প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

৩৮শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৪৫

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিবিধ প্রসঙ্গ

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

চিত্র-সূচী



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কালী

শ্রীচিন্তামণি কর

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড } কার্ত্তিক, ১৩৪৫ { ১ম সংখ্যা

জানা-অজানা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ঘরে আগে পাছে
বোবা কালা বস্তু যত আছে
দলবাঁধা এখানে সেখানে,
কিছু চোখে পড়ে কিছু পড়ে না মনের অবধানে।
পিতলের ফুলদানিটাকে
বহে নিয়ে টিপাইটা এক কোণে গা-ঢেকে সে থাকে।
ক্যাবিনেটে কী যে আছে কত,
না জানারি মতো।
পর্দায় পড়েছে ঢাকা সার্সির দুখানা কাঁচ ভাঙা,
আজ চেয়ে অকস্মাৎ দেখা গেল পর্দাখানা রাঙা।
চোখে পড়ে পড়েও না,
জাজিমেতে আঁকে আলপনা
সাতটা বেলার আলো, সকালে রোদ্দুরে।
সবুজ একটি সাড়ি ভুরে
ঢেকে আছে ডেস্কোখানা; কবে তারে নিয়েছিনু বেছে,
রং তার চোখে উঠেছিল নেচে,
আজ যেন সে রঙের আগুনেতে পড়ে গেছে ছাই,
আছে তবু নাই।

থাকে থাকে দেরাজের
এলোমেলো ভরা আছে ঢের
কাগজ পত্তর নানামতো,
ফেলে দিতে ভুলে যাই কত,
জানি নে কী জানি কোন্ আছে দরকার।
টেবিলে হেলানো ক্যালেণ্ডার,
হঠাৎ ঠাহর হোলো আটই তারিখ। ল্যাভেণ্ডার
শিশিভরা রোদ্দ্ুরের রঙে। দিনরাত
টিক্ টিক্ করে ঘড়ি, চেয়ে দেখি কখনো দৈবাৎ।
দেয়ালের কাছে
আলমারি-ভরা বই আছে
ওয়া বারো আনা
পরিচয় অপেক্ষায় রয়েছে অজানা।
ওই যে দেয়ালে
ছবিগুলো হেথা হোথা, দেখেছি তা কোনো এককালে;
আজ তারা ভুলে-যাওয়া,
যেন ভূতে-পাওয়া।
কার্পেটের ডিজাইন
স্পষ্ট ভাষা বলেছিল একদিন,
আজ অন্যরূপ,
একেবারে চুপ।
আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা ছড়াছড়ি সম্বন্ধ বিহীন।

এইটুকু ঘর।
কিছু বা আপন তার অনেক কিছুই তার পর।
টেবিলের ধারে তাই
চোখ-বোজা অভ্যাসের পথ দিয়ে যাই।
দেখি যাহা অনেকটা স্পষ্ট দেখি নাকো।
জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো,
ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা
তারি পরে করে আনাগোনা।

আয়না-ফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, হলদে হয়ে গেছে তার ছাপ।
পাশাপাশি ছায়া আর ছবি—
মনে ভাবি এই সেই রবি,
স্পষ্ট আর অস্পষ্টের আসবাবে ঠাসা
ঘরের মতন। ঝাপসা-রঙা পুরাতন ভাষা
মাঝে মাঝে জেগে আছে। সব কিছু আছে অন্যমনে।
সামনে রয়েছে কিছু কত হারিয়েছে কোণে কোণে।
যাহা ফেলিবার
ফেলে দিতে মনে নেই। ক্ষয় হয়ে আসে অর্থ তার
যাহা আছে জমে।
ক্রমে ক্রমে
অতীতের দিনগুলি
অস্তিত্ব আঁকড়ি থেকে তবু যায় ভুলি
অস্তিত্বের অধিকার। ছায়া তারা
নূতনের মাঝে পথহারা;
যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে
সে কেহ পড়িতে নাহি জানে,
তাহাতে আভাসে থাকে চরমের কথা,
অস্ত গিরি শিখরের নক্ষত্রের রহস্য বারতা॥

১১।৯।৩৮
উদয়ন, শান্তিনিকেতন



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে,
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যূষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্যগঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।

২৪ ভাদ্র ১৩৪৫

[মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসংরক্ষণ-সমিতির অধিবেশনে পঠিত]

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধারা

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

হিন্দুদিগের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা তাঁহাদিগের ধর্মানুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারা পরমাপ্রকৃতির উপাসক ছিলেন; এই পরমা-প্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে তাঁহারা আকাশস্থ জ্যোতিষ্কপদার্থের মধ্যে পরমসুন্দর দৈবতগণের দর্শন পাইতেন এবং মনে করিতেন যে এই জ্যোতিষ্কদিগের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইতে না পারিলে দেবতাদিগের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে না। সুতরাং এই দেবতাদিগের পূজার জন্য তাঁহারা বেদে যে মন্ত্রাদি রচনা এবং পরে ব্রাহ্মণভাগে যে বিধি ও ক্রিয়াকলাপের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় বা পঞ্জিকা-সম্বন্ধীয় এমন অনেক বিষয় উল্লিখিত আছে যাহার দ্বারা

আমরা পৃথিবীর আকার-প্রকার, আকাশীয় পদার্থের গতিবিধি, কালের গণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইতে পারি। তবে বেদের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাকে জ্যোতিষীয় গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া বেদের উদ্দেশ্যও ছিল না, কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পর্কে যেটুকু জ্যোতিষিক গণনার প্রয়োজন হইত, তাহারই উল্লেখ বেদে আছে।

বৈদিক জ্যোতিষ

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রচিত হইয়াছিল। সংহিতায় জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় যে মত পাওয়া যায়, তাহা ব্রাহ্মণভাগের মতের সহিত কতকাংশে ভিন্ন। সংহিতাভাগের কথাগুলি পদ্যে রূপকভাবে বর্ণিত, ইহার ভাবার্থ গ্রহণ করা সময়ে সময়ে দুষ্কর; ব্রাহ্মণভাগের কথাগুলি সুস্পষ্ট এবং তাহার মধ্যে কোন দ্বিভাব নাই। সুতরাং সংহিতাভাগের বাক্যগুলি যথাযথ বুঝিতে হইলে ব্রাহ্মণভাগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবী একটি গোলক (sphere), আকাশে নিরাধার শূন্যে অবস্থিত এবং সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বেদে এই ব্রহ্মাণ্ডকে তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, যথা :—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক। ইহা দ্বারা অন্তরীক্ষ যে বর্ত্তমান তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অন্তরীক্ষ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঋগ্বেদের কতক মন্ত্রে অন্তরীক্ষকে ঊর্দ্ধ ও অধঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; পৃথিবীর ঊর্দ্ধে যে অন্তরীক্ষ তাহাকে ঊর্দ্ধ অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর নিম্নে যে অন্তরীক্ষ তাহাকে অধঃ অন্তরীক্ষ বলা হইয়াছে। এই অধঃ অন্তরীক্ষ দিয়া সূর্য্য রাত্রিকালে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে গমন করেন। ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে ইহাও পাওয়া যায় যে, সূর্য্যের কোন একটি রশ্মিকলা হইতে বিনির্গত অমৃত দ্বারা সোম (চন্দ্র) ক্রমশঃ পরিপূরিত হইয়া শুক্লপক্ষে দিন দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হন এবং কৃষ্ণপক্ষে তৃষ্ণার্ত্ত দেবতারা এই অমৃত পান করিয়া ফেলেন বলিয়া চন্দ্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যান। বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে যম একটি চান্দ্র দেবতা, বৃহস্পতিও একটি চান্দ্র দেবতা, বরুণ একটি চান্দ্র দেবতা; মিত্রাবরুণ বলিতে সূর্য্য চন্দ্রকে বুঝাইতেছে। বৈদিক যুগে সম্ভবতঃ পঞ্চগ্রহের বিষয় জানা ছিল না, তাহা হইলে অবশ্যই ব্রাহ্মণভাগে রূপক ছন্দে পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ থাকিত। কিন্তু অধ্যাপক হিলব্রান্ট বলেন যে, বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টারা পঞ্চগ্রহের বিষয় অবগত ছিলেন; ঋগ্বেদ-সংহিতার "অধ্বর্য্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্তবিপ্রাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে (৩, ৭, ৭) অধ্যাপক হিলব্রান্ট বলেন যে সপ্ত বিপ্রা অর্থে সপ্তর্ষি আর পঞ্চ অধ্বর্য্যু শব্দে পঞ্চগ্রহ বুঝাইতেছে। খুব সম্ভব এই অর্থই ঠিক।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে পুনঃ পুনঃ অচল নক্ষত্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। রবিমার্গের (ecliptic) নিকটে যে-সকল উজ্জ্বল নক্ষত্র অবস্থিত, তাহাদেরই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই রবিমার্গস্থ নক্ষত্র ভিন্ন অতি অল্প-সংখ্যক নক্ষত্রপুঞ্জেরই নামকরণ হইয়াছিল। বৈদিক গ্রন্থে ২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ প্রায় সর্ব্বত্রই আছে; তবে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে ২৮টি নক্ষত্রের (অভিজিৎকে ধরিয়া) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যেহেতু চন্দ্রের ভগণকাল ঠিক ২৭ দিনে হয় না, ২৭⅓ দিনে হইয়া থাকে, সেই কারণে অভিজিৎ নক্ষত্রকে ধরা হইয়াছে; এইখানে চন্দ্র ⅓ দিন অবস্থান করেন। প্রত্যেক দিনে চন্দ্র মহাবৃত্তপরিধির $\frac{1}{27}$ অংশ পরিভ্রমণ করেন; এই $\frac{1}{27}$ অংশের যে নক্ষত্র উজ্জ্বল তাহাকেই সেই অংশের প্রধান নক্ষত্র বলিয়া প্রায় ধরা হইয়াছে। বেদে নক্ষত্রগুলির নামকরণ কৃত্তিকাকে প্রথম নক্ষত্র ধরিয়া করা হইয়াছে। মহাবিষুব বিন্দু (vernal equinox) হইতেই নক্ষত্রগুলির আরম্ভ ধরা হইয়া থাকে, কারণ গণনা মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতেই আরম্ভ হয়। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, বেদের সময়ে কৃত্তিকানক্ষত্রে মহাবিষুব-সংক্রান্তি হইত। গণনা করিয়া জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, সুতরাং বৈদিক যুগের জ্যোতিষ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ

হিন্দুদিগের প্রাচীনতম জ্যোতিষ-গ্রন্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ।

ইহা বেদের অঙ্গস্বরূপ পরিশিষ্ট গ্রন্থ। পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের কথা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মূলকথা। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসের অমাবস্যাতে উক্ত যুগের শেষ হইয়া থাকে। ৩৬৬ সৌর দিনে, বা ছয় ঋতুতে, বা দুই অয়নে, বা বার সৌর মাসে এক বৎসর হয়। এই প্রকার পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়। এই যুগকে আরও পাঁচটি চান্দ্র বৎসরে বিভাগ করা হইয়াছে। এই পাঁচটি চান্দ্র বৎসরের মধ্যে তিনটি চান্দ্র বৎসরের প্রত্যেকটিতে বারটি চান্দ্র মাস এবং বাকী দুইটি বৎসরের প্রত্যেকটিতে তেরটি চান্দ্র মাস ধরা হইয়াছে। এক যুগে ৬২টি চান্দ্র মাস, আর ৬০টি সৌর মাস, সুতরাং দুইটি চান্দ্র মাস মলমাস ধরা হইয়াছে।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অনেক স্থলে অতি দুরূহ, উহার অর্থ সহজে বুঝা যায় না। উহার এক স্থলে উল্লিখিত আছে, "শ্রবিষ্ঠার প্রারম্ভে সূর্য্য এবং চন্দ্র উত্তর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু অশ্লেষার অর্দ্ধভাগেই সূর্য্য দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'এই উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্ত্তন মাঘ ও শ্রাবণ মাসে হইয়া থাকে।" এই শ্লোক হইতে অধ্যাপক প্র্যাট্ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই প্রকার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১২০০ সালেই সম্ভব হইত। সুতরাং ইহা হইতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১২০০ সালে রচিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

জৈন জ্যোতিষ

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অল্প পরেই জৈনদিগের জ্যোতিষের আরম্ভকাল। জৈনদিগের তিন খানি জ্যোতিষ-গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়:—সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি ও ভদ্রবাহবীয় সংহিতা। সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি পুথির আকারে মুদ্রিত পাওয়া যায়, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তির একখানি পুথি বোম্বাইয়ে ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউটে সংরক্ষিত আছে, কিন্তু ভদ্রবাহবীয় সংহিতা এখন দুষ্প্রাপ্য। জৈন বর্দ্ধমান মহাবীর সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তির রচয়িতা বলিয়া খ্যাত; মহাবীরের মৃত্যুকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫২৭ সাল, সুতরাং সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ সাল হওয়াই সম্ভব। জৈনদিগের ধারণা ছিল যে, গ্রহনক্ষত্রের উদয় ও অস্তের কারণ সুমেরু পর্ব্বত। সুতরাং তাঁহারা কল্পনা করিলেন যে, দুইটি সূর্য্য, দুইটি চন্দ্র, দুইটি করিয়া প্রতিগ্রহ ও দুইটি করিয়া প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জ জম্বুদ্বীপে অবস্থিত এবং ইহারা ক্রমান্বয়ে মেরুর উত্তর ও দক্ষিণে দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাতেই উদয়াস্তের অবতারণা। জৈন জ্যোতিষেও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতই পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের কল্পনা। অথচ প্রভেদ এই যে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে দক্ষিণায়নের অমাবস্যা হইতে যুগের আরম্ভ কল্পিত হইয়াছে, জৈন জ্যোতিষে উত্তরায়ণের পূর্ণিমা হইতে যুগারম্ভের কল্পনা করা হইয়াছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনেক পরবর্ত্তী হইলেও জৈন জ্যোতিষে অনেক অবৈজ্ঞানিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, হিন্দু জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারার সহিত জৈন জ্যোতিষের কোনও সম্পর্ক নাই, ইহা যেন কতকটা খাপছাড়াভাবে মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

জ্যোতিষ-সংহিতা ও প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত

হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ সাল হইতে খ্রীষ্টাব্দ ৫০০ সাল পর্য্যন্ত কালকে অন্ধকার-যুগ বলা যাইতে পারে। কারণ, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তির রচনাকাল হইতে আর্য্যভটের গ্রন্থপ্রণয়নের সময় পর্য্যন্ত যে এক হাজার বৎসরের ব্যবধান আছে, সে সময়ের কোনও জ্যোতিষিক গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। অথচ ইহাও মনে হয় না যে, এত কাল হিন্দুজ্যোতিষের উন্নতির গতি স্থগিত ছিল। এই সময়কার জ্যোতিষিক জ্ঞানের পরিচয় তৎকালীন সাহিত্য ও দর্শনগ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইহাই সম্ভব যে, এই এক হাজার বৎসরের মধ্যে জ্যোতিষ-সংহিতাগুলি ও প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তগুলি রচিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ-সংহিতাগুলি এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য; শোনা যায়, ডাক্তার কার্ণ গর্গসংহিতার একখানি ছিন্ন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তবে সংহিতাগুলিতে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের রচনায় উহাদের উল্লেখ

হইতে। পরবর্ত্তী সময়ের জ্যোতিষগ্রন্থে সাধারণতঃ গর্গসংহিতা ও পরাশরসংহিতার নামোল্লেখ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গর্গ ও পরাশর খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর দুইটি সংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায় বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়, সে দুইটি দেবল ও কাশ্যপ রচিত; কিন্তু এগুলি গর্গসংহিতা ও পরাশরসংহিতার অনেক পরবর্ত্তী রচনা। সংহিতা-যুগের পরেই রচিত হইয়াছিল প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তগুলি। আবুলফজল-কৃত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই কয়টি সিদ্ধান্তগ্রন্থের উল্লেখ আছে,—(১) ব্রহ্ম, (২) সূর্য্য, (৩) সোম, (৪) বৃহস্পতি, (৫) গর্গ, (৬) নারদ, (৭) পরাশর, (৮) পুলস্ত্য, (৯) বশিষ্ঠ, (১০) ব্যাস, (১১) অত্রি, (১২) কাশ্যপ, (১৩) মরীচি, (১৪) মনু, (১৫) অঙ্গিরস, (১৬) লোমশ, (১৭) পুলিশ, (১৮) যবন, (১৯) ভৃগু, ও (২০) চ্যবন। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এবং তাহাদের মূলসূত্রগুলিই পরবর্ত্তী কালে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তগুলিও প্রায় দুষ্প্রাপ্য। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণে অংশস্বরূপ সন্নিবিষ্ট আছে, ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার ব্রাহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে বরাহমিহির তদ্রচিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা নামক সংকলনগ্রন্থে এই পাঁচটি সিদ্ধান্তগ্রন্থ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন—পৈতামহ (ব্রহ্ম), বশিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ ও সৌর। ইহাদিগের মধ্যে সৌরসিদ্ধান্তকেই তিনি প্রথম স্থান দিয়াছেন। বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্তও এই সৌরসিদ্ধান্তের মূলসূত্র লইয়া রচিত। রোমক সিদ্ধান্তটি গ্রীস অথবা রোম দেশের জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে গৃহীত, ইহার আলোচনা-পদ্ধতির সহিত হিন্দুজ্যোতিষ-গ্রন্থের আলোচনা-পদ্ধতির অনেক প্রভেদ এবং ইহা হিন্দুদিগের নিকট আদৌ প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই।

বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ

কিন্তু হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ আরম্ভ হইল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে আর্য্যভটের আবির্ভাবের সময় হইতে। আর্য্যভট দুইখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেবল আর্য্যভটীয় খানি এখন পাওয়া যায়। আর্য্যভট সূর্য্যসিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আর্য্যভট ভূভ্রমবাদ বিশ্বাস করিতেন, তিনিই নীচোচ্চবৃত্ত ও প্রতিবৃত্তের সাহায্যে গ্রহদিগের গতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে গ্রহদিগের গতিপথ ঠিক বৃত্তাকার নহে, উহা অনেকটা বৃত্তাভাসের (ellipse) আকৃতিবিশিষ্ট। আর্য্যভটের পরেই আবির্ভূত হইলেন বরাহমিহির ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ সংকলন-কর্ত্তা। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা; প্রথমখানি ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত জ্যোতিষ দুই বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছে এবং প্রাচীন সংহিতাগ্রন্থকে ভিত্তি করিয়াই রচিত; দ্বিতীয়খানি একটি করণ-গ্রন্থ অর্থাৎ সিদ্ধান্তগুলির ন্যায় উহা নিয়মপদ্ধতিগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করে নাই, কেবল গণনার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছে। বরাহমিহিরের একটা বড় কৃতিত্ব বর্ষারম্ভকে পরিবর্ত্তিত করা। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে দক্ষিণায়নে বর্ষ আরম্ভ হইত, কিন্তু মেষক্রান্তিবিন্দুর অয়নচলনের নিমিত্ত বরাহমিহিরের সময়ে উহাতে ভুল হইত, সুতরাং বরাহমিহির বর্ষারম্ভ-নির্দ্ধারণে একটি পরিবর্ত্তন প্রচলিত করিলেন। তিনি নক্ষত্রতালিকার আরম্ভ করিলেন অশ্বিনী হইতে, ইহার পূর্ব্বে উহার আরম্ভ ছিল কৃত্তিকা হইতে। বরাহমিহির কর্ত্তৃক এই পরিবর্ত্তিত বর্ষারম্ভ-পদ্ধতি এখনও চলিয়া আসিতেছে। বরাহমিহিরের সমসাময়িক ছিলেন জ্যোতিষী লল্লাচার্য্য। তিনি আর্য্যভটের রচনাকে ভিত্তি করিয়া শিষ্যধীবৃদ্ধিদ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আপনাকে আর্য্যভটের শিষ্য বলিয়া প্রচারিত করিলেও তিনি গুরুর ভূভ্রমবাদ বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন, পৃথিবী যদি এত দ্রুতবেগে পরিক্রমণ করিতে থাকে, তাহা হইলে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ প্রক্ষেপস্থানের পশ্চিমে পতিত হয় না কেন, মেঘ সকল কেবল পশ্চিমেই যায় না কেন?

বরাহমিহিরের প্রায় সমসাময়িক এক জ্যোতিষী ছিলেন, তাঁহার নাম ভাস্কর। ইনি সিদ্ধান্তশিরোমণির

রচয়িতা প্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্য্য নহেন; ইনি আর্য্যভটের রচনাকে ভিত্তি করিয়া বৃহৎভাস্করীয় ও লঘুভাস্করীয় নামে দুইখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আনুমানিক ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহার পরে জ্যোতির্ব্বিদ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মস্ফুটগ্রন্থ-প্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত সমগ্র এশিয়াখণ্ডে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল; ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন ইব্রাহিম আল ফাজারি আরবী ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই অনুবাদ সিন্দহিন্দ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত আর একখানি গ্রন্থ—খণ্ডখাদ্যক নামে করণ-গ্রন্থও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, এই অনুবাদ অলর্কন্দ নামে খ্যাত। ব্রহ্মগুপ্তও ভূভ্রমবাদের অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহার এত অধিক প্রসিদ্ধি ছিল যে কোন জ্যোতিষী আর্য্যভটের ভূভ্রমবাদ অনুমোদন করিতে সাহস পাইতেন না।

ব্রহ্মগুপ্তের পরে কিছু কাল প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদের অভাব লক্ষিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইলেন 'লঘুমানস' নামক করণগ্রন্থ-প্রণেতা মুঞ্জাল। তিনি নিশ্চিতই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কারণ অয়নাংশ বাহির করিবার যে নিয়মপদ্ধতি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষেণ্য জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্যও গ্রহণ করিয়া মুঞ্জালের ঋণ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতিষী ছিলেন শ্রীপতি। তিনি ধীকোটি নামে একটি করণগ্রন্থ এবং সিদ্ধান্তশেখর নামে একটি সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখক ধারারাজ ভোজ। তিনি রাজমৃগাঙ্ক নামে একটি করণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্ শতানন্দ পঞ্জিকাকারগণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ভাস্বতী' সূর্য্যসিদ্ধান্তের মূলসূত্রগুলিকে ভিত্তি করিয়া রচিত এবং পঞ্জিকা-প্রণয়নের বিশেষ উপযোগী; পঞ্জিকাকারগণ "ভাস্বতীগ্রহণে ধন্তা" বলিয়া ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। শতানন্দের ভাস্বতী ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

এইবার ভারতের জ্যোতিষক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন ভারত-জ্যোতিষের মুকুটমণি ভাস্করাচার্য্য; তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সিদ্ধান্তশিরোমণি রচনা করিয়াছিলেন। উহা দুই ভাগে বিভক্ত—গোলাধ্যায় ও গ্রহগণিতাধ্যায়। ইহার অনেক পরে ৬৯ বৎসর বয়সে তিনি করণকুতূহল নামে একখানি করণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্যের প্রতিভা বিশ্ববিশ্রুত। তিনি গণিত-জ্যোতিষের সকল দিক্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষগ্রন্থে উল্লিখিত অধিকাংশ বিষয়ের আলোচনা আমরা সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে দেখিতে পাই, গ্রহগতিমীমাংসা, অয়নাংশনির্দ্ধারণ, লম্বননির্ণয় (parallax), গ্রহযুতি (conjunction of planets), বলনমীমাংসা, গ্রহণগণনা প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রের দুরূহ আলোচনাগুলি এমন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা পাঠকমাত্রের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক না করিয়া পারে না। কিন্তু এইখানেই হিন্দুজ্যোতিষের উন্নতির ইতিহাসে যবনিকাপতন। দীপনির্ব্বাণের পূর্ব্বে যেমন অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা যায়, ভাস্করাচার্য্যও ছিলেন ভারতীয় জ্যোতিষ-ক্ষেত্রে সেইরূপ শেষ প্রদীপ্ত শিখা। ইহার পরেই ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গণিত-জ্যোতিষের গবেষণা পরিসমাপ্ত হইল।

ডেভিড হেয়ারের ও রামমোহন রায়ের স্কুল বালিকা-বিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ

১৫

স্কুল-বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি; ডেভিড হেয়ারের স্কুল (১৮১৭-১৮৩০); বালিকা-বিদ্যালয় (১৮১৯-১৮৪৯); মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫)

বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ক যে-সকল কার্য্যের সহিত ডেভিড হেয়ারের নাম যুক্ত, তন্মধ্যে আমাদিগকে স্কুল-বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি (Calcutta School-Book Society and Calcutta School Society)—এই দুইটির বিষয়ে এই প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে।

১৮১৭ সালে ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্ববিধ পুস্তকের রচনা, মুদ্রণ, প্রকাশ, এবং সম্ভব হইলে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে বিতরণ,—এই কয়টি উদ্দেশ্য লইয়া 'কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির সংস্রবে প্রথমতঃ একাদশ প্রস্তাবে উল্লিখিত মে (May) সাহেব ও শ্রীরামপুরের মিশনরী কেরী সাহেব, এবং ক্রমে অন্যান্য কয়েক জন মিশনরী, নানা পুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সোসাইটিতে য়ুরোপীয়, হিন্দু ও মুসলমান, তিন শ্রেণীর সভ্যই ছিলেন; এবং সকলেই অতিশয় উৎসাহের সহিত ও পরস্পর সদ্ভাবের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ার দরিদ্র হইলেও এই সোসাইটিতে বার্ষিক এক শত টাকা সাহায্য করিতেন। বহু বৎসর এই সোসাইটি গভর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। আমরা বাল্যকালে এই সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত কোন কোন পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৮১৩ সালের নূতন চার্টারের পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্ট শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক বে-সরকারী স্কুল ও পাঠশালার অভ্যুদয় হয়। কিন্তু সে-সকল বিদ্যালয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে চলিত; এক নিয়মে ও এক শৃঙ্খলায় পরিচালিত হইত না। যাহাতে এই সকল বিদ্যালয় কিঞ্চিৎ নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার টাউন হলে ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পূর্ব্বোক্ত স্কুল-বুক সোসাইটির প্রধান পুরুষগণই এই নূতন সমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন; ডেভিড হেয়ার তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। এই সমিতির নিম্নোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য তিনটি সব্‌কমিটি নিযুক্ত করা হয়:—(১) নূতন স্কুল স্থাপন; (২) পূর্ব্বেই যে-সকল স্কুল ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের উন্নতিসাধন ও অর্থানুকূল্য; (৩) প্রতিভাসম্পন্ন কতিপয় ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া ইংরেজী শিক্ষার ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার সহায়তা করা।

প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঠন্‌ঠনিয়া ও চাঁপাতলায় দুইটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ১৮৩৪ সালের শেষ ভাগে এই দুইটি স্কুল মিশিয়া পটলডাঙ্গায় যায়। স্কুল সোসাইটির এই স্কুলকে সাধারণ লোকে 'ডেভিড হেয়ারের স্কুল' বলিত।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সোসাইটি কলিকাতায় বিদ্যালয়গুলির বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখা গেল যে এই সময়ে কলিকাতায় ১৯০টি বাঙ্গালা পাঠশালা রহিয়াছে; তাহাতে মোট ৪১৮০ জন ছাত্র পাঠ করিতেছে। এই সোসাইটির পক্ষ হইতে দুর্গাচরণ দত্ত,

রামচন্দ্র ঘোষ, উমানন্দ ঠাকুর এবং রাধাকান্ত দেব তন্মধ্যে ১৬৬টির পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিলেন।৭৬

তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'ডেভিড হেয়ারের স্কুলে'র ত্রিশটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালককে প্রতি বৎসর উক্ত সমিতির কণ্ড হইতে বৃত্তি দিয়া হিন্দু কলেজে অবৈতনিক ছাত্ররূপে পড়িতে পাঠান হইত। এই অবৈতনিক ছাত্রদিগকে হিন্দু কলেজের বড় লোকের ছেলেরা, (যাহারা বেতন দিয়া পড়িত), নানা ভাবে বিদ্রূপ করিত। তাহারা কখনও ইহাদিগকে 'হেয়ার সাহেবের পোষ্যপুত্র', কখনও বা 'ব'ড়ে' বলিত। 'ব'ড়ে' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, দাবাখেলার নানা প্রকার গুটির মধ্যে যেমন ব'ড়েগুলি সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীস্থ, তেমনই হেয়ারের প্রেরিত এই ছাত্রগণ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও হীনশ্রেণীভুক্ত; এবং যেন ব'ড়েরই মত তাহাদের সম্পূর্ণ দলটিকে এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে 'চালাইয়া' আনা হইয়াছে। কিন্তু ধনীপুত্রদের এই অবজ্ঞাসত্ত্বেও সাধারণতঃ হেয়ার সাহেবের ছাত্রগণই হিন্দু কলেজের পরীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্র রূপে পরিগণিত হইতেন। স্বয়ং হেয়ার সাহেব নিজের এই ছাত্রগুলিকে পুত্রনির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন।

ঠন্‌ঠনিয়া ও চাঁপাতলার পূর্ব্বোক্ত যুক্তবিদ্যালয়টি ব্যতীত কিছুকালের জন্য 'আরপুলি' নামক অঞ্চলে 'আরপুলি পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরকালে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পাঠশালায় কলাপাতার ক্লাসে ৭৭ লিখিতে শিক্ষা করেন। ক্রমে এই পাঠশালার নিকটে হেয়ার সাহেব একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহাকে লোকে বলিত 'আরপুলি স্কুল'। তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন। এই স্কুলের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার হেয়ার সাহেব নিজে বহন করিতেন, ৭৮ এবং তাঁহার যত্নে ইহার ইংরেজী বিভাগ ও বাঙ্গালা বিভাগ উভয়ই অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইত। ১৮২৮ সাল পর্য্যন্ত এই 'আরপুলি স্কুল' এবং পটলডাঙ্গায় (অর্থাৎ কলেজ স্কোয়ারে) অবস্থিত 'স্কুল সোসাইটির স্কুল', উভয়ই চলিতেছিল। ক্রমে এই দুইটি মিশিয়া গিয়া বর্ত্তমান হেয়ার স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

অতঃপর আমরা এই যুগে বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

"১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হওয়া অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে, বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইবে কি না? এই বিষয় লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাধাকান্ত দেব উক্ত সোসাইটির অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন; এবং স্কুল সোসাইটির অধীনস্থ কোন কোনও পাঠশালাতে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকেও শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। সম্বৎসর পরে তাঁহার ভবনে স্কুল সোসাইটির পাঠশালা-সকলের বালকদিগের যখন পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইত, তখন বালকদিগের সহিত বালিকারাও আসিয়া পুরস্কার লইয়া যাইত।

এইরূপ কয়েক বৎসর যায়। কিন্তু বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অনেক সভ্যের অভিপ্রেত হইল না। এই বিষয়ে যে বিচার উপস্থিত হইল, তাহার ফলস্বরূপ ১৮১৯ সালে বাপ্তিস্ত মিশন সোসাইটির এক জন সভ্য ভারতীয় নারীগণের দুর্দ্দশা ও শিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া এক নিবেদন-পত্র বাহির করিলেন। সেই নিবেদন-পত্রের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া Mr. Lawson and Pearce's Seminary নামক তৎকাল-প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের মহিলাগণ একত্র হইয়া ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য এক সভা স্থাপন করিলেন; তাহার নাম হইল 'Female Juvenile Society'। এই সভার মহিলা-সভ্যগণ কলিকাতার নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাধাকান্ত দেব ইঁহাদের উৎসাহদাতা হইলেন এবং নিজে 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক' নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য চলিল। ১৮২১ সালে স্কুল সোসাইটির কতিপয় মহিলা-সভ্যের প্ররোচনায় ইংলণ্ডের British and Foreign School Societyর সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুমারী কুক (Miss Cooke)

নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলাকে এদেশে প্রেরণ করিলেন। কুমারী কুক ১৮২১ সালে নবেম্বর মাসে এদেশে উপস্থিত হইলেন। ··· চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির সভ্যগণ ··· কুমারী কুকের ভার গ্রহণ করিলেন। উক্ত মিশনের অধীন থাকিয়া তিনি উৎসাহের সহিত ··· বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাতে মনোনিবেশ করিলেন।

এক দিন তিনি শিশুদের বাঙ্গালা শুনিবার জন্য স্কুল সোসাইটির স্থাপিত কোনও পাঠশালাতে গিয়া দেখেন, একটি বালিকা পাঠশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে; গুরুমহাশয় তাহাকে বালকদিগের সহিত পড়িতে দিবেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন, সেই বালিকাটির ভ্রাতা ঐ পাঠশালে পড়ে; শিশু বালিকাটি স্বীয় ভ্রাতার সহিত পড়িবার জন্য গুরুমহাশয়কে মাসাধিক কাল বিরক্ত করিতেছে। কুমারী কুক সেই বালিকার মাতার ও অপরাপর মহিলাদিগের সহিত দেখা করিলেন। অনেক কথোপকথনের পর সেই পাড়াতে বালিকা-বিদ্যালয় খোলা স্থির হইল। অল্প দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, এবং ন্যূনাধিক ২৭৭টি বালিকা শিক্ষা করিতে লাগিল।

কুমারী কুক দুই বৎসর এই ভাবে কাজ করিলেন। অবশেষে তিনি (Mr. Wilson) উইল্‌সন্ নামক এক জন মিশনরী সাহেবের সহিত পরিণীতা হইলেন। বিবাহের পরেও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ব্রত রহিলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় সময় দিতে পারিতেন না। এই অভাব দূর করিবার জন্য কলিকাতার কতিপয় ভদ্র ইংরাজ মহিলা সমবেত হইয়া তদানীন্তন গবর্ণর-জেনেরাল লর্ড আমহার্ষ্টের পত্নী লেডী আমহার্ষ্টকে আপনাদের অভিনেত্রী করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ বেঙ্গল লেডীস্ সোসাইটি (Bengal Ladies' Society) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার মহিলা-সভ্যগণের উৎসাহে ও যত্নে নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। অল্প কালের মধ্যেই ইহারা শহরের মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।···ঐ গৃহনির্ম্মাণকার্য্যের সাহায্যার্থ রাজা বৈদ্যনাথ বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ···

বেঙ্গল লেডীস্ সোসাইটি (Bengal Ladies' Society) বহু বৎসর জীবিত থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিল। এমন কি, ··· আডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান, কাল্‌না, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা-বিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায়; এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি Ladies' Society-র সভ্য-মহোদয়াগণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের অন্তর্ভূত ছিল।

সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম-শিক্ষাবিহীন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন বীটন্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে করেন। সে কার্য্যের প্রতিষ্ঠা ১৮৪৯ সালে হয়।"[১৭]

মেডিকেল কলেজ ইহার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহারও কিঞ্চিৎ বিবরণ এই প্রস্তাবে প্রদান করা যাইতেছে।

"অগ্রে এদেশীয়দিগকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ আয়োজন ছিল না। ইংরাজ ডাক্তারগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় হস্পিটাল এসিষ্টান্ট প্রেরণ করা আবশ্যক হইত। তাই এক দল এদেশীয় হস্পিটাল এসিষ্টান্ট প্রস্তুত করিবার জন্য 'মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউশন' নামে একটি সামান্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষাতে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রের কতকগুলি ঔষধ ও তাহার গুণাবলী বিষয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েক দিন উপদেশ দেওয়া হইত মাত্র। ডাক্তার টাইটলার (Dr. Tytler) ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৩৪ সালে ··· ডাক্তার রস্ (Dr. Ross) ঐ বিদ্যালয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার উপদেষ্টা ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন, তাহাতে সোডার গুণ সর্ব্বদাই ব্যাখ্যা করিতেন।··· সোডার মহিমা শুনিয়া শুনিয়া ছাত্রেরা এমন বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা তাঁহার নাম 'সোডা' রাখিয়াছিল! ··· কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে 'শ্রীযুক্ত সোডা এবং তাঁহার ছাত্রবৃন্দ' (Soda and his Pupils) এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। Dr. Tytler একজন প্রাচ্যপক্ষপাতী ও উৎকেন্দ্র লোক ছিলেন। এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

এই কারণে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সময় তিনি বড় বাধা দিয়াছিলেন।...

সংস্কৃত কালেজে চরক ও সুশ্রুতের শ্রেণী এবং মাদ্রাসাতে আবিসেন্নার শ্রেণী খুলিয়া দেশীয় বৈদ্যক-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। মেডিকেল কালেজ স্থাপন পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু ইংরাজ-রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাত হইতে বহু অর্থ দিয়া এত ডাক্তার আনা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ এদেশীয়দিগকে ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতে লাগিলেন।...

১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক দেশীয় চিকিৎসা-বিদ্যার অবস্থা অবগত হইবার জন্য সেই সময়ের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিশন নিয়োগ করিলেন। সুবিখ্যাত রামকমল সেন মহাশয় ঐ কমিশনের এক জন সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ নানা জনের সাক্ষ্য লইয়া ও নানা স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এ দেশীয়দিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটি মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তদনুসারে ১৮৩৫ সালের জুন মাসে মেডিকেল কালেজ খোলা হয়। ডাক্তার ব্রামলি (Dr. Bramley) ইহার প্রথম অধ্যক্ষ হন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৮৩৭ সালে মহামতি হেয়ার ইহার সম্পাদক হন। তাঁহারই প্ররোচনাতে তাঁহার ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত সর্ব্ব প্রথমে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হন। সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, এই মৃতদেহব্যবচ্ছেদ লইয়া সে-সময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।"৮০

১৬

রামমোহন রায়ের ইংরেজী স্কুল ও বেদ-বিদ্যালয় (১৮১৭-১৮৩০)

হিন্দু কলেজ কমিটির সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার পর রামমোহন রায় (১৮১৬ কিংবা ১৮১৭ সালে) নিজ ব্যয়ে কলিকাতার সুরিপাড়া-অঞ্চলে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ইহাই এ দেশীয় লোকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্বাধীন বিদ্যালয়। ইহার ছাত্রসংখ্যা ২০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এই স্কুলে সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ নানা সময়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং রেভারেণ্ড উইলিয়ম এডামকে এই কার্য্যের ভার প্রদান করা হইয়াছিল। অতঃপর রামমোহন রায় এই স্কুলের সংশ্রবে তাঁহার মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে একটি ইংরেজী ক্লাস খুলিলেন; তাহাতে ঐ স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ পড়িতে লাগিল; এবং তিনি মোর্‌ক্রফট্ (Morecroft) নামক এক জন ইংরেজকে মাসিক ১০০৲ বেতনে তাহার কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিলেন। কিছুকাল পরে যখন হেদুয়া পুষ্করিণীর চারি ধারে 'কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার' (Cornwallis Square) নামক উদ্যান প্রস্তুত হইতেছিল, তখন রামমোহন রায় তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া, ১৮২২ সালে তাহার উপরে নিজ স্কুলের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। স্কুলটির নাম ছিল 'এংলো-হিন্দু-স্কুল' (Anglo-Hindu School); ইহা অবৈতনিক স্কুল ছিল। ইহার ব্যয়ভারের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রামমোহন রায়ের স্কন্ধে ছিল; কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণও কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। উত্তরকালে য়ুনিটেরিয়ান মিশনরী রেভারেণ্ড উইলিয়ম এডামকে রামমোহন রায় এই স্কুলের পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট সাহেব (Sandford Arnot, যিনি 'ক্যালকাটা জর্ণাল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং "রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড প্রবাসকালে তাঁহার সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেন) এই স্কুলের এক জন শিক্ষক ছিলেন।৮১

নিজ স্কুলে সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াও রামমোহন রায় তৃপ্ত হইলেন না। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে বয়স্কদিগের জন্য একটি ধর্ম্ম-শিক্ষালয়ও তিনি স্থাপন করিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশের সহিত রামমোহন রায়ের যোগের বৃত্তান্ত এই। রামমোহন রায়ের বন্ধু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নিজ ভ্রাতা রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে রামমোহন রায়ের হস্তে অর্পণ করেন। রামমোহন রায় রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে নিজ পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্রের নিকট উপনিষদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে আদেশ করেন। যখন রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঐ দুই শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত হইলেন, তখন (১৮২৬) রামমোহন রায় তাঁহাকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া একটি 'বেদ-বিদ্যালয়' বা 'Vedanta College' প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিদ্যালয়ও হেদুয়ার ধারে বসিত।[৮২] এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, রামমোহন রায়ের নব-নির্ম্মিত ইংরেজী স্কুল-গৃহেই ইহা (সেই স্কুলের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে) বসিত। এই বিদ্যালয়ে উপনিষদ্ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যাপনা ও ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। এইরূপে রামমোহন রায় তাঁহার ইংরেজী স্কুলটির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত করিয়া একটি ধর্ম্মশিক্ষালয়ও স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই 'বেদ-বিদ্যালয়' অধিক দিন জীবিত থাকে নাই।

১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে রামমোহন রায় ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার ইংরেজী স্কুলটির প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র মিত্রের উপরে সেই স্কুল পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার পতিত হইল। সে-সময় হইতে কিছু কাল তাহা 'পূর্ণ মিত্রের স্কুল' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ১৮৩৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে স্কুলটির নাম হইল ইণ্ডিয়ান একাডেমী'। সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই ইণ্ডিয়ান একাডেমীর ছাত্র ছিলেন।

১৮২৮ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে বেঙ্গল হরকরা পত্রিকার অফিসে এক বার রামমোহন রায়ের এংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণের পরীক্ষা হয়। সে-সময়ে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার দিনে স্কুল-কমিটির সভ্যগণকে, ছাত্রদিগের অভিভাবকগণকে, এবং নগরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করা হইত; এবং সর্ব্বসমক্ষে ছাত্রগণের পরীক্ষা লওয়া হইত। ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে আবৃত্তি, দুরূহ প্রশ্নের সমাধান, প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বিশেষ কুতূহলের সহিত শ্রবণ ও দর্শন করিতেন, এবং কৃতী ছাত্রগণকে পুরস্কার দান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। রামমোহন রায়ের স্কুলের ঐ দিনের পরীক্ষার বিবরণ ১০ই জানুয়ারী ১৮২৮ তারিখের বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় মুদ্রিত আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক। তিনি রামমোহন রায়ের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার ঐ পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত থাকিবার কথা।[৮৩]

স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু রামমোহন রায়ের স্কুল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই স্কুলে ইতিহাসাদি সহ বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার এক পরিদর্শক, আদম সাহেব, ১৮২৭ অব্দে ... লিখিয়াছিলেন :—

Two teachers are employed, one at a salary of Rs. 150 per month, and the other at a salary of Rs. 70 per month; and from 60 to 80 Hindu boys are instructed in the English language. The doctrines of Christianity are not inculcated, but the duties of morality are carefully enjoined, and the *facts* belonging to the history of Christianity are taught to those pupils who are capable of understanding general history."[৮৪]

রামমোহন রায়ের এংলো-হিন্দু স্কুলের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি ছিলেন।

রামমোহন রায় যখন বিলাত গমনের উদ্যোগ করেন, তখন তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার সতীর্থ নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতিও হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন।

১৭

হিন্দু কলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রতি রামমোহনের অনাস্থা; এডাম এবং হেয়ার সাহেব সর্ব্ববিষয়ে রামমোহনের সঙ্গী হন নাই

বিগত প্রস্তাবে আমরা দেখিয়াছি যে, রামমোহন রায় নিজে স্বাধীন ভাবে যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁহার বিশেষ আগ্রহের বিষয় হইল। হিন্দু কলেজের উদ্যোক্তাগণ হিন্দুধর্ম্মবেবী

মনে করিয়া রামমোহন রায়কে দূরে ফেলিলেন। ফেলিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কিরূপ বিপন্ন হইতে লাগিলেন, তাহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। রামমোহন রায় কলেজের কর্ণধার থাকিলে হয়তো কলেজটি এত অধিক ধর্ম্মস্পর্শবিহীন হইতে পারিত না। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা ইহা দেখিতে পাইব যে, তৎকালে রামমোহন রায়ের মনের সকল ভাব বুঝিতে সমর্থ মানুষ প্রায় কেহই ছিলেন না। রামমোহনের জীবদ্দশাতেই হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের আচরণে ধর্ম্মহীনতার ফলস্বরূপ নানা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। সেই ছাত্রগণের অনেকে সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; তথাপি রামমোহন তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ধর্ম্মহীনতায় তিনি গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উত্তরকালে ইংলণ্ডে অবস্থিতি সময়ে এই উচ্ছৃঙ্খল দল সম্বন্ধে নিজের মনের ভাব যেরূপে ব্যক্ত করিতেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার একজন চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন,

"He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta, composed principally of imprudent young men, some of them possessing talent, who had avowed themselves sceptics in the widest sense of the term. He described it as partly composed of East Indians, partly of the Hindu youths who, from education, had learnt to reject their own faith without substituting any other. These he thought more debased than the most bigoted Hindu, and their principles the bane of all morality.৮৫

একটি প্রচলিত গল্প হইতেও এই উচ্ছৃঙ্খল দল সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। গল্পটি এই: রামমোহন রায়ের কাছে কেহ আসিয়া বলিয়াছিল, "মহাশয়, অমুক আগে ছিল polytheist, তাহার পর হইল deist, এখন সে হইয়াছে atheist।" রামমোহন রায় হাসিয়া বলিলেন, "ইহার পরে সে হয়তো হইবে beast।"

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ৭ বৎসর পরে (১৮৪০ সালে) তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় হিন্দু কলেজে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার কথঞ্চিৎ আয়োজন-স্বরূপ 'কলেজ পাঠশালা' নামে একটি (attached) পাঠশালা যুক্ত হয়। যদিও তাহা অনেক পরবর্ত্তী কালের ঘটনা, তথাপি এখানেই তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

রামমোহন রায়ের ন্যায় দ্বারকানাথ ঠাকুরও হিন্দু কলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। উক্ত কলেজের নিয়মাবলী ও উদ্দেশ্যের ভিতরে ধর্ম্মশিক্ষার কোনও স্থান রাখা হইল না,—ইহা দেখিয়া রামমোহন রায় অতীব ব্যথিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি ইহার পরিচালকমণ্ডলীর বহির্ভূত বলিয়া কিছু প্রতীকার করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৪০ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া, হিন্দু কলেজে প্রদত্ত সাধারণ শিক্ষার সহিত সংস্কৃত ভাষার ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন কথঞ্চিৎ পরিমাণে যুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, ঐ কলেজের অধীনে অথচ উহার সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা হইতে পৃথক রাখিয়া, 'কলেজ পাঠশালা' নামে একটি পাঠশালা স্থাপন করিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহার প্রধান শিক্ষক হইলেন। ইহার নাম পাঠশালা হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি উচ্চাঙ্গের চতুষ্পাঠী হইল। প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথের এই আয়োজনকে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ১৮২৬ সালে স্থাপিত (এবং তৎকালে লুপ্ত; বিগত প্রস্তাব দ্রষ্টব্য) বেদ-বিদ্যালয়ের (বা Vedanta Collegeএর) পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে।

ধর্ম্মশিক্ষার সহায়তার জন্য রামমোহন রায় নিজ স্কুলে তাঁহার বন্ধু ও অনুবর্ত্তী এডাম সাহেবের সাহায্য লইতেন বটে; কিন্তু এডাম সাহেবও রামমোহন রায়ের মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিতেন না। রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসিয়া এডাম সাহেব প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্ম্মভাব বুঝিতে পারা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। তিনি মনে করিতেন, রামমোহন রায়ও বুঝি তাঁহার মতন, কেবল খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব-বর্জ্জিত খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; এবং আশা করিতেন যে রামমোহন রায় এই ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাবৎ কর্ম্ম করিবেন। ধর্ম্মবিষয়ে এডাম সাহেবের চিন্তার ও দৃষ্টির পরিসর

এরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া রামমোহন রায় তাঁহাকে নিজ প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহাকে কর্তৃত্ব করিতে দিতেন না; সর্ব্ববিষয়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজ হাতেই রাখিতেন।৮৬ এডাম সাহেব এই কথা তাঁহার কোন কোন পত্রে কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।

এক দিকে প্রাচীন-পন্থী গোঁড়া হিন্দুর দল; আর এক দিকে উচ্ছৃঙ্খল, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু রীতির অবজ্ঞাকারী হিন্দু কলেজের নব্য ছাত্রদল; তৃতীয় আর এক দিকে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ, যাঁহাদের ব্যগ্রতার বিষয় কেবল এই যে, কিরূপে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার হয়। রামমোহন রায় ইঁহাদের সকল দলের সহিতই যোগ রক্ষা করিয়াছেন, যাহার নিকট হইতে যে সাহায্য লওয়া সম্ভব তাহা লইয়াছেন, সকলেরই কল্যাণ-চেষ্টার সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু নিজ লক্ষ্য কখনও বিস্মৃত হন নাই।

পাঠক এখন হয়তো বুঝিতে পারিতেছেন যে রামমোহন রায় কেন দেবেন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি না করিয়া তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্ম দ্বারকানাথ ঠাকুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজের প্রথম ছাত্রদল তাঁহাদের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের এই অনাস্থার বিষয় অবগত হইয়াও রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলেন নাই। রামমোহন রায় তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক অধিকবয়স্ক ছিলেন, এবং রামমোহন রায়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিত। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত মধ্যে মধ্যে এই ছাত্রদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। কিন্তু দ্বারকানাথও (রামমোহন রায়ের ন্যায়) সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা প্রতিবাদীর চিত্ত জয় করিতে জানিতেন। তাই তাঁহার প্রতি তাঁহাদের সেই বিরুদ্ধতা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।৮৭

রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু ডেভিড হেয়ারও যে রামমোহন রায়ের মনের সব ভাব বুঝিতেন, তাহা নয়। বিদ্যালয়ে সাধারণ বিদ্যার সহিত ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ডেভিড হেয়ার অনুভব করিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার প্রকৃতির গুরুতর পার্থক্য ছিল; অথচ উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮১৮ সালে, যখন ডেভিড হেয়ার স্কুল সোসাইটির স্কুল ও পাঠশালা লইয়া ব্যস্ত, সেই সময়ে রামমোহন রায় স্বীয় 'আত্মীয় সভা'র দ্বারা এবং 'Abridgment of the Vedant' নামক ইংরেজী গ্রন্থের দ্বারা দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন; শেষোক্ত গ্রন্থের একটি সংস্করণ ইংলণ্ডেও মুদ্রিত হইয়াছে। যে পরিমাণে তিনি য়ুরোপীয়গণের ও এদেশের সংস্কারপ্রিয় লোকদের দ্বারা আদৃত হইতে লাগিলেন, সেই পরিমাণে তিনি রক্ষণশীল লোকদের নিকটে অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ডেভিড হেয়ার নিজ বন্ধুর এই খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেখিয়া তাঁহাকে স্কুল সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীতে গ্রহণ করিতে অতিশয় ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু সেরূপ করিলে পাছে স্কুলগুলি হিন্দু সাধারণের নিকটে অপ্রিয় হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তাহা করিতে পারিলেন না। রামমোহন রায় স্কুল সোসাইটির বাহিরে থাকিয়াও যথাসম্ভব পরামর্শাদির দ্বারা বন্ধুর কল্যাণকর্ম্মের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

মন্তব্য

(৭৬) *David Hare*, pp. 49, 50.

(৭৭) পাঠশালায় তালপাতার ক্লাস, কলাপাতার ক্লাস ও কাগজের ক্লাস বিষয়ে প্রবাসীর বিগত শ্রাবণ সংখ্যার ৪৮২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে রাজনারায়ণ বসু কৃত বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(৭৮) *David Hare*, p. 52.

(৭৯) রামতনু, ১৮৭—১৮৯; *David Hare*, pp. 52-57.

(৮০) রামতনু, ১৫৭, ১৫৮; *David Hare*, pp. 41, 45.

(৮১) এই স্কুল দর্শন করিয়া তদানীন্তন *Calcutta Times* পত্রিকার সম্পাদক M. Dacosta ফ্রান্সে Bishop Abbe Gregoireকে যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠান, তাহা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত একটি ইংরেজী প্রবন্ধে (*Journal of Bihar and Orissa Research Society*র June 1930 সংখ্যার 61 পৃষ্ঠাতে) মুদ্রিত আছে।

(৮২) "ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত," শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৯৭; ১১৩ পৃষ্ঠা। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ৭৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ভূমিতে এই বাড়ী ছিল

(৮৩) রামমোহন রায়ের Anglo-Hindu School সম্বন্ধে এই সকল তথ্যের অধিকাংশ শ্রীযুক্ত অমল হোম সম্পাদিত Rammohun Roy, the Man and His Work পুস্তক (F. M. I., II. 44) হইতে গ্রহণ করা হইল। ৭ই জানুয়ারীর পরীক্ষার সমগ্র বৃত্তান্ত ঐ পুস্তকে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সংগৃহীত বিবরণে প্রদত্ত আছে।

ফারসী 'হর্‌-কারহ্‌' শব্দের অর্থ man of all work বা errand-boy; তাহাই বর্ত্তমান বাংলা ভাষায় বিকৃত হইয়া 'হরকরা' হইয়াছে। সে যুগে অ-কারকে u অক্ষরের দ্বারা, এবং আ-কারকে a অক্ষরের দ্বারা transliterate করা হইত; তাই 'হর-কারহ্‌' শব্দের ইংরেজী রূপ *Hurkaru* হইয়াছিল।

(৮৪) ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জীবনবৃত্তান্তের স্বল্প পরিচয়,' ১৯০২; ১১ পৃঃ। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী প্রবন্ধ, p. 163.

(৮৫) *Biography of Raja Ram Mohan Roy*: London 1833-34. এই স্থলে East Indian বলিতে রামমোহন রায় প্রধানতঃ ডিরোজিওর কথাই মনে করিয়াছিলেন। ডিরোজিও ১৭ বৎসর বয়সে ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮৬) Life and Letters of Raja Ram Mohun Roy by Collet and Sarkar. Calcutta, 1913. Pp. 106, 107, 128, 134.

(৮৭) Kissory Chand Mitra প্রণীত *Memoir of Dwarkanath Tagore*, p. 41, এবং শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ডের ষষ্ঠ অংশ" (পীরালী ব্রাহ্মণ বিবরণের ১ম খণ্ড, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, চৈত্র)—নামক পুস্তকের ৩৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিস্মৃতি ও স্মৃতি

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে।

খুব জোরে ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া নহে, টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি। সন্ধ্যার সময় একা একা বাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে না, কিন্তু উপায় নাই।

শ্রাবণ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; ক্যালেণ্ডারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সাতাশে।

মনে হইল, আজ কত বৎসর ধরিয়া শ্রাবণের শেষ দিকে মনে হইয়াছে, বোধ হয় আজই শেষ বর্ষণ, ভাদ্র মাস আসিলেই শরৎকাল, কাশফুলে ভরা, শিউলির রঙে রাঙা শরৎ। কিন্তু পঞ্জিকায় ভাদ্র মাস হইতে শরৎ আরম্ভ হইলেও প্রকৃত শরৎ আসিতে গোটা ভাদ্র কাটিয়া যায়। তাহার পর সহসা এক দিন আবিষ্কার করি, শরৎ আসিয়াছে, অবিরাম অশ্রুবর্ষণের পরে আকাশের চোখে হাসি ফুটিয়াছে।

আমার ষাট বৎসর বয়স হইয়াছে, ত্রিশ বৎসর আগে যৌবন পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তবু এমনি দিনে মনটা কেমন আনন্দে ভরিয়া যায়, শহরে থাকিয়াও মনে হয় কল্পনার চোখে আমি শুভ্র কাশফুলের গুচ্ছ দেখিতে পাইতেছি, ষ্টেশন হইতে মেঠো রাস্তা ধরিয়া পূজার দিন-কয়েক আগে গ্রামে আসিতেছি, পল্লী-প্রকৃতি তাহার বর্ণবৈচিত্র্যের সম্ভার লইয়া আমাকে সাদরে ডাকিয়া লইতেছে।

অবশ্য বুঝি, পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে-চোখ দিয়া শরতের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, সে-দৃষ্টির আর কণামাত্রও অবশিষ্ট নাই। আমার যৌবন বহু—বহু দূরের অতীতে বিলীন হইয়াছে, আমি এ-জীবনের খেয়াপার হইবার রাস্তা ধরিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্রমাগত পিছনে ফিরিয়া দেখিতেছি, কিন্তু ঝাপসা দৃষ্টি আর বেশী দূর পৌঁছিতেছে না।

ক-টা দিনই বা আর বাকী! বাঙালীর জীবনে ষাট বৎসর বয়স বার্দ্ধক্যের প্রায় শেষ ধাপ, আর গুটিকয়েক ধাপ কোনও রকমে পার হইতে পারিলেই দীঘির শীতল



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কোণারকের পথে
শ্রীকিঙ্কর বেইজ

কালো কাকচক্ষু জলে চিরদিনের মত বিশ্রাম লইতে পারিব। মৃত্যুর পশ্চাতে অন্ধকার ছাড়া আর কি আছে?

কিছুই নাই।

বাহিরে তাকাইলাম। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে রজনীতে পরিণত হইতেছে, বৃষ্টি থামিবার কোনও লক্ষণ নাই। বিরক্ত হইয়া ক্যালেণ্ডারের দিকে আবার তাকাইলাম, যেন আমার দৃষ্টির ফলেই বর্ষা অবিলম্বে শরতে পরিণত হইবে!

সাতাশে শ্রাবণ।

ঠিক এক মাস আগে আমার ষাট বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সহসা মনে হইল, আজিকার দিনটিরও যেন আমার জীবনে কি বিশেষত্ব রহিয়াছে। মনে করিতে পারিলাম না, অনেক চেষ্টা করিয়াও না।

ষাট বৎসর এক মাস আগে এক পল্লীর নিভৃত কুঁড়েঘরে পৃথিবীর আলো অথবা কুঁড়েঘরের অন্ধকার, দেখিয়াছিলাম। তাহার পরে এত দিন পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, ভিক্টোরীয় যুগ ছাড়াইয়া ষষ্ঠ জর্জের যুগে পড়িয়াছি। ডাঙায় রেলগাড়ী যে-সময়ে অবাক হওয়ার বিষয় ছিল, সে-সময় কাটিয়া এরোপ্লেনের যুগ আসিয়াছে। আর আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কথা যদি সত্য হয়, তবে আর কিছু দিনের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্তরের মধ্য দিয়া আকাশযান ছুটিবে, সমস্ত পৃথিবীটাকে নব্য মানবের হাতের মধ্যে আনিয়া।

কিন্তু, কিন্তু আমার জীবনে সাতাশে শ্রাবণ কি শুভদিন আনিয়াছিল? ঠিক এমনি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ছায়াচ্ছন্ন ধরণী, এমনি টিপ্ টিপ্ বর্ষণ, এমনি একটি দিনে আমার জীবনে কি ঘটিয়াছিল?

বুঝিলাম, ষাট বৎসর বয়সকে অবহেলা করা চলে না। আমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল।

আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে ত অনেক জিনিষই ভুলিয়া যাওয়া উচিত। চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, অতি শিশুকালে যে-সব কবিতা পড়িয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশই অবিকল মনে রহিয়াছে। ছাত্রজীবনের অনেক আনন্দ, অনেক ব্যথা, তাহার খুব অল্প অংশই ভুলিয়াছি। তাহা ছাড়া, জীবনের কতকগুলি ঘটনা, যাহাদের নিঃশেষে ভুলিতে পারিলে বিনিময়ে আমার জীবনের দশটা বৎসর অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম, এসবও মনে আছে; শুধু মনে আছে নয়, কারণে অকারণে, সময়ে অসময়ে কাঁটার মত বিঁধিয়া আমার বার্দ্ধক্যের শান্তিময় জীবনকে অসহনীয় করিয়া তোলে।

চাকর আসিয়া তামাক দিয়া গেল। তামাক টানিতে টানিতে অন্যমনস্কভাবে নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমার ষাট বৎসর বয়স হইয়াছে, পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে বিবাহ করিয়াছি; ছেলেটির বিবাহ দিয়াছি, তাহারও ছেলেমেয়ে হইয়াছে। বড় মেয়েটির ত প্রায় নিজেরই ঠাকুরমা হওয়ার বয়স হইল। দুই বছর আগে ছোট মেয়েরও বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি; চিন্তা করিবার মত বিশেষ কোনো বিষয় আর অবশিষ্ট নাই।

গৃহিণীর পঞ্চাশ বৎসর উৎরাইয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার দিনরাত্রির চিন্তা ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরকাল। আমার দিকে নজর দিবার সময়ও বোধ হয় আর বেশী নাই। প্রয়োজন নাই একথা বলিলে অবশ্য মিথ্যা কথা বলা হয়। কারণ বৃদ্ধবয়স মানুষের দ্বিতীয় শিশুকাল; এক জন অভিভাবক না থাকিলে পদে পদে অস্বস্তি বোধ হয়।

অবশ্য, গৃহিণী আমার জন্য এক জন অভিভাবক ঠিক করিয়া দিয়াছেন। চাকর উমেশ আমার ওঠা, বসা, খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো, সমস্ত জিনিষের তদ্বির করে, এবং এসব সে বোঝেও ভাল। যদিও সমস্ত বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার মত বৃদ্ধ আমি এখনও হই নাই।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু আসিলেন। উমেশ আর একটি গড়গড়া দিয়া গেল।

বন্ধু কলিকাতার এক বে-সরকারী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। তিনি জগৎকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এবং গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার বাহিরে কোনও কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। সঙ্গদোষে আমিও আমার অবৈজ্ঞানিক মনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছি। বর্ষার আকাশের দিকে তাকাইয়া

কোন নিবিড়কুন্তলা তরুণীর কথা মনে হইলে মনকে চোখ রাঙাই, শীতের শিশির যখন পত্রহীন গাছের ডালে ডালে মুক্তাহার সৃষ্টি করে, তখন বন্ধুর কথা মনে করিয়া সারফেস্ টেন্‌সন্ দিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করি।

অবশ্য সব সময়ে যে সফল হই, তাহা নহে। কারণ আমার মনের মধ্যে কোনও অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক লুকাইয়া নাই। সাদা চোখে যাহা দেখি, তাহাকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া সুন্দর করিয়া তোলা আমার পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক। তাই এত শিক্ষা সত্ত্বেও পদ্ম দেখিলে প্রভাতরবির প্রিয়া বলিয়াই মনে হয়, গোলাপের রক্তরূপ রূপসীর ওষ্ঠাধরকেই স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাদের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ করিবার কথা মনে আসে না।

বন্ধু আমাকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু আমি জানি আমাদের পথ ভিন্ন, এবং আমার পথই বৃহত্তর সফলতার পথ, বিজ্ঞানের নানা কূট তর্কের অলিগলিপূর্ণ গোলকধাঁধা নয়।

বলিলাম, "আমার স্মৃতিবিভ্রম হয়েছে।"

আমার মুখে এত বড় সংস্কৃত কথা শোনা বোধ হয় বন্ধুবরের অভ্যাস ছিল না, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, "এত বড় কথাটা মনে রাখতে পারা ত স্মৃতিবিভ্রমের লক্ষণ নয়! তার চেয়ে সোজা কথায় বল, মাথার দোষ দেখা দিয়েছে।"

সবিনয়ে জানাইলাম, যে, সে-রকম কোনও অঘটন যদি ঘটিয়া থাকে, তবে সম্পূর্ণ আমার অজ্ঞাতে। আপাততঃ এই সাতাশে শ্রাবণ তারিখের রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করিতে না-পারায় যে সামান্য একটু মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্য।

বন্ধু কহিলেন, "কাব্য পড়া ছাড়, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু থার্মোডিনামিক্‌স্ শিখবে?"

সভয়ে কহিলাম, "না না, আজ থাক, আর এক দিন হবে।" তা ছাড়া স্মৃতিভ্রংশই যখন হইয়াছে, তখন মিছিমিছি পড়িয়া লাভ কি?

আমার ঘরে ও বাহিরে দুই দিকেই সমান বিপদ। গীতা, চণ্ডী, মোহমুদ্গর, প্রভৃতি আত্মার উন্নতিকর গ্রন্থাবলীর দিকে আমার রুচি না-থাকায় গৃহিণী বিরূপ এবং ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি আধিভৌতিক ভোজবাজীর বিদ্যায় রুচিহীনতার জন্য বন্ধু বিরূপ। বন্ধু ও গৃহিণীর পাঠ্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোনও রকম বন্ধুত্ব সম্বন্ধ নাই; বন্ধু নাস্তিক, গৃহিণী পরম আস্তিক। শুধু এক জায়গায় তাঁহারা একমত, কাব্য ও কবিতার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে।

আমার সাহিত্যিক রুচি শুধু আমার ছোট মেয়ে শীলার প্রীতিকর। কিন্তু সে এখন অনুপস্থিত, এবং আমি আমার শিবিরে শত্রুবেষ্টিত।

অথচ গৃহিণী চিরকাল এরূপ ছিলেন না। তিনি শিক্ষিত ঘরের মেয়ে, ইংরেজী বিশেষ না-জানিলেও সংস্কৃত-জ্ঞান বোধ হয় আমার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। কিন্তু তাঁহার বয়স এখন পঞ্চাশ, যে-বয়সে মেঘদূতের চেয়ে মোহমুদ্গর অধিকতর প্রীতিপ্রদ, অভিজ্ঞান শকুন্তলমের চেয়ে গীতাভাষ্য অনেক বেশী মধুর।

বন্ধু কহিলেন, "কই দেখি, তোমার মেমারি কি রকম খারাপ হয়েছে; জিওমেট্রির উনত্রিশের থিওরেমটা বল ত!"

মনে হইল, স্মৃতিভ্রংশের এর চেয়ে ভাল প্রমাণ আর পাইব না। কারণ উনত্রিশের থিওরেম যে মনে নাই, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আরম্ভ করিবামাত্র সমস্ত প্যারাগ্রাফটা গড় গড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল; কোথাও বাধিল না, কমা-সেমিকোলন পর্য্যন্ত না। স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

বন্ধু খুশী হইয়া গড়গড়ার নলটা মাটিতে ফেলিয়া কহিলেন, "এক্সেলেণ্ট! কোন্ হতভাগা বলে তোমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে? তুমি ঠিক আছ।"

কিন্তু সত্যই কি ঠিক আছি? মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলাম, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল ঠিক মনে আছে। পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, তবে উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা, তাহাও মনে রহিয়াছে। এমন কি সূর্য্যের নিকটতম

গ্রহ বুধ, এবং সুদূরতম গ্রহ নেপচুন, ইহাতেও ভুল হয় নাই।

তবে যত গোল কি ঐ সাতাশে শ্রাবণ লইয়া?

চাকর উমেশ আসিয়া কহিল, "বাবু, আজ মা বলেছিলেন আপনাকে বেড়িয়ে ফেরার পথে একটা ফুলদানী আনতে; এনেছেন কিনা জিগ্যেস করছেন।"

বাহির হইতেই পারিলাম না, তার ফুলদানী! কিন্তু এইখানেই আর একটা স্মৃতিবিভ্রমের কথা মনে পড়িল। ফুলদানীর কথা একেবারে মনে ছিল না।

কহিলাম, "কেন ফুলদানী ত একটা রয়েছে, সেটা কি হ'ল?"

সপ্রতিভভাবে উমেশ কহিল, "সেটা কাল আমার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে।"

চটিয়া কহিলাম, "তবে আর কি, আমাকে উদ্ধার করেছ! তোমার মাইনে থেকে ও-ফুলদানীর দাম কাটা যাবে।"

উমেশ হাসিয়া চলিয়া গেল। ও জানে আমার যত তেজ সব মুখে; বাড়ীর সমস্ত বাসনপত্র ভাঙিয়া অণু-পরমাণুতে পরিণত করিলেও তাহার বেতন হইতে এক পয়সাও কাটিবার সাহস আমার নাই।

কিন্তু গৃহিণীর আজই ফুলদানীর কি প্রয়োজন পড়িল? এবং বিশেষ করিয়া আজই আমার স্মৃতিবিভ্রম আরম্ভ হইল কেন?

উপায়ান্তর না দেখিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিলাম।

আর একবার অভয় দিয়া বন্ধু বিদায় লইলেন।

"বৃদ্ধ হইয়াছি" এ-কথাটা বোধ হয় কোন বৃদ্ধেরই প্রীতিপ্রদ নয়। অন্ততঃ বার্দ্ধক্যের প্রথম অবস্থায় নহে। হইতে পারে আশী পার হইয়া লোকে নিজের বয়স লইয়া গর্ব্ব অনুভব করে, এবং সম্ভব হইলে আসল বয়সের সহিত গোটাকয়েক বৎসর বাড়াইয়াও দেয়। কিন্তু আমার বার্দ্ধক্যের মাত্র আরম্ভের যুগ। পারতপক্ষে নিজের বয়সের কথা ভাবি না, তাই সহসা যে-বিস্মৃতির নিদর্শন আমার মনটাকে নাড়া দিয়া গেল, সেই কথা ভাবিয়া অকারণে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

যেন বয়সের কথা ভুলিয়া থাকিলেই বয়সও আমাকে ভুলিয়া থাকিবে; আমার মাথার চুল বরফের মত সাদা হইতে বিরত থাকিবে, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইবে না, আমার মসৃণ মুখে কোনও রেখাপাত হইবে না। আশ্চর্য্য এই দুর্ব্বলতা!

এ বয়সের পরমতম আনন্দ ও চরম দুঃখ নিজের যৌবনের কথা চিন্তা করা। কিন্তু যে আনন্দের সহিত দুঃখের সংমিশ্রণ নাই, তাহা আনন্দই নহে, অন্ততঃ মানুষের পক্ষে নহে। একা একা বসিয়া জানালার বাহির দিয়া বৃষ্টির ক্ষীণ ফোঁটাগুলির দিকে তাকাইয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

সেই তিন যুগ আগে যে তন্বী ষোড়শীকে ঘরে আনিয়াছিলাম, আজ সে বৃদ্ধা, তাহার বড় মেয়েরই প্রায় মাতামহী হওয়ার সময় হইয়াছে। আজ তাহাকে দেখিলে কেহ বলিবে না যে, এক দিন এই লোলচর্ম্মা, ধর্ম্মমাত্র সম্বল, বৃদ্ধা ষোড়শী কিশোরী ছিল, তাহার রূপের আলোয় একটি পল্লী-কুটীর আলো হইয়াছিল।

আয়নার দিকে তাকাইলে আমিই কি মনে করিতে পারি, আমার এক দিন পঁচিশ বৎসর বয়স ছিল, চুলের রং ছিল ভ্রমরকৃষ্ণ, মনে ছিল অফুরন্ত তারুণ্য? আমার পেশীবহুল দেহ শিথিল হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আমি সামান্য একটু বৃষ্টির জন্য এই সন্ধ্যা একা বসিয়া ঘরে কাটাইতেছি!

১৯০৩ সাল ও ১৯৩৮ সালের ব্যবধান ত কম নহে!

আচ্ছা, এমন যদি সম্ভব হইত যে বিজ্ঞানের প্রভাবে গোটাকয়েক বছর আগের যুগে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যাইত! বেশী দিনের ব্যবধানে নহে, কালিদাসের যুগে উজ্জয়িনীতে যাওয়ার বাসনা আমার নাই, আমাকে শুধু ১৯০৩ সাল ফিরাইয়া দাও, আমার পঁচিশ বৎসর বয়স।

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধু শুনিলে পুনরায় আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনা সন্দেহ করিতেন। কিন্তু বন্ধু, তোমরা বিজ্ঞানের বলে সমস্ত দুনিয়া হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়াছ, দূর দেশের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করিয়াছ। বিজ্ঞানের বলে তোমরা আকাশের বিদ্যুৎকে ক্রীতদাস করিয়াছ, প্রকৃতির সহিত মানবের মাতাপুত্র সম্বন্ধ নষ্ট করিয়া প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ

স্থাপন করিয়াছ। বৈজ্ঞানিক, তোমার শক্তি কতটুকু? অণুবীক্ষণের সাহায্যে অণুপরমাণুর রূপ দর্শনই কি তোমার বৃহত্তম জয়? না দূরবীক্ষণ দিয়া দূর আকাশের তারা দেখিয়া নানারূপ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখাই তোমার চরম সাফল্য?

আমি রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশে মণিমাণিক্যের মেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার অজ্ঞতার কৃপার হাসি হাসিয়া জানাইয়াছ, যাহাদের মণিমাণিক্য বলিয়া ভুল করিতেছি তাহারা সূর্য্য, আমাদের সূর্য্যের চেয়ে অনেক বড়, অনেক উজ্জল। শরৎ-রজনীতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া আমার প্রেয়সীর মুখ মনে পড়িয়াছে, জ্যোৎস্না-ধবল ধরণীর রূপ দেখিয়া আমি বিস্ময়ে আনন্দে আকুল হইয়াছি, তুমি চোখে আঙুল দিয়া জানাইয়াছ চাঁদ জীবিত নহে, কোন রূপসী তরুণীর সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই, চাঁদ শুধু কতকগুলি আগ্নেয়গিরির সমষ্টি, মৃত, শুষ্ক, বায়ুহীন। সূর্য্যের কাছে ধার করিয়া তাহার আলোর রূপ, নিজে সে অন্ধকার, কুশ্রী।

বৈজ্ঞানিক, তুমি আমার কাব্যের জগৎ, রূপের জগৎ, রূপহীন করিয়াছ, রূপকথার জগতে অবিশ্বাস আনিয়াছ। আর কোনও দিন দূর তেপান্তরের মাঠে অচিন দেশের রাজপুত্র রূপকথার রাজকন্যার সন্ধানে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিবে না, তোমার এক মুহূর্ত্তের ক্রুর অবিশ্বাসের হাসিতে তুমি অকাতরে তাহার মৃত্যু আনিয়াছ। নিদ্রিত মণিহর্ম্ম্যে রাজকন্যার ঘুম কোনও দিন ভাঙিবে না, সোনার কাঠি রূপার কাঠি অনাদৃত পালঙ্কের এক কোণে পড়িয়া রহিবে। তুমি জীবন আনিতে পার নাই, আনিয়াছ মৃত্যু; কল্পনা আনিতে পার নাই, আনিয়াছ বাস্তব।

কিন্তু শক্তিহীন বৈজ্ঞানিক, আমিও তোমাকে কৃপার পাত্র ভাবিতে পারি। তুমি দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরের নক্ষত্র দেখিতেছ, অচিন্তনীয় দূরদেশে অদৃশ্য নীহারিকা-পুঞ্জ আবিষ্কার করিতেছ; কিন্তু পার তুমি, তোমার প্রাণহীন বিজ্ঞানের পুঁথির শুষ্ক হিসাবের অঙ্ক লইয়া ঐ সব জ্যোতিষ্কের যাত্রী হইতে? কোন দিনও না, তুমি শুধু দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে, আর নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া লজ্জা পাইবে।

আমি আমার কল্পনার আরোহী হইয়া রাত্রির আকাশের তারার তীর্থযাত্রী হইয়া ঘুরিয়া আসিয়াছি; ছায়াপথের ধারে ধারে কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল পার হইয়া ধ্রুবতারার গণ্ডি ছাড়াইয়া বহু দূরে, যেখানে তোমার দূরবীক্ষণের দৃষ্টি পৌঁছায় না, সেই সব পথের পথিক হইয়াছি। পূর্ণিমার রাত্রিতে ডায়ানার সহিত ওরায়নের মিলন দেখিয়াছি, চুপি চুপি অলক্ষ্যে তাহাদের প্রণয়বাণী শুনিয়াছি।

সেই কল্পনাই আমাকে আমার যৌবন ফিরাইয়া দিয়াছে। বর্ষণব্যাকুল ধরণীর অশ্রু মুছাইয়া শরৎ যখন পল্লীতে পল্লীতে নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইয়াছে, এমনি সময় আমার গ্রামে ফিরিয়াছি।

ধানক্ষেতের মাঝে আল বাহিয়া আমি চলিয়াছি বাড়ীর পথে। ষষ্ঠীর প্রভাত। রাত্রি সবে শেষ হইয়াছে। বনপথের মধ্যে গাছ হইতে বড় বড় শিশিরের ফোঁটা আমাকে ভিজাইয়া দিল, প্রবাসী সন্তানের গৃহাগমনে পল্লীমায়ের আনন্দাশ্রু। পূব আকাশে সূর্য্য উঠিতেছে, সোনার রঙে চারি দিক্ রাঙা হইয়া উঠিল, আসন্ন পূজার আনন্দে আমার মনকেও উতলা করিয়া।

বাড়ীর বাহিরের পুকুরঘাটের পাশ দিয়া চলিতেছি; ওপারের কয়েক জনকে দেখা যাইতেছে। পথে লোক দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া ভাবিতেছে "কে আসিল!"

সানাইয়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। আমি বাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আমার সাতপুরুষের ভিটা, আমার তীর্থ!

কিন্তু এ ত পঁচিশ বৎসরের যুবকের চিন্তা। আমি যদি আজ ষাট বৎসর বয়সে সেখানে যাই, আমার চোখে এসব কেমন লাগিবে?

আমি জানি, আমার এ-চিন্তা অপরিবর্ত্তনীয়। এক ষষ্ঠীর প্রভাতে আমার গ্রাম যাহাকে সমাদরে কোলে টানিয়া লইবে, সে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ নয়, পঁচিশ বৎসরের যুবক এবং সে-যুবক আমি। বাহির হইতে তোমরা দেখিবে এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কিন্তু

এক মুহূর্ত্তের কল্পনায় তাহার কেশ ভ্রমরকৃষ্ণ হইয়াছে, জরাজীর্ণ দেহ তাহার পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের পেশীসবল সামর্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছে।

শুধু একটি দিনের জন্ত যে-ভগবানকে কোন দিন মানি নাই, তাঁহারই কাছে প্রার্থনা জানাইয়া রাখি। এক এক পা করিয়া যে শেষের দিনটি আগাইয়া আসিতেছে, সে যখন অবশেষে আসিয়া পৌঁছিবে, তখন যেন এই গ্রামেরই ভৈরবের পারে আমার পূর্ব্বপুরুষদের শ্মশানে, যে-দেহটাকে এত দিন ধরিয়া নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া ভালবাসিয়াছি, চিতার আগুনে তাহার শেষ হয়। অন্তিম দিনে এই হইবে আমার শেষ ইচ্ছা।

একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। উমেশের ডাকে জাগিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ?"

উমেশ সবিনয়ে জানাইল, "মা বললেন, আজ রাত্রে খেতে একটু দেরি হবে।"

আশ্চর্য্য, রাগ করিতে পারিলাম না। যদিও ঘড়িতে নয়টার বেশীই হইয়াছে, এবং আমার নয়টার মধ্যেই খাওয়া অভ্যাস, তবু কেন যেন মনে হইল, ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। সংক্ষেপে বলিলাম, "আচ্ছা।"

উমেশ একটু অবাক হইয়া চলিয়া গেল।

বোধ হয় আজকের দিনটারই কোনও গুণ রহিয়াছে। না হইলে আমি এতক্ষণ বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি, প্রথম যৌবনের স্মৃতি বেদনা অপেক্ষা আনন্দ বেশী দিল কি করিয়া ? আর যে-বয়সে মৃত্যুর চিন্তার মধ্যে একটা অজ্ঞাতের আশঙ্কা ছাড়া কিছুই নাই, সেই বয়সে অনায়াসে কোন্ শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হইব, তাহা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া ফেলিলাম কি করিয়া ?

হয়ত বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সন্দেহই ঠিক ; আমার বোধ হয় মাথার দোষ দেখা দিয়াছে। আচ্ছা তাই যদি হয়, তাহাতে আপত্তির কারণ কি আছে ? প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমি যে-সব চিন্তায় অথবা ঘটনায় শুধু রাগ করিয়া বা ভয় পাইয়া থাকি, আমার এ-ধরণের অবস্থায় যদি তাহা শুধু আনন্দ ও তৃপ্তি দিতে পারে, ভালই ত !

কিন্তু সাতাশে শ্রাবণের রহস্য ভেদ করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গৃহিণী হয়ত বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে আমার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হইল কোথায় ? তাহা ছাড়া, হয়ত গৃহিণী এখন কোন্ নূতন সংস্করণের গীতা, অথবা চণ্ডী, অথবা ঐ ধরণের কোন বইয়ে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া আছেন। আমার অনধিকারপ্রবেশে খুব খুশী না হওয়াই সম্ভব।

বাহিরে এখনও একই ভাবে বৃষ্টি পড়িতেছে।

বাড়ীতে নাতি-নাতনীদের কেহ উপস্থিত থাকিলে এতটা একা একা লাগিত না। কিন্তু ছেলে এলাহাবাদে, এবং মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী এবং আমি এই বাড়ীতে একা, যদিও গৃহিণীও উপস্থিত আছেন।

কিন্তু যে সময় একা মালতী থাকিলেই নির্জ্জনতার সমস্ত শূন্যতা ভরিয়া যাইত, সে সময় আর নাই। এখন হয়ত মালতী বলিয়া ডাকিলেও কেহ ডাক শুনিবে না, কারণ সেদিনের মালতীর আজ একান্ন বৎসর বয়স, তাহার সঙ্গী গীতা প্রভৃতি আত্মার উন্নতিকর গ্রন্থ।

পণ্ডিতেরা নাকি বলিয়াছেন, ধর্ম্মাচরণ সস্ত্রীক করাই কর্ত্তব্য। এ-ক্ষেত্রে স্বামীর যখন ধর্ম্মের বালাই নাই, এবং স্ত্রীর যখন ইহকাল অপেক্ষা পরকালের চিন্তাই প্রধান, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য তাঁহার একাই সম্পাদন করিতে হয়, এবং রবীন্দ্রনাথ, শেলী এবং কালিদাস ইহাদের সাহচর্য্যে দিন কাটান ছাড়া আমার উপায় নাই।

অথচ যখন সাতাশ বৎসর বয়সে এই মালতীকে লইয়াই উত্তর-কলিকাতার এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে দুইখানি ঘর লইয়া সামান্য বেতন সম্বল করিয়া নীড় বাঁধিয়াছিলাম, তখনকার মালতী কেমন ছিল ? সারা দিনের পরিশ্রমের পর যে-মুখখানি দেখিয়া সমস্ত ক্লান্তি ভুলিয়া যাইতাম, এই কয় বৎসরে তাহার এমন পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিল ?

আজ আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অবসর লইয়াছি, আমার অফুরন্ত সময়, সপ্তাহের সাতটি

দিনই রবিবার। এমনিধারা ছুটি আর কয়টি বৎসর আগে পাইলে কাহার কি আসিয়া যাইত?

কিন্তু আজ আর সে-কথা ভাবিয়া লাভ নাই। রূপকথায় রাজকন্যার সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙিয়াছিল, অচিন দেশের রাজপুত্রের সহিত সুখে-স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিয়াছিল। রূপকথার এইখানেই শেষ। আমার রাজকন্যার গল্পের শেষ এইখানেই নয়। রাজকন্যার বয়স বাড়িয়াছে, তরুণী রাজকন্যা বৃদ্ধা হইয়াছে। রাজপুত্রের ভ্রমরকৃষ্ণ চুল সাদা হইয়াছে, কাহারও যৌবনের কণামাত্রও অবশিষ্ট নাই।

এ-রূপকথারও কিন্তু এখানে শেষ নয়। ইহার পরেও তাহার উপসংহার আছে, সে উপসংহার পুঁথির পাতায় নহে, ভৈরবনদের তীরে ক্ষুদ্র একটি শ্মশানঘাটে। কিন্তু তাহা হইলে রূপকথার সমাপ্তি হইল বিয়োগে, মিলনান্ত আর রহিল না।

আশ্চর্য্য, সামান্য একটা কথা মনে করিতে না পারায় অবান্তর কত কথাই যে মনে আসিতেছে! যেন ষাট বৎসরেই মানুষের জীবনের শেষ, সিঁড়ির শেষ ধাপ, সামনে যেন কালো জল ছাড়া আর কিছুই নাই! বন্ধুর কথামতই কাজ করিব, থার্মোডিন্যামিক্‌স্ পড়া ধরিব। তাহাতে জীবন-মৃত্যুর কথা নাই, সুখ-দুঃখের সমস্যা নাই, বিগত যুগের প্রেম, মান-অভিমান কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

কিন্তু সে না-হয় বন্ধু আসিলে চলিতে পারে; এখন রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি, ঘুম আসিতেছে, অথচ গৃহিণী, অথবা উমেশ, কাহারও দেখা নাই। ভাবিতেছি, উঠিয়া গৃহিণীর ঠাকুরঘরে অনভ্যস্ত প্রবেশ করিয়া কারণটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইব কিনা। সাহস হইতেছে না।

একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলাম, গৃহিণী।

গল্পে পড়িয়াছি, ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড-স্পর্শে মরুভূমি সহসা উদ্যানে পরিণত হইয়াছে, লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা তন্বী তরুণীর রূপ পাইয়াছে। আজ দেখিলাম, কিসের গুণে যেন গৃহিণীর অত্যন্ত গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে, হাতে জপের মালা নাই, আছে ফুলের মালা। এক মুহূর্ত্তের মায়ায় তাঁহার বয়স কমে নাই, কিন্তু প্রফুল্লতার ঔজ্জ্বল্যে তাঁহাকে সুন্দরী করিয়াছে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, "ব্যাপার কি?"

উত্তরে গৃহিণী ফুলের মালাটি আমার গলায় পরাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সলজ্জ হাসিয়া কহিলেন, "ভুলে গেছ? আজ সাতাশে শ্রাবণ।"

আবার সেই সাতাশে শ্রাবণ! কহিলাম, "সাতাশে শ্রাবণ কি?"

গৃহিণীর প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল। অভিমানের স্বরে কহিলেন, "সাতাশে শ্রাবণ দশটা পনর মিনিটের লগ্নে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। অবশ্য, তোমার যদি মনে না থাকে, তবে মনে করিয়ে দিয়ে আর কি হবে?"

সমস্যার এতক্ষণে সমাধান হইল। তাড়াতাড়ি কহিলাম, "হাঁ নিশ্চয়, মনে ছিল বইকি, খুব মনে ছিল দাঁড়াও দাঁড়াও, মালাটা তোমার গলায় পরিয়ে দিই।"

গৃহিণীর অন্ধকার মুখে আবার হাসি ফুটিল। ঘড়িতে দশটা বাজিয়া ষোল মিনিট হইয়াছে।

রূপকথার রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়াছে। কল্পনার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় আমি আমার তিন যুগ আগের মালতীকে ফিরিয়া পাইয়াছি, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান যাহা কোনও দিনও দিতে পারে নাই, সাতাশে শ্রাবণের মায়ায় তাহা পাইয়াছি।

গৃহিণীর স্মিতমুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম,

"ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিনাবসানে ছায়েব তরোর্মূলং ন মুঞ্চতি।"

গৃহিণী হাসিয়া আমার চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন।

আশ্চর্য্য, এই দিনটির কথাই ভুলিতে বসিয়াছিলাম!

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩

শ্যামবাজার হইতে শিয়ালদহ পায়ে হাঁটিয়া আসা পয়সা হাতে থাকিলে কষ্টকরই মনে হয়। অমিয়র হাতে পয়সা ছিল না এবং পথের দু-ধারে বৈচিত্র্য কম, কাজেই ঠিক দশটায় সে আপিসে হাজিরা দিল।

আসিয়া দেখে খগেনবাবু হাজিরা-খাতা টেবিলে রাখিয়া লাল কালির কলমটি উঁচাইয়া বসিয়া আছেন। আর দশ মিনিট হইলেই ক্রুতকরে তিনি লাল কালির লাইন টানিতে আরম্ভ করিবেন।

অমিয়কে দেখিয়া তিনি আপন স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "এই যে ছোকরা, ঠিক সময়ে এসেছ। নাও, সই কর।"

অমিয় স্বাক্ষর করিলে বলিলেন, "কোত্থেকে আসছ? শ্যামবাজার? হুঁ, তা পাসটাস কিছু করেছ, না বড়বাবুর রেকমেণ্ডেসন্?"

অমিয় মুখ লাল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

খগেনবাবু আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "বাইরে প্রচার আজকাল বড়বাবুদের কোন হাত নেই। ওটা নিছক মিথ্যা কথা। হাত আবার নেই? খোঁচা দেবার বেলায় তো দেখি রাবণ রাজার তুল্যমূল্য! একটু পরেই দেখবে টেবিলের তলা ওপর তিল ধারণের স্থান নেই।" বলিয়া কর্কশ হাসি হাসিলেন। পরে কলম নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন, "নূতন লোক, ভারি আশ্চর্য্য হচ্ছ, নয়? বলি ছোকরা, সাবধান। দেশে যদি পাটালি গুড় থাকে, ব'লো, পাওয়া যায় না। আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, নারকেল গাছ থাকলে বলবে, গাছ আছে বটে, ফল হয় না। হয়ত খবর নেবে, তোমাদের গোয়ালে মৌচাক হয়েছে কি না, স্রেফ জবাব দেবে, না তো! তার পরে দুধ, মাছ, চাল, ডাল, সার তেল তুন পর্য্যন্ত একবার দিয়েছ কি বার্ষিক বন্দোবস্ত। বলি জমিদারের বার্ষিক খাজনা বোঝ তো? এও তাই।" বলিয়া হো হো করিয়া হাসিলেন, চারি পাশের লোকগুলিও কৌতুকে ফাটিয়া পড়িল।

কে এক জন বলিল, "ওঁকে অত ক'রে বলছেন কেন খগেনবাবু। ও বেচারী সবে কাল এসেছে, কি-ই বা বোঝে?"

খগেনবাবু বলিলেন, "তাই তো হালচাল বাৎলে দিচ্ছি। ওরাই তো শিকারের জিনিষ, মিষ্টি কথায় ওদেরকে ভোলান খুবই সোজা।"

"তা যা বলেছেন। এই দেখুন না, সাত সকালে নাকে মুখে গুঁজে ছুটতে ছুটতে আসছি। আর মজাসে বাবু আসবেন বারটায়। যাদের মাইনে বেশী, সুখও তাদের বেশী।"

খগেনবাবু ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন, "আর এক মিনিট—যে আসুন না-আসুন লাইন টানব কিন্তু।"

"তা টানুন, তবে কিনা মরতে আমরাই মরি। বড়দের তো ভুলচুকও নেই, লেটও নেই। দিব্যি আছেন।"

খগেনবাবু বলিলেন, "আমি কি আপনাদের বাঁচাতে পারি নে? পারি। দশ-বিশ মিনিট পরে লাইন টানলে কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়, বলুন? কিন্তু আপনারাই তখন আমার নামে লাগাবেন। বলবেন, বড়বাবু, খগেনবাবু আজ দশটা কুড়িতে লাইন টেনেছেন। দশটা উনিশে এসে ফণী বাঁচলে, আর দু-মিনিটের জন্যে আমার হল লেট্!"

"তাই কি বলেছি কোনদিন?"

"আপনি না বলুন, আর কেউ বলবেন! কান ভারী করবার লোকের অভাব নেই তো। ঐ দেখুন!" বলিয়া খগেনবাবু এক জন নবাগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। লোকটি শীর্ণকায়, পরনে ময়লা ধুতি, জামা

এবং ততোধিক ময়লা এক খানা চাদর কাঁধে ঝুলিতেছে। মাথার চুল দেখিয়া অনুমান হয় মাসাবধি সেখানে তৈল বা জলবিন্দু পড়ে নাই। পায়ের রং তামাটে, হাতে একটি মাতিবৃহৎ পুঁটুলি। তিনি কুণ্ঠপদে ঘরে ঢুকিলেন।

খগেনবাবু কর্কশ হাস্যদ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন, "এই যে ফণীবাবু, আসুন, আসুন। আপনার জন্তে কলম ধরে ব'সে আছি।"

ফণীবাবু বিনাবাক্যব্যয়ে হাজিরা সহি করিলেন।

খগেনবাবু বলিলেন,"বলি এতে কি? ধান না চাল?"

ফণীবাবু পুঁটুলিটি বড়বাবুর টেবিলের তলায় রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "ধানই বটে। লক্ষ্মীপুজোর ধান।"

খগেনবাবু বলিলেন, "তা বটে, ধান তো কলকাতায় পাওয়া যায় না—"

ফণীবাবু বলিলেন, "এ ধান কলকাতায় কোথা পাবেন? এ একেবারে টাটকা জমি থেকে আনা, এখনও গোলাজাত হয় নি।"

খগেনবাবু সব্যঙ্গ-হাস্যে বলিলেন, "আমরা সব কিনি বাসি ধান—পচা পুরনো জিনিষ। কি করি বলুন, আপনারা ত দয়া করেন না। যাঁর লক্ষ্মীশ্রী বেশী, তাঁকে সাহায্য করবার লোকাভাব হয় না।"

ফণীবাবু বলিলেন, "কেন, আমায় বললেই ত পারতেন।"

খগেনবাবু বলিলেন, "আমায় ধান জুগিয়ে পুরো জিনিষটাই ত লোকসানের খাতায় জমা হ'ত আপনার। চাই নি, সে ত ভালই হয়েছে।"

ওধার হইতে কে এক জন বলিল, "আপনাকে দিলে পুরো লোকসান নাও হ'তে পারে। ওঁর পরেই ত সিংহাসন আপনার। ফণীবাবু বেহিসাবী নন, চিরকালই গোড়া বেঁধে কাজ করেন।"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠিল।

ফণীবাবু তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় গিয়া বসিলেন।

বিনয় খগেনবাবুর নিকটে আসিয়া বলিল, "আজ ফণী সব কথা বড়বাবুর কাছে লাগাবে নিশ্চয়।"

খগেনবাবু নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, "লাগাক গে। যার যা কাজ সে তা করবে না? ওতেই ওদের অন্ন, ওতেই ওদের জীবন।"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা, ফণীবাবুকে জার্মান ওয়ারে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"ভালই হয়। গুপ্তচরের কাজটা ওর জন্মগত বিদ্যা কিনা, ভালই পারবে।"

বিনয় উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিতেই কারণ না বুঝিয়াই সারা আপিস হাসিয়া উঠিল।

অমলবাবু,ওরফে দাদা সেদিন আপিসে আসেন নাই। মাসের মধ্যে তিনি আট-দশ দিন কামাই করেন এবং বছরের মধ্যে লম্বা ছুটি লইলে মাস-পাঁচেকের কম ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেন না। সকলে বলে, কাজের একটু চাপ পড়িলেই দাদার শরীর অসুস্থ হয়। তিনি আসেন নাই বলিয়া সকালের মজলিসটা আজ ভাল করিয়া জমিল না।

বিশ্বজিৎ আসিয়া অমিয়র চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন লাগছে অমিয় বাবু?"

অমিয় বলিল, "রোজই এ রকম চলে?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বড়বাবু উপস্থিত না থাকলেই চলে। আজ যা হ'ল এ ত যৎসামান্য; অপেক্ষা করুন আরও দেখবেন।"

অমিয় বলিল, "পরস্পরকে আঘাত ক'রে এঁরা আনন্দ পান কেন?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আর কিসে আনন্দ পাওয়া যায় তা এঁরা জানেন না বলেই। আমার যা আছে—আপনার তা না থাকলেই—আপনি আঘাত দিয়ে সেই লোভকে প্রকাশ করবেন বইকি।"

অমিয় বলিল, "এ রকম আলোচনায় মানুষ নীচু হয়ে যায় না কি?"

বিশ্বজিৎ হাসিল, "চাকরির ক্ষেত্রে যাদের আয় কম, অভাব ষোল আনা, তাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা যে স্তরের, সেই আলোচনাই আমাদের শোভা পায়।"

অমিয় অধীর কণ্ঠে বলিল, "এ আপনি শুধু তর্কের খাতিরে নীচু হচ্ছেন। সত্যকার আন্তরিক কথা এ নয়।

দারিদ্র্য মনুষ্যত্ববিকাশে বাধা দেয়, এ-কথা দুর্ব্বল লোকেরাই মেনে নেয়।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "এবং দরিদ্র লোক মাত্রই দুর্ব্বল লোক এ-কথাও সর্ব্ববাদিসম্মত।"

"না।" টেবিলে মৃদু চাপড় মারিয়া অমিয় বলিল, "যারা দারিদ্র্যকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পারে সেই সব মেরুদণ্ডহীন মানুষের কথা এসব। দুঃখের মধ্যেও মাথা উঁচু ক'রে ও সম্মান বজায় রেখে চলার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।"

বিশ্বজিৎ হাসি না-থামাইয়া বলিল,"আগে অন্ন-সমস্যা, না আগে সম্মান-সমস্যা, অমিয় বাবু? আপনার জীবনের থেকে মানুষের প্রিয়তর কিছু জগতে আছে? বলুন।"

অমিয় বলিল, "এক কথায় এর কি উত্তর দেব? যদি বলি, সম্মান বড়, আপনি বলবেন নাটকের ভাষা।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বলবই ত। যাঁরা দু-মুঠো খেয়ে সভ্য সমাজে লজ্জা বাঁচিয়ে চলতে পারেন, তাঁরাই ত সৃষ্টি করেছেন ঐ নাটকের ভাষা। মুখে কথা ফোটবার আগে যেমন বাক্‌পটুত্বের মূল্য, অন্ন-সমস্যার আগে তেমনই সম্মান-সমস্যা! আপনি ভাবতে পারেন, অমিয়বাবু, যখন আমরা আর্য্যমাত্র ছিলাম—বল্কলে লজ্জা বাঁচত, অর্দ্ধদগ্ধ মৃগমাংসে উদর পূর্ত্তি হ'ত, গুহায় ছিল বাসগৃহ, গোষ্ঠীতে ছিল না সামাজিক প্রথা, তখন আমাদের সম্মান আজকের দিনের এই পালিশ-করা সম্মানের মতই ছিল কি না? আমরা যাযাবর-বৃত্তি ছেড়ে যেই মাত্র জমি ভাগ ক'রে সমাজ বাঁধলাম, সঙ্গে সঙ্গে এল অনেক উপসর্গ। মৃগমাংস ছেড়ে অন্নে আমাদের রুচি এল, ধনুর্ব্বাণ ফেলে লাঙল ধরলাম। গুহার কদর্য্যতায় মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল, কুটীর তৈরি করলাম এবং জমি ভাগের মত স্ত্রীসম্পত্তিও ভাগ ক'রে নিলাম। যা ছিল সর্ব্বসাধারণের, তাই হ'ল ব্যক্তিবিশেষের। কাজেই ব্যক্তিগত রুচি নিয়ে আমরা এক একটি পৃথক্ পরিবার গ'ড়ে তুললাম। বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার মূলে সেই প্রথম সভ্যতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই বর্ত্তমান।"

অমিয় বলিল, "দাঁড়ান, আপনার তর্ক ঠিক যুক্তি-সহ নয়।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "আমার যুক্তি নয়, অনুমান। কল্পনায় আমি অনেক কিছু ভাবি, যখনই এই আপিসের কথা ভাবি, তখন মানব-সভ্যতার গোড়ার ইতিহাস ভাবতে ইচ্ছে করে। আমার কাছে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ; যতটুকু জানি—তার ওপর যতটুকু জানি না তারই রং মেশাই বেশী করে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যা সৃষ্টি ক'রে গেছেন, আমরা শক্তি হারিয়ে তার ফল ভোগ করছি। আবার আমরা যে-স্বপ্নে জীবন কাটাচ্ছি তার ফল ভোগ করতে দিয়ে যাব আমাদের মেরুদণ্ডহীন বংশধরদের।" একটু থামিয়া বলিল, "দুঃখের মধ্যে জীবন কাটিয়ে অভাবকে প্রতিনিয়ত সম্মুখে রেখে যিনি সত্যকারের বড় হয়েছেন তিনি নিঃসন্দেহ প্রতিভাবান, তাঁর দেবদত্ত ক্ষমতা, দৈব না মেনেও আমরা স্বীকার করতে পারি। কিন্তু অমিয় বাবু, আপনি, আমি, আরও লক্ষ কোটী মানুষ এই দুঃখদৈন্যের অতল সাগরে যে তলিয়ে গেলাম, তার কি! আমরা তলিয়েই যাচ্ছি, টেনে তোলবার কেউ নেই।"

"টেনে কেউ তুলবে না, আমাদের নিজের চেষ্টাতেই—"

"তাও জানি। মাস কাবার হোক, আপনিও তা বুঝবেন।"

"কি হে বিশ্বজিৎ, নূতন ভদ্রলোককে কি লেকচার দিচ্ছ? হাতে কাজ কিছু কম আছে বুঝি?"

খগেনবাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বরে বিশ্বজিৎ মুখ ফিরাইয়া হাসিল, "হাতের কাজ মুখে পুষিয়ে নিচ্ছি, খগেনবাবু। ঐটুকুই তো আমাদের সম্বল।"

"তাহলে ফণীর পথ ধর, উপকার পাবে।"

বড়বাবুর প্রবেশ-ক্ষণটিতে আপিসের চেহারা একদম বদলাইয়া গেল। প্রবল বর্ষণের পর শান্তিময় বিরতি—আকাশ এবং পৃথিবী কোমল কিরণ স্নাত হইয়া হাসিয়া উঠিল। অন্ততঃ অমিয় নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাই ভাবিল।

বড়বাবুর গাম্ভীর্য্য অসাধারণ; যখন হাসেন, সে হাসি অপরিমিত, এবং গম্ভীর হইলে সে গাম্ভীর্য্য ভেদ করিবার শক্তি কাহারও নাই। ফুলকাটা চেয়ারে পুরু একটি গদি আঁটা—গ্লানি মুড়িয়া পরিষ্কার একখানি ঝাড়ন

পাতা। নূতন ব্লটিং পেপারে সম্মুখের প্যাডটি ঝকঝক করিতেছে,—প্যাডের সম্মুখ এবং পশ্চাৎ ভাগের বর্ডারে কালীমাতার জয়কীর্ত্তন। বনাত-মোড়া টেবিলে কোথাও ধুলার বিন্দুটি নাই, কাগজ বা ফাইল পাশের সুদৃশ্য বেতের ট্রেতে সাজান, সেখানে এক পয়সার কালীমূর্ত্তি, কেবল সিন্দুরচর্চ্চিত ললাটে টেবিলের একধারে দণ্ডায়মানা হইয়া ভক্তপ্রবরের মনে সাহস ও লেখনীতে শক্তির প্রেরণা দিতেছেন। মাথা নীচু করিয়া সর্ব্বপ্রথম বড়বাবু তাঁহাকে বন্দনা করিয়া আসন (অর্থাৎ চেয়ার) গ্রহণ করিলেন। চেয়ার গ্রহণ করিয়া কয়েক মিনিট স্তিমিত চক্ষে নিস্তব্ধ থাকিয়া কালীমূর্ত্তি স্মরণ, প্যাডের বর্ডারে কালীমাতার জয়ধ্বনি পাঠ ইত্যাদি ভক্তজনোচিত কর্ত্তব্য পালন করতঃ টানা ড্রয়ার হইতে একখানি খাতা বাহির করিলেন। খাতার প্রথম পৃষ্ঠাতেই আঁকা—জ্যোতির্ম্ময়ী কালীমাতার অভয়হাস্য-রঞ্জিত মুখমণ্ডল ও ঈষৎ উত্তোলিত বরাভয়যুক্ত শ্রীকর—এবং অসুর-রক্ত-রঞ্জিত শ্রীচরণের প্রতি গভীর মনঃসংযোগ-পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বড়বাবু ধীরে ধীরে সেই বরদায়িনী দেবীমূর্ত্তি-সম্বলিত খাতাখানি ললাট স্পর্শ করিলেন—সেই অবস্থায় পাঁচ মিনিট কাটিল—সমাধির পূর্ব্ব অবস্থা আর কি! অতঃপর প্রণাম-পর্ব্ব শেষ করিয়া অর্থাৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লাল কালির কলম বাহির করিলেন। খাতার পৃষ্ঠা উন্টাইয়া আরও পাঁচ মিনিট ধরিয়া 'জয় কালীমাতার জয়' এক শত আটবার লিখিয়া লেখনীরও শক্তি সঞ্চয় করিলেন—অর্থাৎ অতঃপর যে হুকুমনামাই লিখুন না কেন—কাহারও অনিষ্ট হইলে কালীনাম লেখার পুণ্য সলিলে সেটুকু ধুইয়া মুছিয়া যাইবে—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন।

অমিয় কলেজ হইতে আপিসে ঢুকিয়াছে বলিয়া এই ভক্তি-নিবেদন ও কালীনাম-লিখন নূতন বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু চাকরি মাত্র ভরসা করিয়া যাঁহারা বৃহৎ সংসারের হিসাব রাখেন, তাঁহাদের কাছে এই ভক্তি-নিবেদনের মূল্য অকিঞ্চিৎকর নহে। শুদ্ধমাত্র ভক্তির জোরে-কৃত মহাপাপীর মহাপাপ যে খণ্ডন হইয়া যায় তাহা ভক্তিমান না হইলে কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। ভক্তির অনুশীলনে ভক্তের পরকাল এবং ইহকাল দুই-ই সম্পদযুক্ত হয়। চাকুরীয়ার পক্ষে ভক্তি জিনিষটা অমূল্য রত্ন বিশেষ। যে হতভাগ্য এই ভক্তির ধার দিয়াও ঘেঁষিতে চাহে না, তাহার দুর্গতি দেবদেবী তো তুচ্ছ, স্বয়ং বড়বাবুও দূর করিতে পারেন না।

বড়বাবুর প্রণামপর্ব্ব নূতন না হইলেও অনেকে আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সে পর্ব্ব শেষ হইবামাত্র ফণীবাবু আসিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন। বড়বাবু স্মিতহাস্যে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভাল তো?"

ফণীবাবু কৃতকৃতার্থ হইয়া আনন্দগদ্গদ্ স্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ধান এনেছি।"

বড়বাবুর প্রসন্নমুখে জ্যোতি খেলিয়া গেল, কহিলেন, "এনেছ, বেশ, বেশ। যদিও লক্ষ্মীপুজোর দেরি আছে—তবু আগে আনিয়ে রাখা গেল। দু-একটা নারকেল পাওয়া যাবে তো?"

"আজ্ঞে, তা এক কুড়ি দিতে পারবো বোধ হয়।" বলিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কহিলেন।

বড়বাবুর প্রফুল্ল মুখে অকস্মাৎ মেঘ নামিল, অস্ফুট কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "হুঁ।"

ফণীবাবু টেবিল ত্যাগ করিতে না-করিতে হরেন আসিল। মিনিট পাঁচ-ছয় তাহার সঙ্গে অশ্রুতস্বরে বড়বাবুর আলাপ আলোচনা চলিল। সে আলাপের মুহূর্ত্তে কখনও তাঁহার মুখে মেঘ নামিল, কখনও বা সূর্য্য-কিরণ ফুটিল এবং হরেন টেবিল ত্যাগ করিবামাত্র অনাদি আসিল। এইরূপে একে একে অনেকেই আসিল, অনেকেই চলিয়া গেল।

একটার সময় বড়বাবু শম্ভুচন্দ্রকে ডাকিলেন।

শম্ভুচন্দ্র আসিতেই বলিলেন, "নতুন ছোকরা কাজ করছে কেমন?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "ছোকরা ইন্‌টেলিজেন্ট আছে, পারবে।"

শুনিয়া বড়বাবু বিশেষ খুশী হইলেন না; মন্তব্য করিলেন, "ইন্‌টেলিজেন্ট নিয়ে তো আপিস চলে না,

চাতে গোলই বাধে। আমি চাই কর্মী লোক। যারা অনেক জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামায় না, একটি জিনিষই বোঝে। যা হোক, আপিস সম্বন্ধে ছোকরা কোন মন্তব্য করেছে?

শম্ভুচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিলেন, "না, নেহাৎ ভালমানুষ।"

বড়বাবু বলিলেন, "নজর রেখ, খগেনের দলে যেন মেশে না। লোক বিগড়াবার উনি একটি যন্ত্র-বিশেষ।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "না, না, ছোকরা ভাল।"

বড়বাবু ঈষৎ রুষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, "বাইরের ভাল-মন্দয় আমার দরকার নেই। ওরা বিদ্বান, বুদ্ধিমানও দেছ—ওরা একবার কোন জিনিষ বুঝলে সহজে ভোলে না। শাস্তির কথা জান তো? আমিই আনলুম, চাকরিতে উন্নতি হ'ল, এখন আমার নামেই ওপরে দরখাস্ত পাঠায়। নেমকহারাম সব!"

শম্ভুচন্দ্র বড়বাবুর উত্তেজনার মুহূর্ত্তে চুপ করিয়াই থাকেন—আজও কথা কহিলেন না।

বড়বাবু একটু শান্ত হইলে শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "আমার কিছু আশা আছে কি?"

"কিসের?"

শম্ভুচন্দ্র একটু থামিয়া সঙ্কোচজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, গ্রেড সম্বন্ধে।"

"ও, হ্যাঁ",—বলিয়া বড়বাবু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নামাইয়া বলিলেন, "দাদা রয়েছে তোমার সিনিয়র, ওকে ডিঙিয়ে কি ক'রে দেওয়া যায় তাই ভাবছি। আগের দিনে হ'লে ভাবতুম না। যা করেছি সাহেব চোখ বুজে সই করেছেন। এখন নানান রকম আইনকানুন—।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "এফিসিয়েন্সির দিক দিয়েও সুবিধে হয় না?"

বড়বাবু বলিলেন, "সেই কথাই কদিন ধরে ভাবছি। কাজে কর্ম্মে দাদার অবশ্য ত্রুটি কম,—কিন্তু একটা উপায় আছে।"

শম্ভুচন্দ্র আগ্রহোত্তেজিত চক্ষে বড়বাবুর পানে চাহিলেন।

"উপায় হচ্ছে এই, ওর কামাই বড্ড বেশী। ছুটি নিয়ে রেকর্ড খুবই খারাপ ক'রে রেখেছে। আইন বাঁচিয়ে তোমার আর দাদার দু-জনের নামই প্রপোজ করব। সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সার্ভিসটাও রেকর্ড করা থাকবে। তোমার নামে থাকবে রেকমেণ্ডেসন্—দাদার নামে থাকবে ছুটির অঙ্কটা, অর্থাৎ ইরেগুলার অ্যাটেন্‌ডেন্স, যাও, যাও, মা কালীর পূজোর ব্যবস্থা কর গে। আর ভাল কথা, এ সংবাদ যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।"

সে কথা শম্ভুচন্দ্রকে বলাই বাহুল্য। নিজের ভাল যে না বুঝিবে তাহার কেরানীগিরি করিতে আসা বিড়ম্বনা নহে তো কি!

আশ্চর্য্যের কথা, আপিসের দেওয়ালগুলিরও শ্রবণ-শক্তি আছে—বড়বাবুর গোপন অভিলাষটি কি করিয়া খগেনবাবুর কানে গেল। তিনি জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিলেন।

দাঁতে দাঁত রাখিয়া তিনি আপন মনেই খানিকটা বকিয়া গেলেন, অবশ্য সে বক্তৃতা বড়বাবুর অনুপস্থিত মুহূর্ত্তে আর সকলকে উদ্দেশ করিয়াই দিলেন। দাদা আসিলে তিনি যে এই বড়যন্ত্রজাল ছিঁড়িয়া দিবেন ও বড়বাবুকে অপমানিত করিবেন সে ভয়ও দেখাইলেন।

সুতরাং পরদণ্ডেই বড়বাবু খগেনবাবুর শাসনবাক্য অন্যের মারফৎ শুনিলেন। শুনিবামাত্রই তাঁহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "খগেন।"

খগেনবাবু সম্মুখে আসিবামাত্র তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "কি সব ছোটলোকমি হচ্ছে?"

চক্ষু পাকাইয়া খগেনবাবু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "কিসের ছোটলোকমি?"

বড়বাবু বলিয়া চলিলেন, "একসঙ্গে থিয়েটার যাত্রা করেছি, আড্ডা ইয়ার্কি দিয়েছি, বন্ধুত্ব করেছি কিনা, তাই তোমার বড় বাড় হয়েছে। ভাব পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরে তোমার কিছুই করতে পারি না?"

"পার না আবার? যা করেছ তারই ঠেলায় মরে আছি—আবার করবে কি? তোমার মাইনে আর আমার মাইনে ছিল সমান সমান। আজ তুমি আমার তিন গুণ পাচ্ছ, আমায় সেই গর্ত্তেই রেখেছ ফেলে। নিজে কলম উঁচিয়ে ব'সে ব'সে পান চিবুচ্ছ আর গল্প করছ, আর আমার তিন দিন অন্তর নিব বদলাতে হচ্ছে—

সব কাজ দিয়েছ চাপিয়ে। একটি ভুল পেয়েছ কি গলা কাটবার ব্যবস্থারও ত্রুটি হচ্ছে না। তোমার অফেন্স বইটা খোল ত ভাই ; কায়ংনামটা ওতে বেশী ক'রে লেখা আছে, দেখি।"—বলিয়া হো হো করিয়া কর্কশ হাসি হাসিলেন।

বড়বাবু ঈষৎ দমিয়া গিয়া বলিলেন, "ভুল করলে সায়েব কি সন্দেশ খাওয়াবেন তোমাকে ?"

খগেনবাবু কর্কশ হাস্যে বলিলেন, "সন্দেশ কেন, দিব্যি রাজভোগ তো খাওয়াচ্ছ। ভুল হবে না ? যে কাজ করে তারই ভুল হয়—যে ব'সে থাকে তার আবার ভুল কি।"

"কাজ তুমিই কর—আর কেউ করে না, না ?"

"ভুল কি তাদেরই হয় না ?"

"না, তোমার মত হয় না।"

"আমার মত হয় না, কেন না তারা ভুল কাটাবার ফন্দিফিকির জানে, আমি জানি নে। জিনিষ বয়ে তাদের হাত ব্যথা, কাঁধ ব্যথা, ট্র্যাক খালি—অনেক কিছুই হয়,—আমরা ত ওসব খোসামোদের তোয়াক্কা রাখি নে, কাজেই ভুলটা আমার বেশীই হয়।"

বড়বাবু মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "যান্, যান্, সিটে গিয়ে বসুন। মেলা গোলমাল করবেন না।"

সত্য কথা বলিতে কি, বড়বাবু আপিসের মধ্যে একমাত্র খগেনবাবুকেই ভয় করেন।

৪

পরদিন টিফিনের সময় অমিয় একমনে কাজ করিতেছে, এমন সময় কালো, রোগামত একটি ছেলে আসিয়া নিঃশব্দে তাহার পাশে দাঁড়াইল। এক মিনিট দাঁড়াইয়া, একটু কাশিয়া সে অমিয়র মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কহিল, "আপনার নাম বুঝি অমিয়বাবু ?"

অমিয় ঘাড় নাড়িল।

"আপনি ত বি-এ পাস ?"

অদ্ভুত প্রশ্ন ! অমিয় আশ্চর্য্য চোখে তাহার পানে চাহিল।

সে একটু হাসিয়া বলিল, "সত্যি বি-এ পাস হ'লে আমাদের সঙ্গে কথা কবেন কি না তাবছি ! আমাদের দৌড় তো ফোর্থ ক্লাস, ফিফ্থ ক্লাস পর্য্যন্ত।"

অমিয়র ওষ্ঠপ্রান্তে কৌতুক হাস্য ভাসিয়া উঠিল, সে বলিল, "গ্রাজুয়েটরা ফোর্থ ক্লাস পড়িয়েদের সঙ্গে কথা বলে না, এ ধারণা আপনার হ'ল কেন ? তারা কি আলাদা জীব ?"

ছোকরা অমিয়র হাসি দেখিয়া সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, "এই সেক্‌শনের অনন্তবাবুকে চেনেন না বোধ হয় ? ওই যে কালো মত, বেঁটে মত, মাথায় অল্প টাক—ও-ঘরে ব'সে হাত নেড়ে আর মাথা নেড়ে গল্প করছেন, উনিও বি-এ পাস কি না—আমাদের দরখাস্ত—ভুলের কৈফিয়ৎ সবই উনি লিখে দেন। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন যা আমরা বুঝতে পারি না।"

"বটে ! তা হ'লে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে তো।"

"উনি কি বলেন জানেন ? বলেন—অনেক পয়সা খরচ ক'রে তেল পুড়িয়ে তবে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে। প্রথমটা দরখাস্ত লেখাতে গেলেই অনেক কথা শুনিয়ে দেন—তার পর অবশ্য—"

"তা আপনার কি কিছু লেখাবার দরকার আছে ?"

"না, না, আমার নয়—খগেনবাবু একবার আপনাকে ডাকছেন।"

"খগেন বাবু ! কেন ?"

"কি জানি কি লিখেছেন—আপনাকে দিয়ে কারেক্ট করিয়ে নেবেন।"

অমিয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিল। ওই রাশভারী লোকটির সম্বন্ধে ধারণা তাহার ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। তাহার মনে হইয়াছে, উঁহার চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে পরশ্রীকাতরতা বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন, উনি স্পষ্ট বক্তা, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তথাপি উঁহার ভদ্রতালেশহীন উক্তিগুলি অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলে। নিজের পুরুষকারের অভাবে উন্নতি করিতে পারেন নাই বলিয়া অন্যকে অভদ্রভাবে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিয়া থাকেন। নিজে বক্তিত্বের দলে না-পড়িয়া, নিজের স্বার্থকে সম্মুখে না-রাখিয়া যদি

অন্তের যথার্থ দোষত্রুটি দেখাইবার সৎসাহস তাঁহার থাকিত তো কেহই তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতে সাহস পাইত না। কাল দাদাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহাতে বড়বাবুর চেয়ে খগেনবাবুর লজ্জাটাই বেশী হওয়া উচিত।

অমিয়কে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছোকরা বলিল, "বড়বাবু তো সিটে নেই, আসুন না একবার?"

অমিয় সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না।

খগেনবাবু মিষ্ট হাস্যে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন ও পাশের টুলে তাহাকে বসাইয়া বলিলেন, "কিছু মনে না-করেন যদি আপনাকে গুটিকয়েক কথা বলব?"

"বেশ ত বলুন না?"

"বড়বাবুর থ্রু দিয়ে আসেন নি নিশ্চয়ই, তা হ'লে আপনাকে ডাকতাম না। আপনারা শিক্ষিত মানুষ, নিজের বিদ্যের জোরে হাজার হাজার লোককে হটিয়ে চাকরি পেয়েছেন, আপনারা খোসামোদ করতে যাবেন কি দুঃখে?"

অমিয় চুপ করিয়া রহিল।

খগেনবাবু এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিলেন, "এসেছেন আজ দু-তিন দিন, এর মধ্যে দেখছেন তো এখানকার হালচাল। সাজিয়ে রেখেছে, মশাই, সাজিয়ে রেখেছে। সব আত্মীয়গোষ্ঠীতে ভরা; আপনি জোরে হেঁচেছেন কি বড়বাবুর কানে সে হাঁচির কথা উঠবে। আমি খোসামোদের ধার ধারি না কিনা, তাই আমি পরম শত্রু।" আর-এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিলেন, "চাকরি যখন পেয়েছেন ক্রমে ক্রমে সবই জানবেন। আপনারা বুদ্ধিমান, বিদ্বান্, আপনাদের বুঝিয়ে বলাই বাহুল্য। শুনলেম তো, নিজের আত্মীয়টিকে গ্রেড দেবার জন্ম কি ভাবে ষড়যন্ত্র চলছে। ওরা দু-মুখো ছুরি—যখন যেদিকে সুবিধা সেই দিকেই কাটতে থাকে। যখন সিনিয়রিটিতে পায় তখন এফিসিয়েন্সির কোশ্চেন উঠায় না, আবার সিনিয়রিটি টপকাতে এফিসিয়েন্সির কলকাঠি টেপে।"

এতক্ষণে অমিয় কথা কহিল। বিস্ময়মাখা স্বরে বলিল, "উপরের অফিসাররা কিছু দেখেন না?"

খগেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে আর আমাদের এত দুঃখ কেন? ওঁরা কি দেখেন, জানেন? ডাইরেক্ট ইন্‌চার্জ্জ অর্থাৎ বড়বাবু কি রিমার্ক দিয়েছেন। কাউকে ডাকিয়ে পরীক্ষা করে ওঁদের অমূল্য সময় ওঁরা নষ্ট করতে চান না।"

"তা হ'লে তো বড়বাবুদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট।"

"যথেষ্টই তো? আজকাল বাইরের খোঁচা খেয়ে খেয়ে কিছু কমেছে সে প্রতিপত্তি। আমাদের এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েসন্ আছে, জানেন তো? তাদের ঠেলায় প'ড়ে সিলেক্‌সন কমিটি হয়েছে, সিনিয়রিটি বা এফিসিয়েন্সি রেকর্ডেড্ হচ্ছে। কোম্পানীর আমলের স্বেচ্ছাচার অনেক কমে গেছে। এই যে আপনাকে হার্ড-কম্পিটিসনে চাকরি লাভ করতে হ'ল, আগেকার দিনে, ধরুন বছর-দশেক আগে হ'লে কি হ'ত জানেন, অন্ত কোন কোয়ালিফিকেসন্ দরকার হ'ত না—স্রেফ বড়দের সঙ্গে কুটুম্বিতা ছাড়া।"

অমিয় হাসিল।

খগেনবাবু ড্রয়ার টানিয়া এক গোছা কাগজ বাহির করিলেন। সেগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "একখানা দরখাস্ত লিখেছি, আপনাকে কাটকুট ক'রে এটা দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। পড়ুন না, পড়লেই বুঝবেন কি সম্বন্ধে।"

দরখাস্তখানা পড়িয়া অমিয় চিন্তাযুক্ত হইল।

খগেনবাবু বলিলেন, "দাদাকে ওরা কন্‌ডেম্ করতে চায় এফিসিয়েন্সির পাথর চাপিয়ে—আমরা সেই ক্লিক ভাঙবো, অমিয়বাবু।"

অমিয় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমি তো আপিসের কায়দা-কানুন জানি না, আমার লেখা সুবিধা হবে কি?"

খগেনবাবু বলিলেন, "পড়লেন তো ভাবার্থটা। সবটা না লেখেন কিছু সংশোধন করে দিন ওই লেখাটাই।"

অমিয় ঘামিয়া উঠিল। এত শীঘ্র যে তাহার নির্লিপ্ততা নষ্ট হইয়া যাইবে তাহা সে ভাবিতেই পারে নাই। মাত্র দুই দিন সে আপিসে আসিয়াছে, কয়েক জন ছাড়া অধিকাংশের সঙ্গে আলাপ তো দূরের কথা চাক্ষুষ দেখাই

ভাল করিয়া ঘটে নাই, অথচ এত শীঘ্র দলাদলির নিম্নগামী স্রোতের মধ্যে তাহাকে পা রাখিতে হইতেছে! সে মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল; "আমি নূতন লোক, আমায় দিয়ে আর কেন?"

খগেনবাবু ঈষৎ দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, "নূতন লোক হলেও চাকরি নিয়েছেন যখন, তখন আপনাদের ভালমন্দ বুঝবেন না? আপনারাও যদি চোখ বুজে স্বপ্ন দেখেন তাহ'লে বিদ্যাবুদ্ধির বড়াই কিসের?"

অমিয় বলিল, "বিদ্যাবুদ্ধির বড়াই আমি করি নে, আমায় এই অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে রেহাই দিন।"

খগেনবাবু তীব্র দৃষ্টিতে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বিশেষ ক'রে এ ব্যাপারে আপনার যখন কোনই স্বার্থ নেই! আর আপনি লিখলে জানবেই বা কে? নিন্, নিন্, বাসায় গিয়ে ভাল ক'রে এখানা দেখবেন— কাল চাই।" বলিয়া অমিয়কে আর কোন কথা উচ্চারণ করিতে না-দিয়াই কাগজের তাড়াটি তাহার জামার পকেটে গুঁজিয়া দিলেন।

এ-ঘরে আসিতেই শম্ভুচন্দ্র অমিয়কে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "অমিয়বাবু, খগেনবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন বুঝি?"

"না, উনি ডাকলেন—"

বিস্মিত হইয়া শম্ভুবাবু বলিলেন, "ডাকলেন? কেন? কোন দরকারী কাজ ছিল বুঝি?"

অমিয় বুঝিতে পারিল না সত্য বলিবে, না সত্য গোপন করিবে। শম্ভুবাবু লোকটি মিষ্টভাষী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—যত্ন করিয়া অমিয়কে কাজ বুঝাইয়া দিয়াছেন—অথচ ইঁহারই উন্নতির পরিপন্থী হইয়া তাহাকে লেখনী ধরিতে হইবে। খগেনবাবুর উপর তাহার রাগ হইল, সত্য কথা না বলিতে পারিয়া নিজেকে সে বহুবার মনে মনে ধিক্কার দিল।

"না, এমনি।"

শম্ভুচন্দ্র অমিয়র বিবর্ণ মুখভাব দেখিয়া কি অনুমান করিলেন বলা যায় না। তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সহসা তাঁহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শম্ভুচন্দ্র সাগ্রহে বলিলেন, "আপনার পকেটে ওটা কিসের কাগজ?"

অমিয় সরল সত্য কথা না বলার জন্ত মরমে মরিয়া গেল। মুখ লাল করিয়া বলিল, "ও একখানা দরখাস্ত।"

"দেখি—" বলিয়া অমিয়র অনুমতির অপেক্ষা না-রাখিয়া ফস্ করিয়া কাগজের তাড়াটি তাহার পকেট হইতে টানিয়া তুলিলেন।

এতখানি অভদ্রতা অমিয় প্রত্যাশা করে নাই।

অপমানে লাল মুখের সমস্ত রেখা তাহার সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। ঈষৎ তীব্র কণ্ঠেই সে বলিল, "আপনি আমায় না জিজ্ঞেস ক'রে পকেটে হাত দিলেন?"

প্রত্যুত্তরে শম্ভুচন্দ্র কোন কথা না-বলিয়া কাগজ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

পাঠশেষে শম্ভুচন্দ্র কাগজগুলি অমিয়কে আর না-ফিরাইয়া দিয়া আপন পকেটে রাখিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার বিরুদ্ধে লেখা, এতে আপনার চেয়ে আমারই দরকার বেশী।"

অমিয় স্তম্ভিতের মত খানিক দাঁড়াইয়া রহিল; নিদারুণ অপমানে চোখে তাহার জল আসিবার উপক্রম হইল, তাড়াতাড়ি সে আপনার জায়গায় ফিরিয়া গেল।

কিন্তু আশ্চর্য্য, বড়বাবু উপর হইতে ফিরিয়া আসিলেন, শম্ভুচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ তাঁহার টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন, পকেট হইতে সেই কাগজের তাড়া বাহির করিলেন এবং বড়বাবুর টেবিলের উপর রাখিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কি সব বলিলেন, বড়বাবু কাগজের লেখা সবটা পড়িলেন, শম্ভুচন্দ্রের কথা শুনিলেন, কর্ম্মরত অমিয়র পানে কয়েক বার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিও হানিলেন, কিন্তু উচ্চবাচ্য করিলেন না। ঝড় উঠিল না, মেঘও কাটিল না। অমিয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিল। ভয়ের জন্ত অস্বস্তিবোধ নহে, নূতন লোক হইয়া অপরের ব্যাপারে মাথা দিবার দুর্ব্বুদ্ধি তাহার কেন যে হইল, সেই কথা ভাবিয়াই সে সঙ্কুচিত হইল।

সমস্ত দিনটা তাহার অস্বস্তিতে কাটিল, ছুটির ঘণ্টা বাজিলে সকলে যখন বড়বাবুকে নমস্কার করিয়া বাহির

ইয়া গেল, তখন সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বড়বাবুর টেবিলের সামনে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "বড়বাবু।"

বড়বাবু প্যাডের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "কি চাই?"

"কাগজ ক-খানা ফিরিয়ে দিন, খগেনবাবুকে দিয়ে দেব।"

ক্রুদ্ধ চক্ষের দৃষ্টি অমিয়র মুখের উপর ফেলিয়া বড়বাবু বলিলেন, "মানে? আপনারা কালকের ছেলে হয়ে আমার উপর টেক্কা দিতে আসেন? হ'তে পারে আপনারা শিক্ষিত বা বুদ্ধিমান, কিন্তু এই আপিসে এতটুকু বেলা থেকে ঢুকে আজ পঁচিশ বছর কেটে গেল—এক চাউনিতে বুঝতে পারি কে কেমন লোক। খগেনটা আসল পাজী, লোকের হিংসে করা ছাড়া ওর দ্বিতীয় কাজ নেই। আমি জানতুম এই রকম একটা কিছু করবে।" একটু থামিয়া বলিলেন, "এ-কাগজ সাহেবের কাছে যাবে। তাঁকে আমি সবই খুলে বলব, কি সব লোক নিয়ে আমায় আপিস চালাতে হয়। বাছাধন এত কাল ঘুঘুই দেখে এসেছেন এইবার ফাঁদ দেখবেন।"

অমিয়কে তথাপি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি ধমক দিবার ভঙ্গীতে বলিলেন, "যান্। আপনার খগেনবাবু যা পারেন করুন, আমিও যা পারি চেষ্টা করব।"

অমিয় বলিল, "আমি নূতন লোক, আপনাদের আপিসের সম্বন্ধে কিছুই জানি নে—"

"জানেন না তো ওটা লিখবার ভার নিলেন কেন?"

"উনি জোর ক'রে আমার পকেটে কাগজের তাড়াটা ঢুকিয়ে দিলেন।"

"আপনি তো বালক নন, পকেট থেকে বার ক'রে ওরই টেবিলে রেখে এলেন না কেন?"

অমিয় কি বলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। ঠোঁট দুইটা তাহার কাঁপিয়া উঠিল, চোখে ফোঁটা-দুই জলও চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

বড়বাবু তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া মনে মনে খুশী হইলেন। প্রকাশ্যে কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ মোলায়েম করিয়া কহিলেন, "আপনারা শিক্ষিত বলেই বলছি—যে কেউ কোন একটা অন্যায় কাজ করতে বললে তাই করেন কি? যারা বোকা তারা লোকের কথায় ঘরে আগুন দেয়। আপনারা তা দিতে পারেন না।"

অমিয় তাঁহার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ইচ্ছাকৃত না হ'লেও দোষ আমারই।"

বড়বাবু বলিলেন, "এ তত মারাত্মক হয় নি, এখনও শোধরাবার উপায় আছে। আপনারা শিক্ষিত—আশা করি সেটুকু মনের জোর আপনার আছে?"

অমিয় বলিল, "কি করতে হবে?"

"কাল এই কাগজগুলো আমি সাহেবকে দেখাব, যারা আমার পিছনে লেগেছে, তাদের হিষ্ট্রীও সব তাঁকে বলব। আমার কথা যে সত্য সে কথা, আপনি নূতন লোক,—আপনারই সাক্ষ্যে প্রমাণিত হবে।"

অমিয় অন্তরে আবার কাঁপিয়া উঠিল। শুষ্ক মুখে বলিল, "আমি কি সাক্ষ্য দেব?"

"যা জানেন ফ্যাক্ট তাই বলবেন। আপনার পকেটে জোর ক'রে কাগজ গছানো, আপনাকে আমার বিরুদ্ধে তাতান—সবই।"

অমিয় শুষ্ক মুখে বলিল, "এ ব্যাপার এইখানেই শেষ হোক না, বড়বাবু। এ নিয়ে—"

বড়বাবু হো হো করিয়া হাসিলেন। প্রায় দুই মিনিট কাল সেই হাসিকে বিলম্বিত করিয়া অবশেষে কহিলেন, "আপনি সত্যই ছেলেমানুষ, অমিয়বাবু। লেখাপড়া শেখা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। ওর সঙ্গে ঝগড়া আমার আজ প্রথম নয়, যেদিন থেকে আমার উন্নতি হয়েছে—এই পাঁচ বছর—এই পাঁচ বছর ধরে নানা প্রকারে ও আমায় অপদস্থ করবার চেষ্টা ক'রে আসছে। পেতুম আমরা এক মাইনে, একসঙ্গে অনেক কীর্ত্তিই করেছি—হয়ত এক সময়ে দু-জনে বন্ধুত্বও ছিল। কিন্তু সাহেবের সুনজরে প'ড়ে যেমন আমার মাইনে বাড়ল, ওর হ'ল জাতক্রোধ। লোকে শ্রদ্ধা ক'রে আমায় জিনিষ দেয়, ও ব'লে বেড়ায় আমি ঘুষখোর। লোকে-ছুটিছাটার দরখাস্ত নিয়ে আমার কাছে হাঁটাহাঁটি করে—ও রটায় আমি খোসামোদপ্রিয়।

কেউ ছুটো পান আমার টেবিলে রাখলে ওর চোখ টাটায়। সে যাই হোক, ওকে ভয় আমি করি না, ভয় করলে বড়বাবু হ'তে পারতুম না? আমি যা করব তা ধর্ম্ম বজায় রেখেই করব—এতে কেউ চটেন, নিরুপায়।”

বলিয়া কালী-নামাঙ্কিত প্যাডের বর্ডারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

“তারা, তারা,” বলিয়া বড়বাবু পুনরায় অমিয়র পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

“অনেক সহ্য করেছি, অমিয়বাবু। কাল শনিবার, কাল থাকুক, সোমবারে এর একটা হেস্তনেস্ত হবে। আপনাকে সব সত্য কথা বলতে হবে। পারবেন না বলতে সত্য কথা ?”

অমিয় বিশেষ উৎসাহ বোধ করিল না। সব সময়ে সত্য বলায় নিছক আনন্দ লাভ হয় না। বিশেষতঃ এমন একটা বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে জড়াইতে সে একান্ত অনিচ্ছুক। হায় রে চাকরি! হায় রে নির্লিপ্ত থাকার বাসনা!

কোনমতে বড়বাবুকে নমস্কার করিয়া সে পথে বাহির হইল।

অপরাহ্নের বাতাস পথের ধুলা উড়াইয়া একটানা বহিয়া চলিয়াছে। অন্য সময় হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সে নাকে কাপড় তুলিয়া দিত, আজ নির্ভীক চিত্তে সেই ধূলি-প্রবাহকে সে নাসিকা-পথে গ্রহণ করিল। মন্দ কি। অখাদ্যের ভিতর দিয়া যদি অসুখই করে, সে অসুখ তাহার পক্ষে আশীর্ব্বাদ। কিন্তু ত্রিশ টাকার চাকরির এতই কি মমতা! কঠিন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া এই অমূল্য রত্ন লাভ না করিলেই বা কি এমন ক্ষতি হইত? লাভ এবং ক্ষতির অঙ্ক কষিতে কষিতে সে শ্যামবাজারের পথে অগ্রসর হইল। পথের দু-ধারে দেখিবার কিছু ছিল না, অথচ আজ মনে হইল এই সব নিত্যদেখা বস্তুগুলিকে সে তুচ্ছ মনে করিত কোন্ হিসাবে? যে-বাড়ী রোজই চোখে পড়ে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য যেমন বিশেষ দৃষ্টির দ্বারা প্রশংসিত হয় না, এই সার্কুলার রোডের দু-ধারে যাহারা আছে তাহারাও পথিকের চোখে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। পথের এক ধারে প্রাসাদ, আর এক ধারে বস্তি। এক দিকে অপচয়, আর এক দিকে অভাব। ধনীর দুয়ারে ডাষ্টবিন-গুলিতে যাহা উদ্বৃত্ত হইয়া আশ্রয় লাভ করে, গরীবের ভাঙা চালায় সে-জিনিষ কল্পনাতীত। প্রতিযোগিতা কি এখানেও চলিতেছে না? ফুটপাথে ময়লা মাদুর বিছাইয়া বস্তির অধিবাসী কোন বৃদ্ধ আরামে তামাক টানিতেছে, কোন বৃদ্ধা হয়ত কোন বালিকার দ্বারা মাথার উকুন বাছাইতেছে, কেহ শুইয়া শুইয়া গল্প করিতেছে আর হাসিতেছে, কেহ ডাল ঝাড়িতেছে, কেহ ছেঁড়া চটে বিড়ির মশলা বিছাইয়া দিয়াছে।

ইহাদের পোষাক-পরিচ্ছদে সুপরিস্ফুট দৈন্য, মুখে হাসি আনন্দের বিরাম নাই। যাহারা ত্রিতল চারি তল প্রাসাদে বিজলীবাতি জ্বালাইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় দেহ রাখিয়া পরম আলস্যে পড়া কিংবা গল্প করিয়া জীবন উপভোগ করিতেছে তাহারা, এবং ফুটপাথে মাদুর বিছাইয়া খোলা হাওয়া ও ধুলার মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে শত দিকে সুপ্রকটিত দৈন্যকে অবহেলা করিয়া আমৃত্যু উদ্দাম বাতাসের মত বহিয়া চলিয়াছে ইহারা—কাহারও মুখে তো পরাধীনতার বেদনা ঘনাইয়া উঠে নাই! অন্ন ইহাদের ব্যক্তিগত সমস্যাকে সঙ্গীন করিতে পারে নাই; প্রতিযোগিতা হয়ত আছে, কিন্তু সে প্রতিযোগিতা আলোর সঙ্গে ফুলের বিকাশের প্রতিযোগিতার মত স্বতঃস্ফূর্ত্ত। মধ্যবিত্তের মত সংসারে ক্ষুধা এবং সম্ভ্রম দুই তীক্ষ্মমুখী তীরের আঘাতে উহাদের জর্জ্জরিত করিয়া তোলে না। একটি মানুষের উপার্জ্জনের উপর বৃহৎ সংসারের মরণ-বাঁচনের সমস্যা তো নাই! তাই চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও ইহারা পরম অসুখী নহে। ইহারা আকাশ-বিচ্যুত বারিধারার মত—উপরের বিন্দু নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যাইতেছে প্রতিমুহূর্ত্তে—কিন্তু যে ক্ষেত্রটিতে পড়িয়া বিন্দু-লীলা সংবরণ করিতেছে সেটি উষর মরুভূমি নহে, কাজেই নদীরূপে না হউক, নালারূপেও কিছু দিন তার অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেশ আছে ইহারা; আপিস নাই এবং আবর্ত্ত নাই। সত্যকারের সুখ নাই এবং সত্যকারের দুঃখও নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি গলায় ঝুলাইয়া অমিয় আজ এতটুকু সৎসাহস তো দেখাইতে পারিল না! বর্ষার দিনে এঁটেল মেঠো পথে কাদা বাঁচাইয়া কে চলিতে পারে? ক্রমশঃ

চোরের ঘটকালি

শ্রীসীতা দেবী

বুড়ী জগন্মোহিনী দেবীর বয়সের গাছ-পাথর ছিল না। তিনি আত্মীয়স্বজন কাহারও গলগ্রহ ছিলেন না, তবু এমনিই মানুষের মন, কেহ তাঁহার এতকাল বাঁচিয়া থাকাটাকে ভাল চক্ষে দেখিত না। আড়ালে বলাবলি করিত, "বুড়ী মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু নিয়ে এসেছে, এর আর মরণ নেই।"

তাঁহার নিজের ছেলেমেয়ে হয় নাই। কাছে থাকিত একটি ষোল-সতেরো বৎসরের মেয়ে, নাম রত্নমালা। এটি বৃদ্ধার পরলোকগতা ভগিনীর নাতনী। আরও আত্মীয় তাঁহার ছিল, তবে বুড়ীর মুখের দৌড়ে কেহ তাঁহার কাছে ঘেঁসিত না। দোতলা বাড়ীখানা তাঁহার নিজের, আরও একখানা বাড়ী তাঁহার আছে, তাহাতে ভাড়াটিয়া বসাইয়াছেন। এ-বাড়ীরও একতলাটা সম্প্রতি ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। এতকাল নীচের তলাটায় যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো আত্মীয়-জ্ঞাতিদের আড্ডা ছিল। মুখের কথায় তাহারা বিদায় হয় না, কাজেই অসুবিধা স্বীকার করিয়াও জগন্মোহিনী এবার ঘর-তিনখানা ভাড়া দিয়া দিয়াছেন।

উপর তলায় তাঁহারা তিনটি প্রাণী এখন বাস করেন। দিদিমা, নাতনী, আর পুরাতন চাকর ছেদী। ছেদী জাতিতে হিন্দুস্থানী, তবে বালক বয়স হইতে কলিকাতায় বাস করিয়া সে এখন বাঙালীই হইয়া গিয়াছে। কথাবার্ত্তা বাঙালীরই মতন বলে। মাথার চুলে তাহারও পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাড়ীর সব কাজ ছেদীই করে, তবে রান্নাটা রত্নমালার ভাগে। ছেদী জাতে কাহার, তাহার দ্বারা রান্নাঘরের কাজ চলে না। বৃদ্ধার যত বয়স বাড়িতেছে, টাকার প্রতি টানও ততই বাড়িতেছে। টাকা লইয়া কি যে হইবে তাহার ঠিকানা নাই। নাতনীর প্রতি খুব যে একটা অন্তরের টান আছে তাঁহার, তাহাও মনে হয় না। বয়স এত হইল, বিবাহ দিবার নাম নাই। বিবাহের নামেই বুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে। বলে, "বিধবা মানুষ আমি, কি ক'রে ওর বিয়ে দেব? মা-বাপ-খেকো মেয়ে, দুটো পয়সা দিয়েও কেউ সাহায্যি করবে না। দু-হাত এক করা অমনি সোজা কথা কি না? আর এত তাড়া-ই বা কিসের? মেয়ের বয়স ত বারো পেরয় নি।"

বলা বাহুল্য, গত পাঁচ বৎসরের ভিতর রত্নমালার বয়স বাড়ে নাই। নিতান্ত কলিকাতা শহর এবং বুড়ীর টাকাকড়ি আছে, তাই রক্ষা, না হইলে কথার চোটে এত দিনে দিদিমা, নাতনী দুইজনেরই কানে তালা লাগিয়া যাইত।

রত্নমালা দেখিতে ভাল, তবে রং খুব ফরসা নয়। বাড়ন্ত গড়ন, পিঠ ছাইয়া চুলের রাশ হাঁটুর কাছে গড়াইয়া পড়িয়াছে। লেখাপড়া পয়সা খরচ করিয়া কেহ শিখায় নাই, নিজের চেষ্টায় বাংলা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। ঘরকরণার কাজ সবই জানে, কারণ ইহা লইয়াই তাহাকে দিন কাটাইতে হয়।

আত্মীয়বন্ধুজ্ঞাতি কিছুরই অভাব নাই। তবে বৃদ্ধার ধারণা সকলেই তাহার মরণের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, তাহা হইলে বাড়ী দুইখানা, আর টাকা ক'টা হাত করিতে পারে। এইজন্য কাহাকেও তিনি আমল দিতে চান না। তবে বাপের বাড়ীর সম্পর্কের লোক যাহারা, তাহারা হাল না ছাড়িয়া যাওয়া-আসা করিতেই থাকে। শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কিত যাহারা, তাহারা দূরে বসিয়া গালি দেয়, পারতপক্ষে বুড়ীর ছায়া মাড়ায় না।

নীচের তলায় ভাড়াটে বসানর প্রস্তাবে অনেকে

আসিয়া অযাচিত উপদেশ দিয়া গিয়াছে। "কাজ কি বাপু? তোমার টাকার অভাব ত নেই? কে আসবে তা কে জানে?"

কেহ বা বলিয়াছে, "সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ঘর কর, হট্ ক'রে বাইরের লোক ঢুকোলেই হ'ল? তার চেয়ে এরা আপনার জন ছিল, না-হয় পয়সা না-ই দিচ্ছিল? বিপদে আপদে কত কাজে আসত।"

জগন্মোহিনী কাহারও ছেঁদো কথা শুনিবার পাত্রী নহেন। রীতিমত নোটিস লট্‌কাইয়া, বাংলা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া, তিনি ভাড়াটে জুটাইয়া আনিয়াছেন। বাঙালী হিন্দু গৃহস্থ হইলেই হইল। বাজে ভয় পাইবার মানুষ তিনি নন। নীচের তলাটা খালি ফেলিয়া রাখিতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না, যদি ঐ হাড়-জ্বালানে আত্মীয়গুলি দূর হইয়া যাইত। কিন্তু তাহাদের ত বিদায় করার আর কোনও উপায় পাওয়া গেল না? তা ছাড়া বৃদ্ধা সংসারী মানুষ, টাকাকড়ি দু-চারিটা নাড়িতে চাড়িতে হয়, ঘরে দুই-দশটা মানুষ থাকাই ভাল। চোর-ডাকাতের উৎপাত আর কোন্ জায়গায় নাই বল?

তা টাকাপয়সা তিনি ভালমতেই নাড়িতেন-চাড়িতেন। পাড়াপ্রতিবেশীকে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া তাঁহার বহুকালের অভ্যাস। তবে বুড়ী সাবধান খুব, কখনও বিনা বন্ধকে কাহাকেও কিছু দিতেন না। সুতরাং একটি পয়সা কখনও তাঁহার মারা যায় নাই। উপর তলার সব চেয়ে বড় ঘরটি জগন্মোহিনীর শুইবার ঘর, তাহার ভিতর একটি লোহার সিন্দুক, দুইটি খুব মজবুত ষ্টীল ট্রাঙ্ক ও একটি বড় ভারি খাট। ষ্টীল ট্রাঙ্ক দুটি লোহার শিকল দিয়া পরস্পরের সঙ্গে ও খাটের খুরার সহিত বাঁধা। শেষ গ্রন্থিটিতে বড় লোহার তালা লাগানো।

এ-ঘরে রত্নমালা ছাড়া আর কাহারও ঢুকিবার অধিকার নাই। এমন কি ছেদীও এ-ঘরে কোনও দিন ঢুকিতে পায় নাই। যতদিন বৃদ্ধার হাতে পায়ে শক্তি ছিল, ততদিন এই ঘরটি তিনি নিজেই ঝাড়িতেন-মুছিতেন। এখন আর হাত চলে না, চোখেও ভাল দেখেন না, তাই রত্নমালাই ঘর পরিষ্কার করে। দ্বিতীয় ঘরখানিতে সে নিজে থাকে, আত্মীয়বন্ধু কেহ দেখা করিতে আসিলে এ-ঘরেই বসে। তৃতীয় ঘরখানিতে খাওয়া-দাওয়া হয়, বাসন-কোসন ভাঁড়ার থাকে। রাত্রে ছেদী এই ঘরে শুইয়া জিনিষপত্রের তত্ত্বাবধান করে। বাড়ীর দোতলার সিঁড়ির মুখে 'কোলাপ্সিব্‌ল' লোহার দরজা বসান। সাবধানতার অভাব কোথাও দেখা যায় না। বাড়ীতে একটা বুল্‌ডগ রাখিতে তাঁহার এক নাতি উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি হিন্দু বিধবা এমন "ম্লেচ্ছ কাণ্ড" করেন কি করিয়া? তাই কুকুর আর আনা হয় নাই। তাহা ছাড়া হতভাগা জীবের যা খাদ্য-তালিকা তিনি শুনিলেন, তাহাতেই তাঁহার মন আরও বিমুখ হইয়া গেল। নামে কুকুর, খোরাক ত হাতীর মতন। বাড়ীতে তাঁহারা তিনটি প্রাণী থাকেন, খাওয়া-দাওয়া, কাঠ, কয়লা, কেরোসিন সব লইয়াও তাঁহার পনর-ষোল টাকার বেশী খরচ হয় না। হ্যাঁ, তা যদি মিষ্টি বা দুধ সখ করিয়া কেনেন, ত সে আলাদা খরচ। কিন্তু এই কুকুরটা রাখিলেই তাঁহার আরও ছয়-সাতটা টাকা নিশ্চিত খরচ হইয়া যাইত। মাংস দাও, দুধ দাও, হাজাম কত।

চাকরটা তাঁহার ভাল, মাছমাংস খাওয়ার দাবী কোনও দিন করে নাই, ওদের দেশে এসব আপদ্ নাই। রত্নমালীকেও তিনি ভাল শিক্ষা দিয়াছেন, গরীব ঘরের অনাথ মেয়ে, খাওয়া-দাওয়ার পিট্‌পিটানি নাই। যাহা পায়, তাহাই খায়। তিনি নিজে বিধবা মানুষ একাহারী, রাত্রে যা হোক একটু কিছু মুখে দেন। বুড়ী হইয়া এখন তবু কিছু ভালমন্দ খাওয়ার সখ হইয়াছে, আগে তাহাও ছিল না। রোজ দুধ লওয়া হয় না, তবে পাশের বাড়ীতে গোয়ালা রোজ দুধ দেয়, এখন প্রায়ই তাহার নিকট নগদ পয়সা দিয়া দুধ কেনা হয়। রত্নমালা ঘরেই পায়েস, ক্ষীর, পিঠা প্রভৃতি তৈয়ার করে। দিদিমা খাইয়া সবটা শেষ করিতে না পারিলে তাহারও ভাগ্যে সুখাদ্য একটু আধটু জুটিয়া যায়। তবে এমন অঘটন বড় বেশী ঘটে না।

ভাড়াটে আসিয়া গিয়াছে পাঁচ-ছয় দিন হইল, তবে এখনও তাহারা গুছাইয়া বসে নাই। নীচে সারাদিন হট্টগোল লাগিয়া আছে, জিনিষপত্র এ-ঘর হইতে ও-ঘরে টানিয়া লওয়া হইতেছে, দমাদ্দম হাতুড়ি পিটাইয়া

দেওয়ালের গায়ে পেরেক মারা হইতেছে, তাহার উপর মানুষের গলার কলরব ত আছেই। জগন্মোহিনী চোখে এখন অত্যন্তই কম দেখেন, কাজেই ভরসা করিয়া নীচে নামেন না, তবে কান ত ঠিক আছে, এত গোলমালে তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। ভাড়াটে রাখিলে কত উৎপাতই না সহ্য করিতে হয়। হতভাগারা কতদিনে একটু সুস্থির হইয়া বসিবে? তিনখানা ঘর ত ভাড়া লইয়াছে, গুছাইতে যেন তাহাদের বছর ঘুরিয়া গেল। কি এত আসবাব আনিয়াছে নবাবের নাতিরা?

নাতনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁলা রত্নী, বলি নীচে মানুষ কতগুলো এসেছে রে? এ যে কান পাতবার জো নেই?"

রত্নমালা বলিল, "তেমন বেশী আর কই? গিন্নি একজন, তাঁর ছোট ছোট দুটো মেয়ে আর তার ভাই বুঝি একজন। পুরুষমানুষ ত ঐ এক জনই দেখলাম।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "দুড়ুম দুড়ুম করছে দেখ। বুড়ো মানুষ, দুপুর বেলা একটু ঘুমব, তার জো কি? এমন জানলে কে সাধ ক'রে এ আপদ্ ডেকে আনত?"

নাতনী বলিল, "গোছগাছ প্রায় হয়ে এসেছে, বড়-জোর আজকের দিনটা, তার পর চুপচাপ হয়ে যাবে, দেখো এখন। বাবুটি কোথায় আপিসে কাজ করে, সে দশটা বাজতে না-বাজতে বেরিয়ে যাবে। মেয়ে-দুটোও এই পাড়ার ইস্কুলে পড়ে, তারাও থাকবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে কত ঘুমবে, ঘুমিও না?"

বৃদ্ধা একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "এত খবর তোকে কে দিল লা? হট্‌হট্ ক'রে অমনি বুঝি গিয়ে জুটেছিলি? আমি যেমন চোখের মাথা খেয়ে ব'সে আছি, তাই তোর খুব বাড় বেড়েছে না? সোমত্ত মেয়ে, যার তার ঘরে গিয়ে ঢুকিস্ কেন? কে কেমন রীত-চরিত্তিরের মানুষ সব তুই জানিস নাকি!"

নাতনী সুন্দর মুখখানা ঘুরাইয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি ত সারাদিন আমাকে খালি পাড়া বেড়াতেই দেখছ। তাহলে তোমার ঘরের এত কন্নণা করে কে? নীচে যেতে হয় না আমাকে? চান করতে, পা ধুতে সারাক্ষণই ত যাচ্ছি? তোমার মত ত তোলা জলে আমার কাজ চলে না? তা মেয়ে-দুটো নিজে এগিয়ে এসে কথা বলে, উত্তর দেব না নাকি? তাদের মুখেই শুনলাম সব। মানুষ ভাল ওরা, তুমি দেখো, উৎপাত করবে না।"

জগন্মোহিনী বলিলেন, "ছুঁড়িদের বিয়ে হয় নি? কত বড়? তোর মত হবে?"

রত্নমালা বলিল, "কোথায় আমার মত? এইটুকু টুকু, ছোটটা ত এখনও ফ্রক পরে। বড়টা বড়-জোর বছর বারোর হবে।"

বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, "আর তোমার একেবারে বয়সের গাছ-পাথর নেই, না? তোর কত বয়স হ'ল শুনি? সবে ত বারোয় পা দিয়েছিস? নিজেই রটাবে তা লোকে বলবে না কেন? বুদ্ধিশুদ্ধি যদি ঘটে একটু আছে। বড় বিয়ের সাধ হয়েছে, না? ভাবছ বুঝি বয়সটা ব'লে কয়ে বাড়িয়ে দিলেই অমনি বিয়ে হয়ে যাবে? সে গুড়ে বালি লো। অত পয়সা কার কাঁদছে? বিনা পয়সায় কে বা তোকে ঘরে নিচ্ছে?"

রত্নমালা রাগিয়া বলিল, "আ মর, শুধু শুধু ঝগড়া বাধায় দেখ। বুড়ীর যেন খেয়ে কর্ম্মে কাজ নেই। আমি বিয়ে করলে তোমার পিণ্ডি রাঁধবে কে?" বলিয়া দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

আসলে বৃদ্ধার মন সারাক্ষণ ভয়ে আকুল হইয়া আছে। এই নাতনীটিকে না হইলে তাঁহার চলে না। এমন সুন্দর রান্নার হাত, এত সেবাযত্ন করে। এমন কি আর মাইনে-করা লোকের কাছে পাওয়া যাইবে? আর কোন্ সাহসেই বা তিনি সে-সব শহুরে ডাকিনীদের ঘরে ঢুকিতে দিবেন? কোন্‌দিন গলাটা টিপিয়া দিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া সরিয়া পড়িবে ত? ছেদীটা মানুষ ভাল, অনেক দিনের লোক। কিন্তু হইলে কি হয়? একে পুরুষ মানুষ, তায় জাতিতে কাহার। জল তোলা আর বাসন মাজা ছাড়া আর কোন্ কাজটা তাহাকে দিয়া হয়? যদি সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে কি আর নাতনীর বিবাহ তিনি দিতেন না? শত্রুর মুখে ছাই দিয়া তাঁহার যাহা আছে, তাহাতে একটা কেন, দশটা নাতনীর বিবাহ খুব ঘটা করিয়া হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার নিজের দিন কাটে কি

প্রকারে? যাক্, কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা, বেশী দিন যদি কুমারী থাকেই তাহাতে বা কি আসে যায়? হাড়জ্বালানীরা বলে, বিবাহ দিয়া ঘরে ঘরজামাই রাখ। তা সে ঘরজামাই বা কেমন হইবে কে জানে। ভাল স্বভাবচরিত্র যাহার, সে ঘরজামাই হইতে আসিবে কেন? ভালমন্দ বাছিয়াই বা তাঁহাকে দিবে কে? তিনি নিজে ত চোখের মাথা খাইয়া বসিয়া আছেন। আর চারিদিকে তাঁহার অতিশত্রু। তাহারা একবার একটা অনিষ্ট করিবার সুযোগ পাইলে হয়। বাহিরের চোরকে পারা যায়, কিন্তু ঘরের চোরকে পারা যায় না।

বেলা গড়াইয়া আসিতেছে। মেঝেতে শীতলপাটি পাতিয়া নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নীচের কোলাহল তখন কিছু কমিয়া আসিয়াছে।

রত্নমালার দিনে ঘুমানো অভ্যাস নাই। দুপুরে একটু শেলাই-ফোঁড়াই বা পড়াশুনা করা তাহার অভ্যাস। আজ রাগের মাথায় পড়িতেও তাহার ভাল লাগিল না। দিদিমা বুড়ী এমনিতে মানুষ যে খুব খারাপ তাহা নয়, কিন্তু যত দিন যাইতেছে, তত যেন তাঁহাকে ভীমরতিতে ধরিতেছে। কথাবার্ত্তার কিবা ছিরি। শুনিলে হাড় জ্বলিয়া যায়। রত্নমালা যেন বিবাহ করিবার জন্য মরিয়া যাইতেছে। অবশ্য, বিবাহ করিতে যে তাহার কিছু আপত্তি আছে তাহা নয়। ঐ ত পালদের করুণা তাহারই বয়সী, দু-বছর আগে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কেমন সুখে সে ঘরসংসার করিতেছে। পাশের বাড়ীর ছোট বউটাও বেশ আছে, মুখে তাহার সর্ব্বদাই হাসি। স্বামীটা তাহাকে খুব ভালবাসে। অবশ্য, বিবাহ করিয়া অসুখীও অনেকে হয়, তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই, ঘরে ঘরেই পাওয়া যায়। রত্নমালা বিবাহ করিলে তাহার ভাগ্যে কি জুটিত তাহা কে জানে? কিন্তু তাহার মন বলে, সে সুখেই থাকিত। এইভাবে বুড়ী দিদিমার ভাত রাঁধিয়া কতদিন কাটিবে কে জানে? তাহার দিনগুলা যেন কাটিতে আর চায় না। সঙ্গী নাই, সাথী নাই, এমন করিয়া কি মানুষের প্রাণ বাঁচে? বুড়ীর ভয়ে বাড়ীতে কেহ আসেও না, রত্নমালারও কাহারও বাড়ী যাইবার উপায় নাই। এক জান্‌লায় জান্‌লায় পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে যা কথাবার্ত্তা হয়।

কয়দিন হইল একটা ব্লাউস কাটা আছে, শেলাই করিলে হয়। দুই-চার ফোঁড় তুলিয়াই তাহাও আর রত্নমালার ভাল লাগিল না। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার বেশী হাঙ্গাম নাই। বুড়ী আজ দই-চিঁড়া খাইবে। ও-বেলার তরকারি ডাল আছে, তাহাতেই রত্নমালা আর ছেদীর চলিয়া যাইবে। দইও অনেকটা বসানো হইয়াছে, হয়ত দিদিমা সবটা খাইয়া উঠিতে পারিবে না।

রত্নমালা আয়না-চিরুণী আনিয়া চুল বাঁধিতে বসিল। যা এক রাশ চুল, ভাল করিয়া বাঁধিতে সময় লাগে। বসিয়া বসিয়া চ্যাটাল বিনুনী করিয়া রত্নমালা মস্ত একটা খোঁপা গড়িয়া তুলিল। গাটা ধুইয়া আসা যাক, নীচের কলের ঘরে এতক্ষণ জল আসিয়া গিয়াছে। কলঘর একটিই ছিল, এখন ভাড়াটে আসাতে খোলা চৌবাচ্চার চারিদিক্ টিন দিয়া ঘিরিয়া তাহাদের জন্য আর-একটা স্নানের ঘর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরনো কলঘর বাড়ীওয়ালীর ভাগেই আছে।

শাড়ী সেমিজ গামছা লইয়া রত্নমালা নামিয়া চলিল। লাল ডুরে শাড়ীখানা ছিঁড়িয়া আসিল প্রায়। ডুরে, চৌখুপি শাড়ীগুলি বেশ দেখিতে। সাদা কাপড় রত্নমালার বিশেষ পছন্দ নয়। তাঁতিনী বুড়ী কবে আসিবে কে জানে? ধনেখালীর একজোড়া ডুরে শাড়ী তাহার আনিবার কথা। তাঁতিনী শাড়ীগুলি ভালই আনে, বৃদ্ধা জগন্মোহিনী তাহাকে কিছু কম সুদে টাকা ধার দেন, সেও খুব বেশী লাভ না রাখিয়া তাঁহাকে ধুতি, শাড়ী, গামছা, যখন যাহা দরকার জোগায়। নাতনীকে কাপড়চোপড় দিতে বৃদ্ধা কার্পণ্য করেন না। তাই বলিয়া কি আর রোজ বেনারসী, ঢাকাই কিনিয়া দিতেছেন, তাহা নয়। বলিলে বলেন, "আইবুড় মেয়ের অত কাপুড়ে বিবি হয়ে কাজ নেই, সেই ত দিতেই হবে সব বিয়ের সময়।"

নীচে নামিয়া রত্নমালা সিঁড়ির মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। ভাড়াটে ভদ্রলোক বাবুতি করিয়া জল

বহন করিয়া আনিতেছেন, ভিতরে তিন মায়ে ঝিয়ে মিলিয়া মহা জলপ্লাবন বাধাইয়া ঘর ধোওয়া হইতেছে। জিনিষ গোছানো শেষ হইল বোধ হয়। দিদিমা বুড়ী ইহার পর নিশ্চিন্তে ঘুমাইবে। কিন্তু কি পালোয়ানের মত চেহারা ভদ্রলোকের। বাঙালীর ঘরে এমনটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভদ্রলোক তাহাকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ ভাবে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। রত্নমালাও স্নানের ঘরে ঢুকিয়া গেল। তাহার তাড়া নাই। ধীরে সুস্থে গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া সে যখন বাহির হইল, তখন নীচের তলা ধোওয়া-মোছা শেষ হইয়া গিয়াছে। দুই মেয়ে মুকু আর টুকু বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছে। দুই জনেরই হাতে মুখে কাপড়ে জল-কাদার দাগ, পরিশ্রমে মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

মুকু বলিল, "দিদি, তোমাদের কলঘরে আমরা ঢুকে একটু হাত-মুখ ধুয়ে নেব? আমাদের ঘরটায় মামা ঢুকেছেন, তাঁর চান ক'রে বেরোতে একটি ঘণ্টা পুরো। অত ক্ষণ ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।"

রত্নমালা বলিল, "যাও না। আমাদের আর ত কেউ এ-ঘরে চান করে না, আমি একা। তোমাদের ঘর-দোর ধোওয়া হচ্ছিল বুঝি?"

টুকু বলিল, "ও ত আমাদের নিত্যি লেগে আছে। ঘর ধোওয়া, আর কাপড় কাচা মায়ের এক বাতিক। এইজন্যে কখনও আমরা দোতলা ঘর ভাড়া নিই না, মা বলেন দোতলায় মোটে জল পাওয়া যায় না।"

রত্নমালা হাসিয়া উপরে চলিয়া আসিল, মেয়ে-দুটি হাত মুখ ধুইতে ঢুকিল।

ছাদে কাপড় মেলিয়া দিতে গিয়া রত্নমালা দেখিল ছেদী খুব ঘটা করিয়া উনুন ধরাইতেছে। তাহাদের রান্নাঘর এখন ছাদের চিলের কোঠায়। নীচের বড় রান্নাঘরটা ভাড়াটিয়ার দখলে গিয়াছে। তা ইহাতে রত্নমালার আপত্তি নাই, ভারি ত তাহাদের রান্না। যা কিছু কষ্ট তাহা ছেদীর, তাহাকে নীচে হইতে জল টানিয়া তুলিতে হয়।

আলিশার উপর ভিজা শাড়ী মেলিয়া দিতে দিতে সে বলিল, "এখনি উনুন ধরাচ্ছিস্ কেন রে? হবে ত শুধু চারটে ভাত। এখন থেকে রেঁধে রাখলে খাবার বেলা জুড়িয়ে যাবে।"

ছেদী বলিল, "দু-পয়সার চিংড়ি মাছ এনেছি দিদিমণি, একটু চচ্চড়ি ক'রে নাও।"

রত্নমালা বলিল, "পয়সা কোথায় পেলি?"

ছেদী বলিল, "কাঠ-ঘুঁটের পয়সা থেকে দুটো সরিয়ে রেখেছি, দিদিমা ধরতে পারে নি।"

রত্নমালা আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। দিদিমা চোখে প্রায় আর দেখিতে পান না, তাই একটু আধটু লুকোচুরি এখন চলে, আগে এ-সবের উপায় ছিল না। তা মাঝে মাঝে একটু আঁশমুখ করিতে রত্নমালার ভালই লাগে। আনাজের ডালা টানিয়া লইয়া সে আলু-পেঁয়াজ কুটিতে বসিল। উপরে রান্নাঘর হইয়া একটা সুবিধা হইয়াছে, হাওয়াতে বসিয়া কাজ করা যায়, দিব্য খোলা ছাদ সামনে। নীচের রান্নাঘরটায় বড় গরমে কষ্ট পাইতে হইত।

রান্নাবান্না সারিতে তাহার ঘণ্টাখানিকের বেশী সময় লাগিল না। উনুনের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া, ভাত-তরকারি সব তাহার পাশে সাজাইয়া রাখিয়া রত্নমালা বাহির হইয়া আসিল। আর এখন তাহার বিশেষ কোনও কাজ নাই। দিদিমার ঘর সকালে খুব ভাল করিয়া ঝাঁট দিয়া মুছিয়া ফেলা হয়, বিকালে সব দিন আর রত্নমালা ঘর ঝাঁট দেয় না। ঘর নোংরা হইবার কোনও কারণ নাই। এখন পর্য্যন্ত তকতক্ করিতেছে দিদিমাকে সন্ধ্যার সময় জলখাবার গুছাইয়া দিলেই রত্নমালার দিনের কাজ শেষ হইল। নিজের খাওয়া-দাওয়া সে যখন খুশী করে। বুড়ীর বিছানা পাতা, মশারি ঝাড়িয়া দেওয়াও আছে, তা সে রাত দশটার কথা, আর এগুলিকে রত্নমালা কাজের মধ্যে গণ্যই করে না সন্ধ্যাটা তাহার ছাদেই কাটে। আশেপাশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে গল্পেরও এই সময়।

ছোট বউও ছাদে আসিয়াছে। এতক্ষণে তাহার কাপড় কাচা হইল বোধ হয়, হাতে ভিজা শাড়ী। রত্ন-মালা ডাকিয়া বলিল, "আজ এত দেরি কেন গো?"

বউটি মুচকি হাসি হাসিয়া বলিল, "শনিবার দিন উনি তিনটের ফেরেন কি না ভাই, তাই তাঁকে চা জল-খাবার দিতে দেরি হয়ে গেল।"

বেশ ইহাদের জীবনটাও রত্নমালার মনের ভিতরটা কেমন যেন মুষড়িয়া গেল।

ছোট বউ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের নূতন ভাড়াটেরা মানুষ কেমন ভাই? ভাব-সাব হয়েছে?"

রত্নমালা বলিল, "ভালই হবে বোধ হয়। গিন্নির সঙ্গে এখনও কথা হয় নি, মেয়ে-দুটি বেশ, তারা নিজেই এসে ভাব করেছে।"

ছোট বউ বলিল, "গিন্নিটি বিধবা, না? আমাদের ঝি বলছিল। সঙ্গের ভদ্রলোক ওঁর ছোট ভাই বুঝি?"

রত্নমালা বলিল, "তোমাদের ঝি দেখি সব খবর রাখে।"

ছোট বউ বলিল, "ওর বোন ওখানে কাজে লেগেছে কিনা, তাই যাওয়া-আসা আছে। বলে, খুব নাকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; টেবিলে খায়। গিন্নিও নাকি ইংরেজী বই পড়ে। ব্রহ্মজ্ঞানী নাকি?"

রত্নমালা বলিল, "অতশত জানি না বাপু, তাদের ঘরে এখন অবধি ঢুকিই নি মোটে। মেয়েদুটোকে সিঁড়ির মুখে, বারাণ্ডায় দেখেছি এই পর্য্যন্ত।"

ছোট বউ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "সকলের সঙ্গেই চেনা-জানা হবে এর পর, এক বাড়ীতে যখন রয়েছ। ভদ্রলোক ত বিয়ে করেন নি শুনলাম।" বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

রত্নমালার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কান দুটা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। ছোট বউ এমনিতে বেশ কিন্তু বড় বেশী ঠাট্টা-তামাশার পক্ষপাতী। রত্নমালার এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, তাই তাহাকে লইয়া রসিকতা করা ছোট বউয়ের একটা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। ভদ্রলোক বিবাহ করেন নাই ত তাহার কি? তিনি ত আর রত্নমালাকেই বিবাহ করিবার জন্য এতদিন কুমার থাকেন নাই? রত্নমালার মুখটা ক্রমেই বেশী করিয়া লাল হইতে লাগিল।

আর এক দিকের ছাদ হইতে ভূপতিবাবুর নাতনী বেলারাণী ডাকিয়া বলিল, "কি হচ্ছে গো মনের কথা?"

রত্নমালা বলিল, "হবে আর কি? একলা একলা ঘুরছি।"

বেলা আলিশার ধারে আসিয়া ফিশ ফিশ করিয়া বলিল, "একটা দোক্‌লা জোটা না ভাই? তোর এমন রূপ।"

রত্নমালা বলিল, "দোক্‌লা কি আকাশ থেকে পড়বে নাকি?"

বেলা বলিল, "আকাশ থেকে না-ই পড়ল, পাতাল থেকে ত উঠতে পারে? তারই চেষ্টা দেখ্‌ না?"

"তুই দেখ্‌ গে, তোর যদি এত দরকার হয়ে থাকে," বলিয়া রত্নমালা রাগ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। সবাই মিলিয়া আরম্ভ করিয়াছে কি? এর চেয়ে দিদিমা নীচের তলা ভাড়া না দিলেই ছিল ভাল। যদিও তখনও যত জ্ঞাতিগুষ্টীর সঙ্গে দিদিমার ঝগড়ার চোটে কান পাতা যাইত না। পৃথিবীতে বাঁচিয়া মানুষের সুখ নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এখন আলো জ্বালিতে পারা যায়। বৃদ্ধা আগে ঘড়ি ধরিয়া বাতি জ্বালাইতেন এবং হতচ্ছাড়া আত্মীয়দের জব্দ করিবার জন্য সাড়ে ন'টা বাজিতে না-বাজিতে মেন্ সুইচ বন্ধ করিয়া সারা বাড়ী অন্ধকার করিয়া দিতেন। এখন আর সেটা চলে না, নীচে ভাড়াটে আসিয়াছে, তাহারা যত রাত খুশী আলো জ্বালিবে। তা তাহারা নিজের পয়সা খরচ করিয়া যত খুশী আলো জ্বালুক না, তাহাতে জগন্মোহিনীর কি? নিজে চোখে এখন সন্ধ্যার পর প্রায় কিছুই দেখেন না, কাজেই দু-চার মিনিট আগে আলো জ্বালিলে এখন আর কিছুই বলেন না।

রত্নমালা সিঁড়ির মুখের আলো জ্বালিল, তাহার পর খাইবার ঘরের আলো জ্বালিয়া দিদিমার ভিজানো চিঁড়া চটকাইতে বসিল। বুড়ীর দাঁত একটাও নাই, তাহার উপযুক্ত করিয়া ত চটকাইতে হইবে? খানিক সময় গেল ইহাতে। তাহার পর দই, চিনি, পাকা মর্ত্তমান কলা—সব বাহির করিয়া সে যথাস্থানে সাজাইল। আসন পাতিয়া, জল গড়াইয়া রাখিয়া সে দিদিমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া খাইতে বসাইল।

বৃদ্ধা যথাশক্তি খাইয়া অবশেষে হাত গুটাইতে বাধ্য হইলেন। বলিলেন, "ওটুকু আর আদায় করতে পারলাম না ভাই। দই অনেকটা রইল নাকি?"

রত্নমালা দেখিল পাথর বাটিতে প্রায় এক পোওয়া দই রহিয়াছে। সে বলিল, "না, ঐ ফোঁটা-খানেক আছে।"

"তা ওটুকু তুই ভাতে মেখে খাস," বলিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া পড়িলেন। রত্নমালা বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিল, গামছা অগ্রসর করিয়া দিল, আবার হাতে ধরিয়া শুইবার ঘরে রাখিয়া আসিল। এখন বুড়ী ঘুমাইবে না। পাড়ার কায়েৎ-ঠাকরুণ আসিবেন, তাঁহার সঙ্গে পুরাদম গল্প, পরনিন্দা করিয়া পেটের খাবার হজম হইলে পর ঘুমাইবার পালা।

রত্নমালা তাঁহাকে মাদুর পাতিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, "আমি খেয়ে আসি, তোমার ঘরের আলো জ্বালা থাক্?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, জ্বালাই থাক্, নইলে অন্ধকারে বড় গা ছম্ছম্ করে।"

রত্নমালা খাইতে চলিয়া গেল। ছেদীও বাহিরে বারাণ্ডায় খাইতে বসিল। ইহার ভিতর কায়েৎ-ঠাকরুণও আসিয়া জুটিলেন। তাহার পর এঁটো বাসন কুড়াইয়া, ঘর পরিষ্কার করিয়া ছেদী নীচে বাসন মাজিতে চলিল। রত্নমালাও নীচে চলিল, ভাল করিয়া হাত মুখ ধুইবার জন্ম।

নীচের ভদ্রলোকের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দরজা জানালা সব খোলা। ভিতরে বসিয়া কে একজন সুন্দর সেতার বাজাইতেছে। ইহার অনেক গুণ দেখি। রত্নমালার ইচ্ছা করিতে লাগিল সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া একটু বাজনা শোনে, কিন্তু পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, সেই লজ্জায় সে দাঁড়াইল না। কলঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইতে লাগিল।

মুকু হঠাৎ বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, তুমি আমাদের ঘরে এক বার আসবে না?"

রত্নমালা সিঁড়িতে পা দিয়া বলিল, "রাত হয়ে গিয়েছে যে?"

টুকু পিছন পিছন আসিয়া জুটিয়াছিল, সে বলিল, "তা হ'লেই বা! এ ত আর অন্ত বাড়ী নয়? আচ্ছা দিদি, তোমার নাম কি?"

রত্নমালা নাম বলিল। মুকু বলিল, "বাবাঃ, মস্ত নাম, ও ব'লে ডাকা যায় না। তোমার ডাক-নাম নেই?"

রত্নমালা বলিল, "সে বিচ্ছিরি।" টুকু মুকু একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ডাক-নাম ত বিচ্ছিরিই হয় ভাই, আমাদের মামার ডাক-নাম কি জান? বুড়ো।"

ইহার পর রত্নমালার আর নিজের ডাক-নাম কিছুতেই বলা চলিল না। কারণ তাহার ডাক-নাম বুড়ী।

কথা ঘুরাইবার জন্ম সে তাড়াতাড়ি বলিল, "চল তোমাদের ঘর দে'খে আসি, কাল দুপুরে এসে অনেকক্ষণ গল্প করব।"

ঘর তিনখানাই খুব ফিটফাট গোছানো। আসবাব বা গৃহসজ্জা যে খুব বেশী আছে তাহা নয়, তবে সবগুলিই সুন্দর। গৃহিণী বলিলেন, "এস মা বোস, তুমি এ ক'দিন আস নি কেন? তুমি ত আমার মেয়েদেরই প্রায় বয়সী, দু-চার বছরের বড়তে কিছু এসে যায় না। তুমি সর্ব্বদা আসবে যাবে, ওদের সঙ্গে গল্প করবে, খেলবে।"

রত্নমালার হাসি পাইল। খেলিবারই বয়স বটে তার। দেয়ালের কোণে দাঁড় করানো একটা এস্রাজ দেখাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কে বাজায়?"

গৃহিণী বলিলেন, "দুই মেয়েই বাজায়। ওদের মামার কাছে শেখে। তুমি কি বাজাও?"

রত্নমালা লজ্জিতভাবে বলিল, "আমি এখনও কিছু শিখি নি।"

মুকু বলিল, "তুমি যদি একটা এস্রাজ কেন তা হ'লে আমাদের সঙ্গেই শিখতে পার।"

রত্নমালা কি যেন উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়, "মেজদি আমার নূতন মেজ্‌রাপটা কি হল?" বলিয়া টুকুর মামা ঘরের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রত্নমালা পারিলে তখনই পলায়ন করিত, কিন্তু দরজা জুড়িয়া ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে ঠেলিয়া ত পার হইয়া যাওয়া যায় না?

টুকু-মুকুর মা বলিলেন, "এই আমার ছোট ভাই নিশীথ, আর এইটি উপরের বুড়ো-ঠাকরুণের নাতনী।"

ভদ্রলোক তাহাকে নমস্কার করিলেন। রত্নমালা মন অপ্রস্তুত হইয়া গেল যে ফিরিয়া একটা নমস্কারও দিতে পারিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

নিশীথচন্দ্র বলিলেন, "আমরা ক'দিন যা গোলমাল করেছি, আপনাদের নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হয়েছে?"

রত্নমালা অস্ফুট স্বরে বলিল, "না।"

টুকু ইতিমধ্যে ছোটমামার মেজ্‌রাপ খুঁজিয়া পাওয়ায় তিনি সেটা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কায়েৎ-ঠাকুরুণের আড্ডাও কি জানি কেন আজ সকাল সকাল ভাঙিয়া গেল, তিনি বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছেন দেখা গেল। রত্নমালা তাড়াতাড়ি বলিল, "যাই এখন আমি, দিদিমাকে শোওয়াতে হবে।" বলিয়াই সে উপরে পলাইয়া আসিল।

দিদিমাকে যথানিয়মে শোওয়াইয়া আসিয়া সে নিজে বিছানা করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু অনেক রাত পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার ঘুম হইল না। মাথার ভিতরে কত যে আজগুবি চিন্তা পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। অনেক রাত্রে শ্রান্ত হইয়া তবে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক'-ঘণ্টা সে ঘুমাইয়াছিল তাহার ঠিক নাই। হঠাৎ পাশের ঘর হইতে বুড়ী দিদিমা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠাতে, রত্নমালার ঘুম দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। দুই ঘরের মাঝের দরজা খোলাই থাকিত। রত্নমালা তড়াক্ করিয়া তক্তপোষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, জগন্মোহিনীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা উঠিয়া বসিয়া তখনও প্রাণপণে চেঁচাইতেছেন। আর-এক ঘর হইতে, "আরে কি হ'ল দিদিমা?" বলিতে বলিতে ছেদীও আসিয়া জুটিল।

ঘরের আলো জ্বালিয়া, মশারি তুলিয়া রত্নমালা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদিমা?"

দিদিমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "জল দে।"

এক গেলাস জল খাইয়া তিনি বলিলেন, "চোর এসেছে রে।"

রত্নমালা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়? গেটে ত তালা বন্ধ, চোর আসবে কি ক'রে?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আহা, তারা গেট দিয়েই আসে কিনা? চারদিকে গায়ে গায়ে লাগানো ছাদ, আসতে যেন আর পারে না? ঐ বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে জান্‌লা দিয়ে টর্চ্চবাতি ফে'লে দেখছিল, আমার চোখে আলো লাগল, তাই ত জেগে গেলাম।"

ছেদী বলিল, "দরজা খুলে ওদিকে গিয়ে দেখব দিদিমা?"

বৃদ্ধা চেঁচাইয়া বলিলেন, "খবরদার। খোঁড়া ঠ্যাং, হাড়-জিরজিরে দেহ নিয়ে বীরত্ব কত হতভাগার, তোকে ত একটা চড় মারলে ঘুরে পড়বি।"

ছেদীকে বীরপুরুষ অন্ততঃ চেহারা দেখিলে কেহই বলিবে না। তাড়া খাইয়া সে চুপ করিয়া গেল।

বৃদ্ধা আবার আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঐ শোন পায়ের শব্দ, সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। ও মা কি হবে গো! ও ছেদী, পুলিস ডাক। ও মা, কেন আমি ঘর ভাড়া দিতে গেলাম গো। মুখপোড়ারা তবু আমাকে আগ্‌লে রেখেছিল।"

রত্নমালা দরজার কাছে আসিয়া ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিয়া বলিল, "আঃ, কি শুধু শুধু চেঁচাচ্ছ দিদিমা। ও চোর নয়, নীচের তলার ভদ্রলোক, গোলমাল শুনে উঠে এসেছেন। ছেদী যা, বাবু কি বলছেন শোন্।"

ছেদী তাড়াতাড়ি লোহার গেটের কাছে গিয়া নিশীথের প্রশ্নের উত্তর দিতে বসিল।

সে-রাত্রে দিদিমা নিজেও আর ঘুমাইলেন না, নাতনীকেও ঘুমাইতে দিলেন না। ছেদী নিজের ঘরে গিয়া খানিক এ-পাশ ও-পাশ করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া জানা গেল চোর সত্যই আসিয়াছিল। উপরের রান্নাঘরের দরজার তালা ভাঙা, ভিতরে মাত্র একটা কড়া আর ডেক্‌চি ছিল, চোর তাহাই লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সে যে পাশের বাড়ীর ছাদ দিয়াই আসিয়াছিল, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল।

সারাদিন জগন্মোহিনীর বিলাপ আর আর্ত্তনাদে বাড়ী-সুদ্ধ নাওয়া-খাওয়া ঘুরিয়া যাইবার উপক্রম হইল।



রত্নমালা রাগ করিয়া বলিল, "কি জালা রে বাবা, ছুচো পুরনো কড়া-হাঁড়ির জন্যে এমন করছ কেন? বেচলে ত তার আট আনাও দাম হবে না?"

বৃদ্ধা রাগিয়া বলিলেন, "দূর হ মুখপুড়ী, ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি আছে। ওলো এই ত কলির আরম্ভ? এর পর রোজ আসবে লো, রোজ আসবে। আমাদের গলা টিপে মেরে, যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে তবে ক্ষ্যান্ত দেবে। ওরা হ'ল খুনে ডাকাত। ওমা কোথায় যাব মা?"

রত্নমালাও ভয় পাইয়া গেল। বলিল, "দিদিমা, একটা দরোয়ান রাখলে হয় না?"

দিদিমা বলিলেন, "দূর হ আবাগীর বেটী, ওরাই ত চোরের সর্দ্দার সব। নূতন লোক কখনও ঘরে ঢুকতে দিতে আছে?"

রত্নমালা অগত্যা রান্না করিতে চলিয়া গেল। কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহারও বুকটা ভয়ে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইতেই জগন্মোহিনী মড়া কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস রাত্রে সেই চোরটা দলবলসহ আসিয়া তাঁহাকে একেবারে শেষ করিয়া যাইবে। কাহারও কোনও সান্ত্বনায় তিনি কান দিলেন না, তাঁহার স্বর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। আশে-পাশের বাড়ী হইতে লোকজন আসিয়া জুটিতে আরম্ভ হইল।

একতলা হইতে খুকুর মা আসিয়া বলিলেন, "এত ভয়ের কিছু নেই মা, অমন দু-চারটে কোন বাড়ীতে না আসে? তোমাদের বেশী ভয় করে ত নীচে চল, আমার ঘরে সবাই একসঙ্গে শোব।"

বৃদ্ধা সে প্রস্তাব কানেই তুলিলেন না, বলিলেন, "ওমা তা কি ক'রে হবে? আমার যথাসর্ব্বস্ব এই ঘরে।"

খুকুর মা বলিলেন, "তবে আমিই না-হয় মেয়েদের নিয়ে উপরে এসে শুই?"

জগন্মোহিনী বলিলেন, "তাতে কি হবে বাছা? চোর-ডাকাতে কি মেয়েমানুষকে ভয় পায়? ব্যাটা ছেলে হ'ত তবে না?"

খুকুর মা বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু বেটাছেলে এসে শোবে কোথায়? আর তো' ঘর নেই?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা বটে!" জল্পনা কল্পনা করিয়া রাত কাটিয়া গেল। উপরে কেহ শুইতে আসিল না বটে, তবে দিদিমা নিজেও ঘুমাইলেন না, নাতনীকেও ঘুমাইতে দিলেন না। অনিদ্রা আর উদ্বেগের ধাক্কায় পরদিন জগন্মোহিনী একেবারে শয্যাগ্রহণ করিলেন।

রত্নমালা নীচে গিয়া বলিল, "কি করি বলুন ত? দিদিমাকে নিয়ে ত মহা মুস্কিলে পড়লাম।"

খুকুর মা বলিলেন, "সত্যি, ছেলেমানুষ তুমি ক'দিক্ সামলাবে? আচ্ছা, তুমি দিদিমার সঙ্গে শোও, নিশীথ না-হয় পাশের ঘরে শুক্ দু-চার দিন।"

রত্নমালা সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া গেল। বলিল, "তাঁর কষ্ট হবে।"

খুকুর মা বলিলেন, "কষ্ট হবে কেন? উপরের দিব্যি ঘর, ও এই-সব কাজই ভালবাসে। যে-পাড়ায় আগে ছিলাম, সবাই ওকে কি, ভালই বাসত। চ'লে আসছি শুনে কেঁদেই ফেলল কতজন।"

শোনা গেল, গত রাত্রে পাড়ার আর-এক বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। জগন্মোহিনীর নাড়ী প্রায় ছাড়িয়া গিয়াছিল, নিশীথ রাত্রে উপরে শুইবে শুনিয়া সে-যাত্রা তিনি প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন।

নিশীথের কোনও আপত্তি দেখা গেল না। রত্নমালা ছেদীকে দিয়া তাহার বিছানা উপরে আনিয়া পরিপাটি করিয়া পাতিয়া রাখিল। কুঁজায় খাইবার জল, গেলাস সব সাজাইয়া রাখিল। একখানা ভাল হাত-পাখাও আনিয়া রাখিল।

নিশীথ খাইয়া দাইয়া উপরে আসিয়া বলিল, "আপনি আবার অত কষ্ট করতে গেলেন কেন? বিছানাটা আমিই ত ঘাড়ে ক'রে আনতে পারতাম।" রত্নমালা লজ্জায় লাল হইয়া পলাইয়া গেল।

সে রাত্রে জগন্মোহিনী আরাম করিয়া ঘুমাইলেন, তাঁহার নাতনীর কিন্তু ভাল ঘুম হইল না।

সকালে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোঁড়াটা চ'লে গেছে রে?"

রত্নমালা সংক্ষেপে বলিল, "হুঁ।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আজ দুটো টাকা দিয়ে ছেদীকে বাজার পাঠা দিকি। 'পাঁচটা ভাল-মন্দ রাঁধ, আমি ছেলেটিকে খেতে বলি, আজ রবিবার আছে। আহা, দিব্যি ছেলে, কেমন বুকের পাটা, চোরের সাধ্যি কি তার কাছে এগোয়।"'

দিদিমার এ হেন বদান্যতায় চমৎকৃত হইয়া রত্নমালা ছেদীকে টাকা দিতে চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সে-দিন আহার-নিদ্রা দুইই নিশীথের উপরের তলায় সম্পন্ন হইল।

দুই-তিন দিন পরে নিশীথ বলিল, "আর ত চোর ছ্যাঁচড়ের কথা শোনা যাচ্ছে না দিদিমা, এবার আমি যথাস্থানে ফিরে যাই?"

জগন্মোহিনী কাঁদকাঁদ হইয়া বলিলেন, "ওরা ত এই সুযোগেরই অপিক্ষের আছে দাদা, তুমি নীচে নামলেই এসে গলায় ছুরি দেবে।"

নিশীথ বলিল, "কিসের? ছুরি দেওয়া অমনি সস্তা কি না? আমি আজ নীচেই শুই দিদিমা। নইলে লোকে কি বলবে বলুন ত?"

জগন্মোহিনী গর্জন করিয়া বলিলেন, "কোন্ মুখপোড়া মুখপুড়ীর সাধ্যি আছে কথা বলবার? আমি কারও খাই না পরি? আমি তোমায় নাতজামাই করব, তখন দেখি কে কি বলে? তুমিও ত বামুনের ছেলে ভাই।"

"কি যে বলেন," বলিয়া নিশীথ লজ্জিত ভাবে নীচে নামিয়া আসিল। রত্নমালা পাশের ঘরে কি করিতেছিল, সে আরক্তমুখে, স্পন্দিতবক্ষে উপরে ছুটিয়া পালাইল।

স্নানের সময় নীচে নামিতেই টুকু-মুকু তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। মুকু বলিল, "আর তোমার দিদি বলব না গো।"

টুকুও সুর ধরিল, "এবার কি বলব জান? মামী।"

রত্নমালা তাড়াতাড়ি তাহার মুখে চাপা দিয়া বলিল, "এই চুপ। কি যে জ্যাঠামি করে।"

কিন্তু বেচারী ক'জনের মুখে হাত চাপা দিবে? দু-ঘণ্টা যাইতে না-যাইতে পাড়াময় কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল, জগন্মোহিনী নাকি নিজে নীচে গিয়া নিশীথের সঙ্গে রত্নমালার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছেন। বলিয়াছেন, বিবাহ করিয়া এই বাড়ীতে যদি নিশীথ থাকে তাহা হইলে বাড়ীখানি তিনি নাতনীর নামে লিখিয়া দিবেন। এমন কি অন্য বাড়ীখানিও লিখিয়া দিতে পারেন, যদি নাতনী-নাতজামাই তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখাশোনা করে।

নিশীথও কম ছেলে নয়। সে নাকি মত দিয়া বসিয়াছে।

পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু *

গল্পের প্লট অলস সময়ের সৃষ্টি, মনের কোণে মাকড়সার জাল রচনা। এই ব্যস্ততার দিনে সে সমস্তই ছিঁড়ে সাফ হয়ে গেছে—মাকড়সাটা সুদ্ধ ভেগেছে। এক সময় কোণগুলো তারা দখল ক'রে ছিল। এখন মগজের মধ্যে ঘাঁটিয়ে চলেছে কাজের কথা, ভারি ভারি বিষয়—তারা যে-রাস্তা দিয়ে রথ হাঁকিয়ে চলে সে-রাস্তায় উদ্বৃত্ত সৃষ্টির কণামাত্র খুঁটে পাবার জো নেই। আবার যদি এই অকেজো বুদ্ধি নিয়ে জন্মাই অকেজো সময়ে, তখন গল্পের প্লটের দাবী যদি জানাও হয়তো পেতে দেরি হবে না। এখন দিন ফুরিয়েছে। ব্যস্ত আছি ক্লান্ত আছি এবং নিষ্কৃতির সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আছি। ইতি ৩১।৮।৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* উপন্যাসের প্লট প্রার্থনার উত্তরে শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

লবটুলিয়া হইতে কাছারি ফিরিতেছি, জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীর ধারে বাংলা কথাবার্তায় ও হাসির শব্দে ঘোড়া থামাইলাম। যত কাছে যাই, ততই আশ্চর্য্য হই। মেয়েদের গলাও শোনা যাইতেছে—ব্যাপার কি? জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢুকাইয়া কুণ্ডীর ধারে লইয়া গিয়া দেখি বনঝাউয়ের ঝোপের ধারে সতরঞ্চি পাতিয়া আট-দশটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে, পাঁচ-ছয়টি মেয়ে কাছেই রান্না করিতেছে, ছ-সাতটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কোথা হইতে এতগুলি মেয়েপুরুষ এই ঘোর জঙ্গলে ছেলেপুলে লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে আসিল বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় সকলেরই চোখ আমার দিকে পড়িল—এক জন বাংলায় বলিল—এ ছাতুটা আবার কোথা থেকে এসে জুটল এ জঙ্গলে? আম্‌ব্রেলু? আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাদের কাছে যাইতে যাইতে বলিলাম—আপনারা বাঙালী দেখচি—এখানে কোথা থেকে এঁলেন?

তারা খুব আশ্চর্য্য হইল, অপ্রতিভও হইল। বলিল—ও মশায়, বাঙালী? হেঁ-হেঁ কিছু মনে করবেন না, আমরা ভেবেছি—হেঁ-হেঁ—

বলিলাম—না না, মনে করবার আছে কি? তা আপনারা কোথা থেকে আসছেন, বিশেষ মেয়েদের নিয়ে—

আলাপ জমিয়া গেল। এই দলের মধ্যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর। বাকী সকলে তাঁর ছেলে, ভাইপো, ভাইঝি, মেয়ে, নাৎনী, জামাই, জামাইয়ের বন্ধু ইত্যাদি। রায় বাহাদুর কলিকাতায় থাকিতে একখানি বই পড়িয়া জানিতে পারেন পূর্ণিয়া জেলায় খুব শিকার মেলে, তাই শিকার করিবার কোন সুবিধা হয় কিনা দেখিবার জন্ত পূর্ণিয়ায় তাঁর ভাই মুন্সেফ, সেখানেই আসিয়াছিলেন। আজ সকালে সেখান হইতে ট্রেনে চাপিয়া বেলা দশটার সময় কাটারিয়া পৌছেন। সেখান হইতে নৌকা করিয়া কুশী নদী বাহিয়া এখানে পিক্‌নিক্ করিতে আসিয়াছেন—কারণ সকলের মুখেই নাকি শুনিয়াছেন লবটুলিয়া, বোমাইবুরু ও ফুলকিয়া বইহারের জঙ্গল না দেখিয়া গেলে জঙ্গল দেখাই হইল না। পিক্‌নিক্ সারিয়াই চার মাইল হাঁটিয়া মোহনপুরা জঙ্গলের নীচে কুশী নদীতে গিয়া নৌকা ধরিবেন—ধরিয়া আজ রাত্রেই কাটারিয়া ফিরিয়া যাইবেন।

আমি সত্যই অবাক হইয়া গেলাম। সকলের মধ্যে দেখিলাম ইহাদের সঙ্গে আছে একটা দো-নলা শট্-গান্—ইহাই ভরসা করিয়া এ ভীষণ জঙ্গলে ইহারা ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে আসিয়াছে! অবশ্য, সাহস আছে অস্বীকার করিব না, কিন্তু অভিজ্ঞ রায় বাহাদুরের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের নিকট দিয়া এদেশের জংলী লোকেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাইতে সাহস করে না বন্ত মহিষের ভয়ে। বাঘ বার হওয়া আশ্চর্য্য নয়। বুনো শূয়োর আর সাপের তো কথাই নাই। ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে আসিবার জায়গা নয় এটা।

রায় বাহাদুর আমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। বসিতে হইবে, চা খাইতে হইবে। আমি এ জঙ্গলে কি করি, কি বৃত্তান্ত। আমি কি কাঠের ব্যবসা করি? নিজের ইতিহাস বলিবার পরে তাঁহাদিগকে সবসুদ্ধ কাছারিতে রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাঁহারা রাজী হইলেন না। রাত্রি দশটার ট্রেনে কাটারিয়াতে উঠিয়া পূর্ণিয়া আজই রাত বারোটায় পৌছিতে হইবে। না ফিরিলে বাড়ীতে সকলে ভাবিবে, কাজেই থাকিতে অপারগ ইত্যাদি।

জঙ্গলের মধ্যে ইহারা এত দূর কেন পিক্‌নিক্ করিতে আসিয়াছে তাহা বুঝিলাম না। লবটুলিয়া বইহারের উন্মুক্ত প্রান্তর বনানী ও দূরের পাহাড়রাজির শোভা, সূর্য্যাস্তের রং, পাখীর ডাক, দশ হাত দূরে বনের মধ্যে ঝোপের মাথায় মাথায় এই বসন্তকালে কত চমৎকার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—এসবের দিকে ইহাদের নজর নাই দেখিলাম। ইহারা কেবল চীৎকার করিতেছে, গান গাহিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, খাওয়ার তদ্বিবৎ কিসে হয় সে-ব্যবস্থা করিতেছে। মেয়েদের মধ্যে দুটি কলিকাতায় কলেজে পড়ে, বাকী দু-তিনটি স্কুলে পড়ে। ছেলেগুলির মধ্যে এক জন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বাকীগুলি কলিকাতায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে দৈবাৎ যদি আসিয়াই পড়িয়াছে, দেখিবার চোখ নাই আদৌ। প্রকৃতপক্ষে ইহারা আসিয়াছিল শিকার করিতে—খরগোস, পাখী, হরিণ পথের ধারে যেন ইহাদের বন্দুকের গুলি খাইবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

যে মেয়েগুলি আসিয়াছে, এমন কল্পনার লেশ পরিশূন্য মেয়ে যদি কখনও দেখিয়াছি! তাহারা ছুটাছুটি করিতেছে, বনের ধার হইতে রান্নার জন্য কাঠ কুড়াইয়া আনিতেছে, মুখে বকুনির বিরাম নাই—কিন্তু এক বার কেহ চারি ধারে চাহিয়া দেখিল না যে কোথায় বসিয়া তাহারা খিচুড়ি রাঁধিতেছে, কোন্ নিবিড় সৌন্দর্য্যভরা বনানীপ্রান্তে।

একটি মেয়ে বলিল—'টিন-কাটার্' ঠুক্‌বার বড্ড সুবিধে এখানে না? কত পাথরের নুড়ি!

আর একটি মেয়ে বলিল—উঃ কি জায়গা! ভাল চাল কোথাও পাবার যো নেই—কাল সারা টাউন খুঁজে বেড়িয়েছি—কি বিশ্রী মোটা চাল—তোমরা আবার বলছিলে পোলাও হবে!

ইহারা কি জানে যেখানে বসিয়া তারা রান্না করিতেছে, তার দশ-বিশ হাতের মধ্যে রাত্রের জ্যোৎস্নায় পরীরা খেলা করিয়া বেড়ায়?

ইঁহারা সিনেমার গল্প সুরু করিয়াছে। পূর্ণিয়ায় আজও রাত্রে তাহারা সিনেমা দেখিয়াছে, তা নাকি বৎপরোনাস্তি বাজে। এই সব গল্প। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সিনেমার সঙ্গে তাহার তুলনা করিতেছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, কথা মিথ্যা নয়। বৈকাল পাঁচটার সময় ইহারা চলিয়া গেল।

যাইবার সময় কতকগুলা খালি জমাট দুধের ও জ্যামের টিন ফেলিয়া রাখিয়া গেল। লবটুলিয়া জঙ্গলের গাছপালার তলায় সেগুলি আমার কাছে কি খাপছাড়াই দেখাইতেছিল!

বসন্ত শেষ হইতেই এবার লবটুলিয়া বইহারের গম পাকিয়া উঠিল। আমাদের মহালে রাই-সরিষার চাষ ছিল গত বৎসর খুব বেশী। এবার অনেক জমিতে গমের আবাদ, সুতরাং এ বছর এখানে কাটুনী মেলার সময় পড়িল বৈশাখের প্রথমেই।

কাটুনী মজুরদের মাথায় যেন টনক আছে, তাদের দল এবার শীতের শেষে আসে নাই, এ সময় দলে দলে আসিয়া জঙ্গলের ধারে, মাঠের মধ্যে সর্ব্বত্র খুপ্‌ড়ি বাঁধিয়া বাস করিতে সুরু করিয়াছে। দুই-তিন হাজার বিঘা জমির ফসল কাটা হইবে, সুতরাং মজুরও আসিয়াছে প্রায় তিন চার হাজারের কম নয়। আরও শুনিলাম আসিতেছে।

জেলায় লিখিয়া সকলকে টীকা দিবার ব্যবস্থা করিলাম। এতগুলি লোকের টীকা দেওয়া এক-আধ দিনের কর্ম্ম নয়, টীকাদার ও তাহার সহকারিগণ মহালে আসিয়া তাঁবু ফেলিয়া কাজ আরম্ভ করিল।

ফসল কাটার কাজ আরম্ভ হইয়া গেল, আমার দায়িত্ব বাড়িয়া গেল দ্বিগুণ, এতগুলি লোকের মঙ্গলামঙ্গল আমার উপর নির্ভর করিতেছে, আমি সকাল হইলেই ঘোড়ায় বাহির হই, সন্ধ্যায় ঘোড়ার পিঠ হইতে নামি। কত নূতন ধরণের লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কত বদমাইস্ গুণ্ডা, চোর, রোগগ্রস্ত—সকলের উপর নজর না রাখিলে এসব পুলিসবিহীন স্থানে একটা দুর্ঘটনা যখন-তখন ঘটিতে পারে।

দু-একটি ঘটনা বলি।

এক দিন দেখি এক জায়গায় দুটি বালক ও একটি বালিকা রাস্তার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে।

ঘোড়া হইতে নামিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে তোমাদের ?

উত্তরে যাহা বলিল উহার মর্ম্ম এইরূপ। উহাদের বাড়ী আমাদের মহালে নয়, সেই যে নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তাহার ভ্রাতার চাকুরীর জন্যে ঘুষ দিতে চাহিয়াছিল, তাহার গ্রামে। উহারা সহোদর ভাই বোন, এখানে কাটুনী মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। কারণ এখানকার মত এত জমির ফসলও এ অঞ্চলে কোথাও কাটা হয় না, এত বড় মেলাও সুতরাং কোথাও হয় না।

উহারা আজই পৌঁছিয়াছে, এবং কোথায় নাকি লাঠি ও দড়ির ফাঁসের জুয়াখেলা হইতেছিল, বড় ছেলেটি সেখানে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে। একটা লাঠির যে-দিকটা মাটিতে ঠেকিয়া আছে, সেই প্রান্তটা দড়ি দিয়া জড়াইয়া দিতে হয়, যদি দড়ি খুলিতে খুলিতে লাঠির আগায় ফাঁস জড়াইয়া যায়, তবে খেলাওয়ালা খেলুড়েকে এক পয়সায় চার পয়সা হিসাবে দেয়।

বড় ভাইয়ের কাছে ছিল দশ আনা পয়সা, সে এক বারও লাঠিতে ফাঁস বাধাইতে পারে নাই, সব পয়সা হারিয়া ছোট ভাইয়ের আট আনা ও পরিশেষে ছোট বোনের চার আনা পয়সা পর্য্যন্ত লইয়া বাজি ধরিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন উহাদের খাইবার পয়সা নাই, কিছু কেনা বা দেখাশোনা তো দূরের কথা। বড় ভাইটির বয়স বছর চোদ্দ কি পনর, ছোট ভাইয়ের বছর তের, বোনটির বছর দশ।

আমি তাহাদের কাঁদিতে বারণ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া জুয়াখেলার অকুস্থানের দিকে চলিলাম। প্রথমে তাহারা জায়গাই স্থির করিতে পারে না, পরে একটা হরীতকী গাছ দেখাইয়া বলিল—এরই তলায় খেলা হচ্ছিল। জনপ্রাণী নাই সেখানে। কাছারির রূপসিং জমাদারের ভাই সঙ্গে ছিল, সে বলিল—জুয়োচোরেরা কি এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকে হুজুর ? লম্বা দিয়েছে কোন্ দিকে। ছেলেমেয়ে কয়টি নিতান্ত গ্রাম্য ও সরল, কিছুই বোঝে না। নতুবা এমন খেলা খেলিতেই বা যাইবে কেন ? কেবল মাত্র এই ভরসা পাইলাম যে ইহারা সকলেই আমায় আশ্বাস দিল যে সেই লোকটিকে যদি ইহারা কোথাও আবার দেখে, তবে তখনি চিনিতে পারিবে। এ বিষয়ে কোন ভুল নাই।

বিকালের দিকে জুয়াড়ী ধরা পড়িল। সে মাইল তিন দূরে একটি বস্তিতে জুয়া খেলিতেছিল, আমার সিপাহীরা দেখিতে পাইয়া তাহাকে আমার নিকট হাজির করিল। ছেলেমেয়েগুলিও তাহাকে দেখিয়াই চিনিল।

লোকটা প্রথমে পয়সা ফেরৎ দিতে চায় না। বলে, সে তো জোর করিয়া কাড়িয়া লয় নাই, উহারা স্বেচ্ছায় খেলিয়া পয়সা হারিয়াছে, ইহাতে তাহার দোষ কি ? অবশেষে তাহাকে ছেলেমেয়েদের সব পয়সা তো ফেরৎ দিতেই হইল—আমি তাহাকে পুলিসে দিবার আদেশ দিলাম।

সে হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল। বলিলাম—তোমার বাড়ী কোথায় ?

—বালিয়া জেলা, বাবুজী।

—এ রকম করে লোকে ঠকাও কেন ? কত পয়সা ঠকিয়েছ লোকজনের ?

—গরীব লোক, হজুর। আমায় ছেড়ে দিন এবার। তিন দিনে মোটে দু-টাকা তিন আনা রোজগার—

—তিন দিনে খুব বেশী রোজগার হয়েছে মজুরদের তুলনায়।

—হুজুর, সারা বছরে এরকম রোজগার ক'বার হয় ? বছরে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা আয়।

লোকটাকে সেদিন ছাড়িয়া দিয়াছিলাম—কিন্তু আমার মহাল ছাড়িয়া সেদিনই চলিয়া যাইবার কড়ারে। আর তাকে কোনদিন কেউ আমাদের মহালের সীমানার মধ্যে দেখেও নাই।

এবার মঞ্চীকে কাটুনী মজুরদের মধ্যে না দেখিয়া উদ্বেগ ও বিস্ময় দুইই অনুভব করিলাম। সে বারবার বলিয়াছিল গম কাটিবার সময়ে নিশ্চয়ই আমাদের মহালে আসিবে। ফসল কাটার মেলা আসিল, চলিয়াও গেল—কেন যে সে আসিল না, কিছুই বুঝিলাম না।

অন্যান্য মজুরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান মিলিল না। মনে-ভাবিলাম, এত বিস্তীর্ণ ফসলের

মহাল কাছাকাছির মধ্যে আর কোথাও নাই, এক কুশী-নদীর দক্ষিণে ইসমাইলপুরের দিয়ারা মহাল ছাড়া। কিন্তু সেখানে কেন সে যাইবে, অত দূরে, যখন মজুরি উভয় স্থানেই একই!

অবশেষে ফসলের মেলায় শেষ দিকে জনৈক গাঙ্গোতা মজুরের মুখে মঞ্চীর সংবাদ পাওয়া গেল। সে মঞ্চীকে ও তাহার স্বামী নকছেদী ভকৎকে চেনে। একসঙ্গে বহু জায়গায় কাজ করিয়াছে নাকি। তাহারই মুখে শুনিলাম গত ফাল্গুন মাসে সে উহাদের আকবরপুর গবর্ণমেণ্ট খাসমহালে ফসল কাটিতে দেখিয়াছে। তাহার পর তাহারা যে কোথায় গেল, সে জানে না।

ফসলের মেলা শেষ হইয়া গেল, জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি, এমন সময় একদিন সদর কাছারির প্রাঙ্গণে নক্‌ছেদী ভকৎকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। নকছেদী আমার পা জড়াইয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও বিস্মিত হইয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম—কি ব্যাপার? তোমরা এবার ফসলের সময় আস নি কেন? মঞ্চী ভাল আছে তো? কোথায় সে?

উত্তরে নক্‌ছেদী যাহা বলিল তাহার মোট মর্ম্ম এই, মঞ্চী কোথায় তাহা সে জানে না। খাসমহালে কাজ করিবার সময়েই মঞ্চী তাহাদের ফেলিয়া কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। অনেক খোঁজ করিয়াও তাহার পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম বৃদ্ধ নক্‌ছেদী ভকতের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নাই, যা কিছু ভাবনা সবই সেই বন্য মেয়েটির জন্য। কোথায় সে গেল, কে তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গেল, কি অবস্থায় কোথায় বা সে আছে। সস্তা বিলাসদ্রব্যের প্রতি তাহার যে-রকম আসক্তি লক্ষ্য করিয়াছি সে-সবের লোভ দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়াও কষ্টকর নয়। তাহাই ঘটিয়াছে নিশ্চয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তার ছেলে কোথায়?

—সে নেই। সে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে মাঘ মাসে। অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম শুনিয়া। বেচারী পুত্রহারা তরুণী জননী! পুত্রশোকেই উদাসী হইয়া যেদিকে দু-চোখ যায়, চলিয়া গিয়াছে নিশ্চয়ই। কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—তুলসী কোথায়?

—সে এখানেই এসেছে। আমার সঙ্গেই আছে। আমার কিছু জমি ছিল, হুজুর। নইলে আমরা বুড়োবুড়ী ফসল কেটে আর চলে না। মঞ্চী ছিল, তার জোরে আমরা বেড়াতাম। সে আমার হাত-পা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যার সময় নক্‌ছেদীর খুপরিতে গিয়া দেখিলাম তুলসী তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া চীনার দানা ছাড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া তুলসী কাঁদিয়া উঠিল। দেখিলাম মঞ্চী চলিয়া যাওয়াতে সেও যথেষ্ট দুঃখিত। বলিল—হুজুর, সব ঐ বুড়োর দোষ। গোরমিণ্টের লোক মাঠে সব টীকে দিতে এল, বুড়ো তাকে চার আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে তাড়ালে। কাউকে টীকে নিতে দিলে না। বললে টীকে নিলে বসন্ত হবে। হুজুর, তিন দিন গেল না, মঞ্চীর ছেলেটার বসন্ত হ'ল, মারাও গেল। তার শোকে সে পাগলের মত হয়ে গেল—খায় না, দায় না, শুধু কাঁদে।

—তার পর?

—তার পর, হুজুর, খাসমহল থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলে। বললে—বসন্তে তোমাদের লোক মারা গিয়েছে, এখানে থাকতে দেবো না। এক ছোকরা রাজপুত মঞ্চীর দিকে নজর দিত। যেদিন আমরা খাসমহাল থেকে চলে এলাম, সেই রাত্রেই মঞ্চী নিরুদ্দেশ হ'ল। আমি সেদিন সকালে ঐ ছোকরাকে খুপরির কাছে ঘুরতে দেখেছি। ঠিক তার কাজ, হুজুর। ইদানীং মঞ্চী বড় কলকাতা দেখব, কলকাতা দেখব, করত। তখনই জানি একটা কিছু ঘটবে।

আমারও মনে পড়িল মঞ্চী আর বছর কলিকাতা দেখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল বটে। আশ্চর্য্য নয়, ধূর্ত্ত রাজপুত যুবক সরলা বন্য মেয়েটিকে কলিকাতা দেখাইবার লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইয়া যাইবে।

আমি জানি এ অবস্থায় এদেশের মেয়েদের শেষ পরিণতি হয় আসামের চা-বাগানে কুলীগিরিতে। মঞ্চীর অদৃষ্টে কি শেষকালে নির্ব্বান্ধব আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে দাসত্ব ও নির্ব্বাসন লেখা আছে?

বৃদ্ধ নক্ছেদীর উপর খুব রাগ হইল। এই লোকটা যত নষ্টের মূল। বৃদ্ধ বয়সে মঞ্চীকে বিবাহ করিতে গিয়াছিল কেন? দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্টের টীকাদারকে ঘুষ দিয়া বিদায় করিয়াছিল কেন? যদি উহাকে জমি দিই, সে ওর জন্য নয়, উহার প্রৌঢ়া স্ত্রী তুলসী ও ছেলে-মেয়েগুলির মুখের দিকে চাহিয়াই দিব।

দিলামও তাই। নাঢ়া বইহারে শীঘ্র প্রজা বসাইতে হইবে, সদর আপিসের হুকুম আসিয়াছে প্রথম প্রজা বসাইলাম নক্ছেদীকে।

নাঢ়া বইহারে ঘোর জঙ্গল। মাত্র দু-চার ঘর প্রজা সামান্য সামান্য জঙ্গল কাটিয়া খুপরি বাঁধিতে সুরু করিয়াছে। নক্ছেদী প্রথমে জঙ্গল দেখিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল, বলিল—হুজুর, দিনমানেই বাঘে খেয়ে ফেলে দেবে ওখানে—কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি?

তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিলাম তাহার পছন্দ না হয়, সে অন্যত্র চেষ্টা দেখুক।

নিরুপায় হইয়া নক্ছেদী নাঢ়া বইহারের জঙ্গলেই জমি লইল।

সে এখানে আসা পর্য্যন্ত আমি কখনও তাহার খুপরিতে যাই নাই। তবে সেদিন সন্ধ্যার সময় নাঢ়া বইহারের জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিতে দেখি ঘন জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা—নিকটে কাশের দুটি ছোট খুপরি। একটার ভিতর হইতে আলো বাহির হইতেছে।

সেইটাই যে নক্ছেদীর তা আমি জানিতাম না, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি খুপরির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিলাম সে তুলসী।

—তোমরা এখানে জমি নিয়েছ? নক্ছেদী কোথায়?

তুলসী আমায় দেখিয়া থতমত খাইয়া গিয়াছে। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে যবের ভূষি-ভরা একটা চটের গদি পাতিয়া দিয়া বলিল—নামুন বাবুজী—বসুন একটু। ও গিয়েছে লবটুলিয়া তেল নুন কিনে আনতে দোকানে। বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।

—তুমি একা এই ঘন-বনের মধ্যে আছ?

—ও-সব সয়ে গিয়েছে, বাবুজী। ভয়ডর করলে কি আমাদের গরীবদের চলে? একা তো থাকতে হ'ত না—কিন্তু অদৃষ্ট যে খারাপ। মঞ্চী যত দিন ছিল, জলে জঙ্গলে কোথাও ভয় ছিল না। কি সাহস, তেজ ছিল তার, বাবুজী!

তুলসী তাহার তরুণী সপত্নীকে ভালবাসিত। তুলসী ইহাও জানে এই বাঙালী বাবু মঞ্চীর কথা শুনিতে পাইলে খুশী হইবে।

তুলসীর মেয়ে সুরতিয়া বলিল—বাবুজী, একটা নীলগাইয়ের বাচ্চা ধরে রেখেছি, দেখবেন? সেদিন আমাদের খুপরির পেছনের জঙ্গলে এসে বিকেলবেলা খস্‌খস্ করছিল—আমি আর ছনিয়া গিয়ে ধরে ফেলেছি। বড় ভাল বাচ্চা।

বলিলাম—কি খায় রে?

সুরতিয়া বলিল—শুধু চীনের দানার ভূষি আর গাছের কচি পাতা। আমি কচি কেঁদ পাতা তুলে এনে দিই।

তুলসী বলিল—দেখা না বাবুজীকে—

সুরতিয়া ক্ষিপ্রপদে হরিণীর মত ছুটিয়া খুপরির পিছন দিকে অদৃশ্য হইল। একটু পরে তাহার বালিকা-কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল—আরে নীলগাইয়া তো ভাগলুয়া হৈ রে ছনিয়া—উধার-ইধার-জল্‌দি পাক্‌ড়া—

দুই বোনে হুটাপুটি করিয়া নীলগাইয়ের বাচ্চা পাক্‌ড়াও করিয়া ফেলিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাসিমুখে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

অন্ধকারে আমার দেখিবার সুবিধার জন্য তুলসী একখানা জলন্ত কাঠ উঁচু করিয়া ধরিল। সুরতিয়া বলি —কেমন, ভাল না বাবুজী? একে খাবার জন্যে কাল রাত্রে ভালুক এসেছিল। ওই মহুয়া-গাছে কাল ভালুক উঠেছিল মহুয়া-ফুল খেতে—তখন অনেক রাত—বাপ মা ঘুমোয়, আমি সব টের পাই—তারপর গাছ থেকে নেমে আমাদের খুপরির পেছনে এসে দাঁড়াল। আমি একে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শুই রাতে—ভালুকের পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মুখ হাত দিয়ে জোর করে চেপে আরও জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলুম—

—ভয় করল না তোর সুরতিয়া?

—ইস্! ভয় বই কি! ভয় আমি করি নে। কাঠ কুড়ুতে গিয়ে জঙ্গল কত ভালুকঝোড় দেখি—তাতেও ভয় করি নে। ভয় করলে চলে বাবুজী?

সুরতিয়া বিজ্ঞের মত মুখখানা করিল।

বড় বড় কলের চিমনির মত লম্বা, কালো কেঁদ গাছের গুঁড়ি ঠেলিয়া আকাশে উঠিয়াছে খুপ্‌রির চারিধারে, যেন কালিফোর্ণিয়ার রেডউড্ গাছের জঙ্গল। বাদুড় ও নিশাচর কাক পাখীর ডানা-ঝটাপটি, ডালে ডালে, ঝোপে ঝোপে, অন্ধকারে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিতেছে, খুপরির পিছনের বনেই শিয়াল ডাকিতেছে—এই কয়টি ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া উহাদের মা যে কেমন করিয়া এই নির্জ্জন বনে প্রান্তরে থাকে, সত্যই তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। হে বিজ্ঞ, রহস্যময় অরণ্য, হে বিরাট, আশ্রিত জনের প্রতি তোমার সত্যই বড় কৃপা।

কথায় কথায় বলিলাম—মঞ্চী নিজের জিনিস সব নিয়ে গিয়েছে?

সুরতিয়া বলিল—ছোটমা কোন জিনিষ নিয়ে যায় নি। ওর সে বাক্সটা সেবার দেখেছিলেন—ফেলেই রেখে গিয়েছে। দেখবেন? আন্‌ছি।

বাক্সটা আনিয়া সে আমার সামনে খুলিল। চিরুণী, ছোট্ট আয়না, পুঁতির মালা, একখানা সবুজ রঙের খেলো রুমাল—ঠিক যেন ছোট খুকীর পুতুল-খেলার বাক্স! সেই হিংলাজের মালাছড়াটা কিন্তু নাই, সেবার লবটুলিয়া খামারের মেলায় সেই যেটা কিনিয়াছিল।

কোথায় চলিয়া গেল নিজের ঘর-সংসার ছাড়িয়া কে বলিবে? ইহারা তো জমি লইয়া এত দিন পরে গৃহস্থালী পাতাইয়া বসবাস সুরু করিয়াছে, ইহাদের দলের মধ্যে সেই কেবল যে ভবঘুরে, সেই ভবঘুরেই রহিয়া গেল।

ঘোড়ায় উঠিবার সময় সুরতিয়া বলিল—আর এক দিন আসবেন বাবুজী—আমরা পাখী ধরি ফাঁদ পেতে। নূতন ফাঁদ বুনেছি। একটা ডাহুক আর একটা গুড়গুড়ি পাখী পুষেছি। এরা ডাকলে বনের পাখী এসে ফাঁদে পড়ে—আজ আর বেলা নেই—নইলে ধরে দেখাতাম—

নাঢ়া বইহারের বন-প্রান্তরের পথে এত রাত্রে আসিতে ভয় ভয় করে। বাঁয়ে ছোট একটি পাহাড়ী ঝরণার জলস্রোত কুলকুল করিয়া বহিতেছে, কোথায় কি বনের ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধে ভরা অন্ধকার এক-এক জায়গায় এত নিবিড় যে ঘোড়ার ঘাড়ের লোম দেখা যায় না, আবার কোথাও নক্ষত্রালোকে পাতলা।

নাঢ়া বইহার নানাপ্রকার বৃক্ষলতা, বন্য জন্তু ও পাখীদের আশ্রয়স্থান—প্রকৃতি ইহার বনভূমি ও প্রান্তরকে অজস্র সম্পদে সাজাইয়াছে, সরস্বতী কুণ্ডী এই নাঢ়া বইহারেরই উত্তর সীমানায়। প্রাচীন জরিপের থাক্ নক্সায় দেখা যায় সেখানে কুশীনদীর প্রাচীন খাত ছিল—এখন মজিয়া মাত্র ঐ জলটুকু অবশিষ্ট আছে—অন্য দিকে সেই প্রাচীন খাতই ঘন অরণ্যে পরিণত—

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্

কি অবর্ণনীয় শোভা দেখিলাম এই বনভূমির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে! কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাঢ়া বইহারের এ বন আর বেশী দিন নয়। এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল। দু-বৎসরের মধ্যেই সমগ্র মহালটি প্রজাবিলি হইয়া কুশ্রী টোলা ও নোংরা বস্তিতে ছাইয়া ফেলিল বলিয়া। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাঢ়া বইহার ইহার অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য্য ও দূরবিসর্পী প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে?

কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই-জনারের ক্ষেত, শোনের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণিমনসার গাছ, যথেষ্ট খোক্কা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক।

হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।

আর একদিন গেলাম সুরতিয়াদের পাখী-ধরা দেখিতে।

সুরতিয়া ও ছনিয়া দুটি খাঁচা লইয়া আমার সঙ্গে নাঢ়া বইহারের জঙ্গলের বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের দিকে চলিল।

বৈকাল বেলা, নাঢ়া বইহারের মাঠে সুদীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে নামিয়া পড়িয়াছে।

একটা শিমুলচারার তলায় ঘাসের ওপর খাঁচা দুটি নামাইল। একটিতে একটি বড় ডাহুক, অন্যটিতে একটা গুড়গুড়ি। এ দুটি শিক্ষিত পাখী, বন্য পাখীকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ডাহুকটি অমনি ডাকিতে আরম্ভ করিল।

গুড়গুড়িটা প্রথমতঃ ডাকে নাই।

সুরতিয়া শিস্ দিয়া তুড়ি দিয়া বলিল—বোলো রে বহিনিয়া—তোহর্ কির্—

গুড়গুড়ি অমনি ডাকিয়া উঠিল—গুড়-ড়-ড়-ড়—

নিস্তব্ধ অপরাহ্নে বিস্তীর্ণ মাঠের নির্জ্জনতার মধ্যে সে অদ্ভুত সুর শুধুই মনে আনিয়া দেয় এমনি দিগন্তহারা বিস্তীর্ণতার ছবি, এমনি মুক্ত দিকচক্রবালের স্বপ্ন, ছায়াহীন জ্যোৎস্নালোক। নিকটেই ঘাসের মধ্যে যেখানে রাশি রাশি হলুদ রঙের দুধ্‌লি ফুল ফুটিয়া আছে তারই উপর ছনিয়া ফাঁদ পাতিল—যেন পাখীর খাঁচার বেড়ার মত, বাঁশের তৈরি। সেই বেড়া ক'খানা দিয়া গুড়গুড়ি পাখীর খাঁচাটা ঢাকিয়া রাখিয়া দিল।

সুরতিয়া বলিল-চলুন বাবুজী, লুকিয়ে বসি গে ঝোপের আড়ালে। মানুষ দেখলে চিড়িয়া ভাগবে। সবাই মিলিয়া আমরা শাল-চারার আড়ালে কতক্ষণ ঘাপটি মারিয়া বসিয়া রহিলাম।

ডাহুকটি মাঝে মাঝে থামিতেছে···গুড়গুড়ির কিন্তু রবের বিরাম নাই—একটানা ডাকিয়াই চলিয়াছে—গুড়-ড়্-ড়্-ড়্—

সে কি মধুর অপার্থিব রব! বলিলাম—সুরতিয়া, তোদের গুড়গুড়টা বিক্রী করবি? আমি কিনব। কত দাম?

সুরতিয়া বলিল—চুপ চুপ বাবুজী, কথা বলবেন না—ঐ শুনুন, বুনো পাখী আসছে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরে অন্য একটি সুর মাঠের উত্তর দিকে বনপ্রান্তর হইতে ভাসিয়া আসিল—গুড়্-ড়্-ড়্-ড়্

আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। বনের পাখী খাঁচার পাখীর সুরে সাড়া দিয়াছে!

ক্রমে সে-সুর খাঁচার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইটি পাখীর রব পাশাপাশি শোনা যাইতেছিল, ক্রমে দুইটি সুর যেন মিশিয়া এক হইয়া গেল··হঠাৎ আবার একটা সুর···একটা পাখীই ডাকিতেছে···খাঁচার পাখীটা।

ছনিয়া ও সুরতিয়া ছুটিয়া গেল, ফাঁদে পাখী পড়িয়াছে! আমিও ছুটিয়া গেলাম।

ফাঁসে পা বাধাইয়া পাখীটা ঝট্‌পট্ করিতেছে। ফাঁদে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছে—কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! চোখকে যেন বিশ্বাস করা শক্ত।

সুরতিয়া পাখীটা হাতে তুলিয়া দেখাইল—দেখুন, বাবুজী, কেমন ফাঁদে পা আটকেছে। দেখলেন?

সুরতিয়াকে বলিলাম—পাখী তোরা কি করিস্?

সে বলিল—বাবা তিরাশি-রতনগঞ্জের হাটে বিক্রী করে আসে। এক একটা গুড়গুড়ি দু'পয়সা—একটা ডাহুক সাত পয়সা।

বলিলাম—আমাকে বিক্রী কর, দাম দেব।

সুরতিয়া গুড়গুড়িটা আমায় এমনিই দিয়া দিল—কিছুতেই তাহাকে পয়সা লওয়াইতে পারিলাম না।

আশ্বিন মাস। এই সময় একদিন সকালে পত্র পাইলাম রাজা দোবরু পান্না মারা গিয়াছেন, এবং রাজ-পরিবার খুব বিপন্ন—আমি সময় পাইলে যেন যাই। পত্র দিয়াছে জগরু পান্না, ভানুমতীর দাদা।

তখনি রওনা হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে চকমকিটোলা পৌঁছিয়া গেলাম। রাজার বড় ছেলে ও নাতি আমাকে আগাইয়া লইয়া গেল। শুনিলাম রাজা দোবরু গরু চরাইতে চরাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া হাঁটুতে আঘাত প্রাপ্ত হন, শেষ পর্য্যন্ত হাঁটুর সেই আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ ঘটে।

রাজাকে পাহাড়ের উপরে সমাধি-স্থানে সমাধিস্থ করার পরে রাজপরিবারের সকলে বাড়ী ফিরিয়া দেখে মহাজন আসিয়া উহাদের গরু-মহিষ কয়টি আটক করিয়াছে। মহাজন জাতিতে রাজপুত, দশ মাইল দূরের একটি গ্রামে থাকে, রাজা দোবরু তাহার নিকট বছর কয়েক পূর্ব্বে পনেরোটি টাকা ধার করিয়াছিলেন নাতি জগরুর বিবাহের ব্যয়ের জন্য। সুদে আসলে ঐ পনের

টাকা বর্ত্তমানে নাকি পঁচাত্তর টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তাই রাজার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া মাত্র মহাজন আসিয়া গরু-মহিষ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। টাকা না পাইলে সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। ওদিকে বিপদের উপর বিপদ, নূতন রাজার অভিষেক-উৎসব আগামী কল্য সম্পন্ন হইবে। তাহাতেও কিছু খরচ আছে। কিন্তু সে-টাকা কোথায়? তা ছাড়া গরু-মহিষ মহাজনে যদি লইয়া যায়, তবে রাজপরিবারের অবস্থা খুবই হীন হইয়া পড়িবে—ঐ দুধের ঘি বিক্রয় করিয়া রাজার সংসারের অর্দ্ধেক খরচ চলিত—এখন তাহাদের না খাইয়া মরিতে হইবে।

শুনিয়া আমি মহাজনকে ডাকাইলাম। তার নাম বীরবল সিং। আমার কোন কথাই সে দেখিলাম শুনিতে প্রস্তুত নয়। টাকা না পাইলে কিছুতেই সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। লোকটা ভাল নয় দেখিলাম।

ভানুমতী আসিয়া কাঁদিতে লাগিল সে তাহার জ্যাঠামশায় অর্থাৎ প্রপিতামহকে বড়ই ভালবাসিত—জ্যাঠামশায় থাকিতে তাহারা যেন পাহাড়ের আড়ালে ছিল, যেমনি তিনি চোখ বুজিয়াছেন, আর অমনি এই সব গোলমাল। এই সব কথা বলিতে বলিতে ভানুমতীর চোখের জল কিছুতেই থামে না। বলিল—চলুন, বাবুজী, আমার সঙ্গে—জ্যাঠামশায়ের গোর আপনাকে দেখিয়ে আনি পাহাড়ের উপর থেকে। আমার কিছু ভাল লাগছে না বাবুজী, কেবল ইচ্ছে হচ্ছে ওঁর কবরের কাছে ব'সে থাকি।

বলিলাম—দাঁড়াও, মহাজনের একটা কি ব্যবস্থা করা যায় দেখি। তারপর যাব—কিন্তু মহাজনের কোন ব্যবস্থা করা আপাততঃ সম্ভব হইল না। দুর্দ্দান্ত রাজপুত মহাজন কারও অনুরোধ উপরোধ শুনিবার পাত্র নয়। তবে সামান্য একটু খাতির করিয়া আপাততঃ গরু-মহিষগুলি এখানেই বাঁধিয়া রাখিতে সম্মত হইল মাত্র, তবে দুধ এক ফোঁটাও লইতে দিবে না।

ভানুমতী দেখি একা ওদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া। বলিল—বিকেল হয়ে গিয়েছে, এর পর যাওয়া যাবে না, চলুন কবর দেখতে।

ভানুমতী একা যে আমার সঙ্গে পাহাড়ে চলিল ইহাতে বুঝিলাম সরলা পর্ব্বতবালা এখন আমাকে তাহার পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরমাত্মীয় মনে করে। এই পাহাড়ী বালিকার সরল ব্যবহার ও বন্ধুত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

বৈকালের ছায়া নামিয়াছে সেই বড় উপত্যকাটায়।

শরতের প্রথম, শুধু পিয়ালফুল ছাড়া বনে অন্য কোন রকম ফুল ফুটে নাই, কিন্তু পাহাড়ের অনেকখানি উপরে উঠিবার পরে হঠাৎ ঘন, মিষ্ট, তীব্র ছাতিমফুলের গন্ধে মন আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

ভানুমতী বড় তড়বড় করিয়া চলে, ত্রস্তা হরিণীর মত। বলিলাম—শোন ভানুমতী, একটু আস্তে চল, এখানে ছাতিমফুলের গাছ কোথায় আছে?

ভানুমতীদের দেশে ছাতিমফুলের নাম সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিকমত তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। পাহাড়ের উপরে উঠিতে উঠিতে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখ যাইতেছিল। নীল ধন্‌ঝরি শৈলমালা ভানুমতীদের দেশকে, রাজ্যহীন রাজা দোবরু পান্নার রাজ্যকে মেখলাকারে ঘেরিয়া আছে, বহুদূর হইতে হু হু খোলা হাওয়া বহিয়া আসিতেছে।

ভানুমতী চলিতে চলিতে থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—বাবুজী উঠতে কষ্ট হচ্ছে?

—কিছু না। একটু আস্তে চল কেবল—কষ্ট কি?

আর খানিকটা চলিয়া সে বলিল—জ্যাঠামশায় চ'লে গেল, সংসারে আমার আর কেউ রইল না, বাবুজী—

ভানুমতী ছেলেমানুষের মত কাঁদ কাঁদ হইয়া কথাটা বলিল।

উহার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। বৃদ্ধ প্রপিতামহই না হয় মারা গিয়াছে, মাও নাই, নতুবা উহার বাবা, ভাই, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা সবাই বাঁচিয়া, চারি দিকে জাজ্বল্যমান সংসার। হাজার হোক ভানুমতী স্ত্রীলোক এবং বালিকা, পুরুষের একটু সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার ও মেয়েলি আদর কাড়ানোর প্রবৃত্তি তার পক্ষে স্বাভাবিক।

ভানুমতীকে সান্ত্বনা দিলাম।

ভানুমতী বলিল—আপনি মাঝে মাঝে আসবেন বাবুজী আমাদের দেখাশুনো করবেন—ভুলে যাবেন না বলুন—

নারী সব জায়গায় সব অবস্থাতেই সমান! বন্য বালিকা ভানুমতীও সেই একই ধাতুতে গড়া।

বলিলাম—কেন ভুলে যাব? মাঝে মাঝে আসব নিশ্চয়ই—

ভানুমতী কেমন এক রকম অভিমানের সুরে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—হাঁ, বাংলা দেশে গেলে, কলকাতা শহরে গেলে আপনার আবার মনে থাকবে এ পাহাড় জংলী দেশের কথা—একটু থামিয়া বলিল—আমাদের কথা—আমার কথা—

সস্নেহ সুরে বলিলাম—কেন মনে ছিল না ভানুমতী? আয়নাখানা পাওনি? মনে ছিল কি ছিল না ভাব—

ভানুমতী উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ বাবুজী, বড় চমৎকার আয়না—সত্যি, সে-কথা আপনাকে জানাতে ভুলেই গিয়েছি।

সমাধি-স্থানের সেই বটগাছের তলায় যখন গিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বেলা আর নাই বলিলেও হয়, দূর পাহাড়শ্রেণীর আড়ালে সূর্য্য লাল হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, কখন ক্ষীণাভ চাঁদ উঠিয়া বটতলার অপরাহ্নের এই ঘন ছায়া ও সম্মুখবর্ত্তী প্রদোষের গভীর অন্ধকার দূর করিবে, স্থানটি যেন তাহারই শুদ্ধ প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

ভানুমতীকে কিছু বনের ফুল কুড়াইয়া আনিতে বলিলাম উহার ঠাকুরদাদার কবরের পাথরে ছড়াইবার জন্য। সমাধির উপর ফুল ছড়ানো প্রথা এদের দেশে জানা নাই, আমার উৎসাহে সে নিকটের একটা বুনো শিউলি গাছের তলা হইতে কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহার পর ভানুমতী ও আমি দুজনেই ফুল ছড়াইয়া দিলাম এই সমগ্র বন্য রাজ্যের অধিপতির বর্ত্তমান বংশধর, সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা রাজা দোবরু পান্নার সমাধির উপরে। বোধ হয় আর্য্যজাতির বংশধরের এই প্রথম সম্মান বিজিত অনার্য্য জাতির রাজসমাধির উদ্দেশ্যে। ঠিক সেই সময় ডানা ঝট্‌পট্ করিয়া একদল সিল্লি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল বটগাছের মগডাল হইতে—যেন ভানুমতী ও রাজার দোবরুর সমস্ত অবহেলিত, অত্যাচারিত, হাজার হাজার বছরের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ আমার কাজে তৃপ্তিলাভ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সাধু! সাধু!

ক্রমশঃ

হাঙ্গেরীর পথে ঘাটে

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

ডানিয়ুব ইউরোপের গঙ্গা। এর তীরবর্ত্তী দিগন্তব্যাপী শস্যশ্যামল প্রান্তরে কত জাতির উত্থান-পতন। কত আর্য্য অনার্য্য, কত খৃষ্টান মুসলমান সম্প্রদায়ের সংগ্রাম ও সংমিশ্রণ, কত সভ্যতার উদয়াস্ত, কত শহর বন্দর গ্রামের অভ্যুত্থান ও বিলোপ, মধ্য-ইউরোপের বক্ষভেদী এই নদীটিকে করেছে মহামানবের একটি পরম তীর্থক্ষেত্র। তাই কবিরা এর পঙ্কিল খরস্রোতের মধ্যে দেখেছেন অনন্ত সিন্ধুর রং, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় যন্ত্রীরা বিলিয়ে দিয়েছেন এর চলার ছন্দের উচ্ছৃঙ্খল মাদকতা। ষ্ট্রাউসের (Strauss) অমর ভালৎসেরে (Volzer) তাই আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ডানিয়ুবের ক্ষিপ্র স্রোত, মানবের ইতিহাসে যে প্লাবন এনে দিয়েছিল তার স্মৃতি। কিন্তু ডানিয়ুব শুধু অতীতের স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকে নি, বর্ত্তমানের গর্ব্বে ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায় এর বক্ষ ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠেছে; ডানিয়ুব ইউরোপের বিচারশালায় এক জন প্রধান সাক্ষী। গঙ্গার মত ডানিয়ুব যাঁর জটাজাল অবলম্বন ক'রে পৃথিবীতে নেমেছে, তিনিও ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী।



এই তরুণীর পরিচ্ছদে ময়ূর-পুচ্ছের অনুকৃতি লক্ষ্যণীয়



বিচিত্র পরিচ্ছদে কলচ অঞ্চলের তরুণী

ইউরোপীয় সভ্যতার উষাকালে ডানিয়ুব দাঁড়িয়েছিল এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গমস্থলে, দুটি বিভিন্ন সভ্যতার সীমান্ত-প্রদেশে। এরই তটভূমিতে প্রথম সুরু হয় এশিয়া ও ইউরোপের বিরোধ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংগ্রাম; ক্রমশঃ সে বিরোধ সমাজ থেকে জাতীয়তায় এবং জাতীয়তা থেকে ধর্ম্মে গিয়ে পৌঁছয়। দু'টি বিভিন্ন সভ্যতার এই রীতি যে তারা মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালে যুদ্ধ করতে চায়, একে অপরকে জয় করতে চায়, মেনে নিতে চায় না। ডানিয়ুবের তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান হাঙ্গেরী প্রদেশে মাজ্যর (Magyar) নামে যে আদিম সম্প্রদায়টি বিগত তিন হাজার বছর ধ'রে বসবাস ক'রে আসছে, তার ইতিহাসই দক্ষিণ-ডানিয়ুবের তীরে সভ্যতা-সংগ্রামের ইতিহাস। বর্ত্তমান হাঙ্গেরী আজ ভৌগোলিক সংজ্ঞায় ইউরোপের অন্তর্গত: আধুনিক হাঙ্গেরীবাসীদের সমাজ এবং রাষ্ট্র ইউরোপীয় সভ্যতার উদাহরণে তৈরি; তাই বাইরে থেকে দেখতে গেলে মনে হবে যে ইউরোপের সভ্যতা মাজ্যরদের জয় করেছে। একথা ঠিক যে পুরাকালে রোমানরা এখানে রাজত্ব স্থাপন করেছিল এবং আধুনিক কালে টিউটনিক জাতিদের সঙ্গে হাঙ্গেরীর রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা মাজ্যরদিগকে উত্তর-ইউরোপীয় সভ্যতার আওতায় নিয়ে এসেছে; কিন্তু মাজ্যরদের প্রাণে তাদের প্রথম জন্মদিনের স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে আধুনিক হাঙ্গেরীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইউরোপীয় হ'লেও, হাঙ্গেরীর গ্রাম্য অঞ্চলে চাষী ও শিল্পিগণ এখনও তাদের রূপকথার অমূল্য সম্পদ ভুলতে পারে নি। তাই পুস্‌ত'র (Puszta) মেষপালক এবং বালাটন্‌ (Balaton) হ্রদের জেলের চরিত্রে দেখেছি এশিয়ার উত্তরাধিকার; হাঙ্গেরীর গ্রাম্য চারু-শিল্পে দেখেছি এশিয়ার রুচি; আর মাজ্যর-

সাহিত্যে দেখেছি একটি অসীম বীরত্ব-বিলাসী ভাব-প্রবণতা। আধুনিক হাঙ্গেরীর সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করলে তাই দেখতে পাওয়া যাবে এর মধ্যে একাধিক ভিন্নমুখী সভ্যতার সমাবেশ। মাজ্যরদের নিজস্ব একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে; তাই হাজার বছর ধ'রে দু'টি প্রবল এবং দিগ্বিজয়ী জাতীয় শক্তির মধ্যবর্ত্তী হয়েও এরা আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। মজ্যরদের এক দিকে স্লাভ এবং অন্য দিকে টিউটনিক জাতি, কিন্তু মাজ্যররা টিউটনিক-দের সঙ্গেই বরাবর সহযোগিতা ক'রে এসেছে; কোন স্লাভ-বংশ এখনও বুডাপেষ্টে রাজত্ব ক'রে যেতে পারে নি; কিন্তু দক্ষিণ থেকে তুর্কীরা এসে প্রায় দেড়-শ বছর সেণ্ট ষ্টিফেনের সিংহাসন কলুষিত ক'রে গেছে। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরী তুর্কী শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। বর্ত্তমান হাঙ্গেরীবাসীরা মুসলমান-বিদ্বেষী, কিন্তু মুসলমান-দের প্রভাব হাঙ্গেরীর ভাষায়, বেশভূষায় এখনও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর যুগ্ম-রাজত্বের কালে হাঙ্গেরীর অধীনে কতকগুলি স্লাভ জাতি পর্য্যন্ত আসতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধের বিপুল রাষ্ট্র-বিপ্লবের অবসরে তারা বুডাপেষ্টের শাসন-জাল থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রে নিয়েছে।

হাঙ্গেরীতে রাজনীতি আর পল্লীজীবনের মধ্যে অসীম ব্যবধান। মধ্য-ইউরোপে আজ যে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য চলেছে, তার মধ্যে হাঙ্গেরীর একটি বিশেষ রকমের দায়িত্ব আছে। বুডাপেষ্টের একটি প্রধান স্কোয়ারে (Liberty Square) চার দিকে চারটি স্মৃতি-স্তম্ভ আছে; ঐ স্তম্ভ ক'টিকে বলা হয় হাঙ্গেরীর আলসাস্-লোরেন্ (Alsasce-Lorraine); অর্থাৎ ট্রিয়াননের সন্ধিতে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম সকল দিক্ থেকেই হাঙ্গেরী যে-সব প্রদেশ হারিয়েছে তার করুণ স্মৃতি জীবন্ত রাখবার প্রেরণা ঐ স্তম্ভ ক'টিতে। চেকোস্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, যুগোস্লোভিয়া ও রুমানিয়া সকলেই ভাগ পেয়েছে হাঙ্গেরীর অঙ্গচ্ছেদের; কিন্তু হাঙ্গেরীর সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ট্রান্‌সিল্‌ভানিয়া রুমানিয়ার হাতে চ'লে যাওয়াতে; কারণ এই জনপদটিতেই ছিল হাঙ্গেরীর অধিকাংশ আর্থিক সম্পদ্।



কলচ অঞ্চলের বেশভূষা

আজ ট্রান্‌সিল্‌ভানিয়ার কাঠ, লোহার ও কয়লার খনি ও অন্যান্য খনিজ ধাতুর মালিক রুমানিয়া। হাঙ্গেরী তাই ট্রিয়াননের সন্ধির পর থেকেই স্বপ্ন দেখে আসছে ওর লুপ্ত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করবার। কিন্তু এই পুনরুদ্ধার-পদ্ধতির (irredentism) সাফল্যের জন্য যে ধরণের রাজনৈতিক মৈত্রীর প্রয়োজন হাঙ্গেরীর তা নেই। কিছু দিন ইতালী এই পদ্ধতির সাপক্ষে ছিল, আজও বাহ্যিকভাবে আছে; কিন্তু সে শুধু মৌখিক বন্ধুত্ব।* হাঙ্গেরীর লুপ্ত রাজ্যের উদ্ধারের জন্য ইতালী লিট্‌ল্ আঁতাতের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু হাঙ্গেরীর কৃষি-জাত মালের উপর ইতালীর নজর আছে। হাঙ্গেরীর শক্তিকে যারা খর্ব্ব করেছে, অর্থাৎ ফরাসী ও ইংরেজ, তাদেরও প্রতিপত্তি মধ্য-ইউরোপে কম নয়; হাঙ্গেরী

* একদা বুডাপেষ্টে হাঙ্গেরীয়ানরা একটি প্রধান স্কোয়ারের নাম দিয়েছে "মুসোলিনী স্কোয়ার"।



হাই টাট্রাস অঞ্চলের একটি সুরম্য হ্রদ

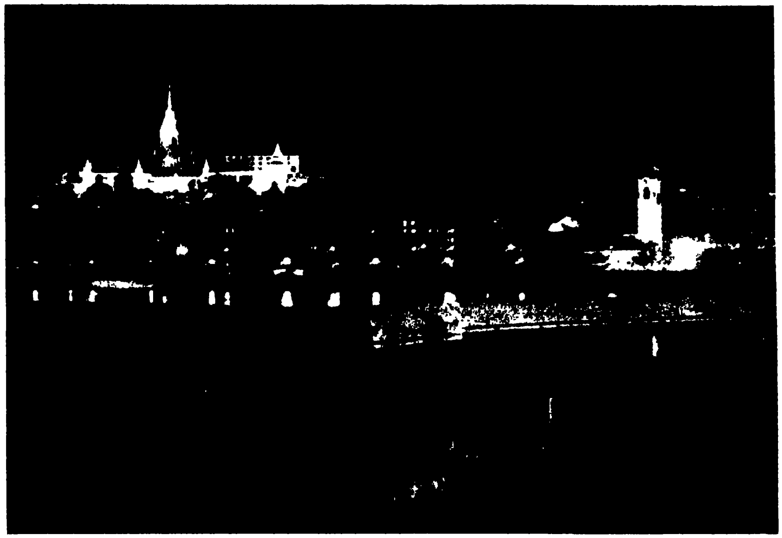
সে কথা ভুলতে পারে না, তাই হাঙ্গেরীর পররাষ্ট্র-পদ্ধতিতে ক্রমশই জার্মান-প্রীতি প্রকট হয়ে উঠছে।

এ সব কথা বুডাপেষ্টে আলোচনা হয়ে থাকে, কিন্তু হাঙ্গেরীর পল্লীগ্রামে রাজনীতির আলোচনা এক প্রকার নেই বললেই চলে। শুধু বুডাপেষ্ট দেখে আসল হাঙ্গেরীর অন্তরের পরিচয় কিছু পাওয়া যায় ব'লে মনে হয় না। বুডাপেষ্ট অন্য যে-কোন ইউরোপীয় রাজধানীর মতই একটি আন্তর্জাতিক শহর, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক শহর ব'লে, হাঙ্গেরীর জাতীয় প্রতিভার বিশেষ কোন ছাপ এতে দেখতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। অবশ্য বুডাপেষ্টে ডানিয়ুবের একটি বিশেষত্ব আছে, প্রকৃতির আবেষ্টনের জন্যই হউক, আর ইতিহাস এবং স্থাপত্যের স্পর্শ আছে ব'লেই হউক, বুডাপেষ্টে ডানিয়ুবের শোভা অতুলনীয়। অধিক রাত্রে বুডাপেষ্টের উজ্জ্বল সেতুগুলির উপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ডানিয়ুবের স্রোত-চঞ্চল বক্ষে অসংখ্য আলোকমালার নৃত্য-কম্পন দেখে মনে সংশয় হয়েছে ও ছদ্মবেশী পদ্মা নয় ত! ওর স্মৃতিমুখর উদ্দাম স্রোতের মধ্যে মনে হয় শুনতে পেয়েছি কীর্ত্তিনাশার অস্পষ্ট কলধ্বনি, যেন ভগীরথের সময়কার একটা অস্ফুট কোলাহল ছিল ওর ঢেউয়ের স্তরে স্তরে, নিরন্তর একটি প্রকাশের ভাষা খুঁজে মরছে।

হাঙ্গেরীর পল্লীজীবন এখনও রূপকথার ইন্দ্রজালে সমাচ্ছন্ন রাজনীতির কলুষস্পর্শ তার আদিম মাধুর্য্যকে খর্ব্ব করতে পারে নি। কোন্ বিস্মৃত অতীতে মেনরট রাজার দুই ছেলে, হুনর ও মাজ্যর, মধ্য-এশিয়ার উর্ব্বর মরুপ্রদেশ থেকে এক মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে ডানিয়ুবের প্রান্তে এসে এখানকার রাজকন্যাদের দেখে মুগ্ধ হয়ে যান, আর তাদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এখানে ঘর বাঁধেন, সেই ইতিহাসের স্মৃতি এখনও দেখতে পাওয়া যায় হাঙ্গেরীর চারুশিল্পে, কখনও শাড়ীর আঁচলে, কখনও তরুণীদের ওড়নায়। মায়ামৃগের উপকথার মত অসংখ্য উপকথা হাঙ্গেরীর পল্লীজীবনকে মোহময় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। মাজ্যরদের গোপনতম অন্তরে যে একটি প্যাগান অনুভূতি এখনও লুকিয়ে আছে, একথা অস্বীকার করা কঠিন। এদের দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতিপূজার যে সমারোহ আজও বিদ্যমান "অর্তবাজী' সমতল-প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে নিয়তির অবশ্যম্ভাবিত্বে যে দৃঢ় বিশ্বাস, জিপ্‌সী সঙ্গীতের উচ্ছৃঙ্খল ভাববিলাসের প্রতি এঁদের যে আকর্ষণ, সকলই হাঙ্গেরীয়দের প্যাগান অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ট্রানসিলভানিয়ায় এবং অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রতি অসংখ্য প্যাগান সমাধির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। হাঙ্গেরীর গ্রাম্য অঞ্চলে শুধু যে ভূতের ভয়ই খুব আছে তা নয়, বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সাজ ধরে, ভূত যে গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে বিচরণ করে, এ ধারণা কোথাও কোথাও একেবারে বদ্ধমূল দেখেছি।

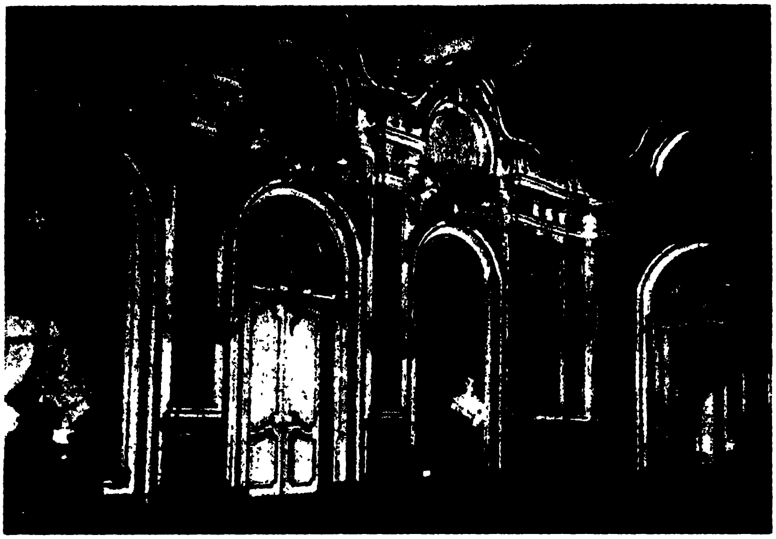
উদাহরণ-স্বরূপ একটি কাহিনী শুধু এখানে বলবার স্থান আছে। বলোটন্ হ্রদ ইউরোপের মধ্যে একটি অতি প্রসিদ্ধ প্রমোদ-উদ্যান, অনেকেই এর নাম শুনে থাকবেন। এই বলোটন্ অঞ্চলে "তিহনী প্রতিধ্বনির" (Echo of Tihany) একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

ওখানকার অধিবাসীরা এতে বিশ্বাস করে এবং এখনও এর গল্প ক'রে থাকে। গল্পটি এই :—এই হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী একটি রাজপ্রাসাদে এক সুন্দরী রাজকন্যা বাস করত। তার কাজ ছিল এক দল স্বর্ণ-মেষ প্রতিপালন করা। সে ছিল অত্যন্ত গর্ব্বিতা, তাই তার মধুময় কণ্ঠস্বর কোনও মানুষের উপভোগ্য নয় বিবেচনা ক'রে সে কখনও কথা বলত না কারও সঙ্গে। কিন্তু এক দিন নিজেকে একান্ত নিঃসঙ্গ মনে হওয়াতে আপন মনে গাইতে সুরু করল। এদিকে বলোটন রাজার ছেলে সেই গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং ঐ রাজকন্যার প্রেমে পড়ে। গর্ব্বিতা রাজকন্যা তার সন্ধান পেয়েই গান বন্ধ ক'রে দেয়, কিন্তু রাজপুত্র পুনরায় রাজকন্যার গান শুনবার জন্যে হ্রদের ঢেউয়ের উপরে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। শেষে এক দিন মারা যায়। পুত্রের মৃত্যুতে বলোটন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে হ্রদে এক তুমুল ঝড় তোলে যাতে রাজকন্যার স্বর্ণমেষগুলি ধুয়ে নিয়ে যায়, আর রাজকন্যা স্বয়ং তিহনী গুহায় বন্দী হয়ে থাকে, এই শাপ নিয়ে যে, যদি কেউ তাকে ডাকে তবে তার উত্তর দিতে হবে। এখনও নাকি ঝড়ের পরে বলোটনের তীরে স্বর্ণমেষের খুর উৎক্ষিপ্ত হয়, আর রাজকন্যার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।



রাতের বুডাপেষ্ট

হাঙ্গেরীর গ্রামবাসীরা মাটিকে খুব ভালবাসে, তাদের মাটির প্রতি এ আকর্ষণ শুধু পিতৃপুরুষের বাসস্থান কিংবা আধুনিক ন্যাশনালিজমের জাতীয় অহঙ্কারকে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠে নি, আদিম মানবের প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের যে যোগাযোগ তার অনুভূতি এখনও মাজ্যর চাষীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এ হিসেবে হাঙ্গেরীর চাষী এখনও প্রিমিটিভ এবং এশিয়ার চাষীর সমকক্ষ। উত্তর-ইউরোপের চাষীর মত মাটিকে তারা অন্ন-সংস্থানের যন্ত্র ব'লে বিবেচনা করে না, চীনের চাষীর মত মাটিকে তারা মাতৃপূজার পবিত্রতার মধ্য দিয়ে স্পর্শ করে। ইংলণ্ডের চাষী প্রকৃতিকে মনে করে মানুষের সেবিকা, কিন্তু এশিয়ার চাষী প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করে মায়ের মতন। তাই ইংলণ্ডে তেমন কোন বিশিষ্ট গ্রাম্য-শিল্প বিদ্যমান নেই; কারখানার ধোঁয়ার মধ্যে তাদের আদিম শিল্পাদর্শ কেমন ক'রে রূপান্তরিত হয়ে যেন উত্তর-সাগরের কুয়াশার সঙ্গে মিশে গেছে। হাঙ্গেরীতে চারু-শিল্পের উদ্ভব হয়েছে মাটি থেকে, তাই তার রচনা-বিন্যাসে দেখতে পাই ফল-ফুল ও পশু-পক্ষীর প্রাদুর্ভাব। হাঙ্গেরীর চারু-শিল্পে কোন স্বপ্ন-বিলাস নেই, আছে নিয়তি-নিষ্ঠ প্রকৃতিপূজার একটি অদ্ভুত প্রতিভা। বর্ণ-সামঞ্জস্যের আদর্শেও হাঙ্গেরীর চারুশিল্পকে দীপ্ত করেছে এশিয়ার রুচি। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের মত রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে এরা কেশ-প্রসাধন করে না; বিপরীত রঙের কঠিন আঘাতে একটি বিশিষ্ট সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে। উত্তর-ভারতের গ্রাম্য-মেলার বর্ণ-সম্পদ দেখেছি তোকাই পাহাড়ের চাষী মেয়েদের বেশভূষায়। তোকাই (Tokaji) হাঙ্গেরীর সবচেয়ে বিখ্যাত সুরা, সমস্ত ইউরোপে এর সমাদর আছে। অক্টোবর মাসে



বুডাপেষ্ট রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ

হেমন্তের কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকায় তোকাই অঞ্চলের মেয়েরা যখন দ্রাক্ষা-চয়নে ব্যস্ত থাকে, তখন তাদের বিভিন্ন রঙের শিরস্ত্রাণ ও বস্ত্রসজ্জার দেখে মনে হয় পারস্যের গোলাপ-বাগের কথা। তেমনি বগোটন্ অঞ্চলের দ্রাক্ষা-চয়নের সময়ে সারারাত্রি ধরে জিপ্‌সী সঙ্গীতের উন্মাদনায় যে "চারদাস্" (Csardas) নৃত্যাভিনয় চলতে থাকে, তার মধ্যে দেখতে পেয়েছি, ছ-হাজার বছর আগে মধ্য-এশিয়ার মাজ্যর রাজপুত্র যেদিন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন তার অনুবর্ত্তী সৈন্যদলের জয়োল্লাস। ফসল-কাটার শেষে হাঙ্গেরীর সর্ব্বত্রই এ ধরণের নৃত্যোৎসব হয়ে থাকে। ফসলকে ওরা আহরণ করে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত, তাই নিজেদের আনন্দোল্লাসে ছড়িয়ে দেয় বসুন্ধরার প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি।

"চারদাস্" নৃত্যটি হাঙ্গেরীর নিজস্ব। এর উৎপত্তি জিপ্‌সীদের উচ্ছৃঙ্খল মাদকতাময় সঙ্গীতপ্রিয় প্রাণে। মাজ্যর ভাষায় "চারদাস্" কথাটার অর্থ পান্থশালা এবং এ নৃত্যের জন্ম পুস্তার পান্থশালাতেই হয়েছিল, হাঙ্গেরীর রূপকথায় এইরূপ বিশ্বাস আছে। পুস্তা অঞ্চলটির একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য ও মোহ আছে। দিগন্ত-ব্যাপী প্রান্তর, ধূধূ করে মাঠ, কিন্তু গাছপালাশূন্য। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম ক'রে গেলেও কোথাও একটি লোকালয় দেখতে পাওয়া যায় না; শুধু পুস্তার তৃণউর্ব্বর প্রদেশগুলিতে কখনও অশ্ব ও মেষপাল নজরে পড়ে। রূপকথায় পুস্তার মেষপালকের সঙ্গে চারদাস্ নৃত্যের যোগাযোগ আছে। সে-কথাটাই বলি। পুস্তার মেষপালক একটি অসাধারণ রকমের মানুষ। মাটি আর লতাপাতা দিয়ে সে পুস্তার ঘর বাঁধে, কিন্তু গ্রীষ্মের রাতে সে ঘরে ঘুমোয় না; তারায় ভরা নীল আকাশের নীচে তার নিশীথ-শয্যা রচনা করে। একাকীত্বের জন্য মন যদি কখনও উদাস হয়ে ওঠে তবে বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করে। তার মেষপালকে পাহারা দিতে হবে, তাই চলে যাবার উপায় নেই। কিন্তু শীতের সময় সমস্ত পুস্তার বুকের উপর দিয়ে বইতে থাকে ভীষণ কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া; তাই মেষপালকের আর বাইরে থাকা হয় না। মাটির ঘরের মধ্যে শীতের দীর্ঘ রাত্রি আর কাটতে চায় না; নির্জ্জনতা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন পুস্তার অন্য প্রান্তে জিপসীদের পান্থশালাটির কথা মনে হয়, মনে লোভ জাগে সেখানকার আমোদ-প্রমোদের ছবি কল্পনা করে। শেষ পর্য্যন্ত প্রলোভনই তাকে জয় করে; সে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় পান্থশালার দিকে, আর সেখানে গিয়ে গুলাস্ (হাঙ্গেরীর ব্যঞ্জনবিশেষ)এর সহযোগে সুরা পান ক'রে দেহের থেকে শীতের অসাড়তা ঝেড়ে ফেলে দেয়। ঠিক এমনি সময়ে জিপ্‌সীরা বাজনা সুরু ক'রে আর তারই ছন্দে "চারদাস্" নৃত্য আরম্ভ হয়। নৃত্যোৎসবের পরে মেষপালক আবার পুস্তায় তার মাটির ঘরে ফিরে এসে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করে।

ইউরোপের প্রায় সব দেশেরই পল্লীগ্রামে অনেক ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি; ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, ইতালী ও জার্ম্মানী,









উপরে : হাঙ্গেরীতে বসন্ত। তরুণীদের পুষ্পচয়ন
নীচে : হাঙ্গেরীর গ্রামে খোলা-মাঠে প্রার্থনা

উপরে : ছেগেড অঞ্চলের পোষাকে হাঙ্গেরীর কৃষক-শিশু
নীচে : হাঙ্গেরীর গ্রামের বর্ষীয়সী গ্রামনেত্রীগণ









উপরে : হাঙ্গেরীতে গ্রীষ্ম। দ্রাক্ষাচয়নের উৎসব
নীচে : হাঙ্গেরীর এরলেকচনাদের বালকবালিকা

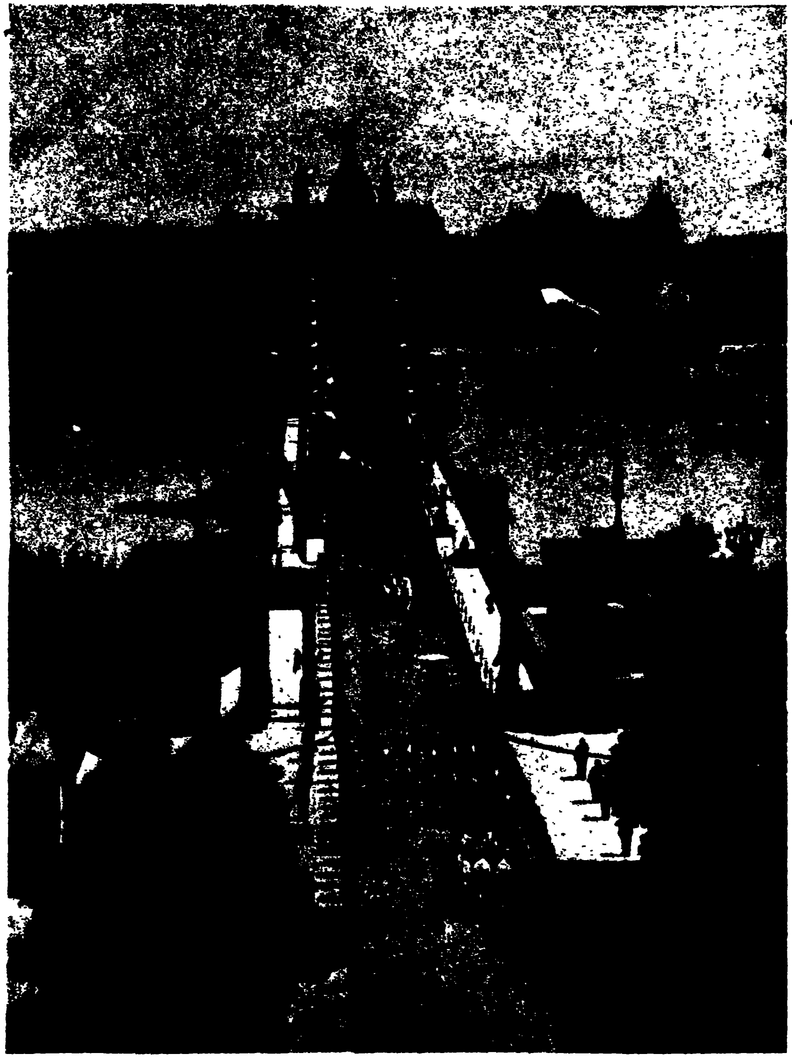
উপরে : পুস্তার বংশীবাদক
নীচে : হাঙ্গেরীর চাষী-পরিবারের মা ও মেয়ে



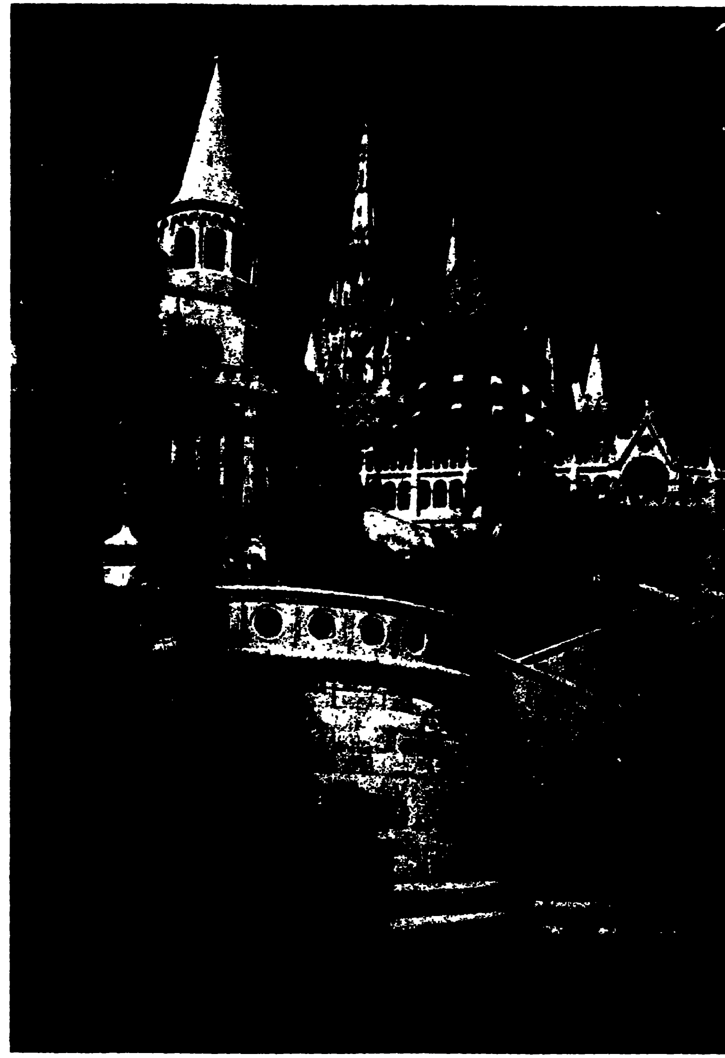




উপরে ঃ বুডা হইতে ডানিয়ুব ও পেষ্টের দৃশ্য। মধ্যে ও নীচে ঃ রাত্রের ডানিয়ুব



দানিয়ুবের উপর নূতন এলিজাবেথ সেতু



হাঙ্গেরীর বিখ্যাত 'জেলেদের কেল্লা'—পিছনে করোনেশন গীর্জার চূড়া

নরওয়ে ও সুইডেন, অষ্ট্রিয়া ও বোহেমিয়া, সর্ব্বত্রই পল্লী-জীবনের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে; কোথাও কোথাও চাষীদের অন্তরের পরিচয় পাই নি এমন নয়; কিন্তু একমাত্র হাঙ্গেরীর কৃষকদের মধ্যেই নিজেকে বিদেশী ব'লে মনে হয় নি; তাদের অপ্রগল্ভ আন্তরিকতায়, সুরসিক আপ্যায়নে এবং অদৃষ্টবাদী বীরধর্ম্মে প্রবাসের অনুভূতি ভুলে গিয়েছি, মনে হয়েছে হিন্দুস্থানের পল্লীগ্রামের কথা। শুধু জিপ্‌সী সঙ্গীত আর তোকাইয়ের আস্বাদনের জন্যই যারা হাঙ্গেরীকে ভালবাসে তারা জানে না এ আপন-ভোলা মাজ্যর-সম্প্রদায়টির প্রাণে এখনও সেই পুরনো দ্বন্দ্বটি চলেছে—এশিয়া আর ইউরোপের দ্বন্দ্ব। এ যুদ্ধে ইউরোপেরই জয় হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু হাঙ্গেরীর পথে ঘাটে অপ্রত্যাশিতভাবে দু-একটি শুধু চাউনি আর অবোধ্য হাসির অন্তরালে যে অন্তরঙ্গতার পরিচয় পেয়েছি তাতে আকাঙ্ক্ষা হয়েছে এশিয়ারই জয় হোক্।

দুরাকাঙ্ক্ষা

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

সুন্দর তুমি কর নি কর নি ভুল
বেদনা গুমরে গোপন মর্ম্মময়
যদিও অঙ্গ কণ্টক-সমাকুল।
যদিও জোছনা নামে নি এখনো
হৃদয়প্রান্ত ছেয়ে
তৃষিত আমার চিত্ত রয়েছে চেয়ে।
বর্ষা আসিলে কদম্ব ওঠে ফুটে
লক্ষ কলির গোপন বন্ধ টুটে
তবুও দীঘির ধারে
রুক্ষ কেতকী বিকশিছে আপনারে—
বদ্ধ তাহার নবযৌবনরূপ
দেহ হ'তে ফিরে অন্তরে আসে ধূপ।
সেই সুগন্ধ দূর দিগন্ত ছায়
ধন্য সে আপনায়—
অঙ্গে আমার কণ্টক বিঁধে আছে
তবু আমি নয় সিক্ত কেতকী ফুল
ভেদিয়া আমার মর্ম্মের গূঢ় মূল
যতটুকু ওঠে সুধা
তা নিয়ে মেটে না বিশ্বজনের ক্ষুধা।

আমি রহিয়াছি পথবর্ত্তিনী,
প্রত্যহ পথপাশে
যত ম্লান ছায়া আসে
কুরূপ কুশ্রীতায়
প্রতিদিন মোর বদ্ধ হৃদয় জীর্ণ করিতে চায়।
তবুও যে দেখি প্রদোষ-আলোতে
প্রভাতের উষালোকে
প্রতিদিন মম চিরসুন্দর দাঁড়ায়েছ চোখে চোখে।
বায়ুমর্ম্মরে বাণী
শুভ্র মেঘেতে দূর নীলিমায়
লিখেছ যে লিপিখানি।
করেছ শোভন করুণ নয়ন পাত
পোহাবে না তাতে দারুণ দুঃখ-রাত।
সব মিটিবে না সাধ
জীবন ঘেরিয়া তুচ্ছ আর্ত্তনাদ।
লিপিখানি তব লেখে নি চরম লিখা
তীব্র প্রেমের জ্বলে নি দীপ্ত শিখা
তবু এতটুকু ক্ষুদ্র প্রদীপ দিয়া
এতটুকু আলো হেসে ওঠে বিকশিয়া
তবু প্রতিদিন প্রভাত-আলোর ভাষা—
জাগ্রত করে আশাতীত মম আশা।

শরৎ-স্মৃতি

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৩ সালের গ্রীষ্মকালে ভাগলপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমার দিদিমা, চাঁচলের রাণী, হাওয়া বদলের জন্য গিয়াছিলেন। শরতের মাতামহ চাঁচলের রাজ-ষ্টেটের ম্যানেজার। সেই সূত্রে উভয় পরিবারের লোকদের মেলামেশা ছিল; এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাওয়া-আসা ছিল। বিকাল বেলা একটি কৃশকায় খর্বদেহ কিশোর আসিয়া উপস্থিত আমাদের বাড়ীতে। তাহার মাথায় বড় চুল, চোখে দীপ্তি। শীঘ্রই আলাপ হইয়া গেল। পরিচয়ের পরেই জানিতে পারিলাম যে শরৎচন্দ্র অপরকে খোঁচা দিয়া হাসিতে ও হাসাইতে খুব দক্ষ।

ভাগলপুরে একটা গুহা আছে। সেখানকার লোকেরা বলে গুম্ফা। জনশ্রুতি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আবাস ছিল এই গুহা; চোরডাকাতের আড্ডা ছিল এই গুহা; আবার মুঙ্গের হইতে ভাগলপুর পর্যন্ত নবাব নাজিম মীর কাশিম এই গুহা খনন করাইয়াছিলেন, বিপদকালে পলায়নের সুবিধা হইবে বলিয়া। সে যাই হোক, এখন ঐ গুহা পরিত্যক্ত। আমরা দল বাঁধিয়া মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো অনেকে দেখিতে গেলাম। গুহার প্রথমে উঁচু, ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে, এক এক জায়গায় এত সরু যে শুইয়া হামাগুড়ি দিয়া ভিন্ন যাওয়া যায় না। আর আশেপাশে কত যে ফ্যাকড়া চোরা গলি আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা বালকেরা অনেক দূর আগাইয়া গেলাম। আমরা ফিরিতে চাই, কিন্তু শরৎ বলে—না, এখনি কি? শেষ পর্যন্ত যাওয়া যাক না। আমরা এখন শুইয়া চলিয়াছি। গুহা এখন এমন সঙ্কীর্ণ হইয়াছে যে গুহার ছাদ পিঠে লাগিতেছে। আমাদের সঙ্গে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন ছিল। সেটা মাটিতে রাখিবা মাত্র দপ করিয়া নিবিয়া গেল। নিবিড় অন্ধকার। আমাদের মনও বাহিরের অন্ধকারের মতন ভয়ে ভরিয়া উঠিল। তখন প্রস্তাব হইল ফেরা যাক। ফেরা তো যাইবে, কিন্তু পথ চেনা যাইবে কেমন করিয়া? কত চোরা গলি পদে পদে যে পথ ভুলাইবে? শরৎ বলিল—ঐ ভুলিতে ভুলিতে ঠিক জায়গায় গিয়া পৌঁছাইয়া যাইব। আমরা যখন অন্ধকারে সরীসৃপ-গতিতে বার বার চোরা গলি হইতে প্রতিহত হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, তখন সামনে আলোক দেখা গেল। আমাদের ধড়ে প্রাণ আসিল। আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বড়রা আমাদের খুঁজিতে লোক পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের আলোয় তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে আমরা গুহা হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলাম।

এই দিনের শরৎচন্দ্রের মধ্যে আমি পরবর্তীকালের ইন্দ্রনাথ-চরিত্র-স্রষ্টাকে দেখিতে পাই।

আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। আমি কাল ভাগলপুর ত্যাগ করিব। আজ বিকালে শরৎ আসিয়া বলিল—চারু, চল, একটু বেড়িয়ে আসি। আমরা বেড়াইতে বেড়াইতে ষ্টেসনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পড়ন্ত রৌদ্র লাগিয়া বড় উদাস ভাবে ষ্টেসনটা দুই বাহু মেলিয়া অনন্তের জন্য ব্যগ্র হইয়া বসিয়া আছে। শরৎ বলিল—তুমি কাল যাবে? হুঁ। বেশ। চল। আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার পথে আর আমাদের একটি কথাও হইল না। বাড়ীতে আসিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার যত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই আমি উপলব্ধি করিতে লাগিলাম যে শরৎ আমার কত ঘনিষ্ঠ প্রিয় হইয়া গিয়াছে। সে নির্বাক ভাবে ষ্টেসন হইতে আমাকে বিদায় দিয়া আসিয়াছে।

ইহার পরে শরৎ আমার স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল। ভারতীতে যখন বড়দিদি গল্পটি বাহির হইল, তখন আমি চিনিতে পারি নাই ঐ শরৎ কে? গল্পের মাধুর্য দেখিয়া কেবলই মনে হইতেছিল যে রবি-বাবু ছদ্মনামে ঐটি লিখিয়াছেন। অর্থাৎ এক রবি-বাবু ছাড়া

বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে এমন আর কোনো লেখক ছিলেন না যে ঐ গল্প লিখিতে পারেন।

অনেক দিন পরে যমুনা কাগজে চরিত্রহীন প্রভৃতি ছাপা হওয়াতে শরৎ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যমুনা-অফিসে বিকালে সাহিত্যিক মজলিস বসে, তাহার মধ্যমণি শরৎ। এক দিন বিকালে আমি সেই সভায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিবা মাত্র শরৎ সহাস্য প্রীত মুখে বলিয়া উঠিল—এই-যে চারু, এস এস, কেমন আছ? আমি যেন কাল বিকালে বৈঠক হইতে উঠিয়া গিয়াছিলাম, আর আজ দেখা হইল, ইহার মধ্যে দীর্ঘ কালের ব্যবধান ঘটে নাই। শরৎ বলিল—সবাই আমার শিবপুরের বাড়ীতে গিয়েছিল, তুমি তো যাও নি? আমি বলিলাম—তোমার ভেলু কুকুরের যে সুখ্যাতি শুনিয়াছি, তাহাতে সাহসে কুলায় নাই। শরৎ হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—না না, ভেলুর নামে যত সব দুর্নাম রটায়। এই সেদিন এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন, তাঁর পায়ের ডিম থেকে এতটুকু মাংস তুলে নিলে। আর তাঁর কী রাগ! বলেন কি না নালিশ করবেন। দেখ তো চারু, তাঁর অন্যায় রাগ। শরতের রঙ্গ শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

এক দিনের সভায় কথাপ্রসঙ্গে এক জন তোষামোদ করিয়া বলিল—দেখুন, রবি-বাবুর লেখা আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু আপনার লেখা বেশ বুঝ্‌তে পারি। শরৎ অম্লান বদনে বলিল—তার কারণ কি জানেন? রবি-বাবু লেখেন আমাদের জন্যে, আর আমরা লিখি আপনাদের জন্যে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পরে শোকসভায় সভাপতি করা হইয়াছে শরৎকে। শরৎ সভায় আসিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে না দিয়া বলিল—হ্যাঁ, হয়েছে, সত্যেন্দ্রের জন্যে আজ আমাদের শোক একেবারে উথ্‌লে উঠছে, আমরা খুব খানিকটা কান্নাকাটি করব। ব্যস। এখন চলুন, বাড়ী চলুন। সবাই তো অবাক্। শেষে শরৎ বলিল—সত্যেন্দ্র তো মস্ত বড় কবি আজ আবিষ্কার হ'ল। কিন্তু যত সাহিত্য-সভা হয়েছে তার সভাপতি করবার সময় তো তাকে মনে পড়ে নি। মনে পড়েছিল যত রাজা-মহারাজাকে। বেশ! শরৎ সভা ভাঙিয়া দিল।

ইহার পরে ১৯২৪ সালে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্যসম্মিলন উপলক্ষ্যে শরতের সহিত সাক্ষাৎ। শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কেমন আছ ভাই? উত্তর পাইলাম—ভাল নেই ভাই, আমার ভেলু হাসপাতালে! এই কথার মধ্যে এমন একটি করুণ বেদনা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল যে সকল শ্রোতাই ব্যথিত হইয়াছিলেন। একটি বাঁশের পুল দিয়া একটা খাল পার হইতেছি। নরেন্দ্র দেব ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল—ও বাবা! শরৎ বলিল—কি নরেন, আর সাহিত্য করবে? এই কথায় সকলেই হাসিয়া অস্থির হইয়াছিলাম।

এই সময়ে সে আমাকে বলিল—দেখ চারু, আমি তোমার বাড়ীর কাছে এসেছি। আমি তোমার বাড়ীতে যাব। আমি মনে করিলাম সে যেমন সকল লোককে লইয়া মজা করে তেমনি আমাকে লইয়াও রঙ্গ করিতেছে। কিন্তু অল্পক্ষণেই আমার ভুল ভাঙিল। আমি আমার পুত্রকে টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম, শরতের আতিথ্যের আয়োজন যেন প্রস্তুত থাকে।

শরৎ আমার বাড়ীতে আসাতে ইউনিভার্সিটির অনেক বড়লোকের অকস্মাৎ আমার দারিদ্র্যের প্রতি করুণা উপ্‌চাইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন দুই-তিন জন অতিথি-সৎকারে খরচ অনেক হইবে। অতএব অতিথি ভাগাভাগি করিয়া লওয়া যাউক। আমরা শরৎ-বাবুকে লইয়া যাই। আমি বলিলাম—বেশ, শরৎ যেতে চায়, নিয়ে যাবেন। শরৎকে বলা হইল, দম্পতি মিলিয়া অনেক বার ঐ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেন, কিন্তু শরৎ যেন শুনিতেই পায় নাই এমনই ভাবে অন্য প্রসঙ্গ আনিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া চেষ্টা ত্যাগ করিলেন।

সেই সময়ে ঢাকায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘটক। এক দিন তিনি আসিয়া বলিলেন, চারু-বাবু, শরৎ-বাবুকে আমরা লইয়া যাইতে চাই। আপনি কি বলেন? আমি বলিলাম—আমার মতামত কিছু নাই, শরৎ যাহা ইচ্ছা

করিবে তাহাই হইবে। প্রস্তাব উপস্থিত হইল। অন্ত কথায় চাপা পড়িয়া গেল। সুরেশ-বাবু পরদিন শরৎ-বাবুকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। পরদিন বিকালে আসিয়া সুরেশ-বাবু আমাকে বলিলেন—শরৎ-বাবুর সুটকেশটা আর বিছানাটা গাড়ীতে তুলে নি, কি বলেন? আমি বলিলাম—আমার তো বলিবার কিছু নাই। শরৎ সম্মত হইলেই আমি শরতের সব জিনিস গাড়ীতে চড়াইয়া দিতেছি। আবার শরতের কাছে প্রস্তাব হইল। শরৎ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—দেখুন সুরেশ-বাবু, আমার একটা বদ অভ্যাস আছে। আমি নিজের বাড়ী ছাড়া অন্যত্র ঘুমাতে পারি না। সুরেশবাবু মহা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে আপনার নিজের বাড়ী? শরৎ আবার হাসিমুখে বলিল—চারু আমার ছেলেবেলার বন্ধু কিনা, তাই ওর বাড়ী আমার নিজের বাড়ী ব'লেই মনে হয়। আর চারুর গৃহিণী আমার যে যত্ন করছেন, তাতে আমার আর অন্যত্র যাওয়ার জো এরা রাখে নি। তেমন যত্ন কেউ করতে পারবে না। সুরেশ-বাবু পরাস্ত হইয়া নিরস্ত হইলেন। আতিথ্যের একটা নিয়ম এই যে কোনো অতিথিকে নিমন্ত্রণ করিলে সেই গৃহপতি ও তাঁহার সঙ্গীদিগকেও নিমন্ত্রণ করিতে হয়। কিন্তু সুরেশ-বাবু এই ভব্যতাটুকু পালন করেন নাই।

আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল এক ঘরে পৃথক্ শয্যায়। শরৎ বলিল—দেখ চারু, এই বিছানাটা বেশ বড় আছে, এতেই আমাদের দুজনার কুলাবে। কি বল? তাহার ইচ্ছা অনুসারেই ব্যবস্থা হইল এবং রাত্রি ১টা ২টা পর্যন্ত জাগিয়া সে অনর্গল কত হাসির গল্প যে বলিয়া যাইত তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তি উহাদের একটাও ধারণা করিয়া রাখিতে পারে নাই।

শরৎ যে-বিকালে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘটকের বাড়ীতে গিয়াছিল সেই দিন রাত্রে শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার চন্দের বাড়ীতে তার নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া সে এমনি গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল যে সুরেশবাবুরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে রাত গভীর হইয়াছে—শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। শরতেরও খেয়াল ছিল না—গল্পের নেশায় সে সেখানেই জমিয়া গিয়াছিল। ওদিকে অপূর্বকুমার চন্দের বাড়ী হইতে বারবার আমাদের বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেছেন—শরৎচন্দ্র ফিরিয়াছেন কি না? শুনিলাম রাত যখন প্রায় এগারোটা, তখন সে মিঃ চন্দের বাড়ীতে আসে। তাও মিঃ চন্দ নিজে গিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন তাঁর বাড়ীতে, তবে। নইলে সে কখন উঠিত কে জানে! এত গল্পপ্রিয় সে ছিল—এবং গল্পের নেশায় তার স্নান-খাওয়ার সময় বহিয়া যায় একথা তাকে বলিলে সে বলিত, "আমার সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে লোকে যদি খুশী হয় তো আমি কেন তাদের এটুকু আনন্দ জোগাতে কৃপণতা করব?" সে-রাত্রে প্রায় আড়াইটার সময়ে সে বাড়ী ফিরিয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়া আসার পর আমি তাহাকে বলিলাম—"শরৎ, সময় সম্বন্ধে তোমার একটু মনোযোগী হওয়া উচিত।" শরৎ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আচ্ছা চারু, মানুষ ঘড়ির দাসত্ব করবে এ আমি সহ্য করতে পারি না। তোমরা দাসত্ব-প্রথাকে ঘৃণা কর—তবু আমাকে বলছ, ঘড়ির দাসত্ব করতে? ও আমি পারব না।"

* * *

পথের যত সব দেশী কুকুর—যাদের প্রতি কেউ কোনো দরদ প্রকাশ করে না—যারা নিরাশ্রয় যারা তাহাদের নিজেদের আহার্য নিজেরাই সন্ধান করিয়া লয়—তাহাদের প্রতি শরতের একটা বিশেষ আন্তরিক করুণা ছিল। তাহার নিজেরও এইরকম একটি কুকুর ছিল, তার নাম ছিল ভেলু। ভেলু মারা যাওয়াতে সে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিল তাহা এখানে ছাপা হইল। নিকটতম আত্মীয় বা বন্ধু-বিয়োগে মানুষ যেমনধারা শোকবিহ্বল হইয়া পড়ে ঠিক সেইরূপ শোকবিহ্বল সে হইয়া পড়িয়াছিল যখন তার অতি প্রিয় সব ক্ষণের সহচর ভেলু মারা গিয়াছিল।

বাজে শিবপুর, হাবড়া

২১শে এপ্রিল, ২৫।

ভাই চারু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। আজ আমার

চিঠিপত্র লেখ্‌বার মতো মনের অবস্থা নয়। তবু তোমাকে এই কথাটা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। তোমার হয়ত মনে পড়বে, আস্‌বার সময় পথের ধারে একটা মৃতপ্রায় বাছুর, তার পরেই একটা জবাই-করা মোরগ আমার চোখে পড়ে। আমি তোমাকে বলি, আজ যাবার সময় এত মৃত্যুর চেহারা দেখি কেন?

তারপর তোমরা ষ্টেসন থেকে চলে গেলে, গাড়ী ছাড়্‌বার পরেই দেখি রাস্তার ধারে একপাল শকুন আর একটা মরা কুকুর। আমার নিজের কুকুর ছিল হাসপাতালে—মন যে আমার কী খারাপ হয়েই গেল তা' লেখা যায় না। ইংরেজীতে যাকে বলে Superstition সে আমার নেই। কিন্তু তিন তিনটে মৃত্যুর কথা সমস্ত পথ আমাকে একটা মুহূর্তের শান্তি দিলে না।

বাড়ী এসে শুন্‌লাম, ভেলু ভালো আছে এবং হাসপাতালের চিঠি পেলাম।

২৭শে এপ্রিল, ২৫

বাড়ীতে নিয়ে এলাম বৃহস্পতিবারে, পরের বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় ভেলু মারা গেল। আমার চব্বিশ-ঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এত বড় ব্যথার ব্যাপারও যে আছে এ আমি ঠিক বুঝ্‌তাম না। বোধ হয় তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল। আর একটা জিনিষ টের পেলাম চারু। পৃথিবীতে objectiveটা কিছুই নয়, subjectiveটাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বই তো নয়। রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যে নয়।

তোমার—

শরৎ।

কৈলাস খুড়োর হৃদয়খানি এই পত্রের ছত্রে উঁকি মারিতেছে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে শরৎচন্দ্র একবার রাঁচি গিয়াছিল। সে সময়েও এমনিধারা একটি পথের নিরাশ্রয় কুকুর তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাহাকে সে যত্ন-আদর করিতে ত্রুটি করে নাই। এ আখ্যায়িকা সে "অতিথি" নাম দিয়া শ্রীনরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত "পাঠশালা"র ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিল। রাঁচি হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে সেই সামান্য একটি কুকুরকে ছাড়িয়া আসিতে সে যে কি রকম ব্যাকুল হইয়াছিল তাহা তার ঐ "অতিথ" গল্পের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্র যখন প্রথমবার ঢাকায় যায় তখন তাহার এই ভেলু জীবিত ছিল। সে তাহার ভেলুর অনেক কাহিনীই আমাদের বলিত। আমাদের বাড়ীতেও তখন দুটি কুকুর ছিল। একটি দেশী, অপরটি বিলাতী। দেশী কুকুরটি খুব সবল এবং তেজী—তার প্রতাপে আমাদের বাড়ীর বাগানের মধ্যে গরু বা ছাগলের প্রবেশ দুঃসাধ্য ছিল। এক দিন দুপুরবেলা শরৎচন্দ্র আমাদের বাড়ীর বাগানের উপরকার বারান্দায় বসিয়া আছে, তাহার কাছে আমিও আছি, সেই সময়ে কোথা দিয়া যেন একটি গরু হঠাৎ বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িল। এই দেখিয়া সেই দেশী কুকুরটি চীৎকার করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া প্রথমে তাহার তীব্র আপত্তি জানাইল। তারপর ছুটিয়া গিয়া গরুটাকে দিল এক কামড় বসাইয়া। গরুটি তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া বাঁচিল। বিজয়গর্বে যখন কুকুরটি ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিল, তখন আমি কুকুরটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম—"ভারী পাজী হয়েছিস।" কুকুরটি তাহার কান গুটাইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। শরৎ তখন কুকুরটিকে কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিল, "চারু, তোমার ওকে বকা অত্যন্ত অন্যায়। ওই তো তোমার বাগান-রক্ষকের কাজ কর্‌ছে!" আমি বলিলাম, "কিন্তু ও যে গরুটাকে কাম্‌ড়ে দিলে।" শরৎচন্দ্র উত্তর দিল, "তা অন্যায়ই বা কি করেছে—কাম্‌ড়ে একটু মাংস তুলে নেবার চেষ্টা করেছিল বই তো নয়।"

দেশী কুকুরের প্রতি সবাই যেমন উদাসীন হয়, আমরাও তেমনি উদাসীন ছিলাম আমাদের সেই দেশী কুকুরটির প্রতি। কারণ আভিজাত্যের গর্ব করিবার মতো তাহার কিছুই ছিল না। সে কুকুরটি সকলের ভুক্তাবশিষ্ট যাহা পাইত তাহাই খাইত—অথচ আমাদেরই সেই বিলাতী কুকুরটির কি আদর যত্নই না হইত। তাকে নিয়মিত স্নান করানো—সময়মত তাহার জন্য ভিন্ন পাত্রে খাদ্য পরিবেশন—এ-সবের ত্রুটি কখনো ঘটিত না।

শরৎ যে-কয়দিন ঢাকায় আমাদের বাড়ীতে ছিল সে কয়দিনই প্রত্যহ সে তাহার খাওয়ার পরে ভোজ্যের উত্তম দ্রব্যগুলি লইয়া গিয়া নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঐ দেশী কুকুরটিকে খাওয়াইত। একদিন তাহাকে বলা হইয়াছিল যে দেশী কুকুরটির প্রতি তাহার এত পক্ষপাতিত্ব কেন? তাহাতে সে উত্তর দিয়াছিল, "ওকে তো তোমরা কেউ দেখ না—ওর প্রতি তোমাদের অযত্ন আর অবহেলা আছে ব'লেই আমি ওকে ভালোবাসি। বিলিতি কুকুরটাকে তো তোমরা যত্ন-আদর করছই। সে আদরের উপর আবার আদর কেন?"

এক দিন আমাদের বাগানের মালীটি কি কারণে বিরক্ত হইয়া সেই দেশী কুকুরটাকে তার জল আনিবার বাঁক দিয়া এক ঘা মারিয়াছিল। শরৎ ইহা দেখিতে পাইয়া মালীটিকে খুব তিরস্কার করিল এবং ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিবার সময়ে বাড়ীর অন্যান্য ভৃত্যদের বকশিস দিয়া সে বিশেষ ভাবে মালীর উল্লেখ করিয়া বলিল, "ওকে আমি একপয়সাও দেবো না। কুকুরকে যে মারে তার প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নেই।"

পথের ধারের দেশী কুকুরদের প্রতি তাহার এই রকম মায়ার পরিচয় আরও একবার পাইয়াছিলাম যখন সে দ্বিতীয় বার ঢাকায় আসে ১৩৪৪ সালে। একদিন সে কোন্ একটা সভায় যাবার জন্য প্রস্তুত হইয়া মোটরে উঠিতে যাইতেছে। সঙ্গে আমিও যাইব। আমি তাহার পিছনে যাইতেছি। গাড়ীতে উঠিবার ঠিক পূর্বে সে ড্রাইভারকে বলিল, "দেখ, যদি রাস্তায় কুকুর চাপা দাও তো আমি গাড়ী থেকে নেমে যাব—সাবধানে চালিয়ো। কলকাতায় আমার ড্রাইভারকে আমি ব'লে দিয়েছি যে সে যদি কোনো কুকুর চাপা দেয় তো তার চাকরী যাবে।"

এইখানে আমরা শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন হইতে খুব বড় একটা অভিজ্ঞতা লাভ করি—তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাহার সৃষ্ট সাহিত্যের একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি। যেখানে অবহেলা, শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি সেইখানে—এই জিনিসটি তাহার সাহিত্যে ও ব্যক্তিগত জীবনে উভয়তঃই সমানভাবে বর্তমান দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অবজ্ঞাত ও নিরাশ্রয় যাহারা তাহাদের সে অতি আদরের সঙ্গে বুকে তুলিয়া লইয়াছিল। ভবঘুরে শ্রীকান্ত, ডানপিটে ইন্দ্রনাথ, চরিত্রহীন সতীশ, পতিতা রাজলক্ষ্মী, স্বামীত্যাগিনী অভয়া, কলঙ্কিতা অন্নদাদিদি বা দুশ্চরিত্র জীবানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া তাহার সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে যাহার আভাস আমরা তাহার আচরণে পাইয়াছি তাহার সাহিত্যেও ঠিক সেই জিনিসটি প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

শরতের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ধারাটি অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে সেই-সব উপন্যাসে অতি নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রা অঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু সমাজের যারা অবহেলিত ও অবনমিত তাহাদের প্রতি শরতের একটা গভীর এবং আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। এই জন্যই সে সমাজের অতি নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রা—এমন কি সমাজ-বহির্ভূত জীবনকে তাহার কল্পনায় স্থান দিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে সে অগ্রণী।

কি পশুজীবন—কি মানব-জীবন—সর্বত্রই তাহার অসীম সহানুভূতি ছিল তুচ্ছতমদের প্রতি। সেই জন্য তাহার কল্পনা তুচ্ছতম ও অবহেলিত নর-নারীদের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিল। তাহার হৃদয়ের আবেগ এত বেশী ছিল যে, সকল কিছুকেই সে খুব বড় করিয়া দেখিয়া গিয়াছে। যাহা সামান্য ও সাধারণ তাহার মধ্যে সে অসামান্যতা ও অসাধারণত্ব উপলব্ধি করিয়াছে। নীলাম্বরের মতো গাঁজাখোর পল্লীসন্তানের মধ্যেও রসের উৎকৃষ্ট উপকরণ সন্ধান করিতে তাহার সাহসের অভাব হয় নাই। অথবা একাদশী বৈরাগীর পাষাণ-হৃদয়ের এক পাশে যে মহত্ত্ব নিহিত ছিল তাহা অঙ্কিত করিতেও সে বিস্মৃত হয় নাই।

কোনো সাহিত্যদর্পণ কাব্যদর্পণ বা অলঙ্কারশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া শরৎ সাহিত্য-সৃষ্টি করে নাই। এ সম্বন্ধে তাহার নিজের বলা কয়েকটি কথা আজ মনে পড়িতেছে। সে প্রায়ই বলিত, "যে জিনিস আমি নিজে কখনো ভালো ক'রে দেখি নি, তা আমার সাহিত্যে স্থান পায় নি। নিছক কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে আমার কোনো উপন্যাসই গড়ে ওঠে নি। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ আমি দেখেছি—সে-সবের কারণ আমি বুঝবার

চেষ্টা করেছি, তার পরে তাকে আমি উপন্যাসে রূপ দিয়েছি।" তাহার এই কথাটি কতখানি সত্য তাহা শরৎ-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। আমাদের তো মনে হয় যে মানুষের সুখ-দুঃখ যতটা সে দেখিয়াছিল তাহার অপেক্ষা বেশী সে উপলব্ধি করিয়াছিল—এই উপলব্ধি করার মধ্যে তাহার যে শক্তি ছিল তাহাই তাহার কবিশক্তি। এই শক্তি ছিল বলিয়া সে তাহার চোখে-দেখা চরিত্রগুলির মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছিল এত সফলতার সঙ্গে।

সে একদিন আমাকে বলিয়াছিল, "চারু, আমার মতো ক'রে তোমাদের যদি উপন্যাস রচনা কর্‌তে হ'ত তাহলে তোমরা উপন্যাস লিখ্‌তেই পার্‌তে না। এমন দিন গেছে, যখন দু-তিনদিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ি-বাগ্‌দীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তার পর খুব ভালো ক'রে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তা ছাড়া, আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।" মানব-জীবনের সহিত পরিচয়ের এই গভীরতার জন্যই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রগুলির মাধুর্য এত প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সে তাহার উপন্যাসসমূহে তার নিজের অভিজ্ঞতাকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়াই তাহার উপন্যাসে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা নাই—এই জন্যই তাহার উপন্যাসের কাহিনীগুলি আমাদের হৃদয়কে এত গভীরভাবে স্পর্শ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট্ উপাধি গ্রহণ করিবার আমন্ত্রণে শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় বার ঢাকায় যায়। তখনও দেখিয়াছি সে কত বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ—কত গভীর জ্ঞান তাহার! কত লোক তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সে সমানে করিয়া যাইত। ইহাতে প্রায়ই তাহার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা প্রকাশ পাইত। দেখিতাম সে ইতিহাস ভূগোল সমাজতত্ত্ব দর্শন ইংরেজী সাহিত্য প্রভৃতিও কী রকম গভীরভাবে পড়িয়াছিল এবং সে সম্বন্ধে কত চিন্তা করিয়াছিল। কলিকাতার তাহার বাড়ীতে তাহার লাইব্রেরি দেখিয়াছি। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের বই ছাড়া বাকী সবই প্রায় দেখিলাম সায়ান্সের বই। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিজের লাইব্রেরিতেও এই রকম দেখিয়াছি—অধিকাংশ আলমারি বায়োলজি ও ভূগোল সম্বন্ধীয় বইয়ে ভরা। কলিকাতায় শরৎচন্দ্রের সহিত যেদিন দেখা করিতে যাই সেদিন সে উপরে তাহার লাইব্রেরি বা পড়ার ঘরে ছিল। আমাকে সে উপরেই ডাকিয়া লইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম সে একখানি Elements of Civics পড়িতেছে—আমাকে দেখিয়াই বইখানি নামাইয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিল।

শরৎ হাজার পণ্ডিতার জীবনকাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিল। গৃহদাহে হাতের লেখা নষ্ট হইয়া যায়। ছাপা হইলে হ্যাভ্‌লক এলিস প্রভৃতির পুস্তকের ন্যায় বিশেষ প্রয়োজনীয় হইত।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য সে খুব মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলও। দ্বিতীয়বার ঢাকায় গিয়া সে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে তাহার কলিকাতা ফিরিয়া আসিতে খুব বিলম্ব হইয়া যায়। সেই সময়ে দেখিয়াছি—দু-একদিন জ্বরের ঘোরে অনর্গল সে "বলাকার" কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে—প্রত্যেকটি কবিতা তার সম্পূর্ণ মুখস্থ। এ ছাড়াও, কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দা করিলে সে বড় ব্যথিত হইত। তাহার চোখ মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিত। মাসিক মোহাম্মদীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষার বিরুদ্ধ-সমালোচনা সম্বন্ধে সে বলিয়াছিল, "আরে, ওরা সব ভুলে যায় যে, এই গাল দেবার—নিন্দা কর্‌বার ভাষাটাই বা ওদের কে শিখিয়েছেন?"

শরৎ ঢাকার বহু সভা-সমিতিতে বলিয়াছিল যে মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করিয়া সে একখানি উপন্যাস রচনা করিবে। অবশ্য, এ ধরণের উপন্যাস রচনা করিবার

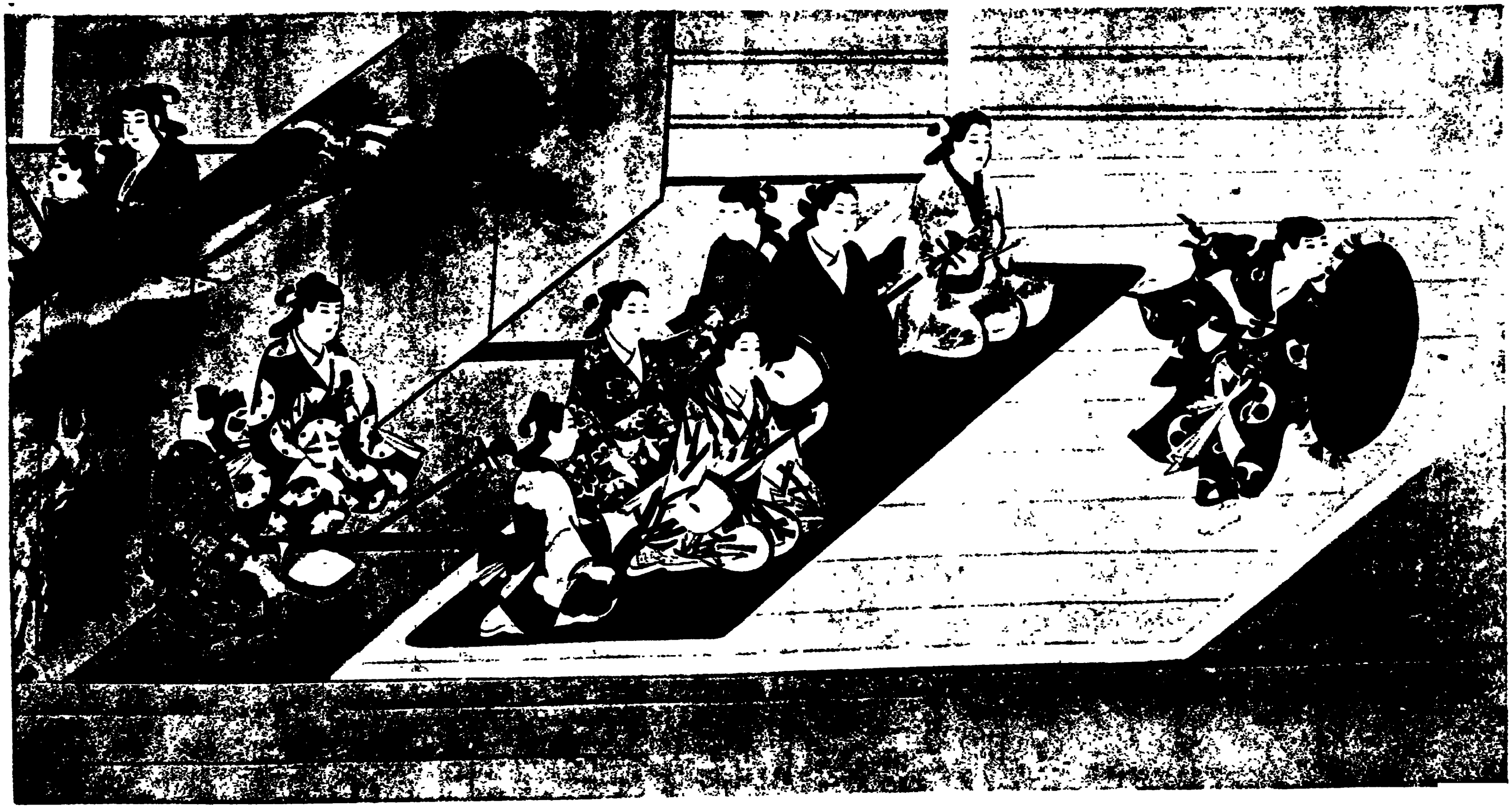
জন্য অনেক পূর্ব হইতে তাহার মনে একটা ইচ্ছা বর্তমান ছিল। সে বলিত, "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মুসলমানদের যে-ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে আমার মন সব জায়গায় সায় দেয় না। কৃষ্ণকান্তের উইলে দানেশ খাঁ যখন নিশাকরের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আঙুল গুণে "এক বাত্‌ হুয়া" "দো বাত হুয়া" বল্‌ছিল, তখন নিশাকর উত্তর দিয়েছিল—"ওস্তাদজি, শুয়ার গুণ্‌চো নাকি?"—এইরকম সব উক্তির দ্বারা অনর্থক তিনি মুসলমান-সমাজের দোষ ত্রুটি না দেখাইয়া উপন্যাস রচনা করিলে মুসলমানেরা ব্যথিত হইতেন না হয়ত।" এইজন্য সে মুসলমান সমাজ ও জীবনকে লইয়া একখানি উপন্যাস লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। শরতের কাছেই শুনিয়াছিলাম যে এ সম্বন্ধে প্রথমে সে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বলেন, "এ দিকটা সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু ভাবি নি, জানাও নেই বিশেষ কিছু। সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা খুব গভীর, তুমিই এ বিষয়ের যোগ্যতম ব্যক্তি।"

ঢাকায় গিয়া সে সুসাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক কাজী আব্‌দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রভৃতিদের সঙ্গে তাহার এই পরিকল্পনা লইয়া নান-খাওয়া বিস্মৃত হইয়া তন্ময় হইয়া আলোচনা করিত। সে তাঁহাদের বলিত "বাংলা দেশের মধ্যে মুসলমান-সমাজ ও হিন্দুসমাজ। তার কেবল একটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে সেটা শোভন হবে না। তাই আমি তোমাদের সমাজ ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে লিখ্‌ব ঠিক করেছি। কিন্তু দেখ,—তোমরা তোমাদের দোষ ত্রুটি দেখে আমার উপর চ'টে যাবে না তো?" কাজী আব্‌দুল ওদুদ প্রভৃতি বল্‌তেন "আপনি যে-রকম সহানুভূতির সঙ্গে আপনার উপন্যাসের মধ্যে হিন্দুসমাজ ও পল্লীসমাজের দোষ-গুণ দেখিয়েছেন, ঠিক সেরকম ভাবে যদি লেখেন তো আমরা খুশীই হব, এবং তাতে আমাদের মুসলমান-সমাজ উপকৃত হবে।" তখন শরৎ মুসলমান-সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কত ব্যাপার লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইত। এই ভাবে সে মুসলমান সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছিল; মাঝে মাঝে বলিত, "একবার তোমাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী আমাকে ভালো ক'রে দেখাতে পার?"

ঢাকাতে তার অসুস্থতার সময়ে প্রায়ই সে চোখ বুজিয়া ইজি-চেয়ারটিতে বসিয়া থাকিত। এক দিন বিকালে আমি ইউনিভার্সিটি হইতে ফিরিতেই সে আমাকে বলিল, "চারু, জ্বরের ঘোরে আজ দুপুরে ঝিমোতে ঝিমোতে ভাব্‌ছিলাম যে, উপন্যাসখানি কি ভাবে আরম্ভ করে কি-ভাবে সেটাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবো। আজ সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। এখন আমার মনের মধ্যে একটা পরিষ্কার প্লট আমি গড়ে তুলেছি—তার আরম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত।" আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি না লিখ্‌লে এ বিষয়ে হাত দেবার ক্ষমতা বা প্রতিভা আর কার আছে? তুমি শীঘ্র সেরে উঠে আমাদের সাহিত্যের এই অভাবটিকে দূর করো, এই তো আমরা চাই।"

কিন্তু শরৎচন্দ্র সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিল না! এ যে কত বড় দুর্ভাগ্য তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মুসলমান জীবন ও সমাজকে লইয়া নূতন ধরণের উপন্যাস রচনার যে মহৎ এবং অভিনব পরিকল্পনা তাহার ছিল তাহা সফল হইল না। ইহাতে বাংলা সাহিত্যের মস্ত একটা অভাব রহিয়া গেল। তাঁহার মত প্রতিভা ও সহানুভূতি দুর্লভ। কাজেই আর কোনো সাহিত্যিক এ বিষয়ে কৃতকার্য হইবেন কি না সন্দেহ।

ঢাকায় আমার বাড়ীতে থাকিবার সময়ে শ্রীমান্ গিরিজাকুমার বসু আমার অতিথি ছিলেন। তাঁর একদিন দাড়ি কামাইবার প্রয়োজন হইল, অথচ তিনি নিজে দাড়ি কামাইতে জানেন না। অনেক অনুসন্ধানেও নাপিত মিলিল না। তখন শরৎ হাস্যমুখে বলিল—"এস চারু, আমরাই এই ঘাস-ক্ষেতটা নিড়িয়ে ফেলি। এঃ হতভাগা গাধা! এত বড় ধাড়ি হয়েছেন অথচ দাড়ি কামাতে শেখেন নি!" তখন গিরিজার দাড়ি-কামানো-পর্ব আরম্ভ হইল। শেষ কালে আমাকে শরৎ বলিল—"চারু, তুমি গিরিজার এই কানটা টেনে ধরো ত, নইলে আমি আবার



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নৃত্য

জাপানী চিত্রকর তোশান অঙ্কিত

কেটে দেবো।" এই লইয়া যে আমরা সেদিন কত হাসিই হাসিয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। শরতের সরল হাস্য করিবার অসাধারণ শক্তি ছিল, এবং যে তাহার সান্নিধ্যে আসিত সে-ই সেই সরল উদারতায় মণ্ডিত হইয়া উপকৃত হইত।

এক জায়গায় ওস্তাদী গান হইতেছিল। শরৎকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইতে আসিয়াছে। শরৎ যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া আমন্ত্রণকারী বলিলেন—"ওস্তাদজী গায় ভাল।" শরৎ হাসিমুখে বলিল—"গায় তো ভাল। কিন্তু থামে তো?" ইহাতেও আমরা কম হাসি নাই।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শরতের পানিত্রাসের বাড়ীর সম্মুখে দুইটি পথিক মুসলমান ভদ্রলোক আসিয়া এক ঘটি জল প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাদের নমাজের সময় হইয়াছে, তাঁহারা ওজু করিবেন। শরৎ তৎক্ষণাৎ জল আনাইয়া দিল। ভদ্রলোকেরা বাড়ীর সাম্‌নে গাছতলায় নমাজ পড়িবার উদ্‌যোগ করিতেছেন দেখিয়া শরৎ তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া পশ্চিমের বারান্দায় লইয়া গেল। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন একখানি সুন্দর কার্পেট তাঁহাদের নমাজ পড়িবার জন্য পাতা রহিয়াছে। হিন্দুর বাড়ীতে তাঁহারা পরম হৃষ্ট মনে খোদা তালার বন্দনা করিলেন। ইহার পরে শরতের বাক্‌পটুতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা বসিয়া গেলেন, এবং সন্ধ্যা হয়-হয় দেখিয়া তাঁহারা ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় লইলেন এবং বলিলেন—"চ'লে যেতে কষ্ট হচ্ছে। অনেক দূরে যেতে হবে। আর এক দিন এসে কথাবার্ত্তা ব'লে সুখী হয়ে শিক্ষা করে যাব।"

শরৎ দরিদ্র-বৎসল ছিল। সে তো তাহাদের জীবনের সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিল, তাই উহাদিগকে সে নিতান্ত আপনার মনে করিত। তাহাদের সাহায্য হইবে বলিয়া শরৎ হোমিওপ্যাথি পড়িতে আরম্ভ করে, ও অনেক টাকার বই কিনিয়া গভীর ভাবে অধ্যয়ন করে। রোগীর চিকিৎসার সময়ে কেবল ঔষধ নহে, অনেক সময়ে পথ্য দিয়াও সে সাহায্য করিয়াছে জানি। এইজন্য সে গ্রামের শ্রদ্ধাভাজন দাদাঠাকুর ছিল।

সে স্বদেশকে বড় ভালবাসিত। যে কেহ স্বদেশের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, সে তাহার পরমাত্মীয় হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ কত লোককে যে সে সাহায্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রাসবিহারী বসু যখন পলাইয়া যাইবেন, তখন একজন আসিয়া শরৎকে বলিল—সাত হাজার টাকা না দিলে রাসবিহারী সীমান্ত পার হইয়া পলাতক হইতে পারে না। তখন রাত্রি এগারটা। শরৎ চিন্তিত হইল। তাহার হাতে অত টাকা নাই। সে অবশেষে মাড়োয়াড়ীর কাছে গিয়া খত লিখিয়া টাকা লইয়া রাসবিহারী-বাবুকে উদ্ধার করিল। শরৎ প্রথম বারে যখন ঢাকায় যায়, তখন তাহার একজন অনুচরের পরিচয় আমাকে বলিয়াছিল—এ লালবিহারী। হাবড়া-ডাকাতি মকদ্দমার জেল-ফেরৎ আসামী। বেচারা কোথাও আশ্রয় পাচ্ছিল না, তাই আমার কাছেই রেখে দিয়েছি।

নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে মিশিতে মিশিতে শরৎ সব রকমের নেশায় পারদর্শী হইয়াছিল। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আচ্ছা ভাই শরৎ, তুমি কত রকমের নেশা করেছ? শরৎ অম্লান বদনে বলিল—নেশার চরম করেছি। আমি পঞ্চরং করেছি, গ্র্যাপ্‌ শট্‌ খেয়েছি, আর কি চাও? একটি হুঁকার পাঁচমুখো একটা কল্‌কী চড়ানো। হুঁকার খোলে জলের বদলে মদ ভরা, আর কল্‌কীর পাঁচ মুখে তামাক গাঁজা চরস গুলি সিদ্ধি সাজা। এই সবগুলিতে একত্র আগুন লাগাইয়া মদের মধ্য দিয়া ধোঁয়া টানিতে হয়। ইহারই নাম পঞ্চরং। আঙুরের খোলো যেমন উপরে মোটা হইয়া ক্রমে সরু হইয়া আসে, এও একটি কল্‌কী তাহার উল্‌টা আকারের, উপরে সরু আর নীচের দিকে ক্রমে মোটা হইয়া হুঁকার মাথায় বসিবার উপযুক্ত। সেই কল্‌কীটির সর্ব্বাঙ্গে হাজার ছিদ্র, প্রত্যেক ছিদ্রে গুলি আর চরসের ছিটা দিয়া সেই ধূম পান করিতে হয়। চীনা চণ্ডু নেশার রাজা, তাহাতে এত নেশা হয় যে না শুইয়া ধোঁয়া টানিলেই ধড়াম করিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। শরৎ grape shots শব্দটিকে উচ্চারণ করিত গ্র্যাপ্‌ শট্‌। তাহার এই উচ্চারণ-বিকৃতি আমার অত্যন্ত হাস্যোদ্রেক করিত।

নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মিশিত বলিয়া সে কোনো দিন তাহাদিগকে জানিতে দেয় নাই যে সে লেখাপড়া-

জানা ভদ্রলোক, তাহা হইলে যে তাহারা তাহার কাছে আর তেমন করিয়া মন খুলিয়া সুখ-দুঃখের কথা বলিবে না। একদিন একজন কারিগরের নামে একটা টেলিগ্রাম আসিল, তাহার মা পীড়িত। শরৎ টেলিগ্রাম পড়িয়াও তাহার মর্ম বলিতে পারিল না। কোনো ভদ্রলোকের কাছে উহা বাচন করিতে পাঠাইয়া দিল।

ঢাকাতে বিশ্বভারতী-সম্মিলনী নামে একটি সমিতি ছিল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য-চর্চ্চা। শরৎ প্রথম বারে ঢাকায় গেলে বিশ্বভারতী-সম্মিলনী তাহাকে একটু সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত শঙ্খে করিয়া মানপত্র দিয়াছিল। রাত্রি দুইটা পর্যন্ত গল্প করিয়া আমরা যখন ঘুমের উমেদারী করিবার জন্য একটু চুপ করিয়াছি, তাহার কয়েক মিনিট পরেই শরৎ মৃদুস্বরে ডাকিল—চারু, ঘুমিয়েছ? আমি বলিলাম—না। তখন সে বলিল—সেই শাঁখটা কোথায় আছে? আমি বলিলাম—এই যে আমার কাছেই বিছানাতেই আছে। শরৎ বলিল—ওটা আমার হাতে দাও তো। শাঁখটি হাতে লইয়া সে এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—চারু, তুমি নইলে এমন জিনিস আমাকে কেউ দিতে পারৃত না। এটি আমার ঠাকুরকে দেবো। রোজ এতে ক'রে তাঁর পূজো হবে।

শরৎ সাপের ওস্তাদ ছিল। সে অনেক বিষাক্ত সাপ ধরিয়াছে, বিষদাঁত ভাঙিয়াছে। অনেক মাল তাহার সাকৃরেদ ছিল। একদিন এক মাল আসিয়া ডাকিল—দাদাঠাকুর, ওপাড়ায় একটা সাপ উৎপাত করৃছে। চল না সেটাকে ধ'রে নিয়ে আসি। শরৎ বলিল—না রে, বাস্ নে, সেটা শুনেছি বড় রাগী। আজকে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে গেছে, আজ থাক। পরে একদিন গেলেই হবে। মাল নিষেধ শুনিল না। সে বলিল—তুমি দেখ না দাদাঠাকুর, আমি কেঁচোটাকে ধ'রে নিয়ে আস্ছি। অল্পক্ষণ পরেই শরতের কাছে খবর আসিল মালকে সাপে সাংঘাতিক কাম্ড়াইয়াছে। শরৎ ছুটিয়া গিয়া নিজের জানা-শোনা ঔষধ দিয়া তখনই তাহাকে হাবড়া হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু মাল বাঁচিল না। সেই হইতেই শরৎ সাপ ধরা ছাড়িয়া দিয়াছিল। সর্পচিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক বই তাহার ছিল। সে জানিত কোন্ সাপের বিষ কিরূপ ক্রিয়া করে—বোড়া সাপের বিষ নার্ভের উপর কাজ করে, আর অন্য সাপের বিষ মাংসপেশীর উপর কাজ করে।

শরৎ সকলের হাতে খাইত বটে, কিন্তু তাহার খাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা ছিল। শেষ বারে ঢাকায় আমার বাড়ীতে গিয়া সে আমাকে বলিয়াছিল—দেখ ভাই চারু, আর সব নিমন্ত্রণ নিও, কিন্তু কারো বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ নিও না। ইহাতে আমার সহকর্মী কেহ কেহ আমার উপর অত্যন্ত চটিয়া গিয়া বলিয়াছিলেন—চারুবাবু এমন কি সোনা-দানা খাওয়াচ্ছেন যা আমরা খাওয়াতে পারব না? শরৎ এই অভিযোগ শুনিয়া বলিয়াছিল—এ তো সোনা-দানার কথা নয় চারু, খেতে গিয়ে যদি কোথাও বিচ্ছি হয়ে যায় সেই ভয়ই আমার করে।

সামাজিক জীবনের চিত্র এবং নর-নারীর দ্বন্দ্ব ও বেদনাকে ভাষা দেন সাহিত্যিক। যে-সাহিত্যিক যত বেশী অনুভূতিশীল—যে-সাহিত্যিক এই সব সামাজিক জীবনের চিত্র এবং অন্তরজগতের রহস্য ও দ্বন্দ্বকে সুপ্রকাশ করিতে পারেন তিনি তত বড় সাহিত্যিক। শরৎ এই শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিল। তার লেখনী বরাবর সমাজের সুখ দুঃখ ও অনুভূতিকে রূপ দিয়াছিল। তাহাকে হারাইয়া আমাদের কেবল মনে হইতেছে যে সহানুভূতির সহিত সমাজের দোষ ত্রুটি দেখাইয়া নর-নারীর অন্তরের পুঞ্জীভূত হাসি-অশ্রুকে তেমন দরদ দিয়া ভাষায় রূপান্তরিত করিবেন কে?

প্রিয়বরেষু,

ভাই চারু, ইতিমধ্যে আমি বাড়ী গিয়েছিলাম। পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ী আর রূপনারায়ণ নদ—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশি দিন কোথাও থাকৃতে পারি নে। তবে এ-ও সত্যি, এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও বেশি দিন বাকী নেই। পুরনো বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন। তাঁদের আমি নিত্যই স্মরণ করি। এইমাত্র এলো অধ্যাপক পরলোকগত বিপিন গুপ্তর শ্রাদ্ধসভায় যাবার আমন্ত্রণপত্র। শিবপুরের কত বিকাল বেলাই না একসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছি। তুমি আছ একটি সাবেক

কালের বন্ধু। আশা করি অন্ততঃ তোমার আগে যেন যেতে পারি। এ সংসারে আর একটা দিনও মন বসছে না, চারু। কেবলই পিছনের কথা ভাবি, সুমুখের দিকে এক বারও চোখ যায় না। কিন্তু যাক্ গে এসব কথা। তোমার মন খারাপ ক'রে দিয়ে লাভ নেই।

তোমার দু-খানা চিঠিই পেলাম। যাঁরা আমাকে উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাই আমার সব চেয়ে বড় উপাধি। এই কথাটি মনে করলেই মন ভরে যায়।

ঢাকায় যদি যাওয়া হয়, তোমার বাড়ীতে গিয়েই উঠব। তুমি নিমন্ত্রণ ক'রে না রাখ্‌লেও। তোমার গৃহিণীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বোলো তাঁর আহ্বান অবহেলা করব না। ইতি—২৮শে মাঘ, ১৩৩২।

তোমাদের—
শরৎ।

হাওড়া Ry. Station
1st April 1930

ভাই চারু,

আজ ঢাকার জন্যে রওনা হয়েও বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। আজ কলকাতায় গাড়োয়ানের দল ধর্মঘট এবং সত্যাগ্রহ করায় অর্থাৎ C.S.P.C.A-র কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার ফলে একটা মহামারী ব্যাপার ঘটে; Sergeantদের সঙ্গে পেটাপিটি হয়,—কেল্লা থেকে গোরা এসে গুলি চালায়। শুনছি ৪ জন মরেছে।

ও তো গেল কলকাতার কথা। কিন্তু হাবড়া শহরেও C.S.P.C.A আছে এবং আমি তার Chairman; এও একটা বড় Department; আজ হাবড়ার Magistrate এবং S.P. কোনোমতে হাবড়ার দাঙ্গা বাঁচিয়েছে। কিন্তু কাল কি ঘটে বলা যায় না। অথচ, এই Departmentএর কর্তা হয়ে আমার এ সময়ে দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না। এইজন্যেই মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছি। কাল সকালেই আবার ফিরে আস্‌তে হবে।

জানি তুমি অতিশয় দুঃখিত হবে। কিন্তু এই না-যাওয়াটা আমার নিতান্তই দৈবের ব্যাপার।

গোলমাল থামুক। নিজের আফিসটা সামলে নিই। তারপরে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসব। আশা করি মার্জনা করবে।

তোমার—
শরৎ।



পঞ্চশস্য

বাংলা দেশের বিচিত্র মাছ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন জাতীয় মাছের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া আমরা বিস্ময় অনুভব করিয়া থাকি; কিন্তু বাংলা দেশের নদ-নদীতে অদ্ভুত আকৃতি প্রকৃতিবিশিষ্ট কত যে বিভিন্ন জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা কোনই খবর রাখি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি যে-সকল মাছ আমরা অহরহ দেখিতে পাই তাহাদের বিষয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে এমন সব বিস্ময়কর তথ্যাবলীর সন্ধান মিলিতে পারে যাহাতে জীবনধারা-সম্পর্কিত বিবিধবিষয়ক জ্ঞানের পরিধি অধিকতর প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশের 'তপ্‌সে' মাছের কথা বলা যাইতে পারে· এই জাতীয় মাছের গায়ের রং বাদামী বা মেটে হলদে পাঁচ-ছয়



তপ্‌সে মাছ

ইঞ্চি লম্বা মাছই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, আকারে ছোট হইলেও শুঁড়ওয়ালী মাছের সঙ্গেই ইহাদের বেশী সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মুখটি হাঙ্গরের মত মস্তকের নীচের দিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত; ইহারা ভয়ানক শিকারী মাছ। হাঙ্গরেরা যেমন দলে দলে শিকারান্বেষণে ঘোরাফেরা করে, ইহারাও সেইরূপ দলবদ্ধ ভাবেই বিচরণ করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্নভাবেও দুই-একটিকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। আড়, বোয়াল, সিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছ ও চিংড়ির যেমন মুখের সামনে এক জোড়া বা ততোধিক শুঁড় বা দাড়ি সম্মুখের দিকে প্রসারিত থাকে, ইহাদেরও সেরূপ কতগুলি শুঁড় বা দাড়ি আছে বটে, কিন্তু মুখের সম্মুখের দিকে প্রসারিত নয় কান্‌কোর নিম্নে গলার পার্শ্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া লেজের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই শুঁড়গুলি ধনুকের আকারে ঈষৎ বক্র এবং মাছের শরীর অপেক্ষা অনেক বড় ও খুব শক্ত। শুঁড়ের সংখ্যাও কম নয়। এক এক দিকে ছোট বড় সাতটি করিয়া চৌদ্দটি শুঁড় আছে। লেজের পাখনা উপরে নীচে দুই ভাগে বিভক্ত। ঘাড়ের কাছের পাখনা দুটি লম্বা ও সূচালো। বুক ও পিঠের পাখনাগুলি বেশ চওড়া। শিকার ধরিবার জন্য যখন জলের মধ্যে ছুটাছুটি করে তখন পাখনা ও দাড়িগুলিকে প্রসারিত করিয়া ভীষণাকার ধারণ করে। এই অবস্থায় ইহাদিগকে ভারি সুন্দর দেখায়। কিন্তু জলের উপর তুলিলেই ইহা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই সৌন্দর্য্যও দূরীভূত হইয়া যায়।

কান্‌কোর নিম্নভাগ হইতে এতগুলি লম্বা দাড়ি বহির্গত হইবার কারণ অনুসন্ধানের ফলে হয়ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা জীবন-সংগ্রামে অভিব্যক্তির ধারা সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ে আলোকসম্পাত করিবে।

চেপ্টা মাছ—শাল, বেলে, খয়রা প্রভৃতি কতকগুলি বিভিন্ন জাতীয় মাছ ব্যতীত অন্যান্য প্রায় অধিকাংশ মাছেরই শরীরের উভয় পার্শ্ব কমবেশী চাপা, কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়াই হউক, কি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলেই হউক, কতকগুলি মাছের শরীরের উভয় পার্শ্ব এমন ভাবে চাপিয়া গিয়াছে যে তাহাদিগকে এক-একটি চেপ্টা পাতার মত দেখায়। আমাদের দেশের চাঁদা-জাতীয় মাছই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের দেশের নদ-নদীতে বা বদ্ধ জলাশয়ে বিচিত্র গঠনের রকমারি চাঁদামাছ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ চাঁদামাছেরই শরীরের আকার গোল, কিন্তু দুই-এক ক্ষেত্রে একটু লম্বাটে ধরণের হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কালো রঙের পায়রা-চাঁদাই বোধ হয় আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া থাকে। নোনা জলে এবং সময়ে সময়ে বদ্ধ জলে প্রায় দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি



তে-কাঁটা মাছ

বাসবিশিষ্ট এক জাতীয় চাঁদামাছ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা দেখিতে বড়ই সুশ্রী। শরীরের আগাগোড়া উজ্জ্বল রূপালি রঙে আবৃত। জলের নীচে কাংভাবে ছুটাছুটি করিবার সময় শরীর হইতে আলো যেন ঠিকরাইয়া পড়ে এবং মাছটা এক খণ্ড উজ্জ্বল রৌপ্য চাকতির মত প্রতিভাত হয়। ইহারা রূপ-চাঁদা নামে পরিচিত। এক স্থানে স্থির ভাবে থাকিবার সময় পিঠ ও বুকের কাঁটাগুলিকে প্রসারিত করিয়া রাখে, কিন্তু ছুটাছুটি করিবার সময় এগুলি সঙ্কুচিত করিয়া লয়। চক্ষের নিমেষে ছোঁ মারিয়া শিকার ধরিয়াই সঙ্গে সঙ্গে গিলিয়া ফেলে।

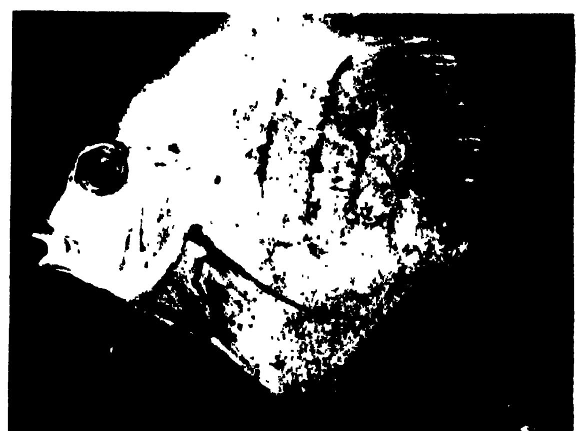
নোনা জলে আর এক জাতীয় অদ্ভুত চাঁদামাছ দেখিতে পাওয়া যায়. রূপ-চাঁদা হইতে ইহাদের আকৃতি কিয়ৎপরিমাণে বড় হইয়া থাকে। কিন্তু রূপ-চাঁদার মত ইহাদের শরীর সম্পূর্ণরূপে গোলাকার নহে পিঠের দিকের খানকটা অংশ উঁচু হইয়া কুঁজের আকার ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং সাদা হইলেও পিঠের দিকের রং কালচে এবং পিঠের উভয় পার্শ্বে খাড়া ভাবে ঈষৎ কালো রঙের কয়েকটি ডোরা দেখিতে পাওয়া যায়। গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁশও আছে। কান্‌কোর উভয় পার্শ্বস্থ পাখনা দুটি লম্বা ও সুচালো। ভ্যাদস মাছের মত ইহাদের নাকের মধ্যে, সম্মুখে ও পিছনে নড়াচড়া করিতে পারে এরূপ একটি কাঠি গোঁজা আছে, ইহার সাহায্যে মুখখানাকে যথেচ্ছ প্রসারিত করিয়া অপেক্ষাকৃত বড় শিকারকেও সহজে উদরস্থ করিতে পারে। ইহারা বিদ্যুদ্বেগে ছুটাছুটি করিয়া ছোট ছোট মাছগুলিকে ধরিয়া খায়। এই মাছেরা কুঁজো-চাঁদা নামে পরিচিত।

কিন্তু আমাদের দেশীয় চেপ্টা মাছের মধ্যে বাঁশপাতী বা সোলিয়া জাতীয় মাছই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। সোলিয়া-জাতীয় দুই প্রকারের মাছই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয়



রূপ-চাঁদা মাছ

সোলিয়ার আকৃতি অশশ্বত্থ পাতার মত লম্বাটে ও ঈষৎ গোলাকার; অপর জাতীয়ের আকৃতি ঠিক বাঁশের পাতার মত। পাতার উপরিভাগের রং যেমন গাঢ় ও নীচের দিক যেমন ফিকে হইয়া থাকে, এই মাছের গায়ের রংও সেইরূপ; ইহাদের পৃষ্ঠদেশের রং ধূসর বা কালো কিন্তু নীচের দিক সম্পূর্ণ সাদা বা ঈষৎ গোলাপী। ইহারা এক ফুট দেড় ফুট লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের আত্মগোপন-শক্তি অদ্ভুত. উপকূল-ভাগের অল্প জলে অথবা বদ্ধ নোনা জলে ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়. কিন্তু জলের তলায় বালি বা মাটির সঙ্গে এমন ভাবে লেপটিয়া পড়িয়া থাকে যে পরিষ্কার জলেও কিছুতেই মালুম হয় না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পরেই শরীর নাড়াচাড়া দিয়া উঠে—তখন লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে



কুঁজো-চাঁদা



বৃহদাকারের বান-জাতীয় মাছ

অল্পপরিসর স্থানের মধ্যেই অসংখ্য বাঁশপাতী মাছ স্তূপ করিয়া বালির উপর পড়িয়া রহিয়াছে। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে এই শ্রেণীর বিভিন্ন রকমের মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং অতি উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এসব অঞ্চলে আমাদের দেশীয় চাঁদামাছের মত কয়েক জাতীয় সোলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চাঁদামাছের মত ইহারা জলের মধ্যে খাড়া ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় না এবং চক্ষু দুটি মস্তকের দুই পার্শ্বে না থাকিয়া এক পার্শ্বেই থাকে।

বাঁশপাতী মাছের জীবনবৃত্তান্ত অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। শৈশবাবস্থায় ইহারা চাঁদামাছের মতই চেপ্টা থাকে এবং তাহাদের মতই জলে খাড়াভাবে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। চাঁদামাছের যেমন মাথার দুই দিকে দুইটি চোখ থাকে—শিশুকালে ইহাদের চোখের অবস্থাও সেইরূপই থাকে কিন্তু বড় হইলেই সব উলট-পালট হইয়া যায়। তখন আর চাঁদামাছের মত খাড়াভাবে থাকিয়া চলাফেরা করে না। চওড়া পার্শ্বের উপর স্থিরভাবে চলাফেরা করিতে থাকে। চক্ষু দুইটিও ক্রমশঃ ঘুরিয়া উপরের দিকে আসিয়া পড়ে। কেবল তাহাই নয়—সাধারণ মাছের মত চোখ দুইটি মস্তকের মধ্যস্থলে থাকে না—এক পাশে সরিয়া আসে। চক্ষু-সংস্থানের এমন অদ্ভুত অসামঞ্জস্য বোধ হয় এই জাতীয় মাছ ছাড়া আর কাহারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইটি চোখও আবার সমান নহে—একটি অপরটি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট বলিয়া বোধ হয়। এ ছাড়া মুখের সংস্থানও অদ্ভুত। মুখটি মধ্যস্থলে না থাকিয়া চোখের বিপরীত দিকে এক পাশে সরিয়া যায়। পেটের তলায় বড়শির আকারবিশিষ্ট মুখবিবরটি দেখিতে পাওয়া যায়। জল হইতে উপরে তুলিলেই ইহাদের শরীরের রং যেন ফ্যাকাশে হইয়া পড়ে এবং চেপ্টা এক খণ্ড মাংসের পাতা বলিয়া অনুমিত হয়, কোন প্রাণীর দেহ বলিয়াই যেন প্রতীতি হয় না।

বানমাছ সকলের নিকটই অল্পাধিক পরিচিত। দেখিতে অনেকটা সাপের মত। ইহাদের আকৃতি দেখিয়া অনেকের ঘৃণার উদ্রেক হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা অতি সুখাদ্য মাছ। আমাদের দেশে কয়েক রকমের বানমাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে আমাদের দেশীয় বানমাছ দেড় হাতেরও বেশী লম্বা হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইহা অপেক্ষাও অনেক বৃহদাকৃতির বানমাছ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এক জাতীয় ভীষণাকৃতির বানমাছ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা কদাচিৎ কাহারও নজরে পড়িয়া থাকে। ইউরোপ আমেরিকায় ছয়-সাত ফুট লম্বা 'কঙ্গার-ইল' নামে এক জাতীয় ভীষণদর্শন মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশীয় সমাকৃতি এই ভীষণদর্শন মাছটিও 'কঙ্গার-ইল'-জাতীয় কোন এক প্রকারের মাছ হইবে। ইহারা চার-পাঁচ ফুট বা ততোধিক লম্বা হয়। চোখ দুটি ভাঁটার মত মাথার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। মুখ সূচালো। উপরের চোয়াল ভয়ানক শক্ত কিন্তু দাঁত প্রায় দেখা যায় না—নীচের চোয়ালে উভয় দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত। মুখের প্রান্ত ভাগে কুকুরের দাঁতের মত উপরে নীচে দুইটি করিয়া লম্বা লম্বা চারিটি দাঁত আছে এবং উপরের ঠোঁটের মধ্যস্থলে মুখগহ্বর পর্যন্ত ভিতরের দিকে বাঁকানো বড় বড় কতকগুলি দাঁত রহিয়াছে। সাধারণতঃ মুখের মধ্যস্থলে এক সারি দন্ত বোধ হয় অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদের লেজ চেপ্টা হইলেও সাঁতার কাটিবার উপযোগী। কিন্তু শোনা যায় ইহারা প্রায়ই রাত্রির অন্ধকারে ডাঙায় উঠিয়া বেগুন প্রভৃতি খাইয়া কৃষকের



বাঁশপাতী বা সোলিয়ার পৃষ্ঠভাগের দৃশ্য

যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। জালে ইহারা সময়ে সময়ে আটকাইয়া গেলেও জাল কাটিয়া বাহির হইয়া যায়। বড় বঁড়শিতে গাঁথিয়া অথবা অন্য কোন অস্ত্র প্রয়োগে ইহাদিগকে ধরা হইয়া থাকে। যাহারা এই জাতীয় বানমাছ শিকার করে তাহাদের শরীরে প্রায়ই ইহাদের দংষ্ট্রাঘাতের ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

[প্রবন্ধের ছবিগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত]

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙালীর কৃতিত্ব

শ্রীআলামোহন দাস—জীবনী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

গত বারে ভারতে যন্ত্রপাতি আমদানির তালিকা দিয়াছি এবং প্রসঙ্গতঃ এ-কথাও উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদের দেশে কলকারখানা স্থাপন করিতে হইলে তাহা দেশেই নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে এক দিকে যেমন দেশের টাকা দেশেই থাকিবে, অন্য দিকে তেমনই সহস্র সহস্র লোকের ইহাতে উদরান্নের সংস্থান হওয়া সম্ভব হইবে। আমরা কাষ্টমস্ হাউসের তালিকা হইতে এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করি এবং অর্থনীতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়া এ-সব কথা চোখে আঙুল দিয়া সাধারণকে দেখাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু আলামোহন স্বকীয় সহজ বুদ্ধিবলে ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং এদিকে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—এইখানেই আলামোহনের বিশেষত্ব।

হাবড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী খিলা গ্রামে ১৩০১ সালের চৈত্র মাসে আলামোহনের জন্ম হয়। পিতা ৺গোপীমোহন ও মাতা ৺বিরাজময়ীর তিনি মধ্যম পুত্র।



ইণ্ডিয়া মেশিনারি কোম্পানীর নূতন ফ্যাক্টরি দাসনগর, হাবড়া

আলামোহন ছেলেবেলায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের অনেক ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভয় কি তাহা আলামোহন জানিতেন না; ছেলেদের প্রিয় যে-কোন অভিযান যতই দুঃসাহসিক হউক না কেন, আলামোহন কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহার নিজ ও অপরাপর গ্রামের

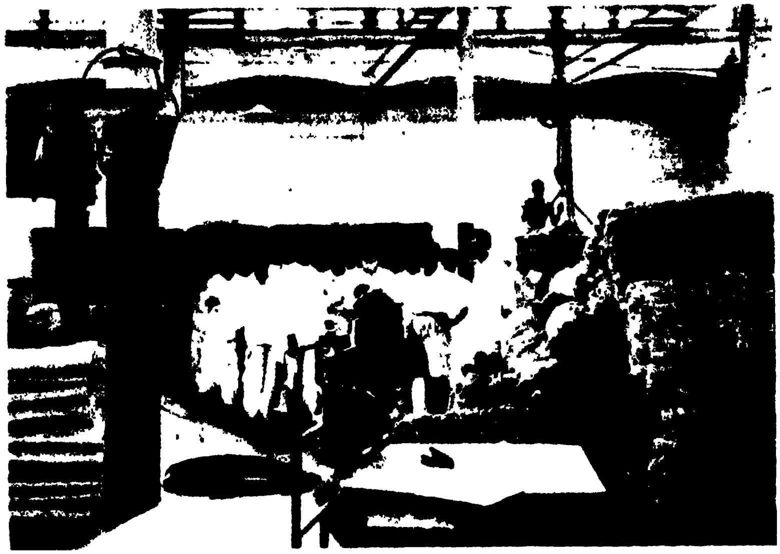
বালকগণ আলামোহনকেই তাহাদের সর্দ্দার বলিয়া মানিয়া চলিত।

আলামোহনের পৈত্রিক অবস্থা প্রথমে ভালই ছিল। কিন্তু যৌথ পরিবারের ব্যবসায়ের দেনায় সমস্ত বিক্রীত হইয়া যায়। তখন আলামোহনের বয়স নিতান্ত অল্প, তাই তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার কোনও সুবিধা হয় নাই। গ্রামেই পাঠশালা ছিল; সেই পাঠশালায় বিনা বেতনে ও কতক দিন গুরুমহাশয়ের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বাংলা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি পাঠ শেষ করিতে বাধ্য হন।



শ্রীআলামোহন দাস

পারিবারিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর অসচ্ছল সংসার ছাড়িয়া আলামোহনের পিতা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তিনি আসিয়া মাসের পর মাস একটি পয়সাও পাঠাইতে পারিতেছেন না। দেশে মা ও ছেলের বড় কষ্ট হইতেছে। বড় ভাই ইহার তিন-চার বৎসর পূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করিয়া



ভারত জুট মিল্‌সের এক অংশ

শ্মশানে শ্মশানে কালীপূজা করিয়া বেড়াইতেন। মাতা ও আলামোহনের এত কষ্ট যে শুইবার খাট ও ঘটিবাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছে। এই সময় মা'র ভয়ানক অসুখ হইল ও মামারা তাঁহাকে শ্যামপুরে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন।

আলামোহন নিতান্ত একগুঁয়ে ছেলে, মামার বাড়ী গেলেন না। সাত মাস মাকে অসুখের জন্য সেখানে থাকিতে হয়। বালক আলামোহন তখন ক্ষেতের কুড়ান আলু সিদ্ধ করিয়া খাইতেন। অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও কিন্তু তিনি কখনও পাঠশালা কামাই করিতেন না। গুরুমহাশয় ৺বরদাপ্রসন্ন ধাড়া দয়াপরবশ হইয়া নিজের জলখাবার হইতে তাঁহাকে অংশ দিতেন। আলামোহন উন্নতি করিবার পর তিনি মারা যান। তাঁহার শ্রাদ্ধে পূর্ব্বতন ছাত্র কৃতজ্ঞ আলামোহন শিক্ষকের যত্ন স্মরণ করিয়া সমস্ত খরচ বহন করিয়াছিলেন। আলামোহনের চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব হইতেছে এই, যে, কাহারও নিকট হইতে এতটুকু সাহায্য-সহানুভূতি পাইলেও তাঁহার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকেন এবং অবসর ও সুযোগ পাইলেই সেই সাহায্যের প্রতিদান দিতে তৎপর হন।

নিতান্ত অল্প বয়সেই দারিদ্র্যের করাল কবলে পতিত হইয়া আলামোহন সংসারে তাঁহার স্থান ও কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই, নিরুৎসাহ না হইয়া এবং পল্লীগ্রামে অর্থোপার্জ্জনের কোনও উপায় না দেখিয়া ১৩১৫ সালে পনর বৎসর বয়সে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় তিনি ভাগ্যান্বেষণের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসেন। চাকরির উপর আলামোহন বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তাই নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্যবসায়ের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। বাগবাজারে ১১ নং গালিফ ষ্ট্রীটে শ্রীরতিকান্ত দে ও শ্রীরজনীকান্ত চোকদার তাঁহার দেশের লোক ছিলেন। তাঁহাদের খৈয়ের কারবার ছিল। তাঁহারা আলামোহনকে বিশ্বাস করিয়া এক বস্তা খৈ ছাড়িয়া দিতেন এবং তিনি সেই খৈ মাথায় করিয়া ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেন। দিনান্তে যাহা লাভ হইত, তাহা হইতে আহারের উপযোগী সামান্য পয়সা রাখিয়া বাকী পয়সা দোকানদারের নিকট জমা দিতেন। এই সময় আলামোহন প্রায়ই এক সন্ধ্যা খাইয়া দিন কাটাইতেন এবং রাত্রে থলে গায়ে এবং ইট মাথায় দিয়া লোকের বাড়ীর অনাবৃত রকে শুইয়া থাকিতেন।

এই ভাবে দু-তিন বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু জমাইতে পারিলেন তাহা দিয়া আলামোহন শিকদার বাগানের মোড়ে একটি ক্ষুদ্র খৈ-মুড়ির দোকান করিলেন। এই সময় মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে স্বনামধন্য স্বর্গীয় পি. এন্. দত্ত মহাশয়ের একটি কারখানা ছিল। সেখানে সর্ব্বপ্রথম বালতি ও এসিড তৈয়ারী হইত এবং যন্ত্রপাতি-নির্ম্মাণেরও আয়োজন হইতেছিল। আলামোহন সেখানে কারিগরদিগকে খৈ-মুড়ি সরবরাহ করিবার জন্য সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। উক্ত এসিড-কারখানার প্রধান কেমিষ্ট ডাঃ শিখরচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের আনুকূল্যে আলামোহন কারখানার সমস্ত কার্য্য ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার সুযোগ পাইতেন। এই হইল তাঁহার জীবনে যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রথম পরিচয়। বিস্ময়াবিষ্ট আলামোহন ডাঃ হাজরার সহিত পি. এন. দত্ত মহাশয়ের কার্য্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবাধে আলোচনা করিতেন। এই সুযোগ এবং আলোচনার ফলে আলামোহনের চিত্ত ক্রমশঃ জাতীয় শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করে।

যোগ্যহীন খৈ-মুড়িওয়ালার চিত্ত বিরাট শিল্পের স্বপ্নে মাতিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার খৈয়ের দোকানে লোকসান হইতে আরম্ভ হইল। অবশেষে দোকান উঠিয়া যায় এবং আলামোহন পুনরায় মাথায় করিয়া খৈ-মুড়ি ফেরি করিতে বাধ্য হন। আবার কিছু দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া হাতে কিছু পয়সা জমাইয়া কলিকাতা হইতে হাবড়ায় চলিয়া আসেন এবং খুরুট রোডে একটি খৈ-মুড়ির দোকান করেন। কিন্তু শিল্পের স্বপ্নে মগ্ন আলামোহন তাহাতে শান্তি পাইতেন না। এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে পি. এন. দত্ত মহাশয়ের কারখানা ফেল হইয়াছে। বাংলা দেশে যন্ত্রশিল্পের এই প্রথম প্রয়াসের ব্যর্থতায় আলামোহনের চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এমন সময় দত্ত মহাশয়ের সহযোগী ডাঃ হাজরা আসিয়া জুটিলেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় আলামোহন তাঁহার অতিকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া হাবড়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস নামে একটি এসিডের কারখানা খোলেন। কিন্তু এসিডের দোকানের টাকা জোগাইতে গিয়া খুরুট রোডের খৈ-মুড়ির দোকানটিও উঠিয়া গেল। এদিকে এসিডের কারখানাও পরিণতি লাভ করে নাই। তখন অনন্যোপায় হইয়া আলামোহন ট্যাংরা চীনা পাড়ায় এসিড ও চামড়ার কাজের উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করিতে আরম্ভ করেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ডি. ওয়াল্ডির নিকট হইতে এসিড কিনিয়া তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত এসিডের সঙ্গে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এ হইল ১৩১৯ অব্দের কথা। এই সময় হইতেই বিশ্ব-বাণিজ্যের রহস্য-দ্বার ধীরে ধীরে আলামোহনের নিকট উন্মুক্ত হইতে লাগিল।

খৈ-মুড়ি ফেরি করিবার সময় আলামোহন কলিকাতার চতুর্দ্দিকে ঘোরাফেরা করিতেন। অবাঙালীদের অর্থোপার্জ্জনের প্রধান ক্ষেত্র শেয়ার-মার্কেট সম্পর্কে আলামোহন তখনই জ্ঞান লাভ করেন। আলামোহনের মেধা সত্যই অতি অসাধারণ এবং শিক্ষার অভিপ্রায়ও অদম্য; তাই শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদির সকল ক্ষেত্রেই

সকল সময় অনুসন্ধান করিয়া নানা তথ্য শিক্ষা করা তাঁহার অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল। এসিড বিক্রীর সঙ্গে সঙ্গে অবসর-মত শেয়ার-মার্কেটে দালালিও আরম্ভ করিলেন। স্বীয় অধ্যবসায় এবং বুদ্ধির গুণে আলামোহন শেয়ার-মার্কেটে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আলামোহনের মন পড়িয়া ছিল জাতীয় যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে এসিডের কারবার ছাড়িয়া দিয়া তিনি শেয়ারের দালালিতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন।

বছর-কয়েকের ভিতর তাঁহার হাতে প্রচুর অর্থ জমিল। তখন তিনি তাঁহার কল্পিত কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময় ডব্লিউ. টি. এভারি কোম্পানীর বিশিষ্ট কারিগর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ঘটে; তখন তিনি ওজনের কল নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে হাবড়ায় বি. ডব্লিউ স্কেল্‌স্ নামে একটি লৌহ-ঢালাই এবং যন্ত্রনির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করেন। এরূপ কারখানায় যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। তখন তিনি তাঁহার এক ব্যবসায়ী বন্ধু শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত পাল মহাশয়ের নিকট হইতে কুড়ি হাজার টাকা ধার লইলেন। কারখানার কাজ ক্রমে বাড়িয়া চলিল। তখন পুনরায় টাকার দরকার হওয়ায় তিনি ১৯২৪ অব্দে এক মাড়োয়ারী ধনীর নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার লইলেন। এই টাকার সাহায্যে তিনি কারখানাটি বড় করিলেন এবং যথাসাধ্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি বসাইলেন। প্রথমে একটু বেগ পাইলেও পরে যন্ত্র বিক্রীত হইতে লাগিল। অবাঙালী ধনী দেখিল বেশ লাভের ব্যবসায়। লোভবশতঃ সে কারখানাটা দখলে আনিবার উদ্দেশ্যে হঠাৎ সমস্ত টাকা চাহিয়া বসিল। তখন আলামোহন নিরুপায় হইয়া চারি দিকে টাকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ব্যবসায়ী মহলে সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি তখন দেশের বড়লোক এবং ধনীদের দরজায় দরজায় ধরণা দিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। এক দিন সেই অবাঙালী ধনী কারখানা দখল করিয়া দরজায় তালা লাগাইয়া দিল। এত দিনের সাধনার পর আলামোহন যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্য অবাঙালীর হাতে চলিয়া গেল, অথচ দেশের কোন ধনী চোখ তুলিয়া চাহিল না। ক্ষোভে দুঃখে আলামোহন কর্ম্মক্ষেত্র হাবড়া ত্যাগ করিলেন।

ভগ্নমনোরথ আলামোহন ত যেখানে দু-চক্ষু যায় চলিয়া গেলেন—শ্রীমতী চপলা বাড়ীভাড়া দিতে না পারায় বাপের বাড়ী আসিলেন। আলামোহনের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর দুই ছেলে দুই মেয়ে লইয়া তাঁহার স্ত্রী যে দুঃখে দিনপাত করিতে লাগিলেন তাহা নিতান্তই মর্ম্মস্পর্শী। আলামোহনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার একটি পুত্র ঔষধ-পথ্যের অভাবেই মারা যায়।

যেদিন মাড়োয়ারী ধনী কারখানা দখল করিল, সেই দিনই আলামোহন তাঁহার সহযোগী বন্ধু শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত পালের নিকট হইতে পঁচিশটি টাকা লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া ঢাকা রওনা হইলেন। ভাবিলেন যদি কিছু করিতে পারেন। ওখান হইতে চাঁদপুর ও পরে চট্টগ্রামে গেলেন। সেখানে হোটেলে খাইয়া গণিয়া দেখিলেন, মাত্র ছয় টাকা সাড়ে পাঁচ আনা সম্বল আছে। সেই সময়ে বি. আই. এস্. এন্ কোং ও বেঙ্গল বর্ম্মা ষ্টীম নেভিগেশ্যন কোম্পানীর মধ্যে রেঙ্গুনের ভাড়া লইয়া দর-কাটাকাটি চলিতেছে। ভাড়া কমিয়া ছয় টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আলামোহন একখানি টিকিট, এক সের ছোলা ও আধ সের গুড় কিনিয়া রেঙ্গুনগামী জাহাজে চড়িয়া বসিলেন।

আলামোহন যখন রেঙ্গুনে নামিলেন তখন ছয়টি পয়সা মাত্র সম্বল; একে অপরিচিত দেশ, তাহাতে কপর্দ্দকহীন, তদুপরি বাঙালী! আলামোহনের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। বাঙালীদের দুর্গাবাড়ীর বারাণ্ডায় শুইয়া থাকিবার স্থান পাইলেন বটে, কিন্তু অন্নসংস্থানের উপায় নাই। কাহারও নিকট হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাওয়া আলামোহনের কল্পনার অতীত। তাঁহার ইচ্ছা, সামান্য সহায়তা পাইলেই একটা কিছু ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

দুই দিন অন্তর এক পয়সার মুড়ি খাইয়া, রাস্তার কলের জলে পেট ভরাইয়া আলামোহন খুঁজিতে লাগিলেন কোথায় হাবড়ার চেনা লোক পাওয়া যায়। বহু অনুসন্ধানের পর ডালার ডক্ইয়ার্ডে হাবড়া জেলার

শ্রীকেদারনাথ আদকের সহিত দেখা হইল। এই বিপদের বন্ধু আদক-মহাশয়ের নিকট হইতে মাত্র তেইশটি টাকা ধার লইয়া আলামোহন পনর টাকার চা ও মণিহারী জিনিষ কিনিয়া বর্ম্মার পল্লীতে পল্লীতে ফেরি করিতে লাগিলেন। অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ প্রত্যহ দুই তিন টাকা লাভ হইতে লাগিল। তখন তিনি মাসে আট টাকা ভাড়া দিয়া ছোট্ট একখানি বাড়ী ভাড়া করিলেন। প্রথমেই জনকয়েক দুঃস্থ বাঙালীর ছেলের নিজের মত কষ্ট দেখিয়া সেইখানেই আশ্রয় দিলেন ও খাইতে দিলেন। ক্রমশঃ যখন হাতে চার-পাঁচ শত টাকা জমিয়া গেল তখন ঐ বাড়ীতেই আপিস খুলিয়া বাজার হইতে জিনিষ কিনিয়া অর্ডার-সাপ্লাইয়ের কাজ আরম্ভ করিলেন। প্রোম, মান্দালয়, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রেশমী কাপড় ও চায়ের কারবার চালাইতে লাগিলেন।

১৯৩১ অব্দের মাঝামাঝি তিনি দেশ হইতে তাঁহার এক পুরাতন সহকর্ম্মীর চিঠিতে জানিতে পারিলেন যে, সেই পরস্বাপহারী অবাঙালী ধনী আলামোহনের হাত হইতে লুণ্ঠিত কারখানা চালাইতে না পারিয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া আলামোহন আবার দেশে ফিরিলেন। আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুশয্যায়! পিতার শ্রাদ্ধশান্তি হইবার পর ছোট ভাই মদনমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, টাকাকড়ি কত দূর কি আনলে?" উত্তর আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পান। তাঁহার ধারণা ছিল, দাদা বর্ম্মা হইতে অনেক টাকাকড়ি লইয়া আসিবেন, তাঁহারা আবার কারখানা করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেন। তদুপরি ছোট ভাই আলোচনা প্রসঙ্গে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ধনী কিংবা বড়মানুষ হইবার ইচ্ছা আলামোহনের নাই। যখন দেখিলেন যে, নিজে কায়ক্লেশে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিয়াও কেবল মাত্র দেশের বুকে জাতীয় যন্ত্রশিল্প স্থাপনই আলামোহন দাসের সঙ্কল্প, তখন মদনমোহন অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া এক দিন হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া ফেলিলেন।

যাহা হউক, আলামোহন পুনরায় ছোট করিয়া একটি ওজনের যন্ত্রের কারখানা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারের বাজারে ঢুকিলেন। ক্ষণজন্মা যন্ত্রশিল্পী আলামোহন এইবার যেন নিজ ক্ষেত্র এবং সুযোগ খুঁজিয়া পাইলেন। যোগ্য সহকর্ম্মী সহযোগে এইবার স্থিরপ্রজ্ঞ আলামোহন এই কারখানা এবং ব্যবসায়ে এরূপ অক্লান্ত এবং একাগ্র ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন যে, কোন বাধাই আর তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। দুই বৎসরের মধ্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ফেলিলেন। তার পর কৃতজ্ঞ আলামোহন তাঁহার বন্ধু শ্রীরজনীকান্ত পালের নামে "পালস্ এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্" নামক একটি বড় কারখানা করিলেন। আলামোহনের অভিজ্ঞতা ও উন্নত পদ্ধতির কল্যাণে এই কারখানা হইতে বাঙালী শিল্পীর হাতে প্রস্তুত বড় বড় পাটকলের যন্ত্র, উৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র ও অন্যান্য নানা প্রকারের কলকব্জা বাহির হইয়া ভারতের নানা দিকে যাইতে লাগিল।

আলামোহন দাস শেয়ার-মার্কেটে দালালি করিবার সময় বড় বড় মাড়োয়ারী ও অন্যান্য অবাঙালী ব্যবসায়িগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইতে লাগিল। এমন সময় তাঁহার দুইটি মাড়োয়ারী বন্ধু একটি পাটকল খুলিবার উদ্যোগ করেন। পাটকলের ব্যবসায় শিখিবার এই সুযোগ বুঝিয়া তিনি উহাদের সঙ্গে ভিড়িয়া গেলেন এবং লাভজনক দুইটি প্রকাণ্ড কারখানার মালিক আলামোহন দাস সম্পূর্ণ বিনা বেতনে চারিটি বৎসর উক্ত পাটকলের পত্তন হইতে ডিভিডেণ্ড প্রদানের দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ চার-পাঁচ ঘণ্টা করিয়া খাটিয়া পাটকলের কার্য্য আদ্যন্ত শিখিয়া লইলেন।

ইহার পরই আলামোহন নিজের শক্তি এবং শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত ভারত জুট মিল গড়িতে আরম্ভ করিলেন। একণে এই জুট মিলটিতে যত যন্ত্র চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজ কারখানায় প্রস্তুত। এই পাটকলটি হাবড়ার নিকটবর্ত্তী কদমতলা নামক স্থানে অবস্থিত। বর্ত্তমানে তাঁহার নিজ কারখানায় নির্ম্মিত ২৫০ খানা তাঁত এই মিলে চলিতেছে এবং সমস্ত কার্য্যভার বাঙালীর হাতে ন্যস্ত।

পালস্ এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে যখন জুট মিলের উপযোগী তাঁত ও অন্যান্য জটিল যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল, তখন আলামোহন দাস নীরবে মোটর গাড়ী প্রস্তুতের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। পরীক্ষার পর যখন বুঝিতে পারিলেন যে বাংলা দেশের কারিগরের দ্বারা উৎকৃষ্ট মোটর গাড়ী প্রস্তুত হইতে পারে, তখন তিনি (১৩৩১ সালে) হাবড়ার সুবিখ্যাত "এট্‌লাস ওয়েরোজ এণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে"র সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিয়া পালস্ এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের সংযোগে, ভারত জুট মিলের সন্নিকটস্থ দাসনগরে এক শত বিঘা জমির উপর "দি ইণ্ডিয়া মেশিনারি কোং লিঃ নামে আর একটি বিরাট কারখানা খুলিয়াছেন; বলা বাহুল্য, যন্ত্রশিল্পের এরূপ বিশাল ব্যবস্থা বাঙালী ইতিপূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই, সামান্ত ফেঁ-মুড়ি-ফেরিওয়ালা রূপে জীবন আরম্ভ করিয়া আলামোহন দাস আজ তাহাই সত্যে পরিণত করিয়াছেন।

আলামোহনের বয়স এখন ৪৫ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আজন্মকল্পিত যন্ত্রশিল্পের ভিত্তি মাত্র স্থাপিত হইয়াছে। সমুচিত অর্থ এবং সহযোগিতা পাইলে তিনি যে বাংলাকে যন্ত্রশিল্প-জগতে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী করিয়া তুলিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পীতু

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভগবানের সম্বন্ধে আপনাদের কোন রকম স্পষ্ট ধারণা আছে?—বোধ হয় নাই। না-থাকিবারই কথা; কেন-না সম্ভবতঃ আপনারা সকলে সেই পন্থাই ধরিয়াছেন যাহা অবলম্বন করিয়া আমায় হার মানিতে হইয়াছে। ওসব আগম-নিগম বেদ-পুরাণে কোনই ফল হয় না। অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো, শুধু সংশয়ের ঘন অন্ধকার—সেটাকে একটু পথ বলিয়া মনে হয়, দেখা যায় সেটা আরও নিবিড়তর অরণ্যে লইয়া আসিয়াছে মাত্র।

তাই বলিতেছিলাম বেশ একটা বিশদ ধারণা না-থাকিবারই কথা। আমারও ছিল না; তবে সম্প্রতি লাভ করিয়াছি এবং আপনাদের মত যাঁহারা অজ্ঞ তাঁহাদের কাছে প্রকাশ না-করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। জানেনই তো—থাকিতে পারা যায় না, জিনিষটা এই রকমই।

অতএব আমি যাহা জানিয়াছি শুনুন—ভগবান্ আকাশের চেয়েও বড়, ইচ্ছা করিলে হাতীর চেয়েও বেশী খাইতে পারেন, আর রেলগাড়ীর চেয়েও জোরে দৌড়াইতে পারেন।

এ ঈশতত্ত্ব অপৌরুষেয় কি না বলিতে পারিলাম না। আমার পাওয়া আমার ভাইঝি ছবির কাছে। তত্ত্বটি অপূর্ণ হইতে পারে, কেন-না ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে তিনটি মাত্র পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু এই তিনটিতেই ধারণা এত স্পষ্ট করিয়া দিতেছে যে অপর তিনটির জন্ত মাথা ঘামাইবার দরকারই হয় না। নয় কি?

আমার দীক্ষা ছবির কাছে। ছবির গুরু পীতু। ধানবাদের পীতু—আপনারা নিশ্চয় জানিতে পারেন। জানেন না?—আপনারা যে অবাক্ করিলেন। অবশ্য আমিও জানিতাম না। কিন্তু ছবির কাছে যে-রকম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং তাহাতে ধানবাদের দিকের পৃথিবীটা সে একাই যে-রকম ভরাট করিয়া আছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে তাহার সম্বন্ধে লোকে অজ্ঞ থাকিতে পারে—বিশ্বাসই করিতে পারা যায় না; আমি নিজেও কি করিয়া ছিলাম আশ্চর্য্য হইতেছি।

যতটা আন্দাজ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় পীতুর বয়স চার হইতে সাতের মধ্যে। আমাকে ছবির

বয়সের তুলনায় আন্দাজটা করিতে হইতেছে। ছবির নিজের যাইতেছে পাঁচ বৎসর। নূতন কোন সঙ্গীর নিকট পরিচয় দেওয়ার সময় বলে, "আমার নাম ছবি— ছ, বয়ে হ্রস্বই, ছবি"—অর্থাৎ প্রথম ভাগ ধরিয়াছে। অনেকটা যেমন সঙ্গতি থাকিলে আপনারা নাম লিখিয়া এম-এ, ডি-লিট্ অথবা বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি জুড়িয়া দেন আর কি।

পীতুর বয়স চার হইতে সাতের মধ্যে ধরার কারণ এই যে, সে ছবির চেয়ে ছোট কি বড় ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

যখন পীতু-কথিত কোন তথ্যে সংশয় প্রকাশ করি, ছবি তাহাকে যতটা সম্ভব বাড়াইয়া তোলে। ধরুন, যেন বৃষ্টির কথা উঠিল। আপনারা যে মনে করেন বাষ্পে শৈত্যস্পর্শ হইয়া বৃষ্টি সংঘটিত হয়, আসলে তাহা নহে। ওটা কতকগুলি হাতীর কীর্ত্তি। তাহারা ভগবানের 'আকাশের মত বড়' পুকুর থেকে কলসী কলসী জল আনিয়া স্বর্গের রাস্তায় ছিটায়, তাহাতেই বর্ষা হয়। স্বর্গের পথ যে পিচ্ছিল এ-কথা আপনারাও স্বীকার করিবেন। জল পড়িবার পূর্ব্বে হাতীরা নিজে যে পড়িয়া যায় না তাহার কারণ তাহাদের পাখা আছে। যদি বলি, "হাতীর তো পাখা হয় না ছবি।" ছবি উত্তর দেয়, "পীতু বলেছে হয়, তুমি পীতুর চেয়ে বেশী জান? পীতু আমার চেয়েও বড় মশাই, অনে—ক জানে।"

এক এক সময় পীতু ছোট হইয়া যায়।

আমি বলি, "পড়াশুনো করছ না ছবি, খালি রোদে রোদে দুষ্টুমি ক'রে বেড়াচ্ছ, এবার যখন ধানবাদে যাবে, দেখবে পীতু আকাশের মত পড়ে ফেলেছে, তোমার সঙ্গে কথাও কইবে না।"

ছবি তাচ্ছিল্যের সহিত বলে, "ইস, পীতুর সাধ্যি! পীতু তো আমার চেয়ে ছোট।"

নিজে সোজা হইয়া দাঁড়ায়, বলে—"আমি তো এত্তো বড়।" তাহার পর ডান হাতটা নামাইয়া বুকের কাছাকাছি আনিয়া মাথাটা নীচু করিয়া বলে, "আর পীতু তো এত্তোটুকু।" যখন ঈর্ষা প্রবলতর হয়, হাতটা আরও নামাইয়া একেবারে হাঁটুর কাছে লইয়া আসিতে বাধে না। পীতুর বিদ্যার্জ্জনের দিক দিয়া সে যে অন্ত হিসাবেও নিশ্চিন্ত, তাহাও এক-এক সময় জানাইয়া দেয়; বলে, "ওর মা বলে—তোর কিচ্ছু বিদ্যে হবে না পীতু…মার কথা মিথ্যে হয় না মশাই, পীতু নিজে বলেছে।"

মোট কথা, পীতুর ছোট হওয়া কি বড় হওয়া একেবারেই ছবির তাৎকালীন মেজাজের উপর নির্ভর করে। তবে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, বয়সটা চার থেকে সাত পর্য্যন্ত যাহাই হোক, পীতু যে অসামান্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ, পীতুর সব বিষয়ে নিজস্ব একটি মত আছে এবং সাধ্যমত সে সেটা দেশ-বিদেশে ছড়াইতে কসুর করে নাই। কোথায় ধানবাদ আর কোথায় সুদূর বেহারে আমাদের এই নগণ্য নগরী—এখানে ইতিমধ্যে তাহার থিয়োরীগুলি আসিয়া পড়িয়াছে এবং বেশ চারাইয়া গিয়াছে। যে-কোন পাড়ার যে-কোন শিশুমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেই পীতুর নাম এবং এক-আধটা অভিমত কানে আসিবে।

বৃষ্টির কথা বলাই হইয়াছে। আরও আছে। যেমন এঞ্জিনের মধ্যে যে-রাক্ষস বসিয়া থাকিয়া অত হাঁকডাক করিতে করিতে গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়, তাহারই একটি ছোট্ট মেয়ে গ্রামোফোনের মধ্যে বসিয়া মিষ্ট মিষ্ট গান করে। মেয়েটি পলাতকা—দুর্দ্দান্ত, নিষ্ঠুর, পিতার ভয়ে রেল-জগৎ ছাড়িয়া সে মানব-পরিবারে আসিয়া লুকাইয়া আছে। ধানবাদ কিংবা যে-কোন ষ্টেশনে গেলেই দেখা যাইবে কতকগুলি ছোট-বড় নানা আকারের এঞ্জিন অবিশ্রান্তভাবে গর্জ্জন করিতে করিতে এদিক-ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, এই মেয়েটিকে খুঁজিয়া বেড়ানো। তাই, কাছে অনেক লোক না-জুটিলে মেয়েটি কোন শব্দই করে না, গান গাওয়া ত দূরের কথা। আহা, রাক্ষস-বাপের লক্ষ্মী মেয়ে বেচারী। পীতু ওকে উদ্ধার করিয়া নিজের কাছে রাখিতে পারিত, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে এঞ্জিনের দল বড় বড় আলোর চোখ মেলিয়া খোঁজাখুঁজি করে, অনেক দূরের পাহাড়ের মাথা থেকে গাছের ডগায় ডগায়, বাড়ীর

জানালায় জানালায় তাহাদের দৃষ্টি আসিয়া পড়ে। বড় হইয়া পীতু একটা ব্যবস্থা করিবে। ইতিমধ্যে ঝাল মাংস খাইয়া গায়ে খুব জোর করিয়া লইতেছে। ছবি চোখ বড় বড় করিয়া বলে, "খু—ব ঝাল মাংস খেয়ে পীতু একটুও উস্‌-আস্‌ করে না, পার তুমি মেজকা ?"

কুকুর বেরাল, ছাগল, ভেড়া সকলেই কথা কয়, এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে ;—মনে করেন বুঝি মাছেরা কথা কহিতে পারে না ?—পারে। কয় না পেটে জল ঢুকিয়া যাইবার ভয়ে। পুকুরে ডুবিয়া একবার কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না—পীতুর কথা সত্য কি না। পুকুরে যদি জল না-থাকিত তো মাছেরা খুব কথা কহিত। অবশ্য যে-পুকুরে মাছও নাই, জলও নাই, সে-সব মাছ আর সে-সব পুকুরের কথা হইতেছে না।

গোটাকতক নমুনা দেওয়া গেল, মোটের উপর সব জিনিষ সম্বন্ধেই পীতুর এই রকম নিজের একটি স্বাধীন মতামত আছে। আপনাদের সঙ্গে মেলে না বলিয়াই যে সেগুলা অবহেলার যোগ্য, এমন মনে করি না। একই সৃষ্টি—আপনারা দেখেন এক রকম চোখে, পীতু এবং পীতু-পন্থীরা দেখে অন্য রকম চোখে। কে ঠিক দেখে, কি করিয়া বলিব ? এই যে মায়াবাদীরা বলে আপনারাই ভুল দেখিতেছেন। পীতুও এক ধরণের মায়াবাদী।

আমার দৃষ্টিতে আসুক সেই মায়া যাহা পীতুর চক্ষে ঝুলান আছে। আপনারা বলিবেন, ছবির শিষ্য বলিয়াই আমার এ-ধরণের অভিরুচি ; ছবি দিন দিন ওদের কল্পলোকের কাহিনী শুনাইয়া, দৃশ্য জগতের নিত্যনূতন ব্যাখ্যা দিয়া আমাকে, আপনাদের চক্ষে যাহা সত্য, তাহা হইতে স্খলিত করিতেছে। সম্ভব।

কিন্তু এই সত্যচ্যুতিতে আমার কোন দুঃখ নাই। এ আমার পরম বিলাস ; তাই প্রতিদিনের আপনাদের এই গতানুগতিক জীবনে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, বার-বার পড়া একই কাহিনীর মত জীবন যখন ঠেকে নিতান্ত বিস্বাদ, অনুচ্চাবচ সমতলের মত বৈচিত্র্যহীন, ছবিকে কাছে ডাকিয়া লই, ধানবাদের পীতুর কথা পাড়ি। দেখিতে দেখিতে নীল পাহাড়ের স্তবকে স্তবকে, অসমতল ভূমির তরঙ্গলীলায়, শিশু-শালের বনে, আর শরৎকালের স্বচ্ছ জলে ভরা সাহেব বাঁধের দীঘিতে ধানবাদ জাগিয়া উঠে। ও-সবের মধ্যে যদি থাকেই কিছু কঠোরতা তো এই তিন শত মাইলের দূরত্বে তাহা যায় গলিয়া মিলাইয়া। অনির্দ্দেশ-সঞ্চরমান দুইটি শিশু পাহাড়ে ঘেরা এবং পাহাড়কেও অতিক্রান্ত করা সমস্ত জায়গাটিকে করিয়া তোলে একটি স্বপ্নপুরী।

ছবি প্রশ্ন করিয়া সুরু করে, "ভারি তো জান—ভগবানের বাড়ী কোথায় বল তো মেজকাকা ?"

সরল প্রশ্ন, উত্তর দিই—"স্বর্গে।"

উত্তরটা নিশ্চয় নির্ভুল, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ছবি যাহা চায় তাহা নয়। মনের ভাবটা ঠিক করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য ছবি একটু ভাবে, তাহার পর বলে, "সে তো ভগবানের কলকাতার বাড়ী,—দেশের বাড়ী কোথায় ?"

প্রশ্নটা আর তভটা সরল থাকে না, আমি উত্তর খুঁজিতেছি, ছবি বলে, "পীতুদের বাড়ীর জানালা থেকে ধানবাদে যে পাহাড়টা দেখা যায় না ? অনে—ক দূরে দেখেছ তুমি ?"

পীতুদের বাড়ী সম্বন্ধেই কোন ধারণা নাই, তাহার জানালা দিয়া কোন্‌ পাহাড় দেখা যায় কি করিয়া বলিব ? বলি, "না, দেখি নি তো।"

ছবি গম্ভীর হইয়া বলে, "কিচ্ছু দেখ নি তুমি, ধানবাদে গিয়ে তবে কি করতে ? পীতুদের জানালা দিয়ে আকাশে—র মত মস্ত একটা পাহাড় দেখা যায়। ভগবানের বাড়ী তার পেছনে, মশাই।...হ্যাঁ!—হাসছ তুমি, ভারি তো জান ; ভগবানের বাড়ী ঠিক তার পেছনে। সেখান থেকে রোজ সকালবেলা—কোথাও যখন কেউ ওঠে না—ভগবান্‌ সূয্যিঠাকুরকে পাঠিয়ে দেন। আহা, অত ভোরে উঠতে কষ্ট হয় না মেজকাকা সূয্যিঠাকুরের ? কি করবে বল ? ভগবানের গায়ে হাতী—র মত জোর, ভয় করে তো ? বাবা দাদাকে ভোরবেলায় যখন পড়তে তুলে দেয় দেখ নি ?—সেই রকম চোখ রগড়াতে রগড়াতে ওঠেন সূয্যিঠাকুর। রাঙা হয়ে যায় চোখ।"

ছবি হাতটা সম্প্রসারিত করিয়া বলে, "তখন কোথাও কেউ ওঠে না, খালি পীতু ওঠে। পীতুর মাও ঘুমিয়ে থাকে। পীতুর মা খু—ব সুন্দর মেজকাকা, জান ? যখন

সূর্য্যিঠাকুর ওঠে, পীতুর মার মুখ রাঙা হয়ে যায়; দুগ্গা ঠাকুরের যেমন ঝকঝকে মুখ নয়?—সেই রকম। এমন চমৎকার দেখায় মেজকা! পীতু বলেছে আমায় এক দিন দেখাবে। পীতু অনেকক্ষণ ধরে দেখে। চাঁদের মত মুখ পীতুর মার। এক-এক দিন জেগে উঠে জিগ্যেস করে, "কি দেখছিস রে পীতু অমন ক'রে?...মেজকাকা, চাঁদ কে বল তো?"

বলি—"সূর্য্যিঠাকুরের ছোট ভাই।"

ছবি এমন হাততালি দিয়া হাসিয়া ওঠে, যে সত্যিই নিজের মূঢ়তার জন্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হয়। ও বলে—"কিচ্ছু জান না মেজকাকা তুমি, শুধু দোরের মত উঁচু হয়েছ,—চাঁদ সূর্য্যিঠাকুরই মশাই, রাত্তিরে চাঁদের মতন দেখায়; পীতু বলেছে।"

আমি ওকে এক রকম হারাইবার জন্যই বলি, "চাঁদ যে সূর্য্যিঠাকুর বলছ, তবে অত চক্‌চক্ করে না কেন?"

দুর্ব্বল প্রতিপক্ষকে হারাইবার উপযোগী অবজ্ঞার সহিত ছবি বলে, "রাত্তিরে যে রোদ্দুর থাকে না মশাই, কি ক'রে করবে চক্‌চক্?...উনি পীতুর চেয়ে বেশী জানেন!...এবারে ধানবাদে গিয়ে পীতুকে বলব তোমার বুদ্ধির কথা, হেসে গড়িয়ে যাবে এখন।"

হঠাৎ হাঁ-টি ছোট এবং গোল করিয়া লইয়া চোখ দুইটা বড় করিয়া ছবি প্রশ্ন করে, "মেজকাকা, তুমি ভগবানকে দেখেছ?"

বলি—"না, তাঁকে কি দেখা যায় ছবি?"

"নাঃ, দেখা যায় না! তবে পীতু কি ক'রে দেখলে মশাই?"

"পীতু দেখেছিল নাকি?"

ছবি খুব টানিয়া জোরের সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ! পীতুর পাঠশালের গুরুমশাই মরে গিছলো কিনা, তার শ্রাদ্ধতে পীতুকে দই দিতে বলেছিল। আহা, কোথায় পাবে দই পীতু মেজকাকা?—গরীব মানুষ, গেরো-দেওয়া কাপড় পরে—চালের পিটুলিকে দুধ ব'লে ওর মা ওকে খাওয়ায়; কোথায় দই পাবে মেজকাকা? পীতুর মা বললে, 'তোর মধুসূদন দাদাকে ডাকিস, তিনি দেবেন দই।' যেদিন শ্রাদ্ধ না মেজকাকা?—পীতু ওদের বাড়ীর ওদিকটায়, একলা পলাশ-বনের ধারে গিয়ে—'কোথায় মধুসূদন দাদা, কোথায় মধুসূদন দাদা, এস, দই দিয়ে যাও' ব'লে কাঁদতে লাগল। আহা, কাঁদবে না মেজকা?—দই না নিয়ে গেলে ওকে মারবে যে। কেঁদে কেঁদে ওর চোখের জলে একটা নদী বয়ে, পলাশবনের মধ্য দিয়ে ছোট পাহাড়ের পাশ দিয়ে ভগবানের বাড়ীর দিকে—যেদিকে সূর্য্যি ওঠে—কত দূর চলে গেল। অমনি এক জন থুড়থুড়ে বুড়ো লাঠি ধরে ঠুক-ঠুক করতে করতে হাতে ক'রে এক ভাঁড় দই নিয়ে এসে বললে—'এই নাও দই, এর জন্যে কি এত কাঁদে?'...এ বুড়ো কে বল তো মেজকাকা?"

বুঝিতেই পারিতেছেন গল্পটি একটি পৌরাণিক উপাখ্যান। কল্পনাপ্রবণ পীতু ওটিকে নিজের জীবনে আত্মসাৎ করিয়াছে,—গেরো-দেওয়া কাপড় আর চালের পিটুলির দুধ-সমেত সমস্ত গল্পটি তাহার তরুণ মনে বড় লাগিয়াছে। অবশ্য, আবশ্যক-মত একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে। মূল উপাখ্যানে বোধ হয় গুরুমহাশয়ের মায়ের শ্রাদ্ধ ছিল, নিজের গল্পে পীতু খোদ গুরুমহাশয়েরই অন্ত্যেষ্টি ঘটাইয়াছে। এটা পীতুর মরজি বলুন, সাধই বলুন বা সুবিধাই বলুন।

আমি প্রশ্ন করিলাম—"বুড়ো, ভগবান বুঝি?"

ছবি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক বলছে রে! তুমি বুঝতে পার মেজকাকা, খুব বোকা নয় তো!

আমি বলিলাম, "কিন্তু এই তুমি বল—ভগবান্ আকাশের মত বড়, আর রেলগাড়ির চেয়েও দৌড়তে পারেন?"

—সে তো যখন রাক্ষসের সঙ্গে কুস্তি করেন মশাই। দই আনবার সময় অত জোর নিয়ে কি হবে? যদি দই না আনলে ওরা পীতুকে মারত তো দেখতে ভগবানের জোর!" —খপ করিয়া আমার হাতের কড়ে-আঙুলটা ধরিয়া বলিল—"ভগবানের এই আঙুল দিয়ে ওদের সব্বার গায়ে একটা পাহাড় ঠেলে দিতেন।...হুঁ, চালাকি নয় মশাই!"

ভীত হইয়া বলিলাম, "ভাগ্যিস তাহলে দই এনে দিয়েছিল বুড়ো, নইলে..."

ছবি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল—

শঙ্কিত কণ্ঠে নিম্নস্বরে কহিল—"জিব কামড়াও মেজকাকা শীগ্‌গির, ভগবানকে বুড়ো বললে! এক্ষুণি এ-রকম শাপ দেবেন!..."

চাপা ঠোঁটে বলিলাম, "হাতটা সরাও, বের করি জিবটা কামড়াবার জন্যে। বড্ড রাগ করেন বুঝি 'বুড়ো' বললে?"

"হ্যাঁ! পীতু কখনও বুড়ো বলে না। তাই কত ভালবাসেন। বাড়ী গেলে কত আদর করেন, ক—ত্তো খাবার দেন..."

বলিলাম, "খেতে দেন? তাহ'লে তো একবার গেলে হ'ত ছবু। পীতু জানে পথটা?"

পীতু জানে বইকি, ছবিও জানে। পীতুতে ছবিতে মিলিয়া কতবার গিয়াছে। পীতু একবার একলা গিয়াছিল। ওর মার কাছে যেদিন ধ্রুবের গল্প শুনিয়াছিল না?—সেই দিন, রাত্রিবেলা। সেদিন সকালবেলা ঠিক যেখান দিয়া সূর্য্য ওঠে, রাত্রে ঠিক সেইখান দিয়া সূর্য্যটা চাঁদ হইয়া বাহির হইল। শোবার সময় পীতুর মার মুখে অন্ধকার ছিল, গল্প বলিতে বলিতে খোলা জানালা দিয়া আলো ফুটিয়া উঠিল। কপালের কাচপোকার টিপ 'আকাশে—র' মত নীল হইয়া উঠিল। চাঁদের চেয়েও পীতুর মার মুখ সুন্দর, মশাই!—চাঁদের কপালে মায়ের মত রাঙা পাড় আর সিঁদুর নাই, পান খাইয়া চাঁদের ঠোঁট মায়ের মত রাঙা হয় না।... পীতু মাকে বড্ড ভালবাসে—ভগবানের চেয়েও। গল্প শুনিতে শুনিতে সেদিন পীতু কাঁদিয়াছিল। আহা, ধ্রুবের মায়ের মতন পীতুর মায়ের যদি মোটে একখানি কাপড় হয়, আর ওর বাবা যদি ঝড়ে বৃষ্টিতে বনে বনে ঘুরিয়া হঠাৎ রাত্রে আসিয়া পড়ে! তাহা হইলে তো মাকে তাই থেকে আধখানা ছিঁড়িয়া দিতে হইবে? তাই গল্প শুনিতে শুনিতে পীতু খুব কাঁদিয়াছিল। ওর মাকে জানিতে দেয় নাই—আস্তে আস্তে চোখের জল গড়াইয়া বালিস ভিজিয়া গিয়াছিল। পীতু খুব সেয়ানা ছেলে মশাই! পীতুর বাবা বকিলে ওর মা যেমন চুপ করিয়া কাঁদিতে পারে না? পীতুও সেই রকম ভাবে কাঁদিতে পারে।...ছবি বলিল, "খু—ব আস্তে আস্তে, খালি ভগবান্ সে-রকম কান্না শুনতে পারেন, মেজকা, পার তুমি কাঁদতে সে-রকম ক'রে?"

পীতু গল্প শুনিতে শুনিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ঠিক করিল, মা ঘুমাইলে সে ধ্রুবের মত ঘুমন্ত মায়ের পাশ হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া ভগবানের কাছে চলিয়া যাইবে এবং গিয়া বলিবে—মায়ের যেন কখন মোটে একখানি কাপড় না হয়, আর বাবা বনে বনে ঘুরিয়া যদি রাত্রে হঠাৎ আসিয়া পড়ে, ভগবান যেন দুয়ারের পাশটিতে চুপি চুপি খাবার রাখিয়া যান। কাহারও কাছে চাহিতে গেলে মার বড্ড লজ্জা করে, চোখে জল আসে; সে-সময় মাকে দেখিলে বড় কষ্ট হয়। ভগবান তো পীতুর মাকে জানেন না, পীতু গিয়া সব বলিবে।

সেদিন রাত্রে মা যখন গল্প বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িল, ভগবান আসিয়া পীতুর চোখে তাঁহার ঘুমের মত ঠাণ্ডা আর নরম হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার পর পীতু উঠিল। ধ্রুবর মায়ের মত পীতুর মা পীতুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেই গেরোটা দাঁত দিয়া কাটিল, তাহার পর ভগবানের বাড়ী চলিল। তাহার আগের দিন মধুসূদন দাদাকে ডাকিয়া ডাকিয়া চোখের জলের যে নদী হইয়া গিয়াছিল কি না, পীতু তাহার ধারে দাঁড়াইয়া খুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া মধুসূদন দাদাকে আবার ডাকিতে লাগিল। তাহার চোখের জলের নদী বাড়ীতে বাড়ীতে 'আকাশে—র' মত বড় হইয়া গেল এবং একটা সোনার নৌকা আসিয়া ধারে দাঁড়াইল। ছবি মামার বাড়ীতে যে নৌকা চড়িয়া গিয়াছিল তাহার চেয়ে অনে—ক ভাল নৌকা, অনে—ক বড় নদী, অনে—ক বেশী হাওয়া; নৌকার সোনার পাল হাওয়ায় ফুলিয়া গিয়াছে।

যাইতে যাইতে কত দূর চলিয়া গেল পীতু। বাবার সঙ্গে কিংবা একলা চুরি করিয়া যত দূর বেড়াইতে যায় তাহার চেয়ে আরও অনেক দূর। অত আলো ছিল তো? ভগবানের বাড়ীর যত কাছে যাইতে লাগিল, আলো ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। খানবাদ ইষ্টিশানের চেয়ে ঢের বেশী আলো। পীতুর এক একবার ভয় করিতেছিল। পীতুর একটুও ভয় করে না, মশাই। ঝাল মাংস খাইয়া ওর গায়ে খুব জোর হইয়াছে। ওর মা যদি কাছে থাকে আর রাক্ষস যদি 'দুঃখিনী সীতার মতন' ওর মাকে ধরিতে আসে তো এ—ক চাপড়ে রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু

ওর মা তো কাছে ছিল না, তাই পীতুর...ভয় করিতেছিল না...পীতুর একটুও ভয় করে না...মায়ের জন্ত শুধু মন কেমন করিতেছিল। তখন ভগবান ওর নৌকা দুলাইয়া দুলাইয়া ওকে ঘুম পাড়াইয়া দিলেন। যখন ঘুম ভাঙিল কি না?—পীতু দেখিল পাহাড়ের ওদিকে, ভগবানের আরও আলোর দেশে পীতু পৌঁছিয়া গিয়াছে। কত বড় দেশ! কত বড় সোনার বাড়ী! 'আকাশে—র' মত উঁচু। বরিয়ার রাজার বাড়ীতে যেমন ঝাড়-লালঠেম টাঙানো আছে না?—ছবি দেখে নাই, কিন্তু পীতু একবার পূজার সময় দেখিয়াছিল—তাহার চেয়েও অনেক ভাল ভাল অনে—ক লালঠেম টাঙান...

পীতুর অভিজ্ঞতায় গরবিণী ছবি আমায় পরীক্ষার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, "কিসের আলো বল তো মেজকাকা?"

বোধ হয় আমা হেন অনভিজ্ঞের পক্ষে উত্তরটা নিতান্তই অসম্ভব ভাবিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলিল, "তারার ঝাড়-লালঠেম!...হ্যাঁ মশাই, তুমি তো ভারি জান; পীতুর মা বলেছে ভগবানের বাড়ীতে খালি তারার ঝাড়-লালঠেম টাঙান আছে!—তারার লালঠেম না হ'লে পীতুর নৌকোয় অত আলো করেছিল কি ক'রে?—বল না এবার মশাই।"

এমন অকাট্য প্রমাণের সামনে আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

ছবির বর্ণনা চলিল—

ভগবান্ জানিতেন পীতু আসিবে। তাহা না হইলে নৌকা কে পাঠাইয়া দিয়াছিল? নৌকা ঘাটে লাগিলে ভগবান্ নামিয়া আসিয়া পীতুকে কোলে করিয়া লইলেন। চুমা খাইলেন। কী সুন্দর যে দেখাইতেছিল ভগবানকে!... ভগবান্ যখন ভালবাসেন তখন আর প্রকাণ্ড থাকেন না, তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয় না। তখন তিনি খুব সুন্দর হইয়া যান। তখন, মা পূজার সময় যে-মালা পরান, ভগবানের গলায় সেই মালা দুলিতে থাকে। তাঁকে খুব আপনার লোক বলিয়া মনে হয়। একটুও ভয় করে না। পীতুর কিন্তু লজ্জা করিতেছিল। বিকালের গাড়ীতে পীতুর বাবা এক-এক দিন আসিয়া পীতুকে কোলে লইয়া যখন চুমা খায় তখন যেমন লজ্জা করে, সেই রকম লজ্জা। পীতু তো বড় হইয়াছে? ওদের ছোটখুকীর মত তো ছোট নয়,—লজ্জা করিবে না?

ছবি আবার প্রশ্ন করিল, "ভগবান পীতুকে কেন কোলে ক'রে নিলেন বল তো মেজকাকা।"

বলিলাম—"ভালবাসতেন ব'লে।"

নির্বুদ্ধির ক্রমাগত ভুল উত্তরে লোকে যেমন জালাতন হইয়া যায়, সেইভাবে ছবি ঈষৎ ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "আর কাদা লেগে যাবে না বুঝি পীতুর পায়ে? কিছু যদি জান তুমি!"

আমি প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "আর ভগবানের পায়ে কাদা লেগে গেল না? তিনি বুঝি বুট জুতো প'রে ছিলেন?"

ছবির হিউমারের দৃষ্টিটা বেশ প্রখর, হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর আবার গম্ভীর হইয়া, বিচক্ষণের মত মাথা দোলাইয়া একটু ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবানের পায়ে বুঝি কাদা লাগে? কি বুদ্ধি তোমার মেজকাকা!"

বলিলাম, "লাগে না বুঝি?"

ছবি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না"।

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "ভগবানের পায়ে কাদাও লাগে না, হাতে কালি লাগে না, সাবান মাখলে চোখ জ্বালা করে না, বিষ্টিতে ভিজলে সর্দ্দি করে না; ওরা সব যে ভগবানের চাকর, মশাই; পীতুর মা বলেছে; আর জান মেজকাকা?"

প্রশ্ন করিলাম, "কি?"

"ওল খেলে ভগবানের মুখ কুটকুট করে না, একটুও তেঁতুল খেতে হয় না।"

ভগবানের এই গূঢ় শক্তির আবিষ্ক্রিয়াটা নিশ্চয় ছবির নিজের, কেন-না আজ সকালে ওল খাইয়া তাহার নিজের নির্যাতন গিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "তাই নাকি? খুব সুবিধে তো ভগবানের! আচ্ছা তার পর ভগবান কি করলেন বল।"

ভগবানের বাড়ীতে অনেক চাকরাণী আছে। বুঝি মনে করিয়াছেন তাহারা আমাদের বাড়ীর 'বিদেশিয়া-কে-মা'-এর মত লম্বা, কালো এবং ময়লা

কাপড় পরা? না, তাহারা সব খুব সুন্দর; পীতুর মায়ের মুখে চাঁদের আলো পড়িলে যেমন সুন্দর দেখায়, সেই রকম। তাহাদের শাদা পায়রার মত বড় বড় ডানা আছে; পীতুদের ঘরে টাঙানো মেমসাহেবদের ছবিতে যেমন আছে না, সেই রকম। এক-এক দিন সকালবেলা পাহাড়ের ওদিকে ভগবানের বাড়ীর উপর যখন ছোট ছোট রাঙা রাঙা মেঘ করে, এরা মেঘের সিঁড়ি দিয়া, আলোর রাস্তা ধরিয়া, গান করিতে করিতে আকাশে উঠিয়া যায়। পীতু ভোরবেলা উঠিয়া যখন জানালা দিয়া মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে, ঘুমন্ত মায়ের আর খুকীর মুখে, আর ডানাওয়ালা মেমসাহেবদের ছবিতে আলো আসিয়া পড়ে, তখন অনেক বার ইহাদের দেখিয়াছে। পীতুর মা বলেন এদের পরী বলা হয়, পীতুদের খুকী মায়ের কোলে আসিবার আগে পরী ছিল।...পরীরা নরম ডানার মধ্যে করিয়া পীতুকে লইয়া গেল।—বেশ লাগে, মনে হয় ঠিক যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া হইতেছে আর মা আঁচলে করিয়া পীতুকে ঘিরিয়া আছে। পীতুর মাও নিশ্চয় আগে পরী ছিল, পীতুকে এমনি করিয়া ডানায় ঢাকিত, এখন যেমন রাঙা পাড়ের আঁচলে করিয়া ঢাকে।

তাহার পর সোনার জলের ঝরণায় নাওয়া। পীতুর মা যে বলে সেখানকার জলে স্নান করিলে সমস্ত পাপ ধুইয়া গিয়া আলোর শরীর হয় তাহা একটুও মিথ্যা নয়। দেখিতে দেখিতে পীতুও পরীদের মত হইয়া গেল। মেমেদের ছবিতে ডানা-বসানো খোকা সব হাতজোড় করিয়া আছে না?—সেই রকম। তখন কিন্তু তাহার মায়ের জন্ত বড় মন কেমন করিয়া উঠিল,—মা যদি চিনিতে না পারে! যদি মনে করে পীতু আসলে সত্যই তাহাদের ঘরের মেমসাহেবদের ছবির শাদা পাখাওয়ালা ছোট ছেলে; মিছামিছি পীতু হইয়া নামিয়া আসিয়াছে! তাহা হইলে কি হইবে?

না, পীতুর এসব ভাল লাগে না; ছেঁড়া কাপড় পরা ধ্রুবের মত সে মায়ের কাছেই থাকিবে। ভগবানের চেয়ে মা অনেক ভাল। আর পীতু না থাকিলে ভগবান্ তো বাঁচিয়া থাকেন, মা কিন্তু কোন মতেই বাঁচিবে না যে!

ভগবান্ সবার মনের কথা বুঝিতে পারেন মশাই! পীতুকে কোলে লইয়া চুমা খাইয়া তাহার মনের ভয় সরাইয়া দিলেন। পীতু মার কথা ভুলিয়া গেল। কত খাবার দিলেন। গোবিন্ হালুয়াইয়ের দোকানের চেয়ে আরও অনেক মিষ্টি খাবার। তাহার পর আরও কত কি দিলেন;—পীতুর বাবা, পূজার সময় টাকা ছিল না বলিয়া যে বড় জাপানী ডলটা কিনিয়া দিতে পারেন নাই, সেইটা; নেমন্তন্নর দিন ওদের বাড়ীর অজু যেমন জরি-বসানো জামা পরিয়াছিল, সেই রকম জামা; ইষ্টিশানের সাহেবদের বাগানের পোষা হাঁস;—পীতুর মনের কথা নিজে নিজেই জানিয়া সমস্ত দিলেন পীতুকে। আরও কত কি দিলেন, কত জায়গায় লইয়া গেলেন—কত রাঙা রাস্তার ওপর দিয়া—লতায় ফুলে ঢাকা কত বাড়ীর কাছ দিয়া—কত পাহাড়ের গা বাহিয়া, সাঁওতালরা যেমন করিয়া যায়—কত রাঙা, হলুদে, বেগুনে মেঘে পা ফেলিয়া—রামধনুর নীচে দিয়া কত জায়গায় লইয়া গেলেন। ভগবানের গায়ের আলোও পরীদের গায়ের রঙে কত সুন্দর হইয়া উঠিল...

বর্ণনায় হারিয়া ছবি বলিল, "সে তুমি বুঝবে না মেজকাকা, কক্ষনও দেখ নি কি না। পীতুর মা বলে বড়রা সে দেখতে পায় না। পীতুদের বাড়ীর জানালা দিয়া যে পাহাড় দেখা যায় তার ওধারে আছে সব। সেখানে যখন পাহাড়ের মাথায় রামধনু ওঠে, কি মেঘের মধ্যে মধ্যে চাঁদের রূপোর নৌকো ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলে, সে সময় পীতু দেখতে পায় ভগবানকে, পরীদের,—কত বাজনা-বাদ্যি ক'রে আগে-পিছে ভগবানের লোকেরা যাচ্ছে। পীতু সব দেখে; আমারও কতবার দেখিয়েছে মশাই, ওর মাকেও দেখিয়েছে। কিন্তু পীতুর মা দেখতে পায় না; পীতুর মা বলে—কেউ বড়রা দেখতে পায় না; ভগবান বড়দের ওপর রাগ করেন।"

ঐ সব রাস্তা দিয়া ভগবানের স্বর্গের বাড়ীতে যাওয়া যায়। যাইতে যাইতে পীতুরা কত দূর গেল,—মেঘের রাজ্য অতিক্রম করিয়া, রামধনুর ফটক পার হইয়া, কত উঁচুতে—রাত্রে যেখানে তারার জানালা খুলিয়া দিয়া

আকাশের ওদিক থেকে মেঘ-বধূরা দলে দলে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে—সেইখানে। সে-জায়গাটায় একটু ভয়-ভয় করে, কেন-না সেটা রাত্রির অন্ধকারের দেশ। এদিককার আলো কমিয়া কমিয়া সেইখানটায় শেষ হইয়াছে, আর উপর থেকে স্বর্গের আলোও পৌঁছায় নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পৃথিবীর হাজার হাজার দুষ্টু ছেলে যখন খেলাধুলা শেষ করিয়া আসিয়া মায়েদের দিদিদের ঘাড়ে পিঠে চড়িয়া দুরন্তপনা করে, সেই দেশ থেকে তখন অন্ধকার আস্তে আস্তে ভগবানের দেশের ওপরও কালো ডানার ছায়া ফেলিয়া নামিয়া আসে।… সেখানে পৌঁছিয়া পীতুর মায়ের জন্য বড্ড মন কেমন করিয়া উঠিল। চোখ নামাইয়া পীতু দেখিতে পাইল নীচে, অনেক—অনেক অনে—ক দূরে, তাহাদের থানবাদের ছোট্ট ঘরটিতে পীতুর মা খুকীকে সঙ্গে লইয়া ঘুমাইয়া আছে। ঘুমাইয়া থাকিলে মায়ের মুখে যে-হাসিটি লাগিয়া থাকে সেই হাসিটি এখান থেকে দেখা যায়। মায়ের শাড়ীর রাঙা পাড়, মায়ের পায়ের রাঙা আলতার ওপর দিয়া, গায়ের উপর দিয়া, মায়ের চুড়ি-পরা হাতের সঙ্গে খুকীকে জড়াইয়া, বুকের উপর দিয়া, কালো চুলের সঙ্গে মিশিয়া গেছে; ভোরের মেঘে যেমন সোনার পাড় বসানো থাকে না?—ঠিক সেই রকম। ঘরের এদিকটায় চাঁদের আলো, কিন্তু ও-পাশটায়—পীতু যেখানটায় নাই, সেইখানটায় চাঁদের আলো নাই। পীতু সমস্ত রাত মায়ের হাতটি বুকে লইয়া শোয়, যেখানে তাহার বুক ছিল হাতটি এখনও সেইখানে পড়িয়া আছে। পীতুর মা না-জানিয়া মনে করিতেছে তাহার হাত এখনও পীতুর গায়েই আছে, মনে করিতেছে ওটা বালিস নয়, পীতুর নরম বুক। তাই তাহার মুখে হাসি। পীতুকে বড্ড ভালবাসিত কি না;—ভগবানের চেয়েও।

পীতুর ভয়ানক মন কেমন করিয়া উঠিল। অন্ধকার পার হইয়া আবার যদি ফিরিয়া আসিতে না পারে! যদি ভগবানের স্বর্গের বাড়ী এত সুন্দর হয় যে মায়ের কথা একেবারেই মনে না পড়ে!—কলকাতায় একবার রতন-দিদির বাড়ীতে গিয়া যেমন একেবারে মনে পড়ে নাই!…মায়ের ঘুমন্ত মুখে এখন হাসি দেখা যাইতেছে; মা মনে করিতেছে পীতুর বুকে হাতটি রহিয়াছে, তাই। ঘুম ভাঙিলেই মা যখন দেখিবে পীতু নাই, যখন বুঝিবে পীতু তাহার অত করিয়া বাঁধা আঁচলের গেরো কাটিয়া, তাহার চোখের জলের নদী দিয়া, ভগবানের পাহাড়-ঘেরা বাড়ী পার হইয়া, অন্ধকারের দেশ পার হইয়া ভগবানের স্বর্গের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে—তখন!

ভয়ানক মন কেমন করিয়া উঠিল পীতুর। ভগবান্ তো মনের কথা টের পান? টের পাইয়া আগেকার মত ভুলাইয়া দেওয়ার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পীতু আর কিছুতেই ভুলিল না,—পীতুর বাবা একবার বাড়ী হইতে যাইবার সময় পীতুকে যেমন কোন মতেই ভুলাইতে পারে নাই, সেই রকম।…পরীরা কত বুঝাইল, আদর করিল, বলিল,—"অন্ধকারের ওপারে গিয়া তাহাকে ঝরিয়ার রাজার মত বাড়ী দিবে, গাড়ী দিবে, অজুর চেয়েও ভাল ভাল জামা দিবে; পীতুর কিন্তু সব জিনিষের চেয়ে মাকে ভাল লাগিতেছিল। তখন ভগবান্ আরও চেষ্টা করিলেন, আরও লোভ দেখাইলেন; বলিলেন—ধ্রুবকে যেমন ধ্রুবলোক করিয়া দিয়াছিলেন—আকাশের অনেক দূরে এখনও দেখা যায়—পীতুকেও সেই রকম আকাশের চেয়েও আরও উঁচুতে ধ্রুবলোক করিয়া দিবেন, আরও কত কথা সব…

পীতুর এক বার মনে হইল যাই, মার যদি কষ্ট হয়; খুকুকে কোলে লইয়া ভুলিবে। ভগবান এমন করিলেন যে পীতু একটুখানি ভুলিয়া গেল মাকে, এ—কটুখানি,—ঘুমাইবার সময় একটুখানি যেমন ভুলিয়া যায় মা লোকে?—সেই রকম। ঠিক সেই সময় হঠাৎ সে রাস্তার পাতলা অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিতে পাইল—অনেক নীচে, থানবাদের ঘরটিতে তাহার মা পাশ ফিরিতেই কাটা আঁচলটা কাপড়ের মধ্যে থেকে বাহির হইয়া পীতু যেখানটায় শুইয়াছিল সেইখানটা লুটাইয়া পড়িল। বাঁতি দিয়া কাটার দরুন পাড় হইতে সুতা বাহির হইয়া যেন রক্তের মত দেখাইতেছে।…মা

যদি এখনই উঠিয়া পড়ে! মুখের হাসি এখনও মুখে লাগিয়া আছে।

পীতু ভগবানের বুকে ছটফট করিয়া উঠিল। মা সে যাইবে না;—তাহার চাই না কিছু—চাই না ধ্রুবলোক। সে মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইবে। ভগবান বড় দুষ্টু, ভগবানের চেয়ে মা ঢের ভাল। মা তো রোজ ভগবানকে পূজা করে, সন্ধ্যার সময় তুলসী-তলায় প্রদীপ দেয়, সকালবেলায় স্নান করিয়া মাটির ভগবান গড়িয়া ফুলচন্দন চড়ায়। তবুও কেন পীতুকে মায়ের কাছে যাইতে দিতেছেন না? পীতু যাইবেই যাইবে। ভগবান যদি না ছাড়েন, ধ্রুব যেমন আগুনের মধ্য থেকে, বাঘেদের মধ্য থেকে ভগবানের তপস্যা করিয়াছিল, পীতুও ধ্রুবলোকে গিয়া মার জন্য সেই রকম তপস্যা করিয়া আবার সেখান থেকে মায়ের কাছে নামিয়া আসিবে। না; পীতুকে ভগবান জানেন না,—পীতু মাকে বড্ড ভালবাসে—ভগবানের চেয়েও—পরীদের চেয়েও—স্বর্গের চেয়েও…

বলিলাম, "ভগবান চ'টে গেলেন না ছবি?"

ছবি একটি স্বপ্নের মধ্যে ছিল যেন, মুখে একটি শান্ত করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু ভাবুকতার সঙ্গে, একটু ক্ষমার সঙ্গে, একটু আর একটা কি অনির্ব্বচনীয়তার সঙ্গে স্মিত হাস্যের সহিত ধীর কণ্ঠে বলিল, "না মেজকাকা, ভগবান যে বড্ড ভাল। পীতুকেও যেমন ভালবাসেন, ওর মাকেও সেই রকম ভালবাসেন কি না। আর উপরে গেলেন না। আর অন্ধকারও রইল না। পীতুকে কত চুমু খেলেন, কত আদর ক'রে কত সব কথা বললেন, পরীরাও কত চুমু খেলে, কত গালে হাত বুলিয়ে বললে—তোমার মায়ের কাছেই এবার থেকে তোমার জন্যে ভগবান থাকবেন পীতু; সেইখানেই তোমার জন্যে ধ্রুবলোক গড়ে দেবেন।…তার পর আবার কত আলোর মধ্য দিয়ে, কত বাজনাবাদ্যির মধ্য দিয়ে, চাঁদের নৌকা ক'রে নদী বেয়ে পীতুকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। হ্যাঁ মশাই, নিয়ে এলেন নামিয়ে, না-হ'লে পীতু যখন উঠল, কি ক'রে দেখলে ঠিক যেমন ক'রে মায়ের হাত বুকে নিয়ে শুয়েছিল, সেই রকম ক'রেই রয়েছে!…আর মেজকাকা, কি আশ্চর্য্য জান?"

প্রশ্ন করিলাম—"কি?"

"আঁচল যে কেটে পীতু চলে গিয়েছিল কি না!—উঠে দেখলে একটুও কাটা নেই। ভগবান যদি আসেন নি তো কে জুড়ে দিয়ে গেল মেজকাকা? তুমি পার? আর পীতু দেখলেও যে নিজে। যখন চোখ খুললে না! দেখলে ভগবানের পাহাড়ের বাড়ীর উপরে নূতন সূয্যির আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে—কত গান হচ্ছে—মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে; আর রাঙা মেঘ দিয়ে গড়া সোনার সিঁড়ি বেয়ে ভগবান, তাঁর পরীরা আর সোনার পোষাক প'রে বাজনা বাজিয়ে যারা সঙ্গে এসেছিল—সব ফিরে যাচ্ছে…হ্যাঁ, দেখলে পীতু মেজকাকা; তখন তার একটু মনও কেমন করেছিল—মনে হচ্ছিল, ভগবান এত ভাল, এত লক্ষ্মী; কিন্তু পরীরা যে বললে পীতুর মায়ের কাছে থাকবেন সর্ব্বদা—যদি ভুলে গিয়ে না-থাকেন কোন দিন!…"

ভ্রম-সংশোধন

গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে ৭৩৬ পৃষ্ঠায় "বঙ্গের বাহিরে কৃতী বাঙালী ছাত্রছাত্রী"দের তালিকায়, শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ স্থানে শ্রীদিলীপকুমার ভট্টাচার্য্য পড়িতে হইবে। শ্রীযুক্তা পারুল চৌধুরী আমাদিগকে এই সংশোধিত সংবাদটি জানাইয়াছেন।

কবিত্বের একটি সূত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

পল ভালেরী বলছেন, কবিরা কানে কথা বলে আর মুখে কথা শোনে।* কবির কবিত্ব যে একটা ইন্দ্রজাল তা আমরা সকলেই জানি ও মানি, কিন্তু তাই ব'লে ও জিনিষ কি এই রকমের একেবারে উল্টাপাল্টা আজগুবি ব্যাপার?

পল ভালেরী আধুনিক কালের এক জন খ্যাতনামা ফরাসী কবি ও মনীষী। তাঁর বৈশিষ্ট্য হ'ল কঠোর চিন্তাশীলতা, প্রখর যুক্তিপ্রিয়তা। তাঁর কবিতা পর্য্যন্ত দারুণ চিন্তাভারগ্রস্ত—দার্শনিক তত্ত্বে, তর্কবুদ্ধিগত জিজ্ঞাসায় সিদ্ধান্তে কণ্টকিত। কথাটি অনেকখানি সত্য—তবু সবটা নয়। ফরাসী চিন্তাশীলতার সর্ব্বদাই সংযুক্ত চিত্তের অনুভববৈদগ্ধ্য, সুকুমার স্পর্শালুতা। চিন্তায় যার থই পাই না, চিত্তের পিছন-দুয়ার দিয়ে তা এখানে সহজে এসে ধরা দেয়। ভালেরীর বেলাতেও তাই ঘটেছে দেখি। তিনি বিশ্বাস করেন না অর্থাৎ তাঁর মস্তিষ্কগত যুক্তি প্রমাণ পায় না যে কবিতার প্রেরণা একটা অতিলৌকিক জগতের কিছু ব্যাপার—তিনি মনে করেন কাব্যের উত্থান ও স্থিতি এবং লয় সবই মস্তিষ্কের সীমানার মধ্যে। অথচ তাঁর কাব্যে বস্তুতঃ অনেক ইঙ্গিত আভাস পাওয়া যায় মস্তিষ্কাতীতের—যদিও ও জিনিষটিকে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন চেপে দাবিয়ে পিছনে টেনে রাখতে।

ভালেরী কবিত্বের যে সূত্র দিয়েছেন তাতেই প্রমাণ তিনি আসলে সকল কবির মতই, চিন্তাপন্থী নন, চিত্তপন্থী—সূক্ষ্ম-নিগূঢ়-চিত্তপন্থী। দেখা যাক তবে তাঁর মন্ত্রটির বোধগম্য অর্থ কিছু হয় কি না। কবিতা দুটি অঙ্গ নিয়ে। কবিতা হ'ল কথার ব্যাপার—কথা গেঁথে গেঁথেই কবিতা। আর কথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে অনিবার্য্য ভাবে জড়িত সম্বন্ধ দুটি বৃত্তি দুটি ইন্দ্রিয়—সুতরাং কবিতা, কবিতার আকার ও প্রকার নির্ভর করে এই দুটিরই উপর—তা হ'ল শ্রবণ ও ভাষণ, কান ও মুখ। কবি কথা বলেন আর শ্রোতারা শোনেন, এটি স্থূল শ্রম-বিভাগ। কবি নিজে-নিজেই কথা বলেন ও কথা শোনেন। প্রথমতঃ তিনি স্থূল মুখে বলেন ও স্থূল কানে শুনে রচনার সৌষ্ঠব বিচার বা অনুভব করেন। দ্বিতীয়ত স্থূল মুখ ফুটে বলবার আগে তিনি কথা শুনে থাকেন দিব্য কর্ণে। আবার এমনও বলা যেতে পারে আগে হয় দিব্য উক্তি—সূক্ষ্ম ভাষণ, অশরীরী বাণী, কবি তাই কান পেতে শোনেন। তবে আসলে ও-দুটি বৃত্তি—সূক্ষ্ম হোক আর স্থূল হোক—যুগপৎ চলে, এবং উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভর করে।

স্থূল মুখে কথা বলা ও স্থূল কর্ণে শোনা, এ হ'ল সাধারণ মানবের প্রাকৃত লৌকিক ধর্ম্ম—এ ব্যাপারের মধ্যে চমৎকারিত্ব কিছু নেই। কবি কথা বলেন ও কথা শোনেন সূক্ষ্ম কণ্ঠ ও সূক্ষ্ম শ্রবণ দিয়ে। এটুকু সহজে স্বীকার করা যায়—কিন্তু ভালেরী তাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি বলছেন জিনিষ কেবল সূক্ষ্ম হ'লে চলবে না। জিনিষের মধ্যে চাই একটা বিপর্য্যয় বৈপরীত্য—তবে না তা কবিত্বের পদবীতে উঠে দাঁড়াতে পারে। অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়াতীত হওয়া নয়, প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে—"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর" এই রকম একটা কিছু। কবিচেতনার এই যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাতেই জন্মে কবিত্বের ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক।

এমন এক চেতনা আছে যেখানে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এক হয়ে মিশে আছে। ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে যে পার্থক্য যে বৈশিষ্ট্য তা বাহ্য স্থূল চেতনার কথা—যত অন্তরে ও সূক্ষ্মে চলে যাই তত দেখি ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে একান্ত পার্থক্য আর নেই। সেই স্তরের অনুভূতি নিয়ে মুখ সহজেই

---

* Dans le poete
L'oreille parle,
La bouche ecoute···—Paul Valery

শুনতে পারে, কানও বলতে পারে কথা। উপনিষদ্ ঐ জিনিষটিকেই লক্ষ্য ক'রে বলেছে "যৎ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ"। তাই ত আমাদের ঋষিদের বলা হয় মন্ত্রশ্রোতা নয়, মন্ত্রদ্রষ্টা। আর ঠিক এখানে চেতনার যে একটা বিপর্য্যয় ঘটে যায় তাকেই ইঙ্গিত করে শ্রুতি বলছে বৃক্ষের মূল রয়েছে উর্দ্ধে আর তার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত নীচের দিকে।

তবে অবশ্য উপনিষদ যে ব্রাহ্মী চেতনা তাকেই কবি-চেতনা ব'লে গ্রহণ করলে ভুল হবে। আদিতে কবি কথাটির ঐ অর্থই ছিল এবং কবির ধর্ম্মও ছিল তাই। কিন্তু সে ছিল সত্যযুগে—অর্ব্বাচীন যুগে কবির সংজ্ঞা অনেকখানি লৌকিক ও লোকায়ত হয়ে গিয়েছে। অন্য কথায়, কবি তাঁর ব্রাহ্মী স্থিতি হ'তে অনেকখানি নেমে এসেছেন, কিন্তু তখনও বজায় রেখেছেন এই ইন্দ্রজাল-শক্তিটি—বস্তুর উর্দ্ধতম উৎসে তিনি একান্ত যদি নাই যেতে পারেন তবুও তিনি অন্ততঃ প্রবেশ করতে পারেন তির্য্যক্‌ভাবে এমন একটা প্রচ্ছন্ন লোকে যেখানে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের মূল আদি একত্ব তখনও দেখা না দিলেও সেখানে আছে তাদের মধ্যে একটা ঐক্য, নিবিড় সংযোগ ও মুক্ত গতায়াত—এবং এই হেতু এখানে সম্ভব ইন্দ্রিয়ের বিপরীত ব্যবহার। কবির কথা তাই কেবল ধ্বনি বা শব্দতরঙ্গ নয়, তাতে আছে সত্য-সত্যই রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ পর্য্যন্ত। কবির কথা এই জন্যেই প্রাণহীন জড় বর্ণসমাহার মাত্র নয়—তা জীবন্ত, যেন রক্তমাংসে গড়া দেহটি।* কবির কথা, কথার ধ্বনি কেবল কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে না, মরমে পশিবার সঙ্গে সঙ্গে বা আগেই কেমন চারিয়ে যায় সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে—সকল ইন্দ্রিয়ই সাড়া দিয়ে ওঠে—তাদের আপন আপন ভোগ্য পেয়ে।

যা হোক, বলছিলাম ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-বিপর্য্যয়ের কথা। এক হিসাবে কাব্যের ও গদ্যের পার্থক্যটি এই সূত্র দিয়ে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। গদ্যের ছন্দ ও রূপ হ'ল সহজ জীবনের, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধারার অর্থাৎ কানে শোনা ও মুখে বলার ছন্দ ও রূপ। এই নিত্যনৈমিত্তিক গতির ছাঁচ ও ঢঙ যত মার্জ্জিত সুকুমার সুললিত হোক না তা থেকে যাবে গদ্যের পর্য্যায়ে—গদ্য পদ্য বা পদ্য পর্য্যন্ত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু হবে না কাব্য। কাব্যের আবির্ভাব ঠিক তখনই যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তির এই বৈপরীত্য ঘটেছে—কানে আর শোনে, কানে কথা বলে, মুখে আর কথা বলে না, মুখে কথা শোনে।

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।—

সুললিত অনুপ্রাসাদি সত্ত্বেও এ গদ্যধর্ম্মী, তবে কিছু মাজাঘষা সাজান-গোছান, এই যা পার্থক্য। কিন্তু

ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া—

এখানে রয়েছে ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিপর্য্যয়। তবে এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে বিপর্য্যয়ের ফল এমন নয় যা কেবল হেঁয়ালি বা প্রলাপ। বিপর্য্যয়ের আসল অর্থ এই, কথার ধ্বনির পিছনে সূক্ষ্ম অনুরণন প্রসারিত হয়ে গিয়েছে এমন একটা লোকে—মুখর মুখ যেখানে মূক স্তব্ধ হয়ে শুনছে শুধু, আর শ্রবণ বাহ্যস্পর্শের অবশ প্রতিলিপি মাত্র শ্রোতা মাত্র না হয়ে, হয়ে উঠেছে বক্তা, সেই ভিতরকে বাহিরে ফুটিয়ে ধরেছে—কানের ও মুখের এই রকমের একটা ধর্ম্মান্তর রূপান্তর হয়েছে। অবশ্য আধুনিক এক শ্রেণীর কবি ঠিক এই কথাই বলতে, এই কাজই করতে চেয়েছেন যে বাক্য যতক্ষণ sense ছেড়ে nonsense না হয়ে উঠছে ততক্ষণ কাব্য হয় নাই। এ রকমটি ঘটে ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হয়ে যথেষ্ট গভীরে যদি না চ'লে গিয়ে থাকে—সেই গভীরের আগে অবধি, একটা স্বপ্নময় জগতে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির যদি অদল-বদল ঘটে তবে তাতে এনে দেয় কেবল ব্যামিশ্রতা, নিরর্থকতা—প্রলাপ, সংলাপ নয়।

সত্যকার বিপর্য্যয়ের ফল উদ্ভট হয় না, হয় চমৎকারী। তবে এই বিপর্য্যয়ের নানা পর্য্যায়—শ্রেণী স্তর ক্রম থাকতে

* ফরাসী কবি Rimbaud তাই প্রত্যেক স্বরবর্ণের দিয়েছেন এক একটি রং—এক একটি ধ্যানমূর্ত্তি—A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles!

পারে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, কাঠামো থেকে অন্তরাত্মায়। বিদ্যাপতির যে চরণ উপরে উদ্ধৃত করেছি তাতে বিপর্য্যয়ের লক্ষণ কাঠামোতে ধরা কিছু দেয় নি—কাঠামো ঠিক সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুগতই রয়ে গেছে। কিন্তু শুনুন রবীন্দ্রনাথের—

তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

এখানে যে চমৎকারের অনুভব হয় তার মূল কারণটি এই নয় কি যে এখানে কবির কি যাদুর ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আর পৃথক্ নয়, সব গ'লে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে (দুরন্ত বরষা কালের মত!) এবং একটা অখণ্ড ইন্দ্রিয়-সমবায়ে ঘটেছে অপ্রত্যাশিত সংযোগ সমন্বয়?

বাস্তবঃ বিপর্য্যয় আরও স্পষ্ট হয়েছে অনেক আধুনিকের মধ্যে—আধুনিকতার প্রধান একটি লক্ষণ এই। শুনুন আমাদের এক আধুনিককে তবে—

সে এক স্বপন আঁখি
নৈঃশব্দ্যের দীপ্তরেণু মাখি
প্রথম প্রভাতে
আলোকের ধ্যানময় স্বর্গভৃঙ্গ সাথে
কানে কানে
ধরণীরে শুনাইল কি যে বাণী মধুমাখা গানে
সেই হতে অজানা সঙ্গীত
আঁধার সাগরে স্ফুজে কুসুম লোহিত।

ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যে অদল-বদল ঠিক নয়, তবে একটা অনুরূপ ব্যাপারের উল্লেখ কোলরিজ ক'রে গিয়েছেন তাঁর "ইমাজিনেশন" ও "ফ্যান্‌সি"র সুবিখ্যাত তুলনায়। দেশে কালে অন্তরিত, বিষয়ের হিসাবে অসম্বদ্ধ বস্তুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা, নূতন নূতন ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করা, অভিনব একত্ব ব্যক্ত করা যে-বৃত্তির সহজ ধর্ম্ম তাকেই কোলরিজ নাম দিয়েছিলেন "ইমাজিনেশন", কবি-কল্পনা। আর যে-বৃত্তির সে ক্ষমতা নেই, যে চলে ধাপে ধাপে ক্রমে ক্রমে একটির সঙ্গে তার সন্নিহিত বস্তুটি যোগ ক'রে ক'রে, যার মধ্যে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত কিছু নেই, তারই নাম "ফ্যান্‌সি"। আমরা প্রায় বলতে পারি এই শেষোক্ত বৃত্তিটি হ'ল পদ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী হ'ল "ইমাজিনেশন"। কবি যে অভূতপূর্ব্ব যোগাযোগ সব সাধন করতে পারেন, তার কারণ আমরা বলেছি তাঁর চেতনা, তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতি একটা অখণ্ড ব্যাপক বৃত্তি—একান্ত স্থূলের মধ্যে রূঢ়ের মধ্যে এসে পড়ে জমাট কঠিন ব্যষ্টিধর্মী হয়ে পড়ে নি, তার আছে নিভৃতের সূক্ষ্মের তারল্য ও সাধারণ গুণ। সেখানে অভিনব যোগ এবং অভিনব অযোগ (বৈপরীত্য ও বিপর্য্যয়) স্বাভাবিক—এই গুণেই সেই চেতনার পরিচয় এবং সেই চেতনাসৃষ্ট কাব্যের চমৎকারিত্ব।

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই অদল-বদলের জন্যই আর একটি ব্যাপার আমরা শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সহজেই লক্ষ্য ক'রে থাকি। শিল্পে শিল্পে যে মেশামিশি হয়—যেমন কাব্যের মধ্যে, কথার গড়ন চলনের মধ্যে কখন দেখি সঙ্গীতের প্রভাব, কখন চিত্রের কখন ভাস্কর্য্যের কখন বা স্থাপত্যের—তার হেতুও ঠিক এইখানে। শেলী-ভেরলেন সঙ্গীতময়, গোতিয়ে (আমাদের কালিদাসও) চিত্রময়—রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতময় চিত্রময় উভয়ই—যোদেনের কথায় ভাস্কর, মিলতন-ভর্জ্জিল স্থপতি।

আরও আমরা দেখতে পারি কাব্যের ইতিহাসে যুগে যুগে যে যুগান্তর বা নবজন্ম হয়েছে তা ঘটেছে নিভৃত চেতনার এই বিপর্য্যয়-পটীয়সী বৃত্তিটির নব আবির্ভাবের ফলে, এবং এই বিপর্য্যয় যত সূক্ষ্ম, গভীরতর হয়েছে—নবসৃষ্টিও তত চমৎকার হয়েছে। ইউরোপে রেণা-সেন্সের যুগ, তার পর রোমান্টিক যুগ, তার পর ইম্‌প্রেশনিজম্-এর যুগ এবং শেষে আধুনিক যুগের প্রচেষ্টা, কয়েকটি যুগান্তরের ক্রম। আমাদের দেশেও এই ধরণের ক্রম নির্দ্দেশ করা যায়—মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক উদ্যোগ।

পৃথিবীর ক্রমপরিণতি

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল, এম. এস্‌সি.

আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হইলেও একথা সত্য যে অল্প কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের পৃথিবী অপেক্ষা সুদূর নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বেশী ছিল। তাহার এক কারণ, পৃথিবীর অন্তর্দ্দেশের পরিচয় লইবার কোন প্রশস্ত উপায় পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্প্রতি ভূকম্প-বিদ্যা নামক নূতন বিজ্ঞানের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে গর্ত্ত খনন করিয়া যত দূর ভিতরের তথ্য অবগত হওয়া যায় তাহা অপেক্ষা বহুগুণ গভীর প্রদেশের সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতেছে। মানুষ ভূগর্ভে অল্পদূর মাত্র প্রবেশ করিতে পারে। ভূকম্পজাত তরঙ্গ পৃথিবীর কেন্দ্রদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া সেখানকার সংবাদ লইয়া আসে। পৃথিবীর অন্তর্দ্দেশের গঠন সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে তাহার আদিম জীবনের অনেক কথা অনুমান করা যায়। বিংশ শতাব্দীতে ভূমধ্যস্থ রেডিয়াম ও রেডিয়াম-ধর্ম্মী অন্যান্য পদার্থ পৃথিবীর জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইবার পক্ষে আরও এক নূতন সন্ধান দিয়াছে। আদিম পৃথিবী যুগে যুগে আপনাকে যে আবরণে আচ্ছাদিত করিয়াছে তাহাতে তাহার পরিণত জীবনের ইতিহাস লিখিত আছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ক্রমে সেই লিপির উদ্ধারসাধন সম্পূর্ণতর ও তাহার অর্থ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের গবেষকগণের সমবেত চেষ্টার ফলে পৃথিবীর ক্রমপরিণতির মোটামুটি আভাস বর্ত্তমানে লাভ করা যায়।

এক হাজার কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী যে সূর্য্যের দেহে মিশিয়াছিল, কোন সুবৃহৎ নক্ষত্র এক সময় উহার কাছাকাছি আসিয়া পড়িলে তাহার আকর্ষণে সৌরদেহ ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহাতেই পৃথিবীর উৎপত্তি—বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে প্রায় একমত। জন্মের সময় পৃথিবীর বাষ্পীয় রূপ ছিল। মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যে নবজাত পৃথিবী তাপের নাশহেতু তরল আকার ধারণ করে। ঐ সময়ে উদ্বায়ী পার্থিব উপাদানসকল বায়ুমণ্ডল গঠন করে এবং তাহা তরল পৃথিবীকে ঘিরিয়া থাকে। আরও শীতল হইলে পৃথিবীর দেহ কঠিন হয়; বাহিরের দিকে কঠিন আবরণ গঠিত হইতে কয়েক হাজার বৎসরের বেশী সময় লাগে নাই। অল্প দিনের মধ্যে ঐ আবরণ প্রায় বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় শীতল হইয়া পড়ে। সেই যুগ হইতে এ-পর্য্যন্ত সৌর রশ্মিই ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বজায় রাখিয়াছে। পৃথিবীর উৎপত্তির কয়েক বৎসরের মধ্যে চন্দ্রেরও জন্ম হয়। পৃথিবী তরল হইয়া যাইবার পর উহার দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে এমনও হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে চন্দ্রের বয়স পৃথিবী অপেক্ষা কয়েক সহস্র বৎসর কম হইবে। মোটের উপর, পৃথিবীর উৎপত্তি, চন্দ্রের জন্ম ও ভূপৃষ্ঠের শীতলতাপ্রাপ্তি—এই তিন ঘটনার মধ্যে কয়েক হাজার বৎসরের বেশী ব্যবধান ছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ দেখা যায় না।

নূতন পৃথিবী কেমন ভাবে জমাট বাঁধে, কোন্ অবস্থায় কি ভাবে উহার উপরিভাগে পর্ব্বতাদি গড়িয়া উঠে, কিরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিবার পর পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ জীবজন্মের উপযোগী হয়—এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা আধুনিক যুগে প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। তরল পৃথিবীর প্রজ্বলন্ত উপাদানের উপর প্রথম প্রস্তর যে একবারে দানা বাঁধে নাই ইহাই সম্ভব। নিম্নের তরল পদার্থের মধ্যে বহুবার গলিয়া পড়িয়া তবে আদি শিলাস্তর গঠিত হয়। নিম্নদেশ ক্রমে শীতল এবং সেই নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া গেলে তাহার উপর ভর করিবার জন্য উক্ত শিলাস্তরকে নানা ভাবে বাঁকিয়া গুটাইয়া যাইতে হয়। ১ নং চিত্রে ভূমধ্যস্থ শিলাস্তর-বিশেষের কুঞ্চিত অবস্থা দেখা যাইবে। পৃথিবীর আদি শিলাস্তরসমূহ এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।



১। কেরেরা দ্বীপের শিলাফলক। প্রস্তরের কুঞ্চিত অবস্থা চিত্রে দেখা যাইতেছে।



২। ৪০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রের উপকূলভাগের এক আগ্নেয়গিরি হইতে লাভাস্রোত জলে পড়িবামাত্র এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। উহা এখনও একই অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

উহার উর্দ্ধদেশ হইতে পর্ব্বতশ্রেণী এবং নিম্নাংশসমূহ হইতে উপত্যকা ও সমুদ্রতল গঠিত হইয়াছে। উক্তরূপ প্রাকৃতিক ক্রিয়া একবারে থামিয়া যায় নাই। ধরাপৃষ্ঠ বরাবরই ঐ ভাবে কিছু কিছু নড়িয়া থাকে। সুতরাং পৃথিবীর পক্ষে সকল সময়েই পর্ব্বত ও উপত্যকা গঠনের সম্ভাবনা আছে। কোন ভূভাগ হঠাৎ ভাঙিয়া পড়িলে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ ভাঙ্গনের স্থান হইতে তরঙ্গ বাহির হইয়া পৃথিবীর সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে। পতনশীল ভূখণ্ডের চাপ ধীরভাবে পড়িলে ভিতরের উত্তপ্ত উপাদান আগ্নেয়গিরি, তৈলখনি ও উষ্ণ-প্রস্রবণের মুখে বাহির হইয়া থাকে। প্রথম যুগে এইরূপ ক্রিয়া সদাসর্ব্বদা প্রচণ্ড বেগে চলিয়াছিল। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার উপর সেই সমুদয় ঘটনার ছাপ আছে।

আগ্নেয়গিরি এখন আর পৃথিবীতে বেশী নাই বটে, তবে বহুসংখ্যক পর্ব্বত যে এক সময়ে অগ্নি উদ্গার করিত সর্ব্বত্র তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যুগ যুগ পূর্ব্বে গলিত প্রস্তর ও গলিত ধাতুর বিরাট্ প্রবাহ পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়াছিল। সেই সকল দিনের 'আগ্নেয়' প্রস্তররাশি ধরাপৃষ্ঠের বহু স্থানে এখনও ছড়াইয়া আছে; ৪০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলস্থ কোন গিরি-নির্ঝর জলে পড়িবামাত্র জমিয়া কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল ২ নং চিত্রে তাহা দেখান হইল। বরাবর উহা এক অবস্থায় আছে। অনুসন্ধানে পৃথিবীর অন্তর্দ্দেশের উপাদানের উক্তরূপ নমুনা আরও মিলিয়াছে; ভূগর্ভে আবদ্ধ জল ও বাষ্প সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডল গঠনে সহায়তা করিয়া থাকিবে।

পৃথিবীর আদি শিলাস্তরের উপরে প্রথমে কোন সমুদ্র গঠিত হইতে পারে নাই। উর্দ্ধদেশে ঘন মেঘ ছিল বটে, কিন্তু উহা হইতে উষ্ণ জল বৃষ্টি হইবামাত্র উত্তপ্ত শিলার স্পর্শে বাষ্পে পরিণত হইত এবং বায়ুর সহিত মিশিয়া উপরে উঠিয়া যাইত। শিলাতলের উষ্ণতা কমিয়া গেলে নিম্নপ্রদেশসমূহে বৃষ্টির জল জমা হইতে থাকে এবং সমুদ্র, হ্রদ প্রভৃতি গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। আদিম পৃথিবীর নদীগুলি প্রস্তরভূমির উপর দিয়া সমুদ্রের দিকে চলিবার কালে প্রচুর পরিমাণে চূর্ণ প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া যাইত। চূর্ণ শিলার বালি মাটির দ্বারাই প্রথম পলি-স্তরের গঠন। ঐ স্তরকে আবৃত করিয়া প্রতি যুগে নূতন পলি-স্তর একটির উপরে একটি পড়িয়া উঠিয়াছে। জলবায়ুর অবিরাম ক্রিয়ায় পর্ব্বত-গাত্র হইতে প্রস্তরখণ্ড খসিয়া পড়িয়া উহার পাদদেশে



৩। কাম্বারল্যাণ্ডের পাহাড়ের পাদদেশে সঞ্চিত প্রস্তররাশি

কি ভাবে স্তূপীকৃত হয় ৩ নং চিত্র হইতে তাহার ধারণা করা যাইবে। পরে ঐগুলি ঝরণা-স্রোতে সমুদ্রের দিকে চালিত হয়। চিরদিন ধরিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ভাবে এক দিকে পর্ব্বতের ক্ষয় হওয়ায় তাহা নীচু হইতেছে এবং অন্য দিকে তলানি জমায় সমুদ্রতল উচ্চতা প্রাপ্ত হইতেছে। উপরিউক্ত কারণে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের দরুন পৃথিবীপৃষ্ঠের উন্নয়ন ও অবনমন-কার্য্য বরাবর ঘটিয়া চলিয়াছে। এক দিন গভীর সমুদ্রের তলদেশ ছিল, শেষে ডাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে কিংবা স্থল-ভাগ সমুদ্রগর্ভে একবারে তলাইয়া গিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে বিরল নয়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত গ্রীক দার্শনিক জেনোফেন্স উচ্চভূমিতে সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ লক্ষ্য করিয়া সে-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতেও সমগ্র মহাদেশ সমুদ্রের নীচে চলিয়া যাইতে পারে অথবা নূতন ভূভাগ জলের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিতে পারে।

প্রস্তরীভূত পলি-স্তরসমূহের মধ্যে পৃথিবীর পরিণত জীবনের ইতিহাস মিলিয়া থাকে বলিয়া পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রস্তরের বিশ্লেষণ, উহার উপর অঙ্কিত নানা প্রকার চিহ্ন এবং উদ্ভিদ ও জীবের শিলীভূত দেহাবশেষ হইতে ঐ ইতিহাস উদ্ধার করা হয়। প্রস্তর-লিপির পরীক্ষার দ্বারা পৃথিবীর জীবনেতিহাস রচনা করা অবশ্য সহজ কার্য্য নয়। মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে প্রস্তর-লিপির প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভূত হয় এবং উহার সম্বন্ধে যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলিতে থাকে। ৪ নং ও ৫ নং চিত্রে পৃথিবীর পলিস্তরের সজ্জা লক্ষ্য করা যাইবে। অনেক স্থলেই স্তরসমূহের ওলট-পালট ও বিচ্যুতি এবং প্রস্তরের বিকৃতি ঘটিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞেরা অসীম ধৈর্য্যের ফলে ঐ সমুদয় হইতে ভিন্ন ভিন্ন যুগে পৃথিবীর অবস্থা ও তাহার উদ্ভিদ ও জীবকুলের স্বরূপ অবগত হইতে পারিতেছেন।

ভূমধ্যস্থ আদি পলিস্তরের প্রস্তর প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় কোন কোন স্থানে উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব-কানাডায় এইরূপ বহুসংখ্যক প্রস্তরখণ্ডের রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, প্রস্তরখণ্ডগুলি ১২৩ কোটি বৎসর পূর্ব্বে জমাট বাঁধিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আরও কিছু পুরাতন প্রস্তরের সন্ধান মিলিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর বয়স যে এক শত পঞ্চাশ কোটি বৎসরের কম হইবে না ইহা নিশ্চিত। পৃথিবী ইহা অপেক্ষা খুব বেশী প্রাচীনও হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে পৃথিবীতে রেডিয়ামের অস্তিত্ব থাকিত না, উহা নিঃশেষে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে অনুমান হয় যে পৃথিবীর বয়স ৩৪০ কোটি বৎসরের বেশী নয়, সম্ভবতঃ অনেক কম। মোটামুটি-ভাবে উহার জীবনকাল দুই শত কোটি বৎসর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন ধরণের কয়েক দিকের গবেষণা হইতে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে—সেকথা স্মরণযোগ্য।

পূর্ব্বোক্ত ১২৩ কোটি বৎসর পূর্ব্বেকার শিলাস্তরে জীবনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে উহার মধ্যে সামান্য কিছু কার্ব্বণ পাওয়া যায় দেখিয়া কোন কোন ভূতত্ত্ববিৎ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী শিলাস্তরে প্রাণের প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় মিলিয়া থাকে প্রায় এক শত কোটি বৎসর পূর্ব্বে জীবনের অতি নিম্নস্তরে



৪। পর্ব্বতবিশেষে গঠিত চূণা পাথরের কতকগুলি স্তর

থাকিয়া যে জীব ও উদ্ভিদ শিলাতলে দাগ রাখিয়া গিয়াছে সূক্ষ্মভাবে কাটা স্বচ্ছ প্রস্তরের ফটোগ্রাফ হইতে তাহাদের সহজ সরল জীবনের কথা জানা যায়। ৬ নং চিত্রটি এইরূপ প্রাচীনতম দেহাবশেষের পরিবর্দ্ধিত ফটোগ্রাফ। রেডিওলেরিয়ান নামক এক প্রকার অতিক্ষুদ্র জীবের পরিচয়ও ঐ যুগের প্রস্তরে মিলিয়া থাকে। ৭ নং চিত্রে উহাদের নানা প্রকার কঙ্কাল দেখা যাইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া উপরিউক্ত ক্ষুদ্র জীবসমূহই কেবল পৃথিবীতে বাস করিত।

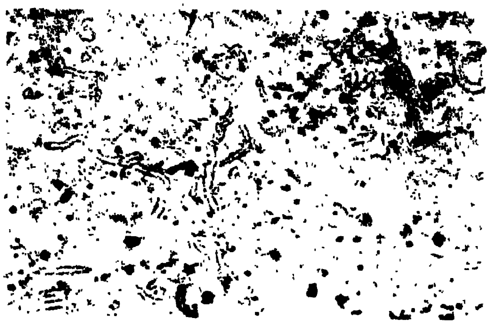
জীবনের সূচনা পৃথিবীতে কেমন ভাবে হইল তাহা অবশ্য জানা যায় না। তবে বৈজ্ঞানিকেরা এ-বিষয়ে একমত যে উষ্ণ জলেই তাহার প্রথম সূত্রপাত হয় এবং যে অবস্থার মধ্যে উহা আরম্ভ হয় পৃথিবীর কোন স্থানেই এখন সেই অবস্থা বর্ত্তমান নাই। জীবনের প্রারম্ভে আকাশ সকল সময়ে ঘন মেঘে আবৃত থাকিত এবং প্রবল ঝড় সমগ্র পৃথিবীকে দিবারাত্র আলোড়িত করিত। মেরুপ্রদেশে এখনও কতকটা সেইরূপ আদিম অবস্থা বর্ত্তমান। সেই যুগে সমস্ত ভূভাগ মরুময় ছিল এবং ভিতর হইতে প্রাপ্ত চাপে উহা ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিত। উত্তপ্ত জলের প্রবাহও যেখান সেখান দিয়া বহিয়া যাইত। সমুদ্র তখন লবণাক্ত ছিল না অথবা এখনকার মত গভীরও হয় নাই। এই অবস্থায় সমুদ্রতটের কাছে কাছে,



৫। কলোরেডো নদের উত্তর ভাগের খাদ। ইহাতে পলিমাটির দ্বারা গঠিত আদিযুগের বহু শিলাস্তর পর পর কেমন ভাবে সজ্জিত আছে, উপরের চিত্র হইতে তাহা অনুমান করা যাইবে।

সূর্য্যালোকিত অগভীর জলে যে আদি-জীব জন্মগ্রহণ করে তাহা কোমল দেহবিশিষ্ট এবং প্রকৃতিতে প্রায় জড়ের মত ছিল। জীবনের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন উহার মধ্যে অতি ধীরে প্রকাশ পাইতে থাকে। জীবাণু-সদৃশ এক প্রকার সরল উদ্ভিদও একই কালে সমুদ্রে দেখা দিয়াছিল এবং জলের মধ্যে থাকিয়াই বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

আরও বহুকাল কাটিয়া গেলে তবে ধরাপৃষ্ঠে জীবনের জটিলতা ও প্রাচুর্য্য আসে। পেলিওজোয়িক যুগের প্রস্তরে আদি-জীবের যে প্রকার দেহাবশেষ পাওয়া যায় ৮ নং চিত্রে তাহা দেখান হইল। চল্লিশ-পঞ্চাশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে এই যুগ আরম্ভ হয়। উহার প্রথম ভাগে নানা প্রকার ঝিনুক, কাঁকড়া, কীটাদি জলাশয়ে সাঁতার দিয়া বেড়াইত। ঐ সমুদয় আদি-জীব কোন দিন জল ছাড়িয়া তীরে উঠে নাই। সামুদ্রিক বিছাই ঐ কালের বৃহত্তম জীব ছিল। উহাদের কোন কোনটি ছয় হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছিল। কিছু দিন পরে আর এক প্রকার নূতন জীব আবির্ভূত হয়। উদ্ভিদ যেরূপ মাটিতে শিকড় গাড়িয়া থাকে সেইভাবে উহা সেকালের অগভীর সমুদ্রের

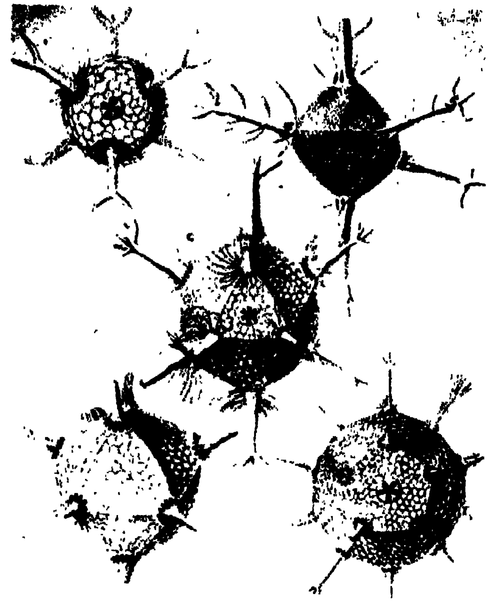


৬। পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রস্তরে অতি সরল জীবনের চিহ্ন মিলিয়া থাকে। এই ফটোগ্রাফে ঐ প্রকার দেহাবশেষ (fossils of microscopic algae) প্রায় ১৯০ গুণ বর্দ্ধিত অবস্থায় দেখা যাইতেছে।

তলদেশে বাস করিত (৯ নং চিত্র)। উদ্ভিদও ঐ সময়ে তীরে উঠিতে সমর্থ হয় নাই। উহা জলের উপরে ভাসিয়া থাকিয়া বায়ুভরে আন্দোলিত হইত।

স্থলের দিকে ধীরে ধীরে কি ভাবে জীবনের প্রসার ঘটিতে সুরু হয়, শেষ পেলিওজোয়িক যুগের শিলারাশির মধ্যে সঞ্চিত উপাদান হইতে তাহার চিত্র অঙ্কিত করা যায়। জলে যে সময়ে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রথম জীব—মৎস্য দেখা দেয় তাহার সমকালে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ডাঙ্গায় উঠিতে আরম্ভ করে। জীবের পূর্ব্বে উদ্ভিদ স্থল অধিকার করে। প্রথম প্রথম গুল্মাদি জলের ধারে মাত্র জন্মাইতে পারিত। উহাদের শিকড় বালি ও মাটি শক্ত করিয়া দিবার পর জীবসমুদয়ও তীরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

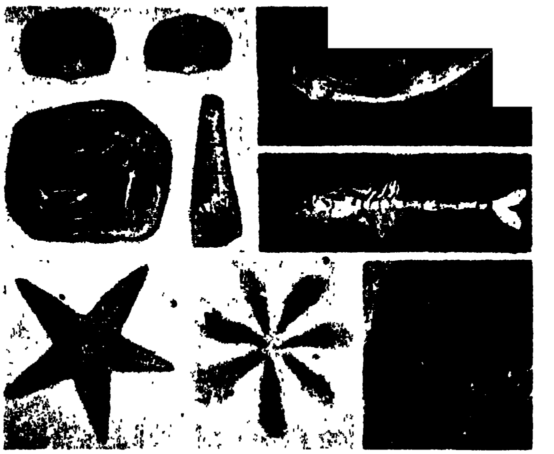
ডাঙ্গায় উঠিতে সমর্থ হইলেও ঐ যুগের শেষ পর্য্যন্ত জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে কোনটি নিম্ন আর্দ্র ভূমি ত্যাগ করে নাই। তখনকার দিনে দেহের গুরুতা প্রাপ্তিতে জীবনের প্রধান সঙ্কট উপস্থিত হইত। সুকোমল দেহকে রক্ষা করিবার মত কঠিন বহিরাবরণ গঠিত হইবার কার্য্য পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিলেও স্থলভাগের মুক্ত আলো-বাতাসের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া প্রাণ ধারণ করিবার মত অবস্থা সমস্ত যুগের মধ্যে কাহারও আসে নাই। জীবনের রক্ষা ও প এবং প্রজননের নিমিত্ত



৭। রেডিওলেরিয়ান নামক ক্ষুদ্র জীবের কঙ্কাল

সকলকেই জলে নামিতে হইত অথবা নিম্ন উপত্যকায় জোয়ারের জলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত। তবে পৃথিবী ঐ সময়ে জলের বন্দী জীবনের মুক্তি প্রয়াসে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া বোঝা যায়। উক্ত যুগের সতেজ উদ্ভিদের দেহাবশেষ সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পৃথিবীর অবস্থা তখন নাতিশীতোষ্ণ এবং জীবনের পক্ষে বিশেষ ভাবে অনুকূল ছিল। শৈবাল-জাতীয় এবং অন্যান্য উদ্ভিদের দেহ শক্ত না হইলেও উহারা বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছিল এবং এক শত ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছিল। এখন আর ঐ সকল উদ্ভিদের অস্তিত্ব নাই. পেলিওজোয়িক যুগের জলাভূমির বিস্তীর্ণ অরণ্যসমষ্টি হইতেই পৃথিবীর কয়লাক্ষেত্রের উৎপত্তি।

আদিম বনভূমিতে যে-সমুদয় জীব চরিয়া বেড়াইত তাহাদের মধ্যে পতঙ্গও ছিল। পতঙ্গগুলির আকার খুব বড় হইয়াছিল। বেলজিয়ামের কয়লাক্ষেত্রে ২৯ ইঞ্চি পাখ্‌নাবিশিষ্ট 'ড্রাগন ফ্লাই'-এর সন্ধান মিলিয়াছে



৮। প্রাচীনতম শিলাস্তরে প্রাপ্ত তারা-মৎস্য প্রবাল প্রভৃতি আদিম জীবের দেহাবশেষ। ঐরূপ জীব এখনও প্রায় অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে।



৯। আদিকালের জীববিশেষের দেহাবশেষ। ৪৫ কোটি বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার জীব সমুদ্রে বাস করিত। দেখিতে উদ্ভিদের মত হইলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি উদ্ভিদ নহে।

মাকড়সা, শামুক, আরশুলা, বিছা এবং নানা প্রকার উভচর জীবের দ্বারা পেলিওজোয়িক জঙ্গল পূর্ণ হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত উহাদের মধ্যে সরীসৃপের আবির্ভাব হয়। তাহা সত্বেও অনুমান করা যায় যে পৃথিবীর বনভূমির উপর সেই যুগে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত। সমগ্র বনদেশ মুখরিত করিয়া তুলিবে এমন কোন পাখী অথবা ঝিল্লীর স্থায় রব তুলিবার মত কোন পতঙ্গ তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। জলের কল্লোল, বাতাসের ধ্বনি ও মাঝে মাঝে বৃক্ষপতনের শব্দ ছাড়া অন্য কিছুই বনদেশের নীরবতা ভঙ্গ করিত না। বিরাট সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ধরণীর সকলই তখন ছিল যেন এক প্রতীক্ষায়। শুধু প্রাণের প্রাচুর্য্যই নয় জীবনের বৈচিত্র্য সাধনের পথও সেই কালে উন্মুক্ত হইয়াছিল।

উক্ত যুগের পরিসমাপ্তিতে জীবনের প্রবল ধারা হঠাৎ ব্যাহত হয়। বর্ত্তমান কাল হইতে বিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বেকার শিলালিপির বিক্ষিপ্ত পৃষ্ঠায় ধরাপৃষ্ঠের এক বিরাট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে ঐ সময় আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত সাগর প্রভৃতি উত্তর ভূমণ্ডলের সমস্ত সমুদ্র একেবারে শুষ্ক হয়। কেবল্য প্রশান্ত মহাসাগরের একাংশে জল থাকে। দক্ষিণ ভূমণ্ডলের সমুদ্রেও 'গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড' নামে বর্ণিত প্রকাণ্ড ভূভাগ জাগিয়া উঠে। উহা দক্ষিণ-আমেরিকার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। অনেক ভূতত্ত্ববিদ মনে করেন যে ঐ সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা, ভারতবর্ষের কতকাংশ, দক্ষিণ-আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ-ভূমণ্ডলের স্থলদেশ সকলের মধ্যে সংযোগ ছিল। এই যুগের প্রস্তরে জীবনের অতি অল্প চিহ্ন মিলিয়া থাকে। উহার মধ্যেকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তে বহু মৎসের দেহাবশেষ কিরূপ ঠাসাঠাসি অবস্থায় বর্ত্তমান আছে বৈজ্ঞানিকেরা তাহা দেখাইয়া থাকেন। উহাদের সকলেই যেন শেষ বারিবিন্দু পাইবার জন্য একজোটে জলের দিকে আগাইয়া গিয়াছিল। কিছু দিন পরে অনাবৃষ্টি দূর হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবীতে কোন জীবের আবির্ভাব ঘটে না। অনাবৃষ্টির মধ্যেও যে দুই-এক প্রকার জীব কোন প্রকারে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল তাহারাই মাত্র এই সময়ে পৃথিবী অধিকার করিয়া বাস করিত। জীবনের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় পৃথিবীতে এমনি ভাবে শেষ হয়।

পুনরায় পৃথিবীর অবস্থা যখন জীবজন্মের উপযোগী হয় তখন পূর্ব্বযুগের মরুভূমির উপর দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত

হইয়াছে এবং নিম্নভূমি সকল আবার সতেজ উদ্ভিদে ভরিয়া গিয়াছে। পেলিওজোয়িক যুগের পরের যুগের নাম মেসোজোয়িক যুগ। এই যুগে জলের ও স্থলের সংবিভাগ মোটেই বর্ত্তমান কালের ন্যায় ছিল না। মেসোজোয়িক যুগে বিশেষতঃ উহার শেষের দিকে এশিয়া ও ইউরোপে তীরের অনেক উপর পর্য্যন্ত সমুদ্র উঠিয়া আসে এবং দক্ষিণ-আমেরিকা বেশীর ভাগ জলের নীচে চলিয়া যায়। উহার সর্ব্বশেষ অংশে, উত্তর-আমেরিকায় পর্ব্বত গড়িয়া উঠে এবং স্থলভাগ উঁচু হইয়া অনেকটা বর্ত্তমান আকার ধারণ করে। উদ্ভিদ ও জীব উভয়েই এই যুগে জলের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা ত্যাগ করিয়া শুষ্ক ডাঙার উপর বাস করিতে সমর্থ হয়। তালগাছের ন্যায় বৃক্ষ এবং প্রকৃত স্থলচর জীব এই প্রথম পৃথিবীতে আসে। জীবনের প্রসার অবশ্য এই যুগে তীরের উপর বেশী দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। নিম্নভূমি ব্যতীত পৃথিবীর অন্য সমস্ত স্থলভাগ তখনও মরুময় ও নিষ্প্রাণ এবং দূরের পাহাড় সম্পূর্ণ ভাবেই নগ্ন। পৃথিবীর গাছে তখন সবে মাত্র ফুলফোটার সূত্রপাত হইয়াছে এবং উহার উপত্যকায় তৃণ নূতন গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উদ্ভিদ এই কালে শ্যামল হইয়াছিল কিন্তু রৌদ্র পাইলে উহার বর্ণ পিঙ্গল হইয়া যাইত। অর্থাৎ ঐ যুগে পৃথিবী সুন্দর হইতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, তবে এখনকার মত সর্ব্বাঙ্গে শ্যামশোভা ধারণ করে নাই। মেসোজোয়িক জীবের ইতিহাস অতীব অদ্ভুত। দশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে বৃক্ষলতায় আবৃত সমস্ত বনভূমি নানা প্রকার জীবে পূর্ণ হইয়া উঠে। অন্য কোন সময়ে পৃথিবী এমন বিভিন্ন জাতীয় অতিকায় জীবের বাসভূমি হইয়া উঠে নাই। বর্ত্তমান কালের তিমি মাছই কেবল সেই সময়কার কদাকার অতিকায় জীবগুলির সহিত আকারে তুলনীয় হইতে পারে। ১৯১২ সালে এক জার্ম্মান অভিযান পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রস্তরস্তূপের মধ্যে এক শত ফুটের বেশী দীর্ঘ মেসোজোয়িক যুগের এক ডাইনোসরের দেহাবশেষ আবিষ্কার করেন। আকারে বৃহৎ হইলেও মেসোজোয়িক যুগের জীবগুলি জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। পালক-যুগ ক্ষুদ্র জীব এই যুগের শেষভাগে আসে। জীবজগতে উহারা নগণ্য ছিল।

প্রথমোক্ত পেলিওজোয়িক যুগের ন্যায় দ্বিতীয় যুগেরও প্রায় সমস্ত জীব এক সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কেবলমাত্র কচ্ছপ, কুম্ভীর, টিকটিকি, পতঙ্গ, মৎস্য এবং কয়েক প্রকার ক্ষুদ্র সরল জীব ব্যতীত অন্য কোন জীবের অস্তিত্বের বিষয় পরবর্ত্তী কালের প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় না। জলে ও স্থলে একসময়ে জীবনের অবসান ঘটে। পৃথিবীর জলবায়ুর অবস্থার পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ। অনেকের ধারণা পৃথিবী ক্রমে ক্রমে নিয়মিতভাবে শীতল হইয়া পড়িতেছে; প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। উষ্ণতা ও শৈত্যের পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। পৃথিবীর অবস্থা কখনও জীবনের পক্ষে অনুকূল কখনও অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে। মেসোজোয়িক জীবনের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যের কারণ পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা। বর্ত্তমান পার্থিব জীবনে সেই অবস্থা রহিয়াছে। এই দুইয়ের মাঝামাঝি কালে দারুণ শীতলতায় জল ও স্থল আক্রান্ত হইলে পার্থিব জীবসমূহ অবস্থানুযায়ী নিজেদের পরিবর্ত্তন করিতে না পারায় সর্ব্বত্র জীবের বিনাশ সাধিত হয়। সেই বিরাট ধ্বংসের পর বর্ত্তমান কালের ন্যায় জীবের জন্ম হইতে পৃথিবীর প্রাণহীন ইতিহাসের আরও কয়েক কোটি বৎসর কাটিয়া যায়।

কেনোজোয়িক যুগই ভূতত্ত্বের তিনটি প্রধান যুগের মধ্যে শেষ যুগ। ইহার আরম্ভ হইতে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ অনেকটা বর্ত্তমান আকার ধারণ করে এবং উহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হইয়া উঠে। উদ্ভিদ-জগতে তাল খেজুর দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ প্রধান স্থান অধিকার করে। নানা প্রকার লতা ও পুষ্পপ্রসূ গাছের দেহাবশেষ কয়েক কোটি বৎসরের পুরাতন প্রস্তরস্তূপে মিলিয়া থাকে। ফুলের সঙ্গে মৌমাছি ও প্রজাপতি আসিয়া জুটে। পক্ষীর ন্যায় জীব ইতিপূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছে। সারা পৃথিবীর উপর শ্যামল তৃণক্ষেত্র সকলও এই যুগে দেখা দেয় এবং তৃণভোজী পশু সেই সকল ক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াইতে থাকে। বিশেষরূপ উষ্ণ অবস্থায় সুবৃহৎ পর্ব্বত গঠনের মধ্যে কেনোজোয়িক যুগ আরম্ভ হয়। আল্‌প্‌স, আণ্ডীজ, হিমালয় প্রভৃতি কেনোজোয়িক পর্ব্বত। পর্ব্বতসমূহ গড়িয়া উঠিবার কালে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

এবং ভূমিকম্পের যথেষ্ট প্রাবল্য ছিল বলিয়া মনে হয়। কেনোজোয়িক যুগে ভূপৃষ্ঠের এমন কোন পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় নাই যাহা বর্ত্তমান পৃথিবীর কোন-না-কোন অংশে ঘটিতে না পারে। পৃথিবী অবশ্য এই যুগে জলবায়ুর কল্পনাতীতরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। কেনোজোয়িক যুগের সূচনা উষ্ণতায় হইলেও প্রবল শৈত্যে আসিয়া উহার অবসান হয়।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ উক্ত যুগের পাঁচটি বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম ভাগেই আধুনিক ধরণের অনেক জীব দেখা দেয়। জীবের দেহে লোম ও পালকের উদ্ভব এবং উহার মস্তিষ্কের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি এই যুগের বিশেষত্ব। ঐ সময়কার আদিম কুকুর, বিড়াল, ভালুক, হাতী প্রভৃতি বিবর্ত্তনের ফলে আধুনিক জীবে পরিণত হইয়াছে। বিগত দুই-তিন কোটি বৎসরে কোন কোন জীবের মস্তিষ্ক দশ গুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। পরবর্ত্তী কালেও পৃথিবী উষ্ণ ছিল। তৃতীয় ভাগে তাপমাত্রা কমিতে আরম্ভ করিয়া পরের অংশে বর্ত্তমান কালের ন্যায় হইয়া যায়। তৃতীয় ভাগের নানা প্রকার উট ও জিরাফের দেহাবশেষ আমেরিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেনোজোয়িক যুগের শেষ ভাগই বিরাট তুষার যুগ। ইহার প্রারম্ভের দিক হইতে সূত্রপাত করিয়া হাজার হাজার বৎসর পৃথিবী যে ক্রমে শীতলতর হইতে থাকে শিলালিপিতে তাহার প্রমাণ আছে। পৃথিবীর আদি-শিলাস্তরেও তুষারপাত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে গ্রীষ্মের তুলনায় শীতের অংশ অল্প ছিল। কেনোজোয়িক যুগে গ্রীষ্মের ভাগ অনেক কমিয়া যায়। তৃতীয় যুগেও সময়বিশেষে পৃথিবীর মেরুদেশ পর্য্যন্ত নাতিশীতোষ্ণ ছিল। মেরুদেশীয় উদ্ভিদের দেহাবশেষের মধ্যে তাহার পরিচয় মিলিয়া থাকে। আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যে পূর্ব্বে স্থলের যে সংযোগ ছিল তুষার-যুগে সেই সংযোগ ছিন্ন হয়। উভয় গোলার্দ্ধের উদ্ভিদ ও জীব সম্বন্ধীয় গবেষণা হইতে ইহা অনুমান করা যায়। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া আমেরিকা এশিয়া ও ইউরোপের সর্ব্বত্র তুষাররাশি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। উহা প্রত্যাবর্ত্তন করে বটে, কিন্তু আবার ফিরিয়া আসে। ব্রিটেনের দক্ষিণ দিকে টেম্‌স পর্য্যন্ত ও উত্তর-আমেরিকায় ওহিও পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ দীর্ঘকাল বরফের নীচে চাপা ছিল। প্রচুর পরিমাণ জল সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়া স্থলভাগের তুষারস্তূপের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় পৃথিবীময় জলের ও স্থলের সংবিভাগের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে যেখানে যেখানে ডাঙ্গা জাগিয়া ছিল এখন সেই সকল স্থান আবার সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। জীবদেহে লোমের প্রাচুর্য্য পৃথিবীর শৈত্যাবস্থায় প্রাণের সংরক্ষক হইয়াছিল। আকাশমার্গের বৃহৎ বস্তুপিণ্ডের আকর্ষণে পৃথিবীর মেরুদণ্ড ঘুরিয়া যাওয়ায় উহার জলবায়ুর অবস্থায় বিশেষ বৈষম্য আসে, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন।

বর্ত্তমানে পৃথিবী শেষ হিমতরঙ্গ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া উষ্ণতার দিকে চলিতেছে। কত দিন এইভাবে চলিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। তুষারযুগে হিমানী-পাতের কম্‌তি-বাড়্‌তির মধ্যে মানুষের ন্যায় জীব পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। পশুজীবন চরম পরিণতি লাভ করে মানবজন্মের মধ্যে।

চিঠি পাওয়ার পর

"বনফুল"

১

সমস্ত দিনটা যেন আর কাটিতে চাহিতেছে না।

তাহাকে আর একবার দেখিতে পাইব এই আশায় বিভোর হইয়া রহিয়াছি। যাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, আবার যে তাহাকে দেখিতে পাইব এ-কল্পনাও করি নাই। সে যে এ-পথে আবার আসিতে পারে তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ছিল না। অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়াছে। সে আসিতেছে এবং আমি তাহার দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছি। আমার বিগতস্বপ্ন জীবন পুনরায় স্বপ্নায়িত হইয়া উঠিয়াছে! যদিও মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য, যদিও তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে, তথাপি এই ঘটনাকে আমার জীবনের বৃহত্তম ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। যত কম সময়ের জন্যই হউক এবং যে-ভাবেই হউক তাহাকে আর একবার দেখিতে পাইব ত! তাহাই যে পরম লাভ। চিঠিখানা আবার খুলিয়া পড়িলাম।

শ্রীচরণেষু,

উনি লক্ষ্ণৌ বদলি হয়েছেন। পাটনা হয়েই আমরা যাব। আমাদের গাড়ী পাটনায় রাত্রি সাড়ে আটটায় পৌছবে। পাঁচ মিনিট মাত্র থামবে। আপনি যদি ষ্টেশনে আসেন সুখী হব। অনেক দিন আপনাকে দেখি নি। দেখতে ইচ্ছে করে। আসবেন ত? আশা করি আমাকে একেবারে ভুলে যান নি।

অমিতা।

২

কিছুই ভুলি নাই।

অতীতের সেই স্বপ্নময় দিনগুলি তাহাদের সমস্ত বর্ণসুষমা লইয়া আবার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে সেই দিনটির কথা যে-দিন অনেক ইতস্ততঃ করিয়া আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল হৃদয়ে তাহাকে প্রথম প্রণয়-নিবেদন করিয়াছিলাম। মনে ভয় ছিল যদি সে ভুল বোঝে—যদি সে রাগ করে। কিন্তু সে কিছুই করে নাই। স্মিত মুখে সহজ ভাবে সে আমার নিবেদন শুনিয়াছিল। তাহার লজ্জারুণ কপোল, আকম্পিত অধর, আনমিত নয়ন—তাহার সেদিনকার সম্পূর্ণ আলেখ্যখানি আমার মনের পরতে পরতে উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা রহিয়াছে। কখনও বিলুপ্ত হইবে না। পরিপূর্ণ সুখ মানুষের জীবনে বহুবার আসে না। আমার জীবনে একবার মাত্র আসিয়াছিল। আর আসিবে না তাহাও জানি। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে হইবে। ভুলিলে চলিবে কেন! ভুলি নাই! এক দণ্ডের জন্যও তোমাকে ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না। তোমাকে এ-জীবনে বহির্লোকে পাই নাই তাহা সত্য, কিন্তু আমার অন্তরলোকে যে-আসন তুমি অলঙ্কৃত করিতেছ সে-আসন এখনও অবিচলিত আছে এবং চিরকাল থাকিবে। তুমি ত আমাকে চাহিয়াছিলে—সমস্ত প্রাণ দিয়াই চাহিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে লইতে পারিলাম কই? তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া আসিতে হইল। আমার দুর্ভাগ্য দিয়া তোমাকে লাঞ্ছিত করিতে আমি কিছুতে পারিলাম না। আমার দুর্ভাগ্য আমি একাই বহন করিব। ইহাই আমার ললাটলিপি। এই ললাটলিপির দুঃসহ বিধান একাই আমি মাথা পাতিয়া সহ্য করিব। তোমাকে ইহার অংশভাগিনী করিব কেন? তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়াই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

৩

ভগবান্ বলিয়া কেহ আছেন হয়ত। এই নিখিল

বিশ্বের কার্য্যকলাপ তাঁহারই অমোঘ বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এই ধারণা করিয়া নির্ম্মম নির্য্যাতনের মধ্যেও আমরা কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি। তাহা না হইলে অসহায় মানব অকারণ দুঃখের বোঝা বহিতে পারিত না। কে এক জন মনীষী না কি বলিয়াছেন যে ভগবান্ যদি না-ও থাকেন নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে একটা ভগবান্ আমাদের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। মানুষের পক্ষে ভগবানহীন জীবন অশান্তিজনক। আমিও আমার এই দুর্ভাগ্যটাকে ভগবানের অমোঘ বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম। মানিয়া লইয়াছিলাম যে যিনি আমার স্বপ্ন-সৌধ-শীর্ষে নিদারুণ বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৃষিত অধর সমীপবর্ত্তী সুধাপাত্রকে যিনি অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাতে বিচূর্ণিত করিয়াছিলেন তিনি করুণাময় পরমেশ্বরই। যাহা করিয়াছেন তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আমরা তাঁহার বিধানের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারি না। সুতরাং তাঁহার কার্য্য-কলাপের সমালোচনা করিতে আমরা যে শুধু অপারগ তাহাই নয়—অনধিকারী। নিরুপায় মন এই যুক্তি মানিয়াছিল। অমিতাকে ভালবাসিয়াছিলাম। অমিতাও আমাকে ভালবাসিয়াছিল। অমিতার পিতা-মাতার আপত্তি ছিল না। আমার দিকে পিতামাতাই ছিল না। তবু বিবাহ হইল না। সমস্ত যখন ঠিকঠাক, হঠাৎ এক দিন কাসিতে কাসিতে এক ঝলক রক্ত আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। জীবাণুতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত শুনিয়াও অমিতা কিন্তু আমাকে চাহিয়াছিল। আমি কিন্তু পারিলাম না।

বিবেকে বাধিল।

৪

অমিতার অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল।

অমিতার মত পাত্রী পড়িয়া থাকে না। সুন্দর স্বভাব, সুন্দর চেহারা, সুন্দর শিক্ষা। অমিতার মত মেয়ে বাংলা দেশে বেশী নাই। আমার চোখে ত আর একটাও পড়িল না। রূপসী শিক্ষিতা মেয়ে হয়ত অনেক আছে কিন্তু অমন মৃদু, অমন স্নিগ্ধ, অমন সুরভিত সুমিষ্ট স্বভাব ত আর কোথাও দেখিলাম না। অমিতার পিতামাতা অমিতার জন্য যে পাত্রটিকে নির্ব্বাচিত করিলেন তিনিও অমিতার উপযুক্ত। বড় বংশের ছেলে, বড় চাকুরী করেন। স্বাস্থ্যবান্ সুরূপ ভদ্রলোক। কোন দিক্ দিয়াই কোন খুঁৎ নাই। আইনতঃ অমিতার সুখে থাকিবারই কথা। হয়ত সুখেই আছে। কিন্তু কেন জানি না আমার অন্তর-নিবাসী অবুঝ ব্যক্তিটির বিশ্বাস, অমিতা সুখে নাই। আমার ধারণা, অমিতা আমাকে পাইলেই বেশী সুখী হইত। যদিও আমি অমিতার স্বামীর অপেক্ষা সব দিক্ দিয়াই নিকৃষ্ট, তথাপি মনে হয় অমিতা এখনও মনে মনে আমারই প্রতীক্ষা করিতেছে। অত্যন্ত যুক্তিহীন এই স্বপ্নটিকে আমি মনে মনে আঁকড়াইয়া আছি যে তাহার স্বামীর বড় বংশ, ভাল চাকুরী, সুন্দর রূপ, অটুট স্বাস্থ্য সত্ত্বেও সে ততটা সুখী নয়, যতটা সুখী সে হইতে পারিত যদি আমি তাহাকে বিবাহ করিতাম। হয়ত ইহা আমার অহমিকা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই অহমিকাটুকুকে আশ্রয় করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। সর্ব্বগ্রাসী জলপ্লাবনে সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে, অহমিকার ক্ষুদ্র দ্বীপটুকু শুধু জাগিয়া আছে। অত্যন্ত নিঃসঙ্গভাবে তাহারই উপর দাঁড়াইয়া আমি বাঁচিয়া আছি।...

আবার তাহার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলাম।

৫

দেখা হইলে কি বলিব তাহাকে!

এত দিন পরে দেখা—পাঁচ মিনিটের জন্য! ষ্টেশনের ভিড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কি তাহাকে বলিব! অথচ বলিবার কত কথাই মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কথা গুছাইয়া বলিব কেমন করিয়া! হয়ত কিছুই বলা হইবে না। হয়ত অতি সাধারণ কুশল-প্রশ্নের ভিতর দিয়াই এই অতিশয় মূল্যবান্ পাঁচটি মিনিট অতিবাহিত হইয়া যাইবে। জীবনে হয়ত তাহার সহিত আর দেখাই হইবে না। হয়ত...সহসা মনে হইল তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে। আবার পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম।

৬

সমস্ত দিন বাজারে ঘুরিয়াছি।

কলিকাতার মিউনিসিপাল মার্কেটের ডালমুট অমিতার বড় প্রিয়বস্তু ছিল। নানা স্থানে ঘুরিয়াও ঠিক সে রকম ডালমুট জোগাড় করিতে পারিলাম না। হয়ত এখানকার জিনিষ তাহার পছন্দ হইবে না। এক জনকে ফরমাস দিয়াছি। সে আশ্বাস দিয়াছে সন্ধ্যা নাগাদ ভাল ডালমুট প্রস্তুত করিয়া দিবে। ডালমুট ছাড়া অমিতার জন্ত আর যে কি লইয়া যাইব স্থির করিতে পারিতেছি না।

* * *

জামা কাপড় ময়লা হইয়া গিয়াছে।

মেসের চাকরটাও ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছে। নিজেই একটা জামা ও কাপড়ে সাবান দিতে বসিলাম। ময়লা জামা কাপড় পরিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে পারিব না।

* * *

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মনে পড়িল কিছু গোলাপ-ফুল জোগাড় করিয়া লইয়া গেলে হয়। লাল নয়—সাদা গোলাপ। নরেনদের বাড়ীতে আছে—গেলেই পাইব। হাতঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। এখনও দেরি আছে। নরেনের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

৭

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নরেনদের বাড়ী হইতে যখন বাহির হইলাম তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার। বড় বড় সাদা সাদা গোলাপগুলি অতি সুন্দর। অমিতা নিশ্চয়ই খুশী হইবে। ফুলগুলি পাইতে কিন্তু দেরি হইয়া গেল। নরেন বাড়ী ছিল না, মালীটাও বাহিরে গিয়াছিল। রাস্তায় নামিয়া হাত-ঘড়িটা আর একবার দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

ট্রেনের এখনও এক ঘণ্টা দেরি আছে। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। যে লোকটাকে ডালমুটের ফরমাস দিয়াছিলাম সে এখান হইতে কিছু দূরে একটা গলির মধ্যে থাকে। গেলাম সেখানে।

৮

ষ্টেশন।

নানা ধরণের যাত্রী নানা ধরণের জিনিষপত্র লইয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছে। ডালমুট ও গোলাপ লইয়া আমিও অন্তমনস্কভাবে প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করিতেছি। সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একটা বেদনাময় অনুভূতি ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছে। কতক্ষণে আসিবে ট্রেনটা? এক জন রেলওয়ে-কর্ম্মচারী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনটির আসিবার আর কত দেরি আছে।

তিনি নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন—"সে ট্রেন ত আটটা পঁয়ত্রিশে ছেড়ে গেছে। এ অন্ত ট্রেন আসছে। এখন ত সাড়ে ন'টা!"

সে কি!

নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিলাম।

সাড়ে সাতটা বাজিয়া রহিয়াছে!

সহসা মনে হইল আজ সকালে ঘড়িতে দম দিই নাই!

অমিতার চিঠি পাইয়া এমন অন্তমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ঘড়িতে দম দেওয়ার কথা মনে ছিল না।

বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ব্রহ্মদেশীয় পওনা ব্রাহ্মণ

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

[১৩৪৪ সালের মাঘের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের "চিন্ময় বঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রহ্মদেশীয় পওনাদিগের উল্লেখ দেখিলাম। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে প্রায় তিন শত বৎসর পরে, এখন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের বিস্মৃত ও বিদেশস্থ আত্মীয়স্বজনের সন্ধান লইতেছেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি সুধীগণ এ-বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং পওনাদিগের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাদিগকে এবং বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দকে জানাইতেছি।]

প্রচলিত বর্ম্মা ভাষায় পওনা শব্দ দ্বারা কোন্ জাতিকে বুঝায়, তাহা এখনও অনির্দ্দিষ্ট আছে।* কিন্তু বর্ম্মারা জানে যে পওনা শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত পুণ্য (পাবন) শব্দ হইতে ইহা গৃহীত হয় নাই। কেন না পওনা শব্দ বর্ম্মার লিখিত ভাষায় পুন্নাঃ অর্থ ব্রাহ্মণ; আর পুণ্য শব্দের বানান পুঞ্ঞা, উচ্চারণ পুনীয়া, অর্থ সুকৃতি। বর্ম্মারা সংস্কৃত ব্রাহ্মণ শব্দকেই বিকৃত করিয়া পুন্নাঃ লিখিয়াছে।

সংস্কৃত ও পালি শব্দের বর্ম্মা অনুবাদে দেখা যায় যে ঐ সকল শব্দের ব অনুবাদকালে প হইয়াছে, এবং র-ফলা, রেফ, বা র-যুক্ত অক্ষরগুলিকে অনুবাদকেরা বর্জ্জন করিয়া, ঐ সকল শব্দের অবশিষ্টাংশকেই মূল পালি বা সংস্কৃত শব্দের স্থানে গ্রহণ করিয়াছে।১

চলিত ভাষায় বঙ্গদেশেও ব্রাহ্মণের হ্ম বর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণকে বামন, বামুন ও বাওন করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ব্রাহ্মণ হইয়াছে বামুন=পুঅন=পুন্ন=পুন্নাঃ।

* ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ব্রহ্মদেশীয় আদমসুমারীর রিপোর্ট, ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) লেখক মহাশয় নিজের মত সমর্থনার্থ অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। স্থানাভাবে তাহা বাদ দিতে হইল। তাঁহার যুক্তি ও দৃষ্টান্তগুলি বিশ্বাসোৎপাদক। —প্রবাসী-সম্পাদক।

পওনা কাহারা?

যদিও ব্রহ্মদেশীয় ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতপক্ষে পওনা নামের অধিকারী, তথাপি সাধারণ লোকেরা অসাবধানভাবে ব্রহ্মদেশে আগত আরাকানী, মণিপুরী, এমন কি কাথেদিগকেও জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পওনা নামে অভিহিত করিতেছে; কিন্তু বর্ম্মারা জানে যে উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ পওনা নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্রহ্মদেশের মণিপুরী মুসলমানেরাও কখনও কখনও তাহাদিগকে "পতি পওনা" বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে পওনা শব্দের অর্থ আরও গোলমাল হইয়া যাইতেছে।

মূল জন্মভূমি ও জাতি হিসাবে ব্রহ্মদেশীয় ব্রাহ্মণ (পওনা)-দিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে:—

(১) বমা পওনা অর্থাৎ বর্ম্মা পওনা

(২) ইয়াখাইঙ পওনা=আরাকানী পওনা

(৩) মণিপুরী বা কাথে পওনা।

ব্রাহ্মণেতর হিন্দু—ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র—মণিপুরী বা আরাকানীদিগকে কেহ অসাবধানভাবে পওনা বলিলেও তাহারা নিজেরা পওনা বলিয়া পরিচয় দেয় না।

এই সকল আরাকানী ও মণিপুরী ব্রাহ্মণই ব্রহ্মদেশের প্রকৃত পওনা; এবং এই ব্রাহ্মণেরাই এখন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশীয় পুরাতন হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও আচার নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ব্রহ্মদেশে ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও জ্যোতিষের প্রচারই এই ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠ অবদান। ব্রহ্মদেশীয় রাজাদিগের রাজপ্রাসাদে এই সকল জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে রাজপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত করা হইত; কর্ণবেধ, চূড়াকরণ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যের শুভকাল নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করা হইত এবং বৌদ্ধ

বর্ম্মাদিগের গৃহনির্ম্মাণ, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও এখন পর্য্যন্ত এই সকল জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগেরই পরামর্শ গৃহীত হইতেছে।

বর্ম্মা-পওনা

বর্মা-পওনাদিগের মূল জন্মভূমি মণিপুর। কথিত আছে যে, সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে মণিপুর হইতে বর্মা-পওনাদিগের আদি-পুরুষেরা মন্দালয়ের নিকট, ইরাবতী-তীরে সাগাইঙ্‌ পর্ব্বতের সন্নিহিত কোনও স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহাদিগকে কেহ কেহ "সাগাইঙ্‌ পওনা" বলে।

আভার রাজা বোডাকায়া (১৭৮১ খ্রীঃ) এই পওনাদিগের জাতি ও জন্মস্থান নিরূপণের জন্য এক অনুসন্ধান-সমিতি সংগঠন করিয়াছিলেন। তাহাতে নিরূপিত হয় যে, এই বর্ম্মা-পওনাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মণিপুরী ব্রাহ্মণ এবং অবশিষ্টাংশ মণিপুরী ক্ষত্রিয়। যাঁহারা ক্ষত্রিয়, তাঁহাদিগের মধ্যে কতক কপিলাবস্তু হইতে মণিপুরের স্থলপথে ব্রহ্মদেশে আগত অভিরাজ-নরপতির অনুচরদিগের বংশধর; আর কতক পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের ঔরসে "ছিন্-কন্যা" উলূপীর গর্ভসম্ভূত সন্তানদিগের বংশধর।[২]

কথিত আছে, টাগাউঙ-এর সূর্য্যবংশীয় রাজা পূর্ব্বোক্ত অভিরাজ-নরপতির বংশধর এবং পিউ দেশের রাজা সুপ্রসিদ্ধ ডাটাবাউঙ (দশবাহু বা দশবাহন) নরপতির রাজত্বকালে তাঁহার রাজধানী প্রোমে (তারাক্ষেত্রে) এক দল সাগাইঙ ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া তারাক্ষেত্রেই বাস করিতে থাকেন। মহারাজ ডাটাবাউঙ ইহাদিগের মধ্য হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে স্বীয় রাজসভায় জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনার জন্য গ্রহণ করেন। এখনও প্রোমে ইহাদিগের বংশধরগণ জীবিত আছেন। প্রোম-রাজ্যের ধ্বংসের পর, পাগানের রাজারা প্রোমের জ্যোতিষী ব্রাহ্মণদিগকে পাগানে আনয়ন করেন। পাগানের রাজা প-পা-স-রাহান্‌ ঐ ব্রাহ্মণদিগের সাহায্যেই ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ব্রহ্মাব্দের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নববর্ষ, অধিমাস, অধিদিন, সংক্রান্তি ও গ্রহণ প্রভৃতি নিরূপণের জন্য ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত গণনার প্রবর্ত্তন করেন।[৩]

ইহার পরে দ্বাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহুবিধ জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে আনীত এবং বর্ম্মাভাষায় অনূদিত হইতে থাকে এবং ব্রহ্মদেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের সমধিক উন্নতি বিহিত হয়।[৪]

বর্ম্মা-পওনা ব্রাহ্মণেরা ৯, ৬, বা ৩ সূত্র যুক্ত উপবীত ধারণ করেন। ইহারা সামবেদীয় ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। পূজার মন্ত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে বারাণসী গিয়া সংস্কৃত ও শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। এখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ইহারা এখন নিজেদের মধ্যে বর্ম্মাভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন; স্বদেশীয় ভাষা বিস্মৃত হইয়াছেন।

ইহারা সকলেই নিরামিষভোজী। স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি বা অন্য জাতীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গেও ইহাদিগের বিবাহ-সম্বন্ধ বা পানাহার নাই। ইহাদের সংখ্যা এখন দ্রুতগতিতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। গত ৩০ ও ২০ বৎসরের মধ্যে বর্ম্মা-পওনাদিগের অনেক স্ত্রী-পুরুষ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়া জাত্যন্তরস্থ পুরুষ ও স্ত্রী গ্রহণ করাতে বর্ম্মা-পওনাদিগের প্রতিপত্তিও এখন অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

বর্ম্মা-পওনারা সাদা মলমলের পাজো (ধুতি) এবং সাদা এঞ্জি (জামা) ব্যবহার করেন। গলায় তুলসীর মালা, বাহুতে তুলসীকাষ্ঠের তাবিজ ও কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ধারণ করেন। বৃদ্ধেরা শির মুণ্ডিত করিয়া শিখা অবশিষ্ট রাখেন। পূজা-আহ্নিকে ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও ইহাদিগের যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হইত। এখন ইহাদিগের পুত্রেরা জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিত্যাগ করিয়া যৎসামান্য বেতনে চাকুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় বাঙালী

(২) ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ব্রহ্মদেশীয় আদমসুমারীর রিপোর্ট, ১২৩ পৃষ্ঠা।

(৩) হারভী-কৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের ১২-১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) কর্ণেমার লিখিত জার্ডিন প্রাইজ দ্রষ্টব্য।

যুবকদিগের ন্যায় ইহারাও এখন গায়ত্রীহীন। কন্যারা এখনও সন্ধ্যাবেলা তুলসী-তলায় প্রদীপ জ্বালাইয়া একটি প্রণাম করেন বটে, কিন্তু বাজারে সকলের সঙ্গে সমাসনে বসিয়া চা পান করিতে কুণ্ঠিত হন না। বিবাহাদি সম্বন্ধেও ইহারা এখন যে আচরণ প্রদর্শন করিতেছেন তাহাও সমাজবিরুদ্ধ। বঙ্গদেশের গোস্বামী-পণ্ডিতেরা চেষ্টা করিলে এখনও ইহাদের পুনরুদ্ধারকার্য্য কষ্টসাধ্য হইবে না। কিন্তু তাঁহাদিগকে বর্ম্মা ভাষা শিখিতে হইবে। ছায়া কো নামক এক পণ্ডিত ও জ্যোতিষী এখন মন্দালয় ও সাগাইঙের বর্ম্মা-পওনাদিগের মধ্যে সম্মানার্হ ব্যক্তি। ইনি সংস্কৃত ও পালি জানেন। বর্ম্মাভাষায়ও ইহার উৎকৃষ্ট জ্ঞান আছে। এতদ্ভিন্ন কয়েক জন বর্ম্মা-পওনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাতেও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শি-প রাজ্যে এক বর্ম্মা-পওনার সহিত ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সুশ্রুত ও চরক হইতে সঙ্কলিত একখানি বর্ম্মা ভাষায় লিখিত পুস্তক দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার কথায় বোধ হইয়াছিল যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্টই অভিজ্ঞতা আছে। অঙ্গ-অভিমর্দ্দনে (massage) এই পওনা চিকিৎসকদিগের অপরিসীম সুখ্যাতি। বাতজনিত সর্ব্বপ্রকার বিকৃতি ও ব্যাধি ইহারা কেবলমাত্র অভিমর্দ্দন দ্বারাই উপশম করিতে পারেন। কেহ কেহ তপ্তাগ্নি-সংযোগ ও ক্ষতচিকিৎসাতেও সুনিপুণ।

আরাকানী জ্যোতিষী কমলেশ্বর বলেন, "বর্ম্মা-পওনারা ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণ। ইহাদিগের আচার-ব্যবহার বর্ম্মাদিগের ন্যায় অশাস্ত্রীয়। গায়ত্রীর উচ্চারণ পর্য্যন্ত ইহাদিগের জিহ্বায় আসে না।" এ মন্তব্য সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। ইহারা প্রায় ১৭০০ বৎসর যাবৎ স্বজাতি ও স্বজাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার জন্য অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। বর্ম্মার রাজারা ইহাদিগকে জাতিধর্ম্মসংরক্ষণে সাহায্য করিতেন, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে এখন ইহাদিগের জীর্ণ অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

গত আদমসুমারীতে প্রোমে৹ বর্ম্মা-পওনাদের সংখ্যা মাত্র ১৯ জন ছিল। মন্দালয় ও সাগাইঙ্ জেলায় ইহাদের সংখ্যা বেশী; কিন্তু ঘরবাড়ী ও ব্যবহার দেখিলে এখন ইহাদিগকে পওনাবেশী বর্ম্মা বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মণ্যতেজ সম্পূর্ণই নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

ইয়াখাইঙ্ পওনা

ইয়াখাইঙ্ পওনাগণ চট্টগ্রামের বাঙালী ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে আরাকানে বাস করিতেন। ব্রহ্মদেশের রাজা বোডাফায়ার রাজত্বকালে বর্ম্মারা আরাকান জয় করে। আরাকানের সুপ্রসিদ্ধ মহামুনি ফায়া এবং ঐ দেবমূর্ত্তির সেবকদিগকে মন্দালয়ে আনয়ন করে।

ইহার পরেও (১৭৮৪ খ্রীঃ হইতে ১৭৯৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত) বর্ম্মারা দুই বার আরাকান আক্রমণ করিয়া সর্ব্বসুদ্ধ ৩৮০০০ হাজার আরাকানীকে বন্দী করিয়া ব্রহ্মদেশে লইয়া আসে।[৫] বন্দী ব্রাহ্মণদিগকে মন্দালয়ের নিকট বডিগৌন্, মহানোয়েজিন্ ও তে-চ্যান্নোয়েজিন পল্লীতে বাস করিতে দেওয়া হয়। কতকাংশ মাডে, অমরপুর ও ঈন্-ডায়া-ফায়ার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই ব্রহ্মদেশের বাঙালী পওনা। বর্ম্মাভাষায় ইহাদিগকে ইয়াখাইঙ্ পওনা বলা হয়।

ইয়াখাইঙ পওনারাও সকলেই চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় কথাবার্ত্তা বলেন। বর্ম্মা ভাষাও ইহারা জানেন। বাঙালী ভিন্ন অন্য জাতির সহিত বর্ম্মা ও হিন্দী ভাষায় কথা বলেন।

ইহাদিগের মধ্যে ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, গৌতম প্রভৃতি বার রকম গোত্রের ব্রাহ্মণ আছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ইয়াখাইঙ এখানে নাই। শূদ্র-জাতীয় বাঙালী আছে। তাহারা বডিগৌন্ পল্লীর নিকটেই এক বৃহৎ পল্লীতে বাস করিতেছে। বর্ম্মা ভাষায় এই সকল শূদ্র আরাকানীয় বাঙালীদিগকে "ছত্তা" বলা হয়।

ইয়াখাইঙ পওনারাও সামবেদী ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব।

---

(৫) হারভী সাহেবের ব্রহ্মদেশের ইতিহাস ২৬৮ ও ২৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই সকল আরাকানী বন্দীদিগের দ্বারাই মিঙ্গিলা হ্রদ, মিন্গুন মন্দির, সুধর্ম্ম মন্দির, মন্দালয়ের রাজকীয় উদ্যান, অঙ্গুত্তপিলের সুদীর্ঘ খাল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। মণিপুরী বন্দীদিগকেও এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়।

প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতেই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। বাঙালী ব্রাহ্মণদিগের পূজাপদ্ধতি অনুসারেই পূজা আরতি ভোগ ও স্তোত্রপাঠাদি হয়। রাস, ঝুলন জন্মাষ্টমী ও দোলের সময় পওনারা সকলে মিলিয়া নামকীর্ত্তন ও কৃষ্ণলীলাদি অভিনয়ের অনুষ্ঠান করে। যাঁহারা যাজনিক ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন, বা গুরুবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ব্যাকরণ স্মৃতি এমন কি ন্যায়শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। পূর্ব্বে ইঁহারা নবদ্বীপে ও কাশীতে গিয়া শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। এখন মন্দালয়েই সাধারণ শিক্ষার জন্য গুরু পাওয়া যায়। কেহ কেহ বেদ পাঠ করিতে পারেন, কিন্তু মনে হইল উপযুক্ত সংস্কৃতজ্ঞানের অভাবে অর্থবোধ হয় না; মুখস্থ করিয়াছেন মাত্র। ইঁহাদিগের মধ্যে দর্শনের পণ্ডিত নাই। কয়েক জন পওনা পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত, ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি এবং বসুমতী আপিস হইতে প্রকাশিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থ দেখিলাম। যাহাদিগের সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান নাই, তাহাদেরও মায়াবাদ, প্রকৃতি-পুরুষবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও সংস্কার আছে। তৎসম্বন্ধে দুই-চারিটি সংস্কৃত শ্লোকও আবৃত্তি করিতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রে অনেকেই সুপণ্ডিত এবং ঐ ব্যবসাদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। যাজনিক ব্রাহ্মণেরা মন্দালয় ও উচ্চ-ব্রহ্মের বাঙালীদিগের পূজাপার্ব্বণ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ-পরিবার এখন চাল-ডালের দোকান, সাইকেল মেরামতের দোকান, কাঠের কারবার, এমন কি ছাপাখানা খুলিয়াছেন। বাঙালী ব্রাহ্মণ-সন্তানদিগের ন্যায় জুতার দোকান এখনও খোলেন নাই।

ইয়াখাইঙ পওনারা বাঙালী বৈষ্ণব হইলেও নবদ্বীপে তাঁহাদিগের ৺গুরুপাট নাই। ৺কৃপারাম নামক এক জন কুরুক্ষেত্রবাসী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগের গুরু ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে তরল গ্রামে ইঁহার বাসস্থান। তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতা ৺লুচিরাম গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। পুত্র রাধাবল্লভ এখন তাঁহাদিগের গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং তিনিই সম্প্রতি অধিকাংশ ইয়াখাইঙ পওনাদিগের দীক্ষাগুরু।

অন্য এক জন গুরু ৺রামচাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি অযোধ্যাবাসী। তাঁহার পুত্র সুপণ্ডিত ও সাধু পরমানন্দ প্রায় শতাধিক ইয়াখাইঙ পওনার গুরু-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। রাধাবল্লভ ও পরমানন্দ পাঁচ-ছয় বৎসর পর এক-এক বার মন্দালয়ে আগমন করিয়া শিষ্যদিগের সেবা গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সাধুগণ চাঁদার খাতা না লইয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াখাইঙ পওনাদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করিলে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবে।

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয় যে বৃন্দাবনবাসী "অচিন্ত্য রাজগুরু"র কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি মন্দালয়ের বড়িগৌন্-পল্লীনিবাসী প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী উ-দান (বর্ম্মাভাষায় উ-ডানা) মহাশয়ের পিতা। মহারাজ তীবর রাজত্বকালে তিনি রাজগুরু উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ছায়া-ড উপানন্দ বলেন, "বর্ম্মা-রাজাদিগের রাজসভায় বা বর্ম্মাভাষায় রাজগুরু নামক কোনও উপাধি ছিল না; ছায়া-ড ছিল। সম্ভবতঃ ঐ ছায়া-ড শব্দকেই সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া "রাজগুরু" করা হইয়াছে।"*

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন যে রাজগুরু রাধিকানাথের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যথার্থই শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধু পণ্ডিত ছিলেন। রাজদ্বারে ও ইয়াখাইঙ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও অতুল প্রতিপত্তি ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ বর্ম্মা ভিক্ষু ও ছায়া-ডদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনায় রাধিকানাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়; এবং তাঁহাদিগেরই প্রশংসাবাদে মহারাজ মিন্ডন্ রাধিকানাথকে ছায়া-ড উপাধি প্রদান করিয়া রাজপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত করেন। রাজসভা হইতে তিনি বৃত্তি পাইতেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

বড়িগৌন্বাসী ইয়াখাইঙ ব্রাহ্মণেরাও ছায়া-ড শব্দকে রাজগুরু শব্দদ্বারাই অনূদিত করিয়াছেন। তাঁহারা

---

* রাজগুরু উপাধিও রাজসভা হইতে দেওয়া হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা নিরাউঙ্ইয়ান্ ছায়া-ডকে "ন্যায় নিরবী পণ্ডিত পুরমা মহাধর্ম্ম রাজাধিরাজগুরু" উপাধি দেওয়া হইয়াছিল (১৮৫৫ খ্রীঃ)।

বলিলেন, রাধিকানাথ ব্যতীত আরও তিন জন ইয়াখাইঙ বাঙালী ব্রাহ্মণ "রাজগুরু" উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম, রাধামোহন, কৃষ্ণমোহন ও চিন্তামোহন। রাধামোহন ও কৃষ্ণমোহন জীবিত নাই। চিন্তামোহনেরই বর্ম্মা নাম উ-চিন্তা বা উ-ছিন্-ডা। "চিন্ময় বঙ্গে" তাঁহাকেই অচিন্ত্য নাম দেওয়া হইয়াছে। ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

উ-চিন্তার পুত্র উ-হ্লান (উ-ডানা) ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ (পণ্ডিত মাধব, পণ্ডিত লোকেশ্বর, এবং পণ্ডিত গোবিন্দ) প্রতিবৎসর মন্দালয় নগরে ব্রহ্মদেশের পঞ্জিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণ করিতেছেন। ফলিত জ্যোতিষেও ইঁহাদিগের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। শ্রীযুক্ত উ-হ্লানের বাড়ীতে প্রাতে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে বর্ম্মা, হিন্দুস্থানী-বাঙালী, ও এংলো-বার্ম্মানগণ অনবরত ভাগ্যফল গণাইবার জন্য যাতায়াত করে। উপরোক্ত পঞ্জিকায় লিখিত আছে—উ-চিন্তা ইংরেজ সরকার হইতেও স্বর্ণপদক (ঘড়ি) এবং সার্টিফিকেট অব অনার পাইয়াছিলেন।

৺জলেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক এক ইয়াখাইঙ পণ্ডিত বড়িগৌন্ পল্লীতে বাস করিতেন। তিনি নবদ্বীপ হইতে ব্যাকরণতীর্থ ও স্মৃতিরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্যও শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রাতা জলেশ্বরের অকাল-মৃত্যুতে তিনি উপাধি না লইয়াই মন্দালয়ে ফিরিয়া আসেন। ইনি সংস্কৃত জানেন এবং শুদ্ধমতে পূজা ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন।

পণ্ডিত কমলেশ্বরও (ছায়া কমলে) জ্যোতিষ-বিদ্যায় পণ্ডিত। যাজনিক ব্যবসাও করেন। শুদ্ধ বাংলা বলেন। তিনি অনেক দিন নবদ্বীপে ছিলেন এবং ভাটপাড়ার পণ্ডিতদিগের সহিত পরিচিত আছেন। তিনি বলিলেন যে বঙ্গদেশের পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও বটতলার চণ্ডীচরণ বিদ্যাভূষণের সহিত বড়িগৌন্‌বাসী আরাকানী ব্রাহ্মণদিগের যথেষ্ট পত্রব্যবহার ছিল।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী উ-কৌড়ি এবং উ-হ্না বড়িগৌনের প্রতিপত্তিসম্পন্ন পওনা। উ-হ্না সম্প্রতি বৃন্দাবনে গিয়াছেন।

পণ্ডিত মহানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সম্মুখে বৃহৎ নাটমন্দির আছে। রাস ও দোলের সময় ঐ নাটমন্দিরে প্রতিবৎসরই কৃষ্ণলীলার কোন-না-কোন অংশ অভিনীত হয়। মহানন্দ পণ্ডিত বলিলেন, "ঐ কৃষ্ণলীলার পুস্তক কলিকাতা হইতে আনাইয়া অভিনেতারা নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে।" ইয়াখাইঙ পওনারা নিজেদের মধ্যে চট্টগ্রামের কথ্য ভাষা ব্যবহার করিলেও গানে ও অভিনয়ে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে প্রয়াস করেন। অভিনয়ের পাত্রপাত্রীগণ সকলেই বঙ্গদেশীয় যাত্রাওয়ালাদিগের ন্যায় বাদ্‌লা ও চুম্‌কীর কার্য্যযুক্ত বিচিত্র বসন এবং তদনুরূপ চূড়া, মুকুট, কুণ্ডল, মালা, নূপুর ও বাজু প্রভৃতি অলঙ্কার পরিধান করে। কৃষ্ণ রাধা ও সখীগণের মুখমণ্ডল অলকাতিলকায় সুশোভিত করা হয়। ইয়াখাইঙ শ্রীকৃষ্ণ, বঙ্গদেশীয় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কিশোর, কৃষ্ণবর্ণ এবং অঙ্গাবরণশূন্য; শিরে শিখিপুচ্ছযুক্ত স্বর্ণচূড়া, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে বনমালা ও কটিদেশে পীতবসন। যে বালকেরা রাধা ও সখীর ভূমিকা গ্রহণ করে, তাহাদিগকে এখন বিলাতী রং, পাউডার, অলক্ত ও কজ্জলাদি দ্বারা সুন্দররূপে সাজাইয়া দেওয়া হয়। গানে সাধারণতঃ বিভাস, বেহাগ, ধানেশ্রী, ত্রিলোক-কামোদ ও সিন্ধু প্রভৃতি রাগরাগিণী ব্যবহৃত হয়। মুদারায় মা-কে সা ধরিয়া ইহারা উচ্চস্বরে গান করে।

ইয়াখাইঙ্ পওনাদিগের গায়ের রং বাঙালীদিগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। গৌরবর্ণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক আমি দেখি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাহারা গৌরবর্ণ তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যায়। চেহারা মঙ্গোলীয় ছাঁচের নয়। বাঙালী-দিগেরই ন্যায়। তথাপি সূক্ষ্মভাবে দেখিলে মনে হয় বাঙালীদিগের মতও নয়। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সুদর্শন মূর্ত্তি কম।

স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানশীন নহে; হাটে বাজারে যাতায়াত করেন। কেহ কেহ দোকানে ক্রয়-বিক্রয়ও করেন; কিন্তু বর্ম্মা বা এংলো-ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদিগের

ন্যায় সর্ব্বসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ বা মেলা-মেশা করেন না। যৌন অপরাধ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা ইহাদিগের মধ্যে মোটেই নাই। স্ত্রীলোকেরা বাঙালী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় শাড়ী পরিধান করেন না; লুঙ্গি ও এঞ্জি ব্যবহার করেন। গৃহে এঞ্জিও (জামা) ব্যবহার করেন না; কটিদেশের লুঙ্গি বক্ষোদেশের উর্দ্ধে পরিধান করিয়া গুলফ পর্য্যন্ত আবৃত রাখেন। এ বেশ অবশ্যই বাঙালী ও বর্ম্মা উভয় জাতির চক্ষেই অসভ্যতাসূচক; কিন্তু পওনারা নাছোড়বান্দা। তাহারা বলে, 'ব্রহ্মের রাজা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া মন্দালয়ে আনিবার পর স্ত্রীলোকদিগকে শাড়ী ছাড়িয়া লুঙ্গি পরিতে আদেশ দিয়াছিলেন।' ব্রহ্মদেশে তখন বাঙালী শাড়ী নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত না। কিন্তু পওনা পুরুষেরা সাদা কাপড়ের ধুতি ও বর্ম্মা এঞ্জি বা বাঙালী ঢোলা জামা ব্যবহার করেন। কেহ কেহ কোট-শার্টও পরেন, কিন্তু তাহা শিষ্টতাসূচক নহে।

ইয়াথাইঙ্ পওনারা বাঙালীদিগের মতই কেহ বা নিরামিষভোজী, কেহ বা মৎস্যাশী। বৃথা মাংস ভোজন করেন না।

পশুবলির প্রথা নাই। পণ্ডিতেরা সকলেই নিরামিষ খান; অথচ পওনা বালকেরা বড়িগৌন্ পোষ্ট-আপিসের নিকটবর্ত্তী খালে এবং আউঙপিন্লের জলাশয়ে মৎস্য ধরিয়া বেড়ায়। হয়ত তাহারা ব্রাহ্মণ নয়—ইয়াথাইঙ শূদ্র। কিন্তু গলায় উপবীত দেখিয়াছি।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের রাস-উৎসবে সিদ্ধেশ্বর ঠাকুরের বাড়ীতে প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। মন্দালয়ের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র, উকীল ৺দুর্গাদাস দত্ত ও ৺শরৎকুমার গুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। আহারের পূর্ব্বে প্রথমতঃ প্রসাদ (অর্থাৎ ভিজানো মুগ, মাখন, মিছরি, নারিকেল কোরা, বাতাসা, আখ ও কলা) পরিবেশিত হইয়াছিল। তৎপরে লুচি, ডাল, বেগুনভাজা, আলু-কুমড়ার চচ্চড়ি, আমড়ার অম্বল, দই এবং যথেষ্ট পরিমাণে পায়স পাইয়াছিলাম। খাস বঙ্গদেশের ব্যঞ্জনাদির ন্যায়।

জপ বা পূজা করিবার সময় ব্রাহ্মণেরা বাঙালীদিগের মতই জোড়াসন করিয়া বসেন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা বর্ম্মা স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নিতম্বের নীচে গুল্ফ সংরক্ষিত করিয়া, দুই জানু সম্মুখে রাখিয়া "থিখো" আসনে বসিয়া জপ ও পূজা করেন। জপের জন্য তুলসীর মালা ব্যবহৃত হয়; কপালে তিলক কাটা হয়, কেহ কেহ নামাবলীও ব্যবহার করেন।

সৎ ব্রাহ্মণদিগের গৃহে কুকুর দেখি নাই। গোশালা আছে; কিন্তু মিউনিসিপালিটির তাড়নায় গোশালা এখন গো-শূন্য। আউঙপিন্লের পারে অর্থাৎ শহর হইতে অনেক দূরে, গরুগুলিকে বাসা দেওয়া হইয়াছে। শূদ্র ইয়াথাইঙ্রা ঘোড়া ও ঘোড়াগাড়ী রাখে। গাড়ী চালাইবার জন্য বর্ম্মা গাড়োয়ান রাখা হয়।

মণিপুরী পওনা

১৭৫৭, ১৭৬৪ এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ম্মারা মণিপুর আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক মণিপুরী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, লৌহকার, স্বর্ণকার ও তন্তুবায়দিগকে সপরিবারে বন্দী করিয়া ব্রহ্মদেশে আনয়ন করে।

বর্ম্মারা মণিপুরী ক্ষত্রিয়দিগকে অশ্বারোহী সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া লয়; পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে রাজসভায় রাজার স্তুতিগান ও মঙ্গলোচ্চারণের জন্য নিযুক্ত করে; প্রায় এক সহস্র তন্তুবায়কে অমরপুর ও মন্দালয়ে বস্ত্রনির্ম্মাণের জন্য নিয়োজিত করে; স্বর্ণকারদিগকে রাজগৃহের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র নির্ম্মাণের জন্য রাখে, লৌহকারদিগকে ব্রহ্ম-সৈন্যের অস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য এবং অবশিষ্ট বন্দী পুরুষদিগকে পদাতিরূপে আসাম, চেঙ্মাই, চীন ও শ্যামদেশের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করে।

বর্ম্মারা প্রচলিত ভাষায় এই সকল মণিপুরীদিগকেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পওনা নামে অভিহিত করে বটে, কিন্তু মণিপুরী ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতপক্ষে মণিপুরী পওনা।

ব্রাহ্মণেরা সকলেই নিরামিষভোজী বৈষ্ণব এবং বঙ্গীয় গোস্বামিগণের শিষ্য। কিন্তু ব্রহ্মদেশে আনীত হইবার পর বঙ্গীয় গোস্বামিগণ আর ব্রহ্মদেশের শিষ্যবাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই। শিক্ষিত মণিপুরী ব্রাহ্মণগণ কিছু কিছু বাংলা বলিতে পারেন এবং বাংলা বইও পড়িতে



মন্দালয়ের প্রসিদ্ধ পওনা গৃহস্থ-নর্ত্তকী লক্ষ্মী দেবীর মণিপুরী নৃত্য



লক্ষ্মী দেবীর মণিপুরী নৃত্য

পারেন। সংস্কৃতও জানেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে ও জ্যোতিষে ইঁহাদিগের প্রগাঢ় অনুরাগ ও অধিকার আছে। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বে নবদ্বীপ বা বারাণসী গিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু এখন জীবন-সমস্যার অসহ্য কশাঘাতে শিক্ষাস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে।

মন্দালয়ের জে-জো বাজারের পশ্চিমে, মন্দালয়ের উত্তর ভাগে, তানুনবিউ, টুন্‌ডোন্, এবং তিন্‌বান্ গৌন গ্রামে মণিপুরী ব্রাহ্মণেরা এখন বাস করিতেছেন। অধিকাংশ লোকই কৃষিবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি এবং জ্যোতিষ-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যেও অঙ্গ-অভিমর্দ্দনপটু পওনা ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন।

মণিপুরী নৃত্য

মণিপুরী ব্রাহ্মণদিগের আকৃতি কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইলেও বাঙালী ব্রাহ্মণদিগেরই ন্যায়। গায়ের রং সাধারণতঃ গৌর। কাল রঙের ব্রাহ্মণ প্রায়ই দেখা যায় না। পরিধান করেন বাঙালীদিগের ন্যায় সাদা ধুতি এবং বর্ম্মাদিগের ন্যায় সাদা এঞ্জি। গলায় তুলসীর মালা রাখেন এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন।

ইঁহাদিগের স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী ও সুগঠনা। চক্ষু ও নাসিকা বঙ্গীয় আর্য্যদিগের ন্যায়। গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ গৌর। মুখশ্রী লাবণ্যযুক্ত। সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে ও পবিত্র ভাবে থাকেন, কিন্তু বর্ম্মা-স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় রঙীন লুঙ্গি ও এঞ্জি পরিধান করেন। শিরোদেশের কবরীও বর্ম্মা-স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে সংস্থাপিত রাখেন। মণিপুরী যুবতীগণ নৃত্য ও গীতে ব্রহ্মদেশের ভারতীয় সমাজে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। নৃত্যকালে ইঁহাদিগের বিলাসব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী, রুচিসম্পন্ন অঙ্গরাগ, এবং অপ্রচুর অথচ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন বেশভূষা



লক্ষ্মী দেবীর মণিপুরী নৃত্য

বঙ্গদেশীয় পূর্ব্বতন নর্ত্তকীদিগের অপেক্ষাও মনোহারী। লীলায়িত পদসঞ্চালন, লালিত্যপূর্ণ কর-চরণ-ভঙ্গী এবং ছন্দ-বিশিষ্ট ও তাল-লয়-সংযমিত বাহু-সংধুননে ইহাদিগের নৃত্য-পদ্ধতি সুষমাসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা নৃত্যকালে বর্ম্মা-নর্ত্তকীদিগের ন্যায় লুঙ্গি এবং থোডাউঙ্ এঞ্জি ব্যবহার করিত; গত দশ-বার বৎসর হইতে রেশমী শাড়ী ব্যবহার করিতেছে।

নানা জাতীয় ভারতীয় শ্রমিক ও ব্যবসায়িগণের নিমন্ত্রণে নৃত্য করিতে হয় বলিয়া, শৃঙ্গাররস-প্রধান লাস্য-নৃত্যেই ইহারা সবিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাঙালীদিগের দুর্গাপূজা, কালীপূজা বা লক্ষ্মীপূজায় ইহারা যে ভক্তিরসপূর্ণ গান ও নৃত্য করে তাহা যথার্থই উপভোগ্য। ঐ নৃত্য মন্দগতিসম্পন্ন, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং সাত্ত্বিক ভাবোদ্দীপক। ইহাতে শ্যামদেশীয় পূর্ব্বতন নৃত্যের রেশ পাওয়া যায়।

গান ও নৃত্যই এই সকল নর্ত্তকীদিগের ব্যবসা। ব্রহ্মদেশে বাঙালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, সুর্ত্তি, মান্দ্রাজী, গুর্খা ও নৈনিতালী প্রভৃতি নানা রকমের লোক আছে এবং এই সকল লোকদিগের প্রীতির জন্য মণিপুরী নর্ত্তকীরা নানা রকম ভাষার নানা রকম গান শিক্ষা করে। গানের অর্থ ইহারা জানে না; কিন্তু উপযুক্ত ছন্দ, ঝোঁক ও টান দিয়া শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। উচ্চারণ যথাসাধ্য।

১৯০৯ সনে রেঙ্গুনের ২য় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে এক মারপিটের মোকদ্দমা হয়। ফরিয়াদী ছিলেন আহাম্মদ নামক এক খালাসী। আসামীরাও জাহাজের খালাসী। বোটাডাউঙ পল্লীতে কোনও উৎসব উপলক্ষে নানা জাহাজের বাঙালী খালাসীরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রাত্রিতে পওনা-নাচ হয়। ঐ সময়ে পওনা-নর্ত্তকী যে-গান গাহিয়াছিল, সেই গানে উত্তেজিত হইয়া আহাম্মদ ও তাহার দলের লোকেরা মারপিট আরম্ভ করে; কিন্তু অন্য পক্ষ পূর্ব্বেই লাঠি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা আহাম্মদের দলকে লাঠির আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দেয়। তার পরই হয় মোকদ্দমা। রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্র সেন ও এস্. সি. দাশ মহাশয় উভয় পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন।

যে-গানটির জন্য এই মারামারির সূত্রপাত হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। পওনা নর্ত্তকীকে প্রায় আট-নয় দিন মহলা দিয়া এবং ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিয়া ঐ গান তাহাকে শিখান হইয়াছিল। জবানবন্দীতে নর্ত্তকী বলিয়াছিল যে গানের অর্থ সে জানিত না। চট্টগ্রামের এক ওস্তাদ তাহাকে পূর্ব্বোক্ত ঐ উৎসবের জন্য ঐ গানটি শিখাইয়া দেয়।

গানটিকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া কোর্টে পাঠাইতে হইয়াছিল। আমি তখন চীফ-কোর্টের বাঙালী দোভাষী ছিলাম। গানটি এই—

আমার সনে ভাঙ্গি দিলি।
(ও আহাম্মক আমার সনে ভাঙ্গি দিলি)

* * *

দিল-দরিয়ার মাইধ্যে ছিল মণিমাণিক্যের ফুল,
পিয়ার লাগি, দিলাম রাখি, ভাঙলো আমার কুল
(আরে ও আহাম্মক ভাঙলি আমার কুল)



ধনরত্ন নামক ভিক্ষাজীবী ইয়াথাইঙ পওনা ব্রাহ্মণ
ইঁহার ভিক্ষার ঝুলি নাই ; তদ্ভিন্ন, যে-বেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান
ও সামুদ্রিকাদি শাস্ত্রের সাহায্যে ভিক্ষা লাভ করেন সেই
বেশে ছবি তোলা হইয়াছে। দক্ষিণ হস্তে মঙ্গল শঙ্খ,
বাম হস্তে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় গ্রন্থ



মন্দালয়ের ইয়াথাইঙ পওনা ব্রাহ্মণদিগের গুরু—পুত্র ও কনিষ্ঠ
ভ্রাতা সমেত উপবিষ্ট। বালকের গাত্রে নামাবলী লক্ষণীয়।

আমার এ-কূল ও-কূল দু-কূল গেল,
সার হলো গো লাজের ডালি।
(তুই আমার সনে ভাজি দিলি)
আরে ও আহাম্মক আমার সনে ভাজি দিলি।

কে ভাজি দিয়াছে, বা কি প্রকারে ভাজি দিয়াছিল, তাহা এই মোকদ্দমায় প্রকাশিত হয় নাই। ফরিয়াদী আহাম্মদ তাহার সাক্ষ্যে বলে যে আহাম্মক শব্দ তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া গানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল এবং পওনা-নর্ত্তকী অর্থ না-জানিয়া আহাম্মক শব্দকে এরূপ ভাবে উচ্চারণ করিতেছিল যে তাহাতে আহাম্মদই শুনা যাইতেছিল।

ব্রহ্মদেশে হিন্দু মণিপুরীদিগের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমিয়া যাইতেছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৪৭২৭ পুরুষ এবং ৬৮০৫ স্ত্রীলোক। ১৯১১ সালের আদমসুমারীতে মাত্র ১৬২৬ পুরুষ ও ১৭২৭ স্ত্রীলোক পাওয়া গিয়াছিল। ১৯২১ সালের রিপোর্টে ইহাদিগের পুরুষের সংখ্যা আরও কমিয়াছে দেখা যায়। সম্ভবতঃ দারিদ্র্য ও জীবিকার্জ্জনোপযোগী ব্যবসায়ের অভাবই এইরূপ সংখ্যাহ্রাসের প্রকৃত কারণ। যাহারা তন্তুবায়-ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল তাহারা প্রথমতঃ সচ্ছল অবস্থাতেই ছিল; কিন্তু গত কুড়ি বৎসর যাবৎ তাহারা বর্ম্মা-দালালদিগের নিকট হইতে দাদন লইয়া এবং তাহাদিগেরই নির্দ্ধারিত দামে বস্ত্র বয়ন করিয়া, শুদ্ধ পরিশ্রম করিয়াই ক্লান্ত হইতেছে, গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে না। সস্তা জাপানী ও চীনা রেশমী কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও মণিপুরীদের নির্ম্মিত বর্ম্মা-রেশমী কাপড় এখন আর বিক্রী হইতেছে না। অথচ বর্ম্মার কাপড় অনেক উৎকৃষ্ট, সুতরাং দামও বেশী। বর্ম্মারাও এখন ক্রমে দরিদ্র হইতেছে। তাহারা সস্তা দামে জাপানী রেশমী কাপড় কিনিয়াই জাঁকজমক করিতেছে।

দুঃখের বিষয়, রাজকর্ম্মচারীরা এই সংখ্যাহ্রাসের হেতু প্রদর্শন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—

• Many of the recent Kathe have become much Burmanised and indeed the greater part have been so completely absorbed by the Burmese, that they describe themselves as Burman Buddhists and form a large population in Mandalay and Amarapura. (Grantham, I. C. S.)



বৃন্দাবনবাসী রাজগুরু অচিন্ত্য ও তাঁহার ভ্রাতা, মান্দালয়ের অধিবাসী প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী উ কৌড়ি (নামাবলীধারী)

প্রকৃতপক্ষে ইহারা অন্নকষ্টেই জাতিগত আচার ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বর্ম্মা হইয়াছে। মণিপুরীদিগের মধ্যে এমন কোনও লোক নাই যে কেহ তাহাদিগের অন্নসমস্যার মীমাংসা করিতে পারে। অর্থের আবশ্যকতাই বেশী। ইহারা পরিশ্রমী এবং সততাজ্ঞানসম্পন্ন লোক।

পওনা ব্রাহ্মণগণ দরিদ্র। অনেকে কেবল মাত্র ভিক্ষালব্ধ চাউল দ্বারাই জীবনধারণ করে। যিনি জ্যোতিষ জানেন, তিনি বাহিরে গিয়া দুই-চারিটি পয়সা সংগ্রহ করিতে পারেন বটে, কিন্তু একবার এক গৃহস্থের নিকট পয়সা পাইলে, ছয় মাসের মধ্যে আবার তাহার গৃহে পয়সা ভিক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। তথাপি পওনা-ভিক্ষুকেরা গৃহস্থের অসন্তোষ বা ভ্রুকুটি সহ্য করিয়াও পুনর্ব্বার তাহারই দ্বারস্থ হইতেছে। কিন্তু দরিদ্র হইলেও পওনারা চোর বা প্রতারক নহে।

ফলিত জ্যোতিষে বৌদ্ধ বর্ম্মাদিগের গভীর আস্থা আছে, এবং বিবাহাদি মঙ্গলানুষ্ঠানেও পওনা ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শ সর্ব্বদাই গৃহীত হইতেছে।

মহারাজ তীবর রাজত্বকালে দুই জন বাঙালী ব্রাহ্মণ রাজসভায় অতিশয় সম্মান সংকারে গৃহীত হইয়াছিলেন। উটিন্-কৃত "ব্রহ্মদেশের রাজাদিগের ইতিহাস" গ্রন্থের ২য় ভাগে ৪৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"... মাসের কৃষ্ণদশমী তিথিতে, প্রাতঃকালে, নীলা-থান-তবিন ড কক্ষের পূর্ব্বদ্বার দ্বারা বঙ্গদেশবাসী হিন্দুবংশজাত নারায়ণ মুখার্জ্জি বাহাদুর এবং গোপীমোহন চাটুর্য্যে প্রভৃতি বাঙ্গালীগণ রাজদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ২০০৲ টাকা মূল্যের একটি পদ্মরাগ-অঙ্গুরী, ১৫০৲ মূল্যের অন্য একটি অঙ্গুরী, দশটি স্বর্ণমুদ্রা, দুই জোড়া স্বর্ণবলয়, বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র, এবং অন্যান্য অনেক মূল্যবান্ দ্রব্য উপঢৌকন দেওয়া হয়।"

কথিত আছে, নারায়ণ মুখার্জ্জি একটি বৃহৎ ভূর্জ্জপত্রে কয়েক খণ্ড গঙ্গামৃত্তিকা বাঁধিয়া মহারাজ তীবকে নজর-স্বরূপে দিয়াছিলেন। ব্রহ্মরাজাদিগের বিশ্বাস ছিল যে বঙ্গদেশ তাঁহাদিগেরই রাজ্য; ইংরেজ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। (হারভী সাহেবের ইতিহাস, ২৯৩ পৃষ্ঠা)।

ইউল সাহেব ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মিন্ডনের রাজসভায় ব্রিটিশ-দূতরূপে আগমন করেন। মেজর ফেয়ারও তখন তাঁহার সহিত মন্দালয়ে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন :—

"মহারাজ (মিনডন্) সিংহাসনে উপবেশন করিলে পর আমরা টুপি খুলিয়া ফেলিলাম। ব্রহ্মদেশীয় সমস্ত পারিষদগণ সভাভূমিতে মস্তক নত করিয়া করজোড়ে মহারাজকে প্রণাম করিল।... শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত স্বর্ণপত্রশোভিত শ্বেতোষ্ণীষধারী আট জন পওনা ব্রাহ্মণ পার্শ্বদেশস্থ চার্ন্দিকের অন্তরাল হইতে সংস্কৃত ভাষায় স্তোত্র ও আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন। তৎপরে বর্ম্মা-পওনাগণ বর্ম্মাভাষায় পূর্ব্বোক্তরূপ গীতিচ্ছন্দযুক্ত স্তোত্র পাঠ করিলেন।...রাজার (মিনডনের) রাজসভায় পওনা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুই জন ব্রাহ্মণ বারাণসী হইতে আনীত হইয়াছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মিনডনের পিতা মহারাজ তারাওডী বঙ্গদেশ হইতে আট জন ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের পরিবারসহ অমরপুরে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে ইঁহাদিগের জ্ঞানবত্তা ছিল। ইঁহারা রাজকীয় উৎসবাদি অনুষ্ঠানের জন্য শুভকাল নির্ণয় করিয়া দিতেন।" (ফেয়ার)

মহারাজ মিনডনের রাজসভায় ভগবানদীন নামক এক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতকে বারাণসী হইতে আনয়-

করা হইয়াছিল। তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে ব্রহ্মদেশীয় পঞ্জিকার সংশোধন করিয়া মলমাস-নির্দ্ধারণের জন্য নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। (বৃহৎ জাতাকা)

আর্থিক অভাবের ফলে ব্রহ্মদেশের পওনাদিগের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, বঙ্গদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা তাহা হইতেও শোচনীয়। সর্ব্বত্রই এক মর্ম্মন্তুদ চীৎকার।

মেমিও।

[নৃত্যব্যবসায়িনী যে তরুণীর তিনটি ছবি দেওয়া হইয়াছে, তিনি মণিপুরী পওনা ব্রাহ্মণদিগের এক কন্যা। ইঁহারা গৃহস্থ। ইঁহারা বলেন, আমরা নৃত্যের ব্যবসা করি বটে, কিন্তু আমরা গৃহস্থ, গণিকা নহি ; আমাদের ফোটো আত্মীয়স্বজন ভিন্ন অন্য কাহাকেও দিই না। যাহার ছবি দেওয়া হইল তাঁহার নাম লক্ষ্মী দেবী। থোক কিছু প্রণামী দিয়া ও ফোটোর খরচ দিয়া অনেক অনুনয়ের পর প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তাঁহার ছবি তুলাইতে পারিয়াছেন। ইঁহারা খাটি ব্রাহ্মণের মত খাওয়া দাওয়া করেন, ব্রাহ্মণেতর কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। নৃত্যের আসরে নানা জাতির লোক থাকে বলিয়া সেখানে চা বা জল গ্রহণও করেন না। লক্ষ্মী দেবী বাংলা, হিন্দুস্থানী, হিন্দী ও পঞ্জাবী গান করেন। গান করেন ভাল। এখনও অবিবাহিতা আছেন।]

সুবর্ণ-সন্ধানে

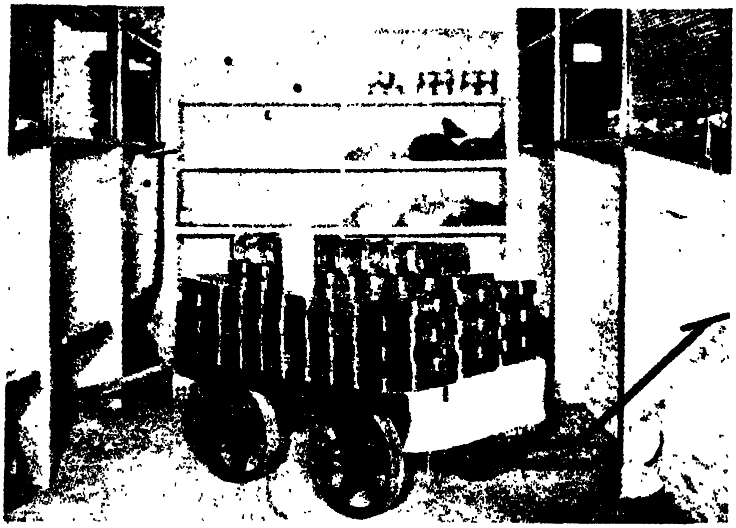
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

আদিম যুগের মানব যখন প্রস্তর, কাষ্ঠ ও জৈব পদার্থের গণ্ডী পার হইয়া ধাতুর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় সোনা ও তামার সহিত। প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণরেণুর পরিচয় সে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমেই পাইয়াছিল, কেন-না জড় জগতের সাধারণ ধাতুগুলির মধ্যে স্বর্ণই স্বরূপে বিরাজ করে। প্লাটিনম ও আরও দুই-একটি দুষ্প্রাপ্য ধাতুও মৌলিক ভাবে জগতে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সেদিনকার মাত্র।

আগুনের সংস্পর্শে আসিবার পর ও অগ্নিদীক্ষার ফলে মানবসভ্যতার উষাকাল আরম্ভ হয়। তাহার পর ধাতুবর্গের সঙ্গে মনুষ্য-সংসারের আদান-প্রদান সুরু হইল। সেই সময়েই, প্রস্তর ও ধাতু-যুগেরও মধ্যভাগে, তাম্র ও কাংস্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণের আদর-অভ্যর্থনা চলিতে থাকে ; উজ্জ্বল বর্ণ, নমনীয় সহজ-গঠন গুণ, পঞ্চভূতের ক্রিয়ায় বিকারের অভাব—এই সকল কারণে মানুষ সোনাকে প্রথম হইতেই ধাতুশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করে এবং সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ রূপ ও গুণের সমাদর যে বাড়িয়াই চলিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্বর্ণের ক্ষমতা এখন প্রায় অসীম, সোনার জন্য মানুষ না-করে এ-রকম কাজ খুবই কম। অথচ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রভু বুদ্ধের বিশ্রামস্থল জেতবন ক্রয় করিতে অনাথপিণ্ডদ সমস্ত রম্য কাননভূমি স্বর্ণমুদ্রায় আচ্ছাদিত করিয়া সেই স্বর্ণরাশি মূল্যস্বরূপ দিয়াছিলেন। তখন জমির দাম কি-ই বা ছিল, বিশেষতঃ বিশ্রাম- বা প্রমোদ- কানন-ভূমির। অথচ ঐ বিরাট স্বর্ণদান যে সত্যই ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনকার দিনে ঐরূপ ঘটনা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন কি ?

সোনার খোঁজ ও স্বর্ণ-আহরণের চেষ্টা কত শত সহস্র বৎসর চলিয়াছে তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে আজ পর্য্যন্ত যে-সকল অতি প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় তাহার ধ্বংসাবশেষ হইতে আমরা উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই দেখা গিয়াছে যে অলঙ্কার-রূপে বা ধনীর গৃহসজ্জার অঙ্গরূপে ধাতুশ্রেষ্ঠ



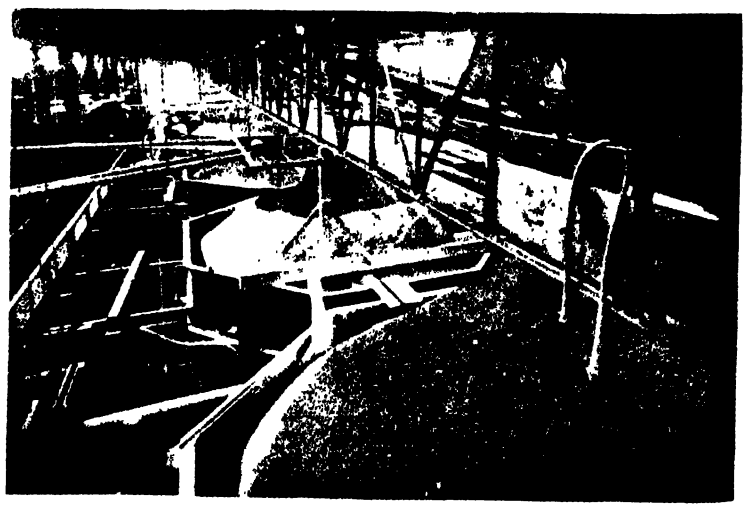
কানাডার স্বর্ণখনিসমূহের দশ দিনের কার্য্যের ফল। প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের সোনা

লঘুভার পদার্থ ধুইয়া যাইত এবং স্বর্ণকণা গুরুভার হওয়ায় পশমের ভিতরে আটকাইয়া থাকিত। বহু দিন এইরূপ করিলে পরে মেষচর্ম্মের পশম ক্রমে স্বর্ণময় হইত। সেইগুলি লুঠ করিবার জন্যই যেসন ও তাহার সঙ্গী গ্রীক দস্যুর দল সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। এখনও, দক্ষিণ-আফ্রিকার ট্রান্সভাল অঞ্চলে পশমের কম্বলে ঐ ভাবে স্বর্ণ আহরণ করা হয়। লেখনীর ক্ষমতা ও কবি-কল্পনা প্রায় স্বর্ণের শক্তির মতই প্রবল, তাই বোম্বেটে যেসন ও অসভ্য দস্যু আলেকজাণ্ডার আজ পৌরাণিক বীরের গৌরবময় বেশে ভূষিত!

স্বর্ণ বিরাজ করিতেছেন। সুমের জাতির লীলাভূমি উর, সিন্ধুনদের অতি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র মোহেনজো-দড়ো—যাহার অধিবাসীদিগের স্মৃতির লেশমাত্রও এখন বর্ত্তমান নাই—ঈজিপ্টের প্রাচীনতম রাজ্যের সমাধি-ভূমিতে, অসুর, বাবিল, ক্রীট, মিসোয়া ইত্যাদি প্রাচীন সভ্য জাতির রাজ্যে, সকল স্থলেই স্বর্ণের আদর দেখা গিয়াছে।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে "গোল্ডেন ফ্লীস্" (স্বর্ণময় মেষচর্ম্ম) অধিকার করিবার অভিযানের গল্প সুপ্রসিদ্ধ। পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভূষণ-রঞ্জন বাদ দিলে যাহা দাঁড়ায় তাহা এই, ইহা খ্রীঃ-পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রীক বোম্বেটেদের লুঠতরাজের কথা, ইহাই আসল ব্যাপার। সেই সময় আর্ম্মেনিয়ার নদীর স্বর্ণ আহরণের উপায় ছিল। নদীর বালু মেষচর্ম্মে চালিয়া তাহা নদীর জলে ধোওয়া। জলের স্রোতে বালুকণা ইত্যাদি

অথচ এই যে সোনা, যাহার জন্য এত দেশ লুণ্ঠিত ও দলিত হইয়াছে, কত কোটি কোটি নিরীহ লোকের রক্তে নদী বহিয়াছে, কত শত শত জনপদ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, সেই সোনা জগতের প্রায় সকল দেশ ছাইয়া, সর্ব্বঘটে বিরাজ করিতেছে। এহেন প্রস্তর-স্তর নাই যাহা সম্পূর্ণ স্বর্ণশূন্য, নদীগর্ভের বালুকায়, সমুদ্র-সৈকতে,



সোনার খনিতে কলের যাতায় পেষা স্বর্ণময় প্রস্তরচূর্ণ ঢালা হইতেছে



সোনার খনির ভিতর প্রচণ্ড বায়ুচাপে চালিত খনন-যন্ত্র দিয়া স্বর্ণ-প্রস্তর-স্তর কাটা হইতেছে

সমুদ্রের জলে, লৌহ, তাম্র, দস্তা, টিন, সীসা ইত্যাদি ধাতুর প্রত্যেক খনিতে এমন কি জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি খনির কয়লাতে পর্য্যন্ত সোনা পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলেয়েফ হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে সমুদ্রের জলে যে-স্বর্ণ দ্রব অবস্থায় আছে তাহার পরিমাণ প্রায় ত্রিশ হাজার কোটি মণ। সুতরাং মনে হয় বরুণদেবের রাজকোষাগার কুবেরের ভাণ্ডার অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। এক কথায় এ জগৎ স্বর্ণময়। দুঃখের বিষয় এইরূপে ব্যাপ্ত যে সোনা, তাহা কুড়াইবার মজুরি পোষায় না বলিয়াই লোকে ফেলিয়া যায়। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা এত সূক্ষ্মভাবে থাকে যে, অণু অণু করিয়া সংগ্রহ করিতে যে সময় ও পরিশ্রম লাগে তাহাতে মূল্য হিসাবে "পড়তা" পড়ে না। তবে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে, প্রকৃতিদেবীর লীলাখেলায় আগ্নেয়গিরির আগুন, বাড়বানলের অত্যুষ্ণ খনিজ দ্রবপূর্ণ জলস্রোত বা তুষার-নদের প্রচণ্ড ঘর্ষণযন্ত্র, মানুষের কাজ বিনা পয়সায় করিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ পাথরের ভিতরের সোনা গলাইয়া বা দ্রব করিয়া কিংবা প্রস্তরস্তর চূর্ণ করিয়া এবং তাহাকে পরে তুষার-গলা জলে ধুইয়া, স্থানে স্থানে স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ করে এই সকল যক্ষের ধনের সন্ধান। যেখানে তাহার খোঁজ পাওয়া যায়, তা উত্তর-মেরুর হিমময় তুষারাচ্ছাদিত সমুদ্র-সৈকত বা দুর্গম গিরিনদবনসঙ্কুল নিউগিনির জঙ্গল যাহাই হউক না কেন, শত সহস্র স্বর্ণলোলুপ শ্বেতাঙ্গ, পীতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সেখানে উপস্থিত হইবেই।



খনির ভিতর স্বর্ণময় পাথর কাটিয়া একত্র করা হইতেছে

এখন পৃথিবীর স্বর্ণপ্রসূ অঞ্চলগুলির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে। বাকী এক-তৃতীয়াংশের অর্দ্ধেকের বেশী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, তাহার পর রুশদেশ, মেক্সিকো এবং অন্য অনেক অঞ্চল। দুঃখের বিষয়, এই অতিসভ্য যুগে স্বর্ণরক্ষা স্বর্ণসঞ্চয় করার চেয়েও দুষ্কর



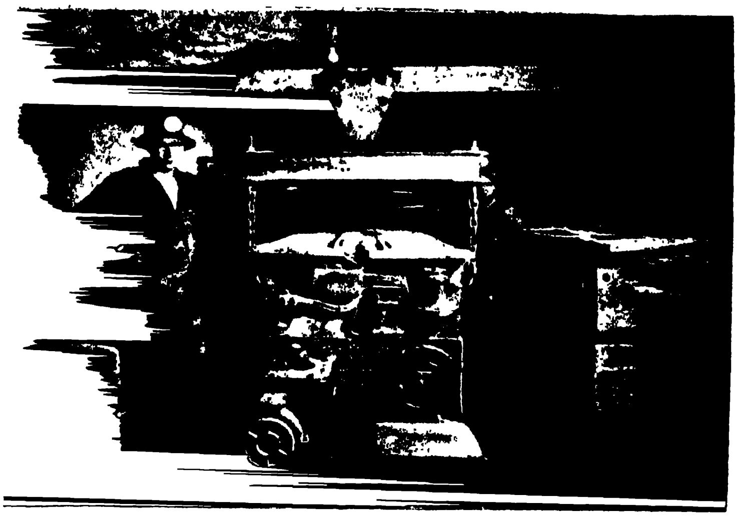
নিউগিনির স্বর্ণবহা নদীর বুকে সোনা ধোলাই ও আহরণের ছবি

ব্যাপার, নহিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিত না।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের স্বর্ণসম্পদ জগদ্বিখ্যাত ছিল। ইদানীংও যেরূপ জলস্রোতের মত স্বর্ণপ্রবাহ এদেশ ছাড়িয়া 'পাউণ্ড ষ্টার্লীং' নামক মুদ্রার মান-ইজ্জৎ রক্ষার জন্য বিদেশযাত্রা করিয়াছে ও করিতেছে তাহাতে মনে হয় সে-প্রসিদ্ধির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তবে এ-দেশের সোনার খনির এখন যেরূপ ব্যবস্থা ও অবস্থা তাহাতে ঐ রপ্তানিতে এ-দেশের কোন কোন বণিক-সম্প্রদায়ের উদরের পরিধির ও সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রীতির বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যের মানরক্ষা ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ সুখের কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, এ-সব অবান্তর কথা, আশা করি পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ দেশনেতা বা "দেশপ্রেমী" থাকেন, তিনি এ অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারের অবতারণা ক্ষমা করিবেন।

আমাদের দেশের সোনার আকর দুই প্রকারের। উত্তরাখণ্ডের আকর সবই "জলযোগ" জাতীয়। অর্থাৎ সবই তুষারনদ বা পার্ব্বত্য নদীর ঘর্ষণ ও প্লাবনের ফলে প্রস্তরস্তর হইতে আহরিত ও নদীগর্ভে সঞ্চিত। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে প্রকৃতিদেবী পাতালের সোনার লঙ্কায় আগুন লাগাইয়া পরে প্রস্তর-কোষের ধনাগারে গলিত সোনা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সব যক্ষের ধনাগারের আবিষ্কার কবে কে করিয়াছিল তাহা এখন কেহ জানে না। তবে প্রাচীন খনির সুড়ঙ্গপথ ধরিয়া নূতন খনির পত্তন হইয়াছে এবং এখন মহীশূরের কোলার-অঞ্চলের সোনার খনির সুড়ঙ্গ মাটির নীচে সোজা-ভাবে সওয়া মাইল নামিয়া গিয়াছে। সেই সুড়ঙ্গ-পথে নামিয়া যাহারা কাজ করে তাহারা বৎসরে প্রায় চারি শত মণ সোনা আহরণে সাহায্য করিয়া দুই বেলা পেট ভরিয়া নুনভাত খাইতে পায়—ডালভাত ও রসমুণ্ড নিশ্চয় জোটে—যাহারা তদারক করে তাহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র এবং মোড়লগণ তো সাক্ষাৎ কুবের!

সোনা সাধারণতঃ অতিসূক্ষ্ম অবস্থায় প্রস্তরের ভিতরে থাকে, "সাদা চোখে" তাহা দেখা যায় না, তবে অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বা সাধারণ "ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস" দিয়া তাহা দেখা যায়।



খনির ভিতর বৈদ্যুতিক ব্যাটারি চালিত মোটর যান

নদীর বালুকায়ও তাহা কাল "ছিটে" গুঁড়ের মত অন্য খনিজের সঙ্গে থাকে, তবে কখন কখন ছোট বড় মটরের মত টুকরাও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। বড় বড় স্বর্ণপিণ্ডও ক্বচিৎ কদাচিৎ পাওয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশে যখন প্রাচীন নদীর গর্ভের পলি-পড়া চরে সোনা আবিষ্কৃত হয় তখন ১৮৬৯ সালে এক দিন এক গাড়োয়ানের চাকা এক জায়গায় নরম মাটিতে বসিয়া যায়। চাকা ঠেলাঠেলি করিতে গিয়া গাড়োয়ানের মনে হয় তাহা যেন কোন শক্ত কিছুতে ঠেকিয়া আছে। চাকা উঠাইয়া সেটা কি দেখিতে গিয়া সে এক স্বর্ণপিণ্ড পায়। ইহাই প্রসিদ্ধ—'ওয়েলকাম ষ্ট্রেঞ্জার" স্বর্ণতাল, ওজন ২৫২০ আউন্স (প্রায় দুই মণ)।

স্বর্ণ-আহরণে সাধারণতঃ এই রকম সৌভাগ্যের কথা বড় একটা শোনা যায় না। তিন ভাবে সোনা সংগ্রহ করা হয়। প্রথম, আদি-অনন্ত কালের রীতি, নদীগর্ভে বা পুরাতন পলিচাপা স্রোতপথে বালি-কাঁকর ধুইয়া তিল তিল করিয়া আহরণ। ইহাই সনাতন পন্থা, গাঁইতি কোদাল, টিনের গামলা, বা কাঠের বাক্সের সাহায্যে বিষম পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে অল্পবিস্তর (সাধারণতঃ অতি অল্প) স্বর্ণলাভ। আমাদের দেশে সুবর্ণরেখা, মহানদী প্রভৃতিতে যাহারা ঐ ভাবে সোনা তোলে তাহাদের ভাগ্যে কোন মাসে দুই-তিন টাকা মূল্যের সোনা জোটে, কোন মাসে তাহাও নয়। যদি কোন স্থানে পলির মধ্যে বিশেষ পরিমাণে সোনা পাওয়া যায় তখন সেখানে খনন-শোধন ইত্যাদির জন্য যন্ত্রপাতি আসে। এরূপ ক্ষেত্রে শক্তিশালী দমকলের সাহায্যে প্রচণ্ড বেগে জলের ধারা চালাইয়া নদীগর্ভ খুঁড়িয়া, মাটি বালি ধুইয়া, লম্বা কাঠের নালায় চালান হয়। সেখানে বড় বড় পাথর হাতে তুলিয়া ফেলিয়া, জলের মৃদু স্রোতে লঘুভার মাটি বালি সরাইয়া ফেলা হয়। নালার নীচে ছোট ছোট কাঠের টুকরা বসাইয়া জলস্রোতের ধারায় বাধা দেওয়া হয়। সেই টুকরাগুলির ধাপে ধাপে গুরুভার ধাতব পদার্থ সকল আটকাইয়া জমিয়া যায়। যথেষ্ট জমিলে পরে সে-সব সযত্নে চাঁছিয়া তুলিয়া শুকান হয়। তাহার পর তাহা পারদের সঙ্গে মাড়িলে স্বর্ণের অংশ পারদে মিশিয়া যায়, অন্য সব কিছু পারদের উপরে ভাসিয়া উঠে। এই পারদ বিশেষ চুল্লীর উত্তাপে ও বকযন্ত্রের সাহায্যে "উদ্ধপাতন" করিলে পারদ আলাদা হইয়া যায়, সোনা পড়িয়া থাকে।

যেখানে গলিত-প্রস্তর প্রবাহের বিশ্লেষণের ফলে স্বর্ণময় প্রস্তরের স্তর বা দেওয়াল জন্মিয়াছে, সেখানে বৈজ্ঞানিক রীতিসম্মত প্রথায় খনির কাজ করিতে হয়। প্রস্তরস্তরের ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া, প্রচণ্ড বায়ুচাপে চালিত খননযন্ত্র বা বিস্ফোরকের সাহায্যে সেই পাথর কাটাইয়া সংগ্রহ করা হয়। তাহার পর তাহা কলের সাহায্যে ভাঙিয়া ও পিষিয়া অতি মিহি চূর্ণে পরিণত করা হয়। এই চূর্ণ হইতে, পোটাসিয়ম সায়ানাইড দ্রবের সাহায্যে, স্বর্ণকে দ্রবীভূত করিয়া বাহির করা হয়। এই সায়ানাইড দ্রবে অতি সূক্ষ্ম দস্তা-চূর্ণ মিশাইলে দস্তার সঙ্গে



বন্যকলে জলের প্রবল স্রোতে মাটি ভেদ করিয়া স্বর্ণমিশ্রিত বালু ও পলিমাটির কর্দ্দমের ধারা চালান হইতেছে। নিউগিনি

সোনাও দ্রব হইতে বাহির হইয়া নীচে কালো পাঁকের রূপে থিতাইয়া পড়ে। তখন ফিল্টার প্রেসের সাহায্যে উহাকে সায়ানাইড দ্রব হইতে ছাঁকিয়া লওয়া হয়। এইবার স্বর্ণের অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হয়, চুল্লীর প্রচণ্ড উত্তাপে ঐ পঙ্ক হইতে স্বর্ণ নিজ রূপে গলিয়া বাহির হয়। তাহার পর শোধন এবং শোধনের পর অর্থনীতির আশ্রয় গ্রহণ—ইহাই স্বর্ণসংগ্রহের শেষ অংশ।

স্বর্ণের গুণ অশেষ। ইহা দুর্ব্বলকে সবল করে, এবং অধিক মাত্রায় থাকিলে সবলকেও শঙ্কিত ও দুর্ব্বল করে। নিপুণ বৈদ্য ইহার সাহায্যে পুটপাক করিয়া ধনী রোগীর রোগমোচন ও গৃহিণীর অলঙ্কার নির্ম্মাণ, একত্রে এই দুই প্রশ্নের সমাধান করেন। স্বর্ণের লোভ ভূত-ভয়-বিতাড়নের প্রধান উপায়। আজকাল শতকরা দুই তিন জন একেবারেই ভূত বিশ্বাস করেন না, আরও শতকরা ষাট-সত্তর জন বিশ্বাস করিলেও সঙ্গে লোকজন থাকিলে বিশেষ ভয় করেন না, বাকীদের কথা না বলাই ভাল। সে যাহাই হউক, আজ হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষের ভূতের ভয় ও মন্ত্রতন্ত্র শাপ ইত্যাদিতে বিশ্বাস অতি প্রবল ছিল, সন্দেহ নাই। সুমের জাতির উর নগরের রাজসমাধি খনন করিয়া উদ্ধার করিলে দেখা যায় সেইকালের চোরের দল ভূত-যক্ষ শাপ-মন্ত্র ইত্যাদির ভয় কাটাইয়া রাজসমাধিতে সুড়ঙ্গ সিঁদ কাটিয়া স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছিল। সেই চুরি ধরা পড়িল পঞ্চাশ শতাব্দীরও পরে। "সোনার সংসার" শব্দ শুনিতে ভাল কিন্তু আসলে বোধ হয় "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"-ই ঠিক—অন্ততঃপক্ষে সভ্য জগতে।

মুক্তিস্বপ্ন

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

এত দিন স্বপ্ন ছিল, এত দিন মনে ছিল আশা,
মুক্তপক্ষ ছিল প্রাণ, ছুটিত সে অনন্ত আকাশে ;
সোনার পিঞ্জরে তব এল যে খুঁজিতে ভালবাসা
কেন তার রুদ্ধ চিত্ত ঝিমাইছে পরম হতাশে ?
আজও কি সে স্বপ্ন দেখে সুবিস্তীর্ণ অরণ্যানীর ?
আজও কি মেলিতে চায় পাখা তার মানস উদ্দেশে ?
আজও কি সে অর্থ বোঝে অন্তরের নিভৃত বাণীর ?
উধাও তাহার আত্মা যায় কি সমুদ্রপারে ভেসে ?

বন্ধন মানে না মন—স্বচ্ছন্দবিহারী গতি তার,
নিপীড়নে কাঁদে তনু, প্রাণ কাঁদে সমবেদনায় ;
কল্পনা ও বাস্তবের মাঝে এই দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়
কেমনে সে উত্তরিবে দিন কাটে সেই ভাবনায়।
খোলে না খাঁচার দ্বার, দিন যায়, আঁধার ঘনায় ;
মৃত্যু যবে আসে দ্বারে সেই দিন শুধু মুক্তি পায়।

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

কোনও দেশের জীবনযাত্রা-প্রণালী, সখ, উৎসব, রুচি ইত্যাদি বুঝতে হ'লে তার দোকান বাজার ভাল ক'রে দেখা দরকার। জাপানে এসে পর্য্যন্ত দু-এক দিনের বেশী বড় দোকানে ঘুরি নি, তাই ঠিক করলাম এখানকার বড় দোকানগুলো দেখতে হবে। টোকিওতে আটটি বড় ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর্স্ আছে শুনেছি। এগুলি অনেকটা আমেরিকান ধরণের।

২০শে আমাদের জাপানী স্কুল কলেজ দেখতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু যাঁর সঙ্গে যাবার কথা ছিল তিনি সেদিন না আসাতে হয়ে উঠল না। আমার মেয়ে বললে, "চল, সিনেমায় যাই।" আমি সিনেমা দেখে এমন একটা রোদের দিন নষ্ট করতে রাজি হলাম না। কাজেই দোকান দেখতে বেরোলাম। ঠিক হ'ল মাটির তলার ট্রেন দিয়ে যাব। এই গাড়ীগুলি ছোট ছোট। ওমোরি থেকে সাধারণ বৈদ্যুতিক ট্রেনে চড়ে এক জায়গায় গিয়ে গাড়ী বদল করলাম। সেখানে সিঁড়ি দিয়ে মাটির তলায় সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে প্রকাণ্ড চওড়া একটা প্ল্যাট-ফর্মে পৌছান গেল। ছোট গাড়ীতে চড়ে যেখানে গিয়ে নামলাম সেটাও মাটির তলায় ষ্টেশন। ষ্টেশনটি একটি বড় দোকানের সর্ব্বনিম্নতলা। ক্রেতাদের যেন গাড়ী ক'রে কি হেঁটে রাস্তা পার হয়ে দোকানে যেতে না-হয় এই জন্য দোকানেরই নীচতলায় ষ্টেশন করা হয়েছে। দোকানের এই নীচতলাটি মাটির নীচে। এখানে ছোট ছেলেমেয়েদের নানা রকম জামা বিক্রী হচ্ছে।



জাপানে পুতুলের উৎসব



পুতুল নর্ত্তকী



পুতুল নর্ত্তকী



খোকা পুতুল



জাপানী পুতুল

সবসুদ্ধ জড়িয়ে দোকানটি একটা বিরাট ব্যাপার। দেখলে মনে হয় রাজপ্রাসাদের চেয়েও বড়। এক দিকে মাটির তলা থেকে আরম্ভ, অন্য দিকে আকাশস্পর্শী চূড়া। আট-দশ তলা ত আমরাই চড়লাম। শুনেছি তারও উপরে ছাদে বাগান থাকে। এখানে শহরের যত সৌখীন ও ফ্যাশনেব্‌ল্‌ লোকেরা বাজার করতে আসে। তাই ব'লে সব জিনিষেরই যে এখানে অদ্ভুত চড়া দাম তা নয়। দোকানের নাম মিৎসুকোসি। এখানে রান্নাঘরের গ্যাস-ষ্টোভ থেকে আরম্ভ ক'রে, চেয়ার, টেবিল, ছেলে-ঠেলা-গাড়ী, গ্রামোফোন, রূপার বাসন, গহনা, বিলাতী পোষাক-পরিচ্ছদ, জাপানী পরিচ্ছদ, ওবির ও কিমোনোর কাপড়, কাঠের ও কাচের বাসন, পুতুল, খেলনা, ছাতা, জুতো, লিপষ্টিক, রুজ প্রভৃতি বিশ্বের সব জিনিষ পাওয়া যায়। সাত পয়সা আট পয়সার থেকে হাজার টাকার জিনিষ পর্য্যন্ত সবই প্রচুর আছে।

দোকানের ঠিক মাঝখান দিয়ে বিরাট একটা জমকালো সিঁড়ি উঠেছে, আশেপাশে ছোট সিঁড়ির সংখ্যাও অনেক। নূতন মানুষ কোন্‌টা দিয়ে উঠে কোন্‌টা দিয়ে নামবে অনেক সময় ঠিক করতে পারে না মাথা পর্য্যন্ত সিঁড়ি ছাড়া লিফ্‌ট্‌ আছে। আমরা সবটা ভাল ক'রে দেখব ব'লে হেঁটে সিঁড়ি দিয়েই সর্ব্বত্র ঘুরলাম সর্ব্বশেষে যেখানে গিয়ে উঠলাম সেটা একটা খাবা[র] ঘর। সারা বাড়ী সওদা ক'রে শেষকালে ক্ষুধিত ও শ্রা[ন্ত] খদ্দেররা বোধ হয় এইখানে এসে খাওয়া-দাওয়া সে[রে] যায়। এদেশে বাইরে খাওয়ার ধুম বড্ড বেশী।



প্রাচীন চিত্রে জাপানী খোপার গহনা



প্রাচীন চিত্রে জাপানী টুপি

জাপানীদের পোষাকের মধ্যে ওবি সবচেয়ে সখের জিনিষ ব'লে এইগুলি মূল্যবানও সবচেয়ে বেশী। কাপড়গুলি চৌদ্দ ইঞ্চি মাত্র চওড়া এবং চার গজ ক'রে লম্বা। তারই দাম ১২০ ইয়েন, ২০০ ইয়েন পর্য্যন্ত দোকানে রয়েছে। কোনও কোনটাতে কিংখাবের মত কাজ করা। ফরমাস দিয়ে এর চেয়েও অনেক মূল্যবান ওবি তৈয়ারী হয়। যে জাতি পোষাকের একটিমাত্র অংশের জন্ম এত খরচ করে তারা যে সৌখীন ও বিলাসী জাতি, তাই মানুষের সকলের আগে মনে হবে। অথচ এদের মত পরিশ্রমী ও হিসাবী জাতিও কম আছে। বাড়ী তৈরি, খাওয়া, বেতন দেওয়া ইত্যাদিতে এরা অদ্ভুত হিসাবী।

এই সব কাপড়ের উপর ছুঁচের কাজ কি তাঁতের নক্সাগুলি সবই জাপানী ধরণের কাজ। আমার ভারতীয় চোখে পোষাকে এগুলি বেমানান হয় মনে হ'ল। একটা ক'রে ফুল কি পাখী খুব প্রকাণ্ড, আবার তার গায়ে খুব ছোট ছোট ফুল পাতা। আমাদের শাড়ী জামাতে এসব মানায় না, কিন্তু এরা এদের পোষাকে পরলে আমাদেরই বেশ লাগে। একরঙা কি সাদা কাপড় চোখে খুব কম পড়ে এসব দোকানে, কারণ জাপানী মেয়েরা রঙীন ফুল-দেওয়া কাপড়ই বেশী পরে। তবে সাদার উপর সাদা ফুল দেওয়া রেশম কিছু আছে দেখলাম। জাপানী মেয়েদের তিনটা চারটা কিমোনো উপরি উপরি পরা নিয়ম। ভিতরের গুলি হয় এক রঙা, কিন্তু সে-রকম কাপড় চোখে ত দেখতে পেলাম না।

পুতুলের ঘরটা আশ্চর্য্য সুন্দর। কত রকমের নাচের ভঙ্গীতে ও প্রাচীন পোষাকে-আসাকে সজ্জিত পুতুল যে রয়েছে। জাপানীরা পুতুলের ভারি ভক্ত। এদের উৎসবের মধ্যে পুতুল-সাজানোর উৎসবই একটা আছে, প্রতি বছরে সবাই করে। তাছাড়া বালকদের উৎসব বালিকাদের উৎসব ব'লে বছরে দুটি নির্দ্দিষ্ট দিন থাকে। আমাদের দেশের ষষ্ঠীপূজার সঙ্গে তার একটা মিল আছে বোধ হয়। এ যেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে জন্মোৎসবপালন। এই সব দিনে নানা রকম প্রাচীন ও সুন্দর পুতুল সাজানো নিয়ম। মা, দিদিমা, ঠাকুরমার পুতুলও মেয়েরা বার ক'রে উৎসবে সাজায়।



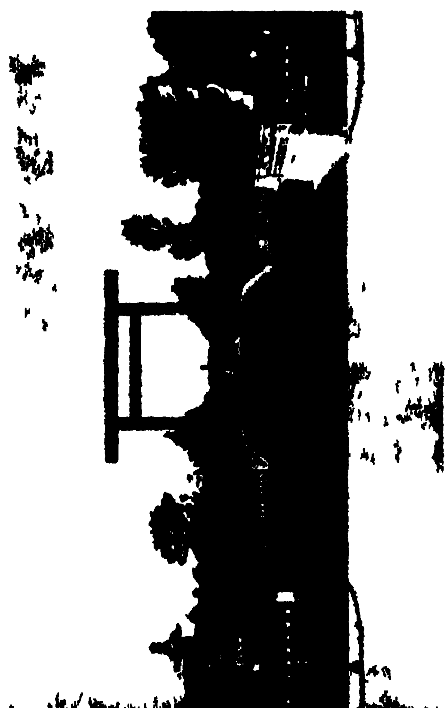
বুদ্ধ-মূর্ত্তিমন্দি[illegible]র ছাদ



বুদ্ধ-মূর্ত্তিমন্দিরের সিংহদ্বার



বুদ্ধ-মূর্ত্তিমন্দির



বুদ্ধ-মূর্ত্তিমন্দিরের তোরণ



জাপানী বাদ্যযন্ত্র "কোতো"—এই যন্ত্রে তেরটি তার থাকে।

এক জায়গায় একটা পুতুলের রাজপ্রাসাদ সাজানো রয়েছে। সেটা একটা সাধারণ ছোট জাপানী বাড়ীরই সমান জায়গা নিয়েছে। তবে তার মধ্যে আঙিনা রাজ-দরবার সবই করতে হয়েছে ব'লে বাড়ীগুলি পুতুলের বাড়ীর মতই দেখাচ্ছে। রাজা রাণী, সভাসদ, নর্ত্তকী গাইয়ে বাজিয়ে সবই তার ভিতর যথাযথ স্থানে সাজানো। বাড়ীর প্রকাণ্ড সিঁড়ি সাজসজ্জা সব ঠিক রাজবাড়ীর মত। এ-সব কিনে ওরা উৎসবের দিনে সাজায়। আমাদের দেশে পুতুল ছেলেদের ভাঙবার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। না-হ'লে কাচের আলমারীতে বাজে চীনে মাটির শিবের ঘাড়ে ডিমাস এবং সরস্বতীর বামে ফরাসী নর্ত্তকী মত টুপি প'রে একটা পিতলের উট কি বকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বদেশী শিল্পীর পুতুল এদেশে চলে না।

নাচের ভঙ্গীর পুতুলগুলি তাদের বিচিত্র খোঁপা ও



বিভিন্ন ধরণের জাপানী জুতা

ঝলমলে সুন্দর পোষাকের জন্য অনেক দামে বিকোয়। দোকানে দাঁড়িয়ে এগুলি দেখলেই নিয়ে আসতে ইচ্ছা করে। এক-হাত দেড়-হাত উঁচু নর্ত্তকী পুতুলদের দাম ৩০।৪০ এমন কি ৫০ ইয়েন পর্য্যন্ত। এ-ছাড়া প্রাচীন রাজা-রাজড়া, যোদ্ধা, পেটুক, পুরোহিত, খোকাখুকী পুতুলও আছে। পুতুলের রকমারি ও শিল্পচাতুর্য্য দেখে এদের শিল্পানুরাগ বোঝা যায়।

জাপানী ছাতা বলতে আমরা কাগজের উপর মোম ও গালার কাজ করা বাঁশের ছাতাই ভাবি। কিন্তু আজকাল আমেরিকার প্রতিবাসী জাপান ফ্যাশনে অনেক জায়গায় তাদেরই অনুকরণ করে। তাই ভাল ছাতা চাই বলাতেই মস্ত রঙীন সিল্কের ছাতার দিকে টেনে নিয়ে গেল। সেগুলি সবই পাশ্চাত্য ধরণের এবং তাদের সংখ্যাই বেশী। তবে এক দিকে খাঁটি জাপানী ধরণের বাঁশ ও কাগজের ছাতাও আছে। দাম খুব বেশী নয়

খাঁটি জাপানী ধরণের জুতার গোড়ালি ও আঙুলের কাছটা পুরাকালে সমান উঁচুই থাকত। সাদাসিধা কাঠের জুতা ত ঠিক ছোট্ট ছোট্ট পিঁড়ির মত দেখ্তে ছিল। দুটো ছোট খাড়া তক্তার উপর একটা বড় চ্যাপ্টা তক্তা বসান। কিন্তু এখন পাশ্চাত্যের অনুকরণে হীলের ধরণ ক'রে জুতার তলা তৈরি হয়। বেতের, রবারের কিংবা ঘাসের অথবা কাঠের জুতার অনেক ধরণ আছে। কোনগুলি গোড়ালির কাছে খুব মোটা পুরু এবং আঙুলের কাছে ক্রমশ পাতলা নীচু হয়ে এসেছে; কিছু কিছু আবার তলার কাঠ ঢেউয়ের মত ক'রে মাঝখান কেটে ঠিক



জাপানে ডিপার্টমেন্ট ষ্টোরের ছাদে বাগান

জোড়া মাছ আমরা ত সর্ব্বদাই দেখি। জাপানীরা বিয়ের সময় মেয়েকে কাপড়ের জোড়া লাল মাছ প্রকাণ্ড উঁচু সাজির মত ক'রে সাজিয়ে উপহার দেয়। সেই উপহারের বিরাট মাছের সাজি বড় দোকানে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। তার ভিতর বাহির সব কাপড়ে ঠাসা। বিবাহ-উৎসবের পর এই কাপড়গুলিকে খুলে নিয়ে কনে তার প্রয়োজনীয় নানা রকম কাপড়চোপড় করে।

এদেশে তরকারির বাটি, চায়ের বাটি ও পেয়ালা, খাবার আনবার বাসন সবই ঢাকনা-সুদ্ধ তৈরি, বিক্রী ও ব্যবহার হয়। এটা এ-দেশের লোকের খুব বুদ্ধির পরিচায়ক। আমাদের দেশে বাটির ঢাকনা থাকে না, আগে গেলাসের ও জলখাবার ঘটির ঢাকনা থাকৃত, এখন ক্রমে তাও উঠে গিয়েছে। কাজেই খাদ্যে ও পানীয়ে পোকা, মাছি ও ধুলো নির্ব্বিবাদে পড়তে পারে। কাঠের উপর গালার কাজ করা বাসনের চলন এখানে খুব। এই সব বাসনে নানা রকম নক্সা ও রং থাকে। শুধু কাঠের উপর খোদাই করা সুন্দর মূল্যবান বাসন অনেক আছে। এ-সব বাসনের সব ভাল, কেবল মাজা ঘষা বিশেষ চলে না এই মুস্কিল। একটু ধুয়ে মুছে তুলে রাখতে হয়। দামের তুলনায় সব বাসনই দেখতে অনেক সুন্দর। ভাত খাবার কাঠি হাতীর দাঁতের, হাড়ের, কাঠের নানা রকম আছে। একবার খেয়ে কাঠি দুটো ফেলে দেওয়া যায় এমন সস্তাও আছে, আবার চিরকাল আদর ক'রে তুলে রাখবার মতও আছে।

জাপানী মেয়েরা জাপানী পোষাকের সঙ্গে গহনা আগে কিছুই পরত না। খোঁপার চিরুণী আর কুলই ছিল

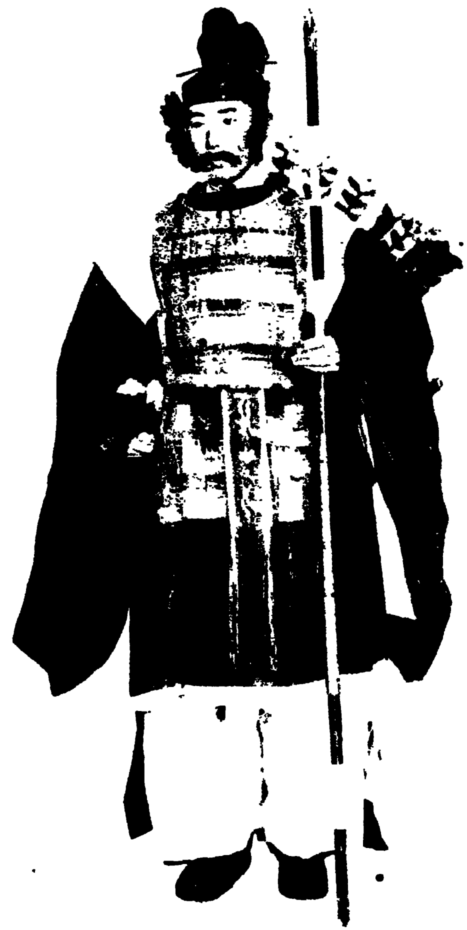
হীলের মতন করা। কাঠের উপর গিল্প বসিয়ে, কাঠের উপর গালা পালিশ ক'রে, কিংবা চামড়া দিয়ে কাঠ মুড়ে সৌখীন জাপানী জুতা হয়। সাদা জানোয়ারের লোম দেওয়া জুতাও আছে। সাপের চামড়া কুমীরের চামড়ার খুব দামী জাপানী জুতাও হয়। তবে সবচেয়ে সস্তা ও সাধারণ জুতা হচ্ছে পিঁড়ির মত তক্তার জুতা অর্থাৎ খড়ম। এদেশের পুতুলের মত জুতার রকমারিও উল্লেখযোগ্য জিনিষ।

আমাদের দেশের মত জাপানীরাও বোধ হয় বিবাহ ব্যাপারে মাঙ্গলিক জিনিষের মধ্যে জোড়া মাছের স্থান দেয়। বিয়ের আলপনায় জোড়া মাছ, ক্ষীরের



足利時代主將人形　(遊就館)

যুদ্ধ-স্মৃতি মিউজিয়মে যোদ্ধার ছবি

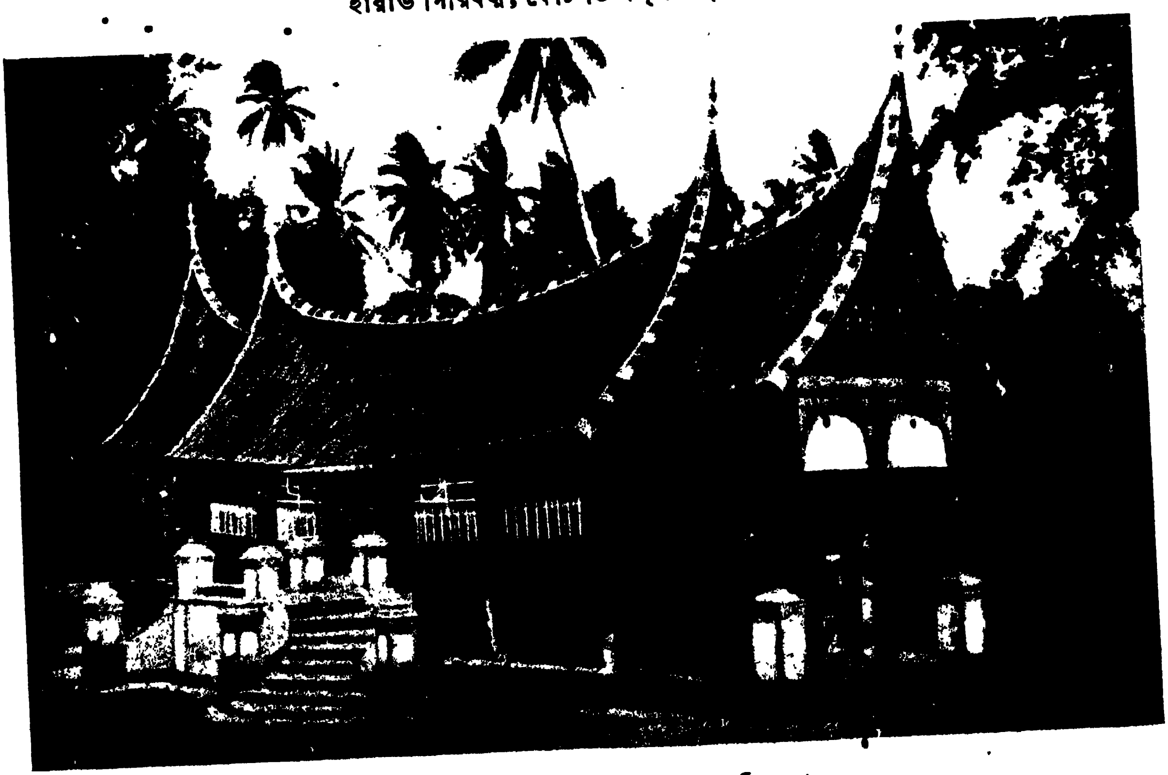


御大鎧装束人形　(遊就館)

যুদ্ধ-স্মৃতি মিউজিয়মে বীরের ছবি



হারাউ গিরিবর্ত্ম, ফোর্ট ডি কক্। সুমাত্রা



সুমাত্রা দ্বীপের একটি গৃহ। পাডাং অধিত্যকা



কম্বোজ। আঙ্কোরে প্রহরী-মূর্তি



কম্বোজ। আঙ্কোরে বহুশীর্ষ নাগ-দেবতা





ইন্দো-চীনের বৌদ্ধ মঠে শ্যামদেশীয় কিশোর শ্রমণ

তাদের গহনা। এখন খোঁপার বহর কমে গিয়ে আমাদের মত সাদাসিধে হয়ে গিয়েছে। তবে তাতে কেউ কেউ মুক্তা-বসান কাঁটা কিংবা অন্ত রকম দামী ফুল কাঁটা কি চিরুণী একটা ছুটো পরে। জাপানী গহনার মধ্যে তাই রেশম জরির ফুল, ঝিনুকের ফুল, হাড়ের কাঁটা, কচ্ছপের খোলার কাঁটা, আসল ও নকল মুক্তা বসান কাঁটা এই সবই প্রধান। মুক্তার সারি বসান চওড়া কাঁটাগুলি আমাদের দেশের খোঁপাতেও বেশ মানায়। আংটির চলন আজকাল পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণে হয়েছে। যারা একেবারে পুরা ইউরোপীয় পোষাক পরে সেই সব মেয়েরা মুক্তা, পাথর ও কাচের মালাও পরে, কাজেই দোকানে মালাও দেখতে পাওয়া যায়। দু-আনা চার আনা থেকে আরম্ভ ক'রে মহামূল্য কাঁটা, মালা প্রভৃতি পাওয়া যায়। মানুষের প্রয়োজনের জিনিষের চেয়ে সখের জিনিষের দাম সব দেশেই বেশী হয়। তবে সেগুলি গহনা কাপড় আসবাব হ'লে আমাদের চোখে খারাপ লাগে না। কিন্তু যে-দেশে এক জোড়া জুতো, ভাল একটা ছাতা কি বাসন সামান্ত এক ইয়েন দামে পাওয়া যায়, সেখানে দেড় ইঞ্চি লিপষ্টিক কিংবা আঙুলের মত রুজের বাক্সের দাম আড়াই ইয়েন দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়; বিশেষত যখন দেখি জাপানে ঝি মজুরণী থেকে আরম্ভ ক'রে সবাই এগুলি ব্যবহার করে, তখন আরও বিস্মিত হ'তে হয়। অনেক জায়গায় তাদের ত মাসে মাইনেই সাত-আট ইয়েন ক'রে। জানি না হয়ত সস্তা দোকানে অনেক সস্তা জিনিষ আছে।

এখানে বাজার করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে মিৎসুকোসির মত বড় দোকান থেকে জিনিষ নিলে মুটেও ভাড়া করতে হয় না, গাড়ীও ডাকতে হয় না। জিনিষগুলি কিনে দামটা ও ঠিকানাটা তাদের দিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। তার পর বিনা-ভাড়ায় জিনিষ ঠিক বাড়ী এসে পৌঁছে।

আমরা যখন জাপানে ছিলাম তখন দিল্লীর চমনলাল মহাশয়ও সেখানে ছিলেন। তিনি সেদিন আমাদের রাত্রে তাঁর বাড়ীতে খেতে বলেছিলেন। আমরা দোকান বাজার সেরে তাঁর বাসাতে গেলাম। প্রকাণ্ড একটা বাড়ীতে অ্যাপার্টমেণ্ট অর্থাৎ একখানা ঘর নিয়ে তিনি থাকতেন। বাড়ীটা অনেক তলা, আমেরিকান ধরণে তৈরি। লিফ্‌টে উঠে যে-তলায় যেতে চাই সেই তলার চাবি টিপলেই আপনা আপনি সেখানে গিয়ে পৌঁছে দেয়। মস্ত লম্বা একটা বারাণ্ডার পাশে পাশে সব ঘর। এক-এক জনের একখানা করেই মাত্র ঘর, তাইতে শোবার ও বসবার জন্ত খানতিনেক ক'রে সোফা। গোটা-চার ক'রে চেয়ার, ছোট ছোট কয়েকটা টেবিল, আলনা ইত্যাদি সব আসবাবই আছে। স্থান খুবই কম, কিন্তু ব্যবস্থা চমৎকার। জাপানীরা অল্পপরিসর জায়গায় বিশ্বসংসার সাজাতে চিরকালই দক্ষ, তার উপর আধুনিক আমেরিকান আসবাব ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সব নিঁখুৎ ক'রে তুলেছে। ঘরে হীটার আছে, টেলিফোন আছে, কাপড়ের আলমারি আছে। তার পর পাশে ছোট ঘরে বাসন ধোওয়ার কল, গ্যাসের উনান, মুখ ধোবার কল ও বাটি রয়েছে; তার পাশে ছোট একটা আড়াল দিয়ে স্নানের গরম ও ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চা (bath), তার পর আর একটা আড়াল দিয়ে শৌচাগার। আয়না বাসন বিছানা ইত্যাদিও বাড়ীর সঙ্গেই পাওয়া যায়। টোকিওর চৌরঙ্গী (গিঞ্জা)তে এই সব ঘর, মাসে একখানা ঘরের ভাড়া ৭৫ ইয়েন। স্বামী-স্ত্রী অল্প দিনের জন্ত গেলে গুটি দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে বেশ থাকতে পারেন। ইংরেজী-জানা একটি ছেলেকে তাঁরা চাকর রেখেছিলেন, তার মাইনে শুনলাম ৫০ ইয়েন মাসে। জাপানীরা নিজেরা ৮।১০ ইয়েনেই খুব ভাল ঝি পায় শুনেছি।

মিসেস চমনলাল আমাদের ঘি দিয়ে ভেজে হিন্দুস্থানী রুটি ও নিরামিষ তরকারি খাওয়ালেন। তিনি প্রত্যহ নিজেই রাঁধতেন। তাঁর ছোট্ট একটি মেয়েও আমাদের সঙ্গে খুব ভাব করল। ওঁরা কিছু হিন্দুস্থানী গানের রেকর্ড নিয়ে গিয়েছিলেন শোনালেন।

আমাকে মাঝে মাঝে ডাক্তারের চেম্বারে ইনজেকসন নিতে যেতে হ'ত। একটি জাপানী মেয়ের সঙ্গে যেতাম। সে আমার কথা কিছু বুঝত না, আমিও তার কথা কিছুই বুঝতাম না। ইসারায় কাজ চলত। ডাক্তারের ওখানে

পৌঁছতেই ইউরোপীয়ান পোষাক পরা এবং ময়দামাথার মত পাউডার মাখা এক জন নর্স এসে জুতো এগিয়ে দিত। সেই জুতো প'রে উপরে যেতে হ'ত। উপরে জাপানী প্রথায় হিবাচি-দেওয়া অপেক্ষা-গৃহ ছিল, তাছাড়া চেয়ারও ছিল। ডাক্তারও আমার কথা কিছু বুঝতেন না। মাঝে মাঝে তাঁকে লিখে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, তাও তিনি অর্দ্ধেক বুঝতেন না, অন্তত লিখে যা জবাব দিতেন তার কোন অর্থ আছে ব'লে আমার মনে হ'ত না। ইন্‌জেকসন দেবার সময় কাঠের বালিশ মাথায় দিয়ে শুতে হ'ত।

২১শে আমরা যুদ্ধের মিউজিয়ম দেখতে যাব ঠিক হ'ল। ওমোরি থেকে টোকিও ষ্টেশনে নেমে মজুমদার মহাশয়ের জন্ম অপেক্ষা করতে হবে, তিনিই হবেন আমাদের পথ-প্রদর্শক। ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে তাঁর জন্ম অপেক্ষা করতে ঢুকে দেখি গোটাকতক মাতাল সেখানে মদ খেয়ে খুব গড়াচ্ছে। ঘরে অনেক স্ত্রীলোক বসে আছে, বোধ হয় সেটা মেয়েদেরই বসবার ঘর, কিন্তু মেয়েরা কিছুই গ্রাহ্য করছে না।

আমি জাপান থেকে ফেরবার সময় জাহাজে এক জন জর্মান অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি বলতেন, "জাপানে সব কাজই মেয়েরা করে, পুরুষরা শুধু মদ খায়।" কথাটা আগে শুনি নি, তবে ২৮ দিনের মধ্যে ৩৪ দিন মাতালের মাতলামি টোকিওতে দেখেছি।

যুদ্ধ-স্মৃতিমন্দিরে পৌঁছতে আমাদের বড় দেরি হয়ে গেল। যাই হোক মোটামুটি দেখা হয়েছিল। পূজার মন্দিরের মত চাল দেওয়া তোরণ-দ্বার, তাতে দুর্গের মত বড় বড় কাঠের কপাটে চার পাশে লোহা লাগানো। রুশিয়া ও চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জাপান যে সব সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষকে হারিয়েছে তাদের একটা বিশেষ সমাধি-মন্দির এখানে আছে, রাজা এখানে বছরে একবার ক'রে মৃত আত্মাদের সম্মান দেখাতে আসেন, এখানে উপাসনা হয়। আজকালকার চীন-জাপান যুদ্ধেতেও এই সমাধি-মন্দিরে স্মৃতিপূজা, যুদ্ধজয়ের জন্ম প্রার্থনা ইত্যাদি চলছে, জাপানী কাগজে ছবি দেখতে ও খবর পড়তে পাই।

স্মৃতিমন্দিরের সামনে একটা প্রকাণ্ড কাঠের তক্তার উপর সোনার পাতে মোড়া ক্রিসানথিমাম ফুল বসানো, এটি রাজবংশের চিহ্ন-স্বরূপ বসানো হয়। সমাধি-গৃহের সামনে জাপানী ধরণের যে গেট, তার স্তম্ভ ও দরজা সব লোহা দিয়ে তৈরি, বোধ হয় যুদ্ধে ব্যবহৃত কোন টর্পেডো কি আর কিছুর লোহা দিয়ে এগুলি গড়া হয়েছে। মিউজিয়মের সামনের গেটও লোহার। এত লোহা ও ইস্পাতের ঘটা দেখে মনে হয় যুদ্ধের স্মৃতিকে সকল দিক দিয়ে খুব তাজা ও বাস্তব ক'রে রাখতে জাপানীরা খুব ব্যস্ত। এক্ষেত্রে নিজেদের শিল্প-নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্যবোধকে তারা একেবারেই উচ্চাসন দেয় নি। স্মৃতিমন্দিরের সামনে কাঠের তোরণ-দ্বার আছে। সেগুলি ফরমোসা দ্বীপ থেকে জাহাজের পিছনে বেঁধে আনা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহের গুঁড়ি। দুই তিন জন মিলে একটি গুঁড়িকে বেষ্টন করা যায়।

মেজি মন্দিরের মত এই স্মৃতিমন্দিরেও চৌবাচ্চা থেকে কাঠের হাতায় জল তুলে হাত মুখ ধুয়ে পবিত্র হয়ে যেতে হয়। মন্দিরের সামনে একটি পয়সা ফেলবার বড় বাক্স আছে, যে যায় নমস্কার ক'রে দু-চার পয়সা ফেলে।

মন্দিরের পর আসল মিউজিয়ম। সে একটা বিরাট ব্যাপার। জাপানীরা যে খুব যুদ্ধ-গর্ব্বিত জাতি তা এই মিউজিয়মের বিপুল সমারোহ এবং অসংখ্য দর্শকের ঠেলাঠেলি দেখলে বোঝা যায়।

রুশ-জাপ যুদ্ধের লুণ্ঠনে জাপানীরা যত অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিষ সংগ্রহ করেছে সব এখানে আছে, তা ছাড়া যুদ্ধে জাপানীরা যত রকম ভাল মন্দ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল সবেরই পরিচয় এখানে পওয়া যায়। সম্প্রতি চীন জাপানে যে যুদ্ধ বেধেছে এই জাতীয় এক কি বহু যুদ্ধের আশঙ্কায় যুদ্ধের সময়ে কি কি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, এবং কেমন ক'রে হওয়া উচিত, সব এখানে চিত্র, মূর্ত্তি পুতুল, নকল শহর, নকল সমুদ্র, বন্দর, যুদ্ধক্ষেত্র, জাহাজ, দুর্গ, এরোপ্লেন, ব্ল্যাক আউট ইত্যাদির সাহায্যে বোঝানো আছে। মানুষকে হত্যা করবার কত রকম আধুনিকতম প্রণালী আছে এবং তার হাত থেকে রক্ষা পাবার কত রকম উপায় আছে সব মডেল গড়ে দেখানো হয়েছে।

মিউজিয়মটিতে কয়েক ঘণ্টা ভাল ক'রে কাটাতে পারলে যুদ্ধ-বিদ্যার কোন কিছুই জানতে বাকি থাকে না। এরোপ্লেন, টর্পেডো, কামান প্রভৃতির যুদ্ধ সত্যিকারের জিনিষের সাহায্যে তাদের ভিতরের সেক্সন কেটে, চালনা-পদ্ধতি দেখিয়ে, বৈদ্যুতিক সুইচের সাহায্যে চালিয়ে থামিয়ে সুস্পষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে।

রুশীয় কামান ভাঙবার জন্য জাপানীরা যে বারোটি সুবিখ্যাত কামান তৈরি করেছিল সেগুলি এবং রুশীয়দের ভাঙা কামান ও মাইন ইত্যাদি সগৌরবে সাজানো আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার কুকুরের ও মানুষের চিকিৎসা জানা দরকার। তাদের চিকিৎসা-প্রণালী মাটির মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা আছে। নকল হাত পা দেওয়া এবং কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস চালান সৈনিকদের প্রায়ই প্রয়োজন হয়।

মাইক্রোফোনের সাহায্যে দূরের শত্রু মিত্রদের আকাশ-পোতের আওয়াজ শোনা, সঙ্কেত করা, আলো ফেলে দেখা, গ্যাস দিয়া শত্রুকে পোড়ান ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা করবার স্থান এ নয়, না হ'লে করা যেত। কত তলা বাড়ীর উপর থেকে আকাশযানের নিক্ষিপ্ত বোমা কত নীচ পর্য্যন্ত ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারে এবং তাহার নীচে ও পাতালে ঘর বেঁধে মানুষ কি ক'রে ঘর-সংসার হাসপাতাল ইত্যাদি চালায়, পুতুল ও বৈদ্যুতিক সুইচের সাহায্যে তা যেন আগাগোড়া প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

বোমার গ্যাস লাগলে মানুষ ও জীবজন্তুর কি কি ক্ষতি হ'তে পারে এবং কত রকম গ্যাস-মুখোস প'রে তার হাত এড়ান যায় এও একটা দেখবার ও শেখবার জিনিষ। দেশবাসীর নিজের দেশরক্ষা-বিষয়ে সর্ব্বদা সচেতন থাকা উচিত ব'লে টোকিও শহরের বড় মডেল ক'রে জল ও আকাশ পথে কোথা দিয়ে তাকে শত্রু কি ভাবে আক্রমণ করতে পারে, কি ভাবে সন্ধানী আলো ফেলে এবং মাইক্রোফোন ঊর্দ্ধমুখী ক'রে তা দেখা ও শোনা যায়, আকাশযান থেকে পরিচিত মাটির পৃথিবী ও নিজ বাসভূমিকে কেমন দেখায়, কি রকম দেখলে শত্রু বোমা ফেলে এবং কি মনে হ'লে ফেলে না, সব ম্যাপ ঘরবাড়ী, ক্ষুদ্র আকাশযান তৈরি ক'রে জলের মত পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে। টোকিও প্রভৃতির বড় বড় আকাশস্পর্শী বাড়ীগুলিতে যুদ্ধ বাধবার অনেক আগে থেকেই যে মাটির নীচে সর্ব্বনিম্নতলে লোক পালিয়ে থাকবার ব্যবস্থা ও হাসপাতাল করবার জোগাড় আছে তা মডেলগুলি দেখেই জানা যায়। যুদ্ধে নিহত অসংখ্য বীরের ছবি ও রক্তমাখা পোষাক প্রভৃতি এখানে সাদরে রক্ষিত আছে।

২২শে আমরা অনেকগুলি স্কুল-কলেজ দেখেছিলাম, তার বিষয় পরে বলব। সেই সূত্রেই মিস্ সাকুরাই নাম্নী একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেই মেয়েটি ২৩শে রাত্রে তাঁদের বাড়ীতে আমাদের খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

জাপানীরা নিমন্ত্রণ করলে নিমন্ত্রিতরাও কিছু উপহার হাতে ক'রে নিয়ে যায়। মজুমদার মহাশয় পথের ধার থেকে এক বাক্স কেক ইত্যাদি কিনে আমাদের নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললেন। পুলিসকে বার বার পথ জিজ্ঞাসা ক'রে ট্যাক্সি ক'রে এমন জায়গায় এলাম যেখানে গাড়ী আর চলে না। কি অসম্ভব সরু অথচ লম্বা আঁকা বাঁকা সব গলি। ডিনার খেতে ইভিনিং গু প'রে সেখান দিয়ে হাঁটা একটা কসরৎ। একটু ভিজে এবং উঁচু নীচুও বটে। বাড়ীর নম্বর দেখতে দেখতে আমরা নানা পথে ঘুরতে লাগলাম। পথগুলি কিন্তু নোংরা নয়। বাড়ীর আবর্জ্জনা ও বিড়াল কুকুরের ময়লা এ-দিক ও-দিক স্তূপ করা কি ছড়ান নেই। অনেক দূর চলে যাবার পর দেখি পিছনে একটি জাপানী মেয়ে ও এক জন ভদ্রলোক আসছেন। ফিরে দেখি মেয়েটি মিস সাকুরাই, কালো রেশমের উপর বিচিত্র রঙের সূচীকার্য্য-করা সুন্দর জাপানী পোষাক প'রে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছেন। মিষ্ট হাসিতে মুখ উজ্জল ক'রে আমার মেয়ের হাত ধরলেন। এমন সুন্দর হাসি কম দেখা যায়।

আমরা অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম। আবার পিছিয়ে আসতে হ'ল। সঙ্গের ভদ্রলোকটি ভারতবর্ষে এক সময় ছিলেন। ইনি জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর প্রভৃতিকে জুজুৎসু শেখাতেন। বাঙালী অতিথি আসছেন ব'লে তাঁকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

গেট দিয়ে ছোট্ট বাগান-দেওয়া একটি বাড়ীতে ঢুকলাম। জুতা খুলে যথারীতি ড্রয়িংরুমে ঢুকতে হ'ল। বেগুনফুলী রঙের পোষাক পরা সুন্দরী একটি মহিলা অভ্যর্থনা করলেন। ইনি মিস্ সাকুরাইয়ের বৌদিদি। তার পর এলেন মা, বাড়ীর গৃহিণী। তিনি বিধবা বর্ষীয়সী। একেবারে কালো সাদাসিদে পোষাক পরেছেন। এঁরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ঘরটি কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি, দক্ষিণ-ভারতীয় মুখোস ইত্যাদি দিয়ে সাজান। সকলেই ইংরাজী বোঝেন, মেয়েটি বলেনও। বিলাতী বসবার ঘরে ও-চা খেয়ে দিশী ঘরে রাত্রের আহারের জন্ত গেলাম। গৃহিণী নিজের হাতে হিবাচিগুলি তুলে সে ঘরে নিয়ে গেলেন, আর কাউকে ছুঁতে দিলেন না। পুরুষমানুষ সামনে থাকলে স্ত্রীলোককে কিছু বহন করতে নেই এই পাশ্চাত্য নীতিটি জাপানীরা একটুও শেখে নি। সব বোঝা মেয়েরাই সেখানে বয়। কাজেই মজুমদার মহাশয় চেষ্টা করেও সাকুরাই-গৃহিণীর কোনও সাহায্য করতে পারলেন না।

এঁরা আজ সব কাজই নিজেরা করছিলেন, ঝিকে কিছু করতে দেওয়া হয় নি। অতিথিকে সম্মান করবার এই প্রাচ্য প্রথাটি জাপানে অনেকে এখনও মানেন। খাবার ঘরটি জাপানী রুচিতে নিঁখুৎ ও নিরাড়ম্বর ক'রে সুসজ্জিত। তেমনি জোড়া গদির আসন, নীচু চৌকির উপর খাবার, দেয়ালে তুলির লিখন ইত্যাদি।

পিছনে অল্প একটু উঁচু জায়গায় ফুল, দক্ষিণ-ভারতীয় পাথরের মূর্ত্তি, সিংহলের কালো কাঠের হাতী ইত্যাদি সাজান। কাঠের দেয়ালের হাওয়া-চলাচলের পথগুলি কাঠের গুঁড়ির গায়ের স্বাভাবিক রেখা অনুযায়ী ঢেউ খেলিয়ে কাটা।

খাওয়া খানিকটা ভারতীয় অর্থাৎ মুসলমানী রকমের হ'ল। বউটি সবই প্রায় নিজে রেঁধেছিলেন। ননদ-ভাজ দু-জনেই খুব কাজের। ভাজ সব পরিবেশন করলেন, এঁটো বাসন পর্য্যন্ত তুলে নিয়ে গেলেন, নিজে খেতে বসলেন না। শাশুড়ীকে সম্মান ক'রে কিছু করতে দেওয়া হ'ল না। তিনি কেবল আদরযত্ন ও গল্পগাছা করলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ীর বৌ জাপানী বীণা-জাতীয় বাজনা 'কোতো' বাজিয়ে শোনালেন। মাটির উপর বাজনাটি রেখে হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে বাজাতে হয়। এর আওয়াজ খানিকটা সেতারের মত। মিস্ সাকুরাই বেশ সুন্দর গান করতে পারেন। তিনি জাপানী ও ইউরোপীয় গান অনেক শোনালেন। জাপান ইউরোপের সমকক্ষ হবার চেষ্টায় তাদের গান, নাচ ইত্যাদিও গ্রহণ করেছে। জাপানের মত সামাজিক শাসনের দেশে এখন যুগল নৃত্য, অর্দ্ধনগ্ন নৃত্য ইত্যাদি খুব চলে।

বিদায়ের সময় এঁরা অনেক ছোট ছোট উপহারও দিলেন এবং খাতায় আমাদের সই করিয়ে নিলেন।

জোড়াসাঁকোতে যিনি জুজুৎসু শেখাতেন সেই ভদ্রলোক এত বৎসর পরেও একটু একটু বাংলা বলতে পারেন। তিনি বাংলায় রথীবাবু ও মীরা দেবীর কুশল প্রশ্ন করলেন। কার কত বয়স হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে দেশী বিলাতী জাপানী সব রকম নমস্কার সেরে ফেরা গেল।

ফিরবার ট্রেনে ভীষণ ভীড়। জাপানীদের ট্রেনে বিদেশী মেয়েরা দাঁড়িয়ে সারা পথ গেলেও কেউ বসতে জায়গা দেয় না। সবাই তাজ্জব জিনিষ ভেবে মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু পুরুষ স্ত্রীলোক কেউ ওঠে না। নিজেদের দেশের মেয়েদেরও এরা কখনও আসন ছেড়ে দেয় না দেখেছি। গাড়ীতে মাঝে মাঝে মাতাল এসে ঘাড়ের কাছে টলতে থাকে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী জন-কয়েক জাপানী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে আমাদের বাসায় চা খেতে বলা হয়েছিল। পি. ই. এন্ ক্লাব আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন ব'লে তাঁদের প্রেসিডেণ্ট সিমাজাকি মহাশয় ও কবি নোগুচি এঁদেরও বলা হয়েছিল। দু-জনেই চিঠির জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্ত কাজ থাকাতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নি। শান্তিনিকেতনে যে চিত্রশিল্পী কাম্পো আরাই এক সময় এসেছিলেন, তিনি সস্ত্রীক

এলেন। অধ্যাপক কিমুরা সংস্কৃত কলেজে এক সময় পড়তেন, তিনিও এসেছিলেন। এছাড়া মিসেস কোয়া, মিসেস শিমিজু, মিসেস সাকুরাই প্রভৃতি আমার মহিলা বন্ধুরা এসেছিলেন। আহাজে পরিচিত মিঃ ও মিসেস নাকাই এবং টোকিওর 'ইন্দোজাপানীস কলচরাল এসোসিয়সনে'র সেক্রেটারী মিঃ সাকাই এসেছিলেন।

জাপানী প্রথামত এঁরা প্রায় সকলেই কিছু কিছু উপহার হাতে ক'রে এসেছিলেন। অধ্যাপক কিমুরা বাংলা বলেন। তিনি বললেন, "এবার আপনার স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি বাংলা পড়িয়াছি লিখিয়াছি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও প্রমথনাথ তর্কভূষণের কাছে পড়িয়াছি।"

আমি বললাম, "আপনি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাস-গুপ্তকে জানেন?" বললেন, "হাঁ জানি। তাঁহার সহিত শিক্ষা বিষয়ে আমার ঝগড়া।" তার পর ঠাকুর মহাশয় ও আমার পিতার বিষয়ে কিছু কিছু কথা বললেন। তিনি বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলেন। 'ল' 'ড়' উচ্চারণ করতে পারেন না, আর সব ঠিকই বলেন। আমার কন্যাকে বললেন "বস, বস, তুমি বুঝি কালিদাসের বড় মেয়ে?" ইনি অল্প উর্দু'ও পড়িতে পারেন।

মিঃ আরাই বসে বসে সকলের খাতায় তুলি দিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে দিলেন। আমার মেয়ের একটি ছবি তিন মিনিটে আঁকলেন এবং তাকে একটি সুন্দর জাপানী ওবি উপহার দিলেন। ক্রমশঃ

বিয়োগিনী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

গৃহলক্ষ্মী নহ শুধু, তুমি দেবি, ছিলে মোর বাণী,
তব স্পর্শে প্রাণ পেয়ে আমার এ চিত্তবীণাখানি
মুখরি উঠিত নিত্য,—জানুক বা না জানুক কেহ;
অত্যুক্তি বলিয়া এরে বন্ধুজনে করিবে সন্দেহ,
জানি তাহা; কিন্তু এই অন্তরের তন্ত্রীর বারতা
তুমি ছাড়া কে জানিবে? কে বুঝিবে এর মর্ম্মকথা!

আজি তুমি ছেড়ে গেছ; পড়ে—আছে অন্ধকার কোণে
যন্ত্রের কঙ্কালখানা—কে আর কাহার কথা শোনে!
ধূলি-জালে ঢাকে নিত্য, বায়ু আসি নাড়া দিয়ে যায়,
হা-হা ক'রে কাঁপে বক্ষ, আজি হায়, সে ধ্বনি কোথায়?

সে বীণা তো আবর্জ্জনা, বুকে যার নাহি বাজে গান।
দুর্দ্দিনের অন্ধকারে আজি তাই ভাবি—ভগবান!
ফিরাইয়া লহ এই যন্ত্রটারে তব অন্তঃপুরে,—
আর কেন এ যন্ত্রণা,—আর কেন রই সৃষ্টি জুড়ে!



বহির্জগৎ

শ্রীগোপাল হালদার

১

ইউরোপে বোধ হয় মানুষের দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে—চারি দিকে যুদ্ধের ঘনায়মান বিভীষিকা, কোন্ মুহূর্তে বারুদের স্তূপে একটি স্ফুলিঙ্গ আসিয়া উড়িয়া পড়িবে, আর জ্বলিয়া উঠিবে সমস্ত ইউরোপ। চারি দিকেই খেলিতেছে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গের ক্রূর দীপ্তি—এক নিমেষে একটি নিবিয়া গিয়া প্রাণে ভরসার সঞ্চার হইতে না হইতেই দেখা দেয় অগণিত স্ফুলিঙ্গের অশান্ত অগ্নিবৃষ্টি,—মানুষের মন আর বিশ্রাম খুঁজিয়া পায় না, দম বন্ধ হইয়া আসিবার কথা। দশ লক্ষ জার্মান সৈনিক হাতিয়ার লইয়া প্রস্তুত, সহস্র সহস্র জার্মান শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী রাইনল্যাণ্ডের গোয়েরিং লাইন ও হিট্‌লার লাইন নামীয় দুর্গশ্রেণী অবিলম্বে সম্পূর্ণ করিবার জন্য মহানায়কের আদেশে রাত্রিদিন নিযুক্ত, ব্যাভেরিয়া ও স্যাক্‌সনির জনসমাজ সমাসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনায় চিন্তাকুল, আর চেকোস্লোভাকিয়ার জাতীয় সংঘর্ষের দুর্নিবার্য্য আশঙ্কা ইহারই ছায়ায় হইয়া উঠিতেছে আরও কঠিন আরও কালো—এমনি চলিয়াছে প্রায় মাসাধিক যাবৎ ইউরোপের অবস্থা। সেই দুর্য্যোগময় দিবস এখন বুঝি এক রক্তসন্ধ্যার দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিল—দিন তিনেকের মধ্যে ন্যুরেম্‌বের্গের নাৎসী-মহোৎসবে স্বয়ং হিট্‌লার কোন বাণী প্রচার করিবেন তাহাই শুনিবার জন্য আট লক্ষ জার্মান আগ্রহে অধীর—আর বাদবাকী ইউরোপ উৎকণ্ঠায় রুদ্ধশ্বাস। সাইবেরিয়ার যুদ্ধাশঙ্কা নিবারিত হইতে না হইতেই সোভিয়েট্-শক্তি কিফ্ ও শ্বেত-রুশিয়ার সামরিক সংগঠন আসন্ন সমরের উপযোগী করিয়া তুলিতে ব্যস্ত,—সীমান্তের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, 'রক্ত বাহিনী' প্রস্তুত, তাহার বিমান-বহর চেকোস্লোভাকিয়ার আহ্বানের জন্য অপেক্ষামান। আর বাল্টিকের পারে, এস্টোনিয়ার ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সীমান্তে, লুগানদীর পার্শ্বে, বনানী জ্বালাইয়া সোভিয়েট্ যে সীমান্ত রক্ষার দ্রুত আয়োজন চালাইয়াছে তাহার ধোঁয়ায় নাকি ফিন্‌ল্যাণ্ডের ও সুইডেনের অধিবাসী-দেরই চোখ অন্ধ হইয়া গেল। ইহারই মধ্যে ধীরে ধীরে ব্রিটিশ নৌ-বহর উত্তর-সাগরে তাহার নৌ-মহড়া শেষ করিতেছে, চেম্বারলেন, হ্যালিফ্যাক্স, সাইমন ছুটি ছাড়িয়া লণ্ডনে আসিয়া জুটিতেছেন; আর ফ্রান্সে ফরাসীর বৈদেশিক দূতরা সমবেত হইতেছেন, সমস্ত বিভাগীয় শাসনকর্তাদের অবিলম্বে কাজে যোগদানের নির্দ্দেশ আসিয়াছে, রিজার্ভ সৈন্যদল আদেশানুযায়ী আসিয়া নিয়মিত বাহিনীতে মিলিয়াছে, ভূগর্ভস্থ মেগিনো লাইনের সুরক্ষিত দুর্গশ্রেণী সৈন্যে, উপকরণে, আয়োজনে একেবারে সর্ব্বাংশে প্রস্তুত। ইউরোপের এই আবহাওয়ার মধ্যে স্পেনের গণতন্ত্রীদের পুনঃ পরাজয়ের পালা বা ইতালীতে য়িহুদী-দলনের নূতন আয়োজনও মানুষের চক্ষেই প্রায় পড়ে না। চীনের বিপুল যুদ্ধাগ্নি পর্য্যন্ত যেন ম্লান। আর প্যালেষ্টাইনের বিদ্রোহী প্রয়াস,—বোমা ও গুলি ও সন্ত্রাসনবাদ দমন, কি মেক্‌সিকোতে ব্রিটিশ ও আমেরিকান তেলের খনিগুলি মেক্‌সিকোর স্বায়ত্তীকরণ,—মানুষ ইহার খোঁজ লইবে কখন? দম যে তাহার নাৎসী-ত্রাসেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। বহু মানুষের ভাগ্য লইয়া খেলা চলিয়াছে যে তাহাদের চোখের সম্মুখে—বার্লিনে ও প্রাগে। আশা ও নিরাশার এমন দ্বন্দ্বও বুঝি এতদিন ধরিয়া এমন তীব্রতায় আর কোনদিন চলে নাই। আজ মনে হয় হিট্‌লার একটু প্রসন্ন, কালই সংবাদ আসিল প্রাগের চেক্‌রা আরও এক দফা দাবী পূরণের জন্য প্রস্তুত, অমনি শোনা গেল সুদেতেন-নেতৃবৃন্দ আবার আলোচনা করিতেছেন, পরদিনেই সংবাদ আসিল আকাশ মসীময়—ফ্যুরেরের ভ্রূকুটি-তলে প্রাগের প্রাণ-শিখা বুঝি আর বাঁচে না।

আবার আশঙ্কা, আবার অনিশ্চয়তার অস্থিরতা আবার দুশ্চিন্তার দোলা,—এমনি করিয়াই ইউরোপের দিন কাটিতেছে।

২

চার দফা দাবি-পূরণের চেষ্টায় বেনেশ ও হোজা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহাতে মনে হয় পিছনে এই জার্ম্মান রাইখের ভরসা না থাকিলে সুদেতেন ডয়েট্শ দল আজ ইহাতে উৎফুল্ল চিত্তে স্বীকৃত হইত। একটু একটু করিয়া বেনেশ প্রায় সবই ছাড়িতেছেন —ছাড়িতে তিনি বাধ্য হইবেন, কতকটা হিট্লারের সশস্ত্র আয়োজনে, আর কতকটা ব্রিটিশ পরামর্শদাতা লর্ড রান্সিম্যানের মধ্যস্থতার মর্য্যাদারক্ষা-কল্পে, এই কথা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম। চেক্ সরকারের শেষ দফা প্রস্তাবাবলী বাহির হইয়াছে (২৩শে ভাদ্র, ১৩৪৫, ৯ই সেপ্টেম্বর, '৩৮)। তাহাতে

প্রথমতঃ জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারী চাকুরীতে সুদেতেন-জার্ম্মাণদিগকে নিয়োগের নীতি অনুসরণের সুপারিশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সুদেতেন অঞ্চলে সরকারী চাকুরীতে তাহাদের স্বদেশীয় লোকজনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ স্থানীয় পুলিসের চাকুরীতে স্থানীয় লোকজনকে নিযুক্ত করার জন্ম সুদেতেন অঞ্চলে স্ব স্ব এলাকায় শান্তিরক্ষা কার্য্যের চাকুরী বণ্টনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ ভাষার সম্পূর্ণ সমান অধিকারের উপর ভিত্তি করিয়া ভাষা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন। পঞ্চমতঃ সঙ্কটের ফলে যে-সব সুদেতেন জার্ম্মান অঞ্চলের শিল্পব্যবসা ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সব শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্ম সুবিধাজনক সর্ত্তে ১০ কোটি ক্রাউন মুদ্রা ঋণদান প্রভৃতি সাহায্য করার প্রস্তাব। ষষ্ঠতঃ শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য দেশকে বিভিন্ন জেলায় বিভাগ করার প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে যে-সব জিলায় জার্ম্মানগণের সংখ্যাধিক্য হইয়াছে সেই সব জেলায় জাতীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। জাতীয় ঐক্যের সহিত সম্পর্কশূন্য যাবতীয় সমস্যার সমাধান স্থানীয় লোকজনই করিবেন। সীমান্ত সুদৃঢ়ীকরণ এবং রাষ্ট্রিক ঐক্য রক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। সপ্তমতঃ কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সকল বিভাগেই প্রত্যেক জেলার জন্য বিশেষ বিভাগ খোলা হইবে এবং উহার কার্য্য চেক ও সুদেতেনগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং চেকস্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান করিবেন চেক কর্ম্মচারীরা এবং সুদেতেন স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান করিবেন সুদেতেন জার্ম্মান কর্ম্মচারীরা। অষ্টমতঃ পৌরাধিকার সম্বন্ধে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হইবে এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে উভয় জাতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণেরই স্ব স্ব জাতীয় অধিকার ও স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা হইলে তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক জাতির লোকের একটি করিয়া বিশেষ তালিকা প্রণয়ন করা হইবে। নবমতঃ যে-সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নাই সে-সব বিষয়ে একটা মীমাংসা করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহার সহিত ২৩শে এপ্রিল কার্লসবাদে সুদেতেন ডয়েট্শ নেতা হেনলাইন যে দাবি উপস্থিত করেন তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। কারণ, সুদেতেন নেতৃবর্গ সেই দাবি এক চুলও এখন পর্য্যন্ত ছাড়িতে অস্বীকৃত। সংক্ষেপে সেই আট দফা দাবি এইরূপ :—

(১) চেক্ ও জার্ম্মানদের সর্ব্বাংশে সমান অধিকার চাই;

(২) এই সমাবস্থার গ্যারান্টি-স্বরূপ সুদেতেন ডয়েট্শ-দের আইনানুযায়ী গঠিত সঙ্ঘ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

(৩) রাষ্ট্রের মধ্যে যে সব অঞ্চল জার্ম্মান তাহা স্থির করিতে ও আইনতঃ জার্ম্মান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে;

(৪) জার্ম্মান অঞ্চলের জন্ম পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই;

(৫) প্রত্যেক নাগরিককে, নিজের বিশেষ জাতীয় অঞ্চলের বাহিরে বাস করিলেও, আইনানুযায়ী রক্ষা করা চাই;

(৬) ১৯১৮ হইতে যে-সব অন্যায় হইয়াছে তাহা বিদূরিত করিতে হইবে এবং ঐ সব অন্যায়ে যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে;

(৭) এই নীতি গ্রহণ করিতে হইবে যে, জার্ম্মান অঞ্চলে জার্ম্মান কর্ম্মচারীই নিযুক্ত হইবে।

(৮) জার্ম্মান জাতীয়-পরিচয় (nationatity) ও জার্ম্মান রাষ্ট্রদর্শন গ্রহণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা জার্ম্মানদের দেওয়া দরকার।

এই আট দফার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে কার্য্যতঃ ইহার অনেক দাবিই এখন চেকরা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত। কিন্তু, এই আট দফার পিছনে যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় তাহা এখনও সুদেতেন জার্ম্মানদের করায়ত্ত

হইবে না। রাষ্ট্রকর্মে জার্মান অধিকার স্বীকৃত হইল বটে এবং স্থানীয় শাসনে প্রায় সর্ব্বত্র এবং রাষ্ট্রিক শাসনেও মাত্রানুযায়ী জার্মান অংশীদারি মানিয়া লওয়া হইতেছে বটে; কিন্তু সুদেতেনল্যাণ্ড এখনও একেবার সর্ব্বাংশে 'স্বাধীন' হইল না; কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রহিল অর্থনৈতিক, বৈদেশিক ও আত্মরক্ষা বিভাগ তিনটি; সুদেতেনের পুলিস ও পোষ্টাপিস এখনও জার্মানরা পাইল না; সুদেতেন জার্মানরা আইনতঃ গঠিত সঙ্ঘ বলিয়া এখনও স্বীকৃত হইল না; পুরাতন ক্ষতির খেসারৎও ঠিক প্রতিশ্রুত হয় নাই; আর জার্মান জাতীয়তা ও জার্মান রাষ্ট্রীয় দর্শন গ্রহণ করিবার অধিকার অর্থাৎ নাৎসী চিন্তা ও নাৎসী আদর্শ অনুযায়ী চলিবার স্বাধীনতা এখনো সুদেতেন ডয়েট্শরা পাইল না। মোটের উপর তাহা হইলে কার্লসবাদের আট দফার মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম দাবি সর্ব্বাংশে পূর্ণ হইল কি না সন্দেহ; আর অষ্টম দাবি যে পূর্ণ হয় নাই, তাহা তো নিঃসংশয়। এই দাবিটিই আবার আজিকার জার্মান চিন্তার প্রথম ও প্রধান কথা—সমস্ত জার্মানকে একই জাতীয় রাষ্ট্রে, একই জাতীয় আদর্শে একত্র করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ইহা ঠিক ঠিক পূর্ণ হইতে পারে তখনি যখন অষ্ট্রিয়ার জার্মানদের মত সুদেতেনল্যাণ্ডের জার্মানরাও তৃতীয় রাইখের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সেই লক্ষ্যের পথে প্রথম স্তর হিসাবেই অষ্টম দাবিটি ও অন্যান্য দাবিগুলি উত্থাপিত হয়—যাহাতে আপাততঃ চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইলেও সুদেতেনল্যাণ্ড একটি বিশিষ্ট ও প্রায় বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়, এবং সেই রাষ্ট্র-কাঠামো গড়া হয় তৃতীয় রাইখের অনুরূপে। হেন্লাইন ও তাঁহার দলের উদ্দেশ্য আপাততঃ চেকোস্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরেই এক সুদেতেন 'সামগ্রিক রাষ্ট্র' গড়া,—ঐ সাধারণতন্ত্রের মধ্যে দাঁড়া করানো একটি 'টোটালিটেরিয়ান্' রাষ্ট্র। ইহার ফলে অবশ্য চেক্ সাধারণতন্ত্র আর "চেক্ জাতীয় রাষ্ট্র" থাকিবে না, একচ্ছত্র থাকিবে না, তাহার সার্ব্বভৌম কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে—রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র গজাইবে। ইহাতে একদিকে চেক্ রাষ্ট্র খণ্ড ও হীনবল হইয়া পড়িবে, এবং তাহাতে তৃতীয় রাইখের "পূর্ব্বদিগ্‌বিজয়ের" পথ পরিষ্কৃত হইবে, অন্য দিকে সুদেতেনরা টোটালিটেরিয়ান্ চিন্তায় ও প্রতিষ্ঠানে বর্দ্ধিত হইবে, এক সময়ে শেষে অষ্ট্রিয়ার মত তৃতীয় রাইখের বুকে আশ্রয় লাভ করিবে। না বলিলেও চলে, চেক্‌রা তিন-তিন-শ বৎসর পরে নিজেদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিয়া আজ বিনা যুদ্ধে এই পরিণাম আর স্বীকার করিয়া লইবে না। অতএব, হেন্লাইনের আটদফাও সর্ব্বাংশে তাহারা গ্রহণ করিবে কেন?

কিন্তু চেক্ রাষ্ট্রজগণ উপরে যে-সব অধিকার ছাড়িয়া দিবার কথা উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতেই কি তাঁহাদের রাষ্ট্রশক্তি আর সবল থাকিবার সম্ভাবনা থাকে? ইহা ঠিক যে, এই অধিকারগুলি সংখ্যাল্পদের দেওয়ার পরে এ রাষ্ট্র আর ঠিক সার্ব্বভৌম, জাতীয় রাষ্ট্র থাকিবেনা, সুইৎসারল্যাণ্ডের মত ক্যান্টনে ক্যান্টনে ভাগ হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে উহার মনস্বী রাষ্ট্রনীতি-কর্ণধারগণ এই সব সর্ত্তও বা স্বীকার করিতেছেন কেন? ইহার উত্তর মিলিবে সে রাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্টের কথায়, "বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের অতিমাত্রায় চাপের ফলেই তাহারা এই সব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।" সে বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট অবশ্য তৃতীয় রাইখ। আর মধ্যস্থ রান্‌সিম্যান নিশ্চয়ই এক এক দফা অধিকার যেই চেক্‌রা ছাড়িতেছে, আর অমনি তাহাদের সুবুদ্ধির তারিফ করিতেছেন; এবং যেই সুদেতেন দল তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছে, অমনি চেক্‌দের দেখাইতেছেন জার্মানির সুসজ্জিত বাহিনীর বিভীষিকা আর পরামর্শ দিতেছেন আরও সুবিবেচনার। ঘটনাটা যে একেবারে অনুমান নয় তাহা প্রমাণিত হয় এই শেষ দফা প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে "টাইম্‌সের" অভিমতে। "টাইম্‌স" সাধারণত ব্রিটেনের সরকারী নীতি ও মনোভাব প্রকাশ করে, তাই তাহার এই সম্পর্কিত অভিমত পাঠে ইউরোপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে অভিমতের ভাষায় বেশ সাবধানতার পরিচয় আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য স্পষ্ট:—

লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকা, সুদেতেন জার্মানদিগকে সুদেতেন-অধ্যুষিত জেলাগুলি ছাড়িয়া দেওয়াই চেক্ সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় বলিয়া সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন।



১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জাপানী সৈন্য। ঐ সময়ের আমেরিকান দৌত্য-অভিযানের চিত্রকর হাইনে কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র



আমেরিকান দূত কমডোর পেরির সহিত জাপানী মন্ত্রীদলের সাক্ষাৎ। হাইনে কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র

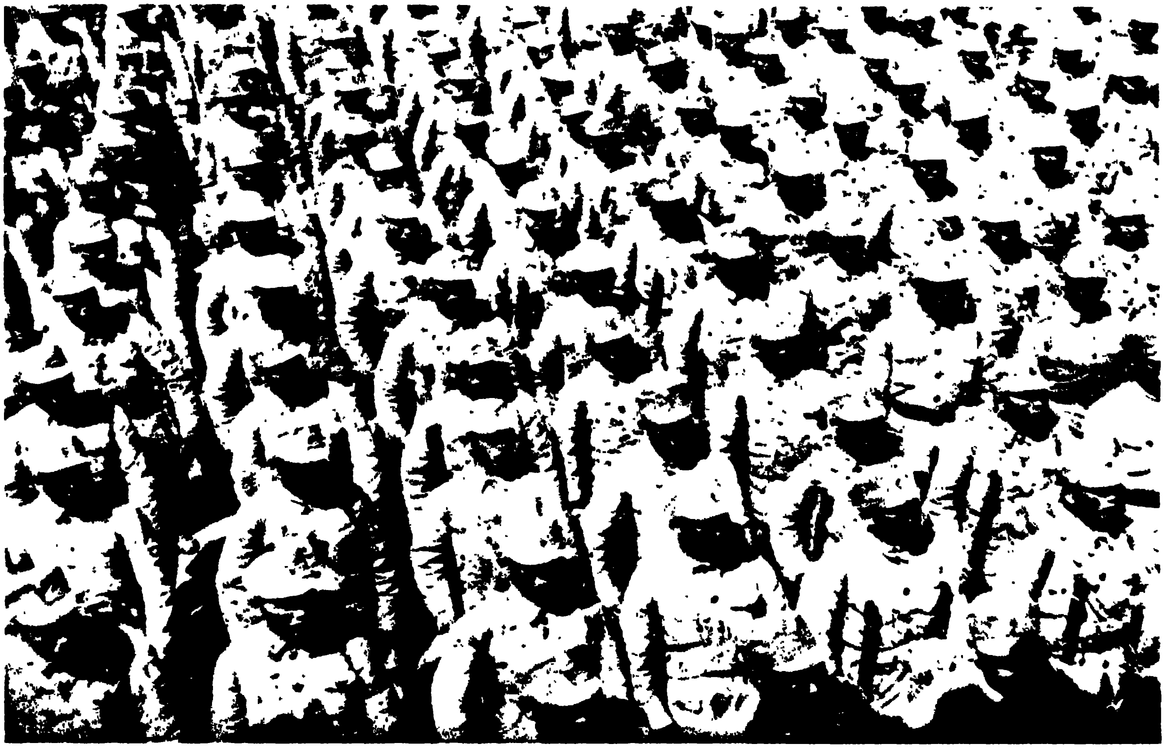


স্পেনের যুদ্ধ

টেরুয়েলের অধিবাসিগণ প্রাণভয়ে পলাতক



এথেন্স। গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র বর্তমানে গ্রীসের একটি প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র



চীন-জাপান যুদ্ধ। চীনের তরুণ স্বেচ্ছাসেবক-সৈন্য। বৎসরাধিক ধরিয়া সহস্র সহস্র এইরূপ স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য সমরক্ষেত্রে যোগ দিয়া আসিতেছে

ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বাস্তবতঃ চেক্ গবর্ণমেণ্ট যে-সকল অধিকার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন সুদেতেনগণ এখন তাহা অপেক্ষা যদি অধিক দাবী করে তাহা হইলে কেবল ইহাই অনুমান করা যায় যে আইনতঃ সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অভাব-অভিযোগ-সম্পর্কীয় দাবী মিটাইলে জার্ম্মানগণ সন্তুষ্ট থাকিবে না। তাহারা চেক্ গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া কখনও শান্ত হইতে পারিবে না। সুদেতেন জেলাগুলি ছাড়িয়া দিয়া চেকোস্লোভাকিয়াকে 'এক জাতির লোকের আবাস-ভূমিতে' পরিণত করিবার অনুকূলে কোন কোন মহল যে মত পোষণ করেন, বর্ত্তমান অবস্থায় চেক্ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই প্রস্তাব-সম্পর্কে বিবেচনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হইয়াছে যে, সমস্যার স্থায়ী সমাধান করিতে হইলে সব অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। রয়টারের কূটনৈতিক সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন যে, সুদেতেন-অঞ্চল ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে 'টাইম্স' যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা ব্রিটিশ সরকারী মহলের অভিমত নহে।—রয়টার

বৃথাই ব্রিটিশ-সরকার বলিতেছেন, আমাদের মনোভাব এইরূপ নহে। ইউরোপ প্রায় বুঝিয়া লইয়াছে, হিট্‌লারের অভীষ্ট পূরণ করিবার পক্ষে "টাইম্স" সর্ব্ব প্রথম এক দফা গাহিয়া লইলেন, ইহার পরেই সুরটা ঘুরিয়া ফিরিয়া অন্যে আবার ধরিবে। কিন্তু সুদেতেন-অঞ্চলকে চেক্ রাষ্ট্র হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে দিতে পারে না ইহা তো জানা কথা। এই কারণেই তো ভার্সাইতে মার্শাল বেনেশ এই অঞ্চলকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। তাহা না-হইলে চেক্ রাষ্ট্রের সীমান্ত-রক্ষা সম্ভব হয় না। সেই সামরিক প্রয়োজনেই এ-অঞ্চল চেক্ রাষ্ট্রের চাই; আর এখন সে প্রয়োজন যত বেশি, বিশ বৎসর পূর্ব্বে ততটা কল্পনাও করা যায় নাই। অন্য দিকে এই প্রয়োজনের তাগিদে এখানে চেক্ রাষ্ট্র যে সুরক্ষিত দুর্গমালা গড়িয়াছে, অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করিয়াছে, সুদেতেনল্যাণ্ড বিচ্ছিন্ন হইলে সেই সবই যাইবে চেক্‌দের শত্রু এই জার্ম্মানদের কবলে। অর্থাৎ, তখন চেকরা যদি



চীন-জাপান যুদ্ধ। জাপানী সৈন্যেরা সমরোপকরণ তীরে আনিতেছে

বাঁচে বাঁচিবে সে শত্রুর কৃপায়—নিজেদের সামর্থ্যে, আয়োজনে নয়।

৪

কিন্তু সুদেতেন নেতৃবর্গ কি চেকদের শেষ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়াছেন? তাঁহারা নিজেদের দাবি সূচ্যগ্র-পরিমাণও ছাড়েন না। এদিকে পুনঃপুনঃ অধিকার ছাড়িয়া চেকরা বিভ্রান্ত। তাই চেক্ সৈনিক ও সাধারণদের মধ্যেও একটা ক্ষুব্ধ উগ্রতা মাথা চাড়া দিতেছে।

"মিলিটারী গেজেটে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে চেকের সামরিক কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে খোলাখুলিভাবে নিজেদের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বিবৃতিতে লিখিত হইয়াছে আমরা যে-সকল কর্ম্মচারী মরণকে বরণ করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি—আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া এবং মাসারিকের শেষ অভিলাষ পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমরা এই সাবধানবাণী ঘোষণা করিতেছি যে, কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রের প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করা বা কোন রকমেই তাহা অবনত করা চলিবে না। এই বিষয়ে ইহাই আমাদের চরম জবাব। আমরা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় চলিতেছি, কাজ করিতেছি এবং আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছি, তাহা হইতে এক পাও হটিয়া দাড়াইব না। মৃত্যু যদি আসে তাহাও স্বীকার, তবু সূচাগ্র ভূমিও ছাড়িতে আমরা প্রস্তুত নহি।"

অতএব, এখানে-ওখানে যে আজ আবার চেক ও জার্ম্মানদের সঙ্গে হাতাহাতি মারামারি হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। এ বিষয়ে সুদেতেন ও জার্ম্মান পত্রিকাগুলি স্পষ্ট উত্তেজনাও সৃষ্টি করিতেছে, প্ররোচনাও দিতেছে; এই কৌশলেই তাহারা অষ্ট্রিয়াও গ্রাস করিয়াছিল। চেক্ রাষ্ট্রকর্ম্মচারীরাও যে সব সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাই, চেকদের প্রস্তাব বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জানা গেল আইন সভার দুই জন সুদেতেন জার্ম্মান প্রতিনিধি চেক্ পুলিশের দ্বারা প্রহৃত হইয়াছেন। অমনি জার্ম্মান পত্রগুলি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—"চেক্ রাষ্ট্রনীতিকগণ আজ নিজেদের লোকদের তাঁবে রাখিতে পারিতেছেন না, শাসন-শৃঙ্খলা সেখানে বিপন্ন, জার্ম্মানদের অবস্থা শোচনীয়। অতএব রক্ত চাই রক্ত চাই।" সুযোগ বুঝিয়া সুদেতেন জার্ম্মান প্রতিনিধিরা চেকদের সঙ্গে আলোচনাই বন্ধ করা স্থির করিলেন। হতভাগ্য হোজা ও বেনেশ ছোটাছুটি করিতেছেন, ব্যস্তভাবে বলিতেছেন—"আমরা

উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিব; ইহার প্রতিবিধান করিব, এইরূপ ঘটনা বন্ধ করিব।" আবার হয়তো তাই আলোচনা সুরু হইবে। কিন্তু নিশ্চয় এবার জার্ম্মানরা আরও চড়া দর হাঁকিবেন।



মাদাম চিয়াং কাই-শেক শত ব্যস্ততার মধ্যেও যুদ্ধে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

এদিকে ১০ই তারিখ ন্যুরেমবের্গে হিটলার তাঁহার ঘোষণাবাণী পাঠ করিবেন। হয়তো তিনি বলিবেন—সুদেতেনল্যাণ্ডের গণমত বা প্লেবিসাইট সংগ্রহ করা হউক। উহার অর্থ, সুদেতেন জার্ম্মানরা চাহিবে জার্ম্মান রাইখের সহিত সংযোগ, এবং চেকোস্লো-ভাকিয়ার সহিত বিচ্ছিন্নতা। উহা 'টাইমসে'র কথারই অনুরূপ। বাঁচিতে হইলে উহা চেক্‌দের প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। আর প্রত্যাখ্যান করিলেই কি চেকোস্লোভাকিয়া বাঁচিবে? তাহা নির্ভর করে—রুশিয়ার উপর, ফ্রান্সের উপর আর ফ্রান্সের সহযোগী হিসাবে হয়তো বা কতকাংশ ইংরেজের উপর।

সুদেতেন-অঞ্চলের জার্ম্মানরা উদ্ধত, উদ্দীপ্ত কণ্ঠে আজ আবার গাহিতেছে—'হোরষ্ট ভেসেল সঙ্গীত' আর প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিতেছে, নাৎসীরা অষ্ট্রিয়ায় পৌঁছিয়া যে বাণী ঘোষণা করিয়াছিল তাহাই—"আইন্ ফ্রোক্, আইন রাইখ, আইন ফ্যুরের।" "সত্যই কি এক জাতি, এক রাষ্ট্র ও এক নেতা" লাভের আর দেরি-আছে তাঁহাদের?



যুদ্ধে আহত জাপানী সৈনিক; যুদ্ধে ইহাদের চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, তাই দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিশেষ চর্চ্চা চলিতেছে।

জাতীয়তার উন্মাদনা এমন জিনিষ যে, সে-প্রবাহে মানুষের অনেক লাভক্ষতির হিসাবও যেমন ভাসিয়া যায়, তেমনি তাহাতে তলাইয়া যায় সামান্য ও অসামান্য মানুষের শুভাশুভের বুদ্ধি সমভাবে। সুদেতেন জার্ম্মানদের জাতীয়তাবোধে উগ্রতা থাকিলেও তাহা বুঝিতে পারা যায়—রক্তের টানে, ভাষার

টানে, কতকাংশে গরিমাময় অতীত ও বর্ত্তমানের টানে তাহারা জার্ম্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত হইতে চায়। কিন্তু অদ্ভুত ঠেকে সেই জাতীয়তাবোধ যাহা অপরের জাতীয়তাবোধকে চূর্ণ করিয়া, অপর জাতির সত্তাকে অপমানিত করিয়া, তাহারই ধ্বংস-স্তূপের উপর গড়িতে চায় নিজ জাতির গগনস্পর্শী মহিমা। অথচ, উহাও জাতীয়তাবোধ তাহাতে সংশয় নাই। বরং জাতীয়তাবাদের শেষ পরিণতিই এই সাম্রাজ্যবাদী দানবীয়তা। সেই অধ্যায় ইউরোপে পূর্ব্ব হইতেই চলিয়াছে ; এশিয়ায় এ অধ্যায়ের উদ্বোধন করিয়াছে জাপান। ১৮৯৪ সনে ফরমোসা ও পরে কোরিয়া বিজয়ের সময় হইতেই তাহার এই দস্যুতার পালা সুরু হয়—এখন সমস্ত চীন তাহারই তাড়না ভোগ করিতেছে। ভগ্ন হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়, চূর্ণ প্রাসাদ ও নগর, সাংহাই-নানকিনের দৌরাত্ম্য, ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কাউর বোমাবিধ্বস্ত অসামরিক অধিবাসী—সেই জাতীয় উন্মত্ততার প্রমাণ। হ্যাঙ্কাউর পথের চীনা প্রতিরোধকে



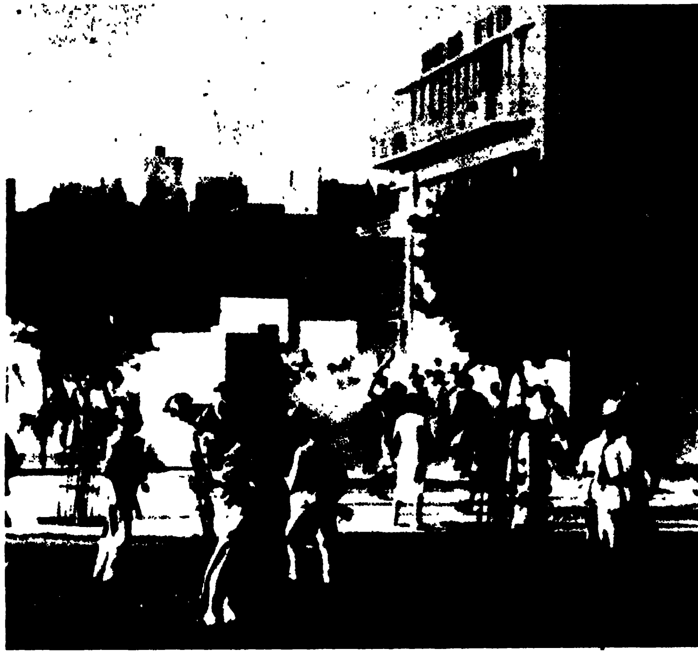
চীনের য়ুনান প্রদেশে ধান্যরোপণ

উড়াইয়া দিতে এখন জাপানীরা প্রাণ দিতেছে অকাতরে। এই ধ্বংসলীলায় জাপানের নরনারী অকুণ্ঠিত চিত্তে দিতেছেন ধনমান, আয়ু-সম্পৎ, পুত্র, বিত্ত, প্রাণ। কিন্তু সাধারণ লোকের এ মত্ততাও সহজবোধ্য—রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রচার-ষড়যন্ত্রে আজ জনসাধারণ তো নিতান্তই তুচ্ছ বলি। উহার মাহাত্ম্যে তাহারা বলি গিয়াই মনে করে, মুক্তি পাইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য মনে হয় এই যে, জাতির চিন্তাশীল মনীষীরাও এই ছোঁয়াচে রোগের হাত এড়াইতে পারেন না। দেখিয়া শুনিয়া মানুষের বুদ্ধি, যুক্তি, হৃদয়-বৃত্তির বড়াই, মনে হয়, বড়ই ফাঁকা—আসলে পরিবেশই তাহার জীবন গতি ও মানস-ধর্ম্ম নিয়মিত করে—হয়তো তাহার অজ্ঞাতসারেই করে। ইহারই একটি প্রমাণ জাপানী কবি নোগুচির লেখা পত্র মহাত্মা গান্ধী ও কবি রবীন্দ্রনাথকে।



প্যালেষ্টাইনে অশান্তি। টেল আভিভ ও জাফ্‌ফার সীমানায় ব্রিটিশ সৈনিক প্রহরী ঘাঁটি আগলাইতেছে

নোগুচি সুকবি, গীতিকবিতার সাধক, মানুষের সৌন্দর্য্যলোকের পথপ্রদর্শক—ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে তিনি ক্ষেপিয়া



টেল-আভিভ ও জাফ্ফার মধ্যবর্ত্তী স্থানে দাঙ্গা। পুলিস দাঙ্গাকারীদের টেল-আভিভ প্রবেশে বাধা দিতেছে।

গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ক্ষেপিয়াছেন জাপানের প্রতি চীনযুদ্ধ-হেতু আমাদের বিরূপতায়। তিনি বলিতেছেন—জাপানের চীন-আক্রমণ একটা মহান্ ত্যাগ—জাপানীদের পক্ষে। চিয়াং কাই-শেক ও চীনারা নিতান্তই ধর্ম্মহীন। এমন পাষণ্ড তাহারা যে, নদীর বাঁধ কাটিয়া ও দেশটাকে ভাসাইয়া দিয়া দেশরক্ষা করিতে চায়। এমন অন্ধ তাহারা যে বুঝে না, যে, পৃথিবীতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনই আধ্যাত্মিক নীতি, এশিয়া এশিয়ারই থাকা উচিত, বুঝে না, এই উদ্দেশ্যে চীনে আজ জাপানের নরনারী কি বীর্য্যময় ত্যাগের পরিচয় দিতেছে।—একজন বুদ্ধিজীবীর এই চিঠি লেখা পরাধীন দেশের অন্ত দুই বুদ্ধিজীবীর নিকটে—নিশ্চয় শুধু প্রচার বা প্রতারণা নোগুচির উদ্দেশ্য নয়। এই চিঠি পড়িয়া তাই হাসি পায়, দুঃখ হয়—ইহার যুক্তিকে আমাদের খণ্ডন করিবার প্রয়োজনও দেখি না। শুধুই মানিতে হয়—মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, শালীনতাবোধ তাহার পরিবেশ-গত ভাবনার তুলনায়, তাহার যুথগত প্রেরণার তুলনায়, তাহার শ্রেণীগত স্বার্থের তুলনায় কতই না তুচ্ছ! স্বীকার করিতে হয়—ন্যায়বোধ তেমন কোন একটা মৌলিক বৃত্তি নয়, নীতি তেমন কোন শক্তিশালী চেতনা নয়—এ সবই পরিবেশ-সাপেক্ষ, শ্রেণীগত বুদ্ধির ফল।

বুদ্ধিজীবীর এই আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিকৃতি রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করিয়াছে। তিনি নোগুচির পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা হয়তো জাপানী জাতীয়তাবাদীর নিকট পরাধীন জাতির জীবনাদর্শের আর এক শোচনীয় প্রমাণ, কিন্তু মানুষের ইতিহাস হয়তো তাহাকেই দিবে স্থির মর্য্যাদা। কারণ, সে ইতিহাস শুধু হত্যার ইতিহাস নয়—মানুষের শুভ বুদ্ধির ও শুভ প্রয়াসের ক্রমবিকাশেরও ইতিহাস তাহা। রবীন্দ্রনাথের পত্র সেই বিকাশের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। উহার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি সম্ভব নয়—কিন্তু চীন-জাপান সম্পর্কের রক্তাঙ্কিত পত্রে উহা স্থান পাইবার মত, ইহা স্মরণীয়। কবি বলিয়াছেন:

"আপনি এমন একটি এশিয়ার কল্পনা করিয়াছেন যাহা নর-কপালের স্তম্ভের উপর রচিত হইবে। আমি এশিয়ার বাণীতে বিশ্বাসবান, ইহা আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু যে বীভৎস নরহত্যার কার্য্যে তৈমুরলঙ্গের হৃদয় আনন্দিত করিত, সেই কার্য্যের সহিত এই বাণী একশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা আমি কখনো করি নাই···যে গবর্ণমেণ্ট তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রে জীবনের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত ধ্বংস-সাধনে ব্রতী, সেই গবর্ণমেণ্টের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ হইয়া তাহার বিশেষ অনুগ্রহলাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকিবাজিকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এড়ানকে আমি আধুনিক বুদ্ধিজীবীগণ কর্ত্তৃক মানবতার প্রতি কৃতঘ্নতার আর একটি দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করি।"

কিন্তু এমনি দৃষ্টান্তই আজ দেশে দেশে। পৃথিবীতে কয় জন আছেন রবীন্দ্রনাথ—এমনিতর মহামনস্বী, যাঁহার সঙ্কীর্ণ পরিবেশের ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া স্থির চিত্তে বুদ্ধির ও বিচারের কঠিন নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে পারেন?



প্যালেষ্টাইন। হায়ফা বন্দরে পুলিসের সাঁজোয়া গাড়ী

৬

আসলে, মানুষের সভ্যতার তলায়ই ফাঁকির গোঁজামিল রহিয়াছে। তাই, বুদ্ধিজীবীও ফাঁকিবাজির আশ্রয় লন, মানুষের কাছে সে ফাঁকিকেই ঢাকিয়া প্রচার করেন। নোগুচির নিকট চিয়াং কাই-শেক ঘৃণার্হ—পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট চীনকে সে বিক্রয় করিয়াছে, তাই।' নোগুচির স্বদেশবাসীদের নিকট চীনা সেনামাত্রই দস্যু, বিদেশীর সুশাসনে বাধা সৃষ্টি করে তাই। কিন্তু দোষটা কি জাপানীদেরই শুধু? ফাঁকিরও ছোঁয়াচে গুণ আছে। দেখিতে-না-দেখিতে প্যালেষ্টাইনের আরব বিদ্রোহীরাও 'সন্ত্রাসবাদীর' পর্য্যায় হইতে 'দস্যুর' পর্য্যায়ে নামিয়া গিয়াছে। দুইটি শব্দই বাংলা দেশের কাছে বিগত কয় বৎসরে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু উহার পিছনে কি এমনি কোন ফাঁকি ছিল, না কি, তাহা বোধ হয় তখন বাঙালা পরীক্ষার অবকাশ পায় নাই।

'বিদ্রোহী', 'সন্ত্রাসবাদী' বা 'দস্যু' যাহাই হউক, আরবরা কিন্তু সামরিক সরকারের সামরিকতায় দমিত হইল না, বরং দেখা যাইতেছে তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল। সম্প্রতি (৮ই সেপ্টেম্বর) হাই কমিশনার জঙ্গী আইন জারি না করিয়া আর এক দফা অসাধারণ ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন। কারণ, আরব সন্ত্রাসবাদীদের স্যর্ চার্লস টেগার্টের বঙ্গীয় অভিজ্ঞতাবলে শায়েস্তা করা গেল



প্যালেষ্টাইন। মোটর রেল-ট্রলিতে ট্রেনের আগে রক্ষীর দল চলিয়াছে

না। ক্ষুদ্র দেশ প্যালেষ্টাইন—ওয়েল্‌সের প্রায় সমতুল্য। তবু তাহার বিদ্রোহী নেতার হাতে নাকি পনর হাজার দৃঢ়চিত্ত 'দস্যু' আছে। অস্ত্রশস্ত্রও তাহাদের প্রচুর, প্রয়োজন হইলে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী জাতিদের নিকট হইতে আরও পাইবে। ১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকাল হইতে যে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে, তাহা কিছুতেই থামে নাই। পিল কমিশন দেশটি দ্বিভাগের প্রস্তাব করে—আরবদের ও য়িহুদীদের স্বতন্ত্র অংশ, আর ব্রিটেনের রহিবে সর্দ্দারি করিবার বখরা। আরব বা য়িহুদী, কেহই উহা গ্রহণ করে না। তবু উড্‌হেড্ কমিশন গেল খুঁটিনাটির খোঁজখবর করিতে, মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডও এক বার গোপনে উড়িয়া দেখিয়া আসিলেন। কিন্তু বোমা ফাটিতেছে, ডিনামাইট্ ফুটিতেছে, গুলি চলিতেছে, রেল-লাইন উপ্‌ড়ান হইতেছে। জুলাই মাসেই য়িহুদী ও আরব দুই দলের এই দ্রোহিতা চরমে উঠে, এখনও থামে নাই। স্পষ্টই বুঝা যায়—ইংরেজ কর্ত্তৃত্ব অবসান-প্রায়। কিন্তু ইংরেজের কি চোখ নাই?

আছে। সে-চোখ এখন নিবদ্ধ ইউরোপে—রাইনের তীরে, সুদেতেনে, বার্লিনে। ইতিহাসের নূতন অঙ্ক সেখানেই হয়তো এই মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইতেছে।

২৪ ভাদ্র ১৩৪৫



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত আধুনিক ফোটোগ্রাফ হইতে

অরণ্য-দেবতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী বন্ধ্যা, জীবের প্রতি তার করুণার কোন লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায় নি। চারি দিকে অগ্নি-উদ্‌গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন্ সুযোগে বনলক্ষ্মী তাঁর দূতী-গুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অঙ্গনে, চারি দিকে তাঁর তৃণশষ্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হ'ল, নগ্ন পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হ'ল। ক্রমে ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন ক'রে। তখনো জীবের আগমন হয় নি; তরুলতা জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাসের জন্য দিয়েছিল ছায়া। সকলের চেয়ে তার বড় দান অগ্নি; সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করেছে, তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে। আজো সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে।

মানুষ অমিতাচারী; যত দিন সে অরণ্যচর ছিল তত দিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হ'ল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল; যে তার প্রথম সুহৃদ্, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন ক'রে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী



শ্রীনিকেতনের উৎসবে রবীন্দ্রনাথের আগমন
শ্রীঅজিতকুমার রায় কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ

তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর-অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে-অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণ-পাঠক মাত্রেই জানেন যে এক কালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর-ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সহজ দানে তার কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে—এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না; এখানে ছিল অরণ্য, সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে, আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন্ তাঁর ফল, দিন্ তাঁর ছায়া।

এ-সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্য-সম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড় বড় বন ধ্বংস করা হয়েছে, তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারি দিকে তারই আয়োজন ক'রে রেখেছিলেন—মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস ক'রে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয় তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।

আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদীনির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম, হলকর্ষণ—হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন, অন্নের জন্য শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্যের পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারি দিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।

শ্রীনিকেতন
১৭ ভাদ্র, ১৩৪৫

[শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে অভিভাষণের শ্রীঅজিতকুমার রায় প্রভৃতি লিখিত অনুলিপি]

স্মৃতি

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ত্রিশ বছর বয়সের যুবক নীরেন। অথচ জীবনে যেন তার কোন বন্ধন নেই···কোন আকর্ষণ নেই এমনি এক খাপছাড়া নিঃশব্দ বৈরাগী। ফর্সা কাপড় জামাও পরে, জনসমাজেও চলাফেরা করে কিন্তু সে স্বতন্ত্র ধরণের। তাকে ঠিক ছোঁয়া যায় না। বাড়ীঘরের সঙ্গে সম্পর্ক নেই···সম্পর্ক সে রাখে নি। নিছক পরকে নিয়েই সে তার জীবনের দুর্লভ মুহূর্তগুলিকে একের পর এক পরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে গলা টিপে মারছে। ভ্রূক্ষেপ নেই, যেন এতেই তার আনন্দ। জীবনের সত্যকারের প্রয়োজন হয়তো তার ফুরিয়ে গিয়েছে। উদাস গম্ভীর নির্ব্বিকার তার ভাব।

অনেক বছর নীরেন দেশছাড়া। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে নিজেকে সে নির্ব্বাসন দিয়েছে। নিজেকে সে ব্যস্ত রেখেছে নানা কাজে। তার চিত্তলোক থেকে মেয়েদের সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল কিন্তু অধুনা সে ভাবে, কি একটা অভাব অনুভব করে। কর্ম্মক্লান্ত দেহমন নিয়ে যখন সে অলসভাবে বিশ্রাম নেয় বহুদিনের পরিচিত একখানি মুখ তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এত দিন তার ভাবনার অবকাশ ছিল না—নিজের গতিকে অপ্রতিহত রেখেছিল কিন্তু আজ সে বাধা পেয়েছে। তার উদ্যম-উৎসাহ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু কতকগুলি নিঃশব্দ মধুর চিন্তার ছোঁয়া লেগে তার বর্ত্তমান জীবন স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। তার দেহগত আশা-আকাঙ্ক্ষা একটা সীমার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে যায়। তার জীবন-ধারণের সহজ প্রয়োজনকে এক কঠিন গুহার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে যেখানে এক বিরাট নৈঃশব্দ্য অটল গাম্ভীর্য্যে বিরাজ করছে। কোলাহল নেই, কৌতূহল নেই। এক দিনের একটি মুহূর্ত্তেই তা শেষ হয়ে গিয়েছে। নীলিকা তার পথচলায় ছন্দপতন। বর্ত্তমান জীবনে রূপকথার এক রাজকুমারী। যার কায়িক কোন রূপ নেই শুধু অনুভব করা যায় চেতনাকে সজাগ রেখে। নীলিকা আজ ছায়া অথচ তার রূপ আছে··· জীবনরসে পুষ্ট সে তবুও তাকে ভাবতে হবে, সে মৃত। না ভেবে নীরেনের উপায় নেই। এক অশরীরী কল্পনাকে নিয়েই সে স্বপ্ন রচনা করে, নিজেকে সেই স্বপ্নের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে চায়—বাঁচিয়ে রাখা মানে একটানা এক-ঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম উপলব্ধি। নীরেনের আজ পিছন ফিরে তাকাবার দিন এসেছে। সে একাগ্র চিত্তে আজ অতীতের কথাই ভাবছে। নিজের মনকে আর কোন ক্রমেই ফাঁকি দেওয়া চলছে না। তার স্বরূপ আজ প্রকাশ পেয়েছে।

ছোট রূপকথা মেয়েটি নীলিকা। যাকে সে অত্যন্ত অবহেলায় গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি সেই মেয়ে যে হঠাৎ সাড়ী ধরেই তার মনের উপর আক্রমণ করবে একথা সে কল্পনা করতে পারে নি। অথচ তাই হ'ল সত্য। নীরেন বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল কিন্তু ফিরতে পারলে না। মন তার আরও কৌতূহলী হয়ে উঠল। মেয়েটার মনের আকস্মিক পরিবর্ত্তনগুলি তার কাছে এক পরম বিস্ময়। তা যে··এত দ্রুত জীবনের রসে পুষ্ট হয়ে উঠতে পারে একথা নীরেন কেমন করে বিশ্বাস করবে? যে মেয়ে দু-দিন আগে একটা বড় ডল পেলেই খুশী হয়ে উঠত সে কিনা আজ ওই নিষ্প্রাণের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার দেহে এসেছে হিল্লোল, হঠাৎ প্রাণের স্পন্দনে সে হয়ে উঠল নৃত্যচপল। তার পৃথিবীতে ধরল রং—সৃষ্টি রূপে রসে এবং মাধুর্য্যে হয়ে উঠল রমণীয়। মন তার জোয়ারের জলে কানায় কানায় ভরা কিন্তু কোথাও তাতে এতটুকু মাটির খাদ নেই, এমনি নির্ম্মল, এমনি স্বচ্ছ।

ছোট ভাই বীরেনের বিবাহের সংবাদ যথাসময়ে সে

পেয়েছে কিন্তু যায় নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এই ভেবে যে আত্মরক্ষার জন্ত আর হয়তো তাকে নব নব পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে না। নীরেন তার অতীতের মধ্যে ডুবে গেল। মায়ের অষ্টম গর্ভজাত ছেলে লেখাপড়ায় বরাবরই সে ভাল ছিল। ছেলেবেলা থেকেই আত্মীয় পরিজন তাকে নিয়ে কত স্বপ্ন রচনা করেছে, তার ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র ক'রে কত তাসের প্রাসাদ নির্মাণ করেছে। একদা মা'র মন তার আনন্দে গর্ব্বে এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পরিকল্পনায় ভরে উঠত।

বয়স ধীরে ধীরে বেড়ে চলতে লাগল। স্কুলের ধাপগুলি সুনামের সঙ্গে একে একে অতিক্রম ক'রে নীরেন এল কলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্ত। মার সেদিন-কার বেদনাকাতর মুখখানা আজও সে ভুলতে পারে নি। মনে পড়ল বহু বছর পূর্ব্বের মাতাপুত্রের বিদায়-মুহূর্ত্তের একখানি সকরুণ ছবি। কিন্তু এতে আর নীরেনের মনে চাঞ্চল্য দেখা দেয় না বরং জীবনের সকল রকম কোলাহলকে সে উপেক্ষা করতে চায়।

কথাটা ভাবতেও আজ তার হাসি পায়—এই নীরেনকে নিয়ে কত স্বপ্নই তাঁরা দেখেছেন কিন্তু যাকে সকলে উপেক্ষা ক'রে গণতির বাইরে সরিয়ে রেখেছিল সে-ই আজ সংসারকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে—তার অভাব-অভিযোগ সুখ-দুঃখের খোরাক সমান ভাবে চালিয়ে এসেছে।

পিতা বহুপূর্ব্বে গত হয়েছেন অথচ মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একটা খবর পর্য্যন্ত পায় নি। মৃত্যুর পরের লোকাচার-গুলি মেনে নিয়েই তাকে নীরব থাকতে হয়েছে। এ ছাড়া আর অন্ত কোন উপায় তার হাতে ছিল না। বিবাহের জন্ত পিতা তাকে বহু প্রকারে অনুরোধ করেছেন—নীরেন গ্রাহ্য করে নি। এর জন্ত সে আন্তরিক দুঃখিত হয়েছে—অবাধ্যতার জন্ত নিজেকে সে ধিক্কার দিয়েছে, কিন্তু তাই ব'লে সে তার নীতিকে লঙ্ঘন করে নি। আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে আত্মবঞ্চনা সে করতে পারে নি।

নীরেনের পিতা গ্রামে ডাক্তারি করতেন। জীবনে পয়সা যেমন দু-হাতে কুড়িয়েছেন—তেমনি মুক্তহস্তে খরচ করতেও তাঁর কার্পণ্য ছিল না। ছেলেদের মানুষ ক'রে তুলতে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু গোড়ার দিকে কেউই মানুষ হয় নি। অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির কষ্ট দ্বারগুলি তাদের কাছে রুদ্ধই থেকে গিয়েছিল। একমাত্র নীরেনই সর্ব্বপ্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটালে। পিতা হলেন মুক্তহস্ত। এইখান থেকেই নীরেনের খেয়ালী জীবনের সূচনা হ'ল। কিন্তু মাঝপথে এক সময় গেল মাত্রা কেটে, পিতার রোজগার নেই। সংসার চলে না, তার উপর পড়ার খরচ কি ক'রে চলতে পারে! নীরেন সোজাসুজি পিতাকে ব'লে পাঠালে, পড়াশুনোর এইখানেই ইতি হোক—তার চেয়ে একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিই। পিতা শুনে নির্ব্বিকারচিত্তে মাথা নেড়ে বললেন, কেউ কারুর জন্ত কিছু করতে পারে না। সব তাঁরই খেলা। তা-ছাড়া আমার ইচ্ছা নয় এখন থেকেই তুমি সংসারের চিন্তা কর। আমি পড়াব তুমি পড়বে, দুর্ভাবনা করতে হয় আমি করব।

আজ তাই ত নীরেন ভাবছে—হায় রে মানুষের আশা, তা কত ক্ষণভঙ্গুর, কত সামান্ত তার মূল্য। অথচ এই মিথ্যাই মানুষের বেঁচে থাকবার একটি মস্ত বড় অবলম্বন।

নীরেনকে পুনরায় কলেজে নাম লেখাতে হ'ল। তাকে দিয়ে তার পিতার অনেক আশা। সে আশা যদি এই পথ ধরেই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হ'তে পারে, সে অবহেলা করবে কেন? তা-ছাড়া লেখাপড়াকে কোন দিনই সে অবজ্ঞা করে না। শুধু সাংসারিক অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়েই সে বিরুদ্ধ মত দিয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে বিনা কারণে অবাধ্যতা করতে সে পারে না।

এরই পরে ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে নীলিকার পরিচয় ঘটল। ছোট ফ্রক-পরা মেয়েটি তার পা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম দিনের পরিচয়ের সূত্র ধরেই মেয়েটি যেন একটু বেশী এগিয়ে এল। নীরেন তাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। এতটুকু একটি মেয়েকে এড়িয়ে চলবার কোন মানে থাকতে পারে না।

নীরেনের আজও মনে পড়ে নীলিকা তাকে প্রথমেই

প্রশ্ন করেছিল—তুমি অত বাবু কেন? এ-কথার কোন উত্তর সে দেয় নি, নীরবে হেসেছিল। নীলিকা পুনরায় বললে, তোমার চুলগুলি কিন্তু বেশ।

একটি সরল অনভিজ্ঞ মেয়ের সরল প্রশ্নের এবং উক্তির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করে নি। অনাবশ্যক ভাবপ্রবণতা তার মধ্যে কোন দিন ছিল না। সে পুনরায় হেসে উঠল।

তার হাসির সূত্র ধরে মেয়েটি পুনরায় প্রশ্ন করেছিল—তুমি বুঝি দাদার বন্ধু? এত দিন আস নি কেন?

তার এই অসঙ্কোচ ব্যবহার নীরেনের ভারি ভাল লেগেছিল। তার জামা-জুতো থেকে আরম্ভ ক'রে সব কিছুর মধ্যেই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা অতি সহজেই সকলকে আকৃষ্ট করে, এ-কথা নীরেন জানে তাই ব'লে কোন অসঙ্গত চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দিতে পারে না। নীলিকার বয়সকে সে ভুল করে নি—কিন্তু এই সহজ সারল্য যে এক সময় তার জীবন-রথের চাকাকে উল্টো পথে ঠেলে নিয়ে যাবে এ-কথা নীরেন কেমন ক'রে ধারণা করবে?

নীরেন একটু অবাক হ'ল। নীলিকা যে তার জীবনে হঠাৎ এত বড় হয়ে উঠবে তা সে বোঝে নি। সহসা টান পড়তেই তার অতীত এসে বর্ত্তমানের গলা ধরে দাঁড়াল। একের পর এক বহু চেনা ও জানা জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এত লোকের আকস্মিক আবির্ভাবে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—আর এমনি দিনেই কিনা মাতার সকাতর আহ্বান এল—ওরে ফিরে আয়!...

তার কল্পনা মিথ্যে হয়ে গেছে তাই মায়ের ডাক তার কাছে অমূল্য হয়ে উঠেছে। নীরেন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলে যে এমনি একটি আহ্বানের প্রতীক্ষায় সে কিছু দিন যাবৎ উদ্গ্রীব হয়েছিল।

যে-উদ্দেশ্য নিয়ে নীরেন অন্তর্হিত হয়েছিল তা আজ সফল হয়ে উঠেছে কিন্তু যাকে কেন্দ্র ক'রে তার এই অভিযান সে নিঃশব্দে সরে গিয়েছে অথচ নীরেন এ-কথা বিশ্বাস করে যে, কোন কারণেই নীলিকা তাকে অবিশ্বাস করতে পারে না। তার মনের কথা নীলিকার ত অজানা ছিল না। কিন্তু বাঙালী মেয়েদের এই জানা-জানির যে কতখানি মূল্য এ-কথাটা তার এত দিনে ভেবে দেখা উচিত ছিল। সেই সঙ্গে এ-কথাটাও সে ভাবলে যে, বর্ত্তমানে এ-কথা নিয়ে মাথাঘামানো মানে মিথ্যা দুশ্চিন্তাকে ডেকে আনা। কিন্তু যুক্তি দেখিয়ে চিন্তার বিরতি ঘটানো সম্ভব নয়। তারা খেয়াল-মত উঁকিঝুঁকি দেবেই। তা দিক্, নীলিকার চিন্তায় ক্লান্তি নেই।

নীরেন অনাবশ্যক কাল হরণ না ক'রে দেশের পথে যাত্রা করেছে। মনে একটা পরিচিত স্পন্দন। গ্রামের শুক্‌নো খাল এ-সময় কূলে কূলে ভরা। বর্ষার পরে এমনি পরিবর্ত্তন চিরদিনের। তবু নীরেন আজ আবার নূতন ক'রে দেখছিল জীবন তার সুরহারা। এই সামান্য কয়টা বছরে রাস্তাঘাটের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। নীরেন গ্রামের সীমানায় এসে পড়েছে। মুন্সী-বাড়ীর বহির্ব্বাটীর বড় ঝাউগাছটায় অসংখ্য বাদুড় ঝুলে আছে। গাছটা ওদের স্থায়ী আস্তানা। দূর থেকে নীরেনের চোখে পড়েছে।

সন্ধ্যা হ'তে বেশী দেরি নেই। নৌকো ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলেছে। নীরেন ছইয়ের বাইরে এসে নীরব দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দেখছিল। এখানকার প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি ঝোপ, এমন কি প্রতি বালুকণাটি পর্য্যন্ত তার পরিচিত। এদের বুকে ছুটোছুটি ক'রে, এদের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে, এদেরই ছায়ায় বিশ্রাম ক'রে তার বাল্যজীবনের কত অগণিত দিন যে কেটে গেছে তার হিসেব নেই। এরা সকলেই যেন নীরেনের আগমন টের পেয়েছে...তাকে সাদরে ডাকছে।

এখানকার সবই যেন আলাদা। শিক্ষা, দীক্ষা, চাল-চলন মায় আলো-বাতাসটুকু পর্য্যন্ত। নীরেন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করলে।

নীরেন ভাবছিল, তার আজকের আসা সব দিক্ দিয়ে সার্থক হয়ে উঠত যদি জীবনের মাঝপথে অপ্রত্যাশিত ভাবে পূর্ণচ্ছেদ না ঘটত। নীলিকা তার জীবনপথ থেকে একটা জীবনের জন্য সরে গিয়েছে। তার চিন্তা করাও অন্যায়, অথচ এই নীলিকাকে নিয়ে তার কত দিনের কত উৎসব-রজনী পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সে খবর কে রাখে!

হয়ত নীলিকা এখন একটা সংসারের গৃহিণী··· হয়ত মা···তার কত কাজ। অতিথি-সেবা, সংসার-প্রতিপালন,—স্বামীর পরিচর্য্যা,—হয়ত প্রতি পদে সে হোঁচট খাচ্ছে; হয়ত সময় সময় সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, হয়ত স্বামীপুত্র আত্মীয়-পরিজনের ভীড়ের মধ্যে সে হারিয়ে গেছে। চিরদিনের জন্য মুছে গেছে। কিন্তু এরই জন্য সে সাধারণ দশ জনের মত মোটেই হা-হুতাশ করবে না। তাই ব'লে মানুষের জীবনে মানুষের প্রভাবকে সে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করতেও পারে না।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই তাকে নূতন ক'রে ফিরে পেয়েছে। তার উপর দিয়ে যে কোন প্রকার ঝড় বয়ে গেছে, তা বুঝবার এতটুকু উপায় নেই। তার সাবেক দিনের বন্ধুবান্ধবের দল একের পর এক এসে উদয় হ'তে সুরু করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যেন প্রাণ নেই। তারা হাসে কথা কয় সব যেন ধার-করা। এরই মধ্যে ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে—কপালের শিরাগুলি ঠেলে উঠছে, চোখ গেছে ব'সে আর তার কোলে কালো রেখা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। মূর্ত্তিমান ক্লান্তির জীবন্ত রূপ। নীরেন ওদের সঙ্গে ঠিক যেন মিশতে পারছে না। ওদের দৈনন্দিন জীবন যে কত বড় পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে তা হয়ত ওরা জানতেই পারে নি নইলে দেহের উপর দিয়ে যাদের এত বড় পরিবর্ত্তন ঘটে যাচ্ছে, তারা মুখে এমন ক'রে হাসে কি ক'রে।

নীরেন অবাক হয়ে যায়, বলে—এই সামান্য ক'টা বছরের মধ্যে তোমরা এত বদলে গিয়েছ ? এ যে আমার ধারণাই ছিল না।

সকলে এক সুরে উত্তর দেয়—সংসারধর্ম্ম কর বন্ধু, সবই বুঝতে পারবে।

নীরেন মৃদু হেসে উত্তর দেয়—এরই নাম যদি সংসার-ধর্ম্ম হয় তবে সে ধর্ম্ম-কাজে আমার প্রয়োজন নেই।

কথা হিসেবে সকলেই এ-কথা ব্যবহার করে, নীরেনও করেছে, কিন্তু ওরা সকলে একবাক্যে প্রতিবাদ করে—শুধু দুঃখটাই তোমার চোখে পড়ছে নীরেন, এর ভিতরের আনন্দের স্বাদ ত পাও নি, তাইতেই বড় বড় কথা বলতে পারছ।

হয়ত ওদের কথাই ঠিক। নীরেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে যে-বস্তুটি গড়ে ওঠে তার পাশে হয়ত সুখদুঃখের পরিমাপ ততটা ভয়াবহ নয় যতটা আগে থেকে মানুষ ভেবে বসে থাকে। নইলে আজও ওরা এমনি ক'রে প্রতিবাদ করতে পারত না। ওদের অনাড়ম্বর জীবনযাপন অতি অল্পেই পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই ওরা পারে। অতি অল্পেই পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু নীরেনের শিক্ষা, তার চালচলন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণে হয়েছিল তাই সে সহজ ভাবে ওদের গ্রহণ করতে পারছে না।

নীরেন বলে—তা বলছি না—আমি বলি দেশ ছেড়ে বিদেশে বেরলে ত পার—সাংসারিক সচ্ছলতা অন্ততঃ ফিরে আসতে পারে।

তা হয়ত পারে, কিন্তু ওরা সকলে একযোগে একটা অলস-ভঙ্গীতে বলে ওঠে—মন্দই বা চলছে কি ! তা ছাড়া কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে ফেলে যেতেও মন সরে না।

নীরেন বলে—চ'লে ত সকলেরই যায়—

ওরা সকলে টেনে টেনে হাসতে থাকে—চ'লে ত যাচ্ছেই—বাপ-পিতামহের ভিটে আগলে আছি—

নীরেন হতাশ হ'ল—এদের নিয়ে অতীত দিনে সে কত জল্পনা-কল্পনা করেছে। শুধু স্বপ্ন···শুধু স্বপ্ন মানুষের কল্পনা, শুধু শূন্যে বাড়ী তোলা, নইলে নিয়তির খেলাই সর্ব্বত্র।

ওরা আজ কেউ করে টোলের পণ্ডিতী—কেউ মাইনর স্কুলের মাষ্টারী। কেউ কেউ বড়জোর ইংরেজী স্কুল পর্য্যন্ত পড়িয়েছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে ওরা জিরাত-কৃষি করে। লাউটা কুমড়োটা, কলাটা মুলোটা—ক্ষেতেই জন্মায়। পুকুরে করে মাছের চাষ। ছুটি-ছাটার দিনে হয়ত ছিপগাছটা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুকুরপাড়েই কাটিয়ে দেয়। ছেলেরা বাড়ীর ভিতর থেকে তামাক সেজে নিয়ে আসে—নিয়ে আসে পান। বাপের কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলে—মা বলেছে ছোট মাছ মারতে মানা। ওদের উৎসাহও কিছু কম নয়। পুনরায় বলে—বড় দেখে একটার বেশী দেয় না যেন। গৃহিণীদের অনুশাসন বাহির-বাড়ী পর্য্যন্ত সমানে চলে।

এই অনুশাসন আর আদেশ মেনে চলার আনন্দ নীরেন পাবে কোথা থেকে ? নীরেন যদিও এক সময় তাদেরই এক জন ছিল কিন্তু সে কথা আজ শুধু ভাবতেই পারা যায়। নীরেনের যদিও এদের কাছে সহজ হয়ে উঠবার চেষ্টার ত্রুটি নেই, তবুও একটি দিনেই যেন ওরা টের পেয়েছে নীরেনের সঙ্গে আর কোনক্রমেই তাদের মিলবে না। এর জন্যে তারা খুব বেশী দুঃখিত নয় বরং এইটে না-ঘটলেই তারা বিস্মিত হ'ত। তারা সব একে একে চলে গেল। নীরেন যদিও মাঝে মাঝে তাদের দর্শন পাবার ইচ্ছা জানিয়েছিল কিন্তু ওরা বলে, সময় কোথা—

বিকেল বেলা নীরেন বেরিয়ে পড়ল গ্রাম-প্রদক্ষিণে। এই সময়টা ঘরের কোণে ব'সে থাকার পক্ষপাতী সে কোন দিন ছিল না। পছন্দও করে না। অভ্যাসটা আজও তার তেমনি আছে।

একলা-একলাই সে কিছুক্ষণ জেলা-বোর্ডের নূতন রাস্তা ধ'রে ঘুরে এল। গ্রামের আজকাল রূপ বদলে গেছে, সুর পাল্টে গেছে। আনাচে-কানাচের বাড়ী থেকে মেয়েলি কণ্ঠের গানের সুরও ভেসে আসে। স্ত্রী-স্বাধীনতার নমুনাও এরই মধ্যে নীরেনের চোখে পড়েছে। শহরের রেওয়াজ চলেছে। নীরেন ভাবছিল পল্লীপ্রান্তে এই শহরের ঢেউ তার কতখানি শ্রী এবং সম্পদ বাড়াতে সমর্থ হবে।

নীরেন অপর একটা রাস্তা ধরলে। এই সব অনাবশ্যক চিন্তা সে ছেড়ে দিয়েছে।

নীরেন চলতে চলতে থেমে পড়ল—কে···দুলাল না ?

এক গাল হেসে দুলাল নীরেনের পাশে এসে দাঁড়াল, বললে—কাল এসেছ খবর পেয়েছি কিন্তু সময় ক'রে দেখা করতে পারি নি। নানা কাজের ঝঞ্ঝাট। এই দেখ না, সন্ধ্যে হ'তেই খোঁজ পড়েছে গরুটার...গরু যদিই বা মিলল বাছুরের পাত্তা নেই···খোঁজ খোঁজ সেই রাজীবদের মাঠে। বকমারি কি কম। তবু ছেলেমেয়েগুলো খেয়ে বাঁচে। দুলাল খুশীকণ্ঠে হেসে উঠল। শুনলুম তুমি নাকি চাকুরে হয়ে ফিরে এসেছ। এবারে তাহলে সংসারধর্ম করছ, বল ?

নীরেন হেসে উঠল,—মাঠে মাঠে গরু খুঁজে বেড়াবার জন্যে ?

দুলাল বলে—রামচন্দ্র—তোমাদের দুঃখ কি! বউ নিয়ে বিদেশে থাকবে পালপার্ব্বণে দিন-কয়েকের জন্য এসে ফুর্ত্তি ক'রে চলে যাবে। এই যে তোমার খুড়তুত ভাই সুবোধ ডাক্তারী পাস দিয়ে বিয়ে করলে, তাকে কোন্ মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। বছরের এগার মাস বিদেশে থেকে এই সেদিনে এল দেশে। বলছিল বটে কিছু দিন থেকে যাবে। আমাদের আর কি···দেখেই সুখ। বৌটি দেখেছ তুমি ? শুনলুম ভারি ভাল বউ হয়েছে।

নীরেন বললে—না, দেখবার সুযোগ হয় নি।

দুলাল পুনরায় কিছু বলবার জন্য মুখ তুলেছিল কিন্তু গরুটা তার মত অতটা ধৈর্য্যশীল নয়। ন'ড়ে-চ'ড়ে নিজের ইচ্ছেটা জানিয়ে দিলে। দুলাল চলে গেল। নীরেন অন্যমনস্ক ভাবে বাড়ী ফিরল।

কিন্তু সেখানেও উদ্ধার পাবার জো নেই। মা এসে দশটা বাজে কথার পরে কাজের কথা পেড়ে বসলেন, সুবোর বউটি ভারি ভাল হয়েছে।

নীরেন সংক্ষেপে উত্তর দিলে—সুখের কথা।

মা পুনরায় বলেন—দশ জনা প্রশংসা করে—শুনেও আনন্দ হয়।

নীরেন কোন কথা কইলে না।

মা পুনরায় বললেন—অমনি একটি বউ আমার ঘরে এলে বেশ হ'ত···এই বুড়ো বয়েসে···মা ছেলের মুখের দিকে চাইলেন।

নীরেন হেসে ফেললে।

মা ভরসা পেলেন। আগ্রহ-স্বরে বললেন—বলিস্ ত খোঁজ করি। বুড়োর ত দেখে যাওয়ার সময় হ'ল না—আমিও আর কদিন। সেই বিয়ে এক দিন করতেই হবে।

নীরেন মায়ের অলক্ষ্যে একটি নিঃশ্বাস ফেললে। মুখে একটু হাসি টেনে এনে বললে—তাই বা কি-ক'রে তুমি জানলে মা ?

মা অত্যন্ত চটে গেলেন—তোর মতলবখানা কি শুনি ?

তোর কাছ থেকে আজ আমি পষ্ট জবাব চাই!

মা জবাব চাইছেন—কিন্তু কি জবাব নীরেন তার মাকে দেবে? ঐ নৃপেন, রাজু, বীরু কিংবা রাজীব যে ভাবে নিজেদের সুখের নেউল গড়ে তুলেছে সে যে তা পারে না একথা কেমন ক'রে সে তার মাকে জানাবে। হয়ত কেঁদে-কেটে এখনি একটা অনর্থ বাধিয়ে বসবে। নীরেন মুহূর্তকাল কি চিন্তা ক'রে শান্ত কণ্ঠে তার মাকে জানালে—এখনি ত চলে যাচ্ছি না মা, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

মা বলেন—বেশ ত ব্যস্ত আমি হব না কিন্তু তুই আমার কথা দে।

নীরেন বললে—তোমায় কথা দিচ্ছি মা—তোমার কথা আমি বেশ ক'রে ভেবে দেখব।

তখনকার মত মা নীরব হ'লেন কিন্তু এইখানেই যে এর শেষ নয়, এর পরে যে আরও অনেক রয়ে গেল, একথা নীরেন বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলে। কিন্তু নীলিকাকে সে ভুলতে পারছে না। তার প্রভাব নীরেনের জীবনে আজও মরে নি। দেশাচার এবং লোকাচার তাকে তফাৎ ক'রে দিলেও তার অন্তরের সত্যকে সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছে না।

নীলিকা বিয়ে করেছে? ভাল কথা। সে সুখী হয়ে উঠুক, সার্থক হয়ে উঠুক, নীরেন আনন্দিত হবে, নিজের বুকের পাষাণ-বোঝাটা কিছু হালকা হবে। সে শুধু নিজেকে নিয়ে একলা থাকতে চায় এতে সাধারণ দশ-জনা ব্যস্ত হয়ে ওঠে কেন? সবচেয়ে বড় আশ্চর্য্যের কথা, গ্রামে জনরব নীরেনের চরিত্র নেই। এতখানি বয়সেও যে-ছেলে অবিবাহিত থেকে যায় তার জীবন-ধারণের স্বাভাবিকতায় কাহারও আস্থা নেই। নীরেন নিজে নিজেই হাসে। তার নিজেকে চিনতে ত আর বাকী নেই কিছু। কিন্তু দুঃখিত হয় এদের জরাগ্রস্ত মনের বিকার দেখে।

ঘরের সামনে দিয়ে একটি নতুন বউ মন্থর পায়ে চলে গেল। নীরেন চঞ্চল হয়ে উঠল, ঠিক তেমনি পায়ের গতি... অবিকল...এতটুকু ব্যতিক্রম নেই—শুধু দূর থেকে একটু রোগা মনে হ'ল। এটা তার গ্রামের বাড়ী না হয়ে শহর হ'লে হয়ত সে নাম ধ'রে ডেকেই উঠত। নীলিকার চলার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত তার মুখস্থ, নইলে ঐ অচেনা বউটির মধ্যে তার প্রকাশ দেখে সে এমন ক'রে চঞ্চল হয়ে উঠবে কেন?

নীরেন মাকে ডেকে সুধালে—বউটি কে মা?

—ও আমাদের সুবোর বৌ। মা বললেন। বড় খাসা বউ, যেমন গুণে কাজে তেমনি কথায় বার্ত্তায়। দুপুর বেলাটা আমার ওর সঙ্গেই ত কাটে। পাকা চুল বেছে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবে ওর ছুটি।

নীরেন মৃদু মৃদু হাসতে থাকে—তারী খাসা বউ তোমার কাছে কে যে নয় মা। মা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—তোর বাজে কথা থামা দিকি—আমার কাছে সবাই ভাল... ঐ যে পীতাম্বরের বউ...তোদের শরৎদা'র... তাদের কোন দিন সুখ্যাতি করেছি? যে খারাপ সে খারাপ...

নীরেন মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। মাকে রাগিয়ে দিয়ে সুবোর বউয়ের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা শুনতে তার অত্যন্ত ভাল লাগছিল। ওর মধ্যে নীলিকার আদল রয়েছে যে ..

মা পুনরায় গভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন—চেহারাটা ইদানীং ক্যাকাশে হয়ে গেছে। তোর খুড়ীমা বলেন, বিয়ের পর থেকেই নাকি মাঝে মাঝে ফিট হয়, নইলে চেহারা এক সময় ভালই ছিল।

নীরেন নীরবে শুনে যাচ্ছিল।

মা পুনরায় বললেন—তা ব'লে ওরা বড় একটা খোঁজ-খবর করে না। তোর খুড়ীদের চাল-চলন বাপু শহরে থেকে থেকে বদলে গিয়েছে। কাজকর্ম্মের এতটুকু ত্রুটি ঘটলেই কথার পর কথা। ছেলেমানুষ—চার দিকে নজর দিয়ে ওরা চলতে শেখে নি। কোথায় শিখিয়ে পড়িয়ে নিবি তা নয় যত সব আদিখ্যেতা। মুখে ভাল কথা ওদের কারুর নেই। তেমনি হয়েছে সুবো... দেখে বুঝবার জোটি নেই। নইলে অমন বউকে কষ্ট দিতে হয়।

নীরেন মাঝপথে কথা কয়ে উঠল—সুবোর বউয়ের গল্প তোমার কাছে কে শুনতে চাইছে মা?'

মা মুখ তুলে কি বলতে গিয়ে সহসা হাঁক দিলেন—অ বউমা একবার এস ত মা···

বউমা অর্থাৎ সুবোধের বউ এসে সম্মুখে দাঁড়াল। ঘোমটায় তার মুখ ঢাকা থাকলেও নীরেন চমকে উঠল।

মা বললেন—তোমার ভাসুর, প্রণাম কর মা। সুবোধের বউ কাঁপছিল, মা তা লক্ষ্য করলেও গ্রাহ্য করেন নি। অথবা এই ভয়জড়িত ভাবটিকে নিছক লজ্জা মনে ক'রে তিনি মৃদু হেসে বললেন—লজ্জা কি মা, প্রণাম কর। কিন্তু সুবোধের বউ গড় হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে আর ওঠে না।

মা চেঁচামেচি ক'রে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। সুবোধের বউ জ্ঞান হারিয়েছে।

নীরেন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে। নীলিকা তার ভ্রাতৃবধূ, এর চেয়ে আর বড় পরিহাস কি থাকতে পারে? নীরেনের বুকের মধ্যে প্রলয়-নাচন সুরু হয়েছে। সেই নীলিকা এই নীলিকা! যে রক্তের প্রাচুর্য্যে ফেটে পড়ত তার মুখের কমনীয় শ্রী আজ রক্তহীনতায় পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তার চোখে মুখে এরই মধ্যে ক্লান্তির ছায়া নেমে এসেছে। এমনি ক'রেই সে তার সংসারকে মেনে নিয়েছে, এমনি ক'রে আরও কত মেয়ে প্রতিনিয়ত নিচ্ছে। নীলিকার অচৈতন্য দেহটি তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে তার দুখানি ব্যগ্র স্নেহব্যাকুল বাহু প্রসারিত হয়ে আসতে চায় কিন্তু সামাজিক অনুশাসন-মত তারা উভয়ে উভয়ের অস্পৃশ্য। অথচ···

মা বললেন, সঙের মত দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে দে ··

নীরেন হয়ত এমনি একটি আদেশের অপেক্ষায় ছিল, এমনি ভাবে সযত্নে ক্ষিপ্রতার সহিত মার আদেশ পালন করলে। বালতি ভ'রে জল এনে নীরেন তার চোখে মুখে অত্যন্ত সাবধানে ছিটে দিতে লাগল। নীলিকা এমন হয়ে গিয়েছে? এমনি ক'রে দিনের পর দিন সে তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে···কিন্তু কেন! নীরেন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলে, কেন?

নীলিকা চোখ খুলে চাইলে। সে চোখে আনন্দ এবং বেদনা মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলে উঠেই নিবে গেল।

নীরেন দৃষ্টি নামিয়ে নিলে। কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন ঐ চোখের দিকে সময়-অসময় নানা ছলে নীরেন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। চোখ-মুখ তাদের গোপন ভাষায় আবেগে নেচে উঠত আর আজ তারা সহজ ভাবে পরস্পরের দিকে চাইতে পর্য্যন্ত পারছে না। অথচ মনের মধ্যে তাদের কত কথা জমে রয়েছে যা কোন কারণে কোন ছলেই প্রকাশ করা চলবে না। তা হ'লেই তার সংজ্ঞা দেওয়া হবে অন্যায়, সুনীতি এবং সুরুচির হবে ব্যতিক্রম। নিজে সে অনেক বিধানই মেনে চলে না, তাই ব'লে নীতিকে লঙ্ঘন করাটাও সে পছন্দ করে না। মানুষের মনে ত কত রকমের আকাঙ্ক্ষাই বাস করে কিন্তু তা নিয়ে প্রকাশ্যে মাতামাতি ক'রে রুচিবহির্ভূত কোন কিছু ক'রে বসবার ইচ্ছে নীরেন রাখে না।

সে উঠে পড়ল। এখানে ব'সে থেকে নিজেকে এবং ঐ অসহায়া বউটিকে পীড়ন করবার তার কোন অধিকার নেই। কিন্তু দিনের আলোয় বাহিরের মুখরতায় নিজেকে যতটা অবরোধ করা সম্ভব হয়েছিল রাতের অন্ধকারে গভীর নিস্তব্ধতায় তা সম্ভবপর হ'ল না। স্মৃতির সংঘাত তাকে বিব্রত ক'রে তুলেছে। নীরেনের মনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঘরের পিছনের ঝাউগাছটার পাতায় পাতায় বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে যায়। দূরে দূরে হঠাৎ শিয়াল ডেকে উঠে রাতের নির্জ্জনতাকে কুৎসিত ক'রে তোলে।

নীরেন ভাবে, হয়ত নীলিকাও রাতের পর রাত এমনি অনিদ্রায় কাটিয়ে দেয়। ওর চোখে যে-দৃষ্টি সে আজ লক্ষ্য করেছে তা কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না। কিন্তু নীলিকাকে তার বাঁচাতেই হবে। অন্ততঃ তাকে সে বুঝতে দেবে···তাকে ভাববার অবকাশ দেবে যে এত দিন সে অসঙ্গত ভাবে নিজেকে পীড়ন করেছে, তার জন্য নীরেন কোন ক্ষতিই স্বীকার করে নি—করবেও না।

বাইরে চৌকিদারের সাবধানী কণ্ঠের রব উঠল, বাবুরা সব জেগে আছেন—,

সঙ্গেসঙ্গেই পাশের ঘরে নীরেনের দাদার ছেলেটা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল।

চৌকিদারের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সমতা রক্ষা হয়েছে।

নীরেনের চোখে ঘুম নেই—অদূরে মেঠো রাস্তায় চলন্ত গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ স্পষ্ট তার কানে আসে। তার একটানা চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে বিরক্তি ঘটায়।

নীরেন ঠিক করলে, নিজেকে নিয়ে আর সে উদ্দেশ্যহীনের মত ঘোরাফেরা করবে না। সকলকে অন্ততঃ সে জানতে দেবে যে সে স্থির হয়েছে, তার সম্বন্ধে আর কারুর কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তার সিদ্ধান্তে নীলিকা হয়ত দুঃখিত হবে, কিন্তু দুঃখের ভিতর দিয়ে সে যদি দিনের আলো দেখতে পায় তাহলে সেইখানেই ঘটবে তার পরম প্রাপ্তি।

নীরেন হঠাৎ যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছে। এত সহজে যে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করতে পেরেছে এতে সে খুশী হয়ে উঠল। নীরেন পুরুষ, নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে বহু পথ তার জন্য খোলা আছে, কিন্তু নীলিকা যে ঐ স্বল্পপরিসর গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করবে এ কখনও হ'তে পারে না। না, তা সে হ'তে দেবে না।

পরদিন প্রত্যূষে নীরেন তার মাকে জানালে—তুমি মেয়ে দেখতে পার মা। ভেবে দেখলাম বিয়ে করার আমার প্রয়োজন হয়েছে।

কিন্তু যত সহজে নীরেন কথাটা তার মাকে জানালে তিনি তত সহজে তা বিশ্বাস করতে পারলেন না। কতকটা যেন বিস্মিত ভাবেই পুত্রের মুখের প্রতি চেয়ে রইলেন।

নীরেন তার কথার পুনরুক্তি ক'রে বললে—তোমার নীরু মিথ্যে বলে নি মা।

কথাটা এমন কিছুই নয়। বিয়ে সকলেই করে, নীরেনও কিছু ধনুর্ভঙ্গ পণ করে নি…তবুও কথাটা অনেকেরই বিস্ময় উৎপাদন করলে। সংসার থেকে তারা নীরেনকে এক প্রকার বাদ দিয়েই রেখেছিল।

কথাটা যথাসময় নীলিকার কানেও গেল। তার দুঃখের কথা কোন ক্রমেই বলবার উপায় নেই—বলতে সে চায়ও না। চোখের জলকে সে জোর ক'রেই আটকে রেখেছে। লোকের চোখে পড়বে যে—কিন্তু বুকের ভাষা ত কেউ পড়তে পারে না, সেখানে তার স্বাধীন সত্তা পুরোমাত্রায়।

নীলিকা নিঃশব্দে ব'সে রইল। তার অন্তর্লোকের অশ্রুরাশি ব্যথার উত্তাপে বাষ্প হয়ে শূন্যে, মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। কেউ জানলেও না…কেউ বুঝলেও না—

বিবিধ প্রসঙ্গ

ব্রিটিশ প্রভুত্ব কি সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে ?

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই মহাশয় গত ভাদ্র মাসে সিমলায় "আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের ভিত্তিগত নীতিনিচয়" সম্বন্ধে একটি বিশদ বক্তৃতা করেন। যে সভায় বক্তৃতা হয়, সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার সভাপতির কার্য্য করেন। এই বক্তৃতাটির একটি অংশ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই। অংশটি এই:—

After the year 1857 and up to the year 1914 or perhaps even 1917 if you examine your poetry or literature, your history and the minds of Indians at large at the time, you will see that there was an absolute acceptance without question of what was called Pax Britannica. They did not question how it arose, why it arose and when it arose; they just accepted it as a blessing. I think the learned President from his own experience in his own language, which is much richer than mine, and many others present here, will be able to recite poems which were composed in 1860*s*., 1870*s*., composed by a large number of poets of the time about the beneficence of the British rule and praising that rule. There is a poem which says that the greatest thing that was done by the British rule was that it enabled a tiger and a goat to drink in the same stream. Whether the tiger became a goat or a goat the tiger I need not examine here, but the fact remains that that was how we were brought up to accept that rule. Therefore the condition of the human mind is such that mere acceptance makes even a wrong thing right.

তাৎপর্য্য।—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত, অথবা হয়ত ১৯১৭ পর্য্যন্তও, যদি আপনারা আপনাদের কাব্য বা সাহিত্য, আপনাদের ইতিহাস, এবং ভারতীয় জনগণের মন পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন "ব্রিটিশ-শান্তি"-প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ প্রভুত্বকে বিনা প্রশ্নে সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই ব্রিটিশ প্রভুত্বের উদ্ভব কেমন করিয়া হইল, কেন হইল, কখন হইল; তাহারা ইহাকে সোজাসুজি বিধাতার বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সুপণ্ডিত সভাপতি মহাশয়ের ভাষা (অর্থাৎ বাংলা ভাষা) আমার ভাষা (গুজরাটী ভাষা) অপেক্ষা সমৃদ্ধ। তাঁহার ভাষার অভিজ্ঞতা হইতে তিনি এবং এখানে উপস্থিত অন্য অনেকে ১৮৬০।১৮৭০-এর কোঠার বহু কবির দ্বারা ব্রিটিশ রাজত্বের হিতকারিতা সম্বন্ধে রচিত ও তাহার প্রশংসাপূর্ণ বহু কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিবেন। একটি কবিতা আছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ-শাসন সকলের চেয়ে বড় এই কাজটি করিয়াছে যে, তাহা বাঘকে ও ছাগলকে একই ঘাটে জল পান করিতে সমর্থ করিয়াছে। বাঘটা ছাগল হইয়া গিয়াছে, কি ছাগলটা বাঘ হইয়া গিয়াছে, এখানে তাহা পরীক্ষা করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আসল কথাটা এই যে, আমরা ঐ ভাবে (ব্রিটিশ-শাসন-স্বীকৃতির হাওয়ার মধ্যে) মানুষ হইয়াছিলাম। অতএব, মানব-মনের অবস্থাই এইরূপ যে কেবলমাত্র স্বীকৃতি মন্দ জিনিষকে ভালতে পরিণত করে।

ভুলাভাই দেশাই মহাশয়ের মন্তব্যটিকে আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার আলোচনা করিব।

—

আধুনিক ভারতেতিহাসে ব্রিটিশ-রাজত্ব-স্বীকৃতি

ভুলাভাই দেশাই মহাশয় বলিতেছেন, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ১৯১৪, হয়ত ১৯১৭, পর্য্যন্ত, ভারতীয়েরা ব্রিটিশ প্রভুত্বকে মানিয়া লইয়াছিল; অর্থাৎ উহার অবসান বা পরিবর্ত্তন চায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বলিতে চান, যে, ভারতীয় রাজনীতিকেরা যদি ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান বা পরিবর্ত্তন চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ১৯১৪ বা ১৯১৭ সালের পরে, পূর্ব্বে নহে। তিনি স্পষ্ট-ভাষায় বলিয়াছেন যে, ভারতীয়েরা ১৮৫৭ হইতে ১৯১৪-১৭ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ-শাসনের স্বীকৃতি ও তাহার স্তাবকতার হাওয়ায় "মানুষ" হইয়াছিল। বাঙালীরা কিরূপ হাওয়ার মধ্যে এই সময়ে বাস করিয়াছিল আমরা তাহা যতটা জানি, অন্যান্য প্রদেশীয়েরা কিরূপ হাওয়ায় ছিল, তাহা ততটা জানি না। অতএব আমরা বঙ্গের হাওয়ার কথাই বলিব। অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা ইচ্ছা করিলে দেশাই মহাশয়ের কথা তাঁহাদের প্রদেশ সম্বন্ধে সত্য কিনা তাহার আলোচনা করিতে পারিবেন।

একটা কথা আগেই বলিয়া রাখা দরকার। কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন সময়ে যদি সমসাময়িক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সশস্ত্র বা অনস্ত্র বিদ্রোহ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই একথা বলা চলিবে না যে, তাঁহারা ব্রিটিশ প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন বা তাহার স্তাবক ছিলেন। গত

মহাযুদ্ধের সময় গান্ধীজী ব্রিটিশ পক্ষে লড়িবার জন্ত সিপাহী সংগ্রহ কার্য্যে নামিয়াছিলেন। ভুলাভাই দেশাই মহাশয় এক সময়ে বোম্বাই গবর্ন্মেণ্টের এডভোকেট-জেনেরাল ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সাতটি প্রদেশে বড় বড় কংগ্রেসওআলারা গবর্ন্মেণ্টের মন্ত্রিত্ব করিতেছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইহারা কেহই ব্রিটিশ শাসনের ভক্ত নহেন, সকলেই স্বাধীনতা চান। অতএব, আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ১৮৫৭ হইতে ১৯১৪-১৭ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে স্বাধীনতার বা আত্মকর্তৃত্বের অনুকূল ভাব ও মত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, তজ্জন্ত আন্দোলন বা অন্তবিধ প্রচেষ্টা হইয়াছিল কি না, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের বিরোধিতা হইয়াছিল কি না।

দেশাই মহাশয় ১৮৫৭ সালের পরবর্ত্তী সময়ের কথা বলিয়াছেন। আমরাও প্রধানতঃ সেই সময়টার সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। কিন্তু বাংলা দেশে তাহার আগেও স্বাধীনতার অনুকূল ভাব স্পষ্টতঃ ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং গবর্ন্মেণ্টবিরোধী আন্দোলন হইয়াছিল। রামমোহন রায় তাহা করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন, মিঃ উইলিয়ম য়্যাডাম তাহা বলিয়া গিয়াছেন।* তাঁহার সময়ে এদেশে ব্যবস্থাপক সভা ছিল না, গবর্ন্মেণ্ট-বিরোধী দল ছিল না। তাহা হইলেও তিনি সমুদয় অনিষ্টকর সরকারী ব্যবস্থা ও আইনের বিরোধিতা করিতেন। ১৮২৮ সালে জুরী আইনের বিরুদ্ধে তিনি যে প্রতিবাদপত্র গবর্ন্মেণ্টকে পাঠান, তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই প্রশ্ন করেন যে, "এক শত বৎসর পরে ভারতীয়েরা সাধারণ জ্ঞান, আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞানের জ্ঞান, এবং রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জ্জন প্রভৃতি দ্বারা চারিত্রিক উন্নতি লাভ করিলে, ইহা কি সম্ভব যে, যাহাতে তাহাদিগকে মানব-সমাজে হেয় করে এরূপ অন্যায় ও অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা-সমূহে সাফল্যের সহিত বাধা দিবার মত তেজস্বিতা ও প্রবৃত্তির অধিকারী তাহারা হইবে না ?"† এই প্রতিবাদে তিনি একথাও বলেন, যে, ব্রিটেনের নিকটবর্ত্তী আয়ার্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহী ভাব প্রশমন যত সহজ, দূরবর্ত্তী ও বৃহৎ ভারতবর্ষে তাহা করা তত সহজ হইবে না যদি ভারত আয়ার্ল্যাণ্ডের জ্ঞান ও কর্ম্মতেজের এক-চতুর্থাংশও অর্জ্জন করিতে পারে; তখন ভারতবর্ষ হয় সুবিধাজনক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ মিত্ররাষ্ট্র হইবে, নতুবা খুব কষ্টদায়ক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু হইবে ("useful as an ally of the British Empire or troublesome and annoying as a determined enemy")। দক্ষিণ-আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলি স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সফলকাম হওয়ায় তিনি কলিকাতার টাউন হলে ভোজ দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়কার ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সফল হওয়ার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে তিনি এত উৎফুল্ল ও উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তখন আর কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে বা কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। বিলাত যাইবার সময় আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে নামিয়া তাঁহার পা ভাঙিয়া যায়, কিন্তু সেই অবস্থাতেও তিনি তথাকার বন্দরে আগত ত্রিবর্ণ ফরাসী বিপ্লবী পতাকাশোভিত দুটি জাহাজ না দেখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই—ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির তিনি এত অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার একটি পুস্তিকায় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অবস্থার এই আভাস দিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ সম্ভবতঃ স্বাধীন হইবে এবং এশিয়ার জ্ঞানালোকদাতা হইবে ("India possibly independent and India the Enlightener of Asia")। "সম্ভবতঃ" কথাটি ব্যবহারের কারণ এই যে, তিনি ভবিষ্যদ্বক্তৃত্বের ভান কখন করিতেন না।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে কোন উপাধি লইতে রাজী হন নাই, তাহা ব্রিটিশ-রাজভক্তির পরিচায়ক নহে।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এবং হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তক ও উদ্যোক্তারা স্বাজাতিকতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার উৎসাহ-

* "He would be free or not be at all." "Love of freedom was, perhaps, the strongest passion of his soul." "He did not seek to limit the enjoyment of it to any class, or colour, or race, or nation, or religion. His sympathies embraced all mankind."—William Adam.

† "Is it possible that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppressive measures serving to degrade them in the scale of society ?"

দাতা ছিলেন। ইহা খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর কথা—১৯১৪-১৭র অনেক আগেকার কথা। বিপিনচন্দ্র পাল, তারাকিশোর চৌধুরী (ব্রহ্মবিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদী) এবং সুন্দরীমোহন দাস যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট সরকারী চাকরি না-করিবার ও দেশের স্বাধীনতার চেষ্টা করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা অর্দ্ধ শতাব্দীরও আগেকার কথা। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অথচ ১৯১৪-১৭ সালের আগেকার কথা এখন বলি।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে যে আন্দোলন হয়, বিদেশী-বর্জ্জন ও স্বদেশীগ্রহণ তাহার অঙ্গ ছিল। কাটা বঙ্গ যাহাতে আবার জোড়া লাগে, তাহাই অবশ্য তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের চরম রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকেও অনেক নেতার চিন্তা ধাবিত হয়। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পূর্ণস্বাধীনতাকেই ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রধানতঃ "বন্দে মাতরম" কাগজে লিখিতে থাকেন ও বক্তৃতা করিতে থাকেন। স্বরাজ বলিতে তাঁহারা পূর্ণ-স্বরাজই বুঝিতেন ও বুঝাইতেন। এ-বিষয়ে বিপিন বাবুর মাদ্রাজে সমুদ্রতটে বক্তৃতাবলী সুপ্রসিদ্ধ। বঙ্গে এই যে পূর্ণস্বরাজবাদের উৎপত্তি ও প্রচার, দেশাই মহাশয় তাহার কোন উল্লেখই করেন নাই। হয়ত এই সময়ে অন্য কোন কোন প্রদেশেও এইরূপ কিছু হইয়া থাকিবে—সে বিষয়ে ঠিক খবর আমাদের সম্যক্ জানা নাই। কিন্তু বঙ্গেও যে স্বাধীনভাবে এই মত জন্মিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ইহার সমর্থক ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নেতারা পূর্ণস্বাধীনতার কথা বলিতেন না বটে; কিন্তু তাঁহারা ব্রিটিশ স্বৈর শাসনের প্রবল বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেন, 'বন্দে মাতরম' না বলিবার হুকুম মানেন নাই, সরকারী একাধিক সার্কুলারের বিরোধী এন্টি-সার্কুলার সোসাইটী চালাইয়াছিলেন।

বঙ্গের যে প্রচেষ্টাকে সন্ত্রাসনবাদ বা বিভীষিকাপন্থা বলা হয়, তাহার নৈতিক প্রকৃতি (ethical character) এখানে আলোচ্য নহে। এখানে কেবল ইহাই উল্লেখ্য যে, বঙ্গে ইহার উদ্ভব হয় ১৯১৪-১৭ সালের পূর্ব্বে। অহিংস আইনলঙ্ঘন যেমন অনস্ত্র বিদ্রোহ, সেইরূপ ইহা সশস্ত্র ও হিংস্র বিদ্রোহ। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। বঙ্গের জনমতের কতটা অংশ ইহার পোষক ছিল, এবং অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভের পরে ঐ জনমতের কতটা অংশ অহিংস আইন-লঙ্ঘনের পোষক হইয়াছিল, ঠিক্ বলা যায় না—যদিও ইহা সুবিদিত যে, অহিংস আইনলঙ্ঘন যত লোক করিয়াছিলেন, সন্ত্রাসনবাদের কার্য্যতঃ অনুসরণ তাহার সহস্রাংশের এক অংশ দ্বারাও হয় নাই। তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে, গবর্ন্মেণ্ট সন্ত্রাসকদিগকে ভয়ঙ্কর ও প্রবল দল মনে করিয়া আসিতেছেন। কারণ, তাহার উচ্ছেদের জন্য বহু বিশেষ আইন ও ব্যবস্থা হইয়াছে, অনেক ষড়যন্ত্রের বিচারান্তে অনেকের শাস্তি এবং বহু সহস্র ব্যক্তির বিনা-বিচারে নির্বাসন ও বন্দীদশা ঘটিয়াছে—যেমন অরবিন্দ ঘোষের ও তাঁহার সঙ্গীদের বিচার। এবং ইহাও আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যে হিন্দু বাঙালীদিগকেই ভারতের অন্য সকল লোকসমষ্টি অপেক্ষা অধিক কাবু করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কারণ, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট বিশ্বাস করিতেন (এবং হয়ত এখনও করেন) যে, হিন্দু বাঙালীরা সকলে না-হউক্ অনেকেই সন্ত্রাসকদিগের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষক বা সহানুভাবী। আমাদের অনুমিত ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের এই বিশ্বাস সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ১৯১৪-১৭ সালের অনেক পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গের অগণিত বহু মনুষ্য অনস্ত্র বা সশস্ত্র বিদ্রোহের হাওয়ায় বাস করিয়া আসিতেছে।

বঙ্গের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসের এই অধ্যায়-গুলি দেশাই মহাশয়ের অজ্ঞাত, না তিনি জানিয়াও এগুলি উপেক্ষা করিয়াছেন, বলা যায় না। আমরা অনেকেই নিজের নিজের প্রদেশের কৃতিত্বকে বড় করিয়া দেখিয়া থাকি, এবং অন্যান্য প্রদেশে যাহা হইয়াছে তাহার খবর রাখি না বা তাহা জানিলেও তুচ্ছ জ্ঞান করি। পূর্ণস্বরাজবাদ এবং ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব ১৮৫৭ সালের পর গুজরাটের মহাত্মা গান্ধী দ্বারাই

প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া দেশাই মহাশয় মনে করেন কিনা জানি না। সেরূপ মনে করা ভুল।

—

একটি অপ্রসিদ্ধ পাড়ার ও শহরের রাজনৈতিক হাওয়া

কলিকাতার মত প্রসিদ্ধ নগরে ঠাকুর-বংশের মত কীর্ত্তিমান্ বংশের বালক ও যুবক রবীন্দ্রনাথ কি রকম রাজনৈতিক ও অন্ত হাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলেন, তাহার আভাস তাঁহার জীবনস্মৃতিতে ও কোন কোন অভিভাষণে পাওয়া যায়। অন্ত কোন কোন প্রসিদ্ধ লোকের স্বরচিত বা অন্তরচিত জীবনীতেও এইরূপ আভাস আছে বা থাকিতে পারে। আমরা এখানে অপ্রসিদ্ধ বাঁকুড়া শহরের ও তাহার পাঠকপাড়া নামক একটি অপ্রসিদ্ধ পাড়ার মোটামুটি ষাট বৎসর আগেকার রাজনৈতিক হাওয়ার অতি সামান্ত কিছু আভাস দিব। হয়ত ইহা পড়িয়া অন্ত কোন কোন ছোট শহরের ছোট ছোট পাড়ার পূর্ব্বস্মৃতি কাহারও কাহারও মনে জাগিয়া উঠিবে।

সেকালে বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ায় জওআহেরলাল ত্রিবেদী নামক এক জন কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুরুষানুক্রমে বাংলা দেশে থাকায় ইঁহারা ঘরে বাহিরে বাংলা বলিতেন ও বাঙালীই হইয়া গিয়াছিলেন। মাত্র আহারাদিতে অন্ত বাঙালীদের সঙ্গে সামান্ত কিছু প্রভেদ ছিল। এই ত্রিবেদী মহাশয় ইংরেজী জানিতেন না, অল্পস্বল্প বাংলা জানিতেন ও অল্প বেতনের সরকারী চাকরি করিতেন। তিনি বোধ হয় শতায়ু হইয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুর সময় হয়ত বয়স আরও অধিক হইয়া থাকিবে। তিনি চরিত্রবান ও খুব স্বাবলম্বী ছিলেন। স্বহস্তে নিজের বাগানের কাজ করিতেন। এই ত্রিবেদীর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল রুশ আসিতেছে বা আসিতেছে না কি-না। কেমন করিয়া কোথা হইতে তিনি রুশদের আসার গুজব শুনিতে পাইতেন জানি না, কিন্তু আমাদিগকে ও হয়ত ইস্কুলের অন্তান্ত বালকদিগকেও তিনি অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিতেন খবরের কাগজে রুশদের আসার কোন খবর বাহির হইয়াছে কিনা এবং ভারতবর্ষের কতটা কাছে তাহারা আসিয়াছে। তাঁহার হয়ত এই বিশ্বাস ছিল যে, রুশরা ভারতবর্ষে পৌঁছিলেই ইংরেজদিগকে পরাস্ত করিবে, এবং তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতেও পারে। তাহা হউক বা না-হউক, তাঁহার ইংরেজ-প্রীতি এত বেশী ছিল যে, তিনি ইংরেজরা তাড়িত হইলেই বোধ করি খুশি হইতেন। এই রকম মনের ভাব সেকালে মোটেই বিরল ছিল না। আমাদের আশে পাশে ইংরেজের স্তাবক সেকালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না—অবশ্য বে-সরকারী, উপাধিহীন, উমেদার নহেন, এরূপ লোকদের মধ্যে। আমরা বড় হইয়া বুঝিয়াছি বটে, যে, ব্রিটিশ রাজত্বকে স্থায়ী ও লাভজনক করিবার নিমিত্ত এবং ব্রিটিশ বণিকদের সুবিধার নিমিত্ত গবর্মেণ্ট এমন অনেক কাজ করিয়াছেন যাহার অনভিপ্রেত পরোক্ষ ফল স্বরূপ ভারতবর্ষের কিঞ্চিৎ চেতনা ও অন্ত কিছু উপকার হইয়াছে। কিন্তু আমরা বাল্যে তাহা ভাবিতাম না, এবং ব্রিটিশ জাতির স্তাবক তখনও বালকেরা ছিল না; বালক ভুলাভাই দেশাই ছিলেন কিনা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। সেকালে বাঁকুড়ার গবর্মেণ্ট স্কুলে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ অধ্বর্য্যু নামক এক জন শিক্ষক ছিলেন। ইনিও কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ। তিনি নীচের দিকের ক্লাসের মাষ্টার ছিলেন, ইংরেজী বেশ জানিতেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা শিখ রাজপুত প্রভৃতির শৌর্য্যের ও বলিষ্ঠতার গল্প কত যে শুনিয়াছি বলিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবেদী মহাশয়ের মত তাঁহারও মনের ভাব ইংরেজের স্তাবকের মনোভাবের বিপরীত ছিল। ইংরেজ-সম্বন্ধীয় তাঁহার অনেক গল্পও তদনুযায়ী ছিল। পোদ্দারপুকুরের পাড়ের ঘোষ-পরিবারে তিনি গৃহশিক্ষকতা করিতেন। আমাদের সেখানে খুব যাতায়াত ছিল। তথায় পাঠনা অপেক্ষা ঐরূপ গল্প যে তিনি কম করিতেন, তাহা বলিতে পারি না।

সেকালে আমরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘোষদের বাড়ীতে "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যের রাণী ভবানীর বা জগৎ শেঠের বক্তৃতা, হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত প্রভৃতি সোৎসাহে নিজেদের মধ্যে আবৃত্তি করিতাম। নিদ্রাভঙ্গ হেতু সে-

বাড়ীর কর্ত্তার তিরস্কারও কখন কখন সহ্য করিতে হইত।

এইরূপ হাওয়ায় আমাদের বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকায় আমরা কেহই রায় বাহাদুর হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি নাই।

আমাদের বাল্য ও কৈশোরের যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন "আর্য্যদর্শনে" ধারাবাহিক প্রকাশিত ম্যাটসিনি ও নব্য ইতালী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, টডের রাজস্থানের অনুবাদ, রজনীকান্ত গুপ্তের মহারাণা প্রতাপসিংহ বিষয়ক প্রবন্ধ, রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গবিজেতা, প্রভৃতি অনেকের প্রিয় ছিল।

আমরা যে দুই জন ভদ্রলোকের কথা বলিলাম তাঁহারা এখন পরলোকে। কেবল তাঁহাদেরই রাজনৈতিক মতিগতি যে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারের ছিল তাহা নহে, আরও অনেকের রাজনৈতিক মতিগতিও ঐ প্রকার ছিল।

অতএব, ১৯১৪-১৭ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র ব্রিটিশ জাতির ও শাসনের প্রশংসায় মুখরিত হইত, দেশাই মহাশয়ের এই প্রকার উক্তি আমাদের বাল্যস্মৃতি হইতে সমর্থন করিতে পারিতেছি না।

—

বাংলা-সাহিত্যে ব্রিটিশ শাসনের স্তুতিনিন্দা

ভুলাভাই দেশাই মহাশয় বলিয়াছেন, ১৮৫৭ হইতে ১৯১৪-১৭ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কাব্য ও অন্যবিধ সাহিত্যে ব্রিটিশ শাসনের স্বীকৃতি ও বহু প্রশংসা পাওয়া যায়। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, যে, একটি কবিতা আছে যাহাতে ব্রিটিশ শাসনের ইহাই প্রধান কীর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা বাঘকে ও ছাগলকে এক ঘাটে জল খাওয়াইয়াছে। ভারতীয় নানা ভাষার সাহিত্যের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সহিতই আমাদের কিছু পরিচয় আছে। তাহাতে ঐরূপ কোন কবিতা আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। বাংলা কবিতা আমাদের চেয়ে যাঁহারা অনেক বেশী পড়িয়াছেন এরূপ কাহাকেও কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া সেরূপ কোন কবিতার সন্ধান পাই নাই। বাংলা কাব্যে ও অন্য সাহিত্যে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে কিরূপ লোক-মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে এখন তাহারই কিছু আলোচনা করিব। তাহার পূর্ব্বে পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে, ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে সোজাসুজি বিদ্রোহ উত্থান ও প্রচার ব্রিটিশ আইন অনুসারে দণ্ডনীয় বলিয়া তেমন দৃষ্টান্ত পাইবার আশা করা উচিত নহে। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় গভীর ও তীব্র অসন্তোষ এবং স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইলেই বুঝা উচিত যে, ব্রিটিশ প্রভুত্বের স্তব করা হইতেছে না।

দৃষ্টান্তগুলির তারিখ নির্ভুল না হইতে পারে, কিন্তু আমরা ১৯১৪-১৭ সালের আগেকার কথাই বলিব।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনীর উপাখ্যানে আছে —

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়;
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।

হেমচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভারতসঙ্গীতে গাহিয়াছিলেন,

"বাজ রে শিঙা, বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

ইহা প্রথমে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সরকারী এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয়, এবং তখন, "জনকত শুধু প্রহরী প্রহরা দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা" এই বাক্যে "শুধু"র জায়গায় ছিল "শ্বেত"। এই কবিতাটি এত সুবিদিত যে, ইহা হইতে বেশী কিছু উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। কেবল মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—"দিন আগত ওই, ভারত তবু কই!"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের এবং রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির উৎসাহে ও সাহায্যে নবগোপাল মিত্র কর্ত্তৃক ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম বৎসরের অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গান

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রিদিন ঝরিতেছে লোচন-বারি।"

গীত হয়। হিন্দুমেলার আর একটি গান ছিল গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লজ্জায় ভারত-যশ গাহিব কী ক'রে।" হিন্দু-মেলার গোড়ার দিকে এক বৎসর শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নামে প্রসিদ্ধ) ১৯ বৎসর বয়সে একটি ৪০০ পংক্তির ১০০ কলির দীর্ঘ কবিতা পড়েন। তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম কলি এইরূপ :—

বঙ্গবাসী! আর কত থাকিবে নিদ্রায় রে,
থাকিবে নিদ্রায়?
জাগ জাগ নারীনর উঠ বাঁধ পরিকর,
অলসে পড়িয়া আর কেন রে শয্যায়?
জন্মে নাকি বীর পুত্র বঙ্গের উদরে রে,
বঙ্গের উদরে?
আমরা কি চিরদিন হ'য়ে আছি পরাধীন?
চিরদিন আছি কি রে নতমুখ ক'রে?

রবীন্দ্রনাথ প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে একটি কবিতা লিখিয়া হিন্দুমেলায় পাঠ করেন। উহা বাইশটি কলিতে বিভক্ত এবং দৈর্ঘ্যে ৮৮ পংক্তি। ভারতবর্ষের প্রাচীন শোভাসম্পদ বর্ণনার পর তিনি লিখিয়াছিলেন,

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়,
বিষাদ-আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসিখুসি আর লাগে না ভাল।

আর আঁধার আসুক এখন,
মরু হ'য়ে যাক্ ভারত-কানন,
চন্দ্রসূর্য্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃখলা ছিঁড়িয়া যাক্।

"বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ" নামক একটি পুস্তক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা-গবর্মেণ্ট তাহা বে-আইনী ও নিষিদ্ধ পুস্তকসমূহের তালিকাভুক্ত করিয়া তাহার প্রচার বন্ধ করিয়াছেন। স্বয়ং কবি কিন্তু এই পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন। অবশ্য বহিটির নামকরণ তিনি করেন নাই। তাঁহার স্বদেশী যুগের বহু উদ্দীপক গান কে না জানে? ১৯১৭ সালে তাঁহার বয়স ছিল ৫৬ বৎসর, এবং তাহার পূর্ব্বেই তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের পরিচায়ক বহু কবিতা ও গদ্যরচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য ১৮৭০-এর কোঠায় রচনা করেন। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, উহা পড়িলে সেকালে লোকের এইরূপ ধারণা হইত।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" ("Old Hindu's Hope") স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল মানুষের লেখা। স্বাধীনতার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সহিত কথোপকথনে তাঁহার যে-সব কথায় ব্যক্ত হইত, তাহা যথাযথ লিখিতে পারা যাইবে না।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের গান,

'কত কাল পরে বল, ভারত রে,
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।"
"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে,
পর দাসখতে সমুদয় দিলে।" ইত্যাদি

বঙ্গে সুবিদিত।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আন্দোলনে পরাধীনতার বেদনাব্যঞ্জক ও স্বাধীনতালিপ্সার উদ্দীপক কত যে কবিতা ও গান রচিত হইয়াছিল শুধু তাহার সংখ্যা গুনিতে হইলেও তখনকার সব পুস্তক, সাময়িক-পত্র ও খবরের কাগজ দেখিতে হয়। সেই সময় দ্বিজেন্দ্রলালের

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ,
কেন গো মা তোর মলিন বদন, কেন গো মা তোর ছিন্ন বেশ?
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি ত মেষ।"

ইত্যাদি

গান অগণিত শোভাযাত্রায় ও সভায় গীত হইত।

আমরা এ-পর্য্যন্ত প্রায় বাংলা কবিতা ও গান হইতেই দৃষ্টান্ত দিয়াছি। গদ্যসাহিত্য হইতেও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু এই একটি বিষয়ে আর বেশী স্থান দিতে পারা যাইবে না। সেই জন্য গদ্যসাহিত্যগুরু মহারথী বঙ্কিমচন্দ্রের দু-একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া এ-বিষয়ে বক্তব্য শেষ করি। "ধর্ম্মতত্ত্বে" আছে—

"আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।"

ঐ পুস্তকেরই অন্যত্র আছে—

"আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে

সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোনো পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষা কর্ত্তব্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ আরও অনেক উক্তি ও স্পষ্টতর উক্তি এবং অন্য অনেক বাংলা গদ্যলেখকের ঐরূপ উক্তি উদ্ধৃত করা যায়।

কোন জাতির প্রকৃত মনের ভাব কি, তাহা তাহার কাব্য ও অন্য সুকুমার সাহিত্য হইতে যেমন বুঝা যায়, তাহার রাজনীতিকদের কথা ও কাজ হইতে ততটা বুঝা যায় না। কারণ, রাজনীতিকগণ অবস্থা বুঝিয়া কথা বলেন কাজ করেন, সুবিধা না হইলে তাঁহারা রফা করেন। কিন্তু কবিরা নিরঙ্কুশ। তাঁহারা যাহা কাম্য ও আদর্শস্থানীয় তাহা বলেন। রাজনীতিকরা ডোমীনিয়ন ষ্টেটস্, প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি লইতে পারেন। কিন্তু বঙ্গের কবি ও ঔপন্যাসিকগণ এ সকলের গুণগান করেন নাই। তাঁহারা স্বাধীনতারই জয়গান করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "জয় ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়!"; বলিয়াছেন, "বন্দে মাতরম্"।

ইহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দেশহিতৈষণা, স্বাধীনতার প্রয়োজন, প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্গে যাঁহারা পদ্যে ও গদ্যে কবিতা, গান, প্রবন্ধ, পুস্তক প্রভৃতি রচনা বা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান অনেকে সরকারী চাকর্য্যে ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু গবর্ন্মেণ্ট ইস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন; ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর ছিলেন; হেমচন্দ্র সরকারী উকীল ছিলেন; রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; রমেশচন্দ্র দত্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার ছিলেন। তখন সরকারী চাকর্য্যেদের ও পেন্স্যন-ভোগীদের বাচন ও লেখন সম্বন্ধে এখনকার মত কড়া নিয়ম ছিল না, নিয়মনিগড় ক্রমশঃ কঠোরতর হইয়াছে। হয়ত কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসিত প্রদেশসকলে নিয়মসমূহের কঠোরতা, অন্ততঃ প্রয়োগে, কিছু কমিয়াছে। আগে যেমন মুচিরাম গুড় ও ঘটিরাম ডেপুটি ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন, এখনও তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী সরকারী চাকর্য্যে না থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে দেশভক্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকের অভাব নাই।

বঙ্গের সেকালের সরকারী বাঙালী কর্ম্মচারীদের বহু প্রধান লোকদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা হইতে ইহা অনুমান করা সঙ্গত যে, সেকালে বঙ্গে ইংরেজস্তাবকতা অপেক্ষা স্বাধীনতালিপ্সা প্রবল ছিল।

মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির

পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ এবং তৎসংলগ্ন উদ্যানাদির জন্য গবর্ন্মেণ্ট খাসমহল হইতে আট বিঘা জমি স্মৃতিমন্দিরের উদ্যোক্তাদিগকে নামমাত্র খাজনায় দিয়াছেন। মেদিনীপুরের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনের উদ্যোগে ইহা হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন অধ্যাপক সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দ্বারা করান হইয়াছে। তিনি বিদ্বান্ ও বাগ্মী, এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে। এসোসিয়েটেড্ প্রেস তাঁহার বক্তৃতার যে দুই চারিটি কথার চুম্বক দিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—

"বিদ্যাসাগর এক জন প্রধান শিক্ষাবিধায়ক, সংস্কারক ও ভারতীয় পুনরুজ্জীবন বা নবজাগরণের নেতা ছিলেন। এই নবজাগরণ প্রাচীন আদর্শের পুনরুদ্ধার বা প্রাচীন কীর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা নহে; ইহা প্রাচীন আদর্শসমূহকে আধুনিক অবস্থাসমূহের সহিত সমঞ্জসীভূত করিবার শক্তিমত্তা।

হিন্দুত্বের ইতিহাসধারা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, চলিষ্ণুতা বা অগ্রগতি ইহার প্রাণ (অর্থাৎ ক্ষিতিমোহন বাবু অথর্ব্ববেদের ভাষায় যাহাকে "চরৈবেতি" বলিয়াছেন)। হিন্দুত্বের পাণ্ডারা যখন যখন নিশ্চলতার সমর্থন করিয়াছেন, সেই সেই সময়ই তাহার তমসাচ্ছন্ন যুগ। হিন্দুত্বের মহা শিক্ষক তাঁহারা নহেন যাঁহারা বর্ত্তমান জীর্ণ ভাব, চিন্তা ও আদর্শের রক্ষণশীল ধ্বজাধারী, কিন্তু তাঁহারাই ইহার প্রধান শিক্ষক যাঁহারা আমূল-নূতন চিন্তাধারার ও কর্ম্মপন্থার প্রবর্ত্তক। বিদ্যাসাগর ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। আমাদের বিফলকাম হইবার কারণ ইহা নহে যে, আমরা আধ্যাত্মিক জিনিষের অনুসরণ করিয়াছি; কিন্তু কারণ ইহাই যে আমরা আধ্যাত্মিকতার যথেষ্ট অনুসরণ করি নাই। আমরা আধ্যাত্মিকতা ও আচরণের মধ্যে একটা গভীর পার্থক্যের সৃষ্টি

করিয়া উত্তরের মধ্যে রক্ষা করিয়াছি। ক্রিয়াকলাপ ও প্রাণহীন কর্ম্মপদ্ধতিতে বিশ্বাস ধর্ম্ম নহে। অনির্দ্দিষ্ট ভয় এবং ভীষণ শাস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিধিনিষেধের দ্বারা ধর্ম্ম নহে। গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে অনেকে ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম করে। ধর্ম্ম শান্তি ও প্রেমের জীবন।

বিদ্যাসাগর নারীকুলের বন্ধু ছিলেন। তিনি সংগঠক দেশভক্ত ছিলেন। তাঁহার নানাবিষয়িণী কর্ম্মিষ্ঠতা তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আগ্রহের পরিচায়ক।"

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কিংবা বিদ্যাসাগরের বজ্রকঠোর কুসুমকোমল হৃদয় ও পৌরুষ সম্বন্ধে যদি কিছু বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে এসোসিয়েটেড্ প্রেস্ তাহার উল্লেখ করেন নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনের নেতৃত্বে এবং ঝাড়গ্রামের কুমার নরসিংহ মল্লদেব প্রভৃতির সহায়তায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা মেদিনীপুরবাসীরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই জন্য আমরা তাঁহাদের প্রশংসা করি। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের বক্তব্য তাঁহাদিগকে জানান কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। তাহা প্রাদেশিক সংকীর্ণতাবশতঃ নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা ও কর্ণধার ছিলেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ললিতকলাবিধির প্রয়োগ তিনিই প্রথমে করেন। কেবলমাত্র বাঙালীর দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রদানের 'দুঃসাহস' তিনিই প্রথমে সাফল্যমণ্ডিত করেন। চালচলন পরিচ্ছদাদিতে তিনি খাঁটি বাঙালী ছিলেন। এই জন্য তাঁহার স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন কোন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বাঙালীর দ্বারা করাইলেই তাহা তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনের সহিত ঠিক সমঞ্জসীভূত হইত। ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রধান-উদ্যোগিতায় যে অনুষ্ঠান হয় তাহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে নামজাদা কোন লোককে পৌরোহিত্য করিতে আহ্বান করা চলে না, জানি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সে রকম দাগী লোক নহেন। তাঁহাকে পুরোধা করিলে বেশ হইত। তবে তিনি কচিৎ কখনও রাজনীতির আসরে নামিয়াছেন বটে। কিন্তু পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কখনও সভায় রাজনৈতিক বক্তৃতা করেন নাই। তিনি সাহিত্যিক। ঐতিহাসিক বলিয়া ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে তাঁহার খ্যাতি আছে, এবং তিনি গবর্ন্মেণ্টপ্রদত্ত "সর্" উপাধিও পাইয়াছেন। তাঁহাকে মেদিনীপুরের অনুষ্ঠানটিতে পুরোধা করা চলিত।

—

মেদিনীপুরে বিনা-চাঁদায় গ্রন্থাগার

বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, এবং অন্য কোন কোন প্রদেশে প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। বাংলা দেশে যে এ-বিষয়ে কেহই কিছু করিতেছে না তাহা নহে; তবে অন্য কোন কোন প্রদেশের চেয়ে বঙ্গে কাজ কম হইতেছে মনে হয়। ঠিক্ ঠিক্ খবর পাওয়াও বঙ্গে কঠিন। যাহা হউক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত মেদিনীপুর জেলায় বিনা-চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ ও উৎসাহজনক। নীচে তাহা মুদ্রিত হইল।

গত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলনের অধিবেশনের ফলে জনশিক্ষা-বিস্তারে গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সাধারণের মনে ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। আর তাহারই ফলে গত কয়েক মাসের মধ্যেই নানা স্থানে নূতন নূতন গ্রন্থাগার স্থাপিত হইতেছে বা পুরাতন গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংস্কৃত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

মেদিনীপুর জেলাই বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্যাপকভাবে বিনা-চাঁদায় গ্রন্থাগারের সেবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইল। এতদুদ্দেশ্যে মেদিনীপুর জেলা বোর্ড সাড়ে ষোল হাজার টাকা অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার সমিতির তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হইবে এবং সেখান হইতে ছয়টি মহকুমার ছয়টি প্রান্তীয় গ্রন্থাগারে পুস্তক সরবরাহ করা হইবে। আবার প্রত্যেক প্রান্তীয় গ্রন্থাগার হইতে কুড়িটি করিয়া ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাধার (Travelling Library Box) পল্লী-গ্রন্থাগারে প্রতি মাসে প্রেরিত হইবে। প্রত্যেক পল্লী-গ্রন্থাগারেই একটি করিয়া পাঠাগার থাকিবে যেখানে নিয়মিতভাবে পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে যাঁহাতে অশিক্ষিতগণও নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন পোষ্টার ও চার্টের সাহায্যে চাক্ষুষ শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে। এই সকল পল্লী-গ্রন্থাগার বয়স্কগণের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিচালিত হইবে। যে যে ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় পল্লীগ্রন্থাগারগুলি অবস্থিত, সেই সেই ইউনিয়ন বোর্ড হইতে অর্থসাহায্য লাভের চেষ্টা করা হইবে। বিনা চাঁদায়

জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণের যে পরিকল্পনা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদ মেদিনীপুর জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিল, তাহা মঞ্জুর হওয়ার ফলে বাঙ্গালা দেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলন দ্রুত প্রসারলাভ করিতে পারিবে। বিলাতে কার্ণেগী ট্রাষ্টের বদান্যতায় সেদেশে বিনাচাঁদায় ব্যাপকভাবে সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে আর আজ মেদিনীপুর সে গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে চলিয়াছে। জনসাধারণের আগ্রহ ও সহানুভূতি এবং কর্ম্মীগণের ঐকান্তিক সেবার দ্বারাই এ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। আশা করা যায় যে, সকল সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছালাভে ইহার কার্য্যধারা সুনিয়ন্ত্রিত হইবে।

মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের শিক্ষাবিস্তারে অনুরাগ ও তাহার নিমিত্ত সাড়ে ষোল হাজার টাকা মঞ্জুর করা প্রশংসনীয়। এই সদনুষ্ঠানের সহিত সম্পৃক্ত অন্য সকলেও প্রশংসাভাজন। অন্য সমুদয় জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটী ইউনিয়ন বোর্ড এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বাংলা দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তাহার যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহা হইতে তাহার কার্য্যকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সভায় কয়েক জন বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কলিকাতার গ্রন্থাগারগুলিকে মিউনিসিপালিটী প্রতিবৎসর যত টাকা সাহায্য করেন, এক জন বক্তা বলেন তাহার সমষ্টি করিলে অনেক লক্ষ টাকা হয়। অথচ তাঁহার মতে এত লক্ষ টাকা ব্যয়ের মত কোন স্থায়ী ফল দেখা যায় না। এ-বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। অর্থের সদ্ব্যয় দ্বারা যাহাতে স্থায়ী সুফল হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলেন, যে, বঙ্গের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যাহাকে লাইব্রেরি বা গ্রন্থসংগ্রহ বলা হয়, তাহা সে নামের যোগ্য নহে। এই মন্তব্য বেঠিক নহে। কিন্তু এইরূপ অবস্থার জন্য কেবল বেসরকারী স্কুলগুলির পরিচালকদিগকে বা কেবল জনসাধারণকে দায়ী করা যায় না। ইহা সত্য কথা যে, আমাদের দেশের কম ধনী লোকেরাই সৎকার্য্যে দান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও সুবিদিত যে, বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট পাঁচ কোটি লোকের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক যত টাকা ব্যয় করেন, অন্য অনেক প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট তদপেক্ষা কমসংখ্যক অধিবাসীর জন্য তদপেক্ষা অধিক শিক্ষাব্যয় করিয়া থাকেন। বাংলা-গবর্ন্মেণ্টকে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট অন্য সকল প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের চেয়ে প্রাদেশিক রাজস্বের খুব কম অংশ রাখিতে দেন, ইহা বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষাব্যয়ের অল্পতার একটা অজুহাত বটে; কিন্তু বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট যদি সোআন ব্যয়সংক্ষেপ কমীটির সব সুপারিশ অনুসারে কাজ করিতেন, মন্ত্রীদের বেতন ভ্রমণব্যয় প্রভৃতি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমান করিতেন, প্রকৃত শিক্ষায়তন হিসাবে মূল্যহীন এবং জাতিগঠনের পক্ষে অনিষ্টকর সাম্প্রদায়িক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর অপব্যয় না করিতেন, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বাংলা-গবর্ন্মেণ্টও শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় করিতে পারিতেন।

সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার গোটা দুই কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছিলেন, শিশুদের বর্ণপরিচয়ের ও তাহার পরবর্ত্তী শিক্ষার জন্য যে-সব পুস্তক ব্যবহৃত হয়, নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার পক্ষে সেগুলি অনুপযোগী। প্রাপ্তবয়স্কেরা "ভব খড় বয়" বা "নব আম খায়" পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তাহাদের জন্য জ্ঞানগর্ভ চিত্তগ্রাহী অন্য রকম বহি সোজা ভাষায় লিখিত হওয়া উচিত। আমরা এইরূপ শুনিয়াছিলাম যে, গ্রন্থাগার-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ পুস্তক রচনা করাইতেছেন বা করাইবেন।

সভাপতি এই আর একটি কথা বলেন যে, ছোট ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে পড়িবার উপযোগী এখন যত বহি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভালগুলির একটি তালিকা গ্রন্থাগার-পরিষদ প্রকাশ করিলে বঙ্গের সমুদয় গ্রন্থাগারের পরিচালকেরা তদনুসারে পুস্তক কিনিতে পারেন।

জ্ঞানবিস্তারের পক্ষে শিক্ষালয় অধিক কার্য্যকর ও ও আবশ্যক, না গ্রন্থাগার অধিক কার্য্যকর ও আবশ্যক, সভাপতি কোন কোন দৈনিক সংবাদপত্রের এই তর্কবিতর্কের

বিষয় উল্লেখ করিয়া গ্রন্থাগারের উপকারিতা যে কত বেশী তাহা বুঝাইয়া বলেন। তবে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, শিক্ষালয় ও গ্রন্থাগার উভয়ই আবশ্যক। গ্রন্থাগার হইতে লব্ধ শিক্ষার সপক্ষে তাঁহার প্রধান বক্তব্য এই ছিল, যে, পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত অনেক ছাত্রকেই এমন অনেক বিষয় শিখিতে হয় যাহা তাহাদের ভাল লাগে না ও তাহাদিগকে আনন্দ দেয় না। এই কারণে এগুলি তাহাদের হৃদয়মনের অঙ্গীভূত হয় না। অন্য দিকে গ্রন্থাগার হইতে বহি লইয়া কেহ যাহা পড়ে, তাহা স্বেচ্ছায় পড়ে। কেহ তাহাকে কোন বহি পড়িতে বাধ্য করে না। সেই কারণে, স্বেচ্ছায় নির্ব্বাচিত ও পঠিত বহি হইতে যাহা শিখা যায়, তাহার ফল অধিকতর স্থায়ী হয়।

—

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলন

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটিতে অনেক ভাবিবার কথা আছে। কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমে দেখা যাক বাংলা দেশে কত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ও কত চাই।

—

বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় কত চাই

মাননীয় বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস তাঁহার অভিভাষণে বলিতেছেন :—

"বাংলা দেশে মোটামুটি পাঁচ কোটি লোক বাস করে; ইহার মধ্যে প্রায় ৭৫ লক্ষ জনের বয়স ৬ হইতে ১১ বৎসর। এদের সকলেরই কোনও বিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু ঐ বয়সের ২২।২৩ লক্ষ বালকবালিকা শিশু-শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ করে। এদের মধ্যে বালিকাদের সংখ্যা খুবই কম। যদিও বালকদের মধ্যে যত জনের বিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত, তার অর্দ্ধেক জন এখন বিদ্যালয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ বালকই এক বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেই পাঠ সমাপ্ত করে। অবশিষ্টদের মধ্যেও অধিকাংশই দুই বা তিন বৎসরের অধিক পড়ে না। পূর্ব্বোক্ত ২২।২৩ লক্ষ বালক-বালিকার মধ্যে কিঞ্চিদধিক ২ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। যারা এক, দুই বা তিন বৎসর বিদ্যালয়ে পাঠ করে, তারা প্রায় সকলেই কিছুকাল পরে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে পড়ে। কাজেই তাদের জন্য সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বৃথা হয়। পঁচাত্তর লক্ষ বালকবালিকার মধ্যে যদিও ২২।২৩ লক্ষ জন বিদ্যালয়ে যায়, কিন্তু মাত্র দু-লক্ষ জন যথার্থ কিছু শিক্ষালাভ করে। এ-কথা ভাবলেও স্তম্ভিত হ'তে হয়।

১৯৩৭ সালে মার্চ্চ মাসে যে সরকারী বিবৃতি বার করা হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে বাংলা দেশে ৬৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে প্রায় ১০,০০০ উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাকীগুলি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাংলা দেশে প্রায় ১,০০,০০০ গ্রাম আছে, এর মধ্যে মাত্র ৮৫০০ গ্রামে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ও ২৮,৬৩০টি গ্রামে নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে ১,০০,০০০ গ্রামের মধ্যে কেবলমাত্র ৩৭,০০০টি গ্রামে ভাল হউক, মন্দ হউক একরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রায় ৬৫০০০ গ্রামে কোনওরূপ বিদ্যালয়ই নাই। এ-অবস্থা ভাবলেও স্তম্ভিত হ'তে হয়।

যাহারা যথেষ্ট সময় পাঠশালায় না পড়িয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া আবার নিরক্ষর হয়, এবং চারি বৎসর পড়িবার পরও যাহারা পরে প্রায় নিরক্ষরের সমান হয়, তাহাদের সকলকেই চারি বৎসর পড়িতে সমর্থ করিতে হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা আবশ্যক। তাহার অর্থ প্রাথমিক শিক্ষাতে আরও অনেক টাকা খরচ করিতে হইবে। এই টাকা কোথা হইতে আসিবে?

যদি সকলকেই চারি বৎসর পড়িতে সমর্থ করাও যায়, তাহা হইলেও তদনন্তর তাহাদিগকে লিখন-পঠনক্ষম রাখিতে হইলে তাহাদিগের বিনামূল্যে কিছু পড়িবার বহি পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার মানে গ্রামে গ্রামে বিনা-চাঁদায় গ্রন্থাগার স্থাপনের এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাধারের (Free Travelling Book-cases-এর) বন্দোবস্ত করা। তাহা করিতে হইলে বিস্তর টাকা চাই। এই টাকা কোথা হইতে আসিবে?

উপরের দুটি প্রশ্ন ছাড়া আর একটি প্রশ্ন আছে। বিশ্বাস মহাশয় বলিয়াছেন প্রায় ৬৫০০০ গ্রামে কোন রকম বিদ্যালয়ই নাই। সেই সকল গ্রামেও ত বিদ্যালয় চাই, গ্রন্থাগার চাই। তাহা স্থাপন করিবার ও চালাইবার টাকা কোথা হইতে আসিবে?

প্রশ্ন করিয়া নিবৃত্ত থাকিলে চলিবে না। যেমন করিয়া হউক, টাকার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা আমরা মূর্খ জাতি, দরিদ্র জাতি, রুগ্ন জাতি, দুর্ব্বল জাতি হইয়া থাকিব। শহরের কতকগুলি শিক্ষিত লোক জাতি

নহে, জাতির সামান্ত অংশ মাত্র। জাতির প্রধান অংশ, যাহারা খাদ্য উৎপন্ন করে তাহারা, গ্রামের কুটীরে কুটীরে বাস করে।

—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন :—

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৎসরে প্রায় ৮০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়। তার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল ফণ্ড হইতে প্রায় ৪৭,০০,০০০ টাকা দেওয়া হয় ও অবশিষ্ট টাকা ছাত্রবেতনরূপে আদায় হয়। যদি আমরা স্মরণ রাখি যে বড় বড় শহরে মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারী স্কুলসমূহে অপেক্ষাকৃত ভাল মাহিনা শিক্ষকদের দেওয়া হয়, তা হ'লে দেখতে পাব যে পল্লীগ্রামের পাঠশালার শিক্ষকেরা সাধারণ তহবিল থেকে গড়ে মাসিক ৩।০ টাকার বেশী পান না ও গড়ে তাঁদের ৩৲ টাকার অধিক ছাত্র-বেতন আদায় হয় না। যদি সম্পূর্ণ ছাত্রবেতন আদায় হয় তা হ'লে তাঁদের মাসিক আয় মাত্র ৬।০ টাকা হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, আজকাল ছাত্রবেতন পল্লীগ্রামের পাঠশালায় কিছুই আদায় হয় না। কাজেই পল্লীগ্রামের পাঠশালার শিক্ষকদের মাসিক আয় ৪৲ টাকার অধিক কোনও রূপেই ধার্য্য করা যায় না। এরূপ দরিদ্র শিক্ষকদের কাছ হ'তে কতটা কাজ আদায় হ'তে পারে তা আপনারাই অনুমান করে নিন। ইহার উপর একথাও মনে রাখতে হবে বাংলা দেশের অধিকাংশ শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

তাহা হইলে আগে যে তিনটি প্রশ্ন করিয়াছি তাহার উপর এই আর একটি প্রশ্ন উঠে, প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদিগকে পল্লীগ্রামের পক্ষেও জীবনধারণের উপযোগী বেতন কি প্রকারে দেওয়া যায়, এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী কিরূপে পাওয়া যায়।

—

শিক্ষা-কর সম্বন্ধে একটি কথা

বঙ্গের সর্ব্বত্র অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সমুদয় বালকবালিকাকে লেখাপড়া শিখাইতে হইলে চার-পাঁচ কোটি টাকা আবশ্যক হইবে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। সব না হউক, কতকটা টাকা তুলিবার জন্য শিক্ষা-কর বসাইবার আইন হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ জমীদার ও কিয়দংশ রায়তদের নিকট হইতে আদায় হইবার কথা। কৃষকপ্রজা-পক্ষের লোকেরা বলিতেছেন, সব টাকাটা জমীদারদের নিকট হইতেই আদায় হওয়া চাই। আবার আইনে বলে রায়তদের অংশটাও জমীদারদিগকেই রায়তদের নিকট হইতে আদায় করিয়া গবর্ন্মেণ্টকে দিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে জমীদারেরা রায়তদের অধিকতর বিরাগভাজন হইবে। এ-বিষয়ে বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় বলেন :—

বর্ত্তমানে এই শিক্ষাকর আদায় সম্বন্ধে বহু জেলাতে প্রতিবাদ চলছে। এই আইন অনুসারে সমগ্র বাংলা দেশে ১,১৩,০০,০০০ টাকা শিক্ষাকর আদায় হ'তে পারে গভর্ণমেণ্ট ভেবেছিলেন। এর মধ্যে প্রায় ৮৩,০০,০০০ টাকা প্রজারা দেবেন ও ৩০,০০,০০০ টাকা জমিদারেরা দেবেন, এই প্রস্তাবই আইনে ছিল। কিন্তু সরকারী সাহায্য অন্যূন ২৩,৫০,০০০ টাকা মাত্র হবে। বর্ত্তমান আন্দোলন অনেকটা এই বৈষম্যের জন্যই হচ্ছে। যদি সরকারী সাহায্য বাড়ান হয় তাহ'লে এই জমিদারের ও প্রজার দেয় কর কম হ'তে পারে। আর একটি কথা, প্রজার দেয় শিক্ষাকর জমিদার মারফৎ আদায়ের ব্যবস্থাটি ভাল হয় নি। জমিদার অবশ্যই তাঁর দেয় অংশ দেবেন, কিন্তু প্রজার অংশ জমিদারের মারফৎ আদায়ের ব্যবস্থা করায় জমিদারেরা প্রজাদের অপ্রিয়ভাজন হচ্ছেন। জমিদারের বিরুদ্ধে এই অযথা আন্দোলন গভর্ণমেণ্ট সহজেই বন্ধ করতে পারেন, যদি তাঁরা প্রজার দেয় টাকা সরাসরিভাবে ইউনিয়ন বোর্ড বা স্কুল বোর্ড দ্বারা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। আমার অনুরোধ, গভর্ণমেণ্ট যেন এই কথাটি ভাল ক'রে বিবেচনা করেন।

খবরের কাগজে এইরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছিল যে, বাংলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকের সিমলা যাইবার একটি উদ্দেশ্য ছিল ভারত-গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে বঙ্গের জন্য কিছু রাজস্ব সংগ্রহ করা—তাহা হইলে সেই টাকার সাহায্যে বঙ্গের শিক্ষাব্যয় বাড়ান যায়। হক্ সাহেবের এই চেষ্টা কতটা সফল হইয়াছে জানিতে ইচ্ছা হয়।

—

গান্ধীজীর শিক্ষাপ্রণালী

গান্ধীজী বর্ধা (Wardha) হইতে যে শিক্ষা-প্রণালী প্রকাশ করেন ও যাহা পরে একটি কমীটির দ্বারা বিস্তারিত ভাবে পুস্তিকার আকারে প্রচারিত হয়, তাহার সপক্ষে বিচারপতি বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে অনেক কথা

বলিয়াছেন। ইহা বঙ্গে প্রবর্ত্তিত করা উচিত কি না এবং প্রবর্ত্তিত করা সম্ভবপর কিনা তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত একটি কমীটি নিয়োগেরও প্রস্তাব হইয়াছে।

এই পদ্ধতির সপক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে এবং ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনাও অনেক হইতে পারে ও হইয়াছে। দুই দিক্ ভাল করিয়া বিচার করা আবশ্যক। ইহার সম্বন্ধে মডার্ণ রিভিয়ুতে আমরা কিছু লিখিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে চাই না; ইহার আলোচনার জন্য যদি কোন কমীটি নিযুক্ত হয়, তাহার সদস্যদের ও অন্য অনুসন্ধিৎসুদের বিবেচনার জন্য দু-একটি কথা বলিতেছি।

এই শিক্ষাপ্রণালী কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে প্রবর্ত্তিত হইবে, কোথাও কোথাও হইয়াছে, কাগজে এইরূপ দেখিয়াছি। যে-যে প্রদেশে ইহা আলোচনার জন্য যে-যে কমীটি বসিয়াছিল এবং সিমলায় যে কমিটি বসিয়াছিল, তাহাদের রিপোর্ট বঙ্গের কমীটির ও অন্য অনুসন্ধিৎসুদের দেখা কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, কোন কোন কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশেও (যেমন বোম্বাইয়ে) ইহা অপরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হয় নাই।

এই প্রণালীটির দুটি দিক্ আছে। একটি শিক্ষাতত্ত্বের, অন্যটি অর্থনীতির দিক্। শিক্ষাতত্ত্বের সহিত যে-দিক্‌টির সম্বন্ধ, তাহা মূলতঃ ও সারতঃ ষোল বৎসর পূর্ব্বে শান্তি-নিকেতনে প্রতিষ্ঠিত (এক্ষণে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত) "শিক্ষাসত্র" নামক বিদ্যালয়ে অনুসৃত প্রণালীর মত। এই প্রণালী বিশ্বভারতীর দুটি বুলেটিনে বর্ণিত আছে। তাহা হইতে আমরা কোন কোন অংশ মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। যাঁহারা ওয়ার্ধা প্রণালীর আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের শিক্ষাসত্রের প্রণালীটিও দেখা উচিত।

খবরের কাগজে ও মাসিকপত্রে এবং অন্যত্র ওয়ার্ধা প্রণালীটির নানা সমালোচনা ও সমর্থন হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুটির কথা এখন আমাদের মনে পড়িতেছে—বোম্বাইয়ের ওরিয়েণ্ট্যাল রিভিয়ুতে শ্রীমতী কপিলা খাণ্ডওআলার সমালোচনা, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিহারীলাল মিত্র ফেলোশিপ লইয়া শ্রীমতী জ্যোতিঃপ্রভা দাস গুপ্ত ভারত ভ্রমণ পূর্ব্বক নানা নারীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার অন্তর্গত সমালোচনা।

গান্ধীজীর উদ্ভাবিত প্রণালীটি তুচ্ছ করিবার জিনিষ নয়, মনোনিবেশ ও বিচার পূর্ব্বক বিবেচনা করিবার জিনিষ। কিন্তু বিনা-বিচারে সমস্তটি গ্রহণীয় নহে।

—

বঙ্গে ও পাশ্চাত্য দেশে পাশবতা

নারীরক্ষাসমিতি কর্ত্তৃক আহূত সভার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহার তাৎপর্য্য আমরা আশ্বিনের প্রবাসীতে দিয়াছিলাম। তাঁহার একটি উক্তি সম্বন্ধে কোন কোন প্রবীণ লোকও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সে-বিষয়ে কিছু বলিতে চাই।

তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে যেরূপ পাশবতা আছে, অন্য কোন দেশে সেরূপ নাই। সংশয়ীরা প্রশ্ন করেন, ইহা কি সত্য? পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধীয় নীতিতে কি বাংলা দেশের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? ইহা সত্য যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যভিচারের ও বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমা অনেক হয় এবং অবিবাহিতা মাতার সংখ্যাও ঐ সব দেশে অধিক। কিন্তু সুভাষবাবু তুলনাটা নিশ্চয়ই এদিক্ দিয়া করেন নাই। মনে রাখিতে হইবে, যে, ব্যভিচার ও বলাৎকার এক নয়; নরনারীর অবৈধ আকর্ষণবশতঃ ব্যভিচার ও বিবাহবিচ্ছেদ, বা তদ্রূপ আকর্ষণবশতঃ কানীন সন্তানের জন্ম, এবং নারীধর্ষণ—বিশেষতঃ দলবদ্ধ কতকগুলি নরপিশাচের দ্বারা একটি নারীকে ধর্ষণ—একজাতীয় দুর্নীতি নহে। আমাদের দেশের নারীধর্ষণের মধ্যে—বিশেষতঃ ছোট বালিকা-দিগকে ধর্ষণের মধ্যে—যে পাশবতা দেখা যায়, অন্য কোন দেশে তাহা নাই। কেহ কেহ বলেন, আমেরিকায় আছে। তাহা ভুল। তথাকার অপরাধ ভিন্ন প্রকারের ও সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম।

স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমাদের সকলেরই স্বাভাবিক আছে। কিন্তু তাহার প্রভাবে বাঙালী জাতির দোষের প্রতি অন্ধ হওয়া উচিত নহে। ইহাও মনে

রাখিতে হইবে যে, বাঙালী জাতি বলিতে কেবল বাঙালী হিন্দুই বুঝায় না। কংগ্রেসের সভাপতি বঙ্গের মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টিয়ান আদিম জাতি প্রভৃতি সকলকেই নিশ্চয়ই বাঙালী জাতির অন্তর্গত মনে করিয়া থাকেন।

ইহাও বিবেচ্য, যে, সুভাষ বাবুর মন্তব্য যদি ভ্রান্তই হয়, যদি পাশ্চাত্য দেশসকলে আমাদের দেশের চেয়ে সত্য সত্যই বেশী পাশবতা থাকে, তাহা হইলেও আমাদের দেশে উহা যতটা আছে, তাহা ত গৌরবের বিষয় নহে। তাহারও উচ্ছেদ একান্ত আবশ্যক।

—

বিদেশী আতসবাজী

বিদেশী কাপড়চোপড় কেনার বিরোধী অনেকেই—আমরাও। সেগুলা যদিও দেশী কাপড়চোপড়ের মতই কাজে লাগে, তথাপি তাহার বিরোধিতা যুক্তিসঙ্গত। অতএব বিদেশী আতসবাজীগুলার বিরোধিতা আরও অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ সেগুলা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, কোন কাজেই লাগে না। অধিকন্তু অনেকে গুরুতর আঘাত পায়, মারাও পড়ে। লক্ষ লক্ষ টাকা ভারতবর্ষে বিদেশী তুবড়ী হাউই পটকা কিনিতে খরচ হয়। যদি এই রকম অপব্যয় করিতেই হয়, তাহা হইলে দেশী আতসবাজীই কেনা উচিত। হিন্দু মুসলমান ও অন্য সকলেরই পূজা-পার্ব্বণের সময় এই কথাটি মনে রাখা উচিত।

—

"ডিসিপ্লিন (নিয়মানুবর্ত্তিতা) চাই"

মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেসনেতা, কেহ সংক্ষেপে কেহ বা বিস্তারিতভাবে, বলিয়াছেন, "ডিসিপ্লিন (নিয়মানুবর্ত্তিতা) চাই।" কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি একথা বার-বার বলিয়াছেন।

নিয়মানুবর্ত্তিতা যে চাই, ইহা অতি সত্য কথা। জড়-জগতে দেখিতে পাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ম অনুসারে চলিতেছে। যে-সকল ঘটনা আকস্মিক মনে হয়, হঠাৎ ঘটে বলিয়া মনে হয়—যেমন ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ঝড়তুফান, জলপ্লাবন—তাহাদেরও ঘটিবার নিয়ম বিজ্ঞানীরা কতক আবিষ্কার করিয়াছেন, কতক আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন। মনুষ্যেতর প্রাণিজগৎ উদ্ভিদ্‌জগৎ নিয়মের অধীন। মানবসমাজে ভিন্ন ভিন্ন জাতির অভ্যুদয় অবনতি পতন নিয়ম অনুসারে হয়; রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব নিয়ম অনুসারে হয়। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়।

সকল নিয়ম মানুষ এখনও জানে না, ক্রমশঃ জানিতেছে।

কংগ্রেসনেতারা কেবল যে মুখেই বলিতেছেন নিয়মানুবর্ত্তিতা চাই, তাহা নহে। বড় বড় কংগ্রেস-ওআলার উপরও শাসনদণ্ড প্রযুক্ত হইয়াছে। শেষ বোম্বাই কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মিঃ নারিমান নেতৃত্ব হইতে অপসৃত হইয়াছেন। মধ্য-প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খারে তাঁহার পদ হইতে অপসৃত হইয়াছেন। বঙ্গে ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত প্রমুখ কয়েক জন প্রধান কংগ্রেসওআলাকে ভুগিতে হইয়াছে—যদিও এখন তাঁহারা অনেকেই পূর্ব্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সম্প্রতি বঙ্গে কয়েক জন কংগ্রেস-ওআলার নিকট হইতে তাঁহাদের কার্য্যবিশেষের জন্য কৈফিয়ৎ চাওয়া হইয়াছে।

বঙ্গের বাহিরে ও বঙ্গে যে-সকল কংগ্রেসী ভুগিয়াছেন তাঁহারা কেহ নাবালক নহেন; সকলেই প্রৌঢ়, কেহ কেহ বৃদ্ধ। কংগ্রেসনেতাদের মত অনুসারে, তাঁহারাও নিয়ম মানিতে বাধ্য।

কংগ্রেস যখন যাঁহার উপর যে-নিয়ম যে-ভাবে খাটাইয়াছেন, তাহা ঠিক্ হইয়াছে কি হয় নাই, তাহার আলোচনা এখানে করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ সব কংগ্রেসওআলাই নিয়ম মানিতে বাধ্য, কংগ্রেসের মত এইরূপ, এবং এই মত ঠিক্।

সকল বয়সের কংগ্রেসওআলারা যখন কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মানিতে বাধ্য, তখন অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকেরাও তাহাদের নিয়ম মানিতে বাধ্য। কংগ্রেসের কোন নিয়ম যদি কোন কংগ্রেসওআলা মন্দ মনে করেন, তবে তিনি তাহা রদ বা পরিবর্ত্তন করাইবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিংবা কংগ্রেস

ত্যাগ করিতে পারেন; কংগ্রেসভুক্ত থাকিব অথচ কংগ্রেসের নিয়ম মানিব না, ইহা হইতে পারে না। এই কথা অন্য সকল প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

কিছু দিন হইতে বঙ্গে (এবং বঙ্গের বাহিরে) নানা স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও স্কুলে ছাত্রদের ধর্ম্মঘট হইতেছে। এই ধর্ম্মঘটগুলির সপক্ষে বা বিরুদ্ধে কিছু আলোচনা করা বা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এতগুলি ঘটনার 'পাইকারী' বিচার এবং তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য প্রকাশ একসঙ্গে হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, কোনও ঘটনাপরম্পরা একটা কোন পরিণতিতে - অন্ততঃ আপাত-পরিণতিতে—না পৌঁছিলে মাসিক কাগজে সে বিষয়ে কিছু বলা সমীচীন নহে। কেন-না, কোন বিষয় সম্বন্ধে আজ যাহা লিখিয়া দিব, কাগজ বাহির হইবার পূর্ব্বেই এমন কিছু ঘটিতে পারে, যাহা সেই লেখার ব্যর্থতা বা অনাবশ্যকতা প্রমাণ করিবে। আমরা ছাত্র-ধর্ম্মঘটগুলির উল্লেখ করিতেছি অন্য উদ্দেশ্যে।

ধর্ম্মঘটগুলি হওয়ায় ছাত্রদের প্রধান কর্ত্তব্য যে অধ্যয়ন করিয়া এবং শিক্ষাদাতাদের ব্যাখ্যান উপদেশাদি শুনিয়া জ্ঞান-লাভ, তাহাতে খুব বাধা ঘটে; অধিকন্তু ছাত্র এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত, তাহা নষ্ট হয়। ইহা উভয় পক্ষের এবং দেশের পক্ষে অনিষ্টকর। যদি আগে হইতে এরূপ স্থির থাকে, যে, কংগ্রেসওআলারা যেমন কংগ্রেসের নিয়ম মানিতে কিংবা কংগ্রেস ছাড়িয়া দিতে বাধ্য, সেইরূপ ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুলের নিয়ম মানিতে কিংবা তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য, তাহা হইলে বোধ হয় সব না-হউক অন্ততঃ অনেকগুলি ধর্ম্মঘট নিবারিত হইতে পারে।

আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা কোন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বা স্কুল বিশেষের কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালী যখন-তখনকার হুকুম মানাইবার ফন্দী নহে। আমরা বলি, শিক্ষায়তনের মধ্যে এবং তাহার বাহিরে ছাত্রদের আচরণ সম্বন্ধে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের, কলেজের ও স্কুলের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম প্রণীত হউক। ছাত্রেরা কোথাও ভর্ত্তি হইবার সময় তথাকার এই নিয়মগুলি তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে। সেগুলি তাঁহাদের পছন্দ না-হইলে তাঁহারা সেই প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হইবেন না, পছন্দ হইলে তাঁহারা ভর্ত্তি হইবেন এবং নিয়মগুলি মানিবেন।

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ কংগ্রেসওআলাদিগকেও যখন নিয়ম মানিতে হয়, তখন ছাত্রেরাই কোন নিয়মই মানিবেন না, ইহা ত হইতে পারে না। ছাত্রেরা শিক্ষাসমাপনান্তে কংগ্রেসী হইলে তখন ত কংগ্রেসের নিয়ম মানিতে বাধ্য হইবেন। তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা কোন নিয়মই মানিবেন না, ইহা সমীচীন নহে। অবশ্য এরূপ হইতে পারে যে, অনেক ছাত্র বলিতে পারেন, "আমরা ছাত্রাবস্থাতেও কংগ্রেসের নিয়মই মানিব, অন্য নিয়ম মানিব না।"

আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, ছাত্রেরা ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে স্কুলে ও তাহার বাহিরে কি কি নিয়ম মানিবেন, কংগ্রেসই তাহা স্থির করিয়া দিউন। যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুল কংগ্রেসনির্দ্ধারিত নিয়ম মানিয়া কোন ছাত্রকে ভর্ত্তি করিতে না-চান, তখন কংগ্রেসানুগত ছাত্রেরা সেখানে ভর্ত্তি না-হইতে পারেন।

কাজটি যে সোজা তাহা আমরা মনে করি না, বলিও না। কিন্তু আলোচ্যমান বিষয়টি সম্বন্ধে অনিশ্চয়ে ছাত্রদের, অভিভাবকদের, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এবং সমগ্র জাতির অনিষ্ট হইতেছে, এবং ধর্ম্মঘটগুলির দ্বারা দেশের স্বাধীনতালাভেরও কোনই সাহায্য হইতেছে না। এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব কথা লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহার মত সময় ও স্থানও নাই। কিন্তু আমরা বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি ছাত্রদের, তাঁহাদের ছাত্রনেতা ও অ-ছাত্রনেতাদের, অভিভাবকদের, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের, খবরের কাগজের সম্পাদক ও সংবাদদাতাদের এবং কংগ্রেস-নেতাদের মনোযোগ কামনা করি।

শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষেরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা, এবং অভিভাবকেরা এ-বিষয়ে নিখুঁত মানুষ, এমন কোন কথা আমরা বলি না। আবার তাঁহারা ছাত্রদের হিত বুঝেন না চান না, দেশের হিত বুঝেন না চান না, তাহাও বলি না। কেবল ছাত্রেরাই ভুল করেন জেদ ধরেন, দেশহিত বা রাজনীতি বুঝেন না, তাহাও বলি না। কিন্তু ইহাও বলি না, যে, ছাত্রেরাই রাজনীতি

এবং দেশহিত বুঝেন, স্বাধীনতা চান, বয়োবৃদ্ধেরা বুঝেন না, চান না। তাঁহারা যে এখনও ছাত্র, এখনও বিদ্যার্থী শিক্ষার্থী, তাহার মানেই এই যে, তাঁহারা কোন কোন বিষয় জানেন না যাহা তাঁহাদিগকে কোন কোন বয়োবৃদ্ধের নিকট শিখিতে হইবে। বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিশেষ করিয়া ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রনীতির (অর্থনীতিরও) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি-বিজ্ঞান (Political Science) ও পৌরজনাধিকার-বিদ্যা (Civics) ইতিহাসেরই মত ছাত্রদের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। এই ব্যবস্থার অর্থই এই, যে, অনেক অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ গ্রন্থকার তাঁহাদের গ্রন্থের মধ্য দিয়া এবং অনেক অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক ব্যাখ্যান দ্বারা ছাত্রদিগকে রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞান ও পৌরজনাধিকার-বিদ্যা শিখাইতে সমর্থ। সুতরাং একথা বলিলে ছাত্রদের কিছুই মর্য্যাদাহানি হয় না যে, তাঁহারা এখনও রাজনীতিতে পারদর্শী হন নাই, এখনও তাঁহাদিগকে রাজনীতি শিখিতে হইবে।

বাংলা দেশে কংগ্রেসী প্রাদেশিক শাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এই জন্য এখানকার শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের স্কুলের বিশেষ বিশেষ নিয়ম বা ব্যবস্থা 'সাম্রাজ্যবাদ'-প্রণোদিত বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেই জন্য আমাদের উপক্ষেপ (suggestion) এই যে, কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে ছাত্রেরা কি কি নিয়ম মানেন তাহার প্রতিলিপি সংগ্রহ করা হউক। যদি ছাত্রেরা সেখানে কোন নিয়মই মানেন না, তাহাও জানিয়া লওয়া ভাল।

—

বন্যায় বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্যদান

আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের বহু স্থানের লোকেরা বন্যার বিপন্ন। কিন্তু বন্যার প্রকোপ বঙ্গেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গের তেরটি জেলার লোক বন্যাপ্রপীড়িত। দৈনিক কাগজগুলির পৃষ্ঠা গৃহহীন আশ্রয়হীন অন্নবস্ত্রহীন বুভুক্ষিত নরনারী বালক-বালিকা ও শিশুদের দুর্দ্দশার কাহিনীতে পূর্ণ। তাহার উপর আমরা আর কি লিখিতে পারি? যাঁহারা বিপন্ন নহেন, তাঁহারা বিপন্নদিগের সহায় হউন। প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি যথাসাধ্য সাহায্য করুন। ভারত-গবর্ন্মেণ্টেরও এই সময় বাংলা হইতে গৃহীত বাৎসরিক বহুকোটি টাকার কিয়দংশ বঙ্গের বিপন্ন লোকদিগকে দেওয়া উচিত।

—

বন্যার প্রতিকার

'বন্যার প্রতিকার' কথাটা শুনিলেই অনেকের চাউনিতে সন্দেহের প্রশ্ন ব্যঞ্জিত হইবে। কিন্তু বন্যা 'দৈব' ঘটনা হইলেও মানুষ ইহার প্রতিকার, অন্ততঃ কিছু প্রতিকার, করিতে পারে। অন্য অনেক দেশে যে চেষ্টা হইতেছে, এবং তথায় যে-ফল পাওয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষে, বঙ্গে, তাহা হইতে পারে, ফলও পাওয়া যাইতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে যে স্মারক পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহাতে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অন্য কোন কোন দেশে নদী শায়েস্তা করিবার যে-সব চেষ্টা হইয়াছে, তাহার একটি বৃত্তান্ত দেন এবং আমাদের দেশেও এইরূপ হওয়া উচিত বলেন। তাহার পরও তিনি মডার্ণ রিভিয়ু পত্রে এ-বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে জলপ্লাবন হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট লিখিবার ভার বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে দেন। তিনি বহু-বৎসরের বারিপাত সম্বন্ধীয় অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া একটি মূল্যবান রিপোর্ট পেশ করেন। তাহা ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে দেওয়া হয় নাই; এবং তাহার মূল্যও এত বেশী রাখা হইয়াছে যে, তাহা কেনাও সহজ নয়। বর্ত্তমান মন্ত্রীরা অন্ততঃ এই রিপোর্টটির মূল্য যদি খুব কম করিয়া দেন, তাহা হইলে বন্যা সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান বাড়িবে—প্রতিকারের কথা যাহাই হউক।

পঞ্জাবে একটি জলসেচন-গবেষণার পরীক্ষাগার (Irrigation Research Laboratory) খোলা হইয়াছে।

তাহাতে বন্যা সম্বন্ধেও গবেষণা হয়। গবেষণা করেন ডক্টর নলিনীকান্ত বসু। সায়েন্স এণ্ড কাল্‌চ্যার ("বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি") নামক মাসিকপত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তাঁহার লিখিত "Floods and Prediction of Flood Levels by River Models" সম্বন্ধে, অর্থাৎ বন্যার জল কত উঁচু পর্য্যন্ত উঠিবে তাহা আগে হইতে অনুমান করিবার উপায় সম্বন্ধে, একটি চিঠি বাহির হইয়াছে। বাংলা দেশে বন্যা ত বহুকাল ধরিয়া হইতেছে; কিন্তু সে বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা বঙ্গে নাই।

জাপানে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা ও এঞ্জিনীয়ারেরা বন্যার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা ও কার্য্যতঃ চেষ্টা অনেক রকম করিতেছেন। জাপানের ভৌগোলিক প্রকৃতির সহিত বঙ্গের হুবহু মিল নাই। তথাপি জাপানে যাহা লেখা ও করা হইতেছে তাহার বিবরণ সংগৃহীত হইলে তাহা নিশ্চয়ই বঙ্গের কিছু কাজে লাগিবে। নদীগর্ভের প্রস্থ ও গভীরতা বৃদ্ধি, মজা নদী আবার খনন, নদীর উপরের সেতুর উচ্চতা বৃদ্ধি, সাধারণ রাস্তা ও রেলের রাস্তার নীচের জলপ্রণালী বৃহত্তর করা, প্রভৃতি নানা উপায় বিবেচিত হইতেছে। কোন কোন উপায় অবলম্বিতও হইয়া থাকিবে।

এখন বাংলা দেশে হুজুক নানা রকমের আছে, আরও দুই চারিটা বাড়িতে পারে। কিন্তু বন্যার সমস্যা অপেক্ষা সঙ্গীন সমস্যা অন্য কোনটাই নহে। তাহার আশু প্রতিকার অবশ্য বিপন্নদিগকে সাহায্যদান, কিন্তু স্থায়ী প্রতিকারও চিন্তনীয় এবং করণীয়।

—

অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন চরিত্রবান্, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বিদ্বান, সুদক্ষ ও কৃতী শিক্ষাব্রতীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি বিশেষ মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি বি-এ পরীক্ষায় দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান এবং এক বিষয়ে প্রথম ও অন্যটিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দর্শনে এম্-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম্-এ পাসের পর ১৯ বৎসর বয়সে তিনি জেনেরাল এসেম্ব্লী (এখন স্কটিশ চর্চ) কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দু-বৎসর পরে বিদ্যাসাগর কলেজে কাজ পাইয়া ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত সেখানে কাজ করেন। অবসরগ্রহণকালে তিনি উহার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও অনেক বৎসর অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন, এবং উহার ফেলো ও সীণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন।

তিনি বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন, এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ও অন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠানে তাহার প্রতিনিধির কাজ করিয়াছিলেন। মদ্যপাননিবারণাদি সমাজহিতকর বহু কাজের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। নারীরক্ষাসমিতির তিনি অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। বাগ্মিতা ও নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য হেতু তাঁহার বক্তৃতাগুলি মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ হইত। তিনি মিষ্টপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং ছাত্রদের ও অন্য সকলের সহজে অধিগম্য ছিলেন।

—

সম্প্রদায় অনুসারে নিয়োগে সরকারী কলেজগুলির অবনতি

আমরা আশ্বিনের প্রবাসীতে ৯০৪ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, যে, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিতা হেতু শিক্ষা-বিভাগের স্কুল-পরিদর্শকদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক নিযুক্ত হওয়ায় এবং শিক্ষকদের নিয়োগেও সেইরূপ সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হেতু বঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলসমূহের অবনতি হইয়াছে। যোগ্যতা অনুসারে সম্প্রদায়নির্বিশেষে নিয়োগ হইলে এরূপ হইত না। সরকারী কলেজগুলির কথা আমরা তখন লিখি নাই। গত ৫ই সেপ্টেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুহৃদগোপাল দত্ত নামক এক জন পত্রপ্রেরক প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া অন্য সাতটি সরকারী কলেজের এই বৎসরের বি-এ ও বি-এস্‌সী অনার্সের ফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের অবনতি

হইয়াছে। তিনি বলেন, গত ৪।৫ বৎসর সরকারী কলেজগুলিতে নূতন যতগুলি শিক্ষাদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ 'ন্যূনতম যোগ্যতাবিশিষ্ট' ("possessed of minimum qualifications") হইলেও সাম্প্রদায়িক কারণে নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে নানা কারণে ভাল ছেলেরা ভর্তি হয়, এবং ইহার অধ্যাপক-সমষ্টি এখনও ভাল। এই জন্য ইহার অবনতি হয় নাই। অন্য সব সরকারী কলেজের সমষ্টির ফল তিনি এইরূপ দেখাইয়াছেন:—

বি-এ অনার্স—ইংরেজীতে মোট পাস ১১৩, সাতটি সরকারী কলেজ হইতে মোট পাস ৯। সংস্কৃতে সংস্কৃত কলেজ হইতে তিন জন প্রথম শ্রেণীতে; লেখক মনে করেন ইহা ভালই। আরবী-ফারসীতে ইসলামিয়া কলেজ হইতে ১ম শ্রেণীতে ৪ জন; ইহাও তাঁহার বিবেচনায় ঠিক্। কিন্তু তিনটি অন্য সরকারী কলেজ হইতে এই প্রাচীন ভাষাগুলিতে কেহ অনার্স পায় নাই। ইতিহাসে মোট ৪২ জন অনার্সপ্রাপ্তের মধ্যে ৬ জন সাতটি সরকারী কলেজের ছাত্র। অর্থনীতিতে দুটি কলেজ হইতে তিন জন অনার্স পাইয়াছে। দর্শনে মোট ৪৬ জনের মধ্যে ৫ জন সরকারী কলেজের। গণিতে কেবল ১টি কলেজ হইতে এক জন অনার্স পাইয়াছে।

বি-এসসী অনার্সে ৭টি কলেজের একটি ছাত্রও গণিতে অনার্স পায় নাই। পদার্থ-বিদ্যায় কেবল হুগলীর একটি এবং রসায়নী বিদ্যায় রাজশাহীর দুটি ছাত্র অনার্স পাইয়াছে।

বি-এতে মোট অনার্সপ্রাপ্ত ৩৭৪ জনের মধ্যে ৩৬ জন ৭টি সরকারী কলেজের; এবং বি-এসসীতে অনার্স প্রাপ্ত মোট ১২৪ জনের মধ্যে তিন জন মাত্র সাতটি সরকারী কলেজের।

লেখক সরকারী কলেজগুলির অনার্সপ্রাপ্ত ছাত্রদের সংখ্যার মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ ধরেন নাই, তাহা আগেই বলিয়াছি। তিনি সমষ্টিগত ভাবে সাতটি কলেজের সমালোচনা করিয়াছেন, প্রত্যেক কলেজই প্রত্যেক বিষয়ে খারাপ, এরূপ বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়।

লেবুগাছে আমের কলমের ভুল খবর

ভাদ্রের প্রবাসীতে লেবুগাছে আমের কলমের ফলের যে খবর দেওয়া হইয়াছিল তাহা ভুল। ফলটি আমাদের প্রদত্ত ছবির মতই হইয়াছিল বটে। কিন্তু আমাদের সংবাদদাতাকে এক ব্যক্তি অপ্রকৃত সংবাদ দিয়াছিল। সাধারণ রূপ হইতে ভিন্ন রূপের ফলফুল হইলে ইংরেজীতে তাহাকে স্পোর্ট (sport) বলে। উল্লিখিত ফলটি সেইরূপ স্পোর্ট।

—

বরপণ কন্যাপণ বন্ধ করিবার আইন

বিহারের মত বঙ্গেও বরপণ ও কন্যাপণ গ্রহণ বন্ধ করিবার আইন পাস করাইবার চেষ্টা হইতেছে। এই কুপ্রথা বন্ধ করিবার সকল রকম চেষ্টা করা নিশ্চয়ই উচিত। ফল অল্প হইলেও অল্প ফলই লাভ।

—

বাঙালী-বিহারী সমস্যা

প্রবাসীর এই সংখ্যা বাঙালী-বিহারী সমস্যা সম্বন্ধীয় কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্তের আগেই বাহির হইয়া যাইবে। এজন্য সে বিষয়ে ইহাতে নূতন কিছু লিখিতে পারিলাম না। কন্‌ফারেন্স বসিবার আগে কিছু লিখিতে চাই না। কেবল সাধারণ ভাবে একটা কথা বলি। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে। সকল প্রদেশেই ভাষা হিসাবে সংখ্যাল্প লোকসমষ্টি আছে। বিহারীরা যেন বাঙালীদের বিরুদ্ধে এমন কোন সিদ্ধান্ত না করেন যাহা অন্যান্য প্রদেশে ভাষাহিসাবে অন্যান্য সংখ্যাল্প লোকসমষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্যমান নাই। এই রকম সংখ্যাল্পদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিখিল-ভারতীয় হওয়া আবশ্যক। নতুবা শুধু বাঙালীবিতাড়নের অস্ত্র প্রস্তুত করিলে ভারতীয় মহাজাতি গঠন ত হইবেই না, অধিকন্তু এমন আগুন জ্বলিবে যাহা বিহারীরা নিবাইতে পারিবেন না এবং যাহা হইতে তাঁহারাও নিষ্কৃতি পাইবেন না। তাঁহারা এবং অন্য অ-বাঙালীরা কেহ কেহ যাহাই মনে করুন, সমগ্রভারতীয় মহাজাতি গঠনের আকাঙ্ক্ষা প্রথম যাহাদের মনে উদিত হইয়াছিল বাঙালীরা তাঁহাদের মধ্যে ছিল—হয়ত অগ্রণীই

ছিল। কিন্তু বিহারীরা একান্ত প্রাদেশিক হইলে অগত্যা বাঙালীদিগকেও প্রাদেশিক হইতে হইবে। তাহাতে বিহারীদের নিশ্চয় জিত হইবে বলা যায় না।

বিহারের বাঙালীদিগকে অসুবিধায় না ফেলিয়া বিহারের উন্নতির কাজে লাগাইতে পারিলে উভয় পক্ষের মঙ্গল।

—

ভারতের মর্য্যাদারক্ষক রামমোহন রায়

রামমোহন রায় যত ধর্ম্মের শাস্ত্র জানিতেন, নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান দিতেন। তাঁহার জানা সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে-সব ভ্রম আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন, তাহার নিরসনের চেষ্টাও করিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান মিশনরীরা ভারতীয় ধর্ম্মবিশ্বাস ও শাস্ত্রাদির নিন্দা করায় তাহার সমুচিত উত্তর দিয়া তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মের সারগ্রাহী হইলেও নিজে যে উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা ভারতীয়-শাস্ত্রানুসারী। তাঁহার রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি ভারতীয় ভিন্ন অন্য চিত্ত হইতে উদ্ভূত হইতে পারিত না।

তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের লোকদের নিজ উন্নতি করিবার সামর্থ্য অন্য যে-কোন সভ্যজাতির সমান ([they] "have the same capability of improvement as any other civilized people")। ভারতবর্ষের বা এশিয়া মহাদেশের অপমানকর কোন নিন্দা তিনি সহ্য করিতেন না। তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক উপলক্ষ্যে এক ইংরেজ "জনৈক খ্রীষ্টিয়ান" স্বাক্ষর করিয়া "এশিয়াবাসীদের মেয়েলি পৌরুষহীনতা" সম্বন্ধে বিদ্রূপ করেন। রামমোহন রায় এই উত্তর দেন যে, খ্রীষ্টিয়ানেরা যত ভগবদ্বাণী-প্রচারক ও কুলপতিকে ভক্তি করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই, এমন কি যীশুখ্রীষ্টও, এশিয়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এশিয়ার অপবাদ করিলে তাঁহাদেরই নিন্দা করা হয়। রামমোহনের ঠিক্ কথাগুলি এই :—

Before "A Christian" indulged in a tirade about persons being "degraded by *Asiatic* effeminacy" he should have recollected that almost all the ancient prophets and patriarchs venerated by Christians, nay even Jesus Christ himself, a Divine Incarnation and the *founder* of the Christian Faith, were ASIATICS, so that if a Christian thinks it degrading to be born or to reside in *Asia*, he directly reflects upon them.

ঐ ইংরেজ খ্রীষ্টিয়ান আরও বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয়েরা "বুদ্ধির আলোক"এর ("Ray of intelligence"এর) জন্য ইংরেজ জাতির নিকট ঋণী। তাহার উত্তরে রামমোহন রায় বলেন :—

If by the "Ray of Intelligence" for which the *Christian* says we are indebted to the English, he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also my gratitude; but with respect to *Science, Literature*, or *Religion*, I do not acknowledge that we are placed under any obligation, for by a reference to history it may be proved that the World was indebted to *our ancestors* for the first dawn of knowledge, which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguishes us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners.

তাৎপর্য্য। 'খ্রীষ্টিয়ান' যে বলিয়াছেন যে আমরা বুদ্ধির আলোকের জন্য ইংরেজ জাতির নিকট ঋণী, তাহার মানে যদি এই হয় যে তাঁহারা ভারতবর্ষে অনেক কেজো যান্ত্রিক কারিগরী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা হইলে আমি আমার স্বীকৃতি এবং আমার কৃতজ্ঞতাও ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু বিজ্ঞান, দর্শন বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের কাছে আমাদের অধমর্ণতা স্বীকার করি না। কারণ ইতিহাস দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, জ্ঞানের প্রথম উষার জন্য পৃথিবী আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট ঋণী। এই উষার আলোক প্রাচ্যে আবির্ভূত হয়। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর কৃপায় আমাদের নিজের এখনও এমন একটি সম্পৎশালিনী ভাষা আছে যাহা আমাদিগকে অন্য সেই সব জাতিসমূহ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে যাহারা বিদেশী ভাষা হইতে ঋণ না করিয়া বৈজ্ঞানিক দার্শনিকাদি ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করিতে পারে না।

এখানে মনে রাখিতে হইবে, রামমোহন রায় বিজ্ঞানের উদ্ভবের কথা বলিয়াছেন, পরবর্ত্তী উন্নতির নহে, এবং তাঁহার সময়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করে নাই। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহে

বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইয়াছে, রামমোহনের ঐ লেখাটির সময়ে তত হয় নাই। ইহাও ঐতিহাসিক সত্য যে, অনেক বিজ্ঞানের সূত্রপাত ভারতবর্ষে হয়।

রামমোহন রায়ের শেষ মন্তব্যটির অর্থ এই যে, ইংরেজ ও অন্ত কোন কোন পাশ্চাত্য জাতি পারিভাষিক শব্দ রচনার নিমিত্ত বিদেশী গ্রীক ও লাটিন ভাষার সাহায্য লইতে বাধ্য হয়; কিন্তু আমরা আমাদের নিজের সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই সমুদয় পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে পারি।

বড় একখানা বহি লিখিয়াও রামমোহন রায় সম্বন্ধে সব কথা বলা যায় না। ১০ই আশ্বিন ২৭শে. সেপ্টেম্বর নানা স্থানে তাঁহার স্মৃতিসভা হইবে বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সামান্ত কয়েকটি কথা লিখিলাম।

—

গান্ধী-জয়ন্তী

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে উৎসব হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার দীর্ঘতর জীবন কামনা করি। গান্ধী-পন্থী আমরা নহি, কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ আছে। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য, কর্ম্ম-পন্থা, ও জীবনকে আমরা শ্রদ্ধা করি। সত্যের অনুসরণ যে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও আবশ্বক, সে-বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। ভারতবর্ষের স্বরাজলাভ যে অহিংস উপায়ে করিতে হইবে সে-বিষয়েও আমরা একমত। জীবনে কোন কোন অবস্থায়—যেমন নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্ত আবশ্বক হইলে—বলপ্রয়োগ, এমন কি দুর্বৃত্তের প্রতি সাংঘাতিক বলপ্রয়োগও, আবশ্বক এবং ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য, আমাদের বিশ্বাস এইরূপ। মহাত্মা গান্ধীর এ-বিষয়ে মত কি জানি না। স্বাধীন জাতির স্বাধীনতারক্ষা এবং পরাধীন জাতির স্বাধীনতালাভ সকল ক্ষেত্রে ও অবস্থায় অহিংস উপায়েই হইতে পারে, এই কথা বলিবার মত জ্ঞান ও বিশ্বাস আমাদের নাই। এ-বিষয়ে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধ-বাদিতা করিবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই।

মহাত্মাজী কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রভুত্বপ্রিয়তা, মিথ্যা-চারিতা, দৈহিকবলাশ্রয়িতা প্রভৃতির বৃদ্ধির স্পষ্ট ও কঠোর প্রতিবাদ করিতেছেন। কংগ্রেস হইতে এইরূপ মনোভাব দূর না হইলে স্বরাজ লব্ধ হইবে না, কংগ্রেসও ধ্বংস পাইবে, এরূপ কথাও তিনি বলিতেছেন।

তিনি দেশীয় রাজ্যের রাজা ও প্রজা, ভারতের ধনিক ও শ্রমিক, ভূম্যধিকারী ও রায়ত—সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া স্বরাজ অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যেকটি উক্তি ও কাজ ঠিক হইয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা আছে। জোর করিয়া বা ন্তায্য ক্ষতিপূরণ না-দিয়া তিনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্তীর বিরোধী—সে সম্পত্তি জমীদারের হউক বা ধনিকের হউক।

সাহসী লোক, ত্যাগী লোক, কর্ম্মশক্তিমান্ লোক কংগ্রেসনেতাদের মধ্যে আরও আছেন, কিন্তু মহাত্মাজীর মত বিবেচনা, ধীরতা, প্রাজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, সত্যসন্ধতা ও অহিংসার একত্র সমাবেশ অন্ত কাহারও মধ্যে দেখিতেছি না। এই জন্ত আশঙ্কা হয়, মৃত্যু বা অসামর্থ্য-হেতু কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাঁহার তিরোভাব ঘটিলে কংগ্রেসে ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব এবং অরাজকতা ঘটিতে পারে।

মহাত্মা মধ্যস্থ ও চিকিৎসকরূপে দীর্ঘজীবী হউন।

গান্ধী-জয়ন্তী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে হইবে। খাদি প্রদর্শনী ও খাদি বিক্রী তাহার বাহ্য অঙ্গ হইবে, এবং তাহা সঙ্গত ও উচিত। কিন্তু গান্ধীজী হৃদয়মনের যে অবস্থাটি কংগ্রেসীদের মধ্যে দেখিতে চান, তাহা প্রদর্শনীর দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না। তাহা ব্যক্তিগত ভাবে স্বস্ব অন্তর পরীক্ষা দ্বারাই জানা যাইতে পারে। তাহা আছে কি নাই, বাহ্য আচরণে ধরা পড়ে। মহাত্মাজী আচরণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অনেকের নাই।

—

ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও হিন্দী

সমগ্র ভারতবর্ষে যদি একটি মাত্র ভাষা প্রচলিত থাকিত, কিংবা যদি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষা ব্যতীত এমন একটি ভাষা থাকিত যাহার মারফৎ সব অঞ্চলের লোকে মৌখিক ও লিখনপঠন দ্বারা ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান করিতে পারিত, তাহা হইলে ভাষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা তাহা যে ভাল ও সুবিধাজনক হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের সব মাতৃভাষাগুলির প্রাণবধ করিয়া একটি মাত্র ভাষা সর্ব্বত্র চালান অসম্ভব। এই জন্ত অন্ত মাতৃভাষাগুলি ঠিক রাখিয়া হিন্দী বা হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দুকে ভারতের সাধারণ ভাষা করিবার চেষ্টা কংগ্রেস করিতেছেন। সে-বিষয়ে আমাদের মত মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছি। পুনরুক্তি করিব না। হিন্দী সর্ব্বত্র চালাইবার চেষ্টায় তাহার বিরোধিতাও দেখা দিয়াছে এবং তাহা তামিল দেশে ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

আমরা বরাবর এই একটা মত পোষণ করিয়া আসিতেছি (এবং প্রকাশও করিয়াছি) যে, রাজনীতি-

ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান কাজ স্বরাজ-অর্জন। তাহার জন্য যথাসম্ভব ঐক্য ও একাগ্রতা আবশ্যক। যাহাতে অনর্থক সেই ঐক্যের ও একাগ্রতার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা করা অকর্ত্তব্য। অন্ধ্র, কর্ণাটক ও কেরলের প্রতিনিধিদের নিকট তাঁহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশ. দাবীর উত্তরে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটিও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দী চালান আমাদের মতে স্বরাজ-অর্জ্জনের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক নহে; অথচ তাহা চালাইবার চেষ্টায় খুব ঝগড়া-বিবাদ হইতেছে, অনেক লোককে সশ্রম কারাদণ্ড দিতে হইতেছে, এক সময়ে কংগ্রেসীরা ফৌজদারী যে আইনটার ঘোর বিরোধী ছিলেন তাহা প্রয়োগ করিতে হইতেছে। এই প্রকারে ঐক্য ও একাগ্রতার ব্যাঘাত জন্মিতেছে। এই জন্য আমরা বলিয়াছিলাম, স্বরাজ আগে অর্জ্জিত হউক তাহার পর সাধারণ ভাষা প্রচলনের চেষ্টা করিবার যথেষ্ট সময় থাকিবে। ইতিমধ্যে অবশ্য জবরদস্তী ব্যতিরেকে হিন্দী চালাইবার চেষ্টা চলিতে পারে—যেমন দক্ষিণ-ভারতে হিন্দী-প্রচার-সমিতি চালাইয়া আসিতেছেন, যাহার বিরুদ্ধতা আমরা কখনও করি নাই। ভারতভৃত্য সমিতির সভাপতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মাতৃভাষা হিন্দী। তিনিও মান্দ্রাজের স্কুলসমূহে হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক করিবার বিরোধী।

স্বরাজ-অর্জ্জনের জন্য যে হিন্দী একান্ত আবশ্যক নহে তাহার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বলিয়াছিলাম, কংগ্রেস সব কাজ ইংরেজীতে চালান, আন্দোলন চালান ইংরেজীতে—আগে ইংরেজীতে যাহা করেন পরে তাহার কিছু কিছু হিন্দী অনুবাদ হয় মাত্র; প্রধান অধিকাংশ খাজাতিক কাগজগুলি ইংরেজী; কোন কোন প্রদেশের প্রবলতম ও বহুল প্রচারিত কাগজ মাতৃভাষার বটে, কিন্তু বিহার আগ্রা-অযোধ্যা মহাকোশলে (যেখানকার মাতৃভাষা হিন্দী) তাহা নহে। আরও বলিতে পারা যায় যে, মহাত্মা গান্ধীর মত যে "হরিজন" কাগজের মারফৎ সমগ্র ভারতে প্রচারিত হয়, তাহা ইংরেজী কাগজ, হিন্দী নহে। আমাদের যুক্তির সমর্থক আর একটি দৃষ্টান্তের উদ্ভব সম্প্রতি হইয়াছে। তাহা এই।

অযোধ্যার প্রধান শহর লক্ষৌ হইতে সম্প্রতি কংগ্রেসী দলের একটি নূতন দৈনিক কাগজ বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার নাম ন্যাশন্যাল হেরাল্ড, "জাতীয় দূত"। ইংরেজী কাগজ। অন্য সকল প্রাদেশিক কাগজের মত ইহারও প্রচার প্রধানতঃ যুক্ত-প্রদেশে হইবে। যুক্তপ্রদেশ (আগ্রা-অযোধ্যা) একভাষিক প্রদেশ। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশাগত অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সকলেরই ভাষা এখানে হিন্দী (বা উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী)। সুতরাং অন্ততঃ এই কাগজটি হিন্দীতে হইলে বুঝিতাম, কংগ্রেসীদের মতে স্বরাজ লাভের জন্য হিন্দী একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাঁহারা কাগজটি ইংরেজীতে চালাইয়া আমাদের এই মতেরই সমর্থন করিতেছেন যে, স্বরাজ-লাভের জন্য হিন্দীভাষী প্রদেশেও হিন্দী একান্ত আবশ্যক নহে! অথচ তর্ক করিবার বেলা ইঁহারা আমাদের বিরুদ্ধতা করেন!!

এই কাগজটির প্রধান উদ্যোক্তা পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, প্রভৃতি, যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী এবং যাঁহারা সমগ্রভারতে হিন্দীর ব্যবহার চান।

—

গান্ধীজীর ভ্রান্ত উপমান-যুক্তি প্রয়োগ

মান্দ্রাজে যে হিন্দীকে অবশ্যশিক্ষণীয় করা হইয়াছে, তাহার সমর্থন প্রসঙ্গে মহাত্মাজী "হরিজন" কাগজে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডের স্কুলসমূহে লাটিন ভাষা অবশ্য-শিক্ষণীয়। এখনও তাহা অবশ্যশিক্ষণীয় কিনা জানি না। কিন্তু যদি তাহা হয়ও, তাহা হইলে ইংলণ্ডে লাটিনকে অবশ্যশিক্ষণীয় করার সহিত তেলুগু-তামিল-কন্নড-মলয়ালম-ভাষী মান্দ্রাজ প্রদেশে হিন্দীকে অবশ্যশিক্ষণীয় করার কোন সাদৃশ্য নাই। লাটিন একটি 'মৃত' ভাষা। উহা কোন দেশের বা ইংলণ্ডের কোন অংশের মাতৃভাষা নহে। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে যদি উহা অবশ্যশিক্ষণীয় হয়ও তাহা হইলে তাহা উহাকে তথাকার রাষ্ট্রভাষা করিবার নিমিত্ত নহে। তাহার কারণ অন্যবিধ। তাহার কারণ অনেক শতাব্দী হইতে লাটিন জানা ইংলণ্ডে শিক্ষিতদের ও সংস্কৃতিশালিতার একটা প্রমাণ ছিল, লাটিন খ্রীষ্টিয়ান পুরোহিতেরা ব্যবহার করিতেন (রোমান ক্যাথলিক পাদরীরা এখনও করেন), অনেক ইংরেজী শব্দ লাটিন হইতে উৎপন্ন এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নূতন ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ রচনার জন্য লাটিন ও গ্রীক ধাতু ব্যবহৃত হয়। মান্দ্রাজে হিন্দী প্রচলনের সপক্ষে এরূপ-কোন-প্রয়োজনগত যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না।

মান্দ্রাজ প্রদেশে হিন্দীর জ্ঞান শিক্ষিতদের ও সংস্কৃতিশালিতার প্রমাণ কখনও ছিল না; উহা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পৌরোহিত্যের ভাষা নহে, ছিল না; মান্দ্রাজের ভাষাগুলি হিন্দী হইতে বহু শব্দ গ্রহণ করে নাই, এবং পারিভাষিক শব্দ রচনায় জন্য তাহাদিগকে হিন্দীর সাহায্য লইতে হয় না, হইবে না।

—

সংস্কৃত শিক্ষার আবশ্যকতা

মহাত্মাজী যদি বলিতেন, ইংলণ্ডে বা ইউরোপের

অন্য কোন দেশে যেমন বিদ্যালয়ে লাটিন অবশ্যশিক্ষণীয়, ভারতবর্ষে সেই রূপ সংস্কৃত অবশ্যশিক্ষণীয় হওয়া উচিত, তাহা হইলে তাঁহার সাদৃশ্যাত্মক এই যুক্তি ঠিক হইত। কারণ সংস্কৃতের জ্ঞান একদা ভারতবর্ষে শিক্ষিতত্বের ও সংস্কৃতিবত্তার লক্ষণ ছিল—এখনও অনেক ক্ষেত্রে আছে; সংস্কৃত ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মের ও পৌরোহিত্যের ভাষা; ভারতবর্ষের (দক্ষিণ-ভারতবর্ষেরও) সাহিত্যশালী সমুদয় ভাষার বিস্তর শব্দ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সংস্কৃত হইতে গৃহীত; এবং নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে হইলে এই সকল ভাষাকে সংস্কৃতের সাহায্য লইতে হয়।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম মহিলা সভ্য শ্রীযুক্তা রাধাবাঈ সুব্বারায়েন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয়সমূহে সংস্কৃতের শিক্ষা আবশ্যিক করা উচিত। বস্তুতঃ, যে-সকল ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকগণের এ-বিষয়ে ধর্ম্মবিশ্বাসমূলক আপত্তি হইতে পারে, তাহাদিগকে বাদ দিয়া অপর সকলকে সংস্কৃত শিখাইবার ব্যবস্থা করিলে তাহাতে ভারতবর্ষের উপকারই হইবে।

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আবশ্যক অনুসারে হিন্দীতে অনেক সংস্কৃত শব্দ আমদানী করা উচিত। তাহা হইলে তাহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চালাইবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

—

ডাক্তার খারের ব্যাপার

মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খারেকে তাঁহার পদ হইতে অপসৃত করার পর এ-পর্য্যন্ত তিনি ও তাঁহার পক্ষাবলম্বীরা, কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী সব্-কমীটি ও ওআর্কিং কমীটির সভ্যেরা, ডাক্তার খারের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী অন্য লোকেরা, এবং সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা ও পত্রপ্রেরকেরা এ-বিষয়ে যত লেখালেখি ও বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা একত্র করিলে একখানা বড় বই হয়। সম্প্রতি অধ্যায়টা খতম করিবার নিমিত্ত কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক অতিদীর্ঘ বিবৃতি ও সমালোচনা দ্বারা ডাক্তার খারেকে দোষী প্রতিপন্ন ও নিরস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তার খারে তাহারও একটা জবাব দিয়াছেন! শুধু রাজনৈতিক মতভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হইলে ব্যাপারটা এত দূর গড়াইত না। ইহার মধ্যে মরাঠীভাষী ও হিন্দীভাষীর ঈর্ষ্যাদ্বেষও আছে।

ডাক্তার খারে সম্বন্ধে বিলাতী সচিত্র নিউস্ রিভিয়ু নামক কাগজে লিখিয়াছে যে,

"ডাক্তার খারে বার্ষিক কুড়ি হাজার টাকা আয়ের ডাক্তারী পসার ছাড়িয়া দিয়া, বার্ষিক ছয় হাজার টাকা এবং মধ্যে মধ্যে সর্দার পটেলের ধমকানী. এই বেতনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে একত্র কারাবাসী ছিলেন। যোদ্ধা-ব্রাহ্মণবংশীয় তিনি এই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ঘাঁটাইলে তিনি বিপজ্জনক মানুষ। তিনি ডাক্তারী করা ছাড়া 'তরুণ ভারত' নামক খুব বিদ্রোহিভাবাপন্ন স্বাজাতিক কাগজ চালাইতেন। তিনি দামী বিলাতী সিগারেটের 'বদ্ধ' ধূমপায়ী। মন্ত্রিত্বপদ হইতে অপসৃত হইয়া ডাক্তার খারে কংগ্রেসের বড় কর্ত্তাদেরকে ("High Command"কে) ফ্যাসিষ্ট মনোভাবাপন্ন বলিয়া অভিযোগ করেন।

—

নিউস্ রিভিয়ুর কৌতুকাবহ উক্তি

উল্লিখিত রিভিয়ুতে অনেক কৌতুকাবহ কথা আছে। যেমন—

"সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল আহমদাবাদ মিউনিসিপালিটীর সভাপতি নির্বাচিত হইবার পর একটা ঝাঁটা জোগাড় করিয়া আড়ম্বরের সহিত সব সরকারী পায়খানা ও রাস্তা ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেন। এখন তিনি সাতটা [কংগ্রেসী] প্রদেশে খুব কর্ম্মিষ্ঠতার সহিত শৈথিল্য উৎকোচগ্রহণ স্বজনপালন ও রাজনৈতিক ফেরেব্বাজী ঝাঁটাইয়া সাফ করিতেছেন। তাঁহার রাজনৈতিক অস্ত্রাগারে তিনি তিনটি অস্ত্র রাখেন—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, চুপচাপ চক্রান্ত ("quiet intrigue"), এবং দল বাঁধিবার বুদ্ধি। গান্ধীপন্থায় অটল বিশ্বাসী পটেল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার ওস্তাদের অনুসরণ করেন। একবার যখন গান্ধী তাঁহার গোঁফের সমালোচনা করেন, তখন তিনি উহা কামাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আবার গজাইয়াছেন।"

"৫২ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠার পর এখন কংগ্রেস শান্তিবাদী গান্ধী, জবাহরলাল নেহরু ও সমাজতন্ত্রী সুভাষ বসুর অধীনে ব্রিটেনকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্যক্ত করিতেছে।"

"কৃষ্ণকেশী [মহিলা] মন্ত্রী বিজয় [লক্ষ্মী] [পণ্ডিত] ফ্রান্সে বেড়াইবার মতলব করিয়াছেন। তিনি সঙ্গে চারিটা ধূসর রঙের প্যাটরা আনিয়াছেন। তাহাতে দু ডজন (২৪টা) রং-বেরঙের ভারতীয় শাড়ী, কয়েকটা সুতী কাপড়ের বডিস্ ও একটা ওভারকোট ঠাসা আছে।"

"ভারতবর্ষের মুসলমান-শিখেরা ('India's Moslem Sikhs') সৈন্যদলে অধিকাংশ দেশী রংরুট জোগায়, কম যুদ্ধপ্রিয় হিন্দু স্বাজাতিকদের সমষ্টি থেকে প্রতি বৎসর অল্পসংখ্যক সিপাহীই পাওয়া যায়।"

"শিখ-মুসলমান" আজব যৌগিক শব্দ।

—

দুর্গাপূজায় রাজনৈতিক দলাদলি

দুর্গাপূজা লইয়া সামাজিক দলাদলি আগে হইতেই প্রচলিত আছে। সুতরাং সর্ব্বগ্রাসী রাজনৈতিক দলাদলি

যে দুর্গাপূজাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যদি কালক্রমে,

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নাৎসীরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

চণ্ডীর এইরূপ পাঠান্তর আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহা "নূতন কিছু" হইবে বটে।

—

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যা

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যা ছাপা আজ ২রা আশ্বিন ১৯শে সেপ্টেম্বর শেষ করিতে হইবে। এই জন্য এমন অনেক ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা যাইবে না যাহা এখনও বিশেষ কোন পরিণতিতে পৌঁছে নাই।

—

চেকোস্লোভাকিয়ার জার্ম্যান সমস্যা

চেকোস্লোভাকিয়ার জার্ম্যান অধিবাসীরা তথাকার একটি সংখ্যা-লঘু লোকসমষ্টি। তাহাদের নানা দাবী লইয়া চেকোস্লোভাকিয়া-গবর্ন্মেণ্টের সহিত তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। তাহারা বিদ্রোহিতা দেখায়। গবর্ন্মেণ্ট কঠোর ভাবে বিদ্রোহিতা দমন করিতেছেন। হিটলার যেমন অষ্ট্রিয়া গ্রাস করিয়াছেন, তেমনই চেকোস্লোভাকিয়ার জার্ম্যান-অধ্যুষিত অংশও গ্রাস করিতে চান। তিনি বলিয়াছেন, চেক-গবর্ন্মেণ্ট চেকোস্লোভাকিয়ার যত জন জার্ম্যানকে কয়েদ করিবেন বা প্রাণদণ্ড দিবেন, তিনি জার্ম্যানী-নিবাসী তত জন চেককে ঐরূপ শাস্তি দিবেন। তিনি বলেন চেকোস্লোভাকিয়ার সকল জার্ম্যানের ভোট লইয়া তদনুসারে তাহাদের দাবীতে সম্মতি দিতে হইবে। চেক্-সরকার ইহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। মুসোলিনির দাবীও হিটলারের মত ছিল। যুদ্ধ বাধিলে মুসোলিনি জার্ম্যান পক্ষ অবলম্বন করিবেন। ফ্রান্স সম্ভবতঃ চেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে—রাশিয়াও সম্ভবতঃ তাহাই। ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সমস্যাটার সমাধান শান্তির পথে করিবার ও করাইবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজনও চলিতেছে। চেম্বারলেন চান—মুসোলিনিও বলিয়াছেন তাহাই, যুদ্ধ বাধিলে তাহা যেন চেকোস্লোভাকিয়াতেই আবদ্ধ থাকে।

পোল্যাণ্ড সময় বুঝিয়া দাবী করিতেছে, চেকোস্লোভাকিয়া-নিবাসী পোলদিগের দাবীও মঞ্জুর করিতে হইবে। অদ্য ২রা আশ্বিনের কাগজের খবর অনুসারে গতকল্য ১লা আশ্বিন পর্য্যন্ত অবস্থা মোটামুটি এইরূপ ছিল।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

জাপানীরা এখনও হাংকাও অধিকার করিতে পারে নাই।

জেনিভায় চীনের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি ডক্টর ওএলিংটন কূ লীগ অব নেশুন্স্ এ্যাসেম্ব্লীতে দাবী জানাইয়াছেন, যে, লীগের সদস্য কোন রাষ্ট্র যেন জাপানকে কাঁচা মাল সরবরাহ না করে ও টাকা ধার না দেয়, এবং যেন চীনকে আর্থিক সাহায্য করা হয়।

তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধে অলিপ্ত দশ লক্ষ লোক চীনে নিহত হইয়াছে এবং তিন কোটি লোক গৃহহীন ও নিঃসম্বল হইয়াছে। শুধু সাংঘাইতেই যত সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য পাঁচ শত কোটি ডলার—প্রায় পনর শত কোটি টাকা; এবং চীনের বাকী অংশের আর্থিক ক্ষতি গণনার অতীত। জাপানকে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার ও যথেচ্ছ বোমা নিক্ষেপ হইতে নিবৃত্ত করিবার ব্যবস্থার পূর্ব্বাহ্লিক কৃত্যস্বরূপ তিনি চীনের জন্য একটি অনুসন্ধান-কমিশন চাহিয়াছেন।

চীনের অবস্থা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়—উপলব্ধি করিতে পারিলে বাক্‌রোধ হয়।

—

প্যালেষ্টাইনের অবস্থা

প্যালেষ্টাইনের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। বরং অশান্তি ও রক্তারক্তি বাড়িয়াছে।

—

ফ্রান্সের উত্তর-আফ্রিকাবাসী আরব প্রজা

উত্তর-আফ্রিকায় মরক্কো ও টিউনিসে ফ্রান্সের যে-সব আরব প্রজা আছে, যুদ্ধ বাধিলে তাহারা ফ্রান্সের পক্ষে লড়িবে এইরূপ ঘোষণা করিয়াছে।

—

চলন্ত স্বদেশী দোকান

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমার্শ্যাল (বাণিজ্যিক) মিউজিয়ামের উদ্যোগে কলিকাতায় স্বদেশী জিনিষের একটি চলন্ত প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। ৭০খানি লরীতে নানা স্বদেশী জিনিষ সাজাইয়া তাহা বড় বড় রাস্তা দিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে, স্বদেশী জিনিষ যে কত রকম ও কেমন সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে, সে-বিষয়ে অনেকের চোখ ফুটিয়াছে। এইরূপ প্রদর্শনী আরও হওয়া উচিত—শুধু কলিকাতায় নহে, মফঃসলেও। কয়েক বৎসর হইতে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েও পূজার আগে দোকানের ট্রেন চালাইয়া ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সুবিধা করিয়া দিতেছেন।

—

আসামের নূতন মন্ত্রিমণ্ডল

আসামের পুরাতন মন্ত্রিমণ্ডল জনগণের আস্থা হারাইয়াছেন বুঝিয়া পদত্যাগ করায় নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইতেছে। ইহা কংগ্রেস-নীতি অনুসারে কাজ করিবে, কিন্তু অ-কংগ্রেসী সদস্যও ইহাতে থাকিবে। আজ ২রা আশ্বিন যাহা খবর পৌঁছিয়াছে, তাহাতে আট জন মন্ত্রীর মধ্যে তিন জন মুসলমান এখনও-মনোনীত হইতে বাকী আছেন। এমনও হইতে পারে, যে, বাকী এই তিন জনের মধ্যে মুসলমান হইবেন দু-জন এবং তৃতীয় ব্যক্তি হইবেন শিলচরের শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চন্দ। শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার দত্ত এডভোকেট-জেনের‍্যাল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত রূপ এমন একটা সাম্রাজ্যবাদ-পোষক চা'ল চালিয়াছেন যে, কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হইলেও চা'লটাকে মানিতে বাধ্য হইতেছেন। সব কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের গঠনে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ধর্ম্মঘট শেষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ধর্ম্মঘট শেষ হওয়ায় প্রীত হইয়াছি।

নারীশিক্ষা-সমিতির প্রচেষ্টা

সমবায় পদ্ধতি অনুসারে নারীদের দ্বারা নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতি ও তাহার বিক্রয়ের নারী-শিক্ষাসমিতির যেরূপ চেষ্টার বর্ণনা কাগজে পড়িলাম, তাহা দ্বারা নারী-সমাজের ও দেশের কল্যাণ হইবে।

পাটের অর্ডিন্যান্স

পাট সম্বন্ধে বঙ্গের মন্ত্রীরা যে অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন, তাহাতে বড় বড় পাটকলের মালিকদের সুবিধা হইবে, ছোট পাটকলগুলির সুবিধা হইবে না। অধিকাংশ পাটকলের মালিক ব্রিটিশ। ব্যবস্থাপক সভার ব্রিটিশ সদস্যদের সমর্থন মন্ত্রীরা এই অর্ডিন্যান্সের ফলে পাইতে থাকিবেন। অর্ডিন্যান্সের ফলে ছোট পাটকলগুলির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ইহার দ্বারা পাটচাষীদের সুবিধা হইবে না, বরং ক্ষতি হইতে পারে। পাটের সুবিবেচিত ন্যূনতম মূল্য আঁটিয়া দিলে তাহাদের সুবিধা হইত। কাঁচা পাটের ব্যবসায়ীদেরও সুবিধা হইবে না। পাটকলের সাপ্তাহিক কাজের সময় যেমন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সঙ্গে এইরূপ নিয়মও করা উচিত ছিল যে, শ্রমিকদের রোজগার কমিবে না। নতুবা আগেকার চেয়ে কম সময় কাজ করার জন্য তাহারা মজুরী কম পাইবে।

এরূপ একদেশদর্শী অর্ডিন্যান্স জারি করা অন্যায় হইয়াছে।

বঙ্গীয় কিশোর ছাত্র-দল

এ বৎসর নহে, আগেও আমরা শুনিয়াছিলাম যে, বাংলা দেশে কিশোর ছাত্র-দল গঠিত হইয়াছে। "শিশু-ভারতী" যখন আছে, তখন শিশু ছাত্র-দলও গঠিত হইয়া থাকিবে। এই উভয় দলের রাষ্ট্রনৈতিক প্রোগ্রাম আমরা এখনও পাই নাই।

ব্রহ্মদেশীয় দাঙ্গা

ব্রহ্মদেশীয় দাঙ্গায় বিস্তর লোক হত আহত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। সর্ব্বস্বান্ত বর্মারা কেহ হয় নাই, যাহারা হইয়াছে তাহারা সকলেই ভারতীয়। হত ও আহতদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই বেশী, এবং এই ভারতীয়দের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। তাহার কারণ, দাঙ্গা খুনাখুনি আরম্ভ হইবার উপলক্ষ্য এক জন মুসলমানকর্ত্তৃক লিখিত বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্মের নিন্দাপূর্ণ একখানা বহি। অনেকদিন হইতে নানা কারণে ভারতীয়দের সম্বন্ধে বর্মাদের বিরুদ্ধ ভাব আছে; বিশেষতঃ অদূরদর্শী বর্মাদের মধ্যে। সেই জন্য ঐ উপলক্ষ্যটাকে অবলম্বন করিয়া সম্প্রদায়নির্বিশেষে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রচার চলিয়া থাকিবে। তাহা হইলেও, হিন্দুদের বিরুদ্ধে কেবল অর্থনৈতিক ও সরকারী চাকরি ঘটিত কারণ থাকায়, কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কারণও থাকায় আক্রমণের ধাক্কাটা মুসলমানদিগকেই বেশী সহিতে হইয়াছে। তাহা হইলেও সব ধর্ম্মের ভারতীয়দেরই উদ্বেগ ও আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ জন্মিয়াছে।

ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাবের সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়াছে, এবং তাহার দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। আবার বন্যাগত দাঙ্গাহাঙ্গামার সুযোগে ভারতীয়-বিতাড়নও চলিতেছে। হত আহত ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয়দিগের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়া জীবিতদের নিরাপত্তার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগের ব্রহ্মদেশেই থাকিবার ব্যবস্থা করা বর্মা-গবর্মেণ্টের উচিত ছিল। কিন্তু নিঃসম্বল ভারতীয়দিগকে বর্মা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত অর্থসাহায্য করা হইতেছে, এবং একটা আইন হইয়াছে যাহার বলে পুলিস সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে এবং অ-বর্মা হইলে তাহাকে ব্রহ্মদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবে। এই প্রকারে ভারতীয়দের বহিষ্কার চলিতে পারিবে।

ভারতীয়েরা যে-দেশেই থাকুক, তাহাদের নিরাপত্তার জন্য ভারত-গবর্মেণ্টের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত-গবর্মেণ্ট বর্মা-গবর্মেণ্টকে মামুলি চিঠি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। নিহত আহত ক্ষতিগ্রস্ত বা সর্ব্বস্বান্ত লোকগুলি ইংরেজ হইলে কি করিতেন? অথবা ইহা জিজ্ঞাসা করাও ঠিক্ নয়। বর্মা-গবর্মেণ্টও ইংরেজেরই গবর্মেণ্ট। সুতরাং ইংরেজশাসনাধীন ব্রহ্মদেশে ইংরেজদের উপর ব্যাপক সাংঘাতিক অত্যাচার হইতে পারে না।

বিবাহ-সম্বন্ধীয় আইন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন করাইবার চেষ্টা হইতেছে। এরূপ চেষ্টা সমর্থনীয়।

হিন্দুদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি কারণে বিবাহবিচ্ছেদ হইতে পারিবে এরূপ আইন করাইবারও চেষ্টা হইতেছে। এরূপ আইনেরও আবশ্যক আছে। তবে কারণগুলি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, হিন্দুসমাজে কোথাও বিবাহবিচ্ছেদ-প্রথা নাই। তাহা ভুল। পশ্চিমে বহু হিন্দুজাতির মধ্যে এই প্রথা আছে। তাহারা হিন্দু নহে।

মুসলমান-বিবাহবিচ্ছেদ আইন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন মুসলমান সদস্য একটি বিল পেশ করিয়াছেন যাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, যে, কোন বিবাহিতা মুসলমান নারী মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও তাহার মুসলমান স্বামী তাহার স্বামী থাকিবে। বর্ত্তমানে কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া যদি অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার স্বামীও ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। ইহাতে এই সুবিধা আছে যে, কোন হিন্দু নারীকে জোর করিয়া বা ঠকাইয়া মুসলমান করিয়া মুসলমানের সহিত বিবাহ দিলে, সে আবার শুদ্ধি গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দু হইয়া মুসলমান স্বামীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। কিন্তু নূতন আইনটা হইলে এই ন্যায্য সুবিধাটা থাকিবে না।

প্রস্তাবিত আইনটাতে এরূপ ধারাও আছে যে, মুসলমান-বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমার বিচার কেবল মুসলমান বিচারকেরাই করিতে পারিবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলা ও মহকুমায় অন্ততঃ এক জন মুসলমান জজ রাখিতে হইবে। ইহাতে গবর্মেণ্টের ব্যয়বৃদ্ধি এবং মুসলমানদের চাকুরী ও আয় বৃদ্ধি হইবে; অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা চাহিবে; এবং এই বিশ্বাস উৎপন্ন ও বদ্ধমূল হইবে যে, এক সম্প্রদায়ের জজেরা অন্য সম্প্রদায়ের বাদী প্রতিবাদী আসামী ফরিয়াদীর মোকদ্দমার বিচার নিরপেক্ষতার সহিত করিতে পারে না।

এই বিল সম্বন্ধে সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় আইন-সচিবরূপে এবং ব্যক্তিগতভাবে অতি সমীচীন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পূজার ছুটি

শারদীয় পূজা উপলক্ষে প্রবাসী-কার্য্যালয় ১২ই আশ্বিন, ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠি-পত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিকের সাবধানতাসূচক বাক্য

পৃথিবীর যতগুলি দেশে এখনও সংবাদপত্রের ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আছে, ব্রিটেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। অথচ সেখানেও বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ জে এ স্পেণ্ডার সাংবাদিকদিগকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন যাহাতে এই স্বাধীনতার শত্রুরা তাহা নষ্ট করিবার কোন ছুতা না পায়। আমাদের দেশের সাংবাদিকেরা সবাই ইংরেজী জানেন। সেই জন্য, অনুবাদ না-করিয়া, তাঁহার কথাগুলি 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' হইতে নীচে তুলিয়া দিতেছি।

'These are times of very real peril for the freedom of the press,' declared Mr. J. A. Spender in an address on March 7 on 'The journalist and the public' to the Institute of Journalists in London. 'It is totally extinguished in one half of the world, and in the other half there are enough enemies of liberty who will gladly seize any handle that we may give them. I would appeal to those who may not have reflected on this matter to bear in mind that a very few false steps may seriously prejudice the liberties which are the common cause of the whole profession.

'On the question of manners it is useless for any of us to set up our own standards against the accepted code of good feeling and good taste. The accepted standards will prevail whatever we do. I do urge that we should do our utmost to uphold these standards and to protect our own members from any pressure that may be put upon them to depart from them.'

Referring to the Journalists (Registration) Bill, brought forward by the institute, Mr. Spender said that the House of Commons had been incensed by certain recent incidents and by the defiant claim of certain newspapers to do exactly what they chose. The press might think itself fortunate if some clever young M. P. did not draft a bill by which the House of Commons would impose its own discipline on the journalistic profession, and pass it through as a private member's bill.

'We think it to be the far better way,' Mr. Spender went on, 'that we should be given the means of setting our house in order than that public authorities should undertake that task for us. We do not trust officials, who may obtain power to correct our manners, not to use it to stop our voices.

'In this country the liberties of the press are never likely to be demolished by a frontal attack, but they may be undermined and grabbed away on the plausible excuse of stopping abuses which we ourselves are unable to defend. The French press in the last few months has been threatened with a measure making any writing which may damage the national credit or send capital abroad a penal offence. The necessity of such a measure may be argued in the most persuasive and plausible terms, yet there is hardly anything which, in the hands of an arbitrary executive, it could not be made to cover.'

—

সংবাদপত্রের ও রাজনৈতিক বক্তাদের 'কণ্ঠরোধ' চেষ্টা

অপ্রকাশিত কোন সরকারী দলিল সরকারী আদেশ বা অনুমতি ব্যতীত কেহ ছাপিয়া প্রকাশ করিলে বা তাহার উপর কোন মন্তব্য কেহ ছাপিয়া বাহির করিলে, কিংবা কেহ মৌখিক কিছু বলিয়া ঐরূপ প্রকাশের কার্য্য করিলে তাহার শাস্তির ব্যবস্থার জন্য একটা বিল সরকারী কলিকাতা গেজেটে বাহির হইয়াছে। প্রেস-রক্ষকেরও শাস্তি হইতে পারিবে। কারাদণ্ড ছাড়া প্রেসের জমানত বাজেয়াপ্ত এবং প্রেস পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে। দলিল প্রকাশ করায় সর্ব্বসাধারণের বা রাষ্ট্রের বাস্তবিক কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। সুতরাং মন্ত্রীরা বা অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারী যাহা কিছু যে-কোন কারণে গোপন রাখিতে চান, তাহা প্রকাশ করিলেই বিপদ!

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আসামের তদানীন্তন চীফ কমিশনার কটন সাহেব কঠোর মন্তব্য লেখেন। লর্ড কার্জন তাহা অপ্রকাশিত রাখিবার

হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাহা বেঙ্গলীতে ছাপিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা কাশ্মীর ও গিলগিট সম্বন্ধে এবং ভূপাল সম্বন্ধে কোন কোন সরকারী গোপনীয় জিনিস ছাপিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অনিষ্টকর লর্ড কার্জনের কোন কোন চেষ্টার স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধিতা করায় উক্ত বড়লাট বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে গ্লানিকর কথা একটা গোপনীয় মিনিটে লিখিয়াছিলেন। আমি তখন এলাহাবাদে কাজ করিতাম। পরলোকগত শ্রীযুক্ত কে জগদীশন্ আইয়ার মহাশয়ের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমি তাহা "সঞ্জীবনী"তে পাঠাই ও তাহা প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান বৎসরে দুইবার হক্-মন্ত্রিমণ্ডলের মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের খসড়া হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকা ছাপিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্‌স্টিটিউটে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সরকারী কোন কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

এই প্রকারে বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে এখন পর্য্যন্ত এই প্রকার যে বহু সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং উপকারই হইয়াছে। এখন যে-রকম আইন করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা প্রণীত হইলে তাহা অনিষ্টের কারণ হইবে। অতএব তাহার প্রবল বিরোধিতা আবশ্যক।

—

বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

ষ্টেট্‌সম্যানে একটা খবর বাহির হইয়াছিল যে, ভারত-গবর্মেণ্ট বাংলা-গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এরূপ কোন আইন করিতে পারেন না যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধিকার বা ক্ষমতায় হাত পড়ে, এবং ভারত-গবর্মেণ্ট স্বয়ং এখন এরূপ কোন আইন করিতে চান না যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ঐরূপ কোন হস্তক্ষেপ হয়। বঙ্গের মন্ত্রীদের অধীন ডিরেক্টর অব্ পব্লিক ইনফর্মেশ্যন অর্থাৎ সরকারী খবর জোগাইবার কর্ত্তা একটু ভিন্ন রকমের খবর দিয়াছেন। তিনি বলেন, বাংলা-গবর্মেণ্ট ভারত-গবর্মেণ্টকে বঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং ভারত-গবর্মেণ্ট সেই অনুরোধ বিবেচনা করিতেছেন।

ঐ কর্ত্তা আরও বলিতেছেন, বঙ্গের মন্ত্রীরা তাঁহাদের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাস করাইবার অভিপ্রায় ত্যাগ করেন নাই; তাঁহারা ভাবিতেছেন কেমন করিয়া আইন-গত বাধা অতিক্রম করা যায়। সেই বাধাটা এই যে, দুইটা প্রদেশসংক্রান্ত কোন বিষয়ে আইন একটা কোন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় হইতে পারে না, এবং বাংলা ও আসাম দুটা প্রদেশের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক আছে।

—

প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়েদের বাংলা শিক্ষা

বঙ্গের বাহিরে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে বাঙালী ছেলেমেয়েদের বাংলা শিক্ষায় বাধা সৃষ্ট হওয়ায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাহাদের জন্য বাংলায় ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

ইহা উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু তাঁহাদের নূতন করিয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করা অনাবশ্যক। শান্তিনিকেতনস্থিত লোকশিক্ষা-সংসদ যে কয়টি পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কেন্দ্র সর্ব্বত্র হইতে পারে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি কানপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় লোকশিক্ষা-সংসদের কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শান্তি-নিকেতনে চিঠি লিখিলেই সব বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি কানপুর ঠিকানায় ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনকে লোকশিক্ষা-সংসদের পুস্তিকা ও নিয়মাবলী পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। উভয়ের মধ্যে শীঘ্র পত্রব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

—

দেশ-বিদেশের কথা

লণ্ডনে ডক্টর শশধর সিংহের বইয়ের দোকান

ডক্টর শশধর সিংহ লণ্ডনে যে-বইয়ের দোকান খুলেছেন সাহিত্যসেবী প্রবাসী ভারতীয়ের পক্ষে তা একটি তীর্থবিশেষ। আধুনিকতম বইয়ের সংগ্রহ একত্র দেখতে পাওয়া এবং সুলভে কেনবার সুযোগ সহজে ঘটে না; যে কোনো নূতন পুরোনো বই বলামাত্র আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে; যতক্ষণ বই আসছে বসবার জায়গা এমন কি চায়ের আয়োজনটাও বাদ নেই। ইউরোপে আর কোথাও ভারতীয়ের এ রকম নিজস্ব একটি জায়গা আছে দেখি নি; শুধু বইয়ের সন্ধান নয়, ভারতীয়কে নানাভাবে আনুকূল্য দানের জন্যে লণ্ডনে ঐ আত্মীয়তার কেন্দ্রটি খোলা রয়েছে। বিদেশে কঠিন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কেন্দ্রটিকে গড়ে তুলেছেন এবং আমাদের

আরও একটি দিক আছে। বিদেশীয়কে ভারতীয় উৎকর্ষের সঙ্গে পরিচিত করবার বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে শশধরবাবু আমাদের দেশের কি পরিমাণ মঙ্গলসাধন করেছেন অল্প কথায় বোঝানো সম্ভব নয়। বিদেশে ভারতীয় সভ্যতার সর্ব্ববিধ নিদর্শনকে চাপা দেবার ব্যবস্থা পাকা হয়েছে; ইউরোপীয় জনসাধারণের পক্ষে আমাদের সৃজনধর্ম্মী সভ্যতার রূপ দেখতে পাওয়া অসাধ্য বললেই চলে। এই দোকানটিতে ভারতীয় বই সম্মানের আসন পেয়েছে; আমাদের শিল্প সাহিত্য ধর্ম্ম রাষ্ট্র সম্বন্ধে বহু বিচিত্র পরিচয় লাভ করবার এমন কেন্দ্র অন্যত্র নেই। ভারতীয় সৌজন্য, এমন কি আতিথ্য লাভ ক'রে বিদেশীরা ঐ নীড় থেকে ফেরেন। আমার বিশ্বাস বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয়েরাও ওখানে গিয়ে স্বদেশের একটি বৃহত্তর ঐক্যের সন্ধান পান।



লণ্ডনে ১৬ নং লিট্‌ল্ রাসেল ষ্ট্রীটে ডক্টর শশধর সিংহের বইয়ের দোকান।
(১) ডক্টর শশধর সিংহ (২) শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সকলের হয়ে সাহচর্য্যের বিধান করেছেন। বই নির্ব্বাচন, পাঠের প্রণালী এবং থীসিস্-রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর সহায়তা লাভ করা ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে কম সৌভাগ্য নয়; তাহা ছাড়া, ঠিক মত বাড়ীঘরের বার্ত্তা, ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণের উপযোগী সংবাদ দাবি ক'রে ওখানে ছাত্র অ-ছাত্রদের আসতে দেখেছি। লণ্ডনে উপনীত ভারতীয়কে একবার ব্রিটিশ ম্যুজিয়মের পার্শ্ববর্ত্তী ঐ দোকানটিতে আসতেই হয়; খ্যাতনামা অধ্যাপক, মাতব্বর ব্যবসায়িক, জননেতা অনেকেরই মিলন ঘটেছে ঐ বইয়ের দপ্তরে।

দোকানটিকে বাঁচিয়ে রাখা, বাড়িয়ে-তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের উপর। তার একটি প্রকৃষ্ট উপায় ইউরোপীয় বই ওখান হ'তে আনানো। এখানে ছাপা ভালো বই ওখানে বিক্রির জন্যে নিয়মিত পাঠানো আবশ্যক। বৈষয়িক প্রসঙ্গের অবতারণা করা আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু স্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবসায়িক তত্ত্বকে স্বীকার করে নিলে আদর্শের কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণতা ঘটে বিশ্বাস করি না। বাঙালীর পক্ষে বিশেষভাবে জানা দরকার হয়েছে যে তাতে আদর্শের ভিত্তি পাকা হয়। শশধরবাবু এই প্রমাণ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর বইয়ের আসরটিকে স্মরণ করছি।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী



লিথুয়ানিয়ার প্রধান নগর কউনাস বা কোভ্‌নো

এস্‌টোনিয়ার কথা

বিগত মহাযুদ্ধের পরে বল্‌টিক্‌ সাগরের তীরে রাশিয়া ও পোলাণ্ডের মধ্যে তিনটি নূতন স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে—লিথুয়ানিয়া এস্‌টোনিয়া ও লেত্তনিয়া। এই তিনটি দেশেরই ইতিহাস করুণ স্মৃতিতে ভরা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই বল্‌টিক্‌ জনপদে চলিয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় শক্তির চিরন্তন কলহ। বল্‌টিকের উর্ব্বর জনপদে শ্লাভ্‌ ও টিউটনিক, সুইডিশ ও রাশিয়ান, জার্ম্মান ও ফিন্নিশ, অনন্তকাল ধরিয়া নিজেদের জাতীয় ও আর্থিক আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কখনও জার্ম্মানীর কখনও রাশিয়ার অন্তর্গত, কখনও শ্লাভিক কখনও টিউটনিক সংস্কৃতির প্রভাবাপন্ন হইয়া এই জনপদের প্রজাদের জাতীয় জীবন অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। তাই বল্‌টিক্‌ জনপদের ভাষায়, লোক-সংস্কারে, ধর্ম্মাচারে, স্থাপত্যে এবং শিল্পে আজ দেখিতে পাওয়া যায় এই বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় শক্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। এক কালে এই অঞ্চলের যে বাণিজ্য-প্রাধান্য ছিল আজ তাহা নাই, কিন্তু রাজনৈতিক দাসত্ব সত্ত্বেও নিজেদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাখিতে পারিয়াছে, বর্ত্তমানে স্বাধীন বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির ইহাই গৌরবের কথা।

বর্ত্তমান স্বাধীন এস্‌টোনিয়ার রাজধানী তাল্লিন্‌ (Tallinn)। এস্‌টোনিয়ার ভাষায় এই শব্দটির অর্থ "ডেনিশদের শহর"। এই নাম হইতেই বোঝা যাইবে যে এই শহরটি স্থাপন করিয়াছি[ল] ডেনমার্কের ঐশ্বর্য্য-সন্ধানী বণিক-সম্প্রদায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রীগার প্রধান পুরোহিত এলবার্ট ডেনিশদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন তখনকার অশান্ত সমাজকে শাসন করিবার জন্য। অতঃপর কিছু কাল জার্ম্মান-আধিপত্যের পরে তাল্লিন্‌ ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হান্‌সা লীগের অন্তর্গত হয়। হান্‌সা লীগ দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া সমস্ত ইউরোপীয় বাণিজ্যের যে উন্নতি সাধন করিয়াছিল, ল্যুবেক ও হামবুর্গ শহরে ছিল যাহার কেন্দ্র, তাহা বল্‌টিকের বিভিন্ন বন্দরে আনিয়া দিয়াছিল একটি নূতন ঐশ্বর্য্যের চাঞ্চল্য। হান্‌সা লীগের অন্তর্গত হওয়ার পর হইতে তাল্লিন্‌ ক্রমশঃ একটি ধন[ী] সমৃদ্ধিশালী শহরে পরিণত হইতে থাকে। ইহার রাস্তাঘাটে, শিল্পে-স্থাপত্যে ভেষ্টফালিয়ার প্রবাসী প্রভুদের প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। সেই জন্য তাল্লিন্‌ আর হান্‌সা লীগের অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী বন্দরগুলির মধ্যে এত সাদৃশ্য আজও দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ এই শহরটির প্রধান প্রধান অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতির এবং বিভিন্ন রুচির পরিচয় স্পষ্ট। ইহার গীর্জ্জা, রাজপ্রাসাদ,



লিথুয়ানিয়া। কৃষকের কুটীর এবং সম্মুখে পূজার ক্রুশ



লিথুয়ানিয়া। গ্রামের য়িহুদী ভজনালয়

বন্দর ইত্যাদির মধ্যে কোথাও রুচির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয় যায় না। তাল্লিনের মার্কেট স্কোয়ারে টাউন হলটি এখনও গত যুদ্ধের ধ্বংসলীলার স্মৃতি ধারণ করিয়া আছে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাল্লিন্ রুশ আধিপত্যের অন্তর্গত হয় এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পিটার্সবার্গের সঙ্গে রেলওয়ে দ্বারা যুক্ত হয়। প্রায় দেড় শত শতাব্দী ধরিয়া সুইডিশ শাসনে তাল্লিনের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল রুশ শাসনে আসিয়া সেই উন্নতি বজায় থাকে; কারণ ক্রমশঃ তাল্লিন্ রাশিয়ার প্রধান বল্‌টিক্ বন্দরে পরিণত হয়। তাল্লি আমেরিকা হইতে রাশিয়ায় তুলা আমদানির প্রধান কেন্দ্রে পরিণ হয় এবং রাশিয়ার বিশিষ্ট কয়েকটি রপ্তানিও তাল্লিনের পথে বিদেশ যাত্রা করিতে আরম্ভ করে। যুদ্ধের পরে এস্‌টোনিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র এ বন্দরটির নানাপ্রকার সংস্কার সাধিত করিয়া ইহার পুন

আনয়ন করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে এস্‌টোনিয়ার সমগ্র বহির্বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশ এই বন্দরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। এই শহরের পুরাতন নাম ছিল রেভাল্ (Reval), ডেনিশদের দেওয়া ছিল এই নাম।

এস্‌টোনিয়ার অন্যতম প্রধান শহর নার্ভা (Narva)। রাশিয়া ও এস্‌টোনিয়ার উত্তর-সীমান্তে এই ঐতিহাসিক শহরটি। নার্ভা শুধু দুইটি দেশের সীমান্তেই নয়, দুইটি জাতি দুইটি সভ্যতার সীমান্তে—এক দিকে শ্লাভ এর অন্য দিকে জার্ম্মান সংস্কৃতি-প্রভাবাপন্ন ফিন্নিশ এই দুইটি বিপরীতমুখী সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে এই শহরটির ইতিহাস বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। রাশিয়ার প্রান্তদেশে এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা এবং শিল্পোন্নতির পরিমাণ এস্‌টোনিয়ার পশ্চিম-জনপদগুলি হইতে কম। কিন্তু এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং আর্থিক সম্পদ এস্‌টোনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রকৃষ্ট। এস্‌টোনিয়ার মৃত্যুর হার জন্মের হার হইতে বেশী, এবং ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জন্মের হার এই দেশে। এস্‌টোনিয়ার জার্ম্মান-প্রীতি এবং প্রতিবেশী শ্লাভ জাতিদের সংখ্যাবৃদ্ধি, ইহাই বর্ত্তমান এস্‌টোনিয়ার প্রধান সমস্যা।

বিগত যুদ্ধের পর নার্ভায় এস্‌টোনিয়ানদের আর বলশেভিকদের লড়াই হইয়াছিল। সেই ধ্বংসলীলার আঘাত হইতে নার্ভা এখনও সম্পূর্ণরূপে তাহার পুরাতন সমৃদ্ধিতে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই। বলশেভিকরা নার্ভার রেলওয়ে ষ্টেশনটি পোড়াইয়া দিয়াছিল।

আধুনিক এস্‌টোনিয়ার বাণিজ্য এবং শিল্প সম্পদের কেন্দ্র যেমন তাল্লিন্, শিক্ষা এবং জাতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র তেমন তার্তু (Tartu) এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে সুইডিশ অধিবাসীদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন নাম ছিল 'গুস্তাভিয়ান্ একাদেমী।' গুস্তাভ ভাসা ছিলেন সুইডেনের প্রথম রাজা ও আধুনিক সুইডিস জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়া ধর্ম্মযুদ্ধগুলির প্রভাব বিশেষভাবে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৮৫০ হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ এই ত্রিশ বৎসর কালই তার্তু বিশ্ববিদ্যালয়টির স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে কারণ ঐ সময়ে রাশিয়ান রুবলের আকর্ষণে বিশিষ্ট জার্ম্মান অধ্যাপকরা এখানে অধ্যাপনার কাজ করিতেন এবং জার্ম্মান ভাষায় শিক্ষা-বিস্তারের প্রচলন ছিল। এতদ্ব্যতীত, তখন কউনাস্ (Kaunas) কিংবা রীগাতে কোন বিশ্ব-


মহালক্ষ্মী
কটন মিলে
তৈরী
আমাদের বাড়ীতেও এবার
"মহালক্ষ্মীর"
কাপড় কেনা হচ্ছে !



টাইবেরিয়াড হ্রদের কূলে (বাইবেল)

লুই রোজার অঙ্কিত



স্পেনে যুদ্ধের দৃশ্য

ত্রোসাইরা অঙ্কিত



মাতা
পল সায়াভেল অঙ্কিত



মার্গারেট
এলিজাবেথ কেলি অঙ্কিত



এস্‌টোনিয়া। নারভার প্রধান গির্জ্জা। পিছনে ইভানগরড ও হেরমান দুর্গ। দূরে রুশ সীমান্ত।

বিদ্যালয় ছিল না। সমগ্র বল্‌টিক্‌ জনপদে উচ্চশিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র ছিল তার্তু। এস্‌টোনিয়ার স্বাধীনতা লাভের পরে তার্তুর বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠিত হয় এবং অধুনা প্রায় তিন হাজার ছাত্র এখানে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে। এখন আর জার্ম্মান ভাষার প্রচলন এখানে নাই, এস্‌টোনিয়ার নিজস্ব ভাষায় সকল প্রকার শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এস্‌টোনিয়ার পণ্ডিত এবং স্বদেশপ্রেমিক কর্ম্মিগণ যে ভাবে সমস্ত বিষয়ের পাঠ্য-পুস্তক নিজস্ব ভাষায় সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা বস্তুতই প্রশংসার বিষয়।

বল্‌টিকের তীরে এই নূতন তিনটি স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে এস্‌টোনিয়ার শিল্প-বাণিজ্য এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। লিথুয়ানিয়ার রাজধানী কউনাস্‌ অত্যন্ত আধুনিক শহর পুরাতন রাজধানী ভিল্‌না এখন পোল্যাণ্ডের অধীনে। লেত্তনিয়ার প্রধান শহর রীগা বল্‌টিকের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শহর কিন্তু ইহার সমকক্ষ কিংবা কাছাকাছিও অন্য কোন শহর লেওনিয়াতে নাই। কিন্তু এসটোনিয়ার তাল্লিন ও নার্ভা, তার্তু ও ভালগা বিভিন্ন সংস্কার ও বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

পরলোকে কৃতী প্রবাসী বাঙালী

লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল পি. এন. বসু বঙ্গের বাহিরে বহু স্থানে সম্মান ও কৃতিত্বের সহিত সিভিল সার্জ্জনের কাজ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভিয়েনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ভাগলপুর-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সুরেশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সমবায় কার্য্যে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং ঐ বিষয়ে অনেক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করায় তিনি সরকার কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। তিনি এক জন উৎসাহী শিকারীও ছিলেন।

যক্ষ্মারোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

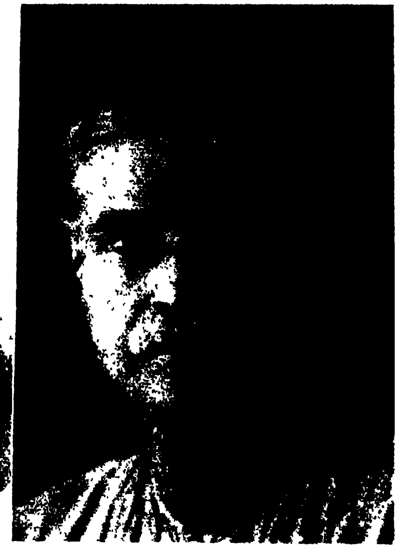
যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ, দিল্লীর ডাঃ শৈলেন্দ্রকুমার সেন সম্প্রতি ওয়েল্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের টি. ডি. ডি. উপাধি লাভ করিয়াছেন। সুইটজারল্যাণ্ড ও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আরোগ্যশালার কর্ম্মপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৯৩৩ সালে দিল্লীতে রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।



ডাঃ শৈলেন্দ্রকুমার সেন



পি. এন. বসু



সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্যারিস সালঁ চিত্র-প্রদর্শনী

পাশ্চাত্য জগতের ললিত-কলার, বিশেষতঃ চিত্রকলার, প্রগতির এক প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় প্যারিসের সালঁ চিত্র-প্রদর্শনীতে। লণ্ডনের রয়াল একাডেমীও চিত্র-জগতের এক অতি প্রধান বার্ষিক যোগ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ



সিংহলে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও তাঁহার সিংহলী ছাত্রীদের নৃত্যাভিনয়

টিন ও অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রকৃতির প্রভেদ। লাটিন জাতি ভাবতই ভাবপ্রবণ, নূতনের অনুরক্ত এবং নব-পন্থান্বেষী। াংলো-স্যাক্সনের স্বভাবে ঘষামাজা পালিশ করা এবং প্রাচীনের া করাই সহজে আসে। ফ্রান্স নূতনকে গালাগালি দেয় চ্চস্বরে, পরে হয়ত গ্রহণ করে- ইংলণ্ড নূতনকে যেন দেখিতেই ায় না, কেবল আড়চোখে দেখে অন্যের নিকট নূতনের কিরূপ ভার্থনা হইতেছে এবং অন্যে তাহাকে গ্রহণ করিল কি না!

সালঁতে নূতন-পুরাতন তরুণ-প্রাচীন সকলেরই স্থান আছে। খানে ছবি দেখাতেও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন, নহিলে চোখের খা ও মনের ধাঁধাই সার হয়। এবারের প্রদর্শনীও ন্যান্য বারের মতই মিশ্র ব্যাপার হইয়াছে তবে রূপদক্ষদিগের তে মোটের উপর এবার রচনাবৈচিত্র্য বা কলাকৌশল প্রদর্শনের য়ে চিত্রে রস-ভাবের প্রকাশের চেষ্টাই বেশী এমন কি প্রতিকৃতি-লিতেও চিত্র-রচনা বা চেহারার সাদৃশ্য রক্ষার চেয়ে মনোভাবের কাশের চেষ্টা যেন অধিক।

প্রাচীন জাপানের চিত্র

আজ জাপান প্রবলপরাক্রান্ত। এখনও পৃথিবীতে অনেক াক জীবিত আছেন যাঁহাদের শৈশব কালে জাপানের অবস্থা র্তমান তিব্বতের সমানই ছিল। ১৮৫৪ খ্রীঃ পূর্ব্বে জাপানী বন্দরে দেশী জাহাজ ঢুকিতে পাইত না। ঐ সালে আমেরিকান ী-বহর-নায়ক কমডোর পেরি কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া জাপানে পস্থিত হন। ফলে জাপানে বিদেশী জাহাজ আসিবার অধিকার ায়। কমডোর পেরির এক জাহাজে ভিলহেল্‌ম হাইনে নামক এক চিত্রকর সাধারণ নাবিক মেট হিসাবে ছিলেন। তাঁহার দুইখানি ছবি ১৩৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। কমডোর পেরি দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার পরও বহুকাল বিদেশীদের সঙ্গে জাপান-প্রবেশের অধিকার লইয়া অনেক গোলমাল হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ও ফরাসী নৌ-সেনা য়োকোহামায় সশস্ত্র প্রবেশ করে এবং ফরাসী মানোয়ারী জাহাজ গোলা চালায়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শোগনদিগের পদচ্যুতি ও মিকাডোর সিংহাসন গ্রহণের পর আধুনিক জগতের সঙ্গে জাপানের প্রকৃত আদান-প্রদান আরম্ভ হয়।

সিংহলে বাঙালী নৃত্যশিল্পী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সিংহল-পরিভ্রমণের পর শান্তিনিকেতনের আদর্শ-অনুসারে সিংহলে একাধিক জাতীয়ভাবানুসারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হোরানার "শ্রীপল্লী" তাহার মধ্যে প্রধান। রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের নামকরণ ও ভিত্তিস্থাপন করেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত- ও নৃত্য- শিক্ষক শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রতি বৎসর নৃত্য ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য এই বিদ্যালয়ে আহূত হইয়া থাকেন। এই বৎসরে তিনি স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের সহযোগে, বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি নৃত্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অভিনয়টি স্থানীয় সিংহলীদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

মফস্বলে চিত্র-প্রদর্শনী

আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে শিল্পানুরাগ ও শিল্পরসবোধ যে এত ক্ষীণ, তাহার অন্যতম কারণ এই যে শিল্পকলার প্রদর্শনী প্রচার ইত্যাদি প্রধান নগরগুলিতেই সীমাবদ্ধ। মূল

চিত্র ও শিল্প-নিদর্শনাদির সহিত সর্ব্বসাধারণের পরিচয় সাধনের জন্য দেশে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। এইরূপ পরিচয় সাধনের একটি ব্যবস্থা হইতে পারে চিত্রশালা প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা। বিদেশে বহু নগরে স্থানীয় চিত্রশালা আছে। পত্রিকাদিতে প্রকাশিত চিত্রের প্রতিলিপি ও প্রবন্ধাদির দ্বারা এই কাজ কিছু কিছু হইয়া থাকে। আর একটি উপায়, চলন্ত চিত্র-প্রদর্শনী ও তৎসহ শিল্প সম্বন্ধে লোকরঞ্জক বক্তৃতাদি। বঙ্গে মফস্বলে কখনও কখনও যে সব শিল্প-বাণিজ্য প্রদর্শনী হয় তাহার সহিত চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও অনেক সময় হইয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই চিত্রগুলি সুনির্ব্বাচিত হয় না এবং তদ্দ্বারা শিল্প-জ্ঞানের কোন প্রচার হয় না।

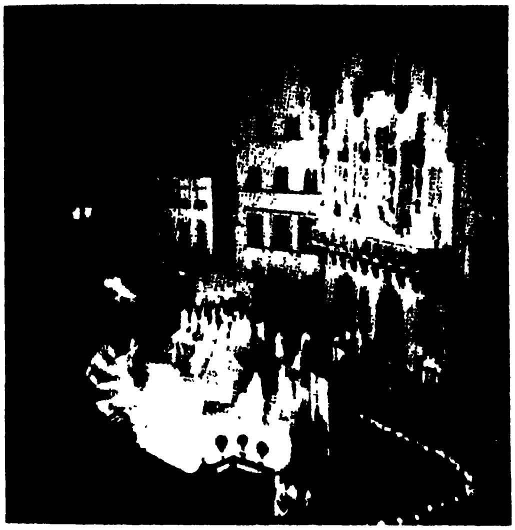
শিল্পী সুধীররঞ্জন খাস্তগীর সম্প্রতি শ্রীহট্টে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। এই সময়ে শিল্পরসজ্ঞ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতারও আয়োজন হইয়াছিল। খাস্তগীর মহাশয়ের চিত্রগুলি স্থানীয় সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; প্রত্যহ বহু লোক প্রদর্শনীতে আসিয়া অভিনিবেশ সহকারে ছবিগুলি দেখিয়াছেন। শ্রীহট্টের প্রদর্শনীর ঠিক পূর্ব্বেই খাস্তগীর মহাশয় শিলং শহরে শ্রীহিতেন্দ্রনাথ নন্দীর ভবনে একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। খাস্তগীর মহাশয়ের উদ্যোগে ও শিলংবাসী শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্রদের সহযোগে শিলঙে বর্ষামঙ্গল উৎসবেরও আয়োজন হইয়াছিল।



শ্রীরমা বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এড. (লীড্‌স্)

জার্ম্মেনীর উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চ

জার্ম্মেনীর উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের খ্যাতি জগদ্ব্যাপী। অতি প্রাচীন কাল হইতে জার্ম্মেনীতে এই রঙ্গমঞ্চের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন যুগের জার্ম্মানরা উৎসব উপলক্ষে খোলা রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় করিয়া নিজেদের চিত্ত-বিনোদন করিত। মধ্যযুগেও হাটে বাজারে অথবা মল্লভূমিতে জনতার সম্মুখে পৌরাণিক নাটকাভিনয়ের রীতি প্রচলিত ছিল। তার পর ইউরোপীয় সভ্যতায় আসিল বারোক ও রোকোকো



গোটের জন্মস্থানে মুক্ত রঙ্গমঞ্চে "ফাউষ্ট" অভিনয়

যুগ। তখন পৌরাণিক নাটকের স্থান অধিকার করিল পল্লী-নাট্য। লোকের রুচিও তখন প্রাকৃতিক আরণ্য-শোভার পরিবর্ত্তে উদ্যানের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও শ্যামলতার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে এই কৃত্রিমতা-প্রীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও লোকের মনে আবার স্বাভাবিকতার প্রতি ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠে। বর্ত্তমান জার্ম্মেনীর নবজীবনের ধারা তাই মুক্ত রঙ্গমঞ্চের মৃতপ্রায় ধারাকে পুনরায় জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

স্থানের উন্মুক্ততা, প্রকৃতির উন্মুক্ততা মনের উন্মুক্ততা—এই তিনটিই খোলা রঙ্গমঞ্চগুলির প্রাণ। এই তিনটি বস্তুর সাহায্যে দর্শকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তাহার মনে মাতঃ বসুন্ধরার প্রতি আকর্ষণ জাগাইয়া তোলাই এইরূপ রঙ্গমঞ্চের উদ্দেশ্য। সেজন্য প্রকৃতির সান্নিধ্যে কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে, সুবৃহৎ প্রাসাদোপম অট্টালিকার অঙ্গনে অথবা মনোরম বনানী-দৃশ্যের মাঝখানে এই রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করা হয়।

জার্ম্মেনীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈচিত্র্য ও সে-দেশের নাট্য-শিল্পের উৎকর্ষ—নিদাঘের পল্লীদৃশ্য, ঊষা ও সন্ধ্যার রঙীন শোভাযাত্রা, জাতীয় রীতিনীতি ও সুপ্রাচীন অট্টালিকা—এ-সকল মিলিয়া মনের উপর এক অবিস্মরণীয় ছাপ রাখিয়া যায়।

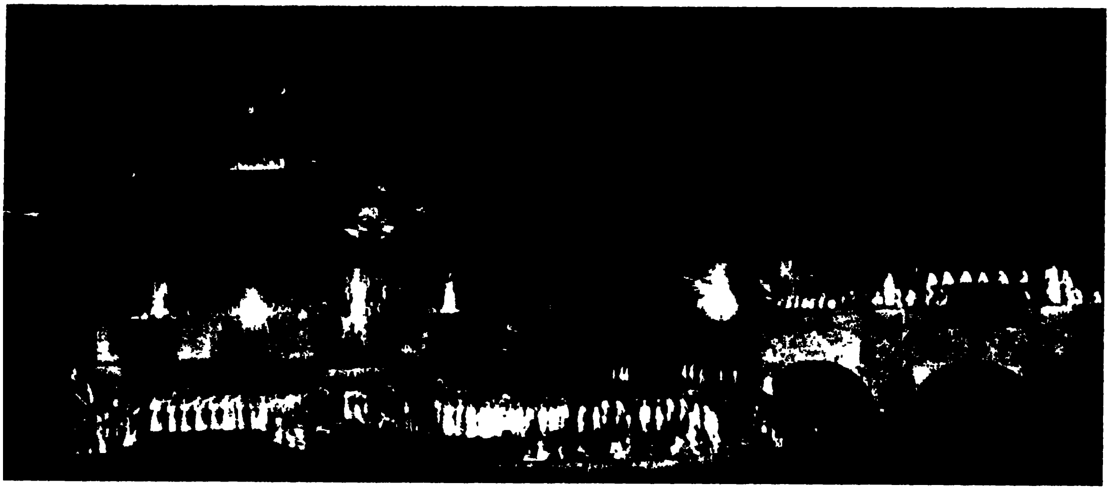
ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-মেন শহরে রোমেরবের্গের উপর যখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসে ও জার্ম্মান সম্রাটদিগের প্রাচীন অভিষেকশালাটি খোলা রঙ্গমঞ্চের টর্চ্চলাইটের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন মনে হয় যেন সময়ের ধারা উজান বহিতেছে।

গ্রীষ্মের নক্ষত্র-খচিত আকাশের নীচে গ্যেটে, শেক্সপীয়ার ও শিলারের অমর বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠে, তাহাদের অতুলনীয় নাটকগুলির ভিতর হইতে এক অপূর্ব্ব মায়া বাহির হইয়া আসিয়া দর্শকমণ্ডলীকে মোহিনী শক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলে। দর্শকগণ দিবসের চিন্তা-ভাবনা ভুলিয়া গিয়া এক মহিমময় জগতে বিচরণ করিতে থাকেন।



হাইডেলবার্গে মুক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়

শুধু যে বড় বড় শহরেই এই খোলা রঙ্গমঞ্চের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়, এমন নয়। ওল্ডেনবুর্গের অন্তর্গত বুকহলৎসবের্গে সেখানকার চাষীরা খোলা রঙ্গমঞ্চে তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস অভিনয় করিয়া থাকে। এই নূতন যুগে সেখানে একটি প্রাচীন ধরণের গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গ্রামের মুটে মজুর ও জেলেরা, তাহাদের নাটকের ভিতর দিয়া, জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্থায়িত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করে। সেখান হইতে কয়েক শত মাইল দক্ষিণে



জার্ম্মেনীর মুক্ত রঙ্গমঞ্চে গীতিনাট্যাভিনয়

বুর্গহাউসেন আন ডের সালৎসাকের প্রাচীন প্রাসাদে, মধ্যযুগের কবি ভেরনহার ডেম গ্যেরটনারের গানগুলি উৎসবকালে পুনরায় চাষীদের কণ্ঠে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের মিলন সাধিত হয়—মানব-ভাগ্য যে যুগে যুগে এক সে-কথা আমরা আবার নূতন করিয়া উপলব্ধি করি।

ভুন্‌সিডেলে, ফিস্‌টেল গিরিমালার মধ্যে একটি সুবৃহৎ খোলা রঙ্গমঞ্চে বীররস-প্রধান অনেক নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। ভাইসেনবুর্গের আরণ্য নির্জ্জনতার মধ্যে বাভারিয়ান আল্পসের বনানী-শ্রেণীর মধ্যে যখন "মিড-সামার নাইট" নাটকের অভিনয় হয়, তখন অরণ্যের গাছগুলিও যেন নাটকের সঙ্গীতের তালে তালে শিস্ দিতে থাকে। মিউনিকের নিকটে নিমফেনবুর্গ প্রাসাদের উদ্যানে রাখাল বালক-বালিকারা যখন নিদাঘ-সন্ধ্যার ছায়ালোকে নাচিতে থাকে, তখন মনে হয় যেন কতকগুলি মাটির পুতুল সহসা জীবন্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

ভ্যুরটেমবের্গের হাইডেনহাইম আন ব্রেন্‌ৎস্ নামক স্থানে ও বাডেনের অন্তর্গত এটিগহাইমে সম্প্রতি খোলা রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব হইয়াছে। এখানে গ্রামবাসীরা উৎসব উপলক্ষে অতি উৎসাহের সহিত তাহাদের নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে; প্রতি রবিবার এই সব স্থানে হাজার হাজার দর্শকের ভীড় হয়।

আজকাল জার্ম্মেনীতে খোলা রঙ্গমঞ্চগুলি ভ্রমণকারীদের তীর্থস্থল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকালে প্রায় দুই শতাধিক স্থানে এই সকল রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও অন্যান্য নাটক অভিনীত হয়। বর্ত্তমান জার্ম্মেনীর মনের পরিচয় পাওয়ার পক্ষে এই রঙ্গমঞ্চগুলি একটি উৎকৃষ্ট সহায়ক।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়

পরলোকগত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

নাটোর-নিবাসী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী কবিতা ও গল্প-উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে নাটোরের "কেয়া", "পঞ্চপ্রদীপ" প্রভৃতি মাসিকপত্র পরিচালনা এবং কলিকাতায় "অত্রি", "জলছবি" প্রভৃতি মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি "আলেয়া", "দীপা", "পল্লব" প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থ, "বৈরাগের চর", "বুকের ভাষা" প্রভৃতি গল্পের বই, এবং ‘মৃণ্ময়ী’, প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।



রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী



শ্রীরেণুকা সাহা

ইঁনি সেতারবাদ্য ও নৃত্যে নিপুণতা দ্বারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন



প্যালেষ্টাইনের অশান্তি এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। চিত্রে প্যালেষ্টাইনে ব্রিটিশ সৈন্যদের ঘাঁটি দেখা যাইতেছে

শিক্ষাতত্ত্ববিৎ মহিলা

কুমারী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাতত্ত্বে গবেষণার জন্ম লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। 'বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা" সম্বন্ধে গবেষণার ফলে তিনি লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এড. উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার কথা

চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্যা প্রতিদিন এমন জটিল হইয়া উঠিয়েছে যে এক-এক সময় মনে হয় যে যুদ্ধ বুঝি আসন্ন, চেকোশ্লোভাকিয়া সমর-আক্রমণে জড়িত হইল বলিয়া, আর কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার; আবার আলোচনায় যুদ্ধ-সম্ভাবনা স্থগিত হইয়া যায়। যুদ্ধ যদি বাধে তবে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমর-প্রস্তুতি কতদূর আছে তাহা জানিবার স্বভাবতই কৌতূহল হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার মিলিটারি একাডেমীর অধ্যাপক কর্ণেল ইয়েট্টার এ-বিষয়ে নিউ ইয়র্কের "নিউ মাসেস" পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জার্ম্মেনী চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে অনেক বলশালী হইলেও চেকরা যে খুব সহজেই জার্ম্মেনীর করায়ত্ত হইয়া পড়িবে এমন নয়, বিশেষ তাহার মিত্র-শক্তিদের সহায়তা ঠিকমত পাইলে। প্রবন্ধটি হইতে কোন কোন অংশ সংকলিত হইল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার অর্দ্ধেক অংশ ভৌগোলিক সংস্থানে জার্ম্মেনী কর্ত্তৃক যেরূপ ভাবে বেষ্টিত তাহাতে জার্ম্মেনীর আক্রমণ-প্রতিরোধে চেকোশ্লোভাকিয়াকে নানা গুরুত্ব সমস্যার সম্মুখীন থাকিতে হইবে:—(১) অতর্কিতে আকাশ- ও স্থল- পথে আক্রমণ প্রতিরোধ (২) চেকদের সৈন্যসজ্জার ব্যবস্থা যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া পড়ে, এজন্য প্রথম আক্রমণের প্রতিরোধের পর আকাশ- ও স্থল পথে পুনরাক্রমণের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৩) সৈন্যবল সংহত করিবার সময়ে, বোহেমিয়া ও পশ্চিম মোরাভিয়া অঞ্চলের সৈন্যদলকে যেন জার্ম্মেনী ঘিরিয়া ফেলিয়া শ্লোভাকিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন না-করিয়া ফেলিতে পারে।

চেকোশ্লোভাকিয়া যুদ্ধাস্ত্রগ্রহণে সমর্থ সকল অধিবাসীদেরই সৈন্যদলে পাইতে পারে, কিন্তু কথা এই যে, যুদ্ধের জন্য সৈন্যসংগ্রহে কিছু বিলম্ব হইয়া গেলে ইতিমধ্যে জার্ম্মেনী পূর্ব্ব বোহেমিয়াকে গ্রাস করিয়া বসিতে পারে। এই জন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম যুদ্ধ-নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রের মধ্যে ধারাবাহিক যোগ রক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিয়া মোরাভিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা দুর্গসংরক্ষিত করা হইয়াছে।

জার্ম্মানদের অভিমত ও ধারণা অনুসারে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমর-প্রস্তুতি কতদূর আছে এ-সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হইয়াছে। জার্ম্মান বিশেষজ্ঞদের মতে শান্তির সময়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার সৈন্য-সংখ্যা ১৮০,০০০; যুদ্ধের সময় ১,৫০০,০০০ জন সুশিক্ষিত সৈন্য সেনাদলে যোগ দিবে।

শত্রুপক্ষ যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অংশতঃ নষ্টও করিয়া দিতে পারে তবু যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে; তাছাড়া গত কয়েক বৎসরে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধান প্রধান শিল্পের কেন্দ্র সীমান্তের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের সময় সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণের ভার সরকারের হাতে আসিবে; সুতরাং সমরোপকরণ যথাবিধি প্রস্তুতের কোন বাধা হইবে না। খাদ্যবস্তুর দিক দিয়া খাদ্যশস্য, মাংস, চিনি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণ চেকোশ্লোভাকিয়াতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে দেশ স্বয়ংনির্ভর।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় চেকোশ্লোভাকিয়া যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণের—বিশেষতঃ স্কোডা-প্রতিষ্ঠানে—ব্যবস্থায় জার্ম্মেনীর সহিতও টক্কর দিয়াছে। মধ্য-ইউরোপে ইটালী ও জার্ম্মেনীর পরেই চেকোশ্লোভাকিয়ার সৈন্যদল অস্ত্রায়োজনে উন্নত। ১৯৩৫ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার লাইট, মেশিন-গান ইংলণ্ডে রপ্তানি পর্য্যন্ত হইয়াছে।

জার্ম্মানদের অনুমানানুসারে চেকোশ্লোভাকিয়ার মোট ১২,৫০০ মেশিন-গান আছে এবং প্রায় ৪০০ 'ট্যাঙ্ক' আছে—ইহার সবই চেকোশ্লোভাকিয়াতেই প্রস্তুত। আকাশ-পথে আক্রমণের ব্যবস্থা সম্পর্কে জার্ম্মানদের অনুমান এই যে চেকোশ্লোভাকিয়ার মোট ১,৩৫০ এরোপ্লেন আছে। ইহার অধিকাংশই চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রস্তুত। এই আয়োজনকে একেবারে ক্ষীণ বলা যায় না।

শ্রীঅজিতকুমার রায়

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



সখী

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

প্রবাসী প্রেস. কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

২য় সংখ্যা

প্রায়শ্চিত্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো—
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুঠের ধন ।

দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল ।
বিদীর্ণ হোলো ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালীনাগিনীর দল ।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা

নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
বিদীর্ণ হয়ে, তার
কলুষপুঞ্জ ক'রে দিক উদগার।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা।

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।

মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি'।

ঐ দলে দলে ধামিক ভীরু
কা'রা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা
ভাত প্রার্থনা রবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়ি-কড়া।
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।
শুধু বাণী-কোশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্র-মন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা।

স'বে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে॥

বিজয়াদশমী
১৩৪৫

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭

ধাওতাল সাহু মহাজনের কাছে আমার একবার হাত পাতিতে হইল। আদায় সে-বার কম হইল, অথচ দশ হাজার টাকা রেভিনিউ দাখিল করিতেই হইবে। তহসিলদার বনোয়ারীলাল পরামর্শ দিল, বাকী টাকাটা ধাওতাল সাহুর কাছে কর্জ্জ করুন। আপনাকে সে নিশ্চয়ই দিতে আপত্তি করিবে না। ধাওতাল সাহু আমার মহালের প্রজা নয়, সে থাকে গবর্ণমেণ্টের খাসমহালে। আমাদের সঙ্গে তার কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নাই, এ অবস্থায় সে যে এক কথায় আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে হাজার-তিনেক টাকা ধার দিবে, এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। এক দিন বনোয়ারীলালকে সঙ্গে লইয়া গোপনে গেলাম ধাওতাল সাহুর বাড়ী, কারণ কাছারির অপর কাহাকেও জানিতে দিতে চাহি না যে টাকা কর্জ্জ করিয়া দিতে হইতেছে।

ধাওতাল সাহুর বাড়ী পওসদিয়ায় একটা ঘিঞ্জি টোলার মধ্যে। বড় এক খানা খোলার চালার সামনে খানকতক দড়ির চারপাই পাতা। ধাওতাল সাহু উঠানের এক পাশের তামাকের ক্ষেত নিড়ানি দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল—আমাদের দেখিয়া শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল, কোথায় বসাইবে, কি করিবে ভাবিয়া পায় না, খানিক ক্ষণের জন্যে যেন দিশাহারা হইয়া গেল।

—এ কি! হজুর এসেছেন গরীবের বাড়ী, আসুন, আসুন। বসুন হজুর। আসুন তহসিলদার সাহেব।

ধাওতাল সাহুর বাড়ীতে চাকরবাকর দেখিলাম না। তাহার এক জন হৃষ্টপুষ্ট নাতি, নাম রামলখিয়া, সে-ই আমাদের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাড়ীঘর আসবাবপত্র দেখিয়া কে বলিবে ইহা লক্ষপতি মহাজনের বাড়ী!

রামলখিয়া আমার ঘোড়ার পিঠ হইতে জিন খুরপাচ খুলিয়া ঘোড়াকে ছায়ায় বাঁধিল। আমাদের জন্য পা ধুইবার জল আনিল। ধাওতাল সাহু নিজের একখানা তালের পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সাহুজীর এক নাতনী তামাক সাজিতে ছুটিল। উহাদের যত্নে বড়ই বিব্রত হইয়া উঠিলাম। বলিলাম—ব্যস্ত হবার দরকার নেই সাহুজী, তামাক আনাতে হবে না, আমার কাছে চুরুট আছে।

যত আদর-আপ্যায়নই করুক, আসল ব্যাপার সম্বন্ধে কথা পাড়িতে একটু সমীহ হইতেছিল, কি করিয়া কথাটা পাড়ি?

ধাওতাল সাহু বলিল—ম্যানেজার সাহেব কি এদিকে পাখী মারতে এসেছিলেন?

—না, তোমার কাছেই এসেছিলাম সাহুজী।

—আমার কাছে হজুর? কি দরকার বলুন তো?

—আমাদের কাছারির সদর খাজনার টাকা কম পড়ে গিয়েছে, সাড়ে তিন হাজার টাকার বড় দরকার, তোমার কাছে সেজন্যেই এসেছিলাম।

মরীয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম, বলিতেই যখন হইবে।

ধাওতাল সাহু কিছুমাত্র না ভাবিয়া বলিল—তার জন্যে আর ভাবনা কি হজুর? সে হয়ে যাবে এখন, তবে তার জন্যে কষ্ট করে আপনার আসবার দরকার কি ছিল? একখানা চিরকুট লিখে তহসিলদার সাহেবের হাতে পাঠিয়ে দিলেই আপনার হুকুম তামিল হ'ত।

মনে ভাবিলাম, এখন আসল কথাটা বলিতে হইবে। টাকা আমি ব্যক্তিগত ভাবে লইব, কারণ জমিদারের নামে টাকা কর্জ্জ করিবার আমমোক্তারনামা আমার নাই। একথা শুনিলেও ধাওতাল কি আমার টাকা দিবে? বিদেশী লোক আমি। আমার কি সম্পত্তি আছে

এখানে যে এতগুলি টাকা বিনা বন্ধকে আমার দিবে? কথাটা একটু সন্দেহের উপরই বলিলাম।

—সাহজী, লেখাপড়াটা কিন্তু আমার নামেই করতে হবে। জমিদারের নামে হবে না।

ধাওতাল সাহু আশ্চর্য্য হইবার স্বরে বলিল—লেখাপড়া কিসের? আপনি আমার বাড়ী বয়ে এসেছেন সামান্য টাকার অভাব পড়েছে, তাই নিতে। এ তো আসবার দরকারই ছিল না, হুকুম ক'রে পাঠালেই টাকা দিতাম। তার পর যখন এসেছেনই—তখন লেখাপড়া কিসের? আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান, যখন কাছারিতে আদায় হবে, আমায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।

আমি রীতিমত অবাক হইলাম। সাড়ে তিন হাজার টাকা আজকালকার বাজারে সোজা টাকা নয় যে ইচ্ছা করিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া যায়, কারণ বিনা লেখাপড়াতে এতগুলি টাকা দেওয়া জলে ফেলিয়া দেওয়ারই সামিল।

বলিলাম—আমি হ্যাণ্ডনোট দিচ্ছি, টিকিট সঙ্গে ক'রে এনেছি। কিংবা তোমার পাকা খাতা বার কর, সই করে দিয়ে যাই। বিনা লেখাপড়ায় টাকা নেব কেন?

ধাওতাল সাহু হাত জোড় করিয়া বলিল—মাপ করুন হুজুর। ও কথাই তুলবেন না। মনে বড় কষ্ট পাব। কোন লেখাপড়ার দরকার নেই, টাকা আপনি নিয়ে যান।

আমার পীড়াপীড়িতে ধাওতাল কর্ণপাতও করিল না। ভিতর হইতে আমার নোটের তাড়া গুনিয়া আনিয়া দিয়া বলিল—হুজুর, একটা কিন্তু অনুরোধ আছে।

—কি?

—এ-বেলা যাওয়া হবে না। সিধা বার ক'রে দিই, রান্নাখাওয়া ক'রে তবে যেতে পাবেন।

পুনরায় আপত্তি করিলাম, তাহাও টিকিল না। তহসিলদারকে বলিলাম—বনোয়ারীলাল, রাঁধতে পারবে তো? আমার দ্বারা সুবিধে হবে না।

বনোয়ারী বলিল—তা চলবে না, হুজুর, আপনাকে রাঁধতে হবে। আমার রান্না খেলে এ পাড়াগাঁয়ে আপনার দুর্নাম হবে। আমি দেখিয়ে দেব এখন।

বিরাট এক সিধা বাহির করিয়া দিল ধাওতাল সাহুর নাতি। রন্ধনের সময় নাতি-ঠাকুরদাদা মিলিয়া নানা রকম উপদেশ-পরামর্শ দিতে লাগিল রন্ধন সম্বন্ধে।

ঠাকুরদাদার অনুপস্থিতিতে নাতি বলিল—বাবুজী, ঐ যে দেখছেন আমার ঠাকুরদাদা, ওঁর জন্তে সব যাবে। এত লোককে টাকা ধার দিয়েছেন বিনা সুদে, বিনা বন্ধকে, বিনা তমসুকে—এখন আর টাকা আদায় হ'তে চায় না। সকলকে বিশ্বাস করেন, অথচ লোকে কত ফাঁকিই দিয়েছে। লোকের বাড়ী বয়ে টাকা ধার দিয়ে আসেন।

গ্রামের আর এক জন লোক বসিয়াছিল, সে বলিল—বিপদে আপদে সাহুজীর কাছে হাত পাতলে ফিরে যেতে কখনো কাউকে দেখি নি বাবুজী। সেকেলে ধরণের লোক, এত বড় মহাজন, কখনো আদালতে মোকদ্দমা করেন নি। আদালতে যেতে ভয় পান। বেজায় ভীতু আর ভালমানুষ।

সেদিন যে-টাকা ধাওতাল সাহুর নিকট হইতে আনিয়াছিলাম, তাহা শোধ দিতে প্রায় ছ'মাস দেরি হইয়া গেল—এই ছ'মাসের মধ্যে ধাওতাল সাহু আমাদের ইসমাইলপুর মহালের ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটে নাই, পাছে আমি মনে করি যে সে টাকার তাগাদা করিতে আসিয়াছে। ভদ্রলোক আর কাহাকে বলে!

প্রায় বছর খানেক রাখালবাবুদের বাড়ী যাওয়া হয় নাই, ফসলের মেলার পরে এক দিন সেখানে গেলাম। রাখালবাবুর স্ত্রী আমায় দেখিয়া খুব খুশী হইলেন। বলিলেন—আপনি আর আসেন না কেন দাদা, কোন খোঁজখবর নেন না—এই নির্ব্বান্ধব জায়গায় বাঙালীর মুখ দেখা যে কি—আর আমাদের এই অবস্থায়—

বলিয়া দিদি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। বাড়ীঘরের অবস্থা আগের মতই হীন, তবে এবার ততটা যেন বিশৃঙ্খল নয়। রাখালবাবুর বড় ছেলেটি বাড়ীতেই টিনের মিস্ত্রীর কাজ করে—সামান্যই উপার্জ্জন—তবু যা হয় সংসার একরকম চলিতেছে।

রাখালবাবুর স্ত্রীকে বলিলাম—ছোট ছেলেটিকে

অন্ততঃ ওর মামার কাছে কাশীতে রেখে একটু লেখা-পড়া শেখান।

তিনি বলিলেন—আপনি মামা কোথায় দাদা? ছু-তিনখানা চিঠি লেখা হয়েছিল, এত বড় বিপদের খবর দিয়ে—দশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে সেই যে চুপ করল—আর এই দেড় বছর সাড়াশব্দ নেই। তার চেয়ে দাদা, ওরা মকাই কাটবে, জনার কাটবে, মহিষ চরাবে—তবুও তেমন মামার দোরে যাবে না।

আমি তখনই ঘোড়ায় ফিরিব—দিদি কিছুতেই আসিতে দিলেন না। সে-বেলা থাকিতে হইবে। তিনি কি-একটা খাবার করিয়া আমায় না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না।

অগত্যা অপেক্ষা করিতে হইল। মকাইয়ের ছাতুর সহিত ঘি ও চিনি মিশাইয়া এক রকমের লাড্ডু বাঁধিয়া ও কিছু হালুয়া তৈরী করিয়া দিদি খাইতে দিলেন। দরিদ্র সংসারে যতটা আদর-অভ্যর্থনা করা যাইতে পারে, তাহার ত্রুটি করিলেন না।

বলিলেন—দাদা, ভাদ্র মাসের মকাই রেখেছিলাম—আপনার জন্যে তুলে। আপনি ভুট্টা-পোড়া খেতে ভালবাসেন, তাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—মকাই কোথায় পেলেন? কিনেছিলেন?

—না। ক্ষেতে কুড়তে যাই, ফসল কেটে নিয়ে গেলে যে-সব ভাঙা, ঝরা ভুট্টা চাষারা ক্ষেতে রেখে যায়—গাঁয়ের মেয়েরাও যায়, আমিও যাই ওদের সঙ্গে—এক ঝুড়ি দেড় ঝুড়ি ক'রে রোজ কুড়তাম।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—ক্ষেতে কুড়তে যেতেন?

—হ্যাঁ, রাত্রে যেতাম, কেউ টের পেত না। গাঁয়ের কত মেয়েরা তো যায়। তাদের সঙ্গে এই ভাদ্র মাসে কম্‌সে কম দশ টুকরি ভুট্টা কুড়িয়ে এনেছিলাম।

আমার মনে বড় দুঃখ হইল। এ কাজ গরীব গাঙ্গোতার মেয়েরা করিয়া থাকে—এদেশের ছত্রি বা রাজপুত মেয়েরা গরীব হইলেও ক্ষেতের ফসল কুড়াইতে যায় না। আর একজন বাঙালীর মেয়েকে এ-কাজ করিতে শুনিলে মনে বড়ই লাগে। এই অশিক্ষিত গাঙ্গোতাদের গ্রামে বাস করিয়া দিদি এ-সব হীনবৃত্তি শিখিয়াছেন—সংসারের দারিদ্র্যও যে তাহার একটা প্রধান কারণ সে-বিষয়ে ভুল নাই। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না, পাছে মনে কষ্ট দেওয়া হয়। এই নিঃস্ব বাঙালী-পরিবার বাংলার কোন শিক্ষা-সংস্কৃতি পাইল না, বছর কয়েক পরে চাষী গাঙ্গোতায় পরিণত হইবে, ভাষায়, চালচলনে, হাবভাবে। এখন হইতেই সে-পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

রেলষ্টেশন হইতে বহু দূরে অজ পল্লীগ্রামে আমি আরও দু-একটি এরকম বাঙালী-পরিবার দেখিয়াছি। এই সব পরিবারে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার! এমনি আর একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ-পরিবার জানিতাম—দক্ষিণ-বিহারে এক অজ গ্রামে তাঁরা থাকিতেন। অবস্থা নিতান্তই হীন, বাড়ীতে তাঁদের তিনটি মেয়ে ছিল, বড়টির বয়স একুশ-বাইশ বছর, মেজটির কুড়ি, ছোটটির সতর। ইহাদের বিবাহ হয় নাই, হইবার কোন উপায়ও নাই—খবর জোটানো, বাঙালী পাত্রের সন্ধান পাওয়া এ-সব অঞ্চলে অত্যন্তই কঠিন।

বাইশ বছরের বড় মেয়েটি দেখিতেও সুশ্রী—এক বর্ণও বাংলা জানে না—আকৃতি-প্রকৃতিতে খাঁটি দেহাতী বিহারী মেয়ে—মাঠ হইতে মাথায় মোট করিয়া কলাই আনে, গমের ভুষি আনে।

এই মেয়েটির নাম ছিল ধ্রুবা। পুরাদস্তুর বিহারী নাম।

তাহার বাবাও প্রথমে এই গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করিতে আসিয়া জমিজমা লইয়া চাষবাসের কাজও আরম্ভ করেন। তার পর তিনি মারা যান, বড় ছেলে একেবারে হিন্দুস্থানী—চাষবাস দেখাশুনা করিত, বয়স্থা ভগ্নীদের বিবাহের যোগাড় সে চেষ্টা করিয়াও করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ পণ দিবার ক্ষমতা তাদের আদৌ ছিল না জানি।

ধ্রুবা ছিল একেবারে কপালকুণ্ডলা। আমাকে 'ভাই' অর্থাৎ দাদা বলিয়া ডাকিত। গায়ে অসীম শক্তি, গম

পিষিতে, উদুখলে ছাতু কুটিতে, মোট বহিয়া আনিতে, গরু-মহিষ চরাইতে চমৎকার মেয়ে, সংসারের কাজকর্মে ঘুণ। তাহার দাদা এ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যে, এমন যদি কোন পাত্র পান, তিনটি মেয়েকেই একই পাত্রে সম্প্রদান করিবেন। মেয়ে তিনটিরও নাকি তাতে অমত ছিল না।

মেজ মেয়ে জবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—বাংলা দেশ দেখতে ইচ্ছে হয়?

জবা বলিয়াছিল—নেই ভেইয়া, উ হাকোঁ প্যানি বড্ডি নরম ছে—

শুনিয়াছিলাম বিবাহ করিতে ধ্রুবারও খুব আগ্রহ। সে নিজে নাকি কাহাকে বলিয়াছিল, তাহাকে যে বিবাহ করিবে, তাহার বাড়ীতে গরুর দোহাল বা উদুখল-ওয়ালী ডাকিতে হইবে না—সে একাই ঘণ্টায় পাঁচ সের গম কুটিয়া ছাতু করিতে পারে।

হায় হতভাগিনী বাঙালী কুমারী! এত বৎসর পরেও সে যে আজও গাঙ্গোতীন সাজিয়া দাদার সংসারে যব কুটিতেছে, কলাইয়ের বোঝা মাথায় করিয়া মাঠ হইতে আনিতেছে, এ আমি বেশ প্রত্যক্ষ করিতেছি—কে আর দরিদ্রা দেহাতী বয়স্কা মেয়েকে বিনাপণে বিবাহ করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে মঙ্গলশঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে!

শান্ত মুক্ত প্রান্তরে যখন সন্ধ্যা নামে, দূর পাহাড়ের গা বাহিয়া যে সরু পথটি দেখা যায় ঘনবনের মধ্যে চেরা সিঁথির মত, ব্যর্থযৌবনা, দরিদ্রা ধ্রুবা হয়তো আজও এত বছর পরে সেই পথ দিয়া শুকনো কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া পাহাড় হইতে নামে—এ ছবি কতবার কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তেমনি প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমার দিদি, রাখালবাবুর স্ত্রী, হয়ত আজও বৃদ্ধা গাঙ্গোতীনদের মত গভীর রাত্রে চোরের মত লুকাইয়া ক্ষেতে খামারে শুকনো তলায়-ঝরা ভুট্টা খুড়ি করিয়া কুড়াইয়া ফেরেন।

. . .

ভানুমতীদের ওখান হইতে ফিরিবার পরে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সেবার ঘোর বর্ষা নামিল। দিনরাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, ঘন কাজল কালো মেঘপুঞ্জে আকাশ ছাইয়াছে, নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তরেখা বৃষ্টির ধোঁয়ায় ঝাপসা, মহালিখারূপের পাহাড় মিলাইয়া গিয়াছে—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের শীর্ষদেশ কখনও ঈষৎ অস্পষ্ট দেখা যায়, কখনও যায় না। শুনিলাম, পূর্বে কুশী ও দক্ষিণে কারো নদীতে বন্যা আসিয়াছে।

তেমন অপরূপ বর্ষা-দৃশ্য জীবনে বেশী দেখি নাই—মাইলের পর মাইল ব্যাপী কাশ ও ঝাউ বন বর্ষার জলে ভিজিতেছে, আমার আপিস-ঘরের বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া দেখিতাম আমার সামনে কাশবনের মধ্যে একটা বনঝাউয়ের ডালে একটা সঙ্গীহারা ঘুঘু বসিয়া অঝোরে ভিজিতেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ভাবেই বসিয়া আছে—মাঝে মাঝে পালক উস্কোখুস্কো করিয়া ফুলাইয়া বৃষ্টির জল আটকাইবার চেষ্টা করে, কখনও এমনিই বসিয়া থাকে।

এমন দিনে আপিস-ঘরে বসিয়া দিন কাটানো আমার পক্ষে কিন্তু অসম্ভব হইয়া উঠিত। ঘোড়ার জিন কসিয়া বর্ষাতি চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—সে কি মুক্তি! কি উদ্দাম জীবনানন্দ! আর কি অপরূপ সবুজের সমুদ্র চারিদিকে—বর্ষার জলে নবীন, সতেজ ঘনসবুজ কাশের বন গজাইয়া উঠিয়াছে—যত দূর দৃষ্টি চলে, এদিকে নাঢ়া বইহারের সীমানা ওদিকে মোহনপুরা অরণ্যের অস্পষ্ট নীল সীমারেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থৈ থৈ করিতেছে এই সবুজের সমুদ্র—বর্ষাসজল হাওয়ায় মেঘকজ্জল আকাশের নীচে এই দীর্ঘ মরকতশ্যাম তৃণভূমির মাথায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে—আমি যেন একা এ অকূল সবুজ সমুদ্রের নাবিক—কোন্ রহস্যময় স্বপ্নবন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছি।

এই বিস্তৃত মেঘছায়াশ্যামল মুক্ত তৃণভূমির মধ্যে ঘোড়া ছুটাইয়া মাইলের পর মাইল যাইতাম—কখনও সরস্বতীকুণ্ডীর বনের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিয়াছি—প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব নিভৃত সৌন্দর্য্যভূমি যুগলপ্রসাদের স্বহস্তে রোপিত নানা জাতীয় বন্য ফুলে ও লতায় সজ্জিত হইয়া আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সরস্বতী হ্রদ ও তাহার তীরবর্তী বনানীর মত

সৌন্দর্য্যভূমি খুব বেশী নাই—এ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। হ্রদের ধারে রেড্ ক্যাম্পিয়নের মেলা বসিয়াছে এই বর্ষাকালে—হ্রদের জলের ধারের নিকট। জলজ ওয়াটার-ক্রোফুটের বড় বড় নীলাভ সাদা ফুলে ভরিয়া আছে। যুগলপ্রসাদ সেদিনও কি একটা বন্যলতা আনিয়া লাগাইয়া গিয়াছে জানি। সে আজমাবাদ কাছারিতে মুহুরীর কাজ করে বটে, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকে সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্ত্তী লতাবিতানে ও বন্যপুষ্পের কুঞ্জে।

সরস্বতী কুণ্ডীর বন হইতে বাহির হইতাম—আবার মুক্ত প্রান্তর, আবার দীর্ঘ তৃণভূমি—বনের মাথায় মাথায় ঘন নীল বর্ষার মেঘ আসিয়া জমিতেছে, সমগ্র জলভার নামাইয়া রিক্ত হইবার পূর্ব্বেই আবার উড়িয়া আসিতেছে নবমেঘপুঞ্জ—এক দিকের আকাশে এক অদ্ভুত ধরণের নীল রং ছুটিয়াছে—তাহার মধ্যে এক খণ্ড লঘুমেঘ অস্তদিগন্তের রঙে রঞ্জিত হইয়া বহির্বিশ্বের দিগন্তে কোন্ অজানা পর্ব্বতশিখরের মত দেখাইতেছে।

সন্ধ্যার বিলম্ব নাই। দিগন্তহারা ফুলকিয়া বইহারের মধ্যে শিয়াল ডাকিয়া উঠিল—একে মেঘের অন্ধকার, তার উপর সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেছে—ঘোড়ার মুখ কাছারির দিকে ফিরাইতাম।

কত বার এই রকম কান্তবর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরের সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন; কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড়-পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্ব্বাদ আজিকার এই নবনীলনীরদমালায় মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষাসন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরের অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছু নাই—এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্ব্বাদ। যে যত হীন, যে যত ছোট, সেই বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশী।

আমার মনে যে-দেবতার স্বপ্ন জাগিত, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষর প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাঢ়া বইহারের কি আজমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোধূলি-বেলায় রক্তমেঘস্তূপের, কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া, গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন।

এমনি এক বর্ষামুখর শ্রাবণ-দিনে ধাতুরিয়া ইসমাইলপুর কাছারিতে আসিয়া হাজির।

অনেক দিন পরে উহাকে দেখিয়া খুশী হইলাম।

—কি ব্যাপার, ধাতুরিয়া? ভাল আছিস্ তো?

যে ছোট পুঁটুলির মধ্যে তার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি বাঁধা, সেটা হাত হইতে নামাইয়া আমার হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—বাবুজী, নাচ দেখাতে এলাম। বড় কষ্টে পড়েছি, আজ এক মাস কেউ নাচ দেখে নি। ভাবলাম, কাছারিতে আপনার কাছে যাই, সেখানে গেলে তাঁরা ঠিক দেখবেন। আরও ভাল ভাল নাচ শিখেছি, বাবুজী।

ধাতুরিয়া যেন আরও রোগা হইয়া গিয়াছে। উহাকে দেখিয়া কষ্ট হইল।

—কিছু খাবি, ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে খাইবে।

আমার ঠাকুরকে ডাকিয়া ধাতুরিয়াকে কিছু খাবার

দিতে বলিলাম। তখন ভাত ছিল না, ঠাকুর দুধ ও চিঁড়া আনিয়া দিল। ধাতুরিয়ার খাওয়া দেখিয়া মনে হইল, সে অন্ততঃ দু-দিন কিছু খাইতে পায় নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধাতুরিয়া নাচ দেখাইল। কাছারির প্রাঙ্গণে সেই বন্য অঞ্চলের অনেক লোক জড় হইয়াছিল ধাতুরিয়ার নাচ দেখিবার জন্য। আগের চেয়েও ধাতুরিয়া নাচে অনেক উন্নতি করিয়াছে। ধাতুরিয়ার মধ্যে যথার্থ শিল্পীর দরদ ও সাধনা আছে। আমি নিজে কিছু দিলাম, কাছারির লোক চাঁদা করিয়া কিছু দিল। ইহাতে তাহার কত দিনই বা চলিবে?

ধাতুরিয়া পর দিন সকালে আমার নিকট বিদায় লইতে আসিল।

—বাবুজী, কবে কলকাতা যাবেন?

—কেন বল তো?

—আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবেন বাবুজী? সেই যে আপনাকে বলেছিলাম।

—তুমি এখন কোথায় যাবে ধাতুরিয়া? খেয়ে তবে যেও।

—না বাবুজী, ঝল্লুটোলাতে এক জন ভূঁইহার বাভনের বাড়ী, তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে হয়তো নাচ দেখতে পারে। সেই চেষ্টাতে যাচ্ছি। এখান থেকে আট ক্রোশ রাস্তা—এখন রওনা হ'লে বিকেল নাগাদ পৌছব।

ধাতুরিয়াকে ছাড়িয়া দিতে মন সরে না। বলিলাম—কাছারিতে যদি কিছু জমি দিই, তবে এখানে থাকতে পারবে? চাষবাস কর, থাক না কেন?

মটুকনাথ পণ্ডিতেরও দেখিলাম খুব ভাল লাগিয়াছে ধাতুরিয়াকে। তাহার ইচ্ছা ধাতুরিয়াকে সে টোলের ছাত্র করিয়া লয়। বলিল—বলুন না ওকে বাবুজী, দু-বছরের মধ্যে মুগ্ধবোধ শেষ করিয়ে দেব। ও থাকুক এখানে।

জমি দেওয়ার কথায় ধাতুরিয়া বলিল—বাবুজী, আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত, আপনার বড় দয়া। কিন্তু চাষ, কাজ কি আমার দিয়ে হবে? ওদিকে আমার মন নেই যে! নাচ দেখাতে পেলে আমার মনটা ভারি খুশী থাকে। আর কিছু তেমন ভাল লাগে না।

—বেশ মাঝে মাঝে নাচ দেখাবে। চাষ করলে তো জমির সঙ্গে তোমায় কেউ শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবে না?

ধাতুরিয়া খুব খুশী হইল। বলিল—আপনি যা বলবেন, আমি তা শুনব। আপনাকে বড় ভাল লাগে, বাবুজী। আমি ঝল্লুটোলা থেকে ঘুরে আসি—আপনার এখানেই আসব।

মটুকনাথ পণ্ডিত বলিল—আর সেই সময় তোমাকে টোলেও ঢুকিয়ে নেব। তুমি না হয় রাত্রে এসে প'ড়ো আমার কাছে। মূর্খ থাকা কিছু নয়, কিছু ব্যাকরণ, কিছু কাব্য নবুজ রাখা দরকার।

ধাতুরিয়া তাহার পর বসিয়া বসিয়া নৃত্যশিল্পের বিষয় নানা কথা কি সব বলিল, আমি তত বুঝিলাম না। পূর্ণিয়ার হো-হো নাচের ভঙ্গীর সঙ্গে ধরমপুর অঞ্চলের ঐ শ্রেণীর নাচের কি তফাৎ—সে নিজে নূতন কি একটা হাতের মুদ্রা প্রবর্ত্তন করিয়াছে—এই সব ধরণের কথা।

—বাবুজী, আপনি বালিয়া জেলায় ছট্ পরবের সময়ে মেয়েদের নাচ দেখেছেন? ওর সঙ্গে ছক্করবাজি নাচের বেশ মিল থাকে একটা জায়গায়। আপনাদের দেশে নাচ কেমন হয়?

আমি তাহাকে গত বৎসর ফসলের মেলায় দৃষ্ট 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচের কথা বলিলাম। ধাতুরিয়া হাসিয়া বলিল—ও কিছু না বাবুজী, ও মুঙ্গেরের গেঁয়ো নাচ। গাঙ্গোতাদের খুশী করবার নাচ। ওর মধ্যে খাঁটি জিনিস কিছু নেই। ও তো সোজা।

বললুম—তুমি জানো? নেচে দেখাও তো?

ধাতুরিয়া দেখিলাম নিজের শাস্ত্রে বেশ অভিজ্ঞ। 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ সত্যই সে চমৎকার নাচিল—সেই খুঁৎ খুঁৎ করিয়া ছেলেমানুষের মত কান্না, সেই চোরা ননী বিতরণ করিবার ভঙ্গী—সেই সব। তাহাকে আরও মানাইল এই জন্য যে সে সত্যই বালক।

ধাতুরিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল—এত মেহেরবানিই যখন করলেন বাবুজী, একবার কলকাতায় কেন নিয়ে চলুন না? ওখানে নাচের আদর আছে।

এই ধাতুরিয়ার সহিত আমার শেষ দেখা।

মাস দুই পরে শোনা গেল, বি এন ডব্লিউ রেল লাইনের কাটারিয়া ষ্টেশনের অদূরে লাইনের উপর একটি বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়—নাটুয়া বালক ধাতুরিয়ার মৃতদেহ বলিয়া সকলে চিনিয়াছে। ইহা আত্মহত্যা কি দুর্ঘটনা তাহা বলিতে পারিব না। আত্মহত্যা হইলে কি দুঃখেই বা সে আত্মহত্যা করিল?

সেই বন্য অঞ্চলে ছ'বছর কাটাইবার সময় যতগুলি নরনারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম—তার মধ্যে ধাতুরিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার মধ্যে যে একটি নির্লোভ, সদাচঞ্চল সদানন্দ, অবৈষয়িক, খাঁটি শিল্পীমনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, শুধু সে বন্য দেশ কেন, সভ্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও তা সুলভ নয়।

আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল।

নাঢ়া বইহার ও লবটুলিয়ার সমুদয় জঙ্গল-মহাল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোথাও পূর্ব্বের মত বন নাই। প্রকৃতি কত বৎসর ধরিয়া নির্জ্জনে নিভৃতে যে কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কত কেঁয়োঝাঁকার নিভৃত লতাবিতান, কত স্বপ্নময় বনভূমি—জনমজুরেরা নির্ম্মম হাতে সব কাটিয়া উড়াইয়া দিল, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরে, তাহা গেল এক দিনে। এখন কোথাও আর সে রহস্যময় দূরবিসর্পী প্রান্তর নাই, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত, মহিষের দেবতা দয়ালু টাঁড়বারো হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া বন্য মহিষদলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিত।

নাঢ়া বইহার নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, লবটুলিয়া এখন একটি বস্তি মাত্র। যে দিকে চোখ যায়, শুধু চালে চালে লাগানো অপকৃষ্ট খোলার ঘর। কোথাও বা কাশের ঘর। ঘন ঘিঞ্জি বসতি—টোলায় টোলায় ভাগ করা—ফাঁকা জায়গায় শুধুই ফসলের ক্ষেত্র। এতটুকু ক্ষেতের চারিদিকে ফণিমনসার বেড়া। ধরণীর মুক্তরূপ ইহারা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আছে কেবল একটি স্থান, সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্ত্তী বনভূমি।

চাকুরীর খাতিরে মনিবের স্বার্থরক্ষার জন্য সব জমিতেই প্রজাবিলি করিয়াছি বটে, কিন্তু যুগলপ্রসাদের হাতে সাজানো সরস্বতী-তীরের অপূর্ব্ব বনকুঞ্জ কিছুতেই প্রাণ ধরিয়া বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। কত বার দলে দলে প্রজারা আসিয়াছে সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের জমি লইতে—বর্দ্ধিত হারে সেলামী ও খাজানা দিতেও চাহিয়াছে, কারণ একে ঐ জমি খুব উর্ব্বরা, তাহার উপর নিকটে জল থাকায় মকাই প্রভৃতি ফসল ভাল জন্মাইবে; কিন্তু আমি রাজী হই নাই।

কিন্তু কত দিন রাখিতে পারিব? সদর আপিস হইতে মাঝে মাঝে চিঠি আসিতেছে, সরস্বতী কুণ্ডীর জমি আমি কেন বিলি করিতে বিলম্ব করিতেছি। নানা ওজর-আপত্তি তুলিয়া এখনও পর্য্যন্ত রাখিয়াছি বটে, কিন্তু বেশী দিন পারিব না। মানুষের লোভ বড় বেশী, দুটি ভুট্টার ছড়া আর চীনাঘাসের এক কাঠা দানার জন্য প্রকৃতির অমন স্বপ্নকুঞ্জ ধ্বংস করিতে তাহাদের কিছুমাত্র বাধিবে না, জানি। বিশেষ করিয়া এখানকার মানুষে গাছপালার সৌন্দর্য্য বোঝে না, রম্য ভূমিশ্রীর মহিমা দেখিবার চোখ নাই, তাহারা জানে পশুর মত পেটে খাইয়া জীবন যাপন করিতে। অন্য দেশ হইলে আইন করিয়া এমন সব স্থান সৌন্দর্য্যপিপাসু প্রকৃতি-রসিক নরনারীর জন্য সুরক্ষিত করিয়া রাখিত, যেমন আছে কালিফোর্ণিয়ার যোসেমাইট ন্যাশনাল পার্ক, দক্ষিণ আফ্রিকার আছে ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক—বেলজিয়াম কঙ্গোতে আছে পার্ক ন্যাশনাল আলবার্ট। আমার জমিদারেরাও ল্যাণ্ডস্কেপ বুঝিবে না, বুঝিবে সেলামীর টাকা, খাজানার টাকা, আদায় ইরশাল, হস্তবুদ।

এই জন্মান্ধ মানুষের দেশে একজন যুগলপ্রসাদ কি করিয়া জন্মিয়াছিল জানি না—শুধু তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আজও সরস্বতী হ্রদের তীরবর্ত্তী বনানী এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি।

কিন্তু কত দিন রাখিতে পারিব?

যাক, আমারও কাজ শেষ হইয়া আসিল বলিয়া।

প্রায় তিন বছর বাংলা দেশে যাই নাই—মাঝে মাঝে বাংলা দেশের জন্য মন বড় উতলা হয়। সারা বাংলা দেশ যেন আমার গৃহ—তরুণী কল্যাণী বধূ যেখানে আপন হাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখায়, এখানকার এমন

লক্ষ্মীছাড়া উদাস ধূ ধূ প্রান্তর ও ঘন বনানী নয়— যেখানে নারীর হাতের স্পর্শ নাই।

কি হইতে যেন মনে অকারণ আনন্দের বান ডাকিল, তাহা জানি না। জ্যোৎস্না রাত্রি—তখনই ঘোড়ায় জিন কসিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর দিকে রওনা হইলাম, কারণ তখন নাঢ়া ও লবটুলিয়া বইহারের বনরাজি শেষ হইয়া আসিয়াছে—যাহা কিছু আরণ্য শোভা ও নির্জ্জনতা তা আছে তখনও সরস্বতীর তীরেই। আমি মনে মনে বেশ বুঝিলাম, এ আনন্দকে উপভোগ করিবার একমাত্র পটভূমি হইতেছে সরস্বতী হ্রদের তীরবর্ত্তী বনানী।

ঐ সরস্বতীর জল জ্যোৎস্নালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে—চিক্ চিক্ করিতেছে কি শুধু? ঢেউয়ে ঢেউয়ে জ্যোৎস্না ভাঙিয়া পড়িতেছে। নির্জ্জন, স্তব্ধ বনানী হ্রদের জলের তিন দিক বেষ্টন করিয়া, বন্য লাল হাঁসের কাকলী, বন্য শেফালিপুষ্পের সৌরভ, কারণ যদিও জ্যৈষ্ঠ মাস, শেফালিফুল এখানে বারোমাস ফোটে—

কত ক্ষণ হ্রদের তীরে এদিকে ওদিকে ইচ্ছামত ঘোড়া চালাইয়া বেড়াইলাম। হ্রদের জলে পদ্ম ফুটিয়াছে, তীরের দিকে ওয়াটার-ক্রোফুট ও যুগলপ্রসাদের আনীত স্পাইডার লিলির ঝাড় বাঁধিয়াছে। দেশে চলিয়াছি কত কাল পরে, এ নির্জ্জন অরণ্যবাস হইতে মুক্তি পাইব, সেখানে বাঙালী মেয়ের হাতে রান্না খাদ্য খাইয়া বাঁচিব, কলিকাতায় এক-আধ দিন থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিব, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কত কাল পরে আবার দেখা হইবে।

এই বার ধীরে ধীরে সে অনস্থভূত আনন্দের বন্যা আমার মনের কূল ভাসাইয়া দোলা দিতে লাগিল। যোগাযোগ হইয়াছিল বোধ হয় অদ্ভুত—এত দিন পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন, সরস্বতী হ্রদের জ্যোৎস্নালোকিত বারিরাশি ও বনফুলের শোভা, বন্য শেফালির জ্যোৎস্না-মাখানো সুবাস, শান্ত স্তব্ধতা—ভাল ঘোড়ার চমৎকার কোনাকুনি ক্যান্টার চাল—হু হু হাওয়া—সব মিলিয়া স্বপ্ন! স্বপ্ন! আনন্দের ঘন নেশা! সে বর্ণনা করা যায় না—প্রাণে প্রাণে, শিরায় শিরায়, রক্তের প্রাণকণায়, অনুভব করার জিনিস। আমি যেন যৌবনোন্মত্ত তরুণ দেবতা, বাধাবন্ধহীন, মুক্ত গতিতে সময়ের সীমা পার হইয়া চলিয়াছি—এই চলাই যেন আমার অদৃষ্টের জয়লিপি, আমার সৌভাগ্য, আমার প্রতি কোন্ সুপ্রসন্ন দেবতার পরম আশীর্ব্বাদ।

হয়তো আর ফিরিব না—দেশে ফিরিয়া মরিয়াও তো যাইতে পারি। বিদায়, সরস্বতী কুণ্ডী, বিদায় তীরতরু-সারি, বিদায় জ্যোৎস্নালোকিত মুক্ত বনানী! কলিকাতার কোলাহলমুখর রাজপথে দাঁড়াইয়া তোমার কথা মনে পড়িবে, বিস্তৃত জীবনদিনের বীণার অনতিস্পষ্ট ঝঙ্কারের মত—মনে পড়িবে যুগলপ্রসাদের আনা গাছগুলির কথা, জলের ধারে স্পাইডার লিলি ও পদ্মের বন, তোমার বনের নিবিড় ডালপালার মধ্যে শুষ্ক মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক, অস্তমেঘের ছায়ায় রাঙা ময়নাকাঁটার গুঁড়ি ও ডাল, তোমার নীল জলের উপরকার নীল আকাশে উড়ন্ত সিল্লি ও লাল হাঁসের সারি—জলের ধারের নরম কাদায় উপরে হরিণ-শিশুর পদচিহ্ন… নির্জ্জনতা। সুগভীর নির্জ্জনতা।…বিদায়, সরস্বতী কুণ্ডী!

ফিরিবার পথে দেখি, সরস্বতী হ্রদের বন হইতে বাহির হইয়া মাইলখানেক দূরে একটা জায়গায় বন কাটিয়া একখানা ঘর বসাইয়া মানুষ বাস করিতেছে—এই জায়গাটার নাম হইয়াছে নয়া লবটুলিয়া—যেমন নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ বা নিউ ইয়র্ক। নূতন গৃহস্থ-পরিবার আসিয়া বনের ডালপালা কাটিয়া (নিকটে বড় বন নাই, সুতরাং সরস্বতীর তীরবর্ত্তী বন হইতেই আমদানী নিশ্চয়ই) ঘাসের ছাওয়া তিন-চার খানা নীচু নীচু খুপড়ি বাঁধিয়াছে। তারই নীচে এখনও পর্য্যন্ত ভিজা দাওয়ার উপর একটা নারকেল কিংবা কড়ুয়া তেলের গলা-ভাঙা বোতল, একটি উলঙ্গ হামাগুড়ি-রত কৃষ্ণকায় শিশু, কয়েকটি সিহোড়া গাছের সরু ডালে বোনা ঝুড়ি, একটি মোটা রূপার অনন্ত পরা, বকের মত কালো আঁটসাঁট গড়নের বউ, খানকয়েক পিতলের লোটা ও থাল ও কয়েকখানা দা, খোন্তা, কোদাল। ইহাই লইয়া ইহারা প্রায় সবাই সংসার করে। শুধু নিউ লবটুলিয়া কেন, ইসমাইলপুর

ও নাঢ়া বইহারের সর্ব্বত্রই এইরূপ। কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে তাই ভাবি, ভদ্রাসন নাই, পৈতৃক ভিটা নাই, গ্রামের মায়া নাই, প্রতিবেশীর স্নেহমমতা নাই—আজ ইসমাইলপুরের বনে, কাল মুঙ্গেরের দিয়াড়া চরে, পরশু জয়ন্তী পাহাড়ের নীচে তরাই ভূমিতে—সর্ব্বত্রই ইহাদের গতি, সর্ব্বত্রই ইহাদের ঘর—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া

বেশ আছে ইহারা।

পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ পাইয়া দেখি রাজু পাঁড়ে এই ধরণের একটি গৃহস্থ-বাড়ীতে বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে। উহাকে দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিলাম। আমায় সবাই মিলিয়া খাতির করিয়া বসাইল। রাজুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে এখানে কবিরাজি করিতে আসিয়াছিল। ভিজিট পাইয়াছে চারি কাঠা যব, এবং নগদ আট পয়সা। ইহাতেই সে মহা খুশী হইয়া ইহাদের সহিত আসর জমাইয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে।

আমায় বলিল—বসুন, একটা কথার মীমাংসা করে দিন তো বাবুজী? আচ্ছা, পৃথিবীর কি শেষ আছে? আমি তো এদের বলছি বাবু, যেমন আকাশের শেষ নেই, পৃথিবীরও তেমনি শেষ নেই। কেমন তাই না বাবুজী? বেড়াইতে আসিয়া এমন গুরুতর জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা ভাবি নাই। রাজু পাঁড়ের দার্শনিক মন সর্ব্বদাই জটিল তত্ত্ব লইয়াই কারবার করে জানি এবং ইহাও জানি যে ইহাদের সমাধানে সে সর্ব্বদাই মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, যেমন রামধনু উইয়ের ঢিবি হইতে জন্মায়, নক্ষত্রদল যমের চর, মানুষ কি পরিমাণে বাড়িতেছে—তাহাই সরেজমিন তদারক করিবার জন্য যম কর্ত্তৃক উহারা প্রেরিত হয়—ইত্যাদি।

পৃথিবীতত্ত্ব যতটা আমার জানা আছে বুঝাইয়া বলিতে রাজু বলিল—কেন সূর্য্য তো পূর্ব্বদিকে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়, আচ্ছা কোন্ সাগর থেকে সূর্য্য উঠছে আর কোন্ সাগরে নামছে এর কেউ নিরাকরণ করতে পেরেছে? রাজু সংস্কৃত পড়িয়াছে, 'নিরাকরণ' কথাটা ব্যবহার করাতে গাঙ্গোতা গৃহস্থ ও তাহার পরিবারবর্গ সপ্রশংস ও বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজুর দিকে চাহিয়া রহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিল ইংরেজীনবীশ বাংগালী বাবুকে কবিরাজ মশায় একেবারে কি অথৈ জলে টানিয়া লইয়া ফেলিয়াছে। বাংগালী বাবু এবার হাবুডুবু খাইয়া মরিল দেখিতেছি।

বলিলাম—রাজু, তোমার চোখের ভুল, সূর্য্য কোথাও যায় না, এক জায়গায় স্থির আছে।

রাজু আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গাঙ্গোতার দল হা হা করিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে হাসিয়া উঠিল। হায় গ্যালিলিও! এই নাস্তিক ও বিচারমূঢ় পৃথিবীতেই তুমি কারারুদ্ধ হইয়াছিলে!

বিস্ময়ের প্রথম রেশ কাটিয়া গেলে রাজু আমায় বলিল—সূরযনারায়ণ পূর্ব্বে উদয়-পাহাড়ে ওঠেন না বা পশ্চিম-সমুদ্রে অস্ত যান না?

বলিলাম—না।

—এ-কথা ইংরিজি বইতে লিখেছে?

—হাঁ।

জ্ঞান মানুষকে সত্যই সাহসী করে, যে শান্ত, নিরীহ রাজু পাঁড়ের মুখে কখনও উঁচু সুরে কথা শুনি নাই—সে সতেজে, সদর্পে বলিল—ঝুট্ বাত্ বাবুজী। উদয়-পাহাড়ের যে গুহা থেকে সূরযনারায়ণ রোজ ওঠেন সে গুহা একবার মুঙ্গেরের এক সাধু দেখে এসেছিলেন। অনেক দূর হেঁটে যেতে হয়, পূর্ব্বদিকের একেবারে সীমানায় সে পাহাড়, গুহার মুখে মস্ত পাথরের দরজা, ঐ যে দেখছেন সূরযনারায়ণ, ওঁর অশ্বের রথ থাকে সেই গুহার মধ্যে। যে-সে কি দেখতে পায় হুজুর? বড় বড় সাধু মোহান্ত দেখেন। ঐ সাধু অশ্বের রথের একটা কুচি এনেছিলেন—এই এত বড় চক্‌চকে অভ্র—আমার গুরুভাই কামতাপ্রসাদ স্বচক্ষে দেখেছেন।

কথা শেষ করিয়া রাজু সগর্ব্বে একবার সমবেত গাঙ্গোতাদের মুখের দিকে চক্ষু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চাহিল।

উদয়-পর্ব্বতের গুহা হইতে সূর্য্যের উত্থানের এত বড় অকাট্য ও চাক্ষুষ প্রমাণ উত্থাপিত করার পরে আমি সেদিন একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেলাম। [ক্রমশঃ]

ডিরোজিও ও বঙ্গসমাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ

১৮

হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর যুগ

(১৮২৬-১৮৩১)

গত মাসে আমরা দেখিয়াছি, রামমোহন রায় প্রথমতঃ হিন্দু কলেজের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে এক জন ছিলেন; কিন্তু উত্তরকালে উহার ধর্ম্মবিহীন শিক্ষাদানে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

সংসারে প্রায় কোনও অনুষ্ঠানই অবিমিশ্র গুণের বা দোষের আধার হয় না। এই হিন্দু কলেজের দ্বারা তৎকালে যে পরিমাণ অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক পরিমাণে যে এ-দেশের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। রামমোহন রায়ের স্বপ্ন এই ছিল যে, ভারতবর্ষ এক দিন পৃথিবীর উন্নতিশীল জাতি সকলের সমকক্ষ হইবে, এবং স্বাধীন ভাবে তাহাদের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান করিবে। হিন্দু কলেজ যে তৎকালে, সমগ্র ভারতের না হইলেও অন্ততঃ বঙ্গদেশের, শিক্ষিত মানুষদের মনে, নিজ জাতির নিজ সম্প্রদায়ের ও নিজ দেশের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার ও বিশ্ব-মানবের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইবার প্রবৃত্তিটি জাগরিত করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে উন্নতি-শীলতা ও স্বাধীন চিন্তার ফলে "আমাদের দেশ গ্রাম্য-সভা হইতে বিশ্ব-সভায় আসন পাইয়াছে," ৮৮ তাহা সে যুগে হিন্দু কলেজ বহুল পরিমাণে দেশবাসীর চরিত্রে সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, হিন্দু কলেজ রামমোহন রায়ের আকাঙ্ক্ষিত কার্য্যেরই একটি অংশ সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিল।

হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর যুগের বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ডিরোজিওর কয়েক জন প্রসিদ্ধ ছাত্রের নামের তালিকা প্রদান করা যাইতেছে। এই তালিকায় যে যে নামের সঙ্গে তারিখ আছে, তাহা দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ১৮২৬-১৮৩১ সালে তাঁহাদের মধ্যে কাহার বয়স কত ছিল।

শিক্ষক ডিরোজিও, জন্ম ১০ই এপ্রিল ১৮০৯; হিন্দু কলেজে প্রথম নিয়োগ ১৮২৬ সালের মে মাসের মধ্যে; সীনিয়র বিভাগে সহকারী শিক্ষকরূপে নিয়োগ, ১৮২৭; দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক পদ প্রাপ্তি, ১৮২৮; হিন্দু কলেজের কর্ম্মত্যাগ, ২৫ এপ্রিল ১৮৩১; মৃত্যু, ২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১।

ছাত্রগণ:—রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র, হরিমোহন সেন, হরচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮০৮, মৃত্যু ১৮৬৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮)।

হিন্দু কলেজের যে সকল ছাত্র ডিরোজিওর সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন, ইঁহারা তাঁহাদের অন্তর্গত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সময়ে হিন্দু কলেজে পড়িতেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ছাত্রগণ সকলেই দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা উপরের নানা শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। উত্তরকালে ইঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু কলেজে পাঠকালে ইঁহাদের সহিত দেবেন্দ্রনাথের এক বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য ঘটিয়াছিল। তাহা এই যে, দেবেন্দ্রনাথ ডিরোজিওর ক্লাসে পড়েন নাই, তাঁহার সংস্পর্শে আসেন নাই, তাঁহার দ্বারা

প্রভাবিত হন নাই। অন্ত সকলে ডিরোজিওর ছাত্র হইয়া তাঁহার দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর যুগ এক অত্যাশ্চর্য্য যুগ। কিশোরের মন কিশোরের সংস্পর্শে যেমন প্রভাবিত হয়, লোকোত্তর-শক্তিশালী বয়োজ্যেষ্ঠের দ্বারাও তেমন প্রভাবিত হয় না। কৈশোরের চিত্তোন্মাদিনী শক্তির যে স্ফুরণ ডিরোজিওতে দেখা গিয়াছে, বঙ্গদেশে তাহার অনুরূপ ছবি আর কখনও দেখা গিয়াছে কি না, সন্দেহ। পাঠক একবার কল্পনার চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করুন, ১৭ বৎসর বয়স্ক শিক্ষক ডিরোজিও, ১৮ হইতে ১৩ বৎসর বয়স্ক ছাত্রগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়াছেন। শিক্ষক ডিরোজিওর মুখের আকৃতি ও ভাব চির-কিশোরের ন্যায়। গাল ছুটি বালকের গণ্ডদেশের ন্যায় স্ফীত ও গোল; চক্ষু ছুটি বিশাল ও ভাবপূর্ণ; মাথায় ঈষৎ দীর্ঘ, ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ কেশরাজি; তাহার মাঝখান দিয়া সোজা সিঁথি কাটা ৮১। জ্ঞান আহরণে, জ্ঞান বিতরণে এবং সর্ব্ববিধ সংস্কার-কার্য্যে উৎসাহদানে ডিরোজিওর এমন প্রবল আগ্রহ যে, তাঁহার নিকটে বসিলেই তাঁহার ছাত্রদের মন জ্ঞানলাভের ও সংস্কারের উৎসাহে অগ্নিময় হইয়া উঠে। শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলেই অল্পবয়স্ক; কাহারও প্রাণে মানব-জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা-প্রসূত দ্বিধা বা সংশয়ের লেশমাত্র নাই; সকলেরই প্রাণে কেবল অদম্য উৎসাহ; সকলেরই চিত্ত কেবল ভবিষ্যতের মনোমুগ্ধকর চিত্র অঙ্কিত করিতে উন্মত্ত। ডিরোজিওর চরিত্র হইতে সত্যানুরাগ, সৎসাহস ও দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা ছাত্রগণের প্রকৃতিতে প্রতিদিন সংক্রান্ত হইতেছে। তদুপরি, ছাত্রগণের ভালবাসা আকর্ষণ করিবার এক অপূর্ব্ব শক্তি ডিরোজিওর প্রকৃতিতে বিদ্যমান। ছাত্রগণের মনের ভাব এই যে, আমাদের এই প্রিয় গুরু যাহা কিছু বলেন তাহা বেদবাক্য সমান; এবং এই প্রিয় গুরুর প্রদর্শিত পথে চলিতে পারিলেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে ও ভারতের জন্য গৌরবময় সুদিন আগমন করিবে। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাত্রগণ তাঁহার কথা শুনিবার জন্য বসিয়া থাকে। যাহারা তাঁহার ক্লাসে পড়ে না, তাহারাও কিরূপে তাঁহার কাছে গিয়া বসিবে, এইজন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করে। তিনিও নানারূপ সভাসমিতি গঠন করিয়া এবং কয়েকখানি পত্রিকা প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রিয় ছাত্রগণের সহিত কার্য্যগত যোগের নানা সূত্র সৃষ্টি করিতে নিরত ব্যস্ত। তিনি শ্বেতকায় ইংরেজ নহেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ য়ুরেশীয় মাত্র। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত; ইংরেজ কবিগণের বহু কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ; ভাবপূর্ণ মধুর কণ্ঠে সে সকল কবিতা আবৃত্তি করিয়া করিয়া তিনি ছাত্রগণের চিত্ত উদ্বেলিত করিয়া তোলেন। সেই বয়সেই তিনি স্বয়ং এক জন সুকবি; তাঁহার রচিত কবিতায় বায়রনের অনুরূপ ভাবাবেগ এবং তৎসহ ভারতের প্রতি গভীর প্রেম মিশ্রিত। ডিরোজিও এবং তাঁহার ছাত্রবৃন্দের এই ছবিটি পাঠক একবার মনশ্চক্ষে দর্শন করিতে চেষ্টা করুন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে আপনাদের প্রায় সমবয়স্ক এক জন শিক্ষককে ঘিরিয়া উপবিষ্ট এমন একটি মুগ্ধ ছাত্রদল আর কখনও দেখা গিয়াছে কি না, সন্দেহ।

ডিরোজিও সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকশিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। কলেজের ভাল ভাল ছাত্রদিগকে তাঁহার কাছে আসিয়া মন খুলিয়া কথা কহিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা উৎসাহ দান করিতেন। টিফিনের সময়ে ও ছুটির পর কলেজ-গৃহে, এবং অন্য সময়ে ডিরোজিওর বাড়ীতে, তাঁহার প্রিয় ছাত্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিত। কখনও বা মুক্তভাবে চিন্তার বিনিময় হইত, কখনও বা কলেজের পাঠ্য-বহির্ভূত কোন ভাল বই পড়া হইত। এই সকল পুস্তকের অধিকাংশই কাব্য, দর্শন ও ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ ছিল।

"এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে, 'একাডেমিক এসোসিয়েশন্' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। মাণিকতলায় যে বাটীতে 'ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন্' বহু বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই উদ্যানবাটীতে উক্ত সভার অধিবেশন হইত, এবং ডিরোজিওর সভাপতিত্বে হিন্দু কলেজের উন্নত ছাত্রগণ কাব্য ও দর্শনাদি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও তর্কবিতর্ক করিত। একাডেমিক সভা এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, হেয়ার সাহেব সর্ব্বদা দর্শকরূপে সভায় উপস্থিত হইতেন। তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার এড্‌ওয়ার্ড রায়ান্, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের

প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্ণেল বেন্‌সন্‌, এড্‌জুটাণ্ট-জেনারেল কর্ণেল লীটসন্‌, এবং বিশপ্‌স্‌ কলেজের সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ ডাক্তার মিল্‌সও মধ্যে মধ্যে সভায় উপস্থিত হইয়া সভ্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ এই সভাতেই প্রথম মুখ খুলিতে শিখেন।"১০

"পাশ্চাত্য কবিগণের কাব্যের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ, রোম গ্রীস, প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত হইতে তত্তদ্দেশীয় মহাপুরুষদিগের স্বদেশপ্রেম সত্যনিষ্ঠা এবং আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি, তিনি ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার ও কথোপকথনের এমনই আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে কলিকাতার অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও ঝটিকাবৃষ্টি ভেদ করিয়া এবং গুরুজনদিগের নিষেধ অবহেলা করিয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইতেন। কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। তিনি নিজে অতি সুমধুর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার 'ফকীর অফ্‌ জঙ্গিরা' নামক খণ্ডকাব্য এবং নানাবিষয়িনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সে সময়ে অতি আদরের সহিত পঠিত হইত। কলেজে থাকিতে তিনি 'হেস্পেরস্‌' (*Hesperus*) এবং কলেজ পরিত্যাগ করিয়া 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান' (*East Indian*) নামক একখানি পত্র সম্পাদন করিতেন। তাঁহার ছাত্রদিগকে তিনি এই সকল পত্রে লিখিবার জন্ম সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। তাঁহার উৎসাহদানের ফলে ও প্রদত্ত শিক্ষার গুণে তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং পরিণামে সাহিত্যের সেবা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এনকোয়ারার' (*Enquirer*) এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাদ্বয় ডিরোজিয়োরই প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত লইয়া তখন বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রতিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই, হয় ধর্ম্মসভা নয় ব্রহ্মসভা, উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সতীদাহপ্রথা নিবারণ লইয়া তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিলোড়িত হইতেছিল। ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগকে এই সকল আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিতেন। ভারতের মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

"কিন্তু ক্রমে ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ ভ্রম ও কুসংস্কার সংশোধনের নামে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সমূলোৎপাটন, এই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবতার উচ্ছেদ করিতে যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন।১১ এবং হিন্দুসমাজে সহমরণপ্রথার ন্যায় কুসংস্কার ছিল বলিয়া সমাজপ্রচলিত যে কোন প্রথাই তাঁহারা কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুরাপান, গোমাংস ভক্ষণ এবং যবনান্ন-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহারা সমাজসংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অন্যান্য স্কুল কলেজেরও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। কলিকাতার গৃহে গৃহে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, এবং অনেক পিতামাতা সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হইলেন।

'হিন্দু কলেজে ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষার ফলে ভীত হইয়া কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ও নিষ্ঠাবান্‌ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ আপন আপন সন্তানদিগকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পাঠাইতেন। ডিরোজিয়োর শিক্ষার সমকালে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

"কিন্তু এ কথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উচ্ছৃঙ্খল হইলেও তাঁহারা অনেক স্থলে যে মানসিক বল দেখাইয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। জীবনের দৈনিক কার্য্যে শত শত প্রয়োজনীয় সংস্কার তাঁহাদিগেরই চেষ্টার ফলে সাধিত হইয়াছে। এমন এক দিন ছিল, যখন মস্তকের শিখাচ্ছেদনে এবং ডাক্তারী ঔষধ সেবনেও সমাজচ্যুত হইতে হইত। ডিরোজিয়োর ছাত্রদিগকে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া নিন্দা করিলেও সমাজের এই অবস্থা পরিবর্ত্তন কিয়ৎ পরিমাণে যে তাঁহাদেরই চেষ্টার ফলে হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদিগের চরিত্রের এই একটি প্রধান গুণ ছিল যে, যাহা তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা করিতে কখনও ভীত হইতেন না; এবং যাহা তাঁহারা কুসংস্কারমূলক ও ভ্রমপ্রণোদিত বলিয়া মনে করিতেন, কখনও তাহা করিতেন না। বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে যাইয়া নির্য্যাতন অত্যাচার উৎপীড়ন কিছুরই দিকে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।" ১২

ডিরোজিওর বিরুদ্ধে অভিভাবকগণের এবং হিন্দু জনসাধারণের মনে যে অসন্তোষ প্রধূমিত হইতেছিল, তাহা ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই:—ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে 'পার্থেনন' (*The Parthenon*) নামে ছাত্রদিগের একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইল; তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিয়া এমন সকল আপত্তিজনক প্রবন্ধ লিখিত হইতে লাগিল যে অভিভাবকগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ক্রোধের বিশেষ কারণ এই হইল যে, এই নূতন পত্রিকার লেখক খ্রীষ্টান্‌ ডিরোজিও নহেন, কিন্তু হিন্দুসমাজেরই অন্তর্গত তরুণবয়স্ক ছাত্রবৃন্দ।

অভিভাবকগণের এই প্রবল অসন্তোষ দর্শনে কলেজের সহকারী সভাপতি ডাক্তার উইল্‌সন্ ঐ পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

"কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিব্রত হইয়া হুকুম জারি করিলেন যে 'বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, যেন এমন কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে না দেওয়া হয়, যদ্দারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাস শিথিলীকৃত হইবার সম্ভাবনা। যদি কোনও শিক্ষক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন কথা ছাত্রদিগকে বলেন, অথবা তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে হিন্দু আচার বিরুদ্ধ পানাহারাদি কোনও কার্য্য করিতে দেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত হইবেন। ছাত্রেরা কোনও রাজনৈতিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনায় সভায় উপস্থিত হইলে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিরাগভাজন হইবে।' এই সকল হুকুম জারির পর কিয়ৎপরিমাণে বিপ্লবের শান্তি হইয়াছিল। কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে আবার গোলযোগ ঘটিল, এবং অভিভাবকগণ কলেজ হইতে আবার ছাত্র ছাড়াইতে লাগিলেন। পরিশেষে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ডিরোজিওকে পদচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গত্যন্তর না দেখিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে এপ্রেল তারিখে ডিরোজিও কর্ম্মে ইস্তফা দিলেন।" ১৩

ডিরোজিওকে পদচ্যুত করিবার প্রয়াস উপলক্ষে তাঁহার নামে নানা মিথ্যা কুৎসা প্রচার করা হইয়াছিল। তিনি ছাত্রদিগকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেন, তিনি ভাই-ভগিনীর বিবাহ সমর্থন করেন, প্রভৃতি কয়েকটি সাংঘাতিক মত তাঁহার প্রতি আরোপিত হইয়াছিল। নিন্দাকারিগণ এই সকল অপবাদের কোনও প্রমাণ দিতে অগ্রসর হইলেন না। কিন্তু ডিরোজিও অতি গম্ভীর ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় এই সকল অপবাদের খণ্ডন করিয়া, এবং নিন্দাকারিগণ যে সম্মুখে আসিতেছেন না, অপ্রকাশ্যে থাকিয়া কুৎসা প্রচার করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া, এক পত্র লিখিলেন। পত্রখানি *David Hare* পুস্তকের ২২-২৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। পত্রখানি পাঠ করিলে অল্পবয়স্ক লেখকের ভাষার গাঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, এবং আমাদের স্বদেশীয় নিন্দাকারীদের হীনতায় লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

'"কলেজের সহিত সংস্রব ঘুচিয়া যাইবার পরেও, ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রগণের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিয়মিত রূপে তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় ছাত্র, তিনি বিসূচিকা রোগে শয্যাশায়ী হইলে পর, অন্তিমকাল পর্য্যন্ত নিরতিশয় যত্নের সহিত তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন।" ১৪

এইরূপে ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৩১ ডিরোজিওর পার্থিব জীবনের অবসান হইল। তিনি চারি বৎসর মাত্র হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রগণ অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও, প্রথম যৌবনে এই গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত স্নেহপূর্ণ সুশিক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে ডিরোজিওর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৯

হিন্দু কলেজে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু

হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা ডিরোজিওর সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনে সেই সংস্পর্শের ফলাফল আমরা দেখিতে পাইলাম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজে যে ক্লাসে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন, ডিরোজিও সেই ক্লাসে পড়াইতেন না; এবং দেবেন্দ্রনাথের ভর্ত্তি হওয়ার কয়েক মাস পরেই ডিরোজিও কর্ম্মত্যাগ করেন। এই কারণে দেবেন্দ্রনাথ ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। দেবেন্দ্রনাথ যে ডিরোজিওর সংস্পর্শ লাভ করিতে পান নাই, বিধাতার বিধানে ইহা দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ও বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনে অতিশয় কল্যাণফলপ্রসূ হইয়াছিল।

বর্জ্জন ও রক্ষণ উভয় লইয়া মানব-সমাজের উন্নতি। সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ধর্ম্মের প্রেরণাতেই সম্ভবে। ধর্ম্ম কখনও কেবল বর্জ্জনশীলতার অথবা কেবল রক্ষণশীলতার দিকে প্রেরণা দান করেন না; যাহা কিছু কল্যাণকর, তাহার দিকেই প্রেরণা দান করেন। আমরা দেখিয়াছি, ডিরোজিওর শিষ্যগণ ভারতের দিকে ও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; সে সকলকে বর্জ্জন করাই তাঁহাদের পদ্ধতি হইয়াছিল। এইখানেই রামমোহন রায়ের সহিত হিন্দু কলেজের দলের

প্রধান পার্থক্য। রামমোহন রায় সংস্কারক ছিলেন বটে, কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে তিনি ছিলেন ধর্ম্মপ্রেরণায় চালিত মানুষ। তিনি ধর্ম্মভাবের প্রেরণাতেই সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; দেশীয় রীতিনীতিতে যাহা কিছু অযৌক্তিক, তাহার প্রতি বিরাগের প্রেরণাতে নহে। এই জন্য রামমোহন রায়ের প্রকৃতিতে রক্ষণ ও বর্জ্জন উভয় ভাবের সামঞ্জস্য ছিল। এই জন্যই তিনি, এক দিকে যেমন এ-দেশের সর্ব্ববিধ সংস্কার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তেমনই এ-দেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ ও উপনিষদকে এবং তদুর্খিত ব্রহ্মজ্ঞানকে সংরক্ষণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; এই জন্যই ভারতের গৌরব-অনুভূতি রামমোহনের অন্তরে আজীবন অতি উজ্জ্বল হইয়া বিদ্যমান ছিল; এই জন্যই রামমোহন পোষাক-পরিচ্ছদে ইংলণ্ডে গিয়াও ভারতীয় রীতি রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং এই জন্যই তিনি ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা অথবা ধর্ম্মবিহীন উদ্দাম সংস্কার-কার্য্য কখনও সমর্থন করেন নাই।

বালক দেবেন্দ্রনাথের উপরে রামমোহন রায়ের নিগূঢ় ও অনির্ব্বচনীয় প্রভাবের কথা সকলেই অবগত আছেন। সেই নিগূঢ় প্রভাবের একটি ফল এই হইয়াছিল যে, দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে আজীবন রক্ষণ ও বর্জ্জন উভয় ভাবের সামঞ্জস্য লক্ষিত হইয়াছিল; বরং বর্জ্জন অপেক্ষা যেন রক্ষণের দিকেই তাঁহার প্রকৃতি অধিক উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে যে সময়ে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে ডিরোজিও-শিষ্যগণেরই প্রাধান্য হইয়া উঠে, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কেবল বিপ্লব-সংঘটনে নিযুক্ত হন, সেই যুগে অতি ধীর অথচ অপ্রতিহত গতিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই শিক্ষিত সমাজের চিন্তা ও ভাবস্রোতের মুখ ফিরাইয়া আনিলেন। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ধীরপ্রকৃতি, অধ্যবসায়শীল, দেশের প্রতি আস্থাবান্ ও দেশের কল্যাণে নিত্য নিরত নূতন একটি দল গঠিত হইল; ক্রমে তাঁহারা শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। সে-যুগ প্রধানতঃ তত্ত্ববোধিনী সভার যুগ; তাহার বৃত্তান্ত অতি চিত্তাকর্ষক হইলেও তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত কালের ব্যাপার। এ জন্য আমরা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হিন্দু কলেজে পাঠের কিঞ্চিৎ বিবরণ দান করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি।

হিন্দু কলেজের দুই বিভাগ ও পাঠ্যপুস্তক

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নিজ আত্মচরিতে ও অন্যান্য প্রসঙ্গে হিন্দু কলেজের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, হিন্দু কলেজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত সীনিয়র ডিপার্টমেণ্ট এবং ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত জুনিয়র ডিপার্টমেণ্ট নামে পরিচিত ছিল। উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে বৎসরের শেষে একবারে দুই শ্রেণী বা তিন শ্রেণী উপরে উঠাইয়া দিতে পারা যাইত। সীনিয়র ডিপার্টমেণ্টের পাঠ্য বর্ত্তমান বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে কঠিন ছিল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে সীনিয়র ও জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা সীনিয়র এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র স্কলারশিপের পরীক্ষা দিতে পারিত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন পড়িতেন, তখন এই বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতের ২০, ২১ পৃষ্ঠায় হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর কোন কোন বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কোন্ কোন্ পুস্তক তৎকালে মনস্বী বঙ্গ-সন্তানদিগের প্রতিভাকে বিকশিত করিবার সাহায্য করিয়াছিল। সাধারণতঃ ১৮।১৯ বৎসর বয়সে ছাত্রগণ কলেজ ত্যাগ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই কলেজ ত্যাগ করেন। এরূপ বয়সের ছাত্রগণের পক্ষে এত বই পড়া বর্ত্তমান কালের বিচারপদ্ধতিতে একটু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সে কালে অসার আমোদ প্রভৃতির দ্বারা ছাত্রগণের মননশক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও অপব্যবহার ও অপচয় (dissipation)

ঘটিত না। মোটের উপরে আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে হিন্দু কলেজের এই শিক্ষাপ্রণালীর সুফলই দেখিতে পাইতেছি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, হিন্দু কলেজের এই কিঞ্চিৎ কঠোর শিক্ষার ফলেই তিনি (তাঁহার আত্মজীবনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত) য়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের গ্রন্থ বুঝিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং উত্তরকালে বিশ্বজগতে ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করিবার সাধনায় অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রদত্ত পাঠ্যতালিকা এইরূপ :—

"*English Literature* : Bacon's Essays. Shakespeare,—Macbeth, Lear, Othello, nnd Hamlet. Milton,—Paradise Lost, Lycidas, Comus, L' Allegro, Il Penseroso, Sonnets, etc. Pope,—Essay on Criticism, Rape of the Lock, Eloisa to Abelard, Elegy on the Death of a Young Lady, Prologue to the Satires, etc. Young,—Night Thoughts. Gray's Poems.

History : পুরাবৃত্তে কোন্ পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্দ্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত,—Hume's History of England (unabridged). Gibbon's Roman Empire (unabridged). Mitford's History of Greece. Fergusson's Roman Republic. Elphinstone's India. Russell's Modern Europe. সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ছাত্রিশ ভালাম হইবে।

Mathematics : Euclid,—First six books and Eleventh book. Algebra. Plane and Spherical Trigonometry. Analytical Conic Sections. Differential and Integral Calculus.

Mixed Mathematics : Whewell's Mechanics. Berkley's Astronomy. Websters's Hydrostatics. Phelp's Optics. Calculation of Eclipses."

পাঠ্যপুস্তক বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইত। ডিরোজিওর জীবনচরিতে ও হিন্দু কলেজের অন্যান্য ছাত্রগণের লিখিত বৃত্তান্তে কোন কোন বৎসরের পাঠ্যপুস্তকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পুস্তক পরিবর্ত্তন হইলেও মোটামুটি সব বৎসরের পাঠ্যমান (standard) প্রায় একই প্রকারের থাকিত। কলেজের অধিকাংশ মনস্বী ছাত্র এই সকল পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত Lock, Hume, Reid ও Dugald Stewart-এর দার্শনিক গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন।

মন্তব্য

(৮৮) অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিতের ৩০ পৃষ্ঠায় এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

(৮৯) পাঠক 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে (তৃতীয় সংস্করণে ৮৭ পৃষ্ঠার সম্মুখে) ডিরোজিওর ছবি দেখিতে পাইবেন।

(৯০) 'শিবচন্দ্র', ৩৮ পৃঃ।

(৯১) গত মাসের প্রবাসীতে ১৭শ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

(৯২) 'মাইকেল', ৩০-৪২ পৃঃ।

(৯৩) 'শিবচন্দ্র', ৩৯ পৃঃ।

(৯৪) 'শিবচন্দ্র', ৩৯ পৃঃ।

[কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে প্রবাসীর সাত সংখ্যায় প্রকাশিত সমগ্র প্রবন্ধটির অনেক উদ্ধৃতোক্তি মূল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়া শ্রীমান্ অশোকলাল ঘোষ বি-এ আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।]

প্রবন্ধ সমাপ্ত

হান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেন

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

আক'রে ও জনসংখ্যায় ডেনমার্ক দেশটি ছোট। সেখানকার জনসাধারণের শিক্ষানীতি, কৃষি, গোপালন ও গোদুগ্ধ-জাত দ্রব্যের ব্যবসায়-সমৃদ্ধির কথা অনেকেই জানেন বা শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু ডেনমার্ককে আপন দেশের গণ্ডীর



হান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেন

বাহিরে পরিচিত করিতে সর্ব্বাপেক্ষা সহায়তা করিয়াছেন এই দেশেরই একটি গরীব ঘরের সন্তান; তাঁহার নাম হান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় আণ্ডেরসেনের নাম না জানে বা তাঁহার গল্প না পড়িয়াছে এমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই তাঁহার গল্প অনূদিত হইয়া বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। আমেরিকার শিকাগো শহরের লিংকলন পার্কে আণ্ডেরসেনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এশিয়া মহাদেশের চীনা, জাপানী, বাংলা ও আরবী ভাষায় আণ্ডেরসেনের গল্পের অনুবাদ হইয়াছে। এমন কি গ্রীনল্যাণ্ডবাসী এস্কিমোদের ভাষায় পর্য্যন্ত তাঁহার বহু গল্প অনূদিত হইয়াছে।

১৯৩৫ সালের প্রথম ভাগে ডেনমার্ক দেশ ঘুরিতে গিয়াছিলাম; তখন ওডেন্‌সে (Odense) শহরে আণ্ডেরসেনের বাড়ী, মিউজিয়মটিও দেখিয়া আসিয়াছি। ডেনমার্ক দেশ তিনটি প্রদেশে বিভক্ত; যথা—সিল্যাণ্ড, ফ্যিন ও জুটল্যাণ্ড। প্রথমোক্ত প্রদেশ দুইটি দ্বীপবিশেষ, তৃতীয়টিরও তিন দিকেই সমুদ্র,—শুধু দক্ষিণ দিক জার্ম্মেনীর



আণ্ডেরসেনের বাড়ী ও আণ্ডেরসেন-মিউজিয়ম

সঙ্গে যুক্ত। ফ্যিন দ্বীপ-প্রদেশটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও ইহারই প্রধান শহর হইল ওডেন্‌সে। ইহা যে দেশের প্রাচীনতম শহর, তাহা ইহার নাম হইতে অনুমান করা যায়। এই শহরের এক ক্ষুদ্র গলিতে এক নগণ্য চর্ম্মকারের গৃহে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে হান্‌স্ আণ্ডেরসেনের জন্ম হয়। সাড়ে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত হান্‌স্ পিতামাতার সঙ্গে ওডেন্‌সে শহরেই কাটাইয়াছিলেন। পরিবারটি কোনদিনই লক্ষ্মীর কৃপা

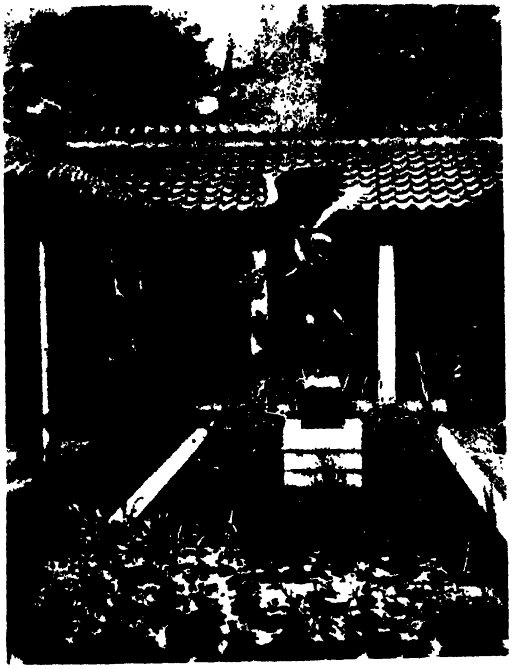


আণ্ডেরসেন-মিউজিয়মের প্রবেশদ্বার ও প্রাচীর-চিত্র

লাভ করে নাই; দারিদ্র্য উঁহার চিরসঙ্গী ছিল। হান্‌সের পিতা নিজের ব্যবসায়ে অর্থাৎ জুতা-মেরামতের কাজেও দক্ষ ছিলেন না; তাছাড়া তিনি ছিলেন অদ্ভুত ভবঘুরে প্রকৃতির লোক। নিজে বিশেষ পড়াশোনা করার সুযোগ পান নাই বলিয়া জীবনটাকেই ব্যর্থ বলিয়া মনে করিতেন। নানা অভিনব কাজের মধ্যেই তিনি জীবনের আনন্দ পাইবার চেষ্টা করিতেন—দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে তাঁহার কোন আগ্রহ ছিল না। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক কৃষক-যুবকের প্রতিনিধিরূপে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হন। তাঁহার আশা ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়া যশ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। কিন্তু সৈনিক-জীবনের সহিত তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না; কোন যুদ্ধেও তাঁহার ডাক পড়ে নাই, কোন সামরিক পদবী পাওয়া তো দূরের কথা। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নিতান্ত ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং সেখানেই ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হান্‌সের জননীর চরিত্র ছিল তাঁহার স্বামীর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন সবল ও কর্ম্মপরায়ণা; ভাবরাজ্যের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না। নিজ গৃহকে তিনি যথাসাধ্য সুশৃঙ্খল করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন ও বয়সে চৌদ্দ বৎসরের বড় রুগ্ন স্বামীকে প্রাণপণ সেবা করিতেন। সর্ব্বোপরি, সমস্ত হৃদয় দিয়া হান্‌স্‌কে তিনি বড় করিয়াছিলেন, যদিও স্বভাবের দিক্ দিয়া পিতার সহিতই হান্‌সের মিল ছিল বেশী। হান্‌সের মা শহরের ঘরে ঘরে গিয়া মলিন কাপড়চোপড় সংগ্রহ করিয়া নদীর ঘাটে বসিয়া পরিষ্কার করিতেন। হান্‌সের পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পর তাঁহার মা আবার বিবাহ করেন। এই স্বামীও ছিলেন চর্ম্মকার এবং তাঁহারও গুণ বিশেষ কিছু ছিল না। দ্বিতীয় স্বামী বয়সে স্ত্রী অপেক্ষা উনিশ বৎসরের ছোট ছিলেন। দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার মূলে ছিল ধোপানীর কাজে সাহায্য পাওয়া; কিন্তু স্বামী পূর্ব্বপক্ষের সন্তান হান্‌স্‌কে ভাল চক্ষে দেখিতেন না।

হান্‌স্ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এক ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান, হস্তলিপি ও সাধারণ যোগ-বিয়োগ-পূরণ-ভাগ মাত্র সেখানে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরে কি হয় না-হয় তাহা দেখিবার ও বুঝিবার স্বাভাবিক আগ্রহ ও ক্ষমতা হান্‌সের ছিল। বর্ত্তমানে ওডেন্‌সে শহরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের বাস কিন্তু তখন ছিল মাত্র পাঁচ হাজার। এই ক্ষুদ্র শহরের বাহিরে উর্ব্বরা ফ্যিন দ্বীপের মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে হান্‌স্ সময়ে অসময়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বাল্যজীবনের অধিকাংশ কালই তিনি ওডেন্‌সে নদীর অদূরে কাটাইয়াছিলেন। নদীটি ডেনমার্কের বৃহত্তম নদীগুলির মধ্যে একটি। এই নদীর ঘাটেই তাঁহার মা সর্ব্বদা কাপড়চোপড় ধুইতেন। মার সঙ্গে থাকিতেন বালক হান্‌স্। উঁচু পাথরের উপর বসিয়া জলের ছোট ছোট মাছগুলির খেলা ও নদীপারের গর্ত্তগুলিতে নানা আকারের ইঁদুরের আনাগোনা একান্তমনে তিনি লক্ষ্য করিতেন। প্রাচীন শহর



আণ্ডেরসেন-মিউজিয়মের উদ্যান

ওডেন্সের ও দেশের পূর্ব্বযুগের বীরদের কীর্ত্তিকাহিনীর কথা শুনিতে তিনি বিশেষ আনন্দ পাইতেন। ওডেন্সে শহরের প্রাসাদে ১৮১৫-১৯ পর্য্যন্ত দ্বীপের গবর্ণর ও ডেনমার্কের ভাবী রাজা বাস করিয়াছিলেন। ওডেন্সে তখন ছিল ডেনিশ অভিজাত-সম্প্রদায়ের বাসস্থান ও শিক্ষা-সভ্যতার কেন্দ্র। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওডেন্সে শহরে নাট্যশালা স্থাপিত হয়। এই নাট্যশালা হানসের জীবনের সার্থকতায় অনেক সহায়তা করিয়াছে। গরীব বলিয়া তাঁহার পিতা-মাতা ছেলেকে ইচ্ছামত অভিনয় দেখিতে যাইতে দিতে পারিতেন না; তাই হান্স্ অভিনয়ের বিজ্ঞাপন কুড়াইয়া আনিয়া অতি মনোযোগের সহিত পড়িয়াই খুশী থাকিতেন। এই বিজ্ঞাপনগুলি তাঁহার কল্পনাকে বিশেষ বিচলিত করিত। গল্প শুনিয়া ও পড়িয়াই তিনি সময় কাটাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে প্রসিদ্ধ ডেনিশ হাস্যরসিক লুড্‌ভিক্ হলবের্গের কমিডি পড়িয়া শুনাইতেন। শহরের এক ধর্ম্মযাজকের স্ত্রীর বাড়ীতে হান্স্ শেক্‌সপীয়ারের রচনার অনুবাদ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাছাড়া বালক হান্স্ শহরের রোগীশালায়ও যাতায়াত করিতেন ও অশিক্ষিত গরীব রোগীদের কাছে বসিয়া নানা গল্প শুনিতেন। কল্পনায় হান্স্ নিজের ও নিজের ভবিষ্যতের ছবি আঁকিতেন—তাঁহার প্রধান ইচ্ছা ছিল জীবনে বড় হওয়া, যশ অর্জ্জন করা। কিন্তু সেই যশের মূল্যস্বরূপ যে দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ তাঁহার কপালে ছিল, সে-কথা তিনি তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই হান্স্ বুঝিয়াছিলেন যে আপন জীবনের পথ প্রশস্ত করিতে হইলে নিজ বাড়ী ও ওডেন্সে ছাড়িয়া যাওয়া প্রয়োজন। শহরের সকলেই জানিত যে হান্সের পিতামহ প্রায় উন্মাদ ছিলেন; সেজন্য হান্সের বড় হওয়ার কল্পনাকেও সকলেই তাঁহার পিতামহের গুণ পাওয়ার ফল বলিয়াই মনে করিত। সমস্ত শহরের মধ্যে মাত্র জনকয়েক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি হান্সের



মিউজিয়মে আণ্ডেরসেনের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিতে দেখা যাইতেছে, আণ্ডেরসেন গল্প পড়িয়া শুনাইতেছেন, শিশুরা তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতেছে



আণ্ডেরসেন-মিউজিয়মে প্রাচীর-চিত্র। আণ্ডেরসেন কলিন-পরিবারকে গল্প শুনাইতেছেন, ইহাই চিত্রের বিষয়

সেখানে আজ তাঁহার বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি বিদ্যমান। বহু দুঃখের দিন তিনি সেখানে কাটাইয়াছেন। কোপেনহাগেনে আসিবার সময় তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সেখানকার নাট্যশালায় তিনি গায়ক হিসাবে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। এই ধারণায় তিনি নাট্যশালার সঙ্গীতজ্ঞের নিকট পাঠগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন সবে তিনি বাল্যসীমা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার গলা একেবারে বসিয়া যায়, সেজন্য গান ছাড়িয়া তিনি নৃত্যকলা শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দিন-কয়েক যাইতে না-যাইতেই বোঝা গেল যে তাঁহার ক্ষমতার কথা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কল্পনারাজ্যের সঙ্গে তাঁহার মাতার কোনরূপ যোগ ছিল না; তিনি আপন সন্তান হান্‌সকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না এবং এই জন্য তিনি হান্‌সের কোপেনহাগেনে যাওয়ার প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। এক বিচিত্র কারণে তিনি বালকের ইচ্ছায় মত দিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই—শহরের হাসপাতালে এক গণৎকার বৃদ্ধার সঙ্গে হান্‌সের মার দেখা হয়। সে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে তাঁহার ছেলে জীবনে বিশেষ যশস্বী হইবে এবং সেই গৌরবে ওডেন্সে শহর এক দিন আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া হান্‌সের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৪ বৎসর বয়সে হান্‌স্ তাঁহার জন্মস্থান ও বাড়ী ছাড়িয়া প্রধান শহর কোপেনহাগেনে চলিয়া আসেন। সেখানে কোথাও কাহার নিকট সাহায্য পাওয়া যাইবে, কি ভাবে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে কিছুই তাঁহার জানা ছিল না। এই সময়েই তাঁহার প্রকৃত জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয়। অতিকষ্টে অর্জ্জিত সামান্য রুটি-মাখন যে-বাগানে বসিয়া খাইতেন,

অতি ক্ষীণ ছিপছিপে চেহারা নৃত্যবিদ্যা শিক্ষার মোটেই উপযোগী নয়। ইতিমধ্যে হান্‌স্ ছোটবড় অনেকগুলি নাটক রচনা করেন। সেগুলি পড়িয়া নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষেরা বুঝিয়াছিলেন যে এই যুবকের মধ্যে রচনার ক্ষমতা নিহিত আছে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাহা বিকাশ পাইতেছে না। এই ভাবে তিন বৎসর কাল কাটিয়া যায়। পরে জনাস কলিন (Jonas Collin) নামক নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষীয় এক জন ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া হান্‌সকে একটি রাজকীয় বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া দেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে স্লাগেল্‌সে (Slagelse) শহরের গ্রামার স্কুলে সতর বৎসরের হান্‌স্ বার-তের বৎসরের বালকদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠ সুরু করেন। বিদ্যালয়ে বাল্যেই যাহা শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল, এখন বহু বিলম্বে তিনি তাহা শিখিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার সময়েই লেখক হিসাবে তাঁহার নাম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কোপেনহাগেনের সংবাদপত্রে স্থান পাইয়াছিল। এক পুস্তক-প্রকাশক তাঁহার রচনাগুলি প্রকাশও করেন। হান্‌স্ এই পুস্তকে উইলিয়ম ক্রিশ্চিয়ান ওয়াল্টার এই

ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। এই বইয়ের কিন্তু কোন কাটতি হয় নাই।

এই বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় তাঁহার জীবনের চরম দুঃখের কাল। সহজেই উত্তেজিত, চঞ্চলমতি হান্‌স্‌কে প্রধান শিক্ষক মোটেই বুঝিতে পারিতেন না। হান্‌স্ প্রধান শিক্ষকের পরিবারেই থাকিতেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান শিক্ষক এলসিংঘরে (Elsingore-এ) বদলি হন, সঙ্গে হান্‌স্‌কেও লইয়া যান। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত কলিন হান্‌স্‌কে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া কোপেনহাগেনে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে হান্‌স্ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া বিদ্যালয়ের সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।



আণ্ডেরসেন-মিউজিয়মে রক্ষিত এই পুতুলগুলির সাহায্যে তাঁহার লিখিত একটি গল্প বর্ণিত হইয়াছে

গ্রামার স্কুলে পড়িবার সময় অতি ভগ্ন হৃদয়ে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতা "The Dying Child" রচনা করেন। ইহা ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কোপেনহাগেনের বিখ্যাত কাগজে ও পরে জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি-সমাজে তাঁহার যশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ফাবর্গ (Faaborg) শহরে রিবর্গ ভৈগ্‌ট (Riborg Voigt) নামক এক তরুণীর সঙ্গে হান্‌সের পরিচয় হয়। হান্‌স্ তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন; তরুণীটিও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি হান্‌সের দেওয়া ফুলের তোড়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পূর্ব্বেই বাগ্‌দত্তা। আণ্ডেরসেন এই প্রেমময় বেদনায় বিদ্ধ হইয়া অনেক কবিতা রচনা করিয়া তরুণীটিকে উপহার দিয়াছিলেন। আণ্ডেরসেনের মৃত্যুর



আণ্ডেরসেন কর্তৃক কাগজ-কাটিয়া-প্রস্তুত একটি ছবি। শিশু পুস্তক-চিত্রণের জন্য এইরূপ বহু ছবি তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন



আণ্ডেরসেন কর্তৃক ব্যবহৃত আসবাবপত্র

করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে যখনই কোন বিশেষ দুঃখের কারণ ঘটিয়াছে, তখনই তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তিনি দেশভ্রমণে বাহির হইতেন। মিউজিয়মে রক্ষিত তাঁহার বিদেশ-যাত্রায়াদের পাসের সংখ্যা অনেক। ১৮৩৩-৩৪ সালে তিনি ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড, ইটালী ও জার্মেনী ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা "Improvisator" প্রকাশ করেন। বইখানা ডেনিশ ভাষায় প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি নিজের জীবনী ও ইটালীর বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী বৎসরে পর পর তাঁহার কতকগুলি উপন্যাস বাহির হয়। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "Only a Fiddler"। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনেক গল্প পর পর পুস্তকাকারে বাহির হয়।

পর জামার ভিতরে বুকের উপরে ঝুলান একটি চামড়ার ব্যাগে ভৈগ টের একখানা পত্র পাওয়া যায়। এই চিঠি ও তাঁহার জীবন-সংক্রান্ত কাগজপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এখন ওডেন্সের আণ্ডেরসেন-মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

ভৈগ ট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া, কিছুকাল যাপনের পর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার শিক্ষাদাতা কলিনের কনিষ্ঠা কন্যার সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার প্রতি প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। এবারও নিরাশার দুঃখ তাঁহার কপালে লেখা ছিল—পরবর্তী বৎসরে কলিন-তনয়া শ্রীযুক্ত লিণ্ড নামক এক যুবক আইনজীবীর বাগ্‌দত্তা হন। এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আণ্ডেরসেন বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হন। পরে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্তা লিণ্ডের (পূর্ব্বে শ্রীমতী কলিন) পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। শ্রীযুক্তা লিণ্ডের পুত্র-কন্যাদের পিতৃব্যস্থানীয় হইয়া তাঁহাদিগকে বহু ছবির বই উপহার দেন। ইহার মধ্যে একটি বইয়ের সমস্ত ছবি তাঁহার নিজের আঁকা। আণ্ডেরসেন কাগজে অনেক রকমের ছবি কাটিয়াছিলেন। এই সংগ্রহ দেখিলে তাঁহার কল্পনার পরিসরের কথা বুঝা যায়।

আণ্ডেরসেন জীবনে বহুবার বিদেশ ভ্রমণ

আণ্ডেরসেনের প্রতিভা বিদেশেই প্রথমে সমাদর লাভ করে। বহু দেশের সকল বয়সের লোকেরা তাঁহার গল্প পড়িয়া তাঁহার নিকট চিঠিপত্র লিখিতেন। তাহাদের মধ্যে বালক-বালিকার সংখ্যা ছিল অনেক। রচনার সূত্রেই ডিকেন্সের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। নিজের দেশের লোকেরা তাঁহার প্রতিভা অপেক্ষা ব্যক্তিগত চরিত্রের বিচিত্র ও অসাধারণ দিকের আলোচনা করিয়াই অধিক আনন্দ পাইত। আণ্ডেরসেনের রচিত গল্পের কদাকার রাজহংস-শাবকের ন্যায় তিনি নিজেও ছিলেন অদ্ভুত, সেজন্য তাঁহাকে জীবনে বহু দুঃখ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহার চেহারা লইয়া প্রচুর বিদ্রূপ-বাণ তাঁহার উপর বর্ষণ করিয়াছে। দরিদ্র চর্মকারের গৃহে তাঁহার জন্ম, উপযুক্ত বয়সে শিক্ষালাভের সুযোগ তিনি পান নাই। তাছাড়া দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতা

আরও বাড়িয়াছিল। তাঁহার সহজে উত্তেজিত চরিত্রের সুযোগ লইয়া ব্যঙ্গবাণে যাঁহারা তাঁহাকে আঘাত দিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহার বিচিত্র জীবন ও চরিত্রের মধ্যেই তাঁহার রচনার উৎস বিদ্যমান, এই উৎস হইতেই তাঁহার কল্পনা ও রচনা শক্তির উদ্ভব। একই কারণে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ছেলে-মেয়ে বৃদ্ধবৃদ্ধা সকল রকম পাঠকই তাঁহার গল্প উপভোগ করিতে পারে; তাঁহার গল্পের গোড়াকার কথা—বিচিত্র মানব-চরিত্র।

আণ্ডেরসেনের জীবনকাহিনী পড়িলে তাঁহার লেখা সম্বন্ধে অন্য একটি ধারণা মনে আসে। বুঝা যায় যে তিনি সৌখীন গল্পলেখক ছিলেন না। আয়াসসাপেক্ষ কল্পনা হইতে তাঁহার গল্পের সৃষ্টি হয় নাই এবং শুধু আনন্দ যোগাইবার জন্যও আরামে বসিয়া রচনা করিতে সুযোগ তিনি পান নাই। তাঁহার প্রত্যেকটি গল্প বা রচনা আন্তরিকতায় রঞ্জিত। জীবিকার জন্য তিনি অনেক নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু গল্পরচনাতেই তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান।

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৫

সোমবার বহু দূরের কথা, আপাততঃ শনিবার আসিল। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের সুবিধা অনেক। সস্তা ভাড়ায় যাতায়াতের টিকেট পাওয়া যায়। অমিয় সপ্তাহান্তিক যাত্রীর সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে—অল্প ভাড়ায় টিকেট কিনিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিয়াছে। খগেনবাবু দরখাস্তটি ফেরত পাইবার আশায় অমিয়র কাছে আসিয়া সত্য কথাই শুনিয়াছেন—এবং হবিপুষ্ট পাবকের মত জ্বলিয়া উঠিয়া ছুটি না পাওয়া পর্য্যন্ত সেক্‌শনটিকে জ্বালাইয়া মারিয়াছেন। দাদা অনুপস্থিত বলিয়া কলহটা ভাল করিয়া বাধে নাই। সে সুযোগ সোমবার হয়তো মিলিবে। কিন্তু আজ শনিবার—লোকজনের ব্যস্ততার অন্ত নাই। কাহারও ভুল লইয়া কাহারও সঙ্গে দীর্ঘ কলহ বাধাইবার দিন আজ নহে। আপিসের কঠিন শাস্তির ধারা আজ কিছু কোমল বোধ হইতেছে, প্রবল এক অনুভূতি অন্য সব চেতনাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। আজ পোঁটলাপুঁটুলিতে মানুষ ভারাক্রান্ত; ব্যাগে, ঝাড়নে, ঝুলিতে সে সঞ্চয় করিয়া চলিতেছে। এক পয়সার পাতিলেবুর পাশে এক টাকা দামের সুরভিত কেশতৈল ও লালপাড় শাড়ীর সঙ্গে বার্লির কৌটা—কোনটার মূল্যই আজ তুচ্ছ নহে। কপি আছে, বালতি আছে; পাউরুটি, বিলাতী কুল, কমলা লেবু, বেদানা ও মশলাপাতি, খোকাখুকুর লজেঞ্জ, বিস্‌কিট্—কোন্‌টা নাই? বহু প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুর চাপে অন্তরের অভাব এই একটি দিনের তরে কোথায় যেন তলাইয়া যায়। কেন যায়? মুক্তিপ্রয়াসী ও বৈচিত্র্য-প্রয়াসী মানুষ আজ ট্রেনে চাপিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য জীবনকে এই সব তীব্র অনুভূতি আনন্দের মাঝে চাখিয়া চাখিয়া ভোগ করিতে পারিবে। আপিসের উৎপীড়ন ও বাড়ীর দুঃখকষ্ট—তারই মাঝখানে রেলপথের সুদীর্ঘ মুক্তি-সেতু

অমিয়র হাতে পয়সা বিশেষ কিছু ছিল না। মাহিনার দেরি আছে, কিন্তু টাকার অভাব হয় নাই। যে-আড়তদারের বাসায় সে থাকিত সেই যাচিয়া টাকা দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে। লক্ষ্মীর প্রাসাদ-পথটি যে সৌভাগ্যবান একবার চিনিয়াছে সূচীভেদ্য

অন্ধকারেও সে পথ ভুল করিবে না, এই বিশ্বাস আড়ভদারের ছিল। দুটি টাকা হাতে দিয়া সে বলিয়াছিল—"বাড়ী ঘুরে এস, ঠাকুর।"

ঠাকুর অর্থে আমরা শহরবাসীরা আজকাল পাচক ব্রাহ্মণের কথাই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু ঠাকুর যে সম্মানবাচক সম্বোধন—এ-কথা এখনও সত্যকারের পল্লীগ্রামের লোকেরা বুঝিয়া থাকে।

দুটি টাকার মধ্যে আট আনা মাত্র ভাড়ায় যাইবে। বাকীটায় কি জিনিষ সে কিনিবে? শিবপূজার জন্য একখানি তামার টাট মা কিনিতে বলিয়া দিয়াছিলেন; পুরানো টাটখানি ফুটা হইয়া গিয়াছে, জল পড়িয়া যায়। আরও বহু জিনিষ আছে, কিন্তু সে-সব মাসকাবারের প্রতীক্ষায় থাকুক। ছুটি হইলে টিকেট কাটিয়া সে শিয়ালদহের বাজার ঘুরিতে গেল। শীত শেষ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি কপির আমদানি কমে নাই। গরিবের পক্ষে তরকারি কিনিবার কালাকাল নাই। এ সময়ে দেশে পাতিলেবু পাওয়া যায় না, দামও চড়া। কমলা লেবু শুকাইয়া গেলেও অখাদ্য নহে। ভাল কথা, মাথা আঁচড়াইবার জন্য চিরুণী একখানি আবশ্যক। পটোলের সের বার আনা হইলেও তরকারি হিসাবে নূতন এবং লোভনীয়। একখানা গন্ধ-সাবান, কাপড়-কাচা সাবানের একটা ডেলা, সুপারি, খয়ের, কিছু কিছু মশলা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ দোকানে ঠাসা রহিয়াছে। বাজারে ঢুকিয়া মনে হয়, কত বৃহৎ অভাবকে আমরা ক্ষুদ্র সংসারে চক্ষু বুজিয়া গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। শুধু আলুভাতে দিয়া ভাত খাওয়া চলে, আবার বার আনা সেরের পটোল সম্মুখে পড়িলে রুচির দোহাই দিয়া তাহাও কিনি। শুধু খয়ের-সুপারিতে যে-পান মিষ্ট লাগিবার কথা, অনেক রকমের মশলা দেখিয়া সে-পানের স্বাদ বদলাইয়া যায়। যে শাড়ীর বিবিধতর পাড় না দেখিয়াছে—সেই হয়তো আটপৌরে কাপড় খুশী মনে গ্রহণ করে।

সে যাহা হউক, একটি সিকি হাতে থাকিতে অমিয়র ট্রেনের সময় হইয়া গেল। ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সে ট্রেনে চাপিল।

ট্রেনে ভিড় হইয়াছে মন্দ নহে; গরমও কিছু বোধ হইতেছে। সূর্য্য-অভিমুখী জানালার দিকে কেহ বসিতে চাহিতেছেন না, মাঝখানেও বসিবার আগ্রহ কম। একটি কোণ ঘেঁসিয়া, রৌদ্র বাঁচাইয়া ও ফাঁকা মাঠের পানে চাহিবার সুবিধা করিয়া বসিবার আগ্রহই সকলের বেশী। প্রত্যেকেই আধময়লা ঝাড়ন বা বাদামী রঙের কাগজ অথবা পুরাতন সংবাদপত্র পাতিয়া বসিয়াছেন—ফরসা কাপড়কে ফরসা রাখিবার চেষ্টা ও ছারপোকার আক্রমণ হইতে দেহরক্ষা—দুই কার্য্যই ইহাতে চলে ভাল। নিজে বসিয়া আরও পরিচিত পাঁচ জনকে ডাকিয়া পাশে বসাইতেছেন। পান, সিগারেট ও বিড়ি বিতরণে আজ কাহারও কার্পণ্য নাই; হাতের সংবাদপত্র যেখানি ছিল, তাহার পাতাগুলি বণ্টিত অবস্থায় বেঞ্চিস্থ সকলের সংবাদ-ক্ষুধাই কিঞ্চিৎ মিটাইতেছে। কিন্তু শনিবারের দুপুরে বাড়ী যাইবার সময়ে এ-সবের আবশ্যকও বড় বেশী দেখা যায় না। কোন বন্ধুর সঙ্গে সপ্তাহ-পরে দেখা হইয়াছে, কেহ বা মাসান্তের অপরিচয়ের যবনিকাখানি তুলিয়া ধরিয়াছেন—তাহাদের সংসারের ও জীবনের বিচিত্র কলরব ও কাহিনীতে কয়েক ঘণ্টা সুখস্বপ্নের মতই হয়তো কাটিয়া যাইবে। হাসিমুখে তাহারা দুঃখের গল্প জমাইবে—এবং চোখের জল না ফেলিয়াই করুণ কাহিনীতে বর্ণ সমাবেশ করিবে। সত্যই কি এই গতিশীল ট্রেনের পথে কেহ কাহারও দুঃখ বুঝিবার চেষ্টা মাত্র করিয়া থাকে? দুঃসহ গতিবেগে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহিঃপ্রকৃতি যেখানে পরিবর্ত্তনের বিচিত্র লীলায় অভিনয় করিতেছে, সেখানে—অথবা যে আকাশের মেঘে কালবৈশাখীর ঝড় লাগিয়াছে—তাহারই একটি কোণে দুঃখনীড় রচনা করিবার হাস্যকর প্রয়াস মানুষের কেন? প্রকৃত আনন্দের ভাগ দিবার বেলায় যে পরম কৃপণ, কিন্তু গভীর দুঃখকে বিলাইয়া দিবার ঔদার্য্যে সে তত চঞ্চল। আসলে মানুষ দুঃখকে লইয়া বিলাস করিতে ভালবাসে।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, ট্রেনও ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনের সঙ্গে অমিয়র সারা অন্তর দুলিয়া উঠিল। ঠাসাঠাসি মানুষ বসিয়াছে, বাঙ্কের উপর জিনিষপত্র উপচিয়া পড়িতেছে, তথাপি শহরের ধূমমলিন আকাশ

ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আনন্দে মন মাতিয়া উঠিতেছে। ইষ্টক-অরণ্য হইতে বহু দিন পরে আজ সে মুক্তিলাভ করিতেছে। পীচ-বাঁধান উত্তপ্ত রাস্তার ধারে একটিও সতেজ, সবুজ পল্লবশ্রী-মণ্ডিত বৃক্ষ চোখে পড়ে না। আকাশের নীল বর্ণ নাই, তাহকে মনে হয় ঘষা কাচের থালা। এখানে কেয়ারী-করা লনে মরসুমী ফুলই মানায় ভাল। বিস্তীর্ণ জমি নাই, জমিকে অতিক্রম করিবার সতেজ স্বাস্থ্য বা স্পর্দ্ধাও নাই কোন গাছের। লতার আলিঙ্গনে গোলাপের চারা নষ্ট হয় না, এবং যেখানে-সেখানে দূর্ব্বা জন্মিয়া গাছের গোড়া জঙ্গলময় করে না। মাপা ভূমিতে—মাপা গাছের পরিমিত সৌন্দর্য্য ;—শাখা মেলিলে মালীর কাঁচি আছে, শিকড় মেলিলে সিমেণ্ট-বাঁধানো চত্বরও আছে। মানুষ আপনার ধর্ম্ম অনুসারে গাছকেও দীক্ষা দিয়াছে। শহরতলী ছাড়াইতেই ফাঁকা মাঠের প্রসার বাড়িল ; রুক্ষ, বন্ধ্যা মাঠ, তথাপি কি গভীর সৌন্দর্য্য। দূর দিক্‌চক্রবালসীমায় আকাশ যেখানে ভূমিলক্ষ্মীর চরণ চুম্বন করিতেছে সেই অস্পষ্ট ধূমরেখায় সৃষ্টির অনন্ত রহস্য হয়তো সর্ব্বমনের অগোচরে নিত্য লিখিত হইতেছে! উর্দ্ধশির নারিকেল, তালশ্রেণী চিহ্নিত কত গ্রাম দু-ধারে পড়িতেছে। কোথাও বৃত্তাকারে চিল উড়িতেছে, কোনও মাঠে দলবদ্ধ গো-মহিষ গোচারণ-ভূমিতে মুখ সংলগ্ন করিয়া পুচ্ছ আন্দোলন করিতেছে, কোন নিষ্পত্র বাবলা গাছের শাখায় বকের সারি সাদা ফুল ফুটাইয়া বসিয়া আছে, কোন অগভীর ডোবায় ঝাঁক বাঁধিয়া হাঁস সাঁতার কাটিতেছে। সশীর্ষ আমের বোল কোন বাগানে পুড়িয়া কালো হইয়াছে—কোথাও বা কচি ফলভারে গাছের শ্রী বর্দ্ধন করিতেছে। দূর মাঠে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা চলিতেছে বেশ।

লোকাল ট্রেন হইলেও গতিবেগ আছে ; ছোট-খাট ষ্টেশন সদম্ভে ও সশব্দে পার হইয়া যাইতেছে। ষ্টেশন অতিক্রম করিবার সময় যাত্রীদের মনে আভিজাত্য-বোধও একটু জাগাইয়া দিতেছে বুঝি! আমরা যেখানে যাইব সে-ষ্টেশন বড়—সে-দেশের মূল্য আছে। আমাদের বহন করিয়া ট্রেন তাই অজ্ঞাত অখ্যাত পথি-পার্শ্বস্থ ষ্টেশনে থামিয়া নিজের তথা আমাদের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছে না। ষ্টেশন অতিক্রম করিবার সময় কোন অতি উৎসাহী মর্য্যাদাবান যুবক হয়তো দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জানালার বাহিরে আনিয়া সে-কথা ইঙ্গিতে জানাইয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না।

কেহ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পরম উৎসাহে বলিতেছে, "যা চালিয়েছে গাড়ী। উঃ! বিফোর্ টাইমে না পৌছায়!"

ট্রেনের নীচের বাঁধা লৌহপথ আছে এবং গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও আছে সে-কথা অতি উৎসাহে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে বুঝি!

ইছাপুরে গাড়ী থামিলে অমিয়র পরিচিত এক যুবক উঠিল। উঠিয়াই সোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হ্যালো, অমিয় যে!"

চীৎকারের প্রত্যুত্তরে অমিয় আর একটু সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে বসিবার জায়গা দিল।

বীরেন বসিয়া অমিয়র পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "তার পর ভাল তো? চাকরি-টাকরি কিছু হ'ল?"

অমিয় মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি মনে হয়?"

বীরেন তাহার পানে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"হাসলে যে?"

"এক মাস আগের কথা মনে পড়ল। শ্যামবাজার না বেলগেছে কোথায় যেন দেখা হয়েছিল তোর সঙ্গে। আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম, তুইও ঠিক এই উত্তর দিয়ে'ছলি? আমি তোর মুখ দেখেও কিন্তু ঠিক অনুমান করতে পারি নি।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "তুমি বলেছিলে আমার চাকরি হয়েছে এবং সে-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাও নি যতক্ষণ না তোমার কাছে টাকা ধার চেয়ে-ছিলাম।"

"ঠিক, ঠিক!" একটু থামিয়া বলিল, "আজ কিন্তু আমি ঠিক অনুমান করেছি, আমার সে-টাকাটা বোধ হয়—"

অমিয় বলিল, "তোমার প্রথম অনুমান সত্য, দ্বিতীয় অনুমান ভুল।"

সাশ্চর্য্যে বীরেন বলিল, "অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ চাকরি আমার হয়েছে, কিন্তু তোমার টাকা শোধ দেবার সামর্থ্য নেই।"

"যাঃ—কি বাজে বকিস্ ? একটা বিড়ি দে।"

"বিড়ি আমি খাই নে।"

বীরেনের বিস্ময় যেন বাড়িতেই লাগিল, "বিড়ি খাস নে ? তবে যে বললি চাকরি হয়েছে ?"

অমিয় হাসিল, "বাঃ রে, চাকরি হ'লেই বিড়ি খেতে হবে—এ কোন্ ন্যায়শাস্ত্রের বিধান ?"

বীরেন বলিল, "আমাদের শাস্ত্রটা আমরাই গড়ি যে, ন্যায় অন্যায় অত বাছি নে। কতকগুলো ফরমূলা নিয়ে আমাদের জীবন। দশ জনের যেটা আছে সেটা তোর বেলাতেই কি ব্যতিক্রম ?"

"কি ফরমূলা বীরেন-দা ?"

"তুই ছেলেমানুষ, অমিয়, সব বুঝবি নে। যেটা আমরা পাই নে সেটার জন্য আগ্রহও আমাদের বড় বেশী। আমরা যোগ্যতার কথা ভুলে যাই, লোভের বশেই কাজ করি। এই ধর, স্বরাজ পাব ব'লে এক বছরের মেয়াদে যেমন সিগারেট ছেড়ে ছিলাম। স্বরাজ তো কেউ পাইয়ে দিলে না, আকাশ থেকেও পাকা ফলটির মত টুপ ক'রে খসে পড়লো না, কাজেই আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে ঠিক একটি বছর পরে আবার আমরা সোৎসাহে সিগ্রেট টানছি। কলম পিষতে পিষতে ক্লান্তি আসে যখন, তখন ধরাও একটা বিড়ি—কোথায় সে ক্লান্তি উবে যাবে! যে কেরাণী সে যদি বলে বিড়ি-সিগ্রেট খায় না তো আমার মনে হয় বাঙালী হয়ে মাছ না-খাওয়াটা তার চেয়ে কম আশ্চর্য্যের নয়! বিড়ি ধর, অমিয়, বিড়ি ধর, চাকরিতে না হ'লে উন্নতি হবে না।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "তোমার মতামতগুলো এখনও তেমনি আছে। রাইফেল ফ্যাক্টরিতে কাজ ক'রেও কিছু বদলায় নি। কই, তোমার টাকার কথা কিছু বললে না তো ?"

"ধার নিয়েছিস তুই—শোধ দেবার ভাবনা তোরই ; তোর সুবিধা ও সুযোগে সে-ব্যবস্থা আপনিই হবে। রাইফেল-ফ্যাক্টরীতে কাজ ক'রে আমার একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছে। শুনবি ? খবরদার শুনে হাসিস না যেন।"

"না, তুমি বল।"

"আসলে আমরা গড়ছি খোকাদের খেলনা, ওরা খেলবে ব'লে।"

"তার পর ?"

"যাই বলিস ওরা আমাদের কম মাইনে দিয়ে বোকা বানিয়ে নিজেদের বাঁচবার অস্ত্র তৈরি করিয়ে নিচ্ছে, সেটা ভুল। ওরা যদি বাঁচবার ইচ্ছেই ক'রে থাকে, সে আমাদের হাত থেকে নয়, ওদের চেয়ে যারা শক্ত তাদের হাত থেকে। আমরা বড় জোর নিঃশব্দে মরতে জানি। হাত তুলতে জানি না, সুতরাং আমাদের মেরে ওদের অনিষ্ট করতে যাবে কেন ? বরং আমরা বেঁচে থাকলে ওদের অস্ত্র তৈরির ভাবনা থাকবে না।"

"তার পর ?"

"তাই, আমাদের কোন ভয় নেই চাকরি যাবার।"

"চাকরিটাই তোমার কাছে প্রধান বস্তু তাহ'লে ?"

"কার কাছে নয় ? এই হাজার হাজার বি-এ, এম-এ, তোদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাঁচে ঢালাই হয়ে বেরুচ্ছে, ওদের একমাত্র লক্ষ্যই তো চাকরি। যে-লেখা-পড়ায় অর্থ উপার্জ্জন হয় না, সে-বিদ্যার কদর আমাদের দেশের মেয়েদের কাছেও নেই।"

"হ্যাঁ, মেয়েদের কাছেই নেই। যারা শিক্ষিত তাদের কাছেও কি—"

"তোর তথাকথিত ডিগ্রীধারী শিক্ষিতদের কথা আর বলিস নে। সাতটা মাষ্টার রেখে আর সাত-শ খানা নোটের বই মুখস্থ ক'রে ওরা উচ্চশিক্ষার নদী পেরবার চেষ্টা করে। লক্ষ্য থাকে ঐ ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি। যে এই পরম পদ পেলে—সেই ভাগ্যবান, যে পেলে না, সে কর্ত্তৃপক্ষের অবিচারের কীর্ত্তন ক'রে মনঃক্ষোভ মেটায়।"

অমিয় ম্লানমুখে বলিল, "এ-কথা যে কতখানি সত্য তা চাকরি পাবার সময়ে বুঝেছি। কেন এমন হয় জান, বীরেন-দা ? আমরা নিতান্ত অন্নগত প্রাণ ব'লে। আমাদের দৈন্য তো এক পুরুষের নয়, পিতৃপিতামহের

়াছ থেকে ঐ মূলধনটুকু পেয়েই মেরুদণ্ড আমাদের ়াকা হয়ে পড়েছে।"

বীরেনের দুই চোখে আগুন জলিয়া উঠিল, ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে কহিল, "কেন তাঁরা এত বড় অন্যায় ক'রে গছেন, অমিয়? তাঁদের জীবনে যে তুষানলের দাহ ন্ত্রণা ভোগ করেছেন আমাদের জীবনকে তারই মধ্যে রখে তাঁরা দায়িত্ব এড়িয়েছেন। সংসার চালাবার ক্ষমতা নেই যাঁদের, তাঁদের সংসার পাতার বিড়ম্বনা কন? এক-একটি দুঃখী পরিবারের সৃষ্টি ক'রে নিজের ়ারলৌকিক জল-পণ্ডুষের ব্যবস্থা করতে যাঁদের বাধে নি, ়াদের সঙ্গে এতটুকু ঋণের সম্পর্ক আমাদের নেই; না শ্রদ্ধার, না কৃতজ্ঞতার।"

বীরেনের ক্রোধ দেখিয়া অমিয় কৌতুক অনুভব ়রিল। কহিল, "তাঁদের সামনে পেলে তুমি দেখছি ়লা টিপে মারবে!"

বীরেন বলিল, "তাঁদের জিজ্ঞাসা করতাম, দেহের ়্ধা মেটাবার তো অন্য উপায় যথেষ্ট ছিল, কেন তোমরা ়ারও গোটাকতক দরিদ্র দাস তৈরি করবার জন্য ধর্মের ়োহাই দিয়ে সংসার পেতেছিলে? কেন আমাদের ়ঃখের হ্রদে নামিয়ে দিয়ে সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলে? ়় চালাক তাঁরা, তাই আমার জ্ঞান হবার আগেই সরে ়ড়েছেন।"

অমিয় বলিল, "তাহ'লে তুমি বিয়ে কর নি?"

বীরেন বলিল, "ও জিনিষটা কি অত্যাবশ্যক? দাস ়ষ্টি করার উৎসাহ আমার নেই। একটি দরিদ্র কম ়্মালে বেকাররা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, ়েশমাতাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।"

অমিয় বলিল, "দারিদ্র্যের মধ্যে দুঃখ আছে, সুখও ়াছে। বৃহৎ দুঃখ বইবার যোগ্যতা যার নেই—"

বীরেন হাসিল, "দুঃখকে যতই মহত্ত্বমণ্ডিত কর না ়কন, দুঃখ আসলে দুঃখই। যোগ্যতা, দায়িত্ব, সম্মান ়াধ—ও-সব স্রেফ মন-ভুলানো কথা। যেটা সহ্যের ়ীমা ছাড়ায়, সেইটার মধ্যে মহত্ত্বের আরোপ না করলে ়ানুষের আত্মহত্যা করা ছাড়া যে পথ নেই।"

অমিয় বলিল, "মানুষ চায় সঙ্গী। একা যে জিনিষ বহন করতে ভয় পায় বা ক্লান্তি বোধ করে, দু-জনে অনায়াসে তা মাথায় তুলে নিতে পারে। দু-জনের দুঃখ দিয়ে রচনা করে তারা সুখের একটি সুকোমল কবিতা—"

বীরেন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "আর জ্বালাস নে'; রবিবাবুর 'শেষের কবিতা'র ন্যাকামিপূর্ণ অনুকরণ আমার ভাল লাগে না। যাদের ব্যাঙ্কের খাতা পরিপুষ্ট তাদের ওই সব স্রেফ ন্যাকামি সাজে। তবে এ-কথা সত্য, মানুষ সুখে বা দুঃখে সঙ্গী চায়। সঙ্গীকে নিয়ে নরক সৃষ্টি ক'রেও তার উল্লাস।"

অমিয় বলিল, "দুঃখবাদ মেনে তুমি বড্ড কঠিন হয়ে পড়েছ, বীরেন-দা!"

বীরেন বলিল, "মন কঠিন না হ'লে শেল্ ফ্যাক্টরীতে চাকরি করতে পারব কেন? আমরা মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করি যে!"

অমিয় বলিল, "যদি বলি তুমি কাপুরুষ। দুঃখ পাবার ভয়ে দুঃখকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছ?"

বীরেন বলিল, "স্বচ্ছন্দে সে কথা বলতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই। দুঃখকে এক পাশে ঠেলে ফেলাই আমার উদ্দেশ্য।"

"কিন্তু পেরেছ কি তাকে ঠেলে ফেলতে? হাতের ঐ সিগ্রেটটার মত জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেই সে চলে যায় কি?"

বীরেন বলিল, "সিগ্রেট গেলেও ওর ধোঁয়া আর গন্ধ যেমন খানিকক্ষণ ওটাকে মনে করিয়ে দেয়, দুঃখটাও তাই। সিগ্রেটের যেমন একটি আকার, দুঃখের তা তো নয়। কোন্ আকারে সে যে মনকে পেয়ে বসে তার ঠিকানা পাওয়াই যে মুস্কিল! যাক্, গল্পে গল্পে নৈহাটি এসে গেল, পান কেনা যাক্।"

বীরেন দুয়ারের কাছে উঠিয়া আসিল, উচ্চৈঃস্বরে পানওয়ালাকে ডাকিতে লাগিল।

অমিয় একমনে যাত্রীদের ওঠানামা দেখিতে লাগিল বৃহৎ পোঁটলা, স্ত্রীলোক, এবং কুলি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া এক ভদ্রলোক হাঁসফাঁস করিতে করিতে প্রত্যেক কামরায় উঁকি মারিতেছেন। শনিবার বলিয়া গাড়ীতে

অসম্ভব ভিড়। তাঁহার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়াও কেহ সহানুভূতি দেখাইতেছে না। ভদ্রলোক ভাঙা আর্ত্তস্বরে মিনতি করিতেছেন, "মশাই দয়া ক'রে একটু জায়গা দিন। মশাই—"

বীরেন ঘটাং করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং ভদ্রলোকের হাত হইতে হ্যারিকেন লণ্ঠন, ছোটখাট পুঁটুলি, লাঠি, ও টুকিটাকি জিনিষভরা বালতিটি লইয়া গাড়ীর মধ্যে রাখিল।

ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। করুণ চক্ষে বীরেনকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। কুলির হাতে চারটি পয়সা দিতেই সে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল—"এক আনা! নেহি বাবুসাব—এতনা হায়রানি কিয়া—"

ভদ্রলোকের করুণ চক্ষে তৎক্ষণাৎ রোষের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন, "তোদের স্বভাবই ঐ। যত দাও— মন আর ওঠে না।"

পুরা দুই মিনিট ধস্তাধস্তি করিয়া গাড়ী গতিলাভ না করা পর্য্যন্ত আর একটি পয়সা দিয়া ভদ্রলোক নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কুলিও পয়সা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভদ্রলোকের সাধুত্বের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া ফুটবোর্ড হইতে নামিয়া পড়িল। এমন ঘটনা প্রত্যহই ঘটে, নূতন বলিয়া কাহারও মনে বিশেষ রেখাপাত করিল না।

মহিলাটি ঘোমটা টানিয়া জড়সড় হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

বীরেন অমিয়র পানে চাহিয়া বলিল, "ওঠ্ রে অমিয়, ওঁকে বসবার জায়গা দে।"

অমিয় উঠিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দুঃখকে সব সময় অস্বীকার করা চলে কি বীরেন-দা?"

বীরেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "না। যত দিন আমাদের সেন্টিমেন্টালিটি না যাবে, উঃ, কি জিনিষই আবিষ্কার করেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ!"

"কেন শ্রীগৌরাঙ্গের আগে কি ও জিনিষটা আমাদের দুর্লভ ছিল?"

"না রে, যে-মাটিতে শ্রীখোল তৈরি হ'ল—তা যে বহু কাল থেকে আমরাই নরম ক'রে রেখেছিলাম। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ ব'লেই ভাবের চাষ-আবাদে ফসল ফলে ভাল। শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝেছিলেন, তাই ধর্ম্ম চালাতে এবং ধর্ম্ম বাঁচাতে তরবারির আশ্রয় নেন নি, শ্রীখোলের আশ্রয় নিয়েছিলেন!"

"তাতে ফল হ'ল—"

"একটা ভাল ফল হ'ল বইকি, অমিয়। একতারা বাজিয়ে চাল আদায় করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেল। গতরকে গতর বজায় রইল, আলস্যের কাঁথাখানি গা থেকে খুলতে হ'ল না, সময় কাটাবার জন্য উচ্চরোলে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা রইল। কম লাভের কথা কি! সুখদুঃখের ইকুইলিব্রিয়ামে কেমন সহজ জীবনধারণ-প্রণালী এটি বল দেখি।"

অমিয় বীরেনের গা টিপিয়া বলিল, "আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে ভদ্রলোকমুদ্ধ আসন গ্রহণ করলেন যে!"

বীরেন বলিল, "হয়তো স্ত্রীর সম্ভ্রমরক্ষার খাতিরে; দেখছ না, উনি না বসলে ওপাশের ভদ্রলোককে বাঁচিয়ে পর্দ্দা সৃষ্টি হ'ত কি ক'রে।"

তত ক্ষণে ভদ্রলোক পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে

"ক'টা পুঁটুলি আছে গুনে নিয়েছ তো? তোমার কাপড়ের ট্রাঙ্কটা—ঐ যে, গহনার বাক্স—হ্যাঁ, সদাসর্ব্বদা হাতে ক'রে রাখবে; এই বালতি, বিছানা, পুঁইডাঁটা, কুমড়ো, হ্যারিকেন, সব আছে তো? ব্যস, ব্যস! হুঁকোটা কোথায় রাখলে—এক ছিলিম টানতে পারলে মন্দ হ'ত না।"

মহিলাটি মৃদুস্বরে বলিলেন, "হুঁকো তো আনা হয়নি।"

"আনা হয় নি! য়্যাঁ!" খানিক বিস্ময়ে চাহিয়া সহসা স্থানকাল ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মেয়েমানুষের ডিম কত আর হবে, আসল জিনিষেই ভুল হ'ল তো? হাজার বার গই গই ক'রে বললাম, ওগো কিছু যেন ভুল হয় না, ভুল হয় না। বলা হ'ল, না গো না, তোমার কাজ তুমি কর গে। এখন?"

মহিলাটি ঘোমটা খুলিলেন না, কিন্তু কণ্ঠস্বর ঈষৎ চড়াইয়া ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে কহিলেন, "কি ভুলটা হয়েছে শুনি? গহনার বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা, পুঁইশাক, লণ্ঠন—কোন্‌টা ভুলেছি শুনি? নিই নি ইচ্ছে করেই হুঁকোটা। বলি কি, আধ পয়সার বিড়ি কিনে মুখে আগুন জ্বেলো এখন। ইষ্টিশান তো মরুভূমি হয় নি যে—"

ভদ্রলোক চাপা কণ্ঠে বলিল, "থাক, থাক, আর লেকচার ঝাড়তে হবে না। খুব হয়েছে। আমার যেমন মরণ তাই মেয়েমানুষের কথায় বিশেষ করে চুপ করে রইলাম। ষ্টেশন ছেড়ে গেল, এখন বিড়ি পাই কোথায়?"

ভদ্রলোক হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিলেন।

বীরেন পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া কহিল, "দেশলাই দেব নাকি?"

"না, না, আপনি আবার কেন, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তুমি ছেলের বয়সী হ'লেও বিড়ি-সিগ্রেটে দোষ নেই। বিদ্যেসাগর কি বলতেন জান—খাবি তো সামনে খা, লুকিয়ে খাওয়াটা দোষের, পাপের।"

দুই হাতের তালুতে ব্যূহ রচনা করিয়া তিনি দেশলাই জ্বালিলেন এবং বিড়ি ধরাইয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন,—"মহাশয়ের নিবাস?"

"নিবাস অনেকদূর—রাণাঘাট। আপনি কোথায় নামবেন?"

"এই শিমুরালি। শিমুরালি ওঁর—এই আমার শ্বশুরবাড়ী কি না। যাচ্ছি অনেক দিন পরে। দ্বিতীয় পক্ষ হ'লে হবে কি মশাই, মাসে মাসে এখানে সস্ত্রীক যদি না আসি তো শ্বশুরপক্ষের অনুযোগের অন্ত থাকে না।"

"আপনার নিবাস কোথায়?"

"মাজদিয়া ষ্টেশনে নেমে কৃষ্ণগঞ্জে যেতে হয়। নামমাত্র বাড়ী প'ড়ে আছে, বন-জঙ্গল—কেউ সেখানে বাস করতে পারে না।"

"নৈহাটিতে থাকেন বুঝি!"

"হ্যাঁ, কর্ম্মস্থল কি না। গৌরীপুর মিল জানেন তো, তারই বড়বাবু আমি। মাইনে কম হ'লেও উপায় কিছু আছে—উপরি। ছিল এক সময়ে যখন মাসে চারটি অঙ্ক বাঁধা ছিল মশাই। সেই ঝোঁকের মাথায় জমি কিনে বাড়ী পর্য্যন্ত তৈরি করলাম এখানে।"

"তাহ'লে জন্মভিটা ত্যাগ করলেন।"

ভদ্রলোক হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ঝাঁটা মার সেই বনজঙ্গলে-ভরা ভাঙা ভিটের মাথায়। সাত সরিক, মশাই—সাত সরিক। তিনটি বছর খাজনা টেনে টেনে দিলাম ছেড়ে, আমি উপায় করি ব'লে ওরাও জো পেয়ে খাজনা বন্ধ করেছিল। ভাবলে ভিটার গরজ ওর বেশী—না দিয়ে পারবে না। আজ পাঁচ বছর আর ও-মুখো হই নি, এক পয়সা ঠেকাই নি। শুনেছি বাকী খাজনার দায়ে বাস্তভিটে নিলাম হয়ে গেছে। আপদ গেছে।" ভদ্রলোক পরম খুশীভরে হাসিতে লাগিলেন।

বীরেন বলিল, "তবে তো মহৎ কাজই করেছেন।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি হয়তো বলবেন সাত-পুরুষের ভিটে, জন্মভূমি—ইত্যাদি। কিন্তু সাপখোপের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে, রোগে জেরবার হয়ে, জ্ঞাতিশত্রুর সঙ্গে খাওয়াখাওয়ি ক'রে সে-ভিটায় বাস করা কি খুবই সুখের হ'ত? আমরা বাঙালী, সারা দেশটাই তো আমাদের জন্মভূমি। হয় এ-জেলা, নয় আর এক জেলা, বাংলার বার হই নি তো।"

বীরেন বলিল, "না, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। যাঁরা বাংলা মুলুক ছেড়ে প্রবাসী হন তাঁরাও স্বাস্থ্য-বিধানের নজির দেখান। ঐসাপ, শেয়াল, বনজঙ্গল, মশা, ম্যালেরিয়া, বিশ্রী গরম আর জ'লো শীতের কথা তাঁরাও শতমুখে কীর্ত্তন করেন। বাংলা দেশ বাঙালীর বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে দিন দিন। না?"

ভদ্রলোক ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "সে-কথা তো আমি বলি নি। চাকরি-স্থলে কাটে আমাদের সমস্ত জীবন। বুড়ো বয়সে কি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে?"

বীরেন উচ্চহাস্যে বলিল, "আমরা যুদ্ধ করি কখন, মশাই? ছেলে, বুড়ো, যুবো, সবাই তো আত্মসমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছি। স্কুলের পড়া, চাকরি, অর্থ উপার্জ্জন

ছিবি্ পর পর সাজানো থাকে; মাঝখানে অবশ্য কিছু জন্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদির সমারোহ আছে; কতক বা অর্থকষ্ট, রোগভোগ, মৃত্যুর উপসর্গ আসে। কিন্তু সবই সাজানো পর পর।"

ভদ্রলোক সরবে হাসিলেন, ট্রেনসুদ্ধ লোকই হাসিয়া উঠিল।

অমিয় বীরেনের হাতে চিমটি কাটিয়া বলিল, "তোমার লেকচার দেওয়ারও অভ্যাস আছে?"

বীরেন বলিল, "কিন্তু শ্রোতা পাই না তেমন। হাসির কথা বললে ওঁরা মুখ ভার করেন, আবার গম্ভীর কথায় হাসেন।. দোষটা আমার বাক্‌ভঙ্গীর না অঙ্গভঙ্গীর অমিয়?"

অমিয়র উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শিমুরালি ষ্টেশন আসিয়া পড়িল।

ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া গাড়ী থামিতে-না-থামিতে বিছানা-ব্রাস্ক টানাটানি করিতে লাগিলেন এবং ট্রেন থামিবামাত্র ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া বালতির উপর পড়িলেন। ঝন্‌ঝন্ শব্দে বালতিটা বাজিয়া উঠিল এবং কয়েকটি ছোটখাট জিনিষও এধার ওধার ছড়াইয়া পড়িল। অত্যন্ত ক্ষিপ্রকরে সেগুলি গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "এই কুলি, কুলি, ইধার আও।"

ষ্টেশনটি ছোট, কুলিপ্রধান নহে। যে দুই-এক জন কুলি ছিল তাহারা অন্য প্রান্তে থাকাতে ডাক শুনিতে পাইল না। ভদ্রলোক অগত্যা বালতি হাতে করিয়া প্ল্যাটফরমে নামিলেন, এবং একে একে ট্রাঙ্ক, বিছানা, পুঁইডাঁটা প্রভৃতি নামাইতে লাগিলেন। তখনও মহিলাটি এক পাশে দাঁড়াইয়া নামিবার প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভদ্রলোক পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রোকো—রোকো—গার্ডসায়েব, রোকো—"

গাড়ীর গতি আরম্ভ হইবার মুখেই থামিয়া গেল। বীরেন অতি কষ্টে মহিলাটিকে নামাইয়া দিল।

ও-পাশ হইতে একটি ছোকরা মন্তব্য করিল, "আসল জিনিষ রইল পড়ে, উনি লাউডাঁটা পুঁইডাঁটা নামাচ্ছেন। আরে বউ না থাকলে তোর পুঁইডাঁটা খাবে কে? দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রে স্রেফ গবেট বনে গেছ, যাহু!"

উচ্চ হাসির মধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বীরেন এবং অমিয় নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।

অমিয় বলিল, "ভদ্রলোক ব্যস্তবাগীশ—"

বীরেন বলিল, "ছোটখাট ঘটনায় মানুষ চেনা যায়। উনি একটি টাইপ।" সহসা অমিয়র পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "তুই বিয়ে করেছিস, অমিয়? করেছিস? বাঃ রে, একটা খবরও তো দিস নি আমায়!"

অমিয় বলিল, "খবর দেবার অবসর পাই নি। আমরা যখন জন্মাই তখন থেকেই পাত্রী ঠিক হয়ে থাকে। গরিবের কন্যাদায় বড় জিনিষ।"

মুখ বিকৃত করিয়া বীরেন বলিল, "ওই ন্যাকামিপূর্ণ কথাগুলো আর বলিস নে। যে গরিব, সে ইচ্ছে ক'রে কন্যাদায়গ্রস্ত হয় কেন? কন্যা যদি জন্মায় তাকে দায় মনে করেই বা কেন? দারিদ্র্য যে মহাপাপ, তা আমাদের কাপুরুষতাই পদে পদে প্রমাণ ক'রে দেয়।"

অমিয় বলিল, "তোমার যুক্তি বিয়ে না করার দিকে তুমি হয়তো এ-সব বুঝবে না, বীরেন-দা।"

বীরেন বলিল, "আমি বুঝতেও চাই নে, অমিয়। তোরাই দায় সৃষ্টি করিস, পুণ্য সৃষ্টি করিস, আবার নরক-বাসের ব্যবস্থাও দিয়ে রেখেছিস। কন্যার জন্ম তোদের দাম্পত্যজীবনে মহা অকল্যাণ। যখনই বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিস হাসিমুখে—তখনই দায় বইবার শক্তি সঞ্চয় করিস না কেন? কাপুরুষ তোরা, এক বার নয়, হাজার বার।"

ক্রুদ্ধমুখে বীরেন অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটায় একটা প্রচণ্ড টান দিয়া সেটা জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল। অমিয় কোন কথা কহিল না। গাড়ী ছুটিয়াছে, সশব্দে মাঠ-প্রান্তর অতিক্রম করিতেছে। এদিকে মাঠ-প্রান্তরের প্রসার ও আকাশে নীলের গাঢ়ত্ব বেশী। মাঝে মাঝে আমবাগান পড়িয়া সেই একটানা ফাঁকা সৌন্দর্য্যকে খণ্ডিত করিতেছে, তথাপি সে সৌন্দর্য্য চোখকে স্নিগ্ধ করে। এই মাত্র লতাজালবেষ্টিত ঝোপঝাড়েতে বনপুষ্প



কাম্বোজের নর্তকী



আধুনিক চীনা তরুণী



কাম্বোজের যুবা

এই পৃষ্ঠায় ও পরের দুই পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চিত্রগুলি ওলন্দাজ শিল্পী শ্রীমতী ম্‌ডার্স কর্তৃক অঙ্কিত। প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন ভূখণ্ডের নরনারীদের বহু চিত্র ইনি অঙ্কন করিয়াছেন। সম্প্রতি কাম্বোজে এই চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল।









উপরে ঃ কেরিণ পণ্ডিত
নীচে ঃ বলিদ্বীপের বালিকা

মাঙ্কু রূপসী
বলিদ্বীপের বাদ্যকর






উপরে : চীনা মাতা-পুত্র
নীচে : চীনদেশের শিশু—রুষ্ট

জাপানী তরুণী
চীনদেশের শিশু—হৃষ্ট



আংকারায় গাজী কামাল আতাতুর্কের বিজয়স্তম্ভ ও
তুরস্কের সাধারণতন্ত্রের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসবে গৃহীত চিত্র

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের গোড়ার কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনরীদের উদ্যোগে কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপক ভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন আরম্ভ হয়। কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তখন মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহারা অন্তঃপুরে কন্যাদের বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করিতেন। এই কারণে মিশনরী-পরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে দরিদ্র ঘরের—অনেক স্থলে নিম্নজাতির মেয়েরাই লেখাপড়া শিখিত। ১৮৪৯ সনে বীটন-কর্ত্তৃক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখা যায় নাই।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের রচয়িতা কে?

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হিন্দু বালিকাদের শিক্ষাবিস্তারকল্পে কলিকাতায় যে-কয়েকটি খ্রীষ্টীয় মহিলা-সমিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার মধ্যে একটির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; সেটি The Female Juvenile Society For the Establishment and Support of Bengalee Female Schools. এই মহিলা-সমিতি খুব সম্ভব ১৮১৯ সনের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।* নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে সমিতির বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য এই মহিলা-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৮২২ সনে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানিতে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক বিদুষী হিন্দু মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ নয় তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন :—

About this time Raja Radhacaunt offered the Society the manuscript of a pamphlet in Bengali the *Stri Siksha Vidhyaka* on the subject of female education,···The Committee of the Calcutta Juvenile Society received the manuscript

---

* ২৯ আগষ্ট ১৮১৯ তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সেক্রেটরী পীয়ার্স (W. H. Pearce) সোসাইটির অন্যতম সভ্য ফর্ব্বেস (G. Forbes) সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তাহা হইতে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। এখানে বলা প্রয়োজন, পীয়ার্স ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির সভাপতিও ছিলেন :—

···there are not more than two hundred Bengalee Schools, averaging twenty-one pupils each, or four thousand and two hundred Children under instruction from Chitpoor Bridge to Birjootulao.······Females too in Calcutta are in an inferior proportion, ··from this number Hindoo *Girls* are excluded, a single School for this interesting, but neglected class of our fellow subjects having never, I believe, till without these last three months, existed in Calcutta.*

* "Many attempts to collect a Female School had been previously made, but failed on account of the prejudices of the parents. The one here referred to was instituted at the expence of a small 'Society for the promotion of Female Bengalee Schools,' formed a few months ago in in a Ladies' [Mrs. Lawson and Pearce's Seminary in Calcutta."—The Second Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings Second Year, 1818-19. P. 88.

এখানে ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির কথাই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লাশিংটন সাহেবের *The Hist., Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions* (Dec. 1828) পুস্তকের ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

and determined on printing it.—*A Biographical Sketch of David Hare* (1877), p. 55.

ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটিই যে প্রথমে নন্দন-বাগানে জুভিনাইল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা করেন, 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রকাশ—

কেবল আমারদের দেশের স্ত্রী লোকের লেখা পড়ার পদ্ধি আগে ছিল না, এই জন্যে কিছু দিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ [১৮১৯?] শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দন বাগানে যুবনাইল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।—'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক', ৩য় সংস্করণ (১৮২৪), পৃ. ৯।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানির কোন সংস্করণেই গ্রন্থকারের নাম নাই। প্যারীচাঁদ মিত্রের উক্তি—"Raja Radhacaunt offered the Society the manuscript" হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে রাধাকান্ত দেবই ইহার লেখক।* কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার লেখক—কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার; ইনি কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক, বজরাপুর-নিবাসী স্বনামধন্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির পঞ্চম (১৮২২-২৩) ও ষষ্ঠ (১৮২৪-২৫) রিপোর্টে, পাদরি লঙের *Bengal Missions* (১৮৭৮) ও বাংলা পুস্তকের তালিকায় (১৮৫৫), এবং ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের জীবনীতে † 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র রচয়িতা-হিসাবে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের নামের উল্লেখ আছে।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র প্রকাশকাল

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' ঠিক কোন্ সালে প্রথম প্রচারিত হয় সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে।* তাহার আখ্যাপত্র হইতে প্রকাশকাল "বা° সন ১২২৮" "1822" পাওয়া যায়। ইহা কলিকাতা ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির পক্ষে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত হয়। আমরা বিলাত হইতে পুস্তকখানির আখ্যাপত্রের যে ফোটো-প্রতিলিপি আনাইয়াছি, পর পৃষ্ঠায় তাহা মুদ্রিত হইল।

১৮২২ সনের এপ্রিল মাসের অব্যবহিত পূর্ব্বেই 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার আরও একটি প্রমাণ-স্বরূপ ৬ এপ্রিল ১৮২২ তাঁরিখের 'সমাচার দর্পণ' হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

স্ত্রী শিক্ষা।—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্বং প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে।...('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ পৃ. ১৩)

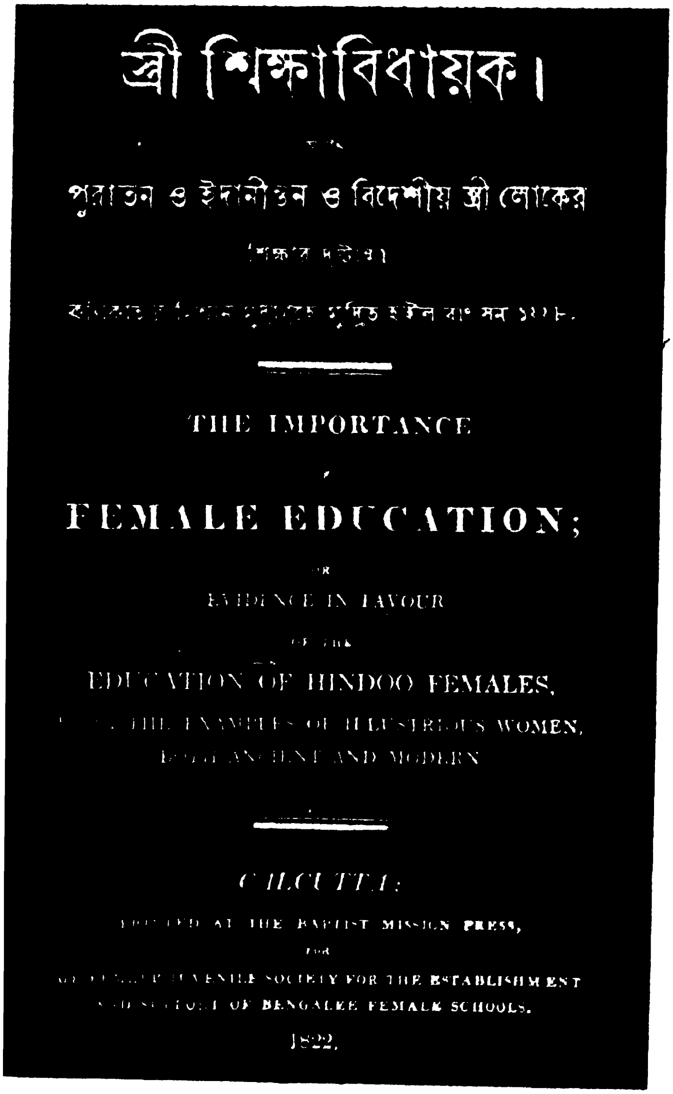
'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়—ইহার উল্লেখ ঐ সোসাইটির পঞ্চম রিপোর্টে আছে।

কয়েক মাসের ব্যবধানে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হইবার কারণ আছে। তখন মিশনরীদের চেষ্টায় চারি দিকেই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। চার্চ মিশনরী সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় মিস কুক (পরে বিবি উইলসন্) নামে এক মহিলা অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে লোকমত গঠনের জন্য 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রধানতঃ

* শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' (১৯০৪), পৃ. ১৯৪। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার "ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায়ের স্কুল" প্রবন্ধে ('প্রবাসী'—কার্ত্তিক ১৩৪৫, পৃ ১০) এবং শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন তাঁহার *Western Influence in Bengali Literature* পুস্তকে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

† "He [Radhakanta Deva] assisted the late Gauramohana Vidyalankara the Head Pandita of the School Society in the preparation and publication of a Pamphlet called the *Stri-Siksha Vidhayaka* on the importance of female education and its concordance with the dictates of the Sastras,..."—*A Rapid Sketch of the Life of Raja Radhakanta Deva Bahadur*,...By the Editors of of the Raja's Sabdakalpadruma. (1859), p. 19.

* ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ২৫) ডক্টর ব্লুমহার্ট এই সংস্করণটিকে ভ্রমক্রমে "দ্বিতীয় সংস্করণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।



স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক।

পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রী লোকের

মুদ্রিত হইল বাং সন ১২২৮.

THE IMPORTANCE

OF

FEMALE EDUCATION;

OR

EVIDENCE IN FAVOUR

OF THE

EDUCATION OF HINDOO FEMALES,

FROM THE EXAMPLES OF ILLUSTRIOUS WOMEN,

BOTH ANCIENT AND MODERN

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,

FOR

THE FEMALE JUVENILE SOCIETY FOR THE ESTABLISHMENT

AND SUPPORT OF BENGALEE FEMALE SCHOOLS.

1822.

বিতরণের জন্যই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮২৪ সনে। এই সংস্করণের গোড়ায় "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়।* কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (১৮২৪-২৫) প্রকাশ :—

Gourmohun's Treatise on Female Education has been reprinted, the second edition of 500 copies having been rapidly distributed. The author has enlarged it to nearly double its original size, and has improved it by simplifying the language and by suiting it to the capacity of those for whose use it is intended.

এই সংস্করণে সংযোজিত "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" অধ্যায় হইতে রচনার নিদর্শন-স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে২ কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; কেন না এ দেশে স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকের করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

রামমোহন কি 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র নিকট ঋণী?

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ১৮২২ সনের গোড়া গৌরমোহনের 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' প্রথম প্রকাশিত হয় কিন্তু পাদরি লং তাঁহার বাংলা পুস্তকের তালিকায়

* এই তৃতীয় সংস্করণের 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' অল্প দিন হইল "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮১৮ সন বলিয়া উল্লেখ করায়* একটি মারাত্মক ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত এই তারিখ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া, ১৮১৯ সনে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ' পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্যও করা হইয়াছে :—

> রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব ও গৌরমোহনের স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক, এই দুই পুস্তকের বহু স্থলে ভাব ও ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। রামমোহনের পুস্তক পরে রচিত হইয়াছিল; সুতরাং ভাবাগত যে আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক।...

উভয় পুস্তকের দু-একটি স্থানে অল্পস্বল্প ভাষা ও ভাবগত মিল আছে সত্য, কিন্তু তাহার জন্ত রামমোহনকে দায়ী করা যায় না, কারণ তাঁহার পুস্তক গৌরমোহনের 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র পরে নহে—অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল! রামমোহন তাঁহার পুস্তক রচনা-কালে গৌরমোহনের সাহায্য লইয়াছিলেন এরূপ প্রমাণও কেহ দিতে পারেন নাই।

* এই তালিকা প্রকাশের ৭ বৎসর পূর্ব্বে পাদরি লং তাঁহার *Hand-Book of Bengal Missions* পুস্তকে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র সঠিক প্রকাশকাল ১৮২২ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

চামড়ায় হাতের কাজ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলা দেশে অনেকেই, বিশেষতঃ মেয়েরা, চামড়ার জিনিষে নানা রকম হাতের কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কারণে এই কাজটি আমাদের দেশে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগের অভাব তাহার মধ্যে একটি। এই কাজ আরম্ভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যথা,—চামড়া বাছাই, কার্য্যে সতর্কতা, ধৈর্য্য, যথাযথ রং ফলান এবং পরিচ্ছন্নতা।

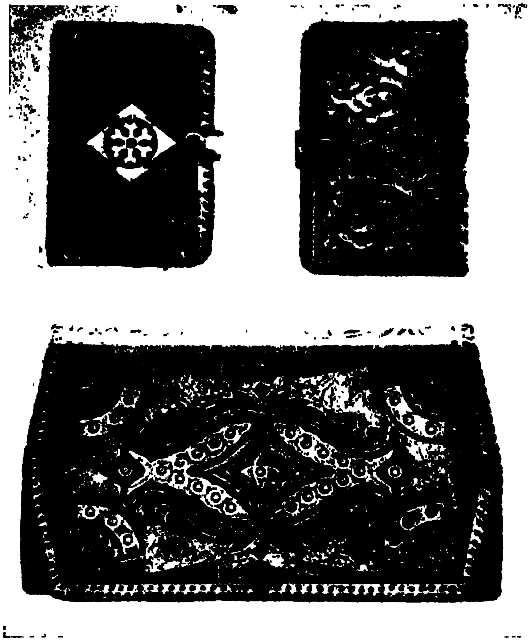
প্রায়ই দেখা যায় যে, এই কাজে হাতের নখ এবং



চামড়ার কাজে ব্যবহারের জন্ত কয়েকটি নক্শা



বামে, সেলাইয়ের বাক্স। দক্ষিণে, উপরে : মনিব্যাগ ; নীচে : ব্রাশ-কেস্



উপরে : দুটি 'ওয়ালেট'
নীচে : মেয়েদের হাত-ব্যাগ

মেয়েদের চুড়ি প্রভৃতিতে চামড়ায় নানারূপ দাগ হয়। ভিজা চামড়ায় সামান্য একটু ধাতুর দাগ লাগিলে সেই দাগ কালো হইয়া যায়, তাহা আর কোনরূপেই সংশোধন করা যায় না। যদিও এই কাজের জন্য অনেক রকম যন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়, তবুও আমার মনে হয় অল্প কয়েকটি বিশেষ বিশেষ যন্ত্র দ্বারাই এই কাজটি করা যায়। বাজারে সাধারণতঃ যে-সকল চামড়া কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু অন্য চামড়া পাওয়া যায় না বলিয়া বাধ্য হইয়াই এই চামড়ায় কাজ করিতে হয়। বিলাতী চামড়ার মূল্য এত বেশী যে তাহা দ্বারা জিনিষ তৈয়ারী করিলে চড়া দামে বিক্রয় করিতে হয়; সেই দাম সচরাচর পাওয়া যায় না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের ট্যানারিওয়ালারা এই কাজের উপযুক্ত চামড়া প্রস্তুত করিয়া দেশের এই নূতন শিল্পকে সাহায্য করেন না।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা	মূল্য
১। মডেলার ও ট্রেসার (modeller & tracer combined,—Winsor and Newton)	।৶০
২। বাটা'ল (ছোট)	।৶০
৩। হাতুড়ি (ছোট)	।০
৪। বোতাম লাগাইবার ডাইস্ (এক সেট)	।৶০
৫। ইনষ্ট্রুমেন্টের বাক্স (Mathematical Instrument Box)	।৵০
৬। কাঠের ফুটকল্	৴০
৭। স্প্রে (Spirit Spray,—Winsor & Newton)	।৶০
৮। সেট্ট যোড় তিন পাউণ্ড ওজনের একটি	।৴০
৯। প্রেস বোতাম (Press Buttons) নানা রঙের	।০
১০। রং (Leather Stain,—George & Co. কিংবা Winsor & Newton) আট রকম	১৲
১১। মোটা কাচের পাত (sheet) কিংবা পাথরের ফলক (slab) ১ ফুট × ১ ফুট	১।০
১২। কাঠের গোল রুলার কিংবা বেলুনি	।০
১৩। ছয় ছিদ্রযুক্ত চামড়ার 'সং' 'পাঞ্চ'	১।০
১৪। চামড়ার 'পাঞ্চ' ১ নং	।০
১৫। কাঁচি	।০
১৬। কাঠের ক্লিপ ১ ডজন	৵০
১৭। ভেড়ার চামড়া ১ পাউণ্ড	২৲
১৮। 'সিকোটিন্' (Seccotine, small)	।০
১৯। তুলি ৪ নং (Water Colour Sable brush No 4,—Winsor & Newton)	।৶০
২০। এনামেল কিংবা এলুমিনিয়ামের ছোট বাটি	৵০



নিটিং কেস্



টয়লেট-কেস্

চামড়া বাছাই

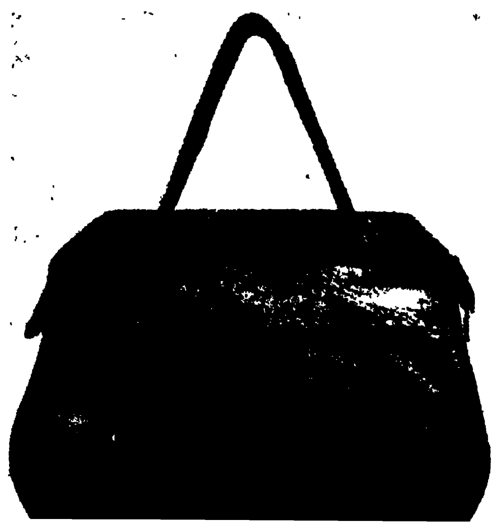
চামড়া সাধারণতঃ তিন রকমের খরিদ করা উচিত। মোটা—যাহাতে হাতের কাজ (modelling) করিতে হইবে, মাঝারি—ভিতরের আস্তরের (lining) জন্য, পাতলা—ফিতার (lace) জন্য। যত বড় জিনিষ হইবে বাহিরের চামড়াও সেই অনুপাতে মোটা দেওয়া উচিত। বর্ষাকালে কখনও বেশী চামড়া খরিদ করা উচিত নহে, কারণ তখন চামড়ায় নানারূপ দাগ হইয়া যায়। চামড়া খুব সাদা, নরম ও মোলায়েম হওয়া প্রয়োজন—হলদেটে নহে। চামড়া হাতের মুঠায় রগ্‌ড়াইলে যদি কোনরূপ কচ্‌ কচ্‌ শব্দ না হয় তাহা হইলেই সাধারণতঃ এই কাজের উপযুক্ত বুঝিতে হইবে। চামড়া খুব সূক্ষ্ম দানার হওয়া চাই। বিলাতী বাছুরের চামড়াই এই কাজের উপযুক্ত, কারণ তাহাতে যেরূপ মডেলিং করা যায় ঠিক সেইরূপই থাকে, কিন্তু অন্য চামড়ায় ঠিক ততটা থাকে না।

চামড়া কার্য্যোপযোগী-করণ

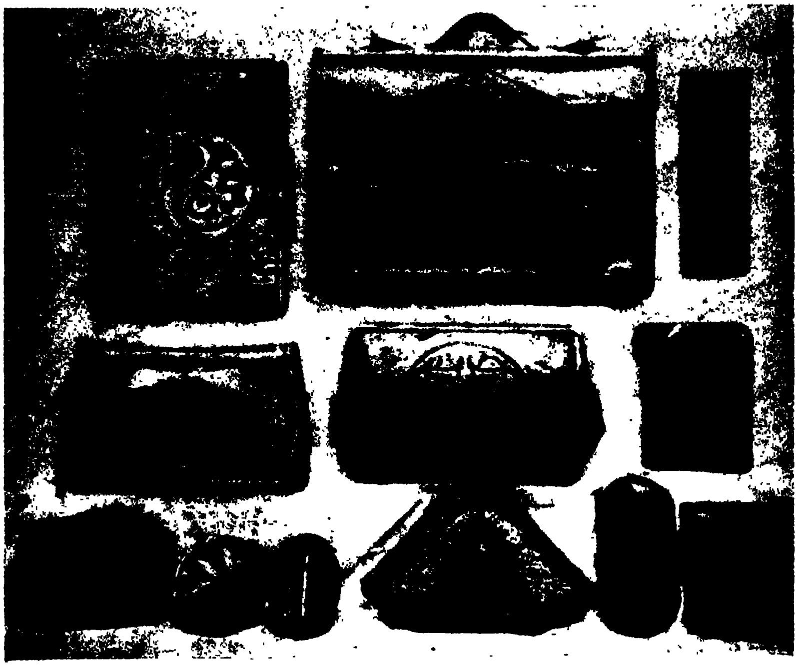
যে-কার্য্যের জন্য যতটুকু চামড়ার প্রয়োজন তাহা রেক্‌টিফায়েড্‌ বেঞ্জিন কিংবা অক্‌জেলিক এসিডের পাতলা আরক দ্বারা ধুইয়া লইতে হইবে, কারণ চামড়ার কোন স্থানে যদি তৈলাক্ত কিংবা অন্য কোনরূপ দুষ্ট জিনিষ থাকে তাহা অনেকটা সংশোধিত হইয়া যাইবে। ইহার পর চামড়া ঠাণ্ডা জল দ্বারা সমান ভাবে ভিজাইয়া কাঠের রুলার কিংবা বেলুনি দ্বারা উত্তমরূপে বেলিয়া লইতে হইবে। ইহাতে চতুর্দ্দিকেই চামড়া টান হইয়া অনেকখানি বড় হইয়া যাইবে। এইরূপ করিয়া প্রথমেই বাড়াইয়া লইলে পরে জিনিষের আকৃতির কোনও তফাৎ হইবে না। এখন চামড়া ছায়ায় সম্পূর্ণ রূপে শুকাইয়া লইতে হইবে, রোদে দেওয়া উচিত নহে কারণ তাহাতে চামড়া বিবর্ণ হইয়া যায়। সর্ব্বদাই চামড়ার চতুর্দ্দিকে একটু বাড়তি চামড়া বেশী রাখা উচিত, কারণ দাগ দিতে ভুল হইলে কিংবা বিচ্ছিন্ন অংশগুলির একত্র সমাবেশের সময় সংশোধন করা সম্ভব হইতে পারে।

দাগান

যে চামড়ায় নক্‌শা তুলিতে হইবে, তাহা সমতল



মেয়েদের বাজার-ব্যাগ

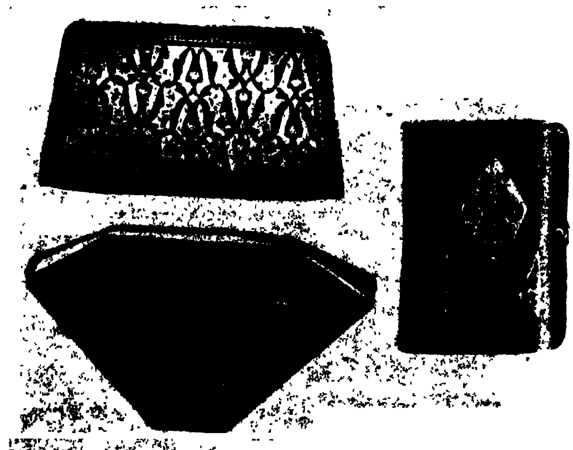


উপরে, বাম হইতে : রাইটিং কেস্, পোর্টফোলিও, চিরুণীর খাপ।
মধ্যে, " মেয়েদের দু-রকম হাত-ব্যাগ, তাসের বাক্স।
নীচে, " ব্রাশ্-কেস, দুটি ছোট মনিব্যাগ, ফোল্ডিং সেলাইয়ের বাক্স, চশমার খাপ, ওয়ালেট

কাচ কিংবা পাথরের ফলকের উপর রাখিতে হইবে। চামড়ার উপরিভাগ পরিষ্কার তুলা দ্বারা সমান ভাবে খুব অল্প করিয়া (যেন চামড়ার অন্য দিক্ ভিজিয়া না যায়) জলে ভিজাইয়া লইতে হইবে। কাগজের উপর পেন্সিলে (কালিতে নহে) নক্শা আঁকিয়া তাহা সেই ভিজা চামড়ার উপর সমান ভাবে বিছাইয়া দিয়া, যাহাতে কাগজখানি একটুও নড়িতে না পারে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন বাম হাতে কাগজখানি আস্তে চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে ট্রেসার দ্বারা নক্শার লাইনে লাইনে হাল্কা ভাবে দাগ দিলেই চামড়ায় নক্শাটি উঠিয়া যাইবে। নক্শা সম্পূর্ণরূপে চামড়ায় আঁকা না হইলে কখনও নক্শার কাগজ চামড়া হইতে উঠান উচিত নহে।

মডেলিং

চামড়ার যে স্থানটুকু যখন মডেলিং করা হইবে সে স্থানটুকু তখনই জলদ্বারা অল্প করিয়া ভিজাইয়া লইতে হইবে। নক্শার যে অংশটুকু উঁচু দেখান প্রয়োজন, মনে রাখিতে হইবে তাহা সর্ব্বদাই মডেলারের অগ্রভাগে থাকিবে। নক্শার লাইনের বাহিরে বাহিরে সমান চাপে মডেলার চালাইলেই আবশ্যক নক্শাটি উঁচু হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। মডেলার সাধারণতঃ ডান হইতে বাম দিকে চালাইতে হয়। কিন্তু এই সময় যদি চামড়া কুঁচকাইতে থাকে তাহা হইলে মডেলার বাম হইতে ডান দিকে চালাইতে হইবে। এইরূপ করিয়াও মডেলিং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। নক্শার লাইনের ধার দিয়া মডেলার দ্বারা চাপ দেওয়ার পর মডেলারের নীচে চামড়ার একটা অনাবশ্যক দাগ দেখা যাইবে, তাহা খুব মোলায়েম ভাবে মডেলার বুলাইয়া মিলাইয়া দিতে হইবে। এই দাগ না

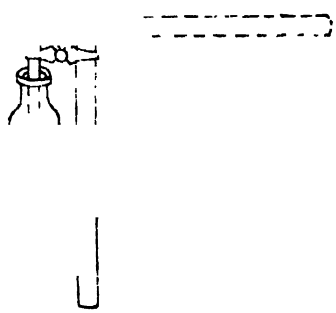


উপরে : মেয়েদের হাত-ব্যাগ   পাশে : তাসের বাক্স
নীচে : ফোল্ডিং সেলাইয়ের বাক্স

উঠাইলে রং ও পালিশের সময় কাজে খুঁৎ থাকিয়া যায়। বাছুরের চামড়ায় মডেলিং করিবার সময় এক হাতে মডেলিং করা ঠিক নহে, কারণ ঐ চামড়ায় খুব উঁচু করিয়া মডেলিং করা যায় বলিয়া মডেলারে দুই হাতে চাপ দিয়াই মডেলিং করিতে হয়।

রং করা

চামড়ার রং গুঁড়া অবস্থায় কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা মেথিলেটেড স্পিরিটে গুলিয়া কাজ করিতে হয়।



স্প্রে দ্বারা রং করিবার প্রণালী

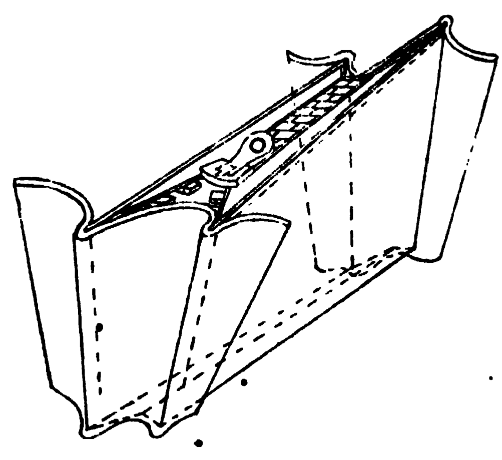
অল্প একটু রঙের গুঁড়াতেই অনেক রং করা হইয়া যায়। চামড়ার কাজের জন্য লাইট ব্রাউন, নাট-ব্রাউন, ক্রিম্‌সন, লাল, হলদে, নীল এবং নিগার ব্রাউন এই কয়টি রংই যথেষ্ট। চামড়ার কাজে সাদা রং পাওয়া যায় না। কাল রং সুবিধার নহে। হলদে, লাল এবং নীল রং মিশাইয়া বেশ সুন্দর কাল রং তৈয়ারী করা যায়। চামড়ায় যেরূপ রং দিতে হইবে তাহা একটি দুই আউন্সের ঔষধের শিশিতে খুব হাল্কা করিয়া মেথিলেটেড্‌ স্পিরিটে গুলিয়া লইতে হইবে। প্রথমতঃ চামড়াতে কখনও গাঢ় রং দেওয়া উচিত নহে, বারংবার হাল্কা করিয়া রং দিয়া যেরূপ গাঢ় রং দরকার সেইরূপ করিতে হইবে। একবার গাঢ় রং দিলে আর কখনই তাহা সংশোধন করা যাইবে না।

এখন যে চামড়া রং করিতে হইবে, তাহা কাঠের ক্লিপ দ্বারা পেষ্ট-বোর্ডে আটকাইয়া, রঙের শিশিতে স্প্রের সরু নলটি ঢুকাইয়া, মোটা নলটি তাহার সঙ্গে সমকোণ করিয়া, সেই মোটা নলের মুখে মুখ লাগাইয়া জোরে ফুঁ দিলেই স্প্রের সরু ও মোটা নলের সঙ্গমস্থল হইতে ফোয়ারার মত রং বাহির হইয়া চামড়ায় পড়িবে।

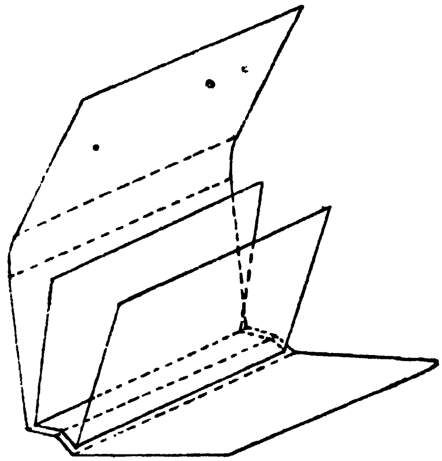
শিশিতে যত রং কমিয়া যাইবে, তত জোরে ফুঁ দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে ফুঁ দিয়া স্প্রের সাহায্যে চামড়ায় সমান ভাবে রং দিতে হইবে। ডিজাইনের ধারগুলিতে কিংবা অন্যান্য যে-সকল স্থানে গাঢ় রঙের প্রয়োজন তাহা তুলি দ্বারা দিতে হইবে। রং দিবার সময় তুলিতে যেন কখনই অতিরিক্ত রং না থাকে, কারণ তাহা হইলে রং চামড়ায় ছড়াইয়া যাইবে।

পালিশ

বাজারে কয়েক রকম চামড়ার পালিশ পাওয়া যায়, তাহার কোন-কোনটা ব্যবহার করা যাইতে পারে। 'সেল্‌ফ পলিশ' বলিয়া এক রকম পালিশ পাওয়া যায় তাহাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। একটি হাঁসের ডিম কিংবা দুইটি মুরগীর ডিমের সাদা অংশ দেড় পোয়া ঠাণ্ডা জলে ফেটাইয়া, এক তোলা গরুর কাঁচা দুধ মিশাইয়া লইয়া, তাহা চামড়াতে পাতলা করিয়া

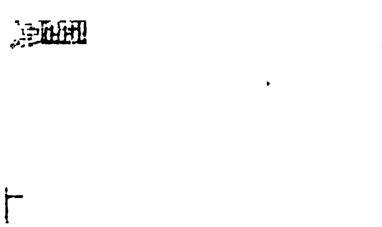


লেডীস্‌ ব্যাগের ভিতরের যাবতীয় অংশ



মেয়েদের ব্যাগের বাহিরের অংশ ও তন্মধ্যস্থ পকেটের দেওয়াল—তাহার দুই ধারে 'গাসেট' ও উপরে 'জিপ্ ফাসনার' লাগাইতে হয়।

লাগাইয়া খুব জোরে ঘষিলেও বেশ পালিশ হয়। তিসি জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ঠাণ্ডা জল কয়েক বার চামড়ার উপর হাল্কা করিয়া মাখাইয়া দিলে চামড়ার জমি খুব সমান করা যায়। তবে নিম্নলিখিত প্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সস্তায় পালিশ করা যায়। স্প্রের সাহায্যে সাধারণ ঠাণ্ডা জল রঙের মত চামড়ায় দিয়া ন্যাকড়ার মধ্যে তুলার পুঁটুলি করিয়া প্রথমতঃ আস্তে আস্তে এবং ক্রমশঃ জোরে রগড়াইলে বেশ ভাল পালিশই হয়। চামড়া বেশী ভিজাইতে হয় না। যদি বেশী ভিজিয়া যায় তাহা হইলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রগড়াইতে

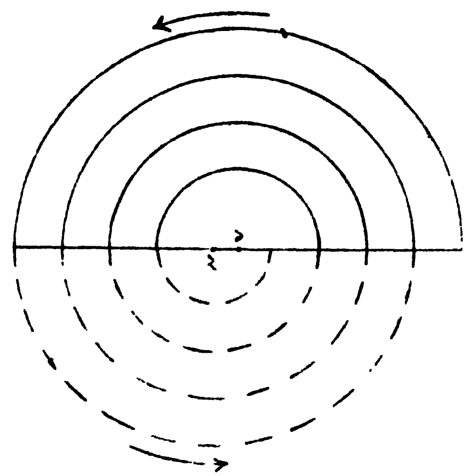


লেডীস ব্যাগের ভিতরের দেওয়াল ও 'জিপ্ ফাস্‌নার'

হইবে। রগড়াইবার সময় বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে, কারণ জলধারা স্প্রে করিবার পর চামড়ার উপরিভাগ খুব নরম হইয়া যায়, তখন আস্তে আস্তে না রগ্‌ড়াইলে নানারূপ দাগ ও আঁচড় লাগিয়া যাইবে—যাহা আর কখনও তুলিয়া ফেলা যাইবে না। ইহা মনে রাখা উচিত যে, জলে এই সকল রং উঠিয়া যায় না। চামড়াতে রং করা শেষ হইয়া গেলে পালিশ করিতে হয়। পালিশের পর জিনিষের আকৃতির দাগে দাগে কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

লেসিং

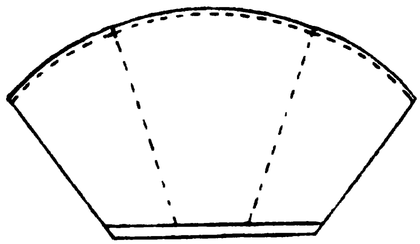
চামড়ার ফিতা তৈয়ারী করিতে নৈপুণ্যের দরকার লেস সমান হওয়াই উচিত, কারণ তাহাতে বাঁধন



লেস কাটিবার প্রণালী

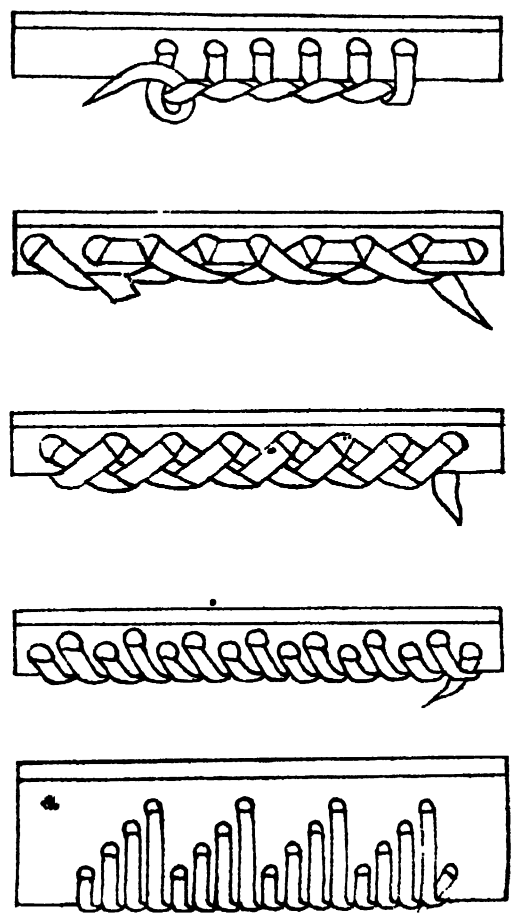
সুন্দর হয়। লেসের জন্য পাতলা চামড়ার দরকার গোল করিয়া লেস কাটাই উচিত, কারণ তাহাতে অনেক লম্বা লেস করা যায়। একটা জিনিষে অত্যধিক জোড়া থাকা উচিত নহে। খুব বড় বড় জিনিষে লেসিঙে জোড়া না দিয়াও করা যায় কিন্তু অত্যধিক লম্বা লেস হইলে লেসিং করিতে বড়ই অসুবিধা হয়, সেই কারণে তিন-চার হাত লম্বা লেস দ্বারা লেসিং করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এখন কি করিয়া লেস তৈয়ারী, রং ও পালিশ করিতে হয় তাহা লিখিতেছি

লেসিঙের চামড়াও জলে ভিজাইয়া যথাসম্ভব বেলুনি দ্বারা বেলিয়া লইতে হইবে। চামড়া শুকাইলে পর ট্রেসার দ্বারা ঠিক মাঝামাঝি একটা হাল্কা দাগ কাটিতে হইবে। চামড়ার মধ্যস্থলে সেই লাইনের উপর একটি বিন্দু ও সেই বিন্দুর বামে সন্নিকটে আর একটি বিন্দু দিতে হইবে। প্রথমতঃ ১ নং বিন্দু হইতে লাইনের উপরার্দ্ধে বিভাজক (divider) দ্বারা অর্দ্ধচক্র আঁকিতে হইবে। এই অর্দ্ধচক্র লাইনের বামে যেখানে মিলিয়াছে, ২ নং বিন্দু হইতে লাইনের নিম্নার্দ্ধে অপরার্দ্ধ চক্র আঁকিতে হইবে। এইরূপ ভাবে একবার ১ নং ও আর একবার ২ নং বিন্দু হইতে অর্দ্ধচক্র আঁকিলেই দেখা যাইবে যে চক্রগুলি ক্রমশই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া সম্পূর্ণ অংশ আঁকা হইয়া গিয়াছে। এখন চক্রের ডান দিকের লাইন ধরিয়া কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেই চক্রাকৃতি একটা লেস তৈয়ারী হইয়া যাইবে।



'গাসেট'

প্রথম ও দ্বিতীয় বিন্দুর দূরত্বের উপর লেসের সরু-মোটা নির্ভর করে। যে রকম চওড়া লেসের প্রয়োজন তাহার দ্বিগুণ চওড়া করিয়া চামড়ায় দাগ দেওয়া উচিত; কারণ পরে লেস অনেক সরু হইয়া যাইবে। এই চক্রাকৃতি লেসও কাজের উপযুক্ত নহে। ইহা অল্প ক্ষণ জলে ভিজাইয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তর্জ্জনী দ্বারা চাপিয়া অল্প অল্প করিয়া টানিয়া লইলে অনেক জলও বাহির হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে লেস অনেকটা লম্বা হইয়া নানা স্থান অসমান হইয়া যাইবে। এখন প্রয়োজন-মত চওড়া কাঁচির দ্বারা লেসের ডান দিকটা ছাটিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই সুন্দর লেস তৈয়ারী হইবে। লেস শুকাইয়া গেলে পর একটা বাটিতে রং গাঢ় করিয়া গুলিয়া তাহাতে ডুবাইয়া দিলেই লেসের রং করা হইয়া গেল। লেসের রং যখন প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে, তখন লেস টান করিয়া সোজাভাবে ধরিয়া রাখিয়া ন্যাকড়া দ্বারা প্রথমতঃ আস্তে আস্তে এবং ক্রমশঃ জোরে রগড়াইয়া দিলেই লেস খুব পালিশ হইয়া যাইবে। এইরূপে তৈয়ারী



বিভিন্ন ধরণের লেসিং

করিলে লেস খুব সুন্দর, নিখুঁৎ ও মজবুৎ হয়। টান লাগিলে লেস যত দূর বাড়িতে পারে তাহা প্রথমতঃ করিয়া লইলে পরে বাঁধন ঢিলা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বাঁধিবার সময় যখন লেস জোড়া দিতে হইবে, তখন লেসের উভয় প্রান্তের তলভাগের এক-দেড় ইঞ্চি পরিমিত অংশ বাটালি দ্বারা পাতলা করিয়া সিকোটিন্ দ্বারা

জোড়া দিয়া লেসের উভয় পার্শ্বের অসমান চামড়া কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এখানে কয়েকটি লেসিঙের নমুনা দেওয়া হইল।

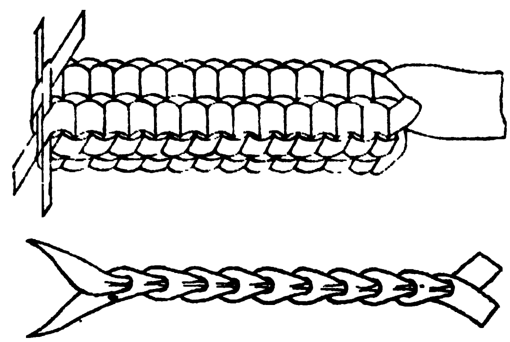
সাজ

চামড়ার অনেক রকম নক্শার কাজ করা যায়। যাহার যত হাত পরিষ্কার এবং শিল্পজ্ঞান অধিক, তাহার কাজ তত পরিষ্কার হইবে। যখনই চামড়ার কোন জিনিষ তৈয়ারী করিতে হইবে, তখনই সর্ব্বপ্রথম কাগজে একটা নিখুঁৎ মাপ আঁকিয়া লওয়া উচিত। এই কাজে যদিও কিছু সময় অতিবাহিত হইবে, তথাপি ইহা করিলে পরের কাজগুলিতে আর কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

চামড়ার কোন কোন জায়গায় ভোঁতা ট্রেসার দ্বারা ঘন ঘন বিন্দু করিয়া গেলে বেশ সুন্দর দেখায়। পেষ্টবোর্ড, কার্ডবোর্ড কিংবা ষ্টেন্‌সিল্‌ কাগজ প্রভৃতিতে নানারূপ নক্শা কাটিয়া তাহা চামড়ার উপর ফেলিয়া স্প্রে দ্বারা রং করিয়া নানারূপ নক্শা করা যায়। ধুনানী কার্পাস তুলা রঙে ডুবাইয়া ভালরূপ নিংড়াইয়া লইয়া ছোপ ছোপ করিয়া চামড়ায় লাগাইয়া গেলে বেশ মেঘের মত দেখায়।

বাটিকের কাজ

ট্রেসিঙের পরই বাটিকের কাজ করা উচিত। কারণ মডেলিঙের পরে করিলে চামড়ার উচ্চতা ও নিম্নতার জন্য সমস্ত স্থানে সমানভাবে গঁদের আঠা লাগে না, তাহাতে সুন্দর বাটিক কাজ হয় না। বাটিকের কাজ আর কিছুই নহে, কেবল চামড়ার উপর সরু সরু রঙের লাইন করা। এইরূপ লাইন হাতে আঁকা সম্ভব নহে। কাজেই নিম্নলিখিতরূপে করিতে হইবে। চামড়ার যে অংশটুকুতে বাটিকের কাজ করিতে হইবে, তাহাতে বেশ একটু মোটা (মধুর মত ঘন) করিয়া গঁদের আঠা লাগাইয়া খুব প্রখর রৌদ্রে দিলেই দেখা যাইবে যে অল্প ক্ষণের মধ্যেই শুকাইয়া আঠার কোন কোন জায়গা আপনা-আপনিই ফাটিয়া গিয়াছে। যে-সকল স্থান ফাটে নাই, সেই সকল স্থানে হাত দ্বারা একটু চাপ দিলেই চট্‌ চট্‌ করিয়া ফাটিয়া যাইবে। বেশী ফাটান উচিত নহে, কারণ তাহাতে লাইন পরিষ্কার হয় না। এখন তুলিতে কিংবা তুলাতে শুক্‌না করিয়া গাঢ় রং মাখাইয়া ঐ গঁদের আঠার উপর সমানভাবে বুলাইয়া গেলেই আঠার ফাটল দিয়া রং প্রবেশ করিয়া চামড়ায় ঢুকিবে। ইহার পর তুলা ও পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে গঁদের আঠা আস্তে আস্তে রগ্‌ড়াইয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। কোন কোন গঁদের আঠায় চামড়ার উপর কালো কালো দাগ হইয়া যায়। কাজেই গঁদের আঠা ব্যবহারের পূর্ব্বে অন্য এক টুক্‌রা চামড়ায় লাগাইয়া দেখাই শ্রেয়। গুঁড়া গাম্‌ একাসিয়া ঠাণ্ডা জলে ঘন করিয়া গুলিয়া ব্যবহার করিলেও বেশ বাটিকের কাজ হয়।



মেয়েদের হাতব্যাগের হাতলের নমুনা

এম্‌বসিং

চামড়ায় এম্‌বসিঙের অর্থ হইল চামড়ার উল্টা পিঠ হইতে নক্শা উঁচু করিয়া তোলা। এই কাজ করিতে হইলে ট্রেসিঙের সময় চামড়া একটু ভিজাইয়া তাহার উল্টা পিঠে কার্ব্বন কাগজের সোজা পিঠ লাগাইয়া নক্শা দাগাইলেই চামড়ার উল্টা পিঠেও সেই নক্শাটি দাগান হইয়া যাইবে। তৎপরে পূর্ব্বের নির্দ্দেশ মত মডেলিং করিয়া নক্শার যে অংশ উঁচু করিতে হইবে, মডেলার দ্বারা চামড়ার পশ্চাৎ ভাগ হইতে আস্তে আস্তে গোলাকৃতি ভাবে ঠেলিয়া দিলেই নক্শার সেই অংশটি ক্রমে উঁচু হইয়া যাইবে। এই কাজটি করিবার সময় বালি-ভরা বালিশের মত একটা জিনিষে চামড়ার উপরিভাগ নিম্ন মুখে রাখিয়া করিলে কাজ ভাল হয়। এই অবস্থায়

চামড়া যদি রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এম্‌বসিং সামান্য চাপেই নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজেই চামড়ার পিছন দিক্‌ হইতে এমন কিছু দেওয়া উচিত যাহাতে চামড়ার উচ্চতা ও কোমলত্ব রক্ষা হয়। এই কাজের জন্য উইনসর এণ্ড নিউটন্‌ কোম্পানীর এক রকম গুঁড়া বাজারে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত জিনিষটি ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাউরুটি সেঁকিয়া তাহা খুব সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে গাম্‌ একাসিয়ার আঠা ও সামান্য এসিড সেলিসেলিক মিশাইয়া বেশ শুক্‌না শুক্‌না একটা পদার্থ তৈয়ারী করিতে হইবে। সেই পদার্থ বার-বার অল্প অল্প করিয়া পিছন দিক্‌ হইতে টিপিয়া লাগাইয়া দিয়া তাহার পশ্চাতে একটা পাতলা চামড়া আঠা দ্বারা লাগাইয়া দিলেই এম্‌বসিং সুন্দর থাকিবে। অন্য জিনিষ দ্বারাও এই কাজ করা যাইতে পারে। চামড়ার পশ্চাৎ ভাগে তুলা, চামড়ার কুচি, কাগজের কুচি, কাগজের মণ্ড, রবারের গুঁড়া, কাঠের গুঁড়া এবং কর্কের গুঁড়া ব্যবহার করিয়াও এই কাজ করা যাইতে পারে।

সোনালী রং করা

নক্‌শার যেস্থানটুকু সোনালী রং করিতে হইবে সেই স্থানটুকুতে 'জাপানী গোল্ড সাইজ' তুলি দ্বারা সমান ভাবে লাগাইতে হইবে। 'গোল্ড সাইজ' যেন পুরু না হয়। উহা যখন প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে (অঙ্গুলি দ্বারা বুঝিতে হইবে) এমন সময় সোনালী পাত সেই স্থানটুকুর উপর বিছাইয়া দিয়া সোনালী পাতের কাগজের উপর দিয়া যে-স্থানে কেবল সোনালী রং লাগাইতে হইবে, সেই স্থানটুকুর উপর আস্তে আস্তে অঙ্গুলি কিংবা শক্ত তুলি বুলাইলে গোল্ড সাইজে সোনালী পাত বসিয়া যাইবে। অন্যান্য যে-সকল স্থানে সোনালী রং দিতে হইবে না, সেই সকল স্থানে কিছু সোনালী রং লাগিলে তাহা তুলাতে বংসামান্য তার্পিন মাখাইয়া আস্তে আস্তে ঘষিয়া উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

চাপা দেওয়া

চামড়ার কোনও অংশে স্বাভাবিক রংই রাখিবার ইচ্ছা হইলে গাম একাসিয়া ঘন করিয়া ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া সেই অংশে মাখাইয়া সামান্য ভিজা অবস্থায় স্প্রে দ্বারা রং দিয়া গেলেই রঙের কোন দাগ লাগে না। পরে তুলা জলে আস্তে আস্তে রগড়াইয়া গঁদ উঠাইয়া ফেলিতে হয়।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয় জানা উচিত, যাহা ক্রমে প্রয়োজন হইবে, যেমন,—লেস্‌ বাঁধা, হ্যাণ্ডেল ও গাসেট তৈয়ারী প্রভৃতি। এই সকল জিনিষের নমুনা কিছু দেওয়া হইল। লেস্‌ জোড়া দেওয়া কিংবা ঐরূপ ছোটখাট জোড়াতে সিকোটিন ব্যবহার করিলে কাজ অপরিষ্কার এবং ঐ স্থানের চামড়া শক্ত হইয়া যায়। বিস্তীর্ণ জায়গায় ময়দা ও তুঁতে মিশাইয়া আঠা করিয়া ব্যবহার করাই ভাল। লেস বাঁধার উপর জিনিষগুলির সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বাজারে সাধারণতঃ দুই-তিন রকমের লেসের বাঁধন দেখা যায়, কিন্তু আমি দশ-বার রকম জানি, তাহা লিখিয়া বুঝান সম্ভব নয়; কেবল কয়েকটি মাত্র নমুনার ছবি দিয়াছি। হ্যাণ্ডেল ও গাসেট নানা রকমের হয়। মেয়েদের হ্যাণ্ডব্যাগ কিংবা অন্য কোন ব্যাগের দুই পার্শ্বের ভাঁজ-করা ধারকে গাসেট বলে। গাসেটের নমুনা কিংবা মাপ বুঝাইতে হইলে আঁকিয়া বুঝাইতে হইবে, তাহা লিখিয়া বিশদ ভাবে বুঝান সম্ভবপর নহে, কেবল এক রকম গাসেটের ছবি দেওয়া হইল। কোন কাপড়ের জামা যেমন সুতা দিয়া টাকিয়া লইলে কাজ পরিষ্কার হয়, তেমনই ময়দার আঠায় সামান্য তুঁতে দিয়া তাহা দ্বারা একটা চামড়া অন্য চামড়ার সহিত জোড়া দিয়া কাজ করিলে কাজ পরিষ্কার হইবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, চামড়ায় এই হাতের কাজ শিল্পচর্চ্চা হিসাবেই করা উচিত। হাতের তৈয়ারী সুন্দর জিনিষ কখনই অল্পমূল্যে বিক্রয় হইতে পারে না। এই কথাটা বিক্রেতা ও ক্রেতার উভয়েরই মনে রাখিতে হইবে। •

কালো ও বেঁটে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

খবর পাওয়া গেল, পরিমলবাবু আসিতেছেন। একা নহে, সস্ত্রীক এবং আমাদেরই বাড়ীর ঠিক সামনে হাত-দুই ব্যবধান সঙ্কীর্ণ এক গলির ওপারে।

পরিমলবাবুকে আজকাল কে না জানেন? বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে জীবনের গ্রন্থখানি তাঁহার উপন্যাসের চেয়েও কৌতূহলকর এবং না-জানা অনেক ঘটনার রহস্যে রোমাঞ্চময়। প্রথম জীবনে তিনি ভাঙিয়া ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড; তার পর নাম করেন প্রফেসারিতে। কিন্তু নাম করিতে না-করিতে অকস্মাৎ খেয়ালের বশে বোম্বাই হইতে বিলাতের দিকে দেন পাড়ি। বছর কতক পরে এ-দেশের মাটিতে যখন পা দিলেন, তখন আচার-ব্যবহারে একেবারে ও-দেশের মানুষ। ও-দেশের মানুষ হইলেও সঙ্গিনী-নির্ব্বাচনে তাঁহার রুচিজ্ঞানের খুব প্রশংসা করা যায় না। উপায় থাকিলে সে খুঁৎটুকু অবশ্য তিনি রাখিতেন না। বিলাতী বিদ্যার রসের রসদ লইয়াই তিনি পা বাড়াইয়াছিলেন অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপার চুকাইয়া শ্বশুরের অর্থেই…। কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার মনস্বিতা। অত্যন্ত তেজী টাটকা বীজ যেমন-তেমন মাটিতে বুনিয়া দিলেও যেমন সতেজ অঙ্কুর বাহির হয়, এবং যথাসময়ে ফলও ফলিয়া থাকে, তেমনই আবহাওয়াকে অনুকূল করিবার দক্ষতা তাঁহার মনের যথেষ্টই ছিল। দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলনের ভরা জোয়ার। স্বর্ণপ্রসবিনী ভবিষ্যৎকে সেই ভরা জোয়ারে ভাসাইয়া দিয়া তিনি গিয়া ঢুকিলেন জেলে। বছর কতক বাদে সেখান হইতে বাহির হইলেন ভগবীর বেশে। অঙ্গে গৈরিক বাস, আহার আতপ তণ্ডুল, পায়ে খড়ম, মুখে বেদ-বেদান্তের বুলি, সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ এবং নিরাসক্ত। শ্বশুর তো প্রমাদ গণিলেন! যথেষ্ট অনুনয়, বিনয় এবং ভর্ৎসনা করিয়া বুঝিলেন, একবার যে-জিনিষ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় তাহাকে ফিরাইয়া আনা কঠিন, ধ্রুব মৃত্যুর মত ইহাকে না মানিয়া উপায় নাই। ইচ্ছা ছিল না মেয়েকে এই ছন্নছাড়ার ঘরে দুঃখের বোঝা বহিতে ঠেলিয়া দেন, মেয়ে কিন্তু পুরাকালের নজির দেখাইয়া হিমালয়-নন্দিনীর মতই যোগিরাজের অনুগামিনী হইলেন।…তার পর কয়টি বৎসর এই মহাপুরুষের জীবনী অনুসরণে বাধা ঘটিয়াছে। ঐ কয়টি বৎসর নেপালে, কি তিব্বতে, কিংবা আলমোড়ায় তিনি কাটাইয়াছেন সে-সংবাদ আমরা জানি না। জানি না বলিয়াই রহস্যের ঘন অন্ধকারে কৌতূহল হইয়াছে প্রবল, এবং জানি না বলিয়াই তপস্যার মত একটি স্বর্গীয় অথচ সুষুপ্ত জিনিষের মাহাত্ম্যকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া মানিয়া লইয়া অপরিসীম শ্রদ্ধায় ঐ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মাথা নামাইয়া আসিতেছি।

সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ—সে-কালের জনক ঋষির আদর্শ। শুধু যোগশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বা শুধু এ-দেশের জল-হাওয়ায় আধ্যাত্মিকতার প্রসার ঘটিলে আমাদের ভক্তিটা হইত ম্‌'লো। নাম শুনিয়াও হয়তো ভাল করিয়া চক্ষুই চাহিতাম না, অথবা, সামনে পড়িলে বলিতাম, 'ওঃ, প্রণাম!' কিন্তু যেহেতু বিলাতী বিদ্যার তকমা তাঁহার কপালে আঁটা, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ইংরেজী ভাষায় তিনি অনর্গল করিয়া যান, আধুনিক যন্ত্র-যুগের উপকারিতা এবং প্রাচীন কালের মতবাদ দুইয়ের সমন্বয় পাওয়া যায় তাঁহার বাণীর মধ্যে প্রচুরতর, সেই হেতু আমাদের ভক্তি জমাট ভাবে দানা বাঁধিয়াছে। বেশবাসে তিনি মার্জ্জিত, ব্যবহারে অমায়িক, শিষ্যসংখ্যায় সৌভাগ্যবান। সুদূর প্রবাস হইতে বহু দিন পরে কলিকাতায় আসিতেছেন। শহরের কোলাহল হইতে কিছু দূরে থাকিতে চান। দূরে মানে, অজ্ঞাতবাস; তাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঘন জনারণ্যে অতি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর ঠিক আমাদের সামনে বাড়ী ভাড়া লইতেছেন।

এ-সমস্ত গেল শোনা কথা, অর্থাৎ জনশ্রুতি ও সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধ হইতে সার-সঙ্কলন। তার পরের কথা, অর্থাৎ দেখা ও জানাজানির কাহিনীটুকুই এই গল্পের বিষয়বস্তু।

সামনাসামনি জানালা, তিনি আসিয়াই ঐ পুব-খোলা ঘরখানি পছন্দ করিলেন। যেদিন সুদূর প্রবাস হইতে কলিকাতায় আসিলেন, সেদিন না বাহির হইল কোন শোভাযাত্রা, না বা সংবাদ-দুর্ভিক্ষগ্রস্ত পত্রিকার পৃষ্ঠাব্যাপী বড় বড় হরফে কোন রসাল শিরোনামা। নারিকেলের মধ্যে অলক্ষিত জলসঞ্চারের মতই তাঁহার আবির্ভাব ঘটিল। অত্যন্ত সাধারণ, এবং সাদাসিধা গৃহস্থেরা যেমন বাসা বদল করিয়া বাসান্তরে আসেন, এবং সঙ্গে আসে বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় দৃষ্টিকটু দ্রব্য-সমূহ, তেমনই তাঁহার সঙ্গে আসিল, পায়াভাঙা চৌকি, শিক-খসা লোহার উনুন, ঝুলমাখা ভাঙা কালো হাতপাখা, গোটাকতক মশলা-ভর্ত্তি টিন ও হাঁড়ি-কলসী, কুলা, ডালা, বঁটি, থলের মধ্যে ভরা বাসনের রাশি, চিমনি-ভাঙা হ্যারিকেন, মায় ময়লা কাপড়ের ছোটবড় অনেক-গুলি পুঁটুলি এবং ততোধিক শোচনীয় ক্ষয়প্রাপ্ত সম্মার্জ্জনী একগাছি। তার পর লোকটিকে দেখিলাম, কালো, এবং বেঁটে! ভারতজোড়া নামের সঙ্গে চেহারাটাও যদি মিলিত! পরনে গৈরিক বাস, গলায় কিসের মালা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কিন্তু কোথায় সে দিব্য জ্যোতি-সম্পন্ন দৃষ্টি—দীর্ঘদিনসঞ্চিত তপস্যার কাহিনী যে-আলোকে জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতে থাকে? কোথায় সেই অধরসংলগ্ন প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ মৃদুহাস্য সর্ব্ব সময়ের জন্ম পরম তৃপ্তির বার্ত্তাটিকে অন্তরলোক হইতে উৎসারিত করিয়া যাহা সন্তপ্তজনের চিত্তের ক্ষোভগ্লানিকে ধুইয়া মুছিয়া দেয়? কণ্ঠস্বরে সে খাদ-গম্ভীর ধ্বনিই বা কই?

—নমস্কার। ব'সে ব'সে আমার ঘর গোছানো দেখছেন? হে-হে প্রতিবেশী হয়েছি, একটু নজর রাখবেন।

বলিয়া চাকরের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ও-দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

এই লোক! বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার, এবং অসহযোগের অগ্নিস্তম্ভ? সমস্তই ভুয়া! যে-কাগজে হৈ-হৈ করিয়া বাঘের পেটে মানবসন্তানের জন্মকাহিনী প্রচারিত হয়, এ সেই কীর্ত্তিমন্তের অক্ষয় কীর্ত্তি! এমন যাহার চেহারা সে কেন জন্মজন্মান্তর জেলে পচিয়া মরিল না? বিলাত যাওয়ার বিড়ম্বনা তাহার কেন? লোক-লোচনের অন্তরালে বসিয়া তপস্যা করাই তাহার উচিত ছিল! বেঁটে, এবং কালো! ক্ষমা করিবেন, শুধু কালো বা শুধু বেঁটে লোকগুলির উপর আমার বিশেষ অশ্রদ্ধা নাই, কিন্তু একাধারে ঐ দুয়ের সংযোগ যাহাতে হইয়াছে, জানি অনেকে ক্রুদ্ধ হইতেছেন, কিন্তু অপ্রিয় সত্যভাষণের কঠিন কর্ত্তব্যে তো অবহেলা করিতে পারি না, তেমন লোককে শ্রদ্ধা করা সত্যই কি কঠিন নহে?

বেঁটে এবং কালো, অথচ নাম পরিমল! অন্ধ স্নেহাতুর দম্পতি বহুদিন পরে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া অন্তরে যে অবর্ণনীয় সুখের সৌরভ- আঘ্রাণ করিয়াছিলেন, তাহারই অক্ষয় স্মৃতি হয়তো বা নামের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিয়াছেন। সে যাহাই হউক, পরিমলকে আমরা দেখিলাম, এইবার আঘ্রাণের কথা বলা যাক।

হাঁকডাক হৈ হৈ করিয়া দিন দুই কাটিল, তার পর পুবখোলা ঘরে যেদিন তিনি স্থির হইয়া বসিলেন, দেখিলাম সাধনভজনের কিছু কিছু উপকরণ তাঁহার আছে; অজিন চর্ম্ম ও কমণ্ডলু, রুদ্রাক্ষ ও ধূপধুনার আয়োজন, চন্দনের গন্ধ ও গ্রন্থযুক্ত আলমারি, এবং সর্ব্বোপরি এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা। এই দু-দিনে এ-ঘরের ত্রিসীমায় কাহাকেও পদার্পণ করিতে দেখি নাই। ঘরটি তিনি ধ্যান-ধারণার জন্যই নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, এবং আশা হইল তাঁহার সাধন-প্রক্রিয়ার কিছু-না-কিছু প্রত্যক্ষ করিয়া নয়ন সার্থক করিব।

কাল—প্রভাত।

এ-ঘরের খাটে বসিয়া দেখিতেছি, ও-ঘরের মেঝেয় কুশাসন পাতিয়া পরিমলবাবু কোশাকুশি লইয়া জপে বসিয়াছেন। আচমন করিয়া আঙুলে পৈতা জড়াইয়াছেন,

দুয়ারের ওপার হইতে শিশুকণ্ঠের অস্ফুট কাকলি আসিল, 'বাবা ?'

কালবিলম্ব না করিয়া পরিমলবাবু আসন ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, 'কে রে, খুকী ?'

'আমি যাব।'

ততক্ষণে পরিমলবাবু দুয়ার খুলিয়া মেয়েকে কোলে লইয়াছেন। কোলে লইয়াই আদর করিয়া তাহার নরম ফুলো গালে চুমা দিতে দিতে বলিলেন, 'লক্ষ্মী সোনা, যাও খেলা কর গে, জপটা সেরে নিই।'

'আমি জপ দেখব।'

'জপ দেখবি কি রে ?'

'না—আ, দেখব।' বাপের গলা জড়াইয়া খুকী আবদারের ধ্বনি তুলিল।

অগত্যা মেয়ে-কাঁধে পরিমল বাবু ফিরিয়া আসিলেন। মুখে এতটুকু বিরক্তি নাই। মেয়ের গালে আরও কয়েকটি চুমা খাইয়া সামনের তক্তাপোষটার উপর বসাইয়া দিলেন, এবং আদর করিয়া বলিলেন, 'লক্ষ্মী খুকু, চুপটি ক'রে ব'সে থাক এইখানে, আমি জপটা সেরে নিই।'

মেয়ে বসিল উপরে তক্তপোষে, বাপ বসিলেন কুশাসনে। চোখ বুজিতেই মেয়ে ডাকিল, 'বাবা ?'

চোখ না খুলিয়া পরিমলবাবু বলিলেন, 'কি, মা ?'

'আমি জপ করব।'

'জপ করবি ?' এইবার পরিমলবাবু চোখ চাহিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, 'জপ করবি ? আচ্ছা চোখ বোজ। বুজেছ ? হাত জোড় কর, করেছ ? আচ্ছা, চুপটি করে ব'স। নড়ো না যেন—লক্ষ্মী মেয়ে।'

মেয়েটি বাপের নির্দ্দেশমত চক্ষু বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিল, বাপও চক্ষু মুদিলেন। শরতের মেঘ ও রৌদ্র যতটুকু স্থির হইয়া থাকে ছোট মেয়েটি হয়তো তার চেয়ে বেশীক্ষণই চুপ করিয়া ছিল, চক্ষু চাহিয়া সে আবার ডাকিল, 'বাবা ?'

মুদিতনয়ন পরিমল বাবু কোন উত্তর দিলেন না।

মেয়ে আবার ডাকিল, পরিমলবাবু নিস্পন্দ।

বার কতক ডাকিয়া মেয়ে কাঁদিবার উপক্রম করিল, কিন্তু না কাঁদিয়া বুকে ভর দিয়া তক্তাপোষ হইতে নামিল। নামিয়া প্রথমে হাত দিল জলভর্ত্তি কোশায়। কুশি দিয়া জল নাড়িয়া কিছুক্ষণ খেলা করিল। খেলা যখন ভাল লাগিল না তখন সোজা আসিয়া বসিল বাপের কোলে। পরিমলবাবু তথাপি নিস্পন্দ রহিলেন। কোল ছাড়িয়া মেয়ে তখন গিয়া উঠিল পিঠে এবং পিঠ বাহিয়া কাঁধে। খুকীর বুদ্ধি কিছু আছে, দেখা গেল। কাঁধের দুই পাশে দুই পা ঝুলাইয়া দিয়া বাপের ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরিয়া ঘোড়া চালাইবার ভঙ্গীতে খুকী 'হেট, হেট' করিতে লাগিল।

পরিমলবাবু চক্ষু চাহিলেন, সামান্য বিরক্তির রেখা তাঁহার মুখে ফুটিল না। জপরত করাঙ্গুলির আবর্ত্তন থামাইয়া পিছন দিকে দুটি হাত দিয়া খুকীকে টানিয়া কোলের উপর নামাইলেন। ক্ষুদ্র মুখখানি তাহার চুমায় ভরিয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন 'দুষ্টু!' তার পর বাপ মেয়ের অনেক কথা হইল; তপস্যার অনুকূল নহে বলিয়া সে-সব কথা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখি না।

বেলা বাড়িল। ওপারে গৃহিণী দেখা দিলেন, (আমরা অবশ্য তাঁহার কণ্ঠস্বর ও সম্বোধনের ভাষা শুনিয়া ধরিয়া লইলাম) বলিলেন, 'আজ কি সারাদিন মেয়ে নিয়ে গল্প করবে ? হাটবাজার হবে না ?'

পরিমল বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'বাজার করতে হবে বইকি। পয়সা দাও।'

ওধারে ঠুং করিয়া টাকার শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর, 'একটা কথা বলব ? এক পয়সার পান এনো।'

'পান!' পরিমলবাবু মহ বিস্ময়ে বর্ত্তুলাকার চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিলেন, 'পান কি হবে ?'

গৃহিণী নরম গলায় উত্তর দিলেন, 'খাব।'

পরিমলবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'না, না, কোন কিছুতে লোভ করা ঠিক নয়। জান তো, ইচ্ছার শেষ নেই; একটার পর একটা, তার পর একটা, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আসেই আসে। আজ পান, কাল দোক্তা—'

গৃহিণী কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন।



পরিমলবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'নাও, খুকীকে ধর। আমি বাজার-খরচের খাতাখানা দেখি। আচ্ছা চল, আগে ভাঁড়ার দেখে আসি, কি আনতে হবে না-হবে।'

এই লোক আধ্যাত্মিক জগতে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন! এবং এই লোকই সাগরপারে সভ্য দেশে গিয়া বছর কয়েক বাস করিয়া আসিয়াছেন! কথায় বা আচরণে এতটুকু মার্জিত রুচির পরিচয় মিলে না, সংসারের তুচ্ছতম জিনিষের উপরও সজাগ দৃষ্টি!

তখন দুপুর বেলা। ওপারের জানালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর কয়েক জন লোকের মৃদু আলাপ চলিতেছে সে-কথা বেশ বুঝা যায়। একটু কান পাতিয়া শুনিলে উপনিষদের শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রতীচ্যের মতবাদ ও প্রাচ্যের ভাবধারা লইয়া এক জন কি তর্ক তুলিয়াছেন, পরিমলবাবু মীমাংসায় মনোযোগ দিয়াছেন। বাদানুবাদ সবই চলিতেছে ইংরেজীতে। একে উপনিষদ, তায় তর্ক আবার ইংরেজীতে; লোকটার উপর যতটা হতশ্রদ্ধ হইয়াছিলাম তাহার তীব্রতা বিদেশী ভাষার ধ্বনি-মাধুর্য্যে বহুলাংশে কমিয়া গেল! তর্কের বিষয় এবং মীমাংসার যুক্তিগুলি যদিও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি মনে হইল, লোক কালো এবং বেঁটে হইলেই নিষ্ফল হয় না, এবং সংসারের অণুপরমাণুতে জড়াইয়া পড়িলেও সরস্বতীকে জন্মের মত বিদায় দেয় না।

বৈকালে খোলা জানালায় প্রভাতের দৃশ্য পুনরভিনীত হইল। সন্ধ্যায় শুধু ঘরখানি রহিল নিস্তব্ধ। বন্ধ জানালার ফাঁকে আলোর মলিন রেখা ও ধূপ-চন্দনের গন্ধ ও ধোঁয়া নাসিকা দিয়া ভাল করিয়াই অনুভব করিলাম। অনুভব করিলাম, প্রত্যহের যন্ত্র-ভার-পীড়িত সংসার ও কলুষ-পুঞ্জিত মন সন্ধ্যার এই সমাহিত প্রশান্তিতে মগ্ন হইয়া নির্ম্মল হইয়া উঠিতেছে, এবং পর দিবসের জন্য শক্তিসঞ্চয় করিতেছে। পরম সংসারী যে, সেও এই সঙ্গবর্জ্জিত মূল্য ভাল করিয়াই বুঝে। অন্তত ঘণ্টা খানেক সময় সংসারকে পিছনে রাখিয়া আত্মার মুখোমুখী বসিয়া যদি না পরস্পরকে চিনিবার চেষ্টা করিলাম তো প্রতিদিবসের কর্ম্ম গুরুভার হইয়া আমাকে নিপীড়িত করিবেই। কে ভাল, কে মন্দ সে বিচার করিবার স্পর্দ্ধা কম লোকেরই আছে, কিন্তু পড়ার ফাঁকে যেমন খেলা, খাওয়ার পরই যেমন খানিকক্ষণ বিশ্রাম, নিদাঘ-মধ্যাহ্নে ক্লান্ত পথিক যেমন স্নিগ্ধ বট-ছায়ায় বসিয়া তৃপ্তি পায়, তেমনই কর্ম্মের ও চিন্তার মধ্যে এই ক্ষণকালীন বিশ্রামই আত্মপরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া বাহির করে।

রাত্রিতে ম্লান আলো উজ্জ্বল হইল, জানালা খুলিল না।

কি আশ্চর্য্য, এই ঘরখানি কি একাধারে তপস্যা ও কোলাহলের সমন্বয়-ভূমি? একাধারে বৈঠকখানা ও শয়নকক্ষ?

'রাগ করেছ?'

'কেন?'

'ওবেলা পান আনি নি। আচ্ছা, কাল এনে দেব। কিন্তু মনে রেখ, ঐ এক দিন। অভ্যাসের দাস হওয়া ভাল নয়।'

'সে আমি অনেকবার শুনেছি।'

'কিন্তু অনেক বারই ভুলে গেছ।'

'হয়ত ভুলেছি, কিন্তু তা কি খুব দোষের হয়েছে?'

'ছিঃ, তুমি এখনও রাগ করে রয়েছ। তুমি তো জান আমি একটা, কি যে বলি, সংসারে ঠিক মানায় না আমাকে। অন্যকে বলি প্রবৃত্তি দমন করতে, নিজে প্রবৃত্তির বেগে চলি ভেসে। গোড়া থেকে যতই ভাবি—জীবনটা যেন এলোমেলো প্রবৃত্তির ঝড়ে, আজ পর্য্যন্ত এর কোথাও একটা ফলবান বৃক্ষ খাড়া করে তুলতে পারলাম না।'

'ও-কথা ব'লো না। প্রবৃত্তি তোমার প্রবল—আসক্তি এবং নিরাসক্তি দুয়েতেই। এক বার মনে হয় তোমার মত ঘোর সংসারী কি ক'রে এত বড় বড় বিষয় নিয়ে মেতে থাকে!'

'ও-সব বড় বড় কথা এখন থাক। এখন আমি পুরোদস্তুর সংসারী; তুমি অভিমানিনী স্ত্রী, এখন আমার কর্ত্তব্য—'

'যাও, কি যে ছেলেমানুষী কর।'

'ছেলেমানুষী আছে ব'লেই তো নিশ্বাস ফেলে বাঁচি, নইলে পৃথিবীতে এত গুরুত্ব আছে, চিন্তায়, কাজে ও চলায় যে, আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের দম আটকে আসতে কতটুকুই বা দেরি।'

'একটা কথা, তোমার ঐ বেদ-উপনিষদের মত তুমিও যেন একটি হেঁয়ালি।'

'এত কাছে পেয়েও এ-কথা তোমার মনে হয়?'

'হয়। এক-এক বার ভাবি, তুমি খুব সোজা, খুব সরল, কিন্তু তার পরেই দেখি সোজা ব'লেই যেন খুব হেঁয়ালি।'

'তুমি হাসালে। এ-যেন একটা সেই রকম কথা, লোকটি কালো এবং ফরসা।'

'না গো, খুব সোজা কথার মানে বুঝতেই বেগ লাগে। সোজা জিনিষ ঐ আকাশ—চোখের ধাঁধা ওতে নেই, কিন্তু ওকে ঠিকমত বুঝতে পারা কি ততটাই সোজা?'

পরিমলবাবু এ-কথার উত্তর দিলেন না। ক্ষণকালের জন্য কক্ষটি নীরব হইল।

খানিক পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'প্রীতি, তুমি আমায় খুব ভালবাস, না?'

কক্ষ নিস্তব্ধ।

পুনরায় পরিমলবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এত মোলায়েম ও এত আবেগ-আর্দ্র যে সে-স্বর যেন দিনের চেনা লোকটার নহে—হয়তো তোমার কথাই ঠিক।

'কি বুঝলে?'

'কোন বিষয়ের তর্ক করতে করতে সূক্ষ্ম মীমাংসায় হয়তো কাউকে পৌঁছে দিতে পারি, কিন্তু তার চেয়েও সূক্ষ্মতর অংশে বিদ্যা ও জ্ঞানের আলো যেখানে জ্বলে না, সেখানে অতি সুকুমার অনুভূতি নিয়ে জাগ্রত মন আছেন ব'সে। তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।'

'আমি তো বুঝতে পারলাম না।'

'কিন্তু আমি বুঝি। আমার মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি আছে যা তোমার সদাজাগ্রত মনের মাঝে অহরহ বিঁধছে। তুমি যখন খুব কাছে, তখনই তুমি অনেক দূরে। এই হাত দিয়ে তোমায় ছুঁয়েছি, মন দিয়ে কি ছুঁতে পেরেছি?'

প্রীতিলতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, 'নাও, শুয়ে পড়। আমি বাতাস করি।'

পরিমলবাবু হয়তো শয়ন করিলেন না, কণ্ঠের স্বর দিব্য সতেজ বোধ হইল, 'না, সত্যি বল দেখি, তুমি অসুখী কি না?'

প্রীতিলতা হয়তো নিঃশব্দে হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি পাগল। এত বই পড়েছ আর এই সোজা কথাটা বোঝ না?'

'কি কথা?' অবোধের মত পরিমলবাবু প্রশ্ন করিলেন।

'না, সত্যিই তুমি ছোট ছেলের মত অজ্ঞান। এই ভালবাসা, এ যেখানে আছে তার ত্রিসীমানায় কি কোন দুঃখ ঘেঁষতে পারে? তুমি হয়তো বুঝতে পার না, কিন্তু আমি জানি, আমি জানি।' শেষের দিকে প্রীতিলতার গাঢ় স্বর আবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল।

তার পর আর বিশেষ কথা শোনা গেল না। যে-কথা প্রীতিলতা জানেন, যে-কথা তাঁর অন্তর জানে, সে-কথা আমরা বাহিরের লোক না জানিলেই বা ক্ষতি কি! পরিমলবাবু পণ্ডিত এবং প্রেমিক; তিনি সংসারী, কর্ম্মী, এবং ভাবুক। কালো এবং বেঁটে চেহারার লোকটির মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু আছে।

পরের দিন সকাল বেলায় দেখিলাম, তিনি পুরাদস্তুর সংসারী। তাঁহার উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি চাকরটাকে ধমকাইতেছিলেন, 'পাজি কোথাকার, নিত্যি বাজারের পয়সা চুরি! কাল আমি নিজে দেখে এসেছি চার পয়সা সের পটোল, তুই বলিস কিনা ছ পয়সা?'

চাকরটা কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, 'আজ্ঞে বাবু চাষীর পটোল।'

'তোমার মাথা পটোল। যে এক পয়সা চুরি করে সুবিধা পেলে সে গলায় ছুরি বসায়। যাও বাপু, ভাগ।'

চাকরটা অনেক কাকুতিমিনতি করিল, কিন্তু পরিমলবাবুর দয়া হইল না। কঠিন আদেশের স্বরে তিনি

বলিলেন, 'যাও বলছি। এই নূতন নয় যে মাপ করব। তোমায় ভাল হবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলাম, দেখলাম সে-প্রবৃত্তি তোমার নেই। যাও।'

খানিক পরে মাথা তুলিয়া দেখি, চাকরটা চলিয়া গিয়াছে। পরিমলবাবু বঁটির উপর উবু হইয়া বসিয়া স্ত্রীলোকের মত নিপুণ হাতে আলুর খোসা ছাড়াইতেছেন।

মনের আর অপরাধ কি! পুরুষকে স্ত্রীলোকের কাজ করিতে দেখিলে কে না বীতশ্রদ্ধ হয়? জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলাম।

জানালা বন্ধ করিলেও কথাগুলিকে আটক করিতে পারি না। নিত্য খুকীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ, বিশেষ করিয়া জপের সময়, মনকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। এত স্নেহাতুর! ঘণ্টাখানেক সংসার হইতে নির্লিপ্ত থাকিলে কতটুকু ক্ষতিই বা তাহার হইত? বাড়ী হইতে তো এক দণ্ডও বাহির হইতে দেখি না; মেয়ে, বউ ও বই এই তিনটি জিনিষ লইয়াই তো ঐ একখানি ঘরে দিব্য মশগুল হইয়া আছেন। অথচ কোথা হইতে টাকা আসে, উপার্জ্জনের সূত্র কি, কিসে সংসার চলে, এ-তথ্য আমাদের অজ্ঞাত।

দিন দুই পরে জানালা খুলিয়াছি, ভদ্রলোক যেন আমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া হাসিয়া বলিলেন, 'নমস্কার। একদিন ভাল ক'রে আলাপও হ'ল না। কবে আছি, কবে নেই, আসুন, একটু পরিচয় করা যাক।'

বলিলাম, 'শীগগিরই কোথাও যাবেন নাকি?'

তিনি হাসিলেন, 'বলা তো যায় না, আমাদের ইচ্ছায় আর কতটুকু হয় বলুন। ভাল কথা, আপনি যে আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন, তা জানি।'

বাধা দিয়া মিথ্যা ভদ্রতার ভান করিলাম, 'না, না—' তিনি বলিলেন, 'হওয়া স্বাভাবিক। আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার বিরক্তি আমায় একটুও বেঁধে নি, কেননা, আমি জানি, এই আমার প্রাপ্য। আমি যা নই তার চেয়ে অনেকখানি বেশী করে নামটা আমার রটেছে কি না! নাম যখন রটে, আসল মানুষ চাপা পড়ে তার অনেক নীচেয়। মানুষ যে মানুষই, এ-কথা ভুলে গিয়ে আমরা দেবত্ব আরোপ ক'রে বসি তার উপর এবং আশা করি, সাধারণ মানুষের চলা-বলা থেকে তার চলা-বলা হবে সম্পূর্ণ উঁচু দরের। মহাত্মা গান্ধী যদি আজ সামান্য শোকে কাঁদতে বসেন আমাদের শ্রদ্ধা অমনি হু হু করে নেমে যাবে।'

বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিছু ক্ষণ পরে হাসির শব্দটা থামিল, সমস্ত মুখে কৌতুকের ছায়াটুকু নিবিড় হইয়া রহিল।

বলিলেন, 'আজকাল মানুষের মনে শস্তার মোহটা খুব বেশী। বেশী আলসে, বেশী পাঠবিমুখ এবং অনেকখানি মেকি নিয়ে চলে বলেই অল্প কিছুতে চমক লাগান যায়। বিশেষ প্রচারকার্য্যের জন্য হাতে যদি একখানা কাগজ থাকল। নিশ্চয়ই আমার নাম শুনেছেন এবং কাজও দেখছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্বন্ধে ধারণা কি রকম বদলে যাচ্ছে বলুন তো?'

চুপ করিয়া থাকা অশোভন বলিয়া বলিলাম, 'নামের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক না থাকতে পারে—'

পরিমলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, 'সম্পর্ক থাকে, কিন্তু বাইরে থেকে হঠাৎ নজরে পড়ে না। লোকের সামনে নিজেকে তুলে ধরা, তাও একটা আর্টের ব্যাপার। যাঁরা বুদ্ধিমান বা ও-সব বিষয়ে যাঁদের পটুত্ব আছে, তাঁরা ঘরের ভিতরকে কিছুতেই বাইরে প্রকাশ করেন না। বাইরের বৈঠকখানা তাঁদের প্রচার বিভাগ। সেখানে অসংখ্য স্তুতিগায়ক, বন্ধু, হিতৈষীদের মধ্যে বসে বিতরণ করেন বাণী; সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান। মুখে থাকে কৃপাবিন্দু স্বরূপ একটু হাসি—' বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়া পুনরায় সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

ছোট মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'কে বাবা?'

তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে তিনি বলিলেন, 'তোর কাকাবাবুর সঙ্গে গল্প করছি রে।' তার পর আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'এরা বড্ড অবোধ, কিন্তু অত্যন্ত সচেতন, বাইরের আদরে ভোলে না। মনের সঙ্গে একটি সহজ যোগ না থাকলে কিছুতেই আত্মীয় হ'তে চায় না।'

'এদের সঙ্গ পেলে আপনি অনেক খানি ভুলে থাকেন।'

উৎসাহিত হইয়া পরিমলবাবু বলিলেন, 'ঠিক বলেছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি বা জ্ঞানের রাজত্বে বাড়ীগুলো বড় ঠাসাঠাসি, এরা সেই ঠাসবুননির মধ্যে অল্প একটু ফাঁকা উঠোন; সহজ নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য আলো বাতাস দুইই এদের মধ্যে আছে। এরা না থাকলে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসত।'

'এরা মায়াও তো হ'তে পারে, অনেক কিছু ভুলিয়ে দেয়।'

পরিমলবাবু বলিলেন, 'মানুষ যেমন চায় জানতে, তেমনি চায় ভুলতে, স্বভাবে দুটি জিনিষই পাশাপাশি রয়েছে। পাছে ভুলে যায় বলে, জানাটিকে স্মৃতির কৌটায় চাবি দিয়ে রাখতে চায়! তাকে আগলে থাকে কৃপণের মত--লালন করে অন্ধ স্নেহে—! আচ্ছা থাক এ-সব নীরস কথা। আমার জীবন-কাহিনী শুনবেন! আমার মাথার উপর ঝুলছে সরু সুতোয় বাঁধা খাঁড়া তলোয়ার, আমি এদের সঙ্গে ঘুমুচ্ছি নিশ্চিন্তে!'

খুকীর এ-সব ভাল লাগিতেছিল না, বাপের চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'বাবা!'

'চল্, তোকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।' বলিয়া পরিমল-বাবু কাহিনীর ভূমিকাটুকু করিয়াই পিছন ফিরিলেন।

আমি বলিলাম, 'যদি বলেন, দুপুর বেলায় আপনার ঘরে যেতে পারি।'

তিনি ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, 'আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না, এই জানালা থেকেই দিব্যি বলা চলবে। সে এমন কিছু গোপনীয় কথা নয়, আশ্চর্য্যজনকও নয়, জোর গলায় বলা চলে।'

অর্থাৎ আর পাঁচ জনে শোনে তো শুনুক।

কথা বলিতে বলিতে মেয়ে-কাঁধে পরিমলবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

পর পর দুটি দুপুর কাটিয়া গেল, পরিমলবাবু অবসর করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সারাক্ষণই দেখি কাজে তিনি নিবিষ্টচিত্ত। বই সাজাইয়া খাতা কলম লইয়া আপন মনে কি লিখিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, পাতার পর পাতা লেখায় উঠিতেছে ভরিয়া, জপতপ বুঝি ভুলিয়া গিয়াছেন, খুকীর সঙ্গে সেইরূপ সরস আলাপও আর জমিতেছে না, প্রীতিলতা নিঃশব্দে ঘরে আসিয়া দু-একটা আবশ্যক কাজ সারিয়া নিঃশব্দেই বাহির হইয়া যাইতেছেন। সরু সুতায় দোদুল্যমান তরবারিটায় কি হাওয়ার বেগ লাগিয়াছে? ক্ষুদ্র গৃহখানির মাথায় বর্ষণোন্মুখ কালো মেঘখানি বুঝি ঘনাইয়া আসিতেছে?

তিন দিনের দিন পরিমলবাবু মুখ তুলিয়া এ-দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'মাপ করবেন, একটু ব্যস্ত ছিলাম।'

বলিয়া হাতের কাছে বন্ধ করা খাতাখানি তুলিয়া ধরিয়া হাসিলেন, 'বিশেষ কিছু নয়, জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা। আমি যখন এ-বাড়ী থেকে উঠে যাব, পড়ে দেখবেন। যদি ভাল না লাগে পুড়িয়ে ফেলবেন।'

বলিয়া খাতাখানা জানালা দিয়া আমার ঘরে ছুড়িয়া দিলেন।

'কিন্তু আপনি কেন রাখলেন না?'

তিনি হাসিলেন, 'রাখবার উপায় থাকলে নিশ্চয়ই রাখতাম। পয়সা থাকলে, ছাপাতামও। কিন্তু চিহ্নিত হয়ে আছি কি না, উপায় নেই রাখবার।' হাসিটা কথা-শেষে ম্লান হইয়া মিশিয়া গেল।

ভয় হইল মনে, যে দিনকাল পড়িয়াছে, লোকটা বিপ্লবী নহে তো?

পরিমলবাবু আমার সন্দেহ বুঝিয়া বলিলেন, 'বিপ্লববাদের একটা কথাও ওতে নেই, আছে সমাজের অবস্থা নিয়ে কথা। আছে আমাদের অন্নসমস্যার দু-একটা প্রসঙ্গ।'

বলিলাম, 'ভয়ে ভয়ে যদি এই খাতাখানি নষ্ট ক'রে ফেলি দুঃখ হবে না আপনার? এত পরিশ্রমের ফল—'

তিনি বলিলেন, "দুঃখকে ঠেকাতে পারি এমন সাধনা এ-জীবনে করতে পারলাম কই? ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সে আসবেই। পড়ে দেখবেন, ওতে ভয় আপনার একটুও নেই। নমস্কার।'

আলাপে অনিচ্ছুক পরিমল বাবুকে আমি আর প্রশ্ন করিলাম না। নীরবে খাতাখানি নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম।

তার পর ঘরে আসিল খুকী। আসিয়াই ভয়ে ভয়ে ডাকিল, 'বাবা?'

'কি মা?' বলিয়া পরিমলবাবু সস্নেহে তাহাকে তক্তাপোষের উপর তুলিয়া বসাইলেন।

'তুমি নাকি চলে যাবে?'

'যাবই তো।'

'কোথায়? আমি যাব।'

'দূর বোকা মেয়ে, সেখানে যেতে নেই।'

'মা যাবে?'

'না।'

'আমি যাব। এখানে ভাল না, সেই পাহাড়, কত ফুল, খেলার পাথর—'

মেয়েকে চুমা খাইতে খাইতে ধরা গলায় পরিমল বাবু বলিলেন, 'খুকী, আমি যদি আর না আসি?'

খুকী বাবার থমথমে মুখ, আর্দ্র স্বর ও ছলছলে চোখ দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং তেমনই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষুদ্র দেহটি তার ক্রন্দন-আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। পরিমলবাবু বাঁ হাত দিয়া খুকীকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে তাহার পিঠে অতি মৃদু চাপড় দিতে লাগিলেন। এই দৃশ্যের মাঝখানে প্রীতিলতার আবির্ভাব হইল।

বলিলেন, 'মেয়ে কাঁদাচ্ছ?'

পরিমল বাবু শুধু বলিলেন, 'ও অবুঝ।'

প্রীতিলতা এ-ধারে আসিলেন। আমার জানালার পানে একবার মাত্র চাহিলেন। কিন্তু আমাকে দেখিয়া দৃষ্টিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ জাগিল না, স্বামীর চোখে চোখ রাখিয়া হয়ত নিঃসংশয়ে বুঝিলেন, আমাকে সঙ্কোচ করিবার কিছু নাই। আমার সম্বন্ধে যেটুকু জানিবার এখানে পা দিয়াই উঁহারা সেটুকু নিঃশেষে জানিয়া লইয়াছেন। অতঃপর পরিমলবাবুর পায়ের ধুলা লইতে মেঝের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন।

পরিমল বাবুর সারা দেহ মুহূর্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কয়েকটি রেখা ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিলাম, সে-ভাব তিনি অনায়াসে দমন করিলেন।

অত্যন্ত শাদা গলায় বলিলেন, 'এসেছ বুঝি! আচ্ছা, খুকীকে কোলে নাও, বোধ হয় ঘুমিয়েছে।'

প্রীতিলতা খুকীকে কোলে লইতেই পরিমলবাবু বলিলেন, 'তোমাদের ব্যবস্থা কিছু হ'ল না, বড় তাড়াতাড়ি।'

'তা হোক।'

প্রীতিলতা আর কোন কথা না বলিয়া পরিমল বাবুর একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কয়েক সেকেণ্ড স্থির হইয়া কি যেন অনুভব করিলেন, পরে হাত ছাড়িয়া অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলিলেন, 'যাও।'

পরিমল বাবু প্রীতিলতা বা খুকীর পানে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না, সোজা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

নীচের যাহা দেখিলাম, তাহাতে ভয়ে আমার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। লাল মোটরের দুই ধারে দুই জন শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জেণ্ট, এক জন পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী মোটরের অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া বেতের ছড়ি দিয়া হুডের উপর মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছেন, মুখে তাঁর জ্বলন্ত চুরুট।

বলা বাহুল্য, পরিমলবাবুর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই, পাণ্ডুলিপিখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইলেও মন হইতে নষ্ট হয় নাই সেই কালো ও বেঁটে লোকটি; ঘোরতর বিষয়ী, এবং সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, তুচ্ছতম কাজে যাঁহার অখণ্ড মনোযোগ, এবং সর্ব্বোত্তম ত্যাগেও যিনি হাসিমুখ।

"দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন যাঁরা করচেন তাঁদের প্রতি সাধুবাদ সাহিত্যিক সৌজন্যের প্রচলিত অলস রীতিরূপে প্রয়োগ করলে উদ্যোগীদের বঞ্চনা করা হবে। কেননা এই সকল গ্রন্থের যথোচিত গ্রাহক ও পাঠক থাকলে তাঁরা সাধুবাদের চেয়ে উপযুক্ত পরিমাণে যথার্থ মূল্য পেতেন। শুনেছি তার কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যায় না। অথচ এ কথা মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্যের পথরেখা অনেকখানি লুপ্ত হয়ে যেত যদি এই গ্রন্থগুলি উদ্ধারের চেষ্টা যথাকালে দেখা না দিত।

এই লেখাগুলিকে আমরা প্রাচীন বলেই গণ্য করি পঞ্জিকার তারিখ গণনা করে নয়, এদের কালান্তর-বর্তিতার সীমা নির্ণয় করে।. বাংলা গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ হয়েছে দূরকালে নয়, অল্পকালে। তখন বাংলা ভাষার ভূমিভাগে মাটি শক্ত হয়ে ওঠে নি, সাহিত্যের পথ হয় নি পাকা, তখন ভাবের ও চিন্তার চলাফিরা ছিল সংশয়িত গতিতে। ভাষা যে মনের ধাত্রী তখন সে মন আপন আশ্রয়ের শিথিলতাবশত সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারে নি। সেই জন্য এই সকল গ্রন্থে প্রাচীনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। ইতিহাসে অনুরাগী যাদের মন তাঁরা এর রস পাবেন। আর যাদের ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা নেই তাঁরা বর্তমানের সম্পূর্ণ পরিচয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই দূরব্যাপী মনোযোগে ঔদাসীন্য অগভীর শিক্ষার লক্ষণ।

এত আশ্চর্য দ্রুতবেগে বাংলা সাহিত্যের বৃদ্ধি হয়েছে যে এর সময়ের পথে মাইলের পরিমাপচিহ্ন শিকি মাইলের মাত্রাতেই দেওয়া সঙ্গত। এ সাহিত্যে অল্প দূরে এগোলেই পিছনের দিকে দূরবীন কষার দরকার হয়ে পড়ে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো যে সকল লেখক আধুনিক সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক তাঁদের রচনারও প্রথম অংশ বাংলা সাহিত্যের পূর্বাহ্ণের পূর্ব প্রহরের অন্ধকারে অপরিস্ফুট। সেই জন্যেই সময় থাকতে এই বেলা এই সাহিত্যের অগোচরপ্রায় প্রাগ্ বিভাগকে গোচরে আনবার অধ্যবসায়কে উৎসাহ দেওয়া বাংলা দেশের পক্ষে নিতান্তই কর্তব্য।

শান্তিনিকেতন
২৭।১০।৩৮

---

* দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা :—১। 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রীঃ)—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ২। 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫ খ্রীঃ)—রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ; ৩। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১ খ্রীঃ)—রামরাম বসু ; ৪। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (১৮১৭ খ্রীঃ)—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ; ৫। 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট' (১৮০৩ খ্রীঃ)—তারিণীচরণ মিত্র ; ৬। 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' (১৮২৪)—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ; ৭। 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩ খ্রীঃ)—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৮। 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২৩ খ্রীঃ)—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ; ৯। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', ১ম ও ২য় খণ্ড—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো হইতে প্রকাশিত।

প্রত্যেকখানির মূল্য ১৲, কেবল ১ম-সংখ্যক পুস্তকের মূল্য ২।০।

নবজন্ম

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কত দিনের পথ-খোঁজার শেষে
মিলল কি আজ দীপালয়ের দিশা!
তাই এনেছি আমার নয়ন-রেশে
শরণ-প্রেমের চাউনি অনিমিষা।

এস, আমার এস আরো কাছে,
রিক্ত শাখায় দীপ্তি মেলে ধরো।
অপুষ্পলের কী-ই বা বলো আছে?
তোমার দানেই বীথি সফল করো।

কী আছে তার?— ঝরা ফুলের ক্ষুধা,
আর আছে এক বাতাস-জাগা গান;
তোমার আছে আকাশ-আলোর সুধা
তাই না কলির কণ্ঠে ফোটে তান।

তাই না দীপে শিখার তৃষা জাগে,
জাগর-আশা জপে স্বপনসুধা
ধূসর ধরা ঝলমলিয়ে মাগে
নীলময়ী মা, মিটাও গহন ক্ষুধা।

পাওয়ার হিসাব মুখর কেন হয়?
জয়-যাচাইয়ের এ কী হানাহানি?
চাওয়ার তৃষা হোক আগে অক্ষয়—
শিখার দীপের হোক্ তো জানাজানি।

রাত্রিশেষে অংশুমালীর বহ্নি
বর্ণকণায় ফোটে স্বর্ণদিশা,—
তার দুরাশার পানে নিরবধি
উধাও আগে হোক তো অমানিশা।

তাহ'লে মা ছায়ার ফল্গুধারা
আলোনিধির নিবিড় পরিচয়ে
হবে অশেষ—ভাঙবে পাষাণকারা
জ্যোতির্ম্ময়ীর দৃষ্টি-বিনিময়ে।

অভিসারের এই তো সুরু—সবে;
এখনি কি জানান দেবে দাবি?
চাওয়ার ছন্দ নিখুঁৎ যখন হবে—
তখনি তো মিলবে পাওয়ার চাবি।

আজ মা নবজন্মদিনে তুমি
অশ্রুধনু রাঙাও হাসি-আভায়—
যার ঝলকে বন্ধ্যা মনভূমি
চিনবে—মরু কেমনে পথ হারায়

ফুল না চেয়ে মরীচিকা বরি',
নীরস বালু-বিলাসে কী আছে?
ফুলের দীক্ষা চায় না যে মন ভরি'
তার কানে কি মলয়-মন্ত্র বাজে?

আজ মা আমি মেনেছি অন্তরে—
ফুল-সাধনার এ সুরু, নয় সারা,
গভীর যখন সুর হবে নির্ভরে
বেসুর কাঁটায় হব না আর হারা।

সুরই দেবে নিয়মবাণী বেঁধে;
বিকাশ তো নয় খামখেয়ালি ভবে,
শ্যামল সাধে কণ্ঠখানি সেধে
যুগের তৃষা মিটবে প্রেমোৎসবে।

শুধু, তৃষার চাই তো আগে চেনা,
ছল-ছলনার চাই তো নির্বাসন ;
নইলে কি হায় অমূল্যে; যায় কেনা ?—
বিনা শরণ মিলবে শ্রীচরণ ?

চরণ-বাতাস বয় তো ভুবন ভ'রে,
তাই তো পরাগ বসন্ত-তন্ময় ।
প্রার্থনা তো আত্মদানের তরে ;
প্রার্থনা তো তোমায় পেতে নয় ।

তোমায় পাব বলো কেমন ক'রে ?
সার্থকতা কভু পাওয়ায় আছে ?
পলে পলে তিলে তিলে ম'রে
জন্ম আমি লব তোমার মাঝে ।

বীজ মুকুলে যেমন জন্ম লভে
মুকুল ফুলে, ফুল—অন্তিম ফলে ;
তেম্‌নি জীবন মরণ-উৎসবে
নিত্য নব জন্মতারায় জলে ।

সরিৎ যেমন পায় না জলধিরে—
তারি মাঝে ডুব দিয়ে চায় লয় ;
জলধিও তেম্‌নি ফিরে ফিরে
পায় যে, মিলন এম্‌নি সুরেই হয় ।

নিত্য-মিলন নয় তো পাওয়ার বাণী ;
হওয়ার তৃষাই যে তার প্রাণের কথা ।
মাটি কবে পায় কুসুমের পাণি ?
রূপান্তরেই হয় সে পুষ্পব্রতা ।

আজ তাই চাই সিন্ধু-পরিণতি—
গতির গানে উদার মোহানায় ;
শীকর-কণা হবে শিহর-ব্রতী
কূল যেখানে অকূলে ঘুম যায় ।

তুমি যখন আছ তরী 'পরে,
কূল কেন হায় চাই বলো পাথারে ?
তোমার তারা যখন বাতি ধরে
শঙ্কা কেন তুফান আঁধিয়ারে ?

ভয় তো আমার ঝড়তুফানে নয়—
অভয় হাসি হাসো যবে তারা !
ঝড়ের বুকে ভয়ের পরিচয়
পেয়েই আমি আজ সরমে সারা ।

ছোট সুখের মন্থনে যে মন
আজো ফিরে চায় ছায়াতট পানে !
আপনারে না ক'রে সমর্পণ
মণি ছেড়ে ফণীরে মান দানে !

পদে পদে ধূসর মায়া ক্ষোভে
হিরণ-শিখার হারায় সে সন্ধান !
গগন ছেড়ে আলিম্পনার লোভে
গাইতে আজো চায় সে হোলির গান !

তোমার চরণপদ্ম-পরিমল—
আস্বাদে যার বুক উঠেছে ভ'রে—
চঞ্চলতায় আজো সে উচ্ছল !
অভিমানে তাই তো অশ্রু ঝরে !

যার প্রাণে মা তোমার প্রেমপ্রতিমা
হৈমবতী জাগায় বরাভয়
কেমনে সে চায় মিছে গরিমা ;
জয়ের ছলে এ-কোন্ পরাজয় ?

আজ দাও এই বর মা করুণায় ;
যা কিছু মোর আছে—যেন পারি
সঁপতে তোমার দুটি কমল পায়
দেওয়ার পণে আর যেন না হারি ।

নয় নোঙর আর—চলতে হবে আজি
যেথায় ল'য়ে যাবে পারাবারে ;
কুঞ্জকূজন নয় আজ,—উঠুক বাজি'
আঁধারভাঙা শঙ্খ—অভিসারে ।

সহজ পথের পথিক হ'য়ে কত
কত দিন যে গেছে সুখ যাচি'
আজকে হ'তে হবে অপার-ব্রত
তোমার নিদেশ ক'রে মাথায় মণি ।

প্রতিধ্বনি

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের চরিত্র যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে সে সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ ঘটে নাই। বরং একটানা সঙ্গতি দেখিলেই কেমন একটা বিস্ময় জাগে, সন্দেহ হয় কোথাও বুঝি কিছু গলদ আছে।

কিন্তু যে-লোকটার জীবনধারা গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি, সে যদি কেবল একটা বাড়ী কিনিবার ফলে অকস্মাৎ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে বন্ধুবান্ধবদের মনে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। সোমনাথ সম্বন্ধে আমরাও একটু বিশেষ রকম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম।

সোমনাথ বরদার আষাঢ়ে গল্পের আসরে বড় একটা যোগ দিত না বটে, তবু সে আমাদের সকলেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। একেবারে প্রাণখোলা লোক—অত্যন্ত মিশুক ও আমুদে—হাসিয়া-খেলিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিতেছিল। বাপ মৃত্যুকালে যথেষ্ট টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অন্নচিন্তা ছিল না। বিবাহের তিন-চার বছরের মধ্যে স্ত্রীও মারা গিয়াছিল, কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় বিপত্নীক হইয়াও সে আর বিবাহ করে নাই। প্রাণখোলা লোক হইলেও তাহার সুবুদ্ধির দ্বারে যে অর্গল ছিল, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মারাত্মক রকম বদখেয়ালীও তাহার কিছু ছিল না। বিহার-প্রান্তের বৈচিত্র্যহীন শহরে জীবনটা নেহাৎ একঘেয়ে হইয়া পড়িলে কলিকাতায় গিয়া কিছু দিন নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ করিয়া আসিত। তার পর আবার হৃষ্ট মনে বিলিয়ার্ড খেলায় মনোনিবেশ করিত। তাহার জীবনে একটি মাত্র নেশা ছিল—ঐ বিলিয়ার্ড খেলা। সিগারেট পর্য্যন্ত তাহাকে কোনও দিন খাইতে দেখি নাই; কিন্তু শহরে থাকিয়াও সন্ধ্যার পর বিলিয়ার্ড খেলিবার জন্য ক্লাবে আসে নাই, এমন একটা দিনও মনে করিতে পারি না।

বাড়ীকেনার ব্যাপারটাও যে বিলিয়ার্ড খেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পৈতৃক বাড়ী ছিল—মন্দ বাড়ী নয়—একটু সেকেলে-গোছের হইলেও ভদ্রলোকের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী। তবু সে সতের হাজার টাকা খরচ করিয়া আর একখানা বাড়ী কিনিয়া বসিল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে এক বিলিয়ার্ড ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

আমাদের মিউনিসিপ্যাল্ সীমানার এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে একটি অতি পুরাতন বাড়ী ছিল এবং বাড়ীতে একটি অতি পুরাতন মেম বাস করিত। বস্তুত বাড়ী অথবা বুড়ী কোন্‌টি বেশী পুরাতন এ লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক দিন তর্ক হইয়া গিয়াছে। শেষে আমাদেরই মধ্যে কেহ এক জন গেজেটিয়ার খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে, বাড়ীটাই অগ্রজ। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এক নীলকর সাহেব এই কুঠি তৈয়ার করাইয়াছিল, ক্রমে নীলের ব্যবসা উঠিয়া যাওয়ায় উহা পারিবারিক বাসভবনে পরিণত হইয়াছিল। তার পর তিন পুরুষ ধরিয়া নীলকর সাহেবের বংশধরেরা এইখানেই বাস করিতেছে। বুড়ী শেষ উত্তরাধিকারিণী।

আমাদের তর্কের নিষ্পত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু আর একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল—বাড়ী অথবা বুড়ী শেষ পর্য্যন্ত কোন্‌টি টিকিয়া থাকিবে? কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বুড়ী হারিয়া গেল। এক দিন শুনিলাম তাহার গঙ্গালাভ হইয়াছে।

বুড়ী চিরকুমারী, তাই সাক্ষাৎ ওয়ারিস কেহ ছিল না। অল্প দিন পরে শোনা গেল বাড়ী বিক্রয় হইবে। নেহাৎ খেয়ালের বশেই এক দিন বৈকালে আমরা

কয়েক জন দেখিতে গেলাম। সোমনাথের মোটর আছে, তাহার মোটরে চড়িয়াই অভিযান হইল।

ফাঁকা মাঠের মত বিস্তৃত গঙ্গার তীরে অনুচ্চ পাঁচিলে ঘেরা 'ভিলা'-জাতীয় বাড়ী। চতুষ্কোণ বাড়ী, চারি দিকে নীচু বারান্দা—মধ্যস্থলটা প্রায় দ্বিতলের মত উঁচু হইয়া আছে। একটা প্রকাণ্ড ঝাউগাছ নিতান্ত সঙ্গীহীন ভাবে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর পিছন দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত; সম্মুখে ফটকের স্তম্ভে শ্বেত পাথরের ফলকের উপর নাম লেখা আছে—"Echoes" প্রতিধ্বনি।

বাড়ীর এক জন মুসলমান চৌকিদার ছিল, সেও বোধ করি বুড়ীর সমসাময়িক। চাবি খুলিয়া বাড়ীর ভিতরটা আমাদের দেখাইল। সুসজ্জিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি, চেয়ার সোফা পালঙ্ক ঘরে ঘরে যেমন ছিল তেমনি সাজানো আছে। বাড়ীর ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড হল-ঘর। ছাদ খুব উচ্চ—বহু ঊর্দ্ধে কাচে ঢাকা স্কাই-লাইট দিয়া আলো আসার ব্যবস্থা। তবু ঘরটি ছায়াচ্ছন্ন।

চৌকিদার সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, কয়েকটা বাল্‌ব একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। তখন দেখিলাম, ঘরের মাঝখানে একটি বিলিয়ার্ড টেবিল রহিয়াছে। টেবিলের উপর সবুজ আবরণে ঢাকা তিনটি বাল্‌ব, কেবলমাত্র টেবিলের সমতল পৃষ্ঠের উপর আলো ফেলিয়াছে। ঘরে অন্য আভরণ বিশেষ কিছু নাই। দেয়ালের ধারে দুইটি সেটি, একধারে বিলিয়ার্ড-বল্‌ রাখিবার র‍্যাক্—তাহাতে সারি সারি কয়েকটি 'ক্যু' রাখা আছে। দেয়ালের গায়ে একটি কালো রঙের মার্কিং বোর্ড; কত দিনের পুরানো বলা যায় না, তাহাতে অঙ্কের চিহ্নগুলি একেবারে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারি দিকে তাকাইয়া সোমনাথ মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল,—'বাঃ!'

সত্যই ঘরের আধা অন্ধকার মোলায়েম আবহাওয়া মনের উপর একটা অনির্ব্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করে, ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমি তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তাই সোমনাথকে সমর্থন করিয়া আমিও ঐ জাতীয় একটা কিছু বলিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার কানের কাছে কে যেন চাপা গলায় বলিল—'আ—ঃ!'

চমকিয়া পিছনে তাকাইলাম।

আমার সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও পিছনে তাকাইয়াছিল—কিন্তু পিছনে কেহই নাই। আমরা উদ্বিগ্নভাবে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিতে লাগিলাম। তখন বৃদ্ধ চৌকিদার ভাঙা গলায় বুঝাইয়া দিল যে উহা প্রতিধ্বনি। এ ঘরে প্রতিধ্বনি আছে, কথা কহিলে অনেক সময় কথার ভগ্নাংশ ফিরিয়া আসে।

আশ্বস্ত হইলাম বটে, মনে একটু ধোঁকা লাগিয়া রহিল। চৌকিদার অতগুলা কথা কহিল, কই তাহার একটা কথাও তো ফিরিয়া আসিল না!

যা হোক, পরিদর্শন শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার পথে সোমনাথ একবার বলিল, 'খাসা বাড়ীখানি। আর ঐ বিলিয়ার্ড-রুমটা—চমৎকার।'

বিলিয়ার্ড-রুমের চমৎকারিত্ব তাহাকে কত দূর মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম দিন-দশেক পরে, যখন শুনিলাম সে বাড়ীখানা খরিদ করিয়াছে। তার পর আরও বিস্ময়কর সংবাদ, সে পৈতৃক বাড়ীর বাস তুলিয়া দিয়া নবক্রীত বাড়ীতে উঠিয়া গেল। গৃহপ্রবেশের দিন আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইল বটে, কিন্তু কেন জানি না সমস্ত ব্যাপারটাতে আনন্দ-উৎসবের স্পর্শ লাগিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল এটা সোমনাথের চিরবিদায়-ভোজ।

দাঁড়াইলও তাই। দুই মাইল দূরে উঠিয়া গেলে পুরাতন বন্ধু কিছু পর হইয়া যায় না, কিন্তু সোমনাথ যেন মনের দিক্ দিয়াও আমাদের অনেক দূরে সরিয়া গেল। মাঝে মাঝে সে ক্লাবে আসিত এবং আগের মত হাসিগল্প করিবার চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু দেখিলাম তাহার মনটা আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেমন সমস্ত গল্প কৌতুক ও খেলায় মনপ্রাণ ঢালিয়া যোগ দিতে পারিত, এখন আর তেমন পারে না। তাহার প্রাণখোলা হাসিটাও যেন কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, যে এত দিন রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল সে যেন অকস্মাৎ অবাস্তব ছায়ায় পরিণত হইয়াছে।

ক্লাবে বসিয়া সোমনাথ সম্বন্ধেই কথা হইতেছিল।

পৃথ্বী বলিল, 'ক্ষুধিত পাষাণ। বাড়ীটা সোমনাথকে গিলে খেয়েছে।—কদিন এদিকে আসে নি?'

আমার হিসাব ছিল, বলিলাম, 'আমাদের 'জনা' অভিনয়ের রাত্রে তাকে শেষ দেখেছি। মাসখানেক হ'ল।'

অমূল্য বলিল, 'ক্ষুধিত পাষাণ-টাষাণ নয়। আসলে নিজের বিলিয়ার্ড টেবিল পেয়েছে, রাতদিন তাই খেলছে।'

বরদা এক পাশে বসিয়া ছিল, কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'হুঁ।'

অমূল্য ভ্রূ তুলিয়া তাহার দিকে ফিরিল, 'হুঁ মানে? বলতে চাও কি? তাকে ভূতে পেয়েছে?'

বরদা উত্তর দিল না, কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল। তার পর চক্ষু নামাইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'যে-রাত্রে সোমনাথ আমাদের নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়েছিল, সে রাত্রির কথা মনে আছে?'

'কোন্ কথা?'

'খাওয়া-দাওয়ার পর তুমি আর সোমনাথ বিলিয়ার্ড খেলেছিলে—বোধ হয় ভোল নি। আমি ব'সে তোমাদের খেলা দেখছিলুম। সে সময় তোমার নিজের খেলার কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য কর নি?'

লক্ষ্য যে করিয়াছিলাম তাহা নিজের কাছেও এত দিন স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করি নাই, অথচ বরদা তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। ভাল খেলোয়াড় বলিয়া আমার অহংকার নাই, কিন্তু সেদিন আমার খেলা আশ্চর্য্য রকম খুলিয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রত্যেক বার বল মারার সময় মনে হইয়াছিল আমি খেলিতেছি, না আর কেহ আমার হাত ধরিয়া খেলিয়া দিতেছে। আমি হয়ত 'পট রেড' মারিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বলের সহিত 'ক্যু'য়ের সংস্পর্শ ঘটিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যেন একটা অদৃশ্য হাত আমার হাতে ঈষৎ নাড়া দিয়া আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। ফলে আমার বল 'রেড'কে স্পর্শ করিয়া সমস্ত টেবিল ঘুরিয়া একটা অসম্ভব পকেটে প্রবেশ করিয়াছে। এমনি অনেক বার ঘটিয়াছিল। ক্রমে আমার মনে এমন একটা মোহাচ্ছন্ন ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল যে, যন্ত্রচালিতের মত খেলিয়া গিয়াছিলাম। সোমনাথ সেদিন আমাকে হারাইতে পারে নাই।

খেলার শেষে মোহের অবস্থা কাটিয়া গেলে এই বলিয়া নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, খেলার ক্ষেত্রে দৈবাৎ এ-রকম অঘটন ঘটিয়া যায়, নিকৃষ্ট খেলোয়াড়ও হঠাৎ ভাল খেলিয়া ফেলে। কিন্তু ইহার মধ্যে অলৌকিক কিছু আছে, তাহা তখন ভাবি নাই। আজ বরদা স্মরণ করাইয়া দিতেই সমস্ত ঘটনা মনে পড়িয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিলাম।

আমি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছি দেখিয়া বরদা বলিল, 'তাহ'লে লক্ষ্য করেছিলে। আমি আর একটা জিনিষ শুনেছিলুম যা তোমরা কেউ শোন নি। খেলায় তন্ময় ছিলে ব'লেই বোধ হয় শুনতে পাও নি।'

'কি?'

'হাততালির শব্দ। সোমনাথ একটা খুব সুন্দর মার মেরেছিল; তিনটে বলে ঠোকাঠুকি হয়ে তিনটেই একই পকেটে গেল। ঠিক তার পরে কে যেন খুব মোলায়েম হাতে হাততালি দিয়ে উঠল।'

অমূল্য বলিল, 'ওটা প্রতিধ্বনি। যেখানে সহজ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা সম্ভব সেখানে ভূত-প্রেত টেনে আনার মানে আমি বুঝি না।—বলে বলে ঠোকাঠুকি হওয়ার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হ'লে সেটা হাততালির মতই মনে হয়।'

বরদা বলিল, 'আশ্চর্য্য বলতে হবে। বল ঠোকাঠুকি ত বরাবরই হচ্ছিল, তবে প্রতিধ্বনিটা ঠিক সেই সময়েই হ'ল কেন?'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না, এইখানে একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। 'বহুরূপী' নাম দিয়া যে ব্যাপারটা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা ঘটিবার পর হইতে বরদার গল্প সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব বেশ একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সকলেরই নাস্তিকতার গোড়া একটু আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল। চুনী তো বিস্তর বই কিনিয়া মহা উৎসাহে প্রেততত্ত্বের চর্চ্চা আরম্ভ

করিয়া দিয়াছিল। অমূল্য যদিও এখনও তর্ক করিতে ছাড়ে নাই, তবু তাহার ঝাঁঝ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল।

জবী আমাদের আলোচনাকে সিধা পথে ফিরাইয়া আনিল, বলিল, 'সে যা হোক, কথাটা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াচ্ছে কি?—সোমনাথ যে বাড়ী কিনে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেল, আমাদের সংসর্গ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে, এর কারণটা তো কেউ দেখাতে পারলে না। তাকে ভূতে পেয়েছে এ-কথায় শ্রদ্ধা করা যায় না। তবে হয়েছে কি তার?'

বরদা আস্তে আস্তে বলিল, 'আমার কি মনে হয় জান? সোমনাথ আমাদের চেয়ে ঢের বেশী মনের মতন সঙ্গী পেয়েছে। পুরনো বাঁধনের পাশে খুব শক্ত নূতন বাঁধন পড়েছে, তাই পুরনো বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে।'

বরদার কথার ইঙ্গিতটা ভুল করিবার মত নয়, কিন্তু এতই উহা আজগুবি যে নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়াও যায় না। অমূল্য আমাদের সকলের মনের ভাব যেন প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, 'অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও, এক দঙ্গল ভূতের সঙ্গে সোমনাথের এতই মহরম-মহরম হয়ে গেছে যে মানুষের সঙ্গ আর তার ভাল লাগছে না?'

এবারও বরদা সোজাসুজি উত্তর দিল না, বরঞ্চ যেন নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এমনি ভাবে চুপ করিয়া রহিল। মিনিট দুই-তিন পরে কতকটা আত্মগত-ভাবেই বলিল, 'Echoes' প্রতিধ্বনি! অদ্ভুত নাম বাড়ীটার। যে-লোক বাড়ী তৈরি করিয়েছিল সেই হয়ত নামকরণ করেছিল। কিংবা তার পরবর্ত্তীরা বাড়ীর আবহাওয়া দেখে নাম রেখেছিল—'প্রতিধ্বনি'!

চুণী এতক্ষণ বসিয়া আলোচনা শুনিতেছিল, কথা বলে নাই। এখন একবার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, 'কিছু দিন থেকে একটা থিওরি আমার মাথায় ঘুরছে—'

'কিসের থিওরি?'

'এই সব হানা-বাড়ী সম্বন্ধে। এখনও থিওরিটা খুব স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে নি, তবু—'

'কি থিওরি তোমার শুনি।'

চুণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'ঐ প্রতিধ্বনি শব্দটার মধ্যেই আমার থিওরির বীজ নিহিত রয়েছে। দেখ, শব্দের যেমন প্রতিধ্বনি আছে, তেমনি বাস্তব ঘটনারও প্রতিধ্বনি থাকতে পারে না কি? প্রতিধ্বনি না ব'লে তাকে প্রতিবিম্বও বলতে পার—ব্যাপারটা মূলে একই। ধ্বনির প্রতিধ্বনি সব সময় থাকে না, এই ঘরের মধ্যে তোমরা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও এতটুকু প্রতিধ্বনি পাবে না। আবার এমন এক-একটা স্থান আছে যেখানে চুপি চুপি একটা কথা উচ্চারণ করলেও কোন্ অদৃশ্য প্রতিবন্ধকে ধাকা খেয়ে সেটা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে। আমার মনে হয় হানা-বাড়ীগুলোও এই জাতীয় স্থান। গ্রামোফোন রেকর্ডের মত তারা অতীতের কতকগুলো বাস্তব ঘটনা সঞ্চয় ক'রে রাখে, তার পর সুবিধে পেলেই তার প্রতিধ্বনি করতে থাকে। বরদা, তোমার কি মনে হয়?'

থিওরিটা অভিনব বটে, কিন্তু বরদার মুখ হইতে ইহার অনুমোদন আশা করা যায় না। সে গোঁড়া ভূত-বিশ্বাসী, অথচ থিওরি সত্য হইলে ভৌতিক কাণ্ড মাত্রেই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়—প্রেত-যোনির স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছু থাকে না।

বরদা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তাহ'লে তোমার মতে প্রেতযোনি নেই! যেগুলোকে ভৌতিক phenomenon ব'লে মনে হয় সেগুলো অতীতের প্রতি-ধ্বনি মাত্র?'

চুণী বলিল, 'না, তা ঠিক নয়। আমি বলতে চাই, প্রেতযোনি থাকে থাক্, কিন্তু হানা-বাড়ীতে সাধারণতঃ যে-সব ব্যাপার ঘটে থাকে, সেগুলো হয়তো অধিকাংশই এই প্রতিধ্বনি-জাতীয়।'

আমি বলিলাম, 'সোমনাথের বাড়ীতে প্রতিধ্বনি আছে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেটা কোন্ জাতীয়?'

চুণী বলিল, 'সেইটেই আমি পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই।—তোমরা কেউ রাজি আছ?'

'কি করতে হবে?'

'আমি স্থির করেছি এক দিন সোমনাথের বাড়ীতে

গিয়ে রাত্রি যাপন করব। সে হঠাৎ এমন বদলে গেল কেন, তার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আবশ্যক, সুতরাং মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়েও পরীক্ষাটা তুচ্ছ হবে না, আর যদি সে এমন কিছু পেয়ে থাকে যার তুলনায় তার আজন্মের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে হয়ে গেছে, তাহ'লে সেই অপূর্ব্ব বস্তুটি কি তাও আমাদের জানা দরকার।'

অমূল্য একটু মুখ বাঁকাইয়া কবিতা আবৃত্তি করিল—

'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারই খানিক
মাগি আমি নতশিরে—'

যদি সুবিধে হয় গোটাকয়েক প্রেতাত্মা বরদার জন্যে চেয়ে নিয়ে এস, আমাদের এই ক্লাব-ঘরে পুষে রাখা যাবে।'

আমি চুণীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, 'বেশ, আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজি আছি। কালই চল তাহ'লে, শনিবার আছে।'

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সোমনাথের বাড়ীর সম্মুখে যখন পৌঁছিলাম, তখন ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে। প্রকাণ্ড হাতার মাঝখানে বাড়ীখানা যেন একেবারে জনশূন্য মনে হইল।

বাড়ীর বারান্দায় উঠিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমি ও চুণী পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলাম। চাকর-বাকর কেহই কি নাই? সব গেল কোথায়?

হাঁক দিব মনে করিতেছি, এমন সময় ভিতর হইতে খট্ খট্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ভুল হইবার নয়, বিলিয়ার্ড বলের ঠোকাঠুকি লাগার শব্দ। আশ্চর্য্য বোধ হইল। এই ভর-সন্ধ্যাবেলা সোমনাথ বিলিয়ার্ড খেলিতেছে! কাহার সহিত খেলিতেছে?

দু-জনে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কোনও ঘরে এখনও বাতি জ্বলে নাই, কেবল বিলিয়ার্ড-রুম হইতে আলো আসিতেছে। আমরা নিঃশব্দে দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

টেবিলের উপরকার সবুজ শেড-ঢাকা বাতি তিনটি শুধু জ্বলিতেছে—তাহাদের আলোক-চক্রের বাহিরে ঘর অন্ধকার। এই আলো-অন্ধকারের সীমানায় টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া সোমনাথ আত্মনিমগ্ন ভাবে 'ক্যু'এর মুখাগ্রে খড়ি লাগাইতেছে। ঘরে আর কেহ নাই।

চুণী বলিয়া উঠিল, 'কি হে, একলাই খেলছ?'

'কে?' সোমনাথ চমকিয়া মুখ ফিরাইল। তার পর দ্রুত দ্বারের কাছে আসিয়া সুইচ টিপিল; ঘরের অন্য আলোগুলো জ্বলিয়া উঠিল। আমাদের দেখিয়া সে প্রথম কিছুক্ষণ নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া রহিল, যেন ভাল করিয়া চিনিতেই পারিল না। আমরাও অপ্রতিভভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বুঝিলাম, আমাদের সহিত তাহার মনের সংযোগ এমন পরিপূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে যে সহসা জোড়া লাগাইতে পারিতেছে না।

যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত হাসির একটি চেষ্টা করিয়া সে বলিল, 'আরে—তোমরা! তার পর—হঠাৎ! কি ব্যাপার?'

সোমনাথের কণ্ঠে যে-সহজ অকৃত্রিম সমাদরের সুর শুনিতে আমরা অভ্যস্ত তাহা যেন ফুটিল না। আমি সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, 'ব্যাপার কিছু নয়, তোমার ঘরকন্না দেখতে এলুম।—একলা বিলিয়ার্ড খেলছিলে নাকি?'

'একলা!' কথাটা বলিয়াই সে সামলাইয়া লইল, মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, একলাই খেলছিলুম।—এস, বাইরে বসা যাক।'

ঘরের আলো নিবাইয়া সোমনাথ আমাদের বারান্দায় লইয়া গিয়া বসাইল। এতক্ষণে বাহিরেও অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, সে বলিল, 'আলো জেলে দেব, না, অন্ধকারেই বসবে?'

চুণী বলিল, 'ক্ষতি কি, অন্ধকারেই বসা যাক।'

বেতের মোড়ায় তিন জনে চুপচাপ বসিয়া আছি, কাহারও মুখে কথা নাই। হঠাৎ সোমনাথ বলিল, 'চা খাবে?'

চুণী উত্তর দিল, 'না, আমরা চা খেয়ে বেরিয়েছি।'—তার পর একবার গলাটা ঝাড়িয়া বলিল, 'তুমি দিন-

দিন যে-রকম ডুমুর-ফুল হয়ে উঠছ, ভয় হ'ল দু-দিন বাদে হয়তো চিনতেই পারবে না। তাই আজ তোমার বাড়ীতে রাত কাটাব ব'লে এসেছি। পুরনো বন্ধুত্ব মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নিতে হবে তো?'

এক মুহূর্ত্ত সোমনাথ জবাব দিল না, তার পর যেন একটু বেশী মাত্রায় ঝোঁক দিয়া বলিয়া উঠিল, 'বেশ তো বেশ তো। তা, দাঁড়াও—আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বাবুর্চ্চিটাকে খবর দিই, তোমাদের খানার ব্যবস্থা করুক।' সোমনাথ উঠিয়া গেল।

মনে মনে ভারি কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিলাম। বন্ধুত্বের দাবীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়া অপর পক্ষের মনে অনাগ্রহের আভাস পাইলে গ্লানির আর অন্ত থাকে না। সোমনাথ বাহিরে হৃদ্যতার ভান করিতেছে বটে, কিন্তু অন্তরের সহিত আমাদের সাহচর্য্য চায় না—তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। আগেকার অবাধ স্বচ্ছন্দ আত্মীয়তা আর নাই। শুধু তাই নয়, আমরা হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, যেন তাহার সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যধারায় আমরা বিঘ্ন ঘটাইয়াছি।

চুণী খাটো গলায় বলিল, 'কি হে, কি রকম মনে হচ্ছে?'

'সুবিধের নয়। ফিরে গেলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।'

'উঁহু—থাকতে হবে।'

চুণী আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু থামিয়া গেল। পরিপূর্ণ অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিলাম না, অস্পষ্ট শব্দে বুঝিলাম সোমনাথ ফিরিয়া আসিয়া মোড়ায় বসিল। মোড়ার মচ্‌মচ্‌ শব্দ যে শুনিয়াছিলাম তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

চুণী সহজ আলাপের সুরে সোমনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'তার পর, একলা থাকতে তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না?'

সোমনাথ উত্তর দিল না।

এই সময়, কেন জানি না, আমার ঘাড়ের রোঁয়া হঠাৎ শক্ত হইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। চুণীও হয়ত কিছু অনুভব করিয়া থাকিবে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সে হঠাৎ দেশলাই জ্বালিল। দেখিলাম সোমনাথের মোড়ায় কেহ বসিয়া নাই।

দেশলাইয়ের কাঠি শেষ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া আস্তে আস্তে নিবিয়া গেল। অবরুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া চুণী মৃদুস্বরে বলিল—'প্রতিধ্বনি।'

এইবার সোমনাথের স্পষ্ট পদশব্দ শুনিতে পাইলাম, শব্দটা কাছে আসিলে চুণী বলিয়া উঠিল, 'সোমনাথ?'

'হাঁ।'

'আলোটা জ্বেলেই দাও ভাই, অন্ধকার আর ভাল লাগছে না।' কথার শেষে হাসিতে গিয়া তাহার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

বারান্দার আলো জ্বালিয়া দিয়া সোমনাথ আসিয়া বসিল। সাদা ঢাকনির মধ্যে মৃদুশক্তি বাল্‌ব স্নিগ্ধ আলো বিকীর্ণ করিতে লাগিল। অন্ধকারের চেয়ে এ ভাল, তবু পরস্পর মুখ দেখা যায়।

সোমনাথ বলিল, 'বাবুর্চ্চিকে ব'লে এলুম। শুধু মুর্গির কারি আর পরটা। তার বেশী কিছু যোগাড় হয়ে উঠল না।'

ইতিমধ্যে যে ক্ষুদ্র ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ না করিয়া চুণী বলিল, 'যথেষ্ট যথেষ্ট। অমৃতের ব্যবস্থা থাকলে পাঁচ রকম ব্যঞ্জনের দরকার হয় না।—কিন্তু তুমি বাবুর্চ্চি রেখেছ যে!'

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'রাখি নি ঠিক। বাড়ীর যে বুড়ো চৌকিদারটা ছিল সে-ই রেঁধে দেয়—'

'রাঁধুনী বামুন পেলে না?'

'দরকার বোধ করি না। আমি একলা মানুষ—'

'চাকরও তো দেখছি না। চাকর রাখ নি কেন?'

'রেখেছিলাম এক জন, কিন্তু—'

'রইল না?' চুণী মোড়া টানিয়া লইয়া সোমনাথের নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল, বলিল, 'আসল কথাটা কি বল তো সোমনাথ। বাড়ীতে কিছু আছে—না?'

মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব আনিয়া সোমনাথ বলিল, 'কি থাকবে?'

'সেই কথাই তো জানতে চাইছি। শহরের এক টেরে এই পুরনো বাড়ী, চাকর-বামুন থাকতে চায় না—কিছু থাকা বিচিত্র নয়।'

সোমনাথের চোখের উপর অদৃশ্য পর্দা নামিয়া আসিল। সে হাসিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, 'পাগল না ক্যাপা। ওসব কিছু নয়। শহর থেকে দূর পড়ে তাই চাকরবাকর থাকতে চায় না।'

বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। ইচ্ছা করিলে যে অনেক কিছু বলিতে পারে তাহাও বুঝা গেল; কারণ সোমনাথ মনের ভাব গোপন করিতে পারে না, মুখে চোখে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু লুকাইতে চায় কেন? যাহা সে জানিয়াছে তাহার অংশীদার রাখিতে চায় না—কৃপণের মত একা ভোগ করিতে চায়? কিংবা অবিশ্বাসীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয়ে বলিতে চায় না?

চুণী কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়। সোজাসুজি জেরায় ফল হইল না দেখিয়া সে অন্য পথ ধরিল। কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর হানা-বাড়ী সম্বন্ধে নিজের থিওরির কথা পাড়িল। বেশ ফলাও করিয়া লেকচারের ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিয়া নিজের থিওরির সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিতে লাগিল। সোমনাথও দেখিলাম একমনে গালে হাত দিয়া শুনিতেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের চারি পাশে যে একটি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা বোধ করি ইহারা দু-জনে জানিতে পারে নাই। প্রথমটা আমিও লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু হঠাৎ এক সময় মনে হইল কাহারা নিঃশব্দে আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া একাগ্র মনে চুণীর কথা শুনিতেছে। চোখে কিছুই দেখিলাম না, এমন কি কানে কিছু শুনিয়াছিলাম এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবু কেমন করিয়া এই অদৃশ্য আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিলাম তাহা আমার কাছে এক প্রহেলিকা। কিন্তু জানিতে যে পারিয়াছিলাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ইহা অনুমান বা উত্তেজনা জনিত কল্পনার রূপায়ন নয়—স্পর্শ করার মত অত্যন্ত বাস্তব অনুভূতি। অপরিস্ফুট আলোকে তাহাদের দেখিতে পাইতেছি না বটে, কিন্তু তাহারা যে আমাদের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ ভাবে চুণীর কথা শুনিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মতই সত্য।

ক্রমে একটি অতিমৃদু সুগন্ধ নাকে আসিতে লাগিল। তাজা ফুলের বা আতর এসেন্সের গন্ধ নয়—পপৌরীর মত একটু বাসি অথচ সুমিষ্ট সৌরভ। ধীরে ধীরে গন্ধ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন বুঝিতে পারিলাম, জিয়ানো ল্যাভেণ্ডার ফুলের গন্ধ।

চুণী তখনও থিওরি ব্যাখ্যা করিতেছিল, তাই গন্ধ নাকে গেলেও সে বোধ হয় উহা লক্ষ্য করে নাই। আলোচনা শেষ করিয়া সে বলিল, 'অবশ্য এটা আমার মনগড়া কাল্পনিক থিওরি। তবু কিছু ভিত্তি কি এর নেই? তোমার কি রকম মনে হচ্ছে?'

সোমনাথ মুখ তুলিয়া বোধ করি একটা কিছু উত্তর দিতে যাইতেছিল, চুণী সচকিত ভাবে চারি দিকে চাহিয়া বলিল, 'গন্ধ! কিসের গন্ধ!'

আমি বলিলাম, 'পেয়েছ তাহলে। ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ।'

সোমনাথের চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ! না না, ও তোমাদের ভুল। গন্ধ কই? আমি তো কিছু পাচ্ছি না।'

চুণী বলিল, 'সত্যি পাচ্ছ না?'

'না—কিচ্ছু না—' বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িল। সে যেন জোর করিয়াই গন্ধটা উড়াইয়া দিতে চায়।

কিন্তু গন্ধকে উড়াইয়া লইয়া গেল অন্য জিনিষ। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বাড়ীর ভিতর দিক্ হইতে আসিয়া সমস্ত গন্ধটুকু এক নিমেষে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিস্মিতভাবে বাহিরের দিকে তাকাইলাম; ঝাউ-গাছের বিরাট্ দেহ অন্ধকারে চোখে পড়িল। ঝাউগাছ একেবারে নিস্তব্ধ; অল্পমাত্র বাতাস বহিলে যে-গাছ মর্মর-ধ্বনি করিয়া উঠে, তাহাতে শব্দমাত্র নাই।

সোমনাথ আবার মোড়ায় বসিয়া পড়িয়াছিল; চুণী প্রখর জিজ্ঞাসু নেত্রে চারিদিকে চাহিতেছিল। আমি নিম্নস্বরে বলিলাম, 'চলে গেছে—যারা এসেছিল তারা আর নেই।—চুণী, গন্ধটাও কি প্রতিধ্বনি?

গরুর গাড়ী যেমন ভাঙা অসমতল পথ দিয়া চলে, তেমনি অসংলগ্ন বাধাবহুল আলোচনার ভিতর দিয়া আহারের পূর্ব্বের ঘণ্টা-দুই সময় কাটিয়া গেল। সোমনাথ মুহ্যমান হইয়া রহিল, আমরাও মনের মধ্যে একটা নামহীন অস্বাচ্ছন্দ্য লইয়া বসিয়া রহিলাম। অসাধারণ আর কিছু অনুভব করিলাম না। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যেন আমাদের অধিকার-বহির্ভূত কৌতূহল দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে চলিয়া গিয়াছে।

নিঃশব্দে আহার শেষ হইল; বুড়া চৌকিদার পরিবেশন করিল। অনুভবে বুঝিলাম সেও আমাদের উপর খুশী নয়। তাহার সাদা ভ্রূযুগল নীরবে আমাদের ধিক্কার দিতে লাগিল। অবরোধের পর্দ্দার ভিতর উঁকি মারিবার চেষ্টা করিয়া আমরা যেন বর্ব্বরোচিত অশিষ্টতা করিয়াছি।

বারান্দার এক প্রান্তে তিনটি ক্যাম্প-খাট পাড়িয়া শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলাম। কোনও মতে রাত্রিটা কাটিলে যেন বাঁচা যায়।

তিন জনে পাশাপাশি শুইয়া আছি; কথাবার্ত্তা নাই। চুণী শুইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতেছে, অন্ধকারে তাহার সিগারেটের আগুন উজ্জ্বল হইয়া আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। সোমনাথ একেবারে নিশ্চল হইয়া আছে; হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। আজ যাহা যাহা ঘটিয়াছে, চুণীর থিওরির সহিত তাহা একেবারে বে-খাপ নয়। তবু যাহারা চুণীর কথা শুনিতেছিল তাহারা কি শুধুই অতীতের প্রতিবিম্ব? সোমনাথ এ-বিষয়ে এমন একগুঁয়ে ভাবে নীরব কেন? অতীতের ছায়ার সহিত বর্ত্তমানের মানুষের এমন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ঘটে কি করিয়া? আর, যদি সজীব স্বতন্ত্র আত্মা হয়, তবে উহারা কাহারা? ল্যাভেণ্ডার ফুলের গন্ধ কেন আসিল? সেকালে ইংরেজ মেয়েদের ল্যাভেণ্ডার ফুল একটা সৌখীনতা ছিল শুনিয়াছি। সেই গন্ধ অতীতের কোন্ দেহ-সৌরভের সহিত মিশিয়া ভাসিয়া আসিল।...

বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত চেতনা সতর্ক হইয়া জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ ভাবে শুইয়া রহিলাম, তার পর বাড়ীর ভিতর হইতে পরিচিত খট্‌খট্ শব্দ কানে আসিল।

ঘাড় তুলিয়া দেখিলাম চুণী বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। সে নিঃশব্দপদে উঠিয়া আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, 'শুনতে পাচ্ছ?—সোমনাথ বিছানায় নেই, কখন উঠে গেছে। এস—দেখা যাক। শব্দ ক'রো না।'

তন্দ্রার মধ্যে এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, রেডিয়াম-যুক্ত হাতঘড়ি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। রাত্রি সাড়ে-এগারটা। অন্ধকারে পা টিপিয়া দু-জনে বিলিয়ার্ড-ঘরের দিকে চলিলাম।

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া আমরা আর অগ্রসর হইলাম না। টেবিলের উপর তেমনি তিনটি আলো জ্বলিতেছে—বাকি ঘর ছায়ান্ধকার। সোমনাথ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বল মারিতেছিল, তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে—সন্ধ্যাবেলার সেই অবসাদগ্রস্ত মুহ্যমান ভাব আর নাই। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, খেলার আনন্দ প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মনে পড়িল, কয়েক মাস আগে সোমনাথ এমনিই ছিল, বাড়ী কিনিবার পর হইতে তাহার এই প্রাণখোলা আমোদে-মাতিয়া-ওঠা মূর্ত্তি আর দেখি নাই।

বল মারিয়া সোমনাথ লঘু কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তার পর নিজেই সচকিতে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া মৃদু স্বরে কি একটা বলিল। পরক্ষণে আর একটি সুমিষ্ট হাসির শব্দ কানে আসিল। হয়তো ইহা সোমনাথের হাসির প্রতিধ্বনি, কিন্তু পর্দ্দা ও মিষ্টতায় এত প্রভেদ যে রমণী-কণ্ঠের হাসি বলিয়া ভ্রম হয়।

খেলা চলিতে লাগিল। সোমনাথ একা খেলিতেছে, তবু যেন একা খেলিতেছে না; কাহারও সহিত কৌতুকপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সম্মোহিতের মত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; সোমনাথ খেলিতেছে, মৃদুস্বরে কাহাদের সহিত কথা কহিতেছে, সন্তর্পণে গলা নামাইয়া হাসিতেছে। প্রতিধ্বনিও তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছে, কখনও ভারী গলায় গভীর



[illegible]দের সভায় চৈতন্য।

[illegible] গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আওয়াজ হইতেছে, আবার কখনও কোমল কণ্ঠের অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু-ভাষণ কানে কানে অর্থহীন কথা বলিয়া যাইতেছে।

সমস্তই যেন চুপি চুপি। লুকাইয়া লুকাইয়া আমোদ-কৌতুক চলিতেছে, তাই রঙ্গ-রস আরও গাঢ় হইয়াছে। বুঝিতে পারিলাম, আমরাই এই লুকোচুরির লক্ষ্যবস্তু, আমাদের জন্যই ইহারা প্রকাণ্ড মজলিশ জমাইতে পারিতেছে না। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া রস-ভঙ্গ করিয়াছিলাম, পাছে জাগিয়া উঠিয়া আবার বিঘ্ন করি তাই গভীর রাত্রে এই ত্রস্ত সতর্কতা।

আমাদের পাশ দিয়া কে এক জন চলিয়া গেল। চুণী নিঃশব্দে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিলাম। চুণী জিজ্ঞাসা করিল, 'সোমনাথ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলে?'

'না। চোখে দেখি নি—কিন্তু—'

'জানি। কিন্তু সেগুলো যে আমাদের মনের কল্পনা নয় তার প্রমাণ কি? সোমনাথ হয়তো পাগল হয়ে গেছে তাই নিজের মনে হাসছে কথা কইছে।'

'কিন্তু গন্ধ? আওয়াজ? এগুলো কি?'

'এগুলো প্রতিধ্বনি হ'তে পারে। হয়তো এই প্রতিধ্বনিই সোমনাথকে পাগল ক'রে দিয়েছে। এখন পর্য্যন্ত আমরা চোখে কিছু দেখি নি; শুধু শব্দ আর গন্ধ। অতীতের কতকগুলো শব্দ-গন্ধ এই বাড়ীটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। তাতে দেহ-বিমুক্ত স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।'

প্রমাণ যে হয় তাহার পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে পাইলাম। ফস্ করিয়া দেশলাই-জ্বালার শব্দে দু-জন একসঙ্গে ঘাড় ফিরাইলাম। সোমনাথের বিছানার শিয়রে দাঁড়াইয়া এক জন পাইপ ধরাইতেছে—দুই করতল দিয়া ঢাকা দেশলাইয়ের আলো কেবল একটা মুখের উপর পড়িয়াছে। মুখখানা ধবধবে সাদা, দাড়িগোঁফ কামানো, অধরোষ্ঠে একটা শুষ্ক বিদ্রূপ; চোখের নীল তারকা পলকহীন ভাবে অগ্নিশিখার পানে চাহিয়া আছে। যেন মোমে-একটা মুখোস।

দেশলাই নিবিয়া আবার অন্ধকার হইয়া গেল। দেহের সমস্ত পেশী শক্ত করিয়া রহিলাম, বুকের স্পন্দন দপ দপ করিয়া কণ্ঠের কাছে ধাক্কা খাইতে লাগিল। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল তাহা জানি না।

আমিই প্রথম কথা কহিলাম, 'চুণী, এবার চোখে দেখা হয়েছে? এও কি প্রতিধ্বনি?'

চুণী উত্তর দিল না; আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

* * *

পরদিন সকালে বিলিয়ার্ড-রুমে দাঁড়াইয়া সোমনাথের নিকট বিদায় লইলাম। চুণীর চোখের কোলে কালি পড়িয়াছিল; সম্ভবতঃ আমার মুখখানাও নিশ্চিহ্ন ছিল না, কিন্তু আয়নার অভাবে নিজের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

চুণী বলিল, 'একটা রাত্রি তোমাকে খুবই জ্বালাতন করলুম। কিছু মনে ক'রো না সোমনাথ।'

সোমনাথ বলিল, 'না না—সে কি কথা—'

চুণী বলিল, 'যা হোক, আমাদের দিক্ থেকে অভিযান একেবারে নিষ্ফল হয় নি, কতকগুলো নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। আমাদের দুঃখ শুধু এই যে, তোমার অভিজ্ঞতা তুমি আমাদের কাছে লুকিয়েই রাখলে, প্রকাশ করলে না।'

সোমনাথ কুণ্ঠিত চক্ষে চাহিয়া রহিল।

'আমার থিওরি কাল তোমায় বলেছি, সেটা সত্যি কিনা ইচ্ছে করলেই তুমি বলতে পারতে।'

'কি—কি বলতে পারতুম?' সোমনাথ ঢোক গিলিল।

'এখনও বলতে পার। কাল রাত্রে আমরা যা যা অনুভব করেছি, সেগুলো কি এই বাড়ীতে সঞ্চিত কতকগুলো স্মৃতির ছায়া, না সত্যিকার জীবন্ত কিছু আছে?'

সোমনাথ উত্তর দিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। উত্তর দিল প্রতিধ্বনি; কানের কাছে চুপি চুপি বলিল, 'আছে! আছে! আছে!'

পঞ্চশস্য

এক-বীজ-পত্রী কয়েকটি উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গমের কৌশল

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে কদাচিৎ উচ্চতর প্রাণীদের মত সন্তান-বাৎসল্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্ন শ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যে কেহ কেহ সন্তান-জন্মের পরেও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিম পাড়িয়াই তাহাদের সন্তানপালনের দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকে। মাছ, কচ্ছপ, ব্যাং, শামুক, প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি প্রাণীদের ডিমের প্রতি যথেষ্ট বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ডিম পাড়িবার পর তাহাদের সঙ্গে আর কোনই সম্বন্ধ রাখে না, অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মেই ডিমের মধ্যে ভ্রূণের পরিপুষ্টি লাভ করিবার জন্য যথেষ্ট উপকরণ সঞ্চিত থাকে



তালের অঙ্কুর মাটির নীচে শিকড় বাহির করিয়া সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে ও উপরের দিকে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতেছে

এবং তাহা হইতেই পুষ্ট হইয়া ডিম হইতে যথাসময়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলেও তাহারা এই দুর্ব্বল শিশুদের রক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্বাহ্নেই এমন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া ডিম পাড়ে, যাহাতে তাহার



তালের অঙ্কুর। নলটি চিরিয়া দেখান হইয়াছে। নিম্নে নবোদ্‌…
শিকড়টি দেখা যাইতেছে

ডিম হইতে বহির্গত হইয়া শরীরপুষ্টিকারক অজস্র খাদ্যসাম… তাহাদের মুখের সামনেই সজ্জিত দেখিতে পায়, ইহাই যা কিছু তাহাদের সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয়।

প্রাণী-জগতের অনুরূপ এইরূপ সন্তান-বাৎসল্যের পরি… উদ্ভিদ্-জগতেও অহরহ পাওয়া যায়। উদ্ভিদের বীজ প্রাণী… ডিমেরই অনুরূপ, উদ্ভিদ-শিশু ভ্রূণরূপে বীজের মধ্যেই লুক্কা… থাকে এবং অঙ্কুরিত হইবার পর যথেচ্ছ বর্দ্ধিত হইবার নি… পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য বীজে সঞ্চিত থাকে। উপ… স্থানে ঐ বীজ পতিত হইয়া উদ্ভিদ্-বংশ বিস্তার করে। … পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার নিষ্পেষণে অনেকেই জী… সংগ্রামে পরাভূত হইতে বাধ্য হয়। এই প্রতিকূল অবস্থা হই… ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্ধার এবং অপমৃত্যুর হাত হইতে … পাওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্-বীজ বিভিন্ন প্রকারের কৌ… আয়ত্ত করিয়াছে। এই বিষয়ে জীব ও উদ্ভিদে অতি সাম… পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার জীব-জগতে যেমন দেখা …



নারিকেলের চারা

ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলেও, যত দিন পর্য্যন্ত তাহারা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে না পারে, তত দিন পর্য্যন্ত মা তাহার সন্তানগুলিকে কোলে পিঠে করিয়া বহন করিয়া বেড়াইতেছে—উদ্ভিদ-জগতেও সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কোন কোন মনসা গাছ, অর্কিড ও আনারস গাছে এরূপ সন্তান-বাৎসল্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের শিশু-বৃক্ষগুলি কাণ্ডের অগ্রভাগে অথবা দোদুল্যমান প্রবাহণীতে আবদ্ধ হইয়া বাড়িতে থাকে। যখন যথেষ্ট শিকড় গজাইয়া স্বতন্ত্র ভাবে জীবন যাপন করিবার উপযুক্ত হয়, তখন খসিয়া মাটিতে পড়ে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে যেমন দেখা যায় যে, ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলেই তাহাদিগকে নিজের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তাহার ফলে অনেকেই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে না, উদ্ভিদ-জীবনেও সাধারণতঃ এরূপ ঘটনাই সচরাচর নজরে পড়ে। লাউ কুমড়া, ধান, যব প্রভৃতি শস্যের বীজ উপযুক্ত স্থানেই অঙ্কুরিত হয় এবং শৈশবাবস্থায় বাঁচিবার জন্ত ইহাদের বীজ-পত্রে যথেষ্ট খাদ্যও সঞ্চিত থাকে সত্য, কিন্তু জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার মত যথেষ্ট সাহায্যের অভাবে অনেককেই অকালে উদ্ভিদলীলা সংবরণ করিতে হয়। উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্ব্বেই শিকড় বাহির হইয়া মাটি আঁকড়াইয়া ধরে, তার পর অঙ্কুর আত্মপ্রকাশ করে। বৃক্ষ-শিশু নিজের ক্ষমতায় খাদ্য আহরণ করিতে না পারা পর্য্যন্ত বীজ-পত্রে সঞ্চিত খাদ্য হইতে তাহার দেহপুষ্টি হইতে থাকে। লাউ, কুমড়া শশা, ধান, যব প্রভৃতি স্বল্পকালস্থায়ী উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গমের সময় শিকড় গজাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়; কিন্তু তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি এক-বীজ-পত্রী বড় বড় উদ্ভিদ্‌কে অনেক ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করিয়া বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে হয়। ইহাদের কাণ্ডও হয় বিরাট্ আয়তনের। অথচ সেই তুলনায় তাহাদের বীজাভ্যন্তরস্থ ভ্রূণ, লাউ, কুমড়া ধান, যব প্রভৃতির ভ্রূণের মতই দুর্ব্বল ও অসহায়। লাউ, কুমড়া, ধান, যব প্রভৃতি উদ্ভিদ্-কাণ্ডের হয়ত দুই-এক ফুট বা সামান্ত কিছু বেশী উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়—অন্যথায় ভূমিতে লুইয়া পড়িলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু তাল, নারিকেল প্রভৃতি উদ্ভিদের স্থূলকায় কাণ্ডগুলিকে যেখানে ৩০।৪০ হাত উঁচু হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সেখানে তাহাদের শিথিল ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না; মূলদেশ গভীর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন. তাহা না হইলে সামান্ত দুর্ব্বিপাকেই তাহাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই সব বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তই যেন তাহারা তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত অন্যান্য সাধারণ বীজ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় অঙ্কুরোদ্গমের অভিনব পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।



বামে: কুমড়ার চারা ও অঙ্কুর। দক্ষিণে: যবের অঙ্কুর



খেজুরের চারা ও অঙ্কুর। বীজ হইতে নলটি কি ভাবে মাটির নীচে গিয়াছে তাহা দেখানো হইয়াছে

তালের বীজ বা আঁঠিগুলি কতকটা গোলাকার, কিন্তু চেপ্টা। দেখিতে কতকটা পাথরের নুড়ির মত, সুদৃঢ় খোলায় আবৃত। আঁঠিগুলি সচরাচর মাটির উপরেই পড়িয়া থাকে। মাটির উপরেই থাক বা পাথরের উপরই থাক, কিছু দিন বৃষ্টি পাইলে বা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় থাকিলেই ঊর্দ্ধদিকের প্রান্তভাগের মধ্য হইতে সূচালো ডগাবিশিষ্ট শিকড়ের মত একটা লম্বা নল বাহির করিয়া দেয়। সাধারণতঃ বীজের অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্ব্বেই শিকড় বাহির হইয়া থাকে। তালের বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্ব্বে শিকড়ের মত এই অদ্ভুত পদার্থটি দেখিয়া শিকড় বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কিন্তু শিকড় নহে। ইহাকে তাল-শিশুর নাভি-রজ্জু বলা যাইতে পারে। উচ্চতর প্রাণীদের ভ্রূণ যেরূপ মাতৃগর্ভে নাভি-রজ্জুর সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তাল-শিশুও এই অদ্ভুত যন্ত্রটির সাহায্যে বীজ হইতে বহু দূরে অবস্থান করিয়াও বীজাভ্যন্তরস্থ খাদ্যে পরিপুষ্ট হয়। এই রজ্জুটি বীজের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্রমবর্দ্ধমান স্পঞ্জের মত একটি ফোঁপল হইতে বাহির হইয়া আসে। ইহা নলের মত, ভিতরে ফাঁপা; কিন্তু সূচালো প্রান্তভাগ সম্পূর্ণ নিরেট। এই সূচালো প্রান্তের অভ্যন্তরে বীজাঙ্কুর অবস্থান করে। অঙ্কুরটি উল্টামুখে নলের মধ্যে থাকিয়া লম্বালম্বিভাবে বাড়িতে থাকে। নলের সূচালো মুখের ডগার সঙ্গে থাকে ইহার গোড়ার দিক। নলটা চিরিয়া ফেলিলে ইহার সবই প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু বাহির হইতে ইহাকে একটা সাধারণ শিকড় ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। এই নলটির প্রধান কাজই হইতেছে—বীজের ভিতর হইতে ভ্রূণটিকে অতি সন্তর্পণে এবং সঙ্গোপনে গভীর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করা এবং সেখানে যত দিন পর্য্যন্ত সে শিকড় গাড়িয়া বসিতে না পারে, তত দিন পর্য্যন্ত মাটির উপরিস্থিত বীজ হইতে খাদ্য আনিয়া তাহার শরীরের পুষ্টি সাধন করা। অনেক ক্ষেত্রেই বীজ হইতে নলটি বাহির হইয়াই ভিতরে প্রবেশ করিবার মত নরম মাটির সন্ধান পায় না; কাজেই কখনও কখনও তাহাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত মাটির উপর দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। অন্ধকার ছাড়া আলোতে ইহারা বাড়িতে পারে না বলিয়া সর্ব্বদা জঞ্জাল, আবর্জ্জনার ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। পাথরের উপর বীজটি পড়িয়া থাকিলে, নরম মাটির সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত পাথর অতিক্রম করিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া বা মোচড় খাইয়া চলিতে থাকে। নরম মাটির সন্ধান পাইলেই খাড়া ভাবে মৃত্তিকাভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে। যতই ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যস্থিত ভ্রূণের বৃদ্ধিহেতু ইহা ততই মোটা হইয়া যায়। বীজ হইতে বাহির হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা একটি সাধারণ কলমের মত মোটা থাকে, কিন্তু মাটির নীচে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিবার পর দেড় ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি কি ততোধিক মোটা হইয়া যায়। এইরূপে নলটা প্রায় এক ফুট দেড় ফুট নীচে চলিয়া গেলে তন্মধ্যস্থ বৃক্ষ-শিশুর উদ্গত হইবার সময় আসিয়া পড়ে। তখন সেই নলের সূচালো মুখটি ক্রমশঃ যেন উল্টামুখে ভিতরের দিকে যাইতে থাকে। অর্থাৎ সূচালো মুখটির বৃদ্ধি তখন শেষ হইলেও পরিবেষ্টিত স্থানগুলি বাড়িতে থাকে, ফলে দেখায় যেন সূচালো মুখটি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িতেছে। এই সময়ে সূচালো মুখের নিকট হইতে একটি মোটা মূল শিকড় উদ্গত হইয়া নীচের দিকে চলিয়া যায় এবং আশেপাশেও শিকড় গজাইতে থাকে। ইতিমধ্যে কিন্তু বৃক্ষ-শিশু নলের অভ্যন্তরে প্রায় ছয় সাত ইঞ্চি লম্বা বাঘ-নখের মত একটা শক্ত আবরণ লইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। শিকড় মাটিতে প্রবেশ করিবার পর এই বাঘ-নখের মত বৃক্ষ-শিশুটি নলের বুক চিরিয়া মৃত্তিকা-ভ্যন্তরেই বাহির হইয়া পড়ে। ইহাকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে তাল-গাছের অঙ্কুর বলা যাইতে পারে। তখনও বাহির হইতে বুঝিবার জো নাই যে, ঠিক কোন্ স্থান হইতে তালের চারা মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইবে। প্রায় তিন-চার মাস পরে হঠাৎ দেখা গেল—যেখানে আঁঠিটি পড়িয়াছিল, সেখান হইতে প্রায় হাতখানেক ব্যবধানে পাখীর পালকের মত লম্বা একটি পাতা মাটি ভেদ করিয়া উঠিতেছে। তালের ভ্রূণটি বাঘ-নখের মত ঐরূপ একটি তীক্ষ্ণাগ্র কঠিন আবরণে আবৃত না থাকিলে তাহার পক্ষে এত মাটির নীচে হইতে বাহির হইয়া আসা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার হইয়া পড়িত। বাঘ-নখের মত বৃক্ষ-শিশুটি বাড়িতে বাড়িতে যখন উপরের মাটির

কাছাকাছি আসে, তখন ভিতর হইতে একটি সরু মুখ লম্বা পাতা বাহির করিয়া দেয়। প্রায় বছরখানেকের মধ্যেই ক্রমশঃ গোলাকার পাতা বাহির করিয়া প্রকৃত তালগাছের আকৃতি ধারণ করে। শৈশবের প্রথমাবস্থায় তাল, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষ-শিশুর পাতার আকার প্রায় একই রকম থাকে; দেখিয়া সহজে কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না।

আঁঠির ভিতর হইতে বাহির হইয়া নলটা যতই মাটির গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে থাকে, ভিতরের ফোঁপলটাও সঙ্গে সঙ্গে ততই বড় হইতে থাকে। আঁঠি হইতে নলটি বাহিরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে "এন্‌জাইম" নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হইতে থাকে। এই "এন্‌জাইমের" সাহায্যেই ভিতরের হাড়ের মত শক্ত শাঁস গলিয়া মাখমের মত হইয়া যায়। ফোঁপল সেই মাখমের মত পদার্থগুলিকে ধীরে ধীরে শোষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নলের সাহায্যে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ভ্রূণের দেহ-পুষ্টির জন্য পাঠাইয়া দেয়।

শিকড় গজাইবার কিছু দিন পরেও লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন প্রভৃতি চারাগাছের বীজ-পত্র নষ্ট হইয়া গেলে তাহারা আর বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু তালের ফাঁপা নলটি একবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাটির নীচে প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার ভ্রূণের আর বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। অঙ্কুর মাটি ফুঁড়িয়া বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে আঁঠিটি নল হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও তাল-শিশু নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাটি ফুঁড়িয়া বাহিরে আসিয়া থাকে।

খেজুর-বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময়ও তালের মত একই রকম কৌশল পরিলক্ষিত হয়। খেজুরের বীজও অতি কঠিন আবরণে আবৃত। ইহা দেখিতে সরু এবং প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা। এক দিকে লম্বালম্বিভাবে চেরা। দেখিয়া বোধ হয় যেন ঐ লম্বালম্বি কাটা দাগের মধ্য দিয়াই ইহাদের অঙ্কুর বাহির হইয়া আসে; কিন্তু তাহা নহে। আঁঠিটি অবশ্য মাটির উপরেই পড়িয়া থাকে এবং সময়মত একটু জল পাইলেই কাটা দাগের বিপরীত দিক্ হইতে যেন খুব সরু একটি ছিপি খুলিয়া শিকড়ের মত একটা লম্বা নল বাহির হইয়া আসে। শিকড়ের মত এই নলটি অতি দ্রুত বাড়িতে বাড়িতে সুবিধামত নরম মাটির নীচে ঢুকিয়া পড়ে। তালের ভ্রূণের মত ইহাদের ভ্রূণটিও ঐ সরু মুখ নলটির ভিতরেই অবস্থান করে। ভ্রূণসমেত নলটি মৃত্তিকাভ্যন্তরে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই ভ্রূণের গোড়ার দিক্ হইতে একটি কি দুইটি মূল শিকড় বাহির হইয়া আরও নীচে চলিয়া যায়। শিকড় বড় হইলে অঙ্কুরটি নলের ভিতরে ঊর্দ্ধদিকে বাড়িতে বাড়িতে তাহার আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং সেখান হইতে শলাকার মত সূচ্যগ্র পত্র মাটির উপর প্রেরণ করে। মোটের উপর তাল ও খেজুর এই উভয় জাতীয় বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গমে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছ যেমন প্রকাণ্ড ও লম্বা হয় তাহাতে তাহাদের চারাগাছগুলিকে এইরূপ দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, ঝড়ঝাপটা সহ্য করিয়া কিছুতেই খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার উপায় থাকিত না। কত যুগযুগান্তের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে ক্রমপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্ষার জন্য তাহারা যে উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়।

নারিকেল গাছ তাল, খেজুর প্রভৃতি উদ্ভিদের মত হইলেও তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম হয় অতি সাধারণ উপায়ে। প্রথমাবস্থায় ইহারা বোধ হয় সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নোনা স্থানসমূহেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বংশবিস্তারের জন্য প্রধানতঃ জলস্রোতের উপরই নির্ভর করিত। আধুনিক সময়ে অবশ্য প্রয়োজনবোধে কৃত্রিম উপায়ে মানুষ ইহাদের বংশবৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দিয়াছে। পরিপক্ব নারিকেল বোঁটা খসিয়া জলের উপর পড়িত বা জলোচ্ছ্বাসের সময় দূর-দূরান্তরে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের বংশবিস্তারের সহায়তা করিত। নারিকেলের উপরে ছোবড়ার আবরণ না থাকিলে এরূপ ব্যাপার কখনও সম্ভব হইত না। এই ছোবড়া যেমন তাহাদিগকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিয়া দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা করিয়া দেয়, তেমনই আবার অভ্যন্তরস্থ বৃক্ষশিশু অঙ্কুরিত হইবার পর তাহাকে দৃঢ়ভাবে মৃত্তিকাসংলগ্ন হইয়া সুপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকে। হয়ত এরূপ সুবিধার জন্যই তাহাদের তাল-খেজুরের মত অঙ্কুরোদ্গমের ব্যাপারে এত কৌশল



বামে: তালের আঁঠি হইতে শিকড়ের মত নল বাহির হইয়া মাটির উপর আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে
দক্ষিণে: নলটি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর তাহার মাথার দিক ক্রমশঃ মোটা হইয়া গিয়াছে

আরম্ভ করিতে হয় নাই। ছোবড়ার নীচে নারিকেলের খোলের মুখের দিকের নরম অংশটি ঠেলিয়া খুব শক্ত একটি অঙ্কুর বাহির হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে খোলের অভ্যন্তরে বাহিরের অঙ্কুরের সহিত সংলগ্নভাবে একটি গোলাকার ফোঁপল আত্মপ্রকাশ করে। অঙ্কুরটি ছোবড়ার বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার গোড়ার দিক্ হইতে খোলের উপর দিয়া ছোবড়ার মধ্যে বেশ মোটা মোটা শিকড় চালাইতে থাকে। বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প অথবা আর্দ্র স্থান হইতে ছোবড়া কিছু কিছু জল শোষণ করিয়া লইতে পারিলে এই নবজাত শিকড়গুলির পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়। শুষ্ক থাকিলেও নারিকেলের শাঁসে যে-পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত থাকে তাহাতে অঙ্কুর ও শিকড় উভয়েই নিশ্চিন্তে বর্দ্ধিত হইতে পারে। ইহাদেরও অঙ্কুরোদ্গমের সময় ভিতরে এক প্রকার 'এন্‌জাইম' উৎপন্ন হয় এবং তাহার সাহায্যে শক্ত শাঁস মাখমের মত নরম হইয়া যায়। ফোঁপল তাহা শুষিয়া লইয়া বৃক্ষশিশুটিকে পোষণ করিতে থাকে। নারিকেল-চারাটি ফোঁপলের সঙ্গে প্রায় ½ ইঞ্চি মোটা এবং প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা বোঁটায় সংলগ্ন থাকে। এই বৃন্তটি নারিকেলের খোলের মুখে ছিপির মত আঁটিয়া থাকে। ইহাতে বাহিরের বাতাসের সঙ্গে খোলের অভ্যন্তরে কোনই সম্পর্ক থাকে না; কিন্তু চারাটিকে ধরিয়া একটু জোড়ে মোচড়াইয়া দিলেই ছিপিটি আল্গা হইয়া যায় এবং ফোঁপলসমেত ঘুরিতে থাকে। ইহাতে গাছ বা ফোঁপলের কোন অনিষ্ট না হইলেও বাহিরের বাতাস ভিতরে ঢুকিতে পাইয়া নারিকেলের অভ্যন্তরস্থ শাঁস ও জল নষ্ট করিয়া ফেলে; কাজেই গাছটি খাদ্যাভাবে আর বাড়িতে পারে না। অবশ্য ছোবড়া ছাড়াইয়া ফেলিলেই এইরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে। ছোবড়ার মধ্যে গাছ অঙ্কুরিত হইলে নারিকেল-চারাকে কখনই এরূপভাবে আল্গা করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না।

তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি গাছগুলির আকৃতি বহুলাংশে এক ধরণের হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-বৈচিত্র্যের ফলেই বোধ হয় ইহাদের অঙ্কুরোদ্গম-প্রণালীতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন অবস্থার চাপে পড়িয়া ইহারা বিভিন্ন রকমের অঙ্কুরোদ্গমের কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। বালুকাময় ক্ষেত্রই বোধ হয় খেজুর-গাছের আদি লীলাভূমি। এই কারণেই খুব সম্ভব মৃত্তিকার নিম্নস্তর হইতে রস শোষণ এবং সুদৃঢ় মাটিতে গোড়াপত্তন করিবার নিমিত্ত এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে বীজ হইতে ভ্রূণকে স্থানান্তরিত করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। তালগাছ বোধ হয় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কোন কঠিন মৃত্তিকাস্তৃত ভূখণ্ডে তাহাদের আদি উপনিবেশ স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল; তাহার ফলে অঙ্কুরের পক্ষে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অতি নিম্নে শিকড় চালাইবার পন্থা খুব সহজ ছিল না। অথচ শিথিল ভিত্তিতে গোড়াপত্তন করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই অঙ্কুরোদ্গমের জন্য তাহাকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। নারিকেল জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়া তীরবর্ত্তী কোন নরম মাটিতে আটকাইয়া অঙ্কুর বাহির করিত বলিয়া অতি সহজেই তাহার পরিপুষ্ট শিকড়-গুলিকে মাটির গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করাইয়া দিতে সমর্থ হইত। এই জন্যই ভবিষ্যৎ বীজাঙ্কুরের প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাকে অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় নাই।

[চিত্রগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত]

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙালীর কৃতিত্ব

কর্ম্মবীর আলামোহন দাস

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(৩)

ইতিপূর্ব্বে আলামোহন দাসের জীবনী ও কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, এবারে তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের পর তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া আমি তাঁহার যে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে করি।

ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ বাঙালী-চরিত্রের একটি অন্যতম প্রধান দুর্ব্বলতা। অনেক সময় সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে বাঙালী কুণ্ঠা বোধ করে না, দুঃখের কথা হইলেও ইহা সত্য। প্রায়ই দেখা যায় যে, বাঙালী যদি একটু তথাকথিত মোটা বেতনের চাকুরী পান কিংবা তাঁহার মাসিক আয় যদি হাজার টাকা বা তদুপরি হয়, তবে চৌরঙ্গী বা

বালিগঞ্জ অঞ্চলে একখানি বাড়ী তৈয়ারী করেন এবং অপ্রয়োজনেও একখানি মোটর গাড়ী কিনিয়া বসেন। তিনি যে একটা কিছু হইয়াছেন, অর্থাৎ নিতান্ত সাধারণ লোক নহেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যেন উঠিয়া-পড়িয়া লাগেন। প্রবাসী বাঙালী সমাজও মাতৃভূমি হইতে এই দোষ পরিপূর্ণরূপে আহরণ করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এখনও অনেক বাঙালী মোটা বেতনে চাকুরী করিয়া থাকেন অথবা ব্যবহারজীবী বা চিকিৎসক হিসাবে বেশ দু-পয়সা উপায় করেন; কিন্তু চালচলন একটু ব্যয়বহুল বলিয়া তাঁহারাও অনেক ক্ষেত্রে কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন না। ফলে চক্ষু বুজিলে অনেকেরই পরিবারবর্গ নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি, মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া সামান্য ছাতু মাত্র আহার করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ব-স্ব ব্যবসায়ের ভিত্তি পত্তন করেন। ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের চালও ক্রমশঃ বাড়িয়া যায় এরূপ কখনও দেখা যায় না। ব্যবসায়ে উত্থান-পতন দুই-ই আছে, তাই উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে চাল বাড়ে না বলিয়াই অকস্মাৎ ভাগ্যবিপর্য্যয়েও তাঁহাদের একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার কোন কারণ ঘটে না।



শ্রীআলামোহন দাস আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শ্রীযুক্তা চপলা দাস

আলামোহন যদিও অতি হীন অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তবুও তাঁহার মাথা বিগড়াইয়া যায় নাই অর্থাৎ জীবনযাত্রা-প্রণালীকে তিনি অহেতুক ব্যয়-বহুল করিয়া তোলেন নাই। তাঁহার কয়েক জন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী আমাকে গোপনে এক দিন বলিয়াছিলেন যে, যখন আলামোহনের প্রচুর আয় হয় এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই কলিকাতার অভিজাত পল্লীতে স্বীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পারিতেন, তখনও তিনি মাসিক দুই টাকা ভাড়ার খোলার বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান নাই, তখনও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বহস্তে পাকশালার এবং অন্যান্য গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন! অবশেষে এক দিন তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "আমাদের জন্য ভাল বাড়ী করিয়া দিয়াছেন অথচ আপনি যদি এই প্রকার খোলার বাড়ীতে বাস করেন তবে আমাদের বড়ই লজ্জা বোধ হয়। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমরা না-হয় চাঁদা করিয়া আপনার জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া দিতেছি।" আলামোহন ইহাতে একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং পূর্ব্ব কুটীরের অতি সন্নিকটে একটি ছোটখাট পাকা বাড়ী ভাড়া করিলেন। এখনও তিনি সেই বাড়ীতেই থাকেন। আমি এক দিন তাঁহার পূর্ব্বেকার কুটীর দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি বলিলেন, অনেক দিনের ভাড়াটিয়া বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বেকার বাড়ীর মালিক লজ্জায় বাড়ীর ভাড়া বাড়াইতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি ঐ বাড়ী ছাড়িবার পরই তাহা ভাঙিয়া-চুরিয়া সেখানে পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমার তখন মনে হইল যদি পূর্ব্বেকার বাড়ীর একখানি ফটো থাকিত তবে তাহা কত না আদরের হইত!

আলামোহনের আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁহার আদর্শবাদ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যবসা করিতে হইলেই

অনিশ্চিতের পথে পা খানিকটা বাড়াইতে হইবে। আদর্শবাদ না থাকিলে মানুষ স্বেচ্ছায় অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াইতে পারে না। বাংলা দেশে যন্ত্র-প্রস্তুতের কারখানা গড়িয়া তুলিবার সাধনায় আলামোহন প্রথমাবধি ব্রতী হইয়াছিলেন, তাই খৈ মুড়ী ফিরি করিবার সময় হইতে যে-চিন্তা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহা কোনদিনই তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। রেঙ্গুনের পল্লীতে পল্লীতে চা ফিরি করিবার সময়ও তিনি ভাবিয়াছেন কি করিয়া যন্ত্রপ্রস্তুতের কারখানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন, আবার শেয়ার-মার্কেটের কার্য্যে যখন দু-পয়সা হাতে আসিতে লাগিল তখনও সেই লাভজনক ব্যবসায় তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। উপযুক্ত অর্থ হাতে আসিতেই তিনি পুনরায় কারখানা গড়িয়া তাঁহার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। যখন কোন ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী দু-পয়সা উপায় করিতে থাকেন, তখন সেই ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করা কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতপক্ষে এরূপ করিতে হইলে প্রচণ্ড আদর্শবাদের প্রয়োজন। আলামোহনের তাহা আছে বলিয়াই যন্ত্রশিল্পে তাঁহাকে অন্যতম পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

তথাকথিত উচ্চশিক্ষার মোহ বাঙালীর চিত্তকে কিরূপ বিভ্রান্ত করিয়াছে তাহা আমি সর্ব্বদা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যবসায়ীর পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে গিয়া যে-সময় নষ্ট করিতে বাধ্য হন, তাহাতে পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদিগকে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা বুঝিয়াও আমরা বুঝি না। মনে হয় ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। বাঙালীর ছেলে যখন কলেজে বসিয়া অধ্যাপকের নিকট শেক্সপীয়র, মিল্টনের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা শোনেন, তখন মাড়োয়ারীর ছেলে গদীতে বসিয়া পিতার নিকট ব্যবসা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করেন। ইহার ফলে যে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙালীরা মাড়োয়ারীর সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সর্ হুকুমচাঁদ স্বরূপচাঁদের কলিকাতা ফার্ম্মের ম্যানেজার ও অংশীদার শ্রীযুক্ত শিউকিষেণ ভাট্টারকে আমি এক দিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনার লেখাপড়া কত দূর, অর্থাৎ কলেজের ধাপ মাড়াইয়াছেন কি না?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমার পিতা আমাকে কলিকাতাস্থ মাড়োয়ারী স্কুলে অষ্টম বা নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িতে দেন এবং তাহার পরই আমাকে টানিয়া তাঁহার ব্যবসায়ে ঢুকান।" কিন্তু এখন স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি যে কেবল এত বড় একটি ফার্ম্মের ম্যানেজার হইয়াছেন তাহা নহে, কয়েকটি বড় বড় ইংরেজ ফার্ম্মের ডিরেক্টর।

আলামোহনের একটি মাত্র পুত্রসন্তান, আর কয়েকটি কন্যা। পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া তিনি নিজ ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করিতে দিয়াছেন। আমার মনে হয়, আলামোহন উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন এবং তিনি যদি ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাধারী করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন, তবে ভুল করিতেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কোন একটি কারখানা সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে ইহার বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, সুতরাং অল্প বয়সেই কারখানার সাধারণ শিক্ষানবিশ হইয়া ঢুকিতে পারিলে সমস্ত বিভাগের কার্য্য যথাযথভাবে আয়ত্ত করিবার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ মেলে। শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা তাঁহার এক পুত্রকে তদীয় দিল্লীস্থিত কাপড়ের কলে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু প্রথমে সেই পুত্রকে মিলে সাধারণ শিক্ষানবিশী করিতে দেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রকে (সম্ভবতঃ তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসরের অধিক হইবে না) একটি রাসায়নিক কারখানা পত্তনে ব্রতী করিয়াছেন।

আলামোহন কঠোর পরিশ্রমী। তিনি তাঁহার নিজের কারখানায় সমস্ত দিন এবং অনেক সময় রাত্রিতেও কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকেন। বস্তুতপক্ষে তাঁহার সহকর্ম্মিগণ আলামোহনের মধ্যে বিন্দুমাত্র শ্রমকাতরতা নাই দেখিয়া বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়া আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গে কাজ করেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মিগণের সহিত সমভাবে মেলামেশা করিয়া থাকেন। আমি দেখিয়াছি যখন তিনি কারখানার কাজে নিযুক্ত থাকেন, তখন কে মনিব কে

কর্ম্মী তাহা চিনিয়া লওয়া কঠিন। এই সকল কর্ম্মিগণের সুখ-দুঃখের ভারও তিনি সমভাবে বহন করিতে দ্বিধা করেন না বলিয়া কর্ম্মিগণও কারখানার জন্ত সর্ব্বপ্রকার কঠোর পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হন না। এক দিন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি কোন প্রকার সংবাদ না দিয়া আপনার বাড়ীতে যাইব। অর্থাৎ আমি দেখিতে চাই যে আপনার পরিবারবর্গ কি ভাবে জীবন যাপন করেন।" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "চলুন"। আমি তাঁহার গৃহে গিয়া প্রথমেই দেখিলাম তাঁহার ছোট বাড়ীর প্রাঙ্গণে পাড়ার কয়েকটি স্ত্রীলোক কুটনা কুটিতেছেন; কয়েক ডালি মাছও দেখিলাম। অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে কারখানার জনৈক ফোরম্যানের ছেলের বিবাহের বৌভাত উপলক্ষে আলামোহনবাবু নিজে কয়েক জন লোক খাওয়াইবেন, তাই সেদিনের আয়োজন। ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, "আমার কারখানার এই শ্রেণীর লোকের ক্রিয়াকলাপের ব্যয়ভার আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বহন করি। আমি কোন জাতিবিচার করি না। আমি কেবল এক জাতি জানি এবং সে জাতি বাঙালী জাতি।"

আলামোহন দাসের জীবন প্রত্যেক বাঙালী ভাগ্যান্বেষীর মনে আশার সঞ্চার করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। জীবন-সংগ্রামে পরাভূত বাঙালী যুবক যদি দৃঢ়-সংকল্প হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হন; তবে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াও তাঁহারা নিজের এবং দেশের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। দৃঢ় সংকল্প, আদর্শনিষ্ঠা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা না থাকিলে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করা যায় না—সেরূপ হইলে এই ব্যবসা-বিমুখ জাতির পক্ষে নূতন ও স্থায়ী কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা ত অনেক দূরের কথা! নূতন উদ্যমে কত বাঙালী যুবককেই ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি, আবার ব্যর্থতার প্রথম বা দ্বিতীয় আঘাতেই ব্যবসা ছাড়িয়া চাকুরীর নিরাপদ পথে চলিতে তাঁহাদেরই অক্লান্ত সাধনাও লক্ষ্য করিয়াছি! হয়ত বা অনভ্যস্ত এবং অনিশ্চিত পথে চলিবার মত দৃঢ় সঙ্কল্প এবং আদর্শনিষ্ঠার অভাবেই এমন হয়। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা এক দিকে যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্য দিকে চাকুরীর ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনিই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ব্যবসায়ের পথ না ধরিলে আমাদের পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিবার কোনই উপায় নাই।*

* এই প্রবন্ধত্রয় লিখিতে কলেজ-অব-সায়েন্সের শ্রীমান্ ভবেশচন্দ্র রায়, এম্. এস্‌সি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীর ৭৭ পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় পি এন দত্ত মহাশয়ের উল্লেখ আছে। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং নিজের ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন। —প্রবন্ধ-লেখক



আলোচনা

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চ্চার ফল

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ

ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে পরম শ্রদ্ধাভাজন রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের লিখিত উক্ত নামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত আমার প্রবন্ধের এক অংশের প্রতিবাদের আকারে লিখিত। চন্দ মহাশয় যে আমার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, সেজন্য আমি এই অবসরে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ জনের সহিত মতভেদ হওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহার প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম যে, প্রকৃত মতভেদ কিছু নাই বলিলেই হয়।

[নিম্নে আমার বিবৃতিতে স্থূলাক্ষর ও italics ব্যবহার সর্ব্বত্র আমার কৃত।]

(১) আমার যে সকল উক্তিকে চন্দ মহাশয় প্রতিবাদযোগ্য মনে করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটি এই:—"রামমোহন রায়ের প্রচলিত জীবনচরিতগুলি হইতে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের মনে ভুল ধারণা জন্মে। একটি ধারণা এই যে তাঁহার বাল্যকালে **বঙ্গদেশে** জ্ঞানচর্চ্চা কিছুই ছিল না, **দেশ** ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।"

১৭৮৭ শকে (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) অগ্রহায়ণ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় "রামমোহন রায়ের এক জন অনুগত শিষ্য" লিখিয়াছিলেন, "রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন **সমুদয় বঙ্গভূমি** অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।" রামমোহন রায়ের আবির্ভাব কালে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ এই বিবরণটির উপরেই নির্ভর করিয়া আসিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত জীবনচরিতের প্রত্যেক সংস্করণে এই বিবরণ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুসরণে মিস্ কলেট লিখিয়াছেন, "Thick clouds of ignorance and superstition hung over *all the land*." আমার আলোচ্য প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে এই মত ভ্রমসঙ্কুল। আষাঢ় হইতে ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে, শুধু কলিকাতায় নয়, সমগ্র বঙ্গদেশেই তখন যথেষ্ট জ্ঞানচর্চ্চা ছিল।

চন্দ মহাশয় লিখিতেছেন, "রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত পাঠ করিলে তাঁহার বাল্যকালে যে বঙ্গদেশে জ্ঞানচর্চ্চা কিছুই ছিল না, এই ধারণা সকলের মনে হয় না। দুই জন বাঙ্গালী পণ্ডিত, নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, তাঁহার সহযোগী ছিলেন, এবং অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিত তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।" উপরে উদ্ধৃত বাংলা ও ইংরেজী বাক্যে স্পষ্ট রহিয়াছে যে সে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। এই মত আমি অস্বীকার করিয়াছি। দেখিতেছি, চন্দ মহাশয়ও প্রকারান্তরে অস্বীকার করিতেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার কোন বিরোধ নাই।

(২) আমি লিখিয়াছিলাম, "দ্বিতীয় ভুল ধারণা এই যে, রামমোহন রায় **বাল্য বয়সে** ফারসী ও আরবী শিক্ষার জন্য পাটনাতে এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কাশীতে প্রেরিত হন। এই ধারণার পরিপোষক অণুমাত্র প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে না।"

চন্দ মহাশয় ইহার তিন স্তম্ভব্যাপী প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শেষ মীমাংসা এই:—"**আঠার বৎসর বয়সে** তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই বোধ হয় পিতার অনুমতি লইয়া রামমোহন পাটনায় গিয়া আরবী এবং কাশীতে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।" আঠারো বৎসর বয়স তো 'বাল্যবয়স' নয়! তবে আমার সহিত চন্দ মহাশয়ের বিরোধ কোথায়?

তিনি আমার ঐ কথার প্রতিবাদের জন্য ডক্টর ল্যাণ্ট কার্পেণ্টারের কয়েকটি উক্তির আলোচনা করিয়াছেন, এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন।

কার্পেণ্টারের যে উক্তি চন্দ মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আছে, "He was *afterwards* sent to Patna to learn Arabic; and *lastly* to Benares to obtain a knowledge of Sanskrit." পাঠক লক্ষ্য করিবেন, 'afterwards' এবং 'lastly' এই দুই শব্দে সময় সম্বন্ধে কিছুই স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করা হয় না। এই দুই অস্পষ্ট শব্দের উপর নির্ভর করিয়াই রামমোহন রায়ের বাংলা জীবনচরিতগুলিতে এই মত প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল যে রামমোহন **বাল্যবয়সেই** পাটনায় ও কাশীতে পাঠ করেন। মিস্ কলেট অধিক সাবধান; তিনি সময় নির্দ্দেশ করেন নাই।

রামমোহন রায় যে বাল্যবয়সে স্বগ্রাম রাধানগরে থাকিয়াই সংস্কৃত ফারসী ও আরবী শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ও নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, ইহা রাধানগর-নিবাসী পরলোকগত সর্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় রামমোহন শতবার্ষিকের সময় স্বীয় বক্তৃতায় স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এক জন পূর্ব্বপুরুষ (রামনারায়ণ

সর্ব্বাধিকারী) রামমোহন রায়ের প্রথম ফারসী ও আরবী শিক্ষক ছিলেন। *Father of Modern India* পুস্তকে (II. 422, 423 পৃষ্ঠায়) দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বক্তৃতাটি মুদ্রিত আছে।

বাল্যবয়স অতিক্রান্ত হইবার পর রামমোহন রায়ের পাটনা ও কাশী গমনের সম্ভাবনা আমি অস্বীকার করি নাই। আমার শ্রাবণের প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম, "তিনি [রামমোহন] সংস্কৃত ও ফারসীর প্রথম শিক্ষা বাল্যকালে স্বগ্রাম রাধানগরে থাকিয়াই লাভ করেন। উত্তরকালে যখন তিনি ভ্রমণসূত্রে পাটনা ও কাশীতে গমন করেন, তখন বাল্যকালে অর্জ্জিত সেই জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া লইয়া থাকিবেন।" আমার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়া চন্দ মহাশয় প্রতিবাদ করিয়াছেন, এ কথাগুলি তাহার ঠিক পরেই আছে।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের নজীর সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-সংক্রান্ত কোনও সন্দেহযুক্ত তথ্যের বা তারিখের মীমাংসা করিতে হইলে কিশোরীচাঁদ মিত্রের নজীর দেওয়া বৃথা। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন, এবং ভাল ইংরেজী লিখিতে পারিতেন বটে। কিন্তু তথ্য ও তারিখ সম্বন্ধে তিনি এত অধিক অসতর্ক ছিলেন এবং অনুসন্ধান না করিয়া অনুমানের উপর এত অধিক নির্ভর করিতেন যে তাঁহার কোনও কথাতে বিনা পরীক্ষায় নির্ভর করা যায় না। তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে হইলে রামমোহনকে (এবং অপর কোনও কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে) উৎকোচগ্রাহী বলিয়া সন্দেহ করিতে হয়। কিশোরীচাঁদের এরূপ সন্দেহদ্যোতক ইঙ্গিত যে কত দূর ভিত্তিহীন, রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাহা এখন প্রকাশ্যে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

(৩) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রসঙ্গে চন্দ মহাশয় আমার মুখে আমার উক্তি অপেক্ষা অধিক কথা আরোপ করিয়া সেই অতিরিক্ত অংশেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমি লিখিয়াছিলাম, "ইহা নিশ্চিত যে" ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতেই রামমোহন "নানা সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের এবং বেদ ও উপনিষদের আলোচনা করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হন।" এস্থলে পাঠক মনে রাখিবেন, আমার শ্রাবণের প্রবন্ধের আলোচ্য অংশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে দেশ কত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং রামমোহন কত উপকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; রামমোহন রায়ের জীবন সম্বন্ধে তথ্যের অবতারণা গৌণ ভাবেই করা হইয়াছিল। অথচ চন্দ মহাশয় লিখিতেছেন, "কিন্তু তিনি [রামমোহন] যে ১৮০০ বা ১৮০১ সাল হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোন পণ্ডিতের এবং মৌলবীর নিকট উপনিষৎ, বেদান্ত, আরবী দর্শন ও গণিত রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার কি প্রমাণ আছে? প্রমাণস্বরূপ সতীশবাবু ডিগবী সাহেব ১৮১০ সালের ৩১শে জানুয়ারী রামমোহন রায়কে রংপুরের কালেক্টরীর দেওয়ান পদের জন্য সুপারিশ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

এ বিষয়ে আমার কৈফিয়ৎ এই যে, 'রীতিমত' অধ্যয়ন দূরে থাকুক, কোনও পণ্ডিত বা মৌলবীর নিকটে অধ্যয়ন করিবার কথা আমি আদৌ তুলি নাই। এবং ডিগবীর পত্রখানি এরূপ কোন অধ্যয়নের প্রমাণস্বরূপ আমি উপস্থিত করি নাই; "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত রামমোহন রায় ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন" আমার এই বাক্যের প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছিলাম।

(৪) আমার যে চতুর্থ উক্তিটি চন্দ মহাশয় প্রতিবাদযোগ্য মনে করিয়াছেন, তাহার সবটা উদ্ধৃত না করিলে আমার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না বলিয়া এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রাবণের প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম, "আর একটি ভুল ধারণা এই যে, রামমোহন রায় **একমাত্র** ডিগ্‌বী সাহেবের নিকট হইতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন ও য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হন। ডিগ্‌বী এই সময়ে রামমোহনের ইংরেজী লেখা কিছু কিছু মার্জ্জিত করিয়া দিতেন, এবং ডিগ্‌বীর নিকট হইতে ইংলণ্ডে প্রকাশিত পত্রিকাদি লইয়া রামমোহন রায় পাঠ করিতেন, ইহা সত্য। কিন্তু ডিগ্‌বীর সহিত রামমোহন রায়ের পরিচয় ঘটে ১৮০৫ সালে। দেখা যায়, তাহার পূর্ব্বেই রামমোহন স্বীয় 'তুহ্‌ফৎ' গ্রন্থে (Tuhfat-ul Muwahhidin, ১৮০৩ কিংবা ১৮০৪ সালে প্রকাশিত) ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃবর্গের চিন্তার সহিত পরিচিত। এত বিষয়ের জ্ঞান কখনও একটি বিশিষ্ট জ্ঞানকেন্দ্রের সহিত যোগ না থাকিলে লাভ করা সম্ভব নহে।"

চন্দ মহাশয় বিস্তারিত ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে (১) ১৮০১ সালে রামমোহন 'সামান্য ইংরেজী জানিতেন", "শুদ্ধ করিয়া ইংরেজী লিখিতে পারিতেন না"; (২) ১৮০৯ হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত রংপুরে "মনোযোগের সহিত সরকারী চিঠিপত্র পড়িয়া" এবং অন্যান্য নানা উপায়ে রামমোহন রায় "ভাল করিয়া ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন।" (৩) ১৮২০ সালে রামমোহন রায় নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "no sooner acquired a tolerable knowledge of English, than he made his desertion of idol worship known to the Christian world by his English publication." এইরূপে চন্দ মহাশয় রামমোহন রায়ের ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিবার, আয়ত্ত করিবার ও ক্রমশঃ উহাতে ব্যুৎপন্ন হইবার ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন। ইহার এক বর্ণের সহিতও আমার উক্তির বিরোধ নাই। আমি বলিয়াছিলাম, **একমাত্র** ডিগ্‌বীর নিকটে রামমোহন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন, এই ধারণাটি ভুল।

এমন কি, আমার বিশ্বাস এই যে **প্রধানতঃ** ডিগ্‌বীর সাহায্যে রামমোহন ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এ ধারণাও ভিত্তিহীন। উপরের প্যারাগ্রাফের (২) চিহ্নিত স্থানটি চন্দ মহাশয়ের প্রবন্ধের যে অংশ হইতে গৃহীত, সেখানে চন্দ মহাশয় "ডিগ্‌বীর সরকারী চিঠিপত্র" বলেন নাই বটে। কিন্তু স্বয়ং ডিগ্‌বী সাহেব তাহা বলিয়াছিলেন। ১৮১৭ সালে ডিগ্‌বী লিখিয়াছিলেন,

"আমার সরকারী চিঠিপত্র পড়িয়া" (by perusing all my public correspondence) রামমোহন রায় নিজের ইংরেজী ভাবাজ্ঞান বিশুদ্ধ করিয়া লন। ইহাতে রামমোহনের ইংরেজী ভাষা মার্জ্জিত করিয়া দেওয়া বিষয়ে ডিগ্‌বী নিজের সাহায্যকে একটু অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। ডিগ্‌বীর সঙ্গে রংপুরে যাইবার পূর্ব্বে, এবং ডিগ্‌বীর সঙ্গে আলাপ হইবারও পূর্ব্বে, রামমোহনের ইংরেজী জ্ঞান কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। শুদ্ধরূপে লিখিতে ও বলিতে না পারিলেও যে সেই ভাষায় লিখিত বই পড়িয়া বুঝিতে পারা যায়, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাইতেছি। রামমোহন রায়ের বাংলা জীবনচরিতের যে সকল সংস্করণ আমরা বাল্যকালে পাঠ করিতাম, তাহাতে ডিগ্‌বীর ঐ বাক্যের উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহাকে আরও অধিক প্রাধান্য দান করা হইত; রামমোহনের ইংরেজী শিক্ষার গুরু তাঁহাকেই বলা হইত।

(৫) চন্দ মহাশয় বলিতেছেন, "'তুফাৎ' রচনার সময় (১৮০৩ বা ১৮০৪ সালে) ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতৃবর্গের রচনার মূল দূরে থাকুক, ইংরেজী অনুবাদ বা ইংরেজী সার সঙ্কলন বুঝিবার মত ইংরেজী ভাবাজ্ঞান রামমোহন রায়ের ছিল না। তবে তাঁহার সম্বল কি ছিল? তাঁহার সম্বল ছিল আশ্চর্য্য প্রতিভা, অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, অসাধারণ মৌলিক চিন্তাশক্তি।...তুফাতে ব্যাখ্যাত ধর্ম্মমত রামমোহন রায়ের নিজের উদ্ভাবিত।"

এ বিষয়ে আমার দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, ১৮০৩ বা ১৮০৪ সালে ইংরেজী ভাষায় লেখা কোন বই "বুঝিবার মত ইংরেজী ভাবাজ্ঞান রামমোহন রায়ের ছিল না,"—এ মত আমি বিনা প্রমাণে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তখন রামমোহনের বয়স ৩০ পার হইয়া গিয়াছে। তিনি তখনই অনেক-গুলি ভাষা জানেন। তিনি ইংরেজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন ১৭৯৬ সালে। ঐ ভাষা "বুঝিবার মত" ভাবে আয়ত্ত করিতে তাঁহার তখন আরও অধিক বৎসর লাগিবার কথা নয়। তার পর, উপরে উদ্ধৃত (৩) চিহ্নিত স্থানের "tolerable knowledge of English" কথাগুলি যে রামমোহন বিনয়প্রকাশসূত্রে বলিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইলে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। চন্দ মহাশয়ের ন্যায় উহার অর্থ "ইংরেজী ভাষায় চলনসহি জ্ঞান" না বলিয়া, "চলনসহি ইংরেজী লিখিবার শক্তি" বলিলেই ঠিক হয়। আশা করি চন্দ মহাশয় বলিবেন না যে রামমোহন রায়ের প্রথম English publicationএর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮১৬ সালের পূর্ব্বে তাঁহার ইংরেজী পড়িয়া বুঝিবার শক্তিও চলনসহি হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, রামমোহন রায়ের তৎকালীন ধর্ম্মমত তুহ্‌ফৎ গ্রন্থে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যে তাঁহার নিজেরই উদ্ভাবিত, ইহাতে আমারও সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ঐ গ্রন্থে ভল্‌টেয়ার ও ভল্‌নির অনুরূপ ভাবে মানবমণ্ডলীকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ঐ গ্রন্থের প্রসঙ্গে (তাঁহার 'Rammohun, the Universal Man' বক্তৃতায়) বলিয়াছেন, "When he was about 30 years of age, he seems to have studied the writings of the Rationalists and Free-thinkers, certainly the Muwahhidins, the Sufis and the Mutazilas, and, perhaps, also the speculations of Hume, Voltaire and Volney.…He divides mankind, in Voltaire's (and Volney's) fashion, into four classes,—those who deceive, those who are deceived, those who both deceive and are deceived, and those who are neither deceivers nor deceived." রামমোহনের সমসাময়িক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রথম প্রচারিত মানবমণ্ডলীর এই শ্রেণীবিভাগটি রামমোহন নিজের প্রতিভাবলে ভারতবর্ষে বসিয়াই পুনরুদ্ভাবন করিয়া স্বীয় গ্রন্থে সেই সময়েই প্রকাশ করিয়াছিলেন,—চন্দ মহাশয় এরূপ বলিলে কেহই তাঁহার সে উক্তির প্রমাণ অথবা খণ্ডন কিছুই করিতে পারিবে না। কিন্তু আমার সান্ত্বনা থাকিবে যে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ন্যায় এক জন জ্ঞানী পণ্ডিতের সঙ্গে আমি এই মত পোষণ করিতেছি।

আর কয়েকটি ছোট ছোট কথা বলিয়া আমার কৈফিয়ৎ শেষ করি। (১) সমসাময়িক মানুষের উক্তিও অন্যের সাক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা না করিয়া নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না; উইলিয়ম এডামের একটি উক্তির ভুল তো স্বয়ং চন্দ মহাশয়ই ধরিয়া দিয়াছেন (৬৭১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে)। (২) রামমোহন রায়ের তিব্বত ভ্রমণ সম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করি নাই। (৩) শিবপ্রসাদ মিশ্রকে রামমোহন কাশী হইতে 'আনয়ন' করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে আমিও ইচ্ছুক; কিন্তু প্রমাণ পাইলে সুখী হইব। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র 'সমভিব্যাহারী' শব্দে কেবল সাহচর্য্য সূচিত করে; সঙ্গে 'আনয়ন' সূচিত করে না।

২রা ভাদ্র, ১৩৩৫

গণপতি ও কলাবধূ

শ্রীমনোরঞ্জন রায় কাব্য-পুরাণতীর্থ

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে বিবিধ প্রসঙ্গের "শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ললিতকলা-প্রদর্শনী" মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে—"ভারতবর্ষীয় পুরাণ অনুসারে গণেশ গণের অধিপতি ও সিদ্ধিদাতা। তাঁহাকে ঠিক্ কি অর্থে ও কারণে শাস্ত্রে গণপতি বলা হইয়াছে, জানি না। তাঁহার বধূকে কলাবধূ বলা হইয়াছে।" ইত্যাদি

গণের অধিপতি বলিয়া গণেশের এক নাম গণপতি। 'গণ' এই শব্দটির যতগুলি প্রতিশব্দ পাওয়া যায় তাহার ভিতর সৈন্য একটি। ২৭টি হস্তী, ২৭খানা রথ, ৮১টি অশ্ব এবং ১৩৫ জন পদাতি লইয়া একটি গণ গঠিত হয়। গণেশ যে এক জন যোদ্ধা

ছিলেন এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধে পিছপা হইতেন না তাহার আভাস আমরা ইহার ধ্যানের তৃতীয় লাইনে পাই, যথা,—"দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরম্"।

শাস্ত্রে কোন স্থানে যে কলাবধূকে গণেশের স্ত্রী বলা হইয়াছে ইহা আমাদের জানা নাই। সাধারণতঃ অশিক্ষিত অথবা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকেরাই কলাবধূকে গণেশের স্ত্রী বলিয়া থাকে।

কলাবধূ নবপত্রিকার নামান্তর। কদলী, হরিদ্রা, ধান্য, কচু, মানক, জয়ন্তী, দাড়িম, অশোক এবং বিল্ব এই নয় প্রকার বৃক্ষ একত্র সূত্রবদ্ধ করিয়া বস্ত্রালঙ্কার এবং সিন্দুরশোভিত করিয়া সপ্তমী পূজার দিন গৃহপ্রবেশ করান হয়। দুর্গাকে এই নয় প্রকার বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (ভিন্ন ভিন্ন নামে) কল্পনা করিয়া পূজা করা হয়; এই জন্য ইহাকে নবদুর্গাও বলা হয়। কদলীর ব্রহ্মাণী নামে, হরিদ্রার দুর্গা নামে, ধান্যের লক্ষ্মী নামে, কচুর কালিকা নামে, মানকের চামুণ্ডা নামে, জয়ন্তীর কার্ত্তিকী নামে, দাড়িমের রক্তদন্তিকা নামে, অশোকের শোকরোহিতা নামে এবং বিল্বের শিবা নামে উক্ত বৃক্ষসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করা হইয়াছে।

—

"হাউস সিস্‌টেম"

চট্টগ্রাম হইতে মোলবী আবুল ফজল লিখিয়াছেন, শ্রাবণ মাসের বিবিধ প্রসঙ্গে "হাউস সিস্‌টেম" সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ভুল। তাঁহার কথা সম্বন্ধে বক্তব্য অনেক দৈনিক কাগজে তিনি দেখিতে পাইবেন।—প্রবাসীর সম্পাদক

হবু সম্বন্ধীয় গোয়েন্দাগিরি

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

[রেঙ্গুন য়ুনিভার্সিটিতে "বর্ম্মা এডুকেশন এক্সটেন্‌শন এসোসিয়েশন" নামক এক সমিতি আছে। এই সমিতি হইতে গন্থলোক নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। য়ুনিভার্সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল উ পে মাউঙ টিন্ এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। ব্রহ্মদেশের অনেক শিক্ষিত লোক এই পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গল্পাদি লিখিয়া থাকেন। 'তকশীল বৌন্‌চোয়ে' এই ছদ্মনামে এক রসিক লেখকও গন্থলোকে ছোট গল্প লিখেন। তাঁহার ভাষা হাস্যোদ্দীপক এবং গল্পের আখ্যানবস্তুও হাস্যজনক। নিম্নে যে গল্পটি দেওয়া দেওয়া হইতেছে তাহা বৌন্‌চোয়ের লিখিত গল্পের অনুবাদ গত জুলাই মাসের গন্থলোকে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুবাদে বৌন্‌চোয়ের ভাষার রসিকতা সংরক্ষণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান ছোটগল্প-সাহিত্যের একটি নমুনা হিসাবে ইহা বঙ্গীয় বন্ধুগণের নিকট পাঠাইতেছি।

রেঙ্গুনের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে সাহিত্যিক চিন্তাধারার সংস্পর্শ সম্পাদনের জন্য বাংলা ও বর্ম্মাভাষার উৎকৃষ্ট গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থাদি অপরাপরের ভাষায় অনূদিত করিয়া প্রকাশ করা ব্রহ্মদেশের বাঙালীদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এই উপদেশ পালন করিতে হইলে, যেরূপ পরিশ্রমী ও পণ্ডিত লোকের প্রয়োজন, সেরূপ লোক আমাদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। তথাপি সম্মিলনের এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই বৌন্‌চোয়ের লিখিত পূর্ব্বোক্ত গল্পটির অনুবাদ দেওয়া হইতেছে।]

সুগন্ধি এঞ্জোরা মাখিবার সামর্থ্য নাই; নারিকেল তৈলের সহিত জল মিশাইয়া বোকে-ফ্যাশনে (১) ছাঁটা অবাধ্য চুলগুলিকে বাঁশের চিরুণী দ্বারা যথাসাধ্য সোজা করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গায়ের জামাটি রেশমী, কিন্তু বয়সের দোষে ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মান্‌ডালে লোংজিখানি চার কিস্তি (২) পরার পর এখন প্রায় বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিট কিনিয়া মং বাটো প্রোম যাইবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

দিনের বেলায় এ গাড়ীতে লোক বেশী হয় না। বড় একটি চুরুট ধরাইয়া, চারি দিকের মুক্ত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চিত্ত কিঞ্চিৎ স্থির হইলে, পার্শ্বের শান-ব্যাগটিকে

---

(১) রেঙ্গুন কলেজের ছেলেরা বোকে-ফ্যাশনে চুল ছাঁটায়। চুল কাটিবার কৌশলে মাথাটিকে একটি বোকে বা ফুলের তোড়ার ন্যায় দেখায়।

(২) এক এক খানি লুঙ্গি এক এক কিস্তিতে ৪।৫ মাস কাল প্রত্যহ পরিয়া ধোপাবাড়ী দিতে হয়। ৪ কিস্তিতে ১৬ মাস বা ২০ মাস হইবে।

মাথার নীচে রাখিয়া, গাড়ীর বেঞ্চের উপর মং বাটো পা ছড়াইয়া শুইল।

মং বাটোর বাপ-মা নাই; এক খুড়া—তিনিও আছেন কি নাই। এই অবস্থায় মং বাটো বি-এ পাস করিয়া এখন "চাকুরী চাই" তালিকায় নাম লিখাইয়া, রেঙ্গুনের নানা আফিসে যাতায়াত করিতেছে।

রেল-লাইনের দুই পার্শ্বে জঙ্গলপূর্ণ ছোট ছোট গ্রাম। তাহারই মধ্যে একটি গ্রামে এক ভূস্বামীর কন্যার সহিত মং বাটোর বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। কন্যা-পক্ষের গুরুজনদিগের অনুমতি পাইয়া, খুড়া মহাশয়ের সুপারিশসহ মং বাটো তাহার ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে সশরীরে সাক্ষাৎ দিবার ও পাইবার জন্য রেঙ্গুন হইতে যাত্রা করিয়াছিল।

বেঞ্চের উপর শুইয়া, রেলগাড়ীর ঝাঁকানিতে বাটোর কল্পনাশক্তি ক্রমে সজীব হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—

দুই হাজার টাকা নগদ! তার উপর চল্লিশ একর ধানী জমি! ছোটখাট নয়! কিন্তু শুনেছি মেয়েটি নাকি কুৎসিত। তা হোক্; যৌতুকের টাকায় একখানি কলের লাঙ্গল কিনব; জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য বিলাত থেকে ফার্টিলাইজার আনব; পৃথিবীর একেবারে অন্তদেশে সুড়ঙ্গ কেটে লৌহ-নলের সাহায্যে বিশুদ্ধ কূপোদক সেচনের ব্যবস্থা করতে হবে; বৃষ্টির উপর নির্ভর করা হবে না! বহুৎ ধান হবে! কিন্তু চল্লিশ একর জমিতে তো পোষাবে না; নূতন জমি কিনতে হবে। একটা চা'লের কলেরও প্রয়োজন হবে! নিজের ধান নিজের কলে ভানতে হবে। সেই চা'ল বিদেশে— বরাবর বিদেশে রপ্তানি করব। ভারতবর্ষ নয়—সেখানে দাম কম; জাপান, জার্ম্মানী ও আমেরিকার সঙ্গে কারবার খুলতে হবে! ষ্টীল ব্রাদার্স আর বেশী কি? তার চেয়ে বড় কারবার ফাঁদতে হবে!

বিদেশের সব বড় বড় চা'লের কারবারী বাটোর সম্মুখে হাজির হইয়া গেল। বিনা পয়সায় মং বাটো খুব প্রকাণ্ড এক—এণ্ড কোং খুলিয়া বসিল।

২

গন্তব্য ষ্টেশনে পৌছিয়া, কেউ দেখে কি না দেখে এই ভাবে মং বাটো প্লাটফর্ম্মে নামিয়া দাঁড়াইল। হাতের শান-ব্যাগ হইতে পূর্ব্বের সেই অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটি মুখে গুঁজিয়া, শ্বশুরবাড়ী হইতে কেউ তাহাকে লইতে আসিয়াছে কিনা জানিবার জন্য প্লাটফর্ম্মে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল।

একটু পরেই আফিংখোরের ন্যায় ময়লা কাপড়-পরা, জাপানী রেশমের ময়লা এক গাউঙ্-বাউঙ্ (৩) মাথায়, পুরনো এক ফানা (৪) পায়ে, চাষাড়ে চেহারার এক বৃদ্ধ লোক মং বাটোর সম্মুখে প্রায় তাহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রেঙ্গুন থেকে আসা হয়েছে বুঝি? উ কো তেইনের বাড়ী থেকে? নাম মং বাটো নয় কি?

বাটো—অ—অ—আপনি? উ-টিন-ব'র বাড়ীর লোক বুঝি? আমাকে নিতে এসেছেন?

বৃদ্ধ—আমিই উ-টিন-ব। নিকটেই আমার বাড়ী। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে এসেছ বুঝি?

ভাবী শ্বশুরের চেহারা দেখিয়া মং বাটোর মনটা একটু দমিয়া গেল; কিন্তু ভাব গোপন করিয়া বাটো বলিল—অ—অ কিছু মনে করবেন না; আমি চিন্তে পারি নাই। হাঁ দ্বিতীয় শ্রেণীতেই এসেছি, তৃতীয় শ্রেণীতে বড় ভিড়।

রেলগাড়ী তখনও ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল। তৃতীয় শ্রেণীর যে গাড়ী হইতে মং বাটো নামিয়াছিল, সেই গাড়ীর দিকে নির্ব্বুদ্ধির মত দৃষ্টিপাত করিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—মালপত্র?

বাটো—মালপত্র কিছুই আনি নি, মাত্র এই ঝোলাটি সঙ্গে আছে। এখানে বেশী দিন থাকা হবে না। অনেক কাজ পড়ে আছে।

বাটো তখনও চাকুরীর উমেদার। সুতরাং কি কাজ

(৩) গাউঙ্-বাউঙ্ ব্রহ্মদেশীয় পুরুষদের ব্যবহৃত এক রকম রেশমী পাগ্ড়ী।

(৪) ফানা—ব্রহ্মদেশীয় চটিজুতা।

জিজ্ঞাসা করিলে "খুড়োর কারবারে সাহায্য করি" এই উত্তরটি সে পূর্ব্বেই তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধ সে-সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না।

"চল, ঘরে যাই", এই বলিয়া এক ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

৩

সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা। সম্মুখে সুদৃশ্য বাগান। তাহার মধ্যস্থলে লৌহের রেলিংযুক্ত ছোট একটি গোল পুকুর। পুকুরের পাড় লাল পাথরে বাঁধানো। চারি দিকে চারটি ঘাটে মার্ব্বল পাথরের পাটাতন। একটু দূরেই গৃহদেবতা বুদ্ধদেবের ছোট একটি সুন্দর মন্দির। অপর দিকে এক মোটর-গ্যারেজে চকচকে একখানি মোটর গাড়ী; তাহার পার্শ্বেই আস্তাবল; তাহাতে দুইটি সুস্থ বলিষ্ঠ ঘোড়া। যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই লক্ষ্মীশ্রী। অথচ এই রাজপ্রাসাদতুল্য গৃহের মালিক ঐ নোংরা কাপড়-পরা এক বৃদ্ধ!

ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে যেরূপ আদরযত্ন হয়, তাহার কোনই ত্রুটি হইল না। রাত্রির আহারাদির পর, বাড়ীর বৈঠকখানায় উ টিন ব, তাঁহার গৃহিণী, তাঁহার কন্যা ও তাঁহার একটি বয়স্যা মং বাটোর সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। উ টিন ব তখন বেশ ভাল কাপড়-জামা পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহিণীরও গায়ে হীরক ও পদ্মরাগের অলঙ্কার। গায়ে স্বদেশী পেহ্‌নির জামা, পরণে ব্যাঙ্কক্ থামিন্, হাতে সোনার চুড়ি। রং ফর্শা, যৌবনে যে সুন্দরী ছিলেন, তাহার যথেষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান।

রেঙ্গুনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিবরণ দিয়া মং বাটো তাহার বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিল। বৃদ্ধ ও তাঁহার স্ত্রী ভাবী জামাতার বিদ্যা ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন।

রাত্রি নয়টার পর, উ টিন্ ব ও তাঁহার স্ত্রী উপরের ঘরে শয়ন করিতে গেলেন। মং বাটোর সহিত বৃদ্ধের কন্যা ও তাহার বয়স্যার, রেঙ্গুন কলেজ, কলেজের ছাত্রী ও তাহাদিগের আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা হইল। মং বাটো বৃদ্ধের ধনসম্পত্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধানসূচক কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া ভাবী পত্নীর নিকট হইতে কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইল না। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, মং বাটো "আজ বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি", এই অজুহাতে ভাবী পত্নীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। বয়স্যা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাল থাকবেন তো?

বাটো সবিনয়ে উত্তর দিল—আপনাদের আদেশ পেলে থাকব বই কি?

বয়স্যা সহাস্যে বলিল—থাকলে, কাল আমরা আমাদের গোলাবাড়ীতে এক বন-ভাতের বন্দোবস্ত করব। সেখানে আমাদের বড় ভাইও উপস্থিত থাকবেন।

মং বাটো মাথা নোয়াইয়া বলিল—ধন্যবাদ।

মেয়ে দুইটি উচ্চহাস্যে বৈঠকখানা প্রতিধ্বনিত করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

মং বাটো দেখিল, ভাবী পত্নীর শরীর তাহার পিতার ন্যায় শক্তি ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক; বাক্য সরল, স্পষ্ট ও বিনীত; কিন্তু মাতার দৈহিক সৌন্দর্য্য সে কিছুই পায় নাই। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিরও কোনই যত্ন নাই—মুখে তানাখা নাই, গায়ে পাউডার নাই, ওষ্ঠে লিপ্-ষ্টিক নাই, কপালে "রুজ" নাই, কবরীতে একটি হীরকের ফুল ভিন্ন অঙ্গে কোনও অলঙ্কারও নাই। ইস্ত্রিহীন ঘোর নীলবর্ণের এক এন্‌জি আর পরনে এক ঘোর রক্তবর্ণের পুরাতন লোংজি! কথাবার্ত্তায় বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে হইল, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার ঝাঁজ পাওয়া গেল না।

৪

পরদিন প্রাতে প্রায় আটটার সময় মং বাটোর ঘুম ভাঙিল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া সে দেখিল উ টিন ব অশ্বারোহণে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন। অশ্ব ও আরোহী উভয়েই ঘর্ম্মাপ্লুত। নীচে নামিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিতে সাহস হইল না; বাটো বারান্দা হইতেই জিজ্ঞাসা করিল—অনেক দূর গিয়াছিলেন বুঝি? উ টিন ব সরল হাস্যে উত্তর দিলেন—বেশী নয়, ষোল-সতর মাইল।

প্রাতর্ভোজন শেষ হইলে, "রেঙ্গুনে কাজ আছে"

বলিয়া বৃদ্ধের নিকট মং বাটো বিদায় প্রার্থনা করিল। যাত্রাকালে মেয়েটির সঙ্গেও দেখা হইল। বাটো সিনেমার ধরণে তাহাকে, অভিবাদন করিয়া বলিল—আবার দেখা হবার সৌভাগ্য হবে কি?

মেয়েটি ঈষৎ হাস্য করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

৫

রেল-ষ্টেশনে গিয়া তৃতীয় শ্রেণীর যে কামরায় মং বাটো আসন গ্রহণ করিল, অন্য একটি যুবকও সেই কামরায় উঠিয়া বসিল—মং বাটোরই অতি নিকটে। রেলগাড়ীর যাত্রীদের যেমন হয়, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই উভয়ের ঘনিষ্ঠ আলাপ আরম্ভ হইল। যেন বহুকালের বন্ধু!

বাটো তাহার সহযাত্রীকে জানাইল সে বি-এ পাস করিয়া রেঙ্গুনে "বিজিনেস্" করিতেছে; ভাবী শ্বশুর ও ভাবী পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে এই গ্রামে আসিয়াছিল।

যুবক বলিল—আমিও পূর্ব্বে রেঙ্গুনে ছিলাম। অষ্টম মান পর্য্যন্ত ইংরেজী প'ড়ে এখন এক ধানের কারবারে অংশীদার হয়েছি। কিন্তু ভাল কথা? এ গ্রামে আপনার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিবে এমন লোক কে আছে? উ টিন ব বুঝি?

বাটো—হাঁ, তিনিই বটে।

যুবক—আম্মালে-বিয়া! (৫) উ টিন ব-র মেয়ে? এই জন্য আপনি এত দূর এসেছেন! মেয়েটির চেহারা যে অত্যন্তই বিশ্রী; তা'ছাড়া তার বাবারও বোধ হয় পয়সা নেই; অত্যন্তই কৃপণ লোক; ব্যবহারেও নিতান্তই অভদ্র ও জংলী। এখানে বিবাহ করলে সুবিধা হবে কি?

বাটো—তা' না হ'তে পারে; কিন্তু তিনি যৌতুক দিচ্ছেন দু-হাজার টাকা নগদ আর চল্লিশ একর জমি।

যুবক—ওরকম যৌতুক আপনি অনেক পাবেন। রেঙ্গুনের কন্যামহলে এখনও দুর্ভিক্ষ পড়ে নি। এ-বিবাহে আপনি সুখী হবেন তো?

বাটো—আম্মালে, মেয়েটি তো কাউ; চুম্বন না করতে পারি, (৬) নিশ্বাস নিয়ে প্রাণ বাঁচবে।

যুবক—তা বটে, তা বটে; কিন্তু এ-বিবাহে দাম্পত্য-সুখ হবে তো?

বাটো—দাম্পত্যসুখটা নিতান্তই নগণ্য বিষয়, বিয়া; সোশ্যাল ফিলজফিতে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এ স্ত্রীর সহিত সুখী না হ'তে পারি, কিছু দিন পরে পছন্দসই অন্য একটি প্রেয়সী সংগ্রহ করা যাবে। আইনে বাধা দিবে কি?

যুবক—না, না, তা তো দিবেই না। ভালই বুদ্ধি করেছেন। মেয়েটির চেহারা কেমন লাগল?

বাটো—নিতান্তই নৈরাশ্যজনক।

আলাপ আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। যুবকটি তাহার নোট-বুক হইতে এক টুক্‌রা কাগজ ছিঁড়িয়া চিঠি লিখিতে বসিল। রেলগাড়ী সম্মুখের ষ্টেশনে পৌঁছিলে, যুবকটি ঐ চিঠিখানি মং বাটোর হাতে দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া গেল।

পত্রে লেখা ছিল :—

"আমি উ টিন্ ব-র জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমার ভগ্নী সুন্দরী নহে; তাহাকে তুমি সৎচিত্তে বিবাহ করিবে কিনা তাহাই জানিবার জন্য তোমার সঙ্গে এক কামরায় বসিয়াছিলাম। বৃদ্ধ পিতা ও মাতা তোমার কৃত্রিম শিষ্টতায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তোমার মুখে যে কুৎসিত কথা শুনিলাম, তাহার পর আর অন্য কথার প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হইয়াছিল যে, গাড়ীতেই তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিই (আমি ছাত্র-জীবনে জুনিয়ার মিডল্‌ওয়েটদের চ্যাম্পিয়ান ছিলাম) কিন্তু উ কো তেইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহা হয় নাই। রেঙ্গুনে গিয়া তোমার খুড়াকে বলিও, কন্যাটি কুৎসিত বলিয়া তুমি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক।

"আর, একটা কথা বলিয়া দিই। কলেজে নীতি শিক্ষা হয় না; দুর্নীতির সমর্থনকারী ইংরেজী বিদ্যারই শিক্ষা দেওয়া হয়।"

মং বাটোর সোনার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। এ পৃথিবীতে আমরা সকলেই বাটোর মত এক এক আল্‌নাশার। হাজার হাজার আকাশকুসুমের বাগান সাজাইয়া এই আল্‌নাশারেরা আশার মৌতাতে বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

(৫) আম্মালে-বিয়া—ও মা গো।

(৬) বর্ম্মারা চুম্বন করিতে প্রিয়ের গণ্ডে নাসিকা রাখিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে, অধরোষ্ঠের স্পর্শ হয় না।

মুহূর্ত্ত ও যুগ

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

সুরপতির ভাগ্নীর বিবাহ। সুরপতি সগর্ব্বে সুন্দরী স্ত্রীর সহিত বন্ধুদের পরিচয় করাইয়া দিল।

নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত বাড়াইয়া বলিল, "ইনি শ্রীমতী, ইনি রঞ্জন বোস, ব্যারিষ্টার।"

রঞ্জন বোস ও মিনতি উভয়েই হাত তুলিয়া পরস্পরকে নমস্কার জানাইল।

এমনি করিয়া পরিচয়ের পালা চলিল; যোগীন ঘোষ, ইন্সিওরেন্স ম্যানেজার; হিমাংশু বাঁড়ুয্যে, ডাক্তার; রতন মুখুয্যে, লেখক। সকলের শেষে সুরপতি কহিল, "ইনি অবনীশ সরকার, এক কালে বিখ্যাত খেলোয়াড়, এখন বিখ্যাত ব্যবসায়ী।"

মিনতি চোখ না তুলিয়াই স্মিতহাস্যে নমস্কার করিল, এবং চোখ তুলিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অবনীশ সরকারকে সহসা দেখিলে বয়স ত্রিশের বেশী মনে হয় না। কিন্তু আসলে সে ত্রিশের কোঠার শেষ প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার বয়স উনচল্লিশ। বাপের মৃত্যুর পর তাঁহার ব্যবসায়ের মোটা অংশের মালিক সে-ই, এবং সেই অনুপাতে যথেষ্ট টাকার মালিক। অত্যন্ত সুপুরুষ, কিন্তু যে-কারণেই হোক, বিবাহ সে করে নাই।

যে-বয়সে লোকে যুবক বলিয়া পরিচিত হয়, অবনীশ সে-বয়স বহু দিন ছাড়াইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের কোন লক্ষণই তাহার মুখে চোখে অথবা দেহে প্রকাশ পায় নাই। তেমনি ঘন চুল, শুধু কপালের দুই পাশ দিয়া একটু একটু উঠিতে সুরু করিয়াছে।

তবু যাহারা তাহাকে সত্যকারের যৌবনে দেখিয়াছে, যখন তাহার যৌবন শুধু দেহে নয়, সমস্ত দেহমন পরিব্যাপ্ত করিয়া ছিল, যখন তাহার মনের সামনে ছিল অনাগত ভবিষ্যতের কূলহীন আকাঙ্ক্ষা, তাহারা জানিত, তাহার দেহের তারুণ্যের আবরণ দিয়া কোথায় যেন বার্দ্ধক্য উঁকি মারিতেছে, বাহির হইতে হউক না কেন তাহাকে ত্রিশ বৎসরের যুবকের মত দেখিতে।

বন্ধুরা বলিত অবনীশের বিবাহ করা অনেক দিন আগেই উচিত ছিল. অবশ্য কার্য্যগতিকে যখন হইয়া উঠে নাই, তখন সে-ত্রুটি এখনও শোধরাইয়া না লওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। কারণ বিবাহের বয়স অবনীশের মোটেই পার হইয়া যায় নাই, এবং সম্ভবতঃ শীঘ্র পার হইবেও না।

অবনীশ হাসিত।

কিন্তু বিবাহ সে কোন দিন করিবে না, কোনো দিনও না। পনর বছর আগে একটা অকিঞ্চিৎকর ঘটনা যদি না ঘটিত, তাহা হইলে অবনীশ নিশ্চয় এত দিন বিবাহ করিত, সে যাহাকেই হউক না কেন। কিন্তু বিবাহ করিতে হইলে নারীজাতির উপর যেটুকু শ্রদ্ধা থাকা একান্ত প্রয়োজন, তাহার এক কণাও অবনীশের অবশিষ্ট ছিল না।

মিনতিকে ঠিক তরুণী বলা চলে না। বাঙালীর মেয়ের পক্ষে চৌত্রিশ বৎসর বয়স মোটেই কম নহে, এবং তিনটি সন্তানের জননীর পক্ষে তো নহেই।

তবু মিনতি সুন্দরী রহিয়াছে। পনর বছর আগে যে-সৌন্দর্য্যে আলোক ও দাহ ছিল, এখন তাহাতে শুধু আলোক রহিয়াছে। কিন্তু এখনও লোকে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হয়। সুরপতির পত্নীগর্ব্বে গর্ব্বিত হওয়ার কারণ রহিয়াছে।

সুরপতির বয়স বিয়াল্লিশ, এবং তাহাকে দেখিলেও ঠিক বিয়াল্লিশ বলিয়াই মনে হয়। চল্লিশের ঘরে আসিয়া সুরপতি বেশ একটু স্থূলকায় হইয়াছে, মাথার মাঝখানে খুব বেশী চুলের অস্তিত্বও আর নাই। কিন্তু সুরপতি

তাহাতে দুঃখিত নহে; সে জানে যৌবন চিরকাল থাকে না, এবং যাহা চলিয়া যাইবেই, তাহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখার চেষ্টার মত মূঢ়তা আর নাই। সকলেই কিছু আর অবনীশ নহে।

মিনতির বড় ছেলেটির বয়স তেরো, তাহার পর একটি মেয়ে, নয়। সকলের ছোট একটি ছেলে, যাহার বয়স মাত্র তিন হইলেও বাড়ীর প্রকৃত মালিক সে-ই, মা বাবা ও অন্যান্য সকলে তাহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য মাত্র।

ইহাদের লইয়াই মিনতির সংসার, এবং অত্যন্ত সুখের সংসার। চরিত্রবান্ বিত্তশালী স্বামী, ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি।

দক্ষিণ-কলিকাতার এক প্রান্তে সুরপতির বাড়ী। খানিকটা বাগান লইয়া ছোট একখানি বাংলো বাড়ী, শুধু অর্থ নয়, রুচিরও পরিচায়ক। এত ফুল, এত আলো-হাওয়া, এমন মধুর নিস্তব্ধতা, কলিকাতার কয়টি বাড়ীতে আছে? বাড়ীকে মিনতি ভালবাসে স্বামী ও ছেলে-মেয়েদের পরেই।

বেলা দশটার সময় গাড়ী লইয়া স্বামী আপিসে যান, বড় ছেলে ও মেয়ে সেই গাড়ীতেই স্কুলে যায়। সাড়ে চারিটার সময় ছেলেমেয়ে চাকরের সহিত স্কুল হইতে ফিরিয়া আসে; মাঝের কয়েক ঘণ্টা মিনতির অখণ্ড অবসর। সেই সময়টুকু ছোট ছেলে মিণ্টুর খবরদারি করিয়াই তাহার সময় কাটে, কারণ মিণ্টু জানে, মা যখন তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য এত বেশী চেষ্টা করিতেছে, তখন নিঃসন্দেহ জাগিয়া থাকিতেই মজা বেশী এবং তাহার বয়স যখন তিন বছর হইয়াছে, তখন সমস্ত ক্ষণ মায়ের আঁচলের আড়ালে থাকার মত ছোট সে আর নাই। শুধু মা এই সোজা কথাটা বুঝিতে পারে না, ইহাই মিণ্টুর দুঃখ।

মিনতির কাজ আবার আরম্ভ হয় ছেলেমেয়ে ও সুরপতি ফিরিয়া আসিলে। মেয়েরা যাহা চাহিয়া থাকে তাহার কিছুরই অভাব মিনতির নাই।

শুধু গভীর রাত্রিতে যখন বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়ে, জনবিরল শহরতলী যখন ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হইয়া যায়, তখন দূরের ট্রেনের শব্দের সহিত কি যেন মিনতির মনে পড়ে, মিনতির চোখে ঘুম আসে না।

পনর বছর আগের কথা; মিনতির বয়স তখন উনিশ।

মিনতির বাবা ব্রজরঞ্জনবাবু একটু খেয়ালী মানুষ ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কলিকাতায় আর তাঁহার মন টিকিল না। যেখানে জনতার কোলাহল, সেখানে তাঁহার থাকা চলিবে না, তাই মেয়েকে লইয়া সাঁওতাল-পরগণার একটি নগণ্য গ্রামে তিনি স্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধিলেন।

তাঁহার একবারও মনে হইল না যে, জনকোলাহল তাঁহার অসহ্য হইলেও হয়তো মিনতির কাছে জনশূন্যতার কষ্টই বেশী অসহ্য হইবে। হয়তো কলিকাতার কলেজের সমবয়সী মেয়েদের অভাব এই নীরব নিস্তব্ধ নিদ্রিত গ্রামে সে আরও কঠিন ভাবে বুঝিবে।

অথচ ব্রজরঞ্জন ঠিক স্বার্থপর লোক নহেন। মেয়েকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কিন্তু যাহাতে তাঁহার নিজের অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধা বেশী হইতেছে, সেই জিনিষটাতেই অন্য কাহারও অসুবিধা হইতে পারে, এমন ধারণা ছিল তাঁহার সংকীর্ণ মনের অগোচর।

মিনতিকে তিনি স্নেহ করিতেন, কিন্তু স্নেহের আতিশয্য প্রকাশ পছন্দ করিতেন না। মিনতি তাঁহাকে ভক্তি করিত, ভালবাসিত, কিন্তু সেই সঙ্গে রাশভারী পিতাকে ভয় করিত, যে ভয় পঞ্চাশ বছরের বাপ ও উনিশ বছরের মেয়ের মধ্যে উপস্থিত থাকা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।

মায়ের মৃত্যুতে মিনতি ব্রজরঞ্জনের চেয়ে কম ব্যথিত হয় নাই, কিন্তু সে-ব্যথার উপশমের জন্য অনির্দ্দিষ্ট কাল অজ্ঞাতবাসে যাওয়ার প্রয়োজনও সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু বাপের ইচ্ছার প্রতিবাদ করা মিনতির পক্ষে সম্ভব নয়, সে ব্রজরঞ্জনকে ভক্তি যতটা করিত, নিঃসন্দেহ তাহার চেয়ে ভয় করিত বেশী।

কিন্তু নির্জ্জনবাসের যে-আশঙ্কা মনে লইয়া মিনতি কিষণপুরে আসিয়াছিল, প্রথম-দর্শনেই তাহার সে-ভয়টা

কাটিয়া গেল। এখানকার অধিবাসীরা নিকষ-কালো সাঁওতাল পুরুষ ও রমণী, কালো পাথরে খোদাই-করা প্রতিমার মত তাহাদের দেহের গঠন। মেয়েরা প্রতি কথায় হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে, সমস্ত জীবনটাকে কঠোর পরিশ্রমের ভিতর দিয়াও তাহারা কলহাস্যের সহিত গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে; দিনের শেষে সযত্নরচিত খোঁপার মধ্যে একরাশ বনফুল গুঁজিয়া সঙ্গীদের বাঁশীর তানের সঙ্গে গান করিতে করিতে তাহারা বাড়ী ফিরে, মিনতি মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকে।

এক সৌখীন সাহেবের পরিত্যক্ত বাংলো তাহার বাবা কিনিয়া লইয়াছিলেন নামমাত্র মূল্যে, সেইখানেই মিনতির কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

ইহার মধ্যে সহসা এক দিন ব্রজরঞ্জন একখানি চিঠি লইয়া আসিয়া বলিলেন, "শোন, আমার এক বন্ধুর ছেলে অবনীশকে আসতে লিখেছিলাম, সে কাল আসছে। খেটে খেটে শরীর খারাপ ক'রে ফেলেছে, একটু খোলা বাতাসের মধ্যে থেকে শরীরটা সারিয়ে যাক্।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ব্রজরঞ্জন চলিয়া গেলেন।

মিনতি একটু অবাক্ হইল। ব্রজরঞ্জনের বন্ধুবান্ধব কাহাকেও সে কোন দিন দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না, হয়তো খুব বেশী ছিলও না কোন দিন। তবে এটুকু সে বুঝিল, নির্জ্জনবাসে তাহার বাবার একটু অপ্রবৃত্তি ধরিয়াছে, কিন্তু শহরে ফিরিয়া এক কথায় পরাজয়স্বীকার তিনি করিতে রাজী নহেন।

অবনীশ কে? বয়স কত? শরীর খারাপ হইলে এত জায়গা থাকিতে কিষণপুরে আসিবার প্রয়োজন কি ছিল? এর চেয়ে বাবা যদি সমবয়সী কোন মেয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার লইতেন, মিনতি একটু কথা বলিয়া বাঁচিত। সাঁওতাল তরুণীরা তাহার কথা বোঝে না, সেও তাহাদের কথা বোঝে না, শুধু রুমণী নদীর প্রস্তর-শয্যার উপরের কলধ্বনির মত হাস্যকল্লোলের ভাষায় তাহারা ভাবের আদান-প্রদান করে, কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু বেশ লাগে।

মিনতিদের বাড়ী হইতে রেল-লাইন প্রায় এক মাইল, ও ষ্টেশন মাইল-তিনেক দূরে। রাত্রে শুধু আকাশ দিয়া ট্রেনের শব্দ কানে আসিয়া পৌছায়, দিনের বেলা অন্যমনস্ক থাকিলে শোনা যায় না। তাই নির্দ্দিষ্ট সময়ে অবনীশ আসিয়া যখন পৌছিল, তাহার আগমনবার্ত্তা আগে আগে কেহ মিনতিকে দিয়া গেল না। সে হঠাৎ আসিয়া মিনতির চোখের সামনে উদয় হইল।

এত সুন্দর চেহারার যুবক মিনতি খুব কমই দেখিয়াছিল। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স, গায়ের রং খুব ফর্সা নহে, কিন্তু মুখের ও দেহের গঠন যেন গ্রীক-ভাস্কর্য্যের দেবতার মত। মিনতির আদর্শ সাঁওতাল যুবকের দল সহসা এই নবাগতের সামনে খর্ব্ব হইয়া পড়িল।

মিনতি কথা বলিবার লোকের অভাবে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, সহসা অবনীশকে পাইয়া বাঁচিয়া গেল। এবং কয়েক দিনের মধ্যে এ বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না কেন এত লোক থাকিতে ব্রজরঞ্জনের মনে অবনীশের শরীর সারাইবার কথা উঠিল, এবং এত জায়গা থাকিতে অবনীশ কেন সাঁওতাল-পরগণার এই জনশূন্য শুষ্ক সুপ্ত পল্লীতে আসিয়া আশ্রয় লইল।

শরীর যে তাহার এক বিন্দুও খারাপ হয় নাই, তাহা বুঝিতে মিনতির এক মুহূর্ত্তও লাগে নাই। কিন্তু নিজের মনের মধ্যে খুঁজিয়া এই অপরিচিত লোকটির আকস্মিক আগমনে কণামাত্রও বিরক্তির চিহ্ন খুঁজিয়া পায় নাই।

এক জনের বয়স চব্বিশ, আর এক জনের বয়স উনিশ। যদি কিছুর অভাব থাকিতে পারিত, সাঁওতাল-পরগণার বন্ধুর দেহ, বিরাট শালবন, বালুকাপূর্ণ তীর রুমণী নদীর অগভীর জলের উপর শুক্লপক্ষের চাঁদ, সকলে মিলিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া দিল।

ব্রজরঞ্জন তাঁহার অতিথির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই, এবং তাহাতে বোধ হয় অতিথি অথবা মিনতি, কাহারও আপত্তির কোন কারণ ছিল না।

শুক্লপক্ষের নির্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। বাড়ীর দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসিয়া অবনীশ চারি দিকে চোখ মেলিয়া একবার নৈশ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিয়া লইল; তাহার পরে মৃদু হাসিয়া বলিল,

"এমনি নিশীথকালে,
বাতাস যখন বনানী-সখীরে স্পর্শিল মৃদুকরে,
প্রেম-চুম্বন দিতে ;
এমনি নিশীথ রাতে,
বুঝি ট্রয়লাস্ দাঁড়াইয়া একা ট্রয়-নগরীর উচ্চ প্রাচীর 'পরে,
গ্রীক শিবিরের পানে চাহি শোকে ফেলিল দীর্ঘশ্বাস,
ক্রেসিডা ঘুমায় যেথা !"

মিনতির মুখ চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল দেখাইল। কহিল, "বুঝেছি, লোরেঞ্জো আর জেসিকা। ঠিক কি না ?"

"ঠিক।"

কথার চেয়ে যে স্তব্ধতা অনেক বেশী মুখর, সেই স্তব্ধতায় আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিল। অবনীশ অথবা মিনতি, কেহ কথা কহিল না।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। দূরে সাঁওতাল-পল্লীর বাঁশীর আওয়াজ থামিয়া গেল, সামনের পথ দিয়া যে দুই-এক জন লোক যাওয়া-আসা করিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইল। দুই জনের মনের মৌন ভাষায় বাতাস মুখর হইয়া উঠিল।

ব্রজরঞ্জন যখন বারাণ্ডায় আসিলেন, তখন মিনতির মাথা অবনীশের কাঁধের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে, অবনীশ মিনতির মুক্ত কবরীর মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতেছে।

ব্রজরঞ্জনের ক্রুদ্ধ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই মিনতির চমক ভাঙিল, সে ত্রস্ত অবনীশের আলিঙ্গন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া অসংলগ্নভাবে যে-কয়টি কথা বলিল, ব্রজরঞ্জন তাহার অর্থ যাহা করিলেন, তাহার পরে অবনীশের আর থাকা চলে না।

ব্রজরঞ্জন অত্যন্ত শান্তভাবে বলিলেন, "তুমি জগদীশের ছেলে, তুমি যে ঠিক এ-রকম হবে, আমি এক বারও ভাবি নি। যাক, আমারই ভুল। সাড়ে দশটার সময় কলকাতার গাড়ী আছে, তুমি জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও।" কথা কয়টি বলিয়াই ব্রজরঞ্জন ঘরে চলিয়া গেলেন।

অবনীশ একটিও কথা বলিল না ; ধীরে ধীরে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া জিনিষপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল।

শুধু মিনতি চিত্রার্পিতের মত সেইখানেই বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন মনে থাকিবার পর সমস্ত ঘটনাটা যখন পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিল, তখন তাহার দেহমনের সমস্ত শক্তি লোপ পাইয়াছে।

মুহূর্তের মধ্যে কি হইয়া গেল! ব্রজরঞ্জনকে সে ভীতির চক্ষে দেখে, কিন্তু সেই জন্য এক মুহূর্তের দুর্ব্বলতায় সে কি করিয়া ফেলিল ? এমনধারা হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল ?

ষ্টেশন হইতে বাড়ী প্রায় মাইলখানেক দূরে। দশটার সময় অবনীশ একটি সুটকেস হাতে লইয়া লাল কাঁকড়ের রাস্তা দিয়া গেট পার হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, একবারও পিছন ফিরিয়া চাহিল না। কেনই বা চাহিবে ?

সাড়ে দশটার ট্রেন যখন গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কলিকাতার দিকে চলিয়া গেল, মিনতি দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিল।

ঠিক এক বৎসর পরে মিনতির বিবাহ হইয়া গেল, সুরপতির সঙ্গে, যথোচিত ধুমধামের সহিত। সুরপতি শুভদৃষ্টির সময় বধূর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল—বধূ কিন্তু চোখ তুলিয়া চাহিল না।

তাহার পরে অনেক দিন কাটিয়াছে। মিনতি এখন আর উনিশ বছরের ব্রীড়াবনতা তরুণী নয়, সে এখন তিনটি সন্তানের জননী, বাড়ীর গৃহিণী। অবশ্য চৌত্রিশ বছর বয়সেও রূপসী, স্বামীপ্রেমে সৌভাগ্যবতী।

শুধু গভীর রাত্রে যখন ঘুম আসে, বহু দিন আগের এক মুহূর্তের একটি দুর্ঘটনা মনে পড়িয়া অরুন্তুদ বেদনায় সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠে, বিছানা ছাড়িয়া সে রাত্রির অন্ধকারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

যদি একবারও অবনীশের দেখা পাইত, তাহাকে বলিত, "ওগো, তুমি আমাকে যতটা নীচ, যতটা হীন

মনে করিয়াছ, আমি তাহা নই, আমার এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার অপরাধে চিরদিনের জন্ম তোমার মনের কক্ষকে আমাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিও না; যে-ব্যথা তোমাকে দিয়াছি, তাহার শতগুণ বেদনা আমি চিরদিন ধরিয়া ভোগ করিতেছি, হয়তো মৃত্যুর আগে সে বেদনার বিরাম নাই। আমার ভীরুতার এ অপরাধ তুমি ক্ষমা করিও।"

আবার মনে হয়, ক্ষমা চাহিবার কি অধিকার তাহার আছে? ক্ষমার প্রয়োজনই বা তাহার কি আছে? ক্ষমা সে লইবেই বা কেন? সে শুধু বলিবে, "আমাকে ঘৃণা কর, ক্ষতি নাই, তোমার মনের মহত্ত্ব দেখাইয়া আমাকে মার্জ্জনা করিও না। আমার বুকের অনির্ব্বাণ অগ্নি তাহাতে ম্লান হইবে না।"

কিন্তু অবনীশের সহিত এত দিন দেখা হয় নাই, হয়তো এ জীবনে আর হইবে না। তাহার অপরাধ স্বীকার, ক্ষমা করিবার অনুরোধ, ও ক্ষমা না করিবার অনুরোধ, সবই হয়তো অবাস্তব কল্পনায় রহিয়া যাইবে।

হয়তো অবনীশ তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। প্রেমাস্পদার একটি দিনের ব্যবহারে হয়তো তাহার জীবন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, হয়তো মিনতির জন্ম তাহার মনের ভাণ্ডারে অপরিসীম ঘৃণা ও তিক্ততা ভিন্ন আর কিছুই নাই!

সেও কি অবনীশকে ভালবাসিয়াছিল? মনের ভিতর হাতড়াইয়া কোন উত্তরের উদ্দেশ মিলিল না। হয়তো তাহার এই স্বামীপ্রেম, তাহার ছেলেমেয়েদের 'পরে এই অন্তহীন গভীরতম নিবিড়তম স্নেহ, তাহার এই নিজস্ব বাড়ী, বাগান, সমস্ত এক মিথ্যা কপট অভিনয়ের আড়ম্বর মাত্র। হয়তো তাহার অন্তরের নিভৃত কোণটি এখনও সেই অবনীশই অধিকার করিয়া রহিয়াছে, যে-অবনীশকে এক দিন তাহারই জন্ম অবমানিত অবনতমস্তকে তাহার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল বহু দূরে; যেখানে মিনতি নাই, প্রেম নাই, মান-অপমানের কোন অস্তিত্ব নাই, এমনি এক নিরুদ্দেশের যাত্রায়। মিনতির মনও সেই দিন হইতে যেন কোন্ নিরুদ্দেশের যাত্রায় চলিয়াছে, যেখানে সুরপতি, তাহার ছেলেমেয়ে, তাহার ঘরসংসার সব নিরর্থক, অস্তিত্বহীন। যে-যাত্রায় শুধু আছে অবনীশ, তাহারই একান্ততম, প্রথমতম অবনীশ।

মিনতি শিহরিয়া উঠে।• এ কি-সব কথা সে ভাবিতেছে? কে বলিল সে অবনীশকে কোনদিন ভালবাসিয়াছিল? না, না, তাহার জীবনে সুরপতি, তাহার ছেলেমেয়ে, ঘরসংসার, এই সবই বাস্তব; মিথ্যা কল্পনায় কেন সে নিজের মস্তিষ্ক ও মন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে?

মিনতি ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া পড়ে; ক্লান্ত দেহমনে নিদ্রা আসিয়া শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়।

পরদিন চায়ের টেবিলে সুরপতি স্ত্রীর চোখের নীচে বিনিদ্র রজনীর ছায়া দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠে, কিন্তু মিনতি সব কথা উড়াইয়া দেয়। এমন কি শরীর যে অসুস্থ, তাহা পর্য্যন্ত স্বীকার করে না।

এত দিন পরে সে অবনীশের সাক্ষাৎ পাইয়াছে; কল্পনায় নহে, বাস্তবে।

অস্বস্তির ভাব কাটাইয়া লইতে মিনতির বেশীক্ষণ লাগিল না, একটু চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, 'কিন্তু ওঁর মুখে তো আপনার কথা শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না!"

অবনীশ হাসিয়া বলিল, "শোনার কথা নয়, মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ আমার খুব বেশী দিনের নয়; তবে ওঁর যতটুকু দেখেছি, তাতে ওঁকে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ব'লে মেনে নিতেও আমার আপত্তি নেই।"

মিনতিও হাসিল। কহিল, "তাছাড়া যতটুকু সময় উনি জেগে থাকেন, বাড়ীর বাইরে থাকেন; আর যতটুকু সময় বাড়ীর ভিতরে থাকেন, ঘুমিয়ে থাকেন। কাজেই ওঁর কাছে আপনার কথা না-শোনা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়।"

সুরপতি কৃত্রিম কোপে কহিল, "ও, তোমার বুঝি বিশ্বাস, তোমার চেয়ে আমার কাছে আপিসের চেয়ার-টেবিল আর ফাইলের তাড়া বেশী প্রিয়? আচ্ছা, কাল থেকে ঘুমটাও আপিসেই সারব, শুধু না-হয় খাওয়ার সময়টা বাড়ী আসা যাবে।"

হাস্য-পরিহাসের মধ্যে রাত বেশী হয়। রাত বারোটার পরে সুরপতি ও মিনতি বাড়ী ফিরিয়া আসে।

কাপড় ছাড়িয়া শুইতে ও ঘুমাইতে সুরপতির বেশী ক্ষণ লাগিল না। স্ত্রীকে কহিল, "দেরি করছ কেন? শুয়ে পড়। রাত বাড়িয়ে লাভ কি?"

"লাভ কিছু নেই, তবে এত গোলমালের পরে ঘুম আসতে আমার দেরি হবে। আমি একটু বাইরে বসি।"

অন্ধকার রাত্রির শীতলতার আবেষ্টনে মিনতি বারাণ্ডায় আসিয়া রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

অবনীশ তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে! পরিচয়ের ক্ষীণতম রশ্মিও আর অবশিষ্ট নাই।

মিনতি নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, এই তো ভাল হইয়াছে! কবে কোন্ দূর অতীতে একটি প্রণয়-ভীরু তরুণী তাহার জীবনে কি ঝড় আনিয়াছিল তাহা যদি সে ভুলিয়া গিয়া থাকে, তাহা তো ভালই! মিনতির শান্তিময় জীবন হইতে যদি সে বহু দূরে চলিয়া গিয়া বিস্মৃতির মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া থাকে, তাহাতে তো মিনতির নিশ্চিন্ত হওয়াই উচিত!

অশান্ত মনের মধ্যে কে যেন বলিল, "তুমি আপনাকে এত বড়, এত বিশিষ্ট করিয়া দেখিতেছিলে কেন? অবনীশের জীবনে তুমি একটি ক্ষুদ্রতম অধ্যায় মাত্র, তাহার জীবন হইতে এই কয় পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেও কিছু আসিয়া যায় না, অথবা রাখিয়া দিলেও কাহারও চোখে এমন কিছু বড় হইয়া দেখা দেয় না। তুমি অবনীশকে ভালবাসিয়াছিলে, আজও তাই তোমার সংসারের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার কথা ভাবিতেছ, একবার চোখের দেখা দিয়া সে তোমার নয়নের নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে। তুমি নিজের দোষে তাহাকে হারাইয়াছ, সত্যকারের প্রেম, যাহা মানুষের জীবনে বড় বেশী আসে না, তাহার অবমাননা করিয়াছ। কিন্তু অবনীশ তোমাকে ভুলিয়াছে; কেনই বা ভুলিবে না?"

সত্যই তো! অবনীশ কেন তাহাকে মনে রাখিবে?

কিন্তু যাহা পরম সান্ত্বনার বিষয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা চরম বেদনায় মিনতির হৃদয় ব্যথিত করিয়া তুলিল। অবনীশের জীবনে সত্যই কি সে এত ছোট, এত নগণ্য একটি অধ্যায় হইয়া আসিয়াছিল? তবে সেই একটি দিনের এমন অকিঞ্চিৎকর অপরাধে তাহার সমস্ত জীবন বিষময় হইয়া উঠিল কেন?

টালিগঞ্জের পুলের উপর দিয়া সশব্দে একখানি গাড়ী চলিয়া গিয়া মিনতির চমক ভাঙিয়া দিল। ঘড়িতে দুইটা বাজিয়াছে।

মিনতি ঘরে ফিরিয়া গেল। সুরপতি গভীরভাবে ঘুমাইতেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মিনতি শুইয়া পড়ে।

ঘুম আসে না।

অবনীশ বাড়ী ফিরিল রাত প্রায় একটার সময়।

কাপড় ছাড়িয়া অবনীশ একটি সিগারেট ধরাইয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে মৃদু হাসিল।

আশ্চর্য্য, মিনতি সেদিনকার ঘটনা কি এত নিশ্চিহ্ন ভাবে ভুলিয়া গিয়াছে! অবনীশকে সে চিনিতেও পারিল না।

অবনীশ কিন্তু মিনতিকে ঠিক চিনিয়াছে। পনর বছরের দীর্ঘ ব্যবধানেও মিনতির এমন কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই, যাহার জন্য সে মিনতিকে চিনিতে পারিবে না।

সে ভাবিয়া খুশী হইল যে মিনতি সুখে রহিয়াছে। সুরপতি লোকটি অতি চমৎকার, এমন লোকের গৃহিণী হওয়া নিঃসন্দেহ সৌভাগ্যের কথা।

অবশ্য মিনতির উপর একটা রাগ যদি তাহার থাকিয়া যাইত, তাহা হইলেও অস্বাভাবিক হইত না। সে নিজের মনের উদারতায় যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল।

তবু এক দিক্ দিয়া মিনতির নিকট তাহার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মেয়েদের সম্বন্ধে তাহার চোখ তো মিনতিই ফুটাইয়া দেয়, এই জ্ঞানাঞ্জনশলাকার জন্য সে মিনতিকে বহুবার ধন্যবাদ জানাইয়াছে।

সত্যই মিনতির উপর তাহার আর কোনো রাগ নাই। সেদিনকার ব্যাপারটা যে কত সামান্য তাহা মিনতির বিস্মৃতি হইতেই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। অতএব তাহার নিজেরও আর অস্বস্তি বোধ করার কোনো কারণ নাই।

মিনতি সুখে থাকুক, তাহার নিজের অটুট যৌবন, তাহার বিগতযৌবন স্বামী, তাহার ছেলেমেয়ে, ইহাদের লইয়া সে বাকী জীবনটা সুখেস্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিক, সে তাহার অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবন লইয়া বেশ আছে। সুরপতিকে সে একটুও ঈর্ষ্যা করে না।

অবনীশ আলো নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যে শিশুর মত পরম শান্তিতে গভীর সুনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

মিসেস টোমিকো ওয়াডাকোরা টোকিওর একজন বিশেষ সুশিক্ষিতা মহিলা। ইনি কিছু কাল পূর্ব্বে একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে যান তখন ইনি তাঁর এবং তাঁর দলের অন্যান্য বাঙালীদের অনেক সাহায্য করেছিলেন। টোকিওতে ইনি আমাকেও অনেক জিনিষ দেখিয়েছিলেন। যদি আমি ওখানে আরও কিছু দিন থাকতে পারতাম এবং অসুস্থ হয়ে না পড়তাম তাহলে হয়তো এঁর সাহায্যে টোকিও সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আরও অনেক বেশী হ'তে পারত। ২২শে ফেব্রুয়ারী মিসেস কোরা আমাকে কতকগুলি শিক্ষা-নিকেতন দেখাবেন বলেছিলেন। তিনি সকাল বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ আমাকে নিতে এলেন। বললেন, "এখানে মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজ একটা দেখবার মত জিনিষ। সেখানে প্রায় ১০০০ হাজার মেয়ে পড়ে। এই অল্প কয়েক বৎসরেই আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার এত উন্নতি হয়েছে যে মেয়েদের একটা কাগজ ৬০,০০০ করে বিলি হয়।" বাস্তবিক জাপানের শিক্ষার প্রসার আশ্চর্য্য। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে ৬ থেকে ১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯৯.৫৭ জন স্কুলে শিক্ষা পেত।

মিসেস কোরা, মিসেস মজুমদার ও আমার মেয়েকে নিয়ে চার জনে ট্রেনে বেরোলাম। খানিকটা গিয়ে তার পর ট্যাক্সি নেওয়া হ'ল। মিসেস মোত্তোকো হানি এখানকার একজন শীর্ষস্থানীয়া মহিলা। তাঁর তিনটি বিদ্যালয় আছে। বড়টিতে স্কুলের মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্ত পায়। আর একটি নূতন প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের স্কুল। তৃতীয়টিতে পাস-করা মেয়েরা নানারকম চারু- ও কারু- শিল্প শিক্ষা করে। এই তৃতীয়টিই আজ আমাদের দেখতে যাবার কথা। মিসেস হানির বড় স্কুলটির প্রকাণ্ড বাড়ী ও বাগান দূর থেকেই দেখলাম। মেয়েদের এই বিদ্যালয়টি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত।

শিল্পবিদ্যালয়টি টোকিও শহরের বাহিরে একটু নির্জ্জন জায়গায়। দু-পাশে গাছের বেড়া-দেওয়া সরু রাস্তার এক দিকে মিসেস হানির বাড়ী, আর এক দিকে শিল্প-বিদ্যালয়। ভিতরে খবর দিতেই মিসেস হানি আর গুটি দুই মহিলার সঙ্গে তাঁর ছোট্ট কাঠের বাড়ীর বাইরে উঠানে বেরিয়ে এলেন। ছোট্টখাট্ট সাদাসিধা মানুষ, বয়স প্রায় ৭০এর কাছাকাছি। কালো কিমোনো ও জাপানী খড়ম পরা। ভদ্রমহিলা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী, ইংরেজীতেই আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, পরে জাপানী ভাষায় মিসেস কোরার ও মিসেস মজুমদারের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর আমরা শিল্পবিদ্যালয় দেখতে গেলাম।

এখানে ঢুকতে সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়ে ঝি চাকর দরোয়ানের অভাব। দরজার কাছে কেউ কার্ড চাইল না, অপেক্ষা-গৃহে কেউ অপেক্ষা করতে বলল না। একেবারেই আমরা বিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সামনের একটা বড় ঘরে এক জন শিক্ষয়িত্রী পিয়ানো বাজিয়ে কতকগুলি ৫।৬ বৎসরের মেয়েকে ড্রিল ও সঙ্গীত শেখাচ্ছিলেন। শিক্ষালয়টি প্রধানত বড় মেয়েদেরই জন্য। তারা স্কুলে সাধারণ শিক্ষা শেষ ক'রে গ্রাজুয়েট নাম পায়; তার পর এই জাতীয় শিক্ষালয়ে নানারকম হাতের কাজ শেখে। ছোট মেয়েদের ক্লাসটা পার হয়ে একটু এগিয়ে যেতেই কয়েকটি বড় মেয়ে কাজ ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিদেশী অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে। এঁদের মধ্যে এক জনের নাম মিস সাকুরাই। তিনি মিসেস মজুমদারকে আগেই চিনতেন এবং নিজের

মা-বাবার সঙ্গে ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাদের সব দেখাবার ভার নিলেন। এঁর পিতা ভারতীয় ছাত্রদের খুব সাহায্য করতেন। প্রত্যেক ঘরে ইউরোপীয় পোষাক-পরা বড় বড় মেয়েরা নীরবে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার সময় বন্ধ দরজা খুলে আবার বন্ধ করে যেতে হবে, অন্যের কাজের ক্ষতি হয় এমন আওয়াজ করবে না ইত্যাদি বিষয়ে দরজার পাশে বড় বড় অক্ষরে নোটিশ দেওয়া আছে। এছাড়া ব্যবহারিক ও আভ্যন্তরীণ জীবনে মানুষের চরিত্রগঠনের জন্য যে-সব সদুপদেশ দরকার সেগুলি "মটোর" মত প্রতি ঘরের দেয়ালে লিখে টাঙানো। মেয়েদের ধর্ম ও নৈতিক জীবনের দিকে মিসেস হানির বিশেষ দৃষ্টি আছে শিক্ষালয়ের আবহাওয়া দেখলেই বোঝা যায়। বিদ্যা অর্জ্জনের চেয়ে আদর্শ-জীবন গঠন ও আত্মনির্ভরের দিকে যে এই শিক্ষালয়ের বেশী দৃষ্টি তা এখানে কিছু ক্ষণ থাকলেই বোঝা যায়। এখানে সুতাকাটা, সুতা রং করা, ওবির কাপড় বোনা, রঙীন ছাতার কাপড় বোনা, ছাতা বানানো, মাদুর তৈয়ারী করা, মাদুরে নানারকম নক্সা করা, বাঁশের কঞ্চি ও কাগজের সৌখীন ব্যাগ তৈয়ারী করা, বেতের ব্যাগ ও চামড়ার ব্যাগ করা, টেব্‌ল-ঢাকা বোনা এবং সৌখীন জিনিষের উপর আঁকবার জন্য নূতন নূতন নক্সা আবিষ্কার করা ইত্যাদি মেয়েরা করছে দেখলাম। কে যে শেখাচ্ছে এবং কে শিখছে ঠিক বোঝা যায় না, সকলেই সমান-ভাবে কাজে ব্যস্ত। ছাঁচের কাজ, কাঠখোদাই, প্ল্যাষ্টারে মূর্ত্তি গড়া এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রথায় ছবি আঁকাও এঁদের শিক্ষণীয় বিষয়।

মেয়েদের হাতের তৈয়ারী সব জিনিষ একটি ঘরে বিক্রীর জন্য সুন্দর ক'রে সাজানো রয়েছে দেখলাম। জাপানে জিনিষপত্রের যে রকম দাম এখানকার জিনিষের দাম তার চেয়ে বেশী মনে হ'ল। হয়তো মেয়েদের স্বহস্তে তৈরী ব'লে দাম একটু বেশী। বিক্রীর টাকা বিদ্যালয়ের তহবিলে যায়। এখানে মেয়েদের তৈরি নানারকম সুসজ্জিত বড় বড় পুতুল, কাঠের ও গালার বাসন, ব্যাগ, ছাতা ও সুদৃশ্য কাঠের বাসন ও আসবাব প্রভৃতি পাওয়া যায়। কাঠের আসবাবগুলি ভারি সুন্দর, কারুশিল্পের নিখুঁৎ নিদর্শন। জাপানীরা শিল্পী জা'ত, এদের সব কাজেরই রং ও রেখায় চোখকে আনন্দ দেয়।

মেয়েদের কাজ দেখতে দেখতে বেলা হয়ে গেল, তখন দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের সময়। মেয়েরা আমাদের তাদের সঙ্গেই খেতে অনুরোধ করল। প্রাচ্য আতিথ্যের এই প্রথাটি জাপানীরা ঘরে তো পালন করেই, স্কুল-কলেজেও অনেক জায়গাতেই করে। যে-সব মেয়েরা বাড়ী থেকে পড়তে ও কাজ শিখতে আসে এবং যে-সব মেয়েরা স্কুলেই হোষ্টেলে থাকে তারা সকলেই দুপুরে একত্রে স্কুলে খায়। সমস্ত রান্না, পরিবেশন, বাসন ধোওয়া, ঘর ও আসবাব পরিষ্কার মেয়েরা নিজেরাই করে; তাদের কোন কাজ করবার জন্যই চাকর-বাকর নেই। রান্নার জন্য চাল-তরকারি মাছ-মাংস কেনাও মেয়েদের কাজ। এরা এই সব জিনিষের এবং এই জাতীয় প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষের একটি সমবায় ভাণ্ডার (কো-অপারেটিভ ষ্টোর) খুলেছে, তাতে বাজারের চেয়ে সস্তায় জিনিষ পাওয়া যায়, তাছাড়া মেয়েদের অভিভাবকদের কাছে জিনিষ বিক্রি ক'রেও কিছু লাভ করা যায়। মিসেস মজুমদারের কাছে শুনেছি খুব ছোট মেয়েরা রান্না করতে পারে না ব'লে তাদের মায়েরা পালা ক'রে তাদের হয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাঁধতে আসেন।

মেয়েদের খাবার ঘরটি সাদাসিধা কিন্তু খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাদের চার জনকে খেতে জায়গা দেবার জন্য চারটি মেয়ে নিজেদের বেঞ্চ ছেড়ে দিল। খাওয়ার আগে মেয়েরা খ্রীষ্টীয় প্রথায় প্রার্থনা করল। বড় বড় কাঠের গাম্‌লাতে ঢাকনা বন্ধ ক'রে ভাত আনা হ'ল। প্লেটে বাঁধাকপি ও মাংসের একটা তরকারি ও কিছু শাকসিদ্ধ দিল। কাঠের গাম্‌লার ভাত প্রত্যেককে এক একটা কাচের বাটিতে তুলে দেওয়া হ'ল। বাটিগুলি দেবার ও নেবার সময় সকলেই দু-হাত দিয়ে ধরছিল। দু-হাত পেতে বাটি নেবার ধরণ দেখে মনে হল এটা ভদ্রতার একটা অঙ্গ। এক হাতে ধরা বোধ হয় ঠিক শিষ্টাচারসঙ্গত নয়। ভাত-তরকারি খাবার পর চিনিতে



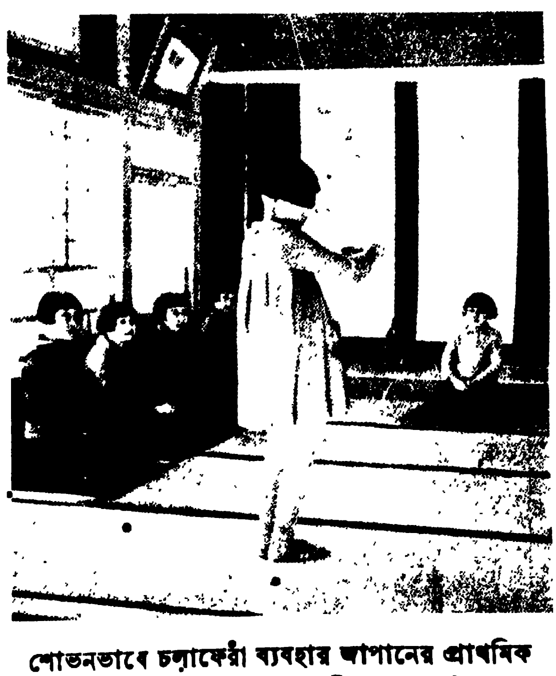
স্কুলের রন্ধনশালায় ছাত্রীরা রন্ধন পরিবেশন প্রভৃতিতে ব্যাপৃত



কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে শিশুদের মধ্যাহ্নভোজন



জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুগ্ন শিশুদের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সূর্য্যালোক গ্রহণের ব্যবস্থা



শোভনভাবে চলাফেরা ব্যবহার জাপানের প্রাথমিক শিক্ষালয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়



জাপানের একটি আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষালয়ে শিশুদের ব্যায়াম-চর্চ্চার ক্লাস



জাপানের বিদ্যালয়ে ডেনিশ প্রণালীতে ব্যায়াম-চর্চ্চা





জাপানী মেয়েদের ফুল সাজ   জাপানে এটি একটি কলাবি   লিয়া গণ

জাপানে চেরিগাছের তলায় কিণ্ডার   টেন



জাপানের সুবিখ্যাত চা-উৎসব



জাপানী রমণীদের ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস



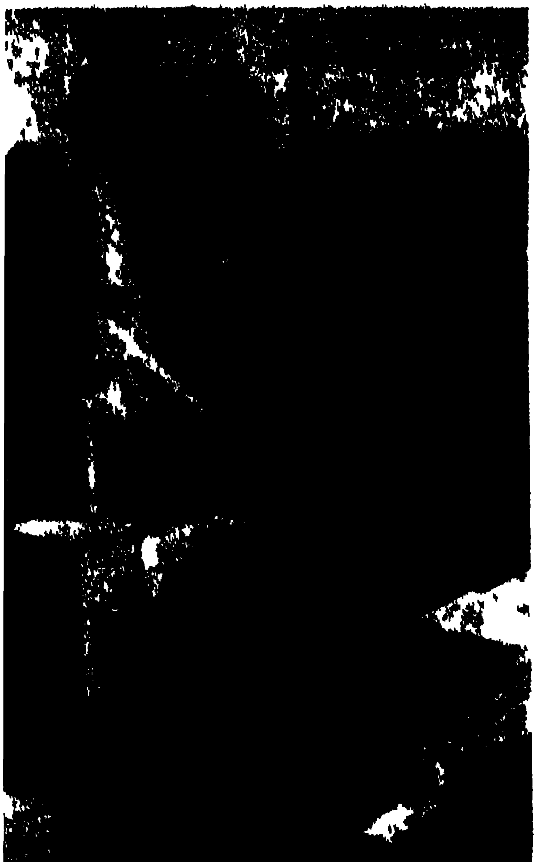
চেকোস্লোভাকিয়ায় সম্প্রতি জার্মান-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হিটলার-কর্তৃক
চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মান-প্রভাবাধীন অঞ্চল পরিদর্শন



বিবাদের রাষ্ট্র-সংকটের সময় চেকোস্লোভাকিয়ার সমর-সজ্জা—সাঁজোয়া ট্রেন

[illegible]

"এখানের মেয়েরা [illegible] এবং আমেরিক্যানির হিসাব রাখা ও আর্থিক পরিচালনা পালা ক'রে



মিসেস হানির বিদ্যালয়ের মেয়েরা জাপ-পতাকাতলে

করে। তিন জন ক'রে সচরাচর একসঙ্গে কাজের ভার নয়। সেই তিন জনের পালা (দুই মাসে) শেষ হ'লে আর তিন জনের পালা সুরু হয়। জাপানে এই একটি মাত্র বিদ্যালয়ে [illegible] কাজের ভার নিজেরা গ্রহণ করে। [illegible] পূর্ণ [illegible] কাহারও [illegible] ছাত্রী-কমিটি [illegible] শিক্ষয়িত্রী [illegible]

[illegible] কিছু বললেন ঃ [illegible] প্রসঙ্গ হানির আমার খুব ভাল লেগেছিল।

খাবার ঘরে খাবার পর মেয়েরা নানা [illegible] আলোচনা করে। একটি মেয়ে একখানা বড় [illegible] খবরের কাগজ থেকে বিশেষ বিশেষ খবর কেটে [illegible] নিয়ে এসেছিল। সে সেগুলি পড়ে শোনাল। তার পর আর একটি মেয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পড়ল। তার প্রধান বক্তব্য ছিল খরচ কমানো বিষয়ে। মেয়েরা গ্রাজুয়েট হবার তিন বছর আগে থেকে স্কুল পরিচালনার নানা বিষয়ে ভার পায়। যাদের উপর যখন ভার থাকে তারা তখন শিক্ষয়িত্রীদের বেতন, ছাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া, স্কুলের অন্যান্য জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি যাবতীয় খরচই নিজেরা চালায়। কাজেই কি কি উপায়ে স্কুলের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস হয় তা মেয়েদের সর্ব্বদাই ভাবতে হয়।

মিসেস হানির এই বিদ্যালয়গুলি জাপানে "জিয়ুগো-কুয়েন" নামে সুবিখ্যাত। মিসেস হানির জন্ম হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। গ্র্যাজুয়েট হবার পর কয়েক বৎসর তিনি একটি খ্রীষ্টীয় বিদ্যালয়ে কাজ করেন। সে সময়ে জাপানের সামাজিক উন্নতি বেশী হয় নি। এটা তাঁর মনে অত্যন্ত লাগ্‌ত। বালিকা বয়স থেকেই তিনি স্বদেশের মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করতে কৃতসংকল্প হন। এই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার পর তিনি সমাজ-সেবার কাজে যোগ দেন এবং একটা খবরের কাগজের আপিসে প্রুফ-রীডারের





জাপানী প্রাচীনপন্থী থিয়েটার

নিয়ে বালকদের বিভাগ খোলা হয়।

মিসেস হানি এখনও প্রত্যেক ক্লাসে সপ্তাহে এক ঘণ্টা ক'রে পড়ান। ছাত্রীদের প্রাত্যহিক জীবন গঠনে সাহায্য করাই তাঁর শিক্ষার বিষয়। মেয়েরা তাঁর কাছে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভিতরের কথা বলে। কি আদর্শ ও কি আশা নিয়ে তারা কাজে নেমেছে সে-বিষয়েও আলোচনা হয়। মিষ্টার হানিও মেয়েদের শিক্ষায় সাহায্য করেন। তিনি মেয়েদের চলতি ইতিহাসের কথা বলেন এবং আধুনিক পৃথিবীর নানা সমস্যা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

কাজ নেন। শীঘ্রই তিনি সেখানে সহকারী সম্পাদকের কাজে উন্নীত হন। জাপানে তিনিই প্রথম মহিলা-সাংবাদিক এবং প্রায় তেত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীর সাহায্যে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই কাগজটির সাহায্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই খ্যাতি লাভ হয়। তাঁহাদের কন্যাদের শিক্ষার বয়স হ'লে মিসেস হানির দৃষ্টি স্ত্রীশিক্ষার দিকে পড়ে। শিক্ষায়তনে ছেলেমেয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ায় তাঁরা দু-জনেই বিশ্বাস করতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা দু-জনে নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে এই "মুক্তি-নিকেতন" স্থাপন করেন। অন্য যাঁদের এ-কাজে সহানুভূতি ছিল তাঁরা অনেকে সাহায্যও করেছিলেন। একজন মার্কিন স্থপতির সাহায্যে টৌকিওর শহরতলী মেজিরোতে একটি সুন্দর বাড়ী করা হ'ল। সে সময় শহরের কোলাহল ও ধূলিবালির থেকে মেজিরো অনেক দূরে ছিল। প্রথম দিন মাত্র ছাব্বিশটি মেয়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। এখন ছাত্রী-সংখ্যা তিন শতের বেশী। পাঁচ শতের বেশী মেয়ে শিক্ষা-সমাপন করে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়েছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পঁয়ত্রিশটি ছেলে

মিসেস হানির শিক্ষালয় থেকে আমরা মিসেস মোচিজির বাড়ী গেলাম। ইনিও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী। জাপানীদের এক পরিবারেই মা-বাবা ছেলেমেয়ের আলাদা আলাদা ধর্ম্ম আছে ব'লে শোনা যায়। ধর্ম্মের গোঁড়ামি নিয়ে ঝগড়া মারামারির ধার তারা ধারে না।

মিসেস মোচিজির চার মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মা মেয়ে-জামাইদের ছবি এনে দেখালেন। এঁর একটি মাত্র ছেলে, গ্র্যাজুয়েট হবার পরই জানুয়ারী মাসে মাঞ্চুকুয়োর যুদ্ধে তাকে সৈন্য ক'রে নিয়ে গিয়েছে। ফিরবে কি না-ফিরবে কে জানে? বৃদ্ধা একলা বাড়ীতে দিন গুনছিলেন। ইনি গ্রামের উন্নতি করবার জন্যে গ্রামে স্কুল খুলেছেন। সেখানে মেয়েদের চাষ-বাস ঘরসংসারের কাজকর্ম্ম লেখাপড়া সব শেখানো হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি ডেনমার্কে গ্রাম-শিক্ষা-পদ্ধতি শিখতে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে নিজেদের গ্রামে এই শিক্ষানিকেতন করেন। কয়েক বছর শিখবার পর এদেরও গ্র্যাজুয়েট বলা হয়। ঘর-



'তাকারাজুকা'র মেয়েদের নাচ

সংসার সুন্দর ক'রে করাই এদের আদত শিক্ষণীয় বিষয়। গ্রামের এই রকম একটি গ্রাজুয়েট মেয়েকে দেখালেন। সে চৌকিওতে তাঁর কাছে থাকে। আমাদের চা ও জাপানী নিমকি খেতে দিল। মিসেস মোচিজি মাঝে মাঝে গ্রামে যান। আমাকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে সব দেখাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু তাঁর এবং আমার অসুস্থতার জন্য যোগাযোগ ঠিক হ'ল না। তাঁদের আদর্শ গ্রামের কিছু ছবি আমাকে দিলেন। এঁর স্বামী এক সময় ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এঁদের বসবার ঘরে তাঁর স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে আগ্রার একটি ছোট তাজমহল এবং রঙীন ফুলের কাজ-করা গুটিদুই শ্বেত পাথরের রেকাবী রয়েছে। বিদায় নেবার সময় আমার মেয়েকে তিনি একটি মাটির জাপানী পুতুল দিলেন।

মিসেস মোচিজির বাড়ী থেকে আমরা জাপানী মেয়েদের একটি শিল্পবিদ্যালয় দেখ্‌তে গেলাম। মিসেস কোরা বললেন, "বিদ্যালয়টি কুড়ি-পঁচিশ বৎসর আগে এক জন জাপানী ডাক্তারের মা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এখন জীবিত নেই। এই স্কুল-কমীটির হাতে একটি বড় সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তাতে প্রায় ৯০০ মেয়ে পড়ে। তাদের অনেক লাভ থাকে। সেই লাভের টাকা দিয়ে তারা শিল্পবিদ্যালয়টিকে সাহায্য করে। গবর্ণমেণ্ট এই স্কুলকে কিছু সাহায্য করেন না, তবে এর খরচ-খরচা তাঁদের কথামত হয়।"

আমরা স্কুলে যেতেই একটি পরিচারিকা আমাদের অপেক্ষা-গৃহে বসিয়ে ভিতরে খবর দিতে গেল। একটু পরেই অভ্যর্থনাসূচক সবুজ চা এল। আর্ট-স্কুল হলেও চায়ের বাসনকোশন অন্য জায়গার তুলনায় অত্যন্ত সাধারণ এবং চটা-ওঠা। চায়ের পর এক বৃদ্ধ এলেন। তিনি স্কুলের শিক্ষক এবং 'ভাইস-সেক্রেটারী'। দোতলা বাড়ী, আলাদা আলাদা ঘরে আলাদা আলাদা ক্লাস হচ্ছে। প্রথম বৎসর ফুল পাতা, দ্বিতীয় বৎসর পশুপক্ষী ও তৃতীয় বৎসর মানুষ দেখে আঁকতে শেখান হয়। দেখলাম সব মেয়েরাই প্রায় রেশমের উপর ছবি আঁকছে। যারা ফুল আঁকছে তাদের সামনে ফুলদানিতে সত্যিকারের ফুল সাজান। ফুলদানিটা বাদ দিয়ে বেশ সুবিন্যস্তভাবে ফুলগুলি আঁকছে। প্রত্যেকেরই ছবি প্রায় আলাদা। কত রকম হাল্কা রং মিলিয়ে রেশমের উপর পুষ্পগুচ্ছ ফুটিয়ে তুলছে দেখবার মত। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীর পক্ষে এদের কাজ আশ্চর্য্য সুন্দর। উপরের ক্লাসে একটা ঘরে সব মেয়েরাই একটি রাজারাণীর ছবি আঁকছে। বোধ হয় কোনও প্রাচীন চিত্রের কপি। এগুলি সব জল-রঙের ছবির ক্লাস। এ ছাড়া তৈলচিত্রের ক্লাস, সূচিশিল্পের ক্লাস,



'তাকারাজুকা'র পাশ্চাত্য নাচ

নকল ফুল তৈরির ক্লাস আছে দেখলাম। খোঁপায় নকল ফুল পরা জাপানে খুব চলে। সূচিশিল্পের ক্লাসে সুন্দর সুন্দর ফ্রেমে রেশমের পর্দা তৈরি হচ্ছে, আশ্চর্য্য রঙের খেলা সেগুলিতে। এখানে মেয়েদের পোষাকের জন্য সুন্দর সুন্দর ওবিও তৈরি হয়। সেগুলি বহুমূল্যে বিক্রয় হয়।

এখানে গৃহরচনার (সংসার) আর্টও শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার করা, ঘর সাজান সবই শেখান হয়। এই ক্লাস মাত্র এক বছরের জন্য। বিবাহের আগে অনেক মেয়ে এখানে কাজ শিখতে আসে।

এই বিদ্যালয়ে বাৎসরিক শিক্ষা-বেতন ৫০।৬০ থেকে ১০০ ইয়েন পর্য্যন্ত। যে যে-রকম ক্লাসে শেখে সেই মত বেতন। খাওয়া থাকা খরচ মাসে ২২ ইয়েন আন্দাজ।

শিল্পবিদ্যালয় দেখা হবার পর মিসেস কোরা বললেন, "টোকিওর কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলাকে একসঙ্গে যদি দেখতে চান তো তাঁদের ক্লাবে চলুন। আজ সোমবার আজ বিকালেই তাঁদের মণ্ডে ক্লাব বসে।"

আমি বললাম, "বেশ তো চলুন। অল্প সময়ে এত জনকে দেখবার অন্য সুযোগ তো হবে না" ট্যাক্সিতে ক'রে আর এক পাড়ায় ক্লাবে গেলাম। প্রকাণ্ড একটা বাড়ী, তারই পাঁচতলার উপরে একটা ঘরে এঁদের ক্লাব বসে। লিফ্‌টে করে উপরে উঠলাম। মস্ত একটা খাবার টেবিলের অথবা লাইব্রেরি টেবিলের দু-ধারে মেয়েরা বসেছেন। এক জন মাত্র পুরুষ আছেন, তিনি নিমন্ত্রিত। স্বদেশ বিষয়ে কিছু বলবার জন্য তাঁকে সেদিন বোধ হয় ডাকা হয়েছিল তিনি ব'সে ব'সে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। তার পর সকলকে ষ্ট্রবেরি, ক্রীম, কেক ও চা দেওয়া হল। ভদ্রলোক চলে যাবার পর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁদের মধ্যে কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ সাংবাদিক, কেউ সমাজ-সেবিকা, কেউ শিক্ষয়িত্রী, কেউ বা সফ্রাজেট। একটি



স্ত্রীবেশী পুরুষ অভিনেতা

মহিলা * বললেন, "আমি ভারতীয় দর্শন পড়তে ভারতবর্ষে যেতে চাই।" এক জন মাসিক পত্রের সম্পাদিকার সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁরই কাগজ মাসে ৬০,০০০ বিলি হয়।



টোকিওর 'ওদোরি' নৃত্য

এই মহিলাদের মধ্যে সাত আট জন ইউরোপীয়ান পোষাক পরেছেন। স্কুলের মেয়ে ছাড়া এক সঙ্গে এত জন মেয়েকে বিদেশী পোষাক পরতে জাপানে ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখি নি। শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে বিদেশী পোষাকের চলন দ্রুত বাড়ছে বোঝা গেল। পুরুষদের তো আধাআধিই ইউরোপীয় পোষাক পরেন। মনৃডে ক্লাবের সদস্যারা ফ্রক কিংবা কিমোনো যে যাই পরে থাকুন সবই হাল্কারঙের-চাপল্যবর্জ্জিত। অধিকাংশের পোষাকই কালো, দুই-এক জনের কালোর কাছাকাছি একটা ভারী রং। জাপানে বয়স্কা মহিলারা বেশীর ভাগই কালো পরেন দেখেছি। যাঁরা মধ্যবয়সের নীচেই তাঁরাও দেখলাম এসব জায়গায় কালো পরে এসেছেন। জাপান এমন রঙের দেশ, এদেশে এই সব মহিলারা উৎসবক্ষেত্রে কি পরেন জানি না। আমাদের বাংলা দেশে তো আজকাল পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ও শিক্ষিত সমাজে সভাসমিতি, সর্ব্বত্রই ছোটবড় সব মেয়েরা নানা রং ও নক্সার কাপড়চোপড় পরেন। নিখিল-ভারত মহিলা-সভা প্রভৃতিতে শাড়ীর বিচিত্র রং যত চোখে পড়ে এত আর কিছু পড়ে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে মেয়েরা চিরকালই সব বয়সে রঙীন কাপড় পরে আসছেন।

মনৃডে ক্লাবের মহিলাদের মধ্যে অনেকে বিবাহিতা, অনেকে মধ্যবয়স্কা কিন্তু অবিবাহিতা। সকলে ইংরেজীতে কথা বলেন না। যিনি ইংরেজী ভাষার শিক্ষয়িত্রী তিনি আমার সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বললেন।

এখানে যে চৌদ্দ-পনরটি মহিলাকে দেখেছিলাম তাঁরা ছাড়া এই ক্লাবের আর সভ্য আছেন কি না জানি না। এঁদের দেখে উচ্চবংশীয়া শিক্ষিতা জাপানী মেয়েদের সাধারণ জাপানী মেয়েদের চেয়ে অনেকটা স্বতন্ত্র মনে হয়। সেই রাত্রেই এক ভারতবর্ষীয় মুসলমান-পরিবারে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে আবার ট্রেনে টোকিও চললাম। সেখান থেকে মজুমদার মহাশয়কে সংগ্রহ করে ট্যাক্সিতে নানা পথ ঘুরে সেই ভদ্রলোকের বাড়ী পৌছান গেল। সেদিন ছিল ঈদের দিন, তার উপর ভদ্রলোকের এক মেয়ের জন্মদিনও। সেই উপলক্ষে জন কয়েক দেশের লোককে তাঁরা নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাড়ীটা সম্পূর্ণ জাপানী ধরণের, কিন্তু গৃহকর্ত্তা ও তাঁর বাড়ীর লোকজনেরা ভারতীয় ধরণেই সেখানে চলাফেরা করছিলেন। কেউ ঘরের বাইরে জুতা খোলেন নি এবং অনেকেই সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি এদিক ওদিকে ফেলছিলেন। একবার তো আর একটু হলেই কাগজের দেয়ালে আগুন ধরে যাচ্ছিল। এঁরা জাপানে নবাগত।



'জিয়ুগাকুয়েনে'র শয়নগৃহ

গৃহকর্ত্তা ভারতবর্ষ থেকে তাঁর চাকরবাকর নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর বাবুর্চ্চি যে-রকম ভাল রান্না করেছিল সে-রকম রান্না দেশেও সর্ব্বদা খেতে পাওয়া যায় না। পোলাও প্রভৃতির পর মিষ্টান্নও সে স্বহস্তে ক'রে খাইয়েছিল। এখানে সুবিখ্যাত রাসবিহারী বসু মহাশয়কে দেখলাম। টোকিওতে তাঁর একটি রেস্তোরাঁ আছে শুনলাম। সেখানে নাকি ঘি দিয়ে রান্না করা হয়; অন্যান্য হোটেলে তা হয় না।

খাওয়ার আগে গ্রামোফোন শুনিয়ে এবং পরে নিজের গান ও কবিতা আবৃত্তি শুনিয়ে গৃহকর্ত্তার ৮৯ বছরের মেয়েটি আমাদের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করল। তার ছোট ছোট ভাইবোনগুলি এসব উপায়ে বিশ্বাস করে না। তাদের বাবা অনেক চেষ্টা করেও তাদের দিয়ে কিছু করাতে পারলেন না। তারা আমার কোলে বসে ঘাড়ে চড়ে হেসে মুখ ভেঙিয়ে গল্প করে নানা ভাবে আমার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলল। আমাদের ফেরবার সময় হ'লে তারা ছেড়ে দিতে চায় না।

রাত্রে ৯৷৷০টায় কন্‌কনে ঠাণ্ডায় বেরিয়ে আমরা একটা বাস্‌ ধরলাম, সেদিন তাপমান-যন্ত্রে শীত ৩০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত নেমেছিল। ইতিপূর্ব্বে ২৬°।২৭° ডিগ্রিও নাম্‌তে দেখেছি, কিন্তু তখন রাত্রে পথে বেরোই নি। চারি দিকে কাচ-বন্ধ গাড়ীতে উঠে দেখলাম এত ভীড় যে পরস্পরকে দেখা যায় না। যাই হোক, কোন প্রকারে ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। রাত্রের ট্রেনে বেশীর ভাগ মানুষ টোকিও থেকে আশেপাশে নিজের নিজের বাড়ীর ষ্টেশন অভিমুখে যায়। কাজেই ট্রেনেও ভীড় অসাধারণ। দরজার সামনে পিছনে এমন লোক জমেছে এবং এমন গুঁতো মারছে যে ঢোক্‌বার কোনও উপায় নেই। নিজে হাঁটাই শক্ত। আমি বিদেশী মানুষ, ভয় হচ্ছিল পাছে ট্রেন ছেড়ে দেয় আর প্লাটফর্ম্মে পড়ে থাকি। অনেক কষ্টে ওঠা গেল, কিন্তু শূন্যে দোলায়মান হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কয়েকটা ষ্টেশন পার হ'তেই গাড়ী খানিক খালি হয়ে গেল, বস্‌তে পেলাম। হঠাৎ দেখলাম দরজার কোণে একটা লোক দাঁড়িয়ে ঢুল্‌ছে। একটু পরেই ঢিপ করে পড়ে গেল। বুঝলাম মদ খেয়ে লোকটার আর কিছু জ্ঞান নেই। তার পাশেই দুটি অল্পবয়স্কা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, লোকটাকে পড়ে যেতে দেখে কি একটা ব'লে ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে অন্য কোণে দৌড় দিল। তাতে লোকটার একটু চেতনা হল, রাগও হল। সে উঠে পড়ে ছুটে একটি মেয়েকে মারতে গেল। মেয়েটির কাঁধ ধরে ঝাঁকানি সুরু করতেই মজুমদার মশায় সেটাকে ধাক্কা মেরে বকে অন্য দিকে সরিয়ে দিলেন। তিনি তার সামনে নিজে দাঁড়িয়ে তাকে আগলে রাখলেন। আশ্চর্য্য এই যে গাড়ীভর্ত্তি এতগুলি জাপানীর মধ্যে এক জনও মেয়েগুলিকে কোন রকম সাহায্য করতে এল

না, এঁদের যিনি তিনি বাঙালী। জাপানীরা সর্ব্বত্রই দেখতাম মেয়েদের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন।

২৩শে মিস্ সাকুরাই-এর বাড়ীর নিমন্ত্রণের কথা আগেই লিখেছি। ২৪শে বাড়ী পরিষ্কার করতে সারাদিন লেগে গেল, কারণ ২৫শে ছিল বাড়ীতে চা-পার্টি। জাপানে এপ্রিল মাসের গোড়ায় সকুরা ফুল ফোটবার সময় লোকেরা আত্মীয়বন্ধু সকলের বাড়ী দেখা করতে যায়। সেই সময় বাড়ীর কাঠের ফ্রেমের পাতলা কাগজগুলি বৎসরান্তে বদলানো হয়। বাড়ীতে পার্টি আছে ব'লে মজুমদার মশায় এক মাস আগেই সব কাগজ বদলের হুকুম দিলেন। দিনের মধ্যে কোথাও যাওয়া হ'ল না ব'লে ঠিক করলাম সন্ধ্যাবেলা এখানকার একটা থিয়েটারে যাওয়া যাবে। টোকিওতে মেয়েদের একটা থিয়েটার আছে, তার নাম



মিসেস হানির ছাত্রীরা ঘরে কাজ করছে

'তাকারাজুকা'। কোবেতেও 'তাকারাজুকা' আছে শুনেছি। মজুমদার মশায় ও তাঁর গৃহিণীকে থিয়েটার দেখতে নিমন্ত্রণ করা গেল। গৃহকর্ত্তা আপিসে ছিলেন, পাড়ার টেলিফোন থেকে তাঁকে খবর দেওয়া হল। ওমোরি থেকে ট্রেনে গিয়ে আমরা থিয়েটারের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মজুমদার মশায় এসে পৌছান নি। থিয়েটারে মেয়েদের কি ভীড়! সাজ-সজ্জাও তেমনি। জাপানী মেয়েরা সর্ব্বদাই এত সাজে যে কখন্ উৎসব আর কখন্ নয় প্রথম দৃষ্টিতে বোঝা যায় না। কিন্তু থিয়েটার প্রভৃতিতে গেলে বোঝা যায় এখানে জুতার, ওবির এবং প্রসাধনের ঘটা আরও অনেক উঁচুদরের এবং আধুনিক। পোষাকে চার ধারে যেন ফুলের বাগান ব'সে গিয়েছে।



মিসেস মোতোকো হানি ক্লাসে পড়াচ্ছেন

থিয়েটার আরম্ভ হবার সময় হয়ে গেল, অথচ মিঃ মজুমদার আসেন না দেখে তাঁর টিকিটটা খামে পুরে নাম লিখে দ্বাররক্ষকের কাছে জমা দিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, অনেক তলা উঁচু, প্রথম তিন তলা তো শুধু দর্শকদের বসবার জন্তেই। তার উপরের তলাগুলিতে দোকান, খাবার ঘর, বিশ্রামের ঘর প্রভৃতি। নানা জিনিষের বিজ্ঞাপনের ঘরও আছে। জাপানে ষ্টেশন, থিয়েটার প্রভৃতি যে-সব জায়গায় খুব লোকসমাগম হয় সেখানে সর্ব্বত্রই পোষাক, পুতুল, খাবার, ফুল ইত্যাদি হরেক রকম জিনিষ কাচের আলমারিতে সাজিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ঘটা।

'তাকারাজুকা'র মেয়েরা পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলের ভূমিকাই নিজেরা গ্রহণ করে। তাদের রঙ্গমঞ্চে পুরুষদের ঢুকতেই দেওয়া হয় না। শুনেছি অনেক ভদ্র ঘরের মেয়েরা এই থিয়েটারে অভিনয়ের টাকার সাহায্যে কলেজের পড়ার খরচ চালায়। নাচ গান বাজনা ইত্যাদির কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে তবে মেয়েদের এখানে ঢুকতে দেওয়া হয়। এদের চালকেরা এবং শয়নগৃহ প্রভৃতির

নিয়মও শুনেছি খুব কড়া। বার বছর বয়স থেকে মেয়েদের এখানে নেওয়া হয়।



ছাত্রীরা সেলাই শিখছে

আমরা যেদিন দেখতে গেলাম সেদিন তিনটি ছোট ছোট নাটক অভিনীত হয়েছিল। তাদের মধ্যে দুটি ইউরোপীয় এবং একটি জাপানী। ইউরোপীয়ান গল্পগুলির রচয়িতাও জাপানী। গানগুলি খাঁটি ইউরোপীয়ান, কিন্তু বাকি কথাবার্তা সব জাপানী ভাষায়। জাপানীরা পরের ভাষা বলতে অত্যন্ত অক্ষম ব'লে বোধ হয় এই নিয়ম। আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত হাস্তকর লাগে।

প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ জুড়ে দেড় শ' কি তারও বেশী মেয়ে অভিনয়ে নেমেছে। তাদের সাজপোষাক খাঁটি ইউরোপীয় মধ্যযুগের। মস্ত মস্ত ঘেরওয়ালা নানা-রঙের গাউন, সেই মত শাল, ওড়না টুপি। অভিনয়ের কথা-বার্তার চেয়ে নাচগানই বেশী। কাজেই সাজসজ্জা সেই মত নিখুঁৎ। রঙ্গমঞ্চের সাজপোষাকে রং ও রেখার এরকম সুষমা আমি কখনও দেখি নি। অবশ্য রঙ্গ-মঞ্চের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব কম। তা'হ'লেও জাপানী-দের শিল্প-চৈতন্তকে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। কত অসংখ্য রঙের খেলা রঙ্গমঞ্চে চলেছে অথচ কোনও রং মানুষের চোখে লাগে না, যে রঙের যেমন ওজন যেখানে দরকার ঠিক সেই মতই সেখানে আছে।

মেয়েরা ছেলে সেজেছে ব'লে ইউরোপীয় পোষাকে তাদের বড্ড বেশী বেঁটে ও ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল। একে তো জাপানীরা বেঁটে জাত, তার ওপর মেয়েরা ছেলে সাজাতে আরোই ছোট মনে হয়। অভিনয়ের মধ্যে নাচগুলিই সব চেয়ে সুন্দর, গানগুলি সুবিখ্যাত ইউরোপীয় গান, কাজেই ভাল। কিন্তু অভিনয়ে ও কথাবার্তায় কিছু ভাঁড়ামি মেশানো থাকাতে এমন সুন্দর পটভূমিকার সম্মুখে একটু খারাপ লাগছিল। এই ভাঁড়ামিগুলো অবশ্য পুরুষবেশীরাই শুধু করছিল।

দ্বিতীয় অভিনয়টি জাপানী সাজে খাঁটি জাপানী পালা। একজন ক্রোরপতি জাপানী তার টাকাগুলো খরচ করতে না পেরে এক ভিখারীকে টাকা উড়োবার কাজে নামিয়েছে, এই হ'ল আসল গল্প। এতেও নাচই বেশী। স্ত্রীবেশী ও পুরুষবেশী দুই দলেরই নাচ আছে। নাচের পোষাকে জাপানী মেয়েদের কিমোনো এবং তার আস্তিনগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মাথার খোঁপাগুলি মস্ত মস্ত এবং তাতে অসংখ্য গহনা। এতে মানুষের তুলনায় মাথা বড় লাগে। ইউরোপীয় পালার চেয়ে জাপানী পালায় পটভূমিকার আড়ম্বর কম। প্রাচ্যের সর্ব্বত্রই এটা আছে বোধ হয়। কিন্তু যেটুকু আড়ম্বর আছে তার বর্ণসমাবেশ ভারি স্নিগ্ধ ও মনোহর। সাজপোষাক সব প্রাচীন জাপানের নাট্যমঞ্চের অনুকরণে। পুরুষের তেমনি মাথা চেঁছে চূড়াবাঁধা, তেমনি জাঁকজমকের কিমোনো ও সরু বাঁকা করে ভুরু ও চোখ আঁকা, মেয়েদেরও সনাতন নর্ত্তকীর সাজ।

তৃতীয় পালায় মেয়েদের একটি বিরাট বাহিনী। সমস্ত ষ্টেজ ও যাওয়া-আসার দুটি লম্বা পথ জুড়ে দেড়শ'- দু-শ' মেয়ে যখন শেষ নৃত্যে একসঙ্গে বিচিত্র পোষাক দুলিয়ে রঙের ঢেউ তুলে নেচে উঠল, তখন মনে হ'ল যেন কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে ঋতুরাজ বসন্ত তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার এই রঙ্গমঞ্চে উজাড় করে দিলেন। এই নাচের পোষাক এবং ভঙ্গীগুলি সুরুচিসঙ্গত। একটা ইউরোপীয় নাচে কেবল দেখলাম কয়েকটি মেয়ের পোষাক আধুনিক কুরুচি-দোষদুষ্ট। বিদেশী অভিনয়-গুলির সময় এই বিরাট ষ্টেজটি আপনা আপনি ঘুরে দৃশ্য পরিবর্ত্তন করছিল। অভিনেতাদের প্রস্থান ক'রে নূতন দৃশ্যে আবার আবির্ভূত হ'তে হয় না। একটা দৃশ্য শেষ

হ'লে সেটা সবাইকে নিয়ে আপনি ঘুরে পিছনে চলে যায় এবং নূতন দৃশ্যটি সামনে আসে। এতে আলো অন্ধকার ও রঙের খেলা অপূর্ব্ব।

অভিনয়ের মাঝে বিশ্রামের সময় আমরা নাট্যগৃহের উপর তলাগুলি দেখে এলাম। ষ্টেজের উপযুক্ত খুব দামী জরির কিমোনো, অন্যান্য কাপড়, পুতুল প্রভৃতি বিজ্ঞাপনের জন্যে সাজানো। পুরুষ সঙ্গী না নিয়েও অল্পবয়স্কা মেয়েরা সর্ব্বত্র নির্ভয়ে নিরাপদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ তাদের দিকে তাকাচ্ছেও না। আমাদের দেশে . থিয়েটার বায়স্কোপ ও মেলা প্রভৃতি মোটেই এমন নিরাপদ নয়। নিঃসঙ্গ মেয়ে দেখলে আমাদের দেশের পুরুষ জনতার মধ্যে কেউ না কেউ কিছু অভদ্রতা যে করবেই এটা এদেশের পুরুষ জাতির মস্ত কলঙ্ক। দিনের আলোতে পথে ঘাটেও সর্ব্বত্র সবাই ভদ্র ব্যবহার করবে আমাদের দেশের মেয়েরা এমন ভরসা রাখতে পারে না, এটাও পুরুষদের গৌরবের বিষয় নয়।

অভিনয় দেখতে এসে আর সবই খুব ভাল লাগল, কেবল বিরক্তিকর লাগল একটা কি দুটো মাতালের চীৎকার। যতক্ষণ অভিনয় হল ততক্ষণই এই লোকগুলি অবিশ্রান্ত গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেছে। মিঃ মজুমদার উঠে গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে তাদের বারণ করাতেও তারা থামল না। আশ্চর্য্য যে এই অভদ্র চীৎকারে অভিনেত্রী কিংবা দর্শকেরা কেউই বিচলিত হচ্ছিল না।

জাপানী কাবুকী থিয়েটার সে-দেশের প্রাচীনপন্থী থিয়েটার। এখানে পুরুষেরাই মেয়েদের পালা অভিনয় করে। মেয়েদের মত সাজপোষাক করে পরচুলার বিরাট খোঁপা পরে, কখনও বা মুখোস পরে তারা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। যারা মেয়েদের পালা করে তাদের বলে .'ওয়ামা'। জাপানী নৃত্যের নাম "ওদোরি"। বিখ্যাত চেরি-নৃত্যকে বলে "মিয়াকো ওদোরি"। এই নাচ কিয়োটো শহরে বসন্তকালে দেখবার জিনিষ।

গেইসাদের নৃত্য, শিণ্টো এবং বৌদ্ধ মন্দিরের নৃত্য এবং "নো" নৃত্য প্রভৃতি আরও অনেক রকম নাচ জাপানে সুপ্রসিদ্ধ। তাকারাজুকার অভিনয় ও পালার বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য ধরণের।

অভিনয়ের পর রাত্রে একটা হোটেলের মাটির তলার ঘরে খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ী ফিরলাম। সেখানে খাওয়া বেশ ভালই দিল।

সাঁচা

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

পুলকের স্বপ্নে রচা আলোকের রঙ্গে খচা
পাখীদের শতেক নীড়ে,
নিঙাড়ি সুধার খনি উঠিছে প্রীতির ধ্বনি
রাগিণীর গমক মীড়ে।

এ কি কল্পনার মেলা? এ কি খেয়ালীর খেলা?
মোহে যে মুগ্ধ হৃদয়।
ক্ষণেকের প্রাণের বাসায় এ যে গো তৃপ্তি খাসা
না জেনে হোস্ নে নিদয়।

আকাশে কুসুম ফোটে সুরভি চিত্ত লোটে
নিত্য সে টাট্‌কা কাঁচা
অসীমার অন্তহারা বহে যায় সুধার ধারা
সে যে গো সাঁচার সাঁচা।

কেশবচন্দ্র সেনের জাতিগঠনচেষ্টা

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮ সালের ১৯শে নবেম্বর কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান বৎসর তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব। এই উৎসব ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, কোথাও কোথাও বর্ত্তমান ও আগামী মাসে হইবে।

কেশবচন্দ্র প্রধানতঃ ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন, এবং ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়াই তিনি বিখ্যাত। মানবসমাজের হিতের নিমিত্ত তিনি যত প্রকার কাজ ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, সমস্তই তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা হইতে উদ্ভূত। তাঁহার এই সব কাজ ও চেষ্টা তাঁহার জীবিতকালে ভারতবর্ষে মহাজাতি-গঠনের সাহায্য করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে। আমরা তাঁহার এই সব কাজ ও চেষ্টার কিছু পরিচয় দিতে চাই।

সকল দেশেই যাহারা অল্পবিত্ত বা বিত্তহীন, তাহাদের সংখ্যাই অধিক। সব দেশেই জাতি বলিতে প্রধানতঃ এই সকল লোককেই বুঝায়। যদি জাতি গড়িতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে ও প্রধানতঃ ইহাদের হিতচেষ্টা করা আবশ্যক, ইহারা যাহাতে মানুষ-নামের যোগ্য হয়, মানুষের অধিকার পায়, মানুষের মর্য্যাদা লাভ করে, সেই চেষ্টা করা আবশ্যক। এই দিকে কেশবচন্দ্রের কিরূপ দৃষ্টি ছিল, তাহা তাঁহার "সুলভ সমাচার" সংবাদ-পত্র হইতে বুঝা যায়। তাহার একটি প্রবন্ধ—

প্রজাপীড়ন

পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কতকগুলি লোকে চাষ, বাণিজ্য, চাকরী ও অন্যান্য ব্যবসায় করিয়া দিন যাপন করে, আর কতকগুলি লোকে তাহাদের উপর রাজত্ব করে। এই দুই প্রকার লোককে রাজা ও প্রজা বলিয়া আমরা জানি। প্রজারা খাজনা ও ট্যাক্স দিতেছে, রাজা যাহা আজ্ঞা করেন তাহা ইচ্ছা হউক অনিচ্ছা হউক তাহারা পালন করিতেছে, এবং রাজা সেই টাকা এবং লোক-দিগকে লইয়া বড়মানুষী করিতেছেন। এই মাত্র সম্বন্ধ উভয়ের সঙ্গে, রাজা আপনার ঘরে বসিয়া হুকুম করিলেন, আর প্রজার হাড়ের মজ্জা হইতে টাকা আসিতে লাগিল। সে টাকা এখন তিনি মদ খাইয়াই উড়াইয়া দিন, কিম্বা বাইনাচ প্রভৃতি বাবুগিরিতেই খরচ করুন, কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই।

প্রজারা কত সময় মুখের অন্নগ্রাস পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া রাজাকে কর দান করে, তিনও কত সময় প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া আপনার উদর পূরণ করেন। এ অধিকার তাঁহাকে কে দিয়াছে? রাজার সঙ্গে প্রজার কি সেইরূপ সম্বন্ধ, যেমন বিদেশী পথিকের সহিত বোম্বেটের সম্বন্ধ? কেবল নেওয়া ভিন্ন কি রাজার আর কোন কাজ নাই? এ কথার উত্তর দিতে গেলে এখনি আসল জায়গায় ঘা লাগে। আমি যে গায়ের রক্ত জল করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিলাম, আর তুমি আসিয়া তাহা লুটিয়া লইয়া যাও, তুমি কে? আমার পুত্র পরিবার অন্নাভাবে প্রাণে মরিতেছে আর তুমি রাশি রাশি অর্থ লইয়া সুখে বসিয়া আছ কি জন্য? দুঃখী প্রজার এ কথার উত্তর দিতে গেলে রাজার মুখ শুকাইয়া যাইবে।

রাজা বলিতে পারেন যে, আমি শাসন না করিলে সংসার অরাজক হয় এবং সকলের অমঙ্গল হয়। মানিলাম, রাজা না থাকলে প্রজার অমঙ্গল হয়. কিন্তু রাজা যদি আপন সুখের জন্যই কেবল ব্যস্ত থাকেন তবে আর কি হইবে? প্রজা পুরুষানুক্রমে মূর্খ হইয়া রহিয়াছে, কতজন রোগে কাতর হইয়া ঔষধ পথ্য অভাবে মরিয়া যাইতেছে, রাজার কর্ম্মচারিগণ কত প্রজার সর্ব্বনাশ করিতেছে, তার উপায় রাজা কি করিলেন? তিনি যখন সুখে বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, তখন হয়ত কত প্রজা অনাহারে হাহাকার করিতেছে। প্রজারা যেমন রাজার সেবা করিবে, রাজাকেও তেমন প্রজার সেবা করা উচিত। রাজা কেবল বেতনভোগী চাকরের ন্যায় প্রজার মঙ্গল সাধন করিতে থাকিবেন; জোর করিয়া এক পয়সা লইবার তাঁহার অধিকার নাই। প্রজার নিকট টাকা লইয়া সেই টাকায় প্রজারই অভাব দুঃখ মোচন করিবেন। হে রাজা, হে জমীদার! মনে করিয়া দেখ অসহায় প্রজাকে মেরে কেটে টাকা আদায় করিয়া লইলে ইহার হিসাব কি একদিন দিতে হবে না? লিখিত আছে রাজা রামচন্দ্র একজন সামান্য প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য গর্ভবতী সীতাকে বনে পাঠাইয়া-ছিলেন; তোমরা লক্ষ লক্ষ প্রাণীর হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া এ পর্য্যন্ত কি করিলে? আশ্রিত প্রজাদিগকে খাইতে পরিতে দেও, বিদ্যা দান কর, এবং দুষ্ট লোকের অত্যাচার হইতে তাদের বাঁচাও; তবে ত জমীদারকে দুই হাত তুলিয়া তাহারা আশীর্ব্বাদ করিবে। কেবল কত টাকা মুনফা হইল তারই দিকে চাহিয়া থাকিও না, প্রজার দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী হও। তাদের ভালবাসিতে শিক্ষা কর। আপনার আপনার হিসাব পরিষ্কার করিয়া রাখ। ঈশ্বরের কাছে রাজা প্রজা উভয়কে এক জায়গায় দাঁড়াইতে হইবে। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারে

কাহারও চিরকাল ফাঁকি দিবার যো নাই। প্রতিজনের কড়ায় গণ্ডায় হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে।—'সুলভ সমাচার', ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা. ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১৮৭০ খ্রীঃ), পৃঃ ১৭।

"প্রজাপীড়ন" প্রবন্ধটির প্রায় সর্ব্বত্র "রাজা" শব্দ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক—নৃপতিও রাজা, জমীদারও রাজা। কিন্তু পাছে কেহ মনে করেন, প্রবন্ধটি কেবল জমীদারদের উদ্দেশে লেখা, সেই জন্য এক জায়গায় রাজা ও জমীদার উভয়কেই সম্বোধন করা হইয়াছে, এবং তাহার পর রামচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

"সুলভ সমাচার" হইতে "বড় লোক" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে বুঝা যাইবে, দেশের ও পৃথিবীর কাহাদিগকে কেশবচন্দ্র "বড়লোক" মনে করিতেন এবং জাতি-শ্রেণী-সাংসারিকপদমর্য্যাদা-নির্বিশেষে মানুষকে মানুষ বলিয়াই তিনি কিরূপ সম্মানার্হ ও জন্মগতঅধিকারসম্পন্ন মনে করিতেন।

বড় লোক

দেশের বড় লোক কাহারা? যাহাদের টাকা আছে—অর্থাৎ যাহারা আগে মিস্ত্রিগিরি ধোপাগিরি কি খানসামাগিরি করিয়া গুজরান চালাইতেন কিন্তু এখন কোন মত প্রকারে টাকা উপার্জ্জন করিয়া এদেশে বড় মানুষ বলিয়া সকলের কাছে পরিচিত হইয়াছেন? বলিতে গেলে বনেদি বড় ঘর এদেশে অল্প। কিন্তু **বাস্তবিক বড় মানুষ কাহারা? আমাদের দেশে এ দেশের ছোট লোকেরা।** তাহারা না থাকিলে কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিত। দেখ সামান্য লোকেরা আমাদের সর্ব্বস্ব দিতেছে। তাদের ধনে আমরা বড়মানুষী করিতেছি। কিন্তু কয়জন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব মনে করে? তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিন রাত্রি কষ্ট করিয়া আমাদিগকে অন্ন দিতেছে, কিন্তু কয়জন তাহাদিগের অবস্থা একবারও মনে করে?

বিলাতের যে এত টাকা এত বল বিক্রম, তাহা কোথা হইতে আসিল? সেই ছোট লোকদের হইতে। **পৃথিবীতে এমন এক সময় আসিবে যখন ছোট লোকেরা আর চুপ করিয়া থাকিবে না, আর দুঃখে মাটির শয্যায় পড়িয়া থাকিবে না।** এখনি বিলাতে তাহারা এমনি বলবান্ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারা আর রাজাকে মানে না, বড় মানুষকে মানে না, আপনাদের অধিকার আপনাদের বিক্রম আপনারাই প্রকাশ করিতে যায়। বিলাতের ভিতর আয়ারলণ্ড বলিয়া যে দেশ আছে, সেখানকার রেওতেরা বঙ্গদেশের রেওতের মত ঠিক দুর্দ্দশাপন্ন। জমিদারেরা তাহাদের কিছুই করিতে দেয় না। কিন্তু এই রকম দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া তাহারা এমনি দুরাচারী হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহাদের মধ্যে অনেকের এই এক গৌরবের বিষয় হইয়াছে, যে কে কত জমিদারকে মাঠের বেড়া হইতে একেবারে গুলি করিতে পারে। তাহাদের দুরাচারের ফল ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া এখন রাজপুরুষেরা ভয় পাইয়াছেন এবং ভয় পাইয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট ক'রতে চেষ্টা করিতেছেন। এই রকম সকল বড় বড় দেশে বড় মানুষে ছোট লোকে লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা নহে যে এখানেও রেওতেরা সেই রকম অত্যাচার করে। কিন্তু অন্যায় না করিয়া তাহারা তাহাদের পীড়নকারী জমিদারদের জব্দ করে, ইহা আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা।

ইহা করিতে হইলে লেখা পড়া শিক্ষা করা আবশ্যক। আমাদের পাঠকগণ **যাহারা তোমাদের মধ্যে রেওত বা কারিগর আছ, সকলে একত্র হইয়া একবার গা তুলো। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তোমরা যাহাতে দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরতা, প্রজাপীড়ন, বল পূর্ব্বক থামাইতে পার, ইহাতে একান্ত যত্ন কর।** তোমাদের ভালর জন্য দেখ আমরা এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি বাহির করিয়াছি। তোমরা আর নিদ্রা যাইও না। সময় হইয়াছে, উঠ। দেখ তোমাদের হইয়া বলে এমন লোক নাই। রাজপুরুষেরা তোমাদের কথা শুনিতে পান না, বড় মানুষেরা তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে না। এরূপ অপমান কি তোমরা চিরকাল সহ্য করিবে? তোমরা কি মানুষ নও? পরমেশ্বর কি তোমাদিগকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া সৃষ্টি করেন নাই? তবে কেন অজ্ঞান-নিদ্রায় পড়িয়া আছ? **তোমরাই এ দেশের বড় লোক, তোমরা না থাকিলে দেশ ছারখার হইবে, তাহা কি জান না?** অতএব যত্ন কর, চেষ্টা কর, জ্ঞান বিদ্যা লাভ কর। তাহার পর যখন আপনাদের অধিকার আপনারা বুঝিবে, আপনাদের কার্য্য আপনারা করিবে, তখন রাজপুরুষেরা তোমাদের কথা শুনিতে বাধ্য হইবেন, এবং অত্যাচারী বড় মানুষেরা তোমাদের বিক্রম দেখিয়া ভয় পাইবেন, এবং অবশেষে তোমাদিগকে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।—'সুলভ সমাচার', ১ম খণ্ড, ৪০ সংখ্যা, ৩১শে শ্রাবণ, ১২৭৮ (১৮৭১ খৃঃ) পৃঃ ১৫১।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রমিক-নেতারা চাষী মজুর ও কারিগর শ্রেণীর লোকদিগকে তাহাদের শক্তি, অধিকার ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তাহারা নিজের শক্তির বলে আপন অধিকার ও মর্য্যাদা যাহাতে অর্জ্জন করিতে পারে সেইরূপ চেষ্টা করিতে তাহাদিগকে বলেন। কেশবচন্দ্র "সুলভ সমাচারে" তাহাদিগকে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন—এবং বলিয়াছেন কখন?

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রমিকদের নেতা ও সমর্থকেরা সাধারণতঃ মনে করেন যে, শ্রমিকদিগকে জাগাইবার চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম করেন কার্ল মার্কস্ তাঁহার জার্ম্যান ভাষায় লিখিত Das Kapital পুস্তক দ্বারা। এই পুস্তকের মূল জার্ম্যান ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রথম বাহির হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ "সুলভ সমাচারে"র "বড় লোক" প্রবন্ধটির ১৫ বৎসর পরে। কেশবচন্দ্র জার্ম্যান জানিতেন না। সুতরাং তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা কার্ল মার্কসের প্রতিধ্বনি নহে—ভারতের কোন নেতারও প্রতিধ্বনি নহে; তাহা তাঁহার নিজস্ব।

"সুলভ সমাচার" সংবাদপত্রেই যে কেশবচন্দ্রের এইরূপ মত প্রকাশিত হইত তাহা নহে। তিনি ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার মধ্যেও এইরূপ কথা বলিতেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হইতে দিতেছি। উদ্ধৃত বাক্যগুলি ১৭৯৪ শকের (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের) ১৬ই মাঘ—১লা ফাল্গুনের 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ৬ষ্ঠ ভাগ, ২য় সংখ্যা হইতে গৃহীত। ১৭৯৪ শকের ১৪ই মাঘ কলিকাতায় সাতুবাবুর বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে পাঁচ হাজার লোকের এক সভায় কেশব একটি বক্তৃতা করেন।

…আবার পুনরায় তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, সামান্য লোকদিগকে কেহ দেখে না, তাহাদের দুঃখে কেহই দুঃখী হয় না, যাহারা সামান্য বলিয়া অনাদৃত হয় তাহারাই মানব সমাজের প্রধান অঙ্গ,…

তাঁহার এই বক্তৃতার আরও কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

এদেশে অনেক সামান্য লোক আছেন, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করে এমন লোক অতি অল্প। ছোট লোক বলিয়া সকলেই ইহাদের ঘৃণা করেন। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের যে এত টাকা তাহা কে দিতেছে—প্রথম শ্রেণীর লোক, না দ্বিতীয় শ্রেণীর, না তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর? যাহারা নিতান্ত গরিব ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে যায়, অতি সামান্য লোক, তাহাদেরই টাকাতে রেলওয়ে কোম্পানীর এত ধন। হিমালয় পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা কর, হিমালয় তুমি যে এত উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, কিসের উপর তুমি আছ? উচ্চ শিখরগুলি কি তোমার আশ্রয়? না নীচে যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত আয়তন আছে তাহাই তোমার অবলম্বন (করতালি)? সেইরূপ এদেশের দুই পাঁচটি ধনী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্য লোকদিগের উপর। দোকানদার না থাকিলে কি সহর একদিন চলিতে পারে? চাষা না থাকিলে কি একদিন বাঁচিতে পারে? (গভীর আনন্দধ্বনি ও করতালি।) এ সকল গরিব দুঃখী চাষা দোকানদার যতদিন গরিব দুঃখী থাকিবে, যত দিন তাহাদের দুরবস্থা দূর না হয়, তত দিন এ দেশের মঙ্গল নাই।

তাহাদের দারিদ্র্য ও দুঃখ দূর করা যে পরস্পরের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে, এই বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র তাহাও বলিয়াছেন।

তোমাদের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান অধিক তাহারা মস্তিষ্ক হও, যাহারা বহুদর্শন তাহারা চক্ষু হউক, যাহারা অধিক কাজ করিতে পারে তাহারা হাত হউক, যাহারা অধিক চলিতে পারে তাহারা পা হউক। এইরূপে সকলে মিলিয়া একটি শরীর হও, দেখিবে ঈশ্বর এই শরীরের প্রাণ হইয়া তোমাদের সকলের দুঃখ দূর করিবেন।

কেশবচন্দ্র ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মা যে দরিদ্রদের স্বজাতি, তাহা তিনি তাঁহার "জীবন বেদ" গ্রন্থের 'জাতি নির্ণয়' শীর্ষক চতুর্দশ অধ্যায়ে সরল ভাষায় নানা প্রকারে বলিয়াছেন।

'হে আত্মন্, তুমি কোন্ জাতীয়?" "অনেক অনুসন্ধানে এবং পঁচিশ বৎসরের সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আত্মা দরিদ্রজাতীয়। শরীরের রক্ত দুঃখীর রক্ত, মাথার মস্তিষ্ক দীনজাতির মস্তিষ্ক। যাহা কিছু আহার ব্যবহার দৈনিক, প্রচুর পরিমাণে তাহাতে দরিদ্রতাই লক্ষিত হয়।" "দুই দলের লোক আসিলে ধনী ছাড়িয়া মন দরিদ্রের খোঁজ লয়; দরিদ্রসহবাসে মন পরিতৃপ্ত বোধ করে। এই সমস্ত দেখিয়া সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মন কোন্ জাতীয়।" "সামান্য আহারে মন তৃপ্তি বোধ করে; দৈন্যসাধন ইহার স্বভাবসিদ্ধ। বহুকষ্টে দীনতা সাধন করিতে হয় না, শাকান্নেই আমি লোভী। আসক্তি যদি কোন পদার্থে থাকে, তবে সে পদার্থ শাক।" "বাষ্পীয় শকটে যদি কোনখানে যাইতে হয়, তৃতীয় ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে ভয় হয়। মনে হয়, বুঝি অনধিকারচর্চ্চা করিতেছি; ভয় হয়, বুঝি ধনীর রাজ্যে যাইতেছি।" "মন পলকের মধ্যে সিদ্ধান্ত করে, প্রথম ছাড়িয়া দ্বিতীয়ে এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়াই স্বভাবসিদ্ধ।"

কেশবচন্দ্রের "নবসংহিতা"র যে অধ্যায়ে ভৃত্যদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ আছে, তাহা হইতেও দরিদ্র জনগণের প্রতি তাঁহার প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অধ্যায় হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

"৩। প্রভু কি সেবা করিবে? ভৃত্যই কেবল সেবা করিয়া থাকে—দাম্ভিক হৃদয়ের এইরূপ যুক্তি। ৪। নিশ্চয় প্রভুও সেবা করে, তাহা ভৃত্যের অপেক্ষা ন্যূন নহে। সেবা না করিলে কেহ প্রভু হইতে পারে না। ৫। যিনি পৃথিবী ও স্বর্গের অধিপতি,

তিনিও সেবা করিয়া থাকেন। এমন কি, প্রতিদিন তিনি আপনার গৌরবের সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া নিজের দুঃখী নীচতম সেবকদিগেরও সেবা করেন। ৬। অতএব, হে গর্ব্বিত মানব, অহঙ্কারকে একেবারে বিদায় করিয়া দিয়া এইটি মনে কর যে যাহারা তোমার সেবার জন্য আসিয়াছে তাহাদের সেবা করা যথার্থ একটি স্বর্গীয় কার্য্য। ৭। গৃহস্বামী ঈশ্বরের ভাবে নীত হইয়া অধীনস্থ সামান্য ভৃত্যবর্গকে স্নেহবাৎসল্যের যোগ্য সন্তান জ্ঞানে তাহাদিগের উপর পিতার ন্যায় দৃষ্টিপাত করিবেন।"

নবসংহিতায় কেশবচন্দ্র ভৃত্যদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও আরামের, জ্ঞানবৃদ্ধির, এবং নৈতিক ও আত্মিক কল্যাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধি নিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাধারণ লোকদের অধিকার ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র শুধু লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাহাদের হিতকল্পে প্রতিষ্ঠান স্থাপনও করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রমিক বিদ্যালয় (Industrial School) এবং কারিগরদের প্রতিষ্ঠান (Workingmen's Institution) স্থাপন করেন। এই দুটিতে শ্রমিক শ্রেণীর লোকদিগকে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ইংরেজী শিখান হইত, আবার অ-শ্রমিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে ছাপিবার ও লিথোগ্রাফের কাজ, ছুতারের কাজ, দরজির কাজ, ঘড়ি মেরামতের কাজ, খোদাইয়ের কাজ, বহি বাঁধিবার কাজ, টিনের বাক্স নির্ম্মাণের কাজ, প্রভৃতি শিখান হইত। সরকারী আফিসের কেরানী, কলেজের পাস করা গ্র্যাডুয়েট, কেশবচন্দ্রপ্রমুখ ধর্ম্মপ্রচারক—সবাই উৎসাহের সহিত এই সব কারিগরি শিখিতেন। কেহ কেহ নিজে কোন কোন শিল্প শিক্ষা করা ছাড়া শ্রমিক বিদ্যালয়ের শ্রমিক শ্রেণীসমূহের ছাত্রদিগকে সাধারণ লেখাপড়া শিখাইতেন। কেশবচন্দ্র নিজে ছুতারের কাজ এরূপ ভাল শিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার নির্ম্মিত নানাবিধ আসবাব দেখিয়া লোকের মনে হইত যে, সেগুলি যেন আবাল্য ছুতারের কাজ করিতে অভ্যস্ত কোন লোকের দ্বারা প্রস্তুত। যাহারা শ্রমিক কারিগর শ্রেণীর লোক তাহাদিগকে তাহাদের জাত-ব্যবসা ছাড়া সাধারণ লেখা পড়া এবং মধ্যবিত্ত "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোকদিগকে সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া কোন কোন শিল্প শিখাইলে তাহার ফলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে এক প্রকার জাতিভেদ রহিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে পারে এবং "শ্রেণীহীন সমাজ" ("classless society") গড়িয়া উঠিতে পারে। কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠানগুলির ফলের এই দিকে গতি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

জাতিভেদ-প্রথা থাকিতে মহাজাতিগঠন ("nation-building") সম্ভবপর নহে। কেশবচন্দ্র উপরে বর্ণিত পরোক্ষ উপায়েই যে জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি সকল জাতির সাম্য প্রচার করিয়া এবং অসবর্ণ বিবাহকে বৈধ করিবার নিমিত্ত আইন পাস করাইয়া ও নিজ পরিবারে ও অন্যত্র সেরূপ বিবাহ দিয়া জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেন। আহারে জাতিভেদ ত তিনি মানিতেনই না। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদের অন্তর্গত। কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূরীকৃত হইলেই জাতিভেদ যাইবে না। সম্ভবতঃ তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী নিজ ব্যাখ্যানুযায়ী বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সমর্থন করিলেও অসবর্ণ বিবাহেও কোন আপত্তি করেন না—তাঁহার এক পুত্রবধূই ত ব্রাহ্মণকন্যা। তিনি নিজে গন্ধবণিক।

কোন দেশের বালিকারা বহুস্থলে বাল্যকালেই সন্তানের জননী হইলে সেইরূপ সন্তানদের সমষ্টি দেহমনে শক্তিশালী একটি মহাজাতিতে পরিণত হইতে পারে না—এরূপ মাতাদেরও দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও স্বাস্থ্য-রক্ষা হইতে পারে না। বাল্যমাতৃত্বের কুফল বুঝিয়া, যে আইন দ্বারা কেশবচন্দ্র অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা সাধন করান, সেই আইনানুযায়ী বিবাহ কেবল অন্যূন ১৪ বৎসর বয়স্কা পাত্রী ও ১৮ বৎসর বয়স্ক পাত্রের মধ্যে হইতে পারে এইরূপ বিধান করাইয়াছিলেন।

মহাজাতি গঠন করিতে হইলে রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি যত প্রকার মতের আলোচনা ও প্রচার করিতে হয়, যত প্রকার আন্দোলন করিতে হয়, তাহা করিবার নিমিত্ত সংবাদপত্র একান্ত আবশ্যক। এখন বঙ্গে ও ভারতবর্ষে যত সংবাদপত্র আছে, কেশবচন্দ্রের বাল্যকালে, যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে তাহা ছিল না। তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তেইশ বৎসর বয়সে ইংরেজী "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা প্রথমে পাক্ষিক ছিল; পরে সাপ্তাহিক হইয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তেত্রিশ বৎসর বয়সে দৈনিকে পরিণত হয়। ইহার দ্বারা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মত প্রচার ও গঠনের কার্য্য দক্ষতা ও সাহসের সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, কেশবচন্দ্র

বাংলা সাপ্তাহিক "সুলভ সমাচার" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার মূল্য ছিল এক পয়সা। ভারতবর্ষে বোধ হয় ইহাই প্রথম সস্তা খবরের কাগজ—বড়ে ত বটেই। দুই সপ্তাহের মধ্যেই ইহার ৫০০০ কাটতি হইতে আরম্ভ হয়, দুই মাসে হয় ৮০০০। পরে আরও বাড়িয়াছিল। আমরা বাল্যকালে ইহা পড়িতাম। আমাদের ছোট বাঁকুড়া শহরে প্রায় দেড় শত খানা যাইত। ইহাতে কিরূপ লেখা বাহির হইত, তাহার কিছু নমুনা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। রঙীন কাগজে ছাপা "পূজার সুলভ" সেকালে আমাদের অতি প্রিয় ছিল। তাহাতে নির্ম্মল ব্যঙ্গ কৌতুক থাকিত, তদনুরূপ কিছু ছবিও থাকিত। সরকারী ইংরেজ কোন কর্ম্মচারী স্বদেশবাসী কাহারও উপর অত্যাচার করিলে "সুলভ সমাচারে" যথোচিত মন্তব্য প্রকাশিত হইত। ১২৭৮ সালের ৭ই ভাদ্রের "সুলভ সমাচারে" 'কাণমলাতেও মন উঠে না' শীর্ষক একটি ছোট নিবন্ধ ছাপা হয়। তাহার শেষে আছে—

"ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে কেবল ইংরেজের মার-খেগো বাঙ্গালীদের চীৎকারধ্বনি শোনা যাইতেছে। একি! কে এত অন্যায় সহিবে ?...হুজুরদের সেলাম না করিলে বাঙ্গালীর ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়; কিন্তু কালা বাঙ্গালীর গায়ে হাত তুলিবার বেলায় বুঝি ভায়াদের স্নেহ প্রকাশ পায় ?"

"সুলভ সমাচারে"র আর একটি ছোট প্রবন্ধ এইরূপ :

বাঙ্গালীর খাঙ্গড় হওয়াই ভাল

পরাধীন জাতির আবার জজ হওয়াই বা কেন মেজিষ্ট্রেট হওয়াই বা কেন ? বাঙ্গালী হয়ে স্বর্গবাসী সাহেবদের সঙ্গে লাগাই বা কেন ? বাঙ্গালীদের লেখা পড়া শিখে বড়ই দায় হইয়াছে। আদর করে আমরা বিপদ ডেকে এনেছি। এ দিকে গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালীদিগকে ডেকে ডেকে বড় বড় কর্ম্ম দিতেছেন, আবার একটুকু স্বাধীনভাবে চলিলেই অমনই লাথি ঝাঁটা মারিতেছেন। দিনাজপুরের মুনসেফ বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষের বিষয়ে গবর্ণমেন্ট এই রূপ সদাচারের বেশ পরিচয় দিয়াছেন। ঐ জিলার জয়েন্ট মেজিষ্ট্রেট ওএষ্টমেকট সাহেব মুনসেফের কাছারির কোন আজ্ঞা অবমাননা করাতে, অতুলবাবু তাঁহার নামে গ্রেপতারি পরওয়ানা দেন। এই অপরাধে আমাদের ছোট লাট সাহেব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। ছোট লাট সাহেব এ বিষয়ে বড় আদালতের জজদের মতামত জিজ্ঞাসা করাতে বড় জজ এবং জজ বেলী ও মেকৃফারসন মুনসেফকে ছয় মাসের নিমিত্ত সারকুলার করিয়া সসপেণ্ড করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট লাট তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া আপনার রায় বজায় রাখিয়াছেন। রাখিবেনই তো। কালা বাঙ্গালি হয়ে ধবধবে সাহেবের সঙ্গে চালাকি ? বিদ্যা বুদ্ধির তারতম্য থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু বর্ণ টা কত তফাত। ধন্য হে সাহেব ভায়ারা ! কিংশুভক্ষণেই তোমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা যাহা কর তাহাই শোভা পায়। আমাদের পান থেকে চুন খসিলেই সর্ব্বনাশ। বড় লাট সাহেব এবং ছোট লাট সাহেব উভয়েই তোমাদের স্বজাতি। আমরা পর বই তো নই ? তাতে আবার আমরা কাঙ্গাল অধীন প্রজা। জগতে রাজার জাতির জয়জয়কারই চিরকাল।—'সুলভ সমাচার,' ১ম খণ্ড, ৪১ সংখ্যা, ৭ই ভাদ্র, ১২৭৮ (১৮৭১ খৃঃ), পৃঃ ১৬১-১৬২।

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্ম "বালকবন্ধু" নামক একটি সচিত্র কাগজ কেশবচন্দ্র প্রকাশ করেন। এ বিষয়েও তিনি পথপ্রদর্শক। মহিলাদের জন্ম তিনি "পরিচারিকা" প্রকাশ করেন।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তি। তাঁহার "জীবন বেদে" 'স্বাধীনতা' সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আছে। তাহার কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"অধীনতা পাপ, অধীনতা অনিষ্টের হেতু, অধীনতা ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা।" "স্বাধীনতাই হইল আদি শব্দ। অধীন হইব না, এই সঙ্কল্প ব্যতীত, এ-ভাব হইতে আর কি ফল ফলিতে পারে ? এই স্বাধীনতা হইতেই অনেক গুরুতর কার্য্য প্রসূত হইয়াছে।" "স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইয়া অধীনতার দুর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে।"

কেশবচন্দ্র যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও ফল সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল "বঙ্গবাণী"তে লিখিয়াছিলেন :—

বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী যে স্বাধীনতামন্ত্র সাধন করিয়া আসিয়াছে, বলিতে গেলে কেশবচন্দ্রই সেই মন্ত্রের একরূপ প্রথম দীক্ষাগুরু। জাতীয় স্বাধীনতা জগতের সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিউজিনটদের সাধনে ও স্বার্থত্যাগেই ফরাসীসের স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডেও পিউরিটানদিগের সাধন দেখিতে পাই। আমাদের সমকালে রুশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সংগ্রামও বহুল পরিমাণে টলষ্টয়ের শিক্ষা এবং আদর্শকে আশ্রয় করিয়াই জাগিয়া ওঠে। যেখানেই জাতীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই তাহার গোড়ায় একটা ধর্ম্মের প্রেরণা জাগিয়াছে। এই ধর্ম্মের প্রেরণায় মানুষ আগে ভিতরের বাঁধন কাটিয়াছে। নিজের চিন্তা ও চিত্তকে বাহিরের বন্ধনমুক্ত করিয়াছে, পরিবারে ও সমাজে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছে, এবং পরিণামে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই নিজের রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম অগ্রসর হইয়াছে। ভিতরে যে দাস, বাহিরে সে স্বাধীন হইতে পারে না। পরিবারে এবং সমাজে যে আপনার বিচারবুদ্ধি এবং বিশ্বাস অনুসারে চলিতে ভয় পায়, সে কখনও নির্ভীক হইয়া একতন্ত্র রাজশক্তির সম্মুখীন হইতে পারে না। কেবল সাংসারিক সুখ

সুবিধা যেখানে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল প্রেরণা হইয়া রহে, সেখানে এই স্বাধীনতার সংগ্রাম কদাপি জয়যুক্ত হইতে পারে না। যেখানে জয়যুক্ত হয়, সেখানে দেশের জনসাধারণে এক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অপর অধীনতাতে যাইয়া পড়ে, 'স্ব'য়ের উপর দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণা লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা বিশুদ্ধ, উদার এবং অপরাজেয় হইয়াছে এবং হইতেছে। এই দিক দিয়া ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বর্ত্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার মূলে একরূপ প্রথম শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু-রূপে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে দেখিতে পাই।—বিপিনচন্দ্র পাল: "বাংলার নবযুগের কথা" [বঙ্গকথা—ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—প্রথম অধ্যায়] "বঙ্গবাণী", ১ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩২৯, পৃঃ ৬৩-৭৩।

ভারতবর্ষ নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাসভূমি। এই সমুদয় সম্প্রদায়ের সকল লোক বিশেষ একটি কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই—অন্ততঃ আমাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতে যত দূর যায়, তাহার মধ্যে এরূপ কোন ঘটনার সম্ভাব্যতা দেখিতে পাইতেছি না। এই সমুদয় সম্প্রদায়ের লোককে লইয়া একটি মহাজাতি (নেশুন) গড়িতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার মধ্যে একটি এই যে, এমন কিছু করা চাই যাহাতে সকল ধর্ম্মের লোকেরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে পারে। সকল ধর্ম্মের মধ্যে—তাহাদের শাস্ত্রসমূহের মধ্যে, এরূপ বহু তত্ত্ব ও সত্য আছে যাহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতে পারে ও মানিতে পারে। আধুনিক যুগে রামমোহন রায় যতগুলি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র জানিতেন, সমুদয়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রও এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মীরা এক এক জন এক একটি ধর্ম্মের বিশেষ অনুশীলন করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেন আরবী ফারসী শিখিয়া কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন, এবং বহু মুসলমান তাপস ও তপস্বিনীর বিষয়ে "তাপস-মালা" গ্রন্থ রচনা করেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার "প্রাচ্য-খ্রীষ্ট" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে খ্রীষ্টকে নব প্রাচ্য রূপে অঙ্কিত করেন। অঘোরনাথ গুপ্ত বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া "শাক্যমুনি-চরিত" রচনা করেন। গৌরগোবিন্দ রায় গীতা প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সমন্বয়ভাষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। সকলের সকল কার্য্যের উল্লেখ এখানে করা যাইবে না। "শ্লোকসংগ্রহ" নামক একটি গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন জরথুষ্ট্রীয় ইহুদী খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান ও শিখ ধর্ম্মের শাস্ত্রসকল হইতে সদুপদেশপূর্ণ উক্তিসমূহ সংগৃহীত হয়।

এইরূপে কেবল যে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারাই বিবিধ ধর্ম্মের মর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে ও সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ সদ্ভাব ও মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করা হয়, তাহা নহে। কেশবচন্দ্র "সাধু-সমাগম" নামক একটি সাধন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। তদনুসারে সাধককে এক এক দিনে এক এক ধর্ম্মোপদেষ্টা, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সাধু মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের সহিত যোগস্থাপনের চেষ্টা করিতে হয়। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ, বুদ্ধদেব, গ্রীসের সোক্রাটিস্, ইহুদীদের মূসা (Moses), খ্রীষ্ট, মোহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতির ব্যক্তিত্বের সহিত সংস্পর্শে আসিবার বিধান হয়। শুধু ধর্ম্মজগতের এই সকল অসাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসিতেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে। ফারাডের মত বিজ্ঞানী এবং কার্লাইল এমার্সন প্রভৃতি মনীষীদের সহিত যোগ স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হয়। সর্ব্ববিধ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এই প্রকারে উৎপাদন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়।

উপরে বলিয়াছি, সকল ধর্ম্মের, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের ও সকল সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা কেশবচন্দ্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। পৌরাণিক ধর্ম্ম ও পুরাণসমূহও এই শ্রদ্ধা যথাযোগ্যভাবে পাইয়াছিল। বহু দেবদেবীর কল্পিত রূপ, স্বরূপ ও কাহিনীর মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সত্য নিহিত আছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি প্রগাঢ়তর ও পূর্ণতর করিয়াছিল, কিন্তু একেশ্বরবাদ হইতে তাঁহাকে দূরে লইয়া যায় নাই।

কেশবচন্দ্র এই প্রকারে হৃদয়মনের ঔদার্য্যলাভ দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও ঈর্ষ্যাদ্বেষ অতিক্রম করিবার উপদেশ দেন। তিনি মহাজাতিগঠনের উপায় চিন্তা করিয়া গভীর স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন।

সকল দেশের জনসমষ্টি অর্দ্ধেক পুরুষ অর্দ্ধেক নারী। নারীকুলের জাগৃতি ও উন্নতি না হইলে জাতীয় অভ্যুত্থান

ও জাতিগঠন হইতে পারে না। বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য কেশবচন্দ্র যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আগে বলা হইয়াছে। অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টাও তিনি বিশেষ ভাবে করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ সালে, তাঁহার ২৫ বৎসর বয়সে, স্থাপিত ব্রাহ্মবন্ধু সভার পাঁচটি উদ্দেশ্যের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল নারীদের মঙ্গলের জন্য তদুপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ। সেকালে বালিকা-বিদ্যালয় ও নারী-শিক্ষালয়ের সংখ্যা কম ছিল। সেই জন্য, যাহারা বালিকা-বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না এরূপ বালিকাদের জন্য গৃহে শিক্ষালাভের সুবিধার্থ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের একটি তালিকা প্রণীত হইয়াছিল। প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা-দেরও গৃহে থাকিয়া শিক্ষালাভের জন্য ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে ভারতসংস্কার সভা স্থাপন করেন, তাহার সুলভ সাহিত্য, নারীদের উন্নতি, শিক্ষা, সুরাপান নিবারণ, এবং দুঃস্থদিগকে সাহায্য দান, এই পাঁচটি বিভাগ ছিল। জাতিগঠনের জন্য এই পাচটিই আবশ্যক। দ্বিতীয় বিভাগ হইতে বালিকা-বিদ্যালয়, প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের জন্য বিদ্যালয় এবং শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত "বামাবোধিনী পত্রিকা" নারীশিক্ষার সহায়ক ছিল। নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রীরা বামাহিতৈষিণী সভা নামক একটি সভা স্থাপন করেন। তদ্ভিন্ন, মহিলাদের জন্য অন্তঃপুর সভা, ব্রাহ্মিকা সমাজ, বামাবোধিনী সভা এবং আর্য্যনারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মসমাজে নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার ভোগ করেন। তাঁহারা আচার্য্যের কাজ পর্য্যন্ত করিবার অধিকারী এবং করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের নারীদের উন্নতির যে চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের নারীদিগেরও কল্যাণ হইয়াছে।

সেকালে সুরাপান-নিবারিণী সভার প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছিল। আশাবাহিনীর (Band of Hopeএর) কার্য্যকলাপ বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল। সুরাপান-নিবারণ বিভাগ গবর্মেণ্টের আবগারী বিভাগের তীব্র সমালোচনা করিতেন ও সরকারী আবগারী নীতির সমুদয় কুফল গবর্মেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের গোচর করিতেন। "মদ না গরল" নামক কেশবচন্দ্রের একটি পত্রিকা আশাবাহিনী বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন।

শিক্ষিত যুবজনের স্বভাবচরিত্র যাহাতে আদর্শানুরূপ হয় ও থাকে, কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজ সে বিষয়ে সেকালে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ও তাহার বাহিরের বহু যুবজনের ও অধিকবয়স্ক লোকদিগের চরিত্র উন্নত ছিল।

বিহার ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশদ্বয়কে বঙ্গে পশ্চিম বলা হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ চেষ্টা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্ম-মন্দিরে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন এবং যথোপযুক্ত সাহায্য করেন। কেশবচন্দ্র ও অন্য যুবকেরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। এখন দুর্ভিক্ষ হইলে অর্থ-সংগ্রহ ও সাহায্য বহু সভা সমিতি করিয়া থাকেন, ইহা সন্তোষের বিষয়। তখনকার দিনে কিন্তু এরূপ কাজ নূতন ছিল। এক প্রদেশের লোকদের দ্বারা অন্য প্রদেশের বিপন্ন লোকদের সাহায্য হইলে তাহাতে কেবল যে দয়াধর্ম্ম আচরিত হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা পরোক্ষ ভাবে জাতিগঠনেরও সাহায্য হয়। ঐ বৎসরই নিম্নবঙ্গের নানা স্থানে ব্যাপক ভাবে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। কেশবচন্দ্রের আগ্রহে ও উদ্যমে নানা স্থানে বিপন্ন লোকদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করা হয়। তখন তাঁহার বয়স তেইশ। অন্য প্রদেশে ও নিজের প্রদেশে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের যে চেষ্টা তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের দ্বারা হয়, তাহাকে যুব-প্রচেষ্টার (Youth Movementএর) সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। সেবা দ্বারা সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর লোকদের সহিত প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া জাতিগঠনেরও ইহা একটি প্রাথমিক দৃষ্টান্ত।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তেইশ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র জাতীয় শিক্ষার একটি সর্ব্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের এক সভায় তাহা প্রকাশ করেন

তাহাতে অতি দরিদ্র সাধারণ লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, পুরুষ- ও নারী- নির্বিশেষে, সকল শ্রেণীর লোকের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে দেহ-মন-আত্মার সমঞ্জসীভূত কল্যাণের উপর দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। স্বাবলম্বন তাহার মূলমন্ত্র ছিল, এবং এরূপ শিক্ষা তিনি দিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে ভারতের লোকেরা বিদেশী-ভাবাপন্ন না হয়। এত বড় একটি পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করা বহুবৎসরব্যাপী-চেষ্টাসাপেক্ষ, এবং বহু ব্যয়সাধ্য। তিনি বাঁচিয়াছিলেন মাত্র ৪৫ বৎসর, এবং নিজের অর্থবল ও সংগৃহীত অর্থের প্রাচুর্য্য তাঁহার ছিল না। সেই জন্য পরিকল্পনাটি কিয়ৎ পরিমাণেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ পারেন নাই।

সর্ব্বসাধারণের মিলামিশার জন্য এবং নানাবিষয়িণী বক্তৃতা ও আলোচনার জন্য তিনি আলবার্ট হল ও আলবার্ট ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ইন্সটিটিউটে লাইব্রেরী ও পাঠাগার ছিল। এখন কলিকাতায় হল কতকগুলি এবং লাইব্রেরী ও পাঠাগার অনেক হইয়াছে। তখন এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল।



কেশবচন্দ্র সেন

তিনি বিদেশীভাবাপন্ন হওয়ার বিশেষ বিরোধী ছিলেন। নিজে কখনও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন না। যে-কোন দেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে এবং তথাকার ভাল যাহা কিছু তাহা স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অ-ভারতীয় হওয়ার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বাথ, বার্মিংহাম, এডিনবরা, গ্লাসগো, লণ্ডন প্রভৃতি বিলাতের নানা স্থানে তিনি বিজাতীয়তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহা তথাকার লোকেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মিস্ এলিজাবেথ শার্পের দুখানি চিঠিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ আগষ্ট রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তাঁহার চিঠিতে আছে :—

P. S. I cannot help wishing to tell you that one of the things we greatly admire in Babu Keshub is his strong wish that his country shall not be denationalised, but that it shall be elevated and improved according to its own nature; it seems to us India can only be thus truly reformed, having life of its own as the basis of reformation, not adopting in all things foreign ways and habits.

—রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃঃ ১৩৪-৩৫।



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

১৮৭০ সালের ২৪শে মে তারিখের ভারতে ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় বক্তৃতায়। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এবং ভারতীয়দের সহিত ইংরেজদের ব্যবহারের এরূপ তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়ান মিরারের প্রত্যেক ইংরেজ গ্রাহক উহা ছাড়িয়া দিয়াছিল, এবং এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা তাঁহাকে সমস্বরে গালাগালি দিয়াছিল। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। বোম্বাইয়ের এক জন ক্রুদ্ধ ইংরেজ বলে, "ঘোড়ার চাবুক হস্তে দণ্ডায়মান আমার সামনে কেহ যদি ঐ বক্তৃতাটা পাড়তে পারে, তাহাকে আমি ৫০০৲ টাকা দিব।"

তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসের সহিত সমঞ্জসীভূত সাম্যবাদে বা স্বত্বসাধারণ্যে (communismএ) বিশ্বাসের আভাস দিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমে। এখানে অনেকগুলি পরিবার এক পরিবারের মত বাস করিতেন, আহারাদি একত্র করিতেন, জ্ঞানানুশীলন, উপাসনা প্রভৃতি একত্র করিতেন।

অন্য সকল বিষয়ে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠা যেমন বহু মানুষকে সংহত ও শক্তিশালী করে, তেমনই ধর্ম্মবিষয়েও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস জাতিকে সংহত ও শক্তিশালী করিতে পারে। এই জন্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মবিশ্বাসও জাতিগঠনের অনুকূল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চের চিঠিতে আছে—

...I can give you another instance of how strongly we respect those who honour their own country and national life.

Another friend of mine was struck with pleasure by nothing so much by Keshub Babu's last speech in London as by his saying, "I came here an Indian and return a confirmed Indian."

—ঐ পৃঃ ১৬৫।

বিলাতে তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়, শ্রেণী বা প্রদেশের লোক বলিয়া আত্মপরিচয় না দিয়া নিজেকে "ভারতীয়" (Indian) বলিতেন, যেমন বলিয়াছিলেন

[কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত "সুলভ সমাচার", "বঙ্গবাসী" ও "রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত" হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলি ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ যোগানন্দ দাস আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।]

মহিলা-সংবাদ



পরলোকগতা শিল্পী সুকুমারী দেবী

["বিবিধ প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য]



শ্রীমতী সুপ্রীতি মজুমদার

পরলোকগত অধ্যাপক অভয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুপ্রীতি মজুমদার এই বৎসর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।



শ্রীমতী শেফালিকা রায়

শ্রীমতী শেফালিকা রায় মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ ভেলোরে শিশু-বিচারশালার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং নারী-কারাগারের অবৈতনিক পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় শিশু-মঙ্গল-সমিতি, গার্ল গাইড, রেড ক্রশ প্রভৃতির কাজের সহিতও তিনি যুক্ত আছেন।

গৌহাটি

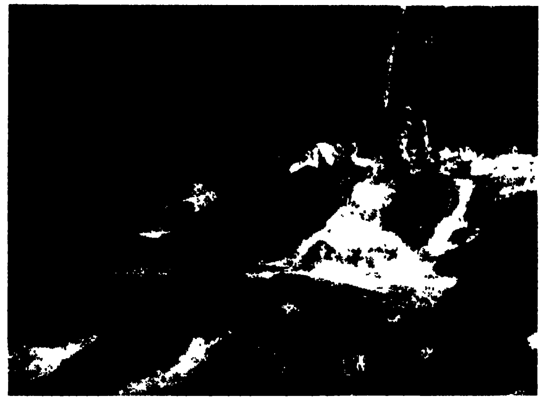
শ্রীভুবনমোহন সেন

আগামী বড়দিনের ছুটিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশন গৌহাটিতে হইবে। গৌহাটি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রধান শহর—শিলঙের প্রবেশপথ—উপর-আসামের দ্বার—একটি বিশিষ্ট শিক্ষা ও ব্যবসা কেন্দ্র—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে নয়নমনোহর। তথাপি, গৌহাটির ও আসামের প্রকৃত কাহিনী বঙ্গীয় সমাজে যথোচিত পরিজ্ঞাত নহে। তজ্জন্য যে-সব সুধীবৃন্দ আগামী সম্মেলন উপলক্ষে গৌহাটিতে আসিবেন, তাঁহাদের নিকট গৌহাটিকে পরিচিত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।



কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি ও মিউজিয়ম

কামরূপ জেলার সদর হইল গৌহাটি। কামরূপ অতি প্রাচীন দেশ। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, তন্ত্রে কামরূপের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন যেমন কামরূপ বলিলে একটি জেলাকে বুঝায়, পূর্ব্বকালে কামরূপের আয়তন ছিল ইহা অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। "করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিকর বাসিনীম্" যোগিনী-তন্ত্রের এই শ্লোকাংশে প্রাচীন কামরূপের সীমানা বর্ত্তমান বগুড়া জেলার করতোয়া নদী হইতে পূর্ব্ব-আসামের দিকরাই নদী পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কালিকা-পুরাণের মতে, কামদেব মহাদেবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইবার পর এই স্থানেই মহাদেবের কৃপায় স্বরূপপ্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম কামরূপ। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ।*



বশিষ্ঠাশ্রম

কালিকা-পুরাণে নরকাসুর নামক এক জন প্রাচীন কামরূপ রাজার উল্লেখ আছে। নরকাসুরের পূর্ব্বে মহীরঙ্গ দানব, হটকাসুর, সম্বরাসুর, রত্নাসুর প্রভৃতি রাজার নামও কালিকা-পুরাণে উল্লেখ আছে। গৌহাটি-শিলং রাস্তার সপ্তম মাইলে মইরাং পর্ব্বত ইহাদের রাজধানী ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। রাজা নরক মহীরঙ্গ-বংশ পরাজয় করিয়া গৌহাটিতে রাজধানী স্থাপিত করেন। গৌহাটির জনসাধারণ আজও নরক পাহাড় বলিলে একটি পর্ব্বত-বিশেষকে বুঝিয়া থাকে।

নরকাসুরের পর তৎপুত্র ভগদত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্ব্বদিকে চীনদেশ পর্য্যন্ত

* প্রাগ্‌জ্যোতিষ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য পাঠক স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'কামরূপ শাসনাবলী' নামক গ্রন্থের ভূমিকা ও রায় বাহাদুর কনকলাল বরুয়া মহাশয়ের "Early History of Kamrup," Chap. I দেখুন।



উমানন্দ ভৈরবের মন্দির

ও দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভগদত্ত স্বীয় শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভারতে ভগদত্তের বিষয় এইরূপ উল্লিখিত আছে :—

"স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানুপবাসিভিঃ"

স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'কামরূপ শাসনাবলী'তে লিখিয়াছেন :—

'আলোচ্যমান সমস্ত তাম্রশাসনেই নরক ও ভগদত্তের কথা আছে এবং ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন ছাড়া অন্যগুলিতে বজ্রদত্তের উল্লেখও আছে।'

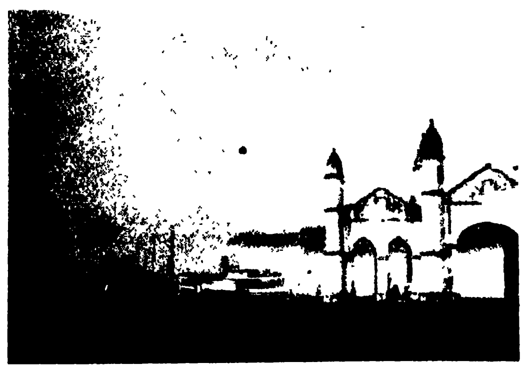
প্রয়াগে আবিষ্কৃত সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপিতে কামরূপের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। আসামের তেজপুরের পাষাণলিপিতে "গুপ্ত ৫১০" লিখিত আছে। অশোকের কোনও স্তম্ভ আসাম প্রদেশে এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক ওয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন :—

"They (the people of Kamrup) worshipped the Devas and did not believe in Buddhism. So there had never been any Buddhist monastery in the land."—Watters' *Yuan Chawang.*

চতুর্থ শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন এমন তের জন কামরূপ-নৃপতির নামোল্লেখ স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে করিয়াছেন। ইঁহারা ভাস্কর বর্ম্মার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ।

কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মার রাজ্যকালে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীন-পরিব্রাজক ওয়ান্ চোয়াং কামরূপ পরিদর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মা কুমার রাজা নামে বিখ্যাত ছিলেন। সমগ্র ভারতে তাঁহার পরাক্রমের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। কবি বাণের "হর্ষচরিত" গ্রন্থে এবং চীন-পরিব্রাজক ওয়ান্ চোয়াং সম্বন্ধে পুস্তকাদিতে কুমার রাজার শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভগদত্তের সময় যেরূপ সমসাময়িক আর্য্যাবর্ত্তের ও কামরূপ রাজ্যের রাষ্ট্রীয় জীবনের একত্ব প্রতিপাদন হইয়াছিল, কুমার রাজার সময়েও তদনুরূপ হইয়াছিল।

ভাস্কর বর্ম্মার পরেই ঐতিহাসিক ধারার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে কামরূপের রাষ্ট্রীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়। বিভিন্ন তাম্রশাসনে উল্লিখিত কামরূপ-অধিপতিগণের নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাস্কর বর্ম্মার পরে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা গৌহাটি কামরূপ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। হারূপেশ্বর, দুর্জ্জয়া, কমতাপুর প্রভৃতি রাজধানীর নাম পাওয়া যায়; গৌহাটি তখন বিস্তৃত জনপদে পরিণত হইয়াছে। তবে পরবর্ত্তী মুসলমান আক্রমণের গতি পরিলক্ষণ করিলে বুঝা যায়, একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত গৌহাটির সন্নিকটেই রাজধানী অবস্থিত ছিল।



নর্থব্রুক গেট হইতে পাণ্ডু আমীনগাঁও পরিদৃশ্যমান

মুসলমান আক্রমণের প্রাথমিক বেগ গৌহাটির সন্নিকট হইতেই প্রতিহত হইয়াছিল। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিল্‌জি কামরূপ আক্রমণ করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন বক্তিয়ার খিল্‌জির উদ্দেশ্য ছিল, কামরূপের পথে তিব্বত চীন জয় করা। কামরূপের রাজধানী তখন উত্তর-গৌহাটিতে—ইহাকে কামরূপ নগর বলা হইত। এই উত্তর-গৌহাটিতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে :

শাকে তুরগযুগেশে মধুমাসি ত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কা ক্ষয়মাযযুঃ॥



নারায়ণী হাণ্ডিকী ইনষ্টিটিউট

মুসলমানগণের প্রথম আক্রমণের সময় আহোম রাজ্য সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিস্তৃত হয় নাই, কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বারভুঞা, ছুটিয়া, কাছারী ও আহোমগণের আধিপত্য ছিল।

অতঃপর কমতাপুর নামক স্থানে কামরূপের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে হুশেন সা কর্ত্তৃক কমতাপুর অধিকৃত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ কামরূপের হাজো পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তার করেন। হাজোর সন্নিকটস্থ আগিয়াঠুটি পর্ব্বত—যাহার নিকটে মুসলমানদের সঙ্গে অনেকবার কামরূপ রাজের যুদ্ধ হইয়াছিল—আমিনগাঁও হইতে পরিষ্কার দেখা যায়।

ইতিমধ্যে পশ্চিমে কোচ-রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়। কোচ-রাজগণ গৌহাটির অনতিদূরে বরনদী পর্য্যন্ত ভূখণ্ড দখল করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচ-আহোম সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই আহোমগণ শ্যামদেশের সন্নিকট হইতে আসিয়া প্রথমে পূর্ব্ব-আসামে এবং কালক্রমে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করেন। কোচ-প্রাধান্যের সময় গৌহাটির যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সে খ্যাতি রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র হিসাবে নয়, কামাখ্যা মহাপীঠের সংলগ্ন বলিয়া। কামাখ্যা দেবীর বর্ত্তমান মন্দির কোচ-রাজ নরনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা সেনাপতি শুক্লধ্বজ কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের ও পূজা ইত্যাদির জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন। এখনও মন্দিরের মধ্যে নরনারায়ণের ও শুক্লধ্বজের দুইটি পাষাণ-মূর্ত্তি খোদিত আছে। প্রবাদ আছে, সেই সময় গৌহাটি হইতে কোচবিহার পর্য্যন্ত ডাক বসাইয়া যাতায়াতের এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, প্রতিদিন নাকি কামাখ্যা-মন্দির হইতে পূজান্তে কোচবিহারে নির্ম্মাল্য পাঠান হইত এবং ঐ দিনের মধ্যেই উহা কোচবিহারে পৌছিত।

কোচরাজ্যে অন্তর্বিপ্লবের ফলে এক পক্ষ মুঘল-সম্রাটের সহায়তা চাহিলেন। ইতিমধ্যে বঙ্গে পাঠান-রাজত্বের অবসান হইয়া মুঘল-অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে। কোচ-রাজ পরীক্ষিৎ নারায়ণের মৃত্যুর পর কামরূপে বরনদী পর্য্যন্ত মুঘল অধিকারভুক্ত হইল। এই সময় কোচ কামরূপ রাজ্য মুঘল কর্ত্তৃক চারিটি সরকারে বিভক্ত হয়। কোচ-রাজগণ এই সরকারসমূহের জমিদার হইলেন—অর্থাৎ মুঘল অধীনে সামন্তরাজ হইলেন। গৌহাটি লইয়া কামরূপ সরকার গঠিত হইল। এই সময় গৌহাটি এক জন মুঘল ফৌজদারের শাসনাধীন ছিল।

এদিকে আহোম-শক্তির বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের রাজ্যের সীমানা কামরূপ-সরকারের সীমানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এখন হইতে মুঘল-আহোম সংঘর্ষের সূচনা। এই বিস্তৃত আহোম-রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রথমে ঘরগাঁও ও পরে রঙ্গপুর—উভয় স্থানই বর্ত্তমান শিবসাগর শহরের এলাকার মধ্যে। ঘরগাঁও ও রঙ্গপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান। শিবসাগর গৌহাটি হইতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের পথে ২৫৯ মাইল দূরে অবস্থিত।

সম্রাট্ শাজাহান যখন কঠিন পীড়াগ্রস্ত এবং ভারতবর্ষ যখন বিরাট্ ভ্রাতৃবিরোধে ছিন্নভিন্ন, সেই সুযোগে কোচ-রাজ প্রেমনারায়ণ নিজের স্বাধীনতা লাভ করিলেন এবং আহোম-রাজ অতি অল্পায়াসেই গৌহাটি দখল করিলেন।

আওরংজীব যখন মুঘল-সম্রাট্ হইলেন, মীরজুমলা তখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মীরজুমলা স্বয়ং কোচবিহার ও আসাম জয়ে বহির্গত হন। এই অভিযানের দায়িত্ব তিনি সম্রাটের আদেশানুসারে গ্রহণ করিলেন। কোচবিহার মুঘল-প্রাধান্য মানিয়া লইল। মীরজুমলার আসাম-অভিযানের মূল উদ্দেশ্য আসাম-বিজয় সাধিত না হইলেও ঘরগাঁয়ের সন্ধি অনুযায়ী গৌহাটি পুনরায় মুসলমান-শাসনাধীন হইল। এই আহোম-মুঘল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় লইয়া পুনরায় যুদ্ধ ঘোষিত হইল। ইহার ফলে গৌহাটি পুনরায় আহোম-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সময়ে গৌহাটিতে আহোম রাজকর্ত্তৃক এক জন বরফুকন (Viceroy) নিযুক্ত হইলেন। আহোম-রাজ্যের সীমানা মনাস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

গৌহাটি মুঘল-রাজের হস্তচ্যুত হইয়াছে—এই সংবাদ পাইয়া আওরংজীব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। গৌহাটি তখন নিম্ন-আসামের প্রধান কেন্দ্র এবং উজনি আসামের প্রবেশদ্বার। আসামের বিশ্রুত সম্পদরাজির মালিক হইতে হইলে গৌহাটি অধিকার নিতান্ত আবশ্যক। দরঙের বিস্তৃত হস্তীবহুল পর্ব্বতমালা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অপর্য্যাপ্ত শস্য, লাক্ষা রেশম ও পশম, ভোটরাজ্য হইতে আনীত বহু অশ্ব, কস্তুরী, বহুমূল্য ব্যাঘ্র ও মৃগ চর্ম্মাদি এবং ব্রহ্মপুত্র ও শাখানদী সমূহের খনিজ সম্পদ বাদশাহগণের নিতান্ত অভীপ্সিত। অতএব আহোম ও মুঘল—এই দুইটি শক্তি জীবন-মরণ পণ করিয়া গৌহাটি অধিকারে সচেষ্ট হইল।

মুঘল-শক্তির আসাম-বিজয়ের এই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। মুঘল-সেনাপতি রাজা রামসিংহ আহোম-সেনাপতি লাচিৎ বরফুকন কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন। এই সরাইঘাটের (গৌহাটির অতি সন্নিকটেই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পার্শ্বে এই যুদ্ধ হইয়াছিল) চারিমাসব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ আসামের একটি গৌরবমণ্ডিত অধ্যায়।

১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আহোম-রাজ উদয়াদিত্যের হত্যার পর কয়েক বৎসর অরাজকতার অবস্থা চলিয়াছিল। এই অরাজকতার সুযোগে মুঘলগণ অতি অল্পকালের জন্য গৌহাটি অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু গদাধর সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অরাজকতার অবসান করেন এবং গৌহাটি পুনরায় দখল করেন। রাজা গদাধর সিংহের পত্নী রাণী জয়মতী আসামের ইতিহাসের মহিমময়ী পুণ্যশ্লোকা সতী। তিনি নিজের জীবন দিয়া স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আহোম-রাজগণ বহুদিন যাবৎ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। রাজা গদাধর সিংহের পুত্র রুদ্রসিংহ রাজা হইয়া আসামে বৈষ্ণব গোস্বামিগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারই পুত্র শিবসিংহ ও তদীয় রাণী ফুলেশ্বরী শান্তিপুরের নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ন্যায়বাগীশ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বৈষ্ণব গোস্বামিগণের যত্নচেষ্টায় ও হিন্দুরাজগণের প্রভাবে প্রায় সমগ্র আহোম জাতিই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। গৌহাটির ও কামরূপের বহু দেবালয় রাণী ফুলেশ্বরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও আহোম-রাজকোষ হইতে প্রদত্ত দেবোত্তর জমির আয় হইতে আজও পরিপুষ্ট।

পরবর্ত্তী কালে যখন মায়ামোরিয়া বা মরাম জাতির বিদ্রোহে আহোম-শক্তি হীনবল হইয়া পড়িল এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন ক্যাপ্টেন ওয়েল্‌স্ প্রথম গৌহাটি আসিয়াই আহোম-রাজের সহিত কথাবার্ত্তা চালান। ইহার পরে মান আক্রমণের যুগ। উহার কিছু দিন পরেই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ। এই



কামাখ্যা মন্দির

যুদ্ধের অবসান হইল ইয়াণ্ডাবুর সন্ধিতে। আসাম ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আসাম সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হিন্দুর সংখ্যাই সবচেয়ে অধিক। মুসলমানের সংখ্যা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে খুবই কম ছিল, কিন্তু এই উপত্যকার বহু পতিত জমির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান এখানে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। বর্ত্তমানে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা কুড়ি জন। হিন্দু-মুসলমান ব্যতীত বহু পার্ব্বত্য জাতি এই উপত্যকায় যুগ যুগ ধরিয়া বাস করিতেছে। এই পার্ব্বত্য জাতিগণের মধ্যে গারো, রাভা, মিরি, মিকির, লালুং, কুকি, নাগা, আবর, মিস্‌মি, আকা,

তাল্লা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খাসিয়া, লুসাই প্রভৃতি জাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাহিরে অবস্থিত।



রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ, গৌহাটি প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

এই পার্ব্বত্য জাতিগুলির উপর বাহির হইতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রভাব সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃত হয়; বর্ত্তমানে ইহারা কিছু পরিমাণে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মের বেষ্টনীতে আসিতেছে। নেপালী, মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীর সংখ্যাও এই উপত্যকায় কম নয়। ব্যবসায়ী ও শ্রমিক ভাবে ইহারা আসামের শহরে, পল্লীতে ও চা-বাগিচায় বসবাস করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বঙ্গভাষাভাষীগণের সংখ্যা প্রায় এগার লক্ষ। সমগ্র উপত্যকার লোকসংখ্যা প্রায় আটচল্লিশ লক্ষ।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হিন্দুরা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত।—মহাপুরুষিয়া ও দামোদরিয়া। শ্রীশঙ্কর দেব ও শ্রীমাধব দেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীগণ এই দুই মহাপুরুষের অনুসৃত ধর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করেন বলিয়া ইহাদিগকে মহাপুরুষিয়া বলা হয়। মূলতঃ ইহারা সকলেই হিন্দুধর্ম্মের বেষ্টনীর মধ্যেই আছেন। শ্রীশঙ্কর দেব, শ্রীমাধব দেব ও তাঁহাদের শিষ্যগণ বহু বহু গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদি রচনা করিয়া, জন্ম-উৎসব, যাত্রা, ভাওনা প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করিয়া অসমীয়া সমাজের ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। শ্রীদামোদর দেবও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, তবে কিছু ভিন্ন ভাবে। দামোদরিয়াগণকে বামুনিয়াও বলা হয়।

মণিপুর আসামের একমাত্র করদ-রাজ্য। ইহার অধিবাসীরা চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব। শ্রীহট্টের গোস্বামিগণ মণিপুর রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন।

আসামে রামকৃষ্ণ মিশন বহু পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে শিক্ষা ও সেবা কার্য্যে ব্রতী হইয়া স্থানীয় জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

এখানকার মুসলমানেরা সুন্নীমতাবলম্বী। হাজো নামক স্থানে "পোয়া মক্কা" নামে একটি মুসলমানদের তীর্থস্থান আছে।

ব্রহ্মপুত্র নদ এই জিলার ও সমগ্র উপত্যকার প্রাণ-স্বরূপ। কামরূপ ও গৌহাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা, মধ্য দিয়া বিশাল ব্রহ্মপুত্র প্রবহমান। বঙ্গদেশের ন্যায় হরিৎ ক্ষেত্রও এখানে প্রচুর, এবং পর্ব্বতরাজির গাম্ভীর্য্যের সহিত হরিৎ-ক্ষেত্রের সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যপট রচিত হইয়াছে।

"অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে" কালিকা-পুরাণের এই শ্লোকাংশটি বর্ত্তমান কামরূপেও প্রযোজ্য। গৌহাটিতে যে-সব তীর্থস্থান আছে তন্মধ্যে শ্রীশ্রী৺কামাখ্যা দেবীর মন্দির, কামাখ্যা পাহাড়ের অন্যান্য মন্দির, ব্রহ্মপুত্র নদের বক্ষে উমানন্দ ভৈরবের মন্দির, বশিষ্ঠাশ্রম, নবগ্রহ মন্দির, উত্তর তীরের অশ্বক্রান্তা মন্দির প্রভৃতি বিশেষ সুপরিচিত।

গৌহাটি শহর আসামের একটি প্রধান বাণিজ্য ও শিক্ষা কেন্দ্র। এখানকার প্রধান শিল্পদ্রব্য আসামজাত রেশম, পাট, মুগা, এণ্ডি প্রভৃতি। গৌহাটির সন্নিকটস্থ শোয়ালকুচি, পলাশবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম এণ্ডি, মুগা, পাটের সূক্ষ্ম কাজের জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

গৌহাটিতে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। ইহাদের মধ্যে কটন কলেজ, আর্ল ল' কলেজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি গবর্ণমেণ্ট বয়ন-বিদ্যালয় এখানে আছে, উহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী আসামের

রেশম, পাটের বস্ত্রাদি বয়ন ও রং করা হয়। এতদ্ব্যতীত পাঁচটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, ইহার একটি মেয়েদের জন্য। এই পাঁচটি ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে সিলভার-জুবিলী এংলো-বেঙ্গলী হাই ইংলিশ স্কুল নামক একটি বাঙালী বিদ্যালয় তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহারই প্রাঙ্গণে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশনের স্থান প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সম্মেলন উপলক্ষে যাঁহারা এখানে শুভাগমন করিবেন তাঁহাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য আরও দুইটি স্থান আছে। প্রথম, কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি ও তৎসংলগ্ন বাদুঘর; দ্বিতীয়, নারায়ণী হাণ্ডিকী ইনষ্টিটিউট। এই উভয় স্থানেই আসামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থাদি সুরক্ষিত আছে।

আসামের বর্ত্তমান যুগের প্রবীণ ও প্রথিতনামা লেখকগণের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

৺আনন্দরাম বরুয়া, আই সি এস—ইনিই প্রথম বিস্তৃতভাবে ইংরেজী-সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন। ইনি উত্তর-গৌহাটির লোক। তাঁহার স্মৃতিস্বরূপ উত্তর-গৌহাটির আনন্দরাম লাইব্রেরী গৌহাটি হইতে দেখা যায়।

৺হেমচন্দ্র গোস্বামী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি' সঙ্কলয়িতা।

৺লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া—ইনি বহুগ্রন্থ প্রণেতা। গত বৎসর পরলোকগমন করিয়াছেন।

৺গুণাভিরাম বরুয়া—ঐতিহাসিক।

৺হেমচন্দ্র বরুয়া—হেমকোষ নামক অসমীয়া অভিধান প্রণেতা।

রায় বাহাদুর কনকলাল বরুয়া—আসামের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও *Early History of Kamrup* প্রণেতা।

রায় বাহাদুর ডাঃ সূর্য্যকুমার ভুঞা, এম্ এ, পিএইচ ডি—ইনি Director of Historical Studies ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি, এম্ এ, পিএইচ ডি—ইনি অসমীয়া ভাষার উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ডাঃ মৈদুল ইস্লাম বরা, এম্ এ, পিএইচ ডি—ইনি 'বাহারিস্তান ঘাইবি' নামক ফার্সী পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীযুত রজনীকান্ত বরদলৈ—ঔপন্যাসিক।

শ্রীযুত কালীরাম মেধি—অসমীয়া ভাষার ইতিহাস প্রণেতা।

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ গোহাঁই রায় বাহাদুর—বহু গ্রন্থ-প্রণেতা।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেও নবযুগের প্রেরণা অনুভূত হইতেছে। অসমীয়া যুব-সম্প্রদায় নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যে ও গবেষণায় ব্রতী হইয়াছেন। স্থানাভাবে ইঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর হইল না বলিয়া প্রবন্ধ-লেখক দুঃখিত।

বহির্জ্জগৎ

গোপাল হালদার

১

ইংরেজী ১লা অক্টোবর, বাংলা ১৪ই আশ্বিন, ইউরোপীয় রাজনীতির পাতায় একটি যতি পড়িয়াছে। যতি যে পড়িবে তাহা সকলেই বুঝিয়াছিল, সংশয় ছিল শুধু ইহার পরে কোন্ পর্ব্ব সুরু হইবে, সে-বিষয়ে। ইতিহাস কি সত্যই উদ্যোগ-পর্ব্বের শেষ শ্লোকটি পড়িয়া মহাসমরের বজ্রবিদ্যুদঙ্কিত ধ্বংসলিপি রচনায় হস্তার্পণ করিবে, না এই ভয়ঙ্কর পরিণামের মুখামুখি হইলে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া মানুষ আপনার গতিকে সুসংযত করিয়া লইতে পারিবে? —এই ছিল পূজার পূর্ব্বে প্রশ্ন—সংগ্রাম না শান্তি। সেই ঘোরতর সঙ্কটের মুখে ইউরোপের বুক কাঁপিতেছিল—১লা অক্টোবর তাহারই উত্তর পাইবার কথা। উত্তর

পাওয়াও গেল—যুদ্ধ নয়। কিন্তু ইহাই কি শান্তি? সে-প্রশ্নের উত্তর দিবে ভবিষ্যৎ। আপাতত ইহাই যথেষ্ট ভাগ্য যে যুদ্ধ নয়। তাই, প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন যখন মিউনিকের ফেরতা বিমান হইতে নামিলেন, জয়-ধ্বনিতে তখন আকাশ ভরিয়া গেল।

আসলে এই জয়ধ্বনি, এই শুভাশীর্ব্বাদ প্রাপ্য চেম্বারলেনের না হিটলারের?—গত দুই মাসের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া এই প্রশ্নটিই মনে জাগিতে পারে। যুদ্ধ যে বাধিল না, সে-কৃতিত্ব কাহার? জার্ম্মান জাতির ভাগ্যবিধাতা যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তো ইউরোপের উপর দিয়া এতক্ষণ আগুনের স্রোত বহিয়া যাইত। ইউরোপকে সেই দুর্ভাগ্য হইতে তিনিই তো রক্ষা করিয়াছেন—এমন নিরুপদ্রব বিজয়ের দৃষ্টান্ত আর কে কবে রচনা করিতে পারিয়াছে? সত্যাকারের অহিংসার কার্য্যনীতির অপেক্ষাও হিংসার হুম্‌কিতেই যে অহিংসার উদ্দেশ্য বেশী সিদ্ধ করা যায়, গত কয়েক মাসের মধ্যে অষ্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপারে হের হিট্‌লার এই এক নূতন তত্ত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন।

২

যুদ্ধ বাধিবার পক্ষে যতগুলি কারণ ছিল সেগুলি আমরা সবাই অল্পবিস্তর জানি; কিন্তু না-বাধিবার পক্ষে যে যে কারণগুলি ছিল তাহা আমরা তলাইয়া বুঝিতে চাহি না। আমরা দেখিতেছিলাম—'এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক মহানেতা', এই আদর্শের নামে জার্ম্মানী চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের জার্ম্মান-অধ্যুষিত সুদেতেন-অঞ্চল ছিনাইয়া লইতে উদ্যোগী,—সুদেতেনের নেতা হেন্‌লাইন্‌ও আর তাই স্বায়ত্তশাসনের বুলি ছাড়িতে দেরি করিলেন না—সরাসরি এবার ব্যাপারটার বুঝাপড়া করিতেছে স্বয়ং জর্ম্মানরা। নুরেনবুর্গের নাৎসি-সম্মেলনের পর হইতে যুদ্ধ-সমাবেশ উভয় পক্ষেই দ্রুত অগ্রসর হয়—চেকরাও সশস্ত্র; তাহাদের বন্ধু ফরাসী পশ্চিম-সীমান্তের ম্যাজিনো প্রহরী গণ্ডীতে সৈন্য রাখিয়াছে সুসজ্জিত; অন্যতম বন্ধু সোভিয়েটও মাঝখানকার পোল্যাণ্ড ও রুমেনিয়ার বেড়ার ওপারে প্রস্তুত; আর ব্রিটিশ-শক্তি এত বার চেকোস্লোভাকিয়া গণতন্ত্রের জন্য দরদ দেখাইয়াছে, ফরাসীকে তাহার সহিত এতটা নিজের পররাষ্ট্রনীতি জড়াইয়া দিতে দিয়াছে, যে, রান্‌সিম্যানের দৌত্যের এই নিষ্ফলতার পরে ব্রিটেনের পক্ষে আর নিরপেক্ষ থাকিবার উপায় নাই।

নিরপেক্ষতা সম্ভব নয় বলিয়াই প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন বেরশ্‌টেস্‌গাডেনে বিমান-যোগে হের হিট্‌লারের সাক্ষাৎ-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। হের হিট্‌লারের দাবী প্রতিপালন করাইবার ভার লইয়াই তিনি ফিরিলেন,—কারণ, ফরাসী মন্ত্রী দালাদিয়ে তো ব্রিটিশ মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিবেনই। তখন ব্রিটেন ও ফরাসী দুই জনের নির্দ্দেশে বিপন্ন চেকোস্লোভাকিয়া এবার স্বীকার করিয়া লইল জার্ম্মানীর দাবী—সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মানীকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। দিন কয় পূর্ব্বে 'টাইম্‌স্' এই উপদেশই দেয়—তখন ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভা প্রকাশ্যে জানায়, ইহা ব্রিটেনের সরকারী মত নয়, তাই চেকরাও তাহাতে আশ্বস্ত হয়। তখনই আমরা বলিয়াছিলাম,—'টাইম্‌স্', শুধু কোন্ দিকে ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার দৃষ্টি, তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছে। এবার সে-দৃষ্টি ধরা পড়িল—অবশ্য বেরশ্‌টেস্‌গাডেনের পর। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য শক্তিপুঞ্জের দৃষ্টিভঙ্গীও বদ্‌লাইয়া গেল। তাহারা এতদিন পর্য্যন্ত মনে করিয়াছিল—ব্রিটিশ ও ফরাসী জাতীয় স্বার্থ চেকোস্লোভাকিয়ার পতন মানিয়া লইবে না। এবার বুঝিল, চেকোস্লোভাকিয়ার কপাল ভাঙিয়াছে। অতএব—পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের নাৎসি-ত্রস্ত দ্বিধাগ্রস্ত রাজ্যগুলি বুঝিয়া ফেলিল—এখন হইতে তাহাদের ভাবী জীবন-নিয়ন্তা হিট্‌লার। ইহার পরে—এমন করিয়া যখন চেক-সমস্যার মীমাংসা হইতেছিল—তখনই সমস্যাটি উঠিল জটিলতর হইয়া, যুদ্ধের আশঙ্কা আসিল ঘনাইয়া। সপ্তাহকাল মধ্যেই আবার চেম্বারলেন 'সম্রাট' হিটলারের দ্বারস্থ হইলেন—এবার গোডেসবের্গে তাঁহার 'বিরাম-প্রাসাদে'। রুষ্ট ফ্যুয়েরের নিকট হইতে ছায়াচ্ছন্ন, বেদনা-ক্লিষ্ট চিত্তে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী যখন ফিরিলেন, তখন মনে হইল যুদ্ধই নিকটে—১লা অক্টোবর, অর্থাৎ ছয় দিনের মধ্যে, সমস্ত সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মানীর হাতে আসা চাই, চাই তার সমস্ত শিল্পায়তন, সমস্ত সৌভাগ্য। কি করিয়া ব্রিটেন বলিবে চেকদের এই সর্ত্তে স্বীকৃত হইতে? একটা গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইল—ফরাসী তো প্রস্তুতই, রুশিয়াও স্বীকৃত; ব্রিটেনেও এখন যুদ্ধোদ্যমের আয়োজন হইল। গ্যাস-মুখোস বিতরণ চলিল, পার্কে পার্কে ট্রেঞ্চ খোঁড়াও হইল, কার্ট লর্ড

অব এ্যাডমিরাল্‌টি মিঃ ডাফ্‌ কুপার উত্তর-সাগরের ব্রিটিশ রণতরীকে সজ্জিত হইবার জন্ম আদেশ-পত্র বাহির করিয়া দিলেন।—মনে হইতেছিল, এবার যুদ্ধই। কিন্তু তবু যুদ্ধ বাধিল না—উদ্বিগ্ন চেম্বারলেন যখন পার্লামেন্টে গোডেস-বের্গের ঘটনাবলীর বিবৃতি শেষ করিতেছেন, যুদ্ধ, যুদ্ধই বুঝি অনীপ্সিত হইলেও অপরিহার্য্য—তখন স্যর্ জন সাইমন দিলেন তাঁহার হাতে নিমন্ত্রণের টেলিগ্রাম। "আবার আহ্বান"—হিট্‌লার-সকাশে, এবার মিউনিকে, মুসোলিনি ও দালাদিয়েরও তাঁহার সঙ্গী। কয়েকটি ঘণ্টামাত্র বাকী ১লা অক্টোবরের—কিন্তু মিউনিকে গোল মিটিয়া গেল—হিট্‌লার সুদেতেন অধিকারের সময় বাড়াইয়া দিলেন—১০ই অক্টোবর তাহা শেষ হইবে। এতদতিরিক্ত যে-সব অঞ্চলে চেক-জার্ম্মান দুই জাতির সমবাস, সেখানকার অধিবাসীদের মত গ্রহণ করিবে এক আন্তর্জ্জাতিক সমিতি গণ-ভোটের সাহায্যে; চেক-সীমান্তের দুর্গাবলী ও সংরক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সুদেতেনের শিল্পায়তনসমূহ অটুটভাবে জার্ম্মান-হস্তে অর্পণ করিতে হইবে; পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, স্লোভাক প্রভৃতি অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠের দাবিও অচিরেই পরীক্ষান্তে চেকদের স্বীকার করিতে হইবে;—আর বিনিময়ে এই চতুঃশক্তির নিকট হইতে চেকরা পাইবে রক্ষার প্রতিশ্রুতি। মিউনিকে এই ব্যাপারে এমনি সিদ্ধান্ত করিয়া চেম্বারলেন, মুসোলিনি, দালাদিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরিলেন—চেকো-স্লোভাকিয়াকে একবার ডাকিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না, রুশিয়াকে তো জিজ্ঞাসা করিবার প্রশ্নই উঠে না—ইউরোপে শান্তি অক্ষুণ্ণ রহিল—যুদ্ধোদ্যমের পাতায় যতি পড়িল—যতি পড়িল চেকোস্লোভাকিয়ার বিশ বৎসরের জীবনেতিহাসেও।

৩

কিন্তু যুদ্ধ কেন বাধিল না? ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকরা বলিতেছেন, কারণ আর কিছু নয়, আমাদের সমরায়োজনে অনেক গলদ রহিয়া গিয়াছে, তাই আসন্ন যুদ্ধের উদ্যোগে অগ্রসর হইয়া আমাদের চমকাইয়া যাইতে হইল।—ব্রিটেন বিমানাক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারে নাই, ইহাই বড় কথা। তাহা ছাড়া ফরাসী সেনাপতি গেমেলিনও বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদেরও যুদ্ধবিমানের সংখ্যা অল্প, তাঁহাদের পদাতিকদের গোলাবারুদের যোগানও অযথেষ্ট। আর সর্ব্ব শেষ কথা-সকলের সেরা কথা তাহাই—রুশিয়া। রুশিয়ার আশা কমই করা উচিত,—আভ্যন্তরীণ কলহে তাহারা হৃতবল। ইহাই কি যুদ্ধ না-বাধিবার কারণ? ইতিমধ্যেই, লোকে বলিতে সুরু করিয়াছে, ফরাসী ও রুশিয়ার সম্পর্কে কথাটা অমূলক। সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব লিটভিনভ তো লর্ড উইণ্টারটনের কথার উত্তরে স্পষ্টই তাঁহাকে এই অপবাদ-বিস্তারের জন্য চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। আসলে হয়তো ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নাই, হয়তো তাহার আয়োজনেও ত্রুটি ছিল; কিন্তু যাহা সত্য তাহা এই যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলে একমাত্র নৌ-মন্ত্রী ডাফ্‌ কুপার ছাড়া কেহই যুদ্ধের সম্ভাবনা মনে মনে স্বীকার করিতেন না—পরবর্ত্তী ঘটনায় সেই কথাটিই আরও স্পষ্ট হইয়াছে। তাই ডাফ্‌ কুপার পদত্যাগ করিয়া গেলেন, এই মীমাংসায় তাঁহার সম্মতি নাই,—অন্যদের সম্মতি নাই হিট্‌লারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিতে।

যুদ্ধ কেন বাধিল না, তাহার কারণ হিসাব করিতে গেলে এইটিই বড় কথা—ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল ফাসিজ্‌মের পরাভব চাহে না, আর চাহে না সাম্যবাদী রুশিয়ার সাহচর্য্য। চেকোস্লোভাকিয়ার বিলোপ তাহার অবশ্য কাঙ্ক্ষিত নয়—মধ্য-ইউরোপে ঐরূপ একটি রাষ্ট্র টিকিয়া থাকিলে বরং জার্ম্মান জাত একচ্ছত্র অধিকার সে দিকে বিস্তার করিতে পারিত না,—একটা বাধা গৃহের এত নিকটে থাকিতে শক্তিমান্ জার্ম্মান জাতি হয়ত নিকট-প্রাচ্যে, কিংবা আফ্রিকার উপনিবেশে কিংবা পশ্চিমে বা উত্তর-সাগরে—কোন দিকেই—হাত বাড়াইবার মত সাহস পাইত না; ব্রিটেনের ইহাতে লাভই ছিল। কিন্তু জার্ম্মানীর মত এত বড় বলিষ্ঠ জাতিকে অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই, তাহার শক্তি অস্বীকার করিয়াও ফল নাই; বিশেষতঃ এই শক্তিই এখন ইউরোপকে সাম্যবাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প—অতএব, ইহার দাবীটাও যাহাতে পূরণ করা যায়, তাহার একটা শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব পথই দেখা ব্রিটেনের দরকার। এই জন্যই রান্‌সিম্যান গিয়াছিলেন মধ্যস্থ-স্বরূপে। হিট্‌লারের কাজ ধীরে ধীরে উদ্ধার করিয়া তিনিই দিতেন। অতি মোলায়েম ভাবে চেক-রাষ্ট্র একটু একটু করিয়া মরিতে পারিত, বলি হইত সভ্যতা-সম্মত, ডিপ্লোম্যাসি-সম্মত উপায়ে। কিন্তু হিট্‌লারের মর্য্যাদা তাঁহার স্বদেশে ও বিদেশে ইহাতে পূর্ণরূপে প্রকট

হইত না—এই মর্য্যাদার বিজ্ঞাপনটি জারী না করিলে এ যুগে কোন রাষ্ট্রনেতার চলে না। তাই, একেবারে সরাসরি আসিল নোটিস—আর কথা নয়, এবার তিনি সসৈন্যে সুদেতেনে হানা দিবেন—চেকরা ভালয় ভালয় সরিয়া যাক্। চেম্বারলেন কি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন? হয়তো চমকিত হইলেন,—চমৎকৃতও হইলেন—কিন্তু বাধা দিবার কথা নিশ্চয়ই কল্পনা করেন নাই। সে-উদ্দেশ্যই তাঁহার নয়। বাধা দিতে গেলে তাঁহাকে সোভিয়েটের সাহচর্য্য ও সৌহার্দ্য মানিয়া লইতে হয়—সাম্যবাদী শক্তির এই সহায়তা গ্রহণ করিতে তিনি চাহেন না, তাঁহার শ্রেণীর কোন রাষ্ট্রনীতিকই ইহা পারেন না—তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও জীবনযাত্রার পদ্ধতির মূলেই তাহা হইলে কুঠারাঘাত করা হয়। আর এই জীবন-পদ্ধতি, এই পরিশ্রমভোগী সমাজ-ব্যবস্থা, আয়াস-পরিপুষ্ট শিক্ষাদীক্ষা, চিন্তা-ভাবনা—এ-সবের একমাত্র রক্ষাব্রত লইয়াই ইউরোপে দাঁড়াইয়াছে ফাসিজ্‌ম্—হিটলার যাহার নেতা, মুসোলিনি যাহার অগ্রদূত,—চেকোস্লোভাকিয়ার গণতন্ত্র, ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট, স্পেনের সাধারণতন্ত্র ও সোভিয়েট-শক্তি ছাড়া সমস্ত ইউরোপে যাহার গতিরোধ করিবার আজ আর কেহ নাই।

ইহাই যে ব্রিটেনের মূলনীতি তাহা বহুদিন হইতেই সকলের জানা—আমরাও উল্লেখ করিয়াছি। কথাটা ক্রমশই এত স্পষ্ট হইতেছে যে, আজ তাহা না বলিলেও চলে। আবিসিনিয়ার পরে, স্পেনের 'নিরপেক্ষতা'র নীতিতে, ইতালীর সহিত মিত্রতার চেষ্টায়, লীগে আবিসিনিয়া-বিজয় অঙ্গীকারে, ইতালীর কথামত ফ্রাঙ্কোর প্রতিষ্ঠায় প্রায় নীরবে সম্মতি দানে, অষ্ট্রিয়ার পতনকালে,—এমন কি বহু বহু রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ব্রিটেন ফাসিষ্টদের কথাই মানিয়া লইয়াছে আবার, স্বগৃহে তাহার কার্য্যাবলীর হিসাব লইলেও দেখা যাইত—গণ-স্বার্থকে খর্ব্ব করিবার ও গণশক্তিকে ধীরে ধীরে পিছনে সরাইয়া দিবার চক্রান্তেই যেন এই সরকার লিপ্ত। যাহারা ইহার কর্ণধারগণের সহিত পরিচিত তাঁহারা বরাবরই বলিয়াছেন—লেডি এষ্টরের 'ক্লাইবডেন' গৃহের এই বন্ধুগোষ্ঠী জার্ম্মানী ও ইতালীর সহিত মিলনের পক্ষপাতী ব্রিটেনের পার্লিয়ামেণ্টরি শাসন-পদ্ধতির আবরণ রাখিয়া তাঁহারা ফাসিষ্ট ব্যবস্থাই এখানে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন—তাঁহাদের প্রধান শত্রু হইল সোভিয়েট। গণতান্ত্রিক জাতিদের জন্য তাঁহাদের কোন মাথাব্যথা নাই—তাই চেকোস্লোভাকিয়ার জন্য তাঁহাদের দরদ নাই। বরং গণতন্ত্রে গণশক্তি যেরূপ সচেতন হইবার অবসর পায়, তাহাতে পুঁজিতন্ত্রের এই সঙ্কটকালে গণতন্ত্র পুঁজিবাদী শাসকের পক্ষে বিপজ্জনক হয়। অতএব, আজিকার দিনে আর গণতন্ত্রের প্রসার কামনা করা শাসক-সম্প্রদায়ের সাজে না।

যাঁহারা তথাপি ভাবেন, জার্ম্মানী-ইতালীকে বাড়িতে দিয়া ব্রিটেন আপন সাম্রাজ্যের ভাবী শত্রু সৃষ্টি করিবে কেন—তাঁহারা এই সত্যটির অংশ দেখিতেছেন না—যত ক্ষণ অন্য রাজ্য দিয়া ইহাদের উদরপূর্ত্তি চলিবে তত ক্ষণ ব্রিটেনেরও আশঙ্কা নাই, এই সব নূতন সাম্রাজ্যবাদীরও তাহার সহিত কলহের কারণ নাই। আর পৃথিবীতে, মাঞ্চুকু, আবিসিনিয়া, অষ্ট্রিয়া, স্পেন, প্রভৃতির মত শিকার একেবারে দুর্লভ হইতে বিলম্ব আছে। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও তত দিন নির্ভাবনা। বরং বর্ত্তমানেই তাঁহার বিপদ, সাম্রাজ্য-মধ্যে স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রসারে এবং রাজ্য-মধ্যে অতৃপ্ত, বেকার শ্রমিক-শক্তির আবির্ভাবে ;—আর এই দুই প্রতিপক্ষেরই হৃদয়ে নূতন আশা, নূতন চেতনার সঞ্চার হইয়াছে সোভিয়েট-শক্তির আবির্ভাবে ও প্রভাবে! এই সব দলই বরং এখন সাম্রাজ্যবাদীর শত্রু নবজাত ফাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ শাসক ও ধনিক শ্রেণীর রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই সহায়ক। আসলে, ফাসিজম্ ও সাম্রাজ্যবাদ সগোত্র—এই কথাটি স্মরণীয়।

জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা বরং ব্রিটেন বরাবরই চাহিতেছেন—জার্ম্মানীর সঙ্গে মিত্রতা। এই পক্ষে তাহার একমাত্র আপদ ছিল পপুলার-ফ্রন্ট-শাসিত ফ্রান্স, ও তাহার রুশ-মিত্রতা। ফ্রান্স তাহার এত নিকটে যে ব্রিটেনও তাহাকে আজ ছাড়িতে অসমর্থ। জার্ম্মানীর সহিত ও ইতালীর সহিত ফ্রান্সের একটা বুঝাপড়া করিয়া ইউরোপে চতুঃশক্তির মিলন-সাধনই চেম্বারলেনের পররাষ্ট্রনীতির একটি বৃহৎ লক্ষ্য বহুদিন হইতেই তাহা স্পষ্ট। কিন্তু সুযোগ্ হইতেছিল না—কিছুতেই ফাসিষ্ট বন্ধুদের তিনি ফ্রান্সের সহিত জুটাইতে পারিতেছিলেন না। এবার চেক-বলির উৎসবে মিউনিকে সেই মিলনের গোড়াপত্তন হইল। ইউরোপে ফাসিষ্ট শক্তিকে একেবারে একচ্ছত্রাধিকার দিয়া চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে নিজেদের মুখোসও সেই সঙ্গে খুলিয়া ফেলিলেন—দেখা গেল সে-মুখে শুধু পার্লিয়ামেণ্টরি শাসনের

ছাইই লেপা; না হইলে সে-মুখ হিটলার ও মুসোলিনিরই।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে, যুদ্ধ হইবে না ইহা যদি জানাই ছিল তবে এমন একটা ঘটা করিবার প্রয়োজন ছিল কি? যুদ্ধের নামে এমন করিয়া পৃথিবীকে আতঙ্কিত করিবার কি কারণ ছিল? উদারনৈতিক মনস্বী কিন্‌স ও সাম্যবাদী জন ষ্ট্রাচি দুই জনেই এ-বিষয়ে একমত—ব্রিটিশ জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্যই এই অভিনয় (Play-Acting)। এখনও ফাসিষ্টদের কাছে আত্ম-সমর্পণ ব্রিটিশ জনগণের অসহ্য—তাই, এই ছলনার সহায়তা লইতে হইয়াছে। ছলনার এই টেক্‌নিক্‌টুকুই নূতন।

৪

অক্টোবরের এই নাৎসি-বিজয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল কি, এই দুই মাসেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। যথা:—(১) চেকোস্লোভাকিয়া আর নাই, আছে চেক ও স্লোভাক দুই ক্ষুদ্র সংযুক্ত রাষ্ট্র, জার্ম্মানী, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী সবাই কিছু কিছু তাহার অপহরণ করিয়াছে। মাসারিক বেনেশের দিন ও মতাদর্শ শেষ হইয়াছে, এখন চেক জাতির পুঁজিপতিদের কথামত নাৎসি চিন্তা ও প্রভাবই সে-দেশে সকলে মানিয়া লইতেছে। (২) সমস্ত মধ্য-ইউরোপ, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশও, নাৎসি ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে (৩) উত্তর-সাগর হইতে ভূমধ্য-সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক 'বৃহত্তর জার্ম্মানীর' উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা যায়,—যেখানকার যত জার্ম্মান জাতকে হিট্‌লার যে-কোন সময়ে এখন নিজ আয়ত্তে আনিতে পারেন, শুধু টিরলের জার্ম্মানদেরই লইয়া একটু অসুবিধা। তাহারা ইতালীর শাসনে দলিত, পিষ্ট; কিন্তু এই ফাসিষ্ট বন্ধুকে নাৎসি নেতাও এখন পর্য্যন্ত ছাড়িতে অসমর্থ। মেমেল, ডান্‌ৎসিগ, সুইটসারল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের এই সুবিধা নাই—সেই সব স্থানের জার্ম্মানদের টানিয়া আনিতে হিট্‌লারের বেশি বেগ পাইতে হইবে না। ইউরোপ অবশ্য জার্ম্মানীই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা—ফ্রান্সের আর তাহার সমকক্ষ হইবার আশাও সম্প্রতি অল্প। (৪) কিন্তু ইহাতে চতুঃশক্তির মিত্রতারও প্রস্তাবনা হইয়াছে, এবার তাহাতে বিঘ্ন আর বড় নাই। পপুলার ফ্রন্টকে তাই দালাদিয়ে স্পষ্টই অবহেলা করিয়া বলিতেছেন,—এই নূতন মিত্রতার পথই ফ্রান্সের বাঁচিবার পথ। অর্থাৎ, ফ্রান্স ফাসিজমের পথে পা বাড়াইতেছে। ব্রিটেনও যে সে-পথে খোলাখুলি ভাবেই এবার অগ্রসর হইবে,—গণতন্ত্রের পার্লিয়ামেণ্টরি ঠাট বজায় রাখিয়াই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইবে, তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সম্প্রতি তাহার মন্ত্রিমণ্ডলের অদল-বদলে, চেম্বারলেন একনেতৃত্বের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী নিজ ভক্তদেরই সেই চক্রে স্থান দিয়াছেন—স্বাধীন মতকে আর সেখানে তিনি ঠাঁই দিতে চাহেন না! এই নীতিরই বাহ্য চিহ্ন এই যে, এই সঙ্কটকালের সিদ্ধান্তে পার্লিয়া-মেণ্টের পরামর্শ চাওয়া দরকার হয় নাই, মন্ত্রিমণ্ডলেরও আলোচনা শোনা হয় নাই—একাই চেম্বারলেন সব সিদ্ধান্ত করিলেন,—পরে মন্ত্রিমণ্ডল তাহার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিল, পার্লিয়ামেণ্টও জানিতে পারিল। জওহরলালজী ইহারই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—চেম্বারলেন আজ ব্রিটেনে ডিক্টেটারী যুগ পত্তন করিতে-ছেন, পার্লিয়ামেণ্ট হইয়াছে রাইশ্‌টাগের সমতুল্য।

এ ব্যাপারে পরোক্ষ ফল কি কি? প্রথম দেখি:—(১) প্যালেষ্টাইনের আরবরা নাকি বুঝিয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ; তাই সেখানে বিদ্রোহের আগুন দ্বিগুণ ছড়াইয়াছে, এখন জঙ্গী-শাসনের সঙ্গে চলিয়াছে তাহার শেষ শক্তিপরীক্ষা। (২) আর, জাপান যখন বুঝিল ব্রিটেন যুদ্ধ চায় না, তখন দক্ষিণ-চীনে সে ভীমবলে লাফাইয়া পড়িল—ক্যাণ্টন গেল; ওদিকে একটু পরেই হাঙ্কাউ। বলিতে গেলে আসল চীন আজ জাপানের অধিকারে—ক্যাণ্টনের পতনে আর হংকং হইতে গোলা-বারুদ আসিবে না—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। দূর দুর্গম অভ্যন্তরে চীন কত দিন টিকিতে পারে, কতটা শক্তি আছে তাহার গরিলা-বাহিনীর, এবার তাহাই দেখিবার। কিন্তু পরোক্ষ—অথচ প্রত্যক্ষেরও বেশী—আরও দুইটি কথা এই সূত্রেই চোখে পড়ে:—(৩) টোটালিটেরিয়ান শক্তির সম্মুখে গণতন্ত্র টিকিতে পারে না,—এই কথা; আমাদের সম্মুখে ইহা ছাড়া আসিয়া

পড়িয়াছে—(৪) জার্মান উপনিবেশ প্রত্যর্পণের কথা এবং (৫) পৃথিবীতে সোভিয়েট রুশিয়ার একবারে একা পড়িবার কথা। গণতন্ত্রের পরাজয় এত স্পষ্ট যে তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু সত্যই ব্রিটেন কি জার্মান উপনিবেশ ফেরৎ দিবে? দেওয়া অসম্ভব নয়। কারণ উপনিবেশে নাকি তাহাদের লাভ নাই, বরং জার্মানী তাহাদের শত্রু হইয়া আছে—তাই কেহ কেহ উপনিবেশগুলি ছাড়িয়া দিবার পক্ষপাতী। কিন্তু যাঁহারা ফাসিজমের আসল বন্ধু, যথা—রোদার-মিয়ারের দল, তাঁহারাই উগ্র সাম্রাজ্যবাদী। এই দোটানা হইতে তাঁহারা উদ্ধার পাইতে চাহিবেন—'মাইন ক্যাম্পের' লক্ষ্যানুযায়ী রুশিয়ার ইউক্রেইন ও রুমেনিয়ার তৈল-খনির দিকে নাৎসিদের নির্দ্দেশ করিয়া। কারণ, হিট্লারের প্রধান লক্ষ্য হইল জার্মান জাতির ঐক্য সাধন, দ্বিতীয়তঃ মধ্য-ইউরোপ অধিকার স্থাপন, তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বাভিযানে যাত্রা করা। সেই পূর্ব্বের দিকেই ছিল চেক-রাষ্ট্র প্রধান বাধা, এবার ইউক্রেইনের দিকে হিট্লারের সেই পথ পরিষ্কার—মধ্যকার রুমেনিয়া পোল্যাণ্ডের ভূমিখণ্ড তো কিছুই নয়। অতএব এবার 'মাইন-ক্যাম্প' সত্যই সুরু হইবে, সুরু হইবে Drang nach Osten, সুরু হইবে মস্কো-অভিযান। আর সেই সোভিয়েট-সংহারে তাহার সহযোগী হইবে এই চতুঃশক্তি, অন্যান্য ভীরু ইউরোপীয় রাষ্ট্ররাও, এবং সর্ব্বশেষে চীন-বিজয়ী জাপান। তখন?

নির্বান্ধব সোভিয়েটের সেই চরম পরীক্ষার দিন আসিতেছে—ইহাই এখনকার বহির্জগতের বড় কথা। হয় তো বৎসর দুই মাত্র সময় রহিবে মধ্যে, হয় তো এতও থাকিবে না। সোভিয়েট অবশ্য ইহা বিলক্ষণ জানে, সেজন্য প্রস্তুতই হইতেছে। কিন্তু এখনও কি তাহার অন্তর্বিরোধ শেষ হয় নাই? সেনাপতি ব্ল্যুখারের পদচ্যুতিতে তাহাই মনে হয়। তাই ভয় হয়, সোভিয়েটের শত্রুরা সংখ্যায় যেরূপ অধিক ও শক্তিতে যেরূপ প্রবল—তাহাতে ভাবী দুর্দ্দিনে সোভিয়েট দাঁড়াইতে পারিবে কি? সেদিকে ভরসা দুইটি—সোভিয়েটের প্রবল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গণ-সাধারণ, আর শত্রুরাজ্যের অভ্যন্তরস্থ সোশ্যালিষ্টগণ—দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলিলে তাঁহারাই সেই সব রাষ্ট্র গোলমাল বাধাইবে—প্রত্যেক দেশেই দেখা দিবে গণবিপ্লব।

তাই, পরীক্ষা শুধু সোভিয়েট নয়, পরীক্ষা পৃথিবীর সমাজতন্ত্রীদেরও। যতই সংশয় থাকুক, সোভিয়েটের ভিতরে বা বাহিরে সাম্যবাদীর এখন প্রধান কর্ত্তব্য সোভিয়েটকে বলশালী করা—অন্যথা ফাসিষ্ট-পদতলে পৃথিবী বিদলিত হইবে। সে হইবে মানুষেরই এক দুর্দ্দিন। অতএব পরীক্ষা রুশিয়ারও শুধু নয় সমাজতন্ত্রীরও শুধু নয়, পরীক্ষা পৃথিবীর।

ওরা কি আমার কেহ?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বাঁধিয়াছে নীড় যারা সঙ্গোপনে মোর চিত্তমাঝে
বিহঙ্গের সম নিত্য সন্ধ্যাবেলা চিত্তে ফিরে আসে,
তারা মোর দুঃখে সুখে অন্তরের অন্তস্তলে রাজে,
সঙ্গীহারা জীবনের সঙ্গী মোর বিশ্ব-পরবাসে।
সংসারের পারাবারে সারাদিন করি বিচরণ,
শুভক্ষণে অন্ধকারে ধ্যানমৌন তপস্বীর মত
বসিয়াছে মর্ম্মে মোর, বন্দনায় হেরি নিমগন;
সুগুণ্ঠিত ক্লান্ত পক্ষ, আঁখিতারা প্রেমে অবনত।

মাতৃস্নেহসম রাত্রি সুপ্তি আনে স্নিগ্ধ সমীরণে,
উহারা ঘুমায়ে পড়ে, আমি জাগি, কত কথা জাগে,—
ওরা কি আমার কেহ? প্রতীক্ষায় ছিল কোনখানে!
জীবন-উষায় মোর মায়ামুঢ় শৈব জাগরণে
নীড় রচি চিত্তকুঞ্জে গাহিতেছে প্রীতিপুষ্পরাগে,
মোর মৃত্যুপথে ওরা ঘুরিবে কি প্রাণের সন্ধানে?

পুস্তক পরিচয়

কুরুপাণ্ডব—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

কিছু কাল হইল কবির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাভারতের মূল আখ্যানভাগ বাংলায় সংকলন করেন। তাহাকেই সংহত করিয়া কবি এই গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন যে, যে বাংলা-রচনারীতি বিশেষ ভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলা ভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। এই কথা মনে করিয়া শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের উচ্চতর বর্গের জন্য এই গ্রন্থখানি প্রবর্তিত হয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতির ন্যায় এই গ্রন্থখানিও ছাত্রদের পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য।

সেঁজুতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথ কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পর প্রথম প্রথম যে কবিতাগুলি রচনা করেন, তাহা এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি জীবনসন্ধ্যায় উপনীত হইয়াছেন বলিয়া এই সেঁজুতি, এই সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়াছেন। রোগের সময় বন্ধুর চিকিৎসা স্মরণ করিয়া তিনি পুস্তকখানি ডাক্তার স্যর্ নীলরতন সরকার মহাশয়কে উৎসর্গ করিয়াছেন। কবিতাগুলি সেঁজুতি নামের উপযোগী। প্রত্যেক কবিতা নব নব ভাবে ও রসে পূর্ণ। ছন্দেরও বৈচিত্র্য আছে। কেবল একটি কবিতা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। গোড়ায় যে "জন্মদিন" কবিতাটি আছে তাহাতে ধরণীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন :—

"যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে,
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত ;
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীনভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি'
বীভৎস চীৎকারে তা'রা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।
শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি'।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্ব্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব, এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের
নাট্যের কবর রূপে বাকি শুধু র'বে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
ব'লে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

বিদায়-অভিশাপ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন আনা।

"দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতি-পুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়া এবং নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়া কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন।" দেবযানীর নিকট হইতে কচ বিদায় লইতে যাইবার সময় উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তাহা এই অনবদ্য কবিতাটির বিষয়।

দেবযানী কচের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কচও দেবযানীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। দেবযানী নিজ হৃদয়ের প্রেম প্রথমে ব্যক্ত না করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন দ্বারা কচের হৃদয়ের রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করেন। প্রশ্নোত্তরের ধারায় দেবযানীর প্রেম এবং কচেরও তাঁহার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ পাইল বটে; কিন্তু কচ প্রেমডোরে বাঁধা রহিলেন না, যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য শুক্রাচার্য্যসমীপে আসিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হওয়ায় দেবলোকে চলিয়া গেলেন। দেবযানী অভিশাপ দিলেন—

"যে-বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ,—তুমি শুধু তা'র
ভারবাহী হয়ে র'বে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।"

কচ উত্তর দিলেন,

"আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।"

পৌরাণিক উপাখ্যানটিকে কবি এরূপ বাস্তবতা দিয়াছেন, যে, ইহা পড়িয়া হৃদয় সমবেদনায় উদ্বেল হইয়া উঠে।

বীরত্বে বাঙালী—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ। পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকটিতে প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত অনেক

বাঙালীর বীরত্বকাহিনী বর্ণিত আছে। দুই-এক জনের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সন্দেহ আছে। তাহাতে পুস্তকটির উপাদেয়তা হ্রাস পায় নাই। ইহাতে অনেকের ছবি আছে। অতীত কালের মানুষগুলির ছবি কল্পিত। আধুনিক দুটি ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি।

বাংলার ঋষি—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য পাঁচ সিকা।

এই পুস্তকখানিতে "রাজর্ষি রামমোহন রায়", "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর", "ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন," "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" ও "স্বামী বিবেকানন্দ," এই পাঁচ জন অসাধারণ পুরুষের জীবনচরিত ও ছবি আছে। অল্প সময়ের ব্যয়ে ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিবার উপায় করিয়া দিয়া গ্রন্থকার বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ক্ষণলেখা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ, পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত দার্শনিক ও বিদ্বান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু অনেকে জানেন না যে, অল্প বয়সে তিনি কবিতা লিখিতেন এবং তাঁহার তখনকার লেখা একখানি কবিতার বহি দেখিয়াছি বলিয়াও মনে পড়িতেছে। অধুনা যে তিনি আবার কবিতা লিখিতেছেন, এই গ্রন্থখানি না দেখিলেও 'প্রবাসী'র পাঠকেরা তাহা জানেন।

নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি লিখিয়া তিনি গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করিয়াছেন:—

"নিখিলমনুজপূজাদীপ্তরশ্মিপ্রবাহে।
জলতু মম শিখেয়ং ম্লানশোভাবগাহে।
অমরসলিলধারে মিশ্রণং যাতু ভৌমঃ।
কবিরবতু রবীন্দ্রো বাক্‌পতিঃ সার্ব্বভৌমঃ।"

দাসগুপ্ত মহাশয়ের এই গ্রন্থে তাঁহার দার্শনিক চিন্তা ও ভাবের ধারার সহিত কবিত্বধারার সংমিশ্রণে অভিনব রসের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিতাগুলি নানা ছন্দে লিখিত হওয়ায় সুখপাঠ্য হইয়াছে।

পুস্তকখানির নাম যদিও দেওয়া হইয়াছে "ক্ষণলেখা", এবং যদিও হয়তো কবিতাগুলি দীর্ঘ বহুবৎসর ধরিয়া লিখিত নহে, তথাপি রসাপ্লুত যে-সকল ভাব তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ক্ষণোদ্ভব বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারকে পুস্তকখানি সম্বন্ধে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন:—

"তোমার ক্ষণলেখা বইখানি প'ড়ে আনন্দিত হ'য়েছি। ভাষার উজ্জ্বল শুচিতা এবং ভাবের গভীরতায় আমি বিস্ময় বোধ করলেম, বিশেষত এই জন্যে যে তোমার কবিত্বসাধনা আপন পূর্ণ পরিণতির জন্য কালের অভিব্যক্তিবেগের প্রবর্ত্তন পায় নি। সেই জন্যে মনে করি ক্ষণলেখা নামটি সঙ্গত হয় নি। সময়ের সীমা দ্বারা এর পরিচয় নয়। হয়তো তোমার অগোচরে কখন তোমার মধ্যে এর পাথেয় সঞ্চিত হয়েছিল যা দূর পথযাত্রায় জন্যে, এবং যে আয়োজন নিজের সম্মান বহন ক'রে এনেছে।

"ইংরেজীতে যাকে classic রীতি বলে, তোমার কবিতা সেই রীতির—এ বড়ো সভার জন্যে পরিচ্ছন্ন ও প্রস্তুত, এর মধ্যে অনবধানতা ও অপরিপাট্য নেই।"

সঙ্গত—ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা-সভা। সভাপতি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক মীমাংসিত আলোচনার সার। দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম সংস্করণ। ১৯৩৮, নববিধান পাব্লিকেশন কমীটি, "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির", ৯৫ নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ষোল পেজি ৮৶০+৩৩১। মূল্য আট আনা মাত্র।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সম্মিলিত হইয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মমণ্ডলীর ধর্ম্মজীবনের উন্নতির জন্য "সঙ্গত সভা" স্থাপন করেন। ইহা একটি ব্রাহ্মপ্রতিষ্ঠান হইলেও ইহাতে আলোচিত বিষয়গুলি যে-কোনও ধর্ম্মমণ্ডলীর বহুবিধ সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিবে। এই জন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেই ইহা পড়িয়া উপকৃত হইতে পারেন। বোধ করি অল্পবিত্ত লোকেরাও যাহাতে ইহা পড়িতে পারেন, তদর্থে ইহার মূল্য অত্যন্ত কম রাখা হইয়াছে।

চিত্ত-ছায়া—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী। মিত্র ও ঘোষ কর্তৃক ১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

নানা ছন্দে গ্রথিত ইহার সুললিত কবিতাগুলি গ্রন্থখানির বাহ্য শোভার অনুরূপ।

এখনও সে দিন বহুদূরে যখন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে প্রবীণা বলা চলিবে; কিন্তু তিনি যখন আরও ছোট ছিলেন তখনও তাঁহার কবিতার এই একটি লক্ষণ দেখা গিয়াছিল যে, তাহার গতি হালকা, চপল, তরল, কিছুর দিকে নয়; অন্তরে ও বাহিরে যাহা কিছু শোভন ও সুষমাময় এবং যাহা শুভ্র ও শুচি, কবিকে এইরূপ সমুদয় বিষয়ই আনন্দ দেয়। তাঁহার কবিজীবনের গোড়ায় তিনি কেবল কবি-প্রেরণাই অনুভব করিতেন; এখন তাঁহার মধ্যে সমালোচকেরও আবির্ভাব হইয়াছে, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা বড় হইয়াছে, সুতরাং অতৃপ্তিও দেখা দিয়াছে। এই কথা তিনি তাঁহার "প্রথম কবিতা" শীর্ষক রচনাটিতে বলিয়াছেন। "প্রথম কবিতাখানি লিখিনু যে দিন", সে দিন "যাহা কিছু লিখি তাই ভারি ভালো লাগে"—অবস্থা এইরূপ ছিল।

"কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষ পরে ডাকে ক্ষুদ্র পাখী,
মনে হয়, তারো কথা আজ লিখে রাখি।
যাহা দেখি তাই লিখি, তাই লাগে ভালো।
রাতের আঁধার আর প্রভাতের আলো,
সব মসীসিক্ত হয়ে শুভ্র-পত্র-ময়
প্রতিদিন নানা ছন্দে গাঁথা হয়ে রয়।"

এখন অবস্থা অন্যরূপ।

"আজ লিখে ছিঁড়ে ফেলি হাত যায় কেঁপে,
আরো ভাল করিবার আশা ধরে চেপে।"
"সুখশান্তি নষ্ট হ'ল কষ্ট শুধু সার
অতি ঊর্দ্ধে লক্ষ্য রাখি; জীবনে আমার
যা কিছু পেয়েছি হাতে, ফেলে গেছি, হায়,
আরো ভাল পাব এই বিফল নেশায়।"

অতৃপ্তি এবং আরো ভাল পাওয়া একই অবস্থার দুই পিঠ।

ভ.।

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশরক্ষার অর্থ

কোন স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় বিষয় সকলের আলোচনার সময় যখন ইংরেজী ডিফেন্স (অর্থাৎ দেশ-রক্ষা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন তথাকার লোকেরা তাহার সোজা অর্থ যাহা তাহা অনায়াসেই বুঝিয়া থাকে। তাহারা বুঝে, দেশরক্ষার মানে এই যে, তাহাদের দেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। দেশরক্ষার উদ্দেশ্য যাহা তাহাও তাহারা বুঝে। তাহারা বুঝে ও জানে যে, দেশটিকে স্বাধীন রাখিতে হইবে তাহার সমুদয় সুখসুবিধা ও ঐশ্বর্য্য প্রধানতঃ যাহাতে পুরুষানুক্রমে তথাকার বাসিন্দা তাহারা ভোগ করিতে পারে।

—

ভারতবর্ষে দেশরক্ষার অর্থ

ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে, ইংরেজের অধীন। এদেশের সমুদয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন ইংরেজরা। তাঁহাদের ভাষার ডিফেন্স কথাটি যখন তাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্যবহার করেন, যখন ভারতরক্ষা (ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া) সমস্যার আলোচনা করেন, তখন ভারত-রক্ষা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয় না। যাহার স্বাধীনতা নাই, তাহার স্বাধীনতা রক্ষার কথা উঠিতে পারে না। তাহার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের, পুনরর্জ্জনের, কথা উঠিতে পারে বটে; কিন্তু ভারতবর্ষকে আবার স্বাধীন করিবার দায় ত ইংরেজের নহে—সে দায় ভারতবর্ষের লোকদের।

তাহা হইলে ইংরেজরা ভারতবর্ষের ডিফেন্স অর্থাৎ রক্ষা কথাগুলি কি অর্থে ব্যবহার করেন? তাহার স্পষ্ট অর্থ, ভারতবর্ষের ইংরেজাধীনতা রক্ষা করা, তাহাকে ভারতীয়দের দ্বারা শাসিত হইতে, স্বাধীন হইতে, না দেওয়া, এবং অন্য কোন জাতি দ্বারাও ভারতবর্ষকে অধিকৃত হইতে না দেওয়া। এই যে বিশেষ অর্থে ভারত-রক্ষা, ইহার উদ্দেশ্যও রহস্যাবৃত নহে। ইহার উদ্দেশ্য, ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষের প্রভু রাখা এবং ভারতবর্ষ হইতে যত বেশী সম্ভব ধন আহরণ করিতে সমর্থ করা।

—

ভারতরক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কমীটি বিলকুল সাদা

আধুনিক সময়ে যুদ্ধের যত রকম অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম আবশ্যক হয় ও অন্যান্য ব্যবস্থা যত করিতে হয়, তাহার জন্য যত টাকা দরকার, বর্ত্তমানে তাহা খরচ করিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের নাই,—ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট অম্লান বদনে এই কথা বলিয়াছেন। ব্রিটেনের মত ছোট দেশের রাশি রাশি টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত বৃহৎ ও প্রাকৃতিক সম্পৎশালী দেশের তাহা নাই, প্রায় দুই শত বৎসর এদেশের হর্ত্তাকর্ত্তা থাকিয়া ইংরেজদের একথা বলিতে লজ্জা বোধ হয় না।

যাহা হউক, আমরা যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহা অন্য কথা।

ভারত-রক্ষা সম্বন্ধে আর্থিক ও তদ্রূপ অন্য কতকগুলি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমীটি নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার সভাপতি লর্ড চ্যাটফীল্ডের নাম অনুসারে ইহাকে চ্যাটফীল্ড কমীটি বলা হয়। ইহার সভাপতি ও সদস্যগণ সবাই "শ্বেত" মনুষ্য, কালা আদমী এক জনও ইহাতে নাই—সব ধলা। ভারতরক্ষা সম্বন্ধীয় কমীটি হইতে ভারতীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়ায় ভারতবর্ষের লোকেরা বড় চটিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন দেশসমূহে দেশরক্ষার যাহা অর্থ ভারতবর্ষেও উহার অর্থ যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে চটাচটা অযৌক্তিক হইত না। কিন্তু ভারতরক্ষার মানে যখন ইহার ইংরেজাধীনতা রক্ষা, তখন সেই জন্য নিযুক্ত কমীটিতে কেবলমাত্র ইংরেজ মনোনীত করাই ত স্বাভাবিক!

ভারতরক্ষার আরও একটু অর্থ আছে বটে। পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সেই অর্থ, ভারতবর্ষকে জাপানের অধীনতা হইতে রক্ষা করা। ভারতবর্ষ যাহাতে জাপানের

কবলে না-পড়ে, সেরূপ বন্দোবস্ত ও চেষ্টা করিতে হইলে ভারতীয়দের সহযোগিতা ও সাহায্য আবশ্যক, কিন্তু তাহা যে একান্ত আবশ্যক তাহা ব্রিটেন বুঝিয়াও বুঝে না।

ভারতরক্ষা কমীটিতে এক জন ভারতীয়কেও কেন লওয়া হয় নাই, তাহার উত্তরে ইংরেজরা বলিতে পারে—যুদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এমন কোন ভারতীয় নাই যাহাকে এই কমীটিতে লওয়া যাইতে পারিত; ভারতবর্ষের সিপাহীরা সাহসে ও রণদক্ষতায় কোন দেশের সৈন্যদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়, নিম্নস্থানীয় সেনানায়কও ভারতীয়দের মধ্যে আছে; কিন্তু বিখ্যাত সেনাপতি কেহই নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয়দের মধ্যে সেনাপতি যে কেহ নাই, তাহার জন্য যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট দায়ী, এরূপ সমালোচনার ন্যায্য ও সত্য উত্তর ইংরেজরা দিতে পারে না বটে; কিন্তু তাহারা বলিবে, দায়ী যেই হউক, সুদক্ষ সেনাপতি ভারতীয়দের মধ্যে নাই, এই তথ্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

এই বিষয়ে দু-একটা কথা বলা আবশ্যক।

কমীটির ইংরেজ সভ্যেরা সবাই অভিজ্ঞ ও বিখ্যাত সেনাপতি নন। ভারতবর্ষে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে না থাকিলেও, দেশী রাজ্যসমূহে অভিজ্ঞ সেনানায়ক আছেন। বিকানীরের মহারাজার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। ইউরোপের গত মহাযুদ্ধের সময় যখন জার্ম্যানদের যুদ্ধকৌশলে ভারতীয় সিপাহীদের ইংরেজ নায়ক অনেক মারা পড়ে, তখন ভারতীয় বহু নায়ক তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া সমান দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও এই কমীটিতে লওয়া যাইতে পারিত।

তদ্ভিন্ন, ইহাও সত্য নহে যে, যে-কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ না করিয়াছে, সামরিক কোন বিষয়ের আলোচনা করিবার তাহার যোগ্যতা ও অধিকার নাই বা সেরূপ বিষয়ে পরামর্শ দিবার অধিকার নাই। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের যুদ্ধবিষয়ক সমুদয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন মিঃ লয়েড্ জর্জ। অথচ তিনি কোনকালে সাধারণ সৈনিক বা সেনানায়ক ছিলেন না। তাঁহার ব্যবস্থাতে ইংলণ্ডের জিতও হইয়াছিল। তিনি যুদ্ধ শেষ হইবার অনেক বৎসর পরে যুদ্ধকালীন স্মৃতিকথার যে পুস্তক লিখেন, তাহাতে বড় বড় সেনাপতিদের ভ্রম দেখাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটেনে মিঃ হোর-বেলিশা যুদ্ধ-আফিসের কর্ত্তা এবং সর্ স্যামুয়েল হোর ও মিঃ ডফ্ কুপার রণতরী-বিভাগের প্রধান সচিবের কাজ করিয়াছেন বা করিতেছেন। কিন্তু এই তিন জনের কাহারও স্থলযুদ্ধ বা জলযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। বিলাতের অসামরিক রাজনীতিকেরা যদি যুদ্ধবিষয়ে মত প্রকাশ করিতে এবং কার্য্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রধান রাজনীতিকদের মধ্যে কেহই তাহা পারিবেন না মনে করা ভুল।

ভারতীয়েরা স্বাধীনতা চায় বটে, এবং সেই জন্য তাহারা ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান চায়। ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান দুই প্রকারে হইতে পারে—ভারতীয়দের স্বাধীনতালাভ দ্বারা বা অন্য কোন বিদেশী জাতি দ্বারা ভারতে ইংরেজদের পরাজয়সংঘটন, ইংরেজ-বিতাড়ন, ও ভারতবিজয় দ্বারা। ভারতীয়েরা প্রথমোক্ত প্রকারে ইংরেজ-প্রভুত্বের অবসান কামনা করে, তাহারা ইংরেজের অধীনতার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বিদেশী জাতির অধীনতা চায় না। যদিও মানুষ যাহারই দাস হউক, দাসত্ব দাসত্বই, তথাপি যদি ভারতবর্ষকে আরও কিছুকাল বিদেশীর অধীন থাকিতেই হয়, তাহা হইলে আবার কোন বিদেশী জাতির অধীন না হইয়া কিছু কাল ধরিয়া ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষ ও বুঝাপড়ার দ্বারা স্বাধীন হওয়াই ভাল। অধীনতা ও স্বাধীনতার মধ্যবর্ত্তী এই যে সময়টা ইংরেজদিগকে ও আমাদিগকে কাটাইতে হইতে পারে, সেই সময় কেমন করিয়া অ-ব্রিটিশ কোন বিদেশী জাতির আক্রমণ ঠেকান যায়, সে পরামর্শে ভারতীয়দের থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সন্দেহ, অহঙ্কার, অদূরদর্শিতা, ভয় প্রভৃতি নানা কারণে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয় নেতাদের সাহায্য লইতেছেন না।

—

ভারতের প্রতি জাপানের দৃষ্টি

ব্রিটিশ জাতির শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষ তাহাদের সম্পত্তি। এই সম্পত্তিটার প্রতি তাহাদের লোভ ও আসক্তি এত বেশী যে, তাহারা এ পর্য্যন্ত এমন কিছু করিতে চায় নাই ও করে নাই যাহার দ্বারা উহা হাতছাড়া হইবার সম্ভাবনা ঘটে। সেই কারণে ভারতশাসন-আইনের পরিকল্পনার মধ্যে স্বাজাতিক হিন্দুদিগকে ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যালঘু রাখিবার ব্যবস্থা আছে এবং স্বাজাতিকদিগকে

বাবাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেশী রাজ্যের রাজাদিগকে ফেডারেশ্যনের মধ্যে আনা হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষের পণ্যশিল্প ও বাণিজ্য যথাসম্ভব ব্রিটিশ জাতির হাতে রাখিবার জন্য অনেকগুলি ধারা ঐ আইনে নিবিষ্ট হইয়াছে।

স্বাধীন দেশসমূহে দেশরক্ষার অর্থ যাহা, সে অর্থে ভারতবর্ষ রক্ষা যদি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় চোখের সামনে পড়িয়াই ছিল। সে উপায়, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকদিগকে যুদ্ধ শিখিবার সুযোগ দিয়া রণদক্ষ করিয়া তোলা। এই উপায় অবলম্বিত হইলে ভারতবর্ষের সৈন্যবল পৃথিবীর সকল দেশের সৈন্যবল অপেক্ষা অধিক হইতে পারিত। কিন্তু ব্রিটেনের বরাবর ভয় ছিল এবং এখনও আছে যে, ভারতবর্ষের শিক্ষায় কিছু অগ্রসর প্রদেশগুলার রাজনৈতিক চেতনাবান্ লোকদিগকে যুদ্ধ শিখিতে দিলে তাহারা বিদ্রোহ করিবে, ভারতবর্ষ-জমিদারীটা হাতছাড়া হইবে।

এই কারণে ""ভারতরক্ষা"র আর সব উপায় ব্রিটেন অবলম্বন করিবে—তাহাতে ব্রিটিশ জাতির প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও মানের হানি যতই হউক, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগকে স্বরক্ষক হইতে দিবে না।

ব্রিটেন যে জার্মেনীকে চেকোস্লোভাকিয়ার একটা অংশ গ্রাস করিতে দিল, তাহার কারণ তাহা না দিলে জাপানের ভারত-আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা ছিল। একটি আমেরিকান্ কাগজে এ-বিষয়ে ভিতরের কথা বাহির হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের উপর জাপানের দৃষ্টি বহুকাল হইতে আছে; চেকো-স্লোভাকিয়ার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া ইংলণ্ড যদি একটা ইউরোপীয় যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে তাহার রণতরী-বিভাগ এবং তাহার স্থলসৈন্য ও এরোপ্লেন আদি ভারতবর্ষে বেশী পরিমাণে বা মোটেই প্রেরিত হইতে পারিত না; সেই সুযোগে জাপান ফরাসী-অধিকৃত ইণ্ডো-চীন (কারণ ফ্রান্সও ঐ ইউরোপীয় যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িত), শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত। বড় বড় সব স্বাধীন দেশ পরস্পরের গোপন উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা জানিবার জন্য গোয়েন্দা রাখে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা-বিভাগ জাপানের উক্তরূপ মতলব জানিতে পারিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে জানায়। ফলে প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন সাহেব তাড়াতাড়ি জার্মেনী গিয়া চেকোস্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদে রাজী হইয়া ব্রিটেনকে যুদ্ধ হইতে রক্ষা করেন।

ইউরোপে কোন যুদ্ধে ব্রিটেন জড়িত হইলে জাপানের ভারতাক্রমণের সুবিধা হইবে বলিয়া, সেরূপ যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে সেই অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ জাতি ইটালীর সহিতও মিতালি করিয়া ইটালীর আবিসীনিয়া-জয় মানিয়া লইতেছে।

কিন্তু নানা প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও হীনতা স্বীকার করিয়াও যে ব্রিটেন ভারতবর্ষকে মুঠার মধ্যে রাখিতে পারিবে, ইহা মনে করা ভুল। যদি কোন বিদেশী জাতির ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা না-ও থাকে, তাহা হইলেও ভারতবর্ষ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইবে এবং শেষে স্বাধীন হইবে। স্বাজাতিক প্রচেষ্টা প্রবলতর হইতেছে—যদিও, দুঃখের বিষয়, দলাদলিও বাড়িতেছে এবং দুর্নীতির প্রাদুর্ভাবে শক্তিক্ষয়ও হইতেছে।

—

কংগ্রেস ও ফেডারেশ্যন

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি নামমাত্র প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব (provincial autonomy) পাইয়াছে। কিছু ক্ষমতা পাইয়াছে বটে, কিন্তু প্রধান কোন বিষয়েই চূড়ান্ত ক্ষমতা পায় নাই। কিন্তু তাহারা যদি পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব পায়—এমন কি যদি তাহারা অতীত কালের ভারতবর্ষের নানা স্বাধীন রাজ্যের মত স্বাধীন হয়, তাহা হইলেও নিখিল-ভারত স্বাধীন হইবে না ও থাকিবে না; যে-সকল কারণে অতীতে স্বাধীন রাজ্যগুলি একটি একটি করিয়া পরপদানত হইয়াছে, স্বাধীন প্রদেশগুলিও সেইরূপ শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িবে।

ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি ব্যতীত দেশী রাজ্যগুলির কথাও ভাবিতে হইবে। তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগ নাই, ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির সহিতও যোগ নাই। তাহারা সকলে ব্রিটিশ নৃপতির প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য, কেবল ইহাই সকলের সাধারণ ধর্ম্ম।

যদি আত্মকর্তৃত্ববিশিষ্ট সমুদয় ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিকে ও আত্মকর্তৃত্ববিশিষ্ট সমুদয় দেশী রাজ্যগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় শক্তিদ্বারা একত্র সংঘবদ্ধ ও সংহত করা হয়, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে ও থাকিতে পারে।

কংগ্রেস-নেতারা ইহা জানেন ও বুঝেন। সেই জন্য তাঁহারা ঐরূপ সংঘবদ্ধতা ও সংহতির বিরোধী নহেন।

বরং তাঁহারা তাহাই চাহেন। অর্থাৎ তাঁহারা, যাহাকে ইংরেজীতে ফেডারেশুন বলেন, তাহা চাহেন। কিন্তু ভারতশাসন-আইনে যে-প্রকার ফেডারেশুনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাঁহারা তাহা চান না; কেন না, ঐ তথাকথিত ফেডারেশুন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি ও দেশী রাজ্যগুলিকে চিরকাল ব্রিটিশ জাতির অধীন রাখিবার উপায় রূপে কল্পিত হইয়াছে। কংগ্রেস এই ব্রিটিশ-কল্পিত ফেডারেশুনকে চালু হইতে না দিয়া, তাহাকে ধ্বংস করিয়া, গণপরিষদের (constituent assemblyর) সাহায্যে নিজ মত অনুযায়ী ফেডারেশুন গড়িতে চান।

হরিপুরা কংগ্রেসে এবং তাহার পরেও কংগ্রেসের এই ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছে। অন্য দিকে, ইহাও জানা কথা যে, মান্দ্রাজের ও অন্য কোন কোন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, গবর্মেণ্ট-পরিকল্পিত ফেডারেশুন ব্যবস্থা নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কতক পরিবর্ত্তিত হইলে আপাততঃ চালু করা যাইতে পারে। এ-রকম কথাও বিলাতী খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বিলাত গিয়াছিলেন ঐরূপ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার ও দিবার জন্য—যদিও ইহা ভারতবর্ষে অস্বীকৃত হয়।

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব সন্তোষজনক না হইলেও যেমন তাহার দ্বারাই জাতিকে বলবত্তর করিবার জন্য কংগ্রেস তাহা আপাততঃ গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ মনে করেন গবর্মেণ্ট-পরিকল্পিত ফেডারেশ্যনও সেই উদ্দেশ্যে সেই প্রকার আপাতগ্রহণীয় হইতে পারে, এবং তাহার দ্বারা পরে গণপরিষদ্ আহ্বানের পথ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই কার্য্যপদ্ধতিই কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হইবে, না কংগ্রেস সরকারী ফেডারেশ্যন ভাঙিয়া দিয়া গণপরিষদ্ আহ্বানের চেষ্টা করিবেন, তাহা বলিতে পারি না।

কংগ্রেস যদি শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সরকারী ফেডারেশ্যনে বাধা কি প্রকারে দিবেন, ঠিক্ বলিতে পারি না।

ফেডার্যাল এসেম্‌ব্লী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের নির্ব্বাচন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির মধ্য দিয়া হইবে। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা যে-সকল প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালিত ও সম্পন্ন হয়, সেই সকল প্রদেশে মন্ত্রীরা তাঁহাদের প্রভাবাধীন ব্যবস্থাপক সভাগুলির মারফতে নির্ব্বাচনে বাধা দিতে পারেন, এবং এই প্রকারে ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভা গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারেন। তাঁহারা ইহাই করিবেন কি না জানি না। এমনও হইতে পারে যে, তাঁহারা ফেডার্যাল এসেম্‌ব্লীর সদস্য নির্ব্বাচন হইতে দিবেন এবং নির্ব্বাচিত সদস্য সকলেই বা অধিকাংশ যাহাতে কংগ্রেসওআলা হন, তাহার চেষ্টা করিবেন। তাহার পর কংগ্রেসী দল ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভায় যথেষ্টসংখ্যক হইলে সেখানে গবর্মেণ্টের অভিপ্রায়ে বাধা দিবার চেষ্টা করিবেন।

আবার এমনও হইতে পারে যে, ভারতসচিব ও ভারত-গবর্মেণ্ট সরকারী ফেডারেশুন চালু করিবার উপক্রম করিবামাত্র আটটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ইস্তফা দিবেন এবং অন্য কাহাকেও মন্ত্রী হইতে না দিয়া বা কেহ হইলেও তাহার প্রতি অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করাইয়া প্রাদেশিক শাসন অচল করিতে চাহিবেন।

যদি কংগ্রেস গণপরিষদ্ আহ্বান করাইতে সমর্থ হন এবং তাহার দ্বারা একটি ফেডারেশুন-পরিকল্পনা মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারেন, তাহা হইলেও অ-কংগ্রেসী কয়েকটি মন্ত্রিসভাকে ও দেশী রাজ্যগুলিকে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করাইতে ও তদনুসারে কাজ করাইতে কি প্রকারে সমর্থ হইবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

কংগ্রেসের সভাপতি বা অন্য কোন বড় নেতা এই বিষয়ে তাঁহাদের অনুসর্ত্তব্য পন্থা ও উপায় সম্বন্ধে এখনও কিছু খুলিয়া বলেন নাই।

আমরা সরকারী ফেডারেশুন-পরিকল্পনার প্রতিকূল সমালোচনা আগে বহুবার করিয়াছি।

—

লেনিনের পাণ্ডিত্য

নিউইয়র্কের ইণ্টারন্যাশন্যাল পাব্লিশারদের দ্বারা প্রকাশিত লেনিনের জীবনচরিত থেকে জানা যায় যে, লেনিনের পিতা ইস্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন, এবং তাঁহার যে দুই পুত্র ও চারি কন্যা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সকলেই বিপ্লবী ছিলেন।* ঐ পুস্তক হইতে আরও জানা যায় যে, ১৭ বৎসর বয়সে একটা বৈপ্লবিক ডিমন্‌স্ট্রেশনে যোগ দেওয়ায় লেনিন কাজান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাড়িত হন, কিন্তু তাহার পর পিটার্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পড়া-

* "The father of Lenin was an inspector of schools. The two sons and four daughters all studied deeply, and were all revolutionaries." P. 21.

শুনা করিতে থাকেন এবং আইনের পরীক্ষা দিয়া ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে উপাধি অর্জ্জন করেন, অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েট হন। ইহা রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ঘটিবার অনেক বৎসর আগেকার কথা। এখন যেমন ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে অনেক রাজনৈতিক গোলাম তৈরি করিবার কারখানা বলেন, রাশিয়ার তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও তখন ঐ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু বিপ্লবিতার জন্য রাশিয়ার একটি "গোলাম-কারখানা" হইতে তাড়িত লেনিন আর একটি "গোলাম-কারখানা"র অধ্যয়ন করিয়া তাহার গ্র্যাজুয়েট হইয়াছিলেন। এরূপ অধ্যয়ন বিপ্লবিতার সহিত বেখাপ বা বেমানান, লেনিনের এরূপ মনে হয় নাই। হইলে তিনি সেরূপ অধ্যয়ন চালাইতেন না।

—

জ্ঞান অর্জ্জন সম্বন্ধে লেনিনের মত

লেনিনের চেয়ে বড় বিপ্লবী এ পর্য্যন্ত কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তিনি যে চাকরি জুটাইবার নিমিত্ত বা ওকালতি করিয়া টাকা রোজগার করিবার জন্য (এই দুইটি উদ্দেশ্যের কোনটিই মন্দ উদ্দেশ্য নহে) গ্র্যাজুয়েট হন নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহা হইলে কেন তিনি "গভীর অধ্যয়ন" করিয়াছিলেন, কেন পড়াশুনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হইয়াছিলেন? তাহার কারণ তাঁহার নিজের এক বক্তৃতার কয়েকটি কথা হইতে বুঝা যায়, এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত জীবনচরিতে লিখিত একটি মত হইতেও বুঝা যায়। জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে যে, অতীত ও বর্ত্তমান সমুদয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির চরম ফল কম্যুনিজম্, সেই সমুদয়ের ভ্রমশূন্য জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, লেনিন এইরূপ মনে করিতেন।*

রাশিয়াতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কম্যুনিষ্ট যুবজনের তৃতীয় কংগ্রেসকে সম্বোধন করিয়া লেনিন যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী না হইয়া কম্যুনিষ্ট হওয়া যায় মনে করিলে গুরুতর ভ্রম হইবে; কতকগুলি কম্যুনিষ্ট গৎ আওড়াইয়া, কতকগুলি কম্যুনিষ্ট বুলি কপচাইয়া, জ্ঞানের সমুদয় শাখার অধিকারী না হইয়া, কম্যুনিষ্ট হওয়া যায় মনে করা ভুল। উত্তরাধিকারসূত্রে মানবজাতি বর্ত্তমানে যত জ্ঞান পাইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া চিন্তার দ্বারা যদি কেহ কম্যুনিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কম্যুনিজম্ একটা ফাঁকা কথা এবং সে নিজে ধাপ্পাবাজ।† লেনিনের মত এইরূপ।

সেই জন্য লেনিন যুবজনকে মানবজ্ঞানের সমগ্র সমষ্টি অর্জ্জন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন—এমন ভাবে অর্জ্জন করিতে বলেন যেন তাহা কণ্ঠস্থ করা কিছুর মত না থাকে, পরন্তু যেন তাহা আধুনিক শিক্ষার দৃষ্টিতে যুবজনেরই চিন্তাপ্রসূত অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত হয়।‡

যাঁহারা বিপ্লবী নহেন, এমন কি অন্য রকমের উৎসাহী রাজনৈতিকও নহেন, তাঁহারা যত দূর সম্ভব সর্ব্ববিধ জ্ঞান অর্জ্জন আবশ্যক মনে করেন—অন্ততঃ কেহ তাহা করিতে চাহিলে তাহা সময়ের অপব্যয় ও পণ্ডশ্রম মনে করেন না। দেখা গেল, লেনিনের মত বড় বিপ্লবীও স্বয়ং মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞান অর্জ্জন কম্যুনিষ্টদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক মনে করিতেন।

—

মার্ক্সের পাণ্ডিত্য

আধুনিক শ্রমিক নেতারা আপনাদিগকে মার্ক্সের শিষ্য মনে করেন ও বলেন। তাঁহারা জানেন বা তাঁহাদের জানা উচিত যে, মার্কস্ মহাপণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন, জ্ঞানের প্রধান সব শাখা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

—

পাণ্ডিত্য ও বিপ্লবিতা

আমরা উপরে লেনিনের ও মার্ক্সের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহার উদ্দেশ্য বিপ্লবী অ-বিপ্লবী সকলের পক্ষে জ্ঞানের আবশ্যকতা প্রদর্শন, তাঁহাদের

* "Lenin constantly insisted that communism cannot be regarded as a special body of doctrines or dogmas of 'ready-made' conclusions to be learnt from text-books, but can only be understood as the outcome of the whole of human science and culture, on the basis of an exact study of all that previous ages, including especially capitalist society, had achieved."—P. 63.

† "It would be a serious mistake to suppose that one can become a communist without making one's own the treasures of human knowledge. It would be mistaken to imagine that it is enough to adopt the communist formulae and conclusions of communist science without mastering that sum-total of different branches of knowledge, the final outcome of which is communism......

"Communism becomes an empty phrase, a mere facade, and the communist a mere bluffer, if he has not worked over in his consciousness the whole inheritance of human knowledge." Pp. 63-64.

‡ Therefore he urged the youth "to acquire the whole sum of human knowledge, and to acquire it in such a way that communism will not be something learnt by heart, but something which you have thought out yourselves, something which forms the inevitable conclusion from the point of view of modern education".—P. 64.

মত সমর্থন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কেহ জ্ঞান অর্জন করিয়া বিপ্লবী হইবেন বা অ-বিপ্লবী থাকিবেন, তাহা তিনি নিজে স্থির করিবেন।

—

বঙ্গের রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য ও দুরবস্থা

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর যে সাতটি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্তেরা সংখ্যায় অধিক, তাহাদের শাসনভার কংগ্রেসী মন্ত্রীরা গ্রহণ করেন। এই সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যা এত বেশী যে, অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যেরা কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে অপসৃত করিয়া নিজেদের দলের মন্ত্রী মনোনয়নের চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন নাই;—মধ্যপ্রদেশে যে মন্ত্রী অদলবদল হইয়া গিয়াছে, তাহা কংগ্রেসীদের মধ্যেই। ফলে ঐ সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের নীতি অনুসারে কাজ ও কাজের চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। তাহাতে ঐ সাতটি প্রদেশের উপকার হইয়াছে। কংগ্রেসের বিরোধীরা যদি তাহা স্বীকার না-ও করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিদল তাড়াইবার চেষ্টা হয় নাই, সুতরাং তাহাতে ও কংগ্রেসী মন্ত্রিদলের আত্মরক্ষার চেষ্টায় সময় ও শক্তির অপব্যবহার হয় নাই; কংগ্রেসীরা তথায় আপনাদের নীতি অনুসারে কাজ করিবার অব্যাহত সুযোগ পাইয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলে বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার গঠন এরূপ হইয়াছে যে, এখানে কংগ্রেসী সদস্যেরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইতে পারেন নাই, ভারতশাসন-আইন অপরিবর্ত্তিত থাকিতে কখনও তাহা হইতে পারিবেন না। মুসলমান সদস্যেরা অন্য প্রত্যেক দলের সদস্যদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী হইলেও তাঁহারা নিজেই মোট সদস্য-সমষ্টি ২৫০এর মধ্যে ১২৬ বা তার চেয়ে বেশী নহেন। তাহার উপর, সকল মুসলমান সদস্য একমতাবলম্বী নহেন—অবশ্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে হইলে তাঁহারা একমতাবলম্বী। যদি মুসলমান সদস্যেরা অন্য-দল-নিরপেক্ষভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতেন এবং তাঁহাদের আপনাদের মধ্যে দলাদলি না থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গের মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিসভাকে অপসৃত করিবার চেষ্টা হইত না এবং মন্ত্রিসভা অন্ততঃ মুসলমান-স্বার্থ-সিদ্ধির অনুকূল নীতিই বরাবর অনুসরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হয় নাই, হইতেছে না। মন্ত্রীদের বিরোধী মুসলমান সদস্যদের সাহায্যে কংগ্রেসীরা বর্ত্তমান মন্ত্রি-দলকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, এবং মন্ত্রীরা ইংরেজ সদস্যদের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইংরেজদের স্বার্থ ভারতবর্ষের ও বঙ্গের সব সম্প্রদায়েরই স্বার্থের প্রতিকূল। সুতরাং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে গিয়া মন্ত্রিদল সমগ্র বাঙালী সমাজের হিত দূরে থাকুক, মুসলমানদের হিতও করিতে পারিতেছেন না। মুসলমানদের প্রকৃত হিত মন্ত্রীরা যদি করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে হিন্দুদেরও কিঞ্চিৎ উপকার হইয়া যাইতে পারিত।

কংগ্রেসীদের সহিত মন্ত্রীদের দলের বিরোধ, মুসলমান সদস্যদের মধ্যে দলাদলি, সাধারণ কংগ্রেসী ও জ্ঞাশন্তালিষ্ট কংগ্রেসীদের মধ্যে অমিল—ইত্যাকার নানা দলাদলিতে বঙ্গের শক্তিক্ষয় হইতেছে, সময়ের অপব্যয় হইতেছে, এবং বোধ করি অর্থের অবৈধ ব্যয়ও কোন কোন স্থলে হইতেছে।

বঙ্গের রাজনৈতিক বিরোধ ও দলাদলিতে আর একটি ক্ষতি ও অসুবিধা এই হইয়াছে যে, বঙ্গের সরকারী কোন বিভাগ দ্বারা বাস্তবিক কোথাও কিছু হিতকর কাজ হইতেছে কি না, সঠিক্ জানিবার উপায় নাই। সরকারী একটি আফিস হইতে জাপনী পত্রী বাহির হয় বটে, কিন্তু বড় কোন কাজ করা হইতেছে বা হইয়াছে বলিয়া কোনটিতে দাবী থাকিলে অমনই একাধিক দৈনিকে তাহার প্রতিবাদ হইতেও দেখা যায়। কাহাকে বিশ্বাস করিব? এখন মন্ত্রীরা ইংরেজী ও বাংলাতে তাঁহাদের দুটি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিয়াছেন। দেখি, এ দুটির ভাগ্যে কি আছে।

—

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু

সুপণ্ডিত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ও ইংরেজীতে প্রত্নতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য অনেক প্রাচীন বাংলা পুঁথি সম্পাদনও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বকোষের সঙ্কলয়িতা ও সম্পাদক বলিয়াই সমধিক পরিচিত। বিশ্বকোষের একটি হিন্দী সংস্করণও বাহির করিয়াছিলেন। তিনি সুস্থ সবল মানুষ ছিলেন না। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের জোর এরূপ ছিল যে,

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরও বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন।

—

মনোমোহন চক্রবর্ত্তী

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক বরিশালনিবাসী মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রাণ, সুবক্তা, সুগায়ক এবং সংগীত-রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার দেশভক্তি বরিশালের উপযুক্ত ছিল, এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি এক জন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। "ব্রহ্মবাদী" নামক ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্রের তিনি সম্পাদক ছিলেন। সকল জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল।

—

মধুসূদন জানা

মফঃসলের বাংলা অনেক কাগজ নিলামের ইস্তাহার ছাপিবার জন্যই আছে। তথাকার অল্প যে ২।১টি কাগজ প্রকৃত সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বিদিত, মেদিনীপুরের "নীহার" তাহার মধ্যে একটি। পরলোকগত মধুসূদন জানা ইহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি বহু প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—

অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত

অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রথমে কলিকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপকতা করেন। পরে তিনি নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজ করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশে বেতুল, হোষাঙ্গাবাদ ও জব্বলপুরে শাসনবিভাগে ও শিক্ষাবিভাগে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার শেষ কাজ শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষতা। এখানকার প্রিন্সিপ্যালের পদ হইতে তিনি পেন্স্যন গ্রহণ করেন। তাহার পর বহু বৎসর ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। গণিতে—বিশেষতঃ জ্যোতিষে, তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। আমরা যখন এলাহাবাদে থাকিতাম, তখন তথাকার বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক হোমার্স্‌হাম কক্সের মুখে দত্ত মহাশয়ের ভূপরিমাণ-বিদ্যা (Geodesy) বিষয়ক একটি মৌলিক প্রবন্ধের প্রশংসা শুনিয়াছিলাম। দত্ত মহাশয় বাংলা একাধিক মাসিক পত্রে জ্যোতিষিক বহু বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই সকল প্রবন্ধ লিখিবার জন্য তাঁহাকে অনেক নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে হইত। তিনি যে সাময়িক পত্রের এক জন এরূপ বিখ্যাত লেখক ছিলেন যে, সম্পাদকেরা তাঁহার প্রবন্ধ পাইবার জন্য ব্যগ্র থাকিতেন, এখনকার পাঠকেরা, এবং সম্পাদকেরাও অনেকেই, তাহা জানেন না। কারণ, তিনি বহু বৎসর ব্যাধি বশতঃ লেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের কোটার গোড়ার দিকে "দাসী" নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করিতাম। দত্ত মহাশয় "জীবনোপায়" নাম দিয়া তাহাতে টলষ্টয়ের একটি বড় গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—

সতীশচন্দ্র বাগচী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল সতীশচন্দ্র বাগচী শুধু আইনে নহে অন্য অনেক বিষয়েও পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতার প্রিন্সিপ্যালের পদ হইতে অবসর লইবার পর তিনি তাঁহার লাইব্রেরী বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। সেখানে তিনি অবৈতনিক অধ্যাপকতাও করিতেন।

—

মৌলবী আবুল হোসেন

মৌলবী আবুল হোসেন উদারচিত্ততা ও বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাতিমান ছিলেন। এম্ এ উপাধি লাভের পর তিনি আইনে এম্ এল্ উপাধি লাভ করেন। এম্ এলের সংখ্যা কম, এবং মুসলমান সমাজে তিনিই বোধ হয় একমাত্র এম্ এল্ ছিলেন। মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকরির শতকরা ৪৫টি আলাদা করিয়া রাখার তিনি প্রতিবাদ করেন। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে সরকারী সব কাজে নিয়োগের তিনি সমর্থক ছিলেন।

—

লেডী গোবিন্দমোহিনী সিংহ

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের সহধর্ম্মিণী লেডী গোবিন্দমোহিনী সিংহ স্বামীর সামান্য আয়ের সময় যেমন নম্রস্বভাবা সুগৃহিণী ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ সম্মান ও ঐশ্বর্য্যের সময়েও সেইরূপ ছিলেন। বিবাহিতা নারী যেদিকে যত বিখ্যাতই হউন, ঘরসংসার যে তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র, তাঁহার ধারণা এইরূপ ছিল। তিনি সাতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁহাকে কখন কখন

উপাসনা-মন্দিরের দ্বারে মাটীতে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিতে দেখা যাইত।

—

সুকুমারী দেবী

শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যাপিকা সুকুমারী দেবী "মাসীমা" নামে পরিচিতা ছিলেন। আলপনা ও অন্য নানা গৃহশিল্পে তিনি নিপুণ ছিলেন। নূতন আলপনার পরিকল্পনায় তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন পৌরাণিক ও অন্যবিধ ছবি আঁকিতে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার কোন কোন ছবি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

—

রামমোহন রায়কে উৎসর্গীকৃত স্পেনিশ গ্রন্থ

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরীতে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় তাঁহার সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। ঐ সভায় অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার অন্যতম বক্তা ছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিয়া বসিবার পর রামমোহন লাইব্রেরীর সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে একটি অতি জীর্ণ কাটদষ্ট লম্বা-চৌড়া পুস্তক দেখাইতেছিলেন। অন্য এক জন বক্তার বক্তৃতা শেষ হইলে অধ্যাপক সরকার সেই বহিটি সভাস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন যে, বহিখানি স্পেনিশ ভাষায় লিখিত ও রাজা রামমোহন রায়কে উৎসর্গীকৃত। পুস্তকখানির বিষয়, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ স্পেনের কেডিজ্ শহরে স্পেন-রাজ্যের যে মূল রাষ্ট্রবিধি (constitution) প্রচারিত হয়, সেই রাষ্ট্রবিধি।

গ্রন্থখানির উৎসর্গ-পত্রে যাহা স্পেনীয় ভাষায় মুদ্রিত আছে, বাংলায় তাহার তাৎপর্য্য—

"মহানুভব, প্রাজ্ঞ, ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়ের স্বাধীনচিত্ততাকে ফিলিপাইন কোম্পানী কর্ত্তৃক [উৎসর্গীকৃত]।"

এই গ্রন্থখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাঁহাদের বংশের একটি মূল্যবান্ সামগ্রী ছিল। তিনি সম্প্রতি উহা রামমোহন লাইব্রেরীকে উপহার দিয়াছেন। রামমোহন রায়ের পৌত্রী রাধাপ্রসাদ রায়ের পুত্রীর তিনি অন্যতম বংশধর।

গ্রন্থখানির পাতাগুলি অনেক স্থানে পোকায় কাটিয়া দিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে ১৬ ও প্রস্থে ১০ ইঞ্চি। ভিতরের পাতাগুলির দৈর্ঘ্য সাড়ে পনর ও প্রস্থ পৌনে দশ ইঞ্চি। গ্রন্থখানির চামড়ার মলাটে সোনালি কাজ ছিল। এই গ্রন্থখানির উৎসর্গ-পত্র, নাম-পত্র, এবং অন্য একটি পৃষ্ঠার ক্ষুদ্রীকৃত ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি দেওয়া হইল। সেকালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের অধীন উপনিবেশ ছিল।

এ বৎসর বাঙ্গালোরে রামমোহন স্মৃতিসভায় দীনবন্ধু সি এফ্ এণ্ড্রুজ সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার জাপান প্রভৃতি দেশে যে নবজীবনের আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল রামমোহন রায়ের প্রভাব। এইরূপ কথা তিনি পূর্ব্বেও কোন কোন বৎসর রামমোহন স্মৃতি-সভাতে বলিয়াছিলেন। বক্ষ্যমাণ বহিখানি হইতে এরূপ উক্তির একটি নূতন পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন ইউরোপের স্পেন দেশে পর্য্যন্ত সুধীসমাজের এতটা পরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন যে, তাঁহাকে একখানি গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, ইহা আগে জানা ছিল না। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নামে অভিহিত কোম্পানী তাঁহাকে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করায় অনুমান হয় যে, তিনি যেমন দূর প্রতীচ্যের স্পেনে সেইরূপ সুদূর প্রাচ্যের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও মনীষীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে এক জন ভারতীয় স্বাধীনচিত্ততা, মহানুভবতা, প্রাজ্ঞতা ও ধার্ম্মিকতার জন্য প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ভারতীয়দের পক্ষে—এবং বিশেষ করিয়া বাঙালীদের পক্ষে, গৌরবের বিষয় বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়ও এই যে, তাঁহার স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য আমরা অনেকেই নহি।

—

স্বামী শুদ্ধানন্দ

বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি বিজ্ঞানানন্দ স্বামীর পরলোকযাত্রার পর স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। তিনি মিষ্টস্বভাব ও বিদ্বান্ ছিলেন। বিবেকানন্দ স্বামীর ইংরেজী সমুদয় গ্রন্থের তিনি বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন।

—


AL

LIBERALISMO

DEL

NOBLE, SABIO, Y VIRTUOSO

BRAMA

Ram-Mo[illegible] Roy

La Compañia

DE

FILIPIN[illegible]

Constitucion Politica de la Monarquia Espanola গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্র।

এই গ্রন্থখানি রামমোহন রায়ের নামে উৎসর্গীকৃত



Constitucion Politica de la Monarquia Espanola

গ্রন্থের আখ্যা-পত্র

D. FERNANDO SÉPTIMO,

por la gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reyno nombrada por las Córtes generales y extraordinarias, á todos los que las presentes vieren y entendieren, SABED: *Que las mismas Córtes han decretado y sancionado la siguiente*

CONSTITUCION POLÍTICA

DE LA

MONARQUÍA ESPAÑOLA.

En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad.

Las Córtes generales y extraordinarias de la Nacion española, bien convencidas, despues del mas detenido exâmen y madura deliberacion, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las

Constitucion Politica de la Monarquia Espanola

গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য

সুপণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুও সেইখানে হইয়াছে। তিনি গৌহাটির কটন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পেন্স্যন প্রাপ্তির পর তিনি স্বগ্রামে আসিয়া একটি টোল স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্ম গবর্ণেমণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণেমণ্ট সারদা আইন (বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন) পাস করায় তিনি ঐ উপাধি ত্যাগ করেন; কারণ ঐ আইনের তিনি বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে যাঁহারা তাঁহার সহিত একমত নহেন, তাঁহারাও তাঁহার বিশ্বাস ও তেজস্বিতাকে শ্রদ্ধা করিবেন। তিনি গ্রন্থকার বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কামরূপ শাসনাবলী ঐতিহাসিকদিগের দৃষ্টিতে অতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ।

—

প্রাণকিশোর বসু

ঢাকা পীপ্‌ল্‌স্‌ এসোসিয়েশ্যনের সভাপতি প্রবীণ ব্যারিষ্টার প্রাণকিশোর বসু মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ঢাকার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং ধীরতা, বুদ্ধিমত্তা, উন্নত চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহারের জন্ম সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

—

ননীগোপাল মজুমদার

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় অনেকের মৃত্যুসংবাদ দিতে হইল। আরও অনেকের বিষয়ে কিছুই লেখা হইল না। যাঁহাদের বিষয়ে কিছু লেখা হইল, স্থানাভাবে তাহাও সামান্য। যাঁহাদের বিষয় লিখিত হইল, বার্দ্ধক্য বা রোগে তাঁহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে। তাহাও শোকের কারণ। কিন্তু বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অন্যতম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ননীগোপাল মজুমদার যে সিন্ধুদেশের দাদু জেলার জোহি নামক স্থানে দস্যুদের দ্বারা নিহত হইয়াছেন, এই অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ সাতিশয় শোকাবহ। দস্যুরা তাঁহার তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার তিন জন কেরানীকে আক্রমণ করে। তিনি হত ও কেরানী তিন জন আহত হন। তিনি বঙ্গের পাহাড়পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করিয়াছিলেন এবং সিন্ধুদেশে কুড়িটি এরূপ ভগ্নাবশেষবহুল স্থান আবিষ্কার করেন যাহা হইতে মোহেনজোদাড়ো যুগের উপর নূতন আলোকপাত হইতে পারে। আমরা করাচীর শেষ কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পথে যখন মোহেনজো-দাড়ো দেখিতে যাই, তখন ননীগোপাল বাবু বিশেষ যত্ন করিয়া আবিষ্কৃত সমুদয় জায়গাগুলি ও অন্যান্ম জিনিষ দেখাইয়াছিলেন। অজ্ঞাতলিপিতে লিখিত তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত দীর্ঘ একটি শিলালেখও দেখাইয়াছিলেন। অকালমৃত্যু না হইলে তিনি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনার‍্যাল হইতে পারিতেন।

—

চূড়ামণিযোগ

চূড়ামণিযোগ উপলক্ষ্যে অগণিত লোক গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহাতে নিরাপদে স্নান করিতে পারেন, মাথা গুঁজিবার জায়গা পাইতে পারেন এবং পীড়িত বা আহত হইলে চিকিৎসিত হইতে পারেন, কলিকাতা মিউনিসিপালিটী তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

কলিকাতার ছাত্রেরা ও অন্ম যুবকেরা যেরূপ শৃঙ্খলা, পরিশ্রম, ধীরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত অসংখ্য যাত্রীর তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন এবং হারান স্ত্রীলোক ও শিশু-দিগকে খুঁজিয়া তাহাদের আত্মীয়দের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহাদের এইরূপ অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যোগের পরদিন কাগজে দেখিয়া-ছিলাম, প্রায় ৩০০ যাত্রীর (পুরুষ, নারী বা শিশুর) খোঁজ পাওয়া যায় নাই, এবং দুর্বৃত্ত লোকে কতকগুলি স্ত্রীলোককে অপহরণ করিয়াছে বা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আশা করি, সকলেরই খোঁজ পরে পাওয়া গিয়াছে ও অপহৃতাদেরও উদ্ধার সাধিত হইয়াছে।

কলিকাতা যে কিরূপ বিপৎসঙ্কুল জায়গা, দুঃখের

বিষয়, পল্লীগ্রামের লোকেরা তাহা জানেন না, কল্পনাও করিতে পারেন না। দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর থাকায়, শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ট না হওয়ায় এবং পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকের—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের, বহির্জগতের কোন জ্ঞান না থাকায়, কত দিকে কত যে অমঙ্গল ও অসুবিধা হইতেছে বলা যায় না।

যাত্রীরা যেরূপ বিশ্বাস বশতঃ গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কতকটা ঐরূপ বিশ্বাসে মুসলমানেরা হজ্‌ করেন ও মক্কায় কোন কোন অনুষ্ঠান করেন, এবং রোমান কাথলিক খ্রীষ্টিয়ানেরাও তাঁহাদের বহু তীর্থে কোন কোন অনুষ্ঠান করেন। যাঁহারা ভিন্নমতাবলম্বী এবং ঐরূপ বিশ্বাসকে কুসংস্কার মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে তদনুযায়ী মন্তব্য প্রকাশ করা সহজ। ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাসের আলোচনা করিব না। কিন্তু এখানে ইহা বলা আবশ্যক মনে করি যে, যাঁহাদিগকে কুসংস্কারাবিষ্ট বলা হয় তাঁহারা নিজ নিজ বিশ্বাসে যেরূপ নিষ্ঠা দেখান এবং তাহার জন্য যেরূপ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেন, তাঁহাদের সমালোচকেরা আপনাদের মত ও বিশ্বাসের জন্য ততখানি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিলে, অন্য কাহারও হিত হউক বা না হউক, তাঁহাদের নিজের উন্নতি হয়।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে গৌহাটিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি অধ্যাপক ভুবন-মোহন সেনের লেখা গৌহাটি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধে একথা লেখা না থাকিলেও আমি জানি, অভ্যর্থনা-সমিতি অধিবেশনটির সুব্যবস্থা করিতেছেন, এবং প্রতিনিধিদের যথেষ্ট আদর যত্ন হইবে।

আমি একবার মাত্র গৌহাটি গিয়াছিলাম। তথাকার দৃশ্যগুলি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম।

গৌহাটিতে অনেক অসমিয়াভাষী ও বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সহিত পরিচয় হয়। তাঁহাদের সৌজন্যে প্রীত হই। আগে হইতে বলিয়া না দিলে বুঝা যায় না, কে অসমিয়াভাষী কে বাঙালী। অসমিয়াভাষী মহিলা ও পুরুষ যাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাঁহারা আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলিয়াছিলেন, পরস্পরের সহিত অবশ্য তাঁহারা অসমিয়ায় কথা বলেন। কিন্তু দুটি সভাতে যে কয় জন ভদ্রলোকের অসমিয়া বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্যও ত ঐ ভাষায় বক্তৃতা শুনিতে অনভ্যস্ত আমার মত বাঙালীর কাছে দুর্বোধ্য মনে হইল না। পানবাজারে শ্রীযুক্তা রাজবালা দাসের বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে যাই কটন কলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি পরে বলিয়া না দিলে আমি বুঝিতে পারিতাম না যে, শ্রীযুক্তা রাজবালা দাস ও তাঁহার স্বামী ডাক্তার দাস বাঙালী নহেন। দাসজায়ার বিদ্যালয়ে অসমিয়াভাষিণী ও বাঙালী উভয়বিধ বালিকাই পড়ে। তাঁহার অনুরোধে আমি তাহাদিগকে বাংলায় কিছু বলি। তিনি বলিয়াছিলেন তাহারা সকলেই আমার কথা বুঝিবে। তিনি যে কলেজের ছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্রীনিবাস চালান, সেখানেও ছাত্রীদের মধ্যে কে যে বাঙালী কে যে নয় বুঝিতে পারি নাই। অসমিয়া ও বাংলার লিপিও এক।

যেখানে এত সাদৃশ্য, সেখানে সদ্ভাব স্থাপন বা বৃদ্ধি অসাধ্য নয়, দুঃসাধ্যও নয়। একবার কটক গিয়াও আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহার ফলেও ঐরূপ চিন্তাও অনিবার্য্য।

আমরা বলি, আমরা সব ভারতবাসী এক, বা এক হইব। ভারতবর্ষে সাহিত্যবিশিষ্ট ভাষা অনেকগুলি আছে, যাহার কতকগুলি যাহারা বলে তাহারা অন্য কতকগুলি বুঝিতে পারে না। কিন্তু কতকগুলি ভাষার সাদৃশ্য আছে; কোন কোন স্থলে সেই সাদৃশ্য খুব বেশী। হিন্দুস্থানী বা বাঙালী তামিল বুঝিতে পারে না; কিন্তু হিন্দুস্থানী বাংলা কিছু বুঝে এবং বাঙালী কিছু হিন্দী বুঝে। এই যে পরস্পরের ভাষা বুঝা, ইহা আসাম, উড়িষ্যা ও বঙ্গে সব চেয়ে বেশী। অতএব ভারতবর্ষের ঐক্যের নমুনা আসাম, উড়িষ্যা ও বঙ্গে প্রথম প্রদর্শিত হইলে তাহা স্বাভাবিক ও সুশোভন হইবে। মিথিলার ও বঙ্গের লিপি এক, ভাষারও সাদৃশ্য আছে। মিথিলার সহিত বঙ্গের ঐক্যের আশা করাও স্বাভাবিক।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন এই ঐক্যসাধন করে সামান্ত কিছুও করিতে পারিবেন আশা করি। অসমিয়া-ভাষী মহিলা ও ভদ্রলোকগণ গৌহাটির অধিবেশনে নিশ্চয়ই আহূত হইবেন।

—

মুসলমান বাঙালীদের সাহিত্য-সম্মেলন

খবরের কাগজে দেখিলাম, মুসলমান বাঙালী সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের একটি পৃথক্ সাহিত্য-সম্মেলন করিবেন। ইহা দুঃখের বিষয়। ধর্ম্মবিষয়ক ক্রিয়াকলাপ ছাড়া আর সমস্ত কাজই হিন্দু-মুসলমান একত্র করিতে পারেন, ও করা উচিত। সাহিত্যক্ষেত্রে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইবে। মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ কথা বলিতে পারেন, হিন্দুসাহিত্যিকদের সহিত তাঁহাদের মতভেদ আছে। কিন্তু হিন্দুসাহিত্যিকদের নিজেদের মধ্যেও ত একাধিক দল আছে। তাহা সত্ত্বেও ত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন একটিই হয়, দলের সংখ্যা অনুসারে সম্মিলনের সংখ্যা বাড়ে না। তাহা যদি বাড়িত, তাহা হইলে সম্মিলনের নামটা বদলাইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যবিভেদন রাখাই ঠিক হইত। যাঁহারা অতি-আধুনিক সাহিত্যিক, তাঁহারাও সাহিত্য-সম্মেলনে তাঁহাদের বিবেচনায় তাঁহাদের প্রাপ্য অধিকতর প্রাধান্ত ও প্রভাবের দাবী করিতেছেন, আলাদা একটা সম্মেলন করিতে চাহিতেছেন না।

মুসলমান বাঙালী সাহিত্যিকদের মনে ভেদবোধের উন্মেষের জন্ত হিন্দুসাহিত্যিকগণ কেহই বিন্দুমাত্রও দায়ী নহেন, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্ত নয়। তাঁহাদের কাহারও কাহারও দায়িত্ব হয়ত কিছু আছে। কিন্তু মুসলমান বাঙালী সাহিত্যিকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া কাজ করিবার অভিপ্রায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের নাই, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের নাই। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এলাহাবাদে শেষ অধিবেশনে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর দর্শন শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের চন্দননগর অধিবেশনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদউল্লাহ্ একটি শাখার সভাপতি ছিলেন। তাহার কৃষ্ণনগর অধিবেশনে ডক্টর কুদরৎ-ই-খুদা একটি শাখার সভাপতি ছিলেন। ইহাঁরা প্রত্যেকেই সুষ্ঠুভাবে আপন আপন কাজ করিয়াছিলেন।

করাচীতে মুসলিম লীগের ভেদবুদ্ধি

মুসলিম লীগের করাচী অধিবেশনে যত প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার মধ্যে দুইটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

একটি প্রস্তাবে মুসলমানদিগকে মুসলমানদের কাটা সুতায় মুসলমান তন্তুবায়দের বোনা খদ্দর কিনিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। মুসলিম লীগ যে কংগ্রেসের অনুকরণে বা অনুসরণে খদ্দর ব্যবহারের অন্ততঃ মৌখিক সমর্থক হইয়াছেন, ইহাতে কংগ্রেসের জয় সূচিত হইয়াছে। কিন্তু জিনিষ তৈরী করা ও কেনাবেচাতেও যদি সাম্প্রদায়িকতা ঢোকান হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের একজাতীয়ত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? মুসলিম লীগ বলিতে পারেন, তাঁহারা ভারতের একজাতীয়ত্ব চান না, চান মুসলমানদের আর্থিক উন্নতি। তাহাই যদি উদ্দেশ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাও কি উক্ত প্রকার সাম্প্রদায়িক নীতি দ্বারা সিদ্ধ হইবে? মুসলমানরা যদি কেবল মুসলমানদের তৈরী জিনিষ কেনে, তাহা হইলে হিন্দুরা বলিবে, "আমরা শুধু হিন্দুর তৈরী জিনিষ কিনিব, মুসলমানের জিনিষ কিনিব না।" তাহাতে কি মুসলমানদের সুবিধা হইবে? সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশী, সুতরাং মুসলমান ক্রেতার চেয়ে হিন্দু ক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশী। মুসলমানরা কি এই অধিকতরসংখ্যক ক্রেতা চায় না, বা তাহারা জিনিষ না কিনিলে মুসলমানদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে?

বঙ্গের মুসলমানেরা বলিতে পারে, আমরা এখানে সংখ্যায় বেশী। কিন্তু ক্রেতা মুসলমান কি ক্রেতা হিন্দুর চেয়ে বেশী? উত্তর- ও পূর্ব্ব- বঙ্গের জোলারা যে-সব কাপড় তৈরী করে, তাহার অনেক অংশ হিন্দুরা কেনে। উত্তর-বঙ্গে জলপ্লাবনে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন গরিব লোকেরা বিপন্ন হয় (তাহাদের সংখ্যাই বেশী) তখন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে যে বিস্তর লোককে সুতা কাটিবার জন্ত তুলা ও চরখা দেওয়া হয় এবং তাহাদের কাটা সুতা কিনিয়া লওয়া হয়, তাহাদের অধিকাংশ মুসলমান। যদি আচার্য্য রায় প্রমুখ জনসেবকেরা বলিতেন, মুসলমান-দিগের দ্বারা সুতা কাটাইব্ না ও তাহাদের কাটা সুতা কিনিব না, তাহা হইলে তাহাদের দশা কিরূপ হইত? মুসলিম লীগ কোন কালে এই প্রকার লোকদের কথা ভাবে নাই, তাহাদের সাহায্য করে নাই—করিবেও না।

ভারতবর্ষে দুটা ফেডারেশ্যন চাই !

মুসলিম লীগের করাচী অধিবেশনে লীগ চাহিয়াছেন ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিতে—তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি এত বেশী ! অথবা হয়ত ভারতবর্ষকে তাঁহাদের স্বদেশ বলিলে তাঁহাদের অপমান হয় ! কিন্তু তাঁহারা অনেকে ত একবার হিজরাত করিয়া ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আফগানিস্থানে গিয়াছিলেন। তাহার সুখটা ও শেষ ফলটা বোধ হয় এখন মুসলীম লীগের মনে নাই। কিন্তু ইহা ঠিক্ যে, এখন লীগ মুসলমানদের ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবার কথা ভুলেন নাই, তাঁহারা এখন দয়া করিয়া এই দেশটাতেই থাকিবেন, কিন্তু ইহাকে মুসলমান ফেডারেশ্যন এবং হিন্দু ফেডারেশ্যনে বিভক্ত করিবেন। তাহার কারণ তাঁহাদের মতে হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলমান সংস্কৃতি, এবং আরও সব কি কি, এত ভিন্ন যে, হিন্দু-মুসলমান একই দেশে এক ফেডারেশ্যনের মধ্যে বাস করিতে পারে না।

কিন্তু মুসলীম লীগ যাহা চাহিতেছেন তাহাতে কি হিন্দু ও মুসলমানের সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকা ঘটিবে ? লীগের ফরমাস এই যে, যে-সকল প্রদেশের ও দেশী রাজ্যের অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান, সেগুলি মুসলমান ফেডারেশুনের অন্তর্গত হওয়া চাই। ফরমাসটা মুসলমানদের পক্ষে খুব সুবিধাজনক বটে। কাশ্মীরের নৃপতি হিন্দু হইলেও তথাকার বাসিন্দারা অধিকাংশ মুসলমান, অতএব কাশ্মীর হইবে মুসলমান ফেডারেশুনের অন্তর্গত ; আবার হায়দরাবাদের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু হইলেও তাহার নৃপতি মুসলমান বলিয়া সেই রাজ্যও মুসলমান ফেডারেশ্যনের অন্তর্গত হইবে ! ভারতবর্ষকে দু-টুকরা করিবার মত দুর্বুদ্ধি যদি হিন্দুদের হইত, তাহা হইলে তাহারাও ত বলিতে পারিত, যেহেতু কাশ্মীরের রাজা হিন্দু অতএব কাশ্মীর পড়ুক হিন্দুদের ভাগে, আবার যেহেতু হায়দরাবাদের অধিকাংশ লোক হিন্দু অতএব সেটাও পড়ুক হিন্দুদের ভাগে।

তাহার পর আর একটা কথা বিবেচনা করিতে হইবে। বাংলা দেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, পঞ্জাবেও তাই। কিন্তু এই দুটা প্রদেশে এবং অন্যান্য মুসলমানবহুল ভূখণ্ডে হিন্দু প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের লোকও আছে অনেক। তাহারা ত মুসলমানদের দাস নহে যে, তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলমান ফেডারেশুনের মধ্যে ফেলা হইবে।

আরও একটা কথা বিবেচ্য। মুসলিম লীগের প্রকাশিত মত এই যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ এত যে তাহারা একই ফেডারেশ্যনে বাস করিতে পারে না। কিন্তু দুটা ফেডারেশুন হইলেও মুসলমান ফেডারেশ্যনের অন্তর্গত বঙ্গে দু-কোটির উপর হিন্দু থাকিবে, আবার হিন্দু ফেডারেশুনের অন্তর্গত আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বোম্বাই, ও মান্দ্রাজে বিস্তর মুসলমান থাকিবে। এই সকল হিন্দুর ও মুসলমানের যদি মুসলমানের ও হিন্দুর সহিত এক ভূখণ্ডে বাস করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ভারতের সর্ব্বত্রই বা কেন তাহা সম্ভবপর হইবে না ?

মুসলিম লীগের ভূগোল জ্ঞানটা চমৎকার। পৃথিবীতে এমন কোন ফেডারেশুন নাই যাহার অংশগুলা পরস্পর-সংলগ্ন নহে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া—এইগুলি ফেডারেশুন। ইহাদের প্রত্যেকটির অংশগুলি লাগাও, পরস্পর পাশাপাশি। কিন্তু মুসলিম লীগের ফরমাসী ফেডারেশুনের টুকরাগুলি পূর্ব্বদিক্ থেকে ধরুন। বাংলা, তাহার পর বিহার ও আগ্রা-অযোধ্যা ডিঙ্গাইয়া সহস্রাধিক মাইল পরে পঞ্জাব। দক্ষিণ দিকে, বাংলার পর সেইরূপ উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের সহস্রাধিক মাইল পরে হায়দরাবাদ। একটা কোন কাল্পনিক জীবের মাথাটা এক জায়গায়, একটা হাত এক জায়গায়, একটা পা এক জায়গায়,...এইরূপ যদি থাকে, তাহা হইলে সেই অদ্ভুত তথাকথিত জীবটা যেমন, এই ফেডারেশুনও সেইরূপ।

মুসলিম লীগ দয়া করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের সীমার বাহিরের কোন মুসলমান রাষ্ট্র যদি তাঁহাদের ভারতীয় মুসলমান ফেডারেশুনের মধ্যে আসিতে চায় তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহারা গ্রহণ করিবেন ! মনে রাখিতে হইবে, মুসলমান ভারতীয় ফেডারেশুনটা ইংরেজদের অধীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিবে। মুসলিম লীগের আশা এই যে, এহেন পরাধীন ফেডারেশুনে স্বাধীন আফগানিস্থান, স্বাধীন ইরান, স্বাধীন ইরাক স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিবে !

—

বিভিন্ন ভাষার, সংস্কৃতির, জাতির লোকদের একরাষ্ট্রীয়তা

মুসলিম লীগের ঘোষিত ধারণা, হিন্দু ও মুসলমান এক ফেডারশুনে বাস করিতে পারে না যেহেতু তাহাদে

ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি আলাদা। ধর্ম আলাদা স্বীকার করা যায়, যদিও উভয়ের মধ্যে তাত্ত্বিক ও নৈতিক সাদৃশ্যও আছে। হিন্দু মুসলমান বহু শতাব্দী এক দেশে বাস করায় তাহাদের সংস্কৃতি অনেক দিকে এক হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা হিন্দু ও মুসলমানের এক। ভারতীয় চিত্রবিদ্যা অনেকাংশে এক বা পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত। ভারতীয় স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় রীতির স্থান ও সংমিশ্রণ আছে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের পৃথক্ কোন ভাষা নাই। উর্দুর কথা যদি তোলেন, তাহা হইলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা হিন্দুরাও ব্যবহার করে।

এখন রাশিয়ার কথা বিবেচনা করুন। সোভিয়েট রাশিয়াতে খ্রীষ্টীয় ধর্মের নানা শাখার খ্রীষ্টিয়ান আছে, মুসলমান আছে, বৌদ্ধ ও লামাপূজক আছে, হিন্দু আছে, অগ্ন্যুপাসক আছে, য়্যানিমিষ্ট আছে, নাস্তিক আছে। নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান প্রধানতঃ একবংশীয়। আরণ্য ও পার্ব্বত্য আদিম জাতিরা ২।৪ শত বা ২।৫ হাজার লোক যে-সব সাহিত্যহীন এক একটি ভাষা বলে, তাহা বাদ দিলে ভারতবর্ষে সাহিত্যশালী প্রধান ভাষা ১৪।১৫টির বেশী নাই। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়াতে দুই শত ন্যাশন্যালিটি বাস করে। তাহাদের অনেকেরই ভাষা পৃথক্, সংস্কৃতি পৃথক্, বেশভূষা আলাদা। অনেকেরই সভ্যতা বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। অথচ সকলে একই রাষ্ট্রে বাস করিতেছে, নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নতির চেষ্টা করিতেছে, কেহ কাহারও উপর প্রভুত্ব করিতে চাহিতেছে না। পৃথিবীর সমগ্র ভূভাগের এক-ষষ্ঠাংশ সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত। সেখানে যদি ইহা সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যত্রও ইহা সম্ভব। সাম্রাজ্যের আমল হইতে ষ্টালিনের আমল পর্য্যন্ত আধুনিক রাশিয়া সম্বন্ধে সম্প্রতি যে পুস্তকখানি (*From Tsardom to the Stalin Constitution*) বাহির হইয়াছে তাহাতে ঠিকই লিখিত হইয়াছে যে,

"If peace and amity between some two hundred nationalities (in U. S. S. R.)—which at the outset were at vastly different stages of economic, political, and cultural development—could be established over one-sixth of the world's surface, all enjoying full freedom to develop their own characteristic national culture, then there is no reason whatever to doubt that the same could be done in the rest of the world, if capitalist exploitation of class by class and nation by nation were eliminated."—*From Tsardom to the Stalin Constitution*, pp. 262-263.

—

ভারতবর্ষে কেশবচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী

ডেরা দূনে কেশবচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী হইয়া গিয়াছে। আর্য্যসমাজের কন্যা-গুরুকুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামদেব জী প্রমুখ অনেক মনীষী ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। রামদেব জী একটি সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, কেশবচন্দ্রই স্বামী দয়ানন্দকে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত করেন।

কলিকাতার শতবার্ষিকী নবেম্বর মাসে হইবে, আবার ডিসেম্বরের শেষের দিকেও হইবে। বোম্বাইয়েও বর্ত্তমান নবেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র শতবার্ষিকীর বন্দোবস্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী কেশবচন্দ্র শতবার্ষিকীর ব্যবস্থা হইয়াছে মান্দ্রাজে। ইহা আরম্ভ হইয়াছে গত ৮ই অক্টোবর এবং শেষ হইবে ২০শে নবেম্বর। এই উৎসবে বিখ্যাত মান্দ্রাজী কংগ্রেসনেত্রী শ্রীমতী কমলা দেবী, মান্দ্রাজের মেয়র, মান্দ্রাজের কয়েক জন মন্ত্রী এবং অন্য বহু কৃতী ব্যক্তি যোগ দিতেছেন। ১২ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয়টি সার্ব্বজনিক সভার (public meetingএর) অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ২০শে ও ২১শে নবেম্বর ধর্ম্মপরিষদের (Parliament of Religions এর) অধিবেশন হইবে।

—

ভারতবর্ষে পণ্যশিল্পের প্রসার

এই একটা কথা ইংরেজরা বার বার বলিয়া আসিতেছে, ইংরেজভক্ত ও ইংরেজশিষ্যেরাও বলিয়া থাকে, যে, ভারতবর্ষ এখন যেমন কৃষিপ্রধান এবং নিজ ব্যবহার্য্য ছোট বড় কারখানায় প্রস্তুত বিস্তর জিনিষ নিজে উৎপন্ন করে না, চিরকালই ঠিক্ সেই অর্থে কৃষিপ্রধানই ছিল, তাহার নিজস্ব পণ্যশিল্পজাত জিনিষ বড় কিছু ছিল না। কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য নহে। ভারতবর্ষের লোকেরা অতীত কালে, ব্রিটিশ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কৃষি দ্বারা যেমন অন্নের সংস্থান করিত, সেইরূপ পণ্যশিল্প দ্বারা আপনাদের প্রয়োজনীয় অন্য সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিত। শুধু তাই নয়। এই রকম জিনিষ তাহারা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান করিয়া লাভবান হইত। পুরাকালে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের আয়তন এরূপ ছিল যে, রোমানদের মধ্যে ভারতবর্ষের একটা 'বদনাম' রটিয়াছিল যে, এদেশ

বিদেশের সোনা রূপা গ্রাস করে, কাহাকেও ফিরিয়া দেয় না।*

ভারতবর্ষের এই পূর্ব্বতন অবস্থা এখন নাই। সেকালে, অন্য সকল দেশের মত, এদেশেও বড় বড় কারখানা ছিল না; শিল্পীদের নিজের নিজের বাড়ীতে ও ছোট ছোট কারখানায় নানা পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত। নানা কারণে, ভারতের বহু কুটীরশিল্প লুপ্ত বা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, কোন কোনটি আগেকার চেয়ে অবনত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে। বড় বড় কারখানা যত হইয়াছে, তাহার মালিক ও পরিচালকেরা অধিকাংশ স্থলে বিদেশী। অন্য কোন কোন প্রদেশে যদি বা দেশী বড় বড় কারখানা-মালিক অনেক আছেন, বঙ্গে তাহা নাই; বঙ্গে বড় বড় কারখানার মালিক অধিকাংশ স্থলে হয় ইউরোপীয়, নয় অ-বাঙালী ভারতীয়।

ভারতবর্ষকে পণ্যশিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে আত্মনির্ভরক্ষম করা আবশ্যক। কিরূপ পরিকল্পনা দ্বারা তাহা হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসু একটি কমীটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কংগ্রেস সাধারণতঃ যে-সকল কমীটি নিযুক্ত করেন, কংগ্রেসীদের মধ্য হইতেই সাধারণতঃ তাহাদের সভ্য মনোনীত হয়। এক্ষেত্রে এই রীতির ব্যতিক্রম করিয়া সুভাষবাবু ঠিক্ কাজ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য অনেক দেশে ও জাপানে বড় বড় ও মাঝারি কারখানা যেমন আছে, শ্রমিক ও শিল্পীদের নিজের নিজের গৃহে কুটীরশিল্প দ্বারা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের রীতিও সেইরূপ আছে। ভারতবর্ষেও পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের সকল রকম উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে।

কারখানা সম্বন্ধে বঙ্গের অবস্থা অন্য অনেক প্রদেশ হইতে পৃথক্। এই জন্য, এক দিকে যেমন বঙ্গের সুবিধার জন্যই তাহার শিল্পোন্নতি-পদ্ধতি সমগ্র ভারতীয় পদ্ধতির সহিত যুক্ত থাকা আবশ্যক, সেইরূপ বঙ্গের পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যও আবশ্যক। এই কারণে, বঙ্গের জন্য বঙ্গের মন্ত্রীদের শিল্পসম্বন্ধীয় কমীটি নিয়োগ সমীচীন হইয়াছে। কংগ্রেস কেবল কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসিত প্রদেশগুলির শিল্পমন্ত্রীদিগকে লইয়া কনফারেন্স করিয়াছিলেন, অ-কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদিগকে ডাকেন নাই; একারণেও বঙ্গের আলাদা কমীটি নিয়োগ আবশ্যক হইয়াছিল।

—

কৃষি ও শিল্প বিষয়ে ভারত ও রাশিয়ার অবস্থা

আধুনিক ভারতবর্ষকে যেরূপ কৃষিপ্রধান বলা হয়, প্রাগ্-বিপ্লব রাশিয়া সেইরূপ কৃষিপ্রধান ছিল। বিপ্লবের পর রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু একথা অনেকে জানেন না বা ভুলিয়া যান যে, রাশিয়ার কৃষিতেও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আশ্চর্য্য উন্নতি ও বিস্তৃতি হইয়াছে।* ভারতবর্ষের কৃষিতেও ইহা আবশ্যক। বস্তুতঃ অনেক রকম পণ্যশিল্পের জন্যও এদেশে কৃষির বিস্তার ও উন্নতি আবশ্যক হইবে।

—

শ্রমিক ও কারখানা-মালিক সমস্যা

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে শ্রমিক ও কারখানা-মালিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-আন্দোলন ও শ্রমিক-নেতারও আবির্ভাব হইয়াছে। অনেক দেশে শ্রমিকদের মধ্য হইতেই শ্রমিক-নেতা নির্ব্বাচিত হন। ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বাংলাদেশে—শ্রমিক-নেতারা প্রায়ই নিজেরা অ-শ্রমিক। কিন্তু এদেশেও শ্রমিকদের মধ্য হইতেই শ্রমিক-নেতা নির্ব্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষাবিস্তার আবশ্যক। দেশহিতৈষিতার দাবী কংগ্রেসনেতাদেরই বেশী; সুতরাং তাঁহাদের এই বিষয়ে খুব বেশী মন দেওয়া উচিত। আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস ইহাতে মন দিতেছেন।

ইহা সত্য কথা যে, কারখানা-মালিকরা লাভের জন্য কারখানা চালান; কিন্তু ইহা সত্য নহে যে, তাঁহারা সকলেই কেবল লাভই চান, শ্রমিকদের হিত চান না।

* "In all ages, gold and silver, particularly the latter, have been the commodities exported with the greatest profit to India. In no part of the earth do the natives depend so little upon foreign countries, either for the necessaries or luxuries of life."—*A Historical Disquisition Concerning India,* by Dr. Robertson (1817), p. 180.

"In all ages, the trade with India has been the same; gold and silver have uniformly been carried thither in order to purchase the same commodities with which it supplies all nations; and from the age of Pliny to the present times, it has been always considered and execrated as a gulf which swallows up the wealth of every other country, that flows incessantly towards it, and from which it never returns."—*Ibid,* p. 203.

* "Although, as we have shown, the aim to industrialize the U. S. S. R. has been attained during the twenty years of the existence of the Soviet Government, agriculture has been by no means neglected; indeed it may be that the verdict of history will be that it is in the solution of the agricultural question that the U. S. S. R. has made the greatest and most original contribution to world economic history."—*From Tsardom to the Stalin Constitution* (published in September 1938), p. 152.

অনেক মালিক শ্রমিকদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের আগ্রহ ও অর্থব্যয় ব্যতীত হইত না এবং কারখানাগুলি নষ্ট হইলে তাহা হইবে না। শ্রমিক আন্দোলনের দ্বারা অনেক স্থলে শ্রমিকদের আয় এবং সুখ সুবিধা বাড়িয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থলে শ্রমিক-নেতাদের আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা ও হঠকারিতায় শ্রমিকদের ক্ষতিও হইয়াছে। শ্রমিক-নেতারা যে সকলেই বিবেচক এবং নিঃস্বার্থ মানব-হিতৈষী তাহা নহে। অন্তবিধ লোকও ইঁহাদের মধ্যে আছে। এই রকম লোকেরা যখন শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘট করাইয়া কারখানার অনিষ্ট করেন, তখন তাঁহারা ভুলিয়া যান, কারখানা না থাকিলে শ্রমিক থাকিবে না, এবং কারখানা ও শ্রমিক না থাকিলে এইরূপ শ্রমিক-নেতাও "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা" গোছ একটা জিনিষ হইবে—"ওথেলোর পেশা থাকিবে না" ("Othello's occupation would be gone")।

শ্রমিকদের কোন রকম অভিযোগ নাই, থাকিতে পারে না, বলি না। কিন্তু ধর্ম্মঘটটা শেষ উপায়, শেষ অস্ত্র। মালিকদের সহিত ধীর ভাবে আলোচনার পর অভিযোগের কারণ দূর না হইলে, কোন রফাও না হইলে, তখন ধর্ম্মঘট আবশ্যক হইতে পারে। গত জুলাই মাসে বিলাতে দুটি কন্‌ফারেন্সে শ্রমিকনেতারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ধর্ম্মঘটের নিন্দা করিয়াছেন।

শ্রমিক-নেতাদের ও শ্রমিকদের মনে রাখা উচিত যে, কারখানা-শ্রমিকদের আয় ক্ষেত-মজুরদের চেয়ে বেশী, ছোট চাষীদের চেয়েও বেশী।

কারখানা-শ্রমিকদের অন্ততঃ এই আয় বজায় রাখা আবশ্যক।

রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যেমন প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব আবশ্যক, এক প্রদেশে যাহা সমীচীন অন্ত প্রত্যেক প্রদেশে তাহা সমীচীন না হইতে পারে, তেমনই পণ্যশিল্পক্ষেত্রেও প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব চাই; বোম্বাইয়ে যাহা চলে বঙ্গে তাহা না চলিতেও পারে। আমেরিকায় নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে যে, তথাকার কারখানা-শ্রমিকদিগকে প্রতি ঘণ্টায় ন্যূনকল্পে ৩০ সেণ্ট (পনর আনা) মজুরী দিতে হইবে, এবং তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়া অন্যূন ৪০ সেণ্ট (পাঁচ সিকা) হইবে, ও তখন তাহাদিগকে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা মাত্র কাজ করিতে হইবে; অর্থাৎ তাহাদের সাপ্তাহিক ন্যূনতম আয় হইবে পঞ্চাশ টাকা। কেহ যদি জিদ ধরেন যে, ভারতবর্ষেও এইরূপ মজুরী দেওয়া চাই, তাহা হইলে এখনই এদেশে সব কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে।

আমেরিকা ও ভারতবর্ষে এ বিষয়ে যেরূপ প্রভেদ, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের মধ্যে, ততটা না-হইলেও, সেইরূপ অনেকটা প্রভেদ আছে।

কয়েকটি প্রদেশ আছে, যেখানকার অধিকাংশ শ্রমিক সেই সেই প্রদেশের লোক, এবং অধিকাংশ কারখানা-মালিকও সেই সেই প্রদেশের। বঙ্গের অবস্থা অন্ত প্রকার। এখানকার অধিকাংশ কারখানা ইউরোপীয় ও অ-বাঙালী ভারতীয়দের, শ্রমিকও বেশীর ভাগ অ-বাঙালী। অল্পসংখ্যক কারখানা আছে যাহার মালিক ও শ্রমিক বাঙালী। এই শেষোক্ত কারখানাগুলিকে সর্ব্বপ্রযত্নে ও সর্ব্বাগ্রে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। অ-বাঙালী ভারতীয়দের কারখানাগুলিও থাকিতে পারে। কিন্তু ইউরোপীয়দের কারখানাগুলির পরিবর্ত্তে বাঙালী বা অ-বাঙালী ভারতীয়দের কারখানা স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

হাবড়ার বেলিলিয়স রোডে বাঙালী মালিক ও বাঙালী শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত কারখানাগুলি বঙ্গে ও ভারতের অন্যত্র অনেক যন্ত্রপাতি জোগায়। এগুলি গৌরবের জিনিষ। কোন নোটিস না দিয়া, অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না চালাইয়া, হঠাৎ ধর্ম্মঘট দ্বারা এইগুলির কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া অপকর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল, এবং অবিবেচনা ও হঠকারিতার পরিচায়ক। আশা করি, এই ধর্ম্মঘট থামিয়া গিয়াছে বা শীঘ্র থামিবে।

বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে প্রতিমাবিসর্জ্জনে বাধা

শ্রীহট্ট, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে মুসলমানেরা হিন্দুদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ শোভাযাত্রা গীতবাদ্য ও প্রতিমা-বিসর্জ্জনে বাধা দিয়াছে। ইহা বাঙালী মুসলমানদেরই বিশেষত্ব নহে। পশ্চিমে এলাহাবাদে তাহাদের বাধা-দানের ফলে ১০।১২ বৎসর রামলীলা উৎসব হয় নাই। গত বৎসর যাহা হইয়াছিল, তাহাও আগেকার মত ঘটা করিয়া হইতে পারে নাই। এ-বৎসরও না-হওয়ার মধ্যে। পশ্চিমে আরও অনেক জায়গায় রামলীলা দধিকাণ্ড প্রভৃতিতে মুসলমানেরা বাধা দেয়।

অবশ্য সমগ্র মুসলমান সমাজ হইতে এই বাধা আসে না, স্থানবিশেষে তাহার বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অংশ হইতে আসে। এই অংশের লোকদের মনের ভাব যে কেবল হিন্দুদেরই ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন জন্মায়, তাহা নহে। লক্ষ্ণৌতে বৎসরাধিক কাল ধরিয়া "মাধে সাহাবা" সম্পর্কে সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যে যে বিবাদের ফলে বাজায় মানুষ হতাহত হইয়াছে, তাহা এইরূপ মনের ভাব হইতে উৎপন্ন।

ইহার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা অনাবশ্যক ও অত্যন্ত অপ্রীতিকর। কাহারও ধর্মানুষ্ঠানে অপর কাহারও বাধাদান অনুচিত। একই রাষ্ট্রে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করে। কাহারও বিবেচনায় অন্য কাহারও ধর্মমত ও অনুষ্ঠান ভ্রান্ত বা কুসংস্কারজাত মনে হইতে পারে। আবার যে-ব্যক্তি অন্যের নিন্দা করে, অন্যেও তাহার নিন্দা করে। কিন্তু অপরের মতে ও অনুষ্ঠানে বাধা দিবার অধিকার কাহারও নাই। রাষ্ট্রেরও নাই। অবশ্য, কেহ যদি বলে, নরহত্যা, ব্যভিচার, নারীহরণ, চুরি ডাকাতি তাহার ধর্মের অঙ্গ, তাহা হইলে তাহাতে রাষ্ট্রের বাধা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।

মসজিদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা, গীতবাদ্য, প্রতিমা লইয়া যাওয়াতে মুসলমানেরা আপত্তি করে। আপত্তি করিবার তাহাদের কোনই অধিকার নাই, এমন কি নমাজের সময়েও তাহাদের আপত্তি করিবার অধিকার নাই। আইন ও উচ্চতম আদালতের রায় কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই এরূপ অধিকার স্বীকার করে না। দেখাও যায় বটে যে, হিন্দুদের দেব-মন্দিরে পূজা-অর্চ্চনা, খ্রীষ্টিয়ানদের গির্জায় উপাসনা, ব্রাহ্মদের ও আর্য্য সমাজীদের উপাসনা-মন্দিরে উপাসনা, প্রভৃতি কার্য্যের সময় তাহারা কেহই রাস্তা দিয়া কোন গীতবাদ্য সহকৃত শোভাযাত্রায় আপত্তি করে না, লাঠি ত চালায়ই না। সকলেই যে ভয়ে করে না, তাহা নহে। ভারতবর্ষ এখন খ্রীষ্টিয়ান জাতির দ্বারা শাসিত, খ্রীষ্টীয় ধর্ম রাজার জাতির ধর্ম। সুতরাং ভারতবর্ষে গির্জার সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্য-প্রতিমা-সম্বলিত শোভাযাত্রা গেলে যদি ইউরোপীয় ও দেশী খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মের অবমাননা হইত বা তাহাদের ধর্ম্মের অনুসরণে বাধা জন্মিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আপত্তি করিত, এবং খ্রীষ্টীয় রাজার গবর্ণ্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন। কিন্তু তাহারা আপত্তি করে না। মসজিদের সম্মুখ দিয়া যে-কোন সময়ে উক্তরূপ শোভাযাত্রা গেলে ইসলামের বা ঈশ্বরের অপমান হয়, বা মুসলমানদের ধর্মাচরণে ব্যাঘাত হয়, ইহা সত্য নহে। যদি কিঞ্চিৎ প্রকৃত বা কল্পিত অসুবিধা কাহারও হয়, তাহা হইলে কাহারও এরূপ দাবী করা উচিত নহে যে, যেহেতু আমার অসুবিধা হইতেছে অতএব আমারই জিদ বজায় থাকিতে হইবে। মহরমের সময় মসজিদ, গির্জা, দেবমন্দির, ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতি কোন কিছুর সম্মুখেই ত মুসলমানদের ঢাক থামে না।

যে-সকল মসজিদের সম্মুখ দিয়া রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, 'বাস গাড়ী, মোটর লরি, মোটর গাড়ী প্রভৃতি যায়, সেগুলা নমাজের সময়ও থামিয়া থাকে না। আকাশে যে অতি উচ্চ শব্দ করিয়া এরোপ্লেন উড়ে, তাহাও মসজিদের উপরে এঞ্জিন থামায় না, থামাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ মসজিদেরই উপর পড়িয়া ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটাইত। এই সব যানবাহনের শব্দে মুসলমান ভক্তদের বিঘ্নের আপত্তির কারণ যখন হয় না, তখন হিন্দুদের শোভাযাত্রা বা তাহার গীতবাদ্যেই আপত্তি কেন হয়, তাহার কারণ খুলিয়া বলা অনাবশ্যক।

হিন্দুরা প্রতিমা পূজা করে, মুসলমানেরা করে না। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্য-সমাজীরাও ত প্রতিমা পূজা করে না। প্রতিমার বা প্রতিমার সাহায্যে ভগবদারাধনা করিয়া যদি কাহারও তৃপ্তি হয়, উন্নতিবোধ হয়, তাহাতে বাধা জন্মাইবার অপরের কি অধিকার আছে? যাহারা প্রতিমা পূজা করে তাহারা ত অন্যদের উপাসনায় বাধা দেয় না। ঈশ্বর শুধু মসজিদে গির্জায় বা অন্য ধর্মমন্দিরে আছেন তাহা নহে, সর্ব্বত্রই আছেন। সুতরাং শোভাযাত্রা গীতবাদ্য প্রতিমা-পূজা যদি বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্র করিতে হইবে, শুধু মসজিদের সম্মুখে নহে। এরূপ অন্যায় ও ভ্রান্ত চেষ্টা কোন কোন নৃপতি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই।

সভ্যসমাজ চলে পারস্পরিক আচরণ (reciprocity) দ্বারা; অর্থাৎ, আমি অন্যের কাছে যেরূপ ব্যবহার চাই, অন্যের প্রতি আমি সেইরূপ ব্যবহার করিব এবং আমার নিকট হইতে অন্যে সেইরূপ ব্যবহার দাবী করিতে পারিবে ও পাইবে, এইরূপ বুঝাপড়া হইতে।

নমাজের সময় যে হিন্দুরা মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য বন্ধ করিতে সম্মত হয়, ইহা ঐ পারস্পরিকতা অনুসরণের দৃষ্টান্ত। যদি মুসলমানেরা ইহা তাহাদের একটা ধর্মসঙ্গত বা আইনসঙ্গত অধিকার মনে করে, তাহা ভুল। যদি সত্যই ঐ প্রকার কোন অধিকার মুসলমানদের থাকে, তাহা হইলে দেবমন্দিরে পূজার সময় মহরমের তাজিয়া ও বাদ্য থামাইতে বলিবার অধিকারও হিন্দুদের আছে। ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্ট বা তদধীন মুসলমান গবর্ণ্মেণ্ট যদি শুধু মুসলমানদেরই জিদ বজায় রাখিতে চান, তাহা পক্ষ-পাতিতা ও ভেদবুদ্ধিরই দৃষ্টান্ত, অন্য কিছুর নহে।

হিন্দুদের সকল সাধারণ পথ দিয়া গীতবাদ্যাদি-সহকারে শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অধিকার আছে; বহুপূর্ব্ব হইতে কোন্ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে এরূপ যুক্তি দেখাইবার আবশ্যক নাই। সাধারণ যে পথে আগে কোন শোভাযাত্রা যাইত না, সেখানেও মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, নাস্তিক সকলেরই শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অধিকার আছে। এই অধিকার সকলের জন্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় সরকারের ও পুলিসের বিশেষ সাহায্য করা উচিত। অবশ্য কোন

সম্প্রদায়কে বিরক্ত বা অসুবিধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই অধিকার সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করা অনুচিত।

হিন্দুদের ন্যায্য ও আইনসঙ্গত যে অধিকার আছে, এবং যাহার জন্ম তাহাদের পুলিসের লাইসেন্সও আছে, শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনায় বা অনুমানে বা আশঙ্কায় সেই অধিকার অনুসারে কাজ করিতে বিরত থাকা দুর্ব্বলতা। যে-সকল হিন্দু সম্পূর্ণ অহিংসাপন্থী, প্রহৃত আহত হইলেও তাহাদের লাঠি চালান উচিত নহে, কিন্তু তাহাদের আপন অধিকার বজায় রাখিয়া চলাও উচিত। স্বাধিকার বর্জ্জন ভীরুতা, অহিংসা নহে। যাহারা অহিংসাপন্থী নহে, তাহারা বেআইনী ভাবে আক্রান্ত হইলে যদি আত্মরক্ষার ও আইনসঙ্গত স্বাধিকার রক্ষার অধিকার পরিচালনা করে, তাহা হইলে তাহা বেআইনী কার্য্য নহে। কালী ও দুর্গার উপাসক কেহ, শাক্ত কেহ, সম্পূর্ণ অহিংসাপন্থী হইতে পারেন কি না, তাহা হিন্দুদের বিবেচ্য।

—

নারীসম্মেলনে ছাত্রীনিবাসবিষয়ক প্রস্তাব

গত ২৮শে কার্ত্তিক নিখিলভারত নারীসম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে কয়েকটি অত্যাবশ্যক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছাত্রীনিবাসবিষয়ক প্রস্তাবটির সাধারণ গুরুত্ব ও সাময়িক গুরুত্ব উভয়ই আছে। তাহা এই :—

১। এই সভার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, প্রত্যেক কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিজ নিজ ছাত্রীনিবাসের যথাযোগ্য তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা যেন অবশ্য অবশ্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিও এই সভার বিশেষ নিবেদন এই যে, তাঁহারা উক্ত প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি রাখেন এবং নিম্নলিখিত উপায়গুলি সম্বন্ধে মনোযোগ দেন :—(ক) কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছাত্রীনিবাসগুলিই কলেজ-ছাত্রীদের বাসস্থান বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। (খ) কেবলমাত্র সুশিক্ষিতা উন্নতমনা বিচক্ষণ ও সহৃদয় মহিলারাই প্রত্যেক ছাত্রীনিবাসের ভারপ্রাপ্ত হইবেন, এবং তাঁহারা কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেন। (গ) বিশ্ববিদ্যালয় ৫০০৲ টাকা বেতনে এক জন তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত করিবেন, যাঁহার উপযুক্ত গুণাবলী ও দক্ষতা থাকিবে ও যাঁহাকে ছাত্রীনিবাসে তত্ত্বাবধায়িকা বলিয়া অভিহিত করা হইবে। তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্ম বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের একটি ছোট পরামর্শসমিতি গঠিত করিবেন। এই সমিতির অধিবেশন মাসে মাসে হইবে এবং তাহার সভ্যগণ ছাত্রীনিবাসের অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়িকারূপে পরিগণিত ও যথাসম্ভব প্রত্যেক ছাত্রীনিবাসের প্রতিবেশিনীর মধ্য হইতে নির্ব্বাচিতা হইবেন। (ঘ) যেখানে ছাত্রীদিগের প্রবেশাধিকার আছে, এমন প্রত্যেক কলেজ অন্ততঃ একটি শিক্ষয়িত্রী যেন নিযুক্ত করেন, যিনি তাহার সংলগ্ন ছাত্রীনিবাসের কর্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে আরও অনুরোধ করা যাইতেছে যেন তাঁহারা যথাসময়মত নিজ নিজ ছাত্রীনিবাস স্থাপন করেন। (ঙ) যে সব ছাত্রী পিতামাতার সহিত অনুমোদিত 'হোমে' অথবা অনুমোদিত তত্ত্বাবধায়কের বাসায় অথবা নিজ নিজ কলেজের প্রত্যক্ষাধীন পরিচালিত কলেজ-হোষ্টেলে বাস করেন না, এরূপ কোন ছাত্রীকেই কোন কলেজেই ভর্ত্তি করা হইবে না বলিয়া নিয়ম থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়েরও এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে, পাঠকালে উপরোক্ত স্থানগুলিতে বাস করিয়াছেন বলিয়া যে-সব ছাত্রী সার্টিফিকেট দিতে না পারিবেন, তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিবেন না।

—

নারীসম্মেলনের অন্যান্য প্রস্তাব

নিখিলভারত নারীসম্মেলনের অন্য প্রস্তাবগুলিও খুব দরকারী। যেমন—নারীদের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে কুটীরশিল্পের সমবায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সমর্থন, শিশুবিদ্যালয় স্থাপনের সমর্থক প্রস্তাব, হিন্দুনারীর বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ক প্রস্তাব, বহুবিবাহ-বিরোধী প্রস্তাব, পাপ-ব্যবসা দমন আইনের সংশোধন দাবী এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রস্তাব।

—

ভাইস-চ্যান্সেলরকে বেতন দিবার উদ্যোগ

খবরের কাগজে দেখিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলরের অবৈতনিক পদটিকে বৈতনিক করিবার চেষ্টা হইতেছে। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর বহু ইংরেজ ও হিন্দু বাঙালী বিনা বেতনে যোগ্যতার সহিত এই কাজটি করিয়াছেন—এমন কি এক জন মুসলমানও তাহা করিয়াছেন। বঙ্গের মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিমণ্ডলের মনোনীত এক জন মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়োগ হইবার পর বেতন দিবার উদ্যোগের অর্থ এই যে, মুসলমান মন্ত্রীরা ও তাঁহাদের নির্ব্বাচিত অন্য প্রদের লোকেরা প্রধানতঃ টাকারই মর্ম্ম ও মূল্য বুঝেন, তাঁহারা খাঁটি নিঃস্বার্থ বা বস্তুতান্ত্রিক দেশসেবারূপ ধোঁয়াটে জিনিষের ধার ধারেন না। কিন্তু এরূপ নিন্দায় তাঁহাদের কিছুই আসে যায় না। "পেটে খেলে পিঠে সয়।"

জার্ম্যানীতে ইহুদীদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার

ইহুদীদের উপর অত্যাচার এবং তাহাদিগকে তাড়াইবার নানা প্রকার অমানুষিক কর্ম্ম উদ্ভাবন করিয়াই

চলিতেছিল। প্যারিসে এক পোলিশ ইহুদী যুবক হের্ বন্ রথকে গুলী করিয়া মারায় সেই অত্যাচার পৈশাচিক আকার ধারণ করিয়াছে। এক জাতির এক জন মানুষের দ্বারা আর এক জাতির এক জন মানুষের প্রাণবধ সম্পূর্ণ অকারণ এবং অতিগর্হিতও যদি হয়, তাহা হইলেও সেই কাজের জন্য হত্যার জাতির সব মানুষের শাস্তি ন্যায্য হইতে পারে না। কিন্তু হিটলারী আমলে সব রকম অত্যাচার ইহুদীদের উপর হইতে পারে। তাই তাহাদের সকলের মোট এক শত কোটি মার্ক জরিমানা হইয়াছে! ১২ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ২৫০০০ ইহুদী গ্রেপ্তার হইয়াছে। মারধর দোকান পাট নষ্ট, সে ত আগেই হইয়া গিয়াছে। দৈনিক কাগজসমূহে আরও বহুবিধ অতি কঠোর ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতার সংবাদ বাহির হইয়াছে। জার্ম্যানীর প্রচার-সচিব অদ্ভুত লঘুচিত্ততা দেখাইতেছে। সে ধমক দিয়াছে যে, যদি জার্ম্যেনীতে ইহুদী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদেশে আন্দোলন হয়, তাহা হইলে আবার নির্যাতন হইবে। যেরূপ জানোয়ার বা পিশাচদের হাতে ইহুদীরা পড়িয়াছে, গোয়েব্‌ল্‌স্ তাহার নমুনা।

—

প্যালেষ্টাইনের অবস্থা

সংবাদ বাহির হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট প্যালেষ্টাইন তিন টুকরা করিবেন না, আরব ও ইহুদীদের সহিত একটা গোলটেবিল বৈঠকে বসিয়া প্যালেষ্টাইন-সমস্যার সমাধান করিবেন, ইত্যাদি। আরবেরা বলিতেছে, আলোচনাটা হউক ইংরেজ ও আরবের মধ্যে। তাহারা ইহুদীদিগকে আমল দিতে চায় না। তাহাদের পছন্দসই মীমাংসা না হইলে সমগ্র আরবজাতি বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিবে।—ইংরেজদের উভয়সঙ্কট। প্যালেষ্টাইনে প্রভুত্ব না থাকিলে তাহাদের ভারতবর্ষে আসিবার পথ বিঘ্নসংকুল হয়। তাহারা সরিয়া গেলেই জার্ম্যানী বা ইতালী বা উভয়ে তথায় আড্‌ডা গাড়িবে। তদ্ভিন্ন, ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইনে জাতীয় বাসভূমি দিয়া মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেন তাহাদের প্রভূত সাহায্য পাইয়াছিল। সে প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ ভাঙিতে ব্রিটেনের বাধিবে না; কিন্তু ইহুদীদিগকে এখন একেবারে নিরাশ করিলে ভবিষ্যতে বিপদের সময় তাহাদের সাহায্য পাওয়া কঠিন হইবে। তাহারা ধনী জাতি। কখন-না-কখন তাহাদের সাহায্য লইতে হইবে।—ইংরেজ সরিয়া পড়িলে বা ইংরেজকে হটাইয়া দিলেই যে আরবদের খুব সুবিধা হইবে, এমন মনে হয় হয় না। আগেই বলিয়াছি, অন্য একটা বা দুটা ইউরোপীয় জাতির তখন প্যালেষ্টাইনে আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব হইবে।—প্যালেষ্টাইন সমস্যার চরম পরিণতি কি হইবে, অনুমান করিতে পারিতেছি না।

—

কমাল আতাতুর্ক

কমাল আতাতুর্কের মৃত্যুতে নবীন তুরস্কের পিতার তিরোভাব হইল। তুরস্ক সাম্রাজ্য বহুপূর্ব্বে খুব বড় ছিল। এখন তুরস্ক ক্ষুদ্র দেশ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দেশকে যিনি সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়া গেলেন, তিনি মহানুভব ও সাতিশয় শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। রুশিয়ার বিপ্লবী নেতাদের চেয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, তাঁহার পন্থা বলশেবিক পন্থার মত রক্তাপ্লুত ও নরকঙ্কালখচিত হয় নাই। তিনি তুরস্ককে শুধু যে নূতন রাষ্ট্রীয় রূপ দিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। তুরস্কের সমাজকে আধুনিক রূপ দিয়াছেন, নারীদের অবরোধ দূর করিয়াছেন এবং তাহাদের সর্ব্ববিধ শিক্ষা ও রোজগারের পথ খুলিয়া দিয়াছেন, বহুবিবাহ বন্ধ করিয়াছেন, শিল্পবাণিজ্যে বিদেশীয় প্রাধান্য লোপ করিয়া দেশীয় অভ্যুদয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রীষ্টিয়ান বিদেশীদের প্রভাববিস্তার বন্ধ করিয়াছেন, খিলাফতের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, রাষ্ট্রকে ইস্‌লামিক ও অন্য ধর্ম্মমত হইতে পৃথক্ করিয়াছেন, মসজিদের নমাজ-আদিতে আরবীয় পরিবর্ত্তে তুর্কী ভাষা চালাইয়াছেন, ফেজের পরিবর্ত্তে সাধারণ ইউরোপীয় টুপি চালাইয়াছেন, তুর্কী ভাষা হইতে আরবী শব্দের বহিষ্কার করাইয়াছেন, আরবী অক্ষরের পরিবর্ত্তে রোমান অক্ষর চালাইয়াছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। কমাল আতাতুর্কের চেয়ে মানব সমাজের ও মানবজীবনের অধিকতর ক্ষেত্রে অধিকতর সংস্কার আর কেহ করিতে পারেন নাই।

—

আসামে কংগ্রেসী শাসন প্রবর্ত্তন

আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল মনোনীত হইয়াছে, ইহা খুব সন্তোষের বিষয়। মন্ত্রীরা প্রত্যেকে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন লইবেন।

—

বঙ্গের রাজনৈতিক বন্দী

বঙ্গের কয়েক শত রাজনৈতিক বন্দীর এখনও মুক্তি হয় নাই। তাহার জন্য আন্দোলন একান্ত আবশ্যক। মুক্ত বন্দীদের জীবিকা-সংস্থানের চেষ্টাও সেইরূপ চাই।

—

• দেশী রাজ্যগুলিতে দমন চেষ্টা

বহু দেশী রাজ্যে প্রজাদিগকে দমন করিবার নির্মম চেষ্টা হইতেছে। রাজাদের বুঝা উচিত, অন্ততঃ ব্রিটিশ ভারতের লোকদের সমান অধিকার দেশী রাজ্যের প্রজাদিগকে না দিলে প্রজাদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন থামিবে না।

—

বোম্বাইয়ে ধর্ম্মঘটের ফল

বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট কারখানা-মালিক ও শ্রমিকদের বিবাদ সম্বন্ধে যে আইন করিয়াছেন, তাহাতে অসন্তোষ প্রদর্শনের জন্য শ্রমিক-নেতারা একদিনব্যাপী শ্রমিক-ধর্ম্মঘটের চেষ্টা করেন। সেই উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের উপর গুলি চালান হয়। এইরূপ ব্যাপার অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

—

বঙ্গে নারীনির্যাতন চলিতেছে

আমরা কখন কখন নানা সাময়িক ব্যাপারকে সকলের চেয়ে জরুরি সমস্যা বলিয়া থাকি। কিন্তু নারীহরণ প্রভৃতি নিষ্ঠুরতা ও দুর্নীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। বঙ্গের এই কলঙ্কমোচনের চেষ্টা সকল সম্প্রদায়ের করা উচিত। মুসলমানদের মধ্যে ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী। সেই জন্য তাঁহাদেরও ঔদাসীন্য গর্হিত। শিক্ষিতা মুসলমান নারীরা এ-বিষয়ে সচেতন হউন। হিন্দু সমাজের দায়িত্বের কথা বহুবার বলা হইয়া থাকিলেও, এই কলঙ্ক থাকিতে তাহা পুনঃপুনঃ বলা কখনও অনাবশ্যক হইবে না।

—

চীন ও জাপান

এক বৎসরের অধিক কাল যুদ্ধের পর চীনের কতক অংশ জাপানের হাতে গিয়াছে বটে; কিন্তু চীনের প্রতিজ্ঞা টলে নাই, সাহস কমে নাই, সৈন্তেরা অধিক অভিজ্ঞ ও দক্ষ হইয়াছে, চীনের প্রতি, জাপান ছাড়া, অন্য সব দেশেরই সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। জাপানের সৈন্তদের অজেয়তার খ্যাতি নষ্ট হইয়াছে, জাপানের আর্থিক সঙ্কট ঘনাইয়া আসিয়াছে, ইটালী ও জার্ম্যানী ছাড়া জাপানের প্রতি সহানুভূতি কাহারও নাই, কিন্তু তাহারা জাপানকে অর্থ সাহায্য দিতে অসমর্থ। চীন-সৈন্য আবার কাণ্টন ও হাংকাউয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

—

স্পেন

স্পেনের সাধারণতন্ত্রী গবর্মেণ্ট পরাজিত হন নাই, এখনও মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিতেছেন।

—

মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুতি

এঞ্জিন চালাইবার জন্য যেমন পেট্রল ব্যবহৃত হয়, সুরাসারও (alcoholও) সেইরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। কল চালাইবার এই সুরাসার যে চিনির কারখানার মাৎগুড় হইতে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে চিনির কারখানা বিহারে ও যুক্ত-প্রদেশে বেশী। উক্ত সুরাসার প্রস্তুত ঐ দুই প্রদেশে বেশী হইবে। বঙ্গেও চিনির কারখানা বাড়ান উচিত। তাহা হইলে বঙ্গেরও এ-বিষয়ে সুবিধা হইবে।

—

জার্ম্যানী প্রভৃতি "উপনিবেশ" চায়

ব্রিটেন ফ্রান্স প্রভৃতির বহুবিস্তৃত "উপনিবেশ" আছে। সুতরাং জার্ম্যানী ও ইটালী প্রভৃতি কেন তাহা না-চাহিবে? জার্ম্যানীর ভয়ে ব্রিটেন নিজের কোন কোন উপনিবেশ ছাড়িয়া দিতেও পারে। কিন্তু উপনিবেশ নামে অভিহিত এই সব দেশের আদিম অধিবাসীদের অধিকারটা যেন কিছুই নয়! তাহারা গরুবাছুরের মত হস্তান্তরিত হইতে পারে! মানব-সভ্যতার এখনও এই অবস্থা!

—

ভূপেশচন্দ্র নাগ

বঙ্গে স্বদেশী-আন্দোলনের ফলে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের বিনা বিচারে নির্ব্বাসন হইয়াছিল, ভূপেশচন্দ্র নাগ তাঁহাদের মধ্যে এক জন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নির্ব্বাসন হইতে মুক্তি পাইবার পরেও তিনি দেশহিতকর কাজ করিতেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি নিজ জেলা ঢাকার বাহিরে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

—

দেশ-বিদেশের কথা

অধ্যাপক শ্রীসূর্য্যকুমার ভুইঞা

গৌহাটি কটন কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার ভুইঞা "আসামে ইংরেজ (১৭৭১-১৮২৭)" বিষয়ে গবেষণা করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ. ডি. উপাধি পাইয়াছেন। লণ্ডনে তিনি স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজে অসমীয়া ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক ভুইঞা অসমীয়া ও ইংরেজীতে অনেকগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মুঘল-ভারতের



অধ্যাপক শ্রীসূর্য্যকুমার ভুইঞা

ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন উপাদান তিনি আসাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। আসামের প্রত্নতত্ত্বচর্চ্চা-বিভাগের তিনি অনেক দিন অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক ভুইঞা রোমের 'প্রাচ্য পরিষৎ কর্ত্তৃক বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন'।

বাঙ্গালোরে বাঙালী-সম্মিলনী

দীপালি উপলক্ষ্যে ২২শে গত অক্টোবর বাঙ্গালোরে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র গুহের ভবনে স্থানীয় বাঙালীদের বাৎসরিক প্রীতিসম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। পর্ব্বে বাঙ্গালোর-বাসী কয়েকজন বাঙালী, বোম্বাই, পুণা,



ব্যাঙ্গালোরে বাঙালী-সম্মিলনী



বিগত ইউরোপীয় রাষ্ট্র-সঙ্কটের সময় যুদ্ধ-সম্ভাবনা উপলক্ষে লণ্ডনের একটি পল্লীতে পরিখা খনন হইতেছে



আধুনিক ইস্‌লাম-জগতের দুই জন প্রধান স্রষ্টা
বামে: গাজী কমাল। দক্ষিণে: রেজা শাহ্‌

মান্দ্রাজ, ভেলোর প্রভৃতি স্থান হইতে এই সম্মিলনীতে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নাট্যাভিনয়ে উৎসবের সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছিল। ডক্টর গুহ তাঁহার বক্তৃতায় বাঙ্গালোরে স্থায়ী একটি বাঙালী-মিলনাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করেন।

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে অনুন্নত সমাজের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির সেবাকার্য্য

যশোহর জিলার এগারখান একটি বিস্তৃত নমঃশূদ্র-অঞ্চল এবং ইহা 'অনুন্নত সমাজের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির' একটি কেন্দ্র সমিতির পরিচালনাধীনে এগারখানের অন্তর্গত বাকুড়ী ও মালীয়াট গ্রামে একটি উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয় ও একটি মধ্য-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বৎসরের বন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের মধ্যে এগারখান অন্যতম। গত আগষ্ট মাস হইতে সমিতির কর্ম্মী, বালক-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শক্তিরঞ্জন বসুর নেতৃত্বে এগারখান সেবক-সঙ্ঘের উদ্যোগে রিলিফ-কমিটি এই অঞ্চলের সাতাইশটি গ্রামের আর্ত্তদিগকে নিয়মিত সাহায্য দান করিতেছে। কর্ম্মীদের গৃহ জলমগ্ন হওয়ায় তাঁহারা নৌকায় বাস করিতেছেন এবং নৌকাযোগে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। ব্রাহ্মসমাজ বন্যা-সাহায্য-সমিতি, স্থানীয় কংগ্রেসের সহিত একযোগে এই কেন্দ্রটি পরিচালনা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টও এই অঞ্চলে কিছু কিছু সাহায্য বিতরণ করিয়া ও কৃষিঋণ দিয়া চাষীদের দুর্দ্দশার লাঘব করিয়াছেন। এত দিন একমাত্র সমস্যা ছিল খাদ্যের। কিন্তু জল কমিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া ও আমাশয় ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। তাহা ছাড়া বস্ত্রের অভাব এত বেশী যে বহু স্ত্রীলোক বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহির হইতে পারিতেছে না। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকে বস্ত্রের অভাবে



র াঁচিতে হিন্দু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনে সমবেত সাহিত্যিক ও কর্ম্মীবৃন্দ
(১) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি (২) শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি
(৩) শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন, সম্মিলনীর সম্পাদক।

স্কুলে আসিতে পারিতেছে না। জেলা-বোর্ড এই কেন্দ্রের জন্য এক জন ডাক্তার পাঠাইয়াছেন কিন্তু পথ্যের অভাবে চিকিৎসা সফল হইতেছে না। খাদ্য, বস্ত্র ও পথ্য এই ত্রিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কিংবা শ্রীযুক্ত শক্তিরঞ্জন বসু, বাকড়ী, পোঃ সেখহাটি, যশোহর, এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইলে বহু দরিদ্র চাষীর প্রাণরক্ষা হইবে।

র াঁচি হিন্দু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্য-সম্মিলনীর সপ্তম-বার্ষিক অধিবেশন

গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই কার্ত্তিক দিবসত্রয় র াঁচিতে হিন্দু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্য-সম্মিলনীর সপ্তমবার্ষিক অধিবেশন বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রথমে কুমারী দিবা সেন কর্ত্তৃক জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' গীত হয়। সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে মাল্যভূষিত করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর শ্রীযুক্ত সুধাকান্তি রায় মহাশয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার "বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দী" শীর্ষক সুচিন্তিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক অভিভাষণটি পাঠ করেন। সম্মিলনীর তিন দিনের অধিবেশনের মধ্যে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডাঃ অমরপ্রসাদ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সুকুমার ভট্টাচার্য্য, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, ডাঃ প্রফুল্লকুমার মিত্র, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় প্রভৃতি বঙ্গভারতীর সুসন্তানগণ প্রবন্ধপাঠ, কবিতাপাঠ ও বক্তৃতাদি করেন।

কুমারী দিবা সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় সুমধুর সঙ্গীত দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। অধিবেশনের শেষ দিনে সভাপতি মহাশয় "বাংলা-গদ্যের জনক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সেন, শ্রীযুক্ত সুধাকান্তি রায় ও শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী প্রভৃতি অধিবেশনের সাফল্যের জন্য বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন।

সাহিত্য-সম্মিলনী উপলক্ষে একটি চিত্রপ্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



ঘাট

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৪৫ | ৩য় সংখ্যা

প্রবীণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ব-জগৎ যখন করে কাজ
স্পর্দ্ধা ক'রে পরে ছুটির সাজ।
আকাশে তার আলোর ঘোড়া চলে,
কৃতিত্বেরে লুকিয়ে রাখে পরিহাসের ছলে।
বনের মাঝে গাছে গাছে শ্যামল রূপের মেলা,
ফুলে ফলে নানান্ রঙে নিত্য নতুন খেলা;
বাহির হতে কে জানতে পায় শান্ত আকাশতলে
প্রাণ বাঁচাবার কঠিন কর্ম্মে নিত্য লড়াই চলে।
চেষ্টা যখন নগ্ন হয়ে শাখায় পড়ে ধরা,
তখন খেলার রূপ চলে যায়, তখন আসে জরা।

বিলাসী নয় মেঘগুলো তো জলের-ভারে ভরা,
চেহারা তার বিলাসিতার রঙের ভূষণ পরা।
বাইরে ওরা বুড়োমিকে দেয় না তো প্রশ্রয়,—
অন্তরে চাই চিরন্তনের বজ্রমন্ত্র রয়।

জল-বয়ানো ছেলেখেলা যেমনি বন্ধ করে,
ক্যাকাশে হয় চেহারা তার বয়স তাকে ধরে।

দেহের মাঝে হাজার কাজে বহে প্রাণের বায়ু,
পালের তরীর মতন যেন ছুটিয়ে চলে আয়ু,
বুকের মধ্যে জাগায় নাচন, কণ্ঠে লাগায় সুর,
সকল অঙ্গ অকারণে উৎসাহে ভরপুর।
রক্তে যখন ফুরোবে ওর খেলায় নেশা খোঁজা
তখনি কাজ অচল হবে বয়স হবে বোঝা।

ওগো তুমি কী করছ ভাই, স্তব্ধ সারাক্ষণ,
বুদ্ধি তোমার আড়ষ্ট যে, ঝিমিয়ে-পড়া মন।
নবীন বয়স যেই পেরোল খেলাঘরের দ্বারে,
মরচে-পড়া লাগল তালা, বন্ধ একেবারে।
ভালো মন্দ বিচারগুলো খোঁটায় যেন পোঁতা।
আপন মনের তলায় তুমি তলিয়ে গেলে কোথা?
চলার পথে আগল দিয়ে বসে আছ স্থির,
বাইরে এসো, বাইরে এসো পরম গম্ভীর।
কেবলি কি প্রবীণ তুমি, নবীন নও কি তাও?
দিনে দিনে ছি ছি কেবল বুড়ো হয়েই যাও।
আশি বছর বয়স হবে ওই যে পিপুল গাছ,
এ আশ্বিনের রোদ্দুরে ওর দেখলে বিপুল নাচ?
পাতায় পাতায় আবোলতাবোল, শাখায় দোলাদুলি,
পান্থ হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাকুলি।
ওগো প্রবীণ, চলো এবার সকল কাজের শেষে
নবীন হাসি মুখে নিয়ে চরম খেলার বেশে॥

সেকালের বঙ্গমহিলা

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের বাল্যকালে, অর্থাৎ এখনকার ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে, বাংলার নারীসমাজে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না বলিলেই হয়। কলিকাতায় এবং মফস্বলের অনেক শহরে তখন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সকল বিদ্যালয়ে প্রকৃত লেখাপড়া কিছুই হইত না। বালিকাদের অক্ষর-পরিচয় হইত, কোন কোন বালিকা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক কষিতে পারিত, কোনরূপে আঁকাবাঁকা অক্ষরে চিঠি-পত্রও লিখিতে পারিত, ইহার অধিক আর কোন বালিকাকে অগ্রসর হইতে বড় দেখা যাইত না। সেই সকল বালিকার নিরক্ষরতা দূর হইত মাত্র, শিক্ষা কিছুই হইত না। যে-সকল স্ত্রীলোক বাল্যকালে ঐরূপ নাম মাত্র শিক্ষা লাভ করিতেন, তাঁহারাই সেকালের নারী-সমাজে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতেন। এইরূপ "শিক্ষিত" স্ত্রীলোকও সেকালে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। অনেকেই বাল্যকালে অধীত বিদ্যা বিবাহের পর বিস্মৃত হইত, মাত্র বর্ণপরিচয়টাই থাকিয়া যাইত। ইহার কারণ, অনেক বাটীতেই স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখা একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। যে-সকল বালিকা লেখাপড়া শিখিত, তাহারা বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া শাশুড়ী-ননদের নিকটে লেখাপড়া শেখার কথাটা গোপন রাখিতেই চেষ্টা করিত। স্ত্রীলোকে লেখা-পড়া শিখিলে বিধবা হয়,- এই ধারণা সেকালের বর্ষীয়সী-দিগের মনে একরূপ বদ্ধমূল ছিল। যদি শাশুড়ী-ননদ জানিতে পারিতেন যে, নববধূ লিখিতে পড়িতে জানে, তাহা হইলে কথায় কথায় তাঁহারা বালিকার বিদ্যাবত্তার উল্লেখ করিয়া তাহার জীবন দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিতেন। লজ্জাবনতা, দীর্ঘ-অবগুণ্ঠনবতী, নবম বা দশম বর্ষীয়া বালিকা-বধূর পদস্পর্শে হয়তো একটা ঘটি বা গেলাস পড়িয়া গেল, তাহা দেখিবামাত্র শাশুড়ী সগর্জ্জনে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বাপ-মা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে মেম করেছে, সংসারের কাজকর্ম্ম কিছুই শেখায় নি?" এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যাইত না, সেকালে বোধ হয় এরূপ ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী অতি অল্পই ছিল।

সেকালে অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই জন্য স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া শেখাটা একটা অনাবশ্যক বিলাসিতা বলিয়া গণ্য ছিল। আবার অনেক বাটীতে পুরুষদিগের মন এত সঙ্কীর্ণ ও নীচ ছিল যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলেই পরপুরুষকে প্রেমপত্র লিখিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এখনকার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও আমারই সমবয়সী, কোন আত্মীয়কে বাহাদুরি করিয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের অন্তঃপুরে কালি-কলম, কাগজ-পেন্সিল রাখিবার হুকুম নাই, কারণ, তাঁহাদের বাটীর দুই-একটি বধূ পিত্রালয়ে কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, পাছে বধূরা পরপুরুষকে পত্র লেখেন সেই জন্যই বাটীর কর্ত্তা ঐরূপ হুকুম জারি করিয়াছিলেন, অথচ তিনি নিজে অশিক্ষিত ছিলেন না। যে-যুগে শিক্ষিত পুরুষগণই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ নীচ ও নিন্দনীয় ধারণার বশবর্ত্তী ছিলেন, সে-যুগে অশিক্ষিতা গৃহিণীরা যে লেখাপড়া-জানা মেয়েকে পুত্রবধূরূপে পাইলে আপনাদিগকে দুর্ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেন, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

অথচ সেকালে যে-স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিতেন, অনেক সময় তাঁহার সমাদরও হইত। সমাদরটা বেশী হইত লিখন-পঠনে অনভিজ্ঞা সমবয়সী তরুণীদিগের মধ্যে। নববিবাহিতা তরুণীরা স্বামীকে পত্র লিখিবার জন্য বা স্বামীর লিখিত পত্র পড়াইয়া শুনিবার জন্য লেখা-

পড়া-জানা মেয়েদের শরণাপন্ন হইত, অনেক সময় প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা গৃহিণীরাও আত্মীয়-আত্মীয়াকে পত্র লেখাইবার জন্ত লেখাপড়া-জানা যুবতীর সাহায্য লইতেন, আবার তাঁহারাই প্রতিবেশিনীদিগের নিকটে ঐরূপ বিদুষী যুবতীর নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শিক্ষিতা মেয়েদের আর এক বিষয়েও সমাদর ছিল। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, কোন কোন বাড়ীতে মধ্যাহ্নে মহিলা-মজলিস বসিত, সাধারণতঃ সেই মজলিসে পরচর্চা ও পরনিন্দাই বেশীর ভাগ হইত, কোন কোন মজলিসে পুস্তক-পাঠও হইত। সাধারণতঃ কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত বা দাশুরায়ের পাঁচালী পড়া হইত। একটি স্ত্রীলোক পুস্তক পাঠ করিতেন, অন্ত সকলে অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। যাঁহারা পুস্তক-পাঠ শুনিতেন, তাঁহারা সকল সময় নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেন না, কেহ পুস্তক শুনিতে শুনিতে সুপারি কাটিতেন, কেহবা সলিতা পাকাইতেন, কেহবা ঐরূপ কোন গৃহস্থালীর কাজ করিতেন। অনেকে এরূপ একটা শিল্প-কাজ করিতেন, যে-শিল্প আজকাল মফস্বল হইতে এবং বহুকাল হইল শহর-অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই শিল্প চুলের দড়ি বিনানো। স্ত্রীলোকেরা একালে কবরী-বন্ধনের সময় "কার" এবং ফিতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেকালে একালের মত এক পয়সায় আট হাত কার বা চারি হাত ফিতা কিনিতে পাওয়া যাইত না, কারের পরিবর্তে স্ত্রীলোকেরা চুলের দড়ি ব্যবহার করিতেন। সেই চুলের দড়ি কিনিতে পাওয়া যাইত না, বাড়ীতে বিনাইয়া লইতে হইত।

মধ্যাহ্নের মহিলা-মজলিসটা আরম্ভ হইত বেলা দুইটা কি আড়াইটার সময়, আর চারিটার পর, আমরা স্কুল হইতে বাড়ীতে আসিলে সে-মজলিস ভঙ্গ হইত। আমার মা বই পড়িয়া শুনাইতেন বলিয়া আমাদের বাড়ীতে মধ্যাহ্নকালে দশ-বারটি প্রতিবেশিনীর সমাগম হইত। প্রতিবেশিনীদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাতে প্রথম সম্ভাষণ হইত "আজ কি রান্না হ'ল" বলিয়া। ইহা প্রাত্যহিক সম্ভাষণ, কোন দিন ইহার অন্যথা হইতে দেখি নাই। সেকালে প্রায় সকল স্ত্রীলোকই অশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া মহিলা-মজলিস মাত্রেই পুস্তক-পাঠ হইত না। মহিলা-মজলিসে আমাদের বাড়ীতে, পুস্তক-পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল আমার পিতার চেষ্টায়। তিনি জানিতেন যে, সাধারণতঃ মহিলা-মজলিসে প্রতিবেশীদিগের নিন্দা, আত্মীয়-পরিজনের নিন্দা, পরচর্চা ও কুৎসা প্রভৃতিই হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত নারীসমাজে আর কোন আলোচ্য বিষয় থাকিত না। তাই তিনি আমার জননীকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "পাড়ার পাঁচ জন মেয়ে আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলে তাহাদিগের নিকটে রামায়ণ, মহাভারত, বা অন্য কোন বই পড়িও, যেন আমাদের বাড়ীতে পরচর্চা বা পরকুৎসা না হয়।" তদবধি এই পুস্তক-পাঠের ব্যবস্থাই প্রচলিত হয়।

সেকালে স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া সাধারণের উপযোগী স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক খুব অল্পই ছিল। আমরা বাল্যকালে সংবাদপত্র দেখিয়াছি,—"সুলভ সমাচার," "এডুকেশন গেজেট," "সাধারণী"। ইহা ব্যতীত আরও হয়তো সংবাদপত্র ছিল, কিন্তু আমাদের সহিত অন্য কোন কাগজের সম্পর্ক ছিল না।

বাল্যকালে আমরা স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী উপদেশপূর্ণ একখানি মাত্র উপন্যাসের কথা জানিতাম, সেই পুস্তকের নাম "সুশীলার উপাখ্যান," গ্রন্থকারের নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। ঐ পুস্তকের প্রথম ভাগ অবিবাহিতা বালিকাদের জন্ত, দ্বিতীয় ভাগ বিবাহিতা তরুণী ও যুবতীদের জন্ত এবং তৃতীয় ভাগ প্রৌঢ়া গৃহিণীদের জন্ত লিখিত হইয়াছিল। সেই পুস্তক আমাদের বাড়ীতে ছিল, আমাদের স্কুলপাঠ্য না হইলেও আমরা সেই পুস্তক বাল্যকালে পাঠ করিয়াছি। তাহার অনেক পরে ঐ ধরণের একখানি পুস্তক স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম "মেজো বৌ"। এই পুস্তক বোধ হয় এখনও পাওয়া যায়। "সুশীলার উপাখ্যান" এখন আর পাওয়া যায় না। এখনকার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, আমি যখন "হিতবাদী"র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতাম, সেই সময় আমাদের গ্রাহকদিগকে উপহার দিবার জন্ত "সুশীলার উপাখ্যান" সংগ্রহের জন্ত একবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু আমাদের সে-চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

আমার পিতা সেকালের লোক হইলেও অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী, এমন কি এখনকার ভাষায় যাহাকে "প্রগতিশীল" বলা হয়, তাহাই ছিলেন। তিনি আমার জননীকে লেখাপড়া শিখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা গল্প শুনিয়াছি যে, তিনি যখন আমার মাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন, তখন আমাদের বাটীর গৃহিণীরা তাহাতে প্রবল অন্তরায় হইয়াছিলেন। কিন্তু বাবা তাঁহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আমার মাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বাবার কাছে মা যে কেবল বাংলা পুস্তক পাঠ করিতেই শিখিয়াছিলেন তাহা নহে, মা ইতিহাস, বিজ্ঞান, বাংলা ব্যাকরণ, ভূগোল এবং খগোল সম্বন্ধেও আমার পিতার নিকট হইতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

লেখাপড়ার চর্চ্চা না থাকাতে সেকালের মহিলা-সমাজ যে কিরূপ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত ছিল, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। স্বদেশ, বিদেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না। বাসস্থান হইতে দুই-তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান তাঁহাদের পক্ষে বিদেশ ছিল। যাঁহারা দেশের অর্থাৎ নিজের পল্লীর বাহিরের কোন সংবাদ রাখা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা যে বিদেশের কোন সংবাদ রাখিতেন না, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। দৈনিক সংসারযাত্রানির্ব্বাহ-সংক্রান্ত ব্যাপার ব্যতীত স্ত্রীলোকের আলোচ্য অন্য কোন ব্যাপার থাকিতে পারে, ইহা সেকালের নারীরা ধারণা করিতেই পারিতেন না। দেশের বা সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সভা-সমিতিতে যোগদান করা যে স্ত্রীলোকেরও উচিত, এরূপ কথা কেহ বলিলে লোকে তাহাকে পাগল বলিত।

সেকালে বঙ্গমহিলাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না বলিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা ছিল না। সেকালের মহিলাদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন, কিন্তু সেই সকল গায়িকার কণ্ঠস্বর সাধারণতঃ কোন পুরুষের কর্ণগোচর হইত না। আমরা বাল্যকালে অনেক মহিলা-মজলিসে, কোন কোন মহিলাকেও গান করিতে শুনিয়াছি। তাঁহারা এরূপ মৃদুস্বরে গান করিতেন যে, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর কখনও অন্তঃপুরের সীমা অতিক্রম করিত না। সেই সকল গানের অধিকাংশই যাত্রা বা পাঁচালীর গান ছিল। রামপ্রসাদের গান, ৺গোবিন্দ অধিকারীর রচিত কৃষ্ণ-যাত্রার গান, দাশুরায়ের পাঁচালী, মদন মাষ্টারের যাত্রার গান এবং নিধুবাবুর বা গোপাল উড়ের টপ্পা সেকালে অনেক ভদ্রমহিলার জানা ছিল। সেই সকল সঙ্গীতের যথোচিত সদ্ব্যবহার হইত বিবাহবাসরে। যে-সকল প্রৌঢ়া গৃহিণী যুবতী বধূর উচ্চকণ্ঠ ভীষণ দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাও বিবাহরাত্রিতে বাসরঘরে, সদ্যবিবাহিত বরের সম্মুখে তাঁহাদের যুবতী বধূর গানকে অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন না। সেকালে হার্ম্মোনিয়মের এরূপ প্রচলন ছিল না; মফস্বলে কালেভদ্রে কখনও হার্ম্মোনিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইত, সুতরাং বাসরেই হউক বা মহিলা-মজলিসেই হউক, মহিলারা যে গান করিতেন, তাহা বিনা বাদ্যযন্ত্রে। যে-যুগে স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া জানা একটা দোষ বলিয়া গণ্য হইত, সেই যুগে স্ত্রীলোকের সঙ্গীতচর্চ্চা যে পুরুষসমাজে অতিবড় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে সঙ্গীত-শ্রবণ-স্পৃহা ছিল না তাহা নহে। যে যুবতীর কণ্ঠস্বর মধুর হইত, তাহার গান শুনিবার জন্য বর্ষীয়সী মহিলারা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সেইরূপ কোন সুকণ্ঠী গায়িকা কোন মহিলা-মজলিসে উপস্থিত হইলে প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা তাহাকে "একটা গান গা না মা, তোর গলাটি বেশ মিষ্টি" এইরূপ বলিয়া গান শুনিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতেন। গান শুনিবার আগ্রহ সকলেরই ছিল, কিন্তু সঙ্গীতের রীতিমত চর্চ্চা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত!

এক বিষয়ে সেকালের মহিলারা একালের মহিলা-দিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন। রন্ধনবিদ্যায় এবং শারীরিক পরিশ্রমে সেকালের স্ত্রীলোকদের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। সাংসারিক নিত্য রন্ধন তো স্ত্রীলোকদের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। বড় বড় ভোজেও রন্ধনের ভার তাঁহারাই গ্রহণ করিতেন এবং অম্লানবদনে সেই ভার বহন করিতেন। রন্ধনকুশলতার জন্য বহু ব্রাহ্মণ-মহিলার

খ্যাতি ছিল। সেকালে অনেক স্ত্রীলোকই সূক্ষ্ম কারুকার্য্যেও বেশ দক্ষতা প্রকাশ করিতেন। বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্য্যে তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা স্বস্তিক বা "শ্রী" নির্ম্মাণ, পিঁড়ার উপর আলিপনা, পঞ্চগুঁড়ির আসন নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে অনেকে এমন সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিতেন যে, তাহা দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিত। অনেকে চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, ছোলার ডালের বরফী, মুগের নাড়ু, মুড়ির নাড়ু ইত্যাদি নানাবিধ সুন্দর সুন্দর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারিতেন, সেই সকল মিষ্টান্ন প্রধানতঃ ফুলশয্যার তত্ত্ব বা অন্য কোন তত্ত্বর সহিত কুটুম্ববাড়ীতে প্রেরিত হইত। আমার কোন নিকট-আত্মীয়া অৰ্দ্ধপক্ক পেঁপে কাটিয়া এমন সুন্দর কৃত্রিম চাঁপা ফুল প্রস্তুত করিতে পারিতেন যে, পাঁচ-সাতটা চাঁপা ফুলের সহিত সেই কৃত্রিম ফুলটা রাখিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারা যাইত না যে উহাদের মধ্যে কোন্‌টা কৃত্রিম। অতি সূক্ষ্ম ভাবে সুপারি কাটাও সেকালে একটা কারুশিল্প ছিল। এক এক জনের কৰ্ত্তিত সুপারি ঠিক সূতার মত সূক্ষ্ম হইত। খয়ের ভিজাইয়া কোমল করিয়া তাহা দ্বারাও অনেকে নানা প্রকার ফলফুল, পশুপক্ষী প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

একালের ভদ্রমহিলারা বালকদিগের জন্য যেরূপ হাফপ্যাণ্ট, ফ্রক ইত্যাদি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সেকালে কেহই সেরূপ করিতে পারিতেন না। তাহার প্রধান কারণ, সেকালে অলঙ্কার-বাহুল্য থাকিলেও পরিচ্ছদ-বাহুল্য একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। ভদ্র পরিবারের বালিকারা চার-পাঁচ বৎসর এবং বালকেরা ছয়-সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ীতে প্রায়ই নগ্ন থাকিত; বাটীর বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে বালক-বালিকারা কাপড় পরিত, বালকেরা জামা ও জুতা পরিত, বালিকারা জামা বা জুতা ব্যবহার করিত না। অনেক বালিকার অঙ্গে প্রথম জামা উঠিত, নববধূরূপে বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাটী যাইবার সময়। সেকালের ভদ্রমহিলারা যে এখনকার মহিলাদের মত বাটীতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারিতেন না, তাহার অন্য কারণ, সেকালে সেলাইয়ের কল ছিল না, সকল প্রকার সেলাই-কাজই হাতে করিতে হইত। সেকালে কোন ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক শেমিজ বা সায়া ব্যবহার করিতেন না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, আমার স্ত্রী শেমিজের উপর শাড়ী পরিয়া কোন আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহাকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। প্রৌঢ়া গৃহিণীরা তাঁহাকে শেমিজ পরিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "যোগিনকে দিয়ে এইবার কলকাতা থেকে জুতো ও কোট আনিয়ে পরিও। মেমেদের মত ঘাঘরা পরেছ, জুতো পায়ে না দিলে মানাবে কেন?" শুনিয়াছি কেবল একজন প্রৌঢ়া মহিলা শেমিজ দেখিয়া বলিয়াছিলেন,"এ পোষাক তো বেশ, পাতলা কাপড় পরলেও বে-আব্রু হ'তে হয় না। আমিও বৌমাদের জন্য এইরকম জামা কলকাতা থেকে আনতে বলব।" তিনি কলিকাতা হইতে শেমিজ আনাইয়া পুত্রবধূদিগকে পরাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন কিনা, জানিতে পারি নাই। বলা বাহুল্য যে, আমার স্ত্রীর জন্য শেমিজ আমি কলিকাতা হইতে লইয়া গিয়াছিলাম। এখন এক এক সময় ভাবি যে, সেকালে ঐসকল রক্ষণশীলা প্রৌঢ়া গৃহিণীদের মধ্যে যদি কেহ রিপ্‌ ভ্যান্‌ উইঙ্ক্‌ল-এর মত সুদীর্ঘ চল্লিশ কি পঞ্চাশ বৎসর গাঢ় নিদ্রার পর এখন নিদ্রাভঙ্গে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান ভদ্রমহিলাদিগের বেশভূষা, আচারব্যবহার দেখিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না যে, তিনি বঙ্গদেশেই আছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে সকল ভদ্রমহিলাকে দেখিতেছেন, তাঁহারা তাঁহারই পৌত্রী, প্রপৌত্রী, বাঙালী মহিলা।

বাস্তবিক, গত পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে নারীসমাজে যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পুরুষসমাজে তাহার তুলনায় অতি সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন কলিকাতাতেও মহিলা-সমাজে কঠোর অবরোধ-প্রথা ছিল। কোন ভদ্রমহিলাকে যদি নিজের বাটী হইতে বাহির হইয়া পথ দিয়া দুই-তিনখানা বাটীর পরবর্ত্তী বাটীতে যাইতে হইত, তাহা হইলে পাল্কী ডাকিতে হইত। তখন কলিকাতায় রিক্‌শ ছিল না,

কলিকাতার সকল পল্লীতেই বহুসংখ্যক পাল্কী ছিল। সেকালে সেই সকল পাল্কীর ছাদের উপর মোটা কাপড়ে প্রস্তুত আট-দশ হাত দীর্ঘ এবং চার হাত প্রস্থ দুইখানা করিয়া পর্দ্দা থাকিত। পাল্কীর বেহারারা সেই দুইখানা পর্দ্দা, ফুটপাথের উপর, গৃহস্থের বাটীর দ্বার হইতে পাল্কীর দ্বার পর্য্যন্ত দুই ধারে আড়াল করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত; ভদ্রমহিলারা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সেই পর্দ্দার অন্তরাল দিয়া পাল্কীতে আরোহণ করিতেন। তাঁহারা আরোহণ করিবার পর, বেহারারা পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া তবে পাল্কী কাঁধে করিত। অনেক পাল্কীতে "ঘেরাটোপ" থাকিত; "ঘেরাটোপ" অর্থে স্থূল বস্ত্রে নির্ম্মিত একটা বড় মশারি। পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া বেহারারা ঐ ঘেরাটোপ দিয়া পাল্কী ঘিরিয়া দিত; তাহাতে পাল্কীর মধ্যে অবরুদ্ধ মহিলারা যে পাল্কীর দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তাহারও উপায় থাকিত না। কলিকাতার কলুটোলা প্রভৃতি মুসলমান-পল্লীতে এখনও ঐরূপ কঠোর অবরোধ-প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য মুসলমান-পল্লীতে এখনও দুই-চারিখানা পাল্কীও আছে; ভদ্র হিন্দু পল্লীতে পাল্কী আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় "রাজা" "মহারাজা" উপাধিধারী কোন কোনও বনিয়াদী বংশে এখনও ঐরূপ কঠোর অবরোধ-প্রথা আছে। এখনকার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সাধারণ হিন্দু ভদ্র গৃহস্থের বাটীতেও অবরোধ সম্বন্ধে এইরূপ কঠোরতা ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গঙ্গাস্নানের সময় গঙ্গার ঘাটে, বা কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থে অবরোধ-প্রথার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। গঙ্গার ঘাটে শত শত পুরুষের দৃষ্টির মধ্যে অবগাহন এবং অভিসিক্ত সিক্তবস্ত্রসহ জল হইতে উঠিয়া ঘাটের উপর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে কোন মহিলা কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ঘোড়ার গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া যে-সকল ভদ্র মহিলা কালীঘাটে দেবীদর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরের সঙ্কীর্ণ পথে, পুরুষের ভীড়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে এবং বাজারে দোকানদারগণের সহিত দরদস্তুর করিয়া খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। অবরোধ সম্বন্ধে যুগপৎ ঐরূপ রক্ষণশীল ও উদারনীতিক ব্যবস্থা দেখিয়া কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "বাঙ্গালীর মেয়ে" নামক ব্যঙ্গ কবিতায় লিখিয়াছিলেন,

"কুটুম বাড়ী যেতে হলেই গাড়ী মুদে যাওয়া
দেশ শুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গার ঘাটে নাওয়া।"

সেকালে বাঙালী ভদ্রগৃহস্থের অন্তঃপুর মধ্যে অবগুণ্ঠনের যেরূপ বাহুল্য ছিল, তাহা দেখিলে একালে কলিকাতা-অঞ্চলে কিশোরী ও যুবতী বধূদের পক্ষে বোধ হয় হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইবে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, অন্তঃপুরমধ্যেও বধূদিগকে প্রায় সর্ব্বক্ষণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতে হইত। পরিবারভুক্ত বয়োবৃদ্ধ স্ত্রীলোক ব্যতীত বাহিরের যে-কোন প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাকে দেখিলে যুবতী ও বালিকা বধূদিগকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে হইত। পরিবারভুক্ত বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়গণের সহিত কথা কহা তো দূরের কথা, তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেই বধূদিগকে ঘোমটা দিতে হইত। দিবাভাগে স্বামীর সহিত কথা কহা অত্যন্ত নির্লজ্জতা বলিয়া বিবেচিত হইত। আমরা যখন হুগলী কলেজে পড়ি, তখন হালিশহরে আমার এক সতীর্থ বন্ধুর বাটীতে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে গিয়া দুই-চারি দিন কাটাইয়া আসিতাম। আমার বন্ধুর বাটীতে তাঁহার তিন-চারিটি ছোট ভ্রাতা ভগিনী, জনক, জননী ও পিতামহী ছিলেন। আমার বয়স তখন কুড়ি কি একুশ বৎসর হইবে আমার বন্ধুর জননীর বয়স তখন বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইবে, অর্থাৎ তিনি আমার জননীরই সমবয়স্কা ছিলেন। আমি তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও আমাকে ঠিক পুত্রের মতই আদরযত্ন করিতেন। সেই প্রৌঢ়া মহিলা তখনও তাঁহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূর সম্মুখে স্বামীকে দেখিলে একগলা ঘোমটা দিতেন, এমন কি, আমার সাক্ষাতেও তিনি স্বামীকে দেখিলে অবগুণ্ঠনবতী হইতেন। তাঁহার এইরূপ অত্যধিক লজ্জাশীলতা দেখিয়া আমি প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম, কারণ আমাদের বাড়ীতে অবগুণ্ঠন-বাহুল্য একেবারেই ছিল না। বোধ হয় চন্দননগরে

আমার পিতাই সর্ব্বপ্রথম অবরোধ-প্রথা ও অবগুণ্ঠন-প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেই জন্ত আমার পিতার বহু বন্ধু আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীরা তাঁহাকে "বেহ্ম" "খিষ্টান" প্রভৃতি বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, আমি এক দিন অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে বাটীতে ফিরিবার সময় বালীতে আমার এক আত্মীয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। আমি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে গৃহস্বামী পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া আসিলেন। সেই অবেলায় তাঁহাকে স্নানের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আর বল কেন? বউমার (ভ্রাতৃবধূর) আঁচলটা আমার গায়ে ঠেকে গিয়েছিল, তাই এই অবেলায় ডুব দিয়ে এলাম।" কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ এবং ভাগিনেয়-বধূকে স্পর্শ করিলে, এমন কি অসাবধানতা বশতঃ তাঁহাদের বস্ত্র স্পর্শ করিলেও এমন উৎকট পাপ হইত যে, তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত! যাঁহারা বলেন যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ দারুণ ঘৃণাবশতঃ নীচ শূদ্রকে স্পর্শ করেন না বা স্পর্শ করিলে স্নান অথবা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, ভ্রাতৃবধূ অথবা ভাগিনেয়-বধূকে অত্যন্ত ঘৃণাবশতই সেকালে লোকে স্পর্শ করিতেন না? হিন্দু সমাজে এই যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার বদ্ধমূল হইয়া আছে, ঘৃণাই যে ইহার প্রধান বা একমাত্র কারণ, তাহা নহে; বহুকাল প্রচলিত দেশাচার ও সংস্কারই ইহার প্রধান কারণ। অবশ্য মেথর, ডোম মুদ্দফরাস প্রভৃতির প্রতি যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুর আদৌ ঘৃণা নাই, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

সেকালে বাংলার ভদ্র নারীসমাজে পরিচ্ছদ-বাহুল্য না থাকিলেও যে অলঙ্কার-বাহুল্য ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেকালে ভদ্রমহিলাদের এক শাড়ী ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পরিচ্ছদ ছিল না; ধনবতী মহিলারা নিজ বাটীতে বিশেষ কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে বা কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় বেনারসী শাড়ী পরিধান করিতেন। সেই সকল শাড়ীর মূল্য পঞ্চাশ-ষাট টাকা হইতে পাঁচ-সাত শত টাকা পর্য্যন্ত ছিল। সাধারণ গৃহস্থ-মহিলারা ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর বা ঢাকাই শাড়ী "তোলা পোষাক" রূপে ব্যবহার করিতেন। কার্পাস বস্ত্র যত সূক্ষ্ম হইত, ততই তাহা মূল্যবান হইত। সুতরাং যে-যুগে শেমিজ বা সায়ার প্রচলন ছিল না, সেই যুগে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রমহিলারা যে কিরূপে লজ্জা নিবারণ করিতেন, তাহা বর্ত্তমান যুগে অনুমান করাও কঠিন। বোধ হয় সেই জন্যই সেকালে অবরোধ-প্রথা এবং পরপুরুষের সম্মুখে বাহির হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কঠোরতা ছিল।

তাহার পর সেকালের অলঙ্কারের কথা। মহিলা-সমাজের কথা বলিবার সময় অলঙ্কারের উল্লেখ না করিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেকালে ধনবানদিগের পুত্রবধূ, কন্যা বা গৃহিণীরা যখন সকল প্রকার অলঙ্কার পরিধান করিতেন, তখন অনেক সময় তাঁহাদিগকে অলঙ্কারের ভারে বিব্রত হইতে হইত। তাঁহাদের আড়ষ্ট ভাব দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইত যে, তাঁহারা অলঙ্কারের জন্য দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। আজকাল দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী প্রভৃতির প্রতিমাকে যেরূপ আপাদমস্তক বহু অলঙ্কারে ভূষিত করা হয়, সেকালে লক্ষ্মীর বরকন্যারা ঠিক সেইরূপ ভূষণে ভূষিত হইতেন।

আমার মনে হয়, সেকালে ভদ্র গৃহস্থ মহিলাদের মধ্যে আত্মমর্য্যাদাবোধ এক বিষয়ে এখনকার অপেক্ষা অল্প ছিল। সেকালে অনেক স্ত্রীলোকই কুটুম্ববাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাইবার সময়, প্রতিবেশিনীদিগের নিকট হইতে অলঙ্কার চাহিয়া লইয়া পরিধান করিয়া যাইতেন। একালে বোধ হয় সামান্য আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন স্ত্রীলোকও সেকালের মত পরের গহনা পরিয়া কুটুম্ববাড়ীতে "বড়মানুষী" দেখাইতে ঘৃণা বোধ করেন। সেকালে মহিলা-সমাজে আর একটা প্রথা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইত, একালে তাহা বড় দেখিতে পাই না। আমরা বাল্যকালেও দেখিয়াছি, ধনবতী মহিলারা আপাদমস্তক অলঙ্কার ও বহুমূল্য বেনারসী শাড়ী পরিয়া আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া আসিবার সময় খাবারের একটা "ছাঁদা" বাঁধিয়া আনিতেন। আজকাল কোন ভদ্র-মহিলা এইরূপ ছাঁদা বাঁধিতে ঘৃণা করেন; বোধ হয়

তাঁহারা কল্পনা করিতেও পারেন না যে তাঁহাদের পিতামহী-মাতামহীরা কুটুম্ববাড়ী হইতে বড় বড় খাবারের পুঁটুলি হাতে লইয়া গাড়ী-পাল্কীতে আরোহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

আর একটা বিষয়ে মহিলা-সমাজে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেকালে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যত অধিকসংখ্যক শুচিবায়ুগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যাইত একালে সেরূপ দেখা যায় না। এক এক জন স্ত্রীলোকের শুচিবায়ুর কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হইত। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের এক প্রতিবেশিনীর এইরূপ উৎকট শুচিবায়ু ছিল। তিনি রন্ধনশালাতে রন্ধনের জন্য যে জল ব্যবহার করিতেন, সেই জলে প্রত্যহ এক টুকরা ঘুঁটে ফেলিয়া রাখিতেন, কারণ পুষ্করিণী হইতে জল আনিবার সময় যদি তাঁহার পদতলে কোন অশুদ্ধ দ্রব্য ঠেকিয়া থাকে, তাহা হইলে যে তাঁহার কক্ষস্থিত ঘড়ার জলটাও অপবিত্র হইত, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাঁধিবার জলের সেই অপবিত্রতা দূর করিবার জন্যই তিনি সেই জলকে গোময় দ্বারা পবিত্র করিয়া লইতেন। আমরা বাল্যকালে এক জন বিধবা ব্রাহ্মণীকে দেখিয়াছি, তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় কক্ষস্থিত ঘড়ার গঙ্গাজল পথে ছড়া দিতে দিতে আসিতেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "পথে কত নোংরা জিনিষ থাকে, কত হাড়ী-মেথর পথ মাড়িয়ে চলে, গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ হয়ে সে-পথে চলি কেমন ক'রে? তাই গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে পথটাকে শুদ্ধ ক'রে নিই।" শুচিবায়ুগ্রস্ত অনেক স্ত্রীলোক সর্ব্বদা জল ঘাঁটার জন্য বার মাসই হাতে পায়ে "হাজা" হতে কষ্ট পাইতেন। কোন কোন স্ত্রীলোক সমস্ত দিন সিক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন, সিক্ত বস্ত্রটা নাকি অশুচিতা-নিবারক। এই শুচিবায়ুরোগ কেবল যে প্রাচীনা ও বিধবাদেরই ছিল তাহা নহে, অনেক সধবা যুবতীও উৎকট শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন।

সেকালের মহিলা-সমাজে আর একটা প্রথা ছিল সম্বন্ধ পাতানো। "সই" (সখি), "মিতিন" (মিত্রাণী), "মকর," "গঙ্গাজল," "মহাপ্রসাদ," "সাগর," "গোলাপজল" বা "গোলাপ", "বেয়ান," "মনের কথা" প্রভৃতি যাহা হউক একটা সম্পর্ক পাতাইয়া সেকালের মহিলারা পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতেন। এই সকল পাতানো সম্বন্ধের মধ্যে কোন কোনটির প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মভাবের উপর ছিল। পুরীতে জগন্নাথ-দর্শনে গিয়া মহিলারা পরস্পরের মুখে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ দিয়া "মহাপ্রসাদ" সম্বন্ধ পাতাইয়া আসিতেন। অনেক সময় কোন মহিলা পুরী হইতে মহাপ্রসাদ আনিয়া নিজ পল্লীবাসিনীর মুখে সেই মহাপ্রসাদ দিয়া "মহাপ্রসাদ" সম্বন্ধ পাতাইতেন। উত্তরায়ণে গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে গিয়া পরস্পরের মধ্যে "সাগর" পাতাইয়া আসিতেন। মকর-সংক্রান্তির দিন, গঙ্গাস্নান করিয়া পরস্পরের মধ্যে "মকর" পাতানো হইত। "বেয়ান" সম্বন্ধটা সাধারণতঃ বাল্যকালে পুতুল খেলার সময় পাতানো হইত। একটি বালিকার পুতুল-ছেলের সহিত অন্য বালিকার পুতুল-মেয়ের বিবাহ দিয়া বালিকারা পরস্পরের "বেয়ান" হইত। সংসারক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকৃত বেয়ানদের মধ্যে, দেনা-পাওনা বা পারিবারিক কোন ব্যাপার লইয়া মনোমালিন্য ঘটিতে দেখা যায়, কিন্তু পাতানো "বেয়ান" অথবা অন্য কোন পাতানো সম্পর্কে সম্পৃক্তা মহিলাদের মধ্যে কখনও মনোমালিন্য ঘটিতে দেখা যাইত না, কারণ উহা নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি এবং ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। এই সকল প্রীতির সম্বন্ধ অনেক সময় দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিত। পুত্রকন্যারা মাতার "সই" বা "বেয়ান"কে "সই-মা" বা "বেয়ান-মা" বলিয়া সম্বোধন করিত। "সই-মার" মত সেকালে "সই-ঠাকুরমা" "সই-দিদিমা" "মকর-ঠাকুরমা" পর্য্যন্ত সম্বোধন আমরা শুনিয়াছি। অনেক সময় রঙ্গপ্রিয়া রসিকারা পরস্পরের মধ্যে এমন অদ্ভুত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন যে, তাহা শুনিলে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইত। আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি আমার জননীর সমবয়স্কা দুই জন মহিলা পরস্পরের মধ্যে "মুখে আগুন" সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বজনসমক্ষে পরস্পরকে "মুখে আগুন" বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। আমাদের বয়স যখন চৌদ্দ কি পনর বৎসর অর্থাৎ এখনকার পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্ব্বে, একটা জনরব

প্রচারিত হইল যে, কোনও গ্রামের গ্রাম্য দেবতা নাকি স্বপ্নযোগে কোন মহিলাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, পুত্রকন্যার কল্যাণকামনায় প্রত্যেক স্ত্রীলোককে অন্ত এক জন স্ত্রীলোকের সহিত "সই" পাতাইতে হইবে, না পাতাইলে ভীষণ অমঙ্গল হইবে। আর যায় কোথা? একে দেবতার প্রত্যাদেশ, তাহার উপর পুত্রকন্যার শুভাশুভ লইয়া কথা। কোন্ গ্রামে, কোন্ দেবতা, কাহাকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রয়োজন হইল না, ইতর-ভদ্র প্রায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই "সই" পাতাইবার ধূম পড়িয়া গেল। দেবতার নাকি আদেশ ছিল যে, দধি ও চিপিটকে কলায় মাখিয়া পরস্পরের মুখে দিয়া "মুখে দিলাম চিঁড়ে-দই, তুমি আমার জন্মের সই" এই মন্ত্র তিন বার বলিতে হইবে। সেই হুজুগে কয়েকদিন ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে চিঁড়া-মুড়কি বিক্রয় হইয়াছিল। এই হুজুগের পূর্ব্বে, যাঁহারা "সই" পাতাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সইয়ের বাড়ীতে দধি চিঁড়া, মুড়কি, কদলী এবং মিষ্টান্ন পাঠাইয়া সেই অজ্ঞাত গ্রামের অপরিচিত গ্রাম্য দেবতার কোপ শান্তি করিয়াছিলেন। সেকালের মহিলাসমাজে এই কৃত্রিম সম্বন্ধ পাতাইবার ইচ্ছা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা অশিক্ষিতা ও কুসংস্কারমণ্ডিতা হইলেও পরকে আপন করিতে, নিঃসংপৃক্ত পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮

যুগলপ্রসাদকে এক দিন বলিলাম—চল, নূতন গাছপালার সন্ধান ক'রে আসি মহালিখারূপের পাহাড়ে।

যুগলপ্রসাদ সোৎসাহে বলিল—এক রকম লতানে গাছ আছে ওই পাহাড়ের মাথার জঙ্গলে—আর কোথাও নেই। চীহড় ফল বলে এদেশে। চলুন খুঁজে দেখি।

নাঢ়া বইহারের নূতন বস্তিগুলির মধ্য দিয়া পথ। এরই মধ্যে এক-এক পাড়ায় সর্দ্দারের নাম অনুসারে টোলার নামকরণ হইয়াছে—ঝল্লুটোলা, রূপদাসটোলা, বেগমটোলা ইত্যাদি। উদুখলে ধুপধাপ যব কোটা হইতেছে, খোলা-ছাওয়া মাটির ঘর হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উপরে উঠিতেছে—উলঙ্গ কৃষ্ণকায় শিশুর দল পথের ধারে ধুলাবালি ছড়াইয়া খেলা করিতেছে।

নাঢ়া বইহারের উত্তর সীমানা এখনও ঘন বনভূমি। তবে লবটুলিয়া বইহারে আর এতটুকু বনজঙ্গল বা গাছ-পালা নাই—নাঢ়া বইহারের শোভাময়ী বনভূমির বারো আনা গিয়াছে, কেবল উত্তর সীমানায় হাজার দুই বিঘা জমি এখনও প্রজাবিলি হয় নাই। দেখিলাম যুগলপ্রসাদ ইহাতে বড় দুঃখিত।

বলিল—গাঙোতার দল ব'সে সব নষ্ট করলে, হুজুর। ওদের ঘরবাড়ী নেই, যাযরের দল। আজ এখানে, কাল সেখানে। এমন বন নষ্ট করলে।

বলিলাম—ওদের দোষ নেই যুগলপ্রসাদ। জমিদারে জমি ফেলে রাখবে কেন, তারাও তো গবর্ণমেণ্টের রেভিনিউ দিচ্ছে, চিরকাল ঘর থেকে রেভিনিউ গুনবে? জমিদার ওদের এনেছে, ওদের কি দোষ?

—সরস্বতী কুণ্ডী দেবেন না হুজুর। বড় কষ্টে ওখানে গাছপালা সংগ্রহ ক'রে এনে বসিয়েছি—

—আমার ইচ্ছেয় তো হবে না, যুগল। এত দিন বজায় রেখেছি এই যথেষ্ট, আর কত দিন রাখা যাবে বল। ওদিকে জমি ভাল দেখে প্রজারা সব ঝুঁকছে।

সঙ্গে আমাদের দু-তিন জন সিপাহী ছিল। তারা

আমাদের কথাবার্ত্তার গতি বুঝিতে না পারিয়া আমাকে উৎসাহ দিবার জন্ম বলিল—কিছু ভাববেন না হুজুর, সামনে চৈতী ফসলের পরে সরস্বতী কুণ্ডীর জমি এক টুকরো পড়ে থাকবে না।

মহালিখারূপের পাহাড় প্রায় নয় মাইল দূরে। আমার আপিস-ঘরের জানালা হইতে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যাইত। পাহাড়ের তলায় পৌঁছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল।

কি সুন্দর রৌদ্র আর কি অদ্ভুত নীল আকাশ সেদিন! এমন নীল কখনও আকাশে দেখি নাই—কেন-যে এক-এক দিন আকাশ এমন গাঢ় নীল হয়, রৌদ্রের কি অপূর্ব্ব রং, নীল আকাশ যেন মদের নেশার মত মনকে আচ্ছন্ন করে। কচি পত্রপল্লবের গায়ে রৌদ্র পড়িয়া স্বচ্ছ দেখায়—আর নাঢ়া বইহারের ও লবটুলিয়ার বত বন্ধ পক্ষীর ঝাঁক বাসা ভাঙিয়া যাওয়াতে কতক সরস্বতী সরোবরের বনে, কতক ভাওয়ালি ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাদের কি অবিশ্রান্ত কূজন!

ঘন বন। এমন ঘন নির্জ্জন আরণ্যভূমিতে মনে একটি অপূর্ব্ব শান্তি ও মুক্ত অবাধ স্বাধীনতার ভাব আসে—কত গাছ, কত ডালপালা, কত বনফুল, কত বড় বড় পাথর ছড়ান—যেখানে সেখানে বসিয়া থাক, শুইয়া পড়, অলস জীবন মুহূর্ত্ত প্রস্ফুটিত পিয়াল বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় বসিয়া কাটাইয়া দাও—বিশাল নির্জ্জন আরণ্যভূমি তোমার শ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে জুড়াইয়া দিবে।

আমরা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি। বড় বড় গাছ মাথার উপরে সূর্য্যের আলোকে আটকাইয়াছে—ছোট বড় ঝরণা কল্ কল্ শব্দে বনের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিতেছে—হরীতকী গাছ, কেলিকদম্ব গাছের সেগুন পাতার মত বড় বড় পাতায় বাতাস বাধিয়া শন্ শন্ শব্দ হইতেছে। বনমধ্যে ময়ূরের ডাক শোনা গেল।

আমি বলিলাম—যুগলপ্রসাদ, চীহড় ফলের গাছ কোথায় খোঁজ—

যুগলপ্রসাদ বলিল—বাবুজী, একটা গুহা আছে পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলে কোথায়—তার গায়ে সব ছবি আঁকা আছে—কত কালের কেউ জানে না, সেটাই খুঁজছি।

হয়তো বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের হাতে আঁকা বা খোদাই ছবি গুহার কঠিন পাথরের গায়ে! পৃথিবীর ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বৎসরের যবনিকা এক মুহূর্ত্তে অপসারিত হইয়া সময়ের উজানে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিবে আমাদের! মহালিখারূপের শৈলমালায় জঙ্গলাবৃত গুহায় বেলে পাথরের প্রাচীরে সে-ছবি খুঁজিয়া বাহির করিতেই তো হইবে।

চীহড় ফলের গাছ পাওয়া গেল আরও অনেক উপরে উঠিয়া। মুচকুন্দের পাতার মত পাতা, খুব মোটা কাষ্ঠময় লতা, আঁকিয়া বাঁকিয়া অন্য গাছকে আশ্রয় করিয়া উঠিয়াছে—ফলগুলি শিমজাতীয়, তবে শিমের চুখানি খোলা কটকী চটিজুতার মত বড় ও অমনই কঠিন ও চওড়া—ভিতরে গোল গোল বীচি। আমরা শুকনো লতাপাতা জ্বালাইয়া বীচি পুড়াইয়া খাইয়াছি—ঠিক যেন গোল আলুর মত আস্বাদ।

অনেক দূর উঠিয়াছি। ওই দূরে মোহনপুরা ফরেষ্ট—দক্ষিণে ওই আমাদের মহাল, ওই সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্ত্তী জঙ্গল অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ওই নাঢ়া বইহারের অবশিষ্ট দিকি ভাগ বন—ওই দূরে কুশী নদী মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের পূর্ব্ব সীমানায় ঘেঁষিয়া প্রবাহিত—নিম্নের সমতল ভূমির দৃশ্য যেন ছবির মত!

—ময়ূর! ময়ূর!...হুজুর ঐ দেখুন ময়ূর!...

প্রকাণ্ড একটা ময়ূর মাথার উপরেই এক গাছের ডালে বসিয়া! এক জন সিপাহী বন্দুক লইয়া আসিয়াছিল সে গুলি করিতে গেল, আমি বারণ করিলাম।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্র ছবি দেখিবার প্রবল আগ্রহে জঙ্গল ঠেলিয়া গুহা খুঁজিয়া বেড়াইলাম—গুহাও মিলিল, কিন্তু যে অন্ধকার, তাহার ভিতর ঢুকিবার সাহস হইল না। ঢুকিলেই বা অন্ধকারের মধ্যে কি দেখিব! অন্য এক দিন তোড়জোড় করিয়া আসিতে হইবে—আজ থাক। অন্ধকারে কি শেষে ভীষণ বিষধর চন্দ্রবোড়া কিংবা শঙ্খচূড় সাপের হাতে প্রাণ দিব? এ-সব স্থানে তাহাদের অভাব নাই।

যুগলপ্রসাদকে বলিলাম—এ জঙ্গলে কিছু গাছপালা লাগাও নূতন ধরণের। পাহাড়ের বন কেউ কখনো কাটবে না। নাঢ়া লবটুলিয়া তো গেল—সরস্বতী কুণ্ডীর ভরসাও ছাড়—

যুগলপ্রসাদ বলিল—ঠিক বলেছেন হুজুর। কথাটা মনে লেগেছে। কিন্তু আপনি তো আসছেন না, আমাকে একাই মরতে হবে।

—আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। তুমি লাগাও—

মহালিখারূপের পাহাড় একটা পাহাড় নয়, একটা নাতিদীর্ঘ, অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, কোথাও দেড় হাজার ফুটের বেশী উঁচু নয়—হিমালয়েরই পাদশৈলের নিম্নতর শাখা, যদিও তরাই প্রদেশের জঙ্গল ও আসল হিমালয় এখান হইতে এক-শ হইতে দেড়-শ মাইল দূরে। মহালিখারূপের পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নের সমতল ভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় প্রাচীন যুগের মহাসমুদ্র এক সময়ে এই বালুকাময় উচ্চ তটভূমির পায়ে আছড়াইয়া পড়িত, গুহাবাসী মানব তখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিদ্রিত এবং মহালিখারূপের পাহাড় তখন সেই সুপ্রাচীন মহাসাগরের বালুকাময় বেলাভূমি।

যুগলপ্রসাদ অন্ততঃ আট-দশ রকমের নূতন গাছ-লতা দেখাইল—সমতল ভূমির বনে এগুলি নাই—পাহাড়ের উপরকার বনের প্রকৃতি অন্য ধরণের—গাছপালাও অনেক অন্য রকম।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। কি এক রকমের বনফুলের গন্ধ খুব পাওয়া যাইতেছিল—বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। গাছের ডালে ঘুঘু, পাহাড়ী বনটিয়া, হরটিট প্রভৃতি কত কি পক্ষীর কূজন!

বাঘের ভয় বলিয়া সঙ্গীরা পাহাড় হইতে নামিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, নতুবা এই আসন্ন সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ায় নির্জ্জন শৈলসানুর বনভূমির কি এক শোভাই ফুটিয়াছে! তাহা ফেলিয়া আসিতে ইচ্ছা করে না।

মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গলের চেয়েও এখানে বাঘের ভয় বেশী। বিকেলের পর এখানে যারা কাঠকুটো কাটতে আসে সব নেমে যায়। আর দল না বেঁধে একা কেউ এ পাহাড়ে আসেও না। বাঘ আছে, বড় বড় শঙ্খচূড় সাপ আছে—দেখছেন না কি গজাড় জঙ্গল সারা পাহাড়ে!

অগত্যা আমরা নামিতে লাগিলাম। পাহাড়ের জঙ্গলের কেলিকদম গাছের বড় বড় পাতার আড়ালে শুক্র ও বৃহস্পতি জল্ জল্ করিতেছে।

এক দিন দেখি এমনি একটি নূতন গৃহস্থের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া গনোরী তেওয়ারী স্কুলমাষ্টার শাল পাতার ওপর ছাতুর তাল মাখিয়া খাইতেছে।

—হুজুর যে! ভাল আছেন?

—বেশ আছি। তুমি কবে এলে? কোথায় ছিলে? এরা তোমার কেউ হয় নাকি?

—কেউ নয়। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, বেলা হয়ে গিয়েছে, ব্রাহ্মণ, এদের এখানে অতিথি হলাম। তাই ছুটো খাচ্ছি। চেনাশুনো ছিল না, তবে আজ হ'ল।

গৃহকর্ত্তা আগাইয়া আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল—আসুন, হুজুর, বসুন উঠে।

—না বসব না। বেশ আছি। কত দিন জমি নিয়েছ?

—আজ দু-মাস হুজুর। এখনও জমি চষতে পারি নি।

গনোরী তেওয়ারীকে একটি ছোট মেয়ে আসিয়া কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা দিয়া গেল। সে খাইতেছে দেখিলাম কলাইয়ের ছাতু, নুন ও লঙ্কা। ছাতুর সে বিরাট তাল শীর্ণ গনোরী তেওয়ারীর পেটে কোথায় ধরিবে বোঝা কঠিন। গনোরী খাঁটি ভবঘুরে। যেখানে খাইতে বসিয়াছে, সেই দাওয়ার এক পাশে একটি ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি ও একটি গেলাপ অর্থাৎ পাতলা বালাপোষজাতীয় লেপ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম উহা গনোরীর—এবং উহাই উহার সমগ্র জাগতিক সম্পত্তি। গনোরীকে বলিলাম—ব্যস্ত আছি, তুমি কাছারিতে এসো ওবেলা।

বিকালে গনোরী কাছারি আসিল।

বলিলাম—কোথায় ছিলে গনোরী?

—বাবুজী, মুঙ্গের জেলার পাড়াগাঁ অঞ্চলে। বহুৎ পাড়াগাঁয়ে ঘুরেছি।

—কি ক'রে বেড়াতে ?

—পাঠশালা করতাম। ছেলে পড়াতাম।

—কোনো পাঠশালা টিক্‌ল না ?

—দু-তিন মাসের বেশী নয় হুজুর। ছেলেরা মাইনে দেয় না।

—বিয়ে-থাওয়া করেছ ? বয়স কত হ'ল ?

—নিজেরই পেট চলে না হুজুর, বিয়ে ক'রে করব কি ? বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হয়েছে।

গনোরী অত্যন্ত দরিদ্র। এত দরিদ্র লোক এ অঞ্চলেও বেশী দেখা যায় না। মনে পড়িল, গনোরী একবার বিনা-নিমন্ত্রণে ভাত খাইতে আমার কাছারিতে আসিয়াছিল, প্রথম যেবার এখানে আসি। বর্ত্তমানে বোধ হয় কত কাল সে ভাত খাইতে পায় নাই। গাঙোতা-বাড়ীতে অতিথি হইয়া কলাইয়ের ছাতু খাইয়া দিন কাটাইতেছে।

বলিলাম—গনোরী, আজ রাত্রে আমার এখানে খাবে। কন্টু মিশির রাঁধে, তার হাতে তোমার তো খেতে আপত্তি নেই ?...

গনোরী বেজায় খুশী হইল। এক গাল হাসিয়া বলিল—কন্টু আমাদেরই ব্রাহ্মণ, ওর হাতে আগেও তো খেয়েছি—আপত্তি কি ?

তার পর বলিল—হুজুর, বিয়ের কথা যখন তুললেন তখন বলি। আর বছর শ্রাবণ মাসে একটা গাঁয়ে গিয়ে পাঠশালা খুললাম। গাঁয়ে এক ঘর আমাদেরই ব্রাহ্মণ ছিল। তার বাড়ীতে থাকি। ওর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা সব ঠিকঠাক, এমন কি আমি মুঙ্গের থেকে ভাল মেরজাই একটা কিনে আনলাম—তার পর পাড়ার লোকে ভাঙচি দিলে—বললে—ও গরীব স্কুলমাষ্টার, চাল নেই চুলো নেই, ওকে মেয়ে দিও না। তাই সে বিয়ে ভেঙে গেল। আমি সে গাঁ ছেড়ে চলেও গেলাম।

—মেয়েটিকে দেখেছিলে ? দেখতে ভাল ?

—দেখি নি ? চমৎকার মেয়ে, হুজুর। তা আমাকে কেন দেবে ? সত্যিই তো। আমার কি আছে বলুন না ?

দেখিলাম গনোরী বেশ দুঃখিত হইয়াছে বিবাহ ফাঁসিয়া যাওয়াতে, মেয়েটিকে মনে ধরিয়াছিল।

তার পর অনেকক্ষণ বসিয়া সে গল্প করিল। তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল জীবন তাহাকে কোনো ভাল জিনিষ দেয় নাই—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়াছে দুটি পেটের ভাতের জন্য। তাও জোটাইতে পারে নাই। গাঙোতাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া অর্দ্ধেক জীবন কাটাইয়া দিল।

বলিল—অনেক দিন পরে তাই লবটুলিয়াতে এলাম। এখানে অনেক নতুন বস্তি হয়েছে শুনেছিলাম। সে জঙ্গল-মহাল আর নেই। এখানে যদি একটা পাঠশালা খুলি—তাই এলাম। চলবে না, কি বলেন হুজুর ?

তখনই মনে মনে ভাবিলাম এখানে একটা পাঠশালা করিয়া দিয়া গনোরীকে রাখিয়া দিব। এতগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমার মহালে নব আগন্তুক, তাহাদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করা আমারই কর্ত্তব্য। দেখি কি করা যায়।

১২

অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত। যুগলপ্রসাদ ও রাজু পাঁড়ে গল্প করিতে আসিল। কাছারি হইতে কিছু দূরে একটি ছোট বস্তি বসিয়াছে। সেখানকার একটি লোকও আসিল। আজ চার দিন মাত্র তাহারা ছাপরা জেলা হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছে।

লোকটি তাহার জীবনের ইতিহাস বলিতেছিল। স্ত্রীপুত্র লইয়া কত জায়গায় ঘুরিয়াছে, কত চরে জঙ্গলে বন কাটিয়া কত বার ঘরদোর বাঁধিয়াছে। কোথাও তিন বছর, কোথাও পাঁচ বছর, এক জায়গায় কুশী নদীর ধারে ছিল দশ বছর। কোথাও উন্নতি করিতে পারে নাই। এইবার লবটুলিয়া বইহারে আসিয়াছে উন্নতি করিতে।

এই সব যাযাবর গৃহস্থ-জীবন বড় বিচিত্র। কথা বলিয়া দেখিয়াছি ইহাদের সঙ্গে, সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত, ব্রাত্য ইহাদের

জীবন—সমাজ নাই, সংস্কার নাই, ভিটায় মায়া নাই, নীল আকাশের নীচে সংসার রচনা করিয়া বসে, শৈলশ্রেণীর মধ্যস্থ উপত্যকায়, বড় নদীর নির্জ্জন চরে ইহাদের বাস। আজ এখানে কাল সেখানে।

ইহাদের প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যু সবই আমার কাছে নূতন ও অদ্ভুত। কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত লাগিল বর্ত্তমানে এই লোকটির উন্নতির আশা।

এই লবটুলিয়ার জঙ্গলে সামান্য পাঁচ বিঘা কি দশ বিঘা জমিতে গম চাষ করিয়া সে কিরূপ উন্নতির আশা করে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

লোকটির বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। নাম বলভদ্র সেজাই, জাতে চাষী কলোয়ার অর্থাৎ কলু। এই বয়সে সে এখনও আশা রাখে জীবনে উন্নতি করিবার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বলভদ্র, এর আগে কোথায় ছিলে?

—হজুর, মুঙ্গের জেলায় এক দিয়ারার চরে। ছ-বছর সেখানে ছিলাম—তার পরে অজন্মা হয়ে মকাই ফসল নষ্ট হয়ে গেল। সে-জায়গায় উন্নতি হবার আশা নেই দেখলাম। হজুর, সংসারে সবাই উন্নতি করবার জন্যে চেষ্টা পায়। আমিও কত জায়গা দেখলাম জীবনে—ভাল উন্নতির জায়গা খুঁজে পাওয়াই শক্ত। এইবার দেখি হজুরের আশ্রয়ে—

রাজু পাঁড়ে বলিল—আমার ছ'টা মহিষ ছিল যখন প্রথম এখানে আসি—এখন হয়েছে দশটা। লবটুলিয়া উন্নতির জায়গা—

বলভদ্র বলিল—মহিষ আমার এক জোড়া কিনে দিও পাঁড়েজী। এবার ফসল হোক সেই টাকা দিয়ে মহিষ কিনতেই হবে—ও ভিন্ন উন্নতি হয় না।

গনোরী ইহাদের কথা শুনিতেছিল। সেও বলিল—ঠিক কথা। আমারও ইচ্ছে আছে মহিষ দু-একটা কিনব। একটু কোথাও বসতে পারলেই—

মহালিখারূপের পাহাড়ের গাছপালা এবং তাহারও পিছনে ধন্‌ঝরি শৈলমালা অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে জ্যোৎস্নার আলোয়, একটু একটু শীত বলিয়া ছোট একটি অগ্নিকুণ্ড করা হইয়াছে আমাদের সামনে—এক দিকে রাজু পাঁড়ে ও যুগলপ্রসাদ, অন্য দিকে বলভদ্র ও তিন-চারটি নবাগত প্রজা।

আমার কাছে কি অদ্ভুত ও রহস্যময় ঠেকিতেছিল ইহাদের বৈষয়িক উন্নতির কথা। আমি অবাক্ হইয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিলাম। উন্নতি সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা অভাবনীয় ধরণের উচ্চ নয়—ছ'টি মহিষের স্থানে দশটা মহিষ না-হয় বারোটা মহিষ—এই সুদূর দুর্গম অরণ্য ও শৈলমালা বেষ্টিত বন্য দেশেও মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কেমন, জানিবার সুযোগ পাইয়া আজকার জ্যোৎস্না রাতটাই আমার নিকট অপূর্ব্ব রহস্যময় মনে হইল। শুধু জ্যোৎস্না রাত কেন, মহালিখারূপের ঐ পাহাড়, দূরে ওই ধন্‌ঝরি শৈলমালা, ঐ পাহাড়ের উপরকার ঘন বনশ্রেণী।

কেবল যুগলপ্রসাদ এ-সব বৈষয়িক কথাবার্ত্তায় থাকে না। ও আর এক ধরণের ব্রাত্য মন লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে—জমিজমা, গরু-মহিষের আলোচনা সে করিতে ভালও বাসে না, তাহাতে যোগও দেয় না।

সে বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর পূব পাড়ের জঙ্গলে যতগুলো হংসলতা লাগিয়েছিলাম, সবগুলো কেমন ঝাঁপালো হয়ে উঠেছে দেখেছেন বাবুজী? এবার জলের ধারে স্পাইডার-লিলির বাহারও খুব। চলুন, যাবেন জ্যোৎস্না রাতে বেড়াতে?

দুঃখ হয় যুগলপ্রসাদের এত সাধের সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমি—কত দিন বা রাখিতে পারিব? কোথায় দূর হইয়া যাইবে হংসলতা আর বন্য শেফালি-বন, তাহার স্থানে শীষ-ওঠা মকাই ও জনারের ক্ষেত এবং সারি সারি খোলা-ছাওয়া ঘর, চালে চালে ঠেকান, সামনে চারপাই পাতা, কাদাহাবড় আঙিনায় গরুমহিষ মাদায় জাব খাইতেছে।

এই সময় মটুকনাথ পণ্ডিত আসিল। আজকাল মটুকনাথের টোলে প্রায় পনরটি ছাত্র কলাপ ও মুগ্ধবোধ পড়ে। তা ছাড়া নবাগত প্রজাদের বস্তিতে মটুকনাথ যজমানি কাজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ঠাকুরপূজা ইত্যাদিও প্রায়ই করিয়া থাকে। তাহার অবস্থা আজকাল ফিরিয়া গিয়াছে। গত ফসলের সময় যজমানদের ঘর হইতে এত

গম ও মকাই পাইয়াছে যে টোলের উঠানে তাহাকে একটা ছোট গোলা বাঁধিতে হইয়াছে।

অধ্যবসায়ী লোকের উন্নতি যে হইতেই হইবে—মটুকনাথ পণ্ডিত তাহার অকাট্য প্রমাণ।

উন্নতি!—আবার সেই উন্নতির কথা আসিয়া পড়িল।

কিন্তু উন্নতির কথা না আসিয়া উপায় নাই। চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি মটুকনাথ উন্নতি করিয়াছে বলিয়াই তাহার আজকাল খুব খাতির-সম্মান—আমার কাছারির যে-সব সিপাহী ও আমলা মটুকনাথকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিত—গোলাবাঁধার পর হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছি তাহারা আজকাল মটুকনাথকে সম্মান ও খাতির করিয়া চলে। সঙ্গে সঙ্গে টোলের ছাত্রসংখ্যাও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ যুগলপ্রসাদ বা গনোরী তেওয়ারীকে কেউ পোঁছেও না। রাজু পাঁড়েও নবাগত প্রজাদের মধ্যে খুব খাতির জমাইয়া ফেলিয়াছে—জড়ি-বুটির পুঁটুলি হাতে তাহাকে প্রায়ই দেখা যায় গৃহস্থবাড়ীর ছেলেমেয়েদের নাড়ী টিপিয়া বেড়াইতেছে। তবে রাজু পাঁড়ে পয়সা তেমন বোঝে না, খাতির পাইয়া ও গল্প করিয়াই সন্তুষ্ট।

মাস তিন-চারের মধ্যে মহালিখারূপের পাহাড়ের কোল হইতে লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারের উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত প্রজা বসিয়া গেল। পূর্ব্বে জমি বিলি হইয়া চাষ আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু লোকের বাস এত হয় নাই—এ বছর দলে দলে লোক আসিয়া রাতারাতি গ্রাম বসাইয়া ফেলিতে লাগিল।

কত ধরণের পরিবার। শীর্ণ টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বিছানাপত্র বাসন, পিতলের ঘয়লা, কাঠের বোঝা, গৃহ-দেবতা, তোলা উনুন চাপাইয়া একটি পরিবারকে আসিতে দেখা গেল। মহিষের পিঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, হাঁড়িকুড়ি, ভাঙা লণ্ঠন এমন কি চারপাই পর্য্যন্ত চাপাইয়া আর এক পরিবার আসিল। কোন কোন পরিবার স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া জিনিষপত্র ও শিশুদের বাঁকের দু-দিকে চাপাইয়া বাঁক কাঁধে বহুদূর হইতে হাঁটিয়া আসিতেছে।

ইহাদের মধ্যে সদাচারী, পবিত্র মৈথিল ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া গাঙোতা ও দোসাদ পর্য্যন্ত সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকই আছে। যুগলপ্রসাদ মুহুরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এরা কি এত দিন গৃহহীন অবস্থায় ছিল? এত লোক আসচে কোথা থেকে?

যুগলপ্রসাদের মন ভাল নয়। তাহার সাধের বন-ফুলের বাগান ধ্বংস হইতেছে দিনে দিনে তার চোখের সামনে! বলিল—এদেশের লোকই বাবু এই রকম। শুনেছে এখানে জমি সস্তায় বিলি হচ্ছে আর জমিতে খুব ফসল হয়, হয়তো এও শুনেছে খাজনা কম—তাই দলে দলে আসছে। সুবিধে বোঝে থাকবে, নয়তো আবার ডেরা উঠিয়ে অন্য জায়গায় ভাগবে।

—পিতৃপিতামহের ভিটের কোনো মায়া নেই এদের কাছে?

—কিছু না বাবুজী। এদের উপজীবিকাই হচ্ছে নূতন-ওঠা চর বা জঙ্গল-মহল বন্দোবস্ত নিয়ে চাষবাস করা বাস করাটা আনুষঙ্গিক। যত দিন ফসল ভাল হবে, খাজনা কম থাকবে, তত দিন থাকবে।

—তার পর?

—তার পর খোঁজ নেবে অন্য কোথায় নূতন চর বা জঙ্গল বিলি হচ্ছে, সেখানে চলে যাবে। এদের ব্যবসাই এই।

২০

সেদিন গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের নীচে জমি মাপিয়া দিতে গিয়াছি, আসরফি টিণ্ডেল জমি মাপিতেছিল, আমি ঘোড়ার উপর বসিয়া দেখিতেছিলাম এমন সময় কুন্তাকে টোলার পথ ধরিয়া যাইতে দেখিলাম।

কুন্তাকে অনেক দিন দেখি নাই। আসরফিকে বলিলাম—কুন্তা আজকাল কোথায় থাকে, ওকে দেখিনে তো?

আসরফি বলিল—ওর কথা শোনেন নি বাবুজী? ও মধ্যে এখানে ছিল না অনেক দিন—

—কি রকম?

—রাসবিহারী সিং ওকে নিয়ে যায় তার বাড়ী।

বলে তুমি আমাদের জাতভাইয়ের স্ত্রী—আমার এখানে এসে থাক—

—বেশ।

—সেখানে কিছু দিন থাকবার পরে—ওর চেহারা দেখেছেন তো বাবুজী, এত দুঃখে কষ্টে এখনও—তার পর রাসবিহারী সিং কি-সব কথা ওকে বলে—এমন কি ওর উপর অত্যাচারও করতে যায়—তাই আজ মাসখানেক হ'ল সেখান থেকে পালিয়ে এসে আছে। উনি রাসবিহারী ছোরা নিয়ে ভয় দেখায়। ও বলেছিল—মেরে কেল বাবুজী, জান্ দেগা—ধরম দেগা নেহি্ন্।

—কোথায় থাকে?

—বহুটোলায় এক গাঙোতার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের গোয়াল-ঘরের পাশে একখানা ছোট্ট চালা আছে সেখানেই থাকে।

—চলে কি ক'রে? ওর তো দু-তিনটি ছেলেমেয়ে।

—ভিক্ষে করে—ক্ষেতের ফসল কুড়োয়। কলাই গম কাটে। বড় ভাল মেয়ে বাবু কুন্তা। বাইজীর মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু ভাল ঘরের মেয়ের মত মন-মেজাজ—কোন অসৎ কাজ ওকে দিয়ে হবে না।

জরীপ শেষ হইল। বালিয়া জেলার একটি প্রজা এই জমি বন্দোবস্ত লইয়াছে—কাল হইতে এখানে সে বাড়ী বাঁধিবে। গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের মহিমাও ধ্বংস হইল।

মহালিখারূপের পাহাড়ে উপরকার বড় বড় গাছপালার মাথায় রোদ রাঙা হইয়া আসিল। সিল্লির দল বাঁক বাঁধিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর দিকে উড়িয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার দেরি নাই।

একটা কথা ভাবিলাম।

এতটুকু জমি কোথাও থাকিবে না এই বিশাল লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারে যেমন দেখিতেছি। দলে দলে অপরিচিত লোক আসিয়া জমি লইয়া ফেলিল—কিন্তু এই আরণ্যভূমিতে যাহারা চিরকাল মানুষ, অথচ যাহারা নিঃস্ব, হতভাগ্য—জমি বন্দোবস্ত লইবার পয়সা নাই বলিয়াই কি তাহারা বঞ্চিত থাকিবে? যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের অন্ততঃ এইটুকু উপকার করিবই।

আস্‌রফিকে বলিলাম—আসরফি, কুন্তাকে কাল সকালে কাছারিতে হাজির করতে পারবে? ওকে একটু দরকার আছে।

—হাঁ, হুজুর। যখন বলবেন।

পরদিন সকালে কুন্তাকে আসরফি আমার আপিস-ঘরের সামনে বেলা ন-টার সময় লইয়া আসিল।

বলিলাম—কুন্তা, কেমন আছ?

কুন্তা আমায় দুই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—জী হুজুর, ভাল আছি।

—তোমার ছেলেমেয়েরা?

—ভাল আছে হুজুরের দোয়ায়।

—বড়ছেলেটি কত বড় হ'ল?

—এই আট বছরে পড়েছে, হুজুর।

—মহিষ চরাতে পারে না?

—অতটুকু ছেলেকে কে মহিষ চরাতে দেবে, হুজুর?

কুন্তা সত্যই এখনও দেখিতে বেশ, ওর মুখে অসহায় জীবনের দুঃখকষ্ট যেমন ছাপ মারিয়া দিয়াছে—সহজ সারল্য ও পবিত্রতাও তেমনি তাদের দুর্লভ জয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।

এই সেই কাশীর বাইজীর মেয়ে প্রেমবিহ্বলা কুন্তা!... প্রেমের উজ্জ্বল বর্তিকা এই দুঃখিনী রমণীর হাতে এখনও সগৌরবে জ্বলিতেছে, তাই ওর এত দুঃখ, দৈন্য, এত হেনস্থা, অপমান। প্রেমের মান রাখিয়াছে কুন্তা।

বলিলাম—কুন্তা জমি নেবে?

কুন্তা কথাটি ঠিক শুনিয়াছে কিনা যেন বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত মুখে বলিল—জমি, হুজুর?

—হাঁ, জমি। নূতন-বিলি জমি।

কুন্তা একটুখানি কি ভাবিল। পরে বলিল—আগে তো আমাদেরই কত জোতজমা ছিল। প্রথম প্রথম এসে দেখেছি। তার পর সব গেল একে একে। এখন আর কি দিয়ে জমি নেব, হুজুর?

—কেন, সেলামীর টাকা দিতে পারবে না?

—কোথা থেকে দেব? রাত্তির ক'রে ক্ষেত থেকে ফসল কুড়োই পাছে দিনমানে কেউ অপমান করে। আধ-টুকরি এক টুকরি কলাই পাই—তাই গুঁড়ো ক'রে ছাতু



বর্ত্তমানে স্পেনে ও চীনে যে যুদ্ধ চলিয়াছে তাহাতে পুরুষের পাশে রমণীরাও অবতীর্ণ হইয়াছেন। উপরের চিত্রটিতে দেখি, স্পেন-সরকারের পক্ষে স্ত্রী-সৈন্যেরা পুরুষের সমান সাহস ও ক্ষিপ্রতার সহিত লড়াই করিতেছেন।



চীনের বীরাঙ্গনা—সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ক্যাণ্টনের দেশরক্ষী-দল



সোভিয়েট রাশিয়া নারীদের জন্ত সমর-বিদ্যালয়ের আয়োজন করিয়াছে। বিগত মহাসমরের সময় রুশ "মৃত্যুবাহিনী" নারীদল প্রভূত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল।



ইংলণ্ডেও সমরকালীন বিভিন্ন কর্মভার গ্রহণের জন্ত নারীরা প্রস্তুত হইতেছেন। চিত্রে এক দল ইংরেজ বিমান-চালিকাকে দেখা যাইতেছে।



স্পেনের রমণীরা যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোন কঠিন ভার গ্রহণেই পশ্চাৎপদ হন নাই। চিত্রে সশস্ত্র স্পেন-রমণীর তেজোদৃপ্ত মূর্তি দেখা যাইতেছে।

ক'রে বাছাদের খাওয়াই। নিজে খেতে সব দিন কুলোয় না— .

কুন্তা কথা বন্ধ করিয়া চোখ নীচু করিল। দুই চোখ বাহিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আস্‌রফি সরিয়া গেল। ছোকরার হৃদয় কোমল, এখনও পরের দুঃখ ভাল রকম সহ্য করিতে পারে না।

আমি বলিলাম—কুন্তা, আচ্ছা ধর যদি সেলামী না লাগে ?

কুন্তা চোখ তুলিয়া জলভরা বিস্মিত চোখে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আস্‌রফি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কুন্তার সামনে হাত নাড়িয়া বলিল—হুজুর তোমায় এমনি জমি দেবেন, এমনি জমি দেবেন—বুঝলে না, বাইজী ?

আস্‌রফিকে বলিলাম—ওকে জমি দিলে ও চাষ করবে কি ক'রে আস্‌রফি ?

আস্‌রফি বলিল—সে বেশী কঠিন কথা নয় হুজুর। ওকে দু-একখানা লাঙল দয়া ক'রে সবাই ভিক্ষে দেবে। এত ঘর গাঙোতা প্রজা, একখানা লাঙল ঘর-পিছু দিলেই ওর জমি চাষ হয়ে যাবে। আমি সে-ভার নেব, হুজুর।

—আচ্ছা, কত বিঘে হ'লে ওর হয়, আস্‌রফি ?

—দিচ্ছেন যখন মেহেরবানি ক'রে হুজুর, দশ বিঘে দিন।

কুন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা, কেমন দশ বিঘে জমি যদি তোমায় বিনা-সেলামীতে দেওয়া যায়—তুমি ঠিকমত চাষ ক'রে ফসল তুলে কাছারির খাজনা শোধ করতে পারবে তো ? অবিশ্যি প্রথম দু-বছর তোমার খাজনা মাপ। তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিতে হবে।

কুন্তা যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাহাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছি, না সত্য কথা বলিতেছি—ইহাই যেন সে এখনও সমঝাইয়া উঠিতে পারে নাই। কতকটা দিশাহারাভাবে বলিল—জমি! দশ বিঘে জমি!

আস্‌রফি আমার হইয়া বলিল—হাঁ—হুজুর তোমায় দিচ্ছেন। খাজনা এখন দু-বছর মাপ। তীস্‌রা সাল থেকে খাজনা দিও। কেমন রাজি ?

কুন্তা লজ্জাজড়িত মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—জী হুজুর মেহেরবান। পরে হঠাৎ বিহ্বলার মত কাঁদিয়া ফেলিল।

আমার ইঙ্গিতে আস্‌রফি তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

স্বপ্ন

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

স্বপন ঘনায়ে এল মগ্নচেতনায়
তোমারে পেয়েছি যেন, দূর সিন্ধুতটে
বনানীর ছায়া-আঁকা পর্ব্বত-সঙ্কটে
চলেছি তোমার সাথে ; নভঃকিনারায়
খলিত মাধুরীজালে মোহ বিচ্ছুরিয়া
হাসিছে অতন্দ্র শশী। নয়নে তোমার
মুকুলিত প্রেমদৃষ্টি, বাসনার সার
বক্ষে তব করস্পর্শ রাখিছু কাড়িয়া।

স্বপন টুটিয়া গেল, কোথা তুমি প্রিয়া,
চিরস্পর্শাতীতা, দূরতম নক্ষত্রের
মহাব্যবধান তোমারে লয়েছে দূরে
আবরিয়া অন্তহীন বিরহের পুরে।
কেহ নাই ঃ বিরলতা বন্ধ্য আকাশের
আর রাত্রি মেঘময়ী আমারে ঘেরিয়া।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য জগতের নানা গ্রাম ও শহর, কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে করিতে এ-প্রশ্ন আমার মনে অনেক বারই উদয় হইয়াছে, এবং এ-অঞ্চলের কেহ কেহ উহা আমায় জিজ্ঞাসাও করিয়াছেন, পাশ্চাত্য ও পূর্ব্বের সমাজের ধারা ও আদর্শের মধ্যে বিভিন্নতা কোন্ খানে? পাশ্চাত্য ও পূর্ব্বের প্রগতির কি সত্য সত্যই বিভিন্ন লক্ষ্য? প্রশ্ন দুরূহ; সমাজতত্ত্ববিদেরা ভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা ও মীমাংসায় হয়তো উপস্থিত হইতে পারেন। এক জন প্রাচ্য সমাজতত্ত্ববিদের মনে সামাজিক বিশিষ্টতাটা কি ভাবে ঠেকিয়াছে এবং তাহার অভিব্যক্তিই বা কি, তাহা ইঙ্গিত করিতে চেষ্টা করিব। আমার মনে হয় পূর্ব্ব জগতে পাশ্চাত্য জগৎ অপেক্ষা গোষ্ঠীমূলক অথবা সহজাত সামাজিক বন্ধন ও সম্বন্ধের অনেক বেশী প্রভাব ও প্রতিপত্তি। পারিবারিক বন্ধন ও আদর্শ সমাজের অন্য সম্বন্ধের মাপকাঠি হইয়া প্রাচ্য সমাজকে একটা বিশিষ্ট ছাঁদ দিয়াছে; এই বিশিষ্ট ছাঁদের সঙ্গে চীন ও ভারতবর্ষের সভ্যতার বিকাশ নিবিড় ভাবে জড়িত। পূর্ব্ব- ও দক্ষিণ-এশিয়ার আর্থিক জীবন ও ব্যবহারিক সম্বন্ধে যে উদারতা ও সহানুভূতি লক্ষিত হয়, যাহা বৈষয়িক ব্যাপারকে অনেক সময়ে সামাজিক বিধি ও কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত করে, তাহার মূল এইখানে। পাশ্চাত্য জগতে আর্থিক বা বৈষয়িক সম্বন্ধে মানুষ যে এক কিম্ভূত-কিমাকার মূর্ত্তি গ্রহণ করে, যে মূর্ত্তি তাহার সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না, এই বৈচিত্র্যের কারণও এইখানে। পারিবারিক ও গোষ্ঠীজীবন হইতে মানুষের সম্বন্ধ বিচারের মাপকাঠি উদ্ভূত হইয়া সমাজের সকল প্রকার সম্বন্ধ ও অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে প্রাচ্য জগতে। পাশ্চাত্য জগতে সহজাত সম্বন্ধ অপেক্ষা কৃত্রিম সম্বন্ধ, প্রকৃতিমূলক সম্বন্ধ অপেক্ষা চুক্তির সম্বন্ধ সমাজের সব অনুষ্ঠান, সব বন্ধনকে পরিচালন করিতে চাহিয়াছে। মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধেও ইউরোপ ও আমেরিকায় স্ত্রী-পুরুষের সুবিধা-অসুবিধা ও পরস্পরের আদান-প্রদানের চুক্তিই প্রধান মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচ্যের পারিবারিক জীবনে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের আদর্শের পরিচয় পাই। স্ত্রী ও পুরুষ এখানে চাহে যুক্তি ও বিচারের প্রাপ্য, উভয়ের স্বার্থসাধনের বিনিময়ে লভ্য কোন প্রাকৃত বস্তু নহে; তাহারা চায় এমন বস্তু যাহা প্রত্যেকের এবং উভয়ের স্বার্থ ও জীবনকে সদাসর্ব্বদাই ঘিরিয়া রহিয়াছে, অথচ উহাদিগকে অতিক্রম করিয়াই সার্থক করিতেছে। ইহাকে নানা প্রকার আখ্যা দেওয়া হয়, যেমন প্রেম, সতীত্ব, ভক্তি, নিষ্ঠা। পারিবারিক জীবনে সত্যাচরণের সঙ্গে যোগ আছে মানুষের চরম সাধন-বস্তুর,—সত্য, প্রেম ও সুন্দরের। প্রাচ্য জগৎ পারিবারিক সম্বন্ধের লক্ষ্যকে মানুষের সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে এক করিয়া রাখিয়াছে। পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধায় মন কষাকষি, সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধির তর্ক ও বিচার ঐ সম্পদের নাগাল পায় না। যে সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও ক্লেশ স্ত্রী-পুরুষ প্রাচ্য জগতে ঐ অপ্রাকৃত সম্পদের জন্য বরণ করিয়াছে তাহা পাশ্চাত্য জগতের দুর্লভ বস্তু।

পরিবার ও গোষ্ঠী যেমন সমাজ-শরীরের বীজাণু তেমনি পরিবার ও গোষ্ঠী জীবন হইতে যে-আদর্শ করি হয় তাহাই সাধারণ ও ব্যাপক ভাবে ব্যক্তির বিচি যোগাযোগ ও সম্বন্ধের বিচার করে। ইউরোপে আমেরিকায় মানুষে মানুষের কৃত্রিম ব্যবহারিক সম্ব যাহা অর্থ ও অনর্থের চঞ্চল বিনিময়ের মতই পরিবর্ত্তনশী তাহা আর্থিক জীবন ও অনুষ্ঠান হইতে গোষ্ঠীজীবন এ গোষ্ঠীজীবন হইতে আর্থিক জীবন সবই অধিকার করি লইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে সব সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধের লক্ষ্য গৌণ ও ব্যবহারিক। পারিবারিক জীবনে মুখ্য ও চরম লক্ষ্য হইতে বিচ্যুতি দেখা দিয়াছে।

বলা বাহুল্য, প্রাচ্য জগতে ধর্মের প্রভাব পাশ্চাত্য জগৎ অপেক্ষা অনেক বেশী। অধ্যাত্মজীবনে প্রাচ্য জগতের লোক ঐ সকল সম্বন্ধকেই আশ্রয় করিয়া ভগবৎ-সাধনে ব্রতী, পারিবারিক জীবনে যে-সকল সম্বন্ধ অমৃতের ও অনন্তের সন্ধান দেয়। মানুষ এখানে ভগবানকে খোঁজে দাসভাবে, শিশুভাবে, সখাভাবে, কখনও বা সহজ যৌনসম্বন্ধের আবেগাতিশয্যের মধ্য দিয়া। এক দিকে পারিবারিক জীবনের নিত্য সম্বন্ধগুলি অপ্রাকৃত রসবোধের আশ্রয় হয়। শিশুভাব, দাসভাব, সখাভাব বা যৌনভাব সংকীর্ণ প্রাকৃতিক বৃত্তি-প্রবাহের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অন্তঃকরণে পূর্ণ জোয়ারের প্লাবন আনিয়া দেয়। তখন সব সম্বন্ধ অতর্কিতে মিলিয়া অনির্দিষ্ট, একাকার হইয়া যায়, দাস বা প্রভু, বিশ্বপিতা বা জগন্মাতা, বন্ধু বা প্রিয়তম কোন ভাব বা মহাভাবই থাকে না। অবশিষ্ট থাকে শুধু একটা অপ্রাকৃত আনন্দ। এমনি করিয়া এক দিকে অধ্যাত্মসাধন ভগবানকে মানুষের রূপে ও বৃত্তিতে গড়িয়াছে, অফুরন্ত ভাবে তাহার প্রতীক ও পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে পারিবারিক জীবনের অচল ও অটল সম্বন্ধগুলি হইতে। অপর দিকে এই প্রতীকগুলি সাধক বা প্রেমিকের অনুরাগ ও বিশ্বাসে জীবন্ত হইয়া শুধু দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনে নহে, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রকার সম্বন্ধের মাপকাঠি হইয়া সত্য, শিব ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সকল প্রকার আদান-প্রদানে।

প্রাচ্য জগতের জন-চৈতন্যে ধর্মের প্রভাব এরূপে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির ব্যবহারে একটা সমগ্রতা আনিয়াছে; এক জন আর এক জনকে যন্ত্র হিসাবে না দেখিয়া সমগ্রতার চক্ষে দেখিতে শিখে এবং পরস্পরের বিনিময়ের মাঝখানে দাঁড়ায় এমন একটা বোধ যাহা প্রত্যেকের স্বার্থসাধনকে অতিক্রম ও শাসন করে।

পাশ্চাত্য জগতে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির ব্যবহারে তাহার মনোবৃত্তির আংশিক স্ফুরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রকটিত হইয়াছে জনচৈতন্যে শ্রেণীর প্রভাবে। শ্রেণী সংঘটিত হয় ব্যক্তির স্বার্থের বিরোধ ও বিনিময়ের ফলে। শ্রেণীর সম্বন্ধ কৃত্রিম সম্বন্ধ; ইহাতে মানুষ পরস্পরের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত। শ্রেণী-সম্বন্ধীয় ব্যবহারে মানুষের সহজ, সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ নাই। পরস্পরের আংশিক ব্যক্তিত্ব যখন শ্রেণীর কাঠামোতে বাড়িতে থাকে তখন সে অতি শীঘ্র স্ফীতকায়, কিম্ভূতকিমাকার হইয়া সমাজে অশান্তি আনে। মানুষ যেখানে সমগ্র সেইটাই হয় সমাজের বন্ধনী। মানুষ যেখানে আংশিক ও সংকীর্ণ সেইটাই হয় সমাজের দ্বন্দ্ব-বিগ্রহের কারণ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্ত ব্যবহার ও সম্বন্ধ শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবান্বিত। একটা কৃত্রিম সমাজবন্ধন, যাহার প্রেরণা হইয়াছে ব্যক্তিগত শ্রেয়, নাগরিক শিল্প সভ্যতাকে আজ বিভিন্ন বিরোধী দলে খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়াছে। ব্যক্তির স্বার্থের যোগফলে শ্রেণী যেমন অতিকায় তেমনি বুভুক্ষু হয়। সমগ্রের বোধ ক্রমশঃ শ্রেণীর সম্পর্ক হইতে অন্তর্হিত হয়; তখন জাগে শুধু একটা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ও বিচার। দেশের লোকমত এইরূপে সংকীর্ণ, খণ্ডিত হইয়া পড়ে। বিসর্পের পেশীর মত শ্রেণী যেমন স্ফীত ও প্রতাপশালী হইতে থাকে, সমাজ-শরীর কলহের বিষে তেমনি জর্জ্জরিত হইতে থাকে। সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজ আজ শ্রেণীগত বিরোধে নিতান্ত ক্লিষ্ট।

প্রাচ্য জগতে শ্রেণীর পরিবর্ত্তে দেখা গিয়াছে সমূহ। সমূহ শুধু আর্থিক স্বার্থসাধনের উপায় নয়; শিল্পী ও মজুর যেমন একযোগে শিল্পকার্য্য বা শ্রমের ব্যবস্থাবিধান করে তেমনি একই সঙ্গে স্বজাতির ধর্ম্ম পালন করে, সামাজিক পূজাপার্ব্বণ ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, সাম্প্রদায়িক আচার বিধিনিয়ম পালন করে। সমূহের সঙ্গে ব্যবহারে শিল্পী ও শ্রমিকের শুধু আর্থিক ব্যবহারিক জীবের মত নহে, খানিকটা সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ ঘটে। ইহা ছাড়া প্রাচ্য জগতের সমাজ-বিন্যাসে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, সমূহ ও সম্প্রদায়ের সহযোগের যে রীতি প্রাচীন সভ্যতা যুগপরম্পরায় অর্জ্জন করিয়াছে তাহা কোন সমাজ-বন্ধনেই খণ্ডিত স্বার্থের অতিপুষ্টিবিধানের সুযোগ দেয় নাই।

সমূহতন্ত্র তাই প্রাচ্য জগতে যেমন সামাজিক শান্তি তেমনি অচলতার কারণও হইয়াছে; যেমন উহা

ব্যক্তির ও দলের অধিকারভেদের সঙ্গে একটা সহজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছে তেমনি উহা সামাজিক জড়তাও আনিয়াছে। সমূহতন্ত্র সজীব রাখিয়াছে সমগ্র প্রাচ্য জনগণের দৈনন্দিন ব্যবহারে একটা নীরব সহজ স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতিকে, তেমনি উহা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণ শক্তিকে বাধা দিয়া তাহার অক্ষমতা ও জাতীয় পরাধীনতার কারণও হইয়াছে।

সমাজের সম্বন্ধ ও ব্যবহারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে বিপরীত ভাব ও আদর্শের আলোচনা করিলাম, তাহা কি চিরসত্য, তাহাই কি শেষ নির্ণয়? ইতিহাস এ কথা মানিবে না। ইতিহাস বরং বলিবে যে পাশ্চাত্য জগতে রেনেসাঁ-প্রবর্তিত বস্তুতান্ত্রিক অকৃষ্টির ফলে, পরবর্তী যুগে প্রোটেস্টান্টিজমের ধর্মানুরাগ ও প্রতীকের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযানের ফলে, আধুনিক যুগে যন্ত্রতন্ত্র ও খণ্ডিত বিজ্ঞানের দারুণ প্রভাব ও একীকরণের ফলে, সমাজে বুদ্ধিবিচারকল্পিত ব্যক্তিগত স্বার্থের বিনিময়প্রণোদিত, কৃত্রিম সম্বন্ধ ও ব্যবহারের এত প্রভাব। ইহার সঙ্গে মানুষ সেই প্রকার বন্ধনকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে যেগুলি ব্যবহারিক স্বার্থসাধনের উপযোগী এবং যাহাদিগের সঙ্গে মানুষের চরম লক্ষ্যের মুখ্য যোগ নাই। ইউরোপে ও আমেরিকায় বিরাট্ শিল্প-ব্যবসায় ও অতিকায় সর্বভুক্ রাষ্ট্র এইরূপ সামাজিক আবহাওয়া ও আবেষ্টনে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষের চিন্তা ও কর্মের ধারাকে একেবারে রূপান্তরিত করিয়াছে, সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বন্ধন ও একীকরণের ছাঁদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

একীকরণ ও কেন্দ্রীকরণে শক্তিদ্বয়ের প্রভাবে ব্যষ্টির যোগফলে যে সমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সমাজ আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ সমাজ বলিতেই আমরা একটা মানুষের অভিমত, কর্তব্যাকর্তব্য ও লক্ষ্যের সহজ ও আন্তরিক ঐক্যস্থাপন মানিয়া লই। বিরাট্ রাষ্ট্র ও ব্যবসায় কৃত্রিম উপায় ও উপাদানে একটা একটানা সমতা জনগণমনের উপর স্থাপিত করিয়াছে। উপায় ও উপাদানটা কৃত্রিম, কারণ মানুষের স্বার্থ ও বুদ্ধি যাহা তৈয়ার করে তাহাতে প্রাণের বন্ধন নাই। তাই রাষ্ট্র আজ প্রাণের বন্ধন আনিতে চাহিয়াছে প্রাদেশিক কৃষ্টিকে রাষ্ট্রশক্তির উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া। প্রদেশে প্রদেশে যেখানে কৃষ্টি একটা বিশিষ্ট আকার লইয়াছে, সেখানে কেন্দ্র করিয়া কৃষ্টিকে একটা নিবিড়তর সমাজ-শাসনের ভার দেওয়ার কথা উঠিয়াছে; দূর হইতে রাজ্য-শাসনের ভার ও ব্যয় লাঘব করিয়া, কেন্দ্রে কেন্দ্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া।

প্রাদেশিক কৃষ্টির স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য রাজ্যশাসনে ক্রমশঃ তাহাদিগের স্বাধিকার বিস্তার করিতেছে। ইহার সঙ্গে রাষ্ট্রের ও যান্ত্রিক ব্যবসায়ের উগ্র সর্বগ্রাসী মূর্তি অন্তর্হিত হইবে। কৃষ্টির প্রাদেশিকতার আশ্রয়ে স্বায়ত্তশাসনের অনুষ্ঠানগুলি সঞ্জীবিত ও সুবিস্তৃত হইলে এক দিকে যেমন রাষ্ট্র লেলিহান মুখব্যাদানে ক্ষান্ত হইবে, অপর দিকে তেমনি কৃষ্টির প্রভাবে শ্রেণী সংঘর্ষও নিয়ন্ত্রিত হইবে, রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহারেরও কম প্রয়োজন হইবে। রাষ্ট্র ও শ্রেণী এখন হয় মুখোমুখী হইয়া পরস্পরকে চোখ রাঙাইতেছে, না-হয় রাষ্ট্র শ্রেণীবিশেষের করতলগত হইয়া অপর শ্রেণীগুলির লোপসাধন করিতেছে। আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রাদেশিকতা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগঠনের একটি নূতন নীতি; পাশ্চাত্য জগতে ইহার প্রতিষ্ঠার সহিত রাষ্ট্র ও শিল্প-ব্যবসায়ের বহুলীকরণ দেখা যাইবে; শ্রেণী ও রাষ্ট্রশক্তির প্রকোপ কমিবে এবং নানাবিধ দল, সম্প্রদায় ও সমূহের সমবায়ের ফলে সমাজশাসন প্রাচ্য জগতের আকার গ্রহণ করিবে। পাশ্চাত্য শাসন-যন্ত্রতন্ত্রের এই সংস্কার প্রাচ্যের বহু শতাব্দী পরিচিত, বহুজনধাবিত পথে অনুধাবন।

উনবিংশ শতাব্দীর বৃহৎ শিল্প কয়লা ও বাষ্পের ব্যবহারের সঙ্গে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির লোপ সাধন করিতেছিল; তাহার পর আর এক শিল্প-বিপ্লবে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হইয়া ক্রমশঃ দেশ জুড়িয়া ও দেশের রাষ্ট্রিক সীমানা অতিক্রম করিয়া একই বা অনুরূপ শিল্পব্যবসায়ে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক সময় ব্যবসায় বা শ্রেণীর স্বার্থের সহিত রাষ্ট্রের কল্যাণের বিরোধ ঘটিয়াছে। শিল্প-ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব এখন মুষ্টিমেয় বণিকের কবলিত এবং শ্রমজীবী-সমাজ

ক্রমশঃ বিরাট উৎপাদন-যন্ত্রে একটি অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য লোহার চাকার মতই স্বাবলম্বনহীন হইয়া অপরের অঙ্গুলি-হেলনে ঘূর্ণায়মান। দেশের অধিকাংশ শিল্পী, শ্রমজীবী, কারিগর ও যান্ত্রিক ধনিক শ্রেণীর ইঙ্গিতে ও স্বার্থে চলমান; দেশ জুড়িয়া মানুষের স্বাবলম্বনহীনতা ও কর্ম্মনিয়োগে অনিশ্চিয়তা গভীর অশান্তি আনিয়া দিয়াছে। বিপুল জনসমাজ আজ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও সভ্যতম অংশে চিরপ্রবাসী, পরান্নভোজী, পরাবসথশায়ী; জনগণের আর্থিক নিরাশ্রয়তা জাতির বহুক্লেশে অর্জ্জিত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক স্বাধীনতাকে আজ তিরস্কার ও বিদ্রূপ করিতেছে।

পাশ্চাত্য জগতে নূতন আর্থিক পরিকল্পনার বিশেষ চেষ্টা অতিকায় শিল্পকে নানা ক্ষুদ্র শিল্পানুষ্ঠানে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়া। বিদ্যুৎশক্তি বৃহৎ শিল্পের এই বহুলীকরণকে নানা স্থানে সাহায্য করিতেছে। আর একটি চেষ্টা হইতেছে ছোট কারখানাকে স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্র-স্বরূপ গড়িয়া তোলা; শ্রমিক ও ধনিকের বিরোধ ক্ষুদ্র কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগিতায় মিটিবার সম্ভাবনা। আমেরিকা, জার্ম্মানী ও চেকোস্লোভাকিয়ায় শ্রমজীবীকে কারখানার কাজের সঙ্গে নিজস্ব জমিতে চাষের বা বাগানের কিছু কাজ দিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। ইতালীতে মজুর, কারিগর, শিল্পী, যান্ত্রিক ব্যবসায়ী বা জমিদার সকলেই সমূহ অথবা করপোরেশনে সংঘবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে। শ্রেণী-বন্ধনের পরিবর্ত্তে সমূহ-বন্ধন প্রবর্ত্তনকে মুসোলিনী মনে করেন এই শিল্পসংঘর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদীর যুগে ইতালীর কৃষ্টির একটি শ্রেষ্ঠ দান।

শিল্পকর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠানের উপরিউক্ত সংস্কার-চেষ্টাকে এক হিসাবে বিপরীত পথে ঘুরিয়া প্রাচ্য শিল্পপদ্ধতি ও আদর্শের অনুগমন বলিয়া ধরা যায়।

অতিকায় ও অতি-দুর্দ্দম রাষ্ট্র ও শিল্পের বহুলীকরণ; প্রাদেশিক কৃষ্টি ও শিল্পের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা; নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা; শ্রেণী-বন্ধনের পরিবর্ত্তে সমূহ-বন্ধনের প্রবর্ত্তন; পারিবারিক অনুষ্ঠানে ও বিবাহের আইন-কানুনে ব্যক্তিসর্ব্বস্বতার পরিবর্ত্তে সামাজিক শীলতা ও নিষ্ঠাচারের প্রভাব; অধ্যাত্মজীবনে নির্দ্দিষ্ট, আনুষ্ঠানিক সমবেত প্রার্থনার পরিবর্ত্তে তুরীয় অপরোক্ষ অনুভূতির অনুশীলন, এ সবই ইউরোপ ও আমেরিকায় মানুষে মানুষে কৃত্রিম ব্যবহারিক সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে সহজাত প্রাণের বন্ধন ও আদর্শ যাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইতেছে মানুষের চরম-সাধ্য বস্তু। পাশ্চাত্য জগতের এই সাধনা প্রাচ্যের অভ্যস্ত বন্ধুর পথেই সিদ্ধিলাভ করিবে।

অপর দিকে প্রাচ্য জগতে এই যুগে যখনই কোন সামাজিক অনুষ্ঠান ও বন্ধন ব্যক্তির স্বচেষ্টা ও স্বসিদ্ধির অন্তরায় হইয়াছে, আমরা তখনই আনিয়াছি পাশ্চাত্যের সেই স্বাধিকার যাহা সেখানকার কৃত্রিম ব্যবহারিক সম্বন্ধ ও ব্যক্তির স্বার্থসাধনের আদর্শ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে যাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে ভারতবর্ষে, চীনে ও জাপানে ব্যক্তির সেই স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ যে-সকল প্রাচীন প্রথা ও অনুষ্ঠান প্রাণ হারাইয়া অতীতের জীর্ণ কঙ্কালের মত সমাজের প্রগতি রোধ করিয়াছিল তাহাদিগকে সংস্কৃত করিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার, জাতি, পল্লীসমাজ, সবই সাগরপারের বাতাস পাইয়া শুষ্ক ও জীর্ণ পাতাগুলি ত্যাগ করিয়াছে, নবীন মসৃণ পাতা ও ফুলের শোভাসম্পদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

একান্নবর্ত্তী গৃহস্থালী চীনে ও ভারতবর্ষে আর্থিক সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া কোথাও বা হটিয়া গিয়াছে, কোথাও বা জিতিয়াছে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিবারের সহযোগে অনেক সুবিধা। একান্নবর্ত্তী গৃহানুষ্ঠান স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগের কিছু সুবিধা দান করিয়া, পুরাতন কর্ত্তার ইচ্ছা কিছু দমন করিয়া পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাপানে পল্লীসমাজ অন্য পল্লী-সমাজের সহিত মিলিয়া শিক্ষা, সমবায় ও কৃষির বিপুল উন্নতির ফল ভোগ করিতেছে। চীনে ও ভারতবর্ষে বণিকের দল পুরাতন ব্যবসায়মণ্ডলের সহিত আধুনিক ব্যাঙ্কিঙের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া প্রদেশে-প্রদেশে আশ্চর্য্য নবীনতা ও কার্য্যকুশলতা দেখাইতেছে।

পাশ্চাত্যের মতই প্রাচ্যের সংস্কারের অনেক বাধা ও বিঘ্ন। অতীতের সেই সহজাত পরিবার, গোষ্ঠী ও

সমূহের বন্ধন পদে পদে ব্যক্তির বিচার ও স্বার্থকে বলি দেয়, প্রাচ্যের সেই সহজ অধ্যাত্মবোধ দারিদ্র্যের মলিন বেশেও অর্থজগতের সম্পদকে অবহেলা করে।

কিন্তু এটা ঠিক যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উভয়ের সংস্কার ও প্রগতি উভয়ের সামাজিক রীতি ও আদর্শের আদান-প্রদানে। শিল্পব্যবসা উপলক্ষে ও উভয়ের কৃষ্টির পরিচয়ে যতই এই আদান-প্রদান বাড়ে ততই উভয়ের কল্যাণ। এই আদান-প্রদানের সঙ্গে প্রাচ্য প্রতীচ্যের অনুরূপ হইবে, এবং প্রতীচ্য হইবে প্রাচ্যের অনুরূপ, এবং উভয় জগৎ পরস্পরকে দান করিবে অশ্রদ্ধার সঙ্গে নহে শ্রদ্ধার সঙ্গে, দর্পের সঙ্গে নহে বিনয়ের সঙ্গে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিচিত্র মানুষকে ঘিরিয়া ও অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে বিশ্বমানব। সমাজ-বিজ্ঞান জগতের বিভিন্ন অংশে মনুষ্য-সমাজের বিচিত্র ধারা ও আদর্শ ব্যাখ্যান করিলেও সবার অধিক মানুষের ঐক্যকে মানুষকেই বড় করিয়া দেখে। প্রাচ্য সমাজ-দর্শন চর্চার প্রতিনিধি হইয়া আজ এই আমেরিকার সমাজ-দর্শন পরিষদে সেই চির-পুরাতন, চির-নূতন পরম পুরুষ সমগ্র বিশ্ব যাঁহার দেহ, সত্য-শিব-সুন্দর যাঁহার মন, জগতের ও মানবের ইতিহাস যাঁহার গতি, তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি।*

---

* আমেরিকার সমাজদর্শন-পরিষদের অভিনন্দন উপলক্ষ্যে ইংরেজী সম্ভাষণ অবলম্বনে লিখিত।

অতিথি

শ্রীআশালতা সিংহ

আজ তিন দিন হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রতিমা ভোর-রাত্রিতে চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া কান পাতিয়া ছিল। ঠিকা ঝিটা এখনই আসিয়া কলতলায় বাসন নাড়ানাড়ি করিবে, সে-শব্দ শোনা যায় কি না। গত তিন দিন হইতে বৃষ্টির অছিলাতেই বোধ করি বা ঝি আসে নাই। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তাহাকে একা-হাতে রান্নাবান্না বাসন-মাজা সমস্তই করিতে হইয়াছে। আজও যদি সে না আসে, এ আশঙ্কায় ভোরবেলা হইতেই তাহার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। বাহিরে অজস্র ধারাপাতে বৃষ্টি পড়িতেছে, ষ্টেশনের কাছে বাড়ী, ভোরের ট্রেনটা আসিতেছে। তীব্র বাঁশীর শব্দ এই বিছানায় শুইয়াই স্পষ্ট শোনা যায়। মুহূর্তের জন্য ঠিকা-ঝিয়ের ভাবনা ভুলিয়া প্রতিমা অন্যমনস্ক হইয়া গেল। এই ট্রেনের শব্দে কত কথাই যে মনে পড়াইয়া দেয়। যে-ট্রেন একটু ক্ষণের জন্য ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আবার ছুটিবে, কত নদী কত প্রান্তর পার হইয়া দেশ-দেশান্তরে ছুটিয়া চলিবে, তাহারই গতিবেগের সহিত মনও ছুটিয়া চলিতে চায়। ভোরের অস্পষ্ট আলোয়, বৃষ্টির ধারাগান শুনিতে শুনিতে চোখের সম্মুখে ছবির মত অতীত জীবনখানি ভাসিতে থাকে। সেই যখন সকালবেলায় উঠিয়া পূব দিকের বারান্দায় সে কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। এই সময়টায় কখনও এস্রাজ বাজাইত। তার পর পড়াশোনা শেষ করিয়া তাহাকে কলেজের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। সেখানে কত কথা লইয়া আলোচনা, তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, গল্প;—মনটা বিশ্বস্রোতের উপর ভাসমান থাকিত একটি বিকশিত কমলের মত। একখানি রূপে রসে গন্ধে ভরা সদ্যজাগ্রত মন বিশ্ব-চেতনার মাঝখানে দলে দলে আপনাকে মেলিয়া ধরিতেছে। গানের সুর তাহার চারি দিক্ ঘিরিয়া ছল্ ছল করিতেছে, তাহাকে বন্দিত বরিত করিতেছে। সকলেই একবাক্যে বলিত, প্রতিমার

ান যে একবার শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য কি যে তাহা ভুলিয়া যায়। গানের সুরে প্রতিমার অন্তর আপনাকে মেলিয়া ধরে, যেন কথা কহিয়া উঠে। অনেকেই গান শেখে, কিন্তু প্রতিমার মত করিয়া গাহিতে পারে ক-জনা! সেদিনটাও এমনই ভোরবেলা ছিল। প্রতিমা প্রতিদিনের অভ্যাসমত বাগানের ধারে পূব দিকের বারান্দাটায় পায়চারি করিতে করিতে আপন মনে একখানি ভজন গাহিতেছিল। সে গান কাহাকেও শোনাইতে হয়ত গাহে নাই। ভোরের আকাশের বিলীনপ্রায় নক্ষত্র এবং প্রভাতের শিশিরভেজা বাতাস সে গানের নির্বাক্ শ্রোতা ছিল। এমন সময় পিছন হইতে কে বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "গান যে এমন হয়, হ'তে পারে, ভাবি নি কখনও তা। অনেক জায়গায় অনেক শুনেছি তো। কিন্তু ঠিক এমন…" প্রতিমা পিছনে ফিরিয়া দেখিল এক জন সুবেশ যুবক রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অদূরে গেটের কাছে একটা ছ্যাকরা গাড়ী দাঁড়াইয়া, তাহার মাথায় বিছানা এবং বাক্স। বুঝিল আগন্তুক এখনই আসিয়া পৌঁছিল। অতিথি প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "আমি সন্তোষ। রেঙ্গুন থেকে আসছি। প্রথমে কলকাতায় এসেছিলুম। তার পর রাত্রির ট্রেনে সেখান থেকে ছেড়েছি। আপনার মামাবাবু সম্ভবতঃ এখনও ওঠেন নি। মাপ করেন তো তাহলে একটা অনুরোধ করি। আমি ঐ গাড়োয়ানটার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নীচের বাগানে বসছি, আপনি আর একটা গান করুন। সম্ভবতঃ আমার এই অসঙ্গত অদ্ভুত কথায় আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, কিন্তু আপনি এইমাত্র যা গাইছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনার যদি আভাসেও কোন ধারণা থাকত তাহ'লে বুঝতে পারতেন এমন অদ্ভুত কথা আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও কেমন ক'রে বলতে পারছি। তখন আর অবাক্ হতেন না।"

প্রতিমা আর গান গাহিল না। বলিল, "আপনি তো সম্পূর্ণ অপরিচিত নন। মামাবাবুর মুখে আপনার কথা আমি শুনেছি। আপনি যে আজকালের মধ্যে আসবেন তাও জানতুম। কিন্তু আমার মনে হয়, মনে হয় কেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস আপনি নিজেও গান জানেন। নইলে…"

এমনই করিয়া প্রথম-পরিচয়ের সূত্রপাত হইল। প্রতিমার মা নাই, বাবা নাই, আপন বলিতে তেমন কেহ নাই। তাহার মামার কাছেই ছোট হইতে সে মানুষ। মামা লোকটি ছিলেন এ যুগের পক্ষে একান্ত বেমানান। এমন মুক্তহস্ত সদাশিব ব্যক্তি আজকালকার দিনে দেখাই যায় না। নিজের অবস্থা বা ওজন কোনটাই না বুঝিয়া পরকে সাহায্য করিতে ছুটিতেন, যত দূর ক্ষমতা স্নেহ দিয়া আশ্রয় দিয়া মমতা দিয়া আশ্রিতদের ঘিরিয়া রাখিতেন। মামার কাছে প্রতিমা সুখেই মানুষ হইতেছিল—তাহার মা নাই, তাহার বাবা নাই, ভাই নাই, গৃহ নাই এমন ভয়ঙ্কর কথাগুলা কোন দিন মনে উঠিবার অবকাশ মাত্র হয় নাই। দিনকয়েক হইল তাহার মাতুল উপেন্দ্রনাথের নিকট রেঙ্গুন হইতে এক খানা চিঠি আসিয়াছিল। তাঁহার বাল্যবন্ধু শশাঙ্কশেখর লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ছেলে সন্তোষ কিছু দিন তাঁর বাড়ীতে থাকিয়া ওকালতি করিবে। পসার একটু জমিলেই বাসা করিয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইবে। প্রথম দিকের কয়েকটা মাস একটু সাহায্য চায়। অজানা অচেনা দেশ, একেবারে একা দিশাহারা হইবে। সেই সন্তোষ আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমনই ভোরের ট্রেনেই সে আসিয়াছিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে। কারণ সে আসিয়া পৌঁছিবার এক মাস পরেই উপেন্দ্রনাথ এক দিন রাত্রিতে বিছানায় ঘুমাইলেন, আর উঠিলেন না। ডাক্তারেরা বলিল, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রাত্রি আড়াইটা আন্দাজ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সেটা প্রতিমার সেকেণ্ড ইয়ার। অনেক রাত্রি জাগিয়া পড়াশোনা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীময় একটা আর্ত্তরোলে ঘুম ভাঙিল। সেদিনও এমনি ভোরবেলা। তখনও শুকতারার আবছা ছায়াটুকু একেবারে যেন আকাশের কোণ হইতে অপসৃত হয় নাই।

ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইল উপেন্দ্রনাথের ঋণের বোঝা। আশ্রিতের দল ভোজবাজীর মত নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল। সন্তোষের দিকে কেহই মনোযোগ দেয় নাই। কবে

এক দিন কোন্ বিস্মৃত সকালবেলায় সে যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল, তেমনই অকস্মাৎ কলিকাতায় চলিয়া গেল। তার পর প্রতিমার দিদিমার প্রাণপণ চেষ্টায় এক-শ টাকা মাহিনার এক জন ষ্টেশন-মাষ্টারের সহিত প্রতিমার বিবাহ হইয়া গেল। যদিচ শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী, কিন্তু পণের ঘরে একেবারে শূন্য। তাই অনাথা প্রতিমা যে অক্লেশে এমন একটা আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গেল তাহাতে তাহার মামীমারা একবাক্যে তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, পাড়াপড়শীরাও করিল। আর একটা এমনই আব্‌ছা আলো-অন্ধকারে জড়ানো ভোর-বেলায় প্রতিমা ট্রেনে চাপিয়া তাহার স্বামিগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিল। আর্দ্র বর্ষণমুখর সকালবেলায় ট্রেনের তীব্র হুইস্‌ল্ শুনিয়া হঠাৎ মনে হয়, দশ বছরের যবনিকা সরিয়া গিয়াছে—প্রতিমা যেদিন লাল রঙের বেনারসী পরিয়া পায়ে অলক্তক-চিহ্ন আঁকিয়া স্পন্দিত বক্ষে স্বামীর অজানা গৃহে যাত্রা করিয়াছিল, সেদিন যেন আজই।

স্বপ্নের সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। দোরগোড়ায় ঝিয়ের খন্‌খনে আওয়াজ আসিল, "বৌমা কি আজ বিছানা ছেড়ে উঠ্‌বে না নাকি গো! এক পহর বেলা হ'তে চলল, কখন আমি বাসন মেজে ব'সে আছি। শিলের কাছে না-আছে মশলাপাতি সাজানো, না পেয়েছি কয়লার ঘরের চাবি!"

এক নিমেষে প্রতিমা দৈনন্দিন জীবনের রূঢ়তায় ফিরিয়া আসিল। ঝিয়ের কাংস্যকণ্ঠের প্রত্যুত্তরে সেও গলা চড়াইয়া কহিল, "আজ চার দিন পরে এসে ভারি আমার মাথা কিনেছ, অমনি মেজাজ দেখান হচ্ছে। মাইনের বেলায় তো একটি পাই-পয়সা ছেড়ে কথা কও না, আর কামাই যখন কর তখন কিছু মনে থাকে না, নয়?"

শহর-অঞ্চলের ঠিকা ঝিদের প্রকৃতি যাঁহাদের জানা আছে তাঁহারা জানেন একবার তাহাদের মুখ ছুটিতে আরম্ভ করিলে কিরূপ কর্কশ ব্যাপার দাঁড়ায়।

ঝি তারস্বরে চেঁচাইতে লাগিল, এখনই তাহার মাহিনা চুকাইয়া দেওয়া হোক, এমন দুর্বিনীত মনিবের বাড়ীতে একটা বেলা, এক ঘণ্টাও আর তাহার পোষাইবে না।

এ-সব কথার মূল্য কি, তাহা প্রতিমা আজ দশ বৎসর ক্ষুদ্র ষ্টেশন-কোয়ার্টার্সে এক-শ টাকা মাস-মাহিনার ঘরের ঘরণী হইয়া হাড়ে হাড়ে জানিত। তিক্ত মুখে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া হাত দিয়া মাথার চুলগুলি বিন্যস্ত করিয়া লইতে লইতে সে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল। ঝিয়ের চীৎকারে প্রতিমার স্বামী রাখালবাবুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি বিরক্ত হইয়া স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আঃ, এই সকালবেলাতেই বকাবকি সুরু করলে কেন? জ্বালাতন! দিন দিন তোমার কি যে ঝগড়াটে স্বভাব হচ্ছে। কাল বৈঠকখানাতে সন্ধ্যেবেলায় বঙ্কুবাবু, নরেনবাবু, আমি সবাই বসে আছি। তোমার বকাবকি, চেঁচামেচি কার সঙ্গে সুরু হ'ল। ভদ্রলোকরা আড়ালে মুখ টিপে হাসাহাসি করতে লাগ্‌লেন। আমি লজ্জায় মরি। ছি ছি, এমন রুক্ষ্ম স্ত্রীকে নিয়েও আমায় ঘর করতে হয়। আমি ব'লেই পারি। অন্য কেউ হ'লে এক কাণ্ড হয়ে যেত।"

প্রতিমা মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া কহিল, "রেখে দাও তোমার ভদ্রলোক আর ভদ্রতা। যা ক'রে সংসার চালাতে হয়, সে শুধু আমিই জানি। কাল সন্ধ্যেতে মেছুনি বলে, আট আনা দর নেব আধ ঘণ্টা বকাবকি ক'রে তিন আনায় আধ সের মাছ কিনলাম। এদিকে মিহি গলায় বলা হয়, ভদ্রলোকরা কি মনে করলেন! ওদিকে মাছ নেই ব'লে রোজ ভাত খাওয়া হয় না, রোজ ঝগড়া। মাছ আনতে কে বাজার যাবে শুনি? আমি যাব? ঝি তো চার দিন এ-মুখো হয় নি।" রাখালবাবু বেগতিক দেখিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ঝি বাহির হইতে আর এক দফা তাড়া দেওয়ায় প্রতিমা আর কথা বলিবার অবসর পাইল না। মুখ-হাত ধুইয়া ঘর-সংসারের বিলিব্যবস্থা সারিয়া ঝিকে বাজারের পয়সা গুনিয়া দিয়া প্রতিমা স্বামীর দিকে এক পেয়ালা চা অগ্রসর করিয়া দিল এবং আর একবার ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "নাও, এবার দয়া ক'রে উঠে চা খেয়ে নাও। চা হাতের কাছে এগিয়ে না দিলে



রোমে দ্রাক্ষা-উৎসবের উদ্যোগ-পর্ব্ব



দ্রাক্ষা-উৎসবে ইতালীর পল্লীতরুণীদল



দ্রাক্ষা-উৎসবে ইতালীর তরুণীদল



দ্রাক্ষা-উৎসবে প্রদর্শনীর একটি দোকান

বিছানা ছেড়ে উঠব না, এ আবার কি বদ অভ্যেস বাপু! সারাদিন এই ভূতের মত খাটুনি, অত পারি নে!"

সামনেই একটা আয়না টাঙানো ছিল। হঠাৎ সেই দিকে চোখ পড়িয়া যাওয়ায় প্রতিমা দেখিল তাহার প্রতিবিম্ব। আটাশ বছরের এক বুড়ী তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মুখে উগ্র কটু ভাব, সারা মুখে কোথাও লেশমাত্র লাবণ্যের আভাস নাই—সামনের চুলগুলি উঠিয়া পাতলা হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণের জন্য সে বিমনা হইয়া গেল। দশ বছর আগে শতদলের মত যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আজ ঝিয়ের সহিত বচসায় এবং মেছুনির সহিত দরাদরিতে তাহার সমস্ত দলগুলিই কি কুৎসিত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে? গোপন অন্তরালে কোথাও এতটুকু শোভা, এতটুকু গন্ধ কি তাহার প্রচ্ছন্ন হইয়া নাই? না-ই যদি থাকিবে, তবে আজ বর্ষণক্লান্ত প্রভাতের ধূসর আলোয় ট্রেনের শব্দে তাহার দূরবগাহ মন কোন্ অতল স্মৃতি-সমুদ্রের মাঝে ডুব মারিয়াছিল? মানুষের মন মরিয়াও মরে না, এই কি তার প্রমাণ?

রাখালবাবু চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া একটা হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "এক পেয়ালা চা দেবে তার এত লেক্‌চার কেন? আর মেয়েমানুষে খাটবে, সেটা আর এমন নূতন কথা কি? যখন স্রেফ একটি পয়সা দাবি না ক'রে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, সে তো এই জন্যেই যে, বড়সড় মেয়ে এসে ঘর-গেরস্থালীর কাজকর্ম্ম করবে। নইলে মনেও ক'রো না যে তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম, বা তোমার কেতাবি বিদ্যার বহর দেখে ভুলেছিলাম, সে-পাত্র আমি নই। অমন আই-এ বি-এ পাস করা মেয়ে আজকাল গণ্ডায় গণ্ডায়, যেদিকে দু-চোখ চাও।"

ছোট ছেলে নেবু ও বড় খোকা সন্তু এতক্ষণে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া ক্রন্দন ও কলকোলাহল তুলিল। ছোট বাড়ী, রান্নাঘরের কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় এই দিকটা আচ্ছন্ন হইবার জো হইল। প্রতিমা বাক্যবাণ বর্ষণের অবসর পাইল না। সংসার শতসহস্র শিখা বিস্তার করিয়া তখন তাহার শুষ্ক জীবনকে অধিকার করিয়াছে—একটি মিনিট থামিবার আর অবসর নাই, আশেপাশে চাহিয়া দেখিবার নিমেষমাত্র সময় নাই।

ঝি বাজার লইয়া আসিয়াছে। ছোট খোকার সামনে চারটি শুকনো মুড়ি ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া প্রতিমা ভাতের ফেন ঝরাইতেছিল। ঝিয়ের গলা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। হাতে হলুদের ছোপ, কাপড়খানা ময়লা। ঝি 'যুদ্ধং দেহি' স্বরে কহিল, "চার আনা সের পটোল, তার আধ পয়সা কমে দেয় না। নিতে হয় নাও বাপু, না নিতে হয় নিও না।"

প্রতিমা কঠিন সুরে তাহার প্রতিবাদ করিয়া ঝিকে কথাটার অসম্ভাব্যতা এবং তাহার চুরির প্রবণতাটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার জন্য কি-একটা বলিতে যাইতে-ছিল, দরজার কাছে জুতার ভারি আওয়াজ পাওয়া গেল। রাখালবাবু এক জন সুদর্শন সুবেশধারী আগন্তুক সহ তথায় প্রবেশ করিলেন। ভাবখানা নিরতিশয় প্রসন্ন। হাঁক দিয়া কহিলেন, "ওগো, এই দেখ তোমার সন্তোষদা, চিনতে পার? ব্যাঙ্কিং ইউনিয়নের বড়বাবু। ভদ্রলোক আমাদের বাসা খুঁজতে সারা শহর খুঁজে বেরিয়েছেন। বললেন, তোমার মামাবাবুর কাছে কিছু দিন থেকে নাকি ওকালতী করেছিলেন। তেমন সুবিধে না হওয়ায় চাকরির খোঁজে থাকেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, বরাত জোর—তার উপর নিজের গুণ, তার ফলে অতি অল্প দিনে এই উন্নতি। নাও, চটপট ক'রে আয়োজন কর। আজ উনি এখানেই খাবেন। আলাদা ক'রে হোটেলে থাকতে চাচ্ছেন এখানে যে কয়েক দিন কাজের জন্য থাকতে হয়। কিন্তু আমি ছাড়ছি নে। হ'লই বা গরিবের কুঁড়ে, এ ক'টা দিন এখানে থাকতে হবে কষ্ট ক'রে।"

প্রতিমা মুখ তুলিয়া চাহিল। এই সেই সন্তোষ, যে দশ বছর আগে প্রথম এক দিন সকালবেলায় তাহাকে দেখিয়াছিল বাগানের পাশে বারান্দায়, নবোদিত সূর্য্যের ছটায় সুরের ঝরণাধারার মাঝে।

সে দৃষ্টি-স্মৃতি এখনও প্রতিমার মনে ম্লান হয় নাই

আজ কি না সেই অমরাবতী হইতে নামিয়া আসিয়া এই দৃশ্যের মাঝে নিজেকে দাঁড় করাইতে হইবে! এক দিকে ছোট খোকা ধুলামুদ্ধ মুড়ি ফেলিয়া প্রাণপণে চেঁচাইতেছে। সামনেই আঁশের বঁটি, স্তূপাকার আলু-পটোল শাক বেগুন ছড়ানো। পটোলের দর লইয়া সে ঝিয়ের সহিত প্রাণপণে চেঁচাইতেছে—মাথার চুল রুক্ষ, পরনের শাড়ীতে হলুদের ছাপ, মুখে কটু তিক্ততার সুস্পষ্ট রেখা। কেমন করিয়া গৃহস্থালীর এই ছবিসমেত সে আপনাকে লুপ্ত করিয়া ফেলিবে তাহাই একান্ত ব্যাকুলতার সহিত অন্বেষণ করিতে করিতে কোনক্রমে একটা নমস্কার সারিয়া প্রতিমা অস্ফুটস্বরে কহিল, "তোমরা বাইরের ঘরে ব'সো। আমি চা তৈরি ক'রে নিয়ে যাই।

ঝি অবাক হইয়া গেল, প্রতিমা বাজারের পয়সা লইয়া আর তাহার সঙ্গে লেশমাত্র বচসা করিল না। মিষ্ট কথায় কহিল, "বাজারের খাবার আর দেব না, আমি ততক্ষণ চায়ের জল চড়িয়ে দিই, তুই যা তো মা, চট্ ক'রে ঘি ময়দা কিনে এনে দে।

ধূল্যবলুণ্ঠিত রোরুদ্যমান ছেলেটা প্রতিদিনের মত মায়ের গালাগাল এবং চড়চাপড় আশা করিয়াছিল। তাহার বদলে প্রতিমা সযত্নে তাহাকে ধুলা হইতে উঠাইয়া গা-হাত মুছাইয়া ফরসা জামাকাপড় পরাইল, চুল আঁচড়াইল। আজ তাহার গৃহে অতিথি আসিয়াছে, যে-অতিথি জীবনের নব-প্রভাতের আলোকে তাহাকে দেখিয়াছিল; সেই দেখাটুকুকে কোন ছলেই সে ম্লান হইতে দিতে পারে না। এখানকার লোকে তাহার কি পরিচয় জানে, সে সমস্তই তো মিথ্যা জানা—সত্যকার পরিচয় অরুন্ধণের জন্যও যে দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিল, তাহার সত্য সে বিলীন হইতে দিবে না।

মিনিট-দশেক পরে মেছুনি বড় মাছ লইয়া আসিল, মাছ নেবে গো মা। প্রতিমার শান্ত স্মিত মুখের দিকে, সুবিন্যস্ত কেশপাশের দিকে সে একটুখানি বিস্মিত হইয়া চাহিল। মাছ কেনা হইল নিঃশব্দে।' মিষ্ট হাসিয়া প্রতিমা শুধু অনুরোধ করিল, "এই ক'দিন রোজ বড় মাছ দিয়ে যেও বাছা। বাড়ীতে লোকজন এসেছেন।"

ভাত খাইতে বসিয়া অদূরে উপবিষ্ট প্রতিমার দিকে চাহিয়া সন্তোষ কহিল, "আজকাল আপনি আর গান করেন না শুনলুম। কিন্তু কেন যে করেন না তা এইবার ক্রমশঃ বুঝতে পারছি।"

রাখালবাবু খাইতে খাইতে কহিলেন, "কেন আর করে না, সময় পায় না। রাঁধা-বাড়া, কাজকর্ম, ছেলেপিলে সামলানো।" সে-কথায় তেমন কর্ণপাত না করিয়া সন্তোষ কহিল, "তার কারণ ক্রমশঃ মনে হচ্ছে যে-গান গাইতেন এক দিন, আজ সে-গানের সুকুমার সুরটিকে নিজের জীবনে আর গৃহস্থালীতে ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছেন। তাই যেদিকে চাইছি সেই দিকেই সামান্য জিনিষ, সামান্য উপকরণ থেকেই একটি শান্তি ও সৌন্দর্য্যের আলো দেখতে পাচ্ছি।" রাখালবাবু পটোলের একটা আস্ত দোলমা মুখে পুরিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, মেয়েমানুষে ঘর-কন্নার কাজ নিখুঁৎ ক'রে চালাতে পারলে তবেই বাহাদুরি তাকে দিই। সেটা উচিত বটে। খুবই উচিত।"

হাতপাখা লইয়া আস্তে আস্তে বাতাস করিয়া দিতে দিতে প্রতিমা অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, বড় করিয়া দাবি করিলেই সমস্ত সত্তা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও আপনাকে সেই দাবির সমান বড় করিয়া তোলে। আর ছোট মাপের বাঁধা-বরাদ্দমাফিক শ্রদ্ধাশূন্য দাবি মানুষকেও তিলে তিলে শ্রদ্ধাবিহীন, শক্তিবিহীন, শিথিল জড় করিয়া তোলে। তাহার প্রমাণ সে নিজে। তাহার দৈনন্দিন জীবন প্রতিদিন প্রতিরাত্রি শুধু তাহার কাছে আশা করিয়াছিল, মেয়েমানুষ হইয়া থাকা। যেমন তেমন করিয়া হোক, দায়সারা করিয়া হোক, কলহ করিয়া হোক, রাঁধাবাড়া, বাসন-মাজা, ঘরগেরস্থালী চালানো—এটুকুর অধিক কেহ দাবি করে নাই। তাই কি সে আপন অজ্ঞাতসারে তিলে তিলে মরণের অধিক মরিয়া গিয়াছে? তাই কি সে ভুলিয়া বসিয়াছিল, এক দিন তাহারই গানের সুরে আকাশের তারা অতন্দ্র হইয়া থাকিত—তাহার চোখের আলোয় কত মনে আরতির আলো জ্বলিয়া উঠিত! যে-কথা সে ভুলিয়া বসিয়াছিল, তাহার সেই বিস্মৃত জীবনের সহিত জড়িত এক জন অতিথি তাহাদের বাড়ীতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কি সে-কথা তাহার মনে পড়াইয়া দিয়া গেল!

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আমবাগানের মধ্যেই ষ্টেশন—কয়েকখানি চালাঘর মাত্র এদিকে-ওদিকে দেখা যায়। শান্তরসাস্পদ তপোবনের খানিকটা সযত্নে কে যেন এখানে বসাইয়া দিয়াছে। ষ্টেশনের বাহিরে পাকা রাস্তার উপর অনেকগুলি ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। না গাড়ী, না ঘোড়া, কাহারও সৌষ্ঠব নাই। ষ্টেশন হইতে গ্রাম পুরা দু-মাইল; যাঁহারা চক্ষু বুজিয়া স্ত্রী-কন্যা এবং অতিকায় মোটঘাট লইয়া ঐ সব পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত অপূর্ব্ব যানে চাপিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন কোনরূপে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই গাড়ীর সঙ্গে সকল সম্পর্কের সমাপ্তি হইবে। এ গাড়ীতে বসিয়া প্রকৃতির পানে চাহিয়া প্রীতির সম্পর্ক পাতান চলে না। এ নিতান্তই দায়ে পড়িয়া ঢেলা বহিবার মত।

ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র চারি দিকে চীৎকার, কলরব এবং হুড়াহুড়ির উদ্দাম স্রোত ঘনাইয়া উঠিল। আগে নামিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। মুটে এবং গাড়ী যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহারা সচীৎকারে সেগুলি সংগ্রহ করিতেছেন। ষ্টেশনের সঙ্কীর্ণ লোহদ্বার দিয়া বহুক্ষণের আবদ্ধ জলস্রোতের মতই সবেগে জনস্রোত বাহিরে আসিতে লাগিল। আগে আসিবার আগ্রহে কেহ অল্লাধিক আহত হইল, কাহারও বা ভঙ্গুর জিনিষ কিছু অপচিত হইল।

অমিয় গাড়ীর চেষ্টা দেখিল না, তাহার বন্ধুরাও না।

প্রথমটা সুরেন বলিয়াছিল, "নতুন চাকরি হ'ল, গাড়ী চড়াবি তো, অমু?"

অমিয় প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিল, "ভয় কি পা-গাড়ী আছে। আমবাগানের মধ্য দিয়ে দিব্যি যাওয়া যাবে।"

পাকা রাস্তায় প্রচুর ধুলা, ঘোড়ার গাড়ী দৌড়াইলে হোলির উৎসব আরম্ভ হইয়া যাইবে। বড় রাস্তার পাশেই পায়ে-চলা একটি রাস্তা আছে আমবাগানের মধ্য দিয়া। নির্জ্জন এবং ধূলিলেশহীন। সে রাস্তার দু-ধারে যা চোরকাঁটা আছে, আর কোন উৎপাত নাই। বহুদিন পরে এই রাস্তায় নামিয়া অমিয় সারা দেহে রোমাঞ্চ অনুভব করিল। রাস্তা তো নহে যেন পরম প্রিয়ের প্রসারিত অঙ্গুলি, যাহা স্পর্শমাত্রই পুরাতন স্বপ্ন নূতন রঙে জন্মলাভ করে। আমের বোলে বাগান সুগন্ধময়, পত্রান্তরালে কোকিল ডাকিতেছে, সূর্য্য এই মাত্র অস্ত গিয়াছেন। আর কোথাও কোন শব্দ নাই। শুধু তাহারা পাঁচ জনে পথ অতিক্রম করিতেছে। কে এক জন কথা বলিতে গিয়াছিল—অমিয় মিনতি করিয়াছে, এখন কথা নহে, গল্প নহে, কোন প্রকার শব্দ নহে, মৌন প্রকৃতির কোলে বসিয়া নির্ব্বাক্ স্নেহকে শুধু উপভোগ করিয়া যাও। শুক্‌না গাছে কাঠঠোকরা ঠকাঠক্ শব্দ করিয়া চলিয়াছে—কোকিলের মিষ্ট স্বরের বিরাম মুহূর্ত্তে এটিও উপভোগ করা যায়; কাপড়ের প্রান্তে চোরকাঁটা ঘন কালো হইয়া আঁটিয়া গেল, যাক, সাবধানীর মত হাঁটুর কাপড় তুলিয়া ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া-যাওয়া সংসারী-মনকে সচেতন করিয়া লাভ কি? সূর্য্যাস্তের মুহূর্ত্তে আকাশ যদি দ্রুত আলো নিবাইয়া নীল বসনে সাজিতে থাকে, উতলা মনে—আশু অন্ধকারের ভয়ে পায়ের গতি কেন দ্রুত কর? বাড়ীতে যে পরিপূর্ণ সুখ সঞ্চিত আছে, এই পথের দু-ধারে ক্ষুদ্র খণ্ডসৌন্দর্য্যে সেটি কায়া লাভ করিতেছে। পথকে বাদ দিয়া বাড়ীর কথা ভাবিলে অলঙ্কারবিহীনা প্রতিমার কথাই মনে জাগিবে।

আমবাগান পার হইয়া তাহারা পুকুরপাড়ে আসিয়া পড়িল। পথে বালির রাশি, পুকুর কাটানর দিন হইতে সে বালি জমিয়াছিল—হয়তো কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে—আজও শেষ নাই। এখানকার বসতি কম, কাজেই

বাড়ী তৈয়ার করিতে অল্প লোকেরই বালির প্রয়োজন হইয়াছে, চাল-ছোলা ভাজিতে গৃহস্থের আর কতটুকু বালি লাগে?

পুকুরের শেষে পুনরায় আমবাগান—ঘন ভাঁটবনে ভরা বাগান। অজস্র সাদা ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধও বাহির হইতেছে। কিন্তু ঘনসন্নিবিষ্ট আমগাছ বলিয়া অন্ধকার এখানে গাঢ়তর। বাগানের এক পাশে 'খড়জলা' বাগানের উচ্চ প্রাচীর; কালের আঘাতে সে প্রাচীর কোথাও ভাঙিয়া পড়িয়াছে কোথাও সংস্কৃত হইয়াছে। অমিয়র সঙ্গীরা হাততালি দিয়া আমবাগানে প্রবেশ করিল।

সৌন্দর্য্য মানুষ কতক্ষণ উপভোগ করিতে পারে? অন্ধকার নামিয়া আসিলেই ভয়ের খাদ সেখানে আপনি মিশিয়া যায়। সবে শীত শেষ হইয়াছে, উপরে অন্ধকার, নীচে ভাঁটের ঝোপে হাঁটু অবধি ঢাকিয়া গিয়াছে—সাপের ভয়ে হাততালি না দিয়া অগ্রসর হইবার জো কি!

হাততালির সঙ্গে কথাও আরম্ভ হইল। সুরেন বলিল, "তুই ভাগ্যবান, অমিয়, এক কথায় চাকরি পেলি।"

পাঁচু বলিল, "রেল-আপিসে উন্নতি আছে, না? গ্রেড কত?"

"তা তো জানি না। এখন দেবে ত্রিশ, পরের কথা পরে।"

সুরেন বলিল, "আরম্ভটা কম। তা হোক, গুড্‌স কোচিং পাস ক'রে যদি ষ্টেশন-মাষ্টার হ'তে পারিস—"

অবনী বলিল, "তা হ'লে মাস গেলে চার-পাঁচ শ টাকা তোর দেয় কে।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "মাষ্টারি নয়, জমিদারি বল। এই তো সবে আরম্ভ, দেখা যাক।"

সুরেন বলিল, "হ্যাঁ, একবার যখন ছুঁচ হয়ে ঢুকেছিস, ফাল হয়ে বেরুতে কতক্ষণ! এ তো আমাদের মার্চেন্ট আপিস নয়, এক কথায় চাকরি যায়, এক কথায় মাইনে কমে। মন দিয়ে কাজ করবি, উন্নতি হবেই।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "বাঁধা কাজে মনোযোগের বালাই নেই, সুরেন। ও কলেজের পড়া নয়। কিন্তু ভাবছি চাকরি কি বরাতে সইবে?"

"কেন, কেন?" প্রায় সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিল।"

"যে ব্যাপার দেখি আপিসে—দলাদলি, রেষারেষি—"

সুরেন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই! দলাদলি রেষারেষি নেই কোথায়? আমাদের পাড়ায় নেই? আমাদের বাড়ীতে নেই? মায়ে বৌয়ে, জায়ে জায়ে? কংগ্রেসে নেই? ধর্ম্ম নিয়ে নেই? আরে, ইস্কুল লাইফেই কত মারপিট করেছিস, অমিয়—"

পাঁচু বলিল, "দলাদলি না থাকলে কি কাজে লাইফ আসে। অনেক কষ্টে চাকরি পেয়েছিস, তোর ওসব ভাবনা কেন রে?"

অবনী বলিল, "সে যদি বলিস, আমাদের পোষ্ট আপিসে কিছু কম। বছর বছর বাঁধা ইন্‌ক্রিমেন্ট, এক-শ ষাট অবধি চক্ষু বুজে চলে যাও,—কারও খোশামোদ নেই, চোখরাঙানির ভয় নেই।"

সুরেন বলিল, "হবে না কেন? তোমাদের ইউনিয়নটি কেমন!"

পাঁচু বলিল, "তা ছাড়া তোমাদের ডাইরেক্ট মনিবের সঙ্গে ব'সে কাজ করতে হয় না। সে আমাদের মার্চেন্ট আপিসে; সামান্য ভুলে যেমন ধমকায়, কাজের লোক হ'লে উন্নতিও আছে।"

অমিয় বলিল, "বাড়ী যাবার সময় আপিসের গল্প ভাল লাগে না, এখন বাড়ীর কথা বল। এবার খালে জল এসেছিল কেমন? খুব মাছ খেলেছিস তো?"

অবনী বলিল, "জল কোথায়! দিন দিন জমি উঁচু হয়ে উঠছে। জল যা-ও বা আসে, বেশী দিন থাকে না, বাঁধ না কাটালে পুকুরে নৌকা ভাসিয়েছি ব'লে মনে হয়।"

অমিয় বলিল, "খাল ভরাট হয়ে আসছে, আর বেশী দিন আমাদের ভাগ্যে নৌকা ভাসান চলবে না। আচ্ছা অবনী, কেউ যদি খাল কাটিয়ে গঙ্গাটিকে গ্রামের নীচে বার মাস বেঁধে রাখতে পারে?"

সুরেন বলিল, "তাহলে গ্রাম দেখতে দেখতে শহর হয়ে ওঠে। শুনেছিস তো, এখানে লাইট দেবার কথা হচ্ছে।

অমিয় বলিল, "হচ্ছে নাকি?"

অবনী বলিল, "জলের কলও হয়তো বসবে।"

অমিয় বলিল, "আমাদের দেশে তো বাড়ী বাড়ী পাতকুয়া, জলকষ্ট নেই, অথচ জলের কল হবে?"

পাঁচু বলিল, "হোক না, কত ছোটখাট অজ-পাড়াগাঁয়ে ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে, জলের কল হয়েছে, আমাদের এত বড় গ্রাম যে তিমিরে সেই তিমিরে!"

সুরেন বলিল, "রাস্তায় জল দেবার মোটর এসেছে দেখেছিস?"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "না, দেখবার সৌভাগ্য এখনও হয় নি, শুনেছি। গরিব দেশকে প্রাণপণে শহর বানাবার চেষ্টা চলেছে, শুনেছি। মোটরের খরচ কম নয়। তার পেট্রোল আছে; মাইনে-করা ড্রাইভার আছে, কল বিগড়োলে খরচ আছে। কিন্তু গরুর গাড়ী ক'রে জল দেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, তা খুব মন্দ ছিল ব'লে বোধ হয় না। খরচও তাতে কম ছিল হয়ত। গরিব গাড়োয়ানরা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কিছু কিছু পেত তো।"

সুরেন বলিল, "শহর যখন তৈরি হয়—তার ধুলোয়, তার ইট-কাঠে কত গরিবের বুকের রক্ত মিশে থাকে জানিস্? আমরা, যারা কিছু উপায় করি, তাদের আজীবন কাটে শহরে, উন্নতি বলতে শহরের আদর্শই আমাদের মনে পড়ে, তার জাঁকজমক সুখসুবিধা—"

পাঁচু বলিল, "তা পাড়াগাঁ যদি শহর হয়, মন্দ কি। সকলেই উন্নতি চায়।"

সুরেন বলিল, "চাইবে না কেন? এই ট্যাক্স দিতেই দশবার ঘটিবাটি নিলেম হয়, আরও উপসর্গ বাড়লে তো কথাই নেই। তবে বলতে পার, আমার পয়সা আছে, আমি কেন ওদের সঙ্গে অসুবিধা ভোগ করব? এত কাল কেরোসিনের আলোয় রাস্তা চলতে তোমার ভুল হ'ল না, আজ চাইছ বিজলী বাতি; এত কাল কুয়ো থেকে ঘড়া দিয়ে জল টেনে তুলেছ হাসি-মুখে, আজ বলছ, হাত ব্যথা করে; যে-পথ অনায়াসে পায়ের সাহায্যে শেষ করেছ, আজ গাড়ী না হ'লে চারদিক অন্ধকার দেখছ। দোষটা তোমার নয় পাঁচু, তোমার সুখসুবিধাবাদী মনের। শহরের কাজল প'রে চোখের দৃষ্টি তোমার আর এক দিকে অনুভূতি-প্রখর হয়েছে—আরামের দিকে।"

পাঁচু বলিল, "তোমার জড়বাদী মনের দোষ দিই নে, সুরেন, এই গাঁয়ে অনেক বুড়ো আছেন যাঁরা কিছু পরিবর্তন দেখলেই কেঁপে ওঠেন। নূতনের সব মন্দ, আর পুরাতনের সমস্ত ভাল—এই তাঁদের অভিমত। তাঁদের মতটাই তুমি প্রকাশ করছ।"

সুরেন বলিল, "আর আমি যদি বলি, প্রগতিবাদীদের মতে পুরাতনের সব কিছু মন্দ আর নূতনের সব কিছু ভাল, তাহলে তুমি কি উত্তর দেবে? পুরাতনকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া বা নূতনকে 'কিছু না' ব'লে পাশ কাটান, দুটোর মধ্যেই যুক্তির জোর যত না থাকুক, বুদ্ধির অহঙ্কার প্রবল। যে বুদ্ধিতে কল্যাণের অংশ কম, তা সব দিক্ দিয়ে সুফল প্রসব করে না।"

অবনী বলিল, "বড় রাস্তায় এসে পড়লাম, থাক্ তোমাদের তর্ক। এখন মুখ খুললেই ধুলো খেতে হবে।"

গোপালপুরের মধ্যে সারি সারি কুমোরের বাস। কলসী, নাদা, জালা, ইত্যাদি স্তূপীকৃত উঠানে সাজান রহিয়াছে। পোয়ানের চালাঘরের পাশে রাশীকৃত অড়হর, আস্‌শেওড়ার পালা, কুমোর কাঁচা হাঁড়ি সাজাইয়া পোয়ান ভর্ত্তি করিতেছে। এখানে কোঠা-ঘর কম, থাকিলেও সে ঘরে আড়ম্বর নাই। বড় রাস্তার উপর মাটির দাওয়াযুক্ত চালাঘর—কোনটি সংস্কার অভাবে শ্রীহীন, কোনটির বহু বৎসরের পুরাতন কালো খড় চাপ বাঁধিয়া খসিয়া পড়িয়াছে, আকাশ হইতে সূর্য্যদেব সেই ছিদ্রপথে গোলাকার রৌদ্ররেখা দিয়া মাটির দাওয়ায় আলিপনা আঁকিয়াছেন। অবস্থা যাহাদের অপেক্ষাকৃত ভাল, তাহারা নূতন ছাওয়া শ্রী-যুক্ত চালাঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাকু টানিতেছে। পঞ্চম দোলের দিন এই পাড়ায় যে অতিকায় গোপালমূর্ত্তির পূজা হয়, দোল আসিবার মাত্র কুড়ি দিন আছে, এখনও সেই অবিসর্জ্জিত সত্যযুগের মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। মূর্ত্তির মুখ নাই, হাত-পাও কিছু নাই—শুধু অড়হরের পালা দিয়া বাঁধা কাঠামোটি ও বুকের নীচে খানিকটা মাটি

এখনও পথিকের বিস্ময়কে জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই মূর্তির পাশ দিয়াই নূতন পুকুরের মধ্যে যাইবার পথ, এবং সেই পথটিই সংক্ষিপ্ত বলিয়া অধিবাসীরা ব্যবহার করে। আম ও নারিকেল বাগানের মাঝখানে নাতিবৃহৎ একটি পুকুর—কোন্ যুগে প্রথম কাটা হইয়া "নূতন" আখ্যা লাভ করিয়াছিল—আজিও ভাঙা ঘাটের চাতালে শ্যাওলা জমিয়া ও আবাঁধা পাড়ের মাটি ধ্বসিয়া সেই অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের 'নূতন' নামটি তাহার অক্ষুণ্ণ আছে। পুকুরের সঙ্গে যে আমগাছ জন্মলাভ করিয়াছিল, যে নারিকেলকুঞ্জ চিক্কণ পত্রে আতপ-তাপে-ক্লান্ত পথিকের মনে একই সঙ্গে শ্রান্তি দূর করিত ও সৌন্দর্য্যবোধ জাগাইয়া দিত—আজ তাহারা কালের স্রোতে বিরল-পত্র ও সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট হইয়াছে; তাহাদের বৃক্ষদেহেও জরা পরিস্ফুট। পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঘন বেণুকুঞ্জের ছায়াভরা কোলে ভগ্ন ভ্রষ্ট ইটকস্তূপে বিশৃঙ্খল সমাধি-গুলিও পুঞ্জীভূত বালুস্তরে অন্ধকারে ক্রত ঢাকিয়া যাইতেছে।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ওটি কি? বাঁশবনের কট্-কট্ ধ্বনি ও বায়ুর সন্‌সনানির সঙ্গে এ যুগের মানুষ উত্তর দিবে—'জানি না'।

যে-যুগের সমাধি—ঐ সব অতিপুরাতন পাতলা ইটক-খণ্ডে খেলাঘরের মত করিয়া সেকালের মানুষ গড়িয়া-ছিল—সেকালের শোকব্যথাতুর চিত্তে যাহাদের প্রিয় স্মৃতি পলাতক প্রেমে ও ক্ষণস্থায়ী স্নেহে এই বিলাপ-মুখরিত বেণুকুঞ্জের মতই নিয়ত মুখরিত হইয়া উঠিত—যাহারা দীপ জ্বালিয়া, মালা দোলাইয়া, অশ্রু বর্ষণ করিয়া, নীরবে এই নগণ্য সমাধিকে আপন জনের মত ভালবাসিত, ইহার অঙ্গ মার্জ্জনা করিত, আপনাদের অন্তরস্থিত প্রেম ও স্নেহে সিক্ত করিয়া ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিত—তাহাদের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে অনামী সমাধিও মহিমা হারাইয়াছে।

বেণুবনে অহরহ হা-হা স্বরে একই প্রশ্ন বহিয়া যাইতেছে, কে ছিল ইহারা? কে ছিল ইহারা?

প্রত্যুত্তরে চিরমৌন কালের ইঙ্গিত উপরে নক্ষত্রপুঞ্জের পানে একবার, নিম্নে স্তূপীকৃত বালুরাশির উপর আরবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। সমাধির অগণিত বালু, আকাশের সংখ্যাহীন নক্ষত্র এবং পৃথিবীর অযুত কোটি মানুষকে চিহ্নিত করিয়া রাখা কি এতই সহজ?

৭

সমাধি ও বাঁশবন পিছনে ফেলিলেই লোকালয়। প্রকৃতি এখানে মানুষের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। বন কাটিয়া যাহারা নানা ভাবে ইটকস্তূপ সাজাইয়াছে, তাহারা নিজের খেয়াল ও নিজের রুচিকেই মাত্র প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের বিভিন্নতর সৌন্দর্য্যজ্ঞানের (?) মধ্যেই সামঞ্জস্যের অভাব। এমন নীচু ছোট ঘর, পর্দ্দা রক্ষার অছিলায় জানালার কার্পণ্য, নেড়া ছাদ এবং বাড়ীর উঠান ঢাকিয়া অতি অখ্যাত আম, কাঁঠাল বা সজিনা গাছ আর কোথাও দেখা যায় না। যাহারা নূতন বড়লোক হইয়াছে তাহাদের লাল রঙের ত্রিতল দরিদ্র প্রতিবেশীর ইট-বার-করা অর্দ্ধভগ্ন বাসগৃহের পাশ দিয়া সোজা উপরে উঠিয়াছে। মোড়ের মাথায় ছোট একটি মুদীখানা; কয়েকটি কাঠের খুপরিতে চাল ডাল ইত্যাদি সাজান, খরিদ্দারের প্রত্যাশায় মুদী নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়া আছে। প্রশস্ত রোয়াকে জনকয়েক যুবক ও বৃদ্ধ মিলিয়া দশ-পঁচিশ খেলিতেছে; নারিকেল-মালার মধ্যে কড়ি পুরিয়া দেওয়াল ঠাসান পিঁড়িটার উপর সবেগে আছড়াইয়া দান ফেলিতেছে এবং ঘুঁটি মার পড়িলে হৈ হৈ শব্দে পাড়া মাতাইয়া তুলিতেছে। মুদী ক্রেতার অভাবে খেলাতেই মনঃসংযোগ করিয়াছে।

রাস্তায় হাঁটু-ভর ধুলা, পথহাঁটার ক্লান্তিও স্বেদসিক্ত ললাটে ফুটিয়াছে; এক পাশে মণ্ডলদের মজা পুকুর ও অন্য পাশে বস্তিভায়ন মসজিদের সুরম্য চত্বর পিছনে ফেলিয়া তাহারা ক্রত নূতন হাটের মধ্যে আসিল। কাল রবিবার, হাট বসিবে। আজ শূন্য চালা ক-খানি খাঁ খাঁ করিতেছে। কাল এ-পাশের রাস্তা অসংখ্য বিচালীর গাড়ীতে ভর্ত্তি হইয়া যাইবে, ও-পাশের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ছাগল, মোরগ ও গুড় ইত্যাদিতে ভরিয়া উঠিবে, মাঝখানে শাকসব্জী ও মাছের বাজার। জনতা ঠেলিয়া বাজার করাই মুস্কিল ব্যাপার। এত বড় হাট—এই গ্রামে কেন, শহরেও কম আছে। গৃহস্থের নিত্য

প্রয়োজনীয় বহু প্রকারের জিনিষ এই হাটে আমদানি হয়। হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল চাষী ছাড়া অসংখ্য গরিব অনাথা শাকসব্জী বহিয়া আনে। কেহ ঘরের কানাচে যে ওল হইয়াছে তাহার গোটাকতক তুলিয়া, সজিনার ডাঁটা দু-এক বোঝা লইয়া, পথে আসিতে আম-বাগান হইতে কিছু আম, কোন গৃহস্থ-বাড়ী হইতে দু-চারটি লেবু—কিছু পেঁপে, চালের কুমড়, পুকুরের কলমী শাক, ইত্যাদি পাঁচ রকমে ঝুড়ি ভর্ত্তি করিয়া বাজারে বেসাতি করিতে আসিবে। দরদস্তুর করিতে ইহারা পরিপক্ক নহে, আর পাঁচ জনের দেখিয়া জিনিষ বেচে এবং একসঙ্গে বেশী জিনিষ বেচিয়া কম পয়সা লইয়া হিসাব ভুল করে।

কোন ভদ্রলোককে দেখিলে সবিনয়ে বলিবে, "হ্যাগো ছেলে, এ আনিটা চলবে তো? এক পয়সায় দুটো পেঁপে হ'লে বারটা পেঁপের দাম কি চার পয়সা হয়? হয় না? ওমা, ঐ মিন্‌সেটা আমায় ঠকিয়েছে তাহলে।"

যাহারা হাট জমা লইয়াছে তাহারা জুলুম করিয়া ইহাদের নিকট হইতে বেশী জিনিষ এবং ভাল জিনিষ আদায় করে। দানদার আসিলেই ইহারা ময়লা, ছেঁড়া আঁচল ঝুড়ির উপর ঢাকিয়া দু-হাত এবং বুক তাহার উপর রাখিয়া মিনতি করে, "ওগো, আজ জিনিষ কম আছে, কম ক'রে নাও।" দানওয়ালা তাহার আঁচল ও হাত সজোরে সরাইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলে, "সর্, মাগী সর্। গেল হাটে বড় ফাঁকি দিয়েছিলি যে! হাটে বসলে দান দিতে হয়, জানিস্ না?"

বিক্রেত্রী ক্রন্দনের সুরে বলে, "এই তো দু-মুঠো কলমী, তোমার দান দিলে আমার পেট চলবে কিসে?"

কিন্তু সেই দু-মুঠা কলমী শাকের এক-চতুর্থাংশ যখন দানওয়ালা উঠাইয়া লয় তখন ক্রন্দনপরায়ণা গালি দিয়া সান্ত্বনা লাভ করে,—"মর্ হতভাগা মিন্‌সে, যম তোমায় নেয় না!"

হাট পার হইবার সময় সামান্য ও সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র পাঁচ বন্ধুরই মনে জাগিয়া উঠিল। কাল হাট করিতে আসিয়া আরও কত জিনিষের আস্বাদ লাভ করিতে হইবে।

ইস্কুল ছাড়াইলেই গড়ের বাজার; এইখানটায় পল্লীর প্রাণস্পন্দন কিছু অনুভূত হয়। অন্ধকার রাত্রিতে পথ এখানে অদৃশ্য হয় না, গভীর রাত্রিতেও কোলাহল এখানে স্তব্ধ হইয়া যায় না। মুদী-দোকানের দরজা বন্ধ হইলেও ময়রা-দোকানের ঝাঁপ খোলা থাকে; বৃহৎ কড়ায় তাড়ু দিয়া ময়রা রস তৈয়ারী করে; কখনও বা সন্দেশ-রসগোল্লার খোলা নামায়। পান সিগারেট বিড়ির দোকানে সন্ধ্যাবেলাতেই ভিড় জমে বেশী, দরজীর দোকান অল্প রাত্রিতেই বন্ধ হইয়া যায়। চার-পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে দলে দলে গোয়ালা আসে ছানা বিক্রয় করিতে। সন্ধ্যামুখে ছানা বেচা শেষ করিয়া, মুদীখানায় জিনিষ কিনিয়া, ময়রা-দোকানে কিছু জলযোগ করিয়া কালিপড়া লণ্ঠন জ্বালিয়া আট-দশ জনে গল্প করিতে করিতে চার-পাঁচ ক্রোশের উদ্দেশে পাড়ি দেয়।

সন্ধ্যা এখনও হয় নাই, ময়রা ও গোয়ালার দাম ও ওজন লইয়া বচসাও বাধে নাই, বিড়ির দোকানে অস্ফুট গানের কলি এবং দরজির দোকানে মেশিনের খটাখট্ শব্দ শুধু বাজারের সম্মান বজায় রাখিতেছে।

বাজারের মোড়ে আসিয়া পাঁচ বন্ধু বিভিন্ন রাস্তা ধরিল। কেহ গেল বিশ্বাসপাড়ার রাস্তায়, কেহ তাম্বলীপাড়ায়, কেহ মুনসীপাড়ায়, কেহ বা ছুতার-পাড়ায়। ছুতারপাড়া ছাড়াইয়া অমিয় যাইবে দক্ষিণ-পাড়ায়—পল্লীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে। কিন্তু পরিচয় আরম্ভ হইল গড়ের বাজারের মোড় হইতে। বিড়ি-দোকানের সম্মুখে কাঠের বেঞ্চে বসিয়া রোহিণী দাস কেরোসিন তৈল ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিক্রয় করিতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে ভাল তো? অনেক দিন পরে—"

অমিয় হাসিমুখে বলিল, "ভাল। তোমার খবর সব ভাল তো, দাদা!"

জিজ্ঞাসার সঙ্গে অমিয় অনেকখানি পথ অতিক্রম করিয়াছে; সুতরাং রোহিণী দাস সে-কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া কেরোসিন তৈল বিক্রয়ের পরমুহূর্ত্তেই ছোট্ট জলের ঘটিটি কাৎ করিয়া একটু হাত ভিজাইয়া লইয়াই

হোমিওপ্যাথির বাক্স খুলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দরিদ্রা স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বোল বার দাস্ত হয়েছে? গা বমি-বমি আছে? আচ্ছা, পয়সা একটা আর শিশি।"

ছুতারপাড়ায় দেখা কুঞ্জ দাসের সঙ্গে। প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের তলায় বসিয়া সে তখন গরুর গাড়ীর চাকা তৈয়ারী করিতেছে। হাতের বাটালি ও মুগুর মাটিতে রাখিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া সে বলিল, "ভাল তো ঠাকুর, প্রণাম।"

অমিয় দ্রুত অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "ভাল, তুমি ভাল তো?"

কুঞ্জ বলিল, "আর ভাল, জ্বর, রক্ত-আমাশা—"

অমিয় ততক্ষণে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, কুঞ্জ বাটালি তুলিয়া মুগুরের ঘা লাগাইতে লাগাইতে আপন মনেই বলিল, "ঠাকুরের চাকরি হয়েছে বোধ হয়।"

বাড়ীর কাছে আসিয়া মন বড় চঞ্চল হইতেছে অমিয়র। কতক্ষণে মোড় ফিরিতেই উঠানের আম-গাছটি তাহার নজরে পড়িবে, বৈশাখে যে-গাছের আম পাকে, এখন নিশ্চয়ই বড় বড় গুটি হইয়াছে। মা হয়তো দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া আছেন, আর এক জন ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া পথের পানে চোখ-কান পাতিয়া রাখিয়াছে। রবি গরুটা এখনও মাঠ হইতে ফিরে নাই। বর্ষাকালে যে বেলফুলের চারাগুলি সে পুঁতিয়াছিল সেগুলিতে কি কুঁড়ি ধরিয়াছে? রোয়াকের ধারে হাসনাহানার গাছটি যদি আজ রাত্রিতে ফোটা ফুলের গন্ধে ঘর মাতাইয়া দেয়। এক পাটি টগরের সাদা মালা গাঁথিয়া কেহ কি চৌকির উপর রাখতে ভুল করিবে?

দরজার গোড়ায় মা দাঁড়াইয়া ছিলেন।

অমিয় তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার পায়ে মাথা নামাইল। ষ্টেশন হইতে বাড়ী সার্দ্ধ দু-মাইল পথ; দু-ধারে তার যত কিছু সৌন্দর্য্য, যত কিছু প্রশ্ন, যত কিছু আশা ও আনন্দ—সবতই পরিপূর্ণ হইয়া প্রণামে রূপান্তরিত হইয়া গেল। নির্ব্বাক্ আনন্দে মা কোন প্রশ্ন করিলেন না ছেলেকে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, ছেলেও অনাবশ্যক প্রশ্ন করিয়া মায়ের মহিমা হ্রাস করিল না।

অমিয়দের বাড়ী খুব প্রকাণ্ড নহে, বনিয়াদীও বলা চলে না; যদিও খুব পুরাতন সেকালের পাতলা ইট-কাদার গাঁথুনিতে তোলা নাতিউচ্চ তিনখানি ঘর, পিছনে অর্থাৎ উত্তর দিকে একটিও জানালা নেই, দক্ষিণমুখী বলিয়া ঘরে আলো হাওয়ার অপ্রতুলতা হয় না। ঘরের সামনে হাত দুই চওড়া রোয়াক আছে; বারান্দা নাই। রোয়াক এবং ঘরের মেঝেতে খোয়া উঠিয়াছে। সুরকির মেঝে—শত বর্ষের উপর হইল কত মানুষের পদাঘাত ও পীড়ন সহিয়া শ্রী হারাইয়াছে। জানালার কাঠের চৌকা গরাদে, কপাটগুলি বাঁকিয়া গিয়াছে, শীতের দিনে চটের পর্দা না টাঙাইয়া দিলে হিম নিবারণ হয় না। দু-বার কপাট বদলান হইয়াছে বলিয়া দুয়ারের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল; কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও বালির জমাট নাই। আলকাতরামাখান আড়া-বরগাগুলি উইয়ে খাইয়া ফেলিয়াছে, কোথাও ন্যাকড়া গুঁজিয়া, কোথাও বা নূতন বরগা ঠেকা দিয়া ঘরের ছাদটিকে অনিবার্য্য পতন হইতে রক্ষা করা হইতেছে। ঘরের দেওয়ালে অসংখ্য পেরেক পোঁতা; কোথায় পুরাতন ক্যালেণ্ডারের বিবর্ণ ছবি, কোথাও চন্দনযাত্রা, দশহরা, প্রভৃতির মেলায় কেনা রামরাজা, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালীর পোকায়-কাটা ছবি টাঙান আছে। কড়ি হইতে নারিকেল-কাতার দড়ি দিয়া বাঁধা বাঁশের আলনা ঝুলিতেছে। বিছানা এবং কাপড়ে সেটি কড়ি স্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেছে। তাছাড়া ঘরে পুরাতন তক্তাপোষখানি পাতা আছে, ডবল টিনের ট্রাঙ্ক, কাঠের সিন্দুক, বাক্স প্রভৃতিও বর্ত্তমান। তক্তপোষের তলায় কিছু আলু কেনা রহিয়াছে; তাহার পাশে কয়েকটি গঙ্গাজল পরিপূর্ণ ঘড়া, এবং ঠাকুর-পূজায় ব্যবহৃত পিতলের থালা বাসন ছোট একখানি জলচৌকির উপর সাজান রহিয়াছে। দারিদ্র্য সুপরিস্ফুট হইলেও এটি যে ভক্তিমান বাঙালীর সংসার তাহার পরিচয় সর্ব্বত্র লেখা রহিয়াছে।

মা ভাঁড়ার-ঘরে ছেলের জন্য জলখাবার সাজাইতে গেলেন। ছেলে বিশ্রাম না করিয়া রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"হ্যাঁ মা, এবার গাছে আম হয় নি তো? কুয়ো হয়ে সব বোল পুড়ে গেছে বুঝি? পাতিলেবু গাছটায় ফুল ধরেছে? সত্যি," বলিয়া এক লাফে রোয়াক হইতে

নামিয়া কুয়োতলায় গিয়া দাঁড়াইল। মা জলখাবার গুছান শেষ করিয়া অমিয়র পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অমিয় ফুল গুনিতে লাগিল, "একটা, দুটো, তিনটে,... কুড়ি-পঁচিশটার বেশী লেবু এবার হবে না। কিন্তু একটা ভুল হয়েছে, মা। গাছটা আর একটু সরিয়ে পুঁতলে কুয়োটা অন্ধকার হ'ত না।"

মা বলিলেন, "বাঁশ দিয়ে বেঁধে দিলেই হবে। দেখেছিস এবার কাঁঠালের ফলন?"

অমিয় খুশীভরা কণ্ঠে কহিল, "বারে, মাটি ফুঁড়ে এঁচড় বেরিয়েছে যে! গাছের আর কোথাও বাকী নেই, কতগুলো হবে?"

মা খুসীভরা কণ্ঠে কহিলেন, 'আমি গুনলাম দেড়শ, বৌমা বলে—একশ বাট।"

অমিয় বলিল, "আচ্ছা, আমি গুনছি—"

মা বাধা দিয়া বলিলেন, "তার আগে হাত-মুখ ধুয়ে জলটল খেয়ে নে, অমু।"

অমিয় অবাধ্য ছেলের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, আগে কাঁঠাল গুনি—এক, দুই, তিন,..."

মা হাসিয়া বলিলেন, "পাগলামি দেখ!"

অমিয় হাসিতে হাসিতে উচ্চকণ্ঠে গণনা-কার্য্য শেষ করিয়া বলিল, "তোমরা দুজনেই হেরে গেছ মা, এক-শ পঞ্চান্নটা হ'ল।"

মা বলিলেন, "আয়, খাবি আয়।"

অমিয় সজিনা গাছের পানে চাহিয়া বলিল, "এবার ডাঁটা হবে মন্দ নয়। কতকাল যে খাই নি ডাঁটা-চচ্চড়ি, কাল রাঁধবে তো মা?"

"রাঁধব। পেড়ে দেবার লোক অভাবে আজ রাঁধতে পারি নি।"

"পেড়ে দেবার লোক নেই? বারে, দাও তো দাখানা। চট ক'রে দুটো ডাল কেটে দি।"

"কি পাগল, দেখ। ভরসন্ধ্যেবেলায় উঠবেন গাছে! কাল সকালে হবে। আয় খাবি আয়।"

অমিয় বলিল, "গাছে ডুমুর হয়েছে তো? কাল ডুমুরের ডালনা রেঁধ, মা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুই আয়।"

"রবি বুঝি এখনও মাঠ থেকে ফেরে নি?"

"সন্ধ্যে উৎরে গেলে ফিরবে। এবার তার কি বাছুর হয়েছে বল দেখি?"

"নিশ্চয়ই নই বাছুর।"

মা হাসিলেন।

"ক-সের ক'রে দুধ দিচ্ছে?"

"দুধ এক টানে দু-সের দেয়।"

"ঘি করেছ ঘরে? কাল তাহলে এক গ্লাস ঘোল খাব কিন্তু।"

"তা খাস্। এখন কিছু জল খাবি আয়"।

মা জলখাবার সাজাইয়া সম্মুখে বসিলেন। অমিয় খাইতে খাইতে গল্প জুড়িয়া দিল।

"বেল কোথায় পেলে মা? পেঁপে, গাছের বুঝি? এই যে দুধের ক্ষীরও করেছ? আচ্ছা মা, তুমি কি ক'রে জানলে আজ আমি বাড়ী আসব—তাই এত সব জোগাড় করেছ?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "ক'শনিবার থেকেই মনে হচ্ছে তুই আসবি। আজ হাত থেকে জলের ঘটি পড়ে গেল, চাকা পাখীও ডেকে গেল। আমি বৌমাকে বললাম, 'আজ অমু নিশ্চয়ই বাড়ী আসবে।' ও তো হেসেই খুন। বলে, 'মা আপনি ক'টা শনিবারই, আসবেন-আসবেন করছেন, উনি কিন্তু আসছেন না।' গেল বারে হাত থেকে ঘটি পড়েছিল কিন্তু পাখী ডাকেনি। এতখানি ক্ষীর তৈরি করে শেষে মনো ঠাকুরকে দিয়ে আসি।"

"তোমরা খেয়ে ফেললে না কেন?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোর মুখের আশার জিনিষ খাব আমরা! শোন অনাছিষ্টি কথা। বামুনকে দিয়ে দিলাম—তবু সার্থক হ'ল।"

অমিয় বলিল, "আচ্ছা মা, ছেলের মুখের জিনিষ বামুনকে দিয়ে খুব তৃপ্তি পেলে?"

মা বলিলেন, "দেবতা-বামুনকে দেওয়ায় পুণ্যি হয়, একথা মানিস তো?"

অমিয় বলিল, "তাই বল! যেমন আশায় বঞ্চিত হলে অমনি পুণ্যসঞ্চয়ের নেশা চাপল! কোনটা বেশী মা? স্নেহটা, না পুণ্যটা?"

মা কৃত্রিম রোষে মুখ ভার করিয়া বলিলেন,"জানি না।

"আহা, রসগোল্লাটা খেয়ে নে, ও-বাড়ীর সরসী তুই খাবি ব'লে দিয়ে গেছে।"

"সরসীদিরও কি পুণ্যসঞ্চয়ের নেশা চেপেছে মা ?"

"পাড়াপড়শীরা এমন দেয়। তোদের কালে কি হবে জানিনে, আমাদের সময়ে যখন নূতন বউ হয়ে এই ভিটেয় এলাম, তখন পনর দিন ধরে বাড়ীতে পাত পাতি নি, জানিস ?"

"বল কি মা, পনর দিন ধরে তুমি নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়িয়েছিলে ? তোমাদের কাল নিশ্চয়ই সত্যযুগের কাছাকাছি ছিল ?"

"রসগোল্লাটা খেলি যদি, নারকোল-নাড়ুটা রাখলি কেন ? ওটা—"

"বুঝেছি, বুঝেছি, ওটা আর এক জন পুণ্যপ্রয়াসী মহিলার দান।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোদের শহরে বুঝি সাধু ভাষায় সব কথা কয় ?"

অমিয় বলিল, "কেন, মিষ্টি নয় এ ভাষা ? না, বুঝতে পার না ?"

মা নিরুত্তরে অমিয়কে আর এক গ্লাস জল ঢালিয়া দিয়া উদ্দেশে বলিলেন, "শাঁখটা বাজিয়ে সন্ধ্যেটা দেখাও, বৌমা। তার আগে দুয়োরে গঙ্গাজল দিও।"

মুখ-হাত ধুইয়া অমিয় তক্তাপোষের উপর বসিতেই মা আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "যে দেখি গোটা চারেক টাকা—ঠাকুর-দেবতার নামে মানত করেছি। আসছে মঙ্গলবার বাকৃদেবী তলায় যাব, ষোল আনা পুজো মানত করেছি।"

অমিয় বলিল, "বাকৃদেবী তলায় পাঁঠা দিয়ে পুজো দেবে তো ?"

মা বলিলেন, "না, মায়ের পুজোয় বলিদান আমি ভালবাসি না।"

অমিয় সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি মা—আমরা তো বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক নই।"

"যে-মন্ত্রেরই উপাসক হই না কেন—ছাগল-বলির মানত আমি কোন দিন করি নি।"

অমিয় বলিল, "শুধুই বাকৃদেবীর পুজো দেবে ?"

মা বলিলেন, "তা কেন। গড়ের বাজারের সিদ্ধেশ্বরী আছেন, তাঁর কাছে একদিন পালুনি করব, সত্য-নারায়ণের পুরো সিন্নি দেব—"

অমিয় বলিল, "পালুনি কি মা ?"

মা বলিলেন, "সমস্ত দিন উপোস করে ঠাকুরের পুজো দিয়ে তাঁর মন্দিরে বসে চালতাজার ফলার খাব।"

অমিয় বলিল, "আর দশ-বার দিন পরে বাকৃদেবী-তলায় যেও, এখন আমার হাতে টাকা তো নেই।"

মা বলিলেন, "তখন অন্ধকার পড়বে; শুক্লপক্ষ না হ'লে যাওয়া হবে না। কিন্তু টাকা নেই কেন ?"

অমিয় বলিল, "এই তো সবে পাঁচ-ছ দিন হল আপিসে ঢুকেছি, মাইনে পেতে দেরী আছে।"

"তাই বল,—আমি এটা ওটা কত কি কিনব মনে করে রেখেছি যে।"

অমিয় বলিল, "আমার যদি চাকরি না হ'ত, তা হলে এটা ওটা কিনতে কি দিয়ে ?"

মা বলিলেন, "না হওয়ার কথা পরে—হ'লেই লোকে আশা করে। এই যে সেদিন ভোঁদার মা এসে বললে, 'ঠাকুরঝি, তোমার অমিয়র চাকরি হ'লে বৌয়ের হাতে দু-গাছা রুলি গড়িয়ে দিও—অমন গোলগাল হাত খালি খালি কেমন দেখায়।"

অমিয় বলিল, "এই ভাঙা ঘরে রুলি হাতে দিয়ে ঘোরাফেরা করলে কেমন দেখাবে মা ?"

মা কৃত্রিম কোপকটাক্ষে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভাঙা ঘর কি কারও চিরকাল থাকে। ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন তখন সবই হবে।"

অমিয় অত্যন্ত সন্তর্পণে একটি নিশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মা তাহার পরিবর্তিত মুখভাব দেখিতে পাইলেন না।

সহসা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "যাই, রান্না চড়াবার উদ্যোগ করিগে। ভাত খাবি না, রুটি ?"

অমিয় বলিল, "রুটি আমি কোন কালে খাই ?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "না, তাই জিজ্ঞেস করছি।

কলকাতায় এক বেলা রুটি খাওয়া নাকি রেওয়াজ। ভোঁদার মা বলে—ভোঁদা বাড়ী এলে ভাত দেখলে জলে যায়।"

অমিয় বলিল, "ভোঁদা নিশ্চয়ই বেরিবেরিতে ভুগছে।"

মা সবিস্ময়ে বলিলেন, "বেরিবেরি কি?"

অমিয় বলিল, "সে তুমি বুঝবে না, রাজসিক নূতন রোগ একটা। ভেতো বাঙালীর বদনামটা ওই রোগের দ্বারাই কাটবে।'

অমিয় চটি পায়ে দিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় দুয়ারের কাছে অবগুণ্ঠিতার মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল, "এখনি বেরুচ্ছ? দাঁড়াও।" বলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সে অমিয়র পায়ের তলায় নতজানু হইল।

অমিয় হাসিয়া চটিজুতা খুলিয়া তক্তাপোষের উপর গিয়া বসিল, এবং বলিল, "অনেক দিন পরে বড্ড নতুন হয়ে এসেছি, নয়?"

"নূতনই তো।" বলিয়া দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অমিয় পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আশার পানে চাহিল। সঙ্কোচে ও লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গে তাহার নূতন শ্রী ফুটিয়াছে। কাপড়খানি সে ফর্সাই পরিয়াছে, পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিয়াছে ও কপালে খয়েরের টিপ দিয়াছে। চুল বাঁধার ফ্যাশানটি নবতর না হইলেও সুষ্ঠু রীতি লক্ষ্য করা যায়। পরিপূর্ণ আলোকে এই শ্যামলা মেয়েটিকে হয়তো সুশ্রী বলিতেও বাধিবে, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে, ম্লান প্রদীপ-শিখার নিকটবর্ত্তিনী হইবামাত্র এই ভগ্ন গৃহের মধ্যে তাহার সৌন্দর্য্যের একটি প্রফুল্ল প্রকাশ, চক্ষু এবং মনকে একই সঙ্গে অভিভূত করে বইকি! সূর্য্যোকরোজ্জ্বলদীপ্ত আকাশের সৌন্দর্য্য ও মেঘলা দিনের মাধুর্য্য দুই-ই মন ভোলানর খেলা জানে।

অমিয়কে নিরুত্তরে চাহিতে দেখিয়া আশা মৃদুস্বরে বলিল, "কি দেখছ অবাক হয়ে?"

অমিয় বলিল, "দেখছি তোমায়।"

আশার কর্ণমূলে এক ঝলক রক্ত জমিল, মুখ নামাইয়া সে বলিল, "যাও, দুষ্টুমি করবার আর জায়গা পেলে না!"

অমিয় চৌকি হইতে উঠিয়া আশার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "সত্যি, জায়গা কোথাও পাই নি।" বলিয়া আশার একখানি হাত নিজের হাতের উপর টানিয়া লইল। আশা নিরাপত্তিতে হাতখানি অমিয়র হাতে তুলিয়া দিল।

অমিয়র তরুণ চিত্তে অলক্ষ্যে ঈষৎ অতৃপ্তির ছায়াপাত হইল। আশার মধ্যে চাঞ্চল্য কই? সে হাত ধরিবার কালে দূরে সরিয়া গেল না কেন? এতদিন পরে দেখা—লীলাকৌতুকে সে-দেখার তৃষ্ণা স্পর্শের বারিবিন্দু না পাওয়া পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবেই সে দেখার সৌন্দর্য্যকে আশা রূপ দিতে কার্পণ্য করিল কেন? অত্যন্ত সহজ হইয়া অত্যন্ত সুকোমল বৃত্তিকে আশা অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া দিল!

চুপ করিয়া থাকা অশোভন বলিয়া অমিয় তক্তাপোষের উপর বসিয়া আশার হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সত্যি, সোনা না হ'লে এ-হাত মানায় না।

আশা কৌতুকভরা কটাক্ষে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিল "এবার তো চাকরি হয়েছে, এ-হাতে সোনা না ওঠার দুঃখু আর থাকবে না।"

আবার আশার অজ্ঞাতে অমিয় বুকের মধ্যে নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল।

চাকরি যেন সুন্দর একটি চাঁদিনী রাত্রি; যে-রাত্রিতে কঠিন বাস্তব নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া সুন্দর স্বপ্নের জাল বোনা চলিতেছে! অমিয়কে মা এবং আশা এই স্বপ্নময় রাত্রির কথাই বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কলিকাতার কথা এখন থাকুক, নূতন আনন্দের বন্যায় বিষাদের বালুস্তূপ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে—বন্যার জলে গা ভাসাইয়া দেওয়া মন্দ কি!

অমিয় বলিল, "নিশ্চয়ই দুঃখমোচন হবে বইকি। তবে কিছু বিলম্বে!" বলিয়া আশাকে আকর্ষণ করিয়া বক্ষোলগ্ন করিল।

আশা অতি আনন্দে চক্ষু মুদিয়া বলিল, "কত মাইনে হ'ল?"

অমিয় বলিল, "শুনলে তুমি সোনার স্বপ্ন হয়তো দেখবে না।"

বক্ষোলগ্ন মুখ উত্তোলন করিয়া আশা চক্ষু চাহিয়া বলিল, "সোনার স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর আমার কাজ নেই বুঝি?"

অমিয় বলিল, "কাজ আবার নেই! ঘর ঝাঁট, বাসন মাজা, গোয়াল পরিষ্কার—"

আশা অমিয়র হাত ছাড়াইবার প্রয়াসে কহিল, "ছাড়, ছাড়, আর ঠাট্টার কাজ নেই।"

অমিয় এতক্ষণ যেন হারানো সৌন্দর্য্যকে ফিরিয়া পাইল। আশার দুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া নিবিড়ভাবে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং তাহার মুখের অতি সন্নিকটে মুখ নামাইয়া আনিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে তুমি জোরে পার?"

আশা উত্তর না দিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিল। এই মুহূর্ত্তকে প্রাণবান করিয়া তুলিতে একমাত্র নীরব থাকা ছাড়া অভিধানের কোন প্রিয় সম্বোধন বা বচন-বিন্যাসের কোন সুষ্ঠু রীতি আশার জানা নাই।

ক্রমশঃ

আগা-খানি হীরালালের কাণ্ড

ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত বেসিন শহরে, অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মদেশের মধ্যে দ্বিতীয় বাণিজ্য-বন্দরে, গত মে মাসে এক অতি বিস্ময়কর ও অভিনব ঘটনার সমাপ্তি হইয়াছে। এই ঘটনাটি সুদূর ব্রহ্মদেশের এক শহরে ঘটিয়া থাকিলেও ইহা হিন্দু- বা মুসলমান- নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ অর্থপূর্ণ ব্যাপার। নয় মাস যাবৎ এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ব্রহ্মবাসী সকল জাতির মধ্যে বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল।

ব্রহ্মপ্রবাসী বিশিষ্ট ভারতবাসীদের মধ্যে খ্যাতনামা সিংহ-পরিবার অন্যতম। শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহ সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি সুবক্তা, পারদর্শী, নির্ভীক এবং জনপ্রিয়। পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরুকে শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহই বেসিনে লইয়া যান এবং বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়াও তিনি অল্প সময়ের মধ্যে শৃঙ্খলার সহিত ও সুচারুরূপে পণ্ডিতজীর সংবর্দ্ধনার আয়োজন করিয়া নিজের কার্য্যদক্ষতার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

ইংরেজী ১৯৩৭ সালে বেসিন শহরের মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। এই মিউনিসিপ্যালিটিতে দুইটি আসন মুসলমানদের জন্য এবং অপর দুইটি আসন হিন্দু ও অ-মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। বহু বন্ধুবান্ধবের পীড়াপীড়ি ও বিশেষ কোন কারণ বশতঃ অনিচ্ছাসত্ত্বেও হিন্দু ও অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত সিংহ নির্ব্বাচনপ্রার্থী হন। শ্রীযুক্ত সিংহ ছাড়াও আরও চারি জন—তিন জন গুজরাতী ও এক জন মহীশূরবাসী—এই নির্ব্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। মনোনয়ন-পত্রের চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন ছিল ১৯৩৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। সেই দিন শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহ মহাশয় এই নির্ব্বাচনে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এক হিন্দুনামধারী গুজরাতী জুয়েলারের বিরুদ্ধে এই বলিয়া এক আবেদন পেশ করেন যে উক্ত ব্যক্তি—হীরালাল—আগা খাঁর শিষ্য ও অনুগামী এবং সেই

কারণে মুসলমানী আইন-পুস্তক অনুসারে তাহাকে খোজা ইসমাইলী মুসলমান ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কারণ মুসলমানী-আইন-গ্রন্থকারেরা, যথা—আমীর আলি, মোল্লা, তায়েবজী, উইলসন প্রভৃতি সকলেই আগা খাঁ-পন্থীদের খোজা মুসলমান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আইনের সম্পূর্ণ অনুমোদনে। ঐ আপত্তি-পত্রে আরও দেখান হইয়াছে যে, গত ২৪ বৎসর যাবৎ ঐ ব্যক্তি শুধু যে আগা খাঁ-পন্থী এমন নহে—সে বেসিনস্থ আগা খাঁ-পন্থী সকল খোজা মুসলমানের মুখী (Mukhi) এবং সেখানকার শিয়া ইমামী ইসমাইলী খোজা জমায়েৎ-এর প্রধান। সে আজীবন আগা খাঁকে "জাকাৎ" বা "দাসোন্দ"—অর্থাৎ কিনা বাধ্যতামূলক মুসলমানী ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কর বরাবরই দিয়া থাকে। এরূপ মুসলমানী কর মুসলমান ভিন্ন অপর কেহই দেয় না। এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে, আইন অনুসারে উক্ত ব্যক্তিকে মুসলমান ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না—অতএব সেই আপত্তির দরখাস্তে নির্ব্বাচন-কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয় যে, এ বিষয়ে যথাবিধি তদন্ত করা হউক এবং উক্ত হীরালালের মনোনয়ন-পত্র অগ্রাহ্য করা হউক। শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় তাঁহার আপত্তির সমর্থনে এক জন খোজা ইসমাইলী মুসলমান শ্রীরমজান আলি কাসেম নামক ভদ্রলোকের ও এক জন গুজরাতী হিন্দু শ্রীমথুরাদাস ভট্টা নামক ভদ্রলোকের দুইখানি শপথ-পত্র দাখিল করেন। রমজান আলি কাসেম মহাশয় খোজা ইসমাইলী মুসলমান হিসাবে বেসিনস্থ শিয়া ইমামী ইসমাইলী খোজা জমায়েৎ-এর সদস্য ও হীরালাল যে জমায়েৎ-এর মুখী তাহার অধীনস্থ। শ্রীমথুরাদাস বাবু উক্ত হীরালালকে ১৩ বৎসর ধরিয়া ভাল করিয়া জানেন এবং ইহাও জানেন যে, সে খোজা-সম্প্রদায়ের মুখী ও আগা খাঁর শিষ্য। এ ছাড়াও শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহ মহাশয়ের আপত্তি-পত্রে মুসলমানী আইন-বিশেষজ্ঞদের মতামত বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং ইহাও দেখান হইয়াছিল যে, আগা খাঁ-পন্থীরা তাহাদের আচার-ব্যবহার ও ভূষণে এবং সমস্ত বাহ্যিক ব্যাপারে হিন্দুদেরই অনুরূপ। উত্তরাধিকার-বিষয়ে হিন্দু-আইনও খোজা ইসমাইলী মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য।

শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহের আপত্তি-পত্র ও তৎসহ শ্রীরমজান আলি কাসেম ও শ্রীমথুরাদাস ভট্টার শপথ-পত্র পাঠ করিয়া তদানীন্তন আই-সি-এস ডেপুটি কমিশনার ও জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সেই গুজরাতী হিন্দুনামধারী হীরালালকে ঐ আপত্তিসমূহের জবাব দিতে বলেন। উত্তরে সে স্বীকার করে যে, সে আগা খাঁ-পন্থী ও ইসমাইলী খোজা মুসলমান-সম্প্রদায়ের মুখী কিন্তু সে "গুপ্তি" এবং গুপ্তভাবে বা গোপনে আগা খাঁর শিষ্য বলিয়া আগা খাঁ-পন্থী হইয়াও সে হিন্দু। এ ছাড়াও সে দেখায় যে, সে বেসিনস্থ সনাতনী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের অন্যতম ট্রষ্টি বা অছি, এবং সে বেসিনস্থ দুইটি হিন্দু স্কুলের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। বেসিনে তাহাকে সকলে হিন্দু বলিয়াই জানে, সেও হিন্দুর আচার-ব্যবহার পালন করে, অতএব সে হিন্দু। তাহার এই মৌখিক জবাব শুনিয়াই কোন প্রকার আইন-পুস্তক না পড়িয়া বা কোন তদন্ত না করিয়া, অথবা কোন আইনজীবী বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ না করিয়াই ডেপুটি কমিশনার ও জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট—যিনি ঐ নির্ব্বাচনের কর্ত্তা ছিলেন—হীরালালের মনোনয়ন-পত্র গ্রহণ করেন ও শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয়ের আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

আজ অন্যূন ৩০ বৎসর যাবৎ গুজরাতী হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই জানিতেন যে, তাঁহাদের মধ্যে হীরালাল নামক ব্যক্তি আগা খাঁর অনুগামী বা শিষ্য। কিন্তু সঠিক প্রমাণের অভাবে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। ঐ চতুর ব্যক্তি তাহার প্রভাব এমন ভাবে অপর গুজরাতীদের উপর বিস্তার করিয়াছিল যে, কেহ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করেন নাই। বেসিনের গত মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের ঠিক আগেই এ কথা শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহ মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়। তিনি প্রথমতঃ এ বিষয়ে কোন মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এক ব্যক্তি কপটতার আশ্রয় লইয়া গত

৩০ বৎসর যাবৎ হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুর ভেক্ ধরিয়া আর খোজা মুসলমানদের মধ্যে খোজা মুসলমান সাজিয়া সকলের উপর অন্যায় আচরণ করিতেছে, আর কেহ তাহার প্রতিকারার্থ অগ্রসর হইতেছেন না, তখন শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহ মহাশয় তাঁহার বিবেক ও কর্ত্তব্যের প্রেরণায় এই অন্যায়ের সম্মুখীন হইবার জন্যই বিশেষ করিয়া নির্ব্বাচন-প্রার্থীভাবে তাঁহার মনোনয়ন-পত্র দাখিল করেন। শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয়কে তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অগ্রসর হইতে বারংবার নিষেধ করেন, কারণ তাঁহার অভিযোগ আপত্তি প্রমাণ করা নেহাৎ সহজ হইবে না—ফলে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সিংহ মহাশয় উত্তরে বলেন যে, আর কোন উপকার যদি নাই বা হয়—অন্ততঃ হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায় জানিতে পারিবেন যে, আইনতঃ প্রমাণের অভাব থাকিলেও কেহ যে তাঁহাদের উভয় সম্প্রদায়ের উপর অন্যায় আচরণ করিতেছে তাহা সহ্য করা বা তাহার সাহায্য করা উচিত নয়। তাঁহার আপত্তি ও তাহার নিষ্পত্তির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু নির্ব্বাচন-ব্যাপারের কর্ত্তৃপক্ষ, পদমর্য্যাদায় গর্ব্বিত ইংরাজ আই-সি-এস ডেপুটি কমিশনার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই আপত্তির নিষ্পত্তি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি শ্রীযুক্ত সিংহের আপত্তি-পত্র এবং সেই আপত্তি-সমর্থক শপথ-পত্র দুইখানির নকল শ্রীযুক্ত সিংহ প্রভৃতির অজ্ঞাতসারে হীরালালের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং তাহার কাছে লিখিত প্রতিবাদ চাহিলেন। দু-দিন পরে সাধারণ ভাবে লেখা একটি উত্তর ও তৎসহ আর একজন খোজা মুসলমানের এক শপথ-পত্র উক্ত হীরালালের নিকট হইতে (শ্রীযুক্ত সিংহ প্রভৃতির অজ্ঞাতসারে) ডেপুটি কমিশনার গ্রহণ করেন। তাহার পর ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের গোড়াতেই শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনের ১৮২ ধারা অনুসারে এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আপত্তি-সমর্থকদ্বয়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনের ১০৯ ধারা অনুসারে (অন্যায় কাজের সাহায্যকারী হিসাবে) মামলা দাখিল করেন।

শ্রীযুক্ত সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি উক্ত হীরালালকে হিন্দু জানিয়াও তাহার ক্ষতি করিবার বা তাহাকে ত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে অথবা ডেপুটি কমিশনারের আইনগত ক্ষমতা উক্ত হীরালালের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন আপত্তি দ্বারা ব্যবহার করাইয়া নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অভিযোগ করায় তিনি ফৌজদারী আইনের ১৮২ ধারা অনুযায়ী দোষ করিয়াছেন, এবং যে দুই ব্যক্তি শ্রীযুক্ত সিংহকে তাঁহার মিথ্যা অভিযোগের সমর্থনে শপথ-পত্র দান করিয়াছেন (শ্রীরমজান আলি কাসেম ও শ্রীমথুরাদাস ভট্টা) তাঁহারা ফৌজদারী আইনের ১০৯ ধারা অনুযায়ী অনুমোদনকারী হিসাবে দোষ করিয়াছেন।

রেঙ্গুনে তথা সমগ্র ব্রহ্মদেশে—যেখানেই ভারতীয়দের বাস আছে সর্ব্বত্র—শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে এই চাঞ্চল্যকর মামলা দাখিল হওয়ায় একটা বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইতিপূর্ব্বে কোন মৃত ব্যক্তি কি ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা লইয়া উত্তরাধিকার-সম্পর্কে অনেক মামলা আদি হইয়াছে। কিন্তু আজ অবধি কোন জীবিত ব্যক্তির ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া কোন মোকদ্দমা হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই।

এক দিকে নির্ব্বাচন-ব্যাপারে, অপর দিকে ফৌজদারী মামলায় শ্রীযুক্ত সিংহ কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যেদিন সমন পাইয়া তিনি প্রথম আদালতে উপস্থিত হন সেদিন আদালতের ভিতর ও বাহিরে এত জনসমাগম হয় যে, তিলমাত্র ধারণের স্থান ছিল না। যথাসময়ে ও যথারীতিতে মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। নির্ব্বাচন-কর্ত্তৃপক্ষরূপে এই মামলার অভিযোগকারী ডেপুটি কমিশনার ও জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত হীরালালের সাহায্যে, হীরালাল ও নিজকে সহ চব্বিশ জন সাক্ষীর এক তালিকা দাখিল করেন। পরে আদালতের পক্ষ হইতে এক জন সাক্ষী ডাকা হয়। এই পঁচিশ জন সাক্ষী নানা জাতীয় ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—জাতি হিসাবে ছিলেন বর্ম্মী, চীনা, কারেন, গুজরাতী, হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী, পার্শী, ইংরেজ,

পঞ্জাবী, এবং ধর্ম্ম হিসাবে ছিলেন খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, জোরোআষ্ট্রীয়ান প্রভৃতি। সুদীর্ঘ আট কি নয় মাস যাবৎ এই রহস্যপূর্ণ জটিল বিচার চলিতে থাকে। শ্রীযুক্ত সিংহ প্রভৃতি খুব তেজস্বিতার সহিত এই মামলা লড়িতে থাকেন। বেসিনের তৃতীয় অতিরিক্ত বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট উ. মাউং মাউঙ্গের আদালতে এই বিচার হয় এবং তাঁহার ধীর, শান্ত ও নিরপেক্ষ বিচারে সকলেই মুগ্ধ হন। এই মামলার সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায় দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মদেশে সুবিচারক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। খবরের কাগজ সমস্ত মামলাটির বরাবর আগাগোড়া রিপোর্ট করিয়াছে। যেদিন এই মামলার কোন খবর থাকিত, সেদিন কাগজ বাহির হইবার দুই-তিন ঘণ্টা পরে কাগজ আর পাওয়া যাইত না।

উ. মাউং মাউঙ্গ সতর্ক বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহের গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি সম্বলিত আবেদনখানি ও তৎসহ প্রদত্ত শপথ-পত্রদ্বয় সম্পূর্ণ সত্য এবং বলিয়াছেন যে, উক্ত হীরালাল শিয়া ইমামী ইসমাইলী খোজা মুসলমান। অতএব তিনি অভিযুক্ত সিংহ মহাশয়কে ও তৎসহ তাঁহার সাহায্যকারী রমজান আলি কাসেম ও শ্রীযুক্ত ভট্টাকে বেকসুর খালাস দিলেন।

মামলার অধিকাংশ ভাগেই শ্রীযুক্ত সিংহ নিজের মামলা নিজেই চালাইয়াছিলেন। কিন্তু মামলার শেষাশেষি বিশেষ কাজে তাঁহাকে দুই মাসের জন্য কলিকাতায় যাইতে হয়। সেই সময় তিনি তাঁহার মামলার ভার শ্রীরমজান আলি কাসেমের অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন মহাশয়কে দিয়া যান। তদবধি শ্রীযুক্ত সেনই মামলায় শ্রীযুক্ত সিংহের পক্ষ সমর্থন করেন। আর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার দাশ শ্রীযুক্ত ভট্টার পক্ষ সমর্থন করেন।

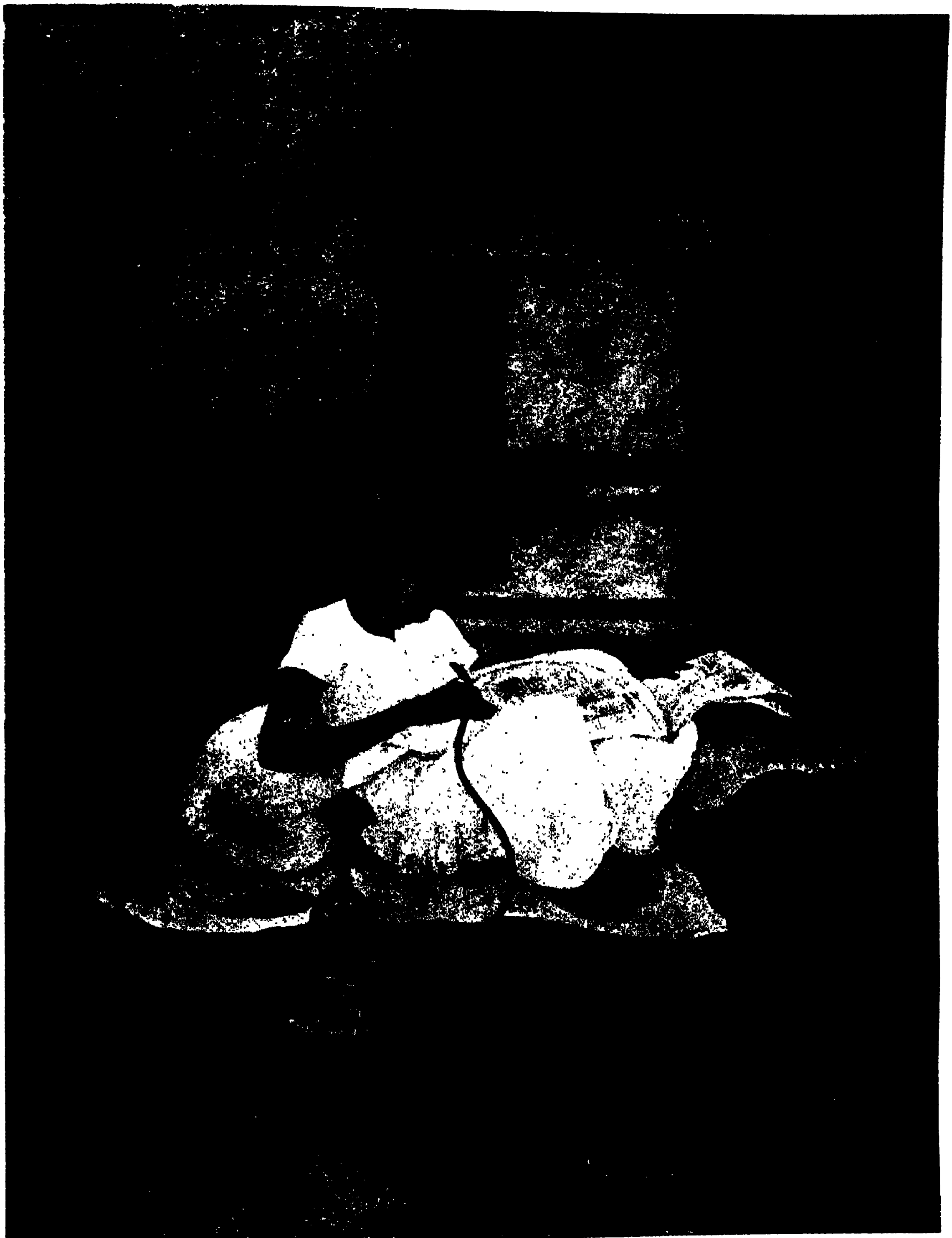
২৪ জনের সাক্ষী গ্রহণ করার পর বাদীর পক্ষে মামলা শেষ হয়। ফরিয়াদী পক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা নিজেদের সমর্থনে কোন সাক্ষী ডাকার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কেন-না তাঁহাদের বক্তব্যের সমর্থক ভূরি ভূরি প্রমাণ বাদীপক্ষের সাক্ষীদের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর কোর্ট হইতে রেঙ্গুনস্থ শিয়া ইমামী ইসমাইলী খোজা জমায়েৎ-এর সম্পাদককে আদালতের সাক্ষীস্বরূপ সমন জারি করিয়া ডাকান হয়।

আদালতে জেরার ফলে প্রকাশ পায় ও প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুনামধারী গুজরাতী মুসলমান বহু আছেন। উক্ত হীরালাল আচার-ব্যবহার, বসন-ভূষণে অপর গুজরাতীদেরই অনুরূপ। পরন্তু বহু ফটোগ্রাফ হইতে প্রমাণিত হয় যে, কাহারও বেশভূষা বা চেহারা হইতে তাহার ধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না। বাদীর পক্ষের অনেক সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশে অনেক বর্ম্মী মুসলমান আছেন — তাঁহাদের আচার-ব্যবহার বেশভূষা দেখিলে, বা নাম শুনিলে, তাঁহাদের বর্ম্মী বৌদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়—যদিও আসলে তাঁহারা মুসলমানই। বাদীপক্ষের সাক্ষীরা ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, উক্ত হীরালালের ধর্ম্মবিশ্বাস কি, সে-কথা তাহার সহিত কোন দিন আলোচনা করেন নাই। তাহার নাম, আচার-ব্যবহার বেশভূষা হইতে হীরালালকে তাঁহারা এ যাবৎ হিন্দু বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন। আবার প্রায় সব সাক্ষীই বলিয়াছেন যে, হীরালাল যে আগা খাঁ-পন্থী বা আগা খাঁ-পন্থীদের মুখী, তাহা কোন দিন ঘুণাক্ষরেও তাঁহারা জানিতেন না। হীরালালের দুই-একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়াছেন যে হীরালাল যে আগা খাঁ-পন্থী, সে-কথা তাঁহারা জানিতেন, কিন্তু হীরালাল "গুপ্তি" অর্থাৎ গোপনে আগা খাঁ-পন্থী তাই তাঁহারা তাহাকে হিন্দু বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রকাশ্যে কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ না-করা অবধি কেহ ধর্ম্মচ্যুত হইতে পারে না। এইরূপ মন্তব্য-কারীদের জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, গুপ্তি আগা খাঁ-পন্থীদের সম্বন্ধে তো আইন-পুস্তক বা খোজাদের কোন পুস্তকই কিছু বলে না। গুপ্তি আগা খাঁর শিষ্য একটা মনগড়া কথা মাত্র। অতএব তাঁহাদের মতের সমর্থনে কোন বিশেষজ্ঞের কোন মত দেখাইতে পারেন কি? প্রত্যেকেই—এমন কি হীরালাল

নিজেও—স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে এ রকম কথা কোন পুস্তকে লেখা নাই, এটা তাহার ও তাহার বন্ধুদের ব্যক্তিগত মতামত মাত্র! তাঁহাদের জবানীর সমর্থন তাঁহারা আর কোন ভাবে করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু কোন আইন-পুস্তকে "গুপ্তি" কথাটির পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। সাক্ষীদের মধ্যে কেহ কেহ এ-কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, হীরালালের এই দুষ্কৃতির কথা আগে জানিতে পারিলে তাঁহারা কখনও তাহাকে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর সনাতনী হিন্দু মন্দিরের অছি হইতে দিতেন না। অনেক সাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন যে, যদি কেহ কোন ধর্ম্মগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি সেই সেই ধর্ম্মগুরুর ধর্ম্মাবলম্বী। হীরালাল নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে, সে আগা খাঁর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছে, অপর কোন ব্যক্তির কাছে সে মন্ত্র গ্রহণ করে নাই। আগা খাঁকে সে তাহার ধর্ম্ম-শিক্ষক বা গুরু বলিয়া মনে করে। সে আগা খাঁকে যেভাবে পূজা করে, তাঁহাকে ছাড়া আর কোন মানুষকে সেভাবে পূজা করে না। সে-পূজা গণেশ ও লক্ষ্মীর পূজার সমান সে মনে করে। এ ছাড়া সে কতকগুলি বাহিক অনুষ্ঠান হিন্দুদের মত করে যাহার জন্য তাহাকে হিন্দু বলিয়া ভ্রম হয়। এ-সব সে করে হিন্দুদের মধ্যে, সেখানে খোজা কেহ থাকে না। আবার খোজাদের মধ্যে সে ব্যবহার করে খোজাদের মত—সেখানে হিন্দু কেহ থাকে না। ইসমাইলী খোজাদের বিশেষ ধর্ম্ম-পুস্তকের নাম "দশ অবতার"। এই পুস্তকে মহ বিষ্ণুর দশম অবতার রূপে দেখান হইয়াছে হজরত মহম্মদের জামাতা আলিকে। এই জন্য শিয়া ইসমাইলী মুসলমানদের মধ্যে "ইয়া আলি মদদ্" অভিভাষণ প্রচলিত। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে হীরালাল তাহার খোজা বন্ধুদের ঐ বলিয়াই সর্ব্বদা অভিবাদন করিয়া থাকে; সে নিজেই এই কথা স্বীকার করিয়াছে। সে আরও স্বীকার করিয়াছে যে, সে আগা খাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, পূজা করে এবং তাঁহার কাছে সে গুপ্ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। ১৪ কি ১৫ বৎসর বয়সে প্রথম আগা খাঁকে দেখিয়া তাহার ধর্ম্ম-প্রেরণা জাগে। সে নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে, ইসমাইলীদের নিয়ম অনুসারে সে বাধ্যতামূলক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কর বহুদিন যাবৎ আগা খাঁকে দিয়া আসিত। এই "জাঘাৎ" বা "দাসোন্দ" অর্থাৎ বাধ্যতামূলক মুসলমানী করের হার এই যে, ইসমাইলী খোজাদের সমস্ত আয়ের এক-দশমাংশ বা এক-অষ্টমাংশ আগা খাঁকে দিতে হইবে। সেই হিসাবে মোটা টাকা হীরালাল আজ ২৪ বৎসরের উপর আগা খাঁকে দিয়া আসিয়াছে, কিন্তু হিন্দু মন্দিরের অছি হইলেও সেখানে এক পয়সাও দেয় না।

এই বিচারে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনেক নিছক ইসমাইলী ধর্ম্মানুষ্ঠান বরাবর সে পালন করিয়া আসিতেছে। এমন কি তার ভ্রাতুষ্পুত্রীর কন্যা যখন মারা যায়, তখন শ্রাদ্ধ না করিয়া খোজা ধর্ম্মমতে অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এ সমস্ত প্রমাণ দলিল, খাতা, রসিদ প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে, সে ইহলোক ও পরলোকে আত্মার কল্যাণার্থ "জাঘাৎ" বা "দাসোন্দ" দেয়। এই সব প্রকাশ পাইবার পর উ. মাউং মাউঙ্ তাঁহার রায়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইংরেজী ভাষায় একটি শব্দ আছে যাহা হীরালালের চরিত্রকে ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে—সেই শব্দটি হইতেছে 'হিপোক্রিট' অর্থাৎ ভণ্ড! ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন যে, হীরালালের এই অদ্ভুত আচরণে তাঁহার ছেলেবেলায় শোনা একটি গল্প মনে পড়ে। যথা—একটি বাদুড় পাখীদের দলভুক্ত হইতে চায়। বাদুড়ের ডানা আছে, পাখীদের মত উড়িতে পারে দেখিয়া পাখীরা তাহাকে দলে ভর্ত্তি করিল। তাহাতেও বাদুড়ের মন যথেষ্ট ভরিল না। তখন সে গেল জন্তুদের দলে যোগদান করিতে। জন্তুরা তাহার ডানা দেখিয়া পাখী মনে করিয়া আপত্তি করিলে বাদুড় তাহার দাঁত দেখাইয়া বলিল যে, পাখীর কি আর দাঁত থাকে? তখন জন্তুরা তাহাকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া লইল। কিন্তু পরে যখন দুই দলই তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলিল, তখন দুই দলই তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

এই রহস্যজনক "গুপ্তি" আগা খাঁ-পন্থী নাকি বোম্বাই



প্রৌঢ়

শ্রীবীরেশ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অঞ্চলে আরও আছে। অবিলম্বে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত। ধর্ম একটা ব্যক্তিগত বিষয়; যাহার যে ধর্ম্মে আস্থা জন্মে, সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। তাহাতে লজ্জার ও ভয়ের কিছুই নাই। কিন্তু দুই নৌকায় পা দিয়া চলা, ভণ্ডামি ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুই ধর্ম্মের প্রতিই অশ্রদ্ধা দেখাইবার সুযোগ বা সুবিধা কাহাকেও দেওয়া কোন মতেই উচিত হইতে পারে না, এরূপ নীচ আচরণ কোন মতেই কাহারও সহ্য করা উচিত নয়। এই প্রকারের লোক সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু, সকল ধর্ম্মের শত্রু।

শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহ মহাশয় আজ ব্রহ্মদেশে হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে সকলের কৃতজ্ঞতা- ও শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছেন। তিনি বিশেষ কার্য্যদক্ষ হইলেও স্বভাবতঃ অমায়িক ও নম্র। সেই অমায়িকতা ও নম্রতার পশ্চাতে তাঁহার সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। বর্ম্মীদের ভিতর শ্রীযুক্ত সিংহ কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট এবং বর্ম্মীদের সহিত ভারতবাসীদের যাহাতে সৌহৃদ্য ও সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয় তিনি তাহার জন্ত সর্ব্বদাই প্রয়াসী।

রেঙ্গুনস্থ বিশেষ সংবাদদাতা।

আধা-ফরাসী আধা-জার্ম্যানের মা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

তাকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'ল কবে কেমন ক'রে, সে কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার সঙ্গসুখ যে তার প্রিয়, তার কারণ বোধ হয় আমি মনে মুখে এক, প্রাণ খুলে সব কথা বলি, কোন আবরণ নেই আমার অন্তর ও রসনার মাঝখানে। তার কথাবার্ত্তা কিন্তু তার বিপুল অভিজ্ঞতার বিবরণী। সে ভবঘুরে, নানা দেশবিদেশে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে। তার মুখে শুনি কেবল সেই সব দেশের কথা, তার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের বিচিত্র বর্ণনা। কিন্তু তার মনের অভিসন্ধি কখনও পেলাম না। নিজের সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক্। সে মৌন অনপনের। আমরা দু-জনে যেন পরস্পরের সম্পূর্ণতা। আমাদের হরিহর-মূর্ত্তিতে যেন একটি অখণ্ড ব্যক্তিত্বের পূর্ণাভাস ফোটে। মহাযুদ্ধের আরম্ভের পর থেকে আমাদের আর দেখাশুনা নেই। শুধু এইটুকু মাত্র শুনেছিলাম যে, সে জার্ম্যান ভাষা খুব ভাল জানে ব'লে দোভাষীর পদে নিযুক্ত হয়েছে। গত বৎসরের শেষাশেষি তার সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন থেকে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে সে রইল প্যারিসে, সুতরাং আমাদের বন্ধুত্বের হ'ল পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ইতিমধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন আমাদের ঘটে নি। তার নানা অভিজ্ঞতার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বড় উপভোগ করতাম। আমি যুদ্ধে যোগ দিতে পারি নি, গাছের মত মাটিতে শিকড় গেড়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে অকেজোর জল্পনা-কল্পনায় কেবল পল্লবিত হয়ে উঠেছি। বন্ধুর মুখে বিষাদের গভীর রেখাগুলি লক্ষ্য করলাম। যে কাজে সে বাহাল হয়েছিল, তাতে এ রকম কালিমার ছায়া যে তার মুখে পড়বে তা আর আশ্চর্য্য কি? তবু মনে হ'ল বুঝি একটা বিশেষ গুপ্ত-বেদনায় সে মুহ্যমান।

কাল সন্ধ্যার সময় আমার কাছে এল অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায়। তার এ রকম বিক্ষুব্ধ ভাব কখনও দেখি নি। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে ঘরের এদিক-ওদিক পাইচারি করতে করতে ব'লে উঠল—"আর তো ভাই চুপ ক'রে থাকতে পারছি নে। মুখ ফুটে কাউকে দুটো কথা না বলতে পারলে দম কেটে যায়

যাব। যুদ্ধের এই ক'টা বছর কি কষ্টে কাটিয়েছি! আজ মনে হচ্ছে বুঝি আমার বুকটা শতধা হ'ল!"

তার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমার উদ্বেগ লক্ষ্য ক'রে সে একটু আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, "কোন মহাপাতক করি নি। দুঃখে, নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় আমাকে একেবারে পিষে ফেলছে। তোমার কাছে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, হয়ত একটু শান্তি পাব। আমাদের পারিবারিক কোন কথাই তুমি জান না। কেবল শুনেছিলে আমার কাছে, আমার বাবা সৎ লোক ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অকৃতকার্য্য হন নি, আমার জন্যে সামান্য কিছু রেখে যেতে পেরেছিলেন। আমার মা নামে ফরাসী ছিলেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি জার্ম্যান।

"মা কিছুতেই আমাদের ফরাসী-জীবনের সঙ্গে আপনাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি। প্যারিসে বাস করতেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রাণ ছিল মাতৃভূমি বাদেন প্রদেশে। কেমন ক'রে ওঁদের বিবাহ হ'ল, ঠিক জানি না। তবে বিশেষভাবে আমার বাবার প্রেম ও উভয় পরিবারের স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণা ছিল এই বিবাহের মূলে।

"আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান। ওঁরা দু-জনেই আমাকে খুব ভালবাসতেন। বাবা ভাবতেন আমার প্রতিভা অসামান্য সেই অল্পবয়সেই। তাই আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছিল তাঁর উচ্চ আশা। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমি দশের এক জন হব। আইন প'ড়ে বড় ব্যারিষ্টার হয়ে এক দিন প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করব। মা মাথা নেড়ে বলতেন, না। তাঁর সাধ ছিল আমি হব কবি এবং সঙ্গীতবিশারদ। যদিও স্পষ্ট বলতেন না, তবু তাঁর বিশ্বাস জার্ম্যানীই আমার প্রতিভা ও চরিত্রের পূর্ণোৎকর্ষের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

"কি বলে মার বর্ণনা করি! তিনি ছিলেন স্বপ্নালু ও ভাবপ্রবণ। প্রত্যহই নিয়মিত পিয়ানো বাজাতেন, তন্ময় হয়ে থাকতেন মেণ্ডেলসোঁ কিংবা শ্যোম্যানের সুরলোকে। ভাগ্‌নারের রাগরাগিণীর ব্যাখ্যান আমাকে শোনাতেন বাজনার সঙ্গে, তাঁর চোখে একটা অপরূপ দীপ্তি ফুটে উঠত। বলতেন—'মন দিয়ে শোন। আমার মাতৃভূমির প্রাণ উদ্বেলিত হয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করছে।' সে সঙ্গীত বড় মধুর লাগত। শুনতাম—আর দেখতাম মার মুখের সেই ভাবোদ্দীপ্ত দিব্য-কান্তি। তাঁর মাতৃভূমি মূর্ত্তিমতী হ'ত আমার চক্ষে। কবিতার রস বড়-একটা গ্রহণ করতে পারতাম না। উলাণ্ড, গাইবেল কিংবা শিলারের পদাবলী আমাকে আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন। বলতেন শিলারের তুলনা নেই। আমি বুঝতে পারতাম না। যখন তাঁর স্বদেশী কবি আর্ণ্ড বা কোয়েনারের কবিতা প'ড়ে শোনাতেন, তখন আমার প্রাণে একটা অজানা বিদ্রোহ জেগে উঠত, আমাকে স্মরণ করিয়ে দিত আমার পিতা ফরাসী এবং সে কথা মাকে বলতাম। মা বিষণ্ণ হয়ে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতেন—তোমার বাবা যদি জার্ম্যান হতেন!

"বাবা এসব কিছুই জানতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল জার্ম্যান-কন্যা হলেও মা তাঁর স্বামীর দেশকেই বরণ ক'রে নিয়েছেন। এই দ্বৈরাজ্যের উত্তরাধিকার আমার জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে, সে-সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ। তিনি বেঁচে থাকলেও হয়তো কোন কুফল ফলত না। কিন্তু আমার কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তিনি মারা গেলেন। আমার জীবনের ধারা প্রবাহিত হ'ল সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে।

"মা তাঁর বাপের বাড়ী চলে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে থাকলে আমি ভাল ক'রে জার্ম্যান ভাষা শিখতে পারব। ভারটেম্বার্গের হাইলব্রন শহরের বোর্ডিং-স্কুলে আমাকে পাঠানো হ'ল। সেখানে আমার মনে সুখ ছিল না। ছেলেরা যে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত তা নয়, তবে আচরণে ছিল না সৌজন্য। ফ্রান্সের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ছিল না, ছিল একটা সকরুণ তাচ্ছিল্য। এর এক দিন এক জার্ম্যান অধ্যাপক জার্ম্যানীর মহত্ত্ব ও গৌরব ঘোষণা করবার প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, 'তোমারও এ গর্ব্বে অধিকার আছে। তুমি আজ আধা-জার্ম্যান, কিন্তু এমন দিন আসবে যখন তোমাকে পুরো জার্ম্যান হ'তে হবে।' তার পর জার্ম্যান সম্রাটের একচ্ছত্র আধিপত্য ও প্রতিভার কেমন ক'রে সমগ্র মানবজাতি উদ্ধার লাভ করবে, সেই

সাম্রাজ্য-স্বপ্নের সুসমাচার আমাকে শোনালেন। আমি উত্তেজিত হয়ে করলাম প্রতিবাদ। তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, ছেলেরাও তাঁর অট্টহাস্যে যোগদান করল।

"ছুটির সময়ে কখনও দেশে ফিরতাম, কখনও বা মার সঙ্গে থাকতাম মামার বাড়ী। মাকে আর চেনা যায় না, তাঁর এমন পরিবর্ত্তন হয়েছে। তিনি যেন আর একটা ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়েছেন। চোখের দৃষ্টিতে আর সেই আগেকার নিরাকুল স্বপ্নাবেশ নেই। এখন তাঁর চোখে মুখে যেন খই ফোটে, সর্ব্বদাই সমুৎফুল্ল ভাব। পিয়ানোর সুরে আর সে স্বপ্নময় মধুঝঙ্কার বাজে না, বাজে কেবল মেঘমন্দ্র। এখন তাঁর কণ্ঠে প্রাণকম্প্র জীবনের গান, স্বরমূর্চ্ছনার চারি দিক্ কেঁপে ওঠে। তাঁর জমকালো সাজগোজে ছিল না সংযম বা শালীনতার লেশ, আমার অসহ্য বোধ হ'ত। তাঁর চালচলনে, ভোজন-বিলাসের আতিশয্যে হঠাৎ-নবাবজাদার ঔদ্ধত্য আমাকে পদে পদে দগ্ধ করত। আমাকে চুমা দিয়ে বলতেন, 'কেমন, বল দেখি কত সুখ এখানে? খুব সুখী নও কি? এমন একটা শ্রেষ্ঠ জাতির আশ্রয় পাওয়ার সৌভাগ্য যে কত, তা কি অনুভব কর না?' তাঁর গর্ব্বোল্লাসের অন্ত ছিল না, কেবল সেই একই কথা, কি আনন্দেই এখানে আছেন! আমার অসোয়াস্তির প্রতি দৃক্‌পাতও করতেন না। আমার মামা কিন্তু লক্ষ্য করতেন। বলতেন, 'বেচারা ফ্রেঞ্চি, ওর এখনও কুসংস্কার ঘোচে নি। তবে আসবে এমন দিন যখন আমাদের ভক্ত হয়ে উঠবেই।' আমার কেবল মনে পড়ত বাবার কথা। ১৮৭০ সনের দুর্গতির ইতিহাস, আমার দু-চোখ ভ'রে উঠত জলে।

"সুখী? হাঁ, মা বাস্তবিকই বড় সুখে ছিলেন। কিন্তু কেন যে এত সুখী, প্রথমে তা কল্পনা করতে পারি নি। তখন ঈষ্টারের ছুটি। এক দিন সন্ধ্যার সময় মা আমাকে কাছে ডাকলেন। বাড়ীতে একটা উৎসবের কোলাহল জেগে উঠেছে, ভাবলাম বুঝি ঈষ্টারের আয়োজনে। সেটা আমার ভুল। বিনা ভূমিকায় চট ক'রে আমাকে ব'লে ফেললেন, 'জাক্, শীগ্‌গিরই আমার বিয়ে হবে।' আমি অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। মা হেসে বললেন, 'আমি কি বিয়ের পক্ষে বুড়ী হয়েছি?' না, মা তো বৃদ্ধা হন নি, বরং তাঁর এমন উচ্ছ্বসিত তারুণ্য ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নি! দুঃখে লজ্জায় আমার কণ্ঠরোধ হ'ল। 'কার সঙ্গে?' অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম। 'ডক্টর ওয়েবারের সঙ্গে!' ভাঙা গলায় বললাম 'উনি যে জার্ম্যান!' মা বললেন, "অবিশ্যি!" বুক ফেটে কান্না উথলে উঠল আমার দু-চোখ উপ্‌চে। মার চোখে ফুটল হিমহানা চাহনি। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি অত্যন্ত ছিঁচকাঁদুনে, গন্ধ যন্ধ জ্ঞান নেই তোমার জীবনের সহজ সত্য সম্বন্ধে।' তার পর ভাবী সৎ-পিতার গুণব্যাখ্যা আরম্ভ ক'রে দিলেন। অমন জ্ঞানী চরিত্রবান্ লোক দুর্লভ। শেষে এই ব'লে কথা সাঙ্গ করলেন যে, আমার লেখাপড়ার সব সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে, এবং নিজের ইচ্ছামত জার্ম্যানী অথবা ফ্রান্সকে আমার পিতৃভূমি ব'লে গ্রহণ করতে পারি।

"ডক্টর ওয়েবারের সঙ্গে আর দৃষ্টিবিনিময়ের আগ্রহ ছিল না। পরদিনই আমার বাবার এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে উঠলাম।

"মার সঙ্গে এ রকম রূঢ় ব্যবহার করেছি ব'লে অনেক দিন ধরে আমার মনে একটা গ্লানি ছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলছি। তখন জার্ম্যান-বিদ্বেষের দিন আসে নি। তবে একটা অন্তর্গূঢ় বিরুদ্ধতা ছিল ও-জাতটার প্রতি, সেই সঙ্গে কিন্তু শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। মার এই দ্বিতীয় বিবাহ বড় অপমানজনক মনে হ'ল। একটা কলঙ্কের ছায়া আমার উপরেও এসে পড়ল। সেই আতঙ্কে মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেখানে প্রকাশিত হ'তে পারে তার ত্রিসীমায় আর যেতাম না।

"মাঝে মাঝে চিঠিতে তাঁর কুশল-সংবাদ পেতাম। আমি মাতৃভক্ত ছিলাম। তাঁকে হারিয়ে তাঁর স্নেহের অভাব আরও শত গুণ অনুভব করতাম। খুব সাগ্রহে পড়তাম তাঁর চিঠিগুলি, যদি কোথাও একটু স্নেহ বা মমতার আভাস পাই। যদি একটিও স্নেহমাখা কথা উদ্ধার করতে পারতাম সেই চিঠিগুলির থেকে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতাম এবং তাঁর স্বামীর

প্রতি বিরুদ্ধ ভাবকে প্রশ্রয় দিতাম না। কিন্তু সে চিঠিগুলি নিঙড়ে এক বিন্দুও স্নেহ পাই নি। কেবল লম্বাচওড়া উপদেশ। তার পর যখন খবর পেলাম তাঁর একটি ছেলে হয়েছে, নাম তার এরিক্, তখন চিরদিনের জন্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'ল। আমি তাঁর কাছে এখন অজানা বিদেশী মাত্র।

"লেখাপড়া আর দেশভ্রমণে আমার পিতৃমাতৃহীন দশার নির্ব্বেদ ঘুচল। ক্রমে একটা কঠিন ঔদাসীন্তের আবরণ আমাকে দিল আত্মপ্রতিষ্ঠা। অন্ততঃ আমি ভাবতাম তাই। কিন্তু এ প্রশান্তি কেবল নিরাকুল চিত্তবিক্ষোভের মূর্চ্ছাতুর অবস্থামাত্র। সম্প্রতি এমন একটি ব্যাপার ঘটেছে যাতে আমার সুপ্ত শোক আবার স্নেহবুভুক্ষু হয়ে উঠেছে। যদিও যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে মার কোন সংবাদই আর পাই নি, তবু আজ আমার প্রাণ অধীর হয়ে উঠেছে মাতৃস্নেহের জন্ত।

"তুমি তো জান, ক'দিন আগেই প্যারিসে একটা জেপেলিন তোপের মুখে ধূলিসাৎ হয়েছে। সেই বিমানের চালক আহত হয়ে আমাদের বন্দী হয়। আমি তাকে দেখি নি, কিন্তু তার পকেটের কাগজপত্র আমার কাছে এল তর্জ্জমার জন্তে। তার মধ্যে সৈন্তাধ্যক্ষ এরিক্ ওয়েবারের নামে গুটিকতক চিঠি ছিল—সে-চিঠিগুলি আমার মার হাতে লেখা!

"কি কষ্টে সে-চিঠিগুলি পড়লাম এবং অনুবাদ করলাম, সেকথা তোমাকে আর কি বলব! আমার মায়ের পেটের আধা-ভাই নিরীহ প্যারিসবাসীদের হত্যা করতে এসেছিল সে জন্ত এ দুঃখ নয়। আমার শোক আমি সেই মায়েরই সন্তান। প্রত্যেক চিঠির সম্বোধনে 'আমার একমাত্র আদরের ধন!' সে তার মার একমাত্র সন্তান! আমার আর অস্তিত্ব নেই মার কাছে!

"তিনি কি আমাকে ভুলে গেছেন? পরিত্যাগ করেছেন আমাকে? মা আছেন বেঁচে, তবু আমি মাতৃহীন! তুমি কি বুঝতে পারবে এ বেদনা কি অপরিসীম, যে তুমি ফরাসী মার সন্তান এবং পেয়েছ যার মাতৃহৃদয়ের অপ্রমেয় স্নেহ?"

[রবার্ট সেফারের 'দি মাদার' গল্পের ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে]

বাংলার সীমানার পুনর্গঠন

শ্রীঅমিয় বসু

বাংলার বাহিরের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে পুনরায় বাংলা প্রদেশে ফিরাইয়া আনা বিষয়ে সংবাদ-পত্রে অধুনা যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতে দেখা যায়, অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নাই যে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ-গুলির ঠিক কোন্ কোন্ অংশ বাঙালী-প্রধান এবং কেনই বা সেগুলিকে বাংলার সহিত যুক্ত করা প্রয়োজন। প্রায়ই দেখা যায়, এই দাবি পেশ করা হয় প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে বাঙালীর প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয় বলিয়া, তাহাকে সাধারণ নাগরিকের পুরা অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় বলিয়া। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সূচনার সহিত স্বভাবতই অন্ততঃ অল্পকালের জন্তও, সর্ব্বত্র প্রাদেশিকতাবোধ প্রবলতররূপে দেখা দিবে। এই মনোভাবকে অবশ্যই সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিতে হইবে, নচেৎ শেষ অবধি ইহা ভারতের একজাতিত্ব-বোধের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে বিশেষ বিশেষ ভূমিখণ্ডের আদান-প্রদানে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার সমাধান হইবে না; কেননা প্রাদেশিক সীমানা যতই ভাবিয়া-চিন্তিয়া নির্দ্ধারণ করা যাক না কেন, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলির

সমস্ত বাঙালীকে নবগঠিত বাংলার মধ্যে আনা যাইবে না এবং যদি অন্য প্রদেশে অবশিষ্ট বাঙালীর সংখ্যা মাত্র মুষ্টিমেয়ও হয়, তথাপি তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে বাধা দিতে হইবে যাহাতে ভারতবর্ষের একজাতিত্ব-বোধ প্রতিহত না হয়।

প্রতিবেশী প্রদেশগুলি হইতে বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে বাংলা দেশে ফিরাইয়া আনিবার আমাদের যে দাবি, তাহার ভিত্তি মূলগত কারণের উপর। একটি জাতিকে কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে তাহার সংস্কৃতিগত জীবন ও উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হয়, কারণ খণ্ডিত অংশগুলি মূল জাতির সংস্কৃতি-বিষয়ক উদ্যম ও আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না এবং তাহাতে সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জন্যই আমরা বাংলার বাহিরের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে ফিরাইয়া লইতে চাই, অন্যথা জাতি-হিসাবে আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতি সতত বাধা পাইতেছে। ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলিতে আমরা কিরূপ ব্যবহার পাই, তাহার সহিত আমাদের দাবির কোনই সম্বন্ধ নাই এবং আমাদের প্রতিবেশীরা যদি আমাদের প্রতি বিশেষ অনুকূল ও পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহারও করেন তাহা হইলেও আমাদের দাবিকে কোনও প্রকারে পরিবর্তিত করা চলিবে না।

লক্ষ্য করিয়াছি, কখনও কখনও সমগ্র পূর্ণিয়া ও সিংহভূম জেলাকে বাংলায় ফিরাইয়া পাইবার দাবি করা হয়। এই জেলা দুটির যে যে অংশ প্রধানতঃ বাংলা-ভাষাভাষী তাহা অবশ্য ন্যায়তঃ ফিরাইয়া চাহিতে পারি, কিন্তু অজ্ঞতানিবন্ধন দায়িত্বশূন্য ভাবে অমূলক দাবি পেশ করায় কিছু লাভ নাই। বরং এইরূপ দাবিতে আমাদের প্রতিবেশীরা তিক্ত ও রুষ্ট হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদের মনে সন্দেহ জন্মে যে বাঙালীরা শুধু তাহাদের প্রাদেশিক সীমানা প্রসারিত করিতে চাহিতেছে—তাহা আমাদের প্রকৃত দাবির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

বাংলা দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করেন যে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের যে-সমস্ত অঞ্চল ভাষা ও সংস্কৃতিতে সত্যই বাংলার অংশ নয় তাহাদিগকে বাংলার সহিত যুক্ত করা হউক। কারণ এরূপ মিলনে বিরোধের বীজ লুকাইয়া থাকে এবং দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। যে-সকল অঞ্চলে ওড়িয়া বা হিন্দুস্থানী ভাষা প্রধান, সেগুলিকে বাংলার সহিত মিলিত করিলে তথাকার অধিবাসীরা মনে-প্রাণে বাঙালী হইয়া উঠিবেন না। অবশ্য কোনও কোনও অঞ্চল যে সত্যই ওড়িয়া বা হিন্দুস্থানী ভাষাভাষী এবং বাংলার সহিত যুক্ত হইতে পারে না—আমাদের প্রতিবেশীদের এরূপ কোন দাবি বিনা বিচারে মানিয়া লইব না। এই সকল দাবি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে।

এখন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী বিবরণী হইতে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিব।

পূর্ণিয়া জেলার সদর মহকুমা এবং কিষণগঞ্জ মহকুমার মিলিত লোকসংখ্যা মোট ১৬,৭২,৩৭৬; তাহার মধ্যে বাংলা বলেন ১,৪৬,০০০ জন, অর্থাৎ শতকরা ৯ জন বাংলা ও ৮৮ জন হিন্দুস্থানী বলেন। কিন্তু যাঁহাদের হিন্দুস্থানী-ভাষী বলিয়া দেখান হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ৬,০০,০০০ লোক যে-ভাষা ব্যবহার করেন তাহা কিষণ-গঞ্জিয়া বা শিরিপুরিয়া নামে পরিচিত সীমান্তের বুলি। লিংগুইষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মতে ইহা উত্তর-বাংলার কথিত ভাষার প্রকারভেদ। এই বুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে তাঁহাদিগকে বাংলা-ভাষাভাষী বলিয়া দেখান হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০১, ১৯২১ এবং ১৯৩১ সালের লোকগণনায় ইহাদের সকলকে বা প্রায় অধিকাংশকে হিন্দুস্থানী-ভাষী বলিয়া দেখান হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা, লিংগুইষ্টিক সার্ভের মতে যে-বুলি বাংলা আদমসুমারীতে তাহা হিন্দুস্থানী বলিয়া দেখান হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না। আদমসুমারী বিবরণীতে বলা হইয়াছে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কিষণগঞ্জের মহকুমা-হাকিম এই মত ব্যক্ত করেন যে, এই অঞ্চলে খাঁটি বাংলা-ভাষী

অপেক্ষা খাঁটি হিন্দুস্থানী-ভাষী অধিক সুবিধার সহিত কথাবার্তা চালাইতে সক্ষম। সুতরাং তাঁহার মতে এই বুলিকে হিন্দুস্থানীর মধ্যে দেখানই সঙ্গত। আশ্চর্য্যের বিষয় যে লিংগুইষ্টিক সার্ভের সুস্পষ্ট নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে মানিয়া লওয়া হইল এক জন অজ্ঞাতনামা মহকুমা-হাকিমের অভিমত, ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান হয়তো সামান্যই। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত মতটি কি অনেক বেশী প্রামাণিক নয়? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি, কিষণগঞ্জিয়া-ভাষীর পক্ষে এক জন খাঁটি বাংলা-ভাষীর কথা বুঝিতে কোনই কষ্ট পাইতে হয় না। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায় নাই যে, বিহারীদের পক্ষ হইতে অকারণে কিষণগঞ্জিয়াকে বাংলা হইতে হিন্দুস্থানীর বেশী কাছাকাছি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ণিয়া জেলার সদর ও কিষণগঞ্জ মহকুমার মোট অধিবাসী ১৬,৭২,৩৭৬ জনের মধ্যে, কিষণগঞ্জিয়াদিগকে ধরিয়া সর্ব্বসমেত ৭,৪৬,০০০ লোক বাংলা ভাষা বলেন। ইহা সত্যই পরিতাপের কথা যে, আদমসুমারী বিবরণীতে এই দুই মহকুমার ভাষিক তথ্য পৃথক্ করিয়া দেখান হয় নাই। জেলা বা মহকুমা দপ্তরের নথিপত্রে হয়তো প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ মিলিতে পারে। এই দুই মহকুমার ভাষানুযায়ী লোকসংখ্যা পৃথক্ ভাবে পাওয়া গেলে খুব সম্ভব দেখা যাইবে যে, দিনাজপুর জেলার সংলগ্ন কিষণগঞ্জ মহকুমা এবং পূর্ণিয়া সদর মহকুমার দু-একটি থানা, যথা গোপালপুর থানা (বার্সোই রেল-ষ্টেশনের আশেপাশে) ও কাটিহার থানার কিছু কিছু অংশ (পূর্ব্ব ও দক্ষিণ) প্রায় সম্পূর্ণ বাংলা-ভাষাভাষী এবং তাহাদিগকে বাংলায় ফিরাইয়া দেওয়া উচিত।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে কিষণগঞ্জ এবং সদর মহকুমার মোট লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৫,৬০,৫৭৭ ও ১১,১১,৭৯৯।

পূর্ণিয়া জেলার গেজেটীয়ারে কিষণগঞ্জ মহকুমা বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে:

"ইহা বিহার অপেক্ষা নিকটস্থ উত্তর-বাংলার জেলাগুলির সহিত অধিক ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ এবং ইহার অধিবাসীদের অধিকাংশ রাজবংশী বা কোচ জাতি হইতে উদ্ভূত, যদিও এখন তাহাদের বেশীর ভাগই ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী।"

সুতরাং এই মহকুমার উপর বাংলার দাবি অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এবার সাঁওতাল-পরগণার অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যাক। মোট লোকসংখ্যা ২০,৫১,৪১২র মধ্যে বাংলা বলেন ২,৫৩,০০০, হিন্দুস্থানী বলেন ৮,৯৮,০০০ এবং বাকী সকলে ব্যবহার করেন আদিমনিবাসীর ভাষা। আদমসুমারী বিবরণী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটি প্রাসঙ্গিক হইবে:—

"সাঁওতাল-পরগণা বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষার দ্বন্দ্বস্থল। যদিও হিন্দুস্থানী যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহাদের সংখ্যা বাংলা-ভাষীদের প্রায় চতুর্গুণ, জেলার আদিমনিবাসীদের মধ্যে বাংলা ভাষাই বেশী প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ, দুমকা মহকুমায় যদিও হিন্দুস্থানী ১,৮০,০০০ লোকের মাতৃভাষা এবং বাংলা মাত্র ৪৬,০০০ লোকের, তথাপি ১৪,৮৬৪ সাঁওতাল বাংলা বলিতে পারেন এবং হিন্দুস্থানী পারেন মাত্র ১,৮৯৮ জন এবং ইহাও অবধানযোগ্য যে সমগ্র জেলা ধরিলে হিন্দুস্থানী-ভাষীদের মধ্যে শতকরা ৪·২ জন বাংলা ভাষা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। পক্ষান্তরে বাংলা-ভাষীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১·৭ জন হিন্দুস্থানী আয়ত্ত করিয়াছেন। বাংলা ভাষার প্রভাব জামতাড়া ও দুমকা মহকুমায় বিশেষ প্রবল; গড্ডা ও রাজমহলে হিন্দুস্থানীরই প্রাধান্য এবং দেওঘর ও পাকুড়ে দুইয়েরই প্রায় সমান আধিপত্য।"

এই জেলার জামতাড়া, দুমকা, পাকুড়, রাজমহল, গড্ডা এবং দেওঘর এই ছয়টি মহকুমার মধ্যে প্রথম চারিটি—বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মালদহ, বাংলার এই তিনটি জেলার সহিত সংলগ্ন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে সাঁওতাল-পরগণার বাঙালীদের অধিকাংশই এই চারিটি মহকুমাতে বাস করেন।

জামতাড়া মহকুমার ২,৪৩,৮৫৮ জন অধিবাসীর মধ্যে ৭৩,০০০ জন বাংলা বলেন, ৭০,০০০ জন হিন্দুস্থানী বলেন এবং ১,০০,০০০ জন আদিমনিবাসীর ভাষা বলেন। অধিকন্তু ১৮,০০০ জন হিন্দুস্থানী-ভাষাভাষী এবং ৩২,০০০ জন আদিমনিবাসী বাংলা বলিতে পারেন কিন্তু কেহই দ্বিতীয় ভাষারূপে হিন্দুস্থানী বলেন না। ইহা এই

মহকুমায় বাংলা ভাষার প্রভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং সমগ্র জামতাড়া মহকুমাটিকে বাংলায় ফিরাইয়া না দিবার কোনই কারণ নাই। অবশ্য যদি থানা হিসাবে ভাষিক লোকসংখ্যা পাওয়া যায় এবং তাহাতে দেখা যায় যে মহকুমাটিকে সন্তোষজনকভাবে ভাষানুযায়ী ভাগ করা সম্ভব, তাহা হইলে ইহার যে অংশে বাংলা ভাষার প্রাধান্য শুধু তাহাই বাংলায় ফিরাইয়া দিলে চলিবে।

দুম্‌কা মহকুমায় বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা এইরূপ :— ৪৬,০০০ জন বাংলা বলেন, ১,৭৭,০০০ জন হিন্দুস্থানী বলেন এবং ২,৪০,০০০ জন আদিমনিবাসীর ভাষা বলেন, আর ১৬,০০০ জন অবাঙালী দ্বিতীয় ভাষারূপে বাংলা বলেন। বাঙালীদের সংখ্যা এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, আদমসুমারী বিবরণী অনুসারে বাংলা ভাষার প্রভাব এই মহকুমায় বিশেষ প্রবল। বীরভূম জেলার সংলগ্ন ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশেই বোধ হয় বাঙালীদের প্রাধান্য। থানা হিসাবে ভাষিক লোকসংখ্যা পাওয়া গেলে ঠিক্ করিয়া সীমারেখা টানিয়া বাংলা-প্রধান অংশকে সহজেই বাংলা প্রদেশে ফিরাইয়া আনা যাইবে।

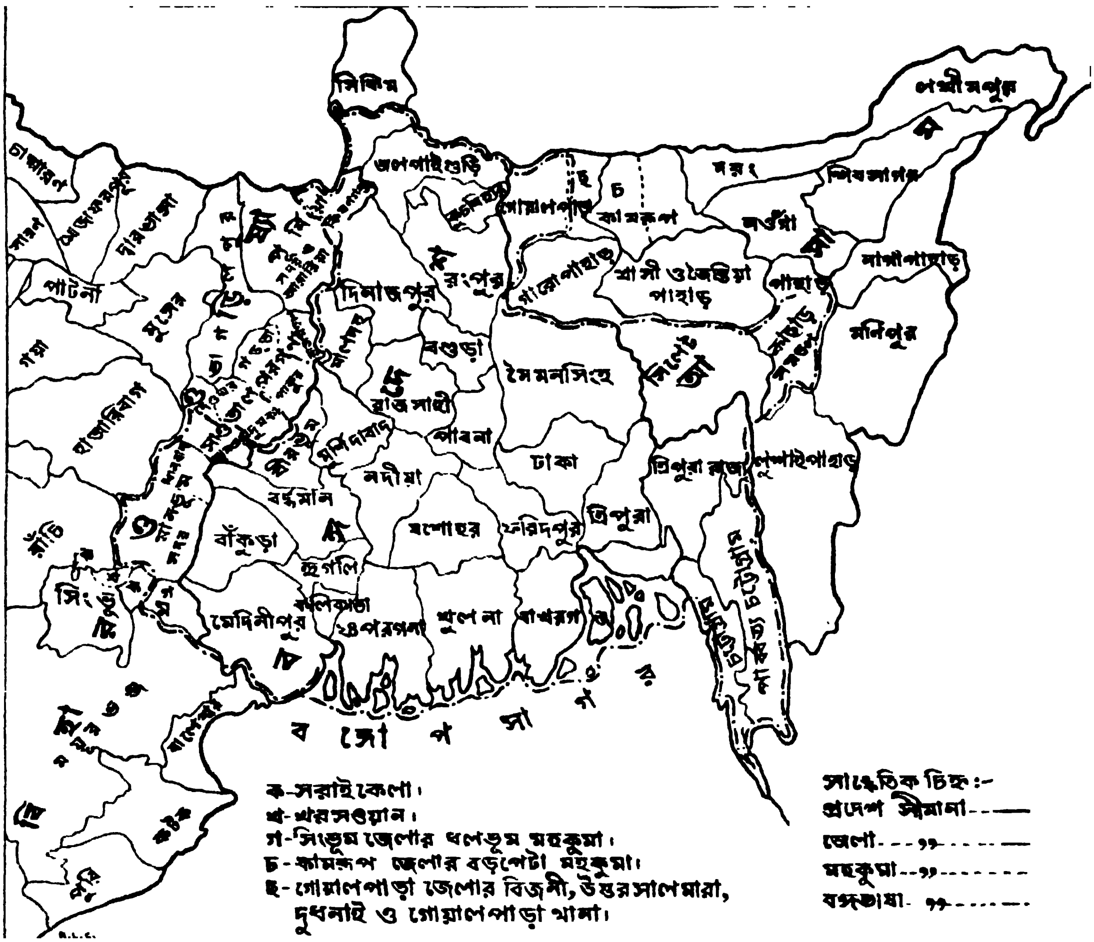
পাকুড় মহকুমায় ৬৯,০০০ জন বাংলা বলেন, ৪৪,০০০ জন হিন্দুস্থানী বলেন এবং ১,৬২,০০০ জন আদিম-নিবাসীর ভাষা বলেন। এখানে বাঙালীর সংখ্যা হিন্দুস্থানী-ভাষী হইতে অধিক, এই মহকুমাটিকে বাংলায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। থানা হিসাবে ভাষিক লোক-সংখ্যা হইতে দেখা যাইবে হিন্দুস্থানীভাষীদের মোটামুটি একত্র পাওয়া যায় কিনা এবং মাত্র বাকী অংশটিকে বাংলায় ফিরাইয়া আনিলে চলিবে কি না।

রাজমহল মহকুমায় ৪৩,০০০ জন বাঙালী, ১,২৩,০০০ জন হিন্দুস্থানীভাষী, এবং ১,৬৫,০০০ জন আদিম-নিবাসী আছেন। এখানেও থানা হিসাবে ভাষিক লোকসংখ্যা হইতে বুঝা যাইবে যে এই মহকুমার কোনও অংশ বাংলাকে ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশ বাঙালীকে নিজ প্রদেশে ফিরাইয়া আনা হইবে কি না।

বাকী দুইটি মহকুমা—গড্‌ডা এবং দেওঘরে বাঙালীরা সংখ্যায় অল্প।

বাংলার যে-সকল অঞ্চল এখন বিহারের সহিত মিলিত, তাহাদের মধ্যে মানভূম জেলাই সর্ব্বপ্রধান। ইহার সদর মহকুমায় বাঙালী ১০,৪৭,০০০ জন, হিন্দুস্থানী-ভাষী ৬২,০০০ জন, আদিমনিবাসী ১,৭৬,০০০ জন। ধানবাদ মহকুমায় বাঙালী ১,৭৬,০০০ জন, হিন্দুস্থানী-ভাষী ২,৫৯,০০০ জন, আদিমনিবাসী ৭৯,০০০ জন, অন্য-ভাষাভাষী ৬,০০০ জন।

সদর মহকুমার কথা খুবই সহজ এবং ইহাকে বাংলায় ফিরাইয়া না দিবার কোনই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ধানবাদ মহকুমাকে লইয়া কিছু মুস্কিলে পড়িতে হয়, কারণ তথায় হিন্দুস্থানী-ভাষীদের সংখ্যা বাঙালীদের অপেক্ষা ৮৩,০০০ অধিক, এবং বিহারীরা হয়তো বলিবেন যে, ধানবাদের উপর তাঁহাদেরও দাবি আছে; সুতরাং জেলা ও মহকুমা দপ্তরে যদি থানা-হিসাবে ভাষিক লোকসংখ্যা পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যে মহকুমাটিকে ভাষা অনুসারে ভাগ করিবার কথা হয়তো তুলিবেন। কিন্তু ধানবাদের ক্ষেত্রে এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া কোনও ফল হইবে না, কারণ এখানকার হিন্দুস্থানী-ভাষীদের অধিকাংশই বাহিরের লোক; তাঁহারা কয়লার খনির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মহকুমায় আকৃষ্ট হইয়াছেন। ভৌগোলিক ঐক্য এবং সংস্কৃতির দিক্ দিয়া ধানবাদ চিরকাল মানভূম জেলার—তথা বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কয়লা-খনির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই মহকুমার যে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে তাহারই দরুন বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষাভাষী লোকসংখ্যার এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বিহারের পক্ষে বাংলার একটি অংশকে ধরিয়া রাখিবার কোন অধিকার নাই। বিশেষতঃ ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, এই মহকুমার ১,৭৬,০০০ জন বাঙালীর প্রায় সকলেই এখানকার স্থানীয় লোক এবং স্থায়ী বাসিন্দা; অপর পক্ষে হিন্দুস্থানী-ভাষীরা প্রধানতঃ বাহির হইতে আগত অস্থায়ী বাসিন্দা, তাঁহাদের স্থায়ী আবাস অন্যত্র। সুতরাং কেবল অস্থায়ী অধিবাসীদের সংখ্যার জোরে এই মহকুমার উপর দাবি করা বিহারীদের পক্ষে অন্যায় হইবে। আদমসুমারী বিবরণী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে আমার উক্তি সমর্থিত হইবে:



"গত ৫০ বৎসরে এই জেলার (মানভূমের) লোকসংখ্যা শতকরা ৭০ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সিংহভূম ব্যতীত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্য সকল ব্রিটিশ জেলা অপেক্ষা এই জেলার লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার সমস্তটাই জেলার শিল্পোন্নতির জন্য হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। ১৮৮১—৯১ দশকেও—যখন ঝরিয়ার কয়লার খনি খোলা হয় নাই, তখনও এই জেলার লোকসংখ্যা সমৃদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকরা ১২'৮। অধিকন্তু সেই সময় এই জেলার বহুসংখ্যক বাড়তি লোক বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে এবং হাজারিবাগ জেলার গিরিডি কয়লার খনিতে চলিয়া যাইত। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ঝরিয়া-খনিতে কাজ আরম্ভ হওয়ার ফলে পরবর্ত্তী আদমসুমারীতে ধানবাদ (তখন গোবিন্দপুর নাম ছিল) মহকুমার লোকসংখ্যা শতকরা ২৫ হিসাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯০১ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়লার খনিগুলি দ্রুত উন্নতি ও প্রসার লাভ করে ; ফলে এই জেলা হইতে লোক বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পরিবর্ত্তে অপর জেলা হইতে এখানে লোক আসিতে থাকে। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি অবশ্য বেশী মাত্রায় হইয়াছিল উত্তর অর্থাৎ ধানবাদ মহকুমায় ; সেখানে বিসূচিকা মহামারীতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ১২,০০০ লোকের মৃত্যু সত্ত্বেও এই দশকে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার হইয়াছিল শতকরা ৩৮'৬।"

সুতরাং বাংলা ন্যায়তঃ ধানবাদ সমেত সমগ্র মানভূম জেলা ফিরাইয়া পাইবার দাবি করিতে পারে।

মানভূমের পর বাংলার সীমানার বাহিরে অবস্থিত বাংলার সর্ব্বপ্রধান অংশ হইল সিংহভূম জেলার ধলভূম পরগণা মহকুমা। মেদিনীপুর এবং মানভূম জেলার সংলগ্ন এই মহকুমাটিতে ১,৪১,০০০ জন লোক বাংলা বলেন, ৫০,০০০ জন হিন্দুস্থানী বলেন, ৪৫,০০০ জন ওড়িয়া বলেন,

১,৪১,০০০ জন আদিম-নিবাসীর ভাষা বলেন, এবং ১৮,০০০ লোক অন্যান্য ভাষা বলেন। ওড়িয়া এবং আদিমনিবাসীদের মধ্যে যথাক্রমে ১৮,০০০ এবং ৬৪,০০০ লোক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা বলেন।

এই তথ্য হইতে কাহারও মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না যে এই মহকুমা বাংলায় ফিরিয়া আসা উচিত।

সদর মহকুমার অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। সেখানকার বাঙালীর সংখ্যা মাত্র ৬,০০০—শতকরা মাত্র ১ জন। ওড়িয়া এবং হিন্দুস্থানীভাষীর সংখ্যা যথাক্রমে ১,২৭,০০০ ও ৩১,০০০। ন্যায়তঃ সদর মহকুমা নূতন প্রদেশ উড়িষ্যায় যাওয়া উচিত।

ওড়িয়ারা প্রায়ই দাবি করেন যে সিংহভূম জেলার সমস্তটাই তাঁহাদের প্রদেশের সহিত যুক্ত হওয়া উচিত। এরূপ দাবি সম্পূর্ণ অন্যায় ও অসঙ্গত এবং বাংলা কোনক্রমেই ধলভূমের অধিকারে বঞ্চিত হইতে রাজী হইবে না। এই প্রসঙ্গে ধলভূমে ওড়িয়া ভাষা বিস্তারের প্রবল প্রচেষ্টার কথা সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রি। তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, আমাদের ওড়িয়া ভাইগণ জানেন তাঁহাদের দাবির দুর্ব্বলতা কোথায়, সেই জন্যই বাহিরের সাহায্য লইয়া এই দাবিকে দৃঢ় করিবার প্রয়াস। আমার মনে হয়, বাঙালীদেরও চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয় এবং যথাসাধ্য এই নূতন প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কি এ-বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন না? তাঁহারা নিয়মিত ভাবে ধলভূমের বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও ক্লব্ সমূহে বাংলা দৈনিক ও সাময়িকপত্র বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হইত?

আদমসুমারী বিবরণীতে এই জেলার ভাষিক অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিত হইয়াছে :—

জাতি এবং ভাষার দিক্ দিয়া সিংহভূমের দুইটি মহকুমা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আবার জামসেদপুর নগরী ধলভূম মহকুমার অবশিষ্ট অংশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জামসেদপুরের বাহিরে বাংলাই ধলভূমের প্রধান ভাষা, তাহার অনেক পরে ওড়িয়া এবং তাহারও অনেক পরে হিন্দুস্থানী। ইহার সহিত জামসেদপুর শহরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে দ্বিতীয় ভাষা রূপে তথাকার ১৮,০০০ অধিবাসী হিন্দুস্থানী ব্যবহার করেন এবং ১৮০০ জনেরও কম ব্যবহার করেন বাংলা। সদর মহকুমায় বাংলার প্রভাব প্রায় লক্ষিতই হয় না।

অন্যান্য যে-সকল অপ্রধান ভূখণ্ডে বাংলা কথিত হয় তাহাদের তালিকা নীচে দেওয়া হইল :—

(ক) ছোটনাগপুর রাজ্যসমূহের সরাইকেলা ও খরসাওয়ান রাজ্যে ৪৫,০০০ লোক বাংলা বলেন, ৫১,০০০ লোক ওড়িয়া বলেন, ১০,০০০ লোক হিন্দুস্থানী বলেন এবং ৭৯,০০০ লোক বলেন আদিমনিবাসীর ভাষা। সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ২৪ জন বাংলা ও ২৭ জন ওড়িয়া বলেন। এই রাজ্য দুটির উত্তর ও পূর্ব্ব সীমায় বাংলা-ভাষাভাষী ভূখণ্ড মানভূম ও ধলভূম অবস্থিত; সুতরাং খুব সম্ভব এই দুই রাজ্যের ৪৫,০০০ বাঙালীর অধিকাংশকেই উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তে একত্র পাওয়া যাইবে। অবশ্য এখানকার সীমানার পরিবর্ত্তন করার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

(খ) ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে ৩৩,০০০ বাঙালী আছেন, তাঁহারা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৪ জন মাত্র। ইঁহাদিগকে রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে ধলভূম ও মেদিনীপুরের সংলগ্ন দু-একটি অঞ্চলে একত্র পাওয়া যাইতেও পারে; তথাপি সীমানার কোনও পরিবর্ত্তন করা এখানে চলিবে না।

(গ) উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় ১৭,০০০ বাঙালী আছেন। ইঁহারা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ২ জন। থানা হিসাবে ভাষিক লোকসংখ্যা হইতে দেখা যাইবে যে, এই ১৭,০০০ বাঙালীর অধিকাংশ মেদিনীপুর জেলার সংলগ্ন অঞ্চলে একত্র বাস করেন কি না; তাহা করিলে ইঁহাদিগকে সহজেই বাংলার সীমার মধ্যে আনা যাইবে। অবশ্য যদি তাঁহারা বালেশ্বর জেলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উড়িষ্যাতেই থাকিতে হইবে।

উত্তরে পূর্ণিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বালেশ্বর পর্য্যন্ত বাংলার পশ্চিম-সীমান্তের সংলগ্ন জেলাগুলির বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। সংক্ষেপতঃ বাংলা

দেশ নিম্নলিখিত ভূখণ্ডগুলি এখনই ফিরাইয়া পাইবার দাবি করিতে পারে :—

(১) পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমা, (২) সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া ও পাকুড় মহকুমা, (৩) সমগ্র মানভূম জেলা, এবং (৪) সিংহভূম জেলার ধলভূম মহকুমা

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাংলার দাবি নির্ণয়ের জন্য থানা-হিসাবে ভাষিক লোকসংখ্যার সবিশেষ প্রণিধান করা প্রয়োজন :—

(১) পূর্ণিয়া জেলা—আমুর, কাডওয়া ও কাটিহার থানা; (২) সাঁওতাল পরগণা—ডুমকা ও রাজমহল মহকুমা; (৩) বালেশ্বর জেলা—জলেশ্বর, বালিয়াপাল ও বস্তা থানা; (৪) ময়ূরভঞ্জ রাজ্য; (৫) সরাইকেলা রাজ্য; (৬) খরসাওয়ান রাজ্য।

পূর্ব্ব-সীমান্তে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বাংলাই প্রধান ভাষা, যথা, গোয়ালপাড়া জেলায়, কামরূপ জেলার কোনও কোনও অংশে, শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায়। এদিককার সমস্যা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের। সমগ্র আসাম প্রদেশ ধরিলে বাঙালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়; সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা জনসাধারণের মনকে উত্তেজিত ও আচ্ছন্ন করিলেও এবং আসামী ও বাঙালীর মধ্যে নগণ্য পার্থক্য কৃত্রিম উপায়ে বাড়াইয়া তুলিলেও বাঙালীর স্বাভাবিক বিশেষত্ব ও সংস্কৃতি হারাইবার ভয় এখানে নাই। জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষার দিক্ দিয়া আসামী ও বাঙালীর মধ্যে পার্থক্য ধরিতে পারা শক্ত। এই দুইটি ভাষার প্রভেদ একই ভাষার বিভিন্ন বুলির স্থানীয় বিশেষত্ব হইতে অধিক নয়, এবং আসামের প্রায় সর্ব্বত্র কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলেই প্রায় বাংলা ভাষা বুঝিতে পারেন। দুইটি ভাষার বর্ণমালার লিখিত রূপও এক। আসামী ও বাঙালী উভয়ে একই ভাবে ধুতি পরিধান করেন এবং মিশ্র লোকসমষ্টির মধ্যে বাঙালী হইতে আসামীকে চিনিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন। আমার অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, আসামী বন্ধুগণের মধ্যে থাকিলে আমি অনুভবই করি না যে আমি বাঙালীদের মধ্যে নাই; কিন্তু ওড়িয়া এবং বিহারী বন্ধুগণের সঙ্গে থাকাকালীন অনুরূপ অনুভূতি হয় না। আমার কোনই সন্দেহ নাই যে, আসাম প্রদেশে এখন যে তুচ্ছ হিংসাদ্বেষের ভাব দেখা দিয়াছে তাহা অচিরে দূর হইবে এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ একই জাতির এই দুইটি শাখা একসঙ্গে মিলিত হইয়া চলিবে, ঠিক যেমন স্কচ ও ইংরেজ অতীত কালের বিবাদ ও যুদ্ধ সত্ত্বেও ব্রিটিশ জাতির সাধারণভূমিতে গর্ব্বের সহিত তাহাদের স্বাতন্ত্র্য মিশাইয়া দিয়াছে। ইহাতে যে অসমীয়া ভাষাকে স্থানভ্রষ্ট হইতে হইবে এমন কোনও কারণ নাই। স্কচদের গান ও গাথা ইংরেজ ও স্কচ উভয়কেই কি আজ অবধি সমভাবে আনন্দ দিয়া আসিতেছে না?

অবশ্য আমাদের আসামী ভাইয়েরা যদি স্থির করেন যে, তাঁহাদের নিজেদের উন্নতিবিধানের জন্য আসাম হইতে বাঙালীদের সরাইয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন তাহা হইলে বাংলা নিম্নলিখিত ভূখণ্ডগুলি ফিরাইয়া চাহিবে :—

সুরমা উপত্যকা স্বাভাবিক বিভাগ সমস্তটাই বাংলায় আসিবে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে সমগ্র শ্রীহট্ট জেলা এবং কাছাড় জেলার সমতলভূমি। আদমসুমারী বিবরণীতে লিখিত আছে :—

"সুরমা উপত্যকা ভাষাগত এবং সামাজিক কারণে বাংলারই অংশ এবং ইহার অধিবাসীদের আসাম-উপত্যকাবাসীদের সহিত অল্পই সংযোগ আছে।"

গোয়ালপাড়া জেলার পূর্ব্ব অংশের কামরূপের সংলগ্ন বিজনী, উত্তর-সালমারা, গোয়ালপাড়া ও দুধনাই থানা বাদ দিয়া বাকী সমস্তটাই বাংলায় ফিরিবে। এই চারটি থানায় ১,১৬,৪১৩ জন অসমীয়া বলেন এবং ৬৪,২৮৩ জন বাংলা বলেন। আদমসুমারী বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

গোয়ালপাড়া মহকুমার অধিকাংশে অসমীয়া ভাষা কথিত হয় এবং সদর বা ধুবড়ী মহকুমায় কথিত হয় বাংলা। গোয়ালপাড়া জেলার অসমীয়া- এবং বাংলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা আমি থানা হিসাবে নিরূপণ করিয়াছি এবং ইহার ফলাফল এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে অসমীয়া ভাষা (বা যাহা লোকে অসমীয়া বলিয়া দাবি করে) ধুবড়ী, গোলকগঞ্জ, গোসাইগাঁও ও মনকাচর থানায় প্রায় মোটেই ব্যবহৃত হয় না; এই চারিটি থানাই জেলার বাংলার দিকের সীমায় অবস্থিত। এই জেলার কামরূপের দিকের সীমায় অবস্থিত

গোয়ালপাড়া, ছুধনাই, উত্তর-সালমারা ও বিজনী থানায় বাংলা হইতে অসমীয়াই সমধিক কথিত হয় এবং জেলার মধ্যভাগে অবস্থিত বিলাসীপাড়া, কোকড়াঝর এবং লখীপুর থানায় অসমীয়া ও বাংলা ছুইই কথিত হয়, কিন্তু বাংলারই প্রাধান্য বেশী।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, কামরূপ জেলার বড়পেটা মহকুমায় বাংলা-ভাষী লোকসংখ্যার অসাধারণ বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিলে গোয়ালপাড়া জেলার পূর্ব্ব প্রান্তের চারিটি থানার আসামের সহিত যুক্ত থাকিবার দাবি বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইবে। এই মহকুমাটি কামরূপ জেলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এবং গোয়ালপাড়া জেলার পূর্ব্বোল্লিখিত চারিটি থানার সংলগ্ন। আদমসুমারী বিবরণীতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

আসাম উপত্যকার মধ্যে কামরূপ এখন সকলের চেয়ে জনবহুল এবং ইহার লোকসংখ্যা ২,১৩,১৭৫ বৃদ্ধি পাওয়ায় শিবসাগরকে অতিক্রম করিয়াছে ; ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শিবসাগরই ছিল জেলাগুলির মধ্যে সকলের চেয়ে জনবহুল। এই দশকে কামরূপের জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ২৭·৯ ; ১৯১১-২১ সালে হইয়াছিল ১৪·২। এইরূপ আকস্মিক হারে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ বুঝা যাইবে যদি এই শতকরা বৃদ্ধি গৌহাটী ও বড়পেটা মহকুমায় পৃথক্ করিয়া দেখা যায়। গৌহাটীতে শতকরা ১৪·৬ এই পরিমিত মাত্রায় বাড়িয়াছে, কিন্তু বড়পেটা মহকুমায় বৃদ্ধির হার খুবই বেশী,—শতকরা ৬১। বড়পেটার এই অভূতপূর্ব বৃদ্ধি (১৯২১ সালের আদমসুমারীতেও এখানে বেশ বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল, শতকরা ৩৪·১) প্রায় সম্পূর্ণই পূর্ব্ববঙ্গ, প্রধানতঃ মৈমনসিংহ হইতে আগত ঔপনিবেশিকদিগের জন্ম।...বড়পেটা মহকুমার তিনটি থানার মধ্যে বড়পেটা থানা—যেখানে বৃদ্ধির হার শতকরা ১০১·৫—এবং সরভোগ থানা—যেখানে বৃদ্ধির হার শতকরা ৮৪·৫—এই ছুইটি থানাই সমগ্র মহকুমায় অতিরিক্ত পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্ম দায়ী।

সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, থানা-হিসাবে ভাষিক লোকসংখ্যা পাওয়া গেলে দেখা যাইবে যে বড়পেটা মহকুমায় বাঙালীরাই এখন প্রধান এবং এই মহকুমাকে বাংলার সহিত যুক্ত করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ঔপনিবেশিকেরা চাষ-আবাদ করিবার জন্ম এখানে স্থায়ী বাসিন্দারূপে আসিয়াছে, এই কথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে। বড়পেটা মহকুমাকে বাংলার সহিত যুক্ত করা না-করা অবশ্য নির্ভর করিবে, বড়পেটা মহকুমার এবং গোয়ালপাড়া জেলার বিজনী, উত্তর-সালমারা, ছুধনাই ও গোয়ালপাড়া—এই চারিটি থানার বাংলা ও অসমীয়া ভাষাভাষীর সমষ্টিগত এবং আপেক্ষিক লোকসংখ্যার উপর। কারণ বড়পেটা মহকুমাকে বাংলায় ফিরাইয়া দিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালপাড়া জেলার উপরিলিখিত চারিটি থানাকেও বাংলায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার পর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উত্তর-কাছাড় পার্ব্বত্য অংশের সংলগ্ন নওগাঁ জেলায় বাংলা হইতে আগত স্থায়ী বাসিন্দা অধিক সংখ্যায় আছেন। এই জেলার প্রতি ১০,০০০ লোকের মধ্যে ৩,৪৩৭ জন বাংলা বলেন এবং ৪,২২০ জন অসমীয়া বলেন। থানা-হিসাবে ভাষিক লোকসংখ্যা হইতে দেখা যাইবে, বাঙালীরা উত্তর-কাছাড় পার্ব্বত্য অঞ্চলের কাছাকাছি স্থানে মোটামুটি একত্র থাকেন কি না। তাহা হইলে উত্তর-কাছাড় মহকুমার সঙ্গে নওগাঁর কিছু অংশ বাংলা ফিরাইয়া চাহিবে।

একথা প্রায়ই শুনা যায় যে, আদমসুমারীর সংখ্যায় যেরূপ প্রকাশ পায় সত্যসত্যই তত বাঙালী আসাম-উপত্যকায় নাই ; কারণ আসামীরা আসামী ছাড়া যে কোন অন্যজাতীয় লোককে বাঙালী বলিয়া অভিহিত করেন। আদমসুমারী বিবরণী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশগুলি হইতে সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকে না যে, এই কারণে অন্ততঃ কামরূপ ও নওগাঁও জেলার কোনও কোনও অংশের উপর বাংলার দাবির বিরুদ্ধতা করা যায় না।

ছুঃখের বিষয় উত্তর-আসামে 'বাংলা' শব্দটির অর্থ আসামী ভিন্ন অন্য যে কোনও জাতির লোক এবং আসামী গণনাকারীদের মধ্যে যে কোনও বিদেশী-ভাষাভাষীকে 'বাংলা' (ইহার অর্থ যাহা কিছু বিদেশী) বলিয়া লিখিবার প্রবৃত্তি সুবিদিত। বস্তুতঃ অপেক্ষাকৃত সরল আসামী গ্রামবাসীরা ইউরোপীয়কে কখন কখন 'বোগা বাংলা' অর্থাৎ সাদা বাঙালী বলিয়া অভিহিত করেন। এই কারণে উত্তর-আসামের জেলাগুলিতে বাংলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা নির্ভরযোগ্য নহে।...

আসাম উপত্যকায় (সীমান্ত অঞ্চল বাদ দিয়া) বাংলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা ৮,৫২,০০০ হইতে ১০,৮৬,০০০ জনে উঠিয়াছে। এই উন্নতি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায় কামরূপ (+১,২০,০০০) এবং নওগাঁও (+১.২৩,০০০) জেলায়। এই ছুইটি জেলার

কোনটিতেই অধিক চা উৎপন্ন হয় না, সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে আসামী গণনাকারী যারা যে কোনও বিদেশী ভাষা অর্থে 'বাংলা' লিখিবার কথা প্রায় উঠেই না।…কামরূপ ও নওগাঁওতে বাংলা-ভাষাভাষীদিগের সমধিক বৃদ্ধি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ঔপনিবেশিকদিগের অবিশ্রান্ত আগমন এবং পূর্ব্বগামী আগন্তুকদিগের স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধির ফল।…

আসাম উপত্যকার বাংলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা যথাযথ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না, কারণ বাংলা শব্দটি যে-কোনও বিদেশী ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কামরূপ ও নওগাঁও-এর সংখ্যা মোটামুটি ঠিকই হওয়া উচিত, যেহেতু এই জেলা দুটিতে চা-বাগান খুব কমই আছে। আসামস্থ পূর্ব্ববঙ্গীয় ঔপনিবেশিকদিগের অধিকাংশই এই জেলা দুটিতে আসিয়াছেন, সুতরাং এই জেলা দুটির লোকসংখ্যার বৈভাষিক তথ্যাবলী সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কামরূপের ১,৭০,০০০ বাংলাভাষী ও নওগাঁও-এর ১,৯৩,০০০ বাংলাভাষীর মধ্যে প্রত্যেক জেলায় বর্ত্তমানে মাত্র ৪,০০০ লোক পরিষ্কার অসমীয়া বলিতে পারেন।

সুতরাং কামরূপের বড়পেটা মহকুমাকে এবং গোয়ালপাড়া জেলার পূর্ব্বপ্রান্তিক চারিটি থানাকে বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার যে দাবি সর্ব্বাধীনভাবে করা হইয়াছে, তাহা খুবই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত।

আসাম প্রদেশের সুনির্দ্দিষ্ট তিনটি স্বাভাবিক বিভাগের মধ্যে সুরমা-উপত্যকা এবং ব্রহ্মপুত্র বা আসাম উপত্যকা এই দুইটি বিভাগ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন দেখা যাউক, এই দুইটি উপত্যকার মধ্যে স্থিত পার্ব্বত্য স্বাভাবিক বিভাগের অবস্থা কিরূপ। নীচের তালিকায় প্রতি ১০,০০০ লোকসংখ্যায় কত লোক বিভিন্ন ভাষা মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করেন, তাহা লিখিত হইল :—

	বাংলা	অসমীয়া	আদিমনিবাসীর ভাষা
গারো পাহাড়	১,০৭১	২৯২	৮,৪৪৩
খাসি ও জৈন্তিয়া পাহাড়	১৯১	৬৫	৮,৯৯৪
উত্তর-কাছাড় পার্ব্বত্য মহকুমা	৩৩৩	১০৭	৮,৪০০
নাগা পাহাড়	২৯	৪৬	৯,৬৮৭
মণিপুর পাহাড়	৫১	৩	৯ ৮৪৪
লুশাই পাহাড়	১০৭	৯	৯,৬৭৮
সমগ্র পার্ব্বত্য বিভাগ	২৪৮	৭০	' ৯,৩৬০

উপরিলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট হয় যে, এই বিভাগে আদিমনিবাসীদিগের ভাষাগুলিরই প্রাধান্য এবং বাংলা ও অসমীয়া উভয় ভাষারই প্রভাব অতি সামান্য। কিন্তু এই দুইটি ভাষার মধ্যে বাংলা নিঃসন্দেহে উচ্চতর স্থান অধিকার করে। এই বিভাগের মোট লোকসংখ্যা ১২,৭২,৫৩৫ এবং উপরিউক্ত হিসাব অনুসারে বাংলা বলেন ৩২,০০০ লোক ও অসমীয়া বলেন মাত্র ৯,০০০ লোক। সুতরাং এই বিভাগকে আসামের মধ্যে না রাখিয়া বাংলার সহিত যুক্ত করিবার দাবি খুবই সঙ্গত। শ্রীহট্ট জেলা ও কাছাড় সমতলভূমির বাঙালীদিগের সহিত প্রতিবেশী পাহাড়িয়াদিগের বহু ক্ষেত্রে সংস্পর্শ ও সংযোগ থাকায় এই দাবি অধিকতর সমর্থিত হইবে। সুতরাং বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি যদি বাংলাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে পার্ব্বত্য বিভাগও আমাদের দাবি করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই বিভাগের উপর ভাষাগত বা সংস্কৃতিগত কারণে কোনরূপ দাবিই আসাম করিতে পারে না।

এরূপ বিতর্ক উঠিতে পারে যে সুরমা উপত্যকা, পার্ব্বত্য স্বাভাবিক বিভাগ, এবং গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাদ দিলে আসামের যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে ইহার পৃথক্ প্রাদেশিক অস্তিত্ব বজায় রাখা খুবই শক্ত হইবে। ইহার মূলে কিছু সত্য আছে, কিন্তু তাহার সহিত বাংলার কোনই সংস্রব নাই। বাংলাকে যদি শ্রীহট্ট এবং কাছাড় সমতলভূমি ফিরাইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত গোয়ালপাড়া, সম্ভবতঃ কামরূপের এক অংশ, এবং পার্ব্বত্য স্বাভাবিক বিভাগকেও দাবি করিতে হইবে।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভা ভাষানুযায়ী প্রদেশ গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার তাঁহাদের কোনও তৎপরতা বা চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। অবশ্য নূতন প্রদেশ স্থাপনা করিতে নানারূপ বাধা আছে। কিন্তু নূতন প্রদেশের সৃষ্টি না করিয়া বর্ত্তমান প্রদেশগুলির সীমানার রদবদল করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এজন্য অনির্দ্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবার কারণ নাই।

প্রায়ই একথা বলা হয় যে, দেশের সম্মুখে এমন অনেক আশু কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে, যাহার উপেক্ষা করিয়া প্রাদেশিক সীমারেখার রদবদলের ভার

বর্ত্তমানে গ্রহণ করা যায় না। সমগ্রভারতব্যাপী এই সমস্যাটির সমাধান করিতে হইলে অনুকূল অবস্থার জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন, একথা সত্য, তথাপি এ-বিষয়ে বাংলার বিশেষ অসুবিধা অবিলম্বে দূর করিতে রাজী না হইবার কোনই কারণ নাই। ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী-প্রচার প্রভৃতি কংগ্রেস-কর্ম্মসূচীর অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সম্বন্ধে যদি বিলম্ব করা না-চলে, এবং অধুনা কংগ্রেসের আয়ত্তাধীন সরকারী শাসনযন্ত্রের সাহায্যে অনিচ্ছুক লোককে এই ভাষাটি গলাধঃকরণ করিতে যদি বাধ্য করা চলে, তবে সীমানা-বিষয়ে বাংলার প্রতি যে ঘোরতর অন্যায় করা হইয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতীকার করা কে হইবে না ?

আজকাল একরূপ রেওয়াজ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, দেশের প্রত্যক সমস্যা হিন্দু-মুসলমান লোকসংখ্যার অনুপাত হিসাব করিয়া বিচার করা। দুঃখের বিষয়, এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাক, বিহার ও আসাম হইতে বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া পুনর্গঠিত বাংলার সাম্প্রদায়িক অনুপাতের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইবে কি না। বর্ত্তমান বাংলার মোট ৫,১০,৭৭,৩৩৮ লোকের মধ্যে ২,২৫,৩২,৬৩২ জন হিন্দু (বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধরিয়া); ২,৭৮,১০,১০০ জন মুসলমান; শতকরা হিন্দু ৪৪·১১, মুসলমান ৫৪·৪৪ জন।

ধরা যাক যে পুনর্গঠিত বাংলায় যুক্ত হইবে পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমা, সাঁওতাল-পরগণার জামতাড়া ও পাকুড় মহকুমা, সমগ্র মানভূম জেলা, সিংহভূম জেলার ধলভূম মহকুমা, সমগ্র গোয়ালপাড়া জেলা, কামরূপ জেলার বড়পেটা মহকুমা, সমগ্র শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা এবং গারো, খাসি-জৈন্তিয়া, লুশাই, মণিপুর ও নাগা পাহাড়। তাহা হইলে বাংলার লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইবে ৯০,০৮,০৫৮; ইহার মধ্যে ৫৫,৮১,০৬০ হইবে হিন্দু (বৌদ্ধ প্রভৃতি সমেত) এবং ২৯,৪১,৪১৭ হইবে মুসলমান। সমগ্র লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে মোট ৬,০০,৮৫,৩৯৬ এবং ইহার মধ্যে ২,৭১,১৩,৬৯২ জন হইবে হিন্দু ও ৩,০৭,৫১,৫১৭ জন মুসলমান; শতকরা হিসাবে হইবে হিন্দু ৪৫·১২, মুসলমান ৫১·১৭। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুর অনুপাত অতি সামান্যই বাড়িবে ও মুসলমানের অনুপাত সামান্য কিছু কমিবে। তথাপি এখনকার মত তখনও মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় থাকিবেন।

দান

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-এ

'আজ শনিবার তোমার সকাল-সকাল ছুটি। কোন একটা অছিলে ক'রে দেরি ক'রো না যেন।' স্বামীকে ভাতের থালাটা এগিয়ে দিয়ে বিমলা বললে।

'আজই নিয়ে যেতে হবে?' তাড়াতাড়ি মুখে এক গ্রাস ভাত পুরে দিয়ে তারিণী জবাব দিলে।

'হ্যাঁ, কাল-পরশু করতে করতে তো দু-মাস কেটে গেল। মাসুদি বলছিলেন, চণ্ডীদাস বইখানা আর বড়-জোর এক হপ্তা দেখান হবে।'

'না হয় আর একখানা বই দেখা যাবে—ওদের কি আর বইয়ের অভাব আছে?'

'না গো না। চণ্ডীদাসই দেখতে হবে। গল্পটা যদি তুমি মাসুদির মুখে শুনতে—কি চমৎকার!' বিমলা উৎসাহের সঙ্গে বলে।

'আমি ভাবছিলাম, মাসের শেষ, হাতে একটিও পয়সা নেই। আর হপ্তায় মাইনে পেলে—'

'মাইনে তো পাবে ত্রিশটি টাকা। দোকানী,

গয়লা আর কয়লাওলার দেনা শোধ করতে প্রতিমাসেই তো হাতে থাকে বার আনা পয়সা। ও লোভ আর আমাকে দেখিও না।' পাশের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে বিমলা গেলাসটা ঠক্ ক'রে তারিণীর থালার সামনে বসিয়ে দিলে।

তারিণী গেলাসটা একটু কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'রাগ করছ কেন বিলা? আজ কত দিন হ'ল শ্রীরামপুরে সিনেমা হয়েছে, তবু এক দিনের জন্তেও তোমায় নিয়ে যেতে পারলাম না। আমার কি ইচ্ছে হয় না যে তোমায় নিয়ে যাই? কিন্তু কি করব, ট্রেনভাড়া আছে, সেখানকার টিকিট আছে, এখানেও ষ্টেশন পর্য্যন্ত একখানা ঘোড়ার গাড়ী না করলে কি আর সমাজে মান থাকবে? সে প্রায় টাকা-তিনেকের ধাক্কা। তিন টাকা আজ পাই কোথা বল?'

একটু নরম হয়ে বিমলা বললে, 'সে আমি দেব, তার জন্তে ভেব না।'

'দেবে তো জানি কিন্তু পাবে কোথা?'

প্রত্যেক মাসে আমি তাকের মাথায় কিছু কিছু তুলে রাখি, তা থেকে নেব।'

'বল কি, তিন টাকা জমেছে তাতে?'

'হাঁ, খুব। তুমি বল আজ সকাল-সকাল ফিরবে।'

'আজ তাহলে যাবেই দেখছি!' একটু হেসে তারিণী জবাব দিলে।

স্বামীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে বিমলার মনের মধ্যে খুশীর আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তার কত দিনের সাধ আজ পূর্ণ হবে। পাড়ার সকলেই সিনেমা দেখে এসেছে। বাঁড়ুজ্জেদের মেয়েরা তো ফি সপ্তায় কলকাতা যায়—ওদের পয়সার অভাব নেই।

মানুষের মত হাত-পা নাড়ে আবার কথাও বলে—ছায়া, পর্দার উপরকার ছায়া—বিমলা ভাবতে ভাবতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। গ্রামোফোনে মানুষের কথা ও শুনেছে কিন্তু সত্যিকারের মানুষের মত হাত-পা নেড়ে অভিনয় করা—এ ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। স্বামী আপিসে চলে যাবার পর প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে ধার করে নিয়ে আসা চণ্ডীদাস পালার বইখানা ও আর এক বার পড়ে নেয়—এমন কয়েক বার ও পড়েছে। তবু পাছে গল্পটা ছবির পর্দায় অনুসরণ করতে না-পারে তাই এই সাবধানতা।

কিন্তু পয়সার হিসেব করতে গিয়ে গণ্ডগোল বাধল। পুরনো ধোঁয়াটে-কালো একটা সিঁদুর-চুপড়ি রান্নাঘরের তাক থেকে পেড়ে তা থেকে একরাশ পয়সা আর কয়েকটা আনি মেঝের উপর ঢাললে। কিন্তু বার-পাঁচেক একটি একটি ক'রে গুণেও তা থেকে এক টাকা সাড়ে আট আনার বেশী সে কিছুতেই বার করতে পারলে না।

সিঁদুর-চুপড়িটা তাকের মাথায় যথাস্থানে রেখে সে ভাবলে, যাই মাহুদির কাছে দেখি। তার কাছে তো কোন দিন টাকাকড়ি চাই নি। চাইলে কি আর পাব না!

পাশের দুটো বাড়ী পেরিয়ে দত্তদের বাড়ী এসে মালিনীকে বললে, 'দাও তো মাহুদি দুটো টাকা।'

'দুটো টাকা, কেন রে?'

'দরকার আছে একটু।—তোমার শরীরটা শুকনো কেন?'

'ও কিছু না। আমায় বলবি না, তোর মুখটা আজ অত হাসিহাসি কেন রে?'

'আজ তোমার দেওর বলেছে—বায়স্কোপে নিয়ে যাবে। তা আমার কাছে আছে মোটে দেড় টাকা, অথচ খরচ হবে তিনটে টাকা। তাই ভাবলুম, তোমার কাছে যদি থাকে। দেড় টাকা পেলেই চলত, তবু আট আনা পয়সা বেশী নেওয়া ভাল, কি জানি বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, যদি হঠাৎ কোন দরকার হয়।'

মালিনী বললে, 'সকালে যদি আসতিস তো হয়তো ওঁর কাছ থেকে চেয়ে দিতে পারতুম; জানিস না, আমার কাছে চাবি থাকে না। এ-বাড়ীর পুরুষরা কি তেমনি!'

বাড়ী ফিরে এসে বিমলার উত্তেজনা বেড়ে যায়। আজ যেমন ক'রে পারে সে বায়স্কোপে যাবেই। এত দিন স্বামীকে রাজী করাতে পারে নি, আজ স্বামী রাজী হয়েছেন। অথচ পয়সার অভাবে যাওয়া

হবে না। সে কি বোকা! এত দিন অনায়াসে আরও কিছু বেশী ক'রে জমাতে পারত। সে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলে।

কিন্তু বাড়ীতে ব'সে ব'সে ভাবলে তো আর পয়সা মিলবে না। প্রায় এগারটা বাজল। আর ঘণ্টা-কয়েক পরেই তারিণী ফিরে আসবে। আড়াইটের গাড়ীতে যেতেই হবে। দেরি ক'রে গেলে আবার গল্পটা সব বুঝতে পারবে না,—ঘোষেদের বৌয়ের মুখে ও এ-কথা শুনেছে। তাছাড়া, ও পয়সা দিয়ে যাবে যখন, গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত কিছু বাদ দেবে না। সিনেমার সব জিনিষ ও দেখতে চায়। বরং কিছুক্ষণ আগে গিয়ে বাড়ীটার চারি দিক্ ঘুরে ঘুরে দেখবে। সিনেমার সম্বন্ধে বিমলার ঔৎসুক্যের শেষ নেই। আর কখনও হয়তো যাওয়া হবে না। এক বার যখন সুযোগ ঘটেছে, ও তন্ন তন্ন ক'রে সব দেখে আসবে।

'দুধ নাও বৌমা।' তেলী-বৌ এসে ডাক দেয়। তেলী-বৌকে দেখে হঠাৎ বিমলার মাথায় একটা খেয়াল চাপে। দুধ নেবার পর সে বলে, 'মাসি একটা কথা বলি শোন।'

'কি গা বৌমা?'

'গোটা-চারেক টাকা ধার দাও না। বড় দরকার।' বিমলা চুপি চুপি বলে—যেন সে বাজারের মাঝখানে রাজ্যের লোকের সামনে কথা বলছে।

'আর-মাসে দুধের দু-টাকা দিতে পার নি, আবার চার টাকা ধার কোথায় পাব বৌমা? তোমাদের দশ জনের বাড়ী থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যাহোক ক'রে তো দিন কাটাচ্ছি—জান তো সবই মা।'

'কানের এই দুলটা রেখেই না-হয় টাকাটা দাও না, বড় দরকার না হ'লে কি আর চাইছি?' ডান কানের দুলটি খুলে বিমলা তেলী-বৌয়ের হাতে দিলে।

দুলটা হাতে ক'রে তেলী-বৌ বললে, 'ঠিকদুপুর-বেলা গয়নাটা তো কান থেকে খুলে দিলে বাছা। হাতে টাকা না থাকলে কি করব বল? তবু গিয়ে দেখি যদি শাশুড়ীর কাছে অন্তত টাকা-দুয়েক পাই।'

তেলী-বৌ চলে যেতেই বুকের আঁচলটা এলিয়ে দিয়ে বিমলা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। আর টাকার ভাবনা কি! এত সহজ উপায় থাকতে এতক্ষণ কি ভাবনাই না সে ভাবছিল। দু-টাকা দু-টাকাই সই। শাশুড়ীর নাম ক'রে ও নিশ্চয়ই নিজের ভাঙা সিন্দুক থেকে টাকা বার ক'রে নিয়ে আসবে। তাহলে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হ'ল।

খেতে বসে ও খেতে পারে না। ওর আজ মনের মধ্যে ডেকে উঠেছে খুশীর বন্যা। সংসারের সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদ আজ ওর নেই।

'বৌদি, ও বৌদি শুনছ?'

ডাক শুনে বিমলা ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে। সবে মাত্র একটু তন্দ্রা এসেছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল, ওর স্বামী বুঝি ডাকছেন। চোখ রগড়ে চেয়ে দেখে, মালিনীর ছোট দেওর। মুখে তার ব্যস্ত দুশ্চিন্তার রেখা।

'কি ঠাকুরপো, কি হয়েছে?' বিস্ময়ের সুরে বিমলা জিজ্ঞেস করলে।

'পাঁচটা টাকা দিতে পার? বৌদির অসুখ করেছে। শ্রীরামপুরে ওষুধ আনতে যেতে হবে।'

'মাসুদির অসুখ করেছে?' কথাটা জিজ্ঞেস ক'রেই বিমলা সাবধান হয়ে যায়। ক্ষণিকের মধ্যে অনেকগুলো ভাবনা তার অন্তর্লোকে বিদ্যুৎগতিতে খেলে যায়। অসুখ করেছে বললেই টাকা দিতে হবে নাকি! আজ বায়স্কোপে না যাওয়া হ'লে আর কখনও হবে! জগৎ-সুদ্ধ সকলের কথা ভাবতে গেলে তো সংসারে বেঁচে থাকা চলে না।

'কোথায় পাব ভাই? এই দেখ না আজ তোমার দাদার সঙ্গে বায়স্কোপে যাবার কথা ছিল, টাকার অভাবে যাওয়া হবে না হয়তো।' অতি-সাবধানতায় হঠাৎ এক টুকরা মিথ্যা কথা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। কথাটা ব'লে ফেলেই কিন্তু ও নিজেকে সামলে নেয়। বলে, 'কি অসুখ করেছে মাসুদির?'

জোরে জোরে পা ফেলে ফিরে যেতে যেতে ছেলেটি

বললে, 'কি জানি, ডাক্তার বাবু তো যা বললেন তা কলেরার মতন।'

মিথ্যা কথাটার জন্যে অনুশোচনা ঘুরেফিরে ওর মন থেকে কিছুতেই যেতে চায় না। কলেরা অসুখ ভয়ঙ্কর, তাতে মানুষ মারা যায়—ও শুনেছে। ওর ইচ্ছে হ'ল, মাসুদিকে দেখে আসে। কিন্তু ঘড়িতে একটা বেজে গেছে। এখুনি তারিণী ফিরে আসবে। তার পর যা আনন্দ! নাঃ, বায়স্কোপ এমন একটা কি জিনিষ যার জন্যে এত তোড়জোড়! বিমলা নিজেকেই নিজে ধমকে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে মালিনীর ঘরে আসতেই ও দেখতে পেলে, মালিনী মেঝেয় শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ভেদ বন্ধ হয়ে তার তলপেটে খিল ধরেছে—নিঃশ্বাস নিতে পর্য্যন্ত কষ্ট হচ্ছে আর বুক থেকে গুমরে উঠছে অসহ্য গোঙানি। মালিনীর শাশুড়ী আর ননদ তার হাতে পায়ে গরম জলের সেক দিচ্ছে। পাড়ার মোহন ডাক্তার সামনে ব'সে আছেন। মালিনীর মুখের দিকে চেয়ে বিমলা অবাক্ হয়ে গেল, এ কি, এ যে আর চিনতে পারা যায় না। কয়েক ঘণ্টা আগে যাকে দেখেছিল কেমন ঢলঢলে মুখ, এখন তা যেন চুপসে অস্থিসার হয়ে গিয়েছে।

বিমলা কোন কথা না ব'লে মালিনীর পায়ের কাছে গিয়ে বসল। শাশুড়ীকে ব'লে, 'আমি সেক দিচ্ছি দিন।'

'তুমি কেন বসলে বৌমা, এ বড় ছোঁয়াচে রোগ। বরং রান্নাঘরে গিয়ে জল গরম ক'রে দাওগে।'

'না আমি এখানেই থাকি।'

চকিতের জন্যে ঘড়ির দিকে চাইতেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। দুটো বাজতে পাঁচ মিনিট। আর তো সময় নেই। এতক্ষণে হয়তো তারিণী ঘরে ফিরেছে। না, আজ তার কিছুতেই আমোদ করতে যাওয়া উচিত নয়—তার মনের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব সুরু হয়।

'উঃ, বড্ড শীত।'—হঠাৎ মালিনীর সারা দেহ কাঁপতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে ইনজেক্‌শান্ দেওয়া হয়েছিল। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নাড়ী দেখবার জন্যে রোগীর হাতটা টিপে ধরলেন। মুখে তাঁর উদ্বেগের ছায়া পড়ল।

বিমলা ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। ডাক্তারবাবু মালিনীদের চাকরকে ডাকলেন, 'গদা, গদা।'

'আজ্ঞে।'

'ছোটবাবু এখনও তো ফেরেন নি?'

'না বাবু, তেনার তো দেরি হবেই। সেই ছিরামপুরে গেছেন।'

'যা, নগেনবাবুর ডাক্তারখানা থেকে এই ওষুধটা নিয়ে আয়। কাগজে লিখে দিচ্ছি।—খুড়ীমা আপনার কাছে টাকা আছে?' ডাক্তারবাবু মালিনীর শাশুড়ীর দিকে চাইলেন।

তিনি বলিলেন, 'না বাবা, যা ছিল সব নিয়ে তো বিজু শ্রীরামপুরে গিয়েছে। বাক্সের চাবি পর্য্যন্ত আমার কাছে নেই।' তাঁর স্বর কেঁপে ওঠে।

'আচ্ছা, আপনি ভাববেন না। ওরে গদা, আগে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে মার কাছ থেকে দুটো টাকা নিবি বুঝলি?—কি জানি, নগেন ডাক্তার যা পিশাচ। আমার নাম দেখলেই হয়তো তিন গুণ দাম হেঁকে বসবে। এই ব'লে মোহনবাবু এক টুকরো কাগজে ওষুধের নামটা লিখে গদার হাতে দিলে।

গদাকে চলে যেতে দেখে বিমলা দাঁড়িয়ে উঠে ঘরের বাইরে এসে বললে, 'ডাক্তারবাবুর বাড়ী অনেক দূরে—অতটা গিয়ে আর কাজ নেই গদা। আমার সঙ্গে আয় টাকা নিয়ে যা।'

গদাকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামতেই ঘোষেদের গিন্নির সঙ্গে দেখা। বিমলাকে দেখে গিন্নি বললে, 'কেমন আছে বামুনদের বৌমা?—একটু ভাল? আহা, মা, অমন বৌ আর হয় না। এই দেখ না, যাচ্ছি ছিরামপুরে। কেষ্টা পাস পেয়েছিল—না গেলে আবার রাগ করবে—আমারও চণ্ডীদাস দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল মা।'

চকিতের জন্যে বিমলার মন ছাঁৎ করে ওঠে।

সিমেন্ট পায়ে পা জড়িয়ে যায়, তার পর আবার সামলে নিয়ে সে পথ চলতে থাকে।

বাড়ীতে পা দিতেই তারিণী চীৎকার ক'রে উঠল, 'এতক্ষণ ছিলে কোথায়? এখনও কাপড় প'রে তৈরি হও নি? আমি আধ ঘণ্টা ধরে তোমায় খুঁজছি। থাক্ আর কথা বলতে হবে না, শিগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও। আর পঁচিশ মিনিটও সময় নেই। আমি ঘোড়ার গাড়ী ডাকতে চললুম।' কোন কথা বলার আগেই সে হন্ হন্ ক'রে চলে যায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বিমলা নিজেকে আর চেপে রাখতে পারে না। উঠানে গদা দাঁড়িয়ে। দু-তিনখানা বাড়ী আগে তার বন্ধুর কাতর গোঙানি। তবু—। ঘর থেকে বার হয়ে এসে ও বলে, 'না, গদা, বাক্সে কি কিছু রাখবার জো আছে। তোমায় মিথ্যে কষ্ট দিলুম। ডাক্তার-বাবুর বাড়ীতে গিয়েই টাকা নিয়ে এস গে।'

তার পরের কাহিনীটুকু খুবই ছোট। ট্রেনে উঠেই তার সব বিপদ মনে হয়। কানে কেবল বাজতে থাকে একটা কাতর, বুকভেদী গোঙানি। নিজের উপরও বিতৃষ্ণা আসে। প্রায় পাঁচ বছর শেষ হতে চলল, তার বিয়ে হয়েছে। প্রথম যেদিন সে শ্বশুরবাড়ী আসে, সেদিন একমাত্র এই মাসুদিকেই তার খুব ভাল লেগেছিল। প্রতিবেশী হ'লেও তাকে দেখবামাত্র কেমন যেন একটা আত্মীয়তা হয়ে গিয়েছিল। তার পর তার নিঃসঙ্গ সংসার-জীবনের এই সুদীর্ঘ কাল মাসুদি না-থাকলে চলত কেমন ক'রে? একে একে নানা ভুলে-যাওয়া ঘটনা বিমলার মনে পড়ে। মালিনীর অতি তুচ্ছ, সামান্য স্নেহটি পর্য্যন্ত যেন মনে হয় কত বড়—কত দুর্লভ! আজ হয়তো সিনেমা দেখে ফিরে যাবার পর আর তার সঙ্গে দেখা হবে না—হয়তো গিয়ে দেখবে—নাঃ, কথাটা ভাবতেও বিমলার প্রাণটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

'কি অত ভাবছ বল তো? তোমার মাসুদির কথা বুঝি? গাড়ী নিয়ে আসবার সময় মোহন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ'ল, বললে ভয়ের বিশেষ কারণ নেই।'

বিমলা জবাব দিতে পারে না। সে যেন ধরা পড়ে গেছে। তবে কি তারিণী তার মনের কথা সব জানতে পেরেছে? নিজেকে নিয়ে সে বিব্রত হয়ে ওঠে। ভাবে, ফিরে গেলে হয় না। সিনেমার আকর্ষণ নেই বটে, তবু ফিরে যেতেও মন চায় না।

একবার মনে হ'ল, তারিণীকে সব কথা খুলে বলবে। তার ভূমিকা হিসেবে সুরু করলে, 'দেখ, সিনেমা দেখবার কি সখ আমার!'

তারিণী তাড়াতাড়ি বলে, 'না না, বেশ করেছ। আজ না এলে হয়তো আবার কবে আসা হ'ত—কখনও হ'ত কিনা সন্দেহ। মাসুবৌদি ভাল হয়ে যাবেন, খুব শক্ত কেস হ'লে কি আর তিন ঘণ্টা টিকে থাকে কেউ?'

এই মিথ্যা প্রবোধে বিমলার আশঙ্কা ঘোচে না। সে জানে, ডাক্তার মুখে যাই বলুক তার ভিতরের উদ্বেগ সে ওর কাছে চেপে রাখতে পারে নি। উঃ, মাসুদির মুখখানা কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল!

শ্রীরামপুর ষ্টেশনে নেমে বিমলার পুরাতন ঔৎসুক্য আবার জেগে ওঠে। ও শুনেছিল ষ্টেশনের পাশেই সিনেমা-বাড়ী। ও আগ্রহে চারি দিক্ চেয়ে দেখে। বাড়ীতে সারাদিন একলা কাটিয়ে আর রোজ রোজ একই সঙ্গিনীদের সঙ্গে গল্প ক'রে ওর জীবনটা একটানা, একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল। আজ ও যেন একটা অপরিচিত গ্রহে এসে পৌঁছেছে।

'উঃ, বোশেখ মাসের গরমে কি ভীষণ অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। ওখানে একজন বুড়ো শুয়ে রয়েছে, দেখেছ! নিশ্চয়ই ওরও কলেরা হয়েছে।' তারিণী আঙুলের ইঙ্গিতে দেখায়।

'কলেরা কেন হ'তে যাবে?' বিমলা বলে, 'তোমার এক কথা, অসুখ হলেই বুঝি কলেরা হ'তে হয়?'

প্লাটফর্মে বসবার আসনের পাশে বিছানা পাতা হয়েছে, তার ওপর শুয়ে শুয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধুঁকছেন। পাশে ব'সে এক জন অল্পবয়সী স্ত্রীলোক তাঁর সেবা করছেন। চারি দিকে দু-চার জন উৎসুক লোক ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

এক জন ছোকরাগোছের লোককে ডেকে তারিণী জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হয়েছে মশাই?'

'যা হবার তাই হয়েছে। এই গরমে ঐ রুগীকে নিয়ে কেউ বেরোয়? মেয়েমানুষের কাণ্ড।'

'আহা, আপনি তো সমালোচনাই করছেন,—হয়েছে কি তাই বলুন না।' তারিণী মুচকে হেসে বললে।

'সমালোচনা করব না তো কি করব মশাই? এ রকম অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখে চুপ ক'রে থাকা যায়? এই যে কলের কুলিমেড়া, ছত্রিশ জাত ঘিরে হাঁ-করে বাঙালীর মেয়েকে দেখছে,—এ কি আমাদের মানের কথা?'

ছেলেটির রুক্ষতার কারণ কি বুঝতে পেরে তারিণী সহানুভূতি দেখিয়ে বললে, 'ঠিক বলেছ ভাই, আমাদের মান-অপমান তো আমাদের নিজেদের হাতে। তা, ভদ্রলোকের অসুখটা কি হয়েছে?'

'কি ক'রে জানব? জিজ্ঞাসা করেছি নাকি!' ছেলেটি একটু নরম হয়ে বললে।

ছেলেটির কথা শুনে এতক্ষণ বিমলা মুচকে মুচকে হাসছিল। বললে, 'চল, ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছে। ও নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের স্ত্রী।'

'হ্যাঁ! বুড়োর তুলনায় ওর বয়েস কি?' তারিণী বললে।

'কেন, দোজপক্ষের হ'তে পারে না বুঝি?'

বিমলা কাছে এসে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এঁর কি হয়েছে দিদি?'

'আর দিদি, দুঃখের কথা কেন বল ভাই! ওঁর বুকের অসুখ ছিল। কলকাতায় এক মাস হাসপাতালে থাকার পর বেশ ভাল হয়ে উঠলেন। ডাক্তারেরা বললে, আর কয়েক দিন থেকে যান। উনি কিন্তু বাড়ী আবার জন্মে ছটফট করতে লাগলেন। আমারও কলকাতায় থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। সকলে বলেছিল, সোজা মোটরে ক'রে বাড়ী নিয়ে যেতে। তা খামোকা অতগুলো টাকা খরচ করতে মন চাইল না। পথ তো আর কম নয়। চন্দননগরে আমাদের বাড়ী। উনিও বললেন, ট্রেনে যেতে পারব। কে জানত দিদি আজ শনিবার?—এই ভীড়, তাতে দুপুরের গরম—'

মেয়েটি থাকতে চায় না। বাচালতা বিমলার ভাল লাগে না। সে মাঝপথে জিজ্ঞাসা করলে, 'তা এখন বাড়ী যাবার উপায় কি করছেন?'

মেয়েটি নানা বাজে কথার ফাঁকে ফাঁকে যা বললে তার মর্ম্ম এই, এক জন শ্রীরামপুর কংগ্রেসের ছেলেদের খবর দিতে গেছে, এখানকার কংগ্রেস খুব ভাল। মেয়েটির হাতে বিশেষ টাকা নেই। না হ'লে এখান থেকে সোজা মোটরে ক'রে তারা ফিরতে পারত।

বিমলা বললে, 'এদিকে শুনুন। একটু পাশে নিয়ে গিয়ে সে আঁচলের খুঁট থেকে টাকাগুলো বার ক'রে বললে, এই টাকা ক'টা রেখে দিন।'

মেয়েটি এই অপ্রত্যাশিত দানে ব'লে উঠল, 'চির এয়োস্ত্রী হয়ে থাক ভাই, বাঁচালে তুমি—।'

বিমলা সে কথায় কান না দিয়ে তারিণীকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে চলল।

কিছুদূর যেতেই তারিণী বললে, 'এদিকে কোথায় চলেছ?'

'কেন, ও-পাশের প্ল্যাটফর্মে। ফেরবার টিকিট তো আমাদের কেনাই আছে।'

'ফিরে যাবে—সিনেমা না দেখেই? টাকাগুলো সব বুঝি দিয়ে দিলে?'

'দেব না?' কপট বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বিমলা উত্তর দিলে। টাকাগুলো হাতছাড়া করতে পেরে ও যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে। বলে, 'বাবা, মেয়েটা কি বাচাল। ও যা বললে তার অর্দ্ধেক কথা আমি বিশ্বাস করি না। তৈরি করা গল্প।'

'তবে দরদ দেখিয়ে টাকাগুলো দিয়ে দিলে কেন?' তারিণীর অজ্ঞাতে তার কণ্ঠস্বরে একটা ঝাঁজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিমলা সে-কথার কোন জবাব দেয় না। তার মুখের উপরে একটা তৃপ্তির আভাস ভেসে ওঠে। দিতে পারাটাই যেন তার কাছে বড় কথা—কাকে দিলাম সে বিচার আজ ও করতে চায় না। বলে, 'টাইম-টেবল্ দেখ তো, ফিরে যাবার কখন্ ট্রেন?'

মুক্তি-পাগল বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমাদের জীবনকে শাসন করে আমাদের আদর্শ। যা তোমার আদর্শ তা হয়তো আমার আদর্শ নয়—যা আমার আদর্শ তা তোমার আদর্শ না-ও হ'তে পারে। কিন্তু জীবনের হাটে কারবার চালাতে হ'লে আদর্শ একটা-না-একটা চাই। কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়—তার বিচার আমরা ক'রে থাকি আমাদের নিজের নিজের আদর্শের মাপকাঠির আশ্রয় নিয়ে।

এক-শ জনের মধ্যে নিরানব্বই জন মানুষ নিজেদের সুবিধামত এক-একটা আদর্শ তৈরি ক'রে নেয়। সে আদর্শ খাঁটি হ'ল কি মেকী হ'ল, তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করে না তারা। যে মত সমাজের আর দশ জন লোক পোষণ করে, তারই স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে চলা তাদের স্বভাব। তাদের নিজেদের মত ব'লে কিছু নেই। সকলের পায়ের চিহ্নে চিহ্নিত যে পথ, সেই পথই হ'ল তাদের চলার পথ।

দমকা হাওয়ার মত সহসা আবির্ভূত হয় এক-এক জন নূতন ধরণের মানুষ। ধারকরা ছেঁদো কথা উচ্চারণ করে না তারা। তাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয় নূতন বাণী, আর সেই বাণী শুনে চমকে ওঠে নরনারীর দল। যে আইডিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ছিল অজ্ঞাত, তারই জয়ধ্বজাকে প্রতিষ্ঠিত করে তারা দেশের বুকে; হাজার হাজার মানুষ যে মন্ত্র শোনে নি কোন দিন, সেই মন্ত্রকে তারা বজ্রগর্জনে ঘোষণা করে জাতির কর্ণকুহরে। মুগ্ধ জাতি সেই মন্ত্রের মধ্যে পায় নবজীবনের সন্ধান। জাতির হৃদয়-সিংহাসনে কেবল যে তারা নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে তা নয়। যে-সব পুরাতন আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে জাতির চিত্তকে শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছে—তাদের সিংহাসনচ্যুত করতে না পারলে নূতন আদর্শকে জয়যুক্ত করা সম্ভবপর নয়। এই জন্য অভিনব আদর্শের স্রষ্টা যারা, তাদের মধ্যে কালাপাহাড়ের রূপও আমরা দেখতে পাই। গড়তে গেলে ভাঙা চাই। এই যে নূতন ধরণের এক দল মানুষ—যারা ইতিহাসে দেখা দেয় নূতন আদর্শের স্রষ্টারূপে, এঁদেরই আমরা ব'লে থাকি প্রতিভা (genius)। ডক্টর ষ্টেকেল প্রতিভার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন,

What else do geniuses, the path-finders of mankind, accomplish but to disseminate a hitherto neglected or even unknown idea and cause it to be generally accepted or to cause ideas that have hitherto stood high in the world's estimation to topple from their thrones?—"The Depths of the Soul" by Dr. William Stekel, p. 162.

এর বাংলা মর্ম্মানুবাদ হ'ল, প্রতিভার কাজ হচ্ছে যে-আদর্শ সম্পূর্ণ নূতন তাকে জনসাধারণের চিত্তভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা, অথবা যে-আদর্শ অনেক কাল ধ'রে মানুষের কাছ থেকে পূজা পেয়ে এসেছে তাকে জনসাধারণের হৃদয়-সিংহাসন থেকে অনাদরের ধূলায় ফেলে দেওয়া।

ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ স্থানটি কোথায়—এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়ে বারে বারে আমার মনে জেগেছে ডক্টর ষ্টেকেলের এই কথাগুলি। অনন্যসাধারণ প্রতিভা বলতে যা বুঝায়, বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল তাই। সেই প্রতিভার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে নবজীবনের অরুণালোকের মধ্যে আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছেন তিনি। অমর হবার মন্ত্র দিয়েছেন আমাদের কানে, দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথ যাকে অবলম্বন ক'রে মুক্তি-পাগল ভারতবর্ষ আজ স্বরাজের মন্দির-প্রাঙ্গণের অনেকখানি নিকটবর্ত্তী হয়েছে। ঋষি অরবিন্দ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের গগনস্পর্শী প্রতিভার বেদীমূলে অর্ঘ্যদান করতে গিয়ে লিখেছেন,

Of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political Gûru.

বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এত বড় সত্য এমন প্রাঞ্জল ভাষায় আর কেউ বোধ হয় উচ্চারণ করেন নি।

আগেই তো বলেছি, প্রতিভার লক্ষণ হচ্ছে সেই আইডিয়ার জয়ধ্বজাকে জনসাধারণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যে-আইডিয়া আর সকলের কাছে ছিল হয় অজ্ঞাত নয় অজানা। প্রতিভার কাজ সেই অগ্নিগর্ভ বাণী শোনানো যা সবাইকে চমকে দেয় তার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে। যারা এই বাণী শোনাতে পারে তারাই ইতিহাসে আনে যুগান্তর, তাদেরই উচ্চারিত মহামন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে জাতি লাভ করে নবজন্ম। বঙ্কিমচন্দ্রকে ভারতভাগ্যবিধাতা পাঠিয়েছিলেন দেশাত্মবোধের জয়ধ্বনি করবার জন্য। বন্দে মাতরম্—এই মহামন্ত্রের মধ্যে দেশাত্মবোধেরই জয়গান। আমাদের চেতনায় দেশাত্মবোধের অনুভূতি কোন দিনই জীবন্ত ছিল না। সে-অনুভূতি জীবন্ত থাকলে আমাদের ললাটে আজ আঁকা থাকত না দাসত্বের কলঙ্কতিলক। আমাদের চিত্ত পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবের কথা স্মরণ ক'রে গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠেছে—কৌলীন্যের মর্য্যাদাকে আমরা অতিরিক্তি মূল্য দিয়ে এসেছি। আমরা কার সন্তান, কোন্ মেল তারই পরিচয় দিয়েছি সগর্ব্বে। হায়, 'আমি ভারতবাসী'—কেবল এই গর্ব্বে কোন দিন ফুলে ওঠে নি আমাদের বুক! আমরা তো দেশের সঙ্গে কোন দিন অনুভব করি নি আমাদের আত্মীয়তা। স্ত্রীপুত্রের প্রতি অত্যধিক মমতা আমাদের সহানুভূতিকে কখনও ব্যাপ্ত হ'তে দেয় নি গৃহপ্রাকারের বাহিরে বৃহত্তর দেশের মধ্যে। বঙ্কিম 'ধর্ম্মতত্বে' লিখেছেন,

> এজন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনুষ্য স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। বাঙালীর এই কলঙ্ক বিশেষ বলবান্।

আমরা ঈশ্বরকে ভালবেসে গৃহত্যাগী হয়েছি, বসুধাকেও কুটুম্ব ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছি—কেবল পারি নি কোন দিন স্বদেশকে আপনার ব'লে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে। আমাদের বিশ্বপ্রেমের মধ্যে দেশপ্রীতির ছিল না কোন ঠাঁই। 'ধর্ম্মতত্বে'র আর এক জায়গায় বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :—

> ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

আমাদের এই দেশাত্মবোধের অভাবের কথা বঙ্কিম 'ভারতকলঙ্ক' নামক বিখ্যাত রচনার মধ্যেও ব্যক্ত করেছেন। সেখানে আছে,

> যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের চিন্তাভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ ক'রে আনলেন জাতিপ্রতিষ্ঠার আইডিয়া আর সেই আইডিয়ার অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন দিক্ থেকে দিগন্তরে, ইংরেজ ক্লাইব, ইংরেজ হেষ্টিংস, ইংরেজ ডায়ার এবং ইংরেজ ও'ডায়ার আমাদের যে ক্ষতি করেছে তা অপরিমেয়। কিন্তু ইংরেজ আমাদের কি কেবল ক্ষতিই করেছে? ইংরেজ শেলী আর ইংরেজ মিল্‌টন, ইংরেজ মিল আর ইংরেজ ডারউইন আর ইংরেজ স্পেন্সার, ইংরেজ রাস্কিন প'ড়ে আমরা কি কিছুই শিখি নি? ইংরেজী সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রেই কি স্বদেশভক্তির আইডিয়া আমাদের দেশে বাসা বাঁধল না? ইংরেজের বই প'ড়ে তো আমরা জানলাম ম্যাট্‌সিনীর অগ্নিগর্ভ বাণীকে! বার্ক প'ড়ে আমরা শিখলাম, জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে কর বসানো অত্যাচার ("Taxation without representation is nothing but tyranny.")। লেকীর ইতিহাস আমাদের পরিচিত ক'রে দিলে আমেরিকার বিপ্লবের রোমাঞ্চকর কাহিনীর সঙ্গে। কার্লাইল প'ড়ে আমরা জানলাম ফরাসী জাতির বাঁধন-ছেঁড়ার ইতিহাসকে। ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখনী আমাদের কাছে বহন ক'রে আনলে ডচ্-বিপ্লবের মর্ম্মবাণী। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা জানলাম রুসোকে আর ইউরোপের সাম্যবাদিগণের চিন্তাধারাকে। টলষ্টয় আর থোরো আর রাস্কিনকে বাদ দিয়ে গান্ধীর কথা আমরা ভাবতে পারি নে। অক্সফোর্ড আর

কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতবর্ষকে দীক্ষিত করেছে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে। ইংরেজের কাছে আমরা সত্যসত্যই ঋণী। সে ঋণকে অস্বীকার করলে আমরা কৃতঘ্নতার অপরাধে অপরাধী হব। পশ্চিমের কাছ থেকে বঙ্কিম পেলেন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার এবং জাতিপ্রতিষ্ঠার আইডিয়া। সেই আইডিয়াকে তিনি ভাষা দিলেন বন্দে মাতরমের অমর সঙ্গীতের মধ্যে, আর এই মহাসঙ্গীতই সৃষ্টি করেছে অরবিন্দের আর তিলকের, গান্ধীর আর জওআহরলালের মুক্তি-পাগল বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে। স্বাধীনতার এবং সাম্যের আইডিয়ার জন্য বঙ্কিম পশ্চিমের কাছে কতখানি যে ঋণী—তাঁর সাম্য প্রবন্ধটি পড়লেই সে কথা পরিষ্কার ক'রে বোঝা যায়। বঙ্কিমের চিত্তের উপরে পাশ্চাত্য যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল—তাঁর লেখার মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে ভূরি ভূরি। তবে পাশ্চাত্যকে স্বীকার করতে গিয়ে যারা প্রাচ্যের সাধনাকে অস্বীকার করে—সেই পরানুকরণপ্রিয় লোকেরা কোন দিনই তাঁকে দলে টানতে পারে নি। এই জন্যই দেখতে পাই, তাঁর দেশপ্রীতি ছিল ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজ্‌ম্ থেকে স্বতন্ত্র, যাকে বলে হিন্দু আদর্শ তারই ছাঁচে ঢালা। মানব-সমষ্টিকে বড় করতে গিয়ে স্বদেশের দাবিকে যেমন তিনি অস্বীকার করেন নি, স্বদেশের দাবিকে বড় করতে গিয়ে জাগতিক প্রীতির দাবিকেও তেমনি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি—ভারতীয় সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্যকে বর্জ্জন ক'রলে বঙ্কিমের দেশপ্রীতি হ'ত হিটলারের আর মুসোলিনীর দেশপ্রীতির মতই উৎকট। ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজ্‌ম্ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্কিম 'ধর্ম্মতত্ত্বে' লিখেছেন :—

> ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন।

জাগতিক প্রীতির সঙ্গে দেশপ্রীতির এই যে সামঞ্জস্য—এই সামঞ্জস্যই তো বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তিনি এসেছিলেন পূর্ব্বের সঙ্গে পশ্চিমকে মেলাতে—পাশ্চাত্যের দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রাচ্যের জাগতিক প্রীতির সামঞ্জস্য ঘটাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার এই বিশিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য ক'রেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

> বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।—'সমাজ'।

যে-কথা বলছিলাম। বঙ্কিম ইংরেজদের চিন্তাভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ ক'রে আনলেন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা আর জাতি-প্রতিষ্ঠার আইডিয়া, আর সেই আইডিয়াকে সাহিত্যে বাণী-মূর্ত্তি দিলেন 'আনন্দমঠে' আর 'দেবীচৌধুরাণীতে,' 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' আর 'ধর্ম্মতত্ত্বে'। Ideas rule the world সংসারে আইডিয়ার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত—একথা যদি সত্য হয় তবে স্বীকার করতেই হবে দেবীচৌধুরাণী আর আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র আর ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করেছে—তার কানে পেট্রিয়টিজ্‌ম্ আর শিভ্যাল্‌রির মহামন্ত্র শুনিয়ে। বিষবৃক্ষের অথবা কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যকে ছোট ক'রে দেখবার মত ঔদ্ধত্য অথবা নির্ব্বুদ্ধিতা আমার নেই। কৃষ্ণকান্তের উইল অথবা দুর্গেশনন্দিনীও বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে উজ্জ্বলতম দুটি রত্ন। আমি শুধু বলতে চাই বিষবৃক্ষের অথবা কপালকুণ্ডলার বঙ্কিম আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে সৃষ্টি করলেও নব্য-ভারতের স্রষ্টার যে গৌরব—সেই গৌরবের দাবি করবে আনন্দমঠের আর কৃষ্ণচরিত্রের রচয়িতা বঙ্কিম। এখানে আর একবার অরবিন্দের প্রতিধ্বনি ক'রে বলি,

> What is it for which we worship the name of Bunkim to-day ? What was his message to us or what the vision which he saw and has helped us to see ? He was a great poet, a master of beautiful language and a creator of fair and gracious dream-figures in the world of imagination ; but it is not as a poet, stylist or novelist that Bengal does honour to him to-day. It is probable that the literary critique of the future will reckon "Kapal Kundala", "Bishabriksha", and "Krishna Kanta's Will" as his artistic masterpieces, and speak with qualified praise of "Debi Chaudhurani", "Ananda Math", "Krishna Charit" or "Dharmatattwa." Yet it is

the Bunkim of these latter works and not the Bunkim of the great creative masterpieces who will rank among the Makers of Modern India. The earlier Bunkim was only a poet and stylist—the later Bunkim was a seer and nation-builder."

এর বাংলা মর্ম্মানুবাদ হ'ল, আজ আমরা বঙ্কিমের স্মৃতিপূজায় ব্রতী হয়েছি কেন? কোন্ বার্ত্তা তিনি বহন ক'রে এনেছিলেন আমাদের প্রাণের দ্বারে? কোন্ মূর্ত্তিকে তিনি উদ্ঘাটিত করেছিলেন আমাদের নয়ন-সম্মুখে? অতুলনীয় ছিল তাঁর ভাষার সৌন্দর্য্য—আমাদের কল্পনার জগৎকে তিনি ভরিয়ে রেখেছেন স্বপ্ন দিয়ে তৈরি কত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি দিয়ে। কিন্তু বাঙালী যাঁর স্মৃতিপূজায় আজ ব্রতী হয়েছে এমন উৎসাহের সঙ্গে তিনি ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নন্। ভবিষ্যতের সাহিত্য-সমালোচক হয়তো তাঁর সমালোচনা করতে গিয়ে কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ অথবা কৃষ্ণকান্তের উইলকে উচ্চতর আসন প্রদান করবে—কিন্তু আসলে দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, কৃষ্ণচরিত্র অথবা ধর্ম্মতত্ত্বের বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যতের ভারতবর্ষের কাছ থেকে পূজা পাবে নব্যভারতবর্ষের স্রষ্টা ব'লে। প্রথম যুগের বঙ্কিম কবি এবং ভাষার যাদুকর—পরবর্ত্তী যুগের বঙ্কিম ঋষি এবং জাতির প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্কিম যদি শুধু কপালকুণ্ডলা অথবা বিষবৃক্ষ লিখে যেতেন তা হ'লেও তিনি বাঙালীর হৃদয়-সিংহাসনে রাজসমারোহে বিরাজ করতেন, কিন্তু তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব এমন সার্ব্বজনীন রূপ গ্রহণ করত না। তাঁকে নিয়ে আজ যে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে বাংলার বাহিরে ও ভিতরে উৎসবের ধুম পড়ে গেছে, তার কারণ আমাদের দেশাত্মবোধ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী জাগ্রত হয়ে উঠেছে এবং সেই জাগ্রত চৈতন্যের আলোকে আমরা তাঁকে আজ চিনতে পেরেছি পেট্রিয়টিজ্‌মের প্রফেট্ ব'লে। দেশপ্রীতি তাঁর কাছে দেখা দেয় নি শুষ্ক কর্ত্তব্যের রূপ ধ'রে। স্বদেশপ্রেম তাঁর কাছে ছিল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' লেখা আছে,

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।

'ধর্ম্মতত্ত্বে'র আর এক জায়গায় আছে,

আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম. কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষ আজ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হ'লে মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার পথ কি প্রশস্ত হ'ত না? আমাদের পরাধীনতা কি পৃথিবীর কল্যাণের পথে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় হয়ে নেই? সমস্ত কথা ভাল ক'রে ভেবে চিন্তেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রীতিকে অবশ্যপালনীয় ধর্ম্ম ব'লে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। অরবিন্দ বলেছেন,

The religion of patriotism—This is the master idea of Bunkim's writings.

ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতিই যে জীবনের পরমধর্ম্ম—সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে এই বাণীপ্রচারে বঙ্কিম আত্মনিয়োগ করেছিলেন কেন? কারণ বঙ্কিম সমস্ত চিত্ত দিয়ে ভালবেসেছিলেন তাঁর স্বদেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত, অর্দ্ধনগ্ন, মেরুদণ্ডহীন নরনারীকে। বাস্তবের হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে চিত্ত তাঁর অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল!

আজি দেশের সর্ব্বত্র শ্মশান ভাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন হায় মা!

এই ব'লে আনন্দমঠের ব্রহ্মচারী যেখানে দরদরধারায় অশ্রুমোচন করেছেন—সেখানে সেই রোদনধ্বনির মধ্যে আমরা কি শুনতে পাই যে বঙ্কিমেরই অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বর?

সংসারে অনেক মানুষ আছে যারা বাস্তবের ডাকে সাড়া দিতে ভয় পায়। কঠিন সত্যের দিকে পিছন ফিরিয়ে তাদের ভীরুচিত্ত আশ্রয় নেয় রংবেরঙের স্বপ্নের মধ্যে। আর্টের কল্পরাজ্যে আশ্রয় নিয়ে তারা ভুলবার চেষ্টা করে বাস্তবের কঠিনতাকে, সুন্দরের পক্ষতলে বাসা নিয়ে সত্যের দাবিকে করে অস্বীকার। শ্মশানের

কঙ্কালরাশির মধ্যে কল্পনার প্রজাপতির পিছু পিছু ছুটে বেড়ানো তাদের স্বভাব। বঙ্কিমের সবল চিত্ত কিন্তু আর্টের দোহাই দিয়ে বাস্তবের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে নি। যে-বাস্তব তার দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা ও ভীরুতা নিয়ে তাঁর সম্মুখে দেখা দিলে তাকে তিনি কিছুতেই চরম ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না। বর্ত্তমানের কদর্য্যতাকে আড়াল ক'রে তাঁর ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভাবী ভারতবর্ষের অপরূপ মূর্ত্তিখানি। সেই ভারতবর্ষ শস্যের প্রাচুর্য্যে সুশ্যামল, জ্ঞানের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, শৌর্য্যের শিখরদেশে অখণ্ড গরিমায় সমাসীন। ভবিষ্যতের এই নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্নে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। সেই তন্ময়তা থেকেই সৃষ্ট হ'ল বন্দে মাতরমের মহামন্ত্র। ধ্যানের এই নূতন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করবার জন্ম বঙ্কিম সাহিত্যকে করলেন আশ্রয়।

কিন্তু কেবল স্বপ্ন দেখলেই হ'ল না। স্বপ্নকে বাস্তবের মধ্যে রূপ দেবার জন্ম সাধনা চাই। সেই সাধনার পথ কণ্টকে সমাকীর্ণ। বঙ্কিম তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন—দীনামলিনা জন্মভূমিকে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করবার পথে সবচেয়ে প্রবল বাধা হচ্ছে রাজনৈতিক পরাধীনতা। পরস্বলোলুপ অপর জাতির অধিকারভুক্ত হওয়ায় তাঁর স্বদেশের দুর্গতির অন্ত নেই। তিনি আরও দেখলেন এই অন্তহীন দুর্গতিকে দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জন্মভূমিকে অপর জাতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করা অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু আত্মকলহে নিমগ্ন যে জাতি শতধা-বিচ্ছিন্ন, যাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের একান্ত অভাব—সে দুর্ব্বল জাতি মুক্ত হবে কেমন ক'রে? যারা পরস্পরকে ভালবাসতে পারে না, তাদের শৃঙ্খল ঘোচাবে কে? যাদের চেতনা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে কেবল দম্পতিপ্রীতির আর অপত্যপ্রীতির ক্ষুদ্রপরিসর গণ্ডীর মধ্যে, তাদের শৃঙ্খল মুক্ত করা দেবাদিদেব মহাদেবেরও অসাধ্য। চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে হবে গৃহপ্রাকারের বাহিরে অগণিত নর-নারীর মধ্যে—বিরাট্ দেশের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করা চাই। তবে তো মুক্ত হবে কারাগারের দ্বার। আমি দেশের—দেশ আমার—দেশপ্রীতি আমার সকলের চেয়ে বড় ধর্ম—এই বোধ জাগলে তবে তো মানুষ স্বদেশরক্ষার জন্ম সর্ব্বস্ব পণ ক'রে দাঁড়াবে। যেখানে এই বোধেরই অভাব সেখানে পরাধীনতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ আসবে কেন? বঙ্কিম দেখলেন সকলের চিত্তে দেশাত্মবোধকে জাগাতে না পারলে স্বাধীনতা অসম্ভব। স্বাধীনতা ভিন্ন নূতন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তিনি তাই পেট্রিয়টিজমের উপরে জোর দিলেন সকলের চেয়ে বেশী আর পেট্রিয়টিজমের যে ব্যাখ্যা তিনি দিলেন তার মধ্যে রইল না কোন অস্পষ্টতার ছায়া। অত্যন্ত সোজা ভাষায় তিনি বললেন,

> ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজী নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism; উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্ম্মপালন।

এর উপরে টীকা অনাবশ্যক।

স্বদেশকে পরস্বলোলুপ জাতির গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হ'লে কেবল দেশাত্মবোধের অনুভূতিই যথেষ্ট নয়, পৌরুষেরও প্রয়োজন। উৎপীড়কের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করবার মত সাহস নেই যেখানে, সেখানে স্বাধীনতার আবির্ভাব অসম্ভব। তাই বঙ্কিম পৌরুষের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করলেন জাতির হৃদয়ে। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো' এই কুক্কুর-জাতীয় পলিটিক্স চর্চ্চার পথে স্বাধীনতা যে কোন দিনই আসবে না—একথা বঙ্কিম ভাল ক'রেই জানতেন। রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর-জাতীয় মেরুদণ্ডহীনদের ঘ্যানঘ্যানানি বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার করত তাঁর ক্ষাত্রতেজে পরিপূর্ণ গর্ব্বিত অন্তরে। স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করতে হ'লে শক্তিমানের বৃষ-জাতীয় পলিটিক্স ছাড়া যে উপায় নেই—এ সত্য তিনিই আমাদের কর্ণে প্রথম ঘোষণা করলেন। অরবিন্দ বঙ্কিমের এই দিকটার সম্পর্কে লিখেছেন,

> He, first of our great publicists, understood the hollowness and inutility of the methods of political agitation—which prevailed in his time and exposed it with merciless satire in his 'Lokarahasya' and 'Kamala Kanta's Daftar.' But he was not satisfied merely with destructive criticism,—he had positive vision of what was

needed for the salvation of the country. He saw that the force from above must be met by a mightier reacting force from below,—the strength of repression by an insurgent national strength. He bade us leave the canine method of agitation for the leonine.

কিন্তু যে-দেশে ভগবান হচ্ছেন শিখিপুচ্ছধারী, বংশীবাদক বনমালী এবং আদর্শ বৈষ্ণব বলতে বোঝায় তৃণাদপি সুনীচ এবং তরোরিব সহিষ্ণু মেরুদণ্ডহীন জীব, সেই ধর্ম্মশাসিত দেশে অন্যায়কে আঘাত করবার জন্য মানুষ উদ্যত হবে কেন? এদেশে বিষ্ণুকে আঁকা হয়েছে কেবল প্রেমময় রূপে। তিনি প্রেমের দেবতা, মধুর থেকেও মধুরতর তাঁর মূর্ত্তি। তিনি কান্ত, কোমল, করুণায় চলচল। তিনি শুধু সৃষ্টি করেন এবং পালন করেন।

বঙ্কিম দেখলেন—বৈষ্ণবের যে আদর্শ গৌড়জনের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে—তাকে সর্ব্বাগ্রে ভাঙতে হবে। তৈরি করতে হবে বৈষ্ণবের নূতন আদর্শ। এই নূতন বৈষ্ণবের দল তৃণের মত সুনীচ এবং তরুর মত সহিষ্ণু হবে না। তারা হবে পদাহত ভুজঙ্গমের মতই অশান্ত। ধৈর্য্য তাদের আদর্শ হবে না, তাদের আদর্শ হবে শৌর্য্য। পরাধীন দেশে ধৈর্য্য মানুষের গুণ নয়, কলঙ্ক। ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে বলছে,

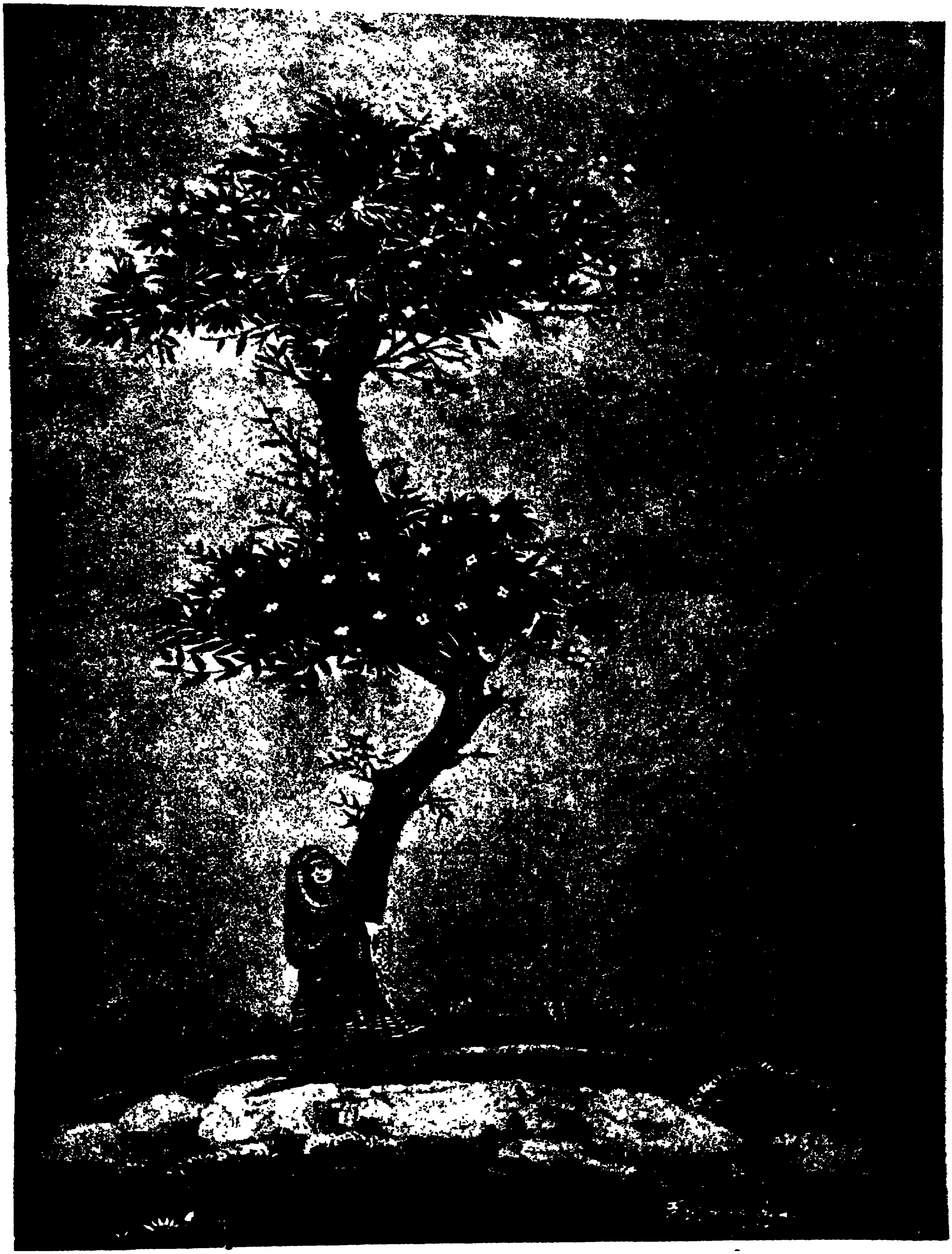
দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না, সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না?

বঙ্কিম চাইলেন দেশের অগণ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত মহেন্দ্র সিংহের অবিচলিত চিত্তকে বাঁধন-ছেঁড়ার উন্মাদনায় বিচলিত ক'রে তুলতে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এক পক্ষের শক্তির আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্য এবং আর এক পক্ষের নিরাপদ নীরব নম্রতা মৃত্যুর শাসনকে রেখেছে অক্ষুণ্ণ। এই নম্রতার আদর্শকে দূর করতে না পারলে অন্যায়ের স্পর্দ্ধা কোন দিনই চূর্ণ হবে না।

যে-আদর্শ কেবলই আমাদের শান্ত আর নত হ'তে শেখায়, তাকে ভাঙবার জন্যই বঙ্কিম আনন্দমঠের সন্তান-গণকে বৈষ্ণব ক'রে তৈরি করলেন। তিনি তাদের কাপালিক ক'রেও সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে শক্তির যে কোন অসামঞ্জস্য নেই—এই কথা প্রচার করবার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। সন্তানের আদর্শ হ'ল তাই শৌর্য্য, নম্রতা নয়। সন্তানের উপাস্য বিষ্ণুর হাতে বাঁকা বাঁশী নয়, সুদর্শনচক্র। মহেন্দ্র সিংহ যখন বললেন, "সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরমধর্ম্ম।"—তখন সত্যানন্দের সতেজ কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র নূতন ভারতবর্ষের কানে বজ্রগর্জ্জনে ঘোষণা করলেন,

সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।

ধৈর্য্য এবং নম্রতার আদর্শকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেখানে শক্তির আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যেমন তিনি আনন্দমঠের সন্তানগণকে বৈষ্ণব ক'রে সৃষ্টি করলেন, তেমনি তিনি তরুণ ভারতবর্ষের সম্মুখে রাখলেন মহাভারতের কৃষ্ণকে। চৈতন্য, বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের প্রচারিত নম্রতার আদর্শের দ্বারা শাসিত ভারতবর্ষের হৃদয়-সিংহাসনে তিনি আদর্শ মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন সেই কৃষ্ণকে যিনি অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিলেন না দুর্য্যোধনের অন্যায়কে নীরবে সহ্য করতে। তাকে তিনি অনুপ্রাণিত করলেন গাণ্ডীব ধ'রে যুদ্ধে ব্রতী হ'তে, মহাভারতের প্রতিষ্ঠার পক্ষে কণ্টক যারা তাদের নির্ম্মমভাবে অপসারিত করতে। মহাভারতের কৃষ্ণ কেবল সৃষ্টি আর পালন করেন না—তিনি ধ্বংসও করেন—কারণ সৃষ্টি করতে হ'লে ধ্বংস না ক'রে উপায় নেই। তরুর মত সহিষ্ণু এবং তৃণের মত নম্র হয়ে জীবনযাপন করাকে বঙ্কিম ধর্ম্ম ব'লে একেবারেই মনে করতেন না। এক গালে চড় মারলে আর এক গাল ফিরিয়ে দেবার খ্রীষ্টীয় আদর্শকে নীট্শে যেমন আদর্শ ব'লে গ্রহণ করতে পারেন নি, বঙ্কিমও তেমনি তাকে আদর্শ ব'লে গ্রহণ করতে পারেন নি। খ্রীষ্টীয় আদর্শের চেয়ে হিন্দু আদর্শকে তিনি মনে করতেন শ্রেষ্ঠ ব'লে আর এই হিন্দু আদর্শ দুষ্টের দমনকে ধর্ম্ম ব'লে এবং অন্যায়কে সহ্য করাকে অধর্ম্ম বলে গ্রহণ করেছে। ধর্ম্ম বলতে এবং অধর্ম্ম বলতে বঙ্কিম ঠিক কি বুঝতেন, কৃষ্ণচরিত্রের সপ্তম পরিচ্ছেদে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি তীরের মত সরল ভাষায় বলছেন,



অভিসারিকা

শ্রীমুকুন্দদেব ঘোষ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

যে ধর্ম্ম রক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম।

জরাসন্ধ, কংস, শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা—কৃষ্ণের এই সব কাজের মধ্যে অন্যায়কে বাধা দেবার আদর্শই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই জন্যই বঙ্কিম পরাধীন ভারতবর্ষের সম্মুখে খ্রীষ্টকে, বুদ্ধকে অথবা চৈতন্যকে আদর্শ মনুষ্যরূপে উপস্থিত করলেন না, তিনি উপস্থিত করলেন মহাভারতের কৃষ্ণকে। সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশকে ছিন্ন করবার জন্য পৌরুষের আদর্শের প্রয়োজন ছিল—আর কৃষ্ণ সেই পৌরুষেরই প্রতীক। বড় দুঃখেই তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে' লিখেছিলেন,

জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ-পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে।

বঙ্কিম বুঝেছিলেন গীতার কৃষ্ণকে ভুলে গিয়েই সর্ব্বনাশকে আমরা ডেকে এনেছি। অর্জ্জুনকে যিনি ক্ষত্রিয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের সেই পাঞ্চজন্যধারী কৃষ্ণের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ ক'রেই ভারতবর্ষ হারিয়েছে তার পৌরুষ এবং পৌরুষকে হারিয়েই সে বঞ্চিত হয়েছে স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদ্ থেকে। একথা বুঝেছিলেন বলেই জয়দেব গোঁসাইকে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি—যারা কৃষ্ণের হাত থেকে সুদর্শনচক্র আর পাঞ্চজন্য কেড়ে নিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে মোহন বাঁশী, তাঁকে কপিধ্বজ রথের সারথির আসন থেকে টেনে নিয়ে এসে কদমের ডালে বসিয়ে চুরি করিয়েছে গোপীগণের বস্ত্র—তারা যে কৃষ্ণচরিত্রকে অবনত ক'রে ভারতবর্ষের অধঃপতন ঘটিয়েছে এ-কথা বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন মনে-প্রাণে। তাই তো তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে' লিখেছেন,—

যেদিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেইদিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি।

'ধর্ম্মতত্ত্বে' আছে—

তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না।

বঙ্কিম, তোমার চরণমূলে আমার অজস্র প্রণতি। এই তরুণ মুক্তি-পাগল ভারতবর্ষের প্রতিটি শিরায় তোমার রুদ্রবীণার সুর। তুমি আমাদের যে সম্পদ্ দান করেছ, তার পরিমাণ করা যায় না। তোমার তুলনা শুধু তুমিই। তুমি আমাদের কানে শুনিয়েছ বন্দে মাতরমের মৃত্যুহীন মন্ত্র, আর সেই অমর মন্ত্রের মধ্যে আমরা অকস্মাৎ খুঁজে পেলাম আমাদের ঘুম-ভাঙানোর সোনার কাঠি। তুমি চেয়েছিলে ক্লীবের জাতিকে মৃত্যুভয়হীন বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করতে এবং সেই জন্য কৃষ্ণচরিত্রকে আদর্শ ক'রে ধরলে দেশের সামনে—তার কানে শোনালে ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মকথা। তুমি আমাদের নয়ন-সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছ স্বাধীন ভারতবর্ষের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। সে প্রতিমা আমাদের হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মুক্ত ভারতের অনিন্দ্যসুন্দর রূপকে যারা একবার প্রত্যক্ষ করেছে কল্পনার নেত্রে, তাদের বেঁধে রাখবে কোন্ বিজেতার শৃঙ্খল?

"A great nation which has had that vision can never again be placed under the feet of the conqueror."

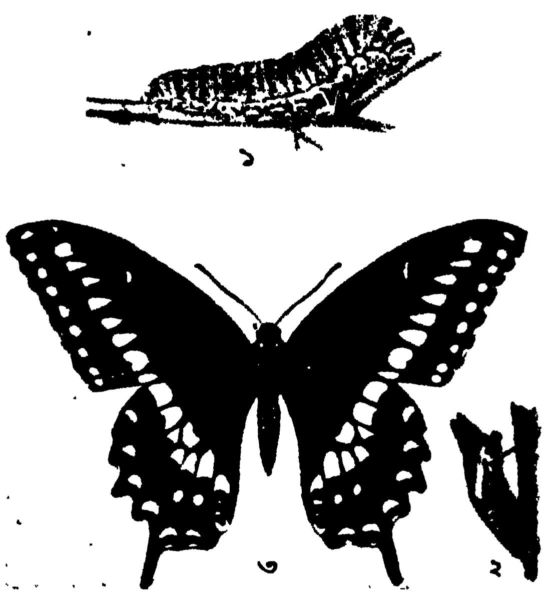
বঙ্কিম, তুমি আমাদের মুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে বাঁধন-ছেঁড়ার যে উন্মাদনা জাগিয়েছ জাতির অন্তরে, সেই উন্মাদনাই আজ সমস্ত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে মুক্তির মন্দির পানে আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে। তোমাকে আবার প্রণাম। বন্দে মাতরম্।*

* কাশী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে পঠিত অভিভাষণ।

কীটপতঙ্গের রূপান্তর-পরিগ্রহণ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জীব ও উদ্ভিদ-জগতে কুত্রাপি দৈহিক গঠনের স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয় না। মানব-শিশু যেরূপ আকৃতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, কিছু দিনের মধ্যেই তাহার সে-আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শৈশব হইতে কৈশোর পর্য্যন্ত দৈহিক আকৃতি যেভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা ভিন্নরূপে বিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। প্রৌঢ়াবস্থায় যৌবনের আকৃতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে এবং



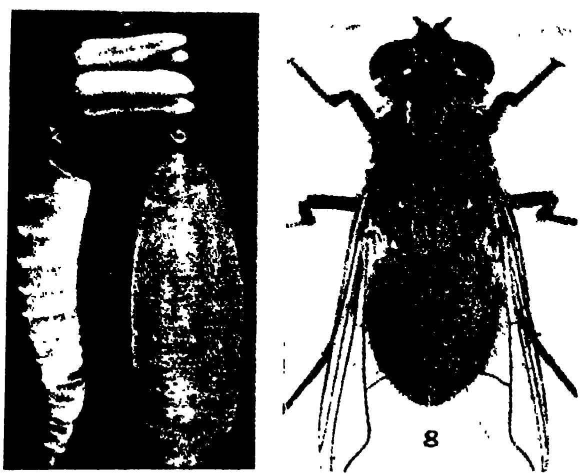
১। প্রজাপতির লার্ভা, ২। প্রজাপতির পুত্তলী, ৩। পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি

সর্ব্বশেষে বার্দ্ধক্যে তাহা একেবারে বদলাইয়া যায়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই যে কেবল পরিবর্ত্তন সুরু হয় তাহা নহে। মাতৃগর্ভে অবস্থিত ভ্রূণের মধ্যেও এরূপ অদ্ভুত রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণ ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করে। মানব ও অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের ভ্রূণ হস্তপদবিহীন, দীর্ঘ লেজসমন্বিত একটা টিকটিকির আকার ধারণ করে। মধ্যাবস্থায় তাহার পিণ্ডাকৃতি হস্তপদ আবির্ভূত হয়, সর্ব্বশেষে মানব-শিশুর আকার ধারণ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসে। মানুষ, গরু, শূকর, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীর মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের প্রায় একই রূপ ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ যেমন আকৃতিগত ক্রম পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়—সমগ্র জীবজগৎ সেই একই নিয়ম অনুসরণ করিয়া থাকে। অবশ্য এই আকৃতি-পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরপ্রাপ্তির ধারা সর্ব্বত্র সমান নহে। মনুষ্য বা মনুষ্যেতর অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দৈহিক আকৃতি পরিবর্ত্তন যেরূপ ধীরে ধীরে একটানা ভাবে ঘটিয়া থাকে, নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না। বিভিন্ন অবস্থায় তাহারা কিছু দিন এক এক প্রকার আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অকস্মাৎ পুরাতন আকৃতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করে। এই রূপান্তর এতই অদ্ভুত যে একই প্রাণীর বিভিন্ন অবস্থায় গঠন বৈচিত্র্যের মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহারা খোলস পরিত্যাগ করিয়া রূপান্তর পরিগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন বয়সে গুরুতর দৈহিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইলেও তাহারা খোলস পরিবর্ত্তন না করিয়া ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাণ ও সোলিয়া শ্রেণীভুক্ত মাছের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সোলিয়া মাছ শৈশবাবস্থায় বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া অবশেষে পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। একজাতীয় সামুদ্রিক বাণ-মাছের শরীর কতকটা নলের মত গোলাকার অনেকটা সাপের মত দেখিতে। কিন্তু শৈশবাবস্থায় ইহাদের শারীরিক গঠন থাকে একটা চেপ্টা পাতার মত। যতই বয়স বাড়ে ততই চওড়ায় কমিতে থাকে। সর্ব্বশেষে চওড়ায় একেবারে কমিয়া গিয়া সরু লিকলিকে একটা লম্বা নলের আকৃতি ধারণ করে। ইহাদের দৈহিক পরিবর্ত্তন দফায় দফায় সংঘটিত হয় না, একটু একটু করিয়া ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে।

ব্যাঙের জীবনেও এরূপ বিভিন্ন দৈহিক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। মানব-শিশুর মাতৃগর্ভে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ইহাদেরও ঠিক সেইরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। কিন্তু ব্যাং-শিশুর এই পরিবর্ত্তন ঘটে মাতৃগর্ভের বাহিরে। ব্যাং জলের মধ্যে ডিম পাড়িয়া রাখে। দুই-তিন দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চাগুলি দেখিতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা পেরেকের মত। দিন দুই পরেই বাচ্চার লেজ গজায় এবং সমস্ত শরীর একটা গোলাকার মস্তকের মত দেখায়। দশ-পনর দিন পর্য্যন্ত লেজের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়, তার পর পিছনের এক জোড়া পা বাহির হয়। পিছনের পা বাহির হইবার দিনকতক

পরে সম্মুখের পা গজাইয়া থাকে। সম্মুখের পা বাহির হইলেই সে ডাঙায় উঠিয়া পড়ে; তখন ধীরে ধীরে লেজটি অদৃশ্য হইতে থাকে। তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের দেহের আয়তন বাড়িতে থাকে। ব্যাং-শিশুর এই বিভিন্ন দৈহিক পরিবর্ত্তন আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় না,—অতি ধীরে ধীরে একটানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

কাঁকড়া ও চিংড়ির দৈহিক পরিবর্ত্তন কীটপতঙ্গের ন্যায় আকস্মিকভাবে ঘটিয়া থাকে। তাহারা খোলস বদলাইতে বদলাইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শৈশবে ইহারা বিভিন্ন আকৃতি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যৌবনে পদার্পণ করে। কাঁকড়া ও চিংড়ি শৈশবে প্রায় একই রকম থাকে, কিন্তু যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলেই কাঁকড়া তাহার লেজ গুটাইয়া লয় এবং মস্তক-সর্ব্বস্ব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।



১। মাছির ডিম, ২। মাছির লার্ভা, ৩। মাছির পুত্তলী, ৪। পূর্ণাঙ্গ মাছি

কিন্তু কীটপতঙ্গের মধ্যে পিপীলিকা, মশা, মাছি, ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতির রূপান্তর-পরিগ্রহণের ব্যাপার অতীব বিস্ময়কর। যদিও ইহাদের দেহের আভ্যন্তরিক পরিণতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধীরে ধীরেই চলিতে থাকে, তথাপি বাহ্যিক রূপান্তর ঘটে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে। পিপীলিকা লম্বাটে ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয় না, সমগ্র ডিমটাই বৃদ্ধি পাইতে পাইতে 'লার্ভা' বা শূকের আকার ধারণ করে। সেই লার্ভাই কালক্রমে ধীরে ধীরে পুত্তলীতে পরিণত হয়। পুত্তলী ক্রমশঃ পরিণতবয়স্ক পিপীলিকাতে রূপান্তরিত হয়। ইহারা সকল অবস্থাতেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাতলা আবরণ ছিন্ন করিয়া নূতন অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। এই পাতলা আবরণ সহজে নয়নগোচর হয় না বলিয়াই সাধারণতঃ ইহাদের দৈহিক রূপান্তর একটানা



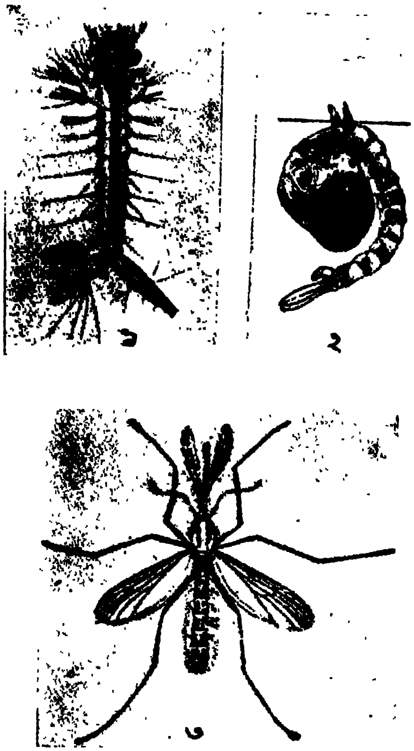
বিভিন্ন আকৃতির পুত্তলী হইতে নির্গত বিভিন্ন জাতের প্রজাপতি

বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মশা-মাছির বেলায় এ রূপান্তর যে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে ঘটিয়া থাকে তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

মশা জলের উপর ডিম পাড়ে। ডিমগুলি একসঙ্গে গায়ে গায়ে লাগিয়া জলের উপর ভাসিয়া থাকে, ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলেই তাহারা জলের নীচে চলিয়া যায়। ইহাদিগকেই মশার কীড়া বা লার্ভা বলা হয়; মশার কীড়াগুলি দেখিতে অনেকটা শুঁয়োপোকার মত। তাহারা কিলবিল করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে করিতে ক্রমশঃ বড় হয়, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কীড়াগুলি পুত্তলীর আকারে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং প্রায়শই জলের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে। পুত্তলী-অবস্থায় কিছু দিন অবস্থান করিবার পর এক দিন হঠাৎ তাহার ঘাড়ের আবরণ চিঁরিয়া পূর্ণাঙ্গ মশা বাহির হইয়া আসে এবং কিছুক্ষণ জলের উপর অপেক্ষা করিয়া উড়িয়া চলিয়া যায়।

মাছির রূপপরিবর্ত্তন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই যখন-তখন নজরে পড়িবার কথা। ময়লা আবর্জ্জনার মধ্যে মাছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শ্বেতবর্ণের ডিম পাড়িয়া রাখে। দুই-এক দিনের মধ্যেই ডিমগুলি লার্ভায় রূপান্তরিত হয়। আমরা ময়লার মধ্যে সাধারণতঃ যে-সকল পোকা কিলবিল করিতে দেখিতে পাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি মাছির লার্ভা ছাড়া আর কিছুই নয়। খাইতে খাইতে লার্ভার দেহ যখন সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্ট হয়, তখন খাওয়া বন্ধ করিয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে একটি আবরণ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে থাকে। কিছু দিন পরে আবরণ কাটিয়া পূর্ণাঙ্গ মাছির আকারে বাহির হইয়া আসে। মাছির রূপ ধারণ করিবার পর তাহাদের আর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।

বিভিন্ন অবস্থায় ফড়িং ও প্রজাপতির রূপ-বৈচিত্র্য প্রত্যেকের মনেই কৌতূহলের উদ্রেক করে। একটু লক্ষ্য করিলেই আমাদের



১। মশার লার্ভা, ২। মশার লার্ভার পুত্তলী-অবস্থা.
৩। পূর্ণাঙ্গ মশা



ফড়িঙের ক্রমবিকাশ। বামে জলপোকার আকৃতির লার্ভা হইতে ফড়িং বাহির হইতেছে। দক্ষিণে পূর্ণাঙ্গ ফড়িং।

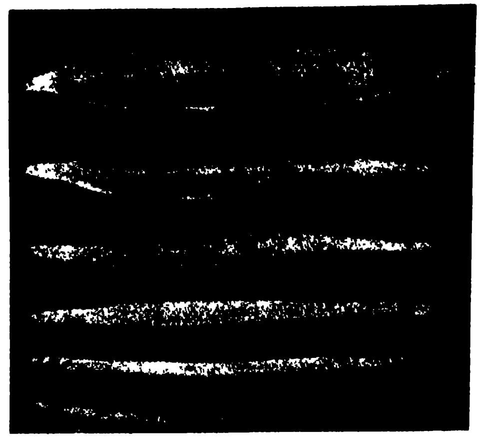
আশেপাশে সর্ব্বত্র তাহাদের এই রূপান্তর-পরিগ্রহণের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ শীতকাল ব্যতীত অন্য সকল ঋতুতেই উড়িতে উড়িতে ফড়িঙের যৌন-মিলন সংঘটিত হয়। তাহার পর স্ত্রী-ফড়িং জলের উপর এক স্থানে স্থির ভাবে উড়িতে উড়িতে মাঝে মাঝে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ জলে ঠেকাইয়া ডিম পাড়িয়া যায়। দিন-কয়েক পরেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়, বাচ্চাগুলি দেখিতে মোটেই ফড়িঙের মত নয়। কাহারও শরীর চওড়া, কাহারও বা শরীর সরু সাধারণ জলপোকার ন্যায়। কাঠি-ফড়িঙের বাচ্চারা লেজের সাহায্যে সাঁতার কাটিয়া বা পায়ে হাঁটিয়া জলের নীচে ঘুরিয়া ফিরিয়া আহার সংগ্রহ করে এবং মাঝে মাঝে খোলস পরিবর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমশঃ বড় হয়। হাম-ফড়িঙের বাচ্চাগুলি এক স্থান হইতে তাড়াতাড়ি দূরতর স্থানে যাইতে হইলে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে পিচকারির মত খুব জোরে জল ছাড়িতে থাকে। ঐ জলের চাপে সে থামিয়া থামিয়া অতি দ্রুতগতিতে আগাইয়া যায়। বাচ্চাগুলি উপযুক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবার পর জলজ লতাপাতা বাহিয়া জলের বাহিরে আসে, এবং এক স্থানে স্থির ভাবে বসিয়া থাকে, শরীর সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া গেলে ঘাড়ের চামড়াটা হঠাৎ লম্বালম্বিভাবে ফাটিয়া যায়। দুই-এক মিনিটের মধ্যেই দেখা যায়—সেই ফাটলের ভিতর হইতে ঈষৎ হরিতাভ একটা পিণ্ডাকার বস্তু যেন ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে ফড়িঙের মুখ ও বুকটা বাহির হইয়া পড়ে। তার পর সমস্ত শরীরটার মধ্যে যেন একটা আক্ষেপের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ফলেই লেজটিও বাহির হইয়া পড়ে। লেজটি সম্পূর্ণরূপে বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই মাথাটা প্রথম উল্টা দিকে নীচে হেলিয়া পড়ে। তখন পর্য্যন্ত ডানা গজায় নাই এবং লেজের দিকও পূর্ব্বের মতই প্রশস্ত রহিয়া গিয়াছে, বাহিরে আসিবার পর খোলসটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এই অবস্থায় ঘন ঘন নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে লেজ ও ডানা তরতর করিয়া বাড়িতে থাকে। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই লেজের আকার লম্বাটে হইয়া যায় এবং ডানা বাড়িতে বাড়িতে প্রায় লেজ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। প্রায় এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কদাকার একটা জলপোকা হইতে অতি সুদৃশ্য পূর্ণাঙ্গ একটি ফড়িং উৎপন্ন হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়।

প্রজাপতির রূপান্তর আরও অদ্ভুত। আমাদের দেশের কালো-মাণিক বা রক্ততিলক প্রজাপতির কথাই বলিতেছি। রক্ত-তিলক প্রজাপতি উড়িতে উড়িতে কোন একজাতীয় গাছের বিভিন্ন পাতার উপর এক বা একাধিক ডিম পাড়িয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই ডিমের মুখ ফাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুঁয়োপোকা বাহির হইয়া আসে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রজাপতির শুঁয়োপোকা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। মোটের উপর আমরা যত রকম বিভিন্ন আকৃতির শুঁয়োপোকা দেখিতে পাই তাহারা সকলেই কোন-না-কোন জাতীয় প্রজাপতির বাচ্চা বা লার্ভা। লার্ভা ডিম ফুটিয়া বাহিরে আসিবার পরই পাতার সবুজ অংশ কুরিয়া কুরিয়া খাইতে থাকে। খাইতে খাইতে শরীর ক্রমশঃ বড় হইয়া দেড়





১। রাণী-পিপীলিকার লার্ভা ২। রাণী-পিপীলিকার পুত্তলী-অবস্থা
৩। পূর্ণাঙ্গ রাণী-পিপীলিকা



উপর হইতে নীচে : বাণ জাতের মৎস্য-শিশুর ক্রমপরিণতি

ইঞ্চি কি দুই ইঞ্চি লম্বা হইয়া যায়। মথ-জাতীয় প্রজাপতির লার্ভা সাধারণতঃ খোলস বদলাইতে বদলাইতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। লার্ভা অবস্থায় ইহারা দিনরাত কেবল প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়াই যায়। লার্ভা পরিপুষ্টি লাভ করিবার পর হঠাৎ সে রূপ বদলাইয়া পুত্তলীর আকার ধারণ করে। কোন কোন লার্ভা আবার মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে সুতা বাহির করিয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে একটি কঠিন আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। যাহা হইতে আমরা রেশম পাইয়া থাকি তাহা কয়েক জাতীয় মথ-প্রজাপতির লার্ভার শরীরের আবরণ মাত্র। আবার কেহ কেহ অল্প সুতা বাহির করিয়া তাহার সঙ্গে শরীরের শুঁয়াগুলি জড়াইয়া গুটি বা বহিরাবরণ নির্ম্মাণ করে। রক্ততিলক প্রজাপতির লার্ভার শরীরে শুঁয়াও নাই বা তাহারা পুত্তলী আকারে পরিবর্ত্তিত হইবার সময় সুতাও বোনে না। শুঁয়োপোকাটা কেমন করিয়া এরূপ অদ্ভুত আকৃতির পুত্তলীতে পরিণত হয় তাহা দেখিবার জন্য প্রথমে বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অবশেষে এক দিন এই রূপান্তর গ্রহণের অদ্ভুত প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রজাপতির পুত্তলী যে কত বিচিত্র গঠনের, কত বর্ণের হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে স্বাভাবিক বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। শুঁয়োপোকা হইতে মনোমুগ্ধকর পুত্তলীর আকার পরিগ্রহ করিতে সর্ব্বসমেত মাত্র আধ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগিয়া থাকে। পুত্তলীতে পরিবর্ত্তিত হইবার দুই-এক দিন পূর্ব্বেই শুঁয়োপোকা একটা উপযুক্ত স্থানে গিয়া বসিয়া থাকে। তার পর মুখ হইতে কিছু সুতা বাহির করিয়া অবলম্বন-স্থানের সঙ্গে শরীরটাকে আটকাইয়া লয়। ইহার পর শরীরটা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে নিশ্চেষ্ট পোকাটা মাঝে মাঝে এক-এক বার কাঁপিয়া উঠিতে থাকে। কয়েক বার কাঁপুনির পর শরীরের চামড়াটা লম্বালম্বি ভাবে চির খাইয়া যায়। তখন ভিতর হইতে গোলাপী আভাযুক্ত একটা অদ্ভুত রকমের মাংসপিণ্ড যেন মোচড় খাইতে খাইতে বাহির হইতে থাকে। শরীরের উপরের অর্দ্ধেকটা বাহির হইবার পর শরীরটাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক জোরের সঙ্গে মোচড় দিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে চামড়াটা গুটাইয়া এক পাশে সরিয়া যায় এবং আঙ্গুরের মত একটি মাংসপিণ্ড বোঁটার সঙ্গে ঝুলিতে থাকে। এই রূপান্তর ঘটিতে অন্ততঃ চার-পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। ঝুলান অবস্থায় মাংসপিণ্ডটার আকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে নির্দ্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। তার পর ধীরে ধীরে রং ধরিতে থাকে। পুত্তলী-অবস্থায় প্রায় পনর কুড়ি দিন ঝুলিয়া থাকিবার পর এক দিন দেখা যায় হঠাৎ পুত্তলীর নীচের দিক্ ফাটিয়া গেল এবং সেই ফাটল হইতে নীচের দিকে মুখ করিয়া অপরিপুষ্ট ডানা লইয়া প্রজাপতি বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইবার পর ডানাটি তরতর



ব্যাঙাচি



পূর্ণাঙ্গ ব্যাং

রিয়া বাড়িতে থাকে এবং প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যেই র্ণ পরিণতি লাভ করিয়া আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। উচ্চশ্রেণীর াণী ও নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের দৈহিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে আপাত-ষ্টিতে যদিও গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি একটু তলাইয়া েখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে েমন কোন পার্থক্য নাই। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণে রূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গদের মধ্যে সেইরূপ রিবর্ত্তনই মাতৃগর্ভের বাহিরে ঘটিয়া থাকে মাত্র। তাছাড়া উভয়ের রিবর্ত্তনই একটানা ভাবে ধীরে ধীরে হইয়া থাকে।

—

ময়না

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ

ামরা যে ময়নার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, ইহাকে সাধারণতঃ পাহাড়িয়া ময়না" বলে। পাহাড়িয়া ময়না ভারতবর্ষের বহু ানেই পাওয়া যায়। স্থানভেদে ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির ল্পাধিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আমরা এখানে ময়মনসিংহ েলার উত্তরপ্রান্তস্থিত গারো পাহাড়ের ময়না সম্পর্কে লিখিতেছি।

ময়না কোকিলের মতই বড় পাখী। ইহারা দৈর্ঘ্যে পনর-াল ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। লেজ পাঁচ-সাত ইঞ্চি ঠোঁট ড়-দুই ইঞ্চি হয়। ময়নার সর্ব্বাঙ্গ চাকচিক্যশালী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ালকে আবৃত। ইহাদের সৌন্দর্য্যসাধনে প্রধান সহায় তাহাদের নোহর কুণ্ডলযুগল। কেহ কেহ এই কুণ্ডলদ্বয়কে ময়নার কান লিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে উহা কর্ণরন্ধ্রের উপরে াদুল্যমান কুণ্ডলাকৃতি স্বর্ণবর্ণ চর্ম্মখণ্ড মাত্র। সোনার মত ানের জন্য ইহাকে "সোনাকানি" ময়না বলা হয়। দিনকয়েক ধভাত খাওয়াইলে ময়নার কুণ্ডলদ্বয় রূপার পাতের মত সাদা ইয়া যায়। তখন ইহাকে "রূপাকানি" ময়না বলা হয়। হলুদ-র্ণ ও ঘি-মাখা ছাতু পাকা তেলাকুচা, ফল, পোলাও প্রভৃতি াওয়াইলে রূপাকানি পুনরায় সোনাকানি হইয়া যায়। রূপাকানি য়নার গৌরব কম।

ময়নার ঠোঁট লালের আভাযুক্ত হলদে—চূণ-হলুদে মিশানো ঙের মত। ঠোঁটের ভিতর দিকটা লাল। ইহাদের ঠোঁট ধারাল, ক্ত ও সুন্দর। ঠোঁটের গোড়ার দুই দিকে দুটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র আছে। া দুটি হরিদ্রাভ; প্রত্যেক আঙুলে চারিটি পর্ব্ব। নখ ঈষৎ ক্র ও তীক্ষ্ণ—কৃষ্ণাভ। মাথার পালক খুব ছোট। মাথা ঈষৎ চপ্টা—টেরিকাটার মত অতি সুন্দর পাট করা।

পাহাড়িয়া ময়নারা পাহাড়ের নীচে কখনই নামে না ও পাহাড়ের িকটবর্ত্তী অরণ্যেও আসে না। পর্ব্বতে যথাসম্ভব উচ্চস্থানে ুউচ্চ বৃক্ষচূড়ে কোটরে বাসা করিয়া ইহারা ডিম পাড়ে। ইহাদের প্রচুর সতর্কতার প্রধান কারণ মানবভীতি। কিন্তু সেই দুর্গম গিরিশিখরেও মানুষ হাতে প্রাণ লইয়া ময়নার বাচ্চার অনুসন্ধান করিয়া থাকে। ময়না অতি সহজেই অপর অপর পাখীর শব্দ অনুকরণ করিতে পারে, তাহা সকলেই জানেন। পাহাড়ে বাসকালে ইহারা অনেক সময়ই অন্য পাখীর ডাক অনুকরণ করিয়া থাকে। গৃহপালিত ময়না মানুষের ভাষায় কথা কহে,—কোন নির্দ্দিষ্ট কথা কয়েক বার শুনিলেই ময়না তাহা অনুকরণ করিয়া থাকে, তাহার পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। জনৈক মুচির একটি বাকপটু ময়না ছত্রিশ্ টাকায় বিক্রীত হইয়া-ছিল। আমি একটি ময়না পাখী দেখিয়াছি, সে অতি স্পষ্ট ভাষায় 'বন্দে মাতরম্' বলিতে পারিত। রাত্রিতে ঘরে চোর প্রবেশ করিলে ময়না 'চোর' 'চোর' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়া দোকানের মালিককে জাগাইয়া দিয়াছে, এরূপও শোনা গিয়াছে। ময়না সম্বন্ধে এরূপ আরও অনেক গল্প আছে।

বৃক্ষকোটরে অতি কোমল খড়কুটা, পাতা, আঁশ প্রভৃতি বিছাইয়া ময়না বাসা প্রস্তুত করে। এই বাসার ভিতর কোনরূপ অপরিষ্কার কিছু থাকিতে পারে না। পত্রবিহীন বা মরা গাছের কোটর ময়নারা সমধিক পছন্দ করে। হাজার হাজার ময়নার বাসোপযোগী মরা গাছ পাহাড়ে থাকা সম্ভবপর নহে; কাজেই সুবিধা অনুসারে তাহারা বাসস্থান নির্ণয় করিয়া লয়। ময়না তাহার স্বজাতিপরিত্যক্ত হইয়া একাকী বিচরণ করিতে চাহে না, কিংবা প্রকাণ্ড দলে বিচরণ করাও তাহাদের পছন্দ নহে। এক এক গাছে দুই-চারি জোড়া ময়না বাসা পাইলেই তাহারা খুশী হয়।

ডিম পাড়িবার সময় হইলে, অর্থাৎ বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গেই ময়নারা বাসার সন্ধান করিতে থাকে। ইহারা একই বাসায় প্রতি বর্ষে ডিম পাড়িতে পাইলে অন্যত্র যাইতে চাহে না। এ সময় ময়নারা যত দূর সম্ভব পরস্পরে নিকটবর্ত্তী কোটরে বা নিকটবর্ত্তী গাছে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে। শীতের অবসান হইলেই ময়নার গর্ভধারণের সময় উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ ফাল্গুন-চৈত্র মাসেই ইহাদের গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে।

ময়নারা তৃতীয় বর্ষ বয়সেই ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ বৈশাখ মাসই ডিম পাড়িবার প্রশস্ত সময়। চৈত্র মাসেও কদাচিৎ ময়নার বাচ্চা হয়। আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র মাসের শেষে ময়নার বাচ্চা ক্রয় করিয়াছিলাম। ঐ সময় না কি খুব কমই বাচ্চা দেখা যায়। কখন কখন আষাঢ় মাসেও ময়নার বাচ্চা হয়। আমার জনৈক পাহাড়ী বন্ধু বলিয়াছিলেন—কোন ময়নাকে বৎসরে দুইবার—অর্থাৎ বৈশাখ ও ভাদ্র মাসে ডিম পাড়িতে তিনি দেখিয়াছেন।

ময়নার বাচ্চা বিক্রয় একটা অতি লাভজনক ব্যবসায়। গাছে উঠিয়া বাচ্চা সংগ্রহ করার বিপত্তি হইতে বাঁচিবার জন্য ময়নার বাচ্চার ব্যবসায়ীরা এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। এই উপায়ে ব্যবসায়ীরা সহজেই বহু শাবক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। ইহারা বাঁশের

বাখারি হইতে বেতি উঠাইয়া তাহা দিয়া বহুসংখ্যক ঝুড়ি প্রস্তুত করে। সেই ঝুড়িগুলির অভ্যন্তরে কিছু পাট ও শণের নুড়ি, সামান্য কোমল পাতা প্রভৃতি দ্বারা ময়নার বাসোপযোগী বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ঐ সকল ঝুড়ি গাছের উপর দৃঢ় ভাবে বাঁধিয়া দেয়। অনেকে বাঁশের ছিলাগুলি কালো বা সবুজ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেয়। কেহ কেহ ঝুড়িগুলি পাতা দিয়া আবৃত করিয়াও রাখে। ময়নারা এই বাসাগুলি কিছু দিন পরীক্ষা করে, তার পর তাহার ভিতরে যাতায়াতে বেশ পরিচয় করিয়া লয়। পরে ঐগুলির মধ্যে বাসা প্রস্তুত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। যথাসময়ে ঐ সকল ঝুড়ি হইতে বাচ্চা সংগ্রহ করা হয়।

ময়না এক জোড়া ডিম পাড়ে, অবশ্য কখন কখন তিনটা বা চারিটা ডিম পাড়িতেও দেখা যায়। পক্ষী ও পক্ষিণী অদল-বদল করিয়া পনর দিন ডিমে তা দেয়, তার পর ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।

উদর ও মুখ সর্ব্বস্ব বাচ্চাটি দিনে দিনে বাড়িতে থাকে। ক্ষুদ্র মাথা, বৃহৎ চক্ষু, হলদে ঠোঁট, দুইটি ক্ষুদ্র ডানা, দুইখানি পা লইয়া এই প্রাণী কোটরে অবস্থান করে। ছানার গায়ে পীতবর্ণের অতি পাতলা লোম থাকে। এই লোমের আবরণে ছানাগুলির দেহের উষ্ণতা রক্ষা হয়। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছানাগুলির গায়ের পালক ক্রমে পাঁশুটে ও ক্রমে কালো হইয়া যায়।

চক্ষু ফুটিলে ছানাগুলি যখন ক্রমে খোপের দরজায় উঁকি দেয় তখনই শিকারীরা ইহাদিগকে হস্তগত করিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করে। ময়নারা চীৎকার করিয়া শোক প্রকাশ করে মাত্র। যে-সকল বাচ্চা মা-বাপের সঙ্গে পলাইতে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে ধরিবার জন্যও ফন্দীর অভাব নাই। কেহ বা গাছে ফাঁদ পাতিয়া কিংবা গলায় ফাঁস লাগাইয়া শাবকগুলিকে ধরিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

ময়নারা বিবিধ ফল খাইতেই সমধিক ভালবাসে। এতদ্ব্যতীত পোকা-মাকড় প্রভৃতিও ইহাদের খাদ্য।

দীর্ঘকাল খাঁচায় আবদ্ধ থাকিয়া বিবিধ বুলি শিক্ষা করিলেও ময়না পলায়ন করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে। পরাধীনতায় ইহাদের ডানা দুর্ব্বল হইলেও একবার ছাড়া পাইলে ময়না সহজে ধরা দিতে চাহে না। পরাধীন পাখী দেখিলেই অপরাপর পক্ষীরা ইহাদিগকে চিনিতে পারে এবং আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিয়া তোলে। উড়িবার বা পলায়নের কায়দা-কানুন না জানা হেতু এই পিঞ্জরমুক্ত পোষা পাখীগুলি সহজেই বিপন্ন হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় কখন কখন হতভাগ্যেরা তাহাদের আশ্রয়স্থল হইতে দূরে তাড়িত এবং নিহত হয়। কোন কোন পোষা ময়না ছাড়া পাইলে বাড়ীর আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ইচ্ছামত সাধের কারাগারে পুনঃপ্রবেশ করিয়া থাকে।

বর্ষার মাঝামাঝি সময় চলিয়া গেলেই ময়না পালক বদলায়। এ সময় অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। বাহিরের অতিরিক্ত শৈত্য বা উষ্ণতায় ইহাদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এইকালে মোটা ও গাঢ় নীলবর্ণের কাপড় দিয়া দিবারাত্র খাঁচাটি বেষ্টন করিয়া রাখা উচিত। এ সময় ভুল হইলে ময়নার জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

পুষ্টিকর ও রুচি-অনুযায়ী খাদ্য না পাইলে ময়না সহজেই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রতিপালকেরা ময়নাকে দুধ ও ছাতুই বেশীর ভাগ খাওয়াইয়া থাকেন। কেহ কেহ মাঝে মাঝে কাঁচা মাছ, গেছো পিঁপড়ার ডিম এবং সপ্তাহে দুই-এক দিন কাঁচা মাংস খাওয়াইয়া থাকেন।

ময়নাকে স্নান করাইবার সময় অনেকে জলপূর্ণ পাত্রে খাঁচাটি বসাইয়া দেন, পাখী আনন্দে অবগাহন স্নান করিয়া থাকে। ময়নার স্নানের জলে হলুদবাটা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। হলুদের গুণে ইহাদের গাত্রস্থিত উকুন বা অন্যবিধ কীটাণু নষ্ট হইয়া যায়। আমার এক পরিচিত ব্যক্তি মাঝে মাঝে নীলগোলা জলে ময়নাকে স্নান করাইতেন।

ঘোরাফেরা করিবার সুবিধার জন্য ময়নার খাঁচাটি একটু বড় হইলেই ভাল হয়। কোন কোন প্রতিপালকের অভিমত এই যে, তারের খাঁচা অপেক্ষা বাঁশের শলাকায় নির্ম্মিত খাঁচা পাখীর পক্ষে উপকারী।

বাঁশী বাজাইলে ময়না চুপ করিয়া কান পাতিয়া শোনে এবং দুই-চারি দিন একই সময়ে বাঁশী শুনিলে সেই স্বর অনুকরণের জন্য চেষ্টাও করে।

ময়নার ডানার পালকের মাঝামাঝি কয়েকটি সাদা পালক আছে। উড়িবার সময় ইহা খুবই সুন্দর দেখায়। পাখা গুটাইয়া বসিলেও কালোর মাঝে দুইটি সাদা রেখায় ময়নার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

পালক-পরিবর্ত্তনের সময় ময়নার ডানায় ও লেজে এমন কয়েকটি পালক গজায় যেগুলি ইহারা সযত্নে তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। এই পালকগুলির গোড়ার দিকটা অপেক্ষাকৃত বেশী মোটা এবং উহা রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। প্রতিপালকেরা বলেন, এই রক্ত দূষিত বা সহজে দূষিত হইয়া ময়নার পীড়া জন্মায়। বহুদর্শী প্রতিপালক ময়নার দেহ হইতে ঐ পালকগুলি তুলিয়া ফেলেন। এক দিনে দুই-একটার বেশী পালক উঠানো সঙ্গত নহে। ঐ সময়ে ময়নাকে হলুদ-জলে স্নান করান একান্ত কর্ত্তব্য।

Basu mitra

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী লীলাবতী দেশাই সম্প্রতি আমেদাবাদ পিপ্‌লস্‌ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত আইন-অমান্য আন্দোলনে ইনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। ইনি অন্যান্য নারীকল্যাণ-প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন।



শ্রীমতী লীলাবতী দেশাই

প্রমীলা বসু বিবাহের পাঁচ বৎসর পর ১৯৩২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হন। সংসারের কাজ যথাসম্ভব সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াও বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও বসু-মহাশয়া এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে এম্‌-এস্‌সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।



শ্রীযুক্তা প্রমীলা বসু

ইতিপূর্ব্বে আর কোনও বঙ্গমহিলা এরূপ কৃতিত্বের সহিত এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। ইনি নববিধান-ব্রাহ্মসমাজের সুবিখ্যাত প্রচারক স্বর্গীয় রেভারেণ্ড বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের দৌহিত্রী।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় অনেক মহিলা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দেবী বাংলায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও শ্রীমতী সতী গুপ্ত প্রথম শ্রেণীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী রৌজিয়া সুলতানা ফার্সী ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার

করিয়াছেন। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী বসু প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী হিমানী গুপ্ত, শ্রীমতী কমলা দাস, শ্রীমতী চিত্রা সেন ও শ্রীমতী ভারতী মুখোপাধ্যায় বাংলার এম. এ. পরীক্ষায়, শ্রীমতী অলকা দেবী প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এম. এ. পরীক্ষায়, শ্রীমতী লয়লা খাঁ, শ্রীমতী সরযূ রায়, শ্রীমতী হেমপ্রভা সেন ও শ্রীমতী লীনা সেন ইংরেজির এম. এ. পরীক্ষায়, শ্রীমতী যূথিকা পাইন ও শ্রীমতী রেণুকা সেন দর্শনের এম. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায় রসায়নশাস্ত্রের এম. এসসি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী আভা মিত্র ও শ্রীমতী সুহাসিনী দত্ত গণিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

লেখকের স্ত্রী

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

সারাদিন কি খাটুনিই গিয়াছে!

স্নান সারিয়া হাতমুখ ভাল করিয়া মুছিয়া শৈল এবার একটা ফরসা কাপড় পরিবে, পরিয়া বাঁচিবে! আ! এত কি আর একলা পারা যায়! যত রাজ্যের খবরের কাগজ, মাসিকপত্র, নবপ্রকাশিত কবিতার বই, উপন্যাস, নাটক, কত কি? তার সঙ্গে আবার বন্ধুদের অর্দ্ধভুক্ত সিগারেট, বিড়ি, কি যে নাই—ভাবা যায় না!

সবই আজ সে পরিষ্কার করিয়াছে। মাগো কি ঘেন্না! ঐ সব যত লোকের এঁটো সিগারেট-বিড়িগুলো হাত দিয়া সরাইয়া আবার স্নান না করিয়া থাকা যায়! হোক না শীতের বিকাল, ঐ সব আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া স্নান না করিলে কি আর রাত্রে ঘুম হইবে!

না, আর একবার ঘাড়ে পিঠে সাবানটা বুলাইয়া লওয়া যাক, যা ধুলা আজ সারাদিনটা চোখেমুখে ঢুকিয়াছে! আর একটু বেশী জল গায়ে দিতে হইবে।

কিন্তু বাড়ী আসিয়া আজ টের পাইবেন এখন! ঘরের চাবি তো কোন কালেই দেওয়া হয় না—আজ কিন্তু বেশ মজাটা দেখিবেন। কেমন জব্দ! শৈল পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, চাবি খুলিয়া ঠাকুরমার আচার চুরি করা কত ছোটবেলা হইতে অভ্যাস, তাহাকে কি না চার আনার একটা তালার ভয় দেখান! শৈলর হাসিই পাইল! আনন্দের আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল সে!

নিরঞ্জন ভোরবেলা কোন এক শহরতলীতে গিয়াছে, সেখানে তাহার ও তাহার সব বন্ধুদের সাহিত্যবাসর না কি-এক মাথামুণ্ডু আছে; শৈল আজ তাই সুযোগ পাইয়াছে স্বামীর পড়ার ঘরটা পরিষ্কার করিবার। কত কালের আবর্জ্জনা যে ঐ ঘরে জমা ছিল—মাগো মা, মানুষের একটু ঘেন্নাও করে না!

তাই কি শৈল বড় সহজে পারিয়াছে! নিরঞ্জন তাহার পড়ার ঘরে শৈলকে ঝাঁটা ঢুকাইতে দেয় না; তাহার ভয়, কত টুকরা কাগজপত্র আছে, কত বিষম দরকারী বই আলমারীর তলায় হয়ত তিন ভাঁজ হইয়া পড়িয়া আছে। শৈল সে-সব চিনিবে কেমন করিয়া! সবই ঝাঁটাইয়া বিদায় করিয়া দিবে। তার চেয়ে ঘর পরিষ্কারের দরকার নাই!

শৈল কত বার বলিয়াছে—তুমি একটু বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ লক্ষ্মীটি, আমি তোমার সুমুখেই ঝাঁট দিয়ে দিই। কিন্তু নিরঞ্জনের সময় কোথায়! শৈল ঝাঁট দিবে আর নিরঞ্জন দেখিবে—এত বেশী ধৈর্য্য থাকিলে তো নিরঞ্জন

জীবনে অনেক কিছুই করিতে পারিত। রবিবার একটু সময় অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু ছয় দিন পর ঐ এক দিনের ছুটিটাকে নিরঞ্জন মাটি করিবে শৈলকে ঘর ঝাঁট দেওয়াইয়া! না, এত নিষ্ঠুর নয় নিরঞ্জন।

কিন্তু শৈলর সহ্য হয় না। মনে পড়ে তাহার উন্মুক্ত পল্লীর কোলে গোবর-নিকানো মেটেঘর—চার দিক্‌ রোদে ঝকমক্‌ করিতেছে, কোথাও এতটুকু আবর্জনা নাই। প্রকাণ্ড উঠানটায় একটি কাণাকড়ি পড়িয়া থাকিলে গোবরের শ্যামাভ রঙে তাহা সুন্দর শ্বেত কলঙ্কের সৃষ্টি করে। একটি ছোট্ট চড়াই পাখী আসিলেও নজরে এড়াইয়া যায় না। আর এই বিশাল শহরের বিরাট্‌ বিরাট্‌ অট্টালিকার ভীড়ে এঁদো গলির মধ্যে দোতলায় দুটি কুঠরী! তাও একটাতে তো বই আর বই, বন্ধু আর বিড়ি-পোড়া, আর একটায় গোটাচারেক ট্রাঙ্ক ও দুখান দেওয়াল-আলমারীর মাঝে কোন রকমে তাহাদের শয্যাখানি পাতা। বাব্বা! শৈলর প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে! কিন্তু উপায় নাই। নিরঞ্জন শতাব্দীকাল ঐ বই, বন্ধু ও বিড়িপোড়া লইয়া থাকিবে, তবু শৈলকে ও-ঘরে ঢুকিতে দিবে না। আজ সেই নিরঞ্জন টেরটা পাইবে এখন!

বেশবাস করিয়া শৈল জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। সখী পূর্ণিমা অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই ওদিকের বাড়ীর জানালাটাতে বসিয়া আছে। হাসিয়া বলিল, "আজ এত দেরি যে ভাই?"

শৈল সালঙ্কারে সখীকে ব্যাপারটা বলিতে লাগিল। বন্ধু ও বিড়ির জালায় দু-জনেই যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে দু-জনেই সমান আনন্দিত হইল। শেষটায় শৈল বলিল যে, পূর্ণিমার স্বামী তবু অনেক ভাল, ঘর নোংরা করে না, বন্ধুদের জন্ত দিনে অন্ততঃ পঁচিশ বার পূর্ণিমাকে চা করিতে হয় না এবং পূর্ণিমার স্বামীর পড়িবার ঘরের বালাই নাই।

পূর্ণিমা কিন্তু ইহাতে খুশী না-হইয়া বলিল, "না ভাই, পুরুষমানুষ, একটু পড়াশুনো করবে বইকি; তাছাড়া তোমার স্বামী তাই বিদ্বান্‌ মানুষ। রোজই তো তাঁর নাম কাগজে দেখি! ও-রকম লোকের বৌ হওয়া কিন্তু ভাই ভাগ্যির কথা।"

শৈল একটু হাসিল। তাহার স্বামী তাহার গর্ব্বের বস্তু—নিশ্চয়ই! বাংলা-সাহিত্যের তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি, সাহিত্যিক। তাঁর নাম না-শুনিয়াছে, তাঁর গল্প না-পড়িয়াছে এমন মেয়ে একটাও শৈল দেখে নাই। এই তো পূজার পূর্ব্বে যখন তাহারা দেওঘর যাইতেছিল, গাড়ীতে কি ভীড়! মেয়ে-কামরায় একটুও জায়গা নাই। কোন রকমে নিরঞ্জন শৈলকে কামরার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। শৈল বসিবার জায়গাই পায় না, এমন সময় গাড়ীর এক কোণ হইতে একটি তরুণী আসিয়া শৈলকে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু যদি মনে না করেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

শৈল বলিল, "না, মনে কি করব—বলুন?"

—উনি কি নিরঞ্জন বাবু—কবি নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী?

—হ্যাঁ।

—আপনার? স্বামী! কেমন!

—হ্যাঁ।

আর যায় কোথা! শৈল যেন গাড়ীর মধ্যে একটা মহা সম্মানের পাত্রী হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ একটা বেঞ্চির মাঝখানে তাহার জন্ত জায়গা হইয়া গেল। সকলেই নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। নিরঞ্জন বাবু কি খাইতে ভালবাসেন, কখন লেখেন, কখন ঘুমান, দিনে কয়টা সিগারেট তাঁহার লাগে, ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নে সকলে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। কি তাহাদের সৌজন্য, কি শ্রদ্ধা! সেদিনও শৈল সেই পঁচিশ-ত্রিশটি মেয়ের মধ্যে এমন এক জনও দেখে নাই যে নিরঞ্জনের গল্প না-পড়িয়াছে।

পূর্ণিমা ঠিকই তো বলিতেছে। শৈলর মত স্বামী কয় জন নারীর ভাগ্যে মিলে। কিন্তু কোথায় যেন শৈলর বাধিতেছিল। কি যেন একটা ব্যথা তাহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া দিল।

অকস্মাৎ সে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিবার ছল করিয়া পূর্ণিমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল। সন্ধ্যার তখনও সময় হয় নাই। শৈল আসিয়া এদিকের বারান্দায় দাঁড়াইল। আকাশের এক প্রান্ত দেখা যায়। পশ্চিমাকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। এমনি সময়

তাহাদের গ্রামে পাণ্ডুটি পালের গরু বাড়ী ফেরে। শৈল এতক্ষণ খড় কাটিয়া খৈল মাখাইয়া মঙ্গলী গাইটার জন্ত খাবার তৈরি করিয়া রাখিত। মঙ্গলী গাইটার বাছুর হইয়াছে, মা লিখিয়াছেন; কতটা দুধ দিতেছে কে জানে। শৈল থাকিলে তাহার যে-রকম যত্ন হইত, তাহা কি আর হইবে!

ও-দিকের ছাদটার আলিসায় সেই কাঁকড়া চুল ছেলেটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শৈল মুখ ফিরাইল! কি যে অদ্ভুত এই সব ছেলের দল! শৈলর গা জ্বালা করে। শৈল ঘরে ঢুকিয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ সাজাইল। দীপ জ্বালাইয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া ঘরের দেওয়ালে টাঙান দেবমূর্ত্তির পায়ে প্রণাম করিল।

এইবার? এইবার সে করিবে কি? নিরঞ্জন বলিয়া গিয়াছে, ফিরিতে রাত্রি এগারটার কম নয়। এই সন্ধ্যা হইতে রান্না চড়াইলে সবই যে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তার উপর শীতের রাত্রি। রান্না একটু দেরি করিয়াই চড়াইবে শৈল। কিন্তু ততক্ষণ যে প্রচুর অবসর, তাহা সে ভরাইয়া রাখিবে কি দিয়া! পূর্ণিমা ত রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে—সকলেই ঢুকিয়াছে, শৈলও অন্ত দিন এতক্ষণ উনানশালে বসিয়া রান্না করে। কিন্তু আজ যে তাহার সময় আর ফুরাইতে চাহিতেছে না। অবশ্য, দিনের বেলা এত বেশী কাজ সে করিয়াছে যে রান্নার সুবিধা হয় নাই। ঘরের সঞ্চিত চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়াছে। এবেলা ভাত না খাইলে অস্বস্তি বোধ করিবে সে। কিন্তু নিজের সুবিধার জন্ত এত আগে শৈল রান্না করিলে, নিরঞ্জন যে সে-ভাত মুখে তুলিতেই পারিবে না। নাঃ কাজ নাই। শৈল আর একবার আসিয়া নিরঞ্জনের পড়ার ঘরে ঢুকিল, সুইচ টিপিতেই ঘরখানি যেন হাসিয়া উঠিল। চারি দিকে নানা রকম বই, সবগুলি আজ সে ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। কত রঙের সুন্দর সুন্দর মলাট, কত ছবি, কত কি যে আছে উহাদের মধ্যে! ইহারা সবাই তাহার স্বামীর নিত্যকার সঙ্গী। নিরঞ্জনের কাছে ইহারা শৈলের অপেক্ষা প্রিয়; কিন্তু নিরঞ্জনের সেই স্নেহ বাহ্যতঃ ইহাদের উপর প্রকাশ পায় না। ধুলায় ইহাদের অঙ্গ ভরিয়া উঠে, মলাটের পাতা খসিয়া যায়; পাতা ছিঁড়িয়া পড়ে, ইহারা করুণ দৃষ্টিতে শৈলর মুখপানে যেন চাহিয়া থাকে একটু আদর পাইবার জন্ত, একটু মাতৃস্নেহ পাইবার অপেক্ষায়। কত বিদেশী বইয়ের শক্ত মলাট খুলিয়া গিয়াছে, কত দেশী বইয়ের পাতা বিড়ির আগুনে পুড়িয়াছে, কত বৃহদাকার মাসিকপত্রগুলি দুমড়াইয়া গিয়াছে—শৈল দেখে আর নীরব সহানুভূতিতে তাহার অন্তর ভরিয়া যায়। তথাপি সে কোন দিন ইহাদের একটু আদর করিতে পারে না—একটু ছুঁইতে পারে না, এমনি নির্ম্মম শাসন নিরঞ্জনের।

হাঁ, আজ শৈল একটা কাজের মত কাজ করিয়াছে। তাহার স্বামীর প্রিয় সঙ্গীগুলিকে স্নেহ দিয়া ভালবাসা দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছে। আনন্দে উহারা যেন খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। কে উহারা, কেমন উহারা শৈল চেনে না, কেন যে নিরঞ্জন উহাদিগকে এত ভালবাসে তাহাও শৈল বোঝে না—

শৈল শুধু জানে ঐ বইগুলি নিরঞ্জনের অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয়, কিন্তু নিরঞ্জন উহাদের যত্ন করিতে জানে না। সে শুধুই দু-চোখের অগাধ তৃষ্ণা দিয়া উহাদের রস শুষিয়া লয়, হৃদয় ভরিয়া তাহা পান করে, তার পর বন্ধুদের সঙ্গে বিড়ি টানিয়া উহাদের কথা লইয়া মাতামাতি করে; কিন্তু আশ্চর্য্য! উহাদের পার্থিব দেহের যত্নও যে করা উচিত নিরঞ্জন তাহা মনে করে না। পুরুষ মানুষ এমনিই হয়। স্বার্থপর!

ঘড়িটার আটটা ঘা পড়িল। না, আর বসিয়া থাকা নয়, রান্না করিতে হইবে। শৈল উঠিল। বেশী কি আর রান্না; ডাল ভাত তরকারি। শৈল তাহাই আস্তে আস্তে রাঁধিতে লাগিল। দশটা ঘা ঘড়িতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই রান্না তাহার শেষ হইয়া গেল। এখনও যে অনেকক্ষণ দেরি। খাবার যাহাতে ঠাণ্ডা হইয়া না যায়, শৈল তাহার জন্ত গরম জল করিয়া খাবার বসাইয়া রাখিল। আসনটা তুলিয়া পাতিল, বিছানাটা একটু ঝাড়িয়া আসিল;—না, সময় আর কাটে না। কি সে করিবে!

পূর্ণিমা কিন্তু বেশ। হাতে কাজ না থাকিলে গল্পের বই পড়ে, সে বই আবার শৈলর কাছেই চাহিয়া লয়। রাত্রে পড়িবার জন্ত নিরঞ্জন মাথায় বালিশের নীচে যে

দু-একখান চটিকা মাসিকপত্র রাখে শৈল তাহাই সখীকে পড়িতে দেয়, না হইলে নিরঞ্জনের পড়িবার ঘরে তো তার প্রবেশ নিষেধ! শৈলর দেওয়া বইয়ের গল্প পড়িয়া কখনও কখনও পূর্ণিমা কাঁদিয়া ফেলে, বলে, তোমার স্বামীর লেখা গল্পটা পড়লুম ভাই, আ কি সুন্দর, কি করুণ! আবার কখনও বা হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে, বলে—"প'ড়ে দেখো ভাই, কি মজার গল্প, হেসে তো আমার পেটের নাড়ী উল্টে আসছে—"

শৈল একটু হাসে, একটু করুণ হাসি। পূর্ণিমা কিছু বুঝিতে পারে না। আপনার মনে বলিয়া চলে—কি সুন্দর লেখেন ভাই তোমার উনি। যেটা পড়ি সেইটেতেই ভাবি, যেন ঠিক আমার কথাটাই লিখেছেন। কি ক'রে লেখেন ভাই! শৈল আবার হাসে, তেমনি ম্লান হাসি! পূর্ণিমা বলে, আচ্ছা ভাই শৈ, এই যে সেদিন গল্পটা পড়লুম "রাতের বিরহ," সে তো দেখি তোমাকে নিয়েই লেখা—তোমাকে এমন সুন্দর ক'রে এঁকেছেন তাতে, তুমি পড়েছ নিশ্চয় গল্পটি?

শৈল নীরবে তেমনি হাসে।

চতুর্দ্দিকে তাহার স্বামীর স্তবগান। পাড়ার তরুণীরা তাহার কাছে সরাসরি আসিয়া বলে—আপনার স্বামীর দু-একটা লেখা ছাপার আগে দেখাতে পারেন না? দেখান না একটু? শৈল মৃদু হাসিয়া বলে—ছাপা হলেই পড়বেন ভাই, তার আগে পড়লে ছাপা বইগুলো বিকোবে কি ক'রে?

শৈলর উত্তর খুবই সমীচীন। কেহই আর কথা কয় না। কিছুক্ষণ পরে এক জন বলে—আচ্ছা শৈলদি, আপনি নিশ্চয়ই ছাপা হবার আগে গল্পগুলো পড়ে নেন? অন্য জন বলে, তুই কি বোকা রে! শৈলদির প্রেরণাতেই তো গল্প লেখা হয়—কাজেই ধরে নিতে হবে নিরঞ্জনবাবু নিজেই ওঁকে পড়ে শোনান নূতন লেখা। না শৈলদি?

শৈল আবার হাসে, কোন জবাব দেয় না।

ঘড়িতে এগার ঘা বাজিল। এবার তাহা হইলে আসিতেছেন। উঃ! কি দীর্ঘ প্রতীক্ষা! ওই যে!

শৈল দরজা খুলিয়া দিল। নিরঞ্জন ঘরে ঢুকিল। গলায় তাহার পুষ্পমাল্য, কপালে চন্দনরেখা, হাতে রৌপ্যপেটিকা।

শৈল অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া নিরঞ্জন তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—চিনতে পারছ না নাকি!

শৈল কৌতুক-হাস্যে বলিল—বিয়ে ক'রে এলে বুঝি? বৌ কই?

নিজের গলার পুষ্পমাল্যটি তাহার গলায় পরাইতে পরাইতে নিরঞ্জন কহিল—এই যে!

আনন্দে শৈলর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিতে লাগিল। ঘরে উঠিয়া রৌপ্যপেটিকাটি লইয়া সে ধীরে ধীরে নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিল—এটাতে কি আছে, খুলব?

জামা খুলিতে খুলিতে নিরঞ্জন ব্যঙ্গ হাস্যে বলিল—ও খুলে সুবিধে করতে পারবে না; তপ্‌সে মাছ নয়। ওতে আছে মানপত্র।

—মানপত্র! সে আবার কি জিনিষ?

—দরকার নেই জেনে। দাও রেখে দিই—বলিয়া নিরঞ্জন তাহার হাত হইতে সেটা ছিনাইয়া লইল। শৈলর অন্তর ভেদ করিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হইতেছিল—সে অতিকষ্টে চাপিয়া গেল। না, দুঃখ করিয়া আজ আর কোন ফল নাই। জামাটা খুলিয়া টাঙাইয়া রাখিয়া নিরঞ্জন গিয়া তাহার পড়ার ঘরের দরজা খুলিবার জন্য তালাতে চাবি লাগাইল। আশায় ও আনন্দে শৈলর বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। আর আধ মিনিট পরেই নিরঞ্জন দেখিবে, দেখিয়া বিস্মিত, মুগ্ধ হইয়া যাইবে। তাহার আদরের বইগুলি কত যত্নে সাজিয়া-গুজিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে, ঠিক প্রতি বৈকালের শৈলর মতই।

নিরঞ্জন চাবি খুলিয়া সুইচ টিপিল। মুহূর্ত্তে ঘর হাসিয়া উঠিল তাহার চোখের উপর। সুন্দর! সারা অঙ্গে যেন তাহার বসন্তের শোভা জাগিয়াছে। নিরঞ্জন সত্যই মুগ্ধ হইল, কিন্তু—

নিরঞ্জন ছুটিয়া শেলফটার কাছে গেল। তার পরই আসিয়া দাঁড়াইল টেবিলটার কাছে। ড্রয়ার টানিল, টেবিলের উপরকার ব্লটিংপ্যাডটা তুলিয়া দেখিল, তার

পর চেঁচাইয়া উঠিল—আমার সেই কানফোঁড়া কাগজগুলো কই—শৈল! কোথায় রেখেছ?

—কোন্ কাগজ! শৈল ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল!

—লালচে রঙের কাগজ—কোণায় পিন দিয়ে আটকানো?—

—পিন দিয়ে আটকানো? সে রকম কাগজ তো ছিল না!

—সে কি শৈল! সর্ব্বনাশ করেছ। কেন তুমি ঘর গোছাতে এলে শৈল, কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে?

নিরঞ্জনের সমস্ত মুখ রাগে দুঃখে ফুলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সে ঘরের সমস্ত বইখাতা ওলটপালট করিয়া টানিয়া ছুড়িয়া মেঝেতে ফেলিয়া তাহার সেই কোণায় পিন আটকানো কাগজ খুঁজিতে লাগিল। পনর মিনিটেই ঘরখানা বই আর কাগজের স্তূপে একাকার হইয়া গেল। শৈল সব দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছে। কোথাও না পাইয়া নিরঞ্জন বলিল, কোথায় ফেলেছ ময়লাগুলো—বল, শীঘ্র বল শৈল—খুঁজে দেখি! বাইরে ফেলে দিয়েছ কি?

শৈলর নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। নিরঞ্জন ধমক দিয়া বলিল—ন্যাকামি রাখ—কোথায় ফেলেছ?

—ঝি বাসন ধুতে এলে তাকে দিয়ে বাইরে সব ছেঁড়া কাগজ ফেলে দিয়েছি—অতিশয় ভীত কণ্ঠে শৈল উত্তর দিল।

—কখন?

—বৈকালে! শৈলর গলা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিরঞ্জন এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া ছুটিল বাহিরে। শৈল নির্ব্বাক্ হইয়া থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দশ মিনিট, বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা—নিরঞ্জন ফিরিল। —নাঃ ওকি আর পাওয়া যায়? ছিঃ ছিঃ! কে তোমাকে আমার ঘর পরিষ্কার করতে বললে? কেন তুমি গেলে ও ঘরে। বল, উত্তর দাও। তুমি জান না কোন্‌টা কাজের আর কোন্‌টা বাজে, তোমার এত সদ্দারী করতে যাওয়া কেন! শৈল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নিরঞ্জন রাগে দুঃখে কাঁপিতেছিল। গর্জ্জন করিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে কেন? যাও—আমার আর খাওয়া-দাওয়ার দরকার নেই—যাও শোও গে! ওঃ এত কষ্টে লেখা—গায়ের রক্ত জল ক'রে লেখা নাটকখানা নষ্ট হয়ে গেল। ওর আর কোথাও কোন কপি নাই যে উদ্ধার হবে। হায় হায়—নিরঞ্জন সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল! মনে পড়িল, কত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইয়াছে ঐ নাটকটি লিখিবার জন্য। শৈল ঘুমাইলে অন্তত দুই ঘণ্টা সে জাগিয়াছে। দিনের বেলা সময় বেশী পায় না সে, তাই রাত্রিতেই তাহাকে লিখিতে হয়। নাটকটা তাহার সমস্ত সাহিত্যিক বন্ধুই প্রশংসা করিয়াছে। শেষ হইলে উহা হয়তো নিরঞ্জনের জন্য আর একটা গৌরবের জয়মাল্য আনিতে পারিত! দুঃখে নিরঞ্জনের মস্তিষ্কের ঠিক ছিল না; প্রস্তরবৎ দণ্ডায়মানা শৈলকে একটা জোর ঠেলা দিয়া শোবার ঘরে ঢুকাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, যাও, তোমার মুখ দেখলে রাগ সামলাতে পারছি না! নিরঞ্জন বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল!

তাহার ভাগ্যই এইরূপ; নতুবা এই বিংশ শতাব্দীতে কাহার ভাগ্যে এমন হয় যে নিজের স্ত্রী স্বামীর বহু যত্নে লিখিত পাণ্ডুলিপি ডাষ্টবিনে ফেলিয়া দেয়! দুঃখ করিয়া লাভ নাই—কপালে যাহা লিখিত আছে তাহাই তো ঘটিবে!

কিন্তু মন যে মানিতে চাহে না। অমন সুন্দর নাটকটা! একটা ছেলে মরিয়া গেলে কত দুঃখ হয় নিরঞ্জন জানে না, কিন্তু সে জানে যে নিজের লেখা বইয়ের একমাত্র পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যাওয়ার শোক অপেক্ষা পুত্রশোক বেশী নয়। তাহার দুই চোখ ভরিয়া আবার জল আসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে একটু প্রকৃতিস্থ হইতেই মনে পড়িল, শৈলকে সে খুব বেশী তিরস্কার করিয়াছে। এতটা কেন করিল! যাহা হইবার হইয়াছে, অনর্থক আর—কিন্তু নিরঞ্জন ভুলিতে পারিতেছে না যে

এ-যুগে শৈল ছাড়া আর কোন মেয়েই এমনটা করিত না। নিজের অদৃষ্টের জন্ত নিরঞ্জন আর কখনও এত বেশী ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বুকের ভিতরটা তাহার মুচড়াইয়া উঠিল।

কিন্তু উপায় নাই। নিরঞ্জন ধীরে ধীরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিরঞ্জন একবার চাহিয়া দেখিল শৈল খাটের পায়া ধরিয়া পাথরের মূর্ত্তির মতই দাঁড়াইয়া আছে, মুখ তাহার অন্ত দিকে থাকায় দেখিতে পাইল না, দেখিবার ইচ্ছাও ছিল না, শৈলকে দেখিলে আজ তাহার রাগই বাড়িয়া যাইতেছে। নিরঞ্জন পাশ ফিরিয়া শুইল। কোন সহানুভূতিই সে দেখাইবে না। যাহার যেমন কর্ম্ম সে তেমনি ফল ভোগ করুক। থাকুক শৈল দাঁড়াইয়া। নিরঞ্জন চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

* * *

সকালে ঠাণ্ডা হাত গায়ে লাগিতেই ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়াই নিরঞ্জন দেখিল, হাতে চা এবং কোণে সুতা বাঁধা একটা খাতা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া শৈল দাঁড়াইয়া আছে।

নিরঞ্জন গত রাত্রে যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। সারা গায়ে তাহার ব্যথা। চায়ের কাপটা লইয়া প্রথমেই সে দুই চুমুক খাইয়া ফেলিল।

শৈল খাতাটা তাহার চোখের সুমুখে ধরিয়া বলিল, দেখ দেখি, এইটা নয়?

উৎকণ্ঠার উদ্বেগে শৈলর মুখখানি করুণ দেখাইতেছে। যেন নিরঞ্জনের উত্তরের উপর তাহার জীবনমরণ নির্ভর করে। নিরঞ্জন তাহার মুখের পানে চাহিল, কি নিদারুণ বেদনা ও ক্লান্তিতে সে-মুখ ছাইয়া গিয়াছে! সন্তানহারা জননীর ব্যথা কি এমনই, না ইহার চেয়েও বেশী?

নিরঞ্জন বলিতে পারিল না যে ইহা তাহাদের ক্লাবের খুচরা হিসাবের খাতা। সে হাসিমুখে বলিল, হাঁ, এই তো, আমি ঘুমুলে খুঁজে পেয়েছ বুঝি?

আনন্দে শৈলর দুটি চোখে অশ্রু উথলিয়া পড়িল।



অতীতের সন্ধান

দেশে ও বিদেশে ছোটবড় নানা পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কথা আমরা প্রায়ই খবরের কাগজে পড়ি বটে, কিন্তু সাধারণ লোক আমাদের মনে সে-সংবাদগুলি বিশেষ কোন কৌতূহল জাগায় না—মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পা পাহাড়পুর, বা মথুরাপুরের দেউল, বা আমাদের বাড়ীর পাশে পাওয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি—সবই আমাদের কাছে সমান নিরর্থক। পুরাতত্ত্বের আলোচনা আমাদের কাছে মনে হয় জনকতক লোকের খেয়াল, প্রাচীন ইতিহাস-নিদর্শন অনুসন্ধান ও সংগ্রহের প্রণালী আমাদের কাছে রহস্যাবৃত।

এই ঔৎসুক্যবোধের অভাবের কারণ, পুরাতত্ত্ববিৎ-দিগের আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা, তাঁহাদের আবিষ্কারের মূল্য ও প্রয়োজনের কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অতীতের সন্ধানে যাঁহারা ভূগর্ভ খনন করিয়া থাকেন, কতকগুলি বিচিত্র বা অপরিচিত বস্তুনিদর্শন সংগ্রহ করিয়া মিউজিয়ম ঘরবোঝাই করাই তাঁহাদের লক্ষ্য নহে; তাঁহাদের উদ্দেশ্য, মানব-ব্যবহৃত প্রাচীন বস্তুর সহায়তায় শত শত বা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ইতিহাস রচনা, বা সেই ইতিহাসের উপর নূতন আলোকসম্পাত; এবং এই ইতিহাস-রচনার উদ্দেশ্য কেবল অলস কৌতূহল-নিবৃত্তি বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞানভার-বৃদ্ধি নয়—প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার মূল লক্ষ্য অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের, প্রাচীন মানুষের সঙ্গে আধুনিক মানুষের যোগসূত্র আবিষ্কার; এই ঐতিহ্য-সম্পৎ তো শুধু বিশেষজ্ঞের সম্পত্তি নয়, সকল দেশের সকল মানুষেরই সম্পত্তি। বহু প্রাচীন যুগে মানুষ কোন্ দেবতাকে উপাসনা করিয়াছে, কেমন গৃহে বাস করিয়াছে, তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ কি ছিল, প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে কি উপায়ে সে জীবিকা আহরণ করিয়াছে, কি অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়াছে—মানুষের প্রস্তুত ও ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর সাহায্যে, প্রাচীন মানুষের গৃহ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে তাহার নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া, প্রাচীন মানুষের সহিত আধুনিক মানুষের যোগসূত্র আমরা ধরিতে পারি, যুগযুগ ধরিয়া প্রবাহিত মানবেতিহাসের ধারা মানুষের রচনা-নিদর্শনের মধ্য দিয়া আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে; এবং জীবনযাত্রার যে-সকল উপকরণ ও উপাদান আমরা একান্ত আধুনিক বলিয়া জানি, প্রাচীন মানুষের গৃহে মন্দিরে বা শবাধারে, তাহারই নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত সেই জাতীয় বস্তু দেখিয়া প্রাচীন ও আধুনিক মানুষের ঐক্যের বাহ্য নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া চমৎকৃত হই।

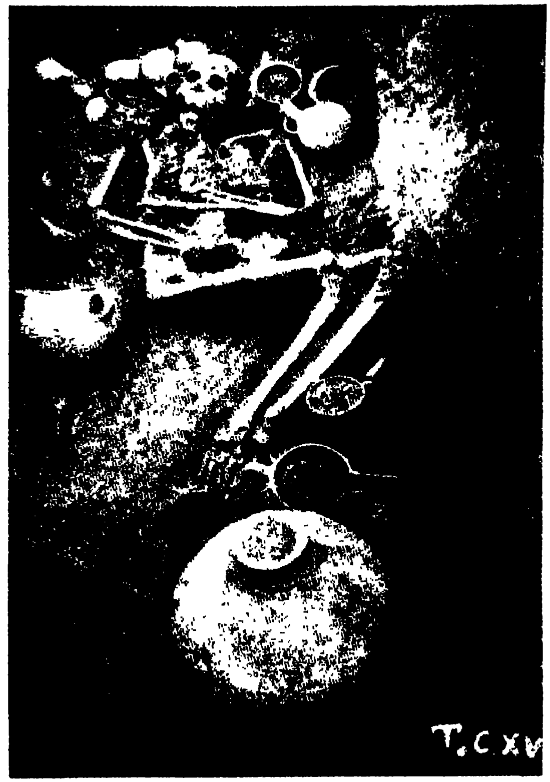
কিন্তু এই ইতিহাস-রচনার জন্য ভূগর্ভ-খননের কি প্রয়োজন আছে? এই খননকর্ম্ম প্রচলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই তো ঐতিহাসিকেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইতিহাসের পুঁথি রচনা করিয়া আসিতেছেন—মানুষের ইতিবৃত্ত জানিবার পক্ষে কি তাহাই যথেষ্ট নয়? এই দুই রকম ইতিহাসে কিন্তু প্রচুর প্রভেদ আছে। দলিল কাগজপত্র ও লিখিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত যে-সব প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহার উপাদানে এবং প্রত্নতাত্ত্বিকের আবিষ্কৃত উপকরণে পার্থক্য অনেকখানি। প্রথম শ্রেণীর ইতিহাসের উপজীব্য যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রবিপ্লব, সম্রাট-বাদশাহদিগের কীর্ত্তিকাহিনী ও বীরত্বগাথা; সমসাময়িক লেখকগণের কাছে যে-সব ঘটনা ও বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে তাহার মধ্যেই প্রধানতঃ এই ইতিহাস সীমাবদ্ধ, বড় জোর সমসাময়িক সাহিত্য গৌণভাবে ইহার উপাদান জোগাইয়া থাকে। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিকের ভূগর্ভ-খননের ফলে আবিষ্কৃত হয় তৎকালীন মানবের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার অভূতপূর্ব্ব উপাদান; পুরাগামী মানুষের শিল্প- ও কারু- নিদর্শন, আবাসগৃহ ও মন্দিরের অবশেষ, প্রাচীন

মানুষের ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায়-রচনায় যে-সাহায্য করে তাহা লিখিত উপাদানের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। ভূগর্ভ-খননের পূর্ব্বে ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতার কথা কাহারও জানা ছিল না। এ-বিষয়ে লিখিত কোন ইতিহাস বা দলিলপত্র ছিল না, তৎসত্ত্বেও আজ তখনকার সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার কথা বা রাজকীয় আড়ম্বরের কথা আমরা জানি। ঈজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে পুনরুদ্ধার লাভ করিয়াছে; এবং সে-ইতিহাস এত বিস্তারিতভাবে জানা গিয়াছে যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ঈজিপ্টের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার তথ্যাবলীর সহিত আমরা যতটা সুপরিচিত, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ বা ইংলণ্ডের জীবনযাত্রার সম্বন্ধেও হয়তো ততটা খবর আমাদের জানা নাই। সুমেরীয় ও হিটাইটদের কথা, যে-সব বিশাল সাম্রাজ্যের কথা মানুষ এক রকম বিস্মৃতই হইয়াছিল, পুরাতাত্ত্বিক খননের ফলে পুনরায় তাহা আমাদের গোচর হইয়াছে; বেবিলনীয় ও আসিরীয়দের কথা যাহা নীরস তথ্যমাত্র ছিল, ভূগর্ভ-খননের ফলে আবিষ্কার দ্বারা তাহাতে নবপ্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে। মহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কারের ফলে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাস নূতন করিয়া রচনা আবশ্যক হইয়াছে। এইরূপে এশিয়ায় ইউরোপে আমেরিকায় সর্ব্বত্র এই ভূগর্ভ-খননের ফলে অতীত যুগের মানবের সম্বন্ধে পূর্ব্বজ্ঞাত তথ্য আমরা নূতন রূপে দেখিতেছি, যেখানে ছিল অজ্ঞানের অন্ধকার সেখানে নূতন আলোক সম্পাতের ফলে আমরা বিস্মিত হইতেছি।

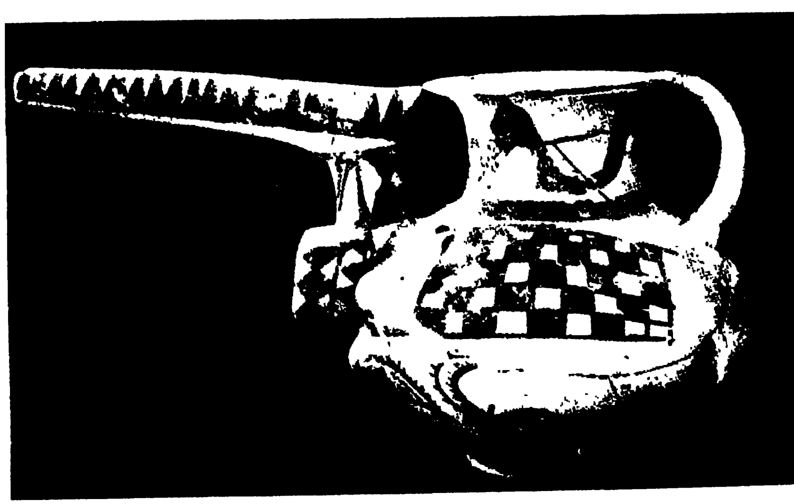
কাহারও মনে হইতে পারে, অতীত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য ভূগর্ভ খনন করিয়া পুরামানবের ব্যবহৃত সামগ্রীনিচয় আবিষ্কারের সার্থকতা আছে বটে, কিন্তু যে-খননের কাজ দিনমজুরের দ্বারাই চলিতে পারে বিশেষজ্ঞ পুরাতাত্ত্বিকের তাহাতে ব্রতী হইবার সার্থকতা কি? সাধারণ লোকের সংগৃহীত উপাদানের দ্বারাই কি ঐতিহাসিকের প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে না? ভূগর্ভ-প্রোথিত ধনসম্পত্তির লোভে মাটি খোঁড়ার ফলেও অনেক সময় ইতিহাসের প্রয়োজনীয় উপাদান মিলিতে দেখা যায়; পুষ্করিণী-খননের ফলে কত সময় কত প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু এইরূপ আকস্মিক আবিষ্কারের সঙ্গে পুরাতাত্ত্বিকের আবিষ্কারের প্রভেদ আছে, ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবেও দুয়ের পার্থক্য আছে। সাধারণ লোকে দৈবাৎ কোন প্রাচীন মূর্ত্তি বা অন্য কোনরূপ ইতিহাস-নিদর্শন পাইলেও, কি অবস্থায় কোন্ স্থানে তাহা পাওয়া গেল, তাহার কোন সন্ধান বা তথ্য স্মরণ করিয়া বা লিখিয়া রাখে না; নিদর্শনগুলি ক্রমশঃ হস্তান্তরিত হইয়া আবিষ্কারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি ঐতিহাসিকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের সুযোগও থাকে না—বাধ্য হইয়া অনুমানের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয় এবং প্রত্নতাত্ত্বিকের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সংগৃহীত হইলে যাহা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতে পারিত, সংগ্রাহকের অনবধানতা ও অজ্ঞতা বশতঃ তাহা বিশেষজ্ঞদের বিতর্কের বিষয় হইয়া উঠে, তাহার সাহায্যে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়। তাছাড়া, প্রত্নতাত্ত্বিকের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ভূ-খননের ফলে এমন উপকরণ গবেষকদের গোচর হইতে পারে যাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু সাধারণের কাছে শিল্পদ্রব্য হিসাবে বা অন্য কোন ভাবে যাহার কোন মূল্য বা বাজার-দর নাই। রোডেসিয়ার একটি সুবিখ্যাত প্রস্তরময় ধ্বংসস্তূপ পুরাতাত্ত্বিকের কাছে বহুকাল বিশেষ রহস্যবিজড়িত হইয়া ছিল, নানা বিচিত্র মত উহার সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল—কেহ বলিতেন, উক্ত মন্দির ফিনীসীয়দের নির্ম্মিত, কেহ বলিতেন, উহা সলোমনের স্বর্ণাহরণভূমি—এই সকল বিভিন্ন মতের যে-কোনটি প্রমাণিত হইলে প্রাচীন ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায় নূতন করিয়া রচনা করা আবশ্যক হইত। অবশেষে পুরাতাত্ত্বিকদিগের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে অনুসন্ধানের ফলে ঐ স্তূপ হইতে সংগৃহীত সামান্য একটি চীনামাটির পাত্রের ভগ্নাবশেষ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল, উক্ত মন্দিরটি মধ্যযুগের, এবং আফ্রিকার দেশীয় অধিবাসীদেরই প্রস্তুত। বহুমূল্য ধনরত্নের লোভে যাহারা ভূগর্ভ খনন বা ধ্বংসস্তূপ সন্ধান



ষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইরাণে সমাগত জাতির অধ্যুষিত অঞ্চলে খননের ফলে বহু শব-সমাধি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।



এই সকল সমাধিতে শবদেহের সহিত লৌহ, তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে।



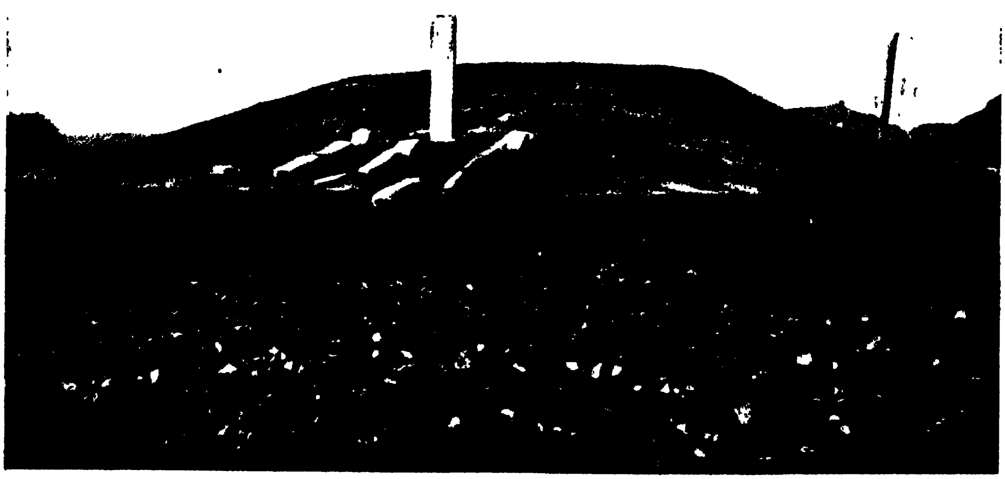
এই সকল সমাধিতে নানারূপ বিচিত্র পাত্রও পাওয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘনলবিশিষ্ট, আইবেক্স ও পাখীর চিত্রসমন্বিত পাত্রটি সম্ভবতঃ পারলৌকিক কোন ক্রিয়া সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত।



তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষের
একটি দৃশ্য



মহেঞ্জোদারোতে
আবিষ্কৃত বৃহৎ
স্নানমণ্ডপের
ধ্বংসাবশেষ



দাক্ষিণাত্যে
গুন্টুরে
নাগার্জ্জুনী-
কোণ্ড
বৌদ্ধস্তূপের
ধ্বংসাবশেষ



পাটনার নিকটে কুম্রাহারে খননের ফলে আবিষ্কৃত
মৌর্য্যপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

করে, এই সামান্য ভগ্নপাত্র তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণও করিত না—দৈবক্রমে করিলেও, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আহরিত নয় বলিয়া গবেষকদের কোন প্রয়োজন উহাতে পূর্ণ হইত না। পুরাতাত্ত্বিকদিগের খননের ফলে আহরিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার সাহায্যে যে শুধু উল্লিখিত ভ্রান্ত মতগুলির নিরসন হইল তাহা নয়, আফ্রিকার ইতিহাসের একটি নব অধ্যায়ও অন্ধকারগর্ভ হইতে উন্মোচিত হইল।

পুরাতন আমলের জীবনযাত্রাপদ্ধতির বিভিন্ন নিদর্শন ও সামগ্রী কি ভাবে ভূগর্ভে স্থান পায়, এ-সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। যে-সব দেশে শব প্রোথিত করিয়া রাখা রীতি ছিল অতীতকালে তাহার অনেক স্থানে পরজীবনে মৃতের আনুকূল্য করিবার জন্য শবের সহিত নানা ব্যবহার্য্য সামগ্রীও প্রোথিত করিয়া রাখা হইত। বৈতরণীর পারাণীর জন্য গ্রীকেরা মৃতের সহিত একটি মুদ্রাও দিত। পরলোকের পথে দীর্ঘদিনের যাত্রার পাথেয় স্বরূপ খাদ্য ও পানীয় দেওয়ার রীতিও অনেক দেশে ছিল। পরলোকের জীবনযাত্রা ইহারা ইহলোকের অনুরূপ করিয়াই কল্পনা করিয়াছে, তাই ইহজীবনে যাহার পক্ষে যে-সামগ্রী একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, মৃত্যুর পরেও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাহাই সঙ্গে দিয়াছে—নারীর শবের সহিত দর্পণ ও প্রসাধনদ্রব্য, সুতাকাটা ও সেলাইয়ের উপকরণ, স্বর্ণকারের সহিত ওজনের যন্ত্র, সৈন্যের সহিত সমরোপকরণ। রাজ-দেহের সহিত তাঁহার পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সর্ব্ববিধ নিদর্শন ও উপকরণ সমাহিত করার প্রথা অনেক দেশে ছিল। ঈজিপ্টের ফ্যারাওদের সমাধিতে বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্ভার নিহিত করা হইত; টুটানখামেনের কবরে নিহিত বস্তুসম্ভার আবিষ্কৃত হইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছে। প্রাচীন

সমাধিগুলি তাই প্রত্নতাত্ত্বিকের তথ্যসংগ্রহের এক প্রধান ক্ষেত্র; কেবল যে প্রাচীন কালের শব-সমাধি ও পরলোক সম্বন্ধে রীতিনীতি ও মত-বিশ্বাস এইগুলি হইতে জানা যায় তাহা নয়, ঐ সময়ের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রারও একটি রূপ ঐ সকল উপাদানের সাহায্যে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

কিন্তু শবের সঙ্গী এ-সকল সামগ্রী তো লোকে ইচ্ছা করিয়াই ভূগর্ভনিহিত করিয়াছে—কিন্তু ঘরবাড়ী গ্রাম-নগর কি করিয়া ভূগর্ভে সমাহিত হয়? কচিৎ অবশ্য আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের ফলে প্রাসাদ-নগরী সমাহিত হইয়া যাইতে পারে—প্রত্নতাত্ত্বিকের তথ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতি-নিদর্শন সংগ্রহের পক্ষে এইগুলি অতি উৎকৃষ্ট স্থান—যেমন পম্পিয়াই—সেখানে আগ্নেয়গিরির উৎপাতের দিন যেখানে যে-জিনিষটি যেমন অবস্থায় ছিল, প্রায় সেই অবস্থায় অক্ষতভাবে সেগুলি প্রায় সবই পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপভাবে নগর সমাধি কদাচিৎ রচিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ, গৃহ ও নগর যে আপনা হইতে ভূগর্ভশায়ী হয় তাহা নয়, ভূ-সমতলই ক্রমশ উচ্চ হইয়া গৃহ, গ্রাম বা নগরী আবৃত করিয়া ফেলে। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, নিকট-প্রাচ্যে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের প্রাচীন অধিবাসীরা তাহাদের মৃন্ময় গৃহের ভগ্নাবশেষ সেখান হইতে না-সরাইয়া তাহাই কোনরূপে সমতল করিয়া তাহার উপর নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে—এই প্রকার গৃহনির্ম্মাণরীতিই তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য ও অল্পব্যয়সাপেক্ষ হইত। এইরূপ ভাবে যে-সব স্থানে বহুকাল ধরিয়া প্রাচীন মানব ক্রমাগত বাস করিয়া আসিয়াছে সেখানে একত্র বহু স্তর মনুষ্য-গৃহাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ অবশেষ-স্তূপ এক শত ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়, ঐ অঞ্চলে যতকাল মানুষের বাস ছিল তদনুসারে তাহাতে দশ-পনরটি পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; পুরাতন গৃহের ভগ্নাবশেষের উপর নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণের সময় পুরাতন গৃহ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই, অনেক সামগ্রী ও চিহ্ন সমাহিত হইয়া রক্ষা পাইয়াছে, এবং পরে প্রত্নতাত্ত্বিকের খননের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে।



হরপ্পাতে প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্ত্তি

ভূগর্ভে যে প্রাচীন নিদর্শন নিহিত হইয়া আছে, প্রত্নতাত্ত্বিক কি রূপে তাহার সন্ধান পান? ভূগর্ভনিহিত হইলেই তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না, প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিজ্ঞ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোন-না-কোন চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিয়াই যায়। নিকট-প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন গ্রাম-নগরীর চিহ্নস্বরূপ যে-সকল স্তূপ বর্ত্তমান সেগুলির কথা তো সুবিদিত। অনেক সময় প্রাচীন ইতিহাস হইতেও প্রাচীন রাজ্য ও নগরীর অবস্থানের কথা জানিতে পারা যায়। অবশ্য বিস্তৃত স্থানে বাছিয়া ঠিক কোন্‌খানে খনন আরম্ভ করিতে হইবে তাহা স্থির করাই কঠিন। কোন স্থানে প্রাচীন গ্রাম বা নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে

ইহা জানা গেলে, তাহার মধ্যে নীচু জায়গা দেখিয়া খনন করিলে মন্দির আবিষ্কৃত হইবে, এইরূপ অনুমান করা হয়; কারণ মন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত হইত ও সুসংস্কৃত অবস্থায় থাকিত বলিয়া সহসা বিনষ্ট হয় নাই, তাহার সমতল বহুকাল একই রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী মৃন্ময় গৃহগুলি বহুকাল স্থায়ী হয় নাই, ক্রমশ তাহার উপর স্তরে স্তরে নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। খননকার্য্য আরম্ভ করিবার সময় প্রত্নতাত্ত্বিককে এইরূপ নানাবিধ চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ঈজিপ্টের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ ক্ষেত্রে কোথাও প্রস্তরখণ্ড বিকীর্ণ দেখিলে বুঝা যায়, এই স্থান খনন করিলে মন্দিরাবশেষ পাওয়া সম্ভব, বিশেষতঃ সাধারণ ঘরবাড়ী যেখানে মৃত্তিকায় নির্ম্মিত হইত। স্তূপের আকার দেখিয়াও তাহার গর্ভে কি নিহিত আছে অনেক সময় তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। পাত্রাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়াও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এবিষয়ে অনেক সময় অনুমান করিতে পারেন। স্তূপের কোন্ খানে খনন করিতে হইবে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির হইলে পরিখা খনন আরম্ভ হয়। খনন অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই প্রাচীরাবশেষ আবিষ্কৃত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়; এখন স্থির করা আবশ্যক এই সকল প্রাচীর একই সময়ে নির্ম্মিত কি না। তাহা না হইলে সর্ব্বাধুনিক প্রাচীর লইয়াই কাজ করা আবশ্যক, কারণ একই কালে দুই বিভিন্ন যুগের গৃহাদি খনন করিয়া আবিষ্কার করিলে, প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি কোন্ যুগের তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন হয়। খননের ফলে প্রাচীর এবং মেঝে আবিষ্কৃত হইলে খননকার্য্য সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া, ঐ সর্ব্বোচ্চ স্তরে প্রাপ্ত পাত্রাদি ও অন্যান্য সামগ্রীর বয়স ও যুগ বিচার করিবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য জানিয়া লইবার পর ঐ স্তর পরিষ্কার করিয়া পরবর্ত্তী নিম্ন স্তর খনন করা হয়। অবশ্য ইহা লেখা যত সহজ করা তত সহজ হয় না। কখন কখন এমন হয় যে, গৃহাদি ধ্বংস হইয়া ভূনিহিত হইয়া গেলেও তাহার প্রাচীরের কোন কোন অংশ হয়তো বিনষ্ট হয় নাই, এবং ঐ প্রাচীর পরবর্ত্তী গৃহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—এই ক্ষেত্রে একই প্রাচীর দুই বিভিন্ন সময়ের রীতিনির্দ্দেশক। কখনও আবার দেখা যায়, একটি গৃহ হয়তো বিনষ্ট হয় নাই, অথচ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ নষ্ট হইয়া ক্রমশ তাহার উপর আরও গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে;



বুলন্দিবাগে প্রাপ্ত মৃন্ময় রমণীমূর্ত্তি

এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম গৃহের বস্তুনিচয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী একাধিক স্তরের সামগ্রী একই যুগ-নির্দ্দেশক। এ-সব বিষয়ে বিচার করিবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

খননকার্য্য ও বস্তুসংগ্রহ সম্পূর্ণ হইলে, উহার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা প্রত্নতাত্ত্বিকের নির্দ্ধারণের বিষয় হয়। সমাধিক্ষেত্রের বিভিন্ন শবাধারে, এবং গৃহাবশেষ-স্তূপের বিভিন্ন স্তরে, পৃথক পৃথক যুগের ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে; এইগুলি সম্মিলিত ভাবে হয়তো কয়েক শত বৎসরের ইতিহাসের উপাদান ও মানব-সংস্কৃতির দ্যোতক, এ কথাটা হয়তো সহজেই অনুমেয়। কিন্তু শুধু এই সামান্য জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া কোন ইতিহাস রচনা করা চলে না; কারণ এখন যেমন, প্রাচীন কালেও তেমনই, শত বৎসরের ব্যবধানে মানুষের সমাজ



ইরাণে প্রাপ্ত পশ্চিম-এশিয়ার প্রাচীনতম মানব-প্রতিমূর্ত্তি

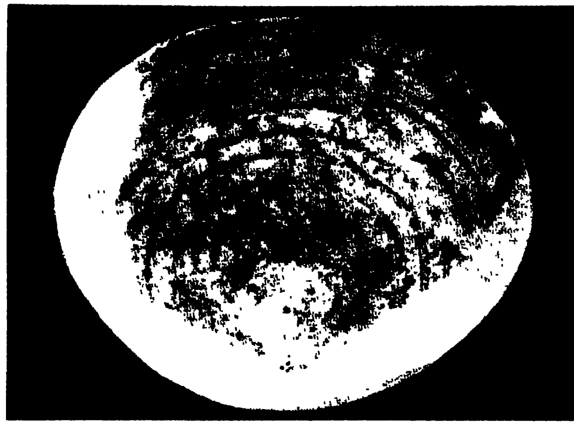
ও সংস্কৃতি বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন যুগের মিশ্র উপাদানগুলিকে যুগপরম্পরায় ভাগ করিতে পারিলে তবেই তাহা হইতে বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিক রূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। ইহাই প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজ। কোনরূপ দলিলপত্র কিংবা লিখিত প্রমাণ বা উপাদান থাকিলে বা সংগৃহীত হইলে এইরূপ পারম্পর্য্যনির্ণয় সহজ হয়, নহিলে প্রত্নতাত্ত্বিকের স্বীয় অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির উপরেই নির্ভর। বিভিন্ন শব-সমাধিতে প্রাপ্ত বস্তুনিচয়ের বিভিন্ন পরিকল্পনা, অলঙ্করণ-বৈচিত্র্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য প্রত্নতাত্ত্বিক নির্ণয় করেন। ইহার সহিত বিভিন্ন স্তরের গৃহাবশেষে প্রাপ্ত সামগ্রীগুলির তুলনা করিয়া, এই বিভিন্ন স্তরের গৃহাবশেষের সহিত বিভিন্ন যুগের সমাধিগুলির একটা সম্বন্ধনির্ণয় করা যাইতে পারে। তাহার ফলে বিভিন্ন যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও সমাধিপ্রথা বিষয়ে অনেক সুসম্বদ্ধ তথ্য আমাদের গোচর হয়; গৃহস্তরের সহিত মন্দিরও আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলে, তৎকালীন ধর্ম্মমত ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্যও আমরা জানিতে পারি।

অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক একক এই সকল বিভিন্ন উপাদানের সমবায়ে সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে পারিবেন সর্ব্বদা এমন আশা করা যায় না। তাঁহার সংগৃহীত বিভিন্ন উপাদান লইয়া বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা করিলে তবেই ঐ যুগের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস খাড়া হইতে পারে। সমাধি হইতে আবিষ্কৃত নরকঙ্কাল হইতে নৃতত্ত্ববিৎ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ঐ লোকদের জাতিনির্ণয় এবং বিভিন্ন রোগচিহ্ন দ্বারা তখনকার জীবনযাত্রা-সংক্রান্ত কোন কোন তথ্য অনুমিত হইতে পারে, মৃৎপাত্রে অঙ্কিত চিত্রাদি দ্বারা তৎকালীন মানুষের আকৃতি ও বেশভূষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়; বসনাদির অবশেষ ও বয়নযন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া তখনকার বস্ত্রবয়নরীতি জানা যায়। তৎকালে ব্যবহৃত ধাতুদ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া কোন্ কোন্ দেশের সহিত সেকালে তাহাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল তাহার পরিচয় পাই। গৃহস্তরে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাণীর অস্থিপরীক্ষা করিয়া প্রাণীতত্ত্ববিৎ তখন কি কি প্রাণী গৃহপালিত ছিল, মানুষ কি কি প্রাণী শিকার করিয়াছে, সে-খবর আমাদের দিতে পারেন। এইরূপে প্রত্নতাত্ত্বিকের খননের ফলে, এবং তাঁহার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ফলে, কোনও লিখিত উপাদান-প্রমাণের সহায়তা ব্যতিরেকেও, প্রাচীন মানবের বিচিত্র ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত ও উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রত্নতাত্ত্বিকের খননের ফলে প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাস আবিষ্কারের একটি সর্ব্বাধুনিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে। ইরাণের রাজধানী তেহেরানের দক্ষিণে কাশান নগরীর সন্নিকটে, পরস্পর ½ মাইল দূরবর্ত্তী দুইটি স্তূপ খনন করিয়া ইরাণের প্রাচীনতম সভ্যতা-নিদর্শন (খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম সহস্রাব্দী হইতে) পাওয়া গিয়াছে। সুবিখ্যাত লুভ্‌র্‌ মিউজিয়মের অধীন এক প্রত্নতাত্ত্বিক দল গত ১৯৩৩ সালে এই অঞ্চলে খননকার্য্য আরম্ভ করেন, বর্ত্তমান ১৯৩৮ সালে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাদের আবিষ্কৃত তথ্য হইতে ইরাণের প্রাচীন অধিবাসীদের সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী তাহার অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

ইরাণের প্রাচীন মানবের সর্ব্বপ্রথম বাসগৃহ ছিল নলখাগড়া ইত্যাদির, তখনও মাটির বাড়ী তৈরি আরম্ভ হয় নাই। এই সময় তাহার জীবিকার প্রধান উপায় পশু-শিকার হইলেও ক্রমশঃ কৃষিকর্ম্মের সূচনা হইতেছে; এমন প্রস্তর-কুঠার পাওয়া গিয়াছে যাহা লাঙ্গলের কাজেও কোন রকমে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই যুগের মনুষ্যাবশেষের সহিত প্রাপ্ত প্রাণীর অস্থি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, মানুষ তখন গরু ছাগল প্রভৃতি প্রাণীকে গৃহে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোথাও তীর ইত্যাদি পাওয়া যায় নাই, তাহাতে বুঝা যায় যে তখনও ইরাণের প্রাচীন মানব পশু-শিকারে ধনুর্ব্বাণের ব্যবহার শেখে নাই।

পরবর্ত্তী স্তরে, এইরূপ শিথিল ব্যবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় মাটির বাড়ী নির্ম্মাণের প্রচলন হইয়াছে। এই সকল গৃহে শস্য ও খাদ্য-দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিবার জন্য বৃহৎ পাত্রাদিও দেখা যায়। এই সময় মৃৎপাত্রাদি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও কুমারের চাক, বা পুড়াইবার ভাঁটি মানুষ তৈরি করিতে পারে নাই—এই মৃৎপাত্রাদি হাতে তৈরি হইত ও তাহা ঘাসপাতায় ঢাকিয়া আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া লওয়া হইত। তবে মানুষের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি যে তখনও



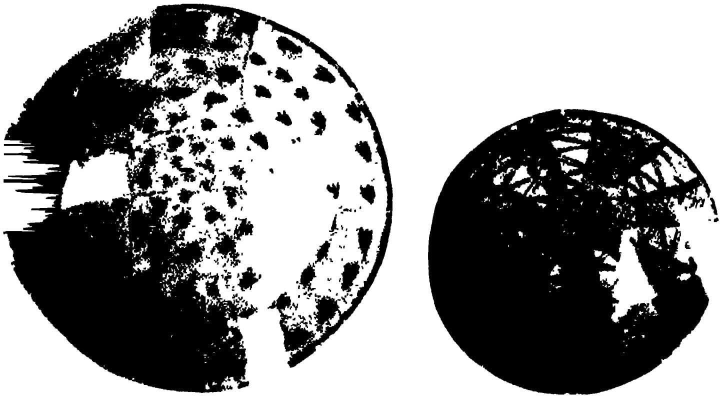
ইরাণের প্রাচী· পাত্র—প্রথম স্তরে প্রাপ্ত। ইহার আকার ও অলঙ্করণে ঝুড়ির অনুকৃতি লক্ষ্যণীয়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম সহস্রাব্দী।

সুপ্ত ছিল না তাহার প্রমাণ পাই যখন দেখি এই সকল পাত্রও মানুষ চিত্রবিচিত্র করিতে ভোলে নাই। মৃৎপাত্রাদির ব্যবহার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মানুষ কঞ্চি ইত্যাদির যে-সব ঝুড়ি ব্যবহার করিত, এই মৃৎপাত্রের অলঙ্করণে তাহারই চিত্র লক্ষণীয়, এই সব পাত্রের আকৃতিও ঐ সব ঝুড়ির অনুকরণে গঠিত। সুতাকাটার টেকো ইত্যাদি দেখিয়া বুঝা যায়, এই সময় বস্ত্রবয়ন সুরু হইয়াছে।

হাড় খোদাই করিয়া প্রস্তুত বিভিন্ন সামগ্রী যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় এই শিল্পটি এই সময় ইরাণের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। হাড় খোদাই করিয়া প্রস্তুত একটি ক্ষুদ্র মানব-মূর্ত্তির যে চিত্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল, পশ্চিম-এশিয়ায় ইহা অপেক্ষা পুরাতন মনুষ্য-প্রতিমূর্ত্তি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই মূর্ত্তির গঠনে যে কলাকৌশল ও নৈপুণ্য লক্ষিত হয় তাহা হইতে সহজেই ইহা অনুমেয় যে আরও পূর্ব্ব হইতেই ইরাণের প্রাচীন মানব এই অস্থি-তক্ষণ-বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া আসিতেছিল।

মৃতদেহ গৃহভিত্তির নীচে সমাধি দেওয়া হইত। কোন কোন সমাধিতে শবের সহিত কুঠার, মেষদেহাবশেষ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে; তাহা দেখিয়া, ইহজীবনের অনুরূপ পরলোকে ইহাদের বিশ্বাসের কথা অনুমান করিতে পারি।

ইহার পরের পর্য্যায়ে দেখি, মানুষ ইট প্রস্তুত করিতে ও তাহা পুড়াইবার ভাঁটি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। প্রথমে ছাঁচ ছাড়াই, হাতে কোন রকমে মাটির তাল পাকাইয়া ইট তৈরি হইত—ক্রমশ মানুষ ইটের ছাঁচ তৈরি করিতে শিখিয়াছে। এই সময়ে প্রস্তুত মৃৎপাত্রগুলি পূর্ব্বের পাত্র অপেক্ষা সৌষ্ঠবময়, এবং তাহার গাত্রের



দ্বিতীয় স্তরে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ সহস্রাব্দীর প্রথমে) প্রাপ্ত দুইটি পাত্র, প্রথম স্তরে প্রাপ্ত পাত্র অপেক্ষা সুগঠিত ও বিচিত্র।

অলঙ্করণও বিচিত্র। এই সময়ের (অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ সহস্রাব্দীর) শব-সমাধিতে প্রাপ্ত অলঙ্কার-সামগ্রী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, এই সময়ে বহির্জ্জগতের সহিত তাহাদের অল্পবিস্তর বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। প্রাণীর অস্থি দেখিয়া জানা যায়, কুকুর, শূকর অশ্ব ইত্যাদি তখন গৃহপালিত জীবের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; ইহার পূর্ব্বে এই অঞ্চলে অশ্বের অস্তিত্বের কথা জানা যায় না।

অষ্টম স্তর পরীক্ষায় মনে হয়, কোন আক্রমণ বা যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এই গ্রাম ধ্বংস হয়। ইহার উপরে নূতন গৃহাদির নিদর্শন পাওয়া যায়—কিন্তু তাহা কোন নূতন জাতির; তাহাদের জীবনযাত্রা রীতিনীতি পূর্ব্বগামীদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া যে প্রাচীন নিবাসীদের সংস্কৃতি ক্রমশ বিকাশ লাভ করিতেছিল, তাহাদের আর চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই স্তরে লক্ষ্য করা যায়, সম্ভবতঃ বহির্জ্জগতের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ বিস্তারের ফলেই, মানুষ লিখন-পদ্ধতি শিখিতেছে। এই নূতন দল এই স্থানে ১৫০।২০০ বৎসর বাস করিয়াছিল এইরূপ অনুমান।

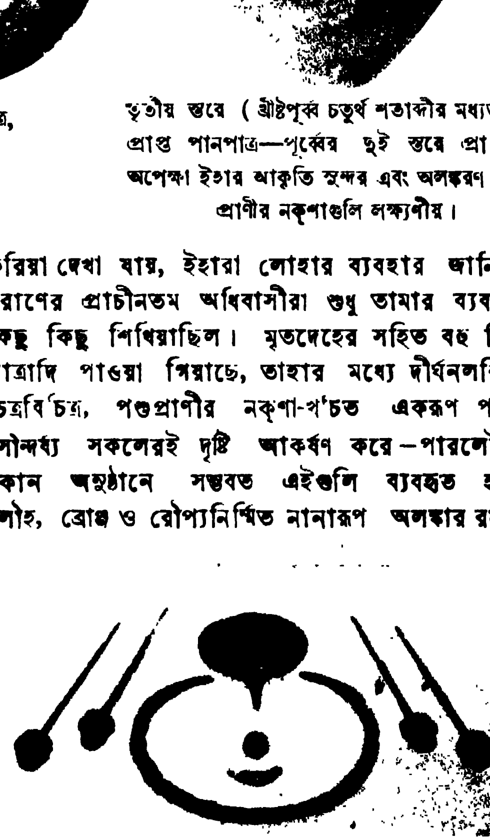
ইহার পরে বহুদিন এই অঞ্চলে মানব-বসতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না; সম্ভবতঃ জীবনযাত্রার একান্ত আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহে কোন বিশেষ বাধা উপস্থিত হওয়ায় বা জলবায়ু কোন কারণে মানব-বাসের অনুপযোগী হওয়ায় মানুষ এই অঞ্চল ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকিবে।

খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ১০০০ বৎসর আগে এই স্থানে পুনরায় অন্য একটি নূতন জাতির বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদের সমাজব্যবস্থা অনেক সুশৃঙ্খল, রীতিনীতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। মৃতদেহ ইহারা গৃহের নিম্নেই সমাহিত করিত না, সেজন্য স্বতন্ত্র সমাধি ছিল। এই সকল সমাধি খনন



তৃতীয় স্তরে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের) প্রাপ্ত পানপাত্র—পূর্ব্বের দুই স্তরে প্রাপ্ত পাত্র অপেক্ষা ইহার আকৃতি সুন্দর এবং অলঙ্করণ বিচিত্র। প্রাণীর নক্শাগুলি লক্ষ্যণীয়।

করিয়া দেখা যায়, ইহারা লোহার ব্যবহার জানিত—ইরাণের প্রাচীনতম অধিবাসীরা শুধু তামার ব্যবহারই কিছু কিছু শিখিয়াছিল। মৃতদেহের সহিত বহু বিচিত্র পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে দীর্ঘনলবিশিষ্ট, চিত্রবিচিত্র, পশুপ্রাণীর নক্শা-খচিত একরূপ পাত্রের সৌন্দর্য্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—পারলৌকিক কোন অনুষ্ঠানে সম্ভবত এইগুলি ব্যবহৃত হইত। লৌহ, ব্রোঞ্জ ও রৌপ্যনির্ম্মিত নানারূপ অলঙ্কার রমণীরা



খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইরাণের অধিবাসিনীদের ব্যবহৃত দর্পণ ও নানাবিধ অলঙ্কার।

ব্যবহার করিতেন, তাহারও নিদর্শন আছে। এই অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার, ও পাত্রাদি পরীক্ষা করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই স্তরের অধিবাসীদের সহিত ট্রান্সককেশিয়া, দক্ষিণ রাশিয়া, থেসালি প্রভৃতির সংস্কৃতিগত যোগ ছিল।

[সর্ লিওনার্ড উলির প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক লোকশিক্ষা-বক্তৃতামালা ও "এশিয়া" পত্রে ইরাণে ফরাসী প্রত্নসমিতির বিবরণ অবলম্বনে]

স.

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্বন্ধে দুই-একটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্ধকার যুগ" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটি ঐতিহাসিক ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে। এই প্রবন্ধে আমি সেইগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১)

প্রথমতঃ, উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে সতীশবাবু লিখিয়াছেন :

"১৬০০ সালে রাণী এলিজাবেথ 'Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies" এই নামে এক চার্টার প্রদান করেন। তাহাতে এই কোম্পানীকে পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার দান করা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে রাজদত্ত এই একচেটিয়া অধিকার না মানিয়া অন্যান্য অনেক বণিক বে-আইনী ভাবে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করে। তৎকালীন অনেক কাগজপত্রে এই সকল লোককে অবজ্ঞাভরে 'ইণ্টারলোপার্স' বলা হইত। ১৬৯৮ সালে ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়ম তাহাদিগকেও অংশী করিয়া লইয়া একটি নূতন কোম্পানী গঠন করিবার জন্য একটি নূতন চার্টার দান করিলেন। এই নূতন কোম্পানী ১৭০৮ সালে গঠিত হইল। নূতন কোম্পানীর নাম হইল The limited Company of Merchants of England trading to the East Indies, অথবা সংক্ষেপে 'New East India Company'।"

১৬০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রাণী এলিজাবেথ-প্রদত্ত চার্টার দ্বারা যে কোম্পানী গঠিত হয় তাহার নাম সতীশবাবু এক রকম ঠিকই দিয়াছেন, যথা, "The Governor (Governors নহে) and Company of Merchants of London Trading into the East Indies" কিন্তু ১৬৯৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়ম-প্রদত্ত চার্টারের দ্বারা যে কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছিল তাহার নাম প্রথমে ছিল, "The English Company trading to the East Indies"। সতীশবাবু যে নাম দিয়াছেন তাহা নহে। এই নূতন কোম্পানীটিকে অনেকে সংক্ষেপে "The Second East India Company," "The New Company" ও "The English East India Company" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এবং ১৬০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে গঠিত কোম্পানীটিকে "The first East India Company," "The Old Company" ও "The London East India Company" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

নূতন কোম্পানীটি গঠিত হইবার পরেই East Indies-এ তাহাদের বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল এবং পুরাতন কোম্পানীর ন্যায় এই নূতন কোম্পানীটিও পূর্ব্বদেশে (East Indies : from the Cape of Good Hope to the Straits of Magellan) বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার পাইয়াছিল—তাহাদের চার্টারে কিন্তু একটি সর্ত্ত ছিল যে পুরাতন কোম্পানীও ১৭০১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ব্বদেশে (East Indies-এ) বাণিজ্য করিতে পারিবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পুরাতন কোম্পানী পার্লামেণ্টের এক নূতন আইনের (12 William III, No. XXVIII) সাহায্যে পূর্ব্বদেশে তাহাদের বাণিজ্য করিবার অধিকার ১৭০১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের পরও আরও কয়েক বৎসর রাখিতে পারিয়াছিল। সতীশবাবু লিখিয়াছেন—"এই নূতন কোম্পানী ১৭০৮ সালে গঠিত হইল"। ইহা ঠিক নহে। ১৬৯৮ সালে গঠিত হইবার পরই নূতন কোম্পানী তাহাদের বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া দেয়। ফলে এদেশে পুরাতন ও নূতন কোম্পানীর মধ্যে খুব একটা প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে এবং তাহাতে উভয়েরই খুব ক্ষতি হইতে থাকে। সেই জন্য দুইটি কোম্পানীকে সম্মিলিত করিয়া একটি নূতন কোম্পানী গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই চেষ্টার প্রথম ফল হয় ১৭০২ সালের ২২শে জুলাইয়ের "Indenture Tripartite between Queen Anne of the first part; the old Company of the second part; and the New Company of the third part." এই ইনডেনচারটিকে দুইটি কোম্পানীর মিলনের প্রথম ক্রম বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে একটি কড়ার ছিল। সেটি এই—

"The old Company covenant to surrender their Charters, in two months after the expiration of…seven years (from the date of the Indenture), into the Queen's hand, and the Queen engages to accept of such surrender; and from thenceforth the New Company is to be called The limited Company of Merchants of England trading to the East Indies : whose affairs shall thenceforth be conducted by their own sole directors, agreeable to their Charter of the tenth of King William the Third" (অর্থাৎ ১৬৯৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরের চার্টার)।

• তাৎপর্য্য "পুরাতন কোম্পানী অঙ্গীকার করিতেছে যে তাহারা তাহাদের সমস্ত চার্টার ইনডেনচারের তারিখ হইতে সাত বৎসর পরে দুই মাসের মধ্যে রাণীর হস্তে সমর্পণ করিবে, ও রাণীও স্বীকৃত হইতেছেন যে তিনি সেই সমস্ত চার্টার প্রতিগ্রহণ করিবেন। তাহার পর হইতে নূতন কোম্পানীর নাম হইবে "The limited Company of Merchants of England trading to the East Indies"। ইহাদের সমস্ত কার্য্য রাজা তৃতীয় উইলিয়ম-প্রদত্ত

চার্টার অনুসারে ইহাদের নিজেদের ডিরেক্টরগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে।"

Indenture Tripartite-র পরেও দেখা গেল যে, দুইটি কোম্পানীর মধ্যে পরস্পরের দেনা-পাওনা লইয়া মতের অমিল রহিয়াছে। তখন পার্লামেন্টের এক আইন (6 Anne Cap. XVII) দ্বারা আদিষ্ট হইয়া লর্ড গডলফিন্ (Lord High Treasurer) মধ্যস্থ হইয়া যে-সব বিষয়ে মতের অমিল হইয়াছিল সেই সব বিষয়ের ১৭০৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটা মীমাংসা করিয়া দেন। ইতিহাসে ইহাই Godolphin's Award বলিয়া পরিচিত। তার পর ১৭০৯ সালের ২২শে মার্চ্চ তারিখে পুরাতন কোম্পানী এক দলিল সম্পাদন করিয়া তাহাদের "Charters, and Corporate Capacity" রাণী এন্ (Anne)-এর হস্তে সমস্ত সমর্পণ (surrender) করে, এবং রাণী এনও ১৭০৯ সালের ৭ই মে তারিখে সেই সব গ্রহণ করেন ("by patent under her great seal of this date")। ইহার পর হইতে Indenture Tripartite-এর কড়ার অনুসারে নূতন কোম্পানীর নাম হইল—"The limited Company of Merchants of England trading to the East Indies." এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যদিও পুরাতন কোম্পানী ১৭০৯ সালে আইনতঃ উঠিয়া গেল, ইহা Indenture Tripartite-এর আর এক সর্ত্তানুসারে পূর্ব্বেই নূতন কোম্পানীর মূলধনে ইহার অংশ (shares) নূতন কোম্পানীর অংশের সমান করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং ইহার অংশীদারদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই।

আশা করি উপরে যাহা লিখিত হইল, উহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, কি ভাবে এবং কোন্ সময়ে নূতন কোম্পানীর নাম হইয়াছিল—"The limited Company of Merchants of England trading to the East Indies."

(২)

সতীশবাবু তাঁহার প্রবন্ধের আর এক স্থানে (পৃ. ৩৫৩) লিখিয়াছেন—

"১৭০২ সালেই নূতন কোম্পানীর চার্টার লিখিত হয়। সেই চার্টারে এই তিনটি ধারা যুক্ত করিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক ধর্ম্মাচার্য্যের নিয়োগের প্রথাটিকে আরও পাকা করা হইল।"

তার পর তিনি ধারা তিনটি উদ্ধৃত করেন। যথা—

"(1) The Company must maintain etc... ..Protestant Religion."

১৭০২ সালে নূতন কোম্পানীর কোন চার্টার লিখিত হয় নাই; বা ঐ সালে উক্ত কোম্পানী কোনও চার্টার পায় নাই। ঐ সালে মাত্র পূর্ব্বে উল্লিখিত Indenture Tripartiteটি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। উহাকে চার্টার বলা যায় না। আগেই বলিয়াছি যে, নূতন কোম্পানীর চার্টারের তারিখ ১৬৯৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। এই চার্টার পার্লামেন্টের এক আইন অনুসারে (9 & 10 William III, Cap. Xliv) ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়ম কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মাচার্য্য নিয়োগ সম্বন্ধে যে তিনটি ধারা সতীশবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি সবই উক্ত চার্টারের মধ্যে আছে। মূল চার্টারটি ভাল করিয়া পড়িলেই সতীশবাবু ঐ ধারাগুলি দেখিতে পাইবেন।

(৩)

কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের বেতন সম্পর্কে সতীশবাবু লিখিয়াছেন—"পলাশীর যুদ্ধের অল্পকাল পরে (১৭৬৫ সালে) বঙ্গদেশের দেওয়ানী কোম্পানীর হাতে আসিল। কর্ম্মচারীদিগকে এক দল বণিকের প্রতিনিধির অনুরূপ মিতব্যয়িতার সহিত চলিতে বলা তখন আর সমীচীন বোধ হইল না। কোর্ট মনে করিলেন, অতঃপর দেশীয় লোকেরা যাহাতে ইংরেজ সরকারের কর্ম্মচারীদিগকে সম্মানের চক্ষে দর্শন করে, এবং ঐ কর্ম্মচারিগণও যাহাতে উৎকোচগ্রহণের প্রলোভনে পতিত না হন, এই উভয় উদ্দেশ্যে রাজকর্ম্মচারিগণকে উচ্চ হারে বেতন দিতে হইবে। এই উচ্চ হার এত অধিক উচ্চ হইল যে কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ বাবুগিরিতে মুসলমান আমলের নবাবদেরও ছাপাইয়া চলিলেন। ভারতবর্ষে গেলেই ধনকুবের হইয়া ফিরিয়া আসা যায়, এই সমাচার ইংলণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল। ইংলণ্ড হইতে অর্থগৃধ্নু লোক দলে দলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরি লইবার আশায় এদেশে আসিতে লাগিল। কোম্পানীও তাহাদিগকে আবশ্যক ও অনাবশ্যক মোটা বেতনের নানা কাজে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।"

এই উদ্ধৃত অংশটুকু পড়িলে মনে হয় সত্যই বুঝি দেওয়ানী-প্রাপ্তির পর কোম্পানী তাহাদের কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানী তাহা করে নাই। তা যদি হইত তাহা হইলে এদেশে অনেক অত্যাচার নিবারিত হইত। দেওয়ানী প্রাপ্তির খবর ইংলণ্ডে পৌঁছিলে কোম্পানীর অংশীদারেরা মোটা ডিভিডেণ্ড পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল ও তাহার বন্দোবস্তও করিয়াছিল—কর্ম্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধির দিকে নজর দিবার তাহাদের অবকাশ ছিল না। ইহাই ঐতিহাসিক ঘটনা। ফলে, এদেশে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা নানা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এক-একটি ছোটখাট নবাবের মত নিজেদের দেশে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন নিবারণের জন্য কোর্ট উইলিয়মের সিলেক্ট কমিটি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সাহায্যকল্পে ১৭৬৫ সালে Society or Committee of Trade (in Salt, Betel-nut and Tobacco) নামে একটি একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে; সোসাইটি অব ট্রেড তুলিয়া দিবার পর কোর্ট অব ডিরেক্টর্স অনেক কর্ম্মচারীকে কোম্পানীর আদায়ী রাজস্ব হইতে কিছু কিছু কমিশন দিবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিল। এই সব বিষয়ে এই প্রবন্ধে বেশী কিছু লিখিবার স্থান নাই। আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে দেওয়ানী-প্রাপ্তির অনেক পরে কর্ম্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। দেওয়ানী পাইবার পরেও যে কোম্পানী তাহাদের কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেয় নাই, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ক্লাইভের একটি উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়:—

"The *Salary* of a Counsellor (i.e., a member of the Council at Fort William) is, I think, scarcely three hundred pounds per annum: and it is well known that he cannot live in that country for less than three thousand pounds. The same proportion holds among the other servants" (i.e., senior merchants, junior merchants, factors and writers). (From Clive's speech in the House of Commons on March 30th, 1772.)

তাৎপর্য্য—"এক জন কাউন্‌সিলারের বাৎসরিক বেতন আমার মনে হয় তিন শত পাউণ্ডও নয়। কিন্তু ইহা সুবিদিত যে, সে বৎসরে তিন হাজার পাউণ্ডের কমে ওদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) বাস করিতে পারে না। বেতন ও ব্যয়ের ঐ প্রকার অনুপাত কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের পক্ষেও প্রযোজ্য।"

(৪)

কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন সম্পর্কে সতীশবাবু এমন একটি উক্তি করিয়াছেন যাহা ইতিহাস-বিরুদ্ধ। সতীশবাবু লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে ইংরেজেরা বেতন বাণিজ্য উৎকোচ ও উৎপীড়ন সূত্রে যে পরিমাণ ধন এদেশ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন তাহার কাহিনী অতীব শোচনীয়। এই সম্পর্কে একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা এই যে, ক্লাইব মীরজাফরকে গদিতে বসাইয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা "পারিতোষিক" লইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময়ে ১৭৬৭ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ আদেশ দিলেন, আর নবাবদিগের নিকট হইতে কেহ কোন "উপহার" গ্রহণ করিতে পারিবে না। তখন সেই পাঁচ লক্ষ টাকার সহিত আরও তিন লক্ষ টাকা যোগ করিয়া যুদ্ধে আহত ইংরেজ সৈনিকগণের জন্য ও যুদ্ধে হত ইংরেজ সৈনিকগণের বিধবাদিগের জন্য 'লর্ড ক্লাইভস্ ফণ্ড' নামে একটি ফণ্ড সৃষ্টি করা হইল।"

তখনকার দিনে কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের নিকট হইতে একখানা পত্র আসিতে জলপথে ৫।৬ মাস ও স্থলপথে অন্ততঃ তিন মাস লাগিত। যদি আমরা ধরিয়াই লই যে ১৭৬৭ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী কোর্ট ঐ রকম একটি আদেশ এদেশে পাঠাইয়াছিল, তাহা হইলে সে আদেশপত্র ১৭৬৭ সালের জুন মাসের পূর্ব্বে এখানে পৌঁছিতে পারিত না। ইহার সঙ্গে যদি আমরা উপরে উদ্ধৃত অংশে নিম্নরেখাঙ্কিত "করিতেছিলেন" ও "এমন সময়ে" কথা কয়টি যোগ দিই তাহা হইলে এই মনে হয় যে সতীশবাবুর মতে ১৭৬৭ সালের মাঝামাঝি মীরজাফর জীবিত ছিলেন ও ক্লাইভও এদেশে ছিলেন। মীরজাফর কিন্তু তার অনেক পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ঠিক তারিখ হইতেছে ১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ক্লাইভও এদেশ হইতে শেষ বিদায় লইয়াছিলেন ১৭৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে। একটি সমসাময়িক হস্তলিখিত সরকারী পত্রে দেখিতে পাই যে, Lord Clive embarked from Ingelee on 29th January, 1767, on board the *Britannia*. (See the General Letter to the Court of Directors dated at Fort William, 16th February, 1767.) ডাঃ কারনিয়ারের মতে তিনি কোর্ট উইলিয়ম হইতে শেষ যাত্রা করেন ১৭৬৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী। সুতরাং সতীশবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। শুধু তাহাই নহে। মীরজাফর যখন দ্বিতীয়বার বাংলার নবাব হন তখন কোর্ট উইলিয়মের গবর্ণর ও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন হেন্‌রি ভ্যান্‌সিটার্ট,—ক্লাইভ নহেন। ক্লাইভ তখন ইংলণ্ডে। অবশ্য এটা সত্য যে পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর প্রথম যখন বাংলার নবাব হন, তখন ক্লাইভ এদেশেই ছিলেন। কিন্তু তখন তিনি মীরজাফরের নিকট হইতে যে উপহার পাইয়াছিলেন তাহার পরিমাণ অনেক বেশী। পার্লামেণ্টের একটি কমিটি অনেক অনুসন্ধানের পর বলিয়াছে যে ঐ সময় একা ক্লাইভই মীরজাফরের নিকট হইতে জায়গীর বাদে কুড়ি লক্ষ আশী হাজার টাকার উপহার পাইয়াছিলেন। দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা পাইয়াছিলেন কোর্ট উইলিয়মের সিলেক্ট কমিটির দ্বিতীয় সদস্য হিসাবে; দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন কোম্পানীর কমাণ্ডার-ইন্‌-চীফ হিসাবে; ও বাকী ষোল লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন "private donation" হিসাবে। (The Third Report of the Select Committee of the House of Commons on the Nature, State, and Condition of the East India Company, dated 8th April, 1773 দ্রষ্টব্য)।

ইহা ঠিকই যে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা যাহাতে কোনও উৎকোচ বা উপহার না লইতে পারে, তজ্জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ এক আদেশ জারি করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আদেশ কলিকাতায় পৌঁছায় ১৭৬৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী। যে জাহাজে কোর্টের ১৭৬৪ সালের ১লা জুন তারিখের পত্র এদেশে আসে, সেই জাহাজেই উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে কোর্টের আদেশপত্রও আসে। উক্ত ১লা জুন তারিখের পত্র কোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেণ্ট এণ্ড কাউন্সিলকে লেখা হয়। ঐ পত্রের এক স্থানে আছে—

"Para. 53:—We also send you by this conveyance and shall do so by others a Deed of Covenant to be entered into by yourselves and all our Civil Servants and another to be executed by all the Military officers which Agreements are prepared pursuant to a Resolution of a General Court of Proprietors held the 2nd of May last, and afterwards approved of by a subsequent General Court upon a Ballot. You are to take care that the same be executed by all Persons and that the Execution of them be attested by proper witnesses…"

তাৎপর্য্য—"আমরা এই জাহাজে এক চুক্তিপত্রও পাঠাইতেছি। পরের জাহাজেও ঐ প্রকার দলিলপত্র পাঠাইব। এই চুক্তিপত্রে আপনারা ও কোম্পানীর অন্যান্য বেসামরিক কর্ম্মচারীরা সই করিবেন। আমরা অপর একটি চুক্তিপত্রও পাঠাইতেছি সামরিক কর্ম্মচারীদের জন্য। প্রথমতঃ, এই চুক্তিপত্রগুলি গত ২রা মে তারিখের জেনারেল কোর্ট অব প্রোপ্রাইটার্সের এক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়।

পরে আবার ঐগুলি ঐ কোর্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। আপনারা দেখিবেন যেন উপযুক্ত সাক্ষীর সাক্ষাতে এই চুক্তিপত্রগুলি আমাদের কর্ম্মচারিগণ যথাবিহিত সই করেন।"

ক্লাইভ দ্বিতীয় বার বাংলায় গবর্ণর হইয়া আসিবার পূর্ব্বে কোর্টের ঐ আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। কারণ ঐ আদেশ প্রতিপালন করিলে অনেক উপরওয়ালা কর্ম্মচারীর স্বার্থে আঘাত লাগিত। ১৭৬৫ সালের ৩রা মে তারিখে ক্লাইভ দ্বিতীয় বার বাংলার গবর্ণর হিসাবে কলিকাতায় আসেন ও ৭ই মে তারিখে কোর্ট উইলিয়মে তাঁহার সিলেক্ট কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনেই উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব কমিটি গ্রহণ করে। পূর্ব্বে উল্লিখিত পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে দেখিতে পাই—

"At the Meeting of the 7th (May, 1765), the Select Committee of Bengal resolved to enforce immediately the Execution of the new Covenants, against receiving Presents by the Servants of the Company from the Indian Powers, a Duplicate of which Covenant, and a Duplicate of the Letter from the Directors, of the 1st of June 1764, requiring the Execution of them, arrived on the 24th of January 1765, but had not been at this time executed by any one of the Company's servants; nor does your (i.e., House of Commons's) Committee discover, from the Records, that the then Governor, Mr. Spencer, had publicly brought the Matter under the consideration of the Council Board; nor had any Notice been given to the other servants of the Company, that they were required to execute such Covenants. And your Committee find, That the said Covenants were executed according to the Direction of the Select Committee; first by the Members of the Council, and the Servants resident on the spot; and afterwards transmitted to the Army and Factories, where they were also executed."

তাৎপর্য্য—"৭ই (মে, ১৭৬৫) তারিখের অধিবেশনে বাংলার সিলেক্ট কমিটি স্থির করিল যে কোম্পানী কর্ম্মচারীদের ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ সম্বন্ধে কোর্টের যে চুক্তিপত্র আসিয়াছে, অনতিবিলম্বে তদনুসারে যথারীতি কার্য্য চলিবে। যদিও এই চুক্তিপত্রের অনুলিপি, এবং ঐ চুক্তিপত্রে সহি দিবার জন্য কোর্টের ১৭৬৪ সালের ১লা জুন তারিখের আদেশপত্রের অনুলিপি, ১৭৬৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল, তথাপি কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী তাহাতে সহি করে নাই এবং তদানীন্তন গবর্ণর মিঃ স্পেন্সার এ বিষয়টি প্রকাশ্যভাবে কাউন্সিলের কোনও অধিবেশনে উপস্থিত করেন নাই। এমন কি কোনও কর্ম্মচারীকে এ বিষয়ে কোনও নোটিস্ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। আপনাদের কমিটি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে সিলেক্ট কমিটি এই বিষয়ে আদেশ দিবার পূর্ব্বে উক্ত চুক্তিপত্রে কোনও কর্ম্মচারী সহি করেন নাই। তার পর উহা প্রথমতঃ সহি করেন কাউন্সিলের সভ্যরা; পরে কলিকাতাস্থ অন্যান্য কর্ম্মচারীরা। এবং তার পর সামরিক কর্ম্মচারীরা ও কোম্পানীর অন্যান্য কুঠিতে (Factory) যে-সব কর্ম্মচারী ছিল তাঁহারাও দস্তখত করেন।"

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উৎকোচ বা উপহার গ্রহণ সম্বন্ধে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স্‌এর আদেশ ১৭৬৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর অনেক পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছিল ও কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে সতীশবাবু মীরজাফর-প্রদত্ত পাঁচ লক্ষ টাকা "পারিতোষিক"-এর ও "লর্ড ক্লাইভস্ ফণ্ড"-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল। মীরজাফর তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ পাঁচ লক্ষ টাকা ক্লাইভকে দান করিয়া যান। ইহা Meer Jaffier's bequest বা legacy to Clive নামে পরিচিত। ক্লাইভ এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। কারণ যে সময় মীরজাফর ঐ টাকা দান করেন, তখন ক্লাইভ ইংলণ্ড হইতে ভারতের পথে। এই সম্বন্ধে হাউস অব কমন্সের এক সিলেক্ট কমিটি (১৭৭৩) যাহা লিখিয়াছে, তাহা হইতে কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"Your Committee then examined the Right honourable Lord Clive; who delivered in a Paper in the following words,

'A few Days after my Arrival at Calcutta, in May 1765, the Nabob Nudjum ul Doula came down from Muxadabad to visit me: that very Day, or the Day after, we rode out together in an open Chaise; and Nobkissen, who spoke English, and was the Interpreter, rode behind. The Nabob took that opportunity to inform me, that his Father (i. e. Meer Jaffer) had left me 5 Lack of Rupees, which he said were in Jewels, Gold Mohurs, and Silver, and that the whole was in the Hands of his Mother the Begum, who would pay it whenever I pleased. I mentioned this circumstance to several Gentlemen very soon after, particularly to Mr. Strachey and Mr. Verelst. At that Time I resolved in my own Mind not to accept the Legacy; but afterwards, when in obedience to the Company's Commands, we had ordered the Double Batta of the Army to be struck off, it occurred to me, that that Legacy might be converted into a Military Fund for the Benefit of invalid officers and soldiers, and widows:—upon that principle I demanded Payment of the Legacy in April 1766. At first I

thought of confining this Fund to the Benefit of the Army in Bengal only, but wishing to have it extended to all the Company's other Settlements, and thinking the 5 Laak insufficient, I applied to the Nabob Syful Doula to add 3 Laaks more, to which he readily consented, upon my explaining to him the Purpose to which the Money was to be applied." (See the Fifth Report from the Committee, House of Commons, appointed to Enquire into the Nature, State, and Condition of the East India Company and of the British Affairs in the East Indies, dated 18th June, 1773.)

তাৎপর্য্য: "তার পর আপনাদের কমিটি লর্ড ক্লাইভের সাক্ষ্য গ্রহণ করিল। তিনি কমিটির হাতে একখানি কাগজ দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—'১৭৬৫ সালের মে মাসে আমার কলিকাতায় পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে নবাব নাজম্‌-উল দৌলা মুর্শিদাবাদ হইতে আমার সহিত এক দিন দেখা করিতে আসিলেন। সেই দিনই বা তার পর দিন একখানি খোলা গাড়ীতে আমরা উভয়ে বেড়াইতে গেলাম। নবকৃষ্ণ আমাদের পিছনে আসিতেছিলেন। তিনি ইংরেজী জানিতেন বলিয়া দোভাষীর কাজ করিতেছিলেন। সেই সময় নবাব আমাকে জানাইলেন যে তাঁর পিতা (মৃত্যুর পূর্ব্বে) আমার জন্য অলঙ্কারে, মোহরে ও রৌপ্য ইত্যাদিতে সর্ব্বসমেত পাঁচ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। সে সমস্তই তাঁহার মা বেগম সাহেবের হাতে আছে। আমি যখন ইচ্ছা সেগুলি পাইতে পারি। আমি শীঘ্রই মিঃ ভেরেল্‌ষ্ট, মিঃ ষ্ট্রাচি প্রভৃতি কয়েক জন ভদ্রলোককে এই ব্যাপারটি জানাই। সেই সময় আমি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম যে এই (মৃত্যুকালীন) দান আমি গ্রহণ করিব না। তার পর যখন আমরা কোম্পানীর আদেশ অনুসারে সৈনিকদের "দ্বিগুণ ভাতা" প্রথা তুলিয়া দিলাম, তখন আমার মনে হইল যে মীরজাফর-প্রদত্ত টাকা দ্বারা যুদ্ধে আহত (ইংরেজ) সৈনিকগণের জন্য ও যুদ্ধে হত (ইংরেজ) সৈনিকগণের বিধবাদিগের জন্য একটি 'মিলিটারি ফণ্ড' সৃষ্টি করা যাইতে পারে। উক্ত সদুদ্দেশ্যে ১৭৬৬ সালের এপ্রিল মাসে আমি এ টাকা দাবি করিলাম। প্রথমে আমি ভাবিয়াছিলাম যে কেবল বাংলা দেশের (ইংরেজ) সৈনিকদিগের মঙ্গলের জন্যই ঐ ফণ্ডটি ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু পরে যখন স্থির করিলাম যে কোম্পানীর অন্যান্য স্থানের সৈনিকদিগের জন্যও উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে, তখন দেখিলাম যে তাহা করিতে গেলে পাঁচ লক্ষ টাকায় কুলায় না। আমি নবাব সই-ফুল দৌলাকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে আরও তিন লক্ষ টাকা চাহিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ তিন লক্ষ টাকা দিতে রাজী হইলেন।"

এই সম্বন্ধে মীরজাফরের পরবর্ত্তী নবাব নাজম্‌-উদ্‌ দৌলা বলিয়াছেন—

"My late most honoured Father, venerable as Mecca (whose offences are wiped away) when he was alive, of Sound Mind, and in the full Enjoyment of all his mortal Faculties, after having appointed me his successor, gave me repeated Orders to the following Purport: 'Out of the whole Money and Effects which I have in my Possession, I have bequeathed the Sum of Three Lacks Fifty thousand Rupees in Money—Fifty thousand Rupees in Jewels, and one Lack in Gold Mohurs; in all, Five Lacks of Rupees, in Money and Effects, to the Light of my Eyes, the Nabob firm in War, Lord Clive, the Hero—accordingly I have deposited the aforesaid Amount with my Lady Begum···' In witness therefore to the Truth of this Promise of late Nabob, I have given these few Lines as a Certificate that it may be fulfilled."

(The above is a faithful Translation from the Persian Original under the Hand and Seal of the Nabob Najim ul Dowla. Witness my hand, this 16th day of January 1767. R. Maddison, Persian Translator.) (*Ibid.*, appendix 7.)

তাৎপর্য্য—"আমার স্বর্গীয় পরমারাধ্য পিতা······তাঁহার জীবিত অবস্থায় সুস্থ শরীরে···আমাকে তাঁহার (সিংহাসনের) উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিবার পর পুনঃ পুনঃ এই কথা আমায় বলিয়াছিলেন—'আমার যাহা কিছু অর্থ ও সম্পত্তি আছে, তাহা হইতে আমি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার মুদ্রা, পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কার ও এক লক্ষ টাকার সোনার মোহর—সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ লক্ষ টাকা—আমার প্রিয় ("নয়নের জ্যোতি"), যুদ্ধে অবিচলিত বীর, নবাব লর্ড ক্লাইভকে দান করিলাম। আমি এই টাকা আমার বেগমের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছি।"

কোম্পানীর আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শদাতার এক মন্তব্যেও আমরা দেখিতে পাই—

"At the unanimous Request of a General Court of Proprietors of East India Stock, Lord Clive accepted the Government of Bengal in May 1764; and···sailed from England the 4th of June 1764, and arrived in Bengal the 3d of May 1765.

"The Nabob of Bengal, Meer Mahomed Jaffier Cawn, by a verbal will left to Lord Clive a Legacy of Five Lack of Rupees, in Testimony of the great Regard and Friendship he had for Lord Clive, and in Gratitude for the many important services formerly rendered the Nabob by his Lordship.

"The Nabob died the 5th of February 1765; Lord Clive being then on his voyage could have

no knowledge of the Nabob's Intention, nor can any suspicion arise by his Lordship having influenced the Nabob in his Favour…"

Lincoln's Inn　　　　Flr. Norton.
6th May 1769

—(*Ibid.*, appendix 18).

তাৎপর্য্য—"(কোম্পানীর) জেনারেল কোর্ট অব প্রোপ্রাইটারস্‌-দের সকলের অনুরোধে লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৪ সালের মে মাসে বাংলার শাসনভার 'গ্রহণ' করেন। ঐ বৎসরেই ৪ঠা জুন তারিখে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ১৭৬৫ সালের ৩রা মে তারিখে বাংলা দেশে পৌঁছান।

"বাংলার নবাব মীর মহম্মদ জাফির খাঁ এক বাচনিক উইলের দ্বারা লর্ড ক্লাইভকে, তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান।

"নবাব ১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মারা যান। লর্ড ক্লাইভ তখন সমুদ্রপথে থাকায় নবাবের ইচ্ছা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। আর ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে নবাবের উক্ত দান সম্পর্কে ক্লাইভের কোনও হাতই ছিল না।"

১৭৬৬ সালের ২৮শে নবেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম হইতে কলিকাতার কাউন্সিল কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌কে যে "General Letter" লেখে, তাহার মধ্যেও দেখিতে পাই—

"Para. 108:—Lord Clive in a Letter to the Board from Mootagheel (Moorshedabad) dated the 8th of April last informed us of his Intention to appropriate a Legacy of five Lacks of Rupees bequeathed to him by the late Nabob Meer Jaffier as a Fund for the relief of the officers and private men who have or may become Invalids in the Company's service, and the widows of such as may lose their Lives in it, unless the Company sh'd think proper to claim and prove a Right to the same under the new Covenants—His Lordship also proposed that the President and Council of Fort William should be perpetual Trustees for the appropriation of this Fund in India and the Court of Directors in England.

"Para. 109:—As we do not conceive such a Legacy to be prohibited by the Covenants we acquainted his Lordship in answer that we should chearfully accept the Honor he intended us in acting as Trustees on this occasion.…"

তাৎপর্য্য:—"গত ৮ই এপ্রিল তারিখে মতিঝিল হইতে লর্ড ক্লাইভ কলিকাতার কাউন্সিলকে যে পত্র দেন তাহাতে তিনি জানান যে যুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের উপকারার্থে ও যুদ্ধে হত সৈনিকগণের বিধবাদিগের সাহায্যকল্পে একটি ফণ্ড করিবার জন্ত মীরজাফর-প্রদত্ত পাঁচ লক্ষ টাকার দান তিনি গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। অবশ্য কোম্পানী যদি তাহাদের কর্ম্মচারীদের নূতন চুক্তিপত্রের সর্ত্তানুসারে ঐ টাকা অধিকার করে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। লর্ড ক্লাইভ তাঁহার পত্রে আরও প্রস্তাব করেন যে ঐ ফণ্ডের টাকা খরচ করিবার জন্ত ভারতবর্ষে ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেন্ট এণ্ড কাউন্সিল স্থায়ী ট্রাষ্টি হইবেন, এবং ইংলণ্ডে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌ ট্রাষ্টি থাকিবেন।

"যেহেতু এই প্রকার দান গ্রহণ করা আমাদের চুক্তিপত্রের সর্ত্তের বিরুদ্ধে নহে, আমরা উত্তরে লর্ড ক্লাইভকে জানাইলাম যে আনন্দের সহিত আমরা ট্রাষ্টি হইতে রাজী আছি।"

ইহার উত্তরে ১৭৬৮ সালের ১৬ই মার্চ তারিখের এক পত্রে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌ ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলকে লেখেন:—

"Para. 136:—Although we are of opinion that by the Spirit of the Covenants entered into by Lord Clive, he could not accept of the Legacy bequeathed him by the Nabob Meer Jaffier, without our consent; yet, considering the benevolent Purposes to which his Lordship intends it to be applied, we do permit him to accept the same for the uses proposed…

"Para 137:—It is with great Pleasure we observe, the Nabob (Syef-ul-Doula) has given the sum of Three Lacks towards the Extension of this beneficent Design; and he is to be acquainted, it gives us the strongest Impression of his Generosity."

তাৎপর্য্য:—"যদিও আমরা মনে করি যে লর্ড ক্লাইভ যে চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ আছেন তাহার সর্ত্তানুসারে তিনি আমাদের বিনা অনুমতিতে মীরজাফর-প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করিতে পারেন না, তথাপি যে শুভ উদ্দেশ্যের জন্ত উক্ত টাকা ব্যবহৃত হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহাকে ঐ উদ্দেশ্যে টাকাটি গ্রহণ করিতে আদেশ দিতেছি।

"আমরা শুনিয়া খুব সুখী হইলাম যে নবাব (সৈয়ফুদ্দৌলা) ঐ শুভ উদ্দেশ্য ব্যাপক ভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাকে জানাইবেন যে তাঁহার এই কার্য্যে তাঁহার মনের উদারতার খুব একটি বড় পরিচয় পাইয়াছি।"

উপরে যে বিবরণ দিলাম, ইহাই ক্লাইভস্‌ ফণ্ডের উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে এই প্রবন্ধে যে-সমস্ত কথা বলিয়াছি তাহাদের প্রমাণ নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদির মধ্যে পাওয়া যাইবে—

পার্লামেন্টের আইন, রাজকীয় চার্টার, পার্লামেন্টের রিপোর্ট, ও ভারত-গবর্ণমেন্টের ইম্পিরিয়েল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে রক্ষিত সমসাময়িক সরকারী হস্তলিখিত দলিলপত্র।

আলোচনা

শিক্ষা-সম্মিলন

শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে "শিক্ষা-সম্মিলন" সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি খুব সমীচীন হইয়াছে :—

"বাংলা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বতন্ত্র সম্মিলন হয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র সম্মিলন করেন, অধ্যাপকগণ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেন; কিন্তু এই প্রদেশে শিক্ষা বিষয়ে সমগ্রভাবে আলোচনা করিবার কোন প্রতিষ্ঠান নাই। ইহার কারণ কি আমাদের শিক্ষকগণের জাতিভেদবুদ্ধি? না, এই ব্যবস্থার পিছনে অন্য কোন মনোভাব আছে?"

ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষকবর্গের সমিতি বিভিন্ন হওয়ায় সেগুলির আওতায় বিভিন্ন ভাবে শিক্ষক-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সমিতিগুলির যদি একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, তাহা হইলে একটি মাত্র বৃহত্তর সম্মিলনের অধিবেশনে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা হইতে পারে।

আমি নিজে গত প্রায় ১২ বৎসর যাবৎ নিখিল-বঙ্গীয় শিক্ষক (মাধ্যমিক) সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছি। এক সময়ে আমার মনেও ঐরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকবর্গকে উক্ত শিক্ষক-সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া "নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক-সমিতি" নামটি যাহাতে সত্যই সার্থক হয়, সেই উদ্দেশ্যে সমিতির নিয়মাবলীর পরিবর্তন-সাধনে সচেষ্ট হই; কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষকের নিকট হইতে সমর্থন লাভ করায় আমার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। ইহার মূল কারণ বুঝিলাম, সত্যই জাতিভেদবুদ্ধি। অবশ্য দুই-একটি অন্য কারণও প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই আমার ধারণা। এই শিক্ষক-সমিতিটি আজ অর্থশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে; ইহা আনন্দের কথা। সেজন্য অনেকেই হয়তো আশঙ্কা করেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিলে ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে—অথচ তদনুপাতে আয়বৃদ্ধি হইবে না এবং ভবিষ্যতে হয়তো ৬৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলিত হইয়া গণতন্ত্রের সুযোগে অর্থাৎ ভোটের জোরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে পরাভূত করিয়া সমিতিতে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন। শ্রুতিকটু হইলেও, ইহা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম এই কারণে যে, বর্তমানে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি (সরকারী দৃষ্টিতে এগুলিও মাধ্যমিক, অর্থাৎ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ভুক্ত) এই মাধ্যমিক শিক্ষক-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও এগুলি সম্বন্ধেও অনুরূপ আশঙ্কা পোষণ করা হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই বোধ হয় কার্যনির্বাহক সভার নির্বাচনক্ষেত্রে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গের নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি আদৌ সুবিচার করা হয় নাই। শিক্ষক-সমিতির সীমারেখা প্রসারিত করা তো দূরের কথা, বরং দেখা যায়, বহু উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রায় প্রতি বৎসরই বার্ষিক সম্মিলনে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিকে উক্ত সমিতি হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাকে জাতিভেদবুদ্ধিই বলুন, বা superiority complexই বলুন—ইহা যে আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকবর্গ একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি যদি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-সমিতিগুলির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেন, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সমিতিটি ফেডারেশন হইয়া প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজভুক্ত বিদ্যালয়গুলির স্বতন্ত্র বিভিন্ন শিক্ষক-সমিতিগুলিকে শাখারূপে গণ্য করিয়া পূর্ণ অটোনমি দেন, তাহা হইলে বোধ হয় সম্পাদক মহাশয়ের আশা পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু ইহা সম্ভব করিয়া তুলিবে কে? পথ দেখাইবে কে?

সম্পাদকীয় মন্তব্যে বেঙ্গল এডুকেশন লীগ ও বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমীটি নামক প্রতিষ্ঠান দুইটির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। দুইটিরই জন্ম হইয়াছে সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—সাময়িক উত্তেজনাবশে। আমি ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই সভ্য, সুতরাং এগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমিও আংশিকভাবে দায়ী। কিন্তু বেঙ্গল এডুকেশন লীগ স্থাপনার সময়েই আমি উহার সম্পাদক মহাশয়কে যে-কথা বলিয়াছিলাম, এক্ষেত্রে তাহা উল্লেখ করিয়া বলিতে চাই যে গঠনমূলক কোন কর্মভার গ্রহণ না করিলে লীগ প্রাণবন্ত হইবে না; আর জীবন্মৃত অবস্থা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। এতগুলি শিক্ষক-সমিতি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে কি আর কিছুই করিবার নাই?

বাংলা দেশে তুলার চাষ

শ্রীবীরেশশোভন সেন

শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে "বাংলায় উৎকৃষ্ট তুলার চাষ" প্রবন্ধ পড়লাম। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত

অখিলবন্ধু গুহ মহাশয়ের একান্ত চেষ্টার ফলে গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় মিলসমূহের টাকায় বাংলা দেশে তুলার চাষের ব্যবস্থা হওয়াতে বাঙালীদের আনন্দের কথা সন্দেহ নেই।

শ্রীযুত অখিলবাবু বাংলায় তুলার চাষের ব্যবস্থার জন্ম, ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটিতে বহুবার চেষ্টার পর সম্প্রতি কিছু অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করতে সফলকাম হয়েছেন। সাধারণতঃ যে-দেশে কম বৃষ্টি এবং অত্যধিক গরম পড়ে, সেখানেই তুলার চাষ ভাল হয়। পৃথিবীর উৎকৃষ্ট তুলা মিশরে হয়। দুই বৎসর পূর্ব্বে মিশরের তুলার চাষের ব্যবস্থা দেখবার জন্ম মিশর-ভ্রমণের সুযোগ আমার হয়েছিল। মিশরে বৎসরে মাত্র ৩ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় এবং মরুভূমির দেশ বলে অত্যধিক গরম থাকে। ভারতে এরূপ আবহাওয়া শুধু সিন্ধুদেশে আছে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি সেখানে মিশরের তুলার চাষের ব্যবস্থা করেছেন। এ পর্য্যন্ত বেশ সুফল পাওয়া গেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট ও দক্ষিণ মাদ্রাজে ভাল তুলার চাষ হয়ে থাকে। বাংলা দেশের আবহাওয়া অবশ্য তুলার চাষের প্রতিকূল; তবে মনে হয় বর্ষার পরে উচ্চ জমিতে তুলার চাষ করলে সুফল হওয়ার সম্ভাবনা। বাংলা দেশের তুলায় পুরাকালে মসলিন তৈরি হ'ত বটে; তবে সেই তুলা মনে হয় দেওকাপাস থেকে হ'ত। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রতি ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে সেই দেওকাপাসের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই তুলার আঁশ মিশরের তুলার মত প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। তবে তার বীজগুলি সাধারণতঃ খুব বড়, এবং খুব কম পরিমাণে তুলা হয়। দেওকাপাসের বিশেষত্ব এই যে, এই গাছ রোদ ও বৃষ্টিতে নষ্ট হয় না। এই স্থানীয় দেওকাপাস ও ভারতের অন্যান্য তুলার সম্মিশ্রণের (cross-breeding) ফলে হয়তো এমন তুলার বীজ উৎপন্ন হ'তে পারে যাতে অত্যধিক বৃষ্টিতেও এই গাছ নষ্ট না হ'তে পারে। আসামে এক প্রকার ছোট আঁশযুক্ত তুলার চাষ হয়, তা বৃষ্টিতে নষ্ট হয় না। বাংলা দেশে যে উৎকৃষ্ট তুলাই জন্মাতে হবে এর কোন অর্থ নেই। যদি উৎকৃষ্ট তুলার গাছ বাংলা দেশে না জন্মে তাহ'লে আসামের তুলার ন্যায় কম আঁশযুক্ত তুলার চাষ করলেও বাংলা দেশের কৃষকের মোটা কাপড়ের সংস্থান হ'তে পারে।

জমিতে পটাসের ভাগ বেশী থাকলে তুলার গাছ কোন প্রকার কীটে নষ্ট করতে পারে না। আমাদের বাংলা দেশে কচুরীপানার অভাব নেই। উহা শুকিয়ে পোড়ালে যে ছাই হয় তাতে পটাসের ভাগ খুব বেশী থাকে। তুলার জমিতে এই প্রকার ছাই দিলে খুব সুফল হওয়ার সম্ভাবনা।

স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদার

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের সংস্কৃতি প্রাচীনতায় পৃথিবীর অন্য দেশের সমকক্ষ নয়—ঐতিহাসিক এইরূপ মতই এত দিন পরিপোষণ ক'রে আসতেন। ঋগ্বেদের যুগই তখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যুগ ব'লে গণ্য হ'ত; কিন্তু তার বয়স নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বর্ত্তমান। এক পক্ষে ম্যাক্সমুলার তার জন্মতারিখ নির্দ্দেশ করেন খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে, অন্য পক্ষে তিলকের গণনায় তার জন্মতারিখ গিয়ে ঠেকে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে। কিন্তু ঋগ্বেদের যুগ যত প্রাচীনই হোক লৌহের ব্যবহারের সঙ্গে বেশ সুপরিচিত সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের হিসাবমতে তা লৌহ-যুগের অন্তর্গত এবং সেই লৌহ-যুগকে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসরের এদিকে ঠেলে দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত হবে না।

লৌহ-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কে ঐতিহাসিক তিনটি যুগে বিভাগ করেছেন এবং তাদের নাম দিয়েছেন প্রাচীনতা অনুসারে যথাক্রমে প্রাচীন প্রস্তর-যুগ, নূতন প্রস্তর-যুগ

এবং ধাতু ও প্রস্তর যুগ। প্রাচীন প্রস্তর-যুগের কালে মানুষ অমসৃণ প্রস্তরের অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখেছিল। পরবর্ত্তী নূতন প্রস্তর-যুগেও মানুষ অস্ত্রাদি নির্ম্মাণে প্রস্তরেরই ব্যবহার করত, কিন্তু সে-প্রস্তরকে মসৃণ ক'রে নিত, এবং ঘষে মেজে তার আকারকে সুদর্শন ক'রে নিত। তার পর যে যুগ আসে তা লৌহ-যুগ ও প্রস্তর-যুগের সংযোগস্থল। তখন মানুষ সবে ধাতব অস্ত্রাদির ব্যবহার করতে শিখেছে, তবে একেবারে প্রস্তরের ব্যবহার ছেড়েও দেয় নি। তখনও মানুষের লৌহের সহিত পরিচয় ঘটে নি, তামাই ধাতু হিসাবে সচরাচর ব্যবহৃত হ'তে সুরু করেছে। এই যুগকেই প্রস্তর এবং ধাতুর যুগে ব'লে নির্দ্দেশ করা হয় এবং গবেষক এর কাল অবধারণ করেন খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ সহস্রাব্দী।

১৯২২ সালে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার করেন, তখন সেই স্থানেই প্রথম প্রস্তর ও ধাতুর মিশ্র যুগের সংস্কৃতির নিদর্শন ভারতে প্রথম পাওয়া যায়। সেই কারণেই মহেঞ্জোদারো একটি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের বলে ভারতের সংস্কৃতির প্রাচীনত্বকে অনায়াসে ঋগ্‌বেদেরও বহু পূর্ব্বে চতুর্থ সহস্রাব্দীতে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়।

কিন্তু এই মিশ্র-যুগের সংস্কৃতি কেবল মহেঞ্জোদারো নামক স্থানেই সীমাবদ্ধ নয়, ঐতিহাসিক গবেষকের মনে এইরূপ এক সন্দেহ আসে। গবেষণার ফলে লাহুমজোদারো ও লিমোজুনেজো নামক সিন্ধুপ্রদেশের অন্য দুইটি স্থানেও সমযুগের বস্তুর আবিষ্কার হওয়ায় এ সন্দেহ একটি সুদৃঢ় মতে পরিণত হয়। ঠিক এই সময়ে ননীগোপাল মজুমদার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে যোগ দিয়েছেন। এর কিছু পূর্ব্বেও তিনি মহেঞ্জোদারোর খননকার্য্যে সর জন্ মার্শাল প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে ১৯২৫ সনে ব্যাপৃত ছিলেন এবং এই ভাবে মহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতির সহিত তিনি বিশেষ পরিচয় লাভ করতে সুযোগ পান। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কল্যাণে পাহাড়পুর খননকার্য্যেও তিনি এই সময় সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। কাজেই যখন প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ ঠিক করলেন যে সিন্ধুদেশে এই মিশ্র-যুগের বিস্তার কত দূর পর্য্যন্ত তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, তখন এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করবার জন্য তাঁরা ননীগোপাল মজুমদারকেই মনোনয়ন করেন।

এই ব্যবস্থা অনুসারে তিনি পর পর দুই বছর ১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩০-৩১ সালের শীতকালে নিজের অধিনায়কত্বে একটি গবেষক-দল নিয়ে সমগ্র সিন্ধুদেশে প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষগুলির সন্ধানে পর্য্যটন ক'রে বেড়ান। তার বিস্তারিত বিবরণ "Explorations in Sind" নাম দিয়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণার ফলে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল।

মহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতির সহিত প্রাচীন পারস্য এবং মেসোপটেমিয়ার সুমের-প্রদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন জাতিগুলির সংস্কৃতির সহিত একটা যোগ আছে এটাও ঐতিহাসিকের মনে একটি ধারণা। সর্ অরেল ষ্টাইন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বেলুচিস্তানে যে-সব প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংস স্তূপ পাওয়া গেছে তাতে প্রাচীন কালে বেলুচিস্তানের সহিত প্রাচীন পারস্য সভ্যতার ভৌগোলিক সংযোগের সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়। ননীগোপাল মজুমদার তাঁর গবেষণার ফলে অন্যূন কুড়িটি ধ্বংসস্তূপ সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কার করেন। সেই স্থানগুলি উত্তরে জেকবাবাদের নিকটবর্ত্তী লিমোজুনেজো নামক স্থান হ'তে দক্ষিণে আরবসাগরের কূলে করাচীর নিকট অবস্থিত ওরাঙ্গী নামক স্থান অবধি ছড়ান। এমন কি সিন্ধুনদের পূর্ব্বকূলে চানহুদারো নামক স্থানেও তিনি এইরূপ ভগ্নস্তূপ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে সিন্ধুদেশে এই মিশ্র-যুগের সংস্কৃতির বিস্তারের প্রশ্নের উত্তর মিলে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মহেঞ্জোদারোতে আমরা যে সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হই, তা খুবই ব্যাপক ছিল এবং সিন্ধুনদের উপত্যকায় সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ জুড়ে তা সংগঠিত হয়েছিল; অরেল ষ্টাইন কর্ত্তৃক বেলুচিস্তানে আবিষ্কৃত ভগ্নস্তূপগুলির সহিত ভৌগোলিক সংযোগও এই ভাবে সাধিত হয়েছে।

এই সিন্ধুদেশে অবস্থিত প্রস্তর ও ধাতুর মিশ্র যুগের সংস্কৃতির উৎপত্তি এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর মত

এইরূপ—"হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানে যে মানুষ বাস করতেন তাঁদের সম্বন্ধে এ-কথা সোজাসুজি বলা চলে না যে তাঁরা ভারতের বাহির হ'তে এসেছিলেন, যদিও তাঁদের কয়েকটি সামগ্রীর সহিত পারস্য, মেসোপটেমিয়া ও ট্রান্সকাস্পিয়া দেশের মিশ্র-যুগের সামগ্রীর গঠন-পদ্ধতি বিষয়ে কয়েকটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই সিন্ধুবাসীদের গৃহস্থালীর সামগ্রী, রূপকর্ম, এবং স্থাপত্যকর্মে এমন একটি বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে যা এই সিদ্ধান্তের অনুকূল হয় যে, যেখান হ'তেই তাঁরা আসুন ভারতবর্ষে তাঁরা বহু যুগ পূর্ব্ব হ'তেই বাস করতে সুরু করেছেন।" "মহেঞ্জোদারো যুগের পূর্ব্বে পশ্চিম দিকের মালভূমি হ'তে যে এঁদের পূর্ব্বপুরুষের আগমন হয়েছিল, এইরূপ অনুমান কতকগুলি সামগ্রীতে যে এক-জাতীয় ছাগের মূর্ত্তি পাওয়া যায় তার দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়। এই আইবেক্সের মূর্ত্তি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত শিলমোহর ও মৃন্ময় পাত্রে এবং চান্‌হুদারোতে প্রাপ্ত শিলমোহরে দেখা যায়। এই জাতীয় ছাগ সিন্ধু-উপত্যকায় একেবারেই পাওয়া যায় না। পারস্য দেশের সুসা ও সুসিয়ান এবং বেলুচিস্তানের মাক্রান ও জালোয়ার জেলার মৃন্ময় পাত্রের গায়ে দলে দলে চিত্রিত পাওয়া যায়। পারস্য হ'তে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই যে প্রমাণসূত্র তাতে আমাদের এই সিদ্ধান্ত করা উচিত যে সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিম সীমানার এপার হ'তে এই ছাগের সহিত পরিচিত এক জাতির আগমন হয়েছিল।"

এই গবেষণার পরেও একটি মস্ত বড় প্রশ্নের সমাধান-কার্য্য বাকী রয়ে গেল। ভারতের পরবর্ত্তী যুগের সংস্কৃতির সহিত এই সিন্ধুদেশের সংস্কৃতির সংযোগ-সূত্রের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। অর্থসঙ্কটহেতু প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য নূতন অভিযানের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। সেই অনাবিষ্কৃত সংযোগ-সূত্রের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করবেন, মজুমদার মহাশয়ের সেই ছিল একটি প্রাণের ইচ্ছা। বর্ত্তমান বৎসরে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ এইরূপ অভিযানের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই মজুমদার মহাশয়ের অধিনায়কত্বে গত অক্টোবর মাসে আবার সিন্ধুদেশে এই অভিযানটি প্রেরিত হয়। যে দুর্ঘটনায় তাঁর শোচনীয় অবস্থায় প্রাণ-সংহার হয় সে সময় তিনি দাদু হ'তে ৩৪ মাইল পশ্চিমে মাঞ্চার হ্রদের উত্তর-পশ্চিমে এক জনশূন্য স্থানে খননকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সেদিন তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন যে খননকার্য্যে তিনি আশাতিরিক্ত সুফল পাচ্ছেন। তাঁর কার্য্য সম্পূর্ণ হ'লে আমরা মহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতির ধারা-বাহিক ইতিহাসের পূর্ণ কাহিনীটি পেতে পারতাম এবং ঐতিহাসিক সময়ের সহিত তার সংযোগও হয়তো স্থাপিত হ'ত। কিন্তু তাঁর আকস্মিক অকালমৃত্যুতে তা সম্ভব হ'ল না।

রাষ্ট্রনীতি

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিবৃদ্ধি বলে, "বন্ধু, শিশু সত্যটিরে
বাড়িতে সময় দাও মিথ্যা দিয়া ঘিরে
কিছুদিন। অসহায় অঙ্কুরের মত
শত্রুর আঘাত হ'তে সযত্নে সতত
তাহারে লুকায়ে রাখো। তার পরে যবে
আপনার মহিমায় উন্নত সে হবে
তখন চাহিয়ো ফল; ছায়া লাগি তাহে
তখন আশ্রয় কোরো দীপ্ত রৌদ্রদাহে।
তার পূর্ব্বে শিশু সত্যে কোরো না বিশ্বাস।"
ধর্ম্মবুদ্ধি ধীরে বলে, ফেলিয়া নিশ্বাস,
"সত্য কভু নাহি বাড়ে মিথ্যার আড়ালে।
অবিশ্বাস স্নেহে তারে ঘিরিয়া দাঁড়ালে
হয় তার শক্তিহানি, হয় খণ্ডিহত
পর্ব্বতবেষ্টিত শৈল-নির্ঝরের মত।
চিরশিশু চিরযুবা এক কালে সে যে;
জন্মলগ্নে মৃত্যুঞ্জয়ী আসে তাই সেজে
অভেদ্য কবচবর্ম্মে। অরির আঘাতে,
জন্মে বীর,—তার প্রতি রক্তবিন্দু হ'তে।"

সত্যেতে বিশ্বাস বিনা সত্য নাহি বাড়ে।
মিথ্যারে যে স্থান দেয়—সত্যেরে সে ছাড়ে।

পুস্তক-পরিচয়

কাশীরামদাস-মহাভারত—সটীক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ অষ্টাদশ পর্ব্ব। কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ সম্পাদিত, সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের একত্র মূল্য সাত টাকা।

প্রবাসীর আকারের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৭৬+৬৮। দুই খণ্ডে মলাটে চিত্রসহ বাঁধান। বড়, পরিষ্কার ও নূতন অক্ষরে পরিপাটি রূপে পুরু মসৃণ কাগজে ছাপা। তিন রঙের ছবির সংখ্যা এক শত একখানি, এবং এক রঙের দুখানি। রঙীন ছবিগুলি গাঢ় রঙে সুমুদ্রিত। চিত্রগুলিতে প্রসিদ্ধ চিত্রকরদিগের আঁকা ছবির বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। ইণ্ডিয়ান প্রেসের অধ্যক্ষ পরলোকগত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের জীবনচরিতও ইহাতে আছে।

গ্রন্থখানিতে বিস্তৃত ভূমিকা, বহু টীকা টিপ্পনী, সংস্কৃত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত অনেক শ্লোক, বেদব্যাস ও কাশীরামদাসের ঘটনা-বর্ণনা-পার্থক্যের নির্দ্দেশ, কাশীরামদাসের জীবন-চরিত, এবং মুদ্রিত অন্যান্য কাশীরামী মহাভারত হইতে অতিরিক্ত পঁয়ত্রিশটি উপাখ্যান আছে।

ভূমিকাতে সম্পাদক কেরি সাহেব ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক এবং পরে অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ কর্ত্তৃক মহাভারত সংস্কারের বিবরণ দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং মোট ৯৪০ খানি পুঁথি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু অবশ্য এতগুলি পুঁথি আদ্যোপান্ত পড়িবার সময় তাঁহার হয় নাই; যেখানে তাঁহার পাঠের সন্দেহ হইয়াছে, সেখানেই উক্ত কোন কোন পুঁথির পাঠের সহিত তিনি মিলাইয়া লইয়াছেন।

তিনি গ্রন্থখানির বর্ত্তমান সংস্করণটির জন্য নয় বৎসর পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহা কাশীরামদাসকৃত মহাভারতের বৃহত্তম ও সুদৃশ্যতম সংস্করণ।

মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ; আদিকাণ্ড—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ, পিএইচ-ডি, সম্পাদিত। Published by P. C. Lahiri, M. A., Ph.D., Secretary Oriental Texts Publication Committee, University of Dacca. মূল্য আড়াই টাকা। পৃষ্ঠার আয়তন প্রবাসীর মত। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯১+৭২।

এই গ্রন্থের চৌষট্টি-পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটি সম্পাদক বিশেষ পরিশ্রম ও বিচার করিয়া লিখিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে:—

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল, কৃত্তিবাসের বংশপরিচয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্করণ, মূল কৃত্তিবাসের অনুসন্ধানে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথির বিবরণ ও সমালোচনা, অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয় ও কালনির্ণয়, কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্যের তুলনায় সমালোচনা, পাঠসংগঠন বিচার, বন্দনাপয়ারসমূহ, "নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ" প্রসঙ্গ, বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী, আদিকাণ্ডের প্রথমাংশের পাঠসংগঠন, বর্ণবিন্যাস রীতি, সংগঠিত পাঠের সহিত কৃত্তিবাসের মূল রচনার পার্থক্য, কৃতজ্ঞতাস্বীকার।

ভূমিকার পরে আদিকাণ্ডের সংগঠিত পাঠ দেওয়া হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠার নীচে অবলম্বিত পুঁথিগুলি হইতে পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে শব্দার্থ-সম্বলিত শব্দসূচী থাকায় মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণে ব্যবহৃত অধুনা-অপ্রচলিত শব্দসমূহের অর্থ এবং প্রচলিত অথচ উহাতে বর্ত্তমান অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ সুবোধ্য হইয়াছে।

এই আদিকাণ্ডটি আমরা গত (অগ্রহায়ণ) মাসে পাইয়াছিলাম। সম্পাদক ১৩৪৩ সালের ৩রা ভাদ্র ভূমিকা সমাপ্ত করেন, এবং পুস্তকখানি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখন হয়ত আরও কোন কোন কাণ্ডের মুদ্রাঙ্কন প্রায় সমাপ্ত হইয়া থাকিবে।

বাংলা ভাষা যত দিন থাকিবে, কৃত্তিবাসের রামায়ণও তত দিন থাকিবে। তাঁহার রচিত এই মহাকাব্যের একটি যথাসম্ভব খাঁটি সংস্করণ থাকা আবশ্যক। ভট্টশালী মহাশয় তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিয়া বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বঙ্কিম-প্রতিভা—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা। প্রবাসীর মত পৃষ্ঠার ৬+৮৪+৮৬ পৃষ্ঠা। পুরু এণ্টিক কাগজে সুমুদ্রিত। সুদৃশ্য বাঁধাই। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ছবি ও একটি ইংরেজী হস্তলিখিত চিঠির ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি সম্বলিত।

গত এপ্রিল মাসে পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিমচন্দ্রের যে জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব হয়, তাহাতে পঠিত কতকগুলি প্রবন্ধ এবং অন্য কোন কোন প্রবন্ধ ও কবিতা এই পুস্তকখানিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতে যে Letters on Hinduism লিখিয়াছিলেন ও দেবীচৌধুরাণীর যে ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাও সেগুলির পাণ্ডুলিপির অধিকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সৌজন্যে সম্পাদক প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির লেখক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, শ্রীমতী সফিয়া খাতুন, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। তদ্ভিন্ন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক তিনটি বাক্য লিখিয়াছেন। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিবেন ও তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিবেন, প্রবন্ধগুলি তাঁহাদের কাজে লাগিবে। তদ্ভিন্ন এক একটির স্বকীয় মূল্যও আছে। কবিতা লিখিয়াছেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীমানকুমারী বসু ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

যাঁহারা আনন্দমঠের শেষ অধ্যায়ে চিকিৎসকের মুখে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি "গোঁড়া" হিন্দু ছিলেন না, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে "নিকৃষ্ট" আবর্জ্জনার অস্তিত্ব ও তাহা দূরীকরণের প্রয়োজন মানিতেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রকাশিত হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিঠিগুলিতেও সেই রূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

"To return to my definition of Hinduism. It will exclude, as I have advanced, much that is popularly considered to be a portion of Hinduism even by Hindus themselves. That, however, is not and ought not to be an objection against the definition. It is precisely popular delusions of this sort that have encrusted Hinduism with the rubbish of ages—with superstitions and absurdities which subvert its higher purposes; and which it is the duty of every true Hindu actively to assail and destroy. The noxious parasitic growth must be exterminated before Hinduism can hope further to carry on the education of the human race. Hinduism is in need of a reformation;—not an unprecedented necessity for an ancient religion. But reformed and purified, it may yet stand forth before the world as the noblest system of individual and social culture available to the Hindu even in this age of progress."

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক আকারের ১৬৫ পৃষ্ঠা। বাঁধান।

এই পুস্তকখানিতে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাতটি প্রবন্ধ আছে। যথা—জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য; ভূদেব মুখোপাধ্যায়; বৃহত্তর বঙ্গ; কাশী; আমাদের সামাজিক 'প্রগতি'; ভিক্ষুক; এবং পুরাণ ও হিন্দুসংস্কৃতি। প্রত্যেক প্রবন্ধেই লেখকের বিদ্যাবত্তা ও মননশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্য প্রত্যেকটিই আলোচনার যোগ্য। কিন্তু সংক্ষিপ্ত 'পুস্তকপরিচয়ে' তাহা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম নামে অভিহিত অনুষ্ঠানমতবিশ্বাসের সমষ্টির সব কিছু মানেন বলেন, তাঁহারা বহিখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন; যাঁহারা তাহা মানেন না, তাঁহাদেরও ইহা পড়িয়া উপকার হইবে এবং নানা চিন্তার উদ্রেক হইবে।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত। শতবার্ষিকী সংস্করণ। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৮৬০ শক। কলিকাতার ৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থিত "নববিধান" প্রেস হইতে শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা দৈর্ঘ্যে ৯ ও প্রস্থে ৬½ ইঞ্চি। এইরূপ ২৩০৪+১৮ পৃষ্ঠায় তিন খণ্ডে বিভক্ত এই বৃহৎ গ্রন্থখানি সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের আরম্ভে প্রার্থনারত কেশবচন্দ্রের একটি ত্রিবর্ণ আলেখ্য আছে। গ্রন্থকারেরও একটি ছবি আছে। মূল্য দশ টাকা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ৪৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন এরূপ কর্ম্মময় ছিল, তাঁহার ভাব ও চিন্তা এত দিকে ধাবিত হইত, তিনি এত দিকে দেশের ও পৃথিবীর হিতসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আপনাকে সেই হিতসাধনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত বহুবিধ সাধনা এরূপ একাগ্রতার সহিত করিয়াছিলেন, যে, তাঁহার জীবনচরিত এরূপ বিস্তারিতভাবে লেখা অনাবশ্যক নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ আবশ্যক। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত ভাল করিয়া জানিতে চান, তাঁহারা ইহা পড়িলে জ্ঞান লাভ করিবেন। কেশবচন্দ্রকে জানিতে বুঝিতে হইলেও ইহা পড়িতে হইবে।

এই গ্রন্থের আর একটি উপযোগিতাও আছে। নিজের জীবনের কার্য্য সম্পাদন উপলক্ষ্যে কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের সমুদায় প্রধান প্রদেশে গিয়াছিলেন। নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতির লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা, ও কখন কখন আলোচনা হইয়াছিল। এই সমুদায়ের বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার জীবিতকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে সামাজিক ও ধার্ম্মিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। তিনি যখন ইংলণ্ড গিয়াছিলেন, তখন ভারত র্ষ সম্বন্ধে তথাকার লোকদের ধারণা কিরূপ ছিল এবং তাঁহার কোন্ কোন্ শক্তি ও গুণের আদর তথাকার গুণগ্রাহী লোকেরা করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়। আমেরিকা যাইবার জন্য তিনি কেন আহূত হইয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

কেশবচন্দ্রের জীবিতকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বাংলা দেশে, অনুভূত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে শিক্ষিত সমাজের নৈতিক উন্নতি হইয়াছিল। রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তখনকার জনহিতকর বহু কর্ম্মপ্রচেষ্টা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ হইতে উদ্ভূত। এই সমুদায়ের বৃত্তান্ত বা উল্লেখ এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থের শেষে যে ১৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী বিষয়-নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কালানুক্রমে কেশবচন্দ্র কোন্ বৎসর কোথায় কি করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায়। এইরূপ যদি একটি বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচীও থাকিত, তাহা হইলে গ্রন্থখানির ব্যবহার-সৌকর্য্য বাড়িত।

প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে এই বৃহৎ গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণ হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

ব্যায়ামে বাঙালী—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম্‌-এ। পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

বাঙালী বালকবালিকাদের এবং বাঙালী যুবজনের (প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদেরও) এই পুস্তক ও এইরূপ অন্যান্য পুস্তক পড়া আবশ্যক। অল্পবয়স্কদের তো নিশ্চয়ই পড়া উচিত। তাহাদের ইহা পড়িতে ভাল লাগিবে। বহিটি—মল্লক্রীড়ায় (কুস্তিতে), সাধারণ ব্যায়াম ও ক্রীড়া-কৌশলে, ধনুর্ব্বিদ্যা ও ক্রীড়া-কৌশলে, অসিখেলায়, খেলাধুলায়, ও লাঠিখেলায় বাঙালী, এবং

তরুণ বাংলার শারীর সম্পদ, বাংলার বাহিরে বাঙালী ব্যায়ামবীর, ড্রিল ও প্যারেড, মেয়েদের ব্যায়ামচর্চ্চা ও সরল ব্যায়াম-প্রণালী—এই কয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তাহাতে শ্যামাকান্ত, পরেশনাথ, ভীমভবানী, গোবর, শ্যামসুন্দর, আশানন্দ প্রভৃতি অনেক অসাধারণ বলশালী বাঙালীর বৃত্তান্ত আছে। শ্যামাকান্ত, পরেশনাথ, ভীমভবানী গোবর, কর্ণ্যপ্রকৃষ্ণ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতির চেহারা দেখিলেও মনে উৎসাহ আসে। সবাই যে তাঁহাদের মত বলিষ্ঠ হইবেন, তাহা নয়। কিন্তু সুস্থ ও সাধারণ রকম বলিষ্ঠ চেষ্টা করিলে প্রায় সকলেই হইতে পারেন। সে-চেষ্টা করা সকলেরই উচিত এবং গায়ের জোর কমবেশী যাঁহার যতই হউক না কেন, মনের জোর ও সাহস অর্জন প্রত্যেক নারী ও পুরুষের একান্ত আবশ্যক ও কর্ত্তব্য।

ড.।

কোচবিহারের ইতিহাস—(প্রথম খণ্ড) কোচবিহার রাজসরকারের অনুমতিক্রমে খ' চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কোচবিহার, রাজশক ৪২৬, পৃ: ৷৷০+২৪+৪৫৫+৫; মূল্যের উল্লেখ নাই।

কোচবিহার বাংলা দেশের প্রধান দেশীয় রাজ্য। ইহার প্রাচীন ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু এই প্রাচীন ইতিহাস নানা আখ্যায়িক দ্বারা আচ্ছন্ন। এই আখ্যায়িকা ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপাদান হইতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে বিশেষ পরিশ্রম ও বিচারশক্তি আবশ্যক। গ্রন্থকার এ বিষয়ে যত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার জন্য প্রত্যেক ইতিহাস-প্রেমিক বাঙালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা বোধ করিবেন।

এই গ্রন্থের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যাহা প্রথমেই সকল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই যে, বঙ্গের এই হিন্দুরাজ্যের ইতিহাস একজন মুসলমান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এবং এই ইতিহাসরচনায় তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। গ্রন্থকারের পূর্ব্বপুরুষ কোচবিহার-রাজের পক্ষে মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে উকিল ছিলেন, এবং তিনি নিজেও কোচবিহারবাসী ও রাজকার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছেন। এ অবস্থায় কোচবিহারের ইতিহাস লিখিতে তাঁহার যে অনেক রকম সুবিধা আছে তিনি তাহার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কোচবিহার রাজভাণ্ডারে ও অন্যত্র এই ইতিহাস-সম্পর্কিত যে-সব মালমশলা আছে তাহা গ্রন্থের প্রারম্ভেই "ঐতিহাসিক উপাদানাবলী" অংশে বিচার করা হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ, হস্তলিখিত পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা, দলিল, তাম্রলিপি ও নানা মানচিত্রের সাহায্যে এই ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। মুসলমান-যুগের একটি দেশীয় হিন্দু রাজ্যের এই গৌরবময় ইতিহাস বাঙালীর পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। নানা দিক দিয়া এই ইতিহাসের মূল্য আছে। কোচবিহার বাংলা দেশের একটি প্রত্যন্ত প্রদেশ। মুসলমান-যুগে ইহার রাজাদের এক দিকে পাঠান ও মোগল, অন্য দিকে কামরূপ ও ভুটান, এবং ইংরেজ আমলেও ইংরেজ ও ভুটানের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে। এই জয়-পরাজয়ের ইতিহাস গ্রন্থকার বেশ স্পষ্টভাবে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া রাজ্যের অন্তর্বিপ্লবের ইতিহাসও আছে। গ্রন্থকার বাঙালীর চক্ষের সম্মুখে আর একটি উজ্জ্বল চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তাহা সেনাপতি শুক্লধ্বজ বা চিলারায়ের বীরত্ব ও দিগ্বিজয়ের ইতিহাস। ইহা বাংলার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল কাহিনী। মোগলদের বঙ্গবিজয়ের অল্পকালপূর্ব্বে শুক্লধ্বজ আসাম, কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, খাসপুর, খাইরম, ডিমরুয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। এই সম্পর্কে একটি কথা মনে হয়, আজকাল পালযুগের দিব্যের স্মৃতির জন্য উৎসব হইতেছে, কোচবিহারের শুক্লধ্বজের জন্যও স্মৃতি-উৎসব হওয়া উচিত।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানা উপাদান এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। সেকালের সংস্কৃত ও বাংলার কবি, স্থাপত্য ইত্যাদির আলোচনা করা হইয়াছে। রাজ্য-পরিচালনার নানা তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সে-যুগের কামান ও স্থল- ও জল- যুদ্ধের ইতিহাস জানা যায়। ভাষার দিক হইতেও কোচবিহার রাজ্যের বৈশিষ্ট্য আছে, উক্ত রাজ্যের কাজকর্ম্ম বাংলা ভাষায় নির্ব্বাহিত হইত, রাজ্যে চলিত উপাধিগুলিও বাংলা বা সংস্কৃত ছিল।

ইংরেজ আমলে কিরূপ ক্রমে ক্রমে কোচবিহারের রাজশক্তিকে খর্ব্ব করা হইয়াছে, কিরূপে ভুটানকে খুশী রাখিবার জন্য কোচবিহারের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে, কোচবিহার রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার চলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে।

মোটের উপর, এরূপ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং গ্রন্থকার সে-অভাব মিটাইয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের ছবি, মানচিত্র, এবং নানা তালিকা খুব কাজে লাগিবে।

পরিশেষে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ট্রেসির নিকট কোচবিহারের একটি মুদ্রা ছিল। ১৩৫৬ শকাব্দে রচিত দামোদর মিশ্রের "গঙ্গাজলম্" নামে একখানা স্মৃতিগ্রন্থ কয়েক বৎসর হইল আসাম গৌরীপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এই গ্রন্থদ্বারা কামরূপ-কোচবিহার অঞ্চল শাসিত হইত। ১৪৭৬ শকাব্দে কবিরত্ন দ্বারা লিখিত কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রের এক প্রতিলিপিতে পাওয়া যায় যে উহা কামরূপ প্রভু শ্রীরাম খানের পুত্র শ্রীমদ্‌গাভুরু খানের জন্য লিখিত হইয়াছিল (*J. B. O. R. S.*—Dec. 1936)। এই গাভুরু খানের সহিত কোচবিহার-রাজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা অনুসন্ধেয়। কোচবিহারে 'গাভুর-নাজীর' প্রভৃতি শব্দ চলিত ছিল। জাতিতত্ত্বের দিক দিয়া গ্রন্থকার কোচবিহারে আর্য্যভাব বেশী দেখাইতে ইচ্ছুক, কিন্তু কোচবিহার অঞ্চলে তিব্বত-বর্ম্মী প্রভাব খুব স্পষ্ট। শব্দসূচী খুব বিস্তৃত হইলেও গ্রন্থের বর্ণিত কোন কোন বিষয় বাদ পড়িয়াছে, যথা, 'কোচবিহার সহর' শব্দটাই উহাতে নাই। গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা, অনেক বার 'কনীয়ান' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইয়াছে। আশা করি পরবর্ত্তী খণ্ডে আমরা কোচবিহার ও ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে আরও নানা কথা জানিতে পারিব।

শ্রীরমেশ বসু

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

২৫শে ফেব্রুয়ারি কোথাও যাব না মনে করেছিলাম। কিন্তু সকালবেলাই মিসেস কোরার কাছ থেকে একটা পোষ্টকার্ড এল যে তিনি বেলা ১০টার সময় সিঞ্চিকু ষ্টেশনে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি সেখানে পৌছলে তিনি আমাকে নিয়ে মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি দেখাবেন। জাপানে পোষ্টকার্ডে এক পয়সা বেশী মাশুল দিয়ে পাঠালে সেটা আমাদের দেশের টেলিগ্রামের চেয়েও তাড়াতাড়ি যথাস্থানে পৌছায়। মিসেস কোরা ২৫শে সকালেই চিঠি লিখেছিলেন এবং তার ঘণ্টাখানেক পরেই সেটা আমি পেলাম।



স্কুলের ছেলেরা চীনা অক্ষর শিখছে

সিঞ্চিকু ষ্টেশনে একলা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না; তাই মিঃ মজুমদার আপিস যাবার সময় ব'লে গেলেন যে তাঁর "অফিস বয়"কে পাঠাবেন আমাকে যথাস্থানে পৌছে দেবার জন্য। পরে একটু বেশী সাবধান হয়ে তিনি তাঁর সহকারী এক জাপানী ভদ্রলোককেই পাঠিয়ে দিলেন।

শীতের দিন, তার উপর বেশ বৃষ্টিও পড়ছিল। তবু একটা ছাতা নিয়ে অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। লোকটি ইংরেজী বলে না, কিন্তু কাজেকর্মে খুব চটপটে এবং ভদ্র। আমাকে খুব যত্ন করেই সিঞ্চিকু ষ্টেশনে নিয়ে গেল। সেখানে মিসেস কোরা অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে দু-জনকে বার চার-পাচ দুই হাতে হাঁটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে নমস্কার ক'রে সে ব্যক্তি ফিরে চলে গেল।

এখান থেকে আমরা একটা মাতৃমঙ্গল হাসপাতালে গেলাম। এটি দরিদ্র জননীদের জন্য। আসন্নপ্রসবা দরিদ্র মেয়েরা এখানে এসে প্রসবের পর সপ্তাহখানেক থেকে বাড়ী ফিরে যায়। প্রত্যেক মেয়েকে এর জন্য ১০৲ টাকা আন্দাজ দিতে হয়। সেই দশ টাকাতে ডাক্তারের খরচ, প্রসবের খরচ, সাত দিনের খাওয়া, থাকা, নর্সভাড়া, ওষুধবিষুধ প্রভৃতি সবই হয়। বাড়ীটিতে ব্যবস্থা যা দেখলাম তা আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর হাসপাতালের চেয়ে খারাপ নয়, কিন্তু দামে সস্তা। তবে বাড়ীগুলি অবশ্য বড় হাসপাতালের মত জমকালো নয়।



মেয়েরা পরিবেশন ইত্যাদি শিখছে



স্কুলের ছুটির সময়

এখানে শিশুরা এবং তাদের মায়েরা 'আউটডোর' চিকিৎসার জন্যও প্রত্যহ অনেকে আসে। আমাদের দেশে শীতকালে অসুখ কম হয়। কিন্তু জাপানের মত দারুণ শীতের দেশে শীতেই রোগীর ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে।

আমরা যখন এই ছোট হাসপাতালে পৌঁছলাম, তখন ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল। কাজেই জাপানী প্রথামত কেবল যে দরজায় এসেই জুতা খুলতে হ'ল তা নয়, যত বার চটি ভিজে যাচ্ছিল তত বারই চটি বদলাতে হ'ল। হাসপাতালের বাড়ী অথবা কুটীরগুলি আলাদা আলাদা; একটার থেকে আর একটাতে যাবার সময় খোলা আকাশের তলা দিয়ে যেতে হয়; কাজেই জুতা খুবই ভেজে। এখানে দেখলাম দুধ পরীক্ষা, কাপড় কাচা, জল সিদ্ধ করা প্রভৃতির বেশ ভাল বন্দোবস্ত। প্রতিদিন ও প্রতিমাসে কত জন শিশু ও মাতার চিকিৎসা হয় চার্টে তা লেখা রয়েছে। ভাবী মাতাদের শিক্ষার জন্য ঘরে ঘরে অসংখ্য চার্ট, ছবি, পুতুলের মডেল প্রভৃতি সাজানো। সদ্য-প্রসূতা মাতা ও নর্সদের শিক্ষারও এই রকম অনেক ব্যবস্থা আছে। ভাল খাবার মন্দ খাবার, ভিটামিনযুক্ত ও ভিটামিনহীন খাবারের নমুনা কাচের আলমারীতে রয়েছে। ছেলে কোলে পিঠে করবার বিজ্ঞানসম্মত ধরণ এবং স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সাধারণ সমস্ত নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

মিসেস কোরার কাছে শুনলাম জাপানে অধিকাংশ মেয়েই প্রসবের সময় হাসপাতালে যায়। কাজেই এখানে নানা শ্রেণীর হাসপাতাল আছে। কোনটায় সামান্য টাকা লাগে, কোনটায় প্রচুর বড়মানুষী রকমের খরচ, কোনটায় মাঝারি খরচ আবার কোন কোনটা একেবারে বিনা পয়সার ব্যাপার।

আমি যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে রঙীন রেশমের লেপের মধ্যে ঘুমন্ত সদ্যোজাত কয়েকটি শিশু এবং তাদের মাদের দেখলাম।

এই হাসপাতালটি দেখা সেরে একটা ট্যাক্সি ক'রে মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে গেলাম। ভুল ক'রে আগে



মহিলা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাতা আরাটা য়োশিয়োকা

তাদের আপিসে নেমেই গাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, কাজেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আবার হেঁটে বড় কলেজ-বাড়ীতে আসতে হ'ল। মিসেস কোরা কাঠের মোটা চাকা জুতো পরে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর বেশী অসুবিধা হয় নি। কিন্তু আমাদের জুতাতে কয়েকটি সরু ফিতায় বোনা সখের জিনিষ মাত্র, কাজেই এ রকম পথে চলতে মুস্কিল হয়।

এই মেডিক্যাল কলেজটি মস্ত ব্যাপার। বৃষ্টির দিন হ'লেও মিসেস কোরা এবং একজন স্থানীয় ডাক্তারের সাহায্যে কলেজ-সংক্রান্ত হাসপাতালটি আগাগোড়া



২০নং ওয়ার্ড মহিলা কলেজ

দেখলাম। প্রধান বাড়ীটি আটতলা, ছয়টি তলা মাটির উপরে এবং দুটি মাটির নীচে। টিউবারকিউলোসিস রোগী প্রভৃতি নীচের দিকে থাকে। বাড়ীগুলি আধুনিক ভাবে তৈরি, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমস্ত ব্যবস্থাই সেখানে আছে। জাপানে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর আদর্শ হাসপাতাল ব'লে বিখ্যাত।

কলেজটি মেয়েদের, কিন্তু তাদের হাসপাতালে পুরুষ রোগীদেরও নেওয়া হয়। জনকতক পুরুষকে হাসপাতালের খাটে শুয়ে থাকতে দেখলাম। প্রত্যহ ষাট জন চিকিৎসক রোগীদের দেখাশুনা করেন। কলেজের উপরের ক্লাসের মেয়েরাও হাসপাতালে চিকিৎসার কাজ করেন। প্রফেসর ছাড়া যে-সব শিক্ষয়িত্রী এখানে শিক্ষা দেন তাঁরা সকলেই এখানকার গ্রাজুয়েট। এর উপর ১৮০ জন নর্স প্রভৃতি আছেন। ক্লিনিকের একটি প্রকাণ্ড ঘর আছে। জাপানে এইরকম বড় ক্লিনিক কমই আছে। ৪০০ শত ছাত্রী এখানে বসতে পারে। সম্প্রতি কলেজের ছাত্রীসংখ্যা প্রায় এক হাজার!

গেটে ঢুকেই দেখলাম হাসপাতালের সামনের খোলা জায়গাতে মহিলা প্রেসিডেন্ট ইয়োয়ি য়োশিয়োকা মহাশয়ার একটি ব্রঞ্জের মূর্ত্তি রয়েছে, দেয়ালের গায়ে প্রতিষ্ঠাতা আরাটা য়োশিকার একটি উঁচু খোদাই-মূর্ত্তিও আছে। এই দুটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন ছাত্রীরা স্থাপন করেন।

প্রধান বাড়ীতে ঢুকবার আগে আমাদের জুতা খুলে কলেজের দেওয়া চটি পরতে হ'ল। দেখলাম এ-দেশে ইউরোপীয়দেরও লোকের বাড়ীতে এবং বড় বড় স্কুল-কলেজে এ-প্রথা মেনে চলতে হয়। পথে ব্যবহৃত জুতা প'রে ঘরে ঢোকা প্রায় সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ। স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি অনুসারে দেখতে গেলে এ নিয়মটি খুব ভালই মনে হয়। পথের যত নোংরা ও বীজাণু মানুষের পায়ে পায়ে



মহিলা মেডিক্যাল কলেজের প্রেসিডেন্ট ইয়োয়ি য়োশিয়োকা

লোকের বাড়ীতে ঢুকতে পায় না। এটি প্রাচ্য নীতি। ভারতবর্ষেও লোকে আগে ঘরে ঢুকবার পূর্ব্বেই জুতা খুলে রাখত। কিন্তু আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই শহরের লোকেরা যে এ নিয়মটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশ শীতপ্রধান দেশ নয়, এখানে জুতা খুলে পরের ব্যবহৃত চটি পরবারও প্রয়োজন হয় না, সুতরাং এদেশে এ নিয়মটির ফল আরোই ভাল হ'তে পারে।

কলেজের কয়েকটি ইউনিফর্ম্ম-পরা দাসী এসে আমাদের বসবার ঘরে নিয়ে গেল। তারপরই অভ্যর্থনার চিহ্নস্বরূপ দুই পেয়ালা সবুজ চা এল। তারপর এলেন এক জন ডাক্তার, তিনি আমাদের সঙ্গে খুব ভদ্র ও শোভন



মেডিক্যাল কলেজের দরজা



স্কুল থেকে বাড়ীর পথে ছাত্রদল

ব্যবহার করলেন। কিন্তু তখনই নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না, আর একটি ঝি বিলাতী চা ও কেক এনে হাজির করল। চা খাওয়া সেরে আমরা কলেজ ও হাসপাতাল দেখতে বেরোলাম। ডাক্তার মহাশয় অত বড় আটতলা বাড়ীর প্রায় প্রত্যেক কোণ পর্য্যন্ত আমাদের ভাল ক'রে দেখালেন। এক্সরে, অল্‌ট্রাভায়লেট প্রভৃতি চিকিৎসার ঘর, ছোটবড় অস্ত্রচিকিৎসার ঘর, বৈদ্যুতিক স্নান ও মালিশের ঘর, ক্লাসের বক্তৃতাঘর সব তো দেখলামই, দুধ পরীক্ষা, কাপড় কাচা, জলসিদ্ধ করা, খাওয়া ইত্যাদির ঘরও বাদ গেল না। সর্ব্বত্রই জাপানীদের আশ্চর্য্য পরিচ্ছন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিকতাতেও যে তারা অন্য জাতের চেয়ে কোনও বিষয়ে কম নয় তাও যন্ত্রপাতি, লিফ্‌ট, অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা-প্রণালী ইত্যাদি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

প্রসব-গৃহগুলিতে কতকগুলি আসন্নপ্রসবা মেয়েকে দেখলাম, তারা সবে মাত্র এসেছে। সব চেয়ে ভাল লাগল শিশুদের ঘরগুলি। এখানে প্রাণহীন যন্ত্রপাতির আড়ম্বরই সব নয়। ছোট ছোট উঁচু খাটে কচিকচি শিশুগুলি উজ্জ্বল রঙীন কিমোনো পরে রংচঙে লেপের তলায় আরামে ঘুমোচ্ছে। কেউ ১০ ঘণ্টা কেউ ১৫ ঘণ্টা আগে পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছে। মাঝে মাঝে নর্সেরা তাদের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে ওজন নিচ্ছে, কিংবা ফিতা দিয়ে তাদের মাপছে।



ইউনিফর্ম্ম-পরিহিত ছাত্রীর দল

বেশ গোলাপী গাল আর খ্যাঁদা নাকের ঘটা সেখানে। মা'দের এই শিশুসদনে থাকতে দেওয়া হয় না।

শিশুদের হাসপাতালটিও দেখবার জিনিষ। এখানে দশ বার বৎসর (ঠিক বয়স জানি না) পর্য্যন্ত বয়সের শিশুদের চিকিৎসা হয়। অতি ক্ষুদ্র শিশুদের মধ্যে কেউ কেউ মাতৃহীন, হাসপাতালে মানুষ হচ্ছে, কেউ রিকেটী, কারুর চর্ম্মরোগ। ঘরের মধ্যে শিশুদের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, কিন্তু শিশুগুলি কান্নাকাটি করছিল না। কেউ বা ঘুমোচ্ছিল, কেউ বা বিষণ্ণমুখে ঘরের খেলনাগুলির দিকে তাকিয়ে নীরবে খাটে বসেছিল। শিশুগৃহ খেলনায় সুসজ্জিত। পাশেই একটা ঘরে আঁতুড়ের শিশু থেকে ১২ বৎসরের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত নানা জাতীয় খেলনা শ্রেণীবিভাগ ক'রে নমুনাস্বরূপ সাজান রয়েছে।

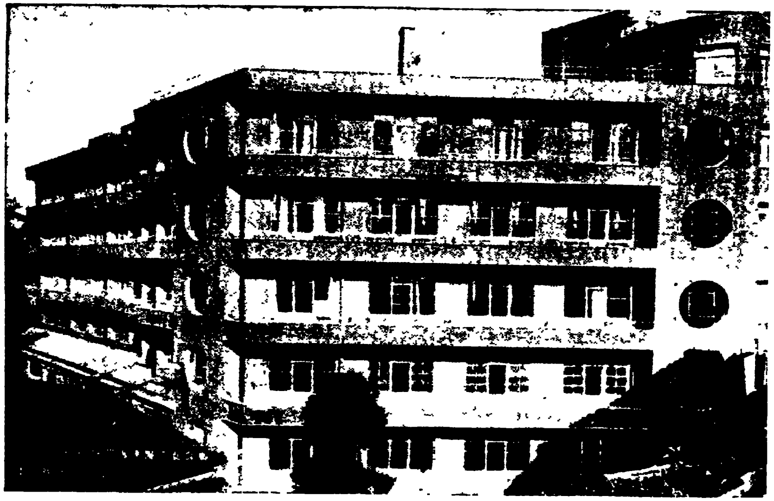
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল স্কুলরূপে এই কলেজটির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১২তে স্কুলটি কলেজে পরিণত হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষামন্ত্রী এটিকে টোকিও মহিলা মেডিক্যাল কলেজ নামে স্বীকার করেন।



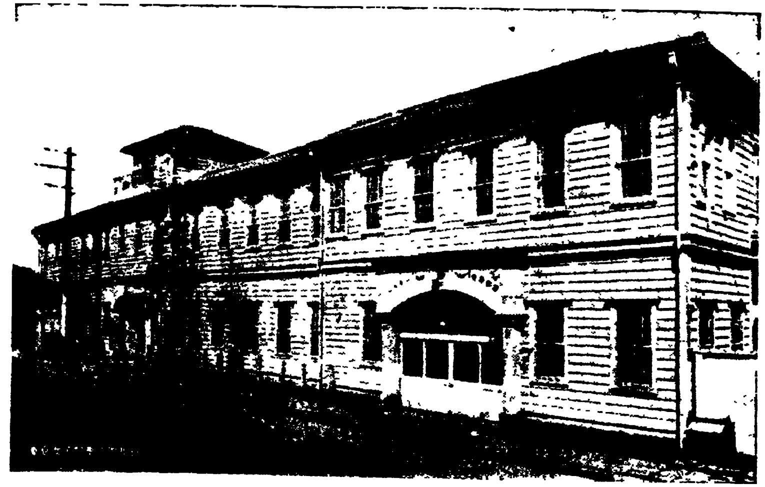
টোকিও হাসপাতালে শিশুদের চিকিৎসা

পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেও জাপানে মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষা ঘৃণার বিষয় ছিল। সেইজন্য সে সময়ের যে একমাত্র স্কুলে মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত সেটি মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু রুশ-জাপ যুদ্ধের পর জাপানের লোকেরা মেয়েদের সকল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। মেয়েরা জীবিকার জন্য চাকরী বাকরীর দাবি করতে আরম্ভ করে। মেয়েদের বিয়ের বয়সও ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। কাজেই চিকিৎসা ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে মানুষের মত বদলাতে আরম্ভ করল।

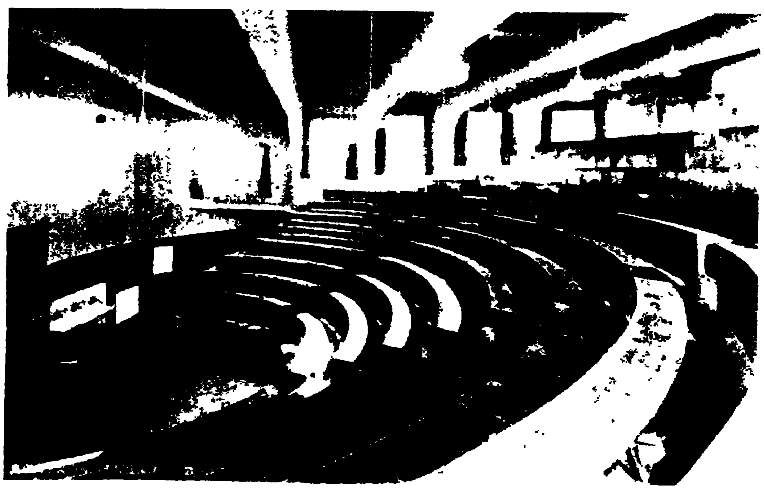
যে-দেশে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মেয়েদের মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয় সেই দেশেই ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৭৮৬ জন মহিলা চিকিৎসক এবং ১৫৪,১৫৩ জন নর্স ও ধাত্রী তৈরি হয়ে উঠল। স্কুলটি যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন একখানি মাত্র ছোট্ট ঘরে সব কাজ হ'ত, আর এখন আটতলা বাড়ীতে তার হাসপাতাল এবং প্রাচ্য দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রীনিবাসে তার ছাত্রীদের বাস। এই



হল ডিক্যাল কলেজের াসপাতাল বাড়ী



মহি মেডিক্যাল কলেজের বড় গেট



ক্লিনিক হল হিলা মেডিক্যাল কলেজ



মহি মেডিক্যাল জর লের ঘর



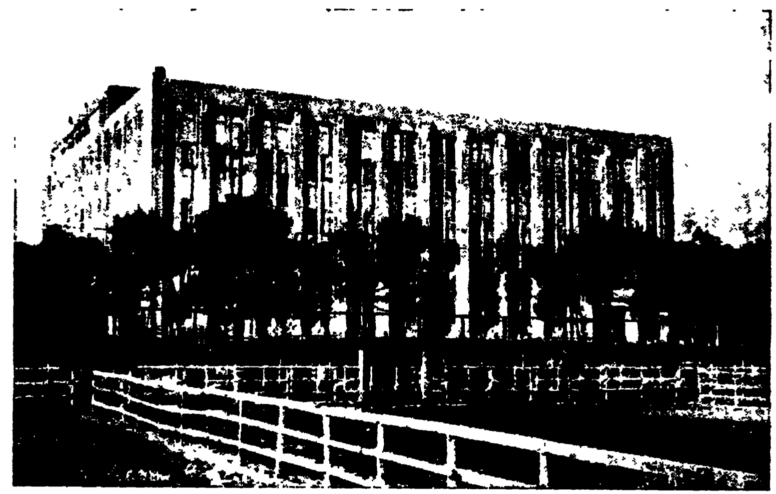
হাসপাতালে ছেলেরা তাস খেলছে



হাসপাতালে মা এসে রুগ্ন শিশুকে ভোল ন



মেডিক্যাল কলেজ বাড়ী



মহিলা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীনিবাস

ছাত্রীনিবাসে পাঁচ-শ ছাত্রীর স্থান সংকুলান হয়। ছাত্রী-নিবাসে মাসে ৭ ইয়েন ঘর ভাড়া এবং ১৮ ইয়েন খাওয়া খরচ। অর্থাৎ মোট খরচ ১৯৲ টাকার মধ্যেই হয়।

জাপানে এবং অন্যান্য দেশেও রোগীরা অনেক সময় সপরিবারে হাসপাতালে এসে থাকতে চায়। সেই সব রোগীদের আর্থিক অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দুতিন কামরাওয়ালা ঘর দেওয়া হয়। প্রধান কামরায় রোগীর জন্য একটি খাট থাকে, পার্টিশান-দেওয়া পাশের ছোট ছোট কামরাগুলি কিন্তু খালিই দেখলাম। মেজেগুলি সব পুরু মাদুরে মোড়া, রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা সেই পরিষ্কার মাদুরের মেজেতে মোটা মোটা গদি পেতে বিছানা করে। পরিবারের সকলের ব্যবহারের জন্যই আধুনিক স্নানাগার শৌচাগার প্রভৃতি আছে।

প্রত্যহ অনেক 'আউটডোর' রোগী এখানে চিকিৎসার জন্য আসে। দিনে ও মাসে কত রোগী আসে তার চার্ট সামনেই টাঙান থাকে। তা দেখে বোঝা যায় যে জাপানে শীতকালেই রোগ বেশী হয়।

মেডিক্যাল কলেজ দেখে দুপুরে ওমোরিতে ফিরে এলাম। এসে দেখলাম জাপানের এক মহিলা-বন্ধু আমাদের জন্য অনেক উপহার নিয়ে ব'সে রয়েছেন। আমিও কিছু উপহার দিলাম।

২৬শে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাব' ঠিক ছিল। কিন্তু সেদিন মিসেস কোরা আসতে পারলেন না ব'লে মিসেস মজুমদারকে নিয়েই আমরা গেলাম। তিনি ইতিপূর্ব্বে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও যান নি, কিন্তু একলা পৃথিবীতে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন এবং জাপানী ভাষাও ভাল জানেন ব'লে পথ হারাবার তাঁর কোন ভয় ছিল না। একটা লোকাল ট্রেনে আমরা তিন জনে বেরিয়ে যাত্রা করলাম। গাড়ীতে একটি মেয়েকে পথ-ঘাট জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে জানা গেল যে সে ওই পাড়াতেই যাচ্ছে। মেয়েটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ দেখিয়ে দিল। ট্রেন থেকে নেমে তার সঙ্গে 'বাসে এসে যথাস্থানে নামলাম।

তখন বেলা বারোটা। ছোট ছোট মেয়েরা পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে দল বেঁধে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। গেটের সামনে বড় রাস্তা সেদিন মেরামত হচ্ছিল, এক এক জায়গায় এক বিঘৎ গভীর কাদা। অনেক কষ্টে ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে মস্ত বড় খোলা জমি। সেখানে নানা রকম খেলার আয়োজন ও সুন্দর বাগানও রয়েছে। মেয়েরা সব খেলায় ব্যস্ত, বোধহয় তখন ছুটির সময়। কেউ নাগরদোলায় ঘুরছে, কেউ ছুটোছুটি করছে। বেশ বড় বড় সতের আঠার উনিশ বছরের মেয়েরা। গাছের ডালে দড়ির বোনা দোলনা বিছানা টাঙানো রয়েছে, অনেকে তাইতে দুলছে। শুষ্ক চেরিগাছের তলায়, সবুজ ঝাউ গাছের আশেপাশে কতকগুলি বালিকা 'সি-স' চড়ে উপর-নীচ করছিল। প্লাম গাছে তখন সবে ছোট ছোট সাদা ও গোলাপী ফুল ফুটতে সুরু হয়েছে; বসন্ত উঁকি দিতে আরম্ভ করেছেন।

আপিস-ঘরে ঢুকতেই এক জন আমাদের আগুনের কাছে বসতে দিয়ে কার্ড চাইল। খানিক পরে এক জন একটা হিবাচিতে কাঠকয়লার আগুন জেলে আমার পায়ের কাছে রেখে গেল।

সকলের শেষে এলেন কলেজের একটি ছাত্রী। তিনিই আমাদের কলেজের ভিতরে নিয়ে গিয়ে শিশু-মনস্তত্ত্ব পরীক্ষাগার দেখালেন। মনস্তত্ত্ব ছাড়া শিশুদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বুদ্ধি, বর্ণান্ধতা, ক্ষিপ্রতা প্রভৃতি আরও নানা জিনিষের পরীক্ষা এখানে হয়। এইসব মাপবার জন্য এখানে অসংখ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আছে। যন্ত্রে পরীক্ষা ছাড়া অন্য রকম পরীক্ষাও হয়। এই কলেজের ছাত্রীরা শিশুদের নানারকম গল্প ব'লে তার পর ছবি এঁকে সেই গল্পগুলি তাদের বুঝিয়ে দিতে বলে। শিশুদের আঁকা এই জাতীয় চিত্তাকর্ষক ছবিতে দেওয়ালগুলি বোঝাই। কতকগুলি ছবিতে শিশুদের শিল্পনৈপুণ্যের বেশ চিহ্ন আছে, কতকগুলি তাদের অদ্ভুত কল্পনাশক্তির পরিচায়ক।

সম্ভবত বাৎসরিক পরীক্ষার পর কলেজের ছাত্রীরা কিছু দিন ছুটি পেয়েছিলেন। সেই জন্য সেদিন কলেজের মেয়েদের বেশী দেখলাম না।

কলেজ দেখার পর রাস্তা পার হয়ে এঁদেরই অধীনস্থ

কিণ্ডারগার্টেন স্কুল দেখতে অনেকখানি হেঁটে যেতে হল। তখন সেখানে মধ্যাহ্নভোজনের সময়। একে শিশুগুলির বয়স অল্প, তাতে জাপানীরা বেঁটে জাত, কাজেই কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্রীদের দেখে মনে হয় সবে তারা 'হাঁটি হাঁটি পা পা' সুরু করেছে। শিশুরা তখন কেউ খেতে ব্যস্ত, কেউ খেলায় মত্ত, কেউ বা বাড়ী যাবার আয়োজন করছে। শিশু-বিদ্যালয়ের বাড়ীটি একটা ছোট পাহাড়ের উপর। বাড়ীর বাইরে বাগান। ভিতরে অতিশিশুদের আহারে শিক্ষয়িত্রীরা সাহায্য করছিলেন। একজনকে দেখলাম পরিবেশন করছেন এবং আরও জন-দুই চামচে ক'রে শিশুদের খাইয়ে দিচ্ছিলেন। শিশুদের আহার্য্য রন্ধনের সময় তাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিনের দিকে এখানে বিশেষ নজর রাখা হয়।

শিশুরা স্কুলে আসবার সময় তাদের ব্যাগের ভিতর এক জোড়া হাল্কা জুতা নিয়ে আসে। স্কুলে ঢোকবার আগে পথ-হাঁটা ভারী জুতাজোড়া খুলে হাল্কাটা পরে নেয়। দেখলাম বাড়ী যাবার আগে তারা হাল্কা জুতা-গুলি খুলে ব্যাগে প্যাক ক'রে রাখছে এবং মোটাগুলি আবার পরছে। জুতা রাখবার জন্ম বারাণ্ডায় কাঠের তাক রয়েছে।

দুই একটি শিশু আমার মেয়েকে দেখে হেসে ভাব করবার জন্ম এগিয়ে এল। তাদের ঘরের ডেস্ক ও টেবিল-গুলি এত নীচু যে দেখলে খেলনা মনে হয়। ঘরগুলি নানা রকম পুতুল ছবি ও খেলনা দিয়ে সাজানো। শিশুদের বয়স চার থেকে ছয় পর্য্যন্ত।

এখান থেকে আমরা প্রাইমারী স্কুল দেখব ব'লে বেরোলাম। মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় একটা পাড়ার মত। কোনও বিদ্যালয় রাস্তার এপারে, কোনটা ওপারে, কোনটা আবার অনেক দূরে। আমাদের সঙ্গে পথ দেখাবার জন্ম যে ঝিটি ছিল সে আমাদের অনেক দরজায় দরজায় ঘোরাল। অনেক বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে শেষে একটা খোলা পথ পাওয়া গেল। মেয়েদের দেখে আমাদের যত না কৌতূহল হ'ল আমাদের দেখে তাদের কৌতূহল দেখলাম তার চেয়ে অনেক বেশী।

স্কুলটি ছয় থেকে বারো বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েদের। এখানে ছয় বৎসর পড়তে হয়। আমরা যখন গেলাম তখন মধ্যাহ্নভোজনের পর মেয়েরা বাগানে বল নিয়ে খেলা করছিল। আমাদের আপিস-ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করতে দেখে তারা বল-টল সব ফেলে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে আমাদের চার পাশে এসে দাঁড়াল। দরজা-জানালার যেখানে যত কোণ ছিল সবগুলির ফাঁক দিয়ে চার-পাঁচটি করে গালফোলা মুখ পরম বিস্ময়ের সঙ্গে উঁকি মারতে আরম্ভ করল। তিন জন বাঙালী মেয়েকে এক সঙ্গে দেখা তাদের জীবনে বিস্ময়কর ঘটনা নিশ্চয়ই। তাদের রকম দেখে একজন শিক্ষয়িত্রী এসে দরজাগুলো বন্ধ ক'রে দিলেন।

ঘরের ভিতর এক জন হিবাচিতে আগুন দিয়ে গেল, একজন চাও দিয়ে গেল। একটি ইউরোপীয় পোষাক-পরা ক্ষীণকায়া শিক্ষয়িত্রী আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে চা পাঠিয়ে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঘরে অপেক্ষা করালেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন, "কাল মাদের উৎসব, তাই মেয়েরা বিশেষ পড়ছে না, মাদের জন্ম উপহার তৈরি করছে।" আমরা বললাম, "আমরা উপহার তৈরিই দেখব।"

জাপান উৎসবের দেশ। সেখানে মেয়েদের উৎসব ছেলেদের উৎসব তো আছেই, তার উপর মাদের উৎসবও আছে। সেদিন সন্তানেরা মায়েদের উপহার দেয়। অনেকটা আমাদের দেশের জামাইষষ্ঠী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মত। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে বধূষষ্ঠী কি ভগ্নী-দ্বিতীয়া নেই।

শিক্ষয়িত্রীটি আমাদের প্রথম বাৎসরিক শ্রেণীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে জন পঞ্চাশ মেয়ে গোল গোল কাগজের বাক্স তৈয়ারী করতে ব্যস্ত। এই সব বাক্সে তারা মাদের উপহার সাজিয়ে দেবে। সকলের কাছেই কাঁচি, মাপকাঠি, এবং জ্যামিতির যন্ত্রপাতি রয়েছে। তাদের দেখে আমরা নমস্কার করাতে তারা প্রতিনমস্কার করল না, হেসে উঠল। বিদেশীর সঙ্গে ভদ্রতা করতে তখনও বোধ হয় তারা শেখে নি। আমাদের তাজ্জব রকম একটা জিনিষ বোধ হয় মনে করেছিল। দ্বিতীয়

বাৎসরিক শ্রেণীর মেয়েরাও উপহার তৈরি করেছিল। তৃতীয় বাৎসরিক শ্রেণীতে পড়া হচ্ছিল। একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে এক জন কিমোনো-পরিহিতা শিক্ষয়িত্রী জাপানী ভাষায় বালিকাদের কিছু বলছিলেন। সূচনার বক্তৃতার পর পড়া আরম্ভ হ'ল। শিক্ষয়িত্রীর প্রশ্নের উত্তরে মেয়েরা হাত তুলছিল। যারা প্রশ্নের উত্তর জানে না তারা হাত তুলল না। আমরা ছ'টি ক্লাসেই গেলাম। মেয়েরা সর্ব্বত্রই ইউরোপীয় ইউনিফর্ম পরা এবং চুল ছাঁটা। তাদের চেহারা সুস্থ ও সুন্দর, গাল দিয়ে রক্ত ফেটে পড়ছে।

জাপান মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মিসেস হিদে ইমু। ট্রষ্টিদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ই আছেন। ১৭ বৎসর বয়সের পর মেয়েদের কলেজের শিক্ষা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়ে গবেষণা করবার একটি বিভাগ আছে। স্কুল দেখবার আগেই আমরা সেটিতে গিয়েছিলাম।

কলেজের পাঁচ-ছয়টি বিভিন্ন বিভাগে ১২০০ ছাত্রী। উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ৫০০ ছাত্রী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০০ ছাত্রী এবং কিণ্ডারগার্টেন বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা ১০০। বিগত ৩০ বৎসরে এখান থেকে ৫০০০ ছাত্রী গ্রাজুয়েট হয়েছে। এখানে ৭৫ জন পুরুষ ও ৭৫ জন স্ত্রীলোক শিক্ষকতা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ছয় একর জোড়া; কিন্তু বাড়ীগুলির অবস্থা খুব ভাল নয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে তাদের এরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি হয়। কতকগুলি কাঠের বাড়ী এবং কতকগুলি অতি পুরাতন জীর্ণ দেখতে, তবু মোটের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা দেখতে ভালই লাগে। শুনলাম এঁরা এবার একটি নূতন জমি জোগাড় করেছেন, তাতে বড় বড় নূতন আধুনিক বাড়ী হবে। সেই জমিটির আয়তন বাট একর।

বর্ত্তমানে এঁদের কুড়িটি ছাত্রীনিবাস আছে। তাতে জাপানের নানা প্রদেশ থেকে ছয়-শ ছাত্রী এসে বাস করেন। এখানেও ছাত্রীদের মধ্যে কিছু কিছু স্বায়ত্ত-শাসন চলতে সুরু করেছে।

১৯৩৩এর মার্চ্চ মাসে জাপানে মেয়েদের জন্য ৯৬৩টি উচ্চ শিক্ষালয় ছিল, তাদের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৩৬১,৭৩৯।

জাপান গবর্ণমেণ্ট দেশ থেকে অশিক্ষা-পাপ দূর করতে বদ্ধপরিকর। সেই জন্য স্কুলে বিকলাঙ্গ ও জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয়। যারা এত দূর বিকলাঙ্গ কি জড়বুদ্ধি যে সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়তে একেবারেই পারে না তাদের অন্ধ বধির মূক ইত্যাদির জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ বিশেষ স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়। ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসে অন্ধ শিশুদের মধ্যে শতকরা ২১·৪৩ জন এবং বধিরদের মধ্যে শতকরা ২৭·১৯ জন স্কুলে পড়ত।

ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে মেয়ের ভাল বিবাহ দিতে হ'লে স্কুল ডিপ্লোমা ছাড়া চলেই না। এ যেন কন্যার যৌতুকের একটি অংশ। জাপানে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা খুলেছিলেন। কুড়ি বৎসরের মধ্যে আরও ৪৩টি মিশনারী স্কুল স্থাপিত হয়। সরকারী প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে খোলা হয়।

তুলির লিখন, ফুল সাজান, চায়ের অনুষ্ঠান, এসব জাপানের প্রাচীন আর্ট। আধুনিক মেয়েরা আধুনিকতার তোড়ে পড়ে এগুলি ভুলে যান নি। জাপান মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যাবেলা বাহিরের মেয়েদের জন্য তুলির লিখন, ফুল সাজান, সূচীশিল্প প্রভৃতির ক্লাস হয়। এখানে বাহিরের ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী দুইই আসেন। জাপানের অনেক স্কুল এবং কলেজে চায়ের অনুষ্ঠান করতে শেখান হয়। হোটেলের দাসীদেরও এগুলি শেখান হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় দেখার পর আমরা একটা রেস্তোরাঁতে খেয়ে কিছুক্ষণ বাজারে ঘুরলাম। নানা দোকান থেকে জিনিষ কিনে একজনের দোকানে জমা রাখলাম। সে লোকটি আমাদের অপরিচিত, কিন্তু তার জন্য জিনিষপত্রের কিছু গোলমাল হয় নি।

২৭এ একবার য়োকোহামায় জনকয়েক শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাড়ী বেড়িয়ে এলাম। তাঁরা অনেক ভদ্রতা করলেন। ২৮এ আমার টোকিও ছাড়বার কথা, তাই ২৭এ রাত্রে মজুমদার-গৃহিণী মিসেস কোরাকে আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছিলেন। তাঁর জন্তে কিছু বাংলা

খাবার তৈরি করা গেল। তিনি বললেন, "আমি যখন ভারতবর্ষে যাই, তখন সিঙাড়া লুচি পাঁপর এই সব খেয়েছিলাম।" মিসেস কোরা আমাকে ও আমার কন্যাকে অনেক উপহার দিলেন। আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পুত্রবধূর জন্যও কিছু উপহার দিলেন।

রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত জিনিষপত্র বেঁধে পর দিন ভোরেই আবার যাবার আয়োজন সুরু হ'ল।

২৮এ ছিল ভীষণ ঠাণ্ডা। টোকিওতে এত শীত কখনও দেখি নি, তার উপর আবার বৃষ্টি। পায়ে দুজোড়া ক'রে মোজা পরেও মনে হচ্ছিল বরফে পা জমে যাচ্ছে। ষ্টেশনে মিস সাকুরাই প্রভৃতি দেখা করতে এলেন। মজুমদার-পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে ট্রেনে কোবে সায়োমিয়া চললাম। সঙ্গে আমার ছোট্ট মেয়েটি ছাড়া কেউ নেই। ষ্টেশনের নাম চিনে নামতে পারব কি না তাও জানি না। গাড়ীতে একটি ইংরেজী-জানা মহিলা ছিলেন। তিনি একটু সাহায্য করলেন। ট্রেন-বয় মিঃ মজুমদারকে বলেছিল আমাদের সায়োমিয়াতে ঠিক নামিয়ে দেবে। সে তার কথা রেখেছিল। জিনিষপত্র সুদ্ধ ঠিক মত নামিয়ে দিয়েছিল। নেমে দেখলাম আমাদের নিতে দাস-মহাশয় এসেছেন। মিঃ দাস আমাদের খাওয়া দাওয়া থাকা সবের জন্যই খুব আশ্চর্য্য যত্ন করলেন।

পরদিন ১লা মার্চ্চ কোবের একটা খুব উঁচু পাহাড়ের মাথায় একটা চিড়িয়াখানা দেখতে গেলাম। আমার মেয়ের সেটা দেখবার খুব সখ ছিল। পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্র ভারী সুন্দর দেখায়, সমস্ত শহরটিও বেশ ছবির মত দেখা যায়। দেখলাম কোবেতে মুসলমানেরা একটি মস্‌জিদ করেছে।

চিড়িয়াখানায় সাদা ভালুক, সিন্ধুঘোটক, বড় বড় ময়ূর ও সাদা সারসগুলি ভারী সুন্দর। অনেক রঙের পাখীর খুব ঘটা; একটি সিংহ-দম্পতির সঙ্গে একটি শাবক রয়েছে। আকাশে খুব মেঘ করেছে দেখে ময়ূরগুলি সব পেখম ধরে নাচতে সুরু করল। এদেশে হাতী দেখা যায় না বলে একটা হাতীকে খুব যত্ন ক'রে বড় একটা কাচের ঘরে রাখা হয়েছে। সেখানে ভীষণ লোকের ভীড়। বাইরে একটা হাতীর ফোটো টাঙানো। বানর, দুই কুঁজওয়ালা উট প্রভৃতি আরও অনেক জীবজন্তুও আছে। তবে চিড়িয়াখানাটি কলকাতার চিড়িয়াখানার মত বড় নয়।

দুপুরে মিঃ দাসের আতিথ্যে মাছের তরকারি ও ভাত খেয়ে বিকালে জাহাজে উঠলাম। দাস-মহাশয় আমার মেয়েদের জন্য তিনটি জাপানী পুতুল দিলেন। এ জাহাজে অফিসাররা ছাড়া সবাই অপরিচিত। রাত্রে ভিতর থেকে তালা বন্ধ করে কেবিনে ঘুমোলাম।

২রা মার্চ্চ আবার অকূল সমুদ্রে পাড়ি। সুদীর্ঘ এক মাস ধরে ফিরতে হবে, সঙ্গে কেউ নেই, মনে একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে উঠলাম। সকালে দাস-মহাশয় আবার এলেন।

দাস-মহাশয় জাহাজ ছাড়া পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। জাহাজে একটি সিন্ধী মুসলমান ছেলে বোম্বাই ফিরছিল, তাকে আমাদের দেখাশুনা করতে বলে গেলেন। আমরা অবশ্য তার সঙ্গে আর দেখা করিনি, কোন সাহায্যও নিই নি।

কোবে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর একটি মাত্র যাত্রী উঠলেন, তিনি একটি সিঙ্গাপুর-প্রবাসী জাপানী। রং ময়লা, বোধহয় বিদেশ-বাসের ফলে।

আজ আমাদের জাপান ভ্রমণ ২৮ দিনে শেষ হয়ে গেল।

সমাপ্ত

বাংলার চিত্রশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রে বিষয়টির আলোচনা হইয়াছে। নিম্নে প্রকাশিত চারিটি পত্রে বিষয়টির অন্য দিক্ দিয়া কিছু আলোচনা আছে।]

ওঁ

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েষু

সবিনয় নিবেদন,

কিছু দিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে "বাংলার চিত্রশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক প্রবন্ধে আপনি শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের পত্রের যে উত্তর দিয়েছেন তা বাংলা ভাষায় চিত্রশিল্প-সমালোচনা-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট বস্তু। আপনার সব কথা মেনে নিলেও একটা কথা কোন রকমে মানতে পারছি না, সেটা হচ্ছে, যেখানে আপনি রূপদক্ষ নন্দলাল বসু-মহাশয়ের শিল্প-প্রতিভার প্রতি কংগ্রেস-ওয়ালাদের অপমানের কথা বলেছেন। আমার মনে হয় এতে দুঃখের কথা থাকলেও গৌরব ও আনন্দের কারণ আছে। দুঃখের কথা এই জন্যে যে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলাল বসু মহাশয়ের অপূর্ব্ব তুলিকার স্পর্শে হরিপুর কংগ্রেসের পর্ণশালায় যে পরিকল্পনা হয়েছিল তা নষ্ট হয়েছে ব'লে; আর গৌরব ও আনন্দ এই জন্যে যে তাঁর মোহিনী তুলিকা জাগিয়ে তুলবে ভারতের সর্ব্বজাতি ও সকল ধর্ম্মের দর্শকের মধ্যে ভারতীয় রূপ-তৃষ্ণা। আপনি দেশের লোকের রূপ-তৃষ্ণা জাগাবার জন্যে বহু কাল থেকে চেষ্টা ক'রে আসছেন, আপনি সারা ভারতের নমস্য। তবে আমার মনে হয়, রূপ-তৃষ্ণা জাগাবার কাজটা চিত্র-প্রদর্শনী অপেক্ষা এই ভাবে সহজ হ'তে পারে। আমাদের দেশের রূপ-তৃষ্ণা এখনও ভাল করে জাগে নি, তবে একথা জোর করে বলা যায় যে রূপ-তৃষ্ণা জাগানোর উদ্বোধন-কার্য্য আপনাদের মত কয়েক জন শিল্পরসিক মনীষীদের দ্বারা সুরু হয়ে গেছে। চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে যে বেশী লোক যায় না, একথা বহুবার প্রমাণ হয়ে গেছে, তাই মনে হয় নানা আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের রূপ-তৃষ্ণা—সেটা কংগ্রেসী বাৎসরিক সভাক্ষেত্র বা অন্যান্য প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়েই হোক। সেই জন্য নন্দলাল বসু মহাশয়কে কংগ্রেসী কর্ত্তারা রাংচিতার বেড়া রং করবার কাজে লাগিয়ে দিয়ে খুব ভুল করেছেন ব'লে মনে হয় না। যদি প্রথমেই বহু চিত্রের প্রদর্শনীতে একটা অসমঝদার লোককে চিত্র দেখিয়ে তার রূপ-পিপাসা জাগাবার চেষ্টা করা হয়তো ভুল হবে, কেন না সে হয়ে পড়বে বাঁশবনে ডোম কানা।

যে-সব আবেষ্টনীর কথা আগে বলেছি, সেই সব ক্ষেত্র বা স্থান পাত্র ভেদে চিত্রের প্রকৃষ্ট একটি চিত্র দেখে রূপ-তৃষ্ণা জাগতে পারে। এখানে একটা কথা আমার ব্যক্তিগত হলেও না ব'লে থাকতে পারছি না। কিছু দিন পূর্ব্বে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে কোন কারণে দেখা করতে গিয়েছিলুম, নানান কথার পর তিনি শিল্পীশ্রেষ্ঠ নন্দলালের পাথরের উপর এক রেখাচিত্র হরপার্ব্বতী দেখালেন। সেই অবধি আমার রূপ-তৃষ্ণা জেগেছে। এর আগে অনেক ছবি দেখেছি কিন্তু এই ভাবে মোহিত করতে পারে নি, তবে আপনি বলতে পারেন এ কাজে শিল্পগুরু নন্দলালের শক্তি ও সময় নষ্টের কি দরকার। অনেকে রয়েছে তাদের দিয়ে এই কার্য্যের পরিকল্পনা করালেই হয়। আমার মনে হয় এতে ফল হবে হিতে বিপরীত, তারা ভারতীয় চিত্রের পরিকল্পনা দেখতে গিয়ে দেখবে ভারতীয়ের রং-মাখান বিদেশীর রূপান্তর। তার ফলে তাদের রূপ-তৃষ্ণা স্থানে অভিষিক্ত হবে রূপ-বিতৃষ্ণা। তবে এ কথা আমি বলি না যে, শিল্পগুরু ছাড়া কেউ সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকেন না, তবে সংখ্যায় নগণ্য। একবার বিতৃষ্ণা জাগলে সেটা সহজে নষ্ট হ'তে চায় না। আর একটা কথা নন্দলালের একটি মোহিনী তুলিকাস্পর্শে যে প্রভাব বিস্তার হবে, অন্যের সারা জীবনের তুলিকায় সে ফল পাওয়া যাবে না। এ কার্য্যে শিল্পগুরুর যে সময় ও শক্তি নষ্ট হয়েছে তার ফল যে আমরা এক দিন পাব, সে আশা আছে। প্রাচীন কালে ভারতের চিত্রকলা এত প্রচার লাভ করেছিল তার কারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে না থেকে থাকত লোক-চক্ষের সামনে। আমার এই সব অনুমান সঠিক কিনা সে সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু লিখলে বাধিত হব। ২২ আষাঢ়, ১৩৪৫।

বিনীত

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি, বিশেষ ব্যস্ত থাকায় আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হ'ল। ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলাল বসু আজ প্রায় ৩০ বৎসর ধরে তাঁহার মোহিনী তুলিকা অক্লান্ত উদ্যোগে ও সহৃদয় চিত্তে চালিয়ে চলেছেন, কিন্তু অদ্যাপি নব্যভারতের—এমন কি কংগ্রেসী ভারতের রূপ-তৃষ্ণা জাগেনি। রূপ-বুদ্ধি সম্বন্ধে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। আপনি নিশ্চয় জানেন যে কংগ্রেসের বৈঠকের সঙ্গে সঙ্গে কখনও কখনও এক একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। লক্ষ্ণৌ শহরে দুই বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটি সুন্দর চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। তাহার চিত্রসম্ভার সংগ্রহ করেছিলেন নন্দলাল বসু ও যামিনীরঞ্জন রায়। এই প্রদর্শনীতে ভারতের চিত্রশিল্পের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ, যুগের পর যুগ সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রদর্শিত হয়েছিল। আমি শুধু এই প্রদর্শনীটি দেখবার জন্যে লক্ষ্ণৌ শহরে গিয়েছিলাম। দেখলুম, কংগ্রেসের সভাসদ্ মহাশয়রা প্রদর্শনীটিকে বয়কট করেছেন। অর্থাৎ বড় কেউ আসেন নি। তার কারণ এই নয় যে প্রদর্শনীটা বর্জ্জনীয়। আসল কারণ এই যে ভারতের সংস্কৃতি, সাধনা, ও কলা-সম্পদের রসাস্বাদন করবার শিক্ষা, সামর্থ্য ও ইচ্ছা আধুনিক ভারতের, বিশেষ ক'রে কংগ্রেসী ভারতের নাই। যাঁহাদের রূপ-তৃষ্ণা নাই তাঁহাদের সম্মুখে রূপশিল্পের নিবেদন অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।—হরিপুরের কংগ্রেসের উদ্যোক্তারা নন্দলালকে সভামঞ্চ অলঙ্কৃত করতে ডেকেছিলেন, রূপের পিপাসায় কাতর হয়ে নয়,—ডেকেছিলেন হরিপুরের সঙ্গীতি-সভার প্রচার-পদ্ধতির (Publicity stunt) বা বিজ্ঞাপনীয় হুজুগের গরজে। "শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা" ভগবানের নাম উচ্চারণ করলে সব সময়েই সুফল ফলবেই। কিন্তু যাঁরা বধির, তাঁদের কাছে ভগবানের নামকীর্ত্তনটাও বিফল হয়। যাঁরা রূপান্ধ তাঁদের কাছে নন্দলালের শিল্প-নিবেদনও বিড়ম্বনা মাত্র।

মহাত্মা গান্ধী যদি মনে করতেন যে ভারতের শিল্প-সাধনার মধ্যে ভারতের জাতিগঠনের বহুমূল্য উপাদান আছে, তাহ'লে তিনি নিশ্চয় "ওয়ার্দ্ধা-শিক্ষা-পদ্ধতি"র প্রবর্ত্তনে নন্দলালকে ডাকতেন। ঐ শিক্ষা-পদ্ধতিতে "Learn by making" অর্থাৎ 'হাতে গড়ে তবে মনকে গড়ে নাও' এই নীতি অবলম্বিত হয়েছে। এই নীতি কার্য্যে পরিণত করবার শক্তি যদি কারও থাকে তো সে-শক্তি ভারতের শিল্পী-গোষ্ঠীর আছে, আর কারও নাই। কিন্তু কংগ্রেসী নূতন শিক্ষাপদ্ধতির নীতিতে নন্দলালের স্থান নেই। এই প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতি সাধন-লাভের শিক্ষা নয়, যৎসামান্য অক্ষরপরিচয় ক'রে, খবরের কাগজ পড়তে পারবার যোগ্যতালাভের শিক্ষা। যে-শিক্ষাতে দেশের শিল্পসাধনার সঙ্গে যোগরক্ষার ব্যবস্থা নেই, আমি তাহাকে 'জাতীয় শিক্ষা' ব'লে স্বীকার করতে প্রস্তুত নই।

হয়তো অর্দ্ধ শতাব্দীর পর দেশের আধুনিক চিত্রশিল্পীদের চিত্র-সম্পদের সমাদর হবে, কিন্তু সেই ভাবী কালের সমাদর এই বর্ত্তমান অনাদরের ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না এই আমার বিশ্বাস। জাতীয় শিল্পীকে তাঁর জাতীয় শিল্পের সম্মানদানের ভার ভবিষ্যতের স্কন্ধে চাপাবার চেষ্টা বর্ত্তমান কালের স্বাজাত্যের পতাকাবাহীদের কাপুরুষতার লক্ষণ ব'লে মনে করি। আমাদের জাতীয় কবি তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান পেয়েছেন—কেবল শিল্পীর প্রাপ্যটাই কোনও অজ্ঞাত ভবিষ্যতে,—payable when able—জাতীয়তার চূড়ান্ত কর্ত্তব্যনীতি !!!

প্রাচীন কালের মত বর্ত্তমান কালেও শিল্পীরা তাঁদের শিল্প-সম্ভারের মেলা লোকচক্ষুর সামনেই মেলে ধরে রয়েছেন,—লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখেন নি—আমাদের চক্ষু নেই, সুতরাং শিল্পীর মহামূল্য নিবেদন আমাদের নজরে ঠেকে না। তার জন্য শিল্পীদের দোষ দেওয়া কি সুবিচারের কাজ ?

বেতারের অনুগ্রহে, জাতীয় সঙ্গীত আমাদের জাতীয় সাধনার জয়যাত্রার পথ মুখরিত ও আলোকিত করছে—কেবল জাতীয় শিল্পের সম্ভার জাতীয় বীরগণের উদ্যত পাদ-বিক্ষেপের নীচে পড়ে দলিত, মর্দ্দিত ও অপমানিত। ২০শে জুলাই ১৯৩৮।

ভবদীয়
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ওঁ

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। আপনার বহুমূল্য সময় আবার খানিকটা বৃথা নষ্ট ক'রে দিচ্ছি। আশা করি মার্জ্জনা করবেন।

জাতীয় শিল্পীদের সম্মানের ভার ভবিষ্যতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা বড় কেউ করে না, তবে তাঁর প্রতিভা বুঝতে না পারলে কি করবে। অনেক কবি সাধক ও শিল্পীকে ভবিষ্যতের কোন দূরবর্ত্তী সময়ের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, কেননা সেই সময় তাঁর "সমান-ধর্ম্মা" লোকে তাঁর পূজা-অর্ঘ্য নিয়ে আসবে। জগতে সব দেশে ও সকল সময়ে যাঁরা মনীষী ও নূতনের বাণী নিয়ে আসেন তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক লোকদের চেয়ে জ্ঞানের দ্রুত পদবিক্ষেপে এগিয়ে যান। সেই জন্য বোধ হয় তাঁদের অনেকের ভাগ্যে তাঁর সমসাময়িক লোকের নিকট থেকে আদর ও প্রশংসা ঘটে না। যাঁরা তাঁদের সমসাময়িক লোকের নিকট থেকে নগদ পূজা আদায় করে নিতে পেরেছেন তাঁদের সৌভাগ্য ও যারা পূজা করেছে তাদেরও সৌভাগ্য, এ কথাটা বলতে হবে। কিন্তু যে সব মনীষীর ভাগ্যে তাঁদের সমসাময়িক লোকের পূজা ঘটে নি তাঁদেরই দুর্ভাগ্য বলি কি ক'রে ? যে মনীষীর প্রতিভা যত বেশী বা নূতনের বাণী যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তাঁকে বুঝতে তত বেশী সময় লেগেছে. তার প্রমাণ জগতের ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে। এর ব্যতিক্রম নেই একথা বলি না—তবে কম, খুব কম। এই নিয়মের যত ব্যতিক্রম হয় তত ভাল জগতের সব লোকে ত মনীষীদের সমান-ধর্ম্মা হয়ে জন্মাতে পারে

না। এই যা দুঃখ। কেহ অর্দ্ধ শতাব্দী কেহ শতাব্দী আর কেহ বা সহস্র বৎসর পরে পূজা পেয়েছেন, তার কারণ এই যে তাঁর সমসাময়িক লোকের চেয়ে সেই জ্ঞানটা তাঁর এই অর্দ্ধ শতাব্দী, শতাব্দী বা সহস্র বৎসর আগে হয়েছিল—একথা যদি বলি তো কি খুব ভুল বলা হয় ? আর একটা কথা, কালের নিকষ-পাষাণ হচ্ছে লোকের প্রতিভা মাপবার অন্যতম প্রধান মাপকাঠি। অনেক কবি, সাধক ও শিল্পী অতি অনাদরের জিনিষ দিয়ে তাঁদের সমসাময়িক লোকের নিকট থেকে বহু মূল্যের প্রশংসা পেয়েছেন, তাতে জগতের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশী, আর কালের নিকষ-পাষাণে প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাঁরা খাঁটি নয় মেকী—তার পর আর তাদের সন্ধান পাওয়া যায় নি। যাঁরা তাঁদের সময়কালে প্রশংসা পান নি, হয়তো যুগ যুগ পরে পেয়েছেন তাতে দুঃখ কি, কিন্তু তাঁদের রচনা মহাকালের তীর থেকে ফিরে এসে প্রমাণ দিয়েছে সে মেকী নয় খাঁটি। অনেক মনীষীর তাঁর সময়কালের লোকের প্রশংসার চেয়ে লক্ষ্য থাকে মহাকালের উপর স্থায়িত্ব—কারণ তাঁরা সঠিক জানেন যে মানুষের চেয়ে কালই প্রতিভার ন্যায়বিচারক—মানুষকে সহজে ভুলান যায়, কিন্তু কালকে ভুলান যায় না। কোন কবি, দার্শনিক বা শিল্পীকে লক্ষ্য ক'রে আমার এ উক্তি নয়, জগতে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে যা হয়েছিল, হচ্ছে ও হবে সেইটাই আমার বক্তব্য। যদি হঠাৎ লোকের উপর একটা খুব উজ্জ্বল আলো পড়ে তখন সে অন্ধকার দেখে, তার কিছুক্ষণ পরে সেই আলোর জ্যোতিঃ চোখে সয়ে গেলে সে তার কদর বুঝতে পারে। মনীষীদের স্বরূপটা ঠিক অতি উজ্জ্বল আলোরই মত। একথা আমি বলি না যে অতীতে যা হয়েছিল বা বর্ত্তমানে যা হচ্ছে আমাদের তারই নকল করতে হবে। লোক শিক্ষিত হ'লে মনীষীদের নূতনের বাণী বুঝবার যে সময়ের ব্যবধান এটা ক্রমে কমে যাবে।

এক জন স্রষ্টা মনীষী ও সেই সঙ্গে যদি এক জন সমান-ধর্ম্মা সমঝদার জন্মান তবে হয় মণিকাঞ্চনের যোগ। স্রষ্টা তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভায় যেটা সৃষ্টি করবেন সেটা কথাশিল্প, রূপশিল্প বা সুরশিল্প হ'তে পারে ও সধর্ম্মী সমঝদার সেই স্রষ্টার রচনার সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রে নিখিল জাতিকে আহ্বান করবেন তাঁর পূজার জন্য। যদি তখন কেউ সাড়া না দেয় তো বুঝতে হবে জাতি ঘুমচ্ছে, আর যদি দু-এক জনও বেরিয়ে আসে তখন আর জাতিকে সুপ্ত বলা যাবে না।

আমাদের ভারতীয় রূপশিল্পে এই মণিকাঞ্চনের যোগ হয়েছে। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলাল বসু তাঁর মোহিনী তুলিকায় অপূর্ব্ব রূপ সৃষ্টি করছেন, আর আপনি ভারতের আধুনিক শ্রেষ্ঠ শিল্প-রসিক তাঁর সৃষ্টির সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করেছেন। জাতিকে আপন শিল্পগুরুর পূজার জন্য আহ্বান করেছেন, সাড়াও আসছে—হয়তো আশানুরূপ হয় নি। সেই জন্য আশানুরূপ ফল পেতে হ'লে চাই প্রচার ও সংবদ্ধ অনুষ্ঠান। ভারতে শিল্পীদিগকে শিক্ষা দেবার জন্য অনেক ছোট বড় শিল্পবিদ্যালয় ও সমিতি আছে কিন্তু রূপ-তৃষ্ণা জাগাবার বা সেটাকে আলোচনা ক'রে বৃদ্ধি করবার কোন সমিতি আছে ব'লে আমার জানা নেই। আমার মনে হয় এইরূপ একটি সমিতি থাকলে আহ্বানের কাজ সরল হবে।

এই সমিতির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ নিম্নলিখিতরূপে হবে।

১। এই সমিতি শিল্পী ও সাধারণের মধ্যে মিলন সাধনের জন্য চেষ্টা করবে ও যত দূর সম্ভব শিল্পীর সৃষ্টির সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রে দেবে।

২। এই সমিতি সভা ক'রে ও শিল্পী বা শিল্প-রসিক দ্বারা ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন ক'রে লোকের রূপপিপাসা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করবে।

৩। এই সমিতি রূপশিল্প সম্বন্ধে পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ, জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় ও বিতরণ ক'রে জনগণের মধ্যে রূপশিল্প সম্বন্ধে আন্দোলন করবে।

আপনার সময় আর নষ্ট করব না। যদি আমার এই প্রস্তাব ভারতীয় শিল্পীদের প্রতিভার নগদ সম্মান দেবার কিছু ব্যবস্থা করতে পারে তো নিজেকে ধন্য ব'লে মনে করব। এই বিষয়ে আপনার মত জানালে বাধিত হব। ইতি ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩৮

বিনীত

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধু,

আপনার ৪ঠা তারিখের চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে যেন আমাদের আলোচ্য সমস্যাটির সম্মুখীন হয়ে সমাধান করতে আর আমাদের সাহস হচ্ছে না,—তাই একটু পার্শ্ব দিক থেকে আক্রমণের চেষ্টা হচ্ছে।

কবি, শিল্পী ও সাধকদের সমান-ধর্ম্মা ও গুণগ্রাহী লোক সব সময় তাঁদের জীবিতকালে পাওয়া যায় না. কিন্তু পাওয়া যাবে না, এমন কোনও নিয়ম নেই; অনেক সময়েই পাওয়া যায়। ইতিহাসে বহুল দৃষ্টান্ত আছে, যে, বহু সমসাময়িক সাধকদের আদর হয়েছে তাঁদের জীবিতকালে। যেমন বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব ও হজরত মহম্মদ। এই ক্ষেত্রে কেবল যিশুখ্রীষ্টের দৃষ্টান্তই নিয়মের ব্যতিক্রম। গ্যালিলিওর সমসাময়িক সম্মান লাভ হয় নি, কিন্তু নিউটন, এডিসন, আইনষ্টাইন ও স্যর্ জগদীশ বসু, সমসাময়িক কর আদায় ক'রে নিয়েছেন, বাকী বকেয়া প'ড়ে নেই। সেক্সপীর ও গয়টে, মিল্টন ও বাইরন্ শেলী ও টেনিসন্, ভাষ ও কালিদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ইয়েটস্ ও কার্দুচী, রবীন্দ্রনাথ ও নোগুচী নগদ বিদায় পেয়েছেন,—কেবল চ্যাটার্টন্ ও ব্লেক ও এই রকম ২।৪ জন কবিকেই ভবিষ্যৎ সমঝদারের ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপিয়ে যেতে হয়েছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা সমসাময়িক সম্মান পান নি, তাঁদের চেয়ে, যাঁরা সমসাময়িক পূজা পেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাই বেশী। সেজান্ ও মাতীশ্ সমসাময়িক সিন্নীর অভাবে প্রাণত্যাগ করেছেন, কিন্তু পনর-ষোল শতকে, ইতালীয়

নবযুগের ও পরবর্ত্তী কালের উচ্চ-শিল্পীদের প্রায় সকলের ভাগ্যেই ভরপুর ভোজ মিলেছে। সুতরাং কবি, শিল্পী ও সাধকদের ভাগ্যে সমসাময়িক পূজা প্রাপ্তিটাই সাধারণ নিয়ম, নিয়মের ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত খুব বেশী নয়। অনেক অযোগ্য কবি ও শিল্পী তাঁদের রচনার আশানুরূপ মূল্য না পেয়ে, নাকিসুরে কেঁদে, ভবিষ্যতের সমান-মর্য্যাদের দোহাই পেড়ে, আত্মসম্মান বাঁচাতে চেষ্টা করেন; এবং সাধারণতঃ, সমসাময়িক-সমাজ প্রতিভার যথার্থ আদর করতে অসমর্থ, এইরূপ একটা দাবী প্রচার করতে চেষ্টা করেন। এই দাবীর মূলে কতটা সত্য আছে তা বিচারসাপেক্ষ। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যে বড়দরের সাধক, বড়দরের কবি, বড়দরের শিল্পীদের ভবিষ্যতের আশায় থাকতে হয় নি সমসাময়িক ভক্তদের মালাচন্দন তাঁরা পেয়েছেন। বর্ত্তমান যুগে, উৎকৃষ্ট প্রচার-নীতির মাহাত্ম্যে, নানা দৈনিক ও মাসিক সাহিত্যের বিজ্ঞাপনের দাপটে ও ছাপাখানার দৌরাত্ম্যে,—প্রকাশের রৌদ্রালোকে, প্রতিভাসুন্দরীদের অবগুণ্ঠনের মধ্যে আত্মগোপন করা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং এই অতিপ্রচার ও সস্তা শিক্ষার যুগে যদি কোনও ক্ষেত্রে যথার্থ প্রতিভার আদর না হয়, তা হ'লে সমাজের শিক্ষার অভাব এই কথাই বলব, প্রতিভার দোষারোপ করব না। বিলাতী ছাপাখানা ও প্রকাশকদের অনুগ্রহে, আমাদের দেশের অনেকের মুখেই সমসাময়িক য়ুরোপীয় সাহিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও স্তবস্তুতি সর্ব্বদাই শুনতে পাই। কেবল সমসাময়িক ভারতীয় জাতীয় শিল্পীদের রচনাই আমাদের শিক্ষাভিমানী স্বরাজকামীদের অবগতির গণ্ডীর বাইরে, এই কথাটা বিশ্বাস করতে 'আমি প্রস্তুত নই'। ভারতের নব্যতন্ত্রের রূপের নূতন পূজারীদের সাধনার গুণগান ও প্রচার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয়েছে। দেশের লোক বিশেষ কিছু সাড়া দেয় নি।

দেশের রূপতৃষ্ণা জাগাবার জন্য অনেক সমিতি আছে। এক কলিকাতা শহরেই দুটি কলা-সংসদ্ আছে। ভারতীয় প্রাচ্য কলা-সংসদ্ আজ প্রায় ৩০ বৎসর ধ'রে সমসাময়িক চিত্রশিল্পীদের জয়ঢাক বাজাচ্ছেন, কিন্তু দেশের নায়করা ও স্বারাজ্যের মুরুব্বীরা শিল্পের স্বারাজ্যে অদ্যাবধি বধির। কলিকাতার প্রাচ্যকলা-সংসদ্ সভ্যের অভাবে, উৎসাহের অভাবে, ও চাঁদার অভাবে মৃতপ্রায়। আপনি আপনার প্রস্তাবিত নূতন সমিতির জন্য যে তিনটি কর্ম্মতালিকার নির্দ্দেশ করেছেন—কলিকাতার ঐ [প্রা]চ্যকলা সমিতি এই তিনটি দফার কর্ত্তব্য নিদারুণ অর্থাভাব সত্ত্বেও প্রাণপণে প্রতিপালন করেছেন। এই শত শত কুবেরের বাসস্থান কলিকালের অলকাপুরী কলিকাতা নগরীতে শিল্প-সাধনা ও আলোচনার উৎসাহী মাত্র ৭০ জনের বেশী সভ্য ঐ প্রাচ্য-কলা-সংসদ্ আজ ৩০ বৎসর চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারেননি।

অলমতিবিস্তরেণ। শিল্প ও শিল্পী মরুক! কংগ্রেসের জয় হউক! শিল্প-হীন, কলা-বিহীন ডালভাতের স্বরাজ্য শিল্পের নির্ব্বাক্ সমাধির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হউক! সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের হুকুমের প্রতিধ্বনি করিয়া বলি, "শিল্প ও শিল্প-সাধকদের সমাধি এইরূপ গভীর গহ্বরে প্রোথিত হউক,—যাহাতে তাহাদের আর্ত্তনাদ ও করুণ ক্রন্দন কংগ্রেসী কত্রপদের কর্ণ-কুহর পীড়িত না করে, অর্থনীতির স্বারাজ্যের শান্তির ব্যাঘাত না করে!" ৯ আগষ্ট ১৯৩৮

ভবদীয়

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দক্ষিণা

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

ভিখারীর ভীরুতারে বক্ষোমাঝে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
দাক্ষিণ্যের দক্ষিণারে কুড়ায়ে কুড়ায়ে চলি পথে,
স্বপ্নময়ী উড়ে চল স্বপ্নথর তব মনোরথে—
করুণা-কৃপণা তুমি, নাহি চাও পিছনে ফিরিয়া।

সেদিন গোধূলি-লগ্নে ফুটেছিল আকাশের তারা!
সে-তারার মায়াস্পর্শ তব মনে ফুটাল প্রসূন;
সহসা কহিলে ধীরে,—"যাবেন না, একটু বসুন,"—
সে তব সুরের সুরা পান করি' হনু আত্মহারা।

জানি সখি, এও তব ক্ষণিকের খেয়ালের খেলা,
তবু এ তোমারি গড়া বাসনার লীলা-প্রজাপতি;
রঙের বাহার নিয়ে আকাশেতে উড়ে মৃদুগতি,
ধরিতে পারি না তবু তারি পিছে কাটে মোর বেলা।

সুগভীর প্রেম নহে, নহে সখি নিবিড় প্রণয়,
কৈশোর-সরসী-নীরে ফোটে রাঙা চিত্ত-শতদল
তাহাও চাহি না সখি, প্রিয়তমে দিয়ো সে-কমল;
আমার কামনা শুধু প্রেমের যা লঘু অপচয়।

পূর্ণপাত্রে লোভ নাই, শুধু যাহা উথলিয়া পড়ে
তাহারি মদিরালুব্ধ চিত্ত মোর সুখ-স্বপ্ন গড়ে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জগৎ-"প্রগতি"র একটা দিক্

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্য-সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন ধারা পরিণতিতে পৌছিতে অনেক সময় শত শত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে—যদিও হয়ত লিখিত ইতিহাসের পাতায় সে-সব বিষয়ের বর্ণনা খুবই অল্পের মধ্যে শেষ করা হইয়াছে। যথা, প্রাচীন ইতিহাসে আর্য্য জাতির অভিযান। কথিত আছে, আর্য্যেরা মধ্য-এশিয়া হইতে যাত্রা করিয়া দূরদূরান্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে বহু শত বৎসর লইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই বিজয়-অভিযানের অন্তর্ভূত সকল কথা জানি না। মোটামুটি জানি যে, তাঁহারা এই এই দেশ অধিকার করিলেন বা তাঁহাদের তৎকালীন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এই প্রকার ছিল। খুঁটিনাটি খবর বা ঘটনাবলীর কথা আমরা জানি না; যেমন তাঁহাদের মধ্যে কে কবে কি যুদ্ধ করিলেন, কে কি ভাবে মরিলেন; অথবা কোন্ শহর ধ্বংস হইল বা গঠিত হইল ইত্যাদি। সময়ের ক্ষেত্রে আমরা দূর হইতে ইতিহাসের আসল কথাটাই ভাল করিয়া দেখি; আপাত-দৃষ্টিতে হয়ত তাহার যথার্থ রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে না।

আধুনিক জগতে যে-সব ঘটনা আমাদের চারি দিকে নিত্য ঘটিতেছে, সে-সব ঘটনার শেষ পরিণতি কি, বা মানুষের ইতিহাসে তাহার প্রকৃত মূল্য কি দাঁড়াইবে, তাহা আমরা হঠাৎ বলিতে পারি না। কোন্ ঘটনাটি নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ আর কোন্‌টি বা বৃহত্তর কোন প্রগতির আংশিক প্রকাশ বা প্রতিচ্ছায়া, এ বিচার করা সহজ নয়। তাই সমসাময়িক ইতিহাসের আলোচনা দুরূহ ও জটিল। তাহার প্রকৃত রূপ ভবিষ্যতের অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া থাকে।

চীন ও জাপানের মহাযুদ্ধ ধরা যাউক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইহা জাপানের জগৎসাম্রাজ্য-বিস্তারের একটি অংশ। হয়ত ভবিষ্যতে জাপানের সাম্রাজ্য সর্ব্বগ্রাসী ও বিরাট্ রূপ ধারণ করিবে। চীনের হয়ত আর কোন অস্তিত্বই থাকিবে না। হয়ত বা জাপানের সঙ্গে সংঘাতে চীনের জাগরণ এত ভাল করিয়াই হইয়া যাইবে যে, চীন নিজের শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া লইয়া জাপানকেই অবশেষে গ্রাস করিয়া বসিবে। চীনের এই জাতীয় জাগরণ হয়ত বা তাহাকে পৃথিবীর মধ্যে প্রবলতম করিয়া তুলিবে—কে বলিতে পারে? জাপানের ক্যাণ্টন অধিকার চীনের স্বাধীনতার অবসানের পূর্ব্বাভাস অথবা তাহা চীনের মহাজাগরণ ও জাপানেরই পতনের প্রথম দৃশ্য, এ কথার উত্তর কে দিতে পারে? একটা কথা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। চীন-জাপানের সংঘাতের ফলে কোন-না-কোন একটা মহাশক্তি সুদূর প্রাচ্যে জন্মলাভ করিবে। এই মহাশক্তি চীন বা জাপান হইবে, এ-কথা এখনও বলা যায় না। এ-কথা অবশ্য বলা চলে যে, এই অজানা মহাশক্তির গঠন সম্পূর্ণ হইলে পরে সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকান ও ইউরোপীয় শক্তি আর পূর্ব্বের মত অবাধ ও অপ্রতিহত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হইবে না। এই মহাশক্তি রুশিয়ার সহিত সখ্যে সোশিয়ালিষ্টিক নীতিবাদ মানিয়া চলিবে, অথবা ফাসিষ্টশক্তি রূপেই গড়িয়া উঠিবে, এ-কথাও এখনও অজানা। এটা বেশ বোঝা যায় যে, এ-প্রশ্নের উত্তরের উপরেও জগতের ইতিহাসের ভবিষ্যৎ ধারা বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। জাপানের শক্তি সমুদ্রতটে অপ্রতিহত। কিন্তু ক্রমশঃ চীনের ভিতরে জাপানের সেনাদল অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধকার্য্য কঠিন হইয়া উঠিবে, ক্রমাগত যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া চলিবে, ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন খণ্ডযুদ্ধ বা "গেরিলা ওআর" চলিতে থাকিবে। ইহাতে জাপানের সেনা ও অর্থবল বিশেষ ভাবে আহত হইবে। অথবা হয়ত জাপান চীনের ভিতরে আর অগ্রসর না-হইয়া কিছু দূর অবধি অধিকার করিয়া একটি দ্বিতীয় বৃহৎ প্রাচীর ("গ্রেট

ওআল") বা "মাজিনো লাইন" গঠন করিয়া সমুদ্রতটবর্ত্তী চীনদেশের উপরে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকিবে; ভিতরে স্বাধীন চীন ভবিষ্যৎ সুযোগের অপেক্ষায় বিফল আক্রোশে ছটফট করিতে থাকিবে। চীন-জাপান যুদ্ধের বিষয় ইহার অধিক কিছু বলা চলে না।

ইউরোপে মধ্যযুগের মত আবার ইহুদীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকে জার্মেনী ও ইটালী ইহুদীবিদ্বেষ-ব্যাপারটাকে প্রায় একটা প্রবল "ধর্ম্ম"-মতের মতই হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে ও অপর দিকে ইংলণ্ড ইহুদীদের নিজেদের রাজত্ব গড়িয়া লইবার সকল সুযোগ দান করিবার জন্য প্যালেষ্টাইনে বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। ইহুদীদিগের ভবিষ্যৎ কি হইবে, ইহার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। ইহুদীরা অর্থবলে বলীয়ান্ ও তাহারা জগতের প্রায় সকল দেশেই প্রভাবশালী। তাহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা যে কি রূপ ধারণ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত এই ইহুদী-প্রশ্নের সমাধানের জন্যই জগতে আর একটা মহাযুদ্ধের সূচনা হইবে। প্যালেষ্টাইনের বিবাদে আরবদিগের প্রতি জার্ম্যান ও ইটালীয়দিগের সহানুভূতি আছে। এই সহানুভূতি কত দূর অবধি চলিবে, কে বলিতে পারে। আমেরিকায় ইহুদীদিগের প্রভাব প্রবল। আমেরিকা ইহার ফলে কত দূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহাও বিচার-সাপেক্ষ ও তাহার উপর ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতি অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। জার্মেনী ও ইটালী দুনিয়াকে বিশ্বাস করাইতে চায় যে, তাহাদের সমরশক্তি অপর সকল জাতির সম্মিলিত সমরশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। ইটালী আবিসীনিয়ার নিরস্ত্র ও স্বল্পাস্ত্র অধিবাসীদের পরাস্ত করিয়া সে দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। ইহাতে ইটালীর সমরশক্তির কোন প্রকৃষ্ট বিচার হইতে পারে না। জার্মেনী এখন অবধি তাহার নবগঠিত সমরশক্তির কোন সাক্ষাৎ-পরিচয় দেয় নাই। জার্মেনীর অষ্ট্রিয়া দখলটা বিনাযুদ্ধে হইয়া যায় ও চেকোস্লোভাকিয়ার নিগ্রহও গলাবাজি ও কাগজে কলমেই সম্পন্ন হইয়াছে। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, জার্মেনী ও ইটালীর আস্ফালনের একটা ফল এই হইয়াছে যে, ইউরোপ ও আমেরিকার সকল শক্তি যুদ্ধের আশঙ্কায় দ্রুতগতিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ফলে, যদিবা কোন সময় জগতের সকল জাতি জার্মেনী ও ইটালী অপেক্ষা দুর্ব্বল ছিলও, তা বর্ত্তমানে সে দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে ও তাহার পরিবর্ত্তে জগদ্ব্যাপী এক "সাজ সাজ" সাড়া পড়িয়া গিয়া, সকলেই যথাসাধ্য অস্ত্র ও সৈন্যবল বাড়াইয়া চলিতেছে। মিউনিখে জার্মেনী অবশ্য জগতের শান্তিপ্রিয়তার সুযোগে নিজের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইয়াছে, কিন্তু সে শান্তিবাদ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে এবং সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে অপর জাতিরাও কার্য্যক্ষেত্রে তলোআরের পায়তারা কষিয়া জার্মেনী ও ইটালীকে শান্তিবাদের প্রশস্ততা বুঝাইতে আরম্ভ করিবে।

—

কামাল আতাতুর্কের বৈশিষ্ট্য

মহাযুদ্ধের পরে যে চারি জন জননেতা পৃথিবীর জাতি-মণ্ডলীতে সর্ব্বাপেক্ষা সাড়া পড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু সম্প্রতি হইয়াছে। এই চারি ব্যক্তি রুশিয়ার নেতা লেনিন, তুরস্কের মুস্তাফা কামাল পাশা বা কামাল আতাতুর্ক, ইটালীর মুসোলিনী ও জার্মেনীর হিটলার। নব রুশিয়ার নব রাষ্ট্রধর্ম্মের পুরোহিত লেনিনের মৃত্যু অনেক দিন পূর্ব্বেই হইয়াছে। সম্প্রতি কামাল পাশার মৃত্যু হইয়াছে। কামাল পাশা যৌবনে বিপ্লববাদী ছিলেন ও মহাযুদ্ধের সময়ে যোদ্ধা ও জননেতারূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। মহাযুদ্ধের পরে তুরস্কের অবস্থা খুবই খারাপ হইত যদি-না কামাল পাশা তাঁহার অদম্য উৎসাহ, কর্ম্মশক্তি ও সাহসের জোরে বহু শত্রুর দমন করিয়া তুরস্ককে নূতন সাজে জাতিসভায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করাইতেন। তিনি তুর্কদের অল্প সময়ের মধ্যেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র অবস্থা হইতে তুলিয়া আনিয়া আধুনিক অগ্রগতির পথে উপস্থাপিত করেন। আজ তুর্কদের দেশে যে নারীদের উন্নতি ও শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস, কারখানা প্রভৃতির প্রসার হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে কামাল আতাতুর্কের কর্ম্মশক্তির জোরেই সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে এক

ব্যক্তির প্রতিভায় কোন জাতি এতটা উন্নতি করিতে পারে নাই। কামাল আতাতুর্কের আর একটা মহাগুণ এই ছিল যে, তিনি একবার নিজ জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া তৎপরে সামরিক নীতি ত্যাগ করিয়া জাতীয় উন্নতির জন্তই নিজের সকল শক্তি নিয়োগ করেন। লুণ্ঠননীতি বা সাম্রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি অন্যায়ের পথে তিনি নিজ জাতিকে চালাইতে চেষ্টা করেন নাই। কোন জাতির উন্নতি যে তাহাদের নিজের জীবন-যাত্রা ও কার্য্যকলাপের উপরেই নির্ভর করে এবং প্রকৃত জাতীয়তা যে আত্মোন্নতির মধ্যেই নিহিত, কামাল আতাতুর্ক এ-কথা উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আজ তুর্ক মেয়েরা অবরোধ-প্রথা ত্যাগ করিয়া জাতীয় জীবনে পূর্ণভাবে যোগদান করিতেছেন। চাষবাস, কারবার প্রভৃতিতে তুর্করা অগ্রণী। বিজ্ঞান-চর্চ্চা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, এবং শিক্ষা- ও সমাজ-সংস্কারে তুর্করা দুনিয়ার যে-কোন জাতির সমকক্ষ। এই সকলেরই মূলে ঐ একটি মহাপুরুষ কামাল আতাতুর্ক।

—

আকাশভ্রমণের উপক্রমণিকা

পৃথিবীতে আজকাল শুধু একটা কথা সকলে খুব বেশী করিয়া আলোচনা করিতেছেন। কথাটা জাতির সমর-শক্তির বৃদ্ধি। সকল জাতিই নিজ নিজ সমরশক্তি বাড়াইবার চিন্তা করিতেছেন ও এই কার্য্যে সকলেই একাগ্র-চিত্তে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন। আধুনিক সমর-কৌশলের মধ্যে আকাশযুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা আশুফলপ্রদ। আকাশযান নির্ম্মাণ ও আকাশযান চালন এবং বিমানযোদ্ধাবাহিনী গঠন সকল জাতির প্রধান চিন্তা। যাহাতে বিমান-যোদ্ধা যথেষ্ট পাওয়া যায়, সেই জন্ম সকল জাতিই নিজ নিজ দেশবাসীর মধ্যে বিমান-চেতনা বা "এআর-মাইণ্ডেডনেস" জাগ্রত করিবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডে বা জার্ম্মেনীতে স্কুলকলেজের ছেলেরাও এঞ্জিনবর্জ্জিত "গ্লাইডার"-যানে আকাশ-ভ্রমণ শিক্ষা করিতেছে। পাখী যেমন ডানা না নাড়িয়া কখনও কখনও বহুক্ষণ আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়, গ্লাইডারেও তেমনই গ্লাইডার-চালক বহুক্ষণ আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। ইহা নিরাপদ ও সস্তার খেলা। জার্ম্মেনী, ইটালী ও অপরাপর দেশে চেষ্টা হইতেছে গ্লাইডারে আকাশ-ভ্রমণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বাইসিক্ল-চড়ার মতই সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তোলা। আমাদের দেশেও কোথাও কোথাও এই চেষ্টা হইতেছে। ইহা খুব প্রয়োজনীয় ও ভারতে সর্ব্বত্র এই খেলার বিস্তার হওয়া আবশ্যক।

—

অ-রাজনৈতিক সাক্ষাৎকার ?

সহকারী ভারতসচিব কর্ণেল মিউরহেড ভারতভ্রমণে আসিয়াছেন। বলা হইয়াছে, তিনি কোন রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন নাই—কিন্তু অবশ্য তীর্থ করিতেও আসেন নাই। খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে রোমান কাথলিকেরা তীর্থদর্শন করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের তীর্থগুলি ভারতবর্ষে অবস্থিত নহে, এবং, আমরা যত দূর জানি, মিউরহেড সাহেব রোমান কাথলিক নহেন।

তিনি কোন রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে না আসিয়া থাকিলে কি মতলবে আসিয়াছেন ? দেশ দেখিতে আসিয়াছেন ? ভারতবর্ষের নিজস্ব গৌরবের বস্তু প্রাচীন কালের। কিন্তু তিনি ভারতের পুরাকালের কীর্ত্তি বা ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বেড়াইতেছেন না। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিতের কোন পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করেন নাই। মধ্যযুগের এবং ঠিক প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগের সন্ধান লইতে হইলে অন্ততঃ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই প্রভৃতি ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন বলিয়া কাগজে খবর বাহির হইত। তাহা হয় নাই।

আধুনিক সময়ে ভারতবর্ষ সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সুকুমার শিল্পে, এবং বোধ হয় দর্শনেও কিঞ্চিৎ নূতন কাজ করিয়াছে বটে; কিন্তু সাহিত্যে ও সুকুমার শিল্পে ভারতবর্ষের আধুনিক কৃতিত্ব বিষয়ে কিছু ধারণা করিতে হইলে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এবং কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত দেখা করা আবশ্যক হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে আধুনিক ভারতের কৃতিত্বের খবর লইতে হইলে কলিকাতায় বসুবিজ্ঞান মন্দিরে

একবার আসা আবশ্যক, এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সর্ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্‌, ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎকার নিষ্প্রয়োজন বিবেচিত হয় না। দর্শনের খবর লইতে হইলে সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতির খোঁজ লইতে হয়। যদি ভারতবর্ষে আধুনিক কলকারখানার বিস্তার ও উন্নতি কিরূপ হইতেছে জানিতে হয়, তাহা হইলে এদেশের সকলের চেয়ে বড় কারখানা জামশেদপুরে টাটার লোহা ও ইস্পাতের কারখানা সকলের আগে দেখা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও অনেক রকম কাজ হয়। শিক্ষার অবস্থা জানিতে হইলে সেগুলি দেখিতে হয়।

কিন্তু মিউরহেড সাহেব যত ঘোরাফেরা করিতেছেন, যত মানুষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতেছেন, যত স্থান দেখিতেছেন, সে সকলের মধ্যে উপরে যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহার কোন উল্লেখ দেখিতেছি না। অথচ মিউরহেড সাহেবের ভারতবর্ষ পরিক্রমার কোন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাখ্যা করা চলিবে না।

আমাদের কিন্তু মনে হয়, সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে তিনি এদেশের রাজনৈতিক 'পরিস্থিতি' (situation) বুঝিতে আসিয়াছেন। তাহার কিঞ্চিৎ কারণ বলি।

তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত কোন বা কোন-কোন (অজ্ঞাত) বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। তাহা যে কি, মানবজাতির মধ্যে তাহা মহাত্মা গান্ধী ও কর্ণেল মিউরহেড জানেন ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। মুলাকাতের সময় সরেজমিনে তৃতীয় কোন ব্যক্তি, এমন কি গান্ধীজীর খাস মুন্‌শীও, উপস্থিত ছিলেন না। ব্যাপারটা গোপনীয় না হইলে এত সাবধানতা অবলম্বিত হইত না। খুব গোপনীয় জিনিষ সাধারণতঃ হইয়া থাকে, (১) প্রেমসম্ভাষণ, (২) রাষ্ট্রনৈতিক ষড়যন্ত্র, (৩) নিগূঢ় রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা, ইত্যাদি। ১ নংটি বাদ দিতেই হইবে। মহাত্মা গান্ধী বিদ্রোহী ও বিপ্লবী বটে ; কিন্তু তিনি ও তাঁহার অন্যতম প্রধান সহকর্মী পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, কংগ্রেসের কোন গোপনীয় অভিসন্ধি নাই, সমস্তই "প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র" ("open conspiracy")। আর, যদি ষড়যন্ত্র করিতেই হয়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিকদের নেতা গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম সরকারী কর্মী সহকারী ভারতসচিবের সহিত ষড়যন্ত্র কেন করিবেন ?

তবে ব্যাপারটা যদি সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয়, তাহা হইলে রহস্যটা কিছু বুঝিতে পারা যায় বটে। এবং তাহা হইলে গান্ধী-মিউরহেড-সংবাদটা উপরে লিখিত দু-নম্বর ও তিন নম্বরের মিশ্রণসম্ভূত মাঝামাঝি কিছু হইতে পারে। অর্থাৎ, মিউরহেড হয়ত বুঝিতে চাহিয়াছিলেন, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কি করিলে গান্ধীজী কংগ্রেসকে ব্রিটিশমার্কা ফেডারেশ্যন চালু করিতে রাজী করিতে পারেন, এবং গান্ধীজী জানিতে চাহিয়াছিলেন, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট স্বাজাতিক (Nationalist) ভারতীয়দের দাবী কতটা মানিয়া লইতে পারেন। এরূপ জিনিষকে ষড়যন্ত্র ও আলোচনার মাঝামাঝি গোছের মিক্শ্চার বলাতে কাহারও চটিবার কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের বামপন্থীরা এবং সমাজতন্ত্রীরা (socialists) ও ধনসাধারণ্যবাদীরা (communists) বিলাতী ফেডারেশ্যনটার নামেই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া থাকেন, এবং কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ত তাহার বিরুদ্ধে ক্রমাগত বক্তৃতা করিতেছেন। এমন অবস্থায়, যদি কেহ কোন প্রকার রফার আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাহাকে ষড়যন্ত্র বলিলে দোষ হয় না। এবং আমরা যে ষড়যন্ত্র কথাটা এপ্রকার রফার আলোচনা বুঝাইতে এখানে ব্যবহার করিতেছি, তাহাও অন্য উপযুক্ত শব্দের অভাবে।

দেখিতেছি, মিউরহেড সাহেব সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁহার দাদা শরৎচন্দ্র বসুর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এবং কাগজে বাহির হইয়াছে যে, এই মুলাকাতের সঙ্গেও রাষ্ট্রনীতির কোন সম্পর্ক নাই।

গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন তাহা বাদ দলেও তিনি যে এক জন অসাধারণ মানুষ হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীতে তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তির প্রধান কারণ যে তাঁহার রাজনৈতিক মত ও কার্য্য, সে-বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে কৃতিত্ব বাদ দিলে, তাঁহার অন্যবিধ গুণাবলী ভারতে

অতুলনীয় নহে। শরৎ বাবু ও সুভাষবাবু রাজনীতিক্ষেত্রে কিছু না করিলে নগণ্য হইয়া থাকিতেন, এমন নহে। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, রাজনীতিচর্চ্চা তাঁহাদিগকে যে উচ্চস্থান দিয়াছে, তাঁহাদের সম্ভাবিত অন্য কোন কৃতিত্ব তাঁহাদিগকে সে উচ্চস্থান হয়ত দিত না। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহাদের কৃতিত্ব বাদ দিলে, তাঁহাদের অন্তবিধ কৃতিত্বের তুলনা বাংলা দেশে দুর্লভ নহে।

সুতরাং ভারতবর্ষে অরাজনৈতিক নানা কার্য্যক্ষেত্রে বিখ্যাত এত লোক থাকিতে মিউরহেড সাহেব রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিখ্যাত লোকদেরই সঙ্গে অরাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা কেবল খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া দেখাসাক্ষাৎ করিতেছেন, ইহাই সর্ব্বসাধারণকে মানিয়া লইতে বলা হইতেছে।

কিন্তু উপরে লিখিত সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিলে, মিউরহেড সাহেব যে রাজনীতিক্ষেত্রেই সমধিক প্রসিদ্ধ গান্ধীজী, সুভাষবাবু ও শরৎবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহার সহিত রাজনীতির কোনই সম্পর্ক নাই, বুঝা বা বিশ্বাস করা কঠিন।

—

মিউরহেড সাহেবকে বাংলার অসন্তোষ জানান

ভারতবর্ষের বড়কর্ত্তা ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডকেও যদি বঙ্গে অসন্তোষের কথা বার-বার জানান হয়, তাহা হইলেও কোন ফল হইবে না। ফল হইত যদি বাঙালীরা ইংরেজ বণিক্‌দের আর্থিক ক্ষতি ঘটাইতে পারিত, যেমন ক্ষতি তাহারা ঘটাইতে পারিয়াছিল বঙ্গবিভাগ-জনিত স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন দ্বারা। তখন শুধু বাঙালীরা নহে, ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন প্রদেশের লোকেরাও বাঙালীদের প্রভাবে স্বদেশী ও বয়কট প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছিল। এখন শুধু অসন্তোষ জানাইলে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা অল্পই, কিন্তু অসন্তোষ মোটেই নাই এরূপ ধারণা উৎপন্ন হইতে দিলেও তাহাতে ক্ষতি আছে।

আমরা মনে করি, মিউরহেড সাহেব নিজের চোখে দেখিয়া ও নিজের কানে শুনিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়া যাইবেন, তাহা লর্ড জেটল্যাণ্ডকে ও বিলাতের অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে জানাইবেন। বাংলা দেশের সম্বন্ধে তাঁহার যদি এই ধারণা হয় যে, নূতন ভারতশাসন-আইন দ্বারা অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা তাহারই ক্ষতি খুব বেশী হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালীরা খুব খুশী আছে, তাহা হইলে এই মিথ্যা ধারণার ফল ভাল হইবে না। বাংলার গবর্ণর লর্ড ব্র্যাবোর্ন সহকারী ভারতসচিবকে উপযাচক হইয়া ত বলিবেনই না, জিজ্ঞাসিত হইলেও বলিবেন না যে, বঙ্গে অসন্তোষ আছে। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তিটা সম্বন্ধে কথায় "না-গ্রহণ না-বর্জ্জন" নীতি কিন্তু কার্য্যতঃ "গ্রহণ" নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং সুভাষবাবু বা অন্য কোন কংগ্রেসী নিশ্চয়ই মিউরহেড সাহেবকে জানান নাই যে, বঙ্গের হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তিটাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আছে এবং তাহা শুধু অবিচার মনে করে না, অপমানকর শাস্তিও মনে করে। শরৎবাবুও একথা মৌখিক বা চিঠির মারফত সহকারী ভারতসচিবকে নিশ্চয়ই জানান নাই যে, সরকারী চাকরীগুলির শতকরা ৬০টি মুসলমানদিগকে দিবার প্রস্তাবে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই শীতের ঠাণ্ডায় লর্ড জেটল্যাণ্ডের সহকারী বুঝিয়া যাইবেন যে, বাংলা দেশের মেজাজ এখন খুবই ঠাণ্ডা। আমরা এই ডিসেম্বর মাসের ১২ই লিখিতেছি বটে—এবং খাঁটি সত্য কথাই লিখিতেছি—যে, বঙ্গে দারুণ অসন্তোষ বিদ্যমান, কিন্তু সাহেব-লোগ্ (ভারতের বা বিলাতের) ত তাহা পড়িবেন না।

—

সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য চাকরী সংরক্ষণ

ভারতশাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকে যে উপদেশপত্র (Instrument of Instructions) দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে সংখ্যালঘুদিগের (অর্থাৎ মাইনরিটিদিগের) স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। সেই ক্ষমতাবলে তাঁহারা সংখ্যা-লঘুদের জন্য শতকরা কিছু চাকরী বরাদ্দ করিতে পারেন। কিন্তু সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠদের (মেজরিটিদের) জন্য চাকরী সংরক্ষণের ক্ষমতা কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। ভারত-শাসন আইনের ২৯৮ ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তিই তাহার ধর্ম্ম জাতি বাসস্থান ইত্যাদির জন্য কোন সরকারী চাকরী বা পেশা আদি হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না। কিন্তু

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাব অনুসারে বাঙালী হিন্দুরা বঙ্গের শতকরা বাটটি চাকরী হইতে বঞ্চিত হইতে পারিবে—অবশ্য যদি গবর্ণর এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন (যাহা করিবার ক্ষমতা আইন অনুসারে তাঁহার নাই)।

বঙ্গের সরকারী চাকরীগুলার ভাগ এই প্রকারে হইলে বাঙালী হিন্দুরা (বিশেষতঃ যাহাদিগকে উচ্চ জাতির হিন্দু বলা হয় তাহারা) যেমন এক দিকে ব্যবস্থাপক সভায় ক্ষমতাহীন ও প্রভাবশূন্য হইয়াছে, সেই রূপ দেশের রাষ্ট্রীয় সকল বিভাগে প্রভাবহীন হইবে। অর্থাৎ, যাহারা ব্যবস্থাপক সভায় কাজ করিতে যোগ্যতম এবং সরকারী সব কাজের সব বিভাগে কাজ করিতে যোগ্যতম, তাহাদের যোগ্যতার সুবিধা ও সুফল হইতে দেশ বহু পরিমাণে বঞ্চিত হইবে।

চাকরীগুলা গোলামী, এই কথাটা, দেশে যে পরিমাণে স্বরাজপ্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে মিতান্ত বাজে কথা হইবে। যখন দেশে স্বরাজ অল্পও ছিল না, পুরা আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, কেহ কি বলিতে পারেন তখনও সরকারী চাকরেয়েরা দেশের কোন সেবা, কোন কল্যাণসাধন করেন নাই? যে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থকাররূপে দেশভক্ত দেশসেবক ছিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্র কি ডেপুটী রূপে দেশদ্রোহী ও দেশের অনিষ্টকারী ছিলেন? যে রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থকার রূপে দেশের উপকার করিয়া গিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে সেই রমেশচন্দ্রই কি দেশের শত্রু ছিলেন? কবি, নাট্যকার ও সংগীতরচয়িতা ডেপুটী দ্বিজেন্দ্রলাল কি কেবল তাঁহার কবিতা গান ও নাটকের দ্বারাই দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন?

বস্তুতঃ পুরা আমলাতান্ত্রিক যুগেও সৎ সরকারী চাকরেয়েদের দ্বারা কিছু দেশহিত হইতে পারিত ও হইয়াছিল—যদিও মেরুদণ্ডহীন স্বার্থপর সরকারী চাকরেয়েদের দ্বারা অনিষ্টও হইয়া আসিতেছে।

আমরা স্বরাজ চাহিতেছি, স্বরাজ আসিবেও। তখন ভলান্টিয়ারদের দ্বারা কাজ চলিবে না, তখনও সরকারী চাকরেয়েদের দরকার হইবে ও থাকিবে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ত স্বাধীন দেশ। সেখানে কি সরকারী চাকরেয়ে নাই? আছে। না থাকিলে কোন দেশের কাজ চলিত না। আমরা অবশ্য যুবকদিগকে সরকারী চাকরীর উমেদারীই করিতে বলিতেছি না, সব কার্য্যক্ষেত্রের কর্ম্মী হইতে বলিতেছি। কেন-না সরকারী চাকরীর সংখ্যা কম, তাহাতে রোজগারও কম, এবং স্বাধীনতাও কম।

যাঁহাদের সরকারী চাকরী করিবার যোগ্যতা ও ইচ্ছা আছে, তাহা চাওয়া ও পাওয়া তাঁহাদের নিশ্চয়ই উচিত। ধর্ম্মজাতিবর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতমদের সরকারী চাকরী পাওয়া উচিত। ধর্ম্মজাতিবর্ণ অনুসারে চাকরীর বাঁটোআরা হওয়া উচিত নহে। কেহ যদি বলে, হিন্দুদিগকে শতকরা ২০টা ও মুসলমানদিগকে ৮০টা চাকরী দেওয়া হউক, তাহাতে আমাদের যেমন আপত্তি, হিন্দুদিগকে ৮০টা ও মুসলমানদিগকে ২০টা দেওয়াতেও আমাদের সেইরূপ আপত্তি। কোন প্রকার বাঁটোআরা-তেই আমরা রাজী নহি, কেবল যোগ্যতমের নিয়োগে রাজী।

বঙ্গের কংগ্রেস জাতীয় দল এ-বিষয়ে পুস্তিকা-প্রচারাদি দ্বারা আন্দোলন করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন।

—

ফেডারেশ্যন সম্বন্ধে রক্ষা কে চায়?

ইংরেজীতে ও বাংলায়, স্বদেশে ও বিদেশে, আমরা ব্রিটিশ-মার্কা ফেডারেশ্যনের পূর্ণ বিরোধিতা করিয়াছি। অথচ, ইহাও দেখিতেছি যে, কেবল মাত্র প্রাদেশিক আত্ম-কর্ত্তৃত্বে (যদি তাহা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় তাহা হইলেও) ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে না। সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতিরেকে স্বরাজ পাওয়া যাইবে না, রক্ষা করাও যাইবে না। সেরূপ সম্মিলিত চেষ্টার জন্য একটি শক্তিকেন্দ্র, একটি পরিচালনকেন্দ্র আবশ্যক। তাহা ছিল কংগ্রেস। কিন্তু প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব পাওয়ার পর কংগ্রেসের শক্তি কয়েকটি প্রদেশে বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সমগ্রভারতীয় বৃহত্তম উদ্দেশ্য সাধনে কংগ্রেস একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছেন না। ভারতবর্ষের রাজধানীতে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়

ব্যাপারের কেন্দ্রে, যদি কংগ্রেস সমগ্রভারতীয় কার্য্যে মন দিতে পারেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের দ্বারা দেশ যে-ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, যে-যে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, ঈর্ষ্যা ও পরস্পরবিরোধিতা দেখা দিয়াছে, তাহার কিছু প্রতিকার হইতে পারিবে।

ভারতের স্বাজাতিকেরা যেরূপ ফেডারেশুন চান তাহা প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই প্রকার প্রতিকার হইবে না। কিন্তু সে ফেডারেশুন কখন হইবে? কংগ্রেসনেতারা যে রাষ্ট্র-বিধিপ্রণয়ন-পরিষদ্ (Constituent Assembly) চান, তাহার দ্বারা এইরূপ ফেডারেশুনের ব্যবস্থা হইতে পারে বটে। কিন্তু এই পরিষদ্ কখন কাহার দ্বারা আহূত হইবে?

বোধ করি, এই বিষয়ে অনিশ্চয় থাকায় কোন কোন কংগ্রেসনেতার মনে এই চিন্তা উদিত হয় যে, ঠিক বাঞ্ছিত ফেডারেশুন না পাইলেও যদি কতকটা কাজ-চলা গোছ ফেডারেশুন পাওয়া যায়, তাহাও মন্দের ভাল। এই রকম মনোভাব হইতে মান্দ্রাজের, বিহারের ও যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দ্বারা চালু করিবার যোগ্য ফেডারেশ্যনের অনুকূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। যে সকল কংগ্রেসনেতা এইরূপ প্রস্তাব পেশ করান ও করেন এবং তাহার সপক্ষে ভোট দেন, তাঁহারা আপনাদের মত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কিছু বলেন নাই। বিলাত হইতে ফিরিবার পর পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরুও সরকারী ফেডারেশ্যনের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই। এই জন্য আমাদের মনে হইয়াছে যে, কংগ্রেসের মধ্যে অনেক বড় নেতা ফেডারেশুন সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সহিত রফা করিতে অনিচ্ছুক নহেন।

—

কেবল বঙ্গের দুঃখ লইয়া বসিয়া না-থাকা

বঙ্গের কত দিকে যে কত দুঃখ তাহা ভুলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে বলি না। কিন্তু কেবল তাহার কাঁদুনী গাইতেও বলি না! সকল দুঃখের প্রতিকারের চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য।

বঙ্গের যেমন দুঃখ আছে, তেমনই সমগ্র ভারতবর্ষেরও নানা দুঃখ আছে। বঙ্গের নিজের দুঃখ ও অভিযোগ বরাবর থাকা সত্ত্বেও যেমন বাঙালী নেতারা আগে আগে সমগ্রভারতীয় দুঃখের প্রতিকারে মনোযোগী ছিলেন, বাঙালীদিগকে এখনও সেইরূপ সমগ্রভারতীয় দুঃখের প্রতিকারে মন দিতে হইবে। কোন বাঙালী যে তাহাতে মন দিতেছেন না এমন নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে, যেমন অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দুঃখ সত্ত্বেও তাহার প্রতিকারচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতকরচেষ্টাও করিয়াছেন, সেই রূপ আমাদের দেশহিতকর্ম্মীদিগকে বঙ্গের হিত ও ভারতের হিত উভয়েরই চিন্তা ও চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যেরা বঙ্গের দুঃখে কান দেন না বলিয়া অভিমানে ঘরের কোণ আশ্রয় সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্রে যত আমরা অন্যদের সহযোগিতা করিব, বঙ্গের দুঃখ দূরীকরণে তাঁহাদের সহযোগিতা লাভ তত সম্ভবপর হইবে মনে করি। 'বাণিজ্যিক' ভাব হইতে আমরা একথা বলিতেছি না। অন্যেরা আমাদের সহযোগিতা করুন বা না-করুন, আমরা সকলের সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকিব ও করিব। শুধু বাংলাই যে আমাদের দেশ, তাহা ত নয়; বাংলা যে-ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সেই ভারতবর্ষও আমাদের দেশ। বঙ্গের হিত ভারতবর্ষের হিতের উপর নির্ভর করে।

এক রকম অ-বাঙালী ভারতীয় আছে যাহারা মনে করে, বঙ্গের প্রতি কোন প্রকার অবিচারের কথা বলিলে, তাহার প্রতিকার চাহিলে, প্রতিকারচেষ্টা করিলে, তাহা বাঙালীদের প্রাদেশিক সংকীর্ণতা; বঙ্গে জিনিষ বেচিয়া বা বঙ্গে আসিয়া অপর সকলে ধনী হউক কিন্তু বাঙালীরা দরিদ্রতর হইতে থাকুক, এ অবস্থায় বাঙালীরা অসন্তুষ্ট ও প্রতিকারেচ্ছু হইলে তাহা তাহাদের প্রাদেশিকতা। বঙ্গের সংস্কৃতিতে, বাংলাভাষায় ও সাহিত্যে, কিছু উৎকর্ষ আছে বলিলে, তাহা বাঙালীদের প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ও অহমিকা। তাহাদের বিবেচনায়, বাঙালীরা যে সকল বিষয়ে অধম, ইহা মানিয়া লইলে তবে আমরা উদারচিত্ত বলিয়া গণিত হইবার যোগ্য হইব। এরূপ উদারচিত্ত আমরা হইতে

চাই না। অন্য দিকে, বাঙালীরা সব বিষয়ে বড়, তাহাদের কোন বিষয়ে অযোগ্যতা নাই শক্তিহীনতা নাই, কোন দোষ নাই, ইহা আমরা মনে করি না, বলি না। অ-বাঙালীদের যে-যে বিষয়ে উৎকর্ষ আছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত, এবং যথাসাধ্য করিয়াও থাকি।

—

রাজধানীর বাঙালীদের কৃতি

ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী চলিয়া যাওয়ায় বঙ্গের ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিয়া কি লাভ? বর্ত্তমান যে রাজধানী, তাহা বাংলাকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষের অন্য সব অঞ্চলের রাজধানী নহে। দিল্লী ও নয়া দিল্লীতে ভারতবর্ষের অন্য সব অঞ্চলের লোকদের আড্ডা গাড়িবার ও কাজ করিবার যেমন অধিকার আছে, বাঙালীদেরও সেখানে আড্ডা গাড়িবার ও কাজ করিবার সেইরূপ অধিকার আছে।

বস্তুতঃ দিল্লী ও নয়া দিল্লী ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী হইবার আগে হইতেই অনেক বাঙালী সেখানে ছিলেন, অনেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, এবং উহা রাজধানী হইবার পরেও সেখানে কেহ কেহ গিয়াছেন। কতকগুলি বাঙালী রাষ্ট্রীয় কার্য্য উপলক্ষ্যে দিল্লীর অস্থায়ী বাসিন্দা হইয়া থাকেন।

দিল্লীর স্থায়ী ও সাময়িক বাসিন্দা বাঙালীদের কৃতি সম্বন্ধে অন্য সকল বাঙালীদের অবহিত থাকা আবশ্যক, কেন-না দেশের কেন্দ্রে যাঁহারা কাজ করেন, বাঙালী জাতি কতকটা তাঁহাদের দ্বারা অন্যদের নিকট পরিচিত হইয়া থাকেন।

বাঙালী সাহিত্যিক, বাঙালী শিক্ষাব্রতী, বাঙালী শিল্পী এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য বৃত্তি-অবলম্বী যে সব বাঙালী দিল্লীতে আছেন, তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধির সংবাদ পাইলে আমরা প্রীত হই। যাঁহারা সরকারী কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের কর্মদক্ষতার গৌরব অনুভব করি। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে যাঁহারা দিল্লীর সাময়িক অধিবাসী হন, তাঁহাদের কাজের খবর পাইতে ব্যগ্র থাকি। বঙ্গের বাহিরের দৈনিকগুলিতে তাহা বেশী থাকে না। এই জন্য, বঙ্গের দৈনিকগুলিতে তাহার যথেষ্ট সংবাদ পাইবার আশা করা স্বাভাবিক।

অন্য সকল প্রদেশের মত বাঙালীরও নানা প্রকার কার্য্যক্ষেত্র দিল্লীতে থাকা আবশ্যক। বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি কলেজ সেখানে থাকিলে বড় ভাল হয়।

—

ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় ডাকমাশুলের হার

কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল বড়াই করিয়া বলেন, ভারতবর্ষের ডাকমাশুল সব দেশের চেয়ে সস্তা। আমরা তাহাতে মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখি যে, তাহা সত্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি যে জাপানের সর্ব্বনিম্ন ডাকমাশুল আধ সেন্ (বর্ত্তমান বিনিময়হারে সিকি পয়সার সমান*), কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যূনতম ডাকমাশুল এক পয়সা।

দরিদ্র ও নিরক্ষর ভারতবর্ষে পোষ্টকার্ডের ও পুস্তকের পুলিন্দার ডাকমাশুল কমিবার পরিবর্ত্তে বাড়িয়াছে; কমাইতে বলিলে নানা ওজর আপত্তি উত্থাপিত হয়। কিন্তু ধনী আমেরিকায় শিক্ষার বিস্তার খুব হইয়া থাকিলেও জ্ঞানলাভ আরও সুগম করিবার জন্য পুস্তক-প্রেরণের ডাকমাশুল খুব কম করা হইয়াছে। নীচে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ হইতে সংবাদটি উদ্ধৃত হইল।

Postage on Books Is Cut
By President to 1 1/2 Cents
Special to THE NEW YORK TIMES.

WASHINGTON, Oct. 31.—President Roosevelt, through a proclamation today, reduced the postage on books to 1 1/2 cents a pound for all domestic mail.

The President declared the new rate, effective tomorrow until June 30, 1939, was required "in the promotion of the cultural growth, education and development of the American people."

Books have previously been under parcel post rates, from 7 cents a pound upward. The National Committee to Abolish Postal Discrimination Against Books called attention to the fact that these rates made it cost more to send

---

* ইহা পুরাতন জাপান ইয়ার-বুক অনুসারে লিখিত। বর্ত্তমানে হার বাড়িয়াছে বলিয়া অবগত নহি।

a Bible through the mails, for instance, than some pulp magazines.

এক সেন্ট মোটামুটি ছ-পয়সা এবং দেড় সেন্ট তিন পয়সার সমান। এক পাউণ্ড ওজন প্রায় ৪০ তোলা। আমেরিকায় গত ১লা নবেম্বর হইতে তিন পয়সা ডাকমাশুলে ৪০ তোলা ওজনের বহি ডাকে পাঠান যাইতেছে। ভারতবর্ষে ৫ তোলা ওজনের বহি পাঠাইতে তিন পয়সা ডাকমাশুল এবং ৪০ তোলা ওজনের বহি পাঠাইতে সওয়া চারি আনা ডাকমাশুল লাগে।

বিহারের বাঙালীদের প্রতি অবিচার

বিহার প্রদেশ খাস বিহার লইয়াই গঠিত নহে। কয়েকটি বাংলাভাষী অঞ্চল উহার সামিল করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বহু শতাব্দী হইতে, ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময় হইতে, অনেক বাঙালী পরিবার খাস বিহারেও স্থায়ী ভাবে বাস করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেও বিহার প্রদেশের বাঙালীদের প্রতি সরকারী চাকরী আদিতে অবিচার হইত, কংগ্রেসী আমলে তাহা বাড়িয়াছে। বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বলেন, বিহার প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালীদিগকে খাস বিহারীদিগেরই মত সমভাবে চাকরী দেওয়া হয়। ইহা মিথ্যা কথা। দৃষ্টান্ত, মানভূমের রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে যোগ্যতম প্রার্থী ছিলেন এবং তিনি যে বিহার প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা তাহার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে অরণ্য-বিভাগে চাকরী দেওয়া হয় নাই।

বিহারী মন্ত্রীরা কেবল যে সরকারী চাকরী হইতেই বাঙালীদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন তাহা নহে, চাপ দিয়া দেশী ও বিদেশী কোম্পানীদিগকেও বাঙালী কর্ম্মচারী না-রাখিতে বাধ্য করিতেছেন এবং পুরাতন বাঙালী কর্ম্মচারীদিগকে বরখাস্ত করিতে বাধ্য করিতেছেন। বিহারে বাঙালী ছাত্রেরা যোগ্যতা অনুসারে অবাধে শিক্ষালয়ে ভর্তি হইতে পারে না, বৃত্তি পায় না। সরকারী ঠিকা প্রাপ্তি ও সরকারকে মাল সরবরাহ বিষয়েও বাঙালীদিগের প্রতি অবিচার করা হইতেছে।

এই সকল বিষয়ে সুবিচারের জন্য বৎসরাধিক পূর্ব্বে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির নিকট আবেদন করা হয়। তাঁহারা বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের উপর মীমাংসার ভার দেন। অসুস্থতা বশতঃ তিনি বহু বিলম্বে তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করেন। সম্প্রতি তাঁহার রিপোর্ট পড়িয়া ওআর্কিং কমীটি যে-যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও চূড়ান্ত নহে, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুমোদন-সাপেক্ষ। অনুমোদন, পরিবর্ত্তন বা নামঞ্জুর করিতে রাজেন্দ্রবাবুর কত সময় লাগিবে, বলা যায় না। এবং এই দীর্ঘ প্রসববেদনার পর পর্ব্বত নেংটি ইঁদুর প্রসব করিবে কিনা, তাহাও বলা যায় না।

ওআর্কিং কমীটি অনুরোধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, রাজেন্দ্রবাবুর দ্বারা শেষ মীমাংসা না-হওয়া পর্য্যন্ত খবরের কাগজওআলারা যেন তর্কবিতর্ক হইতে বিরত থাকেন, কিন্তু তাঁহারা বিহারের মন্ত্রীমণ্ডলকে বিহারের বাঙালীদের বিরুদ্ধে অভিযান স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন নাই। সে অভিযান চলিতেছে। এবং গালাগালিবাজ অভদ্র কোন কোন বিহারী কাগজে বাঙালীদের উপর অভদ্র আক্রমণও চলিতেছে।

বাংলাকে বাংলাভাষী অঞ্চল প্রত্যর্পণ

অনেক দিন হইল নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, বিহার প্রদেশের অন্তর্গত বাংলা-ভাষী অঞ্চলগুলিকে বঙ্গের সামিল করা হউক। কিন্তু বিহারের মন্ত্রীরা এই প্রস্তাবের সমর্থন না-করিয়া বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব পাশ করান যে, এ-বিষয়ে কিছু করা না-করা ভারত-গবর্মেণ্টের এলাকাভুক্ত। বোম্বাই-গবর্মেণ্ট ও মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্ট ভাষা-অনুযায়ী প্রদেশ গঠনে আপত্তি না-করিয়া সেই নীতির সমর্থনই করিয়াছেন। তদনুসারে, কংগ্রেস কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হইলেই, স্বতন্ত্র অন্ধ্র, কর্ণাটক ও কেরল প্রদেশ গঠিত হইবে; মহারাষ্ট্র ও মহাকোশলও আলাদা হইতে পারে। কিন্তু বঙ্গের প্রতি কাহারও ন্যায়বুদ্ধি দেখা যাইতেছে না—মৈত্রী ও সৌজন্য ত নহেই।

বিহারে আন্দোলন চলিতেছে যে, বিহার প্রদেশে

বাংলাভাষী কোন অঞ্চলই নাই; এমন কি মানভূম যে বাংলাভাষী, তাহাও বাঙালীদের কারসাজি! মানভূমের অংশ ধানবাদ চিরকালই বাংলাভাষী ছিল। উহার পুরাতন সরকারী ও জমিদারী দলিল দস্তাবেজ সব বাংলায় লেখা (এখন অবশ্য সেই সব হিন্দীতে করাইবার চেষ্টা হইতেছে)। ধানবাদ অঞ্চলের সব ছড়া, লোকগীত, উপকথা, প্রবাদ-বাক্য বাংলা। ঐ অঞ্চলে কয়লার খাদ হওয়ায় বিস্তর বিহারী মজুরের আমদানী হওয়ায় এখন ধানবাদ মহকুমায় হিন্দী-ভাষী বা বিহারী-ভাষীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু তাহাতে ইহা প্রমাণ হয় না যে, উহা একটা হিন্দীভাষী অঞ্চল। খাস বাংলা দেশে ভদ্রেশ্বর টিটাগড় প্রভৃতি কারখানাকেন্দ্রের অধিবাসীদের অধিকাংশ হিন্দীভাষী। কলিকাতাতেও কোন কোন পাড়ায় হিন্দী বা রাজস্থানীই বেশী লোকে বলে। কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, ভদ্রেশ্বর, টিটাগড় ও কলিকাতার ঐ পাড়াগুলি বঙ্গের অংশ নহে।

বিহার প্রদেশের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি যে বাংলাভাষী নহে, সেন্সসের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা অনেক বৎসর আগেই আরম্ভ হইয়াছিল। আগামী সেন্সসে যাহাতে সেই চেষ্টা চরম পরিণতি লাভ করে, এখন হইতে তাহার আয়োজন চলিতেছে। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"—সেন্সসটা যখন বিহারী মন্ত্রীদের তাঁবেদারদিগের দ্বারা হইবে, তখন ফল কিরূপ হইবে অনুমান করা যাইতে পারে।

বিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের বাংলার মধ্য দিয়া শিক্ষা লাভ করিবার ও পরীক্ষা দিবার সুযোগ হ্রাসের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মানভূমের প্রধান শহর পুরুলিয়াতে পর্য্যন্ত বাঙালী ছাত্রছাত্রীদিগকে সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ে বাংলার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভে বেগ পাইতে হইতেছে।

—

একটা বিহারী কাগজের মিথ্যাবাদিতা

১৯২১ সালের বঙ্গীয় সেন্সস রিপোর্ট হইতে কতকগুলা কথা উদ্ধৃত করিয়া একটা বিহারী দৈনিক বার-বার বলিতে থাকে যে, বঙ্গে বিহারীদিগকে জমীর মালিক হইতে দেওয়া হয় না, এবং ক্ষেতমজুরের কাজও করিতে দেওয়া হয় না। অথচ, ঐ কাগজটা সেন্সস রিপোর্ট হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছে তাহা ত মিথ্যা বটেই, অধিকন্তু উদ্ধৃত বাক্যগুলার ঠিক্ পরেই ঐ রিপোর্টে লেখা আছে, যে, রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় ত্রিশ হাজার বিহারী ক্ষেতমজুরের কাজ করে! ঐ রিপোর্টে ও তাহার পরবর্ত্তী ১৯৩১ সালের সেন্সস রিপোর্টেও আছে যে, বিহারের বিস্তর লোক বঙ্গে জমী জমা লইয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে। অধিকন্তু আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে দেখাইয়াছি যে, বিহারের প্রধান জমিদার দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বঙ্গে বিস্তৃত জমিদারীর মালিক। বিহারী-বংশ-জাত অন্য জমিদারও বঙ্গে অনেক আছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী উড়িয়া বলিয়াই অনেক উড়িয়া শ্রমিককে বরখাস্ত করিয়াছে এবং হাবড়া মিউনিসিপালিটী অবাঙালীদিগকে ব্যবসাবাণিজ্যের লাইসেন্স দেয় নাই, এইরূপ মিথ্যা কথাও ঐ কাগজটা ও বিহারের অন্য কোন কোন কাগজ বার-বার বলিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস এসব কথার অসত্যতা প্রমাণ করা সত্ত্বেও পুনর্বার তাহারা মিথ্যা বলে কি না দেখিতে হইবে।

—

ছোটনাগপুরে বাঙালীকে জমী না-দিবার ফন্দী

বিহারী কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ছোটনাগপুরের জন্য যে ভূমি-সংক্রান্ত আইন (Chotanagpur Tenancy Act) পাস করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ ধারা আছে যে, ছোটনাগপুরের কোন আদিমনিবাসী বা ছোটনাগপুরের তপসীলভুক্ত জাতির কোন লোক নিজের জমী বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে চাহিলে তাহা তথাকার আদিম-নিবাসীকে বা তপসীলভুক্ত জাতিকেই দিতে পারিবে, অন্য কাহাকেও নহে। কাহারা যে তথাকার আদিম-নিবাসী ও তপসীলভুক্ত জাতি, তাহার ফর্দও মন্ত্রীরা সরকারী গেজেটে ছাপাইয়াছেন। আমরা যতটা বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাদের মধ্যে আদিমনিবাসী বাঙালী এবং তপসীলভুক্ত বাঙালী নাই।

ছোটনাগপুরের চাষের জমী যাহাতে অতঃপর কোন বাঙালী পাইতে না-পারে সেই উদ্দেশ্যে আর একটা কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। আইনটাতে আছে যে, যে-জমী হস্তান্তর করা হইবে, তাহা যে-পুলিসথানার এলাকাভুক্ত, সেই পুলিসথানার এলাকাভুক্ত লোককেই তাহা লইতে দেওয়া হইবে। তাহার বাহিরের, এমন কি একই জেলার কোন লোককে তাহা কিনিতে দেওয়া হইবে না—যদ্যপি সে উচ্চতম মূল্য দিতে চায়, তাহা হইলেও নহে। বিক্রেতার সর্ব্বোচ্চ মূল্য পাইবার পথে এই প্রকারে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। ছোটনাগপুরের কোন কোন জেলা বা পুলিসথানার ঠিক্ পরেই বঙ্গের জেলা ও পুলিসথানা থাকায় শেষোক্ত স্থানের লোকেরাও যাহাতে ছোটনাগপুরে চাষের জমী না-পায় তাহার জন্য এই ফন্দী করা হইয়াছে। দূরের বাঙালীরা ত পাইবেই না।

হিন্দুজাতির সরকারী দ্বিখণ্ডীকরণ নিবারণের বা তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী পুনায় প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নূতন করিয়া ছোটনাগপুরের তপসীলভুক্ত হিন্দু জাতির ফর্দ বাহির করিয়া হিন্দুদিগকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন।

—

ব্যক্তিগত-পত্রের প্রেরকদিগের প্রতি সম্পাদকের নিবেদন

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর জন্য প্রদত্ত চাঁদা গ্রহণ, ভ্যালু পেয়েবল ডাকে কাগজ ও বহি প্রেরণের ব্যবস্থা, নগদ মূল্য গ্রহণ, ঠিকানা পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের জবাব দিবার নিমিত্ত ঐ দুটি কাগজের বৈষয়িক-বিভাগ (Business Department) আছে। এই সকল বিষয়ের অধিকাংশ চিঠি কার্য্যাধ্যক্ষের বরাবরেই আসিয়া থাকে। তাহাই ঠিক্। সামান্য কিছু সম্পাদকের নামে আসে। তাহা না-আসিলে আমি অনুগৃহীত হইব। বৈষয়িক বিভাগের কর্ম্মীরা বৈষয়িক-বিভাগের কাজ করিয়া আমার সাহায্য করেন।

প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস কবিতা আলোচনা প্রভৃতিও অধিকাংশ স্থলে যে কোন নাম না দিয়া কেবল সম্পাদকের বরাবরে আসে, তাহাই ঠিক। তত্ত্ববিষয়ক চিঠিপত্রও বেশীর ভাগ ঐরূপ আসে। এই রকম চিঠিপত্র সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সহকারী সম্পাদকেরা করিয়া আমার সাহায্য করিয়া থাকেন।

বৈষয়িক বিভাগ ও সম্পাদকীয় বিভাগের চিঠিপত্র ছাড়া অনেক ব্যক্তিগত চিঠি আমি পাইয়া থাকি। এগুলি পরিচিত ও অপরিচিত বহু ব্যক্তির আমার প্রতি আস্থাজ্ঞাপক ও সহৃদয় ভাবের পরিচায়ক। তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, আমি অবসর অভাবে অনেক চিঠিরই যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি না। অনেক চিঠির উত্তর বিলম্বে দিয়া থাকি। কোন কোন স্থলে বিলম্ব এত হয় যে, তখন উত্তর দেওয়া বৃথা। অনেক চিঠিতে এরূপ জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন থাকে যাহার উত্তর দেওয়া আমার জ্ঞানাতীত বা আমার পক্ষে উত্তর দিবার মত সময় দেওয়া ও পরিশ্রম করা অসম্ভব।

যে-সকল ব্যক্তিগত পত্রের প্রেরকেরা বিলম্বে উত্তর পান কিংবা পানই না, তাঁহারা উপরে বর্ণিত অবস্থা বুঝিয়া আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিলে অনুগৃহীত হইব।

—

প্রবাসীর "আলোচনা"-বিভাগ

প্রবাসীর "আলোচনা"-বিভাগের জন্য আমরা মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত দীর্ঘ লেখা পাইয়া থাকি। তাহার কোন কোনটি মুদ্রিতও হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমাদের বড় অসুবিধা হয়। সত্যনির্ণয় অবশ্যই উচিত। কিন্তু তর্ক-বিতর্কের অতীত বিষয় পৃথিবীতে অল্পই আছে। ইহা বিবেচনা করিয়া "আলোচনা"রও একটা দৈর্ঘ্যসীমা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। নতুবা শুধু "আলোচনা"তেই প্রবাসীর অধিক অংশ পূর্ণ হইতে পারে। এই নিমিত্ত পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, "আলোচনা" সাধারণতঃ ছোট অক্ষরের ২৫।৩০ পংক্তি অপেক্ষা দীর্ঘ না-হওয়া বাঞ্ছনীয়; ৫০ পংক্তি অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে মুদ্রিত না-হওয়ারই সম্ভাবনা।

যাঁহারা দীর্ঘতর আলোচনা লেখেন, তাঁহারা সাধারণতঃ বিবেচনার যোগ্য ও জ্ঞাতব্য কথাই লেখেন বটে; কিন্তু তাহা ছাপিবার মত যথেষ্ট স্থান করা আমাদের পক্ষে কঠিন।

—

বসু বিজ্ঞান-মন্দির

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন ৩০শে নবেম্বর। বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠাও তিনি করেন ৩০শে নবেম্বর। তাঁহার জীবিতকালে ঐ দিন তাঁহার জন্মদিনের উৎসব হইত, বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবও ঐদিন হইত। তাঁহার দেহত্যাগের পর গত ৩০শে নবেম্বর প্রথম বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত বক্তৃতা পড়িবার কথা ছিল। তিনি আসিতে না পারায় উহা আচার্য্য মহাশয়ের এক বৃদ্ধ প্রাক্তন ছাত্র কর্ত্তৃক পঠিত হয়। সভার প্রথম কাজ হয় বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের ডিরেক্টর ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক উহার কার্য্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা পাঠ। তাহার পর সভাপতি সর্ নীলরতন সরকার মহাশয় আচার্য্য বসুর গবেষণাবলী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন এবং আবেগপূর্ণ ভাষায় আচার্য্য মহোদয় সম্বন্ধে কিছু বলেন।

—

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয়ের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই এখনও অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে-সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি যে-সব চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, তাহার যতগুলি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার শিক্ষিত সমাজে ইঁহাদের উভয়ের বন্ধুত্ব সুবিদিত। ইদানীং উভয়ের বয়োবৃদ্ধি এবং কার্য্যবাহুল্য ও অবসরের স্বল্পতা হেতু তাঁহাদের পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ কচিৎ হইত। কিন্তু তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা ঠিক্ হইবে না যে, আচার্য্য বসু বিখ্যাত হইবার পর আর রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রাণের টান অনুভব করিতেন না, কিংবা যৌবনবন্ধুকে ভুলিয়া থাকিতেন।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের একখানি চিঠি আমরা সম্প্রতি শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়ার নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহা এত দিন শান্তিনিকেতনের অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের নিকট ছিল। বসু মহাশয়ের "অব্যক্ত" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর এই চিঠিখানি লিখিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথকে ঐ বহি একখানি উপহার পাঠান :—

কলিকাতা
৩রা অগ্রহায়ণ
১৩২৮

বন্ধু

সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে।
আজ জোনাকির আলো
রবির প্রখর আলোর নিকট
পাঠাইলাম।

তোমার
জগদীশ

এই চিঠির উল্লেখ করিয়া লেডী বসু মহোদয়া 'প্রবাসী'র সম্পাদককে জানাইয়াছেন, "তাহা হইতে বুঝিবেন যে ওঁর কার্য্যে সফলতার মধ্যেও ওঁর বন্ধুত্ব অটুট ছিল।" তাহার পর লেডী বসু যাহা জানাইয়াছেন তাহাতে আচার্য্য বসুর বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তা আরও স্পষ্ট রূপে অনুভূত হয় :—

"জীবনের শেষ বৎসরও উনি প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির স্বর,

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

এর মধ্যে শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন।"

"উনি আজীবন কবির গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং সর্ব্বদাই বলিতেন যে, কবির মতন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিরল, প্রায় দেখা যায় না।"

আচার্য্য বসু সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিলে যে খুব বড় সাহিত্যিক হইতে পারিতেন, তাহা তাঁহার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক লেখাগুলি হইতেও এবং বাংলা লেখাগুলি হইতে বুঝা যায়। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ত সুবিদিত। তাঁহার ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক্ আমরা লেডী বসু মহোদয়ার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি।

আচার্য্য বসু নানা প্রতিষ্ঠানাদিতে দানের জন্ত ও বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্ত যত লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন তাহার একটি কারণ লাভজনক ভাবে টাকা খাটান সম্বন্ধে তাঁহার দক্ষতা। তাঁহার এই দক্ষতা এরূপ ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে বড় ফিন্তান্সিয়ার হইতে পারিতেন। তিনি কোথাও টাকা খাটাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। এক লাখ টাকায় বাড়ী কিনিয়া তাহার ভাড়া হইতে আড়াই লাখ টাকা জমাইয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপকতার বেতন এবং সরকারী সাহায্য ও অন্ত সাহায্য পাইয়াছিলেন বটে, এবং মিতব্যয়ীও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বিস্তর পিতৃঋণ শোধ করিতে হইয়াছিল। বিজ্ঞান-মন্দিরের অনেক ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল, অধ্যাপক ও অন্তান্ত কর্ম্মচারীদের বেতন, ছাত্রদের বৃত্তি ও অন্তান্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। টাকা খাটান সম্বন্ধে তাঁহার দক্ষতা না থাকিলে, এ সব করিয়াও এত টাকা রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা না ভাঙিয়া তাহার আয় হইতে বিজ্ঞান-মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের এখনও প্রয়োজন আছে।

—

প্রবাসী বাঙালীদের জন্য সাহিত্যিক পরীক্ষা

সমগ্রভারতে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান ও চর্চ্চা বাড়াইবার নিমিত্ত এবং আনুষঙ্গিক ভাবে অ-বাঙালীদের মধ্যেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চায় উৎসাহ দিবার জন্ত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সংস্রবে একটি পরীক্ষক-বোর্ড গঠন ও তাহার দ্বারা পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধিদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা কানপুরস্থিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পরিচালক সভার কার্য্যালয় হইতে কতকগুলি প্রস্তাব পাইয়াছি। প্রস্তাবগুলি মোটের উপর ভাল। তদনুসারে কাজ হওয়া খুব আবশ্যক। যদি বোর্ডে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শীল যথেষ্ট সভ্য থাকেন এবং তাঁহারা যথেষ্ট টাকা তুলিতে পারেন, তাহা হইলে প্রস্তাবগুলি কার্য্যকর ও সুফলপ্রদ হইবে।

—

প্রবাসী বাঙালীদিগকে মামুলী পরামর্শ দান

বাঙালী জাতির অধিক অংশ বঙ্গে বাস করে। বঙ্গের ও ভারতবর্ষের (সমগ্র মানবজাতিরও) হিতসাধন তাহাদের যথাশক্তি কর্ত্তব্য। বঙ্গের বাহিরে যে-সকল বাঙালী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করে, তাহাদেরও সেই সেই প্রদেশের ও ভারতবর্ষের হিতসাধন, তথাকার আদি অধিবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া, করা কর্ত্তব্য। বাঙালী ছাড়া অন্ত প্রাদেশিকেরাও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বাস করে। তাহাদেরও এইরূপ কর্ত্তব্য আছে।

বঙ্গের বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যত বাঙালী গিয়াছে তাহাদের অধিকাংশ সরকারী চাকরী রেলের চাকরী ইত্যাদি চাকরী লইয়া গিয়াছে। এই সকল লোকের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান সম্ভবপর নহে—অন্ততঃ খুব দুঃসাধ্য ত বটেই; বিশেষতঃ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। কিন্তু যাঁহারা প্রবাসী বাঙালীদের একটু দীর্ঘকালব্যাপী খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন, প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে যে অল্প অংশের জীবিকা 'স্বাধীন,' তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনকারী বরাবরই দেখা গিয়াছে। লক্ষ্ণৌতে কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু হিন্দুস্থানীদের দ্বারা যেমন, সেইরূপ বাঙালীদের দ্বারাও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বাঙালীদের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি কিছু মামুলী রকমের উপদেশ দিয়াছিলেন। এই লক্ষ্ণৌতেই শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন হিন্দুস্থানীদের সহিত এতটা একাত্ম হইয়াছিলেন যে, তিনি উদারনৈতিকদের অন্যতম নেতা ছিলেন, নাগরিকপ্রধান হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার নামে একটি রাস্তার নামও ঐ শহরে আছে। ঐ লক্ষ্ণৌতেই শ্রীমতী সুনীতি মিত্র অসহযোগ করিয়া জেলে গিয়াছিলেন। আরও হয়ত ২।১ জন ঐরূপ করিয়া থাকিবেন। এলাহাবাদের উকীল শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ বসুও অসহযোগ করিয়া জেলে যান। তিনি এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান এবং সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্য হইয়াছেন।* অল্পসংখ্যক প্রবাসী বাঙালীর মধ্য হইতে এই রকম দু-একটা দৃষ্টান্তও অকিঞ্চিৎকর নহে।

কোন প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ-

দেওয়াই তথাকার লোকদের সহিত সহযোগিতা করিবার একমাত্র ক্ষেত্র ও উপায় নহে। শিক্ষার ক্ষেত্র একটা বড় ক্ষেত্র। তাহাতে বিহার প্রদেশের বাঙালীদের কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব অ-বাঙালীদের দ্বারাও স্বীকৃত হইয়াছে। যুক্ত-প্রদেশেও এইরূপ কাজ বাঙালীরা করিয়াছেন। এলাহাবাদস্থিত মিউর সেণ্ট্র্যাল কলেজ যুক্তপ্রদেশের প্রধান কলেজ। উহার আদি ও প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাঙালী রামেশ্বর চৌধুরী ও 'বোবা-মুন্সেফ' প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে যাহা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। অধুনা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রফুল্ল-কুমার দত্ত কাশীর সেণ্ট্র্যাল হিন্দু কলেজের ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা-বিভাগ (ল্যাবরেটরী সমেত) গড়িয়া তুলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ গড়িয়া তোলার কার্য্যে অধ্যাপক ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত খুবই ছিল। তিনি বৈদ্যুতিক এঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে যশস্বী গ্রন্থকারও বটে। কিন্তু গুপ্ত ষড়যন্ত্রের প্রভাবে তিনি অবসর লইতে সম্প্রতি বাধ্য হইয়াছেন। কেহ বেতন লইয়া কাজ করিয়াছেন বলিয়াই কাজের গুরুত্ব কমে না। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক নীলরতন ধর প্রভৃতির কার্য্য সুফলপ্রদ হইয়াছে এবং পরেও হইবে।

ব্যবসাবাণিজ্যেও প্রবাসী বাঙালীরা যথাসাধ্য ও যথাসুযোগ স্থানীয় লোকদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে।

বঙ্গে অ-বাঙালী বি-প্রাদেশিকদের অধিকাংশের জীবিকা 'স্বাধীন', এবং তাহাদের উপার্জ্জনের সমষ্টিও প্রবাসী বাঙালীদের উপার্জ্জনের সমষ্টি অপেক্ষা অধিক। তাহাদের মধ্যে অধিক লোক যে বঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল ও দেয়, আমরা এরূপ কিছু শুনি নাই। বঙ্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক অন্যান্য কার্য্যের সহিতও তাহাদের যোগ বেশী নাই। তাহারা যে নিজ নিজ ভাষা ও পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহার ত্যাগ করিয়া বাঙালী বনিয়া গিয়াছে, এমনও নহে।

কোন প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদিগকে নেতৃস্থানীয় কোন বাঙালী যদি উপদেশ দেন যে, তাহারা যেন সেই প্রদেশের সব কাজে খুব যোগ দেয়, যেন তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যায়, তাহার উদ্দেশ্য ভাল হইলেও, বাঙালী-বিদ্বেষী অ-বাঙালীরা তাহার মানে এই করে যে, ভারতবর্ষের অন্য প্রাদেশিকদের কোন প্রকার সংকীর্ণতা নাই, কেবল বাঙালীরাই ক্ষুদ্রচেতা। বিহারের কোন কোন কাগজ লক্ষ্ণৌয়ের বাঙালীদের প্রতি সুভাষবাবুর উপদেশের এইরূপ অর্থই করিয়াছে।

এই জন্য, প্রবাসী বাঙালীদিগকে মামুলী উপদেশ না-দেওয়াই ভাল। যদি দিতেই হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী মাড়োয়ারী গুজরাটী বিহারী মান্দ্রাজী পঞ্জাবী প্রভৃতিকেও তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য।

—

মৌলানা শওকৎ আলী

মৌলানা শওকৎ আলীর মৃত্যুতে ভারতীয় মুসলমান সমাজের, এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিরও, ক্ষতি হইল। 'সমগ্র ভারতীয় জাতিরও' বলিতেছি এই জন্য যে, যে সাহসী পুরুষ মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মীরূপে কারাবরণ করিয়াছিলেন, ভারতের স্বাধীনতাপ্রচেষ্টায় হয়ত আবার তাঁহার সহযোগিতা পাওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু "ধরি মাছ না ছুঁই পানী" নীতির অনুবর্ত্তক মিস্টার জিন্নাপ্রমুখ কূটবুদ্ধি মুসলমান রাজনীতিকদের নিকট তাহা পাইবার আশা দুরাশা। ইঁহাদের মত অসরলতা মৌলানা শওকৎ আলীর ছিল না।

তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে খিলাফতের সমর্থক ছিলেন, এবং তাহার জন্য সকল দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

—

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘুদের দশা

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলমানদের মত সুবিবেচনা ও "ওএটেজ্" পাইতেছে না, ইহা জানাইবার জন্য তাহাদের কয়েক জন প্রতিনিধি তথাকার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খান্ সাহেবের সহিত দেখা করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকটি অভিযোগের সপক্ষে তাঁহারা তথ্য ও অকাট্য

যুক্তি উপস্থিত করেন। কিন্তু একটিতেও তাঁহারা প্রতিকার পান নাই। সকলের চেয়ে চমৎকার খান্ সাহেবের চরম 'যুক্তি'টি :—

"The Premier at length declared this was his Government's policy, and if Hindu Congress Assembly members were not satisfied with this policy, they could leave Congress party at any time."

"আমার গবর্মেণ্টের নীতি এই। যদি ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু কংগ্রেসী সদস্যেরা ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে-কোন সময়ে কংগ্রেস ছাড়িয়া দিতে পারেন।"

মন্ত্রীটি বাদশাহ না হইলেও মেজাজটা বাদশাহী বটে।

—

অধ্যাপক পরেশনাথ সেন

বিরাশী বৎসর বয়সে অধ্যাপক পরেশনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিয়া অবধি শেষ পর্য্যন্ত বেথুন কলেজেরই অধ্যাপক ছিলেন। এখন যাঁহারা বর্ষীয়সী এমন কোন কোন শিক্ষিতা মহিলাও তাঁহার ছাত্রী ছিলেন। তাঁহার কোন কোন যশস্বিনী ছাত্রী তাঁহার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কয়েক পুরুষ ধরিয়া ছাত্রীদের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম যাঁহাদিগকে পড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের বা তাঁহাদের সমবয়স্কা মহিলাদের কন্যা বা নাতিনীও তাঁহার ছাত্রী ছিলেন—এমনও কখন কখন ঘটিয়া থাকিবে। এই প্রকারে এই স্বল্পভাষী, নম্র, মৃদুস্বভাব, তেজস্বী, সুপণ্ডিত, সাধু পুরুষের অধ্যাপনা ও চারিত্রিক সংস্পর্শের প্রভাব অজ্ঞাতসারে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে বঙ্গের কত অন্তঃপুরিকাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহা কখনও জানা যাইবে না। তাঁহার এক জন প্রবীণা ছাত্রী বলিয়াছেন, তাঁহাকে কে অধিক ভক্তি করিবে সে বিষয়ে তাঁহার সহাধ্যায়িনীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। ধন্য এরূপ শিক্ষক।

পরেশনাথ সেন মহাশয়ের বন্ধুপ্রীতি ও আতিথেয়তা আদর্শস্থানীয় ছিল। একান্নবর্ত্তী পরিবার কেমন হওয়া উচিত তাহার দৃষ্টান্তও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

—

হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সোজা উপায়!

শ্রীহট্টে ঢাকার নবাবের সভাপতিত্বে এক সভায় কলিকাতার মৌলানা আজাদ সোভানী এই মর্ম্মের কথা বলেন যে, হিন্দু কংগ্রেসীরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যদি সত্যসত্যই সব কিছু করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা সবাই কলমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইয়া যাইবে এবং ভারতবর্ষও স্বাধীন হইতে পারিবে! এই মৌলানার পরামর্শটা আনকোরা নূতন নহে—কিন্তু তিনি যে গম্ভীর ভাবে এই পরামর্শ দিয়াছেন, ইহা নূতন বটে। অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করিয়া সুনীতি বাবুকে বলিয়াছিলেন সবাই মুসলমান হইয়া গেলে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়াটা থাকে না!

মৌলানা সাহেব কি জানেন না যে, মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেও মিল নাই?

—

দেশ রক্ষা

ইউরোপ ও এশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলে একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে শান্তি চিরপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, হিংসা ও কলহের মন্ত্র লইয়াই সকলে জগৎ-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধি ব্যতীত অপর আর কোন উদ্দেশ্য প্রায় কাহারও নাই। জাপানের চীন আক্রমণ, স্পেনে ইতালীয় ও জার্ম্যান ষড়যন্ত্র, প্যালেষ্টাইনে ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা ও ইহুদী-আরব গোলযোগ, ফ্রান্স ও ইতালীর বিবাদ, জার্ম্মেনীর উপনিবেশ 'আহরণ' চেষ্টা, ইত্যাদি সকল ব্যাপারই জগদ্ব্যাপী একটা বিরাট্ হিংসা বিবাদের চিহ্ন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীতে যতটা আন্তর্জাতিক শত্রুতা ছিল, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শত্রুতা লক্ষিত হয়। জোর যার মুল্লুক তার, এই নীতি এত প্রবলরূপে জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, জাতি-সভায় ধর্ম্ম, ন্যায় কিংবা ভদ্রতার আর কোনই স্থান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বর্ত্তমানে সকল জাতিই শুধু সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; মানব-প্রগতির আর কোন প্রচেষ্টা এতটা প্রবল নয়।

এ হেন দুনিয়ায় শান্তিবাদ ধর্ম্মসঙ্গত হইলেও দেশরক্ষার জন্য কেবল তাহার উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত বা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী সম্ভবতঃ যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ে উচ্চতম স্থান অধিকার করিবে। আমরা ভারতবাসীরা যুদ্ধের আশঙ্কাপূর্ণ এই যুগে বাস করিয়াও অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতা জনিত এমন একটা নিস্পৃহ ও নিশ্চেষ্ট ভাবে দিন কাটাইতেছি, যে তাহার তুলনা জগতে আর

কোথাও পাওয়া যাইবে না। কারণ, আত্মরক্ষার ভার আমাদের নিজেদের হাতে বহুদিন হইতেই নাই এবং আমরা আত্মরক্ষার কথা চিন্তার ও কর্ম্মের ক্ষেত্রের বাহিরে রাখিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি।

বর্ত্তমান জগতে যে-সকল আন্তর্জাতিক শত্রুতার ধারা দেখা যায়, তাহা হইতে অনায়াসে একথা বুঝা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু যুদ্ধের সূচনা হইবে। এই সকল যুদ্ধের অনেকগুলি এখনই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যে-সকল যুদ্ধ হইবে তাহার মধ্যে এক বা একের অধিক যুদ্ধে, ইংলণ্ড লিপ্ত হইয়া পড়িবেন এরূপ সম্ভাবনা খুবই অধিক এবং ইংলণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইলে তাহার ধাক্কা ভারতে পৌঁছাইতে বিলম্ব হইবে না। পূর্ব্বকালে যুদ্ধ স্থানীয় ভাবে চলিত এবং সামরিক নীতিতে সৈন্যদল ব্যতীত অপর লোককে আক্রমণ করা দস্তুর ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এরোপ্লেন, সাবমেরিন প্রভৃতির সাহায্যে যুদ্ধ ব্যাপক ভাবে হয় এবং যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহের উপর হারজিত নির্ভর করে বলিয়া শত্রুর দেশের সকল স্থান এবং সকল বাসিন্দাকে আক্রমণ করাই রণনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রীলোক কেহই বাদ যায় না এবং চীন, স্পেন ও আবিসীনিয়াতে সহস্র সহস্র বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রীলোক শত্রুর আক্রমণে নিষ্ঠুর ভাবে হতাহত হইয়াছেন। সুতরাং ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ভারতবর্ষের নির্লিপ্ততাও থাকিবে না এবং ভারতের বহু শহর ধ্বংস হইবে বলিয়াই মনে হয়।

এইরূপ আশঙ্কা যে-স্থলে বর্ত্তমান, সে-ক্ষেত্রে ভারতবাসীর পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। ভারতের কংগ্রেসী দল অবশ্য অহিংস ভাবে সকল কিছু সম্পন্ন করিবেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিহার যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতির কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট যুবকদিগকে যুদ্ধ শিখাইবার ব্যবস্থাও করিতেছেন! পরদেশ অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধ করা অন্যায়, তাহা স্বীকার করিয়া এ-কথা বলা চলে যে, নিজ দেশ ও নিজ দেশের বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের হিংস্র শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করা নিশ্চয়ই অন্যায় নহে।

সেইরূপ যুদ্ধ করার প্রয়োজন ভারতবর্ষে শীঘ্রই হইবে বলিয়া মনে হয় এবং দেশরক্ষার জন্য ভারতবাসীর প্রস্তুত হওয়া দরকার। ইংলণ্ড নিজের স্বার্থের জন্য নিজ ক্ষমতায় আমাদের চিরকাল রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইলেও সকল সময় সক্ষম না থাকিতে পারে। ইংলণ্ডের সহিত আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় সম্পর্ক যে রূপই হউক, বাহিরের শত্রুর দ্বারা বিজিত ও নিষ্পেষিত হওয়ার সহিত সে সম্পর্কের কোন তুলনা হইতে পারে না। একথা অতি নিশ্চিত যে, বাহিরের শত্রু যদি ভারতবর্ষ অবাধে আক্রমণ করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিভীষিকার আবির্ভাব হইবে, তাহা কল্পনার অতীত। বহু মানবপ্রেমিকের প্রেমও সে অবস্থায় হিংসার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই কারণে আমাদিগকে দেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আধুনিক সমরনীতিতে যেভাবে শত্রুকে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করা দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভারত-আক্রমণের আরম্ভ হইবে আকাশ হইতে। তজ্জন্য দেশ-রক্ষী সেনাকেও আকাশে উঠিয়া শত্রুকে প্রত্যাক্রমণ করিতে হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষের উচিত, অবিলম্বে নিজের আত্মরক্ষার পক্ষে উপযুক্ত আকাশবাহিনী গঠন করা। তাহা ব্যতীত, যাহাতে সহজে বৃহৎ বৃহৎ শহরের বাসিন্দারা শহর ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া যাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শহরের মধ্যেও আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা ও বিষাক্ত গ্যাসের হাত হইতে প্রাণ বাঁচানর ব্যবস্থা করা ও আহত লোকদের চিকিৎসা ও গ্যাস-আক্রান্ত স্থানকে গ্যাস-নির্ম্মুক্ত করা ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রয়োজন। সমগ্র জাতির স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস ও একনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণতা সংগঠিত ও জাগ্রত করিয়া তোলা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ কর্ম্মে যাহা প্রতিফলিত হয়, তাহার প্রকৃত আরম্ভ অন্তরে।

—

"স্বদেশী" ও বাঙালী

ভারতের রাষ্ট্রীয় জাগরণের আরম্ভ হইতেই স্বদেশী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা জাতীয়তার মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণ, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা সর্ব্বযুগে সকল দেশেই বিজয়ী জাতির বণিকদিগকে নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া অধীন জাতির আর্থিক ক্ষতির কারণ হইয়াছে। ভারতেও ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল এবং বিদেশী পণ্যের প্রচারে ভারতীয় শ্রমজীবী ধনী ও ব্যাপারী সকলেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। স্বদেশী প্রচারের ফলে নিজ দেশীয় শ্রমশক্তি, মূলধন বা স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য সকল কিছুই উপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে ও নিজ নিজ অধিকারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। মানব-সমাজের যে-সকল অধিকার বা দাবীর উপর সমষ্টিগত জীবনযাত্রা সুপ্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী পরিশ্রম করিয়া সমাজের অঙ্গরূপে পূর্ণ জীবনযাত্রার অধিকার প্রধানতম। ক্ষমতার প্রকারভেদে দার্শনিক বা কবি হইতে কুলি-মজুর সকলেরই এইরূপে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অধিকার আছে বলা যাইতে পারে। ধনিকের, শ্রমিকের, বণিকের, বক্তার বা

বৈজ্ঞানিকের; সকলেরই কার্য্যক্ষেত্রে ও কার্য্যের অধিকার আছে। জাতীয় ভাবে দেখিলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজাতীয়ের অনধিকারপ্রবেশ ও সেই কারণে দেশের ধনিক, বণিক্ বা শ্রমিকের ক্ষতি হইলে তাহা নিবারণ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সেই খানেই বাঞ্ছনীয় যেখানে বাহির হইতে পণ্য দেশে আসিলে তাহাতে দেশবাসীর সুখসুবিধা বৃদ্ধি পায়। কোন কোন দেশে কোন কোন দ্রব্য জন্মে না অথবা প্রস্তুত করিতে ব্যয় অধিক পড়ে এবং অপরাপর দেশে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য হয়ত সহজে ও অল্প ব্যয়ে ও পরিশ্রমে উৎপন্ন হয়। এই জাতীয় দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীতে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূচনা হয়, সেই বাণিজ্য স্বাভাবিক ও বিশ্বমানবের মঙ্গলজনক। যথা —বাংলার পাট অথবা চা, আমেরিকার তামাক কিংবা তুলা, চীনের রেশম ও মাটির বাসন, ইংলণ্ডের আন্থ্রা-সাইট কয়লা কলকব্জা ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রমক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, শ্রমকৌশল বা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি হইতেই দেশবিশেষের দ্রব্যবিশেষ সরবরাহ করিবার ক্ষমতা জন্মায়। ইহাতে নিজ দেশের সহজপ্রসূত পণ্য অপর দেশের উক্ত প্রকার পণ্যের বিনিময়ে আমদানী রপ্তানী হইয়া উভয় পক্ষের লাভ ঘটে। কিন্তু যে ব্যবসা অপর দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও শ্রমশক্তিকে অব্যবহৃত ও বিফল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অপর জাতির উৎপাদন-শক্তিকে বাড়িতে না দিয়া অল্পের পরিবর্ত্তে অধিক আদায় করিবার ব্যবস্থা করে, সে-ব্যবসা দ্বিগুণ ক্ষতিকর। প্রথমতঃ, শেষোক্ত দেশের নিজের উৎপাদন-শক্তি নষ্ট হইয়া ক্ষতি হয়, ও দ্বিতীয়তঃ, অধিক দিয়া অল্প লইবার যে ক্ষতি তাহা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে যাহা সত্য, ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর মধ্যেও তাহা সত্য। অর্থাৎ এক পরিবারের পক্ষে অপর পরিবারকে কর্ম্মক্ষেত্রে হাত পা বাঁধিয়া পূর্ণলাভ হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়, এক গ্রামের পক্ষে অপর গ্রামকে উক্তরূপে বঞ্চিত করা অন্যায়, এবং এক প্রদেশের পক্ষে অপর প্রদেশকে শোষণ করা অন্যায়। স্বদেশীর অর্থ ইহা নহে যে, ভাগবাঁটোআরা বা বিলিব্যবস্থা যে প্রকারই হউক না কেন, জাতীয় জীবনক্ষেত্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সংরক্ষিত থাকিলেই আদর্শ সিদ্ধ হইবে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, সকল ব্যক্তি, সকল পরিবার এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল সংঘের কোন লোকই নিজ সম্পদ ও কর্ম্মশক্তির পূর্ণ ব্যবহার ও তৎলব্ধ ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ সম্ভোগ ও সঞ্চয়ের অধিকার হইতে কোন রূপে বঞ্চিত না হন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক দেশের শ্রমিকের শ্রমশক্তি অপর দেশের ক্রেতার সাহায্যে ব্যবহৃত হইতে পায়। ইহার ফলে যদি ক্রেতা-দেশের শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, ত ইহাতে ক্ষতি নাই। প্রাদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে যদি এমন হয় যে, এক প্রদেশের সকল শ্রমিক, ধনিক অথবা বণিক্ অপর প্রদেশের ব্যবসার ধাক্কায় নিষ্কর্ম্মা হইয়া দিন কাটাইতে সুরু করেন ও শুধু প্রকৃতির দান যেটুকু তাহারই পরিবর্ত্তে অপর প্রদেশের ব্যবসার প্রভাবে উত্তরোত্তর দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতে থাকেন, তাহা হইলে স্বদেশী ব্যবহারের ফল বিষময় হইয়া উঠে। হয়ত বিজাতীয়ের সহিত কারবার করিয়া পূর্ব্বে বঞ্চিত প্রদেশের অধিক লাভ হইতেছিল। স্বদেশী ও বিদেশী বাণিজ্যে নীতিগত মূল সত্যটি এই যে, কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইবে না। এই সত্যটি ভুলিয়া শুধু স্বদেশীর ছোবড়াটুকু পাইলে তাহাতে জাতীয় মঙ্গল হইতে পারে না।

বাংলার সকল লোকের সকল সময় দেখা দরকার যে, বাঙালীর প্রাকৃতিক সম্পদ, সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য, বাণিজ্যশক্তি ও শ্রমের ক্ষমতা বর্ত্তমান স্বদেশীবাদের ফলে পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে কি না। এ-কথা ইতিহাস প্রমাণ করিবে যে, পূর্ব্বে বাঙালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিয়া নিজ প্রকৃতিদত্ত ঐশ্বর্য্য, সঞ্চিত মূলধন ও বাণিজ্যশক্তি অধিক ব্যবহার করিয়া এখনকার চেয়ে অধিক লাভ করিত। শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার সে পূর্ব্বেও করিত না, এখনও করে না। কিন্তু স্বদেশীযুগে বাঙালী ক্রমশঃ তাহার পূর্ব্বের কর্ম্মক্ষেত্রটুকু হইতেও বহিষ্কৃত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সে আমদানী, চালান, বেনিয়ানের কার্য্য, দোকানদারী ইত্যাদি করিয়া টাকায় চার আনা লাভ করিতে পারিত। এখন ভিন্নপ্রদেশজাত স্বদেশী পণ্য বাংলার আদর্শবাদের আশ্রয়ে টাকায় এক টাকা ভিন্ন প্রদেশে লইয়া যাইতেছে। বাঙালী আমদানীর, চালানের, দোকানদারীর, বা বাণিজ্যগত লাভ আর পায় না। এই যে অবস্থা, ইহার প্রতিকার দুই ভাবে হওয়া সম্ভব। এক, ভারতের জাতীয় মহাসভা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুনীতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কোন প্রদেশেই যেন ধনিক, বণিক্ বা শ্রমিক নিজ ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত না হন; অথবা বাঙালীকে নিজেই নিজের পূর্ণ অধিকার নিজ চেষ্টায় অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে।

বাংলায় উৎকৃষ্ট তুলার চাষ সম্ভবপর

বাংলায় কাপড়ের কল পরিচালনার একটি বিশেষ অসুবিধা, কাপড়ের কলে ব্যবহার্য্য লম্বা আঁশের তুলা বাংলা দেশে উৎপন্ন হয় না, উহা বঙ্গের বাহির হইতে

আমদানী করিতে হয়। বাংলা দেশের জমি তুলা-উৎপাদনের উপযুক্ত নয়, এইরূপ একটি ধারণা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। এই মত বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া না-লইয়া, ঢাকেশ্বরী মিলের কর্তৃপক্ষ উৎকৃষ্ট ও লম্বা আঁশের তুলা উৎপাদনের পরীক্ষা করিয়া বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, প্রবাসীতে ইতিপূর্ব্বে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরীক্ষা আরও ব্যাপকভাবে করিয়া দেখিবার জন্য, বঙ্গীয় মিল-মালিক সংঘ ও বঙ্গীয় গবর্ন্মেণ্টের সহযোগিতায় কয়েক মাস পূর্ব্বে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও মুর্শিদাবাদের নির্ব্বাচিত অঞ্চলে উঁচু শুক্‌না কয়েক বিঘা জমীতে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে তুলার চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফল আশাজনক হইলে বিস্তৃততর ভূখণ্ডে তুলার চাষ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি, কেন্দ্রীয় তুলা-সমিতি বাংলা দেশের এই চেষ্টায় তত মনোযোগ দিতেছেন না। তাহার নানা কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু বঙ্গীয় গবর্ন্মেণ্ট যথোচিত উৎসাহী হইলে কেন্দ্রীয় তুলা-সমিতি উদাসীন থাকিলেও তুলার চাষের বিস্তার হওয়া সম্ভব। তুলার চাষ বঙ্গে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হইলে যে শুধু বঙ্গে কাপড়ের কল স্থাপনের সুবিধা হইবে তাহা নহে, আনুষঙ্গিক অনেকের অন্নসংস্থান হইবে এবং বিশেষজ্ঞদের মতে তুলার চাষ পাট অপেক্ষা চাষীর পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইবে। অতীতে বঙ্গে তুলা উৎপাদন ও বর্ত্তমানে বঙ্গে ইহা প্রচলনের চেষ্টা সম্বন্ধে বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবিনয় ভট্টাচার্য্য গত অক্টোবরের "ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জর্ণালে" যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য।

মেদিনীপুরে লম্বা আঁশের তুলা উৎপাদনের যে পরীক্ষা হইতেছে তাহার ফলাফল দেখিবার জন্য বঙ্গের বিভিন্ন কাপড়ের কলের প্রতিনিধি সম্প্রতি মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন। ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। ফসলের পরিমাণ, আঁশের দৈর্ঘ্য (১⅛ ইঞ্চি) ইত্যাদি সকল দিক্ দিয়া এইখানে উৎপন্ন তুলা ভারতের অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন তুলা অপেক্ষা কোন ক্রমে নিকৃষ্ট নহে ও মিলে ব্যবহারের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি কৃত্রিম রেশমের একটি কলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, বঙ্গে কাপড়ের কলের উপযোগী তুলার চাষ হওয়া সম্ভবপর নহে এইরূপ প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। খবরের কাগজে তাঁহার বক্তৃতার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় নাই এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা তিনি ঐ সভায় করিয়াছিলেন কি না।

কেবলমাত্র লম্বা আঁশের তুলাই যে কাজে লাগে, তাহা নহে। অপেক্ষাকৃত ছোট আঁশের তুলার চাষ করিলেও তাহাতেও অনেক লাভ হয়। তাহাও করা উচিত।

—

শান্তিনিকেতনে হ্যাভেল-ভবন প্রতিষ্ঠা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নেতৃত্বে বঙ্গে এবং ভারতে চিত্রশিল্পে যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হয়, স্বর্গীয় ঈ. বী. হ্যাভেল তাহার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। ভারতের বাহিরে যে-সময়ে ভারতশিল্পের সামান্যই আদর ছিল, ভারতীয়েরাও যখন নিজের দেশের শিল্পকলার প্রতি বিমুখ, সেই সময়ে তিনি ভারত-শিল্পের গুণগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অনেক ভারতীয়ের বিপক্ষতা সত্ত্বেও ভারত-শিল্পের নবপ্রবর্ত্তনে উৎসাহী হইয়াছিলেন। অন্য নানা ভাবেও তিনি ভারতের উন্নতির সহায়তা করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের স্বকীয় সংস্কৃতির গুণগ্রাহী ও সমর্থক ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভারতের সংবাদ শুনিতে তিনি আগ্রহশীল ছিলেন। ভারত-শিল্প সম্বন্ধে যে পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইত, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী স্বামীর অঙ্কিত চিত্রাবলী, তাঁহার সংগৃহীত অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিখ্যাত চিত্র, ভারত-শিল্প সম্বন্ধে নিজের ও অন্যের অনেক রচনা ও কাগজের কাটিং ইত্যাদি শান্তিনিকেতনে উপহার দেন। সম্প্রতি এইগুলি যথোচিত ভাবে রক্ষার জন্য শান্তিনিকেতনের কলাভবনের সংলগ্ন একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস মহাশয় এই ভবনের উদ্বোধন করেন। দাস মহাশয় আইনজ্ঞ হিসাবেই সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি যে এক জন শিল্পরসিক তাহা সকলের জানা নাই। আধুনিক বঙ্গীয় পদ্ধতির অনেক বিখ্যাত চিত্র তাঁহার সংগ্রহে আছে। এই ভবনে হ্যাভেল সাহেবের সংগৃহীত কাগজপত্রের দ্বারা আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে জ্ঞানার্থীর বিশেষ সহায়তা হইবে।

—

দিল্লীতে হিন্দুস্থান জীবনবীমা কোম্পানীর শাখা

বঙ্গের প্রধান জীবনবীমা কোম্পানী হিন্দুস্থানের শাখা-কার্য্যালয় আগেই বোম্বাই মান্দ্রাজে স্থাপিত হইয়াছে। গত মাসে একটি শাখা দিল্লীতে স্থাপিত হওয়ায় তাহার কার্য্যক্ষেত্র ও গৌরব বাড়িল। বাংলা দেশ ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল প্রদেশ। অতএব, অন্যান্য কার্য্যক্ষেত্রের মত এবং ভারতের অন্যান্য জাতির মত আর্থিক

নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে বাঙালীদের যথাযোগ্য স্থান থাকা উচিত।

সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার শুধু পদগৌরবে নহে, পরন্তু সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তির দ্বারা বাঙালীর যে আত্যন্তিক ক্ষতি হইয়াছে তাহা নিবারণের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করায়, বহুমানাস্পদ। হিন্দুস্থানের শাখার প্রতিষ্ঠা তিনি করায় যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে।

—

দিল্লীতে নাথ ব্যাঙ্কের শাখা

গত মাসে দিল্লীতে বাঙালীদের আর একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হইয়াছে। নোয়াখালীর নাথ ব্যাঙ্কের দিল্লী শাখার প্রতিষ্ঠা সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার করিয়াছেন। ১২ বৎসর পূর্ব্বে কেবল এক জন ১৫ টাকার কেরানীর সাহায্যে সামান্য পুঁজী লইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দালাল নোয়াখালীতে ইহা স্থাপন করেন। এখন বাংলা, আসাম, ও বিহারে ইহার বহু শাখা স্থাপিত হইয়াছে, দিল্লীতে স্থাপিত হইল, শীঘ্র লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে স্থাপিত হইবে। এখন ইহার কাজ চালাইবার মূলধন (working capital) দেড় কোটি টাকা। সাবধানতা, সততা ও কার্য্যদক্ষতার গুণে এই ব্যাঙ্কের এরূপ উন্নতি বাঙালীর সন্তোষের বিষয়।

উত্তর-ভারতের অনেক শহর বিস্তৃত বাণিজ্যের কেন্দ্র। দিল্লী এইরূপ একটি কেন্দ্র। সেখানে বাঙালীদের আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থাকা খুব দরকার। হিন্দুস্থান জীবনবীমা কোম্পানী ও নাথ ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে পথ দেখাইয়া বাঙালীর উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন।

—

ব্যাঙ্কের সংখ্যাবৃদ্ধি

বাংলা দেশে ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালন পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা যতটা করিয়াছেন, পশ্চিম-বঙ্গের লোকেরা ততটা করেন নাই। ক্রমে ক্রমে পশ্চিম-বঙ্গেও ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িতেছে। তাহাতে ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও সবের সুবিধা হইবে। অবশ্য, কেবলমাত্র সংখ্যা বৃদ্ধিই যে অবিমিশ্র সুলক্ষণ, তাহা বলা যায় না। বড় ছোট যত ব্যাঙ্কই স্থাপিত হউক, সবগুলি সততা, সাবধানতা ও ব্যবসাবুদ্ধি সহকারে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। হুগলী ব্যাঙ্কার্স ও ট্রেডার্সের উত্তরপাড়া শাখার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইহার কার্য্যের প্রশংসা করেন। পরে উহার বালী শাখার ঐরূপ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি তাহার কার্য্যের প্রশংসা করেন। এই ব্যাঙ্কের একটি বিশেষত্ব এই যে, অল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত লোকদিগেরও এই ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিবার ও দরকার মত লইবার সুবিধা আছে। ইহাতে তাঁহাদের সঞ্চয়শীলতা বাড়ে এবং তাঁহাদের আমানতী টাকা ব্যবসায়ীরা ধার লইয়া দেশের বাণিজ্য চালাইতে পারেন, এবং আমানতকারীরাও কিছু সুদ পান। ইহার কাজ সাবধানতার সহিত পরিচালিত হয়। ১৯৩৭ সালের মোট ১০,৫৫,৭৩৪ টাকা দাদনের মধ্যে ১০,১৬,৪৮৭ টাকা উপযুক্ত জামিনে দেওয়া হইয়াছে।



হুগলী ব্যাঙ্কার্স ও ট্রেডার্সের উত্তরপাড়া শাখার পঞ্চম বার্ষিক উৎসবে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

বাঁকুড়ায় বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যে শাখা সম্প্রতি খোলা হইয়াছে, তাহার প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত লালমোহন মুখোপাধ্যায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তিনি বেঙ্গল সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ হেড্ আফিসে যথোপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বাঁকুড়ায় শাখা খুলিয়াছেন। এই জন্য ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির আশা করা যায়।

ব্যাঙ্ক অব এশিয়া নামক অপেক্ষাকৃত নূতন ব্যাঙ্কটিও তাহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাঁকুড়া জেলার শ্রীযুক্ত



হুগলী ব্যাঙ্কার্স ও ট্রেডার্সের বার্ষিক অধিবেশনে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ও প্রবাসী-সম্পাদক

সনৎকুমার সেনের পরিচালনায় উন্নতি লাভ করিতেছে। তিনি এদেশে ও বিলাতে ব্যাঙ্কিং শিক্ষা করিয়াছেন।

ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যার প্রধান দেশী রাজ্য এবং বঙ্গের সন্নিহিত। ইহা অন্য কোন কোন বিষয়ের মত যে ব্যাঙ্কিংএও উন্নতি করিতেছে, তাহা ইহার সরকারী ব্যাঙ্কের (State Bankএর) রিপোর্ট হইতে বুঝা যায়।

—

গরিফায় প্রস্তাবিত কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতিমন্দির

কেশবচন্দ্র সেনের পূর্ব্বপুরুষদের আদিনিবাস গরিফায়। সেখানে তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত একটি স্মৃতিমন্দির থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের কর্ণধার কানপুরের প্রথিতনামা ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাদিগকে সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশে লিখিত একটি আবেদন পাঠাইয়াছেন। তাহা নীচে মুদ্রিত হইল।

একটি বিশেষ নিবেদন লইয়া আপনার শরণাগত হইতেছি। সেটি এই যে, প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে গরিফা-নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বলরাম সেন প্রমুখ কয়েক জন ভদ্রমহোদয়ের ইচ্ছা হয় যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার আদিনিবাস গরিফায় তাঁহার পিতামহের বাস্তভিটায় এক বিঘা জমি, স্বত্বাধিকারীদের নিকট হইতে নামমাত্র খাজনায় ইজারা লইয়া কেশবচন্দ্র স্মৃতিমন্দির স্থাপিত করেন; এবং এই উদ্দেশ্যে "কেশবচন্দ্র-প্রতাপচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি" গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন।

প্রাতঃস্মরণীয় ৺রামকমল সেন (কেশবচন্দ্রের পিতামহ) তাঁহার গরিফার সমস্ত সম্পত্তি ৺গিরিধারীজীউর নামে দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় থাকিয়া উক্ত বিগ্রহের সেবা করিবার ভার লইবেন, তাঁহারাই এই দেবোত্তর সম্পত্তির কর্ত্তা হইবেন বলিয়া উইল করিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত সেবাইতদের মধ্যে দুই ভাইয়ের বংশধরেরা আছেন। এক পক্ষ হইতে সেন-বংশের অনেকের অনুরোধে "কেশবচন্দ্র স্মৃতিমন্দিরে"র জন্য এক বিঘা জমি ঐ দেবোত্তর সম্পত্তির মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেবাইতদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটাতে "স্মৃতিরক্ষা-সমিতি" উক্ত জমির উপর স্মৃতিমন্দির গঠন স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। প্রায় ৮ বৎসর অপেক্ষা করিয়াও যখন হাইকোর্টের কোন নিষ্পত্তি পাওয়া গেল না, তখন ঐ স্মৃতিরক্ষা-সমিতি অন্যত্র (উক্ত দেবোত্তর জমির সম্মুখে) জমি খরিদ করিয়া "কেশব-স্মৃতিমন্দির" গঠন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন; এবং এক অংশ অর্থাৎ পাঠাগার তৈয়ার হইয়া গিয়াছে; এখন অর্থাভাবে বাকী অংশ অর্থাৎ হলটা সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। "প্রতাপচন্দ্র-স্মৃতিমন্দির" সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাঁর বংশধরদের সাহায্যে। কিন্তু অর্থাভাবে "কেশব-স্মৃতিমন্দির" অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে, যদি, যে-মহাপুরুষের জন্মস্থান, আঁতুড়-ঘর দেখিতে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে মনীষিগণ কলুটোলার বাড়ীতে আসেন, তাঁহার আদিনিবাস গরিফায় তাঁহার স্মৃতিমন্দির অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায়। তবে বুঝিতে হইবে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। আমরা কি সেই মহামানবকে এত শীঘ্রই ভুলিয়া গিয়াছি? তাঁহার শতবার্ষিকী উৎসবে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যবর্গের এবং তাঁহার বংশধরদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন তাঁহারা এই স্মৃতিমন্দিরটিকে স্থাপনা করিবার ব্যবস্থা করিয়া এই উৎসবকে সার্থক করুন।

আমরা এই আবেদনটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। স্মৃতিমন্দিরটির অবশিষ্ট অংশ নিশ্চয়ই অবিলম্বে নির্ম্মিত হইয়া যাওয়া উচিত। কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী যত জায়গায় হইয়াছে এবং অতঃপর হইবে, সর্ব্বত্র এই স্মৃতিমন্দিরটির জন্য চাঁদা সংগৃহীত হওয়া উচিত।

—

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় অনেক দিন হইতে দৃষ্টিহীন ও কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া ভুগিতেছিলেন। এখন তাঁহার বিদেহী আত্মা রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

তিনি তাঁহার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে যে বহু বিদ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন, তাহা বঙ্গের বিদ্বান্ ও প্রতিভাবান লোকেরা বলিয়াছেন, আবার বঙ্গের

বাহিরের সর্ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মত বিদ্বান্ ব্যক্তিও বলিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি, এবং পরে পরে বিলাতী দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের



আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

ভাইস-চ্যান্সেলার সুপণ্ডিত সর্ মাইকেল স্যাডলার শীল মহাশয়ের জীবনের ৭২ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহাকে নিজের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া যে প্রশস্তি লিখিয়া পাঠান, তাহার গোড়ায় আছে :

"May one of his pupils (for pupil I was during the years 1917-19 and shall always revere him as one of my *Gurus*) express in a few words love and admiration for Dr. Brajendranath Seal, and gratitude, which grows with the years, for his guidance in my thought and for what he taught me during many long and intimate discussions about the needs and genius of India? He was indeed guide, philosopher and friend to me."

স্যাড্লার সাহেবের সমগ্র প্রশস্তিটি ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে আছে। ঐ সংখ্যায় এবং ১৩৪২ সালের মাঘের প্রবাসীতে তাঁহার উদ্দেশে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব্ব কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার আরম্ভে আছে—

'জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী ;...'

তিনি যে শুধু পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রতিভা ছিল, এবং তাহা বহুমুখী। তাঁহার ইংরেজী কবিতা-গ্রন্থ *The Eternal Quest* গত বৎসর অক্সফর্ড য়ুনিভার্সিটী প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়, যদিও তাহা লিখিত হইয়াছিল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। ধর্ম্ম, দর্শন ও কাব্যেই প্রাচীন ভারতীয়েরা উন্নতি করিয়াছিলেন বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের ধারণা। আচার্য্য শীল রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞানের বৃত্তান্ত লিখিয়া সেই ধারণার ভ্রম দেখাইয়া দেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে সর্ব্ব-নৃজাতি-কংগ্রেস (Universal Races Congress) হয়, তাহার উদ্বোধন করিতে আহূত হইয়া তিনি নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বাদি বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। উচ্চগণিত ছিল তাঁহার চিত্তবিনোদনের উপায় ("recreation")। মহীশূর রাজ্যের তৎপ্রণীত রাষ্ট্রবিধিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা তাঁহার রাজনীতিবিশারদত্বের পরিচায়ক। ঐ রাজ্যের জন্য তৎপ্রণীত শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রাথমিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যন্ত সংস্কৃতিমূলক ও বৃত্তিমূলক উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তথাকার শিল্পোন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য দান ব্যবস্থাতেও তাঁহার হাত ছিল। বঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মত বাগ্মী ও রাজনীতিবিৎ আচার্য্য শীলের নিকট হইতে স্বাজাতিকতার দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। বস্তুতঃ, স্যাড্লার সাহেব যেমন সরল ভাবে তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, বিদ্যার অনেক শাখার বহু ভারতীয় গ্রন্থকারও তাঁহার নিকট সেইরূপ ঋণী। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার যাঁহারা ছাত্র ছিলেন তাঁহারা ত ঋণী আছেনই। অবস্থাচক্রে ও তাঁহার

ষাস্থ্যভঙ্গে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা ও প্রতিভার অনুরূপ গ্রন্থাবলী তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যেমন বড় ব্যাঙ্কের সাহায্যে বণিকেরা ও ছোট ছোট ব্যাঙ্ক নিজ নিজ কারবার চালায়, তেমনই অনেকে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রতিভার আনুকূল্যে নিজ নিজ সাংস্কৃতিক কারবার চালাইয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা, ও প্রতিভা যেরূপ অসামান্য ছিল, তাঁহার স্বভাব ছিল সেইরূপ সরল নম্র ও সৌজন্যপূর্ণ, এবং চরিত্র ছিল সেইরূপ উদার, মহৎ ও পবিত্র।

—

নিজামের রাজ্যে "বন্দে মাতরম্"

"বন্দে মাতরম্" গান করার 'অপরাধে' ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাড়ে তিন শত হিন্দু ছাত্রের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া ইহা দারুণ যেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচার, এবং ধর্ম্মের দিক্ দিয়া ঘোর ধর্ম্মান্ধতা ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা।

—

বহু দেশী রাজ্যে প্রজাপীড়ন

হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুড়, মহীশূর, রাজকোট ঢেনকানাল, তালচের প্রভৃতি বহু দেশী রাজ্য প্রজাপীড়নের জন্য দুর্নামভাগী হইয়াছে। তথায় দমন চলিতেছে। কিন্তু দমননীতি প্রতিকার নহে, স্বরাজ দ্বারাই প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করা যায়। সর্ব্বত্রই স্বরাজ প্রচলনের চেষ্টা করা উচিত; যেমন কোচিন, ঔন্ধ, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি রাজ্যে হইয়াছে।

—

মহাত্মা হংসরাজ

আর্য্যসমাজের অন্যতম নেতা, হিন্দু-পঞ্জাবের পুনর্জ্জন্ম-দাতা, পঞ্জাবের প্রধান শিক্ষাবিধায়ক, অসাধারণ ত্যাগী ও আত্মোৎসর্গপরায়ণ মহাত্মা লালা হংসরাজের মৃত্যু হইয়াছে। সমগ্র ভারত দরিদ্রতর হইল। পঞ্জাবের ক্ষতি অপরিমেয়।

—

একখানি বাজেয়াপ্ত বহির কথা

আইন-অমান্য আন্দোলন প্রভৃতির সময় সরকারী আদেশে যে-সকল বহি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর তাহার অনেকগুলির উপর হইতে বাজেয়াপ্তির আদেশ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কোন কোন বাজেয়াপ্ত বাংলা বহির কথা কয়েক মাস পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে আলোচিত হইয়াছিল। এইরূপ আর একখানি বহির কথা লিখিতেছি।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ "মুক্তিপথে" আইন-অমান্য ও লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় প্রকাশিত ও বাজেয়াপ্ত হয়। হিংসাত্মক কর্ম্মে সত্য বা কল্পিত প্রণোদনার জন্যই রাষ্ট্রনৈতিক কারণে পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত হইয়া থাকে, সচরাচর আমরা এইরূপই জানিয়া আসিতেছি। এই বহিটি কিন্তু তাহার বিপরীত। ইহার লেখক অহিংসাব্রতের এক জন প্রচারক, অনেক উত্তেজনার মধ্যেও অহিংসামন্ত্র ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বহিখানি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতার সমষ্টি, স্বদেশের সেবায় মহত্তম ত্যাগের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান। কিন্তু স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশের জন্য ত্যাগস্বীকার অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। তবে এই সকল কবিতা আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তনামূলক, এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ আন্দোলন এখন নাই। বহিখানি পুনঃপ্রচলনের অনুমতি দিলে তাহার বলেই ঐ আন্দোলন পুনঃপ্রবর্ত্তিতও হইবে না।

বহিখানি যে পুনঃপ্রচলনের কথা আমরা বলিতেছি, তাহা রাষ্ট্রনৈতিক কারণে নহে। তাহার কারণ এই যে, বহিখানির সাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক মূল্য ব্যতীত, অভিজ্ঞ সাহিত্যসমালোচকদের মতে, স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য প্রচুর পরিমাণে আছে। সুতরাং বহিখানি প্রচারিত হইতে না-পারা সাহিত্যের দিক্ দিয়া আমাদের ক্ষতি।

বহিখানিতে হিংসাত্মক প্ররোচনা নাই, একথা লিখিয়াছি। বরং একটি কবিতা আছে যাহাতে হিংসা-ব্রতীদের তীব্র বলিষ্ঠ ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছে, বিপথ-গামী বলা হইয়াছে, এইরূপ স্মরণ হইতেছে।

—

কলিকাতায় শ্রীনিকেতন পণ্যভাণ্ডারের উদ্বোধন-উৎসব

বিশ্বভারতীর পল্লীসংস্কার-বিভাগ, শ্রীনিকেতনে পল্লী-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, কৃষির উন্নতি, লুপ্ত শিল্পের পুনঃপ্রবর্ত্তন ও নূতন শিল্পের প্রচলন সম্বন্ধে যে বহুবিধ আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে একাধিক বার 'প্রবাসী'তে দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় ২১০ নং কর্ণওআলিস ষ্ট্রীটে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সংলগ্ন কক্ষে, শ্রীনিকেতনের গৃহশিল্পজাত নানা প্রয়োজনীয় ও মনোরম দ্রব্যাদির একটি ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। এই ভাণ্ডারের উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। বর্ত্তমানে দেশে

পল্লীসংস্কারের যে উদ্যোগ চলিতেছে, চিন্তায় ও কর্ম্মে রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম প্রধান ও প্রথম পথপ্রবর্ত্তক। সুভাষচন্দ্র তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত একটি স্মৃতিকথার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ও তাঁহার কয়েক জন বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশসেবার বিষয়ে উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন। নানা রূপ ভাবধারার সংঘাত তখন দেশে চলিতেছে; কবির নিকট হইতেও কবিজনোচিত উদ্দীপনাময়ী বাণীই তাঁহারা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন শুধু গ্রামসংগঠনের কথা—এই নীরস কথা শুনিয়া সেই তরুণ বয়সে তাঁহারা মোটেই প্রীত হন নাই। কিন্তু যত দিন যাইতেছে রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশের মর্ম্ম তিনি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য চব্বিশ বৎসরের বহু উর্দ্ধকাল হইতেই রচনায় ও ভাষণে পল্লীসংস্কারের একান্তকর্ত্তব্যতার কথা বলিয়া আসিতেছেন। শুধু কথা নয়, গত ১৬ বৎসর যাবৎ, শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়া বিস্তৃত ভাবে এ বিষয়ে নানা আয়োজনও করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বেও খণ্ড খণ্ড ভাবে পল্লীসংস্কারের চেষ্টা অন্যত্র করিয়াছিলেন। কবি হইয়াও তিনি এই নীরস কর্ত্তব্যের ভার কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে, এবং পল্লীগঠন সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার, সুন্দর একটি বিবরণ আছে, এই ভাণ্ডার-উদ্বোধন-উপলক্ষ্যে রচিত তাঁহার অভিভাষণে :—

…কর্ম উপলক্ষ্যে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত ক'রে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তা-প্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কী রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে, অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।…সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবি-কল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প কয়েক জন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায় নি। সে কথার আলোচনা এখন থাক।

…বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা, সে থাকে মাটির নিচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনী সন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেক বার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়? যাই হোক অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করি নি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হোত।…

…প্ল্যান ছিল না বটে কিন্তু ছুটো একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলি। আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হ'তে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হ'তে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্যবিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ. এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক্ এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ উৎসেরও সেই দশা। সেই জন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরাও যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না—একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দ প্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি ক'রে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহঙ্কার তাদের নয়, তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপ-সৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্ত-ভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্ম-প্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এইরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশ্যে।...

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্তাকে উপেক্ষা করি নি কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘ্যতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করি নি। আমরা জানি যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চ-চূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাটকলায় সৌসাম্যের অপরূপ উৎকর্ষ্য কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ ক'রে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। সচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজনদরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বন্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি, তাঁরা প্রায় ব'লে থাকেন যে আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। একথা মনে রাখা উচিত—সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

এই অভিভাষণের পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন:—

সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই ব'লে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা ব'লে যাচ্ছি, পরীক্ষা ক'রে দেখ এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তাহলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের এই অংশের উল্লেখ করিয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভাষণে যাহা বলেন, সে-সম্বন্ধে একটি কথা না-বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি বলেন, যে, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের পর বর্তমান থাকিবে না, ইহা মিথ্যা কথা। ইহাতে শাশ্বত সত্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা অবিনশ্বর। হয়ত ইহার বর্তমান আকার (শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন) স্থায়ী না-হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার সত্য অংশ ভিন্ন আকারে চিরস্থায়ী হইবে।

কোনও প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে যদি শাশ্বত সত্য থাকে, তবে সেই সত্যটি যে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে চিরস্থায়ী, এবং যে মূল প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া সেই সত্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবে বিনষ্ট হইলেও পরে অন্য প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া যে সে-সত্যটি প্রকাশিত হইতে পারে, এই টুকু তত্ত্বগতভাবে বুঝিবার মত দার্শনিকতা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতার পক্ষে শুধু এই তত্ত্বটি সব সময়ে যথেষ্ট সান্ত্বনাদায়ক নহে। সত্যের এই অবিনশ্বরতার তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথেরও জানা আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছে; এবং পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে "সত্য" খুঁজিয়া পাইলে, তিনি রাষ্ট্রশক্তিকে ও রাষ্ট্রপ্রধানকে তাহার বাস্তব স্থায়িত্বের ভারগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। দেশের পক্ষ হইতে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তত্ত্বকথার পরিবর্তে তাঁহার বাঞ্ছিত আশ্বাস দিতে পারিলে ভাল হইত—অবশ্য সুভাষচন্দ্র ইহাতে "শাশ্বত সত্যের" সন্ধান পাইলে। আর্থিক দিক্ দিয়া শ্রীনিকেতন এখনও এক জন বিদেশীর দানেই প্রধানতঃ পরিচালিত হইতেছে।

কলিকাতার শ্রীনিকেতনের পণ্যভাণ্ডারে প্রাপ্তব্য আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করা আমাদের কর্তব্য।

—

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

শ্রীগোপাল হালদার

কামাল আতাতুর্কের জীবনের সঙ্গে বর্ত্তমান তুরস্কের ইতিহাস বিজড়িত—নবেম্বর মাসের ১০ই যখন সে জীবন-দীপ নিবিয়া গেল তখন স্বভাবতই সকলের বার বার মনে পড়িয়াছে এই কথাটিই। বর্ত্তমান তুরস্ক তাঁহারই সৃষ্টি—পুরাতন তুরস্কের সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া ইতিহাসের এই নূতন যাত্রাপথে তাহাকে স্থাপন করিয়াছেন মুস্তাফা কামাল। কিন্তু কামালের প্রতিভা সেখানেই থামিয়া যায় নাই—বরং তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে এই নূতন তুরস্কের নূতন জীবনেতিহাসে। যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার শৌর্য্যের ও বীরত্বের পরিচয় অনেক সৈন্যাধ্যক্ষই দিতে পারেন; জাতীয় উন্মাকে বিপ্লবের চেতনায় উন্নীত করিতে পারেন অল্প লোক; সে চেতনাকে আবার সার্থক কর্ম্মসূত্রে রূপ দিতে পারেন আরও অল্প লোক; কিন্তু বিপ্লবের শেষে জনসমাজকে সংগঠনাত্মক কার্য্যধারায় নিযুক্ত করিয়া বিপ্লবকে সত্যসত্যই দীর্ঘজীবী ও পূর্ণতা দান করিবার মত শক্তি ও সৌভাগ্য থাকে পৃথিবীতে কয় জনার? কামাল তেমনি ভাগ্যবান্—তিনি তেমনি প্রতিভার অধিকারী। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় যুদ্ধই তিনি করিয়াছেন তুরস্কের বিপক্ষে—যে তুরস্কের প্রেতাত্মা তখনও ওস্‌মানী সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তাহারই বিরুদ্ধে। স্মার্ণার পতনে, লোজানের বৈঠকে তিনি সেই বৃহৎ সমরের শুধু আয়োজন করিলেন—নূতন তুরস্ক জন্মগ্রহণ করিল। পুরাতন তুরস্ককে কামাল প্রথম অস্বীকার করিয়া বসিলেন এত সাধের তুর্ক সাম্রাজ্য ও তাহার 'খিলাফৎ'কে বিদায় দিয়া। তার পর আসিল তুরস্কের জীবনের প্রকৃত বিপ্লব. কামাল সূচনা করিলেন আসল যুদ্ধের—খিলাফতের বালাই তুরস্কের ঘাড় হইতে নামিয়া গেল, ইসলাম আর তুরস্কের রাষ্ট্রধর্ম্ম রহিল না; আইন-সম্পর্কিত ব্যাপারে হাদিসের নির্দ্দেশের স্থান গ্রহণ করিল 'কোদ্ নেপোলিয়ঁ'; এক দিনের আদেশে মেয়েদের অবরোধ ঘুচিয়া গেল, পৌর ও সামাজিক বাধাবিঘ্ন দূর হইল; একই পরোয়ানায় সীমান্তের দুর্দ্দান্ত কুর্দ ও ইস্তানবুলের বিলাসী পাশার দল জাতিগঠনের জন্য কর প্রদানে বাধ্য হইল; একটি হুকুমে তুর্ক ফেজ তুর্কদের মাথা হইতে নামিয়া গেল, পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ হইল তুরস্কের জাতীয় পরিচ্ছদ; নমাজের ভাষা তুর্ক ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইল, আজানের আহ্বান উঠিল তুর্ক ভাষায়; তুর্ক লিপি হইতে আরবী অক্ষর বর্জ্জিত হইয়া রোমক বর্ণমালার প্রচলন হইল, তুর্ক ভাষা হইতে আরবী অক্ষর বিদায় লইল। আরব্য নামের দস্তুর ছাড়িয়া তুর্করা নূতন নামকরণ-পদ্ধতি গ্রহণ করিল—গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা হইলেন কামাল আতাতুর্ক, ইসমেৎ পাশা হইলেন ইসমেৎ ইনোনু। এতবড় যুদ্ধ, এতগুলি জয়—কয়জন বীরের পক্ষে সম্ভব হয়?



প্যালেষ্টাইন। জেরুসালেম ও হাইফার মধ্যে পেট্রোলিয়ম পাইপ-লাইনে সামরিক রক্ষীদল

আশ্চর্য্য এই যে, কামালের স্বরাষ্ট্রনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি দুই-ই সমান সার্থক, সমান স্থির ও সম্মানসূচক। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে প্রথমাবধিই তিনি বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন, ফ্রান্স ও ইতালীও



স্পেন। বিলবাওর নিকটবর্ত্তী, বিদ্রোহী দলের হস্তগত নগর।

ছিল তাঁহার সুহৃদ্। নূতন তুরস্কে অভ্যুদয়ের পরে ব্রিটেন ও গ্রীসকেও তিনি সহজেই মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ইহার পর ইউরোপের ভাগ্যচক্র যে অভাবনীয় রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিল তাহাতেও কামালের বিচক্ষণতাই দেখা গেল। রুশিয়ার টাকায় গড়িয়া উঠে তুরস্কের বস্ত্রশিল্প; জার্ম্মান ক্রুপ-কারখানার অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত হয় দার্দ্দানালিস, ব্রিটেন বিশ লক্ষ ডলার জোগাইল কারাবুকের ইস্পাত কারখানায় আর সম্প্রতি আরও আশী লক্ষ ডলার দিয়াছে তুর্ক নৌবহর ও অস্ত্র-বৃদ্ধির জন্ম। জার্ম্মানী সেদিন ছয় কোটি ডলার দিয়া তুরস্কের রেলপথ, রাসায়নিক, গ্যাসোলিন প্রভৃতির কারখানা গড়িতে লাগিয়াছে—কামালের 'পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পে' এমনি করিয়া প্রত্যেক জাতির অর্থ ও মেধাই কার্য্যকরী হইতেছে—তিনি নাৎসী শিক্ষকদেরও সাদরে আহ্বান করিয়াছেন, আবার বিতাড়িত জার্ম্মান অধ্যাপককেও ইস্তানবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সসম্মানে স্থান দান করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প ১৯৩৪ সালে গৃহীত হয়—আজ তুরস্ক নিজের বস্ত্রের প্রয়োজনের শতকরা আশী অংশ নিজেই জোগায়, নিজ ইস্পাতের কারখানায় তাহার সমস্ত প্রয়োজন মিটে; চিনি ও গমের জন্তও তুরস্ক আর পরমুখাপেক্ষী নয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পও এবার সুরু হইয়াছে—খনি, বিদ্যুৎশক্তি ও কৃষির দিকে ইহার বিশেষ লক্ষ্য; রাষ্ট্রের নিজস্ব কারখানা, রেলপথ ও শিক্ষায়তন বাড়ানো ইহার উদ্দেশ্য; আর সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক প্রয়োজনের তাড়নায় বজেটের এক-তৃতীয়াংশই ব্যয় হইতেছে অস্ত্রায়োজনে। এই সকলের পুঁজি কামাল একদিকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন নিজ দেশে রাষ্ট্রাধিকৃত ব্যবসা বাণিজ্য গঠন করিয়া, অন্য দিকে বিদেশ হইতে। কিন্তু সেই বিদেশী ঋণ তুরস্কের রাষ্ট্র-জীবনকে আজ বশ করিতে পারে না; বরং সুযোগ মত বিদেশীয়দের অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া তুর্ক-রাষ্ট্র আজ সেই সব অনেক ব্যবসা হস্তগত করিয়া লইয়াছে—রেলপথ, জলপথ ও অন্যান্য সাধারণ ব্যবহার্য্য ব্যবসায়ে আজ আর বিদেশীয়দের কোন অধিকারই নাই।

এমনি করিয়া তুরস্কের জীবনে যে বিপ্লব সূচিত হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর। এক বারেই মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চূর্ণ করিয়া কামাল বর্ত্তমানের শিল্প-বিপ্লবের স্তরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সে শিল্প-বিপ্লব কিন্তু এই তুর্ক জাতির মধ্যে পুঁজিদারদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ-আয়োজনের ফলে উদ্ভূত হইল না, দেখা দিল

একজন শক্তিমান পুরুষের জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের প্রয়াসে, দেখা দিল অনেকটা ষ্টেট-সোশ্যালিজম বা রাষ্ট্র-সাম্যবাদ রূপে। পুঁজিপতির স্থানও তাই তুরস্কের সমাজে বিশেষ নাই—মুনাফাও আজ তাহার হাতে যায় না যায় তুর্ক-রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে।



শ্যামদেশের বালক রাজা আনন্দ মহীদল। সম্প্রতি ইঁহার স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনে শ্যামদেশে বিশেষ আনন্দোৎসব হইয়াছে

এক দিক হইতে দেখিলে এ অনেকাংশেই 'সামগ্রিক রাষ্ট্রের মত—কামালই ছিলেন তাহার একনায়ক, তাঁহার দলই ছিল একমাত্র দল। কিন্তু সম্ভবত কামালের তাহা অভিপ্রেত ছিল না—তিনি চাহিতেন পার্লেমেণ্টারী শাসন। এক বার একটি বিরোধী পার্লেমেণ্টারি দলও তাই তিনি নিজের বিপক্ষে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অবশ্য তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। তুর্ক জাতি এমনি ভাবে 'আতাতুর্কের' কঠিন সুদৃঢ় বাহুর দিকে চাহিয়া থাকিত যে, উহার শাসন না হইলেই তাহার চলিত না। কামালও সামাজিক বিপ্লব ও রাষ্ট্রসংগঠনে এমনি আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, ইহার প্রতিকূলাচরণ তিনি কঠোর ভাবেই দমন করিতেন—এমনি ভাবেই কুর্দ-বিদ্রোহ বিনষ্ট হয়, হাজার দশ মোল্লা কারারুদ্ধ হয়, তাঁহার ধর্ম্ম-বিরোধী আন্দোলন সার্থক হয়—আতাতুর্ক তুর্কদের পিতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসঙ্কটের এই মুহূর্ত্তে কামালের মৃত্যু তাই বিশেষ ভাবে তুরস্কের পক্ষে এক দুশ্চিন্তার কথা। বহু শক্তিকে কামাল

নিমন্ত্রণে

আপনি প্রিয় পরিজনদের নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। রসনা-তৃপ্তির জন্যও জিনিষপত্র আয়োজনে আপনার দিক্ থেকে ত্রুটি করেন নি। কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল, আপনার আনা ঘিয়ে জল্‌তি বেশী গেছে শুধু নয়, জিনিষ দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ হ'য়েছে।

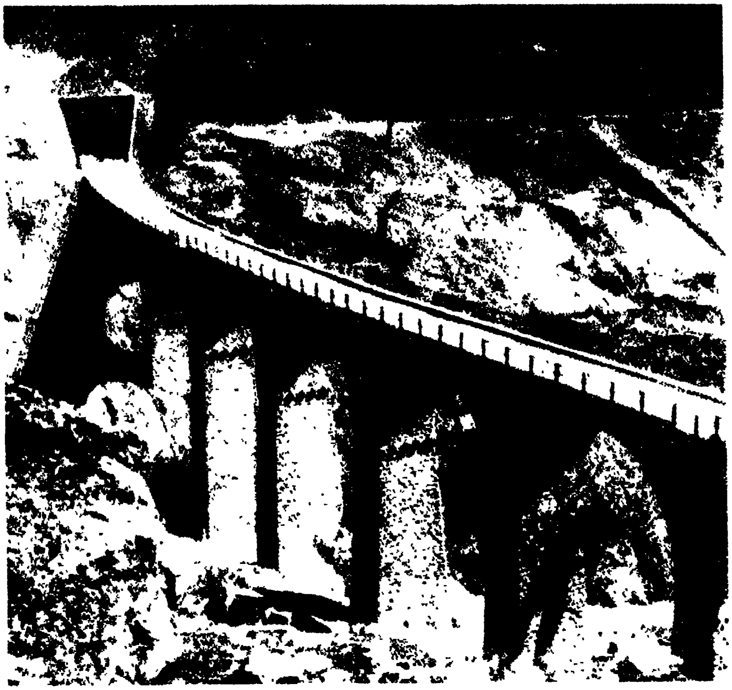
আপনি নিশ্চয়ই চান নি, যে, শিশু বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক, আপনার কত আত্মীয়-আত্মীয়া, বন্ধু-বান্ধবী, যাদের জন্য আপনি আহারের নানা ব্যবস্থা করেছেন এবং যাদের এনেছেন, তারা আপনার এখানে এসে কোনরকম অসুখে পড়ে। আপনার এখানে যারা এসেছে, তারা আপনাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রেই এসেছে।

ভোজ্য তালিকার (menu) প্রয়োজনানুযায়ী দু-একটা জিনিষ কম ক'রে, আরও ভাল উপাদানগুলি আন্‌তে পার্‌লে, বোধ হয়, হিতে বিপরীত ঘট্‌তো না। হয়তো কোন সময় দামে কিছু বেশী পড়ে কিন্তু পরিণামে থাকে তৃপ্তি।

কেন এমন হয়? ঘিয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলীয় অংশ থাক্‌লে, কড়ায় জল্‌তি বেশী যায়। পুরানো ঘি কিংবা ভেজাল ঘি থাক্‌লে অসুখ হয়। দুর্গন্ধ তো হবেই। ঘি, তৈল, আটা ও ময়দা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাই সাবধান হ'তে হয় এবং সকল রকম পচা খাদ্য হ'তে।

শ্রীঘৃতের যত টিনে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার 'এগমার্ক' শীল পড়ে, সে ঘৃত জলীয় অংশ হ'তে পরিশুদ্ধ না হ'লে, তা সম্ভব নয়, ঘৃত তাজা ও বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও।

যাকে বেশী লোক জানে ও বিশ্বাস করে, আপনিও তাকে করুন না। সেইখানে আপনারও নিরাপত্তি ও তৃপ্তি সব চেয়ে বেশী হওয়া সম্ভব।



নূতন ট্রান্স-ইরানিয়ান রেলওয়ে। রেলপথ পাতিবার পূর্ব্বে এক অংশের সেতু

তুষ্ট রাখিয়াছিলেন,—বল্‌কান পেনিনসুলার জাতি-সমাজে তাঁহারই চেষ্টায় সেদিন বুল্‌গেরিয়া স্থান পাইল, বল্‌কানদের বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হইল ; আর আলাপ আলোচনার দ্বারা তুরস্ক মিত্রশক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চল সুরক্ষিত করিবার অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইল। এদিকে জার্ম্মানীর প্রভাব দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপ বাণিজ্যক্ষেত্রে বাড়িতেছে—তুর্ক বহির্বাণিজ্যের শতকরা চল্লিশ ভাগই জার্ম্মানীর সহিত ; ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরাও বসিয়া নাই ; অদূরে ডোডাকানিজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালীর নৌঘাঁটি বসিতেছে, সমস্ত ভূমধ্যসাগরের উপর সেই বুটের পদচ্ছায়া পড়িতেছে ; প্যালেষ্টাইনে এক নূতন পরিবর্ত্তন আশু এবং অবশ্যম্ভাবী—এমনি সময়ে কামালের অভাব তুরস্ক তো অনুভব করিবেই, প্রাচ্যের কোনও জাতিই তাহা স্মরণ না করিয়া পারিবে না—কেবলই মনে পড়িবে, তুরস্ক কাহার সৃষ্টি, কাহার প্রেরণায় নিকট-প্রাচ্যের ইতিহাসে নূতন জীবনের বান ডাকে, সমস্ত প্রাচ্য-ভূখণ্ডে নূতন আশার দুয়ার খুলিয়া যায়।

কামালের স্পর্দ্ধার কথা চিন্তা করিলে চমকিত হইতে হয়—শুধু একটা রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, একটা সমাজবিপ্লবও নয়, একটি সমগ্র জাতিই এই দুঃসাহসী মানব-চিত্তের সম্মুখে ছিল পরীক্ষার উপাদান। তুর্ক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার জাতীয় গুণাগুণ, রক্তের ধর্ম্ম, তুর্ক বৈশিষ্ট্য—তাহার কতটুকু আর নূতন তুরস্কে বাঁচিয়া আছে? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, সত্যসত্যই কি জাতীয় বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক ধর্ম্ম, এমনি পরিবর্ত্তনশীল?

সমগ্র ইউরোপে আজ 'রক্তের ধর্ম্মই' এমনি উৎকট ঢক্কা-নিনাদে এক একটি রাষ্ট্রের ধর্ম্ম বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে যে, তাহাতে মানুষের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। হের হিট্‌লারের য়িহুদীদলন অনেক দিন পর্য্যন্ত সিনর মুসোলিনির নিকট ছিল অবজ্ঞার বিষয়। ইতালীয় ফাশিস্তবাদ রোম সাম্রাজ্যের মহিমাকে আপনার বলিয়া দাবী করিলেও, জার্ম্মান নাৎসীবাদের মত তাহার কোনও রক্ত-বৈশিষ্ট্যের মতবাদ ছিল না—য়িহুদী-বিরোধিতা তাহার ধর্ম্মের অঙ্গ নয়। কিন্তু বার্লিন ও রোম যতই নিকটতর হইল ততই এই রোগও ইতালীতে প্রকাশ পাইতে লাগিল—ইতালীতে এখন স্পষ্টই য়িহুদী-দলন সুরু হইয়াছে। অন্যদিকে জার্ম্মানী যতই শক্তিশালী হইতেছে, হের ষ্ট্রেইখার ও গোয়েবেলের য়িহুদী-দলন ততই উৎকট মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। অপমানিত, উপদ্রুত য়িহুদী এক যুবক প্যারীতে জার্ম্মান দূতাবাসের অন্যতম রাজদূত হের ফন রাথকে হত্যা করিয়া ফেলে—সমস্ত জার্ম্মানী সেই সুযোগে আবার য়িহুদী-বিনাশে মাতিয়া উঠিয়াছে। ধন-সম্পত্তি, দেহ-মান য়িহুদীর কোন জিনিষই জার্ম্মান দুর্বৃত্তদের হাত হইতে রক্ষা পাইল না। পুলকিত গোয়েবেলস বলিলেন, এই কাজ হইতে জার্ম্মানদের নিরস্ত করিতে গেলে আর্য্য-রক্ত পাত করিতে হইত, তিনি তাহা



মার্সেইতে র‍্যাডিকাল-সোশ্যালিষ্ট কংগ্রেসে মঃ দালাদিয়েরের বক্তৃতাকালে বাধাপ্রদান

কি করিয়া করেন ? সহস্র সহস্র য়িহুদীর তাই স্থান হইল বন্দী-শিবিরে ; আর আইনের পর আইন পাস হইতেছে য়িহুদী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া, য়িহুদীদের জীবিকার দুয়ার বন্ধ করিয়া, পরিচ্ছদের, পথ-ঘাটে গতায়াতের পর্যান্ত নিয়মকানুন করিয়া। মধ্য-ইউরোপে এই য়িহুদী-মেধ যজ্ঞে মাতিয়া উঠিতে রাজী নয় একমাত্র রুমানিয়া ও পোলাণ্ডের রাজশক্তি।

কিন্তু ইউরোপের বাহিরেও য়িহুদীর স্থান কোথায় ? ব্রিটেনের সাম্রাজ্যস্থ উগাণ্ডা, কেনিয়া, টাঙ্গানায়িকা, রোডেশিয়া প্রভৃতি অনেক দেশের নামই শোনা যাইতেছে, তবে প্যালেষ্টাইনে য়িহুদীদের জাতীয় বাস স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশই দূরবর্ত্তী হইয়া উঠিতেছে। আরবের বাসভূমি য়িহুদীর হাতে যাইতেছিল—অবশ্য য়িহুদীর টাকায়, য়িহুদীর চেষ্টায়, য়িহুদীর কর্ম্ম নৈপুণ্যেই গত বিশ বৎসরের মধ্যে এই প্যালেষ্টাইনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে—কিন্তু আরবদের স্বগৃহ-চ্যুত করিবার পক্ষে তাহাই তো আর যথেষ্ট যুক্তি নয়। বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরোক্ষ রক্ষক হিসাবে য়িহুদীদের প্রতি নিকট-প্রাচ্যের আরব জাতিরা বিরূপ হইয়াছে বেশী। মিশরে নিখিল-আরব-সম্মেলন আহ্বানের কথাও তাই চলিতেছে। প্যালেষ্টাইনকে ভাগ করিয়া ব্রিটিশ ভাবে আরব ও য়িহুদীর স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করিবার কল্পনা এখন ব্রিটেন পরিত্যাগ করিতেই বাধ্য হইয়াছে। কারণ, পীল কমিশানের এই প্রস্তাব সম্পর্কে উড্‌হেড কমিশন একমত হইতে পারেন নাই ; আর ইতিমধ্যে আরব-বিদ্রোহ এমন দৃঢ়মূল হইয়া পড়িয়াছে যে এবিষয়ে আর অগ্রসর হইয়া লাভ নাই। ব্রিটেনের নূতন প্রস্তাব—আরব গোলটেবল বৈঠক—যেখানে নূতন ব্যবস্থার আলোচনা হইবে ; আর ব্রিটেনের নূতন চেষ্টা প্যালেষ্টাইনের প্রায় পুনর্বিজয়। মোটের উপর প্যালেষ্টাইনের কর্ত্তৃত্ব ব্রিটেন হস্তচ্যুত হইতে সহজে দিবে না—তাহার কারণ, মোসল হইতে হাইফায় তেলের পাইপ আসিয়া নামিয়াছে ; পূর্ব্বাঞ্চলের আকাশপথের যাত্রীরা এখানকার ঘাঁটিতে নামিয়া অগ্রসর হয় ; আর ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ জলপথ আজ এমনি বিপন্ন যে প্যালেষ্টাইনস্থ জাফার নৌঘাঁটি ব্রিটেনের হাতে না থাকিলে তাহার পক্ষে সুয়েজের দুয়ারই বন্ধ হইয়া যাইবে।

৩

ভূমধ্যসাগর—ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির ভাঙাগড়ায় এখন উহাই অন্যতম কেন্দ্র, উহার সহিতই প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ জড়িত ; স্পেনের যুদ্ধচ্ছায়া ইহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আর ইউরোপ ও



নূতন ট্রান্স-ইরানিয়ান রেলপথের উদ্বোধন

আফ্রিকার তীরবর্ত্তী দেশগুলির ভাগ্য এই কারণেই এখন অনিশ্চিত।

মিউনিখের পরে ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি চালু করিবার আয়োজন সহজ হইয়া উঠিয়াছে—কারণ, ফাশিস্ত শক্তিদের উপর আর তথাকথিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিকদের প্রকাশ্যেও বিরুদ্ধ ভাব দেখাইবার প্রয়োজন নাই। ফ্রাঙ্কোর জয়ের পথ তাই ব্রিটেন প্রায় পরিষ্কার করিয়াই দিয়াছে। ফ্রাঙ্কোকে যুদ্ধরত শক্তির অধিকার দিতে ব্রিটেন স্বীকৃত, সিউটা ও ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জেও ইতালীয় বিমানঘাঁটি পাকা হইয়াছে, স্পেনেও নূতন ইতালীয় 'স্বেচ্ছা সেবক' প্রেরণ বন্ধ নাই—এইরূপে পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে ইতালীর অধিকার প্রায় ব্রিটেন মানিয়াই লইল। পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে রোডস্ ইতালীর এক বড় আড্ডা, আর গৃহের উপকূলস্থ ঘাঁটিগুলি ছাড়াও এই সমুদ্রের মধ্যস্থলে কাগলিয়ারি ও পান্‌টেলারিয়া, ইতালীর হাতে আছে; আফ্রিকার উপকূলে আছে ট্রিপলি ও বেনগাজি—সিসিলি ও টুনিসের সমুদ্রপথ এইরূপে প্রায় ইতালীর অধিকারে আসিয়া গিয়াছে। ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের ঘাঁটি রহিয়াছে পশ্চিমে জিব্রাল্‌টারে, মধ্যস্থলে মাল্‌টায়, পূর্ব্বে সাইপ্রাসে, হাইফায়, সুয়েজে, আলেকজেন্দ্রিয়ায়, ফরাসীর ঘাঁটি নিজ উপকূলস্থ মার্সেঈ ও তুলোঁতে, আফ্রিকার ওরাঁ ও আলজিরিয়ায়, টুনিসের বিজের্টায় এবং কর্সিকার এজাচ্চিয়োতে। ভূমধ্যসাগর এই তিন শক্তিরই সমান লক্ষ্যস্থল—গৃহ ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ইতালী ও ফ্রান্স দুই শক্তিই এইখানে আপনার প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে চায়, আর ব্রিটেন চাহে নিজের সাম্রাজ্যপথ এখানে অবাধ রাখিতে। মিউনিখের পরে মুসোলিনি স্পেন ও বেলেরিক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলেন ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি চালু হওয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ইতালীর পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট চিয়ানো প্রকাশ্যে জানাইলেন—ইতালী ভূমধ্যসাগরে আপনার অধিকার-বিস্তৃতি চায়। তারপর, ইতালীর ফাশিস্ত কাউন্‌সিলের অধিবেশনে পথে-পথে রোমের নরনারী ধ্বনি তুলিল—কর্সিকা, টুনিসিয়া চাই; কাউন্‌সিলের সদস্যেরা চীৎকার তুললেন, 'টুনিসিয়া,' 'টুনিসিয়া।'—অর্থাৎ, স্পষ্টই ইতালী জানাইল, ফরাসীর হাত হইতে কর্সিকা ও টুনিস ইতালীর হাতে আসা দরকার।

বিপন্ন হইয়াছে ফ্রান্স। দালাদিয়ে-সরকার মিউনিখের পরে প্রকাশ্যেই 'ফ্রঁৎ পপুলেরকে' প্রায় অবজ্ঞা করিয়া দক্ষিণমার্গী হইয়া উঠিয়াছে—পুরাতন সম্পর্ক সকলই প্রায় একে একে চুকিয়া গিয়াছে, সোভিয়েট সম্পর্কের কথা আর বড় উল্লিখিত হয় না। ইতিপূর্ব্বেই পীরানিজের গিরিপথ রুদ্ধ হওয়ায় স্পেনের সরকার অস্ত্রশস্ত্র পাইত না, এখন হইতে সম্ভবত খাদ্যসামগ্রীও পাইবে না। প্রকৃতপক্ষে সেখানেও ফ্রাঙ্কোর পিছনে মুসোলিনিকেই দালাদিয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ব্রিটেনের সহিত অবশ্য ফ্রান্সের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইতেছে—দালাদিয়ে ও চেম্বারলেন দুয়েরই মত ও উদ্দেশ্য প্রায় সমান—ধীরে ধীরে দুই গণতন্ত্রের মোড় ফাশিস্ত রাষ্ট্রের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া। গৃহমধ্যে দালাদিয়ে ও অর্থসচিব রেনো এক বিপুল নূতন সংগঠনে ব্যাপৃত হইলেন—শ্রমকাল চল্লিশ ঘণ্টা হইতে বাড়িয়া গেল; নূতন ট্যাক্সে সুসম্পন্ন ব্যক্তিরা পীড়িত হইল না, ধনিক রেঁতিয়েদের স্বার্থসংরক্ষিত হইল—ইহাতে শ্রমিক সম্প্রদায় বিক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য এক দিনের ধর্ম্মঘটের আয়োজন করে। দালাদিয়ে উত্তর দিলেন আধাজঙ্গী আইন জারী করিয়া। ধর্ম্মঘট সম্পূর্ণ হয় নাই—দেশবাসী জাতীয় বিপদের দিনে ইহাকে সুনজরে দেখিল না,—ধর্ম্মঘটা সহস্র সহস্র শ্রমিকের কাজ গেল। বুঝা যাইতেছে, দালাদিয়ের দক্ষিণ-গতি কিছুকালের মত অবাধ চলিবে। তাহারই আভাস পাওয়া গেল ফরাসী-জার্ম্মান মিত্রতার আয়োজনে—হের ফন্ রিবেনট্রপ্ সেই মিত্রতাকে পাকা করিয়া গেলেন—ফরাসী ও জার্ম্মান পরস্পরের রাজ্যে হাত দিবে না, বিদেশীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে পরস্পরে আলোচনা করিয়া অগ্রসর হইবে।

ঠিক এমনি সময়ে ইতালী জানাইল—টুনিস চাই, কর্সিকা চাই। টুনিসের সাধারণ অধিবাসীরা শুনিয়া ঘোরতর আপত্তি জানাইতেছে, আবার টুনিস্‌-বাসী ইতালীয়রাও পাল্টা বিক্ষোভ-প্রদর্শন করিতেছে। সংখ্যায় ফরাসীরা টুনিসে ইতালীয়দের অপেক্ষা কম নয়; ইতালীয়দের হাতে আছে ৭৭ হাজার হেক্টর জমি, ফরাসীদের হাতে ৬ লক্ষ ৩০ হাজার; ইতালী খাটায় ৪০ কোটি

ফ্রাঁ আর ফ্রান্স ৩০০ কোটি ফ্রাঁ। তাহা ছাড়া ১৯৩৫-এ আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় এই দুই রাজ্য এই দেশের এই ঔপনিবেশিক অধিকার সম্বন্ধে একটা চুক্তিও করিয়াছিল। ইতালীয় রাষ্ট্রবিৎ কাউণ্ট জ্যয়দা বলিতেছেন—১৯৩৫এর ফরাসী সন্ধি এখনো টিকিয়া থাকিবে এমন কথা নাই—ইতালীয় সাম্রাজ্য-স্বার্থের দিক হইতে আজ বোঝাপড়া করা দরকার টুনিস সম্পর্কে, সুয়েজ সম্পর্কে, জিবুতি সম্পর্কে।

বের্লিন হইতে ফরাসীর নূতন বন্ধু নাৎসিরা জানাইতেছেন ইতালীয় দাবীগুলিতে জার্ম্মানীর সহানুভূতি সম্পূর্ণ। আর ফ্রান্সের অতিসুহৃদ চেম্বারলেন বলিতেছেন, ইতালীয় দ্বারা ফ্রান্স আক্রান্ত হইলে ফ্রান্সকে ব্রিটেন সাহায্য করিবেন, এমন কথা নাই। অতএব, ফ্রান্সের এবার কি বিপদ সমাসন্ন ?

৫

ঠিক এমনি সময়েই লিথুনিয়ার মেমেলে জার্ম্মান পুনরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—চেকোস্লোভাকদের নির্ব্বাচনের মতই মেমেলের নির্ব্বাচন নাৎসীদের এই সুযোগ দান করিয়াছে। মেমেল অবিলম্বেই জার্ম্মানীর হস্তগত হইবে। কিন্তু পূর্ব্ব-ইউরোপে, পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মানীর একটু ছাড়াছাড়ি ঘটিয়াছে। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরি একত্রিত হইয়া রুথেনিয়া দখল করিয়া দুই দেশে ভৌগোলিক যোগাযোগ স্থাপন করিতে চাহিতেছিল—তাহাতে রুমেনিয়া ও উক্রেইনের পথে নাৎসীদের বিজয়যাত্রায় ভবিষ্যতে বাধা পড়িত। তাই পোল্যাণ্ড এই অধিকার পাইল না। পোল্যাণ্ডও এখন নূতন করিয়া সোভিয়েট-বন্ধুত্ব আবার স্বীকার করিল—হয়ত জার্ম্মানীকে চাপ দিবার জন্যই; কারণ, সোভিয়েটের সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্দ্য সহজ নয়, ও আর পোল্যাণ্ডের বন্ধুত্ব চিরদিনই ক্ষণস্থায়ী।

পৃথিবীতে সোভিয়েট একা—একবিংশ বৎসরে পদার্পণ করিয়া সোভিয়েট আজ যেখানে দাঁড়াইয়াছে সেখানে তাহার একুশ বৎসরের বিপুল প্রচেষ্টা দেখিয়া যেমন বিমুগ্ধ হইতে হয়, তেমনি তাহার নিবান্ধব অবস্থার জন্য আজ শঙ্কিত হইতে হয়। পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিদের অনেকখানি ভরসা তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই আজও বাঁচিয়া থাকিতে চায়।

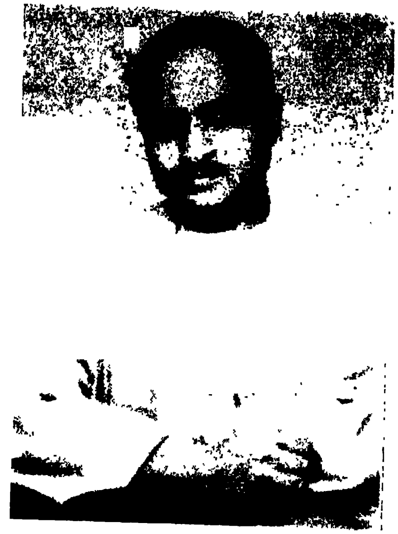
বড়দিনে ভ্রমণের সুযোগ

এই বৎসরে ই. আই. আর. স্বল্প ব্যয়ে বহু স্থান ভ্রমণের একটি বিশেষ সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ১৪ দিনের একটি ভ্রমণ-পর্য্যায় প্রস্তুত করিয়াছেন—এই দুই সপ্তাহে, গয়া, কাশী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যা ভ্রমণ করা চলিবে। এই নির্ব্বাচিত ভ্রমণে টিকিটের দাম পড়িবে প্রথম শ্রেণী ১৩৪৸/১০ দ্বিতীয় শ্রেণী. ৬৭/১০, মধ্যম শ্রেণী ৩৫৸/১০, এবং তৃতীয় শ্রেণী ২০/৫। ই. আই. আর. এর পাব্লিসিটি অফিসারের নিকটে পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে।



শ্রীসমরেন্দ্র রাহা

শ্রীসমরেন্দ্র রাহা কিছুদিন পূর্ব্বে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার জন্ম জাপানে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি স্বীয় পারদর্শিতার জন্ম টোকিয়োর ইউনিভার্সিটির রাজ বিদ্যালয় হইতে ১০০ ইয়েন বৃত্তি পাইয়াছেন।



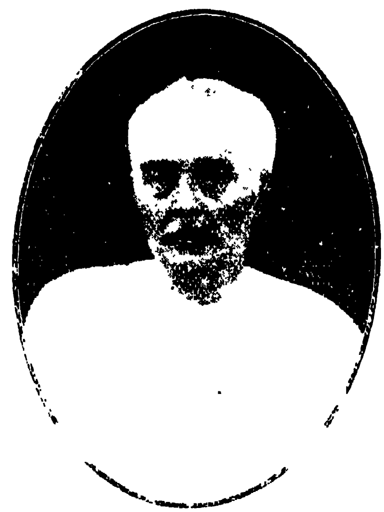
ক্যাপ্টেন কালীপ্রসাদ বাগচী

আগ্রা-প্রবাসী ক্যাপ্টেন কালীপ্রসাদ বাগচী সংযুক্ত প্রদেশ হইতে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৩৬ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংযুক্ত প্রদেশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।



কুমারী কল্পনা গোস্বামী

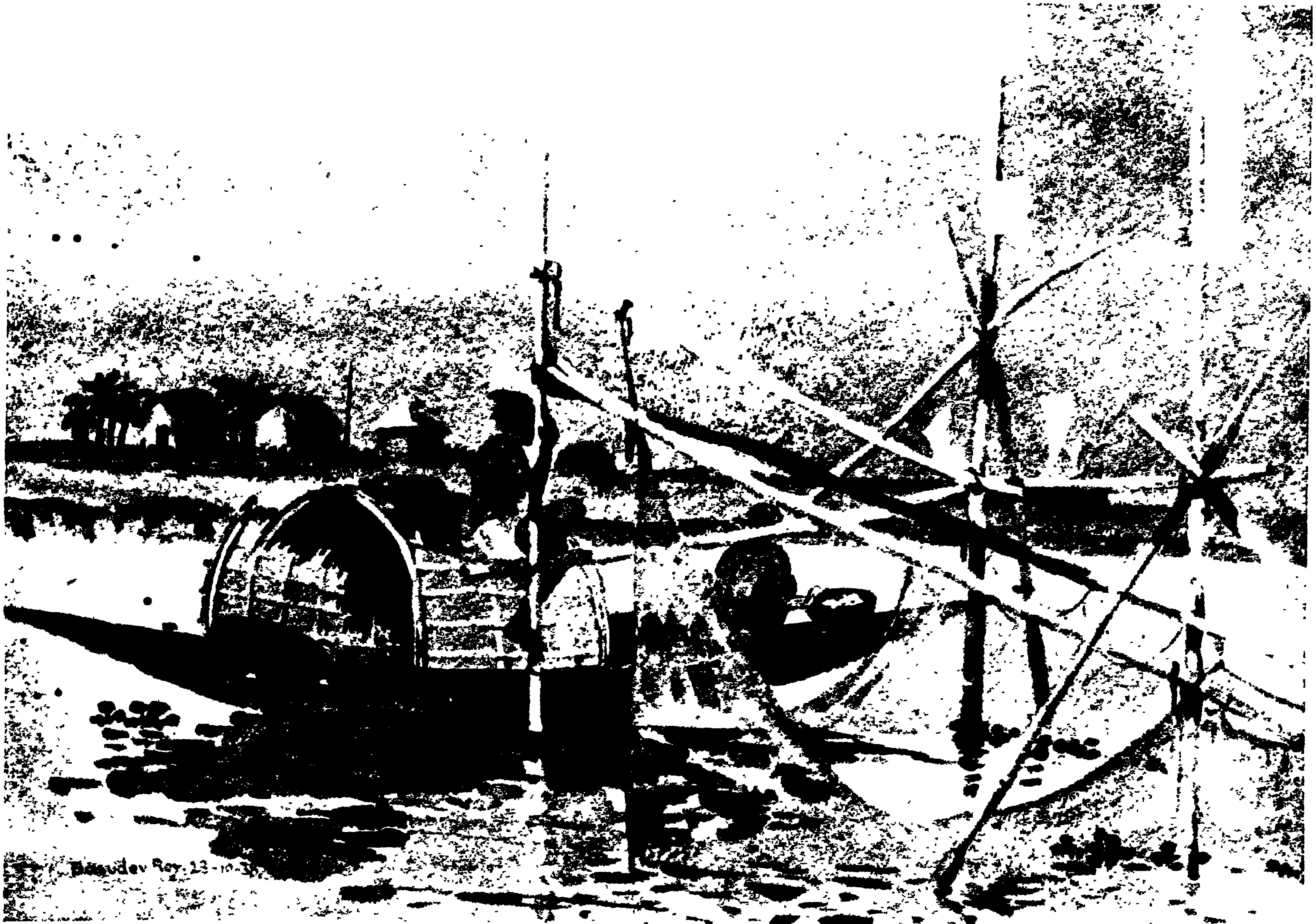
কুমারী কল্পনা গোস্বামী বর্ত্তমান বর্ষে এলাহাবাদে নিখিল-ভারত সঙ্গীত-সম্মিলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি সেতার-প্রতিযোগিতায় প্রথম, তবলায় দ্বিতীয়, ও কণ্ঠসঙ্গীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কারাদি পাইয়াছেন। এই তিনটি প্রতিযোগিতায়ই উচ্চ স্থান অধিকার করায় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আলাউদ্দীন খাঁ তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক দানে পুরস্কৃত করিয়াছেন।



হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়

লালগোলার দানবীর মহারাজা রাও শ্রীযুত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের পুত্র হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি লালগোলাতেই বাস করিতেন; এবং প্রজাহিতৈষী মিষ্টভাষী দরিদ্রবান্ধব ছিলেন। বহুকাল তিনি মুর্শিদাবাদ জিলা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



[illegible]

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪৫

৪র্থ সংখ্যা

ঈ. বী. হ্যাভেল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকে যাঁর স্মৃতি উপলক্ষ্যে আমরা সমবেত হয়েছি, তাঁর পরিচয় অনেকের কাছেই আজ উজ্জ্বল নয়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম বয়সের কথা বলি। তখন ভারতের শিল্পকলার নিদর্শনগুলি দেশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। কেন না তাদের ইতিহাস ছিল পূর্বাপরের সূত্রচ্ছিন্ন, অস্পষ্ট, এবং সে-ইতিহাস আমাদের শিক্ষা-বিষয়ের বহির্ভূত। ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বকালে, নবাবী আমলে বেগবান ছিল চিত্রকলার ধারা। সে খুব বেশি দিনের কথা নয়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের কালে তার প্রভাব হ'ল লুপ্ত। তার একটা কারণ এই যে, ভারতের চিত্রকলা তখনকার কালের ইংরেজের অবজ্ঞাভাজন ছিল। আমরা ছিলুম সেই ইস্কুলমাষ্টারের ছাত্র, তাঁদের দৃষ্টি ছিল আমাদের দৃষ্টির নেতা, তার যা ফল তাই ফলেছিল। সেদিন ভারতীয় শিল্পবিদ্যা ছিল ভারতেরই উপেক্ষার দ্বারা তিরস্কৃত। তখন বনেদী রাজাদের ভাণ্ডারে পূর্বকাল থেকে যে-সব ছবি সঞ্চিত হয়ে এসেছে তার ক্ষতি ঘটলেও সেটা কারো নজরে পড়ত না। তখন বিদেশের যত সব নিকৃষ্ট ছবি বিনা বাধায় ধনীদের ধনগৌরবের সাক্ষী হয়ে তাঁদের প্রাসাদে অভ্যর্থনা পেত।

শিক্ষিতদের কাছে নিজের দেশের শিল্পকলার পরিচয় যখন একেবারেই অন্ধকারে, তখন বিদেশী গুণীদের কীর্তি আমাদের কাছে জনশ্রুতির বিষয় ছিল মাত্র। আমরা সেখানকার নামজাদাদের নাম কীর্তন করতে শিখেছি, তার বেশি এগোই নি। সেই নামাবলী জমা ছিল আমাদের মুখস্থ বিদ্যার ভাণ্ডারে। আমরা বিদেশী ছাপার বইয়ে দেখেছি ছাপার কালিতে সেখানকার শিল্পের প্রতিকৃতি, আর ছাপার অক্ষরে তাদের যাচাই দর। সে-সমস্ত পড়া বুলি ঠিকমতো আওড়ানোই ছিল আমাদের শিক্ষিতদের প্রমাণ। বিদেশী বইয়ে বিদেশী ছবির আবছায়া সঙ্গে নিয়ে ভেসে এসেছিল সমুদ্রপারের হাওয়ায় যে গুণগান, বিনা বিচারে বিনা তুলনায় তা আমরা মেনে নিয়েছি; কেন না তুলনা করবার কোনো উপাদান আমাদের কাছে ছিল না। অর্থাৎ রেলোয়ে টাইম-টেবিলে চোখ বুলিয়ে যাওয়াতেই ছিল আমাদের ভ্রমণ।

তখন ধীরে ধীরে সুরু হয়েছে সাহিত্যের অভ্যুদয়।

সে-কথাও নিজের জীবনের ইতিহাস থেকে বলতে পারি। কাব্যে বাংলা দেশের সাহিত্য থেকে যে প্রেরণা পাব তার পথ ভালো জানা ছিল না।

এমন সময় অক্ষয় সরকার মহাশয় যখন বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম প্রকাশ করলেন লুকিয়ে পড়লাম। পড়ে জানলাম যে কাব্যকলা ব'লে একটি জিনিষ বাংলা প্রাচীন কাব্যে আছে। সেদিন সাহিত্যরসের উদ্দীপনা সহজে প্রাণে পৌঁছল। তারি প্রথম প্রবর্তনায় অন্তত আমার সাহিত্য-অধ্যবসায়কে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে।

চিত্রকলার মাতৃকক্ষ থেকে পূজোপকরণ নিয়ে রূপসাধনার পরিচয় আমাদের বাড়ীতেই পাই। অবন যখন প্রথম তুলি ধরলেন তিনিও বিদেশী পথেই শিক্ষা-যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, ইস্কুলমাষ্টারের স্বাক্ষরের মক্‌সো ক'রে ক'রে।

তখনকার দিনের মডেল-নকল-করা শিল্পবিদ্যাভ্যাস মনে করলে আজ হাসি পায় কিন্তু তখন গাম্ভীর্য ছিল অক্ষুণ্ণ। সেই চির-ছাত্রগিরির দুর্দিন আজও হয়তো চলত যদি হ্যাভেল এসে দৃষ্টি না ফিরিয়ে দিতেন। তিনি ফিরিয়ে দিলেন সেই দিকে ভারতীয় রূপকলার যেখানে প্রাণপুরুষের আসন।

সেদিন অবন ও তাঁর ছাত্রেরা শিল্পকলায় আত্ম-প্রকাশের আনন্দ-বেদনার প্রথম উদ্বোধন যখন পেয়ে-ছিলেন, দেশে তখনো প্রভাতের বিলম্ব ছিল, তখনো আকাশ ছিল আলো-অন্ধকারে আবিল। তার পূর্বে সীসের ফলকে খোদাই করা ছবি দেখেছি পঞ্জিকায়, আর শিশুপাঠ বইয়ে নৃসিংহ-মূর্তি, আর যণ্ডামার্কের চিত্র, এমন সময় দেখা দিল রবিবর্মার চিত্রাবলী। মন বিচলিত হয়েছিল সে-কথা স্বীকার করি। তারা যে কত কৃত্রিম, তারা যে যাত্রার দলের পাত্রপাত্রীর একশ্রেণীভুক্ত, সে-কথা বোঝবার মন তখনো হয় নি। সেই লজ্জাকর অবস্থা থেকে এক দিন যে জাগতে পেরেছি সেজন্যে হ্যাভেলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। সেই নৃসিংহ-মূর্তির মধ্যেও সত্য ছিল কিন্তু রবিবর্মার ছবির মধ্যে ছিল না একথা বোঝবার পথ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।

য়ুরোপের শিল্পকলা গৌরবময় আমি জানি, কিন্তু সে-গৌরব আসল জিনিষে, তার প্রেতচ্ছায়ায় নেই। যে আনন্দলোকে তাদের উদ্ভব তারি আবহাওয়ায় যাদের প্রত্যক্ষ বাস, আনন্দের তারাই পূর্ণ অধিকারী। আমরা জহুরির দোকানে মোটা কাচের আড়ালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছাপানো মূল্যতালিকা হাতে নিয়ে ঢাকাঢুকির ভিতর থেকে যা আন্দাজ করে নিই তাকে কিছু পেলুম ব'লে কল্পনা করা শোচনীয়। অশ্বত্থামা পিটুলিগোলা জল খেয়ে দুধ খেয়েছি মনে ক'রে নৃত্য করেছিলেন এ বিবরণ পড়লে চোখে জল আসে।

অবন ফিরলেন নকল স্বর্গসাধনা থেকে স্বদেশের বাস্তব ক্ষেত্রে শিল্পের স্বরাজ্য স্থাপন করতে। এ একটা শুভ দিন। তাঁর প্রতিভা দেশ থেকে আহ্বান পেল আর তাঁর আহ্বানে দেশ দিল সাড়া। তিনি জাগলেন ব'লেই জাগালেন। কিন্তু জাগাতে কত দেরি হয়েছিল সে-কথা সকলেরই জানা আছে। শিল্পের সেই নব প্রভাতে চার দিক থেকে ভারতীয় কলাভারতীকে কত অবজ্ঞা কত বিদ্রূপ। অযোগ্য জনতার পরিহাসের খরশর বর্ষণের মধ্যে যাঁরা আপন সার্থকতা আবিষ্কার করলেন তাঁদের ধন্য বলি আর সেই সঙ্গে সমস্ত দেশের হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি যিনি তীর্থযাত্রীর সামনে বহুকালের বিলুপ্ত পথকে কাঁটার জঙ্গল থেকে উদ্ধার ক'রে দিলেন।

সেদিন তাঁরও ছিল না শান্তি। কেন না তাঁর স্বজাতীয়দের মধ্যে অল্প দুই এক জন মাত্র ছিলেন যাঁরা তাঁর নির্দেশ-পথকে শ্রদ্ধা করতে পারতেন। আর আমাদের দেশের যে-সব ছাত্র শিল্পবিদ্যালয়ে মাথা নিচু ক'রে অনুকৃতির কৃতিত্ব অর্জন করত তারা হায় হায় করে উঠেছিল। ভেবেছিল শিল্পের উচ্চ আদর্শে সম্মানভাজন হবার জন্যে তারা যে অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত, ইংরেজ গুরুর তা সহ্য হ'ল না, তিনি বুঝি দিশি পোটোর দলেই চিরদিনের জন্যে তাদের লাঞ্ছিত ক'রে রেখে দিতে চান। তাদের দোষ ছিল না, কেন না সেদিন ভারতীয় চিত্র-ভারতীর আসন ছিল আবর্জনাস্তূপে। ঘরে পরে তীব্র বিরুদ্ধতার দিনে হ্যাভেল যে সেদিন অবনের মতো ছাত্র পেয়েছিলেন এ রকম শুভযোগ দৈবাৎ ঘটে। যোগ্য

ছাত্র আবিষ্কার করতে ও তাঁকে যথাপথে প্রবর্তন করতে যে ক্ষমতার আবশ্যক সেও কম দুর্লভ নয়।

অন্ধকারের ভিতর থেকে যুগ-পরিবর্তন যে হ'ল আজ তার প্রমাণ পাই যখন দেখি শিল্পকলায় নব জীবনের বীজ স্বদেশের ভূমিতেই অঙ্কুরিত হ'তে সুরু করেছে। এক দিন আমাদের ঘরে আসত পাঠানের দেশ থেকে কাঠের বাক্সে তুলোয় ঢাকা আঙুর,—খেতে হ'ত সাবধানে নিজের পকেটের দিকে দৃষ্টি রেখে। দ্রাক্ষালতা যে স্বদেশের জমিতেও সফল হ'তে পারে সে-কথা সেদিন জানাই ছিল না। সেদিনকার আঙুর-ব্যবসায়ীদের অনেক দাম দিয়েছি, আজ যারা এই মাটিতে আঙুর ফলিয়ে তুললেন তাঁরা চিরদিনের জন্ম মূল্য দিলেন স্বদেশকে এ কথা যেন মনে রাখি। সব ফলই যে সমান উৎকর্ষ লাভ করবে এ সম্ভব নয় কিন্তু এখন থেকে আপন মাটির উপরে বিশ্বাস রাখতে পারব এইটেই সবচেয়ে বড়ো কথা। সে কথাটিকে প্রথম সম্ভাবনা দিয়েছেন যিনি তাঁকে আজ নমস্কার করি। ভূমিকার প্রতি পরিশিষ্টের অশিষ্টতার প্রমাণ পদে পদে পেয়ে থাকি সেই অকৃতজ্ঞতার দুর্যোগকে যথাসাধ্য দূরে ঠেকিয়ে রাখবার অভিপ্রায়ে আজ আমাদের আশ্রমে হ্যাভেলের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করলুম। যাঁরা আজ এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগদান করলেন সেই সহৃদয় বন্ধুদের আমার অভিবাদন জানাই।

শান্তিনিকেতন

১১।১২।৩৮

[শান্তিনিকেতনে হ্যাভেল-স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ভাষণ। শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুলিপি অবলম্বনে বক্তা কর্তৃক পুনর্লিখিত]

ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় ছাত্র

অধ্যাপক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়, এম. এ., পিএইচ. ডি.

ইংলণ্ড যাওয়ার পূর্ব্বে ইংলণ্ড সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতাম। অনেক দিন ধরেই ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করেছিলাম। তবুও যখন আমি ইউরোপে যাই, তখন খুব একটা বিস্ময়ের ভাব নিয়েই গিয়েছিলাম। ইউরোপ দেশটা এত কাল একটা লাল নীল হলুদে মানচিত্র মাত্র ছিল। যত কথা পড়েছিলাম, সেগুলো যেন মনের কাচে রঙের ছাপের মত লেগে ছিল; অন্তরের রসকে রাঙিয়ে তোলে নি। যখন চোখে চোখে সব দেখলাম, তখন মনে হ'ল যেন কত জানা অথচ কত অচেনা বস্তু দেখছি। যখন উপলব্ধি করলাম যে এত দিন যা পড়েছি তা কবির কল্পনা নয়, সত্য—তখন মন যেন কেমন একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে উঠল।

এমনি বিস্ময়ের ভাব নিয়ে আমি ও-দেশের ছাত্রজীবন লক্ষ্য করেছি। বহুকাল এদেশের ছাত্রজীবনের সংস্পর্শে থেকে-ও-দেশের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়েছে। তা থেকে আজ গোটাকতক কথা লিখব।

আমি যেদিন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্ত্তি হই, সেটা ছিল অক্টোবর মাসের একটা দিন। হেমন্ত ঋতু, ম্লানমুখ রোদ, কুয়াশা আরম্ভ হয়েছে, শীতও মন্দ নয়। বাইরের ঠাণ্ডা ঘরে যাতে না যায়, তার বহুবিধ আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। সদর দরজায় কাচের ভারী ঝুলান দরজা। ঘরে ঘরে কাচের দরজা-জানালা—যাতে আলো আসে অথচ ঠাণ্ডা না লাগে। সদর দরজায় ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, আমার আগের ছেলেমেয়েরা খুব সন্তর্পণে ঢুকছে। এক জন ঢুকে দরজা ঈষৎ ফাঁক ক'রে ধ'রে রাখছে দ্বিতীয় জন দরজার কাছে না-আসা পর্য্যন্ত; তার পর দ্বিতীয় জনের হাতে পাল্লাটা ছেড়ে দিয়ে সে

চলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় জন আবার তার পরবর্তী ছাত্রের জন্ত অপেক্ষা করছে। বিনা-হুকুমে, বিনা-শব্দে, বিনা-অসহিষ্ণুতায় অপূর্ব্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে এই কাজটি নির্ব্বাহ হচ্ছে। এই রকম করাটা তাদের বিনয়ের (ডিসিপ্লিনের) অঙ্গীভূত হ'য়ে গেছে। যে না করে সে অশিষ্ট। আমাদের দেশের ছাত্রসমাজে অশিষ্ট ব'লে কোন বাধা আছে কি? আমাদের দেশ এক কালে বিনয়ের জন্ত বিখ্যাত ছিল। কিন্তু আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সংস্থানের এমন অবস্থা হয়েছে যে হয়ত এক কালে বিনয় (ডিসিপ্লিন) শিখতে ইউরোপে যেতে হবে।

এই যে সামান্ত জিনিষটি চোখে পড়ল, এটি পরে বিত্যালয়ের সমস্ত আয়োজন-অনুষ্ঠানের ভিতরে নানা ভাবে দেখেছি। ব্যথার সঙ্গে মনে হয়েছে যে যদি এটা ভারতীয় বিদ্যালয় হ'ত তাহ'লে কবে এই কাচের দরজা-জানালা চুরমার হয়ে যেত। পুলিসের পাহারা দিয়েও তা রক্ষা হ'ত না। সেখানে কলেজের নোটিস্-বোর্ড খোলা। তাতে বহু দিনের বহু রকমের নোটিস্ ঝোলে। একটাও হারায় না, কেউ ছেঁড়ে না। আর আমাদের দেশে খোলা তো দূরের কথা, অনেক প্রতিষ্ঠানে কাচ বা তারের মধ্যেও নোটিস রক্ষা পায় না; কাচ ভাঙে, তার কাটে, দেশলাই দিয়ে টাইম-টেবল পোড়ায়। এই পার্থক্য লক্ষ্য করলে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ না ক'রে থাকতে পারা যায় না। ইংরেজ ছেলেমেয়েরা যে-নিয়মানুবর্ত্তিতা জীবনে পালন করে, তা তারা তাদের বাড়ী থেকে, সমাজ থেকে শেখে। ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে, পোষ্ট আপিসের ষ্ট্যাম্প কিনতে গিয়ে, দোকানে খাবার খেতে গিয়ে, থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখতে গিয়ে, খেলার মাঠে—জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সংযম, নিয়মানুবর্ত্তিতা তারা দেখে শিখছে। নিয়মানুবর্ত্তিতা বা শিষ্টতা কেউ কারুর ঘাড়ে চাপাতে পারে না। আলো-বাতাসের সঙ্গে ওগুলোও আমরা পারিপার্শ্বিকের মধ্য থেকে গ্রহণ করি। এদের পশ্চাতে যে মানসিক বল ও ধৈর্য্য আছে, তা কি কখনও দু-ঘণ্টা স্কুলে থেকে বা ছুটো বক্তৃতার জোরে মানুষের মনে সঞ্চার করা সম্ভব? ওগুলো আসে মানুষের থেকে মানুষের মধ্যে। ইংলণ্ডে কলেজে যে-ছাত্র কোন শৃঙ্খলা মানে না, যার ব্যবহার অসংযত, সে সকলের উপেক্ষার পাত্র। সংবাদপত্র তার পিঠে হাত বুলিয়ে বাহবা দেয় না —ছাত্রসমিতি তাকে সমর্থন ক'রে রিজলিউশন পাস করে না। সে দুর্ব্বলচিত্ত, অসহিষ্ণু, অশিষ্ট—সমাজে বাস করার অনুপযুক্ত। এই রকম লোককে চলতি ভাষায় বলে ক্যাড্—লাউট (Cad—Lout)। ও-দেশে নরনারী হেসে কথা বলে, কেননা শুকনো ভাষা পীড়িত মনের অসহিষ্ণু প্রকাশ। ওরা কথায় ও ব্যবহারে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখায়, কেননা যার বল আছে সে সকলের প্রতি প্রসন্ন। পাছে কেউ ভাবে দুর্ব্বল, অজীর্ণক্লিষ্ট, তাই সকল ক্লেশ হাসিমুখে বহন করে। অন্তরে অন্তরে যদি ব্যথায় বিধিয়ে যায় তবুও মুখে বলে না। ওদের সাহিত্যেও ঐ আদর্শ আমরা বহু বহু দেখতে পাই। অল্ডাস হাক্সলির বিখ্যাত উপন্যাস "আইলেস্ ইন গাজা"* পড়তে পড়তে ঐ রকম ছবি চোখে পড়েছিল। মার্ক ও এণ্টনি দুই বন্ধু। তারা মেক্সিকোর প্রান্তরভূমির মধ্য দিয়ে দূর শহরে যাচ্ছে। দুজনেই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। অথচ কেউ কাউকে সে-কথা বলে না। মার্ক একটু বেশী শক্ত লোক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঘোড়ার পায়ে হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল, পা জখম হ'ল। এণ্টনি তার পা ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়ে তাকে পা না-সারা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করতে অনুরোধ করল। তাতে সে চ'টে গেল। এণ্টনি তাকে কৃপার পাত্র মনে করছে! এর চেয়ে মরণ ভাল! সে আবার ঘোড়ায় চড়ল। চড়তে পারে না, তবু তার ইচ্ছাক্রমে সবাই মিলে ধরে-পাকড়ে তাকে উঠিয়ে দিল। আবার চলতে লাগল। প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু পরাজয় স্বীকার করবে না। অবশেষে তার পায়ে নালীঘা হ'ল—পা কেটে ফেলতে হ'ল। ইউরোপীয় নওজোয়ানের মন এই রকম ইস্পাতে তৈরি। তাকে মচকাতে পার কিন্তু নোয়াতে পারবে না। সে শুধু গরম কথা বলে না, কাজেও করে। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি ছবি মনে হচ্ছে। বছর দুই আগে জানুয়ারি মাসে কলকাতার একটি কলেজে ইউনিভার্সিটি কাউণ্ডেশন উপলক্ষে প্রস্তুতি চলছিল। পৌষ মাসের সেই রোদে

* Aldous Huxley : *Eyeless in Gaza* (1936.)

কতকগুলি ছাত্র পনর মিনিট ড্রিল ক'রে অধীর হয়ে উঠল। তারা আর রোদে দাঁড়াতে পারবে না। হয় ছায়ায় নিয়ে যাওয়া হোক, নতুবা তারা লাইন ভেঙে চলে যাবে! যদি তারা ইংরেজ ছাত্র হ'ত, তাহলে কি শীতের কন্‌কনে পুবে হাওয়া, বরফ, কিংবা গ্রীষ্মের প্রখর রোদের মধ্যে কখনও একথা বলতে পারত যে তারা আর সইতে পারে না। তাহলে তারা লজ্জায় মরে যেত—কলেজ-সমাজে অপাংক্তেয় হ'ত। সকল ধৈর্য্যের কাজে যে আত্মিক বলের প্রয়োজন আছে। তা যে-জাত পায় না, সে চিরকাল আমাদের মত গোলামিই করবে, প্রভুত্ব করতে কোনদিনই পারবে না। যে খেলার মাঠে সার বেঁধে দাঁড়াতে অধীর হয়ে পড়ে, সে কি যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুকের সামনে স্থির অকুতোভয়ে দাঁড়াতে পারবে? না, ততোধিক কঠিন সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে নীরবে বীরের মত পুলিসের লাঠি খেতে পারবে? সেদিন কাগজে দেখলাম কোন এক প্রদেশের এক জন মন্ত্রী সরকারী দপ্তরখানার গদির উপর উপবিষ্ট হয়ে নরম তাকিয়ার ঠেস দিয়ে ২০ ফুট নলওয়ালা আলবোলা থেকে তামাক খাচ্ছেন! যেন রাজ্যশাসন কাজটি এতই আরামের! প্রাচীন ভারতের ভাল জিনিষগুলো ফিরিয়ে আনা ভাল। কিন্তু তার অলসতা ও আরামপ্রিয়তাও কি স্বরাজের নামে ফিরে আসবে? মোগল-রাজত্বের অবসান-কালে সেনাপতিরা এত সুখপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে তাদের ঘোড়ার পিঠে খুব নরম গদি আঁটা হ'ত। তার ফলে ঘোড়া দৌড়তে পারত না। এই কারণেই ঔরংজেবের সৈন্য মারাঠার সঙ্গে পেরে উঠত না। আজ আবার যদি স্বরাজলাভের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে ঐ সব কাপুরুষোচিত অভ্যাস প্রশ্রয় পায়, তাহলে দেশের আর কোন ভরসা দেখি না।

নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা বলতে গিয়ে আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আরও দুটো জিনিষ যা দেখেছিলাম তা না ব'লে থাকতে পারি না। এক বার শীতে 'ফ্রষ্ট' পড়ে কলেজের সামনের ময়দানের সমস্ত ঘাস মারা গেল। শরতের সময়ে ছাত্রছাত্রীরা ওখানে ব'সে রোদ পোহায়। কিন্তু সেবার মাঠে নূতন ক'রে ঘাস লাগাতে হ'ল। এই অবস্থায় যত দিন না ঘাস ভাল ক'রে লাগে তত দিন কেউ মাঠে গেলে ঘাস আর কোন রকমে জন্মাবে না, সেই জন্য আমাদের প্রভোষ্ট সকল ছাত্রছাত্রীকে অনুরোধ ক'রে এক নোটিস দিলেন। একটি ছাত্রছাত্রীও ময়দানে গেল না। ঘাস খুব সুন্দরভাবেই গজাল। আর একটি কথা হচ্ছে এই যে, সেখানকার প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রেরা চুরুট খায়। অবশ্য পাশ্চাত্য সুরাপানের মত পাশ্চাত্য এই ধূমপানও অনুকরণীয় বা সমর্থনযোগ্য নয়। তবে সেটা ও-দেশের নিয়মানুসারে কেউ বেয়াদবী মনে করে না। কিন্তু কলেজে তার নির্দ্দিষ্ট ঘর ও সময় আছে। রিফেক্‌টরিতে লাঞ্চের সময় খাওয়া নিষেধ কিন্তু চায়ের সময় নয়। কলেজ ক্লয়ষ্টার ও লাইব্রেরিতে নিষেধ। ছাত্রেরা এতে বিরক্ত। কিন্তু যদিও কেউ পাহারা দেয় না, তবুও তারা এ নিয়ম কখনও ভাঙে না। মাথা পেতে নেয়। কেন-না তা না হলে লোকে ভাববে ইতর। আমাদের দেশে লোকে চরিত্র কথাটি শুধু স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্পর্কেই ব্যবহার করে। তাই কর্পোরেশনের টাকা চুরি ক'রে, লিমিটেড কোম্পানী ভেঙে, সুদের ব্যবসায়ে সবার গলা কেটে, দিনরাত মিথ্যা কথা ব'লে, সকল সৎসাহসের কাজ থেকে পালিয়েও কোন লোক যদি যৌন বিষয়ে ঠিক থাকে, তবে তার চরিত্র ভাল বলতে বাধা জন্মে না। ওদের দেশে চরিত্র কথাটা একটু ব্যাপক। কাজেই নিয়ম বা শৃঙ্খলা মানবার যার ধৈর্য্য নেই, তাকে ওরা দুর্ব্বলচরিত্র ব'লে থাকে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রে আর একটি জিনিষ চোখে না-পড়ে পারে না। সেটি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীর সেই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি ভালবাসা। তারা মনে করে যে সেটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তাকে সর্ব্বতোভাবে বড় ক'রে তুলতে হবে। তার যদি ত্রুটি থাকে তাও প্রেমের চোখে দেখতে হবে। সেখানকার জনসাধারণ এবং সংবাদপত্রও আমাদের দেশের মত সেগুলিকে তীব্র আক্রমণ ক'রে তাদের ধ্বংস করতে প্রয়াসী হয় না। যদি কেউ করে তাহলে তাঁকে নীচমনা ব'লে মনে করে। ইউনিভার্সিটি কলেজের সংলগ্ন একটি হাসপাতাল আছে।

বহু অর্থব্যয়ে তার প্রসার সাধন হচ্ছে। তার সর্ব্বতোমুখী উন্নতির জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। প্রতি বৎসর নবেম্বর মাসে ইউনিভার্সিটি কলেজের সকল বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সমস্ত লণ্ডন শহরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাতে প্রতি বৎসর দুই-তিন হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ সাতাশ-আটাশ হাজার টাকা সংগ্রহ হয়। ছাত্রদের যদি বিদ্যালয়ের প্রতি গভীর প্রীতি না থাকত, তবে কি তারা তার জন্যে সেই দারুণ শীত বৃষ্টি ও কুয়াশার মধ্যে ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত?

অবশ্য বিদ্যালয়ের প্রতি এই যে গভীর অনুরাগ, তার কতকগুলি কারণও আছে। প্রত্যেক বিদ্যালয় ছাত্রের বাড়ীঘর। অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজের মত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি) তো বটেই। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি রেসিডেন্সিয়াল নয়, তবু এখানেও ছাত্রছাত্রীরা দিনের প্রায় ১০।১১ ঘণ্টা কাটায়। সকালবেলা ৯টার সময় সকলে কলেজে যায়। ক্লোক-রুম (পোষাক-ঘর) বা তাদের নিজ নিজ লকারে (locker) টুপি, ওভারকোট, ছাতা, ব্যাগ, দস্তানা ও স্কার্ফ প্রভৃতি রেখে বই-খাতা নিয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে। অনার্স ছাত্রদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের বিভিন্ন লাইব্রেরি আছে। ইণ্টারমিডিয়েট বা সাধারণ ছাত্রদের জন্য একটা সাধারণ লাইব্রেরি আছে। পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের লাইব্রেরি পৃথক্। আর্ট্‌স্, সায়ান্স, এঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, লাইব্রেরিয়ান প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক লাইব্রেরির ব্যবস্থা আছে। লাইব্রেরি খোলা, পুস্তকাদি চুরি হয় না। সুতরাং ছাত্রেরা তাদের প্রয়োজনমত পুস্তকাদি পায় ও এখানেই তারা সারাদিনের পড়াশুনা করে। কলেজের লাইব্রেরি সত্যিই পড়াশুনা করবার জায়গা। সেখানে এত মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করা সম্ভব যে খুব কম ছাত্রই বাড়ীতে পড়াশুনা করে। যখন-যখন ক্লাস হয়, লাইব্রেরিতে বই-খাতা রেখেই সবাই ক্লাসে যায়, আবার যখন ফিরে আসে তখন নিজ নিজ জায়গায় ব'সে কাজকর্ম করে।

আগে আগে লাইব্রেরিতে একবারেই বই চুরি হ'ত না। কিছু দিন হ'ল দু-একটা বই হারাতে আরম্ভ হয়েছে। সেই জন্য লাইব্রেরিতে ঢুকবার সিঁড়িতে এক জন বীড্‌ল বা প্রহরী ব'সে থাকে। বেরবার সময় সে সকলের বই দেখে দেখে ছাড়ে। বই চুরি যাওয়াতে সকল ছাত্রছাত্রী এত লজ্জিত যে যাতে চুরি বন্ধ হয়, তার জন্য সকলে বিনা আপত্তিতে বই দেখিয়ে দেখিয়ে যায়। বিদ্যালয়ে যে এইরূপ একটু অসাধুতা আরম্ভ হয়েছে এর জন্যে সমস্ত জাতি যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছে। এক জন চৌরি অধ্যাপক এক দিন কথা-প্রসঙ্গে দুঃ' ক'রে আমাকে বলেছিলেন যে ইংলণ্ডের স্বর্ণযুগের অবসান হয়েছে। তার সভ্যতায় এখন ভাঙন ধরেছে।

প্রত্যেক কলেজে রিফেক্টরি বা ভোজনগৃহ আছে। এখানে ছাত্রেরা নানাবিধ পানীয় ও ভোজ্য পায়। এখানেই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী তাদের লাঞ্চ বা মধ্যাহ্নভোজন করে ও অপরাহ্নে চা খায়। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদের বসবার, খেলবার, সংবাদপত্র পাঠ করবার এমন কি স্নানের ঘরও আছে। পড়াশুনা করতে করতে যখন ছাত্রেরা হাঁপিয়ে ওঠে, তখন লাউঞ্জ বা আরামকক্ষে গল্পগুজব করে, শুয়ে থাকে, চুরুট খায় অথবা লঘু রকমের কিছু পড়াশুনা করে। প্রতি শুক্রবার বিকেলবেলায় কলেজে একটা বিতর্ক সভা হয়। সেখানে মন খুলে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ খেলা, নৃত্য, নাটক, উৎসব আছে। এই প্রকারে ছাত্রদের ভিতর একটা সাহচর্য্য ও বন্ধুত্বের সুযোগ উপস্থিত হয় ও তারা এই সকল সম্পর্কের ভিতর দিয়ে বিদ্যালয়টির সঙ্গে প্রীতির যোগে যুক্ত হয়। তাদের জীবনের বহু সুখকর দিন বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত, কাজেই এই স্থানটি যে তাদের স্মৃতির ফলকে গভীর রেখাপাত ক'রে রাখবে তাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? পরবর্ত্তী জীবনে তাই তারা তাদের পুরাতন বিদ্যালয়টিকে সর্ব্বদা ভালবাসার সঙ্গে দেখে ও তার নানাবিধ কল্যাণ-কার্য্যে সহায়তা করে।

কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য কলেজের নানাবিধ কল্যাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু কলেজের সম্পূর্ণ সামাজিক জীবনটা কলেজ ইউনিয়নের হাতে। কলেজ ইউনিয়ন রিফেক্টরি, স্পোর্ট্‌স্, কলেজ ম্যাগাজিন, লাউঞ্জ চালায় ও সকল

প্রকারের খেলা, আমোদ-আহ্লাদের অনুষ্ঠান করে। এত বড় দায়িত্ব ছাত্রেরা অতি সুশৃঙ্খল ভাবে চালাচ্ছে। কোন গোলযোগ বা দলাদলি নেই—দলাদলি থাকলেও কাজের কোন ক্ষতি হয় না। আর সবচেয়ে বড় কথা এক পয়সাও চুরি হয় না। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রত্যেক ছাত্রের নিকট সাড়ে তিন গিনি ক'রে বৎসরে ইউনিয়নের চাঁদা আদায় হয় ও এই ছাত্র-সমিতির হাত দিয়ে প্রতি বৎসর ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু কখনও এক পয়সা নষ্ট হয় ব'লে শুনি নি, বরঞ্চ প্রত্যেক বিভাগীয় সব্-কমিটি কত টাকা জমাতে পেরেছে তাই নিয়ে বাহাদুরি করে। শুনতে পাই আমাদের দেশে কোথাও কোথাও কলেজ ইউনিয়ন ও স্পোর্ট্সে যাঁরা নেতৃত্ব করেন, তাঁদের কারুর কারুর হাতখরচ তা থেকেই বেশ চ'লে যায়। আমাদের দেশে বড় বড় হোষ্টেলে মেস-কমিটি ব'লে একটা জিনিষ আছে। কোন কোন স্থলে তাতেও নাকি কোন কোন সর্দ্দার-পড়ুয়ার বেশ দু-পয়সা প্রাপ্তি আছে। এই জন্যই নাকি আজকাল কোথাও কোথাও এক শ্রেণীর ছাত্র কলেজের এই সকল প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব করবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব হয়। আজকাল কলেজের ভোটাভোটি ব্যাপার কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। কোন কোন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্র-সমিতির হাতে বহু অর্থ দেন কিন্তু কাজ কিছুই হয় না। বালিতে শিশিরবিন্দুর মত সে অর্থ নিমেষে লুকিয়ে যায়। কর্ত্তৃপক্ষেরা এমনও মনে করেন যে কলেজের ইউনিয়নগুলি এমন এক শ্রেণীর নাগরিকের সৃষ্টি করছে যারা ভবিষ্যৎ জীবনে কলকাতা কর্পোরেশন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা পাবলিক ওয়ার্ক্‌স্ ডিপার্টমেণ্ট ছাড়া আর অন্য কোথাও কাজ করতে পারবে না। আজকাল আবার লিমিটেড কোম্পানীগুলোর আর সে রস নেই।

আজকাল স্পোর্ট্‌স্, থিয়েটার ও পূজোর নামে কলেজে কলেজে এমন একটা মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়েছে যে, সে-সম্বন্ধে আর চুপ ক'রে থাকা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলাতী স্কুল-কলেজ সমূহে স্পোর্ট্‌সের আমদানী হয়েছিল এই আশায় যে ছাত্রেরা তার মধ্যে দিয়ে শিখবে উদারতা, অনাসক্তি ও "at once to obey and to domineer"। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে সেটা কতখানি সফল হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। বাধ্যতা কিছু বেড়েছে কি? অপরের উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা কিছু হয়েছে কি? ছাত্রদের মন কি কিছু বিষয়ে অনাসক্ত হয়েছে? আজকাল যারা ভাল খেলে, তাদেরকে কলেজে নানা রকম সুবিধা ক'রে দিতে হয়। তার পর কোন ম্যাচ-খেলার আগের দিন তারা বেঁকে বসে। তার জন্যে আবার তাদেরকে নানা রকম "ঘুষ" দিতে হয়। কোন কোন স্থলে টীমের কাপ্তেনের কাছে কোন হিসাব না-চাওয়াই ভাল।

আসলে ইংলণ্ডে ছিঁচকে চোর নেই। নইলে কি আর সহস্রবিধ স্লট-মেশিন চলতে পারত? মুদির দোকানে, পোষ্ট আপিসে, চুরুটের দোকানে, রেলের টিকিট-ঘরে, ওষুধের দোকানে কত না মেশিন কাজ ক'রে যাচ্ছে! গভীর অন্ধকার রাত্রিতে কখনও কখনও কেউ এসব ভেঙে একটা জিনিষ নিয়েছে ব'লে শুনি নি। অথচ সে-দেশে কি ক্ষুধার্ত্ত দীনদরিদ্র ভিক্ষুক নেই? ভোরবেলা বাড়ীর সদর-দরজার বাইরে দোকানীরা দুধ, রুটি, খবরের কাগজ দিয়ে যায়। কেউ তো চুরি করে না? আমাদের নেতারা দেশের স্বাধীনতার জন্য কত না উদ্যম করছেন! কিন্তু যত দিন না এই চোর-স্বভাব দেশ থেকে যাবে তত দিন দেশে স্বাধীনতা আসবে না, এলেও আমরা রাখতে পারব না।

যাক্, অবান্তর কথা অনেক ব'লে ফেললাম। ইংলিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কলেজ ইউনিয়নের কর্ম্মচারীদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা। তারা বিনা-বেতনে পড়াশুনা নষ্ট ক'রে কলেজের অর্দ্ধেকের বেশী কাজ ক'রে দেয়। যারা এই সকল কাজ পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করে তারা যে পরবর্ত্তী জীবনে রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রধান স্থান অধিকার করে এ তো খুবই স্বাভাবিক। ঈটনের বোলিং গ্রীনে এক দিন যারা কাপ্তেনি করেছিল, তারা আবার ওয়াটারলু জয় করেছিল এও যেমন সত্য, তেমনি এক কালে যারা অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে ছাত্র-সমিতির নেতৃত্ব করেছিল, তারাই আবার রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছিল।

ইউনিভার্সিটি কলেজ ইউনিয়নের কার্য্যতালিকার

দু-একটা বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করছি। প্রথম উল্লেখযোগ্য আয়োজন, তাদের নাট্যসমিতি। এই সমিতি এত উৎকৃষ্ট নাটক অভিনয় করে যে, নগরীর বহু গণ্যমান্য নরনারী সাধারণ থিয়েটার ছেড়ে এখানে আসেন। প্রায় সাত দিন ধ'রে অভিনয় হয়, সাময়িক সংবাদপত্রে তার বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়; তার পোষ্টার সারা নগরীতে বিখ্যাত বিখ্যাত নাট্যমঞ্চের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে। এক শিলিং থেকে দশ শিলিং পর্য্যন্ত টিকিট বিক্রী হয়; ছাত্রদেরও তা কিনতে হয়। এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে ইউনিভার্সিটি কলেজে বস্তির ছেলেদের লেখাপড়া আমোদ-আহ্লাদের বন্দোবস্ত করা হয়। আমাদের ছাত্রেরা যখন অভিনয় করে, তখন সাধারণতঃ সেই বৎসরের কোন লোকপ্রিয় নাটক করবার জন্ত ব্যস্ত হয় এবং তাতে এক রাত্রির জন্ত শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দেবিকারাণী বা কাননবালার সঙ্গে পাল্লা দেয়। ইংরেজ ছাত্রেরা সাধারণতঃ কোন প্রাচীন অর্দ্ধবিস্মৃত, অথচ সাহিত্যরসিকদের নিকট আদরণীয় নাটক অভিনয় করে। তাতে যদি তারা সাধারণের প্রশংসা না পায় তাতেও নিবৃত্ত হয় না। তারা এর মধ্য দিয়ে তাদের প্রতিভা বিকাশের একটা পথ ক'রে নেয়। লরেন্স হাউস্‌ম্যান এক কালে ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ব'লে তাঁর "লিট্‌ল প্লেজ অব সেণ্ট ফ্রান্সিস অব আসিসি"* নামক সুবিখ্যাত নাটিকাবলী একমাত্র উক্ত কলেজেই অভিনীত হয়। এই নাটিকাগুলি এত হৃদয়গ্রাহী যে নগরের শিক্ষিত ভদ্রসমাজ এগুলি দেখবার জন্ত অতি আগ্রহের সঙ্গে সমবেত হন। সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ডের নাট্যমঞ্চ একটুও খর্ব্ব হয় নি। তাই যে-সকল ছাত্রছাত্রী কলেজ-রঙ্গমঞ্চে সুপরিচিত হয়, তারা আবার পরবর্ত্তী জীবনে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আদরের সঙ্গে গৃহীত হয়। এইরূপে কলেজেই বহু ছাত্রছাত্রীর চাকুরী-জীবনের সূচনা হয়। সেখানে অবশ্য ছাত্রীরা ছাত্রদের সঙ্গে যোগদান করে ও মেয়েদের পার্ট করে। আমাদের দেশে এখনও সেদিন আসে নি; বর্ত্তমান অবস্থায় না-আসাই ভাল। তাছাড়া শীঘ্র আসার প্রয়োজন আছে, তাও মনে হয় না। কেন না, গত বৎসর কলকাতার কোন এক কলেজে শারদীয় উৎসবে মেয়ের পার্ট নেবার উৎসাহ ছেলেদের মধ্যে এত বেড়েছিল যে অনেক কষ্টে স্ত্রীবর্জ্জিত এক নাটক খুঁজে বের করতে হয়েছিল, তা না হ'লে অনেকেই মর্ম্মাহত হ'ত। সব কলেজেই যদি মেয়েদের সঙ্গে এই রকম প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়, তবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ব'লে মনে হয়। সাধনা বসুর জয়শ্রী তো এর মধ্যেই কলেজ-রঙ্গমঞ্চে লাঞ্ছিতা হয়ে পড়েছে। ছেলেদের মধ্যে মেয়েলিপনা মেয়েদের মধ্যে মরদানির মত কুলক্ষণ।

বিলেতে প্রত্যেক কলেজের ম্যাগাজিন একটা উপভোগ্য বস্তু। যেমন নাট্যালয়ে বিনা পয়সায় ঢোকা যায় না, তেমনি ছাত্রেরা বিনা পয়সায় ম্যাগাজিনও পায় না। ইউনিভার্সিটি কলেজ ম্যাগাজিনের এক শিলিং দাম। এই কারণে এই পত্রিকায় নানা প্রকারের ছবি, কার্টুন, নক্‌শা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়। প্রবন্ধ ও কবিতায় একটা উচ্চ আদর্শ রক্ষা করা হয়। পত্রিকা ছাপা ও কাগজে এত শোভন হয় যে, তা কারুর হাতে দিতে লজ্জা বোধ হয় না। ইংরেজ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের একটা মানসিক প্রভেদ আছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা একটু কবিতাপ্রবণ। মলয় হাওয়া, চাঁদিনী রাত, বসন্তের দোদুল দোলা, ভ্রমরের ঝঙ্কার ও কোকিলের কুহুতানে বেচারাদের হৃদয়গুলো যেন নাকাল হয়ে আছে। তাতে আবার বাস-ট্রামে স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে স্কুল-কলেজের দেয়াল থেকে আরম্ভ ক'রে ম্যাগাজিনের পাতা পর্য্যন্ত তাদের প্রেমের ব্যাকুলতায় প্রপীড়িত। ইংরেজ ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে সর্ব্বদা থাকে বটে, কিন্তু সেখানকার ম্যাগাজিন তো দূরে থাক প্রাচীর-সাহিত্যেও কোন রকম রোমান্সের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেখানকার গোসলখানায় বরঞ্চ হিট্‌লার, মুসোলিনী, মোজ্‌লের শ্রাদ্ধ থাকে, অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়গান থাকে। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড

* Laurence Housman : *Little Plays of St. Francis of Assisi.*

যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর সম্বন্ধে অনেক ব্যঙ্গোক্তি থাকৃত—বিশেষতঃ তাঁর ন্যাশন্যাল গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে।* সাহিত্য ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বাদ দিলে ইংরেজী কলেজ ম্যাগাজিনে বেশীর ভাগই থাকে ব্যঙ্গ-রসিকতা। গম্ভীর মুখ ও ছিঁচকে কান্না ইংরেজ যুবক-যুবতীর সবচেয়ে হাসির জিনিষ। তারা জীবনটাকে একটা ব্যঙ্গের চোখেই দেখে থাকে। মরণ নিয়েও ব্যঙ্গ করে। ব্যঙ্গরস ইংরেজ জাতকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বড় করেছে। জাতের অনেক আবর্জ্জনা এই হাসির ফোয়ারায় ধুয়ে গেছে।

শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতই হোক, আর অনভ্যাসবশতই হোক, অথবা নানা প্রকার অসুবিধার দরুনই হোক, ভ্রমণ জিনিষটা যেন আমাদের দেশ থেকে উঠে গেছে। অবশ্য ধনী লোকেরা পূজোর ছুটিতে ট্রেনে বা মোটরে নানা দেশে বেড়িয়ে বেড়ায়, স্বাস্থ্যের অন্বেষণে অনেকে ইউরোপেও যায়, কিন্তু পায়ে হেঁটে দেশের নানা স্থান দর্শন করা—যা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল, মুষ্টিমেয় কতকগুলি যুবকের কথা ছেড়ে দিলে, তা আর প্রায় দেখা যায় না। ইংলণ্ড তথা ইউরোপীয় ছাত্রদের মধ্যে এটা যে শুধু খুব প্রচলিত তা বললে সব বলা হয় না। এটা তাদের একটা ব্যাধি। গরমের ছুটির সময় ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে পায়ে হেঁটে সারা ইংলণ্ড ঘুরে বেড়ায়, এমন কি স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সেও যায়। সাইকেল চ'ড়ে সারা ইউরোপ দেখেছে এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কম নয়। ছুটির আগেই এন. ইউ. এস. (ন্যাশ্‌ন্যাল ইউনিয়ন অব্ ষ্টুডেণ্টস্) কলেজে কলেজে তাদের ভ্রমণসূচী পাঠিয়ে দেয়। ছাত্রছাত্রীরা তখন ছোট ছোট দল বাঁধতে সুরু করে। ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের অধীনে অথবা তাদের সহযোগে কাজ করে। সারা ইউরোপে সকল দ্রষ্টব্য স্থানে এক রকম হষ্টেল আছে। একে ইউথ্ হষ্টেল বলে। এখানে থাকতে ছাত্রদের দৈনিক এক শিলিং মাত্র ভাড়া লাগে। সাধারণতঃ একটা বোর্ডিং হাউসে পাঁচ-ছয় শিলিঙের কম হয় না। এক মাস আগে এসব হষ্টেলে নোটিস্ দিতে হয়, নতুবা জায়গা পাওয়া যায় না। ছাত্রছাত্রীরা ছুটি হওয়া মাত্রই তাদের সামান্য আসবাবপত্র ও দু-একটা শার্ট একটা রুকস্যাকে পিঠে ঝুলিয়ে ছোট ছোট দলে বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে যখন দুপুর হয় তখন রাস্তার ধারে কোন সরাইখানায় বা কৃষকের বাড়ীতে খেয়ে নেয়। গরমের সময় গ্রামের মধ্যে অনেক গৃহস্থলোক এই ভাবে দু-পয়সা রোজগার করে। তার পর যখন সন্ধ্যা হয় তখন যদি কোন ইউথ্ হষ্টেল পায় তাতে ওঠে, নতুবা কোন সরাইখানায় বা কৃষকের বাড়ীতে রাত কাটিয়ে দেয়। ভ্রমণের জন্য নানা রকম মানচিত্র ও পথপ্রদর্শক (গাইড) পাওয়া যায়, তাতে থাকবার খাবার যত জায়গা আছে তারও উল্লেখ থাকে। এই বেড়ানোর মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ছাত্রছাত্রীরা যে শুধু আনন্দই উপভোগ করে তা নয়, নানা প্রকার জ্ঞানসঞ্চয়ও করে। এই ভাবেই তারা ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও নানা প্রকার ব্যবহারিক জ্ঞান সঞ্চয় করে, দেশের সহিত গভীর প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট সুভাষচন্দ্র বসুর কথায়, আমাদের দেশে "পাশবতা" এত বেশী যে, ছাত্রীদের এরূপ ভ্রমণ সুদূরপরাহত।

ইংলণ্ডের ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ছাত্রছাত্রীর মত লেক্‌চার-ভারে প্রপীড়িত নয়। এখানে কলেজে উঠেও প্রত্যেক ছাত্রকে দৈনিক অন্ততঃ চার-পাঁচ ঘণ্টা লেক্‌চার শুনতে হয়, সেখানে বড়-জোর দু-ঘণ্টা। প্রত্যেক ছাত্রকে তার নিজের জন্যে পরিশ্রম করতে হয়, মাথা ঘামাতে হয়। ভাব বা মর্ম্মার্থের খোঁজে চিন্তার সূত্র ধরে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হয়, কেননা, সেখানে অধ্যাপকেরা প্যারাফ্রেজ করেন না—সাধারণ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। কোন্ বইয়ে কি পাওয়া যাবে, এই ব'লেই কর্ত্তব্য শেষ করেন। কাজেই সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের, মস্তিষ্ক নামক যে-পদার্থ ভগবান্ আমাদের দিয়েছেন তাকে খাটাতে হয়। সেখানে যেমন মায়ের আঁচল নেই, তেমনি রাতারাতি পরীক্ষা পাস করবার কোন শর্টকাটও নেই। ছোটবেলা থেকে প্রত্যেক ছাত্র তার নিজের

* কয়েকটা সুন্দর লাইন আমার এখনও মনে আছে :—

Ramsay Mac,
Your shirt is black.
Cover it up,
With Union Jack.

রাস্তা নিজে খুঁজে বের ক'রে নেয়। গতানুগতিকতা সে-দেশেও খুব আছে—কিন্তু আমাদের দেশের মত তা এত শোচনীয় আকার ধারণ করে নি। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই এই যূথ-মনোবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আমাদের বাংলা দেশের নম্‌লা মাটিতে শেয়াল ও ব্যাং দুইই বেশী; এক জন ডাকলে সমস্ত পাল সেই সুরে ডাক ধরে। জানি না পশু-জগতের সঙ্গে মানব-জগতের কোন যোগসূত্র আছে কি না। কিন্তু আমাদের দেশের ছাত্রসমাজে স্বাধীন চিন্তার লক্ষণ খুব কম। যাদের মধ্যে আছে তাদের কোন গোষ্ঠী নেই ও তাদের প্রভাব ছাত্রদের সামাজিক জীবনে পরিস্ফুট হয় না। আজকাল কলকাতার প্রাইভেট কলেজগুলোতে যদি কোন দিন দশটা ছেলের কলেজ পালাবার মতলব থাকে, তবে তারা এই দশটিতে মিলে কোন একটা উপলক্ষ্য ধ'রে কলেজে হরতাল ক'রে দিতে পারে। অপর এক হাজার ন-শ নব্বই জন তাতে খুব বিরক্ত হবে হয়ত, কিন্তু তা বন্ধ করবার জন্ত কোন শক্তি ব্যবহার করবে না। বাংলা দেশের শিক্ষক-জীবনে যদি শিক্ষকবৃত্তির উপর কোন ঘৃণার ভাব থাকে—এই তার একটা প্রধান কারণ। দারিদ্র্য এবং তাচ্ছিল্যও বরণ করা কঠিন নয় যদি নিজ বৃত্তির উপর শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু যখন মনে হয় তার জীবনের সমস্ত শক্তির অপচয় হচ্ছে, তখন ব্যর্থতা ও হতাশার ব্যথায় তার হৃদয়টা জর্জ্জরিত হয়ে যায়। বাংলা দেশে স্কুল ও কলেজ কারবারী নীতিতে পরিচালিত। গবর্ণমেণ্ট টাকা দেয় না—জনসাধারণ সাহায্য করে না, অথচ সুশিক্ষা চাই! দেশের আপামর সাধারণের জন্ত শিক্ষা চাই! কাজেই যে-সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা ছাত্রবেতনের উপর নির্ভর না ক'রে পারে না। এই জন্তেই বহু ছাত্র চাই প্রত্যেক স্কুল-কলেজে। ফলে স্কুল-কলেজে শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে না। ছাত্রেরাও ভুলে যায় যে তারা ভদ্র মানুষ—সমাজ তাদের কাছ থেকে আশা করে মনুষ্যোচিত ব্যবহার। ক্লাসগুলো ক্লাস হয়ে ওঠে না। যে-শ্রদ্ধা ব্যতীত কোন শিক্ষাই অসম্ভব, তারই একান্ত অভাব ক্লাসে। আমাদের শিক্ষা-প্রণালী যদি দেশের কোন বিশেষ অহিত ক'রে থাকে তবে তা এই সব মনোভাবের প্রসার। ইউরোপে টাকার অভাব নেই বলে ক্লাসগুলো হয় ছোট। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের পরিচয় ও প্রীতির মধ্য দিয়ে একটা সত্যিকার গুরুশিষ্যের ভাব জন্মলাভ করে। শিক্ষক সেখানে বক্তা নয়, নেতা। সেই জন্ত শিক্ষকের জীবন সেখানে শুকিয়ে যায় না—একটা অপূর্ব্ব প্রসন্নতায় ভরে ওঠে।

শেষ করবার আগে একটা কথা বলা দরকার। আমাদের দেশেও এমন ছাত্র আছে যাদের সঙ্গে ইউরোপীয় ভাল ছাত্রদের তুলনা করতে লজ্জা নেই, গৌরববোধ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাদের সংখ্যা এত কম যে তাদের ব্যতিক্রম ব'লে ধরা যায়। এও সত্য যে, ইংলণ্ডের সব ছাত্রছাত্রীই আদর্শস্থানীয় নয়।

লাহোর।



মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৮

পুরাতন অমিয় নূতন হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, পাড়াপ্রতিবাসীর কৌতূহলের অন্ত নাই। শিক্ষিতের মর্য্যাদা উপার্জ্জনের সঙ্গে শতগুণ বৃদ্ধি পায়। অমিয় সম্বন্ধে ইহাদের কৌতূহল যে এতদিন পরে সহসা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একমাত্র হেতু কমলার আশীর্ব্বাদ সে লাভ করিয়াছে। গরিবের ঘরে শুধু শিক্ষার জন্ম কে কবে উচ্চ ডিগ্রী আহরণের চেষ্টায় প্রাণপণ করিয়াছে! ডিগ্রীর আঁকশি দিয়া চাকুরী-রূপ চাঁদকে যদি আয়ত্ত করা না গেল তো কিসের গৌরব এত শিক্ষার? অমিয়র শিক্ষালাভ আজ সার্থক!

জ্ঞানবাবুর পিসী বলিলেন, "খাসা ছেলে অমিয়; দিব্যি একটি চাকরি পেলে। আমাদের হরিটা দেখ না, খদ্দর পরে হৈহৈ করে বেড়াচ্ছে।"

বোসেদের সুলোচনা বলিলেন, "আজকাল যে জেলখাটার হুজুক হয়েছে কিনা, ওরা স্বদেশী করছে।"

পিসী বলিলেন, "পোড়া কপাল! পেটে জোটে না ভাত, স্বদেশ? অত বড় ধাড়ী ছেলে বাপ-মার দুঃখু একটু বোঝে না গা?"

সুলোচনা বলিলেন, "তা অমিয়কে ব'লে একটা দিয়ে লাগিয়ে দাও। পাস তো দিয়েছে একটা।"

অমিয় হাসিয়া সেথান হইতে উঠিয়া গেল। নদীতে ভাসিতে ভাসিতে কূলের কাছাকাছি আসিয়াছে সে। জানে না কূলে উঠিতে পারিবে কি না? কিনারায় চোরাবালিও থাকিতে পারে, কর্দ্দম থাকাও বিচিত্র নহে। উঠিবার কালে উঁচু পাড় যদি ধ্বসিয়া পড়ে?

তাই আশাকে ডাকিয়া শুইবার সময় সে বলিল, "আমার চাকরি হওয়াতে তোমাদের খুব আনন্দ হয়েছে, নয়?"

আশা বলিল, "আনন্দ হওয়াটা কি খুবই আশ্চর্য্য ভাব?"

অমিয় বলিল, "চাকরি না থাকার এক চিন্তা, আর থাকার কত রকম চিন্তা জান?"

আশা বলিল, "চাকরি করি নি তো, জানব কোত্থেকে।"

অমিয় বলিল, "তোমাদের ঠাকুরদেবতা, তোমাদের বাড়ীঘর, তোমাদের আসবাবপত্র, সোনারূপোর চাহিদা যদি না মেটাতে পারলাম তো কিসের চাকরি!"

আশা উত্তর দিল না।

অমিয় বলিতে লাগিল, "চাকরি মানেই জীবনের যত রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে সবগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা। শুধু জল খেলে যার তৃষ্ণা মেটে, চাকরি হ'লে তার বাড়ীতে চলবে চা। আলুভাতে হ'লে খিদে মেটে, চাকরির কল্যাণে তার পঞ্চাশ ব্যঞ্জন খেয়েও মুখের অরুচি সারে না। তোমার প্লেন লাল পাড় শাড়ী কি—আর বাড়লে—ব্লাউজ না হ'লে মানাবে? নেমন্তন্ন-বাড়ীতে গিয়ে তুমি খুঁটিয়ে গহনার আলোচনা করবে যদি গহনা গড়াবার ক্ষমতা তোমার থাকে; না হ'লে, হাতের শাঁখা মাথায় ঠেকিয়ে পরম পতিব্রতার অভিনয় তোমায় করতে হবে। আরে ও কি, চোখে জল কেন?"

আশা বালিশে মুখ গুঁজিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অমিয় তাহার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "দেখ একবার কাণ্ড! আমি সাধারণ নিয়মের কথা বলছি, তুমি কাঁদ কেন?"

আশা জোর করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, অমিয় চেষ্টা করিয়াও সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তুলিতে পারিল না।

অতঃপর সে আশার পিঠের উপর হাত রাখিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিতে লাগিল, "পাগল দেখ, ভাল কথাই বললাম দেখ তো। কোথায় নূতন চাকরি হয়েছে, তোমার জন্ম আনব উপহার, তার বদলে কথার আঘাত দিয়ে বার করলাম তোমার চোখের জল।"

আশা মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "চোখের জল বার করতে ভালবাস ব'লেই হয়তো তা বার করেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কবে হাতের শাঁখা মাথায় ঠেকিয়ে তোমাদের কাছে পতিব্রতার অভিনয় করেছি?"

অমিয় বলিল, "তুমি কর নি বটে।"

"তবে বললে কেন ও-কথা? আমরা হয়তো অসার, খেলো, ছেলেমানুষীও আমাদের অনেক দিক দিয়ে দেখতে পাও, কিন্তু আঁতের জিনিষ নিয়ে ঠাট্টা করা আমরা সইতে পারি না।"

অমিয় বলিল, "তুমি এতটা ব্যথা পাবে জানলে বলতাম না।"

আশা বলিল, "কিসে আমাদের ব্যথা তোমরা যে বুঝতে চাও না। তোমরা ভাব স্বামীকে সব মেয়েই উপার্জ্জনের যন্ত্রস্বরূপ মনে করে? ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ও তো বাইরের বিলাস, ওর সঙ্গে মনের সম্পর্ক কতটুকু।" একটু থামিয়া বলিল, "এতদিন যে তোমার উপার্জ্জন ছিল না, কোন দিন নিজের কোন অভাবকে বড় ক'রে দেখেছি, না তোমায় জানিয়েছি কোন কথা? তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখকে কেউ তো আলাদা ক'রে ভাবতে শেখায় নি কোনদিন?"

অমিয় হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "তবু লোকে বলে বিবাহ করা পাপ? নাই থাকল উপার্জ্জন, বিনা চেষ্টায় এমন ধারা স্বর্গ লাভ করতে পায় যারা তাদের সঙ্গে কোন্ জাতের তুলনা! আশা, শোন তবে একটা সত্য কথা, এতক্ষণ যা চেপে রেখেছি—মার আনন্দ দেখে, তোমার আনন্দ দেখে, পাড়াপড়শীর আনন্দ দেখে এতক্ষণে যা মুখ ফুটে বলতে সাহস করি নি, এই চাকরি, এর গুরুভার যদি চিরকাল বইতে না পারি?"

আশা বিস্মিত নয়নে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিল, "ও-কথা বলছ কেন?"

"কেন বলছি, চাকরির ক্ষেত্র বড় সঙ্কীর্ণ ব'লে আমার মনে হচ্ছে। বদ্ধ ঘরের মধ্যে পাখী কতক্ষণ উড়তে পারে, সামনে যদি তার জানালা দিয়ে খোলা আকাশ দেখা যায়? যদিও সে জানে, আকাশের কাঠফাটা রোদ আছে, ঝড়জলের দুর্য্যোগ আছে, মানুষের গুলিও তার মৃত্যু ঘটাতে পারে, তবু শুধু ঝিমিয়ে বেঁচে থাকবার জন্তই কি সে ঘরের বাইরে পাখা মেলবে না?"

আশা এত কথা বুঝিল না। শুধু বুঝিল, অমিয় যে কোন কারণে হউক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে। আপিসের ব্যবহার কিংবা অন্য কোন ঘটনার মূলে তার এই উত্তেজনা। চাকরি পাইবার জন্ম যে শত প্রকারের অসুবিধা ও অপমান ভোগ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, কঠিন প্রতিযোগিতায় চাকরি পাইয়াই তাহার এ অনুশোচনা কেন?

স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "তুমিই তো বলতে, যে উপায় করতে পারে না, তার বেঁচে থাকা মিথ্যে।"

"এখনও বলি সে-কথা। কিন্তু সে কি এই রকম দাস্যবৃত্তি ক'রে বেঁচে থাকা?"

"চাকরি মানেই তো দাস্যবৃত্তি। সংসারে বিনা দাস্যবৃত্তিতে কার দিন চলে?"

"দাস্যবৃত্তির চরম শাস্তি কোথায় জান? যেখানে নিজের বিদ্যাকে, বুদ্ধিকে, বিবেককে বলিদান দিতে হয়।"

আশা হাসিয়া বলিল, "এই কথা! তুমিই না একদিন বলতে চাকরি না পেলে কোন বাড়ীতে নেমন্তন্ন নেব না। দরিদ্র যারা, তাদের মস্তবড় একটা দোষ এই যে মান-অপমানের মানদণ্ড তাদের বড় বেশী দুলতে থাকে। কেউ ঠাট্টা করে দু-কথা বললে মনে হবে—ঘেন্না করে বলছে। কানাকে কানা বললে কানার যেমন রাগ হয়। চাকরি নিয়ে তোমার বুদ্ধি-বিবেককে এতটা সজাগ নাই বা করলে?"

অমিয় চমকিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। আশ্চর্য্য কণ্ঠে বলিল, "তবে কি করব?"

আশা হাসিয়া বলিল, "যেন আমি অনেক কাল ধরে আপিসে চাকরি করেছি তাই তোমায় উপদেশ দেব!"

অমিয় বলিল, "আপিসের কথা নয়, সাধারণ কথায় বল। তুমি হ'লে কি করতে?"

আশা বলিল, "আমাদের আপিস এই সংসার। এর কথাই বলি, যে-কথা আমার সম্পর্কে নয় তা নিয়ে মাথা ঘামান আমার সয় না। যে-কথায় আমায় খোঁচা দেওয়া হয়, তার সম্বন্ধেও বেশী আলোচনা আমার মন করে না। কথার শক্তি কতটুকু? যদি গা পেতে নেওয়া যায় মনকে তা সর্বক্ষণই পুড়িয়ে মারে। যদি গ্রাহ্য না কর—"

অমিয় বলিল, "তাহ'লে তা হবে বালির গাদায় বোমা ফেলার মত। ঠিক বলেছ আশা। কিন্তু পাঁচ জনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখকে যদি না জড়াতে পারলাম—"

আশা হাসির মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "পাঁচ দিন কাজ ক'রে তুমি পাঁচজনের সুখ-দুঃখকে নিজের ক'রে নিয়েছ—এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

"তবে আমার নিজের জন্তই কি এ দুঃখবোধ?"

"হ'তে পারে তুমি চাকরির ক্ষেত্রে যা চেয়েছিলে তা হয়তো পাও নি, তাই দুঃখ হয়েছে।"

এই কথায় অমিয় আর একবার ভাবিতে বসিল।

আশা বলিল, "যা আমরা আশা করি, তা পাই নে ব'লেই তো যত দুঃখ কপালে জোটে। আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনি, রাঙা বর হবে, রাজার রাণী হব, গাড়ী-পাল্কী চড়ব—এমনি কত কি আজগুবি কথা।"

অমিয় বলিল, "অথচ তা আমাদের ভাগ্যে হয় না, কেন বল তো?"

আশা বলিল, "বাবার কথাতেই বলি। মাকে প্রায়ই বলতেন, 'ইস্কুল-মাষ্টারের মেয়েকে তুমি রাজরাণী হবার লোভ দেখাও কেন? সত্যিই কি ও তাই হবে?' মা রাগ ক'রে বলতেন, 'ওর কপালে থাকলে নিশ্চয়ই ও রাজরাণী হবে। তোমার মত ছেলেবেলা থেকে "হা-ভাতের" মন্ত্র শেখাতে আমার লজ্জা করে।' বাবা হেসে বলতেন, 'লজ্জা তোমার করে না, সত্য কথা শোনবার সাহস তোমার নেই। আসলে তোমার মন যা চায়, যা পায় নি, তারই বিষ তুমি মেয়ের কানে ঢালছ।' মা রাগ ক'রে কথা বন্ধ করতেন। বাবা আমার পানে চেয়ে ম্লান হেসে বলতেন, 'সত্যিকার অবস্থা জেনে রাখা ভাল, খুকী। তুই রাঙা বর হয়তো পেতে পারিস, কিন্তু রাজ্যপাট, গাড়ীঘোড়া, এসব তোর জন্ত নয়। যারা রূপোর চামচে মুখে করে জন্মেছে তাদের মা-বাপ তাদের মেয়েছেলেকে ও রকম অসম্ভব কথা বলে না। তারা নিশ্চয় ক'রে জানে যে তারা তা পাবেই, সুতরাং তাদের সে প্রলোভন দেখাতে হয় না। তোদের মাষ্টার বাপ বড় জোর কেরানী বর দিতে পারে, রাজ্যপাটের আশা ভুলে যা।"

অমিয় বলিল, "তোমার বাবার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করি। কেরানী বরই তোমার ভাগ্যে জুটেছে, কিন্তু রাঙা বর জোটে নি।"

আশা হাসিয়া বলিল, "যদি বলি আমার মনের রঙে তাকে রাঙিয়ে নিয়েছি।"

অমিয় তাহার গালে একটি টোকা মারিয়া বলিল, "সে তো তোমার মনের কথা, চোখের কথা নয়।"

আশা বলিল, "আবার তোমার ভুল হ'ল। মন যা দেখায় চোখ তো তাই দেখে। না হ'লে আমার মত কুৎসিতার সঙ্গে কথা বলতেও তোমার বাধত।"

অমিয় বলিল, "তুমি যে এত কথা জান তা তো চাকরি হবার আগে বুঝতে পারি নি!"

"জান না, আমি মাষ্টারের মেয়ে। কথার চোটে তোমায় এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে আসতে পারি।"

অমিয় বলিল, "আমাদের কেনাবেচা অনেক দিন সাঙ্গ হয়েছে, এবং আমার মনে হয় তাতে ঠকি নি।"

অমিয়র বুকে মুখ লুকাইয়া আশা শুধু বলিল, "আবার।"

ফাল্গুনের জ্যোৎস্নাভরা রাত্রি। রোয়াকের ধারে হাস্নুহানার ঝাড়টি ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে—ভাঙা ঘর সে গন্ধে উতলা। স্বর্গ যদি আজ পৃথিবীর কোথাও নামিয়া থাকে তো এই ঘরে, এবং দীর্ঘদিন প্রবাসী প্রিয়তমের বুকের সন্নিকটে মুখ লুকাইয়া সেই স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে পারে শুধু তার প্রিয়া। উতল ফাল্গুন

রাত্রিতে আম্রশাখায় কোকিল ডাকুক, আর 'চোখ গেল' বলিয়া পাপিয়া-বধূ চীৎকারই জানাক, সে-স্বর বুক দিয়া গ্রহণ করিবার সাহস কাহার আছে? ফাল্গুনের হিমকে যাহারা ভয় করে তাহারা জরাগ্রস্ত দেহ-মন লইয়া জানালা বন্ধ করিয়া এমন পৃথিবী-ভাসানো জ্যোৎস্নাকে নির্ব্বাসন দিয়াছে, যাহারা ভয় করে না,—তাহাদের কবির চোখ নাই, নিত্যনিয়মিত নিদ্রার অঙ্কে মাথা রাখিয়া জানালা খুলিয়াই এমন স্বর্গকে ভুলিয়া গেল! নিত্য মিলন-রজনী যাপন যাহাদের তরুণ মনে পরম সম্পদের কথাই জাগাইয়া দেয় তাহারাও কি এই বিশেষ একটি রজনীকে, এই জ্যোৎস্নার বিগলিত ধারা ও হাস্নুহানার গন্ধকে স্বর্গ বলিয়া দুটি চোখের পাতা এক করিবে না?

অবশেষে জাগিয়াই সে-রজনী শেষ হইয়া গেল।

কেরানী কবি নহে, কেরানী বধূও নহে, কিন্তু বিরহের নিকষ-পাথরে উঁহাদের কবিত্বের খাঁটি সোনার দাগ অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াই লাগিয়াছে। ফাল্গুনের রাত্রি—আকাশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া জ্যোৎস্নাকে এই মিলন-সভায় নিমন্ত্রণ করিয়াছে, কোকিল-পাপিয়াকে স্বর-সাধনায় ব্রতী করিয়া হাস্নুহানার ঝাড়ে হাজার হাজার কুঁড়িকে একই সঙ্গে মুক্তি দিয়াছে, দক্ষিণা বাতাস সেই গন্ধ বহিবার ভার পাইয়া ঘরের মধ্যে যেমন উঁকি মারিয়াছে—অমনই বাহির হইবার কথা তাহার মনে নাই। অবশেষে বায়ুর সঙ্গে কোকিল, পাপিয়ার স্বর, জ্যোৎস্নার টুকরা আর রাত্রির মাধুর্য্য ঘরের মধ্যে ভিড় জমাইয়া দুটি হৃদয়ের মিলন-বীণার তারগুলিতে ঝঙ্কার তুলিতে লাগিল। কেরানী তো মানুষ, কাজেই এমন অমৃত-পরিবেশের মধ্যে কবি হইয়া স্বর্গ রচনা করিতে তাহার বাধিল না। সুতরাং ঘুমাইবার আয়োজন না করিতেই প্রভাত হইয়া গেল।

৯

প্রভাতে পৃথিবীর আর এক রূপ। গ্রামের প্রান্ত-সীমায় অমিয়দের বাড়ী। উঁচু ট্র্যাঙ্ক রোড হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। ট্র্যাঙ্ক রোডের নীচে দোতলা-সমান নীচু খালের শুষ্ক গর্ভ, বর্ষার শেষার্দ্ধে মাত্র পূর্ণযৌবনা গঙ্গার কৃপায় নদী নাম ধারণ করে, মাস তিনেকের মধ্যে তাহার সংক্ষিপ্ত নদী-জীবনের শেষ হইয়া যায়। অতঃপর গরু চরিবার প্রশস্ত মাঠে রূপান্তরিত হইয়া বাবলা-বনের সীমানায় মাথা রাখিয়া ঘুমায়। বহুদূরবিস্তৃত সে বাবলা-বন। গঙ্গার চরভূমি হইতে খালের গর্ভসীমা পর্য্যন্ত হাজার হাজার বৃক্ষশীর্ষ হলদে রঙের ফুলে সাজিয়া বৎসরে তিন-চারটি মাসে মাত্র সৌন্দর্য্যের পসরা খুলিয়া দেয়। আর কয়েকটি মাস ধূসর রঙের থলো থলো ফলে ভরিয়া, গৃহস্থের গৃহপালিত পশু গরুর খাদ্য জোগায়; বাকী মাসগুলি সুতীক্ষ্ণ কণ্টকফলক মেলিয়া পথিককে বিভীষিকা দেখায়। বাবলাকুঞ্জ ভেদ করিয়া অতিকায় অশ্বত্থ কোথাও দেখা যায়, কোথাও শিমুল শোভন পত্রে মাথা তুলিয়াছে। বাঁধের ঠিক নীচে একদা বাঁধ কাটা জলের আবর্ত্তে দহ সৃষ্টি হইয়াছিল, সারা বৎসরের পরম সম্পদ সেই জলটুকুতে এ-পাড়ার অধিবাসীদের স্নান, পান ইত্যাদি বহুবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য সারা হইয়া থাকে। কোথাও মাঠ দেখা যায়, বাবলা-বনের অন্তরালে কোথাও তা ঢাকা পড়িয়াছে। প্রত্যূষে ট্র্যাঙ্কে দাঁড়াইয়া সদ্যপ্রকাশিত কোমল সূর্য্যবর্ত্তিকায় বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিকে পাঠাইতে পারা যায়; মাইল-দুই দূরের গঙ্গার তটভূমি লক্ষ্য করিলে দেখিবে কালনা হইতে বয়রা পর্য্যন্ত সমগ্র তটভূমি ও-পারের সুউচ্চ পাড়ের ধূমবর্ণের বৃক্ষসারির দ্বারা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে, এ-পারের স্পষ্টতর বৃক্ষশ্রেণীর এবং ও-পারের ধূমরেখার মধ্যে যতটুকু ফাঁকা মাঠ বর্ত্তমান উহারই মধ্যে গঙ্গা তরঙ্গভঙ্গে বহিয়া চলিয়াছেন। একমাত্র বর্ষাকালে শুভ্র পাল তুলিয়া সারি সারি নৌকা যখন ছায়াছবির মত তরতর করিয়া বহিয়া যায়, তখন বিচিত্র বাবলা-বনের অন্তরালবর্ত্তিনী গঙ্গা স্পষ্টতর হইয়া উঠেন। অন্য সময়ে পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। যাহা হউক, একসঙ্গে দশ-বারো মাইল প্রান্তর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিলে আত্মহারা হইতে মানুষের বিলম্ব হয় না। মানুষ যে কত ক্ষুদ্র, বিরাট প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া শুধু সে উপভোগ করিতে পারে। রুক্ষ, বন্ধ্যা মাঠের বিস্তৃতি কয়েক ক্রোশ ধরিয়া দৃষ্টিকে ব্যাহত না করিলে, অথবা আকাশের সীমানা যেখানে তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্রকে স্পর্শ করিয়াছে, জলধর সমুদ্র

কিংবা বালুময় মরুভূমি, ইহাদের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় লাভ করিতে কাহার কতটুকু বিলম্ব হয়? প্রকৃতি যেখানে বিরাট, মানুষ সেখানে মুগ্ধবিস্ময়ে আপনাকে তুচ্ছ মনে করিয়া থাকে; হয়তো আত্মদর্শনের প্রথম অধ্যায়টি এরূপ বিরাট প্রাকৃতিক পরিবেশ না হইলে চোখেই পড়ে না।

"কি রে অমিয়, একমনে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? কাল বাড়ী এসেছিস বুঝি?"

বৃদ্ধ রাঙা-ঠাকুর্দা লাঠি ঠুকঠুক করিতে করিতে অমিয়র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমিয় তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের ধুলা লইতে লইতে বলিল, "কাল সন্ধ্যেবেলা।"

রাঙা-ঠাকুর্দা প্রসন্নমুখে বলিলেন, "বেশ, বেশ, শুনলাম একটি চাকরি বাগিয়েছিস? ভাল, ভাল। এই বাজারে চাকরি না হ'লে ভদ্রস্থতা থাকে?"

অমিয় বলিল, "আচ্ছা ঠাকুর্দা, আপনাদের আমলে চাকরি না বাগালে ভদ্রস্থতা থাকত কি ক'রে?"

রাঙা-ঠাকুর্দা বলিলেন, "আমরা হলাম চাষা, আমাদের কথা ছেড়ে দে। হাতে-কলমে করি নি এমন কাজ তো দেখি নে। আমাদের আদর্শ কি ছিল জানিস্, অঋণী, অপ্রবাসী। হয়তো আমরা কুয়োর ব্যাঙ ছিলাম, কিন্তু কুয়োর মধ্যেও সুখ ছিল রে ভাই, সুখ ছিল।"

রাঙা-ঠাকুর্দার দোষ, এক বার সেকালের গল্প পাড়িলে আর থামিতে চান না। একালের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, সব কিছুকেই তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন না। একালের ছেলে নাকি গুরুজন দেখিয়া মুখ নীচু করিয়া কথা কহিতে জানে না। বুড়াদের ভুল দেখাইয়া মুখের উপর তর্ক জুড়িয়া দেয়, মাঠ দেখিয়া মুখ সিঁটকায় এবং কাদা পায়ে লাগিলে পাড়াগাঁর নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়।

পাছে তিনি সেকালের গল্পে মাতিয়া উঠেন তাই তাড়াতাড়ি অমিয় বলিল, "আপনার বয়স কত হ'ল, ঠাকুর্দা?"

"কত মনে হয় বল দেখি?"

"সত্তর-একাত্তর হবে।"

হা হা করিয়া হাসিয়া রাঙা-ঠাকুর্দা বলিলেন, "আশির এক ঘণ্টা কম নয়। এখনও জানিস, চালভাজা চিবিয়ে খাই, দশ মাইল রাস্তা হেঁটে মারি। দেখ দেখি চুল,—নাতিনাতনিরা দশটা করে পাকা চুল তুলতে পারলে একটা পয়সা পাবে বলা আছে, তা সে বেচারীরা একটি পয়সাও রোজগার করতে পারে না। হা হা।" বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন।

অমিয় সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, "আপনাদের সময়ে খাওয়ার ভোগ ছিল।"

ঠাকুর্দা বলিলেন, "গরিবের ঘরে লুচি-পোলাও কোথা পাব ভাই, যা করেন ভাত-ডাল-তরকারি। ঘরে গরু ছিল, দুধ কিছু খেতাম বটে; কিন্তু পাঁচ জনকে দিয়ে সে আর কত টুকু?"

"তবে আশি বছর হলেও চুল পাকল না কেন, দশ মাইল হাঁটলেও আপনার পা ব্যথা করে না কেন?"

বৃদ্ধ কৌতুকে চক্ষু নাচাইয়া বলিলেন, "শক্তিরক্ষার মন্ত্র আমাদের জানা ছিল, ভাই। আমরা ভূতের মত খাটতাম আর রাক্ষসের মত খেতাম। দেশের জল, দেশের হাওয়ায় অম্বল, ডিস্‌পেপসিয়ার গন্ধও পাই নি কোন দিন। তোর ঠাকুরমা কি বলেন জানিস, 'হ্যাগা, অম্বল কি গা? আমরা তো এক অম্বল রাঁধি।' বলিয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন।

অমিয় বলিল, "আপনাদের কাল যদি এতই ভাল ছিল তো আমাদের সেই কালের মধ্যে রাখলেন না কেন? 'হা অন্ন, হা অন্ন' ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবার এ দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হয় কেন?"

ঠাকুর্দা বলিলেন, "আমরাই কি তোদের ঘরছাড়া করেছি, নাতি? তোদের নূতন শিক্ষায় নূতন মন গড়ে উঠেছে—সে-মন এই পুরোনো জমিতে তাই আর বসে না। আমরা যে-মাঠ তৈরি করেছিলাম তোরা তাতে ফসল ফলাতে পারলি নে, তোরা মিহি ধুতির কোঁচান কোঁচা হাতের মুঠোয় ধরে জুতো পায়ে পাড়ি দিলি শহরের দিকে। তোরা পিছন ফিরলি ব'লেই মাঠ আজ শুকিয়ে গেছে, আকাশে জলের অভাব। মুখ্যু চাষা—বাপ-পিতাম'র কাদের মর্চে-ধরা লাঙল আর অস্থিচর্ম-সার বলদ নিয়ে কত ফসল ফলাবে বল। রোগে তারা

শক্তিহীন। অভাবে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েছে, তারা আর কত দিন!"

একটি নিশ্বাস ফেলিয়া রাঙা-ঠাকুর্দা অগ্রসর হইলেন।

অমিয় বলিল, "জমিতে আজকাল কিছুই নেই ঠাকুর্দা। ফসল হয়, খাজানা দিয়ে দু-মুঠো ঘরে তোলা যায়, না হ'লে ধারকর্জ্জ।"

রাঙা-ঠাকুর্দা বলিলেন, "কেন এমন অবস্থা হ'ল ভেবেছিস কি? আগের দিনেও জমিদারের খাজনা দিতে হ'ত, জল না হ'লে অজন্মা হ'ত, দুর্ভিক্ষও দেখা দিত। কিন্তু অনেক দুঃখ সয়েও তখনকার লোক জমি চাষ ছাড়ত না। জমি ঠিক ছেলের মত, তাকে স্নেহের চোখে না দেখেছ কি বেয়াড়াপনা করবেই। ভাল ছেলের বায়না রাখতে যেমন ভাল জামা-কাপড়, ভাল খাবার মাঝে মাঝে দিতে হয়, জমির বেলাও তাই।"

অমিয় বলিল, "যদি লাভ বুঝি তবেই তো জমির পিছনে খাটবার উৎসাহ আসে।"

ঠাকুর্দা বলিলেন, "লাভ মানে রাতারাতি বড়লোক হওয়া নয়। জানিস তো 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।' ব্যবসার অর্দ্ধেক চাষে, এ-কথাটি তোরা যে ভুলে যাস।"

অমিয় বলিল, "যেবার ফসল না হ'ত সেবার কি করতেন ঠাকুর্দা?"

রাঙা-ঠাকুর্দা বলিলেন, "শুধু ধান চাষ করলে চাষার অনন্ত দুর্গতি। জমি নিয়ে ম্যাজিক খেলা চাই। ধান, খন্দকুটো, তরিতরকারি—যখন যেটা পারবে। একটি না হ'লে আর একটি তোমার পরিশ্রম পুষিয়ে দেবে। আমরা ছুটি কি জানতাম না, এক অসুখ হ'লেই শুয়ে থাকতাম।"

অমিয় বলিল, "আমাদের জমি কোথায় যে চাষ করব?"

ঠাকুর্দা বলিলেন, "যখন স্কুল-কলেজে পড়েছিলি তখন কি নিশ্চয় মনে করেছিলি চাকরি পাবি। চেষ্টা ক'রে তবে চাকরি জুটিয়েছিস তো? চাকরির চেয়ে অনেক কম চেষ্টা করলে জমি মেলে। সখের জমি চাষ নয়—সমস্ত জীবন তাতে ডুবিয়ে দিতে হবে। তোদের টকি দেখা, সৌখিন রাজনীতির চর্চ্চা করা, শহরের শত রকমের সুখ-সুবিধার উপর লক্ষ্য রাখা—এসব হয়তো চলবে না।"

অমিয় বলিল, "কালের স্রোতকে হাত দিয়ে ঠেকাতে আমরা পারি না, ঠাকুর্দা, আপনিও পারেন না।"

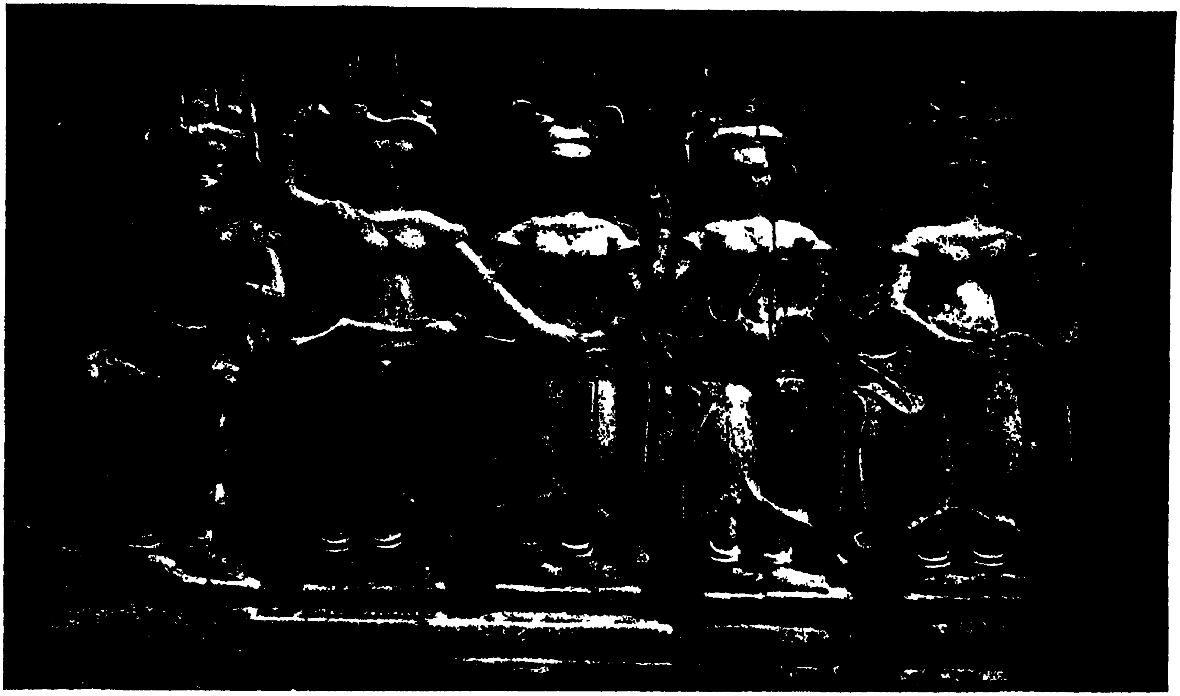
ঠাকুর্দা বলিলেন, "যাদের শক্তি আছে তারা স্রোতকে আটকে না রেখে অন্য দিক দিয়ে চালিয়ে দিতে পারে। স্রোতে বাধা দিতে গেলেই অনর্থপাত হয়। তোরাই তো বলিস, রুশিয়া ব'লে এক দেশ আছে, যারা আধুনিক সভ্যতার মাঝখানে ব'সেও জমিজমা নিয়ে দিব্যি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। তাদের দেশে বেকার-সমস্যা নেই।"

অমিয় বলিল, "সে স্বাধীন দেশের কথা ছেড়ে দিন, রাষ্ট্র সহায় হ'লে অনেক কিছু করা সম্ভব।"

ঠাকুর্দা বলিলেন, "পাঁচজনে একত্র হয়ে কাজ করলে রাষ্ট্রের সাহায্য কি দরকার। সে-সাহায্য পাওয়া যায় আরও ভাল, না পাওয়া গেলেই বা ক্ষতি কিসের? আসল কথা কি জানিস—তোরা দুর্ব্বল। স্রোতে ভেসে যাওয়াটাই সুখের মনে করিস, স্রোতের গতি ফেরাবার জন্য চেষ্টা তোদের নেই। আমাদের ফসল আজকাল হয় বন্যায় ভেসে যায়, নয় জলাভাবে শুকিয়ে যায়, অথচ বাংলা দেশে নদীর অভাব নেই। অনাবৃষ্টির দিনে চেষ্টা করলে আমরা অনায়াসে নদী থেকে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারি। এক জনের চেষ্টায় এ কাজ হয় না। আবার বন্যার জল যাতে না ঢোকে তার ব্যবস্থাও আমাদেরই হাতে। যারা আজকাল চাষা তারা শুধু জমিই চাষ করে, ধারে কর্জ্জে, রোগে শোকে তারা শক্তিহীন, ভাল ক'রে চাষও করতে পারে না। তোরা বুদ্ধি দিয়ে, অর্থ দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে যদি এদের সাহায্য করিস, তবে আবার জমিতে সোনা ফলতে পারে। নইলে কাগজে লিখে, আইন ক'রে, এদের দুঃখ দূর করতে পারবি নে।"

অমিয় দেখিল ঠাকুর্দা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছেন, পায়ের গতি তাঁহার দ্রুত হইয়াছে, লাঠির ঠকঠকানিও বাড়িয়াছে। বুড়ার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে গেলে বৃদ্ধ ঘোড়ানর অভ্যাস করিতে হয়।

সে বলিল, "আর কতটা বেড়াবেন?"



অপ্সরা-মূর্ত্তি, কাম্বোজ



নৌযুদ্ধ, কাম্বোজ





ঠাকুর্দা বলিলেন, "আরও এক মাইল। তোর কি পা ব্যথা করছে নাতি ?"

অপ্রতিভ হইয়া অমিয় বলিল, "না। বাড়িতে অনেক কাজ আছে।"

বৃদ্ধ হাসিলেন, "ওহো, সপ্তাহের একটি দিন মাত্র তোদের, মা, বা, বাড়ী বা, নাতবৌ আবার কি মনে করবেন ?"

অমিয় মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে ভয় আমি করি না।"

"তা বটে, তোরা একালের বীর, অনেক কৌশল তোদের জানা আছে। এমন সকালবেলাটা বুড়োর সঙ্গে বেড়িয়ে মাটি করলি, নাতি।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া গেলেন।

অমিয় আর একবার দিগন্তবিস্তৃত মাঠের পানে চাহিল। কোমল কিরণে মাঠের শোভা বাড়িয়াছে, কিন্তু শহরের বিলাসী মনের এ সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুব দিবার যোগ্যতা কোথায় ? যাহারা নিজের হাতে লাঙল ধরে, মাটি কোপায়, কাদা মাখে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় দুষ্কর তপস্যা করে ভূমি-লক্ষ্মীর প্রসাদ পাইবার অধিকার মাত্র তাহাদেরই আছে, তাহাদের ধ্যাননিমীলিত নেত্রের সম্মুখে স্নেহবিগলিত মাতৃমূর্ত্তিতে জমি দেখা দেন। শহরের সন্তান তুমি—কয়েকটি কোমল মুহূর্ত্ত লইয়া কবিত্ব তোমার শোভা পায় না।

সেকালের পুরাতন কথাতেও মন খারাপ হইয়া যায়। বুড়াদের অটুট স্বাস্থ্য, প্রাণখোলা হাসি-আলাপ, উন্নততর জগৎ-ব্যাপারে ঈষৎ অজ্ঞতা-প্রকাশ প্রগতিশীল তরুণ মনকেও বিষাদ করিয়া দেয়।

বাড়ী ঢুকিবার মুখেই এক দল তরুণ অমিয়কে ঘিরিয়া ফেলিল।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম অমিয়-দা।"

"কেন ?"

অখিল তরুণদলের অধিপতি, যা-কিছু বলিবার দলের মুখপাত্রস্বরূপ সে-ই বলিয়া থাকে। চোখে তাহার চশমা, হাতে রিষ্টওয়াচ ও খাতা-পেন্সিল। খাতাটি অমিয়র সামনে খুলিয়া ধরিয়া কহিল, "আপনাকে চাঁদা দিতে হবে আমাদের ক্লাবে ; আপনার নাম সভ্যতালিকাভুক্ত ক'রে নিয়েছি।"

অমিয় বলিল, "আমি তো মাত্র ছ-মাস দেশছাড়া, এরই মধ্যে কিসের ক্লাব তৈরি করেছ ?"

অখিল বলিল, "এই খাতায় আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য লেখা আছে। শুনবেন ?"

অমিয় বলিল, "পড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে, মুখে বল।"

অখিল বলিল, "আমাদের গ্রামের যাতে উন্নতি হয়, তারই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। ক্লাব করা মানে পাঁচ জনকে এক ক'রে একটি বৃহৎ সংসার সৃষ্টি করা।"

অমিয় বলিল, "ভাল কথা।"

অখিল উৎসাহিত হইয়া বলিল, "কারও বাড়ীতে অসুখ হ'লে রাত জাগবার একটি লোক পাওয়া যায় না। মড়া পোড়াবার জন্য চার জন লোক মেলে না, কোন বাড়ীতে চুরি হলে 'হায় হায়' করা ছাড়া পথ নেই, এই সবের জন্য আমরা সেবক-সমিতি গড়েছি। কাল রাত্রিতে শোনেন নি হুইসিলের শব্দ ?"

"হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে।"

"আমরা জেলার এস্-ডি-ওকে লিখে ব্যাজ আনিয়েছি—প্রত্যেক রাত্রিতে দশ জন ক'রে ছেলে পোষাক পরে লাঠি হাতে হুইস্ল্ নিয়ে গাঁ টহল দেয়।"

"গাঁয়ে কি আজকাল চুরি হচ্ছে নাকি ?"

আর একটি ছেলে উত্তর দিল, "না হয় নি। যদি হয়, প্রিকশন্ নেওয়া মন্দ কি।"

অমিয় একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি উদ্দেশ্য তোমাদের ক্লাবের ?"

অখিল বলিল, "আমাদের খেলাধুলার একটি বিভাগ আছে, সাহিত্যের বিভাগ, নাট্য বিভাগ, ব্যায়াম বিভাগ, সমবায় সমিতি বিভাগ, পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ, জনসেবা—সবই আমরা রেখেছি।"

অমিয় বলিল, "ভাল কথা। এক সঙ্গে অনেকগুলি বিভাগ খুলেছ তোমরা, সবগুলি এক সঙ্গে সুশৃঙ্খলে চালাতে পারবে তো ?"

অখিল বলিল, "কেন পারব না ? আপনাদের সাহায্য পেলে—"

অমিয় বলিল, "হ্যাঁ, আমাদের সাহায্য পেলে—"

অখিল অমিয়কে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিল, "দেখুন না, আমাদের ছ-মাসের রিপোর্ট।" বলিয়া খাতা খুলিয়া সোৎসাহে আরম্ভ করিল, 'পূজার সময় নাট্য বিভাগ ছ-খানি নাটকের অভিনয় ক'রে দেশের লোককে আনন্দ দিয়েছে। এবার শান্তিপুর ব্রিজ-কম্পিটিশনে আমরা 'সুধাময় কাপ' পেয়েছি। সরস্বতী পূজোতেও ছোটখাট একটা প্রীতিসম্মেলন হয়ে গেছে।"

অমিয় বলিল, "জনসেবার বিভাগে কি কাজ হয়েছে ?"

অখিল বলিল, "ওখানে কাজ বিশেষ কিছু হয় নি। কোথাও জলপ্লাবন বা ভূমিকম্প হ'লে আমরা ভিক্ষেয় বেরোব।"

অমিয় বলিল, "যদি জলপ্লাবন বা ভূমিকম্প না হয় ?"

একটি ছেলে টপ্‌ করিয়া উত্তর দিল, "কেন, আমাদের দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে। গরিব-দুঃখী যে আসে একটি পয়সা নিয়ে ওষুধ দেওয়া হয়।"

অমিয় বলিল, "ওষুধ দেন কে ?"

"কেন, পরেশ ডাক্তার। আমাদের ক্লাবের মেম্বার যে—।"

অখিল বলিল, "তা ছাড়া গেল পূর্ণিমাতে আমরা সাহিত্য শাখার একটি অধিবেশন করেছিলাম; প্রবন্ধ-কবিতা তাতে অনেকগুলি পাঠ হয়েছিল।"

অমিয় বলিল, "তোমাদের উৎসাহ আছে, কিন্তু শৃঙ্খলার কিছু অভাব বোধ হচ্ছে। এক সঙ্গে অনেকগুলি বিষয় ধরেছ—শেষ পর্য্যন্ত খেলা বা থিয়েটারের ক্লাব না হয়।"

অখিল বলিল, "তাই তো আপনাদের মেম্বার করে নিচ্ছি। আপনারা যোগ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলুন।"

অমিয় বলিল, "তোমাদের থেকে আমার বয়সও খুব বেশী নয়—দু-চার বছরের তফাৎ। যখন দেশে ছিলাম, এমনি অনেক হুজুগে মেতেছি। সাহিত্যসভা করেছি, অথচ সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখি নি, ফলে ছ-মাসের মধ্যে সেই আল্লায় সভা দেহরক্ষা করলেন। পরোপকার করতে গিয়ে দেখি—ছেলেমানুষ ব'লে লোকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে; মনে মনে খুব রাগ করেছি তাঁদের উপর, প্রতিজ্ঞা করেছি, যে ক'রে হোক তাঁদের জানিয়ে দেব ছেলেমানুষ হ'লেও মতি আমাদের স্থির আছে এবং পরের উপকার ভাল রকমেই করতে পারি। হয়তো আরম্ভটি ভালই হয়েছিল—কিন্তু আজ দেখছ তো, তেমন সমিতি এই গ্রামের কোথায় বেঁচে আছে ? অনেক কষ্টে যে লাইব্রেরি খুললাম—বৎসরের মধ্যে তার বইগুলি পাঠকেরা লোপাট ক'রে দিলেন, তাই লাইব্রেরি গড়ে উঠল না।"

অখিল বলিল, "আপনি আমাদের নিরুৎসাহ করবেন না, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি—"

অমিয় বলিল, "তোমাদের প্রতিজ্ঞার মূল্য আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু যে স্রোতের মুখে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ তাই যে তোমাদের দূরে সরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা কেউ লক্ষপতির ছেলে নও, ইস্কুল-কলেজের পড়া শেষ হলে কর্ম্মক্ষেত্র তোমাদের কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিকঠিকানা নেই।"

অখিল বলিল, "আপনি বড় পেসিমিষ্ট। যে-চেষ্টায় আপনারা সফল হন নি, আমরা তাতে সফল হ'তে পারি।"

অমিয় বলিল, "চেষ্টা ক'রা ভাল। কিন্তু মনের মধ্যে বিলাসের মত ক'রে যদি দেশসেবার আয়োজন ক'রে থাক তো এখনও ফিরে দাঁড়াও। তোমরা ভূমিকম্পের অপেক্ষায় জনসেবাকে মুলতুবি করে রেখেছ, কিন্তু নিজের দেশের মাঠগুলি যখন জলে ডুবে ফসল নষ্ট ক'রে দেয় তখন কি উপায় কর শুনি ? একটি পয়সা না নিয়েও তো দুঃখীর দুঃখ মোচন করা যায়।"

অখিল বলিল, "আমাদের ফাণ্ডের অভাব, পয়সা না নিলে ওষুধ দেব কোত্থেকে ?"

অমিয় বলিল, "বিকেলে এস, আরও কথা ও-সম্বন্ধে বলব।"

অখিল বলিল, "লক্ষ্য আমাদের উচ্চ আছে দাদা।"

অমিয় হাসিমুখে বলিল, "তাই তোমাদের প্রশংসা করি। তোমরা যে বাজারের মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ব'সে পরচর্চ্চার মজলিশ জমাও না, এইটুকুর

জন্ত তোমাদের সাধুবাদ করি। হয়তো তোমরা কিছুই মহৎ কাজ করতে পারবে না, তথাপি তোমাদের দেখে আরও পাঁচজন যদি এ-পথে আসে সে-গৌরব তোমাদেরই।"

অমিয় বলিল, "আপনাকে আমাদের সেক্রেটারী হতে হবে। আমরা কোন্ পথে চলব, কেমন ক'রে চলব, সে নির্দেশ দেবেন আপনি।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "এক অন্ধ আর এক অন্ধকে দেখাবে পথ? মন্দ নয়!"

ছেলেদের বিদায় দিয়া অমিয় বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

বাড়ীর টুকিটাকি কাজ ও বাজার সারিয়া আহারে বসিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। মা বহুক্ষণ হইল রান্না সারিয়া স্নানের তাগাদা দিতেছেন। তেল মাখিতে মাখিতে অমিয়র গল্প আর শেষ হয় না। পাতকুয়া হইতে কয়েক ঘড়া জল তুলিয়া লেবুর চারায় ঢালিয়াছে, যুঁই-গোলাপের গাছে দিয়াছে, মায়ের হাতে-বোনা লাল নটেশাকের জমিখানি ভিজাইয়াছে।

মা অধীর হইয়া তাড়া দিতেছেন, "কি রে, তোর হ'ল? দুপুরবেলা গাছে জল ঢালার সৃষ্টি দেখ! ভাত যে শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেল।"

"এই যাই!" বলিয়া অমিয় মাথায় জল ঢালিল। কলিকাতার কলের জলে স্নান সারিয়া আরাম পাওয়া যায় না। শীতকালে গায়ে জল ঢালিতে অস্বস্তি বোধ হয়, গ্রীষ্মকালে জল ঢালিতেছি বলিয়া বোধই হয় না। আর কুয়ার জল ঋতু অনুসারে তৃপ্তি দান করে। শীতে ঈষদুষ্ণ, গ্রীষ্মে বরফবিগলিত—একমাত্র কষ্ট কুড়ি-বাইশ হাত দড়ার সাহায্যে টানিয়া তুলিতে হয়।

আহারে বসিয়া তো অমিয়র চক্ষুস্থির। সবিস্ময়ে বলিল, "ভাত আর নাই দিলে পারতে মা, এত তরকারি রেঁধেছ, কোন্‌টা আগে মুখে দেব?"

"ভারি তো তরকারি। গাছের ডুমুর ছিল ডাল করেছি, ডাঁটা ছিল চচ্চড়ি রেঁধেছি, থোড় ছিল ছেঁচকি করেছি—আর নটেশাক তুলে তেলশাক করেছি। তুই তো চিংড়ি মাছ নিয়ে এলি বাজার থেকে, তাই পুঁইশাক দিয়ে রাঁধলাম। ক'খানাই বা বড়ি ভাজা, কতটুকুই বা সোনা-মুগের ডাল? আর আমার নিরামিষ দিকে একটু মটর ডাল ভাতে দিয়েছি—তুই গাওয়া ঘি দিয়ে খেতে ভালবাসিস বলে। গলদা চিংড়ি দিয়ে এঁচড়ের ডালনা বউমা রেঁধেছেন ও-বেলার জন্ত; এ-বেলা সামান্ত একটু দিয়েছে বুঝি? আর ঐ তো মাছভাজা, ঝাল আর অম্বল। দেখ আমার পোড়া মনের দশা, ঝিঙে পোস্ত দিতে ভুলে গেছি!"

অমিয় বলিল, "আমি যেগুলি খেতে ভালবাসি সবই রেঁধেছ—কেবল মোচার ঘণ্টটা বাদ গেছে।"

মা বলিলেন, "মোচা আগের দিনে আনিয়ে কুটে না রাখলে রান্নার সুবিধে হয় না। আসছে শনিবারে বাড়ী এলে রাঁধব। ওমা, ও কি, ও কি খাওয়া। ভাল করে ডাল মাখ তাতে। না খেয়ে খেয়ে নাড়ী শুকিয়ে গেছে।"

অমিয় বলিল, "নাড়ী শুকোয় নি মা। তবে তোমার মত মা তো সেখানে ব'সে নেই, আমি কি ভালবাসি না-বাসি তারা সে-সব ধার ধারে না। ঠাণ্ডা ভাত, আলুনি শুকনো তরকারি, জলমেশানো ডাল, আর লঙ্কা-বাটা দেওয়া মাছের ঝোল—এই সব রাজভোগ নিত্য গিলতে হয়। রুচির আর অপরাধ কি বল।"

"হাঁ রে, এই খাওয়া খেয়ে সবাই থাকে কি ক'রে?"

অমিয় বলিল, "সবাই কি আর এই খাওয়া খায়। যে-বাড়ীতে আমি আছি সেখানকার কথা বলছি। মেলাই লোক সেখানে খায়, প্রত্যেকের রুচি-অনুযায়ী রান্না হতে পারে না।"

মা অলক্ষ্যে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ছাই শহর!"

অমিয় বলিল, "তোমার ছেলেটির কপালে ভাল খাবার মেলে না ব'লে শহরটাই ছাই হয়ে গেল!"

"না তো কি! হ্যাঁ রে, সেখানে মোচা-ডুমুর, এসব পাওয়া যায়?"

"সব, সব। ফাল্গুন মাসে পটলের ছড়াছড়ি, আমের ছড়াছড়ি, অঘ্রাণ মাসে ফুলকপি, বাঁধাকপি—পয়সা দিলে এমন জিনিষ নেই যা বছরের যে-কোন সময়ে মেলে না।"

"তবে ?" বলিয়া অল্প একটু থামিয়া মা অন্ত কথা পাড়িলেন, "এবার যখন আসবি পটল নিয়ে আসিস।"

মাছ খাওয়া শেষ হইবামাত্র মা জামবাটি ভরিয়া দুধ আনিলেন। অমিয় লাফাইয়া উঠিল, "দোহাই মা, এ-বেলা আর নয়। সেলাই খুলে পেটের ভেতর দুধ চালান দেবার উপায় নেই—ও-বেলা দিও।"

"ও-বেলার দুধ আলাদা আছে।"

"তা হ'লে বিকেল বেলা।" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল। মা দুঃখিত মনে দুধের বাটি তাকের উপর তুলিয়া রাখিলেন।

অমিয় যখন বাড়ী ছিল, তখন দু-বেলা দুধ জোগাইবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। এক বেলায় যেটুকু পাতে দিতেন পরিমাণে তাহা অল্পই। নিজের দুধ হইতে কিছু ঢালিয়া না দিলে ততটুকু দুধ কোন মা-ই কোন ছেলের পাতে দিয়া পরিতৃপ্তি বোধ করেন না।

অমিয় বুঝিয়া প্রতিবাদ করিত, "আমার পাতে যদি সবটুকু দুধ দিলে তো তুমি খাবে কি ?"

তাকের উপর একটি বাটি দেখাইয়া মা বলিতেন, "ঐ তো আমার দুধ রয়েছে।"

অমিয় বলিত, "পাড় তো দুধের বাটি, কতখানি আছে দেখি।"

মাও পাড়িবেন না, অমিয়ও ছাড়িবে না। অবশেষে অমিয়র জিদে বাটি তাঁহাকে পাড়িতে হইত।

অমিয় বলিত, "এই তোমার দুধ রাখা !"

মা বলিতেন, "জাল দিয়ে ঘন করে রেখেছি ব'লে কমদেখাচ্ছে, পাতলা দুধ আমি খেতে পারি নে।"

অমিয় মায়ের প্রবঞ্চনা বুঝিত, বুঝিয়াও আর কিছু বলিত না।

আহার শেষ হইলেও বিশ্রাম অমিয়র অদৃষ্টে জুটিল না। বাহিরে কে একজন ডাকিতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখিল, ও-পাড়ার মুরারি সরকার।

অমিয়কে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমার একটি উপকার করতে হবে ভায়া। কাল কলকাতায় যাচ্ছ তো ? আচ্ছা। শুনলাম তুমি বেলগেছের দিকে থাক, ঐ কাছাকাছি সর্ব্বধাঁয়ের রোড আছে, সেখানে আমার মেয়ে-জামাই থাকে। তাদের খোঁজটা একবার নিয়ে আসবে ভায়া ? ছ-মাস হ'ল মেয়েটার বিয়ে হয়েছে, বিয়ে হবামাত্রই জামাই কর্ম্মস্থলে তাকে নিয়ে গেলেন—তার পর চিঠি লিখলেও জবাব দেন না।"

প্রৌঢ় সরকার মহাশয়ের মুখে ব্যথার ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। একটু কাশিয়া গলা নামাইয়া বলিলেন, "তুমি আপন লোক, বিশেষ সেখানে গেলে যখন সবই জানতে পারবে, তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই। অবস্থা তো আমাদের জানই, কোন রকমে মেয়েটিকে পার করেছি। তেমন দিতে থুতে তো পারি নি—যা দেবার কথা ছিল তাও—" একটু থামিয়া আর এক বার তিনি কাশিলেন।

অমিয় তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে-প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্ত বলিল, "তা দেবেন চিঠি, উত্তর এনে দেব।"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "দশ ভরি সোনা দেবার কথা ছিল, আট ভরি মাত্র দিতে পেরেছি। বিয়ের রাত্রিতে খরচ বেশী হয়ে গেল কিনা, জামাইয়ের হাত-ঘড়িটিতে কিছু বেশী লাগল, কুলিয়ে উঠতে পারলাম না। তাতেই ওঁদের রাগ। সেই জন্তই মেয়ে পাঠান না, বা উত্তর দেন না।"

অমিয় বলিল, "বাংলা দেশের এ একটা মস্ত বড় কুপ্রথা, সরকার মশাই। যাঁরা বিয়ে করেন তাঁরা হয় তো ভাল করেই জানেন যে জীবনে একটি ভাল ঘড়ি কিনতে পারবেন না, বা বৌকে ভাল গহনা গড়িয়ে দিতে পারবেন না, তাই শ্বশুরের উপরেই জুলুম। জামাইটি আপনার কি করে ?"

"ট্রাম ডিপোয় কি কাজ করে। মাইনে তো তেমন নয়—"

"বুঝেছি, সে যে এক কালে শ্বশুর হবে এ-কথা সে ভাবে না, এমনি আমাদের বাংলা দেশ। যারাই পীড়ন সয়, তারাই পীড়ন করে। নিজের দুঃখ দিয়ে পরের দুঃখ বুঝতে চায় না। যে নদী মজে যায়, তার বালির চড়াই শুধু তার প্রত্যক্ষ কারণ নয় ; সেখানে

শেওলা জমে, পাঁক জমে, যত কিছু আবর্জ্জনা সবই জমে।"

মুরারি সরকার বলিলেন, "তোমরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বোঝ সব কথা। সবাই তো সব কথা বোঝে না। তা ভায়া, ও দু-ভরি সোনা আমি দিয়ে দেব, ধারে কর্জ্জে আমার ভয় নেই। এই নাও চিরকুট, এতে ঠিকানা লেখা আছে। আর—"

"বলুন না, আপনি কিন্তু করছেন কেন ?"

"আমার লজ্জা করে ভায়া। বাড়ীতে একটা মানকচু হয়েছিল, আর কিছু সজনের ডাঁটা ঐ সঙ্গে দিতাম, কিন্তু তোমার কষ্ট হবে।"

"না, না, কষ্ট কিসের—আপনি দেবেন।"

"আমি ষ্টেশনে পৌছে দেব, সেখানে কেবল তোমাকে কষ্ট ক'রে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"আপনি আবার কষ্ট ক'রে ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাবেন কেন, আমাকেই দেবেন।"

সরকার মহাশয় বিনীত হাস্যে বলিলেন, "এই যেটুকু অনুগ্রহ দেখিয়েছ ভায়া, তাই যথেষ্ট। যাকে বলেছি—কেউ গ্রাহ্য করে নি। বলেছে, বেলগাছি বহুদূর। একজনকে ট্রামভাড়া দিতে গিয়েছিলাম, তিনি রাগ ক'রে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। গরিব আমি, কিসে কার মান-অপমান বুঝি, কিন্তু স্নেহের ক্ষেত্রে আমরা চোখ থাকতেও কানা! মন যে বোঝে না ভায়া।" মলিন কোঁচার খুঁট চোখের কোণে ঘষিতে ঘষিতে মুরারি সরকার চলিয়া গেলেন।

অমিয় ব্যথিত অন্তরে ভাবিল, পৃথিবীতে অনেক রকমের দুঃখ আছে, কিন্তু বাঙালী-সংসারের দুঃখগুলি যেমন তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া তীব্র হইয়া উঠে, এমনটি আর কোথাও নাই।

আর একটি রাত্রি।

এ-রাত্রিতেও চাঁদ উঠিয়াছে; হাস্নুহানা ফুটিয়াছে, কোকিল-পাপিয়া ডাকিতেছে, এবং প্রিয়া আসিয়া পাশে বসিয়াছে। আজও এখানে ইচ্ছা করিলে স্বর্গ রচনা করা যায়,—কিন্তু নিতান্ত মর্ত্ত্যবাসীর মত অমিয় আশার একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "আমাদের যদি ছেলে হয় তা হলে এখন থেকে একটি প্রতিজ্ঞা চুপি চুপি করে রাখি, আশা। মন না মতি বলা যায় না, আমি যদি বা ভুলি, তুমি তা মনে করিয়ে দেবে।"

আশা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "রাম না হ'তে রামায়ণ ?"

অমিয় বলিল, "ছেলের বিয়েয় এক পয়সা পণ আমরা নেব না। যদি নিই—"

আশা বলিল, "দিব্যি গালবার দরকার নেই, মনে থাকবে।"

অমিয় বলিল, "এবং মেয়ে হ'লে তার বিয়েয় এক পয়সা পণ আমরা দেব না।"

আশা বলিল, "তা কি ক'রে হবে, তুমি-আমি নিয়ে তো সমাজ নয়।"

অমিয় দৃঢ়স্বরে বলিল, "সমাজ আমরাই গড়ব। হয়তো মেয়ের বিয়ে আমাদের হবে না, হয়তো অনেক কিছু অপমান-দুর্ভোগ আমাদের সইতে হবে। পারবে না ?"

আশা বলিল, "তোমার যে পথ, আমারও সেই গতি।"

আশার হাতে দৃঢ় মুষ্টির চাপ দিয়া অমিয় বলিল, "না, তোমার মত বল। আমার মতে শুধু কাজ হবে না।"

"উঃ, লাগে যে"—বলিয়া আশা হাসিল।

উত্তেজিত অমিয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বল তোমার মত।"

আশা হাত ছাড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ছেলের বিয়ে নিয়ে প্রতিজ্ঞা আমি ক'রে রাখছি, কিন্তু মেয়ের বিয়ের কথা এখন থেকে কেমন ক'রে বলব। বিশেষ মেয়ের মতি-গতি শিক্ষা-রুচির উপর আমাদের প্রতিজ্ঞা নির্ভর করছে যখন।"

অমিয় বলিল, "আমাদের ছেলেমেয়ের শিক্ষা, রুচি গড়ব আমরাই, সে-দায়িত্ব আমাদের।"

আশা বলিল, "মানুষ তো অনেক আশাই করে, অনেক চেষ্টাই করে,—সব কি সফল হয় ?"

অমিয় বলিল, "চেষ্টার মত চেষ্টা করলে কেন হবে না? আমরা আশা করি অসম্ভবের, চেষ্টা করি না সেই আশাকে সফল করবার। আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠা চাই, কিন্তু যে পথে চলি তা পরীক্ষামূলক। হয়তো বুঝলে না? আমি যদি বলি, ঐ উঁচু ডালের বেলটিকে পাড়বই, তা হলে কাঁটার ভয় ত্যাগ ক'রে আমায় গাছে উঠতেই হবে। কিন্তু নীচে থেকে ঢিল মেরে বা আঁকশি দিয়ে খানিক চেষ্টা ক'রে যদি না পাড়তে পারি তো উঁচু ডালের দোষ দিই, নিজের অক্ষমতার কথা ভুলে যাই।"

আশা মৃদু হাসিয়া বলিল, "বুঝলাম। কাল ভোর বেলায় উঠতে হবে, এখন ঘুমোও।"

অমিয় বলিল, "এত শীঘ্র ঘুম আসছে না। আশ্চর্য্য দেখ, আপিসে দিন আর কাটতে চাইত না, অথচ বাড়ীতে সারা রবিবারটা যেন একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শেষ হয়ে গেল!"

আশা বলিল, "অনেক দিন পরে কি না, তাই নূতন লাগছে। অথচ যখন বাড়ী ব'সে ছিলে তখন তো বলতে একঘেয়ে দিন আর কাটতে চায় না।"

অমিয় বলিল, "কবি সত্য কথাই বলেছেন,—

বদ্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

আচ্ছা, এবার মাইনে পেলে তোমার জন্য কি আনব?"

আশা হাসিয়া বলিল, "আমায় ভোলান হচ্ছে?"

অমিয় বলিল, "সত্যি না। আমার ইচ্ছে হয়েছে—"

আশা বলিল, "এখন শুনব না, ঘুমোও। আগে মাইনে পাও, তার পর ভেবেচিন্তে বলব।"

অমিয় বলিল, "ভেবেচিন্তে হয়তো এমন কিছু বলবে যা আমার মাইনের কুলবে না।"

আশা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছ—যা চাইব দেবে।"

অমিয় বলিল, "অবশ্য যদি আমার সাধ্যাতীত না হয়।"

আশা বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, এখন ঘুমোও।"

আলোর দম কমাইয়া দিয়া আশা পাশ ফিরিল।

ক্রমশঃ

ইউরোপীয় চিত্রকর্ম্ম

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

[এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, ইউরোপীয় চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রকর্ম্ম। প্রাচীন এবং আধুনিক সকল প্রধান চিত্রকরই ব্যাপক ভাবে আমাদের আলোচনার বিষয় হবেন। প্রত্যেক চিত্রকরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগত আলোচনা থেকে, সমগ্র চিত্রকর্ম্ম জগতের প্রগতির ধারাই আমাদের বিশেষ অবলম্বন হবে। ধারাবাহিক ভাবে ইউরোপীয় চিত্রকরদের গতি নির্দ্দেশ করাই এই প্রবন্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য।]

ইউরোপীয় চিত্রকর্ম্মের কথা আরম্ভ করতে হ'লে গ্রীকদের কথা প্রথম বলতে হবে। ভাস্কর্য্যবিদ্যায় তাঁরা যে কত নিপুণ ছিলেন তা বিশ্বজনবিদিত। চিত্রকর্ম্মেও তাঁদের পারদর্শিতা কম ছিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, কালের প্রকোপে কোন গ্রীক চিত্রকরের চিত্র এ-যুগ পর্য্যন্ত রক্ষিত হ'তে পারে নি। তবে সেকালের সমসাময়িক সাহিত্যে জক্সিস্ ও আপেলেস্ নামে দুই জন বিখ্যাত চিত্রকরের যশোগাথার উল্লেখ পাই।

তার পর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে চিত্রকর্ম্মের দ্রুত অবনতি সুরু হ'ল। তার কারণ খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকরা মধ্যযুগে চিত্রবিদ্যাকে মোটেই আমল দিতেন না। ঐহিক ভোগসুখের প্রতি তাঁরা একান্ত উদাসীন ছিলেন, কারণ তাঁরা ইহজীবনকে দুঃখকষ্টের মূল ব'লে নির্দ্দেশ করতেন এবং পরলোকের উন্নতিকামনায়

ভগবৎচিন্তায় মন দিতেন। সেই কারণেই স্থূল বিষয়কে অবলম্বন ক'রে যে চিত্রকর্ম্মের সৃষ্টি, ইন্দ্রিয়সুখভোগের প্রতি মানুষকে যা আকর্ষণ করে, তার প্রতি তাঁদের বিদ্বেষবোধ ছিল। ফলে ইউরোপে গ্রীকরা যে উচ্চ আদর্শের চিত্রকর্ম্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা একেবারে লোপ পেয়ে যায়। সেই জন্য রোমান রাজ্যের পতনের পর, গথ জাতিরা যখন তাদের গির্জ্জা প্রভৃতি উপাসনার স্থান চিত্রের সাহায্যে মনোরম করবার ব্যবস্থা করলেন, তাঁদের তখন বৈজন্টিয়ম্ থেকে চিত্রকর আনতে হয়েছিল। এই দেশীয় চিত্রের আদর্শ তখন অতি শৈশব অবস্থায় ছিল। চিত্র-বস্তুকে স্বাভাবিক রূপ দেবার একটা প্রয়াস থাকলেও, মানুষের মনোভাবকে প্রকাশ করবার কোন চেষ্টাই তাতে ছিল না। ফলে সে-চিত্রগুলি একান্ত নির্জ্জীব এবং প্রাণহীন ব'লে মনে হ'ত। এই প্রচেষ্টার ফলে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রভাবে যে-সমস্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল তাতেও সেই দোষগুলি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যে-চিত্রকর এই শ্রেণীর চিত্রের প্রভাবকে কাটিয়ে নূতন পথ প্রদর্শন করেন তাঁর নাম হ'ল সিমাবো। তাঁর জন্ম-তারিখ ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর চিত্রে দেখতে পাই যে, বৈজন্টিয়মের আদর্শের প্রভাব সবে কাটতে সুরু করেছে। তাঁর চিত্রের ম্যাডোনার মুখে একটু কোমলতা ফুটতে আরম্ভ করেছে। যীশুর শিশু-মূর্ত্তিতে আর বৃদ্ধের মুখের শুষ্কতা পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর অঙ্কিত 'ম্যাডোনা ও শিশু'র কথা এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে।

এঁরই শিষ্য জিয়োত্তোর হাতে আমরা দেখি নূতন আন্দোলনটি পাকা রকম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বৈজন্টিয়মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হয়ে গিয়েছে। ইউরোপীয় চিত্রকর্ম্মের ইতিহাসের গৌরবময় যুগের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। এই কথাটি সহজে বুঝতে হ'লে সিমাবোর অঙ্কিত 'ম্যাডোনা ও শিশু'র ছবির সহিত জিয়োত্তোর অঙ্কিত "সেন্ট ফ্রান্সিসের আক্ষেপ" শীর্ষক চিত্রের তুলনা করতে হবে। তুলনায় সিমাবোর চিত্রে একেবারে সজীবতার অভাব না থাকলেও জিয়োত্তোর চিত্র আরও সজীব। জিয়োত্তোর চিত্রের মানুষগুলির প্রত্যেকের একটি ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়েছে এবং চিত্রিত মানুষগুলির সমাবেশেও বেশ একটি নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনে সিমাবো অপেক্ষা তিনি বেশী নৈপুণ্য অর্জ্জন করেছিলেন।

এই বাস্তবের সহিত সাদৃশ্য ফুটিয়ে তোলাই ইউরোপীয় চিত্রকর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। এই পথেই পরবর্ত্তী চিত্রকররা তাঁদের প্রতিভা নিয়োগ করেন। চিত্রের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য্য এবং মনোহারিত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই কারণেই অচিরে ইউরোপীয় চিত্রকর তৈলচিত্রের আবিষ্কার করেন। এই তৈলচিত্রের আবিষ্কারক হলেন জ্যান ভ্যান আইকস্ নামে এক ওলন্দাজ। তাঁর জন্ম চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে। তার পূর্ব্বে দেয়াল-চিত্র আঁকতে চিত্রকরগণ জলের সহিত রং মিশ্রণ করে নিতেন, কিংবা আঠাযুক্ত চিত্রে (টেম্পেরা পেন্টিঙে) ডিমের সঙ্গে রং মিশিয়ে নিতেন। এতে অনেক অসুবিধা। রং শুকোতে দেরি হ'ত, বর্ণের উজ্জ্বলতা কম হ'ত এবং চিত্রের স্থায়িত্বও বেশী হ'ত না। এই অভাব দূর করবার চেষ্টা হ'তেই তৈলচিত্রের আবিষ্কার। ভ্যান্ আবিষ্কার করলেন যে রেড়ি এবং বাদামের তেলের সঙ্গে রং মিশিয়ে আঁকলে-সে রং বেশ তাড়াতাড়ি শুকোয় এবং রঙের উজ্জ্বলতা বাড়ে।

এই বাস্তবের অনুরূপ প্রতিকৃতি দেবার প্রয়াসে যেমন তৈলচিত্রের উৎপত্তি, ইউরোপীয় সাধারণ চিত্রের যা বৈশিষ্ট্য, সেই চেষ্টা হ'তেই তারও জন্ম। ইউরোপীয় সাধারণ চিত্রে আমরা দেখি যে, চিত্র কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সম্মান রক্ষা ক'রেই ক্ষান্ত হয় না। বাস্তবে যেমন গভীরতা পাওয়া যায় (depth বা পার্স্পেক্টিভ) চিত্রতেও সেটিকে পরিস্ফুট করতে তাঁরা বিশেষ যত্নবান হন। ভারতীয় বা অন্যদেশীয় চিত্র এ বিষয়ে উদাসীন। এমন কি অজন্তা গুহার শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিতেও এ গুণ নেই। কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য- এবং প্রস্থ- বিশিষ্ট পটে এই তৃতীয় আয়তিকে (ডাইমেন্শনকে) ফুটিয়ে তুলতে চাই আলো-ছায়ার গভীরতা-বোধ। বাস্তব জগতে কোথায় কতখানি আলোছায়ার সম্পাত হয়েছে রঙের তারতম্যে সেই আলোছায়াকে চিত্রে পরিস্ফুট করতে পারলেই ছবিতে

এই তৃতীয় আয়তিটির নাগাল পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে সাধারণ ইউরোপীয় চিত্রকর সিদ্ধহস্ত। সেই জন্য তাঁদের ছবি অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত সজীব। এই পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে অল্প দিনের মধ্যেই ইউরোপীয় চিত্রকর এই তৃতীয় আয়তিটিকে তুলির সাহায্যে ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতাকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখি, এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপীয় চিত্র বিশেষ সজীব হয়ে উঠেছে; এই যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর কুইন্‌টন্‌ মাসির চিত্র আলোচনা থেকে আমরা সেকথা বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। তিনি ছবিকে ছোট ক'রে আঁকতে ভাল বাসতেন না, তাকে বড় আকারে আঁকতেন, বাস্তবে যত বড় হয় তত বড় ক'রে আঁকতেন। স্থান অপরিসর হ'লে তিনি দেহের সমস্তখানি আঁকতেন না; বরং শরীরের অর্দ্ধেক এঁকেই সন্তুষ্ট হতেন। এই অভ্যাসটি তাঁর বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াসসম্ভূত। এই সম্পর্কে আমরা তাঁর সব থেকে নামজাদা ছবি 'মহাজন এবং তাঁর স্ত্রী'র কথা উল্লেখ করতে পারি।

এইবার যে চিত্রকরের নাম করার প্রয়োজন হবে, ইউরোপীয় চিত্র তাঁর হাতে, তার বৈশিষ্ট্যের চরম সোপানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইনি হলেন লিয়োনার্দো দা বিঞ্চি। ১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম।

মানুষের মূর্ত্তিকে ছবিতে বাস্তবের আকার দিতে হ'লে যে মাত্র আলোছায়া-বোধের জ্ঞান থাকা উচিত তাই নয়, তার শরীরের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে চিত্রকরের বিশেষ পরিচয় চাই, প্রতি মাংসপেশী, প্রতি শিরার রূপ কেমন, জানা চাই। এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই জন্য মানুষের শরীর-গঠন সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। ফলে তিনি যে দেহতত্ত্বের পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাই পৃথিবীর প্রথম দেহতত্ত্বের বই। ভাল চিত্রকর হ'তে হ'লে এমনি সাধনার প্রয়োজন। এর ফলে চিত্রাঙ্কনবিদ্যা তাঁর হাতে এমন পরিবর্ত্তন লাভ করেছিল।

তাঁর সব থেকে বিখ্যাত ছবি 'মোনা লিজা' জগতের মধ্যেও সব থেকে বিখ্যাত ছবি। ফ্লোরেন্সের এক রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী ছিলেন এই মোনা লিজা। এই চিত্রের মুখে যে ক্ষীণ হাসিটি লিপ্ত আছে, তা সকল কালেই চিত্রকর্ম্মের সমজদারের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এসেছে। তার ডান হাতখানি নাকি বিশ্বের নারীহস্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। প্রবাদ আছে যে, দা বিঞ্চি এই নারীটির রহস্যময় হাসিটিকে রেখায় ও রঙে স্থায়িত্ব দেবার জন্য, গায়কদের দিয়ে তাঁর নিকট গানের ব্যবস্থা ক'রে, তবে এই প্রতিমূর্ত্তিখানি আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন।

দা বিঞ্চির সমসময়ে আর একটি চিত্রকর চিত্রবিদ্যায় তাঁরই সমকক্ষতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর নাম হ'ল রাফায়েল সাঞ্জিলো। রোমের ভ্যাটিকানে তিনি অনেক ছবি এঁকে অতি অল্প বয়সেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাস্তবের সহিত সাদৃশ্যে, ভাবে এবং রূপে, তাঁর চিত্রগুলি দা বিঞ্চির ছবির মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং পরবর্ত্তী যুগের আদর্শস্থানীয় হয়েছিল। তাঁর 'সিষ্টাইন্‌ ম্যাডোনা' এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। মা ও সন্তানের এমন সুন্দর যুগ্ম-মূর্ত্তি বুঝি আর কোথাও দেখা যায় না। অতি অল্প কালের মধ্যে ইউরোপীয় চিত্রবিদ্যার কি দ্রুত ক্রমবিকাশ-লাভ! সিমাবোর ম্যাডোনা ও এই ম্যাডোনার তুলনা করলেই, তা অতি সহজে চোখে ধরা পড়বে। অথচ এই দুই চিত্রকরের মধ্যে কালের ব্যবধান মাত্র মোটামুটি দুই শত বৎসরের।

এর পরে ইউরোপীয় চিত্র দুইটি বিপরীত ধারায় বিকাশ লাভ করতে সুরু করে। সকল রূপকর্ম্মের মত চিত্রও দুইটি উপকরণে গঠিত—প্রথম, রূপ এবং দ্বিতীয়, রূপকে অবলম্বন ক'রে যে-মনোভাব প্রকাশ লাভ করে, তাই। রূপ আধার এবং মনোভাব আধেয়। এখানে রূপ হ'ল দুটি আয়তিবিশিষ্ট পটের উপর রঙের সাহায্যে মূর্ত্তিবিশেষের প্রকাশ, এবং ভাব হ'ল যে-মানসিক ভাবকে পরিস্ফুট করবার জন্য চিত্রকর যে চিত্র আঁকেন, তাই। ইউরোপীয় চিত্রকর্ম্ম যখন সবিশেষ পরিবর্ত্তন লাভ করল, তখন চিত্রকরগণ উপলব্ধি করলেন যে চিত্রের উপকরণ এই দুটি জিনিষ। তখন প্রশ্ন উঠল, তাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান এবং কোন্‌টি অপ্রধান। এক দল বললেন, রূপই প্রধান, রূপই চিত্রের মুখ্য জিনিষ। আমরা তাঁদের

রূপবাদী বলতে পারি। অন্য দল বললেন, চিত্রের আসল জিনিষ হ'ল রেখা ও রঙের সমন্বয়ে যে মনোভাবটি অভিব্যক্তি লাভ করে তাই। তাঁদের আমরা ভাববাদী বলতে পারি। রূপবাদীদের যুক্তি এই যে, চিত্র হ'ল চোখে দেখবার জিনিষ, স্থূল-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষ, অতএব তার আদর্শ হওয়া উচিত ষোল আনা সুন্দর নিখুঁত রূপ পরিস্ফুটন। ভাববাদীদের যুক্তি হ'ল ঠিক এর উল্টো। তাঁরা বলবেন, রূপ তো আসল জিনিষ নয়, রূপ চিত্রকর্ম্মের বাহিরের প্রকাশ মাত্র, চিত্রের প্রাণ হ'ল ভাব। তাকে অভিব্যক্তি দেবার জন্যই তো রেখা ও রঙের প্রয়োজন। কাজেই চিত্রকরের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল ভাবকে প্রকাশ করা। রঙের চাকচিক্যের প্রয়োজন নেই, বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্যের প্রয়োজন নেই, কেবল মাত্র প্রয়োজন ভাবকে প্রকাশ করবার—তা সে যে-ভাবেই হোক্। পরবর্ত্তী যুগে বিশিষ্ট ইউরোপীয় চিত্রকরদের প্রায় প্রত্যেককেই এই দুটি বিরোধী দলের একটি দলে ভুক্ত করা যেতে পারে। আমরা এখন ভাববাদী চিত্রকরদের আলোচনা করব।



ম্যাডোনা ও শিশু
সিমাবো অঙ্কিত

ভাববাদী চিত্রকরদের আদি হলেন রুবেন্স (১৫৩০-৮৭)। চিত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের ইচ্ছা তাঁর এত প্রবল ছিল যে, তিনি স্বদেশ থেকে ভিনিসে গিয়ে নামজাদা চিত্রকরদের চিত্রের নকল করতে অভ্যাস করেন। পরে দেশে গিয়ে 'স্কুল অব্ এন্টোয়ার্প্' নামে এক বিখ্যাত চিত্রকর-দল গঠন করেন।

রুবেন্সের প্রথম বয়সে আঁকা চিত্র 'ক্রুশ হইতে অবতরণ' এন্টোয়ার্পের গির্জ্জার জন্য আঁকা হয়েছিল। এ থেকে, রূপ থেকে ভাবের প্রতি তাঁর পক্ষপাত বেশী ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ ছবিতে ততখানি রঙের উজ্জ্বলতা বা দেহের গঠনের বিস্তারিত পরিচয় দেবার চেষ্টা নেই, যতখানি আছে যীশুর মৃতদেহের করুণতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। চিত্র-জগতে এই ছবিখানি তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্র ব'লে খ্যাতি লাভ করেছে।

এর পর ফরাসী দেশের রাণী মারী দ্ মেদিচি তাঁকে আমন্ত্রণ করেন এবং লুক্সেমবুর্গ প্রাসাদ চিত্রিত করবার ভার দেন। এইখানেই তিনি তাঁর আর একখানি বিশিষ্ট চিত্র—'চতুর্থ হেনরী মারী দ্ মেদিচির প্রতিকৃতি গ্রহণ করছেন' চিত্রিত করেন। রাণী মেরীর সঙ্গে রাজা হেনরীর বিবাহটিকে এখানে কল্পনার সাহায্যে একটি মনোহর ছবির আকারে পরিণত করা হয়েছে। তাঁর



সেণ্ট্‌ ফ্রান্সিসের আক্ষেপ
জিয়োত্তো অঙ্কিত

নৈপুণ্য চিত্রের রূপের বাস্তবতা ফুটানোর ততখানি ব্যয়িত হয় নি, কল্পনার লীলাকে অবাধ গতি দেবার জন্তে যতখানি হয়েছে।

রুবেন্সের শিষ্যদের মধ্যে ভ্যান্‌ডাইক ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৫৯৯ সালে এণ্টোয়ার্প শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিকৃতি-অঙ্কনে। মানুষের মুখাকৃতি অঙ্কনে তিনি যে নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন তার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি কেবল অঙ্কনের বস্তুটির বাহিরের আকৃতির হুবহু নকল করায় মনোনিবেশ করতেন না, তার মুখের পিছনে যে-ব্যক্তিটি আছে তার ব্যক্তিত্বটিকেও ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কিত করেছিলেন। এই চিত্রখানি ইংরেজ-সরকার ১৮৮৫ সালে ন্তাশন্তাল গ্যালারির জন্ম ৮৭,৫০০্ টাকায় ক্রয় করেছিলেন।

তাঁর পরবর্তী যে বিশিষ্ট চিত্রকরের নাম করার প্রয়োজন হবে, তিনি হলেন রেমব্রাণ্ট। হল্যাণ্ডে ১৬০৭ সালে তাঁর জন্ম। ভ্যান্‌ডাইকের মত তিনি প্রতিকৃতি-অঙ্কনে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। তাঁর মত তিনিও প্রতিকৃতির মধ্যে আসল মানুষটির ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতেন। এ-বিষয়ে সব থেকে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল তাঁর অঙ্কিত এক প্রৌঢ়া মহিলার ছবিখানি।

এচিং-চিত্রেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তার মধ্যে সব থেকে মনোরম চিত্র হ'ল 'টোবিটের অন্ধতা'। ছবিখানিতে করুণ রসের ধারা যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে। চক্ষুহীন মানুষের দুঃখ এর চেয়ে করুণ ভাবে বুঝি প্রকাশ করা যায় না।

এ-সম্পর্কে দু-জন জার্মান চিত্রকরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন হলবাইন্‌ এবং ডুরের্‌। ডুরেরের জন্ম ১৪৭১ অব্দে। তাঁর বিশেষ খ্যাতি তাঁর উৎকৃষ্ট কাঠখোদাই ছবির জন্ম। এই পদ্ধতির চিত্রের মধ্যে 'এ্যাপোক্যালিপ্সের চার অশ্বারোহী'র ছবিখানি সব থেকে নামজাদা। ইবানেজ্‌ তাঁর বিখ্যাত নভেলখানির নামও ধার করেন এই ছবিখানি থেকে। বুক অব্‌ রেভেলেশনে এই চারটি সওয়ারের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তাঁরা হলেন

যথাক্রমে, বিজয়, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মরণ। এই ছবিটিতে বাহিরের রূপের পারিপাট্যের উপর এতটুকু নজর চোখে পড়ে না, কিন্তু মরণ ও যুদ্ধের বীভৎসতার এমন উজ্জ্বল বর্ণনা বোধ হয় আর সম্ভব হ'তে পারে না।

ডুরেরের অব্যবহিত পরেই এই কাঠখোদাই ছবিতে হল্‌বাইন্ বিশ্বব্যাপী সুযশ অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরও পক্ষপাত রূপ থেকে ভাবের প্রতি বেশী ছিল। তাঁর এই শ্রেণীর চিত্রের মধ্যে 'মৃত্যুর নৃত্য' শীর্ষক চিত্রগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। মৃত্যু যে বিভীষিকার মত আমাদের পদে পদে পিছু নিয়ে আছে, এই চিরন্তন সত্যটিকে তিনি অতি সুন্দর ভাবে আমাদের বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। এই ছবিতে তিনি তিনটি দৃশ্য দেখিয়েছেন—একটি পোপের, একটি কৃপণের ও একটি চাষার। বৌদ্ধ গাথার গল্প যেমন ভারতবর্ষে প্রস্তরের গায়ে চিত্রে বলবার প্রয়াস হয়েছে, এখানেও চিত্রগুলির ব্যবহার সেই গল্প বলার জন্য, জীবনের কতকগুলি কঠোর সত্যকে ফুটানোর জন্য। এখানে চিত্র কেবল রেখা ও রঙের সমাবেশ নয়, এখানে চিত্র সম্পূর্ণরূপে ভাবের বাহন মাত্র।

এই শ্রেণীর আর একটি চিত্রকরের নাম করেই আমরা ভাববাদী চিত্রকরের আলোচনা শেষ করব। ইনি হলেন ইংরেজ চিত্রকর ওয়াট্‌স। ভিক্টোরীয় যুগে তাঁর জন্ম। চিত্রকরের আদর্শ কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "আমার উদ্দেশ্য ছবি এঁকে নয়ন-রঞ্জন করা ততখানি ছিল না, যতখানি ছিল মানুষের মনে মহান্ প্রেরণা উদ্রেক করা, যাতে হৃদয়বৃত্তি এবং কল্পনাশক্তি আলোড়িত হবে এবং মানুষের মধ্যে যা ভাল এবং মহৎ জিনিষ আছে তাকে ফুটিয়ে তুলবে।" বলা বাহুল্য, তিনি চিত্রকে নিজের মনোভাবের বাহন হিসাবে ব্যবহার করতেন, তিনি চূড়ান্তরূপে ভাববাদী ছিলেন।

তাঁর দুখানি ছবির উল্লেখ আমরা এখানে করব। তাঁর সব থেকে বিখ্যাত ছবি হ'ল 'আশা'। একটি গোলকের উপর বসা, চোখ দুটি বাঁধা, হাতে একটি বীণা, এই বেশে তিনি আশাকে চিত্রিত করেছেন। হাজার নিরানন্দ আবেষ্টনীর মাঝেও আশা নিরাশ হ'তে জানে না, এই তার ইঙ্গিত। তাঁর 'ম্যামন' ছবিখানিও আমাদের সমানই মুগ্ধ করে। অন্ধ ঐশ্বর্য্যের লালসা মানুষের জীবনে কি অপরিসীম দুর্গতি আনে, সেই কথাই তিনি এখানে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। ম্যামন এখানে বীভৎসকায় একটি পুরুষ, রক্তাক্ত এক সিংহাসনে উপবিষ্ট—এক হাতে সে নারীর গলা চেপে ধরেছে, অপর দিকে পুরুষ নিরুপায় অবস্থায় তার পদদলিত হয়ে পড়ে রয়েছে।



মহাজন ও তার স্ত্রী
কুইন্‌টন মাসি অঙ্কিত

এমনি মধুর এই চিত্রকরটির হৃদয়খানি। হাতে ছিল তাঁর চিত্রকরের শক্তি, মনে ছিল দার্শনিকের উদারতা এবং হৃদয়ে কবির কোমলতা। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি চিত্র আঁকতেন অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নয়, রেখা ও রঙের সাহায্যে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের সৃষ্টির জন্য নয়, তিনি চিত্র আঁকতেন তাঁর চিন্তাকে রূপ দেবার জন্য, মহান্ সুন্দর মনোভাবকে প্রকাশ করবার জন্য। তাঁর চিত্র এক-একখানি কবিতা।

এইবার আমরা কয়েকটি রূপবাদী চিত্রকরের পরিচয় দেব। এঁদের প্রথম হলেন টিশিয়ান্। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর জন্ম। টিশিয়ান্ ছবিকে জীবন্ত করতে, রঙের চাকচিক্য ফোটাতে বেশী যত্ন নিতেন এবং সেই



এ্যাপোক্যালিপ্সের চার অশ্বারোহী
ডুরের কর্তৃক অঙ্কিত

কারণে তাঁর ছবিতে এই গুণ বিশেষ পরিলক্ষিত হ'ত। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর 'ব্যাক্কাস্ ও আরিয়াড্নি'র ছবি উল্লেখ করা যেতে পারে। আরিয়াড্নিকে থিসিয়ুস্ পরিত্যাগ ক'রে গেলে পর, ব্যাক্কাস তাঁকে সান্ত্বনা দিতে নামছেন তাঁর রথ হ'তে। ছবিখানি যেমন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, বর্ণের বাহারও তার তেমনি সুন্দর। টিশিয়ানের অপর একখানি চিত্র 'ফ্লোরা'ও এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। ফ্লোরা একটি পরিণতযৌবনা নারী, এ যৌবনের সৌন্দর্য্যে প্রথম যৌবনের চাপল্য নেই, কিন্তু পরিণত রূপের ভাব-গাম্ভীর্য্যও কম মনোহর নয়। তাঁর অন্য একখানি চিত্র 'মাদলীন্'ও এই একই আদর্শের নারীচিত্র। অনুতপ্ত হৃদয়ের করুণতা ফোটানোই এ ছবির উদ্দেশ্য; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এ ছবির সজীবতা ও সুরূপতাই আমাদের মুগ্ধ করে বেশী।

রূপবাদী দ্বিতীয় যে চিত্রকরের আমরা নাম করব তিনি হলেন স্পেনদেশবাসী। ভেলাজকেজ-এর জন্ম ১৫৯৯ অব্দে। তাঁর প্রধান গুণ, বাস্তবের সহিত সাদৃশ্য ফোটানোর অদ্ভুত ক্ষমতা। চিত্রিত বস্তুর গভীরতাকে আলোছায়ার তারতম্যের দ্বারা তিনি এমন ক'রে ফোটাতে পারতেন যে তেমনটি কেউ পারতেন না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল তাঁর অঙ্কিত 'মেড্স অব অনার্' নামক ছবিখানি। এখানি প্রাসাদের অভ্যন্তরে স্থিত স্পেনের রাজপরিবারের ছবি। ছবিখানিতে রাণী ইজাবেল তাঁর দাসদাসীর সহিত দাঁড়িয়ে রয়েছেন, রাজা ব'সে, তাঁর বাম পাশে চিত্রকর স্বয়ং দাঁড়িয়ে, তার পিছনে দুটি কর্ম্মচারী দাঁড়িয়ে কথা বলছে, তার পিছনে দেওয়ালের কাছে আয়নার মধ্যে রাজা ও রাণীর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয়েছে এবং আরও দূরে একটি লোক দরজার পর্দ্দা টানছে। এতগুলি বস্তু পর পর স্থাপিত, সব একসঙ্গে চিত্রে ফুটিয়ে তোলা অলৌকিক শিল্প-ক্ষমতার পরিচয় ব'লেই মনে হয়।

এর পরে যে কাহিনী আমরা অবতারণা করব তা ইউরোপীয় চিত্রের ইতিহাসে এক বিচিত্র অধ্যায়।



ফলিবার্জ্যারের একটি পানস্থান
মানে কর্ত্তৃক অঙ্কিত

তিন জন চিত্রকর একই সময়ে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম হ'ল হল্‌ম্যান্ হাণ্ট, এভরেট মিলে ও গ্যাব্রিল রসেটি। এঁদের সকলেরই জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে। এই সময় ইউরোপীয় চিত্রের ইতিহাসে একটি আঁধারের যুগ নেমেছিল। এর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে-সব চিত্রকর জন্মান, তাঁদের মধ্যে পূর্ব্ব-যুগের চিত্রকরদের প্রতিভা ছিল না, ছিল কেবল পূর্ব্বতন চিত্রকরদের রীতির অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা। এরই ফলে তখন চিত্রবিদ্যায় একটি নীতি প্রচারিত হয়েছিল এই যে, ছবি ভাল হ'তে হ'লে তার বর্ণ হওয়া চাই কটা। এর কারণ এই যে, অতীতের যে-সব বড় চিত্রকর ছিলেন, যেমন রেমব্রাণ্ট, টিশিয়ান, এঁদের ছবি কতকটা রঙের গুণে এবং বেশীর ভাগ সময়ের গুণে পাংশুবর্ণ লাভ করেছিল। সে-যুগে চিত্রকর পুরাতন চিত্রকরদের অন্ধ অনুকরণের চেষ্টায় তাঁদের ছবিকে কৃত্রিম ভাবে কটা বর্ণের করতে চেষ্টা করতেন। চিত্রজগতের আবহাওয়া তখন এমনি কলুষিত হয়েছিল এবং স্বাধীন চিন্তাধারার ক্ষেত্র এমনি সঙ্কুচিত হয়েছিল। ফলে চিত্রবিদ্যাকে নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এই তিন চিত্রকর পরস্পর বন্ধুও ছিলেন। তাঁরা এক দিন চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে ঠিক করলেন যে, চিত্রজগতে এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করবার সময় এসেছে। এই তিন বন্ধু এই নূতন সম্প্রদায়ের নামকরণ করলেন 'প্রী-র‍্যাফেলাইট' দল; কারণ তাঁরা র‍্যাফায়েল এবং তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রকরদের চিত্রকেই পরবর্ত্তী যুগের চিত্র অপেক্ষা বেশী পছন্দ করতেন। তখনকার অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে দূরীভূত করবার জন্য তাঁরা একটি নূতন আদর্শ মনস্থ করলেন। সে আদর্শের মতে প্রকৃতিকে বিস্তারিত ভাবে বাস্তবের সহিত নিখুঁত মিল করিয়ে ছবিতে আকার দিতে হবে এবং এই ভাবে প্রথম যুগের ইটালীয় চিত্রকরদের সুগভীর বাস্তবতাকে



তাস খেলোয়াড়
সেজান্ অঙ্কিত

ফিরিয়ে আনতে হবে। মোটামুটি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল চিত্রকে বাস্তবের অনুরূপ ক'রে গড়ে তোলা, অর্থাৎ তাঁরা আদর্শে হলেন চূড়ান্ত রূপবাদী।

এই আদর্শকে রূপ দেবার জন্য এই চিত্রকর-ত্রয়ী একটি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। কোন চিত্র আঁকতে হ'লে তাঁরা তাতে যা কিছু স্থান পাবে তা বাস্তবে সাজিয়ে নিতেন এবং তাকে আদর্শ ক'রে নিখুঁত ভাবে চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। এই ভাবে এই সম্প্রদায়ের নূতন আদর্শের প্রথম ছবি 'ভার্জিনের বাল্য' নামক চিত্রটি রসেটি কর্তৃক অঙ্কিত হয়। এই সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় চিত্র হ'ল মিলে কর্তৃক অঙ্কিত 'ওফিলিয়া'র ছবি। ওফিলিয়া যখন পিতার হত্যার পর উন্মত্ত অবস্থায় জলে ডুবে যাচ্ছেন, এ ছবিটি তখনকার চিত্র। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, প্রতি ক্ষুদ্র বস্তুর বাস্তবের সহিত কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ মিল।

এখন যে-কথা বলার উদ্দেশ্যে এই চিত্রকর-ত্রয়ীর আলোচনা আরম্ভ করা হয়েছে তা বলার সময় হয়েছে। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রসেটি এই ভাবে রূপবাদের চরম আদর্শ গ্রহণ করার পর ধীরে ধীরে তাঁর আদর্শ রূপান্তরিত হ'তে আরম্ভ করল। ফলে, কিছু কাল পরে এই নিখুঁত বাস্তবের সহিত সাদৃশ্যের প্রতি আর তাঁর মন রইল না। তাঁর চিত্র ক্রমশ ভাবপ্রধান হয়ে পড়ল। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রসেটির পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ইটালীয়ান এবং পরে ইংলণ্ডে বাস ক'রে ইংরেজ হয়েছিলেন। রক্তে তাঁর লাটিন জাতির অংশ আছে, কিন্তু আচরণে এবং ব্যবহারে তিনি নর্ডিক। এখানে এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নর্ডিক চিত্রকর সাধারণতঃ ভাববাদী হয়ে থাকেন, যেমন ডুরের্, হলবাইন, ওয়াট্‌স্। অপর দিকে লাটিন জাতি রূপবাদী হয়ে থাকেন, যেমন দা ভিঞ্চি, ভেলাজকেজ, টিশিয়ান। রসেটি লাটিনও বটেন, নর্ডিকও বটেন। হয়তো সেই কারণেই তিনি প্রথমে রূপবাদী হয়ে রূপকর্ম্ম আরম্ভ করেন এবং পরে ভাববাদকেও গ্রহণ করেন। তবে তিনি যে হুবহু ভাববাদী ছিলেন, এমন কথা বললেও অন্যায় করা হবে। পূর্ব্বতন জীবনের বাস্তবে সজীবতার আদর্শ তাঁকে তা হ'তে দেয় নি। কাজেই তিনি এই দুটি বিরোধী আদর্শের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য খুঁজে নিয়েছিলেন। এই সামঞ্জস্য দুয়েরই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, কারও প্রাধান্য স্বীকার করে না। এখানে কেবলমাত্র রূপের অনুকরণেই সমস্ত চেষ্টা ব্যয়িত হয় না, আবার ভাবের প্রতি গভীর আকর্ষণ চিত্রকরের মনে রূপের প্রতি ঔদাসীন্য আনে না। এইখানেই আমরা চিত্রাঙ্কনের আদর্শে বিরোধ-সমন্বয়ের অবস্থা খুঁজে পাই, চিত্রকরের প্রকৃষ্ট আদর্শকে খুঁজে পাই।

তাঁর এই আদর্শের ছবি হ'ল তাঁর শেষ জীবনে আঁকা "দিবাস্বপ্ন" ছবিখানি। এ চিত্রখানি রূপে ও ভাবে সর্ব্বাঙ্গ-

সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। রূপকে সৌন্দর্য্য দেবার চেষ্টার এখানে অভাব নেই, কিন্তু বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তাও এখানে নেই। অথচ এই রূপের মাধুর্য্য এখানে ছবিটির ভাবটিকে যেন প্রস্ফুটিত হ'তে সাহায্য করেছে। মিলের 'ওফিলিয়া' ও ওয়াট্‌সের 'ম্যামন্' এর সঙ্গে এর তুলনা করলে সে-কথা স্পষ্ট হবে।

এর পরে আমরা যে-যুগের কথা বলব, সে হ'ল বিক্ষেপের যুগ। চিত্রের রাজ্যে চরম যা কিছু করবার তা হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে আলোক-চিত্রবিদ্যার প্রচার হওয়ায় চিত্রকরের কাজের প্রসারও অনেকখানি সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আর প্রকৃতির নিখুঁত অনুকরণে বাহাদুরি নেই, কারণ আলোক-চিত্রকেও আর সেখানে কেউ হার মানাতে পারবে না। কাজেই নূতন চিত্রকর-সম্প্রদায়ের নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করবার জন্য একটা নূতন কিছু করবার প্রয়োজন হ'ল। এই নূতন কিছু করবার প্রচেষ্টাই ইউরোপের আধুনিক চিত্রকর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয়। মানুষের যেমন পায়ে হেঁটে চ'লে চ'লে বিরক্তিবোধ হেতু ক্ষণেকের জন্য মাথায় বা হাতে হেঁটে চলবার একটা আকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝে জাগে, এও তেমনি। এটি সত্যই একটি বিক্ষেপের যুগ। মানুষকে স্থায়ী কিছু দান করবার সামর্থ্য তার নেই। দু-দিন পরে চিত্রকরদের এ খামখেয়াল কেটে যাবে, সন্দেহ নেই।



অবগুণ্ঠিতা
পিকাসো কর্ত্তৃক অঙ্কিত

এই নূতন কিছু করবার খামখেয়ালকে চরিতার্থ করবার চেষ্টায় ইউরোপে তিনটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত হয়। তাদের আদর্শ তিনটি বিভিন্ন রকমের জিনিষ। এই সম্প্রদায়গুলির নাম হ'ল ইম্‌প্রেশনিজম্‌, কিউবিজম্‌ এবং ফিউচারিজম্‌।

ইম্প্রেশনিজম্‌-এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফরাসী চিত্রকর মানে (১৮৩৩)। এই ইম্প্রেশনিজম্‌-এর নীতিকে বুঝতে হ'লে তাঁর একখানি ছবির আলোচনা আমাদের করতে হবে। ছবিখানির নাম হ'ল 'ফলিবার্জারের একটি পান-স্থান'। এই ছবিখানির সঙ্গে মিলের ছবি 'ওফিলিয়ার' তুলনা করা দরকার। দুটি চিত্রের একই আদর্শ—বাস্তবের সহিত চিত্রের নিখুঁত মিল সম্পাদন করা। কিন্তু এই

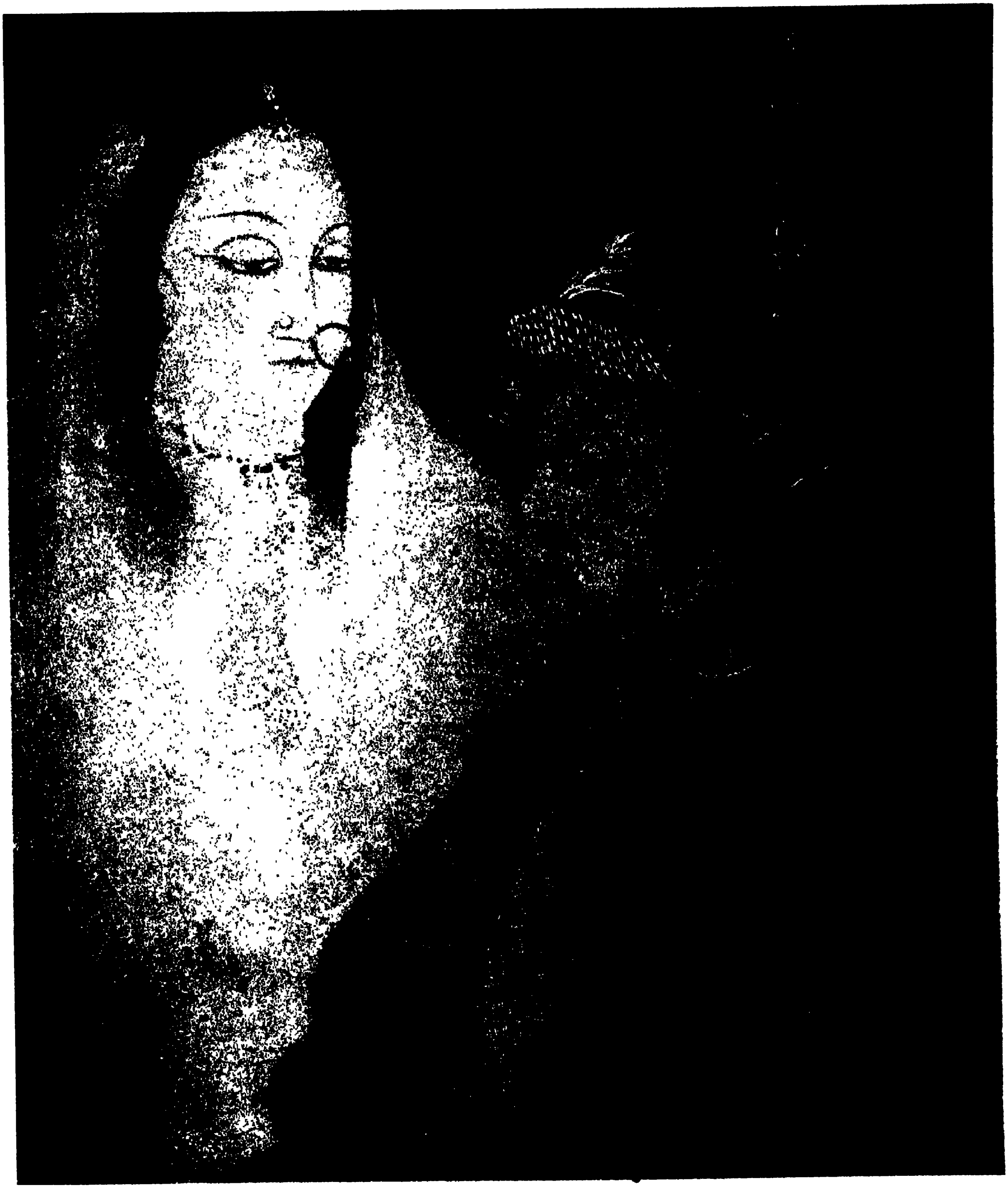


মহিলা ও তাঁর কুকুর
বাল্লা অঙ্কিত

মাত্র এইটিই নয়। তাঁদের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি এবং রঙের ব্যবহার-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র ধরণের। চিত্রের রংকে প্রাকৃতিক রঙের সদৃশ করবার চেষ্টা হ'তেই এই পদ্ধতির উৎপত্তি। উনবিংশ শতাব্দী একটি আবিষ্কারের যুগ। তখন বিজ্ঞান আবিষ্কার করে যে বর্ণবিজ্ঞান একটি নিগূঢ় জটিল ব্যাপার। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, গাছের সহজ রং (লোক্যাল কালার) হ'ল সবুজ। নিকট থেকে ঘাসকে আমরা এই রকমই দেখি। কিন্তু দূর পাহাড়ের গায়ে ঘাসের রং আর সবুজ লাগে না, তখন তা নীলাভ হয়। বায়ুচাপের (এটমস্‌ফিয়ার) পর্দার প্রভাবে এইরূপ সহজ রঙের বিকার ঘটতে দেখা যায়। এই ভাবে একটি নূতন বর্ণ-ব্যবহারের পদ্ধতির প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পূর্ব্বে চিত্রকরেরা লাল, নীল এবং হলদে এই তিনটি আদিম রঙের ব্যবহার করতেন; কিন্তু বিজ্ঞান দেখায় যে, লাল রঙকে সৌরকিরণে (স্পেকট্রাম্) যেমন দেখায় তাতে তাকে প্রাথমিক রং ব'লে গ্রহণ করা যায় না। কমলা রং, সবুজ, বেগুনী, নীল এবং হলদে এই কয়টিই আসল রং। এই কারণে তাঁরা সৌরকিরণের অনুরূপ রং ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা নিছক কালো রঙের ব্যবহার একেবারে ছেড়ে দিলেন; তাঁদের মতে প্রকৃতির মাঝখানে যা কালো রং আমরা পাই, তা হয় গাঢ় নীল, গাঢ় সবুজ বা গাঢ় বেগুনী। তা ছাড়া, তাঁরা দেখলেন যে রংগুলিকে পরস্পরের সহিত যত বেশী মিশ্রণ করা যায় ততই রঙের উজ্জ্বলতা কমে যায়। তা ছাড়া তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ও নয়। সেই কারণে সমগ্রদৃষ্টি-বাদীরা রং-মিশান একেবারে উঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যখন দুই বা তিনটি রঙের মিশ্রণে একটি নূতন রং ফোটাবার প্রয়োজন বোধ করেন, তখন তাঁরা এগুলিকে মেশান না, প্রত্যেকটি রং আলাদা ভাবে ফোঁটা ফোঁটা দিয়ে যান;

একই আদর্শকে বিভিন্ন উপায়ে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছে এই দুটি চিত্রে। মিলের চিত্রে প্রত্যেকটি পাতা, প্রত্যেকটি ফুল, প্রত্যেকটি ডাল আলাদা ভাবে চিত্রিত হয়েছে, যেমন ক'রে দশটি বিভিন্ন সংখ্যার যোগ-ফলে একটি বড় সংখ্যা পাওয়া যায়। অপর পক্ষে মানের ছবিতে সমগ্র জিনিষগুলিকে, সমস্ত মদের বোতল-গুলিকে একসঙ্গে যেমনটি দেখায় সেই রকম দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এখানে যেন সবগুলি সংখ্যার যোগফল একসঙ্গে দেখান হয়েছে। ইম্প্রেশনিজম্ বা সমগ্রদৃষ্টিবাদ এই ভাবে এক দৃষ্টিক্ষেপে সমগ্রটি যেমন দেখায়, তেমনটি আঁকবার চেষ্টা করে (সাইমলটেনিয়াস্ ভিসন্); আর মিলের ছবিতে আমরা পাই পর পর নিক্ষিপ্ত বিশ্লিষ্ট দৃষ্টির (কন্‌জিকিউটিভ ভিসন্) প্রভাব। প্রথম দর্শনে আমরা সমগ্র জিনিষটিকে যেমন দেখি, সমগ্রদৃষ্টিবাদী চিত্রকে ঠিক সেই রকম আঁকতে চেষ্টা করেন। এই দুটি বিভিন্ন উপায় যে বিভিন্ন নীতির উপর স্থাপিত তারা প্রত্যেকেই বাস্তব এবং সত্য।

কিন্তু সমগ্রদৃষ্টিবাদীর স্বতন্ত্রতার মুখ্য অবলম্বন কেবল



ফলে খানিক দূরে ধরলে সেই বিচ্ছিন্ন রঙের ফোঁটাগুলি মিশ্রিত হয়ে গিয়ে একটি নূতন রঙের আকার নেয় এবং সে-রং, একসঙ্গে সব রঙগুলিকে মিশিয়ে নিলে যা হয়, তা হ'তে আরও উজ্জ্বল হয়। একেই বিজ্ঞান চাক্ষুষ মিশ্রণ (অপটিকাল মিক্‌শ্চার) বলেন, কারণ রঙের মিশ্রণ এখানে পটে না সাধিত হয়ে চোখে সাধিত হয়। পূর্ব্বে চিত্রকর রাঙা ও সবুজকে মিশিয়ে কটা রং করতেন, সমগ্রদৃষ্টিবাদী চিত্রকর হলদে এবং মভ্ রঙের ফোঁটা মিশিয়ে আরও উজ্জ্বল কটা রং ফোটান। এই ভাবে চিত্রাঙ্কনবিদ্যা একটি কঠিন বৈজ্ঞানিক গবেষণার আকার নিলে।

আধুনিক যুগের দ্বিতীয় বিক্ষেপ হ'ল 'কিউবিজম্' বা ত্রিকোণিকতা। এই ত্রিকোণিকতার উৎপত্তি সমগ্র-দৃষ্টিবাদের একদেশদর্শিতার প্রতিফলেই। সমগ্রদৃষ্টি-বাদীর মতে চিত্রাঙ্কন একটি কঠিন বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পরিণত হয়ে দাঁড়াল, তা আগেই বলা হয়েছে। তার ফলে এক দল চিত্রকর বললেন, এমনটি হ'লে চলবে না, চিত্রবিদ্যা তো বিজ্ঞান নয়, এর কারবার রূপকর্ম্ম নিয়ে এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল চিত্রকে প্রকৃতির অনুরূপ করা নয়, ভাবের অভিব্যক্তি দেওয়া। ফলে রূপের প্রতি তার একটা গভীর ঔদাসীন্য এল এবং এই ধারণা জন্মাল যে রূপের দিকটা যত অবহেলা পাবে, ভাবের দিকটা সেই পরিমাণ লাভবান হবে। এরই ফলে ত্রিকোণিকতার উৎপত্তি।

এই নূতন দলের অগ্রণী হলেন পল্ সেজান্ (১৮৩৯-১৯০৬)। তিনি যা করেছিলেন, তা ততখানি উপরিউক্ত মতের অনুসারে নয়, যতটা নিজের প্রবৃত্তির বশে। তাঁর 'তাস-খেলোয়াড়' ছবিখানি দেখলে এই কথাটি অবধারিত হ'বে। মানুষগুলির গঠনকে নিখুঁত করবার এখানে কোন প্রয়াস নেই, কেবল খেলাটিকে ইঙ্গিত করবার প্রয়াসই এখানে বেশী বর্ত্তমান। তাঁর 'পুলের দৃশ্য' নামক ছবিখানিতে ভাব প্রকাশের ইচ্ছা যে আরও প্রবল হয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বর্ণনীয় বিষয়টিকেই মাত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং অন্য যা কিছু খুঁটিনাটি ছিল তা বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বাস্তবের প্রতি ঔদাসীন্য এবং ভাবকে আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করবার জন্য পরে তিনি কেবল যে অতিরিক্ত জিনিষ বাদ দিতেন তা নয়, প্রকৃতিতে জিনিষ যেমন দেখা যায়, তাকে তা হ'তে স্বতন্ত্র ক'রে, বিকৃত ক'রে, আঁকতে সুরু করলেন। তাঁর 'প্রভেন্সের দৃশ্য' ছবিতে এই চেষ্টা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। এখানে তিনি বাড়ীগুলিকে পূর্ণতা দেবার জন্য বিকৃত ক'রে ত্রিকোণের আকার দিতে সুরু করেছেন। এই ভাবে ত্রিকোণিকতার উৎপত্তি।

জিনিষের আয়তনকে বোঝাতে এই ত্রিকোণের আকার দেওয়াটা এক দল চিত্রকরের মনকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। তাঁরা আরও ধরে নিলেন যে ধাতুতত্ত্বের মতে ক্রীষ্টাল হ'ল সকল জিনিষের আদিরূপ (প্রিমিটিভ্ ফর্ম্), কাজেই কোন বস্তুকে তার আদি রূপটি দিতে হ'লে সমস্ত বাঁকা লাইনকে বাদ দিতে হবে এবং চিত্রের বস্তুকে ত্রিকোণ বস্তর আকার দিতে হবে। জর্জ্জ ব্রাক্ ও স্পেনীয় চিত্রকর পিকাসো এই মতের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের মত দুটি ভ্রান্ত ধারণার উপর স্থাপিত :—প্রথম, বলই সৌন্দর্য্যের লক্ষণ এবং দ্বিতীয়, বাঁকা রেখা থেকে সোজা রেখা বলীয়ান্। ফুল অতি দুর্ব্বল জিনিষ, কিন্তু তাই ব'লে যে তা সুন্দর নয়, তা কেউ বলবেন না। গৃহনির্ম্মাণের কাজে খিলান বাঁকা হ'লেও মজবুত খুব বেশী। কিন্তু নূতন কিছু করার নেশায় এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁরা সহজ রূপকে বিকৃত ক'রে ত্রিকোণের আকার দিয়ে আঁকতে সুরু করলেন। পিকাসোর 'অবগুণ্ঠনবতী মহিলা'র মুখ এই আদর্শে অঙ্কিত। পরিণত আকারে ত্রিকোণিকতা আরও জটিল হয়ে পড়েছিল। ফলে, টীকা এবং টিপ্পনী ভিন্ন চিত্রের বস্তু কি, বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

আধুনিক চিত্র-জগতে এই নূতন পথে চলার নেশা আরও একটি বিক্ষিপ্তির চেষ্টা ঘটিয়েছে। এই সম্প্রদায়ের চিত্রকরদের নামকরণ হয়েছে ফিউচারিষ্ট। তাঁদের প্রধান বিশিষ্টতা হ'ল চিত্রের মধ্যে গতি এবং চাঞ্চল্যের ভাবকে মূর্ত্তি দেওয়া। সাধারণ চিত্রকর তা দিতেন চলন্ত মানুষ বা জীবের একটি মুহূর্ত্তের অবস্থাকে চিত্রিত ক'রে। তাঁরা তা করবেন না, তাঁরা চলন্ত জীবের চলনকে বুঝাতে অসংখ্য চলন্ত পায়ের ছবিকে আঁকবেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল 'মহিলা ও তাঁর কুকুর' নামে ছবিখানি। এখানে অসংখ্য পা ও লেজ এই কথা বুঝায় যে কুকুরটি চলছে এবং অসংখ্য জুতার এই ইঙ্গিত যে প্রভুও সঙ্গে চলেছেন। বলা বাহুল্য যে, এর ফলে গতিরই ইঙ্গিত হয়েছে, কিন্তু রূপবস্তুর সৃষ্টি হয় নি।

অবিনশ্বর অবিনাশ

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

দেবীপুরের অবিনাশ চৌধুরী এই গল্পের নায়ক। ধন-সম্পত্তি বলতে তার কি আছে, সেকথা বলার পূর্ব্বে তার পিতৃপুরুষগণের কি ছিল সেকথা বলা দরকার। নইলে এই গল্পের মেরুদণ্ড যাবে বেঁকে, এবং সত্য ঘটনার মধ্যে দুর্ব্বলতা আত্মপ্রকাশ করবে।

অবিনাশের প্রপিতামহ যদুনাথ চৌধুরী ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার। তাঁর নামে বাঘে-গরুতে জল খেত কি না জানা নেই; তবে প্রজায়-প্রজায় বিরোধ ছিল বিরল। তিনি নিজের জমিদারীতে জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রায় পাঁচ-শ পুষ্করিণী কাটিয়েছিলেন, এবং অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য খুলেছিলেন দানসত্র, যেখানে প্রতিদিন তিন-শ থেকে চার-শ দরিদ্র এসে পেট ভরে খেয়ে যেত। অতএব তাঁর রাজত্বে জলকষ্ট এবং অন্নকষ্ট ছিল না—একথা বললে খুব বেশী বলা হবে না।

জমিদার যদুনাথ চৌধুরীর নামে অনেক গল্প-কথা এখনও চলিত আছে। বর্ষাকালে ভিজে মাটির দাওয়ায় ব'সে বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় দেশের নাতি-নাতনীরা ঠাকুমাদের মুখে সে-সব গল্প শোনে। কবে নাকি কোন্ এক শীতের দ্বিতীয় প্রহরে জমিদার-বাড়ীর পাশের জঙ্গলে শেয়াল ডাকছিল। যদুনাথ তখন তাঁর খাস-কামরায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে ব'সে আলবোলায় মৃদু মৃদু টান দিচ্ছিলেন। একটু-আধটু আফিং খাওয়ার অভ্যাস ছিল ব'লে এ সময়টায় কেউ তাঁকে কোন রকম বিরক্ত করত না। শৃগালের এই ঐকতানিক প্রহর-ঘোষণায় তিনি বিরক্ত হয়ে উঠে বসে ডাকলেন—কে আছিস, রমাপ্রসন্নকে একবার ডেকে দে।

নায়েব রমাপ্রসন্ন এই অসময়ের আহ্বান শুনে কাঁপতে কাঁপতে হুজুরে হাজির হলেন। যদুনাথ তাঁর পায়ের শব্দ শুনে চোখ না খুলেই গম্ভীর গলায় বললেন—আজ সন্ধ্যে থেকেই ওরা কেবলই চেঁচাচ্ছে। একবার দেখে এস তো ব্যাপারটা কি?

কর্ত্তার মুখে কর্ত্তাপদবিহীন এই বাক্যটি শ্রবণ ক'রে নায়েব রমাপ্রসন্নের অন্তরাত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। বহু কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—কারা চেঁচাচ্ছে হুজুর!

—ওই যে শেয়ালগুলো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তৎক্ষণাৎ রমাপ্রসন্ন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, এবং একটু পরেই ফিরে এসে বিনীত কণ্ঠে বললেন—গিয়েছিলাম হুজুর!

—হুঁ। চেঁচাচ্ছে কেন? কি চায় ওরা? চোখ বুজেই যদুনাথ জিজ্ঞাসা করলেন। বুদ্ধিমান রমাপ্রসন্ন মনিবের এই সব বেপরোয়া মুহূর্ত্তগুলির সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন, তাই কণ্ঠস্বরকে অধিকতর নরম এবং বিনীত ক'রে তিনি বললেন—ওরা আপনারই কাছে নালিশ জানাতে এসেছে হুজুর।

—হুঁ। কি নালিশ?

—এই ভয়ঙ্কর শীতে ওরা বড় কষ্ট পাচ্ছে হুজুর—তাই—

—কেন! ব্যাটাদের কিছু নেই নাকি?

—কিচ্ছু না—হুজুর কিচ্ছু না। একেবারে খালি গা। বড় গরিব কিনা, তাই হুজুরের দরবারে কাঁদতে এসেছে।

—বড় চেঁচিয়ে কাঁদে ওরা। তা—আছে কত জন?

—জন-পঞ্চাশ হবে হুজুর।

—হুঁ। আচ্ছা ওদের একখানা ক'রে শাল আমি মঞ্জুর করলাম। কালই হাজার-পাঁচেক টাকা দিয়ে ওদের যা হোক একটা ব্যবস্থা ক'রে দিও। আর—চেঁচাতে বারণ ক'রে দিও—কেমন?

—তাই হবে হুজুর। শাল পেলে ওরা আর চেঁচাবে কেন? আচ্ছা আমি তবে এখন আসি হুজুর।

—এস।

পরের দিন রমাপ্রসন্ন পাঁচ হাজার টাকা নিলেন এবং পাশের জঙ্গলে কতকগুলি লোক মোতায়েন ক'রে দিলেন, যাতে একটি শেয়ালও এদিকে এসে না ডাকে। অতএব শেয়াল আর ডাকল না—এবং যদুনাথ বুঝলেন—শাল পেয়ে ওরা খুশী হ'য়ে চলে গেছে।

যদুনাথের খামখেয়ালীর আর একটি গল্প দেশে প্রচলিত আছে। বৈশাখ মাসের কোন এক মধ্যরাত্রিতে অত্যধিক গরমে তিনি ঘুমতে পারছিলেন না। রমাপ্রসন্ন এলেন, এসে বললেন—হুজুর, এ হচ্ছে টাকার গরম। তিনি জানতেন সেই দিনই বৈকালে তিনটি মহালের আদায়ী খাজনা ত্রিশ হাজার টাকা যদুনাথের শয়নকক্ষেই রাখা হয়েছে।

—ঠিক। যদুনাথ বললেন—এ টাকার গরমই বটে। ওগুলো সব নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে দাও তো হে রমাপ্রসন্ন! এ আপদ ঘরে থাকলে আজকে তো আমার ঘুম হবে না। নিয়ে যাও—নিয়ে যাও।

—তবে হুজুর অন্য কোন ঘরে—হাত দুটি জোড় ক'রে রমাপ্রসন্ন নিবেদন করলেন।

—উঁহু! ঘরে নয়—পথে। যে-ঘরেই রাখবে, সে-ঘরেই তো গরমে কারুর ঘুম হবে না। ও আপদ বিদেয় কর আমার বাড়ী থেকে।

অতএব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রমাপ্রসন্নকে আপদ বিদেয় করতে হ'ল।

যদুনাথের একমাত্র পুত্র বলরাম চৌধুরী পৈতৃক সম্পত্তির প্রসার ক'রে যেতে পারেন নি। বরং তিনি সারাজীবন দু-হাতে সেই সম্পত্তি উড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং এই রকম অপব্যয়ের পরেও সত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যুকালে তিনি যা রেখে গিয়েছিলেন, অধস্তন পাঁচ পুরুষের পক্ষেও তা পর্য্যাপ্ত।

বলরাম চৌধুরী ছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। সমস্ত জমিদারীর কার্য্য-পদ্ধতিকে তিনি বিলাতী কেতা-দুরস্ত ক'রে তুলেছিলেন। নায়েব, গোমস্তা, খাতাঞ্চী প্রভৃতি পদগুলি তুলে দিয়ে তিনি ম্যানেজার, এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি পদের প্রবর্ত্তন করেছিলেন, এবং চেয়ার-টেবিল, সোফা-কৌচে ভর্ত্তি ক'রে সমস্ত বাড়ীটাতে আধুনিকতার কোন ত্রুটিই রাখেন নি।

তাঁরও প্রথম যৌবনের প্রতাপান্বিত জমিদারী চালনার কাহিনী এ অঞ্চলে এখনও শুনতে পাওয়া যায়। নদীর ওপারে তাঁর অনেক কর্ম্মচারী বাস করত। বেলা দশটায় তারা খেয়েদেয়ে এপারে আপিস করতে আসত, আর ছ-টার সময় ফিরে যেত। প্রাইভেট-সেক্রেটরী প্রমোদ-রঞ্জনও বাস করতেন ওপারে। সেদিন বেলা একটার সময় মনিবের সঙ্গে কি-একটা ইংরেজী বাক্যের মাঝখানে 'অন দি' হবে, না 'টু দি' হবে এই নিয়ে তাঁর বেশ খানিকটা কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। প্রমোদরঞ্জন গ্র্যাজুয়েট। চাকুরীর খাতিরে ইংরেজী ভাষার এই অপমান তিনি সইতে পারলেন না, কোন মতে রাগ দমন ক'রে বললেন—স্কুলে আমি একবার 'টু দি' লিখেছিলাম। হেড মাষ্টার মশায় আমাকে কান ধ'রে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

রাগে আর অপমানে বলরাম চৌধুরীর গৌরবর্ণ মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠল। শুধু বললেন—হুঁ।

সেটা ছিল মাঘ মাস। চার দিকে বেশ কনকনে শীত পড়েছে। রাত্রি আটটার মধ্যেই লোকজন সব খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে যে যার লেপের মধ্যে গিয়ে ঢোকে, নিতান্ত জীবনমরণ প্রয়োজন না হ'লে আর সেখান থেকে বেরোয় না। রাত তখন বারটা। বলরাম চৌধুরী তাঁর আপিসে ব'সে বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল; খাতা থেকে মুখ তুলে তিনি ডাকলেন—হীরা সিং!

জমাদার হীরা সিং তৎক্ষণাৎ সেলাম ক'রে এসে দাঁড়াল। বলরাম বললেন—প্রাইভেট-সেক্রেটরী বাবুকো বোলাও।

—যো হুকুম। ব'লে হীরা সিং প্রস্থান করল।

শীতের এই গভীর রাত্রে মনিবের আহ্বান পেয়ে

প্রমোদরঞ্জন একটু চিন্তান্বিত হলেন। হয়তো হিসাবে কোন ভুল ধরা পড়েছে, কিংবা 'রায়-বাহাদুর' উপাধি আদায়ের নূতন কোন ফন্দী কর্ত্তার মাথায় খেলছে, ইংরেজীতে তারই খসড়া তৈরি করতে হবে। এই রকম পাঁচ-সাত ভাবতে ভাবতে তিনি নদী পার হয়ে বলরাম চৌধুরীর কক্ষে প্রবেশ করলেন।

—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার?

—হ্যাঁ। বলরাম মুখ না তুলেই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমার টেবিল থেকে কলমটা নীচে পড়ে গেছে—সেটা কুড়িয়ে দিন।

কলমটা তুলে দিয়ে প্রমোদরঞ্জন বললেন—কাগজ-কলম আনাব স্যার? দরকারী কিছু—

—না। তেমনি মুখ না তুলেই বলরাম বললেন—আমার কলমটা কুড়িয়ে দেবার জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনি যেতে পারেন এখন।

স্তম্ভিত ভাবে প্রমোদরঞ্জন শুধু একবার বলরাম চৌধুরীর মুখের দিকে চাইলেন। তার পর ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করলেন। শোনা যায়, পরদিন সকালেই তিনি তাঁর পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেছিলেন।

বলরাম চৌধুরীর পুত্র অবনীশ চৌধুরীর উপর ভার ছিল পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত সেই বিপুল সম্পত্তি ব্যয় করার, এবং সে-কাজ তিনি সুষ্ঠু ভাবেই সম্পাদন করেছিলেন। নগদ টাকা যা ছিল প্রথমে তা গেল, তার পর গেল ভূ-সম্পত্তি, তার পর গেল পৈতৃক ভবন, তার পর গেল স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার। শেষ বয়সে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হয়ে স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে সেই গ্রামেরই অন্য একটি বাড়ীতে এসে উঠলেন, এবং সম্মান ও সম্পত্তির শোকে পাগল হয়ে গেলেন। তার পর এই ভাবে বছর-খানেক কাটবার পর এক দিন তিনি সস্ত্রীক পরলোকে প্রস্থান করলেন। ইহলোকে রইল তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ ও একটি নাতি। এই ভাবে জমিদার যদুনাথের রক্তধারার উত্তরাধিকারীর পৃথিবীতে অস্তিত্ব রইল।

সেই বংশধরই আমাদের গল্পের নায়ক অবিনাশ। সে গাইতে জানে, বাজাতে জানে, সব রকম কুস্তি-কসরতেই সে সুদক্ষ। দারিদ্র্যভার-নিপীড়িত হয়েও তার মেজাজী মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নি। স্ত্রী বিভা এ সম্বন্ধে তাকে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু কোনই ফল হয় নি। ইতিমধ্যে সংসারে পরিবার-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম ছেলের পর জন্মেছে আরও দুটি কন্যা।

স্থানীয় স্কুলে অবিনাশ মাষ্টারি করে। স্কুলটি তারই পিতামহ বলরাম চৌধুরী কর্ত্তৃক স্থাপিত। কিন্তু বর্ত্তমানে তার ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন গ্রামের নূতন জমিদার হরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। বলা বাহুল্য, ইনি স্বর্গীয় যদুনাথ চৌধুরীর বিশ্বস্ত নায়েব স্বর্গীয় রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর প্রপৌত্র। দেবীপুরের সমস্ত জমিদারী ইনিই কিনে নিয়েছেন, এবং অবনীশ চৌধুরীর পুত্র অবিনাশ চৌধুরীকে অন্নাভাবে কষ্ট পেতে দেখে করুণাপরবশ হয়ে স্থানীয় স্কুলে তাকে কুড়ি টাকা বেতনে একটা মাষ্টারি দিয়েছেন।

অবিনাশ কিন্তু সে-সব গ্রাহ্যই করে না। সাংসারিক কোন প্রয়োজনই তাকে দিয়ে সাধিত হয় না। মাস গেলে কুড়িটি টাকা এনে সে বিভার হাতে তুলে দেয়, তার পর সারা মাস গান-বাজনা, তাস, পাশা, থিয়েটার প্রভৃতি নিয়ে হৈ হৈ ক'রে বেড়ায়।

শীতের সকাল। অবিনাশ মুখ-হাত ধুয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসেছে। এমন সময় একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে এসে রৌদ্রে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণকে বিদেশী দেখে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাবেন?

—আমি যাব বাবা জমিদার বলরাম চৌধুরীর বাড়ী। শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছি বাবা।

—বলরাম চৌধুরীর বাড়ী! একটা আকস্মিক আনন্দ-বেদনায় অবিনাশের সমস্ত অন্তর দুলে উঠল। বলরাম চৌধুরীর নামে আজও আসে প্রার্থীর দল সাহায্য ভিক্ষা করতে? কোথায় গেল তাদের সে ঐশ্বর্য্য, সম্মান আর প্রতিপত্তি? এত বড় সুনাম আর সম্ভ্রম কোন্ মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে আজ? মাত্র তিন পুরুষ,—মাত্র তিন পুরুষের ব্যবধানে প্রাসাদ থেকে আজ সে নেমে এসেছে পথের ধূলায়। প্রার্থী এসেছে গ্রামে তারই পিতামহের

দরার দুয়ারে হাত পাততে,—আর বলরাম চৌধুরীর পৌত্র অবিনাশ চৌধুরী চুপ ক'রে স্থাণুর মত সেদিকে চেয়ে ব'সে আছে! আশ্চর্য্য! পৃথিবীতে এও আজ সম্ভব হ'ল! দূরে ধ্বংসোন্মুখ পরিত্যক্ত জমিদার-ভবনের উচ্চ চূড়ার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে অবিনাশ বলল—বসুন!

—না আমি বসব না বাবা। তুমি শুধু আমাকে বলরাম চৌধুরীর বাড়ীর রাস্তাটা দেখিয়ে দাও। অনেক দূর থেকে আসছি বাবা।

—তাঁরা কেউ নেই। মরিয়ার মত অবিনাশ উচ্চারণ করল।

—নেই! ব্রাহ্মণ যেন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন।—কোথায় গেছেন তাঁরা?

—মরে গেছেন।

—গত হয়েছেন? ও! তা তাঁর বংশধর—

—বংশধর নেই। তিনি নির্ব্বংশ হ'য়ে মরেছেন।

—হায় হায়, এমন পুণ্য বংশও পৃথিবী থেকে লোপ পায়? একেই বলে কলিকাল। সৎ কাজের যাঁদের অন্ত নেই—কোন মহাপাপে তাঁদের এ দশা হ'ল কে জানে! নারায়ণ!—ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগলেন।

—শুনুন। অবিনাশ ডাকল।

—বল বাবা।

—আপনি একটু বসুন—আমি আসছি এখুনি। এই ব'লে দ্রুতপদে ভিতরে চলে গেল। জমিদার যদুনাথ, বলরাম এবং অবনীশ চৌধুরীর রক্তধারা আজ তার দেহের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে। দেবীপুরের চৌধুরী-বাড়ীতে প্রার্থনা নিয়ে এসে কোনও প্রার্থীই আজ পর্য্যন্ত বিফলমনোরথ হয় নি, শুধু কি এই ব্রাহ্মণই ফিরে যাবে শূন্য হাতে? তা হয় না, চৌধুরী-বংশের অবিনাশ চৌধুরী এখনও বেঁচে আছে,—তা হয় না, ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পিতৃপুরুষের হয়ে সে-ই আজ পূরণ করবে।

বিভা তখন রান্নাঘরে স্বামীর জন্য চা আর ছেলেমেয়েদের জন্য দুধ জ্বাল দেবার ব্যবস্থা করছিল। সে যা দেখতে পায় এমন ভাবে অবিনাশ ঘরে ঢুকে তার পিতামহের আমলের একখানি জীর্ণ শাল বাক্স থেকে বের ক'রে আনল—তার পর নিজের আলোয়ানের তলায় লুকিয়ে শালখানিকে বাইরে নিয়ে এসে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে বলল—এই নিন।

—তুমি দিচ্ছ কেন বাবা? ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বললেন।

—হ্যাঁ, আমাকেই দিতে হবে—আপনি বুঝবেন না, মানে আমারই দেওয়া উচিত। আপনি ব্রাহ্মণ, শীতে কষ্ট পাচ্ছেন, আপনাকে দেব না তো কাকে দেব! নিয়ে যান।

—বেঁচে থাক বাবা। ধনে পুত্রে তোমার লক্ষ্মীলাভ হোক্। আরও কতকগুলি আশীর্ব্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করতে করতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনন্দিত মুখে প্রস্থান করলেন। তাঁর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজের মনেই অবিনাশ বলল—যদুনাথ নাকি শীত নিবারণের জন্য শেয়ালকে শাল দিয়েছিলেন—আর আজ আমি দিলাম মানুষকে। জমিদার যদুনাথের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে দানটা খুব মন্দ হয় নি কিন্তু। অবিনাশ হাসতে লাগল। কিন্তু সে-হাসি দেখলে কান্না পায়।

পাড়ার ক্লাবে 'চন্দ্রগুপ্ত' রিহারস্তাল দিয়ে অবিনাশ যখন বাড়ী ফিরল, রাত্রি তখন এগারটা বেজে গেছে। 'চন্দ্রগুপ্তে' অবিনাশের চন্দ্রগুপ্তেরই ভূমিকা। কারণ তার মত অমন লম্বা-চওড়া সুন্দর চেহারা গ্রামে নাকি আর একটিও নেই। অতএব রাজার ছেলে তাকে যেমন মানাবে, এমন আর কাউকেই নয়।

শীতকালের রাত্রি এগারটা গভীর রাত্রি। বাড়ী ফিরে অবিনাশ দেখলে রান্নাঘরের দাওয়ার সামনে এক হাঁড়ি আগুন নিয়ে বিভা চুপ ক'রে ব'সে আছে। অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ার জন্য মনে মনে অবিনাশ একটু লজ্জিত হ'ল, কিন্তু সেটা প্রকাশ না ক'রে মুখে বিভাকে বলল—তুমি শুধু শুধু জেগে আছ কেন বিভা?

—তোমাকে খেতে দিতে হবে না? মৃদুস্বরে বিভা বলল।

—আমাকে খেতে দেবার জন্য রোজ রোজ এ-রকম

রাত্তির জাগা ঠিক নয়। হঠাৎ যদি একটা অসুখ-বিসুখ—। আমার ভাতগুলো ঘরের মধ্যে ঢাকা দিয়ে রেখো—আমি খেয়ে নেব।

—না তা হয় না। খাবে চল।

খাওয়া-দাওয়ার পর অবিনাশ শোবার ঘরে এসে দেখলে তিনটি ছেলেমেয়ে মেঝের বিছানাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমচ্ছে। পাশেই তাদের মায়ের শোবার জায়গা। খাটে পাঁচ জনের স্থান হবে না ব'লে বিভা এই ব্যবস্থা করেছে। খাটে একলা অবিনাশ শোয়, আর নীচে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিভা। হঠাৎ অবিনাশের চোখ পড়ল, একখানি মাত্র জীর্ণ লেপ ওরা চার জনে গায়ে দিয়ে টানাটানি করছে, এবং তিনটি ছেলেমেয়েকে সে-লেপ দিয়ে ঢাকা দেবার পর বিভার জন্য অবশিষ্ট একটু অংশও থাকে না। অবিনাশের মন খারাপ হয়ে গেল।

—আর লেপ নেই নাকি?

—না।

—কালই তা হ'লে লেপ একটা তৈরি করতে হয়!

—আচ্ছা। সামান্য একটু ম্লান হেসে বিভা জবাব দিলে।

—হাসলে যে।

—এমনি।

—না, বলতে হবে। হাসলে কেন বল? আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?

—না। আবার বিভা ম্লান হেসে বললে।—কিন্তু তোমার মত পাগল আমি আর দুটি দেখি নি। দু-বেলা খেতেই আমাদের কষ্ট হয়, আর তুমি কিনা সেই পয়সা দিয়ে করাবে লেপ! নাও, এখন শুয়ে পড় আলো নিবিয়ে দিয়ে। আর তা ছাড়া শীত তো গেল ব'লে। এখন নুতন ক'রে লেপ তৈরি ক'রে মিছিমিছি পয়সা নষ্ট ক'রে লাভ কি? এতেই এই কটা দিন চালিয়ে নেব। তুমি ঘুমও।

আলো নিবিয়ে দিয়ে অবিনাশ শুয়ে পড়ল। একটা কথা বিভা ঠিক বলেছে, শীত চিরকাল থাকে না। কিছুই চিরকাল থাকে না। যদুনাথ চিরকাল থাকেন নি, বলরাম-অবনীশ চিরকাল থাকেন নি—অবিনাশও চিরকাল থাকবে না। সব হয়ে যাবে মিথ্যে, সব হয়ে যাবে গল্প-কথা।

একখানা লেপ তৈরি করবার তার পয়সা নেই, অথচ তারই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন এই গ্রামেরই বুকে! কে বিশ্বাস করবে এই আরব্য-উপন্যাস? দু-পুরুষের অপব্যয়ের এই অপূর্ব্ব পরিণাম স্বচক্ষে দেখলেও তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না!

আশ্চর্য্য সহনশীলতা বটে বিভার। এত বড় দারিদ্র্যের গুরুভার সে বসুন্ধরার মত বুক পেতে বহন করছে। মুখে একটি কথা নেই, অভাবে অভিযোগ নেই, অনাহারে কান্না নেই। বিভা হচ্ছে অবিনাশের সংসারের হৃৎপিণ্ড। বিভা চলছে তাই অবিনাশ চলছে, বিভা আছে তাই অবিনাশের ছেলেপিলে আছে।

দারিদ্র্যের কথা ভুলে গিয়ে বিভার কথাই অবিনাশ ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে বিভার প্রতি একটি পরম মমতায় তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অনেক দিন পরে আজ অবিনাশের ইচ্ছা হ'ল, বিভাকে একটু আদর করতে। আলো জেলে অবিনাশ বিছানায় উঠে ব'সে বিভার দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেল। বিভার গায়ে একটুও লেপ নেই, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট মেয়েটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছে। মুখে ফুটে উঠেছে একটি পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি। দারিদ্র্য-লক্ষ্মীর কাছে শীতের তীব্রতাও আজ হার মেনেছে।

অবিনাশ ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে আলনা থেকে নিজের আলোয়ানখানা নিয়ে দু-ভাঁজ ক'রে সেটি পরম যত্নে বিভার গায়ে সন্তর্পণে ঢাকা দিয়ে দিলে।

কিন্তু প্রত্যেক দিন রাত ক'রে রিহার্স্যাল দিয়ে বাড়ী ফেরা অবিনাশের সহ্য হ'ল না। একে তো সেই কনকনে শীত, তার উপর গায়ে থাকে না যথোপযুক্ত গরম জামা, অবিনাশ অসুখে পড়ল।

সেদিন বাড়ী ফিরে অবিনাশ বিভাকে বললে—আমি কিছু খাব না বিভা, আমার বোধ হয় জ্বর হয়েছে।

জ—্ব! এক মুহূর্তে বিভা যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। কপালে হাত দিয়ে স্বামীর গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করল, তার পর ক্লান্ত কণ্ঠে বলল—শুয়ে পড়, জ্বরই হয়েছে।

অবিনাশ শয্যাগ্রহণ করল। সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে, মাথার যন্ত্রণাও খুব। গত দশ বৎসরের মধ্যে অবিনাশের মাথাটি পর্য্যন্ত ধরে নি। তাই অসুখ যখন একবার হয়েছে তখন বেশী দিন না ভোগায়! তাহলে ছেলেমেয়েগুলো আর বিভা না খেয়ে মরে যাবে।

বিভা ম্লান মুখে পাশের ঘরে গিয়ে বাক্স থেকে পাঁচটি পয়সা বার ক'রে স্বামীর কপালে ছুঁইয়ে নিয়ে সেটি লক্ষীর ঝাঁপির মধ্যে রেখে দিলে। তার পর হাত দুটি জোড় ক'রে মনে মনে বললে—মা, জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় করি নি। আমার স্বামীর জ্বর ভাল ক'রে দাও। তোমাকে পূজো ক'রে আমরা অনাহারে শুকিয়ে মরব—এ যেন না হয়। মাগো দয়া কর। টপ্ টপ্ ক'রে বিভার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কিন্তু দেবীর দয়া অত সহজে মেলে না। চোখের জলের প্রতি দয়া করতে গেলে তাঁর সৃষ্টিকার্য্য চলে না। এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করবার তাঁর সময় নেই। কত রাজা, কত মহারাজা, কত নবাব, আমীর, ওমরাহ্, কত হিটলার, কত মুসোলিনীকে তাঁর দয়া করতে হয়। দেবীপুরের নগণ্য অবিনাশ চৌধুরীর স্ত্রী নগণ্যতমা বিভাকে দয়া করতে হ'লে দেবীর আভিজাত্য নষ্ট হবে যে!

তাই দেবীর দয়া হ'ল না, তিন দিনের মধ্যে অবিনাশের অসুখ বাঁকা পথ ধরল। বিকারের ঘোরে অবিনাশ ক্রমাগত পাইক ডাকতে লাগল, বরকন্দাজ ডাকতে লাগল, নায়েব গোমস্তা খাজাঞ্চী প্রভৃতিকে তিরস্কার করল। তিন-চারটে মৌজার খাজনা মাপ ক'রে দিলে—এবং হুকুম দিলে—তার রাজ্যে যত দরিদ্র ভিক্ষুক আছে—সবাইকে একখানা ক'রে লেপ তৈরি করে দিতে।... ডাক্তার এসে বললে ডবল নিউমোনিয়া।

সুদীর্ঘ দেড় মাস পরে—

এই দেড় মাসের ইতিহাসে নূতন কোন কথা নেই। কেবলমাত্র মৃত্যু-দেবতার সঙ্গে মর্ত্ত্য মানবীর সুকঠোর সংগ্রাম, ... রাত্রিজাগরণ, ... দারিদ্র্য...অনশন...ক্লান্তি... ও দুশ্চিন্তার কাহিনী। অবশেষে বিধাতার পরাজয় ঘটল। বিভার ঐকান্তিকতার কাছে হয়তো লজ্জিত হয়ে তিনি এ যাত্রা অবিনাশকে নিষ্কৃতি দিলেন। অবিনাশের জ্বর ছাড়ল, ধীরে ধীরে জীবনের আলো তার পাণ্ডুর মুখের উপর ফুটে উঠতে লাগল। প্রথম যেদিন সম্পূর্ণরূপে তার জ্ঞান ফিরে এল, পাশে চেয়ে দেখলে একটি মেয়ে দু-খানি ব্যাকুল চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে ব'সে আছে। অবিনাশ তাকে চিনতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কে?

—আমি বিভ'। উত্তর এল।

বিভা! নামটা যেন পূর্ব্বজন্মের পর থেকে তার স্মৃতির দুয়ারে এসে ধাক্কা মারল। সেই বিভা আজ এই হয়েছে? মলিন, শীর্ণ ক্লান্ত! প্রচণ্ড ঝড় খাওয়া বনস্পতির মত আলুথালু ছন্দহীন, শিথিলবৃন্ত! চোখের নীচে পড়েছে গভীর কালিমা-রেখা, গালের হাড় দুটি সুস্পষ্ট হয়ে জেগে উঠেছে, চুলগুলি রুক্ষ! সেই বিভা।

—আমি তাহলে বেঁচে উঠলাম বিভা? চোখ বুজে ক্লান্ত কণ্ঠে অবিনাশ উচ্চারণ করল।

—হ্যাঁ, ভগবান আমার মুখ রেখেছেন। এই ব'লে বিভা হাতজোড় ক'রে উপর দিকে চেয়ে নমস্কার করলে। দেখা গেল, তার কোটরগত চোখ দুটির কোল বেয়ে শীর্ণ দুটি জলের ধারা গালের উপর দিয়ে বুকের দিকে নামছে...

আজ অবিনাশের অন্নপথ্য। সে এরই মধ্যে অনেকটা সেরে উঠেছে। আস্তে আস্তে দু-এক পা হাঁটতেও পারে। ডাক্তার আজ ব'লে গেছেন ভাত দিতে।

বেলা দশটার সময় পরিপাটি ক'রে একখানি কলার পাতায় ভাত বেড়ে, ভাতের মাঝখানে গর্ত্ত কেটে একটুখানি মাগুর মাছ ও কাঁচকলার ঝোল ঢেলে দিয়ে, বিভা স্বামীকে ধরে নিয়ে এসে আসনে বসিয়ে দিলে। কলার পাতায় ভাত দিতে দেখে এত দিন পরে অবিনাশের যেন

পূর্ণ চৈতন্য ফিরে এল। খেতে ব'সে আজ সে প্রথম বিভার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলে। পরনে একটি তালি-দেওয়া শতছিন্ন ময়লা কাপড়, দু-হাতে দুটি শাঁখা, মাথায় জল জল করছে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথের সিঁদুর আজ আরও বেশী চওড়া ও গাঢ়। খেতে খেতে অবিনাশ ঘরের চার দিকে একবার ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে নিল। বাক্স ও বাসন-কোশনের চিহ্নমাত্র নেই। বিভা সামনে ব'সে একখানা হাত-পাখা দিয়ে স্বামীর গরম ভাতে বাতাস দিচ্ছে। অবিনাশ এইবার স্পষ্ট বুঝতে পারলে—কিসের দামে বিভা ভগবানের কাছ থেকে তার রোগমুক্তি ক্রয় করেছে। তার বুক ঠেলে একটা গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

—বিভা! অবিনাশ ডাকলে।

—কি গো!

—সব গেছে, না?

—কিছু যায় নি, সব আছে। তুমি খাও।

—ছেলেমেয়েগুলো! আছে তো?

—শোন কথা! থাকবে না তো যাবে কোথায়?

—হুঁ। অবিনাশ অন্নপথ্য শেষ করল।

খাওয়া শেষ ক'রে অবিনাশ ধীরপদে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। রৌদ্রকরোজ্জ্বলা সুন্দরী পৃথিবী, কেউ এখানে মরতে চায় না, সবাই বাঁচতে চায়। অনাহারে, অনিদ্রায়, দুঃখদগ্ধ হয়েও এখানে সবাই চায় এর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ উপভোগ করতে!

বাড়ীর মধ্যে ছেলেমেয়েগুলো খিদের চীৎকার করছে, আর মায়ের পেছনে পেছনে ঘুরছে। আশ্চর্য্য! ওরা এখনও বেঁচে আছে। এত বড় দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও ওরা বেঁচে আছে। বিধাতা পরাজিত হয়েছেন ওদের প্রাণশক্তির কাছে! হবে না? জমিদার যদুনাথ চৌধুরীর বংশধর ওরা,—ওদের মারে এমন সাধ্য কার?

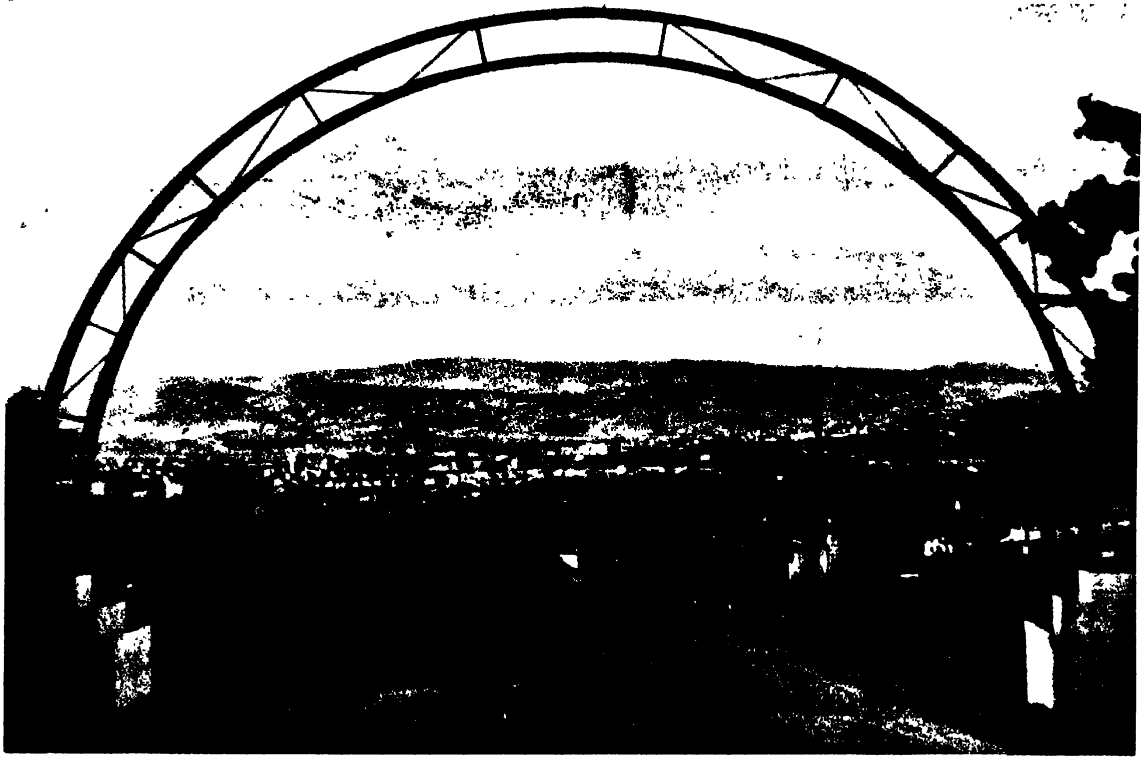
নূতন জমিদার হরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর ছেলের অন্নপ্রাশন—তারই সানাই বাজছে। অবিনাশ আকাশের দিকে চাইলে—রৌদ্রস্নাত নীল আকাশ অপার আনন্দে হাসছে।

আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অবিনাশ যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে সে চেঁচিয়ে উঠল—তুমি আমায় মারতে পারবে না। যত ষড়যন্ত্রই তুমি কর না কেন, যত ব্যাধি, যত দুঃখ, যত দারিদ্র্য, যত আঘাতই তুমি দাও, সকলকে তুচ্ছ ক'রে চিরকাল আমরা বেঁচে থাকব—আমরা অবিনশ্বর। স্বার্থপর ভগবান। এই আমি তোমাকে মারলাম—তোমার সাধ্য থাকে তুমি আমায় মার।

ঘুষি-পাকানো ডান হাতখানা অসহ্য রাগে অবিনাশ ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিল। জানলায় বাধা পেয়ে তৎক্ষণাৎ সে হাত নীচে নেমে পড়ল, এবং একটা পেরেকে লেগে বাঁয়ের আঙুলটা অনেকখানি ছড়ে গেল…

আঙুলটা দিয়ে রক্ত পড়ছে। এই দুর্ব্বল শরীরে রক্তপাতটা ভাল নয়। বিভাকে ডাকতে হবে। বিভা এসে একটা জলপটি দিয়ে দিক্…





আঙ্কারায় কামাল পাশার নামাঙ্কিত রাজপথ—"বুলভার গাজী"



আঙ্কারায় জাতিতত্ত্ব-মন্দির—সম্মুখে কামালের অশ্বারোহী মূর্তি



চীনের বীরত্বব্যঞ্জক, ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়ের, প্রচার-চিত্র বহন করিয়া, দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য চীনের তরুণ দেশ-সেবক ও -সেবিকাগণ চীনের গ্রামে নগরে পরিভ্রমণ করিতেছেন।



চীনের বীরাঙ্গনা। চীনের সমর-শিক্ষাশিবিরগুলিতে তরুণীরাও 'গেরিলা'-যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিতেছেন এবং সামরিক জীবনের সকল দুঃখক্লেশ সানন্দে সহ করিতেছেন।



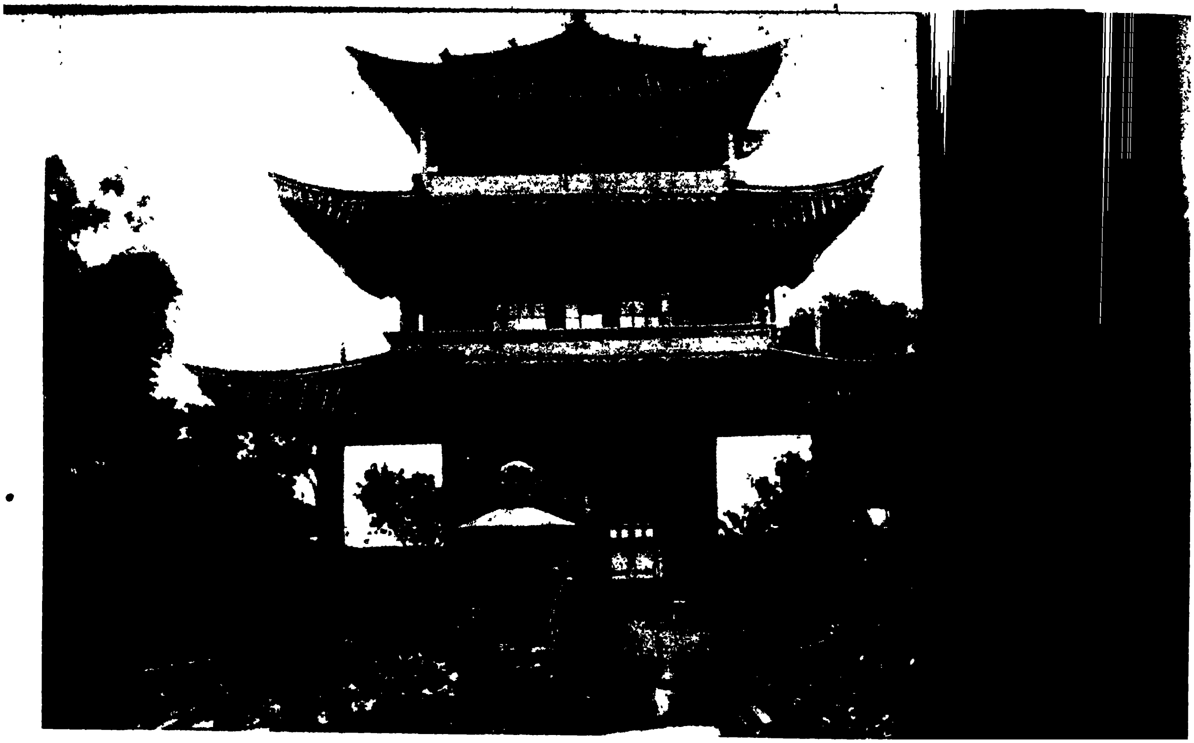
চীন শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে কৃতসংকল্প। চীনের কৃষকেরা অস্ত্রশস্ত্রহীন তবু তাহারাও এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। চিত্রে দেখা যাইতেছে, তাহারা আকাশপথে বোমার আক্রমণ লক্ষ্য করিতেছে।



চীনের য়ুনান প্রদেশের রাজধানী য়ুনান-ফু—ফরাসী ইন্দোচীনের সহিত যোগসূত্র রেলপথের টার্মিনস্



য়ুনান প্রদেশের একটি হ্রদ



য়ুনান-ফুর একটি মন্দির



য়ুনান-ফুর প্রাচীন কনফুশীর মন্দির—বর্ত্তমানে মিউজিয়ম ও বিদ্যালয়

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যার পরে লবটুলিয়ায় নূতন বস্তিগুলি দেখিতে বেশ দেখায়। কুয়াশা হইয়াছে বলিয়া জ্যোৎস্না একটু অস্পষ্ট, বিস্তীর্ণ প্রান্তরব্যাপী কৃষিক্ষেত্র, দূরে দূরে দু-পাঁচটা আলো জ্বলিতেছে বিভিন্ন বস্তিতে। কত লোক, কত পরিবার অন্নের সংস্থান করিতে আসিয়াছে আমাদের মহালে—বন কাটিয়া গ্রাম বসাইয়াছে, চাষ আরম্ভ করিয়াছে। আমি সব বস্তির নামও জানি না, সকলকে চিনিও না। কুয়াশাবৃত জ্যোৎস্নালোকে এখানে ওখানে দূরে নিকটে ছড়ানো বস্তিগুলি কেমন রহস্যময় দেখাইতেছে! যে-সব লোক এই সব বস্তিতে বাস করে, তাহাদের জীবনও আমার কাছে এই কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মতই রহস্যাবৃত। ইহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি—জীবন সম্বন্ধে ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী, ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী আমার বড় অদ্ভুত লাগে।

প্রথম ধরা যাক্‌ ইহাদের খাদ্যের কথা। আমাদের মহালের জমিতে বছরে তিনটি খাদ্যশস্য জন্মায়—ভাদ্র মাসে মকাই, পৌষ মাসে কলাই এবং বৈশাখ মাসে গম। মকাই খুব বেশী হয় না, কারণ ইহার উপযুক্ত জমি বেশী নাই। কলাই ও গম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, কলাই বেশী, গম তাহার অর্দ্ধেক। সুতরাং লোকের প্রধান খাদ্য কলাইয়ের ছাতু।

ধান একেবারেই হয় না—ধানের উপযুক্ত নাবাল জমি নাই। এ অঞ্চলের কোথাও—এমন কি কড়ারী জমিতে কিংবা গবর্ণমেণ্ট খাসমহলেও ধান হয় না। ভাত জিনিষটা সুতরাং এখানকার লোকে কালেভদ্রে খাইতে পায়—ভাত খাওয়াটা সখের বা বিলাসিতার ব্যাপার বলিয়া গণ্য। দু-চার জন খাদ্যবিলাসী লোক গম বা কলাই বিক্রয় করিয়া ধান কিনিয়া আনে বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

তার পর ধরা যাক্‌ ইহাদের বাসগৃহের কথা। এই যে আমাদের মহালের দশ হাজার বিঘা জমিতে অগণ্য গ্রাম বসিয়াছে—সব গৃহস্থের বাড়ীই জঙ্গলের কাশ-ছাওয়া, কাশ-ডাঁটার বেড়া, কেহ কেহ তাহার উপর মাটি লেপিয়াছে, কেহ কেহ তাহা করে নাই। এদেশে বাঁশগাছ আদৌ নাই, সুতরাং বনের গাছের বিশেষ করিয়া কেঁদ ও পিয়াল ডালের বাতা, খুঁটী ও আড়া দিয়াছে ঘরে। পাট বা নারিকেলের দড়ির ব্যবহার নাই। মুঞ্জ ঘাসের দড়ি নিজেরাই পাকাইয়া তৈয়ারী করিয়া লয়—সব কাজেই মুঞ্জের দড়ির চলন।

ধর্ম্মের কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। ইহারা যদিও হিন্দু, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ইহারা হনুমানজীকে কি করিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে জানি না—প্রত্যেক বস্তিতে একটা উঁচু হনুমানজীর ধ্বজা থাকিবেই—এই ধ্বজার রীতিমত পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা হয়। রাম-সীতার কথা কচিৎ শোনা যায়, তাঁহাদের সেবকের গৌরব তাঁহাদের দেবত্বকে একটু বেশী আড়ালে ফেলিয়াছে। বিষ্ণু-শিব, দুর্গা-কালী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার প্রচার তত নাই—আদৌ আছে কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ আমাদের মহালে তো আমি দেখি নাই।

ভুলিয়া গিয়াছি, একজন শিবভক্ত দেখিয়াছি বটে। তার নাম দ্রোণ মাহাতো, জাতিতে গাঙোতা। কাছারিতে কোথা হইতে একটা শিলাখণ্ড কে আনিয়া আজ নাকি দশ-বারো বছর কাছারির হনুমানজীর ধ্বজার নীচে রাখিয়া দিয়াছে—সিপাহীরা মাঝে মাঝে পাথরখানাতে সিঁদুর মাখায়, এক ঘটি জলও কেউ কেউ দেয়। কিন্তু পাথরখানা বেশীর ভাগ অনাদৃত অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে।

কাছারির কিছু দূরে একটা নূতন বস্তি আজ মাস দুই গড়িয়া উঠিয়াছে—দ্রোণ মাহাতো সেখানে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। দ্রোণের বয়স সত্তরের বেশী ছাড়া কম নয়—প্রাচীন লোক বলিয়াই তাহার নাম দ্রোণ, আধুনিক কালের ছেলেছোকরা হইলে নাকি নাম হইত তোমন, লোথাই, মহারাজ ইত্যাদি। এসব বাবুগিরি নাম সেকালে বাপমায়ে রাখিতে লজ্জাবোধ করিত।

যাহা হউক, বৃদ্ধ দ্রোণ একবার কাছারি আসিয়া হনুমান-ধ্বজার নীচে পাথরখানা লক্ষ্য করিল। তার পর হইতে বৃদ্ধ কলবলিয়া নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া এক ঘটি জল প্রত্যহ আনিয়া নিয়মিতভাবে পাথরের উপরে ঢালিত ও সাত বার পরম ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তবে বাড়ী ফিরিত। যত দিন ছিলাম দ্রোণের শিবপূজা একদিনও বাদ যায় নাই।

দ্রোণকে বলিয়াছিলাম—কলবলিয়া তো এক ক্রোশ দূর, রোজ যাও সেখানে, তার চেয়ে ছোট কুণ্ডীর জল আনলেই পার—

দ্রোণ বলিল—মহাদেওজী স্রোতের জলে তুষ্ট থাকেন, বাবুজী। আমার জন্ম সার্থক যে ওঁকে রোজ জল দিয়ে স্নান করাতে পাই।

ভক্তও ভগবানকে গড়ে। দ্রোণ মাহাতোর শিবপূজার কাহিনী লোকের মুখে বিভিন্ন বস্তিতে ছড়াইয়া পড়িতেই মাঝে মাঝে দেখি দু-পাঁচজন শিবের পূজারী নরনারী যাতায়াত সুরু করিল। এ অঞ্চলে এক ধরণের সুগন্ধ ঘাস জঙ্গলে উৎপন্ন হয়, ঘাসের পাতা বা ডাঁটা হাতে লইয়া আঘ্রাণ লইলে চমৎকার সুবাস পাওয়া যায়। ঘাস যত শুকায়, গন্ধ তত তীব্র হয়। কে একজন সেই ঘাস আনিয়া শিবঠাকুরের চারিধারে রোপণ করিল। এক দিন মটুকনাথ পাণ্ডত আসিয়া বলিল—বাবুজী এক জন গাঙোতা কাছারির শিবের মাথায় জল ঢালে, এটা কি ভাল হচ্ছে?

বলিলাম—পণ্ডিতজী, সেই গাঙোতাই ওই ঠাকুরটিকে লোকসমাজে প্রচার করেছে এত দূর দেখতে পাচ্ছি। কই তুমিও তো ছিলে, একঘটি জল তো কোন দিন দিতে দেখি নি তোমার।

রাগের মাথায় খেই হারাইয়া মটুকনাথ বলিয়া বসিল—ও শিবই নয় বাবুজী। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করলে পূজো পাওয়ার যোগ্য হয় না। ও তো একখানা পাথরের নুড়ি।

—তবে আর বলছ কেন? পাথরের নুড়িতে জল দিলে তোমার আপত্তি কি? সেই হইতে দ্রোণ মাহাতো কাছারির শিবলিঙ্গের চার্টার্ড পূজারী হইয়া গেল।

কার্তিক মাসে ছট্‌ পরব এদেশের বড় উৎসব। বিভিন্ন টোলা হইতে মেয়েরা হলুদ-ছোপানো শাড়ী পরিয়া দলে দলে গান করিতে করিতে কলবলিয়া নদীতে ছট্‌ ভাসাইয়া চলিয়াছে। সারাদিন উৎসবের ধূম। সন্ধ্যার বস্তিগুলির কাছ দিয়া যাইতে যাইতে ছট্‌-পরবের পিঠে ভাজার ভরপুর গন্ধ পাওয়া যায়। কত রাত পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের হাসি-কলরব, মেয়েদের গান—যেখানে নীলগাইয়ের জেরা গভীর রাত্রে দৌড়িয়া যাইত, হায়েনার হাসি ও বাঘের কাশি (অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন বাঘে অবিকল মানুষের গলায় কাশির মত এক প্রকার শব্দ করে) শোনা যাইত—সেখানে আজ কলহাস্যমুখরিত, গীতিরবপূর্ণ উৎসবদীপ্ত এক বিস্তীর্ণ জনপদ।...

ছট্‌-পরবের সন্ধ্যায় বল্লুটোলায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। শুধু এই একটি টোলায় নয়—পনেরোটি বিভিন্ন টোলা হইতে ছট্‌-পরবের নিমন্ত্রণ পাইয়াছি কাছারিসুদ্ধ সকল আমলা।

বল্লুটোলার মোড়ল বল্লু মাহাতোর বাড়ী গেলাম প্রথমে।

বল্লু মাহাতোর বাড়ীর এক পাশে দেখি এখনও জঙ্গল কিছু কিছু আছে। বল্লু উঠানে এক ছেঁড়া সামিয়ানা টাঙাইয়াছে—তাহারই তলায় আমাদের আদর করিয়া বসাইল। টোলার সকল লোক ফর্সা ধুতি ও মেরজাই পরিয়া সেখানে ঘাসে-বোনা এক জাতীয় মাদুরের আসনে বসিয়া আছে। বলিলাম—খাইবার অনুরোধ রাখিতে পারিব না, কারণ অনেক স্থানে যাইতে হইবে।

বল্লু বলিল—একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে। মেয়েরা নইলে বড় ক্ষুণ্ণ হবে, আপনি পায়ের ধুলো দেবেন বলে ওরা বড় উৎসাহ ক'রে পিঠে তৈরি করেছে।

উপায় নাই। গোষ্ঠবাবু মুহুরী, আমি ও রাজু পাঁড়ে বসিয়া গেলাম। শালপাতায় কয়েকখানি আটা ও গুড়ের পিঠে আসিল—এক একখানি পিঠে এক ইঞ্চি পুরু ইটের মত শক্ত, ছুঁড়িয়া মারিলে মানুষ মরিয়া না গেলেও দস্তুর মত জখম হয়। অথচ প্রত্যেকখানা পিঠে ছাঁচে ফেলা চন্দ্রপুলির মত। বেশ লতাপাতা কাটা, ছাঁচে ফেলিবার পরে তবে ঘিয়ে ভাজা হইয়াছে।

অত যত্নে মেয়েদের হাতে তৈরি পিষ্টকের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না। আধখানা অতিকষ্টে খাইয়াছিলাম না মিষ্টি, না কোন স্বাদ। বুঝিলাম গাঙোতা মেয়েরা খাবারদাবার তৈরি করিতে জানে না। রাজু পাঁড়ে কিন্তু চার-পাঁচখানা সেই বড় বড় পিঠে দেখিতে দেখিতে খাইয়া ফেলিল—এবং আমাদের সামনে চক্ষুলজ্জা বশতঃই বোধ হয় আর চাহিতে পারিল না।

বস্তুটোলা হইতে গেলাম লোধাইটোলা। তারপর পর্ব্বতটোলা, ভীমদাসটোলা, আসরফিটোলা, লছমনিয়া টোলা। প্রত্যেক টোলায় নাচ-গান, হাসি-বাজনার ধূম। আজ সারারাত ইহারা ঘুমাইবে না। এ-বাড়ী ও-বাড়ী খাওয়াদাওয়া করিয়া নাচ-গান করিয়াই কাটাইয়া দিবে।

একটি ব্যাপার দেখিয়া আনন্দ হইল, মেয়েরা সব টোলাতেই যত্ন করিয়া নাকি খাবার তৈরি করিয়াছে আমাদের জন্য। ম্যানেজার বাবু নিমন্ত্রণে আসিবেন শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের ও যত্নের সহিত নিজেদের চরম রন্ধন-কৌশল প্রদর্শন করিয়া পিষ্টক গড়িয়াছে। মেয়েদের সহৃদয়তার জন্য মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলেও তাহাদের রন্ধন-বিদ্যার প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারিলাম না, ইহা আমার পক্ষে খুবই দুঃখের বিষয়। বস্তুটোলার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর পিষ্টকের সহিতও স্থানে স্থানে পরিচয় ঘটিল।

সব জায়গায় দেখি রঙীন শাড়ী পরা মেয়েরা কৌতূহল-পূর্ণ চোখে আড়াল হইতে ভোজনরত বাংগালী বাবুদের দিকে চাহিয়া আছে। রাজু পাঁড়ে কাহাকেও মনে কষ্ট দিল না—পিষ্টক ভক্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া রাজু পাঁড়ে ক্রমশঃ অসীমের দিকে চলিতে লাগিল দেখিয়া আমি গণনায় হাল ছাড়িয়া দিলাম—সুতরাং সে কয়খানা পিষ্টক খাইয়াছিল বলিতে পারিব না।

শুধু রাজু কেন—নিমন্ত্রিত গাঙোতাদের মধ্যে সেই ইটের মত কঠিন পিষ্টক এক একজন এক কুড়ি দেড় কুড়ি করিয়া খাইল—চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত যে সেই জিনিষ মানুষে অত খাইতে পারে।

নাঢ়াবইহারে ছনিয়া ও সুরতিয়াদের ওখানেও গেলাম।

সুরতিয়া আমায় দেখিয়া ছুটিয়া আসিল।

—বাবুজী, এত রাত ক'রে ফেললেন? আমি আর মা দু-জনে ব'সে আপনার জন্যে আলাদা ক'রে পিঠে গড়েছি—আমরা হাঁ ক'রে ব'সে আছি আর ভাবছি এত দেরী হচ্ছে কেন—আসুন বসুন।

নকছেদী সকলকে খাতির করিয়া বসাইল।

তুলসীকে খুব যত্ন করিয়া খাইবার আসন করিতে দেখিয়া মনে কষ্ট হইল। ইহাদের এখানে খাইবার অবস্থা কি আর আছে? তুলসী একখানা শাল পাতায় পনেরো-ষোলখানা পিঠে দিয়াছে—শুধু পিঠে নয়, তার সঙ্গে সব জায়গায় কিছু না কিছু ফলমূল দিয়াছিল—এখানেও দিয়াছে, কলা, কিস্‌মিস্‌, গুড়ি অর্থাৎ শুক্‌নো নারকেলের শাঁস, পানফল ইত্যাদি।

সুরতিয়াকে বলিলাম—তোমার মাকে বল পিঠে তুলে নিতে। এত কে খাবে?

সুরতিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ও কি বাবুজী, এই ক'খানা খাবেন না? আমি আর ছনিয়াই তো পনর-ষোল খানা ক'রে খেয়েছি। খান—আপনি খাবেন বলে ওর ভেতরে মা কিসমিস দিয়েছে, দুধ দিয়েছে—ভাল আটা এনেছে বাবা ভীমদাসটোলা থেকে—

খাইব না বলিয়া ভাল করি নাই। সারা বছর এই বালক-বালিকা এ সব সুখাদ্যের মুখ দেখিতে পায় না। এদের কত কষ্টের, কত আশার জিনিস! ছেলেমানুষকে খুসি করিবার জন্য মরিয়া হইয়া দুইখানা পিষ্টক খাইয়া ফেলিলাম।

সুরতিয়াকে খুশি করিবার জন্য বলিলাম—চমৎকার

পিঠে। কিন্তু সব জায়গায় কিছু কিছু খেয়েছি বলে খেতে পারলুম না সুরতিয়া। আর একদিন এসে হবে এখন।

রাজু পাঁড়ের হাতে একটা ছোটখাটো বোঁচকা। সে প্রত্যেকের বাড়ী হইতে ছাঁদা বাঁধিয়াছে, এক একখানি পিষ্টকের ওজন বিবেচনা করিলে রাজুর বোঁচকার ওজন দশবারো সেরের কম তো কোন মতেই হইবে না।

দেখিলাম রাজু খুব খুসি। বলিল—এ পিঠে হঠাৎ নষ্ট হয় না হজুর, দু-তিন দিন আর আমায় রাঁধতে হবে না। পিঠে খেয়েই চলবে।

কাছারিতে পর দিন সকালে কুন্তা একখানি পিতলের থালা লইয়া আসিয়া আমার সামনে সসঙ্কোচে স্থাপন করিল। এক টুকরা ফর্সা নেকড়া দিয়া থালাখানা ঢাকা।

বলিলাম—ওতে কি কুন্তা?

কুন্তা সলজ্জ কণ্ঠে বলিল—ছট্-পরবের পিঠে বাবুজী। কাল রাত্রে দু-বার নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছি।

বলিলাম—কাল অনেক রাত্রে ফিরেছি, ছট্-পরবের নেমন্তন্ন রাখতে বেরিয়েছিলাম। আচ্ছা রেখে যাও, খাব এখন।

ঢাকা খুলিয়া দেখি, থালায় কয়েকখানি পিষ্টক, কিছু চিনি, দুটি কলা, এক খণ্ড ঝুনা নারিকেল, একটা বড় কলম্বা লেবু।

বলিলাম—বাঃ, বেশ পিঠে দেখছি!

কুন্তা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে সসঙ্কোচে বলিল—বাবুজী, সবগুলো মেহেরবান করে খাবেন। আপনি খাবেন ব'লে আলাদা ক'রে তৈরি করেছি। তবুও আপনাকে গরম গরম খাওয়াতে পারলাম না, বড় দুঃখ রইল।

—কিছু হয় নি তাতে, কুন্তা। আমি সবগুলো খাব। দেখতে বড় চমৎকার দেখাচ্ছে।

কুন্তা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

একদিন মুনেশ্বর সিং সিপাহী আসিয়া বলিল—হজুর, ওই বনের মধ্যে গাছের নীচে একটা লোক ছেঁড়া কাপড় পেতে শুয়ে আছে—লোকজনে তাকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না—ঢিল ছুঁড়ে মারে, আপনি হুকুম করেন তো তাকে নিয়ে আসি।

কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। বৈকাল বেলা, সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই, শীত তেমন না হইলেও কার্ত্তিক মাস, রাত্রে যথেষ্ট শিশির পড়ে, শেষ রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা। এ-অবস্থায় একটা লোক বনের মধ্যে গাছের তলায় আশ্রয় লইয়াছে কেন, লোকে তাহাকে ঢিল ছুঁড়িয়াই বা মারে কেন বুঝিতে পারিলাম না।

গিয়া দেখি গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের ওদিকে (আজ প্রায় ত্রিশ বছর আগে গ্র্যাণ্ট সাহেব আমীন লবটুলিয়ার বন্য মহাল জরীপ করিতে আসিয়া এই বটতলায় তাঁবু ফেলেন, সেই হইতেই গাছটির এই নাম চলিয়া আসিতেছে) একটা বনঝোপে একটা অর্জ্জুন গাছের তলায় একটা লোক ছেঁড়া ময়লা নেকড়াকানি পাতিয়া শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া আছে। ঝোপের অন্ধকারে লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে না পাইয়া বলিলাম—কে ওখানে? বাড়ী কোথায়? বের হয়ে এস—

লোকটি বাহির হইয়া আসিল—অনেকটা হামাগুড়ি দিয়া, অতি ধীরে ধীরে—বয়স পঞ্চাশের উপর, জীর্ণশীর্ণ চেহারা, মলিন ছেঁড়া কাপড় ও মেরজাই গায়ে,—যতক্ষণ সে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল, কি এক রকম অদ্ভুত, অসহায় ভাব, শিকারীর তাড়া-খাওয়া পশুর মত ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়াছিল।

ঝোপের অন্ধকার হইতে দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসিলে দেখিলাম তাহার বাম হাতে ও বাম পায়ে ভীষণ ক্ষত। বোধ হয় সেইজন্য সে একবার বসিলে বা শুইলে হঠাৎ আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। তাহার চোখের সে অসহায়, ভয়ার্ত্ত বলির পশুর মত দৃষ্টি দেখিয়া বড় কষ্ট হইল।

মুনেশ্বর সিং বলিল—হজুর, ওর ওই ঘায়ের জন্যেই কেউ ওকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না—জল পর্য্যন্ত চাইলে দেয় না। ঢিল মারে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়—

বোঝা গেল তাই এ লোকটা বনের পশুর মত বনঝোপের মধ্যেই আশ্রয় লইয়াছে এই হেমন্তের শিশিরার্দ্র রাত্রে।

বলিলাম—তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

লোকটা আমায় দেখিয়া ভয়ে কেমন হইয়া গিয়াছে—

ওর চোখে রোগকাতর ও ভীত দৃষ্টি। তা ছাড়া আমার পিছনে লাঠি-হাতে মুনেশ্বর সিং সিপাহী। বোধ হয় সে ভাবিল, সে যে বনে আশ্রয় লইয়াছে তাহাতেও আমাদের আপত্তি আছে—তাহাকে তাড়াইয়া দিতেই আমি সিপাহী সঙ্গে করিয়া সেখানে গিয়াছি।

বলিল—আমার নাম?...নাম হুজুর গিরধারীলাল, বাড়ী তিনটাঙা। পরক্ষণেই কেমন একটা অদ্ভুত সুরে—মিনতি, প্রার্থনা এবং বিকারের রোগীর অসংলগ্ন আবদারের সুর এই কয়টি মিলাইয়া এক ধরণের সুরে বলিল—একটু জল খাব—জল—

আমি ততক্ষণ লোকটাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। সেবার পৌষ মাসের মেলায় ইজারাদার ব্রহ্ম মাহাতোর তাঁবুতে সেই যে দেখিয়াছিলাম—সেই গিরধারীলাল। সেই ভীত দৃষ্টি, সেই নম্র মুখের ভাব—

দরিদ্র, নম্র, ভীরু লোকদেরই কি ভগবান জগতে এত বেশী করিয়া কষ্ট দেন! মুনেশ্বর সিংকে বলিলাম—কাছারি যাও—চার-পাঁচ জন লোক আর একটা চারপাই নিয়ে এস—

সে চলিয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে গিরধারীলাল? আমি তোমায় চিনি। তুমি আমায় চিনতে পার নি? সেই যে সেবার ব্রহ্ম মাহাতোর তাঁবুতে মেলার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—মনে নেই? কোন ভয় নেই—। কি হয়েছে তোমার?

গিরধারীলাল ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হাত ও পা নাড়িয়া দেখাইয়া বলিল—হুজুর, কেটে গিয়ে ঘা হয়। কিছুতেই সে ঘা সারে না। যে যা বলে তাই করি—ঘা ক্রমেই বাড়ে। ক্রমে সকলে বললে—তোর কুষ্ঠ হয়েছে। সেই জন্ত আজ চার-পাঁচ মাস এই রকম কষ্ট পাচ্ছি। বস্তির মধ্যে ঢুকতে দেয় না। ভিক্ষে করে কোনো রকমে চালাই। রাত্রে কোথাও জায়গা দেয় না—তাই বনের মধ্যে ঢুকে শুয়ে থাকব বলে—

—কোথায় যাচ্ছিলে এদিকে? এখানে কি ক'রে এলে?

গিরধারীলাল এরই মধ্যে হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। একটু দম লইয়া বলিল—পূর্ণিয়ায় হাসপাতালে যাচ্ছিলাম হুজুর—নইলে ঘা তো সারে না!

আশ্চর্য্য না হইয়া পারিলাম না। মানুষের কি আগ্রহ বাঁচিবার! গিরধারীলাল যেখানে থাকে, পূর্ণিয়া সেখান হইতে চল্লিশ মাইলের কম নয়—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের মত শ্বাপদসঙ্কুল আরণ্যভূমি সামনে—অতে অবশ হাত-পা লইয়া সে চলিয়াছে এই দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলের পথ ভাঙিয়া পূর্ণিয়ার হাসপাতালে!

চারপাই আসিল। সিপাহীদের বাসার কাছে একটা খালি ঘরে উহাকে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিলাম। সিপাহীরাও কুষ্ঠ বলিয়া একটু আপত্তি তুলিয়াছিল, পরে বুঝাইয়া দিতে তাহারা বুঝিল।

গিরধারীকে খুব ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া মনে হইল। অনেক দিন সে যেন পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। কিছু গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে সে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল।

সন্ধ্যার দিকে তাহার ঘরে গিয়া দেখি সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

পরদিন স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসক রাজু পাঁড়েকে ডাকাইলাম। রাজু গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীর নাড়ী দেখিল, ঘা দেখিল। রাজুকে বলিলাম—দেখ, তোমার দ্বারা হবে না পূর্ণিয়ায় পাঠিয়ে দেব?

রাজু আহত অভিমানের সুরে বলিল—আপনার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদ হুজুর, অনেক দিন এই কাজ করছি। পনর দিনের মধ্যে ঘা ভাল হয়ে যাবে।

গিরিধারীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেই ভাল করিতাম পরে বুঝিলাম। ঘায়ের জন্ত নহে, রাজু পাঁড়ের জড়ি বুটির গুণে পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই ঘায়ের চেহারা বদলাইয়া গেল—কিন্তু মুস্কিল বাধিল তাহার সেবাশুশ্রূষা লইয়া। তাহাকে কেহ ছুঁইতে চায় না, ঘায়ে ঔষধ লাগাইয়া দিতে চায় না, তাহার খাওয়া জলের ঘটিটা পর্য্যন্ত মাজিতে আপত্তি করে।

তাহার উপর বেচারীর হইল জর। খুব বেশী জর।

নিরুপায় হইয়া কুন্তাকে ডাকাইলাম। তাহাকে বলিলাম—তুমি বস্তি থেকে একজন গাঙোতার মেয়ে ডেকে দাও, পয়সা দেব—ওকে দেখাশুনো করতে হবে।

কুন্তা কিছুমাত্র না ভাবিয়া তখনই বলিল—আমি করব বাবুজী। পয়সা দিতে হবে না।

কুন্তা রাজপুতের স্ত্রী, সে গাঙোতা রোগীর সেবা করিবে কি করিয়া? ভাবিলাম আমার কথা সে বুঝিতে পারে নাই।

বলিলাম—ওর এঁটো বাসন মাজতে হবে, ওকে খাওয়াতে হবে—ও তো উঠতে পারে না। সে-সব তোমায় দিয়ে কি ক'রে হবে?

কুন্তা বলিল—আপনি হুকুম করলেই আমি সব করব। আমি রাজপুত কোথায় বাবুজী? আমার জাতভাই কেউ এত দিন আমায় কি দেখেছে? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আমার আবার জাত কি?

রাজু পাঁড়ের জড়ি বুটির গুণে ও কুন্তার সেবাশুশ্রূষায় মাসখানেকের মধ্যে গিরিধারীলাল চাঙ্গা হইয়া উঠিল। কুন্তা এজন্য দিতে গেলেও কিছু লইল না। গিরিধারীলালকে সে ইতিমধ্যে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিলাম। বলিল—আহা, বাবা বড় দুঃখী, বাবার সেবা করে আবার পয়সা নেব? ধরমরাজ মাথার উপর নেই?

জীবনে যে কয়টি সৎ কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি প্রধান সৎ কাজ নিরীহ ও নিঃস্ব গিরিধারীলালকে বিনা সেলামিতে কিছু জমি দিয়া নবটুলিয়াতে বাস করানো।

তাহার খুবড়িতে এক দিন গিয়াছিলাম।

নিজের বিঘা পাঁচেক জমি সে নিজের হাতেই পরিষ্কার করিয়া গম বুনিয়াছে। খুবড়ির চারি পাশে কতকগুলি গোঁড়ালেবুর চারা পুঁতিয়াছে।

—এত গোঁড়ালেবুর গাছ কি হবে গিরিধারীলাল?

—হুজুর, ওগুলো সরবতী নেবু। আমি বড় খেতে ভালবাসি। চিনি-মিছরি জোটে না আমাদের, তুরা গুড়ের সরবৎ করে ওই লেবুর রস দিয়ে খেতে ভারি তার!

দেখিলাম আশার আনন্দে গিরিধারীলালের নিরীহ চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—ভাল কলমের লেবু। এক-একটা হবে এক পোয়া। অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে, যদি কখনো জমি-জায়গা করতে পারি, তবে ভাল সরবতী লেবুর গাছ লাগাব। পরের দোরে লেবু চাইতে গিয়ে কত বার অপমান হয়েছি হুজুর। সে-দুঃখ আর রাখব না।

যে যা হইতে আনন্দ পায় জীবনে!

ক্রমশঃ

নিশীথে

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

একাকী ঘুমায়েছিনু হারায়ে চেতন,
আজিকে মধুর নিশা শুক্লা চতুর্দশী;
সহসা নিঃশব্দপদে কে তুমি এখন
দাঁড়ালে আমার কাছে অমর্ত্ত্য প্রেয়সী?
স্ফুরিত অধরে গেল আচম্বিতে থেমে
জীবনের যত বাণী, সন্ধ্যা-সীমন্তিনী
কেন গো পড়িলে ধরা মোর এই প্রেমে?
সকলি বিস্মৃত হই স্বপ্ন-নিবাসিনী!

নববধূটির মত নিকটে বসিলে,
সলজ্জ বঙ্কিম চোখে কি কটাক্ষ, মরি,
উঠিল স্পন্দিত হ'য়ে, অন্তরে ভরিলে
সহজ সুন্দর প্রেম স্মিত ছায়া-পরী;
ভাঙে স্বপ্ন, হেরি পাশে তুমি জেগেছিলে
মদির-নমিতনেত্রা ভুবন-সুন্দরী।

পঞ্চশস্য

জীব ও জড় জগতের মধ্যে সীমারেখা কোথায়?

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এই পর্য্যন্ত জড়ের শেষ এবং এখান হইতে জীবন আরম্ভ, জীব ও জড় জগতের মধ্যে এরূপ কোন সীমারেখা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, জীবন কি এবং তাহার সঙ্গে জড়ের সম্বন্ধই বা কিরূপ—এই সব বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই আলোচনায় উন্নত শ্রেণীর জীবকে বাদ দিয়া সর্ব্বনিম্নস্তরের সহজ ও সরল গঠনের জীবের বিষয়ই অনুসন্ধান করিতে হইবে। জীবন কি?—এ প্রশ্নের সত্য সত্যই কোন উত্তর দেওয়া চলে না, তথাপি জীবন-রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টার বিরাম নাই। জীবন কি? তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে?—এই জটিল সমস্যা সমাধানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবপঙ্ক ও তাহার কয়েকটি উপাদান সম্পর্কিত কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ ব্যতীত কেহই আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও আধুনিক যুগে এক সময়ে অজৈব পদার্থ হইতে অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় জীবের উৎপত্তি বা স্বতঃপ্রজনন মতবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে কোন কোন বিষয়ে এই মতবাদের সারবত্তা উপলব্ধ হইলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তথাকথিত স্বতঃপ্রজনন মতবাদের মূলে কোন সত্য নিহিত নাই। জীবন হইতেই জীবনের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, ইহাই চিরন্তন রীতি বা প্রাকৃতিক নিয়ম। সংসারে ইহার বিপরীত ঘটনা কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় নাই। অবশ্য স্বতঃপ্রজনন মতবাদই হউক বা জীবন হইতে জীবনের উৎপত্তিই হউক, কোন মতবাদের দ্বারাই জীবনের মূল রহস্য উদ্ঘাটনের কোন ইঙ্গিত মিলে নাই। এই সমস্যা সমাধানের উপায় অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রাণীদের মধ্যে বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় জীবনের অস্তিত্বজ্ঞাপক কতকগুলি পরিস্ফুট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এই লক্ষণ পরিস্ফুট নহে; কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা এতই অপরিস্ফুট যে বিশেষ জটিল পরীক্ষার সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনের অস্তিত্বই ধরিতে পারা যায় না। তজ্জন্য জৈব-তড়িৎশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আঘাত উত্তেজনায় জীব-শরীরে এক প্রকার তড়িৎশক্তির উন্মেষ ঘটে। ইহারই বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী হইতে কোন কিছুতে জীবনের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব জ্ঞাপক চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পরীক্ষার সাহায্যে জীবন কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে এবং কোথা হইতে অজৈবের আরম্ভ, তাহার একটা হদিস্ মিলিতে পারে। কিন্তু পরলোকগত আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের 'জৈব অজৈবের সাড়া' বিষয়ক যুগান্তকারী গবেষণার ফলে যে অপূর্ব্ব তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে শারীরতত্ত্ববিদ্ ও জীবতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকগণের প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। জীবের মধ্যেই জীবন থাকিতে পারে, অন্য কোথাও তাহা সম্ভব নহে—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা জীবের উপরেই (জীব শব্দে এস্থলে জীব, উদ্ভিদ, ডায়েটম প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ ধরিতে হইবে) জীবনের অস্তিত্বজ্ঞাপক এই জৈব-তাড়িতিক পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়া দেখিতেন। কিন্তু আচার্য্যদেব এক অসমসাহসিক পরীক্ষায় প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন—জীবনের অস্তিত্বজ্ঞাপক এই চূড়ান্ত পরীক্ষায় জীবের ন্যায় জড়পদার্থও একই ভাবে সাড়া দিয়া থাকে। কাজেই ইহাকে জীব ও জড়ের পার্থক্যজ্ঞাপক চূড়ান্ত পরীক্ষা বলা যাইতে পারে না। জীবন-রহস্য-উদ্ঘাটনে ব্রতী মনীষীদের যেখানে অনুমান বা কল্পনার আশ্রয়ে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তথায় জগদীশচন্দ্রের এই অভাবনীয় গবেষণালব্ধ ফল তাঁহাদের অগ্রগতিকে যথেষ্ট সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

বিষয়টি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কি ভাবে কত দূর অগ্রসর হইয়াছেন তৎসম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। ক্ষুদ্রতম সরল জীবন লইয়া আরম্ভ করা যাউক। জীবন বলিতে সাধারণতঃ আমরা জীবপঙ্কের (protoplasm) এক অদ্ভুত বিশেষত্ব—ক্রিয়াশীলতাই বুঝিয়া থাকি। সাদৃশ্য হিসাবে অবশ্য এই ধারণা জল, বাতাস এমন কি কলকব্জায় ক্রিয়াশীলতা এবং প্রাকৃতিক, অপ্রাকৃতিক বহু ঘটনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝা যায়—জীবন পার্থিব জড়বস্তুর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। জীবন্ত বস্তুতেই জীবনের অভিব্যক্তি সম্ভব। 'জীবন্ত' হইতে যাহা 'জীবন্ত নয়' তাহার পার্থক্য অনুধাবন করিয়াই জীবনের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, 'বহির্দ্দেশীয় অবস্থার সহিত আভ্যন্তরীণ অবস্থার সামঞ্জস্য বিধানের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টাই জীবন'; কিন্তু জীবন যে জৈব পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে তাহা অজৈব পদার্থের সমবায়েই গঠিত—এই কথাগুলি ঐ সূত্রে বাদ পড়িয়া যায়।

জীবনের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাহার অপরিহার্য্য লক্ষণগুলির বর্ণনা ছাড়া আর উপায় নাই। কাজেই আমাদিগকে এক দিকে সুবিন্যস্ত এবং অসংবদ্ধ অজৈব পদার্থ এবং অপর দিকে জীবিত ও মৃত জৈব পদার্থের পার্থক্য বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

জীবপঙ্ক নামক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল জৈব পদার্থে জীবনের আদি অভিব্যক্তি দেখিতে

পাওয়া যায়। যাবতীয় উন্নত ও অবনত জীব ও উদ্ভিদ দেহ এই জৈব পদার্থের বিচিত্র সমবায়ে গঠিত। জীবপঙ্কের মধ্যে অদ্ভুত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা অতি সাধারণ কয়েকটি মূল পদার্থের সমবায়ে গঠিত। এই মূল পদার্থগুলি জৈব পদার্থের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। যাবতীয় জীবপঙ্কের মধ্যেই 'প্রোটিড' নামে একটি জিনিষের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ইহা একটি অদ্ভুত জৈব বস্তু, এবং জৈব পদার্থ ছাড়া অন্যত্র ইহাকে পাওয়া যায় না, অবশ্য রাসায়নিকের গবেষণাগারে আজকাল কৃত্রিম উপায়ে এই পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও তাহাতে কোন ক্রমেই জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয় না। 'প্রোটিডে'র মধ্যে আছে—কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং খানিকটা গন্ধক। তা ছাড়া বিভিন্ন জীবপঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পরিমাণে সাধারণ চর্ব্বি-জাতীয় জিনিষ, কার্বোহাইড্রেট এবং অপর কয়েকটি যৌগিক পদার্থও পাওয়া যায়; এতদ্ব্যতীত লবণ, জল এবং অন্যান্য অজৈব পদার্থও জীবপঙ্কে থাকিতে দেখা যায়, সুতরাং 'জীবন' বলিতে অতি জটিল রাসায়নিক পদার্থ 'প্রোটিড' হইতে সাধারণ লবণ-জাতীয় দ্রব্য সমবায়ে গঠিত এক প্রকার পদার্থের নিজস্ব অদ্ভুত ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় না। জলের নিজস্ব ধর্ম্ম যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ধর্ম্মের মিলিত যোগফল নয়, সেইরূপ 'জীবন'কে উপরিউক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহের নিজস্ব ধর্ম্মের সম্মিলিত যোগফল বলিয়া ধরা চলে না।

এখন দেখা যাক জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কি? গঠনের দিক্ হইতে বিচার করিলে অজৈব পদার্থের গঠন, জৈব পদার্থের গঠন হইতে কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট বলা যাইতে পারে না। অজৈব পদার্থের সুসমঞ্জস, সুব্যবস্থিত দানা বাঁধিবার রীতি লক্ষ্য করিলেই ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। এই হিসাবে উভয় জাতীয় পদার্থের মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই; কিন্তু জীবিত পদার্থ মাত্রেই কতকগুলি বিভিন্ন বস্তুসমষ্টি সাধারণতঃ জলীয় পদার্থের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই কারণেই ইহা 'কৃষ্টালে'র সহিত সর্ব্বাংশে তুলনীয় নহে। তা ছাড়া জীবিত পদার্থের বৃদ্ধি বা পরিণতিতে কৃষ্টালের সঙ্গে গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পৃথক্ পৃথক্ বস্তুকণিকাগুলি একের সঙ্গে আর একটি সাধারণ ভাবে গায়ে গায়ে যুক্ত হইয়া কৃষ্টাল গঠিত হয়; কিন্তু জীবনীশক্তিসম্পন্ন জৈব পদার্থ বাহিরের বস্তু দেহসাৎ করিয়া দেহের বৃদ্ধি সম্পাদন করে। একথা মূলতঃ সত্য হইলেও আর এক দিক্ হইতে ইহার অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। কারণ জলীয় পদার্থের মধ্যে দ্রবণীয় কোন পদার্থ যোগ করিবার সময় অজৈব তরল পদার্থের এইরূপ বৃদ্ধির উদাহরণ বিরল নহে।

সঞ্চরণশীলতা যদিও জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট লক্ষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তথাপি ইহা জৈব ও অজৈবের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি হইতে পারে না। কারণ জীবন্ত বীজের মধ্যে অন্ততঃ বাহ্য সেরূপ কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। বাহিরের আঘাতে উত্তেজিত হওয়া যদিও জীবের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম, তথাপি ইহা কেবল জীবজগতেই সীমাবদ্ধ নহে। কারণ অনেক অজৈব পদার্থ বাহিরের উত্তেজনায় নিয়মিত রূপে উত্তেজিতের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। পরিবর্ত্তনশীলতাও জৈব, অজৈব উভয়ের পক্ষেই প্রায় সমভাবেই প্রযোজ্য হইতে পারে। প্রজনন-ক্ষমতা দ্বারাও জৈব ও অজৈবের পার্থক্য নিরূপণ করা দুরূহ। কারণ অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে অনেকেরই এই ক্ষমতার অভাব রহিয়াছে। তাহারা শরীরকে সমভাবে দ্বিখণ্ডিত করিয়া অথবা কুঁড়ির আকারে অনুরূপ ক্ষুদ্র বস্তু পৃথক্ করিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। এক কোঁটা পারদ ভাঙিয়া তদনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারদবিন্দু-সৃষ্টির ব্যাপারটাকেও উহাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

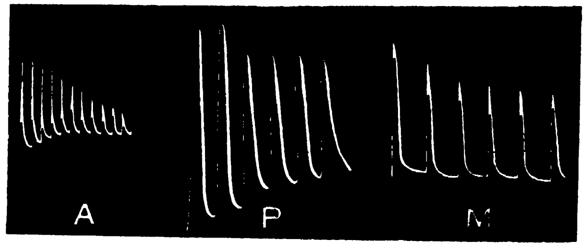
জৈব পদার্থের উৎপত্তির ধারা বিবেচনা করিলে জৈব ও অজৈবে একটা গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বটে; কিন্তু তাহাও নিরপেক্ষ নহে। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার জৈব পদার্থের বিষয় জানা গিয়াছে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জৈব পদার্থ হইতেই উদ্ভূত, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন হইতেই পরবর্ত্তী জীবনের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু উদ্ভিদ্ সবুজ কণিকার সহায়তায় অজৈব পদার্থ হইতেই জৈব পদার্থের সৃষ্টি করে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নততর জীবেরা তাহা দেহসাৎ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কাজেই দেখা যাইতেছে, জৈব ও অজৈবের মধ্যে কোন সীমা-রেখা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কিন্তু আর একটি সাধারণ প্রশ্ন উদিত হয়—জীবন ও মৃত্যুর মত বিভিন্ন অবস্থা তো অজৈব পদার্থের নাই। ইহাই তো জৈব-অজৈবের প্রধান পার্থক্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এই জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারেও এমন কতকগুলি ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইয়া পড়ে। মৃতের পুনর্জীবন লাভের ঘটনা বিরল নহে। আমাদের দেশীয় সাধুসন্ন্যাসীদের ইচ্ছামত জীবন-ক্রিয়া বন্ধ রাখিবার কথাও শোনা যায়। এই সকল ঘটনার সত্যতায় সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে জীবনমৃত্যুর প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সুকঠিন। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে এ. লিউয়েনহেক (A. Leeuwenhoek) কতকগুলি রটিফার ও টার্ডিগ্রেড জাতীয় আণুবীক্ষণিক প্রাণীর মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রাণীগুলিকে অনেক দিন পর্য্যন্ত শুষ্কাবস্থায় রাখিয়া পুনরায় জলে ছাড়িয়া দিলেই তাহারা সক্রিয় হইয়া উঠে। প্রেয়ার (Preyer) এ-সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া এ প্রকার ঘটনাকে anabiosis নামে অভিহিত করেন। তাহার পর ক্রমশঃ অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, কেবল রটিফার বা টার্ডিগ্রেড নহে, বিভিন্ন জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিমাটোড জাতীয় প্রাণীরাও অনুরূপ অবস্থায় থাকিতে পারে। বহুদিনের শুষ্ক বীজ সম্বন্ধেও এ প্রশ্নের উদয় হয়।

(বাম দিক হইতে) মাংসপেশী, উদ্ভিদ ও ধাতুখণ্ডের স্বাভাবিক সাড়া

এই সকল কথা বিবেচনা করিতে গেলে জড় ও জীবের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ক্রমশই ঘনীভূত হইতে থাকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কেবল অবস্থা-সাদৃশ্যে বা ঘটনাসাম্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নির্দ্ধারিত হয় না। শারীরতত্ত্বের পরীক্ষামূলক গবেষণায় এই সন্দেহ নিরাকৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পূর্ব্বে এরূপ অদ্ভুত অসম-সাহসিক কল্পনা কাহারও মনে, উদিত হয় নাই। অবশ্য ঘটনাচক্রে এই সমস্যা তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ফলে তিনি জড় ও অজড়ের সাম্য সম্বন্ধে এক অভাবনীয় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া নূতন পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

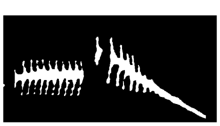
বিদ্যুৎতরঙ্গ লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন অনেকক্ষণ কাজ করিবার পর বিদ্যুৎতরঙ্গ-নির্দ্দেশক কৃত্রিম চক্ষুর সাড়া দিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। একবার নয়, দুইবার নয়, বার বার পরীক্ষা করিয়া তিনি একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। তবে কি প্রাণিদেহের ন্যায় জড়েরও ক্লান্তি আছে? এই প্রশ্ন তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। অবশেষে এই রহস্যোদ্‌ঘাটনে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। অদম্য অধ্যবসায়বলে তাঁহার সাধনা জয়যুক্ত হইল। জৈব ও অজৈবের মধ্যে কোন সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই, ইহা তিনি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিলেন। সজীব মাংসপেশী, উদ্ভিদ ও ধাতুখণ্ড লইয়া একই জাতীয় পরীক্ষার ফলে তিনি দেখিতে পাইলেন, বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে একই অবস্থায় এক জাতীয় সাড়াই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। একখণ্ড জীবন্ত মাংসপেশী, একটি উদ্ভিদ্ বা এক টুকরা ধাতব পদার্থের মধ্যে এ হিসাবে কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জীবন্ত মাংসপেশীতে চিম্‌টি কাটিলে তাহার সঙ্কোচন ও প্রসারণের



(বাম দিক হইতে) মাংসপেশী, উদ্ভিদ ও ধাতুখণ্ডের অবসন্ন অবস্থার সাড়া

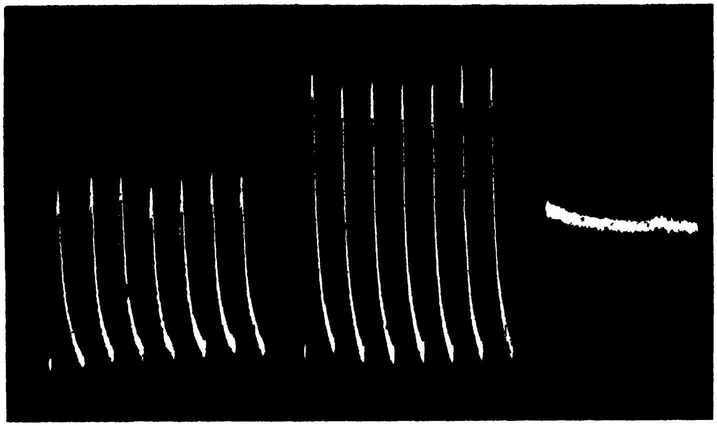
ফলে যেরূপ সাড়া লিপিবদ্ধ হইবে, একটি উদ্ভিদ্ বা ধাতুখণ্ড হইতেও অনুরূপ অবস্থায় একই ধরণের সাড়া-লিপি পাওয়া যাইবে।

সাধারণতঃ জীবিত পদার্থের বিশেষত্ব এই যে, বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় তাহারা অতি পরিস্ফুটভাবে আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এক টুকরা জীবন্ত মাংসপেশীকে চিম্‌টি কাটিলে তৎক্ষণাৎ উহা সঙ্কুচিত হয়। বাহিরের যে আঘাতে পেশীর এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহাকে উত্তেজনা বলা যাইতে পারে। কাজেই দেখা যায়—জীবিত বস্তু আকার পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তেজিত অবস্থা প্রকাশ করে এবং বাহিরের আঘাত, উত্তাপ, আলোকসম্পাত, রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগে জীবিত বস্তুকে উত্তেজিত করা যাইতে পারে। এই উত্তেজনা-প্রবাহ শরীরের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। উত্তেজনা-প্রবাহ শরীরের দূরতম স্থান পর্য্যন্ত পরিচালিত করিবার ক্ষমতা সকল প্রাণীর সমান নহে। কোন কোন পেশীতে এই প্রবাহ ধীরে ধীরে অতি অল্প দূর বিস্তৃত হয়। আবার স্নায়ুসূত্রে ইহা অতি দ্রুতবেগে দূরতর স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ এত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে যে, সাধারণ ভাবে ইহা মোটামুটি দৃষ্টিগোচর হইলেও যন্ত্রসাহায্য ব্যতিরেকে খুঁটিনাটি অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। কাজেই অতি সরলগঠন, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-সাহায্যে তিনি তাহাদের অবস্থান্তরজনিত আভ্যন্তরীণ ঘটনাসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করাইবার ব্যবস্থা করেন। এই যন্ত্রসাহায্যে উত্তেজিত মাংসপেশীর পরিবর্ত্তন ও পুনরায় পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তির স্বলিখিত সাক্ষ্য হইতে তাহার সমস্ত ইতিহাস জানিতে পারা যায়।



মাংসপেশী, উদ্ভিদ ও ধাতুখণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে মরণোন্মুখ অবস্থায় সাড়া-লিপি

এই যন্ত্রে সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘ শলাকার মত একটি লেখনী ঢেঁকি-কলের ন্যায় একটি আশ্রয়দণ্ডের উপর খাড়াভাবে স্থাপিত থাকে। আশ্রয়-দণ্ডের সম্মুখ দিক্ হইতে একটি হাল্কা 'স্প্রিং' লেখনীটিকে বাম দিকে টানিয়া রাখে। আশ্রয়-দণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে লেখনীর প্রান্তদেশের সহিত যদি এক দিক আবদ্ধ এক টুকরা মাংসপেশী সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, তবে পেশী সঙ্কুচিত হইবা-



এক টুকরা টিনের উপরে বিভিন্ন মাত্রায় পটাশ প্রয়োগে বিভিন্ন রূপ সাড়া। বামে, সাধারণ অবস্থায় টিনের স্বলিখিত সাড়া ; মধ্যে, পটাশ প্রয়োগে উত্তেজিত অবস্থার সাড়া ; দক্ষিণে, অত্যধিক মাত্রায় পটাশ প্রয়োগে টিনের অসাড়তার লক্ষণ

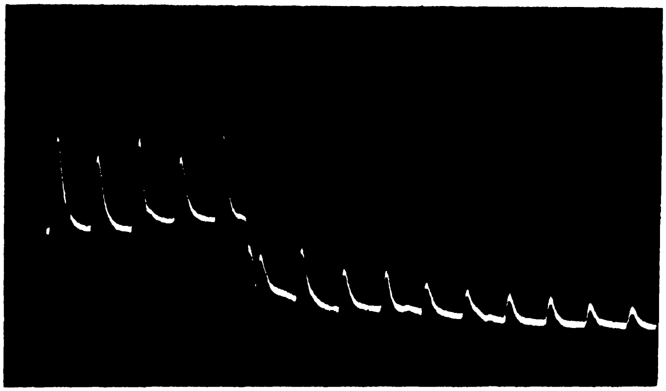


প্ল্যাটিনাম-তারের অবসাদ—সাড়া-লিপির দৈর্ঘ্য ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে

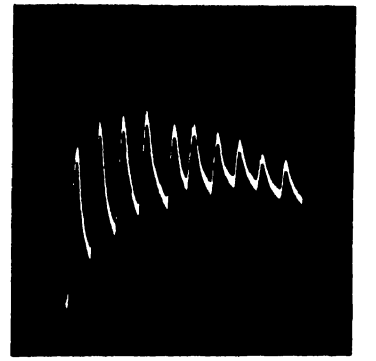
মাত্রই লেখনীটি ডান দিকে ঘুরিয়া যাইবে। সঙ্কোচন যত বেশী হইবে, লেখনী ততই বেশী ডান দিকে ঘুরিবে। শয়ানভাবে স্থাপিত একটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপরে ভূষামাখান কাগজের গায়ে লেখনীর অগ্রভাগ অতি আলতোভাবে ঠেকিয়া থাকে। কাজেই পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে দক্ষিণে ও বামে ঢেউয়ের আকারে একটানা বক্র রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। দক্ষিণাভিমুখী রেখা পেশীর আঘাতজনিত সঙ্কোচনের ফল এবং বামাভিমুখী রেখা তাহার প্রকৃতিস্থ হইবার অবস্থার পরিচায়ক। কিন্তু মাংসপেশীর ন্যায় বাহিরের উত্তেজনায় স্নায়ুসূত্রের সঙ্কোচন-প্রসারণ বা অন্য অবস্থা পরিবর্ত্তন সাধারণ ভাবে মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে দেখা যায়, উত্তেজনা-প্রবাহ দূরে উপনীত হইয়া স্নায়ুসংলগ্ন মাংসপেশীকে সঙ্কুচিত করে। স্নায়ুর কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। এই জন্যই স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনার বিষয় পরীক্ষা করিতে অন্য উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক উপায়ে গ্যালভ্যানোমিটার যন্ত্র সাহায্যে ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে। এই জৈব-তাড়িতিক পরীক্ষাই শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের জীবনের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বজ্ঞাপক প্রধান পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার সাহায্যেই শারীরতত্ত্ব-সম্পর্কিত অভিনব তথ্যসমূহ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যদি গ্যালভ্যানোমিটার হইতে সম-অবস্থাপন্ন দুইটি তড়িৎপ্রান্ত একটি স্নায়ুসূত্রের উভয় প্রান্তে সংযোগ করিয়া স্নায়ুর এক প্রান্তে কোন উত্তেজনা প্রয়োগ করা যায়, তবে গ্যালভ্যানোমিটারে কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হইবে না। কারণ এক প্রান্তের উত্তেজনা-প্রবাহ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর প্রান্তে পরিচালিত হইবে এবং উভয় প্রান্ত সমভাবে উত্তেজিত হওয়ার ফলে কোন পার্থক্য না থাকায় তড়িৎশক্তির বিকাশ হইবে না। কাজেই উত্তেজনাজনিত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হইলে, উভয় প্রান্তের এই সাম্যাবস্থা বিদূরিত করা প্রয়োজন। স্নায়ুসূত্রের এক প্রান্তকে স্থায়ী রূপে কিয়ৎ পরিমাণে অসাড় করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে আঘাতজনিত তড়িৎপ্রবাহ সতেজ প্রান্ত হইতে স্নায়ুসূত্রের মধ্য দিয়া অপেক্ষাকৃত অসাড় প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা নড়াইয়া



প্ল্যাটিনাম ধাতুখণ্ডের অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগের ফলে উত্তেজিত অবস্থা। বামে, অবসন্ন অবস্থার সাড়া ; দক্ষিণে, উত্তেজিত অবস্থার সাড়া।



ফুলকপির পাতার বোঁটায় বিষপ্রয়োগের পূর্ব্বে ও পরের সাড়া-লিপি। বামে, স্বাভাবিক সাড়া ; দক্ষিণে, বিষপ্রয়োগের পরে লিপিবদ্ধ সাড়া



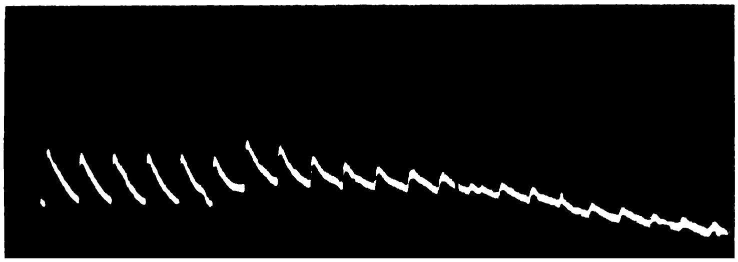
টিনের তারের অবসাদ—ক্রমশ সাড়ার অবনতি দেখা যাইতেছে

দর্পণ ঘুরাইয়া প্রতিবিম্বিত আলোক-রশ্মির সাহায্যে ফটো-প্লেটে স্নায়ুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের বিষয় লিপিবদ্ধ করিবে।

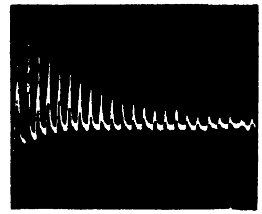
অজৈব পদার্থও স্নায়ু-সূত্রের অনুরূপ তাড়িতিক সাড়া দিতে সক্ষম কিনা তাহা বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে পরিস্ফুট জীবনীশক্তি-সম্পন্ন উদ্ভিদ্-জগতের কথা স্বতই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তিনি উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন—তাহারাও বিষ, ক্লোরোফরম এবং অন্যান্য প্রকারের আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণি-দেহের মতই সাড়া দিয়া থাকে। শারীরতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন পরীক্ষায় উদ্ভিদ- ও প্রাণি- জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে না পাইয়া জগদীশচন্দ্র অসম সাহসে অজৈব পদার্থের রহস্য উদ্ঘাটনে অগ্রসর হইলেন। অসম সাহস বলিতেছি এই যে তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিকেরা পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলী হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জীবিত বস্তুকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিলে যেমন তাহার সাড়া দিবার ক্ষমতা লোপ পায়, অজৈব পদার্থও সেইরূপ মৃত বস্তুর ন্যায় সাড়া দিতে অক্ষম। তখনকার দিনে প্রচলিত এই বৈজ্ঞানিক ধারণার বিরুদ্ধ মত পোষণ করা এক নবীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যে কিরূপ দুঃসাহসিকতার কাজ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু অবশেষে তাঁহার সাধনাই জয়যুক্ত হইল। বহু পরীক্ষায় তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, অজৈব ধাতুখণ্ডও প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রাণী- বা উদ্ভিদ্-দেহের ন্যায় একই প্রকার সাড়া দিয়া থাকে। যে-যন্ত্র সাহায্যে বৃক্ষের বা প্রাণিদেহের মাংসপেশীর সাড়া-লিপি গৃহীত হইয়াছিল, সেই যন্ত্র সাহায্যেই, বৃক্ষের পাতা বা মাংসপেশীর পরিবর্ত্তে ধাতব পদার্থের তার বসাইয়া তিনি এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব অভিনব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। ধাতুনির্ম্মিত তার ক্লোরোফরম, বিষ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ, উত্তাপ, আলোক, আঘাত ও উত্তেজনার প্রয়োগে যন্ত্রকৌশলে তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার স্বলিখিত বিবরণ প্রদান করিতে লাগিল।

পরীক্ষার জন্য টিন বা অন্য কোন ধাতুনির্ম্মিত এক প্রস্থ তারের টান ('টেন্‌সন্') anneal করিয়া সর্ব্বত্র সমান করিয়া লইতে হয়। তার পর খাড়াভাবে টানিয়া রাখিয়া পরিষ্কার বস্ত্র-খণ্ডের সাহায্যে উপর হইতে নীচে বার-বার ঘষিয়া লইলে সামান্য কিছু টান অবশিষ্ট থাকিলেও তাহা বিদূরিত হইয়া যাইবে। অতঃপর ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া, কলের জলে ডুবাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলেই তারের সাড়া দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। এই উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও তারটা যেন সময়ে সময়ে একটু অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া পড়ে। আণবিক সংস্থানের বিপর্য্যয়ই যদি সাড়া দিবার কারণ হইয়া থাকে, তবে এই অবস্থায় পুনরায় anneal করিয়া লইলেই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর হইয়া যাইতে পারে। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই ঘটিয়া থাকে। তারের উপর গরম জল ঢালিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইতে দিলেও ভাল সাড়া পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত স্নায়ু-সূত্রের পরীক্ষানুযায়ী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত তার-খণ্ডের উভয় প্রান্ত গ্যালভ্যানোমিটারের সহিত যোগ করিয়া দিলে তারের দুইটি প্রান্তই সমতাড়িতিক গুণসম্পন্ন বলিয়া যন্ত্রে কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে না। যদি তারের উভয় প্রান্ত তড়িৎ-পরিচালক হিসাবে অসমান হয়, তবে সামান্য তড়িৎস্রোতে গ্যালভ্যানোমিটারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবে। তখন তারের এক প্রান্তে মৃদু ঘা দিয়া বা সামান্য মোচড় দিয়া আঘাত করিলে দেখা যাইবে—অনাহত প্রান্ত হইতে আহত প্রান্তের দিকে একটি তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ব্যাপারটি ঠিক স্নায়ু-সূত্রের সাড়ার মতই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তারের দুই প্রান্ত যদি একই



মূলার উপরে বিষপ্রয়োগের পূর্ব্বে ও পরের সাড়া-লিপি—বামে, স্বাভাবিক সাড়া



অবসাদগ্রস্ত মাংসপেশীর স্বলিখিত সাড়া—ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে

সময়ে মোচড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে পরস্পর বিপরীতাভিমুখী তড়িৎপ্রবাহের ফলে গ্যালভ্যানোমিটারের রশ্মি-প্রতিফলকটি একই স্থানে স্থির হইয়া থাকিবে। কাজেই যে-কোন এক প্রান্তে উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসাহায্যে তাহার সাড়ালিপি গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই উপায়ে বিভিন্ন উত্তেজক বা অবসাদক রাসায়নিক পদার্থপ্রয়োগে মাংসপেশী বা স্নায়ু-সূত্রের সাড়ার মত জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন ধাতুখণ্ডে একই রকম সাড়া পাইতে সমর্থ হইয়াছেন। পেশীর উপর বিভিন্ন বিষের যেমন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়, বিভিন্ন ধাতুখণ্ডেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি সামান্য মাত্রায় কোন কোন বিষ-প্রয়োগে যেমন পেশী উত্তেজিত হয়, বিভিন্ন ধাতুখণ্ডের উপরও ঠিক তেমনই ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ-প্রয়োগে মৃত্যু ঘটিলে যেমন স্নায়ু বা পেশী সমূহের সাড়া দিবার ক্ষমতা লোপ পায়, ধাতুখণ্ডেও ঠিক একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর মাংসপেশী, স্নায়ু, উদ্ভিদ্ ও ধাতুখণ্ডের সাড়া-লিপিগুলি একত্রে মিলাইয়া দেখিলে কাহারও বুঝিবার জো নাই যে, ঐগুলি বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের সাড়া-লিপি। ক্রমাগত সাড়া দিবার ফলে জীবিত পেশীর মত ধাতুখণ্ডও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। আবার বিশ্রাম দিলে তাহার ক্লান্তি দূর হয়। বিষ-প্রয়োগে জীবন্ত পেশীর মৃত্যু ঘটাইলে পুনরায় যেমন তাহার আর সাড়া দিবার সম্ভাবনা থাকে না—অজৈব পদার্থের প্রত্যেক ক্ষেত্রে না হইলেও অনেক ক্ষেত্রে আচার্য্য জগদীশ অনুরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দুইটি বিভিন্ন তারখণ্ডকে পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন—তাহারা উভয়ে একই ভাবে সাড়া দেয়। অতঃপর তাহাদের একটিতে মৃদু অক্সালিক এসিড লাগাইয়া দিলেন এবং কিছুক্ষণ রাখিবার পর জলস্রোতের নীচে ধরিয়া ন্যাকড়ার সাহায্যে ঘষিয়া তার হইতে সমস্ত এসিডের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বিষের চিহ্ন ধুইয়া-মুছিয়া গেলেও তার আর সাড়া দিল না, একেবারে অসাড় হইয়া গেল। কিন্তু অপর তারটি দস্তুরমত সাড়া দিতেছে। তার পর 'এমারি' কাগজের সাহায্যে তারের উপরের এক পর্দ্দা ঘষিয়া তুলিয়া ফেলা হইল, তথাপি সে সাড়া দিল না। কারণ অসাড়তা তারের অন্তঃস্থলে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। তাঁহার এই জাতীয় বহু পরীক্ষা হইতে দেখা যায়—জৈব পদার্থের জীবিত ও মৃত অবস্থাভেদের মত অজৈব পদার্থেরও এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে।

জগদীশচন্দ্রের 'জৈব ও অজৈবের সাড়া' সম্বন্ধীয় অভাবনীয় আবিষ্কারের পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা আঘাত-উত্তেজনায় তাড়িতিক সাড়া দিবার শক্তিকেই জীবিতের প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন, কারণ বিষ-প্রয়োগে স্নায়ুর তাড়িতিক সাড়া দিবার শক্তি লোপ পায়। ক্লোরোফরম-প্রয়োগে বৈদ্যুতিক সাড়া ধীরে ধীরে কমিতে থাকে; কিন্তু উপযুক্ত বিশ্রামের পর পূর্ব্ব চেতনা ফিরিয়া আসে। কাজেই শারীরতত্ত্ববিদেরা এই ক্ষমতাকে কোন অজ্ঞাত রহস্যপূর্ণ জীবনীশক্তির ক্রিয়া বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, যাহাকে পণ্ডিতেরা জীবনীশক্তিজাত সাড়া বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন তাহা পদার্থের আণবিক সংস্থানের পরিবর্ত্তনজনিত ফলমাত্র। এই আণবিক সংস্থানের পরিবর্ত্তন, অবস্থাবিশেষে জৈব ও অজৈব উভয়বিধ পদার্থে একই নিয়মে ঘটিয়া থাকে। বাহিরের আঘাত বা উত্তেজনায় সাড়া দিবার ক্ষমতার মূলে জৈব ও অজৈব পদার্থে যে একই শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাঁহার গবেষণালব্ধ এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব জীবনরহস্য উদ্ঘাটনের পথ যথেষ্ট সুগম করিয়া দিয়াছে।

মাংসপেশীতে চিম্‌টি কাটিলে বা মোচড় দিলে অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুর স্বাভাবিক শৃঙ্খলা কিয়ৎপরিমাণে বিপর্য্যস্ত হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে আবার সেই ধকল কাটাইয়া পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। জোরে মোচড়াইয়া দিলে সেই ধকল আর কাটাইয়া উঠিতে পারে না, তখন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। কাজেই দেখা যায়, আণবিক সংস্থানের সামান্য বিশৃঙ্খলায় প্রাণিদেহ বেদনা বা অন্য কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করে মাত্র। কিন্তু আণবিক সংস্থান যদি এমন ভাবে বিপর্য্যস্ত হয় যে, পূর্ব্বাবস্থায় আর ফিরিয়া আসিবার উপায় থাকে না, তখনই তাহাকে মৃত্যুর অবস্থা বলিয়া গণ্য করা হয়। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ জৈব পদার্থের সাড়ার কারণ

নির্ণয় করিতে গিয়া ইহা জীবনীশক্তি নামক এক অজ্ঞাত শক্তির ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ জীবদেহের অনেক বৈচিত্র্য বা খামখেয়ালীর ভাব পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম দ্বারা মীমাংসা করা যায় না। কিন্তু জগদীশচন্দ্র সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জৈব ও অজৈব উভয় জাতীয় পদার্থের আণবিক সংস্থানের পরিবর্ত্তন হেতুই এই সাড়ার অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। ইহা পদার্থতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় রাসায়নিক নিয়মই মানিয়া চলে। কাজেই শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের পরীক্ষা-পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া জৈব ও অজৈবের মধ্যে কোন সীমারেখা নির্দ্দেশ করা চলে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য উপায় খুঁজিতে হইবে। প্রোটিন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে আজকাল প্রোটিন উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও তাহাতে কিন্তু জীবনের সাড়া মিলে না। জৈব পদার্থজাত প্রোটিন হইতে রাসায়নিকের প্রস্তুত প্রোটিনের আণবিক সংস্থান-জনিত কোন পার্থক্য আছে কি? যদি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আণবিক সংস্থানের বৈষম্যই প্রধান ঘটনা হইয়া থাকে, তবে এই দিক্ দিয়া অগ্রসর হইলে এ সমস্যা সমাধানের প্রশস্ততর পথের সন্ধান মিলিতে পারে।

স্টেশন-মাষ্টার

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়, এম. এ.

১

পাঁশকুড়া ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার আদিত্যবাবু। লম্বা ছিপছিপে দেহের গড়ন, রং তামাটে, ঝাঁকড়া কাঁচা-পাকা চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফ—তামাক ও বিড়ির মহিমায় বর্ণ একেবারে ধূসর হইয়া গিয়াছে। দেহের রূপ যেমনই হোক লোকটি বড় ভালমানুষ। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় প্রায় বছর সাত-আট পূর্ব্বে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টেশনে গাড়ী ধরিতে আসিয়া দেখি--ট্রেনটি সবেমাত্র প্ল্যাটফরম্ ছাড়াইতেছে। আমার তখন ব্যাকুল অবস্থা, ছুটিয়া গিয়া ট্রেন ধরিতে পারা সম্ভব হইবে কি না ভাবিতেছি, এমন সময় ষ্টেশন-মাষ্টার আদিত্যবাবু প্ল্যাটফরমের অপর পাশ হইতে আসিয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন—ট্রেন ফেল করলেন বুঝি? যাবেন কোথায়? কোনও রকমে জবাব দিলাম—কলকাতায়।

—তাই তো। তবে তো দেখছি আপনার আবার চার ঘণ্টার ধাক্কা। তা আর কি করবেন বলুন। ওরে ও রামটহল 'সাহেব কামরা'টা খুলে দেনা রে বাবা। 'সাহেব কামরা' বুঝলেন তো? হাঃ হাঃ হাঃ! মানে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং-রুম। তা আপনি ওয়েটিং-রুমে বিশ্রাম করুন ততক্ষণ—কি আর করবেন। ভোগ যেটুকু আছে কপালে।

ষ্টেশন মাষ্টারের অনুগ্রহে কতকটা প্রীত হইয়া ওয়েটিং-রুমের দিকে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন—শুনুন মশায়, ওয়েটিং-রুমে ব'সে একা আর কি করবেন, তার চেয়ে চলুন আপিসে ব'সে গল্প করা যাবে। আর মশায় আমার যে অবস্থা হয়েছে—সে আর কি বলব। ষ্টেশনে আছে তো আমার এক অ্যাসিষ্টাণ্ট আর এক বুকিং ক্লার্ক। এই দুটি যে কি গলগ্রহ হয়েছে আমার! অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট তো এসেছে নূতন বিয়ে করে—কথা বলতে গেলেই তার বিয়ের আর বউয়ের গল্প—শুনতে শুনতে কান তো ঝালাপালা হয়ে গেল। আর বুকিং ক্লার্কটি এক খাস মাদ্রাজী, কড়র-মড়র ক'রে কি যে বাংলা বলে—শুনে হাসি, না, তার সঙ্গে বসে বসে গল্প করি বলুন তো?

মাষ্টার-মশায়ের অবস্থা উপলব্ধি করিতে আমার বিলম্ব হইল না। বুঝিলাম—গল্প করিতে তিনি একান্ত ভালবাসেন কিন্তু গল্প শুনিতে তিনি নারাজ। তাঁহার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট যে তাঁহারই কাছে বসিয়া তাহার নব-বিবাহিতা পত্নী এবং তৎসঙ্গে সেই পত্নীলাভের আনুষঙ্গিক ব্যাপারের গল্পগুলি একাদিক্রমে করিতে থাকিবে অথবা

তাঁহার মাদ্রাজী বুকিং ক্লার্কটি দ্রাবিড়ী উচ্চারণের ভঙ্গিমায় অনর্গল বাংলা বলিয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না।

তাঁহার পিছন পিছন ষ্টেশন-রুমে ঢুকিয়া পড়িলাম। মাথার সরকারী টুপিটা একটি হুকে ঝুলাইয়া রাখিয়া তিনি তাঁহার চেয়ারে বসিলেন এবং সম্মুখের একখানি চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন—বসুন।

বসিলাম। চাহিয়া দেখিলাম, ঘরের এক কোণে মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি খাতাপত্র লইয়া কাজে ব্যস্ত আছে। মাষ্টার-মহাশয় পকেট হইতে একটি পানের ডিবা বাহির করিয়া আমার দিকে আগাইয়া দিয়া কহিলেন—নিন্। আমি ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম—আমি পান খাই না।

—খান না? বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হয় তো? না? আরে বাপরে—আপনি যে দেখছি অতি ভাল ছেলে। হাঃ হাঃ হাঃ। কি করা হয় মশায়ের?

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—মাষ্টারি করি—স্কুল-মাষ্টার। পান-সিগারেটের পয়সা পাব কোথায় মশায়—এমনই চলে না। ভাল ছেলে কি সাধে হ'তে হয়।

—যা বলেছেন। সত্যিই এ বাজে খরচ। আমার তো মশায় দিন চার পয়সা পানের খরচ আর নিদেন পক্ষে দু-পয়সার বিড়ি। সিগারেট-ফিগারেট আর কিনব কোত্থেকে বলুন? মাইনে তো বুঝতেই পারছেন, আমাদেরও এমন কিছু বেশী নয়। তা সিগারেট দু-একটা ঐ ভেণ্ডারের কাছ থেকে নিয়েই এক রকম কাজ চালাই। ওরে গিরিধারী, ঐ ব্যাটা শীতলাকে ডেকে দে না রে বাবা, একটা সিগারেট দিয়ে যাক্। পাসিং শো-টো নয়, একটা কাঁচি-মার্কাই নিয়ে আসে যেন। হ্যাঁ, এদিকে আবার পানের খরচটা দিন-দিনই বেড়ে চলেছে। গিন্নি আবার বুড়ো বয়সে জরদা ধরেছেন—চিত্তির আর কি! চার পয়সায় কি কুলোত মশায়, রঘুনাথবাড়ীর বিপিন ব্যাপারী যদি না থাকৃত। তাহ'লে দিন কমসে-কম চার আনা তো যেতই। এদিকে পান কি মাগ্যি জানেন তো? ওদিকে আবার শালী এক পানের ডিবে কাশী থেকে পাঠিয়েছেন। ডিবে তো নয় যেন এক ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী। মশায়, সেই ডিবে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার ভরা হচ্ছে আর খালি হচ্ছে। জ্বালাতন! আচ্ছা বলুন তো দেখি আজ ষ্টেশন-মাষ্টার না হয়ে যদি স্কুল-মাষ্টার হতুম, তা হ'লে কি দশাটা হ'ত। না, না, আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনাদের হচ্ছে অনেস্ট প্রফেসন্, ওর কাছে কি আর কিছু লাগে। শুধু একটা তুলনার জন্যই বললুম আর কি! আমার শালীর ভগ্নীপ্রীতিই তো মাটি করেছে মশায়, জরদাও ধরিয়েছেন তিনি। কাশীতে থাকেন কিনা। তাঁর আর কি, নেশা ধরিয়ে দিয়ে এখন সরে পড়েছেন। এখন পান-জর্দ্দা তো এই শর্ম্মাকেই যোগাতে হচ্ছে—কি বলেন? টেলিফোনে টুং টুং করিয়া শব্দ হইতেই তিনি হাতের কাছের চোঙাটি তুলিয়া কানে ধরিয়া উচ্চৈস্বরে কহিলেন—অ্যাঁ! ২৬ আপ? অ্যাঁ? আচ্ছা। ঝনাৎ করিয়া টেলিফোনের চোং ফেলিয়া দিয়া তিনি হাঁকিলেন—এই গিরিধারী! ওরে এই রামটহল! ঘণ্টা দে না রে—টিকিটের ঘণ্টা। তাহ'লে আপনি বসুন, আচ্ছা না-হয় ওয়েটিং-রুমেই অপেক্ষা করুন কিছু ক্ষণ, আমি আসছি। আপনার তো সেই কি বলে আরও দু-ঘণ্টা। এই বলিয়া তিনি হুকে টাঙানো টুপিটি মাথায় পরিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

২

আদিত্যবাবুর সহিত প্রথম পরিচয় এইখানে তার পর বহুবার তাঁহার নিকট বসিয়া নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভাবে তাঁহার গল্প শুনিয়াছি। তাঁহার পারিবারিক কথা আয়ব্যয়ের সংবাদ, উপরি-পাওনার হিসাব—কিছুই আমা আর জানিতে বাকি নাই। ষ্টেশন-মাষ্টার না হইয়া যদি স্কুল-মাষ্টার হইতেন তাহা হইলে তাঁহার যে আর দুর্গতি সীমা-পরিসীমা থাকিত না এ-কথাও আমি তাঁহার মুখে বহু বার শুনিয়াছি—শুনিয়া হাসিয়াছি কিন্তু রাগ করিতে পারি নাই।

বোধ হয় বৎসরখানেক দেশে ফিরিতে পারি নাই পরিবারবর্গ লইয়া কর্ম্মস্থলে বাসা বাঁধিয়াছি। সুতরাং বাড়ী আসিবার ঘন ঘন কোনও তাগিদ ছিল না বিষয়কর্ম্মের জন্য কয়েক দিনের ছুটি লইয়া দে

আসিতেছিলাম। পরিচিত ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম—সবই তেমনি রহিয়াছে। কিন্তু প্রথমটা আদিত্যবাবুকে দেখিতে পাইলাম না। এদিক-ওদিক চাহিতেই দেখিলাম—ষ্টেশন-রুমের এক কোণে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া মনে হইল, বিমর্ষ ক্ষীণ দেহ ক্ষীণতর হইয়াছে, দাড়ি গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন। আমাকে দেখিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন—এই যে আসুন। এবার অনেক দিন পর দেখছি যে। পরিবার নিয়ে গিয়েছেন ব'লে কি বছরে দুই-এক বার দেশে আসতে নেই? আচ্ছা মানুষ তো আপনি!

কহিলাম—কি আর করি মাষ্টার-মশায়, গরীব মানুষ, আসা-যাওয়ার খরচার কথাও তো ভাবতে হয়। এ তো আপনাদের চাকরি নয়, ভূভারতের যেখানে ইচ্ছে চলে যান বিনা-খরচায়—।

আদিত্যবাবুর মুখটি যেন বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তবু মুখে হাসি টানিয়া বলিলেন—যা বলেছেন। রেলের চাকরিতে মধু কিছু আছে বইকি। কিন্তু আর কয়দিনই বা—পরমায়ু তো শেষ হয়ে এল। এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন।—

আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি ম্লান হাসিয়া বলিলেন—শিগ্‌গিরই রিটায়ার করছি কিনা! অবিশ্যি একস্‌টেন্‌সনের দরখাস্ত দিয়েছি, উত্তর এখনও কিছু পাই নি। আজকাল যে ব্যাপার হয়েছে মশায়, এক্‌স্‌টেন্‌সনের নামে ওপরওয়ালা বায় খাপ্পা হয়ে। লোক তাড়াতে পারলেই বাঁচে। আগে ছিল মশায় সত্যযুগ, এক্‌স্‌টেন্‌সনের পর এক্‌স্‌টেন্‌সন, মরবার আগের দিন পর্য্যন্ত কাজ করবার ফুরসুৎ মিলত। আর আজকাল যা ব্যাপার, সব ব্যাটা বুড়োদের পেছনে লাগতে পারলেই বাঁচে। বলে আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট কোশ্চেন, বয়স হয়েছে সরে পড়, ছোঁড়াদের জায়গা ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও তো বুঝলাম রে বাপু, কিন্তু সেই আঠার বৎসরে কাজে ঢুকেছি—এখন হ'ল উনষাট। এই একচল্লিশ বছরের অভ্যাস—সেটা ছাড়ি কি ক'রে বল দেখি। চাকরি ছাড়া মানেই তো হ'ল ওপারের দিকে পা বাড়ানো। বলুন তো, অকেজো হয়ে ব'সে থাকলে যমে ছাড়বে কেন? আচ্ছা আপনি তো বুদ্ধিমান লোক, কত গাধা পিটে ঘোড়া করছেন, আপনার কি মনে হয় এক্‌স্‌টেন্‌সন দেবে না? দুটি বছরের এক্‌স্‌টেন্‌সন্ পেলেই আমার এক রকম হয়ে যাবে।

আদিত্যবাবুকে ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা হইল না। অভ্যাসের দাস মানুষ—একচল্লিশ বছরের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে মায়া হইবে বইকি। রিটায়ার করিতে হইবে এই ভাবনাতেই তিনি আতঙ্কে শুকাইয়া গিয়াছেন, সত্যই সে-দিন আসিলে তাঁহার অবস্থা যে কি হইবে অনুভব করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলাম—নিশ্চয় পাবেন, আপনি ভাববেন না।

তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—না ভাবব কেন। আমার কিছু ভাবনা নেই। আর যদি নাই দেয় ব্যাটারা, বয়েই গেল আমার। হাজার পাঁচ-ছয় পাব প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে। আমি তো ভাবছি কিছু জমি-জায়গা নিয়ে চাষ-আবাদেই যাব লেগে। সেদিন গিয়েছিলাম তমলুকে, এস্-ডি-ওর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি তো আমার আইডিয়া শুনে খুবই তারিফ করলেন। ওঁর সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় ছিল কিনা। উনি আমাদের দেশেই এর আগে ছিলেন যে। তা আপনার মনে হয়—পাব এক্‌স্‌টেন্‌সন্?

বলিলাম—আমার তো খুবই বিশ্বাস। পাবেন।

—হ্যাঁ, পেলে যে সুবিধে হয় তা আমিও বুঝি। তিনটি মেয়ে পার করেছি মশায়, এখনও দুটি বাকি, দিলেই হয়। চাকরিটা থাকতে থাকতে বিয়ে দিতে পারতাম তো বাঁচা যেত। তা ছাড়া একটি মাত্র ছেলে, তিনটি যাবার পর ঐ একটি, দেখেন নি বুঝি তাকে? বড্ড রোগা। দেশে আবার যে ম্যালেরিয়া, ভাবতেও হৃৎকম্প হয়। ঐ ছেলেটার জন্যই বড্ড ভাবনায় পড়েছি। আশায় তো বুক বেঁধে আছি, দেখা যাক কি হয়। ওরে ও গিরিধারী, ওরে বাবা রামটহল—একটা বিড়িটিড়ি দে না রে বাবা! আরে মশায়, রিটায়ার করছি কিনা, ব্যাটারা যদি কেউ আর কোনও কথা শোনে। এখনই মুখের উপর কথা বলতে সুরু করেছে সব। এমন সব নেমকহারাম।

আপনি আবার কবে ফিরছেন বাড়ী থেকে? দিন চার পাঁচ পর? দেখা হবে নিশ্চয়ই। আচ্ছা, নমস্কার।

৩

প্রায় দিন চারের পর ফিরিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া আদিত্যবাবুকে দেখিতে পাইলাম না। ষ্টেশন-রুমে উঁকি মারিয়া দেখি, অন্য এক ভদ্রলোক তাঁহার জায়গায় বসিয়া কাজ করিতেছেন। প্ল্যাটফরমে এদিক-ওদিক একটু ঘুরিতেই নজরে পড়িল, এক প্রান্তে একটি আম-গাছের তলায় বেঞ্চের উপর আদিত্যবাবু বসিয়া আছেন, গায়ে সেই পুরাতন সাদা কোট ও মাথায় সেই চির-পরিচিত টুপি নাই, তৎপরিবর্ত্তে গায়ে জীর্ণ ছিটের কোট, মাথাটি খালি। তাঁহার পাশেই একটি সাত-আট বছরের শীর্ণ বালক বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই তিনি ম্লান হাসিয়া কহিলেন—আসুন, আজই চললেন বুঝি।

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই সমস্ত ব্যাপার বুঝিলাম। আমারই কেমন যেন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আদিত্যবাবু বলিলেন—দিলে না এক্‌সটেন্‌সন্‌। যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় সেই দিনই লোক এল রিলিভ করতে। তার তিন দিন আগেই রিটায়ার করবার কথা ছিল কি না। যাক্‌, তিন দিন তো এক্‌সটেনসেন্‌ পাওয়া গেছে। আপনার কথা কিছু ফলেছে বইকি! এই বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই দেখিলাম—তাঁহার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম এই বৃদ্ধের মানসিক ব্যথা, কিন্তু আজ আর সান্ত্বনা দিবার কোন ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। বলিলাম—এটি বুঝি আপনার ছেলে?

—হ্যাঁ। ওর জন্তেই তো ভাবনাটা আরও বেশী হয়েছে। দেখছেন তো কি রোগা। দেশে গেলে যে আবার কি হবে কি জানি। আর একটু বয়স হ'লে দিতাম না হয় আপনারই হেপাজতে। তাই দেব—কি বলেন? ভারী ইনটেলিজেন্ট—আপনি একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন। প্রথম ভাগ শেষ করতে ওর দু-মাসও লাগে নি, এখন তো মহাভারত পর্য্যন্ত পড়তে পারে। আদিপর্ব্বের খানিকটা মুখস্থ বল দেখি খোকা! লজ্জা কি বল্‌ না। দোষ এই যে ভারী লাজুক।

টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। তড়াক করিয়া বেঞ্চ হইতে উঠিয়া পড়িয়াই আবার বসিয়া লজ্জিত ভাবে বলিলেন—এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, আমার যে আর ডিউটি নেই এ-কথাও মাঝে মাঝে ভুলে যাই। নাঃ, এখানে আর থাকা চলবে না, দু-এক দিনের মধ্যে যেতে হবে। কিন্তু বড্ড মায়া ব'সে গিয়েছে। অনেক দিন আছি এখানে—মায়া হবে না? আপনিই বলুন। কিন্তু নূতন যিনি এসেছেন তিনি তো এরই মধ্যে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছেন—বাড়ী ভেকেট করুন, ফ্যামিলি আনব। আজকালকার কেমন ফেলো-ফিলিং দেখছেন তো। আর আমাদের আমলে যে কি ছিল! আরে তুই তো বলিস্‌ বাড়ী ছাড়্‌—অত তাড়াতাড়ি ছাড়ি কি ক'রে বল দেখি বাপু। এত দিনের সংসার গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো? ভেকেট করা কি মুখের কথা। গিন্নি কেঁদেই আকুল—বাড়ীর চার পাশে তাকায় আর কাঁদে। আমগাছে এবার যে বউলটা ধরেছে মশায়, আর পেঁপেগাছটায় ইয়া বড় বড় পেঁপে। চোখে জল ঝরবে না? আমারই মশায় সব দেখে চোখ জ্বালা করে আর ও তো মেয়েমানুষ। আমি এক-এক দিন বেশীর ভাগই এই বেঞ্চিটায় কাটাই। ষ্টেশন-রুমে যেতে ইচ্ছে করে না, আমাকে দেখলে সবাই মুখ টিপে হাসে, বুঝতে পারি সবই। সব ব্যাটাই সমান। সেদিন তো ভেণ্ডার মুখের উপরই ব'লে বসল—বিনি পয়সায় পান-সিগারেট কত জোগাব বাবু, এই বিশ বছর তো এম্‌নি চলেছে। দেখেছেন আস্পর্দ্ধা। হাতে ক্ষমতা নেই কিনা, সবাই একজোট হয়েছে। একবার দেখুন গিয়ে নূতন বাবুর কি খাতির! না চাইতেই পান-সিগারেট জোগাচ্ছে। সবাই যেন জোড়হস্ত। আরে মশায় ভালমানুষের কি আর কাল আছে! নইলে কি এমনি সময়ে আমাকে বিদায় নিতে হয়। কি অন্যায় বলুন তো? এখনও দু-দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি—এই এক রোগা ছেলে—।

ট্রেন আসিয়া পড়িল। আমি উঠিলাম। আদিত্যবাবুও

সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আমাকে ট্রেনে তুলিয়া দিলেন। আমি নমস্কার করিলাম। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমারই যেন কথা জুটিতেছিল না। আদিত্যবাবু নমস্কার করিয়া বলিলেন—মনে থাকবে তো আমাদের কথা? হ্যাঁ, তা হ'লে বছর দুই বাদে ছেলেটাকে আপনার ওখানেই পাঠাচ্ছি—কি বলেন? ওদিকের স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই আপনি বলছিলেন না?

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই তিনি ঘুরিয়া ষ্টেশনের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন—এই ঘণ্টা—। তার পর বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত ভাবে মাথা নীচু করিলেন। ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল বটে; কিন্তু নূতন ষ্টেশন-মাষ্টারের আদেশে। চাহিয়া দেখি—অদূরে রামটহল, গিরিধারী, পান-বিড়িওয়ালা আদিত্যবাবুর দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। আমি পুনরায় হাত তুলিয়া আদিত্যবাবুকে নমস্কার করিলাম। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম্ ছাড়াইবার পর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি—আদিত্যবাবু ট্রেনের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন এবং ঘন ঘন চোখ মুছিতেছেন। মনটা বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে স্বপ্ন

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

আধুনিক প্রগতিপরায়ণ যুগে বঙ্কিমকে স্বপ্নবাদী ঔপন্যাসিক বলা যাইতে পারে। তিনি অতীতের প্রতি স্বপ্নমাখা দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, আনন্দমঠে অতীতের পরিচয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—আর সম্ভবতঃ তাঁহার মত লোক স্বপ্নবাদী নামে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। স্বপ্ন তিনি উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া পাঠকসমাজকে দেখাইয়াছেন—আর নিজেও প্রচুর দেখিয়াছেন। কমলাকান্তের দপ্তরে কত স্বপ্নের কথা আছে—বাঙালীর মধ্যে এমন কে আছে যে আমার দুর্গোৎসবের কথা ভুলিতে পারে। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বঙ্কিমের স্বপ্ন নহে, বঙ্কিমের উপন্যাসে স্বপ্নের স্থান কোথায়, স্বপ্ন তাঁহার কলাকৌশলে কত দূর সহায়তা করিয়াছে, শুধু তাহাই দেখিব।

যখন দুর্গেশনন্দিনী পড়িতে আরম্ভ করি, তখন দেখি, বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম বাংলা উপন্যাসেও স্বপ্নের কারিগরি আছে। একবিংশ পরিচ্ছেদের নামই হইল "সকলে নিষ্ফল স্বপ্ন।" তিলোত্তমা রোগশয্যায় জগৎসিংহকে পাইয়া তিলে তিলে, দিনে দিনে পুনর্জ্জীবন পাইতেছেন। দু-জনে নিত্য অনেক দিনের মনের কথা সকল বলিতেছেন। জাগরণে কি নিদ্রায় কত মনোমোহন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। তাহার পর এক দিন এক বিশেষ স্বপ্নের কথা বলিলেন, ইহা তিলোত্তমা অচেতনে দেখিয়াছিলেন, জগৎসিংহের কণ্ঠে কুসুমমালা পরাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া গেল, তখন কুসুমের নিগড় চরণে পরাইতে গেলেন, পারিলেন না; জগৎসিংহের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, কিন্তু এক ক্ষীণা নির্ঝরিণী বাদ সাধিল, জগৎসিংহ পার হইলেন, তিলোত্তমা পারিলেন না। পথ বন্ধুর, তাঁহার চরণ চলে না, নদী বড় হইতে লাগিল, তীর উচ্চ ও বন্ধুর হইল, উপকূলের মৃত্তিকা চরণতলে খণ্ডে খণ্ডে খসিয়া পড়িতে লাগিল। অকস্মাৎ কালমূর্ত্তি কতলু খাঁ কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে নদীতরঙ্গপ্রবাহমধ্যে নিক্ষেপ করিল। মধুর পরিসমাপ্তির নিকটে আসিয়া এই স্বপ্ন-বিবরণ অবশ্য পাঠকের মনে কোনও বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করে না, সহজেই বুঝিতে পারা

যায় যে ইহা শুধু অতীত ঘটনার ও বর্ত্তমান ভাববিপ্লবের এক সংলগ্ন বা অসংলগ্ন ছবি—আর কিছুই নহে, ভবিষ্যতের কোনও ছায়া এখানে পড়ে নাই। ঔপন্যাসিক সুকৌশলে তিলোত্তমার ভীরু চিত্তের এক সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন, তিলোত্তমার সম্মুখে দৃষ্টি চলে না। আর অতীত আলোড়ন করিয়া কি দেখিলেন, দেখিলেন জগৎসিংহের প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম, কিন্তু জগৎসিংহকে পাইবার পথে বাধা বাড়িতে লাগিল, কতলু খাঁর হাতে পড়িয়া সুখস্বপ্ন নষ্ট হইয়া গেল।

পরবর্ত্তী উপন্যাস কপালকুণ্ডলায় স্বপ্ন আছে, আর সেই স্বপ্নে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও আছে; যে-ইঙ্গিত মানুষকে শুধু অতীতের প্রতিচ্ছায়া দর্শন করাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, ভবিষ্যতে যে কি হইবে তাহারও একটা আভাস দেয়—বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট পথে লোককে ভ্রমণ করায়। এ স্বপ্ন পুরাপুরি স্বপ্ন নয়, অদৃষ্টের সংকেত—যাহা ঘটিবেই তাহার একটা ছায়া—coming events cast their shadows before, এ যেন সেই ছায়া। তাই পরিচ্ছেদের উপরে ইংরেজ কবি বাইরণ হইতে এক ছত্র উদ্ধৃত করা আছে—I had a dream, which was not all a dream. কপালকুণ্ডলা ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ ও অশনিসম্পাতের শব্দের মধ্যে কাপালিক কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া বন হইতে নিজ প্রকোষ্ঠমধ্যে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ঘটনাবহুল রাত্র তাঁহার মনের মধ্যে আলোড়িত হইতে লাগিল। রাত্রে নিদ্রা হইল না; প্রত্যূষে যখন "পূর্ব্বদিকে উষার মুকুটজ্যোতি প্রকটিত হইল", তখন তাঁহার অল্প তন্দ্রা আসিল। দেখিলেন, সাগরের মধ্য দিয়া তিনি তরণী বাহিয়া চলিয়াছেন—সুসজ্জিত তরণী, নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় পরিয়া গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণে আকাশের মেঘ ও সমুদ্রের তরঙ্গ হাসিতে হাসিতে চলিয়াছে, কিন্তু হঠাৎ রাত্রি হইয়া গেল, মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল—নাবিকের সাজসজ্জা, হাসি, সব ম্লান হইয়া গেল। কোথা হইতে বিরাটদেহ এক জটাজুটধারী আসিয়া নৌকাখানি সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল; তখন আবার ভীমকান্ত এক ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার তরী রাখিব কি নিমগ্ন করিব? কে যেন কপালকুণ্ডলাকে দিয়া বলাইল, নিমগ্ন কর। ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল, তখন নৌকাও যেন শব্দময়ী হইয়া কথা কহিয়া উঠিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।" নৌকা কপালকুণ্ডলাকে জলে ফেলিয়া দিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

তিলোত্তমা যে-স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহার মত এ স্বপ্ন সুখের নয়, অতীত ঘটনার ছায়ামাত্র নয়, ইহা ভবিষ্যৎশংসী। পাঠক জানেন, কপালকুণ্ডলার জীবনের অবশিষ্ট স্বল্প ঘটনা এই স্বপ্নের ইঙ্গিতমত আকার ধারণ করিল। ইংরেজ কবির কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে হয়, এ স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নহে। কপালকুণ্ডলার জীবনের সমস্যা ও তাহার সমাধান এই স্বপ্নে মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাঁহার সুখময় শান্তিময় আনন্দময় জীবনের মধ্যে হঠাৎ বিপর্য্যয় আসিয়া উপস্থিত, কাপালিক জীবনতরীকে নিমগ্ন করিতে চাহে। 'অহং ব্রাহ্মণবেশী' বলিয়া যে অদ্ভুত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল সে হয়তো জীবনতরী রক্ষা করিতেও পারিত,—কিন্তু এ সংসারে বাঁচিতে কে চায়?

কপালকুণ্ডলার আর একটি স্বপ্ন আছে। কাপালিক নবকুমারকে তাহার কথা বলিতেছেন; বালিয়াড়ি হইতে তিনি যখন পড়িয়া গেলেন তখন দুই রাত্রি এক দিন প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেন; সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিলেন, ভবানী ভ্রূকুটিভঙ্গে তাঁহাকে তাড়না করিতেছেন, বলিতেছেন, "যত দিন কপালকুণ্ডলাকে আমার সম্মুখে বলি না দিবে তত দিন আমার পূজা করিও না।" কাপালিক অনুকরণীয়-চরিত্র নহেন, তথাপি স্বপ্ন যে প্রকৃত তাহাতে সন্দেহ করার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না। আমাদেরই অন্তরের কামনাবাসনা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া স্বপ্ন-জগতের অস্ফুট আলোকে ধরা দেয় কি না, কে জানে!

তাহার পর মনে পড়ে, ঝুমঝুমপুরে এক নির্ব্বাণদীপ কক্ষে মৃত পিতার শবদেহের উপরই তালবৃন্ত দিয়া ব্যজন করিতে করিতে কুন্দনন্দিনী অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহুর উপরে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা

যাইতেছে। নিদ্রিত অবস্থায় অদ্ভুত স্বপ্ন। উজ্জ্বল নীল আকাশমণ্ডলে সুবৃহৎ চন্দ্রমণ্ডল, সেই চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি কুন্দর নিকটে আসিয়া কুন্দকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিতেছেন—"আমার সঙ্গে চলিয়া আয়, নহিলে বিস্তর দুঃখ পাইবি।" কুন্দের তত দূর যাওয়ার সাহস নাই,—করুণাময়ী মাতা ঈষৎ ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন, "যাহা ইচ্ছা কর, আর এক বার তোমায় দেখা দিব, তখন আসিও, এখন শুধু দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখাই, যদি পার ইহাদিগকে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও।" বঙ্কিমপ্রেমিককে বলিয়া দিতে হইবে না যে ইঁহাদের একজন মহাপুরুষপ্রতিম মহদাশয় দেবকান্তি নগেন্দ্রনাথ, অন্য জন উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশনয়না হীরা। কুন্দ passive, কিন্তু বিষবৃক্ষের active agent ইহারাই। স্বপ্নের যদি পৃথক সত্তা না-ই থাকিবে, যদি তাহা দর্পণবৎ আমাদের মনোভাবেরই প্রতিচ্ছায়া হইবে, তবে এখানে তাহার অর্থ কি? ঔপন্যাসিক সমগ্র কাহিনীর করুণ পরিণতি কৌশলে সূচিত করিয়া পাঠককে অনর্থপাতের জন্য প্রস্তুত রাখিলেন।

বিশেষ করিয়া এই স্বপ্ন। নগেন্দ্রনাথ ও হীরার প্রথম সন্দর্শনে কুন্দ যেমন চমকিত হইয়াছিল, তাহা মনে আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া কুন্দের দ্বিতীয় স্বপ্নের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে।

সূর্য্যমুখী গৃহপ্রত্যাগতা হইয়াছেন, নগেন্দ্রের মুখে হাসি ফুটিয়াছে, কিন্তু কুন্দ তাহা জানে না; নগেন্দ্র দীর্ঘ প্রবাসের পর তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন না। কোমলস্বভাব বালিকার সে কী মর্ম্মান্তিক দুঃখ! সমস্ত রাত্রি জাগরণের ফলে প্রভাতকালে তাহার তন্দ্রা আসিল। নীলনীরদজালসমারূঢ়া সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি; গম্ভীর-ভাবাপন্ন হইয়া আবার প্রশ্ন করিতেছেন, "সংসারের সুখ তো দেখিলে! এখন আমার সঙ্গে আসিবে কি?" কুন্দ কাঁদিয়া কহিল, "মা, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, আর এখানে থাকিতে চাই না।" নিদ্রাভঙ্গে কুন্দ দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিল, স্বপ্ন সফল হউক! এই স্বপ্ন তাহাকে হীরার নিকট হইতে বিষ ভক্ষণে প্ররোচিত করিল। জীবনে আর কুন্দের সাধ নাই। মৃত্যু তাহার নিকট পরম ভরসা আনিয়া দিবে।

কুন্দের স্বপ্নে আর নগেন্দ্রের স্বপ্নে কিন্তু অনেক প্রভেদ। নগেন্দ্র যখন শ্রীশচন্দ্রের নিকট সূর্য্যমুখীর পথ ক্লেশের কথা শুনিতেছিলেন, তখন তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, সূর্য্যমুখী রত্নসিংহাসনে রাজরাণী হইয়া বসিয়া; শীতল সুরভি বায়ুতে তাঁহার কেশদাম দুলিতেছে; পদতলে শত কোকনদ, সিংহাসন-চন্দ্রাতপে শত চন্দ্র ভাস্বর,—আর তিনি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে অসুরদিগকে নগেন্দ্রের তাড়না হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। ইহা অবাস্তব কল্পনার মূর্ত্তি, অভিজ্ঞতার সহিত ইহার কোনও সঙ্গতি নাই। এ যেন ঠিক হেমচন্দ্রপ্রত্যাখ্যাতা গিরিজায়াসহচারিণী সোপানোপরি নিদ্রাভিভূতা মৃণালিনীর স্বপ্নের মত,—সেই যে অনাহারে অনিদ্রায় দুর্ব্বলা মৃণালিনী তন্দ্রার ঘোরে দেখিলেন, হেমচন্দ্র একাকী সর্ব্বসমরে বিজয়ী—তাঁহার অগ্রে-পশ্চাতে, কত হস্তী, কত অশ্ব, কত পদাতি যাইতেছে, হেমচন্দ্র সন্দর্শনে আগতা মৃণালিনী সেই সৈন্যতরঙ্গে পদদলিত, কিন্তু হেমচন্দ্র নিজের সৈন্ধবী তুরঙ্গী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে উঠাইতেছেন, আর বলিতেছেন, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।" সত্য বটে, হেমচন্দ্র বাস্তবিক তখন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐ কথাই বলিতে-ছিলেন, তবে বাস্তবে ও কল্পনায় শুধু ঐটুকুই মিল, আর সবই গোল। এরূপ স্বপ্ন কর্ম্মবুদ্ধিকে পরিচালিত করে না।

স্বপ্ন আবার দেখিতে ইচ্ছা না করিলেও দেখা যায়, অন্যে দেখাইতে পারে। নগেন্দ্রনাথ দুঃখ-শোকে আর্ত্ত হইয়া যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা আর কেহ তাঁহাকে দেখায় নাই; তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফলাফলই এজন্য দায়ী। কুন্দ যে দুইটি স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার প্রেরণা দৈবী। কিন্তু রজনীতে সন্ন্যাসী শচীন্দ্রকে বলিতেছেন,

> "আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, তোমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি। কিন্তু যে তোমাকে এখন ভালবাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিদ্যার অতীত।"

সেই দিন শচীন্দ্র স্বপ্ন দেখিলেন; দেখিলেন, কলকল

গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতভূমি, তাহার প্রান্তভাগে অর্দ্ধজলমগ্না রজনী। শুধু নিদ্রায় স্বপ্ন নহে, জাগ্রতেও এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন ; শচীন্দ্রনাথের কথায়—

"চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহ্যবস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু কি দেখিতেছি তাহা বলিতে পারি না।"

তাঁহার সম্মুখে প্রভাতবীচিবিক্ষেপচপলা কলকলনাদিনী গঙ্গা, উষার রক্তিম রাগে পূর্ব্ব দিক উজ্জ্বল, আর—রজনী সৈকতমূল হইতে জলে নামিতেছে—অন্ধ, অথচ কুঞ্চিতভ্রূ ; বিকলা অথচ স্থিরা ; প্রভাতশান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা, আবার সেই ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী! লোকে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিয়া জাগরণ করে। শচীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই স্বপ্ন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চিকিৎসা হইল, তাহাতে কিছু ফল দর্শিল না। কিন্তু এই স্বপ্নের জন্য সন্ন্যাসীকেই বা দায়ী করি কেন? তিনি নিজেই বলিতেছেন,—

'শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে আমি কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিলাম। তাহাতে যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে, তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল।

এই বীজকে অঙ্কুরিত, প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিল, অত্যধিক বিদ্যালোচনাজনিত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ততা। আবার অত্যধিক বিদ্যালোচনার কারণ,—আসন্ন দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার একান্ত চেষ্টা। সুতরাং অবস্থাবৈগুণ্য না হইলে সন্ন্যাসীপ্রদর্শিত এই স্বপ্ন সম্ভবতঃ শচীন্দ্রের জীবনে ও সেই সঙ্গে রজনীর জীবনে একটা আমূল পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা সূচিত করিত না।

আনন্দমঠে সন্তানেরা ভক্তিমূল্যে সিদ্ধির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চাহে, সেখানে অস্ত্রের ঝনঝন্, জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র, বন্দে মাতরম্ গীতে সর্ব্বদিক মুখরিত—কিন্তু এ হেন বিপ্লববাদী উপন্যাসেরও অনেকখানি গতি নির্ভর করে কল্যাণীর স্বপ্নের উপর। কল্যাণী শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন এক জ্যোতির্ম্ময় স্থানে গিয়াছেন, সেখানে মনুষ্য নাই, শব্দ নাই, শুধু মৃদু মধুর গীতবাদ্যের মত শব্দ, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত মল্লিকা মালতী গন্ধরাজের গন্ধ ; সকলের উপরে কে যেন বসিয়া আছেন, মাথায় অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট, আর এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ যে চাহিয়া দেখিতে পারা যায় না ; তাহার সম্মুখে মেঘমণ্ডিতা জ্যোতির্ম্ময়ী শীর্ণা স্ত্রীমূর্ত্তি, কল্যাণীকে দেখাইয়া বলিতেছে, 'ইহার জন্যই মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' তখন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস।' কল্যাণী কাঁদিয়া বলিল, 'স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে?' তখন আবার বাঁশীর শব্দে ভাসিয়া আসিল—'আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।' কল্যাণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

আনন্দমঠে এই একটিমাত্র স্বপ্ন আছে। ইহা বইখানির গোড়ার দিকে। মহেন্দ্র-কল্যাণীর মন প্রথমে পারিবারিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের গণ্ডী ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারে নাই, কিন্তু যে কারণ-পরম্পরায় সে-গণ্ডী দূর হইয়া গেল, তাহার মধ্যে স্বপ্নে এই দেবাদেশ বা দৈবাদেশ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। আর ইহা যে কাহারও অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিবিশেষের ইঙ্গিতে ইচ্ছাশক্তিতে বা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে আয়োজনে ঘটিয়াছে তাহাও নহে। আনন্দমঠের গোড়াপত্তন যদি মহেন্দ্রের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিবার ফলে সম্ভব হইয়া থাকে, তবে সেই উদ্বোধনে এই স্বপ্নের কিছু হাত আছে স্বীকার করিতে হইবে,—তখন তখনই সঙ্কল্প স্থির না করিয়া ফেলিলেও যখন সুকুমারী বিষবড়ি গিলিয়া ফেলিল তখন 'দৈবাদেশ ঘটনাচক্রে সমর্থন লাভ করিল' বলিয়া মহেন্দ্র-কল্যাণী মনে করিলেন।

আর একটি স্বপ্নের কথা বলিয়াই বঙ্কিম-সাহিত্যে স্বপ্নমালার এই নীরস বিবরণ শেষ করিব, শৈবলিনীকে সে স্বপ্ন দেখান হইয়াছিল। মহান্ধকারময় পর্ব্বতগুহায় পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া শৈবলিনীর চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। তখন শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে রুধিরের স্রোত—নদীর বিস্তার অন্তহীন। মহাকায় পুরুষের জলন্ত লোহিত

লৌহনির্ম্মিত বেত্রের তাড়নায় তাহাকে সেই নদীতে সাঁতার দিতে হইল; তাহার পরে যে নরকযন্ত্রণা, তাহা শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীই বর্ণনা করিতে পারে—শৈবলিনী নিজে আতঙ্কে পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া উঠিল—সে-চীৎকারে তাহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়। এই স্বপ্নের পর তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল; সপ্তাহব্যাপী অনন্যমনা হইয়া স্বামীর ধ্যান—সপ্তম রাত্রে শৈবলিনী একাকী স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে চেতনা হারাইল। আবার স্বপ্ন দেখা সুরু হইল—শতংশত পরিমিত সর্পগণ তাহাদের ফণা বিস্তার করিয়া শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে, চন্দ্রশেখর এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ দিয়া দাঁড়াইবা মাত্র তাহারা বন্যার জলের মত সরিয়া গেল। আবার দেখিল, অনন্তকুণ্ডে পর্ব্বতাকার অগ্নিতে শৈবলিনী দগ্ধ হইতেছে, চন্দ্রশেখর আসিয়া তাহাতে এক গণ্ডুষ জল নিক্ষেপ করিলে, অগ্নিরাশি অমনি নিবিয়া গেল; আবার দেখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শৈবলিনীকে মুখে করিয়া পর্ব্বতে লইয়া যায়, চন্দ্রশেখর পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প ছুঁড়িয়া ব্যাঘ্রকে মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই প্রাণ হারাইল—তখন শৈবলিনী দেখিল, তাহার মুখ ফষ্টরের মুখের ন্যায়। সেইদিন রাত্রিশেষে আবার স্বপ্ন দেখিল—পিশাচ তাহার কেশ ধরিয়া দেহ লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া। শৈবলিনী নরকে পড়িতে পড়িতে একান্তমনে স্বামীর দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল—চেতনাপ্রাপ্তে দেখিল, ব্রহ্মচারীবেশে চন্দ্রশেখর বসিয়া, তাঁহার অঙ্কে মাথা দিয়া সে শুইয়া আছে। অল্পক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইল বটে, কিন্তু উপবাসে ও মানসিক ক্লেশে বায়ুরোগ উপস্থিত হইল। রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে চন্দ্রশেখরের ঔষধ প্রয়োগে সে রোগ দূর হইল, যোগবলই হউক আর psychic forceই হউক, তাহাতে সে রোগের উপশম হইল—এখনকার দিন হইলে (সম্ভবতঃ বঙ্কিমের দিনেও, কারণ টেকচাঁদী উপন্যাসে ইহার সবিস্তর বর্ণনা আছে) বলিতাম, মেস্‌মেরিজ্‌মের ফলে রোগ সারিল।

উপরে দশটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিলাম। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শুধু আত্মকৃত, কয়েকটি দৈবকৃত, আর কয়েকটি মনুষ্যকৃত—যোগবলই বলুন আর মেস্‌মেরিজ্‌ম্ বা psychic forceই বলুন, কি তান্ত্রিক প্রক্রিয়াই বলুন—তাহার সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। যে সকল স্বপ্ন নিজের মনে মনে অমনি ফুটিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে কোনও কথা বলার নাই—কিন্তু যাহাতে ভবিষ্যতের ঘটনার ছায়া পড়ে ও যাহা সাধু-সন্ন্যাসীর চেষ্টায় সম্ভব হয় তাহাদের কথা অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক জগতের একটা ছায়া—অবশ্য ছায়ামাত্র—আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নের ফলাফলে বিশ্বাস করিতেন; ইংরেজী শিক্ষা, তথাকথিত যুক্তিবাদ, কিংবা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি তাঁহার দৃষ্টি অন্ধ করে নাই। যেখানে সাধনলভ্য মন্ত্র স্বপ্নে পাওয়া যায়, যেখানে গুরুর দর্শনও স্বপ্নে সম্ভবে, যেখানে পিতা, গুরুজন, বা বিশেষ বন্ধুগণ স্বপ্নে আসিয়া নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি, যে-দেশের দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা দৈবযোগে স্বপ্নপ্রাপ্ত ঔষধে চলে এবং ব্যাধি আরোগ্য হয়, সেই দেশে সেই জাতিতে, সেই সমাজে জন্মিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নের মধ্যে যে বাস্তবিক কিছু থাকিতে পারে তাহা অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইংরেজ নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে স্বপ্নের যে স্থান আছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্বপ্ন তাহা অপেক্ষা অধিক পরিসর অধিকার করিয়া আছে।

স্বপ্নদর্শনের অর্থ সম্বন্ধে অনেক জীবসেবাপরায়ণ সত্যাশ্রয়ী সাধুর নিকট প্রশ্ন করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা এই স্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্নসম্বন্ধে ধারণা আমাদের নিকট স্পষ্টতর প্রতীয়মান হইবে বলিয়া মনে করি :—

(১) সাধারণ লোকে সাধারণ ভাবে যে-সব স্বপ্ন দর্শন করে। ইহা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষীকৃত বিষয়জনিত সংস্কারের পুনরাবৃত্তি মাত্র—ইহার সঙ্গে অতীত অনুভূতির সম্বন্ধ। ইহা সময় সময় অস্পষ্ট ও অসম্বদ্ধ। ইহার ফলাফল লইয়া মাথা ঘামাইবার কারণ নাই। এই স্বপ্ন সাধারণতঃ মনের তামসিক ও রাজসিক অবস্থায়ই দৃষ্ট হয়।

(২) যে স্বপ্ন আমরা অনেকটা শান্ত সাত্ত্বিক অবস্থায় জীবিত বা মৃত উন্নত আত্মা হইতে লাভ করি। ইহার অধিকাংশই সত্য হইয়া থাকে; ইহার সম্বন্ধ ভবিষ্যতের সঙ্গে। স্বপ্নে ঔষধ বা উপদেশ লাভ, সাধুদর্শনাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) যে স্বপ্ন ভিতর হইতে আগত (intuitional)—যাহা শুদ্ধচিত্তে আত্মার প্রকাশ। যে স্বপ্ন সমষ্টিলব্ধ জ্ঞানের উপরে স্থাপিত ও প্রধান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের সম্বল। এই লব্ধজ্ঞান নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা-পরমাত্মা-সম্বন্ধীয়।

তার পরে স্বপ্ন সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় চিন্তনীয়—শ্রেষ্ঠ সাধকগণ ইচ্ছানুসারে স্বপ্ন দেখিতে বা দেখাইতে পারেন, তাঁহারা স্বপ্নে কঠিন কঠিন সমস্যার মীমাংসা লাভ করেন, ইচ্ছামত নির্দ্দিষ্ট আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন, স্বপ্নের সাহায্যে দূরদেশে অবস্থিত লোককে, লোকের মনের ভাবকে, সন্দর্শন করেন, লোককে স্বপ্নাবস্থায় আনয়ন করিয়া তাহার চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া তাহার সাহায্যে অনেক অলৌকিক বিষয়ের তত্ত্ব সংগ্রহ করেন।

স্বপ্নসম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণাও মোটামুটি এইরূপ ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সময়হারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডাক্তারেতে বলে যখন, মরেছে এই লোক
তাহার তরে মিথ্যা করা শোক,
কিন্তু যখন বলে জীবন্মৃত,
সেটা শোনায় তিতো।
আমার ঘটল তাই
নালিশ তবু নাই।

কথাটা আর রয় না গোপন, সময় আমার গেছে,
রটায় ওরা,—আমার গড়া পুতুল যারা বেচে
হাল আমলে এমনতরো পসারী আজ নেই
সাবেক কালের দালান ঘরের পিছন দিকের কোণেই
ক্রমে ক্রমে
উঠছে জমে
আমার হাতের খেলনাগুলো,
টানছে ধুলো।

হাল আমলের ছাড়পত্রহীন
অকিঞ্চনটা লুকিয়ে কাটায় জোড়াতাড়ার দিন।
ভাঙা দেয়াল ঢেকে একটা ছেঁড়া পর্দা টাঙাই,
ইচ্ছে করে পৌষমাসের হাওয়ার তোড়টা ভাঙাই ;
ঘুমোই যখন ফড়ফড়িয়ে বেড়ায় সেটা উড়ে,
ব্যাপারখানা হয়ে পড়ে নিতান্ত ভুতুড়ে।
আধপেটা খাই শালুকপোড়া, একলা কঠিন ভুঁয়ে
চ্যাটাই পেতে শুয়ে
ঘুম হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আউড়ে চলি শুধু আপন মনে—

"উড়কি ধানের মুড়কি দেব বিন্নে ধানের খই,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব, কাগমারে দই।"
আমার চেয়ে কম ঘুমন্ত নিশাচরের দল
খোঁজ নিয়ে যায় ঘরে এসে, হায় সে কী নিষ্ফল।
একটু যখন আসে ঘুমের ঘোর
সুড়সুড়ি দেয় আসসুলারা পায়ের তলায় মোর।
দুপুর বেলায় বেকার থাকি অন্যমনা;
গিরগিটি আর কাঠবিড়ালীর আনাগোনা
সেই দালানের বাহির ঝোপে;
থামের মাথায় খোপে খোপে
পায়রাগুলোর সারাটা দিন বকম্ বকম্
আঙিনাটার ভাঙা পাঁচিল, ফাটলে তার রকম রকম
লতাগুল্ম পড়ছে ঝুলে,
হলদে সাদা বেগনি ফুলে
আকাশ পানে দিচ্ছে উঁকি।
ছাতিম গাছের মরা শাখা পড়ছে ঝুঁকি
শঙ্খমণির খালে,
মাছরাঙারা দুপুর বেলায় তন্দ্রা-নিঝুম কালে
তাকিয়ে থাকে গভীর জলের রহস্যভেদরত
বিজ্ঞানীদের মতো।
পানাপুকুর, ভাঙনধরা ঘাট,
অফলা এক চালতা গাছের চলে ছায়ার নাট।
চক্ষু বুজে ছবি দেখি, কাৎলা ভেসেছে
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
ঝাউগুঁড়িটার পরে
কাঠঠোকরা ঠকঠকিয়ে কেবল প্রশ্ন করে।
আগে কানে পৌঁছত না ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক
এখন যখন পোড়ো বাড়ি দাঁড়িয়ে হতবাক
ঝিল্লিরবের তানপুরা-তান স্তব্ধতা সংগীতে
লেগেই আছে একঘেয়ে সুর দিতে।
আঁধার হোতে না হোতে সব শেয়াল ওঠে ডেকে
কলুমিদিঘির ভাঙা পাড়ির থেকে।

পেঁচার ডাকে বাঁশের বাগান ভয়ে জাগে,
তন্দ্রা ভেঙে বুকে চমক লাগে।
বাদুড়ঝোলা তেঁতুল গাছে মনে যে হয় সত্যি
দাড়িওয়ালা আছে ব্রহ্মদত্যি।
রাতের বেলায় ডোমপাড়াতে কিসের কাজে,
তাকধুমাধুম বাদ্যি বাজে।
তখন ভাবি একলা ব'সে দাওয়ার কোণে
মনে মনে
ঝড়েতে কাৎ জারুল গাছের ডালে ডালে
পিরভু নাচে হাওয়ার তালে।

শহর জুড়ে নামটা ছিল, যেদিন গেল ভাসি
হলুম বনগাঁবাসী।
সময় আমার গেছে বলেই সময় থাকে পড়ে
পুতুলগড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেয়াল গড়ে।
সজনে গাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে,
গোধূলিতে সুয্যিমামার বিয়ে,
মামি থাকেন সোনার বরন ঘোমটাতে মুখ ঢাকা,
আলতা পায়ে আঁকা।
এইখানেতে ঘুঘুডাঙার খাঁটি খবর মেলে
কুলতলাতে গেলে।
সময় আমার গেছে বলেই জানার সুযোগ হোলো,
"কলুদ ফুল" যে কাকে বলে, ঐ যে থোলো থোলো
আগাছা জঙ্গলে
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুকরো জ্বলে।
বেড়া আমার সব গিয়েছে টুটে ;
পরের গোরু যেখান থেকে যখন খুশি ছুটে
হাতার মধ্যে আসে
আর কিছু তো পায় না খুঁজে খিদে মেটায় ঘাসে।
আগে ছিল সাটন্ বীজে বিলিতি মৌসুমি
এখন মরুভূমি।

সাত পাড়াতে সাত কুলেতে নেইকো কোথাও কেউ
মনিব যেটার, সেই কুকুরটা কেবলি ঘেউ ঘেউ
লাগায় আমার দ্বারে, আমি বোঝাই তারে কত
আমার ঘরে তাড়িয়ে দেবার মতো
ঘুম ছাড়া আর মিলবে না তো কিছু,
শুনে সে ল্যাজ নাড়ে, সঙ্গে বেড়ায় পিছু পিছু।
অনাদরের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে পিঠের পরে
জানিয়ে দিলে লক্ষ্মীছাড়ার জীর্ণ ভিটের পরে
অধিকারের পাকা দলিল দেহেই বর্তমান।
দুর্ভাগ্যের নতুন হাওয়া-বদল করার স্থান
এমনতরো মিলবে কোথায়। সময় গেছে তারই
সন্দেহ তার নেইকো একেবারেই।
সময় আমার গিয়েছে তাই, গাঁয়ের ছাগল চরাই,
রবিশস্যে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই।
খুদ কুঁড়ো যা বাকি ছিল ইঁদুরগুলো ঢুকে,
দিল কখন ফুঁকে।
শোচনীয় এই যে খবরখানা
আছে শুধু এক মহলেই জানা।
বাকি রইল অনেক অবোধ যাদের আশা আছে
ঘোরে আমার আনাচে কানাচে।

হাওয়ার ঠেলায় শব্দ করে আগলভাঙা দ্বার,
সারাদিনে জনামাত্র নেইকো খরিদ্দার।
কালের অলস চরণপাতে
ঘাস উঠেছে ঘরে আসার বাঁকা গলিটাতে।
ওরি ধারে বটের তলায় নিয়ে চিঁড়ের থালা
চড়ুই পাখির জন্যে আমার খোলা অতিথশালা।

সন্ধে নামে পাতাঝরা শিমুল গাছের আগায়,
আধ ঘুমে আধ জাগায়
মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পসুটারিটির পথে
স্বপ্ন মনোরথে;—

কালপুরুষের সিংহদ্বারের ওপার থেকে
শুনি কে কয় আমায় ডেকে,
ওরে পুতুল-ওলা
তোর যে ঘরে যুগান্তরের দুয়ার আছে খোলা,
সেথায় আগাম বায়না-দেওয়া
খেলনা যত আছে
লুকিয়ে ছিল গ্রহণলাগা ক্ষণিক কালের পাছে ;
আজ চেয়ে দেখ্, দেখতে পাবি,
মোদের দাবি
ছাপ দেওয়া তার ভালে।
পুরানো সে নতুন আলোয় জাগ্‌ল নতুন কালে।
সময় আছে কিংবা গেছে দেখার দৃষ্টি সেই
সবার চক্ষে নেই—
এই কথাটা মনে রেখে ওরে পুতুল-ওলা
আপন সৃষ্টি মাঝখানেতে থাকিস আপনভোলা।
ঐ যে বলিস, বিছানা তোর ভুঁয়ে চ্যাটাই পাতা,
ছেঁড়া মলিন কাঁথা,
ঐ যে বলিস, জোটে কেবল সিদ্ধ কচুর পথ্যি,
এটা নেহাৎ স্বপ্ন কি নয়, এ কি নিছক সত্যি।
পাস নি খবর বাহান্ন জন কাহার
পালকি আনে শব্দ কি পাস তাহার।
বাঘনাপাড়া পেরিয়ে এল ধেয়ে,
সখীর সঙ্গে আসছে রাজার মেয়ে।
খেলা যে তার বন্ধ আছে তোমার খেলনা বিনে,
এবার নেবে কিনে।
কী জানি বা ভাগ্যি তোমার ভালো,
বাসর ঘরে নতুন প্রদীপ জ্বালো ;
নবযুগের রাজকন্যা আধেক রাজ্যসুদ্ধ
যদি মেলে, তা নিয়ে কেউ বাধায় যদি যুদ্ধ,
ব্যাপারখানা উচ্চতলায় ইতিহাসের ধাপে
উঠে পড়বে মহাকাব্যের মাপে।
বয়স নিয়ে পণ্ডিত কেউ তর্ক যদি করে

বলবে তাকে, একটা যুগের পরে
চিরকালের বয়স আসে সকল পাঁজিছাড়া,
যমকে লাগায় তাড়া।

এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপমাত্র,
নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র;
পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা

শান্তিনিকেতন
শ্যামলী
১।১।৩৯

বিজ্ঞানের আধুনিক ভাবধারা

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু দিন পূর্ব্বে কোনও এক দার্শনিক পণ্ডিতের সহিত বিজ্ঞান-বিষয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। তাঁহার মতে বিজ্ঞান মানবজাতির মানসিক অবনতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। তাঁহার এই অভিমতটি অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়। তিনি বোধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অবস্থা ও ধারা বিচার করিয়াই এই কথা বলিয়া থাকিবেন। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং ইহার ভাব ও ধারা ভিন্ন মার্গে পরিচালিত হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনায় সতেজ ও উর্ব্বর কল্পনাশক্তির উৎকর্ষ-সাধনের প্রভূত সুযোগ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান বর্ত্তমান সময়ে নবরূপ ধারণ করিয়া মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ সংঘটনে ও মানবাত্মার ক্রমোন্নতি সাধনে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। গত শতাব্দীতে পণ্ডিতেরা এই মত পোষণ করিতেন যে, প্রকৃতির সকল ব্যাপারই ক্রিয়াবদ্ধ বা mechanised ভাবে সংঘটিত হইতেছে। জার্ম্মান পণ্ডিত হেল্ম্‌হোল্‌ৎস্‌ মনে করিতেন যে, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি কার্য্যকারণ নীতির (Law of Cause and Effect-এর) শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণ প্রণালীর পথে পরিচালিত হইতেছে; এবং ঘটনাগুলির নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট মার্গ হইতে বিচ্যুত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। গত শতাব্দীতে ব্রিটিশ পদার্থবিৎ কেলভিন্‌ এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেন যে, অহেতুকভাবে কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা কখনও ঘটিতে পারে তিনি কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানসেবীদের উপর কার্য্য-কারণ নীতির অক্ষুণ্ণ আধিপত্য ছিল। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপ কতকগুলি ঘটনা আবিষ্কৃত হইল যাহাতে কার্য্য-কারণবাদের অকাট্যতা বিষয়ে পণ্ডিতেরা বিশেষ সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কার্য্য-কারণবাদ ব্যতীত অনিশ্চিতবাদ (Law of Uncertainty) দ্বারা প্রাকৃতিক অনেক ঘটনাই পরিচালিত হইতেছে। অবশ্য কার্য্যকারণ নীতিকে একেবারে পরিহার করা যায় না। কার্য্য-কারণবাদ

ও অনিশ্চিতবাদ এই দুই নীতির দ্বারাই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি চালিত হইতেছে। অনিশ্চিতবাদ বিষয়ে কিছু বিশদভাবে বলিতে চেষ্টা করিব।

রেডিয়াম ধাতু অমিশ্র অবস্থায় স্বকীয় গুণে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় ও অতি সূক্ষ্ম রশ্মিকণা ইহা হইতে নিঃসৃত হয়। আরও কয়েকটি ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে যেগুলির গুণ ও আচরণ অনেকটা রেডিয়ামেরই ন্যায় লক্ষিত হয়। এই ধাতুগুলিকে "রশ্মিশক্তিশালী" (radio-active) বলা হয়। প্রত্যেক রশ্মিশালী পদার্থ অগণনীয় রশ্মিশক্তিশালী পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। একটি পরমাণুর সঙ্গে অন্য কোনও পরমাণুর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি পরমাণু একই ভাবে গঠিত, অবস্থিত ও আবেষ্টিত। কেন যে একটি পরমাণু প্রথমে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় ও তাহার পরে অন্যান্যগুলি ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হয়, ইহার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না। কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট পরমাণুর ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াও আমরা বলিতে অসমর্থ যে, ঠিক কোন্ সময়ে এই পরমাণুটি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে। নিরঙ্কুশ "দৈব" যেন আপন ইচ্ছামত পরমাণুগুলিকে বিশ্লিষ্ট ও বিযুক্ত করিতেছে। কোন্ পরমাণুটি আগে বিশ্লিষ্ট হইবে আর কোন্‌টি বা পরে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখিলে প্রত্যেক পরমাণুই অনিশ্চিত-বাদের অধীন। কিন্তু অনেকগুলি পরমাণু একত্রীভূত হইয়া সমষ্টিবদ্ধ হইলে তাহাদের উপর Definite Law বা নির্দ্দিষ্ট নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক জন সুনিপুণ তীরন্দাজ যদি লক্ষ্য ভেদ করিতে আরম্ভ করে, আমরা অনেকটা নিশ্চিত হইয়া বলিতে পারি যে, সে শতকরা আশী-বার কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু কোনও একটি শর নিক্ষিপ্ত হইবার পর লক্ষ্যের কেন্দ্রস্থল যে ভেদ করিবেই এই বিষয়ে আমরা কৃতনিশ্চয় হইতে পারি না।

তড়িৎ দুই প্রকার, ধনাত্মক (positive) ও ঋণাত্মক (negative)। ঋণাত্মক বিদ্যুতের যে কণা ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না তাহাই ঋণাণু (electron)। ধনাণু (positron) সেইরূপ ধনাত্মক বিদ্যুতের ক্ষুদ্রতম কণা। ধনাণু ও ঋণাণুর জড়-পরিমাণ (mass) সমান। Proton বা বৃহৎ ধনাণুও ধনাত্মক বিদ্যুতের অবিভাজ্য কণা। বৃহৎ ধনাণুর জড়ত্বের পরিমাণ ঋণাণুর প্রায় ১৮০০ গুণ। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি বিভিন্ন অনুপাতে ধনাণু, ঋণাণু, জড়াণু ও বৃহৎ ধনাণুর সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক এটম বা পরমাণু এক-একটি সৌরজগৎ। কেন্দ্রস্থলে বৃহৎ ধনাণু ও জড়াণু (neutron) পিণ্ডীভূত অবস্থায় আছে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে গোলাকার কিংবা অণ্ডাকার মার্গে ঋণাণুগুলি অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে। প্রত্যেক কেন্দ্রকে আবেষ্টন করিয়া সাধারণতঃ একাধিক orbit অর্থাৎ কক্ষ আছে এবং এক একটি কক্ষে একাধিক ঋণাণু পরিভ্রমণ করিতেছে। কোনও একটি পরমাণুর উপর যদি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক "আল্‌ফা" বা "বিটা" রশ্মি ক্ষিপ্রবেগে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঋণাণুগুলি অলোড়িত ও কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে এবং কক্ষান্তরে গিয়া আশ্রয় লয়। ঋণাণুগুলি যখন এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে আশ্রয় লয় তখনই আলোক ও তাপের বিকীরণ কিংবা শোষণ (radiation or absorption) হয়। "আলফা" কিংবা "বিটা" রশ্মি প্রয়োগ করিলে কোন্ কক্ষের কোন্ ঋণাণুটি মার্গচ্যুত হইয়া অন্য কোন্ কক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহার অনুসন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। এই স্থলে ঋণাণুর আচরণ বিবিধ প্রকারে অনিশ্চিত ও স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাতে মনে হয় যেন ঋণাণুগুলি "স্বাধীন ইচ্ছা" লইয়াই সৃষ্ট হইয়াছে।

বিবর্ত্তনবাদী ডারউইনের পৌত্র সি. এইচ. ডারউইন দুই প্রকার "স্বাধীন ইচ্ছার" কথা বলিয়াছেন— "তোমার স্বাধীন ইচ্ছা" ও "আমার স্বাধীন ইচ্ছা"। আমি যখন আমার হস্ত উত্তোলন করি, এই কার্য্যটি আমার স্বেচ্ছাকৃত এবং আমার নিকট ইহা অহেতুকী মনে হয় না। ইহাই "আমার স্বাধীন ইচ্ছা"। কিন্তু তুমি যখন তোমার হস্ত উত্তোলন কর তাহা আমার নিকট অনিয়মিত ও অহেতুককল্পনাপ্রসূত মনে হয়। ইহাই "তোমার স্বাধীন ইচ্ছা"। স্বাধীন ইচ্ছা যেমন দুই প্রকার, এইরূপ অনিশ্চিতবাদও দুই প্রকার। অনির্দ্দিষ্ট-বাদের সহিত সম্ভাবনা-নীতির (Law of Probability-র) বিশেষ সম্বন্ধ আছে। পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় কিংবা ব্যক্তিগত ভাবে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি লইলে অনির্দ্দিষ্টবাদের প্রয়োগ

অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পরন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা ক্রমিকতা-বিহীন বিচ্ছিন্নতায় (discontinuity-র) পরিচয় পাই। অপর দিকে যদি কার্য্যকারণনীতি কেবল সত্য হয় তাহা হইলে প্রাকৃতিক সকল ঘটনাকেই এক সার্ব্বভৌমিক ধারাবাহিক নিরন্তর (continuous) নিয়মের অধীন হইতে হইবে।

নিশ্চেষ্ট অপরিবর্ত্তনশীল বৈশিষ্ট্যহীনতা (dead uniformity) জগৎ ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। এ-জগতে বৈসাদৃশ্য ও বিভিন্নতার প্রকৃত প্রয়োজন। বিশ্বজগৎ বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যময়। নানারূপ বিভিন্নতা ও বিবিধত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য আনয়ন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সঙ্গীতশাস্ত্রে বিভিন্ন সুর আছে। সুনিপুণ গায়ক ইহাই দেখিয়া থাকেন যেন সুরগুলির মধ্যে প্রকৃত মিল থাকে যাহাতে সঙ্গীত সুললিত ও সুমধুর হয়। সুরগুলির মধ্যে অমিল ও ঐক্যের অভাব থাকিলে সঙ্গীত শ্রুতিকঠোর ও কর্কশ হইয়া যায়।

আমরা এক্ষণে দ্বৈতবাদ (Principle of Duality) এবং সাপেক্ষবাদ (Principle of Relativity) এই দুইটি বিধির আলোচনা করিব। বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এই দুইটি নীতির প্রবল প্রভাব। মনোবিজ্ঞানে দ্বৈতবাদ বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে, কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানে সম্প্রতি ইহার প্রচলন হইয়াছে। ঋণাণু ও ধনাণুর বিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক শ্রেণীর যন্ত্রপাতি দিয়া পরীক্ষা করিলে এই তড়িৎকণাগুলিকে জড়পদার্থের অণু (particle) বলিয়াই মনে হয়। আবার ভিন্ন শ্রেণীর যন্ত্রাদি দিয়া পরীক্ষা করিলে এই কণাগুলিকে পুঞ্জীভূত তরঙ্গমালা (packets of waves) বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তড়িৎ-কণাগুলি দ্বৈতগুণবিশিষ্ট; কখনও কখনও ইহারা "অণু"-রূপ ধারণ করে আর কখনও বা "তরঙ্গ"রূপে আবির্ভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহারা কি দিয়া গঠিত. তাহা বলা যায় না। ঋণাণু কিংবা ধনাণুর এই দ্বি-প্রকার আচরণ পরস্পর-বিরোধী (contradictory) নয়, বরঞ্চ এক আচরণের দ্বারা অন্য আচরণের অপূর্ণতা পূর্ণ, (complementary) হইতেছে। আলোক এইরূপ দ্বৈতগুণবিশিষ্ট। আলোক কখনও কখনও তরঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়—আবার কখনও বা তেজকণা (quantum) রূপে আবির্ভূত হয়। আলোকও কি মূল পদার্থে-গঠিত তাহা আমরা জানিতে পারি না। পরীক্ষা হইতে অনুমিত ফল বা সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না; কারণ এই সকল সিদ্ধান্ত পরীক্ষকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা কিংবা যে প্রণালীতে পরীক্ষা লওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি কেহ নীল কাচের ভিতর দিয়া প্রকৃতিকে দেখে, তাহার নিকট সমস্ত প্রকৃতি নীলবর্ণ মনে হইবে। আবার রক্তবর্ণ কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে প্রকৃতি লোহিত-রূপ ধারণ করিবে। প্রকৃতি নীলও নহে, লালও নহে এবং ইহার প্রকৃত রূপের বিষয়ে আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি। বিজ্ঞান একাকী মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে অসমর্থ। মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সহায়তা বিনা কেবল জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। বৈজ্ঞানিক মূলসত্য অনুসন্ধান করিতে অনবরতই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তিনি ইহাতে কেবলই বিফলমনোরথ হইতেছেন এবং প্রকৃত সত্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মূলতত্ত্বের অবধারণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তাঁহার কৃত পরীক্ষাগুলি সবই সাপেক্ষিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দোষে দূষিত। নূতন নূতন পরীক্ষার ফলসমূহ ব্যাখ্যা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যতই পুরাতন অনুমানগুলি পরিহার করিয়া নূতন বিধির অবতারণা করেন, ততই প্রশ্ন জটিল হইতে জটিলতর হয় এবং মূলসত্য করায়ত্ত না হইয়া আরও দূরে অপসরণ করে। বিজ্ঞানসেবীর সত্যনির্ণয়ের ব্যাকুল অভিলাষ যথার্থই প্রশংসনীয়; কিন্তু কেবল বিজ্ঞানের সাহায্যে মূলসত্য লাভ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সহযোগিতা ও সমবেত চেষ্টা দ্বারাই প্রকৃত সত্য লাভ করা যায়। পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাওয়া যায় এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা সাপেক্ষিক ও পরীক্ষকের বৈশিষ্ট্যদোষযুক্ত; সেই জন্য দার্শনিক যদি বিজ্ঞান ও ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে মীমাংসা করিতে প্রয়াসী হন তাহা হইলে তাঁহার মায়াবাদ ও অন্যান্য অযৌক্তিক নীতির অনুগামী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যদিও পরীক্ষাগুলি সাপেক্ষিক,

তথাপি পরীক্ষক কিংবা পর্য্যবেক্ষণকারীর নিকট এইগুলি প্রকৃতপক্ষেই সত্তাবান (real), অবাস্তব কিংবা কাল্পনিক নয়। কৃষ্ণবর্ণ কাচের ভিতর দিয়া যদি সূর্য্যকে দেখা যায়, তাহা হইলে চক্ষুর ক্ষতি হইবার কোনও আশঙ্কা নাই; কিন্তু যদি স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়া সূর্য্যকে দেখা যায় তাহা হইলে চক্ষুর অনিষ্ট হইবার প্রভূত সম্ভাবনা। চক্ষুর এই ক্ষতি প্রকৃত, কাল্পনিক নহে। ধর্ম্ম যদি জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া চলে, তাহা হইলে ইহা অবিলম্বে কুসংস্কারে পরিণত হইয়া যায়। যিনি বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে যথার্থ একতা আনিয়া দিবেন এবং মানবজাতির প্রকৃত সত্য লাভের পথপ্রদর্শক হইবেন এইরূপ এক সমন্বয়বিধানকারী মহাপুরুষের আবির্ভাব বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অনেকেরই মনে এই ধারণা আছে যে, গণিতশাস্ত্র পূর্ণতাসূচক বিদ্যা (exact science)। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, ইহা কি সর্ব্বতোভাবে সত্য। অল্প চিন্তা করিয়া দেখিলেই বোধগম্য হয় যে, গণিতশাস্ত্রও দ্বৈতগুণবিশিষ্ট। গণিতের যে অংশ কেবল পরিমাণ ও সংখ্যা দ্বারাই জড়িত তাহা পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিহীন হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গণিতশাস্ত্রে সম্ভাব্যবাদ ও অনিশ্চিতবাদের প্রচলন হওয়াতে ইহা আর পূর্ণাঙ্গতার ও নির্দ্দিষ্টতার সম্পূর্ণ দাবি করিতে পারে না। সাধারণ লোকের মধ্যে ইহাই ধারণা যে "এক" আর "এক" মিলিয়া "দুই" হয়, ইহা প্রমাণ করা যায়। অল্প চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহা একটি সংজ্ঞা মাত্র। "দুই"—"এক" এবং "একের" সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মাত্র। এইরূপ "চার"—'এক', 'এক' 'এক' এবং 'একের' সংক্ষিপ্ত কথন মাত্র। উপরিউক্ত দুই অনুমানকে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে গ্রহণ করিলে আমরা তখন প্রমাণ করিতে পারি যে "দুই" আর "দুই" এ "চার" হয়। কি জড়বিজ্ঞানে, কি গণিতশাস্ত্রে, কি মনোবিজ্ঞানে সর্ব্বপ্রথমে কতকগুলি অনুমানকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে হয় এবং স্বতঃসিদ্ধগুলির সাহায্য লইয়া উপপাদ্য প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে হয়। বৈজ্ঞানিককে যখন অনুমান এবং স্বতঃসিদ্ধের সাহায্য লইতে হয় তখন তাঁহার পক্ষে বিশ্বাসী ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির স্বাভাবিক অনুমান—ভগবানে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এক জন খ্যাতনামা প্রাণীতত্ত্ববিৎ যদি প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আর আমি যদি জ্যোতির্ব্বিৎ হই ও আমার প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার অভিমতের সমালোচনা কিংবা উপহাস করার কোনও অধিকার আমার নাই। আমি যদি এই বিষয়ে আলোচনা করিতে চাই তাহা হইলে আমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এই যে, আমি প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বিশেষজ্ঞ হই এবং তৎপরে এই বিষয়ে নিজমত প্রকাশ করি। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক যিনি আপনাকে অতীব বিচারবুদ্ধিশালী মনে করেন, তিনিই অধ্যাত্ম বিষয়ে কোনও জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসী ও অধ্যাত্মবিদের সরল বিশ্বাস লইয়া বিদ্রূপ ও পরিহাস করিতে পরাঙ্মুখ হন না। তিনি নিজেকে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী মনে করিতে পারেন, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার আচরণ অযৌক্তিক এবং বিচারবুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক মাত্র। যদি তিনি অকপট-ভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সচেষ্ট ও সমর্থ হন, তাহা হইলে এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত-গুলি আর উপেক্ষণীয় থাকিবে না।

প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে কিনা এই বিষয়ে আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:— পরমাণু-ক্ষেত্র (microscopic or nuclear domain) সংস্পৃষ্ট, মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্র (macroscopic domain) সংস্পৃষ্ট, ও বিশাল ক্ষেত্র (telescopic or astronomical domain) সংস্পৃষ্ট। মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তাহা সীমাবদ্ধ। এই ক্ষেত্রে প্রলয়শক্তি (force of destruction), সৃজনশক্তি (creative force) হইতে বহুগুণ বলশালী বলিয়া মনে হয়। কোনও একটি গৃহ কিংবা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ছয় মাস কিংবা ততোধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, কিন্তু ভূকম্পনে কিংবা অন্য কোনও আকস্মিক প্রাকৃতিক কারণে এক নিমেষে ইহা ভূমিসাৎ হইয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে পরমাণুক্ষেত্রে অণু-পরমাণুগুলির

আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা কি অভিজ্ঞতা লাভ করি। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণাগুলি লইয়াই যদিও এই ক্ষেত্র গঠিত, তথাপি কেহ যেন মনে না করেন ইহার পরিসর অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এই ক্ষেত্রেও অগণ্য বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। পরমাণুক্ষেত্রে প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টির সূচনা এবং এই দুই শক্তির মধ্যে কোনও প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। শক্তিশালী "আল্‌ফা"-রশ্মি দ্বারা যখন কোনও পরমাণুকে চূর্ণ করা হয় সেই ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই শক্তি (energy) ও অপর একটি পরমাণু সৃষ্ট হইয়া যায়। একণে বিশাল ক্ষেত্রে বিশালকায়া নীহারিকা ও বৃহদাকার নক্ষত্রগুলির আচরণ পরীক্ষা করিয়া আমরা কি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি তাহা দেখা যাউক। আমাদের বিশ্বজগৎ একটি অতি বিশাল পরীক্ষা-মন্দির। বড় বড় জ্যোতিষ্কগুলির উপর বিপুলভাবে অনবরত পরীক্ষা চলিতেছে। এই পরীক্ষা-মন্দিরের পরম পরীক্ষক বিধাতাপুরুষ আপন ইচ্ছামত পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করিতেছেন। দুইটি নিষ্প্রভ নক্ষত্রের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয় তাহারই ফলে গ্রহ-উপগ্রহসমেত দুই-জ্যোতিষ্মান্ তারকার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ অনুকূল অবস্থায় গ্রহবিশেষে জৈববীজ (life-sperm) ও উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তির ও অভিজ্ঞতার প্রকৃত বিস্তার হইলেই আমরা অবধারণ করিতে সমর্থ হই যে, প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের আবির্ভাব হয়। প্রলয় সৃষ্টির অবস্থান্তর মাত্র।

এইবার আমরা সাপেক্ষবাদের (Theory of Relativity) বিষয় আলোচনা করিব। মনীষী আইনষ্টাইনের সাপেক্ষবাদ বিজ্ঞান-জগতে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। বল-বিজ্ঞান ও জ্যামিতি শাস্ত্র বিষয়ে আমাদের যাহা ধারণা ছিল তাহার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সাপেক্ষবাদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বিশেষ বিধি (Special Theory) ও সাধারণ বিধি (General Theory)। প্রথমে সাপেক্ষবাদের বিশেষ বিধির বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। এই বিশ্বজগতে এমন কোন পদার্থ কিংবা কণিকা নাই যাহা একেবারে স্থির ও নিশ্চল। আমরা সকলেই পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছি। সূর্য্য এক অতি বিশাল "নক্ষত্র নীহারিকা" রাশির (super galaxy) ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। এই অতিকায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সমষ্টি এক বৃহদাকার চক্রের ন্যায় অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। এই অক্ষদণ্ডটি বৃশ্চিক ও ধনুরাশির পার্শ্ব ভেদ করিয়া গিয়াছে। অক্ষদণ্ডটি যে নিশ্চল আছে তাহা নহে। এই প্রসরণশীল বিশ্বে সবই গতিশীল অবস্থায় আছে। গত শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করিতেন যে, সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া ঈথার (ether) স্থির ও অচল অবস্থায় আছে। কিন্তু ইহাতে এই সমস্যা আসিয়া পড়ে যে, অনেক পরীক্ষার ফলেও বৈজ্ঞানিকেরা কোনও বস্তুর নিরপেক্ষ গতি (Absolute velocity) নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

ঈথার বলিয়া যদি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত কোনও পদার্থ থাকে তাহা হইলে ইহা কুহেলিকাপূর্ণ। ইচ্ছা করিয়াই যেন ইহা প্রচ্ছন্ন ও গুপ্ত অবস্থায় আছে এবং কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে না। নিউটনের বল-বিজ্ঞানে (Mechanics) যে কোন বস্তুর নিরপেক্ষ গতি নির্দ্ধারণ বা অনুমান করা সম্ভব, এই অনুমানের উপর পুরাতন শাস্ত্রসম্মত সাপেক্ষিক গতির (relative velocity) ধারণা নির্ভর করিতেছে। নিরপেক্ষ-ভাবে অচল ও স্থির পদার্থ থাকিতে পারে, এই অনুমান নিউটনের বল-বিজ্ঞানের সংজ্ঞাগুলিতে অপ্রত্যক্ষভাবে নিহিত আছে। সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ অচলতার অনুমান স্বীকার করিয়া লইলে আমরা বলিব যে, যদি কোন বাষ্পীয়-যান পশ্চিম দিকে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ধাবিত হয় এবং এক জন পথিক পদব্রজে চার মাইল হিসাবে পশ্চিম দিকে যায় তাহা হইলে পথিকের তুলনায় বাষ্পীয় শকটের বেগ হইবে ঘণ্টায় ছত্রিশ মাইল। যদি পথিক পশ্চিম দিকে না গিয়া পূর্ব্ব দিকে যায় তাহা হইলে পথিকের তুলনায় শকটের বেগ হইবে ঘণ্টায় চুয়াল্লিশ মাইল। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মাইকেলসন্ ও মরলে'র সম্পাদিত পরীক্ষাগুলি এক জটিল সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দুই বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, আলোকের বেগ সাপেক্ষিকই হউক বা নিরপেক্ষই হউক, আলোকের উৎসের (source) বেগ কিংবা পর্য্যবেক্ষণকারীর বেগের উপর একেবারেই নির্ভর করে না। সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থায় আলোকের বেগ সমান থাকে।

আলোকের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬০০০ মাইল। সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ অচল বস্তু থাকা সম্ভব হইলে সকল ক্ষেত্রে আলোকের সাপেক্ষিক বেগ সমান থাকিতে পারে না। আমি যদি আলোকের উৎসের দিকে কোনও ক্রমে সেকেণ্ডে ২০০০ মাইল বেগে নিক্ষিপ্ত হই, তাহা হইলে নিউটনের গতিশাস্ত্র অনুসারে আমার তুলনায় আলোকের বেগ হইবে সেকেণ্ডে ১৮৮০০০ মাইল। আমি যদি আলোকের উৎস হইতে সেকেণ্ডে ২০০০ মাইল বেগে দূরে অপসারিত হইতে থাকি, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রমতে আমার বেগের তুলনায় আলোকের বেগ হইবে সেকেণ্ডে ১৮৪০০০ মাইল। কিন্তু জটিল সমস্যা এই যে, মাপিয়া দেখিলে দুই ক্ষেত্রেই আমার বেগের তুলনায় আলোকের বেগ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইলই পাওয়া যায়। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অচল পদার্থের অস্তিত্বের অনুমান পরিহার করিতে হয়।

পুরাতন মতে দেশ ও কাল বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট; দেশ (space) আমাদের ঊর্দ্ধে, অধোভাগে ও চতুষ্পার্শ্বে স্থিরভাবে পরিব্যাপ্ত আছে, কিন্তু কালের স্রোত আমাদের অতিক্রম করিয়া অবিরত বেগে অনন্তের পথে ধাবিত হইতেছে। আইনষ্টাইনের নূতন মতে দেশ ও কাল অনেকাংশে সমগুণবিশিষ্ট এবং পরস্পর স্বাধীন ভাবে জড়িত। পূর্ব্বতন মতানুসারে কেবল ত্রিপরিমাণবিশিষ্ট (three-dimensional) দেশেরই প্রয়োজন ছিল; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুসারে দেশ ও কাল স্বাধীন ও সমভাবে মিলিয়া দেশ-কাল (space-time) হইয়াছে এবং উহার প্রসরণ (continuum) যে চতুষ্পরিমাণবিশিষ্ট (four-dimensional) তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। সেই চতুর্থ পরিমাণই কাল। উপরিউক্ত দুই অনুমান লইয়া গণিতজ্ঞেরা দুই সাপেক্ষিক বেগ কি ভাবে যুক্ত হয় তাহারই সূত্র (formula) প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সূত্রের মধ্যে আলোকের অপরিবর্ত্তনশীল বেগের 'পদ' (term) বিশেষ রূপেই সন্নিবিষ্ট আছে। সাধারণতঃ পার্থিব পদার্থের বেগ আলোকের তুলনায় অতি অল্প,—এই সব ক্ষেত্রে দুই বেগের যোগসাধনবিষয়ে আইনষ্টাইনের সাপেক্ষিক সূত্র এবং নিউটনের সূত্রের মধ্যে প্রভেদ অত্যল্প। পরন্তু "আল্‌ফা" এবং "বিটা" রশ্মিকণার বেগ আলোকের বেগের তুলনায় নিতান্ত কম নহে। এই ক্ষেত্রে সাপেক্ষবাদ সূত্রের ও নিউটনের সূত্রের মধ্যে প্রভেদ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া পড়ে। "বিশেষ" সাপেক্ষবাদের বিধিগুলির অব্যর্থ প্রমাণ পরমাণু-সংক্রান্ত পদার্থবিজ্ঞানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধারণ সাপেক্ষবাদের যাহা কিছু প্রমাণ তাহা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানেই পাওয়া যায়। অপরিবর্ত্তনশীল ও নিরপেক্ষ জড়মানের (constant and absolute mass) কল্পনা পরিহার করা এক্ষণে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি ও জড়মান (energy and mass) যে এক এই সিদ্ধান্তে সাপেক্ষবাদীরা উপনীত হইয়াছেন। এই সাপেক্ষ বিধিতে ও এক বিষয়ে দেশ ও কাল বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট। "দেশে"র মধ্যে আমরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারি। কালের স্রোত অনবরত সম্মুখের দিকে ধাবিত হইতেছে এবং কখনও পশ্চাৎগামী হইয়া ফিরিয়া আসে না। নিউটন্ ও আইন্‌ষ্টাইন্ উভয়ের মতে "গতকল্য" যাহা একবার চলিয়া গিয়াছে পুনরায় তাহা ফিরিয়া আসিবে না। "কাল"ও চক্রবৎ ফিরিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে এবং ইহার আবর্ত্তন-বেগ অতীব ধীর—এই অনুমান একেবারে অযৌক্তিক না হইতে পারে। উপরিউক্ত অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আজ যে ঘটনাগুলি ঘটিতেছে পুনরায় ঠিক সেই ঘটনাগুলি কোটি কোটি বৎসর পরে সেইভাবেই ঘটিবে। কিন্তু এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে কালের গতি চক্রের ন্যায় আবর্ত্তনশীল। আইন্‌ষ্টাইন্ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সাপেক্ষবাদের "বিশেষ বিধি" প্রকাশ করেন। ডক্টর উপাধি লাভ করিবার অভিলাষী হইয়া আইন্‌ষ্টাইন্ ইহা প্রবন্ধাকারে কোনও এক জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পরীক্ষকেরা তাঁহার গবেষণার বিষয় কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। সেই জন্য তাঁহার প্রবন্ধটি উপরিউক্ত উপাধির জন্য গৃহীত ও স্বীকৃত হইল না। পর বৎসর অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয়ে গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া আইন্‌ষ্টাইন্ উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন্‌ষ্টাইন্‌ সাপেক্ষবাদের "সাধারণ" বিধি প্রকাশ করিলেন। "বিশেষ" বিধিতে তিনি আপেক্ষিক সমবেগ (uniform velocity) বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং "সাধারণ" বিধিতে জড়পদার্থের উপস্থিতি হেতু আপেক্ষিক অসমবেগ বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। ত্রিপরিমাণবিশিষ্ট নিউটনের বল-বিজ্ঞানে কাল স্বাধীন নির্ণায়ক (independent co-ordinate) ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং গণিতজ্ঞ মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে এই পুরাতন শাস্ত্রে গতিবৃদ্ধি হারের (acceleration) সঙ্কেত (expression) যাহা তাহা চতুষ্পরিমাণবিশিষ্ট দেশ-কালের প্রসারণের বক্রতার সঙ্কেতের অনুরূপ। আইন্‌ষ্টাইনের বিধি অনুসারে পদার্থবিহীন শূন্যগর্ভ বিশ্বের দেশকালবিশিষ্ট আকার অবক্র অবস্থায় থাকিতে পারে এবং ইহার পরিসরও সীমাবদ্ধ থাকে না। কিন্তু যে-বিশ্বের অভ্যন্তর রিক্ত ও বস্তুবিবর্জ্জিত নহে তাহা বক্রভাব ধারণ করে এবং উহার আকার ও আয়তন অন্তর্নিবিষ্ট পদার্থসমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। একভাবাপন্ন (uniform) দেশকালের সর্ব্বস্থানই সকল সময়েই সমগুণ-বিশিষ্ট। এইরূপ দেশকালের অভ্যন্তরে যদি জড়পদার্থ আনয়ন করা যায় তাহা হইলে ইহার সামঞ্জস্য ও অভিন্নতা ভঙ্গ করা হয়। যে যে স্থানে জড়পদার্থের দ্বারা সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে সেই সেই স্থলে জড়পদার্থের পরিমাণ অনুপাতে বিধি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই সকল নিয়ন্ত্রিত বিধিই আইন্‌ষ্টাইনের সূত্র। মনে হয় যেন প্রকৃতির এক স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ক্রিয় ভাব আছে। প্রাকৃতিক ক্রিয়া ও ঘটনাবলী যে মার্গে বিঘ্ন কিংবা প্রতিবন্ধক ক্ষুদ্রতম সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে। মোটামুটি ভাবে ইহার বিষয়ে এক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এক ব্যক্তি সমতল ভূমিতে "ক" বিন্দু হইতে "খ" বিন্দুতে যাইতে চায়। ইহার পক্ষে সরল রেখা "ক খ"ই সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াসলভ্য মার্গ। কিন্তু মধ্যে যদি কোনও উচ্চভূমি থাকে তাহা হইলে সরল রেখা "ক খ" আর সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ থাকিতে পারে না, এই পথটি এখন উচ্চভূমির প্রান্ত দিয়া এবং ইহাকে পরিবেষ্টন করিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আমাদের দেশকালবিশিষ্ট জগৎ অন্তর্নিবিষ্ট পদার্থসমষ্টির নিমিত্ত বক্রভাব ধারণ করিয়াছে। ইহার আকার চতুষ্পরিমাণবিশিষ্ট গোলকের ন্যায় এবং আমাদের ত্রিপরিমাণবিশিষ্ট দেশ এই গোলকের পৃষ্ঠতল (surface)। জ্যোতির্ব্বিদেরা এই অনুমান করেন যে ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর গতিতে এই বিশ্বজগৎ অনবরতই প্রসারিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করা যায় যে, এই বিশ্বজগৎ যদি অনবরতই প্রসারিত হইতেছে তাহা হইলে কিসের মধ্যে ইহা বর্দ্ধিত হইতেছে। বিশ্বজগতের বহির্দ্দেশে কি কিছু আছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে "শূন্য" (void) ও "দেশে"র (space) মধ্যে প্রভেদ কি তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। দেশের মধ্যে জ্যামিতির নীতিগুলি কার্য্যকরী ও ফলদায়ক হয় পরন্তু "শূন্য" মধ্যে এই নীতিগুলি নিষ্ফল হইয়া যায়। দেশ যতই প্রসারিত হইতেছে শূন্যের অভ্যন্তরে ইহা ততই ব্যাপৃত হইতেছে এবং এই সংযোজিত অংশে সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতিক নীতিগুলিও ফলদায়ক হইতেছে। আলোকের বেগের পরিমাণের এক বিশেষত্ব আছে। যে সকল বস্তুর বেগ (সাপেক্ষিক বেগ) আলোকের বেগের তুলনায় অল্প, কেবল তাহাদের বিষয়েই আমরা ভৌতিক বা পার্থিব জ্ঞানলাভ করিতে পারি। দূরে অবস্থিত কোনও পদার্থের বেগ (সাপেক্ষিক বেগ) আলোকের বেগের তুলনায় যদি অধিক হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুর বিষয়ে ভৌতিক জ্ঞান চিরকালই আমাদের নিকট অগোচর থাকিবে। সেই জন্য পার্থিব ভাবে ইহাকে আমাদের পক্ষে "অস্তিত্ববিহীন" বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের এই বিশ্বজগৎ দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে প্রসারিত হইতেছে এবং প্রতি ১৪০ কোটি বৎসরে ইহার আয়তন দ্বিগুণ হইতেছে। এমন এক সময় আসিবে যখন এই বর্দ্ধনশীল গতি আলোকের বেগের গতির সমান হইবে এবং তখন এই বিশ্বজগৎ বুদ্বুদের ন্যায় খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে এবং এই খণ্ডগুলি অবশেষে আলোকের বেগ হইতে অধিকতর বেগে আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং ঐগুলি আমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের অগোচরে চলিয়া যাইবে। সীমাবদ্ধ বিশ্বের সসীমতা "অসীমতা"র পরিকল্পনার প্রতিকূল নহে। আইন্‌ষ্টাইন্‌-জগৎ সীমাবদ্ধ হইতে পারে কিন্তু "শূন্য" অসীম। এমন অসংখ্য জগৎ সৃষ্ট হইয়া

আলোকের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬০০০ মাইল। সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ অচল বস্তু থাকা সম্ভব হইলে সকল ক্ষেত্রে আলোকের সাপেক্ষিক বেগ সমান থাকিতে পারে না। আমি যদি আলোকের উৎসের দিকে কোনও ক্রমে সেকেণ্ডে ২০০০ মাইল বেগে নিক্ষিপ্ত হই, তাহা হইলে নিউটনের গতিশাস্ত্র অনুসারে আমার তুলনায় আলোকের বেগ হইবে সেকেণ্ডে ১৮৮০০০ মাইল। আমি যদি আলোকের উৎস হইতে সেকেণ্ডে ২০০০ মাইল বেগে দূরে অপসারিত হইতে থাকি, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রমতে আমার বেগের তুলনায় আলোকের বেগ হইবে সেকেণ্ডে ১৮৪০০০ মাইল। কিন্তু জটিল সমস্যা এই যে, মাপিয়া দেখিলে দুই ক্ষেত্রেই আমার বেগের তুলনায় আলোকের বেগ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইলই পাওয়া যায়। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অচল পদার্থের অস্তিত্বের অনুমান পরিহার করিতে হয়।

পুরাতন মতে দেশ ও কাল বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট; দেশ (space) আমাদের ঊর্দ্ধে, অধোভাগে ও চতুষ্পার্শ্বে স্থিরভাবে পরিব্যাপ্ত আছে, কিন্তু কালের স্রোত আমাদের অতিক্রম করিয়া অবিরত বেগে অনন্তের পথে ধাবিত হইতেছে। আইনষ্টাইনের নূতন মতে দেশ ও কাল অনেকাংশে সমগুণবিশিষ্ট এবং পরস্পর স্বাধীন ভাবে জড়িত। পূর্ব্বতন মতানুসারে কেবল ত্রিপরিমাণবিশিষ্ট (three-dimensional) দেশেরই প্রয়োজন ছিল; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুসারে দেশ ও কাল স্বাধীন ও সমভাবে মিলিয়া দেশ-কাল (space-time) হইয়াছে এবং উহার প্রসরণ (continuum) যে চতুষ্পরিমাণবিশিষ্ট (four-dimensional) তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। সেই চতুর্থ পরিমাণই কাল। উপরিউক্ত দুই অনুমান লইয়া গণিতজ্ঞেরা দুই সাপেক্ষিক বেগ কি ভাবে যুক্ত হয় তাহারই সূত্র (formula) প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সূত্রের মধ্যে আলোকের অপরিবর্ত্তনশীল বেগের 'পদ' (term) বিশেষ রূপেই সন্নিবিষ্ট আছে। সাধারণতঃ পার্থিব পদার্থের বেগ আলোকের তুলনায় অতি অল্প,—এই সব ক্ষেত্রে দুই বেগের যোগসাধনবিষয়ে আইনষ্টাইনের সাপেক্ষিক সূত্র এবং নিউটনের সূত্রের মধ্যে প্রভেদ অত্যল্প। পরন্তু "আল্‌ফা" এবং "বিটা" রশ্মিকণার বেগ আলোকের বেগের তুলনায় নিতান্ত কম নহে। এই ক্ষেত্রে সাপেক্ষবাদ সূত্রের ও নিউটনের সূত্রের মধ্যে প্রভেদ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া পড়ে। "বিশেষ" সাপেক্ষবাদের বিধিগুলির অব্যর্থ প্রমাণ পরমাণু-সংক্রান্ত পদার্থবিজ্ঞানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধারণ সাপেক্ষবাদের যাহা কিছু প্রমাণ তাহা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানেই পাওয়া যায়। অপরিবর্ত্তনশীল ও নিরপেক্ষ জড়মানের (constant and absolute mass) কল্পনা পরিহার করা এক্ষণে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি ও জড়মান (energy and mass) যে এক এই সিদ্ধান্তে সাপেক্ষবাদীরা উপনীত হইয়াছেন। এই সাপেক্ষ বিধিতে ও এক বিষয়ে দেশ ও কাল বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট। "দেশে"র মধ্যে আমরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারি। কালের স্রোত অনবরত সম্মুখের দিকে ধাবিত হইতেছে এবং কখনও পশ্চাৎগামী হইয়া ফিরিয়া আসে না। নিউটন্ ও আইন্‌ষ্টাইন্ উভয়ের মতে "গতকল্য" যাহা একবার চলিয়া গিয়াছে পুনরায় তাহা ফিরিয়া আসিবে না। "কাল"ও চক্রবৎ ফিরিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে এবং ইহার আবর্ত্তন-বেগ অতীব ধীর—এই অনুমান একেবারে অযৌক্তিক না হইতে পারে। উপরিউক্ত অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আজ যে ঘটনাগুলি ঘটিতেছে পুনরায় ঠিক সেই ঘটনাগুলি কোটি কোটি বৎসর পরে সেইভাবেই ঘটিবে। কিন্তু এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে কালের গতি চক্রের ন্যায় আবর্ত্তনশীল। আইন্‌ষ্টাইন্ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সাপেক্ষবাদের "বিশেষ বিধি" প্রকাশ করেন। ডক্টর উপাধি লাভ করিবার অভিলাষী হইয়া আইন্‌ষ্টাইন্ ইহা প্রবন্ধাকারে কোনও এক জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পরীক্ষকেরা তাঁহার গবেষণার বিষয় কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। সেই জন্য তাঁহার প্রবন্ধটি উপরিউক্ত উপাধির জন্য গৃহীত ও স্বীকৃত হইল না। পর বৎসর অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয়ে গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া আইন্‌ষ্টাইন্ উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন্‌ষ্টাইন্‌ সাপেক্ষবাদের "সাধারণ" বিধি প্রকাশ করিলেন। "বিশেষ" বিধিতে তিনি আপেক্ষিক সমবেগ (uniform velocity) বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং "সাধারণ" বিধিতে জড়পদার্থের উপস্থিতি হেতু আপেক্ষিক অসমবেগ বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। ত্রিপরিমাণবিশিষ্ট নিউটনের বল-বিজ্ঞানে কাল স্বাধীন নির্ণায়ক (independent co-ordinate) ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং গণিতজ্ঞ মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে এই পুরাতন শাস্ত্রে গতিবৃদ্ধি হারের (acceleration) সঙ্কেত (expression) যাহা তাহা চতুষ্পরিমাণবিশিষ্ট দেশ-কালের প্রসারণের বক্রতার সঙ্কেতের অনুরূপ। আইন্‌ষ্টাইনের বিধি অনুসারে পদার্থবিহীন শূন্যগর্ভ বিশ্বের দেশকালবিশিষ্ট আকার অবক্র অবস্থায় থাকিতে পারে এবং ইহার পরিসরও সীমাবদ্ধ থাকে না। কিন্তু যে-বিশ্বের অভ্যন্তর রিক্ত ও বস্তুবিবর্জ্জিত নহে তাহা বক্রভাব ধারণ করে এবং উহার আকার ও আয়তন অন্তর্নিবিষ্ট পদার্থসমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। একভাবাপন্ন (uniform) দেশকালের সর্ব্বস্থানেই সকল সময়েই সমগুণ-বিশিষ্ট। এইরূপ দেশকালের অভ্যন্তরে যদি জড়পদার্থ আনয়ন করা যায় তাহা হইলে ইহার সামঞ্জস্য ও অভিন্নতা ভঙ্গ করা হয়। যে যে স্থানে জড়পদার্থের দ্বারা সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে সেই সেই স্থলে জড়পদার্থের পরিমাণ অনুপাতে বিধি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই সকল নিয়ন্ত্রিত বিধিই আইন্‌ষ্টাইনের সূত্র। মনে হয় যেন প্রকৃতির এক স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ক্রিয় ভাব আছে। প্রাকৃতিক ক্রিয়া ও ঘটনাবলী যে মার্গে বিঘ্ন কিংবা প্রতিবন্ধক ক্ষুদ্রতম সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে। মোটামুটি ভাবে ইহার বিষয়ে এক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এক ব্যক্তি সমতল ভূমিতে "ক" বিন্দু হইতে "খ" বিন্দুতে যাইতে চায়। ইহার পক্ষে সরল রেখা "ক খ"ই সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াসলভ্য মার্গ। কিন্তু মধ্যে যদি কোনও উচ্চভূমি থাকে তাহা হইলে সরল রেখা "ক খ" আর সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ থাকিতে পারে না, এই পথটি এখন উচ্চভূমির প্রান্ত দিয়া এবং ইহাকে পরিবেষ্টন করিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আমাদের দেশকালবিশিষ্ট জগৎ অন্তর্নিবিষ্ট পদার্থসমষ্টির নিমিত্ত বক্রভাব ধারণ করিয়াছে। ইহার আকার চতুষ্পরিমাণবিশিষ্ট গোলকের ন্যায় এবং আমাদের ত্রিপরিমাণবিশিষ্ট দেশ এই গোলকের পৃষ্ঠতল (surface)। জ্যোতির্ব্বিদেরা এই অনুমান করেন যে ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর গতিতে এই বিশ্বজগৎ অনবরতই প্রসারিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করা যায় যে, এই বিশ্বজগৎ যদি অনবরতই প্রসারিত হইতেছে তাহা হইলে কিসের মধ্যে ইহা বর্দ্ধিত হইতেছে। বিশ্ব-জগতের বহির্দ্দেশে কি কিছু আছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে "শূন্য" (void) ও "দেশে"র (space) মধ্যে প্রভেদ কি তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। দেশের মধ্যে জ্যামিতির নীতিগুলি কার্য্যকরী ও ফলদায়ক হয় পরন্তু "শূন্য" মধ্যে এই নীতিগুলি নিষ্ফল হইয়া যায়। দেশ যতই প্রসারিত হইতেছে শূন্যের অভ্যন্তরে ইহা ততই ব্যাপৃত হইতেছে এবং এই সংযোজিত অংশে সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতিক নীতিগুলিও ফলদায়ক হইতেছে। আলোকের বেগের পরিমাণের এক বিশেষত্ব আছে। যে সকল বস্তুর বেগ (সাপেক্ষিক বেগ) আলোকের বেগের তুলনায় অল্প, কেবল তাহাদের বিষয়েই আমরা ভৌতিক বা পার্থিব জ্ঞানলাভ করিতে পারি। দূরে অবস্থিত কোনও পদার্থের বেগ (সাপেক্ষিক বেগ) আলোকের বেগের তুলনায় যদি অধিক হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুর বিষয়ে ভৌতিক জ্ঞান চিরকালই আমাদের নিকট অগোচর থাকিবে। সেই জন্য পার্থিব ভাবে ইহাকে আমাদের পক্ষে "অস্তিত্ববিহীন" বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের এই বিশ্বজগৎ দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে প্রসারিত হইতেছে এবং প্রতি ১৪০ কোটি বৎসরে ইহার আয়তন দ্বিগুণ হইতেছে। এমন এক সময় আসিবে যখন এই বর্দ্ধনশীল গতি আলোকের বেগের গতির সমান হইবে এবং তখন এই বিশ্বজগৎ বুদ্বুদের ন্যায় খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে এবং এই খণ্ডগুলি অবশেষে আলোকের বেগ হইতে অধিকতর বেগে আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং ঐগুলি আমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের অগোচরে চলিয়া যাইবে। সীমাবদ্ধ বিশ্বের সসীমতা "অসীমতা"র পরিকল্পনার প্রতিকূল নহে। আইন্‌ষ্টাইন্‌-জগৎ সীমাবদ্ধ হইতে পারে কিন্তু "শূন্য" অসীম। এমন অসংখ্য জগৎ সৃষ্ট হইয়া

থাকিতে পারে যাহাদের অস্তিত্বের বিষয়ে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই। এই অগণিত জগৎগুলির মধ্যে আমাদের বিশ্বজগৎ অন্যতম। এক একটি জগৎ অগণ্য বৈচিত্র্যে পূর্ণ, সত্তাসমষ্টি (totality of existence) বিকশিত হইয়া অগণ্যভাবে অনন্ত রূপ ধারণ করে। সত্তাসমষ্টি যদি পরব্রহ্মকে প্রকাশ করে তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বরূপ অসংখ্য প্রকারে বিকশিত হইতেছে। ধর্ম্ম-তত্ত্বে কিংবা মনোবিজ্ঞানে অনিশ্চিতবাদের প্রয়োগ হইতে পারে কি না এই বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। তথাপি উপরিউক্ত দুইটি বিষয়ে অনির্দ্দিষ্টনীতির প্রয়োগ করিলে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা ফলপ্রদ হইতে পারে। জন্মান্তরবাদ কর্ম্মবাদ হইতেই অনুমিত হইয়াছে। কর্ম্মবাদ কার্য্যকারণ-নীতির সহিত বিশেষরূপে সম্পৃক্ত। যদি কোনও শিশু ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা বিকলাঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, কর্ম্মবাদীরা তখন বলিয়া থাকেন যে, এই ব্যাধি কিংবা অঙ্গহীনতা শিশুর পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপের ফল। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, জড়বিজ্ঞানে স্বতন্ত্র ভাবে লইলে প্রত্যেক ঘটনাই অনির্দ্দিষ্ট নীতির অধীন। সাম্যনীতির (principle of equivalence) অনুগামী হইয়া যদি আমরা অনিশ্চিতবাদ এই স্থলে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে জন্মান্তরবাদ আর গ্রহণীয় থাকিতে পারে না। শিশুর জন্ম-সম্বন্ধে যদি তাহার পূর্ব্বপুরুষের দোষগুণ এবং তাহার জন্ম-কালীন ও তৎপূর্ব্বের বিজড়িত অবস্থানিচয় পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় যে, কেন সে বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মিয়াছে।

পৃথিবীর জীব ও ধীশক্তির সৃষ্টিবিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ইহা অতি জটিল সমস্যা এবং ইহার সন্তোষজনক সমাধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই; যে সময় পৃথিবী সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, সেই সময় পৃথিবীর তাপ সূর্য্যের তাপের সমান ছিল। জীবতত্ত্ববিৎ মাত্রই জানেন যে, এই উত্তপ্ত অবস্থায় কোনও প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও জৈববীজ (life sperm) জীবিত অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না। সূর্য্যের কেন্দ্রস্থলের তাপ দেড় কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং উপরিভাগের তাপ প্রায় পাঁচ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, অত্যধিক উত্তাপের জন্য যদি প্রথম অবস্থায় পৃথিবী প্রাণী ও উদ্ভিদের অবস্থানের পক্ষে একেবারে অনুপযোগী ছিল, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কালে কি করিয়া এই বসুন্ধরায় উদ্ভিদ্ ও জৈববীজের আবির্ভাব হইল। মার্কিন দেশের ওয়াটসন্-সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের এই অভিমত যে, জীব ও উদ্ভিদ্ জড়পদার্থ হইতেই বিবর্ত্তনশীল ভৌতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। উপরিউক্ত সম্প্রদায়ের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল মাত্র জড়পদার্থই ছিল; কিন্তু যখন প্রকৃতির অবস্থা জীবের অবস্থানের পক্ষে অনুকূল হইল, সেই সময় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জীব এবং "ধী ও সংজ্ঞা"-শক্তি ক্রমশঃ জড়-পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইল। এই ক্ষেত্রে সাম্যনীতিকে স্বীকার করিয়া লইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, উপরিউক্ত প্রক্রিয়া ফলে জড়পদার্থের সমষ্টি হইতে "ধী ও সংজ্ঞা" সমষ্টির (totality of intelligence and consciousness) উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে বিশ্বব্যাপী মহৎজ্ঞান ও ধীশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য এই অভিমতটি "জড়বাদঘটিত" (materialistic)। বিপরীত মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মতে জ্ঞান ও ধীশক্তি সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান আছে এবং এই শক্তিই জীব ও জড়পদার্থের সৃষ্টির আদি কারণ। যে কোনও সিদ্ধান্তই গ্রহণ করি না কেন, এক বিশ্বব্যাপী মহান্ জ্ঞান যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আর একটি উদাহরণ দিয়া আমি আমার প্রবন্ধটি শেষ করিব। নেপোলিয়ান যে কূট-প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন তাহার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই ছিল, "যদি ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করিল?" এই বিষয়ে কেবল দুইটি কল্পনাই সম্ভব। একটি অনুমান এই যে, জড়পদার্থময় এই জগৎ স্বকীয় গুণেই উৎপন্ন ও বিকশিত হইয়াছে। অন্য অভিমতটি এই যে, কোনও এক মহতী শক্তি স্বয়ং উদ্ভূত হইয়া এই বিশ্বকে সৃজন করিয়াছে। উপরিউক্ত দুইটি কল্পনার মধ্যে শেষটি অধিকতর গ্রহণীয় ও স্বীকার্য্য। স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া কোনও এক বিরাট শক্তির পক্ষেই এই জগৎ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা অধিক। এই জগদ্ব্যাপী শক্তিকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা "স্বয়ম্ভূ" বলা যাইতে পারে।

৭ই পৌষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবলোকে দেখি, আদিম যুগে বিশেষ বিশেষ জন্তু যে দৈহিক উপকরণ নিয়ে এসেছিল, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে পরিণতিক্রমে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু পশুদের মধ্যে যে দৈহিক উৎকর্ষ নানা পথ নিয়েছিল, মানুষের মধ্যে তা বন্ধ হ'ল। মানুষের অভিব্যক্তি নতুন পর্ব নিলে মনের পরিণতিতে। এই মন গাছপালার নেই, আদিম জীবাণুর মধ্যে নেই। এই মন জীবিকার সহায়। গাছপালাকে জীবিকার জন্য খোঁজ করতে হয় না, আলোক থেকে মাটি থেকে বাতাস থেকে সে আপনার পুষ্টি পায়। আহার্য্য সন্ধান, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, বাসা নির্মাণ প্রভৃতি কাজে মন জন্তুদের সহায়। মানুষকে এই মন নানা সমৃদ্ধিতে নিয়ে গেছে, সে অস্ত্র বানিয়েছে, লাঙল চালিয়েছে, চরকায় তাঁতে কাপড় বুনেছে, ঘট বানিয়েছে কুমোরের চাকায়। মানুষের মধ্যে দেখা দিল মনের বিকাশে অভিব্যক্তির অগ্রসর গতি, এলো প্রাণবান দেহের উপরকার পর্ব।

আমাদের শাস্ত্রে আছে মনের চেয়ে বুদ্ধি বড়, বুদ্ধির চেয়ে আত্মা বড়। প্রথমে দেখা গেল অপরিণত মনের কল্পনায় প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখচে আকাশে বাতাসে জলে আগুনে; সর্বত্র স্বতন্ত্র দৈবশক্তির প্রকাশ সে অনুমান করচে। বিশ্বাস করচে যে এই সকল বিশেষ শক্তি-প্রকাশক দেবতাকে স্তবের দ্বারা মন্ত্রবলে তুষ্ট করা যায়।

এই ছিল আধুনিক যুগের পূর্ববর্তীকালে প্রকৃতির রহস্য-অনুভূতি। মন সহজ দৃষ্টিতে যা কল্পনা করতে পারে তারি মধ্যে তার বিচার বদ্ধ ছিল। তখনকার মানুষের চিত্ত বিশ্বসন্ধানচেষ্টায় কোন্ সুদূর অস্পষ্ট প্রান্তে ঘুরছিল তা এখনকার বিজ্ঞানের সঙ্গে পৌরাণিক সৃষ্টি-বাদের ও দৈবতত্ত্বের তুলনা করলে বোঝা যাবে।

জন্তুর অভিব্যক্তি-বৈচিত্র্য তার দেহরূপের প্রকাশ-বৈচিত্র্যে। মানুষের অভিব্যক্তির আরম্ভে কিছু তার পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু এখন যে পর্বে মানুষ এসেছে সেখানে তার অভিব্যক্তির ক্রিয়া অন্তরের দিকে। এখন দেখা যায় মানস শক্তির পরিণতির ভিন্নতা অনুসারে এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের চিন্ময় সত্তার অভিব্যক্তি বহুদূরবর্তী। পাজিপুঁথির পাতা উল্‌টিয়ে যে মানুষ তিথি বিচার ক'রে স্থির করে কবে বেগুন খাবে কবে লাউ, কবে গঙ্গার জলে পবিত্রতার গুণ বিশেষ ভাবে বেড়ে উঠেছে, সপ্তাহে কোন্ বার শুভ কোন্ বার অশুভ, আর নিউটন যিনি দুরূহ গাণিতিক যুক্তি উদ্ভাবন ক'রে বিশ্বের সর্বব্যাপী ভূমিকার আবরণ মোচন করেছেন, চিত্ত-অভিব্যক্তির দিক থেকে এই দুই শ্রেণীর মানুষের প্রভেদ যে কত দুষ্পরিমেয় তার আন্দাজ করা শক্ত। দর্পণ উদ্ভাবনের সঙ্গে দূরবীন উদ্ভাবনের যে তফাৎ সেই তফাৎ এই মনের অভিব্যক্তির সঙ্গে বুদ্ধির অভিব্যক্তির। বাইরের কিছু সাদৃশ্য আছে কিন্তু আন্তরিক পার্থক্য প্রভূত। অভিব্যক্তির ভিন্ন পর্যায়বর্তী মানুষের প্রভেদ জানতে পারি, কী তারা চায় তার প্রভেদ থেকে। একজন সন্ত্রস্ত হয়ে আঁকড়ে থাকে ধর্মনিষ্ঠতা নামধারী অনর্থক আচারের অন্ধ পুনরাবৃত্তি, আর অন্য লোক জ্ঞানদীপ্ত মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে সত্যের দুর্গম পথে সুদূর লক্ষ্যসন্ধানে প্রবৃত্ত হবার জন্যে উৎসুক। এই আকাঙ্ক্ষা এই সন্ধানই অভিব্যক্তির বিভিন্ন সোপানের বিভিন্ন লক্ষণ।

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন জগতের সমস্ত পদার্থ নিত্যচঞ্চল বৈদ্যুতকণার সমষ্টি, একই জ্যোতির্ময় উপাদান নিখিল জগতের সৃষ্টিতে। বুদ্ধির পথে মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপগত যে রহস্য আবিষ্কার করেছে এ কত বড় কথা; স্থূলকে দেখেছে অস্থূলরূপে তেজোময় সর্বব্যাপকরূপে— জ্ঞানের অভিব্যক্তিতে এ তত্ত্ব অত্যাশ্চর্য। অথচ দেখতে

পাই এই মানুষ আত্মার দিক থেকে মূঢ়। সে মারছে কাড়ছে। এমন নিষ্ঠুরতার তাণ্ডবলীলা ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখা যায় নি। বুদ্ধির অন্তর্গত এত বড়ো বিরাট বিকাশের সঙ্গে শ্রেয়োবুদ্ধির এমন হীনতার সমাবেশ মনকে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। তার কারণ অভিব্যক্তির আরো উপরের ভূমিকায় যে আত্মার বিকাশ মানুষের মধ্যে এখনো তা অপরিণত। আত্মার ধর্ম ঐক্য উপলব্ধি করা, বুদ্ধি অনৈক্যকেই দেখে তাকে শ্রেণীবদ্ধ করে। আত্মা সেই সর্বব্যাপকত্বকে আপনার মধ্যেই উপলব্ধি করে, যাকে বলেছে ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। আধ্যাত্মিক সর্বব্যাপিত্বের এই তত্ত্ব আমাদের পিতামহেরা তেমনি ক'রেই দেখেছিলেন মানুষের দৈহিক অভিব্যক্তিতে বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত চক্ষু বিনা তর্কে বিনা বিশ্লেষণে যেমন সহজে দেখে আলোক। তাঁদের সেই আত্মিক দেখা আজকের বিজ্ঞানের আবিষ্কারেরই মতই সাধারণ অনুভূতির অতীত। সেদিন তাঁরা নিশ্চিত ভাষায় বলেছেন জ্যোতির্ময় পুরুষকে জেনেছি যাঁকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, মননও করা যায় না, শুধু আনন্দ-উপলব্ধিতে তাঁর উপলব্ধি। সেই আনন্দ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ। অধ্যাত্মসত্যে চৈতন্যের এই আনন্দময় মূর্ত্তি, মানুষের অভিব্যক্তির পর্যায়ে মনের উপরে বুদ্ধির উপরে। এক-এক জন মানুষের মধ্যে এই সহজ আত্মিক অভিব্যক্তি অকস্মাৎ দেখা যায়। চার দিকের মানুষের সঙ্গে তাঁদের মিল পাওয়া যায় না। তাঁরা আঘাত পান, তাঁরা পরিত্যক্ত হন। তখন বুঝতে পারি মানুষের মধ্যে যে পরিণতির ক্রিয়া চলচে তার লক্ষ্য কোন্ দিকে। বুদ্ধদেব বললেন, মা যেমন ক'রে এক পুত্রকে ভালোবাসেন তেমনি ক'রে দিনে রাত্রে শয়নে উপবেশনে বিশ্বকে ভালোবাসতে হবে। এই পূর্ণ সত্য ঘোষণা ক'রে তিনি নিজেরই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাক্ষ্য দিয়ে গিয়েছেন। এই অপরিমেয় প্রেম প্রাণের নয়, মনের নয়, এ আত্মার ধর্ম। এর আংশিক লক্ষণ ত্যাগে আত্ম-নিবেদনে, এখানে ওখানে কোনো কোনো মানুষে দেখা যায়। এ নিষ্কাম, এ অহৈতুক। তার কারণ এতে স্বভাবেরই একান্ত পরিচয়, এ আত্মিক স্বভাব। এই স্বভাবেরই অভিমুখে মানুষের চরম অভিব্যক্তি। মানুষের অন্য অংশে ক্ষতিলাভ সুখদুঃখের যে তাগিদ আছে এই স্বভাবের মধ্যে তা নেই। যে-শঙ্কা মানব-প্রকৃতির অন্য বিভাগে বিপদের দোহাই দিয়ে পাহারা দেয় এর মধ্যে সে-শঙ্কার স্থান নেই। মহাসাগরের গর্ভ থেকে দূরে দূরে এক-এক স্থানে প্রবালদ্বীপ মাথা তুলেছে। আত্মিক সৃষ্টির প্রক্রিয়াও তেমনি সর্বত্র সমান উচ্চতায় পৌঁছয় নি। এক-এক জনের মধ্যে আত্মার এই সত্য জন্ম থেকেই যেন প্রকাশোন্মুখ হয়। আরম্ভেই তাঁরা নিয়ে আসেন সেই পরম প্রকাশের ক্ষুধা। যেমন পিতৃদেবের তেমনি রামমোহনের জীবনে দেখি। তিনি জন্মেছিলেন সনাতন আচার-বিচারের নিবিড় ব্যূহের মধ্যে। তবু অল্প বয়সেই তিনি বলে উঠলেন আমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি এই গতানুগতিকতার মধ্যে নয়। বাংলা দেশে তখন উপনিষদের চর্চা ছিল না,—তবু তিনি অন্তরের ক্ষুধায় সত্যকে সন্ধান করবার পথে সেই উপনিষদের আশ্রয় নিলেন।

আমরা চরম অভিব্যক্তির থেকে দূরে থাকতে পারি, তবু তার মানে এ নয় যে, সেই দূরেই আমাদের অনিবার্য চিরস্থিতি। আমাদের ইচ্ছার মধ্যে আমাদের সাধনা যদি প্রাণ পোষণ করে, তবে জানব পূর্ণতার অভিমুখে সেই লাভ বহুমূল্য। সেই ইচ্ছা থেকেই উপলব্ধির সূচনা। সেই ইচ্ছাই আমাদের অভিব্যক্তি পথযাত্রার বাহন। সেই পরম ইচ্ছার সূচনা দেখা দিয়েছিল এই সাতই পৌষে পিতৃদেবের দীক্ষার দিনে। যে-মন স্বভাবতই ঐশ্বর্য চায় সাংসারিক উন্নতি চায় সেদিন তিনি তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। আত্মা চায় যে-সত্যকে সেই সত্যকে চাওয়ার দ্বারাই তিনি আপনার মধ্যে আত্মবিকাশের প্রমাণ পেয়েছিলেন। অভিজাত সমাজের সম্মান থেকে তিরস্কৃত হলেন, সম্পদের চূড়া থেকে দারিদ্র্যের গহ্বরে অকস্মাৎ নিক্ষিপ্ত হলেন। রইলেন অবিচলিত। কারণ তাঁর আনন্দের উপকরণ বাইরে ছিল না, সে ছিল তাঁর আত্মার স্বতোদীপ্ত আলোকে।

যাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্য পরিব্যক্ত হয়েছে

তাঁদের বাণী এই যে, আনন্দ থেকেই সমস্ত কিছুর উৎপত্তি। এই তাঁদের আবিষ্কার।

বিজ্ঞান বলেছে আদিম জ্যোতিঃশক্তি সমস্ত পদার্থকে সৃষ্টি ও রক্ষা করচে। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত এই প্রাকৃতিক শক্তি, যা দুর্দৃশ্য যা সর্বত্র গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট, যার একমাত্র প্রমাণ বুদ্ধির অতি সূক্ষ্ম প্রমাণে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও ঠিক তেমনি। সকল কিছুর মূলে যে অদৃশ্য অস্পর্শ্য আনন্দ পরিব্যাপ্ত তার অব্যবহিত উপলব্ধি বচনে নয়, মননে নয়, ইন্দ্রিয়বোধে নয় তাঁদেরই চিত্তে যাঁদের স্বভাবে আছে আত্মার অসীম আত্মীয়তার আনন্দ। এই আনন্দের জন্যে তাঁরা আজন্ম ক্ষুধা নিয়ে জন্মেছিলেন, এই আনন্দ-বোধের আত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁদের জীবনে।

২

ঈশোপনিষদের শ্লোকে প্রথম দিকে বলেছে ঈশাবাস্যমিদম্ সর্বম্—বিশ্বচরাচর ঈশের দ্বারা ব্যাপ্ত। এই শ্লোকেরই অন্ত প্রান্তে আছে মা গৃধঃ, লোভ কোরো না। এই দুইটি অংশে যেন পরস্পর যোগ নেই। কিন্তু ভাবতে গেলে দেখি, আত্মার এই যে সর্বব্যাপ্তি সেই সত্যের উপলব্ধির পথে প্রধান বাধা হ'ল রিপু, তাকেই বলেছে লোভ। আত্মার বন্ধনমুক্তির সাধনায় বাধা দেয় রিপু। লোভের আকর্ষণে বাইরের স্থূল বিষয়কে সে বড়ো মূল্য দেয়। তাতেই আত্মার ঐশ্বর্য থেকে সে হয় ভ্রষ্ট। এ যেন ঘরে বর্গির আক্রমণ, আত্মপোষণের সমস্ত অন্ন নিঃশেষ ক'রে তাকেই খাজনা দিতে হয়। এমন অনেক জীবাণু আছে যা জলের মধ্যে অনবরত ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে খাদ্যদ্রব্য তাদের গায়ে ঠেকে ও তার দ্বারাই তারা প্রাণধারণ করে। প্রবৃত্তির ঘূর্ণীপাকে মানুষ এমনি অন্ধভাবেই আত্মকর্তৃত্ব হারায়। তখন বাইরের তাড়নায় আন্তরিক দাসত্বে মানুষের লজ্জা। আজকের ইতিহাসে তার প্রমাণ দেখ। মনুষ্যত্বের অবমাননা হানাহানি কাড়াকাড়ি আজ এমন নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে কেন? প্রচণ্ড লোভ আজ মানুষকে মনুষ্যত্বের কক্ষপথ থেকে প্রবল বেগে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছে।

মহাভারতে দেখি, যুদ্ধে জয়লাভের লোভে অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ এই একটি মিথ্যা কথা যুধিষ্ঠির ব্যবহার করেছেন। সেজন্য তাঁর কত সংকোচ কত পরিতাপ। সেজন্য তখনকার সমাজ তাঁকে নরকবাস প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য ব'লে গণ্য করেছে। য়ুরোপে আজ জয়লোভে চারিদিকে মিথ্যার মহাপ্লাবন। আজ য়ুরোপীয় যোদ্ধারা হত্যাকাণ্ডের কোনো দুর্নীতিতে কোনো কুণ্ঠা রাখে নি। আমাদের দেশে এক দিন যাঁরা বলেছিলেন নিরস্ত্রকে অস্ত্রী, সুপ্তকে জাগ্রত আক্রমণ করবে না, মানবিকতার অভিব্যক্তিতে তাঁরা উপরে উঠেছিলেন, এখনকার জয়লোভপ্রমত্তদের সঙ্গে তাঁরা এক জাতের মানুষ ছিলেন না। যুদ্ধে হিংস্রনীতির চেয়ে অহিংস্রনীতিতে বীরত্ব প্রকাশ পায় অনেক বেশি, একথা অনুভব করতে যাঁরা অক্ষম, মনুষ্যত্বের পরিণতিতে তাঁরা নিচের কোঠায় আছেন সেকথা সম্পূর্ণ বোঝবারও শক্তি থেকে তাঁরা বঞ্চিত।

এ-কথা শুনে কেউ কেউ মনে করতে পারেন আমরা বুঝি এই সকল পাশ্চাত্য দেশের চেয়ে উঁচু পদবীর। কিন্তু মানুষের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করতে আমরাও কি কম করেছি। য়ুরোপে ইহুদীদের যেমন কেবলি আজ ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের দেশের আর্যত্বাভিমানীরাও কি তার চেয়ে অনেক বেশি কাল ধরে অনেক বেশি লোককে তিরস্কৃত অপমানিত করে নি? তাদের কি বঞ্চিত করে নি শিক্ষা থেকে সম্মান থেকে ন্যায়ব্যবহার থেকে?

ইহুদীদের প্রতি নির্যাতন দূর থেকে দেখে আজ আমরা উত্তেজিত হচ্ছি, কিন্তু মানুষকে ছুঁয়ে যখন আমরা গঙ্গাস্নান ক'রে শুচি হয়েছি কল্পনা ক'রে গঙ্গার সমস্ত জলকে অশুচি ক'রে দিই তখন সেটাকে অধ্যাত্মনীতির পতন এবং মানবদ্রোহী বর্বরতা বলেই কি গণ্য করব না? আর্য-উপাধিধারী হিটলারের স্বস্তিকলাঞ্ছিত বর্বরতার সঙ্গে তার কি বিশেষ প্রভেদ আছে?

শান্তিনিকেতন
৭ই পৌষ, ১৩৪৫

[শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আচার্যের উদ্বোধন ও উপদেশ। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।

উত্তরাধিকারী

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

একাকী ঘরে বসিয়া স্তূপীকৃত কাগজপত্র সামনে রাখিয়া একখানি চিঠি পড়িতেছিলাম। চিঠির লেখক আমার ছোট ভাই, ঠাকুরদার নামে লেখা।

ঠাকুরদার মৃত্যুর পরে গ্রামে আসিয়াছিলাম। ইহার আগে শেষ যখন আসিয়াছিলাম, সে অনেক দিন আগের কথা, তখন আমি যুবক। এ গ্রামে আমার পৈতৃক বাড়ী হইলেও গ্রামের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ অনেক দিন যাবৎ নাই, আজও সে-সম্বন্ধ নূতন করিয়া পাতাইবার কোন প্রয়োজন দেখি নাই। তবু আসিয়াছিলাম মৃত পিতামহের শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিতে।

ঠাকুরদাকে শেষ দেখিয়াছিলাম অন্ততঃ পাঁচ বছর আগে। তখনই তিনি অতিবৃদ্ধ, প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়স। কলিকাতায় আসিয়াছিলেন চোখের চিকিৎসা করাইতে, আমার বাসাতেই উঠিয়াছিলেন।

যেন পঁচাত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধের চক্ষুরোগ একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, যেন-সে চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া না পাইলে চলে না।

তাহার পরে তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক কিছু ছিল না বলিলেই চলে। খুব অল্প বয়সে বাবা-মা দুই জনকেই হারাইয়া কলিকাতায় পিসিমার বাড়ীতে মানুষ হই। মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিতাম, ঠাকুরদার সঙ্গে টাকার সম্পর্ক ছিল বলিয়া। মাসে অন্ততঃ একখানি করিয়া চিঠি লিখিতাম, একই কারণে। তাহার পরে উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষীণ যোগ-সূত্রটুকুও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

আজ সেই সুদূরগত পিতামহের কথা মনে পড়িয়া মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। গ্রামে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না, তাঁহার শেষ কয়েকটি বৎসর প্রায় নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে কোন দিন ভাবি নাই, অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গহীন জীবন কত বেদনাময়, কত দুর্ব্বহ! আজ তাঁহার মৃত্যুর পর বারে বারে সেই একই কথা মনে হইতে লাগিল।

আমার ছোট ভাই অসীমের জন্মের পরেই মা মারা যান। তাহার বছরখানেক পরে বাবাও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। শুধু অসীমকে বুকে চাপিয়া বৃদ্ধ পিতামহ সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই বিপুল স্নেহের কাছে আমার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আমি ঠাকুরদার স্নেহের অংশীদার কখনও হইয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না।

আজ তাই মৃত বৃদ্ধের বহু বৎসর ধরিয়া সঞ্চিত পত্ররাশি খুলিয়া দেখিতেছিলাম, বিগত যুগে নিজের লেখা কোন চিঠি পাই কিনা। একখানিও পাইলাম না। সে-সব চিঠির যেটুকু প্রয়োজন ছিল, অস্তিত্বও সেই সময়-টুকুর জন্যই ছিল,—প্রয়োজন ফুরাইলেই তাহারা বাজে কাগজের ঝুড়িতে আশ্রয় লইয়াছে, আর তাহাদের সন্ধান কেহ লয় নাই। তা ছাড়া, প্রয়োজনও তো ছিল শুধু আমারই!

মনের মধ্যে হাৎড়াইয়া এতটুকু অভিমান খুঁজিয়া পাইলাম না। যেখানে বন্ধন শুধু অর্থের, সেখানে স্নেহ-ভালবাসার খোঁজ করিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়, আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এটুকু আমি শিখিয়াছিলাম। আশা যেখানে বেশী, নৈরাশ্যের তীব্রতাও সেখানেই বেদনাদায়ক। আমার আশাও কিছু ছিল না, নিরাশও হইলাম না।

একরাশ কীটদষ্ট কাগজ ঘাঁটিয়া বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত দলিলপত্র সরাইয়া প্রথমেই হাতে পড়িল লাল ফিতায় বাঁধা একতাড়া চিঠি, সংখ্যায় খুব বেশী নহে। বুঝিলাম পিতামহ ও পিতামহীর যৌবনের চিঠি, সেগুলি না খুলিয়া এক পাশে রাখিয়া দিলাম। আরও অনেক কিছু পাইলাম, দশ-বারখানি চিঠি বাবার' লেখা, দুই-চারিখানি ঠাকুরদার কাছে মার লেখা। সঙ্গরী বৃদ্ধের পক্ষে এগুলির এক

খানিও ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কৌতূহলের বশে দুই-একখানি খুলিয়া সেগুলিও সরাইয়া রাখিলাম। মনে হইল, এতগুলি চিঠির মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার মত কিছু পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু ভুল করিয়াছিলাম। আরও কয়েকখানি চিঠি পাইলাম, সকলের চেয়ে সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখা। তাহাতে শিশুহস্তের আঁকাবাঁকা দুর্বোধ্য চিঠি হইতে আরম্ভ করিয়া পাকা হাতের লেখাও নজরে পড়িল। সবগুলিই আমার ছোট ভাই অসীমের লেখা।

মাতৃহীন অনুজকে লোকে যেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, আমি অসীমকে তেমনি ভাবেই ভালবাসিয়াছিলাম। তবু, নিজের অজ্ঞাতে হয়তো একটু বেদনা, একটু ঈর্ষ্যা অনুভব করিলাম। মনে হইল, আমার চিঠিগুলি কি এতই মূল্যহীন যে, বাজে কাগজের ঝুড়ি ভিন্ন তাহাদের স্থান হইল না, আর এ চিঠিগুলি কি এতই অমূল্য?

অথচ আমি জানি, সত্যই এগুলি অমূল্য। সোনা-রূপার দামে এ-চিঠিগুলির দামের হিসাব-নিকাশ করা যায় না। তাহার কারণ শুধু এই নয়, যে অসীম পুত্রহারা পিতামহের শোক ভুলাইয়াছিল; ইহাও নহে, যে মায়ের কোল কাহাকে বলে তাহা সে কোন দিন জানিল না; অথবা, আমি যখন পিতামহের সহিত শুধু অর্থের খাতিরে সম্বন্ধ রাখিয়াছিলাম, তখন সে তাহার হৃদয় দিয়া এই স্থবিরকে ভালবাসিয়াছিল, যে ভালবাসার একটি কণাও তিনি আমার নিকট হইতে পান নাই; কারণ তাহাও নহে।

কারণ এই,—অন্ততঃ সব চেয়ে বড় কারণ,—অসীম যে কোথায়, তাহা আজ দশ বৎসর ধরিয়া কেহ জানে না। অতি সামান্য কারণে এক দিন ঠাকুরদার উপর রাগ করিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল, আর কোন দিন তাহার উদ্দেশ মিলিল না। ঠাকুরদা ও আমি, উভয়েই যথেষ্ট টাকা খরচ করিলাম, সম্ভব অসম্ভব, সমস্ত স্থানে অনুসন্ধান করা হইল, অসীমকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। নিঃসন্দেহ সে বাঁচিয়া নাই, বাঁচিয়া থাকিলে এত দিন নিশ্চয় ফিরিয়া আসিত—পিতামহের স্নেহের টানে।

এই একটি জায়গায় ঠাকুরদার সহিত আমার মিল ছিল—অসীমের উপরে অপরিমিত স্নেহে। আমার সে গোপন স্নেহের খবর ঠাকুরদা রাখিতেন না, রাখিলে হয়তো এত কঠোর হইতে পারিতেন না। আমার স্নেহ ঠাকুরদার স্নেহের মত প্রকাশ পাইত না, মনের গভীরতায় লুকাইয়া থাকিত; সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়, শুধু ঠাকুরদা নহে, হয়তো অসীমও সে-স্নেহের কোন সংবাদ পায় নাই।

এমন কি আমিও হয়তো তখন ভাল করিয়া বুঝি নাই অসীমকে আমি কতখানি ভালবাসি। বুঝিলাম, যখন অসীম সকল স্নেহের অন্তরালে চলিয়া গেল, আমার ও পিতামহের নাগালের বাহিরে, তখন বুঝিলাম, যে স্নেহ আমি কখনও কাহাকেও বিলাইতে পারি নাই, ভাল করিয়া কাহারও কাছে পাইও নাই, সেই স্নেহ এই একটি অসহায় শিশু, যে জন্মাবধি ভাগ্যহীন, তাহাকেই ঘিরিয়া নিঃশেষ হইয়াছিল। কেহ জানিল না; সেও না, হয়তো আমিও না।

শুধু ভাবিয়া অবাক হই, অসীম নিরুদ্দেশ হওয়ার পরেও ঠাকুরদা এত দিন কেমন করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন! বোধ হয় সে এক দিন ফিরিয়া আসিবে, এই আশাটুকু বুকে লইয়া আশি পার হইয়াও তিনি কোনরকমে জীবনভার বহন করিয়াছিলেন। এত বড় দুরাশা বোধ হয় কেহ কোন দিন করে নাই। এত দিন পরে হয়তো তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে মৃত্যুর পরপার হইতে কেহ ফিরিয়া আসে না, কোন পরিজনের, কোন স্থবির বৃদ্ধের আকুল আহ্বান শুনিয়াও না।

অসীমের শেষ চিঠিখানি হাতে করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়াছিলাম। মনে হইল, কি বিপুল স্নেহ এই রুক্ষতার আবরণে গড়া বৃদ্ধের মনের ভিতরে লুকাইয়া ছিল! আমার শৈশবে যাহার সংস্পর্শে আসিয়াও আসিতে পারিলাম না, তাহা পাহাড়ের বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইল অসীমের জন্মের পর। আমি তাহার ন্যায্য অংশ পাই নাই বলিয়া আর আমার দুঃখ ছিল না। যে সর্ব্বতোভাবে পাওয়ার যোগ্য বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, দিয়াছিলেনও তাহাকেই নিঃশেষ করিয়া। যে ভাইকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সে-ই তাহারও হৃদয় পূর্ণ

করিয়াছিল, যদি হতভাগ্য অসীম তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ না করিতে পারিয়া থাকে, দুর্ভাগ্য তাহারই বেশী।

এ-গ্রামকে ভাল করিয়া কোন দিনই চিনি নাই। খুব অল্পবয়সে শহরে আসিয়া সেখানেই মানুষ হইয়াছিলাম, গ্রামের প্রতি আমার খুব বেশী আকর্ষণ ছিল না।

কেবল ব্যতিক্রম ছিল অসীম।

হয়তো এমন কোন দিন ছিল, যে-দিন গ্রামের সৌন্দর্য্য ছিল, সমৃদ্ধি ছিল। আজ তাহার কিছু বাকী নাই। পুরাতন গৌরবের চিহ্ন রহিয়াছে তিন-চারিখানি বড় বড় বাড়ী, যেখানে বাসস্থান যথেষ্ট আছে, বাস করিবার মত মানুষ নাই। বছর দুই আগেও এমন লোক কয়েকটি ছিল যাহাদের এই গ্রামের লোক বলা চলিত। এখন দুই-তিনটি পরিবার ভিন্ন আর কাহারও অস্তিত্ব তাহাদের মধ্যে বাকী নাই। শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ও হরিপদ ঘোষ অল্প কিছু দিন হইল মারা গিয়াছেন, সেই সঙ্গে তাঁহাদের দুই পরিবারের সহিত গ্রামের সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে।

ঠিক তেমনি করিয়া আমার ঠাকুরদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমিও বোধ হয় গ্রামের সহিত, আমার বহু পূর্ব্বপুরুষের ভিটার সহিত, এত দিনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলাম। বাবা-মাকে ভাল করিয়া মনে নাই, কিন্তু অসীমের স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ীতে একাকী কয়েক দিন থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

তবু এই ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট জনমানবহীন দেশে যে লোকটি আশি বছর কাটাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা ভাবিয়া আমার কঠোর চোখেও জল আসিল। কি সুখের আশায় কি আনন্দের আশায় তিনি এই নিরানন্দের প্রতিমূর্ত্তি গ্রামে তাঁহার দৃষ্টিশক্তিহীন শোকাচ্ছন্ন শেষ জীবন কাটাইয়া গেলেন? শুধু কি তাঁহার পিতৃপিতামহের ভিটার মায়ায়, না, শৈশবের খেলাঘর, যৌবনের কর্ম্মস্থল, তাহারই মায়ায়? না, এইখানেই তিনি নিজ হাতে অসীম নামে একটি অনাথ শিশুকে মায়ের অধিক স্নেহে যত্নে মানুষ করিয়াছিলেন, তাহারই স্মৃতির মায়ায়?

অসীম যদি বাঁচিয়া থাকিত, বলিতাম "অকৃতজ্ঞ অসীম!" বলিতাম, "ওরে তুই কোন্ ভ্রমের ঘোরে এমন স্নেহের বন্ধন কাটাইয়া দূরদূরান্তরে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিলি? এমন ঘরের টান তোকে যে বাহিরের টানের কাছে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল, কি সে আকর্ষণ, কোন্ মৃগতৃষ্ণিকার মোহ?"

কিন্তু অসীম তো আর বাঁচিয়া নাই!

যে-লোকটির কথা প্রয়োজন ব্যতীত কখনও মনে পড়ে নাই, যিনি বাঁচিয়া থাকিতে দুই ছত্র লিখিয়া কুশল-প্রশ্নটুকুও করার প্রয়োজন অনুভব করি নাই, আজ তাঁহার মৃত্যুর পক্ষকাল পরে তাঁহারই ব্যবহৃত ছোট ঘরখানিতে বসিয়া তাঁহার কথা মনে পড়িয়া সমস্ত অন্তর ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

ঠাকুরদাকে গ্রামের লোকে যে খুব শ্রদ্ধাভক্তির দৃষ্টিতে দেখিত, তাহা মনে হয় না। তাঁহার কৃপণতার অপবাদ ছিল, সে অপবাদ খুব মিথ্যাও বোধ হয় নহে। ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশের সহিতই তাঁহার পরিপূর্ণ অসদ্ভাব ছিল, শুধু তাঁহারা সুযোগের অভাবে সে অসদ্ভাবের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু ঠাকুরদার মৃত্যুর পরে তাঁহারাই আমার নিকট মায়াকান্না কাঁদিয়া গেলেন, এবং জানাইলেন যে তিনি মারা যাওয়াতে তাঁহাদের শোকের অবধি নাই।

যাঁহার সহিত ঠাকুরদার সবচেয়ে বেশী রেষারেষি ছিল, সেই হলধর রায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন। কহিলেন, "তোমার যে কি কষ্ট হচ্ছে, সেটা আমরাই বুঝতে পারছি। যাক্, শোক ক'রে কি আর করবে বাবা, তিনি গেছেন, বয়স তো হয়েছিলই, ভালই গেছেন।"

তিনি যে ভালই গিয়াছেন, সে বিষয়ে ইহাদের কাছে পাঠ লওয়ার দরকার আমার ছিল না। আমার কষ্ট হউক বা নাই হউক, তাহাতে তাঁহাদের উপদেশের কি প্রয়োজন, তাহাও বুঝিলাম না। তবু ভদ্রতা করিয়া কথার জবাব দিতে হইল, তাঁহারাও পরম পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

আমার এখানকার কাজ মোটামুটি শেষ হইয়াছিল।

স্থির করিলাম, এক জন দূরসম্পর্কীয় দরিদ্র আত্মীয়কে গ্রামে আনিয়া বসাইব, তিনি আমার ও তাঁহার নিজের উভয়েরই স্বার্থের দিকে নজর রাখিবেন। ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় হইলেও জমির ফসল জন্মানোর শক্তি কমে নাই, পাকা হাতে তাহার ভার থাকিলে আয় নিতান্ত কম হইবে না। টাকা আমার নিজের যথেষ্ট আছে, কিন্তু যথেষ্টকে যথেষ্টতর করার যে একটা আত্মপ্রসাদ আছে, তাহা আমি জানিতাম।

এমন একান্ত বিষয়নিমগ্ন মনোভাব লইয়া আমি ঠাকুরদার দপ্তর দেখিতে বসিয়াছিলাম।

কিন্তু অসীমের কয়েকখানি চিঠি সব ওলটপালট করিয়া দিল। মনে হইল, কি জিনিষের আস্বাদন আমি এক কণাও পাইলাম না! খুব শৈশব ব্যতীত মা-বাবার স্নেহ আর পাই নাই। পিতামহের স্নেহ যখন একান্তভাবে পাওয়ার সম্ভাবনা আসিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নূতন অংশীদার আসিয়া তাঁহার সমস্ত স্নেহ নিঃশেষে দখল করিয়া লইল, আমার কণামাত্রও জুটিল না।

মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, ইহার জন্ম সম্পূর্ণ দায়ী তো অসীমই। আমার মায়ের কোল ছাড়িবার বয়স না আসিতেই সে আমার মাতৃস্নেহে ভাগ বসাইতে আসিয়াছিল। মাকে যে চিরদিনের জন্ম হারাইলাম, তাহার জন্ম তো দায়ী সে-ই! বাকী ছিল পিতামহের শুভ্রক্রোড়, কিন্তু অসীমের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আমার দিক দিয়া অর্গল পড়িল, আমি চিরকাল অবাঞ্ছিত, অনাহূতের মত বাহির দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে-দুয়ার কোন দিনও খুলিল না। আমারও করাঘাত করার সাহস বা প্রবৃত্তি রহিল না, রুদ্ধ দুয়ারে আঘাত করিলেই তো আর প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না!

কিন্তু অসীমের সম্বন্ধে আমার কি এক দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, যাহাতে তাহার কোন দোষই আমি দেখিতে পাই না। শুধু এইটুকু ভাবিয়া ব্যথিত হই যে, আমার সে স্নেহের মূল্য সে কোন দিনই বুঝিল না। নাই বা বুঝিল, আমি তাহাকে ভালবাসিয়াই সুখী, প্রতিদানের অপেক্ষা রাখিয়া তো তাহাকে স্নেহ দান করি নাই!

যাহাকে এত ভালবাসিতাম, এত দিনের ব্যবধানে তাহার স্মৃতিও যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তাহাকে শেষ দেখিয়াছি নয় বছর আগে, বয়সে তখন সে প্রায় যুবক; নারীসুলভ অতি সুকুমার কচি মুখ, কোঁকড়া চুল, ফরসা রং, সমস্ত মিলাইয়া তাহার যে স্মৃতি এখনও মনে রহিয়াছে, তাহার সহিত বাস্তবের কতখানি মিলিবে জানি না। তাহার স্বভাব ছিল ভীরু লাজুক শিশুর মত। লেখাপড়ায় খুব ভাল সে কোন দিনই ছিল না, কিন্তু সে অভাব ঠাকুরদা, অথবা আমি, কোনদিনই বোধ করি নাই।

কেন জানি না, আমার সহিত সে কোন দিনই প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিত না। হয়তো আমার নীরস বাহির দেখিয়া সে ভুল করিয়াছিল, যেমন ভুল অনেকেই করিয়াছে; হয়তো যে-বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয় সে অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার তুলনায় আমি ছিলাম নিতান্ত নগণ্য!

শুধু এক দিন সে আমার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিয়াছিল। হয়তো সেখানে আমি ছিলাম উপলক্ষ্য মাত্র, সে নিজের মনের কথা নিজের কাছেই খুলিয়া বলিয়াছিল।

বলিয়াছিল, "দাদা, আমার এসব আর একটুও ভাল লাগে না, পড়াশুনো আমার পোষায় না। দাদুর কাছে ফিরে যেতেও সাহস হয় না, মনে হয় বাঁধা পড়ে যাব—আর বাইরে বার হবার পথ পাব না।"

এ-সব কথার সহিত শেয়ার-মার্কেটের দাম ওঠাপড়ার কোন সম্পর্ক নাই, অর্থকরী কোন বিষয়ের বাষ্পও ইহার মধ্যে নাই। আমি অন্যমনস্কভাবে শুনিয়াছিলাম, অন্যমনস্কভাবেই মনে রহিয়াছে।

আমার মনে হয়, ঠাকুরদার উপরে রাগ একটা অজুহাত মাত্র। এত কাল পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া মুক্ত হাওয়ার টানে সে বাহিরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, অভিজ্ঞতার অভাবে অসংখ্য বিপদের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, বাঁচিয়াও হয়তো আর নাই।

কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কারণ যাহাদের মধ্যে স্নেহ, যাহাদের মধ্যে বিবাদ, তাহাদের একজন মৃত, এবং সম্ভব-অসম্ভব

লন ঠিক বিচার করিব। দেখিলে আর এক জনও মৃত। শুধু আমি জীবিত থাকিয়া নিরঙ্কুশ অবস্থায় বিষয়ের মালিক হইয়া পড়িয়াছি।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। ঘুম আসিতেছিল না। এক জন তরুণ ও একটি বৃদ্ধের চিন্তা স্তব্ধতার মধ্যে নিঃশব্দ কলরবে আমাকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল।

সহসা খেয়ালের বশে আস্তে ডাকিলাম, "অসীম!" চমকিয়া উঠিলাম। মনে হইল রাত্রির অন্ধকারের মধ্য হইতে স্বল্পালোকিত ঘরে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হইল, ঘরের বায়ুমণ্ডল, বাহিরের শূন্যতা সমস্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অসীমের স্মৃতি মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছে। আমার মনের ভিতর হইতে এক অশীতিপর বৃদ্ধের রূপ যেন খানিকক্ষণের জন্য মুছিয়া গেল। মনে হইল, অসীমকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছি,—দুর্বল অসীম, ভাবপ্রবণ অসীম, কল্পনাবিলাসী অসীম, এক দিনের, এক মুহূর্তের খেয়ালে ঘর ছাড়িয়া কোন্ সুদূরে কোন্ সঙ্গীহীন সান্ত্বনাহীন প্রান্তরে তাহার জীবন শেষ হইল? আর যদি সে বাঁচিয়াই থাকে, তবে কোথায় কোন্ নগরের নিষ্করুণ রাজপথে সে একমুষ্টি অন্নের কাঙাল? যে বড় বেশী ভালবাসিত, তাহার স্নেহনীড় ছাড়িয়া হৃদয়হীন পৃথিবীর বুকে সে আজ কতখানি অসহায়!

আবার ডাকিলাম, "অসীম, অসীম, অসীম!" কেহ উত্তর দিল না, শুধু নিস্তব্ধ রাত্রিতে আমার নিজের গলার স্বর, আমার মনের বেলাভূমিতে, অসংখ্য নগণ্য চিন্তার বালুকণায় প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

ভাবিলাম, আজ যদি সে ফিরিয়া আসিত, তবে এক জনের অভাব নিজের হৃদয়ের স্নেহ দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতাম। হয়তো বিনিময়ে আমার বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন, অর্থপিপাসু জীবনে আমিও কিছু পাইতাম, কারণ ভালবাসা এমন একটি জিনিষ, যাহা সঞ্চয় করিয়া রত্নমঞ্জুষায় লুকাইয়া রাখা যায় না, নিঃশেষে বিতরণ করিয়াই তাহাকে ধরিয়া রাখা চলে।

আবার পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে লাগিলাম।

ঠাকুরদার সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে যাহা ধারণা ছিল, এখন দেখিলাম তাহার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। ঠাকুরদা তেজারতী কারবার করিতেন। সামান্য টাকা বহুগুণে বাড়িয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা আমাকে প্রথমে স্তম্ভিত, এবং পরে বিশেষ পরিমাণে তৃপ্ত করিয়া তুলিল।

অবশ্য আমার নিজের যে টাকার খুব বেশী প্রয়োজন ছিল, তাহা নহে। আমি নিজে যাহা উপায় করি তাহার পরিমাণ খুব সামান্য নহে, এবং আমার পক্ষে তো নহেই। আমি বিবাহ করি নাই। জীবিত নিকট-আত্মীয় কেহ আছেন বলিয়া জানা নাই, থাকিলেও তাঁহাদের কাহারও সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু নিজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া, শুধু মানসিক নহে, শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও, যাহা পাই, তাহার কাছে সহসা বিনাযত্নে, বিনাপরিশ্রমে প্রাপ্ত এই অর্থ অত্যন্ত বিশাল বলিয়া মনে হইল।

শুধু এক জন জীবিত থাকিলেই এই অবস্থার অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারিত, সে অসীম। কিন্তু সহজ বুদ্ধি দিয়া বিবেচনা করিলে বুঝি তাহার পক্ষে এখনও বাঁচিয়া থাকা প্রায় অসম্ভব। যদি থাকিত, তবে এই দীর্ঘ নয় বৎসরে তাহার কোন খবরই কি পাইতাম না? অন্ততঃ আমার তাহা মনে হয় না।

রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছিল। ঘরে ঘড়ি ছিল না, জানালার বাহিরে আকাশের দিকে তাকাইয়া বুঝিলাম প্রায় দুইটার কাছাকাছি হইয়াছে। ঘুম আসিতেছিল।

কিন্তু আজ এই দপ্তর শেষ না করিয়া ঘুমের কথা ভাবিব না। যে পিতামহকে কোন দিন ভাল করিয়া চিনি নাই, তিনি হয়তো একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই, আমার জন্য যে বিপুল অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে না হিসাব করিয়া মনে স্বস্তি পাইতেছিলাম না। হয়তো আর আমাকে জীবনে অর্থোপার্জ্জনের তৃষ্ণায় ঘুরিয়া মরিতে হইবে না, যেমন ভাবেই থাকি না কেন, যাহা পাইয়াছি হয়তো তাহাতেই আমার বাকী জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে।

আমার স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি সাধারণের হিসাবে একটু বেশী বড়।

একখানি বৃহৎ আকারের খাম হাতে পড়িল। উপরে কিছু লেখা নাই, শুধু শিলমোহর দিয়া বন্ধ করা।

পঞ্চতন্ত্রের গল্পে পড়িয়াছিলাম, এক জন তামার খনির সন্ধান পাইয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, বড় কিছু চাহিয়াছিল। অনুসন্ধানের ফলে মিলিল রূপার খনি, অবশেষে সোনার খনি, তাহাতেও তাহার আশা মিটিল না। আরও বড় কিছু পাইবার লোভে সে সম্মুখে চলিল, পরিণামে মিলিল মৃত্যু।

খামের মধ্যে একখানি উইল। সেই উইল অনুসারে ঠাকুরদা তাঁহার অস্থাবর নিজস্ব সমস্ত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন অসীমের জন্য, আইন অনুযায়ী তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও ভাগ নাই।

স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। মৃত পিতামহ, নিরুদ্দিষ্ট ভাই, ইহাদের জন্য সমস্ত মমতা, সমস্ত অনুকম্পা মনের মধ্য হইতে উড়িয়া গেল, বাকী রহিল শুধু সীমাহীন ক্রোধ ও ক্ষোভ। আমি যেমন ছিলাম, তেমনই রহিয়াছি, এই বাড়ীর ভিটাটুকু ও কয়েক বিঘা ধান-জমি ভিন্ন ঠাকুরদার কোন সম্পত্তিতে আমার অধিকার নাই, এতটুকু না।

একটু স্থির হইয়া ভাবিলাম, এতটা মন খারাপ করার প্রয়োজনই বা কি? অসীমের যখন কোন উদ্দেশ নাই, এক আধ দিন ধরিয়া নহে, দীর্ঘ নয় বছর ধরিয়া, তখন তাহাকে মৃত বলিয়া মনে করিয়া লওয়ায় কি বাধা থাকিতে পারে? আর সেইটুকু গোল মিটাইতে পারিলেই তো সব আমার, দ্বিতীয় অংশীদার আর কে আছে?

উইল তিন বছর আগের। অর্থাৎ এত দিনেও ঠাকুরদার মন হইতে এ বিশ্বাসটুকু যায় নাই যে, অসীম ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে-বিশ্বাসের মূল্য আজ আর একটুও নাই।

কিন্তু যে কারণেই হউক, কথাটা ভাবিয়া খুব খুশী হইতে পারিলাম না। আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ঠাকুরদা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন, উইলের কোন স্থানে আমার নাম পর্য্যন্ত নাই।

মনকে বুঝাইলাম, "নাই বা থাকিল। পরিণামে ফল তো একই দাঁড়াইতেছে। ও উইলের মূল্য কি আছে? অসীম যদি বাঁচিয়া থাকিত, ও সম্পত্তি দখল করিয়া লইতে ফিরিয়া আসিত, তবে না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।"

কিন্তু সত্যই কি সে সম্ভাবনা কিছু নাই? এমনও তো হইতে পারে, অসীম বাঁচিয়া আছে, এক দিন সহসা ধূমকেতুর মত আসিয়া আমার আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন এক মুহূর্ত্তের রূঢ় সত্যের আঘাতে ভাঙিয়া দিয়া যাইবে!

অসীমের জীবনান্ত সম্বন্ধে আমার এত দিনের দৃঢ় বিশ্বাসের মূল যেন শিথিল হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্য, এক টুকরা কাগজের এতখানি ক্ষমতা!

আমার নিদ্রার সমস্ত বাসনা চলিয়া গিয়াছিল। তবু জোর করিয়া ঘরে গিয়া বিছানা আশ্রয় করিলাম। ঘুম আসিল না।

অল্প তন্দ্রার ঘোরে আমার কেবলি মনে হইতে লাগিল, কাগজপত্রের ঘরে কে যেন চলাফেরা করিতেছে, কি যেন খুঁজিতেছে। মনে হইল ঐ লোকটাই অসীম, আর যাহা সে খুঁজিতেছে, তাহা ঠাকুরদার উইল।

আমি ঘুমের আশা ত্যাগ করিয়া আবার দপ্তর-ঘরে আসিলাম। একটা সিগারেট ধরাইয়া চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

উইলখানি লইয়া ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলাম। বাংলায় লেখা, তারিখ ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ। ঠাকুরদার টানা হাতের সই, নীচে দুই জন সাক্ষী সই করিয়াছেন, শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ও হরিপদ ঘোষ। অর্থাৎ যে তিন জন লোকের হাতে এই উইলের সৃষ্টি, তাঁহারা সকলেই পরলোকে।

যাহার জন্য উইলখানির সৃষ্টি, সে কোথায়, জীবিত না মৃত, কেহ খোঁজ রাখে না।

রক্তমাংসের শরীর লইয়া বাঁচিয়া আছি আমি, যাহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য উইলের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমার অতি দুঃখেও হাসি আসিল।

কিন্তু ও উইলের মূল্য কি? কেই বা উহার খবর রাখে? যাঁহারা রাখিতেন তাঁহারা লোকান্তরে। আজ যদি অসীম ফিরিয়া আসে, তাহাকে তাহার সৌভাগ্যের সংবাদ দিতে পারে শুধু এক জন, সে আমি।

যদি সে ফিরিয়া আসে, আর আমি যদি তাহাকে উইলের খবর না দি? তাহা হইলেই বা কি হয়?

প্রথম কথা, তাহার ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

দ্বিতীয় কথা, এই উইল যাহাতে কোনদিন কাহারো চোখে না পড়িতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা আমার হাতেই রহিয়াছে। দিয়াশলাই জ্বালাইয়া উইলের এক পার্শ্বে ধরিলাম।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে উইল ছাই হইয়া গেল।

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শান্তিনিকেতন।

এই বৃহৎ বাংলা অভিধানের বিষয় আমরা আগে অনেকবার লিখিয়াছি। ইহা বিশ্বকোষ প্রেসে ছাপা হইতেছিল। তাহার স্বত্বাধিকারী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় ইহার ৫৪শ খণ্ড বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। এক্ষণে অন্য প্রেসে ইহার মুদ্রণের বন্দোবস্ত হওয়ায় মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজ পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে। ৫৪শ খণ্ডে ন-বর্গ শেষ হইয়াছে। তাহার শেষ শব্দ "ন্যূনাধিক"। ৫৫শ খণ্ডে 'পক (-কন্)' শব্দ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। পত্র-সংখ্যা ১৭১৬।

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও উচ্চবিদ্যালয় সকলের সমুদয় পুস্তকালয়ে এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য অভিপ্রেত সমুদয় পুস্তকালয়ে এই শ্রেষ্ঠ অভিধান রাখা উচিত।

শেলি-সংগ্রহ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০ নং কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ টাকা।

এই সংগ্রহে শেলির অধিকাংশ সুপরিচিত কবিতার অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শেলির Promethous Unbound কবির নিজের ও অন্য অনেকের মতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য। এই কাব্যের সংক্ষিপ্তসার এবং তাঁহার অন্যতম উৎকৃষ্ট কবিতা Adonais-এর উত্তরার্দ্ধ এই সংগ্রহে অনূদিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের পদ্যানুবাদ-দক্ষতা এবং অনুবাদেও কাব্যরসরক্ষায় নৈপুণ্য বাংলা সাহিত্যামোদীদের সুবিদিত। এই গ্রন্থেও তাহা অক্ষুণ্ণ আছে।

(১) শেষের কবিতা ; (২) ডাকঘর ; (৩) কথা (৪) সঙ্কল্প ও স্বদেশ ; (৫) ব্যঙ্গকৌতুক ; (৬) প্রভাত সঙ্গীত—মূল্য যথাক্রমে ১৷০, ৷০, ৷০, ৷০, ৷৴০, ৷৴০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথের এই ছয়খানি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক হইয়াছে দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। "শেষের কবিতা" উপন্যাসটি প্রথমে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে এই চারি বার মুদ্রিত হইল।

"ডাকঘর" নাটক অন্যূন চারি বার মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গে ইহার অভিনয় অনেক বার হইয়াছে। ইহা ইংরেজীতে ও ইউরোপীয় অন্য বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইহার জার্ম্যান অনুবাদের অভিনয় ড্রেসডেন ও প্রাগে এবং চেক অনুবাদের অভিনয় প্রাগে দেখিয়াছিলাম।

"কথা," "সঙ্কল্প ও স্বদেশ", "প্রভাত সঙ্গীত"—এই তিনখানি প্রসিদ্ধ কবিতা-পুস্তক। এগুলি বহু অধীত। এগুলির অনেক কবিতা আবৃত্তির জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'প্রতিনিধি', 'দেবতার গ্রাস', 'পূজারিণী', 'নগরলক্ষ্মী', 'বন্দীবীর', 'প্রার্থনাতীত দান', 'হোরিখেলা', 'এবার ফিরাও মোরে', 'শরৎ', ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশভক্তি কিরূপ আন্তরিক, গভীর ও নির্ম্মল, তাহা যাঁহারা বুঝিতে চান তাঁহারা "সঙ্কল্প ও স্বদেশ" পড়িবেন ; যাঁহারা তাহা জানেন ও বুঝেন কিন্তু নূতন করিয়া স্মরণ ও অনুভব করিতে চান, তাঁহারাও আবার এই গ্রন্থখানি পড়িবেন। তাহা হইতে নূতন অনুপ্রাণনা আসিবে।

"ব্যঙ্গকৌতুক" গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি প্রবন্ধ ও গল্প এবং 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' নামক একটি ক্ষুদ্র নাট্য আছে। শেষের রচনাটি এই দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন যোগ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি নানাবিধ হাস্যের উৎস। "সাধনা" পত্রিকায় যে-দিন রাত্রে 'তিনি পয়সার ভোজ' পড়িয়া হাসির কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, গত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর সেই দিন গ্রন্থখানিতে ঐ গল্পটি দেখিয়া মনে পড়িয়া গেল।

ছয়খানি গ্রন্থের প্রত্যেকখানিরই দীর্ঘ সমালোচনা হওয়া উচিত ও হইতে পারে। কিন্তু পুস্তক-পরিচয় তাহার স্থান নহে।

রা.।

গৌতম বুদ্ধ—শ্রীত্রিভঙ্গ রায় প্রণীত। সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মধুর সরল ভাষায় বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী ও তাঁহার উপদেশ-সমূহের সারমর্ম এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। ত্রিশটি ছোট পরিচ্ছেদে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই পুস্তক পাঠ করিলে একই সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বিক্ষোভ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন, বি-এল, প্রণীত। ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা, রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৷০ টাকা।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে, আলোচ্য উপন্যাসখানি তাহাদের হইতে একটু স্বতন্ত্র ধরণের। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কয়েকটি তরুণ-তরুণীর জীবন কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই এই উপন্যাসের দুই খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। স্কুলের সহপাঠী উৎপল ও নিরঞ্জনের জীবনব্যাপী সৌহার্দ্দ্য এই গ্রন্থের প্রধান উপভোগ্য বস্তু। তাহাদের প্রকৃতি ভিন্ন ধরণের হইলেও সুখে দুঃখে তাহারা ছিল অভিন্নহৃদয়। নিরঞ্জন ছিল বহুল পরিমাণে অস্থির চিত্ত,

উৎপল ততটা নয়। তাহাদের কলেজ-জীবনে সহপাঠী তরুণীদের সঙ্গে আলাপ তাহাদের জীবনধারাকে অন্যদিকে চালিত করিয়াছিল। এই সমস্তই অতি চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং লেখকের রচনা-কৌশলে তাহা পাঠকের চিত্তে সুন্দর রেখাপাত করে। কিন্তু নিরঞ্জনের মনের কোমলতা দেখাইতে গিয়া লেখক তাহার যে নৈতিক অধঃপতন অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত সংগতি রাখিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের আখ্যানভাগ বেশ মনোজ্ঞ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ঘটনা-পরম্পরার সংঘাতে একটা নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমেই আমরা উৎপলকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিতে দেখিতে পাই। উৎপলের কারাজীবনের বর্ণনায় লেখক উহাকে অত্যধিক স্বাভাবিক করিতে গিয়া ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। কারাগৃহে উৎপলের বক্তৃতা ও বিতণ্ডায় পৃথিবীর কোন বিষয়ই বাদ পড়ে নাই, আইনষ্টাইনের সাপেক্ষবাদ হইতে যৌনবিজ্ঞানের আধুনিক মতবাদ সমস্তই বক্তৃতার মুখে বিবৃত হইয়াছে। এতটা উচ্ছ্বাস ও বক্তৃতাপ্রিয়তা গ্রন্থের গতি মন্থর করিয়া দিয়াছে; শুধু তাই নয়, বহু জটিল তত্ত্বের একত্র সমাবেশে উপন্যাসের লালিত্য বহু অংশে লঘু হইয়া পড়িয়াছে। তার পর উৎপলের পরবর্তী জীবনে পুরুষ ও নারীর বিবাহবন্ধনকে যেরূপ শিথিল করিয়া তোলা হইয়াছে এবং পুরুষের সহিত অবিবাহিতা নারীর সহবাস যেরূপ আদর্শবাদের দিক্ দিয়া চিত্রিত হইয়াছে, তাহা ভারতে কেন আধুনিক পাশ্চাত্য জগতেও গ্রহণীয় হইবে বলিয়া মনে হয় না। মোটের উপর দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের তুলনায় অনেকটা জটিল ও অসংযত হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসের আকার অযথা বর্দ্ধিত হওয়ায় উহার গতি শ্লথ এবং মাধুর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। মনে হয় দ্বিতীয় খণ্ড অনেকটা ছাঁটিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। তবে লেখকের রচনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা করিবার তাঁহার শক্তি আছে এবং রচনায় আর একটু সংযম আনিতে পারিলে তাঁহার রচনা আরও সুপাঠ্য হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। লেখকের ভাষা বেশ সতেজ ও সাবলীল এবং বর্ণনাশক্তিও প্রশংসার্হ।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

শবরী—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীহর্ষ পুস্তক বিভাগ, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

এই কাব্যগ্রন্থখানিতে চব্বিশটি কবিতা আছে। প্রায় সবগুলিই গদ্যকবিতা। শেষের কবিতাটিতে ছন্দ ও মিল আছে।

কাব্য মূলতঃ মানব-মনের প্রকাশ। অনুভূতিকে অপরের মনে সমভাবে সঞ্চারিত করায় কাব্যের সার্থকতা। কাব্য এই হিসাবে সাহিত্য অর্থাৎ রস-সাহিত্যের সমার্থক। সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক্ ছন্দ ও পদের সহিত প্রায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ ছিল। পদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কবিতা আপনাকে মূর্ত্ত করিত। ছন্দের উপর ভর দিয়া কাব্য ঊর্দ্ধে উঠিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছন্দের বহু পরীক্ষা চলিয়াছে। ছন্দ বিচিত্র ও অশেষ হইয়া উঠিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে তাহার প্রতিক্রিয়া। কাব্য ছন্দের বন্ধন কাটাইতে চায়। ছন্দ ও মিল প্রকাশের একটি উপায়। এই উপায়কে স্বতন্ত্র করিয়া ছন্দমুক্ত কাব্যকে ভিন্ন রূপ দান করার চেষ্টায় গদ্যকবিতার সৃষ্টি। এই দিক্ দিয়া রচয়িতা বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। গদ্যকবিতার নিজস্ব ছন্দের প্রকৃতি পদ্যছন্দ হইতে একান্ত ভিন্ন। আধুনিক উপকরণ ব্যবহারে গদ্যকবিতা উপযোগী। লেখকের শক্তি আছে। কতকগুলি কবিতায় স্বপ্নালু ভাবগুলির প্রকাশভঙ্গী অন্তরকে সুকোমল ভাবে স্পর্শ করে।

ভাঙা ভাঙা স্বপ্নের চুড়ো পেরিয়ে
চ'লে এলেম তোমার দিগন্তের কিনারে।
কত ফুল বাজালো সুগন্ধের বাঁশী,
কত ফুল।

অথবা

রাত্রির নদীতে আজ
কান্নার কালো জোয়ার,
আর তারার অশ্রুজল।

অথবা

পূর্ণতার অসহ উচ্ছ্বাসে
অবশ হল বিবশ দেহ:
শুধু রেখে এলেম একটি ভাষা
"মুছে নাও, আমায় মুছে নাও।"

"আমার প্রেমে" প্রেমিক শুধু দৈনন্দিন একটি মানুষ নয়। সে প্রেমের "পরিমাপ" এইরূপ,

আর আমার প্রেম—
যেন স্রষ্টার মতই মূক, বিরাট, শুদ্ধ।

"যাত্রী"

আর এগিয়ে চলুক আমার নৌকো,
এগিয়ে চলুক এই সমুদ্র মরুভূমির
অনন্ত পিপাসিত পথে।

"আহ্বান", "স্মৃতি", "প্রতীক্ষায়" প্রভৃতি কবিতায় আবেগ ও অনুভূতি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে।

হয় তুমি আসবে,
তুমি আসবে দিগন্তের জ্বলন্ত সূর্য্যের মত।
আর আলোকিত হবে আমার কালো প্রাসাদ
আর সুরভিত হবে আমার অনন্ত শূন্যতা।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বালক কেশব—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। সচিত্র। মূল্য আট আনা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বাল্যকালের কয়েকটি ঘটনা বালক-বালিকাদের জন্য কাহিনী-আকারে এই বহিটিতে লিখিত হইয়াছে। বাল্যেও কেশবচন্দ্রের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের সূচনা দেখা গিয়াছিল—তাঁহার বাল্যকথা কিশোর পাঠককে অনুপ্রাণিত করিবে। কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকীর বৎসরে বইটির প্রকাশ সময়োপযোগী হইয়াছে।

বাদুড় বয়কট—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। আশুতোষ লাইব্রেরি। পৃ. ৩১। সচিত্র। মূল্য ছয় আনা।

'পাখীরা জানে যে বাদুড় ডিম পাড়ে না। তার গায়ে পালক নেই, তাই পাখীদের দলে তার মেম্বর হয় না। আবার পশুরা ভাবে যে বাদুড়ের ডানা আছে। সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। তাই পশুদের দলে তার স্থান নেই। আসল কারণটি কেউ জানে না।' বাদুড়ের এই উভপ্রকৃতি শিশুদের জন্য গল্পের উপাদান জুগিয়েছে। 'পশুরা থাকে গাছের তলায়, পাখীরা থাকে ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে। এক জাত থাকে উপরে, আর এক জাত নীচে। তবু তাদের মধ্যে ভারি মিল। দুই দলে ভাব থাকাতে বাদুড় কোন দলেই আমল পাচ্ছে না। তাই ওর ইচ্ছা একটা ঝগড়া বাধায়।' পরে তার ফন্দিফিকির অবশ্য ধরা পড়ে গেল। এই গল্পটি লেখক চিত্তাকর্ষক ভাবে এই বইতে লিখেছেন।

আজগুবি—শ্রীইন্দিরা দেবী। হৃষীকেশ স্মৃতিমন্দির, ৫।১, কেওয়ারডাইন লেন, কলিকাতা। পৃ. ৪১। সচিত্র। মূল্য আট আনা।

শিশুদের জন্য রচিত বারোটি হাস্য ও 'খেয়াল রসের' কবিতার সমষ্টি। এই বই শিশু-পাঠকদের আনন্দ বিধান করিবে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সাধন সঙ্গীত—স্বামী অপূর্ব্বানন্দ সঙ্কলিত। প্রকাশক স্বামী অভয়ানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া। ক্রাউন কোয়ার্টো, ২৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য আড়াই টাকা।

ইহাতে গত এক শত বৎসরের ১০১টি উৎকৃষ্ট ভজন ও তাহার স্বরলিপি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক গীত ৫০টি ও স্বামী বিবেকানন্দ রচিত ৭টি গান আছে। ইহা ছাড়া স্বামী অখিলানন্দ, স্বামী অপূর্ব্বানন্দ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, কমলাকান্ত, কবীর, গিরিশ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, তুলসীদাস, তানসেন, দেবেন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাশরথি রায়, নানক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামপ্রসাদ, হরদাস প্রভৃতি বহু সাধক ও কবির গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষ্কার ছাপা, মোটা এ্যাণ্টিক কাগজ, এবং বাঁধাই ইত্যাদি চমৎকার। গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান্ হইয়াছে।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

ভবিতব্য শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আলোচ্য উপন্যাসখানির ভাষার মধ্যে নূতনত্ব আছে। লেখক চরিত্র সৃষ্টি করিতে জানেন, কাননবালার চরিত্র অঙ্কনে লেখক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তবে প্লটের বিন্যাস মামুলিত্বের জন্যে গল্পটি খুব ভাল জমে নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জলের প্রকৃতি ও প্রয়োগ—ডাক্তার শ্রীবিধুভূষণ পাল, ৩১।৫।১এ গোপালনগর রোড, পোঃ আলিপুর, কলিকাতা। মূল্য ।॰ আনা।

স্বাস্থ্য-সৌধ তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর অবস্থিতি করে—খাদ্য, জল এবং বায়ু। লেখক ইতিপূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছেন কি প্রকারে বিশুদ্ধ মালমসলার অভাবে প্রথম স্তম্ভটির ধারণশক্তি হ্রাস হইলে, সৌধের পতন অবশ্যম্ভাবী। গ্রন্থকারের মতে দ্বিতীয় স্তম্ভটিই সর্ব্বপ্রধান, কারণ দেহের ৭০ ভাগই জল। তাই জলের একটি নাম জীবন। এই জল খাদ্য-পানীয়ের সঙ্গে দেহে গিয়া জীবন রক্ষা করে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকেরা জলের সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার কি তাহা জানিতে পারিবেন।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

সাহসীর জয়যাত্রা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক এস, কে, মিত্র। দাম—এক টাকা।

"সাহসীর জয়যাত্রা"। পড়িয়া মনে হইল, বহু উপকথা, গাল-গল্প, ভূতপ্রেতের কাহিনীতেও কল্পিত য়্যাডভেঞ্চারের উপহারে যে শিশু-সাহিত্য ক্রমশঃ ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছে, শক্তিমান লেখক অতি অনায়াসে কচি মনগুলিকে তাহা হইতে মুক্তি দিয়াছেন। জাতি বা রাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে যে-কয়জন অদ্ভুতকর্ম্মা মানুষ আজ বিশ্বের বিস্ময় হইয়া রহিয়াছেন, এবং সংবাদপত্র পাঠকালে যাঁহাদের কার্য্যের সঙ্গে আমাদের নিত্য সাক্ষাৎকার ঘটিতেছে,—সান ইয়াৎ সেন, লেনিন, আতাতুর্ক কামাল, মুসোলিনী, হিটলার, ডি-ভ্যালেরা ইত্যাদি,—তাঁহাদের অভ্যুত্থানের কাহিনী সহজবোধ্য ও মনোজ্ঞ ভাষায় যোগেশবাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উপকথা হইতে এগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্; পৃথক্ হইলেও কৌতূহল-সৃষ্টিতে ও রসপিপাসা-পরিতৃপ্তিতে যে-কোন রোমাঞ্চকর কাহিনী হইতে বহুগুণে উৎকৃষ্টতর। শিশুচিত্তের উপর এই সকল বাস্তব চিত্রের প্রভাব তাহাদের বর্ত্তমান জীবনের জ্ঞান অভিজ্ঞতার পরিধি তো বাড়াইবেই, বয়োবৃদ্ধেরাও এগুলির মধ্যে অনেক নূতন জিনিষ পাইবেন।

তারা তিন জন—শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—পাঁচ সিকা।

নায়ক পাঁচুর জীবনে তিন জন নারীর আবির্ভাব অর্থাৎ বহুব্যবহৃত কাহিনীই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। লেখক বাস্তব চিত্র আঁকিবার ভান করিয়াছেন, অথচ ঘটনা-সংস্থানে কল্পনার আকাশে উঠিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁহার নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেগুলির অবাস্তবতা সম্বন্ধে লেখকের মনেও সন্দেহ জাগিয়াছে, তাই, উদ্ভট কল্পনাকে বাস্তব বলিয়া চালাইবার জন্য দুর্ব্বল কৈফিয়ৎ মাঝে মাঝে তাঁহাকে দিতে হইয়াছে। সুষ্ঠু কল্পনা ও চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি রসবিকাশের পক্ষে যে কত বড় সম্পদ সে-কথা লেখক হয়ত ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়াছেন, অথবা নূতন কিছু লিখিয়া তাড়াতাড়ি প্রসিদ্ধি লাভ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে চঞ্চল করিয়াছে। পুরাতন ও বহুব্যবহৃত বিষয়বস্তুকে রূপ দিতে হইলে

অনেকখানি শক্তি ও সাধনার আবশ্যক। পথ চলিবার পূর্ব্বে লেখক সর্ব্বাগ্রে এই পাথেয়টুকু সংগ্রহ করুন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দুধের ব্যবসায়—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, M. R Ag. S. (Lond.); F. R. H. S. (Lond.) প্রণীত। নিউ বুকষ্টল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৮৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০ টাকা।

গ্রন্থকারের পরিচয়-প্রকাশকগণ পুস্তকের মলাটে এই প্রকার দিয়াছেন যে তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্য দেশে দুধের কারখানা দেখিয়াছেন এবং তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন এবং দুধের ব্যবসার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল খুঁটিনাটি ইহাতে বর্ণনা করিয়াছেন।

নিত্যবাবুর লেখা "রাশিয়া ট্রু-ডে" আমি পড়িয়াছি। তিনি এমন সহজ ভাবে রাশিয়ার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই ধারণা কেমন করিয়া তাঁহার ভ্রমণের ভিতর দিয়া অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা এত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে পাঠকের মনে হয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য দেখিয়া বেড়াইতেছেন। এই হেতু তাঁহার লিখিত বিষয় সম্বন্ধে লিখিত 'দুধের ব্যবসায়' পুস্তকখানি অতিশয় আগ্রহের সহিত সমস্তটা পড়ি। আশা ছিল ইহাতে গ্রন্থকার কেমন করিয়া তাঁহার বিদেশে পাওয়া অভিজ্ঞতার প্রয়োগ এদেশে করিয়াছেন তাহা জানিব ও তাঁহার চেষ্টার ব্যর্থতা ও সফলতার পরিচয় পাইয়া লাভবান হইব। তাঁহার দুধের ব্যবসার অভিজ্ঞতার দ্বারা নূতন পথ দেখিতে পাইব। কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। পুস্তকখানিতে গোশালা ও গোজাতি সম্বন্ধে মামুলী কথা আছে। গোপালনের বিদেশী কথাই আছে। দুধের বীজাণু, মেশিন-সহযোগে বীজাণুশূন্য করিয়া কি ভাবে দুধ অধিক সময় অবিকৃত রাখা যায় তাহার সাধারণ আলোচনা আছে। যন্ত্র দ্বারা ননী ও মাখন তোলার বর্ণনা আছে। পুস্তকের "শেষ কথা" পর্য্যন্ত পড়িয়াও ইহা দুধের ব্যবসায়ে প্রবেশার্থীর পক্ষে কতটা সহায়ক হইবে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়া গেল।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

কবি বিদ্যাপতি—শ্রীসুখময় চৌধুরী প্রণীত গীতি-নাট্য। প্রাপ্তিস্থান ৩০ নং সা সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা।

অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর নাটক। চরিত্রগুলি অত্যধিক উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—স্থানে স্থানে হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় ঘটনার গতিবেগ অস্বাভাবিক রূপে ক্ষিপ্র হওয়ায় রস দানা বাঁধিতে পায় নাই। কবি বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে অনেকগুলি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পদাবলী-নির্ব্বাচন ভাল। নাটকখানি 'শান্তি' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল—ঐ শান্তির উদ্বৃত্ত ফর্ম্মা লইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সেজন্য পত্রাঙ্কে অনেক গোল রহিয়াছে, যেমন প্রথম পৃষ্ঠার পত্রাঙ্কই তিন শতের উপরে। মূল্য কোথাও লেখা নাই। এ বিষয়ে লেখক সাবধান হইলে ভাল করিতেন

বিজয়ী প্রেমিক—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৮৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি সাধারণ শ্রেণীর হইলেও মোটের উপর ভালই লাগিয়াছে। লেখকের ভাষায় মাধুর্য্য আছে, বর্ণনায় এবং ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তবে উচ্ছ্বাস এবং স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করিয়া উপন্যাসে অভিনবত্ব প্রকাশের চেষ্টা না করাই ভাল। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে, ঐটুকু বর্জ্জন করিলে লেখক আরও ভাল লিখিবেন বলিয়া আশা করি।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্লী-মঙ্গল গ্রন্থাবলী—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়। পল্লী-মঙ্গল সমিতি, ২৫, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৫৬৬। মূল্য ১৲ টাকা।

পল্লী-মঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 'টোটকা চিকিৎসা' নামক পুস্তকের পাঁচটি ভাগ ও নূতন চারটি ভাগ লইয়া এই গ্রন্থাবলী। বিভিন্ন ভাগে সাধারণ রোগ, স্ত্রী ও শিশু-রোগ, গো-মহিষ রোগ, দৈবদুর্ঘটনা প্রভৃতির টোটকা চিকিৎসা, লতাপাতার গুণাগুণ ও রোগ-বিশেষে তাহাদের আময়িক প্রয়োগ, খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণের—বিশেষতঃ গ্রামবাসীদিগের বইখানি যথেষ্ট কাজে লাগিবে। চিকিৎসকগণও বইখানি পাঠ করিয়া লাভবান্ হইবেন।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

আলোচনা

বাংলা দেশে তুলার চাষ

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য

বাংলার উৎকৃষ্ট তুলার চাষ সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র গত পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশলোভন সেনের যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ মূল্যবান, কেননা শ্রীযুক্ত সেন ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির এক জন রাসায়নিক ও মুষ্টিমেয় বাঙালী তুলা-বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে অন্ততম।

কিন্তু তাঁহার দুই-একটি মন্তব্যের বিনীত প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত অখিলবাবু বাংলায় তুলার চাষের ব্যবস্থার জন্ত ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটিতে বহুবার চেষ্টার পর সম্প্রতি কিছু অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করতে সফলকাম হয়েছেন"। ইহা যথার্থ নহে। অর্থসাহায্য করা দূরে থাকুক, ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি এক জন বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া বাংলায় তুলা-চাষের পরিকল্পনার সহায়তা করিতেও এতাবৎকাল স্বীকৃত হন নাই। অথচ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পরীক্ষামূলকতুলা-চাষের জন্য কমিটি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন—অপব্যয়ও যে না হইতেছে এমন কথা বলা চলে না। এ সম্বন্ধে পৌষ মাসের বিবিধ প্রসঙ্গে মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি অদূর ভবিষ্যতে এই প্রচেষ্টার প্রতি অবহিত হইবেন ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টও এ-বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইবেন।

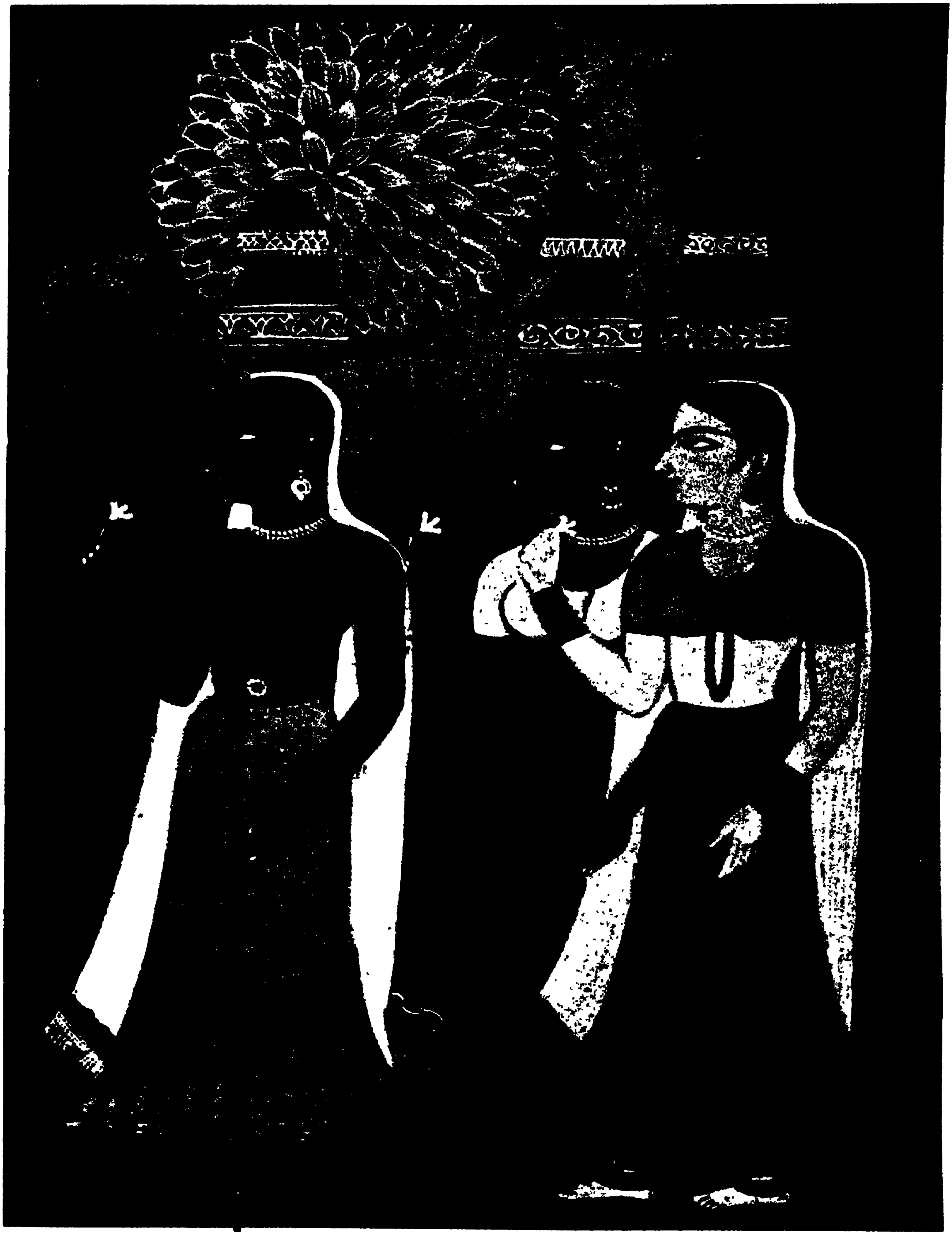
ধীরেশলোভনবাবু বাংলায় উৎকৃষ্ট তুলা-চাষের প্রতি পরোক্ষভাবে অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাংলা দেশের আবহাওয়া উক্ত শ্রেণীর তুলা-চাষের প্রতিকূল। তিনি মনে করেন, বাংলার মসলিন 'দেও কাপাস' অর্থাৎ tree cotton সম্ভূত। তাঁহার মতামত পর্য্যালোচনা করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই, তবে সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রক্সবরো বাংলার মসলিনের তুলাকে ordinary herbaceous annual cotton বা সাধারণ 'চাষ কাপাস' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, সামান্য যত্নের ফলে যে-শ্রেণীর তুলা বাংলার কোন কোন জেলায় জন্মিয়াছে, তাহা ভারতের অন্য যে-কোন প্রদেশে সুদুর্লভ। বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির উৎসাহে মেদিনীপুরের লালগড় জমিদারীতে যে-তুলা ফলিয়াছে তাহার আঁশের দৈর্ঘ্য ১$\frac{1}{8}$", এবং প্রতি গাছে দেড় শতেরও অধিক বোল হইয়াছিল। একটি গাছে বোলের সংখ্যা ছিল ২৭২! আঁশের শক্তিও আশানুরূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, বাংলা দেশে অন্ততঃ সুনির্ব্বাচিত জমিতে উৎকৃষ্ট তুলার চাষ সম্ভবপর; এবং এরূপ জমির পরিমাণ এই সুবৃহৎ বাংলা দেশে সামান্য নহে। তদ্ভিন্ন, একথা বলাই বাহুল্য যে, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ক্ষুদ্রতর আঁশ-যুক্ত তুলার চাহিদাও বাংলা দেশে কম নহে।

[বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু খুব উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহা মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে লেখা হইয়াছে। প্রবাসীর সম্পাদক।]

ভ্রম-সংশোধন

গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে "ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্বন্ধে দুই একটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে ৪৩৩ ও ৪৩৪ পৃষ্ঠায় The limited Company of Merchants of England trading to the East Indies স্থলে The United Company...পড়িতে হইবে।

গত পৌষ মাসের বিবিধ প্রসঙ্গে "দিল্লীতে হিন্দুস্থান জীবনবীমা কোম্পানীর শাখা" শীর্ষক মন্তব্য-প্রসঙ্গে ঐ কোম্পানীর সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, উহার দিল্লী শাখা প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। এত দিন তাহা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল, গত মাসে নিউ দিল্লীতে নির্ম্মিত নিজের বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে। সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এই গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।



স্বামীর ঘর

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আট বছর বয়সে মুন্নির বিবাহ দিয়া পিতা অক্রুরচন্দ্র সমাজের পিতৃরক্ষা করিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা আর এক দিকে বেশ ঘোরাল হইয়া উঠিল। শ্বশুরবাড়ীর বুড়ি ছুঁইয়া গৌরী-রত্ন যথাস্থানে ফিরিয়া সেই যে সিন্দুক-জাত হইল আর ডালা খুলিল না। বছরের পর বছর কাটিয়া যায়, নানারূপ বাধা-বিঘ্ন ওজর-আপত্তি পিতৃগৃহের অবরোধ-প্রাচীরটিকে ক্রমশঃ দুর্ভেদ্য করিয়া তোলে। শেষে এক দিন বিষম অনর্থ বাধিয়া বসিল।

সাত-সাতটা বছর নিঃসঙ্গ জীবনকে উষর মরুভূমিতে কায়ক্লেশে বহন করিয়া নিশাপতি যখন দেখিল যে মরীচিকা শুধু পিছু হটিয়া চলে, সামনে ধরা দেয় না, তখন সে এক দিন শ্বশুরবাড়ী চড়াও করিয়া সরাসরি মুন্নিকে প্রশ্ন করিল, "তোমাদের মতলব কি শুনি? তুমি কি কখনও আমার বাড়ী যাবে না ঠিক করেছ?"

মুন্নি তার কি জানে? কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলেই বা ছাড়ে কে? ঐ একটি জিজ্ঞাসা ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমাগত বিঁধিতে থাকে, "তুমি কি যাবে না আমার বাড়ী?"

নিজেকে দায়মুক্ত করিল সে সোজা জবাব এড়াইয়া। কহিল, "আমায় বলা মিছে। তুমি বাবার মত নাও গে।"

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাপতি বলিল, "ছেড়ে দাও তোমার বাবার কথা। কেবল ভালবাহানা! আসলে চায় আমায় ঘরজামাই ক'রে রাখতে, আমিও সাফ ব'লে দিচ্ছি, বাপের ভিটে ছেড়ে এখানে পাত পাড়তে আসব না—কখখনো না।

স্বামী-স্ত্রীর বিশ্রম্ভালাপ—কিন্তু স্বরগ্রাম কিছু ঊর্দ্ধে চড়িয়াছিল। অক্রুরচন্দ্রের কানে তাহা পৌঁছিল। নিঃশব্দে আসিয়া নধর দেহটিকে চৌকাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়া চিত্রার্পিতের মত সে ভিতর পানে উঁকি মারিয়া চাহিল।

মুন্নি ঘোমটা টানিয়া ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইল।

ভর্ৎসনার স্বরে অক্রুর বলিয়া উঠিল, "এখানে পাত পাড়তে বাবাজীর অপমান। দু-দিন বাদে ভিক্ষের ঝুলি ঘাড়ে বইতে হবে যে। বাপ তো রেখে গেছে এক রাশ দেনা। জমিগুলি গেলে খাবে কি?"

দুইটি অক্ষিগোলকের পরিপূর্ণ লাঞ্ছনা কি যেন অশান্তি ঘরময় সঞ্চারিত করিয়া দিল।

নতমুখে নিশাপতি জানাইল, তাহার শক্তিসামর্থ্য আছে। পৈতৃক ব্যবসায় তন্তুবয়ন করিয়া সে স্বচ্ছন্দে দেনা শোধ করিতে পারিবে। কাহারও কৃপাভিক্ষার প্রয়োজন হইবে না।

শ্লেষের বঁড়শিতে কষিয়া টান পড়িল, "ঈস্—ধর্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির গো। ও-সব বুঝি। মুন্নিকে আটক ক'রে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করা চলবে না।"

নিশাপতি উত্তেজিত হইয়াছিল। কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া শুধু এই মাত্র নিবেদন করিল যে, স্ত্রীকে আপন ঘরে লইয়া যাইবার আইনসঙ্গত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সে কৃতসঙ্কল্প।

"কী, এত বড় আস্পর্দ্ধা? আইন দেখাস্ আমায়? হতভাগা কোথাকার!"

দেয়ালের আড়ালে মুন্নি ছিল নিষ্পলক নিঃসহায় ভাবে চাহিয়া—যেন এই মাত্র কাহার ঘরখানি অগ্নিদাহে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। সে চোখে দেখিতেছে, কিন্তু জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিবার সাহস কই?

গালমন্দের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিশাপতি এবার রুখিয়া উঠিল।

তার পর একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিল।

"কী যত বড় মুখ তত বড় কথা! বেরো বল্‌ছি আমার বাড়ী থেকে। পাজি…"

একটা অস্ফুট চীৎকার মুন্নির মুখ দিয়া নির্গত হইল।

হেঁসেল-ঘরে তাড়াতুড়ির ছেঁকাছেঁকি। সোরগোল শুনিয়া মুন্নির মা সৌদামিনী উঠিয়া আসিল। দেখিল, খিড়কির বাহিরে নিশাপতি হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়াছে।

উদ্বিগ্ন ভাবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি হ'ল কি?"

সে কেবল ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করিতেছিল। মুখ দিয়া চাপা গলায় অনর্গল বাহির হইল, "বেল্লিক…"

সৌদামিনী জিব কাটিল—"কি সর্ব্বনাশ আজ করলে গো। ও যে জামাই—"

"ছুত্তোর জামাই—"

দাওয়ায় উঠিয়া অক্রূরচন্দ্র হাঁটুর কাপড় তুলিয়া বসিল। দক্ষিণ হস্তে হুঁকা টানিয়া লইয়া চোয়ালের তলে ধরিয়া দেখিল, তামাকটা তখনও নিঃশেষে দগ্ধ হয় নাই। খড়ের পালার মত একরাশ গোঁফের মধ্য দিয়া ধূমগুলি কেমন পাকে-চক্রে বাহির হইতে লাগিল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা এক গাল পান মুখে ভরিয়া মুন্নি এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। ছায়াস্নিগ্ধ পল্লীপথের বক্র প্রান্তে কত কি জংলা ফুল বাতাসে দুলিতে থাকে, চলিতে চলিতে সেগুলি সে নিরর্থক ছিঁড়িয়া ফেলে। মাথার উপর শরতের নিঝুম মধ্যাহ্ন সবিস্ময়ে আঁখি মেলিয়া আছে, সান-বাঁধানো সোপানের উপরে রবি-রশ্মি কেমন ঝিকিমিকি দেয়। দেখা যায়, রাঙা ইটের রাস্তা কোথা হইতে আসিয়াছে কে জানে—আর, সেতু, ফটক, নারিকেলশ্রেণী, চিতা-মঠ।

"এই যে মুন্নি এসেছিস্‌। ধর্‌ তো মা ছেলেটাকে।"

শৈলর মার কোল জুড়িয়া ছেলেটা বেজায় উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে।

"ও কি পিসীমা অমন ক'রে দুধ খাওয়াতে হয়? দাও—আহা, লক্ষ্মী ছেলে।"

শৈলর মা বলে, "দস্যি ছেলে বল্‌। সেদিন হামা দিয়ে ঢুকেছিল ঢেঁকি-ঘরে। ঢেঁকির তলে পড়ে নি, এই ভাগ্যি।"

বাটি টানিয়া লইয়া মুন্নি দুধ খাওয়াইতে বসে। হাসি-মুখে বলিয়া যায়—"কি যে বল পিসীমা। বুদ্ধু আমার সোনার ভাইটি। ভাখ কেমন ক'রে চাইছে।…আয় রে আয় টিয়ে…"

স্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া শৈলর মা বলে—"তুই বাছা যাদু জানিস্‌। একটু ঘুম পাড়া। আমি চাট্টি খেয়ে আসি।"

"ও…ও…ও—না…না…না।…আমার বুদ্ধু যাবে শ্বশুর বাড়ী সঙ্গে যাবে কে?…"

নয় বছরের মেয়ে শৈল হাতের রংচঙে টিনের খেলার বাক্সটি মেলিয়া ধরিয়া বলিল—"এর ভিতর কি আছে বলতে পারিস মুন্নিদি?"

আন্দাজে মুন্নি বলে—"পুতুল।"

"দূর। আমি কি এখনও তেমনি ছোট মেয়ে?"

প্রজ্ঞার অকালবোধন তাচ্ছিল্যভরে পুতুলকে যেন হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বাক্স খুলিয়া সে দেখাইল এক জোড়া নূতন চক্‌চকে তাস। হাসিমুখে কহিল, "আজ তোকে খেলতে হবে আমার সঙ্গে মুন্নিদি।"

বাঁ পায়ে ছেলেকে দোল দিতে দিতে মুন্নি হাসে। বলে, "দু-জনে কি খেলা হয়?"

ঠোঁটটি উল্টাইয়া শৈল বলে, "তুমি তো ভারি জান। চিৎবিন্তি খেলব যে।"

তাস ভাঁজিয়া সে তাহা একে একে বাঁটিয়া দেয়। বলে—"বিন্তি।"

মুন্নি হাসিয়া উঠে,—"এ বুঝি তোর বিন্তি শৈল? বিবি যে আমার কাছে।"

ক্ষুণ্ণ স্বরে শৈল বলে, "হ্যাঁ ভাই, মুন্নিদি, রং না থাকলেই কি অমন ক'রে তুরুপ করতে হয়? এখন জিতি কেমন ক'রে বল তো?"

তার পর সচকিতে বলিয়া উঠে, "ও মা, লুকোও লুকোও—"

তাড়াতাড়ি শৈল তাসগুলি আঁচলে ভরিয়া ফেলে। ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলে—"বড়দা এসেছে। পোড়া ইস্কুল গেছে এরই মধ্যে ছুটি হয়ে।"

"এখানে কি কচ্ছিস শৈল,"—কর্কশ কণ্ঠস্বরের পিছু পিছু এক তরুণ যুবা ঘরে আসিয়া ঢোকে। তাহার দীর্ঘ কালো চুল যোরস্ত করিয়া ছাঁটা, মুখে খুরের টান অকালে আরম্ভ হইয়াছে।

সকৌতুকে তাহার পানে একটিবার মুখ তুলিয়া কোলের ছেলের উপর চোখ পড়িতে মুন্নি দেখে, এরই মধ্যে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রৌদ্র ম্লান হইয়া আসে। ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুগুলি দীঘির কালো জলে আসন বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। দিবসের শেষ সম্বল কাড়াকাড়ি লইয়া পক্ষীকুলের কিচিরমিচির শান্ত হইয়া আসিলে মুন্নি আপন মনে বাড়ী ফিরিয়া যায়।

মা বকে, "তোর আক্কেলটা কি শুনি? ধিঙ্গি মেয়ে, এমনধারা পাড়া বেড়ালে লোকে বলে কি?"

কত খোঁটা, কত তিরস্কার সে মুখ বুজিয়া সহিয়া যায়। নীরবে দাঁড়াইয়া শোনে, মা বিড়বিড় করিয়া বলিতেছে—"ওকে ঘরে রেখে আমার হয়েছে মরণ। শাশুড়ী থাকৃত, দিতুম পাঠিয়ে—আপদ যেত।"

পর দিন বাহিরের ডাক আবার সাড়া দিয়া উঠে। অক্লান্ত কাজ, সরস কৌতুক, নিরর্থক খেলাধুলার অপসারিত আকর্ষণ লঘুতার উতলা বাতাসের মত তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তোলে।...

কিন্তু আজ এত সাধের পাড়া-বেড়ানো বন্ধ হইয়া গেল। সেদিন যে বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা যেন জীবনের মুখোস ছিঁড়িয়া দিল, লজ্জা ও ঘৃণার পঙ্কিল চিহ্ন ললাটে আঁকিয়া দিল। কোথাও পা বাড়াইতে আর মন উঠিল না। নিরালা ঘরে জানালার কাছে বসিয়া সে শুধু ভাবিতে লাগিল, "এ অপমান কাহার? স্বামীর না তাহার?"

"সই কমলকলি..."

বাল্যসখী রেণুর গলা!—মুন্নি চমকিয়া উঠিল। বিবাহের পর সেই যে বিদায় লইয়া গিয়াছে সে, তার পর কত বার আসিয়াছে। এমনি বার সকলে—আবার আসে।

এক রাশি হাসি চোখে মুখে মাখিয়া রেণু তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। ছিপছিপে দেহটিতে লাবণ্য যেন লতাইয়া উঠিয়াছে।

ফিনকি দিয়া কৌতুক ছুটিল,—"বিরস বদন কেন লো নেহারি নয়নে অশ্রুবারি।"

বলা প্রয়োজন, সখীর বরাতে কলিকাতায় গিয়া সিনেমা-থিয়েটার দেখিবার ফুরসৎ ঘটিয়াছে হরদম, কেন না, তাহার স্বামী কোন প্রসিদ্ধ সিনেমা-ষ্টুডিওর এক জন ছুতার। নাটকের মদির সুরভি উচ্ছ্বাস তাহার বক্ষোমধ্যে সতত চঞ্চল হইয়া উঠিত—এত দিন সে রাখিত যাহা চাপিয়া, এক্ষণে এই পল্লীবাসিনী সহচরীর মুখচন্দ্র দর্শনে তাহা যেন বাঁধ ছাপাইয়া পড়িল।

মুন্নির মুখ দু-হাতে তুলিয়া ধরিয়া চোখে চোখ মিলাইয়া সে বলিয়া গেল,—"হ্যাঁ সই, এসব শুনছি কি? স্বামী নাকি তোকে ত্যাগ করেছে?"

নিজেকে মুন্নি ছাড়াইয়া লইয়াছিল। বিরক্তিভরে বলিল, "যাঃ, কি যে বকিস—"

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে মুখ ভারি করিয়া রেণু কহিল, "তা এক কাজ কর্ ভাই। সেদিন সিনেমায় একটা চমৎকার ছবি দেখে এসেছি। ছবি কথা বলে তা জানিস তো? রাজকন্যা সংযুক্তা ভালবাসে রাজা পৃথ্বীরাজকে। কিন্তু মিলন হবে কেমন ক'রে তাদের? পৃথ্বীরাজ যে তার বাবার পরম শত্রু। রাজকন্যা তাকে লিখলে, 'আমার স্বয়ম্বর। তুমি এস ছদ্মবেশে, আমি তোমার গলায় মালা দেব।' তখন পৃথ্বীরাজ এল দরোয়ান সেজে রাজসভায় আর বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে রাজকন্যাকে নিয়ে উধাও হ'ল। তার পর সে কি যুদ্ধ...বুঝলি তো?"

মুন্নি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রেণু ক্ষুব্ধ হইল। বলিল,—"নাঃ, সিনেমার প্লট তুই বুঝবি না। আচ্ছা, মনে আছে তোর সেই যে যাত্রার পালা, রুক্মিণী-হরণ?...কাগজ-কলম নিয়ে আয়। বরকে চিঠি লিখতে হবে।"

"দূর তাও কি হয়?"

রেণু খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "হয় রে হয়। আমার এমন সুন্দর প্লটটা—"

এবার তাহারা চিঠি লিখিতে বসিল। মুন্নির হাতে কলমটি গুঁজিয়া দিয়া রেণু বলিল, "লেখ্...প্রিয়তম, এস তুমি কেশবের রূপ ধ'রে তোমার সুদর্শনটি

ঘুরিয়ে। তালব্য শ-এ রেফ। হ্যাঁ, উদ্ধার, দ-এ ধ-এ, উদ্ধার কর আমায়। এস, নিয়ে যাও আমায় এখান থেকে।"

মৃন্নি হাসিয়া ফেলিল, "এত জানিস্ তুই। ছাইভস্ম কি সব লেখালি বল্ তো।"

একটি সাবলীল ভঙ্গী সহকারে তৃপ্ত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রেণু কহিল, "ওরে, রাজপুত্তুর আসবে তেপান্তরের মাঠ বয়ে। তার গলায় মালা দিতে ভুলিস্ নে যেন।..."

তেপান্তরের রূপকথা মৃন্নিকে এখন পাইয়া বসিল। অবরুদ্ধ পুরীর অন্ধকূপমধ্যে বন্দিনী রাজকন্যা আছে সুদূরের পানে চাহিয়া। সাত সমুদ্র তের নদী পারে উপবন-ঘেরা প্রাসাদ—হীরাকুঞ্জে মায়ামৃগের সন্ধানে সাতজন্ম তপস্যার ধন রাজপুত্র অমন মিছা ঘুরিয়া মরে কেন? দেখিতে দেখিতে সব গেল অদৃশ্য হইয়া—মৃগ নাই, রাজপুত্র নাই। ধূ ধূ প্রান্তর—প্রশস্ত রাজপথ স্বর্ণকেতু উড়াইয়া দেশ-দেশান্তরে চলিয়াছে, অন্তহীন বেদনা, অফুরন্ত আশা মেলিয়া দিয়া। রাজকন্যা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কি আর কখনও ফিরিবে না? অকস্মাৎ পক্ষসঞ্চালনে মথিত দিগন্তের চক্রবালে জ্যোতিঃরেখা ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিল। ঐ যে রাজপুত্র—কত যুগ পরে! ঝন্ ঝন্ ঝন্! কারাগৃহের দ্বার ভাঙিয়া পড়িল। অসীম পুলকে রোমাঞ্চিত বাহু-বল্লরী মেলিয়া ধরিয়া রাজকন্যা ডাকিল—রাজপুত্র! সে তাহাকে বক্ষোমধ্যে আলিঙ্গনে বেড়িয়া ধরিয়াছে।

"আমি এসেছি মৃন্নি।"

গভীর রাত্রে সুখ-সুপ্তির মধ্যে মৃন্নি জাগিয়া উঠিল।

ঝন্ ঝন্ ঝন্! শয়নকক্ষের পল্কা দরজাটা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কে এক ব্যক্তি মৃন্নির কাছে দাঁড়াইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিতেছে, "উঠে এস মৃন্নি।"

স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটে নাই—মন্ত্রাবিষ্টের মত মৃন্নি বাহিরে আসিল। ঘরের ভিতর লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে দেখা গেল, খাটের প্রান্তভাগে মাতা সৌদামিনী কাঁথা মুড়ি দিয়া অসাড়ে পড়িয়া আছে।

উঠানে কতকগুলি লোক—হাতে জলন্ত মশাল। তাহাদের মাথায় পাগড়ি, মুখে রং, মালকোঁচা বাঁধা। দক্ষিণের ঘরে পিতা যেখানে একাকী শুইয়াছিল, সেখানে কাহার কণ্ঠ শোনা গেল, "চাবি দে বল্‌ছি, নইলে রক্ষে নেই। পুড়িয়ে মারব।"

মৃন্নি শিহরিয়া উঠিল—"অ্যাঁ—ডাকাতি!"

"চল, চলে এস,"—নিশাপতি তাহার হাত ধরিয়া খিড়কির পারে আমবাগানের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

"তুমি ডাকাত—ছি।"

বিশ্বের পুঞ্জীভূত ঘৃণা কণ্ঠস্বরে মিশিয়া নিশাপতির মর্ম্মে বিঁধিল বিষাক্ত শেলের মত।

"লক্ষ্মীটি আমার এইখানে দাঁড়াও। আমি আসছি" বলিয়া সে দ্রুত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

মৃন্নি একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। দেহের প্রাণশক্তি যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, শুধু অন্তর জুড়িয়া একটা গ্লানি জলিতে লাগিল—আঁখি-পাতে জলটুকু জমিতে দিল না। গাঢ় অন্ধকার, জোনাকির ঝাড়, ঝিঁঝিঁর ডাক—সব মিলিয়া বুকের উপর অসাড় নিস্পন্দ জমাট চাপ বাঁধিয়া তুলিল।

নিশাপতি ফিরিয়া আসিল। কহিল, "ঘাটে নৌকো আছে মৃন্নি, চল।

মৃন্নি নড়িল না। মুখ দিয়া বাহির হইল, "ডাকাত, ছি।"

সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওগো, তুমি ও কথা ব'লো না। ওরা এসেছিল ডাকাত সেজে, ভয় দেখাবে ব'লে। এমন করবে তা কে জানত? আসতে লিখে-ছিলে তাই এসেছি। চল—"

"না না—আমি যাব না।"

ছুটিয়া চলিল সে—ডাকাত, ছি!

ভয় চাপা গলায় নিশাপতি ডাকিল, "মৃন্নি!"

আম্রকুঞ্জের ঘনান্ধকার মধ্যে সে তখন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

গ্রামময় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। এত বড় ডাকাতি এ তল্লাটে কখনও হয় নাই। ডাকাতেরা অক্রুরের মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাত-পা বাঁধিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়াছে। ভাগ্যে সে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল। ডাকাতের সঙ্গে লড়াই—বাপ রে! মেয়েটা বুদ্ধিমতী—কোন্ ফাঁকে আমবাগানে সরিয়া পড়ে, বাঁশঝাড়ের কাছে ভয়ে হিমসিম হইয়া পড়িয়া ছিল। ডাকাতের হাতে পড়িলে কি আর রক্ষা ছিল? উহারা না কি বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া শাসাইয়া আসিয়াছে, কেহ বাহির হইলে তাহার মাথায় বাড়ি দিবে। ধনদৌলত টাকাকড়ি গেলে আবার আসিতে পারে কিন্তু প্রাণটাকে কি অমন বেঘোরে খোয়ানো চলে?

দারোগা-পঞ্চায়েতের সমাবেশ অক্রুরচন্দ্রের বৈঠকখানা ঘরটিকে জমজম করিয়া তুলিল; অক্রুরচন্দ্র এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিতেছে, সলাপরামর্শ আঁটিতেছে।

ঝাঁ করিয়া একটি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া আনিয়া সে সৌদামিনীকে কহিল, "গয়নাগুলি মনে থাকে যেন। কানবালা, বাজু চুড়ি বিছা—"

চোখ দুটি কপালে তুলিয়া সৌদামিনী কহিল, "চুরি হয় নি কিছু, আমি কেমন ক'রে বলব গয়না চুরি গেছে? সবই তো তোমার বাক্সে ভরা আছে।"

অক্রুর খাটো গলায় কহিল, "আছে তা জানি, কিন্তু বলতে হবে, নেই। মোকদ্দমাটা মজবুত করা চাই তো। আর, সবই তো এক রকম গিয়েছিল। কি যে ঘটল, চোখ বাঁধা ছিল, কিছু বুঝতে পারি নি। চাবি দিয়ে লোকটা তোরঙ্গ খুললে, আর তখনি কে যেন দৌড়ে ঘরে ঢুকে তার হাত চেপে ধরলে। ধস্তাধস্তি—ফিস্ ফিস কথা শুনলুম,—খবরদার, চলে যা।"

সামনে তরকারির ঝুড়ি-বঁটি। দেয়ালে মাথা দিয়া মুন্নি চোখ মুদিয়া বসিয়া ছিল। তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না, কে আসিয়া ঐ ডাকাতটাকে বাধা দিয়াছিল, কোন দ্রব্য অপহরণ করিতে দেয় নাই। নিশাপতির কথাগুলি তাহার কানে বাজিতে লাগিল,—ওরা এসেছে ডাকাত সেজে, এমন করবে তা কে জানত!

অক্রুরচন্দ্র মস্ত একখানি বেড়াজাল বিছাইয়া বসিল। ডাকাত কারা, সে জানে না। দরকার? যথা পয়সাটিও তো তাহারা লইয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু এই সুযোগে শত্রুর শেষটি পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিতে সে ছাড়িবে কেন?

অপহৃত মালের কাল্পনিক ফর্দ্দটা দারোগার হাতে দিয়া সে কহিল, "নিধে রামকানাই বিরিঞ্চি—এই তিন জনকে আমি বেশ চিনতে পেরেছি। ওদের বেঁধে ফেলতে পারলেই মালের কিনারা হবে।"

খানাতল্লাসী, সাক্ষীর জবানবন্দী, গ্রেপ্তার—আইনের রথচক্রগুলি নির্ব্বিচারে পিষিয়া চলিতে লাগিল।...

মা ডাকিল, "মুন্নি।"

"কি মা?"

"কাছে আয়—বোস। চুল বেঁধে দি।"

তার পর চুপি চুপি বলিল, "সেদিন রাতে—সত্যি বলবি?"

মুন্নির মুখ শুকাইয়া আসিল। ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

"আচ্ছা বল্ তো সত্যি করে, সেদিন রাতে নিশু তোকে নিয়ে যেতে এসেছিল—না?"

মুন্নি কাঁপিতেছিল। ক্ষীণ কম্পিত স্বরে বলিল, "সে তো ডাকাত নয় মা।"

সৌদামিনী সস্নেহে মেয়ের চুল বাঁধিতে লাগিল। কহিল, "তা কি আমি জানি নে মা? নিশু কি কখনও ডাকাত হ'তে পারে? ডাকাত ও নয়—আমরা। তার জিনিষ তাকে না দিয়ে নিজের ঘরে আটক ক'রে রেখেছি।... তুই তার সঙ্গে গেলি না কেন মুন্নি?"

তীব্র আত্মগ্লানির ধিক্কার মুন্নিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। ডাকাত—ছি! কিন্তু এই যে দেখা গেল সে ডাকাতি করিতে আসে নাই, তখন সেই ছি-ছির ভূতটা রূপ বদলাইয়া তাহারই ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। সকল অনর্থের মূল যে সে নিজে—সে যখাতসলিলে ডুবিতেছে। কেন সে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল?

এ কয় দিন সখীর দেখা নাই। এত সব অনাসৃষ্টি—চৌকিদার দফাদার পুলিস—এর মধ্যে বৌ-ঝি বাহিরে আসিবার কি জো আছে?

"সই কমলকলিই—"

ঘাটে বসিয়া মুন্নি বাসন মাজিয়া যাইতেছিল, মুখ তুলিল না।

রেণু তাহার কাছে গিয়া কহিল, "কাল চ'লে যাব ভাই।"

মুন্নির মুখ দিয়া ফস করিয়া বাহির হইয়া গেল, "এসেছিলি কেন মরতে এখানে পোড়ারমুখী ?"

রেণু হাসিল, "সত্যি সই। বিরহটা তোর দেখছি কাটল না। রাজপুত্তুর এল কই ?"

মুন্নি বলিয়া উঠিল, "কে বললে আসে নি ?"

"অ্যাঁ, এসেছিল না কি ? তার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিলি তো ?"

"না।"

রেণু কি যে বুঝিল সে-ই জানে। বলিল, "ভালই করেছিস্। বে-রসিকের গলায় প্রেমের মালা সাজে না।..."

মোকদ্দমার নেশা অক্রূরচন্দ্রের মাথায় চড়িল এক পাত্র সুরার মত। কিরূপ কৌশলে সেবার নিধিরাম ও রামকানাই তাহার নাল জমিটা হস্তগত করিয়াছিল, তাহা সে জীবনে ভুলিবে না। আজ তাহারই একটা বড় রকম প্রতিশোধ লইবার জন্ত থানায় কোর্টে আর উকিলের ঘরে সে যেন চরকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সৌদামিনী অনুযোগ দিয়া বলে, মিছামিছি ঐ লোকগুলাকে জড়াইয়া এ-সব কি করিতেছে সে ?

মিছামিছি! জমিগুলা উহারা বাপ-বাপ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া বাঁচিবে। আর রফার কথাবার্তা তো এক রকম ঠিক্ হইয়া গিয়াছে। বাছাধনরা ঘুঘু দেখিয়াছে ফাঁদ দেখে নাই।

পেঁটরা হইতে কাপড় বাহির করিয়া সৌদামিনী তোরঙ্গ সাজাইতে বসিল। বলিল, "হুবীর বিয়েতে চললুম। মুন্নি সঙ্গে যাবে।"

"হুবী ? কোন্ হুবী ?"

"সেই যে আমার ভোমরকোলের বোনপো গো। দূর-সম্পর্ক হ'লে কি হয়, আত্মীয়-স্বজনের বে-থায় না গেলে কি চলে ? এত ক'রে ব'লে গেল সেদিন।—কই দাও তো বাক্সের চাবিছড়া—মুন্নির গয়নাগুলো বের করি।

অক্রূর গম্ভীর মুখে বলিল, "তোমরা গয়না প'রে লোকের চোখ টাটিয়ে বেড়াও, আর ডাকাতি হোক্ আমার বাড়ী।"

মুখ ঝামটা দিয়া সৌদামিনী বলিয়া উঠিল, "কত গয়নাই না দিয়েছ আমায় পরতে—শোন কথা। বলে, খেটে খেটে অঙ্গ কালি হ'ল—"

অক্রূর প্রমাদ গণিল। কে জানে, এখনই হয়তো বিছাহার গড়াইবার প্রস্তাবটা নূতন করিয়া পাড়িয়া বসিবে। চাবি ছড়াটা হাতে দিয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা—নাও। সাবধান ক'রে রেখ যেন।"

নৌকার মাঝি তারণ ছেলে নিমাইকে সঙ্গে লইয়া দেখা দিল। ডাকিল, "কই গো, এখনও বেরলে না ? পৌছতে যে সন্ধ্যে হবে।"

"এই হয়েছে। নে মুন্নি—চট্ ক'রে সেরে নে। অ বাপ নিমাই, বাক্স আর বিছানা নিয়ে যা তো বাবা।"

বার-তের বছরের গামছা-পরা অর্দ্ধনগ্ন নিমাই অবলীলাক্রমে ভারি বোঝাগুলি মাথায় বহিয়া চলিল।

নদীর ঘাটে যাইবার পথে মুন্নি মাকে বলিল, "তোমার কি যে সখ মা। চলেছ বিয়ে দেখতে। আমার তো বিয়ে-বাড়ীতে পা দিতেও ইচ্ছে করে না।"

খালের কালো জলে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। সামনে গলুইয়ের উপর বসিয়া নিমাই বৈঠার চার দিতে লাগিল, পিছনে তারণ হাল ধরিয়াছে।

বাঁক ঘুরিয়া খালের মুখ আসিয়া পড়িল। অদূরবর্ত্তী বিলের জল চোখে পড়ে না, শুধু পানকৌড়ির আর বেলে-হাঁসের কাকলি, পক্ষের ঝাপট বাতাসকে শব্দিত করিয়া তোলে।

"ওরে, ও তারণ কোথা চললি রে ?"

"ভোমরকোল গো। হুবীর বাড়ী।"

সৌদামিনী হাসিয়া কহিল, "দূর, সেখানে যেতে কে বললে ? আমরা যাচ্ছি নিশু—নিশাপতির বাড়ী, নন্দীগ্রাম।"

মুন্নি চমকিয়া উঠিল—নন্দীগ্রাম!

"হ্যাঁ মা, সেইখানে তোকে রেখে আসতে যাচ্ছি। তোর বাবাকে বললে কি আর যেতে দিত?"

মুন্নির মনে হর্ষের ঝিলিক আঁধারকে কাটিয়া খান্ খান্ করিয়া দিল। এমন তার মা—কোথায় গেল তার তিরস্কার-গঞ্জনা? ঐ শাসনের মধ্যে মাতৃস্নেহের আভাস সে পায় সত্য, কিন্তু সখীর রূপে যাকে গড়িয়া তোলে দরদের এ কোন্ মোহিনী শক্তি? জীবনের ভাঙা টুকরাগুলিকে সে আবার সাজাইতে বসিল।

বহুকাল পর আজ তাহার মনে পড়িল, সেই যেদিন সে প্রথম শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল, এমনি নৌকায় চড়িয়া। শেষ যাত্রার ঐ অর্দ্ধবিস্মৃত ছায়াপটের সম্মুখে স্বামী-গৃহের ছোট ইতিহাসখানি তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল। সংসারে শ্বশুর আর সৎ-শাশুড়ী—নিশাপতির মাতা তাহাকে শিশু অবস্থায় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিল। শ্বশুর কত যত্ন করিত, কিন্তু সৎ-শাশুড়ীর রূঢ় কথাগুলি আজও তাহার মনে বিঁধিয়া আছে। বিবাহের অল্পকাল পরে শ্বশুরের মৃত্যু ঘটিলে সৎ-শাশুড়ী নিশাপতির সহিত কি একটা কোন্দল বাধাইয়া ছেলে-পুলে সমেত পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। নিশাপতি সাধ্যমত অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু সে আর ফিরিল না।

বাক্স হইতে গহনা বাহির করিয়া মা মেয়েকে সাজাইতে বসিল। কহিল, "স্বামীর ঘরে শুধু-হাতে যেতে নেই মুন্নি।"

সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সে ঐ অলঙ্কারগুলির শীতল স্পর্শ নিমীলিত নেত্রে উপভোগ করিতে লাগিল। বাহুর কঙ্কণ, কানের দুল, কণ্ঠের হার—নিমেষমধ্যে ইহারা যেন কোন তমাল-শাখা বেড়িয়া বসন্তের কিশলয় মুঞ্জরিত করিল।

নৌকা বিলের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এখানে ওখানে অজস্র রক্তকমল—মুন্নির চোখ আর ফিরিতে চায় না। একটি পদ্ম আপন হাতে তুলিয়া সে খোঁপায় গুঁজিয়া দিল। মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বিচিত্র চলচ্ছবি—দীপ্ত একটি ফুল্ল কমল জলে ভাসিয়া চলিয়াছে!

উপকূলে গ্রামখানিকে দেখা যায়, কাজল-চোখের জলরেখার মত।

মাঝি ডাকিয়া কহিল, "ওরে নিমাই ঝটপট বেয়ে চল। পশ্চিমে মেঘটা বড় ভাল নয়।

সজোরে বৈঠায় টান দিয়া তাহারা নন্দীগ্রাম অভিমুখে চলিল। পিছন হইতে মেঘটা চাপিয়া আসিল যে! বাতাস জোরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তরী টলমল করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ঢেউগুলি সব সমাধি ফুঁড়িয়া উঠিয়া বিলের উপর রোমাঞ্চ তুলিয়া দিল।

সোঁ—সোঁ—সোঁ—জোর হাওয়া বারিবর্ষণ সমানে চলিতে লাগিল। অনেক লাঞ্ছনা সহিয়া নৌকা কোনমতে পারের উপর আছাড় খাইয়া বাঁচিল।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "নিশুর বাড়ী জানিস তো তারণ?

"জানি বইকি। এই তো কাছে।"

মুন্নি কহিল, "নৌকোর ভিতর ভিজে কি হবে মা? চল ঘরে উঠি।"

"এত জল-ঝড়—"

"তা হোক—ও তো শিগ্‌গির থামবে না।"

ভিজিতে ভিজিতে তাহারা ঘরের দাওয়ায় আসিয়া উঠিল। দরজা বন্ধ।

"নিশু—অ বাপ্, নিশু।"

বহু সরিকের বাড়ী। অনেক ডাকাডাকির পর কে এক ব্যক্তি পাশের ঘরের জানালা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কারা? কোত্থেকে এলে?

সৌদামিনী কহিল, "নিশুর বৌ এসেছে গো—নিয়ে যাও। দরজাটা খোল তো বাবা। ভিজে সারা হয়ে গেছি।"

বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরে ঢুকিয়া সে দরজা খুলিয়া দিল। তাহারা ভিতরে আসিলে কহিল, "এই বুঝি আমার বৌদি?"

উভয়কে প্রণাম করিয়া সে কহিল, "আর যদি ক'টা দিন আগে আসতে বৌদি।"

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, "কেন? কি হয়েছে?"

নতমুখে অস্ফুটস্বরে সে কহিল, "নিশুদা নিরুদ্দেশ। চিঠি লিখে গেছে, আর দেশে ফিরবে না।"

কে যেন মাথার উপর অকস্মাৎ একটা কঠিন আঘাত বসাইয়া দিয়াছে এমনি হতভম্ব ভাবে টলিতে টলিতে সৌদামিনী আবৃত্তি করিয়া গেল, "অ্যাঁ—নিশু চলে গেছে…আর ফিরবে না—"

মুন্নির মুখে কিন্তু ভাবান্তরের চিহ্ন মাত্র ফুটিল না। দু-হাতে মাকে সযত্নে সাপটিয়া ধরিয়া কহিল, "চল মা, কাপড় ছাড়বে চল। তুমি না বিনু-ঠাকুরপো? চিনেছি তোমায়। একটু দুধ এনে দিতে পার ভাই? নৌকায় চড়লে মার মাথা ঘোরে।"

সৌদামিনীকে লইয়া সে একখানি জীর্ণ তক্তপোষের উপর বসাইল। দুধ মুখে ধরিতে অশ্রুবিহ্বল কণ্ঠে মা বলিয়া উঠিল, "কি হবে এখন মুন্নি—কি হবে—"

"নাও এটুকু খেয়ে শুয়ে পড় দেখি। না, কথা নয়। পায়ে পড়ি মা, চুপ কর।…এস তো বিনু ঠাকুরপো, কোথায় কি আছে দেখিয়ে দেবে।"

বৃষ্টি তখন ধরিয়াছে। নালায় ডোবায় ঘোলা জল কলকল রবে গড়াইয়া পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া বাঁশঝাড়ে বাতাস কেমন মর্মান্তিক ধ্বনি করিয়া উঠিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া মুন্নি কহিল, "আমার নিজের ঘর-দোর আমায় দেখিয়ে দিচ্ছ তুমি—এ ভারি আশ্চর্য্য, কেমন? কিন্তু দোষটা আমার নয় ঠাকুরপো।"

উঠানের তাঁতটিতে একখানি শাড়ী অর্দ্ধেক বোনা হইয়া আছে। খাসা পাড়—এমনটি সে আর কোথাও দেখে নাই। ঘরের ভিতর শিকায় একগাছি দড়ি ছিঁড়িয়া পিতলের হাঁড়িগুলি কাৎ হইয়া ঝুলিতেছে, কাঁথা-বিছানা এখানে-ওখানে পড়িয়া—আবর্জনা জঞ্জাল, বহুকাল ঝাঁট পড়ে নাই। জানালার বাহিরে ঐ কাঁঠাল গাছের প্রসারিত ডালগুলি চালটিকে সুদ্ধ ভাঙিয়া নামিবে যে।

অর্দ্ধভগ্ন তুলসীমঞ্চে মুন্নি সেই যে মাথা রাখিল, আর যেন উঠিতে চায় না।…

"ঐ বুঝি নিশুর বৌ বিনু?"

"ও রাক্ষুসি এখানে এসেছে কেন? চায় কি?"

"শ্বশুর খেয়েছে—এবার খেল সোয়ামি।"

সরিকান পিসী-মাসী খুড়ী-জ্যেঠী মুন্নিকে আসিয়া ছাঁকিয়া ধরিল। সে ঘোমটা টানিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল।

"হয়েছে, অত ভক্তি দেখাতে হবে না বাছা।"

"বলি ও কাঠকুড়ুনির মেয়ে, এদ্দিন যে আস নি, এখন বুঝি বাপের ঘরে ভাত জোটে না? দেব ছাই বেড়ে।"

বিনু এবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "থাম তোমরা বলছি। নিশুদার বৌ ও—আমি থাকতে ও তোমাদের কাছে কিছু চাইবে না।"

কে এক জন ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল—"ঈস্, ভারি যে দরদ দেখছি।"

একটি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি ঘোমটার ফাঁক দিয়া বিনুর মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

পরদিন সকালে বিনুকে ডাকিয়া মুন্নি ফাইফরমাস করিতে বসিল। চাল-ডাল নুন-তেল যাহা কিছু আনিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়া সে কহিল, "তুমি এগুলি নিয়ে আসবে ভাই, আমি ততক্ষণ হেঁসেল-ঘর আর জিনিষগুলি গুছিয়ে ফেলি। ঘরের ছিরি দেখেছ তো, কিছুর ঠিক্ নেই।"

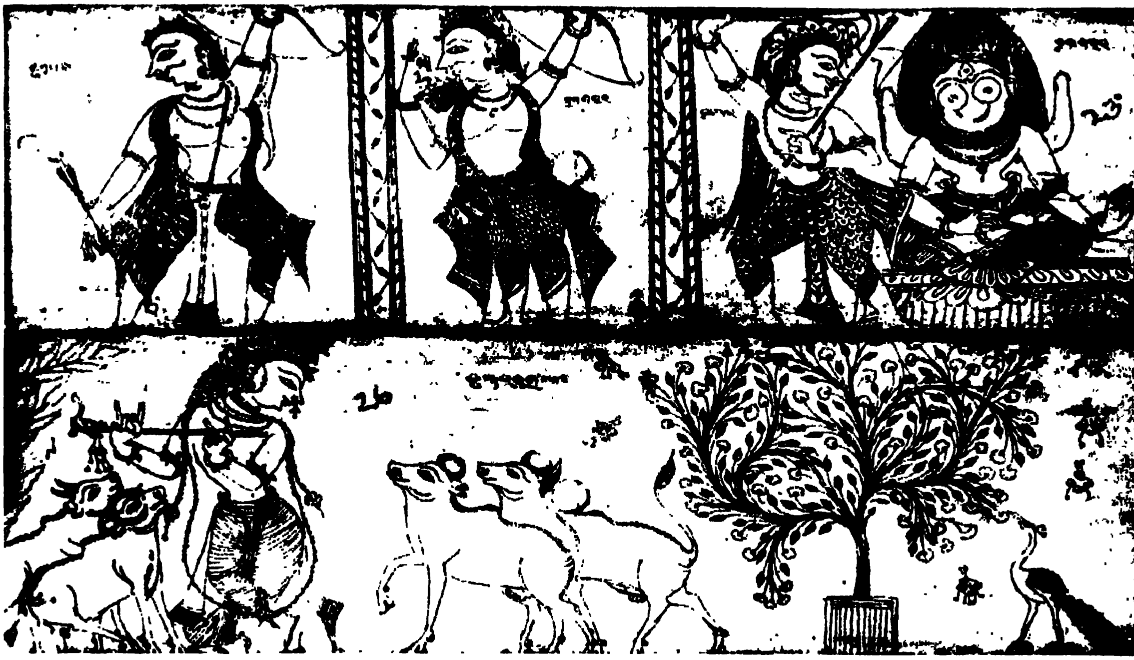
বিনু কহিল, "ব্যস্ত হয়ো না বৌদি। আমি সব ঠিক ক'রে দেব এখন।"

উঠান নিকাইতে বসিয়া মুন্নি বিনুর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। বলিল, "তোমার বৌটির ভাই ভারি লজ্জা। ঐ দেখ, কেমন ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়, কাছে আসে না।"

ব্যাপার দেখিয়া মা একেবারে অবাক হইয়া গেল। কহিল, "এ-সব কি করছিস্ মুন্নি। আমরা যে এখনি চলে যাব।"

মুন্নি স্থির ভাবে বলিল, "আমার তো যাওয়া হবে না মা।"

উড়িষ্যায় প্রাপ্ত একখানি সচিত্র পুঁথি



উপরে, ভৃগুপতি, রামশরীর, হলধর ও বুদ্ধশরীর   নীচে, "কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ"

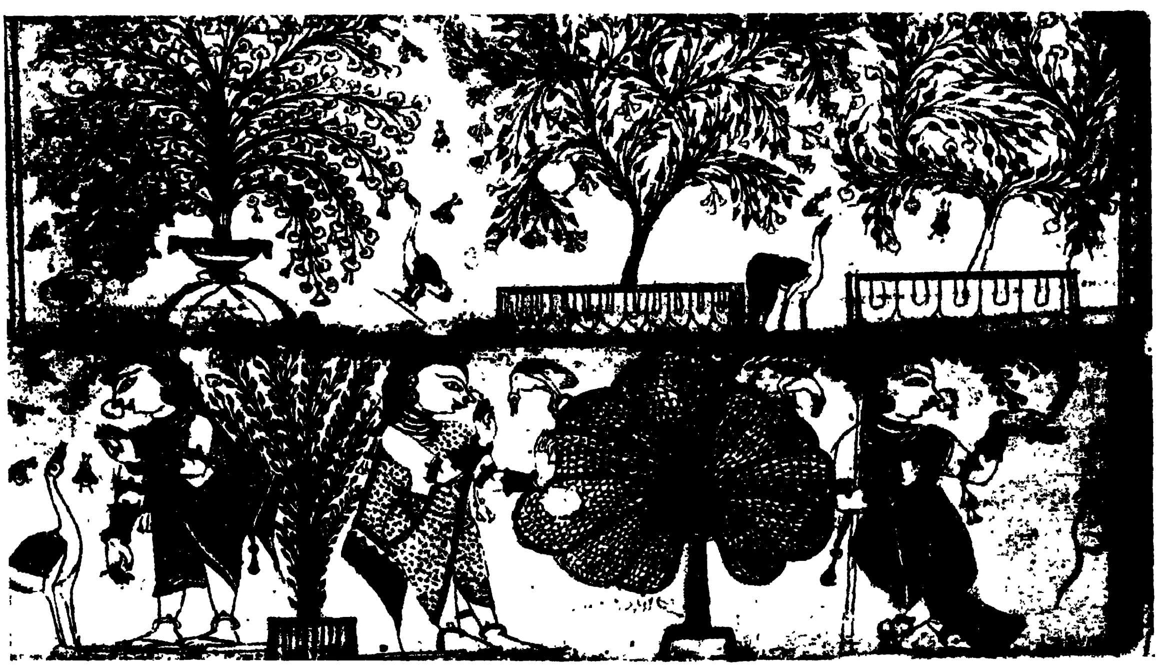


উপরে, বিরহিণী রাধা   নীচে, বিরহী কৃষ্ণ



উপরে, কদম্বমূলে

নীচে, সখীপরিবৃতা রাধা



বিরহিণী রাধা হংস প্রভৃতি পাখীর সহিত কথা বলিতেছেন

এমন একটা বিস্ময়কর কথা জীবনে যেন কখনও শুনে নাই, তেমনি ভাবে সৌদামিনী বলিয়া উঠিল, "বলিস্ কি রে মুন্নি? এখানে থাক্‌বি তুই কেমন ক'রে?"

বিনুর মুখের পানে চোখ তুলিয়া ম্লান হাসির সহিত মুন্নি কহিল, "আমার ভার তুমি নিতে পারবে না ঠাকুরপো?"

বিনু ঢিপ করিয়া মাথাটা ভূতলে ছোঁয়াইল। উৎসাহের সহিত কহিল, "পারি কি না, সে তুমি দেখে নিও বৌদি।"

সৌদামিনীর মন মানিল না। সে আসিয়াছে সত্য, মুন্নিকে স্বামীর ঘরে রাখিয়া যাইতে; এখন যে তাহাই বিষম দায় হইয়া উঠিল।

মেঘমুক্ত আকাশের রৌদ্রকিরণ গাছের মাথায় আঙিনায় এ-দিক ও-দিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তারই মধ্যে কোথায় যেন একটু ঝড়শেষের বজ্রচিহ্ন এখনও লাগিয়া আছে।

সজল নেত্রে সৌদামিনী মুন্নিকে আবার ধরিয়া পড়িল—"চল্ মা, চল্ আমার সঙ্গে। নিশু যে বলেছে, সে আর আসবে না।"

"আসবে মা আসবে। আমি যে ব'সে থাকব এখানে তারই জন্যে ঘর সাজিয়ে। হঠাৎ ফিরে এসে এক দিন সে তা দেখবে। সেদিন তার কত আনন্দ হবে বল তো,"—বলিয়া উচ্ছ্বাসভরে সে মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। চোখ দুইটি দিয়া অশ্রুধারা অঝোরে ঝরিয়া নামিল।

"মুন্নি—মা—" সৌদামিনী আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"ওগো, তোমায় আমি চিনি নি। ডাকাত ব'লে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত···কোথাও যাব না গো, কোথাও যাব না।"

ভূতলে লুটাইয়া পড়িয়া সে যেন কোন্ মহাতীর্থের রেণু অঙ্গে মাখিয়া লইল।

চুপিচুপি

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঃষারের দেশে এই নিশিশেষে যে-চাঁদ জ্বালালো আলো
াতের কুয়াশা আমাতে দুরাশা চুপিচুপি এনেছিলো!
চুপ! চুপ! ঐ মর্ম্মর দেহে রক্ত উঠেছে গেয়ে
স্পন্দনহীন বন্ধন তার জীবনে গিয়েছে ছেয়ে।
ত চাঁদখানি না জানি কি ভেবে জ্বালে ঝল্‌মল্ আলো
ষারের দেশে এই নিশিশেষে হঠাৎ বেসেছি ভালো।

•

প চুপ আজ নেই কোনো কাজ বেজেছে ছুটির বাঁশী,
ভাঁজ এ রাতে বাদুড়ের ডানা চাঁদেরে দেয় নি ফাঁসি।
তামার চোখেতে চাঁদ ভেঙে গেছে, ঝিক্‌মিক ঝিক্‌মিক্;
ক ঠিক আজ দেখেছি হঠাৎ সোনার বালুকারাশি
বিনের কূলে জলে তারা শুধু ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক।

ভুলে যেতে দাও, ডুবে যেতে দাও, চলে যেতে দাও দূরে;
ওগো প্রজাপতি! ডানা ধার দেবে—ফুরফুরে ঝিরঝিরে?
সবুজ শস্যে বাষ্পের মত কেঁপে কেঁপে কেঁপে যাই;
ডুবে যাই আমি, ভুলে যাই আমি, গলে যাই,
মিলে যাই!

গুঁড়িয়েছে চাঁদ তোমার চোখেতে নেই বাদুড়ের ডানা
নিটোল এ রাত বাদুড়ের ঝাঁকে হয় নি হঠাৎ কানা!

তুষারের দেশে আজ অবশেষে কুয়াশা গিয়েছে কেটে;
এক মুঠো ছুটি জুটেছে এখন সারাদিন খেটে খেটে।
চুপ! চুপ! আজ জীবন এসেছে, জীবনে গিয়েছে ছেয়ে,
মূর্ত্তির দেহে মর্ম্মর বাজে, রক্ত উঠেছে গেয়ে!
মৃত চাঁদখানি না জানি কি ভেবে জ্বালে ঝল্‌মল্ আলো
এই নিশিশেষে তুষারের দেশে বেসেছি হঠাৎ ভালো।



বৃন্দাবনে গোষ্ঠ

উড়িষ্যায় প্রাপ্ত একখানি সচিত্র পুঁথি

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

কণারকের মন্দিরে বালি-পাথরের যে-সকল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আছে তাহাদের নগ্ন রূপ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই বটে; কিন্তু এ-কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এক সময়ে এই সকল মূর্ত্তির উপরে রঙের প্রলেপ ছিল। রঙের প্রলেপ দিলে মূর্ত্তিগুলি ভাল দেখায়, না মন্দ দেখায়, তাহা আমরা বলিতে পারি না, তবে ইহা ঠিক যে বহু বৎসর ধরিয়া কণারকের মন্দিরে মূর্ত্তিগুলিকে চিত্রিত করা হইয়াছিল। দু-একখানি মূর্ত্তির উপরে রঙের প্রলেপ পরতের পর পরত জমিয়া এক ইঞ্চিরও বেশী পুরু হইয়া গিয়াছে।

মূর্ত্তিশিল্প এবং স্থাপত্যের জন্যই উড়িষ্যা আজ বিখ্যাত, কিন্তু মনে হয় চিত্রবিদ্যায় তাহার স্থান নিম্নে ছিল না। আজ পর্য্যন্ত পুরীর কুটীরে যে-সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে, চিত্র হিসাবে সেগুলির স্থান উচ্চে। পুরী শহরে প্রতি বৎসর পাণ্ডারা চিত্রকর ডাকিয়া বাড়ীর দেওয়াল সুসজ্জিত করিয়া লন। শুইবার ঘর, পূজার স্থান গৃহলক্ষ্মীরা আলপনার দ্বারা শোভিত করেন। তালপাতার পুঁথিতে গীতগোবিন্দ, রামায়ণ-কাহিনী, অমরুশতক, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতির সচিত্র সংস্করণ অঙ্কিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কোনও কোনও ছবিতে রং দেওয়া হয়, কোনওটিতে শুধু রেখাই থাকে, রং থাকে না। প্রায় তিন-চার বৎসর হইল কটক শহরের সন্নিকটে শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ দাস নামে জনৈক ভদ্রলোক একখানি সচিত্র গীতগোবিন্দ সংগ্রহ করেন, তাহার পরিচয় দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পুস্তকখানি উপস্থিত কলিকাতায় শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকটে আছে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে পারে।

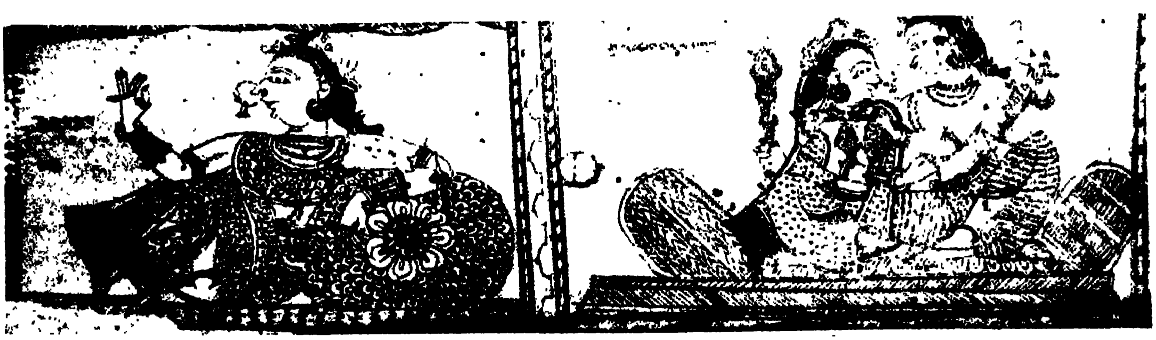
পুঁথিখানি তালপাতায় লেখা। ইহাতে মোট ১০৬ পৃষ্ঠা আছে এবং এই সকল পৃষ্ঠায় সংস্কৃত ভাষায় উড়িয়া অক্ষরে গীতগোবিন্দ মহাকাব্যটি লিখিত আছে। লেখা এবং ছবি উভয়ই তালপাতার উপরে লোহার লেখনী দ্বারা খোদাই করা। পাতাগুলি সাড়ে-চার ইঞ্চির কিছু বেশী দীর্ঘ, এক ইঞ্চির কিছু বেশী প্রস্থ। অনেকগুলির উপরে দুই-তিনখানি করিয়া ছবি আঁকা আছে, অতএব ছবিগুলি আকারে ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও নিখুঁতভাবে আঁকা। কি ধৈর্য্য ও কি শ্রদ্ধার সহিত যে ছবিগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। গত বৎসর মহানদীর তীরে আমি বৌদ নামে এক শহরে প্রাচীন মন্দির দেখিতে যাই। পুরাতন মন্দিরের প্রাঙ্গণে দেখিলাম পনর-কুড়ি জন উড়িয়া শিল্পী পাথর খোদাই করিতেছে। তাহারা একটি বৃহৎ মন্দির-নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিল, মন্দিরের তিন হাত আন্দাজ উঠিয়াছিল, অবশিষ্ট



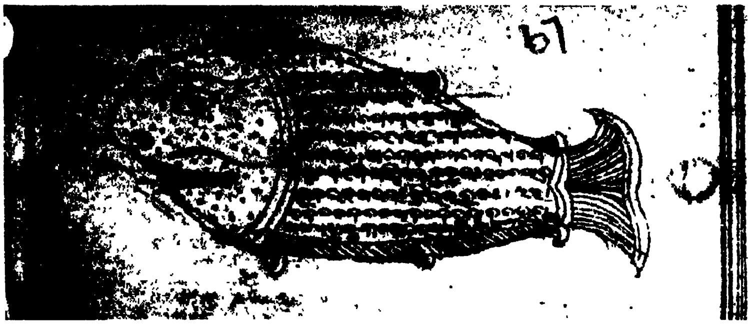
যমুনাপুলিনে রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ। পিছনে নন্দ, আকাশে মেঘ।

সবই বাকি। বৌদ্ধের নরপতি যখন মন্দির আরম্ভ করেন তখন শিল্পিগণকে ডাকিয়া প্রথমে আনুমানিক ব্যয়ের কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারা উত্তর দিয়াছিল, "আমরা এষ্টিমেট প্রভৃতি ব্যাপার জানি না। আমরা কাজ করিব, আপনি দৈনিক মজুরি হিসাবে বারো আনা করিয়া দিবেন, মন্দির যত দিনে শেষ হয় হইবে।" রাজা মহোদয় তাহাদের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তদনুরূপ আদেশ দিয়াছিলেন। মন্দির কবে শেষ হইবে কেহ জানে না। যাহারা কাজ আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের জীবদ্দশায় হইতে পারে, নাও হইতে পারে। তাহার জন্য শিল্পীদের কোনও ব্যস্ততা দেখিলাম না। গীতগোবিন্দের পুঁথিখানিও ঐরূপ মনোভাব লইয়া চিত্রিত হইয়াছিল। কোথাও কোন ব্যস্ততা নাই, শীঘ্র শেষ করিবার তাড়া নাই, শেষ করিয়া দশ জনকে দেখাইয়া নাম কিনিবারও লোভ নাই। বস্তুতঃ কে যে এমন সুন্দর পুঁথি লিখিয়াছিলেন এবং চিত্রিত করিয়াছিলেন তাহার সন তারিখ অথবা নাম কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বইয়ের প্রান্তে শেষের পৃষ্ঠায় একখানি আশ্চর্য্য ছবি আছে। এক জন বৈষ্ণব উপবিষ্ট হইয়া মালা জপ করিতেছেন এবং অপর এক জন তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডবৎ হইয়া আছেন। বোধ হয় ইহাই চিত্রকরের একমাত্র ছবি। মনে হয় তিনি কবি জয়দেব অথবা নিজের গুরুর ছবি আঁকিয়া পাশে নিজের ছবি সাষ্টাঙ্গ অবস্থায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কবির প্রতি তাঁহার ভক্তি অসীম, শুধু এই কথাটুকুই তিনি পুস্তকের প্রান্তে লিখিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার অধিক পরিচয় নিজের সম্বন্ধে দিবার আর তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

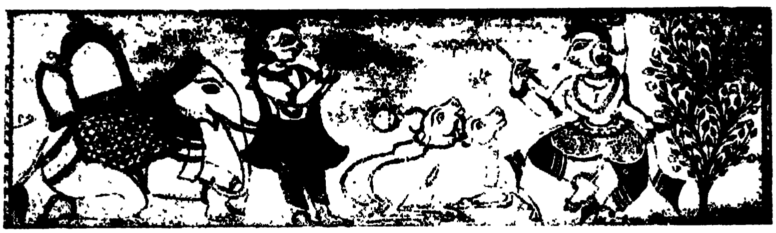
ছবির অঙ্কন-পদ্ধতি বাংলা এবং উড়িষ্যার পটের অনুরূপ। তবে তালপাতায় লোহার লেখনী দিয়া আঁকিবার ফলে সামান্য একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে। পটের শৈলীতে আঁকিবার সময়ে মানুষ যাহা দেখে ঠিক তাহা



রাধাকৃষ্ণ



মৎস্যদেহে লেখ



মন্দরধারী শ্রীকৃষ্ণ ও দেবরাজ ইন্দ্র

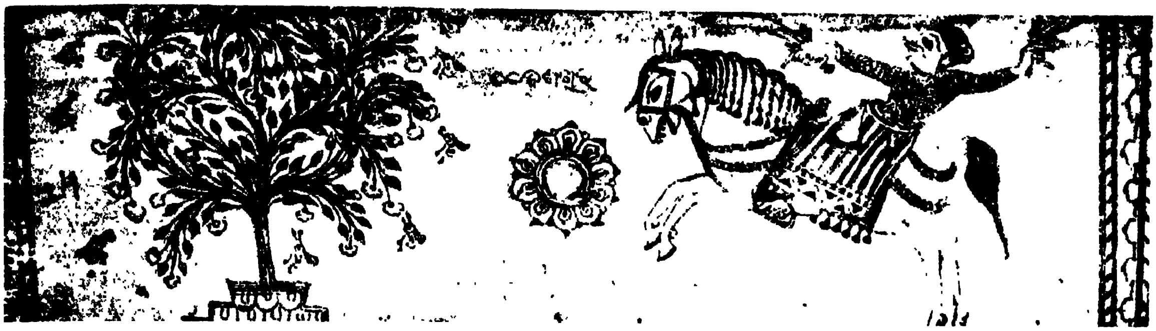


বরাহ, নরহরি, বামন

আঁকে না। নিজের অন্তরে বাহিরের যে-রূপ প্রতিফলিত হয় তাহাকেই মানুষ রূপ দেয়। ইহাতে শিল্পী যে স্বাধীনতা উপভোগ করেন তাহার সুবিধা আছে বটে; কিন্তু অসুবিধাও আছে। যাহাদের দেখাইবার জন্য ছবি আঁকা হয় তাহাদের জন্য বাস্তবের কত টুকু রাখিতে হইবে, কত টুকু বর্জ্জন করিতে হইবে সে-বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ভাল শিল্পী সুর খুব চড়াও বাঁধেন না, খুব শিথিলও করেন না, সেইখানেই তাঁহার বিশেষত্ব। কিন্তু এক বার সে-সুর দখল করিলে, সে-ভাষা আয়ত্ত করিলে তিনি যেমন স্বাধীন ভাবে, স্পষ্ট ও দৃঢ় রূপে অনুভূত সত্যকে প্রকাশ করিতে পারেন, নিছক বাস্তবপন্থী শিল্পীরা তাহা কদাপি পারেন না। বর্ত্তমান পুঁথির চিত্রগুলি যে শৈলীতে আঁকা সেখানে বাস্তবের বন্ধন নাই, অবাস্তবের অস্বাভাবিকতাও নাই। তাহা দুর্ব্বলও নহে। যিনি আঁকিয়াছিলেন তিনি বলিষ্ঠ মন লইয়া আঁকিয়াছিলেন—ইহা পদে পদে অনুভব করা যায়।

শিল্পে অবাস্তব ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া শিল্পী কবি জয়দেবের অন্তর্লোকের সকল কথা কুণ্ঠাহীনভাবে পরিব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। কবির সেই মানসলোকে শ্রীকৃষ্ণ সহস্রশীর্ষ সর্পের মস্তকে পদার্পণ করিয়া নৃত্য করেন, রাধা কলঙ্কিনী হন, ইন্দ্র মন্দরধারী নারায়ণকে স্তবে সন্তুষ্ট করেন, দেবতা কখনও মীন, কখনও বরাহের আকারে বিশ্বভুবনকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। সেই মানসলোক যেমন কবি-মনের সৃষ্টি, শিল্পের অনুসৃত রীতিটিও তেমনই অন্তর্লোকের উপযোগী করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। বাস্তবের কতখানি তাহাতে আছে তাহা ওজন করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। এই শৈলীর স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়া লইলে তবেই আমরা শিল্পীর মনোভূমিতে উপনীত হইতে পারি এবং তখনই বিচার করিতে পারি শিল্পী তাঁহার ভাষার সহায়তায় যে-মনের পরিচয় দিয়াছেন সে-মন কিরূপ, উৎকর্ষে ও সাধনায় তাহার স্থান কোথায়।

যে-পুঁথিখানির কথা আমরা আলোচনা করিতেছি তাহার চিত্রের অন্তরে প্রবেশ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, শিল্পী নিষ্ঠায়, ধৈর্য্যে ও বিনয়ে যথার্থ এক মহৎ



কল্কি-শরীর

ব্যক্তি ছিলেন। তাই এই ছবি আমাদের ভাল লাগে। শিল্পের শেষে মানুষের মনই তো আমরা খুঁজিয়া থাকি। বৌদ্ধ ধম্মপদের প্রারম্ভে যে-কথা লিখিত আছে, শিল্পের শেষে আমরা তো সেই কথাতেই পৌছাই—মনঃ পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনঃ সেঠ্ঠা মনোময়া—মনই সকল ধর্ম্মের পূর্ব্বগামী, মনই শ্রেষ্ঠ, এই জগৎ মনোময়, উহাই মূল বস্তু। মনসা চ পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া



কালীয়দমন

ব অনপায়িনী—প্রসন্ন মন লইয়া যে কথা বলে বা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে সুখ তাহাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে। বৃহৎ মন বৃহৎ দৃষ্টি বৃহৎ জ্ঞান লইয়া যে-ব্যক্তি শিল্পরচনা করে তাহার শিল্পের পদে পদে সেই মন প্রতিফলিত হয় এবং সেই মনের প্রভাব সেই দৃষ্টির ছায়া, সেই জ্ঞানের ছটা অপর মানুষের উপরে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ, আরও আনন্দময় করিয়া তোলে। সেইখানেই শিল্পরচনা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

যাহাই হউক, ছবিগুলির সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সেগুলি আমাকে যে-আনন্দ দিয়াছে পাঠকবর্গকে সেই আনন্দ দান করিবে এই প্রার্থনাই করি। ছোট আকারের তালপাতায় নিখুঁত ভাবে আঁকা, ছাপার কাগজে তাহাদের সুষমা পরিস্ফুট হয় না। যত টুকু হয় তাহাই হউক। বইখানির সমগ্র চিত্র ছাপা হইলে লোকে উড়িষ্যার অন্তরের কথা আরও জানিতে, উড়িষ্যাবাসীকে সম্যক্ ভাবে চিনিতে শিখিবে।



বিশ্বভারতী

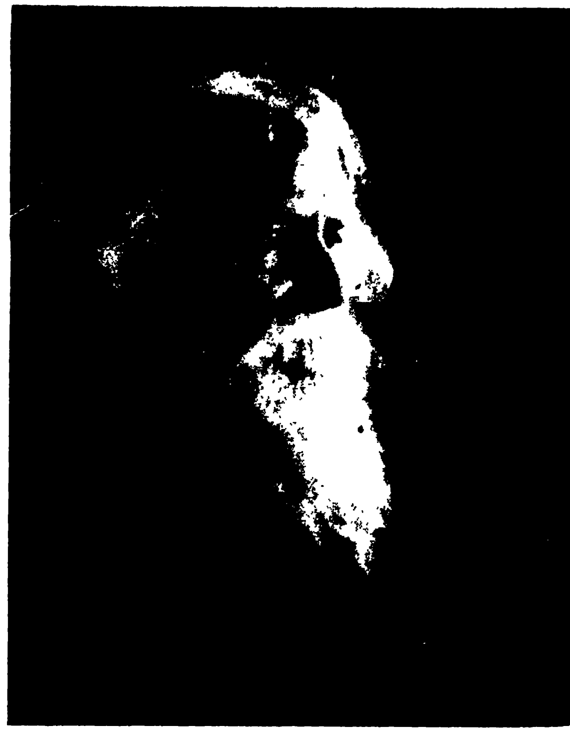
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

য়ুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞান-সাধনার প্রতিষ্ঠান, ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক য়ুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এই জন্যে তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়, সাহিত্য আছে, সঙ্গীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে, জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।

এই সকল কেন্দ্রের প্রধান সার্থকতা কেবল তার কর্মফল নিয়ে নয়। তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি সাধকদের আত্মার বিকাশে। নানা প্রকারে সেই বিকাশের প্রবর্তনা ও আনুকূল্য যদি দেশের মধ্যে থাকে তবেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। মানুষের প্রকৃতিতে উর্ধ্বদেশে আছে তার নিষ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশুদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে, আর কোনো কারণে নয় তাতে তার আত্মারই পূর্ণতা হয় ব'লে।

আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানা-ঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন, সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন, রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এই সকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্যদেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণতঃ মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম সাধারণ মানুষের চিত্তোৎ-



রবীন্দ্রনাথ

গত ৭ই পৌষে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

কর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র। তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন ক'রে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা।

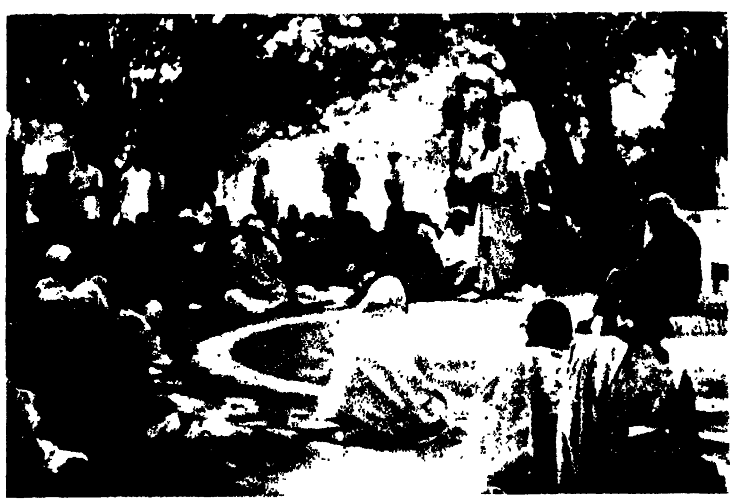


দক্ষিণ হইতে: পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক উৎসবের সভাপতি মিঃ এল্. কে এল্‌মহার্ষ্ট ও শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
[মিঃ পি. রায় চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ]

মন যেখানে সুস্থ সবল মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে দেব শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয় সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে ব'লে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল, তেমনি যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায় এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।

পদ্মার বোটে ছিল আমার নিভৃত নিবাস। সেখান থেকে আশ্রমে চলে এসে আমার আসন নিলুম গুটি পাঁচ-ছয় ছেলের মাঝখানে। কেউ না মনে করেন, তাদের উপকার করাই ছিল আমার লক্ষ্য। ক্লাস পড়ানো কাজে উপকার করার সম্বল আমার ছিল না। বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল—আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে দিয়ে-ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল। ছোটো ছেলেদের পড়াবার কাজে দিনের পরে দিন আমার কেটেছে, তার মধ্যে খ্যাতির প্রত্যাশা বা খ্যাতির স্বাদ পাবার উপায় ছিল না। সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর ইস্কুল-মাস্টারি। ঐ কটি ছোটো ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে অর্থ নিলে সামর্থ্য নিলে—এইটেই আমার সার্থকতা। এই যে আমার সাধনার সুযোগ ঘটল এতে ক'রে আমি আপনাকেই পেতে লাগলুম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সঙ্গমক্ষেত্রে। আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মানুষের



শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষদের অধিবেশন
[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]



শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের মেলায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাঁওতাল নরনারী
[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

দিনে দিনে এই কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। আজ সে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি আমাদের দেশের দৃষ্টি প্রায়ই অনুকূল নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় নি তাতে কর্মের মূল্যই বেড়েছে।

যাঁরা সঙ্কীর্ণ কর্তব্য-সীমার মধ্যেও এই বিদ্যায়তনে কাজ করছেন তাঁদেরও সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমার স্বীকার্য।

এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা একে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছেন কিনা জানি না। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠানকে আমি সমর্পণ করেছি।

বহুদিন এই আশ্রমে আমরা প্রচ্ছন্ন ছিলাম। মাটির ভিতরে বীজের যে অজ্ঞাতবাস প্রাণের স্ফুরণের জন্য তার প্রয়োজন আছে। এই অজ্ঞাতবাসের পর্ব দীর্ঘকাল চলেছিল। আজ যদি এই প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষুর গোচর হয়ে থাকে তবে সেই প্রকাশ্য দৃষ্টিপাতের ঘাত-সংঘাত ভালোমন্দ লাভক্ষতি সমস্ত স্বীকার ক'রে নিতে হবে, কখনো পীড়িত মনে কখনো উৎসাহের সঙ্গে।

যাঁরা উপদেষ্টা পরামর্শদাতা বা অতিথি ভাবে এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করি নি, এবং সেই কারণে যদি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্বসাধনার সঙ্গে এক ব'লে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে। সকল স্থলেই যে সেই আসন সাধকেরা অধিকার করেছেন এমন

সংসর্গ পাওয়া যায় এই সামান্য ছেলে পড়ানোর মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই স্বার্থ নেই, সেই জন্যেই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে।

সকলে জানেন আমি মানুষের কোনো চিত্তবৃত্তিকে অস্বীকার করি নি। বাল্যকাল থেকে আমার কাব্য সাধনার মধ্যে যে আত্মপ্রকাশের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল মানুষের সকল চিত্তবৃত্তির পরেই তার ছিল অভিমুখিতা। মানুষের কোনো চিৎশক্তির অনুশীলনকেই আমি চপলতা বা গাম্ভীর্যহানির দাগা দিই নি।

বহু বৎসর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি, তাতে আমার নিরতিশয় শান্তি ও আনন্দ ছিল। কিন্তু মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে, তাতে সাড়া দিতে হবে, সকল দিক থেকে বলতে হবে ওঁ, আমি জেগে আছি।

এখানে এলুম যখন তখন আমার কর্মচেষ্টায় বাইরের প্রকাশ অতি দীন ছিল। সে সম্বন্ধে এইটুকু মাত্রই বলতে পারি সেই উপকরণবিরল অতি ছোটো ক্ষেত্রের মধ্যে আপনাকে দেওয়ার দ্বারা ও আপনাকে পাওয়ার দ্বারা যে আনন্দ তারি মধ্য দিয়ে এই আশ্রমের কাজ সুরু হয়েছে।

গর্ব করি নে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে—আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমাদের মনে বিশ্বাস হয়েছে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি, যদিও ফসলের পূর্ণ পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা আমাদের সুদীর্ঘ এবং দুরূহ প্রয়াসের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছেন যার সর্বকালীন মূল্য আছে তাঁদের সেই অনুকূল দৃষ্টি থেকে আমরা বর লাভ করেছি। তাঁদের দৃষ্টির সেই আবিষ্কার, শক্তি জাগিয়েছে আমাদের কর্মে। দূরের থেকে এসেছেন মনীষীরা অতিথিরা, ফিরেছেন বন্ধুরূপে, তাঁদের আশ্বাস ও আনন্দ সঞ্চিত হয়েছে আশ্রমের সম্পদভাণ্ডারে।

বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা চেষ্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীমূলে স্থাপন করবার জন্ত নৈবেদ্য সংরচন কার্য আমার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই এক রকম শেষ ক'রে এনেছি। দূরের অতিথি-অভ্যাগতদের অনুমোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। ফুলে ফলে বাইরের ফসলের কিছু একটা প্রকাশ এঁরা দেখেছেন তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকেও দেখেছেন। দূরের সেই অতিথিরা মনীষীরা আমাদের পরম বন্ধু, কারণ তাঁদের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ যেমন তেমনি শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে, এই দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারাজীবনের কর্মসাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণতার রূপ লাভ করবে।

শান্তিনিকেতন
৮ই পৌষ ১৩৪৫

[বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষদে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের অভিভাষণ। শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।]

রাজপুতানা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ছবি রাজপুতানার ;
এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার
দুর্বিষহ বোঝা।
হতবুদ্ধি অতীতের এই যেন খোঁজা
পথভ্রষ্ট বর্তমানে অর্থ আপনার,
শূন্যেতে হারানো অধিকার
ঐ তার গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রূকুটি,
ঐ তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুঠি
বিরুদ্ধ ভাগ্যের পানে।

মৃত্যুতে করেছে গ্রাস তবুও যে মরিতে না জানে,
ভোগ করে অসম্মান অকালের হাতে
দিনে রাতে,
অসাড় অন্তরে
গ্লানি অনুভব নাহি করে,
আপনারি চাটুবাক্যে আপনারে ভুলায় আশ্বাসে—
জানে না সে
পরিপূর্ণ কত শতাব্দীর পণ্যরথ
উত্তীর্ণ না হ'তে পথ
ভগ্নচক্র পড়ে আছে মরুর প্রান্তরে,
ম্রিয়মাণ আলোকের প্রহরে প্রহরে
বেড়িয়াছে অন্ধ বিভাবরী
নাগপাশে, ভাষাভোলা ধূলির করুণা লাভ করি'
একমাত্র শান্তি তাহাদের।
লঙ্ঘন যে করে নাই ভোলামনে কালের বাঁধের
অন্তিম নিষেধ সীমা—
ভগ্নস্তূপে থাকে তার নামহীন প্রচ্ছন্ন মহিমা ;
জেগে থাকে কল্পনার ভিতে
ইতিবৃত্তহারা তার ইতিহাস উদার ইঙ্গিতে।
কিন্তু এ নির্লজ্জ কারা! কালের উপেক্ষা দৃষ্টি কাছে
না থেকেও তবু আছে।
এ কী আত্ম-বিস্মরণ মোহ,
বীর্যহীন ভিত্তি 'পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ।
রাজ্যহীন সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা,
বিধাতার সাজা।
হোথা যারা মাটি করে চাষ
রৌদ্রবৃষ্টি শিরে ধরি বারো মাস,
ওরা কভু আধামিথ্যা রূপে
সত্যেরে তো হানে না বিদ্রূপে।
ওরা আছে নিজ স্থান পেয়ে
দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্ত মূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে।

এদিকে চাহিয়া দেখো টিটাগড়।
লোষ্ট্রে লৌহে বন্দী হেথা কালবৈশাখীর পণ্য ঝড়।
বণিকের দম্ভে নাই বাধা,
আসমুদ্র পৃথ্বিতলে দৃপ্ত তার অক্ষুণ্ণ মর্যাদা।
প্রয়োজন নাহি জানে ওরা
ভূষণে সাজায়ে হাতিঘোড়া
সম্মানের ভান করিবার,
ভুলাইতে ছদ্মবেশী সমুচ্চ তুচ্ছতা আপনার।
শেষের পংক্তিতে যবে থামিবে ওদের ভাগ্যলিখা,
নামিবে অন্তিম যবনিকা,
উত্তাল রজতপিণ্ড উদ্ধারের শেষ হবে পালা
যন্ত্রের কিঙ্করগুলো নিয়ে ভস্মডালা
লুপ্ত হবে নেপথ্যে যখন
পশ্চাতে যাবে না রেখে প্রেতের প্রগল্‌ভ প্রহসন।

উদাত্ত যুগের রথে বল্গাধরা সে রাজপুতানা
মরু প্রস্তরের স্তরে একদিন দিল মুষ্টি হানা,
তুলিল উদ্ভেদ করি কলোল্লোলে মহা ইতিহাস
প্রাণে উচ্ছ্বসিত, মৃত্যুতে ফেনিল ; তারি তপ্তশ্বাস
স্পর্শ দেয় মনে, রক্ত উঠে আবর্তিয়া বুকে,
সে যুগের সুদূর সম্মুখে
স্তব্ধ হয়ে ভুলি এই কৃপণ কালের দৈন্যপাশে
জর্জরিত নতশির অদৃষ্টের অট্টহাসে
গলবদ্ধ পশুশ্রেণী সম চলে দিন পরে দিন
লজ্জাহীন।
জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব মাঝে
সেদিন যে দুন্দুভি মন্দ্রিয়াছিল, তাই বাজে
প্রাণের কুহরে গুরু গুরু। নির্ভয় দুর্দান্ত খেলা

মনে হয় সেই তো সহজ, দূরে নিক্ষেপিয়া ফেলা
আপনারে নিঃসংশয় নিষ্ঠুর সংকটে। তুচ্ছ প্রাণ
নহে তো সহজ, মৃত্যুর বেদীতে যার কোনো দান
নাই কোনো কালে, সেই তো দুর্ভর অতি,
আপনার সঙ্গে নিত্য বাল্যপনা দুঃসহ দুর্গতি।
প্রচণ্ড সত্যেরে ভেঙে গল্পে রচে অলস কল্পনা
নিষ্কর্মার স্বাদু উত্তেজনা,
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীর সাজে
তারস্বর আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন্ লাজে।

তাই ভাবি হে রাজপুতানা
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক;
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।
শঙ্করের তৃতীয় নয়ন হ'তে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে।

মংপু
২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতাহীনতায় অসুবিধা

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কবি রঙ্গলাল লিখিয়াছিলেন,

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?"

তাহার পর ৮০ বৎসর গত হইয়াছে। আমরা দাসত্বশৃঙ্খল এখনও পরিয়া রহিয়াছি। তাহার যে দুঃখ অপমান লাঞ্ছনা অসুবিধা কত, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক।

কেবল একটি বিষয়ে স্বাধীন ও পরাধীন দেশ সকলের মানুষদের মধ্যে প্রভেদের এখানে উল্লেখ করিব।

স্বাধীন দেশের মানুষদেরও দুঃখ ও অভাব নানা রকম আছে, কিন্তু তাহা পরাধীন দেশের মানুষদের মত নহে। এই জন্য স্বাধীন জাতিদের কিছু উদ্‌বৃত্ত শক্তি বিদেশের ও সমগ্র জগতের জন্যও ব্যয়িত হইতে দেখা যায়। সেই কারণে স্বাধীন দেশ সকলের অন্ততঃ কতকগুলি মানুষ বিদেশের ও সমগ্র পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা করিয়াছেন এবং সমাধানের কার্য্যগত চেষ্টাও করিয়াছেন। এখনও কেহ কেহ করিতেছেন। ডক্টর নান্সেন্ গত মহাযুদ্ধে গৃহহীন বহু লক্ষ বহুজাতীয় নরনারী বালক-বালিকা ও শিশুদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য যে মহতী চেষ্টা করেন, যাহা তাঁহার নামধারী প্রতিষ্ঠান এখনও করিতেছে, এবং যাহা সেই জন্য এবার শান্তির নোবেল পুরস্কার পাইয়াছে, তাহা ইহার একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত। স্বাধীন দেশের লোকেরা বিদেশের প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, ললিতকলা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও বহু গবেষণা ও আলোচনা করিয়া থাকেন। হ্যাভেল সাহেবের মত বহু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদেশীরা ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, ললিতকলা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু আমাদের দেশের ও জাতির দুঃখ দুর্গতি ও হীনতাতে এত অভিভূত এবং আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাহা দূর করিতে চান তাঁহাদের শক্তি সেই চেষ্টাতেই এরূপ আবদ্ধ, যে, আমরা কোন বিদেশ সম্বন্ধে সেরূপ কোন হিতৈষণার পরিচয় দিতে পারি না, সেরূপ কোন গবেষণা ও আলোচনা করি না বিদেশীরা যেরূপ হিতকর্ম্ম, গবেষণা ও আলোচনা নানা বিদেশ সম্বন্ধে করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন।

অতএব, বেশী ব্যাখ্যা না করিলেও, এই সামান্য মন্তব্য হইতেই বুঝা যাইবে যে, স্বাধীনতা বিশাল হিতৈষণা ও মনীষার উদ্ভবের অনুকূল, পরাধীনতা তাহার অনুকূল নহে।

কিন্তু ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, যে, পরাধীন দেশে এমন মানুষ জন্মেই না যাঁহারা সমগ্র জগতের জন্য ভাবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসমস্যার বিষয় চিন্তা করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন—এবং এই জন্য কোন কোন স্থূলদর্শী লোক তাঁহার স্বদেশপ্রীতিতে সংশয় প্রকাশও করিয়াছে এবং সে বিষয়ে ব্যঙ্গ করিয়াছে ! মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ নীতি যে জার্ম্মেনীর ইহুদীরা ও চেকোস্লোভাকিয়ার চেকরা এবং ঐরূপ অবস্থাপন্ন অন্যান্য জাতির লোকেরাও অবলম্বন করিতে পারে, তাহা তিনি বলিয়াছেন। তবে, ইহাও বক্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছেন বলিয়াছেন, তাহার উৎপত্তি হইয়াছে স্বজাতির কোন-না-কোন দুঃখ দূরীকরণ বা সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা হইতে। স্বদেশের জন্য তাঁহারা যাহা আবশ্যক ভাবিয়াছেন, তাঁহারা তাহারই প্রয়োগ বিশ্বব্যাপী দেখিতে চাহিয়াছেন।

পরাধীন জাতির মধ্যে ধর্ম্মোপদেষ্টার আবির্ভাব

পরাধীন জাতির মধ্যে অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব

কিন্তু মানবজীবনের একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যাহা সাম্রাজ্যাধিকারী প্রভুজাতিদের মধ্যে দেখা যায় না। ধর্ম্মজগতে ইহা দেখা যায়।

প্রাচীন কালে রোমের সাম্রাজ্য বিশালতম ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের আবির্ভাব বলদৃপ্ত, ধনবল জনবল জ্ঞানবলে অহঙ্কৃত প্রভুজাতির মধ্যে না হইয়া রোমের অধীন প্যালেষ্টাইনে হইয়াছিল। আধুনিক জগতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশালতম। কিন্তু আধুনিক সময়ে অসাধারণ ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মাচার্য্য রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ বলদৃপ্ত, ঐশ্বর্য্যশালী, বিজ্ঞানালোকে উজ্জ্বল ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করেন নাই, পরাধীন অবজ্ঞাত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, অহঙ্কার ও দর্প যেখানে, ভক্তির স্থান সেখানে নহে।

—

"প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" না থাকার অসুবিধা

নূতন ভারতশাসন আইন দ্বারা ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিকে যে "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" দেওয়া হইয়াছে, তাহা পূর্ণ ও প্রকৃত আত্মকর্তৃত্ব বা স্বরাজ নহে। কিন্তু ইহা ঠিক্ যে, যে-সকল প্রদেশে কংগ্রেসীরা মন্ত্রী হইয়াছেন, সেখানে কিছু আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে সেই সব প্রদেশের লোকদের কিছু সুবিধাও হইতেছে।

তাহার কারণ অনেক। একটি কারণ এই যে, তথাকার মন্ত্রীরা আপনাদের পদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন নহেন, এবং সেই জন্য তাঁহাদের সমুদয় শক্তি তাঁহারা স্ব স্ব জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে স্ব স্ব প্রদেশের হিতসাধনে প্রয়োগ করিতে পারিতেছেন। বাংলা দেশের মন্ত্রিমণ্ডল আপন স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। তাহাতে নানা কুফল ফলিতেছে। তাঁহাদের যতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি ও দেশহিতৈষণা আছে, তাহাও দেশের কাজে সম্পূর্ণ লাগাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা মন্ত্রীর সংখ্যা অনাবশ্যক রূপে বাড়াইতেছেন এবং তাহাতে প্রজাদের দেওয়া ট্যাক্সের টাকা বৃথা মন্ত্রীদের বেতন দিতে বাজে খরচ হইতেছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশী বেতন ও ভাতা বঙ্গের মন্ত্রীরা লইয়া থাকেন। কংগ্রেসীদের মত বেতন ও ভাতা লইলে বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা দেশহিতের জন্য খরচ হইতে পারিত।

অনাবশ্যক মন্ত্রী নিয়োগ এবং সকল মন্ত্রীর বেশী বেশী বেতন ও ভাতা লওয়া ছাড়া আর এক দিক্ দিয়া দেশের অনিষ্ট হইতেছে। ব্যবস্থাপক সভার অনেক মুসলমান সভ্যকে হাতে রাখিয়া তাহাদের ভোট পাইবার জন্য তাহাদের আত্মীয়স্বজনকে নানা চাকরী দেওয়া হইতেছে এবং, যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, এই প্রকার স্বদল-পোষণের কায়েমী ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে সরকারী কাজের সকল বিভাগে অযোগ্যতর লোকদের প্রাদুর্ভাবে সব বিভাগের অবনতি হইবে, এবং দেশের মহা অনিষ্ট হইবে।

কংগ্রেসী প্রায় সব—অন্ততঃ অধিকাংশ—মন্ত্রী মন্ত্রী হইবার আগে যত রোজগার করিতেন, মন্ত্রী হইয়া তদপেক্ষা অনেক কম বেতন পান। তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গের মন্ত্রীদের মধ্যে—সকলে না হইলেও—অধিকাংশ মন্ত্রীগিরি চাকরীতে যত বেতন ও ভাতা পান, অন্য কাজ করিয়া তত রোজগার করিতেন না, করিতে পারেনও না। জমিদারীর আয় কাহারও কাহারও থাকিলেও, সেটা তাঁহাদের নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের আয় নহে। এই কারণে, বঙ্গের অধিকাংশ মন্ত্রীর বেতন ও ভাতার উপযুক্ত যোগ্যতা নাই, ইহা সত্য কথা। এরূপ মন্তব্য কেহ বেঠিক বলিলে তাহা মন্ত্রীদিগকেই দেখাইতে হইবে।

সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ও উগ্রতা বৃদ্ধি বঙ্গে প্রকৃত "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" অধিকাংশ প্রদেশ অপেক্ষা কম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আর একটি কুফল। এখানকার প্রধান মন্ত্রীর কণ্ঠ হইতে যতই "ইসলাম বিপন্ন" রব উত্থিত হইতেছে, হিন্দুদের বিপদ ততই ঘটিতেছে ও বাড়িতেছে। বঙ্গে মুসলমান প্রাধান্য ও প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, এই রূপ একটা ধারণা জন্মিতে দিলে মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিদল টিকিবে, সম্ভবতঃ এইরূপ বিশ্বাসের ফলে হিন্দুম্ব-নিগ্রহের প্রতিকার হইতেছে না।

যে-সব প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিদলের শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের একতাবাতাবী

লোকসমষ্টির স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবী এবং সমস্ত একভাষাভাষী অঞ্চলকে একপ্রদেশভুক্ত করিবার দাবী, তথাকার মন্ত্রিদলকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গে এইরূপ দাবী যে ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিতও হয় নাই এবং সম্ভবতঃ হইবেও না, তাহার কারণ বঙ্গে অন্য বহু প্রদেশের অনুরূপ প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হয় নাই। সম্প্রতি বিহারের গবর্ণর পূর্ণিয়ার বাঙালীদিগকে বলিয়াছেন যে, তাহাদের বাংলা-প্রদেশ-ভুক্ত হইবার আবেদন ব্যবস্থাপক সভার সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। ইহার মানে বোধ হয় এই যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা বলুন, "আমরা অন্যান্য প্রদেশভুক্ত বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাই," এবং বিহারের ব্যবস্থাপক সভা তাহাতে সম্মত হউন। কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সভ্যদের এই অমূলক আশঙ্কা আছে যে, সব বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বঙ্গের অন্তর্গত হইলে বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে না (এই আশঙ্কা যে অমূলক তাহা গত মাসের 'প্রবাসী'র একটি প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে)। বোধ হয় সেই কারণে এরূপ প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উঠে নাই। অন্য দিকে বিহারীরা বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি ছাড়িয়া দিতে চায় না এই জন্য যে তাহা হইলে বিহার প্রদেশের আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও আয় কমিয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন, অন্ততঃ কয়েক লক্ষ বাঙালীর উপর প্রভুত্ব করিবার সুখটাও তাহারা ছাড়িতে চায় না!

সকল বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বঙ্গের অন্তর্গত না-হওয়ায় অন্যান্য প্রদেশে তথাকার ভাষা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতি তত্তৎপ্রদেশের গবর্মেণ্টের যে পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিহারে, আসামে ও উড়িষ্যায় তাহা পাইতেছে না—যদিও তথায় বিস্তর বাঙালী স্থায়ী ভাবে বাস করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে সেখানে পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেছে না, শুধু তাহা নহে, বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা-লাভের ও পরীক্ষা দিবার সুবিধা সঙ্কুচিত এবং হয়ত বিনষ্ট হইলে তথাকার ভবিষ্যদ্বংশীয় বাঙালীদের মাতৃভাষা মাতৃসাহিত্য এবং তন্নিবদ্ধ সংস্কৃতির অনুশীলনও লোপ পাইবার সম্ভাবনা ঘটিতেছে। এই অনিষ্টসম্ভাবনা নিবারণের কোন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ চেষ্টা বাংলার গবর্মেণ্ট ও মন্ত্রিমণ্ডল করিতেছেন না, যদিও তাহা তাঁহাদের করা উচিত।

—

প্রবল স্বাধীনতা-আন্দোলন আবশ্যক

ভারতবর্ষের অন্যান্য সব অংশের মত বঙ্গেও স্বাধীনতা-আন্দোলন ও প্রচেষ্টা প্রবল রাখা অত্যাবশ্যক। তাহার অঙ্গস্বরূপ বঙ্গে প্রকৃত প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও অক্লান্তভাবে অবিরত চালাইতে হইবে।

এইরূপ কথা তুলিলেই এক দল লোক বলিবেন, ছাত্রছাত্রীরা দেশের ভবিষ্যৎ আশা, অতএব তাঁহারা এই প্রচেষ্টায় ঝাঁপ দিয়া পড়ুন। যখনই কোন একটা শক্ত কাজের কথা উঠে, তখনই যুবক ও ছাত্রদের ঘাড়ে বোঝা চাপাইবার এইরূপ ব্যগ্রতা দেখা যায়। তাহারা যে দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেই জন্যই আমরা বলি, যাঁহারা ছাত্র নহেন তাঁহারা আপাততঃ স্বয়ং বোঝাটা বহন করুন এবং ভবিষ্যতে বোঝা বহিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত ছাত্রদিগকে প্রস্তুত হইতে দিউন। এখনকার ছাত্রদের পালা ভবিষ্যতে যখন আসিবে তখন কর্ত্তব্যপালনের দায়িত্ব অবশ্যই তাঁহাদের উপর পড়িবে এবং তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমানে কিন্তু আমরা বৃদ্ধেরা, প্রৌঢ়েরা ও অ-ছাত্র তরুণেরা নিজের নিজের বোঝা বহিলেই ভাল হয়।

নিজেদের বোঝা সম্পূর্ণরূপে নিজেরা না বহিয়া ছাত্রদের ঘাড়ে শ্রমসাধ্য সব কাজের ভার অর্পণের ফন্দীর কতকটা সমতুল্য আর একটা ব্যাপার আছে। বাংলা দেশের ঘোর কলঙ্ক নারীহরণ, নারীনির্যাতন। তাহার প্রতিকারের কোন ব্যাপক চেষ্টা না-করিয়া আমরা অনেক সময় বলি, আত্মরক্ষার জন্য নারীদিগকে অস্ত্রব্যবহার করিতে শিখান উচিত। উচিত অবশ্যই বটে; কিন্তু যত দিন তাঁহাদের অস্ত্রচালনদক্ষতা সর্ব্বত্র না জন্মিতেছে, তত দিন এবং তাহার পরও পুরুষনামধারী বঙ্গের মনুষ্যদের পৌরুষ কি ব্যাকরণের ও অভিধানের পাতায় আবদ্ধ থাকিবে? অথর্ব্ব বৃদ্ধদিগকে ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া

লইতে হইবে, এখন তাঁহাদের পৌরুষ নাই। অন্যেরাও কি তাহাই করিবেন?

দেশের প্রত্যেক কাজেই প্রত্যেকেরই নিজের বোঝাটা নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার পর অন্যের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা উচিত।

জাতীয় সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত বিবেক জাগ্রত হউক।

—

চীনের চলিষ্ণু বিশ্ববিদ্যালয়

কথায় বলে, "হুজ্জতে বাঙ্গালী হিক্‌মতে চীন"। সমগ্র চীন মহাজাতির জীবনমরণ সমস্যার সময়েও তাহাদের বুদ্ধিকৌশল লোপ না পাইয়া নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। চলন্ত বিশ্ববিদ্যালয়* এইরূপ একটি উপায়।

জাপানীরা চীনের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা দ্বারা নষ্ট করিয়া চীনের সংস্কৃতি ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা যদিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনেক অট্টালিকা ও লাইব্রেরী নষ্ট করিয়াছে, তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ যে অধ্যাপকগণ ও ছাত্রসমূহ, তাঁহারা সাধারণতঃ আগে হইতেই অন্যত্র চলিয়া গিয়া সেখানে বিদ্যাচর্চ্চা জাগরূক রাখায় চৈনিক সংস্কৃতি রক্ষা পাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। সমুদ্র হইতে দূরে চীনের অভ্যন্তরে যে-সকল গ্রামে নিরক্ষর অজ্ঞ লোকদের সংখ্যা অধিক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই সকল স্থানে গিয়া জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতেছে এবং স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে গ্রামগুলির উন্নতিচেষ্টা করিতেছে। অনেক গ্রামে মন্দিরে অধ্যয়ন অধ্যাপনার ক্লাস বসিতেছে, কোথাও বা পর্ব্বতগুহামন্দিরে ললিতকলা-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রকারে জ্ঞানানুশীলন বজায় থাকিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর গ্রাম্য লোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে এবং নানা দিকে গ্রামগুলির উন্নতি হইতেছে।

এই চলন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এক জায়গা হইতে উঠিয়া গিয়া অন্য জায়গাতেই যে স্থায়ী হইতেছে, তাহা নহে। প্রয়োজন মত আবার আরও দূরে উঠিয়া যাইতেছে। এই প্রকারে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সমষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শত শত মাইল ভ্রমণ করিতেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শের মত চীনেরও আদর্শ জ্ঞানীদের নেতৃত্ব। এই কারণে চীনের নেতারা প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের মধ্যেও জ্ঞানের বাতী জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। অনেক ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সামরিক নানা কাজে যোগ দিয়াছে; কিন্তু সাধারণতঃ ছাত্রেরা ছাত্রই আছে, নেতারা তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান নাই। তাহার কারণ তাহাদের ভীরুতা বা স্বার্থপরতা নহে। এবারকার সাহিত্যের নোবেলপ্রাইজপ্রাপ্তা শ্রীমতী পার্ল্‌ বাকের একটি লেখা হইতে আমরা গত ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি, যে, চীনের নেতারা মনে করেন যে, যুদ্ধ যখন নিরক্ষর লোকদের দ্বারাও হইতে পারে, তখন কেবল যে-সব লোকদের দ্বারাই চীনের পক্ষে অত্যাবশ্যক শিক্ষাবিস্তারের কাজ হইতে পারে, তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া তাহাদের অনেকেরই মৃত্যু ঘটান অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছনীয়। তাহাদের দ্বারা শিক্ষাবিস্তারের কাজ ব্যাপকভাবে হইয়া আসিতেছে।

—

"চীন অপরাজেয়"

চীনের কোন কোন সৈন্যদলের সহিত আমেরিকান্ লেখিকা শ্রীমতী য়্যাগ্নেস্ স্মেড্‌লী যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটেই থাকিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে মডার্ণ রিভিয়ুতে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, গত বৎসরও কিছু লিখিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বিলাতী ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান কাগজে একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন, চীন অপরাজেয়। তাঁহার মতে যুদ্ধ আরম্ভের সময়ের চেয়ে চীন এখন অধিকতর শক্তিশালী। তাহার কারণ,

*"Much has been said and written about the fact that the Chinese students did not as a rule go to the front and take part in the physical defense of their country. Some of our students volunteered for various war services, but the majority remained with the university. To western minds this attitude seems incomprehensible, but the Chinese point of view is clear: in this vast country with its hundreds of millions of people, the tradition of spiritual leadership, the moral front, must not be allowed to be destroyed. It was this idea which brought about in China the unique phenomenon of universities carrying on with their work "as usual" under bombardment and marching from place to place, covering distances of hundreds of miles."—*Asia* for January, 1939, "A University On the March" by Franz Michael, page 33.

"Millions of Chinese soldiers have been magnificently moulded in this war of national liberation. Such consciousness, such resistance on such a scale and over such a vast area is unprecedented in Chinese or, perhaps, in world history. It cannot be destroyed or even temporarily laid to rest by military occupation or by domestic or international intrigue."

তাৎপর্য্য। "এই জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে লক্ষ লক্ষ সৈন্য চমৎকার গড়িয়া উঠিয়াছে। চীনের অথবা, হয়ত, পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বিশাল রণাঙ্গনে এত বৃহৎ লোকসমষ্টির বাধাদান এবং সমষ্টিগত সচেতনতা অভূতপূর্ব্বে। বিদেশী সৈন্যদের দ্বারা দেশ অধিকার অথবা আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত দ্বারা ইহা বিনষ্ট বা সাময়িকভাবে অকর্ম্মণ্য হইতে পারে না।"

—

রণপুরে রক্তপাত

ভারতবর্ষের কতকগুলি দেশী রাজ্যে অন্ততঃ ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির মত আত্মকর্তৃত্বের জন্য প্রজারা আন্দোলন করিতেছে। এই আন্দোলন ২।১টি রাজ্যে সফল হইয়াছে। কয়েকটি রাজ্যের রাজারা বিনা আন্দোলনে প্রজাদিগকে কতকটা আত্মকর্তৃত্ব দিয়াছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনেক স্থলেই প্রজাদের আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। তাহাতে, কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত কোথাও কোথাও প্রজাদের মধ্যে অনেকে নিহত হইয়া থাকিলেও কোথাও কোন ইংরেজ রাজপুরুষ মারা পড়ে নাই। সম্প্রতি তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে উড়িষ্যার রণপুর নামক একটি ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্যে। এটি খুব ছোট রাজ্য, লোকসংখ্যা এক লক্ষও নহে। এখানে "প্রজামণ্ডল" বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়, পুলিস কতকগুলি বাড়ী খানাতল্লাস করে এবং কাহাকেও কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। আনুষঙ্গিক অত্যাচার ও অপকর্ম্মও হইয়া থাকিবে। তাহাতে উত্তেজিত জনতা বন্দীকৃত সহকর্মীদিগকে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করে। রাজা আতঙ্কে পোলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর বাঁজালগেট্‌কে জরুরী টেলিফোন করায় তিনি কিছু সৈন্য লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হন। ঠিক্ কি অবস্থায় তিনি রিভলভার ব্যবহার করেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত আমরা এখনও দেখি নাই। রিভলভার ব্যবহার একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল কি না তাহাও বলিতে পারি না। তবে ইহা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে যে, তাঁহার রিভলভারের গুলীতে দু-জন মানুষ মারা যায়। অনুমান হয়, তাহাতে জনতা উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে লাঠি মারিতে থাকে ও তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এই মৃত্যু শোচনীয়। তাঁহার বিধবা পত্নীর সহিত এবং তাঁহার পরিবারে অন্য লোক থাকিলে তাঁহাদের সহিত সমবেদনা অনুভব ও প্রকাশ স্বাভাবিক।

যে দু-জন অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য লোক তাঁহার গুলীতে মারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুও শোচনীয় এবং তাঁহাদের পরিজনবর্গের সহিত সমবেদনাও স্বাভাবিক। এই লোক দুটির কোন দোষ ছিল কিনা জানা যায় নাই— হয়ত কখনও জানা যাইবে না।

এই দুর্ঘটনাটিতে দেশী রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলনে ব্যাঘাত ঘটিবে, ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশ সকলের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাতেও ব্যাঘাত ঘটিবে। এই কারণে, এবং সাধারণতও হিংসা অকর্ত্তব্য বলিয়া, যাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্বাধীনতাপ্রচেষ্টা ও সর্ব্ববিধ আন্দোলন অহিংসভাবে চলে, তাহার জন্য নেতৃবর্গের এবং অন্য সকলেরও সর্ব্বদা অবহিত ও সচেষ্ট থাকা একান্ত আবশ্যক।

ব্রিটিশ-ভারতের এবং দেশী রাজ্যের কর্তৃপক্ষীয় লোকদিগের স্বীয় প্রভুত্ববোধ সত্ত্বেও তাহা দমন করিয়া ধীর ও শান্তভাবে প্রজাদের সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নতুবা অত্যন্ত নিরীহ এবং অত্যন্ত ভীরু লোকেরাও উত্যক্ত হইয়া হিংস্র হইতে পারে। কংগ্রেস নেতারা ও অন্য সব নেতারা এবং আমরা সাধারণ লোকেরাও এ বিষয়ে একমত বটে যে, উত্তেজনার কারণ থাকা সত্ত্বেও অহিংস থাকা উচিত। কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন, "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"—"চিত্তবিকারের কারণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাঁহারাই ধীর।" এই আদর্শের অনুসরণ অবশ্য কঠিন। কিন্তু তাহার অনুসরণ শিক্ষিত উচ্চপদস্থ প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে যত কঠিন, অশিক্ষিত অত্যাচরিত পদদলিত হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত সাধারণ লোকদের পক্ষে তাহা অপেক্ষা কম কঠিন নহে।

—

সৈন্য হইবার যোগ্যতা ও প্রয়োজন

বহু বৎসর হইতে ভারতীয় সৈন্যদলের নিমিত্ত পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে অধিকাংশ দেশী সিপাহী সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই কারণে তথাকার অনেক লোকের রণদক্ষতা জন্মিয়াছে এবং তাহার প্রমাণ দিবারও বিস্তর সুযোগ তাহারা পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না, যে, যে-সকল প্রদেশ বা অঞ্চল হইতে এখন সৈন্য সংগৃহীত হয় না, তাহাদের সাহস নাই বা তাহারা রণদক্ষ হইতে পারে না—যদিও ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দিগকে সামরিক ও অসামরিক এই দুটা ভাগে বিভক্ত করিয়া এই রকম ধারণাই জন্মাইতে চান।

ব্রিটেনের বর্ত্তমান অবস্থা যে-রকম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কতকগুলি অংশ বিনা যুদ্ধেই যে প্রকারে স্বাধীনতার সার বস্তু লাভ করিয়াছে, তাহাতে, তাহাদের সহিত অনেক বিষয়ে ভারতবর্ষের বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষও বিনা যুদ্ধে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। যদি যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য ভারতবর্ষের এখন প্রস্তুতির অভাব আছে এবং সুযোগও নাই, ইহা চক্ষুষ্মান্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষকে যুদ্ধ করিতে না-হইতে পারে—সম্ভবতঃ হইবেই না। কিন্তু লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে—অন্ততঃ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। স্বাধীন ভারতবর্ষকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ভার ইংরেজ লইবে না, স্বাধীনতার সারবস্তু-প্রাপ্ত ভারতকেও রক্ষা করিবার ভার সম্পূর্ণ লইতে তাহারা অসমর্থ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেই রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভারতীয় সৈন্য আবশ্যক হইবে।* এই সকল কারণে ভারতবর্ষের সামরিক বল বাড়ান দরকার। তাহা বাড়াইতে হইলে ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতে সমর্থ বয়সের সুস্থ সবল মানুষকে সিপাহী হইতে দেওয়া উচিত। তাহা না দিলে ভারতরক্ষার জন্য যত বেশী সৈনিকের প্রয়োজন হইবে, তত সৈনিক পাওয়া যাইবে না। বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত চীনের সৈন্য মরিয়াছেই বহু লক্ষ, আহত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাও অধিক লক্ষ। যদি শুধু পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, গাড়োয়াল ও নেপালই ভারতবর্ষের জন্য আবশ্যক যথেষ্টসংখ্যক সৈন্য দিতে পারে—যাহা তাহারা পারিবে না—তাহা হইলেও তাহা বাঞ্ছনীয় ও ন্যায়সঙ্গত নহে।

বাঞ্ছনীয় নহে নানা কারণে। কোন অঞ্চল হইতে খুব বেশীসংখ্যক লোককে সৈন্য করিলে তথায় কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট কর্ম্মীর অভাব ঘটিতে পারে। এই জন্য সকল প্রদেশ, সকল অঞ্চল হইতেই নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করা উচিত। কেবল কতকগুলি অঞ্চল হইতে সৈন্য লইলে তথাকার লোকদের অহঙ্কার, দর্প, ও অবস্থাবিশেষে অন্যান্য অঞ্চলকে আক্রমণ করিবার শক্তি, প্রবৃত্তি ও সম্ভাবনা বাড়ে, এবং শেষোক্ত অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের অবসাদ, পৌরুষহানি ও মেরুদণ্ডের বক্রতা বাড়ে এবং আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা কমে। ভারতবর্ষের এক এক অংশ দ্বারা অন্যান্য অংশের আক্রমণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। অতএব সেরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নহে বলিয়া তাহা নিবারণের সকল রকম উপায় অবলম্বন আগে হইতে করা উচিত।

কেবল কতকগুলি অঞ্চল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা ন্যায্যও নহে। ভারতবর্ষের রাজস্বের সকলের চেয়ে বেশী অংশ সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয়িত হয়। এই রাজস্ব (ও তাহার এই অংশ) ভারতবর্ষের সব প্রদেশ হইতে আদায় করা হয়। সকলের চেয়ে বেশী অংশ আদায় হয় বাংলা দেশ হইতে। সামরিক বিভাগের ব্যয়ের একটি বৃহৎ অংশ, যে-সব জায়গা হইতে সিপাহী-সংগ্রহ হয়, তথাকার লোকেরা সিপাহীদের বেতন ও ভাতা, শিবির-অনুচরদের বেতন ও ভাতা,

* ইহা ঠিক্ বটে যে, পরাধীনতা সাতিশয় অবাঞ্ছনীয় অবস্থা। কিন্তু এক পরাধীনতার পরিবর্ত্তে আর এক পরাধীনতা বাঞ্ছনীয় নহে; সুতরাং যদি ভারতবর্ষকে আরও কিছু দিন পরাধীন থাকিতেই হয় তাহা হইলে ইংরেজের পরাধীনতার পরিবর্ত্তে আবার আর কোন জাতির পরাধীন হওয়া অপেক্ষা সেই কয়টা দিন ইংরেজের অধীন থাকা মন্দের ভাল—কারণ নূতন জোয়ালে বলদের কাঁধে ঘা হয়।

রসদের মূল্য, অশ্ব অশ্বতর ও বলদের মূল্য, এবং তাঁবু নানাবিধ যুদ্ধযান প্রভৃতির মূল্য ইত্যাদি বাবদে পাইয়া থাকে। ইহার সমষ্টি বহু কোটি টাকা। এই বহু কোটি টাকা আদায় হয় সকল প্রদেশ হইতে—প্রধানতঃ বাংলা দেশ হইতে, কিন্তু ইহার ব্যয়ের ফল ভোগ করে ভারতবর্ষের অল্প অংশের লোকেরা। যাহারা টাকা দেয় তাহাদের অধিকাংশই তাহার কোন অংশ ফিরিয়া পায় না। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে।

"প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" (তাহার মূল্য যাহাই হউক) এখন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতঃপর এ অন্যায় প্রদেশগুলি সহ্য করিবে না যে, টাকা তাহারা সবাই দিবে, অথচ ব্যয়ের বেলা তাহার ভাগ অধিকাংশ প্রদেশই পাইবে না। সুতরাং সব প্রদেশ হইতেই সৈন্য, আজ হউক কাল হউক, লইতেই হইবে।

সৈন্য-সংগ্রহে আর এক অবিচার হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের লোকসমষ্টির যত অংশ মুসলমান ও শিখ, সৈন্যদলের তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অংশ মুসলমান ও শিখ সিপাহীরা। সব ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতেই সৈন্য যথাযোগ্য সংখ্যায় লওয়া উচিত। সৈন্যসংগ্রহের বর্ত্তমান রীতিতে যে-সব প্রদেশ, জাতি ও সম্প্রদায় লাভবান্, তাহারা উক্ত ন্যায্য রীতি প্রবর্ত্তনে আপত্তি করিবে ও বাধা দিবে। তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ন্যায্য রীতির প্রবর্ত্তন আবশ্যক।

—

সব ভারতীয় জাতি কি সৈন্য হইতে পারে ?

দেশের কেবল কোন কোন অংশের কোন কোন শ্রেণীর বা জাতির লোকই সৈন্য হইতে পারে, অন্যেরা পারে না—এরূপ বাঁধা, নিয়ম কেবল ভারতবর্ষেই দেখা যায়। দীর্ঘকাল সিপাহীর কাজ হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হওয়ায় যাহারা যুদ্ধবিমুখ ও যুদ্ধে হয়ত অপেক্ষাকৃত কম সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের সেই বর্ত্তমান অবস্থাটাকে তাহাদিগকে যুদ্ধবিভাগ হইতে চির-নির্ব্বাসনের ন্যায্য কারণ বলিয়া উপস্থিত করা অত্যন্ত অন্যায়।

কয়েক বৎসর হইল এই নিয়ম বা রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, যে-কোন প্রদেশের যে-কোন জাতির লোক সামরিক অফিসারের শিক্ষা পাইবার জন্য এদেশের ও বিলাতের সামরিক শিক্ষালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নির্দ্দিষ্ট অল্পসংখ্যক ছাত্রকে ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষান্তে যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাদিগকে অফিসারের নিম্নতম শ্রেণীতে নিযুক্ত করা হয়। এই অফিসারদের মধ্যে পশ্চিমা বেনিয়া এবং বাঙালীও আছেন। সেনানায়ক অফিসার ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সব জাতির লোক হইতে পারেন, ইহা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট মানিয়া লইয়াছেন। তাহা হইলে সাধারণ সিপাহীও সব প্রদেশের সব জাতি হইতে লওয়া উচিত।

এখন বিবেচনা করিতে হইবে, সব প্রদেশ হইতে সিপাহী হইবার যোগ্য লোক পাওয়া যাইবে কিনা।

ইহা সুবিদিত যে, বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা নির্ম্মূল বা বিতাড়িত হইয়াছে, মধ্যবিত্ত বুর্জোআ শ্রেণীও প্রায় তাই। বাকী সাধারণ লোকদের মধ্য হইতে রাশিয়ার বিশাল রণনিপুণ সৈন্যদল ও তাহাদের অনেক হাজার নায়ক সংগৃহীত হইয়াছে, এবং তাহা রাশিয়ার সব অংশ হইতে হইয়াছে, বিশেষ বিশেষ অংশ হইতে নহে। রাশিয়ায় যাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষেও সম্ভব।

ডাক্তার মুঞ্জে যখন ফ্রান্স যান তখন সেখানে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কোনও বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা সামরিক অফিসার হয় কি না। অনুসন্ধানের ফলে তিনি দেখেন যে, মুদির ছেলে, ব্যাঙ্কের কেরানীর ছেলে ইত্যাদি লোকেরাও অফিসার হইয়াছে, এবং অনাথ আশ্রমে পালিত অজ্ঞাতপিতৃত্ব কোন কোন বালকও অফিসার হইয়াছে।

অতএব কেবল কতকগুলি জাতির বা বংশের লোকেরাই সাধারণ সৈনিক বা সেনানায়ক হইবার যোগ্য, এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রাশিয়া ও ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।

ভারতবর্ষের বাহিরের যে কোন দেশেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক, তাহার বিরুদ্ধে এই তর্ক উঠিতে পারে যে, ভারতবর্ষ ত সে দেশ নয়, অন্য দেশে যাহা সম্ভব ভারতবর্ষে

তাহা সম্ভব নহে। অতএব ভারতবর্ষেরই দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত এমন কোন দেশ নাই যাহা পুরাকালে কোন না কোন সময়ে স্বাধীন ছিল না এবং যুদ্ধ করে নাই, মোটামুটি একথা বলিতে পারা যায়। তখন সেই সব দেশ যে পঞ্জাব নেপাল গাড়োআল বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে সিপাহী আমদানী করিয়া আত্মরক্ষা করিত, এমন নহে। ইংরেজরা এবং অন্যেরাও অনেকে বাংলা দেশকেই ভারতবর্ষের অন্য সব অংশের চেয়ে সৈনিকের জন্মদান সম্বন্ধে অনুপযোগী বলিয়াছে। কিন্তু পাঠান ও মোগল আমলের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অনেক লোক যুদ্ধ করিত, পাঠান এবং মোগল আমলেও করিয়াছিল এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের প্রথম যুগেও করিয়াছিল। ইহা সত্য যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের যে-সব অঞ্চলে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সিপাহী-গিরির চেয়ে আয় বেশী, সেখান থেকে সিপাহী বেশী পাওয়া যায় না। সেই কারণে ভারতবর্ষের সব প্রদেশ হইতে সিপাহী লইবার রীতি ও নিয়ম প্রচলিত হইলেও কোন কোন প্রদেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে হয়ত সেখান হইতে যথেষ্ট লোক সৈনিক হইবে না; কিন্তু কিছু নিশ্চয়ই হইবে। পঞ্জাবেও জল-সেচনের বড় বড় খাল হইবার আগে যত সহজে যত সিপাহী পাওয়া যাইত, এখন তত সহজে তত সিপাহী পাওয়া যায় না।

ক্লাইব যে দেশী লাল কোর্তাদের সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে তেলেঙ্গা (অন্ধ্রদেশীয় লোক), বাঙালী ও বিহারী ছিল। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ফরাসী চন্দননগর হইতে এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত বাংলা দেশ হইতে বাঙালী সৈনিক বেশী যায় নাই বটে, কিন্তু যাহারা গিয়াছিল তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও রণদক্ষতা কম দেখায় নাই।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সংখ্যায় কম হইলেও বাংলা দেশ হইতে ভাল সৈনিক নিশ্চয়ই পাওয়া যাইতে পারে।

বহুনিন্দিত বাংলা দেশ হইতে যদি সিপাহী পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে পাওয়া যাইবে তাহা প্রমাণ করা অনাবশ্যক।

অতঃপর, এখন যে-সব অঞ্চল হইতে সৈনিক লওয়া হয়, অন্যান্য অঞ্চল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিলে তাহারা প্রথমোক্ত অঞ্চলগুলির সৈনিকদের সমকক্ষ হইবে কি না, সে বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক।

ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ইংরেজের প্রথম অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি হইতে সৈন্যসংগ্রহ বন্ধ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরক্ষর ও অশিক্ষিত অঞ্চল হইতে সৈনিক লওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার কারণ, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধ জন্মে, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে সচেতন সৈনিক চান না, চান এরূপ সৈনিক যাহারা বেতনের বিনিময়ে হুকুম তামিল করিবে ও প্রাণ দিবে। এই জন্য শিক্ষাবিষয়ে অগ্রগামী অঞ্চল অপেক্ষা শিক্ষাবিষয়ে অনগ্রসর অঞ্চলই ব্রিটিশ সরকার সিপাহী-সংগ্রহের পক্ষে প্রশস্ততর ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন।

আমরা যে বৃহৎ ভারতীয় সৈন্যদলের প্রয়োজনের কথা বলিতেছি, তাহা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষাকার্য্যের জন্য টাকার গোলাম (mercenary) সৈনিক অপেক্ষা দেশভক্ত সৈনিকের উপযোগিতা বেশী বই কম নয়। এই জন্য, স্বাধীনতারক্ষী সৈন্যদল গঠনে শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিত অঞ্চলকে সৈনিক-সংগ্রহের প্রশস্ততর ক্ষেত্র মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরং যাহাদের হৃদয়ে দেশভক্তি জাগিয়াছে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ সৈনিক হইবে এরূপ নিশ্চিত আশা করা যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, গাড়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের, কিংবা মুসলমানদের, ভারতভক্তি অন্য লোকদের চেয়ে অধিক, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

যুদ্ধে স্বদেশভক্তির কার্যকারিতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার জন্য অতীত কালের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটন অনাবশ্যক। বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের দৃষ্টান্ত লউন। জাপানী সৈন্যদের অপরাজেয়তার খ্যাতি জগৎজোড়া। জাপানীদের যুদ্ধশিক্ষার ও যুদ্ধকৌশলের প্রশংসাও খুব আছে। অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজনও তাহাদের

খুব বেশী। চৈনিক সৈন্যদের অপরাজেয়তার খ্যাতি ছিল না; সামরিক শিক্ষা, যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধের আয়োজন—কোন দিকেই তাহারা জাপানীদের সমকক্ষ বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু জাপানীদের কাছে তাহারা বার বার হারিয়াও যুদ্ধের আরম্ভকাল অপেক্ষা এখন তাহারা অধিকতর শক্তিশালী। তাহার একটি প্রধান কারণ তাহাদের স্বদেশভক্তি।

গঠিতব্য ভারতীয় সৈন্যদলে কোন অঞ্চলের সিপাহীদের ঐতিহাসিক সামরিক খ্যাতি না থাকিলেও দেশভক্তি দ্বারা তাহারা তাহার অভাব পূরণ করিতে পারিবে।

আর একটি বিষয় বিবেচনা করুন। এখন ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত হইতে সংগৃহীত যাহারা ভারতীয় সৈন্যদলের প্রধান অংশ, তাহারা যে-যে অঞ্চলের লোক, সেই সকল অঞ্চল ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছে কোন সিপাহীরা? অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা। পঞ্জাব অধিকৃত হয়, অ-পঞ্জাবী সিপাহীদের সাহায্যে, সুতরাং পঞ্জাব জয়ের সময় অ-পঞ্জাবী সিপাহীরা পঞ্জাবীদের চেয়ে নিকৃষ্ট যোদ্ধা ছিল না। আবার এই অ-পঞ্জাবী সিপাহীরা যে-যে অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই সব অঞ্চল তাহাদের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে স্থিত অঞ্চলের সিপাহীদের সাহায্যে অধিকৃত হইয়াছিল। এই প্রকারে দেখা যাইবে যে, এখন যাহাদিগকে অ-সামরিক জাতি বলা হয়, এক কালে তাহারা পরবর্ত্তী কালে সামরিক বলিয়া বিবেচিত জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। যদি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অনুসারে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে, হিন্দু মরাঠারা মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, এবং ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূখণ্ডের প্রভু মুসলমান ছিল না—ছিল মরাঠা। এখন যে কোন কোন অঞ্চলের মুসলমানদিগকে সৈন্যদলে লওয়া মরাঠাদিগকে লওয়ার চেয়ে ব্রিটিশ সরকার বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাহার কারণ এ নয় যে, মরাঠারা যুদ্ধ কখনও করে নাই বা করিতে জানে না। তাহার কারণ অন্যবিধ, এবং সেই কারণ কূটরাজনীতিমূলক।

—

বাঙালীর কেন যুদ্ধশিক্ষা আবশ্যক

বাঙালীদের কোন দোষ আছে বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, অন্য জাতিদের সে দোষ নাই; কিংবা ইহাও মনে করিতে হইবে না যে, অন্য জাতিদের কোন দোষ থাকিলে বাঙালীদের সেই দোষ থাকায় ক্ষতি নাই। সেইরূপ, বাঙালীদের যুদ্ধশিক্ষা আবশ্যক বলিলে তাহার মানে এ নয় যে, অন্য জাতিদের যুদ্ধশিক্ষা অনাবশ্যক।

বাঙালীদের মধ্যে যথেষ্ট নিয়মানুবর্ত্তিতা, দলবদ্ধতা, এবং নেতার বাধ্যতা নাই। সৈনিক হইলে এই অভাবের আংশিক পূরণ হইতে পারে। অন্যান্য প্রয়োজনসিদ্ধির মত এই কারণেও বাঙালীদের মধ্য হইতে অনেকে সিপাহী হইলে ভাল হয়।

পরস্পরের সহযোগিতা করা ও পরস্পরকে বিশ্বাস করা ব্যতিরেকে যুদ্ধ চলে না। এই জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিশ্বাসও সামরিক শিক্ষা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। বাঙালীদের মধ্যে এইগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নাই। তাহা না-থাকায় তাহারা ব্যবসাবাণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিতেছে না।

আঘাত পাইবার ও প্রয়োজন-মত "অহিংস" ভাবে আঘাত করিবার অনভ্যাস বাঙালীদের মধ্যে আছে। এ বিষয়ে যথেষ্ট অভ্যাস থাকা আবশ্যক। ছোট অস্ত্র দেখিলে, রক্তপাত দেখিলে, মূর্চ্ছা যাওয়া বা প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়া ভাল নয়। অতিরিক্ত মৃত্যুভয়ও অবাঞ্ছনীয়। স্পেনে দু-বৎসরেরও অধিক কাল যুদ্ধ চলিতেছে। অথচ তথাকার লোকেরা আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া নাই, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সব কাজ করিয়া যাইতেছে। আমাদেরও মৃত্যুভয়, সর্ব্ববিধ বিপদ ও বিপদের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করিবার মত দৃঢ়চিত্ততা লাভ করা আবশ্যক। সিপাহী হইয়া যুদ্ধশিক্ষা করিলে মনটা কিছু শক্ত হইতে পারে। সাধারণতঃ সৈন্যদলের মধ্যে মৃত্যুর হার সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যুর হার অপেক্ষা অধিক নহে।

দেহটাকে শক্ত, শ্রমপটু ও কষ্টসহিষ্ণু করা চাষবাসের, পণ্যশিল্পের এবং ব্যবসাবাণিজ্যের জন্যও আবশ্যক। যুদ্ধ শিখিতে গেলে দেহের এই উৎকর্ষ জন্মে।

আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা সকল কাজেই সফলতা লাভে বাধা জন্মায়। যুদ্ধ শিখিলে মানুষ ক্ষিপ্রকারী হয়।

যুদ্ধ শিখিলেই যে নরহন্তা ও হিংস্র হইতেই হইবে এমন নয়। কেহ যুদ্ধ করিতে চান বা না চান, অতিরিক্ত কোমলতা পরিহারের জন্যও যুদ্ধ শিক্ষা করা উচিত।

—

বিভীষিকাপন্থী ও সৈনিক

বিভীষিকাপন্থী ("Terrorist") দলের অনেকে বে-আইনী কাজ করিয়াছে, হিংস্রতা করিয়াছে, কেহ কেহ দুর্নীতিমূলক কাজও করিয়াছে। এরূপ কোন কাজের প্রশংসা, সমর্থন বা দোষক্ষালন আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা উহাদের উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে, বিভীষিকাপন্থী হইয়া যে-পুরুষেরা (নারীরাও) মৃত্যুভয়, বিপদ্ভয়, দুঃখভয়কে অতিক্রম করিয়াছিল এবং স্থলবিশেষে যুদ্ধকৌশলও দেখাইয়াছিল, দেশের আইন কানুন ও রীতি অনুসারে এবং রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা অনুসারে যদি তাহাদের ও তাহাদের মত অন্য বাঙালীদের সৈনিক হইবার সুযোগ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সৈনিকরূপেও ঐরূপ দৃঢ়তা, কঠোরতা ও কৌশলের পরিচয় দিতে পারিত।

বিভীষিকাপন্থার পুনঃপ্রবর্তন আমরা চাই না। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে যোদ্ধৃসুলভ গুণ যে-সব লোকের মধ্যে আছে, তাহার আইনসঙ্গত বিকাশক্ষেত্র ও কার্য্যক্ষেত্র যাহাতে দেশে প্রস্তুত হয়, তাহা আমরা চাই।

যুদ্ধের নানা দোষ আমরা জানি। যুদ্ধ মোটেই ভাল বাসি না। অহিংসাই আমাদের বাঞ্ছিত ও প্রিয়। কিন্তু কেঁচোর অহিংসার প্রশংসা কেহ করে না। হিংসার সামর্থ্য যাহার আছে, তাহার অহিংসাই প্রকৃত অহিংসা।

—

শিক্ষামন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দের বাঙালী-প্রীতি

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী বাবু সম্পূর্ণানন্দ গত নবেম্বর মাসে কানপুরের একটি বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করিবার সময় খিচুড়ী ভাষার নিন্দা করেন এবং বলেন যে, ইংরেজী-মিশ্রিত হিন্দী বলা কাহারও উচিত নহে। সেইরূপ ভাষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন যে, কলেজে তাঁহার ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপক মল্‌ভ্যানী বলিতেন: "Bengalis-men outward simplicity to bahut hai, magar inward sincerity bilkul nahin" "বেঙ্গলীজ্‌মেঁ আউট্‌ওয়ার্ড্‌ সিম্‌প্লিসিটি তো বহুৎ হ্যায়্‌, মগর্‌ ইন্‌ওয়ার্ড্‌ সিন্সেরিটি বিলকুল নহিঁ"; অর্থাৎ বাঙালীদের বাহ্য সরলতা ত বহুৎ আছে, কিন্তু আন্তরিক অকপটতা একেবারেই নাই।

মন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দ খিচুড়ী হিন্দীর দৃষ্টান্ত অনায়াসেই অন্য অনেক দিতে পারিতেন, সমগ্র বাঙালী জাতির মিথ্যা নিন্দা-সূচক বাক্য দ্বারা দৃষ্টান্ত দিবার কোনই আবশ্যক ছিল না। তাঁহার ব্যবহার আরও গর্হিত হইয়াছে এই কারণে যে, তিনি অধ্যাপক মল্‌ভ্যানীর (Professor Mulvanyর) মুখে যে কথা দিয়াছেন, উক্ত ইংরেজ অধ্যাপক মহাশয় সেরূপ কথা বলেন নাই। অধ্যাপক মহাশয় এখনও জীবিত আছেন এবং বেনারস ক্যান্টনমেণ্টে বাস করেন। তিনি খবরের কাগজে মন্ত্রী মহাশয়ের উক্তির এক জন বাঙালী ভদ্রলোকের প্রতিবাদ পড়িয়া জানিতে পারেন যে, মন্ত্রী মহাশয় বাঙালীদের নিন্দা-সূচক একটি বাক্য তাঁহার (অধ্যাপক মহাশয়ের) উক্তি বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং তিনি খবরের কাগজে নিম্নমুদ্রিত চিঠিটি পাঠান এবং তাহা ৮ই ডিসেম্বরের লীডারে প্রকাশিত হয়।

SIR,

I am sorry but I cannot give the Education Minister very high marks for the quotation with which, as it seems from the letter of Mr. A. N. Mukerji in your issue of to-day, he has connected my name. *Simplicity* is the wrong word, and *Bengaleesmen* should go out altogether.

There is a story I have told more than once that two Bengalis were talking together some forty years ago about the then Lt. Governor of Bengal, and one of them said: "outward affability *bahut hai lakin* inward sincerity *kuch nahin.*" As will be seen, in this version the sentence is not aimed at Bengalis but is spoken by a Bengali in respect of one single person, and that a European.

Till a friend showed me the *Leader* of December 3, Mr. Sampurnanand's version was quite unknown to me, and apart from the Minister of Education I have never heard or thought the sentiment it conveys.

C. M. MULVANY.

21, Benares Cantonment.

তাৎপর্য্য। "আমি দুঃখিত, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী আমার নামের সঙ্গে যে উদ্ধৃত বাক্যটি জড়িত করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে খুব বেশী মার্ক দিতে পারি না। "সিম্‌প্লিসিটি" কথাটা ভুল, এবং "বেঙ্গলীজ্‌মেঁ" একেবারেই বাদ যাওয়া চাই।

আমি এই গল্পটা একাধিক বার বলিয়াছি যে, চল্লিশ বৎসর আগে দুজন বাঙালী বঙ্গের তখনকার লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর সম্বন্ধে গল্প করিতেছিল, তাহার মধ্যে এক জন বলিল, "আউটওআড্ ম্যাকাবিলিটি বহুৎ হ্যায়, লেকিন্ ইন্ওআড্ সিন্সেরিটি কুচ্ নাহিঁ।" ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, বাক্যটা বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত নহে; বাক্যটি এক জন মাত্র মানুষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত ও সে মানুষটি ইউরোপীয়।

এক জন বন্ধু মিঃ সম্পূর্ণানন্দের উক্তি দেখাইবার পূর্ব্বে ওরূপ বাক্য আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং বাঙালীদের ওরূপ নিন্দা আমি কখন শুনি নাই বা চিন্তা করি নাই। (স্বাঃ) সি. এম্. মল্ল্যানী।

আমি যখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলাম তখন অধ্যাপক মল্ল্যানীকে সেনেটের অধিবেশনে কখন কখন দেখিয়াছি। তিনি এখনও জীবিত আছেন জানিয়া প্রীত হইলাম। সেকালে তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা ও স্পষ্টবাদিতার খ্যাতি ছিল।

—

"বৃহত্তর বঙ্গ"

গৌহাটীতে গত পৌষ মাসে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে, "বৃহত্তর বঙ্গ" জিনিষটা কি, সে বিষয়ে কিছু কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, আলোচনা হইয়াছিল। ইহার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উত্তর দেওয়া যায়। মিশ্রিত সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক উত্তর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর "চিন্ময় বঙ্গ" পুস্তকে পাওয়া যাইবে যখন তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। আমরা সাধারণ রকম দু-একটা কথা এ বিষয়ে এখানে বলিব।

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের যতটুকু ভূখণ্ডকে বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই সচরাচর লৌকিক ব্যবহারে বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহার বাহিরে ইহার সংলগ্ন আরও ভূখণ্ড আছে যাহার অধিবাসীদের মাতৃভাষা ও সাহিত্য বাংলা, যাহাদের সংস্কৃতি বঙ্গীয়, এবং যাহারা বাঙালী। বাংলা প্রদেশের বাহিরে অবস্থিত ও তাহার সংলগ্ন এই অঞ্চলগুলি বাংলা প্রদেশের সহিত যুক্ত হইলে তাহা হইবে বৃহত্তর বঙ্গ।" গবর্ন্মেণ্ট এই সংযোগ সাধন করিয়া ভৌগোলিক এই বৃহত্তর বঙ্গকে বাংলা প্রদেশ নামে অভিহিত করুন বা না করুন, আমরা বাঙালীরা এই সমগ্র ভূখণ্ডকে বাংলা দেশ মনে করি এবং সেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতি রক্ষা করিবার ও তাহার উন্নতি করিবার দায়িত্ব ও ভার আমাদের বাঙালীদের উপর অর্পিত আছে।

"বৃহত্তর বঙ্গ" বলিতে আমরা আরও কিছু বুঝিয়া থাকি। তাহা আমরা একাধিক বার বলিয়াছি। ১৩৪০ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে সে বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা হইতে নীচে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"...বাঙালী যেখানেই থাকুন, সেখানেই বঙ্গের মানসিক পরিবেষ্টন কতকটা বিদ্যমান আছে, সেখানেই ছোট ছোট বঙ্গ বিরাজিত আছে,......। জার্ম্মানদের একটি কবিতা আছে যাহা এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ: 'জার্ম্মানদের পিতৃভূমি কোথায়? তাহা কি প্রাশিয়া? তাহা কি সোয়াবেন?' উত্তরটা কতকটা এই মর্ম্মের যে, যেখানেই অধিবাসীদের মাতৃভাষা জার্ম্মান সেই স্থানই জার্ম্মেনী। আমরাও বলিতে পারি, যেখানেই কোন বাঙালী বাস করে ও বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাহাই বাঙালীর পিতৃভূমি স্বরূপ ও বৃহত্তর বঙ্গের অংশ। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই সব অধিবাসীর মাতৃভাষা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় অংশের মাতৃভাষা ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্য তাহারাও যে-যে প্রদেশে বাস করে তাহা তাহাদের পিতৃভূমি স্বরূপ, এবং বৃহত্তর গুজরাট, বৃহত্তর উড়িষ্যা, বৃহত্তর বিহার ইত্যাদির অংশ। এই প্রকারে ভারতবর্ষের সব অংশ সব ভারতীয়ের পিতৃভূমি।"

আমরা উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে দেখা যাইবে, বৃহত্তর বঙ্গের একটি ভৌগোলিক অর্থ আছে, এবং আর একটি অর্থ আছে যাহা সাংস্কৃতিক। সাংস্কৃতিক অর্থে পেশাওআরের বাঙালীর, পাটিয়ালার বাঙালীর, রাজপুতানার বাঙালীর, বোম্বাই নাগপুর মান্দ্রাজ সিঙ্গাপুর প্রভৃতির বাঙালীদের বাসগৃহগুলি সাংস্কৃতিক বৃহত্তর বঙ্গের অংশ আমরা দেখিতে চাই। বলা বাহুল্য, এই সাংস্কৃতিক বৃহত্তর বঙ্গের আদর্শের আড়ালে এরূপ কোন গোপন হাস্যকর অভিসন্ধি নাই, যে, বাঙালীরা পেশাওআর পাটিয়ালা রাজপুতানা বোম্বাই মান্দ্রাজ নাগপুর সিঙ্গাপুর প্রভৃতি জয় করিবে বা করিতে পারে। আমরা যে মানসিক ভূগোলে বৃহত্তর গুজরাট বৃহত্তর উড়িষ্যা বৃহত্তর বিহার প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছি, তাহা হইতেই বুদ্ধিমান লোকের কাছে বাঙালীদের অভিসন্ধির অভাব স্পষ্ট হওয়া উচিত।

বৃহত্তর বঙ্গের আদর্শ যে বাঙালীদের অহঙ্কারপ্রসূত কোন সংকীর্ণ 'স্ফুংমার্গ'-দুষ্ট আদর্শ নহে, তাহা ১৩৪০ সালের ফাল্গুনের 'প্রবাসী' হইতে উদ্ধৃত নীচের কথাগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

"ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কোন জাতিই সমগ্রভারতীয় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। প্রত্যেক জাতিরই সমগ্র মহাজাতির অন্যান্য অংশের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কৃষ্টি হইতে কিছু শিখিবার, কিছু অনুপ্রাণনা লাভ করিবার আছে। আমরা বাঙালীরা বঙ্গে থাকিয়াও এই প্রকার কিছু শিখিতে ও অনুপ্রাণনা লাভ করিতে পারি; আবার যে-সব বাঙালী বঙ্গের বাহিরে বাস করেন তাঁহাদের মারফতেও শিক্ষা ও অনুপ্রাণনা পাইতে পারি। ভারতীয় মহাজাতির অন্য সব অংশকে আমাদের যাহা দিবার আছে, তাহাও আমরা কিছু সাক্ষাৎভাবে, কিছু বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের হাত দিয়া দিতে পারি।"

অতএব, বাঙালীদের দোষ দেখা যাঁহাদের স্বভাব তাঁহারা ছাড়া অন্য সকলের বুঝা উচিত যে, আমরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন দিতে ইচ্ছুক লইতেও তেমনই ইচ্ছুক।

—

"সাংস্কৃতিক অভিযান"

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, এরূপ সন্দেহ বা ইঙ্গিত অবাঙালী কর্তৃক ঐ সম্মেলনের গৌহাটী সম্মেলনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এরূপ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। সম্মেলন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে। সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী লোকেরা উভয়েই ইহার সভ্য। সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ মুষ্টিমেয় এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ছড়াইয়া বাস করেন। তাঁহাদের কোন সমষ্টিগত রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাব নাই।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন বাঙালীদের সাংস্কৃতিক বিজয়-অভিযানের (cultural conquest-এর) আয়োজনও নহে। বস্তুতঃ সংস্কৃতির একটি অঙ্গ সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারের জন্য বাংলা সাহিত্যকে কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ অভিযান চালাইতে হয় নাই। ইহার প্রভাব ইহার নিজের গুণেই বিস্তৃত হইয়াছে। এক দিকে বঙ্গের বাহিরের অধিকাংশ প্রদেশের লোক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনরূপ শ্রেষ্ঠতা মুখে স্বীকার না-করিয়া হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীর জয় ঘোষণা করিতে মুখর, অন্য দিকে ভিতরে ভিতরে, অনুমতি লইয়া এবং অধিকাংশ স্থলে অনুমতি না লইয়া, বাংলা বহুসংখ্যক বহির অনুবাদ ভারতীয় প্রধান প্রধান ভাষায় অনেক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রভাব এই প্রকারে মুখে অস্বীকৃত ও কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইতেছে। নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ও পরে পারিবারিক বা বংশীয় পদবী ব্যবহার, ধুতি ও শাড়ী পরিবার রীতি, মাথায় পাগড়ী টুপি ব্যবহার না-করা প্রভৃতি বাংলা দেশ হইতে অন্য বহু প্রদেশে প্রচলিত হইতেছে।

সাংস্কৃতিক অভিযান চলিতেছে হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীর অনুকূলে। তাহার পশ্চাতে কংগ্রেসের ও কংগ্রেস মন্ত্রি-মণ্ডলীসমূহের রাজনৈতিক ক্ষমতাও বিদ্যমান। মান্দ্রাজ প্রদেশে তামিলভাষী অগণিত লোক সন্দেহ করিতেছে যে, হিন্দীপ্রচার ও জোর করিয়া বিদ্যালয়ে হিন্দী শিখান উত্তর-ভারতের সংস্কৃতির দ্বারা দক্ষিণ-ভারতের সংস্কৃতিকে পরাজিত বা অভিভূত করিবার একটা কৌশল। এই সন্দেহবশে কাজ করিয়া ইতিমধ্যে বহু পুরুষ ও নারী জেলে গিয়াছে। এই সন্দেহ সমূলক কি অমূলক, তাহার বিচার এখানে করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়ের আয়োজন যদি হইয়া থাকে, তাহা হিন্দুস্থানীর পক্ষ হইতে হইয়াছে, বাংলার পক্ষ হইতে নহে।

—

পুরুলিয়া জেলাস্কুল

৩রা জানুয়ারী বেহার হেরাল্ডে নিম্নমুদ্রিত চিঠিটি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও সমস্তটি ছাপিতেছি; কারণ বিহার প্রদেশে বাংলাভাষীদের নানা অসুবিধা ঘটাইবার এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যবহার ও অনুশীলন নানা প্রকারে কমাইবার অপচেষ্টার ইহা একটি দৃষ্টান্ত।

SIR,

There has been a great feeling of resentment over the Government orders that from January 1939 there will be only one Bengalee section in Class VIII of the Purulia Zila School. As it has been settled that from 1943 the examination will be through the medium of vernacular of the students, this arrangement is being made for boys of Class VIII. Some time ago the Government wanted to know from the school authorities what is the vernacular of the students or rather the predominant language of the place. They also informed the authorities that there would be only one vernacular section for 40 students and another similar section for imparting education either through English or Hindusthani.

The Managing Committee, however, carefully reviewed the situation and recommended that it was necessary to open two Bengali sections and one section for imparting education either through English or Hindusthani.

The Government have now turned down the recommendation of the managing committee to the detriment of the Bengalee Students.

The committee anticipated from a review of the strength of the class from the previous years that there would be about 70 Bengalee students and about 20 Hindusthani and Urdu students, and hence they recommended 3 sections.

The net result of the Government orders restricting the school authorities to have only one Bengalee section would mean exclusion of a large number of Bengalee boys from getting education in the Government institution of their own district where Bengalee is the accepted predominant language.

It is understood that a largely signed memorial from the public is being sent to His Excellency the Governor and the Hon'ble Education Minister protesting against the decision of the Government and praying for redress.
—Yours, etc.
Purulia, 22-12-38.

SURESH CHANDRA SARKAR,
Pleader.

ইহার অনুবাদ দেওয়া অনাবশ্যক।

যে শহর ভৌগোলিক ও ভাষিক বঙ্গের অংশ, যাহার পুরুষানুক্রমে অধিবাসী ও স্থায়ী অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা, যাহার স্থায়ী ও অস্থায়ী অধিবাসীদের বাড়ীর স্কুলে যাইবার বয়সের বালক-বালিকাদের অধিকাংশ বাঙালী, সেই শহরের সরকারী স্কুলে জোর করিয়া বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ কমাইয়া দেওয়া অতি বড় অবিবেচনা, এবং ইহা জানিয়া শুনিয়া অভিসন্ধিপ্রসূত হইলে সাতিশয় গর্হিত কাজ।

—

পুরুলিয়ায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন চাই

রাঁচিতে যখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তখন বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছিলাম, পরবর্ত্তী অধিবেশন পুরুলিয়ায় হইবে। কিন্তু পরে পাটনায় এবং তাহার পর গৌহাটীতে অধিবেশন হইয়াছে। বোধ হয়, পুরুলিয়ার নাগরিকেরা ভাবিয়াছিলেন, মানভূম ত বাংলারই অংশ, বিহার প্রদেশে থাকিলে কি হয়? সুতরাং মানভূমে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন অনাবশ্যক বা অসঙ্গত। কিন্তু কলিকাতাতেও ত ইহার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

এখন যখন মানভূম জেলাটাকে প্রধানতঃ বাংলা-ভাষী নহে বলিয়া প্রমাণ করিবার ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা চলিতেছে, তখন আমরা মনে করি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ১৯৩৯ সালের অধিবেশন পুরুলিয়াতেই হওয়া উচিত। ইহা করিবার মত শক্তিমান ও উৎসাহী যথেষ্ট লোক পুরুলিয়ার বাঙালী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে পাওয়া যাইবে না মনে করিবার কোন কারণ নাই।

—

ধানবাদকে বঙ্গবহির্ভূত প্রমাণের চেষ্টা

ধানবাদ মানভূম জেলার একটি মহকুমা। মানভূম জেলা বাঙালীপ্রধান জেলা। এই জেলায় সাঁওতাল প্রভৃতি যে-সব আদিম জাতি আছে, তাহারাও আপন আপন মাতৃভাষা ব্যতীত দ্বিতীয় ভাষা রূপে বাংলা জানে ও ব্যবহার করে। কয়লার খনির কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধানবাদেও বাংলা-ভাষীর সংখ্যা অধিক ছিল। পরে ক্রমশঃ অবাঙালীর সংখ্যা বাড়িয়া এখন স্থায়ী ও অস্থায়ী অবাঙালীর সংখ্যা বাঙালীদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, ধানবাদ ভৌগোলিক ও ভাষিক বঙ্গের অংশ নহে। "খাস্ বাংলা প্রদেশে ভদ্রেশ্বর, টিটাগড় প্রভৃতি কারখানা কেন্দ্রের অধিবাসীদের অধিকাংশ হিন্দীভাষী। কলিকাতাতেও কোন কোন পাড়ায় হিন্দী বা রাজস্থানীই বেশী লোকে বলে। কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, ভদ্রেশ্বর, টিটাগড় ও কলিকাতার ঐ পাড়াগুলি বঙ্গের অংশ নহে।" (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৫)। ধানবাদের পুরাতন সরকারী ও জমিদারী দলিল-দস্তাবেজ সব বাংলায় লেখা। তথাকার সব ছড়া, লোকগীত, উপকথা, প্রবাদবাক্য বাংলা। সুতরাং ধানবাদ ভৌগোলিক ও ভাষিক বঙ্গের অংশ।

গৌহাটীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গৌহাটীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারকার অধিবেশনের একটি বিশেষত্ব এক জন মহিলা সাধারণ সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর দ্বারা অধিবেশনের কাজ সুনির্ব্বাহিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যেরা ও তাঁহাদের দ্বারা মনোনীত স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছিলেন।

এবারকার সম্মেলনে ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও দর্শন প্রভৃতি শাখা ছিল না। শাখার সংখ্যা বেশী হইলে কোনটিরই কাজ নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিনের মধ্যে যথেষ্ট অবধান পায় না। সেই জন্য হয় শাখা কম রাখা নয় অধিবেশনের দিন বাড়ান উচিত। কিন্তু প্রতিনিধিরা অধিবেশনের জন্য বেশী দিন দিতে পারেন না। সেই জন্য শাখার সংখ্যাই কমান দরকার। তবে বাছিয়া বাছিয়া দর্শন ও ইতিহাসই কেন বাদ দেওয়া হইয়াছিল, জানি না।

এবার সম্মেলনে, বাংলা যে রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য, এই প্রস্তাব উঠিয়াছিল। সম্মেলন প্রধানতঃ ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা কোন্‌টি হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে তাহার মত প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ওড়িয়া ভাষা ভারতবর্ষের অল্প লোকের মাতৃভাষা। অথচ ওড়িয়ারা তাঁহাদের এক সভায় তাঁহাদের মাতৃভাষা যে রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য তাহা সাহসের সহিত বলিয়াছেন। বাঙালীদের এ-বিষয়ে স্বয় মত প্রকাশে সঙ্কোচের কারণ বুঝি না। ঠিক মাতৃভাষা রূপে হিন্দী যত লোক ব্যবহার করে, বাংলা তাহা অপেক্ষা বেশী লোক মাতৃভাষা রূপে ব্যবহার করে, ইহা বহুভাষাবিৎ এবং হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষপাতী অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার একটি পুস্তকে লিখিয়াছেন। অবশ্য ইহাও বলা হইয়াছে, যে, মাতৃভাষা রূপে না হইলেও বাংলার চেয়ে হিন্দী ব্যবহার করে অধিক লোক। কিন্তু তেমনই বাংলার পক্ষে এ-কথা বলা আবশ্যক যে, তাহার শব্দসম্পদে, ভাব ও চিন্তা প্রকাশের সামর্থ্যে এবং সাহিত্য-গৌরবে বাংলা শ্রেষ্ঠ।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এ-বিষয়ে মত কি হইত বা হইত না, তাহার ক্ষতিলাভ আমরা বিবেচনা করিতেছি না। কিন্তু আমাদের মত এই যে, এ-বিষয়ের আলোচনা ও বিচার হওয়া উচিত ছিল।

—

গিরিশচন্দ্র বসু

বঙ্গবাসী বিদ্যালয়ের ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইহা অকাল মৃত্যু না হইলেও, তাঁহার মত এক জন সুশিক্ষকের মৃত্যুতে দেশের ক্ষতি হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গের অধ্যাপকবর্গের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু এই বয়োজ্যেষ্ঠতাই তাঁহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না।

তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পাস ভালই করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি সরকারী বৃত্তি পাইয়া বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে যান এবং তথাকার কলেজের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন নাই। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বঙ্গবাসী বিদ্যালয়, পরে বঙ্গবাসী কলেজ স্থাপন করেন। শিক্ষাদান-কার্য্যে ও শিক্ষালয়-পরিচালনে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি পরিচ্ছদ ও ভাষায় স্বাজাতিকতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। চালচলনে অমায়িক ও সাদাসিধা, এবং চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। কলেজে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যান বাংলাতে দিতেন। দরিদ্র ছাত্রদের তিনি সহায় ছিলেন। যে-সকল ছাত্র সরকারের রাজনৈতিক কোপে বিপন্ন হইত, তিনি তাহাদিগকে কলেজে ভর্ত্তি করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত নানা ভাবে তাঁহার যোগ ছিল এবং তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হইতেন।

—

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔপন্যাসিক অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন প্রতিভাবান সুলেখক এবং বাংলা ভাষার পণ্ডিত দক্ষ শিক্ষক হারাইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় ৬২র অধিক হয় নাই। এই বয়সে মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলিতে হইবে। প্রবাসীর লেখক-রূপে তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। তাহার পর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় যখন তিনি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের বাংলা সাহিত্য বিভাগের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া এলাহাবাদ যান। তখন তিনি প্রবাসী সম্পাদকের বাসাতেই অতিথি হন। তখনকার একটি বৃত্তান্ত তিনি আমাদিগকে বৎসরাধিক পূর্ব্বে দিয়াছিলেন। তাহা এখনও অমুদ্রিত আছে। তিনি ইণ্ডিয়ান প্রেসের জন্য ছেলেমেয়েদের পাঠ্য কয়েকটি ভাল বাংলা বহি লিখিয়া দিয়াছিলেন। প্রেসের অধ্যক্ষ পরলোকগত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় তাঁহার কাজে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। চিন্তামণি বাবু তাঁহাকে আর একটি কাজে নিযুক্ত করেন। তাহা একটি বৃহৎ প্রামাণিক বাংলা অভিধান সংকলন। সম্প্রতি পরলোকগত বীরভূমের শিবরতন মিত্র মহাশয় চারুবাবুর সহকর্ম্মী ছিলেন। সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে এই কাজের আফিস ছিল। এই অভিধানের শব্দসঙ্কলন কতক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। উহা কি কারণে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা এখন আমাদের ঠিক্ মনে পড়িতেছে না। চারুবাবুর বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অধ্যয়ন এবং শব্দ-সম্পদের অধিকারিত্ব এই অভিধান-সংকলনের কাজ হইতে আংশিক ভাবে ঘটিয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাজের পরই তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত হন। এই দুটি কাগজের কাজ অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় একাধিক সহকারী আবশ্যক হইয়াছিল। চারুবাবু ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করিতে পারিতেন। কখন কখন উপন্যাস, ছোট গল্প, বা প্রবন্ধ ছাড়া, তিনি 'মুদ্রারাক্ষস' নাম লইয়া পুস্তক সমালোচনা করিতেন। 'কষ্টিপাথর', 'বেতালের বৈঠক' ও কখন কখন 'পঞ্চশস্য' বিভাগের ভার তাঁহার উপর থাকিত।

প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতে করিতেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই কাজে দক্ষতার প্রভাবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক নিযুক্ত হন। তখন তিনি 'মডার্ণ রিভিয়ু' ও 'প্রবাসী'র কাজ ছাড়িয়া যান। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরও তিনি 'প্রবাসী'তে কয়েকটি লেখা দিয়াছিলেন। এই মাসিকের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। ঢাকায় অধ্যাপকের কাজে দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কার-স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক এম-এ উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার বয়স ৬০ হওয়ার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর পাইয়া জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপক হন।

তিনি প্রায় চল্লিশখানি উপন্যাসের ও বহু ছোট গল্পের লেখক। চণ্ডীকাব্য, শূন্যপুরাণ, এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলীর তিনি বিস্তৃত টীকাকার। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীর "রবিরশ্মি" নামক টীকা গ্রন্থের প্রথম ভল্যুম প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভল্যুমেরও প্রকাশ দেখিয়া যাইবার অভিলাষ তাঁহার ছিল। সে অভিলাষ পূর্ণ হইল না। অধ্যাপক ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায় তিনি প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা কবিতার একটি চয়নিকা গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তিনি ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সমুদয় প্রসিদ্ধ তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সরস ভ্রমণবৃত্তান্ত 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার নানাবিধ রচনা অনুরাগের সহিত পঠিত হইত। তাঁহার ধর্ম্মমত ও সামাজিক মত উদার ছিল। প্রধানতঃ নামজপ সাধনা করিয়া তিনি কিরূপ আনন্দ ও ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন, তাহা তিনি অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন।

—

শিবরতন মিত্র

উপরে লিখিয়াছি, ইণ্ডিয়ান প্রেসের অভিধান সংকলন কার্য্যে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র চারুবাবুর সহকর্ম্মী ছিলেন। চারুবাবুর কয়েক দিন পরেই শিবরতনবাবুরও

মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারও মৃত্যু অকালে হইয়াছে বলিতে হইবে। তিনি মফস্বলে নিভৃতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকদিগের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। এই কাজটি তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু যত দূর করিয়া গিয়াছেন তাহা মূল্যবান। নূতন লাইব্রেরীতে তাঁহার সংগৃহীত অনেক পুঁথী ও মুদ্রিত পুস্তক আছে। তিনি নম্র প্রকৃতির অল্পভাষী মিতভাষী মানুষ ও নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী ছিলেন।

—

ভূতনাথ কোলে

বাঁকুড়া জেলার কলিকাতা-প্রবাসী প্রসিদ্ধ কাষ্ঠব্যবসায়ী ভূতনাথ কোলে মহাশয়ের ৫৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পিতা নফরচন্দ্র কোলে অল্প বয়সে কলিকাতায় আসেন, এবং পরিশ্রম, ব্যবসাবুদ্ধি ও সাধুতার গুণে দারিদ্র্য হইতে ঐশ্বর্য্যে উপনীত হন। ভূতনাথবাবু সেই সম্পদ আরও বাড়াইয়াছিলেন। বৃহৎ কাঠের ব্যবসা ভিন্ন একটি পাটকলেরও তিনি মালিক ছিলেন। বাঁকুড়া জেলায় তাঁহাদের বাসগ্রামে তাঁহাদের পরিবার কর্ত্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয় ও দাতব্য ঔষধালয় আছে। তদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার পিতার নামে অনেক হাজার টাকা খরচ করিয়া বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলের হাঁসপাতালে একটি দ্বিতল অস্ত্রোপচার-বিভাগ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

তিনি একবার কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কৌন্সিলর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

—

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাটনায় তথাকার ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্ট জজ রায় বাহাদুর অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বিচার-বিভাগে মুন্সেফী হইতে হাইকোর্টের জজিয়তী পর্য্যন্ত যোগ্যতার গুণে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীনচিত্ত, পক্ষপাতশূন্য এবং আইনে সুপণ্ডিত সুবিচারক ছিলেন। বিহারী ও বাঙালী উভয় সমাজে তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সক্রিয় যোগ ছিল। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রত্যহ অনেক সময় ভগবদারাধনায় যাপন করিতেন। বহু সাহায্যপ্রার্থী তাঁহার সাহায্য পাইত। তিনি সামাজিক ও অন্য বহু ব্যাপারে বিহারের বাঙালী সমাজের সুপরামর্শদাতা ও সুপরিচালক ছিলেন।

—

বঙ্গে নারীনিগ্রহ ও কংগ্রেস

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-মহিলা-সম্মেলন সম্প্রতি নারীনির্য্যাতন নিবারণ করিবার নিমিত্ত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে কংগ্রেস-সভাপতি আলবার্ট হলের একটি সভায় বঙ্গে নারীনিগ্রহ সম্বন্ধে খুব স্পষ্টবাদিতার সহিত একটি বক্তৃতা করেন। এ-বিষয়ে কংগ্রেসপক্ষীয় লোকদের তাহাই প্রথম মত প্রকাশ। আমরা তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলাম। কংগ্রেস-মহিলা-সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবটি দ্বিতীয় শুভলক্ষণ।

কংগ্রেসী মহিলারা, এবং পুরুষেরাও, যদি ন্যূনকল্পে কিছু কিছু অর্থসাহায্য নারীরক্ষা সমিতির কার্য্যালয় কলিকাতায় ৬ নং কলেজ স্কোয়ারে সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা ও মহিলাদিগের সভায় গৃহীত প্রস্তাব সার্থক হয়। আশা করি তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করিবেন।

—

সতীত্ব রক্ষার উপায় সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত

গত ৩১শে ডিসেম্বরের "হরিজন" পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন :—

'I have often remarked in these columns that definite rules govern the development of the non-violent spirit in us. It is a strenuous effort. It marks a revolution in the way of thinking and living. If my correspondent and the girls of her way of thinking will revolutionize their life in the prescribed manner, they will soon find that young men, who at all come in contact with them, will learn to respect them and to put on their best behaviour in their presence. But if perchance they find, as they may, that their very chastity is in danger of being violated, they must develop courage enough to die rather than yield to the brute in man. It has been suggested that a girl who is gagged or bound so as to make her powerless even for struggling cannot die as easily as I seem to think. I venture to assert that a girl who has the will to resist can burst all the bonds that may have been used to render her powerless. The resolute will gives her the strength to die.

"But this heroism is possible only for those who have trained themselves for it. Those who have not a living faith in non-violence will learn the art of ordinary self-defence and protect themselves from indecent behaviour of unchilvalrous youth."

পঞ্জাবের কোন কোন দুর্বৃত্ত যুবক কোন কোন ছাত্রীকে অভদ্রভাবে বিরক্ত করে, আক্রমণের উপক্রম করে, এইরূপ অভিযোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিকট চিঠি আসায়, সেই উপলক্ষে তিনি ইংরেজী "হরিজন" কাগজে যে প্রবন্ধ লেখেন, উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি তাহা হইতে গৃহীত। তাঁহার কথাগুলির তাৎপর্য্য এই :—

"অহিংস ভাবের বিকাশ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে হয়। তাহা আত্যন্তিক প্রবলচেষ্টাসাপেক্ষ। ইহা চিন্তা ও জীবন যাপন ধারায় বিপ্লব সূচিত করে। যদি আমার পত্রলেখিকা ও অন্যান্য বালিকারা ব্যবস্থানুযায়ীরূপে তাঁহাদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, যে-সব যুবক তাঁহাদের সংস্পর্শে আসে তাহারা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে, এবং তাঁহাদের সম্মুখে খুব ভাল ব্যবহার করিবে। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে তাঁহাদের সতীত্বনাশের সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে মানুষের পাশবতার নিকট পরাজয় না মানিয়া মরিবার সাহস তাঁহাদিগকে বিকশিত করিতে হইবে। যদি কোন বালিকার মুখ বন্ধ করা বা হাত-পা বাঁধিয়া ফেলা হয়, তথাপি তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে মরিবার শক্তি পাইবেন।

"কিন্তু এই শৌর্য্য কেবল তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব যাঁহারা এতদর্থে আপনাদিগকে শিক্ষিত করিয়াছেন। অহিংসাতে যাঁহাদের জীবন্ত বিশ্বাস নাই, তাঁহারা সাধারণ আত্মরক্ষার বিদ্যা শিখিবেন এবং নারীদের প্রতি সম্মানহীন যুবকদের অশ্লীল আচরণ হইতে তদ্দারা আত্মরক্ষা করিবেন।"

প্রাণপণ করিয়া সতীত্ব রক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে সমুদয় ভদ্রব্যক্তি গান্ধীজীর সহিত একমত। কোন পশুপ্রকৃতি মানুষের দ্বারা কোন সতী নারী আক্রান্ত হইলে, তিনি তাহার আক্রমণে বাধা দিবেন ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। এমন অবস্থা হইতে পারে যে, এই বাধাদান-প্রক্রিয়ায় আক্রমণকারী পশুবৎ মানুষটা এবং আক্রান্তা সতী নারী উভয়েরই বা দুইয়ের এক জনের মৃত্যু ঘটিবে। গান্ধীজী বলিতেছেন, এমত অবস্থায় অহিংসায় জলন্ত বিশ্বাসবতী সতী নারীকেই মরিতে হইবে। ইহার ন্যায্যতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। যদি কোন এক জনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে যিনি নারীরত্ন তাঁহাকেই মরিতে হইবে, এরূপ কেন মনে করিব? যদি অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত ভাবে পশুবৎ মানুষটার মৃত্যু ঘটাইলে নারীরত্নের সতীত্ব ও প্রাণ উভয়ই রক্ষিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমরা তাহাই শ্রেয়ঃ মনে করি। আক্রমণকারী পশুবৎ মানুষকে বধই করিতে হইবে, ইহা আমরা বলি না। তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে তাহাকে আঘাত করিতে হইবে। সেই আঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও এরূপ আঘাত অপরাধ নহে। আমরা "অহিংসা" শব্দটিকে ও বস্তুটিকে একটি ফেটিশে (fetishএ) পরিণত করিবার পক্ষপাতী নহি। যদি কেহ বলেন যে, "জীবন ও মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নাই," তাহা হইলে আমরা বলিব, সে উপদেশ কেবল সতীনারীর পক্ষেই সত্য নহে, তাহা পশুবৎ পুরুষের পক্ষেও সত্য। সে মরিলে বরং মানবসমাজের এই উপকার হইবে যে, তাহার দ্বারা আর কোন নারীর উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা ঘটিবে না, এবং তাহারও এই উপকার হইবে যে, তাহার পাশবতা ও পাপ বাড়িয়া চলিবে না। পক্ষান্তরে, সতী নারীরত্ন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার দৃষ্টান্তে ও আচরণে সমাজ উপকৃত হইবে।

যাঁহারা অহিংসায় বিশ্বাস করেন না, মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে সাধারণ আত্মরক্ষাবিদ্যা—বোধ হয় অস্ত্রব্যবহার—শিখিতে ও প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। সতীত্বরক্ষার জন্য অহিংসায় বিশ্বাসবতী নারীরা কেন অস্ত্রব্যবহার করিবেন না, আক্রান্ত হইলে কেন ও কি প্রকারে কেবল মরিবেনই, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। আমরা অহিংসার সারবস্তুতে, অহিংসার প্রাণে, বিশ্বাস করি। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা বা ইচ্ছা করা বা কার্য্যতঃ অনিষ্ট করা হিংসা, এবং তাহার অভাব অহিংসা। অস্ত্রব্যবহার বা রক্তপাত করিলেই তাহা হিংসাপদবাচ্য হয় না। ডাক্তার যে অস্ত্রব্যবহার ও রক্তপাত করেন, তাহাতে কখন কখন রোগীর মৃত্যু হইলেও, তাহা হিংসা নহে এই জন্য যে, ডাক্তার রোগীর অনিষ্ট করিবার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেন না। সতী নারী আক্রমণকারী পশুবৎ পুরুষের অনিষ্ট করিবার জন্য তাহাকে

আঘাত করেন না, আপনার সতীত্ব রক্ষার জন্য করেন, পশুটাকে পাপ হইতে নিরস্তকরণ দ্বারা তাহার কল্যাণই করেন। আঘাতের ফলে যদি পশুটার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও তাহার মঙ্গলই হয়; কারণ তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে তাহার আরও অধোগতি নিবারিত হয়। এই হেতু সতীত্ব রক্ষার জন্য কোনও নারী আক্রমণকারী কোন পুরুষকে আবশ্যকমত আঘাত করিলে (সে আঘাতে মানুষটার মৃত্যু হইলেও), আমরা তাহাকে হিংসা মনে করি না, বলি না।

মহাত্মাজী যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে সতী নারীর জীবন অপেক্ষা তাঁহার আততায়ী নরপশুর জীবনের মূল্য অধিক ধরা হইয়াছে।

—

বাটানগরে ধর্ম্মঘট ও গুলী নিক্ষেপ

কোন স্থানে ধনিকে শ্রমিকে মতান্তর ও বিবাদ হইলে আপোষে উভয়ের মধ্যে আলোচনার দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। তাহা না-হইলে শ্রমশিল্পবাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রীরা অবিলম্বে আসরে নামিয়া, এবং আবশ্যক হইলে বিবাদ নিষ্পত্তি বিষয়ক আইনের সাহায্য লইয়া, বিবাদভঞ্জনের চেষ্টা করা উচিত। বঙ্গের এই বিভাগের মন্ত্রী বৎসরে অনেক হাজার টাকা বেতন ও ভাতা পান। ঐ বিভাগে উচ্চবেতনভোগী অন্য কর্ম্মচারীরও অভাব নাই কিন্তু মন্ত্রীর কিছু করিবার ফুরসৎ হইবার আগেই বাটানগরের জুতার কারখানার ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলী চলিয়াছে! তাহার কারণ কি এই যে, এদেশের গরীব লোকদের প্রাণের মূল্য কম, বা নাই?

ধর্ম্মঘটীদের প্রত্যেকটি দাবী ন্যায্য কিনা, তাহা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু গুলীচালান বিচার নহে। যদি ভয়ে বা ক্ষুধার তাড়নায় গরীব লোকেরা অভিযোগের প্রতিকার না-হওয়া সত্ত্বেও কাজে যোগ দেয়, তাহা হইলেও বিবাদের মীমাংসা ত, তাহার দ্বারা হইবে না, তাহা স্থগিত থাকিবে, চাপা থাকিবে মাত্র—সময় ও সুযোগ পাইবামাত্র আবার দেখা দিবে।-

লাঠি কিংবা গুলী যখন চলে, তখন শ্রমিকদের উপর চলে, অ-শ্রমিক নেতাদের উপর চলে না। এই জন্য নেতাদের দায়িত্ব গুরুতর।

—

ছাত্রসমাজের প্রতি পণ্ডিত জওআহরলালের উপদেশ

ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রদের নেতাদের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনাই অধিক প্রয়োজন, কিন্তু হয়ত তত বেশী সাহস ও আস্পর্দ্ধা না-থাকায় আমরা ছাত্রসমাজের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সম্বন্ধেই মাঝে মাঝে প্রবাসীতে আমাদের মতামত লিখিয়া থাকি। কিন্তু আমরা উগ্রবাক্যপ্রয়োগে পটু নহি বলিয়া, বা সর্ব্বত্যাগী রাষ্ট্রকর্ম্মী নহি বলিয়া, আমাদের মতামত হয়ত ছাত্রসমাজের গ্রহণীয় বিবেচিত হয় না। এই জন্য, স্বাধীনতার উদ্দেশে যাঁহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, দেশের জন্য যাঁহারা যে কোনরূপ দুঃখ সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ নহেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যাঁহাদের মত মৃদুপন্থী বা সংস্কারপন্থী নহে, এরূপ রাষ্ট্রনেতাদের ছাত্রসমাজের প্রতি উপদেশে আমাদের মতের সমর্থন পাইলে আমরা এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি যে, হয়ত তাঁহাদের সেই উপদেশ ছাত্রদের ও তাঁহাদের নেতৃবর্গের গ্রাহ্য হইবে। এই জন্য পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু নিখিল ভারত ছাত্রসভার গত কলিকাতা অধিবেশনে যে বক্তৃতা দেন তাহা হইতে অংশ-বিশেষের মর্ম্মানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

বিশেষ গুরুতর (grave) কারণ ব্যতীত ছাত্রদের ধর্ম্মঘট করার বিরুদ্ধে পণ্ডিত জওআহরলাল বিশেষ আপত্তি করেন। "গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। অনেক সময় এই চাঞ্চল্যের যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। ইহার ফলে অনেক সময় ধর্ম্মঘট ইত্যাদি ঘটিয়াছে। আমি এ-কথা উপলব্ধি করি যে, এমন কারণ ঘটিতে পারে যখন ছাত্রদের এইরূপ পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু (ভারতবর্ষের) ছাত্রেরা যেরূপ অবলীলাক্রমে স্কুলে কলেজে ধর্ম্মঘট করিয়া থাকে, আমি কিছুতেই তাহার অর্থ বুঝিতে পারি না। জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কিত বিশেষ কারণ ব্যতীত, ভারতের বাহিরে কোথাও ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করিয়া থাকে বলিয়া আমার জানা নাই। অবশ্য ভারতের অবস্থা অন্যত্র হইতে পৃথক, কাজেই ইহার প্রতিবিধানও পৃথক হইবে। তবুও এ-কথা আমি একান্তভাবে অনুভব করি যে, বারংবার ধর্ম্মঘট করিয়া আমাদের ছাত্রেরা ভ্রান্তপথে চলিয়াছে, এবং ভ্রান্ত কর্ম্মপ্রণালীতে বিজড়িত হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মঘট কর্ম্মিক (worker)দের একটি সুপরিচিত সমর-প্রতীক, এবং ধর্ম্মঘটের

অধিকার অনেক স্থানে বিধিপ্রণয়ন পূর্ব্বক কর্ম্মিকদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ধনিক ও কর্ম্মিকদের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কে একটা বিরোধ আছে, ধনিকদের মধ্যে কর্ম্মিকদের শোষণ ইচ্ছা প্রবল হইবার সম্ভাবনা আছে; এই জন্ত আত্মরক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মিকরা সংঘবদ্ধ হইয়াও ধর্ম্মঘট করিয়া থাকে। এ-ব্যাপারটা আমি বুঝিতে পারি।

পণ্ডিত জওআহরলাল বলেন যে, শ্রমিক ও ধনিকদের মধ্যে এই যে বিরোধের সম্ভাবনা রহিয়াছে, ছাত্র ও শিক্ষকে সেরূপ আর্থিক বা অন্ত কোন বিরোধ নাই; ছাত্র ও শিক্ষকের সহযোগিতাই শিক্ষার মূলকথা, নহিলে কোনরূপ শিক্ষাকার্য্য চলিতেই পারে না; সুতরাং বিশেষ গুরুতর কারণ ব্যতীত ছাত্রদের পক্ষে ধর্ম্মঘটের আশ্রয় লওয়া অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় এবং ইহার ফলে অবশেষে ছাত্র-আন্দোলনটিই বিনষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

কিছু দিন পূর্ব্বে, লক্ষ্ণৌতে, ছাত্রদের এক ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে এক ছাত্রসভায় ছাত্রদের বুঝাইতে গিয়া সফলকাম না-হইয়া পণ্ডিত জওআহরলাল অবশেষে বিরক্তিভরে সভাত্যাগ করিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে।

জওআহরলালের এই উপদেশের পর, ছাত্রগণ আগামী ২৬শে জানুয়ারী "স্বাধীনতা দিবস" উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়াদি বন্ধ না-থাকিলে ঐদিন ধর্ম্মঘট করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই কারণে হরতাল জওআহরলালের অনুমোদিত কি না, জানা নাই। ধর্ম্মঘট করিলে স্বাধীনতা আগাইয়া আসিবে কি?

আমাদের "স্বাধীনতা-দিবস" স্বাধীনতা-প্রাপ্তির স্মরণে আনন্দোৎসব নহে; ইহা, পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য, ইহা ঘোষণার দিবসের বার্ষিক স্মরণের দিন। ছাত্রগণ ঐ দিন বিদ্যালয়ে না-গিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য ঐ দিন সামান্য কাজও কি করিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় অতিরিক্ত কৌতূহলের পর্য্যায়ে পড়িবে।

কিছু দিন পূর্ব্বে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী নিরক্ষরতা দূরীকরণের সমবেত চেষ্টায় ছাত্র ও যুবকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন। বিহারের এই চেষ্টার ফলে ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ লোক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। বঙ্গের সরকার অবশ্য এইরূপ কোন উদ্যোগ করেন নাই। কিন্তু ছাত্র ও যুবকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ কিছু করিবেন বলিয়া কাগজে কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ফল কি হইয়াছে অবগত নহি। সরকারী উদ্যোগ ব্যতীত এরূপ চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হওয়া অবশ্য সম্ভব নহে, কিন্তু ছাত্রগণ স্বয়ং উদ্যোগী হইলেও অনেক কাজ নিশ্চয়ই হইতে পারে।

—

ছাত্রদের প্রতি অন্য কোন কোন নেতার উপদেশ

ছাত্রদের প্রতি অন্য কোন কোন নেতা এই উপদেশ দিয়াছেন যে, একটা ফেডারেশন-বিরোধী দিবস ঘোষণা করিয়া ঐ দিন স্কুল-কলেজ বয়কট কর। ছাত্রেরা এক দিন স্কুল-কলেজে না গেলে ফেডারেশন চালু হইতে কি বাধা হইবে, বুঝা যায় না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ছাত্রদের প্রচুর অবসর আছে, তাহাদের অর্থচিন্তা করিতে হয় না; তাহাদের উচিত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অগ্রণী ("advance guard") হওয়া।

ধনিকগণ কর্তৃক শ্রমজীবীদের "এক্সপ্লয়টেশনে"র কথা আমরা শুনিয়া থাকি। উপরিউক্ত কথাগুলি এক ধরণের নৈতিক "এক্সপ্লয়টেশন" বলা যাইতে পারে।

অবসরের কথা যদি বলেন, ছাত্রদের যে প্রধান কাজ লেখাপড়া করা, তাহা না-করিলে খুব অবসর আছে বটে। অর্থচিন্তাটাও এখন না থাকিলেও, তাহা পরে বেকার অবস্থায়, শোধ তুলিয়া—উইথ্ এ ভেঞ্জেন্স—হইতে পারিবে।

মহাত্মা গান্ধী এবং মান্দ্রাজ যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতির দেশশাসক কংগ্রেস-নেতারা রাষ্ট্রনীতির সহিত ছাত্রদের সক্রিয় যোগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

—

চীন-সরকার ও ছাত্রদল

"চায়না ইনফর্মেশন কমিটি" কর্তৃক চীন হইতে প্রেরিত চীন সম্বন্ধে আধা-সরকারী বিবরণ বহুদিন যাবৎ প্রতি সপ্তাহেই আমরা পাইয়া আসিতেছি। সম্প্রতি প্রাপ্ত এইরূপ একটি বিবরণে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি আছে:—

"যুদ্ধ চলুক বা না-চলুক, চীনের সংস্কৃতি রক্ষা করিতে হইবেই—ইহাই চীনের জাতীয় সরকারের নীতি। তদনুসারে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু দিন পরেই সরকার এই আদেশ দেন যে, শিক্ষা-ও-সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানসমূহ উপকূলবর্ত্তী স্থান হইতে চীনের অভ্যন্তরবর্ত্তী নিরাপদ স্থানে সরানো হউক, এবং ছাত্রেরা রাইফেলের দ্বারা নহে, পুস্তক ও তুলির সাহায্যে যুদ্ধে যোগ দিক ("students be en-

couraged to participate in the war with their books and brushes but not with rifles.")।

—

শ্রমিক ধর্ম্মঘট ও তাহার ফলাফল

এই নিবন্ধিকা ও ইহার পরবর্ত্তী নিবন্ধিকাতে ভারতবর্ষের বা অন্য কোন দেশের বিশেষ কোন ধর্ম্মঘট আলোচিত হয় নাই। সাধারণ ভাবে শ্রমিক ধর্ম্মঘট সমূহের আলোচনাই এই দুটির উদ্দেশ্য।

আধুনিক জগতে শ্রমজীবীদের ধর্ম্মঘট একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেন্দ্রীভূত কারখানা-প্রণালীতে মনুষ্যজাতির প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য-সম্ভার উৎপাদন সুরু হইবার পর হইতেই, জাতীয় অর্থনীতিতে সর্ব্বদেশেই শ্রমিক ও ধনিকের শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ ও দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। উভয় পক্ষেরই ইচ্ছা মোট লাভের অধিকাংশ নিজ উপভোগের জন্য পাওয়ার; ফলে বিবাদ ও কলহ। ধনিক অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বলিয়া শ্রমিকরা দলবদ্ধ হইয়া নিজ স্বার্থরক্ষার চেষ্টা আরম্ভ করে এবং শ্রমিক মূর্খ বলিয়া শ্রমজীবীর নেতারূপী এক বিশেষ জাতীয় অল্পবিত্তর শিক্ষিত কর্ম্মীর আবির্ভাব হয়। ধনিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের কলহের মধ্যে পড়িয়া জাতি ও সমাজের ক্রমাগতই বহু অসুবিধা ও অশান্তি সহ্য করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। মানবসভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে এই দুইটি অঙ্গই যেন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষা, চারুশিল্প, ললিতকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সেবা, শান্তিরক্ষা, শাসন, বিচার, চিকিৎসা, দেশরক্ষা প্রভৃতি নানান বিষয়ে যাঁহারা আত্ম-নিয়োগ করিয়া দিন কাটান, তাঁহারা ধনরাজ ও শ্রমরাজ এই দুই রাজার যুদ্ধক্ষেত্রে অসহায় অবস্থায় উলুখড়ের ভূমিকায় কোনমতে জান বাঁচাইয়া বর্ত্তমান আছেন। ইতালীতে জাতীয় শক্তির মালিক মুসোলিনি ধনশক্তি ও শ্রমশক্তিকে নিজের অধীন করিয়া উপরওয়ালা হইয়া উভয় বোড়াকেই কড়া শাসনে রাখিয়াছেন; জার্ম্মেনীতেও হিট্‌লার বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াইতেছেন। এই কারণে ইতালী ও জার্ম্মেনী যুদ্ধ-সম্ভার প্রস্তুতিতে ও সাধারণ পণ্যশিল্পক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। এই কলহ পৃথিবীব্যাপী এবং ইহার সম্যক্ আলোচনা অথবা ইহার বিভিন্ন তর্কের বিচার অল্পের মধ্যে করা য না। বর্ত্তমানে শুধু ইহার মোটামুটি পরিচয় দেওয় আমাদের উদ্দেশ্য।

১৯২৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দ অবধি পৃথি কয়েকটি দেশে এই জাতীয় ধর্ম্মঘট কি পরিমাণ ঘটিয়া তাহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবিভাগের সম্প্র প্রকাশিত ও প্রাপ্ত ৬৫১ সংখ্যক বুলেটিন হইতে তুলি দেখান হইতেছে। (এক জন মজুরের এক দিবে কাজকে এক মজুরী দিবস বলিয়া ধরা হয়)।

দেশ—অষ্ট্রেলিয়া

বৎসর	ধর্ম্মঘটের সংখ্যা	ধর্ম্মঘটকারীর সংখ্যা	নষ্ট মজুরী দিবসের সংখ্যা
১৯২৭	৪৪১	২০০৭৫৭	১৭১৩৫৮১
১৯২৮	২৮৭	৯৬৪২২	৭৭৭২৭৮
১৯২৯	২৫৯	১০৪৬০৪	৪৪৬১৪৭৮
১৯৩০	১৮৩	৫৪২২২	১৫১১২৪১
১৯৩১	১৩৪	৩৭৬৬৭	২৪৫৯৯১
১৯৩২	১২৭	৩২৯১৭	২১২৩১৮
১৯৩৩	৯০	৩০১১৩	১১১৯৫৬
১৯৩৪	১৫৫	৫০৮৫৮	৩৭০৩৮৬
১৯৩৫	১৮৩	৪৭০২২	৪৯৫১২৪
১৯৩৬	২৩৫	৬০৫৮৬	৪৯৪৩১৯

দেশ—বেলজিয়াম

বৎসর	ধর্ম্মঘটের সংখ্যা	ধর্ম্মঘটকারীর সংখ্যা	নষ্ট মজুরী দিবসের সংখ্যা
১৯২৭	১৮৬	৪৫০৭১	১৬৫৮৮৮৬
১৯২৮	১৯২	৭৭৭৮৫	২২৪৪৪২৪
১৯২৯	১৬৮	৬০৫৫৭	৭৯৯১১৭
১৯৩০	৯৩	৬৪৭১৮	৭৮১৬৪৬
১৯৩১	৭৪	২৩০১০	৯৩৯০৩৭
১৯৩২	৬৩	১৬২৬১৩	৫৮০৬৭০
১৯৩৩	৮৭	৩৩১৩৬	৬৬৪০৪৪
১৯৩৪	৭৯	৩৬৫২৫	২৪৪১৩০৫
১৯৩৫	১৫০	১০৪০১৩	৬২০০০২
১৯৩৬	৯৯৯	৫৬৪৮৩১	

দেশ—চীন

বৎসর	ধর্ম্মঘটের সংখ্যা	ধর্ম্মঘটকারীর সংখ্যা	নষ্ট মজুরী দিবসের সংখ্যা
১৯২৭	১১৭	৮৮১২৮৯	৭৬২২০২৯
১৯২৮	১১৮	২০৪৫৫৩	২০৪৯৮২৯
১৯২৯	১০৮	৬৫৫৫৭	৭১১৯২১
১৯৩০	৮৭	৬৪১৩০	৮০১৫০১
১৯৩১	১২২	৭৪১৮৮	৬৮৯৯৪১
১৯৩২	৮২	৭১০৩৯	৭১০৬০৪
১৯৩৩	৮৮	৭৪৯৩৭	৪৬১৬১৯
১৯৩৪	৭৩	৩১৪৭৩	৫০১২৪৫
১৯৩৫	৯৫	৯৬৬৮৪	৫১৭৬৬৬
১৯৩৬	১২৮	৭৮৯৯২	[illegible]

দেশ—ফ্রান্স

বৎসর	ধর্ম্মঘটের সংখ্যা	ধর্ম্মঘটকারীর সংখ্যা	নষ্ট মজুরী দিবসের সংখ্যা
১৯২৭	৪৫৪	১১২৬৩৩	১০৪৬০১৯
১৯২৮	৮২৩	২১০৪৮৮	৬৩৭৫৬৭৫
১৯২৯	১২১৭	২৭১০৪০	২৭৬৪৬০৬
১৯৩০	১০৯৭	৫৮৪৫৭৯	৭২০৯৩১১
১৯৩১	২৬১ আন্দাজ	৫৫৭২৩	
১৯৩২	৩৫০	৫৪০৮৮ আন্দাজ	
১৯৩৩	৩৩১	৮৪৩৯১	
১৯৩৪	৩৭৪	৬১০৪৫	
১৯৩৫	৪২৫	৮৯৭২৬	

দেশ—জার্ম্মেনী

১৯২৭	৮৭১	৫০৩২৭	৬০৪৩৬৯৮
১৯২৮	৭৬৩	৭৮০৩৯৬	২০২৮৮২১১
১৯২৯	৪৪১	২৩৪৫৪৩	৪৪৮৯৮৭০
১৯৩০	৩৬৬	২২৪৯৮৩	৩৯৩৫৯৭৭
১৯৩১	৫০৪	১৭৮২২৩	২০০১৯৭৮
১৯৩২	৬৪২ আন্দাজ	১৭৫৮৭ আন্দাজ	১১১২০৫৩

১৯৩৩, ১৯৩৪, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬-এর সংখ্যা জানা যায় না।

দেশ—গ্রেটব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড

১৯২৭	৩০৮	১০৮০০০	১১৭০০০০
১৯২৮	৩০২	১২৪০০০	১৩৯০০০০
১৯২৯	৪০১	৫৩৩০০০	৮২৯০০০০
১৯৩০	৪২২	৩০৭০০০	৪৪০০০০০
১৯৩১	৪২০	৪৯০০০০	৬৯৮০০০০
১৯৩২	৩৮৯	৩৭৯০০০	৬৪৯০০০০
১৯৩৩	৩৫৭	১৩৬০০০	১০৭০০০০
১৯৩৪	৪৭১	১৩৪০০০	৯৬০০০০
১৯৩৫	৫৫৩	২৭১০০০	১৯৬০০০০
১৯৩৬	৮০৮	৩১৫০০০	১৮৩০০০০

দেশ ইতালী

১৯২৭	১৬৯	১৮৬৬০
১৯২৮	৭৭	২৯৯৯
১৯২৯	৮৩	৩২৫২
১৯৩০	৮২	২৮৬৩
১৯৩১	৬৭	৪১৪১
১৯৩২	২১	৫৯৮
১৯৩৩	৩৪	৮৪১
১৯৩৪	৩৮	৫৭৬
১৯৩৫	৪৩	৬০৫

ইতালী দেশে ১৯২৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ধর্ম্মঘট বে-আইনী কার্য্য বলিয়া জারি হইয়াছে। এই সংখ্যাগুলি শুধু আইনভঙ্গের সংখ্যা হিসাবেই দেখান হইয়াছে।

দেশ—জাপান

বৎসর	ধর্ম্মঘটের সংখ্যা	ধর্ম্মঘটকারীর সংখ্যা	নষ্ট মজুরী দিবসের সংখ্যা
১৯২৭	৩৮৩	৪৬৬৭২	১১৭৭৩৫২
১৯২৮	৩৯৭	৪৬২৫২	৫৮৩৫৯৫
১৯২৯	৫৭৬	৭৭৪৪৪	৫৭১৮৬০
১৯৩০	৯০৬	৮১৩৬২	১০৮৫০৭৪
১৯৩১	৯৯৮	৮৪৫৩৬	৯৮০০৫৪
১৯৩২	৮৯৩	৫৪৭৮৩	৬১৮৬১৪
১৯৩৩	৬১০	৪৯৪২৩	৩৮৪৫৬৫
১৯৩৪	৬২৬	৪৯৫৩৬	৪৪৬১৭৬
১৯৩৫	৫৮৯	৩৭৬১৪	২৯৭৭২৪

দেশ—ভারতবর্ষ

১৯২৭	১২৯	১৩১৬৫৫	২০১৯৯৭০
১৯২৮	২০৩	৫০৬৮৫১	৩১৬৪৭৪০৪
১৯২৯	১৪১	৫৩২০১৬	১২১৬৫৬৯১
১৯৩০	১৪৮	১৯৬৩০১	২২৬১৭৩১
১৯৩১	১৬৬	২০৩০০৮	২৪০৮১২৩
১৯৩২	১১৮	১২৮০৯৯	১৯২২৪৩৭
১৯৩৩	১৪৬	১৬৪৯৩৮	২১৬৮৯৬১
১৯৩৪	১৫৯	২২০৮০৮	৪৭৭৫৫৫৯
১৯৩৫	১৪৫	১১৪২১৭	৯৭৩৪৫৭
১৯৩৬	১৫৭	১৬৯০২৯	২৩৫৮০৬২

ধর্ম্মঘটের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের স্থান বেশ উচ্চে। যদি ভারতবর্ষের স্থান কারখানা-জগতেও সমান উচ্চে হইত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু এতটা ধর্ম্মঘট একটা কৃষিপ্রধান দেশে হইলে তাহার অর্থ এই যে, এ-দেশের শ্রমিক ও ধনিক কাজ চালান অপেক্ষা ধর্ম্মঘটে অধিক দক্ষ। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মঘট ও ধর্ম্মঘটকারীর সংখ্যার তুলনায় ভারতবর্ষের নষ্ট মজুরী দিবসের সংখ্যাটিও অত্যধিক। অর্থাৎ এদেশে ধর্ম্মঘট সহজে থামিতে চায় না। আমেরিকার হিসাব দেখিলে বলা যায় যে, ধর্ম্মঘট যত অধিক কাল স্থায়ী হয়, তাহাতে শ্রমিকের জয়ের সম্ভাবনা ততই কম হয়। ১৯২৭-৩৬, এই দশ বৎসরে ১২১৫৭টি ধর্ম্মঘটের চর্চ্চা হইতে দেখা যায় যে, ধর্ম্মঘট এক সপ্তাহ বা আরও অল্পকাল স্থায়ী হইলে ফলে শতকরা ৩৯.৭ বার শ্রমিকেরই লাভ হয় বেশী, ১৯.৩ বার লাভ লোকসান সমান সমান হয়, ৩৫.৫ বার লোকসান হয় ও ৫.৫ বার ফল অজানা থাকিয়া যায়। এই ভাবে দেখিলে আরও দেখা যায় যে, ধর্ম্মঘটের জের অনুসারে শতকরা কত বার কি প্রকার মীমাংসা হয়।

ধর্ম্মঘটের জের	শ্রমিকের লাভ বেশী	শ্রমিকের লাভ অল্প	শ্রমিকের লোকসান	অজানা
১ সপ্তাহ হইতে ১৫ দিন	৩৯.২	২৬.৪	২৯.৯	৪.৫
১৫ দিন হইতে এক মাস	৩৬.৩	২৭.১	৩২.০	৪.৬
১ মাস হইতে দুই মাস	২৬.২	২৪.৭	৪৩.০	৬.১
২ মাস হইতে তিন মাস	২৪.৮	৩০.১	৩৯.১	৬.০
৩ মাস হইতে অধিক	২১.৯	২৫.৮	৪৮.২	৪.১

সুতরাং দেখা যায় যে, অধিক কাল ধর্ম্মঘট চালাইয়া শ্রমিকের কোন অধিক লাভ তো হয়ই না, বরঞ্চ, নিঃসন্দেহ লোকসানই অধিক হয়।

ধর্ম্মঘট হইলেই সামাজিক লোকসান, অশান্তি ও কষ্টের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় শ্রমিকের যে-যে স্থানে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিক অভাব, সেই সকল স্থানে শ্রমিক-নেতাদিগের আবির্ভাব হয় না। তাঁহারা শুধু বড় বড় কারবার খুঁজিয়া যে কোন কারণেই হউক সেখানকার শ্রমিকের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতেই সতত আগ্রহবান হয়েন। শ্রমজীবীদের জীবন আনন্দময় হয় ইহা সকলেরই আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু স্থানে, অস্থানে, অকারণে বা অল্প কারণে ধর্ম্মঘট ঘটাইলেই সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। ইহার জন্ত আরও সুচিন্তা, শ্রমের সকল ক্ষেত্র উত্তমরূপে বুঝিয়া দেখা ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে উপযুক্ত লোকের দ্বারা প্রতিকার-চেষ্টা প্রয়োজন। হল্লা হুজুগ করিলে তথাকথিত নেতা-দিগের আত্মপ্রসাদ-অনুভব সুগম হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত লাভ তাহাতে নাই—সমাজ, শ্রমিক বা কাহারও না।

ধর্ম্মঘটের প্রকৃতি

সাধারণ বুদ্ধিতে বলে যে, অন্তায় অবিচার বা অত্যাচার বর্ত্তমান থাকিলেই তাহার প্রতিকার-চেষ্টা হওয়া উচিত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘট অর্থনৈতিক অন্তায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্তই ঘটে; সুতরাং শ্রমিকের বেতন, কার্য্যসময় বা অন্তান্ত সুবিধা অসুবিধা যত অধিক অসন্তোষ-জনক হইবে, ততই ধর্ম্মঘট বাড়িয়া চলিবে। কিন্তু ধর্ম্মঘটের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সাধারণ বুদ্ধির বিচার ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়। দেখা যায় যে, ধর্ম্মঘটের প্রাবল্যের সহিত অর্থনৈতিক অবিচার বা অত্যাচারের সম্বন্ধটা উন্টা রকমের। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দ অবধি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি শ্রমিক-ধনিক-বিবাদ-ঘটিত ধর্ম্মঘট হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতি ও শ্রমিকের দুর্দ্দশা বৃদ্ধির সহিত ধর্ম্মঘট ক্রমশঃ কমিতে থাকে, এবং শ্রমিকের অবস্থার উন্নতির সহিত তাহার ধর্ম্মঘটস্পৃহা বাড়িয়া উঠে। ইহা দেখিয়া আমেরিকান অর্থনীতিজ্ঞ সমাজে এই ধারণাই হইয়াছে যে, ধর্ম্মঘটের প্রাদুর্ভাব রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি ও শ্রমিক-সাধারণের মানসিক অবস্থার সহিত এবং শ্রমিকনেতারা যেরূপ ধাঁচের মানুষ তাহার সহিত বিশেষ করিয়া জড়িত।* যে উপলক্ষ্যে ধর্ম্মঘট আরম্ভ, তাহা অধিকাংশ স্থলেই উপলক্ষ্য মাত্র—আসল কারণ তাহা ব্যতীত আর কিছু।

বর্ত্তমান ভারতে যে ধর্ম্মঘটের যুগ চলিতেছে, তাহার সম্যক্ আলোচনা কেহ করেন নাই। করিলে সম্ভবত আমেরিকার অবস্থারই প্রতিচ্ছায়া এদেশেও দেখা যাইবে। ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত বিষয়ে জনসাধারণ সহানুভূতি দেখাইবেন কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখা দরকার যে, সত্যসত্যই কোন অন্তায় বা অবিচার আছে কি না, অথবা তথাকথিত অন্তায় অবিচার উপলক্ষ্য করিয়া অপর কোন গূঢ়তর প্রেরণায় বা অনুপযুক্ত ও অশিক্ষিত নেতার প্ররোচনায় ধর্ম্মঘট করা হইতেছে। সকল ক্ষেত্রেই যে শ্রমজীবীদের নেতাগণ মানবপ্রেমিক, নিঃস্বার্থ ও ত্যাগশীল, এ কথাও স্বীকার করা চলে না। ইহাও দেখা যায় যে, শ্রমের বাজারে, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল অন্তায় ও অবিচার উপস্থিত, শ্রমজীবীনেতা সেখানে আন্দোলন করিতে উপস্থিত হয়েন না; যে-সকল ধনিক ঐশ্বর্য্যশালী

* "In the main, strikes tend to diminish when business activity declines and job opportunities disappear.... It would appear that other conditions, such as the political situation, the state of mind of the workers, and *the type of labour leadership* have as much to do with the amount of strike activity as the purely economic factors of prices and business conditions. (Italics ours —EDITOR, *Prabasi*).—Strikes in the United States, 1880-1936: By Florence Petersen, Page 20, Paragraph 1.

তাঁহারাই এই সকল নেতাদিগের অন্দোলন-আগ্রহ জাগাইয়া তোলেন।

ভারতের গ্রামের বাসিন্দা যে-সকল দরিদ্র লোক কারখানায় খাটিয়া খাইতে আইসে, তাহারা গ্রাম অপেক্ষা কারখানায় আর্থিক দিক দিয়া বহু উন্নততর ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে। বহু ক্ষেত্রে তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও পারেন না। এই কথা ধর্ম্মঘটবহুল কারখানার কেন্দ্রস্থলগুলি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া সত্য। কিন্তু শ্রমজীবীদিগের অনেক নেতা তাহাদিগকে উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে যতটা না শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক চেষ্টা করেন কারণে অল্প কারণে বা অকারণে অসন্তোষের বন্যা ডাকাইয়া দেশ তোলপাড় করিয়া তুলিতে। এই সকল নেতা বহু ক্ষেত্রেই অর্থনীতির বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও বক্তৃতাসার। শ্রমিকের দিক দিয়া ধনিকের বিরুদ্ধে যে অনেক বলিবার আছে ও থাকিতে পারে, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। যুগে যুগে মানব-সমাজে শ্রমিকের উন্নতির জন্য যত চেষ্টা আইন-প্রণয়ন ইত্যাদি হইয়াছে, তাহাই কথাটার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু যথার্থ উন্নতির জন্য যাঁহারা প্রাণপাত করিয়াছেন তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের ভুঁইফোঁড় নেতাদিগের স্বজাতি নহেন। অবশ্য বিশেষজ্ঞ ধীর শ্রমিকনেতাও আছেন। জাতীয় ভাবে আমাদের এই প্রশ্নের বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। সে আলোচনা উপযুক্ত ও বিশেষজ্ঞ লোক দিয়া হওয়া প্রয়োজন। অর্থনীতি, সমাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যাঁহারা গাছে না উঠিয়াই এক এক কাঁদি পাড়িয়া লইতে ব্যগ্র, তাঁহারা কলহের সৃষ্টি করিতে উত্তমরূপেই পারেন, কিন্তু মীমাংসা তাঁহাদের ক্ষমতার বাহিরে। এই গরীব দেশে যে লক্ষ লক্ষ লোকের লক্ষ লক্ষ দিনের মজুরী হাঙ্গামা করিয়া নষ্ট হইতেছে এবং পরোক্ষভাবে সমাজের বহু লোকের তাহাতে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি হইতেছে, ইহার প্রতিকার আবশ্যক। কারণ শ্রমিকের শ্রম শুধু তাহার নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায় নহে। এই শ্রমের ফল ও সেই ফলের চালান, বিনিময়, সংরক্ষণ, হিসাব, ভাগবাঁটোয়ারা প্রভৃতির উপর জাতির কর্ম্মীর সংস্থান নির্ভর করে। শ্রমশক্তির অপচয় অন্য ভাবে জাতীয় ঐশ্বর্য্যের অপচয়। এই অপচয়-নিবারণ-চেষ্টা সকলের কর্ত্তব্য।

—

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কংগ্রেসে যোগ দিবার অভিপ্রায়

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংঘের সম্পাদক বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদককে জানাইয়াছেন যে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা যাহাতে বহু সংখ্যায় কংগ্রেসের সভ্য হন, সেজন্য চেষ্টা চলিতেছে। ইহা সুখের বিষয়। তাঁহারা যদি নিজেদের আলাদা কিছু মনে না করিয়া নিজেদের ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দেন, ও অখিল ভারতবর্ষের সুখদুঃখের অংশী হন, তবে তাহা তাঁহাদের নিজেদের পক্ষেও মঙ্গল, নানারূপ বিভেদে বিচ্ছিন্ন দেশের পক্ষেও মঙ্গল। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংঘের সম্পাদক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন বলিয়া তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি কনষ্টিট্যুয়েন্সি করিতে পারিলে ভাল হয়। তাঁহারা যে যেখানে আছেন, নিজেদের কোন স্বাতন্ত্র্য-কল্পনা বিস্মৃত হইয়া সেই সেই স্থানে কংগ্রেসের সভ্য হইতে এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল কর্ম্মীদের সহযোগে কাজ করিতে পারিলেই কিন্তু ভাল হয়।

—

রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে বহু টাকা দান করিয়া ময়মনসিংহ জেলায় দানশীল রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন ও ধনাঢ্য জমিদার হইয়াও সর্ব্বসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সম্প্রতি পরিণত বয়সে তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে।

শান্তিনিকেতনে স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা

সম্প্রতি স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা বিশ্বভারতী দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্দেশে যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন, নীচে তাহা মুদ্রিত হইল।

"উত্তরায়ণ"
শান্তিনিকেতন

শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য কল্যাণীয়েষু

আজকের এই অস্তোন্মুখ সূর্যের মতোই আমার হৃদয় আমার জীবনের পশ্চিম দিগন্ত থেকে তোমার প্রতি তার আশীর্বাদ বিকীর্ণ করছে।

তোমার সঙ্গে আজ আমার এই মিলন আর একদিনকার শুভ সম্মিলনের আলোকেই উদ্দীপ্ত হয়ে দেখা দিলে। সে কথা আজ তোমাকে জানিয়ে দেবার উপলক্ষ্য ঘটল বলে আমি আনন্দিত। তখন তোমার জন্ম হয় নি, আমি তখন বালক। একদা তোমার স্বর্গগত প্রপিতামহ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, কেবল আমাকে এই কথা জানাবার জন্তে যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতে চান। দেশের কাছ থেকে এই আমি প্রথম সমাদর পেয়েছিলুম। প্রত্যাশা করি নি এবং এই বহুমানের যোগ্যতা লাভ করবার দিন তখন অনেক সুদূরে ছিল। তার পরে স্বাস্থ্যের সন্ধানে কার্সিয়ঙে যাবার সময়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে ডেকে নিয়েছিলেন। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতেন প্রিয় বয়স্যের মতো। তাঁর সংগীতের জ্ঞান অসাধারণ ছিল কিন্তু আমার সেই কাঁচা বয়সের রচিত ছেলেমানুষি গান তিনি আদর করে শুনতেন, বোধ হয় তার মধ্যে ভাবী পরিণতির কোনো একটা সম্ভাবনা প্রত্যাশা করে। এ যেন কোন্ অদৃশ্য রশ্মির লিপি অঙ্কিত হয়েছিল তাঁর কল্পনার পটে। আজ সকলের চেয়ে বিস্ময় লাগে এই কথা মনে করে যে, বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে মহারাজার মনে যে সকল সংকল্প ছিল আমাকে নিয়ে তার পরামর্শ করতেন এবং আমাকে সেই সাহিত্য অনুষ্ঠানের সহযোগী করবেন ব'লে প্রস্তাব করেছিলেন। তার অনতিকাল পরেই কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর মৃত্যু হোলো। মনে ভাবলুম এই রাজবংশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধসূত্র এইখানেই অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তা যে হোলো না সেও আমার পক্ষে বিস্ময়কর। তাঁর অভাবে ত্রিপুরায় আমার যে সৌহৃদ্যের আসন শূন্য হোলো মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য অবিলম্বে আমাকে সেখানে আহ্বান করে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সমাদর পেয়েছিলুম তা দুর্লভ। আজ একথা গর্ব করে তোমাকে বলবার অধিকার আমার হয়েছে যে ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত, তাঁকে তাঁর অনভিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্তে বন্ধু ভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে ত্রিপুরা রাজবংশ গৌরব লাভ করেছেন। তেমন গৌরব বর্তমান ভারতবর্ষের কোনো রাজকুল আজ পর্য্যন্ত পান নি। এই সম্মেলনের যে একটা ঐতিহাসিক মহার্ঘতা আছে আশা করি সেকথা তুমি উপলব্ধি করেছ। যে সংস্কৃতি, যে চিত্তোৎকর্ষ দেশের সকলের চেয়ে বড়ো মানসিক সম্পদ, একদা রাজারা তাকে রাজৈশ্বর্যের প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য করতেন তোমার পিতামহেরা সে কথা মনে মনে জানতেন। এই সংস্কৃতির সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, এবং সে সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য ছিল। আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখস্মৃতির দক্ষিণ সমীরণ তুমি বহন করে এনেছ। আজ তুমি বর্তমান দিনকে সেই অতীতের অর্ঘ্য এনে দিয়েছ, এই উপলক্ষ্যে তুমি আমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেই দান গ্রহণ করো যা তোমার পিতামহদের অর্পণ করেছিলুম, আর গ্রহণ করো আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮।১।৩৯

মহারাজা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদের যথাযোগ্য উত্তর দেন। ত্রিপুরার একটি প্রশংসনীয় বিশেষত্ব এই যে, ইহার সমুদয় রাজকার্য্য বাংলায় হয়, বার্ষিক রিপোর্ট এবং সেন্সস রিপোর্টও বাংলায় লিখিত হয়।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা

যে-সকল দেশ স্বাধীন, যেখানে দেশের লোকদেরই কারখানায় পণ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, যেখানে আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিস্তারিত ভাবে চাষের কাজ করা হয়, এবং যেখানে ব্যবসাবাণিজ্য সুবিস্তৃত ও দেশের লোকদেরই করায়ত্ত, তেমন সকল দেশেও সমর্থ বয়সের বেকার লোক আছে, কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় খুব কম। আমাদের দেশ পরাধীন, বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য যত রকম রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা ও চেষ্টা করা যাইতে পারে, তাহা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অন্য যে-যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও আমাদের দেশের—বিশেষতঃ বঙ্গের—অবস্থা ঠিক্ উল্টা। এই জন্য বঙ্গের বেকার-সমস্যা সঙীন আকার ধারণ করিয়াছে।

এ-অবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে একটি এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড ইন্‌ফর্মেশন বোর্ড স্থাপন করিয়াছেন

এবং বঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য ও কারখানা কত রকম আছে ও হইতে পারে, বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা সে-বিষয়ে চব্বিশটি বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় ব্যবস্থা। প্রথম বক্তৃতা যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প সম্বন্ধে করান হইয়াছে, তাহা সমীচীন হইয়াছে। বাঙালীদিগকে শিল্পবাণিজ্যমুখো করিবার জন্য আধ শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার মত চেষ্টা আর কেহ করেন নাই। সাধারণ ব্যবসাবাণিজ্য, কয়লা, চা, লোহা, ইস্পাত, সুতা কাপড়, পাট, শেয়ার-বাজার, জীবন বীমা, চামড়া, জাহাজের কাজ, চিনি, কাগজ, ছোট ছোট পণ্যশিল্প, কলিকাতা বন্দর—এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা হইবে। আশা করি বক্তৃতাগুলি ইংরেজীতে ও বাংলায় পুস্তকের আকারে ছাপা হইয়া অল্প দামে বিক্রী করা হইবে।

খুব সামান্য পুঁজীতে কি কি ব্যবসা ও পণ্যশিল্পের কাজ চালাইয়া জীবন ধারণের ব্যয় ছাড়া বৃহত্তর ব্যবসার জন্য সঞ্চয় করা যায়, এবং বিনা পুঁজীতে কি কি উপায়ে আয় ও সঞ্চয় নিরক্ষর লোকেরাও করে—এই উভয় বিষয়ে বক্তৃতা হওয়া আবশুক।

অ-বাঙালীরা বঙ্গে আসে টাকা রোজগারের জন্য। বঙ্গে বাঙালীদের বাস শুধু উপার্জ্জনের জন্য নহে। তজ্জন্য, উপার্জ্জনকেই বাঙালীরা বঙ্গে বাসের একমাত্র বা প্রধান লক্ষ্য করে না। অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে তাহাদের পরাজয়ের ইহা একটি কারণ; যেন-না, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—যার যেরূপ ভাবনা তার সিদ্ধি সেইরূপ হয়। আরও অনেক কারণ আছে। বাঙালীরা বঙ্গে যে-যে দিকে জন্মগত অধিকার হইতে চ্যুত হইয়াছে, তাহা পুনরায় পাইতে হইলে তাহাদিগকে সব রকম আগন্তুকদের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী, সৎ ও পরস্পরের সহায়, এবং তাহাদের চেয়ে কম হুজুকপ্রিয় ও কম আমোদপ্রিয় হইতে হইবে। বঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুদের ও হিন্দু ছাত্রদের এখনও একটি প্রায় একচেটিয়া কাজ আছে—যদিও তাহা অবৈতনিক; তাহা আন্দোলন। কিন্তু তাহারও নেতা—কৃষকনেতা, সমাজতন্ত্রীনেতা, ছাত্রনেতা—বিহার দিল্লী প্রভৃতি হইতে আসিতেছে। অতএব, Othello's occupation is gone—যে অকুপেশুনে পয়সা আছে তাহা গিয়াছে, যাহাতে পয়সা নাই তাহাও যাইতেছে। ইহার প্রতিকার, ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ্।

—

বাঙালী ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল কমীটির ১৯৩৭-৩৮ সালের রিপোর্টে লেখা হইয়াছে যে, ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯৩৭ সালের বাঙালী ছাত্র অধিক সবল ও স্বাস্থ্যবান্। ইহা ভাল খবর। তাঁহাদের স্বাস্থ্য আরও ভাল হওয়া চাই। কারণ ঐ রিপোর্টেই ইহাও লেখা আছে যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহের ছাত্রদের চেয়ে বাঙালী ছাত্রদের দৈহিক সামর্থ্যের মান এখনও অনেক কম।

—

রাজশাহীতে হিন্দুশোভাযাত্রা আক্রান্ত

গত ১০ই জানুয়ারী পুলিসের অনুমতিক্রমে হিন্দু মিশনের সভাপতি স্বামী সত্যানন্দ ও সাবিত্রী দেবী নামধারিণী গ্রীক মহিলা রাজশাহীতে হিন্দুদের একটি শোভাযাত্রা "পরিচালনা" করিতেছিলেন। তাহা একটি মসজিদের সম্মুখে আসিলে আক্রান্ত হয়—ইত্যাদি। মুসলমানদের অনেকের এই কদর্য্য ও বিরক্তিকর রোগের প্রতিকার মুসলমান সমাজের নেতারা করিতে পারেন, কিন্তু করেন না। তাঁহারা করিলেই ভাল হয়। গবর্ন্মেণ্টও করিতে পারেন, কিন্তু করেন না।

হিন্দুরা যে মনে করেন যে, আইন ও ন্যায় তাঁহাদের পক্ষে থাকিলেই তাঁহারা নিরুপদ্রবে দিন কাটাইবেন, সেটা তাঁহাদের মহা ভ্রম। আরও কিছু তাঁহাদের পক্ষে থাকা চাই।

—

সংখ্যাভূয়িষ্ঠদের জন্য চাকরী সংরক্ষণ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে যে, মুসলমানেরা শতকরা ৬০টা সরকারী চাকরী পাইবে। গবর্ণর এখনও ইহাতে মত দেন নাই। প্রধান মন্ত্রী এখন কংগ্রেস-নেতা ও অন্য নেতাদের সঙ্গে কন্‌ফারেন্স করিয়া জিনিষটা পাকা করিয়া লইতে চান। তাহার পর বোধ

করি গবর্ণরকে ধরিবেন। আমরা কোন প্রকার ভাগাভাগির সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতশাসন আইনের ২৯৮ ধারা অনুসারে গবর্ণর সংখ্যাভূয়িষ্ঠদের জন্ত চাকরী সংরক্ষণ করিতে পারেন না, সংখ্যান্যূনদের জন্ত পারেন। কিন্তু ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট অব ইন্‌স্ট্রাক্‌শ্যন্সের নবম প্যারাগ্রাফ অনুসারে তাঁহাকে যে অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে তিনি যা খুশি তাই করিতে পারেন। কিন্তু তাহা করাতেও এই বাধা আছে যে, তাঁহাকে ভারত-শাসন আইন সংখ্যান্যূনদের অধিকার রক্ষার জন্ত বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিয়াছে। হিন্দুরা বঙ্গে সংখ্যান্যূন। মুসলমানদিগকে শতকরা ৬০টা সরকারী চাকরী দিলে হিন্দুদের অধিকার রক্ষিত হয় না। তাহা গবর্ণর কি প্রকারে রক্ষা করিবেন ?

—

বিজ্ঞান কংগ্রেস ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল কন্‌ফারেন্স

গত মাসে লাহোরে বিজ্ঞান কংগ্রেস ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। উভয়েই যে-সকল বিশেষজ্ঞ যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীও ছিলেন এবং তাঁহারা অন্তদের চেয়ে কম জ্ঞানের পরিচয় দেন নাই। এই সময় লাহোরে জ্ঞানের ও কেজো কথার 'মানসিক ভোজ' হইয়াছিল।

—

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়

"বন্দেমাতরম্" গান করার জন্ত যে কয়েকশত হিন্দু ছাত্র অন্যায় রূপে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাড়িত হইয়াছেন, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগকে ভর্ত্তি করিতেছেন। এই ছাত্রদের দৃঢ়তা অতীব প্রশংসনীয়। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার ও নির্ভীক আতিথেয়তাও সাতিশয় প্রশংসনীয়।

—

হায়দরাবাদে কংগ্রেসী সত্যাগ্রহ বন্ধ

অনেক দেশী রাজ্যের কংগ্রেসীরা সত্যাগ্রহ করিতেছেন। তন্মধ্যে কেবল মুসলমান রাজ্য হায়দরাবাদে কংগ্রেসের আদেশে কংগ্রেসী সত্যাগ্রহ বন্ধ করা হইয়াছে। আশ্চর্য্য বটে, ও নয়। আশ্চর্য্য এই জন্ত যে, হায়দরাবাদে অধিকাংশ প্রজার প্রতি যে অবিচার ও অত্যাচার আছে, অন্ত কোন দেশী রাজ্যে তাহা অপেক্ষা বেশী নাই। আশ্চর্য্য নহে এই জন্য যে, নিজাম মুসলমান, মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে ধমক দিয়াছিল, এবং মুসলমানদিগকে খুশি করিবার চেষ্টায় কংগ্রেস অসঙ্গত ব্যবহার করিতেও প্রস্তুত। আমরা কংগ্রেসের মূলনীতিতে বিশ্বাস করি। সেই জন্য, এইরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবহারে কংগ্রেসের জন্ত দুঃখিত।

—

আবার রেল দুর্ঘটনা

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে আবার দুর্ঘটনা হইয়াছে ও তাহাতে বহুসংখ্যক লোক হত ও আহত হইয়াছে। ইহার কৈফিয়ৎ যাহাই হউক, রেল কোম্পানী ও তাহার মালিক গবর্ন্মেণ্টও ইহার জন্ত খুব বেশী দায়ী ও দোষী।

—

"সাম্যবাদের গোড়ার কথা"

"সাম্যবাদের গোড়ার কথা" বহি নিষেধমুক্ত হওয়া ভাল খবর। "বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ" বহিটি কেন নিষেধ মুক্ত হইবে না ?

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

শ্রীগোপাল হালদার

মিউনিখে হিট্‌লার ইউরোপের রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার পর সকলেই মনে করিয়াছে. এবার ইউরোপের অন্যতম সম্রাট বেনিতো মুসোলিনীও নিশ্চয়ই অবিলম্বে এক রাজসূয় যজ্ঞের ব্যবস্থা করিবেন। মনে হইয়াছিল, সে যজ্ঞস্থল বুঝি হইবে স্পেন—ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি চালু করিবার প্রয়াসে তাহাই আরও ভাল করিয়া বুঝা গিয়াছিল। মুসোলিনী অবশ্য এই সম্পর্কে তাঁহার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিতে ব্যস্ত হন নাই—মিউনিখে চেম্বারলেন-দালাদিয়ের হাতে গণতান্ত্রিকতার পরাজয়ের পরে সেই বিষয়ে আর তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিবেই বা কে ? অতএব, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষই ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি সচল করিবার জন্য চেষ্টিত হন—স্পেন হইতে মুসোলিনী তো কিছু ইতালীয় স্বেচ্ছাসেবক দেশে ফিরাইয়া লইয়াছেন, তাহাই ব্রিটেনের মুখরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারও এই সময়ে 'আন্তর্জাতিক বাহিনী' ভাঙিয়া দেন—হয়ত দীর্ঘকালের যুদ্ধে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সমাজতান্ত্রিকরাও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, হয়ত একটা যুক্তিও সরকার-পক্ষের প্রদর্শন করা সম্ভব হইল—তাঁহারা আর বিদেশীয়দিগকে স্পেনের এই গৃহযুদ্ধে স্থান দিবেন না ; অতএব ফ্রাঙ্কোর পক্ষেও যেন আর ইতালীয় বা জার্ম্মান বিদেশীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতি না থাকে। অবশ্য এই 'আশা' স্পেন-সরকার মিউনিখের পরেও পোষণ করিবেন. এত নির্ব্বোধ তাঁহারা নহেন ; আর তাঁহাদের এই যুক্তি যে নিষ্ফল হইবে তাহাও তাঁহারা বুঝিতেন। কার্য্যতও হইয়াছে তাহাই—যে কয় হাজার পরিশ্রান্ত ইতালীয় সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে নূতন ইতালীয় স্বেচ্ছাসেবক স্পেনের ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে—ফ্রাঙ্কো বরং অধিকতর লাভবানই হইতেছেন। তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে আজকাল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই কথা ছিল তিনি 'যুদ্ধরত শক্তির অধিকার' লাভ করিবেন—অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি আর বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, স্পেনের গণতান্ত্রিকরাও আর স্পেনের সরকার বলিয়া স্বীকৃত হইবেন না—দুই দলেরই স্থান হইবে সমান, যুদ্ধরত শক্তির স্থান, ইহাতে ফ্রাঙ্কোর অসুবিধা আরও দূর হইবার কথা—অবশ্য নিরপেক্ষ জাতিদের জাহাজ ডুবাইয়া ফ্রাঙ্কো সেই অসুবিধা দূর করিয়াই লইয়াছিলেন, ব্রিটেন ফ্রান্স কাহারও পরোয়া করেন নাই। তবু যুদ্ধরত শক্তি বলিয়া গণ্য হইলে তাঁহার আসন হইত সর্ব্বস্বীকৃত। আর ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে পীরানিজের গিরিপথ তো পূর্ব্বেই প্রায় বন্ধ হইয়াছিল,—সে-পথে স্পেন-সরকার আর অস্ত্রশস্ত্র কিনিয়া আনিতে পারিতেন

না—এখন চেম্বারলেনেরই গোপন পরামর্শে সে-পথে স্পেনীয় সরকার-পক্ষের জন্য খাদ্য-সরবরাহও বন্ধ হইয়া গেল। অতএব অস্ত্রাভাবে, খাদ্যাভাবে, স্পেনের গণতান্ত্রিকরা আর কতদিনই বা টিকিবে? তখনই ভূমধ্যসাগরের এই কোণে বিজয়ী ফ্রাঙ্কোকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া মুসোলিনীই অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিবেন,—স্পেনের উপকূলস্থ বেলেরিক দ্বীপপুঞ্জে তাঁহার নব-নির্ম্মিত বিমান-ঘাঁটিতে ইতালীয় উড়ো-জাহাজ আছে প্রস্তুত, পীরানিজের পশ্চিম পাদে স্পেনের স্থলভূমিতে ইতালীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী থাকিবে সজ্জিত—তখন ফ্রাঙ্কোর বেনামীতে এক দিকে দাবি উঠিবে জিব্রালটার ও ভূমধ্যসাগরে এই পশ্চিমাংশ সম্বন্ধে পুনর্ব্যবস্থার, হয়ত স্পেনাধিকৃত মরক্কো যাইবে ইতালীয় হাতে, আর ফ্রান্সের অধিকৃত আল্‌জিরিয়া, টুনিস্ প্রভৃতি উপনিবেশ সম্বন্ধে কথা উঠিবে একটা পুনর্বণ্টনের অর্থাৎ ইতালীয় আধিপত্যের। এইখানে এইরূপে মুসোলিনী ব্রিটেন ও ফরাসীর নিকট হইতে ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য হস্তগত করিয়া লইবেন—অন্তত তাহার একটা বড় অংশীদার রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, মিউনিখের পরে সকলে এইরূপই অনুমান করিতেছিল। কিন্তু অতটা ঘোরা, অতটা অপেক্ষা করা, মুসোলিনী নিষ্প্রয়োজন মনে করেন—তাহার অপেক্ষা সহজ স্পষ্ট পথই তিনি আশ্রয় করিতেছেন—ভূমধ্যসাগরকে ইতালীয় হ্রদে পরিণত করিতে এখনই তিনি আয়োজন করিবেন, ফ্রাঙ্কোর বিজয়ের জন্ম আর অপেক্ষা করিবেন না। অবশ্য, ফ্রাঙ্কোও জয়লাভ করিতেছেন—তাহাতে মুসোলিনীর এই আয়োজনে আরও সহায়তাই হইবে; স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকার ক্রমশই দুর্বলতর হইয়া পড়িয়াছেন—অস্ত্র নাই, আহার্য্য নাই, পৃথিবীতে সত্যকার কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তাহার স্বপক্ষে আসিবে না, ইউরোপীয় তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রদ্বয় তো তাঁহাকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত—স্পেনের গণতান্ত্রিকরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছেন—এখন ফ্রাঙ্কোর শৌর্য্যবীর্য্য যত দিন তাঁহাদের আয়ু বাড়াইয়া দেয়!

২

মুসোলিনী অপেক্ষা করিলেন না—করিলে তাঁহার নাম রাষ্ট্র-রঙ্গমঞ্চে কিছু দিন শোনা যাইত না—মিউনিখের পরে ইউরোপের চোখে একমাত্র হিট্‌লারই থাকিতেন প্রদীপ্ত ভাস্কর, একচ্ছত্র সম্রাট। নিজের দেশের নিকটে, ইউরোপের নিকটে, ইতালীর ছায়া-ভীত অন্যান্য জাতিদের নিকটে তাহা হইলে মুসোলিনীর দীপ্তি ম্লান হইতে আরম্ভ করিত। অতএব, অবিলম্বেই দাবি উঠিল "টুনিস্, নাইস্, কর্সিকা।" সচকিত ইউরোপ শুনিল—ইতালীর চাই টুনিস্,

ইতালীর চাই জিবুতি, ইতালীর চাই সুয়েজ খালের উপর অধিকার। পূর্ব্ব-ইউরোপের পর্ব্ব শেষ হইতেই ভূমধ্যসাগরের তীরে নূতন পর্ব্বের সূচনা হইল।

ফরাসী প্রধান মন্ত্রী দালাদিয়ে অবশ্য আজ দক্ষিণ-পন্থী—চেম্বারলেনের সগোত্র। এই সেদিন হার ফন্ রিবেনট্রপের সঙ্গে তিনি মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন—অন্তত তাঁহার সেই সীমান্ত সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, সেখানে জার্ম্মানী বা ফ্রান্স কেহই কাহারও সীমানা লঙ্ঘন করিবে না। হয়ত মনে মনে একটা ইতালীয় বন্ধুত্বের পরিকল্পনাও দালাদিয়ে আঁটিতেছিলেন—তাহা সফল হইলে ফ্রান্সের অধিবাসীদের চক্ষে তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণাবর্ত্তন আর তেমন সন্দেহের ও বিরোধিতার কারণ হইবে না। কিন্তু এমনি সময়েই রোম হইতে উঠিল এই সব ফরাসী-অধিকৃত না। যুদ্ধ-জাহাজে চড়িয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন এই সব দেশ সফরে—সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছেন কর্সিকায়। চল্লিশ হাজার কর্সিকাবাসী গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের ভূমিতে প্রাণ দিয়াছে, আজ কি ফ্রান্স কর্সিকাকে ত্যাগ করিবে? দালাদিয়ে বলিতেছেন—"আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি কিছুতেই ইহা ঘটিতে দিব না।"

কর্সিকা ছাড়িতে ফ্রান্স সহজে স্বীকৃত হইতে পারে না, ইহা সত্য কথা। এক কালে কর্সিকা দ্বীপ ইতালীর হাতেই ছিল—শার্লমেনের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে উহা ইতালীর খণ্ড রাজ্যগুলির অধিকারে আসে—কখনো ছিল জিনোয়ার দখলে, কখনো বা পিসার। কিন্তু বহুকাল যাবং ইহা ফ্রান্সেরই অন্তর্গত। বিশেষত এই কর্সিকাই শ্রেষ্ঠ ফরাসী সম্রাটের জন্মভূমি—নেপোলিয়ন এখানেই ভূমিষ্ঠ হন। কোন্ ফরাসী সহজে এই কথা বিস্মৃত



গাজী কামাল—তুর্ক জাতির ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত প্রতিবেদন সম্বন্ধে স্বীয় মতামত লিপিবদ্ধ করিতেছেন

ভূমি আয়ত্ত করার দাবি। দালাদিয়ে ইহাতে সম্মত হইতে পারেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। যে যতই ফাসিজমের গুণগ্রাহী হোক, নিজ স্বার্থে ঘা পড়িলে কোন রাষ্ট্রই তাহা সহ্য করিবে না—পরের উপরে যত ক্ষণ ফাসিস্ত বন্ধু চড়াও হন ততক্ষণ পর্য্যন্তই তাহার বীরত্বের ও মহত্ত্বের প্রশংসা করা চলে, তাঁহার গুণগ্রহণ করা সম্ভব হয়। বিশেষত, ফ্রান্সের জনসাধারণ জার্ম্মান-ভয়ে যতই ত্রস্ত হোক্, মুসোলিনীর হুমকীতে তাঁহার হাতে রাজ্যাংশ অর্পণ করা কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না—টুনিস্, নাইস্, কর্সিকা তাহারা ছাড়িয়া দিবে কেন? তাই দালাদিয়েও দর্প করিতেছেন—কিছুতেই না, কিছুতেই হইবে? আবার, কর্সিকার সুরক্ষিত দুর্গ হইতে আজ ফ্রান্স ভূমধ্যসাগরের এই তীরভূমিতে পাহারা দিতেছে—এক দিকে সে চোখ রাখে স্পেনের উপর, বেলেরিক দ্বীপপুঞ্জের উপর (যেখানে সম্প্রতি ইতালীর বিমান-ঘাঁটি তৈয়ারী হইয়াছে) অন্য দিকে চোখে চোখে রাখিতে পারে ইতালীকে। এখানে ফ্রান্সের আসন সুদৃঢ় থাকিলেই ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ তাহার উপনিবেশগুলি সে আপন আয়ত্তে রাখিতে পারে, সেই পথ রক্ষা করিতে পারে। আর কর্সিকা যদি মুসোলিনীর হাতে যায়, তাহা হইলে শুধু সেই উপনিবেশই বিপন্ন হইবে না, শুধু ভূমধ্যসাগরের উপরেই ফাসিস্ত

অধিকার বাড়িবে না,—নিজ ফ্রান্সেরই আত্মরক্ষা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে।

ভূমধ্যসাগরের তীরের নাইস্ শহরটি সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথাই খাটে। এই আস্তানা অবশ্য ফ্রান্সের হাতে আসিয়াছে ১৮৬০ সালের পরে। তখন ইতালীর সার্দ্দিনিয়ার রাজা উহার মালিক; তৃতীয় নেপোলিয়ন সন্ধিসূত্রে তাহার নিকট হইতে উহা লাভ করেন। তাহার পর হইতে নাইস ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া ইতালী আজ উহা দাবি করিতে ছাড়িবে না—কারণ, আজ ইতালীও সবল, তাহারও শক্তি অপরিমেয়। বিশেষত, এই সাগর-তীরের নৌ-আস্তানা তাহার নিজের কবলে না রাখিলে সে নিশ্চিন্ত হয় কিরূপে?

কিন্তু কর্সিকা বা নাইসের অপেক্ষাও ইতালীর লুব্ধ দৃষ্টি এই-মুহূর্ত্তে বেশী পড়িয়াছে টুনিসের উপর, জিবুতির উপর, সুয়েজ খালের উপর। এখানেই সম্প্রতি এই দিক্‌কার রাষ্ট্রনীতি পাক খাইতেছে। তাহার কারণ বুঝা দুঃসাধ্য নয়।

টুনিস ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এখানেই ভূমধ্যসাগরের অধিকার আর এক বার স্থির হয়—তখন বর্ত্তমান টুনিসের অদূরবর্ত্তী কার্থেজ শহর রোমের সহিত যুঝিয়া যুঝিয়া অবশেষে একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। অতীত ইতিহাসের সেই পাতা আজ নিতান্তই অতীত। টুনিস তার পরে অন্তর্ভুক্ত হইল তুর্কী সাম্রাজ্যের। মৃতকল্প তুরস্ককে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেন, ফরাসী, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি শক্তিগুলি যখন ভাগ-বাঁটোআরা করিতে সচেষ্ট, নবজাত ইতালী তখন মনে মনে টুনিসকে নিজের লক্ষ্যস্থল করিয়া লইল। ইতালীয়েরা গেল সে-দেশে বসবাস করিতে ইতালীর অর্থে সে-দেশে ব্যবসাপত্রও চলিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিকার দাবি করিবার মত তখনও তাহার না ছিল শক্তি, না ছিল সাহস। এমনি সময়ে এক দিন সে চমকিয়া দেখিল—টুনিসের রাষ্ট্রীয় অধিকার ফরাসী গ্রহণ করিয়াছে। সে বেশী দিনের কথা নয়—১৮৭০-এর পরে জার্ম্মানীর নিকট পরাজিত ফ্রান্স তখন নিজের বিড়ম্বিত জীবনের লজ্জা ঢাকিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল—একটা ছোটখাটো জয়-চিহ্ন, ক্ষুদ্র পুরস্কার না হইলে আর তাহার চলে না। বিচক্ষণ বিসমার্কই পরামর্শ দিলেন—ফ্রান্স আফ্রিকায় কেন তাহা অন্বেষণ করে না?

—তাহা হইলে অবশ্য ইউরোপ-ভূখণ্ডে বিসমার্কই থাকিবেন অবিসংবাদিত নেতা। ইহারই ফলে টুনিসে ফ্রান্সের পদার্পণ। সেদিন হইতেই ইতালী মনে মনে স্থির করিয়াছে—ফ্রান্স ইতালীর নিজ প্রাপ্য আত্মসাৎ করিয়াছে। তার পর বহু ইতালীয় টুনিসে গিয়াছে, বসবাস করিতেছে, ইতালীয়দের বংশবৃদ্ধিও হয় খুব দ্রুত—সাধারণ ব্যবসাপত্রে ইতালীয়দের সংখ্যা গণনা করা যায় না। কিন্তু ফরাসী ঔপনিবেশিকের সংখ্যা বেশী নয়, তাহাদের বংশবৃদ্ধিও হয় কম। এই কারণে টুনিসের যে এক দিন একটা বিপদ ঘনাইতে পারে তাহা আশঙ্কা করিয়া ফরাসী সরকারও আইনকানুনের কড়াকড়ি অনেক করিয়াছে। ফলে, খাঁটি ইতালীয়েরা টুনিসে অনেক সুবিধা হইতেই বঞ্চিত। আবার, এই অধিবাসীরাও অনেকেই তাই নিজেদের ইতালীয়-পরিচয় ত্যাগ করিয়া ফরাসী-পরিচয় গ্রহণ

আবিসিনিয়া বিজয়ের পরে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন অন্ত জিনিষের।

জিবুতি ও সুয়েজ খালের কথাটা এই কারণেই এই সময়ে উঠিয়াছে। আবিসিনিয়ার দুয়ারে ফরাসী-অধিকৃত রেলপথ—জিবুতি তাহার কেন্দ্রমূল। ভারতমহাসাগরে ইতালীর পাড়ি জমাইতে হইলে চাই এই জিবুতি, আর চাই সুয়েজ খালের একটা অংশ। এ খালের উপর অধিকার হাতে না আসিলে ইতালী নিশ্চিন্ত হয় কিরূপে? অবশ্য, আবিসিনিয়ার যুদ্ধেই প্রমাণিত হইয়াছে ইহার কর্তৃপক্ষ ফাসিস্ত রাষ্ট্রের পররাজ্যাপহরণে বাধা দিবে না—তাহারা চায় নিজেদের শেয়ারের মুনাফা। তথাপি এই কোম্পানীর অন্তত এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার স্বহস্তে না পাইলে মুসোলিনী নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন না। ভূমধ্যসাগর তাঁহার অধিকারে আসিল কই?



কামালের শবাধারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুরস্কের নূতন রাষ্ট্রপতি ইনোনু শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেছেন

করিয়াছে—তাই আদমসুমারিতে দেখা যায়, টুনিসে ফরাসী ঔপনিবেশিকই অধিক, ফরাসী অর্থই অধিক খাটিতেছে। আসলে ব্যাপারটা অন্য রূপ। এই সমস্যার একটা মীমাংসা স্বীকৃত হয় ১৯৩৬ সালে—তখন ফরাসী মন্ত্রী লাভাল ইতালীকে আবিসিনিয়া-বিজয়ের কার্য্যে প্রকারান্তরে সহায়তা করেন; বিপন্ন মুসোলিনী তখনকার মত তাঁহার সহিত একটা সন্ধি করিয়া টুনিসের উপর ফরাসী অধিকার মানিয়া লন, ফরাসীরাও সেখানকার ইতালীয় ঔপনিবেশিকদের কতকগুলি অধিকার দান করে। কিন্তু আজ ইতালী বলিতেছে, ১৯৩৬ সালের সন্ধি ১৯৩৮ সালে আর চলে না। আমরা অতি চলন্ত কালের মধ্যে বাস করিতেছি—দুই মিনিটেই সব বাসি হইয়া যায়, সন্ধি তো নিশ্চয়ই। সন্ধি মাত্রই আজ শুধু একটা অভিসন্ধি। আবিসিনিয়ার যুদ্ধকালে যাহা প্রয়োজন ছিল, আজ



কামাল পাশার ভগিনী ভ্রাতার শবযাত্রার অনুসরণ করিতেছেন।



কামালের শবযাত্রা—ইস্তাম্বুলের য়েনি কামি মসজিদের সম্মুখে

৩

ফরাসী লেখিকা মাদাম তাবুই বলিতেছেন—মিউনিখের পরে রোম ও বার্লিনে মিত্রতা-বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্ত একটা 'সমঝোতা' হইয়াছে। তাহাতেই স্থির হয়, এবার কিছুদিনের মত মুসোলিনীর পালা—হিট্‌লার রহিবেন আড়ালে। এখন ইতালীকে কিছু ভোজ্য-পেয় না দিলে ইতালীয়েরা ভুলিতে পারিবে না যে, তাহা বন্ধু অষ্ট্রিয়ার নাম পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। পূর্ব-ইউরো শক্তিপুঞ্জ আজ বার্লিনের পদচ্ছায়ার প্রয়াসী। কথা হইয়া ইতালী প্রথম লাভ করিবে টুনিস্, তারপর জিবুতি রেল তারপর সুয়েজ খালের কোম্পানীর এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার।



সুরকার

শ্রীনন্দলাল বসু

দি প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৪৫ | ৫ম সংখ্যা

পাখির ভোজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভোরে উঠেই পড়ে মনে
মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে
আসবে শালিখ পাখি।
চাতাল-কোণে বসে থাকি
ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালো।
শীতের আলো
এ অঘ্রাণের শিশির-ছোঁওয়া প্রাতে
সরল লোভে চপল পাখির চটুল নৃত্য সাথে
পূর্বাকাশের বিমল হাসি মধুর হয়ে মেলে,
চেয়ে দেখি সকল কর্ম ফেলে।

জাড়ের হাওয়ায় ফুলিয়ে ডানা
একটুকু মুখ ঢেকে
অতিথিরা থেকে থেকে
লালচে কালো সাদা রঙের পরিচ্ছন্ন বেশে
দেখা দিচ্ছে এসে।

খানিক পরেই একে একে জোটে পায়রাগুলো
বুক ফুলিয়ে হেলে দুলে খুঁটে খুঁটে খুলো
খায় ছড়ানো ধান।
ওদের সঙ্গে শালিখদলের পংক্তি ব্যবধান
একটুমাত্র নেই।
পরস্পরে এক সমানেই
ব্যস্ত পায়ে বেড়ায় প্রাতরাশে।
মাঝে মাঝে কী অকারণ ত্রাসে
ত্রস্ত পাখা মেলে,
এক মুহূর্তে যায় উড়ে ধান ফেলে।
আবার ফিরে আসে
অহেতু আশ্বাসে।

এমন সময় আসে কাকের দল,
খাদ্যকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।
একটুখানি যাচ্ছে স'রে আসছে আবার কাছে
উড়ে গিয়ে বসছে তেঁতুল গাছে।
বাঁকিয়ে গ্রীবা বিজ্ঞভাবে ভাবছে বারংবার
নিরাপদের সীমা কোথায় তার।
এবার মনে হয়
এতক্ষণে পরস্পরের ভাঙল সমন্বয়।
কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন
সন্দেহ আর সতর্কতায় দুলছে সারাক্ষণ।
প্রথম হোলো মনে
তাড়িয়ে দেব, লজ্জা হোলো তাহার পরক্ষণে।
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার
আমার মতোই সমান অধিকার।
তখন দেখি লাগছে না আর মন্দ,
সকালবেলার ভোজের সভায়
ওদের নাচের ছন্দ॥

পাখির ভোজ

এই যে বছায় ওরা
প্রাণস্রোতের পাগলা ঝোরা,
কোথা হ'তে অহরহ আসছে নাবি
সেই কথা যে ভাবি।
এই খুশিটার স্বরূপ কী যে, তারি
রহস্যটা বুঝতে নাহি পারি।
চটুল দেহ দলে দলে
দুলিয়ে তোলে যে আনন্দ খাদ্যভোগের ছলে,
সে তো নহে এই নিমেষের সদ্য চঞ্চলতা,
অসংখ্যিত যুগের এ যে অতি প্রাচীন কথা।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি,
কালের বাঁশির মৃত্যুরন্ধ্রে সেই মতো উচ্ছ্বাসি
উৎসারিছে প্রাণের ধারা।
সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার নাই তবু তার নাশ।
আলোক যেমন অলক্ষ্য কোন্ সুদূর কেন্দ্র হ'তে
অবিশ্রান্ত স্রোতে
নানা রূপের বিচিত্র সীমায়
ব্যক্ত হ'তে থাকে নিত্য নানা ভঙ্গে নানা রঙ্গিমায়
তেমনি যে এই সত্তার উচ্ছ্বাস
চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে নিবিড় উল্লাস—
যুগের পরে যুগে তবু হয় না গতিহারা,
হয় না ক্লান্ত অনাদি সেই ধারা।
সেই পুরাতন অনির্বচনীয়
সকালবেলায় রোজ দেখা দেয় কি ও
আমার চোখের কাছে
ভিড়-করা ঐ শালিখগুলির নাচে।
আদিমকালের সেই আনন্দ ওদের নৃত্যবেগে
রূপ ধরে মোর রক্তে ওঠে জেগে।
তবুও দেখি কখন কদাচিৎ
বিরূপ বিপরীত,

প্রাণের সহজ সুষমা যায় ঘুচি'
চঞ্চুতে চঞ্চুতে খোঁচাখুঁচি ;
পরাভূত হতভাগ্য মোর দুয়ারের কাছে
ক্ষত অঙ্গে শরণ মাগিয়াছে।
দেখেছি সেই জীবনবিরুদ্ধতা,
হিংসার ক্রুদ্ধতা,—
যেমন দেখি কুহেলিকার কুশ্রী অপরাধ,
শীতের প্রাতে আলোর প্রতি কালোর অপবাদ,—
অহংকৃত ক্ষণিকতার অলীক পরিচয়
অসীমতার মিথ্যা পরাজয়।
তাহার পরে আবার করে ছিন্নেরে গ্রন্থন
সহজ চিরন্তন।
প্রাণোৎসবে অতিথিরা আবার পাশাপাশি
মহাকালের প্রাঙ্গণেতে নৃত্য করে আসি।

শান্তিনিকেতন
শ্যামলী
৬।১২।৩৮

সুফীধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি

শ্রীনীরদকুমার রায়

সুফীধর্ম্মের উৎপত্তি

'সুফী' কথাটি পারস্য দেশের 'সুফ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুফ অর্থে পশম। অষ্টম শতাব্দীর শেষে যখন ক্ষুদ্র এক দল পারসীক, প্রচলিত আনুষ্ঠানিক মুসলিম ধর্ম্মের বিধান ছাড়িয়া ঈশ্বরান্বেষণের এক স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ধরিল, তখন এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি এবং ঐহিক আড়ম্বর ত্যাগ করিল। তাহারা সকলে শুভ্র পশমের বস্ত্র পরিতে লাগিল। এই কারণে তাহারা 'সুফী' অর্থাৎ 'পশমী' নামে পরিচিত হইল, এবং তাহাদের ধর্ম্ম তসব্বুফ (Tasawwuf) নামে অভিহিত হইল। তসব্বুফের সাধারণ অর্থ চিন্তন, মনন বা ধ্যান।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সুফীধর্ম্মের উৎপত্তির কয়েকটি কারণ অনুমান করেন। প্রথমতঃ, মহম্মদীয় ধর্ম্মে ব্যাপকতা বা সার্ব্বভৌমিকতার অভাব। দ্বিতীয়তঃ, সেমিটিক ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে আর্য্য-মনের প্রতিক্রিয়া। তৃতীয়তঃ, 'নিও-প্লেটোনিক' ধর্ম্মের প্রভাব। চতুর্থতঃ, নিরপেক্ষ বা স্বাধীন জন্ম। ইহার মধ্যে চতুর্থ অনুমান আদৌ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

পারসীকেরা আর্য্যবংশসম্ভূত। আর্য্যবংশের অতীত চিন্তাধারা এবং জরথুষ্ট্রের ধর্ম্মশিক্ষা তাহাদের মনে বহুকাল ধরিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার উপর মহম্মদীয় ধর্ম্মের মহনীয়তা ও পবিত্রতা সত্ত্বেও ইহার গণ্ডীবন্ধন, কঠোর নিয়ম এবং অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সকল ইহাদের অনেকের পক্ষে ক্লান্তিকর হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা এই পণ্ডিতেরা মনে করেন। ইতিপূর্ব্বেই ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাত জন গ্রীক প্লোটিনস্-পন্থী (নিও-প্লেটোনিষ্ট) দার্শনিক রাজা নূশির্ব্বানের রাজত্বকালে পারস্যরাজ-সভায় আসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। এই নিও-প্লেটোনিষ্ট-তত্ত্ব. আসলে বেদান্তের ধর্ম্মতত্ত্বের প্রকারভেদ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্লেটোর মূলতত্ত্বেই উপনিষৎ-উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাব দেখা যায়।

প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্বের প্রথম দীক্ষাগুরু সক্রেটিস। মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যাবশ্যক, এবং ভোগাসক্ত জীবন ধর্ম্মজীবনের—অর্থাৎ ন্যায়, বন্ধু-প্রীতি, সৎসাহস, মিতাচারিতা প্রভৃতি গুণযুক্ত জীবনের বিরোধী, এই বিশ্বাস প্লেটো সক্রেটিস হইতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্লেটো ইহাতে ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার চিন্তা আরও বহুদূর প্রসারিত হইয়াছিল। এই চিন্তার ফলে তাঁহার প্রসিদ্ধ ধারণাবাদ প্রসূত হয়। তিনি দেখিলেন যে বাহিরের পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য ও ঘটনাবলীর জ্ঞান অপেক্ষা অন্তর্মুখী চিন্তাধারা সেই সকল দৃশ্য ও ঘটনায় নিহিত যে সত্য বা তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহা অধিকতর স্থায়ী এবং মানবজীবনের পক্ষে কার্য্যকরী। সাধারণ চিন্তাশূন্য মানব তাই গুহায় আবদ্ধ বন্দীর মত; বাহিরের ঘটনার ছায়ামাত্র দেখিয়াই সে তাহাকে সত্য বলিয়া মনে করে। কোনও বস্তুর সত্য আকার, বা তাহার সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা, তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে এবং সকল বস্তু বা ঘটনায় এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির করিতে হইলে সমগ্র জগতের লক্ষ্য বা কল্যাণের মধ্যে ইহাদের স্থান কোথায় ও কত টুকু, তাহা উদার দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতে হইবে। তাই জগতের নিরবচ্ছিন্ন শ্রেয় বা শ্রেয়ের ধারণাই সকল সত্যের ভিত্তি এবং দর্শন-বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।

প্লেটোর সাত শত বৎসর পরে, তাঁহার এই ধারণাবাদের সঙ্গে প্রাচ্য যোগতত্ত্ব বা গূঢ় জ্ঞানতত্ত্ব মিশ্রিত করিয়া প্লোটিনস্ তাঁহার নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বের উপর বেদান্তের অদ্বৈত মায়াবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

প্লোটিনসের তত্ত্বটি কি, জানিলেই সে-কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। অতি সংক্ষেপে ইহা বিবৃত করা গেল। 'নিও-প্লেটোনিষ্টরা' বিশ্বাস করিতেন যে, যিনি পরম কল্যাণ-বিধাতা, তিনিই এই বিশ্বসৃষ্টির উৎস। তিনি বস্তু; সৃষ্টি তাঁহারই সত্তার প্রতিবিম্ব। প্রকৃতি ঈশ্বরের (ব্রহ্মের) সত্তায় অন্তঃপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। জড়প্রকৃতি মুখ্যভাবে অস্তিত্বহীন; উহা কেবল ঐশ্বরিক প্রকাশের সহায়ক ক্ষণস্থায়ী ও সতত চঞ্চল, পরিবর্তনশীল ছায়া মাত্র। এই জন্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বা লাভ করিতে হইলে শুধু জ্ঞানের দ্বারা হইবে না;—জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার ধারণা করা যাইতে পারে—যেমন প্লেটো বলিয়াছেন—কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না। জ্ঞানাতীত এক ধ্যানময় আনন্দঘন উপলব্ধি দ্বারাই সেই জীবনপ্রবাহের চরম উৎসমুখে উপনীত হওয়া যায়,—সেই পরম কল্যাণময়কে লাভ করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, নিওপ্লেটোনিষ্ট ধর্মপদ্ধতি ধ্যানগম্য ভাবোল্লাসের পদ্ধতি। এ সম্বন্ধে প্লোটিনস্ নিজে বলিয়াছেন: "প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজ অন্তরের মধ্যে শ্রেয়ের ধারণা বা জ্ঞানটুকু বেছে নিয়ে তাকে বিকশিত ক'রে তোলেন। নিজ আত্মার মধ্যেই যে পরমসুন্দর বাস করছেন তা যে বোঝে না, সে বাইরে থেকে নানা কষ্ট-কল্পনার দ্বারা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে চায়। বরং তার লক্ষ্য থাকা উচিত যাতে বাইরের সমস্ত জটিলতা ছেঁটে ফেলে সে অন্তর্মুখী হয় এবং নিজ সত্তা বা শক্তিকে প্রসারিত করে; বাইরের 'বহুর' দিকে ধাবিত না হয়ে, সেই অদ্বিতীয়ের সন্ধানে, অন্য সমস্ত বিষয় ত্যাগ ক'রে, যে ঐশ্বরিক সত্তার প্রবাহ তারই মধ্যে ব'য়ে যাচ্ছে, সেই উৎসের মুখের দিকেই ঊর্দ্ধপথে সে নিজেকে যেন উৎক্ষিপ্ত ক'রে নিয়ে যেতে পারে।"

সুফীদের বা সুফীধর্ম্মবিশ্বাসের গতিও মোটামুটি এই রেখার অনুগামী হইয়াছে। ফলে দেখা যাইতেছে যে, সুফীধর্ম্ম প্রধানতঃ উপনিষদের অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তি-বাদের মিশ্রণের ফল। পূর্ব্বে বা পরে এই বৈদান্তিক ধর্ম্মের ভিন্নদেশ-প্রচলিত শাখা-প্রশাখার প্রভাব এবং তাহার সহিত জরথুস্ত্রের ও বুদ্ধদেবের ধর্ম্মোপদেশের প্রভাবও ইহাতে আছে। বাগ্দাদের প্রথিতনামা সম্রাট্ হারুণ-অল্-রশীদের রাজত্বকালে নানা দেশবিদেশ হইতে বহু পণ্ডিত, দার্শনিক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার রাজসভায় নিজ নিজ চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এবং তাহার বহুপূর্ব্বে ও পরেও ভারতের ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত সার্ব্ব-ভৌমিক উদার তত্ত্ব সকল আর্য্য পারসীকদের মধ্যে বহুচিন্তা-শীল ব্যক্তির মনে দৃঢ় লগ্ন হইয়া যায়, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

এইরূপে প্রভাবান্বিত হইয়া সুফীধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে মহম্মদীয় ধর্ম্মের গণ্ডী ছাড়িয়া শেষে এক সার্ব্বভৌমিক গূঢ় যোগতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে pantheistic mysticism বলেন। প্যানথিইষ্টিক কথাটির অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু মিষ্টিসিজ্‌ম্ কথাটির এই সব ক্ষেত্রে তাঁহারা অপ-প্রয়োগ করেন বলিয়া মনে হয়। মিষ্টিক্ শব্দের মূল অর্থ গূঢ়, রহস্যময়, ভীতিজনক, দুর্ব্বোধ্য। এই অর্থে মিষ্টিক্ বলিতে বুঝায় ঐন্দ্রজালিক, অনৈসর্গিক বা অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপার, এবং প্রায়শই ইহা অবজ্ঞাসূচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এই মিষ্টিসিজ্‌ম্ শব্দটি অধুনা বৈদান্তিক, নিওপ্লেটোনিক, সুফী প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, কারণ ঐগুলি সাধারণ জ্ঞানের অনধিগম্য। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ সাধারণ মানবের পক্ষে এত দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য, এত উন্নত যে, তাহারা ইহাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনিতে পারে না। অনেক গভীর চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষেও অদ্বৈততত্ত্ব বোধগম্য করা কঠিন হয়। মানুষ তাহার চিন্তা-শক্তি, আত্মশক্তিকে এত দুর্ব্বল, এমন নিম্নগামী করিয়া ফেলিয়াছে যে, জীবনে তাহারা বড় বড় দাবি করিতে দ্বিধা করে না, কিন্তু বড় কিছু পাইবার জন্য তাহারা অপরের উপরই নির্ভর করিতে চায়। অধিকাংশ লোকই সহজ আরাম-প্রদ ধর্ম্ম চায়, যাহার ছায়ায় বিনা উদ্বেগে পথ উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যে-ধর্ম্মের তরণীতে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে, বিনা ঝড়-ঝাপ্‌টায় ভবনদী পার হওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, অতি অল্প লোকেই সত্যের সন্ধান করে বা সত্যের সাধনা করিতে বুক বাঁধে; আর এমন লোক জগতে বিরল যে সকল সময়েই কার্য্যকালে সত্যের অনুসরণ করিতে সাহস পায়। ইহা তাহাদের দুর্ব্বলতা, চিন্তাশক্তির জড়তা।

কোনও উচ্চচিন্তার ধারণা করিতে গেলেই সব গোলমাল হইয়া যায়। অভ্যস্ত আবেষ্টন বা প্রাচীন বংশগত, শ্রেণী-গত, সমাজগত, দেশগত এবং মানবের স্বভাবগত রাশি রাশি কুসংস্কারের ভার হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে হয়। এই জন্য সহজে, সাধারণ শক্তিতে যাহার ধারণা করিতে পারা যায় না তাহাকেই দুর্জ্ঞেয়, দুর্ব্বোধ্য বা 'মিষ্টিক্' আখ্যা দিয়া মিষ্টিসিজ্‌ম্ শব্দের অর্থ প্রসারিত করা হইয়াছে।

সুফীধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানবত্বকে ঈশ্বরত্বে লীন করা। সুফী চায় যে ঈশ্বরের সহিত তাহার পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া সেই পরম সত্তার প্রতি এক ভাবোল্লাস-ময় ভক্তিতে পরিণত হয়—এমন সে প্রেম যে নিম্নস্তরের সকল অনুরাগ আসক্তিকে দূরীভূত করিয়া সেই প্রেম নিজে সমস্ত অন্তরাত্মাকে জুড়িয়া থাকিবে। এই পরাভক্তিতে পৌঁছিবার পাঁচটি ক্রম আছে।

(১) কর্ম,—সেবা,—ঈশ্বরের নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া;

(২) প্রেম,—ঈশ্বরের প্রতি আত্মার আকর্ষণ;

(৩) নির্জ্জনবাস,—ঐশ্বরিক বিষয়ে ধ্যান;

(৪) জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান; এবং

(৫) মহাভাবাবেশ,—ঐশ্বরিক ক্ষমতার পূর্ণ উপলব্ধি-দ্বারা লব্ধ প্রবল আনন্দাবেগ।

এই সুফীত্বই পারস্যের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠতম কাব্য ও কবিতার প্রেরণা দিয়াছে।

সুফীধর্ম্মের প্রকৃতি

যে সকল মানব ইহজীবনে পুণ্যজীবন যাপন করেন, হিন্দুর লৌকিক আচার ধর্ম্মে এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মে তাঁহাদের মৃত্যুর পরে আবাস-স্বরূপ স্বর্গ বা নন্দনকাননের ও বেহেস্তের কল্পনা করা হইয়াছিল। পৃথিবীস্থিত প্রকৃতির ও মানবজীবনের পার্থিব সম্পদকে মানব-কল্পনাদ্বারা উন্নত করিয়া এই স্বর্গ বা বেহেস্তের সৃষ্টি করা হইয়াছিল বলিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন; ইহা তত্ত্বের অধিগম্য না হইয়া বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই ছিল।

সুফীদের পাঁচটি স্তর এইরূপ :—

(১) অদৃশ্য সম্বন্ধরহিত সত্তার স্তর বা মণ্ডল (Plane of the Absolute Invisible)

(২) সম্বন্ধযুক্ত অদৃশ্য (Relatively Invisible)

(৩) প্রতিরূপের মণ্ডল (World of Similitudes)

(৪) দৃশ্য জগৎ বা অবয়ব, উৎপাদন ও দূষণের স্তর (Visible World, or the Plane of Form, Generation and Corruption)

(৫) মানব-জগৎ (The World of Man)।

এই পাঁচটি স্তরকে অনেক সময় তিনটি বলিয়া ধরা হয়, যথা—অদৃশ্য, মধ্যস্থ ও দৃশ্য অথবা শুধু দুইটি, দৃশ্য ও অদৃশ্য। অদৃশ্য সম্বন্ধ রহিতের স্তরের উপরে আছে এক অসীমতা বা ঊর্দ্ধতম অবকাশশূন্যতা। সুফীরা আত্মার জন্মপূর্ব্ব অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এবং তাঁহারা বলেন যে, আধ্যাত্মিক জগতে পূর্ব্বানুভূত চরম সৌন্দর্য্যের স্মৃতির সাহায্যেই পার্থিব সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ অনুভূতি হয়। দেহ আত্মার আবরণ মাত্র; ভাবোল্লাস বা ভাবসমাধির ('হাল') দ্বারা আত্মা ঐশ্বরিক রহস্য বা তত্ত্বসকল প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কবির বর্ণনানুসারে বলা যায়, মানবের আত্মা যেন এই মরুময় জগতের জীর্ণ প্রবাস-গৃহে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। যখনই সে তাহার আপন শক্তিময় আবাসের কথা মনে করে, তখনই সে কাঁদিয়া আকুল হয়; এবং হৃতসর্ব্বস্বের ন্যায় হা-হুতাশ করিতে করিতে, চতুর্দ্দিগন্তের ঝড়ে বিধ্বস্ত আবাসের সামান্য নিদর্শনটি পাইলে, তাহাই লইয়া সে শোক করিতে থাকে। সৃষ্টি সেই পরম সৌন্দর্য্যময় হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিগণিত। এই দৃশ্যমান জগৎ, এবং যাহা কিছু তাহার মধ্যে অবস্থিত, সকলই সেই পরম আত্মার ছায়া,—ঈশ্বরের সত্তার পূর্ণ চিরপরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য। সেই পরমপ্রিয় যে কি এবং তাঁর ভক্তদের চিত্তলোকের সহিত তাঁর সম্বন্ধ যে কি, এ বিষয়ে সুফীদের যে ধারণা, তাহা প্রসিদ্ধ সুফী-কবি নূর-উদ্-দীন অব্‌দ্-অল্-রহমান জামীর "য়ুসুফ্ ও জুলেখা" কাব্যের একটি অংশে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :

সম্বন্ধ রহিত সেই পরম সুন্দর—
আপনাকে আপনি শুনায় শুধু
ভাষাহীন ছন্দে কত প্রেমের সঙ্গীত।
নিজে নিজে ক্ষেপণ করিছে
প্রেমের গুটিকা। * * *
একটি কিরণময়ি দ্যুতি তাঁহা হ'তে
পড়িল বিশ্বের পরে—

ব্যোমে ব্যোমে ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের চেতনা
করে আলোড়িত ;
অসংখ্য বিচিত্ররূপে প্রত্যেক মুকুর
প্রতিবিম্ব কত তাঁর করে প্রদর্শন ;
সর্ব্বত্র তাঁহার স্তুতি-গান
নব নব সুরে ছন্দে ধ্বনিয়া উঠিল—
'ধন্য ! ধন্য ! বিশ্বপতি জয় ! তব জয় !'
অপার সৌন্দর্য্য তাঁর বিস্ময় হইল প্রকাশ ;
মর্ত্ত্য সৌন্দর্য্যের রূপে ঢাকি নিজরূপ
দেখা দেয় মানবসকাশে ।
সেই তো সে যাদুকর—
প্রেমে মুগ্ধ করে নিত্য মানব-হৃদয় ।
তাঁরই প্রেমে মানব-হৃদয়
হ'য়ে ওঠে সচেতন ।
তাঁর তরে ব্যাকুল হইলে
আত্মা লভে জয় ।

মানুষ ঈশ্বরেরই অংশ, কেন না সে সেই সমগ্রের এক খণ্ড বা কণা ; অর্থাৎ মানুষ সেই ঐশ্বরিক মূল হইতেই উদ্ভূত । এই বিশ্বাসে সেই পরমপ্রিয়ের সহিত পুনর্ম্মিলিত হওয়াই সুফীর চরম আকাঙ্ক্ষা । তবে তাহাকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, পূজা ঈশ্বরকেই করিতে হইবে, ঈশ্বরের নানা বিচিত্র সুন্দর রূপকে নয় । প্রেম তার হৃদয়ে আসিলে সে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিল যে পার্থিব বস্তু যতই প্রেয় ও সুন্দর হউক না কেন, ইহা প্রদীপ মাত্র যাহাতে ঈশ্বরের আলো প্রতিভাত হয় । এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, সুফী কবিরা অনেকেই বাহ্য সৌন্দর্য্যের এবং বিশেষ করিয়া মানবিক সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতিসূচক কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া অনেক ইউরোপীয় সমালোচক তাঁহাদের নিন্দা করেন এবং সুফী-ধর্ম্মের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে প্রতিকূল মত পোষণ করেন । কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহারা এই কথাটি ভুলিয়া যান বলিয়া মনে হয় যে, কবি সকল সময়েই ধর্ম্মপ্রচারক নহেন, এবং কবির সকল কাব্যও ধর্ম্মগ্রন্থ নয় । কবির আত্মগত ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁহার কল্পনা ও রসের সূক্ষ্মানুভূতি মিলিত হইয়া অনেক সময়েই এক অভিনব রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায় । ইহার উপর তাঁহাদের স্বদেশ ও স্বজাতির অতীত চিন্তাধারার প্রভাবও যথেষ্ট থাকে । যাহাই হউক, এই সব কারণে মনে হয় যে, হাফিজের কবিতার প্রত্যেক পংক্তিতেই একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা ধর্ম্মের অনুশাসন পাওয়া যাইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্ত বিসদৃশ। আবার ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সুফী কবিদিগের কবিতাগুলি অনেক সময়ে দ্ব্যর্থবোধক,—বাহ্য লৌকিক ভাব ও গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ ; এবং তাঁহাদের অনেক কাব্যেই রূপকের প্রাচুর্য্য আছে ।

ইহার মধ্যে একটি কাব্যকে বিশেষ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বগ্রন্থ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে । ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তিমান্ কবি জামীর রচিত "লবা'ইহ্" (Lawaih) । এই "লবা'ইহ্" বা 'আলোকের ঝলক' নামে কাব্যটি সুফীধর্ম্মের ভিত্তির উপর লিখিত, সুফীধর্ম্মের ভাবই ইহার উপাদান, এবং সুফীধর্ম্মনীতিই ইহার 'আলোকের ঝলক'-মুখে প্রদর্শনীয় বা প্রতিপাদ্য বিষয় । সুফীধর্ম্মতত্ত্ববোধের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয় ও অমূল্য গ্রন্থ । ইহাতে কবি বলিতেছেন যে, মানসবিভ্রমকারী সকল পার্থিব প্রণয় ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সেই পরমপ্রিয় একের প্রতি তোমার প্রেমকে চালিত কর । মানুষকে তিনি 'নরকজাত গর্ব্ব-অহমিকা' এবং বিষয়বুদ্ধি ও সাংসারিক জ্ঞান, এমন কি ঈশ্বরীয় জ্ঞান ব্যতীত আর সকল বিদ্যা, পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান বর্জ্জন করিবার জন্য উচ্চ কণ্ঠে, দৃঢ় ভাষায় উপদেশ দিয়াছেন । এইখানে বেদান্ততত্ত্বের প্রভাব স্পষ্টই দেখা যায় । কবি তাঁহার অন্তরের আলোকের বলে সকল পার্থিব বিষয়-বস্তুকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া ঠেলিয়া রাখিতেছেন। তিনি যে কেবল এই চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী অসার বস্তুগুলিকে ফেলিয়া দিয়াই ক্ষান্ত, তাহা নয় । স্পষ্ট সতেজ কণ্ঠে এই ঋষিকবি গাহিতেছেন :—

ক্ষণস্থায়ী যেই বস্তু মুগ্ধ আজি করেছে তোমারে,
আজ কিম্বা কাল তাহা বিধির বিধানে যাবে স'রে ।
অচঞ্চল যিনি, তাঁরি 'পরে লগ্ন কর তব হিয়া—
আছে সে তোমারই সাথে, র'বে সদা তোমারি হইয়া ।

জামী ও পূর্ব্বতন সুফীগণের বিশ্বাস যে, আমিত্বের বিলয় না হইলে সেই পরম সত্তার জ্ঞান, বোধ বা অনুভূতি হয় না । এইরূপ আমিত্বশূন্য হইয়া ঈশ্বরের ধারণা বা অনুভূতি তোমার মধ্যে জন্মাইলে তিনি তোমার আত্মার সঙ্গে জড়িত মিশ্রিত হইয়া যাইবেন এবং তখন তোমার ব্যক্তিত্ব বা আমিত্বের অস্তিত্ব তোমার দৃষ্টি হইতে লোপ

পাইয়া যাইবে। জড়বস্তুর সম্বন্ধে আলোচনাও কবি এই কাব্যে করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করিব না। তিনি জড়জগতকে বলিয়াছেন মায়া, ঘটনাচক্রের নিয়ত আবর্ত্তন মাত্র, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে চিরগমনাগমনশীল এক ব্যবধান। তবে এই মধ্যবর্ত্তী বস্তু সেই চিরপ্রিয়ের প্রকাশের সহায়ক হয়। এই "লয়া' ইহ্"-কাব্য ছাড়া আর একটি কাব্যেও এই সুফীতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহা মহমূদ শবিস্তরীর 'গুলশন্-ই-রাজ' বা 'গূঢ়তত্ত্বের ফুলবন'। এই দুই গ্রন্থেরই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বা বাস তখনই হইবে, যখন আত্মা উপলব্ধি করিবে যে আমিত্ব মায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং এই জগতের বস্তুসকল মানব-মনের মুকুরের উপর আসা-যাওয়া করিয়া অবাস্তব ছায়াপাত করিতেছে মাত্র, তাই কবি শবিস্তরী বলিতেছেন :—

যাও যরা,—
মনের মন্দির তব সযতনে মার্জ্জনা করিয়া
প্রস্তুত করিয়া রাখ, প্রিয়তম আসিবে সেথায় ;
বাহিরিয়া গেলে তুমি, সে তোমার আসিবে আপনি,
প্রকাশিবে রূপ তার 'তোমা'-হীন তোমার আত্মায়।

সুফীর কাছে এই অদ্ভুত প্রপঞ্চময় জাগতিক ব্যাপার আর কিছুই নয়, শুধু পুনঃপুনঃঘটনশীল উৎপত্তি ও লয়ের ধারা ; ঈশ্বরের সহিত মিলন-যোগে সেই ধারার পরিসমাপ্তি।

এখানে কোনও কোনও দিক্ হইতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি পার্থিব প্রণয়ের বস্তু শুধু ঈশ্বরের ক্ষণিক ছায়ামাত্র হয়, তবে যে-মানুষ সে বস্তুকে ভালবাসে সেও তেমনই তুচ্ছ ; এবং ঈশ্বর নিজে যখন সৃষ্টিতে বিভক্ত হইয়া আছেন, তখন তিনি কেমন করিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হইবেন, কেন না 'অংশ' তো সমগ্রের সমান নয়। এ-সকল প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। এইখানে বেদান্তের শিক্ষা আরও স্পষ্ট হইয়াছে। তারাগুলি আকাশে এবং সমুদ্রবক্ষে সমভাবে দেখা যাইতেছে। সমুদ্র লুপ্ত হইলে তারাগুলির ছায়াও লুপ্ত হইবে, কিন্তু তারাগুলি থাকিবে। সেইরূপ, এই জগতের লয় হইলে মানবত্ব নামে যে অসংখ্য ছায়ারূপ ছিল তাহার বিলয় হইবে। ঈশ্বর তো আছেনই, থাকিবেনও, এবং আমরাও (জীবাত্মা) থাকিব, কারণ আমরা তাঁহা হইতেই আসিয়াছিলাম। এক মহান্ ধ্বনি সব একাকার করিয়া ফেলিয়াছে। সেই ধ্বনি নরনারীর অন্তরে, জীবজন্তু-কীটপতঙ্গের মধ্যে, পর্ব্বতে সমুদ্রে, মরুতে কান্তারে, সূর্য্যচন্দ্র-গ্রহতারকার দোলায় শব্দিত হইয়াছিল। এই ধ্বনি প্রেমের ধ্বনি · যেখানে সমস্ত গিয়া মিলিবে সেই মহাকালের স্রোতের দিকে সকলের প্রতি প্রেমের মহা-আহ্বান। সুফী জানে এই ধ্বনি ঈশ্বরের ডাক, তিনি তাঁহার সকল প্রেমিক ভক্তদের এক মহা-প্রেমোৎসবে আমন্ত্রণ করিতেছেন। স্বার্থযুক্ত বাসনাময় পার্থিব প্রেম কেমন করিয়া পরমার্থে লগ্ন হইয়া পরম স্থৈর্য্য ও চরমঃসার্থকতা লাভ করে, কবি জামী তাঁহার 'সলামান ও আব্সাল' কাব্যটিতে তাহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কামনাসক্ত প্রণয়ীযুগলকে তিনি বলিতেছেন—

দুজনে দোঁহার পানে চাহ নিরবধি
সুবিমল প্রেমে হিয়া ভ'রে
পরম প্রিয়ের সত্তা হেরি' পরস্পরে ;—
চেয়ে চেয়ে দেখিবে তখন
ভিন্ন আর নাহি দুই জন,
হয়ে গেছে অবিচ্ছিন্ন একেতে মগন।
যাহা কিছু একে নাহি মিশে
ভিন্ন থাকে যত দিন সৃষ্টির মাঝারে—
সুনিশ্চয় বিচ্ছেদ যাতনা
সহিতে হইবে তারে তত দিন তরে।
যেবা পুনঃ প্রেমের নগরে
পশিবারে পারে চিরতরে,
সেই দেখে এক ভিন্ন সেথা কিছু নাই ;
দেখে সেথা সব একাকার
একত্বেই মিলন সবার।

এই প্রেম কি? প্রেমধর্ম্মই বা কি? মানুষের অকৃত্রিম স্বভাবজ প্রেমের সঙ্গে কোনও বস্তুর তুলনা হয় না। প্রেমের তুলনা প্রেমই। প্রেম কেহ চোখে দেখে নাই, কারণ ঈশ্বরকে কেহ চোখে দেখে নাই। শিশু মৃত প্রজাপতির জন্য দুঃখ করে, সেই মৃত প্রজাপতির দেহকে সদয়ভাবে আদর করে,—ইহার কারণ এ নহে যে, সে মৃত্যুর রহস্য বুঝে ; কেবল এক অন্তর্গূঢ় প্রেমই তাহাকে ঐরূপ করিতে প্রণোদিত করে। তাই আমরা, 'কেন, কিসের জন্য' না জানিয়াই ভালবাসি। দুই জনের মধ্যে প্রথমে যে

ভালবাসা জন্মায়, প্রায়ই দেখা যায় তাহাতে উভয়ের কাহারও নিজের হাত থাকে না। তবে ইহা কেমন করিয়া আসে? ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সঞ্জাত সহস্র সহস্র ঘটনার লব্ধ প্রবণতার বিস্তার মাত্র। পূর্ব্বের কত জন্মের কত প্রণয়-ঘটনার সুপ্ত স্মৃতির ফলে ইহজন্মে সুযোগ আসিলেই মানুষের হৃদয়ে প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এই তত্ত্বই মহাকবি কালিদাস তাঁহার শকুন্তলা নাটকে মহারাজ দুষ্মন্তের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, যখন রাজার চিত্ত মহিষী হংসপদিকার গান শুনিয়া মুগ্ধ ও পর্য্যুৎসুক হইল—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"

অর্থাৎ, রম্য দৃশ্য দেখিয়া বা মধুর শব্দ শুনিয়া সুখী জীব বা ব্যক্তির চিত্তও যে পর্য্যুৎসুক বা ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহার কারণ নিশ্চয় এই, যে, তাহার আত্মায় দৃঢ় অঙ্কিত কোন জন্মান্তরীণ সৌহার্দ্দ বা প্রণয়-ঘটনার স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাহার চিত্ততটে আঘাত করে।

মানুষ তাহার জীবনে কোন-না-কোন সময়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে, সেই সমস্ত পূর্ব্বতন অসংখ্য প্রেমপ্রবণতার ব্যাপার, নর বা নারীর অতীত জন্মের অসংখ্য প্রণয়ের আকূতি, যাহা আত্মায় আত্মায় সম্পর্ক ধরিয়া রাখে বলিয়া মনে হয়, সে সবই সৃষ্টজীবের মধ্যে ঈশ্বরের ক্ষণিক প্রকাশমাত্র। কেহ এক জন নারীকে ভালবাসে,—শুধু সে সুন্দরী বলিয়াই নয়। সে ভালবাসে হয়ত এই জন্য যে, সেই রমণী কেমন এক অপরূপ ভাবে কথা কয় বা গান গায় যাহা তার হৃদয়ে সম্যক্ প্রবেশ লাভ করে; যেন তাহাতে এমন এক ধ্বনি আছে যাহা তাহার আত্মাকে উন্নত ও সবল করিয়া তোলে। সেই ধ্বনিটুকু, সেই অদৃশ্য কল্পমূর্ত্তি যেন দেশে দেশে হৃদয়ে-হৃদয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়া নব নব জন্মে সে খুঁজিয়া বেড়ায়। এইরূপে জন্মজন্মের সঞ্চয়ে প্রেমের পরিণতিও হইতে থাকে। যখন ভালবাসা সহজাত হইয়া যাইবে, যখন কিছু চাই বলিয়া ভালবাসি না, ভালবাসার জন্যই, অর্থাৎ ভালবাসিতেই চাই বা ভাল লাগে বলিয়া ভালবাসিব, যখনই স্বার্থ ও অহংবুদ্ধি লোপ পাইবে, তখনই তাঁহাকে, সেই প্রেমের ঠাকুরকে, দেখিতে পাইব। দেখিব যে, এতকাল যে প্রবল অভিলাষে অপরের কাছে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছিলাম, সেই পরমপ্রিয়ই তাহার পরিপূর্ণতা, তাহার চরম সার্থকতা। ঈশ্বরের মধ্যে যত নিজেকে হারাইয়া ফেলি, তত বেশী করিয়া তাঁহাকে পাই। নরনারী এ-জগতে আসে, ভালবাসে, চলিয়া যায়। এমনি কতবার। কিন্তু প্রেম—সেই ঐশ্বরিক সত্তাটুকু অগণিত জন্মের মধ্য দিয়া অন্তঃপ্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে আপন অনন্ত গৌরবের পথে। তাই এই ধ্বংসশীল জগতে প্রেম ব্যক্তিবিশেষে বা জড়দেহে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে প্রেমের সেই বিষয়বস্তুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহারও লয় হইত। যাহা ভাল, অর্থাৎ যাহা সত্য ও স্থায়ী, যাহা পবিত্র অর্থাৎ কল্যাণকর, এবং যাহা সুন্দর, প্রেম যদি তাহারই প্রতি হয়, তবে সেই প্রেম চিরস্থায়ী হয়। এই সত্য, শিব ও সুন্দর, সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তার, সেই ঐশ্বরিক প্রেমেরই অংশ। তাই নরনারীর মধ্যে ঈশ্বরের আলোকের যে প্রকাশ, তাহারই প্রেমে মগ্ন হও; যে দেহ-প্রদীপের মধ্য দিয়া এই আলোক প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতি তোমার প্রেমকে লগ্ন করিও না, কেন না দেহ ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইবে; এবং মনের প্রবৃত্তিসকলও লয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেই পূর্ণ-সত্য, পূর্ণ-আনন্দ, পূর্ণ-সুন্দরের প্রেম শাশ্বত; এবং পার্থিব প্রেমের মধ্যে যখন তাঁহারই প্রভাব ও প্রকাশ পাওয়া যায়, তখন জানিতে হইবে যে, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে নিজেকে পাইয়াছেন এবং মানুষও তাহার মধ্যে নিজেকে দেখিতেছে। ইহাই সুফীদের চরম শিক্ষা।

সুফীর কাছে ঈশ্বর প্রিয়তম প্রেমের পাত্র, পরম বন্ধু। যাহা কিছু আমি হই নাই, যাহা আমার নাই, যাহা আমি হইতে বা পাইতে চাই, তাহাই তিনি। আবার তিনিও প্রেমিক এবং আমরা, তাঁর প্রেমের পাত্র।

সুফীধর্ম্ম মূলতঃ প্রেমের ধর্ম্ম। ইহার সাধন-প্রণালীর কোনও বিশেষ অনুশাসন নাই। সুফীর ধর্ম্মবিশ্বাসে কোনও নির্ম্মম কঠোর নরকের বিভীষিকা জাগিয়া উঠে না। পরপারের যাত্রার জন্য কোনও বিশেষ বাঁধাধরা পথ নাই। সুফীরা বলেন, "ঈশ্বরে পৌঁছিবার পথের সংখ্যা মানবের আত্মার সংখ্যার মতই অগণিত।" কি সুন্দর উদার কথা! সকল ধর্ম্মের এই ভেদমুক্ত তত্ত্বটুকু প্রয়োগ করিতে পারিলে জগতের অশেষ কল্যাণ হইবে। ইহাতে মানুষের চিন্তায় মাধুর্য্য ও গভীরতা আসিবে, এবং ধর্ম্মের তুচ্ছ, অনাবশ্যক. ভেদসকারী গণ্ডী বা অনুশাসন ভুলিয়া মানব সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যময়ের অনুভূতিতে মগ্ন হইবে।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। এক বার ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। ধন্‌ঝরি শৈলমালা একটি সুন্দর স্বপ্নের মত আমার মন অধিকার করিয়া আছে···তাহার বনানী···তাহার জ্যোৎস্না-লোকিত রাত্রি···

সঙ্গে লইলাম যুগলপ্রসাদকে।

তহশিলদার সজ্জন সিংয়ের ঘোড়াটাতে যুগলপ্রসাদ চড়িয়াছিল—আমাদের মহালের সীমানা পার হইতে না-হইতে বলিল—হুজুর, এ-ঘোড়া চলবে না, জঙ্গলের পথে রহল চাল ধরলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও পা খোঁড়া হবে। বদলে নিয়ে আসি।

তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম। সজ্জন সিং ভাল সওয়ার, সে কতবার পূর্ণিয়ায় মোকদ্দমা তদারক করিতে গিয়াছে এই ঘোড়ায়। পূর্ণিয়া যাইতে হইলে কেমন পথে যাইতে হয় যুগলপ্রসাদের তাহা অজ্ঞাত নয় নিশ্চয়ই।

শীঘ্রই কারো নদী পার হইলাম।

তার পরই অরণ্য, অরণ্য···সুন্দর, অপূর্ব্ব, ঘন, নির্জ্জন অরণ্য! পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ-জঙ্গলে মাথার উপরে গাছপালার ডালে ডালে জড়াজড়ি নাই—কেঁদ-চারা, শাল-চারা, পলাশ, মহুয়া, কুলের অরণ্য—প্রস্তরাকীর্ণ রাঙা-মাটির ডাঙা, উঁচু নীচু। মানুষজন নাই।

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম লবটুলিয়ার নূতন তৈরি ঘিঞ্জি কুশ্রী টোলা ও বস্তি এবং একঘেয়ে ধূসর, চষা জমি দেখিবার পরে। এ-রকম আরণ্য প্রদেশ এদিকে আর কোথাও নাই।

এই পথের সেই দুটি বন্য গ্রাম—বুরুডি ও কুলপাল বেলা বারোটার মধ্যেই ছাড়াইলাম। তার পরেই ফাঁকা জঙ্গল পিছনে পড়িয়া রহিল—সম্মুখে বড় বড় বনস্পতির ঘন অরণ্য। কার্ত্তিকের শেষ, বাতাস ঠাণ্ডা—গরমের লেশমাত্র নাই।

দূরে দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিল।

সন্ধ্যার পরে কাছারিতে পৌঁছিলাম। যে বিড়িপাতার জঙ্গল আমাদের ষ্টেট নীলাম ডাকিয়া লইয়াছিল, এ-কাছারি সেই জঙ্গলের ইজারাদারের।

লোকটা মুসলমান, শাহাবাদ জেলায় বাড়ী। নাম আবদুল ওয়াহেদ। খুব খাতির করিয়া রাত্রে রাখিয়া দিল। বলিল—সন্দের সময় পৌঁছেছেন ভাল হয়েছে বাবুজী। জঙ্গলে বড় বাঘের ভয় হয়েছে।

নির্জ্জন রাত্রি।

বড় বড় গাছে শন্ শন্ করিয়া বাতাস বাধিতেছে।

কাছারির বারান্দায় বসিবার ভরসা পাইলাম না কথাটা শুনিয়া।

ঘরের মধ্যে জানালা খুলিয়া বসিয়া গল্প করিতেছি—হঠাৎ কি একটা জন্তু ডাকিয়া উঠিল বনের মধ্যে। যুগলকে বলিলাম—কি ও? যুগল বলিল—ও কিছু না, হুড়াল। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।

এক বার গভীর রাত্রে বনের মধ্যে হায়েনার হাসি শোনা গেল—হঠাৎ শুনিলে বুকের রক্ত জমিয়া যায় ভয়ে, ঠিক যেন কাশরোগীর হাসি, মাঝে মাঝে দম বন্ধ হইয়া যায়, মাঝে মাঝে হাসির উচ্ছ্বাস।

পরদিন ভোরে রওনা হইয়া বেলা ন-টার মধ্যে দোবরু পান্নার রাজধানী চকমকিটোলায় পৌঁছানো গেল। ভানুমতী কি খুশী আমার অপ্রত্যাশিত আগমনে! তার মুখে চোখে খুশী যেন চাপিতে পারিতেছে না, উপছাইয়া পড়িতেছে।

—আপনার কথা কালও ভেবেছি বাবুজী। এত দিন আসেন নি কেন?

ভানুমতীকে একটু লম্বা দেখাইতেছে, একটু রোগাও বটে। তাছাড়া মুখশ্রী আছে ঠিক তেমনি লাবণ্যভরা, সেই নিটোল গড়ন তেমনি আছে।

—নাইবেন তো ঝরণায়? মহুয়া তেল আনব, না কচুয়া তেল? এবার বর্ষায় ঝরণায় কি সুন্দর জল হয়েছে দেখবেন চলুন।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি—ভানুমতী ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে তার সেদিক দিয়া তুলনাই হয় না—তার বেশভূষা ও প্রসাধনের সবুজ সৌন্দর্য্য ও রুচিবোধই তাহাকে অভিজাত-বংশের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে-মাটির ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছি, তাহার উঠানে চারি ধারে বড় বড় আসান ও অর্জ্জুন গাছ। এক ঝাঁক সবুজ বনটিয়া সামনের আসান গাছটার ডালে কলরব করিতেছে, হেমন্তের প্রথম, বেলা চড়িলেও বাতাস ঠাণ্ডা। আমার চোখের সামনে আধ মাইলেরও কম দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়ের গা বহিয়া নামিয়া আসিয়াছে চেরা সিঁথির মত পথ—এক দিকে অনেক দূরে নীল মেঘের মত দৃশ্যমান গয়া জেলার পাহাড়শ্রেণী।

হাতে যে পয়সা নাই! নতুবা বিড়ির পাতার জঙ্গল ইজারা লইয়া এই শান্ত জনবিরল বন্য প্রদেশের পল্লবপ্রচ্ছায় উপত্যকার কোনো পাহাড়ী ঝরণার তীরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতাম চিরদিন। লবটুলিয়া তো গেল, ভানুমতীর দেশের এ-বন কেহ নষ্ট করিবে না। এ-অঞ্চলে মকম কাঁকর ও পাইওরাইট্ বেশী মাটিতে, ফসল তেমন হয় না—হইলে এ-বন কোন্ কালে ঘুচিয়া যাইত। তবে যদি তামার খনি বাহির হইয়া পড়ে, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

তামার কারখানার চিমনি, ট্রলি লাইন, সারি সারি কুলিবস্তি, ময়লা জলের ড্রেন, এঞ্জিন-ঝাড়া কয়লার ছাইয়ের স্তূপ…দোকান-ঘর, চায়ের দোকান, সস্তা সিনেমার 'জোয়ানী-হাওয়া' 'শের শমসের' 'প্রণয়ের জের' (ম্যাটিনিতে তিন আনা, পূর্ব্বাহ্ণে আসন দখল করুন)—দেশী মদের দোকান, দরজীর দোকান।

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসি (সমাগত দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়)। আদি ও অকৃত্রিম আদর্শ হিন্দু হোটেল।

কলের বাঁশিতে তিনটার সিটি বাজিল।

ভানুমতী ঝুড়ি মাথায় করিয়া এঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা বাজারে ফিরি করিতে বাহির হইয়াছে—ক-ই-লা চা-ই-ই—চার পয়সা ঝুড়ি।

একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভানুমতী তেল আনিয়া সামনে দাঁড়াইল। ওদের বাড়ীর সবাই আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতীর ছোট কাকা নবীন যুবক জগরু একটা গাছের ডাল ছুলিতে ছুলিতে আসিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। এই ছেলেটিকে আমি বড় পছন্দ করি। রাজপুত্রের মত চেহারা ওর, কালোর উপরে কি রূপ! এদের বাড়ীর মধ্যে এই যুবক এবং ভানুমতী, এদের দু-জনকে দেখিলে সত্যই যে ইহারা বন্য জাতির মধ্যে অভিজাতবংশ, তা মনে না হইয়া পারে না।

বলিলাম—কি জগরু, শিকার-টিকার কেমন চলছে?

জগরু হাসিয়া বলিল—আপনাকে আজই খাইয়ে দেব বাবুজী ভাববেন না। বলুন কি খাবেন, সজারু, না হরিয়াল, না বনমোরগ?

স্নান করিয়া আসিলাম। ভানুমতী নিজের সেই আয়নাখানি (সেবার যেখানা পূর্ণিয়া হইতে আনিয়া দিয়াছিলাম) আর একখানা কাঠের কাঁকই চুল আঁচড়াইবার জন্য আনিয়া দিল।

আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, ভানুমতী প্রস্তাব করিল—বাবুজী, চলুন পাহাড়ে উঠবেন না? আপনি তো ভালবাসেন।

যুগলপ্রসাদ ঘুমাইতেছিল, সে ঘুম ভাঙিয়া উঠিলে আমরা বেড়াইবার জন্য বাহির হইলাম। সঙ্গে রহিল ভানুমতী, ওর খুড়তুতো বোন—জগরু পান্নার মেজ ভাইয়ের মেয়ে, বছর বার বয়স—আর যুগলপ্রসাদ।

আধ মাইল হাঁটিয়া পাহাড়ের নীচে পৌঁছিলাম।

ধন্‌ঝরির পাদমূলে এই জায়গাটায় বনের দৃশ্য এত অপূর্ব্ব যে খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকেই বড় বড় গাছ, লতা, উপল-বিছান ঝরণার খাদ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট-বড় শিলাস্তূপ, ধন্‌ঝরির দিকে বনে ও পাহাড়ের আড়ালে আকাশটা কেমন সরু হইয়া গিয়াছে, সামনে লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা উঁচু হইয়া ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের ও-পারের দিকে

উঠিয়াছে, কেমন খটখটে শুকনো ভাঙা মাটি, কোথাও ভিজা নয়, স্যাঁতসেঁতে নয়। ঝরণার খাদেও এতটুকু জল নাই।

পাহাড়ের ওপর ঘন বন ঠেলিয়া কিছু দূর উঠিতেই কিসের মধুর সুবাসে মনপ্রাণ মাতিয়া উঠিল, গন্ধটা অত্যন্ত পরিচিত—প্রথমটা ধরিতে পারি নাই, তার পরে চারি দিকে চাহিয়া দেখি—ধন্‌ঝরি পাহাড়ে যে এত ছাতিম গাছ তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই—এখন প্রথম হেমন্তে ছাতিম গাছে ফুল ধরিয়াছে, তাহারই সুবাস।

সে কি দু-চারটি ছাতিম গাছ? সপ্তপর্ণের বন, সপ্তপর্ণ আর কেলিকদম্ব—কদম্ব ফুলের গাছ নয়, কেলিকদম্ব ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ, সেগুন পাতার মত বড় বড় পাতা, চমৎকার আঁকাবাঁকা ডালপালাওয়ালা বনস্পতিশ্রেণীর বৃক্ষ।

হেমন্তের অপরাহ্ণের শীতল বাতাসে পুষ্পিত বন্য সপ্তবর্ণের ঘন বনে দাঁড়াইয়া নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী ভানুমতীর দিকে চাহিয়া মনে হইল মূর্ত্তিমতী বনদেবীর সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—কৃষ্ণা বনদেবী। রাজকুমারী তো ও বটেই, এই বনাঞ্চল, এই পাহাড়, ওই মিছি নদী, কারো নদীর উপত্যকা, এদিকে ধন্‌ঝরি, ওদিকে নওয়াদার শৈলশ্রেণী—এই সমস্ত স্থান এক সময়ে যে পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীনে ছিল, ও সেই রাজবংশের মেয়ে—আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায়, ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে-রাজবংশ বিপর্য্যস্ত, দরিদ্র, প্রভাবহীন—তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মত। ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় আমার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। আজকার আমার এই অপরাহ্ণটি জীবনের আরও বহু সুন্দর অপরাহ্ণের সঙ্গে মিলিয়া মধুময় স্মৃতির সমারোহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—স্বপ্নের মত মধুর, স্বপ্নের মতই অবাস্তব।

ভানুমতী বলিল—চলুন, আরও উঠবেন না?

—কি সুন্দর ফুলের গন্ধ বল তো! একটু বসবে না এখানে? সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে দেখি—

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আপনার যা মর্জ্জি বাবুজী। বসতে বলেন এখানে বসি। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের কবরে ফুল দেবেন না? আপনি সেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি রোজ পাহাড়ে উঠি ফুল দিতে। এখন তো বনে কত ফুল।

দূরে মিছি নদী উত্তরবাহিনী হইয়া পাহাড়ের নীচে দিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে। নওয়াদার দিকে যে অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণী, তারই পিছনে সূর্য্য অস্ত গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী হাওয়া আরও শীতল হইল। ছাতিম ফুলের সুবাস আরও ঘন হইয়া উঠিল, ছায়া গাঢ় হইয়া নামিল শৈলসানুর বনস্থলীতে, নিম্নের বনাবৃত উপত্যকায়, মিছি নদীর পরপারের গণ্ড শৈলমালার গাত্রে।

ভানুমতী এক গুচ্ছ ছাতিম ফুল পাড়িয়া খোঁপায় গুঁজিল। বলিল—বসব, না উঠবেন বাবুজী?

আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যেকের হাতে এক একটা ছাতিম ফুলের ডাল। একেবারে পাহাড়ের উপরে উঠিয়া গেলাম। সেই প্রাচীন বটগাছটা ও তার তলায় প্রাচীন রাজসমাধি। বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের মত পাথর চারি দিকে ছড়ানো। রাজা দোবরু পান্নার কবরের উপর ভানুমতী ও তাহার বোন নিছনি ফুল ছড়াইল, আমি ও যুগলপ্রসাদ ফুল ছড়াইলাম।

ভানুমতী বালিকা তো বটেই, সরলা বালিকার মতই মহা খুশী। বালিকার মত আবদারের সুরে বলিল—এখানে একটু দাঁড়াই বাবুজী, কেমন? বেশ লাগছে, না? আমি ভাবিতেছিলাম—এই শেষ। আর এখানে আসিব না। এ পাহাড়ের উপরকার সমাধিস্থান, এ বনাঞ্চল আর দেখিব না। ধন্‌ঝরির শৈলচূড়ায় পুষ্পিত সপ্তপর্ণের নিকট, ভানুমতীর নিকট, এই আমার চিরবিদায়। ছ-বছরের দীর্ঘ বনবাস সাঙ্গ করিয়া কলিকাতা নগরীতে ফিরিব—কিন্তু যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কেন এত বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছি!

ভানুমতীকে কথাটা বলিবার ইচ্ছা হইল, ভানুমতী কি বলে আমি আর আসিব না শুনিয়া—জানিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কি হইবে সরলা বনবালাকে বৃথা ভালবাসার আদরের কথা বলিয়া?

সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নূতন সুবাস পাইলাম। আশেপাশের বনের মধ্যে যথেষ্ট শিউলি

গাছ আছে। বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিউলি ফুলের ঘনসুগন্ধ সান্ধ্য বাতাসকে সুমিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ছাতিম বন এখানে নাই—সে আরও নীচে নামিলে তবে। এরই মধ্যে গাছপালার ডালে জোনাকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাস কি সতেজ, মধুর, প্রাণারাম! এ বাতাস সকালে বিকালে উপভোগ করিলে আয়ু না বাড়িয়া পারে? নামিতে ইচ্ছা করিতেছিল না; কিন্তু বন্য জন্তুর ভয় আছে—তাছাড়া ভানুমতী সঙ্গে রহিয়াছে। যুগলপ্রসাদ বোধ হয় ভাবিতেছিল নূতন কি ধরণের গাছপালা এ জঙ্গল হইতে লইয়া গিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে পারে। দেখিলাম তাহার সমস্ত মনোযোগ নূতন লতা, পাতার ফুল, সুদৃশ্য পাতার গাছ প্রভৃতির দিকে নিবদ্ধ—অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। যুগলপ্রসাদ পাগলই বটে, কিন্তু ঐ এক ধরণের পাগল।

নূরজাহান পারস্য হইতে চেনার গাছ আনিয়া কাশ্মীরে রোপণ করিয়াছিলেন। এখন নূরজাহান নাই, কিন্তু সারা কাশ্মীর সুদৃশ্য চেনার বৃক্ষে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যুগলপ্রসাদ মরিয়া যাইবে, কিন্তু সরস্বতী হ্রদের জলে আজ হইতে শতবর্ষ পরেও হেমন্তে ফুটন্ত স্পাইডার-লিলির বন বাতাসে সুগন্ধ ছড়াইবে, কিংবা কোন না কোন বনঝোপে বন্য হংসলতার হংসাকৃতি নীলফুল দুলিবে, যুগলপ্রসাদই যে সেগুলি নাঢ়া বইহারের জঙ্গলে আমদানি করিয়াছিল এক দিন—একথা নাই বা কেহ বলিল?

ভানুমতী বলিল—বাঁয়ে ওই সেই টাঁড়বারোর গাছ—চিনেছেন?

বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা দেবতা টাঁড়বারোর গাছ অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই। আকাশে চাঁদ নাই, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

অনেকটা নামিয়া আসিয়াছি। এবার সেই ছাতিম বন। কি মিষ্ট মনমাতানো গন্ধ!

ভানুমতীকে বলিলাম—এখানে একটু বসি।

পরে সেই বনপথে অন্ধকারের মধ্যে নামিতে নামিতে ভাবিলাম লবটুলিয়া গিয়াছে, নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহার গিয়াছে। কিন্তু মহালিখারূপের পাহাড় রহিল—ভানুমতীদের ধন্‌ঝরি পাহাড়ের বনভূমি রহিল। এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুষে অরণ্য দেখিতে পাইবে না—শুধুই চাষের ক্ষেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্য প্রদেশে যেমন লোকে তীর্থে আসে। সেই সব অনাগত দিনের মানুষদের জন্য এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক।

রাত্রে বসিয়া জগরু পান্না ও তাহার দাদার মুখে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা শুনিলাম। মহাজনের দেনা এখনও শোধ যায় নাই, দুইটি মহিষ ধার করিয়া কিনিতে হইয়াছে, না কিনিলে চলে না, গয়ার এক মাড়োয়ারী মহাজন আগে আসিয়া ঘি কিনিয়া লইয়া যাইত—আজ তিন-চার মাস সে আর আসে না। প্রায় আধ মণ ঘি ঘরে মজুত, খরিদ্দার নাই।

ভানুমতী আসিয়া দাওয়ার একধারে বসিল। যুগলপ্রসাদ অত্যন্ত চাখোর, সে চা-চিনি সঙ্গে আনিয়াছে আমি জানি। কিন্তু লাজুকতা বশতঃ গরম জলের কথা বলিতে পারিতেছে না, তাহাও জানি। বলিলাম—চায়ের জল একটু গরম করার সুবিধা হবে কি ভানুমতী? রাজকুমারী ভানুমতী চা কখনও করে নাই। চা খাইবার রেওয়াজই নাই এখানে। তাহাকে জলের পরিমাণ বুঝাইয়া দিতে সে মাটির হাঁড়িতে জল গরম করিয়া আনিল। তাহার ছোট বোন কয়েকটি পাথরবাটি আনিল। ভানুমতীকে চা খাইবার অনুরোধ করিলাম, সে খাইতে চাহিল না। জগরু পান্না পাথরের ছোট খোরার এক খোরা চা শেষ করিয়া আরও খানিকটা চাহিয়া লইল। চা খাইয়া আর সকলে উঠিয়া গেল, ভানুমতী গেল না। আমায় বলিল—ক'দিন এখন আছেন বাবুজী। এবার বড় দেরি ক'রে এসেছেন। কাল তো যেতেই দেব না। চলুন আপনাকে কাল ঝাটি ঝরণা বেড়িয়ে নিয়ে আসি। ঝাটি ঝরণায় আরও ভয়ানক জঙ্গল। অনেক বনময়ূর আছে দেখতে পাবেন। চমৎকার জায়গা। পৃথিবীর মধ্যে এমন আর নেই। ভানুমতীর পৃথিবী কতটুকু জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ভানুমতী, কখনো কোন শহর দেখেছ?

—না বাবুজী।

—দু-একটা শহরের নাম বল তো?

—গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।

—কলকাতার নাম শোন নি?

—হাঁ, বাবুজী।

—কোন্ দিকে জান?

—কি জানি বাবুজী!

—আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?

—আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

—ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?

ভানুমতী মাথা নাড়াইয়া জানাইল সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চক্‌মকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোন্ দিকে!

একটু পরে বলিল—জানেন বাবুজী আমার জ্যাঠামশায় একটা মহিষ এনেছিলেন, সেটা একবেলা তিন সের ওবেলা তিন সের দুধ দিত। তখন আমাদের এর চেয়ে ভাল অবস্থা ছিল বাবুজী, তখন যদি আপনি আসতেন, আপনাকে রোজ খোয়া খাওয়াতাম। জ্যাঠামশায় নিজের হাতে খোয়া তৈরি করতেন। কি মিষ্টি খোয়া! এখন তেমন দুধই হয় না তার খোয়া। তখন আমাদের খাতিরও ছিল খুব।

পরে হাতখানি একবার তুলিয়া চারি দিকে ঘুরাইয়া গর্ব্বের সহিত বলিল—জানেন বাবুজী, এই সমস্ত দেশ আমাদের রাজ্য ছিল। সারা পৃথিবীটা। বনে যে গোঁড় দেখেন, সাঁওতাল দেখেন ওরা আমাদের জাত নয়। আমরা রাজগোঁড়। আমাদের প্রজা ওরা, আমাদের রাজা ব'লে মানে।

উহার কথায় দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। মহাজনে দেনার দায়ে দুই বেলা যাহাদের মহিষ ধরিয়া লইয়া যায় সেও রাজবংশের গর্ব্ব করিতে ছাড়ে না।

বলিলাম—আমি জানি ভানুমতী তোমাদের কত বড় বংশ—

ভানুমতী বলিল—তারপর শুনুন বাবুজী, আমাদের সেই মহিষটা বাঘে নিয়ে গেল। জ্যাঠামশায় যে মহিষটা এনেছিলেন।

—কি ক'রে?

—জ্যাঠামশায় ওই পাহাড়ের নীচে চরাতে নিয়ে গিয়ে একটা গাছতলায় বসেছিলেন সেখানে বাঘে ধরল।

বলিলাম—তুমি বাঘ দেখেছ কখনও?

ভানুমতী কালো জোড়া ভুরু দুটি আশ্চর্য্য হইবার ভঙ্গিতে উপরের দিকে তুলিয়া বলিল—বাঘ দেখি নি বাবুজী! শীতকালে আসবেন চকমকিটোলায়—বাড়ীর উঠোন থেকে গরু-বাছুর ধরে নিয়ে যায় বাঘে—

বলিয়াই সে ডাকিল—নিছনি, নিছনি—শোন্—

ছোট বোন আসিলে বলিল—নিছনি, বাবুজীকে শুনিয়ে দে তো আর বছর শীতকালে বাঘ রোজ রাতে আমাদের উঠোনে এসে কি ক'রে বেড়াত। জগরু এক দিন ফাঁদ পেতেছিল। ধরা পড়ল না।

পরে হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, বাবুজী, একখানা চিঠি পড়ে দেবেন? কোথা থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, কে পড়বে, এমনি তোলা রয়েছে। যা নিছনি চিঠিখানা নিয়ে আয় আর জগরু-কাকাকেও ডেকে নিয়ে আয়—

নিছনি চিঠি পাইল না। তখন ভানুমতী নিজে গিয়া অনেক খুঁজিয়া সেখানা বাহির করিয়া আমার হাতে আনিয়া দিল।

বলিলাম—কবে এসেছে এখানা?

ভানুমতী বলিল—মাস ছ-সাত হবে বাবুজী—তুলে রেখে দিইছি, আপনি এলে পড়াবো। আমরা তো কেউ পড়তে পারিনে! ও নিছনি, জগরু কাকাকে ডেকে নিয়ে আয়। চিঠি পড়া হবে—সবাইকে ডাক দে। ছ-সাত মাস পূর্ব্বের পুরোনো অপঠিত পত্রখানা আমি যুগলপ্রসাদের উনুনের আলোয় পড়িতে বসিলাম—আমার চারি ধারে বাড়ীশুদ্ধ লোক ঘিরিয়া বসিল চিঠি শুনিবার জন্য। চিঠিখানা কায়েথী হিন্দীতে লেখা—রাজা দোবরু পান্নার নামে চিঠি। পাটনার জনৈক মহাজন রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছে এখানে বিড়িপাতার জঙ্গল আছে কিনা—থাকিলে কি দরে ইজারা বিলি হয়।

এ পত্রের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই—ইহাদের অধীনে কোন বিড়িপাতার জঙ্গলও নাই, রাজা দোবরু নামে রাজা ছিলেন, চক্‌মকিটোলার নিজ বসতবাটীর বাহিরে তাঁর যে কোথাও এক ছটাক জমিও নাই একথা

পাটনার উক্ত পত্রলেখক মহাজন জানিলে ডাকমাশুল খরচ করিয়া বৃথা পত্র দিত না নিশ্চয়ই।

একটু দূরে দাওয়ার ও-পাশে যুগলপ্রসাদ রান্না করিতেছে। তাহার কাঠের উনুনের আলোয় দাওয়ার খানিকটা আলো হইয়াছে। এদিকে দাওয়ার অর্দ্ধেকটায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, যদিও কৃষ্ণপক্ষের আজ মোটে তৃতীয়া—ধন্বরি পাহাড়ের আড়াল কাটাইয়া এই কিছুক্ষণ মাত্র চাঁদ ফাঁকা আকাশে দৃশ্যমান হইয়াছে। সামনে কিছু দূরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়শ্রেণী—চকমকিটোলার বস্তির ছেলে-পুলেদের কথা ও কলরব শোনা যাইতেছে।...কি সুন্দর ও অপূর্ব্ব মনে হইতেছিল এই বন্য গ্রামে যাপিত এই রাত্রিটি। ভানুমতীর তুচ্ছ ও সাধারণ গল্পও কি আনন্দই দিতেছিল! সেদিন বলভদ্রের মুখে শোনা সেই উন্নতি করিবার কথা মনে পড়িল।

মানুষে কি চায়—উন্নতি না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে? আমি এমন কত লোকের কথা জানি যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত ভোগে মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা—এখন আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট একঘেয়ে, একরঙা, অর্থহীন। মন সানবাঁধানো—রস ঢুকিতে পায় না।

এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত—আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম। আর শুনিতাম বেশী রাত্রে ওই বনে হড়ালের ডাক, বনমোরগের ডাক, হায়েনার হাসি। ভানুমতী কালো বটে, কিন্তু এমন নিটোল, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাংলা দেশে পাওয়া যায় না। আর ওর ওই সতেজ, সরল মন। দয়া আছে, মায়া আছে, স্নেহ আছে—তার কত প্রমাণ পাইয়াছি।...ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন! কি হইবে উন্নতি করিয়া? বলভদ্র সেদ্মাৎ গিয়া উন্নতি করুক। রাসবিহারী সিং উন্নতি করুক।

যুগলপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল রান্না হইয়াছে, চৌকা লাগাইবে কিনা। ভানুমতীদের বাড়ীতে আতিথ্যের কোন ত্রুটি হয় না। এদেশে আনাজ মেলে না, তবুও কোথা হইতে জগরু বেগুন ও আলু আনিয়াছে। মাষ-কলাইয়ের ডাল, পাখীর মাংস, বাড়ীতে তৈরি অতি উৎকৃষ্ট টাটকা ভঁয়সা ঘি, দুধ। যুগলপ্রসাদের হাতের রান্নাও চমৎকার।

ভানুমতী, জগরু, জগরুর দাদা, নিছনি—সবাই আজ আমাদের এখানে খাইবে—আমিই খাইতে বলিয়াছি। কারণ এমন রান্না উহারা কখনও খাইতে পায় না। বলিলাম—একটু দূরে উহারাও এক সঙ্গে সবাই বসুক। যুগলপ্রসাদের দেওয়াও সুবিধা হইবে। একত্র খাওয়া যাক্।

ওরা রাজি হইল না। আমাদের আগে না খাওয়া হইলে উহারা খাইবে না।

পর দিন আসিবার সময় ভানুমতী এক কাণ্ড করিল।

হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল—আজ যেতে দেব না বাবুজী—

আমি অবাক হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

উহার অনুরোধে সকালে রওনা হইতে পারিলাম না—দুপুরের আহারাদির পরে বিদায় লইলাম।

* * *

আবার দুধারে ছায়ানিবিড় বনপথ। পথের ধারে কোথাও রাজকুমারী ভানুমতী যেন দাঁড়াইয়া আছে—বালিকা নয়, যুবতী ভানুমতী—তাহাকে আমি কখনও দেখি নাই। তার সাগ্রহ দৃষ্টি প্রণয়ীর আগমন-পথের দিকে নিবদ্ধ—হয়তো সে পাহাড়ের ওপারের বনে শিকারে গিয়াছে, আসিবার দেরি নাই। তরুণীকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম। ধন্বরি পাহাড়ের জোনাকী-জ্বলা নিস্তব্ধ প্রাচীন ছাতিম ফুলের বন ও অপূর্ব্ব দূরছন্দা সন্ধ্যার আড়ালে বনবালার গোপন অভিসার সার্থক হউক।

মহালে ফিরিয়া সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া লবটুলিয়া ত্যাগ করিলাম।

আসিবার সময় রাজু পাঁড়ে, গনোরী, যুগলপ্রসাদ, আসরফি টিণ্ডেল প্রভৃতি পাক্কীর চারিধারে ঘিরিয়া পাক্কীর সঙ্গে সঙ্গে লবটুলিয়ার সীমানার নতুন বস্তি মহারাজা-টোলা পর্য্যন্ত আসিল। মটুকনাথ সংস্কৃতে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিল। রাজু বলিল—হুজুর, আপনি চলে গেলে লবটুলিয়া উদাস হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি এদেশে 'উদাস' শব্দের ব্যবহার এবং উহার অর্থের ব্যাপকতা অত্যন্ত বেশী। মকাই-ভাজা খাইতে খারাপ লাগিলে বলে 'ভাজা উদাস লাগচে।' আমার সম্পর্কে কি অর্থে উহা ব্যবহৃত হইল ঠিক বলিতে পারিব না।

আমার বিদায় লইয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে কাঁদিয়াছিল। আজ সকাল হইতে আসিয়া সে কাছারির উঠানে দাঁড়াইয়াছিল—আমার পাক্কী যখন তোলা হইল তখন চাহিয়া দেখি সে হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে। মেয়েটি কুন্তা।

নিরাশ্রয়া কুন্তাকে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি আমার ম্যানেজারী জীবনের ইহা একটি সৎকাজ। পারিলাম না কিছু করিতে সেই বন্যবালিকা মঞ্চীর। অভাগিনীকে কে কোথায় যে ভুলাইয়া লইয়া গেল?… আজ সে যদি থাকিত তাহাকে তাহার নিজের নামে জমি দিতাম বিনা সেলামীতে।

নাঢ়া বইহারের সীমানায় নক্ছেদীর ঘর দেখিয়াই আরও ওর কথা মনে পড়িল। সুরতিয়া ঘরের বাহিরে কি করিতেছিল আমার পাক্কী দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—বাবুজী, বাবুজী, একটু রাখুন—

পরে সে ছুটিয়া আসিয়া পাক্কীর কাছে দাঁড়াইল। ছনিয়াও আসিল পিছু পিছু।

—বাবুজী, কোথায় যাচ্ছেন?

—ভাগলপুরে। তোর বাবা কোথায়?

—মহুটোলায় গমের বীজ আনতে গিয়েছে। কবে আসবেন?

—আর আসব না।

—ইস্! মিথ্যে কথা!…

* *

নাঢ়া বইহারের সীমানা পার হইয়া পাক্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম।

বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথাবার্ত্তা, বালক-বালিকার কলহাস্য, চীৎকার, গরু-মহিষ, ফসলের গোলা। ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে। সবাই কাল তাহাই বলিতেছিল—বাবুজী আপনার কাজ দেখে আমরা পর্য্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছি, নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হয়েছে।

কথাটা আমিও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। নাঢ়া ও লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হইয়াছে।

দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড়ে ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশে দূর হইতে নমস্কার করিলাম।

হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!

বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে তার পর—পনেরো-ষোল বছর!

বাদাম গাছের তলায় বসিয়া এই সব ভাবিতেছিলাম।

বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে।…

বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের সে অপূর্ব্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা, ভানুমতী তাহাদের সে শৈল-বেষ্টিত অরণ্যভূমিতে কি করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরিধারীলাল, কে জানে এত কাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে!…

আর মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়াছে, না আসামের চা-বাগানে চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও?

কতকাল তাহাদের আর খবর রাখি না।

সমাপ্ত

দহন-কল্যাণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

বন্দন লাগি, আজি নি পুষ্পহার,
আজি বিনম্র অম্বরে কাঁপে, গম্ভীর মেঘভার,
পুঞ্জিত অভিশপ্ত কালিমা অঞ্জনসম ঘেরে
মেঘ-ডম্বরে-মেঘনাদ উঠি' হুঙ্কারি নেচে ফেরে,
উল্লাসি ছুটে, গর্জন উঠে,
নভোমণ্ডলে তর্জন ফুটে,
নভোরথ যবে, ওঠে অলক্ষ্যে, গগনবক্ষে,
পক্ষযুগল নাড়ি,
ঝটিকাবেগের গতিপ্রকম্প কাড়ি,
ধূম্র-দহন-শিখা বিমন্দ্র ছাড়ি।
তূর্য হইতে ধ্বনি সদতে ছুটে—
বজ্রগোলক দীর্ণ গগনে টুটে—
শঙ্কা ভীষণ রুদ্র রোষণ ঝঞ্ঝা পবনসনে
দৃপ্ত দহন অগ্নিলোচন মত্ত মরণ-রণে
গৃধিনীশ্রেণী মৃত্যুবেণীর
গহন দ্বন্দ্ব রথে
যুগে যুগে মূর্ত্ত মৃত্যু ভীষণ দ্বন্দ্ব পথে
রণ উল্লাসে জয় উচ্ছ্বাসে স্বর্গ বায়ুর মার্গ রুধিয়া
অর্গলহীন ছুটে;
মরণগর্ভ কন্দুকদল বন্দুকধারা ক্ষণচঞ্চল
কোটি বজ্রের নিনাদ গর্জে নভোপঞ্জরে ফুটে—
গগন ভুবন টুটে।
অবগুণ্ঠনে মণ্ডিত মুখ, নাসা নিরুদ্ধ পিনদ্ধবুক,
অন্ধ পাগল দম্ভকবদ্ধ শিরবিনম্র বিষের ধূম্র ছাড়ে
গগনে পবনে দহন লগনে লক্ষ যোধেরা বক্ষ বাঁধিয়া
মরণ পক্ষ নাড়ে।
পুরপল্লীর মল্লিকাননে অগ্নির শিখা রঙ্গ লহরে ফেরে,
মণিচত্বরে গম্বুর গোলা গরজি গরজি বজ্র উগারি ফেরে,
পূর্বকালের গ্রন্থের রাশি অট্টহাসিতে
অগ্নি ফেলিছে গ্রাসি;
জলে দর্শন, জলে বেদান্ত, জলে বেদাঙ্গ
সকল শাস্ত্ররাশি।

জ্বলিছে কাব্য কোমল কান্ত,
নিমেষে নিমেষে বাড়িছে আগুন,
সকল ফেলিছে নাশি,
জ্বলে মন্দির চিত্র-কানন, জ্বলে মসজিদ গির্জা-ভবন
আর্ত্ত পীড়িত ক্ষুধিত ব্যাথিত দলিয়া মথিয়া অগ্নি পবন ধায়;
জননীর কোলে শিশু কাঁদে রোলে চাহে পলাইতে—
পথ খুঁজে নাহি পায়।
শত নাগিনীর বিষজর্জর হিংসাবহ্নি জ্বলে
জ্বলিছে সূর্য, জ্বলিছে চন্দ্র দিবসে দণ্ডে পলে,
সাগরের জল জ্বলিয়া উঠিছে বড়বা বক্রমুখে
বিকট নক্র হুঙ্কারি ওঠে চক্রবালের বুকে;
বজ্র নাচিছে অম্বুধিজলে, পাতালপুরীতে
বাসুকি দিয়েছে খিল,
ছুটে জলচর, মৎস্য সকল, তিমির পিছনে ছুটেছে তিমিঙ্গিল।
রুদ্র এসেছে দৈত্যের বেশে, প্রলয় নাচনে আজ
হিংসা তুলেছে রক্ত নিশান পিশাচ করেছে সাজ।
মহেশ তোমার তৃতীয় নয়ন মুক্ত করেছ রোষে,
শঙ্কিত ধরা পঙ্কিল হ'ল হিংসা পিছিল দোষে।
ঢাল ঢাল আজি উষ্ণ রক্তধারা,
তোল তোল আজি কালীর করাল খাঁড়া,
অযুত লক্ষ নির্ঝর ধারে আসুক শোণিত বাণ,
ভার্গব এস কুঠারহস্তে সত্যের রাখ মান।
নির্দয় হাতে সভ্যজাতির গর্ব খর্ব কর,
গ্লানি অপমান মৃত্যুর সাথে মিশায়ে পাত্রে ধর।
বিজ্ঞানে যারা ধূলায় টানিল হিংসার বেদীতলে,
আপন ভায়েরে লোভের জ্বালায় পাষাণ বাঁধিল গলে,
অপমান ধূলি পঙ্ক মাখাল প্রাচ্য জাতির মুখে,
অন্নের গ্রাস মুখ হোতে কেড়ে শল্য বিঁধিল বুকে
দম্ভের ভরে আপন দৃষ্টি আপনি রুধিল যারা,
চির সত্যের চির মৈত্রীর দীপ্তি করিল হারা,
তাদের রক্তে ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভুবনখানি
হোক্ প্রতিষ্ঠা চির সত্যের প্রাচীন আসনখানি।

সাঁতারের কথা

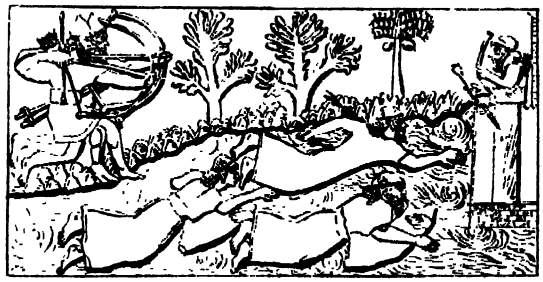
শ্রীশান্তি পাল

বিভিন্ন যুগে সন্তরণ

জগতের সন্তরণ-ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, অতি পুরাকালেও অন্যান্য ব্যায়াম অপেক্ষা সন্তরণ অধিক আদরণীয় ছিল। মানুষ নদী হ্রদ সমুদ্র কিংবা অন্য কোন জলস্রোতে নিয়মিত স্নান করিত। আমাদের দেশের মত প্রাচীন কালে মিশরের পুরোহিতগণ প্রাতঃকালে অবগাহন স্নান করিয়া নিজেদের পবিত্র করিতেন। আমাদের দেশের ভাগীরথীর ন্যায় নীলনদ মিশরবাসীদিগের নিকট অতি পবিত্র।

প্রাচীন কালে গ্রীকদিগের মধ্যেও সন্তরণ-চর্চ্চা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এক-হাতি পাড়ি বুক-সাঁতার বা কাঁচি পাড়ি যাহা আমরা আধুনিক বলিয়া জানি তাহার চিত্র প্রাচীন ভাস্কর্য্যে দেখা যায়। গ্রীকগণ আমাদের মত স্রোতজলে স্নান করিতেন। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং সন্তরণ-ব্যাপকতার জন্য বহু স্নানাগারও নির্ম্মিত হয়। ইলিয়ডে দেখি, প্রাচীনগণ নদনদীতে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হইতেন। হোমরের মতে, ইউলিসিস্ এক জন সুদক্ষ সাঁতারু ছিলেন। মহাভারতে ভীমযুধিষ্ঠিরাদি যে সাঁতার কাটিতেন তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন,"রামায়ণে রাজপুত্রদের শিক্ষার উপযুক্ত বিষয় দেওয়া হইয়াছে—ধনুর্ব্বেদ, নীতিশাস্ত্র, হস্তী ও রথতত্ত্ব, আলেখ্য ও লেখ্য লঙ্ঘন (উল্লম্ফন ও অন্য ব্যায়ামাদি) এবং প্লাবন (সন্তরণ)।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "গৌতমকে মল্লযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধ অশ্বারোহণ ধনুর্বিদ্যা সন্তরণ ইত্যাদি শিখিতে হইয়াছে।" রামায়ণে ভরতের সসৈন্য নদী উত্তরণকালে বহু সৈন্য "বাহু মাত্রেই নির্ভর করিয়া পার হইল," এইরূপ উল্লেখ আছে। ওডেসিতে উল্লেখ রহিয়াছে যে; কিসিয়ার রাজকন্যা নসিকা তাঁহার সহচরীগণ সহ নদীতে স্নান করিতেন।

সুতরাং দেখা যায় যে প্রাচীন গ্রীকগণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপবাসিগণ সন্তরণ ও ঝম্পে বেশ পটু ছিলেন।



সন্তরণযোগে যোদ্ধাদের স্বদুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন।
প্রাচীন আসীরীয় চিত্র হইতে

প্রাচীন রোমে সন্তরণ-বিদ্যা সামরিক শিক্ষার একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল। ইহা রোমক সৈন্যদিগের একটি বিশেষ গুণ হিসাবে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইত। যুদ্ধের সময় সন্তরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিতে বা তাহাদের অনুসরণ করিতে, নদনদী পারাপারের সময় সন্তরণ বিশেষ কাজে লাগিত।

ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই হোরেসাসের সাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যের সহিত পরিচিত। তিনি এবং তাঁহার অপর দুই জন সহকর্ম্মী টাসকান্ শত্রুগণের বিপক্ষে সেতুপথ রক্ষা করিতেছিলেন। শত্রুরা সেতু ধ্বংস করিতেছিল। সহকর্ম্মী দুই জন পতনোন্মুখ সেতুপথ অতিক্রম করেন। হোরেসাস একাকী পরসৈন্যার সম্মুখীন হন এবং সন্তরণ দ্বারা টাইবার নদী অতিক্রম করেন। জুলিয়াস সিজর এক জন সন্তরণবীর ছিলেন। টলেমি কর্ত্তৃক সিজর যখন আক্রান্ত হন, তখন তিনি সন্তরণ দ্বারা রণপোতে যান এবং পরে জলযুদ্ধে টলেমিকে পরাস্ত করিয়া ক্লিওপেট্রাকে সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করেন।

শেক্সপীয়রে, সিজর এবং ক্যাসাসের সন্তরণ-



সন্তরণের উদ্যোগ। প্রাচীন গ্রীসীয় চিত্র হইতে



আসীরীয়গণ সন্তরণ দ্বারা নদী উত্তীর্ণ হইতেছেন।
প্রাচীন চিত্র হইতে

প্রতিযোগিতার সুন্দর বর্ণনা আছে। আরও কথিত আছে যে, রোমের যুবকগণ সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া এই সন্তরণ-বিদ্যা তাহাদের ব্যায়ামের একটি অঙ্গ করিয়া লইত ও মধ্যে মধ্যে সন্তরণ-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিত।

ইতিহাসপাঠে জানা যায়, প্রাচীন কালে স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যেও সন্তরণের প্রচলন ছিল। রোমক রমণীগণ পুরুষদিগের ন্যায় সন্তরণচর্চ্চা করিতেন। শোনা যায়, এক সময় ক্লেলিয়া এবং অন্যান্য রোমক কুমারীগণকে প্রতিভূস্বরূপ এ্যলুরিয়া রাজ্যে প্রেরণ করা হয়। বলা বাহুল্য, সেই স্থান হইতে তাঁহারা সন্তরণের দ্বারা টাইবার অতিক্রম করিয়া পুনরায় রোমে ফিরিয়া আসেন। ক্লেলিয়া যে স্থানে তীরে উঠেন, তাঁহার সম্মানের জন্য সেই স্থানে এক মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। এই সকল হইতে মনে হয় যে, সন্তরণ অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ আমরা নানা দেশের প্রাচীন কবিতা এবং ভাস্কর্য্য হইতেও পাই। হাত-পাড়ি বিষয়ে যাহা কিছু আধুনিক বলিয়া মনে করি, তাহা পুরাকালেও প্রচলিত ছিল; অবশ্য এত উন্নত ধরণের না হইতে পারে। এই সকল পাড়ির অবিকল ভঙ্গী পূর্ব্ব-আসিরিয়ার ভাস্কর্য্য ও পম্পাই নগরীর অঙ্কনের মধ্যে দেখা যায়।

মধ্যযুগেও সন্তরণ সকল শ্রেণীর লোকের নিকট আদরণীয় বা আমোদ-প্রমোদ হিসাবে পরিগণিত ছিল। একাদশ লুই, তাঁহার পার্শ্বচরবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত ফরাসী ব্যক্তিগণ অবগাহন স্নান করিতেন এবং সাঁতার কাটিতেন। ইংলণ্ডও দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। শেক্সপীয়র, বাইরণ প্রভৃতি মনীষিগণ মধ্যে মধ্যে আমোদ-প্রমোদ হিসাবে সাঁতার কাটিতেন।

শত বর্ষ পূর্ব্বেও আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যেও সন্তরণ-বিদ্যার প্রচলন ছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (পৃ. ১৮৭) এই সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে:—

('সমাচার দর্পণ,' ১৬ অক্টোবর ১৮২৪)

"স্ত্রীলোকের সাহস।—কএক দিবস হইল অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক স্ত্রী কলিকাতার নিমতলার ঘাটে স্নানার্থ আসিয়াছিল তাহাতে ক্রীড়াছলে কুতূহলে সন্তরণ দ্বারা অবলীলাক্রমে গঙ্গা পার হইয়া গেল ইহা দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছে।"

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ভাল

সাঁতার কাটিতেন। কবিগুরু তাঁহার সাঁতারের কলা-কৌশল সম্বন্ধে এক দিন বহু গল্প আমার নিকট করিয়াছিলেন—এক সময় তিনি পদ্মা নদীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছেন।

এ যুগে জাপান, আমেরিকা, হাঙ্গেরি, হলাণ্ড সন্তরণে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। হাঙ্গেরির এ জিক্, আমেরিকার জে মেডিকো, এ কিফার, ডি ডিজিনার, জাপানের হ্যামুর, মেচেটো, হলাণ্ডের ম্যাসনব্রক, লিসামক প্রভৃতি সন্তরণ-কারিগণ আন্তর্জাতিক অলিম্পিকে তাঁহাদের যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সন্তরণ-জগতে ইঁহাদিগের স্থান অতি উচ্চে। আমাদের দেশে প্রফুল্ল ঘোষ, দিলীপ মিত্র, দুর্গাদাস মদন সিংহ, রাজারাম সাহু, প্রফুল্ল মল্লিক, আশু দত্ত ও কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাঁতারুগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারাই এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। বোম্বাই, পঞ্জাব, দিল্লী, আলিগড় অল্পদিন হইল সন্তরণ সুরু করিয়াছে। রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ) অবিরাম সন্তরণে ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট এবং ঐ হস্তবদ্ধ অবস্থায় ৭২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট এবং এলাহাবাদ হইতে কাশী ১৮৩ মাইল সাঁতারে সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছেন। সন্তোষ দাস ৬১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই ধরণের সন্তরণ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক গ্রাহ্য করে না।

ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রিয়া, আরজেন্‌টাইন, ঈজিপ্টের সন্তরণকুশলীগণ ইংলিশ-চ্যানেল অতিক্রম করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কর্‌সন, ডানকান, সার্নী লোয়ার্থী প্রমুখ কয়েক জন মহিলাও অল্প সময়ের মধ্যে সন্তরণে ইংলিশ-চ্যানেল অতিক্রম করিয়া আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। মদীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় ডাঃ সুরেশচন্দ্র পাল অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে এক সময় ইংলিশ-চ্যানেলে প্রায় ২৪।২৫ মাইল সাঁতার দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও ইণ্টার-ন্যাশনাল অলিম্পিক গ্রাহ্য করে না। তারা চায় শুধু 'স্পীড'।

জলে ভাসা

এইবার সন্তরণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করিব। নিশ্চলভাবে জলে ভাসা সন্তরণের একটি অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়। জলে ভাসা উত্তমরূপে আয়ত্ত হইলে সাঁতারু সাঁতারের গতিবেগ লাভ করেন এবং ইচ্ছামত জলে সন্তরণের নানারূপ কলা-কৌশলও দেখাইতে পারেন। যেচ্ছামত জলে ভাসা সব সাঁতারুর সহজে আয়ত্ত হয় না। যাঁহাদের শরীরে চর্ব্বি বা মেদের ভাগ বেশী, তাঁহারা অতি সহজেই ভাসিতে সক্ষম হন। শিশুরা আকারে ছোট, তাহাদের অস্থি সরু, এবং তাহাদের দেহও মেদবহুল, তাই দেখা যায় অতি সহজেই তাহারা জলে ভাসা শিক্ষা করিতে পারে। মেয়েদের দেহও মেদবহুল, এবং তাহাদের অস্থিও সরু, তাই তাহারাও শিশুদের ন্যায় সহজেই জলে ভাসিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার্থীদিগের নিরুৎসাহ হইবার কোন হেতু নাই। ধৈর্য্য সহকারে কিছু দিন নিয়মিত অভ্যাস করিলেই ইহা সকলের আয়ত্তে আসিবে।

অস্থি মোটা হইলে এবং তাহার পরিমাণ বেশী হইলে দেহের ওজন বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। এই জন্য ক্ষীণকায় ব্যক্তির জলের উপর ভাসা কষ্টকর হয়। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, অস্থির জন্য গুরুভার-সম্পন্ন ব্যক্তি মেদবহুল মোটা ব্যক্তির ন্যায় জলে ভাসা শিক্ষা করিতে পারেন না। যদি বক্ষ প্রশস্ত হয় ও শ্বাস-যন্ত্র সুস্থ থাকে, তবে অল্প চেষ্টাতেই জলে ভাসিতে পারা যায়। কঙ্কালের গুরুত্বের জন্য জলতলে তলাইয়া যাইতে হয় না।

বৈজ্ঞানিক মতে, স্থলে আমাদের যে ওজন থাকে, জলে অবতরণ করিলে তাহা শরীরের 'ভল্যুম' বা আয়তন অনুপাতে কমিয়া যায়। স্থূলকায় মানুষের শরীরের আয়তন বেশী, সেই জন্য দেহের মোট ওজন হইতে বেশী ভার বাদ যায়, কিন্তু ক্ষীণকায় মানুষের দেহের আয়তন কম, সেই জন্য তাঁহার মোট ওজন হইতে কম ভার বাদ যায়। মনে করুন একটি জলপূর্ণ চৌবাচ্চা আছে, জলের মধ্যে কোন ব্যক্তি অবতরণ করিলে কতকটা জল উপচাইয়া পড়িয়া যায়। যে জলটুকু পড়িয়া যায় তাহার ওজন যত হয়, তাহা ঐ ব্যক্তির

প্রকৃত ওজন হইতে বাদ যায়। সুতরাং মোটা লোকের আয়তন বেশী হওয়ায় বেশী জল উপচাইয়া পড়ে এবং দেহের ভার হইতে অধিক ভার বাদ যায়, সুতরাং জলে অবতরণ করিলে তাঁহার ভার অনেক কম হয় এবং তিনি ভাসিতে সমর্থ হন।

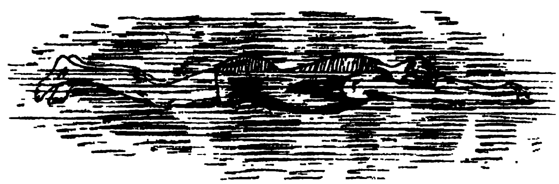
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ক্ষীণকায় ব্যক্তির বক্ষ-স্ফীতি অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং তাহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত না হইয়া লম্বা হয়, সেই জন্য শ্বাস-প্রক্রিয়ায় অল্প বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে, ফলে তিনি ভাসনক্ষম হন না। মোটা বা পেশীবহুল স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি, যাঁহাদের প্রশ্বাস গ্রহণকালে বক্ষঃস্থল অধিক স্ফীত হয়, তাঁহাদের ফুসফুসে অধিক



জলে ভাসা

পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিলে শরীরের আয়তন সহজেই স্ফীত হয়, এবং বেশী পরিমাণে জল সরাইয়া দেয়, তাই দেহের ওজনও বেশী হ্রাস হয়, এবং তাহা সহজেই ভাসিয়া উঠে এবং নিশ্বাস ত্যাগের সময় জল কম পরিমাণে সরিয়া যায় বলিয়া ওজন বেশী হইয়া পড়ে এবং দেহও বেশী ডুবিয়া যায়। রোগা ব্যক্তি অল্প জল সরাইয়া দেন বলিয়া জলে তাঁহার দেহের ভার কম ওজন বাদ যায় বটে, কিন্তু মোটা ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহার প্রকৃত ওজন অনেক কম হয়, সেই জন্য জলে তাঁহার দেহভার হইতে কম ভার বাদ গেলেও তিনি ভাসনক্ষম হইতে পারেন। তাই বলিতেছিলাম, ক্ষীণকায় ব্যক্তির নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। মোট কথা, সাঁতারুর বক্ষ-স্ফীতি দ্বারা অধিক পরিমাণে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করাইতে পারিলে তাঁহার ভাসিবার ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এই বক্ষ-স্ফীতি-ক্রিয়া তরুণ বয়সেই অভ্যাস করা আবশ্যক। কারণ কুড়ি-পঁচিশ বৎসর বয়সের পর বুকের হাড় শক্ত হইয়া যাওয়ায় আর বেশী স্ফীত হয় না।

মোট কথা নিশ্চলভাবে জলে ভাসা শিক্ষা করিতে হইলে, শিক্ষার্থী প্রথমতঃ বক্ষ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিবেন। পরে হাত-পা দেহের সহিত সরলরেখায় স্থাপন করিয়া (একখানি কাঠখণ্ডের ন্যায়) জলে উপুড় কিংবা চিৎ হইয়া ভাসিবেন (প্রথম প্রথম উপুড় হইয়া কিছু দিন অভ্যাস করিবেন), পদদ্বয় জলনিম্নে নামিবার উপক্রম করিলেই পদপাতের দ্বারা ধীরে ধীরে জলে মৃদু আঘাত



জলে ভাসা

করিবেন। দেখা যায়, সন্তরণকালে প্রশ্বাস-গ্রহণের সময় দেহ কিয়ৎপরিমাণে জলের উপর উঠে এবং নিশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় নিমজ্জিত হয়। মুখ জলের উপরে থাকা অবস্থায় ফুসফুস বায়ুশূন্য করিলে এবং পুনরায় ঠিক সময়ে বায়ুপূর্ণ না-করিতে পারিলে দেহ ডুবিয়া যায়। দেহ ঠিকমত না ভাসিলে, তাহা কিঞ্চিৎ বাঁকাইয়া শরীরের ভার পশ্চাতের দিকে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিবেন এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখিবেন, যেন শরীরের কোন অংশ জল হইতে উঠিয়া না পড়ে। প্রথমে বক্ষ বায়ুপূর্ণ করিয়া এই প্রচেষ্টা করিবেন, পরে জলে ভাসা আয়ত্ত হইলে, নিশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ অতি সহজে সম্পন্ন হয়।

মধ্যযুগের ভারতে গ্রন্থাগারিকের স্থান

শ্রীনক্ষত্রলাল সেন

আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার-আন্দোলন সবে মাত্র সুরু হইয়াছে বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ইহা এখনও অতি নগণ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অতীব আশার কথা যে, আমরা জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে গ্রন্থাগার-আন্দোলন কিরূপ সহায়তা করিতে পারে, সে-বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ক্রমশঃ সচেতন হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও গ্রন্থাগারিকের আবশ্যকতা আমরা এখনও অনুভব করিতে পারি নাই; অথচ গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা অনেকাংশে উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের উপর নির্ভর করে। গ্রন্থাগার-আন্দোলন সফল করিতে হইলে এবং গ্রন্থাগারকে শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্রে পরিণত করিতে হইলে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের উপর গ্রন্থাগারের ভার ন্যস্ত করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিক শ্রেণীর এখনও সৃষ্টি হয় নাই। প্রকৃত গ্রন্থাগারিক আমাদের দেশে অতি অল্পসংখ্যক আছেন মাত্র। সার্ব্বজনিক গ্রন্থাগারের কথা দূরে থাকুক এদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে পর্য্যন্ত বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় না; অথচ গ্রন্থাগার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান অঙ্গ। পাশ্চাত্য দেশসমূহে কলেজের গ্রন্থাগারিক, কলেজের অধ্যাপকের, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এবং মিউনিসিপাল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, মিউনিসিপালিটীর অন্যান্য প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের সমশ্রেণীর বলিয়া স্বীকৃত হন এবং তাহাদের সমান বেতন ও মর্য্যাদার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। উহা মোটেই অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইবে না যদি আমরা মনে রাখি যে, বর্ত্তমানে নবজাগরণের দিনে জনসাধারণকে একাধারে শিক্ষা, জ্ঞান ও আনন্দ দান করিতে গ্রন্থাগারের মত উপযোগী আর কোন প্রতিষ্ঠান নাই এবং বর্ত্তমান যুগে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও পরিচালনা-পদ্ধতি জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডস্বরূপ।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের অবস্থা এইরূপ অবজ্ঞাত হইলেও ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাই যে, অতীতে উহাদের অবস্থা এইরূপ ছিল না। আজ আর এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হইয়াছে; এই বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়াছে। কিন্তু অতীত যুগের গ্রন্থাগারিক সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। মধ্যযুগের ভারতে গ্রন্থাগারিকের কিরূপ স্থান ছিল, শিলালিপির সাহায্যে আজ তাহারই আলোচনা করিব। ইহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, আট শত বৎসরেরও পূর্ব্বে গ্রন্থাগারিক কিরূপ সম্মান ও মর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং অতীতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কিরূপ গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইত।

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের রাজ্যে নাগই নামক স্থানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি "নাগইর শিলালেখ" নামে পরিচিত। স্থানটির প্রাচীন নাম ছিল "নাগবাপী"। উহা কালক্রমে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া নাগবাবীতে পরিণত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে নাগবায়ী এবং সর্ব্বশেষে 'নাগই'তে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা নিজাম সরকারের গ্যারাণ্টিড ষ্টেট রেলওয়ের চিতপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। পরবর্ত্তী চালুক্যদের সময় এই স্থানটি শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল; ইহার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ইহার অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এই স্থানে একটি প্রাচীন নগরী ছিল বলিয়া অনুমান করেন। ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও

মুসলমান ধর্মের অনেক প্রাচীন নিদর্শন এই স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন লিপিতে এই স্থানের নাম 'নাগবাবী' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, অধুনা 'বাজী বাই বাভলী' নামে খ্যাত এই স্থানের প্রস্তর-সোপানযুক্ত বৃহৎ দীর্ঘিকা প্রাচীন নাগবাপী নামে পরিচিত ছিল এবং ইহা হইতেই স্থানীয় নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, রামচন্দ্র সীতা-অন্বেষণে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং প্রাচীন লিপিতেও দেখা যায় যে, এই স্থানের একটি দীর্ঘিকা রামতীর্থ নামে পরিচিত ছিল।

নাগইতে চারিটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমটিতে ধর্মানুষ্ঠানের জন্ম স্থানীয় কতকগুলি কর আদায়ের অধিকার প্রদানের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিপিতে একই বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৃতীয় লিপিটি দ্বিতীয় লিপি হইতে সামান্ত পরিবর্তিত আকারে দেখা যায়, কিন্তু মূল বিষয় একই। এই দুই লিপিতে দেবালয়-নির্ম্মাণ এবং একটি বিদ্যায়তন স্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। চতুর্থ লিপিতেও ধর্মকর্মের জন্ম দানের উল্লেখ আছে। এই লিপিগুলি চালুক্য-নৃপতিদের সময় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে তিন জন চালুক্য-নৃপতির রাজত্ব-কালের উল্লেখ আছে, যথা, ত্রৈলোক্যমল্ল, ত্রিভুবনমল্ল, এবং দ্বিতীয় জগদেকমল্ল। উক্ত লিপিসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিপি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোক-পাত করে। এই লিপিদ্বয় বিশেষ মূল্যবান, কারণ ইহা হইতে আমরা সে-যুগের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাই। ভারতের অতীত যুগের শিক্ষার ইতিহাস লিখিবার পক্ষে এই লিপি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিপিতে একটি আবাসিক (রেসিডেন্-শিয়াল) বিদ্যালয়ে বা ঘটিকাশালা স্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। এই বিদ্যালয় হইতে আড়াই শতেরও অধিক ছাত্র ও শিক্ষকের অন্নবস্ত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ব্যতীত কয়েক জন সরস্বতী-ভাণ্ডারিক বা গ্রন্থাগারিকও নিযুক্ত ছিল। প্রাচীন কানাড়ী ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে এই লিপি রচিত।

এই স্থানটি ফ্লীট ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। মাদ্রাজের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শ্রীযুক্ত সি. আর. কৃষ্ণমা চার্লু মহাশয় এই স্থান ও এই স্থানে আবিষ্কৃত শিলা-লেখ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তৃতীয় লিপিটি দ্বিতীয় লিপিরই অনুবৃত্তি এবং উহা অপেক্ষা কয়েক বৎসর পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় লিপি লইয়াই আলোচনা করিব। লিপিটি অতি দীর্ঘ বিধায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম না। নিম্নে কেবল লিপির সারাংশ প্রদত্ত হইল।

এই লিপি নাগইর অরুবত্তু কম্বদগুদি নামক ষাট-স্তম্ভযুক্ত মন্দিরে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভে খোদিত হইয়াছিল। স্তম্ভটির এক পার্শ্বের উপরিভাগে সূর্য্য, ক্ষীণচন্দ্র, সবৎসা একটা গাভী ও একখানা ছুরিকার চিত্র উৎকীর্ণ আছে। লিপিটির মুখবন্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বন্দনা করা হইয়াছে। তৎপরে আদি ব্রহ্ম ও স্বায়ম্ভুব মুনির স্তুতি কীর্ত্তিত রহিয়াছে। ইহার পর স্বায়ম্ভুব মুনি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে চালুক্য-বংশের উৎপত্তির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তার পর চালুক্য-বংশের নৃপতিদের বংশাবলী ও তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইহার পর একটি ব্রাহ্মণ-পরিবারের কাহিনী উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই বংশের গোবিন্দ নামক জনৈক ব্যক্তি ইচিকব্বের পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে কালিদাস কালক্রমে সেনাপতির পদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনিই চালুক্য-বংশের শ্রীবৃদ্ধির পথ সুগম করিয়া দেন। রাজা জয়সিংহকে হত্যা করিবার জন্ম একবার যে ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছিল, ইঁহারই তৎপরতায় সেই ষড়্‌যন্ত্র বিফল হয়। তিনি স্বধর্ম্মনিরত, কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহস্থ ছিলেন। ইহার পর তাঁহার পুত্রদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে মধুসূদন সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ ছিলেন। তিনি কঙ্কণ, মালব ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার "দণ্ডনাথ ত্রিনেত্র" নামে একটি



এলাহাবাদে "নিরক্ষরতা দূরীকরণ দিবস"-অনুষ্ঠান। চিত্রে দেখা যাইতেছে, যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও বিশিষ্ট জননায়ক শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন স্বয়ং শিক্ষা দিতেছেন।



"নিরক্ষরতা দূরীকরণ"-দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এলাহাবাদে জনতার দৃশ্য।



জ্ঞানের দীপালি-উৎসব

"নিরক্ষরতা-দূরীকরণ"-দিবস উপলক্ষ্যে যুক্তপ্রদেশ-সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকার প্রচ্ছদ-চিত্র।
একটি একটি করিয়া শিক্ষার দীপ জ্বলিলেই দেশময় দীপালি-উৎসব আরম্ভ হইবে।
[ইনসেট] এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষণকার্য্যে রত।

উপাধি ছিল। তিনি সন্ধি-বিগ্রহবিষয়ক মন্ত্রীও (সন্ধিবিগ্রহী) ছিলেন। তিনি সাতিশয় রাজানুরক্ত ছিলেন। তাঁহার নানাবিধ গুণগ্রামের জন্য তিনি যুবরাজোচিত মর্য্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। রাজা তাঁহাকে তাম্রশাসন দ্বারা অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি তিনটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং ঘটিকাশালা নামে একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে দুই শত ছাত্রের বেদপাঠের এবং বাহান্ন জন শিক্ষার্থীর শাস্ত্রাধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষায়তনের জন্য তিন জন বেদের অধ্যাপক, ন্যায়, প্রভাকর ও ভট্টদর্শন অধ্যাপনার জন্য তিন জন অধ্যাপক এবং ছয় জন সরস্বতী-ভাণ্ডারিক বা গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত ছিল। মধুসূদন রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত জমি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দান করিয়াছিলেন। এই শিলালিপির তারিখ ইংরেজী গণনা অনুসারে ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর।

এই শিলালিপি হইতে মধুসূদন কোন্ বিষয়ের অধ্যাপককে কি পরিমাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহারও হিসাব পাওয়া যায়। নিম্নলিখিতরূপে জমি বিভাগ করা হইয়াছিল :—

ভট্টদর্শনের অধ্যাপক	৩৫	খণ্ড ভূমি	
ন্যায় " "	৩০	" "	
প্রভাকর " "	৪৫	" "	
প্রত্যেক গ্রন্থাগারিক	৩০	" "	ইত্যাদি।

উপরিলিখিত বর্ণনা হইতে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় :—(১) সেকালে আবাসিক বিদ্যালয়ের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল; (২) বিদ্যা দান করা হইত, বিক্রয় করা হইত না। শুধু তাহাই নহে, ছাত্রদের ভরণপোষণেরও ব্যবস্থা করা হইত; (৩) গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ ছিল এবং গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। আলোচ্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা হইতে অনুমিত হয় যে, গ্রন্থাগারটি বৃহদাকার ও অতিপ্রয়োজনীয় ছিল। নাগইতে একটি বৃহৎ অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অট্টালিকাতে একটি সুপরিসর কক্ষ ছিল এবং এই কক্ষে কতকগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত বেঞ্চ ও দেওয়ালে কতকগুলি পুস্তকাদি রাখিবার যোগ্য আধার ছিল। সম্ভবতঃ এই কক্ষই গ্রন্থাগার-রূপে ব্যবহৃত হইত; (৪) উক্ত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকগণ অধ্যাপকদের সমপদস্থ ছিলেন। তাঁহারা ন্যায়দর্শনের অধ্যাপকের সমপরিমাণ জমি ভোগ করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত ধরণের অবৈতনিক আবাসিক বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগার প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। নালন্দার বিদ্যাপীঠ ছিল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কিন্তু অতীতের গ্রন্থাগারিক সম্বন্ধে নাগইর শিলালিপিতে যেরূপ সুস্পষ্ট চিত্র পাই অন্যত্র তাহা সুলভ নহে। কিন্তু অন্যান্য স্থানের গ্রন্থাগারের খ্যাতি ও আয়তন হইতে ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে তথায়ও গ্রন্থাগারিকের বিশিষ্ট স্থান ছিল। কালক্রমে হয়ত তাহাদের অজ্ঞাত কাহিনী আবিষ্কৃত হইবে।



কালো দিঘি

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারুল নামটি মিঠে
গ্রামটি ছোটোখাটো।
তারি ঘন বনের জটলার তলায় কালো দিঘি,
যেন মায়ের আঁচলের নিচে ঘুমন্ত ছেলে।
আমরা ঐ পারুল গাঁয়েরই লোক বটি
থাকি কালো দিঘির পাড়ে।

দিঘির পাড়ি ঘিরে শালে মহুয়ায় কোলাকুলি,
আমবাগানের ছায়ার মিনতি ছাড়িয়ে উঠেছে
তালগাছ বিষম হেলায়।
অর্জুনের চিকন ডালে আলো করে ঝিকিমিকি,
বুনো জামের কচি,পাতা বুলিয়ে দিয়েছে বনের উপর
নেয়ে-ওঠা কিশোরী মেয়ের ভিজে গায়ের আমেজখানি।

পুবদখিনের কোণে আছে কোন্ কালের এক বুড়ো পাকুড়,
তার ডালে বসেছে কোথাও বা বক, কোথাও বা শঙ্খচিল;
তার তলা ঘেঁষে এঁকেবেঁকে গেছে
পায়ে-চলা-পথ ঘাটের দিকে,
কোথাও সেওড়া-ঝোপ পাশে রেখে, কোথাও কেয়াবন এড়িয়ে।
আমরা ঐ পারুল গাঁয়েরই লোক বটি, থাকি কালো দিঘির পাড়ে।

কাকচক্ষু জল একেই তো বলে।
পৌষ মাসের নিঠুর হাওয়ায় যখন সিরসির করে ওঠে জলতল,
শ্রাবণের মেঘ যখন নাচায় তার ছায়া বাঁশবনের কাঁপনধরা ডালে,
তখন ওর অতল কালোর থই মেলে না, ভয় লাগে রূপ দেখে।
আমরা ঐ পারুল গাঁয়ের লোক বটি, থাকি কালো দিঘির পাড়ে।

কখনো বা দিঘির জলে ছোঁওয়া লাগে পরশমণির।
শ্রাবণের সকালবেলায় শিরীষডালের ফাঁকে ফাঁকে
আকাশ ঢালে অঁজলাভরা সোনার ঝলক,
থেকে থেকে দখিন হাওয়া ওকে ছলছলিয়ে হাসিয়ে তোলে;
তখন দিঘির জল হয় বড়ো আপনার,
চোখ টিপে ইশারা করে সাঙাতের মতো।

ওর জল কখন কালো কখন ধলো, যায় না বোঝা।
যেদিন বাদল হাওয়ায় ঢেউগুলি করে পারাপার,
সাদায় কালোয় করে হাত-কাড়াকাড়ি,
লুটোপুটি করে ঘাটের পরে;
চঞ্চল হয়ে ওঠে কালো ভুরু আর উজল চোখের ভঙ্গিমা।
আমরা ঐ পারুল গাঁয়ের লোক বটি, থাকি কালো দিঘির পাড়ে।

কালো দিঘি যেন আমাদের আপন ঘরের কালো মেয়ে।
কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো রাগারাগি;
দেখি কত না ঢঙ্,
ভুলিয়ে রাখে মন হরেক রূপে,
ওর তুলনা নেই সারা মুলুকে।
আমরা থাকি ঐ পারুল গাঁয়ে কালো দিঘির ধারে।

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১০

রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতে অমিয় ট্রেনে আসিয়া উঠিল।

দিনের আলোয় অতি-পরিচিত প্রিয় পথ অতিক্রম করিতে হয়তো কিছু কষ্ট বোধ হইত; বারবার পিছন ফিরিয়া, পরিচিত গাছের পানে চাহিয়া, যাহারা গান গাহিতে গাহিতে প্রাতঃস্নানে চলিয়াছে তাহাদের পরমসুখী ভাবিয়া—পা তাহার আর চলিতে চাহিত না। এ ভালই হইল। মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া ও আশাকে আগামী শনিবারে আসিবার কথা দিয়া বিদায় লইবার সময় মন যা খারাপ হইয়াছিল, অন্ধকার পথে পা দিয়াও সে-ব্যথা যেন লূতাতন্তুজাল বিস্তার করিতে লাগিল। অবশেষে মোড়ের মাথায় অবনী ও সুরেনকে দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল, "পাঁচু এখনও আসে নি?"

অবনী ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, "স্টেশনটা আল ত, বাস, আর তিন মিনিট বড়জোর আমরা অপেক্ষা করতে পারি। না হ'লে বুঝব সে এল না।"

সুরেন বলিল, "তাদের আপিস ভাল, সোমবারে প্রায়ই সে ডুব দেয়।"

অবনী বলিল, "এই ভোরে বিছানা ছেড়ে আসা কম কষ্টকর নয়। নেহাৎ আপিস, তাই আসতে হয়।"

তিন মিনিট অপেক্ষা করিয়াও পাঁচু আসিল না, অগত্যা গল্প করিতে করিতে তিন জনে অগ্রসর হইল।

আকাশে ঠাসাঠাসি নক্ষত্র, চাঁদ নাই। উষার পিঙ্গল আলোক এখনও ফুটে নাই, কিন্তু বাতাসে স্নিগ্ধতা অনুভূত হইতেছে। গাছপালা বাড়ীঘর অস্পষ্ট চোখে পড়ে; কোথাও সাড়াশব্দ নাই।

অবনী বলিল, "শনিবার বিকেলে আসবার সময় অমিয় আমাদের কথা কইতে বারণ করেছিল, মনে আছে সুরেন?"

সুরেন বলিল, "ও যে এক কালে লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখত। তা এখনও চুপ করে পথ চলি না কেন। এমন থমথমে রাস্তা, অন্ধকার, কবিতার খাদ্য কিছু পেলেও তো পেতে পারে।"

অমিয় বলিল, "না হে না, কথা বলতে বলতেই চল। কবিতা লেখা আমি অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছি। মানুষের জীবনে অনেকগুলি দশা পর পর আসে, আবার একে একে সেগুলি চলে যায়।"

অবনী বলিল, "এখন কোন্ দশায় পৌঁছেছ, অমিয়?"

অমিয় বলিল, "ঠিক বুঝতে পারছি না, চাকরিতে ভাল ক'রে আগে মন বসুক।"

সুরেন বলিল, "যাই বল এ-দশা বৃহস্পতির।"

তিন জনের হাসিতে পথের অন্ধকার যেন টুকরা টুকরা হইয়া গেল। মনের মধ্যে অল্প একটু ব্যথা—গ্রাম ও প্রিয়-পরিজন ছাড়িবার হেতুতে খচ্‌খচ্ করিতেছিল, হাসির শব্দে সেটুকুও কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পথের একটা মায়া আছে, সঙ্গীর মায়াও আছে, সর্ব্বোপরি এই রাত্রির মায়া। মানুষের মন পদ্মপাতার মত না হইলে দুঃখের একটি মাত্র ঢেউয়ে কোন্ অতলে তলাইয়া যাইত।

ট্রেনে বসিয়াও তিন বন্ধুতে গল্প করিতে লাগিল। মানুষ অবস্থাবিশেষে কি হইতে পারে ও কোন্ অসাধ্য সাধনই না করিতে পারে গল্প সে-সম্বন্ধে নহে; মানুষ একটু সুযোগ পাইলে যে ভাবে আশার মেঘে তুলি বুলাইয়া চলে—তাহারই পুরাতন ইতিহাস। আকাশের মেঘ পাইলে মানুষ চিত্রকর হইয়া উঠিবে—এ আর নূতন কি! প্রবল বাতাসে মেঘ উড়িয়া যায়—সে-কথা জানিয়াও—রঙে ও তুলিতে তন্ময় হইয়া ছবি আঁকে; প্রবল বৃষ্টিতে ছবি মুছিয়া যায়, তথাপি চিত্রকর-মন তাহার কল্পনাকে আঁকড়াইয়া ধরে। বাস্তবকে আমরা ভালবাসি এ-কথা

সত্য, কিন্তু কল্পনা নহিলে শুধু বাস্তব কি আমাদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিত?

ট্রেন ছাড়িয়া দিল, পূর্ব্ব দিগন্তে অন্ধকারও গলিয়া পড়িল। খটাখট শব্দ করিয়া ও ধোঁয়া ছাড়িয়া ট্রেন চলিতে লাগিল। নূতন সূর্য্যোদয় দেখিবার মোহ কোথায়? নূতন প্রভাতের আলোককে দিবসের আশীর্ব্বাদী বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রসন্নতাই বা কোথায়? যন্ত্র-দৈত্যের একটি হুঙ্কারে মনের কোমল ভাবগুলি শিথিলবৃন্ত কামিনী ফুলের মত ঝরিয়া পড়িতেছে। পথের দ্রুত ধাবমান শুল্র বৃক্ষের প্রতি, খর্জ্জুর, জাম ও আম্র বৃক্ষের প্রতি এবং বিস্তীর্ণ মাঠের শস্যাঙ্কুরের প্রতি তেমন প্রাণঢালা প্রীতির উৎস তো কই উৎসারিত হইয়া উঠিল না!

তিন বন্ধুর গল্পের স্রোত খানিকটা চলিয়া মন্দীভূত হইল। বিড়ি-সিগারেট ফুঁকিয়া, পুরাতন খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিয়া, অবশেষে কোণ ঠেসান দিয়া জানালার কাছে মাথা রাখিয়া তাহারা চক্ষু মুদিল। ট্রেন শব্দ করিয়া ও দোলা দিয়া চলিতে লাগিল। ভিতরের মানবশিশুগুলি আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত; নিদ্রার অঞ্জন দু-চোখে মাখিয়া তাহারা মনের মধ্যে কোন্ নূতন স্বপ্ন-জাল বুনিতে লাগিল কে জানে? বহিঃপ্রকৃতি আজ তাহাদের কাছে মূল্যহীন।

রাণাঘাট এদিকের বড় জংশন, কোলাহলও ষ্টেশনে বেশী।

অমিয় চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিল, বীরেন দাঁড়াইয়া মৃদুমৃদু হাসিতেছে। অমিয় বীরেনকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

বীরেন বলিল, "গাড়ীসুদ্ধ লোক ঘুমের নেশায় মসগুল। বা রে সংসারী!"

অমিয় দেখিল, সুরেন লম্বা হইয়া শুইয়া নাক ডাকাইতেছে, অবনী ঈষৎ হাঁ করিয়া বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইতেছে; ট্রেনসুদ্ধ লোকগুলি সত্যই যেন মাতাল হইয়াছে। বীরেনের মন্তব্যটা সঠিক।

অমিয় বলিল, "বীরেনদা; যত দোষ বুঝি সংসারের?"

বীরেন ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, তা বলি নি আমি। মানে, যাবার দিন দেখলাম তোরা দিব্যি মানুষ—হাসিতে গল্পে, তাসখেলায়, খবরের কাগজ পড়ায় আর রাজনীতি নিয়ে তর্কে—আজ দেখছি, স্রেফ ঘুম। এত ঘুমও মানুষ ঘুমতে পারে!"

অমিয় বলিল, "যাই চল বীরেনদা, সংসারের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে না এলে তোমার মনটাও কঠিন হয়ে উঠেছে।"

"উঠেছে নাকি!" বলিয়া বীরেন হাহা করিয়া হাসিতে লাগিল।

অমিয় বলিল, "তোমার তো কোন বন্ধন নেই, অথচ চাকরি কর কেন?"

বীরেন বলিল, "সাপের বিষ নেই বললেই কি থাকে না, অমিয়? আমরা বাঙালী যে, দাস যে, বন্ধন আমাদের কোথায় কেউ বলতে পারে না। আর চাকরি করব না তো করব কি!"

অমিয় বলিল, "কেন সাধ ক'রে এ-বন্ধন গলায় পরেছ?"

বীরেন বলিল, "চাকরি না করলে হয় নিকর্ম্মা আড্ডা-বাজ হ'তে হ'ত, না হয় রাজনীতি। যেহেতু আমাদের তৃতীয় পন্থা নেই, তাই চাকরিটি ভাল মনে হ'ল।

অমিয় বলিল, "আর চাকরি যদি নিলেই—"

বীরেন বলিল—"তো সংসার পাতলাম না কেন? সে উত্তর শনিবার দিন দিয়ে রেখেছি। যে-দারিদ্র্যকে আমি পাশ কাটাতে চাই তাকে সখ ক'রে ডেকে আনবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আর যে-চাকরি ইচ্ছে হ'লে আজ ছেড়ে দিতে পারি, সংসার কাঁধে নিলে সে-ক্ষমতা তো থাকবে না।"

অমিয় বলিল, "আমি জানি কেন তুমি চাকরি করছ।"

"কেন?"

"তোমার ছোট ভাইটিকে ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখিয়ে সংসারী করবে বলে।"

"তাতে আমার লাভ?"

"লাভালাভ তুমিই জান।"

বীরেনের দুই চক্ষুতে আবার অগ্নিশিখা দেখা দিল। ঈষৎ বেগের সহিত সে বলিল, "আজ বাবা থাকলে এ

বিড়ম্বনা হয়তো ভোগ করতাম না। ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে জগৎ চিনিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে ব'লেই তা করেছি, এ আমার ত্যাগ নয়। তুমি মনে ক'রো না ওকে সংসারী করবার জন্যই আমি সংসার পাতলাম না। উপযুক্ত আয় না-হ'লে ও যদি সংসার পাতে তো আমি ওকে গুলি ক'রে মারব, অমিয়।"

অমিয় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "বল কি।"

বীরেন বলিল, "যা আমি চারি দিকে দেখছি, যার জালা প্রাণে প্রাণে অনুভব করছি—তা কি খেয়াল-খেলা অমিয়? সুখের অর্থ আমিও বুঝি, কিন্তু যখন দেখি ছন্নছাড়া যুবক সর্ব্বস্ব খুইয়ে বাজনা বাজিয়ে, আলো জালিয়ে পথ দিয়ে বউ নিয়ে যায়—তখনই রক্ত আমার টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে! সর্ব্বনাশকে মানুষ এমন ধর্ম্মের মোড়কে মুড়ে, এমন বাজি-রোশনাই ক'রে বরণ ক'রে নেয় কেন? এ শুধু এই দেশেই হয়, এই দেশেই। এখানে কঙ্কালসার নরনারী পথের কুকুরের মত না খেতে পেয়ে পথের ধূলায় মিশে যায়; এদের জন্য দুর্ভিক্ষের দিনে চাঁদা তোলা, জলপ্লাবনের দিনে গান ক'রে ভিক্ষায় বেরনো, লাট-বেলাটের কাছে দরবার করা, কি না করি আমরা। অথচ এদের বাঁচান আর ঐ নিমগাছে জল ঢালা সমানই পণ্ডশ্রম, অমিয়।"

অমিয় বলিল, "এরা যদি মলো, দেশে থাকবে কে!"

বীরেন বলিল, "কেউ না। থাকবে গাছপালা কুকুর-শেয়াল, বাঘ-ভালুক। মন্দ কি! এরা যে আছে তার প্রমাণ তো শুধু দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পের করুণ আবেদনের মধ্যে দিয়ে জানতে পারি আর কিছুতে তো এদের পরিচয় নেই।" একটু হাসিয়া বলিল, "তবে যদি বল, মানুষের করুণতম বৃত্তিকে সজাগ ক'রে রাখতে হ'লে এদেরও চাই, বা এই বিরাট জনসমুদ্রের ঢেউ দেখিয়ে বিশ্বের জাতিসভায় একটু আসন আমরা দখল করতে চাই, তা হ'লে অন্য কথা। এদের মাথায় চড়ে আমরা কেউ কেউ জ্যোতিষ্ক ব'লে পরিচিত হয়ে থাকি, অর্থ এবং ক্ষমতা, দুই-ই পেয়ে থাকি—সেদিক থেকেও এদের বাঁচবার সার্থকতা থাকতে পারে।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "তুমি চিরকালের অদ্ভুত।"

বীরেন বলিল, "তুমি একটি দিন বাড়ীতে কাটিয়ে কি লাভ ক'রে এলে অমিয়? এই ঘুম, এই শ্রান্তি ছাড়া! সেখানে তুমি যে-স্বর্গ রচনা করেছিলে, এই ট্রেনে চাপবার সঙ্গে সঙ্গেই সে-আকাশ তোমার আকাশ-কুসুম হ'ল কেন?"

অমিয় বলিল, "মানুষের খণ্ড ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলিতে স্বর্গের সুখ থাকে, সেগুলি তার মনের অপূর্ব্ব সঞ্চয়।"

বীরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, "মিথ্যা কথা। একটু আগের মুহূর্ত্ত যদি কথা কইত সে এই দণ্ডে বলত অন্য কথা। যখনই তুমি সুখ পেয়েছ—তখনই কি মনে হয়েছে, এই শেষ, এই পরিপূর্ণ? যদি তা কখনও মনে হয়ে থাকে তো সে তোমার দুর্ব্বল মনের ছলনা।"

"দুর্ব্বল মনের ছলনা!"

"তা ছাড়া কি। রোগ হবার আগে কেউ কি বিছানায় শুয়ে একটি শীতল স্পর্শের মনোরম কল্পনা ক'রে আনন্দে কণ্টকিত হয়? যখন যন্ত্রণা ও দৌর্ব্বল্য মানুষকে পেয়ে বসে তখনই সামান্য একটু সহানুভূতিতে হাত বাড়িয়ে সে স্বর্গ পায়। ভাল খাওয়া, ভাল ভাবে পাস করা, মাইনে বেড়ে উপরের গ্রেডে ওঠা, অনেক দিন পরে চিঠিতে প্রিয়পরিজনের কুশল-সংবাদ পাওয়া ইত্যাদি সব অতিতুচ্ছ ঘটনা থেকেও স্বর্গ পাওয়া যায়, এবং সে-স্বর্গ কয়েকটি মুহূর্ত্তের। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তে সে-স্বর্গ থাকে কোথায়? সংসারের ছোটখাট ঘটনায় তুমি আনন্দ পেতে পার, আমি হয়তো বেদনা পাই। তাহ'লে তুমি এ-কথা জোর গলায় বলতে পার না যে তোমার সুখটিই শাস্ত্রসম্মত বা ব্যাকরণসম্মত।"

"তা হয়তো বলতে পারি না। মানুষের মন তো কাদার তাল নয় যে যেমন ছাঁচে ফেলবে তেমনই মূর্ত্তি নিয়ে বেরুবে। সব মানুষের জন্য একটি মাত্র ছাঁচও তৈরি হয় না।"

বীরেন বলিল, "খুব সত্য কথা। সমাজ-শৃঙ্খলার মধ্যে দলবদ্ধ হয়ে ও নিয়মানুগ হয়ে বাস করাতে কারও শান্তি, কেউ শৃঙ্খলার বাইরে এসে তৃপ্তি পান। সবই মানি। তবু, একটি জিনিষ আমি সহ্য করতে পারি নে,

অমিয়। যারা দরিদ্র, তারা বিবাহ করে কেন? যারা নিজে অভাবের জ্বালায় জ্বলে তারা সংসার পেতে সে-অভাবের আগুনকে দেশময় ছড়িয়ে দেয় কেন? এদের শাস্তি দিতে আইন কোথায়? আমরা যেমন কচুরি পানা ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করি, তেমনই বক্তনাদে কেন দারিদ্র্য ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করি না?" বীরেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া বাহিরের পানে চাহিল।

অমিয় ইচ্ছা করিয়াই কথা কহিল না। একটি প্রবল ইচ্ছার দ্বারা যে পরিচালিত হইতেছে তাহাকে তর্ক দ্বারা আয়ত্ত করা অসম্ভব।

বীরেন দরিদ্র জীবনের বাহিরের খোলসখানি মাত্র দেখিয়াছে, মণিকোঠার সন্ধান সে পায় নাই। অথবা সুকুমার মনোবৃত্তি তার কাছে পীড়াদায়ক। কথাতে তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—সে-স্ফুলিঙ্গের সম্মুখে পড়িলে নিজেকে অসুখী ছাড়া কল্পনা করা যায় না। হয়তো বীরেন নীতিবাদ মানে না, তাই সুন্দর সামাজিক প্রথাটিকে সে ঘৃণা করে।

বীরেন সহসা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমার এই মতবাদের জন্ত ঘরে বাইরে আমার লাঞ্ছনা। কেউ কেউ আবার বলেন আমি কম্যুনিষ্ট, সমাজবিধান ভাঙতে চাই।"

অমিয় বলিল, "তোমার মতবাদের মূলে যে কম্যুনিজম, এ সন্দেহ আমারও—"

বীরেন বলিল, "তোমারও হয়েছে? কিন্তু এক বিয়ে না-করা ছাড়া প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে নেই। আমি ক্লাবে মিশি না, বেকার নই, বন্ধুর সংখ্যা আমার অল্প, কাউকে চিঠি লিখতে আমার আলস্ত বেশী—এক মুখের কথা ছাড়া কোন মতবাদই পোষণ করি না। শুধু কথার দ্বারা যদি সঙ্ঘ তৈরি করা যেত তা হ'লে আমার মত কর্মী বাংলায় খুঁজে পাবে না। কিন্তু বাংলা দেশে আমরাই অর্থাৎ বক্তারাই তো আসর জমিয়ে রাখি।"

অমিয় বলিল, "নৈহাটী আসছে, পান কিনবে না?"

বীরেন বলিল, "না, মনটা ভাল নেই।"

অমিয় বলিল, "এতগুলি সংসারী দেখে নাকি?"

বীরেন বলিল, "যদি বলি তাই। যারা দুঃখ দুঃখ ক'রে চেঁচায়, চোখের জল ফেলে তারাই তো সৃষ্টি করে দুঃখকে। একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা না-থাকলে মানুষ বাঁচে না, যার আকাঙ্ক্ষা নেই—সে নেশা করে। পান-সিগ্রেটের নেশাই বল, আফিং গাঁজা গুলি মদের নেশাই বল, আর সংসারী হওয়ার নেশাই বল—দুর্ব্বল মানুষের একটা-না-একটা চাই।

অমিয় বলিল, "আর সবল মানুষের কি অবলম্বন?"

"অমিয়, ঠাট্টা ক'রো না। সংসার যে নিছক সুখের আগার নয়, বুঝবে দু-দিন পরে!"

অমিয়র প্রফুল্ল মুখে অকস্মাৎ ছায়া পড়িল। সে-কথা সে কি বুঝে নাই? গাড়ী যতই কর্মক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই স্বপ্নের কুয়াশা বাস্তব সূর্য্যকিরণে মিলাইয়া যাইতেছে। শনিবারের দিন যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, আজ বর্দ্ধিত তরুশাখায় তাহারই বিষফল অমিয়র প্রতীক্ষায় দুলিতেছে।

গাড়ীতে কিন্তু ঘুমের ভাব ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতেছে। নৈহাটীর পর হইতেই প্রাত্যহিক যাত্রীর সংখ্যা বাড়িতেছে। হাতে কাগজ, টিফিন-বাক্স, গীতা, নভেল অথবা আপিসের ফাইল লইয়া স-কলরবে দলবদ্ধভাবে ইঁহারা উঠিতেছেন,—সকলে বসিবার জায়গা না-পাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছেন। সপ্তাহান্তিক যাত্রীদের নিদ্রার কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে। বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া শয়নের সুবিধাটুকু হারাইয়াছেন, বিপরীত দিকের বেঞ্চের উপর হইতে পা-দুখানি তুলিয়া লইতে হইয়াছে, স্থানাভাবে নিজেকে কিছু সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এত কষ্টেও নিদ্রার আমেজটুকু তাঁহাদের নয়ন হইতে লুপ্ত হয় নাই। বীরেন আর মুখ খুলে নাই, এক দৃষ্টে বাহিরের পানে চাহিয়া আছে। সিগারেট সে ইচ্ছা করিয়াই কেনে নাই, পানে রুচি নাই, মনটা তাহার সত্যই খারাপ হইল নাকি? অমিয় তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টায় বলিল, "একদিন রাণাঘাটে নেমে তোমার বাড়ী যাব, বীরেন-দা।"

বীরেন অর্দ্ধস্ফুট দৃষ্টিতে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিল, "তার মানে?"

অমিয় বলিল, "মানে নয়, এমনি।"

বীরেন বলিল, "সখ বল।"

"কি খাওয়াবে আমায়?"

বীরেন বলিল, "আমরা যা খাই তাই খাওয়াব, নূতন কিছু আয়োজন তোমার জন্ম হবে না।"

অমিয় বলিল, "তা কি কেউ পারে? যে গরিব সেও অতিথি এলে ভাল খাবার আয়োজন করে।"

বীরেন বলিল, "গরিবের ঐ তো মস্ত দোষ। নিজের ক্ষমতা ছাড়া আয়োজন ক'রে নিজের মর্য্যাদাকে নষ্ট করে। তুমি কি দেখ নি অমিয়, গরিবের বাড়ী খেতে ব'সে যখন পাঁচ তরকারি সাজিয়ে ভাতের থালাটি তোমার সামনে তাঁরা ধরে দেন, তখন সযত্নে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন! পাছে ওদের লোভের দৃষ্টি লেগে খাওয়ার তোমার বিঘ্ন হয়!" একটু থামিয়া বলিল, "তাই আমি গরিবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ নিই নে। একবার এক বন্ধু আমায় তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। রাত্রি ব'লে তিনি আমার জন্ম করেছিলেন লুচির ব্যবস্থা। একখানি আসন পাতা হ'তেই আমি প্রবল আপত্তি করলাম—এক সঙ্গে না হ'লে খাব না। বন্ধু প্রথমটা বিব্রত হয়ে বললেন, অত সকালে তিনি খান না। আমি বললাম বেশ তো, আমিও একটু পরে খাব। অগত্যা আমার ভাল আসনের পাশে তাঁর কাঠের পিঁড়িখানা পাতা হ'ল। আমার জন্ম এল লুচির থালা, তাঁর জন্ম ভাত। সব বুঝেও বললাম, দু-রকম ব্যবস্থা কেন? বন্ধু মুখ নামিয়ে উত্তর দিলেন, রাত্রে ময়দা আমার সহ্য হয় না, ভাতটাই ভালবাসি। আচ্ছা অমিয়, খুব বোকা লোকেও ঐ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হ'তে পারে কি? বার মাস যে ভাত খায় তার মুখে এক দিনও লুচি ভাল লাগে না? তার উপর ওঘরে ছেলেমেয়ের চীৎকার; তারা আমার লুচি খাওয়া দেখবার জন্যই হয়তো বায়না ধরেছে···এ-সব ভাবলে লুচির গ্রাস তুমি মুখে তুলতে পারতে?"

অমিয় অবাক হইয়া বীরেনের পানে চাহিয়া বলিল, "আমি তোমায় ভুল বুঝেছি, বীরেন-দা। তোমাকে কঠিন বলেছি।"

বীরেন বলিল, "ভুল বোঝ নি। ওরাই তো আমাকে কঠিন ক'রে তুলেছে অমিয়। কেউ সাহায্য চাইলে এক পয়সা আমি ভিক্ষা দিই না।" একটু থামিয়া বলিল, "এই গাড়ীতেই দেখ না—অন্ধ উঠেছে, খঞ্জ উঠেছে, ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে ছোট ছেলে উঠেছে, বিকলাঙ্গ বৃদ্ধ উঠেছে। গান গেয়ে এরা প্রত্যেকের কাছে হাত পাতছে।" একটু হাসিয়া বলিল, "যাঁরা এদের ভিক্ষা দিচ্ছেন তাঁরা যে ঠিক দয়ার বশে দিচ্ছেন না, তা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।"

"তবে তাঁরা দিচ্ছেন কেন?"

"হয়তো তাঁদের খেয়াল। এমন পেশাদারী ভিক্ষায় খেয়াল ছাড়া কেউ কিছু দিতে পারেন না।"

"আর যাঁরা দেন না?"

বীরেন হাসিয়া বলিল, "তাঁরা অত্যন্ত হিসাবী।"

"তুমি দাও না কেন বীরেন-দা?"

বীরেন সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু এদের তবু সহ্য করতে পারি, কারণ জানি, এদের ভিক্ষাবৃত্তির মূলে ব্যবসাবৃত্তি রয়েছে। দয়ার সুযোগ নিয়ে এরা রোজগার করতে চায়।"

এমন সময় ইছাপুরে গাড়ী থামিল।

বীরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "আবার শনিবারে দেখা হবে। কিন্তু তোরা সংসারী মানুষ, আমার মতামত-গুলো তোদের মনের উপর খুব ভাল ক্রিয়া করবে না। পারিস তো আমায় এড়িয়ে চলিস অমিয়।"

অবনী জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কে অমিয়?"

অমিয় বলিল, "ও বীরেন। আমরা কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এক সঙ্গে পাস করি।"

অবনী বলিল, "ভদ্রলোক বড় পেসিমিষ্ট। সংসারকে উনি রীতিমত ঘৃণা করেন।"

অমিয় বলিল, "ওর মতামতগুলো আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে; তবু মনে হয় সেই মতের মধ্যে কোথায় যেন শক্তি আছে।"

গাড়ী শিয়ালদহে না-আসা পর্য্যন্ত অবনী বা অমিয় আর কোন কথা কহিল না।

পিছনে পড়িয়া রহিল সুবিস্তীর্ণ মাঠের উপর প্রসারিত গাঢ় নীল আকাশ, ধূলিধূমলেশহীন অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সম্পদ,—সশব্দে ধোঁয়া ছাড়িয়া ট্রেন আসিয়া টিনের শেডের মধ্যে দাঁড়াইল। ট্রেন দাঁড়াইতে-না-দাঁড়াইতে হুড়হুড় করিয়া যাত্রীদল তাহার জঠর হইতে বাহির হইতে লাগিল। পল্লী হইতে বহিয়া আনিয়া এইগুলিকে শহরের জঠরে ছাড়িয়া দেওয়া হইল পরিপাক করিবার জন্ত। দিবসের শেষে এই শ্রান্ত ক্লান্ত যাত্রীদলকে দেখিলেই শহরের পরিপাক-ক্রিয়ার শক্তি কত বেশী তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

আজ যদিও পথের মায়া ছিল না, তথাপি নূতন এমন এক আবেষ্টনে ইহারা পৌঁছিলেন, যেখানে সমস্ত অনুভূতি নিঃশেষ হইয়া যায়। যাত্রীর কোলাহল, ট্রাম-বাসের ঘর্ঘর শব্দ, রিক্‌শার ঠুন ঠুন ঘণ্টাধ্বনি, হিন্দু মুটিয়া ও মুসলমান গাড়োয়ানের কর্কশ কণ্ঠস্বর, বিবর্ণ আকাশ ও বৃক্ষবিরল অট্টালিকা অটবীর মাঝখানে পৌঁছিয়াই মন ক্রমশঃ নির্লিপ্ত হইয়া উঠিতে থাকে। চোখের সম্মুখে দ্রুত কত ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, চক্ষু তাহা গ্রহণ করিতেছে না, ফুটপাথে লাঠি ধরিয়া খোঁড়া ভিক্ষুক হাত পাতিতেছে—হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি বিকশিত হইতেছে কই? হয়তো এক নিমেষে পরিচিত জনের সঙ্গে বহু দিন পরে সাক্ষাৎ হইয়া গেল—চোখের ইঙ্গিত ছাড়া মুখে কুশল-জিজ্ঞাসার অবসর মিলিল না। রাজপথ দিয়া কোন সম্মানিত জননায়ক ট্রাম-বাসের গতি রুদ্ধ করিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইয়াছেন—তাঁহাকে দেখিবার তেমন দুর্নিবার আগ্রহই বা মনের মধ্যে কোথায়? একটি মাত্র তীব্র অনুভূতির দ্বারা আর সব আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আপিস লেট হইলে সেখানকার কড়া আইন অতঃপর কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে—সেইটির পরিবর্দ্ধমান তীব্র আলোক-রশ্মিতে আর সমস্ত ম্লান হইয়া গিয়াছে।

জগৎ কত বৃহৎ, আপিসের ঘরগুলি কত ক্ষুদ্র! সেই মেঝে, সেই সিলিং, সেই বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে, আলো জ্বলিতেছে, সেই চেয়ার-টেবিল সাজান রহিয়াছে। ধূলামাখা দেওয়াল বুকে বহিয়া সেই অতিকায় র‍্যাকগুলি পিঠ চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ছোট ছোট হোয়াট-নট-গুলিতে ফাইলের স্তূপ। সেই চিরপরিচিত দোয়াত-কলম, পেপার-ওয়েট, টিন বা বেতের ট্রে ও কালীমূর্ত্তিতে টেবিল সাজান। একটি দিন বন্ধ থাকার জন্ত ঘরের মধ্য হইতে একটা কাগজ-ভ্যাপসান গন্ধ বাহির হইতেছে।

টেবিলের উপর খগেন বাবু তাঁহার চিররুক্ষ চেহারা লইয়া ডান হাতে লাল কালির কলমটিকে নাচাইতেছেন। অমিয় খাতায় নাম সহি করিতেই তিনি কলম নাচানো বন্ধ করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভাঁটা-মানকচুর ভেট আবার কার জন্যে মশাই? দু-দিন চাকরিতে ঢুকতে না-ঢুকতেই যে পুজোআচ্চার মন্তর জেনে গিয়েছেন দেখছি!"

অমিয়র মুখে খানিক রক্ত আসিয়া জমিল, সে মুখ নামাইয়া সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, "এক আত্মীয়কে দিতে হবে।"

খগেন বাবু বলিলেন, "এখানকার জন্ত নয়?" তাঁহার মুখের কঠিন রেখাগুলি নিমেষে মিলাইয়া গেল। প্রসন্নমুখে বলিলেন, "আমার দরখাস্তখানা—মনে আছে তো?"

অমিয় পাংশুমুখে বলিল, "আপনি শোনেন নি কিছু?"

খগেনবাবু বলিলেন, "কিছু কিছু কানে এসেছে বইকি, শম্ভু ওটা তোমার পকেট থেকে তুলে নিয়েছিল, বড়বাবু সব জেনেছে—এই তো? তা দেখুন, আমরা তো চুরি-জুয়াচুরি করি নি—দু-দিন পরে জানতেন, না-হয় দু-দিন আগে জানলেন—তাতে ক'রে আপিসের নিয়ম-কানুনের কোন ক্ষতি হবে না।"

অমিয় বলিল, "আপনার বিরুদ্ধে উনি সায়েবের কাছে নালিশ করবেন।"

"করবেন নাকি! ভয় দেখিয়েছেন—?" বলিয়া খগেনবাবু কর্কশ হাস্তে ঘর ফাটাইয়া ফেলিলেন। হাসি থামিলে বলিলেন, "আপনারা নূতন লোক, জানেন না, এই নিয়ে ক-বার আমার বিরুদ্ধে নালিশ হবে বড়বাবুকেই জিজ্ঞাসা করবেন। সাক্ষী দেবার লোকের অভাবও হয় না, মিথ্যা কথা বলতেও ওদের বাধে না—তবু মাথার একগাছি চুলও তো আমার ছিঁড়তে পারেন নি। নালিশ! অমন নালিশ আপিসে ঢুকে অবধি দেখছি। সায়েবরা ঘাস খায় না, বোঝে কিছু কিছু।"

অমিয়র মন হইতে মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গেল।



স্নানের ঘাটে

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

যাক্, তাহা হইলে অপ্রীতিকর ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি আর হইবে না।

খগেনবাবু বলিলেন, "আমার দরখাস্তখানার কি হ'ল ?"

অমিয় বলিল, "সেটি শম্ভুবাবু নিয়ে বড়বাবুর কাছে দিয়েছেন।"

এমন সময় অমলবাবু ওরফে দাদা প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র খগেনবাবু টেবিল চাপড়াইয়া উচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন,, "এই যে এসেছেন। ওঁর জন্যে আমরা মরছি ভেবে, আর উনি দিব্যি ডুব মেরে ব'সে আছেন ? ডুব মেরেছিলে কেন চাঁদ, তোমার গরুর বিয়ে—না কি বেড়ালের সাধ ছিল ?"

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "বেশী ছুটি নিই ব'লে সায়েব পর্য্যন্ত আমার ওই বদনাম রটিয়েছেন। জানই তো তোমার বউদিদি চিররুগ্ন—"

খগেনবাবু বলিলেন, "একটি বউ ছিল তার দোহাই দিয়ে বছরে ন-মাস তো আপিসকে কলা দেখাচ্ছ! বলি নিজের ভালমন্দ-জ্ঞান কিছু আছে ?"

দাদা কপালে হাত দিয়া পুনরায় মৃদু হাস্য করিলেন।

খগেনবাবু বলিলেন, "তোমার রোগ বুঝেছি। 'চাল নেই চুলো, ঢেঁকি নেই কুলো', ছুটো কাচ্চাবাচ্চা হয় নি—কাজেই ভাবছ, চাকরি ছাড়লেও কষ্ট হবে না। কিন্তু ন্যায্য দাবি ছাড়লে কপালে অশেষ দুর্গতি। এস এ-ঘরে—অনেক কথা আছে।"

দাদাকে টানিয়া লইয়া খগেনবাবু কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

অমিয় টেবিলের তলায় ডাঁটা ও মানকচু রাখিবামাত্র শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "গাছের ডাঁটা বুঝি ? বেশ সুন্দর জিনিষ—চেহারাই আলাদা! আর আমরা কলকাতায় চিবিয়ে মরি সাত-বাসি শুকনো খাড়া।"

অমিয় কোন উত্তর না দিয়া ড্রয়ার খুলিয়া কলম বাহির করিল।

শম্ভুচন্দ্র একটু থামিয়া বলিলেন, "রাগ করেছেন আমার উপর—সেদিন দরখাস্তখানা পকেট থেকে উঠিয়ে নিয়েছিলাম ব'লে ? তা বলুন, নিজের জীবন-মরণের সমস্যা যেখানে, সেখানে কেউ কি চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে ?"

তথাপি অমিয় মুখ খুলিল না।

শম্ভুচন্দ্র পকেট হইতে কাগজের তাড়া বাহির করিয়া বলিলেন, "এই নিন্ আপনার দরখাস্ত। বড়বাবুর ইচ্ছে ছিল সায়েবের কাছে এই দিয়ে রিপোর্ট করেন, খগেনকে চিরজীবনের জন্য কনডেম্ ক'রে রাখেন। আমি তাঁর হাতে ধরে বারণ করেছি, বললুম, করুক না ওরা দরখাস্ত—আমার ন্যায্য পাওনা হ'লে আমি পাবই। ভগবান যদি সত্যি থাকেন—"

অমিয় ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "ভগবান বেচারীকে আর এর মধ্যে টেনে আনছেন কেন, মানুষের কথাই বলুন।"

শম্ভুচন্দ্র ঈষৎ থতমত খাইয়া বলিলেন, "আমরা দুর্ব্বল মানুষ ব'লেই ভগবানকে মানি। ভাল লেখাপড়া জানি না—তাই ওঁকে বিশ্বাস করি। একটি কথা জেনে রাখবেন অমিয়বাবু, বড়দের বিরুদ্ধে মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে মনের শান্তি নষ্ট করা উচিত নয়। যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁদের ন্যায্য পাওনা আপনাকে দিতেই হবে।"

অমিয় বলিল, "বড়দের সম্মান দেওয়া যেমন উচিত, খোসামোদ করাও তেমনই অন্যায়।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "কে বললে আপনাকে এ-কথা ? বড়বাবু যদি বলেন, অমিয়বাবু, আপনি আজ মেসিন-রুমে কাজ করুন--সে হুকুম মানা মানে কি খোসামোদ ? যদি বলেন, ঐ লেজারখানা আনুন তো, সেটা এনে দিলেই কি আপনি খোসামুদে হয়ে গেলেন ? ঐ ডাঁটা দু-গাছি যদি বড়বাবুকে দেন—সে ভক্তির দেওয়াকে আপনি খোসামোদ বলতে পারেন না।"

"কি ভক্তিতত্ত্বের কথা হচ্ছে শম্ভু, ভাই ?" বলিতে বলিতে দাদা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইলেন।

শম্ভুচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "বেশ্ আছেন আপনি, এক দিন আপিস, তিন দিন কামাই!"

দাদা বলিলেন, "আর ভাই, যে ক'টা দিন আছি এমনি সুখেদুঃখে কেটে গেলেই ভাল। কি অমিয় ভাই, ভাল তো ?"

দাদা আসন গ্রহণ করিয়া ঝাড়নের মোড়ক খুলিয়া পানের ডিবাগুলি বাহির করিলেন এবং শম্ভুচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস ভাই, পান খাও।"

শম্ভুচন্দ্র পান মুখে দিয়া বলিলেন, "একটা গ্রেড্ খালি হচ্ছে—শুনলুম আপনি দরখাস্ত করেছেন?"

দাদা বলিলেন, "গেল সপ্তাহে বলতে গেলে আমি আপিসেই আসি নি—অথচ তুমি শুনলে?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "আপনার বন্ধুরা আছেন তো। তা আপনার পক্ষে সেই পোষ্টে কাজ করা কতটা সম্ভব হবে জানি না। সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডেস্‌প্যাচ করতে হবে, হাড়ভাঙা গাধার খাটুনি।"

দাদা পরম বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "বল কি শম্ভু ভাই, গাধার খাটুনি! তা আমি পারব কেন—আমি মানুষ তো!"

শম্ভুচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আমিও তাই ভাবছিলুম। যে সুখী মানুষ দাদা। ও খাটুনি কি সহ্য হবে! কিন্তু সিনিয়র আপনি—আপনাকেই গ্রেড্ নিতে হবে।"

দাদা বলিলেন, "আমি যদি সিনিয়রিটির ক্লেম ত্যাগ করি, তারা?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "শুধু মুখে ত্যাগ করলে হবে না তো, লিখে দিতে হবে।"

দাদা বলিলেন, "তাই দেব। যদি ঐ ডেস্‌প্যাচের খুঁ দিয়ে না গেলে গ্রেড না পাওয়া যায়—ক্লেম আমি ত্যাগই করব। বুড়ো হয়েছি, অত খাটতে পারব না।"

আনন্দে শম্ভুচন্দ্রের দুটি চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিলেন, "আর একটা পান দিন তো, একটু দোক্তা খাবার ইচ্ছে হ'ল।"

পান-দোক্তা মুখে দিয়া আর একবার দাদাকে পরিশ্রম-জনক উচ্চ পদটির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া শম্ভুচন্দ্র চেয়ার গ্রহণ করিলেন।

দাদা 'তারা তারা' বলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দিন কয়েক পরে অমলবাবু ওরফে দাদা আপিসে আসিতেই খগেনবাবু কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "ওয়ার্থলেস কোথাকার। নিজের ক্লেম লিখে পড়ে ছেড়ে দিলে? ওয়ার্থলেস।"

দাদা মুখ নামাইয়া বলিলেন, "সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ গাধার খাটুনি খাটতে পারব না ভাই।"

খগেনবাবু মুখ ভেঙচাইয়া বলিলেন, "আহা—মরে যাই! আপিসে ওঁকে কুলোয় শুইয়ে তুলোয় করে দুধ খাওয়াবে! গ্রেডটা পেলেই কি তোমাকে ডেস্‌প্যাচ টেবিলে জবাই করা হ'ত?"

দাদা বলিলেন, "তাই তো শুনলাম। ডেস্‌প্যাচার না হ'লে ও পোষ্ট পাব না।"

খগেনবাবু বলিলেন, "না, পাবে না? বড়বাবুর মাইনে বেড়েছিল কি ডেস্‌প্যাচার হয়ে? ও একটা কৌশল—তোমাকে কন্‌ডেম্ করার একটা কৌশল। ভাল কথা, মুখে বলেছিলে বলেছিলে, সাত-তাড়াতাড়ি কাগজে লিখে দেবার দরকার কি ছিল?"

দাদা বলিলেন, "আর ভাই, যে ক'টা দিন আছি, শান্তিতে থাকতে চাই।"

খগেনবাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাদার উপর যে-সব তীব্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিলে অতি শীতল রক্তপ্রবাহও উষ্ণ হইয়া উঠিতে বিলম্ব হয় না। দাদার হাসিমুখের মধ্যে কিন্তু উষ্ণতার ছায়ামাত্র দেখা গেল না। পঁচিশ বৎসর কলম চালাইয়া ও চেয়ারে বসিয়া হয়তো তিনি গীতার নিষ্কাম ধর্মটিকে উত্তমরূপেই আয়ত্ত করিয়াছেন; তাই, সুখে দুঃখে সমান ঔদাসীন্য তাঁহার! তিনি খগেনবাবুর তীব্র মন্তব্যে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাঁহাকে পান-জরদা পাঠাইয়া দিলেন, শম্ভুচন্দ্রকে ডাকিয়া পান দিলেন এবং খাতা খুলিয়া কাজে মনোনিবেশ করিলেন। জীবনধারণের সমস্যা তাঁহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে নাই বলিয়াই বুঝি এতবড় ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিলেন না। [ক্রমশঃ]

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙালীর কৃতিত্ব

শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

ইতিপূর্ব্বে শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙালীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কর্ম্মবীর আলামোহন দাসের জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বোম্বাই-প্রবাসী আর এক জন



শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃতী পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত করিব। ইনি হইতেছেন বোম্বাইস্থিত সুবিখ্যাত হিন্দুস্থান কন্‌ষ্ট্রাকশন্ কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার বাগাটি গ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসামে ফরেষ্ট অফিসার ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আসামের গোলাঘাট নামক স্থানে তাঁহার পুত্র শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। শিবচন্দ্রের সাধারণ শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই—প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং বর্দ্ধমান টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী (সাব্ ওভারসিয়ার) পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এই সময় পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ায় শিবচন্দ্র চাকুরীর সন্ধানে বাহির হন এবং আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে মাত্র চল্লিশ বেতনে সাব-ওভারসিয়ার নিযুক্ত হন। এ চাকুরীতে অল্পদিন থাকিয়া তিনি বারসি লাইট রেলওয়েতে সাব-ওভারসিয়ারের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত মতবিরোধের ফলে কর্ম্মত্যাগ করেন। বারসিতে থাকিতে তিনি বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সর্ বলচাঁদের (Walchand-এর) সহিত পরিচিত হন। শিববাবুর সততা ও কর্ম্মকুশলতা লক্ষ্য করিয়া সর্ বলচাঁদ তাঁহাকে তাঁহার বারসি রেলওয়ের কার্য্য পরিত্যাগ করিবার পর ডাকিয়া লইয়া তাঁহার 'ফাটক বলচাঁদ কনষ্ট্রাকশন্ কোম্পানী'তে ৮০৲ টাকা বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি বোম্বাইতে ১২০৲ টাকা বেতনের আরও একটি কার্য্য পান, কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। ১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি ফাটক বলচাঁদ কোম্পানীর কার্য্য করেন এবং প্রধান পরিচালক হিসাবে উক্ত কোম্পানীর পক্ষ হইতে কয়েকটি রেলওয়ে এবং অনেকগুলি গৃহ, সৈন্য-ব্যারাক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। ঐ সময় তাঁহার সম্পূর্ণ দায়িত্বে যে কার্য্য হয় তাহার মূল্য প্রায় ২৪০০০০ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ হইবে।



গোদাবরী ব্রিজ নির্ম্মিত হইতেছে

অতঃপর স্যর্ বলচাঁদ হীরাচাঁদ, কাটক বলচাঁদ কোম্পানীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া টাটা কন্‌ষ্ট্রাকশ্যন্ কোম্পানী নামে নূতন একটি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিববাবুও আসিয়া এই নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার রূপে যোগদান করেন। এই কোম্পানীতে যুক্ত থাকিবার সময় তিনি অনেক আয়াসসাধ্য এবং ব্যয়বহুল কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান সম্ভব নহে, তবে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার প্রমাণ-স্বরূপ দুই-একটির নামোল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই কোম্পানীর অধীনে তিনি খাণ্ডেলা টানেল ও ভিরা টানেল প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার অনন্যসাধারণ কর্ম্মতৎপরতা এবং এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন।

এই সময়ে তাঁহার পরিচালনাধীনে উক্ত কোম্পানী কর্ত্তৃক ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রূপান্তরিত করা হয়।

৩২০০ ফুট লম্বা একটি রেলওয়ে টানেল প্রস্তুত করিতে গিয়া একবার শিববাবুকে এক গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। টানেলটির দক্ষিণ মুখ একটি নালার উপরে পড়ে এবং অকস্মাৎ মুখটি ধ্বসিয়া পড়িয়া কর্ম্মরত জনগণ আটকা পড়িয়া যায়। অবস্থা দৃষ্টে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ ঐ টানেল-খননকার্য্য বন্ধ করিবার পরামর্শ দেন। শিববাবু কার্য্য বন্ধ করিবার পরামর্শ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে কংক্রীটের খিলান গাঁথিয়া উপরের পাথরের ভার রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি টানেল কাটিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইল।

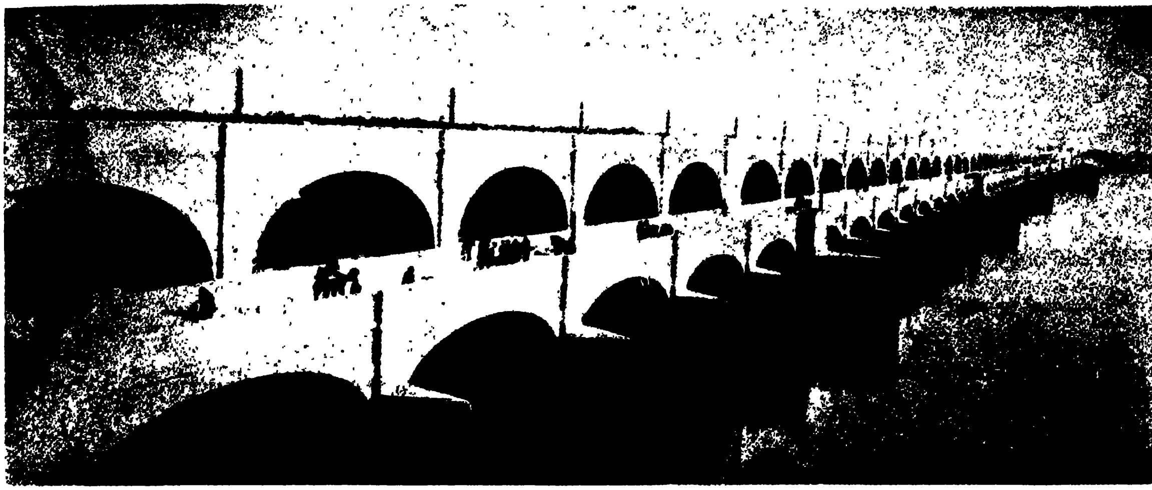
টানেল ও দালান ব্যতীত শিববাবুর পরিচালনাধীনে অনেকগুলি রেলওয়ে ও অন্য প্রকার সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ইরাবতী, বাংলা দেশে ভৈরব ব্রিজ, দক্ষিণ-ভারতে গোদাবরী ব্রিজ প্রভৃতি তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে নির্ম্মিত হয়।

এই সকল কার্য্য এত নৈপুণ্য এবং তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে যে, বিভিন্ন উদ্বোধন-উৎসবে গবর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া উপস্থিত সকল ভদ্রলোকই একাধিক বার শিববাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

টাটা কনষ্ট্রাকশ্যন কোম্পানীর অধীনে (১) প্রিমিয়ার কনষ্ট্রাকশ্যন কোং লিঃ, (২) হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাকশ্যন কোং লিঃ, (৩) অল্‌-ইণ্ডিয়া কনষ্ট্রাকশ্যন কোং লিমিটেড নামে কয়েকটি ভিন্ন কারবার গড়িয়া উঠিয়াছে। শিববাবু বর্ত্তমানে হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাকশ্যন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রিমিয়ার কনষ্ট্রাকশ্যন কোম্পানীর এক জন ডিরেক্টর।

সিন্ধুদেশের প্রসিদ্ধ সুক্কুর ব্যারেজ নামক বাঁধ শিববাবুর কর্ত্তৃত্বাধীনে হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাকশ্যন কোম্পানী কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছে।

শিববাবুর সাধারণ শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই,



সুক্কুর ব্যারেজ

ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনীতে তিনি প্রকৃষ্ট ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন তিনি কত উচ্চ শ্রেণীর এঞ্জিনিয়ার। কঠোর পরিশ্রম ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে তিনি বিদেশে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সামান্য অবস্থা হইতে প্রভূত উন্নতি করিয়া তিনি দুঃসময়ের স্মৃতি এতটুকুও ভুলিয়া যান নাই। তিনি যে ছোট হইতে বড় হইয়াছেন, তাহা তিনি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখেন। বিপন্ন বাঙালীকে তিনি সকল সময়েই সাহায্য করিয়া থাকেন। বহু বাঙালীকে তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া বোম্বাইয়ে চাকুরী করিয়া দিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার এই সহানুভূতির যথেষ্ট মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই, তাই তিনি এখন এ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়াছেন।

গত ১৫ বৎসরে শিবচন্দ্র লক্ষাধিক টাকা জনসেবায় দান করিয়াছেন। নিজ গ্রামে তিনি তাঁহার স্বর্গীয়া প্রথমা পত্নীর নামে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই শিবসোহাগিনী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দান করা হয়। গ্রামের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি শিববাবুর অর্থে পাকা রাস্তায় পরিণত করা হইয়াছে এবং জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে গ্রামে অনেকগুলি টিউবওয়েল বসাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মশক-নিবারণী সমিতি নামে একটি সমিতি গ্রামে স্থাপন করিয়া তিনি তাঁহার আংশিক ব্যয় বহন করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি স্বগ্রামে একটি চক্ষুরোগ-চিকিৎসার হাসপাতাল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি।

কর্ম্মস্থান বোম্বাইতেও তিনি বাঙালীগণের সুবিধার্থ অনেক কার্য্য করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বোম্বাই-স্থিত বেঙ্গল ক্লাব ও এংলো-বেঙ্গলী ক্লাবেও তিনি যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছেন। এংলো-বেঙ্গলী স্কুলটির অবস্থা বর্ত্তমানে বেশ ভাল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহার প্রথম ছয় মাসের যাবতীয় ঘাট্‌তি তিনি একক বহন করিয়াছেন। এখনও তিনি বিদ্যালয়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। বোম্বাইতে বেঙ্গল এডুকেশনাল সোসাইটির তিনি এক জন ট্রাষ্টী।

উপরে শিববাবুর জীবনী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়, স্থির লক্ষ্য, অদম্য কর্ত্তব্য-জ্ঞান এবং সহজ কর্ম্মকুশলতার বলে মানুষ সহজেই আপন আপন ভাগ্য গড়িয়া লইতে পারে। পর পর তিন জন তথাকথিত অশিক্ষিত (?) বাঙালীর জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিয়া আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাহিয়াছি যে, কলেজী শিক্ষা লাভ না-করিয়াও আপন আপন সহজ বুদ্ধি, সততা ও প্রতিভাবলে বাঙালীরাও নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমি জীবন-সায়াহ্নে বাঙালী যুবক-সমাজের সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত কয়টি তুলিয়া ধরিলাম।

[এই প্রবন্ধ প্রণয়নে শ্রীমান ভবেশচন্দ্র রায়, এম্. এস্‌সি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।]

খ্রীষ্টের স্বজাতি

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

যীশুখ্রীষ্ট নাকি এক জন ইহুদীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, সে তাঁহার পুনরাগমনের দিন পর্য্যন্ত অমর



আলবার্ট আইনষ্টাইন
বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম এই সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ইহুদীত্বের অপরাধে জার্ম্মানী হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী।

হইয়া পৃথিবীতে ঘুরিয়া মরিবে, শান্তি সে কোনদিন পাইবে না। ভ্রাম্যমাণ ইহুদীর গল্প সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ ইহুদী শুধু এক জন নয়, সমগ্র ইহুদী জাতি।

বাইবেলের "ওল্ড টেষ্টামেন্ট" পুস্তকের প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহুদীরা শুধু ঘুরিয়াই ফিরিতেছে। নিজেদের দেশে তাহারা স্থায়ী বসবাস করিয়া সুখে শান্তিতে থাকিতে পায় নাই, পরের দেশেও তাহাদের নিরাপত্তা কোন সময়েই স্থায়ী হয় নাই। প্রাচীনতম যুগে আসিরিয়া, মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া সব স্থানেই তাহাদের একই রূপ অদৃষ্ট।

ইহুদী-সমস্যা চিরকালই আছে, হয়ত চিরকালই



সিগমুণ্ড ফ্রয়েড
মনঃসমীক্ষণবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা এই মনীষী ৮২ বৎসর বয়সে, হিটলারের অষ্ট্রিয়া-দখলের সময় ভিয়েনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বর্ত্তমানে তিনি লণ্ডন-নিবাসী।







নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্ম্মানীর কয়েক জন ইহুদী মনীষী ও বৈজ্ঞানিক

কার্ল ল্যাণ্ডষ্টাইনার। ১৯৩০ সালে চিকিৎসা-বিদ্যায় নোবেল-পুরস্কার পান। শিশুদের পক্ষাঘাত যে বীজাণুজাত ইহার গবেষণায় তাহা প্রমাণ হয় এবং ফলে এই রোগের প্রকৃত চিকিৎসা সম্ভব হয়।

জেম্‌স ফ্রাঙ্ক। ১৯২৫ সালে পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল-পুরস্কার পান। ইনি গটিঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যা-মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১৪-১৮ সালে মহাসমরে যোগ দিয়া ইনি "আয়রণ ক্রস্" সম্মান লাভ করেন।

রিচার্ড উইলষ্টাটার। পত্রহরিৎ (Chlorophyll) সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ইনি ১৯১৫ সালে নোবেল-পুরস্কার, ও জার্ম্মানীর একটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন।

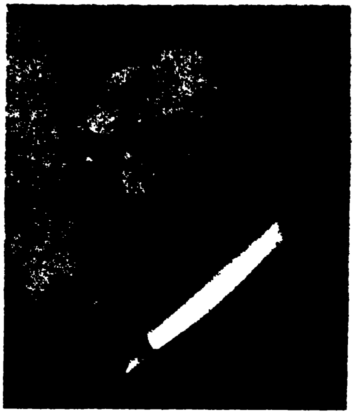
থাকিবে। নিজের দেশে ইহুদী প্রবাসী, বিদেশে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থান যদি বা সে কোন রকমে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, অধিকাংশ সময়েই সে শুধু বিতাড়িত হয় নাই, ধর্ম্মোন্মত্ত জনতার হাতে দলে দলে ইহুদী মরিয়াছে, অনেক স্থানে তাহাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে।

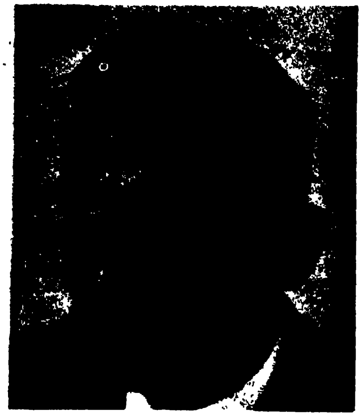
তবু ইহুদীরা বাঁচিয়া আছে। শুধু বাঁচিয়া আছে নয়, সংখ্যায় অনেক গুণ বাড়িয়াছে, এবং যেখানে যেখানে তাহাদের প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ পাইয়াছে, সেখানে অতি সহজেই শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহুদীদের অপরাধ যে কি, সেটা খুঁজিয়া বাহির করা একটু কঠিন। তাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধি বেশী, সহজে টাকা উপায় করিতে পারে। প্রচুর অর্থোপার্জ্জন যদি একটা অপরাধ হয়, তবে স্কচ্ জাতি ইহুদীদের চেয়ে কম অপরাধী নয়। কৃপণতার অপবাদ ইহুদী এবং স্কচ্ উভয়েরই আছে। কিন্তু পৃথিবীর দুই জন শ্রেষ্ঠ দানবীর, রথচাইল্ড ও কার্ণেজি, এক জন ইহুদী, আর এক জন স্কচ্।

ইহুদীদের বিরুদ্ধবাদীরা একটা অপরাধ অতি সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে, তাহা এই যে, ইহুদীরা চিরকাল ইহুদীই রহিয়াছে, কোন দিনই কোন জাতির সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যায় নাই। কথাটা শুধু আংশিক সত্য। কারণ ইহুদী নামে স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী একটি জাতি আছে বটে, কিন্তু এমন জাতি সম্ভবতঃ ইউরোপে নাই যাহাদের মধ্যে ইহুদী-রক্তের সংমিশ্রণ না ঘটিয়াছে। ইংরেজ, জার্ম্মান প্রভৃতি টিউটনিক জাতি; স্কচ্, আইরিশ প্রভৃতি কেল্‌টিক জাতি; ইতালীয়ান্, স্পানিশ প্রভৃতি মেডিটেরেনীয়ান্ জাতি, সকলের মধ্যেই যে কিছু কিছু ইহুদী-রক্ত রহিয়াছে, সমাজ-বিজ্ঞান সে-কথাটা খুব ভাল করিয়াই জানে।

সদ্গতির জন্য পোড়াইয়া মারা হইত, অথবা যে কারণে স্পানিশ্ ইন্‌কুইজিশনের সৃষ্টি এবং যে কারণে এলিজাবেথের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই সেদিন পর্য্যন্তও রোমান্ ক্যাথলিকদের কুকুরের মত দেখা হইত, ইহুদী-নির্য্যাতনের মূল কারণ বোধ হয় তাহা নহে। কারণ রোমান্ ক্যাথলিকের পক্ষে প্রটেষ্ট্যাণ্ট হওয়া, প্রটেষ্ট্যাণ্টের পক্ষে ক্যাথলিক হওয়া মোটেই কঠিন নয়। এবং ধর্ম্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অতীত ধর্ম্মসম্বন্ধে কেহই মাথা ঘামাইত না। আওরংজীবের সময়েও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত।





নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্ম্মানীর দুই জন ইহুদী মনীষী ও বৈজ্ঞানিক

আল্‌ফ্রেড ফ্রীড। ১৯১১ সালে বিশ্বশান্তিতে নোবেল-পুরস্কার লাভ করেন। শান্তি-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও শান্তিবার্ত্তা-প্রচারক একটি পত্রিকার স্থাপয়িতা।

অটো ওয়ারবুর্গ। ১৯৩১ সালে চিকিৎসাতত্ত্বে নোবেল-পুরস্কার লাভ করেন। কোষ-গঠন সম্বন্ধে ইঁহার গবেষণা পরিচালনার জন্য ১৯৩১ সালে বার্লিনে স্বতন্ত্র একটি পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এমন কি হিট্‌লার, গোয়েবল্‌স্ প্রভৃতি তথাকথিত খাঁটি "আর্য্য" সন্তানদের শিরাতেও যে ইহুদী-রক্ত নাই, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু জানা এক জিনিষ এবং উদ্যত বেয়নেটের সামনে দাঁড়াইয়া প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ।

সকলের চেয়ে মজার কথা এই যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা "আর্য্য" জাতি বলিয়া কোনও জাতির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে "আর্য্য" একটি ভাষা, অথবা অনেকগুলি ভাষার মূলসূত্র। কিন্তু জার্ম্মানীতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, "আর্য্য" একটি জাতি, জার্ম্মান জাতি সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ আর্য্যজাতি এবং একথাও নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়াছে যে, ইহুদীরা জগতের নিকৃষ্টতম অনার্য্য জাতি এবং পৃথিবীর বুক হইতে, অন্ততঃ জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বুক হইতে যত শীঘ্র তাহারা নিঃশেষে মুছিয়া যায়, ততই মঙ্গল।

বিধর্ম্মীকে ঘৃণা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং তাহার আদিমতম প্রবৃত্তির অন্যতম। কিন্তু যে কারণে মেরীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডে প্রটেষ্ট্যাণ্টদের আত্মার

কিন্তু ইহুদী খ্রীষ্টান হইলেই তাহার সব দোষ স্খালন হইয়া যায় না। কারণ সেখানে ইহুদী-বংশে জন্মানই একটা মস্ত বড় অপরাধ, সেখানে ধর্ম্মান্তরে কিছু আসিয়া যায় না।

যে-কোন নাৎসীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ইহুদীদের সবচেয়ে বড় অপরাধের কথা বলিয়া দিবে। ইহুদীরা নাকি যীশুকে হত্যা করিয়াছিল। তাহাকে একথা বুঝাইয়া লাভ নাই যে, যীশুকে যাহারা ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল তাহারা ইহুদী নহে, রোমান। একথা বলিয়াও কোন ফল হইবে না যে, যীশু শুক্রবারে ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শুক্রবারে কাহারও প্রাণদণ্ড ইহুদী শাস্ত্রমতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে লুই গোল্‌ডিং লিখিতেছেন—

"যত দূর মনে হয় ইহুদীরা মৃত্যুদণ্ড প্রায় বর্জ্জন করিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগের এক জন রাব্বি যে আদালতে সত্তর বৎসরের মধ্যে একবার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করা হয়, তাহাকে 'খুনে বিচারকের দল' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি যখন ইহুদীদের মৃত্যুদণ্ড দিবার অধিকারও ছিল,






জার্মান সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহুদীদিগের দান চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া আছে। তাহার মধ্যে কয় জনের পরিচয় ও চিত্র প্রদত্ত হইল।

ম্যাক্স লীবারম্যান (১৮৪৭-১৯৩৫)। আধুনিক জার্মান শিল্পকলায় ইহার নাম অগ্রগণ্য—প্রাণহীন ধারা হইতে মুক্ত করিয়া জার্মান চিত্রকলাকে ইনি প্রাণবান্ বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন।

হেনরিক হাইনে (১৭৯৭-১৮৫৬) এই বিশ্ববিখ্যাত গীতিকবির রচনা এখন জার্মানীতে "অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা" বলিয়া মুদ্রিত হইয়া থাকে।

ফেলিক্স মেণ্ডেলসন-বার্টহোল্ডি (১৮০৯-১৮৪৭)। এই অমর গীতকারের সঙ্গীত এখন জার্মানীতে নিষিদ্ধ।

গুস্তাভ মালের (১৮৬০-১৯১১) অষ্ট্রিয়ার গীতকার ও অপেরা-পরিচালক—ইহার পরিচালনাতেই ভিয়েনার অপেরা ইউরোপময় খ্যাতিলাভ করে।

তখনও শুক্রবারে সে দণ্ড দেওয়া চলিত না; এবং যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুদিন শুক্রবার।"*

খ্রীষ্টানদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থের অর্দ্ধাংশ ইহুদীদের নিকট হইতে ধার করা। বাকী অর্দ্ধাংশ যে ইহুদীরা মানে না, সেজন্য ইহুদী-দলন আরম্ভ করার আগে ধার্মিক "আর্য্য" জাতির দল কোনদিনই ভাবিয়া দেখে না যে বাইবেলের শেষাংশও এক জন ইহুদীরই জীবনী এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সন্তরাও ইহুদী, যেমন, মার্ক, মথি, লুক, পিটার প্রভৃতি।

কিন্তু নূতন নাৎসী ধর্ম্মমতে ইহারা সকলেই আর্য্য-বংশোদ্ভূত। শুধু এক জন ইহুদী, সে জুডাস্ ইস্কারিয়ট্, যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যীশুকে ধরাইয়া দিয়াছিল।

বাইবেল অনুসারে যীশুখ্রীষ্ট আর একবার পৃথিবীতে আসিবেন। যদি তিনি আসেন তবে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম অবলম্বনকারীরা তাঁহারই স্বজাতির উপরে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রেম, ক্ষমা প্রভৃতি মধুর গুণের কি প্রকার সদ্ব্যবহার করিতেছেন, দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

* The Jewish Problem. P. 24.

ইহুদীরা যে চিরকাল ইহুদীই রহিয়াছে, মিলিয়া মিশিয়া ইউরোপের অন্যান্য জাতির সঙ্গে এক হইয়া যায় নাই, সেটা তাহাদের দোষ নহে। ইউরোপে প্রথম যুগ হইতেই ইহুদীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইয়াছে, তাহাদের স্বাতন্ত্র্য তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত নহে। তাহাদের সনাতন জাতীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার যে বজায় রহিয়াছে তাহা ভাল কি খারাপ, তাহা পরের কথা। কথা হইতেছে এই যে, যখন একটি জাতিকে দেশের লোকের সহিত মিশিবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই, চিরকালই নগরের এক প্রান্তে (Ghetto) বস্তিতে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে তাহাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য গালি দেওয়া রাজনৈতিক চাল হিসাবে ভাল হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক সুস্থ মনের পরিচায়ক নহে। ইহুদীরা নিজ হাতে এই বস্তির সৃষ্টি করে নাই। ইচ্ছা করিয়া দূরে থাকিবার জন্য নগরের নিকৃষ্টতম পল্লীতে বাসা লয় নাই। তবু এতখানি বিরুদ্ধতার মধ্যে বস্তিতে বাস করিয়া দেশের সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু শিক্ষা না পাইয়াও যে তাহারা ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এইটাই আশ্চর্য্য।



সুপ্রসিদ্ধ ইহুদী অভিনেত্রী লুই রেনার

"গুড্ আর্থ" প্রভৃতি ছায়াচিত্রে অভিনয় করিয়া ইনি বিশেষ যশ অর্জন করিয়াছিলেন ও ছায়াচিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। জার্মানীতে ইহার স্থান নাই।



এলিজাবেথ বার্গনার

শেক্সপীয়রের নাট্যাভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া এই ইহুদী অভিনেত্রী খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বার্নার্ড শ-র সুবিখ্যাত 'সেন্ট জোয়ান' নাটকের নাম-ভূমিকায় ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইনি লণ্ডনের অধিবাসিনী—জার্মানীতে ইহার স্থান নাই।

এই "গেটো"তে ইহুদীদের উপর বর্ব্বরতম অত্যাচার করা হইত। ইংলণ্ডে প্রথম রিচার্ড অথবা প্রথম এডোয়ার্ড ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহুদী-দলনে তাঁহারা সেকালে ফ্যারাও ও একালে হিট্‌লার অপেক্ষা খুব বেশী নীচে ছিলেন না।*

* এই প্রসঙ্গে আমেরিকার 'ক্যাথলিক ওয়ার্ল্ড' পত্র লিখিতেছেন—"(বর্ত্তমান জার্ম্মানীতে) ইহুদীদের উপর নানাবিধ রূপে অত্যাচার করা হইতেছে যাহা পূর্ব্বযুগে অজ্ঞাত ছিল। ঈজিপ্টে ফ্যারাওরা তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিত, দাস করিয়া রাখিত বটে, কিন্তু তাহাদিগকে উপবাসী করিয়া রাখিত না। মূশার যুগে ফ্যারাও ইসরায়েলের সন্তানদের যখন যাইতে দিলেন তখন যাইবার মত স্থান তাহাদের ছিল (অর্থাৎ এখনকার মত এক দিকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া অপর দিকে পাসপোর্ট না-দিয়া বাহিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করা হইত না)। বেবিলনিয়াতে ইহুদীরা 'বন্দী' (captive) ছিল বটে, কিন্তু তাহারা নিজ ব্যবসায় চালাইতে পারিত। তাহাদের মহাপুরুষেরা নির্ভয়ে আপনাদের সান্ত্বনার বাণী ঘোষণা করিতে পারিতেন। কিন্তু বাবিলনের রাজপথে ড্যানিয়েলের মত বার্লিন, ভিয়েনা বা কার্লসবাদের পথে আজ কেহ কথা কহিবে, ইহা কল্পনাও করা যায় না।

"পূর্ব্বযুগে বিভিন্ন দেশে উৎপীড়িত হইয়া ইহুদীরা যখন সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন তৃতীয় আলেকজাণ্ডার, চতুর্থ ইনোসেণ্ট, দশম গ্রেগরি প্রভৃতি পোপগণ তাহাদের রোমে আহ্বান করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে পোপের ১০৮ একর মাত্র জমি আছে—যদি তিনি ভ্যাটিক্যান নগরীতে কতকগুলি ইহুদীকে আশ্রয় দিতে চাহেনও, মুসোলিনী কি তাহাদিগকে প্রবেশের অনুমতি দিবেন?"

ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী চেষ্টারটনের ক্যাথলিকগণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সর্ব্বজনবিদিত। তিনি লিখিয়াছেন, "মধ্যযুগে ইহুদীদের উপর অত্যাচার হইত এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। বলিতে কি, ইহুদীরাই বোধ হয় সে যুগে একমাত্র জাতি ছিল, যাহাদের উপর কোন অত্যাচার করা হইত না।" কারণ-হিসাবে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিত্তশালী ইহুদীরা ছিল রাজার রক্ষণা-বেক্ষণে। কাজেই তাহাদের উপর অত্যাচার ছিল অসম্ভব। কিন্তু রক্ষক যদি ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার ক্ষুধার মাত্রাও একটু বেশী হয়। প্রথম এডোয়ার্ড, প্রথম রিচার্ড এবং স্পেনের ফার্ডিনাণ্ড তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়াও যায় যে, মধ্যযুগে ইহুদীদের উপর এমন কিছু একটা অত্যাচার হইত না (যদিও ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে), তাহা হইলেও ইহা হইতে ইহুদীদের সান্ত্বনা পাইবার বিশেষ কিছু নাই। কারণ তাহাদের সমস্যা বর্ত্তমানের—অতীতের নহে।

সংখ্যায় এত অল্প হইয়া এত বড় বড় লোক বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই। এক স্কচ্ জাতি ভিন্ন এতগুলি সকল দিকে বিখ্যাত লোক যে কোন একটি জাতির মধ্যে দুর্লভ। অবশ্য যে-সকল ইহুদী জগতে নানা দিকে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ ইংরেজ, কেহ জার্মান, কেহ অষ্ট্রিয়ান, কেহ বা ফরাসী। কিন্তু মূলতঃ সকলেই প্যালেষ্টাইনের এক ইহুদী জাতিরই বংশধর।

আজ ইহুদীদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, তাহারা কোথায় যাইবে। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া হইতে যে তাহাদের সমূলে বাহির হইতেই হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, এসব দেশেও ইহুদীদের স্থান আর বেশী দিন হইবে না।

এক সময় ছিল, যে সময়ে ইহুদীরা এক দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া আর এক দেশে আশ্রয় পাইত। কারণ ইহুদী জাতির নানা বিষয়ে গুণপনার কথা এখনকার মত তখনও লোকে জানিত, এবং গৃহচ্যুত ইহুদীকে নিজেদের দেশে সাদরে গ্রহণ করিত। মধ্যযুগে যখন দলে দলে ইহুদী



পল গোয়েব্‌ল্‌স্

ইনি ডক্টর উপাধিধারী—হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহুদী অধ্যাপক ডক্টর গুণ্ডল্‌ফের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করিয়া ইনি উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার পত্নী বার্লিনে এক ইহুদী-পরিবারে মানুষ হইয়াছিলেন। ইহুদীদের জার্মানী হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের স্পর্শদোষ হইতে জার্মান "আর্য্য" সংস্কৃতিকে রক্ষা করিতে ডক্টর গোয়েব্‌ল্‌স্ এক জন প্রধান উদ্যোগী।

স্পেন ও পর্ত্তুগাল হইতে বিতাড়িত হইতেছিল, তখন তাহারা আশ্রয় পাইয়াছিল তুরস্কে। সুলতান বাজাজেৎ বলিয়াছিলেন, "যে ফার্ডিনাণ্ড নিজের দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া আমার দেশের সমৃদ্ধি বাড়াইতেছে, তাহাকে লোকে বুদ্ধিমান্ বলে কি করিয়া?" যখন খ্রীষ্টানদের দেশে ইহুদীদের স্থান ছিল না, তখন মুসলমান রাজত্বে তাহারা আশ্রয় পাইয়াছিল। মুসলমান দেশ মরোক্কো, সারাসেন স্পেনে, ইহুদী কখনও নির্যাতিত হয় নাই; আজ ইহুদী জাতির পরম দুর্ভাগ্যের কথা যে, তাহাদের



জুলিয়াস ষ্ট্রিখের। ইহুদী-দলনের এক জন প্রধান উদ্যোক্তা।

নিজেদের দেশ এশিয়া মাইনরে, তাহাদের অতীতের বন্ধু, একই সেমিটিক জাতির অপর শাখা আরবগণ তাহাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে লয়েড জর্জ লিখিয়াছিলেন, "ইহুদীরা প্রতিভার বলে জার্ম্মানীতে যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, সে-স্থান হইতে যখন হিট্‌লার তাহাদের দূর করিয়া দিলেন, তখন ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা ও হল্যাণ্ড নাৎসীবাদের বিচারে নির্ব্বাসিত ইহুদীদের জন্য দ্বার অবারিত করিয়া দিয়াছিল।" কিন্তু ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে সে-দ্বার অবারিত নাই। কারণ ইহা নহে যে, এই সকল দেশে হিট্‌লারের ইহুদী-বিদ্বেষের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। কারণ এই যে, এই সব দেশে বেকার-সমস্যা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকার অবারিত দ্বার ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, বাকী দেশগুলির দ্বার প্রায় বন্ধ হইয়াছে বলা চলে। যেখানে নিজের শুইবার স্থান নাই, সেখানে "শত্রু"কে ডাকিয়া উভয় পক্ষের দুঃখ বাড়াইয়া কিছু লাভ নাই।

তবে ইহুদীরা যাইবে কোথায়? প্যালেষ্টাইনে? কিন্তু জার্ম্মানীর তপ্ত কটাহ অপেক্ষা প্যালেষ্টাইনের প্রজ্জলিত অগ্নি খুব বেশী মাত্রায় শীতল বোধ হয় নহে। প্রথম যখন লোহিত সাগর পার হইয়া দলে দলে ইহুদীরা তাহাদের আদি দেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহাদের মনে আশা ছিল, উদ্যম ছিল। তাহারা হয়ত ভাবিয়াছিল, আবার "ওল্ড টেষ্টামেণ্টে"র যুগ ফিরিয়া পাইবে, শুধু তাহাদের জীবন বিষময় করিবার জন্য রোম-সাম্রাজ্যের শাসন থাকিবে না, অথবা তাহারও আগের আসিরীয়দের অমানুষিক অত্যাচারও থাকিবে না। ইহুদীদের আদি ভাষা হিব্রু প্যালেষ্টাইনে



হার্ম্মান গোয়েরিং—ইহুদী-বিতাড়নের এক জন প্রধান উৎসাহী।



ভিয়েনায় প্রবীণ ইহুদীদিগকে রাজপথ পরিষ্কার করিতে বাধ্য করা হইতেছে। নাৎসী যুবকেরা অদূরে দাঁড়াইয়া কৌতুক উপভোগ করিতেছে।

আবার প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, এবং আশাতীত ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু শান্তি তাহাদের মিলিল না। মূশা ইজ্‌রালাইটদের দলপতি হইয়া যে চল্লিশবর্ষব্যাপী বনবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার শেষ হইয়া ইহুদীরা আবার স্বদেশে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ভ্রমণের শেষ আজও হয় নাই, ভ্রাম্যমাণ ইহুদীদের আশাহীন আনন্দহীন ভ্রমণ আজও চলিতেছে।

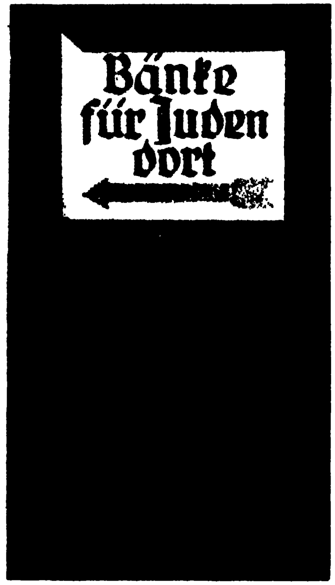
এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের দুই জন নেতার মত উল্লেখযোগ্য। কিছু কাল আগে জওআহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন যে তিনি ইউরোপে নির্ধাতিত ইহুদীদের সপক্ষে, কিন্তু প্যালেষ্টাইনে আরব-বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বী। সম্প্রতি মহাত্মাজী লিখিয়াছেন, "ইংলণ্ড যেমন ইংরেজদের, প্যালেষ্টাইনও তেমনি আরবদের। আরবদের ঘাড়ে ইহুদীদের চাপানো অন্যায় ও অমানুষিক।"

দুই জনই ভারতের শ্রদ্ধেয় জননেতা। কিন্তু তাঁহাদের কথাগুলির যুক্তি বুঝিয়া উঠা কঠিন। প্যালেষ্টাইন আরবদের স্বদেশ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহুদীদেরও বিদেশ নহে; প্রকৃতপক্ষে আরবদের স্বদেশ হওয়ার অনেক আগে হইতেই ইহুদীদের স্বদেশ। আজ যদি অষ্ট্রেলিয়া হইতে দলে দলে লোক লইয়া, অথবা উত্তরমেরু প্রদেশ হইতে এস্কিমোদের আনিয়া প্যালেষ্টাইনে স্থায়ী ভাবে বসবাস করানোর চেষ্টা চলিত, তবে নিঃসন্দেহ জওআহরলাল ও গান্ধীজী, উভয়ের কথাই খাটিত। ঘটনা সম্পূর্ণ অন্যরূপ, এবং সেই কারণে উভয়ের যুক্তিই কিছুমাত্রায় অযৌক্তিক বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক।

রাশিয়াতে ইহুদীদের বসবাসের উপায় এখনও আছে। কারণ সাম্যবাদী রাশিয়া কোন ধর্মেরই ধার ধারে না, ইহুদীরা খ্রীষ্টান না হইলেও তাহাদের কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু সেই কারণেই ধর্মপ্রাণ ইহুদীদের পক্ষে রাশিয়ায় যাওয়া অসুবিধাজনক। কারণ তাহাদের ধর্মাচরণ তাহারা যথাযথ ভাবে করিবেই এবং রাশিয়ার



ভিয়েনার বহির্ভাগে এক প্রাসাদ-দ্বারে ইহুদীদের "প্রবেশ নিষেধ" বিজ্ঞাপন।



জার্ম্মানীর পার্কে যে বেঞ্চে ইহুদীদের বসিবার অনুমতি আছে, তাহার নির্দ্দেশ জ্ঞাপন।

ইহুদী-বিদ্বেষজ্ঞাপক এইরূপ বিজ্ঞাপন ও ছবির ছড়াছড়ি বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর সর্ব্বত্র।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রে কোনরূপ ধর্ম্মাচরণই খুব সহানুভূতির চক্ষে দেখা হয় না।*

বিখ্যাত লেখক লুই গোল্ডিং ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে বসবাসে আশার আলো দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু আরবদের বিরোধিতা যদি নাও থাকিত, তাহা হইলেও জগতের সমস্ত ইহুদীকে প্যালেষ্টাইনের মধ্যে কুলানো যায় না। বর্ত্তমান জগতে ইহুদী জাতির সংখ্যা বিশাল। জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া, ইটালী, পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া হইতে দূর হইয়া ইহারা যে কোথায় থাকিবে, এ সমস্যার কোন সমাধান নাই, অন্ততঃ আপাততঃ নাই।

গোল্ডিঙের মতে ডিক্টেটরগণ আর যাহাই হউন জনমত তাঁহারা বেশী দিন ধরিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে বন্ধ করিলেও লোকের চোখের সম্মুখ হইতে নিজেদের মূর্খতা ও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা বেশী দিন লুকাইয়া রাখা যায় না। তাই হয়ত এমন এক দিন আসিবে, যেদিন জনমতের চাপে পড়িয়া হিট্‌লারকেও মত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, এবং ইহুদী-নির্যাতন তুলিয়া দিতে হইবে।

জনমত বলিয়া একটা জিনিষ সম্ভবতঃ নাৎসী-অধ্যুষিত জার্ম্মানীতেও কিছু পরিমাণে আছে। ইংরেজ লেখিকা ইসোবেল ম্যাকক্লিওর জার্ম্মানী ভ্রমণ করিয়া লিখিতেছেন—

"রাজনৈতিক দিক্ দিয়া জার্ম্মানী নাৎসীমতবাদী হইতে পারে কিন্তু কেন যে আমরা 'নাৎসী' ও 'জার্ম্মান' দুইটি শব্দকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যবহার করিতেছিলাম, যেন জার্ম্মানেরা নাৎসী নহে।

"আমাদের ভাষায় যাহারা জার্ম্মান, তাহারা এখনও চমৎকার মিশুক লোক; তাহারা এখনও আগের মত সঙ্গীত ও পানশালার পক্ষপাতী, এবং শান্তিপ্রিয়। আমার বিশ্বাস, এই ধরণের লোকের সংখ্যাই জার্ম্মানীতে এখনও অধিক, যদিও তাহাদের জীবন খুব সুখের নহে······।"

হয়ত এই ধরণের শান্তিপ্রিয়, সদালাপী প্রকৃত "জার্ম্মান" জাতি এক দিন নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া ভাগ্যহীন ইহুদীদের নির্যাতন বন্ধ করিবে। কিন্তু সেদিন যে খুব অদূর ভবিষ্যতে তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। তবু একটুখানি ক্ষীণ আশার রশ্মি, সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যশিল্প, এবং আরও অনেক দিকে ইহুদীদের প্রতিভার নিদর্শন সুপরিচিত। বিগত যুগের হাইনে, ডিস্রেলী, প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান যুগে ফ্রয়েড, জেনারেল মনাশ, রাইনহার্ট, লুডভিক, এপষ্টাইন, ষ্ট্যালিন, ট্রট্‌স্কি, ইহারা সকলেই ইহুদীবংশসম্ভূত।

কিন্তু ইহুদী জাতির মধ্যে বড় বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সৈনিক, অথবা রাজনৈতিক প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া যে ইহুদী-নির্যাতন অমানুষিক সে-কথা বলা আমাদের

* এ-বিষয়ে *From Tsardom to the Stalin Constitution*—W. P. Coates and Zedda K. Coates গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উদ্দেশ্য নহে। মনীষী 'হাক্সলি লিখিয়াছিলেন, স্বীকার করিতেছি নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গ জাতি অপেক্ষা সভ্যতায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে, গুণে, সকল দিক্ দিয়াই হেয়। কিন্তু সেই জন্যই যে তাহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, এ কেমন যুক্তি?

ইহুদীরা যদি বিদ্যায়, জ্ঞানে, মানবহিতৈষণায় এত বড় নাও হইতেন, তাহা হইলেই কি তাহাদের পথের কুকুরের মত দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়ানোর পক্ষে কোন যুক্তি থাকিত?

নাৎসী জার্মানী ও অষ্ট্রিয়াতে আজ ফ্রয়েড ও আইন্‌ষ্টাইনের স্থান হয় নাই। আরও অগণিত বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, শিল্পী, যাঁহাদের এক জনের অস্তিত্বে একটা সমগ্র জাতি ধন্য হইয়া যায়, তাঁহারা অমানুষিক নির্যাতনের চাপে হয় দেশ ছাড়িয়াছেন, না-হয় আত্মহত্যা করিয়াছেন। মধ্যযুগেও এরূপ বর্ব্বরতার অনুষ্ঠান খুব বেশী হয় নাই। তবে বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য জার্ম্মানী শত শত বৎসরের চেষ্টায় যতখানি বর্ব্বরতার শিক্ষা সংগ্রহ করিয়াছে, মধ্যযুগে তাহা আশা করাই অন্যায়।

আজ সারা পৃথিবীতে এমন জায়গা বেশী নাই যেখানে ইহুদীরা নিশ্চিন্ত মনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর নানা বিপদ, নানা ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া যে জাতি শুধু টিকিয়া নাই, মনে-প্রাণে বাঁচিয়া আছে, তাহার পুনরভ্যুদয়ের যুগ অবশ্যই আসিবে, যদি এত দিনের ইতিহাস মিথ্যা না হয়।



বার্লিনে ইহুদীদের একটি শয্যাদ্রব্যের দোকান—ইহুদী-বিদ্বেষীদের দ্বারা দলবদ্ধ ভাবে লুটতরাজ হইবার পরের দৃশ্য। বার্লিনে ইহুদীদের কোন কোন ধর্ম্মমন্দিরও পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—কোন কোন স্থলে মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ককে সপরিবারে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে।

প্রতিবিম্ব

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পাশাপাশি দুখানি ঘরে একটি মাঝারি সংসার। সংসার বটে, কিন্তু গৃহিণীশূন্য। ছেলেমেয়ে কম নয়, গুটিপাঁচেক, তার উপর আছে ছেলে-বৌ। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ছেলের বিয়ে দিতে হয়েছে নইলে সংসার চলে না। মধ্যবিত্ত সংসারে ঠাকুর-চাকরের কাজ ঝি-বৌরাই ক'রে থাকে। এই নিয়মেই ওদের তিন পুরুষ চলে আসছে, তবে ইদানীং একটি ঠিকে ঝির ব্যবস্থা করা হয়েছে। নইলে মানায় না, তাছাড়া চলেও না। অভাব তো লেগেই আছে, এর উপর আছে সামাজিক অনুশাসন, আছে কুটুম-বাড়ী, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী। তাদের অভিযোগ আছে, আবদার আছে, আসা-যাওয়া আছে। এর কোনটিকে বাদ দিতে গেলে চলে না। তবে ভরসা এই যে, গৃহিণী নেই। সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি তাই আর বড় কেউ খতিয়ে দেখে না। ভরসা শুধু ঐটুকুই।

. দুখানি ঘরে চুলচেরা ভাগাভাগি। ছোট ঘরখানি ছেলের অধিকারে। নূতন বিয়ে করেছে—সৌখিনতা তার চলায় বলায়। আরম্ভের নূতন উন্মাদনায় ওরা সদ্য-ফোটা। ওদের রূপ আছে, রস আছে, সৌরভ আছে—আছে উপভোগ করবার সুতীব্র বাসনা।

গৃহকর্ত্তা অরবিন্দ পঁয়ষট্টি বছরের বাঙালী বৃদ্ধ। ঠিক পাশের ঘরেই তাঁর শেষ জীবনের ভাঙা মন নিয়ে নীরবে ব'সে থাকেন। উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে চলমান পথিকদের লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন—বুকে তাঁর সাত সমুদ্র উথলে ওঠে। অতীতের একখানি স্পষ্ট ছবি তাঁর মনের পর্দ্দায় খেলে বেড়ায়। এই যে ঘর্মাক্ত কলেবরে ছুটাছুটি—উপার্জ্জনের জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি, এতে ওদের ক্লান্তি নেই, যেন ছ-টার ঘণ্টায় ফিরে আসার জন্যেই ওদের এই আরম্ভ। এই ছ-টার ঘণ্টায় ফিরে আসার অন্তরালে যে কি এক গভীর আকর্ষণ আছে তা আজও অরবিন্দ অনুভব করেন। ·কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আর বর্ত্তমানের নন—অতীতের এক নব্য যুবক। দশটা ছ-টা নিয়মিত আপিস ক'রে গৃহাভিমুখে ছুটে চলেছেন, যেখানে আছে ক্লান্তি-অপনোদনের এক জীবন্ত মায়াময়ী।

পরিশ্রমে অবসাদ ছিল না—নব প্রেরণায় তাঁর চতুর্দ্দিক সমুজ্জল, দুঃখের ছায়াও সেখানে মুখ দেখাতে লজ্জিত হয়ে পড়ত। তাঁর পর···

পাশের ঘর থেকে খানিক সজীব হাসির টুকরো এসে অরবিন্দর কানে আঘাত করল। বিরক্তিতে ভ্রূযুগল তাঁর কুঞ্চিত হয়ে উঠল। পাশের ঘরে উপস্থিত থাকা সত্বেও তাঁর অস্তিত্বকে উপেক্ষা করায় অরবিন্দর পঁয়ষট্টি বছরের মনটা গর্জ্জে উঠল। গুরু লঘু জ্ঞান পর্য্যন্ত এদের নেই। পুনরায় পুত্রের চাপা কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জন উঠল। অরবিন্দ সহসা চমকে উঠলেন, এ যেন তাঁরই নিঃশেষিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। যেন তাঁরই মৃত অতীত নব পরিকল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করেছে। অরবিন্দ নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন—শৈশবের কথা তাঁর মনে নেই, কিন্তু কৈশোর তাঁর এক দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে—সে-কথা আজও মাঝে মাঝে তাঁর মনে পড়ে। জীবনটা সত্যই তাঁর বড় দুঃখের। একটু নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আশায় যেখানেই তিনি ব্যগ্রভাবে বাহু প্রসারিত করেছেন সেখানেই প্রচণ্ড বাধা এসে তাঁকে নিরাশ করেছে, তাঁর কৈশোরের স্বপ্ন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এ-কথা তিনি কত দিন গল্পচ্ছলে ছেলেপিলে নাতি-নাতনীদের শুনিয়েছেন। তবু তা পুরনো হয় নি। স্বপ্নের মোহ আছে, অতীতের চিন্তায় আনন্দ পাওয়া যায়—তা নিতান্ত নিষ্ঠুর হ'লেও।

পিতা শ্রীকান্ত জমিদারী ষ্টেটে সামান্য বেতনের চাকুরীজীবী ছিলেন। ঐ সামান্য আয়ের যৎসামান্য রেখে বাকীটা তিনি অরবিন্দকে পাঠাতেন। তাই দিয়েই তাঁকে সংসার চালাতে হ'ত। চালানো মানে কাদার পথে গরুর গাড়ী কোন রকম ঠেলেঠুলে এগিয়ে নেবার মত।

নইলে ঐ সামান্য টাকায় কি ক'রে চলতে পারে—ঐ দিয়েই দোল, ঐ দিয়েই দুর্গোৎসব, ঐতেই বার মাসে তের পার্ব্বণ। বর্ত্তমানের অনটনের কথা কেউ বলতে এলে অরবিন্দ তাঁর নিজ জীবনের এই জলন্ত দৃষ্টান্ত তাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেন। অভাব মনে করলেই অভাব, তা ছাড়া এর সত্যকারের কোন সংজ্ঞা নেই—মানুষের গড়া একটা শব্দ মাত্র। নইলে তাঁর জীবনের পঁয়ষট্টি বছর পঁচিশ বছরেই নিঃশেষে ফুরিয়ে যেত। জীবনে ঝড়-ঝাপটা, উত্থান-পতন মানুষেরই দেখা যায় নইলে রাস্তার ঐ কুকুরটার সঙ্গে তার তফাৎ রইল কোথায়! অরবিন্দ নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, তাঁর অতীত জীবনের স্মৃতির মধ্যে তিনি হারিয়ে যান।

মাঝের দরজাটা ভেজান ছিল, বাতাসের ঘায়ে তা ঈষৎ উন্মুক্ত হ'তে অরবিন্দর অন্যমনা দৃষ্টি সেই দিকে পড়ল।—পুত্র আর পুত্রবধূ। মুখে তাদের কথা নেই, পরস্পর পরস্পরের মুখের চোখের প্রতি মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। পুত্রবধূর সরু আঙুলগুলি শায়িত পুত্রের চুলের মধ্যে অলসভাবে আনাগোনা করছে। মহামূল্য মদির মুহূর্ত্ত—জীবনে যা এক বার মাত্র দেখা দেয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ-ফাঁকি, তাই এ মহামূল্য। হাঁ সম্পূর্ণ ফাঁকি—যার সমষ্টি নিয়ে একটা গোটা জীবন। জীবন মানে···ছোট একটি শব্দ ক'রে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

অরবিন্দর অজ্ঞাতে ছোট একটি নিঃশ্বাস তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।···জীবনের মূল্য তিনি বোঝেন নি। নিজেকে তিনি ঠকিয়েছেন মামুলি বিধিনিষেধ মেনে চলতে গিয়ে।

···এর পরে তাঁর কৈশোরের দুঃস্বপ্নের প্রভাত হ'ল। দুঃখ-দারিদ্র্যের ঘন অন্ধকারের মাঝে ক্ষীণ একটু আলোর শিখা উঠলো জলে। তাইতেই অরবিন্দ খুশিতে নেচে উঠলেন। বছরের পর বছর অন্ধকার জগতে বাস করার পরে অকস্মাৎ সূর্য্যের আলো দেখার মত এ আনন্দ। অরবিন্দ উঠলেন মেতে—

দেহে তাঁর যৌবন···মনে তাঁর জোয়ারের মাতন। সম্মুখে বিরাট্ ভবিষ্যৎ, তাতে দুঃখের ছোঁয়াচ নেই—নেই কোন ক্লিষ্ট ভাব। মনের আশা-আকাঙ্ক্ষায় গড়া একটি টাটকা সবুজ ভবিষ্যৎ। অরবিন্দ নিজের সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলেন—এমনি দিনে হ'ল তাঁর বিবাহ। বানের জলে এল প্লাবন। কিনারা গেল তলিয়ে···শুধু জল আর জল। দিক্হারার মত অরবিন্দ ভেসে চললেন। ঢেউয়ের তালে তালে তাঁর নৌকো চলল ভেসে। ভুলে গিয়েছিলেন তিনি চিন্তা করতে, ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর দারিদ্র্যকে, এমনি দিনে কোথা থেকে উঠল ঝড়, নৌকার পাল নিল উড়িয়ে, নৌকা গেল তলিয়ে। কিন্তু মৃত্যু তাকে রেহাই দিয়ে গেল। চোখ চেয়ে উঠে দাঁড়াতেই তিনি চমকে উঠে দেখেন কঠিন মাটিতে তিনি দাঁড়িয়ে, চতুর্দ্দিকে শুধু দেহি দেহি রব। সম্মুখে বিরাট্ সংসার হাঁ ক'রে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। অতি অকস্মাৎ তাঁর স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল—সবিস্ময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন স্ত্রী শুধু স্বপ্নবিলাসের জন্যই নয়, দাবি তার অনেক যার কঠিন চাপ একে একে তাঁর স্কন্ধে চেপে বসতে সুরু করেছে।

পিতা লিখে পাঠালেন—বিয়ে ক'রেছ···দায়িত্ব বেড়েছে। ঘরে ব'সে সময় নষ্ট না ক'রে এবারে রোজগারের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়, আমার দ্বারা আর হয়ে উঠবে না। মুহূর্ত্তের জন্য অরবিন্দর মনটা রুখে দাঁড়াল। পিতার এই স্পষ্ট উক্তিতে তাঁর অভিমান বড় কম হয় নি, কিন্তু আজ তিনি বুঝতে পারছেন পিতার ঐ অনুশাসনের অন্তরালে কত বড় শুভ কামনা লুকানো ছিল।

অরবিন্দ সোজা হয়ে উঠে বসলেন—দুর্ব্বলতা মহা পাপ···তিনি হেঁকে বললেন, বাজার খারাপের দোহাই দিয়ে ঘরে ব'সে থাকলে বাজার ভাল হয়ে ওঠে না বিনু। রোজগার করতে গেলে প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম চাই।

মুখে এর বেশী শক্ত কথা তিনি বলতে পারেন না। বিনুর কোন প্রকার সাড়া পাওয়া গেল না। অরবিন্দ পুনরায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন···

পিতার কথায় তিনি আহত হয়েছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে চলল গোপন পরামর্শ, তার পরেই একবস্ত্রে গৃহত্যাগ। রোজগারের পথে এই তাঁর প্রথম পদার্পণ—পদে পদে বাধা কিন্তু অরবিন্দ কোন দিনও নিরাশ হয়ে পড়েন নি, মনে মনে তাঁর যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় ছিল, নিজের শক্তির উপর ছিল পূর্ণ নির্ভরশীলতা।

···পুত্রবধূ দরজা খুলে অন্যত্র প্রস্থানোদ্যত হ'তেই

অরবিন্দ পুনরায় কথা ক'য়ে উঠলেন—এদিকে একবার এস তো মা।

পুত্রবধূ পাশে এসে নীরবে উপবেশন করল। অরবিন্দ কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে পুনরায় কথা ক'য়ে উঠলেন—জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অবহেলা ক'রে অপব্যয় করলে দুঃখ-কষ্টকে কেউ ঠেকাতে পারে না—আমার কথাটা একটু ভেবে দেখো মা।...

পুত্রবধূ লজ্জিত মুখে প্রস্থান ক'রলে—অরবিন্দর কথা ক'টির মধ্যে যে গুরু ইঙ্গিত আছে তা বুঝে নিতে তার মোটেই বিলম্ব ঘটে নি।

অরবিন্দ পুত্রবধূর এই নীরব অপস্রিয়মান মূর্ত্তিটির প্রতি চেয়ে থেকে ভাবলেন, কথা ক'টি বলা হয়তো অন্যায় হয়েছে—ছেলেমানুষ ওর আর দোষ কি! তিনি পুনরায় ডেকে পাঠিয়ে পিঠে মাথায় খানিক হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন—তুমি কিন্তু মা খামকা দুঃখ পেয়ো না। তোমার বলার সার্থকতা আছে তাইতেই তোমার কাছে আমার নালিশ। আমার আর ক'দিন—তোমাদের সুখী দেখে যেতে পারলেই আমার আনন্দ—

পুত্রকে ডেকে তিনি খুব খানিকটা ধমকে দিলেন; দিনরাত ঘরে ব'সে ঘুমুতে হ'লে দোকানপাট বন্ধ ক'রে দিয়ে আর দিয়ে—লোক-দেখান একটা রেখেই বা লাভ কি?

অরবিন্দ থামলেন। নীরবে পুনরায় কি ভেবে নিয়ে বললেন—তোদের বয়েসে আমি একলা বিদেশে উপায় করতে বেরিয়েছি।

পুত্রের তরফ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অভিমান হয়েছে—তা হোক...তবু যদি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শেখে।...

অরবিন্দ পুনশ্চ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন...আত্মীয়-স্বজনের তাঁদের অভাব ছিল না, অভাব ছিল শুধু আন্তরিক সহানুভূতির যা নিতান্ত অনাত্মীয়দের কাছ থেকে পেয়েছিলেন অযাচিত ভাবে, তাঁর অতি'বড় দুর্দ্দিনের সময়, অথচ যাদের নিয়ে তাঁর আশার অন্ত ছিল না সেইখানেই ঘটল মর্ম্মান্তিক প্রত্যাখ্যান।

এর পরে তাঁর জীবন-রথের চাকা ঘুরে গেল। অভাবের দুশ্চিন্তা রইল না। যারা অনাত্মীয় তারা দূরেই রয়ে গেল, আত্মীয়েরা হ'ল পরমাত্মীয়। অরবিন্দ তাদের এ ছলনা বুঝতে পেরেও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। বিশ্বাসের গ্রন্থি তাঁর শিথিল হয়ে গেলেও আত্মীয়তার অধিকারকে তিনি ক্ষুণ্ণ হ'তে দেন নি। এইখানে তাঁর এক মস্তবড় দুর্ব্বলতা দেখা যেত।

অরবিন্দ নিজে রইলেন কর্ম্মস্থলে—খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইদের সাহায্যে ফাঁদলেন ব্যবসা। তাঁর যা কিছু সঞ্চিত সব দিলেন নিঃশেষে ঢেলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সবই গেল ওদের উদরে, তিনি পড়লেন ফাঁকে।

অরবিন্দ ডাকলেন—অ বিনু এক বার শুনে যা বাবা—বিনয় এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতেই তিনি বার-কয়েক মাথা নেড়ে বললেন—তোদের ভালর জন্যেই সব, বুঝতে পেরেছিস? সময় থাকতে যদি চোখ চেয়ে না দেখিস, শেষ পর্য্যন্ত তাহলে তোর বাপের মতই বোকা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। টাকা-পয়সার ছোঁয়াছুঁয়িতে বাপ-ছেলের মধ্যে পর্য্যন্ত সহজ ভাব থাকে না—অপরের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম।

বিনয় নতমুখে প্রস্থানোদ্যত হ'তেই অরবিন্দ পুনরায় বললেন—মানুষকে অবিশ্বাস করতে গেলে চলে না—তাই ব'লে চোখ বুজে ব'সে থাকারও কোন মানে হয় না। তুমি যে জেগে আছ এ কথাটাও অন্ততঃ মাঝে মাঝে জানিয়ে দিতে হয়।

বিনয় আর দাঁড়াল না। অরবিন্দ পুনরায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। বয়েস কম, বুদ্ধি তেমন পাকে নি, নইলে বুড়োদের কথায় চেতনা হ'ত। এক কথায় তাদের কর্ম্মব্যস্ত সংসার থেকে বাদ দেবার আয়োজন চলত না, বৃদ্ধের পরিকল্পনা আর যুবার শক্তির সমন্বয় ঘটতে পারত। তখন তাঁর এই ঘোর সাংসারিক কুটিল অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই আজ তিনি হিসাবের বাইরে, পুত্রকে উপদেশ দিতে গেলে অসন্তুষ্ট হয়, আত্মীয়স্বজনের তো কথাই নেই। জীবনে তিনি বহু বার বুদ্ধিমান হয়েছেন, বোকা বহু বার হয়েছেন, কিন্তু শেষ জীবনের অখ্যাতি তাঁর, আজও গেল না। বুদ্ধিতে আর কারুর আস্থা নেই—শক্তি আজ নির্জীব।

অরবিন্দ ব'সে আছেন, মনের মধ্যে আজ যে-তুফান বইছে তার ভাষা নেই, বাইরে থেকে তাই পড়া যায় না, নইলে দেখা যেত—অতীতের সুসংবত্ত সংসারে একখানি ইতিহাস দৃশ্যের পর দৃশ্য তাঁর চোখের সম্মুখে অভিনীত হয়ে চলেছে। আর তিনি ভাবাবেশে নীরবে তা উপভোগ করছেন। অতীতকে বর্ত্তমানের রূপ দিয়ে তাকে অনুভব করতে তিনি লুব্ধ হয়ে ওঠেন।

অদূরে পুত্রবধূ রান্নার কাজে ব্যাপৃত ছিল। উনুনে গনগনে আগুনের একটি শিখার বর্ণচ্ছটা তার আধখানা গালের উপর পড়ে চমৎকার মানিয়েছে। এমনি ক'রে বিনুর মা-ও রান্না করত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কত দিন কত ছলে যে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতেন, সে খবর আর কেউ যদি নাও জানল কিন্তু নিজের মনকে তো অস্বীকার করা চলে না—সত্যের আসন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। বাধা ডিঙিয়ে এই যে আনন্দ এ তাঁরা প্রত্যহই অনুভব করেছেন, অথচ অতি সামান্য কারণেই আজ তিনি পুত্রকে উপদেশ দিতে বসেছেন। মানুষের স্বভাবই এমনি। যৌবনে এমনি সময়ের অপব্যবহার প্রত্যেক মানুষই ক'রে থাকে—উন্মাদনা যখন নিঃশেষ হয়ে আসে, জীবনের সত্যকারের রূপ যখন চোখের সম্মুখে ধরা দেয়, তখনই মানুষ মাথায় হাত দিয়ে বিগত দিনের কথা ভাবতে সুরু করে। ভাবে—হয়তো জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি নেশার ঘোরে অপব্যয় না করলে চলার পথে পদে পদে বাধার সৃষ্টি হ'ত না। হয়তো জীবন-পৃষ্ঠার অক্ষরগুলি সোনার জলে লেখা হয়ে থাকত। কল্পনাকে বাস্তবে দেখতে অরবিন্দ চঞ্চল হয়ে ওঠেন, তাই নিজ জীবনের লোকসান পুত্রকে দিয়ে পুষিয়ে নিতে চান। অরবিন্দর এ এক দুর্ব্বলতা, কিন্তু তিনি তা বোঝেন না। তিনি ইচ্ছে ক'রেই বুঝতে চান না যে, জীবনের একটা সহজ গতি আছে—মানুষের যৌবনের উষ্ণ রক্তের একটা নিজস্ব ধারা আছে।

পুত্রবধূর আহ্বান তাঁর কানে এল, রান্না হয়ে গেছে, আপনি কি এখন খাবেন বাবা?...

অরবিন্দর চিন্তার স্বপ্ন টুটে গেল—কি বলছ মা? খাবার কথা, বিনু এলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে। তিনি পুত্রবধূকে কাছে ডাকলেন, নিজের কোলের কাছে বসিয়ে পরম স্নেহে তার পিঠের উপর একখানি হাত রেখে বলতে লাগলেন—জান মা, বিনুর মার কত সাধ ছিল ছেলের বৌ নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবার। বিনুকে তিনি কত বুঝিয়েছেন—নিজের অসুস্থ শরীরের দোহাই দিয়ে বিয়ে করবার জন্যে তাকে বলেছেন—সেই বিয়ে তাকে আজ করতেই হ'ল কিন্তু দুটি বছর আগে করলে না।

অরবিন্দ মুহূর্ত্তের জন্য থামলেন, গভীর কণ্ঠে বললেন, ওখান থেকে ঐ বড় ছবি খানা নিয়ে এস তো মা।

পুত্রবধূ শ্বশুরের আদেশ পালন করল।

অরবিন্দ পুনরায় কথা কয়ে উঠলেন—ভারী পুণ্যবতী ছিলেন—তোমার দুর্ভাগ্য, দেখতে পেলে না। এঁকে প্রণাম কর, তোমায় স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ করবেন। বুঝলে মা, বিনুর যখন দশ বছর বয়েস তখন থেকেই বিনুর বৌকে নিয়ে কি ভাবে নূতন ক'রে সংসার পাতবেন তার স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিলেন। কত দিন যে বিরক্ত হয়ে আমি নিজেও হেসে ফেলেছি তার হিসেব নেই। ছেলে-বৌকে তিনি কি দিয়ে পরিচয় করবেন—কোন্ গহনাখানা তাকে মানাবে ভাল, বিনুর পাশে কেমন বৌ হ'লে হরপার্ব্বতী-মিলন হবে, এ-কথা তাঁর রোজকার নাওয়া-খাওয়ার মতই দাঁড়িয়েছিল। সংসারকে এত ভালবেসেছিলেন ব'লেই তিনি থাকলেন না।

অরবিন্দ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ছবি-খানা তুলে রাখ। রোজ একবার ক'রে প্রণাম ক'রো, তুমি সুখী হবে মা।

অরবিন্দ চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন।

ঐ ছবিখানি এক সময় কথা কইত, বৃষ্টির ধারার মত ওর স্নেহ-সেবা-প্রীতি তাঁর উপর অজস্র ধারায় ঝরে পড়ত ক্লান্তিহীন, বিরামহীন। তাঁর সুখদুঃখের সঙ্গে সমান ভাবে নিজেকে মিশিয়ে রেখেছিলেন। অরবিন্দর জীবনে তিনি যে কত বড় অবলম্বন ছিলেন, তা এই ক-বছর ধ'রে অরবিন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছেন।

পুত্রবধূ সেবা করতে ত্রুটি করে না, যত্ন নিতে

অবহেলা করে না, কিন্তু তা যেন কেমন প্রাণহীন—তাঁর পঙ্গু মনকে তো কোনক্রমেই স্পর্শ ক'রতে সমর্থ হয় না। একটা প্রকাণ্ড অভাব যেন তাঁকে সর্ব্বদাই ঘিরে আছে।

অরবিন্দ পুনরায় চোখ চাইলেন—আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ আমিই ওঁকে নিজে হাতে মেরে ফেলেছি। শেষ জীবনটা ওঁর বড় কষ্টে কেটেছে। অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-অনটনের জ্বালায় তাঁর দিকে আমি মোটেই তাকাই নি, তেমনি জব্দ করেছে আমায়। ডঙ্কা মেরে পাড়ি দিয়েছে।

অরবিন্দ পুনরায় চোখ বুজলেন—নিজের জীবনে বহু পয়সা উপার্জ্জন ক'রেও স্ত্রীর শেষ জীবনে রুগ্নাবস্থায় তাঁর উপর কতকটা যেন অত্যাচার করা হয়েছে। উপায়হীনের নিষ্ফল ক্রন্দন তাঁর বুকের মধ্যে গুমরে মরেছে কিন্তু প্রতিকার করতে সমর্থ হয় নি, বরং সেই অহিসার দেহের নীরব সেবা অরবিন্দকে চোখ বুজে গ্রহণ করতে হয়েছে। আজ পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বার-বারই তাঁর বিন্থর মার কথা মনে পড়ছে। এমনি ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনায় তিনিও উপছে পড়তেন। কথায় কথায় হাসির বন্যা বইত। জীবনের চাঞ্চল্যে সদ্যফোটা একটি জীবন্ত ফুলের মত রূপে রসে গন্ধে কোমল—তার পর দিনের পর দিন সংসারের রূঢ় সংঘাতে একটির পর একটি তার পাপড়িগুলি খসে যেতে লাগল। এর জন্য অরবিন্দ নিজেকে কতকটা দায়ী মনে করেন এবং এই মনে ক'রেও তিনি যেন কতকটা আনন্দ পান। তাঁর সাংসারিক জীবন যাপনের অতি তুচ্ছ ত্রুটিগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমালোচনা ক'রে তিনি নিজেকে নিজে আঘাত করেন।

অরবিন্দর মুদিত দুই চক্ষের পাশ দিয়ে দুটি জলের ধারা নেমে এল। পুত্রবধূ সেই সৌম্য করুণ কাতর মুখের প্রতি খানিক চেয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বললে—মার পরমায়ু শেষ হয়েছিল তাই তিনি চলে গিয়েছেন, নইলে আপনি তো তাঁর জন্যে দেহপাত করেছেন বাবা—সে-কথা না জানে কে?

অরবিন্দ চোখ চাইলেন। আজ তিনি অকস্মাৎ যেন শিশুর মত সরল এবং উদার হয়েছেন। কোন দিক্ দিয়ে কোন বন্ধন নেই, বাধা নেই, এক সরল নদীর স্রোতধারার মত নিরুপদ্রবে কথা কয়ে চলেছেন—বিন্থর কাছে শুনেছ বুঝি? বোকা ছেলে···সংসারকে ভালবাসলে আর এ-কথা বলতে পারত না। নইলে কি আমি করেছি—আজীবন যে-সেবা আমি তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি, তার সঙ্গে তুলনা করতে গেলে তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে এক কথায় ফুরিয়ে যায়।

—কিন্তু বাবা—

অরবিন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—না মা না, এর মধ্যে আর 'কিন্তু' নেই। তাঁর কাজের সমালোচনা ক'রে তাঁকে আমার কাছে ছোট ক'রে দিতে পারবে না। তিনি যে কি ছিলেন তা আমি জানি। পার তো তাঁর মত হয়ো—এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমার জানা নেই।

অরবিন্দ পুনরায় চোখ বুজলেন—হায় রে, শুধু শুনে শুনেই ওরা আজ বিচার করতে বসেছে। আজ এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ছেলে-পুলেদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেবার একটা সম্বল রাখতে পেরেছেন, এর গোড়ার ইতিহাস ওরা জানে না, জানতে চায়ও না, সেখানেও ঐ মৃতার কত বড় শুভেচ্ছা রয়েছে তা বুঝবে কি ক'রে, সে-কথা তো অরবিন্দ কোন দিন প্রকাশ করেন নি—তাঁর পৌরুষ তাঁর আত্মসম্মান লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

জীবনের শেষ সঞ্চয়টি পর্য্যন্ত উৎকট কর্ত্তব্যবোধের খামখেয়ালীতে আত্মীয়-পরিজনের জন্য ব্যয় ক'রে দিলেন, তখন তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন নি যে এই আত্মীয়েরাই এর পরে তাঁর দুরবস্থায় মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে সরে পড়বে। হ'লও তাই—দুষ্ট শনি কাঁধে চেপে তাঁকে নিয়ে জুয়াখেলা সুরু করল। অরবিন্দর সুনাম গেল, অর্থ গেল, বন্ধুবান্ধব গেল, শেষ পর্য্যন্ত চাকুরীটিও। অবশিষ্ট রইল দুঃখকষ্টের বোঝা বইতে সহধর্ম্মিণী এবং অপোগণ্ড গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে।

অরবিন্দ চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন, বললেন—নিজের অবিবেচনার জন্য যে দুঃখকষ্টের বন্যা এল তা নিতান্তই আমার ডেকে-আনা, তবুও দেখ মা কত কটু কথা

তাঁকে আমার জন্ত শুনতে হয়েছে—কিন্তু অদ্ভুত ছিল তাঁর ধৈর্য্য যেখানে আমার পর্য্যন্ত মাথা নীচু ক'রে ফিরে আসতে হয়েছে। আমার যেখানে ঘটত ধৈর্য্যচ্যুতি, তিনি সেখানে অটল। আমার ফুটো নৌকো আজও শুধু তাঁরই দৌলতে ভেসে আছে, নইলে কবে যেত তলিয়ে। আমি ডুবতে ডুবতেও ভেসে উঠলাম, কিন্তু আমায় নিঃশেষ ক'রে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাহাদের মধ্যে চলে আয়োজন আমাকে একেবারে ডুবিয়ে মারবার—

অরবিন্দ মুহূর্তের জন্ত থেমে পুনরায় বললেন—আমি দিলাম হাল ছেড়ে। আমার শক্তি নেই, উত্তম নেই, উৎসাহ নেই, সবার উপর নেই অর্থ। বিন্নুর মা শক্ত ক'রে ধরলেন হাল। সেই যে ধরলেন আর জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত অপরের সাহায্য চান নি। নিজের শক্তির উপর তাঁর এমনি অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁরই চেষ্টায় আজকের ক্ষুদকুঁড়ো জোটাবার মত অবলম্বনটুকু, কিন্তু ওরই জন্ত তিনি নিজেকে নিরাভরণা করেছিলেন, অথচ আমার দুর্ব্বুদ্ধির জন্ত এক দিনও অনুযোগ দেন নি, বরং হাসিমুখে বলেছেন—ভগবানের রাজত্বে কেউ উপোস ক'রে মরে না। তাঁর কোন কথাই বিফল হয় নি, কিন্তু নিজেকে কি ব'লে প্রবোধ দি বল তো মা? আজকের জগতের দিকে চোখ তুলে চাইতে গেলেও আমাদের সংস্কারে আঘাত লাগে, কিন্তু তবুও মনে হয় সংসারের জীব ব'লে পরিচয় দিতে গেলে বর্ত্তমানের রীতিনীতি মেনে চলায় আর যা হোক ঘোরতর অন্তায় কিছু হয় না। নিজের স্ত্রীপুত্রকে বঞ্চিত ক'রে আত্মীয়কে পরমাত্মীয় ক'রে তুলতে চেয়েছিলাম, তেমনি সাজা আমি পেয়েছি। কি বলব তোমায় মা, যখন পয়সা ছিল তখন প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজে ডাক পড়ত—আমি না হ'লে কোন কাজই তাদের চলত না, কিন্তু আজ আর আমি কেউ নই। ওরা ভয় পায় পাছে আমার অভাবের সংসার ওদের সুদ্ধ গিলতে আসে। এমন দিনও গেছে যখন পুজোর দিনেও ছেলেপিলেদের একখানি নূতন কাপড় কিনে দিতে পারি নি। অথচ যাদের বহু পূজায় আনন্দের রসদ যোগাতে আমি নিঃশব্দে ব্যয় ক'রে গেছি, তারাই আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে বিলাস-বস্ত্র নিয়ে গেছে। মানুষের নিষ্ঠুরতার একটা সীমা থাকা উচিত, কিন্তু আমার এই তথাকথিত আত্মীয়দের তাও নেই। বরং তারা যেন আমার অক্ষমতাকে ব্যক্ত ক'রে উল্লসিত হয়ে উঠত।

অরবিন্দ পুনরায় চোখ বুজলেন। অতীতের দুঃখ-বেদনার স্মৃতিগুলি আজ বানের জলের প্রবল স্রোতের ন্যায় তার মনের কূলে এসে আছাড় খেয়ে প'ড়ল।

পুত্রবধূ নীরবে ব'সে আছে। এখানে আসার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত শ্বশুরের এত বড় ধৈর্য্যচ্যুতি তার চোখে পড়ে নি। এতে ব্যথাও যেমন ছিল, অরবিন্দের অন্তরের একটি সতেজ প্রেমের ছবিও তেমনি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। কতকগুলি বাজে কথা ব'লে তাঁর এই ধ্যানরত ভাব বিনষ্ট হ'তে সে দিল না বরং অত্যন্ত নিঃশব্দ করুণ চোখে পুত্রবধূ শ্বশুরের বিগতযৌবন ম্লান কাতর মুখখানার প্রতি নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইল।

অরবিন্দ চোখ চাইলেন—বুঝলে মা, তেমনি হয়েছে আমার বিনু। বিষয়বুদ্ধি এক ছটাক নেই। বাপের ষোল আনা দোষ নিয়েই জন্মেছে, তাই তো চেয়ে চেয়ে দেখি আর নিজে নিজেই ভেবে মরি, পাছে আমার মত ওকেও আজীবন হোঁচট্ খেয়ে চলতে হয়। সবার উপর বড় ধর্ম নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা—এ কথাটা আমি মানতাম না, কিন্তু আজ অনেক দুঃখ পেয়ে এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করতে পারছি।

অরবিন্দ একটু থেমে পুনশ্চ বললেন—বিন্নুর মা'র মধ্যে ছিল অন্ধ ভক্তি আর অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু এটা সে-যুগ নয়। দুনিয়ার বিষাক্ত বাতাসে মানুষ মলিন হয়ে উঠেছে। সেই কথাই তো আজ ব'সে ব'সে ভাবি, কি ছিল আর কি হ'ল। তাইতেই মাঝে মাঝে তোমাদের সাবধান ক'রে দিই—জানি তো তোমাদের ভবিষ্যৎ পৃথিবী আজ রঙীন স্বপ্নময়, কিন্তু আমাদের স্বপ্ন দেখার দিন ফুরিয়ে গেছে—অরবিন্দ থামলেন। অকস্মাৎ তিনি যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে প'ড়লেন। মৃদু কণ্ঠে পুনরায় কথা কয়ে উঠলেন, সেই থেকে তুমি ব'সে আছ বুঝি—ক-টা বাজল মা? দশটা! এতক্ষণ ধ'রে বকে গেছি।

অরবিন্দ ব'লে চললেন—বড্ড প্রশ্রয় দিচ্ছ মা, এর পরে তোমাকেই ভুগতে হবে, বুড়োগুলো তারী স্বার্থপর হয় কিনা! কিন্তু বিনু আসছে না কেন? রাত বারটা পর্য্যন্ত কি-ই এমন তার কাজটা শুনি! অরবিন্দ যেন এক মুহূর্ত্তে বদলে গেলেন—হতভাগাটা একেবারে বয়ে গেছে। একটা ছোট-বড় কথা বলবার পর্য্যন্ত জো নেই—আচ্ছা তুমিই বল তো বৌমা, অন্যায় কিছু বলেছি আমি? আর যদি ব'লেই থাকি তা কি আমার জন্যে?…

পুত্রবধূ এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে হেসে প্রকাশ্যে বললে, একটু আগেই দশটা বাজল বাবা—সে আর দাঁড়াল না। অরবিন্দও ফিরে ডাকলেন না। তাঁর এতখানি বয়সে এতবড় বিভ্রম আর ইতিপূর্ব্বে হয় নি, নইলে এতটুকু একটা মেয়েকে কিনা তিনি জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলি অকপটে ব'লে গেলেন—যেমন ছোট শিশু তার মায়ের কাছে অকপট।

বিনয় এল আরও আধ ঘণ্টা পরে। অরবিন্দ জানালার পথে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। বিনয় নতমুখে পিতার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। মৃদুকণ্ঠে বললে—সুশীলকে দোকান থেকে বের ক'রে দিয়ে এলাম বাবা।

অরবিন্দ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের প্রতি চেয়ে রইলেন। একটি কথাও কইলেন না।

বিনয় পুনরায় বললে—তাকে বিশ্বাস করেছিলাম—ছ-মাস হিসাবপত্র দেখি নি। তেমনি আক্কেল দিয়েছে। ছ-মাসে ছ-শ টাকা তহবিল-তছরূপ। ওকে আমি জেলে পাঠিয়ে ছাড়ব।

অরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী যে এত সত্বর ফলবতী হবে, একথা তিনি নিজেও ভাবতে পারেন নি। বার-কয়েক মাথা নেড়ে তিনি বললেন, হ'তেই হবে…এ কি আর বাজে কথা। এতখানি বয়েস হ'ল, আর আমি চিনি নে মানুষ। সব বজ্জাতের ধাড়ি…সব চোরের দল। মানুষকে বিশ্বাস…কখনও না…তুমি কি বলছ মা? ভাত বেড়েছ? বিনু ওঠ্, হাত মুখ ধুয়ে নে—

বিনয় বললে—কিন্তু এত বড় অনিয়ম, এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা—

বাধা দিয়ে অরবিন্দ বললেন—এর নাম অনিয়ম নয় বিনু, এরই নাম সংসারের নিয়ম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ জ্ঞান আপনি হবে। তা ছাড়া সুশীলকে দোষ দিলে কি হবে—যার কারবার সে যদি চোখ বুজে থাকে তা হ'লে অপরাধ শুধু চোরের নয়, যে চুরি করতে সহায়তা করে তারও। তাকে জেলে পাঠাতে চাইছ, আইনের চক্ষে তাকে দোষী প্রতিপন্ন করা শক্ত হবে না, কিন্তু আমি যদি বিচারক হতাম তোমাকেও শাসন করতাম।

অরবিন্দ একটু থেমে, একটু হেসে বললেন—ছ-শ টাকার জন্য তুমি দুঃখিত হচ্ছ বিনু, কিন্তু আমি আনন্দ রাখবার ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছি না। ছ-শ টাকায় যে অভিজ্ঞতা তুমি আজ কিনেছ তার দাম হয় না। বরং তাকে তোমার মার্জ্জনা করা উচিত।

অরবিন্দ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। বিনু নীরবে নত-মুখে ব'সে রইল।

অরবিন্দ পুনশ্চ বললেন—তাই ব'লে একেবারে চুপ ক'রে থাকতেও আমি বলছি নে। সুশীলের নামে কেস্ আমি কালই ফাইল করার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়াও পাপ।

বিনয় বিস্মিত হ'ল।

অরবিন্দ হাঁক দিলেন—আমাদের ঠাঁই ক'রে দাও মা। পরে অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে তিনি বললেন, ওঠ্ বিনু—বর্ত্তমান সমস্যাটা এক প্রকার জোর ক'রেই তিনি বন্ধ ক'রে দিতে চান।

কিন্তু খেতে ব'লেও বিনয় সেই কথারই পুনরুক্তি করল,—আত্মীয়-অনাত্মীয় কাউকেই যদি বিশ্বাস করা না চলে তা হ'লে দাঁড়াই কোথায়?

অরবিন্দ একটু হেসে বললেন—সুশীল অনাত্মীয় ব'লেই এ যাত্রা টিকে গেল। আমার এ-কথাটা সব সময় মনে রেখো বিনু।

বিনয় কোন জবাব দিল না। পিতাকে আজ যেন সে ঠিক ধরতে পারছে না।

যথাসময়ে আদালতে নালিশ রুজু করা হ'ল এবং সমন চেপে গ্রেপ্তারি পরওয়ানার সাহায্যে সুশীলকে হাজতে পাঠিয়ে বিনয় সংবাদটা পিতাকে জানাল।

অরবিন্দ এক মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। বিনয় বললে—খুব কান্নাকাটি করছিল।

অরবিন্দ শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

বিনয় একমুখ হেসে বললে—বলছিল ছেলের অসুখ··· স্ত্রীর অসুখ, আমায় ছেড়ে দিন, তারিখের দিন আমি ঠিক আদালতে হাজির হব।

অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—দিয়েছ নাকি?

তেমনি হাসি মুখেই বিনয় বললে—আমার মাথা খারাপ হয় নি।

অরবিন্দ পুনরায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, ছেলের অসুখ—স্ত্রীর অসুখ। অরবিন্দ চোখ তুলে চাইলেন। সম্মুখে মৃতা স্ত্রীর তৈলচিত্রখানি যেন তেমনি করুণ চোখে চেয়ে আছে। রোগ-যন্ত্রণায় সে চোখ দুটি যেন অব্যক্ত ভাষায় কথা কইছে। ইচ্ছামত চিকিৎসা হ'ল না, প্রয়োজনমত অর্থসংস্থান তাঁর হ'ল না তাই। সে-কথা আজও তিনি ভোলেন নি, তাঁর জীবনে এ একটা স্মরণীয় ঘটনা। কি জানি কেমন অসুখ, হয়তো জীবন-সংশয়। ছেলের অসুখ···স্ত্রীর অসুখ। তার উপর আত্মীয়-পরিজন কেউ নেই। অরবিন্দ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন—আর বিষ্টু কিনা এমনি দিনে তাকে হাজতে পাঠিয়েছে।

অরবিন্দ কথা কয়ে উঠলেন, কত জামিনের হুকুম হয়েছিল বিষ্টু?

বিষ্টু বললে—পাঁচ-শ টাকা—বিষ্টু ধীরে ধীরে প্রস্থান করল। ছেলের অসুখ ··· স্ত্রীর অসুখ ··· অরবিন্দ পুনরায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন—বিষ্টুর শক্ত ব্যারামের খবর পেয়ে ছুটি নিতে এক দিন তাঁর বিলম্ব ঘটেছিল, সেই এক দিনের দুশ্চিন্তা যে তাঁর মনের এবং দেহের উপর কতখানি ছাপ রেখে গিয়েছিল সে-কথা তিনি ভোলেন নি—বিষ্টুটা একেবারে অমানুষ হয়ে গেছে।

অরবিন্দ উত্তেজিত ভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অরবিন্দকে দেখা গেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সহিত নীরবে কি পরামর্শ করতে। সুশীলের তিনি দর্শনপ্রার্থী।

সুশীলের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কথা বলবার মত মনের অবস্থা তখন তার ছিল না। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে সে বেরিয়েছিল, পথের মধ্যে এই বিভ্রাট।

অরবিন্দ শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—টাকাগুলো সবই কি খরচ ক'রে ফেলেছ সুশীল?

সুশীল মৃদু কণ্ঠে বলল—বড় বিপদে পড়েই আমাকে এ কাজ করতে হয়েছে।

—আমি তোমায় সে কথা জিজ্ঞেস করছি না। অরবিন্দ বললেন।

সুশীল বলল—আজ্ঞে হাঁ—আজ দু-মাসের উপর স্ত্রীর অসুখ, তার উপর দু-সপ্তাহ ধরে ছেলেটাও পড়েছে। আমার মাথার ঠিক ছিল না।

সুশীল একটু থেমে পুনরায় বললে—ভেবেছিলাম বেঁচে উঠবার যখন কোন আশাই নেই তখন আর এ অবস্থায় গা থেকে সোনার গহনা ক-খানা নেব না। শেষ হয়ে তো যাবেই, তার পরেই দেনাটা শোধ ক'রে দেব। সুশীলের দু-চোখ বেয়ে পুনরায় জল নেমে এল।

অরবিন্দ তেমনি প্রশান্ত কণ্ঠে পুনরায় বললেন—কথাটা আমায় আগে জানালে তো এ বিভ্রাটে পড়তে হ'ত না। নিজের দুর্ব্বুদ্ধির জন্ম বিপদে পড়বে, তা আর আমি কি করব।

অরবিন্দ থামলেন। সুশীল নীরবে ব'সে রইল।

অরবিন্দ ভাবছিলেন—অর্থাভাবে যখন বিষ্টুর মার চিকিৎসা এক প্রকার বন্ধ ছিল, তখন মান-অপমান শত্রুতা সব ভুলে তিনি তাঁর আত্মীয়দের কাছে গিয়ে হাত পেতেছিলেন—ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর গা থেকে সোনার গহনা খুলে নেবার কথা ভাবতে পারেন নি। সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে হাতের কাছে এমনি মজুত টাকা থাকলে এ-প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যেও জেগে উঠত। লোক-চক্ষে আজ তিনি মনিব হয়েছেন ব'লেই কি সে-কথা ভুলে যেতে হবে!

সুশীল কথা বলে উঠল—আমার দুষ্কৃতির শাস্তি আমি পাব—কিন্তু ওরা যেন বিনা-চিকিৎসায় না-খেয়ে মারা না যায়। এই দয়াটুকু আপনি করুন।

আরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে অরবিন্দ প্রস্থান করলেন। সুশীল জামিনে খালাস পেল।

কথাটা বিনয়ের কানে যেতে বিলম্ব ঘটল না। কতকটা বিরক্ত হয়েই পিতাকে বললে, এই যদি আপনার মনে ছিল তাহ'লে মামলা করবার দরকার ছিল কি? অরবিন্দ হাসিমুখে বললেন, হঠাৎ রাগ ক'রে মানুষের উপর অবিচার করিস নে বিনু। তোর বাপ বুড়ো হ'লেও এখনও পাগল হয় নি। সুশীলের অপরাধ 'হয়েছে মানি, কিন্তু কত বড় বিপদে পড়ে এ কাজ করেছে সে-কথা একবার ভেবে দেখছিস না কেন?

অরবিন্দ একটু থেমে পুনর্ব্বার বললেন—মানুষ হয়ে মানুষের উপর শোধ তুলতে পারাটাই বড় কথা নয় বিনু—তার আজ বড় দুঃসময়। স্ত্রী মরতে বসেছে—ছেলেটারও অবস্থা সুবিধে নয়। তার মাথা খারাপ হবে না তো হবে কার? আর এমনি দিনে তুই কিনা তাকে হাজতে পুরে রেখেছিস। কিছু না মানিস মানুষ হ'য়ে অন্ততঃ মানুষকে স্বীকার করিস্, তোর ভাল হবে বাবা।

বিনু নতমস্তকে নীরবে বসে রইল। আর পাশের ঘরে পুত্রবধূ শ্বশুরের উদ্দেশে নত হয়ে প্রণাম করলে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে মৃত্যু ও জীবনের রূপ

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

শান্তিনিকেতনের তপোবনে তখন ঝরা পাতার যুগ। ক্ষণে ক্ষণে দক্ষিণ থেকে দমকা বাতাস আসে আর ঝর ঝর ক'রে ঝরা পাতায় শালবীথি আকীর্ণ হয়ে যায়। ওদিকে মরণ-মত্ত আমলকী-বনে মহোৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে নব-জীবনের সূচনায়, আম্রকুঞ্জে মধুপের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি অভিনন্দন জানাচ্ছে নবজাগ্রত মধুমঞ্জরীকে।

এখানে নব বসন্তে প্রকৃতির এই যে প্রতিবেশ এর প্রভাব মনের উপর না-পড়েই পারে না। স্তবকে স্তবকে নবকিশলয় সেদিন আমার মনকে করেছিল উদাসী। সামনে যে-বইখানি ছিল খোলা তার পাতার প্রতিটি অক্ষরের অলস পাখায় ভর ক'রে ঘর-বিরাগী মন আমার বেরিয়েছিল আশ্রম-পরিক্রমায় কণ্ঠে নিয়ে সঙ্গীতগুঞ্জন—

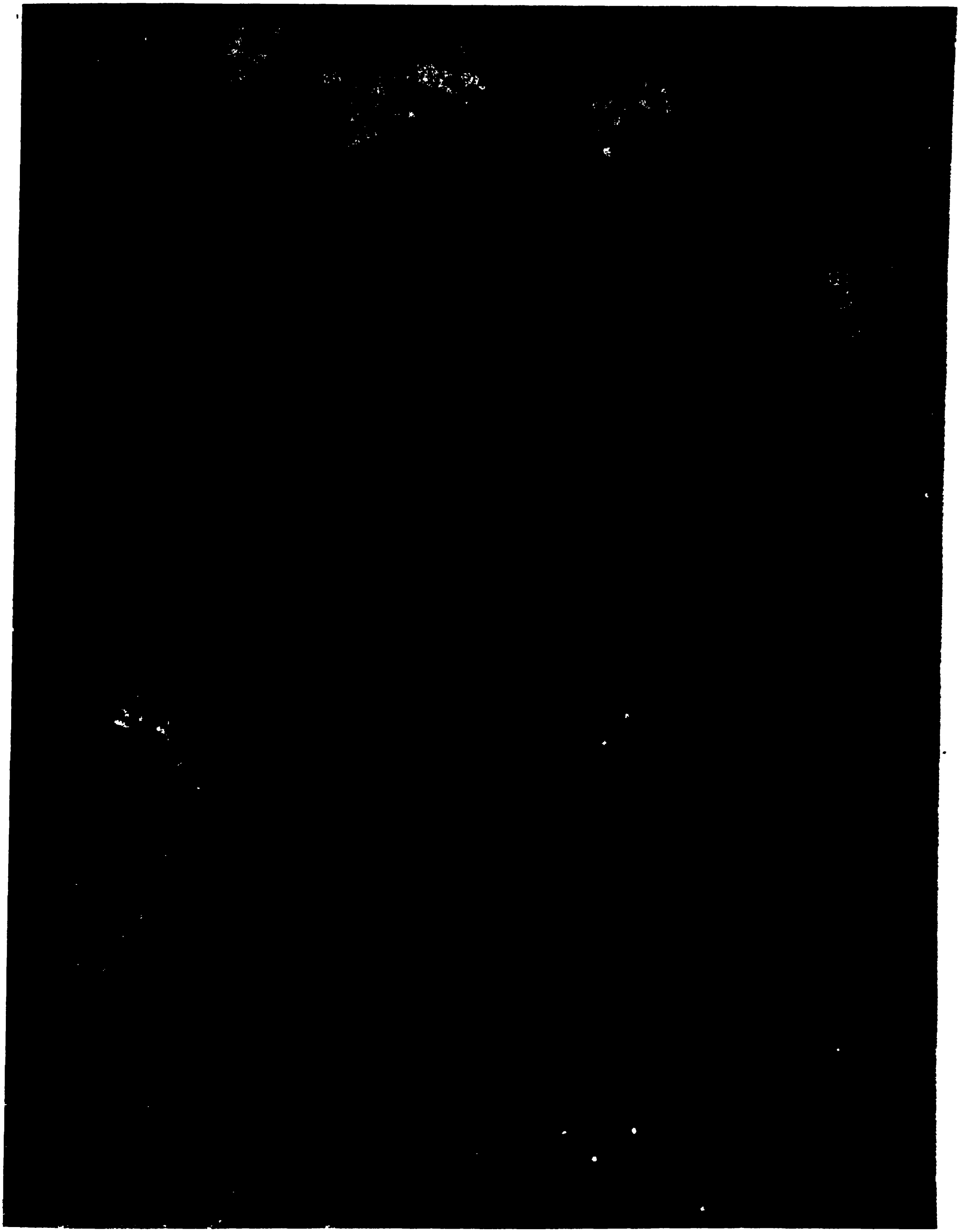
আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নূতন পাতার দ্বারে দ্বারে।

জীর্ণ পাতার কেবল তো ঝ'রে যাওয়াতেই পরিসমাপ্তি নয়—ওরা গৌরবময় সম্ভাবনা জাগিয়ে যায় প্রাণদীপ্ত বনকিশলয়ের। বৎসরে বৎসরে তরুলতা ওদের জীর্ণ পত্র পরিত্যাগ করে নূতনকে গ্রহণ করার জন্য। নূতনকে পুরাতন দেয় পথ ছেড়ে; আর সেই নিরালা পথ বেয়ে রংবেরঙে পুষ্পগুচ্ছের পসরা নিয়ে মলয়-বাহনে বসন্ত আসে ফিরে ফিরে আমাদের বনভূমিতে, ভ'রে দিতে আমাদের শিহরিত কাননবীথি বিকশিত বাসন্তী সুষমায়।

আবার বিশ্বপ্রকৃতির মত প্রাণপ্রকৃতিতেও দেখা যায় এই একই লীলা। জীবনে রূপরসের খেলা শেষ ক'রে অপরাহ্ণে যখন অবসন্নতার ক্লান্তি আসে ঘনিয়ে, চির-নবীনতার ধারা রক্ষার জন্য তখন আমাদেরও বেশ-বদল করতেই হয় মরণের সেই চরম সায়াহ্নে—

সন্ধ্যা হ'ল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।

কিন্তু মলিন বেশ বদল করাই সব নয়—ওর শেষ সার্থকতা নূতন আচ্ছাদন গ্রহণ করায়। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়'—গীতার সেই সর্বপরিচিত সনাতন মতবাদ বা গেটে, টেনিসন, লংফেলো প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষী কবিদের চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার এখানে একটি সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়।



অরণ্য

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আমাদের ক্রমবিবর্তনকারী আত্মা জীর্ণদেহের নির্মোক পরিত্যাগ করতে করতে—অবসন্নতার বোঝা ফেলতে ফেলতে চলেছে নিমেষে নিমেষে অজানা গন্তব্যের চিরযাত্রী হয়ে। কিন্তু জীবনের শেষে জীবনই ফিরে ফিরে আসে কৃষ্ণা রজনীর তিমির-তোরণ পার হয়ে শুক্লা তিথির মত। একই প্রাণের চিরপ্রবাহ যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই যে অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহিত প্রাণধারা, মরণের ভিতর দিয়ে যাকে আমরা বারে বারে ফিরে পাই, রবীন্দ্রনাথ এতে সম্যক বিশ্বাস ক'রেই গীতাঞ্জলিতে গেয়েছেন—

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব,
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।

এই যে ঘট-ভরানো, এ যেন কখনও শেষ হচ্ছে না ; যেই ফুরিয়ে যাচ্ছে অমনি দেখছি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব। আর এই জীবন-কলস ভরে নেবার জন্য আমাদের 'মরণ-আঘাত খেতেই হবে'।

অনন্ত প্রাণ কোন অদৃশ্য প্রচণ্ড শক্তিবশে জন্ম-জন্মান্তরে নবতর ও সুন্দরতরকে অভিব্যক্ত করতে করতে চলে। 'জীবনের তত্ত্বই হচ্ছে মরণের ভিতর দিয়ে নূতনকে কেবাল প্রকাশ করা।' মৃত্যুহীন প্রাণের অমরতা লাভের জন্যই বারে বারে চরমতম দুঃখ মরণকে আলিঙ্গন করার আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃতপক্ষে, এক জীবদেহ থেকে প্রাণের আর এক জীবদেহে গমন ঠিক মৃত্যু বা সমাপ্তি নয়, তা যেন জীর্ণ দুর্গ পরিত্যাগ ক'রে সুদৃঢ় দুর্গান্তরে আশ্রয় গ্রহণ, জড়পুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামর্থ্য-লাভের জন্য। প্রাণের আত্মরক্ষারই এ কৌশলবিশেষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে অমর প্রাণ কর্তৃক উদ্ভাসিত প্রাণরক্ষার উপায় মাত্র।

আত্মরক্ষার জন্য প্রাণের এই গমন অজ্ঞাত কাল থেকে আরম্ভ হয়ে বিরামহীন গতিবেগে বিচিত্র মূর্তিতে বিভিন্ন বিশ্বে অশান্ত ভাবে চলছে। আমাদের ব্যক্তিগত খণ্ড প্রাণ পূর্ণ প্রাণের অর্ঘ্য নিয়ে অসংখ্য 'valley of the shadow of death' অতিক্রম ক'রে ক'রে কোন অবস্থায় পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হয়ে অন্য কোনখানে কেবলই চলেছে পরাণবধূর চরণতলে আত্মনিবেদনের উদ্দেশ্যে—

নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

আবার মরণকে অবলম্বন ক'রেই জীবন অগ্রসর হয় তার যাত্রাপথে। জীবন-তরণীর খেয়া-মাঝি হচ্ছে মরণ। মৃত্যুই আমাদের পৌছে দেয় 'সিন্ধুপারে'। আমাদের জীবন-দেবতার সোনার দেউলে অবশেষে আমরা যে উত্তীর্ণ হই সে মরণ আমাদের জীবন-তরী বেয়ে নিয়ে যায় বলেই—

মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি প্রধান সুর হচ্ছে গতির সুর। বহু স্থানে তিনি বলেছেন—জীবনের গতিধারায় বাধা পড়লেই আসে আমাদের সত্যিকারের মৃত্যু।

The moment you stop the movement,
That moment you begin to play the drama
of Death.
—Cycle of Spring.

বলাকায় শুনেছি—

সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।

কিন্তু যদি ক্লান্তিভরে হঠাৎ মুহূর্তের জন্য থেমে যায় চলচঞ্চলা, কলমুখরা এই প্রাণ-প্রবাহিনীর গতিস্বরূপ তা হ'লে মৃত জড়পুঞ্জের সমাবেশে অবিলম্বে আকীর্ণ হয়ে যাবে পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বজগৎ। প্রাণের এই গতিকেই, এই পরিবর্তনকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জীবন, এবং গতিহীনতা বা পরিবর্তনহীনতাকেই বলেন মৃত্যু। জীবনের এই যে গতি একে কেউই এবং কিছুতেই রুদ্ধ করতে পারে না। আকাশের প্রত্যেকটি নক্ষত্র একে হাতছানিতে ডাকে, মৃত্যুর দ্বার পার হয়ে লোকে-লোকান্তরে নব নব উদয়নে আলোকতীর্থে এর চির নিমন্ত্রণ। এই বেগবতী ও নৃত্যলীলা, কান্নাহীনা অথচ আবর্তসঙ্কুলা, অনন্ত প্রাণ-প্রবাহিণীর

প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে

হ'ল বিরাট বিশ্বসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক অনুভূতি। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের নটরাজ-মূর্ত্তির পরিকল্পনা আমাদের মনে পড়ে। পৌরাণিক শিবের অবাক-জাগানো, আশ্চর্য-সুন্দর নটরাজ-মূর্ত্তির কল্পনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করেছেন কি না আমার জানা নেই। তিনি এমন এক বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তিকে নটরাজ কল্পনা করেছেন যাঁর নাচের তালে তালে বিশ্বে অহোরাত্র সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটছে এবং নৃত্যের ছন্দে ছন্দে জড়জগতের প্রত্যেক ইলেক্ট্রন ও প্রোটন ভীষণ বেগে অবিরাম স্পন্দিত ও আবর্ত্তিত হচ্ছে। কবি নটরাজকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন—

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।

আবার সুন্দরবেগে সেই বিদ্রোহী ইলেক্ট্রন, এটম্ জমাট বেঁধে ছায়াপথে অসংখ্য 'solitary travellers' গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসূর্য তৈরি হয়েছে নটরাজেরই পদযুগলকে কেন্দ্র ক'রে—

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।

আবার নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যের পদবিক্ষেপের ঘূর্ণিতালে জগতে জগতে ক্রমবিবর্তন ঘটছে কম্পিত, পিঙ্গল জটা-জালের নিবিড় রহস্যচ্ছায়ায়—

মোর সংসারে তাণ্ডব তব, কম্পিত জটাজালে,
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।

জন্ম ও মৃত্যু নটরাজের ডমরুর ছন্দ, সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সে কেবল তাল দেওয়া মাত্র। অমর ছন্দে কবি বলছেন—

জীবন-মরণ নাচের ডমরু বাজাও জলদ-মন্দ্র হে।

কিন্তু নটরাজ কেবল নৃত্য ক'রেই ক্ষান্ত নন—নৃত্যেই সমস্তের পরিসমাপ্তি নয়। তাঁর নৃত্যপর পদযুগের স্পর্শে জগতের সমস্ত মলিনতা, সমস্ত পাপ, জীর্ণতা মরণকে অতিক্রম ক'রে পলে পলে পবিত্রতর ও প্রাণবন্ত হচ্ছে। কিন্তু আমরা যে নৃত্য-মন্দাকিনী-স্নাত বিশ্বজীবনকে কেবল নিত্য নিত্য শুচিতর রূপেই পাচ্ছি তা নয়, প্রাণপূর্ণ সৃষ্টির বিচিত্র ঋতু-পর্যায়ের প্রকাশে জগতে অশুচি মরণের আদৌ স্থানই হচ্ছে না—

চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে
চরণ-ঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

মৃত্যু ও জন্ম যেন সন্ধ্যা ও প্রভাত, মধ্যে গম্ভীর অন্ধকার রহস্যের ব্যবধান। কত বড় বড় মনীষীর বড় বড় জটলা এই রহস্যকে ঘিরে ঘিরে। এই গূঢ় রহস্যকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথেরও মনোভৃঙ্গ বারে বারে গুঞ্জরণ করেছে। কত বার দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ছায়া নিয়ে গেছে মুগ্ধ কবির স্তব্ধ প্রাণকে দূরদিগন্তের ইঙ্গিত-লীন উধাও কল্পলোকে।

প্রকৃতি-প্রিয় কবি দিনান্তকে কখনও ভয় করেন না। তিনি হৃদয়-গগন রাঙিয়ে নিতে চান সন্ধ্যার রাঙা রঙে। আবার যে-সুন্দরের প্রতিবিম্বে আলো-আঁধারির অপ্রশস্ত উপকূল ওঠে ঝলমলিয়ে কবি চান সেই অপরূপের মাধুরী-সুধা-স্রোতে ভরিয়ে নিতে তাঁর জীবন-শেষের গানের কলস।

বস্তুতঃ, যে সকল আলোর যাত্রী আমাদের আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায় তাদের জীবনধারা মরুপথে বৃথা নিঃশেষিত হয়ে যায় না, তারা তলিয়ে যায় না সূচীভেদ্য অন্ধকারের বিরাট শূন্য গহ্বরে,—তারা উত্তীর্ণ হয় অন্ধকারের দুয়ার পেরিয়ে আনন্দ-ভরা আরো-আলোর দেশে।

ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চ'লে আলোকে।

অন্য একটি গানের কয়েকটি কুসুম-পেলব পদে মৃত্যু-নিশীথের স্বপ্নরাজি সফলিত হয়ে নব-জাগরণ-ক্ষণেও আনন্দরূপিণী বিরহিণী জীবন-বধূর সঙ্গে পুনর্মিলনের আশায় কবি গেয়েছেন—

বিরহিণী যে ছিল রে মোর হৃদয়ের মর্মমাঝে
বধূবেশে সেই যেন সাজে
নব দিনে চন্দনে কুঙ্কুমে।

মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, মৃত্যুর মধ্যে পরম প্রাণেরই ইঙ্গিত, যেমন অন্ধকার আভাস দেয় অনন্ত কোটি

ব্রহ্মাণ্ডের। 'অন্ধকারের মধ্যে নিখিল বিশ্বের ব্যঞ্জনা, যেমন মৃত্যুর মধ্যেও পরম প্রাণের ব্যঞ্জনা তেমনি।' দিবসের খণ্ড আলো উদ্ঘাটিত করতে অক্ষম অন্ধকারের মণিমঞ্জুষা। সন্ধ্যা আসে গোপন পদসঞ্চারে, হাতে নিয়ে অপরূপ যাদুদণ্ড, উন্মুক্ত ক'রে দিতে সে-রাজ-ভাণ্ডারের অতুল ঐশ্বর্য। জীবনের খণ্ড আলো আমাদের কাছে আবৃত ক'রে রাখে জীবন-শেষের অসীম বিস্ময়। ধীর পদক্ষেপে সন্ধ্যা আসে দূতী হয়ে সেই অনামী 'মানিনী প্রিয়ার' যাকে বারে বারে উপেক্ষা করেছি দৈনন্দিন কর্মের তুচ্ছতায়, অথচ যে প্রতীক্ষা ক'রে আছে 'মরণ-ঘোমটা' টেনে, আমারই সঙ্গে নিবিড়তম মহা-মিলনের জন্য। মৃত্যু আসে, যে সমগ্ররূপা প্রেয়সীকে তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে দেখা হয় নি তাকে দেখবার ভার নিয়ে। বস্তুতঃ, জীবনে ও মরণে, সীমায় ও অসীমে একত্র ক'রে দেখাই হচ্ছে সমগ্র দেখা। প্রসঙ্গক্রমে এবং ভাবের সামঞ্জস্যে হুইটম্যানের দুটি লাইন আমাদের মনে পড়ছে যেখানে তিনি বলেছেন—

> O I see now that life cannot exhibit all
> to me, as the day cannot,
> I see that I am to wait for what will be
> exhibited by death.

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই মৃত্যুকে প্রিয় সম্বোধন করতে শিখেছেন। হ'তে পারে এ দৃষ্টিভঙ্গী হয়ত উপনিষদের প্রভাব কিন্তু বিজ্ঞানপ্রিয় কবির মৃত্যুকে ভয় না-করাই স্বাভাবিক। জীবনের ক্রমাভিব্যক্ত স্তরকে কেউ কখনও ভয় করে না। শুকনো ফুলের বুক থেকে নবীন ফলের আবির্ভাব বৃক্ষজীবনের ভয়ের বা অনুশোচনার নয়। ফল থেকে বীজ এবং অব্যক্ত বীজ থেকে আবার বৃক্ষেরই প্রত্যাবর্তন 'অঙ্কুরের পাখায়' ভর ক'রে, ভূমিগর্ভের অন্ধ সমাধি-শয়ন সমাপনান্তে। এই ভাবেই চলেছে জীবন-ধারা। কাজেই আমরাও জীবন-পুষ্পের পরিণত মরণ-ফলে অমরতার অমৃতরস আস্বাদ ক'রে যুগে যুগে এবং জন্মে জন্মে ধন্য হব।

মৃত্যু হচ্ছে আমাদের পান্থশালা যেখানে দিনের তাপে মুষড়ে-পড়া মুসাফির তার দিনান্তের বিশ্রাম-শয্যাখানি পাতে সুপ্তির আশায় নবশক্তিসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে নব প্রভাতে নব যাত্রাপথে বাহির হবার জন্যে। আমাদের যাত্রাপথে সন্ধ্যা নামে সত্য,—প্রভাত আসে এও সত্য। এখন পথে পান্থশালার রহস্য একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক। মরমী রবীন্দ্রনাথ মানবাত্মার প্রতীক সাজাহানকে উদ্দেশ ক'রে বলেছেন—

> আজি তার রথ
> চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
> নক্ষত্রের গানে
> প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।

মনে হয়, 'রাত্রির আহ্বান' ও 'নক্ষত্রের গান' ব্যবহার ক'রে কবি কোন অজ্ঞাত রহস্য ইঙ্গিত করতে চান। যাহা বোঝা যায় না আভাসে ইঙ্গিতে তাই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সন্ধ্যা থেকে প্রভাতের, মৃত্যু থেকে জন্মের এই যে তিমিরাচ্ছন্ন ব্যবধান সত্যিই এই রহস্যপুরীর দ্বার আজও উন্মোচিত হয় নি। অথচ জীবনকে এই পথই অতিক্রম করতেই হয়। কাজেই মানবাত্মার প্রতীক রথারোহী সাজাহানের সমুদ্র-পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম ক'রে রাত্রির আহ্বানে নক্ষত্রের সঙ্গীতসভায় উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'রাত্রির আহ্বান,' 'নক্ষত্রের গান', 'তারার ডাক'—এর এত প্রাচুর্য অথচ এ-সম্বন্ধে আমাদের কারও কোন ব্যক্তিগত অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে কি না আমার জানা নেই। শোনা যায়, সক্রেটিস নাকি music of the sphere শুনেছিলেন, আর শুনে-ছিলেন আমাদের দেশের উপনিষদের দ্রষ্টা ঋষি-কবিরা যাকে তাঁরা নামকরণ করেছেন 'অনাহত নাদ', 'ক্রন্দসী', 'রোদসী' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের গভীর উপলব্ধিতেও ধরা পড়েছে এই বিশ্বের একটি রহস্যময় ও অনির্বচনীয় প্রকাশের আকুতি, আপন রসস্বরূপ প্রিয়তমার বিরহে এই বিরহী বিশ্বের বুকফাটা ক্রন্দন, সারা বিশ্বের এক-টানা 'আকুল আর্তনাদ', পরমসুন্দরের মধ্যে না-পাওয়ার বেদনা, জীবনে সহসা পূর্ণপাত্র পরিত্যাগ ক'রে যাওয়ার ট্রাজেডি, তাই তিনি প্রকাশ করলেন 'রসো বৈ সঃ'—এর পূর্ণ প্রতীক উর্বশীর জন্য 'দিশে দিশে কাঁদিছে ক্রন্দসী'। ধ'রে নেওয়া যেতে পারে,

মৃত্যুর পর নবতর জন্মের অভিযানে যে নিবিড় রহস্যের ভিতর দিয়ে মনোভবে জীবাত্মাকে অতিক্রম করতে হয় সেই রহস্যকে নির্দেশ করতেই 'রাত্রির আহ্বান' বা 'নক্ষত্রের গান' সাজাহান কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু রাত্রির আহ্বানে নক্ষত্রের সঙ্গীত-সভায় যাওয়াই শেষ কথা নয়। ওখানে আমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে বিশ্রামান্তে প্রভাতের সিংহদ্বার দিয়ে নবজন্মের যাত্রাপথে আবার বাহির হ'তে হবে। ক্লান্ত শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া বিশ্রামান্তে নব উৎসাহে পুনরায় যাত্রা আরম্ভের জন্যই।

কবি অবশ্য বারে বারে মৃত্যু ও জন্মের ব্যবধান-রহস্যকে ইঙ্গিত করেন কিন্তু সে-সম্বন্ধে শেষ কথা কিছু বলেন না। বলার নেইও বিশেষ কিছু, কারণ তিনি জীবন ও মৃত্যুকে কখনও পৃথক ক'রে দেখেন না। প্রকৃতপক্ষে, জীবন ও মৃত্যুকে আমরা ঠিক ঠিক দেখতে পারি নে ব'লেই উভয়ের মধ্যে ছায়াময় ব্যবধান বরাবরই থেকে যায় এবং তা আমাদেরই ভ্রান্তি বা অবিদ্যা হেতু। আমরা আমাদের জীবনকে খণ্ডভাবে দেখছি বলেই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কাল্পনিক ব্যবধান আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপ্‌সা ক'রে রেখেছে। আমাদের একাংশ-আলোকিত ব্যক্তিগত জীবনকে একান্ত ক'রে দেখি ব'লেই যত গোল বাধে। আমরা মরণকে ভাবি জীবনের শত্রু। আমাদের খণ্ডজীবন যেন আলোকিত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। আর তার বাহিরে আলোকিত বিপুল বিশ্ব। হঠাৎ মনে হয় এই দুই যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ নেই, এ ওর বিরোধী। কিন্তু যে অসীম সত্যে ঘর ও বাহির বিধৃত আমাদের আশু প্রয়োজনের দৃষ্টিতে সে-সত্য আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়; এবং উপস্থিত প্রয়োজন আমাদের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠকেই একান্ত ক'রে দেখে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা যাকে বলি জীবন সেও সেই আলোকিত ছোটো ঘরের মতো, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের চৈতনা বিশেষভাবে সংহত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের লীলাস্থল। তার বাহিরে যে অসীম সত্য আছে তাকে আমরা জীবনক্ষেত্রের বিরুদ্ধ ব'লে ভুল করি। কিন্তু আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের যেমন নিরবচ্ছিন্ন যোগ, যেমন এই ঘর ও বাহির একই সত্যে বিধৃত, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সত্যকার ব্যবধান নেই, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই—আমরা আমাদের বোধশক্তির ক্ষণিক বিশেষত্ব বশতঃ অংশমাত্রকে একান্ত ক'রে জানছি ব'লেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখতে পাচ্ছি।' অন্যত্র বলেছেন—

'Life on its negative side, has to maintain separateness from all else, while, on its positive side, it maintains unity with the universe'.

সমগ্রজীবনের মধ্যে যখন negative sideকে বড় ক'রে দেখি তখনই মৃত্যু আমাদের ভয় দেখায় এবং জীবনের positive sideকে প্রাধান্য দিলে খণ্ডপ্রাণের তথাকথিত মৃত্যু বা পরিবর্তন আমাদের গভীর ভাবে নাড়া দিতে পারে না। মৃত্যুর কোন বাস্তব চরম সত্তা নেই; সেই জন্যই মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে জীবন অবাধ আনন্দে পথের কুড়িয়ে-পাওয়া ধন সযত্নে সঞ্চয় করতে থাকে। আবার পাছে এই সযত্নসঞ্চিত ধন তার হয়ে উঠে তাই আলোর পথের পথিককে ভারমুক্ত করবার কাজে নিযুক্ত হয়েছে এই মরণ।

আমাদের যাহা চেতনাপ্রবাহ, টেনিসনের 'walking spirit' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই 'অখণ্ড সত্যকে জীবন ও মৃত্যু কখনই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব।' পথের রমণীয় মায়ায় পড়ে মৃত্যুর ক্ষণিক বিচ্ছেদভয়ে আমরা বিহ্বল হয়ে ভাবি, আমরা বুঝি সবই হারালাম, কিন্তু এটা ভুলি সসীম জীবনে আমরা যাকে নিবিড়ভাবে পেয়েছিলাম মৃত্যুর অমা-অন্ধকারেও আবার তারই উদ্দেশ আমরা পাব যিনি শেষ হয়েও কখনও শেষ হন না—

শেষের দীপালী রাত্রে, হে অশেষ
অমা-অন্ধকার-রন্ধ্রে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ।

মর্ত্য-মানুষের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অমর দেবত্বের দাবিতে পরম বিশ্বাসে কবি প্রশ্ন করছেন—

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা,
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

শঙ্কাহীন, মরমী রবীন্দ্রনাথ জীবনে দুঃখ-দিনের ঝড়-বাদলে এবং মৃত্যুর তথাকথিত সমাপ্তিতে ছদ্মবেশী অসীমরূপী মনের মানুষকে উপলব্ধি করেছেন। তাই দেহের আঁধার রাত্রি ভোর হ'লে মৃত্যু-বন্ধুর কণ্ঠাশ্লিষ্ট হয়ে অদৃষ্টকে পরিহাস করতে করতে চন্দ্রসূর্যের বাতি-জ্বলা এই ধরণী থেকে তিনি বিদায় নিয়ে যেতে চান কোন্ অসীম আশার দেশে, কোন্ অজানা প্রিয়মুখের উদ্দেশে, কে জানে।

আমরা মাতৃক্রোড়ে ভ্রান্ত শিশুর মত স্তনান্তর-প্রাপ্তির পূর্বে মুহূর্তের বিচ্ছেদে হতাশ হয়ে কেবল ক্রন্দন করি। স্তনান্তরপ্রাপ্তির আশ্বাস তখন আমাদের মনে পড়ে না তাই কান্না বেরোয় বুক ফেটে। অটল বিশ্বাসে বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করার ধৈর্য তখন আমাদের থাকে না। জীবনান্তর প্রাপ্তির আশ্বাস-বিস্মরণই আমাদের মৃত্যুভীতির কারণ। কিন্তু যেমন শিশুরা অচিরে আশ্বস্ত হয় স্তনান্তরপ্রাপ্তিতে তেমনি আমরাও আশ্বস্ত হই রাত্রিপ্রভাতে নবজীবনের জবা-রাঙা আলোকতীর্থে উপনীত হয়ে। এই ভাবেই তো চলেছে আলোছায়ার পথে চির আনাগোনা।

প্রকাশ ও গতিভেদে আমাদের আত্মা হচ্ছে যুগ-ধর্মী। এর প্রকাশধর্মে সসীমতা আর গতিধর্মে অসীমতা। আত্মার সসীম প্রকাশ ও অসীম গতি হচ্ছে চলন্ত নদী-ধারার মত। এ যেন শিবের জটার শাশ্বত উৎস থেকে প্রবাহিত মন্দাকিনীর ধারা যার চরম গন্তব্য হচ্ছে নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ মহাসমুদ্র। পথে হঠাৎ থেমে-যাওয়া নদীর স্বভাব নয়। প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলতে চলতে তিলে তিলে বিকাশের আত্মদানে কূলে কূলে নিজেকে পাওয়াই এর ধর্ম। এইরূপে অসীম-স্বারূপ্য লাভ করতে আমাদের ব্যক্তিগত খণ্ডপ্রাণকেও প্রকাশের 'সোনার তরী' বেয়ে বেয়ে জীবন-ঘাটের হাটে হাটে 'সোনার ধানের' বেসাতি করে কেবলই এগিয়ে যেতে হয় 'মরণ-রূপী জীবন-স্রোতে'। নিজেকে ত্যাগ ক'রে পাওয়াই হচ্ছে সত্যিকারের পাওয়া। তাই মরণকে বরণ ক'রে,—নিজেকে মরণের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমাদের অসীম স্বরূপকে বিশুদ্ধ ক'রে পাই। কিন্তু যখন নিজেকে দান করতে, মরণকে বরণ করতে অস্বীকার করি, যখন পরিবর্তনহীনতার জড়ত্ব থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষাও আমাদের না থাকে, তখন আসে উপরওয়ালার আদেশ মরণকে গ্রহণ করার, বিনাশের জন্য নয়, অসীম জীবনে নূতন করে বাঁচবার জন্য। এ হ'ল প্রভাত-আলোর দীপশিখার পরিনির্বাণ, শাশ্বত সূর্যের সম্যক্ ধ্বংস নয়,

'It is the extinction of the lamp in the morning light ; not the abolition of the sun.'

কিন্তু আমাদের ভ্রান্তিবশতঃ খণ্ড জীবন ও অনন্ত জীবনের মধ্যে মৃত্যুর যে কাল্পনিক ব্যবধান রচনা করি আমরা, প্রকৃতপক্ষে, সেই বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই আমাদের খণ্ড জীবন অসীম জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই পূর্ণতার জন্যেই খণ্ডের প্রয়োজন। কিন্তু খণ্ডতাকে প্রাধান্য দিলে অপূর্ণতাই আমাদের বিনাশ করবে। সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হবে। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'—মৃত্যু থেকে সে মৃত্যুকেই পায় যে ইহাকে নানা ভাবে দেখে। যত কুশ্রীতা, যত কামনার পঙ্কিলতা, যত বিরোধ, যত মৃত্যু সে এই 'নানেব পশ্যতি'র মধ্যে। কিন্তু এই খণ্ডতাকে উত্তীর্ণ হ'তে হবে। বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে গিয়েই খণ্ড জীবনকে আপনার পূর্ণস্বরূপ লাভ করা চাই। বস্তুতঃ, এই বিচ্ছেদ তো প্রকৃতপক্ষে ছেদ নয়; ছেদ মনে করাই আমাদের ভ্রান্তি। পূর্ণতাকে জীবনে উপলব্ধি করলে মুহূর্তে ভ্রান্তি অপসারিত হয়ে জীবন ও মৃত্যুর আকাশ-ব্যবধানের মধ্যে পূর্ণ আনন্দের বাঁশি শোনা যায়। এই পূর্ণস্বরূপ জীবন ও মৃত্যুর সীমার অতীত। জীবন ও মৃত্যুধারা এ বাধাগ্রস্ত হয় না। প্রেমিক কবি গেয়েছেন—

> জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
> বন্ধু হে আমার রয়েছো দাঁড়ায়ে।

এই যে সীমাতীত বঁধু এঁকে পাওয়াই হচ্ছে মানব-জীবনের চরমতম লক্ষ্য। এঁকে আশ্রয় করতে পারলেই জন্মমরণ সবই অতিক্রম করা যায়। প্রাণী মাত্রেরই ইনি পরম গতি, পরম সম্পদ, পরম লোক এবং পরম আনন্দ।

এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পদ্,
এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

রবীন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর সমগ্রতার দৃষ্টি (synthetic view)। উনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ পদার্থ-বিশেষকেও কখনো খণ্ডভাবে দেখেন না, তাকে দেখেন অনন্ত দেশকালের পটে লিখা সসীম দেশ ও কালের অতীতে; তাঁর সসীমের অসীমে এবং অসীমের সসীমে নিত্য যাওয়া-আসা। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এই ধরণীর যমুনা-পুলিনে সসীম ও অসীমের নিত্য যুগলমিলন। কবীরের ভাষায় তিনি বলেন—'The formless is in the midst of all forms.' 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।' তাঁর চালানে-ওয়ালা বিশ্বে ব্যাপ্ত আবার বিশ্বকে ছাড়িয়েও। তাঁর দর্শন ও-দেশের theistদের পা ঘেঁষে চলে—এদেশের বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীদের মত। তিনি হচ্ছেন পূজারী সেই 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ', 'বিশ্বতোমুখঃ', এবং 'বিশ্বতোবাহুঃ' অর্থাৎ সমগ্রসত্ত দেবাদিদেবের, 'যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ'—অমৃত যাঁর ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁর ছায়া। কাজেই এইরূপ সমগ্র-দৃষ্টি নিয়ে জগতের নগণ্য ধূলিকণাটি থেকে আকাশের অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা পর্য্যন্ত একই মৃত্যুহীন সত্তার মধ্যে বিধৃত এবং সমগ্র সৃষ্টি একই ঐক্যচ্ছন্দে ছন্দিত এ উপলব্ধি করা দরদী ও মরমী কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, যদি সমগ্র বিশ্ব একই মৃত্যু-হীন প্রাণময় সত্তা থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে তা হ'লে প্রকৃতপক্ষে মরণ হয় কার এবং মরণে ক্ষতিই বা হয় কিসের। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেন, 'জগতে মৃত্যুর ক্ষতি একমাত্র আমি-পদার্থের ক্ষতি। আমার সম্পত্তি, আমার উপকরণ দিয়ে আমার সংসারকে আমি নিরেট ক'রে তুলছিলেম, মৃত্যু হঠাৎ এসে এই আমি-জগৎটাকে ফাঁকা ক'রে দেয়।' এই যে আমাদের সম্পত্তি ও উপকরণ যা হারাবার ভয়ে মৃত্যুচিন্তায় আমরা অবসন্ন হয়ে পড়ি, যাদের ঘিরে ছোট-আমির জীবনের প্রতি এত তীব্র আকর্ষণ, এত মায়া, এত মমতা—হঠাৎ কোথা থেকে মরণ এসে আমাদের সেই সম্পত্তি ও উপকরণ থেকে মুক্তি দিয়ে সংসারের প্রতি ছোট-আমির অনাবশ্যক আসক্তির বন্ধন আল্‌গা ক'রে দেয়। উপকরণ ও রিপুজালে বেষ্টিত যে ছোট-আমি দিয়ে আমি আমার মহাপ্রাণের আকাশ-আসনকে ভরিয়ে রেখেছিলুম মৃত্যু এসে তাকে তার সেই অনধিকার দাবি থেকে নিরস্ত করে। ছোট-আমি নিজেকে নিয়ে পর্য্যাপ্ত হ'লেই আসে অশান্তি, আসে দুঃখ, আসে সত্যিকারের মৃত্যু। কাজেই ছোট-আমির স্থানকে যদি পূরণ করা যায় বড়-আমি দিয়ে, তাহ'লে মৃত্যুর ক্ষতি আমাদের আর সইতে হয় না। তখন বরবেশে শিবের আগমন-প্রতীক্ষায় গৌরীর আঁখি সুখে ছল ছল করতে থাকে—তিনি জানেন, প্রলয়রূপী পিণাকীর শিবস্বরূপের সঙ্গে আনন্দময় প্রেমের সম্বন্ধেই তাঁর সার্থকতা। অখণ্ড আলোর প্রেমিকের অন্তর-গৌরী বুঝতে পারেন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে গিয়ে তাঁর ধ্বংস বা সমাপ্তি নয়—পরম সত্যের সঙ্গে কল্যাণময় প্রেমের মিলনে তাঁর চরম সার্থকতা।

উপনিষদের বাণীঘন-মূর্ত্তি, শান্ত ও সমাহিত রবীন্দ্রনাথ জীবনে প্রেমের মিলনকে কামনা করেন সে কেবল 'আত্মনস্তু কামায়'। তিনি নরনারীর কাঁচা-আমির সাধারণ স্তরের প্রেমকে দেখেছেন জীবনের চল্‌তি-পথের পাথের হিসাবে। তাঁর কাছে প্রেম হয়েছে প্রাণের চলমান স্বরূপের by-product, পথিক-প্রাণ যেখানে ক্ষণিকের বাসা বাঁধে সেখানে হঠাৎ উড়ে পড়ে বীজ 'জীবনের মাল্য হতে খসা'। প্রখর দিবালোকে 'চলিতে' ও 'চালাতে' না-জানা যে-প্রেম পথের মধ্যে পাতে তার মহিমময় সিংহাসন, দিনশেষে সে-সিংহাসন হয় পথেরই ধূলায় পরিত্যক্ত, চিরযাত্রী প্রাণ চলতে থাকে আপন গন্তব্যপথে।

ধরে নেওয়া যাক কবি তাঁর প্রিয়াকে উদ্দেশ ক'রে লিখেছেন, 'তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধুকূলে'। এখানে দেখা যাচ্ছে, সোনার বিন্দু উদিত হয়েছে প্রাণ-সমুদ্রের উদার সৈকতে। অবশ্য সারাদিন আলোকিত উপকূলকে ঝলমলিয়ে দেবে ঐ টুকরো মাত্র সোনার বিন্দু; কিন্তু যখন বিধুলয়ে নামবে নীলাম্বরা প্রেয়সী সন্ধ্যা হাতে নিয়ে অনির্বাণ দীপশিখা, শঙ্খকণ্ঠীর জলদ মন্দ্র তেসে

আসবে মরণ-পারাবারের পরপার থেকে মহাকাল-মন্দিরের পূজারতির, মিশিয়ে যেতে নিবিড় আঁধারের গোপন গহ্বরে, তখন ঐ ঝলমলানির শেষ স্মৃতিটুকু পর্য্যন্তও হয়ে যাবে লক্ষ অতীত বৎসরের পুরাতন। এই তো পরিপূর্ণ ভূমার আশায় অপরিপূর্ণ অল্পের পিছন-না-চাওয়া, মরণ-না-থামানো গতি। নিরাসক্ত ঋষি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ পথের শেষে মহাপ্রাণের অমৃতরাজ্যে, পথের প্রেমের মরুদ্যানে নয়।

অমৃতের পুত্র মানুষ পারে। ছোট-আমির মৃত্যুকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে, অবহেলা করতে। নির্ভীক মানব-কবি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন—

মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি', তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্ব্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

অচিন বঁধুর বাঁশির ডাকে শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা ক'রে চির-জাগ্রত অভিসারিকা যুগে যুগে জন্মে জন্মে অভিসারে চলেছে, অনামী কালের দুর্গম বীথিপথ বেয়ে, গৃহসুখ-আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, তার প্রিয়তমের মিলনাকাঙ্ক্ষায়। যে-আকাঙ্ক্ষায় সে পথের দুঃখ তৃণবৎ-ও গণ্য করে নি, যে-আকাঙ্ক্ষায় সে মেঘের গুরুগর্জনকে উপভোগ করেছে বীণা-ঝঙ্কারের মত, সে শুধু তারই নিবিড় কামনা যাকে তার প্রাণ ভালবাসে। সে বলেছে—

তুয়া দরশন আসে কছু নাহি জানলুঁ
চিরদুখ অব দূরে গেল।

মানুষও জয়ী হয়েছে। ক্ষতি, অপমান মৃত্যুকে বরণ ক'রে সে কৃতার্থ হয়েছে। কিন্তু মানুষ সমস্ত দুঃখ-বিপদ সহ্য ক'রে ছোটো-আমির সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে হেলা ভরে দলে যায় কেন? কেন না সে বিশ্বাস করে সংসারে তার ছোট আমি যা নিয়ে তৃপ্ত হ'তে চায় তার চেয়ে অধিক মূল্যবান এবং মহত্তর অজানা ধন যে-রাজ্যে বর্ত্তমান সেখানে যেতে হ'লে তার তুচ্ছ স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করাই চাই। মানুষের অন্তরপ্রকৃতির নিভৃততম আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য তার জীবনদেবতা পাগল-করা বাঁশির সুরে বাহ্যপ্রকৃতির দৈনন্দিন তুচ্ছতার মধ্যেও ভিতরে ভিতরে ডাক দেয় তাকে। যাঁর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে এই ঘর-ছাড়ানো বাঁশির সুর তিনি মৃত্যুর গর্জন শোনেন সঙ্গীতের মত—

সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

ইতিপূর্বে আমরা যে নটরাজ-মূর্তির আলোচনা করেছি তিনি যদি কেবলই নর্তনশীল হতেন তা-হলে হয়তো পৃথিবী বিশেষ স্বস্তিকর হ'ত না। কিন্তু নটরাজ কেবল গতিশীল নৃত্যপর নন, তিনি আনন্দময়। বিবশ ও বিশৃঙ্খল বিশ্বকে তিনি তাঁর নৃত্যের প্রাণ-বেদনায় চেতনাময় করেছেন এবং অনন্তকাল ধরে সুরে সুরে তালে তালে সুখে দুঃখে তাঁর সেই অক্ষয় পরমানন্দময় সত্তা বিশ্বময় প্রবাহিত ক'রে দিয়ে বিশ্বের কোলাহলহীন কেন্দ্রস্থলে 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ' হয়ে বিরাজিত অম্লান আনন্দোজ্জ্বল মূর্তিতে। 'শেষ সপ্তকে' রবীন্দ্রনাথ এই আনন্দস্বরূপকে উদ্দেশ ক'রে বলেছেন—

প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।

ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্যের নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে আনন্দ-স্বরূপের অনস্তিত্বে একটানা গতি হ'ত বিভীষিকার। গতিতে চাই যতি, গতি ও যতি মিলিয়েই তবে বিশ্বনৃত্য হয়েছে সুসম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর। চলমান প্রাণের মরণই সেই যতি, তাই আমাদের জীবন-গানে রাগিণীর প্রতিষ্ঠা অখণ্ড আনন্দে।

আবার বিশ্ব ব্যেপে এই আনন্দের অস্তিত্ব আছে ব'লেই প্রাণীমাত্রেরই প্রাণধারণের আকাঙ্ক্ষা, অমরতার আকাঙ্ক্ষা। 'কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদ্ এষ আনন্দো ন স্যাৎ'। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমাদের লক্ষ্য বদ্ধ সেই আনন্দ-পারাবার পরমাত্মাতেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জগতে প্রেম-ঘন মূর্তি পরমাত্মা তাঁর আনন্দময় সত্তাতে অধিষ্ঠিত ব'লেই প্রাণের অস্তিত্বপ্রবাহ অবিশ্রান্ত গতিতে বয়ে চলেছে 'চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন মৃত্যু-

মহাসাগরসঙ্গমে'। কিন্তু সে মৃত্যু-মহাসাগর আমাদের হা হতোঽস্মির নয়, সেও সেই অখণ্ড আনন্দময় ও প্রাণময় সত্তাতে বিধৃত।

'বিদ্যা'বান কবি অমৃতের প্রয়াসী। তিনি অবিদ্যা-দ্বারা মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যা দ্বারা সুদূর অমৃতকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করেন। আমরা পূর্বে রবীন্দ্রনাথের যে সমগ্র-দৃষ্টির কথা বলেছি সেই দৃষ্টি দিয়ে উনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে একত্র ক'রে জানেন। কাজেই সংসারের আঘাতে সংঘাতে, শাদা-কালোর দ্বন্দ্বে, আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায় মুহূর্তে মুহূর্তে জন্ম ও মৃত্যুর পরপারে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি অমৃতের রসাস্বাদ করেছেন। আবার অমৃতকে যিনি আস্বাদ করেন তিনিও হয়ে যান—'য এতদ্‌ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি'। আমাদের প্রাণবাদী (vitalist) কবি তাঁর অমৃতত্বের দাবিতে বলেন,—আমি জীবনের ধারাকে কোন মৃত্যুগর্তে আটক থাকতে দিই নি, তাকে

'তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই।'

নির্লিপ্ত শিল্পী কবি 'মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবি'টিকে মনোহররূপে উপভোগ করেছেন; আবার সেই মৃত্যুর সঙ্গে নিজের আনন্দ ও অমৃত রূপ সত্তার ঐক্য অনুভব ক'রে অপরূপ ভাষায় বলেছেন—

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণক্ষেত্রে।

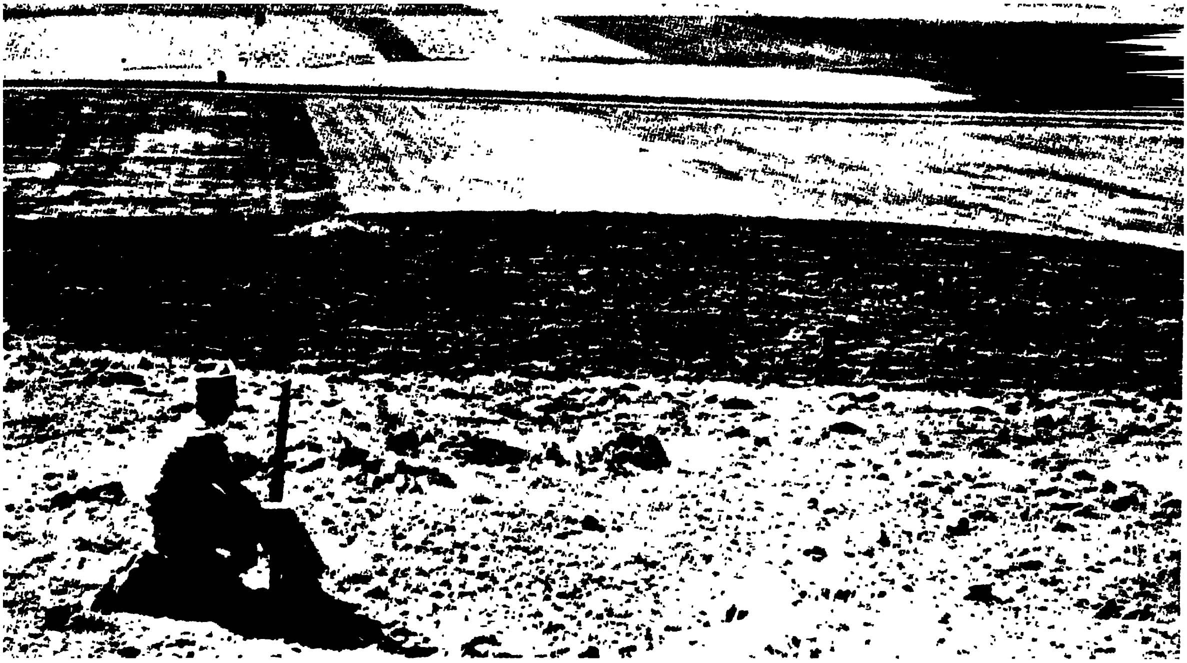
'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যাভিসংবিশন্তি'—রবীন্দ্রনাথ এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করেন। একটি গভীর গানে তিনি বলেছেন—

নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।

দুঃখ ও মৃত্যুর ক্ষতি সত্ত্বেও জগতে অখণ্ড আনন্দের শান্তিময় সত্তা বিরাজিত স্বমহিমায়। গগনচারী গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে, ধরণীর বিচিত্র ঋতুপর্যায়ের মধ্যে, যৌবন-ঘন-মূর্তিতে, স্তব্ধ মহাসমুদ্রে অতন্দ্র তরঙ্গভঙ্গের মত নিবাতনিষ্কম্প অনন্ত প্রাণ-পারাবারে লক্ষ লক্ষ জীবন-তরঙ্গের নিত্য লীলা চলছে। 'নাহি ক্ষয়' 'নাহি শেষ'-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছেড়ে দিলেও আমাদের বৈদান্তিক সত্য হচ্ছে,—জড় ও প্রাণ একই চেতন-সত্তায় বিধৃত এবং উভয়েই অক্ষয় ও অশেষ। কাজেই দ্রষ্টা ঋষি-কবির মন ঐক্যানুভূতির (intuition) দ্বারা এই পরিপূর্ণ বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে আশ্রয় না-চেয়েই পারে না।

উপসংহারে ব'লে রাখি,—আমাদের কবির অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা, তথাকথিত জন্ম-মরণ পার হয়ে মানসযাত্রী শ্বেত বলাকার মত তাঁর যেন সমস্ত প্রাণ মহামরণ-পারের আনন্দময় এবং শান্তিপূর্ণ, অখণ্ড ও অপরিমেয় সত্যের সঙ্গে নিজের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ উপলব্ধি ক'রে আনন্দিত হয়,—যে প্রাণময় ও জ্ঞানময় অসীম স্বরূপকে তিনি এই সসীম ধরণীর সুন্দরে কুৎসিতে অনুভব ক'রে, তাঁকে মনে-প্রাণে উপভোগ ক'রে ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন।

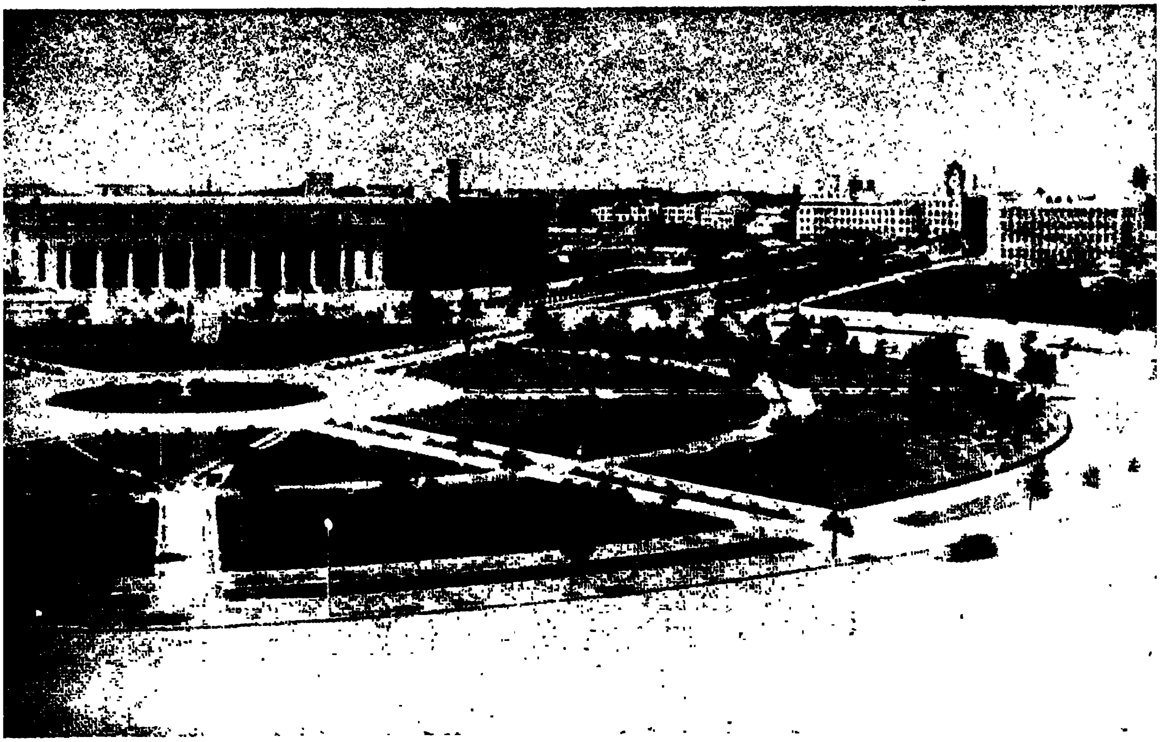




প্যালেষ্টাইন। ইহুদী চাষী জমি চাষ করিতেছে, ইহুদী স্বেচ্ছাব্রতী পাহারা দিতেছে। আরবরা ক্রোধপরবশ হইয়া বহু ইহুদীর জমি ও চাষ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, বহু কৃষককে সপরিবারে নিহত করিয়াছে— এইরূপ স্বেচ্ছাব্রতী ছাড়া তাহাদের রক্ষা করিবার বিশেষ ব্যবস্থা নাই।



লিবিয়া। ইতালীয় উপনিবেশকদের আগমন। বহু সংখ্যায় ইহাঁদের আগমনে ঐ স্থানে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে।



জাপানের আয়ত্তাধীন মাঞ্চুকুয়োর রাজধানী শিন্‌কিঙের কেন্দ্রস্থলের একটি দৃশ্য



শিংকিঙের একটি প্রধান রাজপথ।

অতীতের ছায়া

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

মফস্বলের ছোট্ট শহর। একেবারে একঘেয়ে বৈচিত্র্য-হীন।

এমন জায়গায় বদলি হয়ে এসে মনটায় বড়ই অস্বস্তি বোধ হ'ল। কোথাও যাতায়াত করাও অসুবিধার একশেষ।

রেল-ষ্টেশন থেকে মাইল-দেড়েক ঘোড়ার গাড়ী, তার পর নৌকা ক'রে নদীর এপারে এসে কুড়ি মাইল রাস্তা। আজকাল একটা মোটর-বাস সার্ভিস হয়েছে তাই রক্ষা। সেকালে যখন গরুর গাড়ী কিংবা ঘোড়ার গাড়ী ক'রে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও ঝাঁকানি নিয়ে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হ'ত, তখনকার দিনের অবস্থা মনে মনে উপলব্ধি ক'রে শিউরে উঠি।

পেশকারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—লাইব্রেরি আছে আপনাদের এই শহরে ?

ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে না হুজুর।

—ক্লাব-টাব কিছু ?

—আজ্ঞে না। তবে উকীলবাবুরা তাস-টাস মাঝে মাঝে,—আর থিয়েটারের একটা আখড়া, কতকগুলো ছোকরা—

সুতরাং কাছারির কাজকর্ম্ম এবং মফস্বল ঘোরা,—এই নিয়েই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুরু ক'রে দিলাম।

হঠাৎ এক দিন অনিলা বলে, পাশের একতলা বাড়ী-খানায় যিনি বাস করেন তিনি এখানকার স্কুলের থার্ড মাষ্টার-মশাই। তাঁর স্ত্রী রোজ দুপুরবেলা এসে অনিলার সঙ্গে গল্পসল্প করেন। ভদ্রলোক অনেক দিন থেকেই অসুস্থ, সম্প্রতি কয়েক দিন নাকি বড়ই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে।

মাষ্টার-মশায়ের সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত আমার হয় নি, সুতরাং তাঁর অসুস্থতার সংবাদে খুব বেশী বিচলিত হতাম না, যদি অনিলার শেষ কথাটুকু না শুনতে হ'ত।

অনিলা বললে—চিকিৎসার খরচে ওঁদের যা কিছু ছিল সবই গিয়েছে। কাল নাকি ডাক্তারবাবু কি একটা ইনজেক্‌শনের নাম লিখে দিয়েছেন, সেটা কলকাতা থেকে আনানো ছাড়া উপায় নেই। সেই কথা অনিলাকে বলতে গিয়ে কান্নায় বউটির কথার সমাপ্তি হয় নি, তবে এটুকু বুঝতে অনিলার দেরি হয় নি যে হাতের সোনা-বাঁধানো তামার পেটি দুটি ছাড়া এখন আর অন্য উপায় নেই। ইনজেক্‌শনের মূল্য দেবার মত সেই দুটোই তার একমাত্র সম্বল।

আমারও মনটায় যে আঘাত করল না এমন কথা বলতে পারি না। আমাদের বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব'লে আমরা যাদের অভিহিত করি, তাদের মধ্যে তো সাড়ে পনর আনা লোকেরই এই অবস্থা।

বললাম—আমি যদি ওঁদের বাড়ীতে গিয়ে ওঁকে দেখে আসি, তাহলে কি কিছু দোষ হবে ?

—দোষ আবার কি ? যাওয়াই তো উচিত।

—ঠিক কথা।

দশ-বার বছরের একটি ছেলে এসে দরজা খুলে দিয়ে একটা ঘরের ভেতর আমাকে নিয়ে গেল। তক্তা-পোষের উপর জীর্ণ মলিন বিছানায় যিনি শুয়ে ছিলেন, তাঁর বয়স অনুমান করা শক্ত। অতীত কালে দেহের যে বর্ণকে শ্যামবর্ণ বলা যেতে পারত, রোগের পাণ্ডুরতা তার শ্যামলতাকে নষ্ট ক'রে দিয়ে তার উপরে কালোর প্রলেপ দিয়েছে। হয়তো ভদ্রলোকের বয়স বেশী নয়, কিন্তু কপালের শিরা, চোখের কোটর, সবগুলির দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় অকালবার্দ্ধক্য তাঁকে চারি দিক্ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে, গ্রাস করতে আর দেরি নেই। কাঁচা-পাকা একমুখ দাড়ি মুখখানার মধ্যে যেন একটা বিশ্রী গাম্ভীর্য্য এনেছে।

ভদ্রলোক বোধ হয় একটা তেতো ওষুধ খেয়ে মুখ-

বিকৃতি ক'রে কয়েকখানা ডাঁসা পেয়ারার কুচো চিবুচ্ছিলেন, আমাকে দেখেই যেন শশব্যস্ত হয়ে বললেন—এই যে আসুন, আসুন, স্যার, আসতে আজ্ঞা হয়। ছেলেটার দিকে চেয়ে, হঠাৎ গর্জ্জন ক'রে বললেন—টিনের চেয়ারটা নিয়ে এসে দিবি এ-কথাটা আমি না বললে বুঝি আর খেয়ালই হয় না। যত সব—

কাশির ধমকে তাঁর কথাটা আর শেষ হ'ল না।

চেয়ার এল, কিন্তু ছেলেটার উপর গর্জ্জন থামল না।—হতভাগা, ওর উপর কখনও মানুষে বসতে পারে? এক-খানা ফরসা কাপড় বিছিয়ে দিতে হয়, তাও কি আমাকেই শিখিয়ে দিতে হবে? আমি চক্ষু বুজলে এরা যে কি ক'রে লোকের সঙ্গে ভদ্রতা রাখবে, বুঝলেন স্যার—

একদমে এতগুলো কথা ব'লে তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। একটু দম নিয়ে আবার বললেন—আপনি এসেছেন এখানে বদলি হয়ে, শুনে পর্য্যন্ত এক দিন যাব যাব ক'রে—তবুও তো পাশের বাড়ী,—কিন্তু কি যে পোড়া রোগ—আগে তবু চলাফেরা করতে কোন কষ্ট হ'ত না, কিন্তু পুজোর সময় যাত্রা শুনতে গিয়ে সেই যে বুকে ঠাণ্ডা লাগল, আজ তিনটি মাস—

বলতে বলতেই আবার কাশির ধমক এল।

একটু সামলে নিয়ে বোধ হয় ছেলেটিকেই লক্ষ্য ক'রে বললেন—যেটি না বলব, সেটি আর হবার জো নেই। পই পই ক'রে প্রতিটি দিন বলি আদা কুচিয়ে নুন দিয়ে এইখানটায় রেখে দিতে,—তা যত সব,—হাতে যেন বাত হয়েছে সকলের,—চক্ষু বুজি তখন সব টের পাবেন মজাটা। হয়েছে কি এখনও, শেয়াল-কুকুর কাঁদবে তোদের দুঃখে—

দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা সহ্য ক'রে ভদ্রলোক যে অতিমাত্রায় খিটখিটে হয়ে প'ড়েছেন তা বুঝলাম।

আদার কুচি এল। এক টুকরা মুখে দিয়ে বললেন—ডাক্তারটাও হয়েছে তেমনি। হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে এমন জায়গা নেই যে ব্যথা নয়। ভালই বা বলি কাকে? স্কুলের সেক্রেটারি—এত দিন ধ'রে যে কাজ করলাম, আজ তিন মাস বিছানায় পড়েছি আর অমনি মাইনে বন্ধ। ইচ্ছে করে সব—

কি ভেবে তিনি আর মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করলেন না। আমার দিকে চেয়ে বললেন—বিচ্ছিরি জায়গা মশাই। এখানে কি মানুষ থাকে? ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, সিঙ্গিমাছের ঝোল, তা বলতে কি, আজ সাত দিন ধরেও চেষ্টা ক'রে পাওয়া গেল না। যাক্‌ গে নিজের কথায় আর কাজ নেই, নিজে যেমন কর্ম্ম ক'রে এসেছি, তার ফল ভুগবো তো। বুঝেছেন স্যার, স্বর্গ নরক ব'লে আলাদা কিছু নেই, ওই যে সব ছবি বিক্রি করে, সব বাজে। আমাদের এই সংসারের মধ্যেই স্বর্গ, এর মধ্যেই নরক। যার যেমন ভোগ আর কি!

এসব তত্ত্বকথায় আমার মতামত প্রকাশ করবার কিছুই ছিল না, কাজেই চুপ ক'রে রইলাম। বুঝলাম, কেন এসব তত্ত্ববাদ তাঁর মাথায় আসছে। দীর্ঘকালব্যাপী রোগশয্যা, তার উপর স্কুলের মাইনে বন্ধ, ওষুধের দাম,—সুতরাং সিঙ্গিমাছের ঝোল কেন হচ্ছে না, পথ্যের ব্যবস্থাও কেন ঠিকমত হচ্ছে না, সেকথা বুঝতে দেরি হয় না। তার উপর হাতের পেটির কাহিনী তো অনিলার মুখে শুনেছি।

হঠাৎ তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আপনার বড় ছেলে, মণি যার নাম, সে এখন কোথায়?

আমি বিস্মিত হলাম। আমার বড় ছেলে আমাদের সঙ্গে এখানে আসে নি, কাজেই তার কথা ইনি জানলেন কি ক'রে? হয়তো অনিলার কাছে এঁর স্ত্রী শুনে থাকবেন। বিচিত্র নয়।

বললাম—সে এন্‌জিনিয়ারিং পড়তে রুড়কী গিয়েছে। সেখানে তো তিন বছর—

—আহা বেশ, বেশ, বেঁচে থাক। ছেলেবেলায় তার সেই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলি কি সুন্দরই ছিল। কথা ভাল ক'রে ফোটে নি, কিন্তু তবুও কেমন চমৎকার আবৃত্তি করতো সেই কবিতা—'পঞ্চ নদীর তীরে—' কি তার পর? ভুলে গিয়েছি।

এবার সত্যই আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম ক'রে গেল। বললাম—মণিকে আপনি ছেলেবেলায় দেখেছেন বলছেন—তার কবিতা, ঝাঁকড়া চুল সব কথাই আপনার মনে আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য তো, আমি ত আপনাকে ঠিক চিনতে—

তাঁর পাণ্ডুর মুখে একটু হাসি এল। আর একবার চীৎকার ক'রে বললেন—হ্যাঁ রে চায়ের জল এখনও হ'ল না। জল ফুটতে কি ছ-মাস লাগে? কুড়ের সব বাদশা এক একটি। বুঝেছেন—আর পারি নে। ছেলেতে মেয়েতে সাতটি। এখানে আঠারো বছর চাকরি করছি। ষাট টাকা ক'রে পেতাম, পাড়াগাঁ জায়গা, এক রকম চলে যেত, কিন্তু আজ তিনটি মাস আয় বন্ধ, অথচ খরচ বেড়েই চলেছে। ভগবানকে ডাকি, বলি ভগবান্, আমার কি আর মুক্তি নেই? কিন্তু ডাক তো তিনি শোনেন না!

তাঁর চোখের কোণে জল এল।

বললেন—দেখেছেন তো স্যার আমাদের আগেকার অবস্থা। কি ছিল বাড়ীতে, কি রকম জমজমাট? আর আজ—অনাহারে মরা ছাড়া একে আর কি বলব?

আমি এখনও অবাক্। বললাম—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি নে আপনাদের পূর্ব্ব-পরিচয়টা। কোথায় বলুন দিকি দেখাশুনো—

তিনি বললেন—সে কি কথা? আপনি প্রথম চাকরিতে ঢুকেই যে আমাদের গাঁয়ে জরিপ করতে—আমাদেরই বাড়ীতে—গোলাগাঁয়ে—আমার পিতার নাম ৺রাধাকৃষ্ণ—

চমকে উঠলাম। বললাম—বলেন কি? আপনি—আপনি কি তবে—

—নরেন্দ্রনাথ সান্যাল—

চিনতে এবার দেরি হ'ল না। বললাম—আপনার এক দাদা ছিলেন না?

—হাঁ, তিনি চাকরি করতে গিয়েছিলেন রেঙ্গুনে। সেই খানেই মারা যান। আর আমার ছোট ভাইটি, সেও চাকরি করছে,—তাও কি এখানে? সেই লাহোরে। নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত, কখনও একটি আধলাও মেজদা ব'লে পাঠায় না।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের সে-সব বাড়ীঘর চাষবাস?

—চাষবাস ত বাবার সঙ্গেই গেল। বাড়ীঘর—ইটের ঢিবি বললেই হয়।

কুড়ি বৎসর আগেকার সেই দিনগুলির কথা আজ যেন খুব উজ্জ্বল হয়েই মনের সামনে ফুটে উঠল।

আমার তখন চাকরি-জীবনের উপক্রমণিকা। ছুটো অস্বাস্থ্যকর জায়গায় প্রায় এক বছর কাটিয়ে যেখানে বদলি হলাম তারই নাম গোলাগাঁ। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের কোলে চিতলমারির বিল, তার অর্দ্ধেকের ওপর পদ্মের ঝাঁকে ভরা। খানিকটা মাঠ পেরিয়েই বাঁশ-বাগান, তার পরেই গ্রামের সুরু। জায়গাটা বেশ ভালই লাগল। পৌঁছে-ছিলাম সন্ধ্যাবেলা, তিথিটা কি ছিল মনে নেই, কিন্তু ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় বিলের জল আর তার বুকে-ফোটা অসংখ্য পদ্ম মনের উপর যেন ইন্দ্রধনুর রং বুলিয়ে দিলে। কলেজের গন্ধ তখনও গা থেকে যায় নি, মাসিকপত্রের পাতায় কবিতা লেখাও মক্স করছি, কাজেই জায়গাটার মনোহারিত্ব আমাকে মুগ্ধ করলে। সঙ্গের লোকজনকে বললাম—এই খানেই তাঁবু খাটাও।

রান্নাবান্নার জন্য যে ছোকরাটি আমার সঙ্গে এসেছিল, সে বাবলা গাছতলায় ষ্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি ক'রে দিলে। চা খেয়ে টর্চ্চটা হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়লাম গাঁয়ের দিকে। টর্চ্চ জিনিষটা তখন নূতন, অজানা পাড়াগাঁয়ে জরিপের কাজে ঘুরে বেড়াতে হয় ব'লে বেশী দাম দিয়েই জিনিষটাকে কিনতে হয়েছিল।

লোকজন তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত রইল।

ঠিক শীতকাল না হ'লেও অল্প অল্প ঠাণ্ডা পড়েছিল। রাতও তখন বেশী নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামের রাস্তা এরই মধ্যে নিস্তব্ধ। বাঁশ-বাগানের ফাঁক দিয়ে দুই-একটা আলো দেখা যায়, বোধ হয় কোন দোকানের।

কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই পথ চলেছিলাম, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম বেহালার ছড়ি টানার আওয়াজে। জ্যোৎস্না-রাত্রি, নিস্তব্ধ পল্লীপথ, দুটো মিলিয়ে হয়তো আমার মনের উপর এমনি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, বেহালার আওয়াজ না হয়ে যদি ঢাকের আওয়াজ হ'ত তা হ'লেও আমার কানে মিষ্ট লাগত। কিন্তু সত্যিই আমার বড় ভাল লাগল।

ছোট পাঁচিলে-ঘেরা বাগান, তাতে ফুলের ছড়াছড়ি, তারই মধ্যে একটি ঘর। খোলা জানলা দিয়ে আসছিল খানিকটা আলো আর সেই সুরের ঝঙ্কার।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম

ঠিক খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা লোক লণ্ঠন হাতে ক'রে আমার সামনে এসে বললে—বাবু ডাকছেন।

গেলাম। বাবুটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, গোঁফ-দাড়ি কামানো, বেশ সৌম্যমূর্ত্তি। তাঁরই হাতে এসরাজ। আমারই ভুল, বেহালা নয়—এসরাজ।

পরিচয়ের পালা শেষ হ'লে তিনি তো শশব্যস্ত। তাঁকে অনেক ক'রে থামিয়ে বললাম—যদি আপত্তি না থাকে তো আপনার বাজনা শুনব।

নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে মামুলী বিনয় প্রকাশ ক'রে এসরাজটা তিনি কোলে টেনে নিলেন, তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ হ'তে লাগল তাঁর সুরসাধনা।

তার পর আরম্ভ হ'ল গান।

সেই পুরনো জিনিষ। বৃন্দাবন-লীলার ব্যাপার। কৃষ্ণের মথুরাযাত্রা। ব্রজগোপীদের করুণ নিবেদন, ওগো অকরুণ শ্যাম, অপরূপ আজ তোমার সজ্জা, গলে তোমার নবকিশলয়ের মালা, পরণে তোমার পীতাম্বর, হাতে তোমার মোহন মুরলী, শীর্ষে তোমার কৃষ্ণচূড়ার নবমঞ্জরী! রাজবৈভবের আশে আজ তোমার জয়যাত্রা, লক্ষ্য তোমার রাজসিংহাসন, পার্থিব সম্পদ,—কিন্তু তোমার চিরসেবিকা ব্রজবালাদের কথা কি সেই রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমার মনের নিভৃত কোণেও স্থান পাবে? বৃন্দারণ্যের তমালকুঞ্জ কি মথুরার রাজপ্রাসাদের পাষাণ-তোরণে নিষ্পেষিত হয়ে যাবে না?

এসব গান ছেলেবেলায় অনেক শুনেছি, কিন্তু কি জানি কেন, মনে হ'ল যে অকরুণ শ্যাম যেন আজ গায়কের কণ্ঠে মূর্ত্তি নিয়ে আমার সামনে রয়েছেন দাঁড়িয়ে। এতটা আত্মবিস্মৃত কখনও হয়েছিলাম ব'লে মনে হয় না।

পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হ'ল। বিলের পদ্ম দেখে মোহিত হয়ে সেইখানেই আমি আমার বস্ত্রাবাসের ব্যবস্থা করেছি শুনে তিনি উঠলেন শিউরে। বললেন—কাব্য ভাল, পদ্ম এবং বিলের কালো জল, তার উপর জ্যোৎস্না, এর কোনটাই খারাপ নয়, কিন্তু ওখানে যে সাপের আড্ডা।

তার পর কি ক'রে তাঁর সেই বাগান-বাড়ীতেই এসে উঠতে হ'ল সে ইতিহাস সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন নেই। চাকরি-জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদের সেই দিনগুলি সোনার অক্ষরেই জীবনের পাতায় লেখা ছিল।

তাঁর নাম রামকৃষ্ণ সান্যাল। বিস্তৃত জমিজমা, চাষ, পুকুরভরা মাছ, বাগানভরা ফল তরকারি, গোয়ালভরা গরু, আমাদের বাঙালী-জীবনের প্রাচীন আদর্শ যা-কিছু ছিল, তিনিই যেন তার মূর্ত্তিমান প্রতীক। কোন কিছুর অভাব নেই, সদাপ্রফুল্ল ভাব, সন্ধ্যার পরে এসরাজটি নিয়ে বসেন, আর আপন মনেই গেয়ে যান তাঁর স্বরচিত গান।

শীত শেষ হয়ে ক্রমে এল গরমের দিন। ছুটিতে তাঁর দুই ছেলে কলকাতা থেকে বাড়ী এল। বড় ছেলেটি সেবারে বি-এ দিয়েছে; মেজটি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। আমার কাছে এসে সে নানা বিষয়ের আলোচনা করত।

বড় ভাল এই ছেলেটি। জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা তার মুখ থেকে শুনতে পেতাম

নরেন তার নাম। ছিপছিপে একহারা দেহখানির উপরে উজ্জ্বল চোখদুটি দীপ্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষার প্রথা এবং আমাদের সাংসারিক জীবনে তার প্রয়োগ এই দুটোর অসামঞ্জস্য নিয়ে অনেক সন্ধ্যা তার সঙ্গে তর্কে কেটেছে। সে বলত ইউরোপের কথা, ইংলণ্ডে জার্ম্মানীতে ছেলেরা কি ভাবে মানুষ হয়, কেমন ক'রে তাদের মধ্যে স্পন্দিত হয়ে ওঠে নবজীবনের ধারা, তাদের ভেতরে জেগে ওঠে নব নব প্রেরণা।

এক দিন স্পষ্টই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কলেজ এডুকেশনের পরে কি করবে ঠিক করেছ নরেন?

সেও স্পষ্ট জবাব দিলে—আমাদেরই বাংলা দেশ থেকে অন্যান্য সবাই লুটে নেয় খাদ্যের ভাণ্ডার, আর আমরা বেছে নিই অনাহার। নয় তো সেই লুণ্ঠনকারীদেরই কর্ম্মচারী হয়ে তাদের দয়ার দানে কৃতার্থ হয়ে তাদের লুটের টাকার হিসেব রাখি। এই কি বাঙালীর ছেলের আদর্শ জীবন?

—কোন্ লাইনে যেতে চাও?

প্রত্যুত্তরে তার বক্তৃতার স্রোত থামতে চাইত না। দেশের কৃষি, দেশের বাণিজ্য থেকে আরম্ভ ক'রে দেশের দারিদ্র্যের সহস্র ইতিহাস তাহার মুখাগ্রে।

সে বলত, দেশলক্ষ্মীকে যদি দেশেই প্রতিষ্ঠা করতে পারি তবেই আমার কল্পনা সার্থক, জীবন সার্থক।

বললাম—সার্থক হোক তোমার কল্পনা, সার্থক হোক তোমার জীবন। মনে মনে ভাবলাম যে জীবনটাকে দাসত্বশৃঙ্খলে বেঁধে সারা বাংলাময় সেই শিকল ঝন ঝন ক'রে বেড়াচ্ছি, কেবল আমি নয়, বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক, তার মধ্যে যদি একজনও নরেনের আদর্শ নিয়ে মানুষ হয়, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, "একটি একটি করে প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে দেশে একদিন দেওয়ালীর উৎসব লেগে যাবে।"

তার ছোট ভাই, সুরেন তার নাম, সেটির আমি নাম দিয়েছিলাম হাউই। বয়স তখন তার বছর বারোর বেশী ছিল না, কিন্তু যখনই তাকে দেখতে পেতাম, সে উঠানের পেয়ারাগাছের সর্ব্বোচ্চ শাখায়, নয় তো পদ্মবিলের জলে। সাপের ভয় তাকে আমিও দেখিয়েছিলাম, কিন্তু বারো বছরের ছেলে আমার মত হাকিম মানুষের দিকে চেয়ে এমনি ক'রে হেসে উঠত যে আমিই লজ্জিত হতাম।

আশা করতাম সেও হয়তো একদিন তার মেজদার আদর্শেই অনুপ্রাণিত হবে।

সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম বৃদ্ধ রামকৃষ্ণ সান্যালের ব্যবহারে। বাড়ীতে পনর-কুড়িটি পাইপক, তিনি নিজে তাদের তত্ত্বাবধান করতেন। ধানকাটার সময় প্রায় এক-শ মজুরে কাজ করছে, কিন্তু সকলকে মুড়ি জলখাবার দেওয়া হয়েছে কি না এ-সংবাদটুকুও তাঁর নিজে নেওয়া চাই। সারা দিনের কর্ম্মব্যস্ততার পরে সন্ধ্যার পরে ব'সে তাঁর সেই প্রিয় এসরাজ—তার প্রাণহীন কাঠ আর তারের ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠতো সুরলহরী, চারি দিকের প্রতীক্ষমান বাতাসের ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হ'ত তাঁর সুকণ্ঠের সঙ্গীত।

প্রায় দেড় বছর ছিলাম গোলাগাঁয়ের সেই বাগান-বাড়ীতে। তার পর বদলি হয়ে চলে গেলাম বহুদূরের এক ম্যালেরিয়াখ্যাত স্থানে। সেইখানে ব'সে অনেক দিন দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে মনে করেছি গোলাগাঁয়ের কথা। তাঁদের আদর, আপ্যায়ন, তাঁদের সদানন্দ জীবনের কথা।

ক্রমে ক্রমে জীবনের অনেকগুলো বৎসর কেটে গেল, মাঝে মাঝে মনে হ'ত হয়তো সান্যাল-মশায়ের বড় ছেলেটি এত দিন এক জন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি হয়েছেন, নরেন হয়তো ইউরোপ কিংবা জাপান কিংবা আমেরিকা ঘুরে এসে একটা নূতন কিছু ক'রে একটা অঘটন ঘটিয়েছে, দেশ-মাতৃকার কৃতী সন্তান হয়ে আজ সে নিজেও ধন্য হয়েছে, হয়তো দেশকেও ধন্য করেছে। ছোট ভাই সুরেন—হরিণের মত চঞ্চল সুরেন, জীবনধারার মূর্ত্ত প্রতীক সুরেন—সেও হয়ত আজ দশের এক জন।

মফস্বলের অনেক কদর্য্য জায়গায় ঘুরে' গোলাগাঁয়ে সান্যালদের আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে গ্রামের উন্নতি, পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা অনেক সভায় দিয়েছি। সময়ে সময়ে এক এক বার ইচ্ছাও হ'ত যে একবার যাই সেখানে, আমার চাকরি-জীবনের প্রথমে সেই অখ্যাতনামা পল্লীগ্রামে জীবনের যে-স্বাদ পেয়েছিলাম, আজ বিশ বৎসরের মধ্যে তার তুলনা করতে পারি এমন তো কিছু মনে হয় না।

•

কিন্তু প্রকৃতি যে এমন নিষ্ঠুরভাবে আমার কল্পনার মায়াজাল ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে, এ তো কখনও ভাবি নি। বিশ বৎসর পরে, আমার জীবনের অপরাহ্নবেলায় আজ সেই নরেনকে দেখলাম, দেখে চিনতেও পারি নি, চেনবার উপায়ও ছিল না; কিন্তু ভাগ্যের এ কি নির্দ্দয় পরিহাস! তার জীবনের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সমস্ত আশা, সমস্ত রঙীন আলো কি ঝড়ো হাওয়ায় শেষ হয়ে গেল?

তারই মুখে শুনলাম তাদের সে স্বাচ্ছন্দ্য, সে বৈভব, সে অফুরন্ত ভাণ্ডার সব গিয়েছে। কেন গেল, কি ক'রে গেল সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'ল না, কেবল জানলাম যে চাকরি নিয়ে এদের তিন ভাই বেরিয়েছিল পৈতৃক প্রতিষ্ঠান ছেড়ে। এক জন গেল রেঙ্গুন, সেই খানেই পড়ল তার জীবনের যবনিকা। এক জন এই অখ্যাতনামা শহরে, বিনা-চিকিৎসায় মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আর এক জন লাহোরে—তার কথা আর জিজ্ঞাসা করি নি।

জীবনের মধ্যাহ্নে যে-সূর্য্যের তাপ ছিল প্রখর, সায়াহ্নে আজ সে-ই ঢেলে দিয়েছে অন্ধকার! আজ আমার সামনে রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মূর্ত্তি নিয়ে, দারিদ্র্যের তীব্র আঘাত সহ্য ক'রে যে-মূর্ত্তি শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে, এই তার শেষশয্যা কিনা কে জানে, কিন্তু এ পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী কে? যে মোহ এক-শ বছর আগে বাঙালীর ছেলেকে চাকরির লোভে ঘরছাড়া করেছিল, তারই মরীচিকা?

কি জানি, কোন সদুত্তর পাই না।

উষা-র নন্-কোঅপারেশন

ব্রহ্মদেশীয় গল্প

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

উষা নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ। ভগবান্ বুদ্ধের চরণে প্রতিদিন প্রার্থনা করিতেন—আমাকে অপ্রমেয় প্রেম দাও; সর্ব্বলোকে আমার সুনির্মল মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত কর।

ভক্তের ভগবান্ উষা-র প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে উষা-র শত্রু নাই। ধনধান্যে উষা-র গৃহ যেমন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, বিশ্বপ্রেমেও উষা-র হৃদয় তেমনি কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

কয়েক বৎসর পর, মহাত্মা গান্ধীজীর অসহযোগ-বাদ ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাণোন্মুখ দাবানলের ন্যায় ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিল। রেঙ্গুন হইতে এক বৃদ্ধ ছয়া-ড আসিয়া, ওজস্বিনী ভাষায় "টয়া-হ" করিলেন—ইংরেজের আদালতে ব্রহ্মবাসীদিগের আর্থিক ক্ষতি ও নৈতিক অধঃপতনের সম্বন্ধে। প্রেমের সাধক উষা-র চিত্ত স্বদেশবাসীদিগের দুঃখে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে লইয়া উষা শপথ করিলেন—"আমরা আদালতে যাইব না; নিজেদের বিবাদ-কলহ নিজেরাই মীমাংসা করিব।"

সকলে বলিল—জয় গান্ধীজী-কী জয়।

ভাল লোক যেমন, তেমন শহরের যত দেনায়-ডোবা শঠ লোক পরম আগ্রহে উষা-র অসহযোগ-সমিতির সভ্য হইল। প্রেম ও মৈত্রীর জয়জয়কারে পুলিস অস্থির হইয়া উঠিল। উষা-র কতকগুলি উপগ্রহের তীব্র উত্তাপে সি-আই-ডিরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। উপরে রিপোর্ট গেল—"উষা নন্-কোঅপারেশনের মূর্ত্তিমন্ত টাই।" উষা ভীত হইলেন না; তিনি আরও ভক্তিনম্র হৃদয়ে বুদ্ধের নিকট সার্ব্বজনীন প্রেম ও মৈত্রী ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

উষা-র চায়ের কারবার ছিল। পত্নী মা পোয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। চাউঙ্, উপোছাউঙ, ও নন্-কোঅপারেশন করিয়া উষা-র সময় ছিল না।

সমিতির বিশ্বপ্রেম যত বাড়ুক না-বাড়ুক, নন্-কোঅপারেশনের প্রবল বন্যায় সমধিক ক্ষতি হইল উষা-র কারবারে। তাঁহার খাতকেরা নির্ভয়চিত্তে তাহাদিগের দেনা-শোধ বন্ধ করিয়া দিল। কাশিম আলী সওদাগরের নিকট ছ-মাসের বাড়ীভাড়া বাকী পড়িল। উষা তাগাদা করিয়া হয়রান হইলেন। এক পয়সাও আদায় হইল না।

ও-দিকে উষা-র দেয় টাকার জন্য চায়ের দালালেরা অস্থির হইয়া উঠিল। ভাড়ার টাকাটা পাইলে তাহাদিগকে সহজেই শান্ত করা যাইত। কিন্তু কাশিম আলী অনমনীয় দেনাদার; আজ কাল করিয়া ছয় মাস কাটাইয়া, এই সাত মাস হইল; কাশিম আলী বাড়ীভাড়া দিলেন না।

কাশিম আলীর টাল্-বাহানায় মা পোয়া অত্যন্তই ক্রুদ্ধ হইলেন। দালালদিগের তাগাদায় বিরক্ত হইয়া মা পোয়া উষা-কে বলিলেন, "কো-জী, কাশিম আলীকে তুমি চেন না; সে বড়ই বেইমান; তাকে কোর্টে দাও।"

স্ত্রীর এই অন্যায় প্ররোচনায়, বিশেষতঃ ঐ "বেইমান্" কথাটায়, উষা-র করুণ অন্তরে একটা আকস্মিক ব্যথা বিদ্যুতের ন্যায় বিস্ফুরিত হইয়া গেল। উষা দুঃখিত ভাবে কহিলেন, "ক্রুদ্ধ হয়ো না মা পোয়া; কাশিম আলী আমাকে ঠকাবে না। ঠকালেও আমি কোর্টে যাব না।"

মা পোয়া শান্ত হইলেন না। তিনি সেই অপরাহ্ণেই উষা-কে ভাড়া আদায়ের জন্য কাশিম আলীর দোকানে পাঠাইলেন।

২

কাশিম আলী খুব মিষ্টভাষী লোক; পরিচিত লোক দেখিলেই দুই হাতে সেলাম করিয়া হাস্যবদনে সম্ভাষণ

করেন; দোকানে কেউ আসিলে, এক পেয়ালা চা পান না-করাইয়া কাহাকেও ছাড়েন না; তা ছাড়া পাঁচ বেলা নমাজ পড়েন; মাটিতে কপাল ঠুকিতে ঠুকিতে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে কালো দাগ হইয়া গিয়াছে।

উষা-কে দোকানে আসিতে দেখিয়া, কাশিম আলী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আজানুসন্নত বিষম শ্রদ্ধাপূর্ণ এক সেলাম দিয়া, উষা-কে বড় একখানি চেয়ারে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এ অবেলায় যে, ছয়া-জী?"

উষা সবিনয়ে উত্তর দিলেন—ভাড়ার টাকাটা আজই দিতে হবে, কাশিম আলী। টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

কাশিম আলী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "ভাড়ার টাকা! তা তো অনেক দিন আগেই শোধ হয়ে গেছে!" এক পেয়ালা চাই দাও হে ওস্‌মান্; ছয়া-জী এসেছেন "

চায়ের জলটিকে কাশিম আলী কখনও তাঁহার বাণিজ্য-মৃগয়ার প্রলুব্ধক রূপে, কখনও বা তাঁহার আক্রান্ত জীবের বেদনান্তক এনেস্‌থেটিক্ রূপে ব্যবহার করিতেন।

ওসমান তৎক্ষণাৎ চা লইয়া আসিল। কিন্তু উষা-র তখন চায়ের তৃষ্ণা মোটেই ছিল না। তিনি কহিলেন, "টাকা কবে দিলে হে ভাই? এই যে পরশুদিনই তুমি ব'লে পাঠালে আজ রবিবারে সমস্ত টাকাটা পরিশোধ ক'রে দেবে!"

কাশিম আলী তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া, শিরে করাঘাত করিয়া, কহিলেন, "ও খোদা, টাকাটা আমি নিজ হাতে দিয়েছি! আজই আপনি ভুলে গেলেন? রহমান্ হিসাবটা দেখ তো হে।"

কেরানী রহমান্ নিকটে বসিয়া হিসাব লিখিতে-ছিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "টাকাটা আপনি দিয়েছেন গত শুক্রবারে; ঐ তারিখের হিসাবেই টাকাটা খরচের খাতায় লেখা আছে।"

উষা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মা পোয়ার উচ্চারিত "বেইমান" কথাটি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে গর্জ্জিয়া উঠিল; কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "রেখে দাও তোমার হিসাবের খাতা! সাত মাসের ভাড়া বাকী পড়ে আছে; একটি পয়সাও এ পর্য্যন্ত দাও নাই! তার উপর আবার মিথ্যা কথা! কায়া, কায়া, কায়া! হিসাবে যদি এ-টাকা জমা থাকে তবে সে হিসাব মিথ্যা।"

ক্রোধে রহমান উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খাতার নিন্দা তাঁহার সহ্য হইল না; ধাক্কা দিয়া উষা-কে দোকানের বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

ভাগ্যে রাস্তায় তখন বর্ম্মীরা কেহ ছিল না। নতুবা তৎক্ষণাৎ একটা খুনাখুনি হইয়া যাইত। কিন্তু দোকানের সম্মুখে এক বৃহৎ জনতার সৃষ্টি হইল। সকলেই উষা-কে বলিল, "আপনি নালিশ করুন, আমরা সাক্ষ্য দিব।"

উষা নিঃশব্দে ভূমি হইতে উত্থান করিয়া সস্মিত মুখে গায়ের ধূলি ঝাড়িলেন। তার পর ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া মা পোয়াকে সকল ঘটনা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন। ক্রোধে ও ক্ষোভে সে রাত্রিতে মা পোয়া অন্নজল গ্রহণ করিলেন না।

৩

কাশিম আলী কিন্তু সেই দিনই পুলিসে রিপোর্ট দিলেন—উষা দোকানে ঢুকিয়া তাঁহাকে (কাশিম আলীকে) জুতাপেটা করিয়াছেন। আঘাতের চিহ্ন প্রমাণের জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইলেন। পুলিস উষা-র প্রতি পূর্ব্ব হইতেই ক্রুদ্ধ হইয়া রন্ধ্র অনুসন্ধান করিতেছিল। তাহারা সাক্ষীসাবুদ লইয়া উষা-কে ৪৫২ ধারায় চার্জ্জ করিয়া মোকদ্দমা কোর্টে পাঠাইল।

জামিন লইবার জন্য উষা উকীল নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। উকীল উষা-কে ৩২৩ ধারায় পাল্টা নালিশ করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু উষা স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন—আমি কোর্টে যাব না।

মা পোয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। "নালিশ তোমার করতেই হবে কোথা; ভাড়ার টাকারও নালিশ করতে হবে" এই বলিয়া মা পোয়া তৎক্ষণাৎ উকীলকে নগদ ৫০৲ ফীস্ গণিয়া দিলেন। মোকদ্দমা দাখিল হইল।

উভয় পক্ষে ক্রমে আরও বড় উকীল নিযুক্ত করা হইল। ষ্ট্যাম্প, তলবানা ফীস্, বারবরদারী ও তদন্ত-

কারীদের পারিশ্রমিক স্বরূপ উভয় পক্ষেই বহুপরিমাণে অর্থব্যয় হইতে লাগিল। শহরে এক হুলস্থুল পড়িয়া গেল—কে হারে কে জিতে!

সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা ও কষ্ট হইল উবার। তাঁহার দৈনিক শীল-সাধনার অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। কিন্তু চেরীবৃক্ষ যেমন শীতের প্রচণ্ড তাড়নায় আরও অধিক পুষ্প-গৌরবে সমন্বিত হইয়া পড়ে, উবাও তেমনি তাঁহার এই আকস্মিক বিপদেও অপ্রত্যাশিত দুঃখে ও অপমানে, ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বুদ্ধের চরণে সমর্পিত হইয়া পড়িলেন।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অনুতাপে ক্লিষ্ট হইয়া উবা গোপনে এক দিন কাশিম আলীকে সংবাদ দিলেন, "ভাই কাশিম, ভাড়ার টাকাটা শোধ ক'রে দাও; উভয় পক্ষেরই মোকদ্দমা উঠিয়ে নেওয়া হোক; গান্ধীজীর দোহাই, ঝগড়া বাড়িও না।"

কাশিম আলী জিব কাটিয়া জবাব দিলেন, "ওরে বাপ রে! গান্ধী ভয়ানক রাজদ্রোহী; তার দোহাই আমি মানব না। কোর্টে যা হুকুম হবে, তাই আমার শিরোধার্য্য।"

সুতরাং মোকদ্দমা পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। তিন মাস পরে, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে উভয় পক্ষেরই দশ-দশ টাকা জরিমানা হইল; শান্তিরক্ষার জন্য উভয়েরই জামিন দিতে হইল। উবা ভাড়ার টাকার ডিক্রী পাইলেন। ক্রোকী পরোয়ানা বাহির করিয়া তিনি ডিক্রীর টাকা আদায় করিলেন। কোর্টে যা হউক না-হউক, লোকের গঞ্জনায় কাশিম আলী মরমে মরিয়া গেলেন।

আর নির্দ্দোষ উবা আদালতে বিনা-অপরাধে দণ্ডিত হইয়া ভগবান্ বুদ্ধের চরণে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "হে প্রেমের দেবতা, তুমি জান আমি নির্দ্দোষ। আমাকে এ কঠোর অপমান সহ্য করিবার সামর্থ্য দাও। আমার মান-অপমান দুঃখকষ্ট সবই তোমার চরণে বিসর্জ্জন দিলাম। মা পোয়া উবার অবস্থা দেখিয়া, তাহার মুখের সম্মুখেই বলিলেন, "তুমি মেয়েমানুষেরও অধম। মানুষ হও তো প্রতিহিংসা নাও।"

৪

এক মাস চলিয়া গেল। হঠাৎ এক দিন এক নির্জ্জন রাস্তায় কাশিম আলীর সঙ্গে উবা-র সাক্ষাৎ হইল। তিতিক্ষাশীল উবা সোজা কাশিম আলীর সম্মুখে আসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "ভাই কাশিম, যা হবার তা শেষ হয়ে গেছে; হৃদয়ে বৈর পোষণ ক'রো না; প্রীতি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা কর! ভগবান্ বুদ্ধের বাণী সার্থক হউক। মহাত্মা গান্ধীর জয় হউক।"

উবার অসীম উদারতায় কাশিম আলীর হৃদয় বিগলিত হইল। অনুতাপের অশ্রুধারায় চক্ষু আর্দ্র করিয়া কাশিম আলী কহিলেন, "মার্জ্জনা কর বন্ধু! তোমার কোনই দোষ ছিল না। ঐ গান্ধীই যত অনিষ্টের মূল। পুলিস গান্ধীর পরম শত্রু; তাদেরই উপদেশে আমি তোমার উপর এ মিথ্যা মোকদ্দমা করেছিলাম। যা হোক্, আজ হ'তে তুমি আমার পরম বন্ধু। তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর।"

পরম সৌহার্দ্দ্যে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে ঘরে ফিরিয়া গেলেন। উবা-র আনন্দের সীমা নাই। এক মাস পরেই উবা মস্তক মুণ্ডন করিয়া "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিয়া মহা আনন্দে সংসার ত্যাগ করিলেন। ভিক্ষুগণ বিশ্বপ্রেমিক উবা-কে পরম আগ্রহে সংঘের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। উবা ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিলেন।

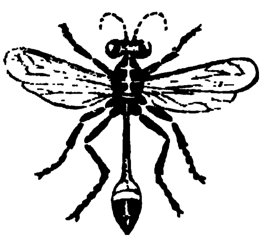
আর মা পোয়া দোকানে বসিয়া প্রত্যহ "সংসার-ধ্বংসী গান্ধী কালার" শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস রহিল যে, ঐ গান্ধীই উবা-র সর্ব্বনাশের মূল। নির্ব্বোধ মা পোয়া বুঝিলেন না যে, নিয়তির বিধান মানুষের অজ্ঞেয়; তাহা অপরিবর্ত্তনীয় এবং অব্যাহত।

পঞ্চশস্য

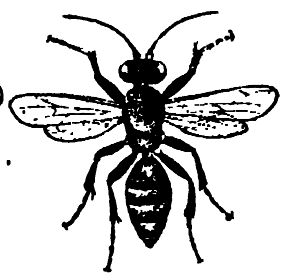
কুমোরে-পোকার সন্তানরক্ষার কৌশল

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঘরের দেয়ালে, পতিত জমি বা বৃক্ষকাণ্ডের উপর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকারী, বোল্‌তা, মৌমাছি বা ভীমরুলের মত কয়েক জাতীয় বিভিন্ন রঙের পোকা অনেকেরই নজরে পড়িয়া থাকিবে। চলতি কথায় লোকে ইহাদিগকে কুমোরে-পোকা বলিয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য কুমোরে-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জাতীয় কুমোরে-পোকার সংখ্যা কম নহে। এদেশীয় উজ্জ্বল নীলাভ সবুজ অথবা সবুজ আভাযুক্ত সোনালী রঙের পোকাগুলির প্রতিই অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য কালো, হলদে, খয়েরী অথবা বিবিধ বর্ণে চিত্রিত পোকাও যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল কুমারে-পোকা সচরাচর আমাদের নজরে পড়ে তাহাদের অনেকেই ঘরের দেয়ালে বা আনাচে-কানাচে নরম মাটির সাহায্যে

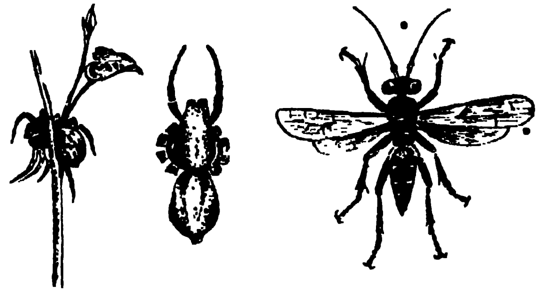


'অ্যামোফিলা'-জাতীয় কুমোরে-পোকা



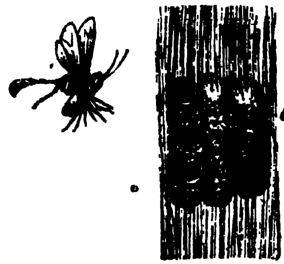
কয়ার-ফড়িং শিকারী কুমোরে-পোকা

বাসা নির্ম্মাণ করে অথবা মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ডিম পাড়ে। এই জন্যই বোধ হয় ইহাদের নাম হইয়াছে কুমোরে-পোকা। কিন্তু কয়েক জাতীয় কুমোরে-পোকা গাছের গুঁড়িতে ছিদ্র করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে, কোন কোন কুমোরে-পোকা আবার ফাঁপা বাঁশ বা নলখাগড়ার মধ্যেও বাসা বাঁধিয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় পোকা মোটেই বাসা নির্ম্মাণ করে না। বসবাস করিবার জন্য ইহাদের বাসা বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না; ডিম ও বাচ্চাদের জন্যই বাসার প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্যও যাহারা বাসা নির্ম্মাণ করে না, তাহারা বাচ্চাদের আহারোপযোগী জীবন্ত প্রাণীর শরীরের অভ্যন্তরে অথবা বহির্দ্দেশে ডিম পাড়িয়া যায়। অনেকে আবার কচি ফল বা বৃক্ষ-মুকুলের গায়ে হুল ফুটাইয়া ডিম পাড়িয়া রাখে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলেই যথেষ্ট খাদ্য পাইয়া তাহারা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠে এবং প্রাণীর দেহ ভেদ করিয়া অথবা মুকুলে ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া আসে।

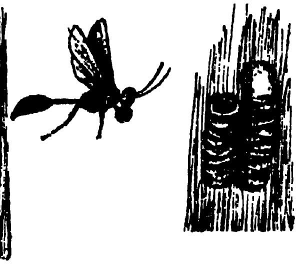


বাম দিক হইতে: ১। কুমোরে-পোকা মাকড়সা শিকার করিয়া আপাততঃ গাছের ডালে রাখিয়াছে। ২। কুমোরে-পোকা বড় মাকড়সা শিকার করিয়া উহার পাগুলি কাটিয়া দিয়াছে। ৩। মাকড়সা-শিকারী কুমোরে-পোকা।

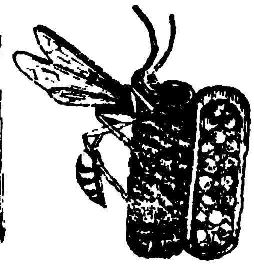
বোল্‌তা, ভীমরুল প্রভৃতি পতঙ্গের সঙ্গে অনেকাংশে দৈহিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও কুমোরে-পোকার জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বোল্‌তা, ভীমরুল, মৌমাছিরা সর্ব্বদাই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে; কিন্তু কুমোরে-পোকা সর্ব্বদাই একাকী বাস করিতে অভ্যস্ত; কখনও দলবদ্ধ ভাবে বাস করে না। বোল্‌তা, মৌমাছি প্রভৃতি প্রাণীরা দিবাবসানেই নিজ নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করে; কিন্তু বিশ্রাম করিবার জন্য কুমোরে-পোকার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। পাতার আড়ালে, গাছের ডালে বা ঘাসের ঝোপে আত্মগোপন করিয়া ইহারা রাত্র কাটাইয়া দেয়। অনেকে আবার ঘাসের ডাঁটা কামড়াইয়া ধরিয়া শরীরটাকে পাশাপাশি প্রসারিত করিয়া নিদ্রা যায়। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে বলিয়া মৌমাছি বোল্‌তা, ভীমরুল প্রভৃতির স্ত্রী পতঙ্গেরা ডিম পাড়িয়াই খালাস, বাকী সব কাজের ভার শ্রমিকদের উপর। বাচ্চাদের পরিণতি লাভ করিবার বয়স পর্য্যন্ত কর্ম্মী বা শ্রমিকরাই তাহাদের তদারক করিয়া থাকে। কিন্তু কুমোরে-পোকারা সামাজিক প্রাণী নয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে কর্ম্মী বা শ্রমিক-জাতীয় কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নাই; কাজেকাজেই স্ত্রী-কুমোরে-পোকাকে নিজে নিজেই সন্তানরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহারা সন্তানরক্ষার ব্যবস্থা করে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে মৌমাছি বা বোল্‌তার শিশুর মত প্রতিপালন করে না; বোল্‌তা বা মৌমাছিরা যেমন বাচ্চাগুলিকে আহার্য্য দ্রব্য মুখে তুলিয়া খাওয়াইয়া দেয় এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখে, কুমোরে-পোকার বাচ্চাদের সে-সব কাজ নিজেদেরই করিতে হয়। ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার পর হইতেই আহারাদি কার্য্যে বাচ্চাগুলি স্বভাবতই অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। অবস্থার চাপে পড়িয়াই হয়তো অতি শৈশব



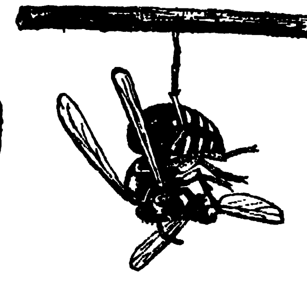
•কুমোরে-পোকা মাকড়সা শিকার করিয়া বাসায় আনিতেছে।



কুমোরে-পোকা বাসা বাঁধিবার জন্ত মাটি আনিতেছে।



কুমোরে-পোকা মাটি দিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিতেছে।



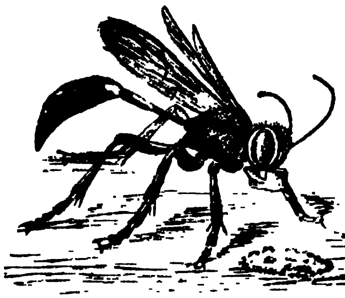
ভীমরুল এক পায়ে ঝুলিয়া শিকারের দেহ কুরিয়া খাইতেছে।

হইতে তাহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইয়াই গড়িয়া উঠিতে হইয়াছে।

বোল্‌তারা শুঁয়োপোকা বা অন্তান্ত কীটপতঙ্গের পিছু পিছু ছুটিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং তৎক্ষণাৎ শিকারের দেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া অধিকাংশই উদরসাৎ করিয়া ফেলে। সময় সময় শিকারের অবশিষ্টাংশ বহন করিয়া বাসায় লইয়া যায়। ভীমরুলেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ শিকার করিয়া, এক পায়ের সাহায্যে গাছের ডালে ঝুলিয়া, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উদরস্থ করে; কিন্তু কুমোরে-পোকা নানা জাতীয় পোকামাকড় শিকার করিলেও তাহাদিগকে কখনও ঐ শিকার উদরস্থ করিতে দেখি নাই। ফুলের মধু ও শর্করা-জাতীয় পদার্থই তাহাদিগকে খাইতে দেখিয়াছি। অবশ্য বোল্‌তা, ভীমরুল, মৌমাছিরা সকলেই শর্করা-জাতীয় পদার্থ-পরম উপাদেয় বোধে চাটিয়া খাইয়া থাকে। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই কুমোরে-পোকা নানা জাতীয় পোকামাকড় সংগ্রহ করিবার জন্ত ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করিয়া থাকে এবং শিকার পাইলেই তাহা বাচ্চাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দেয়।

আমাদের দেশে ঘরের আনাচে-কানাচে বা দেয়ালের গায়ে লম্বাটে ধরণের এবড়ো-খেবড়ো এক-একটা শুষ্ক মাটির ডেলা লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। এইগুলি এক প্রকার কালো রঙের লিক্‌লিকে কুমোরে-পোকার বাসা। এই পোকাগুলির গায়ের রং আগাগোড়া মিশ্‌মিশে কালো, কেবল শরীরের মধ্যস্থলের বোঁটার মত সরু অংশটি হল্‌দে। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ইহারা বাসা তৈয়ারী করিবার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হয়। দুই চার দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া মনোমত কোন স্থান দেখিতে পাইলেই তাহার আশেপাশে বার-বার ঘুরিয়া বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখে। তার পর খানিক দূর উড়িয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসে এবং স্থানটাকে পুনঃপুনঃ দেখিয়া লয়। দুই-তিন বার এরূপভাবে এদিক-ওদিক উড়িয়া অবশেষে কাদামাটির সন্ধানে বাহির হয়। যতটা সম্ভব নিকটবর্ত্তী স্থানে কাদামাটির সন্ধান করিতে সময় সময় দুই-এক দিন চলিয়া যায়। কাদামাটির সন্ধান পাইলেই সেই স্থান হইতে বাসানির্ম্মাণের জন্য নির্ব্বাচিত স্থানে কয়েক বার যাতায়াত করিয়া ভাল করিয়া রাস্তা চিনিয়া লয়, নচেৎ বাসা তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়া রাস্তা ভুল হইলেই বিপদ। সাধারণতঃ আশেপাশে চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ ব্যবধান হইতেই মাটি সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু তত কাছাকাছি বাসানির্ম্মাণের উপযোগী মাটি না পাইলে সময় সময় দেড়-শ দু-শ গজ দূর হইতেও মাটি সংগ্রহ করিয়া থাকে। কাছাকাছি কোন স্থান হইতে মাটি সংগ্রহ করিয়া বাসার একটা কুঠরি নির্ম্মাণ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, এমন সময় সেই স্থান হইতে কাদামাটি ঢাকা দিয়া বা সরাইয়া ফেলিয়া দেখিয়াছি—সংস্কার বশেই হউক বা বুদ্ধি করিয়াই হউক, কুমোরে-পোকা মাটির সন্ধান না পাইয়া কোন একটা জলাশয়ের পাড়ে উড়িয়া গিয়া সেখান হইতে মাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। যত বারই এরূপ করিয়াছি তত বারই দেখিয়াছি—পুকুর বা নালা-ডোবা যত দূরেই থাকুক না কেন, সেখান হইতেই ভিজামাটি আনিয়া বাসা তৈয়ারী করিয়াছে। এই সব অসুবিধার জন্ত অবশ্য বাসা নির্ম্মাণে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া যাইত। একটি কুঠরি নির্ম্মিত হইয়া গেলেই তাহার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাতে একটি মাত্র ডিম পাড়িয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং তাহারই গা ঘেঁষিয়া নূতন কুঠরি নির্ম্মাণ করিতে সুরু করে। কাজেই ইহা হইতে মনে হয় যে, কুমোরে-পোকা ইচ্ছামত ডিম পাড়িবার সময় নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

বাসানির্ম্মাণের জন্ত মাটি সংগ্রহ করিবার সময় উড়িয়া গিয়া ভিজা-মাটির উপর বসে এবং লেজ নাচাইয়া নাচাইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখে। উপযুক্ত বোধ হইলেই সেখান হইতে খুব ছোট এক ডেলা মাটি মটরের মত গোল করিয়া মুখে লইয়া উড়িয়া যায়। মাটি কুরিয়া তুলিবার সময় অতি তীক্ষ্ণ সুরে একটানা গুনগুন শব্দ করে। মুখ দিয়া চাপিয়া চাপিয়া মাটির ডেলাটিকে দেয়ালের গায়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বসাইয়া দেয়। মাটির ডেলাটিকে লম্বা করিয়া চাপিয়া বসাইবার সময়ও তীক্ষ্ণ সুরে একটানা গুনগুন শব্দ করিতে থাকে। কোন অদৃশ্য স্থানে বাসা বাঁধিবার সময়ও এই গুনগুন



অ্যামোফিলা-জাতীয় কুমোরে-পোকা মাটির ঢেলা আছাড় মারিয়া গর্ত্তের মুখ সমান করিয়া বুজাইতেছে।



অ্যামোফিলা-জাতীয় কুমোরে-পোকা গর্ত্তের দিকে শুককীটকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।



অ্যামোফিলা-জাতীয় কুমোরে-পোকা শুককীটের গায়ে হুল ফুটাইতেছে।

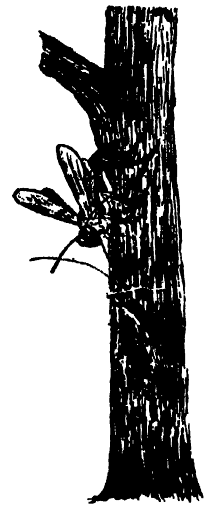
শব্দ শুনিয়াই বুঝিতে পারা যায়, কুমোরে-পোকা বাসা বাঁধিতেছে। পুকুরধারে কাদামাটির উপর মাছির মত এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহার সংগ্রহ করে। এরূপ স্থলে মাটি তুলিবার সময় ঐরূপ কোন পোকা তাহার কাছে আসিয়া পড়িলে মাটি তোলা বন্ধ করিয়া ছুটিয়া তাহাকে তাড়া করে। যাহা হউক, বার-বার এইরূপ এক এক ঢেলা মাটি আনিয়া, ভিতরের দিকে ফাঁকা রাখিয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে বাসা গাঁথিয়া তুলিতে থাকে। প্রায় সওয়া ইঞ্চি লম্বা হইলেই গাঁথুনি ক্ষান্ত করে। এরূপ একটি কুঠরি তৈয়ারী করিতে প্রায় দুই দিন সময় লাগিয়া থাকে। ইতিমধ্যে মাটি শুকাইয়া বাসা শক্ত হইয়া যায়। কুমোরে-পোকা তখন কুঠরির ভিতরে প্রবেশ করিয়া মুখ হইতে এক প্রকার লালা নিঃসৃত করে এবং তাহার সাহায্যে অভ্যন্তরস্থ দেয়ালে প্রলেপ মাখাইয়া দেয়। প্রলেপ দেওয়া শেষ হইলে শিকারের অন্বেষণে বাহির হয়। আমাদের দেশে কয়েক জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সা দেখা যায়; তাহারা জাল বোনে না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিকার ধরে। এই কুমোরে-পোকারা বাছিয়া বাছিয়া এই রূপ ভ্রমণকারী মাকড়সা শিকার করিয়া থাকে। কোন রকমে মাকড়সা এক বার চোখে পড়িলেই হইল, ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরে। কিন্তু কামড়াইয়া ধরিলেও একেবারে মারিয়া ফেলে না। শরীরে হুল ফুটাইয়া এক রকম বিষ ঢালিয়া দেয়। একবার হুল ফুটাইয়াই ইহারা নিরস্ত হয় না। কোন কোন মাকড়সাকে পাঁচ-সাত বার পর্য্যন্ত হুল ফুটাইয়া থাকে। ইহার ফলে মাকড়সাটার মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু একেবারে অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকে। তখন কুমোরে-পোকা অসাড় মাকড়সাকে মুখে করিয়া নবনির্ম্মিত কুঠরির মধ্যে উপস্থিত হয়। কুঠরির নিম্নদেশে মাকড়সাটাকে চিৎ করিয়া রাখিয়া তাহার উদরদেশের এক পাশে লম্বাটে ধরণের একটি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িয়াই আবার নূতন শিকারের সন্ধানে বহির্গত হয়। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দশ-পনরটা মাকড়সা সংগ্রহ করিয়া সেই কুঠরির মধ্যে জমা করিয়া আবার দুই তিন ঢেলা মাটি আনিয়া কুঠরির মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেয়। তার পর আবার দুই এক দিনের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত কুঠরির গায়েই আর একটি কুঠরি নির্ম্মাণ সুরু করে। সেই কুঠরিটিও মাকড়সা-পূর্ণ করিয়া তাহাতে ডিম পাড়িয়া মুখ বন্ধ করিবার পর তৃতীয় কুঠরি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে, একটি বাসার মধ্যে চার-পাঁচটি কুঠরি নির্ম্মিত হয়। ডিমপাড়া সম্পূর্ণ হইয়া গেলে সে তাহার ইচ্ছামত যে কোন স্থানে চলিয়া যায়, বাসার আর কোন খোঁজখবরই লয় না। বাচ্চাদের জন্য খাদ্য সঞ্চিত রাখিয়াই সে খালাস।

দুই-এক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চা সরু লম্বাটে হাতপা-শূন্য পোকা মাত্র। ডিম হইতে বাহির হইবার পর হইতেই বাচ্চাটি মাকড়সার দেহ খাইতে আরম্ভ করে। একটি খাওয়া শেষ হইলেই আর একটিকে খাইতে আরম্ভ করে। দিন-রাত তাহার খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নাই। খাইতে খাইতে প্রায় সাত-আট দিনের মধ্যেই সবগুলি মাকড়সাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কিন্তু আকৃতি বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় না। ডিম পাড়িবার পাঁচ-ছয় দিন পরে কুমোরে-পোকার বাসা ভাঙিয়া দেখিয়াছি—বাচ্চাগুলি বেশ বড় হইয়াছে, মাকড়সাগুলি তখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় নাই, কিন্তু এত দিন পরেও সবগুলি মাকড়সাই জীবিত ছিল যদিও সম্পূর্ণরূপে অসাড়। একটু জোরে সুড়সুড়ি দিলেই হাত-পা নাড়িয়া সাড়া দিত। মারিয়া ফেলিলে নিশ্চয়ই এত দিনে পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। বাচ্চাগুলি যাহাতে রোজ রোজ টাটকা খাদ্য পায় তাহার জন্যই কুমোরে-পোকা শিকারগুলিকে অসাড় করিয়া রাখিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে।

এক-একটি কুঠরির মাকড়সাগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইলেই বাচ্চাগুলি কয়েক ঘণ্টা চুপ করিয়া অবস্থান করে। তার পর মুখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে এক প্রকার সূক্ষ্ম সূতার জাল বুনিতে থাকে। প্রায় দুই দিনের চেষ্টায় শরীরের চতুর্দ্দিকে খোলসের মত এক প্রকার আবরণ পড়িয়া উঠে। বাচ্চাটি সেই আবরণের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। এই সময়ে বাচ্চা ধীরে ধীরে



কালো রঙের কুমোরে-পোকা ঘাসের গায়ে নিদ্রিত।

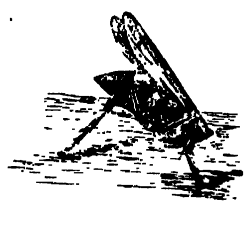


নীল রঙের কুমোরে-পোকা জীবন্ত আরশুলাকে গাছের উপরে গর্ত্তের দিকে লইয়া যাইতেছে।

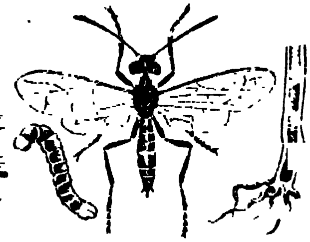
পূর্ণাঙ্গ পুত্তলীর রূপ ধারণ করে। কিছু দিন পরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হইলে মাটির আবরণ ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া যায়।

মাকড়সা-শিকারী কুমোরে-পোকাদের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন জাতীয় পোকা বিভিন্ন জাতীয় অথবা এক গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মাকড়সাই সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রত্যেকের বাসার মধ্যেই একই শ্রেণীর মাকড়সাই দেখিতে পাওয়া যায়। খুব ক্ষুদ্র কয়েক জাতীয় কুমোরে-পোকা দেখা যায়, তাহারা কেবল বাছিয়া বাছিয়া পিঁপড়ে-মাকড়সাই বাচ্চাদের জন্ত সংগ্রহ করিয়া রাখে। কেহ কেহ আবার বিভিন্ন জাতীয় জাল-বোনা মাকড়সাকে জাল হইতে ধরিয়া লইয়া আসে। কুমোরে-পোকাকে জাল-বোনা মাকড়সা শিকার করিতে যেরূপ কৌশল ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে দেখিয়াছি তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। এক প্রকার কুঁজো-মাকড়সা তাঁবুর মত বাসা নির্ম্মাণ করে এবং তাহারা একসঙ্গে বহু তাঁবু খাটাইয়া দলে দলে বাস করিয়া থাকে। তাঁবুর জালের বুনানি সাধারণ মাকড়সার জালের মত নহে। ইহা ঠিক সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট তারের জালের মত। জালগুলি কাপড়ের মত টানা-পোড়েনে বোনা। নীচে এক থাক বা দুই থাক চাঁদোয়া বিস্তৃত। মধ্যস্থলে মাকড়সা মালার আকারে ডিম পাড়িয়া অতি সুরক্ষিত অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। বাস্তবিকই অন্যান্ত জালবোনা মাকড়সারা যেরূপ অরক্ষিত ভাবে জালে বাস করে, ইহাদের অবস্থানক্ষেত্র মোটেই সেরূপ নহে। ছোট ছোট শত্রুর পক্ষে ইহা একরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গবিশেষ। চতুর্দ্দিকে বহু বাসা একত্র থাকায় ইহাদের প্রবেশপথ শত্রুর পক্ষে আরও অগম্য হইয়া উঠে। কিন্তু সূচের মত সরু প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার নীল রঙের কুমোরে-পোকা অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বিভিন্ন ফাঁক-ফন্দীতে সেই বাসার মধ্যে ঢুকিয়া মাকড়সাকে আক্রমণ করে। 'ঘুরিয়া ফিরিয়া' বলিলাম এই জন্ত যে জাল ছিঁড়িয়া সোজা-সুজি মাকড়সাকে ধরিবার চেষ্টা করিলেই কুমোরে-পোকার বিপদ অবশ্যম্ভাবী, কারণ জালের আঠায় তাহাকে জড়াইয়া পড়িতেই হইবে। কাজেই তাহাকে ফাঁক-ফন্দী দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। মাকড়সা এই জাতীয় কুমোরে-পোকা অপেক্ষা আকারে বড় হইলেও শত্রুর ভয়ে কম্পিত কলেবরে ছুটাছুটি করিয়া এক বাসা হইতে আর এক বাসায় বা একই বাসার ভিতরে বাহিরে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কুমোরে-পোকা চিৎ হইয়া, কাং হইয়া কখনও উড়িয়া কখনও বা ছুটাছুটি করিয়া, যেন একেবারে মরিয়া হইয়াই শিকার আক্রমণ করে। একটি মাকড়সার পিছনে কুমোরে-পোকা লাগিতে দেখিবামাত্রই একসঙ্গে সংলগ্ন সকল বাসার মাকড়সারা বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন নিভৃত স্থানে এমন ভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকে যে শত চেষ্টা করিলেও তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

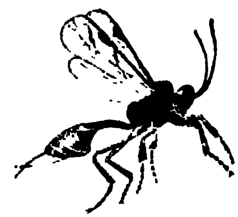
আর এক জাতীয় মাঝারি-আকৃতির কুমোরে-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ডিম পাড়িবার জন্ত কখনও বাসা নির্ম্মাণ করে না। তাহারা বড় বড় এক জাতীয় কাঁকড়া-মাকড়সার গায়ে ডিম পাড়িয়া যায়। এই মাকড়সারা পাতা মুড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করিয়া অধিকাংশ সময়েই তাহার মধ্যে অবস্থান করে। কুমোরে-পোকা ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলেই তাহাদিগকে বাসার মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করে। এই মাকড়সাদের বাসায় দুইটি করিয়া দরজা থাকে। কুমোরে-পোকাকে এক দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে দেখিয়া মাকড়সা অন্ত দরজা দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণভয়ে ছুটিতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই শত্রুর হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই। পিছু তাড়া করিয়া কুমোরে-পোকা তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং কোনরূপে আহত না করিয়া তাহার পেটের এক পাশে একটি ডিম পাড়িয়া যায়। ডিমটি তাহার গায়ে আঠার মত লাগিয়া থাকে। ডিম পাড়িবার পরক্ষণেই এরূপ একটা মাকড়সাকে ধরিয়া বড় কাচপাত্রে রাখিয়া দেখিয়াছিলাম। প্রথম দিন অপরাহ্নের দিকে ডিম পাড়িয়াছিল। দ্বিতীয় দিন সকালবেলায় দেখিলাম ডিমটা যেন অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু একই জায়গায় লাগিয়া রহিয়াছে। প্রায় এগারটার সময় দেখিলাম বেশ পরিষ্কার বাচ্চার আকার ধারণ করিয়াছে এবং মাকড়সার রস শুষিয়া লইবার প্রক্রিয়াটাও স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার শরীরের বৃদ্ধি যেন ক্রমশই দ্রুততর হইয়া উঠিতেছিল। মাকড়সাটা এতক্ষণ পর্য্যন্ত বেশ স্বাভাবিক ভাবেই নড়াচড়া করিতেছিল। কিন্তু প্রায় একটার সময় দেখিলাম বাচ্চাটি অনেক মোটা ও বড় হইয়া উঠিয়াছে এবং মাকড়সার পেটটা যেন অনেক চুপসিয়া গিয়াছে। মাকড়সাটা তখন এক স্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—বেশী নড়াচড়ার ক্ষমতা নাই। দুইটার পর হইতেই



উইচিংড়ি-শিকারী কুমোরে-পোকা মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িতেছে।



কুমোরে-পোকারা গাছে গর্ত্ত করিয়া ডিম পাড়ে। (বামে, কুমোরে-পোকার বাচ্চা)।

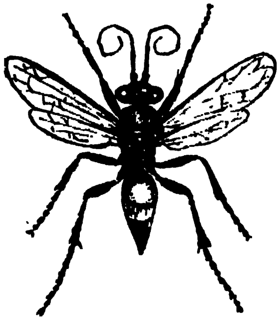


ধোবি-পোকা

বাচ্চাটা যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পেটটাকে কুরিয়া খাইয়া ঠ্যাংগুলিকে একটি একটি করিয়া নিঃশেষ করিতে লাগিল। প্রায় ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই এত বড় একটা মাকড়সাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। খাওয়া শেষ হইলে বাচ্চাটা প্রায় ঘণ্টা-দুই বিশ্রামের পর মুখ নাড়িয়া নাড়িয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে সুতা বুনিতে লাগিল। আড়াই ঘণ্টার পর শরীরের চতুর্দ্দিকে একটা পাতলা স্বচ্ছ আবরণ গঠিত হইল। তার পর দিন দেখি, আবরণ আরও কঠিন অস্বচ্ছ কালচে বাদামী রং ধারণ করিয়াছে। প্রায় এক মাস পরে পূর্ণাঙ্গ কুমোরে-পোকা গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

পরিত্যক্ত জমির বেলেমাটির উপর একটু নজর রাখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, নানা জাতীয় উজ্জ্বল নীল সোনালী বা হলদে রঙের বড় বড় কুমোরে-পোকা গর্ত্ত খুঁড়িতে ব্যাপৃত রহিয়াছে। ইহাদের অনেকগুলিই এক ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। মাটির নীচে তির্য্যক্ ভাবে ৬.৭ ইঞ্চি গর্ত্ত খুঁড়িয়া নিম্ন প্রান্ত অপেক্ষাকৃত চওড়া করিয়া বাটির মত করে। ইহারাও ডিম পাড়িবার সময় হইলেই গর্ত্ত খুঁড়িয়া থাকে। গর্ত্ত খুঁড়িবার সময় প্রথমতঃ পা দিয়া মাটি দূরে ছড়াইয়া ফেলে। গর্ত্ত যতই নীচে নামিতে থাকে, শরীরের অধিকাংশই নীচে ঢুকিয়া যাইবার দরুন আর পা দিয়া মাটি ছড়াইতে পারে না। তখন সে মুখে করিয়া মাটি তুলিয়া আনিয়া দূরে লইয়া ফেলিতে থাকে। এই ভাবে গর্ত্তনির্ম্মাণ শেষ হইলে সে শিকারের সন্ধানে বহির্গত হয়। নীল বর্ণের বড় বড় কুমোরে-পোকারা উইচিংড়ি শিকার করিয়া থাকে। কেহ কেহ পঙ্গপাল অথবা বড় বড় কয়ার ফড়িং শিকার করিয়া থাকে। উইচিংড়ি শিকার করিবার জন্ত ইহারা তাহাদের গর্ত্ত খুঁজিয়া বেড়াইতে থাকে। কয়েক জাতীয় বড় বড় উইচিংড়ি মাটির নীচে দু-মুখো গর্ত্ত করিয়া বাস করে। ইহারা কিছুতেই আলোতে আসিতে চায় না। দিনের বেলায় চুপ করিয়া থাকে—সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলেই সকলে মিলিয়া অতি তীক্ষ্ণস্বরে একটানা ঝিন্ ঝিন্ শব্দ করিতে থাকে। দিনের বেলাও সময় সময় শব্দ করিয়া থাকে। দিনের বেলায় একটু নিস্তব্ধ অবস্থা বুঝিতে পারিলেই লম্বা লম্বা শুঁড় দুইটাকে গর্ত্তের মুখে একটুখানি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে আন্দোলন করিতে থাকে। কুমোরে-পোকারা ঘুরিতে ঘুরিতে এই শুঁড়ের আন্দোলন দেখিয়াই তাহাদের গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু গর্ত্তের মধ্যে তাহাদিগকে ধরা খুবই শক্ত ব্যাপার। কুমোরে-পোকা গর্ত্তে ঢুকিবামাত্রই উইচিংড়ি অপর মুখ দিয়া লাফাইয়া বাহিরে আসে। ইহারা এক এক লাফে প্রায় দুই-তিন হাত জায়গা অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু এত দ্রুতগতিতে লাফাইয়াও তাহারা কুমোরে-পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। কুমোরে-পোকা তৎপরতার সহিত উড়িতে উড়িতে তাহাকে অনুসরণ করিয়া সুযোগ পাইলেই ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিয়া হুল ফুটাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু সহজে উইচিংড়িকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর উইচিংড়িটা কিছু নিস্তেজ হইয়া পড়িলে তাহার শরীরের নিম্নাংশে ও ঘাড়ের কাছে কয়েক বার হুল ফুটাইয়া দিলেই সে একেবারে অসাড় হইয়া পড়ে। তখন কুমোরে-পোকা শিকারটাকে সেখানে রাখিয়া চারি দিকে কিছুক্ষণ উড়িয়া দেখে, বোধ হয় রাস্তা ঠিক করিয়া লয়। তার পর অসাড় অবস্থায় পতিত উইচিংড়িটাকে চিৎ করিয়া গলার কাছে কামড়াইয়া ধরিয়া উড়িয়া যাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু এত ভারী শিকার সহ একটানা উড়িয়া যাইতে পারে না। খানিক দূর উড়িয়াই আবার মাটিতে অবতরণ করে এবং একই ভাবে ধরিয়া পোকাটাকে মাটি বা ঘাসের উপর দিয়া ঘসড়াইয়া লইয়া যাইতে থাকে। আবার খানিক দূর উড়িয়া যায়। এরূপ ভাবে শিকারকে গর্ত্তের কাছে আনিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া একটু এদিক-ওদিক দেখিয়া গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। অল্প ক্ষণ পরেই বাহির হইয়া আসিয়া শিকারটাকে পূর্ব্ববৎ কামড়াইয়া ধরিয়া গর্ত্তের মধ্যে লইয়া যায়। যদি এই ভাবে গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিতে না পারে তবে শিকারের শুঁড় ধরিয়া গর্ত্তে টানিয়া নামায়। শিকারটাকে গর্ত্তের প্রশস্ত স্থানে রাখিয়া তাহার পেটের দিকে একটি ডিম পাড়িয়া প্রায় দশ-বার মিনিট পরেই বাহিরে চলিয়া আসে। বাহিরে আসিয়া চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিবার পর পায়ের সাহায্যে আলগা মাটিগুলিকে গর্ত্তের ভিতর ফেলিয়া মুখ বুজাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। শিকার আকারে ছোট হইলে সময় সময় দুটি উইচিংড়িও একই গর্ত্তে রাখিয়া দিতে দেখা যায়। উইচিংড়ির দেহ সম্পূর্ণরূপে খাইয়া ফেলিবার পর বাচ্চা গুটি বাঁধে এবং প্রায় মাসাধিক কাল পরে পূর্ণাঙ্গ কুমোরে-পোকা মাটি সরাইয়া বাহির হইয়া আসে।

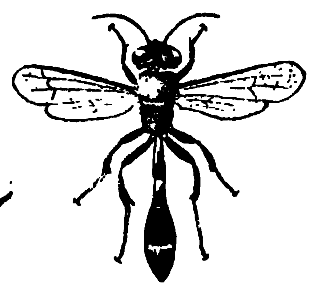
যাহারা মাটিতে গর্ত্ত করিয়া ডিম পাড়ে তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতীয় কুমোরে-পোকা কেবল মাকড়সাই শিকার করিয়া আনে। বড় মাকড়সা শিকার করিয়া তাহার সব কয়টি ঠ্যাং কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, শুধু দেহটা বাসায় লইয়া আসে। অপেক্ষাকৃত ছোট-



'ক্যালিকারগ্যাস্'-জাতীয় কুমোরে-পোকা।



শুঁয়োপোকার গায়ে ক্ষুদ্রকায় কালো রঙের কুমোরে-পোকার গুটি।



এই কুমোরে-পোকারা গাছের গায়ে ছিদ্র করিয়া বাসা তৈরি করিয়া থাকে।

মাকড়সা হইলে তাহাদের ঠ্যাং সহই রাখিয়া দেয়, বাসার কাছে আনিয়া শিকার বেহাত হইবার ভয়েই বোধ হয় অনেক সময় ছোট ছোট গাছপালার ডালের উপর রাখিয়া দেয় এবং গর্তের ভিতর তদারক করিয়া আসিয়া শিকার ভিতরে লইয়া যায়। ইহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন গর্ত খুঁড়িয়া প্রত্যেক গর্তে একটিমাত্র ডিম পাড়িয়া রাখে।

কোন কোন জাতীয় বড় বড় কুমোরে-পোকারা 'মথ'-জাতীয় প্রজাপতির বড় বড় শূককীটই বাছিয়া বাছিয়া শিকার করে। এই শূককীটরা পাতার রঙের সঙ্গে গায়ের রং মিলাইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে; কিন্তু কুমোরে-পোকার চোখ এড়াইবার উপায় নাই। তাহারা শূককীটকে ঘাড়ে কামড় দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয় এবং অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর শরীরের নানা স্থানে হুল বিদ্ধ করিয়া অসাড় করিয়া ফেলে। তার পর গলায় কামড়াইয়া টানিতে টানিতে বাসায় লইয়া যায়। এই শূককীটগুলি সময় সময় এত বড় হয় যে গর্তের ভিতর প্রবেশ করাইতে পারে না, কাজেই শিকার বাহিরে রাখিয়া গর্ত অধিকতর প্রশস্ত করিয়া লয়। তার পর তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া যায়। ডিম পাড়িবার পর গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া ইহারা এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া থাকে। এক খণ্ড ভারী মাটির টুকরা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে গর্তের মুখে বার-বার আছাড় মারিতে থাকে। ইহাতে নরম মাটি চাপিয়া বসিয়া গর্তের স্থানটি আশেপাশের জায়গার সহিত বেমালুম মিশিয়া যায়। শত্রুর চোখে ধূলি দিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

অনেক জাতের কুমোরে-পোকা গাছের গুঁড়িতে ছিদ্র করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। তাহারা বাচ্চার আহারের জন্য নানা জাতীয় পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ধরিয়া লইয়া সঞ্চিত করিয়া রাখে। উজ্জ্বল নীল রঙের কতকটা ভীমরুলের' মত দেখিতে এক জাতীয় কুমোরে-পোকা এদেশে গাছের উপর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ছোট বড় নানা জাতীয় আরসোলা ধরিয়া বাসায় লইয়া যায়। এই আরসোলা-শিকার দুই বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। শিবপুরের বাগানে ও সুন্দরবনের এক স্থানে একই রকম ঘটনা দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির উপর একটা মাঝারি গোছের কুমোরে-পোকা একটা জীবন্ত আরসোলাকে শুঁড়ে ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আরসোলাটাও দিব্য হাঁটিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে। খানিক দূর গিয়াই কুমোরে-পোকাটা আরসোলাটাকে ছাড়িয়া দিয়া গাছের উপরে বাসাটা দেখিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আরসোলাটা যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানেই ঠায় দাঁড়াইয়া ছিল। আবার আসিয়া কুমোরে-পোকা তাহাকে শুঁড়ে ধরিয়া টানিয়া খানিক দূর উপরে লইয়া গিয়া এক স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। এই ফাঁকে একটা কাঠি দিয়া আরসোলাটাকে অন্য স্থানে ঠেলিয়া দিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আরসোলাটা পুনরায় ঘুরিয়া আসিয়া ঠিক পূর্ব্বস্থানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইল। যত বার আরসোলাটাকে সরাইয়া দিলাম, তত বারই সে ঠিক পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুন্দরবনেও ঠিক একই রকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। আরসোলাটা ভয়ে সম্মোহিত হইয়া অথবা কোন অদ্ভুত বিষের ক্রিয়ায় এরূপ কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা আজও বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের দেশে পুরনো দেয়ালের গায়ে অথবা কোন পরিত্যক্ত স্থানে কালো রঙের এক প্রকার অদ্ভুত পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে একটা সাধারণ কুমোরে-পোকার মত। কিন্তু শরীরের পশ্চাদ্ভাগ এত ক্ষুদ্র যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীরের এই অসামঞ্জস্য ভয়ানক চোখে লাগে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ ধোবি-পোকা বলে। এই ধোবি-পোকা কোন বাসা নির্ম্মাণ করে না। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ইহারা গাছের ডালের কচি ডগার অভ্যন্তরে হুল ফুটাইয়া ডিম পাড়িয়া রাখে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চাগুলি গাছের কোমল অংশ আহার করিয়া বাড়িতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডগার আহত অংশও অসম্ভব রূপে ফুলিয়া উঠে। বাচ্চাগুলি পরিণতি লাভ করিয়া গাছের গায়ে ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া আসে। আমাদের দেশে এই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর পোকা দেখিতে পাওয়া যায়।

এক-চতুর্থ ইঞ্চি বা আরও ক্ষুদ্রকায় বহু জাতের কুমোরে-পোকারও আমাদের দেশে অভাব নাই। ইহাদের অনেকগুলিই বাসা নির্ম্মাণ করে না। কোন জীবন্ত প্রাণীর শরীরে ডিম পাড়িয়া যায়। আমাদের দেশে এক ইঞ্চির প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ পরিমাণ এক জাতীয় কুমোরে-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাদা শুঁয়াবিশিষ্ট শুঁয়োপোকার শরীরে হুল ফুটাইয়া

ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম পাড়িবার প্রায় আট-দশ দিন পরে শুঁয়ো-পোকাটা ক্রমশঃ নির্জীব হইয়া পড়িতে থাকে। পূর্ব্ব হইতেই তাহার আহার-বিহারে অরুচি ধরিতে থাকে। তার পর ধীরে ধীরে বন-জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া কোন পরিষ্কার স্থানে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এক স্থানে চুপ করিয়া বসিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখা যায় তাহার শরীরের ভিতর হইতে চামড়া ছিদ্র করিয়া একের পর একটি করিয়া, সুতার মত সরু সরু প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি ছোট বাচ্চা বাহির হইয়া আসিতেছে। বাচ্চাগুলি বাহিরে আসিবামাত্রই তাহার শুঁয়াগুলির মধ্যে থাকিয়া শরীরটাকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে মোচড়াইতে মোচড়াইতে সুতা বাহির করে এবং শরীরের চতুর্দ্দিকে গুটি বাঁধিতে থাকে। বিশ হইতে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সবগুলি বাচ্চাই গুটি প্রস্তুত করিয়া ফেলে এবং এক-একটি চাউলের মত সাদা সাদা গুটি শুঁয়োপোকাটার গায়ে লাগিয়া থাকে। শুঁয়োপোকাটা তখন ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ছয়-সাত দিন থাকিবার পর ছোট ছোট পূর্ণাঙ্গ পোকাগুলি গুটি কাটিয়া উড়িয়া যায়।

প্রণয়-কলহ

ব্রাউনিঙের A Lover's Quarrel হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

কি মধুর উষার আভাস!
শ্রাবণ পরেছে যেন আশ্বিনের রৌদ্রপীত বাস!
সারা নিশি বাদলধারায়
ধৌত নভে নীলিমা ঘনায়,
শুকায় দখিনা বায়ে বনানীর আর্দ্র বাসখানি,
কোথা মোর হৃদয়ের রাণী?
আঁখি মোর নভোনীলে বুলায় যে ধূসর গুলানি!

বারিধারা ভরে ঝরণায়,
নৃত্যপরা নির্ঝরিণী গিরিমূলে কলকণ্ঠে ধায়;
উপলে উপলে তোলে সুর
ফেনোচ্ছ্বাসে মুখর নূপুর,
কোমল পিচ্ছিল পদ প্রহরণে মসৃণপ্রস্তর
সুচিকণ যোগীর কন্দর,
প্রতি শিলা গানে গানে ভুলাত যে প্রিয়ার অন্তর।

প্রিয়তমা! তিন মাস গত!
তার পূর্ব্বে দু-জনায় ছিনু বন্দী এ কক্ষে সতত।
তুষার-আসারে রুদ্ধদ্বার,
হিমবায়ু করিত হুঁকার,
তার খর শরজাল পারিত না পশিতে কুটীরে,
নিভাইতে অগ্নিকুণ্ডটিরে,
সেবিতাম সে আতপ পরস্পরে ভুজবন্ধে ঘিরে।

অকারণ পুলকের হাসি!
কত খেলা খড়কুটা লয়ে দোঁহে বসি' পাশাপাশি!
ছাই দিয়া আঁকি আমি তার
ব্যঙ্গচিত্র, সে আঁকে আমার;
তিলমাত্র খুঁৎটিরে চিত্রে করি তাল পরিমাণ,
কলরবে কক্ষ কম্পমান,
মন্দির তিমিরে মোরা কম্প্রপক্ষ কপোত সমান!

দৈনিকে আছে কি সমাচার?
—ভৎর্সনা সম্রাট্ ওঁরে, একি তাঁর নির্লাজ আচার!
বৃদ্ধ রাজা রূপসী কিশোরী
আনিয়াছে পাটরাণী করি!

মহিষী রূপসী যত বুড়া তত সরমবিহীন,
সিংহাসনে সুখে সমাসীন
রাজা-রাণী ; স্বর্ণচূর্ণে সম্রাজ্ঞীর কুন্তল রঙীন্!

মাঠখানি ভরিয়া কেবল
সবুজে সোনালী আভা দিক্‌দিগন্তে করে ঝলমল
সরিষার ক্ষেতখানি ভরি'
কাঁচা সোনা ফুটেছে শিহরি!
অচঞ্চল দৃশ্যপট সহসা উতলা হয়ে ওঠে,
মত্ত অশ্ব উর্দ্ধশ্বাসে ছোটে
বাঁকায়ে কাজল গ্রীবা, চক্ষে তার বহ্নিদীপ্তি ফোটে!

লঘুস্পর্শে টেবিল ঘুরায়ে
অঙ্গুলির নখরাগ্রে ঐকান্তিক এষণা ঝরায়ে,
আনিব কি মিলিয়া দুজনে
প্রেত-আত্মা জড়ের বন্ধনে ?
জালিয়া তুলিব দোঁহে অদৃশ্য সে রহস্য-অনল ?
কে বা দেখে ? বোঝা যে বিরল!
আর সবে আজীবন শিক্ষা লাভ করুক কেবল!

তার পরে দোঁহে গলাগলি,
স্বাদ-বৈচিত্র্যের লাগি মন-সুখে বনপথে চলি।
পায়চারি করি দু-জনাতে,
যেন জাহাজের ক্ষুদ্র ছাদে
উত্তাল তরঙ্গ মাঝে মোরা দুটি বিপন্ন নাবিক,
রক্ষা নাই, শূন্য দিগ্‌বিদিক্!
নাই থাক্, গাঢ় আলিঙ্গন দোঁহে বরাভয় দিক্।

কি সাজে সেজেছে বধূ মোর,
আপাদমস্তক ঢাকা পশমী প্রচ্ছদে ঘনঘোর।
কুরঙ্গবাহিত ক্ষিপ্ররথে
তুষার আস্তীর্ণ বনপথে
বাহিরিবে মোর সনে, গলবন্ধ উরসে লুটায়,
ভুজবল্লী গুণ্ঠনে লুকায়,
কভু মুক্ত বাহু দুটি প্রিয়া মোর দুলায় হেলায়।

হাতপাখাখানি পদ্মকরে
বিদেশিনী রূপসীরা কেমনে দুলায় লীলাভরে,
না শিখাও যদি, তাহা হ'লে
দিব আঁকি অধরে কপোলে
পুরুষের শ্মশ্রুরেখা অঙ্গারের মসীলিপি টানে,
মরাল চঞ্চুর মাঝখানে
দুটি কালো ফোঁটা যথা গোঁফের আমেজ চোখে আনে।

প্রিয়তমা, তিন মাস আগে
ঐন্দ্রজালিকের সম সুকোমল পরশ-সোহাগে
শীত-ঋতু বুলাইয়া হাত
ধরণীরে দিল মূর্চ্ছাঘাত।
মাহেন্দ্র সুযোগ যেন লভেছিনু উন্মোচিতে হিয়া,
মূর্চ্ছাতুর ছিল যে ভুলিয়া,
যে সম্মোহ হিমস্পর্শ দিয়াছিল নিঃশব্দে হানিয়া।

হায় প্রিয়া, তিন মাস আগে,
স্নেহমনে অবিভিন্ন ছিনু মোরা নব অনুরাগে।
তার পরে এক দিন সাঁঝে,
প্রণয়ের অগ্নিকুণ্ড মাঝে
নিয়তির কমণ্ডলু দিল ঢালি নির্ব্বাপন-বারি ;
বিদ্বেষের খর তরবারি
কাটিল মিলনগ্রন্থি, হ'লে তুমি বিমুখিনী নারী।

নয় তাহা মরমের বাণী,
নিঃশ্বাসে বুদ্বুদ সম ফুটেছিল জানি।
নয় ঘৃণা, দাম্ভিকতা নয়,
নয় শ্লেষ কটূক্তিনিচয়,
শুধু একটিমাত্র কথা নিদারুণ হেন শক্তি ধরে ?
জন্মমৃত্যু রসনাগ্র 'পরে ?
কথা কত মারাত্মক হ'তে পারে বুঝিনু অন্তরে।

ওগো নারী, বঞ্চিবে কি মোরে ?
একটিমাত্র বাক্যভরে ছিঁড়িবে কি চিরন্তন ডোরে ?

তোমার তুমি যে হই আমি
সে-কথা জানেন অন্তর্য্যামী,
অবিভিন্ন তুমি আমি এক দিন ছিলাম অতীতে ;
আমারে কি পারিবে ভুলিতে,
প্রাণের পসরাখানি যার সাথে ভরিয়া তুলিতে ?

হায় প্রিয়া, অন্তরে আমার
কি আলো ঢেলেছ তুমি আঁখি মেলি যদি একবার
দেখিতে, বুঝিতে অনুভবে,
চিরদিন তুমি মোর র'বে,
সত্য শিব সুন্দরের শুভ্রতার অপ্রমেয় খনি।
নিমেষের পরমাদ ভুলিতে অমনি,
মসীবিন্দু শুভ্রতারে করে কভু কাজলবরণী ?

একটিমাত্র চপল কথায়
কিবা আসে যায় ? যদি ভীমরুল হুলটি ফুটায়
বক্ষোপরি শুধু ক্ষণতরে,
বিষ-দংশে দেহ পুড়ে মরে।
চক্ষে যদি পড়ে কণা কানা হই অমনি নিমেষে,
কুটামাত্র কর্ণরন্ধ্রে এসে
মস্তিষ্কে অঙ্কুশ সম বারংবার বিঁধে না কি শেষে ?

ভালমন্দ যাহা হোক্ ধরা
গ্রাহ্য বড় করি নাকো, মোর স্তুতি নিন্দার পসরা
সর্ব্বসহা বসুধার ভার
গুরুতর করিবে না আর।
সহ্য করা নহে বড় সুকঠিন দুঃখের সংসারে,
শুধু আছে এক ব্যথা, যারে
কদাচিৎ লভে নর, লভিলে সহিতে নাহি পারে।

এসেছে, বা আসিবে অচিরে
ঋতুরাজ, কুঞ্জে কুঞ্জে মঞ্জরীরা আসিতেছে ফিরে,
আবার শুনিব সেই সুর
ললিত পঞ্চমে সুমধুর
শুধু মধুকণ্ঠ ছাড়া সে বাণী জানে না কেহ আর।

রাশি রাশি কুসুমসম্ভার
জাগাবে পুরাণ স্মৃতি, বহিবে সে বোবা বেদনার।

হিমহানা মাঘ যদি আসি'
থামাত পাখীর গান ঝরাইত কুসুমের হাসি
তার রথচক্রের ঘর্ঘরে
নিদারুণ কশার মর্ম্মরে
হাসিতাম মহানন্দে, হেরি দৈত্য ভূধর সমান
হেসেছিল অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ
বীর যথা, রূপকথান্তে যার পৌরুষের গান।

যে ঐশ্বর্য্য-বলে ভাবি মনে
অনায়াসে সঙ্গীহীন একাকীত্ব সহিব নির্জ্জনে,
দোসরের তরে এ হৃদয়
সর্ব্বহারা নিরাকুল নয়,
সে সম্পদ লুপ্ত যদি হয়, যদি নিভে রবিশশী
তাহা হ'লে আমি ও প্রেয়সী
যেন দোঁহে এক সাথে শূন্য এক গুহামাঝে পশি।

সে শূন্য গহ্বরে পরস্পরে
কাঁদিয়া শুধাব প্রশ্ন—"শূন্য হিয়া কেন হিমে মরে ?"
মোর সম মরণপাণ্ডুর
আছে হিয়া, যারে মোর সুর
নিমেষে বাঁচাতে পারে হর্ষোদ্দীপ্ত জীবন-স্পন্দনে
বাঁচিব, কি মরিব দুজনে
বল আগে ? তার পরে হব সিক্ত অশ্রুপ্লাবনে।

বুঝি সে ভুলিবে সর্ব্ব গ্লানি
মার্জ্জনা করিবে মোরে আগেকার মত, আমি জানি।
শব্দহীন নিশি দ্বিপ্রহর,
দেরি নাই, সে আসি' সত্বর
দুয়ারে হানিবে কর তুচ্ছ করি ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত,
দ্বার খুলি ধরি তার হাত
বক্ষে তারে লব টানি, নিত্যকাল রব একসাথ।

স্বপ্নবিলাসী

গল্লিতা দেবী

পাহাড়ের গায়ে ঝুলে আছে একটি ছোট্ট আরামকুঞ্জ, যাযাবরের বাসায় অরকিড-রঙিন স্নিগ্ধ ছায়া, মেঘের নীল ডানার তলায় ঘুমন্ত নীড়। ছিটকে-আসা পড়ন্ত রোদ সাদা পাল তুলে দেয় পাহাড়ের গায়ে, হালকা তার গতি, বিরহীর স্বপ্ন মিলনের সারি গানের মতো। মন্দিরার শৈলকুঞ্জগৃহ, নাম তার "আরাধনা" সেখানে পৌঁছল কবি নরেশের খ্যাতি। কবির প্রথম আসায় শহর সজাগ হয়ে উঠেছে, মজলিশের বিচিত্র আয়োজন। মন্দিরার দুরুদুরু করছে বুক, অনেক দিন পরে অযাচিত দেখা, শহরের ভিড়ের মধ্যে। মহিলা-রক্ষিণীরা নরেশদাকে ঘিরে ব্যূহ বানিয়েছে, জোড়া জোড়া চোখের তীব্র কটাক্ষ এড়িয়ে সে দাঁড়াল গিয়ে বেদীর কাছে। অবিশ্রাম মেয়েলী ন্যাকামিতে দম আটকে আসা হাওয়া, সাধনার মুখসের তলায় হ্যাংলামির প্রচ্ছন্ন রূপ।

কবির সিল্কের চাদর খসে পড়েছে অনবধানতায় কাঁধ থেকে। প্রহেলিকা-আঁকা মুখ, বসন্তের স্বপ্নবিলাসী কবি—চিনে নিল পুরোনো বন্ধুকে। ঝাপসা অতীতের পুরবীর শেষ তান মনে যে এখনো লাগা। হাততালি ক্ষীণ হয়ে এল পদ্য আবৃত্তির শেষে। নিচু গলায় মন্দিরা মিনতি করে বললে, "নরেশদা, এমন ক'রে চলবে না। আমার বাড়ি চলুন; এমনি ক'রে কি স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।"

বাধাশূন্য নরেশের মন হালকা প্রজাপতি। ফুলের গন্ধ তাকে টানে, পথের খবর রাখে না। এ অযাচিত আমন্ত্রণ গ্রহণে দ্বিধা হবে কেন। মেয়েরা সভার শেষে নরেশদাকে ঘিরে ধরে, অটোগ্রাফের হরির লুট বিলিয়ে উঠে পড়েন মন্দিরার রথে। পরস্পরের চাপা গলার ঠাট্টা ভীড়ের গুঞ্জনে শোনা যায়। "ত্রেতায় সুভদ্রা-হরণ কি কলিতে কবিহরণ পালার রূপ নিল।" ভক্ত মেয়েরা মুগ্ধ চোখে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, নির্বাক, নিশ্চল।

"আরাধনা"র কুঞ্জ আতিথ্যের বদান্যতায় পূর্ণ। রূপে রঙে, সৌরভে, কোথাও সংকোচ নেই। ফুল তার সমস্ত পাপড়ি খুলে ধরেছে কোন পূর্ণিমার অপেক্ষায়।

নরেশদার অসম্পূর্ণ ইচ্ছার ইঙ্গিতে সেবায় ভরে উঠেছে নিপুণ হাতের ডালা, ত্রুটি থাকে নি কোথাও। কবি ভান করেন তাঁর নির্লিপ্ত মন সজাগ নয় রমণীর প্ররোচনায়।

বসন্ত-পঞ্চমীতে শহরবাসীরা সংবর্ধনার আয়োজন করে। সভায় লোক ঠেসাঠেসি।' মেয়েরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলে, বারণ মানে না, ঘনঘন সাধুবাদে নরেশদা গদ্গদ্।

ও কে এসে মাল্যচন্দন পরায়, মুখ তুলে অবাক! "রেখা, তুমি এখানে!" "হ্যাঁ, দু-দিনের জন্য এসেছি।"

সভার লোক জমাট বেঁধে নরেশদাকে ঘিরে ধরে। স্তবস্তুতিতে বদ্ধ গৃহের হাওয়ায় ঘূর্ণিপাক লাগে। মন্দিরা নরেশদার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যায়, জনতার বাইরে। চকিতে রেখা এসে থমকে দাঁড়ায় গাড়ির দরজা ধ'রে। চোখের স্থির দৃষ্টিতে মিশোনো আছে হিপ্‌নটিক কিছু,—"কাল চললুম শিলং, পারেন তো আসবেন।" হর্ণ বাজিয়ে অন্ধকার বাতাসে গাড়ি মিলিয়ে যায়। সেনাপতির কড়া হুকুমের মতো মনের মধ্যে কথাগুলো কেবলি তোলপাড় করে।

"আরাধনায়" সন্ধ্যাপ্রদীপ জলেছে, উচ্ছ্বাসের হিন্দোলে আজ অবসাদ কিছু। মন্দিরার হাসিঠাট্টা বজায় রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা কেবলি খাদে নেমে নেমে পড়ছে। ব্রাউনিং, এলিয়ট সাঁঝের আবছায়া লুকো-চুরিতে জমে উঠছে না তো! দু-জনের হোঁচট-খাওয়া মন থমকে দাঁড়িয়ে কাচের সারসির ভিতর দিয়ে তাকায় ভাঙা মেঘের কানা থেকে উপচে-পড়া রূপালি আলোর দিকে। বাতি নিববার আগেই অন্যমনে বিদায়ের পালা। ভোরের আলো ঘোমটা খোলে নি; মন্দিরা উঠেছে অনেকক্ষণ, উপেক্ষিত রজনীর কালো ছায়া চক্ষু-পল্লবের কোলে আঁকা, এক আঁচল বকুল কুড়িয়ে, চলেছে নরেশের ঘরের দিকে। দরজা খোলা। শূন্য ঘর। চাপা রঙের উড়ুনি বিছানার উপর প'ড়ে। সেই সঙ্গে এক টুকরা পেন্‌সিলের লেখা, "শিলংএর পথেই গেলুম।" মাথা নুয়ে পড়ে উড়ুনির উপর! "একি শুধু গতির বেগে আঁকাবাঁকা খেলা, কালের খেয়ালে। এই পথের দেখা মনের উপর কিছু ছাপ দেবে? অবসরের মাঝখানে, কখনো কি হঠাৎ পড়বে মনে একটি ভেসে যাওয়া দিন?"

দেনা-পাওনা

শ্রীসীতা দেবী

রামতারণ ঘোষালের অবস্থা তেমন কিছু মন্দ ছিল না। গ্রাম্য গৃহস্থের সচ্ছলতা বুঝাইতে যে-সব বস্তুর প্রয়োজন, সবই তাঁর ছিল। পাঁচ-ছয়খানা বড় বড় ঘর তাঁহার বাড়ীতে, যদিও পাকা বাড়ী নয়। জমিজমা যাহা আছে, তাহাতে মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটিয়া যায়। তাহা ছাড়া গরু আছে চারটি, পুকুর আছে দুইটি, বাগানও আছে ছোটখোছের একটি।

এ সবই ছিল, কিন্তু কন্যাও ছিল চারটি। কেহই সুন্দরী নয়, অবশ্য কুৎসিতও নয়। সাধারণ বাঙালী গৃহস্থঘরের মেয়ে যেমন হইয়া থাকে, তেমনই। নাম স্নেহলতা, আশালতা, সুধালতা, প্রীতিলতা।

তখনও দেশে সারদা আইনের চলন হইতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী বাকি ছিল। কাজেই ভদ্র গৃহস্থঘরে মেয়ে দশ পার হইয়া এগারোয় পড়িতে-না-পড়িতে বিবাহের জন্ত তাড়া লাগিয়া যাইত। ইঁহারা কুলীনও নয় যে কৌলীন্যের দোহাই পাড়িয়া মেয়ে বড় করিয়া রাখিয়া দিবেন। সুতরাং দশ বৎসর বয়স হইতেই, স্নেহলতার জন্ত মা-বাবা হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়াপড়শী সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঘটক আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। গহনা দু-চারখানা গড়ান হইল, কাপড়-চোপড়ও দু-চারখানা কেনা হইল। কাপড়ের বাড়াবাড়ি তখন ছিল না, একখানার বেশী দুইখানা পোষাকী কাপড় ঘরে থাকিলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া লোকে মনে করিত। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে অত বেনারসী ঢাকাই পরিয়া যাইবেই বা কোথায়? আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী একটা উৎসব হইলে সেখানেই বড় জোর মেয়েরা যায়, অন্ত কোথাও যাওয়ার তখন রেওয়াজ ছিল না। তা তেমন উৎসব ক'-টাই বা হইত? আর আত্মীয়ের বাড়ী গেলে সাজিয়া-গুজিয়া দাঁড়াইবার সময়ই বা কোথায়? হাঁড়ি ঠেলিতেই দিন কাবার হইয়া যাইত, কারণ পল্লীগ্রামে বিবাহ বা বৌভাতেও ভাড়া-করা পাচক আনার রীতি ছিল না।

তবু স্নেহলতা মা-বাপের প্রথম মেয়ে, মা-বাবা সখ করিয়া তাহার জন্ত জিনিষপত্র করাইতে লাগিলেন। সম্বন্ধ দুই-চারিটা আসিতে লাগিল। মেয়েও দেখান হইতে লাগিল। শ্যামবর্ণা মেয়ে, প্রথম দর্শনেই কাহারও পছন্দ হইল না। যাহা হউক, এগার বৎসর বয়সে যদু চক্রবর্ত্তীর ছেলের সঙ্গে স্নেহলতার বিবাহ এক রকম ধুমধাম করিয়াই হইয়া গেল। পাশের এক গাঁয়েই মেয়ের শ্বশুর-বাড়ী হইল। মাঝে মাঝে মেয়েকে দেখিতে পাইবেন মনে করিয়া রামতারণের গৃহিণী চোখের জল চাপিয়া রাখিলেন।

রামতারণ কিন্তু নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাইলেন না। স্নেহলতা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে-না-হইতে দেখা গেল আশালতাও মায়ের কাঁধ পর্য্যন্ত বড় হইয়া উঠিয়াছে। ঘটকের আগমন অবাধে চলিতে লাগিল। বড় মেয়ের বিবাহে বিশেষ কাতর হইতে হয় নাই, গৃহিণীর গহনা-গুলির ভিতর খান দুই-তিন ভাঙিতে হইয়াছিল মাত্র। বাকি খরচ রামতারণ ঋণ না করিয়াও চালাইয়া দিয়া-ছিলেন। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ মানুষ, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমানো সম্ভব নয়, তবু কিছু তিনি রাখিয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে প্রথম কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইলেন।

আশার বেলাই ভাবনায় পড়িতে হইল। এবার কিছু বিক্রয় করা বা বন্ধক দেওয়া অনিবার্য্য। দিন চলে এই জমিজমার কল্যাণে, এগুলি হাতছাড়া করিলে খাইবেন কি? পাড়াগাঁয়ে জমির দামও ত তেমন বেশী নয়, বেশ খানিকটা বিক্রয় না করিলে একটা মেয়ে পার করা যায় না। তাহাতে আয় অনেক কমিয়া যাইবে। গৃহিণীর গহনা আর বিক্রয় করিলে তিনিই বা ভদ্রসমাজে বাহির হইবেন কি করিয়া?

কিন্তু কন্যাদায়ের ফাঁস যখন গলায় চাপিয়া বসিতে লাগিল, তখন আর অন্য চিন্তা মনে স্থান পাইল না। হাতে শাঁখা এবং গলায় সুতায় মত একটি হার বাদে সব গহনাই আশার মায়ের অঙ্গ হইতে নামিয়া গেল। তাহাতেই কুলাইল না, জমিও কিছু বাঁধা পড়িল। আশার বিবাহে যেটুকু না দিলে নয় তার বেশী সে কিছুই পাইল না। ঘটাও বিশেষ হইল না, রামতারণ ঘোষালের মুখ রক্ষার্থে যতটা প্রয়োজন ততটুকুই হইল। পাত্র তেমন ভাল জুটিল না বলিয়া মায়ের মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল।

পরিবারে এই যে ভাঙন ধরিল, তাহার গতি আর রোধ করা গেল না। মহাজনরূপী শনি এইবার হইয়া দাঁড়াইলেন রামতারণের ভাগ্যবিধাতা। তাঁহার উৎপাতে শীঘ্রই পরিবারের সকলের মুখের হাসি ঘুচিয়া গেল। জমি ছাড়ানো দূরের কথা, মহাজনের সুদ নিয়মমত গণিতেই রামতারণ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন।

সন্তানের মধ্যে ঐ চারটি মেয়ে, ছেলে একটাও নাই যে বিবাহ দিয়া দু-পয়সা ঘরে আনিবেন। তাঁহার আগাগোড়াই লোকসানের কারবার। বুড়াবুড়ীকে বৃদ্ধ বয়সে কে যে এক ফোঁটা জল দিবে, সে ভাবনাও থাকিয়া থাকিয়া রামতারণের চিত্তে মাথা তুলিতে লাগিল। টাকা-পয়সা থাকিলে আত্মীয় জুটিতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু চারটি কন্যাকে পার করিয়া কিছু যে আর অবশিষ্ট থাকিবে, এমন বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না।

সুধালতাও দশ পার হইয়া এগারোয় পড়িল। গৃহিণী রাত্রে স্বামীকে বলিলেন, "সেজ্ কোটাও বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠল। ছোটটার বয়স আট বছর হ'লে কি হয়, কেমন বাড়ন্ত গড়ন দেখেছ? যেন দুটোই সমবয়সী। ভাবছি একসঙ্গে বিয়ে দিলে হয়।"

রামতারণ বলিলেন, "তার পর ঘরে কাকে নিয়ে থাকবে? আমি না-হয় এধার ওধার তামাক খেয়ে ঘুরব, তুমি কি একলা ঘরে ব'সে গাছের পাতা গুনবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বললে কি হয়? মেয়ের জন্ম যখন দিয়েছি, তখনই জানি পরের ঘরে চ'লে যাবে। একসঙ্গে দিলে খরচের সাশ্রয় কত সেটা বোঝ না?"

রামতারণ বলিলেন, "খাওয়ানোর খরচটা একটু কম হবে এই ত? না হ'লে যাকে যা দেবার-থোবার তা সমানই দিতে হবে, কোনও বেটা এক পয়সা রেয়াৎ করবে না। এক যদি এক ঘরে দুই মেয়ে গছিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে দু-চার পয়সা কম নিতে রাজী হ'তেও পারে।"

গৃহিণী বলিলেন, "বোনে বোনে জা-সম্পর্ক সুখের হয় না। ও-সবে কাজ নেই। তুমি ভিন্ন ঘরেরই দুটি ভাল পাত্র দেখ। আশার বরটা সুবিধার হ'ল না, মেয়েটা চোখের জলে দিন কাটায়। তেমন যেন না হয়।"

কর্ত্তা বলিলেন, "রাজপুত্তুর বর আসবে কি দে'খে? মেয়েগুলিও তো পরীর বাচ্চা নয়, আর আমার অবস্থা যে কি তাও জানতে তোমার বাকি নেই। সুদ দিতে পারি না, ঋণ এদিকে চক্রবৃদ্ধিতে ডবল হয়ে গেল।"

গৃহিণীর গায়ের রং কালো, তিনিও ফোঁস করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তা পরীর বাচ্চার সখ থাকলে ঘরে নিজে পরী আনতে হয়। কেউ তো রং মাখিয়ে ভাঁড়িয়ে বিয়ে দেয় নি? দে'খে শুনে সোনা-দানা গুনে নিয়েই তোমার বাপ নিয়ে এসেছিলেন।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তা মনে আছে গো মনে আছে। ভোলবার জো কি? তোমাকে কি আর আমি দোষ দিচ্ছি? কিন্তু এবার যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা পড়বে, তা ব'লে দিচ্ছি।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বাঁধা পড়লেই বা করছি কি? তা ব'লে মেয়ের বিয়ে তো আটকে রাখা যায় না? মেয়ে-গুলির বিয়ে হয়ে গেলে আমাদের আর কারও ভাবনা ভাবতে হবে না।"

কর্ত্তার মেজাজের আজকাল ঠিক ছিল না, অল্পেই চটিয়া যাইতেন। তিনি বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে হ'লেই কি আমরা অমনি সিঁড়ি বেয়ে সশরীরে স্বর্গলাভ করব? আমাদেরও তো খেয়ে প'রে বেঁচে থাকতে হবে।"

গৃহিণী আর কথা বাড়াইলেন না। রাত অনেক হইয়াছিল।

ঘটকচূড়ামণির আবার শুভাগমন ঘটিল। মেয়ের মা এবার চাকুরে ছেলের ফরমাস দিলেন। বড় মেয়ে

ছ-টার পাড়াগেঁয়ে চাষার হাতে পড়িয়া কোনও সুখ হইল না। হেঁসেলের কালিতে মেয়ে দুইটা যেন কালী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মেজটার তো হাড়ীর হাল, তাহাকে দেখিলে কেহ চিনিতে পারে না। চৌদ্দ বৎসরের মেয়েকে দেখায় যেন চব্বিশ বৎসরের আধবুড়ী। অথচ ইহাদের বিবাহে টাকাটা কি কম খরচ হইল? স্নেহলতার বিবাহে যে কম টাকা খরচ হইয়াছে এমন কথা শত্রুতেও বলিবে না। আশার বিবাহে কিছু কম হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ যে ও-পাড়ার বীরু ঠাকুরপোর মেয়ের বিবাহ হইল প্রায় একই সময়, সে কোন্ বেশী টাকাটা খরচ করিয়াছিল? অথচ মেয়ে কেমন সুখে আছে। গা ত সোনার গহনায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সখ করিয়া কোনও দিন কিছু রাঁধিল ত ভাল, না হইলে হাতা-বেড়ী তাহার হাতে উঠে না। বৎসরের ছ-মাস কলিকাতায় স্বামীর কাছে থাকিয়া আসে। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাহাকে হাড়সার হইতে হয় না।

ঘটক বলিলেন, "তা পাত্রের অভাব কি দেশে? আমার দশ পুরুষ এই বাংলা দেশে ঘটকালি ক'রে খেয়েছে, আমাদের কাছে যা চাইবে তাই এনে দেব। খালি দামটি ঠিকমত দেওয়া চাই, বুঝলে কিনা? তাও মেয়েরা তেমন গৌরবর্ণ নয় ত, সেজটি একটু কালোই যেন বোধ হচ্ছে।"

কথা সত্যই, সুধালতার রংটা আবার অন্য বোনদের চেয়েও কালো। সুতরাং সোনারূপা কিছু বেশীই লাগিবে বোধ হয় ইহাকে পার করিতে।

রামতারণ বলিলেন, "তাড়া নেই কিছু, আপনি ধীরে-সুস্থে দেখুন না। মেয়েগুলি এখনও শিশু বললেই হয়, এখনও বড়টিও দশ পার হয় নি। ভাল পাত্র দেখতে ত সময় লাগে, তাই আগে-ভাগে বলা আর কি?"

পাত্রের সন্ধান একটি দুটি করিয়া প্রতি মাসেই পাওয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তেমন পছন্দসই নয়। যাহার চাকরি আছে তাহার ঘরবাড়ী জমিজমা কিছুই নাই। আবার যাহার জমিজমা আছে, সে একেবারে গোমূর্খ, না-হয় বিকলাঙ্গ কুৎসিত। আশার দুর্গতি তাহার মায়ের মনে নিত্য জাগিয়া আছে, যথাসর্ব্বস্ব যায় তাহাও স্বীকার, কিন্তু তিনি এবার ভাল পাত্র না হইলে মেয়ের বিবাহ দিবেন না। মেয়ে-সন্তান বলিয়া কি জলে ফেলিয়া দিতে হইবে?

বছর ঘুরিয়া গেল পাত্র দেখিতে দেখিতে। সুধার জন্য একটি পাত্র পাওয়া গেল। ছেলে কুৎসিত বা বিকলাঙ্গ নয়, তবে মসীনিন্দিত বর্ণ। লেখাপড়া খুব বেশী করে নাই, এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু পিতৃপুণ্যফলে রেলওয়েতে একটি কাজ পাইয়া গিয়াছে। এখন ছোট পাড়াগাঁয়ে ষ্টেশনেই কাজ করে, কিন্তু কিছু দিন পরে বড় জংশনে বদলি হইবার সম্ভাবনা আছে।

সুধার মা বলিলেন, "বড্ড কালো বলছে যে গো? মেয়েও ত আমার কালো।"

রামতারণ বলিলেন, "তা আর কি করা যাবে? সব দিক্ নিখুঁৎ আর পাওয়া যাচ্ছে কই? নাতী-নাতনী সব হবে রক্কেকালীর বাচ্চা, তা সে ভাল সামলাবেন জামাই বাবাজী, আমাদের ভাববার দরকার নেই।"

গৃহিণী মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "না, তা কি আর আছে? নাতী-নাতনী কালো হ'লে আমার মেয়েকে খোঁটা দিয়ে প্যাঁটা বের করবে না? তোমাদের জাতকে আর চিনি না?"

কর্ত্তা গৃহিণীকে গায়ের রঙের জন্য কখনও খোঁটা দেন নাই এমন কথা আর কি করিয়া বলেন? তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "ছেলেপিলে কালোই হবে এমন আইন নেই ত আর? দুটো ভাল দুটো মন্দ, অমন হয়ই। আমি ত পাত্র ভালই দেখছি। আবার মেয়ে কেমন, তাও ত দেখতে হবে? আমরা মেয়ের মা-বাপ হয়ে যদি নিখুঁৎ খুঁজি, তাহলে ছেলের মা-বাপ হয়ে তারাও নিখুঁৎ খুঁজবে ত? নয়ত এমন দাবী করবে যা আমাদের সাধ্যের অতীত।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা এরা কেমন চাইছে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "এখনও কথা হয় নি, আমরা যদি রাজী হই, মেয়ে দেখাই, তার পর কথা হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা কথাবার্ত্তা কও। লাখ কথার কমে ত বিয়ে হবে না? কিন্তু কই ছুইকীর ত একটাও পাত্র আসছে না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "তুমি এখনও সেই খোঁচ্ ধ'রে ব'সে আছ? একটা মেয়ে না-হয় আর বছর-দুই ঘরে রইলই? একেবারে বাড়ীঘর শ্মশান ক'রে দিতে চাও?"

গৃহিণী বলিলেন, "থাম ত তুমি। আমার চেয়ে ওঁর বয়স হ'ল বেশী। বিয়ে দিয়ে রাখতে ক্ষতি কি? দ্বিরাগমন পরে করালেই হবে, ছোট মেয়ে ব'লে। ভদ্রলোক কুটুম হ'লে এটুকু কথা কি আর রাখবে না?"

রামতারণ বলিলেন, "তুমিই জান বাপু। কুটুম জিনিষই এক আলাদা, ভদ্রতা করতে তাদের বিশেষ দেখি নি। তখন যদি না রাখে ত নাকে কান্না জুড়ো না।"

গৃহিণী বলিলেন, "আহা, পাত্র ত দেখ, তার পর যা হয় দেখা যাবে তখন।"

অতএব দুই কন্যা জোড়ে উৎসর্গ করারই ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। প্রীতিলতারও বর জুটিল, কাছেরই এক গাঁয়ে। শোনা গেল সুধালতার যে-পরিবারে বিবাহের কথা চলিতেছে, তাহাদের সঙ্গে ইহাদের কি একটা জ্ঞাতি-সম্পর্ক আছে। একটা কথা শুনিয়া রামতারণ একটু চিন্তিত হইলেন, দুই পরিবারে নাকি বিশেষ সদ্ভাব নাই।

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, শেষে বোনে বোনে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হবে নাকি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমিও যেমন। এমন কিছু শত্রুতা নেই, এই জ্ঞাতিকুটুমের মধ্যে যেমন একটু রেষারেষি থাকে তাই আর কি? ও মিটে যাবে এখন, তুমি দে'খো।"

দুই মেয়েকেই দেখান হইল। প্রীতিলতাকে বরের পক্ষ পছন্দ করিয়া গেল। তাহাদের বাড়ীতে ছেলের পাল, গৃহিণীর একটি মেয়ের সখ আছে, তাই এত তাড়াতাড়ি তিনি ছেলের বিবাহ দিতেছেন। ধাড়ী মেয়ে বশ মানে না সহজে, বাপের বাড়ীর দিকে টানে, তাই তিনি ছোটখাট মেয়েই খুঁজিতেছেন। সুধালতাকে বরের বাড়ীর লোক তত পছন্দ করিল না। মেয়ে বড়ই কালো যে, নাক-মুখও তেমন কিছু ভাল নয়, চুলও কম। গৃহস্থ-ঘরে অপ্সরী কেউ খোঁজে না। তবু ভবিষ্যৎ বংশের কথাও ত একটু ভাবিতে হইবে? তাঁহাদের ছেলেও ফরসা নয়, তাই বউয়ের রং একটু উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। তবে ঘর ভাল, কন্যার পিতা অতি ভদ্রলোক, এক-কথায় 'না' তাঁহারা বলিতে চান না। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া যদি রামতারণ দেখেন, ইত্যাদি।

কথা হইতেছিল ঘটক-মহাশয়ের সহিত। রামতারণ হাতের হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "অত ধামাই-পানাই না ক'রে সোজা কথাটা ব'লে ফেলুন না মশায়? কত চায় তারা?"

ঘটক হুঁকাটা তুলিয়া এক টান দিয়া বলিলেন, "তা পঁচিশ ভরি সোনার গহনা ত চাইছে, তা ছাড়া বরপণ, বরাভরণ, এ-সব ত আছে।"

রামতারণ বলিলেন, "আমাকে কি তারা জমিদার পেয়েছে? বড়মেয়ের যে অমন জামাই আনলাম তাকেও ত এত দিতে হয় নি?"

ঘটক বলিলেন, "আজ্ঞে সে-মেয়ে আর এ-মেয়েতে একটু তফাৎ আছে। আর এ হ'ল চাকুরে জামাই, আজ বাদে কাল শহরে বাসা করবে। এদের নজর উঁচু হবে ত?"

তর্কাতর্কি চলিতে লাগিল, কিন্তু বরপক্ষ কিছুতেই দাবী ছাড়িল না। অগত্যা বাংলা দেশে যা সচরাচর হয়, তাহাই হইল, মেয়ের বাপকে রাজী হইতে হইল। তিন মাস পরে বিবাহের দিন পড়িল। গৃহিণী আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়া তাড়াতাড়ি জোড়া বিবাহের আয়োজনে লাগিয়া গেলেন। এই সময়ে বিবাহ দিতে না পারিলে সুধালতার বয়স নিতান্তই তেরো পার হইয়া যাইবে। তাহা হইলে নিন্দার চোটে গ্রামে আর কান পাতা যাইবে না।

কিন্তু জিনিষপত্র, গহনাগাঁটি, বরপণ, বিবাহের খরচ প্রভৃতি ধরিয়া যা ফর্দ্দখানি দাঁড়াইল, তাহা দেখিয়া ত কর্ত্তাগৃহিণীর চক্ষুস্থির! গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, এত টাকা কোথা থেকে আসবে? শেষে কি ভিটেমাটি বিক্রী ক'রে একেবারে পথে বসব?"

কর্ত্তা বলিলেন, "তোমারই সখ, তুমি বোঝ। বললাম তখন, ছোটটার আরও দু-চার বছর পরে বিয়ে দিও, তা তুমি কিছুতে শুনলে না। হাতে সময় পেলে সামলে নেওয়া যেত কিছু।"

গৃহিণী বলিলেন, "ছাই সামলাতে, এখন অবধি

বড় মেয়ে মেজ মেয়ের বিয়ের ঋণের সুদ গুনছি। যাক সব একসঙ্গে যাক, দু-জনে কাশী গিয়ে থাকব।"

প্রীতির বয়স এত কম যে সংসারে আগুনের আঁচ তাহার গায়ে লাগে না। সুধালতা বড় হইয়াছে, মা-বাপের বিপদ্ দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা হিম হইয়া যায়। কিন্তু কোনও কথা তাহাদের ত বলিবার জো নাই।

এইবার বাড়ীটা বাদে যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা পড়িল। এসব যে কোনও দিন ছাড়াইতে পারিবেন, এমন ভরসা কর্ত্তা বা গৃহিণী কেহই করিলেন না। যে ক'টা দিন পৈত্রিক ভিটায় বাস করিয়া যাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ।

বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। আত্মীয়স্বজনে বাড়ী ভরিয়া গেল। ধুমধাম হোক বা নাই হোক কোলাহলের অবধি রহিল না। স্নেহ ও আশা দুজনেই আসিয়াছে। মূর্খ, গ্রাম্য স্বামীর হাতে পড়িয়া আশাও যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে। জমিজমা সব যাইবার মুখে শুনিয়া সে গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, সেজ্‌কী আর ছুট্‌কী মিলে তো বাবাকে ভরাডুবি করলে। আমরা তবু রেহাই দিয়েছিলাম।"

সুধালতা মনে মনে ভাবিল, "তাহাতে আর তোমার কৃতিত্ব কি? বছর দুই আগে জন্মিয়াছিলে এই ত?"

বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। কাল হইতে ঘর একেবারে আঁধার হইয়া যাইবে ভাবিয়া গৃহিণী কোন মতে চোখের জল চাপিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামতারণের বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, কখন না জানি আবার কি বিভ্রাট ঘটে। ভাবী বৈবাহিকদ্বয় পরস্পরকে মোটেই সুনজরে দেখেন না, সেও এক চিন্তার বিষয়। এক আসরে উপস্থিত হইলে দু-জনে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তবেই।

দুই কন্যাকে একসঙ্গে সভাস্থ করা হইল। একই রকম কাপড় পরা, একই রকম অলঙ্কার পরা। কিন্তু প্রীতির দিকে চাহিয়াই সুধালতার ভাবী শ্বশুরের মুখখানা প্রলয়গম্ভীর হইয়া উঠিল।

রামতারণের কাছে গিয়া বলিলেন, "বেয়াই মশায় কিছু মনে করবেন না, মেয়েটি যে বড় বেশী কালো বোধ হচ্ছে।"

রামতারণ প্রমাদ গণিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে এই মেয়েই ত আপনারা দেখে পছন্দ ক'রে গেছেন।"

বেহাই বলিলেন, "হ্যাঁ তা আমরা দেখেছি বটে, আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতার লোভে বিয়েতে সম্মতিও দিয়েছি। কিন্তু কথাটা কি জানেন? আপনার ছোট মেয়েটি দেখতে অনেক ভাল, তাকে আর একে সমান-সমান গহনা দিলে অন্যায় হয় না কি? আমাদের বৌমাটির গায়ে অন্ততঃ আরও ভরি দশ বেশী সোনা দরকার হবে যে?"

তর্কাতর্কি একটা বাধিল বটে, কিন্তু কালো মেয়ের বাপের সাধ্য কি যে ছেলের বাপের সঙ্গে তর্ক করিয়া পারে? ভিতরে গিয়া কর্ত্তা স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন কি উপায় করা যায়? এরা উঠে গেলে পাত্র কোথায় পাব?"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা যা কষ্টে একটা পাত্র ওর জুটেছে তা আর বলবার নয়। হট্ করতে আর একটা অমনি জোটে কিনা? উঠতে দিলে চলবে কেন? বাড়ীসুদ্ধ বাঁধা দাও, তার পর যা থাকে অদৃষ্টে।"

বাড়ীও বাঁধা পড়িল। দশ ভরি সোনার দাম ধরিয়া দিতেই সুধালতার কালো রঙের খুঁৎ ঢাকিয়া গেল। দুই মেয়ে অতঃপর নির্ব্বিবাদে পাত্রস্থ হইল, সুধার চোখে যে জল গড়াইয়া পড়িতেছে সেটা কেহ লক্ষ্য করিল না, তাহার বর বাদে।

বাসরে অবসর বুঝিয়া সে একবার জিজ্ঞাসাও করিল, "শুভদৃষ্টির সময় কাঁদছিলে কেন?"

সুধালতা উত্তর দিল না। রং কালো বলিয়া কি তাহার কাঁদিবারও অধিকার নাই?

পরদিন দুই জোড়া বরকনে বিদায় হইল। দুই মেয়েই কাঁদিতে কাঁদিতে গেল, কিন্তু প্রীতির কান্নায় তত ব্যথা ছিল না। যাকে দু-দিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে, আবার আসিয়া অনেক দিন থাকিবে, এই সান্ত্বনা লইয়া সে গেল। সুধা তাহার এতকালের জীবনের কাছে সম্পূর্ণ বিদায় লইয়াই গেল, আর কোনও দিন ইহার ভিতর সে ফিরিতে পারিবে না, তাহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

বিবাহের উৎসবের আলো নিবিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন রামতারণ আর তাঁহার পত্নীর চোখে জগৎ অন্ধকার হইয়া গেল। কর্ত্তা বলিলেন, "আর কেন, এবার বেরিয়ে পড়ি চল। এখনও সব বিক্রী ক'রে দিলে দু-পাঁচ-শ পেতে পারি, ক'মাস বাদে তাও আর পাব না। এটা যেন হানা বাড়ী হয়ে গেল, মন আর টিঁকছে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা কি যাওয়া যায়? এতকালকার সংসার, জিনিষপত্রের একটা বিলি-বন্দেজ করতে হবে ত? মেয়েরা সাত দিন পরে আসবে, তাদের আবার দিন দে'খে দ্বিরাগমন না করিয়ে যাব কি ক'রে? সবই করলাম যখন এইটুকু খুঁৎ কেন রাখি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু এখানে টেঁকা ত আমার অসাধ্য হয়ে উঠেছে। এই গাঁয়ে সবার উপর মাথা তুলে বেড়িয়েছি, আর আজ হয়ে গেছি হাড়ীরও অধম। দু-দিন বাদে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে। তার চেয়ে চল মান থাকতে স'রে পড়ি।"

কিন্তু "চল" বলিলেই যাওয়া হয় না। দুই মেয়ে শ্বশুরবাড়ী ঘুরিয়া আসিল, দিন-কতক থাকিল আবার শুভলগ্নে চলিয়া গেল। তাহার পর জিনিষপত্র যাহা বিক্রয় করিবার মত তাহা বিক্রয় হইল, বাকি আত্মীয়-স্বজনকে বিলাইয়া দেওয়া হইল। জমিজমা, বাড়ী, বাগান, পুকুর সব বিক্রয় করিয়া যৎসামান্ত যাহা কিছু মিলিল তাহাই সম্বল করিয়া ঘোষাল-দম্পতি একদিন ভোর-রাত্রে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার বেলা কাহারও মুখ না দেখিতে হয়, তেমন ব্যবস্থাই করিলেন।

গরুর গাড়ীতে উঠিবার মুখে শ্বশুরের ভিটাকে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এর পর সন্ধ্যে জ্বলবে কিনা কে জানে? আর কোনও জন্মে যেন মেয়ের মা না হই।"

রামতারণ বলিলেন, "যদি আমি সৎ ব্রাহ্মণের ছেলে হই, তাহলে দে'খো ঐ সেজ জামাইয়ের ঘরে দশ মেয়ে হবে। মেয়ের বাপের গলায় পা দেওয়ার নিয়ম এখনই দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে না ত?"

গৃহিণী জিভ কাটিয়া বলিলেন, "ও কি গো, নিজের মেয়ে-জামাইকে অমন অভিশাপ দিতে আছে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "তা চামারের কাজ যা করেছে, অভিশাপ দিলেও দোষ হয় না।"

গরুর গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। পরের গ্রামে ষ্টেশন, সেইখানে ট্রেনে চড়িয়া ব্রাহ্মণ দম্পতি কাশীর পথে যাত্রা করিলেন।

সুখালতার জীবন যে সুখের হইবে তাহা কেহ আশা করে নাই, সুখের হইলও না। তবে সারা দিন খাটিয়া, সকলের গালমন্দ শুনিয়া, দু-বেলা দু-মুঠা মোটা চালের ভাত খাইয়া সে বাঁচিয়া রহিল। বাঙালীর মেয়ের মরণ সহজে হয় না, তাই সুখালতাও বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিল।

সন্তানসন্ততি একটি একটি করিয়া হইতে লাগিল। পিতার অভিশাপের বলেই হোক কি স্বভাবের নিয়ম বশতই হোক, প্রথম তিনটিই হইল মেয়ে।

তৃতীয়া কন্যার জন্মের সময় শাশুড়ী শাঁখটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "পোড়া কপাল, এর আঁতুড়ঘরের সামনে আবার শাঁখ বাজবে। একেবারে মায়ের পয় নিয়ে এসেছে হতভাগী।"

সুখালতা কথাটা শুনিতে পাইল। ধাত্রীর অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, ভাবিল, "মা-বাবাকে পথে বসিয়েছি আমি, আমার কপাল কখনও ভাল হ'তে পারে?"

মেয়েগুলি পিতামাতার উপযুক্তই হইল চেহারায়। সুখার স্বামী তৃতীয়া কন্যার জন্মের পর রাগ করিয়া এক বৎসর চাকুরীস্থল হইতে বাড়ীই আসিল না, সুখাকে চিঠি লেখাও বন্ধ করিয়া দিল। মা আসিতে লিখিলে চিঠির জবাব দিল, "বাড়ী ত হয়ে উঠেছে যেন কালোজিরের ক্ষেত, ও-দিকে আর তাকাতে ইচ্ছা হয় না।"

সুখালতা হাসিয়া ছোট জাকে বলিল, "শুনেছিস গো তোর ভাসুরের বাক্যি, বাড়ী এতদিন শাদা সরষের ক্ষেত ছিল, আমার মেয়েগুলো হয়েই কালোজিরের ক্ষেত হয়েছে।"

ছোট জায়ের ছেলেমেয়ে দুটিও কালো। সে বলিল, "এবার ভাসুর ঠাকুর আসবার সময় ঘরে একখানা বড় আয়না টাঙিয়ে রেখ। নিজেদের রূপের বাহারও মাঝে মাঝে দেখা ভাল।"

সুধা বলিল, "তোর ছাই চামড়া শাদা আছে, তুই জোর ক'রে ওসব বলতে পারিস্, আমার বলবার জো কি? বলবে তোমার গুষ্টির গুণেই সব অমন চেহারা হয়েছে মেয়েদের।"

ছোট জা বলিল, "আর তাঁদের চেহারাগুলি অমন হয়েছে কার গুণে? তবে পুরুষের জাত, তাদের রূপ থাক না-থাক, এসে যায় বা কি।"

খোঁটা খাওয়ার জন্য সুধালতা কানে তুলা, পিঠে কুলা বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াই রহিল। তবে বৎসর তিন পরে একটি ছেলে হওয়াতে কিছুদিনের মত বাক্যবাণের পালা কিছু কমিয়া আসিল।

কিন্তু সে কয়দিনের জন্যই বা? দেখিতে দেখিতে বড় মেয়েটি দশ-এগারো বৎসরের হইয়া উঠিল। সুধালতা দেখিল শাশুড়ীর মুখ ক্রমেই গম্ভীর হইয়া আসিতেছে, স্বামীরও মেজাজের উগ্রতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এত দিনেও অবস্থার তাঁহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। মাহিনা মাত্র চল্লিশ টাকা। বাড়ীঘর জমিজমা যাহা ছিল, তাহা এখন চার-পাঁচ ভাগ হইয়া যাওয়ায় চোখে ঠেকেই না। তবে বাড়ীভাড়া দিতে হয় না, চাল-তরকারি কিনিয়া খাইতে হয় না, এই পর্য্যন্ত।

সুধালতার বিবাহের সময় বরের যা দাম ছিল, এখন তাহার চেয়ে বাড়িয়া গিয়াছে। ছেলেরা আজকাল আর বাপ-মায়ের দেখার উপর নির্ভর করে না, নিজেরা মেয়ে দেখিতে চায় এবং কালো বা কুৎসিত দেখিলে এক কথায় জবাব দিয়া প্রস্থান করে। বাপ-মায়ের সঙ্গে তবু দরদস্তুর চলে, এ-সব নব্য তরুণদের সঙ্গে ত টাকাকড়ির কথা তোলাই যায় না। আগে পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থঘরে মেয়ে দিতে কেহ আপত্তি করিত না, যদি বিষয়সম্পত্তি তেমন থাকিত, আজকাল তাহারা আর সুপাত্র বলিয়া গণ্য হয় না। যে-ছেলে চাকরি করে না, তাহার হাতে মেয়ে দিলে আত্মীয়স্বজনের কাছে নিন্দা-ভাজন হইতে হয়। সুধালতার বড় ভাসুরের মেয়ের বৎসরখানিক আগে বিবাহ হইল এক চাকুরে ছেলের সঙ্গে। চাকরি এমন কিছু জজিয়তি বা ম্যাজিষ্ট্রেটি নয়, বাবাজীবন পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনায় কোনও এক গ্রাম্য পোষ্ট আপিসে কাজ করেন। এ হেন রত্ন আহরণ করিতে দুই হাজারের উপর খরচ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য বেশীর ভাগ টাকাই ধার করিতে হইল।

জায়ে-জায়ে রেষারেষি সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর কিছু থাকে, এখানেও কিছু ছিল। সুধার জামাইগুলি যাহাতে বড় জায়ের জামাইয়ের চেয়ে হীন না হয়, এ ইচ্ছা তাহার থাকা স্বাভাবিক। স্বামীরও সে-বিষয়ে মত একই রকম, কিন্তু টাকাকড়ি লইয়া ত বাধে গোল। বড় ভাসুরের কপাল ভাল, মেয়ে একটি, ছেলে দুটি। মেয়ের বিবাহের-ধার শোধ তাঁহার সহজেই হইবে। কিন্তু সুধার যে তিন মেয়ে, ছেলে মাত্র একটি?

কিন্তু গৌরী তো লম্বায় মায়ের সমান হইতে চলিল, তাহাকে ত আর বিবাহ না দিলে চলে না? পাত্র দেখা হইতে লাগিল। সুধালতা বলিল, "এক পয়সা ত হাতে নেই, ঘরদোর বাঁধা দিও না বাপু, তাহলে ছেলেপিলে নিয়ে খাব কি? আমার গায়ের গহনা সবগুলো দিচ্ছি, এতে যা হয় কর।"

স্বামী নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "কত না দশ-বিশ হাজারের সোনা এনেছ। ওতে আধখানা মেয়ের বিয়েও হবে না। আবার ঊর্ম্মিটা মস্ত বড় হয়ে উঠল, পরের বছর তার ঠেলা ঠেলতে হবে, হাতে কিছু রাখাও দরকার।"

"এক সঙ্গেই দুটোকে পার কর তবে," বলিয়া সুধা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার ও প্রীতির একসঙ্গে বিবাহ দিয়া তাহার পিতামাতাকে কি ভাবে পথে বসিতে হইয়াছিল, তাহা বড় বেশী করিয়া মনে পড়িয়া গেল।

গৌরীর পাত্র জুটিল দুটি, একটি ত্রিশ টাকার কেরানী, সেটির দর বেশী, আর একটি জমিজমা চাষবাস করে, তাহার দর কিছু কম।

সুধা বলিল, "চাকুরেতে কাজ নেই বাপু, ত্রিশ টাকায় কি বা খাবে, কি বা পরবে? ওতে কি সংসার চলে? ঐ অন্য ছেলেটিই নাও, মোটা ভাত মোটা কাপড়ই ভাল।"

তাহার স্বামী বলিল, "খালি খাওয়া পরা-দেখলেই ত হয় না? মানসম্ভ্রম আছে ত? লোকে যখন জিগ্‌গেস

করবে জামাই কি ক'রে, তখন উত্তর দেব কি? তোমাদের কি? দিব্যি বাড়ীতে ব'সে আছ, আমাদের কত দিক্ সামলাতে হয়, তার বোঝ কিছু?"

সুধালতা বলিল, "ভারি তো মান, তার আবার ভাবনা। এই ঘরবাড়ী জমিজমা আছে তাই, নইলে ঐ মাইনেতে আধপেটা খেতেও কোনদিন কুলত না", বলিয়া রাগিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়াই গেল।

চাকুরে ছেলের সঙ্গেই সৌভাগ্যবতী গৌরীর বিবাহ হইয়া গেল। খরচ অবশ্য বড় ভাসুরের কন্যার বিবাহের মতই হইল। অতি-অবজ্ঞাত সুধালতার অলঙ্কারগুলি সবই বিক্রয় হইয়া গেল, এবং জমিও বেশ কিছু বাঁধা পড়িল।

বছর ঘুরিতেই আবার উমার বিবাহের ভাবনা ভাবিতে হইবে। দরিদ্রের ঘরে মেয়ে জন্মায় কেন? জন্মায় ত সকলেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা হয় না কেন?

সুধালতার স্বামী এক শনিবারে বাড়ী আসিয়া বলিল, "উমিটার চেহারা এমন হচ্ছে কেন? যেন পোড়া কাঠখানা। একটু ভাল ক'রে খাওয়াও মাখাও, নইলে ও মেয়ের দিকে কেউ ত চোখ তুলে চাইবে না?"

সুধালতা বলিল, "হাঁ, মেয়ের চেহারায় ত সব হবে। চেহারা কেউ দেখে নাকি? ক-কাঁড়ি টাকা ঢালবে, তারই দিকে লোকে চেয়ে থাকবে।"

স্বামী বলিল, "সত্যি এটার বিয়ে দিতে বোধ হয় ভিটেমাটি চাটি হয়ে যাবে। পথে বসব একেবারে। কি দেশেই জন্মেছি বাবা, মানুষ এখানে কসাইয়েরও অধম। ছেলের বাপ হয়েছে ত বিশ্বের মাথা কিনে নিয়েছে।"

সুধালতা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "সেটা এতদিনে বুঝেছ, না? আমার বাপ-মাকে যখন পথে দাঁড় করিয়েছিলে, তখন ত এত কথা মনে হয় নি? বোঝ, সবারই দিন আসে। তোমার মেয়েও হয়ত শুভদৃষ্টির সময় চোখের জল ফেলবে।"

বকুনির ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার স্বামী অস্ফুট গর্জন করিয়া বলিল, "মেয়েমানুষের জাতই এমনি। বাপের দিক্ টেনে কেমন কথাটা বললে দেখ। আরে আমার কি? যেদিকে দু-চোখ যায় চ'লে যাব। ছেলেপিলে নিয়ে তুইই পথে বসবি।"

আলোচনা

ভারতে রাসায়নিক গবেষণা

শ্রীভবেশচন্দ্র রায়, এম. এস্‌সি.

ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণার অপকৃষ্টতা সম্বন্ধে ডক্টর পুলিন-বিহারী সরকার 'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এক জন উচ্চশিক্ষিত রাসায়নিকের লেখনী-নিঃসৃত এই প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার দেশবাসী সহকর্ম্মিগণ নিরাশ হইয়াছেন—ভারতবর্ষের রাসায়নিক গবেষণার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নহে, এক জন ভারতবাসী কি করিয়া অবাধে নিজের দেশ ও জাতির উপর অহেতুক কলঙ্কের বোঝা চাপাইতে পারেন তাহাই ভাবিয়া। আলোচ্য প্রবন্ধের সত্যতা নির্দ্ধারণে প্রবাসীর প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় একটু অবহিত হইলেই সুখের বিষয় হইত।

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করা বৃথা। রাসায়নিক পিতামহ অশীতিপর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আজও জীবিত; তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা বৃথায় গিয়াছে—ভারতব্যাপী তাঁহার সুবৃহৎ রাসায়নিক পরিজনবর্গের বিদেশে বিদ্বৎসমাজে কোন স্থান নাই, শুধু দেশবাসীকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যোগ্যতার অনুপযোগী উচ্চপদ দখল করিয়া বসিয়া আছেন, এ সকলের মধ্যে সত্যের রেশ কতটুকু আছে তাহা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। শুধু প্রবাসীর ন্যায় বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, তাহারই বিরুদ্ধে দুই-একটা কথার অবতারণা করিতে বাধ্য হইতেছি।

যে ভারতীয় রসায়ন সমিতি (Indian Chemical Society) প্রবন্ধ-লেখকের একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তরুণ গবেষকগণের উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে যে বাৎসরিক পদক দিবার ব্যবস্থা আছে তাহার জন্যও তাঁহাকেই মনোনীত করিয়াছিল। তিনি তাহারই ভিত্তিহীন কলঙ্ক-কাহিনী সাধারণে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেমিক্যাল সোসাইটির জর্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ-সমূহ অন্যত্র প্রকাশের অনুপযুক্ত এইরূপ হাস্যকর ইঙ্গিত করিবার কি কারণ ডক্টর সরকারের ঘটিল তাহা বোঝা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এই অনুযোগের মধ্যে এতটুকু সত্যও আছে কি না সন্দেহ!

ভারতীয় রাসায়নিকের আবিষ্কৃত তথ্য রসায়নের প্রামাণিক গ্রন্থে স্থান পায় না এ অদ্ভুত সংবাদ লেখক কোথায় আবিষ্কার করিলেন জানি না। রসায়নের প্রামাণিক গ্রন্থের সহিত যাঁহার সামান্য মাত্রও পরিচয় আছে তিনিও ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিবেন। সম্ভবতঃ লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির প্রকাশিত বার্ষিক বিবরণীর উপর লেখকের শ্রদ্ধা আছে। যদি কষ্ট করিয়া কয়েক বৎসরের বিবরণী উল্টাইয়া দেখিবার তাঁহার সুযোগ হয়, তাহা হইলে এই অতিরঞ্জিত উক্তির অযথার্থতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকিবে না। নাম উল্লেখ করিতে গেলে প্রবাসীর একটি সংখ্যা ভরিয়া যাইবে। নিউটন ফ্রেণ্ড, মেলর, মর্গ্যান, টেলর প্রভৃতি পাঠ্য ও প্রামাণিক পুস্তকের নির্ঘণ্টও লেখকের বেপরোয়া উক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অন্ততঃ পক্ষে তিন শত নাম এই সকল পাঠ্যপুস্তকেও পাওয়া যাইবে।

ভারতীয় কোন রাসায়নিক আজ পর্য্যন্ত রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন নাই, কেহ নোবেল-পুরস্কারও পান নাই ইহা অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু কেন যে ভারতীয় রাসায়নিকের অদৃষ্টে রয়্যাল সোসাইটির সভ্য হওয়ার সম্মান লাভ ঘটে নাই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লেখক মহা বিভ্রমে পড়িয়াছেন। ভারতীয় রসায়ন-চর্চ্চার যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাগ্যে যে এ সম্মান-লাভ ঘটে নাই তাহার কারণ রাসায়নিক কৃতিত্ব বা মনীষার অভাব নহে। সে কারণ অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক সর্‌ এডোয়ার্ডস্‌ থর্প পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মুখপত্র 'নেচারে' আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করেন (*Nature*, Vol. 103, March 6, 1919, p. 1.)

অল্পদিন পূর্ব্বেও অধ্যাপক এইচ ই. আর্ম্‌ষ্ট্রং 'নেচার' পত্রিকায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মজীবনীর সুদীর্ঘ আলোচনা প্রসঙ্গে রয়্যাল সোসাইটিকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলেন :—

> Our recognition of Ray's services, as chemist, as teacher, as historian and as founder of a great national school of scientific inquiry, is long overdue—it is nothing short of reproach to our Royal Society that it should hitherto have been so narrow in its outlook as not to include his name in the roll of fellowship.—*Nature*, Vol. 131. May 13, 1933, p. 674.

"রাসায়নিক, শিক্ষক, ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ব্রতী এক বৃহৎ জাতীয় পরিমণ্ডলীর স্রষ্টা হিসাবে রায়কে সম্মান দান আমাদের দিক্‌ হইতে বহুপূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল—আমাদের রয়্যাল সোসাইটির পক্ষে ইহা কলঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে যে তাঁহাকে এত দিনও ফেলো হিসাবে গ্রহণ না করিবার মত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ইহা দেখাইয়া আসিতেছে।"

রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা যে রয়্যাল সোসাইটির সভ্যপদলাভের পরিপন্থী হইতে পারে, তাহা বোধ হয় ডক্টর সরকারের অজ্ঞাত নাই। প্রস্তাবিত ভারতীয় রাসায়নিক সার্ভিস সৃষ্টির বিপক্ষে থর্প কমিটির (Thorpe Committee) সভ্য হিসাবে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের

মত প্রকাশ* এবং নাগপুর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ যে বিলাতে তাঁহার রয়্যাল সোসাইটির সভ্য হওয়ার প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিকূল মন্তব্যের জন্যই যে এদেশে আর একটি রাসায়নিক আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই, একথা আজ সর্ব্বজনবিদিত; এবং এই জন্যই পরবর্ত্তী কালে প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মজীবনীর সমালোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক আর্ম্‌ষ্ট্রং এক স্থলে বলিয়াছেন, "তিনি (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র) ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন"—"he indulged in many bitter diatribes against British rule." বস্তুতঃ পক্ষে এই সব কারণেই যে প্রফুল্লচন্দ্র রয়্যাল সোসাইটির সভ্য হইতে পারেন নাই ইহা সহজেই বোঝা যায়।

ডেপুটিগিরি বা জজিয়তী করিয়া মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন লইলে সম্ভবতঃ কাহারই কোন আপত্তি নাই, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী বা চিকিৎসকের মাসিক কয়েক সহস্র মুদ্রা আয় সম্বন্ধেও কাহারও কোন বক্তব্য নাই, শুধু রসায়নের অধ্যাপকগণকে কৌপীনধারী হইয়া থাকিতে হইবে ইহার মধ্যে যে কি যুক্তি থাকিতে পারে তাহা সাধারণের পক্ষে নির্ণয় করা দুরূহ।

নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্তি পৃথিবীর অতি অল্প বৈজ্ঞানিকের অদৃষ্টেই ঘটিয়াছে। যে জার্ম্মান পণ্ডিত সমারফেল্ড বহুমূল্য তথ্য আবিষ্কার করিয়া বিদ্বৎসমাজে বরেণ্য হইয়াছেন, যাঁহার একাধিক ছাত্র নোবেল-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজে আজ পর্য্যন্তও উক্ত পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হন নাই। ইহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও মনীষার কিছুই ক্ষতি হয় নাই; নোবেল-কর্ত্তৃপক্ষের অক্ষমতাই সূচিত হইয়াছে মাত্র।

জাপানে বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা কিছু হয় নাই একথা বোধ হয় কেহ স্বীকার করিবেন না; রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া জাপানে বিজ্ঞানচর্চ্চা যে কি দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীবাণুতত্ত্ব কোন বিষয়েই জাপানী গবেষকের কৃতিত্ব বড় কম নয়—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কয়টি জাপানী বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যে নোবেল-পুরস্কার লাভ ঘটিয়াছে? এক জার্ম্মানী হইতে যত অধিকসংখ্যক পণ্ডিত নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন, অন্য কোন দেশ হইতে তত পান নাই; কিন্তু জার্ম্মানীতেও এমন অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন বা আছেন যাঁহারা তৎকালে নোবেল-পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই, কিন্তু কৃতিত্ব ও খ্যাতিতে তাঁহারা কোন অংশেই নোবেল কমিটি দ্বারা পুরস্কৃত বৈজ্ঞানিকদিগের অপেক্ষা হীন নহেন অথবা ছিলেন না।

সকল সভ্য দেশেই পদার্থতত্ত্বের গবেষকের সংখ্যা রাসায়নিক গবেষকের সংখ্যার অনেক কম—এক-দশমাংশও হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং রয়্যাল সোসাইটির সভ্যপদ অথবা নোবেল-পুরস্কার যাহার জন্যই হউক না কেন এক জন পদার্থতত্ত্ববিদের প্রতিযোগী হন অন্ততঃ দশটি রাসায়নিক, সুতরাং বাছাই করিবার সময় রাসায়নিকের সম্মান লাভের অন্তরায় হয় অনেক।

ভারতীয় রাসায়নিকের বিরুদ্ধে আর এক দফা অভিযোগ এই যে, বিদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণের অধীনে কাজ করিয়া দেশে ফিরিয়া তাঁহারা অনুপযুক্ত ছাত্রগণকে বিজ্ঞানের উচ্চতম উপাধি ডি-এস্‌সি লাভে সহায়তা করিতেছেন। আশা করি প্রবন্ধলেখক অন্ততঃ তাঁহার নিজের অধ্যাপককে এ অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিবেন। ভারতীয় ডি-এস্‌সি উপাধি বিদেশী উপাধি অপেক্ষা নিম্নস্তরের, ভারতীয় ডি-এস্‌সি উপাধিধারী প্রবন্ধলেখক একথা বলিতে চাহেন কি না জানি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি-এস্‌সি উপাধির মৌলিক প্রবন্ধ ইউরোপ ও আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ তিন জন বৈজ্ঞানিকের নিকট স্বতন্ত্র ভাবে পাঠাইয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে গবেষণা ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য হইলেই ডি-এস্‌সি উপাধি প্রদত্ত হইতে পারে, নচেৎ নহে। সম্ভবতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে। অতএব ভারতীয় উপাধি বিদেশী উপাধি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এ ধারণা ধারণা প্রবন্ধলেখকের কি করিয়া হইল তাহা বলা দুরূহ।

—

গৌহাটি

শ্রীবীরেশ্বর সেন

অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন গৌহাটি-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, গৌহাটির পৌরাণিক নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ যাহা মহাভারত এবং রামায়ণে উল্লিখিত আছে এবং গৌহাটিই যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ এই মত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের উল্লেখ যেমন বহু স্থানে আছে তাহাতে বোধ হয় যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ হস্তিনাপুরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান ছিল—আসামের মত দূরবর্ত্তী স্থানে নহে। দুর্য্যোধনের পত্নী ভানুমতী প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজের দুহিতা ছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে নকুলের দিগ্বিজয়ের যে বর্ণনা আছে তাহাতে দেখা যায় যে তিনি হস্তিনাপুর হইতে উত্তর দিকে গিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। গৌহাটি

* It is not a little remarkable that the only member of the Committee to take exception to the creation of an All-India Chemical Service is the one Indian member Sir P. C. Ray. * * * * Sir P. C. Ray's opinion must carry great weight not only on account of his long experience and his distinction as a teacher and investigator but also of his familiarity with industrial requirements.—*Nature*, Vol. 105. July 29, 1920.

যে হস্তিনাপুর হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত নহে তাহা সকলেই জানেন। আবার বনপর্ব্বে দেখিতে পাই যে যখন পাণ্ডবেরা বনবাস করিতেছিলেন তখন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণও হস্তিনাপুর হইতে উত্তর দিকে গিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর জয় করিয়াছিলেন। কালিদাস যে ভূগোল উত্তমরূপে জানিতেন তাহা মেঘদূতে প্রকাশ। তিনি রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে রঘু প্রথমে পূর্ব্বদিকস্থ প্রদেশসকল জয় করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ হইয়া অবশেষে উত্তর দিকে গিয়া উৎসবসঙ্কেত অর্থাৎ তিব্বতীয়দিগকে জয় করিয়া অবশেষে লৌহিত নদী পার হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ জয় করিলেন। হিমালয়ের উত্তর দিকের ভৌগোলিক জ্ঞান কালিদাসের বিশেষ স্পষ্ট না থাকিলেও এটা ঠিক যে তিনিও মোটামুটি জানিতেন যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ উত্তর দিকে।

আমার বোধ হয় কৃষ্ণ যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষে গিয়া ভগদত্তকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরিকাদিগকে হরণ করেন তখন বা অন্য কোন সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সম্পূর্ণ লোপ হইয়া নামমাত্র অবশিষ্ট ছিল। বাল্মীকি সেই নামটা মাত্র জানিতেন কিন্তু স্থানটা যে কোথায় তাহা জানিতেন না। এই জন্য তিনি সুগ্রীবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ কিষ্কিন্ধ্যার পশ্চিম দিকে দুই সহস্র যোজন দূর। তাহা হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হয় আরব-সাগরে না-হয় আটলান্টিক সাগরে।

সুতরাং মহাভারতে এবং রামায়ণে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম থাকিলেও গৌহাটিই যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ এই মত সমর্থিত হয় না।

উর্ব্বশী আসে নি তো

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

অন্ধকার কালো রাতে উর্ব্বশী আসে নি তো,
এখনও কি তারকারা ঘুমে
যাত্রীর মশালখানি নিভে এল ধীরে ধীরে—
দূরে নেই তপোবন-ছায়া,
তাদের চোখের পরে ঘনালো কি ঘনরাত,
রচিবে না কেহ মধু-মায়া ?
উর্ব্বশীর নিশ্বাসেতে কাঁপিছে হিমালী-গিরি,
প্রান্তরেরে সযতনে চুমে।

বেণু যদি বাজিবে না তারাহীন মৌনরাতে,
বাতাসেতে মর্ম্মর-নিশ্বাস,
অকারণে বারে বারে মৃত্তিকার ব্যথা লয়ে
ঘোরে কেন স্তব্ধ-নিরালায় ?
সরোবরে ছায়া পড়ে উর্ব্বশীর অঞ্চলের,
সেকি নহে ভীরু অসহায় ?

কালো রাতে দীপ জেলে শিয়রেতে কে জাগিবে,
গণিবে কে প্রহর উদাস ?

অরণ্যের কানাকানি কানে যেন পশিতেছে
কুয়াশায় ঘুম গেছে টুটে,
অশান্ত কুসুম-গন্ধে ভ্রমরেরা যাযাবর-সম যেন
খোঁজে ছায়াবাস—
রামধনু নেপথ্যের ফুটিল না নভোতলে,
বুনো হাঁস হয়েছে হতাশ,
উর্ব্বশী আসিবে সে কি এমন স্বপনী-রাতে
কলতান উঠিবে কি ফুটে ?

আজো যে হয় নি তার জাগিবার লগ্ন-শুভ এ কথা কি
কালো রাত্রি জানে ?
বেদনার বিষে হায় মলিনা উর্ব্বশী এসে সে বারতা
কয়ে গেছে কানে।

পুস্তক পরিচয়

চলন্তিকা, আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান। শ্রীরাজশেখর বসু-সংকলিত। বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। প্রকাশক—এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৸৹।

রাজশেখর বাবুর এই অভিধানখানি প্রকাশিত হইবামাত্র প্রসিদ্ধি ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের প্রশংসা লাভ করে। তাহার কারণ ইহার উৎকর্ষ ও ব্যবহারসৌকর্য্য। এই উৎকর্ষ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। আমরা প্রথম হইতেই সর্ব্বদা ব্যবহারের নিমিত্ত এই অভিধানখানি হাতের কাছে রাখিয়া আসিতেছি।

ইহার ছাপা পরিপাটী ও বাঁধাই মজবুত। ইহা প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক আকারের ৬৬৮+৷৷৶৹ পৃষ্ঠার বহি, এত বড় বহির ২৸৹ মূল্য সস্তা।

ইহাতে আটাশ হাজারের অধিক সংস্কৃত, সংস্কৃতজাত, দেশজ ও বিদেশী শব্দের বিবৃতি আছে। তদ্ভিন্ন ৮১ পৃষ্ঠা ব্যাপী পরিশিষ্টে আছে—

বানানের নিয়ম, কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের বানান, ণত্ব ও ষত্ব বিধি, সন্ধি, ক্রিয়ারূপ, শব্দবিভক্তি ও কারক, সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ, এবং পারিভাষিক শব্দ।

বস্তুতঃ এই পরিশিষ্টটির অধিক অংশ একটি বাংলা ব্যাকরণের প্রধান অঙ্গ। বাংলা ভাষায় বাংলা অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণের কতকগুলি অংশ বাস্তবিক বাংলা ব্যাকরণ নহে। রাজশেখর বাবু পরিশিষ্টে প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্ত আদর্শ দিয়াছেন, বলা যাইতে পারে।

পুস্তকখানির অভিধান-অংশটিই অবশ্য ইহার প্রধান অংশ। ইহাতে ব্যাখ্যার জন্য শব্দনির্ব্বাচনে গ্রন্থকারের বাংলা সাহিত্যের জ্ঞান, বিচারশক্তি ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচলিত ও প্রচলনযোগ্য শব্দকেই তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন এবং এই সকল শব্দের যথোচিত বিবৃতির স্থান করিবার জন্য অল্পপ্রচলিত শব্দ যথাসম্ভব বাদ দিয়াছেন। অথচ সম্পূর্ণ প্রকাশিত বৃহত্তম বাংলা অভিধানে যাহা নাই, এরূপ কোন কোন শব্দও ইহাতে আছে। যেমন,—'চালু,' যাহার অর্থ 'প্রচলিত,' 'বাজার চলতি'।

এখন শুধু প্রবেশিকা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষার জন্যও বাংলা বহি লিখিতে ও পড়িতে হইবে। তাহার নিমিত্ত বহু ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ স্থির করা ও তাহার অর্থ জানা আবশ্যক হইবে। ইহা সুসাধ্য করিবার নিমিত্ত রাজশেখর বাবুর নিকট একটি যথেষ্ট বৃহৎ ইংরেজী-বাংলা অভিধান দাবি করা যায় না কি? তিনি অন্ততঃ একটি এইরূপ অভিধান-সংকলন-বোর্ডের সভাপতি হউন।

প্রহাসিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তিকাখানির প্রত্যেকটি কবিতা রচনার সময় কবি যে হাসিয়াছেন, তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। পড়িবার সময় পাঠিকারা (এবং পাঠকেরাও) হাসিবেন।

বহিটির ভূমিকাস্বরূপ কবি যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার শেষে আছে:

"এত বুড়ো কোনো কালে হব নাকো আমি
হাসি তামাশারে যবে কব ছ্যাবলামি।
এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
বিধাতার সাথে তা'রে করি ভাগাভাগি
হাসিতে হাসিতে লব মানি।"

তিনি যে বুড়ো হন নাই, হইবেনও না, এই বইটি তাহার অন্যতম প্রমাণ।

ইহাতে শুধু যে হাসি-তামাশাই আছে, তাহা নহে। এমন সমালোচনাও আছে, যাহাতে সমাজের হিত হইতে পারে। যেমন 'আধুনিকা' কবিতায়—

"বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিত ভাঙে স্মৃতিটার।
ভিড় ক'রে ঘটা করা ধরা-বাঁধা বিলাপে
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
ভারতে ছিল না লেশ এই সব খেয়ালের,
কবি 'পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের।"

কিংবা, "পরিণয়-মঙ্গল" কবিতায়—

"বই-কেনা শখটারে দিয়ো নাকো প্রশ্রয়,
ধার নিয়ে ফিরিয়ো না তাতে নাহি দোষ রয়।
বোকো আর নাই বোকো কাছে রেখো গীতা-টি,
মাঝে মাঝে উল্টিয়ো মনুসংহিতাটি
'স্ত্রী স্বামীর ছায়া সম', মনে যেন হোস্ রয়।"

অথবা, "ভাইদ্বিতীয়ায়"—

"ভাইটি অমূল্য,
নাই তার তুল্য,
সংসারে বোনটি
নেহাৎ অতিরিক্ত।"

হয়ত বা, "মাল্যতত্ত্ব" নামক পরম উপভোগ্য কবিতার শেষে—

"আমি বললেম, 'ওগো কন্যে, গলদ আছে মূলেই,
এতক্ষণ যা তর্ক করছি সেই কথাটা ভুলেই।
মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে।

রিয়ালিস্‌টিক প্রসাধন বা নব্য শাস্ত্রে পড়ি -
সেটা গলার দড়ি।'

নাৎনি আমার কাঁকিয়ে মাথা নেড়ে
এক দৌড়ে চলে গেল আমার আশা ছেড়ে।"

রিয়ালিজ মের প্রতি কটাক্ষ এই কবিতাটির অন্যত্রও আছে।

তাসের দেশ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

তাসের দেশের ব্যঙ্গবিদ্রূপমিশ্রিত পরিকল্পনাটি এই বহিটি লিখিবার আগে কবির মাথায় প্রথম আসিয়া থাকিবে তাঁহার "একটি আষাঢ়ে গল্প" নামক ছোট গল্পটি লিখিবার সময়। আচারবিচার ও প্রাণহীন রেওয়াজের বাঁধনে দেশ ও সমাজ আড়ষ্ট ও অচলিষ্ণু হইয়া পড়িলে তাহাকে কোন রকম একটা ধাক্কা দিয়া, কোন প্রকার একটা আঘাত করিয়া, সচেতন ও চলিষ্ণু করিবার প্রয়োজন কবি "অচলায়তন" রচনা করিবার সময় অনুভব করিয়া থাকিবেন। সেই প্রয়োজনের প্রেরণা "তাসের দেশ" রচনাতেও অনুভূত হইবে।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাতে নূতন জিনিষ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা আদ্যোপান্ত কোথাও না থামিয়া পড়িয়া ফেলা যায়। তাহাতে শুধু সুখ নয়, তাস্‌দের যেমন মানুষ হইবার 'ইচ্ছে' হইয়াছিল, সেইরূপ ইচ্ছাও হয়। এবং তাসের দেশের সকলের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও
বাঁধ ভেঙে দাও

বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক;
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক
যাক ভেসে যাক যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরি ডাক।
ভয় করি না অজানারে
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে
দুর্দাড় বেগে ধাও।"

বিশ্বপরিচয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য এক টাকা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই বৈজ্ঞানিক পুস্তকখানি ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংস্করণ বর্ত্তমান ১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। পনর মাসে ইহার চারিটি সংস্করণ হইয়াছে; দ্বিতীয় সংস্করণ দুইবার মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পরিচয় আগে কয়েক বার দিয়াছি। ইহাতে সহজ ভাষায় বিশদরূপে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক ও ভূলোকের বৈজ্ঞানিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উপসংহারে কবি জীবকোষের কথায় আবির্ভাবের কথা এবং "জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা"র কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন।

কণিকা, শিশু, ইংরেজি সহজ শিক্ষা, প্রথম ভাগ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই তিনটি বহির পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে, মূল্য যথাক্রমে চার আনা, বার আনা ও চার আনা। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

"কণিকা" এপর্য্যন্ত চার বার, "শিশু" নয় বার, এবং "ইংরেজি সহজ শিক্ষা" প্রথম ভাগ দুই বার মুদ্রিত হইয়াছে।

"কণিকা"য় নিম্নোদ্ধৃত কবিতাগুলির মত শতাধিক কবিতা আছে:—

"রাষ্ট্রনীতি।"

"কুড়াল কহিল, ভিক্ষা মাগি ওগো শাল,
হাতল নাহিকো, দাও একখানি ডাল।
ডাল নিয়ে হাতল প্রস্তুত হোল যেই,
তারপরে ভিক্ষুকের চাওয়া-চিন্তা নেই;—
একেবারে গোড়া ঘেঁসে লাগাইল কোপ,
শাল বেচারার হোলো আদি অন্ত লোপ।"

"খেলেনা।"

"ভাবে শিশু বড়ো হোলে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি' সমস্ত খেলেনা।
বড়ো হোলে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধন জন পানে।
আরো বড়ো হবে না কি যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে।"

"স্পর্দ্ধা।"

"হাউই কহিল, মোর কী সাহস ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে—তা'র গায়ে লাগে নাকো কিছু
সে ছাই ফিরিয়া আসে তারি পিছু পিছু।"

"শিশু" পুস্তকটির লোকপ্রিয়তা তাহার বহুবার মুদ্রণে বোঝা যায়। ইহাতে শিশুদের নিজেদের কল্পনা, তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদের মায়েদের স্নেহমাখা কল্পনা, এবং অন্য বহু কবিতা আছে। ইহার অনেকগুলি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ "ক্রেসেণ্ট মুন" নাম দিয়া কবি পুস্তকাকারে প্রকাশ করাইয়াছেন। ইউরোপে সেই অনুবাদগুলি শ্রোত্রী ও শ্রোতাদের খুব ভাল লাগিত বলিয়া কবিকে বহুবার আবৃত্তি করিতে হইত দেখিয়াছি। শিশুরা সকল দেশে সকল জাতির আদরের ধন।

"ইংরেজি সহজ শিক্ষা" বহিটি প্রথম শিক্ষার্থীদের বেশ উপযোগী।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবনতির কারণ—এই পুস্তিকাটির মলাটে নাম আছে দেবপ্রসাদ মিত্র, হিতেন্দ্রনাথ নন্দী, প্রশান্তকুমার ঘোষ, পুলিনবিহারী সেন ও যোগানন্দ দাসের। ইহা

৭৩ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই। বোধ হয় বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য। পুস্তকটির শেষে লিখিত হইয়াছে :—

"আমাদের ব্রাহ্মদেরও আজ গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে, ব্রাহ্মসমাজ তার কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্তে দেশের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় শক্তির সৃষ্টি করেছিল।

"সে কথা বুঝতে গেলে তত্ত্বকৌমুদীর লেখাটা আর একবার মনে করা দরকার :—

'[ব্রাহ্মসমাজ] অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী একটি মহা সাধারণতন্ত্রের আয়োজন করিতেছেন। এই স্বাধীনতা দেখিয়া বহু লোক এখানে সমাগত হইয়াছেন। এই সর্ব্বতোমুখী ভাব ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ গৌরব।' (তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ফাল্গুন, ১৮০৩ শক।)

"এই সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতার আন্দোলন, যা শত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় সুরু করে দিয়েছিলেন এবং যা বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্য্যন্ত এসে স্বদেশী আন্দোলনকে পুষ্ট করেছিল, সেই সত্য-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতার সাধনা এখনো শেষ হয় নি, দেশে ব্রাহ্ম সমাজের এখনো প্রয়োজন আছে।"

সত্য-স্বাধীনতার ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ—এই পুস্তিকাটির মলাটে নাম আছে দেবপ্রসাদ মিত্র, হিতেন্দ্রনাথ নন্দী, জ্ঞানাঞ্জন পাল, চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, পুলিনবিহারী সেন, ও যোগানন্দ দাসের। ইহাও শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক কলিকাতা ৭৩ নং বিবেকানন্দ রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই। বোধ হয় বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য।

তত্ত্বকৌমুদী হইতে উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি এই পুস্তিকাটিতেও মুদ্রিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা—

"সমাজ ও মনুষ্য জাতিকে বিস্মৃত হইয়া কেবল ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকাকেই ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বর, মনুষ্য বা জগতের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিবেন, একটিকে বিস্মৃত হইয়া অন্যটিকে লইয়া অবস্থিতি করিবেন না, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণ।" তত্ত্বকৌমুদী : ১৮০৩ শক (১৮৮২ খৃঃ) ১৬ই ফাল্গুন, পৃ. ২০৬।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীন ধর্ম্ম, স্বাধীনতা না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম হইবে না।" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা, ১০ই মাঘ ১৭৯২ শক (১৮৭১ খৃঃ)।

এই দুটি পুস্তিকায় যত কথা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যায় না। আলোচনা যে নবীন ব্রাহ্মেরা উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা শুভ লক্ষণ। তাঁহারা আলোচনা ও সমাজহিত দেশহিত এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মনেতাদের সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ গবেষণা করিলে উপকৃত ও উপকারী হইতে পারিবেন।

পুস্তিকা দুটি যুক্তি ও তথ্য সহকারে সুলিখিত, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরের ও বাহিরের শিক্ষিত লোকদের জন্য অভিপ্রেত। ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই—অন্ততঃ মুখে—স্বীকার করিবেন যে, উপাসনার অর্থ ব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। এই পূর্ণ-অর্থে ব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্ম এখনও আছেন। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম যেমন এই সংজ্ঞার কেবল প্রথম অংশটি ভাসা-ভাসা অর্থে গ্রহণ করিয়া যাক্যসার ভক্তির বিলাসী, যুবজন যে তেমনই আবার কেবল শেষ অংশটির উপরই গুরুত্ব আরোপ করিতে পারেন, তাহা পুস্তিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায়, যদিও আস্তিকের চক্ষে ঐ দুইটি অংশ একই বস্তুর দুই পিঠ :—

"ব্রাহ্মসমাজকে স্বীকার ক'রে নিতে হ'বে যে, এই অভুক্ত মুখে অন্ন দেওয়া, অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, লাঞ্ছিত ও পদদলিতকে মুক্তিদানই ব্রহ্মোপাসনা।...আজকের ব্রহ্ম অদৃশ্য ঊর্দ্ধলোকবাসী, এমন কি নিঃসঙ্গ নিস্তরঙ্গ নিভৃত অন্তরের সমাধিলোকবাসীও ন'ন, একেবারে উন্মুক্ত আলোকে বিশ্বলোকবাসী মহামানবসমাজ।"

আমাদের বিশ্বাস, যুবজনের কাজ এই ধারণায় অনুরূপ হইলেও তাঁহারা পূর্ণ আলোক পাইয়া ধন্য হইবেন।

মহামানবসমাজ ব্রহ্ম নহেন। ব্রহ্ম তাহাতে নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু তাহার অতীত স্বতন্ত্র অস্তিত্বও তাঁহার আছে।

ড.।

আবাল্য-তপস্বিনী বাঙালী মেয়ে—শ্রীসুরজা দেবী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

আলোচ্য গ্রন্থখানি পরমহংস রামকৃষ্ণ-শিষ্যা এবং শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌরীপুরী মাতাজীর বিস্তারিত জীবনী। লেখিকা মাতাজীর শিষ্যা এবং দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার সেবায় নিয়োজিত থাকা কালে মাতাজীর মুখে যেরূপ সব শুনিয়াছেন তদবলম্বনে তাঁহার গুরুমাতৃকার জীবন-চরিত্র রচনা করিয়াছেন। ভক্তিভাবপূর্ণ এবং কোমল কঠোর বিচিত্র ঘটনাবহুল বাঙালী মেয়ের পুণ্য জীবনী পাঠে নরনারী মাত্রই উপকৃত হইবেন।

শ.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—মূল তাহার বঙ্গানুবাদ, পরমহংস পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীমান্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত গূঢ়ার্থদীপিকা টীকা, ও তাহার বঙ্গানুবাদ, টীকার তাৎপর্য্য এবং প্রশ্নোত্তরছলে ভাব প্রকাশ নামক সার সংক্ষেপ সহ। অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ বেদান্ত-মীমাংসাদি সপ্ততীর্থ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, এম-এ; পি-আর-এস, পিএইচ্-ডি। প্রকাশক কৃষ্ণব্রাদার্স ২২ নং পেয়ারাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য প্রতিখণ্ড ১৲ টাকা গ্রাহকপক্ষে।

ভগবদ্গীতার বহু ভাষ্য টীকা প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীর গূঢ়ার্থদীপিকার ন্যায় সরল, সুললিত, অদ্বৈতসিদ্ধান্তবহুল, যুক্তিপূর্ণ, ভক্তিরসে পরিপ্লুত সাধনানুকূল টীকা এ পর্য্যন্ত বোধ হয় আর হয় নাই। ইহার তুলনা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পণ্ডিতশিরোমণি হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইহার পাঠে আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। এপর্য্যন্ত এই টীকাটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। কেবল বঙ্গানুবাদ কেন, অন্য কোন ভাষাতেই ইহার অনুবাদ হয় নাই। ইহাতে বেদান্তবিচারের কত যে সূক্ষ্ম

তত্ত্ব নিহিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিয়া শেষ করা যায় না। মধুসূদনের মনীষা বেদান্তেও বাঙালী জাতিকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়া গিয়াছে। অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে এ-পর্য্যন্ত যত আপত্তি হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যত হইতে পারে, সে সমস্তই মধুসূদন তাঁহার অদ্বৈত-সিদ্ধি গ্রন্থে যেমন লিপিবদ্ধ করিয়া এবং তৎপরে তাহাদের অখণ্ডনীয় খণ্ডন করিয়া এক অক্ষয় অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তদ্রূপ বেদান্তের সেই সমুদয় সূক্ষ্ম বিচার অতি সুমধুর ভক্তিরসে পরিষিক্ত করিয়া ভগবানের অমৃতময় বাণীর ব্যাখ্যাচ্ছলে এই গীতার টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় আর কেহ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ ইহাই পণ্ডিতগণের বিশ্বাস।

যিনি ইহার অনুবাদক তিনি যেমনই পণ্ডিত তেমনি ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি-সম্পন্ন অনাড়ম্বর পুরুষ। মীমাংসা ও বেদান্ত বিদ্যায় কালে ইনি বাঙালীর গৌরবের বস্তুই হইবেন। টীকার গূঢ়ার্থ আবিষ্কার করিবার জন্য ইহার চেষ্টা সুধীগণ উপভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই। ভাষা অতি সরল ও সুললিত হইয়াছে। অনুবাদ ও তাৎপর্য্য মূলানুগত এবং অভ্রান্তই হইতেছে। সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, এম্-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি, মহাশয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে অসাধারণ পণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি ইহাতে "ভাবপ্রকাশ" নামে যাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে দার্শনিক বিচারের অতি সূক্ষ্ম কথা-গুলি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিপিবদ্ধ করায় অতি সহজবোধ্য হইয়াছে। গীতার গূঢ়ার্থদীপিকার তাৎপর্য্য প্রকাশের এরূপ প্রযত্ন পূর্ব্বে বোধ হয় আর হয় নাই।

অদ্বৈতসিদ্ধি প্রকাশের পর এই গ্রন্থখানির উপাদেয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা এই পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা ইহার অনুবাদ করাই—কিন্তু এক খণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইবার পর উহার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু ইহা জানিতে পারিয়া, যথামূল্যে উহা ক্রয় করিয়া অতি যত্নে উহার পুনর্মুদ্রণে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নতিবিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গভাষার অতুলনীয় একটি সম্পদ লাভ হইবে। গীতাপাঠার্থীর ইহা নিশ্চিতই অপূর্ব্ব সুযোগ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

মায়াপুরী—শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ রায় প্রণীত নাটক। প্রকাশক শ্রীসুরথকুমার সরকার, ১৫০।৩ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

একটি হাসপাতালকে কেন্দ্র করিয়া ঐ হাসপাতালের কাহিনী লইয়াই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। মোট চার অঙ্কে নাটকখানি বিভক্ত। অঙ্কগুলির মধ্যে গর্ভাঙ্কের সংখ্যাধিক্য নাই—আধুনিক যুগের রঙ্গমঞ্চের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সেদিক দিয়া নাটকখানি মঞ্চস্থ করিলে হয়তো ভালই হইবে। নাটক লিখিবার শক্তির আভাসও লেখকের রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত। পৃথিবীতে পাপ হয়তো সর্ব্বত্রই আছে—সাধুর মেলার মধ্যে পাপীও লুকাইয়া থাকে সন্দেহ নাই—কিন্তু তা বলিয়া পৃথিবী একমাত্র পাপের পুরীই নয় এবং সাধুর মেলা কয়েক জন ছদ্মবেশধারীর জন্য পাপীর জনতা হইতে পারে না। হাসপাতালে অন্যায় আছে স্বীকার করি, কিন্তু লেখক সেই অন্যায় দেখাইতে গিয়া হাসপাতালকে এক মাত্র অন্যায় ও পাপানুষ্ঠানের কেন্দ্ররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার নিন্দা করি ও একমাত্র কালো ছাড়িয়া আলোর দিকেও লেখককে দৃষ্টি ফিরাইতে অনুরোধ করি।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোম্বল সর্দ্দার—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরি।

ভোম্বল সর্দ্দারের কাহিনী শিশুসাথী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তখনই ইহা ছেলেমেয়েদের চিত্ত বিনোদন করিয়াছিল। বইখানা যে মনোহর তাহা ইহার দ্রুত অপহরণ দেখিয়া বুঝিলাম। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের হাত হইতে বইখানা সমালোচককে আদায় করিতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বালকদের জন্য লিখিত বইয়ের ইহার বেশী আর কি সার্টিফিকেট হইতে পারে।

কবির স্বপ্নসুষমা—ছন্দে গানে [সবুজ পর্ব্ব] শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়, বি-এ প্রণীত। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা।

১২৩ পৃষ্ঠায় এই কাব্য গ্রন্থখানি সচিত্র—অর্থাৎ গ্রন্থকারের একটি চিত্রও ইহাতে আছে।

গ্রন্থ আরম্ভের পূর্ব্বে কবি 'কথা'তে নিবেদন করিয়াছেন—কোন্ কোন্ বন্ধু তাঁহাকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। কবির বন্ধুরা যৎপরোনাস্তি ভুল করিয়াছেন।

কবি, কোন্ কবিতা কবে, কোন্ গৃহে, কোথায়, কয় ঘটিকার সময় লিখিয়াছেন, কবিতার শেষে তাহার উল্লেখ করিতে ভোলেন নাই। এক কথায় কবিত্বের আবহাওয়া বেশ জমাইয়া তুলিয়াছেন—কিন্তু সবই বৃথা। ইহা কবিতা নয়, কবিতার ভান।

স্মরণ—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ৩৬০ পৃষ্ঠা।

৮২টি শোকগাথার সমষ্টি এই কাব্যগ্রন্থ। একে কবিতা, তাহাতে শোকগাথা তবু ভয় পাইবার কিছু নাই। খ্যাতনামা গ্রন্থকার বেদনাকে অশ্রুর আকারে প্রকাশ না করিয়া, হাস্য, অশ্রু, বিদ্রূপ, পরিহাস মিশ্রিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে ব্যথা আপাতত লঘু মনে হইলেও বস্তুতঃ লঘু হইয়া পড়ে নাই। এইখানেই কবির বাহাদুরি। পড়িবার সময় বারংবার রবীন্দ্রনাথের কণিকার কথা মনে পড়িয়াছে। কিন্তু কবির উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নাই বলিলেই চলে। রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণের দিনে শক্তির মেরুদণ্ডের এমন স্বকীয়ত্ব দেখিয়া কবিকে অনেকবার মনে মনে শ্রদ্ধা জানাইয়াছি।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মোজি ও সাংহাইয়ের ঘাটে

শ্রীশান্তা দেবী

আমরা জাপান থেকে ফেরবার পথে কয়েকটা বন্দরে দাঁড়িয়েছিলাম, যেগুলো জাপান যাবার পথে মোটে চোখেই দেখি নি। সর্ব্বপ্রথম দাঁড়িয়েছিলাম 'মোজি' ব'লে জাপানেরই একটা বন্দরে। এখানে যাত্রী নামক কোন ব্যক্তির দেখা পাওয়া গেল না, কিন্তু লোকের কি দারুণ ভীড়! অধিকাংশই ফিরিওয়ালা। জাহাজটা জাপানী, তারাও জাপানী, কাজেই বাধাবিঘ্নের কোনও সম্ভাবনা নেই। সবাই বিনাবাক্যব্যয়ে পালে পালে জাহাজে উঠে পড়ছে। প্রত্যেকের পিঠে মস্ত মস্ত বোঁচকা। জিনিষ দেখে ডেকে দেখতে গেলাম কি জিনিষ এনেছে। নূতন রকম কিছু হয়ত দেখব আশা করে গিয়েছিলাম। দেখলাম কেবল ফল, বই, ছবি, সিগারেট, দেশলাই, চকোলেট, চটি, মাদুর ইত্যাদি। বুঝলাম নাবিকদের মন ভোলাতেই ফিরিওয়ালারা এসেছে। অবশ্য আমার কাছে বিক্রী করতেও তারা উৎসাহ কম দেখাল না। কিন্তু এক কথাও ইংরেজী কেউ বোঝে না। একবার জিনিষ দেখায় আর একবার পয়সা দেখায়, এমনি করে দাম ঠিক করে। একটা সরু মাদুর দেখিয়ে ষাট সেন হাতে তুলে বুঝিয়ে দিল—এর দাম ষাট সেন। গোটা দুই মাদুর কিনলাম। মেয়ে পুরুষ সবাই ফিরি করছে।

এখানেও জল-পুলিসের জেরা; নাম, ধাম, ব্যবসায় কত কি যে জিজ্ঞাসা করে! কি লেখ? কি রকম গল্প? প্রেমের গল্প না উপকথা? বক্তৃতা দিয়েছ নাকি আমাদের দেশে?

তার পর এল খবরের কাগজের এক রিপোর্টার। আমি তাকেও পুলিসের লোক মনে ক'রে বেশী কথা বলি নি। তবু সে জিজ্ঞাসা করল, "জাপানীদের বিষয়ে নভেল লিখবে কি?" আমি বললাম, "তাদের ত আমি কিছুই জানি না, কি ক'রে নভেল লিখব?" ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে পারি।"

সারাদিন ধ'রে বৃষ্টি পড়ছিল। বন্দরের চারিধার প্রায় পাহাড়ে ঘেরা, কিন্তু কুয়াশায় কিছুই প্রায় দেখা যায় না। জাহাজটা মাঝ-জলে দাঁড়িয়েছিল, তীর থেকে ক্রমাগত লক আর মাল বোঝাই নৌকা আসছে। ফিরবার পথে এ-জাহাজে যাত্রী প্রায় নেই, আছে কেবল মাল। মালবাহী নৌকাগুলিতে মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে খাটছে। মেয়েদের মাথায় রুমাল বাঁধা। এতদিন আমরা জাপানের বড় বড় শহরে ঘুরেছি ব'লে এদেশের গ্রাম্য সাজপোষাক কিছু চোখে পড়ে নি। আজ দেখলাম বৃষ্টির দিনে কেউ কেউ ঝুড়ির মতন বোনা টুপি আর ঘাসের বর্ষাতি পরে মাল তুলতে এসেছে। ঘাস কি খড় দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

জাপান যে প্রাচ্যদেশে কি পরিমাণ জিনিষ বেচে এই সব জাহাজ বোঝাই দেখলে তার চাক্ষুষ জ্ঞান হয়। পিপে আর বাক্স আর বস্তা বয়ে কেবলই নৌকার পর নৌকা আসছে। মেয়েরা দাঁড় বেয়ে নৌকা আনছে। তবে অধিকাংশ নৌকাই বাষ্পে চলে। দেখতে অতি সেকেলে সব নৌকা, তারও এক কোণে ধক্ ধক্ ক'রে এঞ্জিন চলছে। আকাশস্পর্শী মাস্তল ও বড় বড় পাল দেওয়া নৌকারও অভাব নেই। তবে জাপান যে কল কারখানাকে সব চেয়ে উচ্চ স্থান দিয়েছে তা সর্ব্বক্ষেত্রেই বোঝা যায়।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জাহাজের বিরাট উদরে কেবল কপিকলে মাল বোঝাই হ'তে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে মানুষগুলোও ঝাঁক বেঁধে কপিকলে উঠছে আর নামছে।

জাপানীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জাতি, কিন্তু যখন মাল জাহাজগুলি বন্দরে দাঁড়ায় কি নোংরা আর দারুণ অপরিষ্কার

হয় চারধার। ছেঁড়া কাগজ, খড়কুটো, খাবারের উচ্ছিষ্ট, সিগারেটের টুকরো ইত্যাদিতে জাহাজের অমন তকতকে ঝকঝকে স্মোকিং-রুম যেন নরক হয়ে ওঠে। যে মানুষ-গুলো জিনিষ তোলাতে আসে তাদের পোষাক-আসাকও ছেঁড়া, নোংরা এবং অদ্ভুত। এই কাজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা বোধ হয় শক্ত, কারণ রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতির কুলি মজুর ঝাড়ুদার সকলেই ত ঝকঝকে কাপড়-চোপড় এবং ভাল ইউনিফর্মে সজ্জিত। সাধারণ মানুষদের মধ্যেও ছেঁড়া নোংরা কাপড়পরা লোক এক মাসে দুই-এক জনের বেশী দেখি নি।

ভোরবেলা "মোজি" ছেড়ে জাহাজ বেরিয়ে পড়ল। এই জায়গায় সমুদ্র মোটেই শান্ত নয়, জাহাজ এত টলে যে কেবিনের মধ্যেও হাঁটা যায় না। খাবার টেবিল সাজাতে গিয়ে চাকররা এত জল উল্টেছে যে সেখানেও একটা সমুদ্র হয়ে উঠেছে। মোজি খুব সুরক্ষিত জায়গা। জাহাজ ছাড়বার পর সারাপথ দেখলাম দুই পাশে পাহাড়ের মাথায় কামান সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার ছবি তোলা কি আঁকা নিষিদ্ধ, জাহাজের চারধারে এই কথা লিখে দেয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে এগারোটার পর থেকে পাথরের পাহাড়ের উপর বাড়ী ও লাইট-হাউস দেখা যেতে লাগল। মেঘের চোটে আশেপাশে জমি কিছুই চোখে পড়ছিল না। শঙ্খচিলরা মাথার উপর দল বেঁধে উড়ছে। কুয়াশা ও মেঘ কাটবার পর উঁচু জমির গায়ে সাদা সাদা ঢেউয়ের আছড়ানি ভারি সুন্দর লাগছিল।

সন্ধ্যা ৬টার সময় জাহাজ সাকিটো ব'লে একটা ছোট বন্দরে এসে দাঁড়াল। জায়গাটা ছোট হ'লেও দেখতে ভারী সুন্দর। জলের ধারে নীচু নীচু পাহাড়, তার উপর জাপানী টালি-ঢাকা ছোট ছোট কুটীর। বোধ হয় এক একটা পাহাড়ের উপর এক একটা গ্রাম। বেশী মালগুদাম নেই ব'লে গ্রামের সৌন্দর্য্যটি অক্ষুণ্ণ আছে। জলের ভিতর পর্য্যন্ত খাঁটি জংলী পাহাড় তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সহজরূপে নেমে এসেছে। কোনওটা সবুজ বনে ঢাকা, কোনটার পায়ের কাছে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। মাঝে মাঝে সিঁড়ির মত থাক্ থাক্ ক'রে কাটা পাহাড়, তার গায়ে শাক তরকারির বাগান মখমলের মত সবুজ।

রাত্রে গ্রাম থেকে একদল ছোট ছোট ছেলে মেয়ে জাহাজ দেখতে এল। আশপাশের নৌকায় মাঝিমাল্লা আর গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে সব চেয়ে বড় দ্রষ্টব্য পদার্থ ছিলাম আমি। নৌকাগুলো রাত্রে জাহাজের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল। মাঝিরা যতক্ষণ পারল আমাকে দেখল।

এখানেও জাহাজ ছাড়বার দিন ফিরিওয়ালারা স্ত্রী-পুরুষে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা বেয়ে জিনিষ বেচতে আসছে। তাদের বেসাতি চিংড়ি মাছেরই বেশী। মোটা মোটা লাল টকটকে চিংড়ি মাছ, গায়ে উঁচু উঁচু কাঁটা, হঠাৎ দেখলে মনে হয় মোটা একটা আমাদের মাথা আর দাঁড়া গজিয়েছে।

সকালে পাহাড়ের উপরের গ্রামগুলি ভারি সুন্দর লাগছিল। গ্রামের পুরুষরা জল তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, মেয়েরা বেড়ার উপর রঙীন কাপড়চোপড় রোদে দিচ্ছিল। ছোট ছেলেরা খেলা করছে। বেতারের খুঁটির তলায় শাকবেগুনের ক্ষেত, সমুদ্রের গা ঘেঁসে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বোধ হয় জেলেদের, তাদের ডিঙি নৌকাগুলি পাথরের উপর টেনে তোলা রয়েছে। কোথাও বা একটা ভাঙা নৌকা উল্টে পড়ে আছে। সকালের আলোতে সবই সুন্দর লাগছিল।

কুশ্রী কেবল কালো কয়লার পাহাড়গুলো। জাহাজের কোষাধ্যক্ষের কাছে শুনলাম এখানে নাকি সমুদ্রের তলায় কয়লার খনি আছে। জাহাজ এখানে কয়লা নিতে আসে। মস্ত একটা ব্রিজের উপর দিয়ে ছোট ট্রেন দরজা খুলে দিয়ে কয়লা ঢেলে দেয়, সেই কয়লা ট্রে ক'রে আবার ফানেলের ভিতর দিয়ে জাহাজে ঢালে। জাহাজটা ব্রিজের গায়েই দাঁড়ায়।

দশটায় সময় প্লাইলট-জাহাজ আমাদের জাহাজটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টান্তে টান্তে খোলা সমুদ্রে বার করে দিল। পাহাড়ঘেরা বন্দরটা বেশ গরম ছিল, বাইরে আসতেই ঠাণ্ডা সুরু হ'ল। কিন্তু সমুদ্রের চেহারা এখানে কি সুন্দর। বন্দরের ভিতরের জল জাহাজের

আর কয়লার অত্যাচারে ঘোলা নোংরা হয়ে গিয়েছে। এখানে বাইরে দিক্‌চক্রবালের কাছে জল আকাশেরই মত নীল। ধূমোদ্গারী চিম্‌নীওয়ালা জাহাজ এখানে দেখা যায় না, বড় বড় পালতোলা ছবির মত নৌকা ভাসছে, ছোট ছোট ডিঙিও নেচে চলেছে; দূরে কুয়াশায় অস্পষ্ট পাহাড়, জল নদীর মত স্থির অচঞ্চল, রোদ পড়ে ঝক্ ঝক্ করছে। জলের দিকে তাকিয়ে বোম্বাই বন্দরের বাহিরের সমুদ্রের কথা মনে হচ্ছিল।

জাহাজে আমরা ছাড়া আর একটি মাত্র যাত্রী আছে মনে করেছিলাম। সকালে দেখ্‌লাম গুটি তিনেক কোরিয়ান নর্ত্তকী ফুলকাটা কিমোনো প'রে খোলের ভিতর থেকে ডেকে বেরিয়ে এল।

ম্যাকিটো ছাড়িয়ে আমরা চীনদেশের দিকে চললাম। সাংহাই আসবার সময় দেখি নি, যাবার বেলা সেই পথে যাওয়া হবে। চীন সমুদ্রের থেকে কখন যে ইয়াংসিকিয়াং নদীতে ঢুকে পড়লাম কিছু বুঝতে পারি নি। সমুদ্রের রং এখানে একটু হলদে মত, কাজেই নদীর ঘোলা জলের সঙ্গে খুব প্রভেদ নেই। হঠাৎ মনে হল জমির চেহারা, জলের পাড় ত সমুদ্রের ধারের মত নয়, এ ত নদীর ধারের মত, অকস্মাৎ ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গার কাছে যেন এসে পড়েছি। বুঝলাম কোনও নদীতে ঢুকছি। কোষাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করে ঠিক খবর জানলাম। তিনি আমাদের সর্ব্বদা খোঁজখবর নিতেন।

ভোর থেকেই আকাশের গায়ে জমির রেখা ও গাছের সারি দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হয় যেন তাল গাছ, কিন্তু তা নয়, পত্রহীন গাছের ঊর্দ্ধমুখী ডাল আর লম্বা লম্বা কাণ্ড। এতদিন বন্দরে বন্দরে খালি পাহাড় দেখেছি, কারণ সেগুলি সবই সমুদ্রের ধারে। এবার নদীর ধার দিয়ে চলেছি, পাহাড়ের কোন চিহ্ন নেই। দুই পাশে শস্যক্ষেত্র, বিস্তীর্ণ জমি, খড়ের চাল দেওয়া ছোট ছোট কত কুঁড়ে ঘর, কিছু দূরে চওড়া চওড়া রাস্তার দুপাশে গাছ, জমির কৃপণতা নেই, কত দূর পর্য্যন্ত খোলা পড়ে রয়েছে, পাহাড় এসে দৃষ্টিকে বাধা দেয় না। অনেকটা যেন আমাদের এই ভারতবর্ষের মত। জাপান ছোট্ট দেশ, কলে কারখানায় ঘরবাড়ীতে শস্যক্ষেত্রে বাগানে যেন ঠাসা হয়ে আছে। আর চীন দেশের এই দিকটা আমাদের দরিদ্র ভারতবর্ষের মত রিক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। পদ্মার পাড় ভেঙে ভেঙে যেমন জলে পড়ে, তেমনি করে দুই তীর থেকে মাটি ভেঙে ভেঙে ইয়াংসিকিয়াং নদীতে পড়ছে। পালতোলা অসংখ্য নৌকা বড় বড় মাস্তুল আর দড়াদড়ি নিয়ে ভেসে চলেছে। জাপানের জলে ষ্টীম লঞ্চের জ্বালায় প্রাচীনপন্থী নৌকাগুলি শীঘ্র লোপ পাবে। এখানে প্রকাণ্ড জাহাজের মত নৌকাও দাঁড়ে পালে চল্‌ছে, ছোট-খাট ডিঙি প্রভৃতির ত কথাই নেই। মেয়ে পুরুষ সবাই দাঁড় টানে।

নদীপথে আরও কিছুদূর এগিয়ে দেখ্‌লাম নদীর ধারে ছোট ছোট সুন্দর সব বাগানবাড়ী। বড় গাছ-গুলি শীতে সবই পত্রহীন। মনে হয় যেন জাপানের চেয়েও এখান বেশী ঠাণ্ডা। আগেই শুনেছিলাম সাংহাই শীতের জন্ম খুব প্রসিদ্ধ। শীতের ঝোড়ো হাওয়ার ভয়ে অনেক জাহাজ নাকি এ-পথ এড়িয়ে যায়।

আমাদের দেশে গরুর গাড়ীতে যেমন গোল ক'রে ছাউনি দেয়, অনেক ডিঙি নৌকায় সেই রকম ছই দেওয়া। তবে আরোহীরা বেশ নব্য ভাবের। বব্ ক'রে চুলকাটা, গলায় বিলাতী স্কার্ফ জড়ানো চীনা সুন্দরীরা সেকেলে ডিঙিতে অনেকেই ভেসে চলেছেন। কেউ কেউ আমাদের দেখে হাসছিল। দুই-একটা নৌকাতে কয়েকজন শিখকে দেখলাম।

চীনাদের শীতের পোষাক খানিকটা কলারওয়ালা চাপকানের মত দেখ্‌তে, জাপানীদের শীতের জোব্বার মত এতে কেপ দেওয়া নেই। চীনাদের শীতের কাপড় বেশীর ভাগ ঘন নীল; হাল্কা নীল এবং কালোও দেখা যায়। জাপানী পুরুষদের শীতের জোব্বা সবই কালো দেখেছি।

পাশাপাশি মাল ব'লে একটা জাহাজ পথ জুড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, তাই আমাদের জাহাজটার ভিতরে ঢুকতে দেরি হ'ল।

চীনারা জাহাজকে Hsing বলে কিনা জানি না, কিন্তু অনেক জাহাজের গায়েই এই কথাটি লেখা ছিল।

সাংহাই বন্দরে ঢুকেই সর্ব্বপ্রথম চোখে লাগ্‌ল চীনাদের ছেঁড়া ময়লা কাপড়। জাহাজের কাছেই এক পাল ছেলে খালিপায়ে নোংরা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে এসে হুড়োহুড়ি করতে লাগ্‌ল। জাপানে এ-সব কখনও চোখে পড়ে নি। জাপানী যে-সব কুঁড়ে ঘর দেখেছি তার চেয়ে চীনাদের কুঁড়েঘরে দারিদ্র্যের চিহ্ন অনেক বেশী স্পষ্ট।

নদীতে অনেক নৌকার পিছনে মাছের মত কিম্বা মকরের মত মুখের গড়ন করা, উঁচু করে মাছের মত বড় বড় চোখ আঁকা। পালগুলি এত চিত্র-বিচিত্র যে মনে হয় ছবি আঁকা আছে, পালে তালিও অসংখ্য। তার উপর সত্যিই ছবি আঁকা ছিল কিনা বোঝা শক্ত, ঝড়ে রোদে জলে তাদের রং এমন ঝরা পাতার মত হয়ে গিয়েছে যে, অন্য রংগুলো তার ভিতর চাপা পড়ে আছে, মাঝে মাঝে যেন ব্রাউন রঙের পরদার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। মনে হয় যেন হল্‌দে লাল নানা রঙের কিউবিক ছবি।

জাপানী শহরে জাপানী টুপি একেবারে দেখা যায় না, ছবিতেই খালি তার চিহ্ন আছে। কিন্তু চীনে শহরে নানা রকম চীনে টুপির খুব ধুম।

আমরা সাংহাই পৌঁছেই খুব শিখের দল দেখ্‌লাম। জাহাজ-ঘাটে এত শিখ পুরুষ স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে এসেছে যে মনে হয় এটা শিখদেরই অর্দ্ধরাজ্য। শুনলাম অনেক শিখ সপরিবারে দেশে ফিরে যাচ্ছে। কোষাধ্যক্ষ বললেন, 'এরা সত্তর জন এই জাহাজের ডেকে যাবে।' মানুষগুলোর চেহারা ভারি সুন্দর, অধিকাংশকেই সুপুরুষ বলা যেতে পারে। ছয় ফুট অন্তত লম্বা, চওড়াও মন্দ নয়, অনেকের রং জাপানীদের চেয়ে ফরসা, তার উপর পোষাক-আসাক পালপাট্টায় খুব জমকালো দেখায়। বিদেশে দেশের লোকের এই রকম চেহারা দেখলে মনে আনন্দ ও গর্ব্ব হয় বটে; কিন্তু সে গর্ব্ব অতি ক্ষণস্থায়ী। শুধু চেহারায় কি হয়? এই বিরাট দলটি যখন তাদের নোংরা দড়ির খাটিয়া, তৈলাক্ত কাঠের বাক্স, ভাঙা লোহার উনুন, কুশ্রী এলুমিনিয়মের হাঁড়িকুড়ি, পিঁড়ি, সাইকেল, বিশ্বসংসার—সব ঘাড়ে ক'রে এনে জাহাজের ডেকে কায়েমী হ'য়ে বস্‌ল, তখন ভারতীয় ব'লে নিজের পরিচয় দিতে বিশেষ গর্ব্ববোধ করছিলাম না। খ্যাবড়াখোবড়া বেঁটে জাপানীরা বকের পালকের মত সাদা ধপধপে পোষাক পরে উঁচু মাথা ক'রে তাদের পাশ দিয়ে যখন হাঁটছিল তখন তাদের নোংরা খাটিয়া আর ঘোমটা-টানা বৌ দেখে নিশ্চয় মনে মনে হাস্‌ছিল। যে-ডেক জাপানীরা দু-বেলা মেজে ঘষে ধুয়ে পালিস দিয়ে রাখে তার উপর শিখদের বৌরা ছেলেদের দিয়ে ময়লাও করাতে দ্বিধাবোধ করছে না। অশিক্ষায় আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থা এমন হয়ে রয়েছে যে বিদেশে নানা লোকের সঙ্গে চলাফেরা মেলামেশা করেও তারা সাধারণ কতকগুলো শিষ্টাচার শিখে উঠতে পারে নি। এই ডেকযাত্রী মেয়েগুলি কেউ সাত বৎসর, কেউ দশ বৎসর বিদেশে রয়েছে, সাহেব মেমদের সঙ্গে এক জাহাজে যাওয়া-আসা করছে, কিন্তু পরের বেড়াবার পথ তাদের ছেলেপিলেরা নোংরা করলে তাদের কিছুই লজ্জা বোধ হয় না, পরিষ্কার করে দিতে বললে নিঁখুৎ ক'রে করতে কিছুই চেষ্টা করে না। নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার দিকেও তাদের কিছুই চোখ নেই। অথচ মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির অভাব যে তাদের মধ্যে খুব বেশী তাও নয়। আমি তাদেরই দেশের মেয়ে, ছোট একটি মেয়ে নিয়ে দেশে ফিরছি দেখে তারা প্রতিদিন দুবেলা আমার খোঁজখবর করত। একটি মেয়ে রোজ আমাকে ছোলাভাজা, পরোটা, আলুর দম ইত্যাদি দিশী খাবার কিছু না-কিছু দিয়ে যেত। সে শুনেছিল যে ক্রমাগত জাহাজের খাবার খেতে আমাদের আর ভাল লাগে না। এদের আসল অভাব শিক্ষার। প্রতিবেশী কি সহযাত্রীরা পরস্পরের চক্ষুপীড়া উৎপাদন করবে না, পরস্পরের সুখ ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখবে—এ-সব শিক্ষা তাদের কেউ দেয় নি। কাজেই জাপান-প্রবাসী কোটিপতি সিন্ধীদের মেয়েরা এবং চীন-প্রবাসী এই সাধারণ শিখ মেয়েরা কেউ চলাফেরার সময় অপরের কি অসুবিধা হচ্ছে, অথবা অপরে তাদের কি রকম অশিক্ষিত মনে করছে এগুলো ভাবে না।

অন্যান্য বন্দরের মত এখানেও জাহাজে ফিরিওয়ালা উঠেছিল। একটা চীনা মুচি উঠে যত রাজ্যের লোকের

জুতো সেলাই করতে বসে গিয়েছে। এই সব জায়গায় চোরের উৎপাত খুব শুনেছি। জাপানী বন্দরে চোর সম্বন্ধে কেউ সাবধান করে না, কিন্তু এখানে দেখলাম সকালে উঠেই ইয়ার্ড বিজ্ঞাপন লিখে নানা জায়গায় টাঙাচ্ছে :—Beware of Thieve. জাপানীরা ইংরেজী বানান কি ব্যাকরণের ধার ধারে না, কাজেই thieveএর ভুল কারুর চোখে পড়ল না। আমাদের বলে দিল ঘরের পোর্টহোলগুলো যেন বন্ধ রাখি, কারণ ঐদিক দিয়ে চোরেরা ওঠে। দরিদ্র অশিক্ষিত চীনাদের অবস্থা অনেকটা আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেদের মত। জাহাজ-ঘাটের কাছে সারাক্ষণই ছেলের বুড়োয় নানা রকম ঝগড়া চলছিল।

সাধারণ চীনা মেয়েদের পোষাকগুলো বড় বিশ্রী দেখতে। কালো খাট পাজামা আর কালো কোর্ত্তা। আমরা চীনা-বাজারে এদেশেও এ-সব পোষাক দেখেছি। জাপানী মেয়েদের রঙচঙে পোষাকের সঙ্গে এর আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেখানে পোষাকের বাহারে নবাগতের চোখ এমন ধাঁধিয়ে যায় যে কে দরিদ্র কে ধনী, কে ঝি কে মনিব সহজে তারা বুঝতেই পারে না।

চীনা বড়ঘরের মেয়েদের পোষাক-আষাক অবশ্য ভাল কাপড়ের হয়। তবে সেগুলিও জাপানী পোষাকের মত সুদৃশ্য নয়। গাউনগুলির দুই পাশ চেরা এবং সেগুলি লুঙ্গির চেয়েও সংকীর্ণ।

আমরা যখন সাংহাইএর পথে ফিরি তখনও চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয় নি। কিন্তু আসন্ন যুদ্ধের ভয়েই সবাই তটস্থ। জাপানী জাহাজের সামনে দিনরাত পুলিস দাঁড়িয়ে থাকত অথবা পায়চারি করত। জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে যতবার কেউ উঠত কি নামত ততবারই পুলিস কি যেন জিজ্ঞাসা করত। রাত্রে দুজন সশস্ত্র পুলিস জাহাজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের বদলি করবার জন্য কয়েক ঘণ্টা পরে মোটরে চড়ে আবার দু-জন আসত। জাহাজের কোনও কেবিনে বেশীক্ষণ আলো জ্বললেও বোধ হয় ওদের মনে কিছু সন্দেহ হ'ত। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় আমি রাত্রে মাঝে মাঝে আলো জ্বালছিলাম। প্রত্যেক বারই দেখতাম পোর্টহোলের কাছে লোকগুলো এগিয়ে আসছে।

জাপানে ডেক-প্যাসেঞ্জারদের যাওয়া বারণ। সেখান থেকে ডেক-প্যাসেঞ্জার আসেও না। সাংহাই থেকেই এদের ভীড়। সারাদিন ধরে এত চীনা আর শিখ উঠল যে জাহাজটা ভরে গেল। উপরে উঠলেই এতদিন মাথার উপর সুন্দর আকাশ দেখা যেত, এখন আধখানা জাহাজ তেরপল ঢাকা হয়ে গেল, ডেকযাত্রী আর কেবিন-যাত্রীদের এলাকার মধ্যে একটা বেড়া পড়ে গেল। গণ্ডীর বাইরে কারুর যাবার নিয়ম নেই। সকলেই যে নিয়ম মানত তা নয়, তবে অধিকাংশই মানত। নাহলে আমাদের ওখানে টেঁকা দায় হত। যাত্রীরা সবাই এক একটা মাদুর পেতে নিজের নিজের বোঁচকা দিয়ে স্ব-স্ব স্থান অধিকার করে বসল বিকাল বেলা। চীনাদের জিনিষ কম, কারণ তারা যাচ্ছে বিদেশে। বড় বড় ঢাকা-দেওয়া ঝুড়ি আর ছাতা ছাড়া খুব বেশী কিছু তাদের নেই। কিন্তু স্বদেশযাত্রী শিখদের জিনিষে জাহাজ বোঝাই।

পঙ্গপালের মত মানুষ ওঠা শেষ হ'লে, সুরু হ'ল মাংস তোলা। এত জানোয়ার কেটে তুলছে দেখলে গায়ের ভিতর কি রকম করে। এগুলি কতকাল বরফে থাকবে কে জানে?

এতদিন জাহাজে আমরা মা-মেয়ে কেবল ঘুরে বেড়াতাম, বিকেল বেলার সমুদ্র আর সূর্য্যাস্ত শুধু দু-জনে দেখতে বেশ লাগত। এবার লোকের ভীড়ে উপরে উঠতেই ভয় করত।

সকাল বেলা যখন ইয়াংসি নদী দিয়ে আবার সমুদ্রের দিকে ফিরছি তখন আবার চোখে পড়ল সেই কুঁড়ে ঘরের সারি, পালমাস্তুল তোলা নৌকা, সবুজ শস্যক্ষেত্র, পত্রহীন গাছের সারি, নদীর ধারে সুদীর্ঘ জনহীন পথ, উদার মাঠ, বাগান বাড়ী, মাঝে মাঝে উঁচু প্যাগোডার চূড়া, কোথাও বাগানে খড় দিয়ে প্যাগোডার মত চাল। পথে অনেক সমুদ্রযাত্রী জাহাজের সঙ্গে দেখা হ'ল। নদীপথে ঘণ্টা চার চলে সমুদ্রে এসে পড়লাম। এটি চীনা গঙ্গা-সাগর। নদীর কূল দেখা যায় না, তবু জলের রং ঘোলাটে মেটে মত, ঠিক যেন নদীর জল।

ডেকে আজ মহা কোলাহল, যেন শিখ আর চীনেদের মেলা বসেছে। সবাই উবু হয়ে বসে তোলা উনুনে রান্না

চড়িয়েছে। শিখেরা চা তৈরি ক'রে ফ্লাস্কে ঢেলে রাখছে, চীনেরা ঠেসে মাংস আর পাউরুটি খাচ্ছে, তাদের, লম্বা পোষাক দেখে কে যে মেয়ে কে যে পুরুষ বোঝা শক্ত। কেউ কেউ বাটিতে জোড়া কাঠি দিয়ে জাপানীদের মত ভাত খাচ্ছে। কেউ হাঁ ক'রে একদৃষ্টে আমাদের দেখছে।

এদিকে সমুদ্রে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ন্যাড়া পাহাড় দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে আছে। অগাধ সমুদ্রের মাঝখানে একলাটি কোথা থেকে এসে পড়ল কে জানে। কোনটা যেন কচ্ছপের মত, আবার কোনটা মাথায় তিন-চারটা খোঁচা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা এই রকম পাহাড়ের উপর অনেক ঘরবাড়ী রয়েছে। কোথা দিয়ে মানুষ তার উপর ওঠে বুঝতে পারলাম না। যেন কোনও নির্ব্বাসিতা রাজকন্যার জন্য তৈরি পথহীন মায়াপুরী। এগুলি প্রত্যেকে এক একটি আলাদা দ্বীপ, খানিকটা ক'রে সমুদ্র আবার কয়েকটা করে দ্বীপ, ভারি চমৎকার দেখতে।

চীনারা এক একদিন সকালে আধমণ আটা নিয়ে মাখতে বসে যায়। তার পর আমন মাছ আর মুলো শালগম কুটে আদা বাঁটা দিয়ে প্রকাণ্ড কড়ায় রান্না চড়ায়। গন্ধে সেখানে তখন টেঁকে কার সাধ্য! সকাল বেলাই ডেক ধোবার পালা। কাজেই ভোরে উঠেই এদের লেপ কম্বল গুটোতে হয়, তার পর এত রান্নার উৎসাহ ভিজে ডেকে উবু হয়ে ব'সে আসে কি করে কে জানে? সত্যিই এরা আশ্চর্য্য কষ্টসহিষ্ণু জাত।

শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রদর্শনী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

আমাদের দেশে সম্প্রতি চিত্র ও সে-সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ একটা প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে—চারি দিকে কলাবিদ্যালয় ও শিল্পী-সংসদ জন্মিতেছে ও মরিতেছে, দৈনিক-সাপ্তাহিক, মাসিক-ত্রৈমাসিকে শিল্প-নিদর্শনের প্রতিলিপি ও সে-সম্বন্ধে গবেষণার ভিড় জমিতেছে, অলিতে-গলিতে প্রদর্শনী তো নিত্যই লাগিয়া আছে—দেখিয়া শুনিয়া সহসা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে শিল্প সম্বন্ধে আমরা অনেকখানি সচেতন হইয়াছি, অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়াছি। চিত্রকলার অভ্যাস ও আলোচনার এই বিস্তার শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই—কিন্তু আপাতদৃষ্টি বর্জ্জন করিলেই দেখা যাইবে, ইহার মধ্যে পরিমাণ-বাহুল্য যতখানি আছে গভীরতা ততখানি নাই, অনুকৃতি যতখানি আছে ততখানি নবীনতা নাই; বৎসরে বৎসরে বিরাটকায় প্রদর্শনী খুলিয়া, প্রচারের সাহায্যে বিচিত্র ভিড় জমাইয়া, সামান্যতম শিল্প-বোধবর্জ্জিত ধনী পৃষ্ঠপোষকের সাহায্যে কেনাবেচা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি, কিন্তু তাহার বিরাট উদর পূর্ণ করিবার জন্য নির্ব্বিচারে এমন সব নিদর্শনকে স্বাগত-সম্ভাষণ করি যে তাহাতে কলালক্ষ্মী ধিক্কৃতা হন; বড়দিনের বাজারে দেয়ালপঞ্জীর দোকানেই যাহার প্রকৃত আসন সেই সকল শিল্পবিকৃতি-নিদর্শনগুলিকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া বহুমানিত প্রদর্শনীতে আসন দিয়া আমাদের শিল্পবুদ্ধিকে লাঞ্ছিত করি। সুতরাং দেশে চিত্রচর্চ্চার আয়তন-স্ফীতি দেখিয়া আশান্বিত হইলেও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিবার যথেষ্ট কোন কারণ নাই; নির্ভীক অথচ রসিক শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ দুর্ভাগ্যক্রমে একরূপ একান্ত অবসরেই দিন অতিবাহন করিতেছেন—বহুপ্রচারিত অন্যান্য শিল্পীরাও এমন শিল্পনিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে রচনা করিতেছেন না, যাহা লইয়া দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিলেও খুব গর্ব্বিত হইবার অবসর আছে।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের অধিনেতৃত্বে ভারত-শিল্পধারা প্রাণশক্তিতে পুষ্ট হইয়া নব নব পথে চলিতেছে, এইরূপ কথা সাধারণ ভাবে আমরা জানিয়া আশান্বিত ছিলাম বটে, কিন্তু সমগ্র ভাবে তাহার পরিচয় দেশবাসীর সম্মুখে এত দিন উপস্থিত হয় নাই। কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রভৃতির শিল্পকীর্ত্তি অবশ্য দেশে ও বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কয়েক মাস পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের চিত্রের একটি প্রদর্শনীও কলিকাতায় হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে আধুনিক অপেক্ষা পুরাতন চিত্রই ছিল বেশী। নন্দলাল বসু ও তাঁহার ছাত্রদের আধুনিক শিল্পধারা এই প্রদর্শনীতে সম্যক্ সংহত রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন নিদর্শনে ভারত-শিল্পে যে নূতন পথনির্দ্দেশ দেখি, যে প্রাণস্ফুলিঙ্গের পরিচয় পাই, তাহাতে আমাদের আশা ও আনন্দের বিষয় অনেক আছে, এমন কি গর্ব্বিত হইবারও কারণ আছে বলিয়া মনে করি।

প্রদর্শনীর শিল্প-নিদর্শনের দুই-চারিটির স্বল্প উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে চিত্রের বর্ত্তমান মূল্যনির্ণয়-রীতি ও আদর্শের কথা কিছু বলিয়া লওয়া প্রাসঙ্গিক হইবে। সাহিত্য-বিচারে আমাদের দেশের সাধারণ রুচি অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু শিল্পে রুচি একেবারেই গঠিত হয় নাই বলিলে অন্যায় হয় না। এই জন্য, অনেক সুশিক্ষিত লোকেরও চিত্র সম্বন্ধে মতামত শুনিলে এবং আপন গৃহে চিত্র-রুচির পরিচয় দেখিলে নৈরাশ্য জন্মে। ইঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, শিল্পের রসগ্রাহী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের অনেকের নিকটও চিত্রের বিষয়বস্তুর মর্য্যাদাই এখনও এত অধিক যে, চিত্রের যে স্বকীয় মূল্য আছে, যে স্বতন্ত্র রস-নিবেদন আছে তাহা অনেকটা উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অথচ চিত্রের এই স্বতন্ত্র, বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ মর্য্যাদার বোধ না-জন্মা পর্য্যন্ত শিল্পরসগ্রাহিতা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। এইজন্যই দেখি, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পনৈপুণ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আরব্য-উপন্যাস-আলেখ্যাবলী তেমন সমাদৃত হয় নাই যতটা লোকপ্রিয় হইয়াছে তাঁহার "ভারতমাতা" চিত্র। সম্ভবতঃ, এই চিত্রটি সু-অঙ্কিত না হইলেও লোকপ্রিয় হইতে বাধা হইত না; কারণ ইহার বিষয়বস্তুর গৌরব এমনই যে, তাহার প্রসঙ্গমাত্রই আমাদিগকে প্রভাবান্বিত করে, অঙ্কন-কৌশলের প্রশ্নই আর অধিকাংশ সময়ে মনে থাকে না। এই জন্যই হয়ত নন্দলাল বসুর "গিরিশ", "সতী" প্রভৃতি যেমন আদৃত হইয়াছিল, শিল্পগৌরবে ন্যূন না হইয়াও, এবং পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে অঙ্কিত হইয়াও তাঁহার অধুনাতন "স্বর্ণকুম্ভ", "রাধার বিরহ" প্রভৃতি চিত্র তেমন জনপ্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই; তাহার কারণ হয়ত এই যে, এইগুলিতে ভাবের ও বিষয়ের মহিমা অপেক্ষাকৃত গৌণ, চিত্রের স্বকীয় রস ও শিল্পনৈপুণ্যই প্রধান স্থান লইয়াছে।

বিষয়বস্তুর একান্ত প্রাধান্য হইতে শিল্পকে মুক্তি দিবার ও স্বীয় প্রাধান্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের কাজে সার্থক হইয়াছে।

এই প্রদর্শনীতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, কাব্যালুতা হইতে বলিষ্ঠতার দিকে অভিমুখীনতা, ঐতিহ্য ও পুরাতনী হইতে প্রকৃতি ও পরিবেশের দিকে গতি-পরিবর্ত্তনের চিহ্ন।

সকলেই জানেন, বঙ্গীয় পন্থার প্রথম যুগের চিত্রকরগণ উপাদান আহরণ করিয়াছেন প্রধানতঃ আমাদের পুরাণ-কথা হইতে। ইহা যে-সময়ের কথা তখন শিল্পধারা আমাদের দেশে আর জীবন্ত ছিল না, একটা বিশেষ সচেতন প্রয়াস দ্বারা শিল্পে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার তাই প্রয়োজন হইয়াছিল—সে-সময়ে প্রারম্ভিক রূপে চিরন্তন ও প্রাচীনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা তাই অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু শুধু পুরাণ-কথার চতুর্দ্দিকেই আবর্ত্তন করা সুস্থতার ধর্ম্ম নহে। আর, তখনকার যুগের অনেকের চিত্রের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল কাব্যময়, একান্তভাবে গীতধর্ম্মী। চিত্র যদি কেবল নানা বর্ণে সাহিত্য ও কাব্যের ব্যাখ্যান হয়, গীতধর্ম্মই যদি তাহাতে প্রধান হইয়া ওঠে তবে চিত্রের স্বতন্ত্র সত্তাকে তাহাতে ক্ষুণ্ণই করা হয়, তাহার মেরুদণ্ডও আর সরল ও সবল থাকে না। এই সকল বাধা হইতেও



অরণ্যপ

শ্রীনন্দলাল বসু



অলিন্দবর্তিনী

শ্রীনন্দলাল বসু

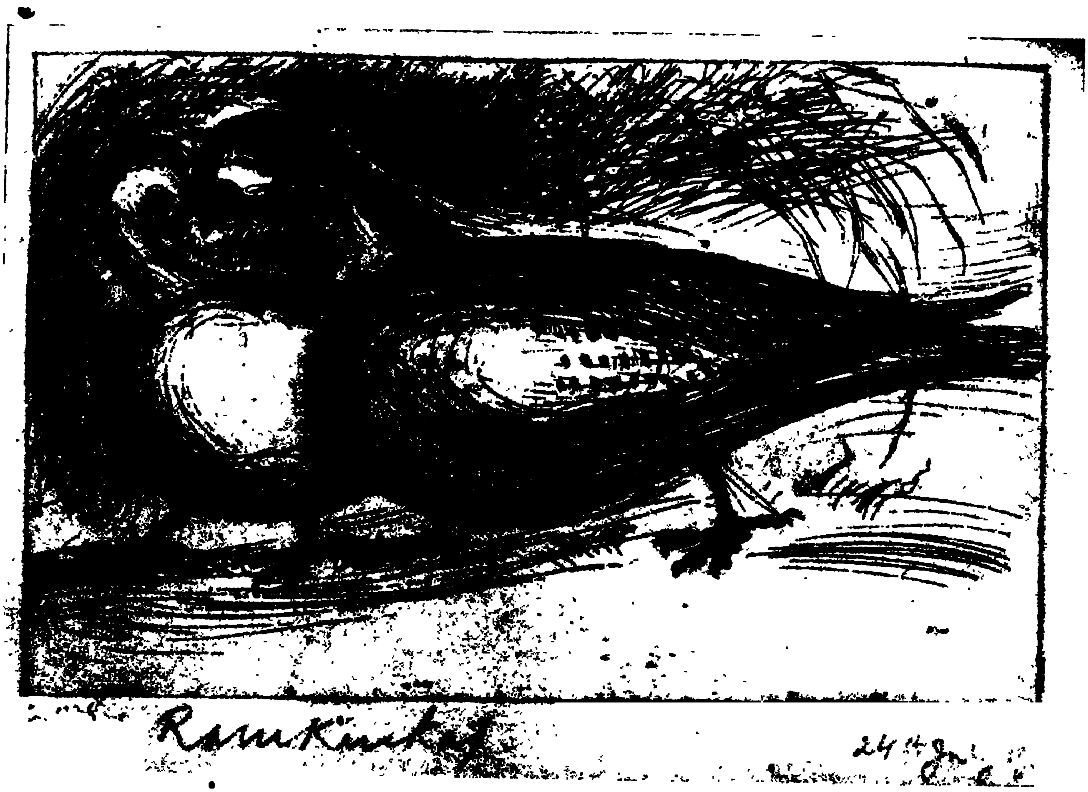


হাতীসওয়ার

শ্রীনন্দলাল বসু



ড্রাইপয়েন্ট : শ্রীনন্দলাল বসু



বনকপোত

এচিং : শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ



বনপথ
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা চিত্রকলাকে মুক্ত করিয়াছেন—নকল বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নয়, সহজ বিবর্ত্তনের ধারায়, নিজেদের প্রতিবেশের সহিত সহজে মিলিত হইয়া ও তাহার উদার গভীর রূপ হইতে প্রেরণা গ্রহণ করিয়া।

নব্যবঙ্গীয় শিল্পপন্থার গোড়ার দিকে আর একটা মনোভাব কাজ করিয়াছিল, তাহা হইল ঐকান্তিক একটা স্বদেশতন্ময়তা। এই সময়ে আমাদের জীবনে কি দেশী কি বিদেশী কোন আর্টই সত্য ছিল না, কাজেই গোড়াপত্তন উপলক্ষ্যে, স্বদেশী ভাবের উপরে একটা বিশেষ জোর দেওয়া আবশ্যক ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। শিল্পীর দিক দিয়া এই স্বদেশী ভাবটা প্রকাশ পাইয়াছিল দেশীয় ভিন্ন অন্য পদ্ধতির প্রতি বিরাগে এবং এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বিচারে এই শিল্প-পদ্ধতি আমাদের অনেকের গৌরব ও গর্ব্বের বিষয় হইয়াছিল। এই স্বদেশী ভাবের উদ্বোধনের সহিত উপরে লিখিত ঐতিহ্যানুসরণ ও কাব্যময়তার যোগাযোগও সহজবোধ্য। কিন্তু স্বদেশী ভাবের দিকে এই একান্ত ঝোঁক বাল্য-অবস্থায়ই শোভন ছিল। কিন্তু দেখিতেছি এই বাল্য-অবস্থাটা আর আমাদের কিছুতেই কাটিতে চাহিতেছে না। তাই দেখি, ভারত-শিল্পে বাহিরের শিল্পধারার সত্য বা কল্পিত কোন প্রভাবের কথা শুনিলেই অনেক প্রবীণ শিল্পী ও শিল্পরসিক বিচলিত হইয়া পড়েন। কিন্তু চারিদিকে এইরূপ গণ্ডী আঁকিয়া প্রাচীর তুলিয়া স্পর্শদোষ বাঁচানো, পরিণত মানুষের বা সুস্থ শিল্পের সহজ বৃদ্ধি ও বিস্তারের পক্ষে অনুকূল কখনও হইতে পারে না। হয়ও নাই। সাহিত্যে আমরা বিদেশের চিন্তা ও কল্পনা গ্রহণ ও আত্মগত করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করিতে দ্বিধা বোধ করিব না, কিন্তু শিল্পের বেলায়ই গণ্ডী টানিয়া বসিয়া থাকিব অথচ তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না, ইহা সম্ভব বা স্বাভাবিক নহে। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা এই ভীরুতার সাধনা করেন নাই; কাজেই বিভিন্ন দেশের শিল্পশৈলী জাতিচ্যুতির ভয়ে তাঁহারা পরখ করিয়া দেখিতে বা প্রয়োজনমত গ্রহণ করিতে ভয় পান না।

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাব গ্রহণ করা যদি অনুমোদিত হয় তবে বিদেশের বিদ্যালয়ে বা শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ করিয়া এবং রাজামহারাজার অয়েল-পেন্টিং করিয়া, 'পাশ্চাত্য শৈলীর শিল্পী' বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হই কেন? সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের এই তথাকথিত পাশ্চাত্য শৈলীর শিল্পীরা অক্ষম শিল্পী, 'পাশ্চাত্য' অর্থে ইহারা খেলো ব্রিটিশ আর্টের নিদর্শন বুঝিয়া থাকেন বাহ্য রূপসাদৃশ্যই ("phto-graphic" এই সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করিতেছি) ইহাদের একমাত্র উপজীব্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক



হরিপুরা কংগ্রেস-মণ্ডপী চিত্র
শ্রীনন্দলাল বসু

কালে পাশ্চাত্য শিল্পে যে-সকল ভাব-সংঘাত ও বিচিত্র পরীক্ষণ দেখা গিয়াছে সে-দিকটার সহিত তাঁহারা পরিচিত নহেন। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা পাশ্চাত্য শিল্পের এই আধুনিক প্রগতির দিকটাই আলোচনা করিয়াছেন।

আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাও অনেক প্রচারিত হইয়াছে। শিল্পরীতির যে ধারা বর্ত্তমানে প্রচলিত ছিল আপাতদৃষ্টিতে তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখিলেই অনেক সময় আমাদের মনে হইয়াছে, ইহা বুঝি বিদেশী পদ্ধতির প্রভাব। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রবাসীতে আলোচনা-প্রসঙ্গে, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের একখানি আধুনিক চিত্রে প্রভাব যে বিদেশীয় নয়, দেশীয় চিত্ররীতিই যে তাহার মূলে, ইহা দেখাইয়াছিলেন। এই প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর দৃশ্যচিত্রগুলি দেখিয়া পাশ্চাত্য অনুপ্রাণনার কথা মনে হইতে পারে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তাহার অনেক-গুলির সহিত চৈনিক চিত্রকলার কোন কোন ধারার বিশেষ সঙ্গতি দেখা যাইবে।

বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে আর একটি কথা বক্তব্য এই যে আপাতদৃষ্টিতে যাহা প্রভাব বলিয়া মনে হয় তাহা সব সময়ে সচেতন কোন অনুসরণের ফল নয়, দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্যই বিভিন্ন দেশের শিল্পীর শিল্পভঙ্গীর মধ্যে একটা ঐক্য আনিয়াছে। প্রথম যুগের চিত্রের কমনীয়তা ও রসালুতা হইতে আধুনিক শিল্পী মহনীয়তা ও বলিষ্ঠতার দিকে, সবলতা ও সরলতার দিকে শিল্পধারাকে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছেন; তাই বিদেশেও যে-সকল শিল্পী ঐ একই পথের পথিক তাহাদের সহিত ভঙ্গীতে ও শৈলীতে আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পীর একটা মিল দেখা যাইতেছে—ইহাতে ধর্ম্মচ্যুতির কোন ভয় নাই, কারণ ইহারা দেশীয় ও প্রাচ্যের বিভিন্ন শিল্পধারাকে বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন ও দেশীয় ভূমির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত আছেন, আত্মবিস্মৃত হন নাই।

এখন প্রদর্শনীর চিত্র দু-একখানির সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রদর্শনীর প্রধান দর্শনীয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর চিত্রাবলী—তাঁহার অঙ্কিত চিত্র, এচিং, কাঠখোদাই প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের



হরিপুরা কংগ্রেস-মণ্ডপী চিত্র
শ্রীনন্দলাল বসু

এতগুলি কাজ একত্র পূর্ব্বে কোথাও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নির্ব্বাচিত কয়েকটি বর্ণসমাবেশে (restricted paletteএ) অঙ্কিত দৃশ্য-প্রধান চিত্রাবলী। এইরূপ স্বল্পবর্ণসমাবেশে ও সামান্য ও তুচ্ছ বিষয়বস্তু লইয়া সার্থক চিত্রাঙ্কন অত্যন্ত দুরূহ, ও শ্রেষ্ঠ শিল্পক্ষমতার দ্যোতক। এই চিত্রগুলির যাহা বক্তব্য তাহা অতি সহজ ও সোজা ভাবেই বলা হইয়াছে—কিন্তু এইরূপ সহজ ও সোজা ভাবে বলার টেক্‌নিক্ অক্ষম শিল্পীর সাধ্যায়ত্ত নহে,—এই ক্ষমতা এই টেক্‌নিক্ শ্রেষ্ঠ চৈনিক শিল্পীরা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

যে বিষয়বস্তু লইয়া, যে শৈলীতেই ছবি আঁকা হউক না কেন, চিত্র যখন রং রেখা ও বিষয়ের সমাবেশে একটি অখণ্ড চিত্ররসের পরিবেশক হয়, যাহার আবেদন কেবল বিষয়-গৌরবে নহে, বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র (abstract) সত্তা ও শ্রেষ্ঠতা যাহার আছে, তখনই ছবিকে শ্রেষ্ঠ গৌরব দিতে পারি। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অধুনা-অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্রগুলি দেখিলে তাঁহার পরিণত শিল্প-প্রতিভা এই পথেই চলিতেছে দেখিতে পাই। এই সব চিত্র পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে রচিত হইলেও এগুলি আর 'ইলাস্ট্রেশন' বা কাহিনী-চিত্রণ নয়—বিষয় এখানে গৌণ, শিল্পরসই প্রধান। "স্বর্ণকুম্ভ" চিত্রখানি রাধার কাহিনী লইয়া অঙ্কিত—রাধা সচ্ছিদ্র কলসী জলপূর্ণ করিয়া আনিয়া সতীত্বের প্রমাণ দিতে চলিয়াছেন—কিন্তু এই ছবিটি, উপাখ্যানের কথাই বড় করিয়া মনে জাগাইয়া দিয়া আমাদের ভাবাবিষ্ট করে না। এমন কি উপাখ্যান না জানিলেও ইহার শিল্প-কৌশল উপভোগে বাধা জন্মে না। গভীর বেদনার আঘাতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একটি নির্ব্বিকার কঠোর ভাব এই চিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে, রাধার নিরুদ্ধ আবেগ তাহার গতি ও ভঙ্গীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, উপাখ্যান অপেক্ষা রসই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—উপাখ্যান এখানে বিশেষ রস বিশেষ অনুভূতির বাহন মাত্র। অন্যান্য পৌরাণিক চিত্রগুলিও এইরূপ; "রাধার বিরহ" ছবিখানিও কাহিনী-সর্ব্বস্ব নহে, নিদাঘঋতুর তাপক্লান্ত অবসন্ন মধ্যাহ্নের রূপ।



ছাগল

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের চিত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর প্রভৃতির চিত্রের এবং শ্রীবিশ্বরূপ বসুর রঙীন ছাপের ছবির পাঠকগণ সুপরিচিত। শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছবি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক। ল্যাণ্ডস্কেপ বা দৃশ্যচিত্রই ইহার প্রধান উপজীব্য। দৃশ্যচিত্র নব্য ভারতীয় পদ্ধতির প্রথম দিকে সমাদরের আসন পায় নাই, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের শিক্ষকতায়ই অধুনা ইহার বিস্তৃত প্রচলন হইতেছে। সম্প্রতি যাঁহারা



ঝাঁতিকল
শ্রীদুর্গাকুমার রায়

যে শুধু ভারতবর্ষেরই শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হইবেন তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবীতেই শিল্পী-সভায় তাঁহার সম্মানের একটি স্থির আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে—তাঁহার রচনায় এরূপ আশার অবকাশ আছে।

কাঠখোদাই প্রভৃতি ছাপের ছবির কাজও শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারাই বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কাঠখোদাইর পরিচয় অল্পবিস্তর সুবিদিত। তরুণ ছাত্রদের কাঠ- ও লিনো- খোদাই

এরূপ চিত্র আঁকিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কাজে বাহ্য রূপসাদৃশ্য বা photographic qualityই অধিক, তাহা শিল্পপদবাচ্য নহে,—কাহারও কাহারও কাজে দৃশ্যের বহিঃসৌন্দর্য্যের দিক্‌টাতেই বেশি ঝোঁক পড়িয়াছে। প্রকৃতির যে ভাবগভীর রূপ, তাহার spirit, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রে রসঘন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—প্রকৃতি তাহাতে আর তরুলতার নিছক একটা সমষ্টি নয়, বা সুন্দর ও প্রীতিকর একটা পরিবেশ মাত্র নয়—তাহার একটা প্রাণস্পন্দিত সত্তা আছে আমাদের অন্তরকে স্পর্শ ও জাগরিত করে।

আমাদের দেশে প্রতিমূর্ত্তিও ভাস্কর্য্যের চর্চ্চাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু অনেকের কাজই এখনো মাত্র রূপসাদৃশ্যের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া সার্থক শিল্পে পরিণত হইতে পারে নাই। শান্তিনিকেতনের শিল্পীগণ ভাস্কর্য্য ও প্রতিমূর্ত্তির যে চর্চ্চা করিতেছেন তাহাতে আমাদের দেশে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হয়। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ কারুকুশলতায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। আধুনিক জীবন লইয়া বিশাল মূর্ত্তিগঠনও তাঁহার দ্বারা প্রথম হইয়াছে। তিনি যদি কোন বিশেষ ষ্টাইল বা রীতির বন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ স্বকীয়তায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তবে তিনি

কাজের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে ইঁহাদের কাজের পরিকল্পনা বিশেষ উচ্চাঙ্গের, কিন্তু যন্ত্রব্যবহার ও ছাপার কাজ তেমন উত্তম বোধ হইল না। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশীর লিনোকাটগুলি উল্লেখযোগ্য। শ্রীবিশ্বরূপ বসুর রঙীন কাঠখোদাইর নূতন নিদর্শন (অবনীন্দ্রনাথের "কচ ও দেবযানী" চিত্রের প্রতিলিপি) প্রদর্শনীতে আছে।

এচিঙেরও বিশেষ চর্চ্চা শান্তিনিকেতনে বর্ত্তমানে চলিতেছে। শ্রীনন্দলাল বসু, কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্ত্তমান অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং রামকিঙ্কর বেইজ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীবিশ্বরূপ বসু, শ্রীদুর্গাকুমার রায় শ্রীশান্তিময় গুহ প্রভৃতি এই বিভাগে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বতন ছাত্র শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তও এই পদ্ধতির সার্থক চর্চ্চা করিয়াছেন। এ পদ্ধতিটিও বিদেশ হইতে আগত, ইহাতে আমাদের দেশীয় ট্র্যাডিশন কিছু ছিল না; তৎসত্ত্বেও এদেশীয় এচিঙের একটি নিজস্ব রূপ ক্রমশঃ দেখা দিতেছে।

[শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কোন কোন রচনা হইতে এই প্রবন্ধে সহায়তা লওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত 'হাতীসওয়ার' চিত্রখানি শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত। অন্য চিত্রগুলি ব্যবহার করিতে প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুমতি দিয়াছেন।]

বিবিধ প্রসঙ্গ

"স্বাধীনতা-দিবস"

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের অনেক গ্রামে ও নগরে "স্বাধীনতা-দিবস" পালিত হইয়াছে। অন্ত কোন কোন দেশে যে স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব হয়, তাহা তাহাদের স্বাধীনতা-লাভের দিনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব। আমাদের "স্বাধীনতা-দিবস" তাহা নহে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লাহোরে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, পূর্ণস্বরাজ বা স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য। উহা ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ঘোষিত হয়। ঐরূপ ঘোষণা তদবধি প্রতিবৎসর ঐ তারিখে হইয়া আসিতেছে। ইহা স্বাধীনতা লাভের দিনের স্মারক উৎসব না হইলেও, ইহার গুরুত্ব আছে। এমন সময় ছিল যখন, ভারতবর্ষ যে আবার স্বাধীন হইতে পারে, তাহা অগণিত লোকে কল্পনা করিত না, আশা করিত না, বিশ্বাস করিত না। এখন যে তাহা করে, ইহা কম কথা নয়। সাহস করিয়া বিশ্বাস ও আশা সহকারে যে তাহারা বলে, স্বাধীনতা চাই-ই চাই, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিব, নতুবা নিশ্চিহ্ন হইতে হয় হইব, ইহা কম কথা নয়। তাহা অপেক্ষাও ভরসার কথা এই যে, স্বাধীনতার জন্ম হাজার হাজার নরনারী সর্ব্ববিধ দুঃখ বরণ ও ভোগ করিয়াছেন, অনেকে মরণান্ত দুঃখ বরণ ও ভোগ করিয়াছেন।

—

"স্বাধীনতা-দিবসে" পঠিত প্রতিজ্ঞা

প্রতি বৎসর "স্বাধীনতা-দিবসে" যে প্রতিজ্ঞাপত্র পঠিত হয়, তাহা ইংরেজীতে লিখিত হইয়া ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই অনুবাদগুলির মধ্যে যেটি যে অঞ্চলের ভাষায়, সেটি সেখানে পঠিত হয়। ইংরেজীতে আছে :—

"We pledge ourselves anew to the independence of India and solemnly resolve to carry on non-violently the struggle till Purna Swaraj is attained."

তাৎপর্য্য। আমরা নূতন করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-ব্রত গ্রহণ করিতেছি এবং পূর্ণস্বরাজ না-পাওয়া পর্য্যন্ত অহিংসভাবে স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টা চালাইতে গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

—

স্বাধীনতা কেন চাই ?

অন্য সকল জাতির মত ভারতীয়দেরও যে স্বাধীনতার অনুচ্ছেদ্য অধিকার আছে, তাহাদের স্বীয় শ্রমের ফল ভোগ করিবার অধিকার আছে, জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্ম আবশ্যক সব কিছু পাইবার অধিকার আছে—যাহাতে তাহারা বাড়িবার পূর্ণ সুবিধা পায়, এই অতি যথার্থ ও অতি সহজ কথা স্বাধীনতা-প্রতিজ্ঞায় আছে। ইহাও তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যদি কোন গবর্ন্মেণ্ট কোন জাতিকে এই সব অধিকার হইতে বঞ্চিত করে ও তাহাদের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে সেই জাতির সেই গবর্ন্মেণ্টের পরিবর্ত্তন বা বিলোপ সাধন করিবার অধিকার আছে। ইহাও স্বতঃসিদ্ধের মত সত্য।

তাহার পর, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ দিকে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "সেই হেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইবে এবং পূর্ণস্বরাজ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে।"

এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তি সুবিদিত যে, তিনি স্বাধীনতার সারবস্তু ("substance of independence") পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন। আমাদের বোধ হয়, তিনি আপাততঃ কিসে সন্তুষ্ট হইবেন তাহাই বলিয়াছিলেন, চরম লক্ষ্যের সম্বন্ধে ইহা বলেন নাই। চরম লক্ষ্য যে পূর্ণস্বরাজ তাহা ত বলাই হইয়াছে।

ইহার পর প্রতিজ্ঞাপত্রে পূর্ণস্বরাজ লাভের উপায় ও

পন্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—বলপ্রয়োগ, হিংসা, সে-পথ নহে; ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ ও বৈধ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া শক্তি ও আত্মনির্ভর লাভ করিয়াছে ও স্বরাজের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, এবং এই পন্থা অবলম্বন দ্বারাই আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে।

আমাদেরও বিশ্বাস সেইরূপ।

—

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কারণ

বিদেশের কোন জাতি যদি অন্য কোন জাতির দেশ অধিকার করিয়া আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতে থাকে এবং অধিকন্তু অধিকৃত দেশের লোকদের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে পরাধীন জাতির মনে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ ও সহজেই আসে। দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে যদি সেই জাতির মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা ও আশা ক্ষীণ হইয়া লুপ্তপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহা জাগাইয়া তুলিবার সকলের চেয়ে সহজ উপায়, তাহাদের যে-সকল অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রতি যে-সব অত্যাচার হইয়াছে, তাহাদের যে-সকল ক্ষতি ও অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের যে অপমান ও লাঞ্ছনা হইয়াছে, এবং তাহাদের পূর্ণ উন্নতির পক্ষে যে-সকল বাধা বিদ্যমান আছে, সেই সমুদয়ের কথা জনগণকে পুনঃপুনঃ বলা ও স্মরণ করাইয়া দেওয়া। এই জন্য, "স্বাধীনতা-দিবস" উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দোষত্রুটির উল্লেখ আবশ্যক।

কিন্তু যদি এরূপ হইত যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ব্রিটেনের স্বার্থসিদ্ধি না করিয়া কেবল ভারতবর্ষেরই মঙ্গল চাহিত, যদি ব্রিটিশ শাসনে কোন অত্যাচার না-হইত, এবং যদি ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশের ধন ও স্বাস্থ্য ভাল হইত, জনগণের জ্ঞানও বাড়িত, তাহা হইলে কি স্বাধীন হইবার কোন প্রয়োজন হইত না? তাহা হইলে কি আমরা কেহই স্বাধীনতা চাহিতাম না? নিশ্চয়ই চাহিতাম।

কেন চাহিতাম?

চাহিতাম এই জন্য যে, মানুষ মানুষ, গৃহপালিত পশুর মত নহে। মানুষে ও গৃহপালিত পশুতে একটা প্রভেদ এই যে, গৃহপালিত পশুর যাহা আবশ্যক তাহা তাহার মালিকরা দেয় এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বাস্থ্যের জন্য যাহা করা দরকার তাহা মালিকরা করে, কিন্তু মানুষ নামের যোগ্য মানুষেরা নিজেদের সব ব্যবস্থা নিজেরাই করে। যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক সব ব্যবস্থা ইংরেজরা করিত এবং যদি আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের নাম "ভারতবর্ষীয় মহাজাতি" না হইয়া "ইংরেজদের দ্বারা পালিত নরাকার ভারতীয় গোরুদের সমষ্টি" হইত। এখনও সেই নাম দিলে কতকটা ঠিকই হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক হয় না এই কারণে যে, ভারতবর্ষের অনেক লোক মনুষ্যত্বলাভ সম্বন্ধে সচেতন এবং সেই নিমিত্ত স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে।

"স্বাধীনতা-দিবস" উপলক্ষ্যে পঠিত প্রতিজ্ঞাপত্রে যদি এই মর্ম্মের কথাও থাকিত যে, ব্রিটিশ শাসন যদি উৎকৃষ্ট হইত তাহা হইলেও আমরা স্বাধীনতা চাহিতাম, তাহা হইলে তাহা বাহুল্য হইত না বলিয়া আমরা মনে করি।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের যে-যে অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই। তাহাতে স্বাধীনতার আবশ্যকতা-বোধ বিন্দুমাত্রও কমিবে না।

—

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও ব্রিটিশ শাসন

ব্রিটিশ শাসন কালে ইংরেজরা ভারতীয় জনগণের শ্রম ও ধনোৎপাদন-শক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে ধনী হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষীয় জনগণ দরিদ্রতর হইয়াছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ-বিষয়ে ভারতীয়দের পক্ষ হইতে দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বড় বড় বহি এবং অন্য অনেকে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

দারিদ্র্যে বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামসকলের মহা অনিষ্ট হইয়াছে। তাহা শুধু অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নহে। গ্রামগুলি শ্রীহীন হইয়াছে—সেখানে শোভা ও আনন্দ নাই। কারখানা-শিল্পের দ্বারা গ্রামগুলির এই অনিষ্টের প্রতিকার হইতেছে না; কুটীরশিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি দ্বারা পরোক্ষ ভাবে হইতে পারে।

—

ব্রিটিশ শাসন ও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা

ব্রিটিশ শাসনের ঠিক্ পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এই অর্থে স্বাধীন ছিল যে, দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি নৃপতিরা প্রভুত্ব করিতেন, তাঁহারা ভারতবর্ষেরই মানুষ, ভারতবর্ষই তাঁহাদের জন্ম ও নিবাসের ভূমি—তাঁহারা বিদেশী ছিলেন না।

ব্রিটিশ শাসনে প্রভেদ এই হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে বিদেশী ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, দেশী রাজ্য নামে অভিহিত অংশগুলিতেও বিদেশী ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে; সমগ্রভারতবর্ষে চূড়ান্ত ক্ষমতা কোন ভারতীয় মানুষের হাতে নাই। এই অর্থে ইহা সত্য যে, ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে (it has ruined India…politically)। ইহার প্রতিকারস্বরূপ, ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনৈতিক যে সচেতনতা বা জাগৃতি ছিল না, এখন তাহা হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক এই জাগরণ ঘটায় নাই, তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহা ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে।

—

ব্রিটিশ শাসন ও ভারতীয় সংস্কৃতি

সংস্কৃতি (culture) শব্দটির একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিবার চেষ্টা করিব না। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দেশের সাহিত্য, ললিতকলা, সংগীত, নৃত্য, শিল্প প্রভৃতি উহার অঙ্গীভূত।

স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞাপত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সংস্কৃতির দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ("has ruined India……culturally")। ইহা নিঃসন্দেহ যে, ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের বহু শিল্পের খুব অবনতি এবং কোন কোনটির ধ্বংস হইয়াছে। ইহাও সত্য যে, বঙ্গের (ভারতবর্ষের অন্য সব অংশের বিষয় ভাল করিয়া জানি না) স্বকীয় যাত্রা গান নৃত্য ইত্যাদির অবনতি বা রূপান্তর ঘটিয়াছে। পল্লীসমূহের সাহিত্য গীতি প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাহা বহুপরিমাণে দেশের দারিদ্র্য বশতঃ। আমরা কিন্তু যত বৎসরের কথা জানি, তাহা ব্রিটিশ আমলের অন্তর্গত। ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হইবার ঠিক্ আগে সংস্কৃতির এই সকল অঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল, জানি না।

সংস্কৃতির যে-অঙ্গ সাহিত্য, সে-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে বঙ্গে যত টোল ছিল এখন বোধ করি তত নাই, এবং সেইগুলি থাকায় দেশে সংস্কৃতের যতটা বিস্তৃত ও গভীর চর্চ্চা হইত, এখন ততটা হয় না। অন্য দিকে ইহাও সত্য যে, সংস্কৃত সাহিত্য ও পালি সাহিত্যে যত গ্রন্থ আছে এবং তাহাতে যে ভাবসম্পদ ও চিন্তাসম্পদ সঞ্চিত আছে, তাহার জ্ঞান ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার ঠিক্ আগে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা এখন অনেক বেশী হইয়াছে। ইংরেজ-রাজত্বকালে বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় সাধারণ বিদ্যার্থীদের অধিগম্য হইয়াছে—যে অবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। এ-বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কোনই কৃতিত্ব নাই, বলা যায় না।

ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ইংরেজ-আমলের আগেকার চেয়ে এখন অধিক। এ-বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট খুব কৃপণতা করিলেও কিছু করিয়াছে।

সংস্কৃত ও পালির পরবর্ত্তী নানা ভারতীয় ভাষার যে-সাহিত্যকে মধ্যযুগের সাহিত্য বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহার অনুশীলন বাড়িয়াছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় কমে নাই।

ভারতীয় নানা ভাষার আধুনিক সাহিত্যসম্পদ এখন যে ইংরেজ-আমলের আগেকার চেয়ে অধিক, তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শে ও তাহার সংঘাতে ইহার উৎপত্তি, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহা ইংরেজ-আমলে ঘটিয়াছে।

সংগীতের চর্চ্চা ইংরেজ-আমলের ঠিক্ আগেকার চেয়ে এখন বেশী কি না বলিতে পারি না। ভদ্রশ্রেণীর নারীদের মধ্যে সংগীত ও নৃত্যের চর্চ্চা এখন যতটা হইয়াছে, ইংরেজ-রাজত্বের ঠিক্ আগে তদপেক্ষা কম বা

বেশী ছিল কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত।

ভারতীয় চিত্রাঙ্কনের নানা পদ্ধতির পুনর্জন্ম হইয়াছে। নূতন পদ্ধতির আবির্ভাবও হইয়াছে। মূর্ত্তিগঠন-শিল্পের অবনতি হইয়া আবার উন্নতি হইতেছে।

সুকুমার শিল্পের মধ্যে বোধ হয় ভারতীয় স্থাপত্যেরই অবনতি ও ক্ষতি ইংরেজ-আমলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব অতিক্রম করিয়া ভারতীয় পুরাতন ও নবোদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

অতএব, মোটের উপর এ-কথা বলা যায় না যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নতি ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বা আছে, ইহাও বলা যায় না।

—

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও ব্রিটিশ শাসন

"স্বাধীনতা-দিবসে"র প্রতিজ্ঞাপত্রে ইহাও আছে যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আধ্যাত্মিকতা-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ("has ruined India...spiritually")। এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক সত্যতার বিচার করিতে হইলে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানা আবশ্যক। সে-জ্ঞান আমাদের নাই। তবে ইংরেজ-রাজত্বকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তাহা হইতে সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলা যাইতে পারে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার আগে কোম্পানী বাহাদুর অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষা চালাইলে শিক্ষিত লোকদের রুচিপরিবর্ত্তন হেতু বিলাতী নানা পণ্যদ্রব্যের (ও তন্মধ্যে মদ্যের) কাট্‌তি বাড়িবে কিনা, তাহাও জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। মেকলে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন; তাঁহার মতে একটা আলমারীর একটা তাকে রক্ষিত ইউরোপীয় পুস্তকসমূহে যত জ্ঞান সঞ্চিত আছে, সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তাহা নাই। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ফল তিনি এই রূপ হইবে আশা করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা এরূপ কতকগুলি ভারতীয় মানুষ প্রস্তুত করা যাইবে যাহাদের মনটা হইবে ইংলণ্ডীয়, কেবল গায়ের রং ও বাহ্য চেহারাটা হইবে ভারতীয়; সেই জন্য তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরা বিদ্রোহী না হইয়া চিরকাল ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়াও অনেক ইংরেজ আশা করিয়াছিলেন।

অতএব, ইংরেজী শিক্ষা ও চাল-চলনের প্রবর্ত্তন দ্বারা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট না হউক, কতকটা আক্রান্ত ও পরাভূত হইবে, ইহা কোম্পানীর আমলে অনেক ইংরেজ অনুমান করিয়াছিলেন। তবে, এ-বিষয়ে তখনকার ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের এবং ১৮৫৮ সালের পরবর্ত্তী ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুসাধ্য নহে—বিশেষতঃ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা। কিন্তু ফল কি হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ও থিয়সফিক্যাল সমিতি ইংরেজ-রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহাদের কাজ এখনও চলিতেছে। মুসলমানদের মধ্যে ওআহাবি প্রচেষ্টা এবং আহমদিয়া প্রচেষ্টাও ইংরেজ আমলে উৎপন্ন; তন্মধ্যে আহমদিয়া প্রচেষ্টা এখনও চলিতেছে। যুক্তপ্রদেশে যে রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের পীঠস্থান আগ্রার দয়ালবাগে, তাহারও উদ্ভব ইংরেজ-আমলে। পরমহংস রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যবৃন্দ যে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবর্ত্তক ও প্রাণস্বরূপ, তাহারও আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ইংরেজ-রাজত্বকালে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচারের জন্য রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নেতাদের দ্বারা যে ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কোম্পানীর আমলে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যেরা এই যুগেই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচারের চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, প্রচার (মাসিক পত্র) যে ধর্ম্মান্দোলনের অন্তর্ভূত, তাহা এই সময়কার। এই সময়ে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, ব্রাহ্মণসভা, সনাতন ধর্ম্মসভা,

বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরিতে এই যুগে তাঁহার আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীকে যেমন শিক্ষা-আয়তন, সেইরূপ একটি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানও বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও অন্তবিধ উপায়ে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকে ভারতীয় রূপ দিবার চেষ্টা একটি আধ্যাত্মিক নবোদ্যম বলা যাইতে পারে। "স্বাধীনতা-দিবস" উপলক্ষ্যে পঠিত প্রতিজ্ঞা-পত্র যাঁহার প্রেরণায়—হয়ত বা যাঁহারই দ্বারা—রচিত, সেই মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার প্রভাবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

এমন লোক কংগ্রেসের মধ্যে ও বাহিরে আছেন যাঁহারা আধ্যাত্মিকতা মানেন না এবং তাহাকে মূল্যহীন মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা তাহাকে অলীক ও মূল্যহীন মনে করেন না, যাঁহারা তাহাকে মূল্যবান মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে উপরে উল্লিখিত কতকগুলি বা অন্ততঃ কোন একটি প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক মনে করিবেন। তাহা যদি মনে করেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে বিনষ্ট করিয়াছে, তিনি বলিতে পারিবেন না। তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা যদি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলেও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কারণ কোন-না-কোন আকারে, কোন-না-কোন প্রচেষ্টার মধ্যে তাহা বাঁচিয়া আছে।

—

ভারতে আধ্যাত্মিকতার নূতন আততায়ী

ভারতবর্ষে মার্ক্স-বাদ ও লেনিন-বাদ প্রচার ও তদনুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত অনেকগুলি লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বিনাশ করিয়াছে কিনা, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়িল যে, মার্ক্স-বাদ ও লেনিন-বাদ অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ও মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের পন্থা নির্দ্দেশে সকল প্রকার অধ্যাত্মবাদের বিপরীত। তাহা এক রকম জড়বাদ (যাহাকে ডায়ালেক্টিক্যাল মেটীরিয়ালিজ্‌ম্ বলা হয়)। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার যদি বিনাশ হয়, তাহা হইলে মার্ক্স-বাদ ও লেনিন-বাদ দ্বারা হইবে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দ্বারা নহে। আমরা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ওকালতী করিবার জন্য একথা বলিতেছি না, কিন্তু যে-কার্য্যের দায়িত্ব যাহার তাহার ঘাড়েই সেই দায়িত্ব চাপান উচিত বলিয়া বলিতেছি।

মার্ক্স-বাদ ও লেনিন-বাদের কোন গুণ নাই, বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু উহা যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা নহে, ইহা বলিলে উহার প্রতি বোধ হয় অবিচার করা হইবে না, এবং উহার ভক্তেরা তাহা প্রশংসার বিষয়ই মনে করিবেন।

—

দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষ

ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতির অবস্থা আলোচনা করিবার সময় ডাকে চৈনিক সংবাদ-দান কমীটি (China Information Committee) কর্ত্তৃক প্রেরিত তিনটি বুলেটিন পাইলাম। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এই বুলেটিন আসে। আগে হাংকাও হইতে আসিত, এখন চাংশা হইতে আসে। ৭ই নবেম্বরের বুলেটিনটিতে একটি প্রবন্ধ আছে, তাহার নাম "চীনের সাংস্কৃতিক সমস্যা" (The Cultural Problem of China)। তাহা হইতে প্রথম প্যারাগ্রাফটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> "When two entirely different cultures meet and clash, two things may happen to the one which emerges second best from the contest. First, it may cease to grow and perhaps even to go out of existence, or it may re-orientate itself and carry on to a greater future. The latter process requires a great deal of cultural vitality and an abundance of willingness to unlearn and learn."

তাৎপর্য্য। যখন দুই সম্পূর্ণ বিপরীত সংস্কৃতির সাক্ষাৎকার ও সংঘাত ঘটে, তখন এই যুদ্ধে যেটি দ্বিতীয় স্থানীয় হয়, তাহার সম্বন্ধে দু-রকম ঘটনা ঘটিতে পারে। প্রথম, ইহা আর বাড়ে না কিংবা হয়ত লোপ পায়; কিংবা ইহা নূতন পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে থাকে এবং মহত্তর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। শেষোক্ত পন্থার অনুসরণের জন্য অধিক পরিমাণে সাংস্কৃতিক জীবনী শক্তি এবং ভুলিবার ও শিখিবার ইচ্ছার প্রাচুর্য্য আবশ্যক।"

আমাদের মনে হয়, ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রাণশক্তি এবং ভারতীয়দিগের ভ্রম বর্জ্জন ও জ্ঞান অর্জ্জনের স্পৃহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি মরে নাই,

এবং সম্ভবতঃ ইহা মহত্তর আকারে পুনরুত্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে বা হইবে।

—

যুক্তপ্রদেশে সাক্ষরতা-দিবস

গত ১লা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, যুক্তপ্রদেশের একটি স্মরণীয় দিন গিয়াছে। ঐ দিন তথাকার গবর্ণর ও প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া বহু লক্ষ লোক ঐ প্রদেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। যাহাদের বিদ্যালয়ে যাইবার বয়স আছে, কেবল এরূপ বালকবালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দিলেই দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর হইবে না, এবং এরূপ সমস্ত বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার মত যথেষ্ট বিদ্যালয় ও শিক্ষকও কোন প্রদেশেই নাই। বিদ্যালয়ে যাইবার বয়সের বালকবালিকাদের চেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর নরনারীর সংখ্যা সব প্রদেশেই বেশী। সমগ্র জাতিকে সাক্ষর অর্থাৎ লিখনপঠনক্ষম করিতে হইলে বালকবালিকাদিগকে শিখাইতে হইবে এবং নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীকেও শিখাইতে হইবে। শিখাইবার এই চেষ্টার আরম্ভ গত ১লা মাঘ যুক্তপ্রদেশের নগরে নগরে ও অনেক গ্রামে হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন বহু লক্ষ লোক নিম্নলিখিত মর্ম্মের প্রতিজ্ঞাপত্র দস্তখত করিয়াছে:—

আমি বিশ্বাস করি যে, নিরক্ষরতা এই দেশের একটি সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর অবস্থা এবং ইহা দেশের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির বাধাজনক। যত শীঘ্র সম্ভব নিরক্ষরতা নির্ম্মূল করিতে সাহায্য করা প্রত্যেক শিক্ষিত ও দেশভক্ত ভারতীয়ের পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি এক বৎসরে ন্যূনকল্পে এক জন পুরুষ বা নারীকে লিখনপঠনক্ষম করিব, কিংবা এক জন নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষর করিবার ন্যূনতম ব্যয় দুটি টাকা যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা-বিস্তার অফিসারকে আমার পক্ষ হইতে কাজ করিবার নিমিত্ত দিব।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় পণ্ডিত তেজবাহাদুর সপ্রু প্রভৃতি প্রধান নাগরিকেরা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। কোন কোন জেলায় মোটর লরী ও হাতীতে চড়িয়া পতাকা লইয়া সাক্ষর-দিবসের শোভাযাত্রা বহু গ্রাম পর্য্যটন করিয়াছে। এলাহাবাদের জনটনগঞ্জ একটি বড় রাস্তা, চৌক হইতে হিউয়েট রোড্ পর্য্যন্ত ৫৫০ গজ। ১লা মাঘ প্রাতে ইহাতে পথিক ও যানবাহনের চলাচল বন্ধ করিয়া সমস্ত রাস্তায় সতরঞ্চ বিছাইয়া বিদ্যালয় খোলা হয়। অনেক শত ছাত্রছাত্রীকে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস টণ্ডন, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বেণীপ্রসাদ প্রভৃতি প্রধান নাগরিকেরা শিক্ষাদান করেন। রাস্তাটি লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিস্তার-বিভাগ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৯৬০টি বিদ্যালয় এবং ৭৬৮টি "চল্‌তে-ফিরতে" পুস্তকালয় (circulating library) খুলিয়াছেন। প্রত্যেক পুস্তকালয়ের ৫টি করিয়া শাখা আছে। প্রত্যেককে ৩০০ হিন্দী ও উর্দ্দু বহি দেওয়া হইয়াছে। ৩৬০০ বাচনালয় (reading room) খোলা হইয়াছে। তাহার প্রত্যেটিকে দুইটি সাপ্তাহিক এবং একটি করিয়া হিন্দী ও উর্দ্দু মাসিকপত্র দেওয়া হয়। তিব্বত ও নেপালের সীমা হইতে পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত ও বিহারের সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের জন্য এইগুলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইগুলি বিনি পয়সায় ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ রকম একাধিক পুস্তক লেখান হইয়াছে এবং বিদ্যার্থীদিগকে তাহা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। যাঁহারা স্বেচ্ছা-শিক্ষক হইয়া এক এক জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ প্রতি সাক্ষরের জন্য এক টাকা পারিতোষিক দেওয়া হয়।

"সাক্ষরতা-দিবস" উপলক্ষ্যে যাঁহারা "বাণী" প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাণী ও ফোটোগ্রাফ এবং প্রতিজ্ঞাপত্রটি সম্বলিত একটি সুন্দর পুস্তিকা যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিস্তার-কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার বহুবর্ণে মুদ্রিত মলাটের একটি একবর্ণের ছবি অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এত টাকা ব্যয় করিতে পারিতেছেন, তাহার একটি কারণ তাঁহারা কেহই মাসে ৫০০ টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করেন না।

—

বাংলা দেশে নিরক্ষরতা

বাংলা দেশে নিরক্ষরতা যুক্তপ্রদেশের চেয়ে কিছু কম

হইলেও বস্তুতঃ খুব বেশী। সংস্কৃত বচন আছে, "অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে, উপর্য্যুপরি পশ্যতঃ সর্ব এব দরিদ্রতি", "নীচে ও তার নীচে তাকাইলে কেবা নিজেকে বড় মনে করিবে? কিন্তু উপরে ও তারও উপরে তাকাইলে সকলেই আপনাকে দরিদ্র মনে করিবে।" যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতির দিকে তাকাইলে প্রধানতঃ-নিরক্ষর যে বাংলা দেশ তাহারও অহঙ্কার জন্মিতে পারে (যদিও তাহা আর বেশী দিন টিকিবে না), কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরের সভ্য দেশ সকলের কথা ভাবিলে বাঙালীর মাথা হেঁট হইবে।

বঙ্গের মন্ত্রীরা সবাই মাসে ৫০০ টাকা বেতন লইলে বৎসরে দুই লক্ষ টাকার উপর শিক্ষাবিস্তারের কাজে লাগান যায়, বেকার বিস্তর লোকের কাজ জুটে ও জীবিকা-নির্ব্বাহ হয় এবং প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুই লক্ষ নিরক্ষর লোককে সাক্ষর করা যায়। কিন্তু বাঙালী যে ২।১ জন মন্ত্রী ৫০০ টাকা বেতনে, এমন কি বিনা বেতনেও মন্ত্রিত্ব করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক হইতে পারেন, তাঁহারাও অন্তরের "ডাল-ভাত" বজায় রাখিবার জন্য কংগ্রেসী পথের পথিক হইতে পারেন না। তাঁহারা বেতন সম্বন্ধে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানিতে চাহিলে মন্ত্রিত্ব হইতে অপসৃত হইতে পারেন, এমনও হইতে পারে।

সুভাষবাবুর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী

কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাহার আগামী অধিবেশনেরও সভাপতি হইতে চাহিয়াছিলেন, এবং নির্ব্বাচিত হইয়াছেনও। পর পর দুই অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুও হইয়াছিলেন। যে প্রকার বিশেষ অবস্থায় তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবার ঠিক্ সেরূপ অবস্থা না থাকিলেও এবারও বিশেষ অবস্থা আছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটির ৭ জন সভ্য একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া সভাপতি-নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে এবং সকল প্রতিনিধির ঐকমত্যে একজনের মনোনয়নের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া ডাঃ পট্টাভি সীতারামায়্যাকে মনোনীত করিতে ও সুভাষবাবুকে সরিয়া দাঁড়াইতে বলেন। অবশ্য ডাঃ সীতারামায়্যাও যোগ্য লোক। কিন্তু সুভাষবাবুরও সরিয়া না-যাইবার পূর্ণ অধিকার ছিল। কংগ্রেসের কন্‌ষ্টিটিউশনে যখন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ও নিয়মাবলী আছে, তখন একাধিক প্রার্থীর প্রতিযোগিতা ও তৎপরে তাহাদের মধ্যে এক জনের নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে, বিনা প্রতিযোগিতায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক জনের মনোনয়নই যে হইতে হইবে, এরূপ রীতি চালাইবার পক্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

সুভাষবাবু নির্ব্বাচিত হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী একটি মন্তব্য-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা "হরিজন" পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পড়িয়া অনেক কংগ্রেসী ও কংগ্রেসের বাহিরের অনেক লোকও দুঃখিত হইয়াছেন। "যাহাই হউক, সুভাষবাবু ত দেশের শত্রু নহেন", এ রকম কথা মহাত্মা গান্ধীর মুখে শোভা পায় না।

গান্ধীজী বলিয়াছেন, নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডাঃ সীতারামায়্যার যে পরাজয় তাহা ডাক্তার মহাশয়ের নহে, গান্ধীজীর নিজের। গান্ধীজী তাঁহাকে সভাপতি-পদপ্রার্থিতা প্রত্যাহার না করিয়া প্রার্থী থাকিতে যখন বলিয়াছিলেন, তখন গান্ধীজীরও যে পরাজয় হইয়াছে তাহা মনে করিলে ও বলিলে ভুল হয় না বটে; কিন্তু যখন কংগ্রেসী প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচনকালে ভোট দিয়াছিলেন তখন তাঁহারা জানিতেন না—অন্ততঃ সকলে জানিতেন না এবং স্পষ্টতঃ জানিতেন না—যে, ডাঃ পট্টাভিকে মহাত্মাজীই প্রার্থী থাকিতে বলিয়াছেন। সুতরাং অধিকাংশ প্রতিনিধি সুভাষবাবুর পক্ষে ভোট দিয়া মহাত্মাজীর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছে, এরূপ ধারণার বশে তাঁহার অভিমান হওয়া উচিত নহে।

মহাত্মাজী যে সম্পূর্ণ তাঁহার মতাবলম্বী কংগ্রেসীদিগকে সরিয়া দাঁড়াইয়া সুভাষবাবুর পক্ষাবলম্বী বা অনুমিত তথাকথিত পক্ষাবলম্বীদিগকে সুভাষবাবুর নির্দ্দিষ্ট নীতি ও পন্থা অনুসারে কাজ করিবার সুবিধা ও সুযোগ দিতে সঙ্কেত করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিবেচনায় ঠিক্ মনে হয় না। বড় কোন দল গণতান্ত্রিক ও পার্লেমেণ্টারী রীতিতে গঠিত হইলে, সাধারণতঃ তাহার একাধিক উপদলও থাকে। কোন বিষয়ে কোন উপদলের মতের জয় হইলে অন্যেরা সরিয়া দাঁড়ান না; তাঁহারা তাঁহাদের বুদ্ধিবিবেচনা

অনুসারে নানা বিষয়ে অন্য উপদলের বিরোধিতা বা সহযোগিতা করিতে থাকেন। কংগ্রেসেও তাহা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যত দিন গান্ধীজীর সম্পূর্ণ-অনুগত কয়েক জন মানুষের সম্পূর্ণ-প্রভুত্ব ছিল, তত দিন ত অন্ত উপদলের লোকেরা সরিয়া দাঁড়ান নাই; তাঁহারা কখন সহযোগিতা, কখন-বা বিরোধিতা করিয়াছেন। গান্ধীজীর সম্পূর্ণ-অনুগত লোকদেরও সেইরূপ করাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

অবশ্য ইহা ঠিক্ বটে যে, কংগ্রেস অসহযোগনীতি অবলম্বন করার পর হইতে কুড়ি বৎসর গান্ধীজীই ইহার প্রধান পরিচালক হইয়া আছেন, এবং ইহা প্রধানতঃ তাঁহার পরিচালনাতেই শক্তিশালী হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ঠিক্ যে, কখন কখন তাঁহার মত অগ্রাহ্য হইয়াছে। যেমন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য-দল গঠনকালে। তখন গান্ধীজীর অন্তরঙ্গদল কংগ্রেস ত্যাগ করেন নাই। তিনিও তাহার সংস্রব ছাড়েন নাই। কয়েক বৎসর হইতে গান্ধীজী সাক্ষাৎভাবে, 'সরকারী' (?) ভাবে (officially), কংগ্রেসের সহিত যুক্ত নাই। কিন্তু কংগ্রেসের পরিচালক তিনি বরাবর আছেন।

কংগ্রেসের দুটি উপদল

কংগ্রেসের বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী এই দুটি উপদলের কথা অনেকেই বলিতেছেন। কিন্তু এই দুটি উপদলের মধ্যে প্রভেদরেখা কোন্‌খানে, উভয়ের মূলনীতি কি কি, তাহা কেহ নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা বাহির হইতে যাহা দেখি তাহাতে মনে হয়, এরূপ বিস্তর কংগ্রেসী আছেন যাঁহাদিগকে দক্ষিণ বা বাম কোন পন্থীই বলা যায় না এবং যাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলে তাঁহারাও বলিতে পারিবেন না তাঁহারা কোন্ পন্থী। কেবল বামপন্থীরা সুভাষবাবুকে ভোট দিয়া জিতাইয়া দিয়াছেন, ইহাও আমাদের সত্য মনে হয় না। আমাদের অনুমান, অনেক তথাকথিত দক্ষিণ-পন্থীও তাঁহাকে ভোট দিয়াছিলেন। সুভাষবাবু তাঁহার একটি ষ্টেট্‌মেণ্টে লিখিয়াছিলেন, দক্ষিণপন্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁহার এই উক্তি ঠিক্ হইলে, তাঁহার পক্ষে যখন ভোট অধিক হইয়াছে, তখন মানিতে হইবে যে, অনেক দক্ষিণপন্থী তাঁহাকে ভোট দিয়াছিলেন।

গান্ধীবাদের সহিত বামপন্থীদের অ-মিল কোথায়

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর লিখিত "What Romain Rolland Thinks" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে রলাঁর ও সুভাষবাবুর অনেক মত বিবৃত আছে। ইহা তিনি কার্লস্‌বাদ হইতে পাঠাইয়াছিলেন। ইহা পড়িলে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মতভেদ অনেকটা বুঝা যায়। প্রেস-আইনের কবলীভূত না-হইবার উদ্দেশ্যে ফ্রেঞ্চ মনীষীর অনুমতি লইয়া ঐ প্রবন্ধের কোন কোন অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার জায়গায় তারকা-চিহ্ন দেওয়া হইয়াছিল। স্থানাভাবে এখানে সমস্ত প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতে পারা যাইবে না। কেবল কতকগুলি বাক্য বিনা অনুবাদে উদ্ধৃত করিব। জিজ্ঞাসু পাঠকপাঠিকারা সমগ্র প্রবন্ধটি পড়িলে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা স্পষ্টতর হইবে।

The failure to win freedom led to a very earnest heart-searching among the rank and file of the Indian National Congress. One section of Congressmen went back to the old policy of constitutional action within the Legislatures. Mahatma Gandhi and his orthodox followers, after the suspension of the civil disobedience movement (or Satyagraha), turned to a programme of social and economic uplift of the villages. But the more radical section, in their disappointment, inclined to a new ideology and plan of action and the majority of them combined to form the Congress Socialist Party * * *

"What would be Mon. Rolland's attitude," I asked at the end of my lengthy preface, "if the united front is broken up and a new movement is started not quite in keeping with the requirements of Gandhian Satyagraha?"

He would be very sorry and disappointed, said Mon. Rolland, if Gandhi's Satyagraha failed to win freedom for India. At the end of the Great War, when the whole world was sick of bloody strife and hatred, a new light had dawned on the horizon when Gandhi emerged with his new weapon of political strife. Great were the hopes that Gandhi had roused throughout the whole world.

"We find from experience," said I, "that Gandhi's method is too lofty for this materialistic world and, as a political leader, he is too straight forward in his dealings with his opponents. We find, further, that though the British are not wanted in India, with the help of superior physical force, they have nevertheless been able to maintain their existence in India in spite of the inconvenience and annoyance caused by the Satyagraha movement. If Satyagraha ultimately fails would Mon. Rolland like to see the national endeavour continued by other methods or would he cease taking interest in the Indian movement?"

"The struggle must go on in any case"—was the emphatic reply.

"But I know several European friends of India wh

have told me distinctly that their interest in the Indian freedom movement is due entirely to Gandhi's method of non-violent resistance."

Mon. Rolland did not agree with them at all. He would be sorry if Satyagraha failed. But if it really did, then the hard facts of life would have to be faced and he would like to see the movement conducted on other lines.

That was the answer nearest to my heart. Here then was an idealist, who did not build castles in the air but who had his feet planted on terra firma.

এই ইংরেজী প্রবন্ধটিতে সুভাষবাবুর যে মতের স্পষ্ট প্রকাশ ও ব্যঞ্জনা আছে, তিনি এখনও সেই মতাবলম্বী কিনা জানি না।

গান্ধীজীর সম্পূর্ণ অনুগত উপদলের সহিত অন্তরের মতভেদের কারণ হয়ত পণ্যশিল্প সম্বন্ধে উভয়ের অভিপ্রায়ের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। মডার্ণ রিভিয়ুতে গত বৎসর ডাঃ মেঘনাদ সাহা ভারতবর্ষে বৃহৎ বৃহৎ যান্ত্রিক-শিল্পকারখানার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন, সুভাষবাবুর এতদ্বিষয়ক বক্তৃতা ও পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে তাহারই অনুবৃত্তি। গান্ধীজীর সম্পূর্ণ মতানুসারী উপদল কেবল পল্লী-কুটীর-শিল্প বা প্রধানতঃ পল্লী-কুটীর-শিল্প চান। সেই উপদলের মত প্রকাশ পাইয়াছিল শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পার ডাঃ মেঘনাদ সাহার প্রবন্ধের সমালোচনায়। বঙ্গে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তও বাংলা ভাষায় ডাঃ মেঘনাদ সাহার পণ্যশিল্প-বিষয়ক মতের সমালোচনা করিয়াছেন।

—

গান্ধীজীর মন্তব্য সম্বন্ধে সুভাষবাবুর মন্তব্য

সুভাষবাবুর নির্ব্বাচনকে গান্ধীজী নিজের পরাজয় বলিয়া অভিহিত করিয়া যে মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন, তাহার উপর সুভাষবাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আত্মসম্ভ্রম ও যথোচিত নম্রতা সহকারে লিখিত। ইহা সুবিবেচনার পরিচায়ক। সুভাষবাবু গান্ধীজীর আস্থাভাজন হইতে চেষ্টা করিবেন, বলিয়াছেন। তাহা করাই কর্ত্তব্য।

—

ফেডারেশ্যন সম্বন্ধে দুই মত

ফেডারেশ্যন সম্বন্ধে কংগ্রেস কর্ত্তৃক যত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পরিকল্পিত ফেডারেশ্যনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সেও এ-বিষয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহারও প্রকৃতি ঐরূপ। এই সকল প্রস্তাবের লক্ষ্য, কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী বা গণপরিষদ্ দ্বারা ভারতবর্ষের ফেডারেশ্যনের ও প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বের ব্যবস্থা করা।

ফেডারেশ্যন সম্বন্ধে কংগ্রেসীদের মধ্যে অন্য একটি মত ঐ প্রস্তাবগুলির মত স্পষ্ট প্রকাশ না পাইয়া থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব অনেকেই অনুমান করিয়াছেন। সেই মতাবলম্বীরা বড়লাটের নিকট কিছু প্রতিশ্রুতি লইয়া (বা দরকার মত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করাইয়া) সরকারী ফেডারেশ্যন ব্যবস্থাটা চালু করিতে চান—যেমন প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বের সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেস মত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও বড়লাটের কিছু প্রতিশ্রুতি লইয়া উহাকে চালু করা হইয়াছে।

কংগ্রেসের প্রকাশিত মতের যাঁহারা সমর্থক তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন, উহার একটি উপদলের অনুমিত মতের সমর্থকদিগের অভিপ্রায়ও তদ্রূপ। কোন দলেরই কোন হীন অভিসন্ধি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। যে-সকল কংগ্রেসওয়ালা আটটি প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট চালাইতেছেন, তাঁহাদের স্বাধীনতাকামিতায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। তাঁহারা প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলি চালাইয়া তাহার দ্বারা ভারতীয় মহাজাতিকে স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপযুক্ত শক্তিশালী করিতে চাহিতেছেন। আমরা কংগ্রেস দ্বারা প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট চালু করার বিরোধিতা করিয়াছিলাম, কিন্তু যাঁহারা চালু করিতে চাহিয়াছিলেন এবং করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বাধীনতানুরাগে সন্দিহান হই নাই। ফেডারেশ্যন সম্বন্ধে ভিন্নমতাবলম্বী কোন উপদলেরই দেশভক্তিতে আমরা সন্দিহান নহি। দেশকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছায় ঐক্য থাকিলেও, উপায় ও পন্থা একাধিক হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাস সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে।

—

নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটিতে শরৎচন্দ্র বসু কেন নির্বাচিত হন নাই

কাগজে এই রূপ সংবাদ বাহির হইয়াছে যে, বঙ্গের যে-

সকল কংগ্রেসওআলা নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাহার মধ্যে অন্যতম নহেন। তিনি প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু মোটে একটি ভোট পাইয়াছিলেন এবং সে ভোটটি তাঁহার নিজের। এরূপ কেন হইল, তাহার কারণ এইরূপ শুনিয়াছি যে, ভোটদাতারা সবাই মনে করিয়াছিলেন যে "আর সকলে ত শরৎবাবুকে ভোট দিবেই; আমি না-ই দিলাম।" ইহা অবশ্য অসম্ভব নহে। কিন্তু, এই ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও সত্য বলিয়া মানিতে হইবে যে, ভোটদাতাদের মধ্যে আর সকলেই শরৎবাবুকে ভোট দেওয়া সম্বন্ধে গাফিলতি করিয়াছিলেন, কেবল শরৎ বাবু স্বয়ং করেন নাই।

—

নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটিতে বঙ্গমহিলা অনাবশ্যক ?

বাংলা দেশ হইতে যাঁহারা নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটিতে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনও মহিলা নাই। এরূপ হইবার কোন কারণ বা ব্যাখ্যা শুনি নাই। মহিলারা কেহই নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির সদস্য হইতে চান নাই, তাহাও নহে; শুনিয়াছি চারি জন চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অহিংস প্রচেষ্টায় বঙ্গের নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম দুঃখ বরণ, স্বার্থ ত্যাগ ও নির্ভীকতা-প্রদর্শন করেন নাই। এই প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে কোন কোন স্থলে কোন কোন নারীর উপর যে অত্যাচার হইয়াছে,পুরুষদের উপর তাহা হইতে পারে না। কংগ্রেসের নেতারা নারীদের সাহায্যও বার-বার চাহিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে প্রতিনিধিগণের এক জন মহিলাকেও যথেষ্টসংখ্যক ভোট না-দিবার কারণ বুঝা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কি অনেকেই, অধিকাংশই, শরৎ বাবুকে ভোট না-দিবার কৈফিয়ৎ-স্বরূপ বলিতে পারেন যে, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, "অন্যেরা যখন দেবীদিগকে ভোট দিবেই, তখন আমি দেবীদিগকে আমার ভোট না-ই দিলাম ? মনুষ্যজাতীয় পুরুষদিগকেই দি।"

হয়ত বা ঘটনাটির আসল কারণের সন্ধান কবির "প্রহাসিনী" পুস্তিকার "ভাইদ্বিতীয়া" কবিতায় মিলিতে পারে। তাহার শেষের দিকে কবি "সাতভাই চম্পার" "সকলের শেষ ভাই"রূপে লিখিতেছেন :—

লিখেছিনু কবিতা
সুরে তালে শোভিতা—
এই দেশ সেরা দেশ
বাঁচতে ও ম'রতে।
ভেবেছিনু তখনি
একি মিছে বকুনি ?
আজ তার মর্মটা
পেরেছি যে ধরতে।
যদি জন্মান্তরে
এ দেশেই টান ধরে,
ভাইরূপে আর বার
আনে যেন দৈব,
হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন,
ঘষাঘষি চন্দন,
ভগ্নী হবার দায়
নৈবচ নৈব।
আসি যদি ভাই হয়ে,
যা রয়েছি তাই হয়ে,
সোরগোল পড়ে যাবে
হলু আর শঙ্খে,
জুটে যাবে বুড়িরা
পিসি মাসি খুড়িরা
খুন্তি আর সন্দেশ
দেবে লোকজনকে।
খোন্‌টার ধ'রে চুল
টেনে ভার দেব দুল,
খেলার পুতুল তা'র
পায়ে দেব দলিয়া।
শোক তা'র কে থামায়,
চুমো দেবে মা আমায়,
মাস্‌সি ব'লে তা'র
কান দেবে মলিয়া।
বড়ো হোলে, নেব তার
পদখানি দেবতার,
দাদা নাম কল্‌তেই
আঁখি হবে সিক্ত।
ভাইটি অমূল্য,
নাই তার তুল্য,
সংসারে বোনটি
নেহাৎ অতিরিক্ত।

—

সুভাষবাবুর ভোটের আধিক্য কোথায় কোথায় ?

যাহারা বাঙালীদিগকে দেখিতে পারে না, তাহারা কোন একটা ছুতা পাইলেই তাহাদের উপর ঝাল ঝাড়ে। ডাঃ পট্টাভি সীতারামায়্যা অন্ধ্রদেশীয়। তিনি নির্ব্বাচিত না হইয়া সুভাষবাবু নির্ব্বাচিত হওয়ায় অন্ধ্রদেশের কতকগুলি লোকের বড় গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা বাঙালী জাতিটারই মনের ভাবের নিন্দা করিয়া পরে বলিয়াছে, বাঙালীরা ও তামিলরা ষড়যন্ত্র করিয়া অন্ধ্রদেশের অনিষ্ট করিবার জন্য সুভাষবাবুর নির্ব্বাচন ঘটাইয়াছে। বাংলা দেশের অধিকাংশ ভোট সুভাষবাবু পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তামিল দেশের ভোটগুলির মধ্যে ডাঃ পট্টাভির চেয়ে তিনি মাত্র ৮টি বেশী ভোট পাইয়াছেন। তা ছাড়া, অন্ধ্রদেশের বা ডাঃ পট্টাভির সহিত তাঁহার ত কোন শত্রুতা নাই। কোন বিষয়ে কেহ প্রতিযোগী হইলেই তাহাকে শত্রু মনে করা অযৌক্তিক। অন্ততঃ ইহা খেলোয়াড়ীর মত মনোভাব নহে অর্থাৎ ইহা আন্‌স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান-লাইক্‌।

সুভাষবাবু বাংলা ছাড়া, কেরল, পঞ্জাব, যুক্ত-প্রদেশ, ও কর্ণাটকে বেশী বেশী ভোট পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ, তামিলদেশ, দিল্লী, আসাম, এবং আজমীর-মেরোআড়াতেও তিনি ডাঃ পট্টাভি অপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে-সব জায়গায় তাঁহার ভোটাধিক্য খুব বেশী নহে।

সুভাষবাবু বঙ্গের জন্য কি করিয়াছেন

সুভাষবাবু গত বৎসর ও এই বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় বাঙালীপ্রেমী অনেক অবাঙালী বাঙালীদিগের প্রতি তাহাদের মনের ভাব লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। এই প্রেমাতিশয্য পীড়াদায়ক হইতেছে। এই জন্য সুভাষবাবুর নিকট হইতে বাঙালীদের কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত। অবশ্য, সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য কংগ্রেসের সভাপতির দ্বারা যাহা কিছু করা হয়, তাহা বঙ্গের জন্যও কৃত বুঝিতে হইবে। কিন্তু নূতন ভারতশাসন-আইন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা ও ক্ষতি বাংলা দেশেরই করিয়াছে এবং "প্রাদেশিক আত্ম-কর্ত্তৃত্ব" কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসনে আটটি প্রদেশের যতটুকু উপকার করিয়াছে, বাংলার তাহা করে নাই, বরং অনিষ্টই করিয়াছে। এই জন্য সমগ্রভারতের প্রতি কর্ত্তব্য ব্যতিরেকে কংগ্রেসের ও সুভাষবাবুর বঙ্গের প্রতি স্বতন্ত্র অতিরিক্ত কর্ত্তব্যও কিছু আছে। তাহা তিনি এক বৎসরে কতটুকু ও কি কি করিয়াছেন, এবং আগামী বৎসরে কতটুকু ও কি কি করিবেন, ভাবিয়া দেখিলে বাংলা দেশের উপকার হইতে পারে।

দিল্লীর ছাত্র-ফেডারেশ্যন ও নিরক্ষরতা

দিল্লীর ছাত্র-ফেডারেশ্যন তথাকার নিরক্ষর লোকদিগকে লিখনপঠনক্ষম করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।

বঙ্গের ছাত্র-ফেডারেশ্যন এ প্রকার কোন অবৈপ্লবিক কাজে হাত দিয়াছেন কিনা খবর পাই নাই। বিহার, যুক্ত-প্রদেশ প্রভৃতির ছাত্রেরা কিন্তু এইরূপ কাজ করিতেছেন।

বঙ্গের কংগ্রেস-মহিলা-কর্ম্মীদের জাগরণ

সংবাদপত্রে দেখিলাম, বঙ্গের মহিলা-কংগ্রেসকর্ম্মীরা জাগিয়াছেন এবং নানা প্রকার কাজ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহাদের দীর্ঘ কার্য্য-তালিকায় অনাবশ্যক কিছুই নাই। প্রত্যেকটি দ্বারাই দেশহিত হইতে পারে।

তালিকার মধ্যে নারীসমাজের নিরক্ষরদিগকে সাক্ষর করিবার চেষ্টা করা হইবে বলিয়া কোন প্রস্তাব বা প্রতিজ্ঞা দেখিলাম না। বঙ্গে যেখানে যেখানে নারীদিগকে সম্বোধন করিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে, সেখানেই আমরা এই গোড়ার কাজটি করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছি। অনুরোধ কোথাও অল্পপরিমাণেও রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাই নাই। আমরা বোধ হয় কথায় ও লেখায় গত আধ শতাব্দী ধরিয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণের একান্ত আবশ্যকতা দেখাইয়া আসিতেছি। নারীদিগকে (এবং পুরুষদিগকেও) লিখিতে-পড়িতে শিখাইয়া দিলে, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, ধার্ম্মিক, অর্থনৈতিক ও অন্য সকল রকম প্রচেষ্টা চালাইবার সুবিধা বাড়ে; দেশের লোকদের অধিকাংশ নিরক্ষর থাকিলে

সেরূপ সুবিধা হয় না। কুড়ি বৎসর আগে যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন হইতে কংগ্রেস এই কাজে হাত দিলে এত দিনে দেশ হইতে নিরক্ষরতা প্রায় দূর হইয়া যাইত। যাহা হউক, যাহা হয় নাই তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীরা যে এখন এই কাজে হাত দিয়াছেন, তাহা খুব আশাপ্রদ। কিন্তু বঙ্গে কংগ্রেস এই কাজে হাত দেন নাই।

যুক্ত-প্রদেশের সাক্ষরতা-দিবস উপলক্ষ্যে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু লিখিয়াছিলেন :—

All our progress, political, social and economic, ultimately depends on the level of real education reached by the masses of our people. If illiteracy is not removed, our people remain blind men groping in the dark, swept hither and thither by waves of sentiment and often exploited by others. Every reform will founder on this rock of illiteracy. Therefore, I hope there will be the fullest co-operation between the Government, the Congress organization and, indeed, all people whatever their political views might be, in this campaign against illiteracy. This is a common platform in which all must join.

তাৎপর্য্য। আমাদের জনগণ সত্যিকার শিক্ষার যে স্তরে পৌঁছিবে শেষ পর্য্যন্ত তাহার উপর আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক—সমুদয় উন্নতি নির্ভর করিবে। নিরক্ষরতা দূরীভূত না হইলে জনগণ অন্ধের মত আঁধারে হাতড়াইবে এবং ভাবের তরঙ্গে এ-দিক্ ও-দিক্ নীত হইতে থাকিবে ও অনেক সময় মতলবী লোকদের দ্বারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। নিরক্ষরতার চড়ায় ঠেকিয়া প্রত্যেক সংস্কারের ভরাডুবি ঘটিবে। অতএব, আমি আশা করি, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এই অভিযানে গবর্মেণ্ট, কংগ্রেসী সংঘ এবং বস্তুতঃ সকল রাজনৈতিক মতের লোকদের মধ্যে পূর্ণতম সহযোগিতা হইবে। এই কাজটি এমন একটি কাজ যাহাতে সকলকেই যোগ দিতে হইবে।

গত ১৪ই জানুয়ারীর "হরিজন" পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন :—

I have myself hitherto sworn by simple adult franchise. My observation of the working of the Congress constitution has altered my opinion, I have come round to the view that the literacy test is necessary for two reasons.

তাৎপর্য্য। আমি নিজে এ-যাবৎ কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তিই যথেষ্ট মনে করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কংগ্রেস কন্‌স্টিটিউশনের কাজ কি ভাবে চলিতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি এখন এই মত পোষণ করি যে, সাক্ষরতার পরীক্ষা দুটি কারণে আবশ্যক।

যুক্ত-প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের অনেক শিক্ষিতা মহিলা নিরক্ষরতা দূরীকরণের নিমিত্ত সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং স্বয়ং এই কাজে নামিয়াছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ পুরুষদেরও কাজ। নারীদিগের দৃষ্টি এই কাজটির দিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিবার কারণ, নারীসমাজে নিরক্ষরতা পুরুষসমাজে নিরক্ষরতা অপেক্ষা অনেক অধিক এবং অধিকতর অসুবিধাজনক ও অনিষ্টকর।

—

শান্তিনিকেতন কলাভবনের চিত্রপ্রদর্শনী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রমেশ-ভবনে মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে বিশ্বভারতীর কলাভবনের চিত্রপ্রদর্শনী হইয়াছিল। ইহাতে ১২ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কিত ২৪খানি ছবি সমেত মোট ২৮১ খানি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই ছাত্রছাত্রীরা কলাভবনের ছাত্রছাত্রী নহে, শান্তিনিকেতনের সাধারণ বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে চিত্রাঙ্কনও শিখিয়াছে, তাহার প্রশংসনীয় পরিচয় তাহাদের প্রদর্শিত ছবিগুলিতে পাওয়া যায়।

সমঝদার লোকেরা রবীন্দ্রনাথের ও নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিগুলি এবং কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের আঁকা বহু চিত্র দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আঁকা বড় একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ছবি আঁকেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের জানা ছিল না। তাঁহার আঁকা ছবিগুলি বেশ—বিশেষতঃ গিরিনদীর চিত্রটি।

—

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব

বিশ্বভারতীর পল্লীসংগঠন বিভাগ সুরুল গ্রামে অবস্থিত। পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠানটির নাম শ্রীনিকেতন। এই নামটি যে সুপ্রযুক্ত, তাহা যাঁহারা আগে বুঝেন নাই তাঁহারাও শ্রীনিকেতনের গত বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হইতে বুঝিতে পারিবেন। তিনি উহাতে এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন যে, পল্লীগ্রামের লোকেরা কৃষিজাত জিনিষ আরও বেশী পাইবে, তাহারা আরও বেশী কাপড় বুনিবে ও অন্যান্য শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত করিবে, সুস্থ থাকিবে—কেবল ইহাই আদর্শ নহে; গ্রামগুলিতে শ্রী ফিরিয়া আসা

চাই, সেগুলি সুশোভন এবং আনন্দমুখরিত হওয়া চাই; যে পল্লীসাহিত্য ও পল্লীগীতি অধুনা লুপ্তপ্রায়, তাহাকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

অতিবিলম্বে রবীন্দ্রনাথের কাজের প্রতি বাঙালী শিক্ষিত-সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহাতেও তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে একটি বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলিয়াছেন যে, অন্য সাধারণ লোকদের মত তিনিও এক জন সাধারণ লোক বলিয়া কবির মহৎ ও অখণ্ড আদর্শ বুঝিতে পারেন নাই। ইহা বলা নিশ্চয়ই নম্রতাব্যঞ্জক। কবির সমগ্র অখণ্ড আদর্শ যে মহৎ এবং তাহার সম্যক্ উপলব্ধি কঠিন, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহার প্রত্যেক খণ্ডই আমাদের মত সাধারণ লোকদের অবোধ্য, তাহা বিনয়ের খাতিরেও স্বীকার করিতে পারি না। সুভাষবাবুর মত নেতার পক্ষেও প্রত্যেকটিই অবোধ্য কি না, সে-বিষয়ে অবশ্য তাঁহার কথাই প্রামাণিক।

শ্রীনিকেতনের গোড়া হইতেই শ্রীযুক্ত এল্ কে এল্মহার্স্ট ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। তাঁহার পত্নী ও তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বার্ষিক কুড়ি হাজার ডলার শ্রীনিকেতনে দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ব্যবসা-বাণিজ্যাদির মন্দা হেতু ষোল হাজার ডলার করিয়া দিতেছেন। এক ডলার মোটামুটি তিন টাকার সমান।

এল্মহার্স্ট সাহেব শ্রীনিকেতনের গোড়ার দিকে উহার পরিচালকতা করিতেন, সাধারণ চাষী মজুর মেথরের কাজও করিতেন। শ্রীনিকেতনের আদর্শ তাঁহার এরূপ প্রিয় যে, ইংলণ্ডে তাঁহাদের গ্রামস্থ বাসভবনের সংলগ্ন স্থানে, শ্রীনিকেতনে যেরূপ কাজ করা হয়, সেইরূপ কাজ করাইয়া থাকেন।

বিদেশীরা বিশ্বভারতীর আদর্শ কার্য্যতঃ যতটুকু বুঝিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতেই পারি না ইহা বিনয়পূর্ব্বক বলিলেই দায়মুক্ত হইতে পারি না।

—•

বড়োদার মহারাজার মৃত্যু

৭৬ বৎসর বয়সে বড়োদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কবাড়ের মৃত্যু হইয়াছে; তিনি গায়কবাড়-বংশের মানুষ, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজার সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী ছিলেন না। সেই মহারাজা নিঃসন্তান মারা যান। তাঁহার বিধবা মহারাণী বার বৎসরের বালক সয়াজীরাওকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

সয়াজীরাও মনস্বী তেজস্বী ও বহু বিষয়ে জ্ঞানবান মানুষ ছিলেন। তিনি পৃথিবীর নানা দেশ দেখিয়াছিলেন এবং বৎসরের অনেক সময় বিদেশে যাপন করিতেন। কিন্তু তিনি বিলাসব্যসনপ্রিয় অন্যান্য মহারাজাদের মত কেবল সুখের সন্ধানেই ঘুরেন নাই। বিদেশের অভিজ্ঞতার বহু ফল তিনি নিজের রাজ্য বড়োদাকে দিয়াছিলেন। নগর ও গ্রামে নানা প্রকারের পুস্তকালয় স্থাপন, সার্ব্বজনিক শিক্ষার প্রচলন ও অন্যান্য উপায়ে রাজ্যমধ্যে জ্ঞানের বিস্তার, নানাবিধ পণ্যশিল্পের বিস্তার দ্বারা প্রজাদের ও রাজ্যের ধন বৃদ্ধি, আদর্শ গ্রাম স্থাপন, নানা প্রকার সামাজিক সংস্কারের নিমিত্ত আইন প্রণয়ন, "অন্ত্যজ" ও আদিমনিবাসীদের শিক্ষাবিধানাদির দ্বারা উন্নতির চেষ্টা, প্রজাদিগকে কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ, কলাভবন স্থাপন দ্বারা অর্থকর শিল্প ও সুকুমার শিল্প উভয়েরই উন্নতির চেষ্টা—এই প্রকার নানা কার্য্যের দ্বারা তিনি বড়োদা রাজ্যের উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বড়োদা কোন কোন বিষয়ে ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি অপেক্ষা অগ্রসর। তিনি নিজের হিতৈষণা নিজের রাজ্যের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নাই। ব্রিটিশ-ভারতের অনেক কাজে তিনি যোগ দিতেন এবং তাহাতে টাকাও দিতেন।

তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের যোগ্য লোক দেখিয়া দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন। বঙ্গের রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তকে এই কাজ দিয়াছিলেন। অন্য কোন কোন উচ্চ কাজেও বাহিরের লোক লইতেন—বাংলা বাদ পড়িত না। বিদ্বান্ লোকদিগকে ডাকাইয়া তাঁহাদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতেন। তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীও ছিলেন।

তিনি নিখুঁৎ মানুষ ছিলেন না বটে, কিন্তু অন্য বহু রাজা-

রাজড়ার মত বাজে আড়ম্বর ভালবাসিতেন না, সাদাসিধা পরিচ্ছদ, চালচলন ও জীবনযাত্রা-প্রণালী পছন্দ করিতেন।

নিজের ব্যক্তিগত তহবিল হইতে প্রজাদের উপকারার্থ দুই কোটির উপর টাকা তিনি দান করিয়াছিলেন।

—

রাশিয়ায় ইহুদীদের অধিকার

"খ্রীষ্টের স্বজাতি" শীর্ষক প্রবন্ধে ৬৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় W. P. Coates ও Zelda K. Coates প্রণীত একটি বহি দেখিতে বলা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের ২৫০–২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উহাতে লিখিত হইয়াছে যে, রাশিয়ায় ইহুদীরা অন্য সব জাতিদের সমান অধিকার ভোগ করে এবং তাহাদের সমান কর্ত্তব্য পালন তাহাদিগকে করিতে হয়। তাহারা অন্তদের সমান ভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, এবং সমুদয় বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। জমীতে বসবাস করিয়া চাষী হইতে পারে, এবং অনেকে সামষ্টিক কৃষিক্ষেত্রে (Collective farmsএ) অন্যদের সহিত সমানভাবে যোগ দিয়াছে। ইহুদীদিগকে বিরোবিজান প্রদেশটি আত্মকর্তৃত্বশালী প্রদেশ ("autonomous province") রূপে দেওয়া হইয়াছে। সেখানকার সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের, সরকারী আপিসের ও সরকারী কাজকর্ম্মের ভাষা ইহুদীদের মাতৃভাষা য়িড্‌ডিশ (Yiddish)।

ধর্ম্মসম্বন্ধে ষ্টালিনের নূতন কন্‌ষ্টিটিউশ্যনের এই তাৎপর্য্য ঐ পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে যে,

"Freedom to practise all religious [rights] (*sic*) is given to all and also liberty to engage in anti-religious propaganda."

"সকলকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকার ভোগের স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে এবং ধর্ম্মবিরোধী প্রচারকার্য্য চালাইবার অধিকারও দেওয়া হইয়াছে।"

—

জলপাইগুড়ি প্রাদেশিক-রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

জলপাইগুড়ি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে গৃহীত সমুদয় প্রস্তাবই গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে, ভারতশাসন-আইনের যুক্ত-রাষ্ট্রীয় (অর্থাৎ ফেডারেশ্যন) অংশ বর্জ্জন ও জনসাধারণ-রচিত শাসনতন্ত্র দাবী সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবটি প্রধান। সম্মেলন নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভাকে আগামী ত্রিপুরা অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। সকল দেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের যে অধিকার (right of self-determination) আছে ভারতবর্ষেরও তাহা পাওয়া উচিত। এই প্রস্তাবে তাহার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। অন্য কয়েকটি প্রস্তাবের বিষয় :— রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী, ভূমি-রাজস্ব তদন্ত কমিশন, পাট-অর্ডিন্যান্স, "অনগ্রসর" স্থানসমূহের অধিবাসীবৃন্দের অভিযোগ, আসাম মন্ত্রিসভার প্রশংসা, মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত প্রজাদের অভিযোগ, হিন্দুস্থানী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী, এবং বাংলার কৃষির উন্নতি। সমুদয় প্রস্তাবই যুক্তিসঙ্গত ভাবে মুসাবিদা করা হইয়াছে।

—

বঙ্গের কৃষির উন্নতিবিষয়ে প্রস্তাব

জলপাইগুড়ি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ও সাক্ষাৎভাবে কৃষিযন্ত্রবিষয়ক এবং তাহা নির্ম্মাণের কারখানা-বিষয়ক। বাঙালী ধনীরা এবং মধ্যবিত্ত অবস্থার বাঙালীরাও এই বিষয়টিতে যথেষ্ট দৃষ্টি দেন নাই। সম্মেলন ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রস্তাবটির প্রতি বিত্তশালী, মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত বাঙালীদের, এবং বিত্তহীন শিক্ষিত উদ্যোগী বাঙালীদের মনোযোগ কামনা করিয়া তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

যেহেতু, বাংলা একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতি দ্বারাই বাংলার অর্থনৈতিক সংগঠন সম্ভব এবং যেহেতু যন্ত্রের সাহায্যই কৃষিকে উন্নত করিবার প্রথম ও প্রধান উপায় এবং যেহেতু বাংলা দেশে কেন্দ্রীভূত অতি বৃহৎ কারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইলে বাংলার জনসাধারণের কর্তৃত্ব-বহির্ভূত পুঁজি বাহির হইতে বাংলাদেশে আমদানী হইয়া বাংলার আর্থিক উন্নতির পথে বাধা জন্মাইবে, সেই-হেতু এই সম্মেলন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে নিম্নলিখিত ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অবিলম্বে

'বঙ্গীয় কৃষি ও শিল্পসংগঠন সমিতি' নামে একটি উপসমিতি গঠনের জন্য অনুরোধ করিতেছে:—

(১) বাংলার কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা ও তাহাদের যন্ত্র-সম্বন্ধীয় চেতনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযোগের জন্য এবং তৎকল্পে কৃষিক্ষেত্রসমূহের আবশ্যক পুনর্বণ্টন করিবার জন্য কার্য্যকরী উপায় ও পথ নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে বাংলার সমগ্র কৃষিভূমির একটি বিস্তৃত জরীপের ব্যবস্থা করা,

(২) উপরের ১ ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাংলার বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত যন্ত্র তৈয়ারী, যন্ত্রের নক্শা প্রস্তুত করা বা করাইবার জন্য পরিকল্পনা ও কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ,

(৩) বাংলা দেশের স্থানে স্থানে কৃষিজাত দ্রব্য প্রভৃতির জন্য স্থানীয় মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের অর্থে নাতিবৃহৎ কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলার কৃষিজাত দ্রব্য সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা,

(৪) উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন ও উহাদের উপযুক্ত বণ্টনের উপায় ও পন্থা নির্দ্ধারণ,

(৫) উল্লিখিত যন্ত্রের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং বাংলা দেশে ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা,

কেন্দ্রীয় কৃষি সংগঠন-সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য সভ্য মনোনয়নপূর্ব্বক বিভিন্ন জেলা-উপসমিতি গঠন।

—

রায়ৎদিগের অবস্থার উন্নতি

জলপাইগুড়ি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে দাবি করা হইয়াছে যে,

নিপীড়িত ও দরিদ্র কৃষকগণের দাবি-দাওয়া ও অভিযোগ দূর করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা এবং সর্ব্বপ্রকার জমিদারী প্রথা রহিত করা হউক।

কৃষকদের সমুদয় অভিযোগ দূরীকরণের প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য, এবং "যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা" করিলে জমিদারীপ্রথা রহিত করায় জমিদারদেরও আপত্তি হওয়া উচিত নহে।

অন্য একটি প্রস্তাবের একটি অংশ এই প্রকার:—

এই সম্মেলন আরও দাবি করিতেছে যে, যেহেতু অন্যান্য যে-সব জেলায় খাসমহাল, বা গবর্ণমেণ্টের রিজার্ভ ফরেষ্ট ও চা-বাগান আছে সেই সব স্থানে প্রচলিত আইন-কানুনসমূহের অতি কঠোর বিধানের ও পদ্ধতির ফলে বা স্থলবিশেষে উপযুক্ত আইন-কানুনের অভাবপ্রযুক্ত খাসমহালের প্রজাগণের, ফরেষ্টের সন্নিকটবাসিগণের ও চা-বাগানের শ্রমিক এবং নিম্ন কর্ম্মচারিগণের অশেষ দুঃখ-দুর্গতি ঘটিয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহাদিগের দুঃখ দূরীকরণার্থে ও তাহাদিগকে যথাযোগ্য ন্যায্য অধিকার ও সুবিধা দানার্থ খাসমহালের নিয়ম-কানুনসমূহ ও ফরেষ্ট-সংক্রান্ত আইন সবিশেষ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন এবং চা-বাগান সম্পর্কে নূতন আইন বা নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করা হউক।

দেখা যাইতেছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে যে-সব জমিদারী আছে এবং যাহাদের উচ্ছেদ চাওয়া হইয়াছে, তাহাদের রায়ৎদের মত খাসমহালের প্রজাগণেরও "অশেষ দুঃখ দুর্গতি আছে"। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিয়া তদনুযায়ী জমিদারীগুলিকে খাসমহালে পরিণত করিলেই প্রজাদের দুঃখ যাইবে না। সেই জন্য, হয় উভয়েরই আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, নতুবা উভয়েরই পরিবর্ত্তে কৃষকদিগের কল্যাণকর তৃতীয় কোন প্রথার উদ্ভাবন ও প্রচলন করিতে হইবে।

এ-বিষয়ে কৃষকদিগের কল্যাণকামী বিশেষজ্ঞেরা কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন সংবাদপত্রে তাহার আলোচনা আবশ্যক।

—

কংগ্রেসকর্ম্মীদের হিন্দুস্থানী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

জলপাইগুড়ি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীকে হিন্দুস্থানী শিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কংগ্রেস যখন ঐ ভাষাকে সাধারণ ভাষা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তখন, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত ও বহু উৎকৃষ্ট হিন্দী গ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা উপকৃত হইবার নিমিত্ত, উহা শুধু কংগ্রেসকর্ম্মীদের নহে অন্যদিগেরও শিখিলে উপকার হইবে।

কিন্তু প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, "হিন্দুস্থানী ভাষা ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী বলিতে ও বুঝিতে পারেন", ইহা সত্য নহে। সমুদয় উক্তি ও যুক্তি নির্ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

—

সব বাঙালীর বাংলা-লিখনপঠন-সামর্থ্য অনাবশ্যক ?

জলপাইগুড়ি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে হিন্দুস্থানী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা সমুদয় বাঙালীর বাংলা-লিখনপঠনক্ষম হইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, কিংবা, এমন কি, সমুদয় বালকবালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থার আবশ্যকতা সম্বন্ধে, কোন প্রস্তাব নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, গোঁড়া অসহযোগী কংগ্রেস শিক্ষার উপর ঝোঁক কেবল গত বৎসর হইতে দিতেছেন, আগে শিক্ষাটা তুচ্ছ একটা ব্যাপার ছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে এই পরিবর্ত্তিত মনোভাব এখন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কাজে প্রকাশ পাইতেছে, মহাত্মা গান্ধীও বলিয়াছেন লিখনপঠনক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহার মত বদলাইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় কংগ্রেস-কর্ম্মীরা এখনও নড়েন নাই।

হিন্দু মহাসভার সভাপতির উক্তি

হিন্দু মহাসভার বর্ত্তমান সভাপতি বিনায়ক দামোদর সাভারকর মহাশয়ের স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও স্বদেশপ্রেম সন্দেহাতীত। কিন্তু তাঁহার সমুদয় মত গ্রহণীয় মনে হয় না। তিনি হিন্দু মহাসভার গত অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে হিন্দুরাই নেশ্যন, মুসলমানেরা একটি সম্প্রদায় মাত্র—যেমন জার্ম্যানরা জার্মেনীর নেশ্যন, তথাকার ইহুদীরা একটি সম্প্রদায় মাত্র। বাংলা ভাষায় ও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভারতীয় অন্য কয়েকটি ভাষায় "জাতি" শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নেশ্যনকে আমরা জাতি বলি, রেস্‌কে জাতি বলি, আবার কাষ্টকেও জাতি বলি, ইত্যাদি। আবার যখন বলি, হিন্দু জাতি, মুসলমান জাতি, তখন জাতির অর্থ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ও হয়। কিন্তু ইংরেজী নেশ্যন শব্দটি কেবল রাষ্ট্রীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক রাষ্ট্রের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন রেসের (raceএর) লোকও বাস করিতে পারে—যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে; কিন্তু তাহারা একই নেশ্যনের অন্তর্গত—নেশ্যনটি তাহাদের সমষ্টি। সেইরূপ ভারতীয় নেশ্যন বলিতে, ধর্ম্মের দিক্‌ দিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পারসী, ভারতীয় ইহুদী, ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ান, ভারতীয় মুসলমান, শিখ প্রভৃতির সমষ্টিকে বুঝায়; ভাষা ও প্রদেশের দিক দিয়া হিন্দুস্থানী, বাঙালী, অন্ধ্রদেশীয়, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয়, তামিল, সিন্ধী, ওড়িয়া, আসামীয়, গুজারাটী প্রভৃতির সমষ্টিকে বুঝায়।

সাভারকর মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন, দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার ওআর্কিং কমীটির অধিবেশনে তদনুরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অধিকন্তু কমীটি হিন্দুদিগকে কংগ্রেসের সভ্য না-হইতে ও হিন্দু মহাসভার সভ্য হইতে বলিয়াছেন। এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য হিন্দু মহাসভা ও তাহার কমীটিকেই দোষী করা যায় না। প্রথম আক্রমণ কংগ্রেসের দিক্‌ হইতে আসিয়াছে। বৎসরাধিক পূর্ব্বে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া যখন হিন্দু মহাসভাকেই সাম্প্রদায়িকতার জন্য আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার এইরূপ ব্যবহারের সমালোচনা হওয়ায় তিনি পরে মুসলিম লীগেরও সামান্য কিছু সমালোচনা করিয়াছিলেন।

নেহরু মহাশয় বা অন্য কোন কংগ্রেস-নেতা হিন্দু-মহাসভা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত মত বলা যাইতে পারিত। কিন্তু সম্প্রতি কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা উভয়কেই এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া কংগ্রেসকর্ম্মীদের পক্ষে উভয়েরই সভ্য হওয়া অবৈধ বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অনুচিত হইয়াছে। কংগ্রেস বরাবরই মুসলিম লীগকে যথাসম্ভব তুষ্ট রাখিতে ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন এবং হিন্দু মহাসভাকে কখনও পুছেন নাই।

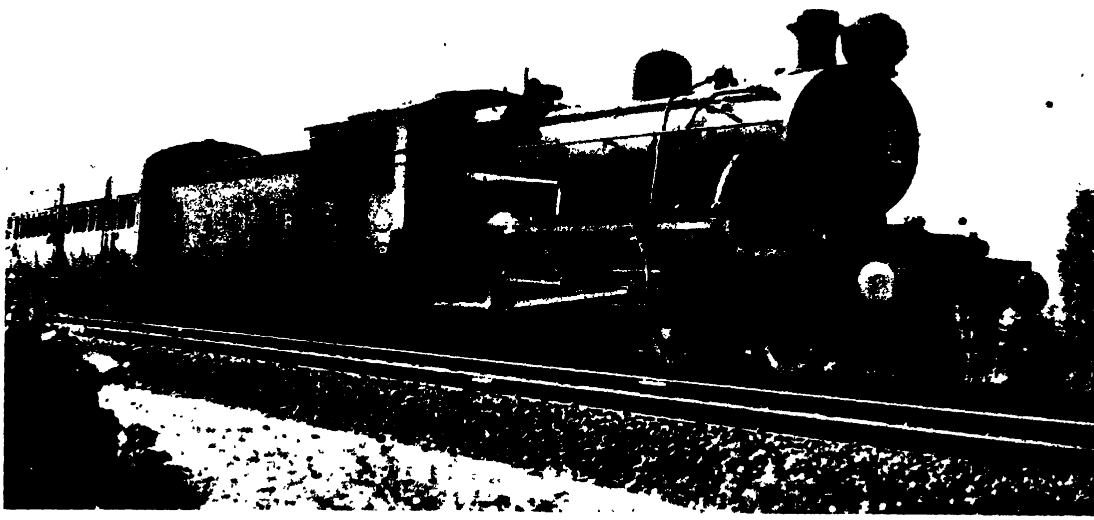
কংগ্রেসের উক্ত প্রস্তাব ও এবম্বিধ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় যদি হিন্দু মহাসভা কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু বলেন করেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এরূপ অবস্থায় হিন্দুদের কর্ত্তব্য স্থির করা সহজ নহে—বিশেষতঃ যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা চান, তাঁহাদের পক্ষে। আমরা কংগ্রেসের সভ্য নহি, হিন্দু মহাসভারও সভ্য নহি বলিয়া আমরা যাহা বলি লিখি, তাহার জন্য কেবল আমরাই দায়ী। এই জন্য আমাদের বক্তব্য স্বাধীন ভাবে বলিতে পারি।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি মুসলমান-দিগকে হাতে রাখিবার নিমিত্ত হিন্দুদের প্রতি—বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুদের প্রতি—অত্যন্ত অবিচার ও তাহাদের খুব ক্ষতি করিয়াছে। কংগ্রেসও ঐ নিষ্পত্তি সম্বন্ধে "না-গ্রহণ না-বর্জন" নীতি অবলম্বন করিয়াছেন মুসলমানদের বিরাগভাজক না-হইবার নিমিত্ত। তাহাতে হিন্দুদের ক্ষতি হইয়াছে। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে সরকারী কাজে হিন্দুরা যোগ্যতা বা লোকসংখ্যা কোনটি অনুসারেই নিযুক্ত হইতেছে না, মুসলমানেরা দুই দিক্‌ দিয়াই অধিক কাজ পাইতেছে। যতগুলি প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথাকার মুসলমানদের সমষ্টি ও যোগ্যতা এবং হিন্দুদের সমষ্টি ও যোগ্যতা বিবেচনা করিলে মুসলমান-দিগকে যে মন্ত্রীর পদ অধিক দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে—অন্য চাকরীর ত কথাই নাই।

কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেগুলিতে হিন্দুরা যোগ্যতা বা সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার পাইতেছে না। আবার যে-বঙ্গদেশে তাহারা সংখ্যালঘু, সেখানেও মুসলমানেরা তাহাদিগকে তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে বা সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অধিকার দিতেছে না। বঙ্গীয় সাধারণ কংগ্রেস-দল তাহার প্রতিবাদ করেন নাই, করিতেছেন না, বরং বাজে তর্ক করিয়া নিজ দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন। কেবল কংগ্রেস জাতীয় দল এরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সমগ্র-ভারতীয় কংগ্রেস-দলের এবং বঙ্গের কংগ্রেস-দলের হিন্দুদের সম্বন্ধে মনোভাব, নীতি ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই আবশ্যক। প্রশ্ন এই, হিন্দুরা কংগ্রেসের বাহিরে থাকিলে, বা কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে



দেরাদুন এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন, টেণ্ডার ও গাড়ীর প্রথম কামরাখানি। এইগুলি লাইনচ্যুত হয় নাই



দুর্ঘটনার পর অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভস্মীভূত গাড়ীর ধ্বংসাবশেষ।



দুর্ঘটনার পর রেল-লাইনের দৃশ্য। মধ্যখানে যে লাইনটুকু খোলা অবস্থায় দেখা যাইতেছে, তথাকথিত অনিষ্টকারীরা এই লাইনটুকু অপসারিত করিয়াছিল, বলা হইয়াছে।



দুর্ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় অনুসন্ধান। তথাকথিত 'অপসারিত' রেল-লাইনের পরীক্ষা।

এই পরিবর্ত্তন হইবে কি? যে-সব হিন্দু কংগ্রেসের সভ্য আছেন তাঁহাদের মধ্যে বেশী লোক যে উহা ছাড়িয়া দিবেন এরূপ সম্ভাবনা আমাদের মতে কম এবং যাঁহারা উহার মধ্যে আছেন উহাকে শক্তিশালী রাখার পক্ষে তাঁহারা যথেষ্ট। তাহার উপর মুসলমানেরা ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দিতেছে, কারণ তাহাতে তাহাদের সুবিধা আছে—সুবিধা অনুসারে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া না-দেওয়া মুসলমানদের পলিসি।

এ-অবস্থায়, আমাদের বিবেচনায়, যে-সকল হিন্দুর ভারতবর্ষকে অহিংস উপায়ে স্বাধীন করার নীতিতে আস্থা আছে, তাঁহাদের অধিকতর সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দিয়া কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিকতা ও ন্যায়ের পথে আনিবার ও রাখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের সাধারণ সভ্য এবং হিন্দু মহাসভার সাধারণ সভ্য উভয়ই একসঙ্গে এখনও হওয়া চলে।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে ও অন্যত্র চাকরীর বাঁটোআরা

সমগ্র ভারতবর্ষে, সমগ্র বঙ্গে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে বা অন্য কোথাও আমরা ধর্ম্মসম্প্রদায় বা অন্য কোন জনসমষ্টি অনুসারে সরকারী চাকরীর বাঁটোআরার বিরোধী। সরকারী চাকরী জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে কেবল যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া উচিত। তাহা করিলেই সরকারী কাজ অধিকতম দক্ষতা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সততার সহিত নির্ব্বাহিত হয়, কিন্তু তাহা না করিলে সরকারী কাজে দক্ষতা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সততার মান (standard) কমে। তদ্ভিন্ন যোগ্য লোকদের প্রতি অবিচারও হয়। বঙ্গে সরকারী নানা বিভাগে যে দক্ষতা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সততার হ্রাস হইয়াছে, তাহা বিশেষজ্ঞেরা জানেন।

যোগ্যতা ভিন্ন অন্য কিছু অনুসারে সরকারী চাকরীতে নিয়োগ গণতান্ত্রিক রীতিও নহে।

যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকরী দিবার নীতির সমর্থন করিলে একটা কুতর্ক কখন কখন এইরূপ উঠে যে, যোগ্যতা অনুসারে চাকরী ত দেওয়া হয় না, আত্মীয়তা সুপারিশ প্রভৃতি অনুসারে পক্ষপাত করিয়া চাকরী দেওয়া হয়। ইহা যে কোন কোন স্থলে বা অনেক স্থলে হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ প্রকার কুরীতির প্রতিকার করা যায় ক্রমাগত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-আদি দ্বারা যোগ্যতা অনুসারে কাজ দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা দ্বারা। কোন কোন স্থলে বা অনেক স্থলে পক্ষপাতিত্ব হয় বলিয়া সমষ্টিগত সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষপাতিত্বকে (organized communal favouritismকে) তাহার প্রতিকার মনে করা সুবুদ্ধিমত্তার ও প্রকৃতিস্থ ন্যায়নিষ্ঠ মনের পরিচায়ক নহে।

সুযুক্তির উত্তর দিতে না-পারিলেও পুরাতন কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া চলার একটা রীতি আছে। বঙ্গে সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে যাহা প্রাপ্য তদপেক্ষা অধিক চাকরী দিবার প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হওয়ায়, তাহাতে যে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছিল যে, সরকারী চাকরীগুলা দ্বারা শতকরা এত কম লোকের রোজগারের উপায় হয় যে, ওগুলাকে বেকার-সমস্যা সমাধানের উপায় বলা যায় না। সেই কথা আবার সম্প্রতি বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন একটা কিছুর দ্বারাই ত বেকার-সমস্যার সমাধান হয় না। ব্যারিষ্টরী, ওকালতী, ডাক্তারী, বাণিজ্য, চাষ, মুটে-মজুরগিরি, সরকারী ও বেসরকারী চাকরী—ইহাদের কেবলমাত্র একটা কিছুর দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। অথচ প্রত্যেকটির দ্বারা আংশিক কিছু সমাধান হয়। এই জন্য কোন কৃত্রিম বাঁটোআরা দ্বারা যোগ্য লোকদের পক্ষে কোনটি অবলম্বনের পথ সঙ্কীর্ণতর করা অত্যন্ত অন্যায়। তাহাতে বেকার-সমস্যা গুরুতর করা হয়।

সরকারী চাকরীর দুটি দিক্ আছে। একটি উপার্জ্জনের দিক্, অন্যটি দেশের সেবার দিক্। বিদেশী আমলা-তন্ত্রের আমলে যাঁহারা চাকরী করিয়া গিয়াছেন ও এখনও যাঁহারা করেন, তাঁহারা সকলেই পেটের দায়ে কেবল গোলামি করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন, মনে করা ভুল। তাহাতে তাঁহাদের প্রতি অবিচারও হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি চাকরীসূত্রে দেশহিত অনেক করিয়াছিলেন। দেশে স্বরাজ যে-পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে সরকারী চাকরোরা বেসরকারী অবৈতনিক জন-সেবকদিগের সহকর্ম্মী বলিয়া প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত হইবেন। সরকারী চাকরী যদি শুধু জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ই হইত, তাহা হইলেও বহুসংখ্যক যোগ্য যোগ্যতর ও যোগ্যতম লোককে শৃঙ্খলাবদ্ধ সমষ্টিগত সাম্প্রদায়িক পক্ষ-পাতিত্ব-ব্যবস্থা (organized communal favouritism) দ্বারা তাহা হইতে বঞ্চিত করা অন্যায় ও দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইত। কিন্তু যেহেতু সরকারী চাকরী দেশের সেবারও একটি পথ, সেই জন্য অনেক যোগ্য যোগ্যতর ও যোগ্যতম লোককে উহা হইতে বঞ্চিত করা আরও অন্যায় এবং দেশের পক্ষে আরও অনিষ্টকর।

—

ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে দুর্ঘটনার বাহুল্য

গত দেড় দুই বৎসরের মধ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে সাত-আটটা দুর্ঘটনায় ট্রেনের এঞ্জিন ও অন্য কোন কোন অংশ লাইনচ্যুত হয়, অনেক যাত্রী হত ও আহত হয়, এবং অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়। সাধারণতঃ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তাহার কারণ বলেন, অসন্তুষ্ট কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের দ্বারা স্যাবটাজ্ (sabotage) অর্থাৎ দু-একটা রেল তুলিয়া ফেলিয়া বা লাইনের উপর বড় পাথর, কাঠের গুঁড়ি ইত্যাদি স্থাপন করিয়া ক্ষতি করা। ডেরাদূন এক্সপ্রেসে সম্প্রতি যে দুর্ঘটনা হইয়াছে, তাহারও কারণ রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা ও কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ বলেন। কিন্তু তাঁহাদের ঐরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে দৈনিক কাগজে, ব্যবস্থাপক সভায় ও মাসিক কাগজে যে-সকল যুক্তি প্রযুক্ত ও প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার সন্তোষজনক উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন নাই। হাবড়া হইতে ট্রেন যখন ছাড়ে তখন উহা যাত্রী-বোঝাই ছিল। দুর্ঘটনায় চারিটা গাড়ী ভস্মসাৎ হয়, অথচ দুর্ঘটনার পরেই কর্ত্তৃপক্ষ সামান্য কয়েক জন হতাহত হইয়াছে বলিয়া খবর প্রকাশ করেন। গাড়ী চারিটা ৩৬ ঘণ্টা ধরিয়া পুড়ে, অথচ তাহা নিবাইবার চেষ্টা হয় নাই। সত্বর আগুন নিবান হইলে অনেক যাত্রীর প্রাণ ও কিছু সম্পত্তি রক্ষিত হইতে পারিত। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে, সম্ভবতঃ প্রায় ১০০ জন যাত্রী পুড়িয়া মরিয়াছে। রেল-দুর্ঘটনায় এতগুলি মানুষের এরূপ যন্ত্রণাদায়ক ও ভীষণ মৃত্যুর বৃত্তান্ত আমরা আগে কখনও শুনি নাই।

অসন্তুষ্ট ও কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের দ্বারাই যদি এই সব দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা হইলেও কেবল ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতেই এইরূপ এতগুলা দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ কি?

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্কের পর গবর্ন্মেণ্ট ডেরাডুন এক্সপ্রেস ধ্বংসের তদন্ত যোগ্য জজ দ্বারা করাইতে সম্মত হইয়াছেন। ইহার ফল যাহাই হউক, ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের, আবশ্যক হইলে খুব বেশী খরচ করিয়াও, ট্রেনে যাতায়াত সম্পূর্ণ নিরাপদ করিবার সকল রকম ব্যবস্থা করা ও সর্ব্ববিধ সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—

ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনের আলোচনা

গত ১২শে ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে একটি সভার অধিবেশন হয়। সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি এবং অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রফুল্লকুমার সরকার, সুন্দরীমোহন দাস ও দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র আলোচনায় যোগদান করেন। আলোচনাটি কলিকাতার অন্ততঃ একখানি ইংরেজী দৈনিক কাগজে বিস্তারিত ভাবে বাহির হওয়া উচিত ছিল। তাহা না-হওয়ায় বাঙালী বিদ্বান্ ও সাহিত্যিকগণের এ-বিষয়ে মত ও যুক্তি সে-দিন কি বিবৃত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে অ-বাঙালীরা সাধারণতঃ অজ্ঞ থাকিবেন। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হইয়াছিল:—

১। এই সভার মতে বাংলা ভাষার বহুলতর প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা উচিত:—

(ক) বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাঙালী মাত্রেরই দৈনন্দিন কার্য্য ও ব্যবহারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(খ) বাংলা দেশে প্রবাসী অন্যভাষাভাষী ব্যক্তিগণের সহিত যত দূর সম্ভব বাংলা ভাষায় কথোপকথন ও চিন্তার বিনিময় কর্ত্তব্য।

(গ) অ-বাঙালীর মধ্যে ও বাংলার বাহিরে যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কর কর্ত্তব্য; যথা—পরীক্ষা-গ্রহণ, পুরস্কার-বিতরণ, বাংলা সাহিত্য আলোচনার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রতিযোগিতা-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি।

২। এই সভার মতে ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্দ্ধারণের চেষ্টা কালোচিত নহে এবং অসমীচীন। ভারতবর্ষে পূর্ণস্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

৩। বর্ত্তমানে যদি রাষ্ট্রভাষা নির্দ্দিষ্ট করিতেই হয়, তবে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ ও সমৃদ্ধি এবং ঐ ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা দ্বারা প্রভাবান্বিত মনে রাখিয়া বঙ্গভাষাকেই রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে নির্দ্ধারণ করা উচিত।

৪। এই সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, মুসলিম সাহিত্য-সম্মেলন, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন ও অন্যান্য বঙ্গসাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এ-সম্বন্ধে একযোগে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ ও আহ্বান করিতেছেন।

৫। উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে লইয়া গঠিত কমিটির উপর অর্পণ করা হইল। কমিটি প্রয়োজন-মত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন:—

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সভ্য শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র-নাথ মিত্র, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক, শ্রীযুক্ত

প্রফুল্লকুমার সরকার, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি।

বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বক্তাদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই জন্য তাঁহার বক্তৃতার তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া হইল :—

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সাহিত্যের গৌরব থাকিলেই ভাষার প্রসার হয় না। ইংরেজ জাতির আত্মপ্রসারের শক্তির ফলে ইংরেজী ভাষার প্রসার হইয়াছে। কয়লাওয়ালা চাউলওয়ালা মুদী দারোয়ান প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া হিন্দী ভাষার প্রসার ঘটিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস উহাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে সাহসী নহে। কারণ মুসলমানেরা কিছুতেই উর্দু ছাড়িবে না। সেই জন্য হিন্দুস্থানীর সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুস্থানী একাডেমী ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় অদ্ভুত হিন্দুস্থানী সৃষ্টি হইতেছে। তাহারা জোড়া জোড়া শব্দ ব্যবহার করিতেছে—একটি হিন্দী ও আর একটি উর্দু শব্দ। "আন্তর্জ্জাতিক" শব্দটির শেষের "জাতিক" শব্দের পরিবর্ত্তে উর্দু 'কৌম' শব্দ দিয়া তাহারা হিন্দুস্থানী 'অন্তরাকৌম' শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। বক্তা মনে করেন যে, বাঙালীদের এই সকল গোলমালে গিয়া কাজ নাই। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে বাংলা ভাষাকে দাবাইয়া রাখিবার যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বাংলা দেশেও হিন্দুস্থানী চালু করিবার চেষ্টায় আপত্তি হওয়া উচিত। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন যে, গয়ার ভাষা ও মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার অনেক মিল আছে, কিন্তু লিখিবার সময় সেখানকার হিন্দুরা হিন্দী ও মুসলমানেরা উর্দু ভাষা ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে উর্দু ও সিন্ধী ভাষা ছাড়া ভারতের সব ভাষার গতি ও প্রকৃতি এক। কারণ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ হইতে যে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ইহা হইতে জানা যাইবে যে, সুনীতিবাবুও কংগ্রেসের নির্দ্ধারণের সমর্থন করেন না।

বাংলা রাষ্ট্রভাষা হউক বা না-হউক, তাহার চর্চ্চা সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের সম্যক্ চেষ্টা বাঙালীদের করা উচিত। বাঙালীরা তাহা করেন না। এই অবহেলার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বাংলার বাহিরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষার লেখকেরা ইংরেজীতে লিখিত কাগজেও তাঁহাদের বহিগুলির সমালোচনা করান। বাঙালী লেখকেরা তাহা কচিৎ করান। বাঙালীদের ইংরেজী কাগজের সম্পাদকেরাও এ-বিষয়ে কম মনোযোগী। ফলে, বাংলায় যে কত ও কিরূপ বহি বাহির হইতেছে, তাহা অ-বাঙালীরা কম জানিতে পারে।

'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বাংলা বহির লেখকের ও প্রকাশকের ঐ বহি একখানি করিয়া শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে বিনা মূল্যে প্রেরণ করা উচিত। তাহা প্রেরিত হয় না। হইলে শুধু যে ঐ গ্রন্থাগারের পুষ্টিই হইত, তাহা নহে। শান্তিনিকেতনে ভারতবর্ষের যত ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী একত্র সম্মিলিত হয়, বঙ্গের অন্য কোন শিক্ষায়তনে তাহা হয় না। ইহারা সকলে না হউক অনেকে বাংলা শিখে। তাহাদিগকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ ও সম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞান দিবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায় শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার। এই কারণে বাংলা বহির দ্বারা তাহাকে পুষ্ট করা বঙ্গসাহিত্যোৎসাহীদের কর্ত্তব্য।

অন্য দিকে, যাঁহারা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চান, তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যোগিতা কিরূপ দেখুন। তাঁহারা অর্থব্যয় করিয়া শান্তিনিকেতনে "হিন্দী ভবন" নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু দ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন, এণ্ড্রুজ সাহেবের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়াছেন, এবং অর্থব্যয় করিয়া হিন্দীর অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন।

'হিন্দুস্থানী'কে রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অনেক বার বলিয়াছি—প্রধানতঃ মডার্ণ রিভিয়ুতে। তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। কংগ্রেসের এই চেষ্টায় মুসলমানদের সহিত ঝগড়ার আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। তামিলদেশে খুব বিরোধ চলিতেছে। অন্যপ্রদেশে বিরোধিতাটা আপাততঃ চাপা আছে। 'হিন্দুস্থানী'কে রাষ্ট্রভাষা করার একটা উপসর্গ এই হইয়াছে যে, ইহা শিখিয়া, এই ভাষায় কে কি লিখিতেছে সে-বিষয়ে ওয়াকিফহাল থাকিতে হইলে, নাগরী অক্ষর, আরবী-ফারসী অক্ষর, এবং রোমান অক্ষর, এই তিন রকম অক্ষর উত্তমরূপে পড়িতে শিখিতে হইবে। কারণ, কংগ্রেসের মুসলমান পুরোহিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব পাতি দিয়াছেন যে, রোমান অক্ষরও শিখিতে হইবে।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

জলপাইগুড়িতে এবার মহাসমারোহে ও উৎসাহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে চারি শতের অধিক প্রতিনিধি ও পনর হাজারের অধিক দর্শক এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। জলপাইগুড়ির অধিবেশনের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, অনেক মুসলমান প্রতিনিধি ও দর্শক এবং মহিলা প্রতিনিধি ও

দর্শক ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার চারুচন্দ্র সান্যাল এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই-যোগ্য লোক, এবং দীর্ঘ ও নিজ নিজ খ্যাতির অনুরূপ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন।

—

বিহারের বাঙালীদের সম্বন্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

বিহার-প্রদেশবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে আমরা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বা সম্পূর্ণ অসন্তোষকর বলিতে পারি না। ইহার কিয়দংশ সন্তোষকর, কোন কোন নির্দ্ধারণ অসন্তোষজনক, এবং কতকগুলিতে এরূপ ছিদ্র আছে যাহার সাহায্যে বিহারের বাঙালীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা চলিবে। আমরা ফেব্রুয়ারীর মডার্ণ রিভিয়ুতে কমীটির নির্দ্ধারণগুলির বিস্তারিত বিচার করিয়াছি। বাংলা ভাষায় তাহা আবার করা অনাবশ্যক। কারণ, কমীটির অধিকাংশ সভ্য এবং বিহারের সমুদয় মন্ত্রী অ-বাঙালী।

—

প্রস্তাবিত নূতন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন

ভারতবর্ষে হিন্দুদের সমষ্টি অন্য সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের সম্মিলিত সমষ্টি অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু ভারতশাসন-আইন অনুসারে তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় অর্দ্ধেকেরও কম আসন দেওয়া হইয়াছে। এই মহৎ সু-নজীরের অনুসরণ করিয়া বঙ্গের মুসলমান-প্রধান মন্ত্রীদল কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে কলিকাতার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধিবাসীদিগকে অর্দ্ধেকেরও কম (৯৯এর মধ্যে ৪৬টি) প্রতিনিধি দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই ৪৬এর মধ্যে আবার ৭টি থাকিবে তপসিলভুক্ত হিন্দুদের জন্য। শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস এই চা'লটার বিরুদ্ধে কাগজে লিখিয়াছেন। হিন্দুরা ত সংখ্যায় বেশী বটেই; তাহাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের সমষ্টিও অন্য সকলের প্রদত্ত ট্যাক্সের সমষ্টির চেয়ে বেশী। মিউনিসিপালিটির জন্য অবৈতনিক পরিশ্রমও হিন্দুরা বরাবর 'অধিক' করিয়া আসিতেছে। তথাপি—অথবা সেই কারণেই—তাঁহাদিগকে কোণঠাসা করা চাই, এবং সেই কাজটি সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অল্পসংখ্যক ইংরেজদিগকে ১২টি আসন দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণ বোধ হয় এই বলা হইবে যে, তাহারা ট্যাক্স অনেক দেয় এবং তাহাদের বিস্তর টাকা এই নগরে ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটে। তাহা হইলে হিন্দুদের বেলায় তাহাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটান তাহাদের ধনের পরিমাণ কেন বিবেচিত হয় না?

প্রস্তাবিত আইনটা জঘন্য ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত এবং অন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ খসড়ায় যে সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থাও নূতন করিয়া করা হইয়াছে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

—

মহারাজ দিব্যের স্মৃতি-উৎসব

এই বৎসরও মহারাজ দিব্যের স্মৃতি-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। তিনি প্রাচীন বঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক গৌরবস্তম্ভ ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল রাখা আবশ্যক। নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে না-পারায় তাঁহার অভিভাষণ পঠিত হইয়াছিল।

—

জয়পুরে প্রজা-আন্দোলন

অন্য অনেক দেশী রাজ্যের মত জয়পুরেও প্রজা-মণ্ডল আছে এবং তাহা প্রজাদের শিক্ষাদির দ্বারা উন্নতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ বিষয়ে সচেষ্ট। জয়পুরের দরবার (গবর্মেণ্ট) প্রজামণ্ডলকে নিষিদ্ধ সমিতি ঘোষণা করেন এবং উহার সভাপতি শেঠ যমুনালাল বজাজকে জয়পুর প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। তিনি নিষেধ না মানিয়া জয়পুর প্রবেশ করায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মথুরায় আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তিনি আবার প্রবেশ করায় আবার ধৃত হইয়াছেন। তিনি ও জয়পুরের অন্য অনেক প্রজা অহিংস সংগ্রাম চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

স্বেচ্ছাকারী নৃপতিদের শেষ পরাজয় নিশ্চিত।

—

রাজকোটে সত্যাগ্রহ

সত্যাগ্রহের ফলে রাজকোটের ঠাকুর সাহেব (মহারাজা) প্রজাদিগকে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র দিতে রাজী হইয়াছিলেন। তাহার পর, বোধ করি অভিভাবক (বা মনিব) ইংরেজ রাজপুরুষের পরামর্শে (বা হুকুমে), অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছেন। প্রজাদের পক্ষ হইতে আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কস্তুরবাঈও যোগ দেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা হওয়ায় তাহার প্রতিবাদ হইয়াছে। রাজকোট বোম্বাই প্রদেশের

অন্তর্গত। ইহার মহারাজার সহিত যেরূপ শাসনতন্ত্রের পরামর্শ হইয়াছিল, তাহা হইয়াছিল সর্দ্দার বল্লভভাই পটেলের সহিত। সর্দ্দারজীর কন্যা কুমারী মণি বেনও অন্য অনেক সত্যাগ্রহীর মধ্যে বন্দিনী। মহাত্মাজীর সহধর্ম্মিণীও বন্দিনী।

এই প্রকার নানা অবস্থার সমাবেশে কংগ্রেসের কর্ত্তাদের টনক নড়িয়াছে। অনেকে মনে করেন, ভারত-গবর্ন্মেণ্টের হস্তক্ষেপে রাজকোটের ঠাকুরসাহেবের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ঘটিয়াছে। সেই জন্য, ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ঠাকুরসাহেবকে প্রতিশ্রুতি পালনের স্বাধীনতা না দিলে, চাই কি বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ইস্তফা দিতে পারেন। তাহা হইলে সমগ্র ভারতে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইবে।

—

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

স্পেনে যুদ্ধের এখন যাহা অবস্থা তাহাতে বিদ্রোহীদের জয় এবং ফ্রাঙ্কোর দ্বারা ইটালীর অনুগত গবর্ন্মেণ্ট স্থাপন আসন্ন মনে হইতেছে। গভীর দুঃখের বিষয়।

—

ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের অবস্থা

ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের অবস্থা পুনর্ব্বার অধিকতর বিপৎসঙ্কুল হইতেছে। এ-বিষয়ে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট যথোচিত মন দেন নাই ও দিতেছেন না। সেই হেতু এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুলতুবি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

চীন-জাপান যুদ্ধের খবর আজকাল বেশী আসিতেছে না। কিন্তু চীন পরাজয় মানে নাই, মানিবেও না। চীনের বন্দর দিয়া অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর উপায় না থাকায় এখন যুদ্ধের সরঞ্জাম বোঝাই জাহাজ রেঙ্গুনে খালাস করিয়া স্থলপথে ব্রহ্মদেশ ও য়ুনানের ভিতর দিয়া অস্ত্রশস্ত্র চালানের বন্দোবস্ত ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট করিয়া দিয়াছেন।

—

কুড়ি কোটি চটের থলির ফরমাশ

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কুড়ি কোটি চটের থলির ফরমাশ দিয়াছেন, এই সংবাদে অনুমান হয়, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট বোমা ও গোলাগুলী হইতে আত্মরক্ষার জন্য বালুকাপূর্ণ বস্তার আয়োজন করিতেছেন।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুসভেল্ট সাহেব ডিক্টেটরী ও ডিক্টেটরদের বিরুদ্ধে গরম ও স্পষ্ট বক্তৃতা করায় অ-ডিক্টেটরী গবর্ন্মেণ্টগুলির কিছু সাহস বাড়িয়া থাকিবে।

—

প্যালেস্টাইন কন্‌ফারেন্স

প্যালেষ্টাইন ঠাণ্ডা হয় নাই। বিলাতে আরবদের সহিত ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হইয়াছে।

আরব ও ইহুদীরা আপোষে মিটমাট করিয়া যদি সম্মিলিত ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে কাবু করিতে পারিত, তাহা হইলেই প্যালেষ্টাইন-সমস্যার সুমীমাংসা হইত।

—

বিঠলভাই পটেলের উইল

পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট বিঠলভাই পটেল তাঁহার উইলে ভারত-হিতার্থ বিদেশে কাজের জন্য লক্ষাধিক টাকা রাখিয়া যান, এবং কাজের বন্দোবস্তের ও টাকা ব্যবহারের ভার ও ক্ষমতা সুভাষচন্দ্র বসুকে দিয়া যান। উইলে খুঁৎ আছে এই ওজুহাতে অছিরা সুভাষবাবুকে এ-পর্য্যন্ত ঐ টাকা দেন নাই। এখন তাঁহারাই উইলের ঠিক্ ব্যাখ্যার জন্য আদালতে আবেদন করিয়াছেন। টাকা সুভাষবাবু না-পাইলে বিঠলভাই পটেল মহাশয়ের ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল ও অন্য কোন কোন আত্মীয় পাইবেন।

—

খুলনায় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন

খুলনায় শীঘ্রই বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন হইবে। শুধু রাষ্ট্রীয় নহে, সামাজিক নানা বিষয়ও ইহার বিবেচ্য। হিন্দু যুবক ও যুবতীদের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা বাড়িতেছে। বরপণ ইহার একটা কারণ বটে; কিন্তু অনেক যুবকের বেকার অবস্থাও বড় একটা কারণ। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর সংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক অকল্যাণ ও লোকসংখ্যা উপযুক্তরূপ না-বাড়িবার কারণ।

কতকগুলি হিন্দু জাতির মধ্যে কন্যাপণ প্রচলিত। ফলে অনেক পুরুষের বিবাহই হয় না, অনেকের বিবাহ হয় প্রৌঢ় অবস্থায় বা প্রায় বার্দ্ধক্যে। তাহার ফলে অনেক পাত্রীর বালবৈধব্য ঘটে। যুবা বা প্রৌঢ় অবিবাহিতেরা এই বিধবাদিগকে বিবাহ করিলে উভয় পক্ষের কল্যাণ হয়, দুর্নীতি নিবারিত হয়, এবং হিন্দুসমাজের স্বাভাবিক লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি বজায় থাকে।

যে-কোন কারণে হিন্দু সমাজে 'উচ্চ' ও 'নিম্ন' শ্রেণীর মধ্যে এক পক্ষের অহংকার ও অবজ্ঞা এবং অন্য পক্ষের অপমানবোধ ও অসন্তোষ আছে, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে দূর করিতে হইবে।

—

"গণ সাহিত্য", "প্রগতি সাহিত্য"

কিছু দিন হইতে এইরূপ দু-একটা কথা শোনা যাইতেছে যে, বাংলা দেশের অমুক লেখকের আগে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ও গণিকারা ভারতীয় বা বঙ্গীয় সাহিত্যে স্থান পায় নাই। এরূপ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। আমরা সাহিত্যের বিস্তৃত জ্ঞানের দাবি করিতে পারি না। কিন্তু ঐরূপ মন্তব্যের বিপরীত দু-একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়িকা বসন্তসেনা গণিকা ছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রণীত চণ্ডীকাব্যের কালকেতু ফুল্লরা খুল্লনা প্রভৃতি অভিজাত বা "ভদ্র" শ্রেণীর লোক ছিলেন না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" নাটকে নিম্নশ্রেণীর পুরুষ ও নারী আছে। তাঁহার "একেই কি বলে সভ্যতা?" নাটকে নিম্নশ্রেণীর অনেক পুরুষ নারী এবং বারবিলাসিনীও আছে। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকে নিম্নশ্রেণীর লোক আছে, "সধবার একাদশী"তে অধিকন্তু গণিকা আছে। তাঁহার অন্য নাটকগুলিও এই সব দিক্ দিয়া বিবেচ্য।

"গণ সাহিত্য" "প্রগতি সাহিত্য" ইত্যাদি নামে অভিহিত সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল তথ্যের দিক্ দিয়া দু-একটা কথা বলিলাম।

কংগ্রেসে "বামপন্থী" ও "দক্ষিণপন্থী"

কংগ্রেসের "বামপন্থী"রা "দক্ষিণপন্থী"দিগকে সরিয়া পড়িতে বলেন নাই, তাঁহারা নিজেই সরিয়া পড়িবার পরামর্শ করিতেছেন এইরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই চা'লের ঠিক্ উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে না। তাঁহারা সরিয়া পড়িলে "বামপন্থী"রা জব্দ হইবেন, এরূপ অভিসন্ধি থাকিলে, তাহা সিদ্ধ হইবে, মনে হয় না। কিন্তু দুই উপদলে ছাড়াছাড়ি হইলে কংগ্রেসের শক্তি কমিবার সম্ভাবনা আছে। "বামপন্থী"রাও পরামর্শ করিতেছেন।

—

"বাইবেলের উৎপত্তি ও প্রকৃতি"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন পরীক্ষার জন্য বাইবেলের কোন কোন অংশ পঠিতব্য। যে-সকল অধ্যাপক এই অংশগুলি পড়ান ও যে-সকল ছাত্র পড়েন, আচার্য্য সাণ্ডার্স্যাণ্ড প্রণীত "বাইবেলের উৎপত্তি ও প্রকৃতি" ("The Origin and Character of the Bible") নামক পুস্তকটি তাঁহাদের পড়া উচিত। ইহা সমালোচনার বহি ও ঐতিহাসিক বহি—শ্রদ্ধার সহিত লিখিত। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ইহাতে দেখাইয়াছেন যে, বাইবেল অভ্রান্ত নহে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া বাইবেলের কোন্ কোন্ অংশ মূল্যবান্, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বাইবেলের অংশবিশেষ পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রেরও চয়নিকা পাঠের ব্যবস্থা করা উচিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের দ্বারা সংগৃহীত হিন্দু জৈন বৌদ্ধ পারসীক ইহুদী খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান ও শিখ শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত "শ্লোকসংগ্রহ" এইরূপ অধ্যয়নের উপযোগী।

—

চলচ্চিত্র সম্মেলন

চলচ্চিত্র সম্মেলনে প্রধান ব্যক্তিরা যে অল্পবয়স্কদিগের উপযোগী, আলাদা ভাল চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন, ইহা শুভলক্ষণ।

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

শ্রীগোপাল হালদার

অবশেষে বার্সিলোনার পতন হইল—ইতালীয় ও মূর সেনার সহায়তায় বিদ্রোহী সেনাপতি ফ্রাঙ্কো দুর্গম এই নগরীতে বিজয়ীরূপে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার বহুবলসমৃদ্ধ বাহিনীর সম্মুখে কাটালোনিয়ার অন্যান্য গণতন্ত্রাধিকৃত নগরগুলিও একে একে আপনাদের অধিকার হারাইতেছে, বিদ্রোহী জাতীয়তাবাদীদের সৈন্যদল ফরাসী সীমান্তে পীরানিজের পার্ব্বত্য প্রদেশের নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে। সামরিক ভাবে গণতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী নেগ্রিন ও তাঁহার মন্ত্রিপরিষদ বার্সিলোনা হইতে ফিগরাসে তাঁহাদের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন—"এই খানে, পীরানিজের এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যেই, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইবে"—২রা ফেব্রুয়ারী, স্পেনীয় আইন সভা কোর্টেজের অধিবেশনে নেগ্রিন এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। আর ৫ই ফেব্রুয়ারীই নেগ্রিন স্বদলে বিমান-যোগে ফিগরাস হইতে মাদ্রিদ যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন, প্রেসিডেণ্ট আজানা প্যারিস-যাত্রার পথে সীমান্তস্থ পিরপীগ্‌নানে চলিলেন, মন্ত্রিসভার অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও সীমান্ত অতিক্রম করিলেন—ফিগরাসও বিদ্রোহীবাহিনীর হস্তে আসিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে বিদ্রোহী উড়ো-জাহাজ সাধারণতন্ত্রীদের কার্টাগোনা বন্দরের যুদ্ধ-জাহাজের উপর, ভিলায়ুগার বিমান-ঘাঁটিতে, ভ্যালেন্‌সিয়ার সামরিক অঞ্চলে এবং জিরোনার রেল-ষ্টেশনে বোমা বর্ষণ করিতেছিল—অতএব, মনে করা যাইতে পারে এক মাদ্রিদ ভিন্ন স্পেনের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সাধারণতন্ত্রী স্পেন-সরকারের অধিকার লোপ পাইতে আর দেরি নাই।

বার্সিলোনা বা সমগ্র কাটালোনিয়া হইতে গণতন্ত্রীদের এই অপসারণ বিস্ময়ের বস্তু নয়—বরং বোমাবিধ্বস্ত বার্সিলোনায় মাসের পর মাস অন্নহীন বস্ত্রহীন, জনসাধারণ যে দুঃখবরণের ও দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামশীলতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ফরাসী সরকার এই সাধারণতন্ত্রীদের যুদ্ধোপকরণ আনয়নের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন না,—যৎসামান্য চোরাই অস্ত্রের উপর ভরসা করিয়াই নেগ্রিনের সরকার যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। অবরুদ্ধ গিরিপথ একেবারে শেষ দিকে যদিই বা খাদ্য-সামগ্রীর জন্য খোলা হইল, তখন বার্সিলোনার দুয়ারে ফ্রাঙ্কো, আহার্য্য পাইলেও গণতন্ত্রীদের আত্মরক্ষার উপায় নাই। অন্য দিকে ইতালীয় স্বেচ্ছাসেবক, ইতালীয় বিমান, ইতালীয় বোমা ফ্রাঙ্কোর নিষ্ঠুর আশা ও পরাশ্রয়ী 'জাতীয়' সরকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে দিনে দিনেই অধিকতর উদ্যোগী হইয়া উঠিল। কারণ, ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ফ্রান্স বা ব্রিটেন আর স্পেনকে স্বতন্ত্র, স্বনির্ভর রাখিবার জন্য জেদ করিতে পারে না. বরং দালাদিয়ে ও চেম্বারলেন সরকার ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয়ভাবে এই গণতন্ত্র-বিনাশের চক্রান্তেই সহায়তা করিয়া চলিল। তাই বলিতে হয়, বার্সিলোনার পরাজয় ফ্রাঙ্কোর নিকটে হয় নাই—হইয়াছে ইউরোপের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন ফাসিস্তদের নিকটে।

স্পেন-যুদ্ধের একটি বড় পরিচ্ছেদ যে কাটালোনিয়ার পতনে শেষ হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই—এবার সে বিদ্রোহের শেষ অধ্যায়টিই হয়ত উদ্‌ঘাটিত হইবে—মধ্য ও দক্ষিণ স্পেনে যেখানে এখনো সাধারণতন্ত্রীদের অধিকার লোপ হইতে বাকী, সেইখানে। কোর্টেজে বক্তৃতাকালে নেগ্রিন এই কথাই জানাইয়াছিলেন :—মধ্য ও দক্ষিণ স্পেনে সহস্র সহস্র স্পেনবাসী আমাদের স্বপক্ষে রহিয়াছে। সেখান হইতে আমাদের সংগ্রাম চলিবে। এই সংগ্রামের শেষ কেন্দ্র হইবে মাদ্রিদ—পাঁচ-পাঁচ বার উহার দুয়ার হইতে বিদ্রোহী-বাহিনী ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এই বার মাদ্রিদ কত দিন আর টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহাই দ্রষ্টব্য। অবশ্য গণতন্ত্রীরা সহায়হীন হইলেও দৃঢ়সঙ্কল্প। নেগ্রিন বলিতেছিলেন "স্পেনে শান্তি হইতে পারে তিন সর্ত্তে—প্রথমতঃ, স্পেনের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, স্পেনবাসীদেরই নিজেদের সরকার স্থির করিবার অধিকার দিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, যুদ্ধশেষে কাহারও উপর কোন প্রতিশোধ লওয়া চলিবে না। কিন্তু আজ ফ্রাঙ্কো শান্তির জন্য বলিবেন একটিমাত্র সর্ত্ত—সমস্ত স্পেনের উপর তাঁহার জাতীয় দলের একনায়কত্ব।

২

কিন্তু স্পেনে বিদ্রোহীদের জয়ে প্রকৃত জয় ফ্রাঙ্কোর নয়, প্রকৃত জয় মুসোলিনীর—এই কথা বহুবারই উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন রোম হইতে বহু আপ্যায়ন লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রমিক ও বিরোধী দলের সমালোচনার উত্তরে তিনি বলিতেছেন—স্বয়ং মুসোলিনী বলিয়াছেন স্পেনে তিনি কোন অধিকার চান না; তাঁহার বিশ্বস্ত পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট চিয়ানো বলিয়াছেন, স্পেনে কোন অংশ দখলের ইচ্ছাই ইতালীর নাই; ইহার পরে আর চেম্বারলেন কেন নিশ্চিন্ত হইবেন না, আর তাঁহার বিপক্ষদলই বা কেন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না? কিন্তু তথাপি আশ্চর্য্য, এই সদুত্তরের পরেও ব্রিটেনের বা জগতের

কোন লোকই চেম্বারলেন সাহেবের কথাটা মানিয়া লইতে চায় না ; আর স্বয়ং চেম্বারলেন সাহেব নিজেও তাহা মনে মনে মানিয়া লন না বলিয়াই ইহারা সকলে বিশ্বাস করে। তাহারা দেখে—মেজর্কায় ইতালীয় যুদ্ধ-বিমানের ঘাঁটি বাঁটি হইয়া বসিয়াছে, স্পেনের বুকে জয়দৃপ্ত সহস্র সহস্র ইতালীয় 'স্বেচ্ছাসেবক' ; আর ভূমধ্যসাগরের চারিদিকে ইতালী আপনার সামরিক শক্তি সুদৃঢ় করিয়া এই সাগরটিকে 'ইতালীয় হ্রদে' পরিণত করিতে এবার বদ্ধপরিকর। স্পেনের উপকূল সেই হিসাবে মুসোলিনীর নিকট অপরিত্যজ্য ; আর সেই কারণেই আবার অপরিত্যজ্য স্পেনভূমিও—এইখান হইতে ঘিরিয়া ধরিলে ভূমধ্যসাগরে তাঁহার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স জলে স্থলে আকাশে ইতালীর নিকট অবনমিত হইয়া পড়িবে—ইতালীর উদ্দেশ্যকে আর বাধা দিতে সাহস করিবে না।

কিন্তু কথাটি নূতন নয়, স্পেন-বিদ্রোহের সূচনা হইতেই এই সম্ভাবনাটি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে ; ইতালী ও জার্মানী যখন ফ্রাঙ্কোকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইল, আর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের "গণতান্ত্রিক" সরকারকে 'নিরপেক্ষতার' ওজুহাতে নিষ্ক্রিয়তা-নীতি অবলম্বনে বাধ্য করিল, তখন হইতে এই সম্ভাবনা কার্য্যে রূপ ধরিতে আরম্ভ করে। ইহারই কয়েকটি প্রধান প্রমাণ জার্মানীর দ্বারা স্পেনের বিদ্রোহী-অধিকৃত দেশের খনিজ সম্পদ আয়ত্তীকরণ, ইতালীর বেলারিক দ্বীপপুঞ্জে ও পীরানিজের পশ্চিমে বিমান-ঘাঁটি নির্ম্মাণ, ও স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা ফ্রাঙ্কোর জয় সাধন ইত্যাদি। কিন্তু স্পেনের ভাগ্য একেবারে স্থিরীকৃত হওয়ার পূর্ব্বেই ইতালী অন্য দিক দিয়াও অগ্রসর হইল, কারণ, তাহার উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার পক্ষে আর তখন বাধা নাই, তখন বিগত অক্টোবরে মিউনিখ সিদ্ধান্তের দ্বারা ইউরোপীয় গণতন্ত্রী সরকারদ্বয় ফাসিস্তদের নিকট আত্মসমর্পণ বা আত্মবিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। ইতালী অনতিবিলম্বেই ঘোষণা করিল, তাহার চাই—"টুনিস, নাইস, কর্সিকা,"—অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরে ফরাসী প্রভাব বিলোপ।

এই সব ফরাসী-অধিকৃত দেশের উপর ইতালীর দাবি কি, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে নৌ-ঘাঁটি হিসাবে ইহাদের সামরিক উপযোগিতা কি, তাহা পূর্ব্বেই দেখা হইয়াছে। জাহাজ-ভর্ত্তি যে ইতালীয় ঔপনিবেশিক-দল টুনিসে নামিয়াছে, ব্যবসা করিয়াছে, বসবাস করিয়াছে,—তাহাদের মধ্যে ইতালীর দূত সিনর বোম্বিয়ারি ক্লাব, হোটেল, সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া বৎসরের পর বৎসর একটা নূতন ইতালীয় জাতীয়তা-বোধ অতি চতুরতার সহিত জ্বালিয়া তুলিয়াছেন,—পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের কুচকাওয়াজ করাইয়া একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পল্টনের উপযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে—এখন তাহারাই হইবে ইতালীর টুনিস অধিকারে একটি প্রধান সহায়স্থল—এই সব কথাও পূর্ব্বেই অল্পবিস্তর বিবৃত হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বুঝিবার কথা শুধু এই যে,—টুনিসের উপর এই দাবি আকস্মিক নয়, উহা বিচ্ছিন্ন একটা কিছু নয়—যে-পরিকল্পনানুযায়ী মুসোলিনী স্পেনে অগ্রসর হন, সে-পরিকল্পনারই একটি অংশ ইতালীর টুনিস প্রভৃতি অধিকারে ও সুয়েজে প্রভাব বিস্তারে সার্থক হইবার কথা। তাই স্পেন হইতে মুসোলিনী সরিয়া আসিবেন,—ভূমধ্যসাগরে এই দিকটিতে নিজের নবলব্ধ অধিকারটুকু পাকা না করিয়া বরং ত্যাগ করিবেন, এই কথা চেম্বারলেনও বিশ্বাস করেন না, পৃথিবীর অন্য কেহও বিশ্বাস করিতে অক্ষম।

অতএব, স্পেনের এই যুদ্ধে যেই যবনিকাপাত হইবে, অমনি ভূমধ্যসাগরের অন্যত্র ইতালীয় সৈন্য ও নৌবহর হানা দিবে। এখনই তাহার উদ্যোগ চলিয়াছে, তখন ভূমধ্যসাগর "ইতালীয় হ্রদে" পরিণত হইবে। কিন্তু কোথায় প্রথম মুসোলিনী হস্তার্পণ করিবেন ?—টুনিসে ? না, নূতন ইতালীয় সাম্রাজ্যের দ্বার পথ, ফরাসী-অধিকৃত রেল-কেন্দ্র জিবুতিতে ? সামরিক কারণে দুইটিরই উপযোগিতা প্রচুর—দুই স্থানেই উভয় পক্ষের সতর্ক দৃষ্টি পড়িয়াছে, সৈন্যসমাবেশও হইতেছে। ফরাসীর মনোভাব দেখিয়া মনে হয়,—তাহারা বিনা যুদ্ধে টুনিস বা জিবুতি হস্তান্তর করিবেন না। ফরাসী সিনেট বলিতেছে—ফরাসী সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ ফরাসী ভূমিরই অখণ্ড অংশ।

এদিকে অন্তত টুনিসের স্থানীয় আরব মুসলমানেরা মুসোলিনীর আবির্ভাব-সম্ভাবনায় পুলকিত হয় নাই—বরং ফরাসীর অবস্থানই তাহারা কামনা করে। কিন্তু ফরাসী জাত আজ ইউরোপীয় রাজনীতির শতরঞ্চ খেলায় দারুণ সঙ্কটে উপনীত। তাহার প্রধান-মন্ত্রী দালাদিয়ে প্রভৃতি অবশ্য ফরাসী অখণ্ডতায়ও বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁহারা রাষ্ট্রনীতিতে ফাসিস্ত প্রভাবান্বিত, এবং শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণকে স্বশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকল্পে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টিত। তাই ইহাদের নায়কত্বে শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্স আপন ঘরে ও অন্যত্র আপন নির্বিঘ্নতা এবং স্বার্থ বাধামুক্ত করিবার নামে, ইতালীকে এই সব স্থান ছাড়িয়া দিয়া একটা 'সুমীমাংসা'ও করিয়া বসিতে পারে। এইরূপ করিবার অন্য আরও কারণও আছে—ফ্রান্স সঙ্গীহীন হইতে পারে। চেম্বারলেন তো ব্রিটেন ও ইতালীর বন্ধুত্ব পাকাই করিতেছেন, কাজেই ফরাসী-ইতালীয় যে-কোন দ্বন্দ্বে ব্রিটেনের সাহায্যলাভ ফরাসীর পক্ষে সহজ হইবে না। অন্য দিকে, জার্মানী তো স্পষ্টতঃ বলিয়াছে, রোম-বার্লিন কেন্দ্ররেখা খুবই গভীর। সম্প্রতি রাইষ্টাগের বক্তৃতায় হিট্‌লার আবার বলিলেন, যুদ্ধকালে ইতালীর পার্শ্বেই জার্মানী দাঁড়াইবে। অতএব, ইতালীর সহিত যুদ্ধে কোন্ সাহসে অগ্রসর হইবে ফ্রান্স ? বাগাড়ম্বর যতই হউক, ফ্রান্স শেষ পর্য্যন্ত হয় টুনিস নয় জিবুতি, এবং হয়ত দুইই, ইতালীর হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। তবে তাহার পূর্ব্বে মিউনিখের মত একটা নাটকের পুনরভিনয় হইতে পারে। অন্ততঃ ভূমধ্যসাগর লইয়া তেমনি একটা খেলা খুবই সম্ভব—রাষ্ট্রনীতিকরা 'মেডিটেরিনিয়ান্ মিউনিখে'র কথা বলিতে সুরু করিয়া দিয়াছেন।

অবশ্য কোন বৃহৎ শক্তিরই এই সব কথা অজানা নয়—জার্মানীর

আশেপাশে যে-সব রাষ্ট্র এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহাদের তো কথাই নাই, কখন প্রাণ যায় ঠিক কি? কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশই বুঝিতেছে, আজ পৃথিবীতে নির্লজ্জ বলের জয় অবিসংবাদিত। তাই সবাই অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ বৃদ্ধি করিতে উন্মাদের মত রাত্রি-দিন প্রয়াস করিতেছে। গত ১৯৩৮ সনে পৃথিবীর সামরিক ব্যয়ের যে হিসাব সম্প্রতি বাহির হইয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে মানুষের মনের উপর কি করাল ছায়া ঘনায়মান।

জেনেভা রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক হইতে জানা যায় যে, ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর দেশগুলি (৬৪টি দেশের হিসাব ধরা হইয়াছে) সমরসজ্জায় প্রায় ৯৫০ কোটি স্বর্ণ ডলার ব্যয় করিয়াছে। ৯৫০ কোটি স্বর্ণ ডলার ৩৪০ কোটি পাউণ্ডের সমান। ভারতীয় মুদ্রায় ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪৭৬০ কোটি টাকা। ১৯৩৭ সালে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৮০০ কোটি স্বর্ণ ডলার, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ১৫০ কোটি স্বর্ণ ডলার ব্যয় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

উপরে যে অঙ্ক দেওয়া হইল, তাহা শুধু স্থলসৈন্য, নৌ-ও বিমান-বহরের জন্য বিভিন্ন দেশ যে ব্যয় করিয়াছে, তাহারই সমষ্টি; আধা-সামরিক কার্য্যে, যথা, সামরিক উদ্দেশ্যে রাস্তা, বিমানঘাঁটি প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যয় ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।

১৯৩২ সালে রণসম্ভার হ্রাস-সম্মেলন হয়। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০৬০ কোটি স্বর্ণ ডলার বা গড়ে বাৎসরিক ৪১০ কোটি স্বর্ণ ডলার, পক্ষান্তরে রণসম্ভার-হ্রাস সম্মে-লনের কাজ শেষ হইবার পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর সামরিক ব্যয়ের মোট পরিমাণ ছিল ৩৩০০ কোটি স্বর্ণ ডলার বা গড়ে বাৎসরিক ৬৫০ কোটি স্বর্ণ ডলার। ১৯৩৩ সাল হইতে সামরিক ব্যয় দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৩ সালে পৃথিবীর সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪৫০ কোটি স্বর্ণ ডলার—ছয় বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে উহা ৯৪০ কোটি স্বর্ণ ডলারে উঠিয়াছে, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে।

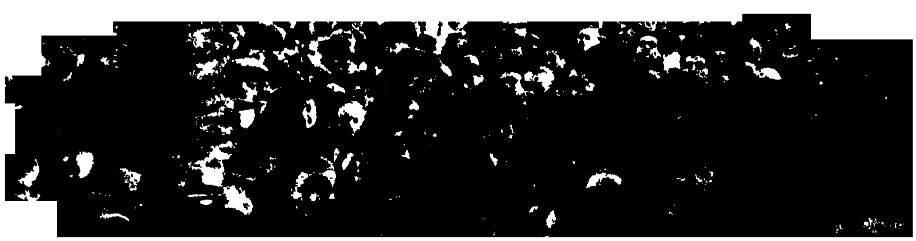
১৯৩৮ সালে যে ৯৪০ কোটি স্বর্ণ ডলার ব্যয় হইয়াছে, ইহা ৬৪টি দেশের সামরিক ব্যয়ের সমষ্টি। ইহার মধ্যে ৭টি বড় বড় শক্তি ৭৪০ কোটি অর্থাৎ পৃথিবীর সমগ্র সামরিক ব্যয়ের শতকরা ৭৮·৭ ভাগ ব্যয় করিয়াছে। ১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে ঐ ৭টি দেশ পৃথিবীর সামরিক ব্যয়ের (তখন ৪২০ কোটি স্বর্ণ ডলার ছিল) শতকরা ৬৬·৭ ভাগ (২৮০ কোটি স্বর্ণ ডলার) ব্যয় করিয়াছিল।

এই দশ বৎসরে সাতটি বড় শক্তি মোট ৪১০০ কোটি স্বর্ণ ডলার ব্যয় করিয়াছে। সুতরাং গত দশ বৎসরে উহারা প্রত্যেকে গড়ে ৫৮০ কোটি স্বর্ণ ডলার ব্যয় করিয়াছে। অবশিষ্ট ৫৭টি দেশ এই দশ বৎসরে মাত্র ১৪৫০ কোটি ডলার বা প্রত্যেকে গড়ে ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়াছে। ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর



মসিয় দালাদিয়েরের টুনিস পরিদর্শন উপলক্ষ্যে আরব গোলন্দাজগণের যাত্রা





মসিয় দালাদিয়েরের টুনিস পরিদর্শন উপলক্ষ্যে সৈন্যপরিদর্শনকালীন জনতা

মোট সামরিক ব্যয়ের শতকরা ৭২'৩ ভাগ (অর্থাৎ মোট ৯৪০ কোটি সুবর্ণ ডলারের মধ্যে ৬৮০ কোটি সুবর্ণ ডলার) ইউরোপের দেশগুলি ব্যয় করিয়াছে।

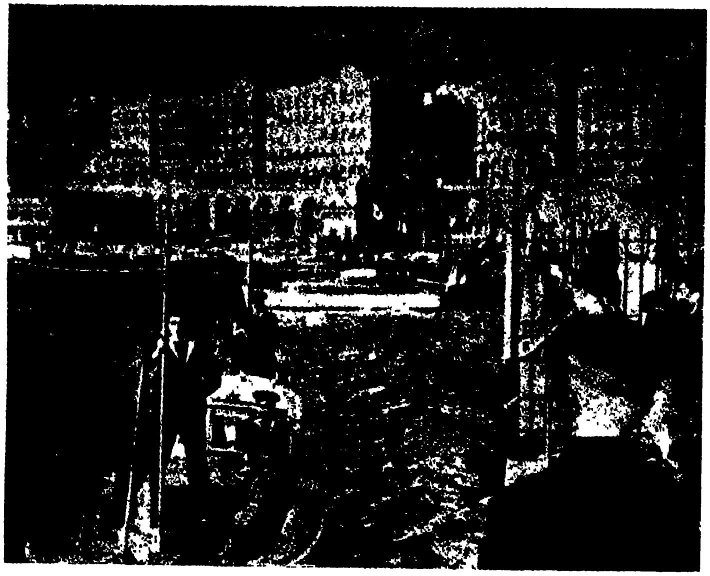
এই যে ৬৪টি দেশের সামরিক ব্যয়ের হিসাব সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত উল্লেখযোগ্য দেশগুলিই পড়ে। ৬৪টির মধ্যে কতকগুলি দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নহে।



মসিয় দালাদিয়েকে ক্যা-র সৈয়দ সাহেব রৌপ্যাধারে জলপাই উপঢৌকন দিতেছেন ও মসিয় দালাদিয়ে ধন্যবাদ সহকারে তাহা গ্রহণ করিতেছেন।

বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংবাদ হইতে বা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সরাসরি সংবাদ আনাইয়া এই হিসাব সঙ্কলিত হইয়াছে।

এ বৎসরের সমরসজ্জার অঙ্ক অবশ্য আরও অনেকগুণ বেশী হইবে। কারণ, মিউনিখের পরে সবাই সে-ব্যয় বাড়াইয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স সচেষ্ট হইয়াছে তাহাদের বিমান-সম্পর্কিত হীনবলতা শেষ করিয়া জার্ম্মানীর মত সবল হওয়ার জন্য। ব্যাপারটা সুসাধ্য নয়—জার্ম্মানীর তুলনায় ইহারা এত পিছনে ও ইহাদের প্রয়াসও এতই বিঘ্ন-ব্যাহত যে ইহাদের সে আশা পূর্ণ হওয়া দুর্ঘট। ফ্রান্স তখন মাসে ৩০ খানার মত যুদ্ধবিমান নির্ম্মাণ করিতে পারে, ব্রিটেন পারিত বহু চেষ্টায় শত দুয়েক; কিন্তু জার্ম্মানীর বিমান-নির্ম্মাণ শক্তি তখন মাসে ৬০০। আজ যখন ব্রিটেন ও ফরাসী এদিকে সমতা-সাধনে অস্থির, ফরাসী বিমান-মন্ত্রী পিয়ের কোৎ হিসাবে, জার্ম্মানী ও ইতালী দুই শক্তিতে মিলিয়া তখন নির্ম্মাণ করিতেছে ইহাদের তিন গুণ বিমান। ইতিমধ্যে আমেরিকাও এই দিকে নিজ অস্ত্রায়োজন ও যুদ্ধ-বিমান বৃদ্ধিতে বদ্ধপর হইয়াছে, কিন্তু জার্ম্মানীও বসিয়া থাকিবে না। ব্রিটেনের আশা যখন মাসে ২৫০।৩০০ শত বিমান, আমেরিকার ৫০০।৬০০ শত, জার্ম্মানীর চেষ্টা তখন মাসে ১০০০ হাজার বিমান। আসলে, মিউনিখের সমকালে যদি জার্ম্মানীকে অস্ত্রবলে আঁটিয়া উঠা দুঃসাধ্য অনুমিত হইয়া থাকে, আজ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা অসাধ্য। চেকোস্লোভাকিয়ার পতনের পর তাহার হাতে আসিয়াছে নূতন ৩ লক্ষ সৈন্য, সেই সীমান্তের সুরক্ষিত বহু দুর্গ ও ঘাঁটি এবং কামান (যাহা নির্ম্মাণ করিতেই লাগিত বৎসর তিন) এবং সর্ব্বোপরি চেকোস্লোভাকিয়ার কয়েকটি প্রসিদ্ধ অস্ত্র-কারখানা। তাই সে বিমান তৈয়ারী বাড়াইতেছে, পশ্চিম-সীমান্তে ফরাসী মাজিনো লাইনের পাল্টা জিগ্‌ফ্রিড লাইন নির্ম্মাণ শেষ করিতেছে, আর ব্রিটেনকে জানাইয়াছে, তাহাদের যে চুক্তিমত ব্রিটেনের সমান ওজনের ডুবো-জাহাজ নির্ম্মাণে সে অধিকারী, তাই সে এবার নির্ম্মাণ করিবে! কথাটায় ব্রিটেনের একটু চমক লাগিয়াছে—ইঙ্গ-জার্ম্মান চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন শতকরা ৩৫ ভাগ ওজনের যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করিবে, তবে ডুবো-জাহাজ নির্ম্মাণ করিবে সাধারণতঃ শতকরা ৪০ ভাগ, প্রয়োজন হইলে অবশ্য ইহা বাড়ানো চলিবে। কি সেই প্রয়োজন যাহাতে আজ জার্ম্মানী ডুবো-জাহাজে ব্রিটেনের সমান হইতে চায়? ব্রিটেন একটু ভাবিতেছে—গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মান ডুবো-জাহাজের উপদ্রবের পর আর এ বিষয়ে তাহার দুর্ভাবনা না জুটিয়া পারে না। সৈন্যবলে বিমানবলে জার্ম্মানী অতুলনীয়, নৌবলেও ব্রিটেনের উত্তর-সাগরস্থ নৌ-বলের সে প্রায় সমকক্ষ,—দুইখানা নূতন 'ক্রুজারও' তাহার তৈয়ারী হইয়াছে। তদুপরি আবার এই ডুবো-জাহাজে সমকক্ষতার দাবি! তাহা হইলে ব্রিটেন দাঁড়াইবে কোথায়? অবশ্য স্মরণ রাখা দরকার, যত দিন ব্রিটেনে বর্ত্তমান মন্ত্রিপরিষদ আছে, তত দিন তাহার সহিত জার্ম্মানীর দ্বন্দ্ব ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই সুদূর।



মসির দালাদিয়ে আলজিয়ার্সে পৌঁছিতেছেন

কিন্তু প্রশ্ন এই, এই খরচ জার্মানী জোগায় কোথা হইতে? বহুদিনই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে—কিন্তু তথাপি নাৎসীরা নিরস্ত হয় নাই, "মাখনের বদলে কামান" তাহাদের প্রায় নীতিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এই সমরসজ্জার তাড়ায় আজ সেই আহার্য্য পেয় জনসাধারণ আরও কম পাইতেছে, সন্দেহ নাই। জার্মানীর যাত্রী রেলগাড়ীগুলি বহু পরিমাণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—সমরোপকরণের মাল টানিতেই রেলগাড়ী আজ বেশী দরকার। এদিকে মালের বদলে মাল বিক্রী করিয়া জার্মানী যে পুরাতন ব্যবসা-নিয়ম পুনঃপ্রচলিত করিয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র সে প্রসার করিতে সচেষ্ট। বল্‌কান দেশগুলিতে হের ফুঙ্ক এই নিয়মে অনেকাংশে জার্মান বাণিজ্য প্রসারে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু হের শাখ্‌টের অনুরূপ দৌত্য ব্রিটেনে বেশী সার্থক হয় নাই। ডাক্তার শাখ্‌ট্‌ রাইস্‌ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট, অর্থনৈতিক জগতে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন,—কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নাৎসীদের জোর-জবরদস্তি খাটানো নাকি তাঁহার মতেও ছিল আপত্তিকর—তিনি সাবধানে পা ফেলিতে চাহিতেন, তাই, অকস্মাৎ এক দিন ১৮ই জানুয়ারি, হিট্‌লার হের শাখ্‌ট্‌কে রাইস্‌ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট পদ হইতে বিদায় দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত হইল তাঁহার সহযোগীরা। সেখানে কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন হের ফন ফুঙ্ক ও তাহার মতাবলম্বীরা। অবশ্য শাখ্‌টের ভাগ্যে প্রশংসা জুটিল প্রচুর; কিন্তু পৃথিবীতে সকলেই বিস্ময় মানিল। কারণ, নূতন জার্মানীর আর্থিক জীবন এই ঐন্দ্রজালিকের রচনা—কেহই তাহা অস্বীকার করে না। কিন্তু গোয়েরিং 'চতুর্বার্ষিক সঙ্কল্প' জার্মান ব্যবসাকে ও সমর-সজ্জাকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিল। ফুঙ্ক হইলেন এই সূত্রনায়ক। শাখ্‌ট্‌ না কি ব্যবসাপত্রকে একটা নাৎসী প্রয়োজনের বশ করিয়া চালনা সুবিধার মনে করিতেন না, অন্তত ব্যাঙ্ক ও টাকাকড়িকে তিনি তেমনি তর ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য খাটানো যায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। তাই, নাৎসী-দেবতার অভিশাপে রাইস্‌ব্যাঙ্কের এই যক্ষাধ্যক্ষ এবার বিদায় লইলেন।

এই ব্যাপারটির গুরুত্ব এইখানে যে, এখন হইতে রাইস্‌ব্যাঙ্ক ও জার্মান ব্যবসাপত্র, সমস্তই সেই "সামূর্দ্দিক" (টোটালিটেরিয়ান্‌) একনায়কত্বের রাষ্ট্রে স্থাপিত হইবে যুদ্ধ-নিয়োজিত রাষ্ট্রের উপযুক্ত করিয়া—যেন জার্মানী যুদ্ধেই নিযুক্ত! নাৎসী অর্থনীতি একটা ছেদহীন আপদ্ধর্ম্ম-স্বরূপ।

কিন্তু এভাবে কত দিন চলিবে জার্মানী? হিট্‌লার রাইষ্টাগে বলিয়াছেন: "অর্থনীতিজ্ঞরা যখন বলেন মজুত সোনার উপর নির্ভর করে দেশের মুদ্রার মূল্য, আমরা তখন হাসি। আমরা মনে করি, জার্মান মার্কের মূল্য নির্ভর করে জার্মান শ্রমিকের শক্তির উপর, তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ ও পরিমাণের উপর।" কিন্তু জার্মান শ্রমিকের সেই শক্তি নির্ভর করে কিসের উপর? যত দিন কোন একটা প্রচণ্ড বহিঃশত্রুর আঘাতে বা ভিতরের বহুদিনপুষ্ট অভাবের তাড়নায় নাৎসী-ভিত্তি টলিয়া না পড়ে তত দিন নাৎসী-মোহ ও নাৎসী-মাদকতা ভাঙিয়া যাইবে না, জার্মান শ্রমিক মাখনের বদলে কামান লইয়াও তৃপ্ত থাকিবে।

৬

শ্রমিক ও জনসাধারণ যে এখনও কোনরূপ একটা মোহে কত

দূর পর্য্যন্ত আত্মনিগ্রহ ভোগ করিতে পারে ও আত্মোৎসর্গ করিতে স্বীকৃত হয়, তাহার অন্ত প্রমাণ মিলে জাপানে। এই এতদিনব্যাপী যুদ্ধে জাপানের অর্থনৈতিক জীবনে যে কি দুর্দ্দশা ঘটিতেছে তাহা ভাবিলে চমকিত হইতে হয়, কিন্তু এখনও অসন্তোষ তেমন ফুটিয়া উঠিতেছে না। অথচ, এই সম্ভাবনার উপরই বেশী নির্ভর করে আজ চীনের ভাগ্য। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যদি প্রতিরোধ চালানো যায়, তাহা হইলে জাপান আর্থিক তাড়নায় ভাঙিয়া পড়িবে, ইহাই অন্ততঃ চিয়াং-কাই-শেকের পক্ষীয়দের আশা। তাই জাপানের নিকট সন্ধিভিক্ষায় তাহারা অস্বীকৃত। এদিকে জাপানও নিজ ব্যবসাপত্রকে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় সুনিবদ্ধ করিয়া লইতেছে আর পূর্ব্ব-এশিয়ায় এক নূতন নিয়ম ঘোষণা করিতেছে। ভূতপূর্ব্ব-প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে শক্তিপুঞ্জকে জানান যে, জাপান চীন ও মাঞ্চুকুতে পূর্ব্ব-এশিয়ায় এক নূতন তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে, কম্যুনিজমের হইবে তাহা শত্রু, আর তিন রাষ্ট্রের পরস্পরের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা হইবে ইহার বন্ধন—এশিয়া-বহির্ভূত জাতিদের তাহারা অবশ্য পর বলিয়াই জ্ঞান করিবে। এই নীতির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে, প্রধানতঃ ব্রিটেনের চেষ্টায়, যে 'মুক্তদ্বার" নীতি চীনা বাণিজ্যে সর্ব্বস্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, যাহা অনুসরণ করিয়া জাপানও ওয়াশিংটনের সন্ধিতে স্বীকার করিয়াছে যে, চীনে সকল জাতির জন্যই বাণিজ্য-দ্বার মুক্ত থাকিবে—এইবার জাপান তাহা আর মানিবে না। কার্য্যতঃ অবশ্য ওয়াশিংটন-সন্ধি জাপান অনেক দিনই নাকচ করিয়া দিয়াছে—উহা অবজ্ঞা করিয়াই 'অখণ্ড চীন' হইতে জাপান মাঞ্চুকু রাজ্য ছিনাইয়া লইয়াছে, বর্ত্তমানে বহু খণ্ডে চীনকে ভাগ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, আবার, কার্য্যতঃ এই মাঞ্চুকু ও চীনের অধিকৃত অঞ্চল হইতে জাপানীরা ইতিপূর্ব্বেই বিদেশীয়দের ব্যবসাপত্র অচল করিয়া নিজেরা একচেটিয়া করিয়া লইতেছিল। তথাপি এত দিন মুখে তাহারা বলিত যে, তাহারা শুধু কুয়োমিংতাংকে শাস্তি দিতে চায়, চীনকে দখল করিতে চায় না; আর চীনে বিদেশীয়দের যে বাণিজ্যাধিকার আছে তাহাও লোপ করিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ যাহা হইতেছে এবার কাগজে পত্রেও জাপান তাহা দাবি করিয়া বসিয়াছে। অবশ্য, ব্রিটেন এই দাবি মানে নাই এবং যুক্তরাষ্ট্র এই দাবিকে একটু কড়া ভাষায়ই অস্বীকার করিয়াছে—চীনের বাণিজ্যদ্বার তাহারা অবরুদ্ধ হইতে দিবে না। এদিকে রাজধানী চুংকিং-এ যতই বোমা পড়ুক, চীনা যুদ্ধ শেষ হয় নাই—ব্রহ্মের পথে কিছু কিছু শস্ত্রশস্ত্রও চীনারা পাইতেছে, সোভিয়েট হইতেও তাহা আমদানী হইতেছে। এমন কি সম্প্রতি ৫ লক্ষ পাউণ্ড ধারও ব্রিটেনের কাছ



ফ্রান্সের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। ১০০ ফুট মাটির নীচে, সুবিখ্যাত 'মাজিনো' দুর্গব্যূহের দৃশ্য।

হইতে চীন পাইল, আমেরিকার কাছ হইতেও পাইল ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ। ওদিকে পশ্চিম-প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকা আবার একটা বিমান-নৌ-ঘাঁটি বসাইতেছে। তাহা ছাড়া মাঞ্চুকু-সোভিয়েট সীমান্তে আবার একটা খণ্ড-মারামারিও বাধিয়াছিল। মোটের উপর মনে হয়, চীনের দিকে ব্রিটেন ও আমেরিকার সহানুভূতি সামান্য একটু সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। আবার যদি সোভিয়েট সীমান্তে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে রাজনীতি যে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহা বলা দুঃসাধ্য—রোম-বার্লিন-টোকিও কেন্দ্ররেখার ভয়ে হয়ত ব্রিটেনের ও আমেরিকার সহানুভূতি অস্পষ্ট হইয়াই থাকিবে. হয়ত সোভিয়েটও সহজে আপনার ভাগ্যনির্ণয়ে অগ্রসর হইবে না—চীন আপনার বোঝা আপনি বহিয়া চলিবে, যত দিন বোঝার ভারে সে ভাঙিয়া না পড়ে।

এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই চীনের সমৃদ্ধ দেশগুলি আজ জাপানের করায়ত্ত। ইহাও ঠিক—যুদ্ধে চীনের পরাজয় অনিবার্য্য। প্রশ্ন শুধু এই—চীনের মত মহাদেশ জয় করিলেই কি তাহা জাপান শাসন করিয়া উঠিতে পারিবে? এইটুকুই আজ তার শেষ আশা।

—

উদ্যোগী ও কৃতী বাঙালী যুবক

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯২৪ সালে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিছুকাল রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর গামী জাহাজের চিকিৎসকরূপে কার্য্য করিয়া কানপুরে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে চক্ষুচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী হইবার জন্য ইনি বিলাতে গিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি ডি. ও. এম-এস্, (লণ্ডন) ও ডি. ও. (অক্সফোর্ড) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ডি. ও. পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে নানারূপ অবস্থাবৈগুণ্যের মধ্যে ইনি বিশেষ স্বাবলম্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু গুপ্ত ১৯৩৬ সালে পাটনা মেডিকেল কলেজ হইতে এম. বি., বি. এস. পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ



ডাঃ বিমলেন্দু গুপ্ত



ডাঃ প্রবোধচন্দ্র সেন



শ্রীযুক্ত পি. সি. সেন



শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়

হইয়াছিলেন। ঐ পরীক্ষায় অ্যানাটমি, ফার্মাকোলজি ও প্যাথলজিতে তিনি অনার্স ও বৃত্তি পান। ফার্মাকোলজিতে তৎপূর্ব্বে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ অনার্স পান নাই। মেডিসিন ও সার্জ্জারিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক তিনি পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি. উপাধি লাভ করিয়াছেন।

কানপুরের মাথুর ও মজুর কোম্পানীর রাসায়নিক শ্রীযুক্ত পি সি সেন হাইড্রোজেন পারক্সাইড বহুল পরিমাণে প্রস্তুতির একটি প্রণালী আবিষ্কার করিয়া এদেশে উহা প্রস্তুতের ও ব্যবসায়ের পথ বিশেষ সুগম করিয়াছেন।

লোকান্তরে দানশীলা মহিলা

ঢাকা জেলার পুবাইলের জমিদার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী সরোজিনী দেবীর কিছুদিন পূর্ব্বে লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তিনি সাতিশয় দানশীলা রমণী ছিলেন ও গ্রামে একটি স্থায়ী অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।



সরোজিনী দেবী

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় বেদান্তভূষণ ভাগবতরত্ন

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় বহু উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা ও শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপনা করিয়া ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। বিগত পৌষসংক্রান্তি দিবসে ইঁহার বন্ধু ও অনুরাগীবৃন্দ কলিকাতা সিনেট হলে ইঁহার সপ্তসপ্ততিতম জন্মোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন ও তাঁহাকে একটি মানপত্র ও টাকার তোড়া উপহার দিয়াছেন। বাসন্তীগীতা, ধ্যানযোগ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থও ইনি রচনা করিয়াছেন।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বিলের ধারে

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮শ ভাগ ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৪৫ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতির্বিরা বলে
সবিতার আত্মদান যজ্ঞের হোমাগ্নি বেদীতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দির-মণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।
কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন,
কিন্তু কেন।

তার পরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্য-জগতে
ভেসে চলে সুখদুঃখ কল্পনা ভাবনা কত পথে।
কোথাও বা জ্বলে ওঠে জীবন-উৎসাহ,
কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ
নিভে আসে নিঃস্বতার ভস্ম অবশেষে।
নির্ঝর ঝরিছে দেশে দেশে
লক্ষ্যহীন প্রাণস্রোত মৃত্যুর গহ্বরে ঢালে মহী
বাসনার বেদনার অজস্র বুদ্বুদপুঞ্জ বহি'।
কে তার হিসাব রাখে লিখি।
নিত্য নিত্য এমনি কি
অফুরান আত্মহত্যা মানব-সৃষ্টির
নিরন্তর প্রলয়বৃষ্টির
অশ্রান্ত প্লাবনে।
নিরর্থক হরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন,—
কিন্তু কেন।

প্রথম বয়সে কবে ভাবনার কী আঘাত লেগে
এ প্রশ্নই মনে উঠেছিল জেগে—
শুধায়েছি এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে প্রতি দণ্ডে পলে
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের উল্লোল গর্জন
ঝটিকার মন্দ্রস্বন,
দিবস-রজনী
বেদনাবীণার তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকারধ্বনি,
পূর্ণ করি' ঋতুর উৎসব
জীবনের মরণের নিত্য কলরব,
আলোকের নিঃশব্দ চরণপাত

নিয়ত স্পন্দিত করি' দ্যুলোকের অন্তহীন রাত।
কল্পনায় দেখেছিনু প্রতিধ্বনি মণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-কন্দর মাঝে।
সেথা বাঁধে বাসা
চতুর্দিক হতে আসি' জগতের পাখা-মেলা ভাষা।
সেথা হতে পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি'
সৃষ্টির আরম্ভ বীজ লয় ভরি' ভরি'
আপনার পক্ষপুটে প্রতিধ্বনি।
অনুভব করেছি তখনি
বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি' পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।
প্রশ্ন মনে আসে আর বার
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার,
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন।
কিন্তু কেন।

১২।১০।৩৮
শান্তিনিকেতন

পত্রালাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

ডাক্তার অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

সুরের বোঝাই ভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল। নটনটীরা যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে চলে গেল কলকাতায়। দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত। আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ, কেননা সে নির্বস্তুক (abstract)। বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চলতি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাই নে তার মূল্যের আদর্শ। ঐতিহাসিক এক-একটা অপঘাতে সাহিত্য-সেতারের কানে মোচড় লাগায়, জানি নে কোন্ নতুন সুরের প্রতি লক্ষ্য ক'রে বেসুরের মাত্রা চড়তে থাকে, কেউবা বলে পৌঁছেছে সুরে, কেউ বা বলে পৌঁছবে। এত দিন যে ধুয়ো বেঁধে গান সাধা চলছিল তার অভ্যাস বদলে যাচ্ছে। ধুয়ো সুরকে বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস রক্ষা করাটাই অবজ্ঞার বিষয় হয়েছে। পৃথিবীর জমিটা স্থির আছে ব'লেই তার উপরে আমরা নানা প্রকার ঘর-বাড়ী বানিয়ে এসেছি। যে কারণেই হোক সেই পৃথিবীটা ভূমিকম্পের পৃথিবী হয়ে উঠল, মনোলোকের অবচেতন স্তরে যে আগুন চাপা ছিল সে হয়েছে চঞ্চল, আগেকার নিয়মে পাকা ইমারত বানানো চলবে না, মিস্ত্রি-মহলে এই রকম একটা রব উঠেছে। এখন যে জিনিসটা বানানো হবে সেটা হবে টলমলে বাঁকাচোরা সুষমাহারা, পাঁকে পাথরে সব কিছু মিশিয়ে যাবে তার মধ্যে। সাজানো কিছুর উপরে শ্রদ্ধা নেই—কেননা মনের ভূগর্ভে স্তরগুলো ভেঙে চুরে উলটে-পালটে গেছে। অন্তত মানবলোকের কোনো এক জায়গায় কোনো এক দল ভূতত্ত্ববিদ্ এই রকমের হিসেব করেছেন। এই নাড়া-খাওয়া অব্যবস্থা এখনো তো অনুভব করছি নে—আমাদের পাড়ায় করবার কোনো সাংঘাতিক কারণ ঘটে নি। কিন্তু এ মুল্লুকে যাঁরা কাঁপনলাগা পায়ের ছাঁদে পায়তাড়া শুরু করেছেন—তাঁদের দেখে মনে ভাবনা লাগে—ভালো বুঝতে পারি নে। না-বুঝতে পারার কারণ এই যে, অস্থির ইতিহাসের এলেকায় যে চালটার উদ্ভব নকল অস্থিরতার সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। তার তুলনায় এ নিতান্ত খেলা ব'লে ঠেকে। সেখানে ধ্রুবের প্রতি বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে একটা বাণীর প্রয়াস আছে, সেটা ক্রমশ ফুটতে ফুটতে হয়তো একটা নূতন সুরের ধ্রুবপদে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু অন্যত্র যেটা দেখি সেটার অনেকখানিই চাল, তার চলন গিয়ে ঠোকর খায় সংকীর্ণ সীমায়। কান পেতে থাকি, জিজ্ঞাসা করি এরা কী শোনাতে চায়—কানে আসে গোলমাল, নতুন ফ্যাশানের কলরব। গোলমাল করার চেয়ে সহজ কিছু নেই—যদি সবটাই হয় গোল, মাল কিছুই না থাকে। কোনো এক দেশের ভাঙনের যুগের ব্যাকুলতা যে কাকুতি জাগিয়ে তোলে, তার উদ্যগ্র ভাষা অনেকখানি হয়তো বোঝা কঠিন, কিন্তু বোঝাবার একটা কোনো বিষয় তার ভিতরে আলোড়িত হয়, তার অন্তর থেকে বাণীর ইঙ্গিত ফেনায়িত হয়ে উঠতে থাকে—সে ইঙ্গিত আপন মত্ততায় ব্যাকরণেরও বাঁধা নিয়ম ভাঙে। বস্তুত সেই ভাঙাচোরার উচ্ছৃঙ্খলতাই তার ইডিয়মরূপে কাজ করে। যেখানে বলবার উদ্বেগেই বলবার বেড়া ভাঙতে থাকে সেখানে বেড়া ভেঙেছে ব'লেই হয়তো রাস্তার নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে অন্তর্গূঢ় আবেগে বলবার কোনো তাড়া নেই কেবল বেড়া ভাঙবারই উৎসাহ আছে সেখানে মনে সন্দেহ জাগে।

পাশ্চাত্য জগতে যখন মানুষের মনের মধ্যে কোনো একটা চাঞ্চল্য জাগে তখন ঝড় যেমন অরণ্যের গাছপালার

মধ্যে কোলাহল তোলে। সেইরকম সেখানকার পুঁথি-পাড়ায় জাগায় মুখরতা। অত্যন্ত ঘন সেখানকার পুঁথির ভিড়। তাই হাওয়া জোরে বইলে এক পুঁথি থেকে আর এক পুঁথিতে তোলপাড় সঞ্চারিত হ'তে থাকে—তৈরি হয়ে ওঠে পুঁথির কোলাহল। সেই এক-এক হাওয়ার কলগর্জন এক-একটা পুঁথিগত নাম পায়—সেই নামের বন্ধনে দল বাঁধা হয়। সভ্যতা জিনিসটাই জনতা, এই জন্য সভ্যদেশে এই রকম উপসর্গ সর্বদা দেখতে পাই।

আমি যখন জন্মেছিলুম তখন এদেশে নব সভ্যতার ভিড় জমেনি। তাই চারিদিকে সারি সারি পুঁথির বেড়া ছিল না। মানুষের বেষ্টন নিষ্ঠুর ক'রে আমাকে ঘিরেছিল—প্রহরীরা ছিল যাকে বলে প্রিমিটিভ, আদিম জাতীয়, আমার সব নিরক্ষর শাসনকর্তা। সেই বেষ্টনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিত পুকুরের জলে বটের ছায়া, আর পাতিহাঁসের সাঁতার কাটা; দক্ষিণ পাড়িতে খাড়া ছিল সারি সারি নারকেল গাছ, নীল আকাশের নিচে কী নিবিড় সঙ্গ পেয়েছিলুম কাউকে বোঝাতে পারব না। অত্যন্ত খুশি হয়েছিলুম; কিন্তু সেই খুশি হওয়া সম্বন্ধে যুগধর্মের কোনো বিশেষ বিধান ছিল না। হয়তো সাইকো- এনালিসিসের কোনো এক কোঠায় তার কোনো বিশেষ এক আখ্যা থাকতে পারে, সনাতন কিংবা আধুনিক, কিন্তু সে-কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে কোনো পুঁথি-প্রবীণ ছিল না আমার কানের কাছে। পুঁথির কারখানাঘরে সর্বদা যেখানে ছাঁচ তৈরি হচ্ছে, ছাঁচ বদল হচ্ছে, মাপকাঠি হাতে সাহিত্যিক ইন্‌স্পেক্টর নোটবই পকেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে-দেশ ছিল বহু দূরে, দিগন্তের পরপারে। সেইজন্যে ভাষা বানিয়েছি আপন মন নিয়ে, ছন্দ বানিয়েছি যা খুশি তাই। মানুষকে ভালো বেসেছি মর্মান্তিক তীব্রতার সঙ্গে। সেই সংবেগ ঠেলা দিয়েছে পালের হাওয়ার মতো কল্পনার তরীতে, কখনো এ বাঁকে কখনো ও বাঁকে, কিন্তু পুঁথিলোকের আইনের সীমানা থেকে দূরে। তাই নিয়ে তখনকার বিধানকর্তারা হেসেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যাও ছিল অল্প, তাদের অট্টহাস্যের জোরও ছিল কম। তখনকার সাহিত্যরাজ্যে রাজস্ব পদার্থটা ছিল খুব হালকা। এক দল লোক পিঠ চাপড়ে বলেছে বাহবা, সেটা আকস্মিক, সেটা মুখ্য কথা নয়; সম্পূর্ণ আমার নিজের গরজে লিখছি, কোনো বারোয়ারি বাহবা এই কথাটাকে ছাড়িয়ে ওঠবার মত জোর পায় নি—নিন্দেও ছিল নিতান্ত ভ্যালসা। জোর ফরমাস ছিল না, লেখার আনন্দ ছিল ডুব-সাঁতারের আনন্দ; ডাঙা থেকে মুরুব্বির দল ঘন ঘন সাবাস ব'লে ওঠে নি। তার ফল হয়েছে কী এবং তার মূল্য কতখানি, হয়তো এখনো তা নিশ্চিত বলবার সময় হয় নি। যেটা আমার ভালো লেগেছে সেটা নিশ্চিত ভালোই এই বিশ্বাসের পরে জোরে সাবল মারবার কোনো ধাক্কা তখন ছিল না; এই আত্মপ্রত্যয় ছাড়া আর কোনো ধ্রুব আদর্শ যে আছে এখনো তার প্রমাণ হয়নি। কেমন ক'রে হবে। আজ দেখতে পাচ্ছি এবেলায় যাঁরা সমজদার সেজে আইন জারি করে বেড়াচ্ছেন ওবেলায় তাঁদের তকমা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটুকু বুঝেছি এই পুঁথিপাড়ার বাজার-দর হিসেব ক'রে যাঁরা নতুন খাতা খুলে কারবার ফেঁদেছেন তাঁদের অদৃষ্ট চলেছে চোখে ঠুলি দিয়ে।

এই শীতের দুপুর বেলায় সামনের জানলা খুলে মুকুলে ভরা ঐ আমবাগানের দিকে চেয়ে প্রায়ই ভাবি—জন্মেছি এই পৃথিবীতে, খুব খুশি হয়েছি—প্রকাশ করেছি নিজেকে আপনা হ'তে নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে, তাতে যশগুল করেছে—বাস্ এইখানেই থামা যাক—আর তো কিছু দরকার নেই—পালা তো শেষ হবেই—তারও পরেকার প্যালার হিসেব কল্পনা করতে চযমা আঁটে ভিতরকার একটা লোভী পাগল—তার সেই হিসেবের উপরে আজ আর আস্থা নেই। এতদিন যেমন যেমন খুশি হয়েছি সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সংস্কার জন্মেছে খুশি করবারও জোগান বুঝি হাতে হাতে দিয়ে গেলুম। সেটা স্থায়ী সত্য না হবারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু কেই বা স্থায়ী, কীই বা স্থায়ী। অনিশ্চিত দখলের দাবি নিয়ে তবে এত তীব্র ঝগড়া কেন, রাগারাগি কী জন্যে, লোভই বা কিসের। মরীচিকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে আদালতে নালিশ?

এই টলমলে অবস্থায় এখনকার মতো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের—গান আর ছবি। এ পাড়ায়

এদের উপরে বাজারের বস্তাবন্দীর ছাপ পড়ে নি। যদিও আমার গান নিয়ে বচসার অন্ত নেই তবু সেটা আমার মনকে নাড়া লাগায় না। তার একটা কারণ সুরের সমগ্রতা নিয়ে কাটাছেঁড়া করা চলে না। মনের মধ্যে ওর যে প্রেরণা সে ব্যাখ্যার অতীত। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নিয়ে যে-সব যাচনদারেরা গানের আঙ্গিক বিচার করেন কোনো দিন সেই সব গানের মহাজনদের ওস্তাদিকে আমি আমল দিই নি;—এ সম্বন্ধে জাতখোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ ব'লে মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষভাবে গানের বিভাগে। গানে আমার পাণ্ডিত্য নেই এ কথা আমার নিতান্ত জানা; তার চেয়ে বেশি জানা গানের ভিতর দিয়ে অব্যবহিত আনন্দের সহজ বোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের করক্ষেপ আমাকে একটুও নাড়াতে পারে নি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্ধিত আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে। বচনের অতীত ব'লেই গানের অনির্বচনীয়তা আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করতে পারে যদি তার মধ্যে থাকে আইনের চেয়ে বড়ো আইন। গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে, তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌঁছয়। এই যে জাগরণের কথা বলছি তার মানে এ নয় যে সে একটা মস্ত কোনো অপূর্ব সৃষ্টিসহযোগে। হয়তো দেখা যাবে সে একটা সামান্য কিছু—কিন্তু আমার কাছে তার সত্য তার তৎসাময়িক অকৃত্রিম বেদনার বেগে। কিছু দিন পরে তার তেজ কমে যেতে পারে, কিন্তু যে মানুষ সম্ভোগ করেছে তার তাতে কিছু আসে যায় না যদি না সে অন্যের কাছে বকশিশের বাঁধা বরাদ্দ দাবি করে। নতুন রচনার আনন্দ আমি পদে পদে ভুলি, গাছ যেমন ভোলে তার ফুল ফোটানো। সেইজন্যে অন্যেরা যখন ভোলে সে আমি টেরও পাই নে। যে ছন্দ-উৎস বেয়ে অনাদিকাল ধরে ঝরছে রূপের ঝরণা তারই যে-কোনো একটা ধারা এসে যখন চেতনায় আবর্তিত হয়ে ওঠে এমন কি ক্ষণকালের জন্যেও, তখন তার জাদুতে কিছু-না রূপ ধরে কিছু-একটার, সেই জাদুর স্পর্শ লাগে কল্পনায়—যেন ইন্দ্রলোকের থেকে বাহবা এসে পৌঁছয় আমার মর্ত্য-সীমানায়—সেই দেবতাদের উৎসাহ পাই যে-দেবতারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। হয়তো সেই মুহূর্তে তাঁরা কড়ি মূল্য দেন, কিন্তু সে স্বর্গীয় কড়ি।

এই যা সব বকছি তা এখনকার হিসাবে শোনাচ্ছে অত্যন্ত অবাস্তব—বিশেষত এর মধ্যে রূপক এবং ভাষার অলংকার এসে পড়ছে। ওটা আমার মজ্জাগত অভ্যাস। পারো যদি ও-সব বাদ দিয়ে পোড়ো। আর একটু স্পষ্ট ক'রে বলি। গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা, তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে, সীমান্তরে, প্রাত্যহিকের করস্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না। আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরি করেছি, ভৈরবী রাগিণীতে—

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা

হে গরবিনী।

এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারংবার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে, এই বারংবারের অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলংকার। এই দূরবিলাসী গাইয়েটাকে অবাস্তবের নেশাখোর ব'লে যদি অবজ্ঞা করো, এই গরবিনীকে যদি দোক্তা খেয়ে পানের পিক ফেলতে দেখলে তবেই তাকে সাঁচ্চা ব'লে মেনে নিতে পারো, তবে তা নিয়ে তর্ক করব না; সৃষ্টিক্ষেত্রে তারো একটা জায়গা আছে, কিন্তু সেই জায়গা-দখলের দলিল দেখিয়ে আমার সুরলোকের গরবিনীকে উচ্ছেদ করতে এলে আমি পেয়াদাকে বলব ওকে তাড়িয়ে তো কোনো লাভ নেই কেননা আঁচলে-পানের-পিকের-ছোপ-লাগা মেয়েটা জায়গা পেতে পারে এমন কোনো ঘোর আধুনিক ভৈরবী রাগিণী হাল আমলের কোনো তানসেনের হাতে আজো তৈরি হয় নি। কথার হাটে হ'তে পারে কিন্তু সুরের সভায় নয়। এই সুরে যে চিরদূরত্ব সৃষ্টি করে সে অমর্ত্য লোকের দূরত্ব, তাকে অবাস্তব ব'লে অবজ্ঞা করলে বাস্তবীকে আমরা তাঁদের অধিকার স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিয়ে যাব, এবং গির্জেতে গিয়ে প্রার্থনা করব ত্রাণকর্তা এদের যেন মুক্তি দেন।

গানে আমি রচনা করেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ ভালোমন্দ। তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়। কিন্তু এগুলোকে পুলিস-কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি—গানে তার বাধা দিয়েছে—তার চারদিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারে নি যা-কিছু অবান্তর যা অসংলগ্ন, যা অনাহূত আকস্মিক। অথচ জগতে সব কিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন, অর্থহীন, আবর্জনা; তাদেরই সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা, এমন বেআইনী বিধি মানতে মনে বাধছে। অন্তত গানে এ-কথা ভাবতেই পারি নে। আজকালকার য়ুরোপে হয়তো সুরের ঘাড়ে বেসুর চড়ে ব'সে ভূতের নৃত্য বাধিয়েছে। আমাদের আসরে এখনো এই ভূতে-পাওয়া অবস্থা পৌঁছয় নি—কেননা আমাদের পাঠশালায় য়ুরোপীয় গানের চর্চা নেই। নইলে এতদিনে বাংলায় নকল বেতালের দল কানে তালা ধরিয়ে দিতে কসুর করত না।

যাই হোক যখন বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালা আমাকে তাড়া করে তখন আমার পালাবার জায়গা আছে আমার গান। একেই হয়তো এখনকার সাইকলজি বলে এস্‌কেপিজ়ম্। আর আছে আমার ছবি; কোথা থেকে দেখা দিতে এসেছে এই শেষবেলায়, যখন রোদ্দুর পড়ে এল। আমার এই রেখানাট্যের নটী আর-কারো চোখে ধরা দেয় কিনা তার সঠিক খবর পাই নে। ইংলণ্ড থেকে দুই-একটা প্রেস নোটিস্ বেরিয়েছে—নিন্দে করে নি—দুই-একটাতে আছে পেটভরা রকমের প্রশংসা। প্যারিসে একদা এর চেয়ে অনেক বেশি উঁচুগলায় বলেছিল বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু এই প্রশংসা আমার মনকে আঁকড়ে ধরে নি, মুক্ত আছে মন। আমার ছবির প্রশংসা টেঁকসই কিনা সে তর্ক বাজারে ওঠে নি, আমার মনেও না। আমার চৈতন্য-অন্তঃপুরে রেখারূপের জাদুনর্তকীরা এক দিন পর্দানশীন ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমার কাছে এই অদ্ভুত প্রকাশলীলার আনন্দই যথেষ্ট। ত্রিপুরার পরলোকগত রাধাকিশোর মাণিক্যকে গবর্মেণ্ট যখন প্রথম মহারাজ উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি বলেছিলেন, আমি তো আমার আপন প্রজার কাছে মহারাজাই, আমার এ পদ চিরস্থায়ী; কিন্তু সরকার বাহাদুর যে উপাধি দেবেন, সে তাঁরা দিতেও পারেন আবার কেড়ে নিতেও পারেন,—কীই বা তার দাম! আমার ছবির খ্যাতি সম্বন্ধেও সেই কথা। তার গায়ে ছাপ লাগায় যে-মানুষ, ছাপ মোছেও সে। তার চেয়ে অখ্যাতির গৌরবে আছে সে ভালো—আমিই তাকে মাঝে মাঝে দিচ্ছি বাহবা।

এতক্ষণ যা বললুম এ'কে সাইকলজির কোন্ ছাপে লাঞ্ছিত করবে জানি নে। হয়তো বলবে শুদ্ধ অহংকারের বৈরাগ্য। আমাকে জিজ্ঞাসা করো, আমি বলব আমার এই জন্মটা আপন অভিজ্ঞতার প্রান্তসীমায় এসে আজ আবার নতুন হ'তে চায়, সংশয়ের পুরাতন বলি-পড়া বাকল খসিয়ে ফেলতে তার শখ গিয়েছে। আসুক নববসন্ত, বাইরে নয়, অন্তরের গভীরে। ইতি ১৪।২।৩৯



বাতের মহৌষধ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

শ্বশুরের চিঠি আসিয়াছে—

বাবাজি, নিত্য আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তদনুযায়ী ইহার সহিত অপর একখানি কাগজে তোমার বন্ধুর "বাত-শক্তিশেল"-এর জন্য প্রশংসা-পত্র পাঠাইতেছি ; কিন্তু···

জামাতা চিঠি ছাড়িয়া আগে প্রশংসাপত্রটাই তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিল। লেখা আছে—

আজ আট বৎসর যাবৎ উগ্র রকম বাতে আক্রান্ত হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছিলাম। চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি রাখি নাই। আমেরিকা-ইউরোপের একেবারে নবীনতম ঔষধ হইতে আরম্ভ করিয়া ইউনানি, টোটকা, স্বপ্নাদ্য—কিছুই বাকী রাখি নাই। জলের মত অর্থব্যয় হইয়াছে, ফল কিছুই হয় নাই। অবশেষে আমার এক বাতজর্জ্জরিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট আপনার "বাত-শক্তিশেল"-এর প্রশংসা শুনিয়া ঔষধটি আনাই। এক সপ্তাহের মধ্যেই যে আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি তাহাতে আপনার ঔষধের একমুখে প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। কলির ধন্বন্তরি এত দিন একটা কথার কথা ছিল, আপনি সেটাকে সার্থক করিয়াছেন। আমাকে অবাধ গতিতে চলাফেরা করিতে দেখিয়া আমার কয়েকটি বাতগ্রস্ত বন্ধু আপনার ঔষধের জন্য নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। বাতে পঙ্গুত্বের অবস্থায় অধৈর্য্য হওয়া কিরূপ সঙ্কটজনক জানেনই, সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া ফেরৎ ডাকেই আর এক ডজন শিশি ভি-পি-পি যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

বিনীত

রহিমগঞ্জ শ্রীরামসদয় সেনগুপ্ত (রায় সাহেব)

জিলা মুর্শিদাবাদ রিটায়ার্ড সবজজ

আর একবার পড়িয়া লইয়া পরেশ মূল চিঠিখানি আবার পড়িতে লাগিল।—

—কিন্তু বাবাজি, তোমার প্রেরিত দুইটি শিশিই নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিয়াও বিন্দুমাত্রও উপকার পাই নাই। অতএব, তোমার বন্ধুকে এতৎসহ প্রেরিত প্রশংসা-পত্রখানি দিও, কিন্তু ঔষধ যেন আর না পাঠান হয় সে-বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিও। শুধু তাহাই নয়, তোমার বন্ধু-মহলে যে এমন এক ব্যক্তি আছে যে এরূপ বোগাস্ ঔষধ চালাইয়া গৃহস্থকে—বিশেষ করিয়া বাত-পীড়িত নিরুপায় গৃহস্থকে প্রবঞ্চিত করিবার অতি নীচ মনোবৃত্তি রাখে ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলাম। এরূপ বন্ধু বিষবৎ পরিত্যাজ্য। ঔষধ সেবন করিয়া তিলমাত্র উপকার তো পাই নাই-ই, অধিকন্তু মনে হইতেছে এদানি ব্যাধিটার প্রকোপ যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তোমার বন্ধুর অনুরোধ,—তুমি ক্ষুণ্ণ হইবে, সেই আশঙ্কায় প্রশংসা-পত্রটি দিলাম, কিন্তু মনে মনে বুঝিতেছি একটি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করা হইল। পূর্ব্বজন্মের না জানি কতই পাপের ফলে আজ প্রায় বৎসরাবধি আমি বাতে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন, আবার এই জন্মে ঐ রোগকে ভাঙাইয়াই পাপের পাথেয় সঞ্চয় করিতেছি, অদৃষ্টে যে কি আছে জানি না। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ,—আমি বাতে জবুথবু, ওদিকে এক জন সেইটাকেই মূলধন করিয়া, প্রশংসা-পত্র লিখাইয়া পরম উৎসাহে রোজগারের পথ পরিষ্কার করিতেছে। ঘোর কলি নয়ত কি ?

যাই হোক, তুমি যত শীঘ্র পার এরূপ বন্ধুকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিও।

বিপদ একা আসে না। তোমার শাশুড়ীর এক দূর-সম্পর্কের পিসতুত ভগ্নীর স্বামীর চাকরি গিয়াছে। কোন এক সাহেব বাড়ীতে কাজ করিত। লোকটা খুব ধড়িবাজ, এক দিনও বসিয়া থাকিবার পাত্র নয় ; চাকরি যাইবার কয়েক দিনের মধ্যেই একটা স্বপ্নাদ্য বাতের মাদুলি পাইয়া বসিয়াছে। কি করিয়া সন্ধান লইয়াছে আমি এক বৎসর

হইতে ভুগিতেছি। তাহাকেও প্রশংসাপত্র দিতে হইবে; তোমার শাশুড়ীর বোন অতিরিক্ত কাঁদিয়া কাটিয়া তোমার শাশুড়ীকে লিখিয়াছেন। তোমার শাশুড়ী বলিতেছেন—লোকে রিটায়ার হইয়া কত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করে, আমি বাড়ী বসিয়াই যদি সামান্য এক-আধটা চিঠি দিয়া লোকের উপকার করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি তো সে সুবিধা ছাড়া উচিত নয়; তাহা ভিন্ন তাঁহার মতে দৈব মাদুলির প্রশংসা—সে এক হিসাবে দেব-সেবাই বলিতে হইবে। বিপদটা বোঝ বাবাজি।

হাতের কাছেই আর এক উপদ্রব। এখানে রসময় সরকারের ছেলে বছর-তিনেক নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় কোথায় ঘুরিয়া অবধূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বলিতেছে বাতটা কিছুই নয়, যোগের কয়েকটা আসন অভ্যাস করিলেই কোথায় যে পলাইবে তাহার ঠিক নাই। প্রমাণস্বরূপ বলিতেছে রামায়ণ-মহাভারতে কোথাও বাতের উল্লেখ নাই, তাহার কারণ সে-যুগে নানাবিধ আসনের প্রয়োগ ছিল। তোমার শাশুড়ীকে দলে টানিয়াছে এবং আমাকে আসন শিখাইবার জন্য এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে যে আমি রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। যোগের একটা আসন দেখাইতে সে পায়ের গোড়ালি দুইটা মাথার ব্রহ্মতলে তুলিয়া বসিয়া থাকে। বলে, সব আসনই প্রায় এই রকম সহজ, সুধু একটু অভ্যাসের দরকার। এদিকে পুরুত-ঠাকুর বলিতেছেন—বেশী না পারেন মাসে গোটা-ছয়েক নির্জ্জলা উপোস দিন আর রাত্রের খাওয়াটা একেবারে ছাড়িয়া দিন। তোমার শাশুড়ীও সায় দিতেছেন।

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম এই সব প্রশংসা-পত্র, আসন আর উপবাসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে আমার কিছু দিন গা-ঢাকা দেওয়া দরকার। একেবারে কয়েক মাসের অজ্ঞাতবাস। বাতব্যাধিটা রিটায়ার্ড জীবনের সঙ্গী—কখন বাড়িতেছে, কখন কমিতেছে, প্রাণে মারিবে বলিয়া কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু পুরাণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিষেধকের যে রকম উপদ্রব জুটিতেছে, আর পরমাত্মীয়েরা যে-রকম ফেরকম অত্যাচার লাগাইয়াছেন তাহাতে ক'টা দিন সরিয়া থাকাই ভাল। বাতের এই মারাত্মক খ্যাতিটা কমিয়া আসিলে আবার তখন ফেরা যাইবে।

তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণকে বাপের বাড়ীই পাঠাইয়া দিব। সেই সঙ্গে চপলাও দিনকতক মামার বাড়ী বেড়াইয়া আসুক। কথাটা গোপনীয়, তবে তোমায় না বলিলেই নয়। সঙ্গে যাইবার জন্য আমার একটি বিচক্ষণ চাকর চাই, তোমায় জোগাড় করিয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। আমার চাকরটা বাহিরে যাইতে নারাজ। পূর্ব্বে কবে এক বার হাওড়া ষ্টেশনের দিকে গিয়াছিল। অত লাইনের মাঝে নিজের লাইনটি বাছিয়া গাড়ী যে কি করিয়া নিজের গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে ওর মাথায় সেটা কোন মতেই ঢোকে না। ফলে বিদেশ যাওয়ার নামেই কান্নাকাটি জুড়িয়া দেয়।

তুমি যথাসম্ভব শীঘ্র একটি বেশ চটপটে চাকর জোগাড় করিয়া পাঠাইয়া দিবে, আর কি উদ্দেশ্যে যে তোমার শাশুড়ীকে বাপের বাড়ী পাঠাইতেছি ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে দিবে না।

আর ঐ যা বলিলাম; ওরকম সাংঘাতিক বন্ধুর সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ কর।

তোমার শাশুড়ীর মাথব্যাথা আজকাল অনেকটা কম। খগেনের ডায়েবিটিস্‌টা আবার একটু বাড়িয়াছে, মাস-দুয়েকের ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। শৈলজার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। লিখিয়াছে ভালই, তবে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় শরীরটা একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে; লক্ষ্ণৌয়ে ওর মেসোর কাছে যাইবে বলিতেছে। যাক, একটু ঘুরিয়া আসুক। তবে, হ্যাঁ, তোমার বন্ধুটিকে এসব অসুখের কথা বলিয়া কাজ নাই। প্রত্যেক রোগের জন্য দুটা করিয়া শিশি পাঠাইয়া দিয়া তোমায় ধরিয়া বসিবে প্রশংসাপত্র আনাইয়া দাও। ও-ধরণের লোক সব পারে। না; লোকটাকে এড়াইয়া চলিও বাবাজি।

চাকর পাঠানোর কথা ভুলিও না। খালি একটি ঠাকুর আর একটি চাকর লইয়াই যাইব; বেশ স্মার্ট হওয়া চাই, যেন ফাঁকিবাজ না হয়।

অত্রস্থ সমস্তই কুশল। তোমাদের কুশলদানে সুখী করিবে।

ইতি—

২

চিঠি পড়িয়া জামাতা বাবাজী একেবারে গুম্ হইয়া বসিল। আত্মধিক্কারে তাহার মনটা যেন একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। চিঠিটা একবার মুড়িয়া-মুড়িয়া মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর আবার ভাঁজ খুলিয়া বন্ধুর সম্বন্ধে যেখানে যেখানে তীব্র, নগ্ন মন্তব্যগুলা রহিয়াছে সেগুলা আবার পড়িয়া গেল। প্রশংসাপত্রখানা পড়িয়া মনে যে একটা উল্লাস আসিয়াছিল সেটা জমিতে না জমিতেই যেন বাষ্প হইয়া উবিয়া গেল।

কারণ আছে;—মন্তব্যগুলা কোন বন্ধুর ঘাড়ে পড়ে নাই, পড়িয়াছে তাহার নিজেরই উপর। আসল কথা "বাত-শক্তিশেল"এর আবিষ্কর্ত্তা পরেশ নিজেই, তবে বন্ধুর নামে কেন চালাইতেছে, অথবা যে-নামে চালাইতেছে সে-নামের কোন বন্ধু আদৌ আছে কিনা, বা শ্বশুরের সঙ্গে এত লুকোচুরির কারণই বা কি—এ-সব কথা তুলিতে গেলে এত অল্পে কুলাইবে না, তাই সেটা আপাতত বারান্তরের জন্য রাখিয়া দিলাম। মোট কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—যেভাবেই আসুক কথাগুলা পরেশকে বিঁধিয়াছে—মাঝখানে একটা মনগড়া বন্ধুর পর্দা থাকিলেও শ্বশুর-জামাইয়ের সম্পর্কে তো!

পরেশের প্রথমে মনে হইল বেশ কড়া করিয়া একটা উত্তর দেয়—অবশ্য কাল্পনিক বন্ধুর নিরাপদ অন্তরাল হইতে।...রাগটা ও-পর্দ্দা থেকে নামিলে মনে করিল প্রশংসা-পত্রটাই ছিঁড়িয়া ফেলে,—তিন পাতার কটু রসে জড়ানো আধ পাতার প্রশংসাপত্রের আর কিসের এত মোহ? ছিঁড়িতে গিয়া কিন্তু চক্ষু দুইটা নিতান্ত অবাধ্য ভাবেই লাইনগুলার উপর আবদ্ধ হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া চিঠির নিম্নে স্বাক্ষর আর ঠিকানাটার উপর। প্রশংসা মিথ্যা হোক, কিন্তু রিটায়ার্ড সবজজ তো মিথ্যা নয়?—রহিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—এসব তো মিথ্যা নয়। এই পরশ-পাথরই যে ঐ মিথ্যার রাংকে সত্যের স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে।

সোনার স্পর্শে মনেও সোনার স্বপ্নের রং ধরিল।... প্রশংসাপত্র ছেঁড়া চলে না, আর কড়া জবাব?—শ্বশুরকে! ভগবান্ বহু পুণ্যে অমন একটি জীব দেন।—তুমি সংসার করিবে, গোড়াপত্তন করিয়া দিল শ্বশুর; তোমার ক্ষমতা নাই, বুনিয়াদের উপর ভিত তুলিয়া দিল শ্বশুর।...তুমি স্বপ্রান্ত চালাইবে?—মন, বাক্য, কায়া লইয়া তিনি হাজির আছেন—বাতগ্রস্ত কায়া, নিতান্ত তোমারই জন্য... এমন শ্বশুরকে কড়া জবাব দেয়? বরং, যদি নিজের ক্ষতি না হয় তো পারতপক্ষে মাঝে মাঝে একটু উপকারই করা ভাল...

কি উপকার করা যায়?

কেস্ হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া কেসের ডালার উপর কয়েক বার ঠুকিয়া, ঠোঁটে চাপিয়া পরেশ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। তাহার পর কৃতজ্ঞচিত্তে শ্বশুরের উপকারের সুযোগ চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল—শ্বশুর সম্প্রতি একটি চাকরের জন্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—এই চিঠিতেই তো লিখিয়াছেন।

এই আবার এক ফ্যাসাদ! চাকর কি এখানে গাছে ফলিতেছে যে হুট্ বলিতেই একটা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইবে? শ্বশুরের যদি একটু আক্কেল আছে। এখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া কোথায় চাকর, কোথায় চাকর করিয়া ফের!

উপকারের ইচ্ছাটা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে ঘাড়ের উপর উপকারের তাগাদায় মনটা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। চিন্তিত ভাবে খানিকক্ষণ সিগারেট টানিল পরেশ, তাহার পর মনে হইল—দেখা যাক তার নিজের চাকরটা যদি একটা জোগাড় করিয়া আনিতে পারে। ডাক দিল—"রামকানাই!"

উত্তর না পাইয়া আবার একবার ডাকিল। উত্তর নাই।...মরেছে!—বেটা ঠিক কোথাও পড়িয়া ঘুমাইতেছে। কিন্তু এইমাত্র তো দুই বালতি জল লইয়া বাথরুমের দিকে গেল। কখন বাহির হইয়া গেছে? চোখে পড়ে নাই তো। এতই কি অন্যমনস্ক ছিল পরেশ?... আরও জোরে হাঁক দিল—"রামকেনো!"

ঠাকুর রান্না করিতেছিল। পরেশ প্রশ্ন করিল—"রামকানাইকে কোথাও পাঠিয়েছ ঠাকুর?"

ঠাকুর দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "কই, না তো বাবু।"

"দেখ তো বাইরে কোথাও আছে কি না।"

ঠাকুর বাইরে গিয়া বিস্তর হাঁকডাক করিল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নিশ্চয় কোথাও ঘুমুচ্ছে বাবু।"

"এই মিনিট দু-একও হয় নি বালতি নিয়ে বাথরুমে ঢুকল, এর মধ্যে কখন বেরুল, কোথায়ই বা গেল…"

"দাঁড়ান দেখি বাবু"—বলিয়া ঠাকুর বাথরুমের দিকে চলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "একবার দেখে যান বাবু কাণ্ডটা, শীগ্‌গির আসুন।"

বাথরুমে জলে ভরা দুইটি বালতি, তাহার একটির কাণাকে বালিশ করিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া রামকানাই নিদ্রামগ্ন, গাঢ় নিদ্রায় গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ওঠানামা করিতেছে, বালতির জলে বীচিভঙ্গ হইতেছে, সামনের বড় বড় চুলগুলা বালতির জলে ভাসিতেছে। অনেক করিয়া ঠেলিয়া ঠুলিয়া তুলিতে ঘুমের আমেজে বিহ্বলভাবে চাহিয়া বলিল, "এই নাইবার জল রেখে দিলুম।"

রাগে পরেশের বাকস্ফূর্তি হইতেছিল না; বলিল, "এই না তুই আধ ঘণ্টা আগে মশলা বাটতে বাটতে এক চোট ঘুমিয়ে নিলি?…না, ঠাকুর তুমি দেখ অন্য লোক।"

"আমি তো বলছিই বাবু কদ্দিন থেকে আপনাকে, তা লোক জোগাড় ক'রে আনলেই আপনি বলবেন—থাক্‌, বারটান নেই, চুরিচামারির দোষ নেই…চুরি!—কিছু সরাতে সরাতেই যদি ঘুমিয়ে পড়ে তো হাতে-নাতে ধরা পড়বে—সেটুকু কি ও বোঝে না?"

পরেশের রাগটা শ্বশুরের উপর গিয়া পড়িল। বাহিরে আসিতে আসিতে বলিল, "নিজের চাকর নিয়ে এই অবস্থা, আবার ওদিকে শ্বশুরের ফরমাস হয়েছে চাকর জোগাড় করে পাঠাও। ওঁর আর কি; দিব্যি বাতে বিছানা কামড়ে পড়ে আছেন…বে-আক্কেলেপনারও একটা সীমা থাকে…"

"কাজ যদি খালি থাকে তো…"

রামকানাই বলিতেছে। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া—পরেশ ধমকের স্বরে প্রশ্ন করিল, "কাজ যদি খালি থাকে তো কি?—বল্‌, চুপ করে রইলি কেন?"

রামকানাই কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "তাহলে আমার দাদাকে ভর্তি ক'রে দেন যদি, বছরখানেক থেকে ব'সে রয়েছে…"

পরেশ কপালে চক্ষু তুলিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তোমার দাদা! তিনি চাকরি করবেন! বছরের মধ্যে ক-দিন চোখ খোলেন তিনি জিগ্যেস করি?"

৩

পরেশ বাহিরের বারান্দায় থামে পা আটকাইয়া একটি ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। মনটা খুব প্রসন্ন। শ্বশুরের প্রশংসাপত্র মন্ত্রবৎ কাজ করিতেছে, ছাপান অবধি "বাত-শক্তিশেলে"র কাটতি হুহু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া শ্বশুরবাড়ীর অঞ্চলে। আজ ডাকে পাঁচটি ভি. পি. সরবরাহ করিল। অবশ্য অন্য কয়েকটি প্রশংসাপত্রও আছে, কিন্তু অমন জোরাল নয়, তাদের তো আর জামাই নয় পরেশকুমার। আর নিজের গড়া প্রশংসাপত্রগুলো অতটা লাগসই হয় না, তাহাদের নামধাম কোনটারই পরেশেরই মস্তিষ্কের বাহিরে স্থান নাই কিনা।…গ্রাহকদের ভগবান্ কেমন একটা সূক্ষ্ম শক্তি দেন, তাহারা মেকী নামধাম আর ঠিকানা কেমন করিয়া যেন ধরিয়া ফেলে।

রামকানাই রকের কোণটার ধারের দিকে একটা থামে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। কাজ না থাকিলে তাহাকে আজকাল কাছেই বসিয়া থাকিতে হয় এবং মাঝে মাঝে উঠিয়া প্রভুর নিকট হইতে নস্য লইয়া নাকে দিতে হয়। নিদ্রাকর্ষণের আপাতত এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাঁচ দু-গুণে দশটি মুদ্রার ভি. পি.! শ্বশুরের প্রতি ভক্তিরসে মনটি আপ্লুত হইয়া রহিয়াছে। শ্বশুর মাত্রেই ভাল, তবে ইনি যেন আবার একেবারে দেবতুল্য। বহু পুণ্যে এমন শ্বশুর মেলে। যেমন কাটতি বাড়িয়াছে তেমনই সত্য-সত্যই কোন একটা উপকার করা যাইত…একটা উপকার অবশ্য চলিতেছে,—বধূ চপলা আজকাল পিত্রালয়েই।

তাহাকে একটা চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে—সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়। একে বাপ, তায় ওদিকে আবার পরমগুরু স্বামীর শ্বশুর—দুই দিক দিয়াই সম্বন্ধটা গুরুতর কিনা।

ডাকপিয়ন আসিল। পরেশের চক্ষে আজকাল এ-লোকটি দেবদূতের মতই শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনটি অর্ডার—তাহার মধ্যে দুইটি শ্বশুরবাড়ীর অঞ্চল হইতে।

তৃতীয় একখানি পত্র খামে। খুলিয়া দেখিল শ্বশুরের লেখা। সেই এক কথা!—বাত বাড়িয়াছে, অবধূতের আসনের ভয়, প্রশংসাপত্রের তাগিদ বাড়িতেছে, না পলাইয়া উপায় নাই, একটা মস্ত সুযোগ গৃহিণী বাপের বাড়ী গিয়াছেন ক'দিনের জন্য। ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়ন। সঙ্গে চপলাকেও এক রকম জোর করিয়াই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শুধু এখন চাকর আসার অপেক্ষা। যেদিন চাকর আসিয়া পঁহুছিবে সেই দিনই বাহির হইয়া পড়িবেন; কোথায় যাইবেন, কোথায় উঠিবেন সে-সব ঠিক হইয়া আছে।—চাকর চাই, এদিকে তো চাকর খুব সুলভ, এই পনর দিনেও সংগ্রহ হইল না?

চিঠি পড়িয়া পরেশের মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল।—আরে, চাকর কি রাস্তায় রাস্তায় এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যে একটাকে পাকড়াও করিয়া চালান করিয়া দেওয়া হইবে? আচ্ছা বে-আক্কেলে লোক তো! বাতে ভুগিয়া ভুগিয়া কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইল নাকি? আর এখন তাহার ফুরসৎই বা কোথায়? এই সব গাছ-গাছড়া তুলিয়া আনান, ধোওয়া, শুকানো, বাঁটা এসব তদারক করা—এই সব ছাড়িয়া ওঁর চাকরের পিছনে ঘুরিতে পার তো উনি খুশী থাকেন। স্বার্থপর! তাহা ভিন্ন দুনিয়াসুদ্ধ এই এত লোকের বাত সারিতেছে,—ঔষধ সরবরাহ করিতে করিতেও হয়রান হইয়া যাইতেছে আর শুধু ওঁরই বাত কায়দা হইল না! মিথ্যা কথা, একটা ভান; বাত নয়, ও বুজরুকি একটা।

পরেশ ডাকিল, "ঠাকুর!"

উপস্থিত হইলে প্রশ্ন করিল, "দেখেছিলে একটা চাকর?"

"ব'লে রেখেছি কয়েক জনকে বাবু।"

"না, ব'লে রাখলে চলবে না। আমার রিটায়াড সবজজ শ্বশুর মহামহিম রায়সাহেব রামসদয় সেনগুপ্ত মশাইয়ের হুকুম—আজই চাই, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে—এই পরোয়ানা এসেছে।···কি বে-আক্কেলে লোক বল দিকিন! আরে চাকরের কথা বলেছ, তা আমরা করছি চেষ্টা—চারি দিকে বলে রাখা হয়েছে, এলেই দোব পাঠিয়ে—না···"

এমন সময় ধপ করিয়া পাশেই গুরুভারপতনের একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুরের ছানা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। দুই জনেই ঘুরিয়া দেখিল, রামকানাই ঘুমন্ত অবস্থায় রক থেকে একেবারে নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছে—জিমির বাচ্চা দুইটা খেলা করিতেছিল—একেবারে একটার ঘাড়ের উপর। ঘুমের ঘোর ভাল কাটে নাই, ঠাকুর গিয়া তাড়াতাড়ি তুলিয়া দাঁড় করাইল।

পরেশ এ-অবস্থায় আজকাল রাগের মাথায় চড়টা কিলটাও বাকী রাখিতেছে না। আজ কিন্তু কিছু বলিল না; শুধু প্রশ্ন করিল "নস্যি নিয়ে যাস্ নি কেন এত ক্ষণ?" রামকানাই ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

পরেশ কিছু বলিল না। মুঠায় মুখটা চাপিয়া চিন্তিত ভাবে একটু পায়চারি করিল, তাহার পর রামকানাইয়ের সামনে দাঁড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিল, "তোর দাদা বাড়ীতে আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু?"

"বাইরে কাজ করতে যাবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব যাবে।"

"ঘুমোয় কেমন?—শুধু খাবার সময় ছাড়া আর উঠে না তো?···খবরদার মিছে কথা বলবি নি।"

রামকানাই হাত দুইটা একত্র করিয়া একটু মাথা নীচু করিয়া রহিল, তাহার পর কুণ্ঠিত ভাবে মুখটা তুলিয়া বলিল, "তা মিছে কথা বলব না বাবু, ঘুমোয় একটু,—মা আমার মতন অতটা সজাগ নয় বেশ···"

পরেশ বলিল, "যা, ডেকে নিয়ে আয়—ঠিক এক ঘণ্টা সময় দিলাম,—এই নস্যির ডিবে নে। নস্যি দিতে যাবি, তার নাকে নস্যি দিয়ে তুলে দু-জনে

নিতে নিতে চলে আসবি—কোথাও বসা নয়, দাঁড়ান নয়, কিচ্ছু নয়—যা। এক টিপ নস্যি নিয়ে নে আগে।"

শ্বশুরকে পত্র লিখিল—

প্রণামাবহবনিবেদঞ্চাগে,

চাকর পাঠাইতেছি। আমার ভৃত্য রামকানাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শোনা গেল কাজে খুব তৎপর। আপনি যে লিখিয়াছেন চাকর পৌছিবার দিনই যাত্রা করিবেন সেই পরামর্শই ভাল।

আমার বন্ধু ঔষধে আপনার ফল হয় নাই শুনিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি কয়েকটি কারণে এই ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে চান। একটি কারণ, তিনি আপাতত একটি ভাল চাকরি লইয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছেন। তবে তাঁহার বিশ্বাস এবার ঔষধে আপনার উপকার হইবেই। সেই জন্য আরও দুই শিশি এই সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং বিদেশে নির্ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বেশ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিতে বলিলেন। তিনি ঔষধের স্বত্ব আমায় বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি আপনি উপকৃত হন তো আমিই ঔষধটি চালাইবার প্রয়াস করিব···

৪

ঠিক সতের দিবস পরে এক দিন বৈকালে পরেশ কার্য্যান্তর হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল বাহিরের রোয়াকে একটি লোক দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে। রামকানাই ভাবিয়া গালিগালাজ দিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। পরে বোঝা গেল রামকানাইয়ের দাদা। ঠেলাঠেলি করিতে ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইল না, তবে তাহার শরীরের কোথা হইতে একটা লেফাফা খসিয়া সামনে পড়িল।

পরেশ তাড়াতাড়ি সেটা খুলিয়া পড়িল—

বাবাজি,

নিত্য আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমি এক রকম পূর্ণভাবেই সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। তোমার বন্ধুর বাত-শক্তিশেল নিয়মিত ভাবে আবার ব্যবহার করিয়াছি বটে কিন্তু মহৌষধটি তোমার বন্ধুর এই তৈল, কি তোমার ভৃত্য রামকানাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সে-সম্বন্ধে এখনও মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই পনরটা দিন নিজের হাতে মালিসের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অঙ্গসঞ্চালন করিতে হইয়াছে, কেননা এক আহারের সময় উঠিয়া আহারটুকু সারিয়া লওয়া ব্যতীত রামতারণ আর আমার অন্য কোন উপকারে লাগিত না। ছাত্রজীবনে যে দৈহিক পরিশ্রম করিতে পারিতাম এখন সেই শক্তি প্রায় ফিরিয়া পাইয়াছি।

যাহাই হোক তোমার বন্ধুর ঔষধের স্বত্বটা কিনিয়া রাখিও। রামতারণ পৌছিল কি না জানিবার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন রহিলাম। ফিরিবার সময় টিকিট কিনিতে ভিড়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পৌছিলেই পত্র দিবে। তোমার শ্বশ্রূ এখনও পিত্রালয়েই। অন্যান্য সংবাদ কুশল। ইতি



মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অতঃপর নিত্যহরি দেখা দিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথায় টাক, চক্ষে নিকেল ফ্রেমের কমদামী চশমা, সার্টের কাঁধ ছেঁড়া এবং পায়ের জুতায় কয়েকটি তালি। ছাপোষা মানুষ—যে মাহিনা তিনি পান তাহাতে সংসার চলে না।—আপিসের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, কো-অপারেটিভ ইত্যাদির ঋণ শোধ দিয়া মাহিনার অর্দ্ধেক হাতে পান। খগেনবাবুকে মাসিক কিছু দেনা দিতে হয়—বড় মেয়ের বিবাহের সময় একখানি হ্যাণ্ডনোট কাটিয়াছিলেন—আর খুচরা দেনার কথা না বলাই ভাল। আকাশের তারা ও সমুদ্রতীরের বালু যদি কেহ বা গণিবার চেষ্টা করেন, তিনিও সভয়ে নিত্যহরির দেনার তালিকাটি পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করিবেন। নিত্যহরি নিজেই জানেন না কতগুলি মহাজন লইয়া তাঁহার কারবার। মাসকাবারে এই সব ক্রমবর্দ্ধমান মহাজনদের আবির্ভাবের আশঙ্কায় কয়েকদিন তিনি আপিস কামাই করিতে বাধ্য হন।

নিত্যহরি দাদার টেবিলের উপর ডিবা হইতে পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিলেন, জরদা খান না বলিয়া ছোট কৌটাটির দিকে হাত বাড়াইলেন না। পানটিকে ঈষৎ আয়ত্ত করিয়া বলিলেন, "ভেবে আর কি হবে, অদৃষ্ট ছাড়া তো পথ নেই। কিনুন একখানা রেঞ্জার্সের টিকেট—লাগে তো লাল হয়ে যাবেন।"

দাদা আগ্রহভরা কণ্ঠে বলিলেন, "নিতে হবে বৈকি। ওরা খুব বিশ্বাসী, কিন্তু আমাদের পাথর-চাপা কপালে কিছুই হয় না, ভাই।"

নিত্যহরি কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামাইয়া বলিলেন, "হেড আপিসের মাখন চাপরাসীর গেল বার কি হ'ল? শুনলাম বেটা পনের বছর যাবৎ টিকেট কিনে আসছিল—লেগে গেল তো?"

দাদা বলিলেন, "আমাদেরও বড় কম দিন হ'ল না, হিসেব করে দেখ তো নিত্যভায়া, বছরে আট টাকা হ'লে কুড়ি বছরে কত হয়।"

নিত্যহরি হাসিয়া বলিলেন, "অত যদি হিসেব-জ্ঞান থাকবে তো দেনার সমুদ্রে ভাসব কেন? ঐ খগেনটাকে মাসে মাসে কত সুদ দিই জান? পাঁচ টাকা। টাকায় এক আনা সুদের সে একটি পয়সা কম নেয় না—এটাও সুদের হিসেবে ধরে রাখি।"

দাদা বলিলেন, "চাকরি যত দিন আছে, 'চান্স' তত দিন দেখব বৈকি। আশায় মানুষ বাঁচে।

নিত্যহরি বলিলেন,—"অদৃষ্ট, অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। এই যে তোমার চেয়ে জুনিয়র ম্যান হয়ে শম্ভুচন্দ্র গ্রেডটি পেলেন, এও অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?"

পরম অদৃষ্টবাদী দাদার মুখ এ-কথায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না,—লটারির খাতাখানি টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে ঘর পূরণ করিতে লাগিলেন।

নিত্যহরি বলিলেন, "হেড আপিসের পিওনটা টাকা পাওয়ার পর থেকে রেল আপিসে এর বিক্রী বেড়ে গেছে। আর একখানা বই আনাতে হবে।"

দাদা বলিলেন, "আনিও, মোদ্দা টাকা ঠিক আদায় হয় তো?"

নিত্যহরি বলিলেন, "অন্য দেনা দিতে যার যত অনিচ্ছে থাকুক, এর বেলায় কেউ পাই পয়সাটি ফেলে রাখে না।"

দাদার টেবিল হইতে আরও দুইজন লটারির টিকেটের গ্রাহক হইবামাত্র খাতাখানি শেষ হইয়া গেল।

নিত্যহরি খাতাখানি পকেটে পুরিয়া বলিলেন, "ওহে ফণী, রমেন, মনে থাকে যেন মাসকাবারে টাকা চাই, না হ'লে টিকেট আসতে দেরি হবে।"

বিশ্বজিৎ অমিয়র টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি নিলেন না কেন একখানা টিকেট?"

অমিয় বলিল, "আপনি নিয়েছেন?"

বিশ্বজিৎ বলিলেন, "দেখেন নি খাতাখানি, প্রথম নাম পত্তন তো আমিই করেছি।"

অমিয় বলিল, "আপনি সেদিন তো বললেন, অদৃষ্টবাদকে ঘৃণা করেন।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "ঘৃণা নয়, অস্বীকার করি। কিন্তু অস্বীকার করলেও, টিকেট্ কিনতে দোষ কি। যাঁরা হিন্দু হয়ে ঈশ্বর মানেন না, তাঁরাও তো রোগে বা সঙ্কটে পড়লে চুপি চুপি মানত ক'রে বসেন। অনেকে তো ভূত মানেন না, অথচ অন্ধকার পথে চলতে চলতে গলা ফাটিয়ে গান ধরেন কেন?"

অমিয় বলিল, "যাঁরা ঈশ্বর মানেন না, বা ভূত মানেন না, তাঁরা সত্তিকারের শক্তিমান হলে—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "সত্তিকারের শক্তিটাই তো হচ্ছে আসল বস্তু—যেমন আগুন। তার ত্রি-সীমানায় আবর্জ্জনার স্থান নেই। কিন্তু আমরা যে সত্যের উপাসনা করি তার মধ্যে খাদ মেশানো অনেকখানি। লটারির টিকেট প্রতি বছরই কিনি, বছরে চার বার কিনি, জানি কিছু আসবে না, জেনেও কিনি, অথচ ফাঁকি জেনেও ফাঁকিকে ঠেকিয়ে রাখতে তো পারি না। আসল কথা, আমরা যে পরিমাণে দরিদ্র সেই পরিমাণে লোভী। এবং সেই পরিমাণে হিংসুক। পাঁচ জনে টিকেট কিনে যদি হঠাৎ মোটা রকমের টাকাটা মেরে দেয় এই হিংসার বশবর্ত্তী হয়েই আমরা টিকেট কেনার প্রতিযোগিতায়, ভুয়ো জেনেও, পিছুতে চাই না।"

অমিয় বলিল, "আজ যদি দাদা হঠাৎ কিছু টাকা পান?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আমার মনে হবে ভগবানের অন্যায় বিচার। ওঁর ছেলেমেয়ে নেই, ওঁর পাওয়ার দরকার নেই, আমি ছাপোষা মানুষ, আমার পাওয়াটাই উচিত ছিল। এত তুচ্ছ লটারির টিকেট, আর একটি প্রবল নেশায় আমরা অদৃষ্ট পরীক্ষা করি, দেখেন নি শনিবার দিন?—না, আপনি থাকেন শ্যামবাজারে, রেস-কোর্সের খবর হয়তো রাখেন না।"

অমিয় বলিল, "ওঁদের এই তো সামান্য মাইনে; সংসার চালিয়ে রেস-কোর্সের নেশায় মাতেন কি ক'রে?"

বিশ্বজিৎ হাসিল, "সংসারটা তো গৌণ, তাকে রসাতলে পাঠিয়ে যদি রেস-কোর্সের মধ্যে বসে স্বর্গ গড়ে তোলা যায়, মন্দ কি? অমিয়বাবু, আশ্চর্য্য হবেন না, আমরা নেহাৎ মরা জাতের কেরানি নয়। উপরে শুকনো মুখ, ছেঁড়া জামা, তালিমারা জুতো দেখে ভুল বুঝবেন না, মনের মধ্যে সখের সমুদ্র আমাদের তোলপাড় করছে, দুঃখ তীব্র হয়ে ওঠে, নেশার তীব্রতা তাকে না ছাপিয়ে উঠলে তৎক্ষণাৎ যে দম ফেটে আমরা মরে যাব।"

অমিয় বলিল, "যাঁরা রেস খেলে সংসারে দুঃখ ডেকে আনেন—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "দুঃখ আমাদের কাছে অনিমন্ত্রিত হয়েই আসে: এবং আমরা সব দুঃখজয়ীর দল যখন-তখন যে-কোন সময়ে তাকে দেখে খুশিমনে অভ্যর্থনা করি। সে যদি বা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা আদর ক'রে তার গলা জড়িয়ে ধরি।"

"আর বলবেন না।"

"না, আর বলব না, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখাবার ইচ্ছা আছে। অমিয় বাবু, এ বড় কঠিন ঠাঁই। এই চেয়ারে ব'সে দুঃখকে যদি সজাগ ক'রে মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তো ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবেন। আমাদের জ্ঞান, বিবেক, মনুষ্যত্ব—এ-সব নিয়ে বিচার করবেন না। হয়তো আমরা সত্য কথা বলবার বড়াই করি, কিন্তু বলতে ভালবাসি মিথ্যা। অথচ জানি না তা মিথ্যা। আমরা পরম জ্ঞানীর মত, পরম বিদ্বানের মত কথা বলি, কিন্তু ব্যবহারে পাবেন পরম মূর্খের মত আচরণ। আমরা সগর্ব্বে বলি রাজমিস্ত্রি থেকে মুসোলিনি ইটালীর কর্ণধার হয়েছেন, ষ্টালিনের বা হিট্‌লারের বংশপরিচয় খুব গৌরবজনক নয়, অথচ অর্দ্ধপৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা তাঁরা, আমাদের দেশের সামান্য ফ্যাক্টরি, সামান্য ব্যবসায় সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে আজ পৃথিবীবিখ্যাত হয়েছে, অনেক দরিদ্র আছেন, যাঁদের নাম দেবতার নামের মতই আমরা প্রতিদিন বহুসময় উচ্চারণ করে থাকি—অথচ মুখের ভক্তি ছাড়া তাঁদের আমরা আর কিছু দিতে পারি না।"

"কেন পারি না?"

"পারি না, কারণ গল্প ক'রে আমরা যত আনন্দ পাই,

গল্প শুনতে আমরা যত ভালবাসি, সত্যিকার বাস্তবকে ঠিক ততখানিই ভয় করি। আমি অনায়াসে বলতে পারি তুমি অমুকের মত হও কিন্তু নিজে কি হয়েছি তার বিচার করতে পছন্দ করি না। যাই হোক, আজ ছুটির পর আমার সঙ্গে যাবেন, আপনার নেমন্তন্ন রইল।"

১১

ছুটির পর আপিস হইতে বাহির হইবামাত্র মনে প্রফুল্লতা আসে, যদিও অবসাদে শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহে। তখন উপরের আকাশের পানে চাহিয়া কবিত্বই বল আর চলমান জনস্রোতের ঢেউ গণিয়া সমস্যাই বল—কোনটাই ভাল লাগে না। পা দুখানি আপন ইচ্ছায় চলিতে চায়, তাই চলিতে হয়, গন্তব্য স্থান একটা জানা আছে, তাই পথ ভুল হয় না, এবং জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত অসতর্ক মুহূর্ত্তেও আমরা সচেতন বলিয়া গাড়ীচাপা পড়িয়া বিপদ বাধাইয়া বসি না। আপিস যাইবার কালে ও আপিস হইতে ফিরিবার সময় পথের দু-ধারে দেখা সাধারণ ঘটনাগুলি মনের কোণে রেখাপাত করিতে পারে না; যন্ত্র-জীবন মানুষের সমস্ত অনুভূতিকে এমনই পঙ্গু করিয়া দেয়।

অমিয়র হাত ধরিয়া বিশ্বজিৎ সেই কথাই বলিতেছিল, "এক দিন আপিস আসবার মুখে দেখলাম, শেয়ালদার মোড়ে একটা লোক মোটর-চাপা পড়ল। চার দিকে হৈ হৈ বেধে গেল। আমিও দাঁড়ালাম, কিন্তু সে এক মিনিট। পাছে লেট হয়ে যায় সেই ভয়ে ভিড় ঠেলে লোকটাকে একবার দেখে আসতেও পারলাম না—সে মরল কি বেঁচে রইল!" একটু থামিয়া বলিল, "এ বিষয়ে প্রত্যেক মনের একটা অদ্ভুত অনুভূতি আছে। যেখানে সেল্ফ্ ইন্টারেষ্ট নেই মনের সাড়া সেখানে মেলেই না। ধরুন, আজ আপনার কোন প্রিয়তম আত্মীয়-বিয়োগ হয়েছে, আপনি হায় হায় করছেন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে মৃত আত্মীয়ের গুণ-কীর্ত্তন ক'রে দুঃখ প্রকাশ করছেন, কিন্তু বন্ধুরা কতক্ষণ সেই দুঃখপ্রকাশকে সহ্য করতে পারেন?"

অমিয় বলিল, "নিজের সত্যকার যে-দুঃখ অন্যের কাছে প্রকাশ করলে সত্যই তার মহিমা হানি হয়।"

"কিন্তু নিজের দুঃখটাকে খুব বড় করে দেখি আমরা, কাজেই তা দিয়ে অন্যকে অভিভূত করতে চাই। অন্যের বিরক্তি জেনেও নিজের কাঙালপনা আমরা নির্লজ্জ ভাবেই প্রকাশ করি। আমার মনে হয় অমিয়-বাবু, প্রত্যেক মানুষ আলাদা জগতে বাস করে; নিজের সুখ-দুঃখ, রুচি-আনন্দ, বিদ্যা-বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে তৈরি করে নেয় সেই জগৎ—অন্যের প্রবেশাধিকার সেখানে নেই। অথচ অন্যকে নিয়ে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করা তার রীতি। আর সব সময়ে অন্যকে দারুণ অবহেলা করলেও—নিজের প্রকাশকে যেখানে মূল্যবান ক'রে তুলতে হবে, সেখানে সে পরমুখাপেক্ষী। সে পরকে চায়।"

অমিয় বলিল, "ঠিক বুঝলাম না। পরকে যখন আপন ক'রে নিই—বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "পরকে আমরা কোন সময়েই আপন করতে পারি না। আমাদের কতকগুলি সুকোমল বৃত্তির বৃন্তে ওদের ফুটতে দিই মাত্র। আমাদের দাক্ষিণ্য বা দয়ায় ওঁরা নিকটবর্ত্তী হন। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই ফোটা ফুলের সৌন্দর্য্য দেখি, তার গন্ধে তৃপ্তি পাই, তাকে নিয়ে বিলাস করি, কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্য জীবন বিনিময় করি, অর্থাৎ ভালবাসি।"

অমিয় বলিল, "সে ভালবাসার জন্য প্রাণও দিতে পারি—পৃথিবীতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "মানুষ যেমন র‍্যাশন্যাল তেমনি সেন্টিমেণ্টাল। আদিম বৃত্তিকে জয় করবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলে। খবরের কাগজে সবিস্ময়ে আমরা সেই অকল্পিত ঘটনা পড়ে কোলাহল তুলি।" একটু থামিয়া বলিল, "আপনার নিজের মন দিয়েই দেখুন, বাড়ীতে আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে, যা আছেন, তাঁদের জন্য একটি স্নেহমিশ্রিত উৎকণ্ঠা আপনি প্রতি মুহূর্ত্তে ভোগ করছেন। করছেন তো? ভাল, আর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখুন—সে উৎকণ্ঠা কি সত্যই তাঁদের জন্য না আপনার দৌর্ব্বল্যের একটা প্রকাশ? তাঁদের অকুশলে আপনি ব্যথা পাবেন, যাঁদের কেন্দ্র ক'রে সুখের একটা ছবি আপনার মনে আঁকা আছে, তাঁদেরকে আপনি কেন ভালবাসলেন? কারণ আপনার আঁকা ছবিটিকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসেন। আপনার

শরীরের বৈকল্য যেমন আপনাকে পীড়া দেয়, মনের বৈকল্যও তেমনই।"

অমিয় বিশ্বজিতের হাতে টান দিয়া বলিল, "থামান আপনার মায়াবাদ, মনকে অত্যন্ত ফাঁকা ক'রে দেয়।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "মায়াবাদ না থাকলে আমরা যে এক দণ্ডও টিঁকতাম না অমিয়বাবু।"

গলির পর গলি পার হইয়া অমিয়রা যেখানে থামিল সেখানে তেমন ভাবের বাড়ী যে থাকিতে পারে—কলিকাতা করপোরেশনের অধীনে বাস করিয়া সে-চিন্তা করা যায় না। অথচ বিশ্বজিৎ এই বাড়ীতেই থাকে। মোগল-বাদশাহের আমলের পাতলা ছোট ইট নোনা ধরিয়া ভিত্তি-মূলে ভয়ের ভ্রূকুটি দেখাইতেছে; কাঠের চৌকা গরাদ দেওয়া ছোট জানালা ও লোহার পেরেক আঁটা দুয়ার দেখিলে বাড়ীটির আভিজাত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। বাড়ীর সম্মুখের গলিটিও কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টিবর্জ্জিত, কাজেই প্রকৃতিমাতার কার্পণ্যও এখানে পরিস্ফুট। কড়া নাড়িয়া বিশ্বজিৎ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। কয়েকটি কেরানী-পরিবার বাড়ীটির সঙ্গে সুখদুঃখ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছেন।

বাড়ীওয়ালার পয়সা আছে, তিনি বালিগঞ্জের দিকে নূতন প্রাসাদ তৈয়ারী করিয়া বাস করেন। আয়ের সম্পত্তি হইলেও এটি সংস্কার-সম্বন্ধে অবহেলিত হইয়া আসিতেছে।

দোতলার কোণের দিকের ঘরখানি বিশ্বজিতের। গোটা দুই জানালা ঘরে আছে, তারই প্রসাদে কিঞ্চিৎ আলো ও হাওয়া আসিয়া থাকে। দিনের বেলায় লণ্ঠন জ্বালিয়া কথা কহিতে হয় না। বারান্দা দরমা দিয়া ঘিরিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। যখন প্রচুর ধোঁয়া কয়লার তোলা উনুন হইতে উঠিতে থাকে, তখন ঘরের একমাত্র দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তথাপি ঘরের কড়িকাঠ হইতে চারিদিকের দেওয়াল পর্য্যন্ত ধূম-চিহ্নে চিহ্নিত। দেওয়ালে কালী-দুর্গার ছবির পাশেই বিলাতি মদের বিজ্ঞাপনী ক্যালেণ্ডার ঝুলিতেছে, রামকৃষ্ণ-দেবের ছবির নীচেই জাপানী সাকুরা বিয়ারের লাস্যময়ী তরুণী ফেনায়িত গ্লাস হস্তে বিলোল ভঙ্গীতে চাহিয়া আছে। নির্ব্বাচনে বিশ্বজিতের রুচি-দ্বিধা নাই। কিনিয়া-আনা ছবির পাশে চাহিয়া-আনা ক্যালেণ্ডারকে অনায়াসে সে বসাইয়া দিয়াছে। চূণবালিখসা দেওয়ালের কুশ্রীতা যে কোন ছবির দ্বারা যতটুকু ঢাকিয়া যায়, তাহাই হয়ত শোভন।

অমিয়কে লইয়া সে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকিল। দরিদ্রের বাড়ী, এত্তেলা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, সামান্য একটুখানি কাসিলেই অন্য পক্ষকে সচেতন হইবার যথেষ্ট অবসর দেওয়া হয়।

ঘরের মধ্যে তক্তপোষ পাতা আছে, বিছানাটা আছে এক ধারে গুটানো। এক ছবিতে রুচিবিরুদ্ধ ভাবের প্রকাশ থাকিলেও বিশ্বজিতের ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলি চোখকে নিদারুণ ভাবে খোঁচা মারে না। কিংবা গরীবের ছেলে বলিয়াই হয়ত অমিয় সেখানে বিসদৃশ কিছু ধরিতে পারিল না। বিছানা-বালিশ পরিষ্কার, ঘরের মধ্যেই বলিতে গেলে সংসার, এবং সে-সংসারে বিশৃঙ্খলা নাই। জানালার ধারে জলের কুঁজা, পরিষ্কার পানের বাটা, কাঠের জলচৌকির উপর ঝকঝকে কাঁসার বাসনগুলি পরিপাটি করিয়া সাজান। টিপয়ের উপর গোটা দুই কাঁচের গ্লাস, টাইমপিস্ ঘড়ি একটা ছোট ব্রাকেটের উপর টিক্ টিক্ করিতেছে।

বিশ্বজিৎ বলিল, "এই আমার সাম্রাজ্য।"

অমিয় বলিল, "মন্দ কি। আমরা প্রত্যেকেই যখন সম্রাট—তখন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করতে হয়।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "একটি বাধা, সম্রাট-পত্নীর সঙ্গে হয়ত আপনার সাক্ষাৎকার হবে না।"

"কেন, তিনি কি অনুপস্থিত?"

"না, একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন তিনি উপস্থিত; কিন্তু চোখে না দেখলেও গন্ধে যেমন ফুলের অনুমান, ছোটখাট কতকগুলি ঘটনার দ্বারা বুঝছি তিনি আজ প্রজা-সন্দর্শনে যাত্রা করবেন।"

অমিয় না বুঝিয়াই হাসিল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "মানে আপনাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। ঐ জানলার ধারে লক্ষ্য করে দেখুন দেখি—কিছু দেখতে পাচ্ছেন?"

"আরসি, চিরুণী, তেল—"

"ব্যস, ব্যস। ক্রীমের কৌটোটাও খোলা রয়েছে, সুতরাং বুঝতেই পারছেন অসমাপ্ত প্রসাধন নিয়েই তিনি কর্ণান্তরিত হয়েছেন—আমার কাসির শব্দে। আর এই অসময়ে প্রসাধনের মানেই, বাইরে কোথাও যাবেন।"

অমিয় ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আজ তাহলে উঠি, আর একদিন আসব।"

তাহার হাত ধরিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "না, না, আপনার ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। এ রাজ্যে রাজা ও রাণীতে ভাবের বৈলক্ষণ্য নেই। তাঁর সিনেমা দেখার ক্ষতি হলেও আমার শান্তিভঙ্গ হবে না। চা খান তো? চা?"

"না, কিন্তু আমার দরকার ছিল—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "এই তো প্রতারণা সুরু করলেন! দরকার আপনার লজ্জা—আর ভদ্রমহিলার সখটিকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু তার স্বামী বেচারাটির দিক দিয়ে তো দেখছেন না। যে আগুন-আগুন ভাত খেয়ে সাড়ে নটায় উর্দ্ধশ্বাসে আপিসে ছুটেছে, আর সাড়ে পাচটায় একদম মিইয়ে সেখান থেকে এল—সে কি প্রত্যাশা করতে পারে না তার স্ত্রীর হাতের এক কাপ গরম চা, বা তার মুখের এক টুকরো হাসি বা তার একটু সলজ্জ সেবা? আপনার স্বার্থপরতাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, অমিয়বাবু!"

অমিয় বলিল, "আমার স্বার্থপরতা!"

"ওই হ'ল—আপনাকে সামনে রেখে আর কারুকেও তা বলতে পারি।"

নেপথ্যে শাড়ীর খস্‌খসানি ও চুড়ির ঠুনঠুন আওয়াজটা হঠাৎ তীব্র হইয়া উঠিল। বিশ্বজিৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অমিয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিলেও কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

বিশ্বজিতের হাসি থামিলে দেখা গেল, বছরখানেকের একটি খোকা হামা টানিয়া ঘরের মেঝের খানিকটা আসিয়াই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল এবং তারস্বরে ক্রন্দন জুড়িয়া দিল।

হাসিতে হাসিতে বিশ্বজিৎ তক্তপোষ হইতে উঠিয়া আসিয়া শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইল ও ছেলে ভোলানোর মত তাহাকে দোলাইতে দোলাইতে বলিল, "চুপ্‌ চুপ, কাঁদেনা—

খোকা আমাদের সোনা
স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দোনা।"

অমিয় বলিল, "ছেলে-ভোলানো ছড়াও জানেন দেখছি?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "জানি বৈকি, না জানলে চলে না। কিন্তু নেপথ্যচারিণীর রাগটা অহেতুক, আমার উপর ছেলেটিকে লেলিয়ে দিয়ে মনে করলেন—মস্তবড় একটা সৎকার্য্য করলাম। আমি হয়ত খোকাকে থামাতে পারব না বা একটিও ছেলে-ভোলান ছড়া মুখস্থ বলতে পারব না! আর একটা ছড়া শুনবি খোকা?" বলিয়া ছেলেকে দোলা দিতে দিতে বিশ্বজিৎ আরম্ভ করিল;

ওপারেতে জস্তি গাছটি জস্তি বড় ফলে
গুয়ো জস্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আই-ঢাই গলা করে কাঠ
কতক্ষণে যাব রে ভাই দিগনগরের মাঠ।
দিগনগরের মেয়েগুলি নাইতে লেগেছে
চিকন চিকন চুলগুলি তা'র ঝাড়তে লেগেছে
হাতে তার দেব শাঁখা নেপ লেগেছে
পরণে তার ডুরে সাড়ী উড়ে পড়েছে
টিয়ের মার বিয়ে
লাল গামছা দিয়ে
ঢ্যামকুড়াকুড় বাদ্যি বাজে চড়ক ডাঙায় ঘর।

নেপথ্য হইতে পুনরায় খিল খিল হাস্যধ্বনি উঠিল।

বিশ্বজিৎ মৃদুস্বরে বলিল, "ছড়া ভুল হোক আর বাদই পড়ুক খোকা কিন্তু ঘুমোল। এরা সত্যই দেবশিশু, ছন্দের অমিল বা কথার মানে অথবা উপমার অসামঞ্জস্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, সুরটুকু কানে গেলেই যথেষ্ট।"

এক হাতে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিশ্বজিৎ অন্য হাতে ছোট দু-খানি কাঁথা ও ছোট একটি বালিশ পাতিয়া অতি সন্তর্পণে খোকাকে তাহার উপর শোয়াইল এবং মৃদু মৃদু চাপড় দিয়া ঘুমটিকে তাহার গাঢ় করিয়া অমিয়র পানে চাহিয়া হাসিল।

অমিয় মুগ্ধদৃষ্টিতে বিশ্বজিতের কার্য্যকলাপ দেখিতে-

ছিল। এই ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে ছেলেটি যেন পরম ঐশ্বর্য্য। ওর তুলতুলে নরম গাল দুটিতে সারাক্ষণই চাপড় মারিতে ইচ্ছা হয়—পাতলা ঠোঁট দুখানি চুমায় ভরিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে মন উৎসুক হয়।

বিশ্বজিৎ বলিল, "ভাবছেন ছেলেটি তো বেশ!"

অমিয় বলিল, "ছেলে আপনার যেরকম রাগ ক'রে মাটিতে এসে শুয়েছিল তাতে মনে হয় দুষ্টু আর চালাক হবে।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "ওর দুষ্টুমি আর চালাকি শেষ পর্য্যন্ত একটা কেরানীগিরি পেলে হয়তো সার্থক হবে।"

'আপনার ছেলে যে কেরানীই হবে তার মানে কি?"

"বটগাছের বীজে যে বটগাছই হয় এ তো ধ্রুব সত্য। আমার কাছ থেকে ও কি শিক্ষা আশা করতে পারে? চাকরির পক্ষে যতটুকু দরকার—তাই দিতেই আমার প্রাণান্ত হবে হয়ত।"

"তা হলে ছেলের কথা ভেবে আপনি এখন থেকেই চিন্তিত হয়েছেন, বলুন?"

"তা হয়েছি বৈকি, নিজের দায়িত্বে ওকে সংসারে এনেছি, ওকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্য্যন্ত আমার চিন্তার শেষ কোথায়?"

অমিয় বলিল, "তবু এ-চিন্তায় সুখ আছে।"

"তা আছে স্বীকার করি। দুঃখের অন্ধকারে এরা প্রদীপের আলো—মানুষকে পথভ্রান্ত হ'তে দেয় না।"

এই মুহূর্ত্তে অমিয়র বীরেনের কথা মনে পড়িল। দরিদ্রের বিবাহকে সে রীতিমত মহাপাপ বলিয়া মনে করে। হয়ত তার মনের অদম্য তেজে শারীরধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিবার দুঃসাহস সে সঞ্চয় করিয়াছে। সম্মুখে কোন একটি ধ্রুব লক্ষ্যে দৃষ্টি তার নিবদ্ধ। সংসার সম্বন্ধে যে মনগুলি অত্যন্ত মমতাবদ্ধ, জগতের সীমা রেখা টানিয়া যাহারা নীড়ের মধ্যে শান্তির লূতাতন্তু-জাল বুনিতে ভালবাসে তাহাদের পক্ষে বীরেনের মতানুবর্ত্তী হওয়ার চেয়ে আত্মঘাতী হওয়া সহজ। ইচ্ছা করিয়াই অমিয় বীরেনের প্রসঙ্গ তুলিল না। বিশ্বজিতের সবল মনের এই দুর্ব্বল মমতাটুকু তাহারই পরমক্ষণের প্রকাশ বলিয়া মনে হইতেছিল। তর্কের উত্তাল ঢেউয়ে এমন স্বপ্নমোহময় কিরণটুকু ভাঙিয়া দিয়া কি-ই বা লাভ!

অবশেষে বারান্দার ও-পাশে ষ্টোভের গর্জ্জন শোনা গেল, বিশ্বজিৎও কয়েকবার বাহিরে গিয়া কি সব তদারক করিল। ফলে মিনিট কয়েকের মধ্যে কিছু গরম শিঙাড়া ও জিলাপীর সঙ্গে পেয়ালা-দুই চা লইয়া বিশ্বজিতের স্ত্রী-ই ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ছোট ট্রের উপর খাবারের প্লেট ও চায়ের কাপ নামাইয়া তিনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

অমিয় বলিল, "এত আয়োজন করলেন কেন?"

বিশ্বজিৎ একখানা শিঙাড়া হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমি নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি আয়োজন বেশী নয়, এবং আপনার অতিথি হ'লে আপনিও এটুকু করতেন। তর্ক করবেন না, জিনিষের সদ্ব্যবহার করুন।" বলিয়া শিঙাড়ায় কামড় দিল। অগত্যা অমিয়কেও বিশ্বজিতের পন্থা অনুসরণ করিতে হইল।

চা খাওয়া শেষ করিয়া বিশ্বজিৎ বলিল, "কিছু মনে করবেন না, আমার স্ত্রী আপনার সামনে বেরিয়ে কথা কইলেন না বা একটি মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে খাবার জন্য অনুরোধ করলেন না, এটি হয়ত আপনার চোখে কিছু বিসদৃশ ঠেকল।"

অমিয় বলিল, "সম্পূর্ণ অপরিচিতের সামনে এক মুহূর্ত্তে প্রগল্‌ভা হওয়া আমাদের বাড়ীতেও বিধান নেই। আমরা পাড়াগাঁয়ে বাস করি। সমাজ-ধর্ম্মের প্রবল শাসন গ্রাহ্য না করলেও শৃঙ্খলা কিছু কিছু মানি। লজ্জার বাহুল্য মনকে পীড়া দিলেও, শালীনতা প্রকাশে মন ক্ষুণ্ণ হয় না। ওঁদেরকে শালীনতা শিক্ষা দিতে হয় না, নিজেদের সহজাত সংস্কার-বলে সকলের সঙ্গেই ওঁরা মানিয়ে চলতে পারেন।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আমার সন্দেহ হয়, বি-এ পাশ করলেও আপনি সত্যকারের প্রগতিমূলক শিক্ষা হয়ত লাভ করেন নি! আমাদের পাশের ঘরের ভাড়াটেও অল্প মাইনের চাকরে, কোন প্রেসে কাজ করেন। অথচ দেখুন নিত্য সন্ধ্যা বেলায় কোন পার্কে হাওয়া না খেলে ওঁদের মন সুস্থ থাকে না।"

অমিয় জিজ্ঞাসা করিল, "এ-বাড়ীতে ক-ঘর আপনারা থাকেন ?"

"আট ঘর। বাড়ীখানার সঙ্গে আমাদের মিলও চমৎকার। তাই নানান্ অসুবিধা সত্বেও ছাড়তে পারি নি।"

অমিয় হাসিয়া বলিল, "স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "স্বাস্থ্য আমাদের বিমাতা। যা মাইনে পাই তাতে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকা চলে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব আলোচনা পাগলামি। ও কি, উঠলেন যে!"

"শ্যামবাজার পাড়ি দিতে হবে—রাস্তা অনেকখানি।"

"বাসা বদলে নিকটে আসুন না কেন ?"

"মনে করেছি মাইনে পেলে একটা সস্তার মেস্-টেস্ দেখে নেব। হাঁটার জন্য নয়, অপরের গলগ্রহ হয়ে আর কত দিন থাকব বলুন ?"

কথা বলিতে বলিতে তাহারা বারান্দায় আসিল।

অমিয় দেখিল, বারান্দার ও-পাশে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিতা একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছে। মৃদুপুষ্পসারসৌরভে বারান্দা আমোদিত। অমিয়র কাসির শব্দ পাইয়া মেয়েটি হিল-উঁচু জুতার খুট্ খুট্ শব্দ তুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল এবং সেখান হইতে স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "ন-টার শো-টাও মিস্ করতে চাও ? তা হবে না।"

বিশ্বজিৎ ও অমিয় সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "ওঁর স্বামীই প্রেসে কাজ করেন।"

বাড়ীর বাহিরে আসিতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে ফণীবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

অমিয় সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি এখানে ?"

ফণীবাবু ম্লান হাস্যে বলিলেন, "আমি এই বাড়ীতেই থাকি। তা আপনি…ও, বিশ্বজিৎবাবুর কাছে এসেছিলেন ?"

অমিয় বলিল, "আপনার আপিস থেকে ফিরতে এত দেরী হ'ল যে ?"

মাথা নামাইয়া ফণীবাবু বলিলেন, "অন্য জায়গায় একটু কাজ সেরে আসতে দেরি হয়। আজ বোধ হয় একটু সকাল সকাল ফিরেছি।" বলিয়া ফণীবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

অমিয় বিশ্বজিতের পানে চাহিয়া বলিল, "ওঁর সম্বন্ধে সেক্সানে যা শুনি—"

বিশ্বজিৎ বলিল, "সবাই বলেন উনি বড়বাবুর গুপ্তচর ? বড়বাবু সম্বন্ধে, আপিস সম্বন্ধে, সায়েব সম্বন্ধে বা কাজ সম্বন্ধে যা কিছু কেউ আলোচনা করেন উনি তা বড়বাবুর কানে তুলে দেন—এই তো ?"

"হাঁ, এ-সব বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

"There are more things, অমিয়বাবু ; বিশ্বাস করুন চাই না-করুন কথাটা মিথ্যে নয়।"

"বলেন কি ?"

"হ্যাঁ, একটা কথা জানবেন, আমরা যা শিক্ষালাভ করি—তা আমাদের ছদ্মবেশকেই সাহায্য করে মাত্র। আমাদের জ্ঞানের পথকে প্রশস্ততর করে না। আর বড়বাবুর কানে সব কথা তুলে তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়াটাকে খুব সুখের মনে করবেন না। আচ্ছা, নমস্কার।"

অমিয়কে আর কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া বিশ্বজিৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অমিয় যে বিশ্বজিতের বাড়ী গিয়াছিল, সে-কথা পরদিনই আপিসময় রাষ্ট্র হইয়া গেল।

শম্ভুচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুনলুম তুমি কবিত্ব আলোচনা করছ ? কবির সঙ্গে বন্ধু পাতিয়েছ ?"

অমিয় বিস্মিত স্বরে বলিল, "কবি কে ?"

শম্ভুচন্দ্র চোখ নাচাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চেহারা দেখে অনুমান করে নাও, আমাদের মত কালো পাকাটে চেহারায় কি কবিত্বের ফুল ফোটে ? ওই দেখ—লম্বা, কোঁকড়া চুল, গৌরবর্ণ ফুটফুটে যে মানুষটি—"

বিশ্বজিতের পানে চাহিয়া অমিয় একটু হাসিল।

সুতরাং বড়বাবুও সে-কথা শুনিলেন।

অমিয়কে একান্তে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "শুনলুম, আপনি কাজে আজকাল বড্ড ভুল করছেন। আপিসে কাজের চেয়ে গল্প করেন বেশী। সাবধান ক'রে দিচ্ছি—"

অমিয় ফিরিতেছিল—তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সেক্‌সানে কে কেমন লোক, ছেলেমানুষ আপনি, এখনও চেনেন নি। যদি ঠিক মত অফিস ডিউটি করতে চান যার তার সঙ্গে মিশবেন না। ভাল কথা, খগেনবাবু দরখাস্তখানা পেয়ে কি বললেন?"

অমিয় এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কিছুই বলেন নি।"

বড়বাবু বক্রদৃষ্টিতে অমিয়র মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? তবে তো দেখছি খগেনবাবু আজকাল বাক্‌সংযম আরম্ভ করেছেন! আচ্ছা যান।"

অমিয় চেয়ারে আসিয়া বসিল, কাজে তাহার মন লাগিতেছিল না। আপিসের হাওয়া মনে হইতেছে নিশ্বাস লইবার পক্ষে অত্যন্ত ভারি। ভিতরে ভিতরে কিসের যেন ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

টিফিনের সময় অমিয় মাঠের ধারে লৌহবৃতির উপর পা রাখিয়া মধ্যাহ্নের আকাশে চিলের চক্রভ্রমণ দেখিতেছিল, অত্যন্ত সন্তর্পণে ফণীবাবু তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমার একটা কথা শুনবেন?"

অমিয় তাহার পানে চাহিল।

অমিয়র মুখের পানে না চাহিয়া ফণিবাবু বলিতে লাগিলেন, "আপনি হয়ত ভাবছেন আমি আপিসময় ব'লে বেড়িয়েছি আপনি বিশ্বজিতের ওখানে গেছলেন?"

অমিয় বলিল, "এ যেন সেই চোরকে প্রশ্ন করার মত কৈফিয়ৎ, ফণীবাবু।"

ফণীবাবু অন্য দিকে চাহিয়াই বলিলেন, "কতকগুলি লোককে বড়বাবু চিরকাল সন্দেহ করে আসছেন, আপনি নতুন লোক হয়ত জানেন না—তাদের সঙ্গে না মেশাই ভাল।"

"তাই নাকি? সে চিহ্নিত লোকগুলির নাম?"

"আপনি ঠাট্টা মনে করছেন, কিন্তু চাকরি করতে এসে বড়দের সঙ্গে টক্কর দিয়ে কত ক্ষণ চলা যায় বলুন? ওঁরা যদি ইচ্ছা করেন, আপনার ভুল বেরুবে অসংখ্য এবং চাকরির দফাও দু-দিনে গয়া।"

অমিয় কোন কথা কহিল না।

ফণীবাবু বলিতে লাগিলেন, "ওই খগেনবাবু, বড়বাবুর সঙ্গে ছিলেন এক গ্রেডে, কাজ দেখিয়ে ইনি উঠলেন ওপরের গ্রেডে, ওঁর হ'ল হিংসে। চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি যে আলাদা, সে-কথা যাঁরা বোঝেন তারাই উন্নতি লাভ করেন। সায়েবের বাড়ী ফুলের তোড়া পাঠানই বলুন, সেক্‌সন সম্বন্ধে কোন গুপ্তকথা উপরওয়ালার কানে তোলাই বলুন—দু-কলম লেখার চেয়ে ও কৃতিত্বগুলিও কম নয়।"

"তাই নাকি? আপনি নিশ্চয়ই ও-গুলির অনুশীলন করেন?"

"করি বৈকি অমিয়বাবু। লেখাপড়া শিখি নি বামুনের ছেলে—এ-চাকরিটি খোয়ালে আর কোথাও পাঁচ টাকা মাইনের একটা জুটিয়ে নিতে পারব না, কাজে কাজেই সব দিক বজায় রেখে চলতে হয়। আর যিনি অন্নদাতা, তাঁর আপিসেরই খবর যদি তাঁকে জানাই, সেটা কি আমার পক্ষে এতই ঘৃণ্য কাজ?"

অমিয় সবিস্ময়ে ফণীবাবুর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল চোখে তাঁহার দু-ফোঁটা জল। সত্যিই কি অন্নদাতার প্রতি ফণীবাবুর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন ঐ দু-ফোঁটা জল, না ভাববিলাসিতার দুর্ব্বল প্রকাশ?

সহসা সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ফণীবাবু, আপনি বুঝতে পারেন সবাই এ-কাজের জন্য আপনাকে ঘৃণা করেন?"

ফণীবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "ঘৃণা করেন? কেন? তাঁরা যা করেন আমিও তো তাই করি।"

"সকলেই কি ---"

"ওই খগেনবাবুর কথাই ধরুন—আমাদের সামনে তো হেন করেগা তেন করেগা—যত লাফালাফি; বড়বাবু কটমটিয়ে একবার চাইলে মাথা তুলতে পারেন?··· শুনেছেন একটা কথা"

"কি?"

"গেল বছর থেকে রেলের আয় কমে গেছে শীঘ্রই রিট্রেঞ্চমেণ্ট সুরু হবে। হয় কেরানীদের কম মাইনে নিয়ে কাজ করতে হবে, নয় লোক-ছাঁটাই হবে।"

"কোন্‌টা সম্ভব মনে করেন?"

"কি জানি অফিসারদের মর্জি? কমতে লোকই কমবে, মাইনে হয়ত কমবে না।"

"কেন?"

"কেন আবার—বড় বড় সায়েবরা কি কম মাইনে নিয়ে কাজ করবেন? তা আর করতে হয় না।"

"তবে কি রকম ছাঁটাই হবে?"

"কাজের লোক দেখে।"

"কে কাজের লোক কে বা অকাজের ঠিক করবেন কে?"

"যাঁরা চিরকাল ঠিক করেন, তাঁরাই করবেন। সেক্‌সানের যাঁরা ইন্‌-চার্জ্জ তাঁদের মতামত নিয়েই উপর-ওয়ালারা কাজ করেন চিরকাল। তাই বলছি, চাকরিটি বজায় রাখতে চান তো ওদের দলে ভিড়বেন না।"

"কিন্তু দলের কারও নাম তো আপনি করলেন না।"

"আপনি বুদ্ধিমান, নিশ্চয়ই বুঝেছেন।—তবু শুনে রাখুন, ঐ খগেনবাবুর ত্রিসীমানায় যাবেন না, দাদার মুখখানি মিষ্টি কিন্তু অন্তরে জিলিপির প্যাঁচ! ওই শান্তি, রমেন—এমন কি বিশ্বজিতের সঙ্গে—"

অমিয় বলিল, "কিন্তু আপনি তো বিশ্বজিতের সঙ্গে এক বাসায় থাকেন, বড়বাবু কিছু বলেন না?"

"বলেন না আবার, দু-বেলা ধমকান। কিন্তু উপায় কি বলুন, অত কম ভাড়ায় বাড়ী কোথায় পাই বলুন তো? অবশ্য বড়বাবু মাঝে মাঝে বলেন যে তাঁর বাড়ী গিয়ে সস্ত্রীক থাকতে, কিন্তু কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে।"

"বেশ তো, ভাড়া লাগবে না।"

"ভাড়ার কথা নয়, অমিয়বাবু।···আচ্ছা, আচ্ছা, একদিন আপনাকে বলব সব কথা, তখন বুঝবেন সব।"

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া টিফিনের ঘণ্টা পড়িল। অমিয়র পাশে চলিতে চলিতে ফণীবাবু চুপি চুপি মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে যে এত কথা বললাম, খবর্দ্দার, বড়বাবু যেন তার বিন্দুবিসর্গও জানতে না পারেন।"

"কেন, আমি তো শত্রুদলের নই!" বলিয়া অমিয় হাসিল।

ফণীবাবু বলিলেন, "না, না, তা বলছি নে। তবে, তবে কি জানেন, বড়বাবু শিক্ষিত লোক মাত্রকেই বিশ্বাস করেন না—একটু ইয়ের চক্ষে দেখেন। তা আপনার সম্বন্ধে কোন ভয় নেই, একটু বড়বাবুকে ইয়ে করে চলবেন; এই যা বলবেন, শুনবেন, তর্ক করবেন না। ধরুন কোন ইংরাজি নোট যদি ভুল দেন তো করেক্ট ক'রে দেবেন, এই আর কি।"

টিফিনের ঘণ্টা পড়িলেও দাদার টেবিল ঘিরিয়া অনেক-গুলি লোক বসিয়াছিলেন এবং লোক-ছাঁটাইয়ের আলোচনা হইতেছিল। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই সংবাদে কেরানী-মহলে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

শান্তি বলিতেছিল, "ভারি তো চাকরি, তালপাতার ছাউনি! ঢুকে অবধি শুনছি, গেল, গেল। আজ পাঁচ বছর ধরে শুনছি মশাই।"

রাজেন উত্তর দিল, "যাই হোক, একে তো এতেই সংসার চলে না, কম মাইনেয়—"

খগেনবাবু বলিলেন, "যখন কম মাইনে পেতেন তখন চলত কি করে?"

রাজেন বলিল, "ধার, স্রেফ ধার।"

খগেনবাবু বলিলেন, "এখনও মাইনে বেড়ে ধার তো কমে নি। ও রেলওয়ে বোর্ডই করুন, আর এসো-সিয়েশনের ধুঁ দিয়ে ভাইস্‌রয় অবধি যান, ফল কিছুই হবে না। যাঁরা কাজ করব না বলে ভয় দেখাচ্ছেন তাঁরাই তখন সোনা হেন মুখ করে দশটা-পাঁচটা বজায় রাখবেন। এ. বি. রেলের ষ্ট্রাইকের কথা এত শীঘ্র ভুলে গেলেন?"

শান্তি বলিল, "আমরা যে হয়েছি হ্যাংলা, যেন চাকরি ছাড়া আর গতি নেই! এক জন কাজ ছেড়েছে কি হাজার জন হাঁ ক'রে কলম উঁচিয়ে ব'সে আছে।"

দাদা বলিলেন, "তাই তো চুপচাপ থাকি ভায়া। আজ যদি হঠাৎ আদ্ধেক মাইনে করে দেয় তা হলেও মরতে মরতে এখানে হাজিরা দিতে হবে, কাজেও মনোযোগ কম করলে চলবে না।"

শান্তি একটু রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "আপনাদের মত বুড়োদেরই চাকরিতে অসীম মায়া। নিজের যোগ্যতায় আপনাদের আস্থা নেই।"

দাদা উত্তর না দিয়া হাসিলেন। খগেনবাবু কিন্তু পরুষ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মানে? আপনারা ছোকরারা চাকরির কেয়ার করেন না? দেখলুম অনেক মশায়, ইউনিভার্সিটির অনেক ডিগ্রীধারী এই ফ্যানের তলায় ব'সে মিইয়ে গেলেন।"

শান্তি বলিল, "অন্যের কথা জানি না। কিন্তু মাইনে কমালে বা চাকরি ছাড়িয়ে দিলে লড়ব শেষ অবধি। হয় এস্পার, না হয় ওস্পার।"

টেবিল চাপড়াইয়া খগেনবাবু বলিলেন, "দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় মরে।"

দাদা একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ওঠ, ওঠ সব, অনেকক্ষণ দুটো বেজে গেছে। ঐ দেখ ফাইল হাতে করে চাপরাশী ফিরে এল—বড়বাবুও ওর পেছনে পেছনে আসছেন হয়ত।"

বলা বাহুল্য মুহূর্তে বৈঠক ভাঙিয়া গেল। শান্তির আস্ফালনবাক্যে মুখগুলি কাহারও প্রফুল্ল বোধ হইল না—ভাবী অমঙ্গলের গাঢ় কালিমাতে সেগুলি অন্ধকার হইয়াই রহিল।

ঠিক ঘণ্টাখানেক পরেই ফণীবাবু একখানা কেসবোর্ড হাতে করিয়া অমিয়র টেবিলের সম্মুখে দেখা দিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার মুখে আপনার সুখ্যাতি শুনে বড়বাবু বললেন, আচ্ছা, এই কেসটা ষ্টাডি ক'রে ওঁকে একটা নোট দিতে বল তো দেখি তোমার কেমন গ্রাজুয়েট। বড়বাবুর নোটটাও ওর সঙ্গে আছে, ইচ্ছে করলে ওটাও দেখতে পারেন।"

ফাইল রাখিয়া ফণীবাবু চলিয়া গেলেন।

দাদা উঁকি মারিয়া বলিলেন, "কিসের ফাইল হে অমিয় ভায়া?"

অমিয় বলিল, "কি একটা ভুল ভাড়া ছাপা হয়েছে—"

দাদা শশব্যস্তে চেয়ার হইতে উঠিয়া অমিয়র পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন—মুখে তাঁহার আতঙ্ক পরিস্ফুট। শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, "আমার ভুল নয় তো? একে তো দশটা ওয়ার্ণিং অফেন্স-বইয়ে নোট করা আছে, এইটে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।"

অমিয় খানিকটা পড়িয়া বলিল, "না, আপনার ভুল নয়, শান্তিবাবুর নাম দেখছি।"

দাদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "যাক্, বাঁচা গেল।"

অমিয় সবিস্ময়ে বলিল, "কিন্তু ওঁরও শাস্তি হ'তে পারে তো?"

দাদা হাসিমুখে বলিলেন, "শাস্তি তো হবেই, বেচারার ইন্‌ক্রিমেণ্ট হয়ত শেষ অবধি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

"এই সামান্য ভুলে এত গুরু শাস্তি হতে পারে?"

দাদা গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন, "লঘু ভুলের নোট যদি গুরু ক'রে দেওয়া যায়, তবে সায়েবরা এর গুরুত্ব বুঝবেন না কেন, ভায়া? সবই নোট দেবার উপর নির্ভর করে।"

অমিয় বলিল, "আমাদের বড়বাবু কি সবই এই রকম নোট দেন?"

দাদা চারিদিকে আর এক বার সন্তর্পণে চাহিয়া তেমনই নীচু গলায় বলিলেন, "ব্যক্তিবিশেষে নোটের চেহারা বদলায়। তোমরা বুদ্ধিমান, বিদ্বান, এই দশ-বারো দিনেও এখানকার হালচাল বুঝতে পার নি, ভায়া?"

এমন সময় ফণী আসিয়া পাশে দাঁড়াইতেই দাদা হাস্যমুখে বলিলেন, "বড়বাবু তো আমাদের বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ করেন, কিন্তু সায়েব বড় সুবিধের নয়। এসো ফণীভায়া, পান খাবে এস।"

অমিয় ফাইল খুলিয়া ব্যাপারটি আগাগোড়া পড়িয়া লইল। সত্য কথা, আপিসের কেস প্রবেশিকার পরীক্ষা পত্র নহে, ব্যাকরণ বা বানান শুদ্ধ করিয়া লিখিবার সতর্কতাও কেহ উপলব্ধি করেন না, কোন রকমে অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিলেই যথেষ্ট, কিন্তু ইংরেজি লেখার এ দুর্দ্দশা অমিয়কে অত্যন্ত আঘাত করিল।—ক্রিয়ার সঙ্গে কর্ত্তার সম্বন্ধ নাই, বানানে যথেচ্ছাচারিতা এবং ব্যাকরণকে একদম অস্বীকার করা হইয়াছে।

কলম ধরিয়া অমিয় বড়বাবুর নোটের সংস্কার সাধন করিতে লাগিল।

ফণীবাবু পান মুখে দিয়া পুনরায় অমিয়র পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"ওকি করছেন, অমিয়বাবু?"

"লেখাটা আগাগোড়া ভুল, তাই ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

ফণীবাবু দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "বড়বাবুর লেখা ভুল। এ যে আগাগোড়াই ঢেলে সাজছেন! অমন কাজটি করবেন না।"

অমিয়ও সবিস্ময়ে বলিল, "তবে বললেন কেন করেক্ট ক'রে দিন?"

ফণীবাবু বলিলেন, "করেক্‌শান্ মানে তো আগাগোড়া বদল নয়।"

এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া অমিয় নিজের লেখা নোটটি ছিঁড়িয়া ফেলিল ও ফাইলটি ফণীবাবুর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "তা হলে আমাকে দেখাবার দরকার নেই। বলুন গে ঠিক আছে।"

ফণীবাবু আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "তাহলে ঠিক আছে? পাশ না করলে কি হয় মশায়, বড়বাবু আজ পর্য্যন্ত যে কলম ভেলেছেন তা কোন সায়েব পর্য্যন্ত একটি লাইন কাটতে সাহস করেন নি।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা আছে? দিন না, পরশু মাইনে পেলেই দিয়ে দেব।"

অমিয়র কাছে গণ্ডা বারো পয়সা মাত্র ছিল, অবশ্য এই বার গণ্ডা পয়সা সে তিন দিনে খরচ করিত না, তথাপি বিদেশে এই সামান্য পুঁজি হাতছাড়া করিতে সে চিন্তিত হইয়া উঠিল। বলিল, "বার আনা পয়সা মাত্র আছে—"

ফণীবাবু বলিলেন, "বিপদ কি জানেন, পয়সা আমারও দরকার হ'ত না। বড়বাবু এইমাত্র বললেন, "ওহে ফণী, দু-সের ভাল ছানা নিয়ে এস তো বৌবাজার থেকে, আজ রাত্রে বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে জনকতক লোক বলেছি—। রতন গোটা দুই বড় এঁচোড় দিয়েছে তার ডালনা হবে, ছানার ডালনা একটা, আর ও-মাসে শম্ভু দুটো বিলাতী কুমড়ো দিয়েছিল, পটল তুলসীর কাছ থেকে টাটকাই পেলাম। দেখ, ছানাটা যেন ভাল হয়।" বলে আট আনা পয়সা মাত্র দিলেন। এখন বিপদ হয়েছে কি জানেন, ছানার সেরই আজ আট আনা, আর আট আনা না হলে দু-সের ছানা কিনি কোত্থেকে বলুন?"

অমিয় বলিল, "কেন বড়বাবুকে বলে আর আট আনা চেয়ে নিন না, সব দিন দর তো ঠিক থাকে না।"

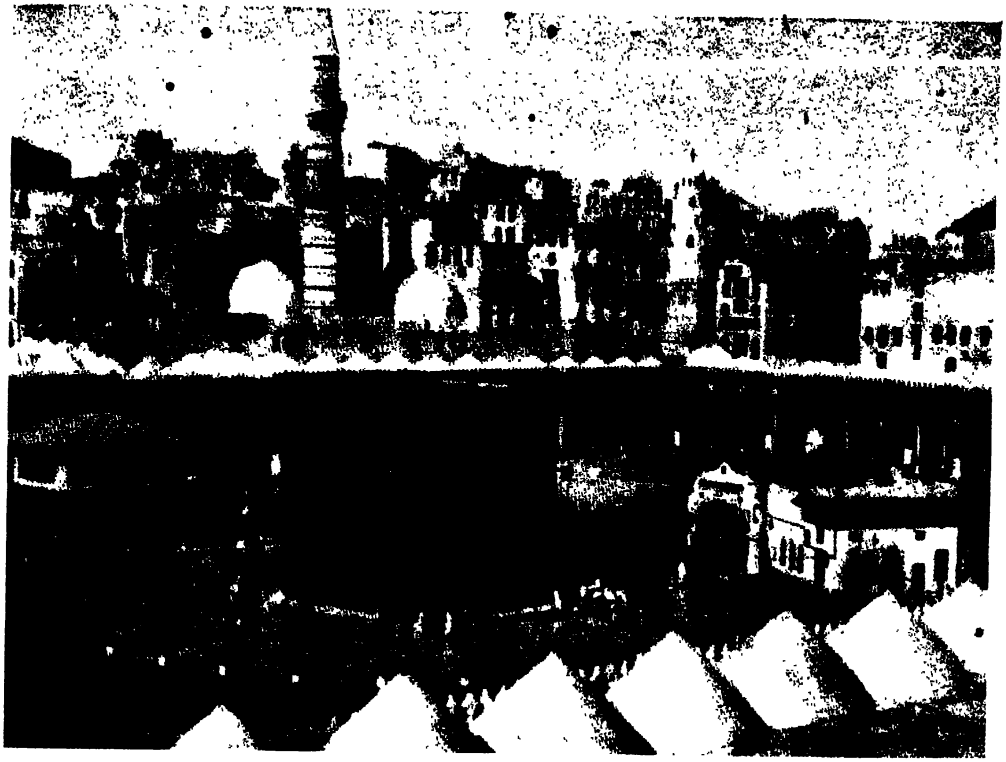
ফণীবাবু কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন, "এক দিন সস্তার বাজারে চার আনা সের ছানা ওঁকে এনে দিয়েছিলাম, উনি সেই দরটি ধরে বরাবর আমায় দাম দেন, প্রায়ই দু-এক আনা পকেট থেকে ঘুষ দিয়ে ওঁর দরটি বজায় রাখি।"

অমিয় বলিল, "এ মিথ্যাচরণ করবার দরকার? যা সত্য কথা তাই বললেই তো পারতেন।"

ফণীবাবু সাতঙ্কে বলিলেন, "চুপ, চুপ। দু-এক আনার জন্যে চাকরিটি হারাব মশায়? আমার তো কখনও সখনও দু-এক আনা যায়, আর যাঁরা বাজার থেকে আম, তরকারি কিনে এনে বাড়ীর জিনিষ ব'লে চালাচ্ছেন— তাঁদের অবস্থাটা ভাবুন দেখি! বড়বাবুর ধারণা ওঁর মত সস্তা জিনিষ এ দুনিয়ায় কেউ কিনতে পারে না, পাড়ায় এই নিয়ে গল্প করেন। আমরা ওঁর সে-ধারণাকে ভাঙতে পারি কি? না সে ধারণা ভাঙা আমাদের উচিত!"

পয়সা দিয়া অমিয় আর ফণীবাবুর দিকে চাহিল না। সারা মনে তাহার বিষক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। এই তো জীবন! কেরানীর জীবন! সামান্য সত্যকে প্রকাশ করিবার ভাষা তাহাদের মুখে জোগায় না, অহরহ মিথ্যার মায়াজাল বুনিয়া দিব্য হাসিয়া ও কৌতুক করিয়া জীবন তাহাদের কাটে! কেন এ জীবন, কিসের জন্য বাঁচিয়া থাকা। কিন্তু এই স্রোতহীন নদীর পারে বসিয়া এই সব অনাবশ্যক প্রশ্নে মনকে উত্যক্ত করিয়া কিই বা লাভ? আপিস এবং বড়বাবু, ঋণ এবং কন্যাদায়…হাজার রকমের দুঃখকে অস্বীকার করিয়া হাজার রকমের সুখকে সঞ্চয় করিবার নেশা—ইহা লইয়াই তো জীবন দিব্য কাটিয়া যায়। কি কাজ আত্মবোধে বা আত্মপ্রশ্নে?

কাল শনিবার। হাতে পয়সা নাই, ইচ্ছা থাকিলেও অমিয় বাড়ী যাইবে না। কলিকাতার বুকে বসিয়া সপ্তাহ ভোর যে-রুক্ষতা মনকে পিষ্ট করিয়া তোলে, শিয়ালদহ হইতে ট্রেন ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নীল আকাশ ও শ্যামল



মক্কা

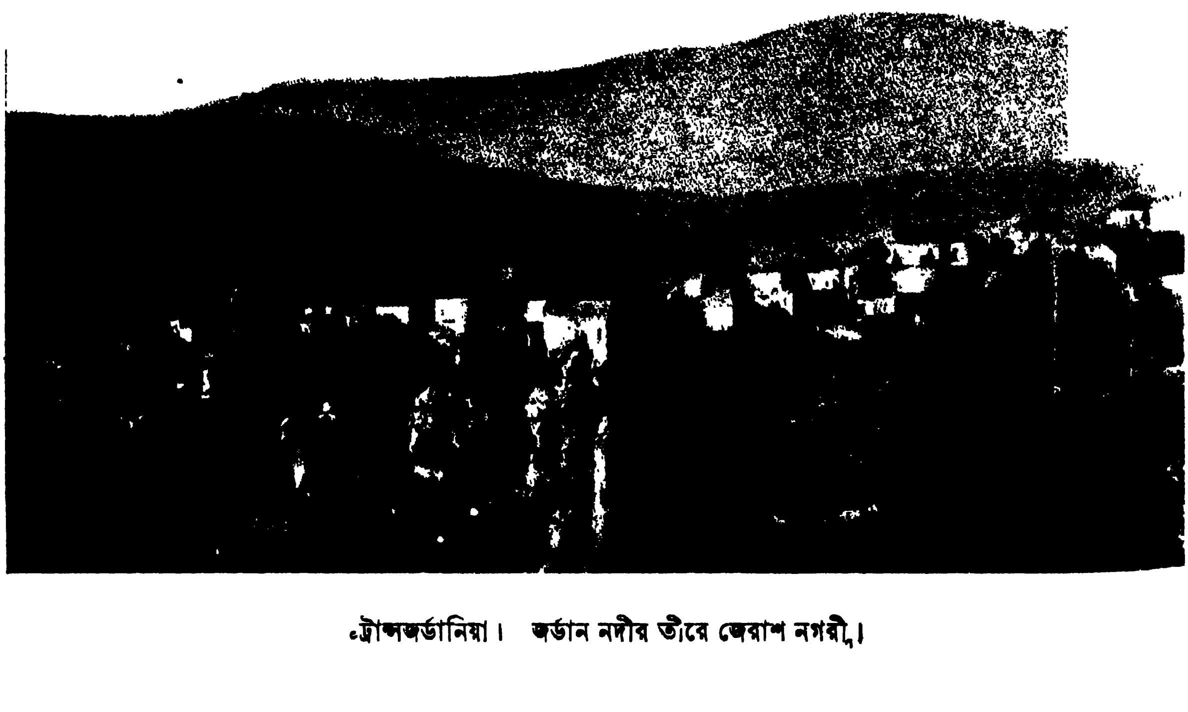


মদিনা

[এশিয়া মাইনর ও হেজাজ রেলপথ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]



সিরিয়ার উত্তরে ভূমধ্যসাগরকূলে আলেকজান্ড্রেটা বন্দর



ট্রান্সজর্ডানিয়া। জর্ডান নদীর তীরে জেরাশ নগরী।

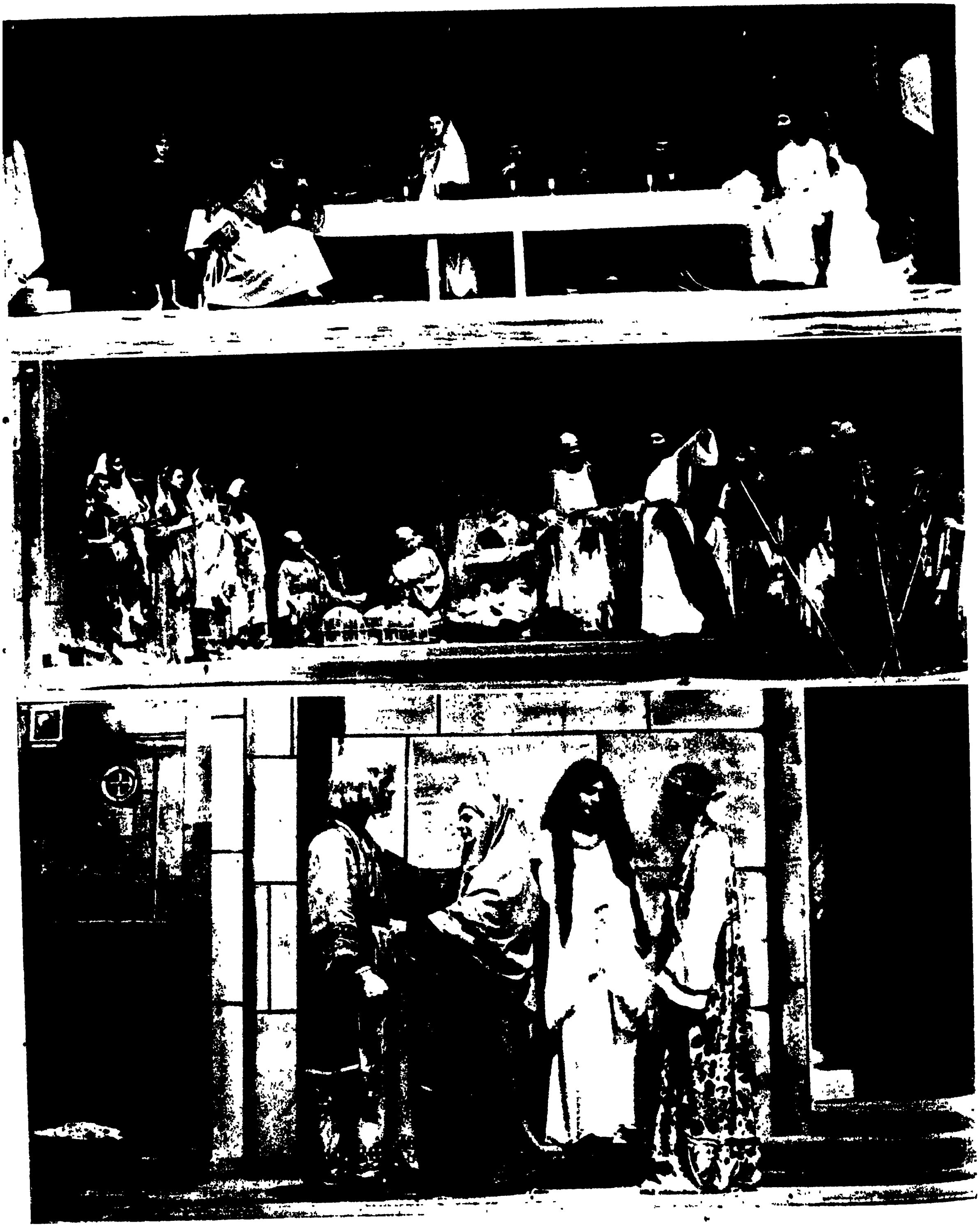


দামস্কস—আকাশ হইতে গৃহীত চিত্র





পথে ও পথের শেষে। স্পেনের নিরাশ্রয় লোকজনের ফ্রান্স-সীমান্তে যাত্রা



উপর হইতে : সাইমনের গৃহে খ্রীষ্ট ॥ ব্যবসায়- ও দ্যূতক্রীড়া-কলুষিত ধর্ম্মমন্দিরে খ্রীষ্টের অভিযান
খ্রীষ্ট-নিগ্রহ-সংবাদে মাতা মেরী ও মেরী মাগদালিন ॥
[কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে অনুষ্ঠিত খ্রীষ্ট-জীবন অভিনয়ের চিত্র]

মাঠের সাহচর্য্যে মন আবার সরস হইয়া উঠে, সে-রুক্ষতা কোথায় মিলাইয়া যায়। আপিসের কারাপ্রাচীরের বাহিরে এই যে একটি দিনের পরিপূর্ণ মুক্তি—এ-মুক্তির পরিচয় কর্ম্মহীন অবস্থায় একদিনও সে পায় নাই। সপ্তাহব্যাপী বন্ধনের বেদনায় মন যখনই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে—যখন গ্লানিতে, অতৃপ্তিতে, আত্মধিক্কারে মনের বিকার দেখা দেয় অমনই শনিবারের প্রভাত দেখা দেয়। প্রভাতের আলোয় আপিসের কারাপ্রাচীর বিলীন হইয়া দেখা দেয়—অনন্তপ্রসারী নীল আকাশ আর সবুজ মাঠ, একখানি ভগ্ন গৃহের প্রাচীর, কয়েক ক্রোশ ব্যাপী বাব্‌লা বৃক্ষ আকীর্ণ প্রান্তর এবং প্রান্তরগামিনী গঙ্গার মহিমময়ী মূর্ত্তি। সপ্তাহের পর এক দিন বিশ্রাম যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনি সত্যই ভগবান।

বাড়ী যাইবার উত্তেজনায় সপ্তাহের ছয়টি দিন দিব্য কাটে। শুক্রবারের বৈকাল হইতে সেই উত্তেজনা প্রবল হইয়া শনিবারের দিনটিকে নিমেষে কোন্ কল্পলোকে যেন উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। শনিবার হাজিরা-খাতা সহি করিয়া চেয়ারে বসা ছাড়া কাজ কিছু অগ্রসর হয় না, এমন কি এই দিন সহকর্ম্মী কাহারও দুঃখের কথা শুনিতে ভাল লাগে। আজ কাজের ভুলে মনে ত্রাসের সঞ্চার হয় না, বড়দের ভ্রূকুটিতে মন খারাপ হয় না, চাই কি কেহ ধার চাহিলেও কয়েক আনা ধার দেওয়াও বিচিত্র নহে। আধ ময়লা ঝাড়নে বাঁধা সংসারের কত কি টুকিটাকি জিনিষ···কোনটা আধ পয়সা সুবিধা দরে পাওয়া গিয়াছে, কোনটা দেশে মিলে না। মন আজ সঞ্চয়ের নেশায় মাতিয়াছে।

তাড়াহুড়ায় ছুটা বাজিয়া গেল। যাহারা বাড়ী যাইবে তাহারা পোঁটলাপুঁটলি লইয়া কয়েক মিনিট আগেই বাহির হইয়া গিয়াছে; সহরের জন কয়েক বাসিন্দা শুধু কলম চালনা করিতেছে। অমিয়র বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইল; টিকেট কাটার ব্যস্ততা, বাজার করার ব্যস্ততা এবং ট্রেনে ওঠার ব্যস্ততায় মন যেন উড়িয়া চলে। শনিবারের ছুটির পর আপিসের বিভীষিকা মনকে শুষ্ক করিয়া তুলে, এবং আপিসের বাহিরেও সমস্ত পথটা যেন প্রাণহীন। কলিকাতার দোকানে, বাজারে, ফুটপাথে তেমন প্রাণের প্রবাহও বুঝি নাই। এখানে যাঁহাদের বাড়ী তাঁহাদের কাছে শনিবারের এই ছুটাছুটি মূল্যহীন! তাঁহারা হয়ত খতাইয়া দেখেন, দীর্ঘ মেঠো পথ অতিক্রমের পরিশ্রম, বাজে জিনিষ পত্র কেনার হায়রানি, এবং সোমবারের অস্নাত, অভুক্ত শুষ্ক মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ক্লান্তির একটি গভীর বেদনা বোধ! তাঁহারা যাহাই দেখুন, অমিয়র মনে হইল, শনিবার দ্বিপ্রহরে কলিকাতার অপমৃত্যু ঘটে! যাঁহারা ছুটির বাজারে আমোদ-আহ্লাদ করিতে থিয়েটার-সিনেমায় ভিড় জমান, ক্রিকেট-ফুটবলের মাঠে রৌদ্রদগ্ধ হন অথবা রেস-কোর্সে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন তাঁহারা সহরের মৃতদেহ কাঁধে করিয়াই আনন্দের অন্তরালে শোককে বহিয়া বেড়ান। জীবন যে কি করিয়া সম্পদ হয় সে ধারণা তাঁহাদের নাই, অথবা জীবন সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রকমের নিশ্চেষ্টতা তাঁহাদের ধাতুসহ হইয়াছে।

বিশ্বজিৎ ম্লানমুখ অমিয়র পাশে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "অমিয়বাবু, চলুন।"

"কোথায়?" বিহ্বলের মত অমিয় প্রশ্ন করিল।

"এখনি আপিসের দরজা বন্ধ হবে—যেতে তো হবে।"

অমিয় উঠিল।

পথে আসিয়া বিশ্বজিৎ বলিল,—"ভাল লাগছে না, কেমন?"

অমিয় ঘাড় নাড়িল।

"বাড়ী গেলেন না কেন? থাক্, থাক্, বুঝতে পেরেছি। এখন শ্যামবাজারের বাসাও বোধ হয় ভাল লাগবে না।"

অমিয় বলিল, "খানিক মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক্।"

"শুধু শুধু রোদে ঘুরে শরীর খারাপ করা। তার চেয়ে আসুন আমার বাসায়।"

অমিয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "না, থাক?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বুঝেছি, একখানি ঘর—তার মধ্যে বসে আড্ডা জমাতে আপনার মন চাইছে না। কিন্তু আপনাকে আমি অভয় দিচ্ছি, আর এক জনের কথা ভেবে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, আসুন।"

অমিয় বলিল, "তার চেয়ে পার্কে চলুন না কেন?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আপনি অত্যন্ত লাজুক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সরখানি পরিচয়ই কি ভদ্রতা আর এটিকেট

দিয়ে বানানো। আসল পরিচয় যেখানে মানুষ পায়—সেখানে লজ্জা তার বাহুল্য মাত্র। জানেন, আমি এই মুহূর্ত্তে আপনার প্রতি 'আপনি' সম্বোধন তুলে নিতে পারি ?"

অমিয় খুশী মনে বলিল, "পারেন ? সত্যি পারেন ? আঃ তা হলে আমি বেঁচে যাই।"

বিশ্বজিৎ অমিয়র হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া বলিল, "এসো। তোমার ছোট ভাই বা বড় দাদা আছেন ?"

"না" বলিয়াই অমিয় হাসিয়া ফেলিল, এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আছেন, আছেন।"

"কৈ, শুনিনি তো ?"

"আমিও জানতাম না,—কিন্তু এই মাত্র জানলাম।"

বিশ্বজিৎ তাহার হাতের চাপ দৃঢ় করিয়া কহিল, "তা হলে দাদার আদেশ মান্য করে চলবে।"

অমিয়র মুখে ঈষৎ ছায়া পড়িল। কহিল, "কিন্তু দাদার আদেশ মান্য ক'রে চললে আমার চাকরিটি থাকবে তো ?"

"মানে ?"

"ফণীবাবু বলেন, আপনি নাকি চিহ্নিতনামা লোক ?"

"ফণীবাবু বলেছেন এ কথা ?" বিস্ময় কাটিয়া বিশ্বজিতের মুখে গাম্ভীর্য্যের ছায়া নামিল, "ওঃ, তা সে বলতে পারে এ-কথা। সে-ই শুধু বলতে পারে।"

"ও-কথা কেন বললেন ?"

"ক্রমে সব শুনবে। একটা কথা ভাবছি, নূতন চাকরি তোমার, চিহ্নিত লোকের সঙ্গে মিশে সত্যিই যদি কোন অনিষ্ট হয় ?"

"অনিষ্ট ?" অমিয় হাসিল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "আমি জানি অনিষ্টকে তুমি ডরাও না, অন্যায়কে অগ্রাহ্য করবার সাহসও তোমার আছে। না হ'লে সমস্ত জেনে শুনে তোমাকে কি আমার বাসায় সেদিন টেনে নিয়ে যেতে পারতাম ! তবু ভাই—"

অমিয় বলিল, "তবু নেই। একটু পা চালিয়ে, ক্ষিদেটা আমার বেশীই পেয়েছে।"

"তাই নাকি ? তোমার যে ক্ষিদে পায় এ-কথা যেন নূতন বলে মনে হচ্ছে।"

দু-জনেই হাসিতে লাগিল। [ক্রমশঃ]



কাঠখোদাই শ্রীবাসুদেব রায়

মা ও ছেলে

মাতৃভাবে ব্রহ্মসাধন

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

যে ধর্ম্ম ঈশ্বরের সহিত মানবের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ দেখাতে পারে না, তাতে হৃদয় তৃপ্তি পায় না। এমন ধর্ম্ম আছে যাতে বুদ্ধি তৃপ্ত হয়, কিন্তু হৃদয় তৃপ্ত হয় না। হৃদয় তৃপ্ত না হ'লে বুদ্ধির তৃপ্তি স্থায়ী হয় না, সুতরাং ধর্ম্মও থাকে না। বাঙালী জাতি হৃদয়-প্রধান। এই জাতির মধ্যে অনেক বুদ্ধি-প্রধান ব্যক্তি আছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালীই প্রধানতঃ হৃদয়ের তৃপ্তি খোঁজে। কোন কোন বাঙালী বুদ্ধি-প্রাধান্য নিয়ে যৌবন ও প্রৌঢ় বয়স কাটিয়ে দেয়, কিন্তু শেষ জীবনে এমন ধর্ম্ম অবলম্বন না ক'রে থাকৃতে পারে না যাতে হৃদয় তৃপ্ত হয়। হৃদয়ের তৃপ্তিকর দুটি ধর্ম্ম বাঙালীর মধ্যে প্রবল। প্রথমটি হ'চ্ছে ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখা, দ্বিতীয়টি তাঁকে স্বামীভাবে দেখা। প্রথমটি শাক্তদের মধ্যে প্রবল। দ্বিতীয়টি বৈষ্ণবদের মধ্যে। কিন্তু অনেক বাঙালী পরিবারে শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবের মিলন দেখতে পাওয়া যায়। এমন একটি পরিবারেই আমি জন্ম ও শিক্ষা লাভ করেছি। তার ফলে শাক্তের 'বীর' ভাব পরিহার ক'রেও তাঁর কোমল মাতৃভাবের পক্ষপাতী হয়েছি; আর বৈষ্ণবের 'মধুর' ভাবের পক্ষপাতী হয়েও তাঁর গোপী ও রাধা ভাবের আতিশয্য পরিহার করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে 'মা' বা 'পতি' যে-ভাবেই সাধন করা যাক্, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন-শিক্ষার প্রভাবে অনেক বাঙালীর পক্ষেই জ্ঞানবর্জ্জিত অন্ধ-বিশ্বাসের ধর্ম্ম-সাধন অসম্ভব হয়ে পড়েছে, সুতরাং ভক্তিধর্ম্ম যে-আকারেই গ্রহণ করা যাক্, তাকে দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান চাই, এই প্রয়াসে আমি এ-দেশের বেদান্তদর্শন ও পশ্চিম দেশের হেগেল-দর্শনের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। বেদান্তদর্শনের ভিত্তি 'ঈশা'দি দ্বাদশ উপনিষদ্। বেদান্ত-ব্যাখ্যায়ক আচার্য্যদের মধ্যে প্রধান শঙ্কর ও রামানুজ। শঙ্কর প্রধানতঃ ঔপনিষদ ব্রহ্মর্ষিদের অনুসরণ করেছেন। রামানুজ প্রধানতঃ ঔপনিষদ দেবর্ষি ও রাজর্ষিদের অনুবর্ত্তী। হেগেল-দর্শনের ইংরেজ ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে গ্রীণ, কেয়ার্ড-ভ্রাতৃদ্বয়, ওয়ালেস, হলডেন্ ও জোন্স্ রামানুজের ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ব্র্যাড্‌লী ও বসাঙ্কে শঙ্করের ন্যায় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী। দেশীয় ও বিদেশীয় এই উভয় শ্রেণীর দার্শনিকের নিকট আমি অনেক শিক্ষা করেছি। কার নিকট কি শিক্ষা করেছি তা না ব'লে ভক্তিধর্ম্মের ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁদের সাহায্যে যা বুঝেছি তাই এস্থলে সংক্ষেপে বলছি। দেখাতে চেষ্টা করব যে ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদের মাতা-সন্তান সম্বন্ধ, তা অন্ধবিশ্বাসের বিষয় নয়, সূক্ষ্ম দার্শনিক জ্ঞানের বিষয়। দর্শনে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন দর্শন বুঝি কেবল পরোক্ষ অনুমান নিয়েই ব্যস্ত, প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বাভাবিক বিশ্বাসের কোন ধার ধারেন না। একথা ঠিক নয়। দর্শনশাস্ত্র বলেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান, অনুভূতি ও অনুমান, অচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ, কেউ কাহাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, চলতে পারে না। জ্ঞানের কোন উপাদানই দর্শনশাস্ত্রের অধিকার-বহির্ভূত নয়।

জ্ঞানের সাক্ষ্য ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও লক্ষণ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, সুতরাং জ্ঞানের পরীক্ষা, জ্ঞানের উপাদানগুলির বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ, এই হচ্ছে সন্তোষকর জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। জ্ঞানের পরীক্ষা না ক'রে কেবল পরম্পরাগত বিশ্বাস মেনে নেওয়া, অথবা সে-সব বিশ্বাস অমূলক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া, উভয়ই অযৌক্তিক। যাকে আমরা আপাততঃ অতি স্থূল জ্ঞান মনে

করি,—চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়-ঘটিত জ্ঞান,—তা পরীক্ষা করলেও তার ভিতরে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব পাওয়া যায়। আমার সুমুখের খাতা বা বইখানা, যা দেখছি ও ছুঁইছি, যার উপর হাতের আঘাত করলে শব্দ শুনি, যা চক্ষু, কর্ণ ও স্পর্শের বিষয়, তা জানতে গিয়ে অতীন্দ্রিয় বস্তু আত্মাকে জানতে হয়। দেখা, শোনা, ছোঁওয়ার ভিতরে 'আমি'র জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, রয়েছে। আমি-ছাড়া, আত্মা-ছাড়া, দেখা, শোনা, ছোঁওয়ার কোন অর্থই নেই। এই আত্মার ভিতরে দুটি ভাব রয়েছে,—সসীম ও অসীমের ভাব। আমি বিশেষ দেশে বা স্থানে, আর বিশেষ কালে, এই বইটে জান্‌ছি। এই বিশেষ দেশকে অনন্ত দেশের অংশ বলে জান্‌ছি, এই কালকে অনন্ত কালের অংশ বলে জান্‌ছি। বইয়ের বর্ণ, স্পর্শ ও শব্দ আত্মজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ বলেই জান্‌ছি। দেখা, ছোঁওয়া ও শোনার বিষয়ছাড়া বর্ণ, স্পর্শ ও শব্দ অর্থহীন, অচিন্তনীয়। কিন্তু আমার দেখা, ছোঁওয়া, শোনা শেষ হয়ে যায়, অথচ বই থাকে, স্থানান্তরিত হয়েও থাকে, কালান্তরিত হয়েও থাকে, এমন কি কোন মানুষ এ'কে না দেখ্‌লে, না ছুঁলে, না শুন্‌লেও থাকে। কিন্তু মানুষের জ্ঞাননিরপেক্ষ হয়ে যে বস্তু থাকে, এ কথার অর্থ বুঝতে গেলেই দেখা যায় আত্মার ভিতরে সসীম অসীম দুটি ভাব আছে, অথবা অন্য ভাষায় বলতে গেলে, জ্ঞান-ব্যাপারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সহযোগিতা থাকে,—এমন সহযোগিতা যে দু-জনকে ঠিক একও বলা যায় না, ঠিক ভিন্নও বলা যায় না। জীবাত্মা অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে যায়; বইটা আগে দেখ্‌ছিল না, এখন দেখ্‌ছে। দেখ্‌তে গিয়ে সে ভাবে তার দেখ্‌বার আগেও বইটা ছিল,—যেমন দেখছে তেমনি ছিল, অর্থাৎ তার আত্মজ্ঞানে জড়িয়ে ছিল, তারই পরম আত্মায়, higher selfএ, ছিল। সাধারণ লোক ঠিক এই কথা ভাবে না, বলে না, কিন্তু তাদের ভাবনা বিশ্লেষণ করলে ঠিক এ'ই পাওয়া যায়। জীবাত্মা ভোলে। বইটা সুমুখে রেখেও আমি অন্যমনস্ক হয়ে এ'কে ভুলি, এ'র চিন্তা আমার মন থেকে চলে যায়। কিন্তু সে-চিন্তা আবার মনে আসে। না থাক্‌লে আবার আস্‌তো না। কিন্তু চিন্তা তো কেবল চিন্তাকারী মনেই থাক্‌তে পারে, যেমন জ্ঞান কেবল জ্ঞাতাতেই থাকতে পারে। সুতরাং আমার বিস্মৃতি-কালে আমার স্মৃতি, আমার চিন্তা, আমার পরমাত্মাতে, আমার higher selfএই, ছিল, তিনিই তা আমাকে এনে দিলেন। জীবাত্মা ঘুমায়,—স্বপ্নহীন নিদ্রায় তার সমস্ত জ্ঞান আশ্চর্য্য রূপে লুকিয়ে যায়। কিন্তু পুনর্জাগরণে জ্ঞান আবার ফিরে আসে, তার নিজ জ্ঞানরূপেই ফিরে আসে। জ্ঞান কেবল জ্ঞাত হয়েই থাক্‌তে পারে, জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ হয়ে জ্ঞানের থাকা অর্থহীন। সুতরাং সুষুপ্তিতে আমাদের জ্ঞান আমাদের পরমাত্মাতে, higher selfএ, বর্ত্তমান থাকে, তিনিই তা ফিরিয়ে দিয়ে আমাদিগকে জাগান। ভৌতিক অভিজ্ঞতায় যেমন, নৈতিক অভিজ্ঞতায়ও তেমনি ঘটে। আমরা অপ্রেমিক হই, পাপ করি, কিন্তু আমাদের পরমাত্মা সর্ব্বদা প্রেমিক, নিষ্পাপই থাকেন, আর আমাদের নিকট পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে আমাদিগকে অনুতপ্ত ও পবিত্র করেন। ঈশ্বর অনেক জীবাত্মার পরমাত্মা হয়েও যে এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, তাও বোঝা কঠিন নয়। সসীম দেশ-কাল যেমন এক অসীম দেশ-কালেরই অন্তর্গত, জগৎ বিচিত্র হয়েও যেমন এক বিশ্ব, universe, জীবাত্মা সসীম হয়েও, বহু হয়েও, তেমনি এক, অদ্বিতীয় পরমাত্মার আশ্রিত, আর তাঁদ্বারাই চালিত, পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত। এক বিশ্বের ভাবনায় এক ঈশ্বরের ভাবনা পশ্চাৎভিত্তি (background) রূপে বর্ত্তমান।

যা বলা হ'ল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ-মায়ের গর্ভস্থ ও ক্রোড়স্থ শিশুর সঙ্গে তাঁর যেরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ, পরম-মাতার সঙ্গে আমাদের যোগ তার চেয়ে অনন্ত গুণে ঘনিষ্ঠতর। শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লে মাকে ছেড়েও থাক্‌তে পারে। সে যতই বড় হয়, আত্ম-নির্ভরশীল হয়, ততই মায়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ কমে যায়। কিন্তু আমরা যতই বাড়ি, যতই শিখি, তাতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগ বাড়ে বই কমে না। জ্ঞান-অজ্ঞানে, স্মৃতি-বিস্মৃতিতে, নিদ্রা-জাগরণে, পাপ-পুণ্যে, আহারে-বিহারে, চলায়-ফেরায়, জীবন-মরণে, তিনি আমাদের মাতৃরূপে নিত্যসঙ্গিনী। তাঁর সহিত এই সম্বন্ধ বুঝলে ও স্মরণ রাখলে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসাধন সুগম হয়, সহজ হয়। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক হয়, আরাধনা ও নামকীর্ত্তন

মধুর হয়, ধ্যান গভীর ও শান্তিপ্রদ হয়, প্রার্থনা ব্যাকুল ও আশু ফলপ্রদ হয়, পরপ্রেম ও পরসেবা আয়াসশূন্য হয়, জগতে প্রেমরাজ্য নিকটতর হয়।

এই প্রেমধর্ম্মের দুটি বাধার উল্লেখ করে বাধা দূর করবার কথা বলি। একটি বাধা জড়বাদ। দার্শনিক চিন্তাবিহীন লোক দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, শ্রুত, আঘ্রাত, আস্বাদিত বিষয়কে জড় মনে করে। এই ভ্রম একটা যবনিকা হয়ে ঈশ্বরকে তাদের নিকট আচ্ছাদন করে রাখে। অপেক্ষাকৃত অল্প দর্শনালোচনাতেই এই ভ্রম দূর হয়। 'বৈজ্ঞানিক' 'দার্শনিক' নামের উপযুক্ত সকল ব্যক্তিই ইতিমধ্যে বুঝেছেন যে এ-সকল বিষয় মানসিক, জড়ীয় গুণ নয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কারো কারো এই ধারণা রয়েছে যে এ-সকল মানসিক ব্যাপারের কারণ একটা ইন্দ্রিয়াতীত অচেতন শক্তি। এই ধারণার কারণ বর্ণ-স্পর্শাদির সহিত আত্মার অচ্ছেদ্য যোগ, মৌলিক একতা, না বোঝা। বর্ণ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়বোধ স্বতন্ত্র বিষয় নয়, এরা আত্মারই বিশেষ বিশেষ প্রকারমাত্র। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ার গোটা (concrete) বিষয় কেবল ইন্দ্রিয়বোধ নয়, ইন্দ্রিয়বোধ-যুক্ত আত্মা। শুধু ইন্দ্রিয়বোধ ব'লে কোন বস্তু নেই, সুতরাং তার কোন কারণও নেই। গোটা বস্তু যা, বোধসমন্বিত আত্মা, তার কারণ থাকা অসম্ভব, কেননা সে স্বয়ম্ভূ। জীবাত্মা সসীম ব'লে সে তার আশ্রয় খোঁজে, সে-আশ্রয় অসীম আত্মা। সত্তারূপে সে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, সসীম ব'লে সে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন। জীবাত্মা কার্য্য নয়, কালাতীত বস্তু, সুতরাং তার কারণ অর্থাৎ কর্ত্তা থাকা অসম্ভব। সম্যক্ দার্শনিক জ্ঞানে জড়বাদ দূর হয়, বিশ্ব বিশ্বাত্মারূপে প্রকাশিত হয়।

প্রেমধর্ম্মের দ্বিতীয় বাধা জীবাত্মার মরণাশঙ্কা। এই আশঙ্কা কেবল জড়বাদীর নয়, নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীও এই আশঙ্কা করেন। তিনি কেবল ব্রহ্ম মানেন, জীব মানেন না, জগৎও মানেন না। তাঁর কাছে ব্রহ্ম পারমার্থিক, জীবও জগৎ মায়িক। 'মায়া' অর্থ ভ্রম। 'ভ্রমটা কার?' একথার উত্তর তিনি দিতে পারেন না। অসীমের ভ্রম হ'তে পারে না, সসীমেরই ভ্রম সম্ভব, সুতরাং ভ্রম থাকলে সসীমও আছে। অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ-রূপ যে জ্ঞান-প্রণালী, তাতে সসীমের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়। ঈশ্বরের নিজ জ্ঞানে আরম্ভ নেই, শেষও নেই। জ্ঞানক্রিয়ায় জীবের নিকট ঈশ্বর আত্মপ্রকাশ করেন, অজ্ঞানে ঈশ্বর তা' থেকে আত্মতিরোধান করেন। এই আবির্ভাব-তিরোভাবে জীব-ব্রহ্মের পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। এতে জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমও নিঃসন্দিগ্ধ হয়। নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ অথচ নিজ থেকে ভিন্ন ব্যক্তির হিতসাধনে ব্যস্ততাই প্রেম। নির্ব্বিশেষ একক ব্রহ্মে এই ব্যস্ততা অসম্ভব। এই ব্যস্ততা যাঁর, তিনি নিশ্চয়ই প্রেমিক, প্রেমপাত্র-সমন্বিত। ঈশ্বরের প্রেমপাত্র কখনও বিনষ্ট হ'তে পারে না। একে তো সে কালাতীত, জন্মমৃত্যুর অধীন নয়; তার পরে, সে ঈশ্বরের অনন্ত যত্নের ধন, তার বিনাশ অসম্ভব। যারা ঈশ্বরের প্রেম স্বীকার করে না, তারাই মানবের অমরত্ব অস্বীকার বা সন্দেহ করে। শরীরের দৌর্ব্বল্যে যেমন নিদ্রা আবশ্যক, তেমনি শরীর-বিনাশেও অল্পাধিক দীর্ঘ নিদ্রা অসম্ভব নয়। কিন্তু মানুষ-মা যেমন সন্তানের অতি দীর্ঘ নিদ্রা পছন্দ করেন না, তেমনি পরমমাতা কখনও সন্তানের চিরনিদ্রার পক্ষপাতী হ'তে পারেন না। সুতরাং ইহলোকের অল্পকালস্থায়ী নিদ্রায় যেমন বিনাশের আশঙ্কা নেই, পরলোকের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ নিদ্রাতেও মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। ফলতঃ গভীর যোগের অবস্থায় সন্তানকে যখন মায়ের কোলে, মায়ের বাহুবেষ্টনে, মায়ের অনিমেষ প্রেমদৃষ্টির বিষয়রূপে দেখা যায়, তখন তাকে অবশ্যম্ভাবী রূপেই মায়ের অমরত্ব-ভাগী ব'লে বিশ্বাস হয়, তার মরণ অসম্ভব বোধ হয়।

এই যোগসাধনের অভাবেই মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হয়, দৃঢ় হ'তে পায় না। যোগসাধনের ভিত্তি জগৎ জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে দার্শনিক জ্ঞান। পরম্পরাগত লৌকিক বিশ্বাসের উপর যোগ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। সেই জন্যই ব্রহ্ম-যোগের দার্শনিক ভিত্তি নির্দ্দেশ করলাম। এই ভিত্তি বেদান্তদর্শন ও হেগেল-দর্শনের অনুগত। সাংখ্যদর্শনের সাহায্যেও যোগসাধন সম্ভব। কিন্তু সেই যোগ পুরুষ-প্রকৃতির অর্থাৎ জীব ও জগতের মধ্যে একান্ত ভেদ কল্পনা ক'রে প্রকৃতিকে হেয় বোধে বর্জ্জন করে, আর নির্ব্বিষয় পুরুষকে উপাদেয় রূপে গ্রহণ করে। সাংখ্যদর্শন,—কাপিল ও পাতঞ্জল উভয়বিধ

সাংখ্য—সংসার-বিরোধী, সন্ন্যাসের পক্ষপাতী। কিন্তু বেদান্তদর্শন, বিশেষতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্ত, এবং হেগেলদর্শন, জগৎ ও জীবকে ব্রহ্মের অন্তর্ভূত, ব্রহ্মের সহিত এক, জেনে উভয়কে যোগসাধনের বিষয়ীভূত করে। এই যোগসাধনই ভক্তিসাধনের সহায়। এই সাধনের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়ে বক্তব্য শেষ করি। সর্ব্ববিধ জ্ঞানক্রিয়ার একমাত্র বিষয় ব্রহ্ম,—জীব ও জগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। ব্রহ্মকেই আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, আঘ্রাণ করি, আস্বাদন করি, স্মরণ করি, মনন করি, বুদ্ধির বিষয়ীভূত করি। সুতরাং যোগসাধন চক্ষু খুলেও হ'তে পারে, চক্ষু বুজেও হ'তে পারে; জগৎ ভেবেও হ'তে পারে, জগৎভাবনা ছেড়ে যথাসম্ভব নির্জ্জন, নির্ব্বিষয় হয়েও হ'তে পারে। 'যথাসম্ভব' বল্‌লাম এই জন্যে যে বিষয়-বিষয়ীর ভেদাভেদবশতঃ একান্ত নির্ব্বিষয় হওয়া অসম্ভব। যাহোক, যোগসাধনের প্রারম্ভে 'ব্যতিরেক' প্রণালীতে বিষয়-ভাবনা ছেড়ে স্পষ্টভাবে আত্মদর্শন করা আবশ্যক। এক অখণ্ড আত্মাই সর্ব্ববিষয়ে প্রকাশিত হয়। যাকে আমরা নিজ উচ্চতর বা পরম আত্মা বলি, সে-ই বিশ্বাত্মা। এই আত্মদর্শন খুব গভীররূপে সাধন করা চাই। সাধনে জগৎ-ভাবনা এলেও তাতে ক্ষতি নেই যদি সেই ভাবনাকে আত্মদর্শনের সঙ্গে একীভূত করা হয়। কিন্তু এই অভেদভাবনার ভিতরেই ভেদভাবনা নিহিত আছে। জীব জগৎকে ভুল্‌তে পারে, ব্রহ্ম তো তা পারেন না; তিনি সর্ব্বাধার, সর্ব্বময়। তিনি ভোলা জীবকে তার ভোলা বিষয় স্মরণ করিয়ে তার বিচিত্র জীবন রচনা করেন। যাহোক্ এই নির্জ্জন নির্ব্বিষয় অবস্থায় জীব-ব্রহ্মের নিগূঢ় ভেদাভেদ সম্বন্ধ, মা-ছেলের সম্বন্ধ, উপলব্ধি করা চাই। তার পরে হচ্ছে অন্বয়-সাধন, জগতের সঙ্গে জীব ও ব্রহ্মের একত্বসাধন এই উভয়বিধ সাধন নির্জ্জনে করলে সজন জীবনে, কোলাহল-পূর্ণ কার্য্যগত জীবনে, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব রক্ষা সম্ভব হয়। 'ভগবদ্গীতার' ষষ্ঠাধ্যায়ে 'ব্যতিরেক'-প্রণালী ও একাদশাধ্যায়ে 'অন্বয়'-প্রণালী ব্যাখ্যাত হয়েছে। শঙ্করের "অপরোক্ষানুভূতির" শেষভাগে উভয় প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মাতৃভাব সাধনের কথা কোন গ্রন্থে স্পষ্টভাবে দেখি না। 'চণ্ডী'তে তার আভাসমাত্র দেখি, তাও রুদ্র-ভাবে আচ্ছন্ন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাঁর কোন কোন 'উপদেশ' ও 'নিবেদনে' এই ভাবসাধনের সহায়তা পাওয়া যায়।



ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর কৃতিত্ব

ইন্দুভূষণ দত্ত

শ্রীসুনীলকুমার সেন, এম-এ, বি-এল

[আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙালীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নীচে যে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইবে যে, ব্যাঙ্কিঙেও বুদ্ধি, দক্ষতা ও সততা বাঙালীকে কৃতী করিয়াছে। প্রবাসীর সম্পাদক।]

বাঙালী ভাল ব্যবসা বোঝে না এই অপবাদ অনেকেই দিয়া থাকেন, কিন্তু এই ব্যবসাবুদ্ধিহীন বাঙালীর মধ্যেও এ রকম লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে যথার্থ ব্যবসায়ী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বাংলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলেই কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ৺ইন্দুভূষণ দত্ত মহাশয়ের নাম জানেন। ইন্দুবাবু নিজের কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায় গুণে প্রকৃত ব্যবসায়বুদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই কারণেই কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মত একটি উন্নতিশীল ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান গঠন করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে কুমিল্লা শহরে ইন্দুবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺কৈলাসচন্দ্র দত্ত এক জন উচ্চশিক্ষিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার প্রসিদ্ধ মেড্ডাগ্রামে কৈলাসবাবুর পৈতৃক বাসস্থান। ইন্দুবাবু কৈলাসবাবুর দ্বিতীয় পুত্র। কৈলাসবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ডক্টর শান্তিভূষণ দত্ত, এম-এ, পি-এইচ ডি, ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল, বর্ত্তমানে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শৈশব হইতেই ইন্দুবাবুর স্বভাব খুব নম্র ছিল, এই কারণে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মত বিরাট্ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররূপে কাজ করিবার সময়ও তিনি কদাচিৎ মানুষের সঙ্গে রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই জন্যই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সকলেই তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। ইন্দুবাবু কুমিল্লা জেলা স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এফ-এ পড়িতে যান। এফ-এ পাস করিয়া তিনি আই-সি-এস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। প্রথম বার ইন্দুবাবু আই-সি-এস পরীক্ষাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিবার জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করাতে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি আর আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। দেশে ফিরিয়াও ইন্দুবাবু পাঁচ বৎসর এক রকম শয্যাগত অবস্থায় কাটান। কিন্তু এই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন এবং বাস্তবিক পক্ষেও তিনি বেশ সুস্থ হইয়াছিলেন এবং যত দিন জীবিত ছিলেন যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

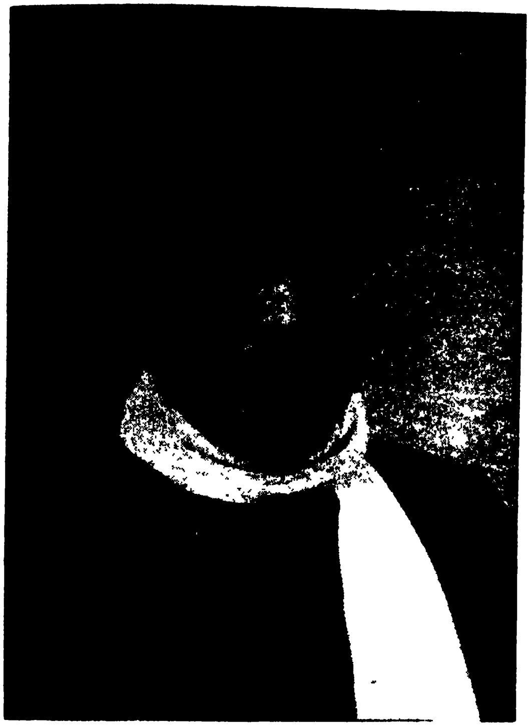
ইন্দুবাবুর জীবনে আমরা তাঁহার মাতার প্রভাব খুব দেখিতে পাই—মাতাকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং অনেক সময়েই তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেন। ইন্দুবাবুর মাও খুব ধর্ম্মশীলা এবং বুদ্ধিমতী মহিলা। পুত্রের উন্নতির মূলে তাঁহারই ঐকান্তিক প্রেরণা রহিয়াছে।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হইবার পর বাংলা দেশের ব্যাঙ্কিং-জগতে ভয়ানক আতঙ্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, ফলে দেশী ব্যাঙ্কের উপর সকলেই আস্থাহীন হইয়া পড়েন। ক্রমে ক্রমে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের উপর আবার আস্থা ফিরাইয়া আনিবার মূলে রহিয়াছে দুইটি লোকের কর্ম্মপ্রচেষ্টা—এক জন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দত্ত আর

এক জন ইন্দুবাবু। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক বৎসর পরে যখন ইন্দুবাবু রোগমুক্ত হইয়া কার্য্যক্ষম হইলেন তখন তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল কি করিয়া তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিবেন। কিছু দিন তিনি নিজের ইচ্ছাতে কুমিল্লা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে গিয়া কাজ করিতেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি স্থির করিলেন যে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবেন ও তাহার সাহায্যে দেশেরও উপকার করিতে পারিবেন এবং নিজের পক্ষেও কাজ করিবার সুবিধা হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি ১৯১৭ সনে কুমিল্লা শহরে পিপল্‌স্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের অবস্থাও বেশ ভাল। ব্যাঙ্কিং-ব্যবসা বুঝিবার তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। তাহা ছাড়া কেহ যদি ব্যাঙ্কিং-ব্যাপারে তাঁহার নিকট কোন নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন তাহা হইলেও তিনি তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন এবং তাহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধেও চিন্তা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিতেন। ইন্দুবাবু ১৯২২ সনে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। যখন তিনি এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন, তখন ভাবিতেও পারেন নাই যে, এই ব্যাঙ্ক কালে বাংলা দেশের একটি প্রধান ব্যাঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাহা ছাড়া ইন্দুবাবুর জীবিতাবস্থাতেই বাংলা ও আসামের নানা স্থানে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের শাখা-আপিস স্থাপিত হওয়াতে তাঁহারই অসামান্য কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কলিকাতা-শাখা খোলা হইবার পূর্ব্বে লোকের ধারণাই ছিল না যে, এক মফস্বলের ব্যাঙ্ক কলিকাতার মত জায়গাতে গিয়া যোগ্যতার সহিত ব্যাঙ্কিং-ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কলিকাতা-শাখা খোলা হইবার পর কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনও তাহাদের কলিকাতা শাখা খোলে এবং এখন মফস্বলের প্রায় সব ব্যাঙ্কই কলিকাতায় তাহাদের শাখা-আপিস খুলিতেছে। আমরা নিঃসন্দেহে এ-কথা বলিতে পারি যে ইন্দুবাবু বিচক্ষণতার সহিত ব্যাঙ্কিং-ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের উপর লোকের বিশ্বাস আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ইন্দুবাবু যদি তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা দ্বারা দেখাইতে না পারিতেন যে মফস্বলের ব্যাঙ্কও সততার সহিত পরিচালিত হইলে কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে তাহাদের শাখা স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইত। একথা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই যে, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বাংলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই তাহাদের শাখা স্থাপন করিয়া কৃতিত্বের সহিত ব্যাঙ্কিং-ব্যবসা চালাইতেছে বলিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বাংলা দেশের নানা স্থানে তাহাদের শাখা স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এদেশের ব্যাঙ্কিং-জগতে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন একটি ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং ইহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলে, আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ঠিক এই শ্রেণীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর এদেশে অনেক নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়াতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এই সকল নূতন ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপসিল(শিডিউল)ভুক্ত হইয়া নিজেদের ব্যাঙ্কিং-ব্যবসার উন্নতি করা এবং বর্ত্তমানে এই উদ্দেশ্য লইয়া মফস্বলের অনেক ব্যাঙ্কই কাজ করিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের মধ্যে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রথম তপসিলভুক্ত হয়। শেষোক্ত ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পর মফস্বলের অন্যান্য ব্যাঙ্কও তপসিলভুক্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে অন্যান্য বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কও ঐরূপ চেষ্টায় আছে। এ-বিষয়ে যে ইন্দুবাবুই পথপ্রদর্শক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহা ছাড়া মফস্বলের ব্যাঙ্কের মধ্যে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কই প্রথম ক্লিয়ারিং এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হইয়াছে। মফস্বলের ব্যাঙ্কের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয়।



ইন্দুভূষণ দত্ত

ইন্দুবাবুর কৃতিত্ব কেবল ব্যাঙ্কিং-ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি এক জন দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং নানা ভাবে দেশসেবা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিছু দিন তিনি পুরাতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং সেখানে গিয়াও দেশসেবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইন্দুবাবু ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি অনেক সময়ই ইচ্ছানুরূপ পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। তবুও যে কঠিন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পর তিনি যে কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়া কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন, তাহার জন্য প্রত্যেক বাঙালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ককে আরও বৃহত্তর ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহাকে অচিরেই মরজগৎ হইতে বিদায় লইতে হইল। ১৩৪৩ সনের ১০ই ভাদ্র আপিস হইতে ফিরিবার পর অত্যধিক রক্তের চাপ বৃদ্ধি হওয়াতে ইন্দুবাবু অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইহার পূর্ব্বেও তাঁহার আর একবার রক্তের চাপ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইবার আক্রান্ত হইয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের এইখানেই পরিসমাপ্তি হইবে। ১২ই ভাদ্র সকাল ১০টার সময় তিনি কুমিল্লায় তাঁহার নিজবাড়ীতে ইহলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণের ইচ্ছানুসারে ইন্দুবাবুর এক আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি এ-বৎসর তাঁহার মৃত্যুবার্ষিক দিবসে ব্যাঙ্কের সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে। যদিও ইন্দুবাবু আর ইহজগতে নাই, তবুও যাঁহারা ব্যাঙ্কিং-ব্যবসাতে লিপ্ত আছেন তাঁহারা চিরকালই ইন্দুবাবুর দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিবেন।



ইন্দুভূষণ দত্ত মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি

বিক্রমপুর লস্কর দীঘির শিবমন্দির

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

উত্তর-বিক্রমপুরে বাঘিয়া গ্রাম। গ্রামটি বেশ প্রাচীন। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের খাতের পশ্চিম দিকে এই গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে একটি খাল বরাবর আঁকিয়া বাঁকিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই বাঘিয়া গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আজিও মাথা তুলিয়া কোন রকমে দাঁড়াইয়া আছে। এই মন্দিরটি লস্কর দীঘির শিবমন্দির নামে পরিচিত।

লস্কর দীঘির তীরের এই মন্দিরের বিষয় আমি সর্ব্বপ্রথম মৎপ্রণীত (প্রঃ ১৩১৬ সাল) বিক্রমপুরের ইতিহাসে (পৃ. ৩৮১) উল্লেখ করিয়াছিলাম। সে-সময়ে জল ছিল বিবিধ জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ, এমন কি সে-সময়ে এখানে বাঘও হানা দিতে ছাড়িত না। মন্দিরের ভিতরে সাপ নিশ্চিন্ত মনে বাস করিত। শিবলিঙ্গ যে ছিল, তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান ছিল। লস্কর দীঘিটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় শত হাত এবং প্রস্থে প্রায় তিন শত হাত হইবে। সরোবরের পূর্ব্বতটে শিব মন্দিরটি বিরাজিত। তখন এই মন্দিরের গায়ে যে-সব কারুকার্যসম্পন্ন ইষ্টকগ্রথিত মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। এরূপ সুন্দর কারুকার্যসম্পন্ন ইষ্টকগ্রথিত শিবমন্দির বিক্রমপুরের আর কোথাও বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।



১. লস্কর দীঘির শিবমন্দির, বাঘিয়া

মন্দিরটি আনুমানিক ১০১২ বাংলা সনে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ত্রিপুর গুপ্তের বংশোদ্ভব মহীপতির বংশের ধর্ম্মনারায়ণ গুপ্ত সেনহাটি চন্দনি মহল হইতে বিক্রমপুরে বাঘিয়া গ্রামে আসিয়া প্রথমে বসতি করেন। এই বংশের রূপরাম গুপ্ত লস্কর এই শিবমন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন বলিয়া কথিত আছে। রূপরাম নবাবের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তাহার লস্কর উপাধি থাকায় এই দীঘির নাম "লস্করের দীঘি" হইয়াছে এবং শিবমন্দিরটিও লস্করের দীঘির শিবমন্দির নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

যখন প্রথম লস্কর দীঘির তীরবর্ত্তী এই মন্দিরটি দেখি, তখন উহার কাছাকাছি কোনও বসতি ছিল না। চারিদিকে ছিল বন-জঙ্গল ও বাঁশের ঝাড়। দীঘির

রূপরাম ধনী ছিলেন, তিনি যে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার সেই বাস্তভিটা, পরিখা এবং

চারিদিকের দীঘি ও সরোবরের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও মাটি খুঁড়িতে প্রচুর ইট পাওয়া যায়।

এই গুপ্তবংশীয়গণ বিক্রমপুরের নানা গ্রামে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিতেছেন। এই বংশের স্বর্গত রামকমল গুপ্ত ও নীলকমল গুপ্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে পুরাতন কাগজ-পত্র ইত্যাদি ছিল; তাঁহারা আমাকে সামান্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারি যে ১০১২ সনে রূপরাম গুপ্ত এই শিবমন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রূপরাম গুপ্ত কোন্ নবাবের অধীনে কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার বাসস্থান কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা এখন সুকঠিন।



২. শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণাসুন্দরী

মন্দিরটি চতুষ্কোণ। দৈর্ঘ্যে ২০।২৫ হাত এবং প্রস্থে ১০।১২ হাত হইবে। ঊর্দ্ধে অর্থাৎ খাড়া কুড়ি হাতের বেশী হইবে না। মন্দিরের একটি মাত্র দ্বার। জানালা ইত্যাদি কোথাও কিছু নাই। এই শিবমন্দিরটির মুখ বা দরজা দক্ষিণ দিকে। কোথাও বড় ইট এবং কোথাও ছোট ইটের সমাবেশে মন্দিরটি নির্ম্মিত। মন্দিরের চারিদিকেই বিবিধ পৌরাণিক চিত্র বিদ্যমান। সে-গুলিকে মৃত্তিফলক (terra-cotta) বলিলেই সঙ্গত হয়।

পূর্ব্বে এইগুলি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, "কোথাও দিগ্‌বসনা লোলরসনা কালিকা-মূর্ত্তি, কোথাও বা মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশ হস্তে দশপ্রহরণধারিণী শক্তি-রূপিণী দেবী ভগবতীর মূর্ত্তি, কোথাও কৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করিয়া তাহার বদন-বিবর হইতে বহির্গত হইতেছেন, আবার একধারে আভীর-পল্লীর চিত্র, গোপবধূগণ গো-দোহন-রত, গোপগণ ভাঁড় কাঁধে করিয়া যাইতেছে, তাহারই পার্শ্বে আবার কোন রমণী প্রসাধনে রত, এক সখী তাহার কেশপাশ বন্ধন করিয়া দিতেছে, আর এক দিকে কে একজন পুরুষ জনৈকা যুবতীর খোঁপা ধরিয়া টানিতেছে। এরূপ যে কত চিত্র তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা সুকঠিন। মন্দিরটির কোন কোন অংশ লোণা ধরায় সে-দিকের মূর্ত্তি ধ্বংস হইয়াছে।"

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে-সব মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশই এখন আর নাই। বিগত কার্ত্তিক মাসে আবার লস্কর দীঘির তীরবর্ত্তী এই মন্দিরটি দেখিতে গিয়াছিলাম। এখন দীঘির পাড়ে মন্দিরের কাছে ক্ষুদ্র একটি মুসলমান-পল্লী গঠিত হইয়াছে। মন্দিরটির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তবে মন্দিরের আশেপাশে আর কোনও জঙ্গল নাই। দীঘিটি এখনও অপরিষ্কৃত ও জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ। পাশের খালটিতে কচুরিপানা থাকিলেও চলাচল সম্ভব নহে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের জঙ্গলাকীর্ণ বাঘিয়া গ্রাম এখন জনবহুল। বিরাট বাজার বসিয়াছে, বহু ধনী ব্যক্তি আসিয়া বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পদ্মার ভাঙ্গনের দরুনই এই গ্রামের এইরূপ উন্নতি হইয়াছে।

মন্দিরের গায়ের খোদিত ইটগুলি বেশীর ভাগই খসিয়া পড়িয়া ভাঙিয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহার বেশীর ভাগই লোণা ধরিয়া একেবারে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। শুধু



৩. যুগল-নৃত্য

পশ্চিম দিকের ও দক্ষিণ দিকের কয়েকখানা ইষ্টক-ফলক বেশ স্পষ্টই রহিয়াছে। এই প্রবন্ধের সহিত তাহার কয়েকটি চিত্র প্রকাশিত হইল।

একটি চিত্রে (২ নং) দেখিতে পাইতেছি একটি স্ত্রীলোক যষ্টিতে ভর করিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পায়ে মল, হাতে চুড়ি ও বাহুতে বাজু। কাপড় প্রায় পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আর এক জন পুরুষ—মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, কেশপাশের এক অংশে পিছনের দিকে টিকির মত বাঁকা হইয়া আছে। গলায় মালা। বস্ত্র পাজামার মত পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হইয়া নারীর মস্তকোপরি স্থাপিত। বাম হস্তও তাহারই শিরোপরি ন্যস্ত। আমার মনে হয় এই দুই জন শ্রীকৃষ্ণ ও কুব্জা সুন্দরী।

আর একটি চিত্রে (৩ নং) দেখিতে পাইতেছি—যুগলে যুগলে নৃত্য-ভঙ্গিমা। একজন পুরুষ নারীর উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত হস্তখানি দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়াছেন, বাম হস্তে তাঁহার বাঁশী। মুখে চোখে হাসিটি অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নয়নদ্বয় আকর্ণবিস্তৃত, পদদ্বয় নৃত্যলীলার ছন্দে স্থাপিত। নারীমূর্ত্তিটির মস্তকে গুণ্ঠন, নাসিকা সূক্ষ্ম, চক্ষু আকর্ণবিস্তৃত, বক্ষ বসনাবৃত। কাপড় গোড়ালির একটু উপর পর্য্যন্ত প্রলম্বিত। কাপড় পরিবার রীতি এখনও যেমন পূর্ব্ব-বঙ্গের পল্লীবাসিনী প্রাচীনা বা প্রৌঢ়া মহিলাদের ধরণের। হস্ত-প্রকোষ্ঠে ও বাহুতে অনেকগুলি চুড়ি, আজকাল যেমন পশ্চিমপ্রদেশীয়া মহিলারা একসঙ্গে পরেন, ঠিক তেমনি। বাহুতে অনন্ত বা বাজুর মত ভূষণ। অপর পুরুষটির চুলগুলি চূড়ার আকারে বাঁধা। দক্ষিণ হস্তে শিঙ্গা ধারণ করিয়া বাজাইতেছেন আর বাম হস্তে রমণীর বসন ধারণ করিয়া আছেন। নারী তাহার দুই হস্ত মাথার উপরে তুলিয়া নৃত্যভঙ্গিমায় অঙ্গুলি ধারণ করিয়াছেন। বসন চঞ্চল নৃত্যগতিতে বিক্ষিপ্ত। এ কি নৃত্য? যদি রাসলীলা হইবে, তবে বলরাম কেন? আমার মনে হয় ইহা সেকালের বাঙালী-সমাজের দোললীলা কিংবা বসন্ত-উৎসবের একটি চিত্র।

৪ নং চিত্রটি দেখিলে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ যেন কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কে এক জন বীরদর্পে তরবারির খাপ হইতে তরবারি বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই দুইটি মূর্ত্তির মধ্যেই সাহস ও বীরত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের চক্ষু, মুখ, বাহু, পেশী, হস্ত ও পদদ্বয়ের সংস্থান সকলের মধ্য দিয়াই একটি 'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কে ইহারা, কোন্ সময়ে এবং কাহার সহিত কে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং এই মূর্ত্তিটি আদৌ শ্রীকৃষ্ণরূপে কল্পিত কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

ইহা ছাড়া কালীমূর্ত্তি, বলরাম-মূর্ত্তি ও কতকগুলি পুরুষ ও নারীর মূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক পৌরাণিক চিত্র ছিল। তাহা এখন কোথায়? এখনও দেখিতে পাই কোনও সারিতে আবার একই শ্রেণীর মূর্ত্তির সারি চলিয়াছে; কোথাও অনন্তনাগ, কোথাও কালীয়দমন, কোথাও সামাজিক চিত্র কত কি যে এই মন্দিরের গায়ে খোদিত ছিল তাহা এখন আর বলিবার উপায় নাই। সেকালের সামাজিক চিত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি অনেক কিছু এই মন্দিরের গাত্রে খোদিত ইষ্টক-ফলক হইতে



৪. দ্বন্দ্বযুদ্ধ

জানিতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল। পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

বাঘিয়ার গুপ্তবংশীয়দের বংশাবলী হইতে জানিতে পারা যায় যে তাঁহারা প্রায় ত্রিশ-পয়ত্রিশ পুরুষ পূর্ব্বে বাঘিয়া গ্রামে আসেন। বাঘিয়া গ্রাম হইতে ইঁহারা বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে গমন করেন। কেহ দশলং (অধুনা পরিবর্ত্তিত নাম যশোলং) কেহ মধ্যপাড়া, কেহ সিমুলিয়া, কেহ মূলচর, কেহ জল্‌শা (দক্ষিণ বিক্রমপুর) প্রভৃতি গ্রামে বিবাহ ইত্যাদি নানা কারণে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সকলেরই আদি নিবাস ছিল বাঘিয়া গ্রামে। ইহাদের বংশাবলী হইতে দেখা যায় যে প্রত্যেক পুরুষ ২৫ বৎসর হিসাবে ধরিলেও ত্রিশ-পয়ত্রিশ পুরুষে এই বংশীয়েরা প্রায় সাত শত বৎসর কাল পূর্ব্বে এই গ্রামে আসেন। রূপরামের পরিচয় হইতে এবং বংশাবলী হইতে দেখা যাইতেছে যে মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সম্ভবতঃ রূপরাম ঢাকা জাহাঙ্গীরনগরের মোগল শাসনকর্ত্তার অধীনে সৈন্য-বিভাগে কোনও কার্য্য করিয়া থাকিবেন। লস্কর, সৈন্য-বিভাগের কোনও কার্য্যেরই পরিচায়ক।

এই মূর্ত্তি-ফলকগুলি প্রথমে কাঁচামাটিতে তৈরী করিয়া পরে পোড়াইয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। খোদিত এই ইষ্টকগুলির মত মূর্ত্তি প্রভৃতি বাংলা দেশের নানা স্থানের প্রাচীন মঠ ও মন্দিরের গায়ে দেখিতে পাই। এইরূপ খোদিত মূর্ত্তিসমন্বিত ইষ্টক দ্বারা মন্দির গঠন করা সেকালের একটি বিশেষ রীতি ছিল। তাহার প্রায় অনেকগুলিই ৩০০।৩৫০ শত বৎসরের প্রাচীন। আমাদের হাতের কাছে এমন দলিলপত্র কিংবা খোদিত লিপি নাই যাহার সাহায্যে আমরা এই মন্দিরের নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

বাঘিয়া গ্রামবাসীর এই প্রাচীন মন্দিরটির রক্ষার জন্য মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এই সুন্দর মন্দিরটির এখন যাঁহারা মালিক তাঁহাদেরই এই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এমন একটি প্রাচীন কীর্ত্তি-মন্দির যদি গ্রামবাসীর অযত্নে বিলুপ্ত হয় তাহা তাঁহাদের যে কত অগৌরবের বিষয় হইবে তাহা না বলিলেও চলে।

আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বাঘিয়া গ্রামবাসী শিক্ষিত যুবকগণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই মন্দিরটিকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে যত্নবান হউন।

কবি য়েট্স্

ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম.এ., পিএইচ. ডি.

১

য়েট্সের সঙ্গে লণ্ডনে প্রথম দেখা হবার পর ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আধুনিকেরা কাব্য-জগতের কবি, য়েট্স্ বিশ্বজগতের কবি। প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল মনে আছে। বর্ত্তমান যুগে বই হ'তে বইয়ের উৎপত্তি: সাহিত্যিক মালমশলার অভাব নেই, বুদ্ধি যথেষ্ট, ছাপাযন্ত্র উদ্যত, ভুলে যাচ্ছি লণ্ডনের জঠরে কত মণ কাগজের বরাদ্দ। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল য়েট্স্ এই কাব্যিক কারখানা হ'তে দূরে—তাঁর কবিতার শিকড় নেমেছে চিরন্তনের মাটিতে, যেখান থেকে ফুল ফোটে, চিত্ত রসিত হয়ে ওঠে।

দূরত্বের জন্যে আর্টিস্টকে বিশেষ জরিমানা দিতে হয়, কেবল সামাজিকতায় সাহিত্য-ব্যবসায়ে নয়, মানসলোকে বেড়া-বাঁধার জন্যে। ভিড়-ঠেকানোর আয়োজন সুরু হয় মনে—কল্পনাকে প্রথমটা সরিয়ে রাখতে হয় প্রাত্যহিক টানের বাহিরে। অভ্যাসের গণ্ডী-বাঁধা হ'লে ক্ষতির সম্ভাবনা, স্বেচ্ছায় ভিড়ে বাহিরে যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটে। স্বপ্নসুদূর গর্ব্বিত ছন্দে য়েট্স্‌কে পরাভবের সুর ঢাকতে হয়েছিল; প্রথম যুগের কাব্যে সংসারকে সরিয়ে রেখে বেদনার অলঙ্কার দেখা দিয়েছে, ঘরে-বাহিরে মিলন ঘটে নি আলোজ্বালা সৃষ্টির পথে। হাটের চলচ্ছবি হ'তে একান্তে মনের মিনারেট উঠল আকাশে, ঘুরোনো তার সিঁড়ি, কিম্বদন্তী শুনেছি হাতির দাঁতে তৈরি তার দেয়াল, শুভ্র অলৌকিক কারুকাজ গায়ে গায়ে, চূড়োর আগাগোড়া কোথাও বাস্তবের ইটপাথরের ব্যবহার নেই। য়েট্স্ চান্দ্রিক স্বপ্নে, কেল্‌টিক্ কুয়াশায়, গানে ধ্যানে ছেঁড়া জোড়া দিদিমার গল্পে মিশিয়ে তাঁর কবিতার সৌধ গড়লেন।

ভিক্টোরীয় অবসানের যুগে এক দল সাহিত্যিক এমনিতর স্বপ্নচূড় কবিতায় নাম করেছিলেন: নব্বইয়ে-পাওয়া আখ্যায় তাঁরা পরিচিত। শতাব্দীর শেষ আলোয় তাঁরা উপরের বাতায়নে ব'সে "হল্‌দে পুঁথি" পড়তেন, তারই পৃষ্ঠায় তাঁদের ছবি গল্প কবিতা বার হ'ত; য়েট্স্‌ও তাঁদের সৌখীন মজলিশে ক্লান্ত মধুর কল্পনা নিয়ে যোগ দিতেন। প্রচলিতের চয়নিকায় তথ্যের চেয়ে আকাশকুসুমের প্রাদুর্ভাব, সমালোচকের কৃতিত্ব সেইখানে। তবু নব্বইয়ের দলের এই বর্ণনায় কিছু সত্য আছে। বিংশ শতাব্দীর দুরন্ত দিনালোকে অবসন্ন মাধুরীর দল বিদায় নিলেন, য়েট্স্ রইলেন বেঁচে। "দি ট্র্যাজিক জেনারেশন্" নামক বইয়ে তিনি বন্ধুদের কাহিনী লিখেছেন দরদে হাসিতে মিলিয়ে। বোঝা যায় চূড়াবিহারীর দলে থেকেও তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন। তার প্রধান একটা কারণ, কল্পনার পথ বেয়ে দৈবক্রমে তিনি আইরিশ যুগের কেন্দ্রে পৌঁছলেন, নূতন প্রাণ পেলেন সজীব জাতীয় সত্তায়। ক্ষণজীবী বন্ধু দলের কাব্য ইংলণ্ডের অভ্যস্ত ভূমিকে অবজ্ঞা ক'রে অন্য কোথাও পৌঁছতে পারে নি। ফরাসী সমুদ্রপারের হাওয়ায় তাঁদের মন উতলা: প্রতীকে, উপমায়, অনুপ্রাসে বাণীকারের দল মেতেছিলেন। আরও জানা গেল, অতীব দুরবিলাসিতা ছিল যাঁদের পেশা তাঁরা যখন হাটে নামতেন, লণ্ডনের তলানিতে ঠেক্‌ত তাঁদের লক্ষ্যহারা গতিবিধি। "রাইমার্স ক্লাব" গড়েছিলেন য়েট্স্ তাঁদের দু-চার জনের সঙ্গে; "চেশায়ার চীস্"-রেস্তরাঁয় ব'সে তিনি এঁদের আবর্ত্তযাপন চক্ষে দেখেছিলেন; উদ্ধার করবার উপায় তাঁর হাতে ছিল না। লায়োনেল্ জন্‌সন্, ডাউসন, লে গালিয়েন্ প্রমুখ বন্ধুদের ইতিবৃত্ত সকরুণ গদ্যে লিখেছেন, এর ভিতর দিয়ে স্বজীবনী ফুটে উঠেছে। "অটো-বায়োগ্রাফিস্" গ্রন্থে য়েট্সের স্মৃতিছবি একত্র বার হয়েছে; কবির প্রথম পর্ব্বের ইতিহাস তাতে পাওয়া যায়।

· য়েট্সের জন্ম ডব্লিনে, ১৩ই জুন, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

পিতা ছিলেন আর্টিস্ট, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন; মায়ের পরিবারে অনেকে ছিলেন জাহাজ-ব্যবসায়ী, স্লাইগোর গ্রামাঞ্চলে তাঁদের নিবাস। পল্লীশ্যামল স্লাইগোর ছোট পাহাড় হ্রদের সঙ্গে তরুণ য়েট্‌সের জীবন জড়িয়েছিল; শেষ প্রান্তের কাব্যেও তার ডাক শোনা যায়। য়েট্‌সের জন্মের কিছু পরেই তাঁর পিতামাতা চলে যান লণ্ডনে, হ্যামার্‌স্মিথ স্কুলে তিনি দশ বছর বয়সে ভর্ত্তি হন। পাচ বছরের শেষে পুনশ্চ ডব্লিনে ফিরে ইরাস্‌মস্‌ বিদ্যালয়ে যোগ দেবার পূর্ব্বেই বালক য়েট্‌স্‌ প্রায়ই ছুটিতে আসতেন স্বদেশে। ছাত্রের পালা ফুরোতেই য়েট্‌স্‌-এর পিতা তাঁকে প্রবৃত্ত করলেন ছবি-আঁকার সাধনায়। কিন্তু কবির বেলা যেত



উইলিয়াম বাট্‌লার য়েট্‌স্‌

ম্যুজিয়মে, গ্রন্থাগারের কোণে, তর্জ্জমা পড়তেন প্রাচীন সাহিত্যের কখনও নিজে করতেন তর্জ্জমা, কখনও পালাতেন পুরনো কনট্‌ গ্রামের দিকে, পল্লীপ্রবীণদের কণ্ঠে বিস্মৃতপ্রায় স্বদেশের কাহিনী শুনতেন মুগ্ধ হয়ে। উনিশ বছরে প্রথম বেরোল তাঁর কবিতা "ডব্লিন্‌ য়্যুনিভার্সিটি রিভিয়্যু"-এ; রচনা দেখা দিতে লাগল ছাপায়; একুশ বৎসরে "মোসাডা" নামে নাট্যরসাত্মক কবিতার বই ছাপালেন। প্রবীণ য়েট্‌স্‌-এর নিডনিতে এই সব প্রথম বয়সের পল্লব রক্ষা পায় নি,—আজ তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সহজ হবে না। ১৮৮৭ সালে য়েট্‌স্‌ এলেন লণ্ডনে—কবি এবং জর্ণলিষ্ট—অন্য পরিচয় ঘুচল। "দি

ওয়ান্ডারিং অফ্ অয়সিন্" কাব্যসংগ্রহ বেরিয়েছিল এই সনে; সাধারণ্যের কাছে তাঁর প্রথম রচনা ব'লে পরিচিত। স্লাইগোর পলায়নীতে লিখে ছিলেন এর কবিতা।

চব্বিশ বৎসরের তরুণ সাধক ক্রমে শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় কবির আসন নিলেন; পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস রয়েছে ১৯৩৯ এবং সেদিনের মধ্যে। কত প্রভাবের রশ্মিপাতে তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকশিত হ'ল, গড়ে উঠল স্বকীয়তায়। মিষ্টিক্ কবি ব্লেকের রচনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল; কেল্‌টিক লোকগাথা এবং নানা দেশীয় পৌরাণিক কল্পকথা তাঁর মনকে চিরন্তন আদিমতায় অভিষিক্ত করে। প্রথম জীবনেই তিনি ভারতবর্ষের স্পর্শে এসেছিলেন। হোন্-এর বই আজকাল পাওয়া যায় না; তাতে য়েট্‌স্-এর নিজের উক্তি আছে; ডব্লিনে ভারতীয় কোন দার্শনিকের মুখে তত্ত্বকথা শুনে তাঁর মন নূতন উপলব্ধিতে ভরেছিল। আত্মজীবনীতেও এ-বিষয়ে উল্লেখ আছে। "অনসূয়া অ্যাণ্ড বিজয়া", "দি ইণ্ডিয়ান আপন্ গড", "দি ইণ্ডিয়ান্ টু হিস্ লভ্"—কবিতাগুলি আমাদের সুপরিচিত, ১৮৮৯ সালে "ক্রস্‌ওয়েস্"-সংগ্রহে বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, গীতাঞ্জলির সুন্দর ভূমিকা; "দি ওয়াইণ্ডিং ষ্টেয়ার্" নামক কাব্যগুচ্ছে "মোহিনী চ্যাটার্জ্জি"র উপর অপূর্ব্ব কবিতা,—নানা সূত্রে তাঁর রচনা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত। অল্পদিন হ'ল মেজর্কা দ্বীপে বসে শ্রীপুরোহিত স্বামীর সাহচর্য্যে য়েট্‌স্ উপনিষদের তর্জ্জমা করেছিলেন, বইখানি ত্রুটি সত্ত্বেও য়েট্‌সের ভাষায় অলঙ্কৃত। আহরণশীল সৃজনীশক্তি পূর্ব্বে-পশ্চিমে পাথেয় খুঁজেছিল, যুগের কবি তাই সর্ব্বকালীন উৎকর্ষের মূলে পৌছলেন। বাইজান্‌টিয়াম্ পর্য্যন্ত তিনি পূর্ব্বপথে এসেছিলেন—ঐ নামে চিরোজ্জ্বল কবিতা রেখে গেছেন—কিন্তু এশিয়ার গভীর চিত্তে কোনও বিদেশী কবি এমন ক'রে প্রবেশ করেছেন ব'লে জানি না।

সাহিত্যিক লণ্ডনে যুবক য়েট্‌স্। চোখে স্বপ্ন, মাথায় লম্বা চুল; দীর্ঘ, ঋজু তাঁর দেহ, মুখে তাপসিক ভাব। "দি ল্যাণ্ড্ অফ্ হার্টস্ ডিসায়ার্" নাটিকার অভিনয় চল্‌ছে। জর্জ্জ মুর ছিলেন উপস্থিত—তাঁর কলমে ১৮৯৪ সালের য়েট্‌স্-এর বর্ণনা পাই। মাথায় মস্ত বড় কালো টুপি, গায়ে কালো ক্লোক, কলার থেকে ঝুল্‌ছে অনেকখানি কালো সিল্কের টাই, পাজামার ভাঁজ গেছে নষ্ট হয়ে—উদ্‌ভ্রান্তভাবে য়েট্‌স্ ঘুরছেন থিয়েটারে। বেশী বয়সে চেহারার অনেক কিছু বদ্‌লেছিল; তবু সব মিলে সেই পুরনো ভাবই মনে পড়ে। শরীরের রেখা ভরে উঠেছে, মুখে পূর্ণতার দীপ্তি, কিন্তু সেই তাপসিক দূরত্ব, বেশে ব্যবহারে আর্টিস্টের ঔদাসীন্য—দু-বছর আগেও ওঁকে দেখে অগস্টস্ জন্-এর আঁকা প্রসিদ্ধ ছবির নূতন সংস্করণ ব'লে মনে হয়েছে। ইতিমধ্যে য়েট্‌স্ হয়েছিলেন সেনেটর স্বাধীন আইরিশ্ রাষ্ট্রে, কবির একাকীত্ব ঘুচেছে পরিপূর্ণ গার্হস্থ্য সংসারে, নোবেল প্রাইজ সম্মানিত হ'ল তাঁর নামের যোগে। কিন্তু যৌবনের ঔৎসুক্য নেভে নি, মনে করা যায় না তাঁর পথিক-দশা ঘুচেছে। মুর বলেছেন—সাহিত্যলোকে য়েট্‌স্ ছিলেন সন্ন্যাসীগোছের মানুষ। কথাটা সত্য।

১৮৯৯ সালে য়েট্‌স্ "আইরিশ্ লিটেররি থিয়েটর" স্থাপন করলেন ডব্লিনে; তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন লেডি গ্রেগরি এবং দু-এক জন লেখক বন্ধু। থিয়েটরকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র আয়র্লণ্ডে নূতন উৎকর্ষের চেতনা দেখা দিল। স্বদেশী সাহিত্যে নূতন পাতা খুল্‌ল এবং তাতে লেখা হ'ল সীনজ্ এবং প্যাড্রায়িক কলাম্-এর নাম—যাকে বলে, জ্যোতির অক্ষরে। য়েট্‌স্-এর তাগিদ বিনা এঁদের রচনা হ'তে আমরা বঞ্চিত হতাম।

য়েট্‌স্-এর সাহিত্য-জীবন চুয়াত্তর বৎসর পর্য্যন্ত অক্লান্ত সাধনার ইতিহাস; বাহিরের ঘটনা প্রায় নেই। নিভৃতে পড়বার ঘরে অনেক রাত্রি অবধি আলো জ্বলেছে; জ্ঞানের অধ্যবসায়ে, সুন্দরের ধ্যানে, কত বেদনা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যের দীর্ঘ অভিসার। গদ্যরচনায় তিনি অমরত্বের অধিকারী,—"কেল্‌টিক টোয়াইলাইট্" (১৮৯৩), "আইডিয়স্ অফ্ গুড্ অ্যাণ্ড ইভ্‌ল্" (১৯০৩), এবং জীবনস্মৃতিসংগ্রহ পাঠকের সুপরিচিত; সংহত সরস গদ্যের ভাষা কবির অন্তর্দৃষ্টিতে উজ্জ্বল। সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি সূক্ষ্ম বিচারের সঙ্গে দরদী চিত্তের স্পর্শ রেখে গেছেন। গদ্যে তাঁর মনের বিশিষ্ট পরিচয় কিন্তু কাব্যেই



বাউল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীনন্দলাল বসু

তাঁর শ্রেষ্ঠ অধিকার। তিন স্তর দেখা যায় তাঁর কবিতার ক্রমবিবর্ত্তনে।

জীবনের প্রথম গভীর শোক প্রেমের অশ্রুপ্লুত গানে তাঁর কবিতায় আভাসিত হয়েছে। আত্মসৃষ্টির প্রথম পর্য্যায়ে দেখি "প্রি-রাফেলাইট্" রূপকে তাঁর বাণী অলঙ্কৃত, আইরিশ্ রূপকথা দিয়েছে সুর, কথাকে সাজিয়েছেন নির্জ্জন কারুকাজে। ভিড়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কবি শুনছেন মানসহ্রদের জলধ্বনি "ইনিস্‌ফ্রি"র তটে, বিশ্ববেদনা শান্ত হয়েছে কল্পছবিতে। আধুনিক কবিদের মতে "পলায়নী" কবিতার মূল্য চিরদিনই থাকবে—অডেন্ বল্‌ছেন, গভীর ঘুমের মত, ক্ষুধার খাদ্যের মত, মানুষ চায় সব থেকে দূরে যাবার মন। অথচ, এ-কথাটাও ঠিক, যে, বিজনতায় সমাশ্রিত কাব্যে সৃষ্টির প্রাচুর্য্য ধরে না। ১৯১০-এ দেখি কবি য়েট্‌স্ অস্থির হয়েছেন; বলছেন, কল্পনার কারুশিল্পে তাঁর মন ক্লান্ত। আয়র্লণ্ডে তখন জাতীয় স্বাধীনতার ঢেউ উঠেছে, স্বদেশের ধ্যান তাঁর কাছে বাস্তব হয়ে উঠল। নূতনে প্রাচীনে মানুষের উৎকর্ষধারা অধিকার করল তাঁর মনকে। রচনার আঙ্গিকে দৃঢ়তা দেখা দিল। "দি গ্রীণ্ হেল্‌মেট্" কাব্যের আধুনিক বাক্-সংহতি এবং বিরল মাধুর্য্য মনকে জাগিয়ে তোলে। তৃতীয় পর্য্যায়ের আরম্ভ স্পষ্ট দেখি "রেস্‌পন্সিবিলিটিস্" কাব্যে। নির্ম্মম সাধনায় য়েট্‌স্ নামলেন বাহুল্যবর্জ্জনের পথে; বললেন, পুরনো রূপকথায় চিত্রিত কোটের চেয়ে কাব্যসৃষ্টিতে নগ্নতাই ভাল। তখনও এজ্‌রা পাউণ্ডএর মন কিছু প্রকৃতিস্থ ছিল, ক্ষ্যাপামির ফাঁকে ফাঁকে তার প্রতিভার ঝলক পড়ত নূতন যুগের ভাষায়। মার্কিন্ আধুনিকতার প্রভাবে পড়েও য়েট্‌স্ গদ্য-কবিতায় নাম্‌লেন না, কিন্তু পদ্যের কোঠায় আরো সাবধানে চলাফেরা সুরু করলেন। অতিচেতনতার প্রকোপে য়েট্‌স্ তাঁর কিছু পুরনো কবিতা বদ্‌লে অঙ্গহানি করেছেন, মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে প্রথম পাঠই থেকে যাবে। হঠাৎ উৎসারিত হয়ে উঠল তাঁর কাব্য নব নব সৃষ্টিতে; কবি নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে চললেন। এমনতর পরিণত যৌবনের উদ্দীপনা গীতিকাব্যের ইতিহাসে দুর্লভ। "দি ওয়াইল্‌ড্ সোয়ান্‌স্ অ্যাট্ কূল্" (১৯১৯) হ'তে "দি টাওয়ার" (১৯২৮), "দি ওয়াইণ্ডিং স্টেয়ার্" (১৯৩৩), এবং ১৯৩৫ সালের "দি ফুল্ মুন্ ইন্ মার্চ্চ" পর্য্যন্ত প্রতিভার ঐশ্বর্য্য নূতন-পুরনো সব দলকেই আশ্চর্য্য ক'রে দিল। শেষ কয়েক বছরে তাঁর আরও কবিতা পত্রিকায় বেরিয়েছে, তারও তুলনা নেই। বোধ করি জানুয়ারির "লণ্ডন মার্করি" এবং "আট্‌লাণ্টিক মন্‌থলি" কাগজে যে-কবিতাগুলি ছাপা হয়েছে য়েট্‌স্-এর শ্রেষ্ঠ কবিতার আসনে তাদের স্থান। দুই যুগকে তিনি মিলিয়েছেন; দ্বন্দ্ব ঘুচেছে প্রত্যক্ষ জীবনে এবং স্বপ্নের সত্যে; খরধার ভাষায় তিনি সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছেন ঘননিবিষ্ট গীতিকবিতায়।

৩

আবার উঠলেন কবি য়েট্‌স্ ঘুরনো সিঁড়ি বেয়ে উচ্চ চূড়ায়,—কিন্তু এ কোন্ চূড়া? পাথর আনলেন আইরিশ পাহাড় ভেঙে; ছাতের সবুজ স্লেট এলো খনি কেটে; গল্‌ওয়ে প্রদেশে সমুদ্রের কাছে পুরনো দুর্গ পড়ে ছিল, মেরামত ক'রে সেখানে সংসার বাঁধলেন। সত্যকার বাড়ী। স্মরণীয় কবিতায় বলেছেন, তাঁর স্ত্রী জর্জ্জ—জর্জ্জি লীস্—তাঁর এই চূড়ার অধিকারী: আমি কবি উইলিয়ম্ য়েট্‌স্ সংস্কার ক'রে উপহার দিলাম তাঁকে; আমার এই বাণী বেঁচে থাকুক যখন সব মিলেছে আবার ধূলিতে চূর্ণ হয়ে॥ অপরূপ সৌধের চার পাশে ভিড় ক'রে দাঁড়াল নবীনের দল। বিস্ময়ে দেখল প্রাচীন চিত্রিত দরজা, রঙীন জানলার কাচ, দৃঢ় হয়ে নীল আকাশে উঠেছে খেয়ালের সৃষ্টি। হাটবাজারের বুকেই এই বাসা; চূড়া-নিবাসী দৈত্যকে দেখা গেল ভালমানুষ, আমাদের ভাষাতেই কথা কন যদিচ তাঁর আপন ধ্যানের ভাবে। দল বা গোষ্ঠীর বা যুগধর্ম্মের ছাপ-মারা নেই কোথাও, স্বাধীন সৃষ্টির রহস্য কবিতায় স্বপ্রকাশ।

কবি য়েট্‌স্ তাঁর সংসারের খবর দিলেন বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে—চিঠিতে লিখলেন,—

"আমাদের দেখা হওয়ার পর আমি বিবাহ করেছি। আমার এখন দুই সন্তান, একটি ছেলে, একটি মেয়ে, আর মনে হয় জীবনের সঙ্গে আমি আরও ঘন গ্রন্থিতে বাঁধা পড়েছি। জীবনকে যখন তার আপন রূপেই দেখি, যা

কিছু বাহিরের ডাকে বাদ দিয়ে, যা কিছু যান্ত্রিক এবং জটিল তার থেকে ছাড়িয়ে, তখন আমার কল্পনায় তা এশিয়ার মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়ায়। এই মূর্ত্তি প্রথম দেখেছিলাম আপনার লেখায়, পরে কিছু চীনে কবিতায় এবং জাপানী গল্পে। কী উত্তেজনা হয়েছিল সেই প্রথম আপনার কবিতাগুলি পড়ে—যেন তারা প্রান্তর নদীর মধ্য হ'তে জেগেছে এবং তারই অপরিবর্ত্তনীয়তা তাদের অন্তরে।..."

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে লেখা এই চিঠিখানি বেরিয়েছিল ইংরেজী "গোল্ডেন্ বুক্ অব টেগোর"-এ। "জীবনের সঙ্গে ঘন গ্রন্থিতে বাঁধা"—শেষ কবিতার মূল সুর তাঁর ঐ কয়েকটি কথায়। প্রশস্ত ভূমিকা ছিল না তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার, কল্পনা দিয়ে ঘিরেছিলেন জীবনের একটি অঙ্গন; তারই মধ্যে সত্যের চেতনা, সুন্দরের তপস্যা, জাগ্রতের বিশ্বের স্বীকৃতি এসে মিলেছিল। নূতন যুগের স্থূল আবরণ ভেদ ক'রে তার সাধনার মর্ম্মে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন।

বাঁশরী

শ্রীগোপাললাল দে

আধো ভুলে যাওয়া সুখ-দুঃখের কাহিনী ভরিয়া রন্ধ্রে,
ওরে বাঁশরিয়া, বাঁশরী তোমার বাজাও বল কি ছন্দে?
গভীর রজনী আলো-ছায়া আঁকা,
আকাশের নীলে নীহারিকা মাখা,
আলসে আবেশে আঁখিতারা ঢাকা নিবিড় নয়নবন্ধে,
হেন কালে পথে, ওরে বাঁশরিয়া, বাজাও বাঁশী কি ছন্দে!

সহসা নয়নে নিদ্ টুটে যায়, ফুটে কারো আঁখিতারা,
ঘুম ছেয়ে আসে কারো পল্লবে, কারো গলা ভারা ভারা,
বাতায়ন খুলে কেহ বা দাঁড়ায়,
অজানিতে কেহ চরণ বাড়ায়,
ভুলে যাওয়া কি যে কাহিনী ছড়ায়, জাগা-স্বপনের পারা,
বাঁশী গেয়ে চলে, ফুটে দলে দলে স্মৃতিপথে শতধারা।

বড় সে করুণ! বুঝি অকরুণ ধরণীরে চিনিয়াছে,
মন উড়ে যায় জরায়, ক্ষুধায় রোগশয্যার পাছে,
শিশুহারা যেন কাঁদিছে জননী,
পতিহারা কাঁদে কত বিনোদিনী,
মিটিল না আশা, কত ভালবাসা মরণে শরণ যাচে,
ওরে বাঁশরিয়া, ও সুর থামাও, দুখ জানি আছে, আছে।

আবার ঝরে কি-সুর-নিঝর! থর থর ফুটে বনে,
কনক-চম্পা, কেলি-কদম্ব, কিষণ-চূড়ার সনে,
গেয়ে ওঠে শত শ্যামা শুক পিক,
কুঞ্জে গুঞ্জে ভরি উঠে দিক,
কত না উদয় অস্ত রাগেতে, জোছনার আলিপনে,
গানে ও গন্ধে, প্রেম আনন্দে, পূর্ণের জাল বোনে।

বড় গম্ভীর! কালের কপোত চলে চঞ্চল-হিয়া,
সুখ-দুঃখের আশা-নিরাশার পক্ষেতে ভর দিয়া,
রাজার রাজ্য, বণিকের ধন,
পিছে পড়ে থাকে মুছিয়া স্মরণ,
কোণে কোণে কাঁদে অশ্রুর বাঁধে, অণুজীব দখিয়া,
ভুলে ভালবাসে, ভুলিয়া সে হাসে; প্রকৃতি অ-দরদিয়া!

কারে তুমি চাও, কেন বা বাজাও, কি সুরে কি গান গাও,
একই তানে যে গো ঘুমাও, জাগাও, সুখ দাও, সুখ নাও,
হিয়া দুরু দুরু কারো আশাভরে,
নয়ন-কুন্তে কারো বারি ঝরে,
শ্যাম যমুনার বাঁশরীর ধ্বনি কালে কালে বরষাও,
থেমে গেলে সুর, ভরি মন-পুর রেশখানি রাখি যাও।

দ্বিতীয় পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

ডাক্তার অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, তুমি জানো চারিদিকের সঙ্গে আমার মনের স্পর্শের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। যাই বলি না কেন বর্তমান যুগধর্মের প্রেরণাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার পথের বাঁকাচুর সে ঘটিয়েছেই সব সময়ে জানতে পারি বা না পারি। আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে আধুনিক দেখা দিয়েছে পুরাতন বাসাতেই, আমি বাসা বদল করি নি—বোধ হচ্ছে না-করবার কারণ এই যে আমার বাসায় জায়গা ছিল যথেষ্ট। জগদীশ বলতেন সাহিত্যের জলচর আমি যদি না হতুম তা হলে বিজ্ঞানের ডাঙায় আমি মাথা তুলে বেড়াতুম। আমার মানসিক চালচলনে বিজ্ঞানের ঝোঁক ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমার হালের লেখার মধ্যে তার প্রভাব প্রবেশ করেছে ব'লে সন্দেহ হয়, সেই প্রভাবটা যদি ভিতরকার জিনিস হয় তাহলেই সেটা অকৃত্রিম হোতে পারে। তুমি জানো আমি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলুম তখন আমাদের পরিবার ছিল এদেশের সমাজ থেকে নির্বাসিত—আমরা ছিলুম দ্বীপে রবিন্‌সন্ ক্রুসোর মতো, হাতের কাছে তৈরি জিনিস কিছুই পাই নি, সব আপনারা তৈরি করে নিয়েছি—সেই নিজের তৈরি আত্মরচনার মধ্যে বেড়ে উঠেছি সুদীর্ঘকাল ধ'রে। মনে আছে ছেলেবেলা প্রায় শুনতুম পিরিলি বাড়ির ভাবভঙ্গী ভাষা বেশভূষা আচার-ব্যবহার নিয়ে পরিহাস, যারা হাসত তারা ভাবতে পারত না এই জিনিসটাই অকৃত্রিম, আমাদের স্বভাবের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে, বাইরে থেকে সাজানো নয়। আমাদের মধ্যে এই যে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা ঘটেছে এটা কাজ করেছে আমার জীবনের সকল বিভাগেই। এমন কি যে-ধর্মশিক্ষার মধ্যে জীবন আরম্ভ করেছি সেই ধর্মকেও যতক্ষণ না আপন স্বভাবের সঙ্গে সংগতি দিয়ে রূপান্তরিত করতে পারলুম ততক্ষণ তাকে গ্রহণ করতে পারি নি। প্রথম বয়সে কাব্য আরম্ভ করেছিলুম অনুকরণে, বিহারীলালকে অক্ষয় চৌধুরীকে রেখেছিলুম সামনে, কিন্তু অল্প বয়সেই একদিন কখন বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়লুম। তেতালার ঘরে দুপুর বেলায় সেই হঠাৎ মুক্তির প্রবল আনন্দের কথা আজও মনে পড়ে—অথচ যে কবিতাটি সেদিন আমার নবীন লেখনীকে কুলত্যাগিনী করেছিল তার কাঁচা ছেলেমানুষি আজকের দিনে কোনো শ্রেণীর কবির পক্ষেই গৌরবের বিষয় হোত না। আমাকে আমার স্বভাবের পথ ধরিয়ে দিয়ে নিজে সে কোথায় করেছে অন্তর্ধান। মনে আছে যে-প্রবল বেদনায় সেই লেখাটা হঠাৎ উৎসারিত হয়েছিল সেটা অত্যন্ত আমার অন্তম, তাকে ভিড়ের লোকের হাতে দিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়েছিল। একলা ঘরে বসে সেটা লিখেছিলুম স্লেটে, এবং মুছে ফেলেছিলুম। তার পর থেকে আমার কাব্যস্বরূপ আপন দেহকে প্রকাশ করেছে আপন প্রাণশক্তির প্রবর্তনায়। এর মধ্যে স্বাভাবিক পরিবর্তন চলে কিন্তু অনুকরণ চলে না। এই ডাঙার শরীর যদি কোনো খেয়ালে জলে সাঁতার দিতে চায় তবে মানুষরূপেই দেয়, রুই মাছ সেজে দেয় না। দেশবিদেশ থেকে নানা রকম ভাবের প্রেরণা এসে পৌঁছেছে আমার মনে এবং রচনায়, তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছি, তা আমার কাব্যদেহকে হয়তো বল দিয়েছে পুষ্টি দিয়েছে কিন্তু কোনো বাইরের আদর্শ তার স্বাভাবিক রূপকে বদল করে দেয় নি। ভিতরের দিক থেকে ভাব গ্রহণ করবার মানসিক আধার প্রশস্ত, কিন্তু বাইরের দিকে যে দেহরূপ আছে তার স্বাভাবিক গঠন একটা চেহারার

সীমানায় বাঁধা, সেই সীমায় মধ্যেই কিছু কিছু তার বাড়া কমা, কিছু কিছু তার অদল-বদল চলতে পারে—কিন্তু আগাগোড়া রূপ-বদল দেখলেই বুঝি সেটা আদর্শকে গ্রহণ করা নয় সেটা আদর্শকে নকল করা এই জিনিসটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি নে। এই দেখো না কেন, যাচনদার এখনকার কোনো ছবিকে ওরিয়েণ্টাল মার্কা দিয়ে যদি হাটে চালান দেয় তাহলে বুঝব সেটা ম্যুজিয়মের জিনিস; কোনো একসময়কার যে প্রাচ্য আর্ট সত্য ছিল সজীব ছিল তারি ছাঁচে ঢালা নকল পদার্থকেই আজ ওরিয়েণ্টাল বলে। অবনের মধ্যে যদি প্রাচ্য শিল্পের প্রেরণা থাকে সেটা ভিতর থেকেই কাজ করবে, তাঁর চিত্রদেহের বাইরের রূপ যদি কেবলি অজন্তা কাংড়া ভ্যালি আর মোগল আর্টেরই দাগাবুলোনো হোতে থাকে তাহলে ব্যবসায়ী যাচনদারেরা তাকেই ওরিয়েণ্টাল আর্ট ব'লে খাতির করবে বটে, কিন্তু তাকে স্বভাবসিদ্ধ সজীব আর্ট বলা চলবে না। অবনের আর্টের যদি স্বাভাবিক প্রাণগত অভিব্যক্তি থাকে তবে তাকে কোনো একান্ত বিশেষ শ্রেণীগত মার্কার বেষ্টনীভুক্ত করা চলবেই না। তেমনি আমাদের দেশে হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলছি যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীব-সমাজে নেব কী করে? যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রানিক নিয়মপথে চলেছে—তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হোতে পারে সনাতনীও হোতে পারে অথবা উভয়ই হোতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়টের বা অডিনের বা এজরা পাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হোতেই পারে না। সজীব দেহের আপন চেহারার পরিচয়েই মানুষকে সনাক্ত করা চলে, তার পরে চালচলনে তার ভাবের পরিচয় নেওয়া সম্ভব হয়। যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম।

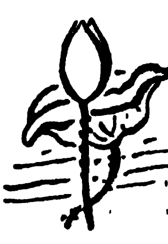
তোমাকে আমি এত কথা বললুম তার মূলে আছে আমার নিজের কাব্যরূপের অভিব্যক্তির অভিজ্ঞতা। সেই অভিব্যক্তি নানা পর্বে নানা পথে গেছে কিন্তু সব নিয়ে স্বতই তার একটা চেহারার ঐক্য রয়ে গেল। যুগধর্মের তিলকলাঞ্ছিত হবার লোভে সেটাকে বদল করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

তুমি এখনকার ইংরেজ কবিদের যে-সব নমুনা কপি ক'রে পাঠাচ্ছ প'ড়ে আমার খুব ভালো লাগছে,—সংশয় ছিল আমি বুঝি দূরে পড়ে গেছি, আধুনিকদের নাগাল পাব না—এই কবিতাগুলি পড়ে বুঝতে পারলুম আমার অবস্থা অত্যন্ত বেশি শোচনীয় হয় নি। তুমি যদি এই সময়ে কাছে থাকতে তোমার সাহায্যে বর্তমান সাহিত্যের তীর্থপরিক্রমা সারতে পারতুম।

আমার পূর্ব চিঠির উত্তরে তুমি যে চিঠি লিখেছিলে সেটা পড়ে খুব খুশি হয়েছি।

আমার বড়ো বড়ো বহরের চিঠি দেখে মনে কোরো না আমার অবকাশের waste land বুঝি বহু-বিস্তৃত। একেবারেই তার উল্টো। আমার জীবনের এই একটা প্যারাডক্স, যখন টানাটানি হয় বেশি তখনি ছড়াছড়ি হয় বিস্তর।

২৩।২।৩৯



সাক্ষী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'কী বলতে হবে, ঠাকুর? বলো দিকি বুঝিয়ে, ভাল করে ঝালিয়ে নি। ট্রেনে ওঠবার আগে দুর্লভ আরেকবার ভটচাযকে জিগ্‌গেস করলে।

ভটচায ভারি বিরক্ত হ'ল। আজ প্রায় সাত-আট দিন তাকে সে সমানে বোঝাচ্ছে, কিন্তু এখনো কথাটা তার মাথায় ঢুকল না। কিন্তু বিরক্তির ভাব সম্পূর্ণ গোপন রেখে বললে, 'বলবি, একালি জমি, আজ বিশ-তিরিশ বছর ধরে দেখে আসছি ষষ্ঠী ভটচায বর্গায় দখল করছে।'

'চাষ করে কে জিগগেস করলে কী বলব?'

কোনো দিকে না তাকিয়ে ভটচায বললে, 'সোনাউল্লো।'

'এই কথা? এ আমার খুব মনে থাকবে।' দুর্লভ নির্ভাবনায় ঘাড় হেলালো। বললে, 'দু-পয়সার পান কিনে দাও, ঠাকুর।'

ভটচায পান কিনে দিল। এক'মুখ পান চিবোতে-চিবোতে দুর্লভ ট্রেনে উঠল, এমন নির্লিপ্ত, যেন কত সে ট্রেনে উঠেছে।

রাত্রের ট্রেন, ব্রাঞ্চ-লাইন। সকালের দিকে এ-অঞ্চলে আগে একটা ট্রেন ছিল। বছর তিনেক উঠে গেছে। তাই আদালতের প্যাসেঞ্জার এ-ট্রেনেই শহরে যায়, কেউ হোটেলে, কেউ বাজারে, কেউ বা স্টেশনের প্লাটফর্মে রাত্রিযাপন ক'রে পর দিন সাড়ে-দশটায় গিয়ে হাজিরা ফাইল করে।

বেজায় ভিড় থাকে ট্রেনে, আজকের শেষ ও কালকের প্রথম ট্রেন।

সেদিনও ছিল।

গাড়ীতে উঠেই দুর্লভ বিরক্ত হয়ে বললে, 'এ কী একটা জঘন্য গাড়িতে নিয়ে এলে, ঠাকুর? গদি নেই যে?'

ভটচায বললে, 'দাঁড়া, আমার কম্বলটা ভাঁজ ক'রে পেতে দিচ্ছি।'

'তা তো দেবে, কিন্তু জায়গা কোথায়?'

'এই, তুই ওঠ্‌ তো পবন।' ভটচায এক জনের কাঁধে একটা টোকা মারলে: 'আর, এই নটবর, ওরে সখীচরণ, ওগো বেয়াই মশাই, তোমরা একটু সরে' বসো, দুর্লভকে বসতে দাও।'

পবন উঠে দাঁড়াতেই দুর্লভের কম্বলাস্তৃত জায়গা হ'ল।

কিন্তু তবু তার অস্বস্তি ঘুচল না। বললে, 'নাঃ, এ ভাবে বসলে জামাটা একেবারে দলামোচা হয়ে যাবে। দাও, ধোঁয়া বার করো, ঠাকুর।'

ভটচায পকেট থেকে সাদা সুতোর বিড়ি বার করলে।

'কী গুচ্ছের বিড়ি বার করছ? সাক্ষী দিতে যাচ্ছি, একটা সিগরেট খাওয়াও।'

ভটচায অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে, 'এখন একটা বিড়িই ধরা, নাগরদ' ইষ্টিশানে সিগরেট কিনে দেব।'

দুর্লভ মুখ ভার ক'রে বললে, 'দখলের বয়েস তবে তোমার তিন-চার বছরে নেমে যাবে, ঠাকুর, বিশ-তিরিশ আমি বলতে পারব না। একটা সিগরেট খাওয়াতে পারো না, বর্গায় লাগিয়ে দখল কর না-ব'লে নিজেই হাল চালাও বল না কেন?

'আছে নাকি হে সখীচরণ?' ভটচায সহযাত্রীদের দিকে ভিক্ষুকের চোখে তাকাতে লাগলে।

'আছে।' নটবর বললে। নটবর যদিও মাসতুত শালা এবং যদিও বয়স্ক ভগ্নীপতির সামনে ধূমপান তার নিষিদ্ধ, তবু এ-যাত্রায় চক্ষুলজ্জা করলে চলে না। কেননা, দুর্লভই একমাত্র অনাত্মীয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সাক্ষী, তাকে চটানো মানেই মামলাটি চটিয়ে দেয়া। আর সব

সাক্ষীকে এতটুকু খোঁচা দিলেই রক্ত না হোক রক্তের সম্পর্ক পড়বে বেরিয়ে।

'চৌহদ্দিটা শিখিয়ে দিলে হ'ত না?' পবন প্রস্তাব করলে।

'পূবে ভেকটমারির খাল, পশ্চিমে মাদার মণ্ডল, উত্তরে বিষ্টু গোলদার আর দক্ষিণে হাবেদ আলি—' দলের মধ্যে থেকে বুড়ো পতিপ্রসন্ন, মানে গাঁ-সম্পর্কে ভটচাযের বেয়াই, বিড়বিড় ক'রে আউড়ে দিলে। এর দাদার নাম ছিল সতীপ্রসন্ন, মিলিয়ে নাম রাখতে গিয়ে এ হয়েছে পতিপ্রসন্ন।

'ভেটকিমারি না বোয়ালমারি ও-সব আমি বলতে পারব না, ভটচায।' দুর্লভ সিগরেটে লম্বা টান দিলে। বললে, 'পাশের জমি ঠাকুরদার দখল ছিল ব'লে দলিলে লেখা আছে বলছ, সেই জোরে সাক্ষী দিতে যাচ্ছি। নইলে কাংলামারি কি চিংড়িমারি—ও-সবের আমি ধার ধারি না।'

'দরকার নেই।' ভটচায সায় দিলেন, 'একালি জমি, তাই বললেই যথেষ্ট। আর বিশ-তিরিশ বছর ধ'রে ষষ্ঠী ভটচায দখল করছে বর্গায়। বর্গাদার কে মনে আছে তো?'

'সে যেই হোক, শহরে গিয়ে টকি দেখাতে হবে, ভটচায।' দুর্লভ চোখ বড় ক'রে বললে।

'কিন্তু বল্ আগে, বর্গা করত কে?'

'দাঁড়াও, ভেবে নি।' সিগরেটে জলন্ত টান দিয়ে দুর্লভ চোখ বুজল।

কাটল কতক্ষণ।

'কি রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?' ভটচায তার হাঁটুতে ঠেলা দিলে।

'ও, হাঁ—' দুর্লভ উঠল হকচকিয়ে, 'ছোট একটা টেপা-বাতি চাই। আমার পকেটে যাতে লুকিয়ে নেওয়া চলে। মুখ-চোখ একেবারে তার ঝলসে দেব না?

ভটচায তিরিক্ষি হয়ে উঠল, 'দুত্তোর্ তোর টেপা-বাতি। বর্গাদারের নাম কী?'

'বেফাঁস নাম বলার চেয়ে স্রেফ ব'লে দেব স্মরণ নেই। তাই না পতি-ঠাকুর?' দুর্লভ পতিপ্রসন্নের দিকে ঝুঁকে এল: 'তুমি বলো নি জেরায় ঠেকে গেলেই বলতে হবে স্মরণ নেই? 'তবে আর ভাবনা কিসের! বর্গাদার কে মনে না থাকে, পষ্ট ব'লে দেব স্মরণ নেই, ধর্ম্মাবতার! হাঁ-ও নয় না-ও নয়, মারে কে শুনি?'

'না।' ভটচায ধমকে উঠল, 'শুনে রাখ্ সোনাউল্লো। সোনাউল্লো বর্গা করে।'

'সোনাউল্লোও যা, রূপাউল্লোও তাই। আসে নি তো কেউ!'

'সে জন্যে তোর ভাবতে হবে না। মুহুরিবাবু তাকে ধরে নিয়ে আসবে বলেছে। আসুক আর না-আসুক নামটা তুই তার ভুলিস নে।'

'আমি কি তেমনি ছেলে? কিন্তু, যাই বল, টেপা-বাতি চাই একটা। ঠিক গোল হয়ে আলো পড়বে। সমস্তখানা গোল মুখের উপর।' সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দুর্লভ শিথিল গলায় বললে, 'একটু সরু হও পবনচন্দ্র, পা দুটো একটু টান করি।'

জায়গা ছেড়ে পবন উঠে দাঁড়াল।

'পুঁটলিটা তোর এগিয়ে নিয়ে আয়, নটবর, আমার মাথার নীচে শান্তিতে থাকবে।'

ভটচাযের ইসারায় নটবরও উঠে দাঁড়াল, এবং তার জায়গাটা অধিকার করল তার পুঁটলিটা। দুর্লভ স্বচ্ছন্দে তাকে শিরোধার্য্য করলে।

বাঘ তাড়াবার জন্যে লাইন পেতেছিল ব'লে নিদারুণ শব্দ হয় এখানকার ট্রেনের চাকায়। কিন্তু দেখা গেল বনের বাঘ তাড়া পেয়ে বাসা নিয়েছে এসে দুর্লভের স্ফারিত ও রোমশ নাসারন্ধ্রে।

দু-বেঞ্চির ফাঁকে মেঝের উপর হাঁটু গুটিয়ে নটবর আর পবন ব'সে, আর দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভটচায।

হোটেলে বেজায় ভিড়, খাওয়া যদি বা মেলে শোয়াই দুষ্কর।

ভটচায নটবরকে বললে, 'খেয়ে দেয়ে তোরা ইষ্টিশানে চলে যা ঘুমুতে। দুল্লভকে নিয়ে আমি এখানে থাকব।'

'জায়গা কোথায় এখানে?' নটবর আপত্তি করলে।

'হোটেলওয়ালা একখানা বেঞ্চি দেবে বলেছে—

ছ-পয়সা ভাড়া। ভাবছি, দুর্লভকে ওটাতে শুতে দিয়ে আমি নীচে মাটিতে শুয়ে থাকব। গ্রীষ্মকাল, কষ্ট হবে না।'

পবন গরম হ'য়ে উঠল, বললে, 'দুর্লভ তো নাপিত, ও শোবে বেঞ্চিতে, আর তুমি বামুন হয়ে শোবে মাটিতে। এ কি অনাচারের কথা!'

ভটচায চোখ টিপে বললে, 'যা আর বকাসনে। দুর্লভই আমাদের ভরসা। ওকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এক রাতের তো মামলা—তাতে কি যায় আসে! মোকদ্দমাটা তো আগে পাই!'

ভিড়টা বেশীর ভাগই দেওয়ানি: বোঁচকাতে নথি, কাছায় টাকা আর ললাটে দুর্ভাগ্য। আর কতকগুলি ফড়ে আর দালাল, এর থেকে ওকে কাড়ে, ওকে ভাগিয়ে একে বাগায়।

'যা যা, সেদিনের ছোকরা নবকেষ্ট, আইনের ও জানে কি!'

'আর যত জানে তোমার ঐ বুড়ো-হাবড়া বিপিন হালদার! দু-কথা ইংরিজি বলতে গিয়ে যে ইয়ে-ইয়ে ক'রে কেঁদে ফেলে!'

'আরে দাদা, উকিল-ফুকিলে কিছুই নেই!' ভিড়ের মধ্যে থেকে কে ব'লে উঠল: 'সব এই অদেষ্ট। তুমি বললে এ, সে বললে ও, আর তার বাবা বললে, কিচ্ছু না।'

'কিচ্ছু না।' আরেক জন সায় দিলে, 'শুধু বাজি খেলা। যেমন আতসবাজি, তেমনি মামলাবাজি। উকিল-হাকিমে করবে কি?'

দুর্লভ এরি মধ্যে চেনা-অচেনা অনেকের সঙ্গেই জমিয়ে নিয়েছে।

'কত দিয়ে কিনলে এই চাদরখানা?'

'হাঁ, সাক্ষী দিতে এসেছি, তায় গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে চাদর কিনব!'

'তবে দিলে কে?' দুর্লভ হাতে ক'রে জমিটা পরখ করতে লাগল।

'পার্টি কিনে দিয়েছে।'

'সে আবার কে?'

'যার মামলা, সে। শহরে এসে ভদ্দর-সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেব, কাঁধে একখানা গামছা ফেলে তো আর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। তাই নায়েবমশাইকে বললাম, গায়ের একখানা কাপড় চাই, বহু মারামারি ক'রে তের আনা দিয়ে এখানা উদ্ধার করেছি।'

দুর্লভ সটান ভটচাযের সামনে এসে হাত পাতলে।

'না, ছাড়াছাড়ি নেই, গায়ের চাদর দিতে হবে, ঠাকুর।'

'মামলাটা আগে জিতি, চাদর কেন, তোকে শাল-দোরোখা দেব দেখিস।'

'কাজ হাসিল করবার আগে সব শালাই তা ব'লে থাকে। কাজের পর তখন অষ্টরম্ভা। না, চাদর না দাও, ছিটের অন্তত একটা হাফ-সার্ট দিতে হবে।'

'তার চেয়ে চুল ছাঁটবার জন্যে একখানা কাঁচি চেয়ে নে না।' পতিপ্রসন্নর সহ্য হ'ল না, মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'সাক্ষী দিতে হবে ব'লে শালা, একেবারে ঘাড়ে চেপে বসেছে।'

'নাপিত ব'লে হেনস্তা কোরো না পতিঠাকুর', দুর্লভ চোখ পাকালে: 'খুরে শান দিয়ে রাখব-ব'লে রাখছি। কই, নিজেদের দিয়ে তো কুলোল না, শেষকালে ডাক পড়ল সোনাউল্লো আর দুর্লভ প্রামাণিকের। এতই যখন হেনস্তা তখন পারব না সাক্ষী দিতে।' দুর্লভ একটা ঘাই মারলে।

'কেন চটিস্, দুর্লভ? আদালতে গিয়েই তোকে সার্ট কিনে দেব।' ভটচায তার পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত করলে। আর চোখ মটকে পতিপ্রসন্নকে বললে সরে যেতে।

খেয়ে-দেয়ে সবাই শুয়েছে, দুর্লভ বেঞ্চির উপর আর ভটচায নিচে, মাটিতে মাদুর বিছিয়ে। গরম পড়েছে নিদারুণ, কিন্তু দলিল-পত্রের পুঁটুলি নিয়ে বাইরে শুতে সাহস হয় না। মশারি নেই তাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি, কিন্তু রাত একটু ঘন হয়ে আসতেই দুর্লভের কাশি উঠেছে। খুকখুক থেকে খনখনে কাশি—মুখের আর পাতা পড়ে না। চোখের পাতা একত্র করে সাধ্যি কার!

দুখ অনুনাসিক শব্দে ভটচায কয়েকবার প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। কাশি থামলেই সাক্ষী যায় চটে, আর সাক্ষী চটতেই কাশি আরও প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু কতক্ষণ পরে দেখা গেল কাশি তরল হয়ে এসেছে, আর সেটা বেশ উত্তপ্ত তরলতা।

এতটা ভটচাযের সহ্য হ'ল না। ধড়মড়িয়ে সে উঠে বসল, ধমকে উঠল দিশেহারার মত: 'তোর যে দেখছি বড্ড গরম কাশ, দুর্লভ।'

দুর্লভও উঠল খাড়া হয়ে দু-হাতে পাঁজরা চেপে। গলায় সাঁই সাঁই শব্দ ক'রে বললে, 'যার ঠাণ্ডা কাশ, তার কাছে যাও, আমি পারব না তোমার সাক্ষী দিতে। বলে আমি মরছি হাঁপানিতে, আর উনি এখানে জমির চৌহদ্দি মেলাচ্ছেন!'

সকালবেলা দলবল নিয়ে ভটচায উকিলের বাড়ী এসে হাজির হ'ল। বোসেদের নতুন দালানে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে এসেছিল, সেখান থেকে মুহুরি সোনাউল্লোকে ধরে এনেছে। বলে দিলে সবাইকে: চিনে রাখ, এই সোনাউল্লো

উকিল নরহরি বললে, 'বউনি কর। হাকিম বড় কড়া, ইংরিজিতে ছাড়া কথা বলে না, চার টাকায় কমে পারব না কাজ করতে।'

মুহুরি টিপ্পনি কাটলে, 'আর বিনা গাউনে যদি মামলা চালাতে চাও তবে কম দিলে চলে, কিন্তু জান না তো, গাউন পরে' সওয়াল না করলে কোন হাকিমই আর চোখ তুলে চেয়ে দেখে না আজকাল।'

'না, না, গাউন পরে' বই কি।' ভটচায ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'কি তবে পুরো চাই।'

টেনে-বুনে দর-কষাকষি ক'রে চার টাকা বার আনায় রফা হ'ল—মায় মুহুরি আট আনা, আর সোনাউল্লার দিনের মজুরি।

নরহরি মুহুরিকে বললে, 'হাজিরা লিখে ওদের সব টিপটাপ নিয়ে ঠিকমত ফাইল ক'রে দাও গে।' তার পর ভটচাযের দিকে তাকিয়ে: 'এ-মামলায় তুমি নির্ঘাৎ ফল পাবে পুরুতঠাকুর, হাইকোর্ট ছেড়ে প্রিভিকাউন্সিলও তোমার কিছু করতে পারবে না। খরচ-পত্র ক'রে এত গুচ্ছের সাক্ষী এনেছ কেন? দুর্লভ পরামাণিক আর সোনাউল্লো সেখ—ব্যস্, কেল্লা ফতে! লাগোয়া জমি, বিশ-কুড়ি বছর দখল, চাষ আর রোয়া, মাড়াই আর কাটা, আর তোমাকে পায় কে! তার পরে যা করবার করবে আমার এই মুখ! ওদেরকে শুধু চৌহদ্দিটা বার কতক ঝালিয়ে নিতে বলো।'

ট্যাকে টাকা গুঁজে নরহরি বাড়ীর ভিতরে উঠে যাচ্ছিল, ভটচায শশব্যস্তে ব'লে উঠল 'মামলাটা আর এক বার যদি বুঝে নেন—'

নরহরি বাধা দিয়ে বললে, 'বোঝবার কিছুই নেই এতে। বোঝাব কাকে যে নিজে বুঝব? হাকিমরা কি বোঝে কিছু মাথামুণ্ডু? সব লবডঙ্কা। কিছু ভেবো না তুমি ভটচায, সব ঠিক হয়ে যাবে। চান ক'রে কালাবাড়ীতে দুটো ডিপ ক'রে হোটেল থেকে খেয়ে-দেয়ে কাছারিতে চ'লে যাও, এক ডাকে যেন হাজির পায় তোমাদের।'

এগারটা বাজতেই ঘণ্টা পড়ল কোর্টে। খেয়ে উঠে আঁচাচ্ছিল, ঘণ্টা শুনতেই তার সমস্ত শরীর একটা রেলগাড়ী হয়ে উঠল। কাপড়ে তাড়াতাড়ি হাত মুছে মালকোঁচা মেরে তার উপর দিয়ে জিনের প্যাণ্ট দিল চালিয়ে, গলাবন্ধ কালো কোটটাতে কোনরকমে গলিয়ে নিল হাত দুটো, জুতোর ফিতে বাঁধবার সময় হ'ল না. গোটা-ছয়েক পান মুখে পুরে দিয়ে সবুজ গাউনের পুঁটলিটা বগলে ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলে।

হাকিম এজলাসে, চাপরাশি গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, অপর পক্ষ প্রস্তুত, কিন্তু না আছে ভটচায, না আছে সাক্ষীরা। পেস্কার বললে, মুহুরি হাজিরা ফাইল ক'রে তাদের খুঁজতে গেছে, তাও প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেল।

নরহরি আদালতকে সম্বোধন ক'রে বললে, 'আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিন, হুজুর, আমি একবার নিজে খুঁজে দেখি। এখানে নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাকিম বললে, 'পাঁচ মিনিট।'

নরহরি ছুটল বার-লাইব্রেরির দিকে। বেশী দূর

যেতে হ'ল না, ঐ ভটচাযদের ভিড়। রাস্তার পাশে একটা কাটা-কাপড়ের দোকানের পাশে জটলা করছে।

'কী করছ তোমরা?' নরহরি ঝাঁজিয়ে উঠল: 'ওদিকে মামলা যে গেল খারিজ হয়ে।'

বিরক্ত হয়ে ভটচায বললে, 'দুল্লভের জামা আর কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না।'

'কী ক'রে হবে? গায়ে আঁট হ'লেও নিতে হবে নাকি?' দুর্লভ ঘাড় মোটা ক'রে বললে, 'ছিটই পছন্দ হয় না, তায় সব ঝিনুকের বোতাম-ওলা। আমি চাই ডবল-ঘরের বুক। অনেক বেছে তবে এটা পাওয়া গেল।'

'নে, নে, চমৎকার হয়েছে। চলে আয় শিগগির। নরহরি তাড়া দিলে।

'বা, সুতো-বাঁধা একগাছি হাড়ের বা কাচের বোতাম কিনে নিতে হবে না? হাঁ-করা জামা প'রে আমি সাক্ষী দেব নাকি? দুর্লভ ঘাড়টা আরও ছোট ক'রে আনলে।

'আমার এখানে আছে।' পাশেই একটা মাটিতে-বিছানো মনিহারী দোকান থেকে কে বলে উঠলো: 'এই যে এই জিনিষ। নকল হীরের।'

'বাঃ,' দুর্লভ লাফিয়ে উঠল যখন দেখল ওটা রোদ লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে: 'ঐটেই চাই। সুতো দিয়ে বেঁধে দাও লম্বা ক'রে।'

'দাম কত?' ভটচায জিগগেস করলে।

'সাড়ে চার আনা।'

'দশ পয়সা পাবে, দিয়ে দাও।'

'নাও আর দরাদরি কোরো না।' পান-মুখে নরহরি একটা ঢোক গিললো: 'এদিকে ছ' পয়সা বাঁচাতে গিয়ে ওদিকে তোমার ছ-শো টাকার মামলাটি ফুপোকাৎ হ'য়ে যাক। এই না হ'লে কি পুরুতের বুদ্ধি, চুল কেটে টিকি রাখা।'

অগত্যা সাড়ে চার আনা পয়সাই ভটচায ফেলে দিল।

কিন্তু আরও বিপদ আছে। দু'পা এগোতেই আর এক জনের দোকানে দড়িতে টাঙানো রঙবেরঙের পাৎলা চাদর ঝুলছে—সব ইটালী থেকে আমদানি। সিল্ক-ফিনিস।

দুর্লভ বললে, 'আর এ একখানা। কথা রাখ ঠাকুর।'

নরহরি চমকে উঠল, 'এই গরমে তোর গায়ের কাপড় দিয়ে কী হবে রে হতভাগা?'

'এই গরমে তোমাদের গাউন হ'তে পারে আর আমাদের একখানা উড়ুনি হ'লেই চোখ টাটায়।' দুর্লভ ফোড়ন দিলে।

মুহুরি আদ্যনাথ ছুটতে ছুটতে হাজির।

'বেটাদের আমি গরু-খোঁজা করছি। ওদিকে সাত মিনিট হয়ে গেছে, খারিজ করবার জন্যে হাকিম আছে কলম উঁচিয়ে ব'সে। নে, চল্, এগো শিগগির।' বলে সে দুর্লভের হাত ধ'রে প্রায় হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চলল।

'লণ্ঠন, টেপা-বাতি আর ছাতা—কিছুই হ'ল না।' দুর্লভ গাইগুঁই করতে লাগল।

'ওদিকে যে জরিমানা হয়ে যাবে, সে-খেয়াল আছে?' আদ্যনাথ গোঁফ ফুলিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল: 'টিপ-সই ক'রে হাজিরা দিয়েছিস, অথচ আদালতের ডাকে সাড়া দিচ্ছিস না। মারা যাবি দুল্লভ।'

দুর্লভের চেতনা হ'ল। ভটচাযের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'চল ঠাকুর, চল—ও-সব পরে হবে'খন। পুরুত মানুষ—তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। ভয় নেই, আমি কিছু ভুল করব না—পূবে ভেকটমারির খাল, পশ্চিমে মাদার মণ্ডল, উত্তরে বিষ্টু গোলদার আর দক্ষিণে ছাবেদ আলি—কেমন, ঠিক ত?

ভটচায আশাতিরিক্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল: 'তুই সাক্ষীটা আগে দিয়ে আয়, মামলাটা আগে জিতি—সব দেব, যা তুই চাস, যা তোর দরকার।'

আবার সেই সুর ক'রে ডাক উঠল চাপরাশির: 'বাদী ষষ্ঠীচরণ ভটচায বিবাদী উমেশ বালা।'

সাক্ষীসাবুদ নিয়ে নরহরি আদালতের মধ্যে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল। 'হোটেল থেকে খেয়ে আসতেই ওদের দেরি হচ্ছিল, বাইকে ক'রে মুহুরিকে পাঠিয়ে তবে ডেকে এনেছি।' এই কথাগুলি বলতে বলতে নরহরি দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে গাউনটা আদালতের সম্মুখেই পরে' নিলে। ছ-টা পানের ছ-আনি তখনও মুখের মধ্যে, তাড়াতাড়ি তার চর্ব্বণ-পর্ব্বটা সমাধা করতে করতে বললে, 'নাও, ওঠ, ওঠ ষষ্ঠী।'

হাকিম বললে, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, পানটা আগে খেয়ে নিন।'

নরহরি লজ্জিত হ'ল, কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধিতে তার যশ আছে। মুখের চর্ব্বিতাবশেষটুকু জিভের এক ঠেলায় দক্ষিণ কোণের মাড়ির উপরে চালান দিয়ে ডান হাতের উলটো পিঠে বোজানো ঠোঁট দুটো বার-কতক রগড়ে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাব দেখিয়ে নরহরি ভটচাযকে কাঠগড়ায় তুলে দিল। বললে, 'নাম বল।'

যথারীতি সুরু হয়ে গেল মামলা। অপর পক্ষে কৈলাস বাবু, সিনিয়র উকিল, অগাধ জলের মাছ, ভাব দেখান যেন চুনোপুঁটি। নরহরি একটা প্রশ্ন জিগগেস করছে আর অমনি তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'I object, Sir.'

এমনি যখন, 'চিফে'র পর জেরা চলছে, কে আরেক জন উকিল দাঁড়িয়ে পড়েছে কোণের দিকে। পার্শ্ববর্ত্তীকে বললে, 'এই, তোর গাউনটা দে দিকি, একটা জরুরি পেশ সেরে নি। আমাকে এক বার এক্ষুনি সার্টিফিকেট-আপিসে যেতে হবে।' ব'লে তাড়াতাড়ি গাউনটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে বার-কতক পাঁয়তাড়া কসে বললে, 'স্যার! এক মিনিট।'

আদালত নির্ম্মম গলায় বললে, 'আড়াইটেয়।'

ষষ্ঠীর পালা নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল, এমন কি দুর্লভের 'চিফ' পর্য্যন্ত। ভটচায্য পর্য্যন্ত অবাক, সব একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। জমির কোন ধারে 'পাতো' দেওয়া হয়েছিল তাতেও সে ভুল করল না।

'দ্যাট্‌স্ অল।' নরহরি বললে।

চশমার ফাঁকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে করতে কৈলাসবাবু উঠলেন। গলা খাঁখরে বললেন, 'দুর্লভবাবু, আপনি তো গাঁয়ের এক জন মাতব্বর।'

প্রথমটা দুর্লভ স্তব্ধ হয়ে গেল। ঠিক তাকেই জিগগেস করা হচ্ছে কিনা সে ঠিক দিশে পেলে না।

কৈলাসবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি—এমন পুলিস-সাহেবের মত জামা, গাঁয়ের একজন বিশিষ্ট মাতব্বর না হয়েই আপনি পারেন না।'

দুর্লভ গলে একেবারে জল হয়ে গেল। তার আপনার লোকেরা তাকে চিরকাল হেনস্তা করেছে, সে যে কত বড় একটা মানুষ এ-কথা কেউ কোনদিন তাকে বুঝতেই দেয় নি, আজ যেন মুহূর্ত্তে তার চোখের সুমুখ থেকে কালো একটা পর্দ্দা উঠে গেল, গাঁয়ের প্রেসিডেণ্টের চেয়েও সে মান্যী লোক, শহরের সব চেয়ে সেরা উকিল কৈলাসবাবু তাকে 'আপনি' বলে ডেকেছে, এক কথায় চিনে নিয়েছে সে মাতব্বর, রাম-শ্যাম যদু-মধু নয়।

লজ্জিত বিনয়ে দুর্লভ বললে, 'তা গাঁয়ের লোকে ব'লে থাকে বটে।'

'বলতেই হবে।' কৈলাসবাবু ফের প্রশ্ন করলেন, 'মাতব্বরি করতে তো আপনাকে এখানে সেখানে বেরুতে হয়, কোন বাড়ীতে শ্রাদ্ধ, কোন সরিকের সম্পত্তি বাঁটোয়ারা ক'রে দেওয়া, কোন জমির আল-ভাঙার ঝগড়া মিটোনো—এমনি লেগেই আছে তো আপনার কাজ। গাঁয়ের মাতব্বর, বিঘটিত একটা কিছু হ'লেই তো আপনার ডাক পড়ে।'

'মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন।' দুর্লভ উৎফুল্ল হ'য়ে বলে উঠলো 'এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত নেই।'

'মাতব্বর হবার দোষই এই। সাক্ষী পর্য্যন্ত দিতে হয়।'

'হয়ই তো। দলিল-পত্র কিছু একটা হলেই দুর্লভের ডাক পড়ে। গাঁয়ে আদালতের চাপরাশি গেলেই সব্বাইর আগে আমাকে ডাকে জারি দেখতে।'

'তা হ'লে চাষ-আবাদ আর করতে পারেন না! সময় কোথায়?'

'আমি করব কেন? শীতল করে—ভাগে।'

'সে তো আপনার ঝিলখালির জমি, মালেক নন্দী-বাবুরা। খতিয়ানে বর্গা-দখল শীতল মণ্ডল।'

'ঐ তো আমার জমি। শীতল চাষ করে।'

'তা তো ঠিকই। নিজের হাতে লাঙল-ঠেলা আপনাকে মানাবে কেন? আসছে বছরে বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হবার কথা, কত চৌকিদার-দফাদার খাটবে আপনার নিচে—কি, ঠিক বলছি কিনা।'

সস্মিত লজ্জার ভান করে দুর্লভ বললে, 'তেমনিই তো শুনছি কাণাঘুষো।'

'আর ঐ তো আপনার একমাত্র জমা।'

'একমাত্র। মায় সেস সাড়ে ন'টাকা খাজনা।

'আর আপনার ভিটে-বাড়ীও তো সেই জমার সামিল ?

'সামিল।

'আচ্ছা, এখন বলুন তো, নালিশী জমি থেকে আপনার বাড়ী কত দূর ?

'নালিশী জমি ?' দুর্লভের মনের কোণে এতক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললে, 'নালিশী জমির চৌহদ্দি আমি ব'লে দিতে পারি।'

'এত বড় মাতব্বর, তা পারবেন বই কি। কিন্তু ও আমি চাই না।' কৈলাসবাবু চশমার তলা দিয়ে চোখ বাড়িয়ে জিগগেস করলেন: 'আমার প্রশ্ন হচ্ছে নালিশী জমির থেকে আপনার ঝিলখালির বাড়ী কত দূর? ক'রশি ?'

'রশি আমি বুঝি না।'

'আচ্ছা, ক' মাইল ?'

'লেখাপড়া জানি না বাবু, মাইল কব কি করে।'

'আচ্ছা,' কৈলাসবাবু প্রশ্নটাকে আরেকটু ঘুরিয়ে দিলেন: 'ঘণ্টা বোঝেন তো ? দণ্ড।'

'তা বুঝি।'

'বেশ, তবে বলুন দিকি, আপনার বাড়ী থেকে নালিশী জমিতে যেতে কতক্ষণ লাগে ? ক' ঘণ্টা ?'

'কতক্ষণ ?' দুর্লভ মনে মনে কি হিসেব করল। বললে, 'আচ্ছা, যাব কিসে ? তড়ে না নৌকোয় ?'

'ধরুন, নৌকোয়।'

'আচ্ছা, গোনে না বেগোনে ?'

'ধরুন বেগোনে।'

'উজানে না পিঠামে ?'

'ধরুন পিঠামে।'

'দিবসে না রজনীতে ?'

'ধরুন রজনীতে।'

দুর্লভ মরিয়া হয়ে ব'লে উঠল: 'ও আমি কেন, আমার ঠাকুর্দা এসেও বলতে পারবে না।'

'তা হলে আপনি বলতে পারেন, না জমি সোনাউল্লো করত কি তার চাচা করত।'

'জমিতে পৌছিয়েই দিতে পারলেন না, তায় বলব কি ক'রে কে করে ?' করজোড় ক'রে দুর্লভ বললে, 'এই ধর্ম্মঘরে আছি, একটি কথাও মিথ্যে বলব না হুজুর।'

কৈলাসবাবু বললেন, 'নামো।'

আদালত বললে, 'পরের সাক্ষী।'

নরহরি আত্মনাথকে জিগগেস করলে, 'ষষ্ঠী কোথায় ? দেখ, আর কাকে সে সাক্ষী দেবে ?'

চারদিকে চেয়ে ভটচাযকে কোথাও না পেয়ে আত্মনাথ বাইরে বেরিয়ে গেল। ভেণ্ডাররা যেখানে বসে তার বারান্দার কাছে ভটচাযের সঙ্গে তার দেখা, গায়ে তার একখানা রঙীন চাদর।

আত্মনাথ ধমকে উঠল: 'গেছলে কোথায় ?

'চাদর কিনতে। নগদ পাঁচ সিকে দাম নিলে।' ভটচাযের চোখে তখন প্রায় জল দাঁড়িয়ে গেছে।

'ও দিয়ে হবে কি ?' আত্মনাথ মুখ খিঁচোল।

'দুল্লভের চোখের সামনে গায়ে দিয়ে থাকব। ও দেখবে, ওর চাদর কেনা হয়ে গেছে। চাদর দেখলেই ও ধাতে আসবে।'

'আর দুল্লভ। এখন আর কাকে সাক্ষী দেবে তার নাম কও।'

'কেন, দুল্লভ নেমে গেছে ? হা অদৃষ্ট!' ভটচায উদ্‌ভ্রান্তের মত আদালতে ছুটে এল।

এসে দেখলে তার আসতে দেরি দেখে নরহরি হাজিরায় লিখে দিয়েছে আর সাক্ষী দেবে না এবং অপর পক্ষের উমেশ গিয়ে দাঁড়িয়েছে কাঠগড়ায়।

অস্ফুট কণ্ঠে ভটচায নরহরির কাছে কেঁদে পড়ল, 'কি হবে বাবু ?'

নরহরি বললে, 'ভয় কী, মামলা এখানে না পাও আপিল আছে। সেখানে সাক্ষী খাটবে না, সব আইনের কুস্তি। নাও, আরও গোটা দুই টাকা বার কর, জেরায় সব ফাঁসিয়ে দেব এক্ষুনি, গোন-বেগোন বেরিয়ে যাবে বাছাধনের। আরও দুটো টাকা চাই, নইলে এমন উইক্ কেস আমি জেতাতে পারব না।'

ভটচায তার পেট-কাপড়ের ভিতর থেকে শেষ দুটো টাকা বার ক'রে দিল।

১৯৩৯ঃ তত্ত্বোধিনী সভার শতাব্দ বৎসর

শ্রীযোগানন্দ দাস

গোড়ার কথাঃ ইতিহাসের ধারাবাহিকতা

অতীতের আলোচনায় সকলের চেয়ে বড় বিপদ হ'ল অতীতকে পুজো করবার প্রবৃত্তি। তখন মনে হয়, অতীতে যা কিছু ছিল তাই ঠিক, আজকের দিনে আমাদের সেইখানেই ফিরে যাওয়া উচিত। এরই পাল্টা আপদ, আধুনিকতা বা 'মডার্নিজ্‌ম্‌'-এর নামে অতীতের প্রতি একটা তীব্র বিতৃষ্ণা। তার ফলে, অতীতে যা কিছু ঘটেছিল তাই ভুল, আগেকার সকল চিন্তানায়ক বা কর্ম্মবীরেরা যে-কোনো কাজ ক'রে গিয়েছেন সে-সব আধুনিক দৃষ্টিতে পণ্ডশ্রম মাত্র, আমাদের বর্ত্তমান বিচার বা চিন্তাপ্রণালীর মাপকাঠিতেই তা করা উচিত ছিল, এমনিতর একটা ধারণা জন্মে। ধর্ম্মজগতে 'ঈশ্বরের বিশেষ মনোনীত জাতি বা দেশ-এর মত বর্ত্তমান কালকে তখন মনে হয়, কালপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, একটি 'বিশেষ' কাল।

এ-সব অতীত বা বর্ত্তমান কালের দোষ নয়। এর কারণ মানুষের সেই দৃষ্টি, যা খণ্ডভাবে, বিচ্ছিন্ন রূপে সমস্ত জিনিষকে দেখে—সার কথায়, তার সংস্কারবদ্ধ 'মেটাফিজিক্যাল্' মন। অর্থাৎ, আমরা মুখে আধুনিকতার কথা বলি বটে, কিন্তু আমাদের মনটা থাকে দু-শ বছর পেছিয়ে।

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই সমগ্রটা নিয়ে যদি আমরা অবিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে মানব-ইতিহাসের আলোচনা করতে পারি, তবে শুধু অতীতেরই যে একটা যথার্থতর চিত্র পাব তা নয়, আজকের দিনে জাতীয় সমস্যাগুলোর বেশীর ভাগ শিকড়ই যে বর্ত্তমান কালের মধ্যে নিহিত নেই—তা সে-বর্ত্তমান এ-দেশের নিজস্বই হোক্ বা বিদেশের আমদানীই হোক্—সে-কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সুতরাং ইতিহাসের বিচারে তার এই সচল নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক রূপটির পরিকল্পনা সকলের আগে দরকার। কিন্তু শুধু সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। এই প্রবহমান ধারা থেকে কোনো একটা যুগ বা 'পীরিয়ড'কে সাময়িক ভাবে আলাদা ক'রে বিচার করলে দেখা যাবে, সেই যুগের একটি 'মন' আছে, সে-মনের গঠন অতি বিচিত্র। এই যুগমনকে ইংরেজীতে বলা চলে time spirit। এই যুগমন বা 'টাইম্-স্পিরিট্' কোনো হেঁয়ালি কথা নয়, এর একটা অত্যন্ত বাস্তব সত্তা ও রূপ আছে।

ব্যক্তিমন, সঙ্ঘমন, যুগমন

মন অথবা জড়, কোন্‌টা গোড়ার কথা, কোন্‌টার থেকে কোন্‌টার সত্তা জন্মেছে, সে-তর্কে না গিয়েও নির্ব্বিঘ্নে বলা চলে, মানুষের মন ব'লে একটা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তা সেটা বস্তু-নিরপেক্ষ পৃথক্ সত্তা হোক্ বা না-হোক্। এ কথাও ঠিক যে, সে-মন জড়ের মত চুপ ক'রে পড়ে থাকে না, কাজ করে। প্রত্যেক মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার এই ব্যক্তিমন কাজ ক'রে চলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নতর অনেক জীবের মত মানুষও একলা থাকতে ভালবাসে না, তার মধ্যেও একটা দল বাঁধবার প্রবৃত্তি আছে। তারই ফলে এবং বাইরের বাস্তব বা 'অব্‌জেক্‌টিভ' জগতের পরিবেষ্টনীর তাগিদে, তার পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, জাতি প্রভৃতি গড়ে ওঠে। এলোমেলো জীবন ছেড়ে এইভাবে মানুষের সমাজ রচিত হয়ে যখন তার জীবনযাত্রা আরও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে, এবং যখন সে অনেক বেশী নির্দ্দিষ্ট ভাবে ও শৃঙ্খলার সঙ্গে চিন্তা ও কাজ করতে শেখে, তখন দশে মিলে একটা বা কয়েকটা উদ্দেশ্য নিয়ে সে এক-একটা সভা সঙ্ঘ বা সমিতি রচনা করতে লেগে যায়।

এমনি ক'রে দশ জনে একই সঙ্ঘ বা সমাজের মধ্যে মিলবার দরুন পরস্পর ব্যক্তিমনের ঘাত-প্রতিঘাতে কিছু ছাড়া এবং কিছু নেওয়ার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা ক'রে সঙ্ঘমনের সৃষ্টি হয়।

একই ধরণের আশা আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য যাদের, তারাই একত্র হয়ে এক-একটা সঙ্ঘ বা সমিতি গড়ে। কিন্তু মনের ঝোঁক সকলের এক নয়, অথচ দল বাঁধবার প্রবৃত্তি মানুষের মনে স্বাভাবিক। সুতরাং সুনিয়ন্ত্রিত মানবসমাজে বিভিন্ন মনের ঝোঁকে ও তারই সঙ্গে বাইরের অবস্থার প্রেরণায় একাধিক সঙ্ঘের সৃষ্টি হয় এবং দেখা যায়, সঙ্ঘগুলি ঠিক ভাবে দানা বাঁধতে পারলে এক-একটি সঙ্ঘের এক-একটি বিশিষ্ট মন গড়ে ওঠে, যে-সঙ্ঘমন সেই সেই সঙ্ঘের আলাদা আলাদা মানুষগুলির ব্যক্তিমনকে প্রভাবিত করে।

ফলে, ইতিহাসের একই যুগে, এক সঙ্গে একাধিক সঙ্ঘ ও সঙ্ঘমনের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার দেখা যায়, সেই সব সঙ্ঘগুলির মধ্যে দু-একটি দাঁড়ায় প্রবল শক্তিশালী ও বেগবান্ বা 'ডাইন্যামিক্'। অন্য সঙ্ঘগুলির সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থেকে এই দু-একটিই যায় টিকে। সেই প্রবলতম সঙ্ঘের মনই, পারিপার্শ্বিক ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ায় হয়ত কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে, সমস্ত যুগটিকে প্রভাবিত করে।

এমনি ক'রে এক-একটি যুগমনের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং কোনও একটি যুগ বা 'পীরিয়ড্'-এর যুগমনের বা টাইম্ স্পিরিটের বিচার করতে গেলে, অর্থাৎ তাকে সমগ্র ভাবে ধরতে গেলে, সেই যুগের বিভিন্ন সঙ্ঘমনের, এবং বিশেষভাবে প্রবলতম সঙ্ঘমনটির, পরিচয় নিতে হয়। যে-যুগে পরস্পর-বিরুদ্ধ শক্তি বা সঙ্ঘের ঘাত-প্রতিঘাত কম, অনেক ক্ষেত্রে সে-যুগের প্রবলতম সঙ্ঘটির ও তৎসম মনবিশিষ্ট সঙ্ঘগুলির পরিচয় নিলেই চলে। এই প্রবলতম সঙ্ঘটিকেই ইংরেজীতে বলা চলতে পারে, 'ডমিন্যাণ্ট্ মাইনরিটি'।

একটা বিশিষ্ট যুগমনের আবহাওয়ার মধ্যে যাদের বাল্য কৈশোর অথবা প্রথম যৌবন কাট্ল, তাদের ব্যক্তিমন সেই যুগমনের আওতাতেই গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, পরের যুগবাসী যে মানুষরা ইতিহাসে বড় হয়ে ওঠেন, পূর্ব্বের যুগমনটা হ'ল তাঁদের ব্যক্তিমনের পক্ষে কতকটা কারবারের মূলধনের মত। এইটেই হ'ল তাঁদের মনের 'সাবজেক্টিভ ব্যাক্গ্রাউণ্ড' বা চিত্ত-পটভূমিকা। কোনো মহাপুরুষের আলোচনাতেও এই পটভূমিটির বিচারকে বাদ দিলে ইতিহাস পঙ্গু হয়।

পক্ষপাতী ইতিহাসের খণ্ডরূপ

কিন্তু সাধারণত ঘটে এই যে, আমরা জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা করতে ব'সে, আমাদের রুচি অনুযায়ী সঙ্ঘবিশেষের, এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্ঘও নয়, শুধু কয়েকটি ব্যক্তির খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন কীর্ত্তিকাহিনীর হিসাব ক'রেই সেরে দিই। এই ধরণের ইতিহাস-আলোচনায় আমরা সেই যুগের কিংবা সেই যুগবর্ত্তী কোন ব্যক্তিরই পূর্ণ ও বাস্তব চিত্র পাই না, যেটা পাই তা শুধু ইতিহাসকারের পক্ষপাতী মনের পরিচয়।

সেই জন্যে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে, বঙ্কিম-হেম-নবীনের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী যে যুগ, অর্থাৎ যে যুগ জাতীয়তা, স্বাধীনতা, নূতন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সাধারণ শিক্ষা প্রভৃতিকে রূপ দিয়ে গড়ে তুলেছিল, সমগ্র ভাবে সেই যুগ এবং খণ্ডভাবে তার কেন্দ্রশক্তি বা প্রবলতম যে সঙ্ঘ, এই দুটিকেই ইতিহাসের সচল ধারা থেকে কেটে বাদ দিয়ে একেবারে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে জাতীয় ইতিহাস সুরু করবার একটা প্রবল চেষ্টা চলেছে। রামমোহন-আলোচনাতেও যেমন একটা সময় ছিল যখন কেউ কেউ মনে করতেন, তাঁ'র পূর্ব্বে সবই অন্ধকার ছিল, সেই রকম এখন পাল্টা মনে করা হচ্ছে, বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তী কালটা ছিল জাতীয়তার ক্ষেত্রে একটা জমাট অন্ধকার, বঙ্কিমচন্দ্রই হলেন সেই অমাকাশে প্রথম জ্যোতিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ, আধুনিক বাঙালীর জাতীয় ট্রাডিশ্যনের ইতিহাস বড় জোর, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত, তা'র ওদিকে যাবার কোন প্রয়োজন নেই; কারণ সেদিকটায় সবই নাকি আমাদের ভুলে ভরা।

জাতীয় জীবনের চিরস্মরণীয় সেই দিন যেদিন 'আনন্দমঠ' লিখিবার জন্য বঙ্কিম লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার

পূর্ব্বে কবরের নির্জ্জীব শান্তি আমাদিগকে ঘেরিয়াছিল। পরাধীনতার কোন বেদনা ছিল না। যাঁহারা বড়লোক তাঁহারা ছিলেন দুধ-ঘির যম; আপন আপন অট্টালিকায় সুখনিদ্রায় মগ্ন থাকিতেন! যাঁহারা দরিদ্র---অতি দুঃখে তাঁহাদের দিন কাটিত। দুঃখের বন্ধনকে ছিন্ন করিবার কোন উদ্যম ছিল না। দুঃখের কারণ অন্বেষণেও কোন উৎসাহ দেখা যাইত না। দেশ ব্যাপিয়া একটা লজ্জারজনক নিশ্চেষ্টতা; তামসিকতার চূড়ান্ত! মৃত্যু আসিয়া সমস্ত জাতিটাকে তিলে তিলে গ্রাস করিতেছে; উন্মত্ত সাগরের বুকে ভগ্ন জাহাজ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে। সেই ভগ্ন তরীকে বন্দরে লইয়া যাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই যাত্রীরা হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে। বাঁচিবার পর্য্যন্ত স্পৃহা নাই—মরিতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যায়।...১

এমন সময় এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর পূর্ব্বে দেশ যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেখানে যে একটা "তামসিকতার চূড়ান্ত" ছিল, "পরাধীনতার কোন বেদনা ছিল না," এ ধারণা খুবই স্বাভাবিক, যদি আমরা তাঁর আগেকার সমষ্টিগত জীবন-আন্দোলনের যথার্থ ইতিহাস না-জানি অথবা উপেক্ষা ক'রে যাই।

আজকাল নূতন ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস লেখবার যে চেষ্টা চলেছে, সেটা এই ভাবের একটা একপেশে প্রয়াস, তা'র মধ্যে রুচির বা অভিপ্রায়ের একটা 'সাব্জেক্টিভ্ বায়াস্' বা পক্ষপাত রয়েছে। তার দরুন, কোনো কোনো ঐতিহাসিক যেমন এক দিকে সে-যুগের কেন্দ্রশক্তি ব্রাহ্ম প্রচেষ্টার ইতিহাসকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন ও ঐ প্রচেষ্টার ইতিবৃত্তকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বা সাম্প্রদায়িক গৌরববৃদ্ধির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন, অপর পক্ষে তেমনি ঐ ইতিহাসকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার একটা হাস্যকর চেষ্টা চলেছে।

খৃষ্টান যুগে দুই তিন হাজার লোক ব্রাহ্ম হইয়াছে, ইহা বিশেষ ভাবিবার কথা নয়। একটা বৃহৎ, যুগে, একটা বৃহৎ ব্যাপারে অমন সমান্ত বাজে খরচ কিছু হইয়া থাকে।...২

যে বই থেকে এটি উদ্ধৃত করা হ'ল, সেই বইখানি আগাগোড়া এই ধরণের সুরে লেখা এবং এই বইয়ের অংশ-বিশেষই বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ইণ্টারমীডিয়েট্ শ্রেণীর জন্য পাঠ্যরূপে বাংলা গদ্য-সঙ্কলন-গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

উপরে সংখ্যার দিক থেকে 'সামান্ত বাজে খরচে'র, যে উটুকো হিসাব দাখিল করা হয়েছে, পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য তারই পাল্টা হিসাবের কিছু নমুনা নীচে দিলাম। যাঁ'রা এ হিসাব কষেছেন, তাঁরা কেউই ব্রাহ্ম নন, এবং তাঁরা সত্য কথা লিখেছেন। বাংলা দেশের আদমসুমারীর রিপোর্টে বলে,

In spite of its numercial insignificance the community is very influential...... (1901)[3]

The actual numbers, however, give no idea of the extent to which the Brahmo doctrines have spread. (1911)[4]

Thus, though the number of professed Brahmos is small and has increased but little in the last 20 years, thousands of the intellectual Hindus of Bengal have been so profoundly influenced by the monotheistic ideas of the Brahmo Samaj as really to be Brahmos at heart, though they have not actually joined the Samaj. (1921)[5]

তাৎপর্য্য। সংখ্যার দিক দিয়ে নগণ্য হ'লেও এই সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রভাবশালী......(১৯০১)

ব্রাহ্ম মতামত যে কি পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে, আসল সংখ্যার বিচারে তা ধরা যাবে না। (১৯১১)

এই ভাবে দেখা যায় যে, যদিও নাম-লেখানো ব্রাহ্মের সংখ্যা বেশী নয় এবং গত ২০ বছরে সেই সংখ্যা কমই বেড়েছে, তবুও বলতে হবে, বাংলা দেশের হাজার হাজার চিন্তাশীল হিন্দু একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম আদর্শ দ্বারা এত গভীর ভাবে প্রভাবিত যে তাঁরা ব্রাহ্ম সমাজে একেবারে যোগ না দিলেও মনে প্রাণে ব্রাহ্ম। (১৯২১)

অ্যানি বেসাণ্টের মতে,

The Brahmo Samaj marked the awakening of the Indian Nation from the state of coma produced by the East India Company;[6]

তাৎপর্য্য। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কবলে থেকে ভারতীয় জাতি যে মুমূর্ষুর শেষ দশায় গিয়ে পৌঁছেছিল, ব্রাহ্ম সমাজ সেখান থেকে তাকে পুনর্জ্জাগরণে ফিরিয়ে এনেছে;

এ রকমের অনেক নজির আছে; পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই। দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের জমা-খরচের খতিয়ান সব খাজাঞ্চির এক রকম নয়।

যাই হোক, জাতীয় হিসাবের খাতায় ঐ ধরণের যে ভুল অঙ্কপাত কিছু কাল থেকে সুরু হয়েছে, তার

কারণ, জাতিগঠন বিষয়ে, তা'র বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ব্রাহ্ম প্রচেষ্টার ইতিহাসের যে বাস্তব ও বিচিত্র দান, তা'র সঠিক ও বিস্তৃত সংবাদ আমাদের জানা নেই অথবা জেনেও উপেক্ষা বা অস্বীকার করবার প্রচ্ছন্ন, কোথাও বা প্রকট, চেষ্টা চলেছে। ব্রাহ্ম প্রচেষ্টা যে একটা সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা নয়, আধুনিক যুগে ভারতবর্ষে জাতীয়তার ও সত্য-স্বাধীনতার সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা, প্রত্যক্ষ ভাবে এরই ঘাত-প্রতিঘাতে সমস্ত বাংলা দেশের, এবং বহুল অংশে ভারতবর্ষের, বর্ত্তমান জাতীয় ইতিহাস গঠিত, এই মোটা কথাটা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে আছে।" ফলে, বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ প্রভৃতি কয়েকটি ব্যক্তিবিশেষের জীবনচরিতের কিছু কিছু খুঁটিনাটি আলোচনাকেই ঐতিহাসিক গবেষণার চূড়ান্ত মনে ক'রে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করছি, সমষ্টিগত ভাবে কোনও প্রচেষ্টার ধারাবাহিক তাৎপর্য্যকে ঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করি নি।

অবশ্য, যেখানে কোনো লোক ঐতিহাসিক "গবেষণা"র নাম ক'রে ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধেও তথ্যে মারাত্মক ভুল করেন, অথবা স্বেচ্ছায় তার বিকৃতি ঘটিয়ে ইতিহাস-নীতি ও শিষ্টাচারকে লঙ্ঘন করেন, সেখানে প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য, তার সংশোধন করা। কিন্তু সব সময়েই মনে রাখা দরকার, 'ব্যক্তি'র আলোচনাই ইতিহাসের সবটা নয়।

ইতিহাসের পদ্ধতি : রাজতান্ত্রিক, মহাপুরুষতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক

অনেক আগে, যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাজতন্ত্রের শাসন খুব প্রবল ছিল, তখন ইতিহাস-রচনার সাধারণ পদ্ধতি ছিল প্রশস্তি, গদ্যে ও পদ্যে। সে-যুগের প্রধান ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রস্তরস্তূপ ও ইমারৎ, তাম্রশাসন ও লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি। কোন্ রাজা কত বড় ছিলেন এবং তাঁর তুলনায় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজারা কত তুচ্ছ ও নগণ্য, প্রবল প্রতাপশালী রাজারা কে ক'টা শত্রু-রাজার মাথা নিয়েছেন, ক'টা যুদ্ধ জয় করলেন, প্রজার রক্ত-জল-করা টাকা দিয়ে কতগুলো কীর্ত্তিস্তম্ভ রচিত হ'ল, তাঁদের বংশাবলীই বা কি রকম, এমন কি রাজার পারিষদবর্গের কীর্ত্তিকলাপ ও কেচ্ছা বা 'কোর্ট লাইফ্' এই সবই ছিল রাজার বৃত্তিভোগী ইতিহাসকার বা ভাট-চারণদের উপজীব্য। তা'র পরে মার্কিন স্বাধীনতার ও ফরাসী বিপ্লবের পরে, রাজতন্ত্রের পতনে এবং 'জাতীয়' বীরপুরুষদের অভ্যুদয়ে, সুরু হ'ল Heroes and Hero Worship-এর ('বীর ও বীরপূজা'র) কাল। এখন থেকে চলল মহাপুরুষ পূজা। অর্থাৎ জাতির ইতিহাস বলতে আমরা বুঝতাম, যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহাপুরুষ বা 'সুপারম্যান্'দের জীবনের কীর্ত্তিকাহিনী।

ইতিহাস-রচনার এই ধারারই জের এসে পৌঁছেছে লেনিন হিট্‌লার মুসোলিনী প্রভৃতি অতিআধুনিক রাষ্ট্রীয় হুকুমদার বা 'ডিক্টেটর'দের জীবনকাহিনীতে। বর্ত্তমান জার্ম্মেনীর ইতিহাস বলতে আমরা হিট্‌লার গোয়েরিং প্রভৃতি কয়েক জনের কাজই বুঝি, এঁদের আড়ালে বিশাল জনগণের সমষ্টিগত জীবনযাত্রা বা চিন্তা ও কর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতের যে ইতিহাস নিত্য রচিত হয়ে চলেছে, তা'র মূল্য বড় একটা দিই না।

এ কথা ঠিক, সাধারণ প্রজাশক্তি থেকে আত্মীয়তার সূত্রে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন রাজা-রাজড়ার ইতিহাসের চেয়ে মহাপুরুষদের জীবনীমূলক জাতীয় ইতিহাস অনেক ভালো, কারণ, যে শ্রেণীরই হোন, প্রজাশক্তি থেকেই উত্থিত মহাপুরুষদের জীবনে সেই সময়কার জাতীয় চিন্তার ও সাধনার অন্তত খানিকটা অংশও মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে রাজনারায়ণ বসু, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি এই দৃষ্টি নিয়ে ইতিহাস-রচনার কিছু সূত্রপাত ক'রে দিয়েছেন। এঁদের সকলের মধ্যে বোধ হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সাধারণত শিবনাথের নাম অতি কুণ্ঠার সঙ্গে উল্লিখিত হয়, অথবা একেবারেই হয় না।

স্যর্ রোপার লেথ্‌ব্রিজ্ ১৯১৩ সালে পণ্ডিত শিবনাথের "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"

বইয়ের যে ইংরেজী সংস্করণ বা'র করেন, তা'র ভূমিকায় লিখছেন,[৭]

The Pandit's work is quite the most scholarly book of its kind, as well as the most serious and sustained effort to combine in a biographical work, Oriental and Western modes of thought, that has yet appeared in Bengali.

তাৎপর্য্য। পণ্ডিতের [শিবনাথের] বইখানি এই শ্রেণীর সমস্ত বইয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, আজ পর্য্যন্ত এ ধরণের যতগুলি বই বাংলা ভাষায় বেরিয়েছে, তার মধ্যে এইখানি, জীবনচরিত আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমন্বয় বিষয়ে, সকলের চেয়ে বেশী ঐকান্তিক ও আগাগোড়া সকল প্রযত্নের নিদর্শন।*

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতও এই শ্রেণীর ইতিহাসের একটি অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ।

তবুও জাতীয় ইতিহাস বলতে মানুষ ব্যক্তির ইতিহাসই বুঝত। একথা খুবই সত্য, প্রজাতান্ত্রিক আধুনিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হবার পরে, প্রধানত সরকারী গরজে, অর্থনীতি শিক্ষা ধর্ম্ম প্রভৃতি বহু বিষয়ে প্রজা-সাধারণের বাস্তব অবস্থা নির্দ্ধারণের জন্যে বার বার জনসমাজকে জরীপ বা 'সার্ভে' করা হয়েছে, তাদের জীবন-সংক্রান্ত অনেক হিসাব নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সব মশলা-গুলিকে ঐতিহ্য বা 'হিস্টরিক্যাল্ ডেটা' হিসেবে গ্রহণ ক'রে, শুধু ব্যক্তিবিশেষকে গৌরবান্বিত অথবা নিন্দিত করবার জন্যে নয়, গণতান্ত্রিক সমষ্টিগত ইতিহাস রচনা করবার উদ্দেশ্যে, ব্যবহার করার মত দৃষ্টি এদেশে এখনও ঠিক ভাবে খোলে নি।† রামায়ণ, মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য প্রভৃতি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হ'লেও, মোটামুটি বাংলা দেশে এখনও ব্যক্তি-বিশেষ বা মহাপুরুষের ইতিবৃত্তকেই আমরা খুব বড় রকমের ঐতিহাসিক গবেষণা ব'লে মনে করছি। একথা ঠিকই, ইতিহাস-রচনায় এরও খুব বেশী মূল্য আছে, কারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ ছাড়া সঙ্ঘ গড়ে না, সঙ্ঘকে বুঝতে গেলে কেন্দ্রীয় মানুষগুলিরও সঠিক পরিচয় দরকার; কিন্তু ব্যক্তিত্বের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়লে ইতিহাস তার ধারাবাহিক প্রবাহ থেকে খণ্ডিত হয়ে সেই ব্যক্তি বা মহাপুরুষকে ঘিরে ঘিরে গণ্ডী রচনা করতে থাকে, জনগণের সঙ্ঘজীবনের রথচক্রে তার যে জয়যাত্রা, সেই যাত্রাপথের সন্ধান মেলে না।

সম্ভবত য়ুরোপে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ থেকেই ইতিহাস রচনার পদ্ধতি স্পষ্ট ভাবে বদলেছে। যদিও এঁদের পদ্ধতিও কতকটা একদেশদর্শী, অর্থাৎ ফ্রয়েড্ বা য়ুঙের সর্ব্বগ্রাসী 'সেক্স্'-এর মত, মার্কস্-এঙ্গেলস্ও সর্ব্ব বিষয়ে হেগেলের আদর্শবাদকে প্রায় অস্বীকার ক'রে অর্থনীতির একাধিপত্যই দেখেছেন, তবুও একথা বলতে হবে, ব্যক্তির ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে সমষ্টির বা জনসাধারণের

---

* শিবনাথের এই মূল বাংলা বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা'রই অনুপাঠ হিসেবে, এখানে আর একটি বইয়ের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, (১৯২৭), "শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী" এই শ্রেণীর ইতিহাসমূলক জীবনী-গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি উঁচুদরের বই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামতনু লাহিড়ীর সমসাময়িক বাংলা সমাজের ইতিহাস বুঝতে, সতীশ বাবুর লিখিত যে ষাটটি পরিশিষ্ট (১৬৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী) এই বইয়ের পিছনে আছে, তার দাম বাংলা ইতিহাস-সাহিত্যে কম নয়। কিছু দিন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে যে দিকে গবেষণার গতি চলেছে, ১৯২৭ সালে প্রকাশিত এই বইখানি সে দিক থেকে একটি অগ্রণী, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীকে, বিশেষত তত্ত্ববোধিনী যুগকে (দেবেন্দ্রনাথ, রামতনু প্রভৃতির) যে সকল ছাত্র বুঝতে চান, তাঁদের পক্ষে এই বইখানি, বিশেষ ক'রে এর পরিশিষ্টগুলি, অবশ্যপাঠ্য।

† এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা" একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই। যদিও এ বইয়ের আগে থেকেই এ দেশে অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও সেকালের সংবাদপত্রকে ইতিহাসবিষয়ক উপাদানের অন্যতম উৎস হিসেবে অল্পস্বল্প ব্যবহার করেছেন, তবুও এই সবগুলি সংবাদের একত্র সংকলনে যে পরিশ্রম করা হয়েছে তা বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয় এবং এর সংবাদগুলি যথাবিহিত তুলনামূলক প্রামাণিক পরীক্ষা বা corroboration ও যাচাইয়ের পর গণতান্ত্রিক সামাজিক ইতিহাসকারের অনেক কাজে আসবে। ইংরেজীতে এই ধরণের কাজকে 'হিস্টরিওগ্রাফি' (Historiography) বলে। এতে উচ্চশ্রেণীর ঐতিহাসিকের (বা Historian-এর) বিশ্লেষণ ও সমন্বয় মূলক উন্নত মনীষার দরকার না লাগলেও ইতিহাস-রচনায় এই সন-তারিখ-ঘটিত 'প্রাথমিক' তথ্য-সংগ্রহ অত্যাবশ্যক। অবশ্য সে-সব তথ্য নির্ভুল ও যথাযথ হওয়া চাই।

ইতিহাস-রচনাকেই মানব-ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবার বড় কৃতিত্ব এঁদেরই। অবশ্য এঁদের পরেও ইতিহাস-রচনার নবতর পন্থা আবিষ্কারের পরীক্ষা চলেছে।

এদেশে গণতান্ত্রিক ইতিহাস রচনা

সুখের বিষয়; খুব সম্প্রতি মার্কস্-এঙ্গেল্স্-এর অনুসরণে এদেশেরও উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার চেষ্টা সুরু হয়েছে। কিন্তু এই নবীন ঐতিহাসিকেরাও উনবিংশ শতাব্দীর কেন্দ্রশক্তি প্রচণ্ড বেগবান্ বিপ্লবমূলক ব্রাহ্ম প্রচেষ্টা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ না হওয়ার দরুন, এবং প্রধানত ঐ প্রচেষ্টার সঠিক ইতিহাস না জানা থাকায়, যে-জিনিষটা দাঁড়াচ্ছে সেটা বাংলা দেশের সম্পূর্ণ ও বাস্তব ইতিহাস নয়, এই দেশের উপর আরোপিত পাশ্চাত্য শ্রেণী-চিন্তার ও কতকগুলি বৈপ্লবিক মুখস্থ-করা নীতির বাহ্য এবং অধিকাংশ স্থলে ভুল প্রয়োগ। ফলে, তাঁরা ইতিহাসের একটা দিকই দেখেছেন, সবটা দেখবার অবসর হয়ত পান নি। তারা বাংলার উনবিংশ শতাব্দীকে শুধু একটা পাশ্চাত্য প্রভাবের 'পূর্ণ ফল' হিসেবেই ধ'রে নিয়েছেন, তার মধ্যে এই ভারতের অথবা বাংলার আত্মসাধন ও আত্মশক্তির স্বাভাবিক বিকাশের অভিব্যক্তিকে ধরবার চেষ্টা এখনও করেন নি। অর্থাৎ, মার্কস্-এর স্বীকৃত পরিভাষায়, ইতিহাসের শুধু থীসিস্‌টাই দেখেছেন, এন্টিথীসিস্ বা সিন্থেসিসের বিকাশ-ধারার আলোচনা করেন নি।

যুগে যুগে ইতিহাসের এই তিনটি স্তর—থীসিস্, এন্টি-থীসিস্ ও সিন্থেসিস্—ফিরে ফিরে আসে। বাংলা দেশেরও বর্ত্তমান সংস্কৃতিকে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে যে ভাবধারা চলে আসছে তাকে, যদি মূল থীসিস্ ব'লে ধরা যায়, তবে তার মধ্যেকার এন্টিথীসিস্ বা স্বাভাবিক অন্তর্বিরোধ আজ অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে এবং বাঙালী জাতি আজ ইতিহাসের অমোঘ গতিতে নবতর সিন্থেসিস্ বা ভাবসমন্বয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই নূতন সমন্বয় অতীতের কোনো পুরনো সমন্বয়ের হুবহু পুনরাবৃত্তি দিয়ে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বাইরের কোনো কিছুর অনুকরণ মাত্র দিয়েও ঘটে না, কোনো দেশে বা কোনো যুগে তা ঘটে নি। এর প্রয়োজক যে সমস্ত অবস্থা, তার উদ্ভব হয় প্রত্যক্ষ ভাবে সেই সেই সমাজের ও দেশের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই। সুতরাং বাংলা দেশের আসন্ন সমন্বয়কে যদি জেনে শুনে বরণ ক'রে আনতে হয় ও মানতে হয়, তবে, বিদেশ থেকে তা'কে হুবহু টবে ক'রে চালান আনলে চলবে না, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধ'রে এই ইতিহাসের চাকা এই দেশের মাটির উপর দিয়ে কেমন ভাবে ঘুরেছে, কেমন ক'রে উচ্ছৃঙ্খল অনুকরণকে অতিক্রম ক'রে অভিভূত ক'রে নূতন সৃষ্টিচক্র নব নব বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জাতীয় কাহিনী রচনা করেছে, সেই সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় দরকার।

স্টালিনের বিখ্যাত কথা "Revolution cannot be exported" (অর্থাৎ, বিপ্লব বস্তুটির রপ্তানি চলে না) যেমন সত্য, কোন জাতির ইতিহাসও তেমনি অপর কোন জাতির ঐতিহাসিক বিকাশের নিছক অনুকরণ নয়, সে কথাও তেমনি সত্য। ব্রাহ্ম প্রচেষ্টা বাংলা দেশে পাশ্চাত্য অনুকরণের ইতিহাস নয়, পশ্চিমের জবাবে বাঙালীর আত্মশক্তি ও আত্মসাধন বিকাশের এবং যুগ-প্রয়োজনে নব সৃষ্টির দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

> সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, এ দেশীয় লোকেরা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোনো কার্য্যই করিতে পারেন না, আর ইঁহারা যাহা করিতে পারেন তাহা অপরের অনুকৃতি মাত্র হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ [ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্] এই দুইটিই অপরের সহায়তা অথবা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার দ্বারাই হিন্দু সমাজের ভাবি পরিবর্ত্তসমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল।৮ (ভূদেব)

'ব্রাহ্মধর্ম্ম' বলতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এখানে তত্ত্ব-বোধিনী সভার সঙ্ঘগত ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বলেছেন। বঙ্কিমের পূর্ব্ব থেকে রচিত এই সমষ্টিগত পটভূমিটি জানি না অথবা হারিয়ে ফেলি ব'লেই বঙ্কিম-প্রতিভাকে অমন আকস্মিক মনে হয়।

উনবিংশ শতাব্দী ও সঙ্ঘমন

বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করতে ব'সে শুধু কয়েকজন ব্যক্তির বা মহাপুরুষের জীবন-

বৃত্তান্ত একক ভাবে আলোচনা ক'রেই ক্ষান্ত হ'লে চলে না, তাঁদেরও দেশে ও কালে এক-একটা সমষ্টির অঙ্গ হিসেবে দেখে, এক-একটা সভা, সঙ্ঘ, 'গ্রুপ' বা সমাজের স্রষ্টারূপে বিচার ক'রে তবে ইতিহাসের পূর্ণতর পরিচয় পেতে পারি। ব্যক্তিগত মনের মত সমষ্টিগত মনেরও একটা বাস্তব ভিত্তি আছে, ইতিহাস বুঝবার পক্ষে সেই মূল্য গভীর। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন জীবনীর আলোচনায় ইতিহাসের যে ছবি পাওয়া যায়, আত্মীয়-সভা, ব্রহ্ম-সভা, ধর্ম্ম-সভা, একাডেমিক এসোসিয়েশন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, ভূম্যধিকারী সভা, 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি', ভারতবর্ষীয় সভা, কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ, শান্তিনিকেতন, ও চৈত্রমেলা প্রভৃতির এবং সেই সঙ্গে খ্রীষ্টীয় মিশন ও শিক্ষায়তনগুলির পরস্পর সম্পৃক্ত সমষ্টিগত ইতিহাসগুলিকে ঠিক ভাবে ধরতে পারলে সেই সময়ের একটা সমগ্র ইতিহাসের বাস্তব চেহারা এবং এই সমস্ত বিভিন্ন সঙ্ঘমনের পরস্পর সংঘাতের ফলে একটা পরিপূর্ণ যুগমন চোখের সামনে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাল যাঁদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হ'ল অথবা ঠিক ভাবে হ'ল না, সেই কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস পালের পূর্ণতর চিত্র পেতে গেলে তাঁদের প্রথম বয়সের পিছনকার— ১৮৩৯ অক্টোবর থেকে ১৮৫৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, অন্তত এই কুড়ি বৎসরের, পটভূমিকার সঠিক ছবি দরকার। তাঁদের ব্যক্তিগত প্রতিভা যত বড় হোক্ বা যত আকস্মিকই মনে হোক্ না কেন, তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক জাতীয় চিন্তা ও সাধনার জননভূমির নাড়ীর যোগকে অস্বীকার ক'রে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করবার চেষ্টা বিড়ম্বনা।

"একথা সত্য যে, মানুষে মানুষে শক্তি ও বুদ্ধির তারতম্যের জন্যে, যাঁরা অন্য দশ জনকে ছাড়িয়ে প্রতিভার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, তাঁরা নিজেদের অসাধারণ দৃষ্টিশক্তির ও সৃষ্টিশক্তির দরুন সেই সময়ের অথবা তার পরবর্ত্তী কালের সমষ্টিগত জীবনকে অনেক নূতন জিনিষ দিয়ে যান, কিন্তু তাঁরাও অনেকখানি সেই সময়ের অথবা তার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সমষ্টিগত জীবনের ফল। জাতির জীবনে তাঁদের যে প্রভাব, সেটা প্রধানত প্রকাশ পায় ও জাতির উপরে কাজ করে তাঁদের সৃষ্ট ও শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা গঠিত বা পরিপুষ্ট সঙ্ঘ বা সমিতিগুলির দ্বারা। সুতরাং তাঁদের জীবন-চরিত শুধু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগতভাবে বিচার না ক'রে এই সব সঙ্ঘের মধ্যবিন্দুরূপে যে দেখা, সেইটেই হ'ল পূর্ণতর ঐতিহাসিক দৃষ্টি।

আরও দেখা যায়, তাঁরা যখনই এক-একটা প্রবল সঙ্ঘের সৃষ্টি করেন, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়ায় বিরুদ্ধ সঙ্ঘ সুরু হয়, এবং এই সকল পরস্পরবিরোধী দলের ঘাত-প্রতিঘাতে ও নব নব প্রতিভাশালী মানুষের আগমনে নূতন ক'রে গোষ্ঠীবন্ধন বা re-grouping হয়। এই ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে। এই সকলের ব্যষ্টি ও সমষ্টি গত ইতিহাসই জাতির ও মানবসমাজের সচল ইতিহাস।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ : ব্রাহ্ম সমাজ

বাংলা দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে সে-যুগের সর্ব্বপ্রধান ও সকলের চেয়ে শক্তিশালী বেগবান বা 'ডাইন্যামিক্' দল বা 'গ্রুপ'—ব্রাহ্ম সমাজের—পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাসকে যাঁরা এড়িয়ে চলতে চান, তাঁরা জাতীয় ইতিহাসের গতিবেগ থেকে অন্তত বারো আনা অংশ বাদ দেন ব'লে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়।

১৮২৮ সালে, অতি সামান্য ভাবে, ক'লকাতা শহরের এক পল্লীতে যে ব্রাহ্মসমাজ সুরু হয়, ১৮৭২ সালের মধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষে (ব্রহ্ম দেশ পর্য্যন্ত) তার এক-শ একটি শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে।* ধর্ম্মে, সমাজ-সংস্কারে, নারী- ও ছাত্র- আন্দোলনে, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার বিকাশে, রাষ্ট্রে শিল্পে ও সাহিত্যে, জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে ব্রাহ্ম প্রচেষ্টার প্রভাব বহুদূরবিস্তৃত। প্রধানত কেশবচন্দ্রের সময়ে ও পরে, ওড়িয়া, হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটী, মারাঠী, তেলুগু, তামিল, কানাড়ী, অসমিয়া, খাসিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন ভাষায় নব-রচিত পত্রিকা ও পুস্তকাদি মারফত নূতন প্রাদেশিক সাহিত্যের ও নব চিন্তার ধারা নানা মনে বিভক্ত ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর

প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি ধ্রুব, একটি উদ্দেশ্য, 'সমানং মনঃ সমিতিঃ সমানী' ব্রাহ্ম প্রচেষ্টা দ্বারা গ'ড়ে উঠতে থাকে। এই ঐক্যমূলক সর্ব্বতোমুখী নিখিল-ভারতীয় যুগমনের সমসূত্রে কেমন ক'রে ঐক্যমূলক নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্রমন ক্রমবিকশিত হ'ল, সে একটি সম্পূর্ণ পৃথক ইতিহাস।

একটা অতি তীব্র তেজঃপুঞ্জ আপন মণ্ডল-পথে প্রবল গতিতে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে চলার সময়ে যেমন আশে-পাশের অন্য নানা শক্তিবিন্দুকে বিপুল বেগে আকর্ষণ করে এবং মধ্যে মধ্যে তার নিজ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নব নব তেজোরাশি নিজ নিজ পৃথক পৃথক মণ্ডল রচনা করে, সেই রকম ক'রে, এক দিকে যেমন একাডেমিক এসোসিয়েশন্, সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা, জ্ঞানপ্রকাশিকা সভা প্রভৃতি ভেঙে চুরে তাদের মানুষগুলি তত্ত্ববোধিনী সভা বা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে এবং ভূম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ এসোসিয়েশন্ ভেঙে চুরে তত্ত্ববোধিনীর সহযোগী ভারত-বর্ষীয় সভার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, তেমনি আবার পরবর্ত্তী কালে এই ব্রাহ্ম প্রচেষ্টা থেকেই ছিটকে গিয়ে বিবেকানন্দ, শিবানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, পওহারী বাবা, সন্তদাস বাবাজী, শিশিরকুমার ও মতিলাল, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নিজ নিজ পৃথক মণ্ডলী রচনা ক'রে সমস্ত ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর এই কেন্দ্রীয় আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রার্থনাসমাজ, আর্য্যসমাজ, বেদসমাজ, দেবসমাজ, এবং বহুতর হরিসভা ও পণ্ডিতসভা প্রভৃতি বিভিন্ন সঙ্ঘ সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এই সব দেশব্যাপী মনঃশক্তিকে ঠিকভাবে জানতে গেলে সমগ্র শতাব্দী ধ'রে এই গতিশীল বিচিত্রগঠন প্রবলতম কেন্দ্রীয় সঙ্ঘমনের পরিচয় দরকার। এই পরিচয় নিতে গেলেই আমরা পুরো এক শতাব্দীর এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের প্রকৃত রহস্য জানতে পারব।

আমাদের ব্যক্তিগত রুচি দিয়ে আমরা এই প্রচেষ্টার ইতিহাসকে উপেক্ষা করতে পারি বা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু বাংলা দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়োজনের দিক থেকে বাদ দেওয়া চলে না।

এমন কি, ঐ প্রচেষ্টার দানকে অস্বীকার করবার উদ্দেশ্যে জোর ক'রে তার আসন বাইরে থেকে জাতির উপর আরোপিত খ্রীষ্টীয় প্রচেষ্টা দিয়ে পূর্ণ করবার চেষ্টা করলেও কুলিয়ে ওঠে না। সুতরাং অনেক জায়গায় ঐ একপেশে ইতিহাসের অন্তরের দুর্ব্বলতাকে ঢাকতে গিয়ে তথ্যের বা তত্ত্বের বিকৃতি ঘটাতে হয়। ব্যক্তি থেকে সমষ্টির আলোচনায় গেলেই এই সব ইতিহাস-বিকৃতির স্বরূপ ধরা পড়ে যায়।

সুতরাং রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে ঠিক ভাবে বুঝতে গেলে তাঁদের তৈরি সমষ্টিগত সভা, সমিতি, সমাজ বা 'গ্রুপ'গুলিরও আলোচনা করা দরকার।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও তার সভ্যবৃন্দ

রামমোহনের সময়কে বাদ দিয়ে আপাতত আমি দেবেন্দ্রনাথের সময় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব, দু'টো কারণে। প্রথম, রামমোহন সম্বন্ধে অনেক আলোচনাই ইতিমধ্যে হয়েছে, যদিও সমগ্রদর্শী ইতিহাস এখনো অনেক-খানি বাকী। তবুও, জাতির ইতিহাসে রামমোহনের আসন কোথায়, তা খানিকটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে জাতীয় ক্ষেত্রে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সঙ্ঘের যে অপরিসীম দান, তার আলোচনা এখনো বিশেষ কিছু হয় নি। এমন কি, জাতির দিক থেকে, ৬ই মাঘে, তাঁর মৃত্যুদিনে, কখনো কোনো স্মৃতিসভারও আয়োজন হয় না। দ্বিতীয় কারণ, আজকের দিনে, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে, এই আলোচনার একটা বিশেষ উপলক্ষ্য আছে। বর্ত্তমান বৎসর দেবেন্দ্রনাথের "তত্ত্ববোধিনী সভা" প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিক বৎসর।

১৭৬১ শকাব্দের ২১এ আশ্বিন, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর, রবিবার, কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে, পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আচার্য্য পদে বরণ ক'রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক দেশবিখ্যাত ও সে-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান "তত্ত্ববোধিনী সভা"র প্রতিষ্ঠা হয়।[১০] প্রথম অধিবেশনের নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে বিদ্যাবাগীশের উপদেশে নূতন নামকরণ হ'ল, "তত্ত্ববোধিনী সভা"।[১১]

তত্ত্ববোধিনী সভার কথা বলতে গিয়ে ব্রাহ্ম প্রচেষ্টার কথা এত বেশী বললাম এই জন্যে যে, এই দুটি শক্তিশালী সঙ্ঘ বা 'গ্রুপ' অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; একটিকে বাদ দিয়ে আর' একটির আলোচনা অসম্ভব। শুধু তাই নয়, তত্ত্ববোধিনীর যুগে, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম থেকে সুরু ক'রে শিক্ষা ও সাহিত্য পর্য্যন্ত জাতির সমস্ত বিভাগে, সভার সঙ্ঘমন ও ইতিহাসের যুগমনকে বুঝতে গেলে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ যোগ সম্বন্ধে সকল সময়ে সচেতন থাকা দরকার। সমগ্র ভারতবর্ষের মনে বাংলা দেশ সেদিন পর্য্যন্তও যে অত্যুচ্চ গৌরবের আসন দখল করেছিল, তার সুরু এই যুগেই, সে-বিষয়ে প্রথম দায়ী এই যুগের প্রবলতম সঙ্ঘজাত যুগমন।

উভয় সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠতা এত বেশী ছিল যে প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই তত্ত্ববোধিনী সভা অনেক বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়।[১২]

তত্ত্ববোধিনী সভা এই সময় হইতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের মত প্রচারের উপায় হইল।[১৩] (রাজনারায়ণ)

তাছাড়া, তত্ত্ববোধিনী সভার "উদ্দেশ্য" পরিষ্কার ভাষায় লেখা হয়েছে "বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার"।

এই ঘনিষ্ঠতা বাড়তে বাড়তে ১৭৮১ শকের ১১ই পৌষ, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা তা'র পৃথক্ অস্তিত্ব হারিয়ে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে একেবারে লীন হয়ে যায়।[১৪] পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত থেকে সম্পাদকীয় দপ্তরের ভার নিলেন যুগ্মভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন। সুতরাং তত্ত্ববোধিনী সভার জীবিতকাল বলা চলে, কুড়ি বৎসর, ৬ অক্টোবর, ১৮৩৯—ডিসেম্বরের শেষ, ১৮৫৯।

এই কুড়ি বৎসর আধুনিক বাংলা দেশের গঠনশীল যুগ বা 'ফর্ম্মেটিভ পীরিয়ড'। এই যুগটিকে না বুঝতে পারলে, তত্ত্ববোধিনী সভাকে জাতীয় ইতিহাসের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসেবে না চিনতে পারলে, পরবর্ত্তী কালের কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বিবেকানন্দ প্রভৃতি অনেক মনীষীকেই ঠিক ভাবে ধরতে পারা যাবে না।

যেমন দূরদর্শিতা সহকারে এই [তত্ত্ববোধিনী] সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার শুভফল সমস্ত তেমনি দূরতর পরবর্ত্তী পুরুষগণের ভোগ্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে নদী উচ্চতর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হয়, তাহার প্রবাহও তেমনি দূরগামি হইয়া থাকে।[১৫] (ভূদেব)

নবজাগ্রত বাংলার যে প্রথম যুবকদল বা 'ইয়ং বেঙ্গল' (প্রবীণও ছিলেন) এই সভাকে ব্যক্তিগত ভাবে উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন এবং সমষ্টিগত ভাবে তত্ত্ববোধিনী সভার কাছ থেকে নিজ নিজ জীবনপাত্রে নব উদ্দীপনা বহন ক'রে নিয়ে সাহিত্য, সংবাদপত্র ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমস্ত দেশময় সভার সেই বিশিষ্ট সঙ্ঘমনকে ছড়িয়ে দিয়ে একটা স্পষ্ট যুগমন গঠন ক'রে তুলছিলেন, তাঁ'দের মধ্যে আপাতত চৌষট্টি জনের নাম করছি।

(১) পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (২) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (৩) অক্ষয়কুমার দত্ত (৪) রাজনারায়ণ বসু (৫) তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী (৬) রামগোপাল ঘোষ (৭) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (৮) কবি ঈশ্বর গুপ্ত (৯) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১০) ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) (১১) গঙ্গাচরণ সরকার (অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা) (১২) নিবাধই দত্তপুকুরের কালীকৃষ্ণ দত্ত (১৩) সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৪) রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৫) রামতনু লাহিড়ী (১৬) নন্দকিশোর বসু (রাজনারায়ণ বসুর পিতা) (১৭) ব্যবস্থা-দর্পণ প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার (১৮) বৈকুণ্ঠনাথ সেন (১৯) নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২০) বেচারাম চট্টোপাধ্যায় (২১) কেশবচন্দ্র সেন (২২) রাখালদাস হালদার (২৩) বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদ বাহাদুর (২৪) নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র রায় (২৫) উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (২৬) মহারাজ রমানাথ ঠাকুর (২৭) রাধাপ্রসাদ রায় (২৮) রমাপ্রসাদ রায় (২৯) রাজারাম রায় (৩০) ব্রজসুন্দর মিত্র

(৩১) শিবচন্দ্র দেব (৩২) গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩৩) শম্ভুনাথ পণ্ডিত (৩৪) দিগম্বর মিত্র (৩৫) গিরীশচন্দ্র দেব (৩৬) রাজা সত্যচরণ ঘোষাল (৩৭) রাজা সত্যশরণ ঘোষাল (৩৮) রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর (৩৯) কীর্ত্তিচন্দ্র মিত্র (৪০) স্বরূপচন্দ্র লাহা (৪১) কৃষ্ণকমল সেন (৪২) ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪৩) নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪৪) গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪৫) গোপাললাল ঠাকুর (৪৬) দ্বারিকানাথ ঠাকুর (৪৭) পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর * (৪৮) উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর (৪৯) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (৫০) বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (৫১) রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (৫২) শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ (৫৩) আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (৫৪) দয়ালচন্দ্র শিরোমণি (৫৫) শ্রীধর বিদ্যারত্ন (৫৬) গদাধর ভট্টাচার্য্য (৫৭) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৮) চন্দ্রশেখর দেব (৫৯) প্যারীচাঁদ মিত্র (৬০) কিশোরীচাঁদ মিত্র (৬১) কাশীশ্বর মিত্র (৬২) কাশীপ্রসাদ ঘোষ (৬৩) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৪) মধুসূদন দত্ত।

* দেখা যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দু'জন। তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৬৯ শকের (খ্রীঃ ১৮৪৭-৪৮) কার্য্যবিবরণীতে ("সাম্বৎসরিক আয় ব্যয় স্থিতির নিরূপণ পুস্তক"-এ) উল্লিখিত সভ্য ও চাঁদার ("বর্ত্তমান শকের সভ্যগণের চাঁদার মধ্যে দত্ত ধন" শীর্ষক) তালিকায় একজন মাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ আছে। নামের পরে ঠিকানা নেই, প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ ১২০০ বারো শ টাকা। কিন্তু ১৭৭০ থেকে ১৭৭৫ শক অবধি (এখন পর্য্যন্ত যতদূর আমি দেখেছি) প্রত্যেক বছরে পর-পর দু'জন ক'রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ আছে। প্রথম জনের নামের পিছনে ১৭৭০ থেকে '৭৫ পর্য্যন্ত বরাবর "যোড়াসাঁকো" এই ঠিকানা আছে। দ্বিতীয় দেবেন্দ্রনাথের নামের পরে, ১৭৭০ ও '৭১ শকে "হিন্দুকালেজ", '৭২ ও '৭৩ শকে "পাথুরিয়াঘাটা" এবং '৭৪ ও '৭৫ শকে "পাতুরেঘাটা" এই ঠিকানা আছে। যোড়াসাঁকোর ও পাথুরিয়াঘাটার, দুই দেবেন্দ্রনাথের, চাঁদার পরিমাণ যথাক্রমে (১৭৭০-'৭৫): ১২০ ও ২, ১১০ ও ৩, ৮০ ও ৩, ১২০ ও ৩, ১৮০ ও ৩ এবং ২২ ও ৩ টাকা।

যোড়াসাঁকোর 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথই কি হিন্দু কলেজের ছাত্র ও সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সভ্য ছিলেন, না পাথুরিয়াঘাটার এই অপর দেবেন্দ্রনাথ? অবশ্য দু'জনেরই হিন্দু কলেজের ছাত্র হওয়া অসম্ভব নয়। ঈশানচন্দ্র বসু সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা সম্বন্ধে তাঁর লেখা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিতে বলেন, "প্রায় দুই শত যুবক ইহার সভ্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথের নামও দৃষ্ট হয়।" আসলে ইনি কোন্ দেবেন্দ্রনাথ? ইতিহাসে এই দু'টি তথ্যের কিছু মূল্য আছে। সুতরাং এ বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত আত্মজীবনীতে এমন কোনো উল্লেখ পাই নি যার দ্বারা বোঝা যায়, তিনি হিন্দু কলেজে পড়তেন অথবা সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সভ্য ছিলেন। এমন কি হিন্দু কলেজে না পড়ার অনুমান সুদৃঢ় হবার কারণ আছে।

একই নামে দুই ব্যক্তির বর্ত্তমান থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার একাধিক বর্ষের সভ্য-তালিকায় "রামমোহন রায়" নাম পাওয়া যায়। ১৮৩৩ সালে "রাজা" রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং ১৮৩৯ সালের পরের এই দ্বিতীয় রামমোহন রায় যে আর এক ব্যক্তি, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই রকম দু'জন দেবেন্দ্রনাথ (এমন কি একই সময়েও) থাকা বিচিত্র নয়। ঠাকুরবাড়ীর সুবিস্তৃত বংশ-তালিকা বা 'বংশলতিকা' ভালো ক'রে দেখা দরকার।

তত্ত্ববোধিনী সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণীগুলি, বাংলাভাষার প্রাচীন অভিধান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ-পুরস্কার-প্রাপ্ত সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য্য তত্ত্বরত্নাকর মহাশয়ের সৌজন্যে দেখবার সুযোগ ঘটেছে।

দেশের এই বিশিষ্টতম সঙ্ঘের অধিনায়ক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভূদেবের মতে এক সময়ে এই সভার সভ্য সংখ্যা ৮০০ আট শ-র বেশী উঠেছিল।[১৭] মনে রাখতে হবে তখনকার দিনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনৈতিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, ৩১এ অক্টোবর, ১৮৫১ সালে স্থাপিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্' বা 'ভারতবর্ষীয় সভা', প্রধানত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার বহু সভ্যদ্বারা গঠিত। ঐ সভা ও তত্ত্ববোধিনী, এই দুই সভার কাজ প্রায় একই নেতৃত্বে পাশাপাশি চলেছিল এবং তার সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে। যুগমনের সম্বন্ধ বিচারে তত্ত্ববোধিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষীয় সভার বৃত্তান্তও জানা দরকার। সেই জন্যে তার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিলাম।

ভূম্যধিকারী সভা ও 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী'

ভারতবর্ষীয় সভার আগেই, এমন কি তত্ত্ববোধিনী

সভা প্রতিষ্ঠারও কিছু আগে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট মানুষদের নেতৃত্বে 'জমিন্দারী এসোসিয়েশন্' বা ভূম্যধিকারী সভা স্থাপিত হয়। ঐ বছরের ১২ই নবেম্বর তারিখে, সভার প্রথম অধিবেশনে, ঘোষণা করা হয়,

the Zemindary Association is intended to embrace '*people of all descriptions*, without reference to caste, country or complexion, and rejecting all exclusiveness, is to be based, *on the most universal and liberal principles*; the only qualification to become its members being the possession of interest in the soil of the country.[18] (Italics mine).

তাৎপর্য্য। জাতি, দেশ বা বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল রকম মানুষদের সাদরে গ্রহণ করবার জন্যে এই 'জমিন্দারী এসোসিয়েশন্' গঠিত হ'ল। এ'কে চাই না, তাকে চাই না, এমনিধারা সমস্ত ছুৎমার্গকে বর্জ্জন করে একেবারে বিশ্বজনীন ও উদারতম নীতির উপর এই সভা প্রতিষ্ঠিত। এ দেশের জমির উপর নিজের একটা স্বার্থ থাকাটাই এই সভার সভ্য হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা।

এই ঘোষণা থেকে মনে হয়, নামটা জমিদারী হ'লেও সব শ্রেণীর লোকের কাছে এর দ্বার মুক্ত ছিল। পুরোপুরি জমিদারী স্বার্থে পরিণত হওয়ার ইতিহাস অনেক পরে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহেরও এপারে, তখন এর স্বতন্ত্র সত্তাও ছিল না। 'জমিন্দারী এসোসিয়েশন' নাম বদলে পরে হয়, 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটী' এবং আরও পরে নিজের পৃথক অস্তিত্ব লোপ ক'রে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্' বা ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে একেবারে মিশে যায়।

রামমোহনের একজন প্রধান শিষ্য অ্যাডাম সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসে বিলাতে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী'র অন্যতম প্রধান সভ্য, বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ্জ টম্‌সনের পরামর্শে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী' নামে আর একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ১৮৪৩ সালের ২০এ এপ্রিল তারিখে ক'লকাতায় স্থাপিত হয়। এই সভা খুব জোর চলে নি। তবুও এই সোসাইটীরও উদ্দেশ্য ছিল উদার, "সকল শ্রেণীর প্রজার কল্যাণ সাধন, তা'দের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বিস্তার ও স্বার্থরক্ষা,"

"calculated to secure the welfare, extend the just rights and advance *the interests of all classes of our fellow subjects*."[19] (Italics mine).

তত্ত্ববোধিনী সভা ও ভারতবর্ষীয় সভা

পরে, প্রধানত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের উদ্যোগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক ক'রে যখন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্' বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হ'ল, তখন ভূম্যধিকারী সভা ও 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী' নিজের নিজের পৃথক্ সত্তা লোপ ক'রে ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সে-যুগের প্রধানতম ও প্রবলতম জাতীয় রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের পত্তন হ'ল। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী ও ভারতবর্ষীয় উভয় সভার কাজ চলল পাশাপাশি। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' তৃতীয় ভাগে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখছেন,[২০]

তাৎকালিক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী মাত্রেরই অন্তঃকরণে স্বদেশীয় সামাজিক দোষ সংশোধন করাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম কার্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ইহা সেই সময়ের ভারতবর্ষীয় সভার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়। ভারতবর্ষীয় সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি এবং ব্যবস্থাসম্পৃক্ত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদ্বিষয়ে দেশীয় জনগণের অভিপ্রায় প্রকাশ করা, কিন্তু সভা ঐ সময়ে আপনাদিগের একমাত্র প্রকৃত কার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা একজন সুপ্রীম কোর্টের ইংরেজ উকীলকে আপনাদিগের সভাপতি করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং কখনো রাজধানী পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছিলেন, কখনো পুলিষের দোষানুসন্ধান করিতেছিলেন, আর কখন বা বিধবা বিবাহের উপায় বিধান, কখন বহু বিবাহ নিবারণ, কখন স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলতঃ ভারতবর্ষ ও তত্ত্ববোধিনী সভার আনুপূর্ব্বিক ক্রমে কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় যে, যত দিন তত্ত্ববোধিনী সভা বল প্রকাশ করিতে না পারিয়াছিলেন, তাবৎকাল ভারতবর্ষীয় সভাও আপন প্রকৃত কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু হার্ডিঞ্জ সাহেবের অধিকার কালের মধ্যেই এই উভয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তত্ত্ববোধিনী সভা নব্যদলের ধর্ম্মপ্রণালী সংস্থাপিত করিলেন, এবং একজন সুবিজ্ঞ বাঙ্গালী, [রামগোপাল ঘোষ] ভারতবর্ষীয় সমাজের সভাপতি হইয়া রাজকার্য্য বিষয়েই সভার স্থিরদৃষ্টি জন্মাইলেন।

দেখা যাচ্ছে যে তত্ত্ববোধিনী সভার বহু সভ্যের দ্বারা গঠিত ভারতবর্ষীয় সভার প্রত্যক্ষ বিষয় রাষ্ট্রনীতি হ'লেও এর উদ্দেশ্য ব্যাপক। ভূদেবের কার্য্যতালিকা থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, তত্ত্ববোধিনী সভার সজ্ঞমন ভারতবর্ষীয় সভার সজ্ঞমনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল। একই ধরণের উদার সামাজিক সজ্ঞমন তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) থেকে ভারতবর্ষীয় সভা (১৮৫১), ভারতবর্ষীয় সভা থেকে ভারত সভা বা 'ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্' :(১৮৭৬), ও পরে কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভায় (১৮৮৫) পরিণতি লাভ করেছে।

১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়, সেই সময়ে সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তার প্রথম উদ্দেশ্য, দেশকর্ম্মীদের পরস্পরের মধ্যে জানাশোনার সুবিধা ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে জাতীয় ঐক্য সাধনের কথা উল্লেখ ক'রে, তৃতীয় উদ্দেশ্য বিষয়ে বলেন,

The authoritative record of the matured opinions of the educated classes in India on some of the more important and pressing of the *social questions* of the day.[21] (Italics mine)

তাৎপর্য্য। বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা দেশের সামনে রয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি, যার মূল্য ও আশু মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা বেশী সেইগুলি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সাধারণের সুচিন্তিত মতামতের প্রামাণিক স্বীকৃতি।

কংগ্রেসে, রাষ্ট্রীয় বিষয় ছাড়াও, এই সর্ব্বতোমুখী সামাজিক মনের জের মহাত্মা গান্ধীর সময় পর্য্যন্ত নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে চ'লে এসেছে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আর বিস্তৃত ক'রে বলবার জায়গা হবে না।

তত্ত্ববোধিনী সভা : শিক্ষায়, সাহিত্যে ও সমাজ-সংস্কারে

শিক্ষায়, সাহিত্যে ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এই সঙ্ঘের সমষ্টিগত দান একাধিক বৃহৎ গ্রন্থের বিষয় হ'তে পারে।

তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বেদ-বিদ্যালয়, ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ও হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক শিক্ষা-সংস্কার, রাখালদাস, রামতনু, রাজনারায়ণ, ব্রজসুন্দর, শিবচন্দ্র প্রভৃতি বহু সভ্যের দ্বারা বহুতর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার নূতন আদর্শ প্রচার এদেশের জাতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়।

সংবাদপত্রে ও সাহিত্যে এই সভার দান সম্বন্ধে বলা বাহুল্য মাত্র। সভ্যদের কয়েক জনের নামের প্রতি লক্ষ্য করলেই সে-যুগের সাহিত্যিক দানের পরিমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রামমোহন-শিষ্য রামনারায়ণ মিত্রের পুত্র ও শিবচন্দ্র দেবের বৈবাহিক, প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির লেখা থেকেও অতি সুস্পষ্টভাবে ধরা যায়, তাঁদের ব্যক্তিমনের উপর সভার সঙ্ঘমনের ও তত্ত্ববোধিনী-যুগমনের প্রভাব কত গভীর। এই সভার অনেক সভ্যই যে সঙ্ঘমনের প্রভাবে সাহিত্য রচনা ক'রে গিয়েছেন, সে কথা আমরা ভুলতে বসেছি। মহারাজ মহাতাবচাঁদের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত যে এখনও ছাপা আছে, সে খবর হয়ত অনেকেই রাখেন না। শুধু ঠাকুর-পরিবারের প্রতিভাকে নয়, পরবর্ত্তীকালের অধিকাংশ বঙ্গ সাহিত্যিককে বুঝতে গেলে এই তত্ত্ববোধিনী যুগের সাহিত্যিক প্রকৃতির নিখুঁৎ পটভূমিটি দরকার। সে এক বৃহৎ ব্যাপার।

সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনাও আপাতত করব না। কারণ পরবর্ত্তী কালের ইতিহাসকে বুঝতে গেলে এই তত্ত্ববোধিনী যুগের সংস্কার-আন্দোলনকে এক কথায় সেরে দেওয়া চলে না।

যেমন, একটা বিষয় ধরা যাক্। সে-যুগের অনেকেই সাংবাদিক বা সাহিত্যিক ইত্যাদি রূপেই জনসাধারণের মধ্যে আজ প্রচারিত। কিন্তু তা ছাড়াও যে তাঁদের জীবনে ধর্ম্ম বা সমাজ-সংস্কার প্রভৃতিরও একটা দিক ছিল, সে কথাগুলো চাপা পড়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' পত্রিকার সুবিখ্যাত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে শুধু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারের জন্যে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাই নয়, নিজে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম স্থাপয়িতাও ছিলেন। সে-সংবাদ আমরা

'ঐতিহাসিক 'গবেষণায়' হরিশচন্দ্র সম্বন্ধীয় আলোচনা থেকে সাধারণত কেটে বাদ দিই।

It is not so generally known that amidst his multifarious labours for the political amelioration of his country, Hurrish Chunder Mookerjee did not lose sight of its religious interests. He was one of the founders of the Bhowanipore Brahmo Somaj. It was he, who, with a view to popularise its teachings, introduced into the Brahmo Somaj the practice of delivering public lectures, using the English language as the medium of communication.[22]

'তাৎপর্য্য। একথা আজ সাধারণ ভাবে জানা নেই যে, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির বহুমুখী প্রয়াসের মধ্যে থেকেও দেশের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্টি হারান নি। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষাদীক্ষা দেশের মধ্যে বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতার রেওয়াজ ব্রাহ্ম সমাজে তিনিই প্রথম চালান।

শেষ কথা : তত্ত্ববোধিনী সভার শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে

সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সভা ও যুগের সমষ্টিগত বহুমুখী দান সম্বন্ধে আমরা এখনও সচেতন হই নি। যাঁরা এদেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করেন, তাঁরা উপরে উল্লিখিত সভ্যদের নামের অতি ক্ষুদ্র আংশিক তালিকা থেকেই তত্ত্ববোধিনী সভার জাতীয় মূল্যের কতকটা ধারণা করতে পারবেন। এই সভার নায়ক ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও চারজন তেজস্বী যুবক: (১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (৩) অক্ষয়কুমার দত্ত এবং (৪) রাজনারায়ণ বসু। তত্ত্ববোধিনী সভার বহু বিশিষ্ট সভ্যের মতো এই চার জনেরও জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ তার অধিকাংশের বিকাশ তাঁদের এই উদ্দীপনাময় সঙ্ঘজীবনের সময়েই। সুতরাং এঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইতিহাসের স্ফুরণ তত্ত্ববোধিনীর সঙ্ঘগত জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্বদ্ধ, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিমন ছাড়াও একটি সঙ্ঘমনের পরিচয় আছে।

ঈশ্বর গুপ্তেরও মতামতের যথেষ্ট মূল্য ছিল মনে হয়। রাজনারায়ণ বসু লিখছেন,

অক্ষয় বাবু প্রথম প্রথম আমার বক্তৃতা পছন্দ করিতেন না। তাহার বিপক্ষে দেবেন্দ্রবাবুর নিকট সর্ব্বদা বলিতেন। অনেক লোকের—তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম করিয়া বলিতেন উহা তাহাদের পছন্দ হইত না। আমি মনে মনে করিতাম যে আমার বক্তৃতায় ত অনুপ্রাসের ছটা নাই তাহা ঈশ্বর বাবুর পছন্দ হইবে কেন? কিন্তু অক্ষয় বাবু ক্রমে ক্রমে আমার বক্তৃতার গুণ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার কোনো কোনো বক্তৃতায় ঈশ্বর প্রেমের কথা বলিতে লাগিলেন।[২৩]

যাই হোক, প্রধানত যে পাঁচ জনের নাম উপরে করলাম, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাবাগীশ ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ও আচার্য্য (দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি একুশ জন সভ্য পরে এঁরই কাছে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন)। বিদ্যাসাগর অনেক দিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন ও কিছুকাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও সম্পাদন করেন। অক্ষয়কুমারের দ্বারা পত্রিকা সম্পাদনের সময়েই তার গৌরব সব চেয়ে বৃদ্ধি পায়। রাজনারায়ণ সভার একজন বিশিষ্ট নায়ক এবং পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হন। এই চার জন ও দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছিলেন কঠোর বৈদান্তিক, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় বিচারের অগ্রদূত, স্বদেশপ্রেমিক এবং বহু বিষয়ে রামমোহনের পরবর্ত্তী সূত্রধারক। বিদ্যাসাগর ছিলেন বিদ্রোহীচেতা সংস্কারক। শিক্ষায় ও সমাজে তাঁর সংস্কার চেষ্টা সকল বাধাকে অতিক্রম করেছিল। অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক ও প্রবল যুক্তিবাদী। রাজনারায়ণের মধ্যে বাঙালীত্ব ও জাতীয় হিন্দুত্ববোধ তীব্র ছিল। এঁদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের ছাপ যেমন দেবেন্দ্রনাথের এবং পরস্পরের উপর পড়েছিল, দেবেন্দ্রনাথের প্রবল ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট ছাপও এঁরা কেউই এড়াতে পারেন নি। সকলের শেষে এসে যোগ দিলেন মূর্ত্তিমান্ বিপ্লবী কেশবচন্দ্র। এখান থেকেই যুগ পরিবর্ত্তন।

এই সমস্ত ব্যক্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রতিনিয়ত মানিয়ে চলতে হয়েছে দেবেন্দ্রনাথকে। তিনি সকল রকম বিরুদ্ধ শক্তির রাশ টেনে ধ'রে দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল বাংলার রাজপথে বৃহত্তর জাতীয় মনীষার বিচিত্র সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যকে দু-হাতে ছড়া'তে ছড়া'তে যে তত্ত্ববোধিনী

সভায় বিজয়রথ চালিয়ে গিয়েছেন, দুঃখের বিষয়, আজ আমরা সেই সভার প্রকাণ্ড বহুমুখী সমষ্টিগত দানকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'তে বসেছি, শতাব্দীর দীর্ঘ একটা যুগ ধ'রে সেই সঙ্ঘগত মনঃসমষ্টির আশ্চর্য্য সৃষ্টির পরিমাপ করবার চেষ্টা করি নি। দেবেন্দ্রনাথকে এই বিপুল ও প্রবল সঙ্ঘের অধিনায়ক রূপে, বাংলার নব-জাগরক ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার, জাতীয়তা ও স্বাধীনতা, সর্ব্বোপরি নীতি ও ধর্ম্মের বিচিত্র কর্ম্মশক্তির কেন্দ্ররূপে দেখবার চেষ্টা না ক'রে শুধু তাঁকে হিমালয়ের মত নিঃসঙ্গ একাকী মহর্ষিত্বের উত্তুঙ্গ শিখরের উপরে তুলে দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছি। একথা ঠিক, তাঁর সমস্ত কর্ম্মপ্রেরণার মূল ছিল গভীর ব্রহ্মধ্যান, কিন্তু তা ছাড়াও, শুধু ঋষি ন'ন, সেই পরিপূর্ণ মানুষ দেবেন্দ্রনাথের বিশাল তরঙ্গবহুল সমুদ্রের মত সভা ও সমাজ-জীবনের, তাঁ'র সমষ্টিগত কর্ম্মজীবনের মূল্য জাতীয় ইতিহাসের দিক থেকে অমূল্য। সে মূল্যের বিচার সহজ হয়ে আসবে, যদি আমরা অন্তত তত্ত্ববোধিনী সভার সমষ্টিগত ভাবে ও তার সভ্যদের ব্যষ্টি ভাবে জাতীয় দানের পরিমাপ করতে পারি। নানা দিক থেকে বিচার করলে এ কাজ কঠিন, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার এই শতবার্ষিক বৎসরে সেই জাতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুরু হওয়া দরকার।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ আলোচনার আরম্ভ মাত্র, কোনো 'গবেষণা' নয়। ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ করতে গেলে বহুজনের সমষ্টিগত চেষ্টার প্রয়োজন।

প্রমাণ-পঞ্জী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় : "বঙ্কিমের স্বপ্ন" দেশ, ৩০ চৈত্র, ১৩৪১, পৃঃ ১৩।

২ গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী : বাংলার রূপ, (১৩২৯), "বাংলার কথা", পৃঃ ৪৩।

৩ E. A. Gait : *Census of India,* 1901, Vol. VI, The Lower Provinces of Bengal and their Feudatories, Part I, p. 159.

৪ L. S. S. O'mally : *Census,* 1911, Vol. V, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Part I, p. 210.

৫ W. J. Thomson : *Census,* 1921, Vol. V, Bengal, Part I, p. 163.

৬ Annie Besant : *India : A Nation,* 3rd Edition, (1923), p. 74.

৭ Sir Roper Lethbridge : *Ramtanu Lahiri | Brahman and Reformer | A History of the Renaissance in Bengal* | from the Bengali of Pandit Sivanath Sastri M.A. | (1913), Preface, p. 5.

৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ, (১৩১০ সন), পৃপৃঃ ৪১-৪২। বইয়ের গোড়ায় "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশক জানাচ্ছেন, এই ইতিহাস "পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৭২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে শিক্ষা-দর্পণে লিখিতে আরম্ভ করেন।" এর পরে, এই বই শুধু "ভূদেব" ব'লে উল্লিখিত হ'বে।

৯ *The Theistic Annual, 1872,* "Brahmo Somajes of India". pp. 103-107.

১০ ঈশানচন্দ্র বসু : শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জীবনবৃত্তান্তের স্বল্প পরিচয়, (১৯০২), পৃঃ ১৭।

১১ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত : শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (১৯২৭) পৃপৃঃ ৭২-৭৪।

১২ ঐ, ২০ পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩৫৭।

১৩ রাজনারায়ণ বসু : "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত" (১), দাসী, ৪র্থ ভাগ ১১ সংখ্যা, নবেম্বর, ১৮৯৫, পৃঃ ৫৯৪।

১৪ ঐ (২), দাসী, ডিসেম্বর, ১৮৯৫, পৃঃ ৬৫০।

১৫ ভূদেব, পৃঃ ২৫।

১৬ ঈশানচন্দ্র বসু, পৃঃ ১৭।

১৭ ভূদেব, পৃঃ ৩৯।

১৮ C. F. Andrews and Girija Mukerji : *The Rise and Growth of the Congress in India,* (1938), p. 98.

১৯ Andrews and Mukerji, p. 99.

২০ ভূদেব পৃঃ ৪১।

২১ Andrews and Mukerji, p. 134.

২২ Braja Lall Chuckerbutty : *Lectures on Religious Subjects by Hurrish Chunder Mookerjee (of Hindoo Patriot),* (1887), Preface, p. i. এই বইয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রথম ইংরেজী বক্তৃতার তারিখ দেওয়া আছে, ২৩এ ডিসেম্বর, ১৮৫৪ ; স্থান, ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজ ; বিষয়, "The Brahmo Sumaj; its Position and Prospects." বইখানি ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২৩ রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, (লেখা সমাপ্ত ১৮৭৪।৭৫ ? প্রকাশিত বা° ১৩১৯), পৃপৃঃ ৫৩-৫৪।

যশোরের কালু মিঞা

শ্রীতারাপদ রাহা

সরস্বতী পূজায় বাড়ী যাইব আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। মাত্র দু-দিন ছুটি। যাইতে প্রায় পুরা দিনটা লাগিয়া যাইবে; প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি বাড়ী পৌছিব, হয়ত সন্ধ্যা উত্তীর্ণও হইয়া যাইতে পারে। যাইয়া মা-বাপকে এক এক করিয়া প্রণাম, রাত্রে মায়ের হাতের অন্নব্যঞ্জন, পরম তৃপ্তির সহিত আহার পর দিন ভোরে আবার তাঁহাদের প্রণাম করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন—এই পর্য্যন্ত।

অথচ বাবা লিখিয়াছিলেন—সাবধান হয়ে আসবে, রাত্রে কখনও বাসে বা নৌকায় চ'ড়ো না। বাসে যদিও বা এস—নৌকায় কখনও রাত্রে উঠবে না। রাত্রে মাগুরায় এসে তোমার পাঁচু-কাকার বাসায় থেকো, ভোর হ'লে তবে নৌকো ছেড়ো। অভাবে দেশের লোকের স্বভাব ভাল নেই জেনো। পরশু রাতে দত্তবাড়ী চুরি হয়ে গেছে, আমাদের রান্নাঘরে সিঁদ কেটে যে থালা-বাসন নিয়ে গেছে সে তো তোমায় আগের পত্রেই জানিয়েছি। কোন দামী জিনিষপত্তর সঙ্গে এনো না। তোমায় আর বেশী কি লিখব—বেশ বুঝে সুঝে সাবধান হয়ে এস।

যাইবার আগে সোনার বোতাম বাক্সে তুলিয়া ঝিনুকের বোতামওয়ালা একটা পুরান পাঞ্জাবী বাহির করিলাম, শীত পড়িয়া আসিয়াছিল, কোটের কোন দরকার ছিল না। ছিন্নপ্রায় যে-আলোয়ানটি রিপু করিয়া গত বৎসর গাঢ় সবুজ রং করাইয়াছিলাম সেইটিকে সঙ্গে লইলাম। বরাবর বাড়ী যাইবার সময় ছোট সুটকেস্‌টিতে দু-একখানা কাপড় বই ইত্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই—এবার বাবার কথায় তাহা করিতে আর সাহস পাইলাম না। গ্রামে আমাদেরই পাড়ার শ্রীরাম চক্রবর্ত্তীর ছেলে বসন্ত চক্রবর্ত্তী যোসিণীর মাঠ দিয়া সুটকেস্ লইয়া বাড়ী আসিবার সময় কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিল সে-খবর কলিকাতায় থাকিয়াও আমরা পাইয়াছি। সুটকেস্ খোওয়ানোই বড় কথা নয়, তাহার মত মার খাইতে আমি পারিব না। সুতরাং সুটকেস্ লওয়া আমার হইল না। ছ-আনা সিরিজের একখানা বিলাতী উপন্যাস ও শুকনো গামছাখানা খবরের কাগজে মুড়িয়া ছোট একটি পুঁটলি করিয়া লইলাম।

যশোর অবধি রিটার্ণ টিকেটের ভাড়া—বাস্ ও নৌকা ভাড়া—হিসাব করিয়া টাকা লইলাম; সঙ্গে একটি টাকাও বেশী রাখিতে চাই না।

ট্রেনের পর বাসে চাপিয়া যখন মাগুরায় পৌছিলাম তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। আর একটু পরেই পুবের আলো দেখা দিল, কিছু পরেই সূর্য্য উঠিল।

ইহার পরেই নৌকা-ভাড়ার পালা। ঘাটে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ খানা নৌকা বাঁধা আছে। আমাকে দেখিয়াই সবাই চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবু, এই নৌকোয় আসেন এই নৌকোয়—কোন্ গাঁয়ে যাবেন—বাবু—আসেন···

ভাড়া দেখিলাম অসম্ভব কম। তিন-বৈঠার নৌকার ভাড়া এক টাকা পাঁচ আনা, আগে লাগিত তিন টাকার কাছাকাছি। বাবা সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং তিন-বৈঠার নৌকা আমার ভাড়া করা হইল না। তাহা ছাড়া যে নৌকায় জোয়ান মাঝি আছে তাহার কাছেও আমি ঘেঁষিলাম না। অবশ্য জোয়ান মাঝির গায়েও কাহারও যৌবনের দীপ্তি দেখিলাম না। অবশেষে এক-বৈঠার এক 'টাপুরে' নৌকা বারো আনায় ঠিক করিয়া বেলা সাতটায় মাগুরা ছাড়িয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। নৌকার চেয়ে মাঝিকেই আমি ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলাম। মাঝি বৃদ্ধ, বয়স ষাট ছাড়াইয়া সত্তরের কাছাকাছি, শীর্ণ পাকাটির মত দেহ, চক্ষু কোটরগত, হঠাৎ কোনও কারণে আক্রমণ করিলে বাঁ হাতের ধাক্কায় আমি তাহাকে জলে ফেলিয়া দিতে পারিব। হাঁ, এই মাঝিই আমার ঠিক।

খবরের কাগজ খুলিয়া গামছাখানা বাহির করিলাম, হাতমুখ ধুইয়া গামছায় মুছিলাম। বইখানাও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, গামছা রাখিয়া বইয়ের পাতা খুলিলাম। বার বার বই ও গামছা নাড়াচাড়া করিয়া মাঝিকে জানাইয়া দিলাম—ইহা ছাড়া আমার কাছে আর তৃতীয় বস্তু নাই। মাঝির সেদিকে কোন খেয়াল আছে বলিয়া মনে হইল না। বুঝিলাম নিজের খেয়াল সে দেখাইতে চায় না,—খেয়াল দেখাইলে চুরি করা হয় না।

যাহা হউক, মাঝি বৈঠা চালাইতে থাকিল। আমি বই খুলিয়া বসিলাম, কিন্তু পড়া হইল না: মাঝির কোটরগত চক্ষুতে অস্বাভাবিক দৃষ্টি দেখিয়া আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল—একটু সাবধান থাকা ভাল—বে-হুঁশিয়ার দেখিলে ঐ বৈঠার আঘাত ও যে-কোন মুহূর্ত্তে আমার মাথায় বসাইয়া দিতে পারে—আশ্চর্য্য কি!

কিন্তু মাঝির সুমুখে বই বন্ধ করিবারও উপায় ছিল না: বই বন্ধ করিলেই মাঝির মুখের দিকে নজর পড়ে, আর তার মুখের দিকে নজর পড়িলেই আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসে। লোকটা যে সত্যই বাঁচিয়া আছে এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং বই খুলিয়াই রাখিলাম।

পুবের সূর্য্য ক্রমে মাথায় উঠিল,—মাঝির বৈঠা আর চলিতে চায় না। দুপুরে কাজলীর হাটখোলায় নৌকা বাঁধিয়া চিড়া ও মুড়কি কিনিলাম, আর গুড়ের সন্দেশ কিনিলাম। না খাইয়া নৌকায় বসিয়াও যেন আর আগাইতে পারিতেছি না। মাঝি চিড়া-মুড়কির দিকে কেমন করিয়া তাকাইয়া ছিল—তাহাকেও চারিটি দিলাম। সে তাহা খাইয়া দুই আঁচল ভরিয়া পরম তৃপ্তির সহিত জল পান করিল।

—বিড়ি আছে বাবু?

বলিলাম—না, পান তামাক আমি কিছু খাই না।

মাঝি আর কোন কথা না বলিয়া একটা বাঁশের চোঙার ভিতর একটা কাঠি দিয়া খোঁচাইতে লাগিল; তাহার ফলে গুঁড়া গুঁড়া যাহা বাহির হইয়া আসিল তাহাতে এক বার তাহার ধূম্রপান হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাহাই কলিকায় সাজিয়া নারিকেলের ছোবড়ায় আগুন ধরাইয়া লইয়া মাঝি একবার ধূম্রপান করিয়া লইল।

এইবার দেখি মাঝির বৈঠা একটু জোরে চলিতেছে। কিন্তু সে কতক্ষণ? একটু পরেই তাহার হস্ত আবার শিথিল হইয়া আসিল।

মধ্যাহ্ন-সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। আমরা তখনও শ্রীপুর ছাড়াই নাই। মাঝিকে ডাকিয়া বলিলাম, মাঝি রাত্রের আগে কিন্তু বাড়ী পৌছান চাই।

এই প্রথম আমি মাঝির মুখে হাসি দেখিলাম। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আলো তাহার মুখে গিয়া পড়িয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া দেখিলাম—শীর্ণ বিশুষ্ক বীভৎস মুখ সে উৎকট হাসিতে বিকট করিয়া বলিল, ক্যান্, বাবু ভয় করে?

ভয় আমার সত্যই করে—কিন্তু তাহা তাহাকে বলি কি করিয়া! তাহাকে বলিলাম—না, তা নয়, মাত্র দিন দুইয়ের ছুটি, মা-বাপের কাছে যতটা বেশী সময় থাকা যায়—তাই লাভ।

উত্তরে ছোট একটি 'হু' ছাড়া আর কোন শব্দ মাঝি উচ্চারণ করিল না।

যখন বাড়ী পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাবা দেখি জলচৌকিতে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছেন, মা রান্না ঘরে।

'মা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেই মা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন, বাবা 'নারায়ণ নারায়ণ' বলিয়া তাঁহার সন্ধ্যা শেষ করিলেন।

পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল—মা ঠাকরুণ, আমার চাল-ডাল?

লোকটা আবার পিছু পিছু আসিয়াছে কেন? ভাড়া তো চুকাইয়া দিয়াছি।

মা কিছু কথা না বলিয়া তাহাকে একজনের খাইবার মত চাল ডাল লঙ্কা তেল ইত্যাদি দিয়া দিলেন। লোকটা যেন এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল।

বাবা বলিলেন—পথে কোন কষ্ট হয় নি তো রে? এক বৈঠের নৌকায় এসেছিস বুঝি, তা বেশ করেছিস্ আজকাল

যে দিন-কাল পড়েছে! এতক্ষণ তোর না আসা দেখে কত ভাবনা হচ্ছিল।

বাবা এইবার গল্প ফাঁদিবার উপক্রম করিতেছিলেন, মা তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন—সারা দিন ওর কিছু খাওয়া হয় নি, ও হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিক্—তার পর গল্প কোরো।

তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—হাঁরে, মুড়কির মোয়া করেছি, আর কদমা আছে তাই একটু খেয়ে জল খা, আর একটু পরেই ভাত দিচ্ছি, রান্নাও আমার প্রায় হয়ে এল।

রাত্রিজাগরণ ও পথশ্রমে শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, মুড়কির দিকে আর স্পৃহা ছিল না। বলিলাম—তুমি একটু তাড়াতাড়ি রাঁধ—স্নান ক'রে আমি চারটি ভাতই খাব।

—রাত্রে স্নান করবি?

—ও অভ্যেস আমার আছে, মা, কিচ্ছু হবে না।

বাবার একখানা কাপড় ও আমার গামছা লইয়া নদীতে চলিলাম।

ঘাটে আবার হরেনের সঙ্গে দেখা, কত দিন পরে দেখা, গল্প জমিয়া উঠিল; সে চাউলের ব্যবসা করিতেছে, দেশের যাহা অবস্থা,—আমরা নাকি কলিকাতায় ভালই আছি,—এবার এখানে লোকের যা কষ্ট, যার অবস্থা ভাল তারও চাল ঘরে রাখিবার উপায় নাই, এক দিনের চাল জমাইয়া রাখিবার উপায় নাই, চুরি হইয়া যায়। এবার দেশের ভাল লোকের স্বভাব মন্দ হইয়া উঠিয়াছে, ঘরে সোনা-রূপা রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই।

কথায় কথা আসিল। আমি কেমন বিবেচনা করিয়া মাঝি নির্ব্বাচন করিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম। তবু ভয়ে ভয়ে আসিতে হইয়াছে।

হরেন বলিল—কবে যে আষাঢ় মাস আসবে!

নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিতে একটু দেরিই হইয়া গিয়াছিল। পথ হইতে দেখি—রান্নাঘরে আলো নাই, মা রান্না শেষ করিয়া সন্ধ্যা করিতে ঠাকুরঘরে ঢুকিয়াছেন। রান্না হইলে বাবার আর দেরি সয় না, তিনি হয়ত আহার শেষ করিয়া লেপের মধ্যে ঢুকিয়াছেন। কি একটা গানের এক কলি আওড়াইতে আওড়াইতে তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরের দিকে যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখি আমাদের বৈঠকখানা ঘরের বারান্দার পাশে কাঁঠাল গাছের নীচে একটা লোক দাঁড়াইয়া।

—কে?

কোন উত্তর দিল না।

ভয়ে আমার সমস্ত গা কাঁটা দিয়া উঠিল। কলিকাতায় গ্যাসের আলোতে চলিয়া চলিয়া পাড়াগাঁয়ে আসিয়া রাত্রির অন্ধকারে ভাল চোখে দেখি না। দূর হইতেই উচ্চতর কণ্ঠে আবার ডাকিলাম—কে?

লোকটা তবুও কোন সাড়া দিল না। কিন্তু এই বার তাহাকে একটু দেখিতে পাইলাম।

—কে—? মাঝি!—বলিয়া আগাইয়া আসিলাম; হাতে দেখি একখানা লাঠি লইয়া আসিয়াছে। রাগে সারা গা জ্বলিয়া উঠিল: পাজিটা কিছুক্ষণ আগেই আমার পিছু পিছু আসিয়া চাল-ডাল লইবার ছলে বাড়ীর সব দেখিয়া গিয়াছে। এইবার বাড়ী নির্জ্জন দেখিয়া কাজ গোছাইতে আসিয়াছে।

ঐ শরীরে লাঠি দিয়াও ও আমার কিছু করিতে পারিবে না। রুষ্ট স্বরে 'কি চাই মাঝি' বলিয়া তাহার একেবারে কাছে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু এ তো মাঝি নয়, মাঝিরই মত শীর্ণশরীর, আরও কোটরগত চক্ষু, মুখে দাড়ি,—লোকটা ধরা পড়িয়া আর পলাইতে পারিল না। কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কে তুমি, কি চাই?

লোকটা কথা কহিতে সাহস পাইল না।

—কেন এসেছ? এমনি করে আঁধারে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

লজ্জায় লোকটার মুখ আঁধারেও কেমন বিকৃত হইয়া উঠিল। আমার দিকে একবার চাহিয়া মুখ নত করিল। হাসিয়া বলিলাম—যাও, পালাও, আর দেরি কোরো না, বাবাকে ডাকলে আর পিঠের চামড়া আস্ত থাকবে না।··· ভরসন্ধ্যেয় চুরি! চুরি করতে হ'লে একটু বুদ্ধি থাকা চাই, আমি বাড়ী এসেছি খবরটা জানা নেই বুঝি!

লোকটা তবুও নড়ে না দেখিয়া গলা ধাক্কা দিতে

যাইতেছিলাম। তাহার আর দরকার হইল না; একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমাদের গেট পার হইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া ঘোষেদের বাড়ীর পাশ দিয়া তাহার মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। বাবা হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, মা আহ্নিক করিতেছেন, ব্যাপারটা লইয়া তখন আর হৈচৈ করিলাম না। হাত-পা ধুইয়া শোবার ঘরে লেপের মাঝে ঢুকিলাম। জানি, মা'র আহ্নিক সারা হইতে এখনও আধঘণ্টা দেরি। এই কাজটা করিতে তিনি এমন কি তাঁহার পুত্রকেও উপেক্ষা করিয়া চলেন।

সারাদিনের উপবাসের জন্যই হউক অথবা মা'র রন্ধনের গুণেই হউক, আহারটা হইল যেন অমৃত। কত দিন পরে এমন তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নূতন ইলিশ মাছ ঘরে আসিয়াছিল। লাউয়ের সঙ্গে বড়ি দিয়া মা চমৎকার ঘণ্ট রাঁধিয়াছিলেন। নারিকেলের সন্দেশ দিয়া পাথরের বাটিতে দুধ দিয়া মা বলিলেন—এবার এই পাথরের বাটিতেই খা। তোর দুধ খাবার সেই কাঁসার জামবাটিটা এবার রান্নাঘর থেকে চুরি হয়ে গেছে। আরে বাবা, চোরের কি উপদ্রবই হয়েছে! তোরা তো বাড়ী থাকিস্ না,—টের পাবি কি করে?

নারিকেলের সন্দেশে একটা কামড় দিয়া, দুধের বাটিতে একটা চুমুক দিয়া বলিলাম—মা, তুমি আমার চেঁচামিচি শুনেছ—যখন তুমি ঠাকুরঘরে ছিলে?

—না, কেন কি হয়েছিল?

এক বার ভাবিলাম মাকে আর বলিব না,—শুনিলে রাত্রিটা তাঁর উদ্বেগে কাটিবে। বলিলাম—না, কিছু নয় এমনি!

—এমনি নয়,—কি হয়েছিল—বল্!

দুধের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়া বলিলাম,—বিশেষ কিছু নয়, একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল।

মা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—কোথায়?

—ঐ বৈঠকখানা ঘরের সামনে—কাঁঠাল তলায়—আঁধারে।...বেটার যেমন বুদ্ধি, এই সন্ধ্যেরাত্রে চুরি করতে এসেছেন,—নড়তে পারেন না, অথচ হাতে আবার একটা লাঠি! দিতাম আচ্ছা করে ঘা-কতক বসিয়ে, বাবার যে আবার ঘুম ভেঙে যাবে,—তা ছাড়া তুমি তো সন্ধ্যে করছিলে।

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন—মুখে অল্প দাড়ি আছে?

—হাঁ।

—একটু কুঁজো—না?

—হাঁ

মা কাতর হইয়া বলিলেন—তুই তাড়িয়ে দিয়েছিস্?

—হাঁ,—কেন মা!

—আহা!—মার চোখ দুটি ছলছল করিয়া আসিল: আহা! বেচারা খেতে পায় না রে,—দিনে লজ্জা করে তাই রাত্রে আসে, ও-পাড়ার কালু মিঞা। অবস্থা ওর একদিন ভাল ছিল, তাই রাত্রে আসে, যারা গরীব তারা দিনেও আসে। কিছু বলে না, চুপ ক'রে বসে থাকে। যারা ভদ্র গৃহস্থ, তাদের অধিকাংশ কলকাতা বা অন্য কোথাও চাকরী ক'রে দু-দশ টাকা পাঠাচ্ছে, তাই তারা দুটি খেতে পায়,—ওরা কোথায় পাবে? ওরা এসে দোরে দোরে বসে থাকে, কিছু কথা বলে না, গৃহস্থের খাওয়া হলে যদি কিছু বাঁচে তাই তারা দেয়, ওরা আঁচলে বেঁধে ঘরে নিয়ে তাই আবার ভাগ ক'রে খায়। কিছু না পেলে আস্তে আস্তে আপনি উঠে যায়—কথা বলে না। ভিক্ষে তো এরা কোন দিন করে নি।

মায়ের চোখ দিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

এইবার কালু মিঞার মুখখানি আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারিলাম। একটু আগে অন্ধকারের মধ্যে তার কোটরগত চক্ষুতে ধরা পড়িবার লজ্জা বলিয়া আমি যাহা ভ্রম করিয়াছিলাম তাহার স্পষ্ট অর্থ এখন আমি অনুভব করিতে পারিলাম। মাতৃপক্ক অন্নে কত দিন পরে আমি যে তৃপ্তির আহার করিয়াছিলাম, তাহা আমার একেবারে বিস্বাদ হইয়া গেল, আজ আমি একজন ক্ষুধার্ত্তকে—অন্ন হইতে বঞ্চিত করিয়াছি।

পরদিন দুপুরে হয়ত আরও দুই-একজন আমাদের বাড়ীতে উদ্বৃত্ত অন্নের আশায় অধীর প্রতীক্ষায় ক্ষণ গণিবে, কিন্তু দিনের আলোতে কালু মিঞা আর আসিবে না।

দেশের ধাড়ীতে দুপুরের খাওয়া হইতে একটা দুইটা বাজিয়া যায়। অথচ ট্রেন ধরিতে আমার অন্তত দশটার আগেই রওনা হইতে হইল। একটি ক্ষুধার্ত্তকেও অন্ন দিয়া আমি মনের গ্লানি দূর করিবার সুযোগ পাইলাম না।

সাত-আট দিন হইল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। মেসের খাইবার ঘরে বন্ধুদের হৈচৈ পূর্ব্বের মত চলিতে থাকে; আমিই কেবল তাহাতে যোগদান করিতে পারি না। আমিই দেখিতে পাই আমাদের গ্রামের কালু মিঞা—কোটরগত চক্ষুর লুব্ধ দৃষ্টি দিয়া আমার থালার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। অন্ন উদ্বৃত্ত থাকিলে সে তার ছেলেমেয়ে স্ত্রীর জন্য আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।

ব্রহ্মদেশীয় খাদ্যদ্রব্য

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম বা কোন্‌টি মুখরোচক তাহা নির্দ্দেশ করা বিদেশীয়গণের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যাইতে পারে যে বিদেশীয়গণের প্রীতিকর ও উল্লাসজনক ব্যঞ্জন বা মিষ্টান্ন ব্রহ্মদেশে মোটেই নাই। ব্রহ্মদেশ ব্যতীত অন্য কোনও দেশে, ব্রহ্মদেশীয় ব্যঞ্জনাদি তৈয়ারী হয় না; এ-পর্য্যন্ত কেহই ব্রহ্মদেশীয় ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি অন্য দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টাও করেন নাই। অথচ ব্রহ্মদেশীয় খাদ্যদ্রব্য বিদেশীয়দিগের পক্ষে যাহাই হউক, বর্ম্মীদিগের সম্পূর্ণই উপযোগী, স্বাস্থ্যকর ও রসনা-তৃপ্তিকর। বিদেশীয়রা যদি তাহা পছন্দ না করেন, ব্রহ্মদেশীয়গণ তজ্জন্য দুঃখিত নহে।

চাউল :—ব্রহ্মদেশ নদীমাতৃক দেশ। ইরাবতীর ব-দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। উত্তর-ব্রহ্মদেশেও যথেষ্ট রোয়া ধান উৎপন্ন হয়। সুতরাং চাউলই ব্রহ্মদেশের প্রধান খাদ্য।

সাগাইঙ শোয়েবো ও মিন্‌জান জেলায় যে যব ও গম উৎপন্ন হয়, তাহা ব্রহ্মদেশস্থ বিদেশীয়দিগের আহারে ব্যবহৃত হয়। খাদ্য হিসাবে যতই সারবান্ হউক না কেন, বর্ম্মীরা তাহা খায় না, পছন্দও করে না। সুতরাং পুরী, কচোরী, 'লোক' বা পরোটার চিন্তা ব্রহ্মদেশে নাই। বঙ্গদেশেও শহরের চাকুরে ব্যতীত, গ্রামের বাঙালীরা রুটি-পুরীর জন্য ব্যস্ত হয় না, দু-বেলাই ভাত খায়।

ডাল :—আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধ ও নিরামিষভোজী বর্ম্মীরা সময়ে সময়ে ডাল খায় বটে, কিন্তু বঙ্গদেশে ভাতের সঙ্গে ডালের যেরূপ নিরবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব পাতানো হইয়াছে ব্রহ্মদেশে তাহা নাই। শরীরপুষ্টির জন্য যে ডালের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে, বর্ম্মীরা তাহা স্বীকার করে না। বাঙালী বা হিন্দুস্থানীদিগকে বর্ম্মারা "পে-ছারে-কাল" (ডাল-খোর্-কালা) বলিয়া উপহাস করে। অথচ শহরে বর্ম্মীদিগের প্রাতরাশে পে-জী-সিদ্ধ (মটরের ডাল) প্রায় কোনও গরীব বর্ম্মা-পরিবারেই বাদ যায় না। ভিক্ষু ও শ্রমণদিগকে প্রাতর্ভোজ্যদানেও চিংড়ি-শুটকি-যুক্ত মসুর ডাল উপাদেয় খাদ্যরূপেই পরিগণিত হয়। পে-হ্লন (মটর ভাজা) আবালবৃদ্ধ সকল বর্ম্মীরই প্রিয় জিনিষ।

শাকসব্জী :—ডাল পছন্দ না করিলেও, বর্ম্মীরা প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জী ও ফলমূল ভোজন করে। লাউ,কুমড়া, ঝিঙ্গা, শশা, সীম, বেগুন, মোচা, থোড়, আলু, মূলা, ওল প্রভৃতি যে সকল তরকারি বঙ্গদেশে পাওয়া যায়, ব্রহ্মদেশে তাহা সবই পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন আরও অনেক রকমের বনজ, জলজ ও ক্ষেত্রজ শাকসব্জী ব্রহ্মদেশীয়গণের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাঙালীর ন্যায় শুক্ত, শড়শড়ি, লাব্‌ড়া,

চচ্চড়ি, ঘণ্ট, বঠি, ছক্কা, ডালনা, রাওতা ও ভর্ত্তা প্রভৃতি রসনারোচক ব্যঞ্জন বর্ম্মীরা তৈয়ারী করিতে জানে না। শাক ও তরকারিগুলিকে ইচ্ছামত কাটিয়া, তৈল, লবণ, হলুদ, পেঁয়াজ ও একগণ্ডা লঙ্কা একত্র মাখিয়া একযোগে জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাদের ব্যঞ্জন বা হিনজো প্রস্তুত হয়। পর্য্যাপ্ত ঝোল রাখা হয়। আস্বাদনবৃদ্ধির জন্য কয়েকটি টমাটো বা কিঞ্চিৎ তেঁতুল দেওয়া যায়; কিন্তু না দিলেও দোষ হয় না। গ্রীষ্মকালে কাঁচা আম, আমড়া, মরিয়ম, তেঁতুল বা অন্তত তেঁতুলপাতা দ্বারা ঝালের ঝোল বা অম্বল তৈয়ারী হয়। ঐ ঝোলে বা অম্বলে কয়েকটি শাকপাতা ও ছোট চিংড়ি দিলে খুবই আনন্দ।

ব্রহ্মদেশে নানা রকমের উৎকৃষ্ট কলা, কমলা, আনারস, আম ও কাঁঠাল ইত্যাদি ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ডুরিয়ান পুষ্টিকর ফল; কিন্তু গন্ধ অসহ্য।

ব্রহ্মদেশে জিরা, ধনিয়া, লবঙ্গ, এলাচ ও দারুচিনি প্রভৃতি সুগন্ধি মশলার ব্যবহার নাই। মৎস্য, মাংস বা নিরামিষ ব্যঞ্জনে বর্ম্মীরা হলুদ ও লবণ ভিন্ন অন্য কিছুই দেয় না। সুস্বাদু ও সুগন্ধি করিবার জন্য পূর্ণমাত্রায় রশুন ও পেঁয়াজ ব্যবহার করে। গরীব গৃহস্থরা তদভাবে তদগন্ধযুক্ত "জ্যু" নামক এক প্রকার শিকড় ও গন্ধ-ভাদালিয়ার মত গন্ধযুক্ত এক প্রকার পাতা ব্যবহার করে। বাঙালীর নাকে উহা ন্যক্কারজনক; কিন্তু তাহা অনভ্যাসের ফলে। বঙ্গদেশেও রশুন, পিঁয়াজ, হিং, পুদিনা বা ধনিয়া পাতার গন্ধকে এখন আর কেহ দুর্গন্ধ বলিতে সাহস করে না।

ভাতের সঙ্গে ভাজা খাওয়াও ব্রহ্মদেশের সুপ্রচলিত রীতি। লাউ, কুমড়া বা মাছ ভাজা—অন্তত গুটি-কয়েক লঙ্কা ভাজাই যথেষ্ট। শুট্‌কি মাছ ভাজা (ঙাচ্ছাউ) হইলে তো খুব ভালই হয়। নতুবা যাহা হয় তাহাই ভাজিয়া বা পোড়াইয়া লঙ্কার সহিত চালাইয়া দেওয়া হয়। যদি বর্ষার প্রাক্কালে কয়েকটি পইয়ে ভাজা (উড়চুঙ্গা—ক্রিকেট) পাওয়া গেল তবে সেদিন বর্ম্মী পরিবারের মহা আনন্দ। মাসকলাই ডালের পেঁয়াজো (ডাল, লঙ্কা ও পেঁয়াজ বাটার পকৌড়ি) বর্ম্মী ও কালা উভয়েরই প্রিয় খাদ্য। মদের দোকানের সম্মুখে পেঁয়াজো ও তাহার চিরসহচর মাদ্রাজী মারিকার্রি, মদ্যপায়ীদিগের উৎকৃষ্ট চাষ নাই রূপে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন শ্রীপাট বসাইতেছে। "পুজুনডাউঙ্-এর বাজারে বর্ম্মা হোটেল-ওয়ালারা এখন পরাটা, বিন্দালু, কাট্‌লেট্ ও পেঁয়াজোর দোকান খুলিয়াছে। বর্ম্মা খরিদ্দারই বেশী।"* গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মারপিটে যে সকল হোটেলওয়ালা নিহত হইয়াছে বা পলায়ন করিয়াছে, তাহাদের স্থানে বর্ম্মীদিগের পরোটার দোকান খুলিয়াছে, অথচ পরোটা ও বিন্দালু বর্ম্মীদিগের দৈনিক খাদ্যদ্রব্যের তালিকাভুক্ত নহে; সৌখিন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার নামও উত্তর ব্রহ্মে কেহ জানিত না।

মৎস্য :—ব্রহ্মদেশে বঙ্গদেশের ন্যায় রুই, কাতলা, ভেট্‌কি, বোয়াল, শোল, টেংরা, পুঁটি, চেলা, খয়রা, তপসী, ইলিশ, কই, মাগুর, চিংড়ি, চাঁদা, বাচা, পাঙ্গাশ প্রভৃতি সকল মাছই পাওয়া যায়। বাজারে যে পরিমাণ মাছ উঠে এবং খালে বিলে ডোবায় কৃষিজীবী বর্ম্মীরা যেরূপ উৎসাহে মাছ ধরে, তাহাতে বোধ হয় শাকসব্জীর পরই মাছ বর্ম্মীদের এক প্রধান খাদ্য। কিন্তু বিধাতার এমন বিদ্রূপাত্মক অভিশাপ যে, এদেশে অপর্য্যাপ্ত মাছ থাকিতেও বর্ম্মীরা শুট্‌কি মাছ খায় এবং ঙাপ্পি-ঙাচ্ছাউ ব্যতীত তাহাদের এক দিনও চলে না। একষ্ট্রা এসিষ্টেন্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত উলুডিন লিখিয়াছেন, "বর্ম্মীরা গরীব, সদ্যধৃত মৎস্য ক্রয় করিবার পয়সা তাহাদের জুটে না। শুট্‌কি মাছ সস্তা এবং অনেকদিন অবিকৃত অবস্থায় ঘরে রাখা যায়। এই জন্য বর্ম্মীরা ঙাপ্পি ও ঙাচ্ছাউ বেশী পছন্দ করে।" ঙাপ্পির নিন্দা করিলে, বর্ম্মীরা ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, "ঙাপ্পির স্বাদ যাহারা জানে না, তাহাদের তদ্‌বিষয়ে সমালোচনা করা অন্যায়।" আমরাও বলি, "তন্মঞ্জরী-রসাস্বাদং-জানন্ত্যেব কুহু-মুখাঃ"।

ব্রহ্মদেশের মৎস্য স্বাদু ও সুপ্রিয় হইলেও, বর্ম্মীরা বাঙালীদিগের ন্যায় মাছ-সিদ্ধ, মাছের চচ্চড়ি, মাছের ডালনা, মাছের ঘণ্ট, লাউ-মাছ, সরিষা-মাছ, মুড়ি-ঘণ্ট বা পাতা-চচ্চড়ি প্রভৃতি বহুবিধ মাছের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানে না।

মাছভাজা ও মাছের ঝোলই তাহাদিগের মৎস্য-

* রেঙ্গুন গেজেট, ১৮ই নবেম্বর, ১৯৩৮।

রন্ধন-প্রণালীর দুইটি মাত্র প্রকরণ। মাছের ঝোল রাঁধিতে মাছগুলিকে তাহারা ভাজে না বা সাঁৎলাইয়া লয় না। হলুদ, লবণ ও লঙ্কাচূর্ণ মাখাইয়া, পেঁয়াজ ও রশুন সহ জলে সিদ্ধ করিয়া লয়। আবশ্যক হইলে, উপযুক্ত তরকারিও তাহার সঙ্গে দেওয়া হয়। অন্য কোনও মশলার প্রয়োজন হয় না।

বর্ম্মীরা অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। অহিংসা তাহাদিগের পরম ধর্ম্ম। কিন্তু আমিষ-ভক্ষণে সাধারণ বর্ম্মীদিগের যেরূপ আগ্রহ, তাহাতে মনে হয় যে আহারের জন্য জীবহত্যা করিলে, আমিষভোজনকারীর কোনই পাপ হয় না। বঙ্গদেশেও তদ্রূপ; ব্রাহ্মণ বৈরাগী সকলেই মাছ খায়। আমিষভোজী হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বর্ম্মীরা স্বহস্তে প্রাণীহত্যা করে না। ব্রহ্মদেশে বঙ্গদেশেরই ন্যায় ধীবরজাতি আছে। মাছ ধরাই তাহাদের ব্যবসা। নীচ কর্ম্ম করে বলিয়া অন্য বর্ম্মীদের সহিত তাহাদিগের বিবাহাদি ক্রিয়া চলে না। অথচ বিবাহ হইলে, সে-বিবাহ অসিদ্ধও হয় না। কারণ তাহারাও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

মাংসের জন্য পশুহত্যা ও মাংস বিক্রয় করে জেরবাদী মুসলমানেরা। বৌদ্ধ বর্ম্মীদের সঙ্গে তাহাদিগের কোনই সামাজিক সম্বন্ধ নাই।

ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই দেখিতেছি বাজারের মৎস্য-বিক্রয়কারিণীরা বেশ স্বাস্থ্যবতী; গায়ে সোনার গহনা, পরনে বিচিত্র লৌংজি ও এঞ্জি এবং ব্যবহার খরিদ্দার-ভুলানো। দরাদরি করিয়া কিছুতেই মাছের দাম কমানো যায় না। মাছ বিক্রয় করে বলিয়া সমাজে তাহাদিগের অনাদর নাই। তাহারা ধনী মৎস্যব্যবসায়ীদিগের চিত্তাকর্ষক ভৃত্য মাত্র।

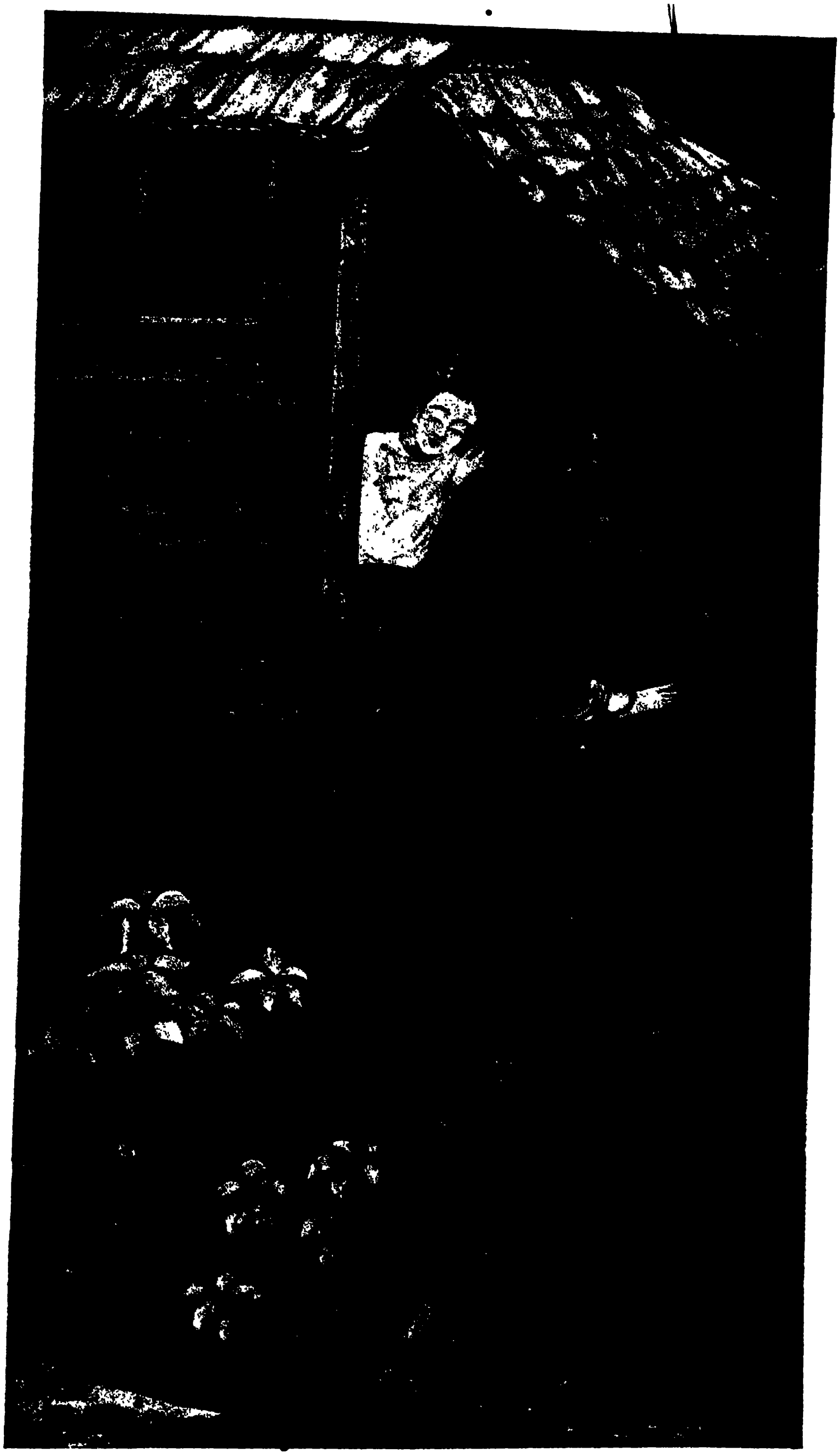
মাংস :—উত্তর-ব্রহ্মের গ্রাম্য বর্ম্মীরা কুকুর, শৃগাল ও ব্যাঘ্র ব্যতীত প্রায় সকল প্রকার জন্তুর মাংসই ভোজন করে। পোষা হাতী মরিলে দশ গ্রামের লোক একত্র হইয়া উহার মাংস বাঁটোয়ারা করিয়া লয়। কাচীনেরা ব্যাঘ্র-মাংসও ব্যবহার করে, সম্ভবতঃ ঔষধ প্রস্তুতের জন্য। ছিন্‌দিগের প্রতিবেশী বর্ম্মীরা সাপ ও গোসাপের মাংসও অখাদ্য বলিয়া মনে করে না। টিকটিকি ও গিরগিটি ভাজা কোন কোন শ্রেণীর বর্ম্মীদের সুপ্রিয় খাদ্য। জলচর প্রাণীর মধ্যে কোন প্রাণীই বর্ম্মীদের অখাদ্য নহে। খেচর জীবের মধ্যে কাক শকুন চিল ও বাজ ব্যতীত সকল প্রকার পাখীর মাংসই ভক্ষণযোগ্য। কিন্তু আধুনিক ও শিক্ষিত বর্ম্মীগণ হাঁস, মুরগী, শূকর, মেষ, ছাগ ও গোমাংসই পছন্দ করেন। অন্য মাংস খান না।

বর্ম্মীদের মাংস-রন্ধন-প্রণালী মৎস্যের ব্যঞ্জন রন্ধন-প্রণালীরই অনুরূপ। হলুদ, লবণ, তৈল ও রশুন ব্যতীত অন্য মশলার ব্যবহার নাই। পার্ব্বত্য-বর্ম্মীরা মাংসের ব্যঞ্জন অপেক্ষা পোড়া মাংস বা মাংসের কাবাবই বেশী পছন্দ করে। তাহাতেও কোনও মশলার প্রয়োজন হয় না।

মুসলমানদিগের তৈয়ারী কোপ্তা, কালিয়া, কাবাব, পোলাও ও বিরাণি বর্ম্মীদিগের ধাতে সহ্য হয় না। লোভে পড়িয়া এক দিন খাইলে, তিন দিন পর্য্যন্ত শরীর গরমে "আইটে আইটে" (আইঢাই) করে।

ঘৃত :—বর্ম্মীরা ঘি খায় না। দুধ, ঘি, দই, ছানা, মাখন ঘোল—দুধের কোনও জিনিসই বর্ম্মাদের পছন্দ হয় না। ঘিয়ের পরিবর্ত্তে বর্ম্মীরা তিলের তেল বা চীনাবাদামের তেল ব্যবহার করে। পূর্ব্বে ঘিয়ের গন্ধ বর্ম্মীদের একেবারেই অসহ্য ছিল। পার্শ্বের বাড়ীতে পুরী ভাজিলে, প্রতিবেশী বর্ম্মীরা যত্নে নাক ঢাকিয়া রাখিত। পীড়িতের জন্য বর্ম্মা চিকিৎসকেরাও কখনও কখনও দুগ্ধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন; কিন্তু রোগী দুগ্ধ পান করিত চক্ষু মুদিয়া নিমের সরবতের মত। আজকাল কিন্তু সেরূপ অবস্থা আর নাই। শিক্ষিতেরা প্রয়োজন অনুসারে দুধ মাখন ও ঘি ব্যবহার করেন। আর মফঃস্বলের বর্ম্মীরাও শহরের মুসলমান হোটেলওয়ালাদের দোকানে চা-পরোটা খাইয়া দুধ ও ঘির প্রতি এখন আর ততটা বীতশ্রদ্ধ নহে। তথাপি কাকার দোকানে টিনের দুধ মিশ্রিত চা পান করিয়া, দুই পেয়ালা স-লবণ সাদা চায়ের জল পান না করিলে গ্রাম্য বর্ম্মীদের মুখ সাফা হয় না। "ছোরে," "ছিন্‌ডে," "ছাউটে" প্রভৃতি নানা উপদ্রবপূর্ণ উপসর্গ উপস্থিত হয়।

মিঠাই :—বঙ্গদেশে যেমন সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া, লালমোহন, ক্ষীরমোহন, লাড্ডু, বরফি ও পেড়ার ছড়াছড়ি,



ব্রহ্মদেশের তরুণী

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র [illegible]

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



ভোজনরত বর্ম্মী পরিবার

ব্রহ্মদেশে তেমন মিঠাই-মণ্ডা নাই; আগেও ছিল না। বঙ্গদেশের মিঠাইয়ের প্রধান উপাদান ছানা। বর্ম্মীরা তাহা খায় না; সুতরাং বাঙালীদের ন্যায় ছানার মিঠাই প্রস্তুত করা তাহাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। তা-ছাড়া, ভারতীয় মিঠাই বর্ম্মীরা বেশী পছন্দ করে না। কেন না, ভারতীয় মিঠাই তাহাদিগের পক্ষে অত্যধিক মিষ্ট; তাহাতে ঘিয়ের গন্ধ থাকে এবং তাহা ছানার তৈয়ারী। এই সকল মিঠাইয়ের অভাবে বর্ম্মীরা ভালই আছে। আর্থিক ও শারীরিক উভয়পক্ষেই মঙ্গল।

ব্রহ্মদেশে বাজারে যে-সকল মিঠাই বিক্রয় হয় তন্মধ্যে চ্যান্ বা "তক্তি" মিঠাই সুপরিচিত। তিল বা চীনাবাদাম বা নারিকেলের চিলতার সহিত গুড় মিশাইয়া, অল্প আগুনের জ্বালে ব্রহ্মদেশীয় তক্তি তৈয়ারী হয়। এখন গুড়ের পরিবর্ত্তে চিনি ব্যবহার করাতে তক্তিগুলি দেখিতে সুদৃশ্য হইতেছে।

চালকুমড়া, আখরোট, খেজুর, চীনাবাদাম, নারিকেল প্রভৃতি ফলের টুকরাগুলিকেও ঐরূপে চিনির রসে জ্বাল দিয়া এমন ভাবে শুকাইয়া লওয়া হয় যে প্রত্যেক খণ্ড পৃথক পৃথক থাকে। দুই দিন পরে উহা টিনের বাক্সে বন্ধ করিয়া মিঠাই নামে বিক্রীত হয়। এই সকল মিষ্টান্নকে "ইয়োঙ" এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হয়। "মৌঙ" জাতীয় মিষ্টান্ন আমাদের দেশের পিঠা-পর্য্যায়ের অন্তর্গত। বর্ম্মী পিঠার মধ্যে মৌঙ-শী-জ্য (চিতই পিঠা), লৌঙ-ইয়ে-বঁ (পুলিপিঠা) চ্যা-লেই (পাটিসাপ্টা) ফে-ঠউ (পাটিসাপ্টার অনুরূপ) মৌঙ্-বাউঙ্ মৌঙ্-পী-ছলে প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের লোকপ্রিয় পিষ্টক। আতপ চাউলের বা কাউহ্নিন চাউলের গুঁড়া এই সকল পিষ্টকের প্রধান উপাদান। চীনাবাদামের তেলে এই সকল পিষ্টক ভাজা হয় বলিয়া ভারতবাসীর পক্ষে উহা মুখরোচক নহে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ইউল মন্দালয়ে মহামন্ত্রী মাগোয়া মিন্জীর গৃহে চা-পানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রথমতঃ আমাদিগকে রুটি মাখন ও মাফিন-টার্ট দেওয়া হইল। ভৃত্যেরা এই সকল দ্রব্য পুনরায় আনয়ন করিতে উদ্যত হইলে, মাগোয়ে

মিন্‌জি সহর্ষে কহিলেন, "বাস বাস; ইংরেজী খাদ্য ইহারা সর্ব্বদাই খান। বর্ম্মী খাদ্য দাও।" ইহার পর টেবিলের উপর বহুবিধ মিষ্টান্ন রাখা হইল। গণিয়া দেখিলাম ৫৭ রকমের মিষ্টান্ন।"

ব্রহ্মদেশে এখন আর তদ্রূপ বহুবিধ মিষ্টান্ন দেখিতে পাই না। সে-রাজা নাই, সে-রাজ্য নাই, মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিবার সে-সকল লোকও এখন নাই। "তে হি নো দিবসা গতাঃ"।

রাজভোগ:—অন্নব্যঞ্জনাদি তৈয়ারী করিবার জন্য মন্দালয়ের রাজকীয় পাকশালায় দেশীয় ও বিদেশীয় পাচক নিযুক্ত ছিল। রাজপরিবারের প্রয়োজন অনুসারে তাহারা নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভোজনগৃহে সাজাইয়া রাখিত। মহারাজার খাদ্যপরীক্ষক ঐ সকল খাদ্য পরীক্ষা করিয়া যাহা মহারাজ ও মহারাণীর প্রীতিকর ও নির্দ্দোষ, তাহাই তাঁহাদিগের আহারার্থে নির্ব্বাচিত করিয়া রাজার ভোজনগৃহে পাঠাইয়া দিতেন। কঙ-দিবসে এবং রাজকীয় উৎসবাদিতে মহামন্ত্রী, মন্ত্রী, অমাত্যগণ ও বিভাগীয় শাসন-কর্ত্তাগণ সপরিবারে রাজপ্রাসাদে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইতেন। তখন তাঁহাদিগের আহারের জন্য দেশীয় এবং বিদেশীয় বহুবিধ মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত হইত। কোনও কোনও বিশিষ্ট মিষ্টান্ন এই সময়ে "রাজভোগ" নামে নিমন্ত্রিতগণকে খাওয়ানো হইত। রাজগৃহের সম্মানার্থে রাজকীয় পাকশালা ব্যতীত অন্যত্র এই রাজভোগ তৈয়ার করা হইত না। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে ঐ প্রকারের "রাজভোগ" রাজার বয়স্য (লেটঠৌন্-ড) ও রাজার অনুগ্রহভাজন অমাত্যদিগের গৃহে প্রেরিত হইত, এবং ঐ সকল অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিগণের এক তালিকা পাকশালার অধ্যক্ষের নিকট সংরক্ষিত হইত।

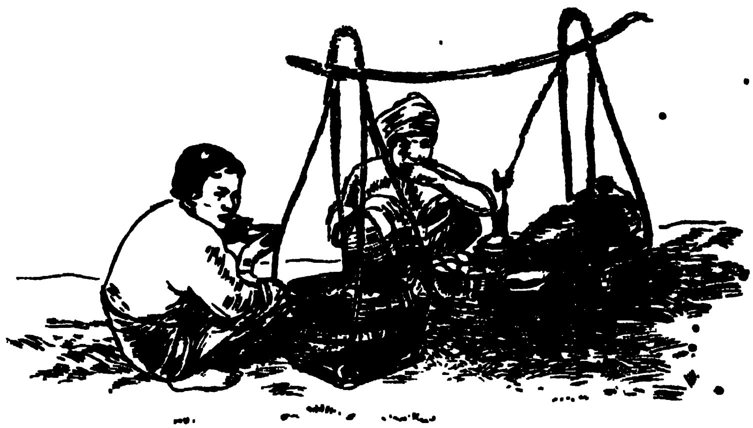
কথিত আছে, মহামন্ত্রী কিন্ উন্ মিন্‌জীর পুত্রবধূ, তাঁহার গৃহে প্রেরিত, পূর্ব্বোক্ত রাজভোগে বিষ মিশ্রিত আছে সন্দেহ করিয়া ঐ মিষ্টান্ন এক কুকুরকে খাওয়াইয়াছিলেন। এই সংবাদ মহারাণী সুপিয়ালার কর্ণগোচর হইলে মন্ত্রী-পুত্রবধূকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া রাজপ্রাসাদে আনয়ন করা হয়; এবং মন্ত্রী-পুত্রবধূর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিছুদিন পর, মহারাজ তিব তাঁহাকে মুক্তিদান করেন।* কিন্তু রাজভোগ প্রেরণ তখন হইতে বন্ধ হইয়া যায়।

মন্দালয়ের রাজপ্রাসাদে বিদেশী পাচকদিগের তৈয়ারী ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদির যথেষ্ট আদর ছিল। এ-সম্বন্ধে এখনও অনেক রকমের গল্প শুনা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মেমিওতে লাটসাহেবের বাঙালী সূপকার ভীমরাজ বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা হয়। ভীমরাজ তৎপূর্ব্বে মহারাজ তিবর রন্ধন-শালায় পাচকের কার্য্য করিত। তাহার নিকট মন্দালয় রাজপ্রাসাদের অনেক আশ্চর্য্যজনক কাহিনী শুনিয়াছি। এক তডিন্ জ্যো পর্ব্বে ভীমরাজ, মহারাজ তিবর জন্য "সোলেমানী হালুয়া" নামক এক পুরাপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন তৈয়ার করিয়াছিল। উহাতে স্বর্ণভস্ম, মতিভস্ম ও মৃগনাভির মিশ্রণ দিতে হইত। ঐ মিষ্টান্ন বাইবেলের প্রসিদ্ধ রাজা সলোমনের প্রিয় খাদ্য ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। তজ্জন্য উহার নাম হইয়াছিল সোলেমানী হালুয়া। মহারাজ তিব এই হালুয়া খাইয়া এত সন্তুষ্ট হন যে ভীমরাজকে তিনি পনর হাজার টাকা মূল্যের মণিরত্ন বকশিশ্ দেন। মহারাণী সুপিয়ালার নিকট হইতেও, তাঁহাকে স্বর্ণঘটিত মাজুন্ খাওয়াইয়া ভীমরাজ বহুমূল্য রত্নাদি বকশিশ্ পাইয়াছিল। কিন্তু হতভাগ্য ভীমরাজ ঐ সকল মণিরত্ন দেশে না পাঠাইয়া স্বীয় বাস-গৃহেই গুপ্তভাবে রাখিয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর তারিখে, ইংরেজ-সৈন্য অতর্কিতে রাজদুর্গ ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করিয়া প্রতি দুর্গদ্বারে গোরাসৈন্য মোতায়েন করে। সুতরাং ঐ মণিরত্নাদি বাহিরে আনয়ন করা অসম্ভব হওয়াতে, ভীমরাজ ঐ মণিরত্নাদি পূর্ব্বকথিত গুপ্তস্থানেই সংরক্ষণ করিয়া, দুর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সে-রত্ন আর ভীমরাজ খুঁজিয়া পায় নাই। তাহার ও অন্যান্য ভৃত্যদিগের বাসস্থানে পরে ভারতীয় সৈন্যদিগের ব্যারাক নির্ম্মিত হয়। মেমিওর পুরাতন বাঙালীরা সকলেই ভীমরাজকে দেখিয়াছেন। তাহার

* ব্রহ্মদেশের ইতিহাস-প্রণেতা উটিন্ লিখিয়াছেন, রাজদ্রোহে সংশ্লিষ্ট থাকার অপরাধে কিন্ উন্ মিন্‌জীর পুত্রবধূ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

জামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা ব্রহ্মদেশেই কার্য্য করিতেছে। মেমিওতে ভীমরাজ অর্থবান্ লোক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

বিদেশী পাচকদিগের তৈয়ারী ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নে রাজসরকারের প্রভূত অর্থব্যয় হইত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মহারাজ বা মহারাণী কোনও ভোজ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ দ্রব্যের তৈয়ারীর ব্যয় দশ-পনর গুণ বাড়িয়া যাইত এবং পাকশালার অধ্যক্ষই উহার "লায়নস্ শেয়ার" গ্রহণ করিতেন। **Burma Backwaters** নামক পুস্তকে লিখিত আছে, "মহারাজ তিব ও মহারাণী সুপিয়ালাকে বন্দী করিয়া যে জাহাজে মন্দালয় হইতে রেঙ্গুন লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, ঐ জাহাজের **victuals contractor** রাজা ও রাণীর সাত দিনের খোরাকী বাবদ চৌষট্টি হাজার টাকার বিল করেন। প্রথমতঃ ঐ বিলের সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছিল কিন্তু অবশেষে ইংরেজ-সরকার তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য হন।"



ব্রহ্মদেশের চলমান হোটেল

হোটেল :—মহারাজ তিবর রাজত্ব কালে (১৮৯৭ খ্রীঃ) তাঁহার রাজধানী মন্দালয় নগরে ভারতীয় মুসলমান ও চীনাদিগের হোটেল ও চায়ের দোকান ছিল। ব্রহ্ম-রাজের আদেশে স্বাধীন ব্রহ্মদেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ থাকায় এই সকল হোটেলে তখন হাঁস, মুরগী, শূকর ও মেষ মাংস খাওয়ানো হইত। চীনাদিগের খাউছোয়ে এবং ডাক্‌রোষ্ট ঐ সময় হইতেই উত্তর-ব্রহ্মদেশে লোকপ্রিয়তা লাভ করে।

মফস্বল হইতে কোনও ব্যক্তি কার্য্যোপলক্ষে মন্দালয়ে আসিলে, সে অতি দূরসম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনকেও নিকট-জ্ঞানে তাহার বাড়ীতে আতিথ্যগ্রহণ করিত। বর্ম্মীরা অত্যন্ত অতিথিসৎকারশীল জাতি। অপরিচিত লোকও আহারের সময়ে উপস্থিত হইলে তাহাকে আহারের জন্য অনুরোধ না করিয়া, বাড়ীর গৃহস্থ অন্ন গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং, বর্ম্মীদের তখন হোটেল খুলিবার প্রয়োজন ছিল না।

রীতিমত হোটেল না থাকিলেও ব্রহ্মদেশে তখন সাবেকী ধরণের খাবারের দোকান ছিল। কোনও বড় রাস্তার পার্শ্বে, কোনও বড় গাছের নীচে, পুকুরের পাড়ে বা বড় এক ময়দানের সম্মুখে ছোট ছোট আল্‌গা চুল্লী জ্বালাইয়া, এক হাঁড়ি ভাত, এক হাঁড়ি মুরগীর ঝোল বা হিন্‌জ্যো এবং কিঞ্চিৎ ঙাপ্পি লইয়া, প্রৌঢ়া রমণীগণ বুভুক্ষু বর্ম্মীদের ক্ষুধানিবৃত্তি করিত। আহারার্থী ও ক্রেতার সংখ্যা দেখিলে মনে হইত, উহারা ঘরে উনান জ্বালায় না বা খাবার দেখিলেই উহাদের ক্ষুধা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সকল ক্রেতা অধিকাংশই ছিল মফস্বলের লোক। সেবাপরায়ণ গৃহস্থের বাড়ীতে দুই বেলাই অন্ন ধ্বংস করা, তাহারা অতিথিসেবার উপর অত্যাচার বলিয়া মনে করিত। জ্ঞাতিস্বজনের বাড়ীতে থাকিয়া এই সকল খাবারের দোকানে অল্প পয়সাতেই তাহারা পর্য্যাপ্ত আহার পাইত। এখন রেঙ্গুন ও মন্দালয়ে বর্ম্মীদের অনেক হোটেল হইয়াছে; অতিথিসেবার প্রয়োজন হয় না।

এই সকল হোটেল বা খাবারের দোকানের সাজ-সরঞ্জামও বেশী ছিল না। দোকানে একখানি বা দুইখানি চাটাই পাতা থাকিত। ভোজনকারীরা ঐ চাটাইয়ের উপরে বসিয়া, মাটির খোরায় বা শালপাতায় চারটি ভাত, ঐ ভাতের উপরেই হিন্‌জ্যো বা মাছের ঝোল লইত; পাশে একটু ভাজা বা ঙাপ্পি পাইলেই সে-বেলার ভোজন তৃপ্তির সহিত পরিসমাপ্ত হইত।

প্লেট-পেয়ালা, চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি কোনও আসবাবেরই প্রয়োজন হইত না।

তখন চীনাদের হোটেলেও চেয়ার-টেবিল রাখিবার প্রথা ছিল না। চাটাইয়ের উপর বসিয়া এক বা দেড় ফুট উচ্চ কাঠের বা বাঁশের মাচায় পরিচিত-অপরিচিত সকলে একত্র বসিয়া ভোজনকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। জাতিভেদ নাই; সুতরাং, "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলে"র অনুসন্ধান করিতে হইত না কিংবা বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন স্থানের ব্যবস্থা করিবারও প্রয়োজন ছিল না। কোনও কোনও দোকানে মাটির শান্‌কি ও মাটির খোরা ব্যবহৃত হইত। কিন্তু চীনামাটির প্লেট ও পেয়ালা ব্রহ্ম-সরকারের ডিউটির ভয়ে স্বাধীন ব্রহ্মদেশের সীমান্তে অর্থাৎ থেয়েট্‌মিওর অপর প্রান্তে বিশ্রাম লাভ করিত।

জলযোগ :—রাস্তার পার্শ্বে, আদালতের আঙিনায় বা মেলার প্রাঙ্গণে তখন যে-সকল জলযোগের দোকান ছিল, তাহা সম্পূর্ণ স্বদেশী খাদ্যের দোকান। জিন্‌তউ ও লফে-তউ ঐ সকল দোকানের বিশিষ্ট খাদ্য। জলযোগের জিনিষ-গুলি সাধারণতঃ দুইটি বড় থালায় বাটিতে বাটিতে সাজানো থাকিত। এক থালায়—(১) বড় পেঁয়াজের পাতলা কুচি, (২) কাঁচা পেঁপের কোরা (৩) বর্ম্মা খাউছোয়ে (৪) চ্যা-জান—সেউই জাতীয় সূত্রাকার জিনিষ (৫) আলু-সিদ্ধ (৬) লঙ্কান্ন (৭) চ্যাউ-পান্—শৈবাল জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিজ্জ (৮) মাথেয়াপু—কটু ও তিক্ত রসযুক্ত ফলবিশেষ (৯) মিয়ে-খোয়া-ইওয়ে—তৃণজাতীয় শাক, এবং (১০) জীন্-উ। অন্য থালায় (১) পুজুন্ জাউঙ—চিংড়ি শুট্‌কি চূর্ণ (২) লবণ ও লঙ্কাচূর্ণ মাখা ডিম (৩) কালা-পে—মটর ডাল চূর্ণ (৪) রশুনভাজা তৈল এবং (৫) তেঁতুলগোলা।

ইহার মধ্যে কোন্ দ্রব্যের সহিত কোন্ দ্রব্যের সংযোগ করিয়া বর্ম্মীরা জলযোগ করিত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

বালেচ্ছাউঙ্ :—ব্রহ্মদেশীয় খাদ্যের নাম করিতে, বালেচ্ছাউঙ্ ও ঙ্গাপ্পির পরিচয় না দিলে পাঠকেরা সন্তুষ্ট হইবেন না। বালেচ্ছাউঙ্ ও ঙ্গাপ্পি ব্রহ্মদেশের সুপ্রসিদ্ধ আচার। যাহারা শুট্‌কি মাছ খায় তাহাদিগের নিকট বালেচ্ছাউঙ্ বিশেষ অপ্রিয় হইবে না। সুতরাং নিম্নে বালেচ্ছাউঙ্ প্রস্তুত করিবার সাধারণ নিয়ম দেওয়া হইতেছে।

উপকরণ :—টেঙর—শুটকি মাছ ১ পোয়া; ১৫টি রশুন; ১ পোয়া আদার কুচি; দশটি মান্দ্রাজী লঙ্কার চূর্ণ; ১৷৹ পোয়া সরিষার তৈল ও এক আউন্স ভিনিগার। প্রস্তুত-প্রণালী :—প্রথমতঃ মাছের খণ্ডগুলিকে কাঁটা ছাড়াইয়া থেঁৎলাইয়া লইতে হইবে। তার পর লোহার কড়াইয়ের তেলটুকু আগুনের মৃদু জ্বালে ফুটাইয়া, রশুন আদা ও লঙ্কাচূর্ণ সামান্য একটু সাঁৎলাইয়া মাছের খণ্ডগুলি উহাতে ছাড়িয়া দিতে হয়। মাছগুলি উত্তমরূপে ভাজা হইলে কড়াই নামাইয়া লইবে। ঠাণ্ডা হইলে একটি বৈয়েমে রাখিয়া অল্প ভিনিগার মিশাইয়া ছিপি বন্ধ করিয়া দিবে। এক মাস পর্য্যন্ত ইহা নষ্ট হয় না। পরে বিস্বাদ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ঙ্গাপি :—মধুরেণ সমাপয়েৎ, সর্ব্বশেষে ঙ্গাপ্পির পরিচয় দিতেছি। ঙ্গাপ্পি প্রধানতঃ তিন প্রকার। প্রথম, সমগ্র মৎস্যটিকে লবণ দিয়া পচাইয়া আস্ত ও অখণ্ড অবস্থায় রাখা হয়। ইহা বর্ম্মীদের কাছে অত্যন্ত স্বাদু ও মূল্যবান ঙ্গাপ্পি। দ্বিতীয়, মাছ পচাইয়া তাহার হাড় কাঁটা ছাড়াইয়া লেই-এর মত নরম করিতে হয়। তার পর উহাতে তেল লবণ ও লঙ্কাচূর্ণ মিশাইয়া, মাটির গাম্‌লা বা জালাতে রাখিয়া দিতে হয়। ইহাই সাধারণতঃ ঙ্গাপ্পি নামে বাজারে বিক্রীত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারে লাগে। তৃতীয়, সম্পূর্ণ গলিত মৎস্য হইতে ইহা তৈয়ারী করা হয়। দেখিতে কর্দ্দমের ন্যায়, লবণ দিয়া উহাকে রক্ষণোপযোগী করা হয়। ইহার গন্ধ বিদেশীর পক্ষে অসহ্য।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সকল পচা মাছ খাইয়া বর্ম্মীদের অসুখ হয় না; বরং সুস্থ শরীরে অনেক বৎসর জীবিত থাকে। বস্তুতঃ খাদ্য সম্বন্ধে কোনও জাতিকে নিন্দা করা সকল সময়ে সঙ্গত নহে। লোকের রুচি বিভিন্ন: আবহাওয়া অনুসারে প্রত্যেক দেশের আহারোপযোগী উৎপন্ন দ্রব্যাদিও বিভিন্ন হয়; বিভিন্ন দেশের অধিবাসী-দিগের শারীরিক ধর্ম্ম, প্রকৃতি, ব্যবসায়, সামাজিক প্রয়োজনও বিভিন্ন। স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরপুষ্টি ও রসনার তৃপ্তি এই তিনটি উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ খাদ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু দেশের আর্থিক অবস্থাই খাদ্য-নির্ব্বাচনের প্রধান নিয়ামক।

আঁধারচারিণী

শ্রীসুশীল জানা

হিমসাগরের ঝিম্-কালো জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি ভাঙা ঘাটের সিঁড়ির উপরে ব'সে সাগর আর কখনো দেখবে না; বসন্তের নির্ম্মম আক্রোশে বেচারী দুটি চোখই হারিয়েছে। বয়স তার বিশেষ কিছু নয়—বাইশ-চব্বিশ হবে। উজ্জ্বল দিনের আলোয় তার চিররাত্রির অনন্ত অন্ধকার নেমেছে।

বেচারী অন্ধ, পরমুখাপেক্ষী; নিজের কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। প্রকাণ্ড আলোর জগৎখানা ঘন অন্ধকারে তাল-গোল পাকিয়ে অজ্ঞাত অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

মাকে ডেকে ডেকে সাড়া মেলে না—কোথায় হয়ত কাজে ব্যস্ত। মতিরও সাড়া নেই। সাগরের বড্ড খিদে পেয়েছে। সাগর অগত্যা লাঠি বুলিয়ে বুলিয়ে দরজা খুঁজে খুঁজে চলল। মতি কাছাকাছিই ছিল—ছুটে এল। হাত ধরে তাকে বসিয়ে বললে—যাবে কোথায় দাদা, এইখানে ব'স।

—যমালয়ে যাব। আজ কি দুটি খেতে দিবি নে? তুই পোড়ারমুখী রাক্ষুসী ঠিক এইখানে ছিলি—আর আমি ডেকে ডেকে···

মতি খিল খিল করে হেসে বললে—ছিলামই তো। কেন, বৌকে ডাকতে পার না? সবাইকে ডাকতে পার—আর···

—দেখ্, হাতে লাঠি আছে—চটাস নে।

—তবে রইল, আজ আমি খাওয়াতে পারব না।

মতি দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে রাগ ক'রে চলে যায় দেখে সাগর কোমল কণ্ঠে বললে—দে ভাই দুটি খেতে, বড্ড খিদে পেয়েছে।

—আমি পারব না, বৌকে ডাক।

—দেখ্, খেতে দিচ্ছিস্ নে আজ—এই জন্যে, কিন্তু এক দিন কেঁদে কেঁদে মরবি।

মতি নীরব।

সাগর ফের ভয় দেখিয়ে বললে—এবার গেলে তোর শ্বশুরবাড়ী থেকে আনবার আর নামও করব না।

—ইস্···বয়ে গেল। কে যেন বাবুকে সাধাসাধি করে।···

মতির সেই এক গো—বৌ এসেছে, আমি আর খাওয়াতে যাব কি জন্যে?

মা মতিকে গালাগালি দিয়ে রেগে চটে শেষকালে হেসে ফেললে, বললে—বৌমা ক'দিনই বা এসেছে—ভাল ক'রে এখনও লজ্জা ভাঙে নি। একঘর লোকের সুমুখে সে খাওয়াতে যায় কি ক'রে! যা মা লক্ষ্মীটি।

—আমি পারব না···পারব না···পারব না।

লজ্জানত নববধূর মুখের দিকে তাকিয়ে মা হেসে বললে—ও হতভাগী যাবে না—আমারও যে হাতজোড়া বৌমা। আজ দুটি খাইয়ে দিয়ে এস—লজ্জা কি মা, নিজের অন্ধ স্বামীকে খাইয়ে দেবে···

বেচারী বৌ অগত্যা স্বামীকে খাওয়াতে চলল—লজ্জায় জড়সড় হয়ে ঘেমে একাকার। পেছনে আবার মতির উচ্ছল হাসি আর হাততালি, বললে—মা গো মা, কি বেহায়া বৌ। আমি চললাম, পাড়ার সকলকে ডেকে এনে আজ দেখাব।

সময় নেই অসময় নেই—বৌকে সাগর বড় জ্বালাতন করে। অন্ধ হ'লেও দুঃখী সে নয়। কারণে-অকারণে যখন তখন বৌকে চেঁচামেচি ক'রে ডাকাডাকি। বৌ চটে বলে—চোখে দেখতে পায় না, না ছাই, সব দেখতে পায়। তোমার কাছে আমি কিছুতেই আসব না আর—ডাকলেও সাড়া দেব না। চালাকি বের করছি।

অপরাধী সাগর তবু মুচকি মুচকি হাসে। বলে—আহা চটিস কেন? তোর আবার লজ্জা কিসের। কিছু চেনা-শোনা না থাকত···

কিন্তু বৌ চটেছে—সেদিন ডেকে ডেকে তার আর সাড়া মিলল না। অগত্যা সাগর চুপ করল। কিছুক্ষণ পরে ঘরে পায়ের শব্দ হ'ল। সাগর শুয়ে ছিল, উঠে বসল, হাসি-হাসি মুখ। চাপা গলায় বললে—ও মালা, শোন শোন, খুব গোপন কথা একটা আছে—কানে কানে বলব …ও মালা…

মালার বদলে গলা-খাঁকারি দিলে বুড়ো বাপ অক্ষয়। বললে—তামাকের গাড়ুটা এইখেনে ছিল—কোথায় গেল…বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

সাগর লজ্জায় চুপ—চোখ থাকলে ছুটে পালাত। কিন্তু তবু সাগরের কেবল মালা…মালা…মালা।

অথচ এই 'মালা' শব্দটা যখন স্বামীর মুখ থেকে উচ্ছ্বাসে উচ্চারিত হয়ে নববধূর কানে এল আর সেই সঙ্গে এল দুটি পেশীবহুল হাতের পুলক-রোমাঞ্চিত আহ্বান, তখন সে বুঝতেই পারে নি, স্বামী মালা বলে কাকে। তার পর ধীরে ধীরে সয়ে গেল এই নাম, ভাবলে—স্বামীর খেয়ালের দেওয়া এই নাম। দুটি অক্ষরের মাত্র নামটি—অপরিচিত হ'লেও সাগরের সমস্ত ভালবাসা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উছলে পড়ে বৌটির কাছে, ভারি ভাল লাগে। গৃহপরিজনদের মাঝে লজ্জার ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি অক্ষরের নামটি যে সুখস্পর্শ বহন ক'রে আনত তার তুলনা নেই। তবু চটে এসে বলত—কেন, অত ডাকাডাকি কিসের জন্যে? ফের যদি ডাকবে…তোমার না-হয় লজ্জা-সরম নেই—আমি বৌ-মানুষ…

ধমক খেয়ে সাগর বললে—মানে…ইয়ে…মানে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ব'লে…

—সারাদিন কেবল কথা—কি কথা?

—অমন ক'রে ধমকালে কি আর মনে পড়ে? ও হাঁা, তোর কপালের সেই কাটা দাগটা…

একটা বিদ্রূপ মন্তব্য ক'রে বৌ চলে গেল—সাগর পেছন থেকে ডাকলে—ও মালা…মালা, শুনে যা। ও মালা…

বৌটি অস্ফুট কণ্ঠে ব'লে গেল—বয়ে গেছে আমার সাড়া দিতে। 'আমার নাম মালা নয়—কাজলী।

কিন্তু সাগর তার বিন্দু-বিসর্গও শুনতে পেলে না।

মালা নামে যে মোহটুকু জন্মেছিল কাজলীর, তা এক দিন অতি দুঃখেরই সঙ্গে ভেঙে গেল।

সাগর জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মালা, আমার সঙ্গে তোর যদি বিয়ে না হ'ত!…

সাগরের বুকের মাঝখানটিতে নির্ভয়ে থেকে সে-কথা কাজলী আজ আর ভাবতে পারে না—কেমন ভয় হয়। সে চুপ ক'রে থাকে।

সাগর দুঃখ ক'রে বলে—আমার তাহ'লে কি হ'ত মালা! বাপ-মায়ের দুঃখও ঘোচাতে পারলাম না বরং বাড়ালাম। বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত খেটে খেটে আজ দশ বারো বিঘে জমি করেছে আর আমি ব'সে ব'সে খাচ্ছি। আমি কোন কাজেই এলাম না। তোকে যদি না পেতাম মালা তাহ'লে ঠিক এক দিন গাঙে ডুবে মরতাম—সব দুঃখকষ্টের শেষ হ'ত।

অন্ধের এ ব্যর্থ আকুতিতে কোন সান্ত্বনা দেওয়া যায় না—কাজলী নীরব।

সাগর আবার বললে—তোর বাপের অবস্থা ভাল—বিশ-পঁচিশ বিঘা তবু জমি আছে, নিজেকে খাটতে হয় না। আমার ভাগ্য ভাল যে তোর বাপ আমাদের ঘরে তোকে দিলে। তার পর হেসে বললে, ভগবান আছে মালা। হিমসাগরের ঘাটে শালুক ফুলের মালা পরিয়ে তোকে যেদিন বৌ বলে ডেকেছিলাম সেদিন ভগবান সাক্ষী ছিল যে। হ'লই বা ছেলেখেলা, কি বলিস?

কাজলীর চোখে ধীরে ধীরে নামল ব্যথার ছায়া। সাগর যে-মালার কথা ব'লে গেল কাজলীর সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। বিয়ের আগে কোনদিন সাগরকে সে চোখেও দেখে নি। বাপ তার বড় গরীব তাই অন্ধ স্বামীর হাতেই তাকে সমর্পণ করেছে। কিন্তু সে নিয়ে একটি দিনের জন্যেও তার অনুযোগ ছিল না, খেয়ালী সাগরের বিভিন্ন খেয়াল-খেলার মাঝে সে যে লোভনীয় ভালবাসার স্বাদ পেয়েছিল তাতে তার অন্তর ছিল ভরে। কিন্তু সে সমস্ত মুহূর্ত্তে কোথায় স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। সে বেশ বুঝল, কাজলী মালা নয়, স্বামীর আদরের দেওয়া নামও নয়—মালা ব'লে অন্য কেউ ছিল যে তার অন্ধ স্বামীর

অন্তর ভরে আছে। ভাঙা মনের নিদারুণ জ্বালায় সারারাত্রি জেগে কাটাল মালা। কেবলি তার মনে হ'ল এত দিন 'মালা' নামের অন্তরালে সাগরের কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছে সে—সে তার নয়, মালার।

ভোর হ'ল।

সারা দিনের একরাশ গৃহকাজের মাঝখানে এই অল্পবয়সী বৌটির বুকভাঙা বেদনার ঠাঁই নেই। মাঝে মাঝে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—অন্তর হুহু ক'রে ওঠে, একটু নির্জ্জনে কাঁদবারও অবসর নেই।

মতি জিজ্ঞেস করল—কি হ'ল বৌদি, অমন কেঁপে কেঁপে উঠছ যে!

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাই—ঠিক বলবে—বলতে বলতে মালার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

মতি বুঝতে না পেরে অস্ফুট কণ্ঠে বললে—তা তুমি কাঁদছ কেন বৌদি—কি কথা?

—মালা কে?…দেখো ভাই, মিথ্যে ব'লো না।

মতি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল—কোন সান্ত্বনার ভাষাই তার মুখ দিয়ে বেরোল না। তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—তাই মাকে অনেক আগে বলেছিলাম—বৌকে সব খুলে এক দিন বুঝিয়ে বল। মালা গাঁয়েরই একটি মেয়ে বৌদি—এই আমাদেরই বয়সী। অন্য জায়গায় তার বিয়ে হয়েছে। মেয়েটিকে দাদার খুব পছন্দ হয়েছিল; আর আজও দাদা জানে, সেই মালার সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছে। অন্ধ মানুষ—কেউ তো তাকে কিছু আর খুলে বলে নি, দুঃখ পাবে ব'লে…সে অনেক কথা বৌদি।

—তুমি বল ভাই, আমি আর পারছি নে…বেদনার উচ্ছ্বাসে কাজলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

—তার আগে তুমি বল, আমার অন্ধ দাদাকে কোন কষ্ট দেবে না…দাদাকে কোন দিন কিছু এসব কথা বলবে না!…

—না না, তুমি বল।

সাগরের চোখ তখনো অন্ধ হয় নি—এই তো মাত্র বছর তিনেক চোখ দুটি হারিয়েছে সে। মালা এই গাঁয়েরই মেয়ে। তার বাপ জোয়ান তিন ছেলের সাহায্যে অবস্থার বেশ উন্নতিই করেছে অল্প দিনের মধ্যে—গরিব চাষীদের মধ্যে তার একটা প্রতিপত্তি আছে।

এই মালার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, মারামারি ক'রে আর প্রচুর ভালবেসে শৈশবের সরল দিনগুলি এক দিন কেটে গেল—এল এমন একটা নূতন রঙীন দিন, যেখানে কল্পনার পৃথিবী রঙে রঙে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। এতদিনকার খেলাঘরের সাথীটি সলজ্জ অন্তরের কোণে গোপনে কল্পনাসঙ্গিনী হয়ে রইল। তার পর ভগবান সাগরের চোখ দুটি দিলেন অন্ধ ক'রে। জগতের অন্তহীন অন্ধকার তার চোখে নেমে এল বটে, কিন্তু মালার কৈশোর-মূর্ত্তিটি মর্ম্মে রইল গাঁথা।

তাই অন্যত্র সাগরের যেদিন বিয়ের কথা উঠল সেদিন মাকে সে স্পষ্টই জানিয়ে দিলে যে, মালাকে ছাড়া কাউকে সে বিয়ে করবে না। বুড়ো অক্ষয় এই বিয়ের জন্তে হারাধনের কাছ থেকে কিন্তু এক দিন নিরাশ হয়ে ফিরে এল। বললে- মালার খুব বড় ঘরে সম্বন্ধ হচ্ছে। লক্ষ্মীর মত মেয়ে—হবে না? সে-সম্বন্ধ ভেঙে কি আর আমাদের ঘরে মালাকে দেবে?

মার মারফৎ এই খবর শুনে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল সাগর: তারা গরিব আর সে নিজেও অন্ধ। নিরাশ কণ্ঠে বলেছিল, আমার আর বিয়ের কোন চেষ্টা ক'রো না মা—অন্ধের আবার বিয়ে।

তার পর কিছুদিন পরেই তার বিয়ে হ'ল। সাগর জানল, মালার সঙ্গেই তার বিয়ে হ'ল। কিন্তু মালার বিয়ে ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র হয়ে গিয়েছে—মা-বাপের নিষেধে সাগরকে সে-খবর কেউ জানায়ও নি। কারণ ইতিপূর্ব্বে মালার সঙ্গে বিয়ে হবে না শুনে সে একবার ডুবে মরবার চেষ্টা ক'রেছিল—গাঁয়ের ভৈরব মিস্ত্রীর চোখে পড়ায় কোন রকমে বেঁচে যায়। এই ঘটনার পরে ক্রমশ তার মাথার দোষ ঘটে। তার পর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে ক্রমশ সেটুকু সেরে যায়। আজও সে জানে, মালার সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছে।

উপসংহারে মতি বললে—এ-সব দাদাকে ভেঙে কখনো ব'লো না বৌদি…কখন জলে-টলে গিয়ে পড়বে কি কিছু ক'রে বসবে…মনের দুঃখে—ব'লে মতি কেঁদে ফেললে।

কাজলী চুপ ক'রে শুনছিল—জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, মালার কপালে কি একটা কাটা দাগ ছিল?

—হুঁ, ছিল—আমাদের পেয়ারা গাছের উপর থেকে দাদা তাকে এক বার ফেলে দিয়েছিল। সে-সব কিছু নয় বৌদি—দাদা তোমাকে এত দিন যখন চিনতে পারে নি··· এমন কি, তোমার গলার স্বরটিও মালার মত বরং একটু মিষ্টি।···

তার পর দু-জনেই চুপ ক'রে হিমসাগরের ঘাটের সিঁড়ির উপরে ব'সে রইল—কারু মুখে আর কোন কথা জোগাল না। কাজলী ভাবলে, মতির মত প্রথম রাত্রিতে স্বামীও বলেছিল বটে, 'তোর গলা আগের চেয়ে এখন আরো মিষ্টি হ'য়েছে মালা।'

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে জমে আসছিল। বৈশাখের তৃষাদীর্ণ শস্যশূন্য দিগন্তবিস্তৃত মাঠের হুহু করা হাওয়া হিমসাগরের কাজল জলে প্রতিফলিত লক্ষ কোটি নক্ষত্র চঞ্চলিত ক'রে সুদূর দিগন্তের দিকে আবার হুহু ক'রে বয়ে গেল···ভাঙা ঘাটের গভীর ফাটলে হাওয়া গুন্ গুন্ ক'রে উঠল, অদূরের তালবন মুখর হয়ে উঠল। তার পর ধীরে ধীরে গভীর নির্জ্জনতা আবার নেমে এল। একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কাজলীর চোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। কর্ত্তব্যের বোঝা নিয়ে আমরণ এই সংসারের চাকা দুঃখে কষ্টে তাকেই ঠেলতে হবে; আর কোন্ সুদূর থেকে মালা তার অন্ধ স্বামীকে তার কাছ থেকে দুর্ভেদ্য আবরণের মাঝখানে ঘিরে রাখবে। বৈশাখের এই উদাসী সন্ধ্যাটির মত নিঃসঙ্গে সে দূরে পড়ে থাকবে—তার পর এক দিন মরে গেলে সব ফুরিয়ে যাবে। সাগর তাকে কোন দিনই দেখতে পাবে না—কোন দিনই চিনবে না। হায় রে···

সাগর বললে—মালা, বকুলতলায় ছেলেরা এখনো খেলা করে? সেই রকম দোলনা টাঙিয়ে···

কোথায় সেই বকুলতলা কাজলী তা জানে না। ধীর কণ্ঠে তবু বললে—হু।

—সেই জায়গাগুলো এখন ভারি দেখতে ইচ্ছে করে মালা। হিমসাগরের সেই ভাঙা ঘাটে ব'সে ব'সে কত রাত্রি ধরে গল্প করতাম···গাঙ-ধারের সেই বড় বাঁধটায় মাছরাঙা পাখীর ছানা খুঁজতে খুঁজতে কত দূর চলে যেতাম—সেই বাতিঘর পর্য্যন্ত···তার পর সেই বৌ-হারানির মাঠ—সেই যে পানিফল তুলতে গিয়ে তুই একবার ডুবে গেছলি···মনে পড়ে সে-সব তোর মালা? তোর গা ছুঁলে সব যেন আমার চোখের সুমুখে ভাসে—সব দেখতে পাই। নিজেকে আর অন্ধ ব'লে মনে হয় না।

কাজলী নীরব। সাগর আবার হেসে বললে—তুই কোন দিন বুড়ী হবি নে মালা—তোকে শেষ যেমন দেখেছিলাম আমার কাছে তেমনিই তুই চিরদিন থাকবি। আচ্ছা হ্যাঁরে, সেই তেলটা আছে—সেই কাঞ্চনপুরের মেলা থেকে লুকিয়ে এনে দিয়েছিলাম?

—না।

—ইস্, অমন ভাল তেলটা···খুব জাবড়া-জাবড়া মাখতিস বোধ হয়? চারটি গণ্ডা পয়সা নিয়েছিল··· হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব খুশবো। ও-সব তেল কি আর বেশী মাখে? মার কাছে হ'লে ওই তেলটা পাঁচ বচ্ছর হ'ত।

অতীত দিনের সাগরের অজ্ঞাত জগৎখানি ধীরে ধীরে কাজলীর ব্যথাকাতর চোখের সুমুখে ফুটে উঠল। কবেকার দূর শৈশবের ছোটখাটো কাহিনী থেকে প্রথম সলজ্জ তারুণ্যের গোপনে তেল কিনে দেওয়াটি পর্য্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন ধারার দুটি জীবন একত্রে তার চোখের সুমুখে এসে দেখা দিল। সেখানে তার ঠাঁই কোথায়? দিনের পর দিন এই নিপীড়ন চলে—কাজলী নীরবে সয়ে যায়, সাগর তার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

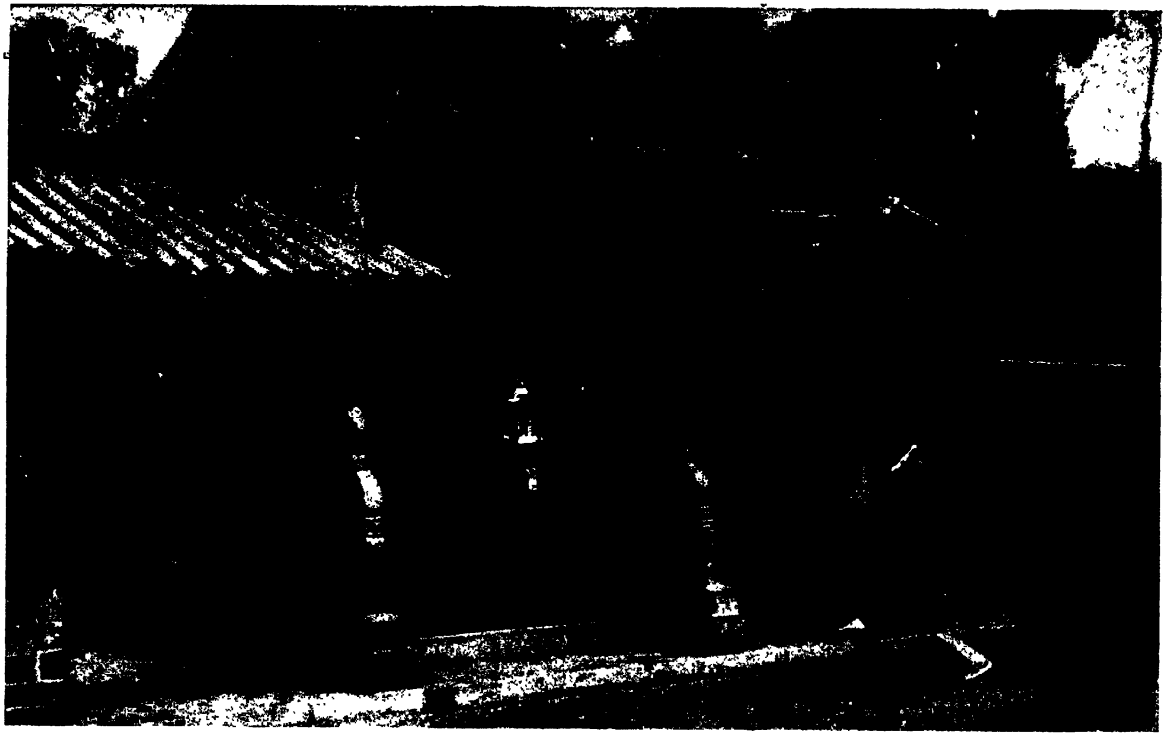
অন্ধ সাগর তবু বলে—তুই না এলে আমার কি ক'রে চলত বল্ তো? কে আমার এত জঞ্জাল পোয়াত—এত দেখাশোনা করত মালা! প্রসাদ বৈরাগীকে মনে পড়ে? সেই যে চোখে ছানি পড়ে যাওয়ার পর বোষ্টমীটা তার কি হেনস্তাই না করত। শেষ কালে একদিন বৈরাগীর সব টাকা কড়ি নিয়ে কোথায় পালাল। তুই না হয়ে অন্য যদি কেউ এ বাড়ীর বৌ হয়ে আসত মালা, তাহ'লে আমারও তেমনি হাল হ'ত। তোর মত না-পারত অত যত্ন করতে আর না-পারত অত ভালবাসতে।



য়ুনান প্রদেশের পল্লীদৃশ্য



য়ুনান-ফুতে জাপানী বিমান-আক্রমণ



চীনের আত্মরক্ষার শেষ আশ্রয়, য়ুনান-প্রদেশ। য়ুনান-ফুর কারুকার্যময় একটি মন্দির



য়ুনান-প্রদেশের একটি কন্‌ফুশীয় মন্দির

মালা, তুই যে আমার কতখানি…ব'লে সাগর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করত।

তার পর আবার কাজলীর উষ্ণ কোমল হাতটিকে ধীরে ধীরে চোখের উপরে চেপে বলত—আমি এমনি অন্ধ হব ব'লেই ভগবান আমাদের ছোটবেলা থেকেই এক সঙ্গে মিলিয়েছিল মালা। যত ক্ষণ তুই আছিস তত ক্ষণ অন্ধ হয়েও আমার কোন দুঃখ নেই।

স্বামীর বর্ত্তমান অন্ধ জীবনে কাজলীর প্রয়োজনের শেষ নেই। সে যে তার কতখানি, তার অভাব যে কি, স্বামীর প্রত্যেকটি স্বীকারোক্তিতে তা সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এও সেই 'মালা' নামটির অন্তরালে। মালাকে অতিক্রম ক'রে সাগরের প্রেমোচ্ছ্বাস, উচ্ছল প্রেম-নিবেদন কাজলীর কাছে পৌঁছায় কটু হলাহল হয়ে, অমৃত থেকে যায় সেই অজ্ঞাত অপরিচিত দূরচারিণী মালার কাছে। সাগরের কথাগুলি শুনতে শুনতে কাজলীর কান্না আসে। বর্ত্তমানের বুক ভরে থাকে সে, স্বামীর দৃঢ় বাহুবন্ধনে একান্ত বুকের গহনে থেকেও কোথায়… কত দূরে সে!…

মনে মনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করে সাগর… আনন্দ-মুখর একটি সংসার…ছেলেমেয়েদের হাসিমুখ… এই মাটির ক্ষুদ্র কুটীরের বদলে পাকা ঘর হবে, দশ বিঘে জমির বদলে কত জমি হবে…অন্ধ ব্যবসা ক'রে কত টাকা ঘরে আনবে…চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী একেবারে উপচে পড়বে। কিন্তু সেখানেও কাজলী নেই—আছে মালা স্বামীর অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সব জুড়ে মালা·· মালা…মালা!

একটা কুটিল ঈর্ষা এই পল্লীবাসিনীটির সমস্ত অন্তর দগ্ধ ক'রে দিতে সুরু করল। সমস্ত কিছু থেকেও তার নিজের কিছু নেই—স্বামীর কাছ থেকে সে দূরে, অপরিচিত; এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হ'তে পারে। অন্ধ অসহায় সাগরের প্রতি তার যে একটু মমতা আছে, যে ভালবাসাটি তার বুক জুড়ে বিরাজ করছে এই অন্ধের জন্যে—তাও তার নয়, মালার। মালা নামের অন্তরালে অন্ধের ভালবাসার উচ্ছ্বাস-আদরগুলি সমস্ত শিরা-উপশিরায় যখন রক্তসঞ্চালন দ্রুত ক'রে তোলে, সমস্ত দেহে যখন রোমাঞ্চের শিহরণ আনে তখন অন্তর পুড়ে যায় তুষানলে। চীৎকার ক'রে তার বলতে ইচ্ছা করে—ওগো, যে তোমার এতখানি, যার কাছে তুমি এত কৃতজ্ঞ—সে মালা নয়···মালা নয়, সে এই হতভাগিনী কাজলী। অন্ধ, আমার গলার স্বর শুনেও কি আমায় চিনতে পার নি! কণ্ঠস্বর আমার মিষ্টি কিন্তু সেও কি মালার। ওগো, তুমি আমাকে দেখ, আমাকে চেন, আমাকে ভালবাস। মালা কি তপস্যা করেছিল—কেন তার এত সৌভাগ্য? কোন্ জন্মে আমি কি পাপ করেছি—কিসের জন্যে আমি এত হতভাগিনী!

এমনি ক'রে একটি বছর কেটে গেল। দূর মাঠের শেষে কৃষ্ণচূড়ার গাছটি লালে লাল হয়ে উঠেছিল কাজলী প্রথম যখন এই ঘরে বৌ হয়ে আসে—কৃষ্ণচূড়ার বনে আবার আগুন লেগেছে।

সাগর বললে—কোকিল ডাকছে, ফাল্গুন মাস এল বোধ হয় মালা, নয়?

—হুঁ।

সাগর বললে—কচি আমের দিন এল। মালা, তোর মনে পড়ে—উঃ কি আমটাই খেতাম লোকের গাছ থেকে চুরি ক'রে। তোর জন্যে কি মারটাই খেয়েছি মালা! সে-সব কখনো আর ভুলব না—সেই দিনগুলিই আমার সম্বল।

আর সহ্য হয় না—কাজলীর চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা নামল।

অন্ধ সাগর ফের বললে—আমি যেন সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মালা—তুই কাছে থাকলে আমি যেন সব দেখতে পাই, তুই যেন আমার একটি চোখ। এ কি, তুই কাঁদছিস কেন? কি হ'ল মালা?···

—ওগো আমি মালা নই···ও ব'লে আমাকে আর ডেকো না। কাজলী ফুঁপিয়ে বললে—আমার নাম কাজলী।

—কি বলিলি, কি নাম?

—কাজলী।

সাগর ভাবলে, এ কি উপহাস! সত্যি না হ'লে ও অত কাঁদবেই বা কেন? বিস্ময়ে সে হতবাক্ হয়ে ব'সে

রইল। তার পর ধীরে ধীরে সে সব শুনল : মালার অন্যত্রই বিয়ে হয়েছে—অন্ধ এবং গরিব ব'লে তার বাপ সাগরের সঙ্গে বিয়ে দেয় নি। কাজলীর সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছে। সাগর ভাবলে, সে এত দিন কোন্ অন্ধকারে ছিল। ভগবান তাকে নিয়ে বার বার এ কি পরিহাস করছে! এই মেয়েটির কণ্ঠস্বরটিও পর্য্যন্ত হুবহু প্রায় মালার মত—যেটুকু বিভিন্নতা ছিল সেটুকু তার ভালই লেগেছিল—ভেবেছিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর একটু বদলেছে। এদিকে বাবা-মা-মতি পাড়া-প্রতিবেশী সবাই কি এত দিন তার সঙ্গে পরিহাস ক'রে আসছিল। হবেও বা। তাকে দুঃখ না দেওয়ার জন্যেই তার কাছে তারা কিছু ভাঙে নি। সাগরের কাছে ক্রমশঃ সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিছানার এক পাশে যে-মেয়েটি ফুলে ফুলে কাঁদছে সে মালা কোন দিনই ছিল না—সে কাজলী। এত দিন ধ'রে ধীরে ধীরে যে-মায়াটি ওর উপরে গড়ে উঠেছে তা মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হ'ল না বটে, কিন্তু সাগরের মনে হ'ল, মালা ছাড়া কে অত তাকে ভালবাসতে পারে—কাকে অত সে ভালবাসতে পারে! ও কাজলী নয়…সেই মালা, যা সে শুনেছে তা সমস্তটা একটা প্রচণ্ড উপহাস। কিন্তু মালার কৈশোর-মূর্ত্তির পাশে তার চোখের অন্ধকার ভেদ ক'রে আর একটি মূর্ত্তি এসে ধীরে ধীরে দাঁড়াল…স্বল্পভাষী ভীরু ক্রন্দসী মেয়ে একটি—যে এত দিন কেবল দুঃখই পেয়ে এসেছে।

ভোর হ'তে সাগর মতিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল—সত্যি কথা বলবি মতি—দেখ্ মিথ্যে বলিস নে।

কথার ধরণে মতি শঙ্কিত হয়ে উঠল, বললে—কি কথা দাদা?

—তোর বৌদির নাম কি রে?

কাজলী মিথ্যে বলে নি—সবই সত্যি। মতির কাছে সমস্ত শুনে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সাগর।

মতি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললে—পাছে তুমি দুঃখ পাও, এই জন্যে নিজে মুখ বুজে সব সয়ে গেছে—মুখ ফুটে একটি কথাও বলে নি। সবই তাকে বলেছিলাম এক দিন খুলে—অন্ধ মানুষ, পাছে কিছু ক'রে বস দুঃখে—এই জন্য সব সয়ে গেছে। কিন্তু এ অবস্থায় মেয়েমানুষের যে কত দুঃখ দাদা…কত কষ্ট সে ভগবান ভিন্ন কেউ জানে না। বৌকে আর দুঃখ দিও না দাদা—বলো তুমি… ব'লে মতি সাগরের পা চেপে ধরলে।

সাগর ম্লান হেসে বললে—আমি সব বুঝি মতি—পা ছাড়।

মতি বললে—কত দিন দেখেছি বৌ কাঁদছে। কাজ করতে করতে চোখের জল টপ টপ ক'রে ঝরে পড়েছে। জিজ্ঞেস করতে উত্তর দিয়েছে—ও কিছু নয় মতি। সবই তো বুঝতাম—কি ব'লে তাকে আর বুঝাই। নিজে মেয়েমানুষ—সবই বুঝি তো।…

—আমি সবই জানি মতি। সাগর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, মালা…ইয়ে, কাজলীকে আমি তোর চেয়ে বেশী চিনেছি।

মতি ঠিকই বলেছে বটে। কাজলী সব সয়ে গিয়েছে—একটি দিনের জন্যেও সাগর কোন কিছুর অভাব বোধ করে নি। শেষকালে যখন আর পারে নি তখনই বোধ হয় কেবল বলেছে, আর সারা রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে। ভাবতে ভাবতে একটি প্রশান্ত করুণায় সাগরের বুক ভরে গেল। অতীতের দৃশ্যমান জগৎটার অনেকগুলি দিনরাত্রি মালার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত—তার কটু হলাহলটাই কেবল সাগরের অন্ধকার জগৎটাকে বার বার বিষাক্ত ক'রে দিয়ে গিয়েছে; আর এই কাজলী মেয়েটি—সাগরের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুঃখের জগৎকে 'মালা' নামের অন্তরালে যে আঁধারচারিণী করস্পর্শে সুন্দর ক'রে তুলেছে—তাকে সাগর কেবল দুঃখই দিয়ে এসেছে গোড়া থেকে। মালা তার কোথাও নেই, সুখে না, দুঃখে না, পাশে না—আছে কেবল কল্পনাচ্ছন্ন মনের কোণে। সে কাজলীর মাঝে যেন সত্য হয়ে উঠেছে।

কাজলী পয়সার লোভ দেখিয়ে একটি ছেলের হাতে খবর পাঠিয়েছিল, যেমন ক'রে হোক—হয় দাদাকে, না হয় বাবাকে আসতে বলিস, আমাকে যেন নিয়ে যায়। ভাবল, এরকম জ্বলে-পুড়ে খাক হওয়ার চেয়ে গরিব বাপের ঘরে অর্দ্ধাশন ঢের ভাল। সেও রক্তমাংসের মানুষ তো!…

খবর পেয়ে সন্ধ্যার পরে কাজলীর বাপ রাখাল এল। একটি মেয়ে—বুড়ো বড্ড ভালবাসে।

সকলে শুনল, কাজলী কাল সকালে বাপের বাড়ী যাবে—সাগরও শুনল। অমন হট্ ক'রে কেন যাবে—পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তার আসল কারণটা না জানলেও সাগর কতকটা অনুমান করল—মতি সবই বুঝল। মতির কাছ থেকে মা শুনল, বাপও শুনল সাগরের। কোন প্রতিবাদ করবার ভাষা খুঁজে পেল না তারা।

সাগর যখন বলল, "কাজলী, কাল সকালে তুই নাকি বাপের বাড়ী যাবি? আমার উপরে নাকি রাগ করেছিস?"—তখন স্বামীর দৃঢ় বাহুবেষ্টনের মাঝখানে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে অঝোরে কেঁদেছিল কাজলী—এই পল্লীবাসিনীটির এতদিনকার অবরুদ্ধ দুঃখ-স্রোতের মুখ সাগরের প্রেমরোমাঞ্চিত করস্পর্শে খুলে গিয়েছিল যেন। কাজলীর সে কান্নার সাক্ষী ছিল কেবল গভীর নির্জ্জন রাত্রির অনন্ত জ্যোৎস্না, শিয়রের জানালার ধারে এসে যে উঁকি মেরেছিল। মালা তখন অনেক দূরে।

কাজলীর গুমরে গুমরে কান্না আর থামে না। সাগর বললে—আমি অন্ধ মানুষ মালা···সেই মালা নামটা তবু এসে পড়ে—সাগর গুমরে নিয়ে বললে—কাজলী, তুইও আমাকে ছেড়ে যাবি—যা, সবাই একে একে যা। আমার দুঃখ কেউ বুঝবে না, তুইও বুঝলি নে।

কাজলী তবু ফুলে ফুলে কাঁদে।

সাগর বললে—তোর সঙ্গে তো কোন দিন খারাপ ব্যাভার করি নি কাজলী—কারুর কাছে বলিস নি যেন যে আমি তোকে ভালবাসি নি···ভগবান জানেন—ব'লে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সাগর চুপ করল। আবার বলল—ভগবান আমার কপালে অনেক দুঃখ লিখেছেন রে। গাঙের ধারে একবার ছেড়ে দিয়ে আসতে পারিস—সব দুঃখকষ্টের শেষ ক'রে দিই—তার পর তুই চলে যাস্।

কাজলী কেঁপে কেঁপে উঠল। তার দুটি কাঁকনপরা নিটোল হাত সাগরের কণ্ঠলগ্ন হ'ল নিবিড় ভাবে। ফুঁপিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে—ওগো আমি যাব না—কোথাও যাব না, আমাকে যেতে দিও না।

বহু দিন পরে একটি প্রশান্ত মিলনরাত্রি শেষ হ'ল।

ভোর হ'তে মতি শুনল, তার কাছ থেকে মা শুনল, বৌয়ের মত বদলে গিয়েছে—সে এখন যাবে না। কাজলীর সলজ্জ আনত মুখ খানির দিকে তাকিয়ে এই দুটি মেয়ের বুক অসীম আনন্দে ভরে গেল। মতি হাততালি দিয়ে বললে, হ্যাংলা বৌ—আমি সকলকে বলব···

রাখাল বিস্মিত হয়ে বললে—সে কি বল বেয়ান! কাল যে ও খবর পাঠাল—'না এলে আর দেখতে পাবে না'—আমি ভয়ে ভয়ে···না বেয়ান, মেয়ে আমার বড্ড অভিমানী। এই বারটি পাঠিয়ে দাও—মন-টন একটু ভাল হ'লে আবার আমি নিজেই দিয়ে যাব।

সাগরের মা বললে—তোমার মেয়েই যে যেতে চায় না—আচ্ছা আমি ডেকে দিচ্ছি, নিজেই জিজ্ঞেস করো। ও বৌমা···

লজ্জায় কাজলী তখন তার ত্রিসীমানায় নেই। সাগর বললে—আবার এসে অমন ক'রে শুয়ে পড়লি যে! ভূতে তাড়া করেছে নাকি! তোর বাপকে ব'লে দিয়েছিস্ তো যে যাবি নে। বলেছিস?

—যাঃ, ও আমি পারব না—লজ্জা করে। তুমি ব'লে দাও।···

—তবে চল্—নিয়ে চল্ আমাকে।

সাগর মাথা চুলকে শ্বশুরকে জানাল—ও তো এখন যেতে চায় না···মানে ইয়ে···সেই চাষ-বাস শেষ হ'লে বর্ষার পর না-হয় যাবে।

বিস্মিত রাখাল সম্মতির জন্যে বোধ হয় মেয়ের মুখের দিকে তাকাল—কিন্তু সে-মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে একবারে নুয়ে পড়েছে—ভাল ক'রে দেখা গেল না। বিমূঢ়ের মত রাখাল বললে—তাহ'লে আমি যাই—বেলা হ'ল, কাজ আছে আবার।···

রাখাল খুশী মনে চলে গেল।

অন্ধ সাগর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আমাকে ঘরে নিয়ে চল্ মালা···থমকে গিয়ে বললে—খালি ভুল হয়ে যায় কাজলী—রাগ করিস নে।

কাজলী নীরবে অন্ধ সাগরের হাতটি ধরে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে নিয়ে চলল।

মোগল ও রাজপুত

আওরঙ্গজেব-ইতিহাসের এক অধ্যায়

ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো, এম. এ., পিএইচ. ডি.

১

জাহান-জেব বানু—ডাক নাম জানী বেগম—ছিলেন সম্রাট শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্‌জাদা দারা শুকোর কন্যা। রাজলক্ষ্মী এবং ততোধিক প্রিয়তমা নাদিরাকে হারাইয়া দারা যখন পত্নী-বিয়োগের অশৌচ পালনের জন্য সীমান্তবাসী পাঠান নরাধম মালিক জীবনের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন তখন জাহান-জেব, তাঁহার অপর একটি ছোট বোন এবং সিপর শুকোও সঙ্গে ছিলেন। দিল্লীশ্বরের ভাবী উত্তরাধিকারী দারার করুণাদৃষ্টি যখন রাতকে দিন করিতে পারিত তখন এক দিন তাঁহারই কৃপায় মালিক জীবন খুনে হাতীর পায়ের তলা হইতে উহার পিঠে চড়িয়া বধ্যভূমি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আজীবন মানুষকে বিশ্বাস করিয়া মানুষের দ্বারা পদে পদে প্রতারিত হইলেও তিনি মনে করিতেন, হিংস্র পশুও উপকার ভুলিতে পারে না। এই ভরসায় হৃতসর্বস্ব শাহ্‌জাদা শোক-বিভ্রান্ত চিত্তে পাঠানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। পাঠান কেন, অতিআধুনিক সভ্য সমাজেও মানুষের মনে লোভের তরঙ্গ উঠিলে কৃতজ্ঞতার বালির বাঁধ মুহূর্তে ভাসিয়া যায়; শিকার হাতে পাইয়া মালিক জীবনও সাত-হাজারী মনসবের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কিন্তু আতিথ্যের অবমাননা করিলে পাঠান মাত্রই তাহাকে আজীবন ধিক্কার দিবে—এই ভয়ে মালিক জীবন তিন দিন দারাকে যথেষ্ট সম্মান ও সম্বর্দ্ধনায় আপ্যায়িত করিল; নিজের বাড়ীতে তাঁহার গায়ে হাত দিতে সাহসী হইল না। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন মালিক জীবনের গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া দারা কান্দাহারে যাইবার উদ্দেশ্যে বোলান-গিরিসঙ্কটের দিকে যাত্রা করিলেন। গৃহ-প্রাচীরের ছায়ার বাহিরে আতিথেয়তার দাবী নাই; সুতরাং মালিক জীবন স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গিরিসঙ্কটের নির্গমপথ অবরোধ করিল। কৃতঘ্ন পাঠানের কবল হইতে পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য সিপর শুকোর ক্ষুদ্র অসি কোষমুক্ত হইল; আট-নয় বৎসরের শিশু জাহান-জেব পাপিষ্ঠের পায়ে পড়িয়া কৃপাভিক্ষা করিলেন। শাহ্‌জাদা মোরাদের এক জন আশ্রিত কবি লিখিয়াছেন—পাষাণ-হৃদয় মালিক জীবন রোরুদ্যমানা রাজকুমারীর গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া তাঁহার পিতৃকৃত উপকারের প্রতিদান দিয়াছিল।

হতভাগ্য দারা বন্দী অবস্থায় ঐ বৎসরের ২৩শে আগষ্ট দিল্লীতে আনীত হইলেন। সেদিনই জাহান-জেবের সহিত তাঁহার পিতার শেষ সাক্ষাৎ। কিছুদিন পরে দারার ছিন্ন মুণ্ড আগ্রা দুর্গে বন্দী শাহ্‌জাহানের নিকট তাঁহার সংশয় দূর করিবার জন্য উপহার-স্বরূপ প্রেরিত হইল। শোকবিহ্বল শাহ্‌জাহান ও জাহান্‌-আরা দারার কন্যাদ্বয়কে তাঁহাদের কাছে পাঠাইবার প্রার্থনা করিলেন; আওরঙ্গজেব পিতা ও ভগ্নীকে এই সান্ত্বনা হইতে অন্ততঃ বঞ্চিত করেন নাই। জাহানারা ভ্রাতার অভিজ্ঞান-স্বরূপ অনাথা কন্যাদ্বয়কে বুকে করিয়া দারার শোক হয়ত কিঞ্চিৎ ভুলিতে পারিয়াছিলেন। জাহান-জেব মাতা নাদিরার অসামান্য রূপ, স্থির বুদ্ধি ও নীতিকুশলতা এবং পিতার সাহস, উদারতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ লাভ করিয়াছিলেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহান্‌-আরা সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র মহম্মদ আজমের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। শত্রুদুহিতা স্নুষারূপে সম্রাটের বিশেষ স্নেহপাত্রী হইয়াছিলেন—তাঁহার দরবারের সংবাদ-তালিকায় জাহান-জেব বা জানী বেগমকে যে সমস্ত উপহার দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী ইতিহাসে তিনি জানী বেগম নামে অভিহিত হইয়াছেন।

২

দারার দুর্ভাগ্যের অনুযাত্রী বুঁদীর রাজবংশ ধরমাত্ এবং সামুগড়ের যুদ্ধে প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছিল। যাঁহার বীরত্বে আওরঙ্গজেবের ভাগ্যলক্ষ্মী এক দিন বিপন্ন হইয়াছিল দিল্লীর শাহী-তক্তে বসিয়াও তিনি সেই রাও ছত্রসাল হাড়ার পুত্রদিগকে ক্ষমা করিলেন না। তাঁহার সৈন্য-সাহায্য এবং প্ররোচনায় উৎসাহিত হইয়া শিবপুরের সামন্ত আত্মারাম গৌর রাজশূন্য বুঁদীরাজ্য লুটপাট করিয়া ছারখার করিতে লাগিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের কৌশল হাড়াবংশীয় সামন্তগণের বীরত্বে ব্যর্থ হইয়া গেল। গোতুর্দ্দার যুদ্ধে বুঁদী-সেনা আত্মারাম ও তাহার সাহায্য-কারী মুসলমান সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া মোগলের সূর্য্যলাঞ্ছিত * রাজপতাকা কাড়িয়া লইল। রাজপুতের তথা সমগ্র হিন্দুজাতির দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা আকবর হইতে সমস্ত মোগল-সম্রাট বিশেষ রূপে জানিতেন বলিয়া তাঁহারা হিন্দুস্থানে দীর্ঘকাল নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবও ভেদনীতি প্রয়োগে সুনিপুণ ছিলেন। যুদ্ধে অপরাজেয় চৌহান-কুলকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আর এক চাল চালিলেন। বুঁদীর রাজ্য এবং রাও ছত্রসালের পাঁচ-হাজারী মনসবকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার দুই পুত্র ভাও সিংহ ও ভগবন্ত সিংহকে দেওয়া হইল; ভ্রাতৃবিরোধ বদ্ধমূল করিবার নিমিত্ত সম্রাট কনিষ্ঠ ভগবন্ত সিংহের প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেবের এই কার্য্যকে বুঁদীর নাক-কান কাটা বলিয়া কবি সুরজমল আক্ষেপ করিয়াছেন।

ছত্রসালের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাও সিংহকে লইয়া বাদশাহ্ ফাঁপড়েই পড়িয়াছিলেন। বুঁদীর চৌহান চিরকালই বেয়াড়া; মাথায় খুন চাপিলে তাঁহারা স্থান-কাল ও বলাবল বিবেচনা করেন না—তরবারি খুলিয়া বসেন। রাজ্যারোহণের পর ভাও সিংহ দিল্লীর দরবারে যান নাই; কয়েক বৎসর পরে সম্রাটের বিশেষ আমন্ত্রণে একবার দিল্লী গিয়াছিলেন। কিন্তু বুঁদীরাজ গোঁ ধরিলেন, আওরঙ্গজেবের রাজধানী দিল্লীর বুকে বসিয়া তিনি একাদশী করিবেন; এবং হিন্দু পর্ব্বাদি পালনে নিষেধ সত্ত্বেও পরদিন যমুনার জলে "বিষ্ণুবিমান" ভাসাইবেন। অন্যান্য রাজপুত রাজারা ভীত ও চিন্তিত হইলেন; কিন্তু ভাও সিংহ নিবৃত্ত হওয়ার পাত্র নন। আফিমের কৌটা ও কুঙ্কুম রঙের কাপড় বরাবর তাঁহার সঙ্গেই থাকিত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুর নিশান জাফরানী কাপড় পরিয়া সশস্ত্র রাজপুতগণ তাঁহার নেতৃত্বে শোভা-যাত্রা করিয়া নিগম-বোধ ঘাটে "বিষ্ণুবিমান" ভাসাইতে চলিল। আওরঙ্গজেব হুকুম দিলেন, বেতমীজ কাফেরের দলকে তোপের মুখে উড়াইয়া দাও। মুসলমান আমীরেরা সম্রাটের কাছে গিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। রাজপুত মরিয়া হইয়া উঠিলে রেকাবী তোপখানায় কুলাইবে না; রাজপুতের মাথা শিউলি ফুল নয়। আওরঙ্গজেবের মনে ধর্ম্ম ও রাজনীতির সংঘাতে সাময়িক ভাবে রাজনীতিই জয়যুক্ত হইল। তিনি তোপখানা সরাইয়া লইতে আদেশ দিলেন;—উভয় পক্ষ, অন্ততঃ ভাও সিংহ, বিরোধ ভুলিয়া গেলেন। আকবরের বংশে যখন যিনি দিল্লীর শাহী-তক্তে বসিবেন তিনিই মালিক; তাঁহার প্রদত্ত মন্‌সব ও জায়গীর যে ভোগ করিবে জানু কবুল করিয়া উহার নিমকহালালী করাই ছিল রাজপুতের স্বামীধর্ম্ম। বাদশাহের সহিত ঝগড়া এক রকম ঘরোয়া ব্যাপার; যে বাদশাহের দুষমন, হিন্দুই হউক কিংবা মুসলমানই হউক, সে রাজপুতের শত্রু। একাদশী লইয়া যাহার সহিত খুনোখুনি করিবার জন্য ভাও সিংহ কোমর বাঁধিয়াছিলেন তাঁহারই হুকুমে বুঁদীরাজ অসংকোচে মারাঠা হিন্দুর মাথা কাটিবার জন্য আওরঙ্গাবাদ চলিলেন।

বুঁদীরাজ্যের ভাগাভাগি লইয়া ভাও সিংহ ও তাঁহার ছোট ভাই ভগবন্ত সিংহের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। কিন্তু ভগবন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণ সিংহ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভাও সিংহের প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। এই জন্য অপুত্রক ভাও সিংহ তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকেই বুঁদীরাজ্যে তাঁহার অর্দ্ধাংশের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। বয়স ভাঁটা পড়ায়

* অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা হালের আমদানী। মোগলের পতাকা-চিহ্ন সমূহের বিবরণ আইন-ই আকবরীতে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে মোগল সম্রাটের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ক্ষীণতর হইয়া ধর্ম্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র হিন্দু মন্দির ধ্বংসের হুকুম জারি করিয়াছিলেন। আকবরের আমল হইতে ১০০ বৎসর মোগল সাম্রাজ্যে জিজিয়া আদায় বন্ধ ছিল। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে তাঁহার আদেশে উহা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইল। বুঁদীকবি সুরজমল লিখিয়াছেন:—এক দিন বাদশাহী হুকুমে একজন মুসলমান সেনাধ্যক্ষ একটি মন্দিরের চূড়া হইতে কলস নামাইয়া উহা ভাঙিবার উদ্যোগ করিতেছিল; কুমার কৃষ্ণ সিংহ তাহাকে বধ করিয়া মন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন। এই অপরাধের জন্য ভগবন্ত সিংহের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা হইলে তিনি উত্তর দিলেন, ছেলে আমার বশে নাই; শাহান্‌শাহ ইচ্ছা করিলে তাহাকে দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু এদিকে কৃষ্ণ সিংহের নির্ভীক ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বীরোচিত কার্য্যের কথা শুনিয়া ভাও সিংহের বক্ষ কুলগৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে অভয় দান করিলেন।

আওরঙ্গজেব ভাও সিংহের সহিত প্রকাশ্য শত্রুতার আশঙ্কায় মালবের সুবাদার শাহজাদা মোয়াজ্জমকে লিখিয়া পাঠাইলেন, কেউটে সাপের বাচ্চা বাঁচিয়া থাকিলে মঙ্গল নাই। শাহ্‌জাদা বন্ধুত্বের ভান করিয়া কৃষ্ণ সিংহকে পুষ্পকরণ্ডিনী নামক উজ্জয়িনীর উদ্যানবাটিকায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কুমারকে শাহ্‌জাদা সঙ্গে করিয়া ভিতর মহলে লইয়া যাওয়ায় তাঁহার দেহরক্ষী অনুচরবর্গ বাহিরেই রহিল। লুক্কায়িত গুপ্তঘাতকেরা নির্ম্মমভাবে উদীয়মান রাজপুতবীরকে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় হত্যা করিল (১৬৭৮ খ্রীঃ) উন্মত্ত রাজপুতগণ মোয়াজ্জমের রাজপ্রাসাদে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া প্রভুর প্রেততর্পণ সমাপনান্তে বীরগতি প্রাপ্ত হইল। হাড়া-বংশের ধৌম্যপ্রতিম পুরোহিত ভবানী দাস এবং কুমার কৃষ্ণ সিংহের খবাস বা গোলাম শ্যামরূপের কাতর প্রার্থনায় দয়াপরবশ হইয়া বাগরের রাবল শাহ্‌জাদার নিকট হইতে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করিলেন। ৪০টি শব সিপ্রাতটে নীত হইল; পুরোহিত ঐগুলির যথাশাস্ত্র অগ্নিসংস্কার করিয়া বুঁদী ফিরিয়া আসিলেন।

৩

বুঁদীর রাজবংশে এখন অবশিষ্ট রহিল কুমার কৃষ্ণ সিংহের ১১ বৎসরের শিশু "সতাকুল-তন্তু" অর্থাৎ ছত্রসালের কুলতন্তু-স্বরূপ কুমার অনিরুদ্ধ। বৃদ্ধ রাও ভাও সিংহ অনিরুদ্ধকে তাঁহার দত্তকপুত্র ও উত্তরাধিকারী রূপে গ্রহণ করিলেন। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিশ্বস্তভাবে সম্রাটের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ভাও সিংহ দেহরক্ষা করিলেন। পূর্ব্বে বর্ত্তমান কোটা ও বুঁদী একটি রাজ্যই ছিল। হাড়া-বংশীয় চৌহানগণকে গৃহবিবাদের দ্বারা হীনবল করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট শাহ্‌জাহান কোটাকে বুঁদী হইতে স্বাধীন করিয়া "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্" ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় সর্ব্ববিষয়ে শাহ্‌জাহানের একমাত্র উপযুক্ত পুত্র আওরঙ্গজেব বুঁদীর প্রতি রাজপুতের সেই আত্মঘাতী অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ভাও সিংহের মৃত্যুর পর বুঁদীর শূন্য গদীর লোভে কোটারাজ দুর্জ্জন সিংহ ভীলমীনা প্রভৃতি পার্ব্বত্য সৈন্যসহ অরক্ষিত বুঁদীরাজ্য আক্রমণ করিলেন। স্বয়ং আওরঙ্গজেব এই সময়ে আজমীরে ছিলেন; তাঁহার ইঙ্গিত না পাইলে দুর্জ্জন সিংহ এই দুষ্কার্য্য করিতে সাহসী হইত না। যাহা হউক, সম্রাটের কূটনীতি এবারও নিষ্ফল হইল। ভাও সিংহের শিশোদিয়া রাণী বুঁদীর সামন্তগণের সমক্ষে অনিরুদ্ধকে তাঁহার দত্তকপুত্র এবং বুঁদীর ন্যায্য অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তখন কুমার অনিরুদ্ধের বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। তিনি সামন্তগণের সাহায্যে দুর্জ্জন সিংহকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া গদীতে বসিলেন। আওরঙ্গজেব এই সময়ে মহারাণা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া ছত্রপতি সম্ভাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধে রাজপুতের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন; সুতরাং তিনি অসীম উদারতা প্রদর্শন করিয়া বিজয়ী অনিরুদ্ধের জন্য খেলাত সহ বুঁদীর পাট্টা প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, বুঁদীর ফৌজ সহ শাহ্‌জাদা আজমের সৈন্যের সহিত তাঁহাকে আওরঙ্গাবাদ যাইতে হইবে। রাও অনিরুদ্ধ রাজ্য হইতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির সম্ভাবনা দেখিয়া উহার শাসন-ব্যবস্থায় মনোযোগী হইলেন। বুঁদীর

শাসনভার নাথাউত চাঁদুক্য কিশোর সিংহের উপর অর্পিত হইল। বনিয়া করনসিংহ "নিয়োগী," উদয় সিংহ কায়স্থ "মুনীম" (কোষাধ্যক্ষ), গনৌলীর শেখা বনিয়া "গুল্মী" (গ্রাম-মণ্ডলাধীশ), দ্বারা (দ্বারকা), মিরধা কোটপাল (দুর্গরক্ষক) এবং ঘাসী কালাল (শুঁড়ী), অত্রিবনপাল অর্থাৎ বনবিভাগের শাসক নিযুক্ত হইল *; কুলদেবীর সেবাকার্য্যের অধিকার পাইলেন সুক নামক পুরোহিত।

১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই শাহ্‌জাদা আজম আজমীর হইতে টোডা-রাজমহল নামক স্থানে পৌছিয়া রাও অনিরুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। বুঁদীরাজ মনসব অনুযায়ী সৈন্য ও যানবাহন ইত্যাদি সহ মোগল-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। দাক্ষিণাত্য-যাত্রার পাঁচ দিন পূর্ব্বে বিজাপুর-সুলতানের কন্যার সহিত শাহ্‌জাদা আজমের বিবাহ হইয়াছিল বটে; কিন্তু তিনি প্রথমা স্ত্রী জানী বেগমকে কখনও কাছছাড়া করিতেন না; তিনিই ছিলেন স্বামীর "গৃহিনী" এবং "নিভৃত-সচিব"। আওরঙ্গজেবের পুত্র হইলেও শাহ্‌জাদা আজমের রক্ত চাচা মোরাদের মত বড় গরম ছিল। কথায় কথায় তিনি চোখ রাঙাইয়া জামার আস্তিন গুটাইতেন। স্বামীর হঠকরিতার রাশ টানিয়া ধরিতেন জানী বেগম। দারা শুকোর কন্যার স্বভাবতই হিন্দুর জন্য একটা দরদ এবং রাজপুতের উপর অসীম বিশ্বাস ছিল। নিজের বুদ্ধির দৌড়ে দুই-এক বার কাজ করিয়া ঠকিবার পর শাহ্‌জাদা আজম সাংসারিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে চিন্তা করিবার কাজটি পত্নীর উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

৪

সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর আজমীর হইতে অগস্ত্যযাত্রা করিলেন। দাক্ষিণাত্যে পৌছিয়া তিনি যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, সেই অগ্নি মারাঠা, বিজাপুর ও গোলকণ্ডা রাজ্য ভস্মীভূত করিবার পর অবশেষে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই জরাজীর্ণ দেহকে শেষ আহুতি রূপে গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাপিত হইল। বন্দী ছত্রপতি সম্ভাজীর মাথা কাটিয়া আওরঙ্গজেব মনে করিয়াছিলেন রাজা- ও নেতা- শূন্য মারাঠা জাতি বুঝি মরিল। কিন্তু সম্ভাজীর ছিন্ন মুণ্ড ভূমিস্পর্শ করিতে না-করিতেই মারাঠা জাতি যেন সহস্রবাহু সহস্রমূর্দ্ধা বিরাট অপ্রমেয় পুরুষের ন্যায় উত্থিত হইয়া তাঁহার বার্দ্ধক্যশিথিল বাহুপাশ হইতে মোগলের সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে হরণ করিতে উদ্যত হইল। দাক্ষিণাত্যের এই সুদীর্ঘ যুদ্ধনাট্যের এক দৃশ্যে প্রায় সীতাহরণের ন্যায় এক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সম্প্রতি আমরা উহা আলোচনা করিব।

শাহ্‌জাদা মহম্মদ আজম ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি আহমদনগর হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া বিজাপুর ও মহারাষ্ট্র আক্রমণ করিবার আদেশ পাইলেন। ধারুর অধিকার করিয়া তিনি নীরা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। মোগল-শিবির একটি ছোটখাট তাঁবুর শহর। বেগম দাসদাসী শাহীমহলের লটবহর সবই যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আজম কৌশলী যোদ্ধা হইলেও মারাঠা সৈন্যদের ফিকির-ফেরেব্ তাহার জানা ছিল না। চতুর মারাঠাগণ শাহ্‌জাদাকে জব্দ করিবার জন্য একটি ফন্দী আঁটিল। এক দিন এক দল মারাঠা অশ্বারোহী মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া পলায়নের ভান করিল। শাহ্‌জাদা ব্যাপার বুঝিতে না পরিয়া মারাঠা মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটিলেন; কিন্তু ধরি-ধরি করিয়া ধরিতে পারিলেন না; ক্রমশঃ শিবির হইতে বহুদূরে চলিয়া গেলেন। বুঁদীর কবি সুরজমল লিখিয়াছেন—

> ভাজত জুরত জুরি ভাজত লহত ভংগ।
> পীছে পীছে সাহ-পুত্র বিচর্‌য়ো দমন ব্যংগ।

অর্থাৎ [দিল্লীর-সেনার অসহ্য বিক্রম দেখিয়া মারাঠা-সর্দ্দার আনন্দ-রাও প্রভৃতি] এক বার পলায়নপর হইয়া

---

* "নিয়োগী" পদবী বাংলা দেশে সুপরিচিত। ইহার অর্থ বোধ হয় রাজস্ব-সচিব ও জমি-জমা সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারক। "মিরধা" বাংলা ভাষায় "মৃধা" হইয়া গিয়াছে; মাতব্বর গোছের মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রাম দেশে মির্‌ধা পদবী দাবী করে। মূল শব্দ ফারসী মীর্-দেহ্ অর্থাৎ দশের উপর সর্দ্দার। ইহা মীর্-দেহ্ [mir-dih] অর্থাৎ দেহ্ বাংলায় জমিদারীর তৌজীর "ডিহি" বা গ্রামের প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আবার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়; যুদ্ধোদ্যম করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে; সম্রাট-নন্দন তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহম্মদ আজমও ছাড়িবার পাত্র নহেন; যুদ্ধোন্মাদনায় তিনি শত্রুর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না।

এদিকে মারাঠা সর্দারগণ সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের সৈন্যের প্রধান অংশ সহ প্রায় অরক্ষিত মোগলশিবির আক্রমণার্থ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্রাটের পুত্রবধূ জানী বেগমকে বন্দী করিতে পারিলে দিল্লীশ্বর সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন—ইহাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। শাহ্‌জাদা আজম রাও অনিরুদ্ধকে শিবির-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজপুত অশ্বারোহী ছিল সংখ্যায় দেড় হাজারের কম।

মারাঠারা আসিতেছে শুনিয়া কিশোর বালক অনিরুদ্ধ নিজ কর্ত্তব্য মুহূর্ত্তেই স্থির করিয়াছিল। ওদিকে মেয়েমহলে হাহাকার পড়িয়া গেল, রাও অনিরুদ্ধ প্রমাদ গণিলেন। রাজপুত চিরদিন যুদ্ধ করিয়াই মরিয়াছে; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে মরিলেও মরণাধিক কলঙ্ক চিরদিনের মত হাড়া-বংশের উচ্চ শির অবনত করিবে, যদি দিল্লীশ্বরের পুত্রবধূ জীবন্তাবস্থায় শত্রু-কবলিত হয়—ইহাই হইল তাঁহার আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ। এমন সময় অন্তঃপুর-শিবিরের সরাপর্দার কাছে জানী বেগম বুঁদীরাজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং পর্দার আড়াল হইতে যুদ্ধের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাও অনিরুদ্ধ নিবেদন করিলেন, শাহ্‌জাদার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষাই একমাত্র সম্ভব। বেগম উত্তর দিলেন, শিবিরের আড়ালে যুদ্ধ করিলে আক্রমণকারীরা অধিক সাহস ও বেশী সুবিধা পাইবে। দাঁড়াইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষা করার চেয়ে বরং আমরা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকেই প্রথম চড়াও করিব। শিবিরের বাহিরে সৈন্যদল যুদ্ধার্থ সজ্জিত থাকুক; আমি স্বয়ং প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি। যোদ্ধার সাধারণ বুদ্ধিতে ১৫০০ সেনা লইয়া ১৫০০০ হাজার শত্রুকে আক্রমণ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে হইল না; রাও অনিরুদ্ধ ইহাতে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিলেন। যাঁহার ধমনীতে তাইমুর-আকবরের রক্ত প্রবাহিত, অসূর্য্যম্পশ্যা নারী হইলেও তিনি যোদ্ধার উপর হুকুম চালাইতে জানেন। জানী বেগম দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন, বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় নাই, কাজ আরম্ভ করা যাক।

রাও অনিরুদ্ধের আপত্তি অসঙ্গত কিংবা রাজপুতের পক্ষে অশোভন ছিল না। সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় খোলা ময়দানে আক্রমণ করাই যে আত্মরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, যুদ্ধের এই মূল সূত্র রণদেবতা নেপোলিয়নের পূর্ব্বে কেহ বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। জানী বেগমের সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া মনে হয় দারা ঠিকই বলিয়া ছিলেন হিন্দুস্থানের মেয়ে পুরুষের চেয়ে ঢের বেশী বাহাদুর; দুর্গাবতী, রাণী ভবানী, চাঁদ সুলতানা, লক্ষ্মী বাঈ এবং অযোধ্যার বেগমের নীতিকুশলতা ও শৌর্য্য এই কথাই আমাদিগকে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দেয়।

৫

বর্ম্মাবৃত হাওদায় উপবিষ্ট জানী বেগম দশপ্রহরণ-ধারিণী মহাশক্তির ন্যায় রণ-রঙ্গে অবতীর্ণা হইলেন; রাও অনিরুদ্ধ-পরিচালিত রাজপুত সেনা তাঁহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া চলিয়াছে। যে-শাহ্‌জাদীর কণ্ঠস্বর অবরোধের বাহিরে কেহ কখনও শুনে নাই, তিনি অনিরুদ্ধকে হাওদার কাছে ডাকাইয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন: "আমি তোমাকে পুত্র (ফরজন্দ) রূপে গ্রহণ করিলাম; রাজপুতের কাছে চাঘতাই (মোগল) বংশের মান ইজ্জত (শরম-ই-চাঘতাই) নিজের ইজ্জত-আব্রু হইতে ভিন্ন নয়—ইহা আমার জানা আছে।" বেগম নিজ হাতে কয়েকটি বর্শা অনিরুদ্ধ ও তাঁহার সর্দারগণকে উপহার দিয়া বলিলেন: "যদি আমরা এ যুদ্ধে জিতি ভাল কথা; ফল অশুভ হইলেও চিন্তার কোন কারণ নাই। নিজের কাজ নিজে শেষ করিয়া আমি হাওদার ভিতরেই থাকিব।" এত ক্ষণ যে অব্যক্ত উদ্বেগ ও আশঙ্কা রাজপুতদিগকে নিশ্চিত মৃত্যুর চিন্তা অপেক্ষাও অধিক অভিভূত করিতেছিল জানী বেগমের শেষ কয়েকটি কথা শুনিয়া তাহাদের মনের সেই মেঘ কাটিয়া গেল। তাহারা বুঝিল, রাজপুতানীর মত শাহ্‌জাদীরাও স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিতে পারে। আজ কেবল যুদ্ধ করিয়া মরিতে পারিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে।

শিবির হইতে দুই মাইল দূরে ব্যূহবদ্ধ রাজপুত-

বাহিনী অভিমন্যু-প্রতিম ষোড়শবর্ষীয় বালক অনিরুদ্ধের নেতৃত্বে মারাঠা চক্রব্যূহের উপর ভীমবেগে আপতিত হইল।

উভয়পক্ষে দুর্জ্জয় পণ। আওরঙ্গজেবকে জব্দ করিবার এমন সুযোগ মারাঠাদের আর আসে নাই। অপর পক্ষে গোঁয়ার রাজপুতের মরণের খেলা; এ খেলা দেখিবেন সম্রাটের কুললক্ষ্মী এবং দারার পুত্রী জানী বেগম। যুদ্ধের সঙ্কট-মুহূর্ত্তে যখনই কোন রাজপুত সেনানী অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল তখনই বেগম খোজাদের হাতে তাহাদের কাছে পানের খিলি পাঠাইতে লাগিলেন। মারাঠারাও নাছোড়বান্দা হইয়া লড়িতেছিল। বন্যবরাহ-প্রিয় রাজপুতের হামলাকে মুসলমানেরা শূয়রের গোঁ বলিত; ইহার সামনে দক্ষিণী টাট্টু ও ক্ষুদ্রকায় মারাঠা দূরের কথা, তুর্কী ঘোড়া, খোরাসানী ও মুলতানী সওয়ারও কোন দিন স্থির থাকিতে পারে নাই। তবুও সংখ্যায় প্রায় দশ গুণ বেশী ছিল বলিয়া মারাঠারা সহজে নিরস্ত হইল না। যুদ্ধ বহু ক্ষণ চলিল। রাও অনিরুদ্ধের নয় শত রাজপুত নিহত ও বাকী এক-তৃতীয়াংশ আঘাতে জর্জ্জরিত হইল। কিন্তু মারাঠা সৈন্য-তরঙ্গ বেগমের হাওদা স্পর্শ করিতে পারিল না। জয়ের সম্ভাবনা না থাকিলেও দাঁড়াইয়া মরিতে রাজপুত চিরকাল অভ্যস্ত; কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে পাথরে মাথা ঠুকিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া ছিল মারাঠাদের স্বভাববিরুদ্ধ। অবশেষে শত্রুসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। বুঁদী কবি গাহিয়াছেন—

> বিজয় সমেত য়োঁ নরেস লায়ো বেগম কোঁ।
> বারাহ জোঁ বসুধা দিতিকে সুতকো বিদারি।

মারাঠা-প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্না মোগলের কুলবধূ ও জয়লক্ষ্মীকে রাও অনিরুদ্ধ আদি বরাহ কর্ত্তৃক বসুধার ন্যায় শত্রুকবল হইতে উদ্ধার করিয়া শিবিরে প্রত্যানয়ন করিলেন।

মান সিংহ-জয় সিংহ ছত্রসালের ভাগ্যে বীরত্বের যে পুরস্কার মিলিয়াছিল, বালক অনিরুদ্ধের সৌভাগ্যের সহিত উহার তুলনা হয় না। শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া জানী বেগম তরবারি ও বাণের ঘায়ে জর্জ্জরিত অনিরুদ্ধের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন—গঙ্গাপ্রবাহ আপনহারা হইয়া আজ যেন উজান চলিয়াছে। তিনি বুঁদীরাজের বীরত্বের অশেষ প্রশংসা করিয়া নিজের গলার ৪০,০০০ টাকার মুক্তাহার তাঁহার গলায় জয়মাল্যস্বরূপ নিজ হাতে পরাইয়া দিলেন। পরে হয়ত বেগমের মনে হইল যে একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু শাহজাদা আজম ফিরিয়া আসিয়া পত্নীর কার্য্যের প্রভূত প্রশংসা করিলেন; বেগমের মনের বোঝা নামিয়া গেল।

শাহজাদা আজমের আর্জ্জিতে হাড়া ছত্রসালের প্রপৌত্র নিমকহালালী দ্বারা তাঁহার মান-ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে জানিয়া বাদশাহ একেবারে গলিয়া গেলেন। হাতী, ঘোড়া ও খেলাত সহ পাঁচ হাজারী মনসব রাও অনিরুদ্ধকে বকশিশ করিলেন। এবং আরও লিখিয়া পাঠাইলেন বুঁদীরাজের প্রার্থিতব্য যাহা কিছু আছে সমস্তই মঞ্জুর করা হইল। প্রকৃত বীরের হৃদয়ে হীন প্রতিহিংসা কিংবা লোভের স্থান নাই। কুলোচিত কার্য্যের অতিরিক্ত কিছু করিয়াছেন বলিয়া কোন ধারণা অনিরুদ্ধের মনে স্থান পায় নাই। তাঁহার পিতা রুক্ষ সিংহের পূর্ব্বকথিত মন্দির রক্ষারূপ অপরাধের জন্য বারা-মউ, চাচুরনী ইত্যাদি যে সমস্ত পরগণা বাদশাহী হুকুমে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তিনি শুধু ঐ গুলিই ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিলেন।





প্রধান রেলওয়েষ্টেশন, ফ্রাঙ্কফোর্ট



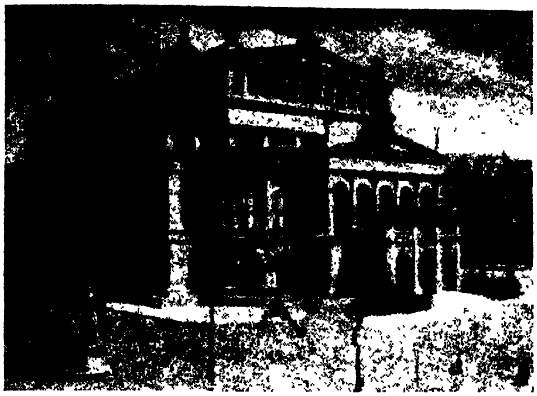
প্রাচীন গির্জ্জা ও সেতু, ফ্রাঙ্কফোর্ট

জার্ম্মানী ভ্রমণ

শ্রীশোভারাণী হুই

…বেলা ১১টার সময় ষ্টুগার্ট পৌছলাম। শহরে ঢুকেই মনে হ'ল, হাঁা, এটা জার্ম্মান রাজ্যই বটে। অধিকাংশ বাড়ীর জানালা থেকে স্বস্তিক-লাঞ্ছিত পতাকা ঝুলছে। ষ্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে উঠ্‌লাম। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম ক'রে "Mylander" নামে একটি কারখানায় আমার স্বামী টেলিফোন করলেন। আধঘণ্টার মধ্যে ম্যানেজার এসে হাজির। পরিচয়ের পর ম্যানেজার আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন—হ্যাণ্ডশেক্ করবার জন্য। হাত বাড়িয়ে দেবার আগে একটু ইতস্ততঃ করলাম, কারণ যতই আলোকপ্রাপ্তা হবার ইচ্ছা করি না কেন, আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার তো সহজে ভুলবার নয়। কারখানায় পৌছে আমার স্বামী ও ম্যানেজার নেমে গেলেন, আমি মোটরেই রইলাম শহরটি একটু ঘুরে দেখবার জন্য। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। সেপ্টেম্বর মাস, শীতের হাওয়া বইতে স্থুরু হয়েছে। সুন্দর দেশ, রাস্তাগুলি ঝকঝকে পরিষ্কার। পার্কে সুন্দর সবল শিশুরা নানারকম খেলা করছে। অনেক জায়গায় মায়েরা তাদের ছোট শিশুদের প্যারাম্বুলেটরে নিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পার্কে সুন্দর বাগানে নানারকম ফুল ফুটে রয়েছে, কিন্তু কোন ছেলে একটি ফুলও স্পর্শ করছে না। পাহাড়ের উপর ঘুরে ঘুরে আমাদের মোটরটি উঠ্‌ল। চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক আলোতে শহরটি ঝলমল করছে। আশেপাশে, মাথার উপরে মনে হয় যেন সহস্র সহস্র জোনাকি চিক্‌মিক্ করছে। সেখান থেকে শহরটা আরও খানিকটা ঘুরে কারখানায় ফিরে এলাম। তখন ছ-টা বেজে গেছে, কারখানা বন্ধ। সারাদিন কাজের পর কারিগররা সাইকেলে যে যার বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। সেদিন শনিবার। এদেশে মাইনে প্রতি শনিবারে দেওয়া হয়, এজন্য সমস্ত সপ্তাহের পর শনিবার এরা খুবই আমোদ করে। তাছাড়া পরদিন রবিবার, সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আমি কারখানায় নেমে বসবার ঘরে একটু ব'সে সেদিনের মত ফিরে এলাম।

পরদিন রবিবার থাকায় এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ালাম। সোমবার বেলা দুটোর সময় আর একটি কারখানা দেখ্‌তে গেলাম। কারখানাটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখান থেকে তাদেরই মোটরে একটি বেশ বড় দোকানে গেলাম আমার স্বামীর স্যুট ও আমার একটি ওভারকোট অর্ডার দেবার জন্য। দোকানটি ছ-তলা; এক-এক তলায় এক-একটি বিভাগ। লিফ্‌টের সাহায্যে ছ-তলায় উঠ্‌লাম। প্রকাণ্ড দুটি হল-ঘরের



অপেরা ভবন, ফ্রাঙ্কফোর্ট

ভিতর দিয়ে আমরা আর একটি হলে এলাম। হলের দু-পাশে শো-কেসের ভিতর নানারকম প্যাটার্নের সুট ও ওভারকোট সুন্দর ভাবে সাজানো আছে। এখানে কয়েকটি কাঠের পার্টিশনের কেবিন আছে; একটি কেবিনে আমরা তিন জনে বসলাম। মিনিট কয়েক পর দোকানের একটি কর্ম্মচারী আমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে গেল মাপ নেবার জন্য, ম্যানেজার আর আমি ব'সে রইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বোম্বে থেকে কত তারিখে রওনা হয়েছিলাম, কত দিন জার্ম্মানীতে থাকব, প্যারিসের ইণ্টারন্যাশনাল এক্সপজিশ্যন দেখ্তে যাব কিনা, ডক্টর টেগোর এখন কোথায়—সমস্ত ইউরোপের মধ্যে বিশেষ ক'রে জার্ম্মানরাই তাঁকে পছন্দ করে মনে হয়—টেগোরের সব বই পড়েছি কি না ইত্যাদি। পরে আমার সিঁদুর-টিপ দেখিয়ে বললেন, "এই রকম লাল চিহ্ন সব ব্রাহ্মণ-মেয়েই দেয়, না?" হেসে বললাম, "সমস্ত হিন্দু মেয়েই ইচ্ছা করলে এই রকম চিহ্ন দিতে পারে। অবশ্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে পূর্ব্বে যেমন জাতিভেদ ছিল, এখনও তেমন আছে কি?" বললাম, "আছে, তবে আগেকার মত নেই।" "এ নিশ্চয়ই মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফল?" বললাম, "হাঁ, আমরা যাদের ছোটলোক ব'লে ঠেলে রেখেছিলাম তিনি তাদের সঙ্গে মিশে, তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করবার অনেক চেষ্টা করছেন। তাদের জন্য একটি পত্রিকাও বার করছেন। তাতে দেশের খবরাখবর ছাড়াও তাদের কিসে উন্নতি হয় সে-বিষয়ে আলোচনা করা হয়।" এই রকম আরও দু-চারটে কথার পর আমার স্বামী ফিরে এলেন, আমি এক জন মহিলা কর্ম্মচারীর সঙ্গে মাপ দেবার জন্য উঠলাম। সেখান থেকে আমরা মোটরে খানিকটা এসে একটু পায়ে হাঁটবার জন্য নামলাম। দু-পাশের দোকানগুলি আলো দিয়ে নানা রকমে সাজানো। কাফে-রেস্তোরাঁয় লোক গিস্‌গিস্ করছে। সুবেশ তরুণ-তরুণী সারাদিনের পরিশ্রমের পর এখন হাস্যকৌতুকে মত্ত। এত হাসি এরা পায় কোথায়? মনে পড়ল আমার দেশের কথা, ক-জন সেখানে এ-রকম প্রাণখোলা হাসি হাসতে পায়? অভিজাত সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় কয়েক জন লোক ছাড়া অধিকাংশেরই এক মুষ্টি অন্নের জন্য কি ভীষণ সংগ্রামই না করতে হয়! এদের তো সে-সব বালাই নেই। স্বাধীন দেশ, স্বামী-স্ত্রী মিলে উপায় করে—পোষ্য বলতে নিজেদের দু-একটি ছেলেমেয়ে, স্ফূর্ত্তি করবে



ফ্রাঙ্কফোর্টের ক্যাথিড্রাল

না কেন? সারাদিন পরিশ্রমের পর এরা রাত্রি দেড়টা দুটো পর্য্যন্ত আমোদ-প্রমোদ করে। এই জন্য রাত্রি একটার পর ট্রাম-বাস ইত্যাদির ভাড়া দ্বিগুণ হ'য়ে যায়।

পরদিন আরও কয়েকটি কারখানা দেখলাম। কারখানাগুলি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের ভিতর প্রচুর আলো-বাতাস আসবার ব্যবস্থা আছে। কারখানার সকলেই কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের আপাদমস্তক অবাক হয়ে দেখছিল।

সন্ধ্যার সময় এক থিয়েটারে গেলাম। ওভারকোট রাখবার জন্য কিছু দক্ষিণা দিয়ে ভিতরে ঢোকা গেল। বসবার পর সকলেই আমাদের দিকে এক বার দেখে নিল। প্রথমে হাতী ও দড়ির নানারকম খেলা দেখান হ'ল। তার পর একটি ভারতীয় মেয়ে "মন্দির-নৃত্য" করলেন। এই মেয়েটি ইউরোপের নানাদেশে ভারতীয় নৃত্য দেখিয়ে খুব প্রশংসা লাভ করেছেন। আরও নানাপ্রকার ইউরোপীয় নৃত্য দেখবার পর হোটেলে ফিরলাম।

ষ্টুটগার্টে আরও কয়েক দিন থেকে আমরা সন্ধ্যার সময় মান্‌হাইম যাবার জন্য ট্রেনে চড়লাম। এখানকার ট্রেনগুলি অন্য রকম, উঠবার ও নামবার জন্য দুটো দরজা। ট্রেনের ভিতর দিয়েই প্রত্যেক কামরায় যাতায়াত করতে পারা যায়। ট্রেন বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, থার্ড ক্লাসেও গদি আছে। ধূমপানের জন্য আলাদা কামরা আছে। ট্রেন গরম রাখবার ব্যবস্থা আছে। তার পর আরও একটি মস্ত সুবিধা এই যে, এ-দেশে যাতায়াত করতে হ'লে আমাদের দেশের মত বিছানার গাঁটরি বইতে হয় না, দুটি-একটি সুটকেসে একান্ত আবশ্যক কাপড় ছাড়া কিছু নেবার দরকার নেই। ষ্টেশনের কাছেই ছোট-বড় নানা রকমের হোটেল, কোন বিদেশীর কষ্ট ক'রে খুঁজবার দরকার হয় না। ট্রেন থামলে কুলি আপনা থেকেই এসে দাঁড়ায়—যদি দরকার হয়, তাকে নিজের সুটকেস দেখিয়ে ঠিকানা ব'লে দিলেই তারা ঠিক পৌঁছে দেবে। আমাদের দেশের মত হাঁকডাক, দরদস্তুর, বকাবকি কিছুই করতে হয় না। ট্রেনের ভিতর গল্পগুজব-হাসি সবই হচ্ছে, কিন্তু গোলমাল একটুও হচ্ছে না। রাত্রি দশটার পর ট্রেনে কথা বলবার নিয়ম নেই, বললেও খুব আস্তে আস্তে



লাইপজিগ, সেণ্ট টমাস গির্জ্জা

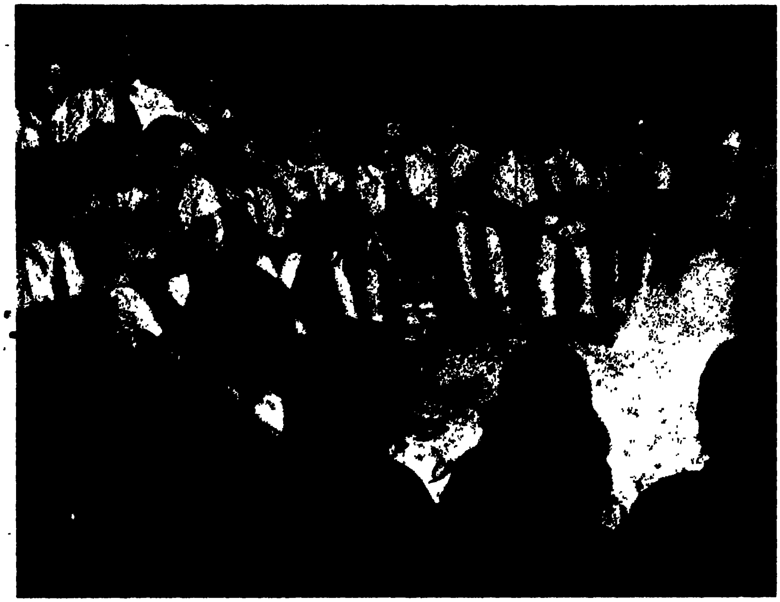
যাতে অন্যের কোন অসুবিধা না হয়। অধিক রাত্রিতে যখন অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েন তখন ট্রেনের যে-সব কামরা যাত্রীতে পূর্ণ থাকে তার সামনে "স্থান খালি নাই" লেখা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এক জনের ঘুম ভাঙিয়ে বা তার বিশ্রামের ব্যাঘাত ক'রে অন্য যাত্রী কেউই ভিতরে যায় না—তার চেয়ে বাইরে শীতের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকতেও তারা প্রস্তুত। এমনি এদের সুব্যবস্থা।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ট্রেনে কাটিয়ে আমরা মান্‌হাইমে পৌঁছলাম। পরদিন মানহাইম থেকে পঁচিশ মাইল দূরে ফ্রাঙ্কেন্‌থাল্ নামক একটি গ্রামে কারখানা দেখতে গেলাম। বিরাট কারখানা, বিরাট তার আপিস। কারখানাটি ঘুরে ফিরে দেখে কারখানার মালিক, ম্যানেজার ও এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে একটা ছোট



রোম্যার ফ্রাঙ্কফোর্ট

হোটেলে লাঞ্চ খাবার পর হেঁটে গ্রামটি প্রদক্ষিণ করলাম। পথগুলি খুব বেশী চওড়া নয়, তবে একেবারে সরুও নয়। বেশ পরিষ্কার, পাকা রাস্তা, ইলেক্‌ট্রিক্ আলো, মোটর, স্কুল, টেলিফোন, মানুষের বাসোপযোগী সবই আছে, নেই কেবল শহরের কোলাহল, চঞ্চলতা। পরদিন শনিবার। সেদিন একটার সময় কারখানা-আপিস সব বন্ধ, খুলবে সোমবার। শ্রমিকদের আমোদ-প্রমোদের জন্য এক ঘণ্টা কন্‌সার্ট বাজান হ'ল এবং সেটা আবার রেডিওতে দেওয়া হ'ল—যাতে সব কারখানার কারিগর উপভোগ করতে পারে। শ্রমিকদের স্ফূর্ত্তির জন্য প্রায়ই এই রকম গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন আমরা ফ্রাঙ্কফোর্টের দিকে রওনা হলাম। সেদিন রবিবার, সব বন্ধ। কাজেই শহরের দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখে বেড়ালাম। প্রথমে গেলাম রাজপ্রাসাদ রোম্যারে। এই প্রাসাদ প্রায় প্রত্যেক ইউরোপ-যাত্রীই দেখেছেন এবং অনেকেই বর্ণনাও করেছেন। সেদিন চিড়িয়াখানা ও পাম গার্ডেনে (Palm garden) গিয়েছিলাম। চিড়িয়াখানাও এই কলকাতারই মত। একটি হলের ভিতর দু-পাশেই দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট ঘর, সামনে উপরে, পাশে মোটা মোটা কাচ দিয়ে বন্ধ, ঠিক শো-কেসের মত। সেই ঘরগুলির ভিতর ছোট ছোট পাথরের নুড়ি দিয়ে পাহাড়ের মত করা আছে। প্রত্যেক ঘরই পাম্প দিয়ে জল ভর্ত্তি করা। উপর থেকে আলো দেবার ব্যবস্থা আছে। তার ভিতর নানা রকম সামুদ্রিক ছোট ছোট গাছপালা, শামুক, ঝিনুক, কচ্ছপ ইত্যাদি আছে। প্রত্যেক গাছের পাতায়, মাছের পাখ্‌নায়, নানা রকম রং ঝিলমিল করছে। দেখলে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা বাগানে একটা বেঞ্চে বসলাম। দেখলাম ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। আর এক জায়গায় দেখলাম অনেকগুলি প্যারাম্বুলেটরের ভিতর শিশুরা হাত-পা নেড়ে নেড়ে খেলা করছে। পথে ঘাটে ট্রামে সব জায়গাতেই লক্ষ্য করেছি, এখানকার মেয়েরা শিশুদের কোলে খুবই কম করে—প্রায় করেই না বললেই হয়। যারা হাঁটতে পারে তারা হেঁটে মায়ের সঙ্গে যায়, যারা হাঁটতে পারে না, খুব কচি, তারা প্যারাম্বুলেটরে যায়। এমন কি, এই শিশুসমেত প্যারাম্বুলেটর ট্রামেতেও যেতে দেখেছি। এখান থেকে



জার্ম্মানীর ভ্রমণকারী তরুণদল—ক্যাম্পের আগুনের পাশে

পরে।" তার পর সে আমায় অভিবাদন ক'রে চলে গেল। সেই দিনই সন্ধ্যায় আমরা লাইপ্‌জিগে রওনা হলাম।

দুই পাশে পাহাড়ের উপর ছোট ছোট ঝকঝকে বাড়ী, আঙুরের ক্ষেত দেখতে দেখতে চললাম, একটু পরেই চেয়ে দেখি আকাশে সুন্দর চাঁদ, দু-পাশে পাহাড়ের উপরে ঢেউ খেলে যাচ্ছে চাঁদের শুভ্র আলো। অনেক দিন পর চাঁদের আলো দেখে মন আনন্দে ভরে উঠল। মনে পড়ল, আজ কোজাগরী পূর্ণিমা—বাংলা দেশের একটি বিশেষ আনন্দের দিন। আমাদের কামরায় আর তিন জন জার্ম্মান সাহেব ছিলেন। তাঁরা জার্ম্মান ভাষায় আমার স্বামীর সঙ্গে নানা প্রকার আলাপ করছিলেন। আমি অবশ্য বিশেষ কিছুই বুঝলাম না। পরে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে তাঁরা জিজ্ঞাসা করছিলেন, ভারতবাসীর উপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব আজকাল কেমন? গঙ্গাসাগরে আর ছেলে ভাসান হয় কিনা? জাতিভেদ আর আছে কি না? ভারতের মেয়েদের আজকাল কিরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে? ইতাদি। আমাদের সম্বন্ধে ওদের কৌতূহলের সীমা নেই। লাইপ্‌জিগে আমার স্বামীর এক পুরাতন বন্ধু ছিলেন। আমরা টেলিফোনে সন্ধ্যায় তাদের নিমন্ত্রণ করলাম। মিঃ এবং মিসেস ষ্টলে সন্ধ্যা ছ-টায় আমাদের হোটেলে এলেন। মিঃ ষ্টলে বেশ ইংরেজী জানতেন, মিসেস ষ্টলেও অল্প অল্প জানতেন। আমরা সকলেই ওখানকারই একটি বহু পুরনো ও বেশ বড় রেস্তোরাঁ "আওয়ার বাক্‌কেলার"এ গেলাম। রেস্তোরাঁটি মাটির নীচে। এখানে জার্ম্মানীর বিখ্যাত কবি গ্যেটে, মন্ত্রী বিসমার্ক মধ্যে মধ্যে খেতে আসতেন। তাঁদের হাতের লেখা, গ্যেটের কয়েক গুচ্ছ চুল ও বিসমার্ক যে গ্লাসে পান করতেন যত্নের

আমরা আরও নানা জায়গা ঘুরে রাত্রিতে একটি ভ্যারাইটি শো (variety show) দেখে হোটেলে ফিরলাম। পরদিন আমি হোটেলেই ছিলাম, কোথাও বের হই নি। আবহাওয়া সেদিন একটুও ভাল ছিল না। বেলা তখন এগারটা, বাইরে তখন কুয়াশায় অন্ধকার। জানালাটা বন্ধ ক'রে র‍্যাপারটা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে একটা পত্রিকা পড়ছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল, খুলে দিলাম। পরিচারিকা আমাকে অভিবাদন ক'রে জিজ্ঞাসা করল, শরীর কেমন, আজ কেন বাইরে যাই নি ইত্যাদি। দু-চারটা চলতি জার্ম্মান ভাষা আমি বুঝতে পারতাম, আর যা না পারতাম, ইশারায় ধরতাম। তার পর পরিচারিকাটি বিছানা ঠিক ক'রে আসবাবপত্র ঝেড়ে যাবার সময় জিজ্ঞাসা করল—"মাথার লাল দাগ কি?" বললাম, এর নাম সিঁদুর। আমাদের দেশের বিবাহিতা মেয়েদের এই চিহ্ন। ভাঙাভাঙা ইংরেজীতে আবার জিজ্ঞাসা করল, "ভারতের মেয়েরা নাকি খালি-পায়ে থাকে?" বললাম, সব জায়গায় নয়, যে-সব জায়গা খুব ঠাণ্ডা, সেখানকার মেয়েরা জুতো-মোজা পরেই থাকে, আর যেখানে খুব গরম সেখানে বাড়ীতে জুতো না পরলেও বাইরে যাবার সময় জুতো

সহিত তা রক্ষিত আছে। এখানে খাবার পর মিঃ ও মিসেস ষ্টলে তাঁদের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেলেন। বাড়ীটি শহরের বাইরে, পাড়াটাও নির্জ্জন। কিছু দূরে দূরে এক একটি গ্যাসের আলো মিটমিট ক'রে জ্বলছে। মিঃ ষ্টলে চাবি খুললেন, আমরা ঘরে ঢুকলাম। বসবার ঘরে আমরা চা খেলাম, খাবার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, বিবাহপ্রথা, পারিবারিক নিয়মকানুন ইত্যাদি নানাপ্রকার আলোচনা হ'ল। এই রকম আরও নানারূপ কথাবার্ত্তার পর আমরা যাবার জন্য উঠলাম। মিসেস ষ্টলে বললেন, "আমাদের ঘর দেখবেন আসুন।" আমরা তাঁর পিছনে চললাম। খাবার ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর সব দেখবার পর— সব শেষে একটি ছোট ঘরে চাবি খুলে ঢুকলেন। সুইচ টিপ্‌তে দেখলাম, ফুলের মত সুন্দর ছোট্ট একটি মাস দশেকের মেয়ে ঘুমাচ্ছে। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার মেয়ের কাছে কে ছিল?" তিনি বললেন, "কেউ নয়। খুকী একাই থাকে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর চাবি দিয়ে আমরা বাইরে যাই, ফিরি অনেক রাত্রিতে।" অবাক হয়ে বললাম, 'কাঁদে না?" তিনি বললেন, "কখনো না।" ভাবলাম আমাদের দেশের বোধ হয় পনের বৎসরের মেয়েও এই রকম একা ঘরে থাকতে পারে কি না সন্দেহ। মনে পড়ল, জাহাজে উঠবার সময় দেখেছিলাম একটি তিন বছরের ছেলে দু-পাশের দড়ি ধরে একাই জাহাজে উঠছে। তার মা-বাপ তখন অনেক উপরে উঠে গেছে।



সাঁমুচী প্রাসাদের গ্রন্থভবন

আমাদের দেশ হ'লে একা তো উঠতে পারতই না, বোধ হয় কোলে ক'রে নিতে হ'ত। ছোট থেকেই এদের সাহসী এবং স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা দেওয়া হয়। এটা ক'রো না, ওটা ক'রো না, এখানে যেও না প্রভৃতি শত নিষেধের গণ্ডীতে এদের উৎসাহদীপ্ত প্রাণকে ম্লান করা হয় না এবং যত রাজ্যের ভূত-প্রেত-জুজুর

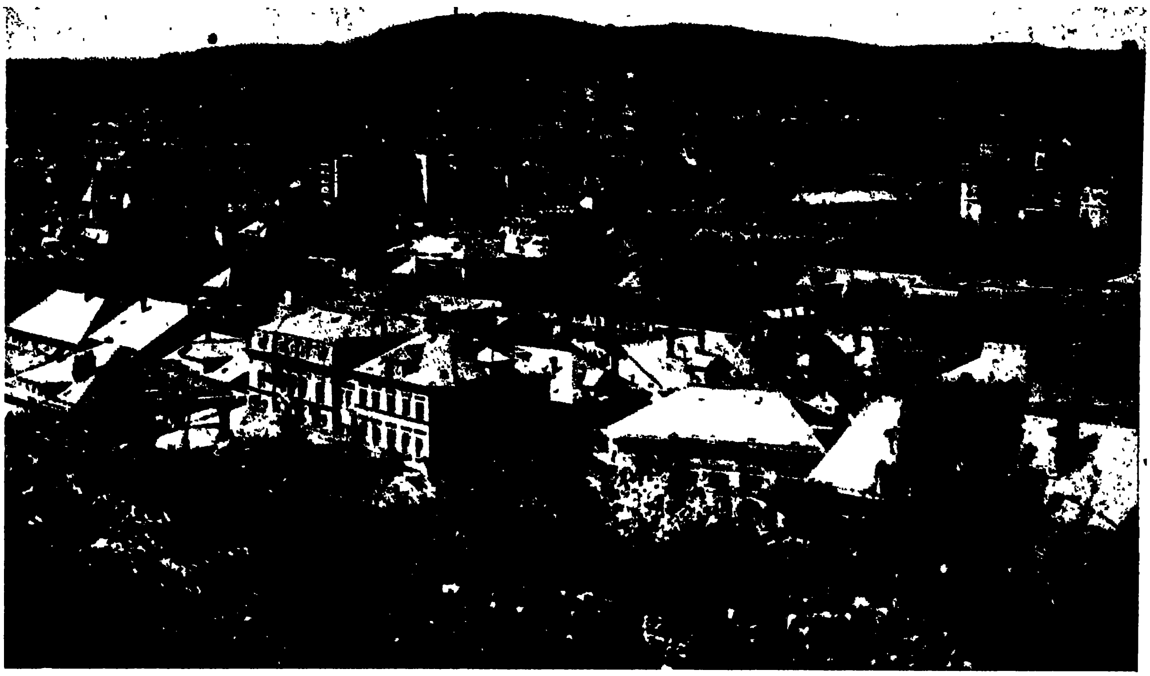
ভয় দেখিয়ে এদের সাহস এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করা হয় না।

পরদিন রবিবার। আমরা মোটরে ক'রে চল্লিশ মাইল দূরে হালে পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলাম। চল্লিশ এই মাইল রাস্তা বিশেষ ক'রে মোটরে ভ্রমণের জন্যই তৈরি। মোটর ছাড়া অন্য কোন যানবাহনের যাতায়াত নিষিদ্ধ। রাস্তার মধ্যে মধ্যে গাছ লাগিয়ে রাস্তাকে দুই ভাগ করা হয়েছে। এক পাশ দিয়ে মোটর যায়, আর এক পাশ দিয়ে আসে। এক পাশ থেকে অন্য পাশে যেতে হ'লে ওভারব্রিজ দিয়ে যেতে হয়। এই জন্য মধ্যে মধ্যে ওভারব্রিজ দিয়ে যেতে হয়। চাষীরা এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে ওভারব্রিজ দিয়েই যায়। সুন্দর ঝকঝকে সোজা রাস্তা। এই রাস্তাকে জার্ম্মানীতে বলে অটোবান। জার্ম্মানীর সর্ব্বত্রই এই রকম অটোবান তৈরি হচ্ছে। আরও কয়েক দিন লাইপ্‌জিগে থেকে আমরা ড্রেসডেন গেলাম।

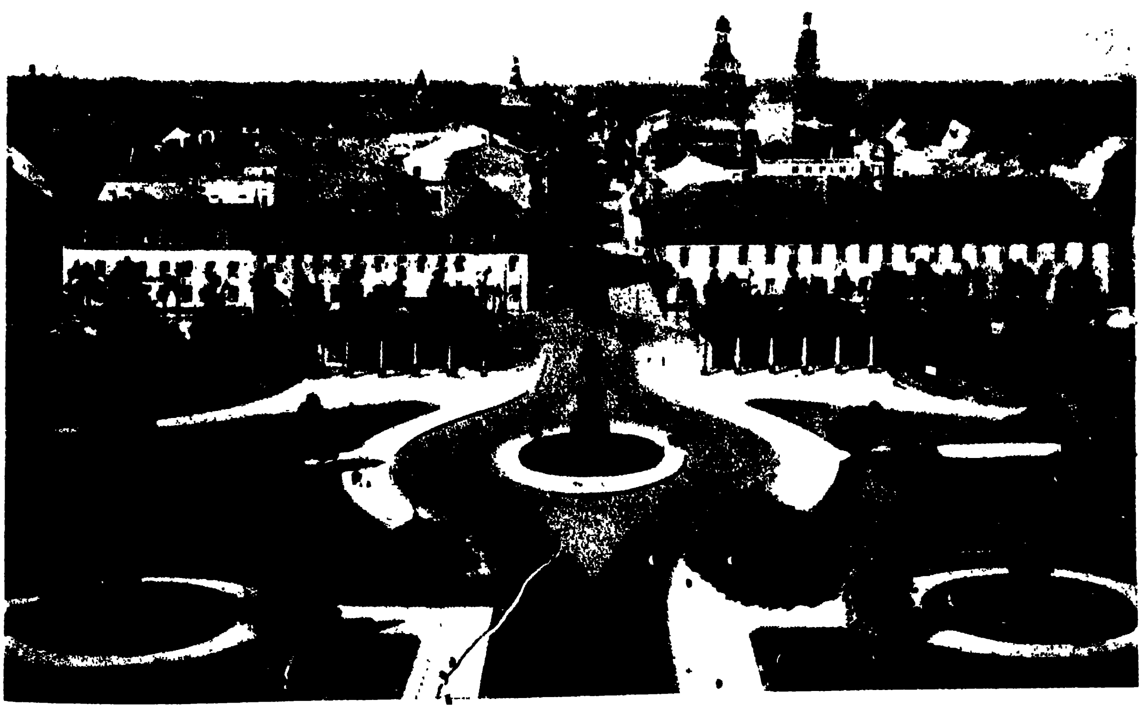
এই শহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। লতায় পাতায়, ফলে ফুলে প্রকৃতিদেবী শহরটিকে নিপুণ ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। ষ্টেশনেরই কাছে লতায় পাতায় ঘেরা ছোট্ট একটি হোটেলে উঠলাম। এক দিন বিখ্যাত গ্যালেরী-ডে-গ্যালারীতে ছবি দেখতে গেলাম। এইখানে রাফেয়েলের অঙ্কিত ম্যাডোনার মাতৃমূর্ত্তি অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। এখানে থাকতেই এক দিন পঁচিশ মাইল দূরে কামেঞ্জ বেড়াতে গেলাম। সেখানে একটি কারখানা দেখে আমরা, ঐ কারখানারই মালিক এবং তাঁর স্ত্রী ও ছোট্ট মেয়ে সব এক সঙ্গে গেলাম। খাবার পর ওঁরা কারখানায় চলে গেলেন। আমি মালিক-পত্নীর সঙ্গে গ্রামটি বেড়াতে বের হলাম। পাহাড়ের কোলে সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম। বেড়াতে বেড়াতে পাহাড়েরই উপর একটি চত্বরে এসে দাঁড়ালাম গ্রামটি ভাল করে দেখবার জন্য। উপরে উন্মুক্ত আকাশ, আশেপাশে নীচে শস্যপূর্ণ প্রান্তর, মধ্যে মধ্যে সুন্দর পাহাড়ী ফুল ফুটে রয়েছে। দূরে পাহাড়ের কোলে সূর্য্যদেব ডুবে যাচ্ছেন। পথ চলতে চলতে অনেক গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হ'ল। অনাড়ম্বর পোষাকে হাসিমুখে গ্রামবাসীরা বেড়াতে যাচ্ছে। তাদের গতির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সজীবতা ফুটে বেরুচ্ছে। সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্য তাদের। গ্রামবাসীরা একবার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। ঘুরে ফিরে ভ্রমণ-সঙ্গিনীর বাড়ীতে এলাম। তাঁর বোন ও ভগ্নীপতির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। এঁরা সকলেই বেশ ইংরেজী জানেন। আমাদের দেশ সম্বন্ধে নানারূপ কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সেদিন আমি একটা বেনারসী শাড়ী পরেছিলাম। গলায় একটি মুক্তার নেক্‌লেস ছিল। শাড়ী ও নেক্‌লেসটির তাঁরা খুব প্রশংসা করলেন। শাড়ীটির আঁচলের নানারূপ জরির কাজ দেখে তাঁরা বললেন, কি সুন্দর ভারতীয় শাড়ী—কত দাম, কোথায় তৈরি হয় ইত্যাদি। শুধু এখানে ব'লে নয়, বিদেশে যেখানেই আমি বেনারসী পরে গিয়েছি সেখানেই শাড়ীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি।

ওখান থেকে আমরা পরের দিন বার্লিন রওনা হলাম। ট্রেনে একটি ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। নানারূপ কথাবার্ত্তার পর তিনি বললেন, "জার্ম্মান জাত দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেমন সব বিষয়ে শক্তিশালী হয়ে গেল! তাদের সব বিষয় শিখবার আকাঙ্ক্ষাও খুব প্রবল এবং প্রত্যেক বিষয় মনপ্রাণ দিয়ে গভীরভাবে শিখবার চেষ্টা করে। শুধু কলকব্জার দিক থেকেই যে উন্নত তা নয়, জ্ঞানের দিক থেকেও ওদের খুব বেশী শিখবার চেষ্টা। চীনে, জাপানী, ভারতীয় সব দুর্ব্বোধ্য ভাষা আয়ত্ত ক'রে তাদের ভাল ভাল সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস পড়ছে। আমাদের জাতের সে-রকম শিখবার চেষ্টা নেই। গভীর চিন্তাপূর্ণ সাহিত্য জার্ম্মানদের মত আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা পড়ে না। তবে আমাদের কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ইণ্ডিয়া প্রভৃতি হাতে থাকায় অর্থের দিক থেকে ভালই চল্‌ছে। কিন্তু সামনাসাম্‌নি প্রতিযোগিতায় জার্ম্মানদের সঙ্গে আমরা পারব ব'লে মনে হয় না।"

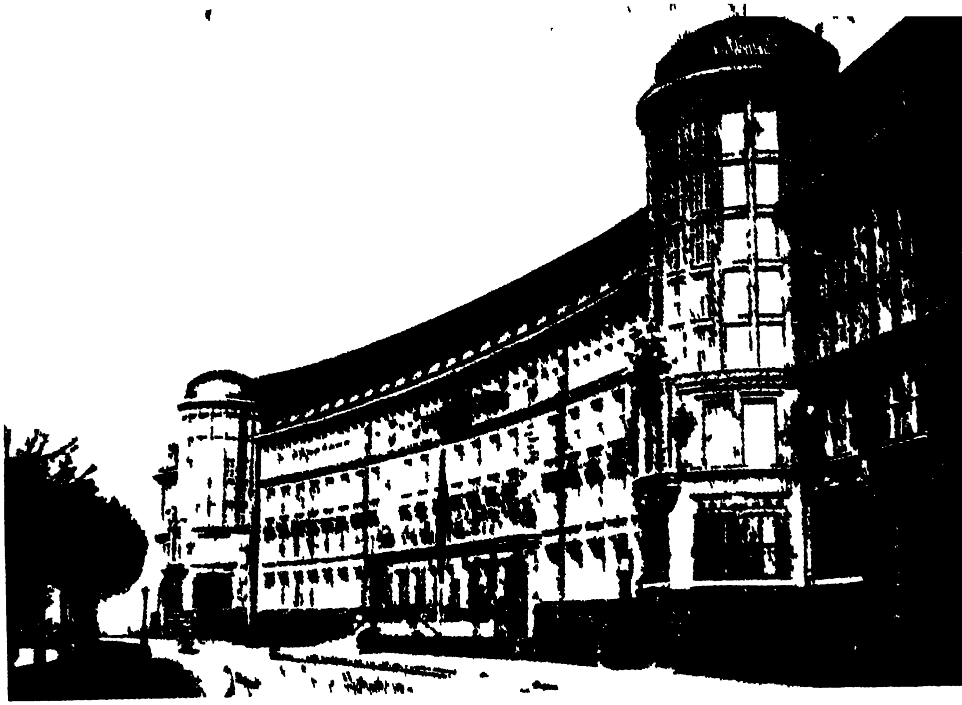
সন্ধ্যার সময় বার্লিনে পৌঁছলাম। এখানে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ট্রেন আছে। উপরে ট্রাম বাস, ট্র্যাফিক আবার নীচেও ট্রেন। দু-তিন মিনিট পর পর অনবরত ট্রেন আসা-যাওয়া করছে। খুব তাড়াতাড়ি উঠতে নামতে হয়। ভীড়ও অসম্ভব। কিন্তু লক্ষ্য করলাম যে অত



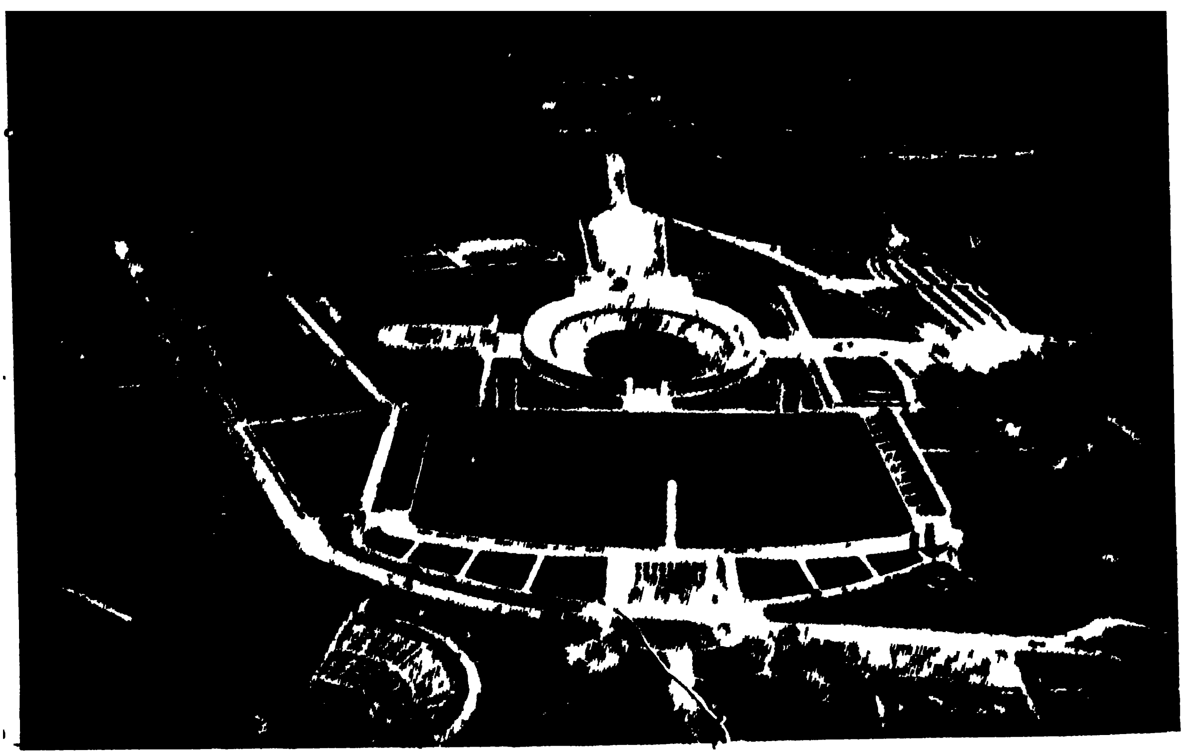
স্টুগার্ট



মানহাইমের উদ্যান ও সাধারণ দৃশ্য



লাইপজিগের বিরাট জার্মান গ্রন্থসৌধ



বার্লিন, জাতীয় ক্রীড়াভূমি। কেন্দ্রস্থলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ষ্টেডিয়াম, বামে সন্তরণের স্থান সম্মুখে মুক্ত রঙ্গমঞ্চ

ভীড়ের মধ্যেও যাত্রীরা শৃঙ্খলার সঙ্গে ওঠানামা করছে। ঠেলাঠেলি ক'রে জায়গা দখলের চেষ্টা এরা করে না, বসবার জায়গা খালি হ'লেই সবাই হুড়োহুড়ি ক'রে বসবার চেষ্টা কখনই করে না, যে কাছে দাঁড়িয়ে থাকে সে-ই বসে। ছোট ছেলেগুলি পর্য্যন্ত অত ভীড়ে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। থিয়েটার, সিনেমা, ভ্যারাইটি শো ইত্যাদি সব জায়গায় দেখেছি যত ক্ষণ অভিনয় চলে সব নিস্তব্ধ, এতটুকু শব্দ নেই। প্রত্যেক দৃশ্যের পর এক বার হাততালি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। যদি কিছু বলবার দরকার হয় এত চুপিচুপি বলে যে, যাকে বল্‌ছে সে ছাড়া অন্য কেউ শুন্‌তে পায় না। আর আমাদের দেশে থিয়েটার-সিনেমায় ছোট ছেলের কান্না, হাসি-হল্লায় বিরক্তি ধরে যায়। অবশ্য, পূর্ব্বের মত এখন সিনেমায় গোলমাল হয় না বটে, তবে এখনও মেয়েমহলে বস্‌লে তাদের রান্না আর খাওয়ার কষ্টের কথা শুনতে শুনতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

বার্লিনে কয়েকটি চীনে রেস্তোরাঁ আছে। তাছাড়া একটি বাঙালী ভদ্রলোকও এখানে রেস্তোরাঁ করেছেন। কাজেই আমাদের মত লোকের কোন অসুবিধা নেই।

রবিবার বিশ্রামের দিন। আমরা ব্রেকফাষ্টের পর কয়েক জন পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে জার্ম্মানীর পূর্ব্ব রাজপ্রাসাদ সাঁ সুচী (Sans Souci) দেখ্‌তে গেলাম। শহরের বাইরে দিয়ে তখন আমাদের ট্রেন চল্‌ছে। স্কুলের ছাত্ররা পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে সব এক্সকার্শনে (excursion এ) যাচ্ছে দেখলাম। অনেক শহরবাসী তাদের অল্প গ্রাম্য জমিতে ফুলকপি ইত্যাদি চাষ করছেন দেখা যেতে লাগ্‌ল। সেদিন বেশ রোদ উঠেছিল। অনেকে বাড়ীর সাম্‌নে বাগানের চেয়ারে বসে রোদ পোয়াচ্ছে। সাঁ সুচী দেখে ফিরতে আমাদের বেলা প্রায় দুটো বেজে গেল। সন্ধ্যার সময় বরফের উপর নৃত্য এবং হকি খেলা দেখ্‌তে গেলাম। পরদিন আমার স্বামীর এক পুরাতন বন্ধু আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁর মোটর এসে আমাদের নিয়ে গেল। শহরের বাইরে প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী। মিষ্টার ও মিসেস ডিকেন এসে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। খাবার টেবিলে নানারূপ গল্পগুজবের মধ্যে মিঃ ডিকেন বললেন—যুদ্ধের পর ১৯২৪ সালে যখন এসেছিলে তখন জার্ম্মানীর অবস্থা কত খারাপ ছিল। বাস্তবিকই আমরা কল্পনাও করতে পারি নি যে এই কয় বৎসরে এত উন্নতি হবে। হিটলারের অভ্যুদয়ে খুব উন্নতি হয়েছে। জগতের কাছে আমাদের সম্মান অনেক বেড়ে গেছে। আজকাল ছোট থেকে ছেলেদের এমন ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা লম্বাচওড়া ও শক্তিশালী হয়। ইংরেজদের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নেই, কিন্তু শতকরা ৭০ জন লোকই শারীরিক পরীক্ষায় সৈন্য হবার অযোগ্য, তাছাড়া আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা এমন সব জিনিস আবিষ্কার করেছেন যা এক কালে অসম্ভব ব'লে মনে হ'ত। যেমন পেট্রল আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, এখন কয়লা থেকে পেট্রল তৈরি হচ্ছে। কয়লা ও চুন থেকে রবার হচ্ছে, কয়লা থেকে কার্পাস তুলার গুণের মত সুতা প্রস্তুত ক'রে পোষাক হচ্ছে। হাতীর দাঁতও এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে। এখন আমরা জগতের যে কোন শক্তিশালী জাতির সঙ্গে লড়াই করতে পিছপা নই।" ১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে তিনি এই কথা বলেছিলেন, বাস্তবিকই ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে তার প্রমাণ হয়ে গেল।

বার্লিনে থাকতেই আমাদের 'উলষ্টাইন ভেরলাগ' নামক একটি ছাপাখানা থেকে নিমন্ত্রণ হয়। এটি ইউরোপের বৃহত্তম ছাপাখানা। প্রায় সমস্ত কাজই অটোমেটিক দ্বারা হয়। তা সত্ত্বেও দশ হাজার লোক যাতায়াত করে। তার মধ্যে মেয়ে প্রায় তিন হাজার। এই ছাপাখানার জন্য দুটি বাড়ী আছে, একটি ১৬ তলা ও একটি ১১ তলা। ১০৪টি শুধু রোটারী মেশিনই আছে, যা আমাদের সমস্ত ভারতেও নাই। সমস্ত শ্রমিকের স্নান করবার, পোষাক রাখবার আলাদা ব্যবস্থা আছে। এত বড় বিরাট ছাপাখানা, কিন্তু এতটুকু মলিনতা কোথাও নেই। জার্ম্মানীতে নব্বইটি কারখানা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রত্যেক জায়গায়ই লক্ষ্য করেছি, কারখানার মালিকরা প্রত্যেক শ্রমিকের সঙ্গে এমন কি এক জন

'খাদ্যদারের সঙ্গেও খুব ভদ্র ব্যবহার করেন। তাদের স্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাতে বজায় থাকে তার প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখেন।

হের হিটলার যে কেবলমাত্র যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য সংগ্রহ, নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে তৈরির দিকে মন দিয়েছেন তা নয়, খাদ্য, শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির দিকেও তাঁর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। বার্লিনে সপ্তাহে মাথা-পিছু সিকি পাউণ্ড মাখন পাওয়া যায়, তাও আসল মাখন নয়, তিমি মাছের চর্ব্বি থেকে প্রাপ্ত নকল মাখন। বিদেশ থেকে তরিতরকারি আমদানী প্রায় বন্ধ। ময়দার রুটির দাম বেশী ক'রে দেওয়া হয়েছে—যাতে সাধারণ লোক কিনতে না পারে। তার বদলে অল্প ময়দা, লাল আলুর চূর্ণ ও অন্যান্য নকল খাদ্য দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার রুটি বাজারে বিক্রয় হচ্ছে। প্রায় সকলেই মাখন-তোলা দুধ ব্যবহার করছে। কোন্ খাবার ব্যবহার করা যাবে, কোন্ খাবার ব্যবহার করা যাবে না তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেই মত সকলে খাদ্যদ্রব্য পায়। প্রত্যেক রেস্তোরাঁ যাহাতে তালিকাভুক্ত আহার্য্য ছাড়া আর কিছু না রাখে তার জন্য সরকার থেকে কড়া নজর রাখা হয়েছে। এদের শিক্ষাও সেই অনুপাতে অগ্রসর হচ্ছে। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত শিক্ষিতও যথেষ্টই আছে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও যে এদের শিক্ষা কত দূর প্রসার লাভ করেছে, তা একটা সামান্য ঘটনার উল্লেখ করলেই বুঝতে পারা যায়। দেশে ফিরবার পথে আমরা ষ্টুটগার্টে পুনরায় পাঁচ-ছয় দিন ছিলাম। আমার স্বামী এক দিন একটি জরুরী কাজের জন্য কেমটেন শহরে গিয়েছিলেন। শহরটি খুব ছোট, জার্ম্মানী ও ইটালীর সীমান্তে অবস্থিত। যখন তিনি হোটেল থেকে রওনা হলেন, তখন দিন ভালই ছিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আকাশে ঘনঘটায় মেঘ দেখা দিল, একটু পরেই ভীষণ বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়তে লাগল। প্রায় ঘণ্টা-দুই পর তিনি ষ্টেশনে পৌঁছলেন। তিনি বর্ষাতি সঙ্গে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেদিন সেখানে কি একটা উৎসবের জন্য হোটেল ইত্যাদি সব ভর্ত্তি। ঠাণ্ডায় বৃষ্টির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি হয়রান হয়ে গেলেন। আর ট্রেনও নেই যে সেই রাত্রিতেই ফিরে আসবেন। ঐ বৃষ্টির মধ্যে তাঁর হাত-পা জমে যাবার উপক্রম হ'ল। ভীষণ কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস সোঁ সোঁ ক'রে বইছিল। শেষে একটি মাত্র হোটেল দেখবার বাকী ছিল, সেখানে গিয়েও শুনলেন, জায়গা নেই। হোটেলেরই দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছেন, কি করা যায়? ঘুরতে ঘুরতে ষ্টেশন থেকে অনেক দূর এসে পড়েছেন, সমস্ত শরীর শীতে কাঁপছে, টুপি থেকেও ঝর ঝর ক'রে জল ঝরছে। ঐ হোটেলেরই একটি 'বয়'-এর বোধ হয় তাঁর মুখের অসহায় ও উদ্বিগ্ন ভাব দেখে দয়া হয়েছিল, এসে বললে, "আমার সঙ্গে চল, একটি বীয়ার শপ (Beer shop) আছে, যদি আজ রাত্রির মত জায়গা হয়।" তিনি আশান্বিত হৃদয়ে তার সঙ্গে চললেন। অনেক অলিগলি ঘুরবার পর একটি সরু গলিতে এসে 'বয়'টি থামল। উনি বাইরে রইলেন, 'বয়' ভিতরে গেল। একটু পর তাঁকেও ডেকে নিয়ে গেল। উনি দেখলেন, পাঁচ-ছয় জন লোক একটি টেবিল ঘিরে বসে বীয়ার খাচ্ছে। 'বয়'টি ওঁকে একজন 'ইণ্ডিয়ান' ব'লে পরিচয় করিয়ে দিলে। যাই হোক, সেই রাত্রির মত তিনি সেখানে স্থান পেলেন। পোষাক বদলে আগুনে হাত-পা সেঁকে কফি খাওয়ার পর তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন। তার পর নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠল। তারা তাঁর 'ঘরে বাইরে' বইয়ের নিখিলেশ ও বিমলার চরিত্রের সমালোচনা আরম্ভ করল। এই কয় জনই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর। তাদের ভিতর এইরূপ ধরণের আলোচনা শুনে তিনি বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। এক 'ঘরে বাইরে' বইয়ের জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ প্রথম সংস্করণেই ১ লক্ষ ৬৫ হাজার হয়েছিল যা আমাদের দেশে বোধ হয় দু-তিন হাজারের বেশী হয় নি অথচ জার্ম্মানী ও বাংলার লোকসংখ্যা একই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—ফ্রাঙ্কেনথাল ছোট্ট একটি গ্রাম, মাত্র তিন হাজার লোকের বাস। সেখানেও একটি দৈনিক পত্রিকা আছে—যা আমাদের ঢাকার মত শহরে, যেখানে দেড় লক্ষ লোকের বাস, সেখানেও নেই।

অর্ঘ্য

শ্রীনিশিকান্ত

সুর সাধিবার তরে বাঁধি নাই
এ মোর বীণা,
ওঠে প্রতি মীড় প্রাণ প্রতি তীর
চেতন-লীলা,
শঙ্কাহারার ঝঙ্কার বাজে
স্নায়ুর তুম্বুর তালে তালে নাচে,
ধ্বনির গতির মুক্ত নদীর
আবেগ লাগে,
দেহের দুকূলে তরঙ্গ তুলে
জীবন জাগে।

ফুল ফোটাবার তরে ফোটে নাই
কমল মম,
তোমারে বরণ করিতে চেয়েছি
হে প্রিয়তম,
রঙে রঙে রচি তাই প্রতি দল
আনি সৌরভ আনি পরিমল,
গূঢ় মর্ম্মের মকরন্দের
পরাণ মাঝে
তোমার কোমল পরশে পরশ—
স্বতন রাজে।

লক্ষ প্রদীপ জ্বালায়ে চলেছি—
লক্ষ শিখা,
আমি চাহি নাই আলোক দানের
মানের টীকা,
আমি শুধু চাই পথের আঁধারে
বিকীর্ণ করি যাব তব দ্বারে,
আমি শুধু চাই বাধা বিদীর্ণ
জ্যোতির ধারা,...
নিশার নিকষে কষিত-কনক :
বিজয়ী তারা।

নবীন সৃষ্টি লভিয়া দৃষ্টি
নয়ন তোলে,
চিৎ-সবিতার দীপ্ত গীতার
গগন দোলে,

কত অনাগত কত অনামিকা,
আসে, লভে নাম, মোর হাতে লিখা
তুলিকার তালে কত শত ভালে
বিকশি তুলি,
তারার কুসুমে রূপান্তরিত
ধরার ধূলি।

সারা বেলা ব'সে কত ছবি আঁকি,
কত যে লিখি,
রঙের সুরের রেখার লেখার
ছন্দ শিখি,
একের লাগিয়া বিচিত্রতায়
কত লীলা দোলে মোর সত্তায়,
রূপের নিখিল বাণীর জগৎ
মিতালি করে,
রঞ্জিত রাগে জাগে চিত্রালি,
গীতালি ঝরে।

মোর সাধনার উপলব্ধির
যেটুকু পাই,
সঙ্গীতে আর রেখাভঙ্গীতে
সাজাই তাই,
ভাবনা-কপোল-রস-চুম্বনে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে তুমি চল ক্ষণে ক্ষণে,
অধরা-অধর—পরশ-সুধার
মাধুরী ধরি'
আমার আধারে তোমার অমৃত
উঠিছে ভরি'।

এ কবি তোমার কবিযশোমালা
প্রার্থী নয়,
তোমার পূজার প্রার্থনা শুধু
সাধিয়া লয়,
কবিতার তরে কবিতা গাঁথি না
রূপ রচনায় রূপেরে সাধি না।
ওগো অপরূপ ওগো অনুপম
পরম প্রিয়,
ওগো সম্রাট অকিঞ্চনের

পঞ্চশস্য

কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীর সন্তানবাৎসল্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সন্তানবাৎসল্য জীবের একটি অদ্ভুত সংস্কার। অদৃশ্য জীবের কথা জানি না, কিন্তু পরিদৃশ্যমান জীবজগতের নিম্ন স্তর হইতে উর্দ্ধ স্তরের প্রাণীদের মধ্যে কেহই বোধ হয় এ-সংস্কার-মুক্ত নহে। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে এই সন্তানবাৎসল্য বিভিন্ন ধারায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া, প্রয়োজনের তাগিদে কোন কোন জাতীয় প্রাণীর এই সহজাত সংস্কার উত্তরোত্তর হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; কাহারও কাহারও আবার দুর্ব্বল ও অক্ষম সন্তান প্রতিপালনের জন্য বিবিধ কৌশল আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে অপত্যস্নেহের যেরূপ প্রাবল্য দেখা যায়



জলচর মাকড়সা শরীরের পশ্চাদ্ভাগে ডিম আটকাইয়া রাখিয়াছে

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে বরং তাহার বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কীটপতঙ্গ-জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অনেকেই ডিম পাড়িয়াই খালাস। তাহারা বাচ্চাদিগের আর কোন খোঁজখবর লয় না, এমন কি কোন কোন জাতীয় প্রাণী আপন শাবককে উদরস্থ করিতে ইতস্ততঃ করে না। তথাপি তাহারা ডিম পাড়িবার সময় যথেষ্ট অপত্যস্নেহের পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু এই কীটপতঙ্গের মধ্যেও এমন অনেক প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা কেবল ডিম পাড়িয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করে না, ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার পর তাহাদিগকে একরকম কোলে পিঠে করিয়াই প্রতিপালন করিয়া থাকে।

জঙ্গলের ধারে বসিয়া একবার গুবরে পোকার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। প্রায় পাঁচ-ছয় হাত তফাতে একটা শুষ্ক পত্রের নীচ হইতে কালো রঙের কেন্নোর মত, প্রায় ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা, একটা পোকা বাহির হইয়া আসিতে দেখিলাম। পাতার তলা হইতে বাহির হইয়া দুই-তিন ইঞ্চি অগ্রসর হইবার পর পোকাটা চুপ করিয়া দাঁড়াইল। চোখ দুইটা তাহার জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, পাতার তলা হইতে প্রায় আধ ইঞ্চির কিছু কম মোটা এবং প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা একটা অদ্ভুত জিনিষ যেন কতকটা গড়াইতে গড়াইতেই অগ্রসর হইয়া আসিল। এই অদ্ভুত জিনিষটা অগ্রগামী পোকাটার খুব নিকটে আসিবামাত্রই সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম ঐ লম্বা জিনিষটা আর কিছুই নহে কতকগুলি কীড়ার সমষ্টি মাত্র। কীড়াগুলি ঐ পোকাটারই বাচ্চা, তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার ভয়ে পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। পোকাটা আগে আগে পথ দেখাইয়া তাহার সন্তানগুলিকে কোন সুবিধাজনক স্থানে লইয়া যাইতেছিল সন্দেহ নাই। নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কারবশে পরিচালিত হইয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে এরূপ সন্তানবাৎসল্য অতীব বিস্ময়কর।

আমাদের দেশের বদ্ধ জলাশয়ে জল-উকুন নামে গোলাকার অথচ চেপ্টা এক জাতীয় পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অন্যান্য কীটপতঙ্গের ন্যায় যেখানে-সেখানে ডিম পাড়ে না। স্ত্রী-পোকা পুরুষ-পোকাটার পিঠের উপর সুসজ্জিত ভাবে প্রায় ২০।২৫ টা ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষ-পোকা ইহাদিগকে সযত্নে বহন করিয়া বেড়ায়। ইহাতেও যথেষ্ট সন্তানবাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অনেক ক্ষেত্রে পিঁপড়েরা বাচ্চাদিগকে মুখে করিয়া বেড়ায় এবং বাচ্চারা যথেষ্ট উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও ইহাকে অপত্যস্নেহ বলা যায় না তথাপি ইহা মাতৃস্নেহেরই..পর্য্যায়ভুক্ত

এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কারণ পিপীলিকারা সমাজবদ্ধ জীব। রাণী-পিপীলিকা ডিম প্রসব করিয়াই ধাত্রীদের হস্তে ছাড়িয়া দেয়। তাহারাই উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া বড় করিয়া তোলে।

আমাদের দেশের কয়েক জাতীয় মাকড়সার মধ্যেও অদ্ভুত অপত্যস্নেহ পরিলক্ষিত হয়। ঘরের দেয়ালে বাস করে এরূপ অন্ততঃ দুই জাতের বড় বড় মাকড়সা ডিমের থলি বুকে করিয়া বেড়ায়। আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যও ইহারা ডিমগুলিকে শত্রুর হস্তে ছাড়িয়া দেয় না। আর এক জাতীয় মাকড়সা দেয়ালের গায়ে ডিম পাড়িয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দিন-রাত তাহাদিগকে পাহারা দেয়।[১] ডিম ফুটিতে প্রায় ১৫।২০ দিন লাগে। এত দিন অনাহারে থাকিয়া মাকড়সা ডিম আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে; এক চুলও এদিক-ওদিক নড়ে না। যাহারা একটু ছায়া দেখিলেই চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহারা ডিম পাড়িবার পর শত ভয় পাইলেও সহজে স্থানত্যাগ করেনা। এমন কি ঠ্যাং ধরিয়া টানিলেও দেয়াল আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার চেষ্টা করে। এমনই অদ্ভুত ইহাদের মাতৃস্নেহ।

আমাদের দেশের ডুবুরী মাকড়সা এবং স্থলচর এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় কালো মাকড়সা ডিমের থলি শরীরের পশ্চাদ্ভাগে আটকাইয়া ইতস্ততঃ চলাফেরা করিয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে। দশ, পনর দিন পর ডিম ফুটিয়া বাচ্চাগুলি বাহিরে আসিয়াই মায়ের পিঠের উপর স্তরে স্তরে জমা হইতে থাকে। মা প্রায় ৫০।৬০টি বাচ্চাকে পিঠের উপর চড়াইয়া আহারান্বেষণে ঘোরাঘুরি করিয়া থাকে। কিছু দিন মায়ের পিঠের উপর নিরাপদে যাপন করিয়া যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিবার পর তাহারা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে এবং স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রা সুরু করিয়া দেয়। আমাদের দেশীয় কাঁকড়া-বিছার বাচ্চাগুলিও মায়ের পিঠের উপর চড়িয়া তাহাদের শৈশব-অবস্থা অতিক্রম করে।

নদনদী ও সমুদ্রের অধিবাসী কাঁকড়া-জাতীয় প্রাণীরা জলের মধ্যেই ডিম ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হয়---বাচ্চাদের কোন খোঁজই লয় না। কিন্তু আমাদের দেশের বদ্ধ জলাশয়ে যে সকল পাতি-কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা বাচ্চাগুলিকে নিজের অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। স্ত্রী-কাঁকড়ার বুকের নীচে একটা চওড়া ঢাকনা থাকে। তাহারা তাহাদের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচ্চাকে সযত্নে এই ঢাকনার অন্তরালে রাখিয়া বুকে করিয়া বেড়ায়। বাচ্চাগুলি স্বাধীনভাবে চলিবার মত উপযুক্ত হইলে এই ঢাকনার ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় চিংড়িও ডিম বুকে করিয়া বেড়ায়।

কীটপতঙ্গ হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর প্রাণী হইলেও



ডুবুরী মাকড়সা পিঠে করিয়া সন্তান বহন করিতেছে

ব্যাং-জাতীয় প্রাণীর মধ্যে তেমন কোন সন্তানবাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাদের অনেকেই বদ্ধ জলে ডিম পাড়িয়া চলিয়া আসে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এমন কয়েক জাতীয় ব্যাং দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা ডিম অথবা বাচ্চার প্রতি যথেষ্ট বাৎসল্যের পরিচয় দিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, 'এলাইটিস্' অথবা ধাত্রী-ব্যাঙের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডিম পাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই এই জাতীয় পুরুষ-ব্যাঙেরা ডিমগুলিকে পিছনের পায়ের সঙ্গে জড়াইয়া লয় এবং বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই বহন করিয়া বেড়ায়। আমেরিকার 'পাইপা'-জাতীয় ব্যাং আরও অদ্ভুত। তাহাদের পিঠের উপর ছোট ছোট থলির মত কতকগুলি গর্ত আছে। বাচ্চাগুলি বড় না হওয়া পর্যন্ত ঐ থলির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। উন্নত শ্রেণীর ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি অপেক্ষা ইহাদের অপত্যস্নেহ কোন অংশেই হীন নহে।

মাছেরা সাধারণতঃ উপযুক্ত স্থানে ডিম পাড়িয়াই তাহাদের কর্তব্য শেষ করে। ডিম পাড়িবার পর সন্তান-সন্ততিদের জন্য আর কোন ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু কোন কোন মাছের মধ্যে উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের মতই সন্তানবাৎসল্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের দেশীয় চিতল, আড় এবং শোল মাছের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। চিতল মাছ জলনিমজ্জিত কোন শক্ত জিনিসের ফাটলের মধ্যে ডিম পাড়িয়া



এলাইটিস বা ধাত্রী-ব্যাং ডিমগুলিকে শরীরের পশ্চাদ্দেশে বহন করিতেছে

সর্ব্বদা পাহারায় থাকে যেন কেহ ডিমের কোন অনিষ্ট না করিতে পারে। এই সময় তাহারা ভয়ানক উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করে। ডিম পাহারা দিবার সময় যে-কেহ নিকটে আসে তাহাকেই আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করে না। অনেক পুকুরে পুরাতন সিঁড়ির ফাটলের অভ্যন্তরে চিতল মাছ ডিম পাড়িয়া রাখে। সেই সময় সিঁড়ি দিয়া মানুষের পক্ষেও জলে নামা সুকঠিন হইয়া পড়ে। জলে নামিলেই চিতল মাছ তাহাকে তাড়া করিয়া আসে এবং কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। এমনই প্রবল তাহাদের অপত্যস্নেহ। আড় মাছেরা গভীর জলের নীচে মাটিতে কূয়ার মত প্রকাণ্ড গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বাচ্চাগুলিকে রাখিয়া দেয় এবং অনবরত কাছে কাছে থাকিয়া তাহাদের তদারক করে। বাচ্চাগুলি এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি বড় হইলে পাখীদের মত আহারান্বেষণে বহির্গত হয়, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র বাসায় ফিরিয়া আসে। অপত্যস্নেহের এই সুযোগ লইয়া লোকে অতি সহজে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আড় মাছ শিকার করিয়া থাকে। ল্যাটা ও শোল জাতীয় মাছের সন্তানবাৎসল্য আরও অদ্ভুত। তাহারা ডিম পাড়িয়া তাহাদিগকে সযত্নে রক্ষা করিয়াই নিরস্ত হয় না। বাচ্চা ফুটিবার পরও মা তাহাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া থাকে। বর্ষাকালে শোলমাছকে এইরূপ বাচ্চা সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। মা অতি সন্তর্পণে চারি দিকে দেখিয়া শুনিয়া আগে আগে যায়, বাচ্চাগুলি তাহার পিছনে কিলবিল করিতে করিতে অগ্রসর হয়। বিপদের কোন আশঙ্কা না-থাকিলে মা একস্থানে চুপ করিয়া থাকে, বাচ্চাগুলি তখন কিলবিল করিতে করিতে একসঙ্গে জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং ভাসমান কোন খাদ্যদ্রব্য পাইলেই তাহা উদরস্থ করে। বিপদের কোন সম্ভাবনা বুঝিলেই মায়ের ইঙ্গিতে জলের নীচে ডুবিয়া আত্ম-গোপন করিয়া থাকে।

পাখীদের সন্তানবাৎসল্য সর্ব্বজনবিদিত। বাসা-নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্তানকে সক্ষম করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের অক্লান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশের চড়ুই পাখীর অপত্যস্নেহ সম্বন্ধে ডাঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক এক অপূর্ব্ব ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম। ঘরের কার্ণিসের উপর চড়ুই পাখীর বাচ্চা হইয়াছিল। ঘর পরিষ্কার করিবার সময় বাচ্চাগুলি বাসা হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়া মারা যায়। চড়ুই-দম্পতি সারাদিন অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াও বাচ্চাগুলিকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। বাচ্চাগুলি যেস্থানে পড়িয়া ছিল তাহার অতি নিকটেই একটি বৃহৎ দর্পণ ছিল। পরদিন ভোর হইতে-না-হইতেই চড়ুই-দম্পতি পুনরায় সেই স্থানে বাচ্চার খোঁজে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া



'পাইপা'-জাতীয় সুরিনাম্ ব্যাং বাচ্চাগুলিকে পিঠে করিয়া বহন করিয়া থাকে

করুণস্বরে ডাকিতে ডাকিতে এদিক ওদিক খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল। একটি পাখী দর্পণখানার সম্মুখে আসিবামাত্রই দর্পণে প্রতিফলিত নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে দর্পণের উপর বারংবার উড়িয়া পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে সঙ্গীটি আসিয়াও তাহার সঙ্গে যোগ দিল। উভয়ে মিলিয়া তখন সে কি চেঁচামেচি! যেন তাহাদের হারানো মাণিক ফিরিয়া পাইয়াছে। বহু চেষ্টাতেও তাহাদের সেই



অপোসাম তাহার বাচ্চাগুলিকে পিঠে করিয়া ঝুলিতেছে

কল্পিত বাচ্চার নাগাল না পাইয়া দিবাবসানে ক্ষুন্ন মনে যথাস্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু এক দিনের এই বিফল প্রচেষ্টার ফলেই তাহাদের মোহ ঘোচে নাই। উপর্য্যুপরি দুই-তিন দিন ধরিয়া তাহারা এই কাণ্ড করিয়াছিল।

মুরগীদের মধ্যেও অদ্ভুত সন্তানবাৎসল্য পরিলক্ষিত হয়। অপত্যস্নেহ তাহাদের এতই প্রবল যে ডিম পাড়িবার পর তাহাদের নিজের ডিম বা পরের ডিমের মধ্যে পার্থক্যবোধ পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়। মুরগীর ডিমের সঙ্গে হাঁসের ডিম রাখিয়া দিলেও তাহারা তা দিয়া বাচ্চা ফুটাইয়া তোলে। হাঁসের ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলেও তাহারা কিছুমাত্র পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারে না। হাঁস ও মুরগী উভয় জাতীয় বাচ্চা ফুটিবার পর মুরগী তাহাদিগকে লইয়া আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। ছোট ছোট কীটপতঙ্গ ধরিয়া বাচ্চাদিগকে খাইতে দেয়। মায়ের দেখাদেখি বাচ্চাগুলিও আহার্য্য সংগ্রহ করিতে শিক্ষা করে। বাচ্চাকাচ্চা সহ আহারান্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবাৎ কোন জলাশয়ের পাড়ে উপস্থিত হইলেই, হাঁসের বাচ্চাগুলি তাহাদের সহজাত সংস্কার-বশে জলে নামিয়া পড়ে। বাচ্চাগুলি ডুবিয়া মরিবে, ভাবিয়া মুরগী তখন ব্যাকুলভাবে চীৎকার ও ছুটাছুটি করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিতে থাকে। অপত্যস্নেহে উহারা এমনই অন্ধ হইয়া যায়। অবসর-সময়ে বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠের উপর চড়িয়াও বসিয়া থাকে। শাবকগুলি সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত শত্রুর ভয়ে মুরগী চতুর্দ্দিকে অতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখে। বাজ পাখীরা মুরগীর ছানার ভয়ানক শত্রু। সুবিধা পাইলেই এক-একটাকে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। বাজ পাখীকে আকাশে উড়িতে দেখিলেই মুরগী এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিয়া সন্তানদের সাবধান করিয়া দেয়। সঙ্কেত শুনিলেই বাচ্চাগুলি ছুটিয়া মায়ের কাছে আসে। মুরগী তখন ডানা-দুটিকে ঈষৎ মেলিয়া ধরে এবং সন্তানগুলি ডানার নীচে ঢুকিয়া বেমালুম আত্মগোপন করে।

কাকেরাও বোধ হয় নিজের এবং অপরের ডিমের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে না। হয়ত বা অপত্যস্নেহে অন্ধ হইয়াই কোকিলের ডিম ফুটাইয়া থাকে।

পেঙ্গুইন পাখী অপত্যস্নেহের আতিশয্যে অতি অদ্ভুত কাণ্ড করে। তাহারা আহারনিদ্রা ভুলিয়া ডিমে তা দিতে থাকে। এই অবস্থায় ডিম শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে কিছুতেই সে দুঃখ সামলাইতে পারে না। অবশেষে ডিমের অভাবে একটা বরফের ডেলাকেই পরম স্নেহভরে দিনের পর দিন তা দিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করে।



পেঙ্গুইন পাখী ডিমের পরিবর্ত্তে বরফের ডেলায় তা দিতেছে



পেলিকান তাহার শাবককে আহার করাইতেছে

পেলিকানের সন্তানবাৎসল্যও কম বিস্ময়ের বস্তু নহে। মা শাবকদের জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া লইয়া আসে। শাবকগুলি মায়ের গলার মধ্যে চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া উদ্গীরিত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়।

অনেক পাখীর মধ্যেও অপরূপ সন্তানবাৎসল্য পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রী-পাখী গাছের কোটরে ডিম পাড়িয়া তা দিতে বসিলেই পুরুষ-পাখীটি কাদা মাটি আনিয়া কোটরের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। মাটির প্রলেপের মধ্যস্থলে, ঠোঁট প্রবেশ করাইবার মত একটি ছোট ছিদ্র রাখে। পুরুষ পাখীটি খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ছিদ্রের মধ্যে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া স্ত্রী পাখীটিকে আহার প্রদান করে। শাবকগুলি বাহিরে না আসা পর্যন্ত পুরুষ পাখী দিনের পর দিন এইরূপে স্ত্রী-পাখীর আহার যোগাইতে থাকে। শাবকগুলি উড়িবার উপযুক্ত হইলেই মাটির প্রলেপ ভাঙিয়া স্ত্রী পাখীটি তাহাদিগকে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। এরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং অনশন বা অর্দ্ধাশন সহ্য করিতে না পারিয়া পুরুষ পাখীরা অনেকে এই সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু যতই ক্লেশ হউক না কেন, অপত্য-স্নেহের বশীভূত হইয়া তাহারা কোন অবস্থাতেই এ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারে না।

ইউরোপের কোন কোন অংশে কোকিল-জাতীয় ছোট ছোট এক প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। পেঁচার মত দেখিতে উহাদের অপেক্ষা বৃহদাকার এক রকম পাখী তাঁহাদের বাসায় ডিম পাড়িয়া যায়। ক্ষুদ্রকায় কোকিল তাহার নিজের ডিম মনে করিয়া তাহাদিগকে তা দেয়, বাচ্চা ফুটিলে তাহাকে সযত্নে পালন করিয়া বড় করিয়া তোলে। কিছুদিনের মধ্যেই শাবক পালয়িত্রী অপেক্ষা চতুর্গুণ বড় হইয়া উঠে। পালয়িত্রী হয়ত ভাবিয়াই পায় না, তাহার বাচ্চা এত বড় হইল কেমন করিয়া। সারাদিন আহার সংগ্রহ করিয়াও মা তাহার রাক্ষুসে ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, মা নিজে আকারে ক্ষুদ্র, অতবড় বাচ্চাটার ঘাড়ের উপর চড়িয়া বসিয়া তাহাকে আহার করাইতে হয়। তথাপি সন্তান-বাৎসল্যের প্রাবল্যে কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করে না।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যেও সন্তানবাৎসল্যের বহুবিধ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শুনিয়াছি এক বার কোনও এক স্থানে গোসাপ-দম্পতি তাহাদের বাচ্চা কাচ্চাদের লইয়া আহারান্বেষণে ব্যাপৃত ছিল। একটা বাচ্চা তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছু দূরে গর্ত্ত খুঁড়িতে-ছিল। গর্ত্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতেই সে স্থান হইতে একটা বিষধর সাপ বাহির হইয়া আসিল। সাপটা ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গোসাপের বাচ্চাটা দুই তিন হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নির্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া সে ছুটিয়া পলায়ন করিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল গোসাপ দম্পতি অতি উত্তেজিত ভাবে সেই গর্ত্তের দিকে তাড়া করিয়া আসিতেছে। ক্রোধভরে তাহারা সেই গর্ত্ত ও তাহার চতুর্দ্দিকের স্থান চষিয়া ফেলিল, কিন্তু সাপের সন্ধান মিলিল না। অবশেষে নিষ্ফল আক্রোশে ফোঁস ফাঁস করিতে করিতে চলিয়া গেল।

অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের অপত্যস্নেহ সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র, তথাপিও দুই একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। গরু মহিষ প্রভৃতি জন্তুরা অপত্যস্নেহে এমনই আত্মহারা হইয়া থাকে যে জীবন্ত বাছুরের পরিবর্ত্তে খড়কুটায় নির্ম্মিত নকল বাছুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেও তাহাদের দুগ্ধ ক্ষরণ হয়। বানরের বাচ্চা বড় হইলেও মা তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে চাহে না। তাহাকে দিয়া কোন কাজ করাইতে হইলে বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হয়, নচেৎ তাহাকে একপাও নড়াইতে পারা যায় না। অনেকেই হয়ত বানরের সন্তানবাৎসল্যের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়াছেন। বুকের উপর সন্তান মরিয়া গেলে, পচিয়া খসিয়া না পড়া পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। সন্তানের শোকে অস্থির হইয়া অনেকে সময় সময় বিড়াল-ছানা চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া রাখে।

অপোসাম জাতীয় প্রাণীরা সন্তান প্রতিপালন ও তাহাদিগকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। সর্ব্বদাই ইহারা গাছের ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠের উপর আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে। অনেক সময় তাহাদের দীর্ঘ লেজের সাহায্যে মায়ের লেজ আঁকড়াইয়া ধরে। বাচ্চাগুলি সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত মা অনায়াসে তাহাদিগকে বহন করিয়া বেড়াইয়া থাকে।

কাঙ্গারুর অপত্যস্নেহ ও সন্তানপালন-কৌশল আরও অদ্ভুত। ইহাদের উদরদেশের বহির্দ্দিকে একটি থলি আছে। সন্তান মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়ায়, কিন্তু ভয় পাইবামাত্রই মায়ের ঐ থলির মধ্যে লুকাইয়া থাকে। অনেক সময় থলি হইতেই মুখ বাড়াইয়া ঘাস-পাতা আহার করে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধীর উপবাসভঙ্গ

অনেক দেশী রাজ্যের প্রজারা ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য এবং দায়িত্বশীল শাসন-প্রণালীর জন্য (অর্থাৎ যে শাসন-প্রণালীতে মন্ত্রী ও অন্য কার্য্যনির্বাহকেরা প্রজাদের প্রতিনিধিসভার নিকট নিজ নিজ কার্য্যের জন্য দায়ী হন, এই প্রকার শাসনপ্রণালীর জন্য) আন্দোলন করিতেছে। তাহার ফলে অনেক রাজ্যে প্রজাদের উপর জুলুম হইতেছে, কোন কোন রাজ্যে অনেক প্রজা গুলিতে হত, আহত, এবং অনেকে কারারুদ্ধ হইয়াছে। উড়িষ্যার তালচের প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া অনেক হাজার প্রজা ব্রিটিশ-শাসিত উড়িষ্যা প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছে।

গুজরাটের রাজকোট রাজ্যের প্রজারা আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ করে। সর্দার বল্লভভাই পটেলের মধ্যস্থতায় রাজকোটের "ঠাকুর সাহেব" নামধেয় মহারাজা নিজ রাজ্যের শাসন-প্রণালীর সংস্কার করিতে রাজী হন। সত্যাগ্রহ থামিয়া যায়। পরে তিনি অঙ্গীকারভঙ্গ করায় আবার প্রজাদের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিণী শ্রীমতী কস্তুরবাঈ রাজকোটের মেয়ে, তিনি এই সত্যাগ্রহে যোগ দিয়া ধৃত ও স্বাধীনতা-বঞ্চিত হন। মহাত্মা গান্ধী রাজকোটে শান্তি স্থাপনার্থ সেখানে যান, এবং ঠাকুর সাহেবের মনে অঙ্গীকার পালনের ইচ্ছা জন্মাইবার নিমিত্ত উপবাস আরম্ভ করেন—এই পণ করিয়া যে ঠাকুর সাহেব অঙ্গীকার পালন করিতে রাজী না হইলে তিনি মরিবেন তবু উপবাস ভঙ্গ করিবেন না। সমগ্র ভারতে উদ্বেগের সঞ্চার হয়। ভারতে বড়লাটের এবং বিলাতে রাজপুরুষদেরও টনক নড়ে। বড়লাট রাজপুতানায় সফর করিতেছিলেন; তাড়াতাড়ি দিল্লী ফিরিয়া আসেন। দূর হইতেই তাঁহার সহিত মহাত্মাজীর কথাবার্তা চলিতে থাকে। ঠাকুর সাহেব নিজের কথা রাখিবেন বড়লাটের মধ্যবর্তিতায় এইরূপ স্থির হওয়ায় মহাত্মাজী উপবাস ভঙ্গ করিয়াছেন। ঠাকুর সাহেব যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহার অর্থ স্থির করিবেন ভারতবর্ষের (ফেডারাল কোর্টের) প্রধান বিচারপতি, এবং তাঁহার ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত হইবে।

এখানে ইহা লক্ষিতব্য যে, মহাত্মাজীকে ফেডারেশ্যনের একটা অঙ্গ ফেডারাল কোর্ট পরোক্ষভাবে অগ্রিম মানাইয়া লওয়া হইল।

মহাত্মাজী কিছু বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইলে ভারতবর্ষ নিরুদ্বেগ হইবে। (লিখিবার তারিখ ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪৫।)

—

সুভাষচন্দ্র বসুর ত্রিপুরী যাত্রা

সুভাষচন্দ্র বসুর পীড়া যেরূপ এবং সে-সম্বন্ধে ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কংগ্রেসের অধিবেশন কয়েক দিন পিছাইয়া দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতি তাহা সম্ভবপর নহে বলায় কংগ্রেস-সভাপতি রুগ্ন ও অত্যন্ত দুর্বল অবস্থাতেই ত্রিপুরী গিয়াছেন। সেখানে তাঁহার বাসা হইতে তাঁহাকে রোগীর যান অ্যাম্বুলেন্সে ও পরে স্ট্রেচারে শুয়াইয়া সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তিনি শায়িত বা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বিষয়-নির্বাচক কমীটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতেছেন।

সুভাষবাবুর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও সাহস দৃষ্টান্তস্থল এবং অতীব প্রশংসনীয়। বিপৎসম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাকে তাহা করিতে বাধ্য অগত্যা করিয়াছেন, বা তাঁহার রোগ সম্বন্ধে ডাক্তারদের মতে অবিশ্বাস করিয়া করিয়াছেন, বা জেদ বশতঃ করিয়াছেন, বা তাঁহার প্রতি মমতা না-থাকায় করিয়াছেন, কিংবা তাঁহার প্রাণের মূল্য কম অনুমান করিয়া করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

তিনি দ্বিতীয় বার সভাপতি নির্বাচিত হইবার পূর্ব হইতেই—দ্বিতীয় বার সভাপতিপদাভিলাষী হওয়ায় এবং মহাত্মা গান্ধীর ও সাত জন কংগ্রেসনেতার বিরোধিতা

নত্ত্বেও সেই সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকায়—অনেক কংগ্রেসনেতার মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে একটা প্রতিকূলতা লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রতিকূলতার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তিনি তাঁহাদের কথায় সভাপতি নির্বাচন-প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই।

এই প্রতিকূলতাবশতঃ ওআর্কিং কমীটির অধিকাংশ সভ্য তাঁহার কঠিন পীড়ার সময়েই, তাঁহার কৈফিয়ৎ বা বক্তব্য শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই, একযোগে পদত্যাগ করেন। তাঁহাদের পদত্যাগ জরুরী ছিল না, রোগশয্যায় শায়িত সুভাষ বাবুর একা একা এমন কিছু করিয়া বসিবার সম্ভাবনা ছিল না যাহার দ্বারা ওআর্কিং কমীটির সভ্যদিগকে অপ্রতিভ বা অযথা দায়ী হইতে হয়। এই কারণে আমাদের মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছে যে, ওআর্কিং কমীটির অধিকাংশ সভ্যের প্রভুত্বাভিমানে ঘা লাগায় তাঁহাদের মনে একটা এইরূপ জেদ জন্মিয়া থাকিবে যে, "আমরা দেখিয়া লইব সুভাষ কেমন করিয়া কাজ চালান!" সুভাষ বাবু তাঁহাদিগকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ না করিয়া তাহা গ্রহণ করায় তাঁহাদের জেদ বাড়িয়া থাকিবে। 'প্রভুত্বাভিমান' বলিতেছি এই জন্য যে, কংগ্রেস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিবার পর হইতে ওআর্কিং কমীটির সভ্য কয়েক জন নেতা, গান্ধীজীর অনুজ্ঞা ও অনুমোদনে, কংগ্রেসের সব কাজে প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছেন। এই সকল নেতার সুভাষ বাবু সম্বন্ধে প্রতিকূলতার প্রভাব ত্রিপুরী অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির উপর পড়িয়াছে কিনা এবং সেই প্রভাবের বশে তাঁহারা অধিবেশন কয়েক দিন স্থগিত রাখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না।

সুভাষ বাবু রুগ্ন অবস্থায় অধিবেশনে যোগ দিয়াছেন এবং যথাসাধ্য নিজের কর্ত্তব্য করিতেছেন। এখনও প্রত্যহ তাঁহার জ্বর বাড়িতেছে কমিতেছে। অগণিত লোকের কামনা এবং আমাদেরও কামনা এই যে, তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতায় যেন তাঁহার কোন 'দৈহিক' অনিষ্ট না হয়। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, অধিবেশন কয়েক দিনের জন্য স্থগিত হইলে এবং তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া তাহাতে যোগ দিয়া তাহার কাজ চালাইলে যেমন ভাল করিয়া কাজ চালাইতে পারিতেন, রুগ্ন অবস্থায় তাহা পারিবেন না।

গান্ধীজী সুভাষ বাবুকে দ্বিতীয় বার সভাপতিপদের প্রার্থী হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এই কারণে যে, তাহা গান্ধীজীর মতে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে। শ্রীযুক্ত পট্টাভি সীতারামায়্যা সভাপতি হইতে না-পারায় মহাত্মাজী ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, ডাক্তার সীতারামায়্যার পরাজয়কে নিজের পরাজয় মনে করিয়াছেন। তিনি সাধু ব্যক্তি ও মহাপুরুষ। এই কারণে, যে-অবস্থায় সাধারণ মানুষদের অভিমানে ঘা লাগে, তাহাদের মনে ক্রোধ ও প্রতিশোধ-স্পৃহার উদ্রেক হয়, বিরক্তিভাজন মানুষকে জব্দ করিতে বা দেখিতে ইচ্ছা হয়, মহাত্মাজীর সেরূপ কোন চিত্তবিকার হইয়াছে বলিয়া অনুমান বা সন্দেহ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি।

সুভাষ বাবুর আচরণ সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত কিছু বলি নাই। আমাদের বিবেচনায়, তাঁহার দ্বিতীয় বার সভাপতি পদের প্রার্থী হওয়া, সেই সংকল্পে দৃঢ় থাকা, ও নির্বাচিত হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ হয় নাই এবং দোষের বিষয় হয় নাই। তিনি দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হইয়া দেশের বিশেষ এমন কোন হিত করিতে পারিবেন কি না যাহা অন্যের দ্বারা হইতে পারিত না, তাহা এখন বলা যায় না।

তিনি কিম্বা অন্য কোন 'বামপন্থী' সভাপতি নির্বাচিত না হইলে ব্রিটিশ পরিকল্পনানুযায়ী ফেডারেশ্যন চালু হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং তাহা হইত সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত বিশেষ কোন 'দক্ষিণপন্থী' নেতা ও বিশেষ বিশেষ কোন কোন 'দক্ষিণপন্থী' ওআর্কিং কমীটির সভ্যদিগের সহযোগিতায়, ইহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই; যদিও তাঁহার একটি স্টেটমেণ্টে তাঁহার এইরূপ আশঙ্কা, অনুমান, সিদ্ধান্ত, বা সন্দেহ সূচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল। সুতরাং ঐ স্টেটমেণ্টে ওরূপ কিছু বলা উচিত হয় নাই। তিনি পরে অন্য একটি স্টেটমেণ্টে এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্টেটমেণ্টে, ফেডারেশ্যন চালু হইবে, সর্ব্বসাধারণের এইরূপ একটা আশঙ্কাপূর্ণ ধারণার অস্তিত্বই

জানাইতে চাহিয়াছিলেন, কোন এক বা একাধিক নেতার বিরুদ্ধে কিছু তিনি বলেন নাই ও বলা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তাহা হইতে পারে। কিন্তু তাহা তাঁহার প্রথমোক্ত স্টেটমেণ্টে স্পষ্ট বুঝা যায় নাই।

তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন কংগ্রেসীদের মধ্যে 'দক্ষিণপন্থী'রা সংখ্যাধিক। অথচ তিনি তাহাদিগকে এবার সভাপতির আসন এক জন 'বামপন্থী'কে ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন। বলায় অবশ্য কোন দোষ হয় নাই। কিন্তু সংখ্যাধিকদের প্রাধান্যই গণতান্ত্রিক রীতি।

ওআর্কিং কমীটির অধিকাংশ সভ্য যে দলবদ্ধ ও প্রকাশ্য ভাবে সুভাষ বাবুর দ্বিতীয় বার সভাপতি হওয়ার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাহা দূষণীয় মনে করি।

আমরা মনে করি না যে, কংগ্রেসে 'বামপন্থী' 'দক্ষিণপন্থী' বলিয়া স্পষ্ট সীমারেখা বা প্রভেদরেখা টানা দুটি দল আছে। আমাদের ধারণা, অনেক তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী'ও সভাপতি নির্বাচনে সুভাষ বাবুকে ভোট দিয়াছিলেন। অবশ্য, আমাদের উভয় ধারণাই ভ্রান্ত হইতে পারে। (লিখিবার তারিখ ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪৫।)

—

কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশন

কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের তারিখ এরূপ পড়িয়াছে যে, পূরা অধিবেশনের আরম্ভের পূর্বে এবং তাহার বর্ণনা কলিকাতার দৈনিকগুলিতে প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমাদিগকে চৈত্রের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ লিখিতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে, এবং অধিবেশনের শেষ দিনের কার্য্যবিবরণ কলিকাতার দৈনিকগুলিতে প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বিবিধ প্রসঙ্গ সমাপ্ত বা প্রায় সমাপ্ত করিতে হইবে। সেই কারণে এই অধিবেশনের অনেক বিষয়ের আলোচনা প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় করা চলিবে না। পরবর্ত্তী সংখ্যায় কি করিতে পারিব বা পারিব না, এখন হইতে তাহা না-বলাই ভাল। (লিখিবার তারিখ ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪৫।)

বেহুলার স্মৃতিসভা

"বাংলাভাষা পরিচয়" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতেই দেখি কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোন ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেচ্ছাচারী। নিজের জীবনে মুকুন্দরাম রাষ্ট্রশক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি সব চেয়ে প্রবল ক'রে অনুভব করেছেন অন্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা। বিদেশে উপবাসের পর স্নান ক'রে তিনি যখন ঘুমোলেন দেবী স্বপ্নে তাঁকে আদেশ করলেন দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্যে। সেই মহিমাকীর্তন ক্ষমাহীন ন্যায়ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রূরতার জয়কীর্তন। কাব্যে জানালেন, যে-শিবকে কল্যাণময় ব'লে ভক্তি করা যায়, তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁর ভক্তদের পদে পদে পরাভব। ভক্তের অপমানের বিষয় এই, যে, অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে সে ভয়ে মাথা করেছে নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়। শিবশক্তিকে সে মেনে নিয়েছে অশক্তি ব'লেই।

"মনসামঙ্গলের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন ক'রে ধর্মকে অস্বীকার ক'রে তবেই ভীরুর পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।"

আমরা যে বিষয়ে লিখিতে যাইতেছি, উপরের প্যারাগ্রাফ দুইটি তাহার যথেষ্ট উপক্রমণিকা। কিন্তু আমাদের দেশের অতীত কালের সাহিত্যে এবং বিদেশী সাহিত্যে যে অন্য রকম চিত্রও আছে, কবি যে তাহাও দেখাইয়াছেন তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত তাঁহার গ্রন্থখানি হইতে আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"অপর দিকে আমাদের পুরাণ কথা সাহিত্যে দেখো প্রহ্লাদ চরিত্র। যাঁরা এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মানুষের আত্মপরাভবকেই বাস্তব ব'লে মানেন নি। সংসারে সচরাচর ঘটে সেই দীনতাই, কিন্তু সংখ্যাগণনা ক'রে তাঁরা মানবসত্যকে বিচার করেন নি। মানুষের চরিত্রে যেটা সত্য হওয়া উচিত তাঁদের কাছে সেইটেই হয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তব, যেটা সর্বদাই ঘটে এর কাছে সেটা ছায়া। যে কালের মন থেকে এ রচনা জেগেছিল সে কালের কাছে বীর্যবান দৃঢ়চিত্ততার মূল্য যে কতখানি, এই সাহিত্য থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

"আর এক কবিকে দেখো, শেলি। তাঁর কাব্যে অত্যাচারী দেবতার কাছে মানুষ বন্দী। কিন্তু পরাভব এর পরিণাম নয়। অসহ্য পীড়নের তাড়নাতেও অন্যায়শক্তির কাছে মানুষ অভিভূত হয় নি। এই কবির কাছে অত্যাচারীর পীড়নশক্তির

মূর্খতাই সব চেয়ে বড় সত্য হয়ে প্রকাশ পায় না, তাঁর কাছে তার চেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে অত্যাচরিতের অপরাজিত বীর্য।"

কলিকাতায় একখানি ইংরেজী দৈনিকে ৩১শে জানুআরি ১৭ই মাঘ তারিখের বর্দ্ধমানের চিঠিতে দেখি বর্দ্ধমান শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী কসবা-চম্পাইনগর গ্রামে বেহুলার স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তেই এ-বিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লেখা হয় নাই। এবার লিখিতে বসিয়া, রবীন্দ্রনাথ মনসামঙ্গল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা সংগত ও আবশ্যক মনে হইল; কেন তাহা পরে বুঝা যাইবে।

মনসামঙ্গলে আছে, তাহার প্রধান পুরুষচরিত্র চাঁদসদাগরের বাড়ী ছিল চম্পাইনগরে। চাঁদসদাগর ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা, ঐতিহাসিক পুরুষ হইলে তাঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার চম্পাইনগরেই ছিল কিনা, তাহার আলোচনা করিব না।

অনেক কবিকল্পিত চরিত্র অনেক ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা আমাদের কাছে স্পষ্টতর। তাহাদের দ্বারা আমাদের হৃদয়মন অনেক ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবিত হয়, এবং তাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব পূর্ণতর হয়। সুতরাং কবিকল্পিত হইলেও এই সব চরিত্রকে আমরা বাস্তবের আসন দিয়া থাকি, ছায়া মনে করি না।

মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের চরিত্রে আমরা ঠিক্ "অত্যাচরিতের অপরাজিত বীর্য্য" বা অপরাজেয় বীর্য্যের দৃষ্টান্ত পাই না বটে, কিন্তু যাহা পাই তাহাও দৃঢ় মনুষ্যত্বের মহনীয় দৃষ্টান্ত। এই মানুষটি মনসাদেবীর কাছে সহজে মাথা হেঁট করে নাই।

কিন্তু কসবা-চম্পাইনগরে স্মৃতিসভা চাঁদসদাগরের উদ্দেশে হয় নাই; হইয়াছিল সতী বেহুলাকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিবার নিমিত্ত। যাঁহারা এই সভার আয়োজন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

আমাদের দেশে কাব্যে পুরাণে সতীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মনসামঙ্গলের বেহুলা-চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, ইহা বাঙালী কবির মনোভব, এবং ইহা বিশেষ করিয়া বঙ্গের সেই সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয়মনের উপর ছাপ দিয়াছে যাহারা বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, চাষের মাঠে, খালে বিলে ঘাটে জীবনের অনেকটা সময় কাটায় এবং যাহাদিগকে সাপ ও সাপের দেবতাকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই জন্য মনসামঙ্গল বঙ্গীয় পল্লীজনের মহাকাব্য। ইহার শুচিশুভ্র বেহুলাচরিত্র বহুযুগ ধরিয়া অগণিত পল্লীকন্যার ও পল্লীবধূর হৃদয়মনকে পূত করিয়াছে, পবিত্র রাখিয়াছে। এই নিষ্কলুষ সতীর চিত্ত কোন ভয়ের, কোন বিপদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই, মৃত্যুর কাছে হার মানে নাই। এক দিকে বজ্রের দৃঢ়তা, অন্য দিকে কুসুমের কোমলতা এই চরিত্রে বিদ্যমান।

চম্পাইনগরে যে সভায় গদ্যে পদ্যে বেহুলার বন্দনা হইয়াছিল, তাহাতে সেই গ্রামের লোক ছাড়া বর্দ্ধমানের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার নাগরিকদিগের মধ্যে কেবল অধ্যাপক সুকুমার সেন ও বণিক হরিশঙ্কর পালের নাম বর্দ্ধমান হইতে লিখিত পূর্ব্বোক্ত চিঠিতে পাইতেছি। স্বৈরিণী, বহুচারিণী, ও বারবিলাসিনী-দিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন 'প্রগতি'র অন্যতম লক্ষণ। মনসা-মঙ্গলে তাহা নাই। সুতরাং মনসামঙ্গলের কোন চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া বহু 'প্রগতি'পন্থী নাগরিক হুড়াহুড়ি করিয়া কলিকাতা হইতে চম্পাইনগরে হাজির হইবেন, ইহা কাহারও আশা করা উচিত নয়। বস্তুতঃ চম্পাইনগরে যে বেহুলার স্মারক একটি সভা হইবে, এ সংবাদও আমরা কাগজে প্রকাশিত হইতে দেখি নাই।

সভার উদ্যোক্তারা এই উপলক্ষ্যে একটি মেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর এই মেলা হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে মনসামঙ্গলের পালার বন্দোবস্ত হইলেও বেশ হয়। আমরা বাল্যকালে এইরূপ যাত্রা দেখিয়াছি শুনিয়াছি। একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে বেহুলার মর্ম্মর মূর্তি রাখিবার প্রস্তাবও হইয়াছে। তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মূর্তিটিকে বেহুলার চরিত্রের দ্যোতক করিতে পারিবেন, এমন শিল্পী আগে খুঁজিয়া পাওয়া দরকার। নতুবা মানসী মূর্তিই শ্রেষ্ঠ।

ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস-স্মৃতিসভা

ভারতবর্ষ বড় দেশ। ইহাতে নানা জাতির লোকের বাস। তাহারা নানা ভাষায় কথা বলে। প্রাচীন কালে এই প্রকার নানা প্রভেদের মধ্যে একটি বন্ধনসূত্র ছিল সংস্কৃত ভাষা। সবাই যে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিত বা সংস্কৃত বুঝিতে পারিত, তাহা নহে। যত রকম প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে কতক সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হইত, কতক বা কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে ব্যবহৃত হইত। আদিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতিদের ভাষায় সাহিত্য ছিল না। তাহাদের নানা ভাষা সংস্কৃতের জ্ঞাতি নহে, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বহু শব্দ প্রাচীন কাল হইতেই আসিয়া থাকিবে। আবার দক্ষিণ-ভারতের তামিল প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন সাহিত্যবান ভাষাও সংস্কৃতের জ্ঞাতি নহে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত ও সংস্কৃতোদ্ভব বহু শব্দ স্থান পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে।

এই জন্য বলিয়াছি, ভারতবর্ষের নানা অংশের নানা প্রভেদের মধ্যে সংস্কৃত ছিল ঐক্যসূত্র। ইহা এখনও অনেকটা ঐক্যসূত্রের কাজ করে।

আর এক ঐক্যসূত্র, হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষের বেদ-আদি হিন্দু শাস্ত্রসমূহ এবং প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত। বেদ আদি প্রাচীন শাস্ত্রের অনুবাদ ভারতের কোন কোন আধুনিক ভাষায় হইয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর আগে হয় নাই। কিন্তু ঠিক্ অনুবাদ না হইলেও আধুনিক নানা ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ লিখিত হইয়াছে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে। বাংলায় রামায়ণ লিখিত হইতে আরম্ভ হয় মোটামুটি পাঁচ শত বৎসর আগে। হিন্দীতে তুলসী-কৃত রামায়ণ লিখিত হয় তাহার পরে। অন্য কোন কোন ভারতীয় ভাষাতেও রামায়ণ আছে। ভারতবর্ষের যে-যে অংশে তথাকার ভাষায় রামায়ণ আছে, সেই সব অংশের পরস্পরের সহিত এবং জাভা প্রভৃতিরও সহিত যোগসূত্র এই মহাকাব্য। রামায়ণের নানা পুরুষ- ও স্ত্রী- চরিত্রের প্রভাব বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের এবং দ্বীপময় ভারতের অগণিত মানুষের উপর পড়িয়াছে। ফলে এই সব মানুষ যেন অনেকটা এক ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। অতএব, আমাদের রাজনীতিকেরা ভারতীয়দের যে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য চান, রামায়ণ তাহা অনেকটা করিয়া রাখিয়াছে।

তুলসীকৃত রামায়ণ সম্বন্ধে শুনিয়াছি বহুভাষাবিৎ গ্রিয়ার্সন সাহেব বলিয়াছেন যে, ইয়োরোপে বাইবেলের প্রভাব যত ও যেরূপ, ভারতবর্ষের হিন্দীভাষী অংশে তুলসীদাসের রামচরিতমানসের প্রভাব তার চেয়ে বেশী। বাংলা দেশে রামায়ণের প্রভাবও ঐ জাতীয়। এই প্রভাব সাক্ষর নিরক্ষর সকলের উপর—এখন হয়ত বা "শিক্ষিত"-দের চেয়ে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতদের উপর ইহার প্রভাব অধিক। আগে যাহারা রামায়ণ পড়িতে পারিত না, তাহারা রামায়ণ-গায়কের গান শুনিয়া, রামায়ণ-পাঠকের পঠন শুনিয়া, কথকের কথকতা শুনিয়া এবং রামায়ণের কোন-না-কোন অংশের যাত্রা দেখিয়া শুনিয়া এই মহাকাব্য হইতে অনুপ্রাণনা লাভ করিত। এখনও, ছেলেমেয়েদের গৃহপাঠ্য বহু পুস্তক ও মাসিক কাগজ সত্ত্বেও, রামায়ণ তাহাদের আকর্ষণের বস্তু আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"একমাত্র কাহিনী ছিল রামায়ণ মহাভারতকে অবলম্বন ক'রে, যা মানবচরিত্রের নতোন্নতকে নিয়ে হিমালয়ের মতো ছিল দিক থেকে দিগন্তরে প্রসারিত। কিন্তু সে হিমালয় বাংলাদেশের উত্তরতম সীমার দূর গিরিমালার মতোই; তার অভ্রভেদী মহত্ত্বের কঠিন মূর্তি সমতল বাংলার রসাতিশয্যের সঙ্গে মেলে না। তা বিশেষভাবে বাংলার নয়, তা সনাতন ভারতের।"

ইহা সত্য।

কিন্তু রামায়ণ বিশেষভাবে বাংলার না-হইলেও বাংলারও বটে। এক দিকে রামায়ণ যেমন ভারতবর্ষের অন্য বহু অংশের সহিত বঙ্গের অলক্ষিত ঐক্যসূত্র হইয়া আছে, তেমনি কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণের কোন কোন চরিত্রকে কিয়ৎ পরিমাণে বাঙালীর ছাঁচে ঢালায় তাহা বাঙালীর কতকটা নিজস্বও হইয়াছে। আর এই কৃত্তিবাসী বা কৃত্তিবাসী বলিয়া বিদিত রামায়ণই বাংলা দেশে চলিয়া আসিতেছে বেশী।

কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে। সেখানে গত ফাল্গুন মাসে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য শান্তিপুর সাহিত্য-

পরিষৎ একটি সভার আয়োজন করেন। সভা হইয়াছিল একটি খোলা মাঠে। তাহার এক দিকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় নির্মিত কৃত্তিবাস-স্মৃতিস্তম্ভ ও পথিকদের জন্য পানীয় জলের বৃহৎ কূপ এবং অন্য দিকে কৃত্তিবাসের নামে উৎসর্গীকৃত একটি পাকা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঈস্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সুযোগ্য অফিসার অমিয় বসু মহাশয়ের চেষ্টায় শিয়ালদহ হইতে ফুলিয়া স্টেশন পর্য্যন্ত যাতায়াতের বন্দোবস্তও ভাল হইয়াছিল। তিনি সস্ত্রীক এবং তাঁহার সহকারী এক জন সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফুলিয়া গ্রামের অনেকগুলি লোক ও শান্তিপুরের কিছু রামায়ণানুরাগী লোক ছাড়া কলিকাতা ও রাণাঘাট মিলাইয়া জনা পঞ্চাশ লোকও সভায় যোগ দিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমাদের জাতির আবালবৃদ্ধবনিতা অগণিত মানুষের উপর রামায়ণের প্রভাব যত, ইংরেজ জাতির উপর শেক্সপিয়রের প্রভাব তত না হইলেও ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-য্যাভন ইংরেজের একটি সাহিত্যিক তীর্থ, কিন্তু ফুলিয়া বাঙালীর সাহিত্যিক তীর্থ হয় নাই। শেক্সপিয়র ও কৃত্তিবাস এক প্রকারের কবি নহেন। তাঁহাদের স্বজাতিরা কি ভাবে তাঁহাদিগকে সম্মান করেন, আমাদের তাহাই বক্তব্য।

আকাশে ছোটবড় তারা উঠে প্রত্যহই, চন্দ্রও অনেক দিন দেখা যায়। কিন্তু একটা ধূমকেতু উঠিলে লোকে যেমন ভিড় করিয়া দেখে, আতস বাজিও যেমন ভিড় করিয়া দেখে, তারকাচন্দ্রমাখচিত আকাশ তেমন ভিড় করিয়া লোকে দেখে না।

জল না হইলে মানুষের চলে না, কিন্তু অনেক কৃত্রিম পানীয় মানুষের যেমন লোভের বস্তু, জল তেমন নয়।

অন্ন বিনা মানুষ সুস্থ সবল প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? চাট ও চাটনি এবং তদ্বিধ অনেক জিনিষ অনেক লোকের অধিক প্রিয়।

যে-সকল সদ্‌গুণ ও মহদ্‌গুণ সুস্থ মানব-চরিত্রের ভিত্তীভূত, মানুষের সহিত মানুষের যে-সকল সম্পর্ক ও তদুচিত আচরণ মানুষের আনন্দের কারণ ও লোকস্থিতির মূলীভূত, যে-সব কাব্যে তাহার প্রাচুর্য্য বশতঃ তৎসমুদয় সহজ মানুষের প্রিয়, সেগুলি সাহিত্যিক চাট-ও-চাটনি-ভক্তদের প্রিয় হইবার কথা নয়। তাহারা চায় বিকৃত সমাজের নানা ব্যাধিজ সমস্যার বর্ণনা—যে-সব সমস্যার অনেকগুলা ভারতবর্ষের নহে, বঙ্গের নহে। তাহারা চায় স্বৈরিণী বহুচারিণী বারবিলাসিনীদের এবং তদ্বিধ পুরুষদের অপচরিতের বিবৃতি। কৃত্তিবাস তাহাদিগকে এরূপ কিছু যোগাইয়া অপকীর্ত্তিমান হন নাই। সুতরাং তাঁহার স্মৃতিসভায় ভিড় না হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তাঁহার গত স্মৃতিসভায় প্রস্তাব হয় যে, ভবিষ্যতে সভার সঙ্গে মেলার ব্যবস্থা করা হইবে। রামায়ণ-গান ও যাত্রার ব্যবস্থার কথাও বলা হইয়াছে। এরূপ মন্তব্য ঐ সভায় করা হইয়াছে যে, কৃত্তিবাস-স্মৃতিসভার বন্দোবস্ত সমগ্র বঙ্গের সমুদয় সাহিত্যিক সমিতির সহযোগিতায় হওয়া উচিত—ইহা কেবল শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের পিতৃমাতৃদায় নহে। অনেকে আশা করেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এ-বিষয়ে অগ্রণী হইবেন। পরিষৎ বহুবৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসী রামায়ণের খাঁটি পাঠোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে পরিষদের অগ্রণীত্ব স্বাভাবিক, সঙ্গত ও শোভন হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

আগামী ২৫শে ও ২৬শে চৈত্র শনিবার ও রবিবার কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন হইবে। স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা বীর-বিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর সম্মিলনের উদ্বোধন করিবেন। সমগ্র ভারতবর্ষে ত্রিপুরার এই একটি বিশেষত্ব আছে যে, ইহার সমুদয় রাজকার্য্য দেশভাষায় হইয়া থাকে। এই দেশভাষা বাংলা। বাংলায় ত্রিপুরার সব রাজকার্য্য হয়। বার্ষিক রিপোর্ট, সেন্সস রিপোর্ট প্রভৃতিও বাংলায় লিখিত হয়। এই রাজবংশ বহুকাল হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা। বর্ত্তমান মহারাজা যে কুমিল্লার অধিবেশনের উদ্বোধন করিবেন ইহা তাঁহার বংশোচিত এবং এবারকার অধিবেশনের একটি বিশেষত্ব।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয় বহু সাহিত্যিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে কুমিল্লার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিতেছেন—এমন কি, তিনি এই অনুরোধ লইয়া অ-সাহিত্যিক প্রবাসী-সম্পাদকের বাসাতেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। এরূপ উদ্যোগী পুরুষ ও তাঁহার সহযোগীরা যে-অধিবেশনের আয়োজন করিতেছেন, তাহার সাফল্যের আশা নিশ্চয়ই করা যায়।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। শাখা এবার পাঁচটি হইবে। যথা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও সঙ্গীত। এগুলির সভাপতি হইবেন যথাক্রমে মৌলবী আবদুল ওদুদ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এবং শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সাধারণ সভাপতি এবং শাখা সভাপতিগণ সকলেই অধ্যাপক বা ভূতপূর্ব অধ্যাপক। তাঁহারা যে সকলেই বিদ্বান ও যোগ্য ব্যক্তি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে, অধ্যাপক নহেন, ছিলেনও না, এমন সাহিত্যিক দু-এক জনকেও কোন প্রকার সভাপতি করিলে কিছু বৈচিত্র্য হইত। যাহাদিগকে সভাপতি করা হইয়াছে তাঁহারা সবাই ক্লাস্-লেক্‌চার দিবেন, এরূপ সন্দেহ করি না বা বলি না। কিন্তু কোন কোন অধ্যাপক সর্বসাধারণের সভাতেও ঐরূপ বক্তৃতা করিয়া থাকেন, এবং তখন কস্মিন্ কালেও অধ্যাপক ছিলেন না এরূপ বক্তার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

যাহাতে এই অধিবেশনের আলোচনা সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়, সেই নিমিত্ত সম্মিলনের পরিচালক-সমিতি এবার স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার অধিবেশনে যথাক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মহাকাব্য, শঙ্করের বিজ্ঞানবাদ, গুপ্তরাজগণের সাম্রাজ্যবাদের সফলতা এবং বঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রচলনের সুবিধা ও অসুবিধা—এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। আলোচনার বিষয় আগে হইতে জানাইয়া দেওয়া উত্তম। বিজ্ঞানশাখার আলোচ্য বিষয়টি খুব সময়োপযোগী ও কেজো। সাহিত্যশাখার বিষয়টি বর্ত্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন সমস্যাবিষয়ক না হইলেও গুরুত্বপূর্ণ বটে। পরিচালক-সমিতি উনবিংশ শতাব্দীর কোন্ কোন্ বাংলা কাব্যকে মহাকাব্য মনে করেন, তাহা বলিয়া দিলে মন্দ হইত না। যেমন অতিকায় নানা জীবের যুগ চলিয়া গিয়াছে, সেইরূপ মহাকাব্যের যুগও বোধ হয় চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এখন কোন দেশে মহাকাব্য লিখিত হইতেছে কিনা বলিতে পারি না। সাহিত্যে যেমন, দর্শনে ও ইতিহাসেও সেইরূপ, সম্মিলন এরূপ বিষয়েরই আলোচনা করিবেন যাহা বর্ত্তমানে বিদ্বন্মণ্ডলীর বিচার্য বটে এবং ভবিষ্যতেও বিচার্য থাকিবে। কিন্তু এই বিষয়গুলির ইণ্টারেস্ট্ অনেকটা য়্যাকাডেমিক, এগুলি বর্ত্তমানে সাধারণতঃ মানুষের মনকে আলোড়িত করিতেছে না, বঙ্গের মানুষের মনকেও আলোড়িত করিতেছে না। হইতে পারে যে, সম্মিলন জিয়ন্ত কোন সমস্যা বা প্রশ্নের বিচারস্থল নহে। তাহা হইলে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই।

অভ্যর্থনা-সমিতি প্রতিনিধিগণের কুমিল্লা যাতায়াতের সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত ঈস্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কুমিল্লায় যে তাঁহাদের আরামের ও চিত্তবিনোদনের আয়োজন হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

—

বাঙালী কাপড়ের কলওআলাদের দুঃখ

বাঙালী কাপড়ের কলওআলারা তাঁহাদের বার্ষিক সভায় দুঃখ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কাপড়ের কাটতি কমিয়াছে ও বাহিরের কাপড় বঙ্গে আসিয়াছে বেশী। দৈনিক হইতে মাসিক পর্য্যন্ত বঙ্গের দেশী বাংলা ও ইংরেজী কাগজগুলি বাঙালীদিগকে বঙ্গে উৎপন্ন কাপড়ই ব্যবহার করিতে বারবার বলিয়া আসিতেছে। চা-পানের পক্ষে অধিকাংশ কাগজ তেমন করিয়া কখন কিছু লেখে না। এবং সভ্য মানুষের পক্ষে কাপড় পরা যেমন দরকার, চা-পান তেমন একান্ত আবশ্যক নহে। তথাপি চা-ব্যবহার-বর্ধক সমিতি নানা ভঙ্গীর নানা বিজ্ঞাপনের দ্বারা চা-

পানের অভ্যাস বাড়াইয়া চলিতেছে। কিন্তু দুই-একটি কাপড়ের মিল ছাড়া অধিকাংশ মিল কোন কাগজে কোন বিজ্ঞাপনই দেন না, এবং যাঁহারা দেন তাঁহারাও অতি অল্পসংখ্যক কাগজে বিজ্ঞাপন দেন ও তাঁহাদের বিজ্ঞাপন একঘেয়ে, তাহাতে কোন বৈচিত্র্য নাই। চা-পান-বর্ধক সমিতি সকল চা-বাগানের পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপন দেন—বিশেষ কোন কোন বাগান বিজ্ঞাপন দেন বা না দেন, সমিতি নিজের কাজ নিয়মিত ভাবে অবিরত করিয়া চলিতেছেন। বাঙালী মিল-মালিকদের সমিতিরও এইরূপ ব্যাপক, বিচিত্র, বিরামবিহীন, সুশৃঙ্খল বিজ্ঞাপন-অভিযান চালান কর্তব্য। তদ্ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন মিলের বিচিত্র বিজ্ঞাপনও বাহির হওয়া আবশ্যক। বাঙালীদের মিলগুলির সমিতি এবং আলাদা এক-একটি মিল বাঙালী জনসাধারণকে তাঁহাদের উৎপাদিত জিনিষগুলি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন রাখিবার জন্য অক্লান্ত-চেষ্টা ও ব্যয় করিবেন না, কেবল কাগজওআলাদের স্বদেশীর মহিমাকীর্ত্তনের চোটে কেল্লা ফতে হইবে, ইহা দুরাশা মাত্র।

জানি, বঙ্গের বাহিরের কাপড়—বিদেশী কাপড় ও বি-প্রদেশী কাপড়—প্রধানতঃ সস্তা দামের জোরে কাটতি বাড়াইতেছে। বাঙালী মিল-মালিকদিগকেও কাপড় সস্তা করিবার অবিরাম চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু যত দিন তাঁহারা দামের প্রতিযোগিতায় জয়ী না হইতেছেন, তত দিন বঙ্গজাত জিনিষের প্রতি বাঙালীর টানের উপর ও বিজ্ঞাপন-অভিযানের উপর বেশী করিয়া নির্ভরও করিতে হইবে। সব শহরের ও গ্রামের সব দোকানে তাঁহাদের কাপড় যাহাতে পাওয়া যায় তাহার বন্দোবস্তও করিতে হইবে।

—

আমদানী তুলার উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি

যে-তুলা হইতে মিহি সুতা হয়, তাহা প্রধানতঃ বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়। তাহার দাম, বোম্বাই মধ্যপ্রদেশ ও বাংলা সর্বত্র মোটামুটি সমান। অন্য তুলা মধ্যপ্রদেশে ও বোম্বাইয়ে বেশী হয়, বঙ্গে হয় না। এই জন্য সে-তুলার সুতা ও কাপড়ে বাংলা দেশের পক্ষে বঙ্গের বাহিরের ভারতীয় সুতা ও কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কঠিন। কিন্তু মিহি সুতা ও কাপড়ে প্রতিযোগিতা বাংলা করিতে পারে ও করে। আগামী বৎসরের সমগ্রভারতীয় বজেটে আমদানী তুলার উপর শুল্ক দ্বিগুণ করিয়া সেই প্রতিযোগিতা খুব কঠিন করা হইতেছে। বঙ্গের কাপড়ের কলগুলির উপরই এই শুল্কবৃদ্ধির কুফল সকলের চেয়ে অধিক অনুভূত হইবে। কারণ, এইগুলি কেবল বিদেশী তুলাই ভারতীয় অন্য মিলগুলির সমান ব্যয়ে পায় বলিয়া সেই তুলা হইতে মিহি সুতা ও কাপড় উৎপাদনে অধিক মন দিয়া থাকে।

সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বাঙালী সভ্যেরা অবশ্য এই শুল্কবৃদ্ধির প্রতিবাদ করিবেন ও তাহার বিরুদ্ধে ভোট দিবেন। অন্যেরাও অনেকে তাহা করিবেন।

—

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও ভগিনীদ্বিতীয়া

যতদূর মনে পড়ে, যখন যুবক ছিলাম তখনই মনে মনে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলাম যে, যদি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে বড় ভাইয়ের সংবর্ধনা এবং ছোট ভাইয়ের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই দিন বা অন্য কোন দিন বড় বোনের সংবর্ধনা ও ছোট বোনের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন কেন অনাবশ্যক মনে হয়। হয়ত সঙ্গীদের সঙ্গেও এবিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকিব। নিজের সম্পাদিত বা অন্যের সম্পাদিত কোন-না-কোন কাগজে এবিষয়ে কিছু লিখিয়াও থাকিতে পারি—এখন তাহা মনে নাই।

আগামী ভাইদ্বিতীয়া আসিতে এখন অনেক মাস বাকী। কিন্তু প্রবাসীর গত সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের "ভাই দ্বিতীয়া" কবিতা হইতে দুই জায়গায় কিছু উদ্ধৃত করায় এই উৎসবের কথাটা বারবার মনে হইতেছে। তাই আমাদের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিব মনে করিলাম।

কবি ঐ কবিতায় লিখিয়াছেন বটে, "সংসারে বোনটি নেহাৎ অতিরিক্ত"। কিন্তু তাহা তাঁহার মত নহে। সমাজে নারীরা যেরূপ ব্যবহার পায়, তাহারই সংক্ষিপ্ত সূচনা ঐ কয়টি কথাতে আছে। নারীরা নেহাৎ অতিরিক্ত ত নহেনই; তাঁহারা অত্যাবশ্যক। তাঁহাদের প্রতি তাচ্ছিল্য, তাঁহাদের প্রতি অযত্ন যে-সমাজে হয়, তাহার

অধোগতি ও শক্তিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হইলেও তাঁহার প্রতিকার না হইলে তো সমাজের অধঃপতন নিশ্চিত।

কবি তো নূতন উৎসব কয়েকটিই শান্তিনিকেতনে চালাইয়াছেন। তিনিই ভগিনীদ্বিতীয়াও (বা -তৃতীয়া, বা -চতুর্থী, বা -পঞ্চমী,…) চালাইলে ভাল হয়। যত রকম শক্তি ও বহুমুখী প্রতিভা থাকিলে একটি উৎসবকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন, সুশোভন ও আনন্দদায়ক করা যায়, তাহা তাঁহার আছে।

—

বঙ্গীয় হিন্দু-সম্মেলনের সামাজিক প্রস্তাবাবলী

গত মাসে খুলনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলনে রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক যতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সবগুলিই গুরুত্বপূর্ণ ও সমর্থনযোগ্য। আমরা প্রধানতঃ সামাজিক প্রস্তাবগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। সেই প্রস্তাবগুলি অনুসারে কাজ না হইলে বঙ্গের হিন্দুসমাজের রাষ্ট্রিক শক্তি যতটা কমিয়াছে সেই হ্রাস বৃদ্ধিতে পরিণত হইবে না, বরং সেই শক্তি লুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। বাঙালী হিন্দুরা সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসমাজের একটি প্রধান অংশ, এবং সমগ্র ভারতীয় মহাজাতিরও (নেশ্যনেরও) একটি প্রধান অংশ। অতএব বাঙালী হিন্দুদের সংহতি ও শক্তিবৃদ্ধি ভারতীয় মহাজাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্যও আবশ্যক। ইহাকে কেবল সংকীর্ণ প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার মনে করা ভুল।

এখন আমরা বঙ্গীয় হিন্দু-সম্মেলনের খুলনা অধিবেশনের হিন্দুসংগঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটির আবশ্যক (সামাজিক) অংশগুলি উদ্ধৃত করিব।

এই প্রাদেশিক হিন্দুসম্মেলন মনে করেন যে, হিন্দুসংগঠন অর্থাৎ হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শাখা ও জাতির মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়—বিশেষতঃ এই প্রদেশের হিন্দুদের পক্ষে জীবন-মরণের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং শাখা হিন্দুসভাসমূহের সমগ্র শক্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্মেলন হিন্দুসংগঠন-কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছেন যে,

(ঘ) সর্ব্বত্র হিন্দুসমাজের মহাপুরুষগণ, ধর্ম্মগুরুগণ ও বীরপুরুষগণের বাৎসরিক উৎসব সমবেতভাবে প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুর আত্মগৌরব-বোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা হউক।

(ঙ) হিন্দুমাত্রেই যাহাতে নিজদিগকে জাতিবাচক সংজ্ঞায় আত্মপরিচয় না দিয়া কেবল হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, তজ্জন্য প্রচারকার্য্য চালান হউক।

(চ) বিভিন্ন জাতির (casteএর) ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে যাহাতে বিবাহের প্রচলন হয়, তজ্জন্য প্রযত্ন করা হউক।

(ছ) যে-সকল অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, তাহাদের উপর যাহাতে কোন সামাজিক উৎপীড়ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

(জ) বিবাহে সম্মত বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহের প্রচলন করা হউক।

(ঝ) সাধারণ মন্দির ও দেবস্থানে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমস্ত হিন্দুকে প্রবেশ দর্শন ও পূজার অধিকার দেওয়া হউক।

(ঞ) বাল্যবিবাহপ্রথা নিরোধ করা হউক, এবং এই সম্বন্ধে যে আইন হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য চেষ্টা করা হউক।

(ট) পণপ্রথা উচ্ছেদের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে চেষ্টা করা হউক এবং বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বিবিধ অবান্তর বিষয়ের খরচ যত দূর সম্ভব কমান হউক।

(ঠ) এতদুদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে মল্লশালা স্থাপন করা, লাঠি ও ছোরা খেলা প্রবর্ত্তন করা ও ব্যায়াম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সম্মেলন হিন্দুসভাসমূহকে অনুরোধ করিতেছে।

(ড) হিন্দুসমাজ হইতে যাহাতে পানদোষ ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার দূরীভূত হয়, তাহার চেষ্টা করা হউক।

খুলনার বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলনে বাঙালী হিন্দু-সমাজের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বিনায়করাও দামোদর সাভারকর সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অন্য এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণপ্রধান ডাঃ মুঞ্জে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। অবাঙালী হিন্দু আরও কেহ কেহ এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে, বিরোধিতা ব্যতিরেকে গৃহীত হইয়াছিল।

আধুনিক কালে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ আরম্ভ করে এবং তাহা এখনও চালাইতেছে। ব্রাহ্মেরা হিন্দু কিনা সে প্রশ্ন এখানে তোলা অনাবশ্যক। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এখন বিশাল হিন্দু-

সমাজের প্রতিনিধিরাও বিবাহে ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে জাতিভেদকে উপেক্ষা করিতে বলিতেছেন। তাঁহারা "জাতিবাচক সংজ্ঞায়" আত্মপরিচয় দানের পর্য্যন্ত বিরোধী।

আধুনিক কালে বাল্যবিবাহের কার্য্যতঃ বিরোধিতা ব্রাহ্ম সমাজ আরম্ভ করে। এখন বিশাল হিন্দু সমাজেও বিরোধীর সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে।

বিধবাবিবাহ চালাইবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফল ধীরে ধীরে ফলিতেছে।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জাতিভেদবিরোধী অভিযানের একটি অংশ। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক পুণানিবাসী বিঠল রাম শিন্দে মহাশয়ের প্রস্তাবে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ কংগ্রেসের কার্য্যতালিকার অন্তর্ভূত করেন।

সভাপতি বিনায়করাও দামোদর সাভারকর খুলনায় অস্পৃশ্যতা শুধু কথায় নহে কাজেও অস্বীকার করেন। তথাকার নমশূদ্রজাতীয় একটি ভদ্রলোক, উকীল শ্রীযুক্ত মনোহর ঢালী, তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন ও বলেন যে, তাহাতে অন্যান্য তথা-কথিত অনাচরণীয় জাতির লোকদের সহিত তিনি একত্র এক পংক্তিতে ভোজন করিবেন। তদনুসারে তাঁহার সহিত বহুসংখ্যক মুচি ও মেথর সম্প্রদায়ের লোকও আহার করিয়াছিলেন।

সম্মেলনের নারীজাতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটিও প্রশংসনীয়। যথা—

এই সম্মেলন হিন্দু সমাজের পুনরভ্যুত্থানের জন্য নারী জাতিকে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত করা এবং সর্ব্ব প্রকার বাধা-মুক্ত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রস্তাব করিতেছেন যে,

(ক) নারীগণের অবরোধ-প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হউক।

(খ) নারীগণের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা—বিশেষতঃ যাহাতে তাঁহারা উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা—করা হউক।

(গ) প্রত্যেক নারী যাহাতে শরীরচর্চা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

(ঘ) নারীগণের আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্রধারণ-প্রথা প্রচলনের জন্য যত্ন করা হউক।

যাঁহারা বাংলা দেশে বহু বৎসর পূর্বে অবরোধ-প্রথা আপনাদের মধ্যে উঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং নারীদিগকে উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপ বাধা পাইয়াছিলেন, তাহা এখন স্মর্তব্য।

নারীনির্যাতন সম্বন্ধে হিন্দু-সম্মেলনের প্রস্তাব

খুলনার বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

বাংলার বিভিন্ন জেলায় অসহায়া নারীর উপর যে-সব অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, এই সম্মেলন তজ্জন্য গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। এই সম্মেলনের মতে এরূপ ব্যাপক ও সংঘবদ্ধ নারীনির্যাতন যে কোনও সভ্যদেশ ও সমাজের পক্ষে কলঙ্কজনক, এবং গবর্ণমেন্টের ঔদাসীন্য, রাজকর্ম্মচারীদের অযোগ্যতা এবং কোনও কোনও স্থলে পরোক্ষ সহায়তার ফলেই এই পাপ এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

এই সম্মেলন নির্দ্দেশ করিতেছে যে, নারীর উপর এই সমস্ত পাশবিক অত্যাচারের রোধ ও প্রতিকার-কল্পে হিন্দু জনসাধারণ বদ্ধপরিকর হউন এবং জীবনপণ করিয়াও অপহৃতা নারীদিগকে উদ্ধার করিতে এবং নারীহরণকারী ও তাহাদের সহায়তাকারী দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হউন।

যাহাতে ধর্ষিতা ও অপহৃতা নারীর পূর্ব্ব স্থান সমাজে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

এই প্রস্তাবটি বাঙালী হিন্দুদের পৌরুষের কষ্টিপাথর। এই প্রসঙ্গে সন্তোষের সহিত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সম্মেলন কৃষ্ণকুমার মিত্রের তিরোভাবে শোক প্রকাশ করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, তিনি "এই দুর্ভাগা দেশের লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত নারীসমাজের রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া পরিণত বয়সেও যুবজনোচিত অতন্দ্র কর্ম্মনিষ্ঠা ও শ্রমশীলতা দেখাইয়া গিয়াছেন।"

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন

"আগামী ৮ই ও ৯ই এপ্রিল কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। খান বাহাদুর

মৌঃ আজিজুল হক সি-আই-ই সাহেব অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং মৌলানা মোহাঃ আকরম খাঁ, খান বাহাদুর তসদ্দুক আহ্‌মদ, খান সাহেব মিঃ আনোয়ারউল কাদির, মিঃ হুমায়ুন কবীর, কবি গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ ব্যক্তিগণ সহঃ সভাপতি এবং মিঃ আয়মুন হক খাঁ সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

"মূল সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন প্রবীণ সাহিত্যিক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব।

"শাখাসমূহ নিম্নরূপ ভাগ করা হইয়াছে :—

১। সাহিত্য শাখা—সভাপতি মিঃ এস ওয়াজেদ আলী;

২। কথা-সাহিত্য শাখা " খান সাহেব মৌঃ হেদায়েৎ উল্লাহ্;

৩। কাব্য শাখা ,, কবি নজরুল ইস্‌লাম;

৪। মনন শাখা ,, মৌঃ মোহাঃ বরকত উল্লাহ্, বি-সি-এস।

"সম্মেলনে যোগদান করার জন্য বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নিকট ৪৯ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতায় পত্রব্যবহার করিতে হইবে। মুজীবর রহমান খাঁ, খান বাহাদুর মঈনুদ্দীন, প্রচার-সম্পাদক।"

যদি এই সম্মেলনের ফলে বাঙালী মুসলমানদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় উৎসাহ বাড়ে, তাহা সুখের বিষয় হইবে। সম্মেলনে বিজ্ঞানাদি কি কি শাখা নাই এবং কেন নাই, শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানেরা তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

কুমিল্লায় যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে, তাহাও আগামী ৮ই ও ৯ই এপ্রিলে হইবে। তাহার সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন মৌলবী আবদুল ওদুদ, এবং ঐ সম্মেলনে যোগ দিবার নিমিত্ত কোন একটি সম্প্রদায়কে "বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা" না-হওয়ায় মুসলমানদের তাহাতে যোগ দিতে বাধা নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের চন্দননগর ও কৃষ্ণনগর অধিবেশনে এক একটি শাখায় এক এক জন মসলমান সাহিত্যিক সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

এই সব কারণে মনে হইতেছে, কুমিল্লার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে অনেক মুসলমান যোগ দিতে ইচ্ছা করিবেন। সেই জন্য যদি কুমিল্লার ও কলিকাতার সম্মেলন দুটির তারিখ পৃথক হইত, তাহা হইলে উভয়েই যোগদানে ইচ্ছুক লোকদের সুবিধা হইত।

—

বজেট ঋতু

আমরা আগে আগে বজেটের আলোচনা করিতাম। সম্প্রতি কয়েক বৎসর বিশেষ কিছু করি নাই। করিতে উৎসাহবোধ হয় না।

বসন্তে নবজীবনের সাড়া পড়ে। কিন্তু সমগ্রভারতীয় বজেট এবং প্রাদেশিক বজেটগুলিতে তাহার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তাহার উপর বাংলা দেশের বজেটে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ স্পষ্ট। সরকারী খাজনা-খানায় টাকা দেয় হিন্দুরাই খুব বেশী ও সব চেয়ে বেশী। তাহার জন্য তাহারা চায় না যে, ট্যাক্সের টাকাগুলা বেশী পরিমাণে তাহাদিগকে বকশীশ দেওয়া হউক। সকল সরকারী কার্য্যবিভাগে যদি এরূপ ব্যয়ের ব্যবস্থা হয় যে তাহার দ্বারা সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেরই হিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু অনেক টাকা মুসলমান বলিয়াই মুসলমানদিগকে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অধিকন্তু যে খবরের কাগজটার লেখার প্রভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাংলায় বাড়িয়াছে তাহাকে মবলগ ত্রিশ হাজার টাকা বকশীশ দেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রীদের একটা বাংলা ও একটা ইংরেজী সরকারী সাপ্তাহিক কাগজ আছে। তাহার উপর এই বকশীশ। ট্যাক্সও বাড়িবে।

সমগ্রভারতীয় বজেটে আমদানী তুলার উপর শুল্ক দ্বিগুণিত করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আগে কিছু বলিয়াছি। যাহারা উহার সমর্থনে ওকালতী করিতেছে, তাহারা বলে, মিহি সুতার জন্য আমদানী লম্বা আঁশের তুলার উপর শুল্ক বাড়িলে সেই তুলার দাম বাড়িবে, এবং সেই কারণে ভারতের কৃষকেরা ঐ রকম তুলার চাষে বেশী মন দিবে; সুতরাং ট্যাক্সবৃদ্ধিটা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর। ১৫।২০ বৎসর ধরিয়া সরকারী কৃষিবিভাগ ও বেসরকারী অনেকে লম্বা আঁশের তুলা যথেষ্ট পরিমাণে ভারতে উৎপাদনের চেষ্টা

করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, রাজস্বসচিব বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে কলমের এক আঁচড়ে ট্যাক্স বাড়াইয়া তাহা করিতে পারিবেন, "এ ত বড় রঙ্গ, জাদু"! ভারতবর্ষে মিহি-সূতা ও কাপড় উৎপাদন এখনকার চেয়ে অধিকতর ব্যয়সাধ্য করিয়া দিয়া লাঙ্কেশায়ারের সূতা ও কাপড়-ওআলাদের সুবিধা করিয়া দেওয়া এই শুল্কবৃদ্ধির উদ্দেশ্য; যদি সঙ্গে সঙ্গে জাপানেরও কিছু সুবিধা হইয়া যায়, তাহাতে ইংরেজ রাজস্বসচিব ও তাঁহার জাতভাইদের আপত্তি নাই।

—

নূতন উপন্যাস প্রকাশ

প্রবাসীতে একখানি উপন্যাস যে মাসে শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া যায়, তাহার পর মাসেই আমরা আর একখানি উপন্যাস ছাপিতে আরম্ভ করি। "আরণ্যক" ফাল্গুনের প্রবাসীতে শেষ হইয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান চৈত্র সংখ্যাতেই আর একটি উপন্যাস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতাম। কিন্তু ইহা বৎসরের শেষ মাস বলিয়া তাহা করিলাম না। বৈশাখ সংখ্যা হইতেই একখানি নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইবে।

—

ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয়

ভারতবর্ষের রাজস্ব যত আদায় হয়, তাহার তুলনায় ইহার সামরিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী, এবং এই ব্যয় ভারত-রক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত করা হয় না—তাহার ইংরেজাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত এবং ইংরেজদের সাম্রাজ্যরক্ষা ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্যও করা হয়। ব্যয় সম্বন্ধে আপত্তি এইরূপ। আর তিনটি আপত্তি এই যে, (১) ভারতবর্ষের সৈন্যদলে কেবল ভারতীয় লোকদিগকেই রাখিয়া গোরা সৈন্যদিগকে বিদায় দেওয়া উচিত; কেন-না, ভারতীয় সিপাহীরা সাহসে ও যুদ্ধনৈপুণ্যে গোরাদের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, গোরা সৈন্যেরা ভারতবর্ষের বিজিতত্বের স্মারক প্রতীক, এবং তাহাদের জন প্রতি সিপাহীদের চেয়ে অনেক বেশী খরচ হয়। (২) সেনানায়কের কাজে কেবল ভারতীয়দেরই নিয়োগ হওয়া উচিত, সেই নিমিত্ত যাহাতে বর্ত্তমান ইংরেজ সেনানায়কদের পদ ভারতীয়েরা যথাসম্ভব শীঘ্র লইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে যথেষ্টসংখ্যক ভারতীয়কে যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধনেতৃত্ব শিখাইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। (৩) ভারতীয় সিপাহী সংগ্রহ সামান্য কয়েকটি প্রদেশ ও অঞ্চল হইতে না করিয়া ভারতবর্ষের সমুদয় অংশ হইতে করা উচিত। যাহা যাহা উচিত বা আবশ্যক বলা হইল, তাহা করা হইতেছে না।

সামরিক বিভাগ ও সামরিক ব্যয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের যে-সকল অভিযোগ আছে, তাহার উপর বঙ্গের এই অভিযোগও আছে যে, বাংলা ভারতগবন্মে´ন্টকে সব চেয়ে বেশী টাকা দেয়, সুতরাং সামরিক ব্যয়েরও অধিকতম অংশ বাংলা জোগায়, কিন্তু ব্যয়ের যথোচিত অংশ বাংলা দেশ সিপাহী সেনানায়ক ও সামরিক বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীর বেতন বাবতে কিংবা যুদ্ধের নানা সরঞ্জাম যোগাইয়া তাহার মূল্য বাবতে পায় না; সামরিক ব্যয়ের টাকার বঙ্গের অংশও, অন্যান্য অংশের মত, অবাঙালীরাই পায়।

—

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় রেলওয়ে বজেটের আলোচনার সময় জানা গিয়াছে যে, গত বৎসর রেলের প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে চারি লক্ষ, দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিয়াল্লিশ লক্ষ, মধ্যম শ্রেণীতে এক কোটি তের লক্ষ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পঞ্চাশ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ যাত্রী গিয়াছিল। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা ভাড়া দিয়াছিল মোট উনআশি লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ, মধ্যম শ্রেণীর এক কোটি বাইশ লক্ষ এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সাতাশ কোটি বাষট্টি লক্ষ টাকা ভাড়া দিয়াছিল। প্রতি বৎসরই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা রেলওয়েকে সকলের চেয়ে বেশী টাকা দিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা প্রত্যেকে যাহা দেয় তাহা অন্যান্য শ্রেণীর প্রত্যেক যাত্রীর ভাড়ার চেয়ে কম বলিয়া এবং তাহারা সাধারণতঃ গরীব ও নিরক্ষর বলিয়া তাহাদের আরাম ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি কম দেওয়া হয়। ইহা ঠিক নয়। কোন বড় মুদীর দোকান থেকে কয়েক জন ধনী গৃহস্থ দামী চাল কিছু কিছু কিনিলেই তাহার দোকান

চলিতে পারে না। মোটা চাল খায় এ-রকম অনেক ক্রেতা থাকিলেই তবে তাহার কারবারে লাভ হয়।

মহীশূর রাজ্যের সরকারী রেলওয়ের সব তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বৈদ্যুতিক পাখা লাগান হইবে। রাজ্যটি বৃহৎ নহে, রেলপথও খুব দীর্ঘ নহে। কিন্তু আয়ও তদনুরূপ কম।

ভারতবর্ষের সরকারী রেলওয়েগুলি অনেক হাজার মাইল লম্বা। তাহার তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে বৈদ্যুতিক পাখা লাগাইবার প্রস্তাব অনেকবার আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কাজে কিছু করা হয় নাই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ঘরে অবশ্য বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খায় না। কিন্তু ঘরে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর মত বস্তাবন্দী হইয়া থাকিতেও বাধ্য হয় না। তাহাদের গাড়ীগুলিতে অনেক সময় অত্যন্ত বেশী যাত্রী জোর করিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। ইহা বন্ধ করা উচিত, এবং গ্রীষ্মকালে সেগুলিতে বৈদ্যুতিক পাখা লাগাইয়া দেওয়া উচিত। সরকারী একটা আন্দাজ দেওয়া হইয়াছে যে তাহা করিতে এককালীন থোক দুই কোটি টাকা খরচ হইবে এবং পাখাগুলি চালাইতে ও ভাল অবস্থায় রাখিতে বাৎসরিক ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। কিন্তু যে খরিদদারদের নিকট হইতে বৎসরে আটাশ কোটি টাকা পাওয়া যায়, তাহাদের জন্য দুই কোটি টাকা এককালীন ও ত্রিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক খরচ যে-কোন বুদ্ধিমান ব্যবসাদারের করা উচিত।

—

রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির সংলগ্ন রমেশ-ভবনের প্রতিষ্ঠাকার্য্য গত ২৫এ ফাল্গুন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মূর্ত্তি ও চিত্রও রক্ষিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীযুক্তা অরুণা সেন তাঁহার ছবিটি আঁকিয়া পরিষদকে উহা উপহার দিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত পিতার আবক্ষ মূর্ত্তিটি পরিষদকে উপহার দিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সর্ বিজয়চন্দ্ মহতব্ বাহাদুরের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য নির্বাহিত হয়। সঙ্গীতাদি রমেশচন্দ্রের পৌত্রী ও দৌহিত্রীগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। রমেশ-ভবন সমিতির সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ব্যবহৃত দ্রব্য, পুস্তকাদির পাণ্ডুলিপি এবং পত্রাদি প্রদর্শিত হয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অগ্রণী এবং তাহার প্রথম সভাপতি ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে রমেশ-ভবন পরিষদ্ মন্দিরের একটি অঙ্গরূপে নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কেবল পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি বলিয়াই দেশের লোকদের কৃতজ্ঞতা ভাজন নহেন। তিনি ইংরেজীতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়া, ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতবর্ষের যে আর্থিক অবনতি ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার ইতিহাস লিখিয়া, ভারতবর্ষের একখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাস লিখিয়া, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজীতে লিখিয়া এবং রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যায়িকা ইংরেজী কবিতায় লিখিয়া সমুদয় ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি যে একজন বড় রাজনীতিক ছিলেন, বড়োদার পরলোকগত মহারাজা সয়াজীরাও গায়কবাড়ের তাঁহাকে দেওয়ান নিযুক্ত করাতেই তাহা বুঝা যায়—যদিও তাহার অন্য প্রমাণের অভাব নাই। তিনি একবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার কীর্তি ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশ, এবং বঙ্গ বিজেতা, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, মাধবীকঙ্কণ, সংসার ও সমাজ উপন্যাসগুলি প্রণয়ন। আমরা যৌবনে তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি পড়িয়া হৃদয়ে দেশভক্তির স্পন্দন অনুভব করিতাম। তাঁহার সমুদয় উপন্যাসই মনোজ্ঞ, সুরুচিসঙ্গত, ও সুনীতির পরিপোষক, যদিও কোনটিই তিনি উপদেশ দিবার জন্য লেখেন নাই।

তাঁহার সম্বন্ধে আমার কিছু বাল্যস্মৃতি, যৌবনস্মৃতি, এবং প্রৌঢ় বয়সের স্মৃতি হইতে বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি যখন

বাঁকুড়া জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রবেশিকা শ্রেণীতে উঠি, তখন সেবারকার বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে মার্ক দেওয়া বিষয়ে এরূপ অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন যে, এক জন ছাত্রকে এক শ'র মধ্যে ছিয়ানব্বই নম্বর দিয়াছিলেন। তাহাতে আমাদের হেডমাস্‌টার পূজ্যপাদ স্বর্গত চন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় তাঁহার নিকটে গিয়া বলেন যে, এত নম্বর দিলে ছাত্রেরা অহঙ্কৃত হইবে ও তাহারা আর পরিশ্রম করিবে না। মৈত্র মহাশয় খুব বিদ্বান্ ছিলেন, রমেশচন্দ্র তাঁহাকে খুব সম্মান করিতেন। তাঁহার কথায় তিনি ঐ ছাত্রটির নম্বর কিছু কমাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ বৎসর দত্ত মহাশয় তাহাকে ইংরেজী সাহিত্যে ভাল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য "Maunder's Treasury of History" বিশেষ-পুরস্কার দিয়াছিলেন। ঐ ছাত্রটি যখন কালক্রমে গত শতাব্দীতে বালকবালিকাদের মাসিকপত্র "মুকুলে"র অন্যতম সহকারী সম্পাদক হন, তখন দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে একটি প্রবন্ধ চাওয়ায় তিনি সে-সময় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তাঁহার যে একখানি ইংরেজী ভ্রমণ-পুস্তক ছাপা হইতেছিল তাহারই কিছু অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে বলেন। তিনি তখন দার্জিলিঙে ছিলেন। অনুবাদটি তাঁহাকে পাঠাইলে তিনি তাহা দেখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া ফেরত দেন। তাহাতে সংশোধন কিরূপ ছিল বা ছিল না, এখন তাহা আমার মনে নাই। ঐ ছাত্রটি পরে যখন এলাহাবাদের একটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হন তখন দত্ত মহাশয় একবার এলাহাবাদ গিয়াছিলেন। উক্ত অধ্যাপক তাঁহার বাসভবনে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি কোথায় বাহিরে গিয়াছিলেন। এই জন্য একখানি চিঠি সমেত তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত "Maunder's Treasury of History"-খানি অধ্যাপক তাঁহাকে, তাঁহার অবগতির জন্য, পাঠাইয়া দেন। তিনি অবিলম্বে পরিহাস করিয়া এই মর্ম্মে অধ্যাপককে লেখেন যে, "তাহা হইলে ত আমি আপনার বাল্যকালে ভবিষ্যদ্দর্শীর মত ঠিকই বুঝিয়াছিলাম যে, আপনি পরে ইংরেজীর অধ্যাপক হইবেন।"

দত্ত মহাশয়ের কোন ভবিষ্যৎ জীবনচরিতলেখক এই সামান্য ঘটনাগুলি হইতে হয়ত তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোক পাইতে পারিবেন।

—

জামশেদজী টাটা শতবার্ষিক উৎসব

জামশেদজী টাটার জন্মের শতবার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। তিনি নানা কারণে চিরস্মরণীয়। জামশেদপুরের বৃহৎ লোহা ও ইস্পাতের কারখানা তাঁহার দূরদৃষ্টি, ব্যবসা-বুদ্ধি ও সাহসের ফল। ইহাতে যে কেবল তাঁহার পরিবারের ও কারখানা-কোম্পানীর লাভ হইতেছে তাহা নহে। বহুসংখ্যক ভারতীয় বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের ও দক্ষতার ইহা প্রয়োগক্ষেত্র হইয়াছে, অনেক হাজার কারিগর ও মিস্ত্রি এবং সাধারণ শ্রমিক ইহাতে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে, এবং লোহা ও ইস্পাতের কারখানার সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন কোন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। টাটার কারখানা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তম লোহা ও ইস্পাতের কারখানা। বাঙ্গালোরে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্দির (Indian Institute of Science) আছে, তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই বদান্যতা ও উদ্যোগিতায় স্থাপিত হয়। শিল্পের কারখানা উন্নততম ও নূতনতম প্রণালীতে চালাইতে হইলে এবং নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আবশ্যক, জামশেদজী তাহা বুঝিতেন। বাঙ্গালোরের বিজ্ঞানমন্দির তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৃত্তি পাইয়া অনেক ভারতীয় ছাত্র বিদেশে শিক্ষালাভানন্তর জীবনে কৃতী হইয়াছে। মানুষের কোন কোন দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসাবিষয়ে গবেষণার নিমিত্তও টাটা-পরিবার বিদেশীদের ও ভারতীয়দের নিমিত্ত অনেকগুলি বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রতিবৎসরই সেগুলি যোগ্য ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হয়।

—

মনীষী প্রমথনাথ বসু

ভূতত্ত্ববিৎ ও অন্য বহুদিকে প্রতিভাবান প্রমথনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জ রাজ্য হইতে যে প্রচুর লোহা পাওয়া যাইবে তাহা আবিষ্কার না করিলে জামশেদপুরে টাটার

কারখানা স্থাপিত হইতে পারিত না। যথাযোগ্যভাবে তাঁহারও স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা হইতেছে, ইহা সন্তোষের বিষয়

কলিকাতায় শ্রীনিকেতনের কুটীরশিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা

সুরুলে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে যে যে কুটীরশিল্প শিখান হয়, কলিকাতাতেও তাহা জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক ভবনে শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহাতে অনেক অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর উপকার হইবে এবং উপার্জ্জনের পথ খুলিবে। শ্রীনিকেতনে প্রস্তুত অনেক সুন্দর জিনিষ বিক্রীর জন্য ২১০ নং কর্ণওআলিস ষ্ট্রীটে রাখা হয়। কলিকাতাতেও অতঃপর সেরূপ জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারিবে।

মৌলবী ওবেইদউল্লার ভারত প্রত্যাগমন

মৌলবী ওবেইদ উল্লাহ্ নামজাদা বিপ্লবী বলিয়া এত দিন দেশে ফিরিতে পারেন নাই। সম্প্রতি দেশে আসিবার অনুমতি পাইয়া গত ৭ই মার্চ (২৩এ ফাল্গুন) তিনি করাচী পৌছিয়াছেন। মুসলিম লীগ তাঁহাকে নিজের দলে পাইতে চেষ্টা করায় তিনি বলেন যে, কংগ্রেসই তাঁহার পোতাশ্রয় ("haven"), তিনি অন্য বন্দরে ভিড়িবেন না; কংগ্রেস দেশকে স্বাধীন করিতে চায়, এই জন্য তিনি কখনও কংগ্রেসের বাহিরে যাইবেন না। "গভীর অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন এবং দৃঢ়-বিশ্বাসানুরূপ কাজ করিবার সাহসের ফলে আমি অনেক বৎসর পূর্বে কংগ্রেসওআলা হই ও তখন কাবুলে একটি কংগ্রেস কমীটি স্থাপন করি। তাহার পর হইতে কংগ্রেসের এক জন সামান্য কর্ম্মীরূপে নানা বিদেশে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছি। আমি ধর্ম্মে পূর্ণ আস্থাবান্ এক জন সার্বজাতিক (Internationalist)।···যদি আমি দেখি কংগ্রেসের কোন কার্য্যতালিকার সহিত আমার মতে মিলে না, তাহা হইলে আমি আমার আলাদা দল গড়িব। কিন্তু তখনও আমি কংগ্রেসেই থাকিব, কেন-না ভারতকে স্বাধীন করা ইহার আদর্শ।"

নারীদের প্রতি নারীদের দরদ

নোয়াখালিতে সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহিলা সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য মহিলা-সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির মত তাহার প্রস্তাবগুলিও উত্তম। তাহার মধ্যে একটি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। তাহা এই যে, সম্মেলন প্রত্যেক মহিলা-সমিতিকে একটি করিয়া বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ও চালাইতে বলিয়াছেন।

১৯৩১ সালের সেন্সস রিপোর্ট অনুসারে বঙ্গের পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক নারীজাতীয় মানুষদের মধ্যে হাজারে ৩২ জন সাক্ষর অর্থাৎ লিখনপঠনক্ষম। তাহারা যে খুব বিদ্বান তা নয়; অধিকাংশই কেবল নাম সহি করিতে ও সোজা বহি পড়িতে পারে। বঙ্গের নারীদের প্রত্যেক এক-শ জনের মধ্যে সাতানব্বই জনের অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নাই। যে-সব শিক্ষিতা মহিলা রাষ্ট্রিক সমিতি স্থাপন করেন, তাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে চান, অবশ্যই করিবেন; কিন্তু দেশের এই অবস্থায় শতকরা ৯৭ জন নারীর প্রতি তাঁহাদের মমতাপূর্ণ দৃষ্টি ভিক্ষা করিতে পারি না কি? তাঁহাদিগকে আরও একটি কথা বলি। যাহারা শিশু ও বালিকা, কেবল তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখাইলেই হইবে না, যে-সব নারী প্রাপ্তবয়স্কা অথচ নিরক্ষর তাঁহাদিগকেও শিখাইবার বন্দোবস্ত শিক্ষিতা মহিলারা করুন। গৃহকর্ম সমাপনের পর, মধ্যাহ্নের পর, প্রত্যেক পাড়ার কোন-না-কোন অন্তঃপুরে যদি এক এক জন শিক্ষিতা মহিলা প্রত্যহ আধঘণ্টা করিয়াও নিরক্ষরাদিগকে শিখান, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার সুফল দেখিয়া তাঁহারা প্রীত ও উৎসাহিত হইবেন।

মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির বালিকা বিদ্যালয়

আমরা নিম্নমুদ্রিত সংবাদটি পাইয়া প্রীত হইয়াছি।

"মুর্শিদাবাদ জেলা মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্তর্গত বহরমপুর মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির কয়েকটি মহিলা নিরক্ষরতা-দূরীকরণ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, এই রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবী। সমিতির যুগ্ম সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণলতা ভট্ট গত ডিসেম্বর মাসে একটি

অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমাজের নিম্নস্তরের বালক-বালিকারাই এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্রীর সংখ্যা এ-পর্য্যন্ত ৫০।৬০টি হইয়াছে। ইহাদের শিক্ষালাভের অত্যধিক আগ্রহে রবিবার পর্য্যন্ত ছুটি লইতেও ইহারা অনিচ্ছুক। শ্রীমতী অরুণা ভট্ট ও শ্রীমতী রেবা ভট্ট এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রী। বিনা মূল্যে বই, স্লেট ইত্যাদি সাহায্য করিয়া ইহাদের অভাব পূরণ করিতে হয়। ডাঃ পঞ্চানন ভট্ট মহাশয়ের বাটীতেই স্কুলটি অস্থায়ী ভাবে চলিতেছে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

"এইরূপ অবৈতনিক বিদ্যালয় আমাদের মহিলা কর্ম্মীদের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে আরও ২।১টি পরিচালিত হইতেছে।"

—

হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কৃতিগত ঐক্য

খুলনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানদের (বিশেষতঃ বঙ্গীয় মুসলমানদের) জাতিগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্য সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুরা ও ভারতবর্ষের মুসলমানদের ন্যূনকল্পে শতকরা নব্বই জন (বঙ্গে শতকরা মোটামুটি নিরানব্বই জন) নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুসারে অভিন্নজাতীয় (racially not different)। ইহা খাঁটি সত্য। কিন্তু যে-কারণেই হউক, বিস্তর মুসলমান ইহা স্বীকার করিতে চান না। সেই জন্য ইহা বারবার বলিতে চাই না। কিন্তু অন্য কয়েকটা সত্য কথা বলিতে ও স্বদেশবাসী মুসলমানদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে বাধা নাই।

ভাষা, সাহিত্য, সংগীতাদি ললিতকলা, নানাবিধ কারিগরীর কাজ—এই সব সংস্কৃতির (কালচারের) অন্তর্গত। আগে হয়ত যাহা আফগানিস্থানের অংশ ছিল এখন ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছে, সেই অংশটুকু ছাড়া ভারতবর্ষের এমন কোন অঞ্চল নাই যেখানকার মুসলমানেরা যে ভাষায় কথা বলে তথাকার হিন্দুদেরও সেই ভাষা মাতৃভাষা নহে। এই সকল ভাষার সাহিত্য হিন্দুর ও মুসলমানের এক। মুসলমানেরা না-হয় কিছু বেশী আরবী ফারসী কথা ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহাতে সাহিত্য আলাদা হইয়া যায় না। বাংলাভাষা ও সাহিত্য ধরুন। মক্তব মাদ্রাসায় ব্যবহারের জন্য যে সব ফরমাশী বহি লেখা হয়, সে-সব বহি ঠিক্ সাহিত্য নয়। সে-সব পুস্তক বাদে, বাঙালী মুসলমানেরা গদ্যে ও পদ্যে যে-সকল ভাল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার ভাষা ও হিন্দুদের লিখিত পুস্তক-সমূহের ভাষা এক—যদিও মুসলমানদের বহিতে কিছু আরবী ফারসী শব্দ সামান্য বেশী থাকিতে পারে।

মুসলমানদের মধ্যে ভারতবর্ষে (বিশেষতঃ বঙ্গের বাহিরে) অনেক বিখ্যাত 'সংগীতের ওস্তাদ আছেন। তাঁহারা যে-সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন, সেগুলি ভারতবর্ষীয়, হিন্দুরাও তাহা ব্যবহার করে। তাহা অপেক্ষাও বড় কথা এই যে, তাঁহারা যে সব গান করেন, যে-সকল গৎ বাজান, তাহাদের রাগরাগিণী ভারতবর্ষের; হিন্দুদের রাগরাগিণীও তাই।

ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের সাংস্কৃতিক ঐক্যের আরও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

কোন ইংরেজ যদি মুসলমান হন, তাহা হইলে তিনি ব্রিটেনের ইতিহাসের কোন যুগেরই গৌরব হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে চান না। তাহাতে তিনি অন্য মুসলমানদের চেয়ে কম মুসলমান হইয়া যান না। ভারতবর্ষের মুসলমানদেরও এইরূপ ভারতেতিহাসের সব যুগের গৌরবের হিন্দুদের সহিত আপনাদিগকে সমান অধিকারী মনে করা উচিত। জাভার লোকেরা প্রায় সকলেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি, মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি ছাড়ে নাই। এমন কি, এখনও সেখানে মুসলমানদের 'সুব্রত' 'শাস্ত্রবিদগ্ধ' প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। মহারাজ দিব্যের যে বার্ষিক উৎসব হয়, তাহাতে যে-সকল মুসলমান প্রধান কর্ম্মীরূপে যোগ দেন, তাঁহারা আপনাদিগকে দিব্য মহারাজের যুগের গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করেন। ইহাই স্বাভাবিক।

—

ভারতীয়েরা দুধ সামান্যই পায়

দুধ অল্পবয়স্ক ও অধিকবয়স্ক সকল মানুষেরই একটি প্রধান খাদ্য। যাহারা মাছ মাংস খায় না, দুধ তাহাদের পক্ষে আরও বেশী দরকার। ভারতবর্ষের যে-সকল

লোকের মাছমাংস খাইতে আপত্তি নাই, তাহারাও ইউরোপের লোকদের মত অধিক আমিষাশী নহে। এই জন্য এদেশের সকল লোকেরই দুধ বেশী খাইতে পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু বাস্তবিক যাহা দেখা যায় তাহাতে ভারতীয়েরা দুধ সামান্যই খাইতে পায়। সরকারী কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণা-বিভাগ অনুসন্ধানের পর এক রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের গ্রামসকলে শতকরা ১৬ জন মানুষ দুধ বা দুধ থেকে তৈরি কোন জিনিষ খাইতে পায় না, শতকরা ৩৬ জন দৈনিক ৪ ছটাক দুধ পায়, শতকরা ২৬ জন ৪ হইতে ৮ ছটাক পায়, এবং বাকী লোকেরা (অর্থাৎ শতকরা ২২ জন) দৈনিক আট ছটাকের বেশী দুধ পায়। শুধু বাংলা দেশের গ্রামসকল সম্বন্ধে এরূপ কিছু লিখিলে তাহা বেশী উজ্জ্বল অযথার্থ ছবি হইবে মনে হইতেছে। যাহা হউক, সরকারী রিপোর্টটা নির্ভুল হইলেও তদনুরূপ অবস্থাও সন্তোষজনক বলা যায় না। কেন না, বিশেষজ্ঞদের মতে স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক মানুষের প্রত্যহ ৭॥ হইতে ১৭॥ ছটাক পর্য্যন্ত দুধ খাওয়া আবশ্যক।

গ্রামসমূহে গোচারণের যথেষ্ট জায়গা রাখা চাই। সরিষা প্রভৃতি যে-সব বীজ থেকে মানুষের খাদ্যরূপে বা খাদ্যপ্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত তৈল নিষ্কাশিত হয়, তাহা বিদেশে রপ্তানি না হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষেই গ্রামে গ্রামে ঘানিতে পেষা হয়, তাহার ব্যবস্থা ও চেষ্টা খুব হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে তাহার খইলগুলি গোরুর খাদ্যের জন্য সস্তা দামে পাওয়া যাইবে। ভাল ষাঁড় রাখিয়া গোবংশের উন্নতি করিতে হইবে। তাহার নিমিত্ত আবশ্যকসংখ্যক ষাঁড় বাদে অন্য সব ষাঁড়কে লাঙ্গল-টানা ও গাড়ী-টানা বলদ করিয়া ফেলা উচিত। যে-সকল গাভী এখনও অনেক বৎসর দুগ্ধবতী হইতে ও থাকিতে পারে, মাংসের জন্য তাহাদের হত্যা বন্ধ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে, ফুকা-প্রথার বিরুদ্ধে প্রণীত আইন খুব দৃঢ়তার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে গ্রামে ও শহরে দুধ ও দুধ হইতে প্রস্তুত জিনিষ এখনকার চেয়ে অধিক পরিমাণে ও কম দামে পাওয়া যাইবে।

—

কংগ্রেসের বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে দক্ষিণপন্থীদের জয়

আমরা এ মাসের বিবিধ প্রসঙ্গে ২৫এ ফাল্গুন লিখিয়াছিলাম যে, সুভাষবাবুর আরোগ্যলাভের পর যদি কংগ্রেসের অধিবেশন হইত, তাহা হইলে তিনি সভাপতির কাজ যত ভাল করিয়া করিতে পারিতেন, রুগ্ন অবস্থায় তাহা পারিবেন না। তবুও কিছু কাজ তিনি করিতেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের বিষয়নির্ব্বাচন সমিতির যে-অধিবেশনে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্ত তাঁহার প্রস্তাব সম্পর্কে সেই প্রস্তাবের সংশোধকপ্রস্তাবকারীদের বক্তৃতার জবাব দেন, সেই অধিবেশনে সুভাষবাবু দুর্ব্বলতাবশতঃ উপস্থিতই হইতে পারেন নাই। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করেন। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনের আরম্ভেও সুভাষবাবু দুর্ব্বলতা ও ডাক্তারদের নিষেধপ্রযুক্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অভিভাষণের ইংরেজী পাঠটি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এবং হিন্দুস্থানী পাঠটি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব পাঠ করেন।

কংগ্রেসের ইতিহাসে এমনটি কখনও হয় নাই। ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির উহার অধিবেশন কিছু পিছাইয়া না-দেওয়া বিষয়ে দৃঢ়তা বা জেদ ন্যায্য বা অন্যায্য যাহাই হউক, তাহার ফলে সভাপতিকে রুগ্ন অবস্থায় ত্রিপুরী যাইতে হইয়াছে। তাহার ফলাফলের জন্য এই অভ্যর্থনা-সমিতি এবং, তাহাদের কোন বা কোন-কোন পরামর্শদাতা থাকিলে, তিনি বা তাঁহারা দায়ী।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্তের যে প্রস্তাবটি বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে অনেক ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে, ইংরেজীতে তাহা এইরূপ :—

"The Committee declares its firm adherence to the fundamental policies of the Congress which have governed its programme in the past years under the guidance of Mahatma Gandhi and is definitely of the opinion that there should be no break in these policies and that these should continue to govern the Congress programme in the future.

"The Committee expresses its confidence in the work of the Working Committee which functioned during last year and regrets that any aspersions should have been cast against any of its members.

"In view of a critical situation that may develop during the coming year and in view of the fact that Mahatma Gandhi alone can lead the Congress and the country to victory during such a crisis, the Committee re-

gards it as imperative that the executive authority of the Congress should command his implicit confidence and requests the President to nominate the Working Committee for the ensuing year in accordance with the wishes of Gandhiji."

বাংলায় প্রস্তাবটির তাৎপর্য্য এই রূপ :—

মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ মত গত কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা যে মূলগত নীতি ও কার্য্যক্রম অনুসারে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, এই কমীটি তাহাতে গভীর আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে, এবং দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে, ঐ নীতি পরিহার না করিয়া ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্য্যক্রম-নির্দ্ধারণে উক্ত নীতিই অনুসরণ করাই উচিত। গত বৎসরের কংগ্রেসের ওআর্কিং কমীটির কার্য্যে এই কমীটি আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং উহার সদস্যদের উপর দোষারোপ করায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

"আগামী বর্ষে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এবং ঐরূপ সঙ্কটে মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেস ও দেশবাসীকে পরিচালিত করিতে সমর্থ বলিয়া, তাঁহার অবিচলিত আস্থা কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালকগণের লাভ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া এই কমীটি মনে করে। সেজন্য এই কমীটি সভাপতিকে মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী আগামী বৎসরের কংগ্রেসের ওআর্কিং কমীটির সদস্যগণকে মনোনীত করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।"

বিষয়-নির্বাচন সমিতিতে বিবেচ্য সমুদয় প্রস্তাব কংগ্রেসের নিয়ম অনুসারে ২৮শে ফেব্রুআরির মধ্যে পেশ হইবার কথা। এই প্রস্তাবটি তাহার অনেক দিন পরে উপস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও সুভাষবাবু তাহা আলোচনা করিতে এবং গোড়াতেই আলোচনা করিতে দিয়া দক্ষিণ-পন্থীদিগকে বিশেষ সুবিধা দিয়াছিলেন।

এই প্রস্তাবটির সংশোধক বহুসংখ্যক প্রস্তাব পেশ হইয়াছিল। সবগুলিই বহু ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়। পণ্ডিত পন্থ তাঁহার প্রস্তাবের সামান্য পরিবর্ত্তনও করিতে রাজী হন নাই। একটি টেলিগ্রামে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি টেলিফোনে মহাত্মাজীর দ্বারা এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করাইয়া লইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উহা বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন করিতে পণ্ডিত পন্থের অসম্মতির ইহা একটি কারণ। লাহোরের ট্রিবিউনের একটি টেলিগ্রামে প্রকাশ, সাতটি কংগ্রেসী গবর্মেণ্টের লোকেরা এই প্রস্তাবের অনুকূলে ভোটসংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। এইরূপ ব্যাপারে দেখিতেছি কংগ্রেসী গবর্মেণ্টগুলি ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রী গবর্মেণ্টের চেয়ে একটুও কম যান না।

প্রথমে যাহা সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমীটি (All India Congress Committe) ছিল, পরে তাহা কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচন কমীটি হয়। এই কমীটি সুভাষবাবু দ্বিতীয় বার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার আগেকার আমলের। যাঁহাদের ভোটে সুভাষবাবু দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হইয়াছেন, এই কমীটির গঠনে তাঁহাদের হাত ছিল না। এই জন্য ইহাতে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হইবে, এইরূপ অনুমান অনেকেই করিয়াছিলেন। যাঁহাদের ভোটে সুভাষবাবু দ্বিতীয় বার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটি কংগ্রেসের পূরা অধিবেশনে উপস্থাপিত হইলে তাঁহারা কোন্ পক্ষে ভোট দেন দেখা যাইবে। পণ্ডিত পন্থ যাহাই বলুন, প্রস্তাবটি দ্বারা সভাপতি সুভাষবাবুকে খাটো করা হইয়াছে। যাঁহারা সুভাষবাবুকে সভাপতি করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার লাঘব চান কি না তাঁহাদের ভোটের দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে।

অনেক সভার সভাপতি কোন প্রস্তাব ভোটে দিবার আগে সে-সম্বন্ধে এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বক্তৃতা সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য বলিয়া থাকেন। কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচন-কমীটিতে সভাপতির এরূপ কিছু বলিবার রীতি ও অধিকার আছে কি না, জানি না। থাকিলে, সুভাষবাবু অনুপস্থিতিবশতঃ সেই রীতির অনুসরণ করিতে পারেন নাই। পারিলেও, ভোট হয়তো প্রস্তাবটির সপক্ষেই অধিক হইত। কিন্তু ফল যাহাই হউক, সভাপতির কোন অধিকার থাকিলে তাহা বজায় থাকা উচিত।

প্রস্তাবটির বিস্তারিত সমালোচনা আমরা করিতে পারিব না। কেবল কয়েকটি কথা বলিব।

প্রস্তাবটিতে, "ওআর্কিং কমীটির সদস্যদের উপর যে দোষারোপ করা হইয়াছিল তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে, এই মর্ম্মের কথা ছিল। অধিকাংশ সংশোধক প্রস্তাব ইহা বাদ দিবার জন্য আনা হইয়াছিল। দোষারোপ হইয়াছিল কিনা, হইয়া থাকিলে কে দোষারোপ করিয়াছিল, ইত্যাদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কোন কোন দক্ষিণপন্থীর উপর দোষারোপ হইয়াছিল। সেই প্রকার, সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে নানা কথাও মহাত্মা গান্ধী এবং ওআর্কিং কমীটির ১।৮ জন সদস্য বলিয়াছিলেন। দুঃখ প্রকাশ ইহার জন্যও করা উচিত ছিল।

কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী যে সকলের চেয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞ ও ধীর তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন মানুষকেও আমরা এখন ডিক্টেটর করার বিরোধী, তাহা এখন একান্ত আবশ্যকও মনে করি না। প্রস্তাবটির দ্বারা তাঁহাকে কার্য্যতঃ ডিক্টেটরই করা হইতেছে। "সহিংস" (violent) ডিক্টেটরীর মত আমরা "অহিংস" (non-violent) ডিক্টেটরীরও বিরোধী। কেন-না, কোন মানুষই অভ্রান্ত নহেন, এবং মহাত্মাজী নিজেই একাধিক বার বৃহৎ ভ্রান্তি

স্বীকার করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রের কথা আলাদা। রূপক ভাষায় কোন অবস্থাকে সংগ্রাম বলিলেই তাহা ঠিক্ যুদ্ধের মত সঙীন, ইহা স্বীকার্য্য নহে।

কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, অভ্রান্তগুরুবাদ বহু কুফলের জনয়িতা।

প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে, অতীত বৎসরসমূহে ("in the past years") কংগ্রেসের কার্য্যতালিকায় যে-সব নীতি অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় হইয়াছিল। এই অতীত বৎসরগুলির আরম্ভ কখন্ হইয়াছিল? চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোতীলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যবাদীরা ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশ করে। তাহা মহাত্মাজীর পরাভব দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে যে, অসহযোগ-নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করার পর হইতে বরাবর গান্ধীজী তাহার একচ্ছত্র নেতা ছিলেন না। অতএব, অতীত বৎসরগুলির আরম্ভ নির্দেশ করা উচিত ছিল। কংগ্রেসের সব দল—কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল, কংগ্রেস জাতীয় (Nationalist) দল—সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মহাত্মাজীর অনুসরণ করে না। এই জন্য তাঁহার কোন্ পলিসি ও কোন্ প্রোগ্রামের উদ্দেশে প্রস্তাবটির মুসাবিদা হইয়াছে, তাহা বলিয়া দিলে ভাল হইত।

তাঁহার পলিসি ও প্রোগ্রাম হইতে সুভাষবাবু তাঁহার প্রথম সভাপতিত্বের বৎসরে দূরে চলিয়া যান নাই বা তাহার বিপরীত কিছু করেন নাই, এ বৎসরও যে করিবেন তাহা বলেন নাই। বরং সত্য ও অহিংসার পথে কংগ্রেসের দৃঢ় থাকা উচিত ইহা একাধিক বার প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, কংগ্রেসের নীতির এই ভিত্তি দৃঢ় ও অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া, অবস্থাভেদে পলিসি ও প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন করা ও পরিবর্ত্তিত হইতে দেওয়া উচিত। পলিসি ও প্রোগ্রামের পরিবর্ত্তন মধ্যে মধ্যে হইয়াছেও।

গত বৎসরের ওআর্কিং কমীটি সুভাষবাবুর দ্বিতীয় বার নির্বাচনের আগে যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্তর কংগ্রেওআলাও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রস্তাবটার দ্বারা তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইলেও সেই অসন্তোষ ও তাহার কারণ দূর হইবে না।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব করেন, আমরাও তাহা চাই। কিন্তু তিনি কংগ্রেসের ভিতরে আসিয়া পুনরায় উহার সভ্য হইয়া সকলকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া উহার নেতৃত্ব করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। তিনি থাকিবেন কংগ্রেসের বাহিরে, তাহার কাছে দায়ী হইবেন না, অথচ সর্বেসর্বা হইবেন, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কংগ্রেসওআলারা চান দায়িত্বশীল গবন্মেণ্ট। তাহার অর্থ এই যে, যাঁহাদের হাতে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহারা দায়ী থাকিবেন জনপ্রতিনিধিদের নিকট। সুতরাং এই চাহিদা ও নীতি অনুসারে, কংগ্রেসে বা কংগ্রেসের উপর যাঁহার বা যাঁহাদের ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার বা তাঁহাদের কাহারও কাছে দায়ী হওয়া উচিত। গান্ধীজী মহাত্মা বলিয়াই তাঁহাকে দায়িত্ববর্জিত ক্ষমতা ("Power without responsibility") ভোগ ও প্রয়োগ করিতে দেওয়া উচিত নয়।

তিনি ধীর বিজ্ঞ অভিজ্ঞ কৌশলী। তাঁহার নেতৃত্ব অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে ("in accordance with the wishes of Gandhiji") ওআর্কিং কমীটি গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া গঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কংগ্রেসের কন্সটিটিউশ্যন অনুসারে ওআর্কিং কমীটির সভ্য মনোনয়নের অধিকার কংগ্রেসের সভাপতির। তাঁহাকে সেই অধিকার হইতে কার্য্যতঃ বঞ্চিত করিলে নিয়মভঙ্গ হয়। অতএব যদি গান্ধীজীর দ্বারা ওআর্কিং কমীটি গঠনই একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে নিয়মভঙ্গ না করিয়া তাঁহাকেই যাবজ্জীবন কংগ্রেস-সভাপতি করা হউক।

যদি তাঁহাকেই সর্বেসর্বা করিতে হয়, তাহা হইলে সভাপতি-নির্বাচন, নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটি নির্বাচন, ওআর্কিং কমীটি নির্বাচন, কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন, ইত্যাদি বহু ব্যয়সাধ্য শ্রমসাধ্য সময়সাপেক্ষ ব্যাপারের কি প্রয়োজন আছে? এগুলা কি প্রহসন?

রবার স্ট্যাম্পের কাজ করিবার নিমিত্ত ও বকলম দিবার নিমিত্ত বেচারা এক সাক্ষীগোপাল সভাপতি রাখিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

যত বৎসর ধরিয়া মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাহা তিনি করিয়াছেন নিজের চরিত্র ও বুদ্ধির বলে এবং তদুৎপন্ন নানা যুক্তিতর্কের প্রভাবে। এখন একটা প্রস্তাবের দ্বারা তাহার নেতৃত্বের ভিত্তি পাকা করিবার চেষ্টা হইতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জনসাধারণের উপর তাঁহার চরিত্র ও বুদ্ধির প্রভাব কমিয়াছে? অবশ্য ইহাও হইতে পারে যে, তাঁহার নামের আড়ালে কতকগুলি নেতা নিজেদের কর্ত্তৃত্ব আরও দীর্ঘকাল চালাইতে চান।

—

কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ

ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর যে অভিভাষণটি ত্রিপুরীর অধিবেশনে পঠিত হয়, নীচে তাহার অধিক অংশ বাংলায় দিতেছি।

রাজকোট ব্যাপারে মহাত্মাজীর সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ

বন্ধুগণ, কিছু বলিবার পূর্ব্বে রাজকোট ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার এবং তাহার ফলে তাঁহার অনশন-ব্রতের অবসান হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সমগ্র দেশ এক্ষণে দারুণ দুর্ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তি অনুভব করিতেছে।

অস্বাভাবিক অবস্থাবহুল বৎসর

বন্ধুগণ, এই বৎসর বহু দিক্ দিয়া অস্বাভাবিক বা অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। এবার সভাপতি-নির্ব্বাচন একঘেয়ে পদ্ধতিতে হয় নাই। নির্ব্বাচনের পর চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ওআর্কিং কমীটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল, মৌলানা আজাদ, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ১২ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। ওআর্কিং কমীটির আর এক জন বিশিষ্ট সদস্য পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু যথারীতি পদত্যাগ না করিলেও একটি বিবৃতি প্রচার করেন, যাহাতে সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, তিনিও পদত্যাগ করিয়াছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে রাজকোটের ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীকে মৃত্যুপণ করিয়া অনশন-ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর পীড়িত অবস্থায় সভাপতি ত্রিপুরীতে পৌঁছেন। সুতরাং এই বৎসর সভাপতির অভিভাষণ যদি দৈর্ঘ্যের দিক্ হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে তাহা বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগীই হইবে।

ওয়াফদী প্রতিনিধি দলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে, মিশর হইতে ওয়াফদী প্রতিনিধি-দল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার অতিথিরূপে আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে আন্তরিকভাবে সম্বর্দ্ধিত করিতে আপনারা আমার সহিত যোগদান করিবেন। আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পক্ষে ভারতে আসা সম্ভবপর হওয়ায় আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমরা এই জন্য শুধু দুঃখিত যে মিশরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন অবস্থার উদ্ভব হেতু ওয়াফদী দলের সভাপতি মুস্তাফা এল নাহাস-পাশা স্বয়ং এই প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহার ও ওয়াফদী দলের বিশিষ্ট সদস্যগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল; সেই হেতু আমার আনন্দ আজ বেশী। আমার দেশবাসিগণের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

হরিপুর কংগ্রেসের পর সার্ব্বজাতিক পরিস্থিতি

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা যখন হরিপুরে সমবেত হইয়াছিলাম তাহার পর সার্ব্বজাতিক ক্ষেত্রে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। উহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মিউনিক চুক্তি। উহার অর্থ এই যে, নাৎসী জার্ম্মানীর নিকট ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন হীন আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহার ফলে ইউরোপে ফ্রান্স আর অন্যতম প্রধান শক্তি রহিল না এবং একটি মাত্র গুলীনিক্ষেপ ব্যতিরেকেও কর্ত্তৃত্ব জার্ম্মানীর হস্তে চলিয়া গেল। সম্প্রতি স্পেনে গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের ক্রমিক পতন ফ্যাসিস্ত ইতালী ও নাৎসী জার্ম্মানীর শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দুটি শক্তি—ফ্রান্স ও ব্রিটেন, ইউরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে আপাততঃ ছাঁটিয়া দিবার জন্য ইতালী ও জার্ম্মানীর সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে।

কিন্তু ইহা কত দিন সম্ভব হইবে? রাশিয়াকে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিয়া ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের কি লাভ হইয়াছে? ইউরোপ ও এশিয়ায় সম্প্রতি যে সার্ব্বজাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ফলে শক্তি ও মর্য্যাদার দিক্ হইতে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ যে যথেষ্ট পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট চরমপত্র দানের প্রস্তাব

আমি এখন ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমার স্বাস্থ্য ভাল নাই, সেই জন্য কয়েকটি মাত্র গুরুতর সমস্যার উল্লেখ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। প্রথমেই, কিছু দিন হইতে আমি যাহা মনে করিতেছি, তৎসম্বন্ধে স্পষ্টভাবে আমার অভিমত প্রকাশ করিব। আমার মনে হয় যে, স্বরাজের প্রশ্ন উত্থাপন এবং চরমপত্রের আকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের জাতীয় দাবী দাখিল করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। আমাদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা চাপাইয়া দেওয়া হউক এবং আমরা নিষ্ক্রিয় মনোভাব অবলম্বন করিয়া থাকিব, এরূপ অবস্থা বহুকাল পূর্ব্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনা কখন আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে, তাহ এখন আর সমস্যা নহে। ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনা যদি সুযোগ বুঝিয়া ধামাচাপা দিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমরা কি করিব, ইহাই হইতেছে সমস্যা। চতুঃশক্তি চুক্তি দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ইয়োরোপে একবার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেট ব্রিটেন যে কড়া সাম্রাজ্যবাদ-নীতি অবলম্বন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই গ্রেট ব্রিটেন প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরবদিগকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে এই কারণে যে, সার্ব্বজাতিক ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন নিজেকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে করিতেছে। সেই হেতু আমি বিবেচনা করি যে, উত্তর দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় দিয়া চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা আমাদের উচিত। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন উত্তর পাওয়া না যায় বা অসন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় দাবীসমূহ আদায় করিবার জন্য আমাদের যে সকল উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের নিকট যে উপায় আছে তাহা হইতেছে ব্যাপক আইন-অমান্য করা বা সত্যাগ্রহ। দীর্ঘ সময়ের জন্য নিখিলভারতব্যাপী সত্যাগ্রহের ন্যায় বড় রকমের একটা সঙ্ঘর্ষের সম্মুখীন হইবার মত অবস্থা আজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই।

আমি দেখিয়া ব্যথিত হই যে, কংগ্রেসে এমন সব নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহারা মনে করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে বড় রকমের অভিযান আরম্ভ করিবার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি নৈরাশ্যের বিন্দুমাত্র কারণ দেখি না। আটটি প্রদেশে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্বত্র গণ-আন্দোলন যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে।

তাহার পর দেশীয় রাজ্যসমূহে অভূতপূর্ব্ব গণ-জাগরণ দেখা দিয়াছে। স্বরাজের দিকে চূড়ান্তভাবে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত মুহূর্ত্ত আর কখন হইতে পারে, বিশেষতঃ, সার্বজাতিক পরিস্থিতি যখন আমাদের অনুকূল? নিছক বাস্তববাদী হিসাবে আমি বলিতে পারি যে, বর্ত্তমানে সমগ্র অবস্থা আমাদের এত অনুকূল যে, আমাদের খুব বেশী রকমের আশা পোষণ করা উচিত। আমরা শুধু যদি মতানৈক্য ভুলিয়া জাতীয় সংগ্রামে সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করি, তাহা হইলে আমাদের আক্রমণ এত তীব্র হইবে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। আমরা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা লইয়া বর্ত্তমান অনুকূল অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিব, না এই সুযোগ হারাইব? জাতির জীবনে এমন সুযোগ খুব কম আসে।

দেশীয় রাজ্য

দেশীয় রাজ্যসমূহে গণ-আন্দোলন বিষয়টির আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, হরিপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতি আমাদের যে মনোভাব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা উচিত।

উক্ত প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যসমূহে কংগ্রেসের নামে পরিচালিত কতকগুলি কার্য্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবের ফলে পার্লামেণ্টারী কাজকর্ম্ম বা দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কংগ্রেসের নামে পরিচালিত হইতে পারে না। কিন্তু হরিপুরের পর অনেক কিছু ঘটিয়াছে। আজ আমরা দেখিতেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম শক্তি দেশীয় রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত জোট বাঁধিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমরা কংগ্রেসের লোকগণ কি দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের পক্ষ লইব না? আজ আমাদের কর্ত্তব্য কি, সে সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় নাই।

উক্ত নিষেধ তুলিয়া দেওয়া ছাড়া, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্রের জন্ত দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলন ব্যাপকভাবে ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ওআর্কিং কমীটি কর্ত্তৃকই পরিচালিত হওয়া উচিত। এ পর্য্যন্ত যে সকল কাজ করা হইয়াছে, তাহা বিক্ষিপ্ত ধরণের—তাহার মধ্যে বিশেষ কোন পদ্ধতি বা পরিকল্পনা নাই। কিন্তু ওআর্কিং কমীটির পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ এবং ব্যাপকভাবে ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দায়িত্ব পালন এবং প্রয়োজন হইলে, ঐ উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাবকমীটি নিযুক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব ও সহযোগিতা ও নিখিল-ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মেলনের সহযোগিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

স্বরাজের পথে চূড়ান্তভাবে অগ্রসর হওয়ার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার জন্ম আমাদের যথেষ্ট ভাবে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ, আমাদের মধ্যে যে-সকল দুর্নীতি ও দুর্ব্বলতা—প্রধানতঃ ক্ষমতার লোভে, প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলিকে নির্ম্মমভাবে অপসারিত করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা

তাহার পর, দেশে যে-সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের সহিত, বিশেষ করিয়া কিষান আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সহিত, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রাখিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দেশে যে-সকল র‍্যাডিকেলপন্থী দল আছে, তাহাদিগকে একযোগে ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সহকারে কাজ করিতে হইবে এবং সমগ্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

বন্ধুগণ, আজ কংগ্রেসের মধ্যে দিঙ্‌মণ্ডল ঘনঘটাচ্ছন্ন, এবং মতভেদ দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের অনেক বন্ধু বিষণ্ণ ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমি এক জন আশাবাদী; কিছুতেই আমার আশাভঙ্গ হয় না। আজ আপনারা যে মেঘ দেখিতেছেন, তাহা সাময়িক মাত্র। আমার দেশবাসিগণের দেশপ্রেমে আমার বিশ্বাস আছে এবং আমি নিঃসন্দেহ যে, শীঘ্রই আমরা বর্ত্তমান বিরোধের সমাধান করিতে ও আমাদের মধ্যে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইব।—বন্দে মাতরম্। —ইউ, পি, স্পেশ্যাল

সুভাষবাবুর অভিভাষণের গোড়ায় কতকগুলি বাক্যে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ইত্যাদি ছিল। তাহা ব্যতীত আর সমস্তটি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। অভিভাষণটি ছোট। এত ছোট অভিভাষণ ইতিপূর্ব্বে আর কোন কংগ্রেস সভাপতি দেন নাই।

বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সমালোচনা করিবার মত কিছু দেখিতেছি না। আমরা এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত। দেশী রাজ্য-সমূহ সম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য তিনি যাহা বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মতও সেই রকম বলিয়া মনে হয়। ইহাতেও সমালোচনা করিবার কিছু নাই। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি নিবারণের প্রয়োজনীয়তা মহাত্মা গান্ধী অনেক বার বলিয়াছেন। কংগ্রেস-সপ্তাহের মধ্যেই তিনি একটি টেলিগ্রামে সভাপতিকে ঐ কথা আবার বলিয়াছেন। বলা অনেক বার হইল। এখন কাজের পালা।

গ্রেট ব্রিটেনের ও ইয়োরোপের সঙ্কট অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া গ্রেট ব্রিটেনকে চরমপত্র দেওয়া এবং গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষের দাবীতে কান না দিলে ব্যাপক অহিংস আইন-লঙ্ঘন চালান সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু বলিতে অনিচ্ছুক। কারণ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই। নীতির দিক্ দিয়া ইহা অন্যায় বা গর্হিত নহে। তবে, ইহা কার্য্যতঃ সাধ্যায়ত্ত হইবে কিনা, আমরা বলিতে পারি না। সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা কখন ছিলাম না, এবং ইহার কায়দাকানুন জানি না। কিন্তু সম্ভবপর হইলে ও আবশ্যক হইলে ইহা করা উচিত, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার সফলতা সম্বন্ধে যে সুভাষবাবু আশাশীল, তাহা সন্তোষের বিষয়। তাঁহার উৎসাহ তাঁহাকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না করিয়া থাকিলে এবং ভবিষ্যতেও না-করিলে, তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। আমরা ধাপ্পাবাজী ও ফাঁকা আওয়াজের বিরোধী।

তাঁহার বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী নেতারা যাহা বলিয়াছেন করিয়াছেন এবং এখনও বলিতেছেন করিতেছেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অভিভাষণে কোন তিক্ততা, জ্বালা, বা ঝাঁজ লক্ষিত হয় না। ইহা মনকে সংযত করিয়া শান্ত অবস্থায় রাখিবার ক্ষমতার পরিচায়ক।

কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

শনিবার ২৭শে ফাল্গুন কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে প্রথমেই বিষয়-নির্বাচন কমীটিতে গৃহীত পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থের প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবার কথা ছিল। তাহা হইলে সেই দিন সমুদয় প্রতিনিধির সেটি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার সুবিধা হইত। কিন্তু শ্রীযুক্ত আণে প্রস্তাব করেন যে, প্রস্তাবটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি (A. I. C. C.) দ্বারা বিবেচিত হউক, এবং পণ্ডিত পন্থ ইহার সমর্থন করেন। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটি সম্বন্ধে সমুদয় প্রতিনিধিকে তাঁহাদের মত প্রকাশের সুযোগ না-দিয়া তাহা ধামা-চাপা রাখিয়া পরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি দ্বারা তাহা অনুমোদন করাইবার ইহা একটা কৌশল, কারণ দক্ষিণপন্থীদের আশঙ্কা হইয়া থাকিবে যে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে উহা অগ্রাহ্য হইয়া যাইতে পারে—সুভাষবাবুর পক্ষের বিস্তর প্রতিনিধির এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় কংগ্রেসে খুব উত্তেজনার সঞ্চার হয়। সাময়িক সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শ্রীযুক্ত আণের প্রস্তাবটি ভোটে দিয়া ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে ঘোষণা করায় উত্তেজনা আরও বাড়ে এবং ডিবিজনের দাবী হয়। এক ঘণ্টার অধিক সময় বিক্ষোভ ও হট্টগোল চলিতে থাকে। পরে শ্রীযুক্ত আণের প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইলে শান্তি স্থাপিত হয়। তখন কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচন সমিতিতে গৃহীত "জাতীয় দাবী," "কংগ্রেসে দুর্নীতির প্রাবল্য," "পরলোকগত নেতাদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ," "মিশরীয় নেতাদিগকে সংবর্দ্ধনা," এবং "চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ" সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি পূর্ণ অধিবেশনে গৃহীত হয়।

জাতীয় দাবী সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে ছয় মাসের নোটিস্ দিয়া চরমপত্র ("ultimatum") দেওয়ার কোন কথা নাই। এ-বিষয়ে সভাপতির অভিভাষণে প্রকাশিত মতের অনুসরণ করা হয় নাই। দেশের অবস্থা আমরা যতটুকু বুঝি, তাহাতে আমাদের বিবেচনায় ইহা ভালই হইয়াছে। চরমপত্র দেওয়াটা ফাঁকা আওয়াজ হইলে তাহাতে কুফলই বেশী হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের দাবী অগ্রাহ্য করিলে, কংগ্রেস যাহা করিবেন বলিয়াছেন সাধ্য থাকিলে চরমপত্র না-দিয়াও তাহা করিতে কোন বাধা নাই। চরমপত্র দিলে আগে হইতে নেতাদের রণকৌশল ব্রিটেনকে জানান হইবে ও প্রস্তুত হইবার সময় দেওয়া হইবে।

জাতীয় দাবী সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জবাহর লাল নেহরু বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক মন্ত্রীদের পদত্যাগ করা অনুচিত; তাঁহারা আমলাতন্ত্রের কেল্লার মধ্যে থাকিয়াই স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতে থাকুন, এবং বাহিরে কংগ্রেস তাহার পরিপোষক ও সমর্থক সংগ্রাম চালাইতে থাকুন।

সুভাষচন্দ্র বসুর পীড়াবৃদ্ধি

অদ্য ২৮এ ফাল্গুনের দৈনিক কাগজগুলিতে সুভাষবাবুর পীড়াবৃদ্ধির সংবাদে সর্ব্বসাধারণের উদ্বেগ খুব বাড়িবে। তাঁহার পীড়ার কিছু উপশমের সংবাদ বাহির হইলে এবং পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইলে উদ্বেগ কমিবে। কংগ্রেসের অধিবেশন অভ্যর্থনা-সমিতি যদি আগেই কয়েক দিন পিছাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সুভাষবাবুর পীড়াবৃদ্ধির জন্য কেহ দায়ী করিতে পারিত না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে ভাইসচ্যান্সেলারের বক্তৃতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ (কনভোকেশ্যন) সভার অধিবেশনে তাহার ভাইসচ্যান্সেলার খান বাহাদুর আজিজুল হক যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে

তিনি আরও প্রগাঢ়ভাবে ইস্‌লামীয় নানা বিদ্যার অনুশীলন করিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগের কাজের যথেষ্ট বিস্তার ও উন্নতি যে অর্থাভাবে হইতেছে না, তাহাও তিনি বলেন। তাঁহার বক্তৃতার অন্য কোন কোন অংশের তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি।

ইংরেজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষণ ও মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষণ সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

অনেকে মনে করেন যে, ইংরেজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান না হইলে যুবকগণ আধুনিক সভ্যতার ধারার সংস্পর্শ লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে, রাজনৈতিক চেতনাবোধ হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখা হইবে। আমার মনে হয় জগতের কোনও শিক্ষাবিদ্‌ই ইহা সমর্থন করিবেন না।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে জাতি বা সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চেতনা বিলুপ্ত হইবে, এমন কথা কেহই স্বীকার করিবেন না। বরং ইহা রাজনৈতিক ও আর্থিক উন্নতির সহায়ক হইবে ত। এই প্রদেশ সম্পর্কে বলিতে পারি যে, বাঙ্গলা ভাষা কি এমনই দীন যে সমালোচকগণের এই সমস্ত বিরুদ্ধ উক্তি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে? বাঙ্গলা ভাষা কি এমন প্রকাশশক্তি-রহিত, প্রেরণাশক্তি হইতে এরূপ বঞ্চিত যে ইহার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিলে আমাদের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিবে? ইহাই কি আমাদের স্বীকার করিতে হইবে? বাঙ্গলা ভাষা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ভাষা। এই ভাষার উন্নতির জন্য কত বিদ্বৎজন, কত দেশপ্রেমিক আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল দেশ বাঙ্গলা ভাষার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ। ইহা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা-বোধ সৃষ্টি করিয়াছে। আমি ইংরেজী ভাষার আবশ্যকতা অস্বীকার করি না, ইহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষারূপে প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে ইহা গৃহীত হইতে পারে না।

পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগ দ্বারা যে-সকল গবেষণা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন :—

বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগ্রহণের একটি প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার নূতন পরিণতি সম্ভব হইয়াছে। গত ২০ বৎসর যাবৎ ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২০ বৎসর একটা জাতির ইতিহাসে বা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সামান্য সময়মাত্র, অথচ এই সামান্য সময়ের মধ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গবেষণা-ভাণ্ডারে যাহা দান করা হইয়াছে তাহা স্মরণযোগ্য। কিন্তু এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইহার গবেষণা-ভাণ্ডারে আর্থিক অসচ্ছলতা উল্লেখযোগ্য। যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য প্রদত্ত না হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া কোনও লাভ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কোন অভিযোগের উত্তরে ভাইসচ্যান্সেলর মহাশয় বলেন :—

বর্ত্তমানে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, থিয়োরী শিক্ষা দেওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। থিয়োরীগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকুন। কিন্তু দেশের শিল্পের এবং সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বের কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। যাঁহারা সমস্ত খবরাখবর রাখিয়া থাকেন, তাঁহারাই বলিবেন যে, জনসাধারণের সংস্কৃতিগত অভাব বিদূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন ও চিন্তাধারার উপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় আমাদের জ্ঞানের পরিধি প্রসার লাভ করিয়াছে এবং জনসাধারণ শিল্প কথাসাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে। ইহার জন্যই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শিল্পজগতে এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। সমস্ত বিভাগের প্রসারকল্পে আমাদিগকে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দেশ যদি উপকৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যের দাবী করিতে পারে। দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন অধিকসংখ্যক হাতেকলমে-শিক্ষাপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিককে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। আশা করি, তাঁহারা এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন। যদি তাঁহারা ইহা উপলব্ধি না করিতে পারেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দায়িত্ব থাকিবে না। বৎসরে বিভিন্ন বিভাগে প্রায় এক শত জন ছাত্র এম, এস্‌-সি পাস করেন। আমার মনে হয় বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের জন্য অতি সহজেই স্থান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ভাইসচ্যান্সেলর মহাশয়ের এই সকল কথা ও অনুরোধ সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

উপাধিপ্রাপ্ত নূতন গ্রাজুয়েটদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন :—

এই পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গত বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাবলীর ইতিহাস প্রদান এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিতে হইলেও আমার অন্তরঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদিগের কথাও স্মরণ হইয়াছে। এক্ষণে আমি উপসংহারে তাঁহাদিগের সম্পর্কে দুই চারিটি কথা বলিতেছি। বহু বৎসরের অধ্যয়নান্তে গ্রাজুয়েটগণ উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাহাদিগের এখন জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সেই সংগ্রামে তাহারা যেন সফলকাম হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে যে আদর্শমুখী করিয়াছে, তাহার মূলনীতি হইতেও তাহারা যেন ভ্রষ্ট না হয়, তবে জাতীয় জীবনের উন্নয়নে তাহাদিগের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিতে হইবে এবং আমাদিগের সকলেরই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা মূলতঃ সকলেই প্রাচ্যদেশীয় এক ভারতীয় জাতি; আমাদিগের অতীত অমূল্য সংস্কৃতি ত্যাগ করিলে চলিবে না।

জাতীয় জীবন গঠনমূলক মহৎ কার্য্যে আপনারা আত্মনিয়োগ করুন। বাংলা তাহার যুবকগণের নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিতেছে। আমাদের পূর্ব্ব-গৌরব ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে। আমরা ভারতীয় ও প্রাচ্যবাসীই থাকিতে চাই। আপনাদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণী এই :—আপনারা যে ডিগ্রী লাভ করিলেন তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন এবং আপনাদের জীবনের সমস্ত মুহূর্ত্তে এই দেশজননীর মানচিত্র মানসপটে চিত্রিত রাখিবেন।

—

প্রধান মন্ত্রী ফজলল হক সাহেবের গোস্‌সা ও আফসোস

প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক সাহেব ফরিদপুরের এক জন মুসলমান ভদ্রলোককে সরকারী চিঠির কাগজে একটি পত্রে বাংলা দেশের হিন্দু সরকারী কর্মচারীরা যে তাঁহার গবর্ন্মেণ্টের বিরোধী এবং কংগ্রেসকে ও তাঁহার বিরোধী দলকে সাহায্য করেন ইত্যাকার অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। চিঠিটি "গোপনীয়" বলিয়া চিহ্নিতও ছিল না। এই চিঠির ফোটোগ্রাফিক নকল খবরের কাগজে বাহির হইয়া যাওয়ায় ফজলল হক সাহেবের মত মানুষও ফাঁপরে পড়েন। তিনি লেখায় এবং ব্যবস্থাপক সভায় মৌখিক আফসোস প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, চিঠিটা ক্ষণিক রাগের মাথায় লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন; বস্তুতঃ তিনি হিন্দু কর্মচারীদের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করেন; ইত্যাদি। যদি হিন্দু কর্মচারীরা গবর্ন্মেণ্ট-অভক্ত না-হয় ও বিশ্বস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের বদনাম গোপনীয় চিঠিতেও করা উচিত হয় নাই। অপ্রকাশ্য মিথ্যাও মিথ্যা। আর যদি তাহারা সত্য সত্যই হক্‌-মন্ত্রীমণ্ডলের বিরোধী হয়, তাহা হইলে হক্‌ সাহেবের আফসোস-প্রকাশ মিথ্যা। যাঁহার মতিস্থৈর্য্য, বাক্‌সংযম ও লেখনীসংযম নাই, এরূপ মানুষের বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী হওয়াটা বঙ্গের দুর্ভাগ্য।

—

"তত্ত্ববোধিনী সভা"

"তত্ত্ববোধিনী সভা" ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার কাজ চলিয়াছিল। এই কুড়ি বৎসরে বাংলা সাহিত্যের উপর এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনের অনেক বিভাগের উপর ইহার কল্যাণকর প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। ইহার বিস্তারিত ইতিহাস লিখিত হওয়া আবশ্যক। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস তাহার সূচনা করিয়া বাঙালীর একটি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যের আভাস দিয়াছেন এবং স্বয়ং তাহার উপক্রমণিকা লিখিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কত দিকে কৃতী কত বাঙালী ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন, তাহা প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝা যায়।

তত্ত্ববোধিনী সভা যদি একটি কোন মানুষ হইতেন, তাহা হইলে এই বৎসর তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উৎসব হইত। কিন্তু মনুষ্যসমষ্টিরও তো এরূপ উৎসব হইতে পারে। তাহা হইলে বাঙালীদের একটি কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন হয়।

—

সুভাষবাবুর পীড়ার অবস্থা

২৮শে ফাল্গুন রবিবারের টেলিগ্রামে প্রকাশ, সুভাষবাবুর দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্‌ সম্পূর্ণ আক্রান্ত হইয়াছে। ইহা সাতিশয় উদ্বেগজনক। সোমবার ২৯শে ফাল্গুন বোম্বাই মেলে তাঁহার কলিকাতা রওনা হইবার কথা ছিল।

কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত

কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইবার প্রধান কারণ, সমাজতন্ত্রী দলের নিরপেক্ষ থাকা। এই দলের লোকেরা সুভাষবাবুকে সভাপতি-নির্বাচন প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া না-যাইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর ও ওআর্কিং কমীটির অধিকাংশ সদস্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও যে সুভাষবাবু দ্বিতীয় বার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, সমাজতন্ত্রী দলে ভোট পাওয়া তাহার একটা কারণ। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভের প্রস্তাব দ্বারা সুভাষবাবুর কিছু অগৌরব নিশ্চয়ই হইল। সে ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহা নিশ্চিত যে, ঐ প্রস্তাব সভাপতিকে মহাত্মা গান্ধীর হাতের পুতুল করিল এবং গণতান্ত্রিকতাকে কেবল নামে পরিণত করিল। যে-সমাজতন্ত্রীরা গণতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলে, তাহাদের 'নিরপেক্ষতা' (অর্থাৎ সোজা ভাষায় আত্ম-বিশ্বাসের অভাব ও ভীরুতা) এরূপ ঘটিবার একটা কারণ। এই বচনবাগীশেরা যে মানুষকে গাছে চড়াইয়া মইটি সরাইয়া লইতে পারে, তাহা দেখা গেল।

পণ্ডিত জ্‌বাহরলাল নেহরুর প্রকৃতি বুঝিবার জন্য আরও কিছু উপকরণ পাওয়া গেল। তিনি সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টদের বুলি আওড়ান, বিশ্বাসও তাঁহার তদনুরূপ; কিন্তু তিনি কার্য্যকালে গান্ধীজীর পূরা আনুগত্য ছাড়িতে পারেন না।

—

বঙ্গের মেডিক্যাল স্কুলগুলির বিপৎ সম্ভাবনা

ভারত-গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে মেডিক্যাল স্কুলগুলিতে পড়িবার সময় চারি হইতে পাঁচ বৎসর করিবার চেষ্টা হইতেছে। এখন প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরাও এই সব স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারে। প্রস্তাব হইয়াছে যে, অতঃপর আই-এস্‌সী উত্তীর্ণ না হইলে কেহ ভর্ত্তি হইতে পারিবে না। বঙ্গে নয়টি মেডিক্যাল স্কুল আছে। তাহাদের অধিকাংশের পাঁচ বৎসরের কোর্স পড়াইবার সঙ্গতি নাই। যদি তাহা থাকেও, তাহা হইলেও নয়টি স্কুলে পড়িবার মত আই-এসসী পাস করা যথেষ্ট ছাত্র কোথা পাওয়া যাইবে? শেষ যে বৎসরের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে ম্যাট্রিকের উপর পাস-করা মোট ১৩৮ জন ছাত্র নয়টি স্কুলে ছিল। এক একটি স্কুল ১৫১/২ বা ষোলটি ছাত্র লইয়া চালান যাইবে কি?

পুস্তক পরিচয়

বাংলাভাষা পরিচয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদ কর্তৃক মনোনীত। মূল্য লেখা নাই।

কোন পুস্তকে লিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিলে তাহার কতকটা পরিচয় দেওয়া হয়। "বাংলাভাষা পরিচয়" বহিখানির সেরূপ পরিচয় দিবার উপায় নাই। কারণ, ইহার বর্ণানুক্রমিক বা অন্য কোন প্রকার সূচী নাই। যেন তেইশটি অধ্যায়ে গ্রন্থখানি বিভক্ত, সেগুলিরও প্রত্যেকটির নাম গ্রন্থকার মহাশয় দেন নাই। তাহা দেওয়া অবশ্য সহজ নহে।

আমরা অন্য প্রকারে এই অপূর্ব গ্রন্থখানির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ইহা ভাষাতত্ত্ববিষয়ক হইলেও নীরস নহে। আনন্দের সহিত পড়া যায়। দুরূহ তত্ত্বও রবীন্দ্রনাথ সহজবোধ্য ও মনোজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে অধিকাংশ স্থলে তাঁহার বক্তব্য বিশদ হইয়াছে, কিন্তু কোথাও কোথাও যে তাহা সহজবোধ্য হয় নাই, তাহা বিষয়টির বা তত্ত্বটির নিগূঢ়তা বশতঃ, তাঁহার অক্ষমতাপ্রযুক্ত নহে।

গ্রন্থের ভূমিকা ছাত্র পাঠকদের উদ্দেশে "ভাষার আশ্চর্য্য রহস্য" সম্বন্ধে লিখিত। প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রাকৃতের দুই শাখা শৌরসেনী ও মাগধী প্রচলিত ছিল। মাগধী ছিল "প্রাচ্য হিন্দির আদিতে। আর ছিল ওড্রী, উড়িয়া, গৌড়ী, বাংলা।" "মাগধী ও শৌরসেনীর মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর।"

ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

"মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তারি ব্যাখ্যা ক'রে এই বইটি আরম্ভ করেছি। তার পরে, এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে।"

সেটা কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের প্রাকৃত।

গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে এত রকমের কথা বলা হইয়াছে যে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া সুকঠিন। তাহার চেষ্টা করিব না। কেবল কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিব; তাহা হইতে পাঠকেরা পুস্তকটির কিছু পরিচয় পাইবেন।

"সমাজ ও সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদান প্রদানের উপায় স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি, সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতিকে এক ক'রে তুলেছে—নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হ'ত।........

"জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ভাষা অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে এ আমাদের বিস্মিত করে না, যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি, যে-চোখের দ্বার দিয়ে নিত্যনিয়ত পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে।"

"কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইঁট, তার পরে চুন সুরকির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইঁট, বাংলায় তাকে বলি কথা। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।"

শব্দগুলি মানুষের নানা ভাব ও চিন্তার এবং বাহ্য জগতের নানা পদার্থের প্রতীক।

"ভাষা নিয়ে মানুষের প্রতীকের কারবার। বাঘের খবর আলোচনা করবার উপলক্ষ্যে স্বয়ং বাঘকে হাজির করা সহজও নয় নিরাপদও নয়। বাঘে মানুষটাকে খায় এই সংবাদটাকে প্রত্যক্ষ করানোর চেষ্টা নানা কারণেই অসংগত। বাঘ ব'লে একটা শব্দকে মানুষ বানিয়েছে বাঘ জন্তুর প্রতীক। বাঘের চরিত্রে জানিবার বিষয় থাকতে পারে বিস্তর, সে সমস্তই ব্যবহার করা ও জমা করা যায় ভাষার প্রতীক দিয়ে।"

কবিত্বের কাজ ও কল্পনার কাজের আলোচনা কবি দুটি পরিচ্ছেদে করিয়াছেন। কল্পনাকে রূপ দেওয়া ভাষার একটা খুব বড় কাজ। ভাষা যখন এই কাজ করে, তখন মানুষের সাহিত্য, কাব্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে লিখিত গ্রন্থের দুটি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করিতেছি। 'অতি-আধুনিক সাহিত্য' ও 'বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য' যাঁহারা পড়েন ও পড়িতে ভালবাসেন, এই কথাগুলি তাঁহাদের ভাল না লাগিতে পারে; কিন্তু তবু সকলের অনুধাবনীয়।

"এই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালো মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, সে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয়। তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হ'তে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তো দেখা দেয় তার ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে, তখন পাতায় পাতায় রঙিনতার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে; সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেইরকম কোন জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে, তখন তারি সাহিত্যে তার শিল্পে কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত ক'রে তোলে।

"মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমজদার হয়ে, আত্মশ্লাঘা ক'রে বেড়াবে তা নয়, তাঁকে পরিপূর্ণ ক'রে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্য্যবান হয়ে সকল প্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। **স্বজাতির সমাধির উপর ফুলবাগান না হয় নাই তৈরি হ'ল।"**

'মাতৃভূমি' ও "মাতৃভাষা" নাম দুটি এবং "স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য" আমরা কোথা থেকে পাইয়াছি, কবি তাহা বলিয়াছেন। রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রভাষা চাই বটে, কিন্তু "তার চেয়ে বড় কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না।" মাতৃভাষা এই 'আপন ভাষা'।

কবি বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 'তত্ত্বকথা' বলা এবং বিজ্ঞানের চর্চা সাধুভাষার মত চলতি বাংলাতেও বেশ হইতে পারে। "নতুন বানানো পারিভাষিকে উভয় পক্ষেরই হবে সমান স্বত্ব।"

গ্রন্থখানির একটি দীর্ঘ অধ্যায় ছন্দ সম্বন্ধে লিখিত। তাহার পর একটি দীর্ঘ অধ্যায়ে তিনি চলতি বাংলার অনেক কথার উচ্চারণের আলোচনা করিয়াছেন। একটি অধ্যায়ে চলতি বাংলার অনেক বিশেষত্বের আলোচনা আছে। যেমন 'মো' প্রত্যয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: "ঐ মো প্রত্যয়ের যোগে বাঁদরামো বলি, কিন্তু সিংহমো বলি না। কিপটেমো হ'ল, দাতামো হ'ল না। পেজোমো বলা চলে অনায়াসে, সেধোমো (সাধুত্ব) বলতে বাধে। একটা প্রত্যয় দিয়ে মনের ঝাল মেটাবার উপায় বোধ করি আর কোনো ভাষাতেই নেই।"

অনেক অধ্যায়ের কোন পরিচয় দেওয়া হইল না। উদ্ধৃত করিবার যোগ্য জিনিষও পুস্তকখানিতে বিস্তর আছে। কিন্তু বাঙালী মেয়েদের নাম সম্বন্ধে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াই শেষ করি।

"আকারযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ধার নিয়েছে, যেমন লতা, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় বাংলায় নেই। সংস্কৃতে আছে জানি, এত বেশি জানি যে, আকারান্ত শব্দ দেখবামাত্র তাকে নারী শ্রেণীর ব'লে সন্দেহ করি। বাংলাদেশের মেয়েদের সবিতা নাম দেখে প্রায়ই আশঙ্কা হয় পিতাকে পাছে কেউ এই নিয়মে মাতা ব'লে গণ্য করে। মেয়েদের নামে চন্দ্রমা শব্দেরও ব্যবহার দেখেছি; আর মনে পড়ছে কোন দুর্যোগে ভগবান চন্দ্রমা স্ত্রী-ছদ্মবেশে বাঙালির ঘরেও দেখা দিয়েছেন, বাঙালির কাব্যেও অবতীর্ণ হয়েছেন। এদিকে নীলিমা তনিমা প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ আকারের টানে মেয়েদের নামের সঙ্গে এক মালায় গাঁথা পড়ে। নিভা নামক একটা ছিন্নমুণ্ড শব্দ শরচ্চন্দ্রনিভাননা (শরদিন্দুনিভাননা?) থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যুক্ত হয়েছে বাঙালী মেয়েদের নামমালায় আকারের টিকিট দেখিয়ে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর শতবার্ষিক সংস্করণ—(১) দুর্গেশনন্দিনী, (২) কপালকুণ্ডলা, (৩) মৃণালিনী, (৪) আনন্দমঠ, (৫) কমলাকান্ত, (৬) বিজ্ঞানরহস্য, (৭) সাম্য।

এই সংস্করণটি উৎকৃষ্ট এন্টীক কাগজে প্রবাসীর আকারে পাইকা অক্ষরে (যে অক্ষরে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপা হয়) সুমুদ্রিত। ছাপার ভুল প্রায় নাই। খুব পরিশ্রম ও যত্নের সহিত সাবধানে মুদ্রিত হইতেছে। আমরা সমালোচনার জন্য যে বহিগুলি পাইয়াছি, সেগুলির কেবল কাগজের মলাট আছে এবং ধার ছাঁটা নাই। ইহাই সুবিধাজনক। এরূপ বহি মালিক নিজের পছন্দ অনুসারে বাঁধাইয়া লইতে পারেন।

এই সংস্করণটি মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরের বদান্যতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার বিজ্ঞপ্তিতে লিখিয়াছেন, "কুমার সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্যমও উল্লেখযোগ্য।"

সংস্করণটির সম্পাদন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস প্রভৃত পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও সাহিত্যবোধ সহকারে করিতেছেন। অনেক অসুবিধার মধ্যে, বহু বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে এই কাজ করিতে হইতেছে। বহু তথ্যপূর্ণ সম্পাদকীয় ভূমিকাগুলি লিখিতেও ইঁহাদের খুব পরিশ্রম হইতেছে।

হীরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন:—

"...বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া ও স্বতন্ত্র ভূমিকা দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্কিমের যে সব ইংরেজী বাংলা রচনা আজিও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং বঙ্কিমের চিঠিপত্রাদি—এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে।"

সম্পাদকদ্বয়কে কিরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইতেছে, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। অধিকন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুকে বঙ্কিমের রচনাপঞ্জী ও রাজকার্যের ইতিহাস এবং সজনীকান্তবাবুকে বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বঙ্কিম সম্পর্কে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইতেছে। সর্বশেষ খণ্ডে হীরেন্দ্রবাবুর লেখা সাধারণ ভূমিকা, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের লেখা বঙ্কিমের সাহিত্য প্রতিভা বিষয়ক ভূমিকা, এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ লিখিত বিভিন্ন ভাষায় বঙ্কিমের গ্রন্থাদির অনুবাদ সম্বন্ধে বিবৃতি থাকিবে।

(১) দুর্গেশনন্দিনী। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৬+৮৮। মূল্য দুই টাকা। ইহাতে উপন্যাসখানি ব্যতীত হীরেন্দ্রবাবুর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, যদুবাবুর ভূমিকা, সম্পাদকীয় ভূমিকা, এবং বিভিন্ন সংস্করণে 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাঠভেদ আছে।

(২) কপালকুণ্ডলা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৩+।০। মূল্য এক টাকা চার আনা। ইহাতে উপন্যাসটি ব্যতীত সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, সম্পাদকীয় ভূমিকা, এবং পাঠভেদ আছে।

(৩) মৃণালিনী। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৮+।০। মূল্য দুই টাকা। ইহাতে উপন্যাসটি ছাড়া সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, সম্পাদকীয় ভূমিকা, ও পাঠভেদ আছে।

(৪) আনন্দমঠ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৯+১।০। মূল্য এক টাকা বারো আনা। ইহাতে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে যদুবাবুর ভূমিকা, সম্পাদকীয় ভূমিকা, Appendix I (History of the Sannyasi Rebellion, from "Warren Hastings' Letters in Gleig's Memoirs"), Appendix II (History of the Sannyasi Rebellion, from "The Annals of Rural

Bengal"), প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন, এবং পাঠভেদ আছে।

(৫) কমলাকান্ত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩১+১১০। মূল্য দেড় টাকা। ইহাতে আছে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, সম্পাদকীয় ভূমিকা, কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র, কমলাকান্তের জোবানবন্দী, পাঠভেদ, এবং পরিশিষ্ট (কাকাতুয়া)।

(৬) বিজ্ঞান রহস্য। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৭+॥০। মূল্য বারো আনা। ইহাতে আছে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, সম্পাদকীয় ভূমিকা, বিজ্ঞান রহস্য, ও পাঠভেদ।

(৭) সাম্য। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৭+১৵০। মূল্য বারো আনা। ইহাতে আছে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, সম্পাদকীয় ভূমিকা, এবং সাম্য।

মানুষ রবীন্দ্রনাথ—শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্নওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; সাহিত্য ভবন প্রেস, ২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি বা অন্যবিধ সাহিত্যিক নহেন; শুধু নানা ললিতকলাবিদ নহেন, শুধু রাজনীতিজ্ঞ, সংস্কারক, বহুবিধ দেশহিত-কর্ম্মী নহেন, শুধু ধর্ম্মাচার্য্য নহেন; শুধু শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ও শিক্ষাবিধায়ক নহেন। তিনি এই সমস্ত এবং তাহার উপর আরও কিছু। তাঁহার ব্যক্তিত্ব যাহা, লেখক এই পুস্তকখানিতে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। "গোড়ার কথা"য় তিনি লিখিয়াছেন:—"বিভিন্ন খণ্ড ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ ক'রে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে মূল সুরগুলি ধরবার চেষ্টা করেছি।...তাঁর বিশাল চিত্তসমুদ্রে মুহূর্তে মুহূর্তে ফেনিল হয়ে উঠছে ঢেউ এর পর ঢেউ। সেই অসংখ্য তরঙ্গের বিচার রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কে করতে পারে! রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে বুঝতে হ'লে চাই আর এক জন রবীন্দ্রনাথ।...আমি শুধু এই পুরুষ সিংহের চিত্তের কয়েকটি তরঙ্গের বিচার করতে চেষ্টা করছি।" তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হইলেও অনেকটা সফল হইয়াছে। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের ও বিশ্লেষণের শক্তি এবং নূতন ধরণের এরূপ একটি বহি লেখার কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপের সাহস প্রশংসনীয়। তিনি অল্পকাল মাত্র কবির নিকটে থাকিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে যতটা বুঝিয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য তিনি যে সবই ঠিক্ বুঝিয়াছেন, এমন বলা যায় না। শান্তিনিকেতনের কর্ম্মপ্রণালী তাঁহার মতে যথেষ্ট সুফলদায়ক হয় নাই। ইহার জন্য তিনি অধিকাংশ কর্ম্মীকে যতটা দায়ী করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় ততটা দায়ী তাঁহারা নহেন। এই কর্ম্মপ্রণালী যে পরিমাণে সফল হইয়াছে তাহার এবং শান্তিনিকেতনের আদর্শের প্রশংসা তিনি অবশ্য করিয়াছেন।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—

"কলাভবন আজ বিশ্বভারতীর গৌরব। কিন্তু অপর অপর ক্ষেত্রে দেখা গেছে বার বার কবি নতুন নতুন কর্মীর ওপর একান্তভাবে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। কখনো বা সে ভার যোগ্যের ওপর পড়েছে কিন্তু কবির আদর্শধারার সঙ্গে তাঁদের আদর্শধারা মেলে নি তাই কিছুদিন পরে ঘটেছে বিচ্ছেদ। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এইয়ে বার বার অযোগ্যের হাতে সে ভার পড়ায় প্রতিষ্ঠানের কাজ পিছিয়ে গেছে। অযোগ্যকে দীর্ঘদিন সহ্য করার আশ্চর্য্য ক্ষমতা কবির চিত্তে দেখা যায়। হয়ত তিনি এত বড় যে অযোগ্যকে অবজ্ঞা করতে তাঁর মন পীড়িত হয়ে ওঠে। জীবনের ক্ষেত্রে এই দরদ উদারতার চিহ্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তা পরিচালককে করে তোলে দুর্বল—কর্ম-অনুষ্ঠানে সৃষ্টি করে অপ্রয়োজনীয় বাধা।

"একথা স্বীকার করতে হবে, এই দরদের ফলে রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন হয়ে উঠেছে যেন একটি 'নোয়ার নৌকা'।"

কলাভবন যে বিশ্বভারতীর গৌরব তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু বিশ্বভারতীর কাজের "অপর অপর ক্ষেত্র" (অর্থাৎ পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, শ্রীনিকেতন ও শিক্ষাসত্র) সম্বন্ধে ব্যাপক যে নিন্দা লেখকের উপরে উদ্ধৃত বাক্যসমূহে উহ্য রহিয়াছে, তাহাতে বহু কর্ম্মীর প্রতি অবিচার হইয়াছে। ইহা সত্য হইতে পারে যে, "অযোগ্যকে দীর্ঘদিন সহ্য করার আশ্চর্য ক্ষমতা কবির চিত্তে" আছে। এখানে সে-বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করা অনাবশ্যক। কিন্তু যাঁহাদিগকে তিনি "দীর্ঘদিন সহ্য" করিয়াছেন বা করিতেছেন সুতরাং বিদায় দেন নাই, তাঁহারা সবাই বা তাঁহাদের অধিকাংশ অযোগ্য এবং যাঁহাদিগকে তিনি বিদায় দিয়াছেন বা রাখিতে চান নাই তাঁহারা সবাই বা তাঁহাদের অধিকাংশ যোগ্য, লেখকের মন্তব্যগুলির এরূপ অর্থ কেহ করে, লেখক বোধ হয় তাহা চান না।

নিম্নলিখিত কথাগুলি কবির উক্তি বলিয়া পুস্তকখানিতে দেখিতেছি।

"'আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাসত্ব নিয়েছিলুম, তখন ভেবেছিলুম নাটক কি, উপন্যাস কি, এই সব বিষয়ে ক্রমশঃ লিখব। কিন্তু'—' কবি রহস্য ক'রে হাসতে হাসতে বললেন: 'তার আগেই বিদায় নেবার সময় এল। দেখ, ওদের মধ্যে একটা আদর্শ নিয়ে কাজ করার অভ্যাস সকলের নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, এর সম্মান বাড়ুক—এরকম আদর্শ নেই। কেউ কেউ ভাবেন, টাকা পাই, কাজ করি। কেবল আশুতোষ ছিলেন যিনি এই আদর্শ নিয়ে কাজ করতেন। আর আজকাল শ্যামাপ্রসাদও করছেন।' কবি ব'লে যান: 'জান, ওরা এমন যে আমি যখন দাসত্ব শুরু করলুম, তখন কেউ কেউ আমায় বললেন, আপনাকে বেশি কিছু করতে হবে না, যাহোক কিছু মাঝে মাঝে ব'লে সেরে দেবেন। এই তো তাঁদের কাজের আদর্শ। তারা কাজ চান না। আমার নাম আছে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তা যোগ ক'রে দিলেন।'"

কবির মুখে যে সকল কথা দেওয়া হইয়াছে তিনি **ঠিক্** তাহাই বলিয়াছিলেন কিনা, জানি না। কিন্তু "কেবল আশুতোষ" "আর আজকালকার শ্যামাপ্রসাদ", নাম কেবল এই দুই ব্যক্তির হওয়ায় মনে হইতে পারে যে, কবির মতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংসৃষ্ট অন্য সকলের বা তাঁহাদের অধিকাংশের আদর্শ নাই—যদিও কবি ঠিক্ এই রকম কথা বলেন নাই। বলিতে পারেনও না; কেননা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আরও লোক ছিলেন ও আছেন যাঁহারা ইহার সম্মান চাহিতেন ও চান। অসাধারণ লোকেরাও সাধারণতঃ সাধারণ কথাবার্ত্তা এরূপ আটঘাট বাঁধিয়া বলেন না যে, যেন তাহাতে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা না থাকে। এই জন্য রিপোর্ট করা সম্বন্ধে খুব বিবেচনা ও সাবধানতা আবশ্যক।

পরিশেষে বক্তব্য, কিছু অনভিপ্রেত দোষক্রটি সত্ত্বেও বহিখানি ভাল এবং বাংলা সাহিত্যে এরূপ বহির প্রয়োজন আছে।

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ১৭০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট হইতে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। প্রথম খণ্ডের ত্রয়োবিংশ সংখ্যা এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম হইতে পঞ্চম সংখ্যা।

বঙ্গীয় মহাকোষের এক এক খণ্ড ৭৬৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবার কথা, কিন্তু প্রথম খণ্ড ৮৪৩ পৃষ্ঠাপরিমিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে সেমি-টাইটেল পেজ, টাইটেল পেজ, পৃষ্ঠপোষকগণের নাম ও বিভাগীয় সংঘের কয়েক জন সম্পাদকের নাম দেওয়া হইয়াছে।

এই মহাকোষের প্রকাশক ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল তাঁহার "নিবেদনে" লিখিয়াছেন যে, ভারতের বাহিরে নানা দেশে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মহাকোষ এবং সাধারণ মহাকোষ যে সব আছে, "বাঙ্গালা বা ভারত-সম্বন্ধে সেগুলিতে বিশেষ কোন তথ্য নাই। যাহা বা আছে তাহাও অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক কথায় পূর্ণ, কাজের কথা বড় একটা পাওয়া যায় না।" এই নিন্দা সম্পূর্ণ ঠিক্ না হইলেও কতকটা ঠিক্। সেই জন্য এবং আমাদের মাতৃভাষায় মহাকোষ আবশ্যক বলিয়া এই মহাকোষ প্রকাশিত হইতেছে। "এক দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য, অপর দিকে দেশের সকল বিষয়ের কথা একত্র সন্নিবেশিত করিবার জন্য একখানি মহাকোষের অভাব বহুদিন হইতেই আমরা বোধ করিয়া আসিতেছি," প্রকাশক এইরূপ লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় মহাকোষ দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ হইতে যাইতেছে। ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রধান সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকবর্গ, বহু বিভাগীয় সংঘের সভ্যগণ ও সম্পাদকগণ পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের জ্ঞান ও পরিশ্রম মহাকোষখানির উৎকর্ষ সম্পাদন করিতেছে। ইহার প্রবন্ধগুলি যেমন লেখকদিগের বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক, তেমনি অনেকগুলি দীর্ঘ প্রবন্ধ স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইলে সাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণের সুখপাঠ্য বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে। এক দিকে এই মহাকোষ বঙ্গ-সাহিত্যের উৎকর্ষ ও বিস্তারের পরিচায়ক, অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের এই কথাও সত্য যে, "এই মহাকোষ সম্পূর্ণ হইলে বাংলা দেশের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে।"

ইহার প্রকাশ বহুব্যয়সাধ্য। এই জন্য ইহার ক্রেতার সংখ্যা যথেষ্ট অধিক হওয়া আবশ্যক।

আচার ও মোরব্বা—স্বর্গতা স্নেহলতা দেবী লিখিত। প্রকাশক এম. সি. সরকার য়্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

বারাণসীর স্বর্গতা স্নেহলতা দেবী আচার ও মোরব্বা প্রস্তুতির কার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার দক্ষতা এলাহাবাদের ফল-উৎপাদক সমিতির (Fruit-growers' Association) দ্বারা একাধিক বার প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত এই পুস্তকটির সাহায্যে মহিলারা নানা রকম আচার ও মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া নিজ নিজ গৃহে ব্যবহার করিতে পারেন, প্রতিবেশীদিগকে উপহার দিতে পারেন, এবং আবশ্যক মত বিক্রী করিয়া কিছু উপার্জ্জনও করিতে পারেন।

পুস্তকটির প্রথম পরিচ্ছেদে, ফল বা শাকসব্জী কি কি কারণে পচিয়া বা অন্য প্রকারে নষ্ট হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক বর্ণনা আছে, এবং ফল-সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ফল বাছাই, খোসা ছাড়ান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাতব্য কিছু বলা হইয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলির বিষয়—আচার, জেলি, মারমালেড, জ্যাম, মোরব্বা, শির্কা, সিরাপ, কর্ডিয়্যাল, গুলকন্দ, ফল-সংরক্ষণ, এবং শাক-সবজি শুষ্ক করা। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা এই বহিটিতে বর্ণিত অন্ততঃ কয়েকটি জিনিষ নিশ্চয়ই প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

ড.।



জার্ম্মানীতে শ্রমিকদের অবসরবিনোদনের জন্য কন্সার্ট
["জার্ম্মানী-ভ্রমণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

বসন্ত-উৎসব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৎসরে বৎসরে আশ্রমের এই আম্রকুঞ্জে দোল-উৎসবের দিনে আমাদের নৃত্যে গানে কাব্যে ছন্দে সুন্দরের অভ্যর্থনা ক'রে থাকি। বসন্তের দক্ষিণ সমীরণে যে দৈববাণী ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে এসেছে এই ধরণীর ধুলায়, তাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত ক'রে নেবার জন্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

পৃথিবীতে দুঃখদৈন্যের ভীষণ রূপ আমরা বৎসরে বৎসরেই দেখেছি; দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, মহামারীর আক্রমণ চারিদিকে যে বিভীষিকা বিস্তার করে, আমরা তার দায়িত্ব বিস্মৃত হ'তে পারি নে। কিন্তু এই সকল রোগশোক দুঃখ-দৈন্যের ঊর্ধ্বে যে আনন্দধারা নিত্য প্রবহমান তাকে স্বীকার করাই আজকের দিনের এই উৎসবের উদ্দেশ্য। এই শালবীথিকার নবীন কিশলয়, প্রস্ফুটিত মঞ্জরী, আম্রকুঞ্জের মধুগন্ধে ভরা মুকুলদল পৃথিবীর বুকে নিত্যকালের যে নৃত্যচ্ছন্দ বহন করে নিয়ে এসেছে সেই ছন্দ ক্ষণকালীন শোকদুঃখের উপরে আনন্দ চাঞ্চল্য জাগিয়ে এসেছে যুগে যুগে কালে কালে।

অতীত যুগে আমাদের পিতামহরা উপনিষদে ব'লে গেছেন—রসো বৈ সঃ—যিনি চিরন্তন আনন্দস্বরূপ, তাঁর এই সৃষ্টির মাঝে ফলে ফুলে আকাশে বাতাসে সুন্দরের প্রকাশ অবারিত। বৎসরে বৎসরে আমাদের নৃত্যে সংগীতে বিশ্বদেবতার বেদীমূলে তাঁরই প্রতিদানের অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে থাকি।

আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয়তার উপক্রমণিকা আমাদের দ্বারের নিকট সমাগত। কঠোর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মহাত্মাজী অনশনব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁর সেই আত্মদানযজ্ঞের আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশে যখন দুষ্টবুদ্ধির চক্রান্ত দেখা দেয় তখন তার ভিতর থেকে এই একটা প্রেরণা আসে যে, কর্মক্ষেত্রে এর বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করব। অন্যায়কে অত্যাচারকে আমরা মানব না, এই কথা বলবার জন্যে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখবার প্রয়োজন আছে বারংবার। এ সহজে ঘটে না। বিশেষত যে দেশে দুর্বলতা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু সেই দৃষ্টান্তের মূল্য দিতে যিনি প্রাণ পণ করেছেন তাঁর এই আত্মত্যাগ দেশ এক দিকে মাথা হেঁট ক'রে আর এক দিকে গৌরবের সঙ্গে গ্রহণ করবে। এই আত্মদান-যজ্ঞের মধ্যে এই মহৎ অর্থ আছে যে, যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে মানুষ লাভ করে কঠিন দুঃখেরই দুর্গম পথে।

ইতিহাসে দেখি, প্রাণের প্রতিদানেই মানুষ চিরপ্রাণের প্রতিষ্ঠা করেছে। মহাত্মাজী এই প্রাণের অর্ঘ্যই নিবেদন করতে বসেছেন ইতিহাস বিধাতার পাদমূলে। বিধাতা সেই নৈবেদ্যকে গ্রহণের দ্বারা পবিত্র ক'রে আমাদের ঘরেই তাকে ফিরিয়ে দেবেন, এই আমাদের একান্ত কামনা।

এই প্রসঙ্গে অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে চাই যে, সব বিকৃতি ও বিভীষিকার উপরে রয়েছেন শান্তম্ শিবম্। যিনি মঙ্গলস্বরূপ তিনি দক্ষিণ হস্তে এই বেদনাদগ্ধ বিশ্বের বুকে কল্যাণবারি সিঞ্চন করেন। সেই কল্যাণের ক্রিয়া গোচরে ও অগোচরে চলেছে ধরণীর প্রাঙ্গণে পুষ্পপল্লবে, আকাশে বাতাসে, অরণ্যের শ্যামলিমায়।

উপনিষদে বলেছে—রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম্ তেন মাম্ পাহি নিত্যম্। যিনি রুদ্র, যিনি ভয়ংকর তিনি তাঁর প্রসন্ন-মুখ আমাদের যেন দেখান। দুঃখ-বিপদ্ সংশয় আশঙ্কার অন্তর থেকেই যাঁর প্রসন্নতার আবির্ভাব, জয়ধ্বনি ক'রে আমরা তাঁর অভ্যর্থনা করব। আজ তাঁর বাণী এসেছে বসন্তে অনাহত বীণায় অশ্রুত গানের সুরে, শালবীথিকার শাখায় শাখায়; তাকে মানুষের বাণীর শিল্প দিয়ে গ্রহণ করব।

মনে এই বিশ্বাস রাখি যে মনুষ্যত্বের সাধনায় এক দিকে

রয়েছে পরম দুঃখ অপর দিকে রয়েছে পরম সুন্দর। বসন্তে আম্রবন অজস্র মুকুল ঝরিয়ে রিক্ততার সাধনা করে কিন্তু সেই সাধনাই সফলতার, সেই সাধনাই পূর্ণ সুন্দরের।

মানুষের শ্রেষ্ঠ দান দুঃখের দান। ত্যাগী পুরুষের হাত দিয়ে মানুষ এই দান ইতিহাসে সঞ্চয় করতে থাকে। সেই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ আহুতির আহরণ আজ দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে। এই আত্মত্যাগের মধ্যে যে কঠোর আছে তারই অন্তরে আছে সুন্দর, আজ আমরা তারই প্রতীক দেখব বনশ্রীর আমন্ত্রণসভায়। দেখব, যা কিছু জীর্ণ ম্লান তা দক্ষিণ হাওয়ায় ঝরে পড়ছে, ধরণীর ধুলায় বিলীন হচ্ছে, আর তারি থেকে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে সুন্দরের শাশ্বত রূপ চির আশ্বাস বহন ক'রে।

২১ ফাল্গুন, ১৩৪৫

শান্তিনিকেতন

[শ্রীসাগরময় ঘোষ কৃত অনুলিপি হইতে মুদ্রিত]

পাহাড়ি মেয়ে

কল্পিতা দেবী

ঘন পাতাঢাকা নাসপাতি-বীথি
জানলাতে ফেলে ছায়া।
সারাবেলা সেথা আলোবাতাসের
ছেলেমানুষির খেলা।
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আকাশে ছড়ানো
ফেনিল অচল ঢেউ ;
তলায় তাহার স্বচ্ছ নীলিম আভা।
ফুরফুরে হাওয়া লেগে
সির্‌সির্‌ করে পাতা
শরৎকালের শুভ্র স্বপ্ন
আকাশে প্রলাপ মেলে।
ভুট্টা ক্ষেতের আড়ে দেখা যায়,
পাহাড়তলির মাঠে
ছোট্ট মেয়েটি ; ছুটে-চলা দেহে
চিকনিয়া ওঠে আলো।
খুরপির ফলা ঝলকে তাহার হাতে।
প্রজাপতি যেন
ডানা মেলে ভেসে চলে
রৌদ্ররঙিন প্রভাতে হালকা হাওয়ায়।
চপল চকিত প্রাণ,
পায়ের তলায় ঘাসে ঘাসে তার
খুশি ক'রে যায় দান।
দিল্‌খোলা এই আশ্বিনে আজি
রূপায়িত করে তারে
আলোর অলংকারে ॥



ত্রিপুরী কংগ্রেসের পথনির্ব্বাচন

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এসসি.

কংগ্রেসের এবার ৫২ বর্ষীয় অধিবেশন। ইহার চলার পথে কত দ্বন্দ্ব, কত বিপত্তি, কত মতবিভেদ দেখা দিয়াছে। চলিতে চলিতে পূর্ব্ব-অনুসৃত পথ কংগ্রেস বহু বার পরিত্যাগ করিয়াছে, পরিচালকগণ নিজেদের মধ্যে মতবিভেদ লইয়া তীব্রতর আন্দোলন করিয়াছেন; আজ মডারেট কাল অসহযোগী, পরে স্বরাজী, অবশেষে কংগ্রেস-গবর্ণমেণ্ট।

কংগ্রেসের প্রাদেশিক কর্ত্তৃত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক এবং আইন-সভা বর্জ্জন করিয়া নূতন ভারত-শাসন আইন ধ্বংস করিতে অভিলাষী।

সর্ব্বজনমান্য, ভারতের নির্দ্দেশক গান্ধীজী সমাজতন্ত্রীদের নিকট হইতে দূরে থাকেন। গান্ধীজীর অনুবর্ত্তী কর্ম্মীরাও তাহাদিগকে পরিহার করিতে উদ্যত। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট পরিচালনকারী কংগ্রেস স্বাভাবিক পরিণতি রূপে ভারতীয় ফেডারেশন গ্রহণ করিবে কিনা, এই প্রশ্নের



শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

কালধর্ম্মে সমাজতন্ত্রী, বিদ্রোহী যুবশক্তি কংগ্রেসে নিজেদের মতপ্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত। ইহারা উত্তর এখন স্পষ্ট ভাষায় সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেস-পরিচালনকারীদের নিকট চাহিতেছেন।



ত্রিপুরী কংগ্রেসে বেঙ্গল কেমিক্যালের দাতব্য ঔষধালয়

তাঁহারা কংগ্রেস-পরিচালনকারীদের ইচ্ছা অমান্য করিয়া যুবশক্তির প্রতীক সুভাষচন্দ্রকে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সে-নির্ব্বাচন মহাত্মা গান্ধী নিজের পরাজয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে সর্দ্দার পটেল প্রমুখ বারো জন কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এদিকে দেশীয় রাজ্য রাজকোটের নৃপতি সর্দ্দার পটেলের চেষ্টায় প্রজাদের যে-সকল সুবিধা দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করায় গান্ধীজী সেখানে গিয়া উপবাস আরম্ভ করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র ১৫ দিন অসুস্থ, সভাপতির গুরুদায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে। তিনি বিনা আড়ম্বরে সমবেত জনসমুদ্র এড়াইয়া নিঃশব্দে অ্যাম্বুলেন্সে ত্রিপুরীতে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

ত্রিপুরীতে পৌছিয়া আমরা দেখিলাম, কংগ্রেস-নগর উদ্বেগে অধীর। গত বৎসরের হরিপুরা কংগ্রেসের মতই বাঁশের চাটাই ঘেরা বহুবিস্তীর্ণ ছাউনি, নানা দোকান, ঝাণ্ডা চক, বেঙ্গল কেমিক্যালের হাসপাতাল, প্রদর্শনী, সুসজ্জিত নানা সভামণ্ডপ, নেতাদের আবাস, গান্ধী-কুটীর ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। স্বেচ্ছা সেবক ও সেবিকারা নগরের সর্ব্ববিধ সেবা করিতেছেন। কিন্তু নগর স্তব্ধ, মুহ্যমান। গান্ধীজীর উপবাস, সভাপতির পীড়া, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুই মতাবলম্বীদের আসন্ন সংঘর্ষ এই পর্ব্বত-বেষ্টিত নগরের উপরে যেন পাষাণের গুরুভার অর্পণ করিয়াছে।

কংগ্রেস ভারতের একমাত্র আশা। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে প্রতিদিন যে দ্বন্দ্ব বর্দ্ধিত হইতেছে ভারতীয় কংগ্রেস তাহাতেও শান্তিবারি সিঞ্চন



বিষ্ণুদত্তনগরে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু



ত্রিপুরী খাদিপ্রদর্শনীর অভিমুখে পণ্ডিত জওাহরলাল, শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু প্রভৃতি

করিয়া জগতের কাছে আশার বাণী বহন করিয়া আনে। তাই কত বিদেশীকেই তো আজ সংসার-বিরাগীর বেশে এই ত্রিপুরীতে দেখিতেছি। সেই কংগ্রেসের অন্তরের উষ্ণ বাষ্প অসহ্য লাগিতেছে।

৭ই মার্চ্চ প্রাতে জওাহরলালজীকে বেষ্টন করিয়া এক দল ও সুভাষচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া অন্য দল নেতা অতি সঙ্গোপনে পরামর্শে নিযুক্ত রহিলেন। আমরা আশা করিলাম, সংঘর্ষ এড়াইবার চেষ্টা জয়যুক্ত হউক, দেশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচুক। কিন্তু দেখিলাম, অপরাহ্ণে বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় সুভাষচন্দ্র আসিলেন না এবং সভাপতির মঞ্চ এড়াইয়া বহুদূরে আসিয়া সর্দ্দার পটেল ও আজাদ সাহেব, প্রধান সমাজতন্ত্রী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের বামে ও ডাহিনে বসিলেন, তখন দর্শকদের মনে বিস্ময় ও নৈরাশ্যের তরঙ্গ উঠিল।

একটু পূর্ব্বে মহাত্মার উপবাসভঙ্গের সংবাদ দিয়া যে জওাহরলালজী আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া সভাপতির মঞ্চের উপর বসিয়া শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, সীমান্ত-গান্ধী প্রভৃতির এবং নিকটে ও দূরের সকলের ফটো তুলিতেছিলেন তিনিও এই দৃশ্য দেখিয়া সহসা নির্ব্বাপিত হইলেন। তার পর অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুত নরসিংহম্ আজাদজীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আট-দশ মিনিটে তাঁহাকে দিয়া সেদিনের মামুলী কাজ শেষ করিয়া দিলেন।

এই সময় জওাহরলালজী সর্দ্দারের নিকট আগত একটি টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া শুনাইলেন-- ইহার অর্থ এইরূপ, "বড়লাট জানাইয়াছেন যে রাজকোটের অধিপতি যাহা যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা পাওয়া যাইবে, যদি রাজকোট-সংস্কার কমিটির অনুমোদিত কোন বিষয় লইয়া রাজকোট-অধিপতির সঙ্গে মতদ্বৈধ ঘটে, তবে সে-বিষয়ের বিচারমীমাংসা ভারতের প্রধান বিচারপতি করিবেন।" ইহা শুনিয়া শ্রোতারা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

মহাত্মার জীবন রক্ষা হইল, হয়ত তিনি অধিবেশনের শেষের দিকে ত্রিপুরীতে আসিতেও পারেন, ইহা ভাবিয়াও বহু লোক উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু মহাত্মার উপবাসে আরও একটি প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হইয়া গেল।



ত্রিপুরী বিষ্ণুদত্তনগরে বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতির সভামণ্ডপ. ও অন্যান্য শিবির

কংগ্রেসের নিয়ন্তা গান্ধীজী ভারতের প্রধান বিচারপতিকে মানিয়া লইলেন। ভারত-শাসন নিয়ম অনুসারে ইনি ফেডারেটেড্ গবর্ণমেণ্টের ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারক এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় নৃপতিদের পরস্পরের বিতণ্ডার নিয়ামক। সুতরাং ইঁহাকে মানিয়া লইয়া ফেডারেশন গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ অগ্রসর হইয়া গেল এবং ইহার বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ যখন ইহার গতিরোধ করিতে অসমর্থ তখন ভারতীয় কংগ্রেসের পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল।

ত্রিপুরী

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪৫

কিশোর কবি

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

তোমার চোখে কি পড়েছে ধরা
আনন্দময়ী বসুন্ধরা ?
কল-কাকলিত প্রভাত-আলো
তোমার চোখে কি লেগেছে ভালো ?
এখনো ওঠে নি ছায়া-যবনিকা সমুখে তব
তোমার গভীর সরল চাহনি হৃদয়ে লব।

তোমার মনে কি জেগেছে সুর—
বাণী বিলসিত মৃত বিধুর ?
আপনার মাঝে আপনি রহি'
তোমার মনে কি জাগে বিরহী ?
ভাব-গুণ্ঠিত গৃহকোণে বসি' সুদূরে চেয়ে
স্বপন-নদীতে গোপনে তরণী চলেছ বেয়ে !

তোমার মনে কি গাহিছে গান
ভাবী দিবসের নেপোলিয়ান ?
তব সুকুমার কপোল-তলে
আগামী কালের আলোক ঝলে।
রূঢ় দিবসের সহস্রফণ কালীয় নাগে
করিবে দমন—ললাটে তোমার আশিস্ জাগে।

এশিয়া মাইনর ও হেজাজ রেলপথ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তের দেশগুলি তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। তখন আরব বলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবদেশবাসীই বুঝাইত। যুদ্ধের প্রারম্ভে তুর্কী-সৈন্যের মধ্যে অনেক আরব জাতীয় সৈন্য ও অনেক আরব সেনাধ্যক্ষ ছিল। শত্রুজয়ের একটি প্রধান অস্ত্র বিপক্ষের দলের মধ্যে বিদ্রোহ-বিবাদ ঘটানো, এবং এই নীতির অনুসারে সমস্ত পশ্চিম এশিয়ার আরবভাষাভাষী জাতি সমষ্টিকে কি করিয়া ইংরাজেরা স্বপক্ষে আনিয়াছিলেন তাহা এখন জগৎবিদিত। যুদ্ধের শেষে যখন তুর্কী সাম্রাজ্য ভূমিসাৎ এবং জার্ম্মান জাতি বলহীন, শক্তিহীন ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সে সময়ে বিজেতার দল—বিশেষতঃ ইংরাজ ও ফরাসী—সকল প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া সাম্রাজ্য-বিস্তারে প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন। আমেরিকার পীড়াপীড়ির ফলে মরুময় আরবদেশ এবং পালেস্তাইনের শুষ্ক ও নীরস অংশ মাত্র (বর্ত্তমান ট্রান্সজর্ডানিয়া) অপেক্ষাকৃত স্বাধীন দেশ-রূপে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইস্তাম্বুল ও তুর্কদেশের সামান্য অবশিষ্ট অংশও নামে স্বাধীন রাখা হয়, কেননা ঐ অঞ্চলের উপর সমস্ত পাশ্চাত্য জাতিরই তীব্র লোলুপ দৃষ্টি ছিল, সুতরাং কেহই তাহা নিজস্ব করিতে সাহস করে নাই।

তুর্কী ও জার্ম্মান সাম্রাজ্যের বাকী অংশ ভাগবাটোয়ারা করা হয়। এক্ষেত্রেও আবার ইটালীকে ফাঁকি দিয়া ইংরাজ ও ফরাসী সবই প্রায় গ্রাস করেন। তবে আমেরিকা বিশেষ চটিতেছে দেখিয়া সোজা সাম্রাজ্য বিস্তার হিসাবে দখল না করিয়া 'ম্যাণ্ডেট' নামক বিলাতি জুয়াচুরীর আশ্রয় লওয়া হয়। এই "ম্যাণ্ডেট" শব্দের লোকভুলানো অর্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ, প্রকৃত অর্থ "জোর যার মুল্লুক তার"। পশ্চিম এশিয়ায় ফ্রান্স লইলেন সিরিয়া এবং ব্রিটেন লইলেন পালেস্তাইন, ইরাক ও ইরাণের কিছু অংশ। মহা ধুমধাম করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে জাতি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সে মহাসভার হস্তে সমস্ত পৃথিবীর শান্তিরক্ষার ভার দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, সে সভায় "ভোট" দ্বারা সব কিছু স্থির করা হইবে ইহা ঠিক হওয়ায় ব্রিটেনের দল ভারী করারও উচিত ব্যবস্থা



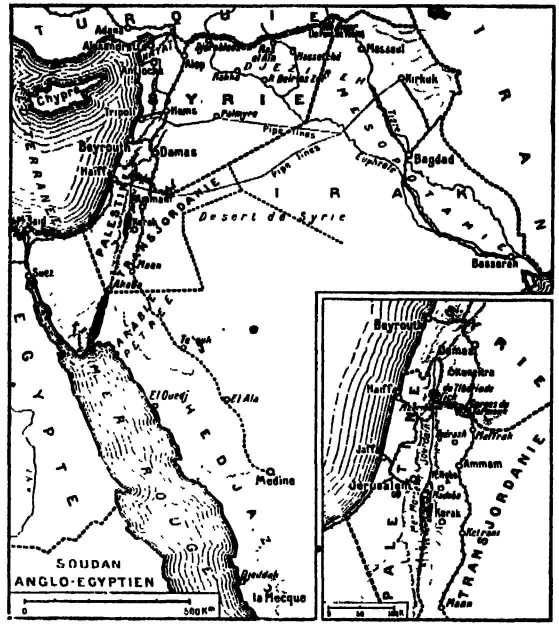
এশিয়া মাইনর প্রবাসী সরকাশিয়-দম্পতি

হইল। জগৎময় সাড়া পড়িয়া গেল যে এবার চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা হইয়াছে, ধরিত্রী স্বর্গে পরিণত হইতে আর দেরি নাই! শান্তিভঙ্গের ভয়ে রুষদেশে "শ্বেত" রুষদিগের সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইয়া রুষসাম্রাজ্যেরও "দায়িত্ব" গ্রহণের চেষ্টা চলিল এবং "অসভ্য" জাপান চীনদেশে জার্ম্মান ও রুষজাতির অধিকৃত অঞ্চলগুলির "দায়িত্ব" গ্রহণের অনুপযুক্ত সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাকে সে সব অঞ্চল উগরাইয়া দিতে বাধ্য করা হইল। ইটালী আবিসিনিয়া ও পূর্ব্ব আফ্রিকার অংশ চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ

দেওয়ায় নির্বীর্য্য ইটালী তখনকার মত তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল।

কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে কলিযুগ শেষ হয় নাই। ধর্ম্মের এতটা প্রভাব বরদাস্ত না করিতে পারিয়া আমেরিকা প্রথমে অসন্তুষ্ট ও শেষে সরিয়া দাঁড়াইল, অশান্ত রুষ শান্তি ভঙ্গ করিয়া স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া ছাড়িল। ওদিকে তুর্ক-বীর গাজী মুস্তাফা কেমাল গ্রীক সৈন্যকে হারাইয়া ইস্তাম্বুল দখল ও আসল তুর্ক দেশকে স্বাধীন করিয়া বসিলেন। ইংরাজ ও ফরাসীর মিলনের বাঁশী বেসুরো বাজিতে লাগিল। ইটালীতে মুসোলিনি দেশব্যাপী কায়কল্পের ব্যবস্থা করিলেন, জাপান বদ্ধপরিকর হইয়া শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। আমেরিকা তাহার ন্যায্য প্রাপ্য গণ্ডা চাওয়ায় ফ্রান্স "কে কার কড়ি ধারে" গাহিয়া দিল। ব্রিটেনও দুই-চারি বার সুর ভাঁজিবার পর ঐকতানে সঙ্গত করিল। জার্ম্মান জাতিও এই সুযোগে দুই চারিটা "হোঁচট" খাইবার পর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

আরব জাতি যুদ্ধের মধ্যে যে সকল প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিল, সে সবই মেকি টাকায় শোধের ব্যবস্থা হইয়াছিল, মক্কাতীর্থের শরীফ হুসেন ও তাঁহার পুত্রগণ—বিশেষতঃ ফৈজল—যুদ্ধের সময় ইংরাজ মিত্রদলের সপক্ষে যাওয়ায় বহু দুর্দ্ধর্ষ আরব উপজাতি কর্ণেল ল্যারেন্স ও অন্য বিদেশী সেনানায়কের নির্দ্দেশমত তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে যুদ্ধযাত্রা করে। যুদ্ধের পর ইংরাজদল পালেস্তাইন ও ইরাকদেশ নিজের হাতে লইয়া আরবদেশে শরীফ হুসেন ও ফরাসী "দায়িত্ব"-গৃহীত সিরিয়ায় এমির ফৈজলকে নৃপতি-পুত্তলিকা হিসাবে বসাইয়া দেন। মিশর দেশ যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইংরাজের অধীন ছিল, যুদ্ধের পর সে আধিপত্য একচ্ছত্র করার ব্যবস্থাও চলিল। যুদ্ধের পূর্ব্বেও এ সকল অঞ্চল স্বাধীন ছিল না, কিন্তু তুর্কীদিগের প্রভুত্ব এবং ব্রিটেনের আধিপত্যে অনেক প্রভেদ। তুর্কীগণ "মনিব" হইয়াই মোটামুটি সন্তুষ্ট ছিল, আরবগণ তাহা মানিয়া চলিলে অন্য কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত না, অন্ততঃপক্ষে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার মত ব্যবস্থা ও কার্য্যতৎপরতা তুর্কীদিগের ধাতে ছিল না। ইংরাজের অধিকার শৃঙ্খলাবদ্ধ



এশিয়া মাইনর ও হেজাজ রেলপথের মানচিত্র

হইতেই আরবগণ দাসত্বের শৃঙ্খলের পরিচয় পাইল এবং তাহাতেই ঐ সকল স্বাধীনতাপ্রিয় যুদ্ধনিপুণ জাতি-উপজাতিদিগের মধ্যে বিপ্লবের সূত্রপাত হইল।

ইরাক ও মিশরে গণআন্দোলন, সিরিয়ায় দ্রুস উপজাতির বিদ্রোহ, আরবদেশে ইবন্ সউদ কর্ত্তৃক শরীফ হুসেনের বংশের উচ্ছেদ এবং একাধিপত্যের স্থাপনা ইত্যাদি ঘটনা এখন ইতিহাসের অঙ্গ। ইহার ফলে আরব দেশ, ইরাক ও মিশরে স্বাতন্ত্র্যের স্থাপনা হইয়াছে। পালেস্তাইনের এক অংশে ট্রান্সজর্ডানিয়া নামে নূতন আরব জনপদের সৃষ্টি হইয়াছে, অল্পদিন হইল ফ্রান্সের "দায়িত্বে"র বদলে সিরিয়াকে "স্বরাজ" দেওয়া হইয়াছে, বাকী আছে পালেস্তাইন। বলা বাহুল্য, কর্ণেল ল্যারেন্সের মারফৎ ব্রিটেন যে বিরাট আরব যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনার প্রচার করিয়াছিলেন তাহার এখন আর কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

ঐ আরবযুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত এশিয়া মাইনর আরব দেশ ও ইরাক একীভূত হইবে এইরূপ ধারণা লইয়াই আরবগণ ইংরাজ মিত্রপক্ষে যোগদান করে। ভূমধ্যসাগর, লোহিত



ট্রান্সজর্ডানিয়ার মান নগরীর একটি রাজপথ

সাগর, পারস্য উপসাগর, ইরাণ সীমান্ত ও বর্ত্তমান তুর্কী রাষ্ট্রের সীমান্ত এশিয়ার যে অংশকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে তাহা লইয়াই এই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ও যুদ্ধের মধ্যে তুর্কগণ তাহাদের সাম্রাজ্যের এই অংশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টায় দুইটি রেলওয়ের যোজনা আরম্ভ করে, একটি ইস্তাম্বুল হইতে আদানা, আলেপ, দামস্কস হইয়া মদিনা পর্য্যন্ত গিয়াছিল, ইহাই প্রসিদ্ধ হেজাজ রেলওয়ে। অন্যটি ইস্তাম্বুল, আলেপ হইয়া টরস্ গিরিমালা ছেদ করিয়া ইরাকদেশে মোসল ও কিরকুক হইয়া বাগদাদে লইয়া যাইবার কথা হয়, কিন্তু ইহা ইরাক পৌছাইবার পূর্ব্বেই তুর্কীসাম্রাজ্যের পতন হয়। সম্প্রতি ঐ রেলওয়ে মোসল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এবং কিরকুক হইতে মোসল পর্য্যন্ত রেলওয়ে যোজনাও অল্পদিনের মধ্যে হইয়া যাইবে। এই ইস্তাম্বুল-ইরাক রেলওয়ের শেষ অংশটুকুই আরব জনপদের মধ্য দিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে হেজাজ রেলওয়ে মক্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে আরবজাতির প্রধান লীলাভূমির মধ্য দিয়া যাইবে। তবে এই রেলপথ "মরুময় আরব" দেশে কারবার হিসাবে কিছু লাভ দেখাইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। মোটরকারের প্রতিযোগিতায় সকল দেশেই রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, এ অঞ্চলে তাহা আরও কঠোর হইবে।

হেজাজ রেলওয়ের যে অংশ বর্ত্তমান আরব দেশে ছিল তাহার ধ্বংসসাধনই কর্ণেল লারেন্সের প্রধান কীর্ত্তি। ইহার ফলে মদিনার তুর্কী সৈন্য রসদ ও সাহায্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের তুর্কী সেনাধ্যক্ষ দমিয়া যান নাই। বহুদিন অমিততেজে যুদ্ধ করার পর এই "বৃদ্ধ ব্যাঘ্র" পরাস্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে হেজাজ রেলওয়ে ট্রান্স জর্ডানিয়ার মান নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইহার অধ্যক্ষ গাস্ক নামে একজন ফরাসী এবং ইহার চালনা দামস্কস হইতে হইয়া থাকে। তুর্কী ও পশ্চিম এশিয়ার এই প্রাচীন যাত্রীপথ দামস্কসের সবুজ উপত্যকা ছাড়াইয়া য়ারমুক অঞ্চলের গভীর গিরিসঙ্কট ও বিশুষ্ক রুদ্রমূর্ত্তি উপত্যকায়



আসিরো-কাল্দীয় পুরোহিত ও পূজা-সহায়ক

প্রবেশ করে। এই উপত্যকা হইতে কর্ণেল ল্যারেন্স মরুদেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালান। ইহার সীমানা টাইবেরিয়াস্ হ্রদের কূলে মজেরিব গ্রাম।

এই ছোট রেল লাইনটির প্রত্যেক অংশ অদ্ভুত ও চমকপ্রদ। দামস্কসের রেলওয়ে ষ্টেশন জার্ম্মানগণ তুর্কদিগের আমলে নির্ম্মাণ করে। তাহার সুন্দর আরব স্থাপত্য, ষ্টেশনের ভিতরে "মাল" হিসাবে নানা প্রকার তৈল, ধূপ, মস্তগী, নানা প্রকার অভিনব খাবার ও মসল্লার সম্ভার, যাত্রীদিগের বিশ্রামের বিরাট হলে মরুবাসী যাযাবর বেদুইন ও পার্ব্বত্য সিরীয়দিগের নানাপ্রকার বেশভূষা ও আকৃতি-প্রকৃতি সব মিলিয়া এক বিচিত্র ভাবের সমাবেশ করে।

দামস্কস্ ছাড়িয়া প্রথমে সুদূরব্যাপী সমতল প্রদেশ আসে। কোথাও বালুময় শুষ্ক প্রান্তর, কোথাও বা যব ও গমের ক্ষেত্রের হরিৎ শোভা। ইহার পর প্যালেস্তাইনের সীমান্ত, সেখানে খাকী উর্দ্দী পরা ব্রিটিশ সিপাহী শাস্ত্রীর কড়াক্কড় পাহারা এবং পাসপোর্টের পর্য্যবেক্ষণ। সীমান্তের পরেই য়ারমুক নদীর ভীষণ খাদ ও উপত্যকার আরম্ভ। এই নদী পরে খৃষ্টানদিগের পবিত্র জর্ডান-নদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। পথে ছয়টি সুড়ঙ্গ পার হইতে হয়। এই স্থানে টেল্ এল্ সেহাব গিরিমালার নিকটে কর্ণেল ল্যারেন্স তুর্ক ও জার্ম্মান সৈন্যদলকে হারাইয়া তাহাদের মদিনায় পলায়ন রোধ করার জন্য রেলওয়ে সেতু ভাঙ্গিয়া দেন। এই পথেই প্রাচীন মিশরের অধিপতি প্রথম সেটি (রামেসিসের পিতা) যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মারকলিপিযুক্ত বিজয়স্তম্ভ এখনও এখানে রহিয়াছে। মজেরিব গ্রাম এখন এই রেল সেতুর শেষ সীমা। গ্রামটি গ্যালিলীর পর্ব্বতমালার নীচে অতি মনোহর পুষ্পোদ্যানের মত দেখায়, কিন্তু এখানকার স্বাস্থ্য এতই খারাপ যে ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদিগকে ক্রমাগত বদলী করা প্রয়োজন।

এই হেজাজ রেলপথ করার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদিগের তীর্থমালা যুক্ত করা। দামস্কস্, মদিনা ও মক্কা, পথে জেরুসালেম ও নবীমুসা, এই সকল পবিত্র নগরী তীর্থযাত্রীদিগের কারাভানের শব্দে শত শত শতাব্দী ধরিয়া মুখরিত হইয়া আছে। দামস্কস্, মদিনা ও মক্কার বিদ্বান উলেমাদিগের বিদ্যামন্দির মুসলমান-জগতে বিখ্যাত, সুতরাং ইহাদের মধ্যবর্ত্তী পথ সুগম করা হইবে শুনিয়া দেশ-বিদেশের মুসলমানরা এই রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ



সিরিয়ার খাবুর নদীর তীরে নির্বাসিত নেস্‌টরীয়দিগের উপনিবেশ

দান করে। ভারতের মুসলমানগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিয়াছিল। কিন্তু রেলপথ মদিনা পর্য্যন্ত পৌঁছিলে দেখা গেল ওপথে যাত্রী ও শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বানের পরিবর্ত্তে তুর্কী সেনা ও শস্ত্রকুশলী সেনাধ্যক্ষেরা সুলতান আব্দুল হামিদের কর ও শুল্ক আদায়ের জন্য হেজাজ চলিয়াছে। তাহাদের জোরজবরদস্তি আরম্ভ হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই মহাযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় কর্ণেল ল্যারেন্সের বিদ্রোহ-চক্রান্তের বিশেষ সুবিধা হয় এবং চক্রান্তের ফলে গরীব ভারতবাসী মুসলমানদের টাকা ডিনামাইটের বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমির ধূলায় মিলাইয়া যায়। নির্ম্মাণকালে এই হেজাজ রেলওয়ে প্রায় ১১৫০ মাইল বিস্তৃত ছিল, এখন আছে মাত্র ৫২০ মাইল এবং তাহার মধ্যে হেজাজ প্রদেশে এক ইঞ্চি পরিমাণও নাই! সম্প্রতি সিরিয়া দেশের অর্থ ও সমর সচিব শুকৃরি বে কুআব্‌লি হজ করিতে গিয়া নৃপতি ইবন্ সউদের সঙ্গে স্থির করিয়া আসেন যে এই রেলপথ পুনর্ব্বার মদিনা পর্য্যন্ত যোজনা করা হইবে। সিরিয়া, ট্রান্সজর্ডানিয়া পালেস্তাইন ও হেজাজ দেশ প্রত্যেকে এই মেরামত ও নির্ম্মাণের জন্য ৩০০০০ স্বর্ণমুদ্রা দিবে। ভারতবাসী মুসলমানদিগের অর্থদানের চিহ্নস্বরূপ মদিনার ষ্টেশন ও ষ্টেশনের প্রাঙ্গণে পুরাতন মরিচাধরা কয়েকটি এঞ্জিন আছে। মেরামতের পর তাহাও থাকিবে না।

পুনর্নির্ম্মাণের পর মক্কা তিনটি মরু রেলপথের লক্ষ্যস্থল হইবে, যথা দামস্কস-হাইফা-মদিনা, দামস্কস-আলেপ্পো-মদিনা ও দামস্কস-মান-মদিনা। এই তিন পথে দেশ-বিদেশের হজযাত্রীর দল মক্কাদর্শনে যাইবার সময় পথের দুধারে টাকা ছড়াইয়া যাইবে। এখন জেদ্দা হইয়া মক্কা যাইবার পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন মাইল পথ ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে ঘেরা। রেল হইয়া গেলে নিতান্ত দরিদ্র ভিন্ন অন্য কেহ ও পথে যাইবে কি না সন্দেহ। যদিও অনেকের মতে ঐ দুর্গম মরু অতিক্রমের পর প্রস্তরময় গিরিমালায় ঘেরা পবিত্র মক্কা নগরীর সৌন্দর্য্য আরও হৃদয়গ্রাহী হয়। সত্য সত্যই জলহীন ভয়াবহ মরুকান্তার পার হইবার পর মক্কাশরীফের প্রথম দর্শনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি হয়। ফরাসী লেখিকার ভাষায় ঐভাবে দেখিলে মনে হয় যেন মক্কা অপার্থিব, যেন ইহা আকাশ ও ধরাপৃষ্ঠের মধ্যে সেতুবিশেষ।

ইবন্ সউদের ব্যবস্থায় মক্কা ক্রমে পশ্চিম এশিয়ার অন্য সকল সমৃদ্ধ নগরীর মত সজ্জিত হইয়া উঠিতেছে। কাফে রেস্তোরাঁ, হোটেল ও দোকান-পথ ভরিয়া উঠিতেছে। শহরে টেলিফোন, বেতার ও সতার-টেলিগ্রাফ ও রেডিওর ছড়াছড়ি। মসজিদ ও পবিত্র স্থান সকল বিজলীর মালায় আলোকিত। পথঘাট পরিষ্কার ও মেরামত করার ব্যবস্থাও হইয়াছে। নৃপতি ইবন্ সউদের নূতন ব্যবস্থায়, পবিত্র কাবার কিস্‌য়া আচ্ছাদন এখন মক্কাতেই প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে বহু শতাব্দী যাবৎ ইহা মিশর হইতে আসিত। ইহার কারুকার্য্যে ভারতীয়

মুসলমান-শিল্পীর পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত থাকিত, কেন না, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত হইত।

পুনরাবৃত্তি করা যাক্। এখন হেজাজ রেলপথ "প্রস্তরময়" আরবদেশে শেষ হইয়াছে। এই দেশ বাইবেলে মোয়াব নামে খ্যাত এবং আধুনিক ভূগোলে ট্রান্সজর্ডানিয়া নামে পরিচিত। প্রাচীন ক্রুসেডের (জেহাদ) আমলের প্রস্তর দুর্গমালায় পূর্ণ এই দেশ এখনও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিশর, সিরিয়া ও আরবদেশের প্রধান পথ অধিকার করিয়া আছে। ইংরাজের পক্ষে এই পথগুলি এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে, কেননা ইহা ভারতযাত্রার নূতন পথ এবং ব্রিটেনের নৌ-বহরের প্রাণস্বরূপ ইরাকের তৈলনালিরও পথ। পালেস্টাইনে বিপ্লবের ফলে এখন ট্রান্সজর্ডানিয়ার রেল ও রাজ-পথ-ঘাট সকল সাঁজোয়া মোটরের পাহারায় সরগরম।

পালেস্তাইন ও ট্রান্সজর্ডানিয়ার সীমানা জর্ডান নদ ও মৃত সাগর। এই মৃত সাগরের ট্রান্সজর্ডানিয়ার কূলে ফরাসী ক্রুসেড যোদ্ধা রেনোল্ড শাটিয়ন নির্ম্মিত কেরাক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও প্রাচীন জেহাদের বিরাট পরিব্যাপ্তির পরিচয় দেয়। এখন এখানে জেহাদের গম্ভীর বিষম যুদ্ধসম্ভারের পরিবর্ত্তে ভারতমুখী নূতন মোটর-পথের পেট্রোল পম্পমালা ও টিনের স্তূপ শোভা পাইতেছে। এখানকার যোদ্ধা আরব উপজাতির অধিপতি এখন শেল পেট্রোলের এজেন্ট। কেরাক হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ প্রেতপুরীর মত অদ্ভুত ও বিকট প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করিলে জর্ডান নদের কূলে জেরাশ শহরে পৌছান যায়। ইহা প্রাচীন গ্রীকো-রোমান রাজধানী এবং এখনও সূর্য্যমন্দির-আদির ভগ্নাবশেষ এখানে আছে। এখানে চতুর্দ্দিকে আরব-পরিবেষ্টিত হইয়া প্রায় আট হাজার সরকাশিয় জাতির লোক বাস করে। এই আর্য্য-জাতীয় লোকেরা ককাসসের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া যুদ্ধক্ষমতার গুণে নিজেদের প্রাচীন বিশেষত্ব বেশভূষা সকলই রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের সিরিয়া ও ট্রান্সজর্ডনিয়ায় আগমন ফরাসী ও ইংরাজদিগের টাকার গুণে। ঐ মিত্রদ্বয় সিরিয়া ও পালেস্তাইনের আরবদিগের "দায়িত্ব" গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পাছে অবুঝ আরবেরা স্বাধীনতার চেষ্টায় শান্তি-ভঙ্গ করে এই জন্য ইহাদের আনাইয়া স্থানীয় সৈন্যদলে দলাদলি ও ভেদনীতির ব্যবস্থা করেন। যাহা হউক, সরকাশিয় জাতি যুদ্ধক্ষম ও মুসলমান, সুতরাং তাহারা নিজেদের রক্ষা করিতে পারিয়াছে। অন্য আর এক জাতি ঐরূপে ইংরাজের "শান্তি-লীলাখেলা"র শোচনীয় ফল ভোগ করিতেছে।

প্রাচীন ইরাকের (তখনও উহার ইরাক নাম হয় নাই) অসুর, বাবিল ও ক্যালদীয় জাতিসকলের সভ্যতা জগৎ বিখ্যাত। ঐ সকল জাতির অবশিষ্ট এক অংশের আধুনিক নাম "আসিরো-ক্যালদীয়ান"। মিশর, ইরান, গ্রীস, রোম ইত্যাদির ঘাত-প্রতিঘাতে যখন ঐ প্রাচীন সভ্যতা লুপ্তপ্রায় হয় তখন এ সকল জাতির এক অংশ খৃষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহা গ্রহণ করে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে ইহারা নেস্টরীয় নামক "ভ্রষ্ট" খ্রীষ্টমত অবলম্বন করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোঙ্গল মুসলমান-গণের অত্যাচারে বিব্রত হওয়ায় ইহারা দেশত্যাগ করিয়া ইরাকের উত্তরে জাব্ নদীর উচ্চ অধিত্যকায় আশ্রয় পায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে সেখানে প্রায় এক লক্ষ "অসুর-ক্যাল্‌দীয়" নিজেদের মত স্বজাতীয় প্রধানদিগের ও পুরোহিতদিগের শাসনে বাস করিতেছিল। তুর্কদিগের শাসনকালে ইহারা প্রায় স্বাধীন ছিল, নাম মাত্র করদান ও তুর্কীদিগের আধিপত্য স্বীকার করায় তাহাদের বাধ্যবাধকতা ছিল।

যুদ্ধের প্রারম্ভে (নবেম্বর ১৯১৪) তুর্কিগণ "জেহাদ" আহ্বান করিলে ইহারা তাহাতে যোগদান করিতে অস্বীকার করে। ফলে বিষম অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া, দেশ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। ১৯১৪ নবেম্বর হইতে ১৯১৮ অগষ্ট পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র জাতি যেরূপ বীরত্বের সহিত অসংখ্য প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে অহর্নিশ যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল, তাহার তুলনা গত মহাযুদ্ধে অতি অল্প ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছিল। চারি বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া বহু শত মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া উহাদের অর্দ্ধেকেরও কম লোক ইরাণের হামাদান নগরে ব্রিটিশ সেনাদলের আশ্রয় লয়।

যুদ্ধের পর ইংরাজগণ ইরাকের "দায়িত্ব" লইয়া এই জাতি হইতে বহু সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রসিদ্ধ "অসুর-বাহিনী" (Assyrian levees) গঠন করে। ইহারা ইরাক বিদ্রোহের সময় অতি বিশ্বস্ত ভাবে এবং শৌর্য্যের সহিত ইংরাজদিগের প্রাণ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে। ইরাক বিদ্রোহের পরও ইহারা নৃপতি ফৈজলের অধীনে বিশ্বস্ত সেনাদল রূপে ছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে ইরাকের "দায়িত্বের" টাকাপয়সা হিসাবের ঘন ঘন কৈফিয়ৎ চাওয়ার ফলে ইংরাজগণ নিজ স্বার্থরক্ষার সকল আটঘাট বাঁধিয়া "দায়িত্ব" ছাড়িয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নেস্‌টরীয়-গণ সৈন্যদল হইতে বিতাড়িত হয়। ইংরেজেরা ইহাঁদের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, কেবলমাত্র উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ফলে বৎসরকাল ধরিয়া তর্কবিতর্কর পর ইহারা যখন দেখিল যে ইরাকীগণ তাহাদিগকে স্বাতন্ত্র্যের কোন অধিকার দিতে প্রস্তুত নহে, তখন ইহারা ইংরাজের নিকট হতাশ হইয়া ফ্রান্সের কাছে সিরিয়াতে আশ্রয় চাহে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে কয়েক শত নেস্‌টরীয় টাইগ্রিস নদী পার হইয়া সিরিয়ায় প্রবেশ করার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, ইহাদের অন্য মিত্র ফ্রান্সও তখন বিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উহাদের তাড়াইয়া দেয়। ভগ্ন-মনোরথ আশ্রয়প্রার্থীর দল যখন পুনর্ব্বার টাইগ্রিস পার হইয়া স্বদেশে ফিরিবার চেষ্টা করে তখন ইরাকী সৈন্য অন্য পার হইতে মেশিনগানের সাহায্যে এই নিরাশ্রয়, অস্ত্রশূন্য জনতাকে হত্যা করে। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-ইরাকের সর্ব্বত্রই নেস্‌টরীয়দিগের উপর আরব জনতা লুঠতরাজ, হত্যা, বলাৎকারের বন্যা বহাইয়া দেয়। ইরাকী পুলিসও এই লুঠতরাজ ও খুনে যোগদান করে। স্বাধীনতা-প্রিয় ইরাকের আরব এইরূপে অন্যধর্ম্মাবলম্বীর স্বাধীনতার আদর দেখায়

এই মাৎস্য ন্যায়ের সংবাদ ক্রমে সভ্যজগতে সর্ব্বত্রই প্রচারিত হওয়ায় ফ্রান্স ও ব্রিটেনের অশেষ নিন্দাবাদ আরম্ভ হয়। তখন জেনেভার জাতিমহাসঙ্ঘ নেস্‌টরীয়-দিগের অবশিষ্ট অংশকে ইরাক হইতে উদ্ধার করিয়া অন্য কোথাও বসাইবার চেষ্টা দেখেন। বলা-বাহুল্য, ব্রিটেনের সাম্রাজ্যে কোথাও তিলমাত্র স্থান পাওয়া গেল না! ব্রেজিল দেশ আশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সেখানে অন্য কারণে কিছু ব্যবস্থা করা যায় নাই। শেষে ফ্রান্স সিরিয়ার উত্তরে খাবুর নদীর জনহীন উপত্যকায় ইহাদের একটি উপনিবেশ স্থাপনে সম্মতি দেয়। এখনও সেখানে এই দুর্ভাগা জাতির অবশিষ্ট দল আছে। কিন্তু আরবদিগের মনোবৃত্তিতে অপরের অধিকার সম্বন্ধে যেরূপ বিচার-ব্যবস্থা হয় তাহাতে ইহাদের সম্বন্ধে "অপরম্বা কিম্ ভবিষ্যতি" ভাবনা হয়। ইহাদের শেষ আশ্রয় ফ্রান্স এবং ফ্রান্সকে ইহারা কোনও প্রত্যক্ষ সহায়তা দেয় নাই, দিয়াছিল ইংরাজকে, সুতরাং ফ্রান্সের কোনও বাধ্যবাধকতা নাই।

হেজাজ রেলপথের কথায় অনেক অবান্তর কথা আসিয়া পড়িল। প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং এখানেই শেষ করা প্রয়োজন। আর এক কথা; এই রেলপথ দামস্কসের দক্ষিণে আরবজাতির অধিকৃত অঞ্চলে চলিয়াছে। উত্তরে কিন্তু আর এক দুর্দ্ধর্ষ জাতির অধিকারে হস্তক্ষেপ হইয়াছে। আলেকজাণ্ড্রেটা, এণ্টিয়োখ ইত্যাদি বন্দরের উপর নব্য তুর্কীগণের শ্যেনদৃষ্টি আছে এবং আরবীয় সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বিচার সম্বন্ধে তাহাদের কোনও ভুল ধারণা নাই।

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

গোপাল হালদার

বৎসরের প্রান্তসীমা যতই ছাড়াইবার উপক্রম করিতেছি ততই বেশী করিয়া আজ আমরা উপলব্ধি করিতেছি এই বিলীয়মান বৎসরের ঘটনাবলী ও তাহার ফলাফলের কথা; আর তেমনি শঙ্কিত স্তব্ধ চিত্তে চিন্তা করিতেছি সমাগত-প্রায় বৎসরের নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর সম্ভাব্যতার বিষয়। দেশ-বিদেশের ঘটনা ও ভাবধারার দ্রুত ও দুর্নিবার্য সঙ্ঘাতে আমাদের চিন্তা ও ভাবনার উপর এমনি একটি অনিশ্চয়তার ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ-যুগের কোনো হৃদয়বান্ বা চক্ষুষ্মান্ মানুষই নিশ্চিন্ত অভ্যাস বশে আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে আপন প্রয়াসে আর তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছে না। গত এক বৎসরের মধ্যে চোখের উপর দিয়া যে ঘটনাস্রোত বহিয়া গিয়াছে তাহাতে চিন্তাশীল মানুষের মন স্বভাবতই মানুষের শুভবুদ্ধির ও সভ্যতার সুমহৎ গর্ব্বে আর আস্থা রাখিতে পারিতেছে না। অথচ সত্যসত্যই মানব-সভ্যতার গতি যে স্তব্ধ হইয়াছে তাহা নয়। জলে স্থলে আকাশে,—বিজ্ঞানের বীক্ষণাগারে, মনস্বীর গ্রন্থশালায় তাহার অপরাজেয় অভিযান নিত্যনূতন জয়ে বিভূষিত হইয়া উঠিতেছে, যাত্রাপথ তাহার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে দিগ্‌দিগন্তরে, কখনো আকাশ ছাড়াইয়া মহাশূন্যের পানে কখনো প্রাণকোষের দুর্লক্ষ্য রহস্যের সন্ধানে; তাঁহার গতির ছন্দ হইয়াছে আরও দ্রুত, আরও চঞ্চল। আসল কথা, সভ্যতা থামিয়া যাই, কিন্তু তাহার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া মানুষের সমাজ নিজেকে পুনর্গঠিত করিয়া লইতে পারে নাই। সভ্যতার গতি এক দিকে আর সমাজ-গতি অন্য দিকে, এই বিরোধের ফলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিজয় মানুষের পরাজয় ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি দান তাহার হাতে আত্ম-হত্যার উপকরণ হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞান চলিয়াছে সম্মুখে, কিন্তু সমাজ পুরাতন আবর্ত্তে পাক খাইতেছে, পুরাতন স্বার্থ-সম্পর্কের জীর্ণ ভিত্তিকেই চাহিতেছে এই বিপুল ঐশ্বর্য্যে দৃঢ়তর করিতে,—মানিতে চাহে না যে, উহার ভরে তাহারা ভিৎ ধসিয়া যাইবে, বুঝিতে চাহে না যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে আপনার সৃষ্টিশক্তির নব-নব বিকাশে, মানব-সমাজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে তাহার পুরাতন সমাজের ও সমাজ-বিন্যাসের রূপান্তর ঘটিতে বাধা, তাহাকে অস্বীকার করিলেই বরং তাহার ভবিষ্যৎকে করা হইবে অস্বীকার, তাহার বর্ত্তমান হইবে সঙ্কীর্ণ, সংক্ষুব্ধ আত্ম-বিরোধে ব্যর্থ।

এই সঙ্কীর্ণতা, এই বিক্ষোভ, এই ব্যর্থতাই একটি বৎসরের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্য দিয়া স্পষ্টতর কঠিনতর হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে—কুয়াসার জাল গিয়াছে অপসারিত হইয়া, মিথ্যা স্বপ্ন গিয়াছে ভাঙিয়া, তথাকথিত গণতন্ত্রের ও উদারনীতির স্বরূপ পড়িয়াছে প্রকাশিত হইয়া।

গত এক বৎসরের ইতিহাস এই গণতান্ত্রিক মোহভঙ্গের ইতিহাস—এই কারণেই আজ মানুষের চিন্তায় ভাবনায়ও এত বিক্ষোভ, এত হতাশা, এত অনিশ্চয়তা।

২

বৎসরের সূচনায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির স্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই।

এশিয়ায় ও ইউরোপে তখন দুইটি গণতন্ত্র-বিনাশী সংগ্রাম চলিয়াছে, প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহের সমিধ্-আহরণ সম্পূর্ণ হইতেছে, নিরপেক্ষতা-নীতির ফলে স্পেন, জার্ম্মান যোদ্ধা ও ইতালীয় স্বেচ্ছা-সৈনিক দলের সঙ্গে সোভিয়েট যুদ্ধ-বিশারদ ও আন্তর্জাতিক বাহিনীর শক্তি-পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; অস্ত্রবল-সমৃদ্ধ নাৎসি ও ফাশিস্ত রাষ্ট্রদ্বয় নূতন সাম্রাজ্যলাভের জন্য অধীর ও অস্থির, জাপানী সমরবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ দৃঢ় সবল পদক্ষেপে সুদূর প্রাচ্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—সাংঘাই, নানকিং তাহাদের পদতলে পিষ্ট, উত্তর-চীন তাহাদের কবলিত, ইয়াংসির জলধারা বাহিয়া তাহাদের রণতরী চীনের হৃৎকেন্দ্রে যাত্রা করিবে। গণতন্ত্রের দুর্দ্দিন বলিতে হয়, কিন্তু তাহার স্বরূপ তখনও অগোচর। জাতি-সঙ্ঘ একেবারে মরে নাই—আবিসিনিয়া-বিজয় সেখানে মানিয়া লওয়া হয় নাই।

এক দিকে রোম-বার্লিন-তোকিওর কোমিণ্টার্ণ-বিরোধী কেন্দ্ররেখা যেমন স্পষ্ট, অন্যদিকে তেমনি স্পষ্ট রহিয়াছে জাতি-সঙ্ঘের সহযোগিতার অন্ত একটি মিত্রতার সূত্র—ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েট রুশিয়া, আর ইহাদের পার্শ্বে গ্রেট ব্রিটেন—এই গণতন্ত্রের বাহিনী।

এই বৎসরের মধ্যে একটু একটু করিয়া এই আবরণ অপসারিত হইয়া গেল। তাহার মূল প্রয়াস কয়টি সহজেই লক্ষ্য করা যায়:—ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব এন্থনি ইডেনের বিদায়-উপলক্ষেই প্রথম ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায়ের গোপন ফাশিস্ত-অনুরাগ প্রকট হইয়া পড়ে; তখন হইতেই কাম্যত ফাশিস্ত-তৃপ্তি সাধন হইয়া উঠে তাহার নীতির লক্ষ্য; ভূমধ্যসাগরের সাম্রাজ্যপথ তাহা হইলে ব্রিটেনের পক্ষে অবাধ রহিবে; মাণ্টায়, মিশরে, সুয়েজে, জিব্রাণ্টারে ব্রিটিশ ঘাঁটি আর বিপন্ন হইবে না। নিকট-প্রাচ্যের আরব রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করিয়া প্যালেষ্টাইনে, ব্রিটিশ-বিদ্বেষে মুসোলিনি আর ইন্ধন যোগাইবেন না। এই নীতিরই ফল জাতি-সঙ্ঘকে দিয়া ইতালীর আবিসিনিয়া-জয় স্বীকার করাইয়া লওয়া; এই নীতিরই ফল ফ্রাঙ্কোর স্পেন-অধিকারে ও স্পেন-বিজয়ে ইতালীর নীরব সহায় প্রদান দ্বারা স্পেন-গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা। প্রকৃত পক্ষে, এই নীতি অনুসরণ করিয়াই গ্রেটব্রিটেন নাৎসি জার্ম্মানিকেও চাহিয়াছে পরিতুষ্ট করিতে। তাই, এই জাতি-সঙ্ঘের নেতৃবর্গের প্রতিশ্রুতি অবজ্ঞা করিয়া হিটলার মে মাসে সবলে অষ্ট্রিয়া অধিকার করিলেন। তারপর আরম্ভ হইল চেকোস্লোভাকিয়ার বিয়োগান্ত নাটকের চমকপ্রদ অভিনয়। প্রথমে, চেম্বারলেনের ঘোষণা যে চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীন সত্তারক্ষায় ব্রিটেন প্রতিশ্রুত; হিটলারের প্রতিশ্রুতি যে চেকোস্লোভাকিয়ার হস্তক্ষেপে তাঁহার ইচ্ছা নাই। দ্বিতীয় অঙ্কে মে মাসের চেক-সঙ্কটে বার্লিনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ব্রিটিশ-সন্দেশ বহন, তারপর রান্সিম্যানের দৌত্যে চেকোস্লোভাকিয়ার ক্রম-দৌর্ব্বল্য-সাধন আবার আক্রমণোদ্যত জার্ম্মানীকে বাধা দিবার জন্য ফ্রান্সের সহযোগে ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যোগ, সর্ব্বশেষে মিউনিকে হিট্‌লার, মুসোলিনি, চেম্বারলেন, দালাদিয়েরের সাক্ষাৎ ও সন্ধি—চেকোস্লোভাকিয়ার সম্মতির প্রয়োজন হইল না, উপস্থিতিরও অপেক্ষা রহিল না—তাঁহার ভাগ্য নির্ণীত হইয়া গেল।

মিউনিকের পরে একেবারেই স্পষ্ট হইয়া গেল যে, এই তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক শক্তি' ব্রিটেন ও ফ্রান্স গণতান্ত্রিক মিলন সূত্র রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র নহে—ইহাদের গণতান্ত্রিক বহির্বাসের তলে যে ফাশিস্ত মনোভাব আচ্ছাদিত ছিল এখন হইতে তাহা

অনাবৃত হইয়া পড়িল। স্পষ্ট হইয়া গেল যে, রাষ্ট্র-কাঠামো যতই গণতান্ত্রিক হউক, রাষ্ট্রশাসন যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধনিক শাসক-শ্রেণীর হস্তে রহিয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত খাঁটি গণতন্ত্রের বিকাশ বা প্রকাশ সেই রাষ্ট্রে সম্ভব নয় ; ক্রমজাগ্রত জনগণ যতই আর্থিক ও রাষ্ট্রিক গণাধিকারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে ততই শাসক-সম্প্রদায় গণতান্ত্রিক অধিকার গুটাইয়া লইয়া আপনাদের শ্রেণী-স্বার্থ ও রাষ্ট্র-স্বার্থ সংরক্ষণে নগ্নমূর্ত্তি ধারণ করিবে। ইহাই দালাদিয়ে চেম্বারলেন প্রমুখ শাসকগণের গণতান্ত্রিকতা বিসর্জ্জনের হেতু,—সাম্যবাদী রুশিয়ার সহিত একত্র হইয়া গণতন্ত্র রক্ষা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। তাহাতে গণতন্ত্র রক্ষা পাইতে পারে ; কিন্তু নিজ নিজ দেশে শ্রমিক-শ্রেণী এতদূর প্রশ্রয় পাইবে যে, ধনিকতন্ত্র বিপন্ন হইয়া পড়িবে, চেম্বারলেন-দালাদিয়ের স্ব-শ্রেণী বিলোপের পথে অগ্রসর হইবে, তাঁহারা স্বজন-হত্যার পাপে লিপ্ত হইবেন। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতিতে ধনিক-তন্ত্রের অবসান সুনিশ্চয়,—তাই তাহার স্বাভাবিক পরিণতির পথ রুদ্ধ করাও প্রয়োজন। মিউনিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলিয়া জার্ম্মানী ও ইটালীকে নিজেদের সমধর্ম্মী বলিয়া কার্য্যত স্বীকার করিল।

এই এক বৎসরের প্রধান আবিষ্কার এই যে—রোম-বার্লিন-তোকিওর কেন্দ্ররেখার সঙ্গে প্যারিস-লণ্ডন কেন্দ্ররেখা প্রায় সম্মিলিত হইতে চাহিতেছে—গণতান্ত্রিক বাহিনীর চেকো-স্লোভাকিয়া বিলুপ্ত, আর সোভিয়েট রুশিয়া একা, নির্বান্ধব, অস্পৃশ্য। বৎসরের প্রারম্ভে শক্তিপুঞ্জের সমাবেশ যে ভাবে ছিল তাহাতেও ভাবা চলিত যে, গণতান্ত্রিক মৈত্রী-বন্ধন বুঝি একটা বাস্তব সত্য ; বৎসরের শেষে আজ স্পষ্ট—গণতান্ত্রিক বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, এই বন্ধনটিই বাস্তব নয় ; বাস্তব যাহা তাহা শ্রেণীবন্ধন, গণতান্ত্রিক সূত্র নয়, ধনতান্ত্রিক স্বার্থ।

মিউনিকের পরে এই কঠিন সত্য সম্বন্ধে অন্ধ থাকিবার উপায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে পরিপুষ্ট, বহু মনস্বী ও চিন্তা-নায়কের পক্ষেই এই সত্য স্বীকার অত্যন্ত ক্লেশকর, তাই তাঁহাদের মানস-লোক এক অসহায় আত্মদ্রোহে শতছিন্ন, বা আত্ম-প্রতারণায় বিমলিন।

মিউনিকের রাষ্ট্রীয় ফলাফল সুপরিচিত। তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইউরোপে "বৃহত্তর জার্ম্মানী" আপন আসনে

অধিষ্ঠিত :—ফ্রান্সের গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে, বল্কান ও বাল্‌টিক জার্ম্মান পক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে ; মেমেল ও ডানসিগ্‌ প্রায় হস্তগত ; পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া আপনার অঙ্গচ্ছেদের সম্ভাবনায় ত্রস্ত ; হিট্‌লার নূতন উক্রেইন রাষ্ট্র পত্তন করিয়া যখন সোভিয়েট রুশিয়াকে পর্য্যুদস্ত করিবেন তখন পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার অধিকৃত উক্রেইন খণ্ডদ্বয়ও সেই দুই রাজ্যের বিসর্জ্জন দিতে হইবে। জার্ম্মানীর এই পূর্ব্বাভিযানের আর বাকী কত তাহাই তাহাদের প্রশ্ন। পোল্যাণ্ড সেই ভবিষ্যতের ভয়ে বাধ্য হইয়াই সমাবস্থ সোভিয়েটের সঙ্গে নিজের পুরাতন বন্ধুত্ব পুনঃ স্বীকার করিয়াছে। অবশ্য প্রশ্ন আসে, বাল্‌টিক হইতে আড্রিয়াটিক পর্য্যন্ত যে বৃহত্তর জার্ম্মানীর ছায়া বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহার সম্মুখে পূর্ব্ব-ইউরোপে কেহই দাঁড়াইতে পারিবে কি ?

কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় ফলাফল অপেক্ষাও মিউনিক যে রাষ্ট্রদৃষ্টির ও রাষ্ট্র-প্রয়াসের পরিবর্ত্তন সূচনা করিয়াছে তাহাই বেশী উল্লেখ-যোগ্য। মিলন-বিরোধ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের দায়ে নিয়ত ঘটিতেছে ও ঘটে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন তাহার অপেক্ষা অনেক গুরুতর। মিউনিকের পূর্ব্ব হইতেই এই কথা স্পষ্ট হইতেছিল যে, ব্রিটেন তাহার আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখিতেও আর তেমন যত্নশীল নয়, পার্লামেন্টের মতামতের অপেক্ষা রাখিয়া মন্ত্রিমণ্ডল কাজ করে না, এমন কি, প্রধানমন্ত্রী হয়ত মন্ত্রিমণ্ডলেরও মত গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন না, একাই সিদ্ধান্ত স্থির করেন। অতি গুরুতর রাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও পার্লামেন্টের মত গ্রহণ না করিয়াই প্রধানমন্ত্রী একা তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হন ; তাহাই পরে পার্লামেন্টকে গ্রহণ করিতে বলা হয়—ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অসহায় ভাবে মাথা পাতিয়া লয়। পার্লামেন্টের কাঠামো অটুট রহিলেও গণতান্ত্রিকতা আর প্রশ্রয় পাইতেছে না, একনায়কত্ব স্থির আসন গ্রহণ করিতেছে, ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ফাশিস্ত শাসনের অনুকূল হইয়া উঠিতেছে। পররাষ্ট্র বিষয়ে, মিউনিক চুক্তি এমনি করিয়া গৃহীত হয় ; সম্প্রতি ফ্রাঙ্কোকেও এমনি করিয়া স্বীকার করা হইল। অন্যদিকে, স্বরাজ্য ও যুদ্ধোপকরণের তাগিদে এক দিকে সমস্ত স্বাধীন শ্রমপ্রতিষ্ঠানের

উপর সরকারী হস্তক্ষেপের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য দিকে ঐ কারণেই শ্রমিকের শ্রমকাল বাড়ানর ক্ষমতাও সরকার গ্রহণ করিয়াছে, সংবাদপত্র প্রভৃতির উপরও সরকারী প্রভাব বিস্তারের সরকারী ও আধা-সরকারী চেষ্টা চলিতেছে। যাঁহারা ব্রিটেনের বহুদিনকার গণতান্ত্রিক মোহের কথা জানেন, তাঁহারা মনে করেন যে, ব্রিটেনের ফাশিস্তবাদ এমনি প্রচ্ছন্ন বেশেই আবির্ভূত হইবে,—চেম্বারলেনই ব্রিটিশ ফাশিজমের অগ্রদূত, মসলি নহেন।

কিন্তু ফ্রান্সে গণতান্ত্রিকতা ক্রম-বিকশিত রাষ্ট্ররূপ নয়, তাহার এইরূপ ক্রমবিলোপও প্রয়োজন হইবে না,—ফাশিস্তবাদ সেখানে আরও প্রকাশ্যরূপেই আবির্ভূত হইতে পারে। দালাদিয়েরের চেষ্টায় তাহা হইতেছেও। ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিহ্ন :—প্রথমত, রিব্বেনট্রোপের দৌত্যে ফরাসী-জার্মান চুক্তি, ইহাতে সোভিয়েট বন্ধুত্ব প্রকারান্তরে প্রায় অস্বীকৃত হইল ; দ্বিতীয়ত, মসিয়ে রেবোর আর্থিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা—ইহাতে সমাজতান্ত্রিক ব্লুমের স্থিরীকৃত ৪০ ঘণ্টা শ্রমকাল কার্য্যত নাকচ হইল, ফরাসী ধনিকশ্রেণীর উপরও করভারের চাপ পড়িল না ; তৃতীয়ত, দালাদিয়েরের শ্রমিক ধর্ম্মঘট ভাঙার নামে আধা-সামরিক নিয়ম-কানুন প্রয়োগ ও কার্য্যত শ্রমিকশক্তির নির্বীর্য্যতা-সাধন ; চতুর্থত, স্পেনের গণতন্ত্রীদের অস্ত্রশস্ত্র ও আহার্য্য প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া ফ্রাঙ্কোর জয়পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, আর সর্বশেষে আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহীদলকে আইনত স্পেনের সরকার বলিয়া স্বীকার করা।

স্বরাজ্য ও পররাজ্য নীতিতে এই ভাবেই গণতান্ত্রিক দৃষ্টির স্থলে শ্রেণী-স্বার্থ-জড়িত ফাশিস্ত দৃষ্টি ক্রমশ ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে এই এক বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে, এইটি চিন্তাশীলদের বিশেষ লক্ষণীয়।

৪

ফাশিস্তবাদ সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থকে স্বাদেশিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাঁড়ায় ; তাহার উগ্র স্বাদেশিকতার সঙ্গে অন্য ফাশিস্তের উগ্র স্বাদেশিকতার ততক্ষণ পর্য্যন্ত কলহ বাধে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই তৃতীয় কোনো সবল বা দুর্ব্বল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিযুক্ত থাকে ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পরে দুর্ব্বলের "ঘাড় মটকাইয়া" নিজেদের পুষ্টিসাধন করিতে পারে। তাই, অষ্ট্রিয়ার বিলোপেও ইতালী নীরব ছিল ; প্রায় টিরলের জার্ম্মানদের জার্ম্মানরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির দাবীও জার্ম্মানী করেনাই। ইহারা দুইজনেই সাম্রাজ্যবুভুক্ষু, জাপানও তাহাই ;—তাই ইহাদের মিলন অনেকদিন পর্য্যন্ত টিকিতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যাধিকারী ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইহাদের সঙ্গে চলিতে পদে পদে বাধা পাইবে ; উহাদের সাম্রাজ্যক্ষুধা মাঞ্চুকু, আবিসিনিয়া, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া দিয়া মিটাইলেই উহারা এই অতিস্ফীত সাম্রাজ্যবাদীদের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিবে। ফাশিস্ত নীতির মধ্যেই এই বিরোধের বীজ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে ; স্বার্থের সঙ্ঘাত একদিন-না-একদিন অনিবার্য্য। ব্রিটেন ও ফরাসী ইহা বুঝিয়াই চাহিয়াছিল, ইউরোপে একটা চতুঃশক্তির বুঝাপড়া হউক, একটা ব্যবস্থা হউক,—তাহা হইলে তাহাদের সাম্রাজ্য তাহারা অবাধে ভোগ করিতে পারে ; অন্যত্র, নিকট-প্রাচ্যে সিরিয়ায় প্যালেষ্টাইনে আফ্রিকায়, কিম্বা জাপানের বিভীষিকা-ত্রস্ত সুদূর-প্রাচ্যে তখন নিজেদের শক্তি তাহারা দৃঢ়তর করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যতই তাহারা ফাশিস্ত-শক্তিদের পরিতৃপ্ত করিতে চাউক, তাহাদের এই আশা সফল হয় নাই, সহজে হইবেও না। জার্ম্মানী আজ চাহিতেছে ইংলণ্ডের কবল হইতে তাহার যুদ্ধাপহৃত উপনিবেশগুলির পুনরুদ্ধার, আর ইতালী চাহিতেছে ফ্রান্সের নিকট হইতে টুনিসিয়া, কর্সিকা, নাইস্, জিবুতি। তাই, চতুঃশক্তির মিলন সুদূরপরাহত ; ব্রিটেন উপনিবেশ প্রত্যর্পণে অনিচ্ছুক, ফ্রান্স ঐসব দেশ ও অঞ্চল ছাড়িতে অস্বীকৃত।

ফাশিস্ত-মিলনের সূত্র ফাশিস্ত স্বার্থের সঙ্ঘাতে এমনি করিয়া ছিন্ন হইয়া যায় অথচ, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে এই অসম্ভব মিলনকে ক্ষণকালের মত সম্ভব করিয়া লইতেই হয়। চেম্বারলেন তাহাই করিতেছেন, দালাদিয়ে তাহাই মানিয়াছেন।

৫

মিউনিকের পথে পুরাতন বৎসরের শেষ দুয়ারে আসিয়া পৃথিবী দেখিতেছে স্পেনে গণতন্ত্রের সংহার ও বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠা। ফ্রাঙ্কোর প্রতিষ্ঠা মিউনিক-পর্ব্বেরই পরিশিষ্টমাত্র, তথাপি উহার বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করিবার মত। স্পেন-গণতন্ত্রের বিনাশের ষড়যন্ত্রে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্থান অবশ্য ইতালী ও জার্ম্মানীর পরে, কিন্তু তাহাদেরই সঙ্গে। গণতন্ত্রের ধ্বংসকামী হিসাবে তাহারা যে ফ্রাঙ্কোর সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে তাহা সহজবোধ্য। কিন্তু ইতালীর সহিত সাম্রাজ্য লইয়া তাহাদের যে বিরোধিতা তাহাতে ফ্রাঙ্কোকে ইতালীর বেনামদার মাত্র হইতে দিলে ইংরেজ ও ফরাসীর স্বার্থ ভূমধ্যসাগরে একেবারে অতলে ডুবিয়া যাইবে। ফ্রাঙ্কোকে



আক্রমণ-বিপর্য্যস্ত বার্সিলোনা। আহারপ্রার্থী নিঃসহায় নরনারীশিশু পথপ্রান্তে উপবিষ্ট।

তাই ইতালীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া স্পেনে নিজেদের মিত্র হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে যে কৌশল গৃহীত হইয়াছে তাহা এই ফ্রাঙ্কো-সরকারের স্বীকৃতি, ইহারই সঙ্গে ইংরেজ-জাহাজে ফ্রাঙ্কোর দূত মাইনরকা দ্বীপ অধিকার করিয়া ইতালীকে উহা দখল করিবার সুযোগ দিল না—ইহার পরে আসিবে স্পেন পুনর্গঠনের জন্ত ইংরেজের ঋণদান। কিন্তু ফ্রাঙ্কো কি ইতালীর কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে,—না এই দুই দলের মধ্যে নিজের স্থান চতুরতার সহিত রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? তাহাই ভবিষ্যতে দ্রষ্টব্য।

৬

বর্ষান্তের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া যাহা সর্ব্বাধিক চক্ষে পড়ে, তাহা শক্তিপুঞ্জের বিপুল সমরায়োজন। এই সমরায়োজন-ব্যয় যোগাইতে জনসাধারণের অশন-বসনের বহু অভাব বাড়িয়া চলিয়াছে—জার্ম্মানীতে হার শাখটের বিদায়ে তাহাই স্বীকৃত হয়। ইংলণ্ডের মনস্বীরাও এই আশঙ্কাই ইংলণ্ড সম্বন্ধে করিতেছেন। এই বিপুল ভার কতদিন জনগণ সহ্য করিবে?" হয়ত বেশী দিন নয়। এই শ্বাসরোধ-কারী অনিশ্চয়তা শেষ করিয়া যুদ্ধ-দেবতা আগামী বৎসরে আবির্ভূত হইবেন—ফরাসী মন্ত্রীর এই উক্তিই হয়ত সত্য।

বিদেশের এই ঘোরতর সম্ভাবনাকে সম্মুখে জানিয়াই স্বদেশে আজ ত্রিপুরী কংগ্রেসে আমাদের রাষ্ট্রকর্ম্মী ও রাষ্ট্রচিন্তানায়ক-সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদের মাথার উপরে দেশীয় সমস্যার দুর্ব্বহ ভার, কিন্তু দেশ-বিদেশের এই দুর্য্যোগরাত্রির মধ্য হইতেই আজ ত্রিপুরীতে জাতীয় সুপ্রভাতের শুভ সম্ভাবনাকে তাঁহাদের উপলব্ধি করিতে হইবে, স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে, উদ্ধার করিতে হইবে।●

২০শে ফাল্গুন ১৩৪৫

ত্রি-পুরীর দো-টানা

আমাদের সংবাদদাতার পত্র

ত্রিপুরী, বিষ্ণুদত্ত নগর,
বঙ্গীয় প্রতিনিধি-শিবির
৮ মার্চ, ১৯৩৯, ২৪শে ফাল্গুন ১৩৪৫

...কাল পৌঁছেছি বিকাল প্রায় সাড়ে ছ-টায়, তখন এ দের দপ্তরখানা বন্ধ। আজ সকালবেলা 'মডার্ণ রিভিয়ু'র কার্ড নিয়ে দেখা করলাম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যাতে বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির (সবজেক্টস্ কমীটির) প্রবেশ-পত্র পাই (এঁরা আমাদের কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনেরই প্রবেশ-অনুমতি দিয়েছেন, বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতির দেন নি)। কর্তৃপক্ষ অক্ষমতা জানালেন। কারণ বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতিতে, মাসিক পত্র দূরে থাক, সব সাপ্তাহিক কাগজকেও প্রবেশপত্র দিতে পারেন নি। যুক্তির দিক থেকে এঁদের কথা বুঝতে পারি। তবে ১২৫ খানা প্রবেশ-পত্র বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতিতেও দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন; আমার সামনেও একখানা হিন্দী কাগজের প্রবেশপত্র বেশ আপোষেই দিলেন। সাধারণ অধিবেশনের প্রবেশপত্র ১০ তারিখে দেবেন, আজ দিলেন না।

বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতির সভা কাল প্রথম হ'ল, দৈনিক পত্রে তার খবর সব বেরিয়ে থাকবে। সুভাষবাবু উপস্থিত হ'তে পারেন নি—মৌলানা আজাদ, জওাহরলালের পরামর্শমত, সভাপতিত্ব করেন। মঞ্চোপরি প্রবীণ নেতারা বসেন নি—শুধু জওাহরলাল, সরোজিনী নাইডু, আবদুল গফ্ফর খাঁ ছাড়া। মনে হয়, এঁরা তিন জন, 'একেবারে নূতনের ছোঁয়াচ এড়াব' এরূপ মনোভাব পোষণ করেন না। কিন্তু পূর্ব্বতন ওআর্কিং কমীটির সদস্য অপর নেতৃমণ্ডলী বসেছিলেন পিছনে—'ব্যাক্‌বেঞ্চার' ব'লে নিজেদের প্রচার করবার জন্য একটা সকৌতুক উগ্রতা এঁদের মধ্যে আছে ব'লে মনে হচ্ছে। তাদের মধ্যে এরূপ চিন্তা আছে—পূর্ব্বে আচার্য্য কৃপালানী প্রমুখের উক্তিতে তা প্রকাশও পেয়েছে—যে এই 'তথাকথিত বামপন্থী'দের একবার "শিক্ষা" দেওয়া দরকার; আমরা 'তথাকথিত দক্ষিণপন্থীরা' যদি একবার দূরে সরে থাকি তাহলে—'বামপন্থীরা' তো শুধু কথাই বলতে জানেন—কাজের দায়িত্ব পড়লে অমনি তাঁরা 'ফেল মারবেন', দায়িত্বের ভারে ঠাণ্ডা হবেন এবং এই 'দক্ষিণপন্থী'দেরই দ্বারস্থ হবেন। আর দেশবাসীরাও যখন দেখবে যে, বামপন্থীরা অকেজো, তখন এই 'দক্ষিণ' দ্বারেই এসেই শরণ নেবে, বলবে, "রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"। কার্য্যতঃ এর ফল হবে দক্ষিণপন্থীদের অসহযোগ—অবশ্য যদি 'বামপন্থীরা' জেতেন, কিন্তু তাঁরা খুব সম্ভব জিততে পারবেন না। তাঁরা তাঁদের "কার্য্যপন্থা" খুব কমিয়ে নিয়েছেন, যে-কোনও একটা সংগ্রামাত্মক কার্য্যপন্থা গ্রহণ করলে যেন দেশের সম্মিলিত শক্তির সহায়তা পেতে পারেন। পরশু সন্ধ্যায় ও কাল সন্ধ্যায় সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদীদের একটা সম্মিলিত প্রস্তাব স্থির হয়েছে—অনেকটা জলপাইগুড়ির প্রস্তাবের অনুরূপ, তবে তা থেকে বাদ দিয়েছেন 'আল্টিমেটাম' সম্পর্কিত কথা; কারণ, তাতে জওআহরলালের অসম্মতি, মহাত্মাজীরও অসম্মতি। সমাজতান্ত্রিকেরা জওআহরলালকে ছেড়ে এগোতে চান না—পারলে কাউকেই তাঁরা ছেড়ে দেবেন না। কিন্তু সে-অবস্থাটা বোঝেন ব'লেই অন্য প্রবীণ নেতাদেরও এবার অভিমান বেশী। জানা গেল, ঠিক গতবারের কার্য্যপন্থা ও ওআর্কিং কমীটিতে সদস্যসংখ্যাধিক্য না থাকলে তাঁরা থাকবেন না। এ-কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। তাহ'লে বিষয়নির্ব্বাচন সমিতি থেকে সংগ্রাম যাবে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে। সাধারণ অধিবেশনে তাহলে এবার অনেক কাজই হবে—গণতান্ত্রিকতার দিক থেকে এ ভালই। গত কয়েক বৎসরের 'কোটেরি পলিটিক্সের' (coterie politics) এই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তাহলে কংগ্রেস তিন দিনে শেষ করা যাবে না—আর, কাজ করবার জন্য তাকে ছোট ছোট বিশেষ সমিতি নির্ব্বাচিত করতে হবে, সাধারণ অধিবেশন শুধু কার্য্যপন্থা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেবে।...

[আমাদের সংবাদদাতার আরও তিনটি চিঠি আসিয়াছে। তাহাতে ত্রিপুরী অধিবেশনের অনেক গূঢ় কথা আছে। কিন্তু স্থানাভাবে এবং আর সময় না-থাকায়, সেগুলি ছাপিতে পারা গেল না।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীনারায়ণ নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত